রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৫৮-শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৫

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক ঃ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হাটের পথে

শ্রীপি. সি. বড়ুয়া

ব্যয়ের অপচয়

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় খরচের আধিক্য প্রয়োজনীয় খরচকে ব্যাহত করিতেছে। ভারতীয় দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্যয়াধিক্যের বহর এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ এখন প্রচেষ্টা করিতেছেন যাহাতে পরিকল্পনার সারাংশ (Core of the plan) কার্য্যকরী করা যায়। ব্যয়াধিক্যের আভ্যন্তরিক খরচ ঘাটতি ব্যয় দ্বারা কিছু পরিমাণ মিটান যায়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের একটি বিপজ্জনক সীমানা আছে যে সীমানা লঙ্ঘন করিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির প্রবল স্রোতে বানচাল হইয়া যাইবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি ব্যয়ের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সীমা অর্থাৎ, ১২০০ কোটি টাকা সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণমাচারী যে ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন পরিত্যক্ত হইল। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় হইবে। পরিকল্পনা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনার মূল কথাটি তুলিয়াছেন, তাহা কিন্তু কার্য্যতঃ অনুসরণ করা হইতেছে না। একদিক দিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে গিয়া অন্যদিক দিয়া ব্যয়াধিক্য ঘটিয়া যাইতেছে।

অম্বর চরখার পরিকল্পনা এইরূপ একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়াধিক্যের নিদর্শন। কেন্দ্রীয় সরকার যে "অম্বর চরখা অনুসন্ধান কমিটি" ১৯৫৬ সনে নিয়োগ করেন তাহার সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ইহা অনাবশ্যকীয় খরচে ভর্ত্তি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে, ১৯৬০-৬১ সনে ভারতের বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ১৭০ কোটি গজে বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার মধ্যে তাঁতশিল্পে ৩০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। যদি ধরা হয় যে, প্রতি অম্বর-চরখায় প্রস্তুত সূতা হইতে বৎসরে অতিরিক্ত ৭২০ গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইবে, তাহা হইলে ৪,২০,০০০ অম্বর-চরখা প্রয়োজন হইবে ৩০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদনের জন্য। পাঁচ বৎসরে তাঁতিদের শিক্ষার বাবদ ও চরখা তৈয়ারির খরচের জন্য ৩৭ কোটি টাকার মত খরচ পড়িবে। ৪ ২০ লক্ষ চরখা প্রতিষ্ঠার খরচ হইবে ৫'৬ কোটি টাকা; ৮'৪০ লক্ষ তাঁতিদের শিক্ষার বাবদ ৯'৫ কোটি টাকা খরচ হইবে, চলতি মূলধন লাগিবে ৩০'২৪ কোটি টাকার এবং প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করিতে খরচ হইবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। অনুসন্ধান সমিতির হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে ৪৭ কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টি করিয়া উৎপাদিত মূল্য সৃষ্টি হইবে ১২'২৪ কোটি টাকার মত। ইহাতে মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত দাঁড়ায় '২৮তে। মিলবস্ত্রের উৎপাদনের তুলনায় এই উৎপাদনের হার অবশ্য কম। মিলবস্ত্রশিল্পে মূলধন-উৎপাদনের হার '৪৫ হইতে '৫৬ পর্য্যন্ত দেখা যায়, অর্থাৎ কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিলশিল্পে মূলধন-উৎপাদনের আনুপাতিক হার তাঁতশিল্পের প্রায় দ্বিগুণ। তাঁতশিল্পকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও রক্ষণ দেওয়া সত্ত্বেও ইহার উৎপাদন খরচ অত্যধিক পড়িবে এবং বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে অম্বর-চরখার পরিকল্পনা ব্যয়াধিক্যের সূচনা করে।

ব্যয়াধিক্য অবশ্য সর্ব্বতোভাবেই ঘটিতেছে। কেন্দ্রীয় অডিট রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ পুরানো সামরিক সম্ভার দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছে। এই পুরানো অস্ত্রশস্ত্র প্রকৃতপক্ষে অকেজো এবং ইহার জন্য এত অধিক মূল্য দেওয়া শুধু গর্হিত নহে, আইনতঃ অন্যায়। ইহাতে ভারতের নিরাপত্তাও ব্যাহত হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হইতেছে ও হইয়াছে তাহার সবটাই বাজে খরচ হইয়াছে; সত্যিকার উন্নয়ন টাকা খরচের তুলনায় কিছুই হয় নাই। সালানপুরে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। উদ্বাস্তু ব্যতীত অন্যান্যদের পুনর্ব্বাসন এই খরচের দ্বারা হইয়াছে। ৯০টি পরিবার পুনর্ব্বাসনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি পরিবারের জন্য প্রায় ২২ হাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হইয়াছে। এই টাকায় কলিকাতা শহরে ছোট ছোট বাড়ী হইতে পারিত, তবে টাকা লুঠের সুবিধা হইত না।

জাতীয় অর্থ অপচয়ের আর একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার ১৯৫৬ সনের অডিট রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ৫,০০০ টাকায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের ১৭ খানি চালু ষ্টুডিবেকার গাড়ী বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেক গাড়ীর গড়পড়তা মূল্য দাঁড়ায় ২৯৪৲ টাকা। এই গাড়ীগুলির প্রত্যেকখানির নূতনের মূল্য ২,৬০০০-২৭,০০০। সুতরাং প্রায় বিনামূল্যেই এইগুলিকে দানখয়রাত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে অবশ্য পশ্চিম বাংলার ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের কাছে নূতন কিছু নয়। গত ১৮ বছর ধরিয়া এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। দামী দামী গাড়ীগুলিকে চালু অবস্থায় জলের দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, নিশ্চয় কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশক্রমে এই ভাবে গাড়ীগুলিকে বিক্রয় করিয়া দিয়া লাভের ব্যবসা করা হয়।* এই ১৭টি গাড়ী ক্রয়ের জন্য ৪৭,০০০ টাকার প্রস্তাব আসে শুনিয়াছি। অধিক মূল্যের প্রস্তাব ছিল দুইটি—একটি ৫১,৭৯৯ টাকা এবং অপরটি ৬৬,৩৮৫ টাকা। এই অধিক মূল্যের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে (কারণ বোধ হয় যে তাহাতে ষ্টেটের লাভ হইলেও সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের কোনও লাভ থাকিত না)। শেষ পর্য্যন্ত মূল্য হিসাবে মোট ৩৬,০০০ টাকা ষ্টেট ট্রান্সপোর্টকে ক্রেতা দিয়াছিল। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট ৩১,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া গাড়ীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মেরামত করিয়া দেয়। সুতরাং ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের দৃশ্যতঃ মোট আয় হইয়াছে মাত্র ৫০০০ টাকা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের এই বাবদ অদৃশ্যতঃ কত

টাকা-লাভ হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আইনের অনুসন্ধান হওয়া উচিত। মোটর গাড়ীগুলির ট্যাক্স দেওয়ার জন্ম প্রদত্ত ১.৪ লক্ষ টাকা ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। অডিট রিপোর্টে এই বে-আইনী খরচ, অর্থাৎ চুরির হিসাব অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ঘাটতিই পূরণ করা হয় ঘাটতি ব্যয় ও করধার্য্য দ্বারা।

ভারতের জাতীয় আয়

ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সনে বর্ত্তমান মূল্যমানে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১১,৪১০ কোটি টাকায়। গত বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত আয় হইতেছে গড়ে ২৯৪ টাকা এবং জনসংখ্যার পরিমাণ হইতেছে ৩৮.৭৬ কোটি। ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যমানের হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১১,০১০ কোটি টাকা এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সনে বাৎসরিক গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ২৮৪ টাকা এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল ২৭৩ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সনে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৮৩ কোটি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (অর্থাৎ ১৯৫১-১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত) ভারতের জাতীয় আয় ১৮.৪ শতাংশ দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে এই বৃদ্ধির অনুপাত ছিল ৫ শতাংশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর এই বৃদ্ধির অনুপাত ছিল ৩.৮ শতাংশ। ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ সনে ছিল ৪৯ লক্ষ এবং ১৯৫৪-৫৫ সনে ছিল ৪৮ লক্ষ। ভারতে গড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদিও ১.২৫ শতাংশ বলিয়া ধরা হইয়াছে, তথাপি দেখা যায় যে, ১৯৫৪-৫৫ সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.২৮ শতাংশ, ১৯৫৫-৫৬ সনে ১.৩১ শতাংশ এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে ১.২১ শতাংশ। জাতীয় আয় ও গড়পড়তা আয় বৃদ্ধি পাইলেও সাধারণ লোকের আর্থিক উন্নতি হইতেছে কোথায়? জীবনধারণের খরচা যে হু হু করিয়া বাড়িতেছে।

রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে কর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয় লইয়া কিছু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বাদানুবাদের উপলক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ কমিশনের রিপোর্ট। জনৈক কংগ্রেসী সভ্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, মৌখিক পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে কি না? ইহার উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এইরূপ মৌখিক পরীক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে প্রার্থীদের চরিত্র ও নিষ্ঠা যাচাই করিবার জন্য। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সত্যই তাহা হয় কিনা। ইহা অবশ্য ঠিক যে, কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ কমিশনের সভ্যরা সকলেই খুব উপযুক্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে কোন লোকের যে কোন প্রকার প্রশ্নের দ্বারা কেমন করিয়া যে চারিত্রিক নিষ্ঠা প্রতীয়মান করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠিতে আমরা অক্ষম। আজ জাতির পরতে পরতে অসাধুতা ভরা, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও বাদ যান না। তাঁহারা সকলে নিশ্চয়ই মৌখিক পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া তবে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে, পরীক্ষার সবটাই ভুল হইয়া গিয়াছে, চরিত্রের গন্ধ একটুও ধরা পড়ে নাই, তবে এ প্রহসন কেন? সাধু সরকারী কর্ম্মচারী যেন ক্রমশঃ বিরল বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে, সুতরাং কর্ম্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা অন্যরকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রার্থী পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইত, মৌখিক পরীক্ষা হইত কেবল লোক দেখানোর জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবান্তর ও উদ্ভট প্রশ্ন করা হইত যাহার সদুত্তর বোধ হয় কমিশনের সভ্যরা নিজেরাই জানেন না। একবার কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত উচ্চপদের জন্য কর্ম্মচারী পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলিতে জানেন কি না। আর কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। লিখিত পরীক্ষায় ভাল করিলেও মৌখিক পরীক্ষায় খারাপ ফল হইলে প্রার্থীর চাকুরী হয় না। অথচ মৌখিক পরীক্ষার কোন বাঁধাধরা নিয়ম কিংবা মাপকাঠি নাই, যাহাকে যাহা খুশী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং খুশীমত নম্বর দেওয়া হয়। এইরূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীকে অযোগ্য প্রমাণিত করা হয়।

আসানসোলে দারোগার মৃত্যুরহস্য

আসানসোলের বড় দারোগা শ্রীমতিলাল সরকারের মৃত্যু লইয়া এক রহস্য-যবনিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে তদন্ত সম্পর্কে পুলিসের আচরণ বিশেষ ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু পুলিস পূর্ব্ববৎ নিষ্ক্রিয়ই রহিয়াছে। আসানসোলের সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা প্রকাশ্যেই (২৫শে মার্চ্চ) পুলিসের বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ আনিয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমতিলাল সরকারের মৃত্যু সম্পর্কে নূতন করিয়া তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ যে নির্দ্দেশ দেন পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাহা মানিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। কিভাবে পুলিস উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। তবে এই সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রয়োজন হইলে সেজন্য কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স ব্যুরো হইতেও লোক আনানো উচিত।

আসানসোলের জলকষ্ট

আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে

প্রচণ্ড জলকষ্ট দেখা দেয়। এবারেও তাহার পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে "বর্দ্ধমান" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"আসানসোল মহকুমার অবস্থা এই প্রসঙ্গে আর একবার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। গ্রীষ্মকাল আগতপ্রায়। পানীয় জলের অভাবে আসানসোলের শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে গ্রীষ্মকালে যে নিদারুণ কষ্ট দেখা দেয় এই বৎসর তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভাদ্র মাসের পরে আর ভালভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় পুষ্করিণীগুলি ইতিমধ্যেই শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই এতদঞ্চলের জন্য করা প্রয়োজন বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতেও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পসমৃদ্ধ এই অঞ্চলের কথা সরকারের চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কাকদ্বীপ অঞ্চলে জলকষ্ট নিবারণে সরকার বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। আসানসোল মহকুমাটিতেও অবহেলা না করিয়া সরকার সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এ বিষয়ে বিলম্ব করিবার কোন অবকাশ নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-পরিচালনা ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে উহার আমূল পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী পরিচালকবর্গের অযোগ্যতা এবং অকর্ম্মণ্যতা বিশেষ প্রকট হইয়াছে। সরকার নির্ব্বাচিত মধ্যশিক্ষা পর্ষত বাতিল করিয়া দিয়া উহার পরিচালন-ভার সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর ছাড়িয়া দিয়া মনে করিলেন যে, তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ফলাফল যাহা হইয়াছে তাহার দুই-একটি বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখিয়াছি। বস্তুতঃ পক্ষে সরকারী নীতি পর্ষৎটিকে জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে মুষ্টিমেয় সঙ্কীর্ণমনা, স্বার্থান্বেষী সরকারী কর্ম্মচারীর প্রভুত্বের ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত করিয়াছে। অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও, পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনে পর্ষত যে অযোগ্যতা (ইহা কি অযোগ্যতা না আরও কিছু?) পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় যে, ছাত্রদের স্বার্থ কিভাবে অবহেলিত হইয়াছে। হিন্দী পুস্তক নির্ব্বাচনে পর্ষত যে কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাহার স্মরণে লজ্জায় অধোবদন হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির পশ্চাতে সরকারী নীতির দায়িত্ব কতখানি, আজ তাহা বিশেষভাবে আলোচনার সময় আসিয়াছে। নিম্নতন শ্রেণীগুলিতে পাঠ্যহিসাবে শিক্ষাবিভাগ যে সকল পুস্তক অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহা পাঠে কাহারও প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। অধিকাংশ পুস্তকেরই ছত্রে ছত্রে ভুল। এ অবস্থায় উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়া ছাত্রগণ যদি নির্ভুল ভাবে তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে না পারে তজ্জন্য ছাত্রদিগকে দোষারোপ করা অনুচিত।

প্রশ্ন এই যে, একই ধরনের ভ্রান্তি এবং গাফিলতী পর্ষতের কার্য্যে একাধিক বার ধরা পড়া সত্ত্বেও কেন তাহার প্রতিকার হইতেছে না? এবিষয়ে কি সরকারী বিভাগের কাহারও কোন দায়িত্ব নাই?

কলিকাতার যানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধি

১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে নয়া পয়সা প্রবর্ত্তনের পর কলিকাতার ট্রাম ও বাস ভাড়ার যে নূতন হার প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যাপক বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, তাহার চাপে বাধ্য হইয়া সরকার ডঃ এইচ, এল. দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিশনের উপর এ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করিবার ভার দেন। কমিশনের সুপারিশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতার ট্রাম ও বাসগুলি মোট ৫৩১টি পর্য্যায় অনুসারে ভাড়া আদায় করে। কমিশনের রায় অনুযায়ী ১৯৮টি পর্য্যায়ের ক্ষেত্রে ভাড়া ৩ নয়া পয়সা বৃদ্ধি পাইবে, মাত্র ৭টি পর্য্যায়ে হ্রাস পাইবে এবং অবশিষ্ট ৩২৬টি পর্য্যায়ে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

নয়া পয়সা প্রবর্ত্তনের পর ট্রাম ও বাসগুলি যে ভাড়ার হার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই। উহা ভাড়া বৃদ্ধিরই সামিল, কমিশন তাঁহাদের এই মূল বিচার্য্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব

কলিকাতা শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় কলেরা এরূপ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে যে তাহার তুলনায় বসন্ত রোগের প্রকোপ চাপা পড়িয়াছে। কলেরা প্রতিরোধে কলিকাতার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ কমিবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কলিকাতায় কলেরা প্রসারের অন্যতম কারণ কলিকাতার জল-সরবরাহ ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলপরিবহনকারী পাইপ-গুলি বহু পুরাতন—ঐ পাইপগুলিই স্থানে স্থানে বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ায় রোগ-সংক্রমণের তীব্রতা বাড়িতে পারিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে খিদিরপুর অঞ্চলে যখন কলেরার প্রকোপ দেখা দেয় তাহারও মূলে ছিল ক্ষীয়মান জলের পাইপগুলি। পাইপগুলির পরিবর্ত্তন বহু সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রতি বৎসর কলেরার প্রকোপ উত্তরোত্তর যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কলিকাতার জলসরবরাহ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার অত্যন্ত জরুরী হইয়াছে।

করিমগঞ্জের যানবাহন সমস্যা

আসামের জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানী তাহাদের ব্যবসায় তুলিয়া দিতেছেন, ইতিমধ্যে আসামের ডিব্রুগড় এজেন্সী, এস. পি. আর. টি. সার্ভিস এবং কোন কোন ষ্টীমার ষ্টেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপরন্তু করিমগঞ্জ হইতে শিলচরের মধ্যবর্তী সকল জাহাজ ষ্টেশন-গুলিই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হইলে কাছাড় জেলার অধিবাসীদের যে কিরূপ অসুবিধা হইবে, তাহার আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানী এতদঞ্চলে নদী-সংরক্ষণ বা সংস্কার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের আচরণও প্রশংসনীয় নহে, আমরা পূর্ব্বেও কয়েকবার এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্থানীয় বণিক সঙ্ঘ ইত্যাদির পক্ষ হইতেও ষ্টীমার কোম্পানীর অবাঞ্ছিত আচরণাদি সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

"জলপথে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বন্দরসমূহ বিশেষতঃ কলিকাতার সহিত কাছাড় তথা আসামের জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থা অব্যাহত না থাকিলে এখানকার লোকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। শুধু লিঙ্ক লাইনের রেলগাড়ীর উপর নির্ভর করিলে সম্প্রতি চিনির ব্যাপারে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেলায়ও অহরহ তাহা ঘটিবে। এই অবস্থায় নদীপথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। অবশ্য পাকিস্থানের মধ্য দিয়া জাহাজ চালাইবার অসুবিধা আছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু তজ্জন্য হাত-পা গুটাইয়া আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত চূড়ান্তভাবে বোঝাপড়া করিয়া তাহাদের জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্যথায় অনতিবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

বাঁকুড়া হাসপাতালের অব্যবস্থা

পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" (৮ই এপ্রিল) লিখিতেছেন :

"বাঁকুড়া সরকারী হাসপাতাল সংলগ্ন মড়িঘরে বিকৃত মৃতদেহ রাখার দরুন পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর মৃতদেহ সংকার লইয়া যে খেলা সুরু হইয়াছে তাহা বর্ব্বরোচিত। উলঙ্গ মৃতদেহকে শহরের জনবহুল রাস্তা দিয়া বাঁশে শূকরের মত বাঁধিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে ও ভীতিজনক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া লইয়া যাওয়া সাধারণ দৃশ্য। শব লইয়া যাইবার জন্য হাসপাতালের উপযোগী একটি গাড়ী আছে কিন্তু তাহা কখনও ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, বহু প্রতিবাদেও কোন প্রতিকার হয় নাই।

গত ৩১শে মার্চ্চ রাত্রে দেখা যায়, মড়িঘর হইতে একটি শব টানিয়া বাহির করিয়া হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিতে থাকে। পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহ লইয়া কুকুরে টানাটানি করিতেছিল। ঐ রাস্তা দিয়া বহু শিশু বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে, ঐ দৃশ্যে তাহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। রোগীদের সম্মুখে ঐ ভাবে মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে দেওয়া হয়ত স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তাদের উচ্চ দার্শনিক মনের পরিচায়ক। হাসপাতাল প্রাঙ্গনটি বর্ত্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাড়ীর ছাদ হইতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জনৈক নিকট আত্মীয় মড়িঘরের নিকটস্থ একটি জমি বাড়ী তৈরীর জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি বাড়ী তৈরী করিতে আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত মড়িঘর স্থানান্তর অথবা মৃতদেহ লইয়া শিয়াল-কুকুরের টানাটানি করিতে দেওয়া বন্ধ হইবে না।

"পোষ্টমর্টেম করা মৃতদেহগুলি নদীর ঘাটে যত্রতত্র ফেলিয়া দিয়া আসার প্রতিকার কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী সাহায্যের টাকা মারিবার জন্য একটি সংকার সমিতি বাঁকুড়ায় অধুনা গঠিত হইয়াছে শুনিয়াছি। হাসপাতালের মৃতদেহ সংকার হইতেছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কাহার দায়িত্ব?"

এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জনসাধারণকে অবিলম্বে জানান প্রয়োজন।

বাঁকুড়ায় খাদ্যসঙ্কট

"শ্রীদুর্মুখ" পাক্ষিক "হিন্দুবাণী"তে বাঁকুড়ায় খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন :

"বাঁকুড়া জেলায় গত বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধান্য হয় নাই। বাঁকুড়া জেলায় একমাত্র ফসল ধান্য, তাহার উপর জলের অভাবে লোকের অন্য চাষ করা সম্ভব হয় না। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনাহার, অর্দ্ধাহার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। লোকে অভাবের তাড়নায় চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে—প্রায়ই চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পুলিস, রক্ষীবাহিনী করিয়াও তাহা আটকানো যাইতেছে না।

"অপরদিকে মিল মালিকদের নিকট হইতে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ চাউল ১৮৷০ টাকা দরে গ্রহণ করিয়া বাকি চাউল অবাধে জেলার বাহিরে প্রেরণের সুযোগ করিয়া দেওয়ায় চাউলের দর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। জেলায় খাদ্যাভাব ও তদুপরি লোকের কর্ম্মাভাব, দুইয়ে মিলিয়া লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে।

"আমরা বিগত ছয়-সাত বৎসর যাবত বলিয়া আসিতেছি যে, জেলায় টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে রাস্তা করিয়া লাভ নাই, উহাতে পুকুর কাটানো হোক। জেলা কর্তৃপক্ষ এতদিনে সে কথা বুঝিয়াছেন। ১লা এপ্রিল হইতে জেলায় টেষ্ট রিলিফের কাজ খোলা সুরু হইবে। শকুনির দল উড়িতেছে। পে-মাষ্টার ও মোহরারের দল ঘোরাঘুরি সুরু করিয়াছেন। কাজ সুরু করার প্রারম্ভে একটি জিনিসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করার জন্য জেলা

কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যেন 'তেলা মাথায় তেল' দেওয়া না হয়। জেলার মধ্যে যে সকল অঞ্চল বিশেষ দুর্গত সেই সব অঞ্চলেই যেন টেষ্টরিলিফ খোলা হয়।"

ত্রিপুরারাজ্যের বাজেট

ত্রিপুরারাজ্যের জননির্ব্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ এবং সরকার-মনোনীত প্রশাসকের ভিতরকার বিরোধ ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। পরিষদ ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সনের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করেন প্রশাসক তাহা অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। প্রশাসক বাজেট দুইটিকে সঙ্গতিবিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়া ফেরত দেন। কিন্তু পরিষদ বাজেটের কোন সংশোধন না করিয়া পুনরায় প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান। প্রশাসক বাজেট অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরিষদের রাজনৈতিকদলমতনির্ব্বিশেষে সকল সদস্যের মধ্যেই বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীশচীন্দ্র-লাল সিংহ এক বিবৃতিতে বলেন :

"জনসাধারণের নিকট আমাদের দায়িত্ব আছে অতএব জন-সাধারণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদিগকে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। যে সকল সংস্থা ও বিষয় পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহাদিগকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করার জন্যই এই বাজেট রচিত হইয়াছে।

তিনি অভিযোগের সুরে বলেন যে, যে সকল সংস্থা ও বিষয় পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে সেই অনুপাতে কর্ম্মী ও যন্ত্রপাতি হস্তান্তরিত করা হয় নাই। অতএব আমাদের পরি-কল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে লোকনিয়োগ, যন্ত্রপাতি খরিদ করার জন্য অর্থবরাদ্দ করিতে গিয়া বাজেটের ঘাটতি বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও পশু-চিকিৎসালয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, রাস্তা, গৃহ, পশু-চিকিৎসালয় হস্তান্তরিত হইলেও কর্ম্মী ও রাস্তা নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি দেওয়া হয় নাই। ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে প্রশাসকের মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিয়া তিনি বলেন যে, হস্তান্তরিত বিষয়ের আনুপাতিক হারে কর্ম্মী, যন্ত্রপাতি, গাড়ী ইত্যাদি পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত করিলে ঐ সকলের জন্য আমাদিগকে পুনরায় ব্যয়বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল না। ত্রিপুরা প্রশাসনের ঘাটতি বাজেটের কথা উল্লেখ করিয়া চেয়ারম্যান বলেন যে, রাজ্যের আয় ৩৫ লক্ষ টাকা হইলেও প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার বাজেট রচনা করিতে হয়। ত্রিপুরা প্রশাসনের ঘাটতি বাজেটের অনুপাতে ত্রিপুরা আঞ্চলিক-পরিষদের ঘাটতি মোটেই বেশী নহে।"

কেন্দ্রীয় সরকার এবং সরকারী ভাষা

বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নীতি আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে নীতি বা নীতির অভাব যে জনসাধারণের স্বার্থের বিশেষ হানি ঘটাইতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা হইতে আমরা সেই দৃষ্টান্ত পাই। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা বরাবর বাংলা ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্য (এবং পরে টেরিটরি) রূপে গণ্য হওয়ার পর বাংলার পদচ্যুতি ঘটে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান, এমন কি আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাবও সরকারের অযৌক্তিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। এ সম্পর্কে ২৩শে মার্চ 'সেবক' পত্রিকার 'দূরবীনে দর্শন' শীর্ষক কলমে যাহা যাহা লেখা হইয়াছে, আমরা তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম :—

"শ্রীদশরথ দেবের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ লোকসভায় জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ বাংলাকে সরকারী ভাষা করার পক্ষে যে প্রস্তাব করেছিলেন তা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীনে আছে। ত্রিপুরার সরকারী ভাষা বাংলা করার জন্য ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এখন পরিষদের দাবী মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকার একটি খুব ভাল কাজ করবেন।

মহারাজার শাসনকালেও বাংলাই ত্রিপুরার সরকারী ভাষা ছিল। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা যখন ভারতভুক্ত হ'ল তখনই সরকারী দপ্তর থেকে বাংলা একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেল। বাংলা ভাষাই সরকারী দপ্তর থেকে উঠে গেল না সরকারী দপ্তরগুলিও আস্তে আস্তে বহু দূরবর্ত্তী অঞ্চলবাসীর হাতে চলে গেল—চালচলনে, ভাবের আদানপ্রদানে ইংরেজী অথবা হিন্দীর প্রাধান্য ঘটল। সাহেবিয়ানা সরকারী দপ্তরেই সীমাবদ্ধ রইল না ইহার রেশ ঘর পর্য্যন্ত ধাওয়া করল, লিপষ্টিক ভেনিটিব্যাগের কাটতি বেড়ে গেল।

লিপষ্টিক ভেনিটিব্যাগ লোকসান যাই করুক, বাংলা ভাষায় অজ্ঞান ব্যক্তিদের নিয়ে ত্রিপুরার লোক মহা ফাঁপরে পড়েছে। তাঁদের সাথে অর্থাৎ সরকারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করাই মুস্কিল। এই অবস্থার জের দেখা দিল প্রাদেশিকতায়, স্বজনপ্রীতিতে। যার ফলে দেখা দিয়েছে চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি। ব্যবসা, বড় বড় চাকুরী, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এখন আর ত্রিপুরার অধি-বাসীর প্রাপ্য নয়। সোজা কথায় বলা চলে যে, পাঁচসালা পরি-কল্পনায় রাজ্যের লোকের কর্ম্মসংস্থান না হয়ে এখন ভিন্ন রাজ্যবাসীর বেকারত্ব কিভাবে ঘুচানো যায় সেই এক ভয়াবহ প্ল্যান কিছুসংখ্যক নবাগত লোকদের মাথায় কাজ করছে এবং এ কয় বছরে তার কিছুটা সাফল্য লাভও ঘটেছে।

বাংলাকে সরকারী ভাষা বলে মেনে নিলে এইরূপ রাষ্ট্রদ্রোহী পরিকল্পনা বানচাল হতে পারবে অন্ততঃ এইটুকু আশা করতে পারি।"

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষা

গত ২৬শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৬০ সনের মধ্যে

বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের দাবি জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়ন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার জন্যও প্রস্তাবে অনুরোধ জানান হয়। যে সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ অপরিহার্য্য সেই সকল ক্ষেত্রে সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী আরও কিছুকাল থাকিতে পারে বলিয়াও প্রস্তাবে বলা হয়। প্রস্তাবের অপরাংশে সরকারী হিন্দী কমিশনের রায়ের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দী বা অপর কোন ভারতীয় ভাষা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিতে পারে ততদিন ইংরেজী ভাষা পূর্ব্ববৎ বজায় রাখা হউক।

পূর্ণ প্রস্তাবটি এইরূপ: "যেহেতু ভারতের সরকারী ভাষা নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি এক্ষণে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইতেছে এবং যেহেতু বিধানসভা সরকারী ভাষা কমিশনের প্রস্তাবের সহিত একমত হইতে পারে নাই, সেইজন্য বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে—(১) সমস্ত রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যাবলীতে ভারত সরকার নির্দ্দেশ দিবেন, সেই সব কার্য্যে সংস্কৃত ব্যবহার করা হউক; (২) যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দী অথবা অন্য কোন কোন ভাষা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার উপযুক্ত হইয়া না উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা ইংরেজীর ব্যবহার অব্যাহত রাখা হউক; (৩) এই রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের এবং এই রাজ্যের সহিত কেন্দ্রের আদান-প্রদান দুই ভাষায় হইবে—একটি ভাষা হইবে এই রাজ্যের সরকারী ভাষা বাংলা এবং অপরটি হইবে কেন্দ্রীয় সরকার যখন যে ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্থির করিবেন সেই ভাষা; (৪) বাংলা ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের জন্য সত্বর আইন-প্রণয়ন করা হউক এবং উহাতে ব্যবস্থা থাকুক যে, যেখানে যেখানে সরকার অপরিহার্য্য মনে করিবেন সেখানে ইংরেজীও চালু রাখা যাইবে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যাহাতে বাংলাকে সরকারী ভাষায় পরিণত করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করা হউক; (৫) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের কি স্তরবিন্যাস হইবে তাহা বিশেষজ্ঞ কমিটির সহিত আলোচনাক্রমে সরকার স্থির করিবেন; (৬) এই রাজ্যে শিক্ষার বাহন এবং পরীক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে ভাষাগত সংখ্যালঘুরা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে পারেন এবং পরীক্ষা দিতে পারেন।"

বিলম্বে হইলেও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যগণ বাংলা ভাষাকে তাহার যোগ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। আমরা আশা করি যে, রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত বসিয়া না থাকিয়া অবিলম্বেই তৎপর হইবেন। বিধান পরিষদে সরকারী ভাষারূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাংলার স্বীকৃতিদান নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে অনেক অবাঙ্গালী সদস্য থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেহ ভোট দেন নাই। ইহা প্রস্তাবটির যৌক্তিকতারও পরিচায়ক।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ এবং সরকারের সহিত যোগাযোগের অধিকার মানবের মৌলিক অধিকারগুলির অন্যতম। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও এখনও পর্য্যন্ত ভারতের কোন রাজ্যেই রাজ্যবাসীর মাতৃভাষা উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারী কার্য্যের বাহনরূপে পূর্ণ স্বীকৃতি পায় নাই। বহুদিন যাবৎ ইংরেজীতে অভ্যস্ত থাকার ফলে এবং ইংরেজ আমলে দেশীয় ভাষাগুলির প্রতি উদ্দেশ্যমূলক অবহেলার ফলে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে অন্য ভাষার ব্যবহার নানা দিক হইতেই সমস্যাপূর্ণ। কিন্তু সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে না পারিলে কোনদিনই দেশীয় ভাষাগুলি তাহাদের স্ব স্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিলে প্রথমেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক রাজ্যেই মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। গোড়ার দিকে ইহাতে অবশ্য আংশিক অবনতি ঘটিতে পারে, কিন্তু পরিণামে এই প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার কোন খারাপ প্রভাবই থাকিবে না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ১৯৪০ সনের পূর্ব্বে বাংলা দেশে ম্যাট্রিক (বর্ত্তমানে স্কুল ফাইন্যাল) পরীক্ষার মাধ্যমও ছিল ইংরেজী। তখন বাংলা ভাষায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার পুস্তকাদি রচনা, পঠন-পাঠন যে সম্ভব তাহা অনেকেই ভাবিতে পারিতেন না। আজ বাংলা ভাষায় বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া চলে। শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা গ্রহণের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব্ব বিস্তার ঘটিয়াছে, অন্যথা তাহা অসম্ভব হইত। তুলনামূলক বিচারে দেখা যাইবে যে, গত দুই দশকে বাংলা ভাষায় যতসংখ্যক এবং যত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী এক শত বৎসরেও তাহা হয় নাই। ভারতের অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কেও যে এই উক্তি খাটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা গ্রহণের সুফল যদি এরূপ ব্যাপক হয় তবে সর্ব্বস্তরে মাতৃভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে, এ সম্পর্কে সন্দেহ অমূলক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজ্যের স্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগে ইতস্ততঃ করিলেও সর্ব্বভারতীয় স্তরে ইংরেজীকে অবিলম্বে উঠাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভারতের সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী চিরকাল থাকিতে পারে না, একথা সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখনই ইংরেজীকে পরিত্যাগ করা যায় কিনা সে সম্পর্কে অবশ্যই গভীর মতপার্থক্য রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে যখন হিন্দীকে গ্রহণের কথা বলা হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাহার কারণ এই নহে যে, অ-হিন্দীভাষীরা হিন্দীকে দেখিতে পারে না। তাহার কারণ স্বতন্ত্র। হিন্দী ভারতের অন্যতম

ভাষা এবং একাধিক রাজ্যের অধিবাসীদের মাতৃভাষা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যেই হিন্দী পরিপূর্ণ ভাবে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি পায় নাই। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে সকল নেতৃবৃন্দ রাজ্যের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেও হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে এখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কি কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অবিলম্বেই হিন্দীকে চাপাইয়া দিবার জন্ত এরূপ উৎসাহী হইয়াছেন? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। সেহেতু হিন্দীভাষী সজ্জন এবং অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলের জনসাধারণ হিন্দীর বিরোধিতা করিয়াছেন। যদি কোন কোন অঞ্চলে এই হিন্দী-বিরোধিতা অবাঞ্ছিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে তজ্জন্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী হিন্দী-উৎসাহী রাজনৈতিক চক্র।

হিন্দীকে চাপাইয়া দিবার জন্ত হিন্দী-সমর্থকরা ধুয়া তুলিয়াছেন, হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা না হইলে ভারতের ঐক্য ব্যাহত হইবে। এই ঐক্যের জিগীর প্রকৃত ঐক্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভারতের ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি হইতেছে বিভিন্ন জাতি এবং ভাষাভাষীর মধ্যকার স্বেচ্ছাকৃত মিলন এবং সহযোগিতা। ভারত রাষ্ট্রে সকলের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকিলেই ভারতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হইতে পারে। জাতিবিশেষ বা ভাষাবিশেষ বা রাজ্যবিশেষের মুষ্টিমেয় অভিসন্ধিকারীদের অন্যায় উদ্দেশ্য চাপানোর মধ্য দিয়া সেই ঐক্য বজায় থাকিতে পারিতেছে না।

সংস্কৃত ও সার মির্জ্জা ইসমাইল

সার মির্জ্জা ইসমাইল ভারতের অন্যতম কৃতী সন্তান। শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তানদের ন্যায় সার মির্জ্জা আজীবনকাল নিজেকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে রাখিয়াছেন। সকল বিষয়েই তাঁহার বক্তব্য বিশেষ শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃত সম্পর্কে সার মির্জ্জা যাহা বলিয়াছেন, আমরা সকলের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ হইল ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করা হউক। সংস্কৃত কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা হইতেও অনুরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সার মির্জ্জার বক্তব্যের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সার মির্জ্জা ইসমাইল বলিতেছেন :

"As for a Lingua Franca for India, I wonder if this cannot solve itself in the evolution of a simplified Sanskrit for the man in the street.

With the increasing necessity for a common language, now that India is awake to her national destiny and travel and broad-casting are diminishing distance—speaking as a well-wisher of Hindus, I feel strongly that Sanskrit learning should be fully encouraged, thus discharging a sacred duty to their civilisation and culture.

It is a priceless heritage and should be shared by all. We should respect the traditions of Scholarship through which the Sanskrit language has come down to us from antiquity. In view of the living value to the whole Indian Nation we should opine, make the teaching of it nation-wide.

Its philosophical truth, described as among the most astonishing productions of the human mind in any age and in any country and its scientific aspects would naturally remain the interest of an intellectual minority which must be encouraged and helped.

But as a spoken language in a simplified popular form, it would pass beyond any particular caste or group and become popular in the widest sense of the term."

সরকারী খাসজমি বিলির অব্যবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চলে সরকারী খাসজমি বিলি ব্যাপারে অব্যবস্থা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনায় স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন :

"এতদঞ্চলে সরকারের খাসজমি ঠিকা, ফসলী অস্থায়ী বিলি-বন্দোবস্তের কাজ চলিতেছে, এ সম্পর্কে আমরা পল্লী অঞ্চল হইতে কিছু কিছু অভিযোগ পাইতেছি। অভিযোগে প্রকাশ—কোন কোন স্থানে সরকারী তহশীলদারগণ এখন "নিকাশী" খরচ হিসাবে টাকায় এক আনা বা দুই আনা প্রজাদের নিকট আদায় করিতেছেন। এইরূপ নিকাশী খরচ আদায়ের সরকারী কোন বিধান নাই, সুতরাং বলা বাহুল্য আদায়ীকৃত সমুদয় অর্থই অসাধু তহশীলদারগণের পকেটস্থ হইতেছে। এ ছাড়া আর একটি অভিযোগ এই যে, বরাবর যে সমস্ত প্রজা জমিজমা সরকারের খাস হইবার পূর্ব্বে ভাগে চাষাবাদ করিত, বর্ত্তমানে উক্ত জমি সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঠিকা বন্দোবস্ত করিবার সময় তাহাদিগকে অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হইতেছে না। সাবেক চাষীরা প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নাকচ করিয়া নূতন লোককে তদ্বির করিয়া আমদানী করিয়া এই সমস্ত খাসজমি ঠিকা বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করিয়া যে দুর্নীতির রাজত্ব চলিতেছে তাহাই নাকি এই ধরণের পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ। শোনা যাইতেছে যে, যদি কোন জমি বিঘাপ্রতি সরকারী ভাবে তিন-চার টাকায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেছে সে ক্ষেত্রে আদায় হইতেছে বিঘাপ্রতি

২৫।৩০ টাকা। এই উপরি টাকাটা কাহার পকেটে যাইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অস্থায়ী ঠিকা বন্দোবস্ত কতকটা ভাগে বিলি বন্দোবস্ত করার বিকল্প মাত্র, ভাগচাষ আইনের নিয়মানুযায়ী যেখানে ভাগীদারের কোন গুরুতর অপরাধ না থাকিলে তাহাকে বাতিল করা যায় না, সেখানে সরকারী পর্য্যায়ে সাবেক চাষীদিগকে অন্যায় লোভের আশায় বেপরোয়া ছাঁটাই করা কোন রকমেই ন্যায়-সঙ্গত নহে।

আমরা উপরোক্ত উভয় অভিযোগের প্রতি সরকারের গুরুতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার প্রতিকারের দাবী জানাইতেছি।"

পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ সমস্যা

শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে প্রতি বৎসরই পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহে অভিভাবকদের দুর্গতির অন্ত থাকে না। এই দুর্গতির জন্য প্রথমতঃ দায়ী সরকার নিজে। সরকারী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "কিশলয়" পুস্তক অবশ্যপাঠ্য, কিন্তু উহা কিনিতে পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। প্রথমতঃ অধিকাংশ দোকানদারই পুস্তকটি রাখে না। যে কয়েকটি বিশেষ দোকানদার "কিশলয়" রাখে, তাহারাও অর্থপুস্তক সঙ্গে না কিনিলে "কিশলয়" বিক্রয় করে না। বৎসরের পর বৎসর এই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে অথচ তাহার কোন প্রতিকারের উপায় কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিতেছেন না। কয়েকটি পুস্তকালয়ে উহা বিক্রীর জন্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেখানে সাধারণ ক্রেতা পাইকারদিগের ঠেলায় ঢুকিতে পারে না।

ছাত্র ও অভিভাবকদিগকে এই দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করা সরকারের এমন কিছু কঠিন নহে। দুগ্ধ বিভাগের নিকট হইতে সরকার এ বিষয়ে সহজেই একটি আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রচার দপ্তরের ভ্যানে সরকার কলিকাতায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 'কিশলয়' পুস্তক সরবরাহ করিতে পারেন। অনুরূপভাবে মফঃস্বলের শহরগুলিতেও "কিশলয়" বিক্রয় করা যাইতে পারে।

কালনা থানায় অব্যবস্থা

১৯শে মার্চ্চ তারিখে সাপ্তাহিক 'বর্দ্ধমান'-এ প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, কালনা থানায় অত্যন্ত অব্যবস্থা চলিতেছে। থানা অফিসাররা তদন্তে বাহিরে গেলে জনসাধারণের অভিযোগ শুনিবার জন্য থানায় কেহই থাকে না যদিও সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী সর্ব্বদাই থানায় একজন এ. এস. আই থাকিবার কথা। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, যদি থানার পুলিসকে কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তাহারা চোখ রাঙাইয়া উঠে।

এই সংবাদটি সত্যই আশ্চর্য্যজনক। থানায় নিয়ম জনসাধারণ প্রয়োজনের সময় পুলিসকে পাইবেন না এ কেমন কথা! আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৭শে মার্চ্চ "বর্দ্ধমান বাণী" পত্রিকা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন। কবির দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া আমরা পাঠকদের গোচরার্থে তাহা প্রকাশ করিলাম :

"এক মনোরম অনুষ্ঠানে গত ১৩ই মার্চ্চ পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী তাঁহার জন্মস্থান কাটোয়া মহকুমার কোগ্রাম পল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক ডাঃ অবনীভূষণ রুদ্র অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় জন্মোৎসব-সভায় পৌরোহিত্য করেন কাটোয়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক কবির বাল্যবন্ধু শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র। বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থান ও কলিকাতা হইতে আগত কবির গুণমুগ্ধ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন ও কবির দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কাটোয়া মহকুমাবাসীর পক্ষ হইতে কবিকে কাটোয়ার গৌরবের বস্ত্র কুটিরশিল্পজাত তসর বস্ত্রের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর এবং একখানি রূপার থালা, কাটোয়া মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে একখানি টেবিল ক্লথ এবং কাটোয়া শ্যামলাল লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ হইতে ফুলদানী উপহার দেওয়া হয়। কবির অসামান্য কাব্যপ্রতিভা ও দেবোপম চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কবি কালিদাস রায়, কাটোয়ার অধিবাসীবৃন্দ, মঙ্গলকোট জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার কর্ম্মীগণ, কাটোয়া মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া মানপত্র প্রদান করা হয়। কবি তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর ভাষণে সমাগত সকলের প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানান।

কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দামোদর" পত্রিকা ২১শে চৈত্র একটি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"কাটোয়া অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিগণের উদ্যোগে মহাভারত রচয়িতা অমর কবি স্বর্গীয় কাশীরাম দাসের জন্মভিটায় সিঙ্গি গ্রামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। নিঃসন্দেহে ইহা একটা কাজের মত কাজ হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইবার দশ বৎসরের মধ্যে ইহা এত দিন হওয়া উচিত ছিল। নদীয়াবাসী বহুদিন পূর্ব্বে ফুলিয়া গ্রামে রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহাকবি কাশীরামের নামানুসারে কাটোয়া শহরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সিঙ্গি গ্রামে একাধিক বার কবির জন্মভিটা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। গ্রামবাসী তাঁহাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কাশীরামের নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহাতে কবির নাম-বিজড়িত পাঠাগারটি সরকারী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। আমাদের নিবেদন, কবির জন্মভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দাঁইহাট হইতে সিঙ্গি পর্য্যন্ত দুর্গম রাস্তাটিকে পাকা করা হউক। কাশীরাম দাস স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়াছে শুনিয়াছি, কিন্তু উহার কার্য্যালয় কোথায় এবং কোন ঠিকানায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য জনসাধারণ অর্থ পাঠাইবেন, তাহা সমিতি এ পর্য্যন্ত জেলার বিশিষ্ট পত্রিকাগুলিকে জানান নাই। সমিতি উহার ঠিকানা ঘোষণা করিলে জনসাধারণ যেন মুক্তহস্তে উক্ত স্মৃতিভাণ্ডারে দান করেন এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সমিতির পরিকল্পিত কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালিকার ভাণ্ডার হইতে স্মৃতিভাণ্ডারে এক সহস্র টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং আরও দুই সহস্র টাকা সংগ্রহ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদও নাকি ব্যক্তিগত ভাবে উক্ত ভাণ্ডারে কিছু দান করিয়াছেন, কিন্তু উহার পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নাই কেন? যাঁহাদের দানে জাতি অনুপ্রাণিত হইবে তাহার পরিমাণ প্রকাশ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত দিকে কত টাকা বরবাদ করিতেছেন, এই সংকার্য্যে কিছু দান করিয়া পাপের ভাগ কমাইলে দেশবাসী কিছুটা সুখী হইত। প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ ও রাস্তাটির নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইলে বর্দ্ধমান জেলা তথা বাংলা দেশের একটা জাতীয় ঋণ পরিশোধ হইবে বলিয়া মনে করি।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে কাশীরাম দাসের দান অতুলনীয়। বঙ্গভারতীর এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা বিশেষ সুখের বিষয়। আশা করি যাহাতে প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধটি অবিলম্বে নির্মিত হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

সীমান্তে পাকিস্থানী হামলা

ভারত সীমান্তে পাকিস্থানী হামলা যেন দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলকেই যেন হামলাদাররা আদর্শ স্থানরূপে ধরিয়া লইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সরকারীভাবে ভারত হইতে প্রতিকারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় নাই। তবে সর্ব্বশেষ প্রকাশিত সংবাদে ভারত সরকার এবিষয়ে অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আসাম সীমান্তে পাকিস্থানীদের হামলা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ৪ঠা এপ্রিল এক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন:

"গুলীবর্ষণ-বিরতি চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পাকিস্থানী সশস্ত্র বাহিনী কাছাড় সীমান্তে বিভিন্ন ভারতীয় এলাকায় বেপরোয়া ভাবে গুলীচালনা অব্যাহত রাখিয়াছে। তাহারা ভারতের অন্তর্ভুক্ত সুরমা নদীতীরস্থ নিজজলালপুর গ্রামের সত্যেন্দ্রচন্দ্র নাথ নামক এক ভারতীয় নাগরিককে গুলী করিয়া নিহত করিয়াছে এবং আরও অনেকে গুলীতে আহত হইয়াছে; মদনপুরে ও লেবারপুতায় দুই জন নারীকে পাকিস্থানীরা গুলীবিদ্ধ করিয়াছে এবং ভাঙ্গাবাজারে একটি শিশু অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়াছে। সীমান্তবর্তী কতিপয় এলাকায় নর-নারী-শিশু নির্ব্বিশেষে যে কোনও নিরীহ ভারতীয়কেই গুলী করিয়া মারিতে তাহারা সচেষ্ট হইয়াছে।

'অন্য দিকে পাকিস্থানসুলভ অসত্য প্রচার সমান তালেই চলিয়াছে: করাচী হইতে প্রকাশিত পাকিস্থান সরকারের এক প্রেসনোটে প্রকাশ যে, ভারতীয় সৈন্যরা গত ২৮শে মার্চ্চ লাতুগামী পাকিস্থান ট্রেনে গুলী করিয়া দুইজন যাত্রীকে নিহত করিয়াছে—ইহার সহিত সত্যের কোনও সম্পর্কই নাই। গত ২৬শে মার্চ্চ পাকিস্থানী সীমান্তস্থিত রেলষ্টেশন লাতুতে করিমগঞ্জ ও মৌলবী-বাজারের পুলিশপ্রধানদ্বয়ের মধ্যে গুলীবর্ষণ-বিরতি চুক্তি (২য় পর্য্যায়) স্বাক্ষরিত হয়। ঐ দিন পর্য্যন্ত পাকিস্থানী ট্রেন করিমগঞ্জে যথা নিয়মে যাতায়াত করে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ দিন গাড়ী লাতু প্রত্যাবর্ত্তন করে। গুলী করিয়া যাত্রী নিহত করার আজগুবী কাহিনীটি তখনও কিন্তু রচিত হয় নাই। পরদিন হইতে অজ্ঞাত কারণে পাকিস্থানী ট্রেন আর করিমগঞ্জ অভিমুখে আসে নাই। কাজেই তাহাতে গুলী করিয়া যাত্রী নিধনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পাকিস্থান রেডিওতে আবার ঐ সময়ে ঘোষিত হয় যে, সুরমা নদীর নিকটস্থ পাকিস্থানী অঞ্চলে দুইটি ছাত্র ভারতীয় সৈন্যের গুলীতে নিহত হইয়াছে। অধিকন্তু এই অপ-প্রচারও করা হইতেছে যে, ভারতীয় সৈন্যেরাই বার বার পাকিস্থানী-দের উদ্দেশ্যেই গুলী বর্ষণ করিতেছে।

"সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, পাকিস্থানীরা এই সব ব্যাপারকে নিছক তামাসা বা ভারতকে জব্দ করিবার কৌশল বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু এই মারাত্মক তামাসার গুরুতর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হইবার সময় কি এখনও আসে নাই? সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ভাঙ্গা ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে—যেখানে উভয় রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কে কোন বিষয়ে কোন বিরোধই বর্ত্তমান নাই, তথায়ও নিরীহ নর-নারী-শিশুর উপর অকারণ গুলীবর্ষণ করার জঘন্য মনোবৃত্তি প্রতিহত করিতে হইলে শুধু প্রতিবাদ বা পত্রবিনিময় দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে কি? এ সব বিষয়ে স্থায়ী প্রতিবিধানকল্পে ফলপ্রসূ অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে প্রবোধনের আবশ্যকতা আমরা তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি। এতদঞ্চলের জনপ্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কালবিলম্ব না করিয়া একযোগে কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইবেন ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি।"

'যুগশক্তি'র মন্তব্যে উপক্রান্ত এলাকার ভারতীয় অধিবাসীদের অসহায়তার চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। নাগরিকদিগের নিরাপত্তাবিধান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য।

অঞ্চলবিশেষে প্রতিনিয়তই যখন সেই নিরাপত্তা ব্যাহত হইতেছে তখন রাষ্ট্রের এবং সরকারের উচিত অধিকতর ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ঢাকায় ছায়াবাজী

পূর্ব্ব পাকিস্থানে মন্ত্রী বদল এইবার অদ্ভুত ভাবে হইয়াছে। সংবাদটি নীচে দেওয়া হইল।

ঢাকা, ১লা এপ্রিল—মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীআবু হোসেন সরকার বরখাস্ত হইয়াছেন। অদ্য প্রাতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নূতন গবর্ণর শ্রীহামিদ আলি খাঁ তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন।

শ্রীসরকারকে বরখাস্ত করিয়া নির্দ্দেশ জারীর অব্যবহিত পরেই অস্থায়ী গবর্ণর শ্রীহামিদ আলি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য শ্রীআতাউর রহমান খাঁকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভার ৯ জন মন্ত্রিসহ বেলা ১১৷টার সময় শপথ গ্রহণ করেন।

করাচী হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, কৃষক শ্রমিক দলের নেতা শ্রীহামিদুল হক চৌধুরী শীঘ্রই পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে শ্রীআবু হোসেন সরকারের পদচ্যুতির প্রতিবাদে পূর্ব্ব পাকিস্থান হাইকোর্টে মামলা দায়ের করিতেছেন।

গতকল্য রাত্রে শ্রীআবু হোসেন সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখ্য-মন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বরখাস্ত হন।

পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর শ্রী এ. কে. ফজলুল হক কর্ত্তৃক বরখাস্ত শ্রীআতাউর রহমান খাঁ অদ্য বেলা সাড়ে এগারটার সময় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নয়জন সহকর্ম্মীসহ পুনরায় মুখ্যমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

শ্রীআবু হোসেন সরকারের পদচ্যুতি ঘোষণা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, প্রাদেশিক বিধানসভায় তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভার মোট ৩১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৮২ জন অদ্য শ্রীআতাউর রহমান খাঁর প্রতি তাঁহাদের 'পূর্ণ আস্থা' জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

শ্রী নেহরু এতদিনে গোড়ায় গলদ যাহা করিয়াছেন তাহা শোধরাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অন্ততঃ নিম্নস্থ সংবাদে তাহাই মনে হয়।

৪ঠা এপ্রিল—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু শুক্রবার নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী-দ্বয়ের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানকল্পে ডাঃ গ্রাহাম যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ''আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি কিছুটা অতীত ইতিহাসের জালে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। যে সমস্যা বিবেচনায় কয়েকটি মূল বিষয়কে উপেক্ষা করা হয় এবং যাহা আমাদিগকে পাকিস্থানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহা আমরা মানিয়া লইব না।"

পি টি আই-এর খবরে প্রকাশ: পাকিস্থান পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা ছাড়িয়া যাইবার পর কাশ্মীর সীমান্তবর্ত্তী পাকিস্থানী ভূভাগে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী মোতায়েন করার জন্য ডাঃ গ্রাহাম যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রী নেহরু বলেন যে, ভারত এই প্রস্তাব যতই অপছন্দ করুক না কেন, সে পাকিস্থানকে কোন কিছুতে সম্মত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। তবে ভারত সম্ভবতঃ পাকিস্থানবিরোধী কোন কিছু কাজ করিতে পারে—এমন একটা সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তাবটি রচিত; কাজেই উহা সুস্থ মনোভাব নয়।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, পাক প্রধান মন্ত্রী সহ যে কোন ব্যক্তির সহিত বৈঠকে মিলিত হইতে তিনি প্রস্তুত; আলোচনা ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেক্ষেত্রেই স্বভাবতঃ মিলিত হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সম্ভাবনা নাই। "এ ব্যাপারে কাহাকেও আমরা সালিশ বা বিচারক অথবা এ জাতীয় অন্য কোনরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" ভারতের দৃঢ় অভিমত এই যে, পাক ফৌজের কাশ্মীর ত্যাগ ও কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির স্বীকৃতি ভিন্ন এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না।

'ডাঃ গ্রাহাম বা অপর কোন ব্যক্তি আমাদিগকে তলব করিয়া প্রশ্ন করিবেন এবং আমরা উহার উত্তর দিব' এই অন্তর্নিহিত মনোভাবের বিরোধিতা করিয়া তিনি বলেন যে, 'রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি শুধু প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানই চাহেন নাই, তিনি তাঁহাদের উভয়ের পাশেও বসিতে চাহিয়াছেন।' এই অবস্থাটি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়।

কংগ্রেসী ভেল্কী

কংগ্রেসের যতই অধঃপতন হইতেছে তাহার কর্তৃপক্ষ ততই উটপক্ষীর আত্মরক্ষানীতি গ্রহণ করিতেছেন। রোগের চিকিৎসার কোনও চেষ্টা নাই শুধু তাহার বাহ্যিক প্রকাশ ঢাকিবার চেষ্টা!

৫ই এপ্রিল—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ শনিবার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যে সমস্ত কংগ্রেসী সদস্য দলগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবেন বা দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয়ে একমত হন যে, কংগ্রেস পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে পার্টির সর্বস্তরেই "কঠোর শৃঙ্খলাবোধ" ও "সেবার ভাব" জাগ্রত করিতে হইবে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে ১৯৫৯ সনের জানুয়ারীর মাঝামাঝি নাগপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, আগামী ১০ই ও ১১ই মে দিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা হইবে বলিয়াও বৈঠকে স্থির হইয়াছে।

প্রকাশ, নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির শেষ দিনের অধিবেশন রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে। উহাতে সদস্যগণ কয়েকটি রাজ্যের কংগ্রেসী সংস্থায় ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের হেতু খোলাখুলিভাবে আলোচনার সুযোগ পাইবেন।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন কেরল অথবা উড়িষ্যায় অনুষ্ঠানের জন্য ইতোপূর্বে সাময়িক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তবে নাগপুর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া এবং ১৯২০ সন হইতে এখানে আর কোন অধিবেশন হয় নাই বলিয়া উহাকে মনোনীত করা হইয়াছে। '২০ সনে নাগপুরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথমবার ব্যাপক ভিত্তিতে রচিত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছিল।

গুণ্ডামির বন্যা

দেশে কিরূপ অরাজক চলিতেছে তাহা নিম্নস্থ কয়েকটি সংবাদ হইতেই বুঝা যাইবে। আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উহা আমরা দিলাম।

এই সংবাদগুলির উপর মন্তব্য করা বৃথা। শুধু এইমাত্র বলিব যে, রেলওয়েতে এইরূপ অব্যবস্থা শোধন না করিতে পারায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছিলেন সেই সুদৃষ্টান্ত বাংলায় দেখা যাইবে কি ?

শনিবার ৩০শে চৈত্র সন্ধ্যার কিছু পরে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামি যেরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে দুঃসাহসিকতার একটি চরম দৃষ্টান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঐদিন রাত্রি প্রায় ৮।টার সময় একদল গুণ্ডা প্রকৃতির যুবক—সংখ্যায় অনুমান ১৫ জন হইবে—প্রকাশ্যে উপর্যুপরি বোমা ছুঁড়িয়া সমগ্র পাড়াটিকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে। বোমার আঘাতে একটি এক বছরের শিশু সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি হইয়া যায়, জনৈক ভদ্রমহিলার চোখে বোমার ঝাপটা লাগায় তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, ৮ ব্যক্তি নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন, একটি চায়ের দোকান তচনচ হইয়া যায় এবং একটি বাড়ীর দোতলায় অবস্থিত একখানি শয়নকক্ষের ভিতর বোমা পড়ায় পালঙ্ক, কাঁচের বাসন, আয়না ও অন্যান্য কিছু আসবাবপত্র ভাঙিয়া চুরমার হয়, দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়া পড়ে এবং ইলেকট্রিকের তারে আগুন লাগিবার উপক্রম হয়। তবে কাহারও জীবনহানি হয় নাই।

ঐ পাড়ার দায়িত্বশীল কয়েকজন লোকের অভিযোগে প্রকাশ, বড়তলা থানার পুলিস সময়মত আসিয়া পৌঁছায় নাই। বড়তলা থানার পুলিস আসিবার পূর্বেই লালবাজার হইতে পুলিসের গাড়ী আসিয়া ৬ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রকাশ, তন্মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলিয়া তাহাকে তথায় ভর্তি করা হয়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, গুণ্ডার দল রাস্তার উপর বোমায় আগুন ধরাইয়া বিভিন্ন বাড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দেয়। তাহাদের হাতে লোহার রড ইত্যাদিও ছিল।

সংবাদ পাইয়া আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে উপস্থিত জনমণ্ডলী একবাক্যে বড়তলা পুলিসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁহাদের অভিযোগে প্রকাশ, এক মাস-দেড় মাস পূর্বেও এই জাতীয় এক ঘটনা ঘটে। সেই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বড়তলার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এমন কি সংশ্লিষ্ট কয়েকজন গুণ্ডার নাম পর্যন্তও থানায় জানান হয়, কিন্তু একজন মাত্র কনস্টেবল ঐ স্থানে রাখা হয়। কিছুদিন পূর্বে ঐ পুলিস কনস্টেবলকেও তুলিয়া লওয়া হয়।

বড়তলা পুলিস সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের এতই অনাস্থা যে, এইদিন তদন্তের জন্য বড়তলা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া মাত্র জনসাধারণ উত্তেজিতভাবে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ধরে। প্রকাশ, ঐ পুলিসদের দেখিয়া ভীতসন্ত্রস্ত পাড়ার মহিলাদের কেহ কেহ নাকি কান্না জুড়িয়া দেয়। তাহারা এইরূপ উক্তিও করে ; শীঘ্রই লালবাজারে খবর দাও। থানার পুলিস কিছুই করিবে না, উল্টো আমাদের হয়রাণি করিবে পাড়ার কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, থানায় ইতঃপূর্বে যে রিপোর্ট করা হইয়াছিল, তদনুযায়ী পুলিস ব্যবস্থাবলম্বন করিলে এই হাঙ্গামা ঘটিত না।

৪৭-সি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়ীটির দোতলায় দুইটি বড় বোমা ছোঁড়া হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। উহার একটির আঘাতে শয়নকক্ষের নীল-রঙা দেওয়াল কালো হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরময় কাঁচ, পালঙ্ক ও আসবাবপত্রের টুকরা ছড়ান। ঐ ঘরে একটি এক বৎসরের শিশু ঘুমাইতেছিল। তাহার বিছানাটিও দেখি পলেস্তারা ও কাঁচের গুঁড়া এবং বোমার আঁশ ও টুকরা দড়ি ইত্যাদিতে ভরিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী জানান যে, শিশুটি অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়াছে বটে, তবে সে সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। ঐ বাড়ীটির সামনের বাড়ীতেও জনৈকা মহিলা বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। আমরা যখন যাই, তখনও তিনি অসুস্থ। তাঁহার চোখে বোমার ঝাপটা লাগিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঐ পাড়ার একটি চায়ের দোকানও বোমার আঘাতে তচনচ হইয়া যায়। দোকানের মালিক প্রাণভয়ে একটি আলমারির পিছনে আত্মগোপন করায় রক্ষা পায়।

এই ঘটনায় ঐ পাড়ায় বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই বলিয়া প্রকাশ।

১০ই এপ্রিল—ব্যাঁটরা থানা এলাকায় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন, কাঁটাপুকুর রোড ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী লেনের সংযোগস্থলে বুধবার শেষরাত্রিতে দুইজন মুখোস-পরিহিত রিভলবারধারী দুর্বৃত্ত একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে প্রবেশ করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৭৫০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বুধবার শেষরাত্রি আন্দাজ চার ঘটিকার সময় উপরোক্ত কোন রূপার দোকানের মালিক বাহির হইলে তথায় অপেক্ষমান দুর্বৃত্তদ্বয়ের একজন তাহার সম্মুখে রিভলবার উচাইয়া ধরে ও অপর জন দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া উভয়ে একযোগে পলায়ন করে। এই সম্পর্কে পরে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

উল্লেখ করা যাইতে পারা যায় যে হাওড়ায় সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি ও গুণ্ডামি অবাধে চলার পর পুলিস অভিযান সুরু হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল সমাজবিরোধী কার্য্য এখনও দমন হয় নাই। গত ২১শে ডিসেম্বর ব্যাঁটরা ও শিবপুর এলাকায় দুইটি হত্যাকাণ্ডের পর পুলিস আজ পর্য্যন্ত নিবারক-নিরোধ আইনে (পি ডি এ্যাক্টে) ১৭ জনকে আটক করিয়াছে ও বিভিন্ন হাঙ্গামায় লিপ্ত সন্দেহে ১০০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছে। ইহা ছাড়াও সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ দমন অভিযানে পুলিস তিন হাজার জনকে গ্রেপ্তার করে ও তাহারা সকলেই পরে মুক্তি পায়।

হাওড়া শহরে ছোটখাট চুরি ও রাহাজানিকারী দল ছাড়াও প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর গুণ্ডাদল আছে। বর্ত্তমানে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত প্রথম শ্রেণীর গুণ্ডাদল (হাওড়া-শিবপুর ও ব্যাঁটরা দল) যাহারা সকল প্রকার চুরি, রাহাজানি, জুয়া, চোলাই মদের ঘাঁটি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণ্ডাদল সাধারণতঃ হাওড়া ষ্টেশন হইতে সুরু করিয়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ের লিলুয়া-বালী ও সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের শালিমার এলাকা পর্য্যন্ত প্রায়ই ওয়াগনের মাল লুঠ করিয়া থাকে। হাওড়া ষ্টেশন ও হাওড়া ময়দান এলাকায় বসবাসকারী কুখ্যাত কঙালী দলই শহরের তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডাদল। এই দলভুক্ত দুর্বৃত্তগণ রেল, ট্রাম ও বাসযাত্রীদের মালপত্র অপসারণ, পকেটমারা ও হাওড়া ষ্টেশন এলাকায় লরী, ঠেলাগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন হইতে মাল অপহরণ করিয়া থাকে, ইহাদের কার্য্যকলাপও সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন।

হাওড়া, ১৫ই মার্চ্চ—হাওড়ার সাম্প্রতিক সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের অন্তরালে শক্তিশালী এক শ্রেণী অফিসারের প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন বয়সের উচ্ছৃঙ্খল শতাধিক তরুণীর জিম্মাদার জনৈক কুখ্যাত ব্যক্তিই যে নিষ্ক্রিয় ও অযোগ্য শাসনযন্ত্রকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহা এখানকার বিভিন্ন ওয়াকিবহাল মহলে সমর্থিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বোটানিক্যাল গার্ডেনের জনৈক কর্ম্মচারী কিছুসংখ্যক পুলিস অফিসারের যোগসাজসে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে হাওড়ার গুণ্ডা দমনে পুলিসী ব্যর্থতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

হাওড়া, ব্যাঁটরা ও শিবপুর থানাকে লইয়া হাওড়া সার্কেল গঠিত। হাওড়া সার্কেল একজন ইন্সপেক্টরের অধীন। এই তিনটি থানা-এলাকা গুণ্ডাদের নানাবিধ দুষ্কার্য্য, রাহাজানি, নরহত্যা, ওয়াগন লুণ্ঠন প্রভৃতি নানাপ্রকার সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এতদঞ্চলের গুণ্ডাদের আড্ডাস্থল পুলিস কর্ম্মচারীদের সঠিকভাবেই জানা আছে। তথাপি কেন উহাদের দমন করা সম্ভব হইতেছে না, তাহার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধিকে বলেন যে, বোটানিক্যাল গার্ডেনের এই কুখ্যাত কর্ম্মচারীটির সহিত হাওড়া সার্কেলের কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর গভীর যোগ আছে। তাহাদের সহিত আবার যোগ রহিয়াছে হাওড়া ও কলিকাতার একদল বিত্তশালী ও নীতিজ্ঞানহীন নাগরিকের ও উচ্চপদস্থ অফিসারের। হাওড়ায় তাঁহাদের খুবই আনাগোনা। আর সকল আকর্ষণের উৎস এই উচ্ছৃঙ্খল তরুণীদল। নীতিবিগর্হিত এই সব কার্য্যকলাপের দরুণ স্বভাবতঃই তাঁহাদের গুণ্ডা-পোষণের প্রয়োজন হয়। তিনি আরও বলেন যে, যতদিন না এইসব অপকর্ম্মের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হইবে, ততদিন হাওড়ায় সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের অবসান হইবে না।

উক্ত সরকারী কর্ম্মচারী হাওড়া ও কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য যুবসমাজের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। যে সব নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতার অনেক খ্যাতিমান পুরুষও আছেন।

ইহা ছাড়া হাওড়ার বর্ষীয়ান এক জননেতাও 'আনন্দবাজার পত্রিকার' প্রতিনিধিকে বলেন যে, হাওড়ার গুণ্ডাদল যাঁহাদের আশ্রিত, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। তাঁহাদের মুখোস না খুলিতে পারিলে সমাজজীবনে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

ছাত্রসমাজে দুর্নীতির প্রবাহ

গত মাসে যে সকল গুণ্ডামির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কয়েকটিতেই শিক্ষার্থী ও ছাত্রদিগের অতি হীন কার্য্যকলাপের পরিচয় ছিল। বলা বাহুল্য এইরূপ ঘটনা শুধু যে

পরিতাপের বিষয় তাহা নহে, বরং ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা অতি দৃঢ়তার সহিত এখনই করা কর্তব্য। এইরূপ ঘটনা বাড়িয়াই চলিয়াছে যাহার ফলে সুশিক্ষা ও ছাত্রজীবন গঠন প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ বিবরণগুলি দিয়াছেন।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ইতিহাস পরীক্ষা গ্রহণের সময় সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামি চলিবার ফলে উত্তর-কলিকাতা অঞ্চলের অধিকাংশ পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষা-গ্রহণ পণ্ড হয়। পুলিস ও পর্ষদ কর্তৃপক্ষ-সূত্রে প্রকাশ যে, যাহারা ঐ সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামি চালায় তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র ও একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত ছিল।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, এই দিন উত্তর কলিকাতার অনুমান ১৯টি এবং মধ্য কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের উত্তরাংশে ৬টি—মোট ২৫টি কেন্দ্রে এই সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির আক্রমণ চালানো হয়। পুলিস এই সম্পর্কে প্রায় ৩০জনকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এডমিনিষ্ট্রেটার সোমবার সন্ধ্যায় প্রচারিত এক প্রেস নোটে দুঃখের সহিত এরূপ ঘোষণা করেন যে, "উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের অধিকাংশ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা-কেন্দ্রে সোমবার বিকালে ইতিহাস পরীক্ষার সময় গুণ্ডামির ঘটনা হয়। যাহা হউক ঐ সব কেন্দ্রসহ সমস্ত পরীক্ষা-কেন্দ্রেই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ীই যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ চলিবে। গুণ্ডামির জন্ত যে সকল ছাত্রছাত্রী ইতিহাস পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দিতে পারে নাই, বোর্ড তাহাদের বিষয় যথোচিত বিবেচনা করিবেন।"

দুর্বৃত্তদলের আক্রমণের ফলে শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বীণাপাণি পর্দা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আহত হন; জনৈক পরীক্ষার্থীর ডান হাত সোডার বোতলে কাটিয়া যায়; পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে বলপূর্বক খাতা ছিনাইয়া লইয়া সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। বেঞ্চ, আসবাবপত্র, দরজা ও কাচের জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করা হয়; বড়বাজারে একটি কেন্দ্রের মধ্যে বাহির হইতে বোমা ফেলা হয়; কয়েকটি মেয়েদের কেন্দ্রে আক্রমণ চালাইয়া পরীক্ষার্থিনীদের হয়রাণি করা হয়। কয়েকটি কেন্দ্রের দ্বারোয়ান ও ঝিদের মারপিট করা হয় বলিয়াও জানা যায়। বিডন ষ্ট্রীটের একটি পরীক্ষা-কেন্দ্রের দেওয়াল-ঘড়ি চুরি যায়।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর অঞ্চলের দুই-তিনটি পরীক্ষা-কেন্দ্রে ইতিহাসের প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে এই অজুহাতে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী নাকি গোলমাল সুরু করিয়া বাহির হইয়া আসে। তাহাদের সঙ্গে দুর্বৃত্ত স্বভাবের একদল লোকও জুটিয়া যায়। তার পর তাহারা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে গিয়া হানা দেয় এবং লণ্ডভণ্ড করিতে থাকে। বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের অভিযোগে প্রকাশ যে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও পুলিস যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই। পুলিস যদি সময়মত আসিত তাহা হইলে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এত শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, এমনকি পরীক্ষা গ্রহণও পণ্ড হইত না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ইতিহাসের প্রশ্নপত্র এমন কিছু কঠিন হয় নাই, যাহার জন্ত পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ উঠিতে পারে। কিন্তু অভিযোগ থাকিলেও তজ্জন্ত এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মোটেই সমীচীন নহে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা এরূপ গুণ্ডামির তীব্র নিন্দা করেন। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে ছাত্রসমাজের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা মন্তব্য করেন।

অদ্য মঙ্গলবার বাংলা অথবা মাতৃভাষার পরীক্ষা আছে। এইদিন যাহাতে অনুরূপ ঘটনা না হইতে পারে, তজ্জন্ত কলিকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষ হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রের নিকট পুলিস পাহারা মোতায়েন রাখার আয়োজন করা হইবে বলিয়া জানানো হয়। ইহা ছাড়া পুলিশের টহলদার বাহিনীও মোটরযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির ঘটনা গত ১৯৫৪ সনে আর একবার কলিকাতায় ঘটিয়াছিল। তখনও ঐ গুণ্ডামি উত্তর ও মধ্য কলিকাতা অঞ্চলেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। উহার ফলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল হইয়া যায় এবং পরীক্ষার্থীদের বিশেষ হয়রাণি হয়। ঐ ঘটনার শেষ পরিণতিস্বরূপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেও সরকার বাতিল করিয়া দিয়া উহার পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

পর্ষদ হইতে সোমবার সন্ধ্যায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ঐ দিন উত্তর ও মধ্য কলিকাতার নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থিত পরীক্ষা-কেন্দ্রে গণ্ডগোল ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাহত হয়:—

বিদ্যাভবন, সাধক রামপ্রসাদ বিদ্যালয়, স্কটিশ চার্চ্চ স্কুল, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়, পার্ক ইনষ্টিটিউশন, প্যারীচরণ গার্লস স্কুল, কেশব অ্যাকাডেমী, শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, হোলি চাইল্ড ইনষ্টিটিউশন, আদি মহাকালী পাঠশালা, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়, কমলা হাই স্কুল, বীণাপাণি পর্দা গার্লস স্কুল, সারদাচরণ এরিয়ান স্কুল, এস. ভি. এস বিদ্যালয়, টাউন স্কুল, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন (বড়বাজার), বালিকা শিক্ষাসদন (বিবেকানন্দ রোড) প্রভৃতি।

প্রকাশ, দক্ষিণ কলিকাতা চেতলা বয়েজ স্কুলেও ঐ দিন অপরাহ্নে ইতিহাসের প্রশ্ন লইয়া গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। অন্য এক বিদ্যালয়ের একদল ছাত্র আসিয়া বাহির হইতে উক্ত কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বয়কট করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইতে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রচেষ্টায় ঐরূপ অপচেষ্টা ব্যাহত হয়।

অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় গ্রে স্ট্রীটে অবস্থিত বিদ্যাভবন নামে এক বিদ্যালয়ে অবস্থিত পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে গোলমালের খবর পাওয়া যায়। প্রকাশ, উক্ত কেন্দ্রের অফিসার-ইন-চার্জ্জ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে টেলিফোন করিয়া জানান যে, ইতিহাসের প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে এই অভিযোগে কিছু পরীক্ষার্থী গোলমাল সুরু করিয়াছে। তাহার পর আরও নানা কেন্দ্র হইতে পর্ষদে টেলিফোন করিয়া জানান হয় যে, বাহির হইতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা আসিয়া গোলমাল সুরু করিয়াছে। ইট-পাটকেল ছোঁড়া হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ ও খাতা কাড়িয়া লইয়া পরীক্ষায় বাধাদানের সংবাদও পাওয়া যায়।

প্রায় সকল কেন্দ্রেই ঐরূপ "হামলা" তিনটা হইতে সাড়ে তিনটার মধ্যে ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে তিন হইতে চার শত ব্যক্তি বাহির হইতে আসিয়া চড়াও হয় এবং বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করে। তাহাদের হাতে লাঠি, ডাণ্ডা, ডাব, সোডার বোতল ইত্যাদি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। বড়বাজারের এক কেন্দ্রে বাহির হইতে বোমা মারা হয় বলিয়াও জানা গিয়াছে। ফলে ঐ বিদ্যালয়-ভবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উহার বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যাহত হয়। চাপ দিয়া দরজার তালা ভাঙ্গিয়া বা পাঁচিল টপকাইয়া পরীক্ষা-কেন্দ্রে বলপূর্ব্বক প্রবেশের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত জানা গিয়াছে।

মেয়েদের পরীক্ষা দিবার যে সকল কেন্দ্র "আক্রান্ত" হয় সেই সকল স্থলে ছাত্রীদের হাত হইতে বলপূর্ব্বক খাতা ও প্রশ্নপত্র ছিনাইয়া লইবার অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে। দুই-একটি ছাত্রী ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায় বলিয়াও জানা গিয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জনৈক ব্যক্তি বলেন, অনেক অভিভাবক জানাইয়াছেন যে, এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে থাকিলে তাঁহারা ভরসা করিয়া মেয়েদের পরীক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাইতে পারিবেন না।

এক স্থান হইতে ঐ সম্পর্কে তিনজন কুখ্যাত গুণ্ডাকেও গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

শনিবার ২৯শে চৈত্র দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের অধিবেশন চলিতেছিল, তখন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মারমুখী দুই দল ছাত্র পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইয়া অধিবেশন-কক্ষের সংলগ্ন দোতালার উত্তর চত্বরে প্রচণ্ড হট্টগোলের সৃষ্টি করে। শেষ পর্য্যন্ত উত্তেজিত ছাত্রদের কেহ কেহ অধিবেশন কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া পড়ার উপক্রম করিলে উপাচার্য্য অধ্যাপক সিদ্ধান্ত সেনেটের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় লনে জাতীয় ছাত্র সম্মিলনীর প্রকাশ্য অধিবেশনে উপাচার্য্য অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তের সভাপতিত্ব করা লইয়া এইদিন দুই দল ছাত্রের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয় এবং এই বিবাদের পরিণতিতে রাত্রি ৮।৯টা পর্য্যন্ত বিবদমান ছাত্রদলের "খণ্ডযুদ্ধে" বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছোটখাট এক রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। এই খণ্ডযুদ্ধে শুধু কথা কাটাকাটি, গালিগালাজ, ঘুষাঘুষি, ধস্তাধস্তিই নহে, ইট-পাটকেল, লোহার ডাণ্ডা, ডাব, চামড়ার বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়। আহতদের মধ্যে মস্তকে লোহার ডাণ্ডার আঘাতে আশুতোষ কলেজের জনৈকা ছাত্রী শ্রীমতী জয়শ্রী মুখার্জ্জি এবং চামড়ার বেল্টের আঘাতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র শ্রীঅরুণ দাশগুপ্তের অবস্থা গুরুতর।

শেষ পর্য্যন্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রকাশ্য অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন এবং কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সুস্থ পরিবেশে ঐ অনুষ্ঠান চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

সেনেটের অধিবেশন-কক্ষের সম্মুখে উভয় ছাত্রদলের মধ্যে মারামারির সময় সেনেটের সদস্য অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী অধিবেশন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া উত্তেজিত ছাত্রদলকে শান্ত করার চেষ্টা করিলে উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তির ধাক্কা তাঁহার শরীরেও কিছুটা লাগে।

সেনেটের অধিবেশন মুলতুবী রাখার পর উপাচার্য্য অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তকে এই গোলমাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জানান যে, ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঐ সম্মেলন আহ্বান করা হইলে তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হন। কিন্তু একদল ছাত্র সম্মেলনের বৈধতা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে বাধা দেয়। ছাত্রদের এই ধরণের দলাদলির মধ্যে নিজেকে জড়িত না করার উদ্দেশ্যেই তিনি ফিরিয়া চলিয়া আসেন বলিয়া উপাচার্য্য উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, উপাচার্য্য অধ্যাপক সিদ্ধান্ত এবং অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী উক্ত জাতীয় ছাত্র-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির যথাক্রমে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ।

বোলপুর, ৫ই এপ্রিল—বোলপুর কেন্দ্রে স্কুল ফাইন্যালের অঙ্ক পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জনৈক শিক্ষক এক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী কর্ত্তৃক সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হন। কুণ্ডলা বিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের বোলপুর কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং নিজে 'ইনভিজিলেটারের' কাজ করিতেছিলেন। অঙ্ক পরীক্ষার সময় তিনি উক্ত ছাত্রটিকে অসদুপায় গ্রহণে বাধা দেন। সেজন্য উক্ত প্রাইভেট পরীক্ষার্থী প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। বিকালে শিক্ষক মহাশয় যখন ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন তখন বোলপুর পরীক্ষা-কেন্দ্রের অনতিদূরে ঐ পরীক্ষার্থীটি দলবলসহ তাঁহাকে রিক্সা হইতে নামায় ও শিক্ষকের হাত হইতে ছাতাটি কাড়িয়া লইয়া ছাতার সাহায্যেই তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। ফলে শিক্ষকের মাথা ফাটিয়া যায় ও বুকের পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। শিক্ষক মহাশয় তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। উক্ত ছাত্র ও তাহার সঙ্গীদল চম্পট দেয়। বাজারের লোকজন শিক্ষক মহাশয়কে অচেতন অবস্থায়

হাসপাতালে লইয়া যায়। সংবাদ পাইয়া বোলপুরের শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং পরীক্ষা-কেন্দ্রের ইনচার্জ্জ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার শ্রীতারকচন্দ্র ধর হাসপাতালে উপস্থিত হন। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। পুলিস তৎক্ষণাৎ উক্ত ছাত্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করে, কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতোমধ্যে প্রহৃত শিক্ষকের জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তবে বিপদ এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হয় যাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। আমরা তাহার কিছু নীচে দিলাম।

বিষ্ণুপুর, ১৫ই মার্চ্চ—আজ অপরাহ্ণে এইখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের ১৭শ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ডাঃ বি. পি. ত্রিবেদী কলিকাতার হাসপাতালগুলি পরিচালনার ব্যাপারে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের হেলথ সার্ভিসের সমগ্র কাঠামো সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত করিয়া বিভিন্ন গলদ প্রতিকার এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের উপায়াদি নির্দ্ধারণের জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান।

সম্মেলনে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার সভাপতি ডাঃ শশধর ব্যানার্জ্জি সকলকে স্বাগত জানান।

তৎপূর্ব্বে এইদিন এখানে বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীশশধর সরকার 'সোসিও-মেডিকেল' সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ডাঃ শশধর ব্যানার্জ্জি উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

এই উপলক্ষে এখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি জেলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাঃ এ. সি. উকিল উহার উদ্বোধন করেন। কাছারী ময়দানে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে ১৩০টি ষ্টল আছে।

প্রাদেশিক মেডিকেল সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ শশধর ব্যানার্জ্জি তাঁহার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙলা দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহা বর্ত্তমানে বহুলাংশে বিদূরিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গে টাইফয়েড ও যক্ষ্মারোগের আক্রমণ বাড়িয়া চলিয়াছে, এই দুই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, এইরূপ মন্তব্য করিয়া ডাঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, এই সব রোগীর হাসপাতালের শয্যার জন্য অপেক্ষা না করিয়া 'চেষ্ট ক্লিনিকের' সহায়তায় গৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই সমীচীন।

জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, বর্ত্তমানে এখানে ৫৮টি শয্যাবিশিষ্ট একটি মহকুমা হাসপাতাল নির্ম্মিত হইতেছে। কোতুলপুরেও ৫০টি শয্যার একটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য ইউনিয়নেও কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যদিও শয্যাসংখ্যা অনেক কম, তথাপি কেবল শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অন্ততঃ থানা, মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে বিচক্ষণ চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হইবে।

ডাঃ বি পি ত্রিবেদী সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন কলিকাতা শহরের হাসপাতালসমূহ এবং জেলা ও মহকুমাসমূহের হাসপাতালের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সরকার এবং জনসাধারণের নিকট দাবী জানাইতেছে। কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। এখানে ওখানে দুই-একজন অফিসার নিয়োগের জোড়াতালি ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার আদৌ সমাধান হইতে পারে না। সরকার যদি জনসাধারণের সরকাররূপে নিজেদের দাবী বজায় রাখিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই সমগ্র কাঠামো সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত করিয়া উন্নতিবিধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে অব্যবস্থা ও অপচয় অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার কথা বিবেচনা করিলে মাথাপিছু ব্যয়ের ঐ তালিকায় খুব কম কৃতিত্বই দাবী করা চলে। "আমার বন্ধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন জানাইতে চাহেন যে, তাঁহার রাজ্য অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ফেল-করা প্রার্থীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারী বলিয়া অভিনন্দন জানাইতে প্রস্তুত আছি।"

ডাঃ ত্রিবেদী আরও বলেন যে, তাঁহারা হাসপাতালসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে এবং যথোপযুক্তভাবে গলদের প্রতিকার কার্য্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন। হাসপাতালে যদি স্থানাভাব থাকে তাঁহারা জনসাধারণকে তাহার কারণ জানাইতে চাহিয়াছিলেন। হাসপাতালসমূহে ডাক্তার, নার্স বা ওয়ার্ড-বয়দের দ্বারা রোগীদের প্রতি অবহেলার কোন ঘটনা হইয়া থাকিলে কি পরিমাণ অবহেলা হইয়া থাকে এবং তাহার কারণ ও প্রতিকারই বা কি, তাহাই তাঁহারা জনসাধারণকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। যদি কোন হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার, নার্স বা ওয়ার্ড-বয়দের মধ্যে শৃঙ্খলা চালু করিতে না পারেন, তাহা হইলে উহার পথে বিঘ্ন কি তাহাও জনসাধারণ জানুক, ইহাই আমরা চাহিয়াছিলাম। কর্তৃপক্ষ যদি ধর্ম্মঘটকে ভয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাঁহারা ধর্ম্মঘটীদের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেন, তাঁহাদিগকে ঐ ব্যাপারে তাঁহাদিগের দায়িত্বের পরিমাণ সম্পর্কে জনমতের সম্মুখে হাজির করা উচিত।

ডাঃ ত্রিবেদী মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণে সরকার হইতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শাদি করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃতি করেন।

বক্রোক্তি

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রসাত্মক বাক্য হ'ল কাব্য। কেমন করে বাক্যকে রসাভিষিক্ত করা যায় এ নিয়ে পণ্ডিতজনার মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। স্বভাবোক্তি কি কাব্য-গোত্রীয়? কেউ কেউ বললেন যে, স্বভাবোক্তি হ'ল সহজভাবে সাধারণ কথাটুকু বলা সুতরাং তার মধ্যে কাব্য নেই।১ তা যদি থাকত তবে কাব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতো কেন না জীবন সত্যই তো কাব্যসত্য হয়ে উঠতো। বাক্য তো কাব্য নয়; বাক্যের সঙ্গে রসের যোজনায় কাব্যের সৃষ্টি। এই রসটুকু কাব্যের অন্তররসায়ন নয়। নিঃসঙ্গ যে বাক্য, রস তার মধ্যে অনুস্যূত নয়। রসের অধিষ্ঠান ঘটে যখন বাক্য রস-সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। কোন্ পথে রসের অধিষ্ঠান ঘটবে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর হ'ল বক্রোক্তি। 'বক্রোক্তি' বাক্যকে রসাত্মক করে। এই রসাত্মক বাক্যই কাব্যের উপজীব্য; কাব্য। যেখানে বক্রতার পথে রসের অধ্যাস ঘটল না সেখানে বাক্য কাব্য হয়ে উঠল না। জীবনের বস্তুভাবে কাব্য নেই। বস্তুতন্ত্র যদি কাব্যতন্ত্রের আসন নিতো তবে কাব্যলোক সৃষ্টির কথাটুকু অবান্তর, অতিরিক্ত হয়ে পড়তো। ফোটোগ্রাফিকে যদি শিল্পকলা বলে স্বীকার না করি তা জীবনের হুবহু নকল বলে, তা হলে স্বভাবোক্তিকেও কাব্য বলতে পারি না কেন না সে জীবনকে অতিক্রম করে না কোথাও। কিছুটা অতিরিক্তের রস-রাজত্ব থেকে আমদানী না করলে বাক্য কাব্য হয় না। তাই বোধ হয় স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন:

> 'সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে দিতে তোরে
> সাহস নাহি পাই।'

কবি-মাত্রেই এই দুঃসাহস প্রকাশ করবেন না। কেন না সহজ কথাটুকু শুনিয়ে দিলে তা আর কথার সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকু অতিক্রম করে কাব্যের সীমাহীন বিস্তারে পক্ষবিস্তার করার অবকাশ পায় না। স্বভাবোক্তির ব্যঞ্জনা নেই। 'চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে'—এ হ'ল বস্তুসত্য; কাব্যসত্যের স্পর্শ নেই এদের দেহে মনে। কবির 'প্রকাশে' কাব্যের প্রতিষ্ঠা। সে প্রকাশ নিত্য আশ্রয় করে বক্রতাকে। তাই ত কবি সহজ কথাকে ঘুরিয়ে বলেন, রসধন্য হয়ে ওঠে অতি সাধারণ কাহিনীটুকু। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই বললেন যে, বক্রোক্তিই হ'ল কাব্যপ্রাণ। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বললে মনে নেশার রঙ্ লাগে না, কাব্যানন্দের আস্বাদন করা কাব্যরসিকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য এ কথা স্মরণীয় যে, রসিকের রসবোধ যত উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকবে, অলঙ্কারের প্রয়োজন ততই কমে আসবে। আজকের অলঙ্করণ রীতি স্বভাবানুগামী। রসিকের মন অতি সহজেই রসের ধারাটুকু খুঁজে পায়। কবিমনের সহজ প্রকাশে রসিক কাব্যরস পান করে। কবি তাঁর বাগানের ফুলগুলিকে তোড়া করে না বাঁধলেও এ যুগের রসিক-সমাজ সেই অগোছালো ইতস্ততঃবিন্যস্ত ফুলগুলিতেও সুন্দরকে অধিষ্ঠিত দেখে। প্রাচীন যুগের রীতি-নীতি ছিল স্বতন্ত্র। সোজা কথা সহজ করে বললে প্রকাশের যাদুটুকু বুঝি লাগত না সে যুগের শিল্পে। তাই 'ত' অনসূয়ার অনাবশ্যক বাক্ বিস্তার। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্যন্তের আকস্মিক আশ্রম-প্রবেশে বিস্মিতা অনসূয়া তাঁর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানবার জন্য এই বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন।২

১। পুরাতন বক্রোক্তিবাদীদের যুগ অতিক্রান্ত। আজ আর বক্রোক্তি অলঙ্কার আবশ্যিক কাব্যলক্ষণ বলে স্বীকৃত হয় না। অলঙ্কার হ'ল রস-সৃষ্টির উপায়, উপেয় হল রস। অলঙ্কার ব্যতিরেকেই রস-সৃষ্টি সম্ভব হয় এ কথা আধুনিক সমালোচকেরা বলেন। আমরা মনে করি যে, নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তি কখনও কাব্য বলে স্বীকৃত হবে না। মানুষের মনোধর্মের গভীরে অলঙ্করণপ্রবণতা সুপ্রতিষ্ঠ। এ কথা মনোবৈজ্ঞানিক বলেন। যেমনটি ঘটল তার সঠিক পুনরাবৃত্তি মানব-কল্পনায় অকল্পনীয়। এ যুগে হয়ত অলঙ্কারের বাহুল্য চলে গেছে, তার রং ফিকে হয়েছে, ভার হয়েছে লঘু। তবু যখনই রসাত্মক কাব্যের দেখা পাই তখনই দেখি যে, বাক্যের কোথাও না কোথাও একটুখানি বক্রতা তার চারুতা সম্পাদন করেছে। বক্রতার ধারণার বদল হয়েছে। বক্রতা বিলুপ্ত হয় নি। তাই ত বক্রোক্তি হল কাব্য-প্রাণ।

২। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'সাহিত্য-মীমাংসা' গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা দিতেছে যে, আর্য কোন্ রাজর্ষি বংশ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন? কোন জনপদের অধিবাসীগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুক-হৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিরতিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবন-পরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন?"

অনসূয়া যদি প্রশ্ন করতেন যে, আর্য কোথা থেকে আগমন করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি তা হ'লে এই নিরাভরণ কৌতূহল প্রাকৃতজনোচিত হতো। মহাকবি কালিদাস এই উক্তিতে বক্রতা সম্পাদন করেছেন এবং তারই ফলে এই সাধারণ প্রশ্নও সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এই উক্তি কৌশল, এই 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' হ'ল বক্রোক্তি।

অবশ্য এই বক্রোক্তির ধারণা সব আলঙ্কারিকের কাছে এক নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, কারো চোখে বক্রোক্তি হ'ল কাব্য-প্রাণ, আবার কারো কাছে শুধু অলঙ্কার মাত্র। আলঙ্কারিকেরা কাকুবক্রোক্তি এবং শ্লেষবক্রোক্তির কথা বললেন। এরা হ'ল ভাবপ্রকাশের অন্যতম রীতি। যাঁরা বক্রোক্তিকে কাব্য-প্রাণ বলে মনে করেন তাঁরা যথার্থ কাব্যের সর্ববিধ প্রকাশভঙ্গীকেই বক্রোক্তি বলবেন। ভামহ এঁদের দলে। "ভামহের সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি বাক্যের ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে অর্থপ্রকাশকেই কাব্যত্বের প্রয়োজক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র।"৩ যাঁরা বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য করেছেন তাঁদের চোখে বক্রোক্তি হ'ল দ্ব্যর্থবোধক উক্তি। আলঙ্কারিক দণ্ডী এঁদের পুরোভাগে। দণ্ডী হলেন আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতকের লোক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ' আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। দণ্ডীর বক্রোক্তির উদাহরণ দিই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পাঠক-পাঠিকারা জানেন ঈশ্বরী-ঈশ্বরী পাটনী সংবাদের কথা। পাটনীর কৌতূহল নিবৃত্তি করার জন্য ঈশ্বরীকে আপন ভর্তা দেবাদিদেব মহাদেবের গুণাতীত মহিমার কথা বিবৃত করতে হয়েছে আপন সত্য পরিচয়টুকুকে গোপন রেখে। তাঁর উক্তি: 'কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন' দ্ব্যর্থ বহন করে। পাটনী তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝল যে, তার নায়ের যাত্রী এক অভাগার ঘরণী। রসিক পাঠক বুঝল যে, ঈশ্বরীর স্বামী আত্মভোলা মহেশ্বর; তিনি নির্গুণ, সর্বগুণাতীত। তাঁর তৃতীয় নেত্রের বহ্নিবলয় সদা-প্রজ্বলন্ত। ঈশ্বরী যে অনৃত-ভাষণের দায়ভাগী হলেন না, তার সবটুকু কৃতিত্ব দণ্ডীকথিত বক্রোক্তির। বামন এবং রুদ্রট দণ্ডীর মতই বক্রোক্তিকে 'শব্দালঙ্কার' হিসেবে গণ্য করেছেন। রুদ্রটের মতে বক্রোক্তি একটি অলঙ্কার। এই অলঙ্কারে শব্দ-শ্লেষের জন্য বা কাকুর জন্য বক্তা যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন, শ্রোতা তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। যথা—

"অহো কেনেদৃশী বুদ্ধির্দারুণা তব নির্ম্মিতা?
ত্রিগুণা শ্রূয়তে বুদ্ধির্ন তু দারুময়ী কচিৎ।"

এখানে দারুণা শব্দটি উভয়ার্থক। দারুণা শব্দটিকে নৃশংস এবং কাষ্ঠ-নির্মিত এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়।৪ বক্তা এখানে 'কে তোমায় এমন দারুণ বুদ্ধি দিল?' এই প্রশ্ন করলেন। শ্রোতা প্রশ্নের অর্থান্তর ঘটিয়ে উত্তর করলেন: "বুদ্ধি ত্রিগুণই শোনা যায়, দারু নির্মিত বলিয়া শুনা যায় না।"৫ দণ্ডীপ্রমুখ আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার হিসেবে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করলেও ভামহ যে বক্রোক্তিকে কাব্য-প্রাণ বলেছেন এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভামহ হলেন দণ্ডীর পূর্বাচার্য।৬ ভামহ বক্রোক্তিবাদের আদি প্রবক্তা। তিনি তাঁর কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে বললেন যে, শব্দের এবং অর্থের আত্মগত যোগ যে কাব্যে দৃষ্ট হয়, সেই কাব্যই যথার্থ কাব্য। এই আত্মিক যোগের ফলে যে নূতন অর্থ ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়, তা শব্দের এবং শব্দবিন্যাসের প্রাকৃতিক সীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। এই বিশিষ্ট প্রকাশ-রীতিটুকুই কাব্যবৈশিষ্ট্যরূপ কবিকে অমরতা দান করে। যেখানে ব্যঞ্জনা নেই, সেখানে কাব্য অগোচর। ভামহ বললেন:৭

"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ॥
ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্ত্তামেনাং প্রচক্ষ্যতে।"

সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ উঠেছে, পাখীরা উড়ছে এই বর্ণন কাব্যধর্মী নয়। বলবার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য নেই বলে ভামহ

৩। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'কাব্যবিচার' পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য।

৪। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডক্টর সুশীলকুমার দে প্রণীত 'History of Sanskrit Literature' গ্রন্থের ৫৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'কাব্যবিচার' পৃঃ ৬১ দ্রষ্টব্য।

৬। পি ভি কানে দণ্ডীকে ভামহের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করলেও প্রায় অধিকাংশ গবেষক এবং পণ্ডিতের এই ধারণা যে, ভামহের আবির্ভাব হয়েছিল দণ্ডীর আগে।

৭। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' দ্রষ্টব্য।

একে কাব্য আখ্যা দেন নি। তাঁর মতে কাব্য-দোষগুলি এই বক্রতা বা কবির বিশিষ্ট কথনরীতিটুকুকে ম্লান করে। বামন বললেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' রীতি হ'ল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। বিশিষ্টা পদ রচনা রীতিঃ। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হ'ল ষ্টাইল ৮ এই ষ্টাইল বলতে আমরা ক্রোচের মত 'Technique of Externalization' বা বহিরঙ্গীকরণ রীতিটুকু বুঝছি না,আমরা বোধিগ্রাহ্য রূপ (Intuition) এবং তার প্রকাশের (Expression) সমন্বয়কে বুঝছি। আমরা মনে করি এই বোধিগ্রাহ্য রূপ এবং তার প্রকাশ পরস্পর নিয়ামক। প্রকাশটুকু দেখে বোধির রূপটুকু বোঝা যায়। বোধিগ্রাহ্য রূপ বহিঃপ্রকাশকে পরিণতি দেয়। এরা এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, এ যুগের আলঙ্কারিক ক্রোচে এদের সমার্থক বললেন।

'বক্রোক্তি জীবিত'কার কুন্তকাচার্য ভামহের অর্থেই বক্রোক্তিকে নিয়েছেন। কুন্তকাচার্য এসেছেন দণ্ডীর অনেক পরে। খ্রীষ্টিয় দশম শতকে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম মণি। আচার্য কুন্তক তাঁর গ্রন্থে বললেনঃ "পদসমুদায়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই বক্রতার মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেমন 'মুখটি অতিশয় সুন্দর' এই বাক্যটিকে 'মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর', 'মুখটি যেন চন্দ্র', 'ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র', 'এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর', এইভাবে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে ৯ উদ্দেশ্য একই—মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা; ভেদ কেবল বাক্য-বিন্যাসে। অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের 'জীবাত্ম' তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল এবং এই বক্রোক্তি লৌকিক বাক্যাবলীকে রসোত্তীর্ণ করে। একটি বিশেষ ঢঙে বাক্য এবং শব্দের বিন্যাসের ফলে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সে ব্যঞ্জনা গভীরতর অর্থবহ। ভামহ বলেছিলেনঃ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং'—শব্দার্থের সাহিত্যের নাম কাব্য। ভামহের এই নির্দেশনা কুন্তককে তাঁর শিল্পদর্শন লিখতে সহায়তা করেছে। কুন্তক বললেন, "প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য যাঁহারা কেবলমাত্র শব্দচ্ছটার মাধুর্য্য সৃষ্টি করিতে চান, তাঁহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্য্যের দ্বারাও শুষ্ক তর্কের গাঁথুনি বাঁধিলে কাব্যত্ব হয় না। প্রতিভার প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমতঃ কবিচিত্তের মধ্যে বর্ণনীয় বস্তুটি অস্ফুটভাবে বিচ্ছিন্ন মণিখণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে অস্ফুট-ভাবে যাহা মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহাই বক্র বাক্যের দ্বারা যখন প্রকাশিত হয়, তখন পালিশ-করা উজ্জ্বল হীরকের মালার ন্যায় তাহা শোভা পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়া কাব্যত্বপদবী লাভ করে।"১০ কুন্তকের মতে একই সত্য প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতায় বিভিন্ন-শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টি করে। এই প্রকাশরীতির ব্যঞ্জনাটুকু শব্দ এবং বাক্যগত অর্থকে অতিক্রম করে অনায়াসে। এই প্রকাশভঙ্গীটুকু কবির নিজস্ব কবিকৃতি। একই সত্য হাজারো মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য উদ্ভাসিত। তাকে দেখবার ভঙ্গীটুকু এবং তাকে দেখাবার রীতিটুকুই হ'ল কবির একান্ত আপনার ধন। এই ধনে ধনী হয়েছেন বলেই তিনি প্রাকৃত জন থেকে পৃথক। প্রাকৃত জনের চোখের ওপর দিয়ে বর্ষা আসে। তবু তার চোখে সজল মেঘের স্নিগ্ধ ছায়ার মেদুরতা নামে না। সে দেখে প্রকৃতির আসন্ন বর্ষণ-প্রত্যাশার অধীরতা। তার চোখে এ অধীরতা একান্তই প্রাকৃত। আর কবির চোখে সে অধীরতা অসীম ব্যঞ্জনামণ্ডিত। কবি শোনেন ঝিল্লিমন্দ্রে সে অশান্তি নিত্য স্পন্দিত। কদম্বের বনে বনে কবি আসন্ন বর্ষণের আগমনী কান পেতে শোনেন। সেই দেখা, সেই শোনা কবির বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীতে রসঘন মূর্তি লাভ করে। যে সত্য সহজ ছিল, অনাড়ম্বর স্বচ্ছতায় যে ছিল একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য, কবি তাকে হৃদয়গ্রাহ্য করে তুললেন। সত্য সুন্দরের রথে আবির্ভূত হ'ল। কবি তার সারথী। কবি-কণ্ঠে আসন্ন বর্ষার বর্ষণ-সম্ভাবনা অজস্র সঙ্গীতের ধারাজলে মুক্তি পেল ঃ

"নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর
হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর,
হে গম্ভীর।
বর্ষণগীত হ'ল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,—
নন্দিত তব উৎসব মন্দির,
হে গম্ভীর॥ (গীতবিতান)

৮। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

৯। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'সাহিত্য মীমাংসা' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

এই চিত্রধর্মী কাব্যাংশের আবেদন সংগীতের দিক্‌প্রসারী ব্যঞ্জনায় সুবিপুল অর্থবহ। প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণ-প্রত্যাশায় ব্যাকুল; তার পুলক-চঞ্চলতা, তার অবিশ্রাম ঝিল্লীস্বনন, তার উপর আকাশের মেঘমন্দ্র, তার উৎসবমন্দিরের আনন্দঘন পরিবেশ, সব কিছুকে অতিক্রম করে আর এক অর্থ, আর এক ব্যঞ্জনা পাঠককে রসলোকের অন্তস্তলে নিয়ে যায়। রসাবেশে রসিক মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। কবির কথকতার ঢঙটুকু ভাষার, শব্দের সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থকে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' করে তুলেছে। কাব্যোক্তির বক্রতা সঙ্গীতের নন্দনীয়তাটুকু এনে দিয়েছে। আগেই বলেছি যে, এই বক্রোক্তির রূপভেদ ঘটেছে নানান্ কবির হাতে; আবার একই কবির বিভিন্ন সৃষ্টিতেও এই বক্রতার প্রকারভেদ লক্ষণীয়। গীতবিতানের অন্যান্য গানে, রবীন্দ্রনাথের হাজারো রচনায় হাজারো বক্রোক্তির অবতারণা। কবিগুরুর 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা বলি। সেখানেও কবি আসন্ন বর্ষার আগমনী গাইছেন। সেখানেও শব্দার্থের সাহিত্য আর এক রসলোক সৃষ্টি করেছে। বর্ষা আসছে। কবিকণ্ঠে মেঘস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল:

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীপ-মঞ্জরী শিহরে।
শিখিদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে।
দিগ্বধূচিত হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা॥

একই কবির বক্রোক্তিতে যেমন অনন্ত রূপভেদ দেখি তেমনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের কবিকুলের বলবার ঢঙে অনন্ত রূপবৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যটুকু একদিকে যেমন কবি-মানস-নির্ভর অন্যদিকে আবার কবির বলবার ঢঙে তার কালও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়। এ যুগবৈশিষ্ট্য হ'ল সরলীকরণ। এ যুগে কবির বলবার রীতিতে রং ফিকে হয়ে এসেছে, ঢং হয়েছে লঘুপদসঞ্চারী। আজকের দিনের মানুষ কাব্যে বলুন, সাহিত্যে বলুন, কোথাও আর অতিরিক্তের বোঝা বইতে রাজী নয়। তাই দেখি এ কালের কবির কাব্যে বক্রতার রূপ বদল হয়েছে। কবি সহজ সত্যকে যেমন অনায়াসে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি অনায়াস-ছন্দে তাকে রূপায়িত করেছেন। জীবনের অতিনির্দিষ্টতার কথা কবি বললেন হাল্কা সহজ ভঙ্গীতে:

"ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে।
হুকুম কোথায় চালের বাহিরে হেলতে!
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা।
রাজার প্রজার নিজের গরজে
যে যেমন দেয়, নাম তা।"

(ছক—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

জীবনের গতিপথ পূর্ব-পরিকল্পিত। কোথায় কোন্ অদৃশ্য সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা সমাসীন। তাঁর নির্দেশেই বুঝি ইতিহাসের নিরন্তর পুনরাবৃত্তি। জীবন ও জগত আপনার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান। এ তত্ত্ব সুপরিচিত, বহু-কথিত, অতিখ্যাত। তবুও কবি-কথায় পুনরাবৃত্তির বিরক্তিকর অখ্যাদটুকু অগোচর রইল। কারণ, কবির বলবার ঢঙে কবিসুলভ বক্রতা। এই বক্রোক্তি বিলিয়ে গেল রং ও রস; রসিকের চিত্তে সুধাস্রাবী মধুভাণ্ডের স্থাপনা করল। গৌড়জন ধন্য হ'ল এই রসধারায়। এর স্পর্শেই গদ্য পদ্য হয়ে ওঠে। জীবন হয়ে ওঠে কাব্য। কাব্যপ্রাণ স্পন্দিত হয় ভাব ও ভাষার পূর্ণ-মিলন ঘটন-পটিয়সী এই বক্রতার মধ্যে। বক্রোক্তিতে ভাব ভাষার দ্বারা অবাধিত। তার স্ফূর্তি ঘটে কবির শব্দচয়নের এবং শব্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। এই বক্রোক্তি বৈশিষ্ট্য কাব্যকে সমগ্রতা দান করে; এর মধ্যেই ভাব ও ভাষা একাত্ম হয়ে ওঠে। সাহিত্যের রূপ হ'ল সমগ্রতার রূপ। ভাব ও ভাষার আত্মিক যোগসাধনে যে সমগ্রতা, তাইতো সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য ও কাব্যের এই সামগ্রিক সত্তার কথা গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলও আমাদের শুনিয়েছেন, এদেশে এবং ওদেশে তাঁর অনুপন্থীদের অসদ্ভাব নেই। এই সমগ্রতার মধ্যেই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের ধারণাটুকু নিহিত। এই ব্যঙ্গার্থই 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' যে কাব্যানন্দ তার আস্বাদন ঘটায়। আবার এই ব্যঙ্গার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটে কবি-উক্তির সুচারু বক্রতায়। তাইতো আচার্য কুন্তক কাব্যোক্তির বক্রতার মধ্যে সকল কালের সকল শ্রেণীর কাব্যের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করলেন। বক্রোক্তি হ'ল কাব্যপ্রাণ। আচার্য ভামহ কথিত তত্ত্ব সকল কালের সকল কবির কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

"বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মদর্শন"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মেয়ে নিতান্ত 'আহা-মরি' না হলেও একেবারেই যে বাতিল করে দেওয়ার মত এমনও নয়। তবু কারুরই আর পছন্দ হয়ে উঠছে না শেষ পর্য্যন্ত, এক একবার করে সবাই দেখে এলেন।

ছেলের বাপ-খুড়ো নেই, অভিভাবক ঠাকুরদাদা। তিনি গিয়ে সবার আগে দেখে এক কথাতেই নাকচ করে দিলেন, একটু নৈরাশ্যের হাসি হেসে বললেন, "একেবারেই অচল।"

ক্রমাগতই এই হচ্ছে, বিয়ে ত দেওয়া চাই, অনুপমের ছোট বোন নিরুপমা বলল, "তুমি নাতির জন্যে একেবারে ডানা-কাটা পরী চাও দাদু, আমরা ত রাজা-রাজড়ার ঘরে খুঁজতে যেতে পারব না, কি করে হয় বল?"

সনাতন গড়গড়া টানতে টানতে বললেন, "একেবারেই অচল যে। তোমরাই না হয় দেখে এস।"

"বেশ সেই কথাই থাক। আমাদের পছন্দ হলে হবে ত?...তোমার মতন সন্দেশ খেয়ে এসে বেইমানি করতে পারব না, তা কিন্তু বলে যাচ্ছি।"

"বেশ ত, যানা; দাদা সন্দেশ খাওয়াচ্ছে না বলে তার ওপর ত বেইমানি করবি নে।"

"খাব সন্দেশ; শুনেছি মেয়ে তত খারাপ নয়।"

পাড়ার একজন বর্ষীয়সীকে নিয়ে দেখে এল মেয়ে।

তিনজনেই এসে উপরের বারান্দায় বসল, সনাতন তামাক খাচ্ছিলেন।

"হ্যাঁ দাদু, মন্দ কি এমন? নাক, মুখ, চোখ, সবই এক রকম আছে, গড়ন ভালই, রংও..."

"ও নাকে চলবে?"

– সটকাটা আবার মুখে দিয়ে গম্ভীরভাবে টানতে লাগলেন। একটু যে নিস্তব্ধতা গেল তাতে তিনজনের মধ্যেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি হ'ল। ওষুধ ধরেছে দেখে সটকাটা আবার মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন সনাতন।

"চলত।...কিন্তু মুখটা একটু বেশী গোল নয়?..."

নিরুপমা বলল, "ভালই ত; বেশ ঘোরালো, চাঁদপানা..."

"একশবার স্বীকার করছি। ষষ্ঠীরও নয় একাদশীরও নয়, পুর্ণিমার চাঁদ। সেই জন্যে ও নাক একটু বেশী খাঁদা মনে হয় না?"

পাড়ার লোককেই সাক্ষী মানলেন—"কুল বৌমা কি বলেন জিজ্ঞেস কর না।"

বর্ষীয়সী আধা-ঘোমটার মধ্যে দিয়ে একটু নিম্নকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, গোল মুখে একটু টানা নাকেই যেন খোলতাই..."

নিরুপমা বাধা দিয়ে বলল, "না দাদু, ওটুকুর জন্যে আর অমত কর না..."

"ওটুকুই নয়। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে..."

"আর খুঁটিয়ে দেখতে হবে না তোমায়। তুমি যেন কি দাদু! নিজে সাত-তাড়াতাড়ি ম্যাট্রিক পাশ করেই বিয়ে করেছিলেন, এদিকে দাদা কলেজ ছাড়তে বসল, এখনও পছন্দই হচ্ছে..."

মা আর বর্ষীয়সী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চাওনি নিয়ে হয়ত একটা মিষ্টি ঠাট্টা মুখে এসেছিল, উচ্চারণ করতে না পেরে সনাতন শুধু একটা মিষ্টি হাসি ঠোঁটে করে তামাক খেয়ে যেতে লাগলেন।

নিরুপমা বলল, "বেশ, তাহলে এক কাজ কর বরং, দাদার হাতেই ছেড়ে দাও...আর সবই ত ভালো—কুটুম-সাক্ষাৎ..."

"কেড়ে রেখেছি আমি?"

"ঠাট্টা নয়। দাদা দেখে আসুক। পছন্দ হয়, করুক বিয়ে, খাঁদা-কুচ্ছিৎ নিয়ে ভুগুক চির-জন্মটা..."

উঠে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "দাদার ইচ্ছে আছে দাদু, বলছি আমি। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল, সরে গেল এই।"

অনুপম দেখে এসে বোনের মারফতই জানাল খুব অপছন্দ নয় তার। বিয়ের এখন ইচ্ছে নেই মোটেই, তবে ওঁরা চান ত দেখতে পারেন ওখানে।

সনাতন বললেন, "তাই হবে তাহলে। তবে ডেকে আন্ একবার আমার সামনে। একটা কথা বলেছি, নেহাৎ হারব নাতির কাছে, একটা ফয়সালা অন্তত হয়ে যাক।"

এলে প্রশ্ন করলেন—"ও নাকে চলে যাবে তোর বলছিস তাহলে?"

"চলে যাওয়া যাওয়ি মানে..."—একটু কুণ্ঠিতভাবেই

আরম্ভ করল অনুপম—"বলছিলাম ওকে—আর সব যদি ঠিক আছে মনে করিস তোরা···মানে, মুখটা ত অত গোল থাকবে না, গাল ঝরে গেলে নাকটা তখন আবার···"

"চোয়াল দুটো লক্ষ্য করেছিলি ?·· একটু ভাবি নয় ?"

বেশ একটু থতমত খেয়েই মুখ তুলে চাইল অনুপম। ওষুধ ধরেছে দেখে আবার মুখ থেকে সটকাটা সরিয়ে নিলেন সনাতন, একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, "না হয় আধুনিকের চোখ নেই আমার এখন. এক সময় ত সেই চোখেই দেখেছি। গাল ঝরে গিয়ে যখন দুটো চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আসবে তখন···কান দুটো কি রকম একটু দাঁড়া-দাঁড়া তাও বোধ হয় অত লক্ষ্য করিস নি···"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আতঙ্ক ভরে আসছিল, অনুপম বলল, "থাক, তাহলে ওখানে।"

একটু চিন্তিতভাবে আস্তে আস্তে চলে গেল। নিরুপমা মুখটা ভার করে একটু আক্রোশবশেই বলল, "কি যে পেয়েছ রাঙা-ঠাকুরমার মধ্যে দাদু,চাও না যে একটি টুক্‌টুকে নাত-বৌ এসে পাশে দাঁড়াক। আমিও ছেড়ে দিলাম এবার।"

একেবারে উল্টে বলল। একটি টুক্‌টুকে, নিখুঁৎ নাত-বৌ-ই চান সনাতন এবং এ-চাওয়ার সঙ্গে স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর খানিকটা সম্বন্ধও আছে। সুরূপা বলে কোন কালে খ্যাতি ছিল না বিন্ধ্যবাসিনীর। দাঁত, ঠোঁট, কপাল, চোখ সব নিয়ে রূপ তা বরাবরই প্রতিকূল সমালোচনাই পেয়ে এসেছে। শুধু চামড়াটা একটু কটা, তারই ওপর নির্ভর করে সনাতনের পিতা বধূ করে এনেছিলেন তাঁকে।

এই রূপ, তার ওপর গৃহিণী হিসাবে যত গুণই থাক, অত্যন্ত মুখরা স্ত্রীলোক।

শৌখীন ভাল মানুষের মুখরা স্ত্রী হওয়া ভাল। শখের দিকটা বাইরে বাইরে বজায় থাকলেও ভেতরে যায় শুকিয়ে। সনাতন এখনও চুনোট-করা কালপেড়ে ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী ব্যবহার করেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। রূপ নিয়ে যে একটা খুঁৎখুঁতুনি—এটা অনেক দিনই ভোঁতা হয়ে গেছে, বিন্ধ্যবাসিনীর মুখরতার জন্য। খুব যে মন্দ কাটল জীবনটা এমনও নয়। সদাই ভয়ে ভয়ে থেকে বেশ এক ধরণের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে তার সঙ্গে; জীবনকে নিরুপায় ভাবে গ্রহণ করবার, আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে একটি হাস্য-মণ্ডিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকবার ক্ষমতা অর্জন করে ভালভাবেই কাটিয়ে দিলেন জীবনটা। ওদিকে বিন্ধ্যবাসিনী যে মনে করেন চুনোট-করা ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবী তাঁরই জন্যে—এতে তাঁর মেজাজের পারাটা মাঝে মাঝে নামিয়ে এনে সব দিক দিয়ে সাহায্যই করে। বেশ চলে এসেছে এক রকম।

কিন্তু সারা জীবন ধরে যা থেকে বঞ্চিত রইলেন, সুযোগ পেলে সেটা অত্যুগ্র হয়েই দেয় দেখা। নিজের যা হ'ল না, জীবনের সায়াহ্নে নাতিকে অবলম্বন করে সেই সাধটি নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে চায়। একটি একেবারে নিখুঁত সুন্দরী নাতবৌ আসুক এবার। ঘোরাফেরা করুক চারিদিকে। রূপের আলোয় জীবনটা একবার নূতন করে বিকশিত হয়ে উঠুক রহস্যে হাস্যে-পরিহাসে।

নিখুঁত, তার সঙ্গে শান্ত, নত দৃষ্টি।

সনাতনের মনের মত হয়ে উঠছে না।

বিন্ধ্যবাসিনী দল পেয়ে মাসখানেক হ'ল তীর্থ পর্য্যটনে গেছেন। বাড়ী থেকে একাই গেছেন; মাঝে মাঝে যান। তীর্থ পর্য্যটনের শখটা বেশী করে সনাতনেরই হওয়া উচিত, কিন্তু কি রহস্যে বলা যায় না, মোটেই নেই। হয়ত পত্নী-বিরহিত বাড়ীটাই তাঁর তাবৎ দিনের জন্য তীর্থ হয়ে ওঠে। একটু নিশ্চিন্ত মনেই নাতবৌ-এর সন্ধানে লেগে যান।

একদিন একটা টেলিগ্রাম এল, বিন্ধ্যবাসিনী ফিরে আসছেন। নিরুপমার মেয়েটি বড় চোখে লেগেছে, এরই প্রতীক্ষায় ছিল, ফিরে এলে বিন্ধ্যবাসিনীকে ধরে বসল—একবার দেখে আসতে হবে।

একটু ধাক্কা খেতে হ'ল। সাধারণ নিয়মটা হচ্ছে—বিন্ধ্যবাসিনী যে পথে যাবেন সনাতনেরও সেই পথ হলেও সনাতন নিজের হতে কোন পথ ধরলেন, বিন্ধ্যবাসিনী ঠিক তার উল্টে দিকে পা বাড়াবেন—সনাতন যখন বাতিল করেছেন, বিন্ধ্যবাসিনীকে দলে টানা সহজ হবে, এই ভেবেই তাঁর কাছে এগুলো, কিন্তু হয়তো সদ্য তীর্থ থেকে ফেরার জন্যই তিনি একেবারে উলটে গেলেন। বললেন, "সে কি লো, বলিস কি! উনি একটা মত দিয়েছেন, আর আমি এসে সেটা উলটে দেব একেবারে! চারপো কলি তো হয় নি এখনও।

স্বামীর কাছে অনুযোগও করলেন, অভিমতটা জানিয়ে বললেন—"বলে কি তোমার নাতনি! বুড়ো বয়সে আমায়ও ওদের মত আধুনিকা ঠাওরালে নাকি? পরিবার চললেন আগে আগে, স্বামী চললেন পেছনে!"

পঞ্চাশ বৎসরের সারা দাম্পত্যজীবনে এ ধরণের অমৃত-বর্ষণ হয় নি সনাতনের কর্ণে। একটু জিদ করেই বললেন, "যাও, দেখে এস, আবদার ধরেছে ছেলেমানুষ।···পছন্দ হয়, ঠিক করেই আসবে, তোমার পছন্দ ভুল হবে না তো।"

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্ময়ে গালে আঙুল চারটে চেপে ধরলেন, বললেন—"শোন কথা—সব শেয়ালের এক রা! ইনি আবার বলেন ঠিক করেই এস!"

নিরুপমার দিকে চেয়ে বললেন, "নিয়ে যাচ্ছ, চল নিয়ে,

কিন্তু যা হবার তা আগে থাকতেই বলে রাখছি বাপু—যা বেরিয়েছে এক মুখ থেকে, অন্য মুখে এসে তা ওলটাবে না, ব্রহ্মা-বিষ্টু-মহেশ্বর এলেও না।"

নিরুপমা নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, "বেশ, চলোই তো তুমি।"

তিন-বার সাজ-গোছ করিয়ে দেখা হয়েছে, এবার কি ভেবে নিরুপমা আর আগে থাকতে কিছু জানান না। একটা রিক্সা করে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গিয়ে শুনল মেয়ে বাড়ি নেই, মামাতো ভাইয়ের উপনয়নে তিন-চার দিনের জন্য হঠাৎ চলে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীকে কিন্তু ওঁরা তখনই ছাড়লেন না। একই জায়গা—তবে ভিন্ন পাড়ায় খানিকটা দূরে দূরে বাস, তবু জানাশোনা আছে, থিয়েটার-সিনেমায় বা নিমন্ত্রণে দেখা-শোনা হয়, তারপর পরিণাম যাই হোক, বিয়ের কথায় যাওয়া-আসাও হয়েছে খানিকটা। একটু বসে যেতেই হ'ল।

ওঁর একটু তোয়াজ করবার সুযোগও পেলেন। পুত্রবধূ বাসনা মেয়েটি চালাক। তীর্থ থেকে ফিরেছেন, পা ধুয়ে দিল, তার পর তীর্থের গল্প শোনবার জন্যে সবাই মিলে ঘিরে-ঘুরে বসল।

হামানদিস্তের ছ্যাঁচা পান এল, দোক্তা এল, খানিকক্ষণ গল্প-স্বল্প করে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন—"এবার যাই বাছা।"

গিন্নী আপশোষ করলেন—"পোড়া বরাত দেখ আমার! রাঙা খুড়ী এলেন, পছন্দ হ'তই মেয়েকে আমার, তা কপাল নিয়ে ঠিক এই সময়টায় মামার বাড়ি চলে যেতে হ'ল! কাল আর হবে না, দপ্তর থেকে বেরুবে বিমল, আমি পরশুই আনিয়ে নিচ্ছি রাঙা-খুড়িমা, পায়ের ধুলো দিতে হবে।..."

বাসনা বলল—"আর ঠাকুরঝিকেও আমাদের পায়ের ডগায় একটু জায়গা দিতে হবে রাঙা-ঠাকুরমা, আমরা ছাড়ছি না। পছন্দ আপনার হবেই।"

একটু রূঢ় শোনালেও বিন্ধ্যবাসিনী খানিকটা হাতে রাখলেনই—"ঐখানেই তো একটু ভয় দিদি। কি করে কথা দিই বল। তিন তিন বার দেখা হয়ে গেল—মায় কত্তা পর্য্যন্ত এলেন—তবে আসব বৈকি একবার।"

ঠোঁট টিপে একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল বাসনা, বলল, "মুখে আটকায়, সতী-লক্ষ্মীর সামনে এক হিসেবে পতি-নিন্দের মতনই শোনায় তো।...তবু আমার যখন বলবার সম্বন্ধ বলতে ছাড়ি কেন—দাদুর আর আমাদের সে পছন্দ নেই রাঙা-ঠাকুমা; এক সময় যা ছিল..."

এক হাতে ভর দিয়ে ভারী শরীরটা তুলতে গিয়ে একটু থমকে গেলেন বিন্ধ্যবাসিনী, প্রশ্ন করলেন—"এক সময় মানে?"

"এক সময় মানে—যখন তোমায় গিয়ে আপনাকে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।"

হাতটা আলগা হয়ে যেতে ভারী দেহটা যেটুকু উঠেছিল আবার নেমে গেল, পানভরা গালে এক গাল হেসে বললেন, "শোন কথা আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়ীর বৌমা! রাঙা-খুড়ীকে যখন নিয়ে এল, তখন উনি যে কোথায়!"

"জন্মাইনি-ই যেন, তা বলে জানতে নেই?"

শাশুড়ীর দিকে একটু আড়ে চেয়ে বলল, "মা দুঃখু করছিলেন না?...করছিলে না দুঃখু তুমি মা—কত্তা কেন যে আমার মেয়েকে পছন্দ করলেন না! একেবারে ছেলে-বেলায়, কনে বৌটি সেজে যখন এলেন রাঙা-খুড়ীমা তখন অবিশ্যি দেখি নি, তবে বয়েসকালে ত দেখেছি, আমার ছন্দা ঠিক ঐ রকমটি হয়ে উঠছে—ঐ নাক, ঐ চোখ, ঐ সাজানো দাঁত, ঐ কপাল..."

বিন্ধ্যবাসিনী বেশ গা এলিয়েই হেসে উঠলেন, তাতে গুটিকয়েক দাঁত যা মাড়ির এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে বেশ ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করে উঠল, বললেন, "হাঁ বৌমা, তোমাদের শাশুড়ী-বৌয়ে এই সব হয়?..."

চালটা ধরতে পারলেও একটু হকচকিয়ে গিয়েই গিন্নী একটু আমতা আমতা করে গুছিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী হাসতে হাসতেই বললেন, "এ ঠিক তোর বানিয়ে বানিয়ে বলা নাতবৌ—কোথায় নাক, কোথায় চোখ তার ঠিক নেই, দাঁত ত একে একে সব গন্তে গেছে..."

বাসনা গালে হাত দিয়ে আবার শাশুড়ীর দিকে চাইল, বলল, "ওমা কোথায় যাব! রাঙা-ঠাকুরমা বলেন বানিয়ে বলছি!...বল নি তুমি আমায় মা?"

গিন্নী একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, "মিথ্যে ত বলি নি, যা দেখেছি বলেছি।"

বাসনা এগিয়ে বলল, "আর সে মুখ-চোখ না হয় দেখি নি আমি, কিন্তু চুল ত এখনও সাক্ষী দিচ্ছে। সে জিনিস এখন অবিশ্যি নেই, থাকবার কথাও নয়, তবে মা যে বল-ছিলেন—সে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলের ঢাল, পিঠ ঢেকে হাঁটুর নিচে গিয়ে পড়েছে...এখনও ত তার সাক্ষী রয়েছে রাঙা-ঠাকুরমা...ঠাকুরঝিরও নাকি ঐ রকম তাই মা বলছিলেন

হাসিতে আরও এলিয়ে পড়তে পড়তে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তুই থাম নাতবৌ।... যা দিকিন বরং খানিকটা পান ছেঁচে নিয়ে আয়—তোরই সাজা—যেমন হাসতে হাসতে পানগুলো গিলিয়ে দিলি।...কি মেয়ে বাবা! কপাল-গুণে একটা ঝগড়াটে কাকে ধরে নিয়ে এসে সারা জীবন

ভুগল মানুষটা।—মুখের ঝাঁজে পাড়ার লোকে টেঁকতে পারে না—বলে কিনা এত রূপ, তত রূপ!…"

পানের জন্যে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল বাসনা, ঘাড়টা ঘুরিয়ে মুখ টিপে হেসে টিপ্পনী করল—"কার মুখের ঝাঁজ কার কাছে মিষ্টি খুব জানা আছে।"

ভেতরে চলে গেল।

আসবার সময় নিরুপমার সঙ্গে একটু টেপা হাসির বিনিময় হয়ে গেল বাসনার। বাকিটা সে-ই এগিয়ে নিয়ে গেল।

বাড়ী এসে বলল, "রাঙা-ঠাকুরমা, এস তোমার চুলটি আঁচড়ে দিই একটু। তীর্থে তীর্থে ঘুরে কি যে অবস্থা হয়েছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু সলজ্জকণ্ঠেই বললেন, "দিবি? না হয় দে। আর চুল! ক'গাছাই বা আছে…"

"চুপ কর তুমি। তোমার এ বয়েসে এর সিকি ভাগ থাকলেও আমরা বর্তে যাব। ঐ ত সব রয়েছেন—রায়েদের সেজগিন্নী, ওপাড়ার কুন্দপিসী—পরিষ্কার হয়ে এল মাথা, অথচ তোমার চেয়ে কত ছোট!"

বিকালে গা ধোয়ার সময় নাতনীর সাবানটা চেয়ে নিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তীর্থে তীর্থে ঘুরে এ যেন চিমটি কাটলে গায়ে ময়লা উঠছে, বেশী গন্ধ ওলা সাবান নয় ত তোর আবার?"

তীর্থের কাপড়-চোপড় কাচতে দেওয়ার জন্যে সরিয়ে রেখে একটি পাটভাঙা শাড়ী পরলেন।

সনাতন যখন বেড়িয়েটেরিয়ে ফিরলেন সন্ধ্যার পর, বিন্ধ্যবাসিনী তখন ওপরে নিজেদের ঘরে এটা-ওটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন। সনাতন বললেন, "এই যে তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম—দেখে এলে মেয়ে? কেমন?"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু সামনে এগিয়ে আসতে, একটু দেখে নিয়ে হেসেই বললেন, "লক্ষণটা ত নাতবৌ নিয়ে আসবার মতনই দেখছি, কিন্তু…"

বিন্ধ্যবাসিনী গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, "কিন্তু-টিন্তু নয়। মেয়ে অবিশ্যি দেখি নি এখনও, তবে এক রকম কথা দিয়ে এসেছি আমি!"

সনাতন, বিশেষ করে বোধ হয় যাওয়ার আগের কথাটা ভেবে এত বিস্মিত হয়ে উঠলেন যে পরিণামের কথা ভুলে একটু বিরক্তিই ফুটে উঠল মুখে—বললেন, "সে কি! এ যে…!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। আপত্তি আছে? তাহলে পষ্ট করে না হয় বলেই দাও, দেখি।"

কোমরের দু'দিকে দুটো মুঠো গিয়ে উঠল। একটু নরম হয়ে এলেন সনাতন, তবু তর্কটা ছাড়লেন না, একটু স্তিমিত কণ্ঠেই বললেন, "তখন তুমিই বললে যে—আমার যা মত…"

"আমি মিথ্যেবাদী, কথা ঠিক রাখি না—আর কিছু বলবে? কিন্তু যা-তা করে একটা কথা গেরস্তকে যে বলে দাও—মেয়ে যখন কুচ্ছিৎ নয়…"

"কিন্তু তুমি ত বলছ দেখোই নি এখনও। না দেখেই কথা দিয়ে আসা।"

মুঠোয় কোমর দুটো চেপে একটু দুলে দুলেই বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, "কেউ দেখেও দেখতে পায় না, কেউ আবার না দেখেও দেখতে পায়, বুঝলে! এও তাই হয়েছে। ট্যাঁস ট্যাঁস করলে কি হবে?"

দোরের কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দুধারে একটু দেখে নিয়ে এসে আবার সেইভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, "বলছিলাম, এও তাই হয়েছে। একবার চোখ মেলে ভাল করে দেখ দিকিন—আমি কি কুচ্ছিৎ? পঞ্চাশটা বছর ত ভোগালে।"

কোমরের ওপরের দিকটা বাড়িয়ে ধরলেন। সনাতন এতটা বিমূঢ় হয়ে গেছেন যে হাত দুটো পড়ল উঠে, চোখ বড় বড় করে বললেন, "দেখ কাণ্ড! এর সঙ্গে তোমার কুশ্রী-সুশ্রী হওয়ার কথা কি আছে, তুমি…বলতে গেলে…"

"আছে কথা। যে দেখার চোখ হারিয়েছে তার অত মাতব্বরি করতে হবে না। আমি এক রকম বলেই এসেছি, ঐখানেই দিতে হবে বিয়ে। এই শেষ বলে দিলাম।"

পরের দিন সনাতন নিজেই বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পাকা কথা দিয়ে এলেন, বললেন, "গিন্নী দেখেন নি এখনও—তাঁর জন্যেই ত এতদিন অপেক্ষা করছিলাম—আপত্তি করছিলেন বটে, তা আমি জোর করে বললাম আমি নিজে ত দেখেছি—ঐ মেয়েই দিব্যি হবে।"

শঙ্কর-দর্শনে "ঈশ্বর"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, ব্যবহারিক দিক থেকে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত, জগৎ সত্য, অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ম ও সৃষ্ট-কার্য জগৎ উভয়ই সত্য। কিন্তু সৃষ্টি ও সৃষ্ট-কার্য স্বীকার করলে, স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাও অত্যাবশ্যক। এই সৃষ্টিকর্তার নাম 'ঈশ্বর।" এরূপে, ব্রহ্ম যখন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কর্তারূপে পরিগণিত হন, তখনই তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা হয়। অবশ্য পারমার্থিক দিক্ থেকে, সৃষ্টিও নেই, সৃষ্ট জীবজগৎও নেই, সেজন্য স্রষ্টার কোনো প্রশ্নও নেই। সেই দিক্ থেকে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার—এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব, জীবজগতের স্রষ্টাও নন, পরিণামীও নন। কিন্তু ব্যবহারিক দিক্ থেকে, ব্রহ্ম তাঁর মায়াশক্তির সাহায্যে মিথ্যা জীবজগতের যেন সৃষ্টি করেন বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে, ব্রহ্ম মায়াশক্তিবিশিষ্টও নন, স্রষ্টাও নন; শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মায়াশক্তিবিশিষ্ট, স্রষ্টা, সক্রিয়, পরিণামী বা জগতের অভিন্ন ও উপাদান কারণ, এবং এই রূপেই তিনি "ঈশ্বর"।

শঙ্কর এস্থলে মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১।১।১৭)

তিনি বলেছেন:

"এক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে, নান্যো বিজ্ঞান-ধাতুরস্তীতি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।৩।১৯)।

অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, কূটস্থ নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যা বা মায়ার দ্বারা তিনি মায়াবীর ন্যায় বহুরূপে প্রতিভাত হন—তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বিজ্ঞান বা তত্ত্ব নেই।

"পরমাত্মনস্তু স্বরূপ-ব্যাপাশ্রয়মৌদাসীন্যং মায়াব্যাপা-শ্রয়ঞ্চ প্রবর্তকত্বমত্যন্তাতিশ্রয়ঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-২-৭)

অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপতঃ উদাসীন, অকর্তা, অপ্রবর্তক; কিন্তু মায়াবিশিষ্টরূপে কর্তা ও প্রবর্তক।

নিপুণ মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক তাঁর মায়া বা ইন্দ্রজাল-শক্তির প্রভাবে বংশদণ্ড, রজ্জু প্রভৃতির সাহায্যে আকাশ-চারী পুরুষ সৃষ্টি করে' দর্শকবৃন্দকে মোহগ্রস্ত বা প্রতারিত করেন। অধিকাংশ দর্শকই এক্ষেত্রে সেই আকাশচারী পুরুষকে সত্যবস্তুরূপেই গ্রহণ করেন। সেজন্য তাঁদের নিকট মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক স্রষ্টারূপেই বোধ হয়—অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেন যে, সেই মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক সত্যই তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিশক্তি দ্বারা একটি আকাশচারী পুরুষ সৃষ্টি করছেন। এরূপে, মায়াবীর মায়ায় মোহগ্রস্ত হ'য়ে তাঁরা মায়াবীকে এরূপ আকাশচারী পুরুষোৎপাদিকা শক্তির অধিকারী বা মায়াশক্তিমান এবং এরূপ পুরুষের স্রষ্টারূপেই গ্রহণ করেন।

অপরপক্ষে, দর্শকবৃন্দের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক অধিকতর বুদ্ধিমান দর্শক মায়াবীর মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হন না, তাঁরা বংশদণ্ড, রজ্জু প্রভৃতিকে বংশ-দণ্ড রজ্জু প্রভৃতি রূপেই দেখেন, আকাশচারী পুরুষরূপে নয়। সেজন্য তাঁদের নিকট আকাশচারী পুরুষ সত্য বস্তু নয়, মিথ্যা; মায়াবী পুরুষোৎ-পাদিকাশক্তির অধিকারী বা মায়াশক্তিমানও নন, স্রষ্টাও নন—যেহেতু তাঁদের নিকট এক্ষেত্রে কোনো বস্তুই প্রকৃত-কল্পে সৃষ্টই হয় নি। এরূপে, তাঁদের নিকট, মায়াবীর মায়া সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ।

একই ভাবে, ব্রহ্মও মায়াশক্তির সাহায্যে যেন এই মিথ্যা বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করছেন। যে সকল অজ্ঞানী ও বদ্ধ ব্যক্তি জগৎকে সত্যবস্তুরূপেই গ্রহণ করেন, তাঁদের নিকট ব্রহ্ম মায়াশক্তিবিশিষ্ট জগৎস্রষ্টা। এই হ'ল ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু যে সকল জ্ঞানী ও মুক্ত ব্যক্তি জগৎকে মিথ্যারূপেই উপলব্ধি করেন, তাঁদের নিকট স্বভাবতঃই ব্রহ্ম মায়াশক্তি-বিশিষ্টও নন, জগৎস্রষ্টাও নন। এই হ'ল পারমার্থিক দৃষ্টি-ভঙ্গি। এরূপে, ব্যবহারিক স্তরেই মায়ারূপ শক্তি বা উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই হলেন ঈশ্বর।—

"ঈশ্বরস্য তু সর্বজ্ঞত্বাৎ, সর্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেত॥ (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২-২-৪)

অর্থাৎ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মহামায়াবিশিষ্ট বলে, তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি ও লয় সম্পূর্ণ-রূপে ন্যায়সঙ্গত।

ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২)—এই প্রখ্যাত দ্বিতীয় সূত্রটি শঙ্কর এই ব্যবহারিক দিক থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। এ স্থলে প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১)-এর পরে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে: ব্রহ্ম কে? এরই উত্তরে, দ্বিতীয় সূত্রে সূত্রকার বলছেন:

তিনিই হলেন ব্রহ্ম যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। শঙ্করের মতানুসারে অবশ্য এই ব্রহ্ম "ঈশ্বরই" মাত্র।

সেজন্য, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—এই উভয় দিক থেকে ব্রহ্মেরও দুটি বিভিন্ন দিক বা রূপের বিষয় শঙ্কর উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি একস্থানে বলছেন:

"উচ্যতে—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে; নাম-রূপ-বিকার-ভেদোপাধি-বিশিষ্টং, তদ্ বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধি-বিবর্জিতম্। ...ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১'১'১১)

অর্থাৎ, শ্রুতিতে দ্বিরূপ ব্রহ্মের বিষয় উল্লিখিত আছে, নামরূপ-বিকার ও ভেদরূপ উপাধিবিশিষ্ট ও সর্বোপাধি-বিবর্জিত। প্রথম শ্রেণীর শ্রুতিবাক্যসমূহ অবিদ্যামূলক, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রুতিবাক্যসমূহ বিদ্যামূলক—উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

এরূপে, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম দ্বিবিধ: নির্গুণ বা পরব্রহ্ম, সগুণ বা ঈশ্বর।

নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের বিষয় কয়েকটী পূর্ব সংখ্যায় (আষাঢ়—আশ্বিন ১৩৬৪) বিশদভাবে বলা হয়েছে। তিনিই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা, এবং তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব আর কিছুই নেই—সৃষ্টি নেই, স্রষ্টা নেই, সৃষ্ট জীবজগৎ নেই। সেজন্য তথাকথিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব জীব ও জগৎ, ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন, অর্থাৎ তারা উভয়েই মিথ্যামাত্র।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পরব্রহ্মের ব্যবহারিক রূপ। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা, জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, জীব ও জগৎ তাঁর কার্য, পরিণাম, অংশ। এরূপে, এই দিক থেকে, একতত্ত্ববাদের স্থলে ত্রিতত্ত্ববাদই গ্রহণীয়: ঈশ্বর, জীব, জগৎ—এই তিনটি সমসত্য, সমনিত্য তত্ত্ব। সেজন্য এই দিক থেকে বিবর্তবাদের স্থলে পরিণাম-বাদই স্বীকৃত। ঈশ্বর সগুণ—অনন্ত কল্যাণগুণমণ্ডিত ও হেয়গুণবর্জিত; সবিশেষ বা স্বগতভেদবান—জীব-জগৎ তাঁর স্বগতভেদ; সক্রিয়—সৃষ্টি ও মুক্তি তাঁর প্রধান কার্য; পরিণামী—বিশ্ব-প্রপঞ্চে পরিণত হয়েও অবিকারী; জীব জগতের সঙ্গে ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ, জীবের চিরোপাস্য দেবতা। এক কথায়, সাধারণ ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে, ঈশ্বরকে যে সকল গুণ ও শক্তিবিমণ্ডিত রূপে গ্রহণ করা হয়, ব্যবহারিক স্তরে ঈশ্বরও বদ্ধজীবের নিকট সেই সকল গুণ ও শক্তিবিশিষ্টরূপেই প্রতিভাত হন। সেজন্য শঙ্করের সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সঙ্গে রামানুজ-নিম্বার্কের পরব্রহ্মের কোনোরূপ ভেদ নেই।

শ্রুতিতে অবশ্য সগুণ-নির্গুণ উভয় প্রকারের বাক্যই পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে, সগুণ-বাক্যসমূহ অবিদ্যামূলক বা ব্যবহারিক দিক্ থেকে প্রামাণিক; নির্গুণ-বাক্যসমূহ বিদ্যা-মূলক বা পারমার্থিক দিক্ থেকে প্রামাণিক।

সেজন্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে শঙ্কর বলেছেন—

"কিং দ্বে ব্রহ্মণী—পরমপরঞ্চেতি। বাঢ়ং দ্বে।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪-৩-১৪)

অর্থাৎ, সত্যই কি ব্রহ্ম পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ? হ্যাঁ, সত্যই তাই।

এরূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করে শঙ্কর বলেছেন যে, শ্রুতিতে যে যে স্থলে অবিদ্যাকৃত, নামরূপাদি প্রমুখ বিশেষ বা ভেদ নিষেধ করা হয়েছে এবং 'অস্থূল' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নঞর্থক ভাবে নিষেধমুখে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই সেই স্থলে পরব্রহ্মকেই প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। অপর পক্ষে, যে যে স্থলে উপাসনার্থ 'মনোময়' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা সদর্থক ভাবে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই সেই স্থলে অপরব্রহ্মকেই প্রপঞ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এই ভাবে দ্বিবিধ ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রপঞ্চিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, অভিন্ন।

"নন্বেবং সত্য দ্বিতীয়-শ্রুতিরুপরুধ্যেত" ন, অবিদ্যা-কৃত-নাম-রূপোপাধিকতয়া পরিহৃতত্বাৎ। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪-৩-১৪)।

অর্থাৎ, অপর-ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অবিদ্যাকৃত-নাম-রূপাদি উপাধি দ্বারাই সৃষ্ট, সেজন্য মিথ্যা। অতএব, পরব্রহ্ম বা নির্গুণব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

এরূপে, ব্যবহারিক দিক্ থেকে, ঈশ্বরকে সত্য বলে বোধ হলেও, পারমার্থিক দিক্ থেকে সৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও বাধিত হয়ে যান, অর্থাৎ তিনিও সমভাবে মিথ্যা মায়া মাত্র। শঙ্কর বলেছেন—

"অবিদ্যাত্মক-নামরূপবীজ-ব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বস্য।... সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বা-ভ্যামনির্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চ-বীজভূতে সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া-শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।... এবমবিদ্যাকৃত-নামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি—ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্ম-ভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপ-কৃত-কার্য-করণ-সঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহার-বিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষ-মেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিত বা সর্বজ্ঞত্বাদি-

ব্যবহারঃ উপপদ্যতে। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-১-১৪)

এই অংশে, শঙ্কর সুন্দর ভাবে "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বরের" ভেদ, ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরকে 'সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' বলা হয়। তার অর্থ হ'ল এই যে, তাঁর মধ্যে অবিদ্যাত্মক যে নামরূপ বীজ বা জড় জগতের মূলস্বরূপ অচিৎ-শক্তি নিহিত হয়ে আছে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানরূপে তাকে অভিব্যক্ত করেন। এই অবিদ্যাকল্পিত অচিৎশক্তিই 'মায়া', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি নামে শ্রুতি-স্মৃতিতে অভিহিত হয়েছে, এবং সৃষ্টি-কর্তারূপে, সৃষ্টির পরে, ঈশ্বর সৃষ্ট-জগৎ-প্রপঞ্চ থেকে ভিন্নও হয়ে যান। এরূপে, অবিদ্যাকৃতনামরূপ বা জড়জগৎরূপ উপাধিবিশিষ্ট হয়েই "ব্রহ্ম" হন "ঈশ্বর", যেরূপ ঘটাদি উপাধি-বিশিষ্ট হয়েই 'আকাশ' হয় 'ঘটাকাশ'। এই ঘটাকাশাদি-স্থানীয়, স্বাত্মস্বরূপ, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত নামরূপ বা জড় অচিৎ থেকে উৎপন্ন দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট হয়ে জীবাত্মা যখন জন্ম পরিগ্রহ করে স্বকর্মানুসারে, তখন ব্যবহারিক দিক্ থেকে, সাধারণ জীবনের দিক্ থেকে, "ঈশ্বরই" তাকে পরিচালিত করেন। এই দিক থেকেই তিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও জীবের অন্তর্যামী।

সুতরাং 'অবিদ্যা'রূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়েই (যেমন, ঘটরূপ উপাধি দ্বারা ঘটাকাশ পরিচ্ছিন্ন বা মহাকাশ থেকে তথাকথিত ভাবে পৃথক হয়ে যায়) ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিত্ব। কিন্তু, পারমার্থিক দিক থেকে বিদ্যা দ্বারা সর্বোপাধি বিরহিত অবস্থায় ঈশ্বরও নিয়ন্তা নন, জীব-জগৎও নিয়ম্য নয়, যে হেতু সেই দিক থেকে এক পরব্রহ্মই কেবল আছেন; সর্বজ্ঞও নন, জ্ঞানস্বরূপই মাত্র। সেজন্য, বেদান্তের মতে, পারমার্থিক দিক থেকে সৃষ্টি-স্রষ্টৃ-সৃষ্টাদি ব্যবহার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

"সংসারো ন তু পরমার্থতোঽস্তীত্যসকৃদবোচাম।" (ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য ২।১।২২ শঙ্কর)

শঙ্কর বারংবার এই ভাবে বলেছেন যে, সংসার পারমার্থিক তত্ত্ব বা সত্য নয়। সেজন্য জগৎ কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মের "স্বরূপ-লক্ষণ" নয়, "তটস্থ-লক্ষণ" মাত্র। অর্থাৎ, এই সকল গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করে না—যেহেতু তারা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত, মিথ্যা গুণই মাত্র। "সচ্চিদানন্দই" ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ।

শঙ্কর ঈশ্বর-বিষয়ে উল্লেখকালে বারংবার 'অবিদ্যামূলক উপাধি' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন এই জন্য যে, জীব ও জগৎ যেরূপ অবিদ্যামূলক উপাধিজাত, ঈশ্বরও ঠিক তাই। সেজন্য ব্যবহারিক স্তরের ত্রিতত্ত্বঃ ঈশ্বর, জীব, জগৎ, সম-ভাবে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যান পারমার্থিক স্তরের "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-কৃত "বেদান্ত-পরিভাষা" ব্রহ্মের এরূপ "স্বরূপ-লক্ষণ" ও "তটস্থ-লক্ষণের" সুন্দর সংজ্ঞা দান করে বলেছেন ঃ

তত্র লক্ষণং দ্বিবিধং, স্বরূপ-লক্ষণং তটস্থ-লক্ষণঞ্চেতি। তত্র স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপ-লক্ষণং, যথা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যত্র সত্যত্বাদিকং স্বরূপ-লক্ষণম্।...তটস্থ-লক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্যকালম্ অনবস্থিতত্বে সতি যদ্ব্যাবর্তকং তদেব।... জগজ্জন্মাদি-কারণম্।" (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ, লক্ষণ দ্বিবিধ ঃ স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। স্বয়ং স্বরূপকেই লক্ষণরূপে গ্রহণ করলে, তা' হয় "স্বরূপ-লক্ষণ।" এ স্থলে প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ ও লক্ষণ অভিন্ন, বিশেষ্য-বিশেষণ, ধর্মি-ধর্ম ভেদ তাদের মধ্যে নেই। তা সত্ত্বেও বুঝবার সুবিধার জন্য, এরূপ ভেদের কল্পনা করেই বলা হয় যে, 'এই লক্ষণটি ঐ বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ।' যথা, 'সত্যত্ব', 'জ্ঞান', 'অনন্তত্ব' প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ বলেই, সত্যত্ব, জ্ঞান ও অনন্তত্বকে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণও বলে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং স্বরূপ-লক্ষণ শাশ্বত—সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় বিরাজ করে। অপর পক্ষে, যে লক্ষণ শাশ্বত নয়, অথবা সর্বদাই সেই লক্ষ্য বস্তুটিতে বিরাজ করে না, কিন্তু কেবল সময়-বিশেষেই তাকে বিশেষ করে নির্দেশ করে দেয়, তা হ'ল "তটস্থ-লক্ষণ।" যথা, 'গন্ধবত্ত্ব' পৃথিবীর তটস্থ-লক্ষণ, যেহেতু মহাপ্রলয়কালে পরমাণুতে এবং উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে গন্ধের অস্তিত্ব থাকে না। অপর একটি সাধারণ দৃষ্টান্তও গ্রহণ করা চলে। কোনো নবাগত ব্যক্তি দেবদত্তের গৃহে গমন করতে ইচ্ছুক হয়ে, সেই দেশের একজনকে সেই গৃহটি নির্দেশ করতে অনুরোধ করেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন ঃ 'যে গৃহে পতাকা উত্তোলিত আছে, সেই গৃহই হ'ল দেব দত্তের গৃহ।' এ স্থলে 'পতাকা' হ'ল গৃহটির তটস্থ-লক্ষণ; কারণ, পতাকা গৃহে সর্বদা থাকে না, কোনো বিশেষ উৎসবাদিতেই উত্তোলিত হয়। একই ভাবে, ব্রহ্ম সর্বদা জগতের স্রষ্টা নন; অবস্থা বিশেষেই, ব্যবহারিক দিক্ থেকেই, যেন মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হয়েই, তিনি যেন জগৎ সৃষ্টি করেন।

এই ব্যবহারিক দিক্ থেকে ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্বের অর্থ হ'ল এই ঃ

"কারণত্বঞ্চ কর্তৃত্বম। কর্তৃত্বঞ্চ তদুপাদানগোচরা-পরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমত্ত্বম্।"

(বেদান্ত-পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ, নিমিত্তত্বের অর্থ হ'ল : কর্তৃত্ব ; কর্তৃত্বের অর্থ হ'ল : উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সেই উপাদানের সাহায্যে কার্যটি সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা, এবং সেই বিষয়ে প্রযত্ন। যেমন, মৃন্ময় ঘটের নিমিত্তকারণ হ'ল কুম্ভকার, উপাদান কারণ হ'ল মৃৎপিণ্ড। এক্ষেত্রে, ঘটসৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান মৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান কুম্ভকারের আছে, মৃন্ময় ঘটটিকে নির্মাণ করার ইচ্ছা আছে এবং তার জন্য শক্তি, প্রযত্ন বা প্রচেষ্টাও আছে। জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি বা প্রযত্নের সমন্বয়েই কেবল হতে পারে পরিশেষে উপাদানের সাহায্যে কার্যোৎপত্তি। একই ভাবে, জগতের সৃষ্টির ইচ্ছা, সৃষ্টির প্রচেষ্টা ; জগতের স্থিতির জ্ঞান, স্থিতির ইচ্ছা, স্থিতির প্রযত্ন ; জগতের প্রলয়ের জ্ঞান, প্রলয়ের ইচ্ছা, প্রলয়ের প্রচেষ্টা—এই হ'ল ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্বের নব লক্ষণ—

"এবঞ্চ লক্ষণানি নব সম্পদ্যন্তে।"

(বেদান্ত-পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্বের অর্থ হ'ল :

"উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, জগদাকারেণ পরিণমমান-মায়াধিষ্ঠানত্বং বা।" (বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

অর্থাৎ, জগতের উপাদানত্বের বিবর্তবাদানুসারী অর্থ হ'ল : জগতের অধ্যাস বা ব্রহ্মে জগদ্রূপ ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞানের অধিষ্ঠান হওয়া—জ্ঞাতা বা ভ্রমকারীর দিক্ থেকে ; এবং জগদাকারে পরিণত মায়ার অধিষ্ঠান হওয়া—জ্ঞেয় বা মিথ্যা বস্তুর দিক থেকে। যেমন, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে, সর্প-ভ্রমের উপাদান কারণ হ'ল অধিষ্ঠান-রজ্জু, যেহেতু রজ্জু না থাকলে সর্প রজ্জুর উপর অধ্যস্ত হয়ে ভ্রমের সৃষ্টি করতে পারত না ভ্রমকারীর দিক থেকে ; পুনরায় রজ্জু না থাকলে মিথ্যা, মায়িক সর্পেরও সৃষ্টি হতে পারত না মিথ্যা বস্তুর দিক থেকে। একই ভাবে, জগদ্‌ভ্রমের ও মিথ্যা-জগতের অধিষ্ঠান হলেন ব্রহ্ম।

এরূপ মিথ্যাসৃষ্টির উল্লেখ করে "পঞ্চদশী" সেই সুবিখ্যাত শ্লোকে বলছেন :

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ-পঞ্চকম্।

আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥"

অর্থাৎ, অস্তিত্ব, প্রকাশত্ব, প্রিয়ত্ব, নাম ও রূপ—এই পাঁচটি অংশ জগতের প্রত্যেক পদার্থেই প্রতীত হয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মের রূপ ; শেষের দুটি জগতের রূপ। ব্রহ্ম অস্তিত্বযুক্ত বা সৎ, প্রকাশত্বযুক্ত বা চিৎ, প্রিয়ত্বযুক্ত বা আনন্দ। জগৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হওয়াতেই, জাগতিক বস্তু অস্তিত্বযুক্ত, প্রকাশত্বযুক্ত ও আনন্দযুক্ত হয় ; ফলে : 'ঘটঃসন্ ঘটো ভাতি, ঘট ইষ্টঃ : 'ঘটটি আছে, ঘটটি প্রতিভাত হচ্ছে, ঘটটি প্রিয় বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু'—এরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু নাম ও রূপ মায়ার পরিণাম নামরূপের সম্বন্ধ থেকেই উদ্ভূত। এই ভাবেই বিশেষ বিশেষ নাম-রূপ-বিশিষ্ট চৈত্রমৈত্রাদি চেতন জীব ও ঘটপটাদি অচেতন দ্রব্যের তথাকথিত উৎপত্তি।

শঙ্করের এই "ঈশ্বরবাদ" জগতের দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি অপূর্ব তত্ত্ব। অবশ্য "The Absolute of Philosophy" এবং "God of Religion"—দর্শনের অদ্বৈত ব্রহ্ম এবং ধর্মের দ্বৈতাদ্বৈত ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও একটি ক্ষেত্রে করা না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু সেই সকল দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। বহু থেকে আরম্ভ করে', ক্রমান্বয়ে বহুকে সমন্বিত করে', অল্প থেকে অল্পতর তত্ত্বে উপনীত হয়ে, পরিশেষে বহুসমন্বিত এক তত্ত্ব লাভ করা এক কথা ; এবং এক থেকেই আরম্ভ করে, বহুকে পারমার্থিক দিক থেকে অস্বীকার করে, একতত্ত্ব রক্ষা করা, অন্য কথা। সেই দিক থেকে, পারমার্থিক স্তরে, ঈশ্বর জীব ও জগৎকে সমভাবে মিথ্যারূপে গ্রহণ করে' শঙ্কর সত্যই একতত্ত্ববাদের একটি অভিনব রূপ আমাদের দেখিয়েছেন।
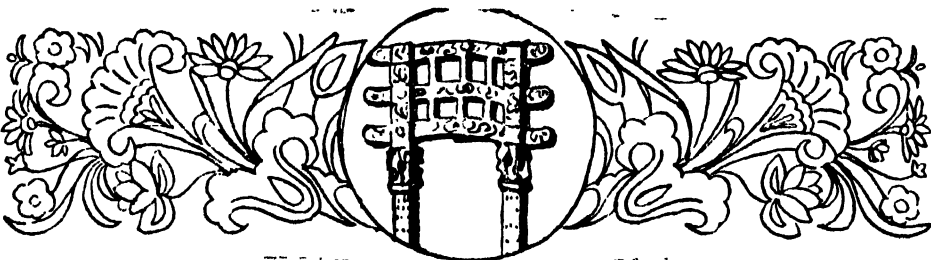
সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

নিউ-ইয়র্কে ট্রেন ধরতে যাবার পথে প্রাসাদ অরণ্যের মাঝখানে চোখে পড়ল দিবারাত্রি আলোজ্বালা সিনেমা হাউস। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই সিনেমা হচ্ছে। যে কোনও সময় টিকিট কেটে ঢুকে পড়লেই হ'ল। কোন ছবির ল্যাজা এবং কোনটার মুড়ো দেখতে পাবেই। আনন্দসন্ধানীদের অকারণ অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। কাজই হউক আর স্ফূর্ত্তিই হউক সবই অনায়াসলভ্য করার চেষ্টা এখানে সর্ব্বত্রে আছে।

বিরাট ষ্টেশনে এসে খানিক অপেক্ষা করার পর গাড়ীর সময় হ'ল। আমাদের জাহাজের বন্ধু মিসেস ভেটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইসরাইলে শিক্ষয়িত্রী কন্যার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরে চলেছেন। বললেন, "আমি মাঝে মাঝে তোমাদের খবর নেব।" সত্যই বার বার ট্রেনে আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। একবার খাবার নিয়ে এলেন, একবার অন্য সহযাত্রিনীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছোট একটি মেয়ে দিদিমার সঙ্গে চলেছিল কোথায়, সে ত এতই ভাব করে বসল যে নিজের একটা নোট-বই দান করে ফেলল। তবে সবাই জিজ্ঞাসা করে, "আমেরিকা কেমন লাগে?" এই ত সবে পা দিয়েছি, এখনই কেমন লাগে কি করে যে বলা যায় জানি না। দুই একজন বললেন, "এই কি প্রথম আমেরিকায় এলে?" সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া অবশ্য সহজ। ডাঃ নাগের তৃতীয় বার হলেও আমাদের সেই প্রথম বার।

তিনটায় ট্রেন ধরেছিলাম, সারা রাত ট্রেনে কাটবে। খুব বড়লোক ছাড়া কেউ রাত্রে "স্লিপিংকারে" যায় না। অথচ এখানের সিটগুলিতে ঘুমোবার ব্যবস্থা তেমন নেই। সন্ধ্যার পর চেয়ারগুলোর মাথা আর একটু হেলিয়ে দেয় যাতে বিশ্রাম বেশী হয়, আর প্রায় সবাই একটা করে বালিশ ভাড়া করে। সন্ধ্যায় যে গাড়ী তদারক করে সে যাত্রীদের সবাইকে যথাস্থানে বসতে বলে দিল। দিনের বেলা যে যার পাশে বসে থাকে, এখন সব মেয়েরা মেয়েদের পাশে এবং ছেলেরা ছেলেদের পাশে। সারারাত অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে বসেই কাটাতে হয়।

ট্রেনের পথটি সুদীর্ঘ হডসন নদীর পাশ দিয়ে চলেছে। ট্রেন-ভ্রমণটা যাতে সুখকর হয় তার সুন্দর উপায়। নদীর ধারে ধারে বাড়ী এবং লম্বা মোটরের রাস্তা। মাঝে মাঝে নদীর জল বাঁধা পড়েছে, সরু সরু পথ দিয়ে পিচকিরির মত জল পড়ছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ এবং নদীর গতিপথ ঠিক রাখার কত ব্যবস্থা। পাড় পাছে ভাঙে বা বেশী বালির চড়া পড়ে তাই আগাগোড়া দু'পাশে গাছপালা। এদেশে বালির চর চোখে পড়ে নি।

পরদিন শিকাগো পৌঁছলাম, এখানে অন্য গাড়ীতে চড়তে হবে। ট্রেন থেকে নামবার সময় মহা বিভ্রাট! আমাদের সঙ্গে পর্ব্বত প্রমাণ জিনিস। জিনিস নামাবার অনেক আগে একজন নিগ্রো অনেকের জিনিস দরজার কাছে রাখছিল। আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ বলে তাকে তখন কিছু বলি নি। যথাসময়ে জিনিসগুলি নামাতে বলাতে সে ভীষণ ক্ষেপে গেল। "আগে কেন বল নি? আমি কিছুতেই নামাব না।" ভাগ্যে মিসেস ভেটার ছিলেন। তিনি অনেক বুঝিয়ে-পড়িয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলেন। আমাদের বললেন, "ওরা বড় অল্পে রেগে যায়।" ভদ্রমহিলা সর্ব্বদা সাদা-কালো উভয়পক্ষকে বাঁচিয়ে কথা বলতেন। সাদারা ভাল, কালোরা মন্দ—এ রকম মত যে তাঁর নয় এটা বোঝাতে খুব চেষ্টা ছিল তাঁর। মিসেস ভেটার এখান থেকে ওহায়োর পথে চলে গেলেন। এদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি আমাদের ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে এবং তাতেই এতগুলি মানুষ ও পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিস চাপিয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করে দিলেন।

প্রত্যেক বড় ষ্টেশনে যাত্রীদের সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক থাকে। এখানে কাণে দুল পরা একটি মেয়ে এসে আমাদের টিকিট করিয়ে ব্রেকফাষ্টের জায়গা দেখিয়ে মাল রাখবার স্থান ঠিক করে অনেক সাহায্য করল।

আবার আর একটা নূতন ট্রেন ধরলাম। অল্পবয়স্কা এক একটি মেয়ের কি সাজের ঘটা। মাথার চুল, চোখের পাতা কাপড় জুতো সব এক রঙের এবং এক ধরণের। এই রকম একটি নীলবসনা নীলনয়না সুন্দরী আমার এক মেয়েকে পাকড়ালেন। সারা ট্রেন ঘুরিয়ে দেখালেন, নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করলেন এবং বিয়ার খাওয়ায় রাজি করতে না পেরে কোকাকোলা খাওয়ালেন। মেয়েটির গল্প লেখা পেশা। সে বললে, "তোমার নামে আমি একটা গল্প লিখতে

চাই।" বোধ হয় ভাবছিল কার চারটে স্ত্রী, কার পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছে, কে ইঁদুর-বাঁদর পুজো করে ইত্যাদি অনেক তথ্য পাবে। কারণ দেখেছি এইগুলো জানবার আগ্রহ ও দেশের মেয়েদের ভয়ানক বেশী।

শিকাগো থেকে যে ট্রেনে উঠলাম তার পথের দৃশ্যগুলিও সুন্দর। দু'ধারে নদী পাহাড় বন ক্ষেত। ইউরোপের মত ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট জমি নয়, সবই বিরাট। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গেই এদের মিল বেশী। নদী ত এত লম্বা যে, শেষ হয় না, পাহাড়ও সুদীর্ঘ। নদীতে বড় বড় ষ্টীমার চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। তাছাড়া সখের দাঁড়টানা নৌকা কিম্বা মোটর বোটেরও ছড়াছড়ি। এরা যেমন কাজের লোক, তেমন ফুর্ত্তিবাজও। সর্ব্বত্র আনন্দ খুঁজে বেড়ায় এবং আনন্দ উপভোগও করে।

আমরা পাঁচজন একত্রে চলেছি দেখে অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের গল্প ফাঁদল। এক বৃদ্ধের তিন ছেলে বিয়ে করে তিনটে গাড়ী কিনে বসে আছে। তার বেচারীর কিছু নেই। এদেশে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কত একলা পড়ে পরে দেখেছি।

প্যারিসে শাঁজিলিশে অসম্ভব মোটরগাড়ী দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, আমেরিকায় তার বহু গুণ! নিউ-ইয়র্ক থেকে সেণ্টপল পর্য্যন্ত যত বড় ষ্টেশন পার হলাম সেখানে প্রায় পথের কাঁকরের মত গাড়ী ছড়ানো বলা যায়। অবশ্য ছড়াবার স্থান নেই, ঠাসা। বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাকে চাপিয়ে ছয়-সাতটা গাড়ী একত্রে প্রায়ই চালান যাচ্ছে, সারা পথ দেখলাম। গাড়ী যেমন তৈরী হয়, তার চাহিদাও তেমনি। যাঁতা ঘোরালে যেমন ঝর্ ঝর্ করে আটা পড়ে, মনে হয় এ সব শহরে তেমনি করে মোটরগাড়ী ঝরে পড়তে থাকে।

সন্ধ্যার আগেই সেদিন সেণ্টপল ষ্টেশনে পৌঁছলাম। জানতাম আমাদের নিতে কেউ না কেউ আসছেন। আমরা নামবা মাত্র হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মার্শ নামক এক যুবক অধ্যাপক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। জিনিস-পত্র সামলে যখন ষ্টেশনের বাইরে এসে হাজির হলাম তখন মেকালেষ্টারের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ টর্ক ও হ্যামলিনের ডীন উইমার আমাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন দেখলাম। টর্ক বয়স্ক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শান্ত স্থির গম্ভীর দেখতে, তবে প্রসন্ন হাসি একটা আছে। ডীন উইমার একটু বেশী সাহেব সাহেব দেখতে। এঁদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ই দিল না খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। তারা কেবলি ছবি তুলছে আর অসংখ্য প্রশ্ন করছে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা দুটো গাড়ীতে চড়ে একটা বড় হোটেলে খেতে গেলাম। অধ্যাপক টর্ক আতিথ্য করলেন। যে যা খেতে ভালবাসে তার জন্য সেই রকম খাবার অর্ডার দেওয়া হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের নূতন বাড়ীর পথে যাত্রা। কিন্তু খানিক পথ এসে একটা গীর্জ্জার কাছে গাড়ীর টায়ার গেল ফুটো হয়ে। মহা হাঙ্গাম। এদেশে যাঁর গাড়ী তিনিই চালক। বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্বয়ং দৌড়লেন গাড়ী খুঁজতে। আমরা ডীন উইমারের সঙ্গে গাড়ী চড়ে চললাম। টর্ক মহাশয় নিজের গাড়ী সারাবার চেষ্টায় লাগলেন।

মেয়েরা ডাঃ মার্শের সঙ্গে অন্য গাড়ীতে আগেই চলে গিয়েছিল। বাড়ীতে পৌঁছে দেখি তারা তখন ঘর-সংসার সব বুঝে নিচ্ছে। কি করে উনুন ধরায় কি করে ঘর ঠাণ্ডা গরম করে, কোথায় কি রাখে এবং আছে অধ্যাপক তাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ীটা তিনতলা বলা যায়, একটা তলা মাটির তলায় আর দুটো উপরে। আধুনিক সংসারের প্রয়োজনীয় সবই আছে। ফ্রিজিডেয়ার, গ্যাস-ষ্টোভ, কাপড় কাচা কল, ঘর ঝাঁটানো কল, হীটার, অষ্টপ্রহর গরম জল কিছুর অভাব নেই, আসবাব বাসন কোশন ত আছেই। তবে বেশী বড়মানুষী সংসারে আরও অনেক ব্যবস্থা থাকে যেমন বাসন ধোয়া মেসিন, স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রী ইত্যাদি, সেগুলো এ বাড়ীতে ছিল না।

এত খেটে সব বুঝিয়ে দেখিয়ে ভদ্রলোকরা যখন চলে যাচ্ছেন তখন দেখি মাথায় দেবার বালিশ নেই। বেচারীরা আবার ছুটে কলেজ থেকে বালিশ নিয়ে এলেন। মান্যগণ্য অধ্যাপকরা নিজে হাতে সব করে দিচ্ছেন ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেখা অভ্যাস ছিল না, কাজেই সব কিছু একটু নূতন লাগছিল, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ ভেবে যদিও নীরব রইলাম। অবশেষে রাত্রের মত ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। পরদিন সকাল থেকে আমাদের নিজের ভার নিজে নিতে হবে। কোথায় কাল জিনিসপত্র পাব জিজ্ঞাসা করাতে অধ্যাপক মার্শ বড় রাস্তার দিকে হাতটা দেখিয়ে শুধু বললেন, "ঐ দিকে।"

পরদিন সকালে উঠে খাবারের সন্ধান করতে এবং শহর দেখতে বেরোলাম। আধুনিক দেশ আর আধুনিক শহর ত! কাজেই ছক-কাটা কাটা রাস্তা, দুটি পথের মাঝ-খানের দূরত্বগুলি সমান সমান মনে হয়। বাড়ীগুলি প্রায় একই রকম, সকলেরই পিছনে একটু উঠান, কিন্তু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, ছোট ছোট ফুলগাছের বেড়া। উঠানের শেষে বাড়ীর জঞ্জাল পোড়ানো হয়, তারপর খিড়কির গলি। মোড় ফিরে এই রকম কয়েক সারি বাড়ী পেরিয়ে বড় রাস্তায় এলাম, অর্থাৎ যে রাস্তায় দোকান-পাট ট্রাম। মনে করে-ছিলাম কোন একটা জায়গায় ব্রেকফাষ্ট খেয়ে পরে রান্নাবান্নার জিনিস কিনব। কিন্তু সে রকম কোন জায়গা চোখে পড়ল না। এমনি একটা দোকানে ঢুকে পড়ে খোঁজ করতে

গেলাম কোথায় কি পাওয়া যায়। দেখলাম সবই প্রায় তার দোকানে আছে, কেবল খাবার জায়গা নেই। রান্নাও অবশ্য করে দেয় না। অগত্যা রুটি মাখন ডিম কেক চিনি চা থেকে চাল-ডাল আলু পেঁয়াজ পর্য্যন্ত সব কিনে বাড়ী ফিরে এলাম।

দোকানদারটি প্রথমে আমাদের জিপ্‌সী মনে করেছিল। বললে, "তোমরা বুঝি মেলায় এসেছ?" শহরে তখন একটা মেলা হচ্ছিল। যখন শুনল যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি তখন একটু সমীহ করে বললে, "My education has been left in the dark." আমাদের কিছু বিস্কুট উপহার দিল এবং বলল, "এই রকম কি আর তোমরা থাকবে? কিছুদিন পরে এ সব পোষাক ছেড়ে বাঁকা টুপি পরে মেম সেজে বেড়াবে।"

ওদেশে সবাই সবাইকার সঙ্গে সমানভাবে কথা বলে। যে মাল পৌঁছতে এসেছিল সেও আমার ছোট মেয়েকে অনায়াসে বলল, "তোমার মত সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখি নি। তুমি দেশে ফিরে যেও না, এইখানেই থাক।" আরও অনেক রসিকতা করবার চেষ্টায় ছিল।

সন্ধ্যায় দু'জন অধ্যাপকের স্ত্রী আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ করতে এলেন। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে গল্প করে গেলেন।

অগষ্টে ঠাণ্ডা কিছু পড়ে নি, তবু মেঘ করলেই ঠাণ্ডা আর রোদ উঠলেই একটু গরম। ঠাণ্ডাটা আমাদের যত কম মনে হয় আসলে তার চেয়ে অনেক বেশী, শুকনো দেশ বলে ঠিক ধরা যায় না, তবে হঠাৎ সর্দ্দি বসে যায়।

এই পাড়াটা মধ্যবিত্তদের পাড়া, অনেককে গরীবও বলা যায় ওদের দেশের আদর্শে। কিন্তু পাড়াটা দেখতে ভাল। কলেজ থেকে কাছেই, রাস্তার দু'ধারে বড় বড় পত্রবহুল গাছ, বাড়ীর সামনে অল্প একটু জায়গা, কেউ ফুলগাছ কেউ আরও অন্য সৌখীন জিনিস দিয়ে সাজিয়েছে। বাড়ীর ঠিক আশে-পাশে যারা থাকে তারা বড় কাজ কিছু করে না, একজন ত মাটি কাটা মেসিনের কাজ করে। এরা আমাদের বাড়ী খুব আসছে। মা, বাবা আর তিনটি ছেলে। বাবা বিদ্বান নয় বলে একটু লজ্জিত, স্ত্রীর ও সব বালাই নেই, সে অনর্গল বক্‌ বক্‌ করে গল্প করে যায়, অনেক কাজে সাহায্যও করে। ছোট ছেলেটি বছর দুই-এর, আর দুটি নয়-দশ বছরের। বড় দুটি সারাদিন তীর-ধনুক নিয়ে খেলে, ছোটটি নানা রকম গাড়ী নিয়ে খেলে, নয়ত ক্রমাগত কাঁদে। বড় দুটি আমাদের দেশের পিঠোপিঠি ভাই-এর মতই অল্প বিস্তর মারপিট সারাক্ষণই করে। উল্টো দিকের বাড়ীতে কয়েকটি ছোট মেয়ে আছে শ্ল্যাক্স পরে খেলে বেড়ায়। এ দেশের ছেলেপিলেরা রাস্তায় খেলতে বেরোলে কেউ তদারক করে না তাদের, তবে ভিতরের উঠোনে বা ঘরেই তারা বেশী খেলে। সকলেরই খিড়কির দিকে কাপড় শুকোবার জায়গা। শনি-রবিবারে বাইরে ফুর্ত্তি করে বাড়ীর গিন্নীরা সোমবারে মেসিনে কাপড় কেচে উঠোনে শুকোতে দেয়। যার যেমন কাজ করবার ক্ষমতা ও সখ সেই অনুপাতে বাগানগুলির যত্ন হয়। কোন কোন পেনসনপ্রাপ্ত দম্পতির বাগান ও ঘর সাজানো দেখবার মত, কারণ তাদের ঐটাই একমাত্র কাজ। রোজগার করা ও সন্তান পালন করা অনেক দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।

এদেশে রোদ বেশী নয় এবং ঘর সর্ব্বদা বন্ধ রাখে, তাই সকলেরই ঘরের কাচের দরজা জানালায় সাদা লেস ও নেটের পর্দ্দা। এতে ঘরগুলিতে আলো বেশী দেখায়। আমাদের রৌদ্রোজ্জ্বল দেশে রঙীন পর্দ্দাই ভাল, না হলে রোদে চোখ ঝলসে যায়। অবশ্য সাদা পর্দ্দাকে দুগ্ধ শুভ্র না রাখতে পারলে গৃহিণীর নিন্দা। কাচা, ইস্ত্রী-করা সব নিয়মিত হওয়া চাই।

একদিন বিকালে অধ্যাপক মার্শের বাড়ী গেলাম। এঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে, তৎসত্ত্বেও স্বামি-স্ত্রী দুজনেই চাকরী করেন। বড় মেয়েটি আট বছরের, দ্বিতীয়টি ছেলে সাড়ে তিন বছরের, ছোট মেয়ে এক বছরের। বড় মেয়েটির নাম নর্ম্মা, তার কাছে আমার মেয়েরা গল্প করছিল যে রাস্তায় কয়েকটি ছেলে ওদের "হেলো চাইনী" বলে ডেকেছে। মেয়েটি ভীষণ রেগে গেল এবং সেই ছেলেদের খুঁজে বকে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। তাদের এত স্পর্দ্ধা যে, নর্ম্মার বন্ধুদের 'চাইনী' বলে! যাই হোক পাড়ার ছেলেদের কৌতুহলের শেষ ছিল না, এক দলের ধারণা আমরা চীনা, আর একদল ভাবে আমরা 'রেড ইণ্ডিয়ান।' মেয়েরা কম্বল পরে কিনা এবং তাদের বাবা মাথায় পালক পরেন কিনা এটা জানা তাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা 'রিয়াল ইণ্ডিয়া' থেকে এসেছি শুনে কেউ কেউ খুশী হ'ল, তখন তাদের প্রশ্নাবলী অন্য পথে ফিরল।

আমাদের রং ময়লা এবং পোষাক আলাদা, কাজেই আমরা যে নূতন কিছু একটা, এটা ছোট বড় সবাই ভাবে। মেম সাহেবের মত পোষাক হলে নিগ্রো ভাবত। তবে বড়রা লক্ষ্য করে যে চুল কোঁকড়া নয়।

অন্য ষ্টেটের তুলনায় কম হলেও মিনেসোটাতেও নিগ্রো-সমস্যা আছে। নিগ্রো বিয়ে করতে প্রায় কেউ চায় না। মিসেস মার্শ বলছিলেন, ওঁদের এক বন্ধু দুবার বিয়ে করেছেন, প্রথমবার মেম, দ্বিতীয়বার নিগ্রো। দুবারে দুটি ছেলে আছে, ছোট ছেলেটি নিগ্রোর মত দেখতে, তাই বড়টিকে সবাই তার ভাইকে নিয়ে ঠাট্টা করে। আমরা যে সব পাড়া

দেখতাম, সেখানে নিগ্রোদের বাস নেই ওদের পাড়াও আলাদা।

আমাদের পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে ভাব করতে আসে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতবর্ষ কি এখনও ইংরেজের অধীন? তোমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান আর মহমেডান বলে তিনটে জাত আছে না? তা ছাড়া Caste system (জাতিভেদও) ত আছে।"

আমরা বললাম, "তোমাদের দেশে যেমন সাদায়-কালোয় ভেদ আছে, ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট আছে, আমাদের হিন্দুদের মধ্যেও সেই রকম নানা ভেদ আছে।"

ভদ্রমহিলা নিজের ধর্ম্মের এবং জাতের বিষয়ও সব কথা জানেন না, বলছিলেন, "আমার স্বামী বলেন, 'তুমি লেখাপড়া শেখ নি, অত শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে মেশ কেন?' স্ত্রী বলেন, 'তাতে কি? আমি না মিশলেই কি ওরা আমাকে শিক্ষিত ভাববে? তার চেয়ে আমি যে রকম তাই ওদের জানা ভাল।'

অধ্যাপক কঙ্গারের চেষ্টাতেই আমেরিকা যাওয়া হয়েছিল। একদিন তাঁদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেক গণ্যমান্য অথবা অবস্থাপন্ন লোক এদেশে শহরের একটু বাইরে খোলা এবং সুন্দর জায়গায় থাকেন। কঙ্গাররাও এই রকম অনেক দূরে থাকেন। তাঁদের নানা দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা, তাই বোধ হয় গাড়ি ও রাখেন না। আমরা তাঁদের বাড়ীর সন্ধানে ট্রামেই বেরোলাম। এখানে ট্রামে ভিড় নেই এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পরে একটা গাড়ী আসে। কোথা দিয়ে কোথায় যাব পথে কেউ কিছুই বলতে পারল না। যাই হউক, ট্রামে উঠে দেখি একটি মেয়ে ট্রাম চালাচ্ছে। তার কথামত পয়সা নিয়ে একটা বাক্সে দিলাম। বার দুই নদী পার হয়ে এক জায়গায় নামতে বলল। কিন্তু সেখানেও আগের অবস্থা, কেউ জানে না কোথায় যেতে হবে। একজন বুদ্ধি খরচ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে বলল। ট্যাক্সিওয়ালা নাম-ধাম ঠিকানা লিখে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে যথাস্থানেই নামাল।

জায়গাটি ভারী সুন্দর, তপোবনের মত। খুব উঁচু জমির উপর বড় বড় গাছের বাগানের মধ্যে বাড়ী, অনেক নীচে মস্ত বড় নদী বয়ে যাচ্ছে, ওপারে পাহাড় ঘনগাছে সবুজ হয়ে আছে। ট্যাক্সি দেখেই বাগানের মধ্যে দিয়ে মিসেস কঙ্গার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। খুব আদর করে বসালেন, কিন্তু তাঁর স্বামী ট্রাম লাইনে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বলে ছুটে আবার তাঁকে ডাকতে গেলেন। এদেশে ত চাকর-বাকর নেই, ভদ্রমহিলার ছেলেপিলেও নেই। কাজেই অতিথিদের ফেলে তিনি নিজেই বেরোতে বাধ্য হলেন। আমরা খালি বাড়ীতে বসে রইলাম। অধ্যাপক কঙ্গার বিদ্বান দার্শনিক, সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, ভারতবর্ষে অনেকবার এসেছেন। ঘরে নটরাজ, বুদ্ধ, বংশীবাদক কৃষ্ণ, ব্যাবিলোনিয়ার হাঁস, ভারতীয় গঙ্গাযমুনা ঘটি, কত কি সুন্দর সুন্দর জিনিস সাজানো। কঙ্গার উদার হৃদয় মানুষ, যারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত তাদের দুর্দ্দশার জন্য অথবা ক্ষুদ্রতার জন্য যে লাঞ্ছনাকারীরাই দায়ী তা জোর দিয়ে বলেন। নিগ্রোদের অপরিচ্ছন্নতা ও অল্পবুদ্ধির নিন্দা ওঁর স্ত্রী করাতে অধ্যাপক বলছিলেন কোন জাতকে শত শত বৎসর দাস করে রেখে দিলে তারা ওর চেয়ে ভাল হবে আশা করাই ভুল। ভারতবর্ষ বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য মোটা মোটা জার্ম্মান বই তাঁর লাইব্রেরীতে রয়েছে, অন্যান্য অনেক বই আছে। ওঁরা স্বামিস্ত্রী আমাদের ওদেশ বিষয়ে নানা পরামর্শ দিলেন। শীত আগতপ্রায়, আমরা সে বিষয়ে কিছুই জানি না, সে রকম ভারী কোটও নেই। কাজেই সর্ব্বপ্রথম পরামর্শ শীত নিবারণ বিষয়ে। ভদ্রমহিলা দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে শাড়ী-গয়না-খাবারের গল্প বেশী পছন্দ করেন, কাজেই সে বিষয়েও মহোৎসাহে গল্প করলেন। অধ্যাপক কঙ্গার উচ্চাঙ্গের আলোচনাই করলেন, ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁর উদার মতামত শুনলে আনন্দ হয়। মানুষটি বিশেষ একটা দেশের মার্কামারা মানুষের মত নন, যাঁরা সর্ব্বত্র নীর ত্যাগ করে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে জানেন ইনি সেই জাতের মানুষ। দেশে আমি ঘরের বাইরে বেশী বেরোই না। কাজেই দেশের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। তবু বিদেশে গিয়ে অল্প যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছিল এই ধরণের মানুষ আমাদের দেশে বেশী দেখা যায় না। আমরা পরের দেশের নিন্দা করি, কিন্তু আমাদের দেশে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি উপরের একটা পোশাকের মত, তা ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। বিদ্যাবুদ্ধি আছে বলেই যে তার আদর্শবাদ, উদারতা মানবহিতৈষণা থাকবে এমন আমাদের দেশে ধরে নিতে সাহস হয় না। জ্ঞানতপস্যারত মানুষ আমাদের দেশে যে নেই তা নয়, তবে মনে হয় তাঁরা মুষ্টিমেয়, তাঁদের দিন শেষ হয়ে আসছে, মানুষ জ্ঞানের মুখোশ পরে ক্ষুদ্রতার পিছনে ছুটতে ব্যস্ত।

পত্রযোগে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ক্রমে তাঁরা দুই-একজন করে দেখা করে যাচ্ছেন। এদেশের ভদ্রতার যে সব নিয়ম বাঁধা আছে তাঁরা সেই মতই চলেন। ঘড়ি-ধরা নির্দ্দিষ্ট একটা দিনে আসা, নিজের বাড়ীতে একবার ডাকা এইগুলিই প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁরা তার চেয়ে বেশী হৃদ্যতা দেখান তাঁরা গাড়ী করে এখানে-ওখানে নিয়ে যান মাঝে মাঝে। দুই-একজন হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন যাঁরা সকল কাজেই হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে আসেন। এ রকম আমাদের

ভাগ্যেও দুই-একজন জুটে গিয়েছিলেন দিন কয়েক পরে। তবে আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মতৎপর দেশ বলে সবাই নিজের কাজেই বেশী ব্যস্ত থাকে, এবং আশা করে যে, পরেও তাই থাকবে। কেউ কারুর সাহায্য চাইবেও না, করবেও না।

পাশের বাড়ীর অল্পশিক্ষিত মেয়েটিই সর্ব্বপ্রথম কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করতে আসত। সে কাপড়কাচা কলে কাপড় কি করে কাচে, ধূলো ঝাঁট দেওয়া কলে কি করে ঘর পরিষ্কার করে এসব দেখিয়ে দিয়ে যেত। কোথায় ভাল কোট কম দামে পাওয়া যায় তাও একদিন দেখিয়ে আনল। এখানে টেলিফোনের খরচ কম কথা বললেও যা বেশী বললেও তা। তাই মাঝে মাঝে পাশের বাড়ী থেকেই টেলিফোনে গল্প করা তার একটা বাতিক ছিল। তার দু'বছরের ছোট্ট ছেলে মাইক অল্পবয়স্ক মেয়ে দেখলেই 'ক্যারল' বলে ডাকত, সাদা-কালো বুঝত না। সে আমার মেয়েদের দেখলেও 'হাই ক্যারল' বলে চেঁচিয়ে উঠত এবং সুবিধা পেলেই আমাদের বাড়ী এসে কেক বিস্কুট খেয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

শুধু যদি প্রজ্ঞা হতো, যুক্তকরে দূরত্ব বাঁচিয়ে
দাঁড়াতেম ভয়ে ভয়ে; কাছে যাই স্পর্দ্ধিত সাহস
কোথা পাবে মূঢ় এই মন!

অথবা ভাস্কর্য শুধু—
সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায়
কুঁদে কুঁদে জীবনের প্রতিকল্প রূপরঙ রেখায় রেখায়
—দাঁড়াতেম তাও দূরে সরে'
দুই চোখে অ-স্বাদিতপূর্ব এক অবাক বিস্ময়;
জানি না সে সৃজনের রুদ্ধবাক অপূর্ব কুহকে
অথবা সে শিল্প-প্রতিভার!

এ ত শুধু প্রজ্ঞা নয়, শুধু নয় সৃষ্টির প্রতিভা;
এ যে এক অতলান্ত হৃদয়ের প্রশান্ত সাগর
পরিতৃপ্ত অবগাহনের;
এখানে উদার নভে এই মন-বলাকা উধাও
সীমিত জীবন ভেঙে; ডাক আসে: হেথা নয়, নয়'
অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অঙ্গে নাহি আভরণ– দীনা শীর্ণা এ বঙ্গভারতী
কবিকণ্ঠে জাগে শুধু পাঁচালীর রাখালিয়া-গান,
ভবিষ্যের স্বপ্ন ভাঙে অতীতের অন্ধ-অনুকৃতি
কবির কমলবনে কমলার নাহি অধিষ্ঠান!

সে উষা-আকাশে এলে হে রবীন্দ্র প্রোজ্জ্বল ভাস্কর-
বিকশিত তব স্পর্শে মুদিত এ কাব্যশতদল,
ফোটে ফুল বাণীর মোহন কুঞ্জে, গুণী মধুকর
কূজনগুঞ্জনে নিত্য পূর্ণ করে রবি-সভাতল।

কালচক্র-আবর্তনে সূর্য যায় অস্তাচলতীরে—
বিকীর্ণ কিরণ রহে পূর্ণ করি নিখিলের প্রাণ,
সে আলোর নাহি শেষ সর্বনাশী কালসিন্ধু নীরে,
জীবনের অন্ধকারে দিশারী সে—দৃষ্টি করে দান।

সারস্বতকুঞ্জে আজি করি মোরা তোমারে স্মরণ—
হে কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রাণ-মন্ত্রে করি আবাহন!

মন্দিরময়-ভারত গুহামন্দির কার্লি ও ভাজা

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

বোম্বাই শহর। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। সন্ধ্যাবেলা, আপিস থেকে ফিরে এসে বাসার প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রবীন্দ্ররচনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। পাশের টিপয়ের উপর ধূমায়মান চায়ের কাপ। ডাঃ মণি লাহিড়ী এসে হাজির। সঙ্গে আছেন ডাঃ সরকার আর সান্যাল।

মণি বলেন, পুণা যাবেন কাকাবাবু? মোটরে চড়ে যাওয়া যাবে। আছে একটি নয়নাভিরাম রাস্তা, বোম্বাই থেকে পুণা পর্যন্ত। বিস্তৃত সেই পথ একশ' কুড়ি মাইল। মণি আমার ভাইপো। বোম্বাইয়ের এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ডাঃ সরকার আর সান্যাল তাঁর সতীর্থ।

আমি বলি, যেতে পারি, যদি কার্লি, ভাজা ও বিদিশা হয়ে যাওয়া হয়। তা হলে পুণাও দেখা হবে, পথে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যাবে কার্লি, ভাজার ও বিদিশার চৈত্য। দেখা হবে ভাজার ও বিদিশার বিহারও।

সম্মত হন তাঁরা। বলেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে পুণায় থাকবার জায়গার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

রাজী হই তাঁদের প্রস্তাবে। স্বীকৃত হই স্থানের ব্যবস্থা করবার ভার নিতে। স্থির হয়, আসছে শনিবার ভোর বেলাতেই আমরা রওনা হব, যদি ইতিমধ্যে থাকবার স্থান মেলে। শনি ও সোমবার ছুটি নিলেই চলবে। মঙ্গলবারে এলে আপিস করা যাবে।

পরের দিন। আপিসে গিয়েই বন্ধুবর ভাণ্ডারীকে ফোন করি, যদি কিছু সুরাহা করতে পারেন। বলেন তিনি, তাঁর একটি গুজরাটী বন্ধু আছেন। অবিলম্বে তাঁকে নিয়ে হাজির হচ্ছেন। হয় ত কিছু সুব্যবস্থা হলে হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরেই, ভাণ্ডারী তাঁর গুজরাটী বন্ধুকে নিয়ে উপস্থিত। বন্ধুটি বলেন, তাঁদের একটি ধর্মশালা পুণাতে আছে। ষ্টেশনের একেবারে বিপরীত দিকে। ষ্টেশন থেকে দু'মিনিটের রাস্তা। একতলায় ধর্মশালা, দোকান ও রেস্তোরা। দোতলায় ডাভে হোটেল, অন্যতম বৃহত্তম হোটেল পুণার। তিন তলায় আর চার তলায় যাত্রীনিবাস আছে, সেই যাত্রীনিবাসে অনেকগুলি পৃথক "সুইট"। প্রতি সুইটে আছে দুখানি পাশাপাশি ঘর, শোবার আর বসবার, সংযুক্ত দরজা। শোবার ঘরের পিছনে ড্রেসিং রুম, তার পিছনে রান্নার। রান্নাঘরের একদিকে নাইবার ঘর, অপর দিকে ফ্লাসড পায়খানা। আসবাবে সজ্জিত এই ঘরগুলি। ঘরে আছে গদিসমেত দুখানি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি বড় ওয়ার্ডরোব, লিখবার টেবিল ও দুখানি টিপয়। আছে প্রতি সুইটে পঞ্চাশ জনের রান্নার উপযোগী বাসনপত্রও। সুইটগুলির সামনে একটি টানা বারান্দা আছে। সেখান থেকে দ্রষ্টব্য পুণা শহর। লাগবে না কোন দর্শনী। দিতে হবে শুধু ছ' আনা, দৈনিক বৈদ্যুতিক বাতির খরচের জন্য।

তিনি বলেন, এই সব সুইটে তাঁদের আত্মীয়রা বাস করেন। থাকতে দেওয়া হয় পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও সপরিবারে একাধিক্রমে দুই সপ্তাহ। তার বেশী দিন থাকতে হলে চাই বিশেষ অনুমতি।

আরও বলেন, তিনি আজই টেলিফোনে জেনে নেবেন কোন খালি সুইট আছে নাকি। পাকা ব্যবস্থার জন্য কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পরের দিন সকালে আপিসে যেতেই টেলিফোন বেজে ওঠে। সাগ্রহে রিসিভার কানের কাছে তুলে ধরি। শুনি আমাদের বাসের জন্য একটি সুইট সংরক্ষিত হয়েছে।

তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোনেই একে একে ডাঃ লাহিড়ী, সরকার ও সান্যালকে এই সুখবরটি পরিবেশন করি। শুনে সবাই মহাখুশী, বলেন, কল্পনাতীত এই ব্যবস্থা।

শনিবারে ভোর বেলাতেই ডাঃ সান্যাল মোটর নিয়ে এসে আমাদের বাসা থেকে তুলে নেন। আমাদের মোটর বিদ্যুৎগতিতে ছোটে। প্রশস্ত সায়ন রোড দিয়ে আমরা সায়ন অতিক্রম করে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে রেলের লাইন পেরিয়ে এক বিস্তীর্ণ খাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হই। এই খাড়ি আরব সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। দেখা যায় খাড়ি আর সাগরের সংযুক্ত স্থলে মিশছে— গিয়ে সাগর দিগন্তে। সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ, সুন্দর এক লীলানিকেতন।

আমরা ডান দিকে মোড় নিয়ে কিছুদূর খাড়ির কিনারা দিয়ে গিয়ে কুর্লাতে উপনীত হই। এখানে অনেকগুলি কারখানা এবং কয়েকটি কাপড়ের কলও আছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর সুরু হয় উঁচুনীচু পাহাড়ের রাস্তা। আমরা চলি পশ্চিমঘাট শৈলমালার পাদদেশ দিয়ে। যাই বঙ্কিম-গতিতে। কখনও উঁচুতে উঠি, কখনও নীচে নামি। অতিক্রম করি কত আম্রকুঞ্জ, কত বন, কত উপবন, অবশেষে উপস্থিত হই থানাতে। বোম্বাইয়ের একটি জেলার সদর এই থানা, বোম্বাই থেকে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে এসেই সমাপ্ত হয় বোম্বাই দ্বীপের এক প্রান্ত। তাই সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে থানা, সংযুক্ত হয়ে আছে ভারতের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সেতু

দিয়ে। সেই সেতুর উপর দিয়েই যাতায়াত করে লোক, গাড়ী- ঘোড়াও যায়। অনতিদূরে নির্মিত হয় আরও একটি সেতু, নির্মাণ করেন জি. আই. পি (কেন্দ্র) রেল। সেই সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। মাইল তিনেক দূরে বোরিভিলিতে অনুরূপ একটি সেতু বি, বি, সি, আই (পশ্চিম) রেল নির্মাণ করেন। সেতুর উপর থেকে সেই সেতুটিও দেখা যায়।

সেতুর উপান্তে এসে আমাদের গাড়ী থামে। সামনে নীল সমুদ্র দক্ষিণে বামে বিস্তৃত। পরপারে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে। তার অন্তরাল থেকে অরুণদেব অতি ধীরে উদয় হন। তাঁর অঙ্গের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে শৈলমালার শীর্ষদেশে, প্রতিফলিত হয় সাগরের বুকেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ। প্রণাম জানাই দিবাকরকে, জানাই "জবাকুসুম সঙ্কাশংকে।" গাড়ী মন্থরগতিতে চলে—অতিক্রম করে সেতু।

কার্লা : চৈত্য

বদলে যায় রাস্তার রূপ। লুকোচুরি খেলে রাস্তায় পর্বতশ্রেণীতে আর খাড়িতে। বামে সুউচ্চ পশ্চিমঘাটের শৈলশ্রেণী। তার পদতল বেষ্টন করে এগিয়ে চলে পথ। দক্ষিণে প্রশস্ত খাড়ি রূপ ধারণ করে সমুদ্রের। কখনও এগিয়ে আসে পর্বত, রুদ্ধ করে পথের গতি। মনে হয়, পরিসমাপ্তি হয় বুঝি পথের, বন্ধ হয় যাত্রা। কখনও দক্ষিণের খাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়। হারিয়ে যায় পথ, তার বক্ষের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। পরিসমাপ্তি হয় পথের, বুঝি যাত্রীরও। কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় না পথের, রুদ্ধ হয় না তার গতি—চলে পথ ঈষৎ বঙ্কিমগতিতে পাহাড়ের চরণ-চুমে আর খাড়ির অঙ্গ স্পর্শ করে। দেখি খাড়ির বুকেও অসংখ্য ডিঙি বুকে নিয়ে সাদাপাল। দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি অসংখ্য বক শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে বসে আছে। এই ডিঙি-নৌকা করেই জেলেরা মাছ ধরে বিক্রী করে বোম্বাই শহরে।

কিছুদূর এই রকম পথ অতিক্রম করে আমরা আবার উঁচুতে উঠতে থাকি। পথ চলে এঁকে বেঁকে অরণ্যের ভিতর দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে ঘন মহীরুহের শ্রেণী, তার ছায়া এসে পড়ে রাস্তার উপর, পথ হয় ছায়াশীতল। গাড়ী একটি উঁচু পাহাড়ের সানুদেশে এসে থামে।

এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই—হাজার চারেক ফুট উঁচুতে খাণ্ডালা শহর। নিম্নতম প্রদেশে, টাটার জল-বিদ্যুতের কারখানা। সেই বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয় বোম্বাই শহর।

আমরা পাহাড় আরোহণ করতে থাকি, কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল এই পর্বত-আরোহণ। পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে সর্পিলগতিতে উঠে রাস্তা উপনীত হয় শীর্ষদেশে। যেমন খাড়া, তেমনই গড়ানে। একটু অসাবধান হলেই পিছলে যাবে চাকা, গড়িয়ে পড়বে মোটর পাহাড়ের গহ্বরে, বিচূর্ণ হবে গাড়ী, সঙ্গে আমাদের দেহও। মাঝপথে এসে রুদ্ধ হয় গাড়ীর গতি। প্রচণ্ড জোরে এক্সিলারেটর চাপা হয়, ঘোরে গাড়ীর চাকা, কিন্তু অগ্রসর হয় না গাড়ী। শেষে গাড়ী থেকে নেমে তিন জনে গায়ের জোরে গাড়ী ঠেলি, আবার গাড়ী চলতে সুরু করে।
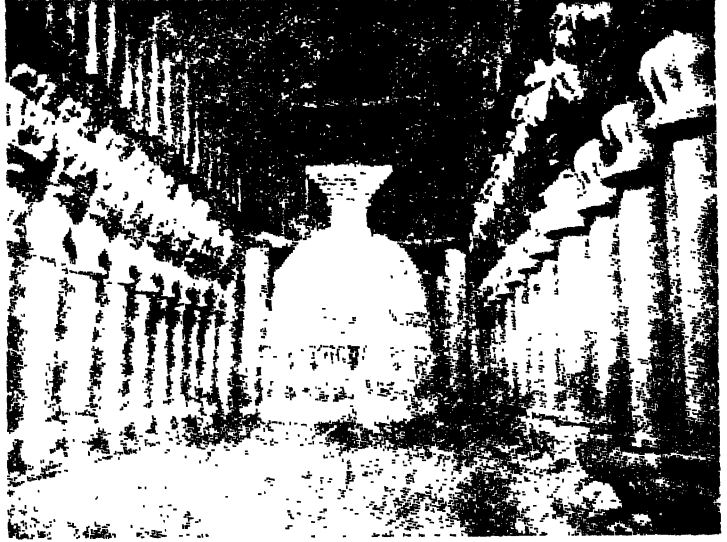
উপর থেকে অবিরাম সামরিক ট্রাক আসে, পরিপূর্ণ যুদ্ধের উপকরণে। তারা আসে পুণার নিকটের ডেহু-রোড থেকে। সেখানেই স্থাপিত হয় ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সামরিক ডিপো। উপকরণ নিয়ে যায় বোম্বাইতে। সেখান থেকে প্রেরিত হয় সারা ভারতবর্ষে। নীচে থেকেও সামরিক ট্রাক আসে। অতি সন্তর্পণে, এক পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের যাতায়াতের পথ করে দিতে হয়। নইলে তাদের সংঘাতে বিচূর্ণ হবে গাড়ী। হবে সকলের প্রাণান্ত। আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় আমাদের অন্তঃকরণ দুরু দুরু করে।

শেষে উপনীত হই পাহাড়ের শীর্ষদেশে খাণ্ডালা শহরে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় লাল টালিতে ছাওয়া বাড়ী। তাদের প্রাঙ্গণের উদ্যানে ফুটে আছে কত ডালিয়া, কত গোলাপ। বিভিন্ন তাদের রঙ। দেখি আরও অনেক টাইলের বাড়ী, বিক্ষিপ্ত তারা পাহাড়ের অঙ্গে। আমাদের গাড়ী রেস্তোরার সামনে এসে নামে।

গাড়ী থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে চা ও কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। সুরু হয় পর্বত অবতরণ। সহজ আর সুন্দর এই অবতরণ। দেখতে দেখতে যাই দু'পাশের

সবুজ বনানী, দেখি এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। পাহাড় অতিক্রম করে উপনীত হই আবার সমতল রাস্তায়, পৌঁছাই কার্লার রাস্তার সংযোগ-স্থলে। পথের পাশে একটি প্রস্তরফলক দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশক কার্লার রাস্তার।

ডান দিকে মোড় নিয়ে মোটর কার্লার চৈত্যের সামনে এসে থামে। গাড়ী থেকে নেমে মন্দিরের সামনে এগিয়ে যাই। বিস্ময়ে চেয়ে দেখি ভারতের এই বৃহত্তম চৈত্যটি। বৃহত্তম বৌদ্ধ উপাসনা-মন্দির ভারতের। এই চৈত্যটি পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু, একশ' চব্বিশ ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে ছেচল্লিশ ফুট পরিধি। এটি শেষ চৈত্য হীনযান সম্প্রদায়ের। চৈত্যটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হয়, নির্মাণ করেন অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা।

সম্মুখভাগের দুই পাশে, কিছু আগে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি অতিকায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ধ্বজ-স্তম্ভ। তাদের শীর্ষদেশে শোভা পায় চারিটি সিংহের মূর্তি। অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব এই মূর্তিগুলির। কার্লার চৈত্যের বৈশিষ্ট্য এই স্তম্ভ দুটি। অন্য কোন চৈত্যের সামনে এমন শীর্ষে সিংহ নিয়ে ধ্বজস্তম্ভ নাই।

ধ্বজস্তম্ভ দুইটির পিছনে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অঙ্গ কেটে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, উপাসনা মন্দিরের বারান্দা। তোরণের সম্মুখ ভাগে পাথরের পর্দা। দুই ভাগে বিভক্ত এর সম্মুখভাগ। নিম্নাংশে তিনটি দ্বার, উপরাংশে স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ। কিছু কাঠের কাজও ছিল। কালের করালে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই কাঠের কাজ, অবশিষ্ট আছে শুধু চিহ্ন, পর্দার অঙ্গে।

একটি দরজা দিয়ে অলিন্দে প্রবেশ করে ভিতরের সম্মুখভাগের সামনে উপস্থিত হই। দেখি ভিতরের সম্মুখভাগের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, দেখি সূর্য্য-গবাক্ষ। দেখি এক সুউচ্চ অর্দ্ধচন্দ্রাকার-খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ অধিকার করে আছে সম্মুখভাগের এক বিস্তৃত অংশ। আকৃতি তার ঘোড়ার খুরের মত। তার সঙ্গে ততোধিক সুবিশাল এক অর্দ্ধচন্দ্রাকার সূর্য্য-গবাক্ষ গ্রথিত হয়ে আছে।

এই মহামহিমময় প্রবেশ-পথের দুই পাশে আর অলিন্দের সংকীর্ণতর প্রান্তদেশে প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত আছে কত অনবদ্য খিলানযুক্ত চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের চারিপাশে সূক্ষ্মতম গরাদ। এই গরাদ দিয়ে বেষ্টিত চন্দ্রাতপ।

নিম্নাংশে ক্ষোদিত এক মূর্ত্তি প্যানেলের অঙ্গে। মূর্ত্তি দম্পতির, মন্দিরের দাতার আর তার পত্নীর। মূর্ত্তি বুদ্ধের, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব। এই বুদ্ধ-মূর্ত্তি পরবর্ত্তী কালে রচিত, গুপ্তযুগে। রচনা করেন মহাযান সম্প্রদায়। প্রান্তদেশে দেখি মূর্ত্তি হস্তীর, তারা এই চৈত্যের বাহন। দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর, অর্দ্ধপ্রমাণ আকৃতির হস্তীগুলি, লম্বিত তাদের শুণ্ড, স্পর্শ করে মঞ্চের পৃষ্ঠদেশ। অপরূপ গরাদে দিয়ে শোভিত মঞ্চের সম্মুখভাগও। এই হস্তীর মুখে গজদন্ত ছিল। সেই দন্ত অদৃশ্য হয়েছে। মহিমময়, সুন্দর শোভন এই মূর্ত্তি-সম্ভার, অনুপম চন্দ্রাতপ, নিরুপম গরাদে—তাদের নিখুঁত সমন্বয়। রচনা করেন স্থপতি এক কল্পলোক, এক স্বর্গপুরী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, মনের সবখানি মাধুরী। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এক অলৌকিক প্রবেশ-পথ, দেখে পরিতৃপ্তি হয় না।

কেন্দ্রস্থলের প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি। এই পথ দিয়েই প্রবেশ করতেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত—মহাশ্রমণ আর বোধিসত্ত্বেরাও। অন্য সকলে প্রবেশ করতেন দুই প্রান্তের দ্বার দিয়ে, সোপানের সংলগ্ন জলধারায় পদ প্রক্ষালন করে। পবিত্র করে নিতেন নিজেদের দেহ আর মন, মহাপবিত্র এই মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে। ধুয়ে যেত সংসারের কালিমা, দূর হ'ত মোহ, দূর হ'ত মায়া-মমতা, সুলভ হ'ত মোক্ষলাভ।

ভিতরে প্রবেশ করেও স্তব্ধ হয়ে যাই, মূক হয়ে যাই একেবারে মন্দিরের স্তম্ভের শ্রেণী দেখে, তার মহিমময় সূর্য্য-গবাক্ষ আর অর্দ্ধ-গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ।

অষ্টআশী ফুট দীর্ঘ, পঁচিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরের পরিধি। তার উপর পঞ্চাশ ফুট উঁচু ছাদ।

সাইত্রিশটি স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, দু'পাশের গলিপথ থেকে। ঘন-সন্নিবিষ্ট এই স্তম্ভের সারি। স্থান নাই ভিতরে দ্বিতীয় স্তম্ভ স্থাপনের। সাতটি স্তম্ভ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে প্রান্তদেশের বৃত্তাকার স্থান। নাই কোন কারুকার্য্য এই স্তম্ভগুলির অঙ্গে, নাই তাদের শীর্ষদেশেও। অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন কিন্তু দুই পাশের পনরটি করে স্তম্ভের শ্রেণী। অষ্ট কোণ এই সব স্তম্ভের দণ্ড, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি এক-একটি বৃত্তাকার পাত্রের মধ্যে। ঘণ্টার আকারে রচিত স্তম্ভের শীর্ষদেশ। শীর্ষদেশে সুউচ্চ চতুষ্কোণ—মঞ্চের উপর আছে দুইটি করে হস্তী; বসে আছে হস্তী হাঁটু গেড়ে। তাদের পৃষ্ঠে একটি নর ও একটি নারী আরোহণ করে আছেন। বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিত এই সব নর আর নারী। তাঁদের শিরে শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাদের বসবার ভঙ্গীও। তাই সুন্দর, নয়নাভিরাম।

বিপরীত দিকে গলিপথের দিকে মুখ করে সুউচ্চ মঞ্চের উপর অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন অনুরূপ নর ও নারী। তাঁরাও বহুমূল্য অলংকারে ও বসনে সজ্জিত। তাঁদের শিরেও শোভা পায় মূল্যবান শিরো-ভূষণ। প্রতিটি হস্তীর মুখে নাকি গজ অথবা রৌপ্য দন্ত ছিল। ধাতুর তৈরী অশ্বের অঙ্গাবরণও ছিল। কিন্তু কালের করালে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এই অনবদ্য সুন্দরতম মূর্ত্তি-সম্ভারের শীর্ষদেশে রচিত হয় সুউচ্চ অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত মন্দিরের ছাদ। নির্ম্মিত হয় ছাদের অঙ্গে শিরার আকারে উদ্গত সূক্ষ্ম বঙ্কিম কড়ি, এক-একটি পৃথক কাষ্ঠখণ্ড থেকে। খিল দিয়ে ছাদের খাঁজে তারা আবদ্ধ। সমমাপ এই কড়িগুলির, বঙ্কিম হয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে ছাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পিছনের বৃত্তের কড়িগুলি কেন্দ্রস্থলে এসে মিশেছে। এতে মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে আর স্তূপের চারি-

পাশে এক অপরূপ রহস্যময় আলোছায়ার সমাবেশ হয়েছে। বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি স্থপতির এই সুমহান পরিকল্পনা।

পিছনে অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাদের নীচে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধগোলক স্তূপটি, দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। বৃত্তাকার এই স্তূপটির নিম্নাংশ, তাতে আছে শুধু দুটি রেলের বন্ধনী, তার অঙ্গে অন্য কোন অলঙ্কার বা ভূষণ নাই। শীর্ষদেশে শোভা পায় একটি সুবিশাল অনবদ্য "হারমিকা"। সবার উপরে বিরাজ করে একটি সুউচ্চ সুমহান ছত্র, আকৃতি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত।

বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি চৈত্যের ভিতরের আলোছায়ার সমাবেশ —শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই চৈত্যের, যা অন্য কোন চৈত্যে নাই। প্রবেশ করে সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল রশ্মি, তোরণের পর্দ্দার উপরাংশের গবাক্ষগুলির ভিতর দিয়ে তোরণের ভিতরের সম্মুখভাগে। সেখান থেকে সুবিশাল সূর্য্যগবাক্ষের কাঠের অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চৈত্যের অভ্যন্তরে। এই প্রবেশের পথে হারিয়ে ফেলে রশ্মি তার ঔজ্জ্বল্য, প্রশমিত হয় তার প্রাখর্য্যও। পরিণত হয় এক আলোকসুন্দর, অলৌকিক দীপ্তিতে। ছড়িয়ে পড়ে সেই দীপ্তি একে একে স্তম্ভের শীর্ষদেশে, তার অঙ্গে আর পাদদেশে। বিস্তৃত হয় সারা চৈত্যে। শেষে বর্ষিত হয় সেই দীপ্তি স্তূপের উপর, আলোকসুন্দর হয় স্তূপ, হয় মহামহিমময়। প্রবেশ করে না সেই দীপ্তি ছাদের বঙ্কিম অংশে, গলিপথে আর চৈত্যের অন্তরতম প্রদেশেও। অর্দ্ধআলোকিত হয় স্তম্ভের শ্রেণী। ছায়াচ্ছন্ন হয় গলিপথ। অন্ধকারে পরিণত হয় অন্তরতম প্রদেশ। রূপ ধারণ করে চৈত্য এক অন্তহীন রহস্যময় নিভৃত নির্জ্জন গুহায় এক মহাপবিত্র শান্তির পরিবেশের। সৃষ্টি করেন বৌদ্ধ স্থপতি, পরিচায়ক তাঁর সূর্য্যগবাক্ষ—নির্ম্মাণকৌশলের নিদর্শন, তাঁর অগাধ স্থাপত্য জ্ঞানের। তাই এই প্রসিদ্ধি কার্লার চৈত্যের। বুকে নিয়ে আছে চৈত্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের ও প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক মহা গৌরবময় কীর্ত্তির। তাই কার্লার স্থপতি, কার্লার ভাস্কর বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। অমর হন কার্লার স্থপতি, অমর হয় কার্লা আর ভারতবর্ষ।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্তূপকে, শ্রদ্ধা জানাই বুদ্ধকে ও স্থপতিকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, ম্লান হয় নাই।

৩

ধীরে ধীরে এসে মোটরে উঠে বসি। আবার মোটর ছাড়ে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ। কানে ভেসে আসে লক্ষ কোটি পদধ্বনি, পদধ্বনি কত বৌদ্ধ শ্রমণের। তাদের অঙ্গে শোভা পায় হরিদ্রাবর্ণের আলখাল্লা, হস্তে জপের মালা। চরণধ্বনি কত বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীরও। আসেন তাঁরা সারা ভারত থেকে। আসেন সুদূর বিদেশ থেকেও। এই মহাপবিত্র তীর্থে এসে প্রণতি জানান তাঁরা তথাগতকে, জানান বুদ্ধকে। কানে ভেসে আসে লক্ষ শত কণ্ঠের :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

গাড়ী এসে বোম্বাই-পুণা রাস্তায় উপনীত হয়। আবার সুরু হয় রাস্তার দুপাশে দিগন্তপ্রসারী সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে দেখা যায় আম্রকুঞ্জও। মোটর এক অনুচ্চ শৈলমালার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই আছে লোনাভেলা। বাস করেন এখানে কত ধনী, কত শ্রেষ্ঠী। আছে একটি ভারতীয় নাবিকদের শিক্ষাকেন্দ্রও। কারুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় ক্যাডেটরা সেই শিক্ষাপীঠে।

ভাজা গুহা

আমরা অতিক্রম করতে থাকি পাহাড়। রাস্তা যায় সর্পিল গতিতে দুপাশের ঘন সবুজ বনানী আর লতাকুঞ্জ ভেদ করে। উপনীত হই পাহাড়ের শীর্ষদেশে। মোটর পাহাড়ের শীর্ষদেশে এসে পৌঁছায়। দু'পাশে দেখা যায় ফুলে ভর্ত্তি প্রাঙ্গণে বেষ্টিত লাল টাইলের বাংলো। সুন্দরতর আর শোভনতর এই বাংলোগুলি সুপরিকল্পিতও। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নয় খাণ্ডালার বাংলোর মত। দেখতে দেখতে যাই বাংলোর সৌন্দর্য্য আর তার প্রাঙ্গণের ফুলের বর্ণবিন্যাস। গাড়ী একটি হোটেলের সামনে এসে থামে।

গাড়ী থেকে নেমে স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নেই। তার পর বিশুদ্ধ নিরামিষ মহারাষ্ট্রীয় খানা খেতে বসি। বসতে হয় কম্বলের আসনে সামনে নিয়ে একটি কাষ্ঠাসন। সেই আসনের উপর থালা রেখে অর্দ্ধেক ভাত ও অর্দ্ধেক রুটি, একটু ঘি, ডাল ও তরকারি আহার করি। থাকে কিছু দহি বড়াও। বিশেষ পার্থক্য নাই মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী খানায়—উভয়েই নিরামিষাশী। তাই বোম্বাই শহরে গুজরাটীর বাড়ীতে, মাছমাংস ও ডিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি ভাড়াটেদের বেলায়ও। তাই ভাড়া

নেওয়ার আগেই তাদের মাছমাংস ও ডিম না খাওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। ব্যতিক্রম শুধু পার্শীরা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী বিদ্যুৎ বেগে ছোটে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা শৈলমালা অতিক্রম করে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে এক লীলানিকেতনে এসে উপনীত হই। এপারে ঘন নীল শৈলমালা বুকে নিয়ে গাঢ় সবুজ বনানী আর লতাকুঞ্জ। ওপারে সবুজ ক্ষেত দিগবলয়ে গিয়ে মেশে। মাঝখানে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী বয়ে যায় শৈলমালার পদপ্রান্ত স্পর্শ করে। শোনা যায় তার মৃদু গুঞ্জন, কানে ভেসে আসে তার অন্তরের ধ্বনিও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এই সুন্দরতম রূপ, এই অপরূপ শোভা। গাড়ী মালভিলিতে এসে পৌঁছায়। এখান থেকেই ভাজার গুহামন্দিরে যেতে হয়। এখানে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। রেলে করেও বোম্বাই অথবা পুণা থেকে যাওয়া যায়।

মোটর থেকে নেমে, মাইলখানেক উঁচুনীচু রাস্তা অতিক্রম করি। দূর থেকেই দেখতে পাই দিগন্তবিস্তৃত পশ্চিমঘাট শৈল-মালার বুকে দাঁড়িয়ে আছে ভাজার চৈত্য, দেখি কয়েকটি বিহারও—প্রকৃতির এক রমণীয় পরিবেশ। ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এসে উপস্থিত হই।

এটি পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বুকের প্রাচীনতম চৈত্য, অন্যতম প্রাচীনতম বৌদ্ধ চৈত্য, উপাসনা মন্দির বৌদ্ধদের। এই চৈত্যটি সতরটি বিহার নিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধ স্ত্রী-শ্রমণদের পূজা ও বাসের জন্য সুঙ্গ রাজারা নির্ম্মাণ করেন। এই চৈত্যটি বুকে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির, সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

চৈত্যের সম্মুখভাগের চিহ্ন নাই; নাই প্রবেশপথেরও। নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি সুবিশাল খিলান-যুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার চন্দ্রাতপ। তার ভিতর দিয়ে মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশ দেখা যায়। কাঠ দিয়ে নির্ম্মিত হয়েছিল চৈত্যের সম্মুখ ভাগ, পূর্ণ ছিল সম্মুখের শূন্য স্থান অপরূপ কাঠের কাজে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে সেই কাজ কালের নির্ম্মম হস্তে. কিছুই অবশিষ্ট নাই।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে চৈত্যটি পঞ্চান্ন ফুট দীর্ঘ ও ছাব্বিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ এই চৈত্যের ভিতরের দু'পাশের গলিপথ। দেখি সুন্দর স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয়েছে তার কেন্দ্রস্থল গলিপথ থেকে। পর্য্যায়ক্রমে নীচু হয়ে নেমে যায় স্তম্ভগুলি, ক্ষীয়মাণ হয় তাদের উচ্চতা যত যায় ভিতরে। স্তম্ভের উপর উনত্রিশ ফুট উঁচু আড়ম্বর-পূর্ণ অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ। ছাদের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে ঘন সন্নিবিষ্ট শিরার আকারে কড়ি। কাঠ দিয়ে সেগুলি নির্ম্মিত।

মন্দিরের প্রান্তদেশে বৃত্তাকার স্থানের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে স্তূপটি। বুকে নিয়ে আছে বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক। দুই অংশে বিভক্ত এই স্তূপটি। বৃত্তাকার তার তলদেশ। গম্বুজের আকারে রচিত তার অঙ্গ. শীর্ষে শোভা পাচ্ছে একটি অনুপম গরাদে (রেল)। সবার উপরে বিরাজ করে একটি ছত্র। কাঠ দিয়ে রচিত এই স্তূপের শীর্ষদেশের হারমিকা। উপরের ছত্রও কাঠ দিয়েই নির্ম্মিত। খুব সম্ভব এই স্তূপের এবং চৈত্যের ভিতরে ও প্রাচীরের গাত্রে অনবদ্য সুন্দরতম চিত্রসম্ভার ছিল। অদৃশ্য হয়েছে সেই চিত্র-সম্ভার।

চৈত্য দেখে আমরা একে একে বিহারগুলি দেখি। উপনীত হই দক্ষিণ প্রান্তের শেষ গুহামন্দিরে। একটি বিহার—এই গুহা-মন্দিরটি সমসাময়িক ভাজার চৈত্যের। এই বিহারে একটি স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত কক্ষ আছে তার সামনে একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। সম্মুখভাগের প্রাচীরগাত্রে দুইটি প্রবেশ-পথ আছে। এক-একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে প্রকোষ্ঠগুলি কক্ষ বা সভাগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অঙ্গ কেটে রচিত হয় অলিন্দের খিলান-যুক্ত ছাদ। তার দুই প্রান্তে ত্রিকোণাগ্র প্রাচীর। রচিত হয় ভিতরের সমতল প্রাচীর ও অঙ্গে নিয়ে কার্নিশ। দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড স্তূপও বাহনের উপর। পশ্চিম প্রান্তে স্তম্ভ আর উদগত স্তম্ভ দিয়ে অলিন্দ থেকে তিনটি প্রকোষ্ঠকে পৃথক করা হয়। রচিত হয় কার্নিশের নীচেও মূর্ত্তির সারি দিয়ে সুন্দরতম পাড়। অনবদ্য এই মূর্ত্তি সম্ভার—দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। পদ্মের আকারে রচিত স্তম্ভের শীর্ষদেশ, তার উপরে নারী-সিংহীর মূর্ত্তি। গো-জাতীয় তাদের দেহ, নারীর বক্ষ। দেখি ধ্বংসে পরিণত হয়েছে বারান্দার বাইরের সূক্ষ্ম শোভন স্তম্ভগুলি। দেখি অলিন্দের প্রাচীরে প্রশস্ত কুলুঙ্গির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি অতিকায় মূর্ত্তি, সজ্জিত তারা অস্ত্রশস্ত্রে।

অলিন্দের পূর্ব্ব প্রান্তে ও প্রাচীরের গাত্রে দেখি দুইটি অপরূপ মূর্ত্তিসম্ভার, পৃথক হয়ে আছে তারা একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-পথ দিয়ে।

বামে দেখি রথের উপর উপবিষ্ট এক নৃপতি। পরিচালিত সেই রথ চারিটি অশ্বে। নৃপতির দুই পাশে বসে আছেন দুইটি রূপবতী নারী। তাঁদের একজনের হস্তে শোভা পায় ছত্র। অপর জন হাতে ধরে আছেন চামর। তাঁদের পিছনে, অশ্বপৃষ্ঠে আসছেন রক্ষীর দল। আছেন তাদের মধ্যে একটি নারী ও তাঁর অশ্বের পৃষ্ঠে শোভা পায় একটি জিন্ সঙ্গে নিয়ে পাদান। এইটিই প্রাচীনতম জিন ভারতীয় স্থাপত্যে। অশ্বের পৃষ্ঠে জিন ভারতীয় স্থপতি-এর আগে রচনা করেন নি। অশ্বের পদতল একটি বিকটদর্শনা, বিকৃতবদনা, বীভৎস নারী-দানবের পৃষ্ঠের উপর। মহাশূন্যে উড়ে যায় সেই নারী-দানব। যান তপনদেব চতুঃঅশ্ব চালিত রথ-আরোহণে, সঙ্গে নিয়ে যান দুই রাণী। যান অন্ধকারকে বিতাড়িত করতে। উদয় হন দিবাকর পৃথিবীতে, দূর হয় তমিস্রা, আলোকিত হয় জগৎ। মূক হয়ে যাই দেখে ভাস্করের এই অপরূপ সৃষ্টি। এক অমর মহিমময় কীর্ত্তি।

তার দক্ষিণে দেখি এক বৃহৎ হস্তীপৃষ্ঠে বসে আছেন এক মহা-মহিমময় নৃপতি। বসে আছেন তাঁর পশ্চাতে একজন অনুচর, হস্তে এক সুউচ্চ ধ্বজা নিয়ে। অগ্রসর হন রাজা একটি গ্রাম্য পথ দিয়ে। শুণ্ডে ধরে আছে হস্তী একটি সুবিশাল উৎপাটিত বৃক্ষ। রাজা নিজেই হস্তী চালনা করেন, কোন মাহুৎ নেই। অনুচরের হস্তের বিচিত্র ধ্বজাও বিস্তৃত হয়ে আছে ত্রিশূলের আকারে। শোভা পায় অনুচরের কণ্ঠে এক বিচিত্র কণ্ঠভূষণ কটিদেশে মালকোচা দিয়ে আবদ্ধ তার অঙ্গের বসন। শোভা পায় রাজার শিরেও বহু-মূল্য শিরোভূষণ, হস্তে বজ্র। বসে আছেন তাঁরা একটি মূল্যবান আসনের উপর। আসন দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত হস্তীর পৃষ্ঠদেশ। উৎপাটিত বৃক্ষের নীচে নিষ্পিষ্ট কত অসংখ্য নর-নারী মর্দিত হয়ে আছে ভূতলে। নাই তাদের দেহে প্রাণ, হয়েছে বিগত প্রাণ বৃক্ষের সংঘাতে। ঐরাবৎ আরোহণে যান দেবরাজ ইন্দ্র। অধিকর্তা তিনি বৃষ্টির, মহাশক্তিশালী, তাঁর প্রবল প্রতাপে ত্রিভুবন, কম্পিত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল। মেঘের বাহনে যান মারুতি সখা পুরন্দর সঙ্গে নিয়ে বজ্র আর বিদ্যুৎ। রুদ্র মূর্তিতে আসে ঝড়, আসে প্রভঞ্জন তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে ডমরু বাজাতে বাজাতে। আসে অশনি, আসে ঘোর ঘন গর্জনে। কম্পিত হয় দামিনী, বিরামহীন সেই কম্পন, উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত। হয় বুঝি মহা প্রলয়, লুপ্ত হয় সৃষ্টি। নাই কোন ঝড়ের চিহ্ন দৃশ্যের বাকী অংশে, বিরাজ করে সেখানে মহাশান্তি।

দেখি নিষ্পিষ্ট নর-নারীর নীচে একটি পবিত্র বৃক্ষ, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি বেদী দিয়ে। এই পবিত্র বৃক্ষের উপরে তিনটি নর ও নারী ঝুলছে। ঝুলছে আরও তিনটি নর ও নারী, নীচের অনুরূপ একটি পবিত্র বৃক্ষের উপর। শোভা পায় দুইটি ছত্র, দুইটি পবিত্র বৃক্ষের উপর। খুব সম্ভব তারা দেবতার পায়ে আত্মোৎসর্গের প্রতীক। প্রশমিত হয় দেবতার ক্রোধ, ফিরে আসে মহাশান্তি পৃথিবীতে।

তার নীচে দক্ষিণে রচিত হয়েছে প্রাচীরের গাত্রে একটি রাজসভা। ভদ্রাসনে রাজা বসে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর শোভা পাচ্ছে একটি রাজছত্র। তাঁর দুই পাশে, হস্তে চামর নিয়ে বসে আছেন দুই অনুচর। রাজার সামনে নর্তক, নর্তকী ও বাদ্যকরের দল, দক্ষিণে একটি চৈত্য বৃক্ষ। বৃক্ষের কণ্ঠে শোভা পায় মালা, মস্তকে ছত্র। বেষ্টিত হয়ে আছে বৃক্ষটি একটি রেল দিয়ে।

তার দক্ষিণে একেবারে প্রান্তদেশে দেখি একটি অরণ্যের দৃশ্য। আছে সেই অরণ্যে একজন নর, সজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রে। আছে একটি অশ্বমস্তকা অপ্সরাও। সজ্জিতা অপ্সরা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে, তার শিরে শোভা পায় একটি মূল্যবান শিরোভূষণ। অনুরূপ ভারহুতের অপ্সরাটি, কিন্তু অধিকতর মূল্যবান বসনে আর ভূষণে সজ্জিতা। পদ কুশল মানব জাতকে বর্ণিত যক্ষিণী অশ্বমুখি এই অপ্সরা বাস করেন গহন অরণ্যে এক পর্বতের পাদদেশে। নিরাপদ নয় তাঁর ভয়ে পথিকের পথ চলা ভীতিপ্রদও। তিনি তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যান গভীর অরণ্যের অন্তরতম

ভাজা চৈত্য

প্রদেশে। তার পর তাদের হত্যা করে উদরস্থ করেন। রচিত হয় অনুরূপ অপ্সরার মূর্তি, সাঁচীর গবাদের অঙ্গের পদকের গাত্রে, বুদ্ধগয়ার রেলের অঙ্গে আর পাটলীপুত্রের গবাদের অঙ্গে।

ভারতের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত। স্থপতির মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত এই দৃশ্যটি, পরিচায়ক তাঁর প্রভূত প্রকৃতি-জ্ঞানের, নিবদ্ধ নয় শুধু প্রকৃতির অধ্যয়নে। এই চিত্রে বস্তুর ভীড় নাই, নাই উপর্য্যুপরি সন্নিবেশও। তাই অনবদ্য সুন্দরতম এই দৃশ্য।

প্রবেশ-পথ দিয়ে বিহারের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি সভাগৃহের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রাচীরের গাত্রেও বৃহৎ কুলুঙ্গির ভিতর পাঁচটি সশস্ত্র নর। অনুরূপ অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের মূর্তির এই মূর্তিগুলি, বীরত্বব্যঞ্জক মহিমময়। দেখি এক অপরূপ নৃত্যপরায়ণা দম্পতিও। অনুরূপ কার্লার চৈত্যের সম্মুখভাগের নৃত্যপরায়ণা দম্পতির প্রতীক এই দম্পতি—এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে। দেখি রাজার মূর্তিও।

বেরিয়ে এসে আর একবার দেখি অলিন্দের মূর্তিগুলি। অনবদ্য এই মূর্তিগুলি, রচিত হয় নাই তারা আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচারের জন্য, নয় তারা নীতির প্রতীকও। বাস্তব তারা। রচনা করেন তাদের ভাস্কর, সমৃদ্ধশালী করেন মিশিয়ে দিয়ে মনের সমস্ত মাধুরী মহিমান্বিত করেন কল্পনায়। অপূর্ব্ব এই শিল্প-সম্ভার। আবার কোথাও দেখি, চিত্রগুলি বৈদিক কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হয়েছে বেদের সঙ্গীতের অনুসরণে আর প্রকৃতির শক্তির সহায়তায় মানবের চিরন্তন কাহিনী তাতে আছে, আছে তার সুখ দুঃখের ইতিহাসের। মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি সেই ইতিহাস। তাই তারা অনাদি, অনন্ত, প্রাচীনতম বুদ্ধযুগেরও। রচিত হন রাজা, হয় রাজসভা, নিয়ে নর্তক আর নর্তকীর দল। যান রাজা

অশ্ব বাহনে, যান হস্তী আরোহণেও। নিষ্পিষ্ট হয় কত নর-নারী, মর্দ্দিত হয় ভূতলে। আসে মেঘের বাহনে রুদ্রমূর্ত্তিতে ঝড়, আসে প্রভঞ্জন, তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে বিলুপ্ত হয় সৃষ্টি। আছে মহা অরণ্যও নিয়ে তার ব্যাঘ্র-ভীতি।

সৃষ্টি হয় বিহারের প্রাচীরে প্রস্তরের অঙ্গে এক রহস্যলোক। অনবদ্য, তুলনাহীন, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যজ্ঞানের, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য জ্ঞানেরও। রচিত হয় নাই এই রহস্যলোক ভারহুতে, হয় নাই সাঁচীতেও, কারণ সেখানে রচনা করেন নাই ভাস্কর মনের সমস্ত মাধুরী উজাড় করে দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্য শুধু ভাজার বিহারের। তাই তার প্রাচীরের অঙ্গের মূর্ত্তিসম্ভার লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন—বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ। তাই অমর হন ভাজার স্থপতি আর ভাস্কর, অমর হয় ভাজা—মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারত।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা জানাই শুঙ্গ রাজাদেরও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি—যা উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে, চিররাত্রি, চিরদিন।

ওগো কবি!

শ্রীবিভা সরকার

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গেয়েছিল তব জয়গান,
ঘন ঘোর ঘটা বিদ্যুৎ-ছটা করেছিল প্রাণ আনচান।
হৃদয়ের নীপশাখে শাখে তাই কদম ফুটিল ভারে ভারে,
মানসী তোমার দোলে বিহ্বল মন বনশাখা ঝুলনার।
তা তা থৈ থৈ অধীর অথৈ হৃদয়-সরসী টলমল,
এত আছে প্রাণ এত হাসি গান আকুল নয়ন ছলছল।
ঐ নভোচারী বলাকার সারি পাগল করিল মনপ্রাণ,
তাইত ব্যাকুল বর্ষার কবি মন-পাখা মেলি গাহে গান।

সুদূর বলাকা দূরের বলাকা যেও না যেও না চলি,
নীল নীলাকাশে হে শ্বেতবিন্দু শুধু ছলনায় ছলি!
আকুল পরাণে প্রতীক্ষারত মর্ত্ত্যকবির পানে চাও,
মন-বিহঙ্গ উড়িল যে তাঁর পথের নিশানা বলে যাও।
মানসযাত্রী তীর্থপথিক তোমারই স্মরণ মাগে,
হংস-বলাকা তোমাদের পাখা ঝলকে রবির রাগে।
কবি ফিরে এস! মর্ত্ত্যের ধূলি ডাকিছে আকুল হয়ে।
খেয়াল বিলাস কল্পনা কথা জাগ সে বলাকা লয়ে।

তুমি যে মোদের ধূলার দুলাল ধরণী মায়ের আশা,
তুমি যে মোদের সুখদুঃখ ধন বুকভরা ভালবাসা।
আমাদের কথা মর্ত্ত্যের কথা বল তুমি আজ কবি,
তোমার লেখনী রচনা করুক মোদের ঘরের ছবি।
বল কে কোথায় প্রভাতবেলায় দোহন করিল দুগ্ধ,
নবীন নবনী-নিন্দিত কর করিল তোমায় মুগ্ধ।
বল আজ কবি দিয়েছিল কেবা তৃষ্ণায় তোমা বারি,
কোন্ কুয়া হতে বাবলা তলায় কোন্ সে গাঁয়ের নারী?

কালো সাঁওতালি আলো-করা রূপ কবে লেগেছিল ভাল,
জানা-অজানার হাসি-কান্নার দীপখানি তুমি জ্বালো।
কোন্ সন্ধ্যায় কে বল কোথায় বাজালো বাঁশের বাঁশী,
কোন্ অঙ্গন আলো করে ছিলো পূর্ণ শশীর হাসি।
জগতের এই পারাবার তীরে কোন্ শিশু করে খেলা,
কবে কোথা কেবা আপনা পাসরি ভাসালো পাতার ভেলা?
কে ভাসালো কবে কোন্ নদীনীরে কাগজ নৌকাখানি,
কোথা দুটি প্রাণ হয়ে আনচান করেছিল কানাকানি।

মহা উল্লাসে কেবা কলহাসে বাজালো পাতার ভেঁপু,
রোজ কি তোমার খোঁজ নিয়ে যেত গাঁয়ের কুকুর টেবু?
যার লাগি তব ঘরের দুয়ার সদাই রহিত খোলা,
ব্যথা পাছে পায় পথ ভুলে যায় যদি সে আপনভোলা।
এই যে তোমার অরূপ দরদ মোরা ত কাঙ্গাল এরই,
দেবদুর্লভ এ মহারতন বাজালো প্রেমের ভেরী।
ভালোবেসেছিলে ধূলা-বালি-মাটি তুমি এই পৃথিবীর,
তাই জয়গান করে গেছ কবি সুন্দর সৃষ্টির।
এরই মাঝে তুমি পেয়েছ দেখিতে নয়ন-ভোলানো মায়া,
জন্ম-মৃত্যু-আধি-ব্যাধি-ভয় সৃষ্টির আলোছায়া।
ধন্য হয়েছে মাটির ধরণী তোমায় বক্ষে লভি,
এ মরজগতে মোরাও ধন্য তোমায় লভিয়া কবি॥

দীপ্তি

দেবাচার্য্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি নির্জ্জন স্থান। গঙ্গার সামনে একটি বেঞ্চ। বেঞ্চের উপর বসে আছে সত্যজিৎ, তারপর শোভন, তারপর দীপ্তি। সত্যজিতের দৃষ্টি দীপ্তির পায়ের দিকে। অসাবধানতাবশতঃ দীপ্তির শাড়ীর এক অংশ বাঁ পায়ের প্রায় ছ' ইঞ্চি উপরে উঠে আছে। সত্যজিতের দৃষ্টি তার পায়ের দিকে বুঝতে পেরে দীপ্তি ভাবে, সভ্য হয়ে বসবার ইঙ্গিত করছে সত্যজিৎ। দীপ্তি লজ্জিত হয়। শাড়ীটা ঠিক করে বসে। শোভন সামনের দিকে তাকিয়ে হাততালি দেয়। দিদির দিকে ইঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করে, দীপ্তির গাল ধরে বোঝায়—দি-দি-দি যা-যা-যা—]

দীপ্তি। যাও, কিন্তু জল থেকে দূরে থেকো।

[শোভনের প্রস্থান]

[দীপ্তি ও সত্যজিৎ। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। কারুর মুখে কথা নেই। দীপ্তি দূরের দিকে চেয়ে। সত্যজিৎ একদৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চেয়ে]

সত্যজিৎ। কেমন লাগছে? এত চুপচাপ, কি ব্যাপার? ভাল লাগছে না বুঝি?

দীপ্তি। (অন্যমনস্কভাবে)—কি বললেন?

সত্যজিৎ। কেমন লাগছে?

দীপ্তি। সুন্দর। এত সুন্দর আমি ভাবতেও পারি নি। মনে হচ্ছিল, এই রকম একটা জায়গা যদি ভগবান আমায় দিতেন!

সত্যজিৎ। তা হলে কি করতে?

দীপ্তি। গঙ্গার স্রোত দেখেই দিন কাটিয়ে দিতাম না, গড়ে তুলতাম একটা আশ্রম।

সত্যজিৎ। আশ্রম! কিসের আশ্রম?

দীপ্তি। যেখানে সকল হতভাগ্য যারা, যারা কোনদিনই বস্তীর ক্ষুদ্র গণ্ডী আর অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে সত্য ও সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে শেখে নি, সেই সব মা-বাপহারা, অথবা উন্মাদিনীর ছেলেমেয়েদের আমি শেখাতাম—

সত্যজিৎ। শেখাতে! মানে মাষ্টারি। তবে তুমি যে বল, নার্স হবে।

দীপ্তি। না, নার্স দেশে অনেক আছে। অনেক হবে। শুধু শরীরের রোগ সারলেই ত সব হ'ল না। আমি বি, টি পরীক্ষা পাশ করব, যদি সম্ভব হয় এম, এ।

সত্যজিৎ। বাঃ, তুমি ত বেশ কথা বলতে শিখেছ!

(দীপ্তি মুখ নীচু করে হাসে)

কি—নিশ্চয় মনে মনে বলছ, সে ত আপনারই দোষে? আপনিই ত আমার শান্তি নষ্ট করেছেন।

দীপ্তি। (স্মিতমুখে) এই অশান্তির মুহূর্তগুলোই যেন কণ্ঠহার হয়ে আমার গলায় দোলে। সারা জীবনই আমি সেই কণ্ঠহারের গর্ব্ব করে বেড়াব। আমার যা কিছু সার্থকতা সবই ত—

সত্যজিৎ। সবই ত ভগবানের দান।

দীপ্তি। তাই কি বলতে চেয়েছিলাম; তা এক হিসেবে মানুষের জীবনের যা কিছু ভাল সবই ত ভগবানের দান।

সত্যজিৎ। তোমার ভগবান তোমারই থাকুন। উপস্থিত তাঁর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

দীপ্তি। কেন?

সত্যজিৎ। কারণ, তিনি নিরন্ন নিঃস্ব হয়ে যমের দুয়োরে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে করছেন। কাতরকণ্ঠে বলছেন, হে যম! তুমিও আমার বিরুদ্ধে?

[দীপ্তি ছলছল চোখে সত্যজিতের প্রতি তাকিয়ে থাকে। কয়েক সেকেণ্ড আবার দু'জনে চুপচাপ, কেউ কথা বলে না]

দীপ্তি। আপনি কি সত্যি ভগবানে বিশ্বাস করেন না? ভগবান না থাকলে পৃথিবীটা হ'ল কি করে? তা'ছাড়া, তিনি যদি না থাকেন, বেঁচে থেকে লাভ কি?

সত্যজিৎ। জানো, ভগবানের স্রষ্টা কে? প্রকৃতির ভয়ে ভীত মানুষের মন। ভগবানকে কি কেউ কোনদিন চোখে দেখেছে?

দীপ্তি। দেখেছেন শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব দেখেছেন।

সত্যজিৎ। সেটা হ'ল ঐ ভূত দেখার মতন। ভগবান ও ভূতের সাক্ষাৎ পান তাঁরাই—যাঁরা কি করে বিজ্ঞানের বিজলী দিয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর করা যায় তার সন্ধান রাখেন না।

দীপ্তি। কিন্তু, রাত্রির অন্ধকার কি বাস্তব সত্য নয়? বিজলী আলো জ্বাললেই সব অন্ধকার দূর হয়?

সত্যজিৎ। (দীপ্তির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে)—আমি তোমার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না। কারণ যতদিন না রাত্রির অন্ধকার দূর করা যাচ্ছে, ততদিন ভয় থেকে মুক্তি পাবার ভরসা, যদি রাম নাম জপ করে সাধারণ লোক পায়, পাক। তবে

আমি নিজে রামনামের মধ্যে বিশেষ কিছু ভরসা করবার মত খুঁজে পাই নি। বরং আমার ধারণা হচ্ছে, আমি যদি রাম নাম জপ করতে শুরু করি শেষ পর্যন্ত একদিন দেখব, 'মরা' 'মরা' নাম জপ করছি। বাল্মীকি না হয়ে বল্মীক হওয়ায় কি লাভ বলতে পার? যাক, বর্তমানে ভাগবত আলোচনা স্থগিত থাক। তুমি তা হলে কলেজেই পড়তে চাও?

দীপ্তি। হ্যাঁ, বাবাও বলেছেন তাই।

সত্যজিৎ। তোমার বাবা নাকি বায়োস্কোপে একটা পার্ট পেয়েছেন? ট্রাম-ড্রাইভারের কাজ নাকি ছেড়ে দেবেন?

দীপ্তি। হ্যাঁ, বলছিলেন তাই। এখনও বইটা রিলিজ হয় নি। রিলিজই ত বলে—তাই না?

সত্যজিৎ। হ্যাঁ। আগাম টাকা আরও কিছু পেয়েছেন কি তোমার বাবা?

দীপ্তি। পেয়েছেন।

সত্যজিৎ। শ্রাদ্ধে কীর্তন গাইতেও নাকি আজকাল নিমন্ত্রণ পান? এতে কিছু আয় হয়?

দীপ্তি। হ্যাঁ, কিছু কিছু হয়। বলছিলেন, সামনে মাসে নতুন বাসায় উঠে যাবেন।

সত্যজিৎ। কোথায়?

দীপ্তি। বাগবাজারের দিকে খালধারে কোন গলিতে নাকি একতলায় একটা ভাল বাসা পেয়েছেন।

সত্যজিৎ। বাঃ, খুব সুখবর। আমিও ভবানীপুরে উঠে যাচ্ছি সামনের সপ্তাহে।

দীপ্তি। আমি জানি। বাবার কাছে শুনেছি।

সত্যজিৎ। কোন্ কলেজে পড়বে ঠিক করেছ?

দীপ্তি। ঠিক করি নি কিছু। আপনি যে কলেজে বলবেন।

সত্যজিৎ। কি কি সাবজেক্ট নেবে ভেবে দেখেছ?

দীপ্তি। ভাবছি অল্টারনেটিভ বেঙ্গলী নেব।

সত্যজিৎ। তা হ'লে ত সংস্কৃত নিতে পারবে না।

দীপ্তি। ভারী মুশকিল ত। কি করা যায় তা হলে? আপনি কি উপদেশ দেন?

সত্যজিৎ। উপদেশ। উপদেশ দেব আমি!! আমার উপদেশ ভারী ত মান।

দীপ্তি। (প্রায় চীৎকারের সুরে) কি বললেন, আপনার উপদেশ মানি না!!

[সত্যজিতের মুখে দুষ্ট মিভরা হাসির রেখা ফুটে ওঠে]

সত্যজিৎ। আমার সব আদেশই কি মানতে রাজি আছ?

দীপ্তি। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, না ভেবেই বলে) নিশ্চয়।

সত্যজিৎ। যদি বলি, আগুনে ঝাঁপ দাও—দেবে?

দীপ্তি। (অবাক হয়ে সত্যজিতের দিকে চেয়ে) হ্যাঁ, তাও বোধ হয় দিতে পারি।

[সত্যজিৎ সহসা চুপ করে যায়। এরকম উত্তর যেন সে আশা করে নি। একটু দূরে গিয়ে পায়চারি করে—কি যেন অস্ফুট স্বরে বলে] কি হ'ল আপনার? উঠে গেলেন যে হঠাৎ?

সত্যজিৎ। দেখছি। দূরের ওই গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রীকে দেখছি। শতাব্দীর অভিজ্ঞতা নিয়ে যে গাছ বেড়ে উঠেছে, তার ছায়ায় গিয়ে বনদেবতার আদেশ প্রার্থনা করব কিনা ভাবছি। ভগবান না মানলেও বনদেবতাকে যেন মানতে ইচ্ছে করছে। অন্ততঃ, এই ক্ষণমুহূর্তের জন্যে। বনদেবতাই বুঝি ভগবান। গাছপালার সংস্পর্শে না এলে—সত্যি, পরম—আই অ্যাম সরি—মানে, আমি বলতে চাই, নির্মল বা বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় না।

There is pleasure in pathless woods,
There is society where none intrudes.

—বায়রণের নাম শুনেছ দীপ্তি?

দীপ্তি। শুনেছি। বায়রণের 'Ocean' কবিতাটা একদিন আপনি পড়ালেন, মনে নেই?

সত্যজিৎ। আমার অতো মনে থাকে না। যা বলছিলাম, ঐ বায়রণ লোকটা কিন্তু ছিল অত্যন্ত পাজি। অর্থাৎ বদলোক। অন্ততঃ মেয়েদের দিক দিয়ে বিচার করলে, তা বলতেই হবে। তবু কি সুন্দর দুটো লাইন লিখে রেখে গিয়েছে কবি! শাশ্বত কালের জন্যেই বলা চলে। জানো, কে দিয়েছিল প্রেরণা—? এই বনদেবতা। বনদেবতার আশীর্বাদেই একটি ফরাসী কন্যার দায়িত্বহীন পিতা হয়েও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঋষি-কবিতে পরিণত হয়েছিলেন।

দীপ্তি। বায়রণ বুঝি ভগবান মানতেন না?

সত্যজিৎ। ও হরি, তাহলে ইতিমধ্যেই তুমি ধরে নিয়েছ, আমিও ঐ বায়রণের চেলা।

দীপ্তি। না না, কি যে বলেন! আমি কি তাই বলেছি। আপনাকে, মানে আমি—আপনাকে—

সত্যজিৎ। দেবতার মত ভক্তি করি। কেবল পছন্দ করি না আপনার নাস্তিকতাকে।

[হঠাৎ দীপ্তি উঃ শব্দ করে, বাঁ পা তুলে দেয় বেঞ্চের উপর]

—কি হ'ল। লাল পিঁপড়ে কামড়েছে বুঝি?

দীপ্তি। না, একটা কাঁটা। এখানে কাঁটা এল কি করে?

[দীপ্তি কাঁটাটা তুলে দূরে ফেলে দেয়]

সত্যজিৎ। কাঁটা আসবে না, তাই বা কে বলেছে তোমাকে। প্রকৃতির রাজ্যে এসে খালি পায়ে চলব, অথচ কাঁটা ফুটবে না, তা কি হয়?

দীপ্তি। স্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে কাঁটাটা বিঁধেছে। পা কাৎ করে ছিলাম কি না।

সত্যজিৎ। ইস, রক্ত পড়ছে যে!

দীপ্তি। (পায়ের গোড়ালি টিপে ধরে) ও দুই-এক ফোঁটা পড়েছে। এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ। তোমার জন্যে একবার আমার আঙুলও কেটেছিল।

দীপ্তি। জানলা বন্ধ করতে গেলেন কেন ঘুম চোখে? ভাঙা কাঁচ—ইস, যা লজ্জা পেয়েছিলাম সেদিন।

সত্যজিৎ। যা ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরিয়েছিলে। উঃ, সে কি ধোঁয়া! আর তোমার উনুনটাও রেখেছিলে এমন জায়গায়! অন্য কোন দিকে না গিয়ে সমস্ত ধোঁয়াটা ঢুকল আমার ঘরে। প্রথম দিনেই রক্তপাত।

দীপ্তি। সেদিনের পর নিশ্চয় আর ধোঁয়া পান নি।

সত্যজিৎ। না, তেমন ধোঁয়া আর দেখি নি। সেজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি রক্তরাগরঞ্জিত সেই দিনটিকে। বিন্দু বিন্দু রক্তও ঝরল, আমিও পেলাম ধোঁয়া থেকে পরিত্রাণ। মন্দ নয়। আসলে ব্যালান্স-শীটে লাভই হয়েছে।

[শোভনের প্রবেশ]

শোভন। দির্দদি-দি—দা-দা-দা—পা-পা-পা-খী।

[দীপ্তি ও সত্যজিৎ উভয়ে শোভনের দিকে দৃষ্টি ফেরায়]

দীপ্তি। একটা কাল পাখী উড়ে গিয়েছে এইমাত্র। বোধ হয় সেই কথা আমাকে জানাতে এসেছে।

সত্যজিৎ। কালো পাখীগুলো কিন্তু দেখতে সুন্দর।

দীপ্তি। দাঁড়কাক ছাড়া।

সত্যজিৎ। ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। খেতে দাও। এতদিনে টিফিন ক্যারিয়ারটা আবার কাজে লাগল।

[দীপ্তি টিফিন ক্যারিয়ার থেকে কলা, বিস্কুট, মাখন বের করে সাজিয়ে দেয়, ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালে। খোকন খেতে খেতে আবার লাফ দিয়ে চলে যায় মঞ্চের বাইরে]

সত্যজিৎ। (চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) এ জায়গাটায় ছায়া বেশী।

দীপ্তি। খুব নির্জ্জন।

সত্যজিৎ। তুমি খেলে না?

দীপ্তি। আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

সত্যজিৎ। আমার কিন্তু ক্ষিদের ব্যাপারে সময়-অসময় নেই। খাবার জিনিস সামনে থাকলেই, খেতে ইচ্ছে করে।

দীপ্তি। এই সামান্য খাবার খেয়ে আপনার ক্ষিদে কি মিটবে?

সত্যজিৎ। (ঢোক গিলে) না, তা কি মেটে!

দীপ্তি। আগে থেকে যদি জানতাম আপনি বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে আনবেন, তা হলে লুচি, তরকারী, হালুয়া করে আনা যেত, খরচাও কম হ'ত। সময় ত দিলেন না। এলেন আর বললেন, চল—ভাল করে চুলও বেঁধে আসতে পারি নি।

[দীপ্তি দু'হাত দিয়ে পিছন থেকে খুলে-যাওয়া খোঁপাটা ঠিক করে নেয়, কিন্তু খোঁপা আবার খুলে পড়ে। বাতাসে চুল উড়তে থাকে। দীপ্তি আবার খোঁপা ঠিক করে। সত্যজিৎ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দীপ্তির দিকে]

সত্যজিৎ। দীপ্তি, তুমি ত গান জান, একটা গান গাও। এখানে আর কেউ ত নেই।

দীপ্তি। কে বলল আপনাকে, আমি গান গাইতে জানি?

সত্যজিৎ। কেন, সেদিন হঠাৎ এসে শুনি তুমি রান্নাঘরে গুনগুন করে গান গাইছ।

দীপ্তি। (লজ্জিতভাবে) ও কি গান! ওরকম গান সব মেয়েই গাইতে পারে। বাবার কাছে একটু-আধটু কীর্ত্তন শিখেছিলাম। এতদিনে চর্চ্চার অভাবে—

সত্যজিৎ। সব ভুলে গিয়েছ, তাই না! আমি বলব, তুমি অঙ্গীকারভঙ্গকারিণী। এইমাত্র কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ? আমার উপদেশ নাকি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সামান্য একটা গান গাইবার অনুরোধও ত রাখছ না!

দীপ্তি। (ছলছল চোখে) সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি, আমি গান গাইতে ঠিক জানি না। তাছাড়া [হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—লাইট ফোকাস]

সত্যজিৎ। তা ছাড়া? কি?

দীপ্তি কিছুদিন পরে, রোজ রোজই ত সুগায়িকার গান শুনবেন। এ ক'টা দিন অন্য কারুর গান না শুনলেও আপনার চলবে।

সত্যজিৎ। কার গানের কথা বলছ?

দীপ্তি। কেন, মিনতিদি ত খুব ভাল গান। রেডিয়োতে গেয়েছেন কয়েকবার, আমি শুনেছি। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি সাধনা।

সত্যজিৎ। (চমকে) মিনতিদি! মিনতিকে চিনলে কি করে? সেই বা কেন আমাকে গান শোনাবে রোজ?

দীপ্তি। (দুষ্টুমির হাসি হেসে) কেন, মিনতিদির সঙ্গে আপনার বিয়ে ত ঠিক হয়েই আছে! জানেন না বুঝি আপনি!!

সত্যজিৎ। ঠিক হয়ে আছে! কে বলল তোমায়?

দীপ্তি। কেন, গত সপ্তাহে ত জ্যেঠামশায়, আপনার বাবার ওখানে যিনি কাজ করেন—আপনাদের মনোমোহন বাবু—তিনি ত এসেছিলেন আমাদের বাসায়। বললেন কত কথা! আপনার সঙ্গে নাকি মস্ত, মানে খু-উব বড়লোকের মেয়ে—একমাত্র মেয়ের বিয়ে হবে। অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আমি জিগ্যেস করলাম, মেয়ের নাম কি; তিনি বললেন, মিনতি। তখন কি বুঝতে বাকী থাকে।

সত্যজিৎ। বটে, সবই বুঝে ফেলেছ দেখছি।

দীপ্তি। আমি কিন্তু বৌভাতের দিন যাব। নিয়ে যেতে হবে মনে থাকে যেন। মিনতিদি—মিনতিদিকে দেখবার আমার খুব ইচ্ছে।

সত্যজিৎ। কেন?

দীপ্তি। (হেসে) বাঃ, কত বড়লোকের মেয়ে! কত বড় বিদ্বানের স্ত্রী হবেন। তা ছাড়া মিনতিদির কাছে যদি মিনতি

জানাই, তা হলে কি আর লেখাপড়া না শিখে থাকব? তিনি ত বি-এ পাশ। ক'দিন বাদে এম, এও পাশ করবেন। কত নাম তাঁর! কত কাগজে তাঁর গল্প-কবিতা বের হয়েছে এর মধ্যে। আপনার থেকেও তাঁর নাম, উৎপলা বলে। মিনতিদির কাছ থেকে পড়া শিখে নেব। আপনাকে ত আর পাওয়া যাবে না।

সত্যজিৎ। বটে, অনেক খবর তুমি রাখ দেখছি।

[ছেলেমানুষের মতন আবার ফিক করে হাসে দীপ্তি।]

দীপ্তি। আপনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?

সত্যজিৎ। পরেকার ঘটনা যা ঘটবে, তা পরেই ঘটবে। তখন আমাকে মনে করিয়ে দিও। আপাততঃ তোমার কর্তব্য, আমার আদেশ পালন করা। নইলে অঙ্গীকারভঙ্গের অপরাধ হবে তোমার।

দীপ্তি। বলুন, কি আপনার আদেশ?

সত্যজিৎ। এইখানে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

[দীপ্তি অবাক হয়ে যায়। কিন্তু উঠে আসে। সামনে এসে দাঁড়ায়। বাধ্য ছাত্রী যেমন মাষ্টারের কথা শোনে]

দীপ্তি। এই ত দাঁড়িয়েছি।

সত্যজিৎ। হাত দুটো পিছনে নাও; আমি ফটো নেব।

দীপ্তি। ক্যামেরা কই?

সত্যজিৎ। আমার চোখের লেন্সের মতন পাওয়ারফুল লেন্স বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

[দীপ্তি ইতস্ততঃ করে]

দীপ্তি। আপনার আজ হয়েছে কি? আপনার সামনে ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বুঝি লজ্জা করবে না—?

সত্যজিৎ। আবার অবাধ্যতা।

[দীপ্তি এইবার সত্যজিতের কথা অনুযায়ী হাত দুটো পিছনে নিয়ে দাঁড়ায়। উন্নত তরুণীবক্ষের শোভা দেখা যায়]

তোমার ফিগারটা কিন্তু শিল্পীর মডেলের উপযোগী।

[দীপ্তি মুখ নীচু করে]

মুখ নীচু করো না! আবার মুখ নীচু করে!! তাকাও—আমার মুখের দিকে তাকাও।

[দীপ্তির মুখে ব্রীড়াবনতার দীপ্তি। কিছুতেই স্থির-দৃষ্টিতে সে সত্যজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না]

আচ্ছা, এইবার এ্যাট ইজ দাঁড়াও। বোসো, আপত্তি নেই। একটু জিরিয়ে নাও।

[দীপ্তি দ্রুতবেগে সত্যজিতের সামনে থেকে সরে যায়। মঞ্চের এক কোণে গিয়ে বুকে হাত দেয়। তার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। সত্যজিৎ দু'হাত পিছনে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে নীরবে পায়চারি করে ঝোপের কাছে (সিনারী ঘেঁসে)। একবার, দুব তিনবার করে সাতবার সে হাতের মুঠোয় কি যেন, কা যেন ধরতে যায়। তার পর মঞ্চের মাঝখানে এ ভগ্নস্বরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে]

দীপ্তি, শোন, এদিকে এস।

[দীপ্তি ভীরু লজ্জিতভাবে এগিয়ে আসে]

আমাকে দুটো মালা গেঁথে দাও।

দীপ্তি। [পরম বিস্ময়ে, মনে মনে—মালা!] (প্রকাশ্যে) মা—মা—মালা—!

সত্যজিৎ। হ্যাঁ, মালা, দুটো মালা চাই।

দীপ্তি। মালা—মানে—মানে—

সত্যজিৎ। মানে মানে করছ কেন। সোজা কথা বুঝতে পারছ না।

দীপ্তি। (অনেকটা সহজভাবে)—মালা দিয়ে কি করবেন?

সত্যজিৎ। সে যাই করি না কেন, তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তার পর তুমি আমার উপদেশ পালন করবে, এমন কি কথা হয়েছিল? স্মরণ করে দেখ, কিছুক্ষণ আগে নিজমুখে কি বলেছিলে তুমি?

দীপ্তি। (আরও সহজভাবে, এইবার মৃদু হাস্যে) কিন্তু দুটো মালা গাঁথব, ফুল কই, সুতো কই, সুচ কই?

সত্যজিৎ। (পকেট থেকে চারটে গোলাপ ফুল বের করে) এই নাও চারটে লাল গোলাপ। মিনতিদের লনে ফুটেছিল। মিনতি কাল সন্ধ্যেয় আমাকে উপহার দিয়েছে। আমার পকেটে পকেটেই ঘুরছে। একটু বাসি হয়ে গিয়েছে, তাও মিষ্টি গন্ধ এখনও।

[গোলাপ চারটি নাকের কাছে নিয়ে সত্যজিৎ দীপ্তির হাতে দেয়। দীপ্তি কম্পিত হস্তে গ্রহণ করে নীরবে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

[কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যায়]

কই, নড়ছ না যে!

দীপ্তি। (মুখ তুলে) এই চারটে গোলাপ ফুল দিয়ে মালা হবে কি করে? মালা গাঁথতে হলে সুচ সুতোও ত চাই।

সত্যজিৎ। (হেসে) যে কাঁটাটা ফেলে দিয়েছ সেটা খুঁজে ছাখ, সুচের কাজ হবে। না পাও আরও অনেক কাঁটা পাবে। সুতোর ভাবনা কি, আমার ধুতির কোঁচায় আর তোমার শাড়ীর কোণায় অনেক সুতো আছে।

দীপ্তি। (বিব্রতভাবে ও ম্লান মুখে) কেন আজ আপনি এ রকম—?

সত্যজিৎ। পাগলামী করছেন—এই ত বলবে? তা বল, তাতে আপত্তি নেই। আজকে তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান—? (দীপ্তি উত্তর দেয় না) মনে হচ্ছে, তোমার জন্যে আমার পাগল হলেও ক্ষতি নেই। কারণ, (মৃদু হেসে) তুমি যে

দীপ্তি। আমার নাম রেখেছিলেন বাবা, কি ভেবে জানি না। সত্য কি তা জানি না। কিন্তু তুমি কাছে থাকলে আমি— (সত্যজিৎ কথা শেষ করে না) পায়চারি করে।

দীপ্তি। কি বলছিলেন যেন ?

সত্যজিৎ। হ্যাঁ, বলছিলাম, আমি আনন্দিত হই। এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু—

দীপ্তি। কিন্তু কি—?

সত্যজিৎ। কিন্তু, তবু কেন ছেড়ে যেতে হয় আমাকে, তাই ভাবি, ভগবান যদি—

দীপ্তি। এই ত ভগবান মানেন। তবে যে বললেন, ভগবান মানেন না।

সত্যজিৎ। তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, ভগবান কেন—ভূত-প্রেত কাউকেই আমার মানতে আপত্তি নেই।

দীপ্তি। আপনি ভগবানকে নিয়ে বড় ঠাট্টা করেন। ভগবান কি পরিহাসের বস্তু ?

সত্যজিৎ। চটে যেও না। ওই ত তোমাদের দোষ। ভগবানকে যারা মানে, তাদের কোন হিউমার নেই।

দীপ্তি। 'হিউমার' কথাটির ঠিক অর্থ জানি না। তাই উত্তর দিতে পারব না, তবে আমার মনে হয়, আপনার সবই ভাল, কেবল একটি মারাত্মক দোষ—আপনার মধ্যে—

সত্যজিৎ। অনন্ত শক্তির আধার পরম পিতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি নেই, এই ত বলবে ? তা বল, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। আমি ভগবানকে মানব সেই দিন, যেদিন বুঝব, তুমি আমি—

দীপ্তি। কথা শেষ করুন।

সত্যজিৎ। সে কথা অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। শোন—(গম্ভীর আদেশের সুরে) তুমি এখানে বেঞ্চে একটু বস। খোকন যদি এসে পড়ে, ওকে আবার গঙ্গার দিকে পাঠিয়ে দিও। আমি তোমাকে একলা পেতে চাই। আসছি এক্ষুণি, এক মিনিট।

[সত্যজিতের প্রস্থান। দীপ্তি একা, বিস্মিতভাবে সত্যজিতের গতিপথের দিকে চেয়ে বেঞ্চে বসে থাকে। চুলটা আবার খুলে যায়, আবার দু' হাত পিছনে নিয়ে বাঁধতে যায়। চুলের কাঁটা খোঁজে মাটিতে, উঠে দাঁড়ায়, বসে, এদিক-ওদিক তাকায়, তার পর খুঁজে পায়। টিফিন ক্যারিয়ারের খোলা বাটিগুলি ঠিক করে রাখে। কলার খোসাগুলি সরিয়ে ফেলে। ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢেলে খাবে কিনা ভাবে, কাপটার চা আবার ফ্লাস্কে ঢেলে রাখে, চা খায় না, কাপটা তালপাতার হাতব্যাগে ফিরিয়ে রাখে। সত্যজিৎ কতকগুলি পাতাসমেত লতা হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে]

সত্যজিৎ। দীপ্তি, তোমার ভগবান চান, আমি যা চাই তা যেন পাই। দ্যাখ, কি সুন্দর—দেখছ, কেমন কচি কাঁচ পাতা, আর ছোট ছোট ফুল ফুটেছে—এ লতাগুলিকে বনদেবতাই বল, আর ভগবানই বল—কেউ একজন সৃষ্টি করেছেন, এ কথা যদি মেনে নি, তা হলে বলব, এ সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। বুঝতে পেরেছ কি উদ্দেশ্য—?

দীপ্তি। না।

সত্যজিৎ। ধর। এগুলি থেকে দুটো লতা বেছে নাও। দুটোকে জড়িয়ে লতার হার কর। আর বেঁধে দাও দুটো করে গোলাপ। মালা গাঁথা কত সহজে হতে পারে, সে বুদ্ধি তোমার ভগবানই আমাকে হঠাৎ যুগিয়ে দিয়েছেন। নাও, ধর। দেরী করো না। যা বলি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর। নইলে, নইলে আমি ভীষণ চটে যাব।

[দীপ্তি দুটো লতার মালা তৈরী করে। সত্যজিৎ কোঁচা থেকে কয়েকটি সুতো বের করে দীপ্তির হাতে দেয়। দীপ্তি দুটো করে গোলাপ প্রত্যেক মালার সঙ্গে বেঁধে দেয়।

সতেজ পাতা সমেত লতার মালা দুটো বেশ ভালই দেখতে লাগে]

দীপ্তি। এখন কি করব ?

সত্যজিৎ। এখন কি করবে !! বোকা মেয়ে !! তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে !! আমি কি অত সব খুঁটিনাটি জানি ! কে আগে দেয়, তুমি কি জান না ?—আচ্ছা, তুমিই আগে দাও।

দীপ্তি। কি দেব, কাকে দেব ?

সত্যজিৎ। ধর, মালা দুটো দু'হাতে ধর। হাত তোল। আমাকে একটা দাও।

[দীপ্তি সত্যজিতের নির্দেশ পালন করে]

আচ্ছা এগিয়ে এস, দাঁড়াও, ওরকম ভাবে নয়। এস আমার সামনে, হ্যাঁ, এইবার দাও তোমার হাতের ঐ মালাটা আমার গলায় পরিয়ে।—দাও।

[দীপ্তি কাঁপতে কাঁপতে লতার মালা পরিয়ে দেয় সত্যজিতের গলায়]

প্রণাম কর। [যন্ত্রচালিতের ন্যায় দীপ্তি সত্যজিতকে প্রণাম করে] উঠে দাঁড়াও। [দীপ্তি ওঠে] আশীর্বাদ করি তোমাকে। তুমি আমার আদেশ পালন করেছ। কোন দিনও আমি তোমাকে ভুলব না।—ভুলতে পারব না। অন্ধকার রাত্রিতে যখন চেয়ে থাকব আমি—তুমি জ্বলবে, জোনাকীর মত।—বুঝতে পারছ না আমাকে ?—তাই না—? থাক্, ও-সব কথা থাক্। এই নাও আমার মালা। সবুজ মালা।

[সত্যজিৎ দীপ্তির গলায় লতার মালা পরিয়ে দেয়। দীপ্তি প্রায় অচৈতন্য-প্রায়, ঢলে পড়ে সত্যজিতের বুকে। সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে দীপ্তিকে ধরে। স্নেহের ভঙ্গিতে দীপ্তির পিঠে এক হাত রেখে দীপ্তিকে বেঞ্চের উপর বসিয়ে দেয়। দীপ্তি অজ্ঞান হয়ে সত্যজিতের কোলের উপর মাথা রেখে লুটিয়ে পড়ে।]

তৃতীয় দৃশ্য

(পার্কের একাংশ। একটি বেঞ্চে বসে মনতোষ, ক্ষীরোদ, প্রভাস ও সত্যজিৎ। চিনে বাদাম ভাঙতে ভাঙতে আলোচনা চলেছে)

প্রভাস। এই কেলাওয়ালা, ইধার আও।

(মাথায় ঝুড়িতে পাকা কলা, একটি হিন্দুস্থানীর প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। কেতনা করকে ডরজন ?

কলাওয়ালা। এক রূপেয়া।

প্রভাস। পহিলা বাতাও তুমারা ঘর কাঁহা ?

মনতোষ। নাম কৌন ?

কলাওয়ালা। ঘর ছাপরা জিলা। ময় হু বজরঙ্গ।

ক্ষীরোদ। হাঁ'রে বুড়্রুকি, তু যে পাকিটমে চাকু চালাইতে জানছস সে কথা নি আমরা জা'নছি—তাও নি জানছ ?

বজরঙ্গি। কেয়া বাবু, কেয়া বাত ?

ক্ষীরোদ। ও প্রভাস, কেলাওয়ালারে কেলা কারে কয়, তানি শিখাইতে পার।

(কলাওয়ালা একটু যেন ভয় পায়)

বজরঙ্গি। বার আনা করকে লিজিয়ে।

ক্ষীরোদ। বার হাত কাঁকুড় ড্যাখছ ?

বজরঙ্গি। কাঁকুর কেয়া বাবু ? ম্যায়নে নাহি দেখা।

ক্ষীরোদ। তেরো হাত বীচি ড্যাখছ ? ড্যাখ নাই। ও প্রভাস, উহারে ড্যাগাইয়া দাও। জলদি কর। আবার মাঝী আইয়া পড়তে পারে।

(কলাওয়ালা আবার ভয় পায়)

বজরঙ্গী। আট আনি করকে লিজিয়ে।

প্রভাস। লেও, ছে আনি লেও, দে দেও এক ডরজন।

(কলাওয়ালা পয়সা নিয়ে এক ডজন কলা দেয়, তার পর মাথায় ঝাকা ওঠায়)

ক্ষীরোদ। (কলা খাইতে খাইতে) এইবার স্বস্থানে প্রস্থান কর। না হলে বোঝঝি নি—।

(সত্যজিৎ চুপ করে বসে। সে চীনেবাদাম বা কলা স্পর্শ করে না। গম্ভীরভাবে সামনের দিকে চেয়ে)

প্রভাস। ব্রাদার ভিক্টোরিয়াসের মুখ এত ভার কেন ?

ক্ষীরোদ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুখভার করে নি এমন লোক খুব বেশী নেই। জানিস সত্যজিৎ তোকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে—এই মুহূর্ত্তে—?

সত্যজিৎ। কি ?

ক্ষীরোদ। বলে ফেলব—এতগুলো লোকের সামনে ?

মনতোষ। বল না, আপত্তি কি। খুব নিন্দের কথা না ত ?

ক্ষীরোদ। নিন্দের বইকি। আমরা লজিক পড়েছি। লজিকের অর্থ ন্যায়। ন্যায়ের বিরুদ্ধে হলেই অন্যায়। সুতরাং নিন্দনীয়, দোষাবহ বলতেই হবে।

সত্যজিৎ। অত ভণিতা না করে আসল কথাটা বলে ফ্যাল সত্যজিতের আর যাই দোষ থাকুক না কেন, নিজের ত্রুটি জানতে পারলে সে কৃতজ্ঞই হয়, ক্রুদ্ধ হয় না।

ক্ষীরোদ। তুমি সত্যজিৎ—ইউনিভার্সিটির রত্ন হলে কি হবে, তুমি একটি মূর্ত্তিমান কনট্রাডিক্‌শান।

প্রভাস। জানিস, "সাহিত্য ও সমাজ" প্রবন্ধে সত্যজিৎ কি লিখেছে ?

ক্ষীরোদ। নিশ্চয় তাতে লিখেছে, খুন করে যদি কেউ মনকে স্থির রাখতে পারে, সে পাপী নয়।

প্রভাস। না, তা ঠিক লেখে নি। লিখেছে, উই এক্‌জিষ্ট এই হ'ল একমাত্র পরম সত্য। আর পরম সত্য বলে কিছুই নেই। অবাঙমনসগোচর বলে কোন পদার্থ থাকতে পারে না। সুতরাং সমাজের উচিত—নাগরিকদের মধ্যে বাস্তবপ্রীতি জাগিয়ে তোলা। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই ভারতবর্ষ আজ ডুবতে বসেছে। পরমের পশ্চাতে মায়া-মৃগয়ার ফলে ভারত-সীতা জন্মদুঃখিনী হয়েই কাল কাটাবেন। ভারতের রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণচন্দ্রের একান্ত মূর্খতার জন্য রাক্ষসেরা ভারত-সীতার উপর অপবাদ এনে দিয়েছে। অপবাদ নিরঙ্কুশ। পৃথিবীর মধ্যে তাই কাণাঘুষা এখনও বন্ধ হয় নি। জন ষ্টুয়ার্ট মিল—

ক্ষীরোদ। থাক্ থাক, আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি ও কি বলতে চায়। কিন্তু, ও কি জানে কি বলতে কি বলছে শেষমেশ ? মানে, মেনে নিতে বাধ্য হবে—?

মনতোষ। তার মানে ?

ক্ষীরোদ। তার মানে, ধর্ম্ম বাদ দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? রাশিয়ার মত ধর—

মনতোষ। আবার রাশিয়া আনছিস কেন বাপু।

প্রভাস। রাশিয়াতেও কিন্তু চিরন্তন বা পরম পদার্থের স্বীকৃতি আছে। এক হিসেবে ওরা সবাই ধার্ম্মিক।

মনতোষ। বাঃ, রাশিয়ার কমিউনিষ্টরা বলে, ধর্ম্মের প্রভাবেই জনসাধারণের দাসত্ব এখনও ঘোচে নি। ধার্ম্মিকতার অর্থই হল মধ্যযুগীয় ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া।

প্রভাস। সে হল কুধর্ম্ম, কুসংস্কারের কথা।

মনতোষ। মুশকিল ত ঐখানেই। কোনটা কুধর্ম্ম, কোনটা সুধর্ম্ম এ নিয়ে বিবাদ থাকবেই। আবার কেউ কেউ শুধু একটা টার্ম্ম নিয়েই ঝগড়া করে।

ক্ষীরোদ। ঠিক বলেছিস। আমি বুঝি, ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, চিরন্তন বা চরম বা পরম বলে ত কিছু থাকবেই। না হলে তুই আমিই বা থাকি কি করে। চোর-জোচ্চোরেরাই যদি সব কলাগুলি খেয়ে যায়, আর আমাদের বলে—তোমাদের জন্যে ঐ রইল কলার খোসা, না বাপু ও ব্যাটাদের আমি চিরন্তন কালের ডাংগস মারবই। মরুক শ্যালারা রৌরব নরকে। ভাই, কি বলব,

যা সরষের তেল, আর ঘিয়ের অবস্থা হয়েছে বাজারে—তিন দিনের মধ্যে ক্ষিধেই হচ্ছে না—দে প্রভাস, আর একটা কলা দে।

প্রভাস। সব শ্যালকদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে পচা গোবর খাওয়াও। পাড়ায় পাড়ায় সমিতি কর—পচা গোবরের খরচ এমন বিশেষ কিছুই নয়। গুলী করায় বিপদ আছে।

ক্ষীরোদ। ছাখ—দেখছিস—

মনতোষ। কি দেখব ?

ক্ষীরোদ। ছাখ, সত্যজিৎকে ছাখ—মূর্তিমান কনট্রাডিকশনকে ছাখ—ইউরেকা।

(ক্ষীরোদ বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায়, প্রভাসও ক্ষীরোদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়)

প্রভাস। এলডরেডো—স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছে ক্ষীরোদ।

ক্ষীরোদ। হ্যাঁ, স্বর্ণখনিই বলতে পার, আমি পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছি। আমি প্রমাণ করে দেব, চিরন্তন নীতি বা পরম সত্য বলে কিছু আছে। আগে স্বীকার কর সবাই, স্যর আইজাক নিউটন্ বা আইনষ্টাইনকে যে সম্মান তোমরা দাও বা দিচ্ছ তা আমাকেও দেবে। এ একটা অরিজিন্যাল, মানে মৌলিক গবেষণা, আবিষ্কারও বটে।

প্রভাস। কি রকম ?

ক্ষীরোদ। এই ধর্ একটি কুমারী মেয়ে।

প্রভাস। কুমারী মেয়েকে ধরব, বলিস কি !

ক্ষীরোদ। আরে না না তা বলি নি। ধর মানে ধর—মানে, মানে ধর।

প্রভাস। আচ্ছা, ধরলাম। তার পর।

ক্ষীরোদ। তার পর ধর, তুমি যদি তাকে প্রতারিত কর, অর্থাৎ বুঝতে পারছ ব্যাপারটা—আমি আর ব্যাখ্যা করে বলতে চাই না। খবরের কাগজে ত এ সব কাহিনী হামেশাই ঘটেছে দেখা যায়। ধর তুমি।

প্রভাস। না ভাই, আমি না, আমি না।

ক্ষীরোদ। তবে মনতোষ।

মনতোষ। না বাপু, কোন কুমারীকেই আমি প্রতারিত করতে চাই না।

ক্ষীরোদ। তবে, ধরা যাক, এই আমাদের ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির সত্যজিৎ, যিনি এক প্রক্সি ছাড়া জীবনে কোনদিন মিথ্যায় উৎসাহ দেন নি, এবং যিনি প্রতারণা আর ভণ্ডামীর উপর খড়্গহস্ত, বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত দিক্‌পালদের ন্যাকামির উপর যিনি চটা, অথচ যিনি আবার সোফিষ্টদের মত বলে বসেন শাদা যে শাদা তার কোন প্রমাণ নেই—এহেন আমাদের বন্ধু করলেন কি শেষকালে। পড়লেন—প্রেমে নয়,

মানে আমি বলতে চাই যা, তা তোমরা বুঝে নাও। আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় পতিত হয়ে করলেন এক কাণ্ড। একটি নিষ্পাপ কুমারীর—

প্রভাস। সর্ব্বনাশ।

মনতোষ। এ্যাঃ !

[সত্যজিৎ গম্ভীর হয়ে শুনছিল, হঠাৎ জিগেস করে]

সত্যজিৎ। তার পর ?

ক্ষীরোদ। তার পর আর কি। লজিকের ফাণ্ডামেন্টাল ল', দি ল' অব কন্ট্রাডিকশন—কোয়াড এরাট ডিমনষ্ট্রেটাট—উচ্চারণটা ঠিক হ'ল ত ?

প্রভাস। আবার উচ্চারণ কিরে ! আমরা যা উচ্চারণ করব তাই হ'ল মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা—উচ্চারণ, আচরণ, বিচরণ। অল কম্বাইন্‌ড। ইউক্লিডের বাড়ী থেকে আসছি যে।

মনতোষ। যাঃ, তোরা কি যা-তা বলছিস। সত্যজিৎ কখনও তা করতে পারে না।

ক্ষীরোদ। কিছু বিশ্বাস নেই। আমরা ভাই ফিলসফির ছাত্র, সাইকলজিও পড়তে হয়। যারা যত বুদ্ধিমান, বিদ্বান তারা চিরন্তনের ডাঙ্গসের ভয় করে না। সবই তাদের রিলেটিভিটি। মানে পার্শিয়ালিটি। আংশিক সত্যের পূজা। পক্ষপাতদোষও বলতে পার। এরা তর্ক করে, সব কিছু উড়িয়ে দেয়। আবার করবার বেলায় যেটা করবার, সেটা করে না। যেটা না করবার সেইটিই করে বসে।

প্রভাস। তা যা বলেছিস, একেবারে মিথ্যে নয়। আজ-কাল পাপী হ'ল শিক্ষিত সমাজ। অশিক্ষিতেরা বড়জোর পতিতাকে খুন করে তার সোনাদানা চুরি করে। আর শিক্ষিতেরা, তারা পতিতা অপতিতা কাউকেই বাদ দেয় না। অপতিতাকে পতিতা করে, হয় টাকার জন্যে—নয়—

ক্ষীরোদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যারা যত মহাপুরুষ তারা আবার তত মহাপাপীও হতে পারে। স্থান-কাল-পাত্রীভেদে অঘটনও ঘটে। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মহাভারত আর রামায়ণ ঘাটলে দেখতে পাবে।

মনতোষ। দূর, এই যে বললি, এ ক্যানট বি 'এ' এ্যাণ্ড নট 'এ' এ্যাট দি সেমটাইম।

ক্ষীরোদ। থুড়ি।

প্রভাস। না না, ক্ষীরোদ ইজ রাইট। ও সত্যজিৎ হ'ল ঠিক জেকিল এ্যাণ্ড হাইড। তবে ঠিক উল্টো। ও দিনের বেলায় আমাদের কাছে পাপ উড়িয়ে দেয়, কিন্তু রাত্রে পুণ্যের চর্চ্চা করে।

ক্ষীরোদ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়ে। বুদ্ধদেবের মতন ধ্যানেও বসে। প্রাণায়াম করে কি না, তা আমার জানা নেই।

সত্যজিৎ (চমকে)। কি করে জানলি, আমি কথামৃত পড়ি ?

ক্ষীরোদ। একদিন তুই বলেছিলি, মনে করে দ্যাখ। বলেছিলি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত উৎকৃষ্ট সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইগুলোর একটা বিশিষ্ট স্থান হওয়া উচিত।

সত্যজিৎ। সে ত সাহিত্যের দিক থেকে কথাটি বলেছি।

ধর্মসংক্রান্ত কোন মতামত দিই নি। রামকৃষ্ণ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষকে অভয় দিয়েছেন। তার একটা সার্থকতা আছে।

ক্ষীরোদ। কেন, তুই কি ধর্ম মানিস না?

সত্যজিৎ। তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মানুষের ধর্ম কি হওয়া উচিত, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে কোন ধর্ম শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনীন হয়ে দাঁড়াবে—এ বিষয়ে এখনি কিছু বলা যায় না। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা—হলফ করে কে বলতে পারে? বললেই বা শুনব কেন?

মনতোষ। হলফ করে বলা যায় বৈ কি—ধর্ম ছাড়া মানব-সভ্যতার কোনই অর্থ নেই। ধর্ম বাদ দিলে সভ্যতার সবটাই বাঁদরামি।

প্রভাস। এ্যাঃ, কি বললি—বাঁদরের বাঁদরামি—সিনেট হলের ওই উঁচু থাম বেয়েও কি উঠতে পারে ওরা?

সত্যজিৎ। তোরা কেবল ধর্ম ধর্ম করেই ফতুর হবি। ধর্ম ধর্ম করে চেঁচাচ্ছিস—বলতে পারিস এ পর্যন্ত কেউ ধর্ম বা পূর্ণ সত্যরূপ হাতীটার গোটা চেহারা বাক্য বা ইঙ্গিতের মধ্যে ধরতে পেরেছে? এ বলে পা, ও বলে শুঁড়, আর এক দল বলে লেজই সত্য।

মনতোষ। যত মত তত পথ।

সত্যজিৎ। কিন্তু শ্রীভগবান বিশ্বাসের কাণাগলিতেই পরি-সমাপ্তি। বস্তাপচা নীতিবাক্য না শুনিয়ে নিজের চরখায় তেল দাও। আমি উঠি।

প্রভাস। এই উঠছিস কোথায়! দাঁড়া দাঁড়া।

সত্যজিৎ। না আমার কাজ আছে।

[হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সত্যজিৎ উঠে দাঁড়ায়। প্রস্থানের জন্ম পা বাড়ায়]

সকলে সমস্বরে। বোস বোস—যাস কোথায়। সত্যজিৎ, ও সত্যজিৎ!! শোন্ শোন্।

[সত্যজিৎ দাঁড়ায় না। সত্যজিতের প্রস্থান]

প্রভাস। সত্যজিৎ রাগ করেছে। ক্ষীরোদ তুই কেন ওকে ওরকম ভাবে বললি?

মনতোষ। সর্বনেশে কথা ত বললি তুই।

প্রভাস। তা বলেছি বটে, তবে কি না, ঠিক ইচ্ছে করেও বলি নি—হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস তোরা, সত্যজিৎ আজকাল প্রায়ই ক্লাশ কামাই করে। আশ্চর্য্য একটা দৃশ্য দেখেছি ভাই, বলি বলি করে তোদের বলা হয় নি।

মনতোষ। কি দেখেছিস?

প্রভাস। দেখলাম ঠিক যেন আমাদের সত্যজিৎ, সঙ্গে একটি শ্যামবর্ণা বেশ সুশ্রী যুবতী।

ক্ষীরোদ। কি বললি!

প্রভাস। হ্যাঁরে, দেখলাম সারকুলার রোডে তিনকোণা সেই হোটেলটায় দুজনে গিয়ে ঢুকল।

ক্ষীরোদ। কি বাজে বকছিস!

মনতোষ। তুই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস। এ হতেই পারে না।

প্রভাস। তা ব্রাদার, নেশা-ভাং ত করি না, তবে হ্যাঁ—দূরে থেকে দেখা, হয়ত ভুল হতেও পারে।

ক্ষীরোদ। ভুলই দেখেছিস। কালো মেয়েকে নিয়ে হোটেলে যাবে কেন? মিনতির রং ত শ্যামবর্ণ নয়।

প্রভাস। মিনতি! মিনতিকে টানছিস কেন আবার?

ক্ষীরোদ। বাঃ মিনতির সঙ্গে যে সত্যজিতের বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। ওঃ হোঃ, তোদের বুঝি বলি নি সে কথা?

মনতোষ। বিয়ে? বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে? মিনতির সঙ্গে? কবে?—কবে? তুই কি বল ত ক্ষীরোদ—এমন খবরটাও চেপে গিয়েছিস আমাদের কাছে!

প্রভাস। অব সমঝলুম—ও হরি, তাই সত্যজিৎ আর বসতে চাইল না। তা বেশ, তা বেশ—মিনতির মত মেয়ে হয় না।

[ক্রমশঃ]

অরণ্য

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমি বনবাসী হই, সে আজ বহুকাল আগেকার কথা। অনেক কারণে কলকাতার পাঠ চুকিয়ে হাজারীবাগ জেলার একটি অরণ্য-ঘেরা পল্লীতে এসে ঘর বাঁধি। আজকের যে হাজারীবাগ আমরা দেখতে পাই সে হাজারীবাগে আধুনিকতার, শহুরে সভ্যতার গাঢ় রং লেগেছে, যেখানে গ্রাম ছিল সেখানে বাজার-গঞ্জ গড়ে উঠেছে, ভাল ভাল টারম্যাক পথ তৈরি হয়েছে, তাতে রাত্ত-দিন মোটর আর বড় বড় ট্রাক ছুটছে, মাঠের মাঝখান দিয়ে বিদ্যুতবাহী তারের উচু লোহার সারিবন্দী থাম চলে গেছে, আর এ দেশের যা ছিল সম্পদ আর সৌন্দর্য্য সেই শাল-অরণ্যের অভাব ঘটেছে। অর্দ্ধশতাব্দী আগে এই হাজারীবাগ কি ছিল? ছোট ছোট পাহাড় আর গভীর শালবন, তিন-চার ক্রোশ বাদে বাদে বিশ-পঁচিশখানা মাটির ঘর নিয়ে ছিল এক-একটা গ্রাম, যাতায়াতের জন্তে ছিল বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। এ কথা ঠিক যে, হাজারীবাগের অর্থনৈতিক উন্নতি আগের চেয়ে বেশী হয়েছে কিন্তু আর একদিক দিয়ে তার অবনতি ঘটেছে—সে দিক হচ্ছে তার সৌন্দর্য্যের রহস্তের দিক। অরণ্যের সঙ্গে চলে গেছে অরণ্যবাসী বাঘ-ভালুক, হায়না-হরিণ, ময়ূর মুরগীর দল। কষ্টিপাথরের মত কালো সুস্থ-সবল হাস্তময় আদিম সাওতাল আর সাওতালনী চোখে পড়ে না, যারা চোখে পড়ে তারা নামে সাওতাল মাত্র, তাদের দেহে সৌন্দর্য্য নেই, মনে আনন্দ নেই, মুখে হাসি নেই।

আমি আজ সেই অরণ্যময়, রহস্তময় হাজারীবাগের কথা লিখতে বসেছি।

জানুয়ারী মাসে একদিন শেষরাত্রে আমি হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনে এসে নামলাম। ষ্টেশনে যাদের থাকবার কথা ছিল, স্থানীয় চাকর ও অন্ত দু'-চারজন লোক তারা সবাই উপস্থিত ছিল। ট্রেন থেকে নামলাম, নীচু প্লাটফর্ম, প্রায় লাফ দিয়ে নামতে হ'ল। আলোর ব্যবস্থা নাই, অন্ধকারে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসলাম। কি প্রচণ্ড শীত, যথেষ্ট গরম জামা-কাপড় থাকা সত্ত্বেও বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসে থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলাম। চাকর মহু সিংকে বললাম, 'বাপু, এক পেয়ালা চা আনতে পার?" সে সময়ে আজকের মত প্লাটফর্মে চা-ভেণ্ডারদের কিলিবিলি আর কলরব ছিল না। মহু ত চলে গেল, আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে হতাশভাবে জানাল চা পাওয়া গেল না। স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, ঠাণ্ডা লেগে যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে, তাই ঝুড়ি খুলে ষ্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম বার করে সেইখানেই চা করতে লেগে গেলাম। ষ্টেশনের প্লাটফর্মকে সেদিন প্লাটফর্ম বলে মনে হয় নি, নির্জ্জন অরণ্যলোক বলেই মনে হয়েছিল।

হাজারীবাগ ষ্টেশন আমার চেনা, আমার বড় মামা এই দিকটাতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন বসাবার ব্যাপারে কনট্রাক্টর ছিলেন, তাঁর আপিস ছিল হাজারীবাগ রোডে, সেইজন্তে এর আগে কয়েক-বার এখানে বেড়াতে এসেছি। তবে, এবার আমার যাত্রা ষ্টেশনে নেমেই সমাপ্ত হবে না, আমি যাব এখান থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের কোলে একটা ছোট গ্রামে, সেইখানে কিছুদিনের জন্তে যাপন করব এক নতুন জীবন। বড় মামার আপত্তি সত্ত্বেও আমি এই ব্যবস্থা করেছি, অরণ্য আমাকে ডাক দিয়েছে।

ভোর হয়ে গেলে দেখি আমার যাত্রার জন্তে দুখানা গরুর গাড়ী ঠিক করে রাখা হয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু জলখাবার ও এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে গাড়ীতে মাল বোঝাই করতে লেগে গেলাম। এ দেশের বলদগুলো খুবই ছোট, গাড়ীও সেই অনুপাতে ছোট, দেখলে যেন খেলার গাড়ী বলে মনে হয়। একখানা গাড়ীতে বাক্স-ঝুড়ি-বালতি যাবতীয় জিনিস তুলে দিয়ে আর একখানাতে পুরু খড়ের গাদার উপর বিছানা বিছিয়ে নিলাম। দুটো গাড়ীর উপরেই অবশ্য দরমার ছই ছিল। খবর নিয়ে জানলাম আমার আস্তানা এখান থেকে প্রায় ছ-সাত ঘণ্টার রাস্তা, বেলা তিনটের আগে কিছুতেই পৌছান যাবে না। তাড়াহুড়ো করে গাড়ীতে যখন উঠে বসলাম তখন ঘড়িতে দেখলাম আটটা বেজেছে।

হাজারীবাগ শহরে যাবার পাকা সড়ক ধরে আমরা চললাম। আমাদের পাশ দিয়ে একখানা দোতলা উটের গাড়ী শহরমুখো চলে গেল। একখানা পুসপুসও গেল। পুসপুস হচ্ছে দুটো চাকার উপর বসান একখানা বড় পালকি, সামনের দিকে ছোট একটা দরজা। চার জন কুলিতে পুস করে নিয়ে যায় বলে এর নাম হচ্ছে পুসপুস। চার-পাঁচ মাইল বাদে বাদে কুলির ঘাঁটি আছে, সেখানে কুলি বদল হয়, এই ভাবে চল্লিশ মাইল রাস্তা যেতে কত আরাম আর কত সময় লাগে তা সামান্ত কল্পনাতেই বুঝতে পারা যাবে। এ ছাড়া পথে চোর-ডাকাত এবং বাঘের ভয় ত আছেই।

পাকা রাস্তা ধরে মাইলখানেক গিয়েই আমরা ডাইনে মেঠো

পথে নেমে গেলাম, সভ্যসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আপাততঃ ছিন্ন হ'ল।

ঘাসহীন কাঁকরময় একটা মাঠের উপর দিয়ে চলেছি, এখানে-ওখানে জংলী কুলের ঝোপ, দূরে দু-চারটে আম ও মহুয়া গাছ। ঘুরে ফিরে পথ ক্রমে ঢালু হয়ে একটা ছোট নদীতে গিয়ে নেমেছে। নদীর সবটাই বালুময়, একপাশ দিয়ে একটি ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। নদী পার হয়ে ওদিকের উঁচু পাড়ে উঠবার সময় মাল-বোঝাই গাড়ীটাকে যথেষ্ট ঠেলাঠেলি করে তুলতে হ'ল। পথে এই বাধা-বিপত্তি আছে বলেই গাড়োয়ান ছাড়াও অতিরিক্ত দু'জন লোক আমার সঙ্গে রয়েছে।

নদীর এপারে এসেই দেখলাম পারিপার্শ্বিক ভূমির রূপ বদলে গেছে। চারিদিকে হালকা জঙ্গল, শাল আর পলাশ গাছই আমার চেনা, আর সব অচেনা গাছ, মাঝে মাঝে আমলকীর ঝোপ, সরু ডালগুলি ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। জমি ঢেউয়ের মত কখনও উঁচু আবার কখনও নীচু, গাড়ী কখনও ধীরে ধীরে কেঁকিয়ে কুঁকিয়ে উঠছে, আবার কখনও হুড়মুড় করে ছুটে নেমে যাচ্ছে।

বেলা বারটা নাগাদ আমরা আর একটা ছোট নদীতে এসে পৌঁছলাম। এটাকে নদী না বলে নালা বলাই সঙ্গত কেন না খুবই অপরিসর, জল একেবারেই নাই। মনু সিং এসে বললে, "বাবু, কিছু খেয়ে নিন, এর পরে আর জল পাবেন না।" খিদে পেয়েছিল, বললাম, "জায়গাটা বেশ, খেতেও ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু জলের সমস্যা যে এখানেও, সঙ্গে কি জল এনেছ?" মনু বললে, "জল ত রয়েছে বাবু, আপনি খেতে বসুন।" টিফিন কেরিয়ার বার করে গতকালের লুচি-তরকারী নিয়ে বসলাম। মনু একটা ঘটি নিয়ে নালার মধ্যে এগিয়ে গেল, তার পরে একটা পাথরের পাশে খানিকটা বালি হাত দিয়ে খুঁড়ে ফেলল, অবাক হয়ে দেখলাম নীচে থেকে পরিষ্কার জল চুইয়ে এসে জমা হচ্ছে। মিনিট দশেকের মধ্যে বেশ খানিকটা জল জমা হয়ে গেল, আমি তখনকার মত খেলাম ত বটেই, কিছু সঙ্গে করে নিয়ে চললাম।

এবার পথ আমাদের ক্রমে উঁচু হয়ে চলেছে, বড় বড় পাথর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, বনও গভীর হয়ে আসছে। পথের দু'পাশে কেবল গাছ আর গাছ শালগাছই বেশী। আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গভীর বনে আগাছা খুবই কম, শালগাছের গুঁড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, নীচেটা পরিচ্ছন্ন তক্‌তকে। বাংলা দেশের জঙ্গল ছোট আগাছাতে এত ঠাসা যে, ভিতরে ঢোকা মুস্কিল, এখানে স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়ান যায়, কোন বাধা নেই। ঘণ্টাখানেক চলে গেলাম—তবুও বন শেষ হয় না। দু'-একটা পাখীর উড়ে যাবার শব্দ বা তাদের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই—এত নীরব যে, গা ছমছম্‌ করে উঠে। দু'খানা গাড়ী চলেছে, এতগুলি লোক হৈ-হল্লা করে চলেছে তবু যেন এই বিপুল নীরবতা ভাঙতে পারছে না।

হঠাৎ বন শেষ হয়ে খোলা মাঠ সুরু হ'ল। উঁচু-নীচু মাঠ, মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই, এখানে ওখানে দু'-চারটে গাছ। মাঠের সবচেয়ে উঁচু যেখানটা সেখানে এসে পৌঁছতে চোখে পড়ল দূরের পাহাড় খুব কাছে এসে পড়েছে। পাহাড় দূর থেকে অনেক দেখেছি, কাছে কখনও দেখিনি, তাই এত কাছে পাহাড় দেখে মনটা আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠল। মাঠের শেষে আবার বন আরম্ভ হ'ল, তেমন গভীর নয়। আম কাঁঠালের গাছও দেখলাম দু'-চারটে। এখন মন বলছে "আর কত দূর—আর কত দূর।"

সামনে একটা মস্ত বড় পাথরের চাঁই, তার পাশ দিয়ে পথটা ঘুরে গেছে, মোড় ফিরতেই দেখি এক পাশে একটা টিলার উপর বিশাল এক আমগাছ, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ডালপালা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচে ছোট্ট একখানা ঘর, দেওয়াল মাটির, খাপরার চাল। ঘরের সামনে অনেকগুলি বাঁশ পোঁতা, তাদের মাথায় উড়ন্ত লাল কাপড়ের নিশান। নিশান দেখে বুঝলাম এ একটা ধর্ম্মের স্থান, জিজ্ঞাসা করে জানলাম এর নাম "মারোয়া।" মণ্ডপের অপভ্রংশ। মারোয়া দেখে অনুমান করলাম সামনে অবশ্যই গ্রাম আছে, মনুকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, "গ্রাম ডানদিকে ফেলে এসেছি বাবু, এখান থেকে অনেক দূর।" আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আমাদের তা হলে আর কতদূর যেতে হবে রে—তিনটে ত বেজে গেছে?" মনু ভরসা দিয়ে বললে, 'এই ত এসে পড়েছি বাবু, আপনার ঘর এখান থেকে মাত্র মাইল খানেক হবে।" শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। গাড়ী থেকে নেমে সবার সঙ্গে হেঁটে চললাম।

কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই কানে এল টুং টুং ঘণ্টার আওয়াজ, সন্দেহ হ'ল এ কি গরুর গলার ঘণ্টা! এই গভীর বনে গরু চরছে কোথায়? মনুকে প্রশ্ন করলাম, "কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিস?" সে বললে, 'হ্যাঁ বাবু, গরুর গলার ঘণ্ট বাজছে, গাঁয়ের গরুর পাল চরতে এসেছে।" শুনে ভীতভাবে প্রশ্ন করলাম, "এই বিজন বনে গরু চরছে কি রে—বাঘের ভয় নেই?" নিশ্চিন্ত মনে হেসে মনু বললে, "ভয় কি বাবু, দিনের বেলা বাঘ আসবে না।" আর প্রশ্ন করলাম না, মনে মনে বললাম, "ভরসাই বা কি, এসে পড়লেই হ'ল।'

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই গরুর পাল চোখে পড়ল, বনের মধ্যে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে। ভাবছি এ দেশে কি গরুর সঙ্গে রাখাল থাকে না, এমন সময় ভেল্কী বাজীর মত কোথা থেকে পাঁচ-সাতটা আট-দশ বছরের ছেলে এসে গাড়ীর সামনে খাড়া হ'ল, তাদের হাতে একখানা করে ছোট কুড়ুল, অঙ্গে একটুকরো লেংটি। একদল শিশু বাঘের লীলাভূমিতে গরু চরাচ্ছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিছুদিন এ দেশে থাকবার পর অবশ্য বুঝতে পারলাম পশুপক্ষীর সঙ্গে যারা প্রতিবেশীর মত বসবাস করে তারা বাঘ-ভাল্লুককে শহুরে লোকদের মত সমীহ করে চলে না।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা ঢলে পড়েছে, আমরা একটা ঢালু বনভূমি অতিক্রম করে উপরে উঠতে লাগলাম। বন ক্রমে

গভীর হতে লাগল। গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝে পাহাড় নজরে পড়ছে, আরও কাছে এসে পড়েছে, পাহাড়ের গায় যে সব গাছ রয়েছে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবই অচেনা গাছ, কোথাও ছোট ছোট বাঁশের ঝোপ। এখন আর ধরা-বাঁধা রাস্তা নেই, একটা পায়ে চলার পথকে অনুসরণ করে আমাদের গাড়ী দুটো শাল-গাছ এড়িয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। খানিক দূর যেতেই দেখতে পেলাম পাঁচ ছ'খানা ছোট ছোট মাটির ঘর, উপরে কুশের চাল। কাছাকাছি এলে লক্ষ্য করলাম ঘরের সামনের ছোট্ট আঙিনাগুলি শালের লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়ে মজবুত করে ঘেরা। আমাদের গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে সেই সব ঘর থেকে দু'-চার জন মেয়ে-পুরুষ ছুটে বেরিয়ে এল, চিনতে আমার দেরী হ'ল না—এরা সাঁওতাল।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেছি, এমন সময় মনু কাছে এসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "ঐ দেখুন বাবু আপনার ঘর।"

সে দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ বড় একখানা মাটির কোঠাঘর, উপরে খাপরার চালু। আর একটু পরে সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরখানা একেবারে নতুন, ঝকঝকে তকতকে। ঘরের ভিতরে দুটো কামরা, সামনে বারান্দা, তাও আবার ঘরের মতই দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিলে মনে হয় যেন ছোটখাট একটা দুর্গ, জানালার বালাই নেই কোন দিকে। অত্যধিক শীত ও অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্যে এ দেশে এই ভাবেই ঘর তৈরির রীতি। ঘরখানা যেমন সুন্দর, ঘরের চারিদিকটাও তেমনি সুন্দর, পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটা টিলার উপর তৈরি করা হয়েছে। সামনে মস্ত একটা মহুয়া গাছ আঙিনায় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

জিনিসপত্র নামান চলছে, হৈ-চৈ-এর অন্ত নাই, তারই এক ফাঁকে মনুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ ঘর কার? আমার জন্য নিশ্চয় তোমরা তৈরি কর নি। এ জঙ্গলে এত ভাল ঘর হবে এ আমি আশাই করতে পারি নি।" মনু বললে, "বাবু, ঘরখানা হঠাৎ পেয়ে গেছি, এ ঘর না পেলে আপনাকে গাঁয়ের মধ্যে থাকতে হ'ত। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গাঁয়ের এক অবস্থাপন্ন গোয়ালমহতো তার গাঁয়ের বাড়ীতে জায়গা কম বলে এই ঘর তৈরি করেছিল। ঘর তৈরি হবার পর দিন-ক্ষণ দেখে গৃহ-প্রবেশের আয়োজন চলছে এমন সময় একদিন এক শকুন এসে বসল এর চালে। তার পরে আর ত এ বাড়ী ব্যবহার করা চলে না। বাঙালীর ভয়-ডর কম, তারা এ সব মানে না বলে আপনার জন্যে এই ঘর ভাড়া করা হ'ল।" "বেশ হয়েছে" বলে তার পিঠ ঠুকে বিদেয় করলাম।

একটি লোকের সংসার, সামান্যই জিনিসপত্র, গুছিয়ে ফেলতে বেশী সময় লাগল না। পশ্চিমের পাহাড়টার আড়ালে সূর্য্য ঢলে পড়ল। হঠাৎ বনভূমিকে আবৃত করে একটা ছায়া নেমে এল, মনে হ'ল যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, অথচ সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ খানিকটা দেরি। বুঝলাম পাহাড়ের কোলে এমনি হয়ে থাকে। ঘরের সামনে খাটিয়াতে বসে গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে শিথিল দেহটাকে সুস্থ করছি, এমন সময় গুটি তিনেক সাঁওতাল মেয়ে মাথায় মাটির কলসী নিয়ে মহুয়াতলায় এসে দাঁড়াল, আমাকে পরম কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল—তাদের সে দৃষ্টির মধ্যে কোন সঙ্কোচ নেই। আমি কিন্তু বেশ খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। ঘরের ভিতরে পালিয়ে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় তারাই চলে গেল, ঢালু পথ বেয়ে হুড়িঘড়ি পাহাড়তলির দিকে নেমে গেল। একটু পরে তারা আবার জল-ভরা কলসী মাথায় নিয়ে ফিরে এল, এবার আর দাঁড়াল না, রোগা এই বাবুটির কোথাও অসাধারণ কোন লক্ষণ না দেখে হতাশ হয়ে চলে গেল।

পাহাড়তলির যে ঝরণা থেকে সাঁওতালদের জল আসে, আমাদের জলও সেই ঝরণা থেকে বালতি-ভর্ত্তি হয়ে এল। মনুকে ডেকে বললাম, "ঝরণার জলে চা কর মনু, সে চা খেয়ে আমি নিশ্চয় কবি হয়ে উঠব।" মনু অবিলম্বে চা করে নিয়ে এল, পরম উৎসাহের সঙ্গে তাতে চুমুক দিলাম কিন্তু বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করলাম না।

আমাদের গাড়ী দুখানা ভাড়া বুঝে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলে গেল। এ জঙ্গলে বাইরে বলদ রাখা নিরাপদ নয় বলে তারা আজ রাত ওখানে কাটিয়ে কাল সকালে ষ্টেশনে ফিরে যাবে। আর দুটি লোক যারা আমাদের সঙ্গে ছিল তারা এখানেই থাকবে। মনু বড় বড় খানকয়েক পাথর কুড়িয়ে এনে বারান্দায় উনুন তৈরি করে ফেলল, লোক দুটি ইতিমধ্যে কিছু শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, অবিলম্বে আমাদের রান্না চেপে গেল। দেখলাম এ বিষয়ে মনু সিং করিতকর্ম্মা লোক, অভিযোগ নেই, অসন্তোষ নেই, ঝুড়িতে যা আছে আলু'টা বেগুনটা, তাই নিয়ে কাজে লেগে গেল।

সন্ধ্যা ক্রমে নেমে আসছে আর আমি থেকে থেকে হাঁক দিচ্ছি "মনুসিং পুলোভারটা নিয়ে এসো', মনুসিং মাফলারটা নিয়ে এস, মনু সিং ওভারকোটটা দাও।" এত চাপাচুপি দিয়েও শীতে আমি অস্বস্তি বোধ করছি, অথচ আমার সামনে দুটি লোক কাপড়ের প্রান্ত গায় জড়িয়ে বসে দিব্যি গল্প করছে। এর পরে যে দীর্ঘ রাত পড়ে আছে সে ভাবনাও এদের নেই। বুঝলাম বাঘকে যেমন এরা ডরায় না, তেমনি শীতকেও ডরায় না—এরা বীর।

পাহাড়টা ক্রমে ঝাপসা হয়ে এল, বনের মধ্যেও ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল। দু'-একজন সাঁওতাল যারা ঘোরাফেরা করছিল তাদের আর দেখতে পেলাম না। একটা বিপুল নিস্তব্ধতা যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে নেমে আসছে—পথ নেই, পথিক নেই, শঙ্খ-ঘণ্টার আওয়াজ নেই, কোলাহল নেই, চারিদিকে সারি সারি অসংখ্য গাছ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনটা দমে গেল, এ কোথায় এলাম—কেমন দেশে এলাম! যে অরণ্যের আকর্ষণে আমি এখানে এসেছি সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই অরণ্যের রূপ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

দূরে একটা বনমোরগ ডেকে উঠল, এদিকে ওদিকে আরও দু'-একটা ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে মন কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল—এ অরণ্যেও এমন সময় তাহলে একজন আর একজনকে ডাকে, নাইবা হ'ল মানুষ তারা। হয়ত একটা মোরগ আর একটাকে ডেকে বলছে, "চল গো ঝরণাতে যাই জল খেতে" জবাব আসছে "চল গো চল।" এই সব ভাবছি এমন সময় আর একটা কি ডেকে উঠল—"কাঁই, কাঁই—কাঁই কাঁই।" এ হেন অদ্ভুত ডাক পশুর কি পাখীর তা বুঝতে পারলাম না, ওদের জিজ্ঞাসা করলাম! ওরা বললে, "বাবু, মেঁজুর ডাকছে।" এই ময়ূরের ডাক, এই কেকা? কিন্তু মাধুর্য্য ত কিছু টের পেলাম না, বরং যথেষ্ট কর্কশ বলেই মনে হ'ল। ভাবলাম শীতে ময়ূর এই রকমই ডাকে, আষাঢ়ের মেঘ দেখলে এদের গলার স্বর বদলে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনু বললে, "বাবু এইবার ভিতরে চলুন।" এতক্ষণে খেয়াল হ'ল সন্ধ্যা ঘোরালো হয়ে এসেছে, বনের অন্ধকারের দিকে একবার সভয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লাম।

আলো জ্বালতে গিয়ে মনু আবিষ্কার করল লণ্ঠনে তেল নেই, সঙ্গেও তেল আনা হয় নি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও এমন ভুল হয়ে গেছে। ভারী ভাবনায় পড়লাম, এই বনের মধ্যে বিনা আলোয় থাকব কেমন করে। উনুনের আগুনে বারান্দায় কিছু আলো হয়েছে, কিন্তু ঘরের ভিতর কি জমাট অন্ধকার, ঢুকতে ভয় হয়। কি ক'রি ভাবছি এমন সময় মনু বললে, "বাবু, কাল লোক পাঠিয়ে ষ্টেশন থেকে তেল আনিয়ে নেব, এখন খাবার তৈরি হয়ে গেছে, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।" কথাটা মন্দ নয়, শুয়ে চোখ বুজলে আজকের মত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

খেয়ে নিয়ে বারান্দাতেই খাটিয়া পেড়ে শুয়ে পড়লাম। মনু আর লোক দুটো খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার ব্যবস্থা করতে লাগল, তখন দেখলাম শীত সম্বন্ধে ওরা তেমন উদাসীন নয়, পেতে শোবার জন্যে আমার গাড়ী থেকে খড়গুলো নামিয়ে রেখে দিয়েছে।

চোখ বুজে শুয়ে আছি কিন্তু ঘুম আসছে না। উনুনের আগুন অনেকক্ষণ নিভে গেছে, ওপাশে নিদ্রিত লোকগুলির নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আমি একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ করছি। এই নতুন আবেষ্টন বোধ হয় আমার মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে তুলেছে। কেবলই মনে হচ্ছে এই চারটে মাটির দেয়ালের ওদিকেই কি বিস্ময়কর অন্ধকারলোক বিরাজ করছে, কান পেতে আছি যদি কিছু শুনতে পাই। শুনতেও পাচ্ছি বিচিত্র সব শব্দ, ঝটপট করে কি যেন উড়ে গেল, অনেক দূরে কি যেন ডেকে উঠল, ঘরের ঠিক পিছনেই শুকনো পাতার উপর দিয়ে কারা যেন চলে গেল—কি ডাকল, কারা চলে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না, কেবল কল্পনা করে চলেছি।

(২)

ঘুম ভেঙে গেল, চোখ মেলে তাকিয়ে প্রথমটা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না আমি কোথায় আছি। চারপাশে মাটির দেওয়াল, উপরে কাঠের চাল, সবই যেন অদ্ভুত মনে হ'ল। একটু পরেই মনে পড়ে গেল সব, তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে। অরণ্যের আর এক নতুন রূপ দেখলাম, কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখেছিলাম রহস্যময় বিভীষিকাময় রূপ, এখন দেখলাম অকপট হাস্যময় রূপ। কানে এল পরিচিত পাখীর ডাক, এক মুহূর্ত্তে মন হাল্কা হয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে মনুসিং বললে, 'বাবু দুধ আনতে একবার গাঁয়ে যেতে হবে।' বললাম 'খাটিয়াটা বাইরে এনে দিয়ে তুমি চলে যাও।' মনুসিং খাটিয়া এনে দিল, আমি চা নিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোক দুটা সামনে এসে দাঁড়াল, তারা ষ্টেশনে চলে যাবে। পয়সাকড়ি মিটিয়ে তাদের বিদেয় করে দিলাম, তারা সেলাম করে বনের পথ ধরে চলে গেল। হঠাৎ মনটা আবার ভারি হয়ে উঠল, লোকদুটা চলে যাওয়াতে খুব যেন একলা বোধ হতে লাগল, একটা গোটাদিন গোটারাত এরা সঙ্গে ছিল, এদের এক দিনের সাহচর্য্যও ভাল লেগেছিল। এখন একেবারে একলা থাকতে হবে ভাবতে খুব ভাল লাগছিল না। মনুসিং ঘটি নিয়ে দুধ আনতে গাঁয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললাম, 'এমন একা আমি থাকতে পারব না মনুসিং, তুমি গ্রামের একটা লোক বন্দোবস্ত কর, দিন রাত সে এখানে থাকবে। জোয়ান ছোকরা যেন হয়, হামেশা ষ্টেশনে যেতে আসতে হবে, জঙ্গলে আমার সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে হবে।' মনু মাথা নেড়ে গাঁয়ে চলে গেল।

বসে বসে বনের রূপ দেখছি, দুটি-একটি করে কয়েকজন সাওতাল স্ত্রী-পুরুষ এসে মহুয়াতলায় জমা হ'ল। সাহিত্যের পাতায় এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিন্তু বনের আবেষ্টনে জীবন্ত সাওতাল আমি এই প্রথম দেখলাম। কালো রং, সুস্থ-সবল দেহ, পুরুষের পোষাক একটুকরো লেংটি, মেয়েদের অঙ্গে মোটা তাঁতের শাড়ী, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দুদিকেই খাটো, শিশুরা দিগম্বর। এই ত এদের বাহ্যিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক পরিচয় পেলাম এদের ব্যবহারে, এরা এসে কেউ আমাকে সেলাম করল না। সেলাম বা নমস্কার না করাটা আপাতদৃষ্টিতে অসভ্যতা বলে মনে হবে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে আমি দেখেছি যে, এরা অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল প্রকৃতির, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে বন্ধু যে কারণে আনুষ্ঠানিক নমস্কার ইত্যাদি করে না ঠিক সেই কারণেই এরাও তা করে না। চেনা এবং অচেনা সকলকেই এরা বন্ধুভাবে গ্রহণ করে, এদের সম্বোধনে 'তুমি' 'আপনি' নাই, আছে কেবলমাত্র 'তুই'।

মজাটা হচ্ছিল বেশ, আমি এদের সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা করছিলাম তা নিজের মনেই, ওরাও আমার সম্বন্ধে যা আলোচনা

করছিল তা নিজেদের মধ্যেই, আমার সঙ্গে ওদের কোন বাক্যালাপ হচ্ছিল না। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটাল মনু এসে পড়ে। গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে ফিরে এসে মনু বললে, "এখানে থাকবার জন্ত একটা লোক ঠিক করেছি বাবু। বললাম, "বেশ করেছ।"

বেলা বেড়ে গেছে অনেকখানি, আমি ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা লোক এসে আমাকে সেলাম করে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলাম—লম্বা রোগা আধাবয়েসী একটা লোক, গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়ানো, হাতে রয়েছে মোটা লাঠি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাও তুমি?" লাঠিটা বুকের কাছে এনে হাত দুটি তার উপরে রেখে সে বললে, "আপনার কাজ করতে এসেছি বাবু, মনু সিং আমাকে খবর দিয়েছে।" রাগ হ'ল মনু সিংয়ের উপর, বলে দিলাম একটা জোয়ান ছোকরা ঠিক করতে, তা নয়, নিয়ে এল এই আধবুড়ো রোগা লোক। প্রশ্ন করলাম, "কি কাজ করতে হবে মনু তা তোমাকে বলেছে?" দরকার পড়লে ষ্টেশনে যেতে-আসতে হবে—পারবে তুমি?" সে বললে, "পারব।" বললাম, "পারবে না তুমি, আমি জোয়ান লোক খুঁজছিলাম।" সে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এমন সময় মনু বাইরে এসে লোকটিকে দেখে বলে উঠল, "এই যে এসেছে নানকু মহতো।" আমি মনুকে ডেকে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, "একটা বুড়ো মানুষ নিয়ে এলে, বসে থাকা ছাড়া এর দ্বারা অন্ত কোন কাজই হবে না।" মনু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "কেন হবে না বাবু, নানকু মহতো সব কাজ পারবে।" মাথা নেড়ে আমি বললাম, "পারবে না।" নানকু মহতো এইবার কথা কইল, বলল, "বাবু জোয়ান লোক খুঁজছেন মনু সিং।" মনু হেসে বললে, "বাবু, আপনি বুঝতে পারেন নি, নানকু একটা জোয়ানকে মাথার উপর তুলে আছাড় মারতে পারে। দেখতে ঐ রকম বটে কিন্তু গায়ে যেমন জোর বুকে তেমন সাহস, এ রকম লোক গাঁয়ে দুটি নেই।" এগিয়ে গিয়ে মনু নানকুর গা থেকে চাদরখানা খুলে নিয়ে আমাকে বললে, "আসুন বাবু, দেখুন।" কি ব্যাপার দেখতে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম লোকটার বাঁ কাঁধ এক সময়ে এমন ভয়ানক ভাবে জখম হয়েছিল যে, তার স্থানে স্থানে মাংস নেই, ঘা সেরে গিয়েও কাঁধটা বীভৎস হয়ে আছে। মনু বললে "বাবু, নানকু মহতো যখন কাঁচি জোয়ান তখন একদিন জঙ্গলে তার এই কাঁধটায় বাঘে কামড়ে ধরেছিল। সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে গেল। নানকুর গায়ে তখন অসীম শক্তি, বাঘটাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা খাদের পাশে এনে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। তার পরে গাঁয়ের বীর পুরুষেরা যখন লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসছিল তখন মাঝপথে নানকুর সঙ্গে তাদের দেখা।" নানকুকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম কথাটা সত্যি কিনা তখন সে ছোট একটা 'হুঁ' বলে হাসতে লাগল। নানকুকে কাজে বহাল করলাম।

দু চার দিন থেকে না থেকে বুঝতে পারলাম—সাহস ও শক্তি ছাড়াও নানকুর অনেক গুণ আছে—পাহাড় ও অরণ্যের সঙ্গে তার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ, নিম্নতম শ্রেণী থেকে সুরু করে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত বনতীয় বন্যপশুর স্বভাব-চরিত্র ও চাল-চলন তার খুবই জানা। প্রথম যে দিন নানকুর সঙ্গে বনে বেড়াতে গেলাম সেদিন ভারী মজা হল, সে মজা অবশ্য আমি উপভোগ করিনি, করল নানকু। সকাল বেলা চা ইত্যাদি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পাহাড়টা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, তারই কোল দিয়ে পথের একটা ক্ষীণ রেখা পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে, সেই পথে কখনও কদাচিৎ দরকার পড়লে দিনে মানুষ চলে, রাত্রে সর্ব্বদা জানোয়ার চলে। সেই পথ ধরে আমরা পশ্চিম দিকে চললাম। বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়, ডান দিকে অপেক্ষাকৃত সমতল বনভূমি। এই আমার প্রথম পায়ে হেঁটে গভীর বনে চলা। পাহাড়ের গায় হাতীর পিঠের মত বড় বড় ধূসর পাথর পিঠ বার করে আছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নানান রকমের ছোট-বড় গাছ গজিয়েছে। ডান-দিকের বনে বেশীর ভাগই শাল গাছ, দৃঢ় ঋজু দেহ নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। এক-এক জায়গায় আবার কেবল মহুয়া গাছ, শীতের সময় বলে ডালপালা প্রায় পাতাশূন্য। মাঝে মাঝে এক-একটা নালা পাহাড় থেকে নেমে ঢালু বনভূমির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বর্ষার সময় পাহাড়ের জল এই নালা-পথে সমতল ভূমির দিকে নেমে যায় অন্ত সময় শুকনোই পড়ে থাকে। উপরের দিকে নালাগুলো খুবই সরু, দু'দিকের গাছের ডাল মেশামেশি হয়ে পাতার চাঁদোয়া তৈরি করেছে। আমরা এই রকম একটা নালা পার হয়ে চলে গেলাম। একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা অর্জ্জুন গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নানকু আমাকে তার কাছে নিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে উপরের এক ডাল দেখিয়ে দিয়ে বললে "বাবু দেখুন।" হ্যাঁ, দেখলাম, অবাক হয়েই দেখলাম প্রকাণ্ড নীলাভ পুচ্ছ ঝুলিয়ে বসে আছে এক ময়ূর। দূর থেকে এর বর্ণ-মাধুর্য্য তেমন বুঝতে পারলাম না, মুগ্ধ হলাম ওর বসবার মনোহর ভঙ্গিমা দেখে। আর এক ডালে একটি ময়ূরী বসে—দেখলাম, সে আকারে অনেক ছোট, আর তার কলাপ নেই বলে দেখতেও সুন্দর নয়।

আমরা এইবার পাহাড়ের কোল থেকে ডান পাশে সরে এসেছি। পথ আছে কি নাই আমার চোখ ধরতে পারছে না, নানকুকে অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি। কি গভীর অরণ্য! কি যেন একটা অনুভূতি—হয় ত ভয়, হয় ত বিস্ময় মনকে অভিভূত করে ফেলছে। একদা আমার পূর্ব্ব পুরুষ অরণ্যবাসী ছিল, সেই আদিম স্মৃতি হয়ত আমার মনে জেগে উঠেছে।

অরণ্যপথ ধরে এতদূর চলে এলাম অথচ একটা জানোয়ার চোখে পড়ল না। খানিকটা নিরাশ হয়ে নানকুকে প্রশ্ন করলাম, "এ বনে জানোয়ার ত কিছু দেখছি না নানকু।" নানকু হেসে জবাব দিল, "জঙ্গলে ওদের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ত ভাল।" উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে চুপ করলাম।

সামনে আর একটা নালা, এটা একটু চওড়া। আমরা এসে সেই নালায় নামলাম। উপরের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে বালুর উপর আলোছায়ায় বিচিত্র নক্সার সৃষ্টি করেছে। নালায় নেমে দু'পা এগোতেই নানকু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নীচের দিকে। নানকুর পাশে এসে দাঁড়ালাম, প্রশ্ন করলাম "কি ব্যাপার, দাঁড়ালে কেন?" কোন কথা না করে সে আঙুল দিয়ে আমাকে পায়ের নীচের বালু দেখিয়ে দিলে। দেখলাম কতকগুলো পায়ের দাগ, আমাদের আগে কে যেন নালা ধরে চলা-ফেরা করেছে। নানকু নড়ে না, তার ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "ও আর কি দেখছ—চল এগিয়ে যাই।"

নানকু আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাত ধরে সেইখানে বসিয়ে দিল তার পরে নিজেও ঝুপ করে বসে পড়ে চাপা গলায় বলল, "দাগগুলো ভাল করে দেখুন।" ভাল করে দেখলাম, মানুষের ছাপ এ নয়, বেশ অদ্ভুত ধরণের ছাপ। জিজ্ঞেস করলাম "কার পায়ের ছাপ!" নানকু তেমনি চাপা গলায় বললে, "বাঘের পাঞ্জা বাবু, এই দেখুন নখের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।" শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেবল গাছ আর গাছ, আবছায়া অন্ধকারে বন্যজন্তুর লীলাভূমি গভীর অরণ্যলোক বিরাজ করছে, মানুষ এখানে একেবারে আশ্রয়হীন। আমার চেতন-সত্তার অজ্ঞাতে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল, আমি নালা ধরে ছুটলাম, বললাম "নানকু পালিয়ে এস পালিয়ে এস।" কিছুদূর ছুটে গেছি এমন সময় নানকু লাফিয়ে এসে আমাকে ধরে ফেলল, বলল "ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন বাবু?" বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, বললাম, "আ করছ কি তুমি, বোকার মত এখানে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকব না।" নানকু আমাকে ধরে রেখেই বলল, "বাবু, আর একবার বাঘের পাঞ্জা দেখুন তা হলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি আপনাকে আটকেছি।" বললাম, "দেখেছি ত, আর দেখব কি?" নানকু বলল, "পাঞ্জা দেখে বুঝতে পারছেন না, যে দিকে বাঘ গেছে আপনিও সেদিকে ছুটছেন। তাই ত! এই দিকেই ত বাঘ গেছে, কি মারাত্মক ভুল করে বসেছি, আমার মাথা যেন গোলমাল হয়ে গেছে। আমি নানকুকে টেনে নিয়ে আবার উল্টোমুখে ছুটলাম। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বোমা ফাটার মত নানকু হো হো করে হেসে উঠল, আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

নানকু এইবার হাত জোড় করে বলল, "বাবু, রাগ করবেন না, আপনি বিনা কারণে ছুটোছুটি করছেন।" প্রশ্ন করলাম, "কেন?" সে বললে, বাঘ আমাদের দু-এক মাইলের মধ্যেও নাই। কাল রাত্রে সে পাহাড় থেকে এই পথে শিকার ধরতে বা জল খেতে নেমেছিল, ভোর বেলায় অন্যপথে আবার তার আস্তানায় ফিরে গেছে। বিশেষ দরকার না হলে আস্তানা ছেড়ে বাঘ দিনের বেলায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না।"

এতক্ষণে আমার ভয় লজ্জায় পরিণত হয়েছে। নানকু সেটা লক্ষ্য করে বললে "বাবু, আপনি যা করেছেন তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, যদি বাঘের স্বভাব না জানতাম তা হলে আমিও ঐ রকম ছুটোছুটি করতাম, হয়ত এর চেয়ে আরও মজার কাণ্ড করতাম, হুড়মুড় করে গাছে উঠে সারাদিন বসে থাকতাম।" আমার লজ্জা এবার গর্ব্বে পরিণত হ'ল।

গভীর অরণ্য এমনই রহস্যময় স্থান যে, নতুন কেউ সেখানে প্রবেশ করলে সে তার মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। অরণ্যের আবেষ্টনে কিছুদিন থাকলে, অরণ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলে মন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আমিও অরণ্যের কোলে ধীরে ধীরে মানুষ হতে লাগলাম।

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ

(বাচনশক্তির বিকাশ ও ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি)

শ্রীচারুশীলা বোলার

মাঘ (১৩৬৪) মাসের প্রবাসীতে আলোচনা করেছি খেলার ভিতর দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কি ভাবে সাধিত হয়। একদিকে যেমন তার দক্ষতালাভের সমস্যা, অন্যদিকে বাচনশক্তি বিকাশের ও ভাষা-বৃদ্ধির সমস্যাও শিশুর মন, বুদ্ধি, অভ্যন্তর-ঘটিত স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির একটি বিধিদত্ত প্রকরণ। শৈশব অবস্থা থেকেই বাচন-শক্তি বিকাশের পদ্ধতি ও উপায় নিরূপণ করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য—কি পিতামাতার কি শিক্ষক-শিক্ষিকার। বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু করার জন্যে প্রত্যেক শিশুর প্রস্তুতির প্রয়োজন।

বস্তুমাত্রেই তার অব্যবহিত (Immediate) পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জীব সেই যোগস্থাপন করে গতিভঙ্গীর বিন্যাসে, কিন্তু মানুষের চাহিদা পরিপূরণের পক্ষে একমাত্র গতিভঙ্গীর সাহায্যই যথেষ্ট নয়—ভাষারও প্রয়োজন। এই জন্যে মানুষকে কেউ কেউ "Talking animal" (সংলাপী জীব) বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্য জীবের তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠতা এইখানে; অর্থাৎ সে সুসজ্জিত অর্থগর্ভ শব্দপুঞ্জের দ্বারা নিজের মনের ভাবকে অন্যের পক্ষে গ্রহণীয় করে রূপ দিতে পারে। অন্য কোনো জ্ঞাত জীবের এই গুণ নাই। এই অনন্যসাধারণ গুণই মানুষের চরমতম উন্নতি ও শক্তিপথের প্রধান বাহন। সুতরাং শিশু-জীবনের প্রত্যুষের প্রথম কাকলী থেকেই এই অত্যাশ্চর্য বাহনটিকে শক্তিশালী করে তোলার দিকে আমরা যেন বিশেষ ভাবে মনঃ-সংযোগ করি। ভাষা হচ্ছে কণ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত vocalisation ভাব-বিনিময়ের আবশ্যক অর্থপূর্ণ সজ্জিত শব্দপুঞ্জ, তবে জন্মের পরই শিশুর কান্নাকে মানবীয় অর্থে হয়ত ভাষা বলা চলে না। যেমন ব্যাঙের ডাক বা পাখীর গান বা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজকেও মানবীয় অর্থে ভাষা বলা যেতে পারে না।

অর্থপূর্ণ শব্দে নিজের মনের ইচ্ছাকে অন্যের বোধগম্য করবার ভাষা ব্যবহার করার পূর্ব্বে প্রায় সকল শিশুই নানা রকম অঙ্গভঙ্গীর কান্নাগুলি দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে যাকে ইংরেজিতে বলে 'Gesture language (ঠাটের ভঙ্গীর ভাষা)। শিশু হাত বাড়ায় কোলে যাবার জন্যে; শিশুর অপরিচিত বা গরপছন্দের লোক কোলে নিতে গেলে সে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়—আপত্তি জানায়। জোর করে নিতে গেলে প্রবলতর আপত্তি জানায়—কেঁদে। পেটে ব্যথা করলে, খিদে পেলে, পিঁপড়ে কামড়ালে বিভিন্ন সুরে কেঁদে ওঠে। মা এবং অভিজ্ঞ লোক ছাড়া তাদের এই সাঙ্কেতিক ভাষা সহজে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেকে প্রকাশ করবার চাহিদা বাড়তে থাকে। তখন কেবল মাত্র এই সাঙ্কেতিক (Gesture) ভাষায় তার চাহিদা পূরণ হয় না। তখনই কথা বলে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়। সামাজিক জীবনে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এই ভাষার দৌত্যে।

ছোট্ট খুকু চোখ-কান ফোটা মাত্র বয়স্কদের মুখের নানা রকম কথা শোনে এবং তাদের অঙ্গভঙ্গী দেখে কিছুই বোঝে না। তবুও শোনে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। মায়ের গলার স্বরের সঙ্গে মায়ের আরামদায়ক কোল এবং ক্ষুৎপিপাসায় অমৃত, স্তন্যের যোগাযোগ সাধন হয় এবং মায়ের ডাকে প্রথম সে সাড়া দেয়। পরে অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি ও পারিপার্শ্বিক নানা রকমের শব্দের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। মা নিজের কথাগুলিকে ভেঙেচুরে সহজ করে মিষ্টি সুরে নানা ভঙ্গীতে খুকুর সঙ্গে কথা বলেন; পাঁচ-ছ' মাসেই খুকু গা গা-, না-না, দা-দা, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে। শৈশব কাকলী (Infantile babbling) সব দেশের সকল শিশুরই একরকম—ভারতীয়, ইউরোপীয়, চীনা, কাফ্রি, এস্কিমোতে কোন তফাৎ নেই। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এমন কি বধির শিশু, শব্দ যে শুনতে পায় না, স্বর অনুকরণও করতে পারে না তারও মুখের শব্দ ঐ একই রকম।

পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রথমেই যে প্রাণসত্তার ঘোষণা করে—উঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া—সেটা স্বরবর্ণ। পরেও কিছুকাল স্বরবর্ণেই তার বাকশক্তি নির্দিষ্ট থাকে। সে বলে আই-আই-আই-আই। (যেন বলে আমি-আমি-আমি—আমাকে অবহেলা কর না, আমার দিকে নজর দাও।) পরে 'স্বর' এবং ব্যঞ্জনের সংযোগে উম-উম-উম। আরও পরে মম-মম-মম। এর থেকেই শিশু প্রথম মা শব্দ বলতে শেখে। পরে বা-পা-দা-তা বলে। শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব, ত্বক) এবং মন, বুদ্ধি ও অহংএর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর জ্ঞান আহরণ করে। সুতরাং শব্দপ্রাণ-ভাষা শিক্ষার জন্যে অন্য ব্যক্তির কথা শিশুর কানে পৌঁছতে হবে। যে শিশু শুনতে পায় সে যত বেশী রকমের শব্দ মুখ দিয়ে বার করতে পারে বধির শিশু তত বেশী পারে না। চার, পাঁচ, ছয় মাস বয়স থেকেই মুখের নানা রকম শব্দে খুকু কলকল করতে সুরু করেছে—যাকে বলে "শুধু অকারণ পুলকে"। তার মধ্যেও অবশ্য তার নিজের স্ফুরণের আনন্দ প্রকাশের চাহিদা থাকে। নানা রকমের শব্দের সাহায্যেই সে তার চাহিদা মেটায়। চাহিদা অনুযায়ী সে

নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। বিশেষ কোনও আওয়াজে খুশী হলে বার বারই সেই আওয়াজ মুখ দিয়ে বার করতে থাকে।

সুস্থ শিশুর অর্থপূর্ণ কথা-বলা-চেষ্টার প্রথম পরীক্ষা-মূলক-কাজ চতুর্দিকের সব কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেয়। প্রথম অবস্থায় তার অভাব পূরণ করার জন্তে সে কথা বলতে শেখে এবং তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে তার চেষ্টার আপেক্ষিক কৃতকার্য্যতার উপর।

হাঁটতে, দৌড়তে বা ছুড়তে শেখার মতই কথা বলতে শেখাও মাংসপেশীপুঞ্জের একটা জটিল প্রতিক্রিয়া (a complex muscular re-action)। সর্ব্বদাই শিশুর মনে বিস্ময় ও প্রশ্ন জাগছে—'কি' 'কেমন'। এই বিস্ময়ই হচ্ছে জানবার ইচ্ছার উদ্দীপক (Stimulus) এবং ইচ্ছাই প্রশ্নের জননী।

জন্মের পর প্রথম কয়েক বৎসর শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ (Individual variation) খুব বেশী দেখা যায়। সেই জন্তে ভাষা সম্পর্কে আদৌ কোনও নির্দ্দিষ্ট মান (Norm) ঠিক করা যায় নি। ক্রমবৃদ্ধিকালের প্রথম দিকে বিশেষ করে ১৮ মাস-২ বৎসরে, ও ২-৩ বৎসরে বাচন-শক্তির বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে হয়। স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধির ধারণা-শক্তির উপরেই শিশুর বাচন শক্তির বিকাশ কেবল নির্ভর করে না, উত্তেজনা পরিবেশন-যোগ্য পরিবেশের উপরেও করে। কি ধরণের বা কি উপায়ে সে কথা বলতে শিখছে, তার পরিবেশ তাকে কি ভাবে উৎসাহিত করছে বা পরিবেশে তার কি ভাবে উদ্দীপনা জাগছে তা লক্ষ্য করতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়া বাচনশক্তির বিকাশ বা ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি কখনই হতে পারে না। যে শিশু অনাথ আশ্রমে অথবা তার আশ্রয়ের বারংবার পরিবর্ত্তনে অবহেলিত অবস্থায় লালিত পালিত, সে বাচন-বিকাশের দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে কারণ তার পরিবেশে উদ্দীপনা কম সুতরাং অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক পরিবেশে লালিত পালিত শিশু বয়স্ক ব্যক্তিকে অনুকরণ করতে আনন্দ পায়, বিভিন্ন জিনিসের নাম শেখে ; প্রশ্ন করে—সব কিছু জানতে চায়। আবার শিক্ষিত পরিবারের শিশু দরিদ্র অশিক্ষিত গৃহের বা অবহেলিত শিশু অপেক্ষা বাচন-শক্তিতে অনেক বেশী অগ্রসর। কারণ শিক্ষিত পরিবেশে শিশুর জন্মগত গুণগুলি অধিকতর উত্তেজনার সাহায্য পায় অর্থাৎ সে অনেক বেশী এবং বিভিন্ন বস্তুর সংস্রবে আসে এবং বহুতর শব্দসম্ভার তার শ্রুতিগোচর হয়। সুতরাং তার চিন্তাশক্তি ও ভাষা-জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সে অনেক বেশী পায়। বস্তুপরিচয়ের সাহায্যের জন্তে কত ছবি, কত রকম খেলনা সে পায়, কত গান কত ছড়া সে শোনে! সে সব সুযোগ-সুবিধা অশিক্ষিত পরিবারের বা দরিদ্র পরিবারের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত শিশুদের ভাগ্যে জোটে না।

গেসেল দেখিয়েছেন এই রকম শিশুরা কত বেশীসংখ্যক শব্দ ব্যবহার করছে সেটার হিসাব না করে কত দীর্ঘ সুসংগত বাক্য তারা বলতে পারে এবং কথাবার্ত্তায় কতটা বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে, সেইটা বিচার করে দেখার তাৎপর্য্য আরও অনেক বেশী।

শিশু, স্বভাবের নিয়মে সকলের অজ্ঞাতসারে মনোযোগ দিয়ে নানা ব্যক্তির কথা শোনে ও পরে কথাগুলি বলতে চেষ্টা করে। এই শোনা এবং পরে প্রকাশ করার ভিতর সময়ের একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ববিদ (Ruth Griffith) শিশুর কথা শেখার উপর নানাভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন যে, শিশুর ক্রমবৃদ্ধিকালে সে যা শুনছে তার উপলব্ধি এবং কথায় নিজেকে প্রকাশ করতে তার যে ক্ষমতা এই দুটির ভিতর এই যে সময়ের ব্যবধান এটা পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকেও অনেক সময় বাচন-বিকাশে পিছিয়ে থাকতে দেখা যায়। সব কথা বোঝে অথচ বলতে পারে না। কথা বলতে দেরী হবার—শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক, সামাজিক প্রভৃতি বহু কারণ আছে। যেমন দুর্ব্বল, অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ শিশু কথা বলতে পারে দেরীতে। বিকৃত বুদ্ধি, জেদী, একরোখা শিশু কথা-বলতে-শেখায় পিছিয়ে থাকে। ভিক্ষুক, দরিদ্র বা মজুর শিশু শিক্ষিত বা ধনী শিশু অপেক্ষা বাচন-ক্ষমতায় অনেক বেশী অনগ্রসর। একটি অবহেলিত শিশু একটি সুপরিচালিত পরিবেশে লালিত-পালিত শিশু অপেক্ষা বাচনশক্তি বিকাশে অনেক পিছিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম ভাগে শিশু ভাষার দিকে অনেক এগিয়ে যায়। তার মুখের সেই অর্থপূর্ণ ও অনুকরণ-প্রবণ আওয়াজ অর্থ-পূর্ণ শব্দসম্ভারে পরিণত হতে থাকে। অন্ততঃ শিশুর সান্নিধ্যে যারা সর্ব্বদা আছে তারা সে ভাষা বোঝে। আশেপাশের সকল জিনিসের প্রতি সে তখন আকৃষ্ট হয়, ভাষায় তা প্রকাশ করবার জন্তে উত্তেজনা জাগে। যখন শিশু ঐ অবস্থায় পৌঁছায় অর্থাৎ শব্দার্থ বুঝতে পারে তখনই কথা-বলা-শেখানোর প্রভাব তার উপর কার্য্যকরী হয়। মা খুকুর সঙ্গে খেলতে খেলতেই ঘড়ি দেখিয়ে টিক-টিক শব্দটি উচ্চারণ করছেন এবং কানের কাছে ধরছেন। সে মায়ের উচ্চারণ এবং ঘড়ির শব্দ শুনছে আর টিক টিক শব্দটি ঘড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিচ্ছে। খুকু রোজই বাড়ীর মিনি বিড়ালের ডাক শোনে—"মিউ"। ঐ ডাকের আওয়াজ মিনির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মিনিকে দেখলেই খুকু তার সীমাবদ্ধ ভাষায় আঙুল দেখিয়ে বলে 'মিউ'। সাধারণত শিশু মায়ের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী কথা শেখে। অবশ্য ধনী পরিবারের শিশু 'আয়া'র পোষা, পরভৃতিকার দলে—মায়ের মার্জ্জিত ভাষা ও জ্ঞানের সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত—প্রবঞ্চিত। শিশুর প্রথম অনুভূত সমাজ-চেতনার বিকাশ পায় মায়ের সঙ্গলাভেই। নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে ভাষার প্রয়োজন। ছোট খুকু কথা বলতে পারে না কিন্তু পাশে আছেন মা, মাসি, দাদা, দিদি। তাঁরাই তাকে উৎসাহ দেন। শব্দের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ সাধনের ক্ষমতা তার জাগছে ধীরে ধীরে। বড়দের কথা সে ক্রমে বোঝে। মা, মাসিরা চোখ,

রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ চিভুষ্টোইকা মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়মের আর্ট গ্যালারিতে মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি পরিদর্শন করিতেছেন

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম হাউসের চেয়ারম্যান মিঃ লেবানভকে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ অভ্যর্থনা করিতেছেন
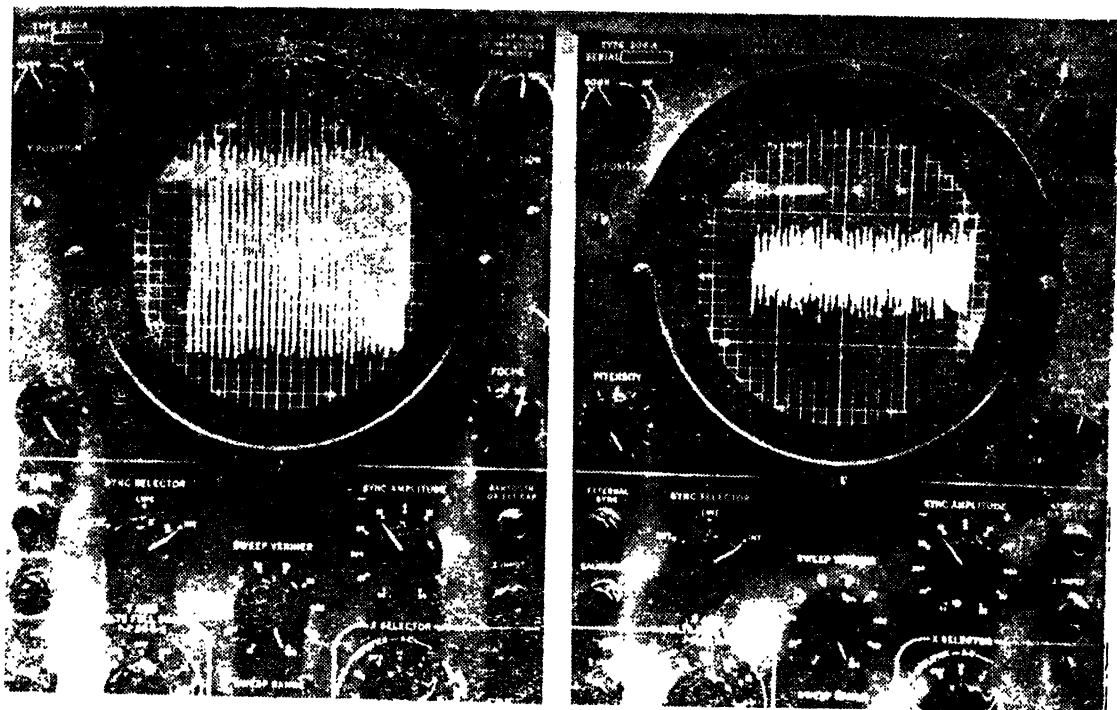
নিউইয়র্কের এক্‌সপ্লোরার হইতে প্রাপ্ত অসিলোগ্রাফ রেকর্ড
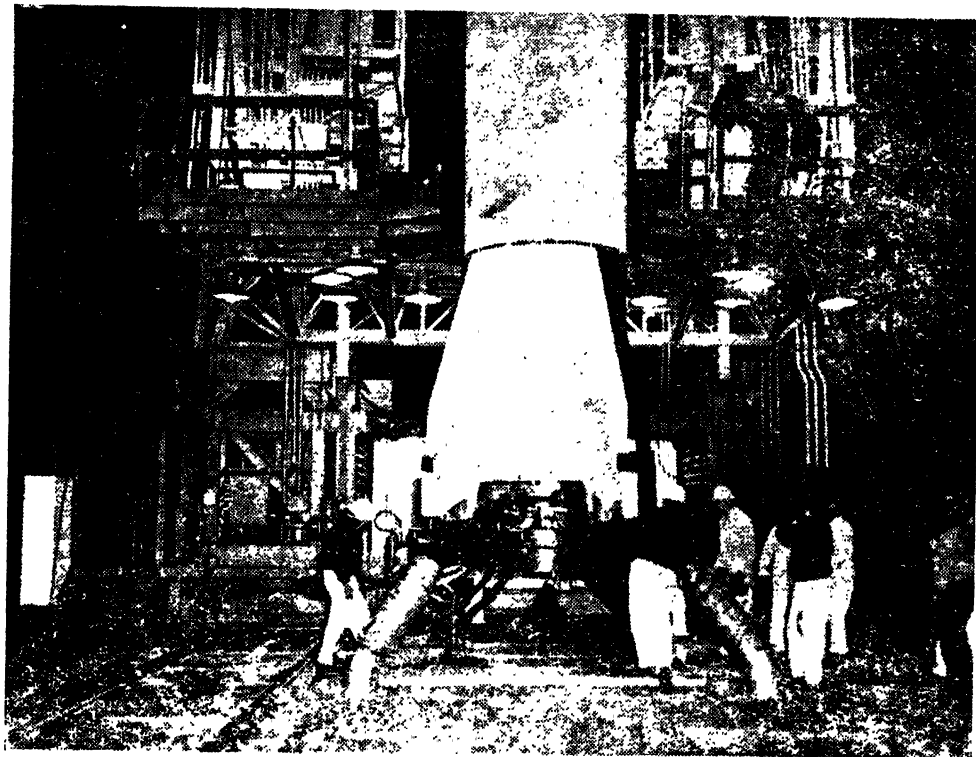
ক্যানাভারাল অন্তরীপে ফ্লোরিডাস্থ বিজ্ঞানীরা জুপিটার (সি) রকেট পরীক্ষা করিতেছেন

কান, চুল দেখাতে বললেই সে ঠিক ঠিক দেখিয়ে দেয়—কারণ যে-শব্দের সঙ্গে যে-জিনিসের যে-সম্পর্ক, সঙ্গে সঙ্গেই মা-মাসিরা খুকুকে তা দেখিয়েছেন।

এইভাবে ভিতরের তাগিদে এবং বাইরের নানা উত্তেজনা-ঘটিত আগ্রহের উদ্দীপনায় ক্রমে ক্রমে খুকু শোনা কথাগুলি মুখ দিয়ে বার করতে পারে এবং সেটাও নিজের বুদ্ধির প্রয়োজনে। একটি মাত্র শব্দ প্রয়োগ করে সে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে চায় যেমন—'দুধ' অর্থাৎ 'আমি এখন দুধ খাব।' কাঁদতে কাঁদতে দাদার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে 'দাদা' অর্থাৎ 'দাদা আমাকে মেরেছে।' যে শব্দটা সে উচ্চারণ করছে সেটা তার সমগ্র ইচ্ছা বা অনুভূতি থেকে আলাদা করা যায় না—সেটা দিয়েই সে তার মনের পুরো ভাবটাকে প্রকাশ করছে।

পারিপার্শ্বিক সব কিছু জানবার জন্যে খুকুর মনের প্রবল আগ্রহ জাগে। এখন সে জেনেছে প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নাম আছে—পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্কিত নাম, পোষা জীব-জানোয়ারের নাম, খেলনার নাম, খাবার জিনিসের নাম ইত্যাদি। এ ছাড়া সমাজে খাপ খাওয়ার প্রয়োজনে ও সামাজিকতা বৃদ্ধির প্রয়োজনেও সে কথাগুলি শেখে। তার আগ্রহ এগিয়ে চলেছে আরও জানতে—এটা কি? ওটা কি? এইভাবে সে অনবরত প্রশ্ন করে। এই কৌতূহল তাকে শব্দসংখ্যা (vocabulary) বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। একক শব্দে কথা সে এখন আর বলে না। দু-চারটে শব্দের সংযোগে একটা পুরো বাক্যে সে এখন বোঝাতে চেষ্টা করে। শব্দগুলো গুছিয়ে কিন্তু খুকু বলতে পারে না। সে বলে 'মা মিনি দুধ' অর্থাৎ 'মা মিনিকে দুধ খেতে দাও। পরিচিত জিনিস দেখলেই খুকু নাম বলতে পারে এমন কি তার ছবির বইয়ের পাতায় কোনটা কুকুর কোনটা ছাগল তাও বলতে পারে।

লুইস (Lewis), যিনি শিশুর উচ্চারণ সম্পর্কীয় (Phonetic sounds) শব্দগুলির প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা করেছেন তিনি বলেন: In Infant speech the three processes —Expression Imitation & Training combine to link a sound with a definite situation and when this stage is reached the child's advance is rapid." শিশুকে সরাসরি (direct) ভাবে শেখান বৃথা। আগেই বলেছি খুব বুদ্ধিমান শিশুও অনেক সময়ে কথা বলতে পারে দেরীতে, কিন্তু একবার বলতে আরম্ভ করলেই দু-একটা শব্দে মাত্র নয়, একেবারে পুরো বাক্যে কথা বলে। অনেক মাকে দেখা যায় সন্তানের কথা বলতে দেরী হচ্ছে দেখে বড় নিরাশ হয়ে পড়েন অথচ যতখানি সুযোগ শিশুকে দেওয়া প্রয়োজন তা দিতে পারেন না। ফলে সে পিছিয়ে থাকে শুধু কথা বলার দিক দিয়ে নয়—আত্মনির্ভরশীলতায়ও। এতে এই হয়, শিশুর সব কিছুই যাকে করে দিতে হয়—অথচ শিশু বলতে পারলে নিজেই করত। আত্মনির্ভরশীল হলে কথা বলার দিকে তার আরও আগ্রহ জন্মায়—আরও বেশী অগ্রসর হয়। এই কথাটা আমাদের দেশের মায়েদের বিশেষ করে জানা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বুদ্ধিমান শিশু এমন কি বড়দের মুখে শোনা কথাগুলিও পুনরাবৃত্তি করে এবং ঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। হাতের কৌশলের উন্নতির (Manipulative progress) চেয়ে বাচন-শক্তি বিকাশের পথে অনেক দ্রুত অগ্রসর হয়। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতে সে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনুভূতির অভিজ্ঞতার দ্বারা সমস্যা-গুলি সমাধা করতে চেষ্টা করে কারণ অনুভূতির দ্বারা ও অনুভূতির ভিতর দিয়েই (by & through the senses) সে চিন্তা করছে। ক্রমশঃ তার চিন্তাকে সে বড়দের মুখ থেকে শোনা কথাগুলো দিয়ে প্রকাশ করে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে শিশুর বাচন-শক্তির বিকাশ হতে থাকে।

দ্বিতীয় বৎসরের শেষ ভাগে শিশুর বাচন-শক্তির বিকাশে জটিলতা দেখা যায়। আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার চেয়ে অর্থবোধ-শক্তি অনেক বেশী থাকে। এই সময় কথা বলে নিজেকে প্রকাশ করতে তার অসীম চেষ্টা ও উৎসাহ। বেশীসংখ্যক একক শব্দে অস্পষ্ট বা অশুদ্ধ উচ্চারণে কল-কল করে তাকে কথা বলতে শোনা যায়। শিশুর কাছে সেগুলোর অর্থ আছে কিন্তু চারিপাশের অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না। বয়স্ক ব্যক্তির পর্য্যায়ে তার অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় না। শিশুর কাছে তার অর্থ যা তাই ই—সে জানে ঠিক কি জিনিস সে চায় এবং চেষ্টা করে ঠিক উচ্চারণ করে বোঝাতে। ক্রমে ক্রমে কতকগুলি ঠিক ঠিক স্পষ্ট শব্দ সে বলতে পারে যা অপর ব্যক্তিও বুঝতে পারে, এমন কি ছোট ছোট বাক্যেও বলতে চেষ্টা করে এবং আংশিক ভাবে তাতে কৃতকার্য্যও হয়—তাতে সে গর্ব্ব অনুভব করে।

দুই বৎসর বয়সে নিজেকে প্রকাশ করতে শিশুর একক শব্দে বাক্য ব্যবহার করাটা একটা বৈশিষ্ট্য। কখনও বা দুইটি শব্দ—একটি বিশেষ্য অন্যটি ক্রিয়াপদ। যেমন 'বাড়ী যাব', 'ভাত খাব', 'আমাকে দাও' ইত্যাদি। কথার ভিতর দিয়ে সে নিজের ইচ্ছা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রবল ভাবে প্রয়াস পায়। কোনও জিনিস সম্বন্ধে নিজের ধারণা (যেমন লুচির নেচিগুলোকে রসগোল্লা মনে করে হাব-ভাবেই তা বুঝিয়ে দেয়), প্রয়োজন বোধে কিছু চাওয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি বড়দের মধ্যে সে লক্ষ্য করে। বড়দের কথাবার্ত্তা সে যখন শোনে তখনও আমরা যদি শিশুর মুখভাব মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং অনুকরণ করার চেষ্টায় যে গভীর আকুতি (Intensity) অথবা সীমাবদ্ধ কথা ও ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে মনোভাব বোঝাবার যে চেষ্টা, যদি তা লক্ষ্য করি, তবে আমরা দেখতে পাই তার সেই কি প্রবল আবেগপূর্ণ আয়াস এই অস্ত্রটিকে আয়ত্তাধীন করবার জন্যে। প্রাণক্রিয়ায় জন্মী

হবার এই চেষ্টার আবেগে বেশীর ভাগ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু শব্দ-সংখ্যাতে খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা বস্তুর নাম শেখার প্রয়োজনেই। এটা কি, ওটা কি, অনবরত প্রশ্ন করতে থাকে। শুধু তাই নয় মুখ দিয়ে বলতে চেষ্টা করে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার বিষয়। আবার বহু শিশু আছে যারা ভীরু স্বভাবের (Timidity-র) জন্যে চুপচাপ থাকে। তাদের শব্দভাণ্ডার এমন যথেষ্ট নয় যে, সুবিধা মত কথা তৈরি করে নিতে পারে।

২-৩ বৎসর বয়সের শিশুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সময় কিম্বা গল্প বলার সময়েই আমরা বুঝতে পারি যে, বলার ক্ষমতার চেয়ে শিশুর বোঝার ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং ভাষা বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে শিশুর উদ্দীপনা জাগাতে হবে (১) খেলাধূলার ভিতর দিয়ে, (২) সঙ্গীসাথীর সঙ্গলাভের ভিতর দিয়ে এবং (৩) বড়দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগের ভিতর দিয়ে। স্বপ্না, ৩ বৎসরের তাকে প্রশ্ন করলেই সে আগে সেটা পুনরাবৃত্তি করে—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেয়। যেমন, স্বপ্না তুমি কি খেয়েছ? উত্তর কি খেয়েছি?—ভাত। অনর্গল কথা সে বলে না, সঙ্গীসাথীর সঙ্গে বড় একটা মেশে না। বড়দের উপর নির্ভরশীল, উচ্চারণ অস্পষ্ট, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যে কথা বলে। শিশু বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার পূর্ব্বের ইতিহাসে জানা গেছে বাপ-মা দুজনেই চাকুরে, দিনের বেশী সময়ই তারা বাইরে থাকেন। স্বপ্নার শৈশব-অবস্থা কেটেছে তার অন্ধ ঠাকুরমার আশ্রয়ে। অপর ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সে পায় নি।

শৈশবে ভাষার দিক দিয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য যে যে কারণে ঘটে তার মধ্যে শিশুর পরিবেশই প্রধান। শিক্ষিত ঘরের বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর সাধারণতঃ শব্দসংখ্যা অনেক বেশী—অ-শিক্ষিত গৃহ ও প্রতিবেশে বর্দ্ধিত শিশু অপেক্ষা, অথবা এমন শিশু যার পরিবেশে ছবির বই, খেলাধূলা, বড়দের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ কিছুই নাই।

বাচন-শক্তি বিকাশে পিছিয়ে থাকার অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে। যে শিশুর প্রক্ষোভ-ঘটিত ও সামাজিকতার বিকাশ সন্তোষজনক এবং অতি শৈশব অবস্থাতেই হয়েছে, তার বাচন-ক্ষমতা অবহেলিত শিশু অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। অনাথ আশ্রমে লালিত-পালিত শিশুরা সাধারণতঃ বাচন-বিকাশে পিছিয়ে থাকে। কারণ যে কোনও কারণেই হোক স্নেহ ও সহানুভূতিশীল বয়স্ক ব্যক্তির খেয়াল এদের উপর কম থাকে। অযত্নে বর্দ্ধিত শিশুর পরিবেশে উপযুক্ত উদ্দীপনার অভাব থাকে। অনেক সময় দেখা যায় নিজের কাজের সুবিধার জন্যে কখনও কখনও মা তার চঞ্চল সন্তানদের বাঁশের বা কাঠের কাঠগড়ার মধ্যে রেখে দেন। একদিকে এতে যেমন কতকটা আকস্মিক বিপদ থেকে সহজে রক্ষা করার সুবিধা আছে, অন্য দিকে আবার অনবরত এই ভাবে একলা থাকতে থাকতে শিশু কথা বলায় পেছিয়ে থাকে। সুতরাং এই পন্থা অবলম্বন সত্ত্বেও শিশুকে কথা শেখার সুযোগদান সম্বন্ধে মা এবং স্নেহশীল বয়োজ্যেষ্ঠদের যথেষ্ট সজাগ থাকা প্রয়োজন। আবার যে শিশু অত্যন্ত আদরে প্রতিপালিত, চাওয়া অর্থাৎ প্রকাশের পূর্ব্বেই যার চাহিদা মিটান হয়েছে তার বাচন-শক্তির বিকাশ হয় দেরীতে। মায়ের অতিমাত্রায় আশঙ্কাধর্ম্মী মনোযোগিতা শিশুর পরিণতিতে বাধা জন্মায় এবং শিশুর বাচন-ক্ষমতারও বাধার সৃষ্টি করে।

অবস্থার প্রকার ভেদ ছাড়াও শিশুর বাচন শক্তি বিকাশের উপর তার অনুভূতি অনেক অংশে কাজ করে। সাময়িক ঘটনার জন্যেও তার বাচন-বিকাশে বাধা ঘটে। যেমন—(১) নতুন ভাই-বোন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু চুপচাপ হয়ে যায়, কারণ মায়ের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে বাধা ঘটে। মায়েরই তেমন মনোযোগ আর সে পায় না। ফলে নবজাত শিশুর উপর তার হিংসা বা ভীতি জন্মায়। (২) শিশুর পরিবেশের পরিবর্ত্তনের ফলেও এ সমস্যা দেখা যায়। নূতন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে তার সময় লাগে—চুপচাপ থাকে। (৩) শারীরিক অসুস্থতাও আর একটি কারণ। (৪) পরিবারের অতি প্রিয়জনের মৃত্যুও শিশুর বাচন-বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এগুলি ছাড়াও ক্ষীণবুদ্ধি শিশু অনেক দেরীতে স্পষ্ট কথা বলতে পারে—তিন, সাড়ে তিন বৎসর বয়সে। এক দিকে এই সব কারণে যেমন পেছিয়ে থাকে অন্য দিকে শিশুর সঙ্গে পিতামাতা, ভাই-বোন, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির মধুর সম্পর্কও শিশুকে ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করে। আবার যে শিশু কেবল বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে সে অকালপক্ক হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে মানসিক পটুতার উপরেও শিশুর বাচন-ক্ষমতা নির্ভর করে।

দুই-পাঁচ বৎসরের শিশুদের ভাষা পর্য্যবেক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। এই বয়সে কথা বলার ধরন-ধারণ, উচ্চারণ, প্রকাশ-ভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন ধরনের এবং প্রত্যেকটির ভেতর বৈশিষ্ট্য আছে। খুকুর বয়স এখন দুই বৎসর পূর্ণ। অনেক কথা সে শিখেছে, প্রয়োজনমত সে বলতেও পারে। চিন্তা করে কথা বলতেও পারে। এই বয়সটি সুরু হ'ল নার্সারী বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে। নার্সারী স্কুলে অনেক শিশুকে দেখা যায় যে, তাদের ভাষা ও কথা স্পষ্ট নয়। শিশুকে বুঝাতে শিক্ষককে অসুবিধায় পড়তে হয়। এই বুঝতে না পারার জন্যে শিশু অসুখী হয় এবং জিদ্, চীৎকার ও কান্নাকাটি করতে থাকে।

নার্সারী স্কুলের পরিবেশ শিশুর বাচন-শক্তি বিকাশে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির দিক থেকে খুব সাহায্য করে। ভাষা প্রধানত একটি সামাজিক অস্ত্র এবং অন্যান্য শিশু অথবা বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি শিশুকে উৎসাহিত করে, উদ্দীপনা জাগায় কথা বলার জন্যে। নিজেদের ভেতর নানা রকম কথাবার্ত্তা চলে, বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গেও শিশু অনর্গল কথা বলে যায়, উত্তরের তোয়াক্কা করে না তবে মনোযোগ আশা করে। চারিদিকের নানা রকম আকর্ষণীয় জিনিস তাকে চিন্তা করবার সুযোগ দেয়। নানা রকম খেলনা ও খেলাধূলার ভেতর

সে সুযোগ পায় অনেক কথা বলতে ও শিখতে—নিজেদের মনোভাবের আদান প্রদান করতে। পুতুলের ঘরে খেলতে খেলতেই পরস্পরের ভেতর বড়দের সংসর্গে-শেখা নানা কথা বলে—'আমার মেয়ের জ্বর হয়েছে', 'বার্লি খাবে', 'তোর মেয়ে চান করবে না ?', 'কান্না করেছে', 'কাপড় কাচব', 'দুধ গরম হবে না ?', 'চুলোটা দে', 'বঁটি কই', 'আমার ছোট হাতাটা নিয়েছিস কেন ?', 'খাওয়াব কি করে ?' আরও কত মজার মজার কথা, অনবরতই হতে থাকে।

বিদ্যালয়ে লেখাপড়া সুরুর পূর্ব্বে শিশুর বাচন-শক্তি বিকাশের জন্যে কিংবা ভাষাজ্ঞানের জন্যে আলাদা পাঠ্য বিষয় না থাকলেও নার্সারী স্কুলে এদিকটা একেবারেই উপেক্ষা করা হয় না খেলাই। এই বয়সে শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়। খেলার সময়ে স্বাধীন ভাবে কথাবার্তা বলে মনোভাবের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে চিন্তা-শক্তি ও ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজন মত শিশু উৎসাহিত হয়, ফলে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে ভাষার দ্বারা। এ ছাড়াও নার্সারী স্কুলে অন্যান্য কাজের ভেতর দিয়ে, যেমন হাত-মুখ ধোয়ার সময়, খাওয়ার সময় শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে নানা ভাবে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পায়।

নার্সারী স্কুলে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ কালে তাদের কথা বলার ভেতর বিশেষ কয়েক ধরনের উচ্চারণের ত্রুটি দেখা যায়। (১) 'চ' শব্দের প্রয়োগে ; (২) ট, ঠ, ড, ঢ শব্দের প্রয়োগে ; (৩) ত, থ, দ, ধ শব্দের প্রয়োগে, (৪) তিন, সাড়ে তিন বৎসর বয়সেও জিভের জড়তা—কথার অস্পষ্টতায়, (৫) শিশুসুলভ তোতলামিতে। দীর্ঘ বাক্যে কথা বলার চেষ্টা—কিন্তু মধ্যে মধ্যে অতিমাত্রায় 'হ্যাঁ' ও 'না' শব্দের প্রয়োগে, (৬) প্রকৃত তোতলামিতে—কথা সুরু করতে বেধে যাওয়ায়। এই ধরনের ত্রুটিগুলি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং সংশোধনের জন্যে শিশুকে সাহায্য করা চাই। শিশুর সময় সম্বন্ধে জ্ঞান কম থাকে। অনেকদিন আগে হয় ত যে কাজ করেছে, বলে, 'কাল' করেছে। কারণ একমাত্র 'কাল' শব্দটি সময়ের প্রতীক রূপে সে শিখেছে।

গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বয়স্ক ব্যক্তি বহু উপায়ে শিশুকে সাহায্য করতে পারেন। আমরা প্রায়ই শিশুর আধো কথায় আকৃষ্ট হই এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কথা বলে সমাজে বাহবা দিয়ে তাকে আরও উৎসাহিত করি। ফলে সে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারে না। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য শিশুর সঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা। মাঝে মাঝে ঠিক উচ্চারণে শিশুকে কথা বলানোও প্রয়োজন। তবে একেবারে শুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে পুনরাবৃত্তি করান বা জোর করে বলানোও ঠিক নয়। পিতামাতাও শিশুকে বাড়ীতে এইভাবে শেখাবেন। এই সময়েই শিশু প্রায়ই তোতলামো অথবা স্খলিত উচ্চারণ করে। খুব সাবধানতার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে শিশুদের শেখাতে হবে—অর্থাৎ পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়েই ধৈর্য্য সহকারে ধীর-স্থির ভাবে শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রতি যত্ন নেবেন। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না—বুঝতে হবে শিশুর সামনে যথেষ্ট সময় আছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার জন্যে।

নার্সারী স্কুলে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে শিক্ষিকা শিশুকে সাহায্য করেন। এতে নূতন নূতন শব্দ ও নূতন ধারণা সে লাভ করে। শিক্ষিকা নিজের উচ্চারণ সম্বন্ধে যত্ন নেন বিশেষভাবে। উচ্চারণ স্পষ্ট, গলার স্বর ও সুরও মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন। শিশুর সঙ্গে কথা বলে নিজের মাতৃভাষা সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মাতে চেষ্টা করেন। দুই-একটি অপরিচিত শব্দও কথার ভিতর থাকা প্রয়োজন। শিক্ষিকার গলার স্বর যেন ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও প্রাণ-পূর্ণ হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেন। শিশু কৃত্রিমতা খুব বুঝতে পারে। একঘেয়ে কথার ভিতর ক্লান্তি বোধ করে। আবার অদ্ভুত উচ্চারণ ও অজানা শব্দগুলি শুনে সে মজা পায়। বার বার পুনরাবৃত্তি করে। অর্থহীন শব্দগুলিও শিশু উপভোগ করে। এই রকম মজার শব্দ ব্যবহারের খেলায় শিশুর রসবোধ জেগে ওঠে।

খেলার ভিতর দিয়েই শিশু বিচার করে, যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে, সিদ্ধান্ত করে, কথা বলে প্রকাশ করার আগেই। প্রথম পাঁচ বৎসরে ভাষাজ্ঞান নিয়মিত শিক্ষার দ্বারা দেওয়া ঠিক নয়। সমস্ত সজাগ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিখবে সেটাই যথেষ্ট। সেই শেখা নির্ভর করবে তার আগ্রহের উপর। ভাষা ব্যবহারে পটু করে তোলার জন্যে সুনির্ব্বাচিত শব্দে সাজানো সরল ভাষায় গুছিয়ে শিশুর মনোজ্ঞ করে গল্প বলা একটি খুব ভাল উপায়। তিন, সাড়ে তিন বৎসর বয়সে গল্প শোনানোর ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। পরে শিশুকে সুযোগ দিতে হবে অন্য শিশুদের গল্প বলতে। তার নিজের অভিজ্ঞতার প্রকাশে সমবয়সীরা হয় আগ্রহান্বিত হবে, আর না হয় ত না হবে। আগ্রহ না জন্মালে, তারা শুনবেই না। সে বিষয়ে শিশুরা 'খাতির নাদারৎ'।

মানুষ মাত্রেই গল্প শুনতে ভালবাসে। গল্পের মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যের প্রতিনিধিত্বে নিজের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার একটা রাস্তা পায়। যাকে বলে পরস্মৈপদী সুখভোগ। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের রসায়নে কল্পনাশক্তি জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুও তার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা গল্পের মধ্যে দিয়ে পেতে চায়। ৩।৪ বৎসরের শিশু নিজে যেমন কথা বলে, খেলে, কাজ করে—সেই রকম অন্য জীব-জানোয়ারও তারই মত কাপড়চোপড় পরে, কথা বলে, কাজ করে—এমন গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। মানুষ ও জীব-জানোয়ারের গল্পে আগ্রহ তাদের বেশী। শিশুদের গল্প বলার কতকগুলি প্রধান গুণ আছে। গল্পের ভাষা হবে সহজ, সুস্পষ্ট ও জটিলতা-বর্জ্জিত। বাক্যগুলি হবে ছোট ছোট—তার ছোট মস্তিষ্কে আয়ত্ত করার যোগ্য—পুনরাবৃত্তি ও কথোপকথন থাকবে। টুনী ও নাপিতের গল্পে শিশু বারবারই বলতে চায় 'কে ভাই! টুনী ভাই! এস ভাই, বস ভাই? পাত পেড়ে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?' এর সুরে ও ছন্দে সে মুগ্ধ হয়,

বার বার বলতে চায়, বলতে ভালবাসে, বলতে গর্ব্ব অনুভব করে। ভাষা অস্পষ্ট, বুঝতে শক্ত হলে শিশুর আগ্রহ উবে যায়—মনোযোগ থাকে না—কল্পনা ভেসে আর এক রাজ্যে চলে যায়, অবান্তর কথা বলে, প্রশ্ন করে গল্প বলায় ব্যাঘাত জন্মাতে থাকে। গল্পের বিষয়-বস্তু এমন হবে যার সঙ্গে শিশুর পরিচয় আছে, যে সব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা জন্মেছে, যে সব কথা সে সহজে বুঝতে পারে। গল্পের চরিত্র-চিত্রণে, আচরণের সামাজিক মান, শিশুর অভিজ্ঞতার বাইরে যেন না হয়। যেমন—সাত ছাগলের গল্পে মা ছাগল তার বাচ্ছা-দের দরজা খুলতে বারণ করে গিয়েছিল জঙ্গলে নেকড়ে আছে বলে। মায়ের কথা না শুনে দরজা খোলার ফলে নেকড়ে এসে একটা বাচ্ছা (যে সিন্দুকের পিছনে লুকিয়ে ছিল) ছাড়া সব ক'টাকে গিলে ফেলল। শিশু চায় গল্পের শেষ হবে আনন্দপূর্ণ। বেঁচে থাকা বাচ্ছাটি মায়ের কাছে সব বলল। পরে স্থান-পরিবর্ত্তনের সময় নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে পেটমোটা নেকড়ের ঘুমন্ত অবস্থায় মা চটপট করে ছুরি দিয়ে পেটটা কেটে ফেলতেই সব বাচ্ছা বার হয়ে নাচতে শুরু করল। এই সময়ে শিশুদের মুখে হাসি ধরে না। আবার নেকড়ে মরে গেল জেনে আরও উৎফুল্ল, 'বেশ হয়েছে, কেমন জব্দ' এই রকম কত মন্তব্য। ভয়ঙ্করের ভয় থেকে নিস্তার পাওয়ায় সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

একটি খুব আজগুবি গল্পও শিশুর কাছে সত্য ঘটনার মত আনন্দ ও উত্তেজনাপূর্ণ হবে যদি গল্পের কাঠামো এবং ক্রিয়াকলাপ শিশুর তরফ থেকে যুক্তিসঙ্গত এবং সমীচীন অর্থাৎ তার মনোমত হয়। একটা ব্যাঙ কথা বলছে শুনে শিশু চিন্তিত হবে না একটুও। খেলতে খেলতে রাজার মেয়ের সোনার বলটা পুকুরে পড়ে গেল—ব্যাঙ সেটা তুলে দিতে রাজী হ'ল এই সর্ত্তে যদি রাজ-কুমারী তাকে তার সঙ্গে খেলতে নেয়, এক পাতে খেতে দেয় এবং এক বিছানায় শুতে দেয়। আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। গল্প সর্ব্বদা ছোট হওয়া চাই কারণ এই বয়সে শিশু মিনিট পনেরর বেশী মনোযোগ দিতে পারে না। গল্পের ছবিগুলি রঙচঙে দিয়ে স্পষ্টভাবে শিশুর মনোজ্ঞ করে আঁকা চাই। ছবির নীচে গল্প-সংক্রান্ত ঘটনা কয়েকটিমাত্র শব্দে, একটি বাক্য, মোটা মোটা গোটা গোটা স্পষ্ট হরফে লেখা থাকবে। এর থেকেই শিশুর মনে পড়ার আগ্রহ জাগবে।

পাঁচ বৎসর বয়সে গল্প শোনার আগ্রহ শিশুর মধ্যে বেশী দেখা যায়। এই বয়সে প্রত্যক্ষ পরিবেশ ছাড়িয়ে আরও দূরে অনেক দূরে তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রসারিত হয়, কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ায়। এই বয়সে শিশুর বাচন-ক্ষমতা অনেক বেশী আয়ত্ত হয়। বড়দের প্রায় সব কথাই ভাল করে বুঝতে পারে এবং সহজ ও সুন্দর ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতেও পারে। এই বয়সে শিশু চায় গল্পের ভিতর আরও বিষয়-বস্তু থাকবে। আরও জটিলতা, আরও উত্তেজনা থাকবে অথচ গল্পের প্রধান গুণগুলি জোর থাকবে, পুনরাবৃত্তি থাকবে ও ছন্দপূর্ণ হবে। এই সময় কল্পনা-শক্তির বিকাশ খুব বেশী হয়। কল্পনার ভিতর দিয়ে সব কিছু বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। তাই ত সে রাজপুত্র সেজে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে রাক্ষসদের দেশে যায়, রাক্ষসদের মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। কখনও বা পরী সেজে নাচে।

কোনও কোনও মনস্তত্ত্ববিদ বলেন—বাস্তব জগতে দৈনিক জীবনে যা ঘটে সেই ধরনের গল্প শিশুদের বলা উচিত এবং ওরা তাই-ই চায়। রূপকথার গল্প এদের উপযুক্ত নয়। আবার কোনও কোনও শিক্ষাবিদ মনে করেন একথা একেবারেই ভুল। যে গল্প বাস্তবে ঘটে না বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না সে গল্পও শিশুরা ভালবাসে। তবে সব গল্পই সুন্দর করে বলতে বা লিখতে হবে, নইলে শিশুর রুচিমতন হবে না। কাল্পনিক জগৎ শিশুর কাছে শুধু প্রয়োজন নয়—বাস্তবের মত সত্য, অবশ্য যদি শিশু সুস্থ মনে ও আনন্দের সঙ্গে সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। কাল্পনিক জীবন শিশুর জন্যে ক্ষতিকর নয় বরং সৃজনশক্তি ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। অবশ্য ভাল-খারাপ দুই পর্য্যায়েরই গল্প আছে—গল্পের উপরোক্ত গুণাবলী যে গল্পে নাই, যে গল্প শুনলে শিশু ভয় পায় এবং গল্পের রাক্ষস, ডাইনি, পরী কোনটাই তাদের কল্পনার জগতে প্রবেশ করতে পারছে না—সে গল্প শুধু অনুপযুক্ত নয়—ক্ষতিকরও। আমাদের দেশের 'ঠাকুরমার ঝুলি' এই বয়সের জন্যে খুবই উপযুক্ত।

পাঁচ বৎসরের শিশু যে কেবল গল্প শোনা বা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তা নয়, গল্পের লেখাগুলি দেখার প্রতিও। অনেক গল্প তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়—বইএর পাতা উল্টে উল্টে ঠিক ঠিক জায়গায় ভান করে যেন পড়ছে। কতবার বড়দের জিজ্ঞাসা করে 'এ পাতায় কি লেখা আছে' 'ও পাতায় কি লেখা আছে'—আর শিখেও নেয়। বড় বড় অক্ষরগুলি ও শব্দগুলি তারা পড়তে চেষ্টা করে। এর অর্থ নয় যে, যে মুহূর্ত্তে শিশু এই ইচ্ছা প্রকাশ করল অমনি প্রতিদিন সে পড়া মুখস্থ করবে। তবে তাদের যথেষ্ট উপযুক্ত ছবির বই ও গল্পের বই দিতে হবে যার উপর তাদের অভিনিবেশ থাকবে বেছে নিতে, পড়তে, খুঁজে বার করতে এমন কি লেখাগুলি দেখে দেখে নকল করতে। এই সময়ে ছবিসহ শব্দ বা বাক্যে লেখা দিলে ওরা ঠিক শব্দগুলি শিখে ফেলতে পারে।

কথাবার্ত্তা ও গল্পবলার ভিতর দিয়ে ছাড়াও ছড়া, কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে শিশুর বাচন-ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তি সাহায্য করতে পারেন। শিশুর বয়স ও ক্ষমতা অনুযায়ী ছড়াগুলি বাছাই করা চাই। ৩-৫ বৎসর বয়সের শিশুদের ছড়াগুলি সহজ, সরল ও ছন্দপূর্ণ হবে। গানগুলিও ছন্দপূর্ণ ও সহজ সুরের হওয়া চাই। দুই বৎসরের শিশু তিন বৎসর অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর। ছড়া শেখার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে বয়স্ক ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে থাকে—ছন্দের ঝঙ্কারে সে অভিভূত হয়। একটু একটু মুখ নেড়ে বলতেও চেষ্টা করে। স্পষ্ট উচ্চারণ-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ

থাকাতে থেমে যায় কিন্তু মন দিয়ে শোনে। পরে চলতে ফিরতে ২।৪টি শেখা শব্দ জোরে জোরে আওড়াতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হয়। কিন্তু ৩ ৩॥ বৎসর বয়স থেকেই শিশু নিজের অজ্ঞাতে (unconsciously) সেগুলি কণ্ঠস্থ করে ফেলে। হাত নেড়ে, পা নেড়ে কত রকম অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে বলতে চেষ্টা করে। এর ভিতর দিয়ে যেমন তার স্মরণশক্তির বিকাশ হয়—নৃত্য ও ছন্দের প্রতিও আগ্রহ জন্মায়। ৪ ৫ বৎসরের শিশু ছড়া শিখতে অনেক বেশী অগ্রসর। শিশুদের জানা গল্প ছড়ায় লিখে তাতে সুর দিলে তারা খুব আনন্দ পায়। অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে নেচে নেচে গাইতে থাকে। এরা ছোট ছোট কবিতা শুনতে ও বলতে ভালবাসে যদি তার ভিতর সহজ-সরল শব্দ ও ছন্দ থাকে, যেমন 'আমি আজ কানাই মাষ্টার', কিম্বা 'ঝর বায়ু বহে বেগে……হাঁইও হাঁইও, হাঁইও' ইত্যাদি। অর্থহীন ছড়াও যদি ছন্দপূর্ণ হয় শিশুরা খুব উপভোগ করে, যা আবোল তাবোলের "ভাগ বাবাজী দেখবি নাকি? দেখবি খেলা দেখ চালাকি, ভোজের বাজী ভেল্কি ফাঁকি, পড় পড় পড় পড়বি পাখী—ধপ" কিম্বা "আতা গাছে তোতা পাখী, ডালিম গাছে মৌ, কথা কওনা কেন বউ? কথা কইব কি ছলে, কথা কইতে গা জ্বলে" ইত্যাদি কবিতাগুলি শিশুদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা জাগায়, ছন্দ-ঝঙ্কারের রস উপভোগ করে পূর্ণ মাত্রায়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে ছড়া, কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে শিশুর বাচন-শক্তির বিকাশ হয়, উচ্চারণ শুদ্ধ হয়। উচ্চারণের ত্রুটি সংশোধনের এটা একটা পথ ও উপায়। কেবল উচ্চারণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ছন্দজ্ঞান ও মানসিক ভারসাম্য (balance) বৃদ্ধি পায় যেটা তার জীবনে খুবই প্রয়োজন।

বাচন-শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাশিক্ষাও শুরু হয়। ছোট শিশু পারিপার্শ্বিক পরিচিত যা কিছু দেখে আনন্দে নেচে উঠে। নতুন যা কিছু দেখে বিস্মিত হয়—তাকে জানবার ইচ্ছা জাগে। দুই ক্ষেত্রেই সে নিজের মনের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। তাকে ছবির বই দিতে হবে—তাতে থাকবে পরিচিত জিনিসের ছবি। বিষয়বস্তু হবে মাত্র একটি—রংএ স্বাভাবিক চেহারার বড় ও স্পষ্ট করে আঁকা একটি বিড়াল, একটি কুকুর, একটি গরু। এই রকম ছবির বই ৩-৫ বৎসরের শিশুরও পছন্দ। তবে আর একটু বেশী ঘটনা সন্নিবেশ করে (detail-এ)। শিশু যেন কয়েকটি বাক্যে সেটা বর্ণনা করতে পারে। যেমন একটি বিড়াল তার সামনের দুধের বাটি থেকে চক্ চক্ করে দুধ খাচ্ছে এবং একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। ছবি দেখলেই শিশু বিড়ালের ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারবে। ছোট ছোট বাক্যে সে ছবিটিকে বর্ণনা করবে। ছবির নীচের লেখাটি পড়তে না জানলেও ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড় গড় করে সে পড়তে থাকে। এই ভাবে তার পড়তে শেখার আগ্রহ জন্মায়। অনেক সময় ছড়ার বইয়ের পাতা উল্টিয়ে একটি ছবির ঠিক ছড়াটি আঙুল দেখিয়ে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যায়। আবার যে ছড়াটি সে জানে না অথচ ছবিটি খুব আকর্ষণীয়, বয়স্কদের কাছে অনুনয় করে পড়ে দেবার জন্যে। এইজন্যে প্রত্যেক ছড়া ও গল্পের বইএ স্পষ্ট রংএ ছবি থাকা প্রয়োজন। এই ছবিই তাকে পড়তে শেখার আগ্রহ জাগায়।

শিশুর এই বাচন-ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক কাজ চলেছে, বিশেষ করে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সম্বন্ধে। আরও বহু গবেষণার প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের, কি অভিভাবক, কি শিক্ষিকা সকলের মনেই একটা শিথিল ভাব আছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে বয়স এবং অবস্থা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করে তত্ত্বনির্ণয় আমরা করে থাকি না। সাধারণতঃ শিশু সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা থেকে আমরা নিজেদের মত প্রচার করে থাকি। এরূপ তথ্যকে তথ্য বলা চলে না। শিশু পর্যবেক্ষক যদি ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন নানা জাতীয় শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার যথাযথ রেকর্ড রাখেন এবং অন্যের রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করে কোন সমাধানে উপস্থিত হন তবেই সে পর্যবেক্ষণের কতকটা মূল্য থাকে, অন্যথা সকল অবৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও মতামত অসার।

শিশু বিদ্যালয় (Nursery School) এ বিষয়ে একটি আদর্শ স্থান। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে স্বাধীনভাবে খেলে বেড়ায়, এবং বাড়ীর মতই স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলে। এখানে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর শিশুই থাকে। সুতরাং বাচন-শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে তুলনামূলক পরীক্ষা করা যায়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রত্যেক নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাই শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি অনুসন্ধান করবেন—যেগুলির ভিতর বাচন-ক্ষমতা হচ্ছে খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ এই বাচন-ক্ষমতা নির্ভর করছে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual growth) ও সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর (Social adjustment) উপর। প্রত্যেক শিক্ষিকা নিশ্চিত জানবেন শিশু মনে যা ভাবে মুখ দিয়ে সেই কথাই বলে—"what he says he means and means what he says", অর্থাৎ শিশু মনে আর মুখে এক।

পরিশেষে আমি আমাদের দেশের অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায়, সতর্ক-মনে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ এবং তা রেকর্ড করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সব রেকর্ডের ভিত্তিতেই পরে এ বিষয়ে প্রকৃত গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে। নিজের দেশের শিশুদের শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই রকম গবেষণা অপরিত্যাজ্য।

নন্দদাস ও হিন্দীর কৃষ্ণভক্ত কবিগণ

শ্রীঅমল সরকার

নন্দদাস

ইনি অষ্টছাপ কবিদের একজন। হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'চৌরাসী বৈষ্ণবোঁ কী বার্ত্তা'র রচয়িতা গোস্বামী গোকুলনাথের মতে নন্দদাস মহাকবি তুলসীদাসের ভাই ছিলেন এবং নন্দদাসের সঙ্গেই তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবন পরিদর্শন করেছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, ইনি চন্দ্রহাসের ভাই। সে যাই হোক নন্দদাস কৃষ্ণ-কবিদের মধ্যে সুরদাসের পরেই গণ্য হন এবং খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তাও তিনি সুরদাসের অপেক্ষা কিছু কম অর্জ্জন করেন নি। এঁর 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা অদ্বিতীয়। এমন সজীব ভাষায় বর্ণনা সচরাচর দেখা যায় না।

ছবি সোঁ নির্ত্তান, পটকনি লটকনি, মণ্ডল ডোলনি।

কোটি অমৃত সন মুসকানি, মঞ্জুলতা ভেই-ভেই বোলনি॥

নন্দদাস জাতিতে সনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত হয় যে, তুলসীদাস নিয়মমত এঁর খোঁজখবর নিতেন আর এর থেকেই মনে হয় যে, বয়সে নন্দদাস তুলসীদাসের ছোট ছিলেন। তুলসী নন্দদাসকে কৃষ্ণভক্তি সম্প্রদায়ে দীক্ষা নিতে বিরত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। অবশেষে তিনিই একদিন গোকুলে আসেন ও কৃষ্ণ-কবিদের কৃষ্ণ-গানে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন, 'তুলসী মস্তক তব নবৈ ধনুষ বান্ লেহু হাথ।' তুলসীদাসের ভাষার অনুকরণে নন্দদাস ভাগবৎ রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু গোসাই বিট্ঠলনাথের বলবার পর ভাগবতের ব্রজলীলা পর্য্যন্ত রেখে বাকী অংশ জলে ফেলে দেন। আকবর ও বীরবলের সম্মুখে নন্দদাস নাকি মানসীগঙ্গায় দেহত্যাগ করেন। জনশ্রুতি আছে যে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যখন নন্দদাস গৃহত্যাগ করে সুরদাসের কাছে পৌঁছান তখন সুরদাস বলেন যে, তোমাকে গৃহে ফিরে যেতে হবে কারণ তোমার ভেতর এখনও গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান এবং যতক্ষণ না সেই ধর্ম্ম পালন করবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুরদাসের উপদেশে তিনি রামপুর গ্রামে এসে ১৬১২ সম্বতে কমলা নামে এক পরমাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। বিবাহ করলেন ঠিক, সংসার-গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করবার জন্য ছুটেও এলেন সুদূর রামপুর গ্রামে কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল সেই গোকুলে, কৃষ্ণধামে। তাঁর প্রাণ-মন কৃষ্ণ নামে ছেয়ে থাকল, এমনকি পুত্রের নামও রেখে ফেললেন কৃষ্ণদাস। আপন পুত্রের ভেতর দিয়ে তিনি দেখলেন ব্রজদুলালের বালরূপ। এমনি ভাবে নন্দদাসের কৃষ্ণপ্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। পরে তিনি গোবর্দ্ধন ও মানসীগঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

নন্দদাসের রচনাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) রামভক্তি, হনুমান এবং রাম ও কৃষ্ণের অভেদত্ব সম্বন্ধীয় পদ। এই রচনাগুলির ভাষা একেবারে পরিমার্জ্জিত নয় ও এগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তিরও বিশেষ প্রকাশ হয় নি এবং কলাও খুব উচ্চস্তরের নয়।

(২) প্রথম বিভাগের রচনা তিনি ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করতে থাকেন। তার পর কৃষ্ণভক্তির ওপর পদ-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদাবলী রচনাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়। কিন্তু সেই পর্য্যায়ের কবিতাতেও তাঁর কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় নি। তৃতীয় পর্য্যায় তাঁর প্রৌঢ় রচনা এবং ঐরূপ সুষ্ঠু রচনা হিন্দী সাহিত্যে খুব কম কবিই করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনায় সুরদাসের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ থেকে ব্রজে ফিরে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার সমাবেশ আছে। এই রচনার ভেতর সুরদাসের বেশ প্রভাব দেখা যায়। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নন্দদাস সাহিত্য-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞানের বিশেষ অধ্যয়ন করেন এবং বোধ হয় এই সময় 'অনেকার্থ মঞ্জরী' ও 'মান-মঞ্জরী' রচনা করেন।

(৩) তাঁর তৃতীয় পর্য্যায়ের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় এবং এইগুলি ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তীকালে লেখা। এই প্রৌঢ় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শ্যাম-সগাই', 'ভঁবরগীত', 'রাস পঞ্চাধ্যায়ী' ও 'সিদ্ধান্ত পঞ্চাধ্যায়ী' প্রথমে লেখা। ১৬৩১ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নন্দদাস যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন তাদের মধ্যে 'রূপমঞ্জরী', 'বিরহ-মঞ্জরী', 'দশম-স্কন্ধ' ও 'রুক্মিণী-মঙ্গল' প্রধান। মঞ্জরী শব্দটি নন্দদাসের বিশেষ প্রিয় ছিল। শোনা যায় মঞ্জরী নামে একটি বৈষ্ণবীর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তাঁরই প্রেরণা ও উৎসাহ দানে তিনি অধিকাংশ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

নন্দদাসের রচনাগুলিকে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নলিখিত ভাবেও ভাগ করতে পারি।

(১) মঞ্জরী-গ্রন্থ এই ভাগে মোট পাঁচটি গ্রন্থ আছে যাকে আমরা 'পঞ্চমঞ্জরী' নামে অভিহিত করতে পারি। 'রূপ-মঞ্জরী', 'বিরহ-মঞ্জরী', 'রস-মঞ্জরী', 'মান-মঞ্জরী' ও 'অনেকার্থ-মঞ্জরী'। রূপ-মঞ্জরীতে ভূমিকা ছাড়া কবি নিজের কথাই বলে গেছেন। 'বিরহ-মঞ্জরী' বার মাস ও মেঘদূতকে অবলম্বন করে লেখা। নায়িকা বিভিন্ন ঋতুর ও মাসের নাম করতে করতে কৃষ্ণ-আগমনের প্রার্থনা করছে 'বিরহ-মঞ্জরী'তে।

চৈত চলো জিনি কতে বার বার পৌ পরি কহ্যো
নিপট অসন্ত বসন্ত, মৈন মহা মৈনন্ত জই—
আবহু বলি বৈসাখ, দুখ নিরদন, সুখকরন পিয়
উপজী মন অভিলাখ, বন বিহরন গিরিধরন সঙ্গ।

'মান-মঞ্জরী' ও 'অনেকার্থ-মঞ্জরী'র সাহিত্যবস্তু না থাকলেও শব্দচয়ন ও অভিধান-বস্তুর দিক থেকে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ভূমিকাতে কবি লিখেছেন :

গুণী নানা নাম কী, 'অমরকোস' কে ভাই।
মানবতী কে মান পর মিলৈ অর্থ সব আই।

এই দুই অভিধান বা কোষ-গ্রন্থে আমরা জানতে পারি যে, নন্দদাস ভাষা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন।

(২) শ্যাম-সগাই—একটি ছোট কথা-গ্রন্থ। বিষয়বস্তু নাম থেকেই ধরা যায়। এর ভেতর সুর-রচিত সুর-সাগরের কিছুটা প্রভাব আছে।

মত হরি লীনো শ্যাম, পরী রাধে মুরঝাঈ
ভঈ সিথিল সব দেহ, বাত কছু কহী ন জাঈ।

৩। ভবঁরগীত—ভবঁরগীত নন্দদাসের প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা এবং সেই রচনার ভেতর নন্দদাস আপন বৈশিষ্ট্য, কাব্য-প্রতিভা ও উচ্চ-ভাবনার বিকাশ করেছেন তাই সুরদাসের 'ভ্রমর-গীত' নন্দদাসের 'ভবঁরগীতে'র কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

৪। রাস-পঞ্চাধ্যায়ী ও সিদ্ধান্ত-পঞ্চাধ্যায়ী—ভাগবত দশম সর্গের কিছু অংশ রাসপঞ্চাধ্যায়ীর বিষয়বস্তু—আর এরই দার্শনিক ও ধার্ম্মিক বিচার করেছেন সিদ্ধান্ত পঞ্চাধ্যায়ীতে।

৫। রুক্মিণী-মঙ্গল—ভাগবত দশম সর্গের ৫২ থেকে ৫৪ অধ্যায়ের কথাবস্তু নিয়ে রুক্মিণী-মঙ্গলের রচনা। হয়ত তুলসীদাসের 'জানকী-মঙ্গল' ও 'পার্ব্বতী-মঙ্গল' দেখে নন্দদাস তাঁর আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ-বিবাহের (মঙ্গল) ওপর রচনায় প্রবিষ্ট হন। পৌরাণিক কথার ওপর রচিত রুক্মিণী-মঙ্গল এক সুন্দর কাব্য। হিন্দী সাহিত্যে এর চেয়ে ছোট সফল কাব্য বোধ হয় আর নেই।

৬। দশম-স্কন্ধ—দশম-স্কন্ধ ভাগবতের দশম সর্গের প্রথম ২৯ অধ্যায়ের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও এর মধ্যে নন্দদাস আপন সিদ্ধান্তের অনেক কিছু যোগ করে দিয়েছেন যার ফলে এর ভেতর মৌলিকত্বের ছাপ পাওয়া যায়। ভাগবতের দশম সর্গ থেকে এই গ্রন্থের আরম্ভ হয়।

অষ্টছাপ কবি

অষ্টছাপ কবিদের মধ্যে সুরদাসের পরেই নন্দদাসের স্থান। শব্দ-বিন্যাস, ভাষা-সমৃদ্ধি, গীতি-মাধুর্য্য ও কলা-নৈপুণ্য সব দিক থেকেই সুরদাস ছাড়া অন্যান্য অষ্টছাপ কবিরা কেউ-ই নন্দদাসের সমকক্ষ হতে পারেন নি। শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন ও ধার্ম্মিক বিচার ও সিদ্ধান্ত শুধু নন্দদাসের রচনার মধ্যে আমরা পাই। নন্দদাস সম্বন্ধে এক প্রসিদ্ধ উক্তি আছে যে, 'ঔর সব গঢ়িয়া নন্দদাস জড়িয়া' অর্থাৎ কেবল নন্দদাসই এক কবি যাঁর কাব্যের শব্দসমূহের চয়নে আমরা তাঁকে কেবল এক জহুরীর হীরে পরীক্ষার কুশলতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। নাভাদাসের 'ভক্তমালে' রসিক নন্দদাসের চাতুর্য্যের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। নন্দদাস সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সাহিত্যের কলাপক্ষের দিক থেকে তিনি সুরদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আর এইজন্যই লোকে তাঁকে 'জড়িয়া' নামে অভিহিত করে থাকে। এই 'জড়িয়া' বৃত্তি অর্থাৎ শব্দ-চয়নের মাধুর্য্যের সহিত যদি ভাব, সৌন্দর্য্য ও কাব্য-গুণের সমাবেশ থাকে তা হলে সেই কাব্যের উৎকৃষ্টতা অনেক বেড়ে যায় এবং কাব্যের 'ব্রহ্মানন্দ সহোদর' রূপ পায় প্রকাশ। নন্দদাসের রচনায় আমরা এই অপার্থিব ভাবনা অনুভব করতে পারি আর এই দিক থেকে হিন্দী সাহিত্যে নন্দদাসের অনবদ্য দানকে কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না।

শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের পুত্র গোস্বামী বিটঠলনাথ পুষ্টি-মার্গের (ভক্তি-মার্গকে এই সম্প্রদায়ের লোক পুষ্টিমার্গ আখ্যা দেয় এবং বাল-কৃষ্ণের উপাসনায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন) আট জন প্রধান কবিকে বেছে নেন যাঁরা অষ্টছাপ নামে পরিচিত। অষ্টছাপ কবিদের দুই জন হলেন সুরদাস ও নন্দদাস। বাকি ছয় জনের নাম—কুম্ভনদাস, কৃষ্ণদাস, ছীতস্বামী, গোবিন্দস্বামী, চতুর্ভুজদাস ও পরমানন্দদাস। এই আট জনের চার জন আচার্য্য মহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন ও অন্য চার জন গোস্বামী বিটঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অষ্টছাপের অনেকেই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন ও ব্রজভাষার ওপর তাঁদের পূর্ণ অধিকার ছিল। রাজদরবারে গিয়ে রাজার গুণগান গাওয়া বা তাঁর মনোরঞ্জন করা এঁদের পেশা ছিল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপার ভক্তি প্রদর্শন ও কৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামের সীমার ভেতর অবস্থান করাই ছিল তাঁদের কাম্য এবং তাতেই ছিল তাঁদের পূর্ণ তৃপ্তি। ব্রজের মহিমাগান, ব্রজদুলালের করুণা-প্রাপ্তি ও ব্রজধামের ধূলিকণায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

'হে বিধনা তো সো অঞ্চরা পসারী মাগোঁ,
জনম জনম দীজো মোহি যাহী ব্রজ বসিবো।

অষ্টছাপ কবিরা ছিলেন বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের ছাড়াও কৃষ্ণভক্তি শাখার আরও চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিতহরিবংশ ছিলেন রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কথিত আছে যে, শ্রীরাধিকা স্বয়ং এঁকে দীক্ষা দান করেছিলেন। এঁর সম্প্রদায়ে শ্রীরাধার স্থান সবার উপরে, এঁদের মতে স্বয়ং ভগবানও প্রকৃতির দাস। 'হিত-চৌরাসী' এঁর রচনা, এ ছাড়া 'রাধা-সুধা-নিধি' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থও ইনি লেখেন। ধ্রুবদাস ও বৃন্দাবনচাচা এঁর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। গদাধর ভট্ট ছিলেন গৌড়ীয়া সম্প্রদায়ের মুখ্য কবি। কৃষ্ণবন্দনার সঙ্গে সঙ্গে ইনি যশোদা ও নন্দের গুণগান করে গেছেন। গদাধরের কৃষ্ণের হোলী-খেলা ও ঝুলন-বর্ণনা অদ্বিতীয়।

মিলি খেলে ফাগ বল্লভ বালা।
সংগ ধরৈ রসরংগ ভরে নবরংগ ত্রিভংগী লালা।

বৃন্দাবনের সাহজী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত। হরিদাস ব্যাসও কিছুদিন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হরিদাস প্রথমে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ছিলেন, পরে ইনি টটি সম্প্রদায় নামে একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এঁর ভাষা সঙ্গীতময় এবং রাগ-রাগিণীর সুরে বেঁধে গানের ছন্দে কৃষ্ণ-ভগবানের লীলাখেলার রূপ দেওয়া আর এজন্যই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে হরিদাসের গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বল্লভাচার্য্য, গৌড়ীয়া, রাধাবল্লভী, নিম্বার্ক ও টটি সম্প্রদায়ের কবিদের ছাড়াও যাঁরা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ—একজন হলেন মীরা বা মীরাবাঈ, অপর দুইজন হলেন রসখান ও ঘনানন্দ। এঁদের ছাড়াও আরও কয়েকজন শ্রীকৃষ্ণের মহিমাগানে সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন—এঁরা ছিলেন বাদশাহ আকবরের দরবারী কবি—দরবারের কবি (court poet) হয়েও এঁরা ভগবানকে কোনদিন বিস্মৃত হ'ন নি। এঁরা হলেন—রহিম, গংগ, নরহরি, বীরবল, টোডরমল, বনারসীদাস, সেনাপতি ও নরোত্তমদাস।

মীরাবাঈ

মীরাবাঈ হলেন আমাদের কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী মীরা, যাঁর গিরিধর গোপাল ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না; রাজ্য-লিপ্সা, দাম্পত্য-সুখ, গার্হস্থ্য-জীবন সব কিছু ইনি বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় গোপালের রাতুল চরণে। মীরাবাঈ যোধপুর রাজ্যের মেড়তা নামক স্থানের কুড়কী গ্রামে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুদূর প্রবাসে তাঁর জন্ম হলেও আমাদের বার বার মনে হয়, তিনি যেন বাংলাদেশের একজন কৃষ্ণপ্রাণা ভক্তিপরায়ণা নারী; এর কারণ বোধ হয় এই যে, মীরা যেমন সবকিছু পরিত্যাগ করে ছুটে বেরিয়েছিলেন সেই মনমোহিনীকে পাবার জন্য, ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গও পথে বেরিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে,এইখানে রয়েছে এ দু'জনার মধ্যে এক বিরাট সামঞ্জস্য! মীরার নিজের কথায় থেকেই জানা যায় যে, তিনি ক্ষত্রিয়াণী। "ক্ষাত্র বংশ জন্ম মম জানো নগর মেড়তে আনা।" খুব অল্প বয়সেই মীরার মায়ের মৃত্যু হয়। তখন থেকেই তাঁর কৃষ্ণভক্ত দাদামশায় রাও যোধাজীর কাছে তিনি থাকতেন এবং এইখানেই ছোটবেলা থেকে বিগ্রহ গিরিধারীলালকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করতে আরম্ভ করেন। শিশু অবস্থায় যাঁর শিরায় শিরায় কৃষ্ণ-প্রেমের অমৃত-ধারা বইতে আরম্ভ করেছিল পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণ-প্রেমে সে যে পাগল হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? রত্নসিংহের এই বিদুষী ও সুন্দরী কন্যার গতানুগতিকভাবে একদিন বিয়ে হয়ে গেল পরাক্রমী ভোজরাজের সঙ্গে।

কিন্তু ভগবানের নিজের তাকে প্রয়োজন, তাই হঠাৎ বছর ঘুরতে না ঘুরতে মীরার স্বামীর মৃত্যু হ'ল। ভগবানকে ধ্যান করবার পথে এসে দাঁড়ায় কত অন্তরায়—মীরার জীবনেও ঠিক তাই হ'ল। মীরা চায় সব আগল ভেঙে গিরিধারীর কাছে ছুটে যেতে—সমাজ ও তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দেয়। কিন্তু অন্তরের ভক্তির কাছে কোন কিছুই অন্তরায় হতে পারে না। সমাজের বন্ধন ভেঙে মীরা চাইলেন মুক্তি—হিন্দুনারীর পক্ষে এ এক বিরাট অপরাধ—শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে—ভগবানের চরণামৃত বলে পাঠান হ'ল বিষ! ভক্তকে চিরদিন রক্ষা করেন ভগবান—কথিত আছে বিনা দ্বিধায় মীরা সেই গরল অনায়াসে পান করে ফেললেন। "রাণাজী ভেজা বিষ কা প্যালা সো অমৃত কর পীজ্যো জী।" এমনি ভাবে কৃষ্ণ-প্রাণা মীরা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলেন। এই সময়ে গোস্বামী তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁর অনেক পত্র-বিনিময় হয়। আজ পর্য্যন্ত চারিটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে যেগুলি মীরাবাঈ-এর রচনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। (১) নরসী কা মায়রা (২) গীত-গোবিন্দ টীকা (৩) রাম গোবিন্দ ও (৪) রাগ সোরট। বাংলাদেশে যেমন এই মহীয়সী ধর্ম্মপ্রাণা নারীর সমাদর দেওয়া হয়ে থাকে ঠিক তেমনি সম্মান তিনি পান গুজরাটে! গুজরাটী ভাষায় লেখা তাঁর বাণী বা বচন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ ব্রজভাষায় ইনি বেশীর ভাগ লিখেছেন কিন্তু সময় সময় রাজস্থানী শব্দের বেশ খানিকটা সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। তন্ময়তা, আপনাকে লীন করে দেওয়া হ'ল মীরাবাঈ-এর বৈশিষ্ট্য। ভগবানের কাছে এমনভাবে বিলিয়ে দেওয়া বোধ হয় আর কোনও ভক্ত-কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি। গোপিনীদের বিরহ এঁর কাছে তাঁর নিজের বেদনা। তিনি নিজেই একা কেঁদে ফিরেছেন বনে বনে, কান্তার-পাথার, তুষার-প্রান্তর সব খুঁজে বেড়িয়েছেন শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও পার্থিব জগৎ থেকে মুক্তি। তাঁর জীবনে শুধু একটি আশা ছিল—এই দীর্ঘ বিরহের অবসান একদিন হবেই হবে, আর প্রিয়-মিলনের শুভ-মুহূর্ত একদিন আসবেই। মীরার কতকগুলি পদ কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

(ক) বসো মেরে নৈনন মে নন্দলাল।
মোহিনী মূরতি সাঁবরি সুরতি নৈনা বনে বিসাল।

(খ) হরে হরে নিত বাগ লগাউঁ বিচ বিচ রাখুঁ ক্যারী।
সাঁবরিয়াকে দরসন পাউঁ পহর কুসম্মী সারী।

এই পদগুলির ছায়া অবলম্বনেই বিশ্বকবি তাঁর Gardener নামক কবিতা রচনা করেছিলেন—

স্যাম মনে চাকর রাখো জী।

* * *

চাকরী মে দরসন পাউঁ সুমিরণ পাউঁ খরচী।

* * *

মালী রাণীর কাছে প্রার্থনা করে যে তাঁর বাগানে একটা চাকরী দেবার জন্য। রাণী জিজ্ঞেস করেন কিন্তু কত মাইনে দিতে হবে।

উত্তর আসে—শুধু একটি করে মালা প্রতিদিন দেবার অধিকার।

রসখান

কৃষ্ণ-প্রেমের ভেতর এমন এক মহিমা ছিল যা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। ভক্তের ধর্ম যাই হ'ক না কেন, ভক্তের কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কয়েকজন বিধর্মী মুসলমান কৃষ্ণ-গানে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এদের মধ্যে হিন্দী-সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি রসখানের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। রসখান জাতিতে পাঠান ছিলেন এবং রাজবংশের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু কথাই আছে যে, কৃষ্ণপ্রেমে যে একবার মজেছে সেই মরেছে। রসখানেরও তাই হ'ল। কৃষ্ণ-রূপে মুগ্ধ রসখান সব কিছু গেলেন ভুলে—প্রেমের বানে তিনি গা ভাসিয়ে দিলেন। কিছুদিনের ভেতর বল্লভ-সম্প্রদায়ের গোস্বামী বিট্‌ঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ফেললেন। 'দো-সৌ বাবন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা'-তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্রজভূমির প্রতি এঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল—ব্রজদুলালের দেশে তিনি যেন যুগে যুগে আসতে পারেন এই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য আর এর জন্ত তিনি জীবনের সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন।

"মানুষ হৌঁ তো বহী রসখান বসৌ ব্রজ-গোকুল-গাঁবকে গ্বারণ।
জো পশু হৌ, তো কহা বসু মেরো, চরৌ নিত নন্দ কী ধেনু মঝারণ
পাহন হৌঁ, তো বহী গিরি কো, জু পরবৌ কর ছত্র পুরন্দর-ধারণ।
জো খগ হৌঁ, তো বসেরো করৌ মিলি কালিন্দী-কূল কদম্ব কী ডারণ

সুরদাসের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ইনি সখারূপে দেখতেন ও সখারূপেই পাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাঁর সবৈয়ার ভেতরে আমরা প্রত্যেক পদে দেখতে পাই হৃদয়ের আবেগ ও ভাবের উচ্ছ্বাস। শোনা যায় যে, জীবনের প্রথম দিকে রসখান একটি বালকের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে কৃষ্ণ-প্রেমে সেই পার্থিব আকর্ষণ ঈশ্বরীয় বা ভগবদ্ প্রেমে পর্য্যবসিত হয়েছিল। এঁর দুখানি গ্রন্থ 'প্রেম-বাটিকা' ও 'সুজান-রসখান' বিশেষ প্রসিদ্ধ। যে প্রেমে কোন স্বার্থ নিহিত থাকে না, যে প্রেমে প্রতিদানের কোন প্রশ্নই উঠে না, সেই প্রেমই হ'ল ভক্তের প্রেম আর এই প্রেমেই নিজের জাতিধর্ম ত্যাগ করে মেতে উঠেছিলেন মুসলমান কবি রসখান। তাঁর কথায় 'প্রেম ন বাড়ী উপজৈ, প্রেম ন হাট বিকায়ে…।'

সুরদাসের ন্যায় তিনিও কৃষ্ণকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এই সূত্রে তাঁর সবৈয়া আজও হিন্দী সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করে আছে:

'সেস মহেস গনেস দিনেস
সুরেসহু জাহি নিরন্তর গাবৈঁ।
জাহি অনাদি অনন্ত অখণ্ড,
অছেদ অভেদ সুবেদ বতাবৈঁ।

নারদ-সে সুক ব্যাস রটৈ,
পচিহারে তউ পুনি পার ন পাবৈঁ।
তাহি অহীর কী ছোহরিয়াঁ,
ছছিয়া ভর ছাছ পৈ নাচ নচাবৈঁ।'

রসখানের সবৈয়াগুলি সত্যই রসের আকর। মুসলমান কবি রসখান শুদ্ধ ব্রজভাষায় তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমের কথা জানিয়েছিলেন—তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল যে, এগুলির ভেতর বিদেশী শব্দের ব্যবহারে ব্রজধামের ব্রজগোপালের গানের মাধুর্য্য হবে ক্ষুণ্ণ, তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমের ভাবের পূর্ণ বিকাশ হবে না। তাই তিনি বলেছিলেন:

'জান বহী, উন প্রাণ কে সংগ, ঔ
মান বহী, জু করৈ মনমানী।
ত্যোঁ রসখানি (কবি), বহী রসখানি (রস চাহনেবালা)
জু হৈ রসখানি (কৃষ্ণ), সো হৈ রসখানি (সচ্চা প্রেমী)।'

ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে, 'ইন মুসলমান হরিজনন পৈ কোটিন হিন্দু বারিয়ে।' কোটি কোটি হিন্দুরও বুঝি এমন কৃষ্ণ-ভক্তি নেই!

ঘনানন্দ

সময়ের হিসাবে ঘনানন্দ পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ রীতিকালের কবি কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ঘনানন্দকে ভক্তিকালের অন্যান্য কৃষ্ণ-উপাসক কবিদের সঙ্গে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া রীতিকালের কবিদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিকৃত রূপের বর্ণনা এঁর কবিতার ভিতর একেবারে নেই, ইনি সত্যই একজন কৃষ্ণসাধক ছিলেন। এঁর জন্ম ১৭৪৬ (অথবা ১৭৯৫ বাবু অমীর সিংহের 'রসখান-ঘনানন্দ' এর মতে) সম্বতে হয় এবং নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের সময় নাদিরের এক সিপাহীর হাতে এঁর মৃত্যু হয়।

ঘনানন্দ নিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। ঘনানন্দের কবিতায় অনেক স্থানেই 'সুজান' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, ইনি সুজান নামে এক বারবণিতাকে ভালবাসতেন। ঘনানন্দ কৃষ্ণ-ভগবানকে লক্ষ্য করে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন যেগুলির ভিতর সুজানসাগর', 'বিরহ-লীলা', 'কোকসার', 'রসকেলী-বল্লী' এবং 'কৃপা-কাণ্ড' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এঁর বিরহের ভিতর উত্তেজনা নেই, অশান্ত মনের কোন পরিচয় নেই, বিরাট মহাসাগরের প্রশান্তির মত বিরহের বেদনার ভিতরই ঘনানন্দের পূর্ণ শান্তি, ধীর, গম্ভীর ভাবে প্রেমের সাধনা করে যাওয়াই এঁর চরম উদ্দেশ্য। সুরদাস, নন্দদাস, বা অন্যান্য কৃষ্ণ-কবিদের মত কোথাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এঁর কোন অভিযোগ নেই, কোন অভিমান নেই।

ঘনানন্দ শুদ্ধ ব্রজভাষা লিখতেন, শব্দচয়ন ও প্রকৃতি বর্ণনায় এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'মেঘদূতে' এঁর বর্ষা-বর্ণনা অনুপম।

নিধি কী নীর সুধা কে সমান করৌ সব হা বিধি
সজ্জনতা সরসৌ।
ঘন-আনন্দ জীবন-দায়ক হৌ কছু মেরিয়ৌ
পীর হিএ পরসৌ॥

বীরগাথা-কালে আমরা দেখেছি যে, হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে কবিরা তাঁদের আপনাপন প্রতিভা বিকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন এবং কবিগণও আপন কবিতার মাধ্যমে তাঁদের আশ্রয়দাতার মহিমা ও গুণগান গেয়ে তাঁদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সেই গুণকীর্ত্তনের ভিতর ছিল কিছু সঙ্কীর্ণতা কারণ তাঁদের রচনাবলী আপন আশ্রয়দাতার শৌর্য্য, বীর্য্য ও জীবনের প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যে যুগে কৃষ্ণ ও রাম ভক্ত কবিরা এলেন তখন তাঁদের ভগবদ ভক্তি ও মহিমার গান গেয়ে বেড়াতে হ'ল কাজেই তাঁদের দৃষ্টি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকল না। যে সময় সুরদাস, তুলসীদাস, নন্দদাস, মীরা প্রভৃতি ভক্তগণ আপন আপন ইষ্টদেবের পূজার অন্তরালে হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সেবা করে চলেছিলেন সে সময় মোগল বা মুসলমানেরা এ দেশে শিকড় জমিয়ে বসে গেছে। হিন্দু রাজাদের ন্যায় এই সব মুসলমান বাদশাহেরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চারুকলা, সাহিত্য প্রভৃতি ললিত-কলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এঁরা নিজেরাও সাহিত্যের চর্চা করতেন, শুধু চর্চা কেন কেউ কেউ ত কবিতা, পদ লিখে খ্যাতিও অর্জ্জন করেছিলেন। এই সব বাদশাহ হিন্দী কবিদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেবার জন্য এগিয়ে এলেন ও বীরগাথা কালের আশ্রয়দাতাদের ন্যায় তাঁদের আশ্রয়ে বহু কবি ছুটে এলেন তাঁদের দরবারে।

এই সমস্ত দরবারী কবি (Court Paet)দের ভিতর রহিম বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল অবদুর রহিম খানখানা। এঁর পিতা হলেন ইতিহাস-বিখ্যাত মোগল সরদার খানখান বৈরাম খাঁ। রহিম শুধু এক কবি ছিলেন না, নীতিকুশলতা ও বীরত্বের জন্য ইনি সকলের এমন কি বাদশাহ আকবরের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। এ ছাড়া তিনি ছিলেন দাতা ও পরোপকারী। কারও অভাব বা দুঃখ দেখলে রহিম চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না। আপন সাধ্যমত চেষ্টায় সেই অভাব বা দুঃখ মোচন করবার জন্য তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। কথিত আছে কবি গঙ্গের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ইনি ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন। সে যাই হোক অদৃষ্টের পরিহাস এই মহাপণ্ডিত, দানী কবিকেও সহ্য করতে হয়েছিল। জীবনের শেষদিকে রহিম বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন, যার ফলে তাঁকে অশেষ যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল, এই সময়ে পরম শ্রদ্ধেয় বীর ও কর্ণের ন্যায় দাতা কবি রহিমের দুর্দ্দশা দেখে কেউ চোখের জল রোধ করতে পারত না কিন্তু বাদশাহের হুকুমের বিরুদ্ধে কিছু করবার কারুর এতটুকু সাহস ছিল না। গোস্বামী তুলসীদাসের সঙ্গে রহিমের বিশেষ মিত্রতা ছিল। তুলসীদাস যখন 'সুরতিয়, নরতিয়, নাগতিয় সব চাহত অস হোয়' লিখে পরবর্ত্তী পদ-পূরণ কিছুতেই করতে পারছিলেন না তখন রহিম 'গোদ লিএ হুলসী ফিরৈ তুলসী সো সুত হোয়' লিখে অনায়াসে সেই পদ-পূরণ করে দিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের সময় রহিম হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শনও অধ্যয়ন করেছিলেন।

কেবল অধ্যয়ন নয়, সংসারের উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ প্রভৃতির সত্য পরিচয় দিয়ে তিনি মানুষকে সত্য পথে চালিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কবিমনের সরসতা, রসিকতা ও সহৃদয়তার খোঁজ তাঁর প্রতিটি দোঁহার ভিতর পাওয়া যায়। নৈতিক-জীবন সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া তাঁর জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল, তাই তাঁর অনেক দোঁহা নীতিমূলক এবং আজও যেগুলি সবার কাছে যোগ্য সমাদর পায়। রহিমের দোঁহার বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই যে, এগুলির ভিতর মানব-মনের তন্ত্রীতে আঘাত করবার এক অদ্ভুত শক্তি আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসের অভেদ্য সম্বন্ধ। জীবনের রহস্যের সত্যিকারের খোঁজ পাওয়া যায় রহিমের দোঁহায়, আর সেই জন্য তুলসী, কবীরের দোঁহার সঙ্গে আজও রহিমের দোঁহা শুনতে পাওয়া যায় লোকের মুখে মুখে। রহিমের কবিতায় মধ্যে আড়ম্বর নেই, কাজেই অলঙ্কারে সাজাবার প্রয়োজন হয় নি। এঁর প্রেমের বর্ণনায় ভিতর রয়েছে এক সংযত রূপ এবং শৃঙ্গার-রসে এঁর রচনা বিহারী, দেব প্রভৃতি শৃঙ্গারী কবিদের রচনা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। নায়িকা-ভেদের উপর এঁর বরবৈ অত্যন্ত সরস ও সুন্দর। তুলসীদাসের ন্যায় রহিমেরও ব্রজ ও অবধী ভাষার উপর সমান অধিকার। 'বরবৈ নায়িকাভেদ' ও 'বরবৈ' এই দুখানা গ্রন্থ অবধী ভাষায় লেখা, বাকী সমস্ত রচনায় ব্রজ ও অবধীর সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি 'রহিম কাব্য' নামে এক হিন্দী-সংস্কৃত গ্রন্থ ও 'খেট-কৌতুকম' নামে এক সংস্কৃত-ফারসী জ্যোতিষ কাব্য লিখেছিলেন। তুর্কী ভাষাতেও এঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল এবং 'বাকয়াত বাবরী' নামক তুর্কী ভাষায় একটি গ্রন্থের ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন। সংস্কৃত মালিনী ছন্দে এঁর 'মদনাষ্টক' বিশেষ প্রসিদ্ধ কিন্তু বরবৈ ছিল এঁর বিশেষ প্রিয় ছন্দ ও এই কারণে বরবৈ রচনায় ইনি পূর্ণ সফলতা অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল।

"কবিও কহ্যৌ, দোহা কহ্যৌ, তুলে ন ছপ্পা ছন্দ।
বিরচ্যো যহৈ বিচার কে য়হ বরবৈ রসকন্দ।"

হিন্দী সাহিত্যে তুলসীর চৌপাই, সুরের পদ, বিহারীর দোহা যেমন প্রসিদ্ধ ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধ রহিমের বরবৈ। রহিমের প্রধান গ্রন্থগুলি হ'ল—'দোহাবলী' 'নগর-শোভা' 'বরবৈ নায়িকা-ভেদ', 'বরবৈ', 'মদনাষ্টক', 'ফুটকর পদ', শৃঙ্গার সোরটা 'রহীম কাব্য', 'খেট-কৌতুকম। এ ছাড়া 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' ও 'সতসঈ' নামে দুটি গ্রন্থ রহিমের রচনা বলে ধরা হয়। এই সমস্ত রচনাগুলিকে 'রহিম রত্নাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশিত করা হয়েছে। রহিমের ভাব যে

বড় গভীর, প্রকাশভঙ্গী যে কত সরল ও সুন্দর তা নিম্নের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

(ক) রহিমন অঁসুআ নয়ন ভরি জিয় দুঃখ প্রগট করেই।
জাকৌ ঘর তে কাঢ়িয়ে ক্যোঁ ন ভেদ কহি দেই।

(খ) বড়ে পেট কে ভরন মেঁ হৈ রহীম দুখ বাঢ়ি।
যাতেঁ হাথী হহরি কৈ দয়ে দাঁত দুই কাঢ়ি।

(গ) জো চন্দন উত্তম প্রকৃতি, কা করি সকত কুসঙ্গ।
চন্দন বিষ ব্যাপত নহীঁ, লিপটে রহত ভুজঙ্গ।
তরুবর ফল নহি খাত হৈ, সরবত পিয়হি ন পান।
কহ রহীম পর ব্যাজ হিত, সম্পতি সঞ্চহি সুজান।
রহিমন কঠিন চিতা কু তেঁ, চিন্তা কহ চিত চেত।
চিন্তা দহতি নির্জীব কো, চিন্তা জীব সমেত।

রহিম ছাড়া গঙ্গ ও নরহরি বন্দীজন আকবরের দরবারের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। শৃঙ্গার ও বীর রসের কবিতা রচনাই গঙ্গের বৈশিষ্ট্য ছিল। তুলসীদাসের ন্যায় ইনিও আপন রচনায় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ করেন। এই কবিকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল 'তুলসী গঙ্গ দোউ ভএ সুকবিন্ কে সরদার।' গঙ্গ মোগল বাদশাহ আকবরের দরবারী কবি ছিলেন। ইতিহাসে বর্ণিত হয় যে, কোন নবাবের আদেশে একে হাতীর পায়ের নীচে পিষে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়—

কবহু ন ভড়বা রণ চঢ়ৈ,
কবহু ন বাজী বম্ব,
সকল সনাহি প্রণাম করি,
বিদা হোত কবি গঙ্গ।'

শোনা যায় যে, রহিম এর একটি 'ছপ্পা' শুনে ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন—ছপ্পাটি হ'ল—

'চকিত ভবর রহি গয়ো, গমন নহি করত কমল বন।
অহি ফন মণি নহি লেত, তেজ নহি বহত পবণ ঘন।
হংস মান সর তজ্যো, চক্ক-চক্কী ন মিলৈ রতি।
কহু সুন্দরি পদ্মিনী পুরুষ ন চহৈ ন করৈ রতি।
খল চকিত সেস কবি গঙ্গ মন, অমিত তেজ রসি রথ খস্যো।
খালান খান বৈরম-সুবন জবহি ক্রোধ করি তঙ্গ কস্যো।

নরহরি বন্দীজনও আপন ছপ্পায় ছন্দের কবিতা দ্বারা সকলকে মোহিত করেছিলেন। বাদশাহ আকবর এর কবিতা শুনে এত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে অনতিবিলম্বে সারা রাজ্যে গোহত্যা নিষেধের আদেশ জারী করেন। 'রুক্মিনী-মঙ্গল', 'ছপ্পায়-নীতি' ও 'কবিত্ব নীতি' এর তিনখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বাক চাতুর্যের জন্য বীরবল আকবরের নবরত্নের সভায় স্থান পেয়েছিলেন কিন্তু কাব্যে যে এর বিশেষ অধিকার ছিল তার প্রমাণ তাঁর রচনা থেকেই পাওয়া যায়। টোডরমল রাজ্যের আর্থিক ও শাসন ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন করেছিলেন সত্য কিন্তু নীতি-বিষয়ক এর কবিতা হৃদয়গ্রাহী। এই সময়ে বনারসীদাস নামে জৌনপুর নিবাসী একজন জৈন ধর্মাবলম্বী কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। হীরে-জহরতের ব্যবসা করা ছিল বনারসী দাসের পেশা। কিন্তু শৃঙ্গার-রসের অনেক সুন্দর কবিতা ইনি রচনা করেন। একদিন ধর্মে তাঁর মতি হল এবং তাঁর হৃদয়-ভাবনার আমূল পরিবর্তন হল ও সেই দিন গোমতীর জলে তাঁর সমস্ত শৃঙ্গারী-রচনা বিসর্জন দিয়ে এলেন। কবি সুন্দর দাসের ন্যায় নীতি ও জ্ঞানগর্ভ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এর কবিতায়। 'সময়সার' নামে একটি নাটকও তিনি লেখেন। ঐ সময় আত্ম-কথা (Auto biagraphy) লেখার প্রচলন একেবারেই হয় নি —এমন কি ইউরোপেও এ জাতীয় রচনার জন্ম তখনও হয় নি। রুসোর আত্মকথা বা কনফেশনের বহু পূর্বে বনারসী দাস তাঁর আত্মকথা 'অর্দ্ধ-কথানক' নামে একটি রচনায় প্রকাশ করেন। এই দিক থেকে ভারতবর্ষ আত্মকথা রচনার জন্মস্থান।

১৬৪৬ বিক্রম সম্বতের কাছাকাছি অনুপ শহরে এক ব্রাহ্মণ বংশে কবি সেনাপতির জন্ম হয়। প্রারম্ভিক জীবনে ইনিও ছিলেন এক সরকারী কবি কিন্তু পরে কোন অজ্ঞাত কারণে সংসার ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন ও দরবারী জীবনের প্রতি তাঁর ঘৃণার উদ্রেক হয়। এর কবিতা ঘনাক্ষরী ছন্দ রচিত। সেনাপতি ছিলেন সত্যই একজন ভাবপ্রবণ কবি—যদিও ইনি নন্দকিশোরের লীলাক্ষেত্র—শ্রীবৃন্দাবনে বাস করতেন কিন্তু এর ভক্তি ছিল প্রজা-বৎসল শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি। অলঙ্কার ও ছন্দে এর পূর্ণ অধিকার ছিল। 'কাব্য-কল্পদ্রুম' ও 'কাব্য-রত্নাকর' এর দুখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎসম-শব্দ বহুল শুদ্ধ সাহিত্যিক ব্রজভাষায় এই গ্রন্থ দুখানি লেখা। মানবের ন্যায় প্রকৃতিরও অনুভব-শক্তি আছে, মানবের হাসি-কান্নার মত প্রকৃতিও কখনও উল্লসিত হয়ে ওঠে—আবার কখনও বিষণ্ণ-মেদুর দৃষ্টিতে তার হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে সঞ্চিত দীর্ঘ-শ্বাসের পরম অন্ধকার ঘনায়—বর্ণন-ব্যাকুল রাত্রি প্রকৃতিরই হৃদয়ের বেদনার রূপ ছাড়া আর কিছু নয়, সেনাপতি প্রকৃতির এই তিন রূপ তাঁর 'যড়ঋতু বর্ণন' এ অদ্ভুত ভাবে বর্ণনা করেছেন। হিন্দী সাহিত্যে ঋতুর এইরূপ বর্ণনা খুব কমই পাওয়া যায়—

সিসির তুষার কে বুখার সে উখারত হৈ,
পূস বীতে হোত সুন হাথ পাই ঠিঠি কৈ।
দ্যোস কি ছুটাই কি বড়াই বরনী ন জাই,
'সেনাপতি' গাই কছু, সোচি কৈ সুমিতি কৈ।

সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কবিও হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে চলেছিলেন। ইনি হলেন 'সুদান-চরিত্র' রচয়িতা নরত্তোম দাস। হিন্দী খণ্ডকাব্য রচনায় এর বিশেষ স্থান ও ব্রজ-ভাষায় এই খণ্ডকাব্য রচনা করে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে-ছিলেন।

রাজদরবারে এই কবিদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-কালেরও শেষ হয়ে গেল। এই কাল ও পরবর্তী কালের মধ্যে সাহিত্যের যোগ থাকলেও ভাবনা ও চিন্তাধারার এক বিরাট

ব্যবধানের সৃষ্টি হল, তৎকালীন জনতা আনন্দ পাবার জন্য, জীবনকে উপভোগ করবার জন্য সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলল আলেয়ার পিছনে, কিন্তু তবুও সুর, তুলসী, কবীর, দাদু, মীরা প্রভৃতি মনিষীগণের বাণী তাদের মজ্জার সঙ্গে মিশে রইল। ভক্তিকালে হিন্দী সাহিত্যের চরম বিকাশ হয়েছিল এবং আজও এই যুগকে নিয়ে হিন্দী সাহিত্যের গর্ব্ব। কবীর, সুর, তুলসী, জায়সী যা দিয়ে গেছেন তা হয় ত কোন দিন কেউ দিতে পারবে না আর এই জন্য বোধ হয় ভক্তি-কালকে হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামসুন্দর দাসের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

"জিস যুগ মেঁ কবীর, জায়সী, তুলসী, সুর জৈসে সুপ্রসিদ্ধ কবিয়োঁ ঔর মহাত্মাওঁ কী দিব্য বাণী উনকে অন্তঃকরণে। সে নিকল কর দেশ কে কোনে কোনে মে ফৈলী থী উসে সাহিত্য কে ইতিহাস মে সামান্যতঃ ভক্তি যুগ কহতে হৈঁ। নিশ্চয় হী যহ হিন্দী সাহিত্য কা স্বর্ণযুগ থা।"

সাহিত্য যখন একটি বিশেষ সীমারেখার ভিতর আবদ্ধ না থেকে দূর দিগন্তে প্রসারিত হয়, কোন বিশেষ কেন্দ্রকে লক্ষ্য না করে বিশ্বজনীন ভাবনা ও চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলে তখনই হয় সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ। সে সাহিত্য চিরকাল অমর হয়ে থাকে। নিজের দেশবাসীদের ভিতর-ই সে শুধু সমাদর পায় না, সমস্ত জগত-বাসী তাকে পেয়ে হয়ে ওঠে ধন্য। ঠিক এই রকম ছিল আমাদের সুর, তুলসী, মীরা, রাসখানের সাহিত্য। ভক্তিকালের সাহিত্য মন, হৃদয় ও আত্মা এক সঙ্গে তৃপ্তি পায়। আত্মার এই সন্তুষ্টি বোধ হয় আর কোন কালে সম্ভব হয় নি, এখনও হয় না। সুর, তুলসী, মীরা আজও জীর্ণ পর্ণকুটির থেকে বিরাট অট্টালিকা পর্য্যন্ত পান সমান সম্মান, ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধনী দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সবাই ছুটে আসে ভক্তি-সাহিত্যের দরবারে। বীরগাথাকালে অসির ঝনঝনানি ও নূপুরের রুনঝুন শব্দে, বীর ও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্যে মানব-মন ভরে ওঠে সত্য; কিন্তু হৃদয়ের সব কোমলতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পরবর্ত্তীকাল অর্থাৎ রতিকাল রতির সাম্রাজ্য, কামনার নগ্ন রূপ, নারী তার মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে বিলাসের সামগ্রী হয়ে সমাজে স্থান পায়। নারীদেহের অঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে কবিরা আত্মনিয়োগ করেন, অর্থোপার্জ্জন হয়ে ওঠে তাঁদের চরম লক্ষ্য। আধুনিক কালে স্বর্ণযুগের বৈশিষ্ট্য থাকলেও, প্রসাদজী, মহাদেবী, বচ্চন, গুপ্তজী, পন্তজীর রচনার ভিতর আত্মার সঙ্গীত নেই। এখনও তাই তুলসীর দোহা, সুরের পদ, কবীরের সাখী আমাদের মুখে মুখে। ভক্তি সাহিত্যে বিশ্ব মানবের আহ্বানকে লক্ষ্য করে ডাঃ রামরতন ভটনাগর একবার বলেছিলেন—

"ভগভগ তীন সৌ বর্ষো কি ইস হৃদয় ঔর মন কি সাধনা কে আধার পর হী হিন্দী সাহিত্য উন্নতমুখী হো সকা হৈ। তুলসী, সুর, নন্দদাস, মীরা, রসখান, হিতহরি বংশ, কবীর—ইন মে সে কিসী পর ভী সংসার কা কোঈ সাহিত্য গর্ব্ব কর সকতা হৈ। যে বৈষ্ণব কবি হিন্দী ভারতী কে কণ্ঠমাল হৈঁ।"

অনন্তের পূজা

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

অর্থের গাঁথনি স্বার্থের বাঁধন
মানুষের কল্যাণ নাহি করে সাধন,
গড়িতে ভাঙিয়া পড়ে ঘটে বিপর্য্যয়
ভাঙাচোরা পৃথিবীর পথে জড়ো হয়।
পথিক দাঁড়ায়ে তুমি চলিতেছ সব
দেখেছ কি পৃথিবীর অতুল বৈভব?
নিয়ত নূতনে সে যে জন্ম দিয়া চলে
অর্থে নয় স্বার্থে নয় সৃষ্টির কৌশলে।
মানুষ অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রেরণার দূত
জ্ঞানে প্রেমে অপরূপ আশ্চর্য্য অদ্ভুত।
প্রেরণার বলে সে গো কত কি যে গড়ে
সাগরে দেওয়ায় পাড়ি হিমালয়ে চড়ে।
উল্কাপিণ্ড ছুঁড়ি দূর আকাশের গায়
নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবারে চায়।

স্রষ্টা সাথে মিলাইয়া আনন্দের সুর
জন্মে তার কর্মে তার আনন্দ প্রচুর।
হে মোর জগৎ মোর জাগ্রত স্বপন
তোমাতে ঘটিছে নিত্য উত্থান পতন।
প্রেরণার কল্পনায় ভাঙে গড়ে যত
অনন্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের মত।
হে অনন্ত হে বিশাল তুমি চিরন্তন
অন্তরে অন্তরে তুমি অন্তরের ধন।
আত্মা তুমি প্রাণ তুমি তুমি যে নিশ্বাস
অনন্তকালের বুকে হে ধ্রুব প্রকাশ।
মানুষে প্রকাশ তব অনন্ত স্বরূপ।
ধন্য ভাগ্য মানুষের ধন্য বিশ্বরূপ
মানুষ যুগের স্রষ্টা শ্রেয়ের সন্ধানী
যুগে যুগে আনি দেয় শ্রেয়তর বাণী।

মিত্তিরবাড়ী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এক ডাকে হরিশ মিত্তিরকে চেনে না এমন লোক এ পাড়াতে বিরল। বেঁটে কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষটি, মাথাটা দেহের অনুপাতে বড়, দুটি ড্যাবডেবে চোখ থ্যাবড়া নাকের দু'পাশে বেমানান, গোলাকার মুখ, মাথায় টাক পড়তে সুরু হয়েছে—অনেকটা চায়ের বিজ্ঞাপনে আঁকা কেতলিটার মত। বাষ্পভরা কেতলির মতই উনি শব্দশীল অর্থাৎ অশ্রান্ত আলাপচারী।

মিত্তিরকে দেখলেই আমার কিন্তু ভয় করে। মনে হয়, এই রে—সারলে ! এবার কাজকর্মের দফা গয়া !

চুপি চুপি সরে পড়তাম।

শুধু আমিই নয়, বন্ধু বিমলও একদিন বলল, লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। নিজের সংসারের দায়ঝক্কি নেই —পরের ঝক্কি বাড়াতে ওস্তাদ। যদি একবার গল্প জুড়ল ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়েই যাবে। সেই জন্যে সবাই ওকে এড়িয়ে চলে।

একজনের সঙ্গে ওর ভারী দহরম-মহরম দেখি। দত্ত-বাড়ীর ছোটকর্তার বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যায় ওর হাজিরা দেওয়া চাই।

তার কারণ আছে। বিমল হেসে জবাব দিল, ওর পুরনো ইয়ার-বকসির মধ্যে ওই একজনই আছেন যিনি কালাচাঁদের পরম ভক্ত।

শুধু কালাচাঁদ ?

হাঁ—গোরাচাঁদও আছেন বৈকি। মাঝে মিশেলে তাঁর আরাধনা হয়।

মাঝে মিশেলে কেন ?

বিমল বলল, কারণ দত্তজা রিটায়ার করেছেন। ছেলেদের হাতে সংসার, বাজেটের বরাদ্দ ঢালাও নয়।

মিত্তিরের অবস্থা ত মন্দ নয়।

বিমল হাসল। মিত্তির কোন্‌কালে আর নিজের বাড়ীতে মজলিস বসাল। বৈঠকখানাই নেই বাড়ীতে ! সেদিকে বুড়ো খুব হুঁসিয়ার। সংসারের কিছুই দেখে না, অথচ ওর বিনা হুকুমে পাই পয়সাটি বে-হিসাবে ব্যয় হতে পারে না।

এমনই কথা অনেকেই বলেন। অনেকেই পছন্দ করেন না মিত্তির মশাইকে। অথচ পাড়ায় কারও বাড়ীতে কোন কিছুর দরকার হলে মিত্তির মশাই যথাসাধ্য করেন।

এক সময়ে নাকি কোন ফার্মে কাজ করতেন। পরে সেখানকার ম্যানেজার হন। বিলাতী ফার্ম—কাজকারবার গুটিয়ে সাহেবরা বিলেত চলে গেল—গুডউইলটা কিনে মিত্তির বেশ কিছুদিন চালালেন ব্যবসা। তারই দৌলতে ওর ধনদৌলত। ফার্ম উঠে গেলেও মিত্তিরের গায়ে আঁচড় লাগল না। তখন বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন। ওই লাইনেই আর একটা ফার্ম খুললেন। সেটাও দিব্যি চালু হ'ল, কিন্তু হঠাৎ সেদিন সংসারের ক্ষেত্র থেকে সরে এলেন মিত্তির। তখন কতই বা ওঁর বয়স—বড়জোর পঁয়তাল্লিশ ওই বয়সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ব্যবসার বনিয়াদ পাকা হবার কথা, মিত্তির কিন্তু পিছিয়ে এলেন।

মিত্তিরের সঙ্গে প্রথম আলাপের ঘটনাটি আজও মনে আছে।

আমরা তখন কলেজ ছেড়ে চাকরির উমেদারিতে নানান আপিসের দরজায় ঢুঁ মারছি। আমি আর বিমল।

মিত্তিরের সঙ্গে দেখা এই গলিতেই। সারাদিন হাঁটাহাঁটির ফলে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে শুকনো মুখে ফিরছি—ওর সামনে পড়ে গেলাম।

উনিই প্রথম শুধোলেন, কি ভায়া, চাকরির খোঁজে গিয়েছিলে ত ? ও মায়ামৃগের পিছু পিছু কত আর ঘুরবে ! তার চেয়ে যে কোন ব্যবসায়ে নেমে পড়।

ব্যবসা ! কি জানি তার ?

জানতে হয় না, নামলেই জানা যায়। যা কিছু মধু ওই-খানেই।

বললাম সসঙ্কোচে, কিন্তু আপনি ত ও-লাইন ছেড়ে দিলেন।

আমি আর তোমরা ! হেসে উঠলেন মিত্তির। তোমা-দের সবে জীবনের গোড়াপত্তন, আমরা ত পশ্চিমে হেলেছি। তোমাদের কত আশা—কত আনন্দ বল ত।

তা যদি কোন পথ বাতলে দেন। সসঙ্কোচে বললাম।

নিশ্চয়—নিশ্চয়। প্রত্যেককে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত আমি, তবে একটি সর্তে। পারবে কি সে সর্ত রাখতে ? একটু হেসে বললেন, ভয় নেই—সর্তটা আমার সঙ্গে নয়, লাভের পার্সেণ্টেজ নেব না। শুধু নিজের কাছে নিজেকে কঠিন করা। পারবে কি ?

না শুনে বলি কি করে ? বললাম।

তা বটে। আচ্ছা আরও কিছুদিন যাক। তোমাদের হালচাল বুঝি—তার পর বলব সেকথা।

বলা বাহুল্য, সেকথা শোনবার অবসর আমার হয়নি, অল্প দিনের মধ্যে চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিমলকে মিত্তিরের কথা বলছিলাম

বিমল বলেছিল, আশ্চর্য্য ত, তোকেও বলেছে সর্ত্তের কথা! একটু থেমে বলেছিল, কাকে না বলেছে! পাড়ার যত বেকার ছেলে—সবাইকে অমনি কথা বলেছে।

বললাম, কিন্তু সর্তটা কি জানতে পেরেছে কি কেউ ?

বিমল হাসল একটু। বলল, আঁচে ইসারায় খানিকটা ধরেছি, ঠিকমত বুঝতে পারি নি।

ব্যাপার কি ?

একটু সরে এসে বলেছিল বিমল, অবশ্য এটা আমার অনুমান। আরও তিন চার জনের অনুমানের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে কিছু সত্য আছে বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা কি ?

কথা ভাল। মিত্তির চায় আমরা যারা ব্যবসায়ে নামব—তারা এক-একটি ভীষ্মদেব হব।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আমাদের জীবনে রোমান্স আসবে না, কোন রসকষ থাকবে না—শুধু কারবার নিয়ে থাকব আর টাকা জমাব ব্যাঙ্কে।

দুর—তা কখনও হয় ?

হয় বৈকি। মিত্তিরের অঢেল টাকা অথচ সংসার ফাঁকা। কতকগুলি দূরসম্পর্কের পোষ্য পুষছে।

তাতে কি ?

বিমল হেসেছিল শব্দ করে। আছে ওরই মধ্যে কিছু রহস্য। আমরা যখন ছোট তখন ওই তেতলা বাড়ীটার ভিত পত্তন হয়। খোঁড়া ভিতের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতাম মনে আছে ?

ওই ভিতের মধ্যেই বুঝি রহস্য ?

দুর বোকা—তা নয়। আরও জোরে হেসেছিল বিমল। মানে মিত্তিরমশাই ত এ গলির আদি বাসিন্দা নন, আমাদের চোখের সামনেই ওর বাড়ী তৈরী হ'ল। আমরা তখন কলেজে, উনি রিটায়ার করে গৃহপ্রবেশ করলেন। রিটায়ার অবশ্য অসময়েই করলেন আর তাই নিয়ে পাঁচ জনে পাঁচ রকম অনুমান করে নিলে।

বললাম, আমাদের বড় দোষ অপরিচিত সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করা—বিশেষ করে তার চালচলন আচার আচরণ যদি সাধারণ নিয়মের বাইরে হয়।

মিথ্যে কি ? বুদ্ধি খাটিয়ে অনুসন্ধান করলে শেষ পর্য্যন্ত রহস্যের একটা সূত্রও মিলে যায় ত ?

মিত্তির সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান আরম্ভ করেছ কি ?

আমি কি টিকটিকি পুলিস, না সখের গোয়েন্দা ? ও সব কর্ম্ম আমার নয়। তবে পরের জন্য মাথা ব্যথাওলা মানুষের অভাব নাই ত পৃথিবীতে—তাঁরাই যথাকালে ও কার্য্যটা শেষ করবেন।

এই কথার পর আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয়েছে—অর্থাৎ ও নিয়ে আর মাথা ঘামাই নি। শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঘামতও না যদি একটা হৈচৈ কাণ্ড না ঘটত।

তার আগে আর একটা ঘটনার আভাস দিয়ে রাখি। পাঁচ বছর চাকরি করার পর যা হয়ে থাকে তাই হ'ল, আমার বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি হয়ে গেল। প্রথম ছেলের বিয়ে, বাবা একটু ঘটা করেই সারবেন ঠিক করলেন। পাড়ার সবাইকে করলেন নিমন্ত্রণ।

বিয়ের আগের দিন মিত্তিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা গলিতে। বললেন, কি ভায়া, সুখের সপ্তম স্বর্গে কায়েম হতে চলেছ ত ? ভাল—ভাল।

লজ্জিত মুখটা নামিয়ে নিলাম।

মিত্তির বললেন, তা লজ্জা কি, এই ত সংসারের নিয়ম। যদি ভালবেসে বিয়ে করতে, বলতাম, সাবধান! কিন্তু বিয়ে হচ্ছে তোমার অভিভাবকদের পছন্দে। তুমি হদ্দমুদ্দ মেয়েটিকে একবার চোখে দেখেছ ? এ এমন কিছু মারাত্মক নয় যেমন পূর্ব্বরাগের বেলায় ঘটে।

আসছেন ত ?

কি জানি—কথা দিতে পারি না। যদি আটকে না পড়ি—

প্রীতিভোজের দিন মিত্তির আসেন নি। বিমল শুনে বলেছিল, উনি আসবেন না। পাড়ার যতগুলি বিয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছে—কোনটাতেই উনি যান নি।

খুব কৃপণ বুঝি ?

না, তাও ত বোধ হয় না। লোকটার চ্যারিটি আছে। এই ত কিছুদিন আগে নারীকল্যাণ সঙ্ঘে মোটা টাকা ডোনেট করেছেন। কেউ জানত না, হঠাৎ কাগজে খবরটা পেয়ে গেলাম।

বিয়ের উপর ওর বিতৃষ্ণা আছে বোধ করি। এক-একটা লোক থাকে চিরকুমার—নারীবিদ্বেষী।

না, তাও নয়। এই গলিতে তিন-চারটি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা দায়মুক্ত হয়েছেন—যা নাকি মিত্তিরের সাহায্য ভিন্ন সম্ভবই হ'ত না। ওর সাহায্যদানের একটি সর্ত্ত আছে সেটি সম্প্রতি জানতে পেরেছি।

কি—রোমান্স চলবে না ? হেসে বললাম।

তা বটে! বিমলও হাসল। বিয়ের পর যত তুমি ভালবাস—মিত্তির আপত্তি করবেন না। কিন্তু সর্ত্তটা তা নয়। সর্ত্তটা হ'ল এই—সাহায্যদানের ব্যাপারটা কেউ যেন জানতে না পারে।

অথচ জানতে পারে ত অনেকেই।

যাঁরা উপকৃত হন—তাঁরা কতক্ষণ চেপে রাখতে পারেন উচ্ছ্বাসকে। দু'একজন শক্ত লোক অবশ্য আছেন স্বীকার করি; কিন্তু অধিকাংশই ত তুমি-আমির দল—আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে যাদের কারবার!

যাই হোক মিত্তির সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল অতঃপর স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই এবার শীতটা চেপে পড়েছে—গলির সর্ব্বাঙ্গে ধোঁয়ার চাপও ঘন। আপিস থেকে ফিরছি, সন্ধ্যা উতরে গেছে। অগ্রহায়ণের স্বল্পায়ু দিনে রাত্রির ছায়া তাড়াতাড়ি নেমে আসে। গলিতে এত ধোঁয়া জমেছে, দম আটকে আসার জো। গ্যাস-পোষ্টগুলো একটার থেকে আর একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। খানিকটা এসেছি, হঠাৎ একটা চীৎকার কানে গেল। বড় বেসুরো চীৎকার। গলির মাঝ বরাবর দত্তবাড়ীর সামনে মেলাই লোক জমেছে। গণ্ডগোলের কেন্দ্রস্থল ওই বাড়ীটাই। একখানা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে দোর গোড়ায়। খানিক পরে কাকে যেন ধরাধরি করে বয়ে এনে তুলে দেওয়া হ'ল রিক্সাটায়। এগিয়ে দেখি মিত্তির মশাই। একজনের কাঁধে মাথাটা হেলে রয়েছে—বেশবাস বিশৃঙ্খল।

ভাবলাম—আজ কি কালাচাঁদ থেকে গোরাচাঁদে প্রমোশন পেয়েছিলেন উনি! কাছে এসে দেখি ব্যাপার ঠিক তা নয়। মিত্তিরের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছিল একটু আগে—যার চিহ্ন জামাটায় এবং দু'গালের ধারায় লেগে রয়েছে। শুনলাম পড়ে গিয়ে এমন হয় নি, হয়েছে প্রহার লাভ করে। প্রহার করলে কে ? ওর অভিন্নহৃদয় বন্ধু দত্ত মহাশয়! আজ আট-দশ বছর ধরে যাঁর বৈঠকখানায় ওর নিত্য অন্তরঙ্গতার আসর বসছে সন্ধ্যার পর!

আমাদের দেখে মিত্তির হাউ হাউ করে উঠলেন, তোমরা সাক্ষী রইলে ভায়া—এর বিহিত করবই আমি। আমারই যথাসর্বস্ব নিয়ে · রাসকেল—শয়তান—

কুৎসা-গ্লানির গন্ধে গলিতে জমায়েৎ লোকগুলির মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি রিকসাখানাকে ঠেলে দিলাম মিত্তির মশাইয়ের বাড়ীর দিকে। কারও সাহায্য না নিয়ে রিকসা থেকে নামলেন। নেমেই আমার আর বিমলের হাত চেপে ধরলেন দু'হাত দিয়ে। বললেন, এস ভায়ারা, একটা কথা শুনে যাও।

বললাম, আপনি সুস্থ হন, পরে শুনব।

সুস্থ আমি হয়েছি—খুব সুস্থ। কিন্তু কথাটা তোমাদের না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

আমরা কিছুতেই শুনলাম না। ওঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন সকালে গেলাম দুজনে। কি কথা বলবেন মিত্তির মশাই—যথেষ্ট কৌতূহল জমেছিল ত।

মিত্তির মশাই বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমাদের দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, কি ব্যাপার—এত সকালে!

কেমন আছেন জানতে এলাম।

ভালই আছি। কালকের কথা কিছু ধরো না ভায়া। ওসব নেশাখোরের কাণ্ড—অমন হয়ই। তোমরা ভাল ছেলে ওসব জানতে চেও না। চাকরি-বাকরি করছ, বিয়ে-থা হয়েছে, সভ্য পরিজনের মধ্যে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছ—তোমাদের কি লাভ এ সব নোংরা ব্যাপার দেখে! বলে হাসলেন।

আমরা দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে ঘামতে লাগলাম। বললেন, বস বস—চা খেয়ে যাও।

চা-বিস্কুট খেয়ে খানিকটা একথা-সেকথা করে ঘণ্টাখানেক কাটল। তার পর চলে এলাম।

পথে এসে বিমল বলল, লোকটা ভারি চাপা—নারে ?

হুঁ। এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে—যা চেপে গেলেন উনি।

কি রহস্য ?

সেইটাই ত ভাবছি।

হঠাৎ বিমল বলল, এক কাজ করলে হয় না ? দত্ত মশাইয়ের কাছে গেলে হয় ত এর সূত্র মিলতে পারে।

কৌতূহল বাড়ল। বললাম, সেই ভাল। আপিস থেকে এসে ওবেলায় যাওয়া যাবে। মিত্তির মশাই ত আর ওমুখো হবেন না।

আজও ধোঁয়ায় অন্ধকার গলি। দত্তবাড়ীর কাছ বরাবর আসতেই একটা উচ্চহাসির ধ্বনি আমাদের কানে গেল। থমকে দাঁড়ালাম দুজনে। না, মনের ভ্রম নয়—হাসিটা ঠিকই শুনছি ত। দত্ত মশাইয়ের বৈঠকখানা থেকে লহরে লহরে গমকে গমকে ওই যুগ্ম হাসির ধ্বনি উঠে অনেক রাত পর্য্যন্ত গলিটাকে কাঁপিয়ে তোলে। যখন হাসি থেমে যায়—আমরা ঘড়ি না দেখেও বুঝতে পারি রাত এগারটা বাজল।

আশ্চর্য্য, কাল অমন একটা বিশ্রী কাণ্ডের পর নির্লজ্জ মিত্তির আবার এসেছে দত্তবাড়ীতে আড্ডা জমাতে!

বিমল বলল, এ রহস্য ভেদ করতেই হবে—আসছে রবিবার সকালে দত্তবাড়ীতে যাব।

দত্তবাড়ী তৈরী হয়েছিল মিত্তিরবাড়ীর আগেই। ওরা এই গলির আদি বাসিন্দা না হন, পুরাতন বাসিন্দা বটে। দত্তজা লোকটিও সাদাসিধা। না চেহারাতে, না চালচলনে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। উনিও ব্যবসার লাইনে ছিলেন। প্রথমে ছিলেন মিত্তিরের কর্ম্মচারী, তা থেকে পার্টনার, তার পর হঠাৎ ও লাইন ছেড়ে একদিন উধাও হয়ে যান, ফিরে এলেন অনেক দিন বাদে। এসে ওই কারবারের মালিক হয়ে বসলেন। মিত্তির নিলেন অবসর। এই সময়ে প্রৌঢ়ত্বের সোপানে পা দিয়ে দত্ত বিয়ে করলেন। এমন বয়সে বিয়ে করে অসুখী হয়েছেন বলে শুনি নি।

অসুখী হবার কারণও অবশ্য ছিল না। বাড়ীতে মেয়েমহলের আলোচনা থেকে জেনেছিলাম—দত্তগৃহিণীর বয়সও কম নয়। ওদের মতে ত্রিশ ছাড়িয়েছে কোন্ কালে। আরও প্রকাশ—এ বিয়েতে দত্তর আত্মীয়স্বজন মত দেন নি। দত্ত অবশ্য নিজেই ছিলেন কর্ত্তা—কারও মতামতের অপেক্ষা রাখেন নি। শুভ পরিণয়ের কাজটা নেপথ্যে সেরে সংসারী হয়ে বসেছিলেন বাড়ীতে। সঙ্গে একটি কিশোর ছেলে—আর কিশোরী মেয়ে একটি এসেছিল। ওরা কে? প্রতিবেশীরা কৌতুহল প্রকাশ করেছিল। উত্তরে শুনেছিল—আত্মীয়।

এই জবাবে কারই বা কৌতুহল মেটে! কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। ছেলেটি যথানিয়মে ইস্কুলে যেতে লাগল—পর পর তিনটে পাস করল। তার পর চাকরি নিয়ে কোন্ বিদেশে চলে গেল। আসে কচিৎ কদাচিৎ। পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে ও মিশত না—সুতরাং ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে গেল যথাকালে। ভাল ঘরেই বিয়ে হ'ল। চলে গেল দূর দেশে। শুনি সেইখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।

রবিবার। দত্তবাড়ীর সামনে এসে দেখি সদর দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে। হঠাৎ বাড়ী বন্ধ করে দত্তজা কোথায় চলে গেছেন।

এক-পাঁচিলে-বাড়ী মল্লিক বললেন, কিছু পাবেন বুঝি? আর মশায় সে গুড়ে বালি! কাল থেকে কত লোককে যে এই একই কথা বলছি তার লেখাজোখা নেই। শুনছি কারবারে গণেশ উল্টে সবাই উধাও হয়েছে।

ক'দিন ধরে বহু জল্পনা-কল্পনা হ'ল দত্তপরিবারকে নিয়ে, ক্রমশঃ তা থিতিয়েও গেল। এমন সময়ে একদিন সবিস্ময়ে দেখলাম সদর দরজার তালা খুলে গেছে, ঝি-চাকর দু'একজন যাতায়াত করছে।

তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, দত্তমশাই বাড়ী আছেন? একবার ডেকে দেবে?

আজ্ঞে বড়বাবু ত আসেন নি।

সেকি, তবে বাড়ী খুলল কে?

ছোটবাবু।

কবে ফিরবেন বড়বাবু?

কি করে বলব বাবু! আমরা সামান্য লোক, কি জানি বলুন।

শুনলাম সব। কারবারে শ্রীগণেশ বসে আছেন কায়েমী ভাবে, ছেলেদের হাতে জোর চলছে কারবার। হাওয়া খেতে বাইরে গিয়েছিল সবাই। দত্তমশাই এখন পশ্চিমেই থাকবেন, এমনকি জায়গাটা পছন্দ হলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রয়েই যাবেন সেখানে।

রীতিমত বাণপ্রস্থের ব্যাপার! দত্তমশায়ের সঙ্গে দত্তগৃহিণীও কি বাণপ্রস্থ নিলেন? মহাভারতের একটি দৃশ্য পুনরভিনীত হচ্ছে কলিযুগের বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে!

বিমলকে বললাম কথাটা।

বিমল বলল, ব্যাপারটা মহাভারতীয় বটে! তবে কলিযুগের মহাভারত সবটাই উলটো।

অর্থাৎ?

বলব—আর দু'দিন যাক। এ রীতিমত গোয়েন্দা-কাহিনী। সূত্র যা পেয়েছি—জমজমাট গল্প একটা মিলে যাবে আশা করি। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার বোধ করি লক্ষ্য করনি? বলি মিত্তির মশাইয়ের খবর কি?

তাঁকে ত বহুদিন হ'ল দেখি নি।

তিনিও কি বাণপ্রস্থে? বিমল হাসল। সেখানেও কালাচাঁদের আসর না বসলে বুঝি মোক্ষলাভ হবে না?

ব্যাপার কি - সবটাই কেমন ধাঁধা বলে বোধ হচ্ছে।

শুধু ধাঁধা—রীতিমত গোলকধাঁধা। সবুর কর কিছু দিন, চমৎকার একটি কাহিনী শোনাব। শুনে দিল তর হয়ে যাবে।

সুতরাং কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হ'ল। অতঃপর বিমল সে কাহিনী শোনালে। শুনে দিল সুস্থ না হোক—অন্তত শান্ত হ'ল। কাহিনীটা সংক্ষেপে তুলে দিচ্ছি:

মিত্তির আর দত্তজার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। একদা মিত্তিরের কারখানাতেই কাজ করতেন দত্তজা। সুশ্রী, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ যুবক—দেখলেই প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা হয়। তা ছাড়া সমবয়সীও। ক্রমে মিত্তিরের

ডান হাত হয়ে দাঁড়ালেন দত্তজা। প্রধান সহকারিত্বে প্রমোশন পেলেন বাইরে, ভিতরেও পদোন্নতি হ'ল বন্ধুত্ব-বন্ধনে। এমনি বেশ কিছুদিন ধরে চলল বন্ধুত্বের জের। তার পর একটা স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে দত্তজা কারবারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন ছিঁড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। দুষ্টজনে অনেক কথা বলে। কেউ বলে—যে মেয়েটিকে অনুগ্রহ করতেন মিত্তির তাকে নিয়েই উধাও হয়েছিলেন দত্তজা। কেউ বলে তা ঠিক নয়। ওটা কুখ্যাত কোন পাড়ারই ঘটনা। মেয়েটি ছিল বহুভোগ্যা। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে—তাই হয়েছিল। মিত্তিরের কবল থেকে দত্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল মেয়েটিকে। তবু ব্যাপারটা কেউ পরিষ্কার বলতে পারে নি। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়—তাই কি হয়েছিল হুবহু? দত্ত কি মিত্তিরের চেয়ে বেশী টাকার মালিক ছিলেন? কান্তিমান পুরুষ ছিলেন দত্ত, তাতেই কি টলেছিল মেয়েটি? আর কারবার ছেড়ে যাওয়ার সময় দত্ত নাকি মোটা রকম টাকার সংস্থান করে নিয়েছিল। মোট কথা, সবই অনুমান। তবে এই ঘটনার কিছুদিন পরে মিত্তির এসেছিলেন আমাদের পাড়ায়। যুদ্ধের বাজারে মোটা টাকা হাতে এসেছিল। তুলে দেব দেব করেও কারবার তুলে দিতে পারেন নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা—যে দত্ত ওর বুকে দাগা দিয়ে একদা উধাও হয়েছিল—তারই হাতে তুলে দিয়েছিলেন চালু কারবার আর তারই বৈঠকখানায় সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত অন্তরঙ্গতার আসর জমিয়েছিলেন আরও দশ বছর ধরে!

আশ্চর্য্যের বাকী ছিল অনেক। সেটা সগৃহিণী দত্তের অন্তর্দ্ধানে আর একবার প্রমাণিত হয়েছে। ওই যে দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে লৌহযবনিকার অন্তরাল—ওইখানেই ছিল আসল রহস্য। দত্তগৃহিণী নাকি আর কেউ নন—মিত্তিরের অনুগৃহীতা মেয়েটিই। ঐ যে ৬টি ছেলেমেয়ে বিয়ের পর ওদের সঙ্গে এ বাড়ীতে আসে, ওরা দত্তগৃহিণীর পূর্ব্বপক্ষের সন্তান। কেউ কেউ বলে মিত্তিরই ওদের জনক। জনশ্রুতি ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেখানো থেকে কর্ম্মসংস্থান বা বিবাহ পর্য্যন্ত সব ব্যাপারেই অকৃপণ ভাবে অর্থসাহায্য করেছেন মিত্তির। আরও আশ্চর্য্যের কথা দায়ে-অদায়ে ঠেকলে আজও মিত্তিরের কাছে অর্থসাহায্য নেন দত্তজা।

তবে শেষ কথাটা শুনলে আর আশ্চর্য্য লাগবে না। কাহিনী শেষ করে বিমল বলল, অদ্ভুত সহ্যগুণ মিত্তিরের, কৌশলীও বটে। অবনী পরশু ফিরেছে কাশী থেকে—ওর মুখেই শুনলাম। মিত্তির নাকি কাশীবাস করছে, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। ওরা প্রতিদিন সকালে বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাটে একসঙ্গে স্নান করে বেড়ায়, গল্প করে।

তাই নাকি! বুড়োবয়সে মিত্তিরের দেখি ভীমরতি হ'ল!

নাবে, ভীমরতি নয়, ভালবাসার পুরনো গাছটি নতুন করে গজিয়েছে। মেয়েটি আর কেউ নয়, দত্তগৃহিণী।

সামনে বজ্রপাত হলেও এমন চমকাতাম না, কিন্তু বিচিত্র জগতে কিনা সম্ভব!

অনেকদিন পরে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। মিত্তিরবাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। অনেকদিন আগেকার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ল। মানুষের প্রবৃত্তির কথা ভেবে সেদিন যেমন ঘৃণা বোধ করেছিলাম তেমনি ঘৃণায় মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। দত্তমশাই বহুদিন গত হয়েছেন, ছেলেরা ধুমধাম করে শ্রাদ্ধকৃত্য করেছে। দত্তগৃহিণীর কথা ভুলে গেছে সবাই। প্রতিবেশীরা কতটুকুই বা জানত দত্তগৃহিণীকে!

মিত্তিরও এবার ও-গলি থেকে স্মৃতিচিহ্ন লোপ করে দেবার আয়োজন করছেন। ভালই হ'ল, বিগত দিনের একটা কলঙ্ক-স্মৃতির দাগ মুছে যাবে পাড়া থেকে।

এর পর আর একদিন সংবাদপত্রে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম—একটি মহৎ দানের ঘোষণা—তার সঙ্গে যুক্ত মিত্তিরের নাম। একটি প্রসূতি-আগার স্থাপনোদ্দেশে ওঁর স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই উনি দান করে দিচ্ছেন। এর জন্য ট্রাষ্ট বোর্ড গঠিত হয়েছে। প্রসূতি-আগারের নাম হবে ব্রজসুন্দরী শিশু লালনাগার। মিত্তিরের মহৎ অন্তঃকরণকে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম আমরা।

সম্পূর্ণভাবে ওকে দেখলাম আরও দশটি বছর বাদে। তখন ওর বয়স আশী পার হয়েছে। আমিও অবসর নিয়ে কাশীবাস করবার সঙ্কল্প নিয়ে সুবিধামত একটি বাসা খুঁজছি। দেখা হ'ল দশাশ্বমেধ ঘাটে এক কথক ঠাকুরের আসরে। বয়সের ভারে অনেকখানি নুয়ে পড়েছেন মিত্তির, কিন্তু মাথায় প্রকাণ্ড টাক—লোলচামড়ায় আকীর্ণ ছোট-হয়ে-যাওয়া একখানি সুগোল মুখ এবং ঝুলন্ত ভ্রূর নীচের দুটি ড্যাবডেবে নিবন্ত চোখ আমার সমস্ত সংশয় দূর করে দিল। নিকটস্থ হয়ে নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন?

কে? ও। পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন পাড়ার চেনাশোনা লোকের কথা। শেষে বললেন, কেমন চলছে ছেলেদের হাসপাতালটা? ভাবছি ওটা সরকারের হাতেই তুলে দেব। এদিকের রেস্তও শেষ হয়ে এল ত।

নামটা বুঝি বদলে দেবেন?

না, না—ওটা বদলান চলবে না। সর্ত্তে বনে নি বলে পাবলিকের হাতে তুলে দিই নি এতকাল। ও নাম বদলান যায় না।

যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বুদ্ধিমান মিত্তির আমার প্রশ্নটি বুঝে নিয়ে জবাব দিলেন, জানি কি জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তাতে কার কতটুকু লাভ! আজকের দিনে আমিও যেমন মুছে গেছি ব্রজও তাই। হাসপাতালটার কি নাম এ নিয়ে ক'জনই বা মাথা ঘামায়! সাধারণ মানুষ যে বিপদে পড়ে ওখানে আসে—সেইটুকু শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ওটার নাম মনে রাখে—তার পর নিরবধি কালোহ্যয়ং বিপুলা চ পৃথ্বী। কেমন—ঠিক কিনা?

বলে হাসলেন। তবে তোমাদের একটা কথা প্রায়ই বলতাম তা বোধ করি ভোল নি। বলতাম—জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাও ত ব্যবসার পথ ধর। আর একটি সর্ত্ত মেনে চলবে জীবনভোর। বিয়ে করে সংসারী হও মন্দ নয়, কিন্তু বিয়ের আগে ভালবেসো না কাউকে। এই ভালবাসা সব প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু আপনি ত—

বিয়ে করিনি, অথচ ব্যবসায় থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। আরে বাবা, সে অনেক কথা, সাতকাণ্ড রামায়ণেরও বেশী। যাক—যা হয়ে গেছে। আজ হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেখছি—ঠকি নি। যে ভালবাসার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলাম ভেবেছি—সেই ভালবাসাই আমাকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য পৃথিবীতে কেউই বাঁচে না চিরদিন, আমিও বাঁচব না। তবু যতদিন বেঁচে রইলাম পৃথিবীতে—ততদিন আমার মধ্যেই আমার জীবনকে সুন্দর করে পেয়েছি—একথা ভুলি কি করে! আচ্ছা চলি বাবা। আমার বাসায় এস মাঝে মাঝে, গল্পসল্প করা যাবে।

ঠিকানা জানিয়ে উনি চলে গেলেন।

বাসা খোঁজার তাড়নায় এ ক'দিন ওর কথা মনেই হয় নি। যেদিন মনে পড়ল গিয়ে দেখি সত্যিই অনেক দেরী করে ফেলেছি। মিত্তির শয্যা নিয়েছেন এবং গল্প করার সামর্থ্য ওর নাই।

আমায় দেখে ম্লান হেসে বললেন, বড্ড দেরী করে ফেলেছ ভায়া। যাক, তাতে আর কি, বাসা পেয়েছ ত? বস।

বৌদির কাছে একটা টুল ছিল, টেনে নিয়ে ওর শিয়রে বসলাম।

বললেন, একটা কথা জানিয়ে রাখি তোমাকে, না জানালেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সামাজিক জীবকে সমাজের কাছে না হোক—প্রতিবেশীদের কাছে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হয়, না হলে মানুষের মন সুস্থ থাকে না। আরও একটু সরে এস—আমার মাথার কাছে দেওয়ালের পানে চাও। একখানা ছবি দেখছ ত? হ্যাঁ ফটো একটা। উনিই আমাকে কারবার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আমায় সংসার পাততে দেন নি—সর্ব্বহারা করেছেন। অথচ দিয়েছেনও উনি অনেক। যা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলেও পেতাম না, পুত্রকন্যা নাতিনাতনীতে ঘর ভরে গেলেও মিলত না।

একজন সাধারণ রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। তৈলচিত্র নয়—বড় আলোকচিত্রই। আমার চোখে কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল না।

বালিশের তলা থেকে একখানা মাঝারি একসারসাইজ বই টেনে বার করলেন মিত্তির। আমার দিকে সেটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এটা পড়ে দেখো অবসরমত। পড়লে বুঝবে এমন অন্যায় করি নি যা সমাজে বা লোকাচারে হেয়।

ডায়েরী ঠিক নয়—গুছিয়ে লেখাও নয়। ছাড়া ছাড়া ঘটনা—বেশ খানিকটা এলোমেলো ভাবে লেখা। অজস্র বানান ভুল, আড়ষ্ট ভাষা, ভাবও সব জায়গায় ঠিকমত প্রকাশ পায় নি। যাই হোক তা থেকে যে কাহিনীটা উদ্ধার করা গেল তা মোটামুটি এই:

ব্রজসুন্দরীর পিতা ছিলেন বড় আড়তদার। একসময়ে মিত্তিরকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পালন করেছিলেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিল; ব্রজসুন্দরী ছিল পিতার একমাত্র কন্যা। কাজেই একটিমাত্র আশা নিয়ে ছেলেটিকে কারবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার আগেই তাঁর ডাক এল পরপার থেকে। শেষ বিদায় নেবার আগে মিত্তিরকে ডেকে বললেন মনের কথা। মিত্তির কথা দিলেন, তবে এটুকুও জানিয়ে রাখলেন ব্রজর অমতে এ কাজ হতে পারবে না। ব্রজ যদি স্বেচ্ছায় সানন্দে সম্মতি দেয় তবে এই সংসার হবে তাঁদের মিলিত সংসার।

ব্রজর পিতা পরিপূর্ণ আশ্বাস নিয়ে চোখ বুজলেন এবং নিজের পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করে কারবারটা মিত্তিরের নামেই লেখাপড়া করে দিয়ে গেলেন। মিত্তির যে ব্রজর পাণিগ্রহণ করবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাঁর ছিল না। সন্দেহ ছিল মিত্তিরের মনে। মিত্তির বুঝেছিলেন কোথায় ফাটল ধরেছে। তাঁরই সহকর্ম্মী দত্ত অলক্ষ্যে সৃষ্টি করেছিলেন ফাঁক। সেই ফাঁকই একদিন বৃহৎ হয়ে মিত্তিরকে দূরে সরিয়ে দিল। ব্রজর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটুও অশান্তি তুললেন না মিত্তির। অবশ্য আপত্তি তুললে এমন কেউ ছিল না তা খণ্ডন করে। দত্তর কেমন চক্ষুলজ্জা ছিল—সে একদিন ব্রজকে নিয়ে অন্তর্হিত হ'ল। মিত্তিরের চেষ্টায় দশ বছর বাদে ওরা ফিরে এল। একটি পুত্র আর একটি কন্যা সঙ্গে। কর্ম্মহীন দত্তের

তখন নিঃস্ব অবস্থা। মিত্তির শুধু তাঁর ঘর বেঁধে দিলেন না—জীবিকায় করলেন প্রতিষ্ঠিত। তবে একটি নিয়ম তিনি আজীবন পালন করে গিয়েছেন—ব্রজর সঙ্গে কোনদিন সাক্ষাৎ করেন নি। দত্তের বৈঠকখানায় এই আলোকচিত্রের সামনে বসে প্রচুর সান্ত্বনা পেয়েছেন মিত্তির। আসল মূর্তির সম্মুখীন হবার প্রয়োজন ঘটে নি। উভয়ের সাক্ষাৎকার হলে—ভালবাসার ক্ষেত্রে শুধু তাঁরই পরাজয় নয়, ব্রজরও অসম্মান যে। এই অসম্মান থেকে বরাবর বাঁচিয়েছেন ব্রজকে। শেষ দিন পর্য্যন্ত হয় ত তাই করতেন—যদি না বৃদ্ধ বয়সে দত্ত আপন কুৎসিত সন্দেহের দ্বারা এই নিরাসক্ত প্রেমকে পঙ্কিল করে তুলত। দত্ত নিশ্চয় ভালবাসত ব্রজকে না হলে এমন সন্দেহ কেন তার মনে জাগবে! মিত্তিরের প্রতিদিন হাজিরা দেওয়ার মূলে অবৈধ কিছু কল্পনা করে নেবেন কেন! মিত্তিরকে কিছু বলতে না পেরে ব্রজর উপর অত্যাচার আরম্ভ করল দত্ত। একদিন সে কথা পৌঁছল মিত্তিরের কানে। আর সেই দিনই যা ঘটল সেকথা গলির বাসিন্দা সবাই জানল। তার পরেও অত্যাচার বন্ধ হয় নি। ক্রমে তা অসহ্য হয়ে উঠল ব্রজর পক্ষে। ব্রজ দ্বিতীয়বার ঘর ছাড়ল—মিত্তিরের সঙ্গে কাশী এল। কিন্তু এ ঘর ছাড়ার মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা ছিল না—বিগত যৌবন নরনারী শান্তির আশায় কাশী এসে পৃথকভাবে বাসা বাঁধল। পৃথক হলেও পরস্পরের সঙ্গে নূতন করে যে পরিচয় হ'ল তাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রইল না আর। যৌবনে ব্রজ ভালবাসতে পারে নি মিত্তিরকে—হয় ত মিত্তিরের রূপ ছিল না বলে। প্রৌঢ়ত্বের শেষে মিত্তিরের আশ্রয়ে এসে সে ভালবাসা আর এক রূপে প্রকাশ পেল। তখন 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'র কাল শেষ হয়েছে, 'গুণে চিত ভোর' হবার কালও নয় সেটা। তবু দৃষ্টি আর আলাপ, সঙ্গ ও সুরের জগতে দু'জনকে নূতন করে ঘনিষ্ঠ করে তুলল। সেই পরিচয়ে কাটল আরও কয়েকটা বছর। তার পর? না তার পর কিছু নাই। পৃথিবী বিপুল, কালস্রোত নিষ্ঠুর। দুজনেই তাঁরা ভেসে গিয়েছেন খরস্রোতে। দুজনেই আজ তুচ্ছ হয়ে গেছেন, লুপ্ত হয়ে গেছেন।

খাতা বন্ধ করলাম। স্মৃতিতে ভেসে উঠল কলকাতা শহর এত দূরে থেকেও আমাদের গলিটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গৃহ-অরণ্যের মাঝখানে মিত্তিরবাড়ীটা অবশ্য চোখে পড়ছে না, তার লালরঙের চিলেকোঠার ছাদটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শুভ ১৩৬৫ সাল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তুমি লয়ে এস শ্রীভগবানের—
নূতন আশীর্ব্বাদ,
দাও অনাগত অমৃতের আস্বাদ।
আনো উন্নতি ক্রমশঃ বর্দ্ধমান,
সুস্থ সবল শুচি দেহ, পূতঃপ্রাণ—
আনো নব শুভ আবিষ্কারের
নিত্য সুসংবাদ।

২

আনো হে সিদ্ধি ঋদ্ধি তোমার
ও মণি-মঞ্জুষায়,
এ ভারত তব কালজয়ী দান চায়।
শীতে আনো তুমি সর্ব্ব মতের স্নেহ,
আতপে রামেশ্বরের আতপ দে'হ,
কর বিশুদ্ধ পবিত্র-কর
ভঞ্জন অপরাধ।

৩

তুমি যে নূতন হে অপরিচিত—
অবাজানো তুমি বীণা,
তোমার গায়েতে পড়েনি কালের চিনা।
কি রাগিণী তুমি বাজাইবে জানি নাকো
মানবজাতিকে দিব্য আলোকে ডাকো
আনো সারা পথে কুসুম ছিটায়ে,
সাধ আর আহ্লাদ।

নববর্ষ

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

চৈত্র রজনীর শেষ তারাগুলি মুদে,—
অতল গভীর কালো কালের বুদ্‌বুদে
দুঃসহ চেতনাসম নববর্ষ হাসে
সুপ্তিভগ্ন প্রত্যুষের আয়ত আকাশে
শিশু রবি জাগি উঠে আনন্দ-সুন্দর ;
লীলাচ্ছন্দে ছড়াল সে দিক দিগন্তর
আরক্তিম প্রভাতের রক্তিম সঞ্চয়।

সে আলোকধারাস্রোতে সারা সৃষ্টিময়
রাঙায়ে ভাসায়ে নিল বিচিত্র বন্তরে ;
প্রচ্ছায় অশথ তাই সুদূর সিন্দুরে
অস্পষ্ট স্মৃতির মত আজিকে দুর্লভ ;
ঘনায়িত বনানীর শ্যামল বিভব
আজ তাই মনে হয় দুরূহ আবেগে
কেঁপে মরে প্রভাতের আলোরাশি লেগে।
প্রাচীন দীঘির জলে এ আলোর হাসি
কাজল ঢেউয়ের তলে উঠিছে বিকাশি।
পৃথিবীর মানুষের বুক মুখ ঘেঁষে
সর্ব্বাঙ্গে লুটায়ে পড়ে কত ভালবেসে !

চৈত্ররজনীর আয়ু নহে ত অক্ষয়,—
তাই শুভ বৈশাখের প্রত্যুষ সময়
নববর্ষ জন্ম নেয় কালের পাথারে—
অনন্ত বুদ্‌বুদ রাশি যেথায় সাঁতারে
অলক্ষিত ভবিষ্যের তিমির জঠরে।
পৃথিবীর মানুষেরা ধীর যুক্তকরে
বন্দি উঠে নবজাত বরষের লাগি,
আতঙ্কে নিগূঢ় হর্ষে আশীর্ব্বাণী মাগি'—
চিরদুঃখী জীবনের কল্যাণকামনা।
বিগত বর্ষের কোটি কঠিন বঞ্চনা,
লক্ষ ব্যর্থ বাসনার প্রয়াস নিষ্ফল
প্রেমমুগ্ধ জীবনের কোটি হলাহল—
মুক্তি চায় মানুষেরা এ সবার হতে,
কল্যাণ মাগিছে তাই প্রমুক্ত আলোতে।
বর্ষব্যাপী জীবনের লণ্ডভণ্ড যাগ
রচিবে নূতন করে যেই মহাভাগ
তার তরে পৃথিবীর দুর্ভাগারা মিলে
বন্দনা পাঠায়ে দেয় অনন্ত নিখিলে।
সে বন্দনা ফিরে আসে—বোঝে না মানুষে,
নববর্ষ প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রত্যুষে
স্তব্ধ তীক্ষ্ণ একাকার অতীতের কোলে
ঘুমন্ত শিশুর মত পড়ে ঢলে ঢলে।
অতীতের গর্ভে এই ভাঙনের খেলা
চলিতেছে পলে পলে সুচির দু'বেলা।

মানুষ তবুও ভোলে নববর্ষদিনে
হতাশ্বাসে জীবনের জীর্ণ ঋণে ঋণে
কোথা যে চলিতে হবে দুঃস্থ ভাগ্যহত
অবসন্ন যৌবনের দুরাশার মত !
তবু যাচে নববর্ষে কালের আশিস্
ভিক্ষা মাগে করপুটে অমৃতের বিষ,
থেকে থেকে পরিম্লান হাসির কল্লোলে
মৃতকল্প বাঞ্ছাগুলি জিয়াইয়া তোলে—
নন্দিত এ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পসরা,
তবু চায় পরিতৃপ্তি শূন্য বুকভরা।
দুর্ভাগার ভাগ্যে কোথা সুখ অভিলাষ ?—
পলাতক যৌবনের ক্ষয়িষ্ণু উল্লাস
ভুলাইছে মানুষেরে পলকে নিমেষে।
চিরন্তন আনন্দেরে পাইতে নিঃশেষে
প্রতি নববর্ষটিরে গুণিছে অধীর
বর্ষ গুণি' গুণি' আজ মানুষ স্থবির।

শেষ চৈত্রদিবসের নিভে আসা আলো
মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে আজিকে জড়ালো
প্রত্যাসন্ন বিদায়ের অন্তিম আশ্লেষে !
আজি সন্ধ্যাতারাটির বুকখানি ঘেঁষে
সময়-তরঙ্গফেনা চূর্ণ হয়ে পড়ে !
কোন্ দূর কুঞ্জবনে সুরের লহরে
ঘুমভাঙা পাখী এক অবিশ্রান্ত ডাকে।
হয়ত জানায়ে দেয় আসন্ন বৈশাখে—
বলে—রাত্রিশেষে আসে নববর্ষ দিন,
দুর্ভাগা ভুলো না নব-জীবনের ঋণ !

সারেংহাটি কালভার্ট

'নিরঙ্কুশ'

পরেশ ঘরের ভেতর ঢুকল। নৃপেনের ছোট ভাই, কিছু দিন হ'ল ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে। রুক্ষ চুল, কালো ফ্রেমের চশমা, ছিপছিপে লম্বা চেহারা, ঘরে ঢুকেই তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য না করেই সুরু করল পরেশ, দাদা, আমায় বাইরে যেতে হবে।

সদর দরজা ত খোলাই, আর আজ্ঞাধীন নির্ভরশীল হয়ে পড়লে কেন? বাইরে যাবার জন্যে এর আগে কোনদিনই অনুমতি নিতে হয়েছে বলে ত মনে পড়ে না।

না, কলকাতার বাইরে যেতে হবে।

ও তাই বল, হঠাৎ?

না, হঠাৎ নয়, পার্টির কাজে।

হ্যাঁ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার বন্ধু সুনীল রায়—এ আমার ভাই পরেশ। পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলে ওরা।

সম্পর্কের কথা বলে অন্যায় করি নি ত? পরেশের দিকে তাকিয়ে রইল নৃপেন।

কেন, অন্যায় কিসের?

তোমরা ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের দাম দাও না।

না, ওকথা ভুল।

কেন, তোমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান আদর্শ রাজনৈতিক। অন্য কোন আদর্শ সেখানে ঠাঁই পায় না একথা ঠিক নয়?

আংশিক ভাবে বলা যায়।

তোমাদের রাজনৈতিক ছকে ফেলে তোমরা বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এমনকি মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক পর্য্যন্ত গড়ে নিয়েছ, বোধ হয় নিজেদের "থিওরী" মেলাবার জন্যে?

কিন্তু আমাদের "থিওরী" ভুল প্রমাণ করে নি কেউ।

থিওরী কোন দিন ভুল হয় না, তোমার মত ব্যাধিগ্রস্ত মনই তাঁকে আঁকড়ে ধরে জীবনের বহুমূল্যবান সম্পর্কগুলো অব্যবহার্য্য করে দেয়।

ওকথা তোমরা চিরকালই বলেছ দাদা, মানুষকে শোষণ করবার জন্যে মজদুরের পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে তাদেরই শেষ করেছ। কখনও ধর্ম্মের আফিং খাইয়ে, কখনও ছিটেফোঁটা দিয়ে ক্ষুধা বাড়িয়ে মজা উপভোগ করেছ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য কখনও অস্বীকার করা যায় না। শ্রেণীযুদ্ধে যারা এত দিন হেরে এসেছে সেই শ্রমিক এখন ধনিকদের হারাবে।

বাঃ, বেশ বলেছ পরেশ, তা হলে বৈজ্ঞানিক সত্য হ'ল শ্রেণীযুদ্ধ এবং তোমাদের মতে মোটামুটি দুটি দল শ্রমিক ও ধনিক, কেমন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আমার মতেও দু'দল—রুগী এবং ডাক্তার। বল্লালসেনের আমলে অবশ্য দল আরও বেশী ছিল—পূজারী, ব্যবসায়ী, ছুতোর, কুমোর ইত্যাদি। আবার দেখ বিশ্বপ্রেমিকেরা বলছেন মানুষ একজাতি। সুতরাং নিজের মত এবং ইচ্ছানুযায়ী যে কেউ মানবজাতিকে ভাগ করতে পারে আপত্তি কি? আর বৈজ্ঞানিক সত্য? যে কোন থিওরীর পেছনে এই একটা ছোট্ট কথা যোগ করে দিলেই কি ভাব জিনিসটার সত্যতা প্রমাণিত হ'ল?

না, তা নয়, তবে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সত্য প্রমাণিত হয় নি, মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবধারাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ও দার্শনিক ছিটেফোঁটায় এক অদ্ভুত খিচুরীর সৃষ্টি করা হয়েছে! তোমার মত গোঁড়া এবং অন্ধরা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য তৈরী করতে গিয়ে আরও জঘন্য স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা করেছে, আরও উগ্র এক দল শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত তারা উন্মত্ত হয়ে লণ্ডভণ্ড করে চলেছে আর তোমরা দূর থেকে দেখে বাহবা দিচ্ছো। ভুল স্বীকার করবার মত সৎসাহস তোমাদের নেই।

তুমি যে ইঙ্গিতটা করলে তা আমি বুঝতে পেরেছি দাদা, তবে দেশ শাসন করতে গেলে ও রকম একটু রক্তপাত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনেক জায়গায় তা হয়েছে।

তোমার মুখে শাসন কথাটা বড় বেমানান লাগছে পরেশ। অনেক জায়গায় রক্তপাত হয়েছে তা স্বীকার করি। তুমি হয় ত বলবে রাজনৈতিক কারণে সেটার প্রয়োজন আছে, আমি তা মানি না। মানুষের উপর মানুষের শ্রদ্ধা রাজনৈতিক মতবাদ দিয়ে মুছে ফেলা যায় না। মানুষকে যন্ত্রে রূপান্তরিত

করার চেষ্টা চলছে বটে, তবে তাতে সাফল্য লাভ করতে তোমরা পারবে না।

আমি তোমার কথায় আপত্তি করি দাদা! শ্রদ্ধা হারায় নি বরং তাঁদের আত্মসম্মান ফিরে এসেছে, নিপীড়িত নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর একটা বিশেষ অংশ ফিরে পেয়েছে আত্মচেতনা ও মর্য্যাদা।

তাই গলা দিয়ে কারো বেসুরো ধ্বনি উচ্চারিত হলে সে ধ্বনি শুদ্ধ করে দেওয়া হয়? আত্মসম্মান ও মর্য্যাদার ঐখানেই ইতি নাকি? না, না পরেশ, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী আদর্শকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করা বাতুলতা নয় শুধু, অন্যায়, পাপ।

তোমরা দাদা এতদিন পাপ আর পুণ্য নিয়েই রাজত্ব করে এলে।

আমার ভারতীয় ঐতিহ্য আমার থাক পরেশ, তার উদারতা বুঝবার মত ক্ষমতা তোমার আছে কিনা জানি না তবে এইটুকু জেনে রেখ আমাদের মন্ত্রে আছে:

মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী
মধুনক্তম্ উতোষসঃ
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতিঃ
মধুমান অস্তু সূর্যঃ,
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

তর্পণের সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা শুধু পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই না, মানবজাতি, জীবজন্তু এমনকি লতাগুল্মকেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। তার নাগাল পাওয়া তোমার পক্ষে শক্ত।

সুনীল অস্থির হয়ে পড়ছিল। ভাইয়েদের রাজনৈতিক মতবিরোধের বিষয়ে তার খুব ঔৎসুক্য ছিল না। সুনীল উঠে দাঁড়াল।

নৃপেন ব্যস্ত হয়ে বললে, বস, বস সুনীল, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

না, এবারে একটু যেতে হবে।

যাবে, এত ব্যস্ত কেন? হ্যাঁ পরেশ, তুমি যেও তবে একটা কাজ করতে হবে, মাসীমাকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

মাসীমা কোথায় যাবেন?

তীর্থ করতে, আপত্তি আছে নাকি? নৃপেন পরেশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা নিয়ে যাব। পরেশ মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাদার সঙ্গে তর্কের তার শেষ নেই। দাদাকে কোন জিনিস বোঝান শক্ত, পরেশ সে চেষ্টা করেও নি। তবে তর্ক করতে কেউই কম নয়। জিনিসটা বিরক্তিকর নয়, বরং লোভনীয়। পরিণতি নেই বটে, তবে উত্তেজনা আছে। নৃপেন তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত পরেশের যাবার পথে, তার পর হেসে সুনীলকে বললে, ভাবছি ছোকরার এর পরে উগ্রতাটা এই রকমই থাকবে কিনা?

কেন?

বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

সেকি, এত অল্প বয়সে?

মাসীমার ইচ্ছে, আর তা ছাড়া "সেফটি ভালভ" হিসেবে একটি সুন্দরী বউ ছোকরার পক্ষে ভালই হবে। ভাবী শ্বশুরও খুব জাঁদরেল। মাথার উপর ওর একজন জোরালো লোকের দরকার।

কে বল ত?

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জী, পুলিসে কাজ করেন বটে কিন্তু ভারী আমুদে লোক। তা ছাড়া মেয়েটিও সুন্দরী।

সুনীল নৃপেনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অতটা সময় বৃথাই নষ্ট হ'ল তার।

নাঃ, আর দেরী করা চলে না। রাস্তায় নেমে সুনীল মনে মনে সব ঠিক করে নিলে। হ্যাঁ টাকা আছে, তবে উপায়টা সহজ নয়, তা হোক জোগাড় তাকে করতেই হবে। না হলে হাসনু—

টাকা সুনীল রায় পেয়েছিল—প্রচুর টাকা।

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জিও পুলিস থেকে সেই টাকার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধেই খোঁজ করার ভার পেয়েছিলেন। কলকাতার নামজাদা একটা সার্কিট আপিস থেকে মোটা অঙ্কের একটা টাকা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিল।

ব্রজেশ্বর বাবু কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন—কেন বাবু, এই ত সেদিন কাঁকুড়গাছির কেস সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তাঁর কি একটু বিশ্রামের প্রয়োজনও নেই?

বউবাজারের বাসায় তিনি মোটা কালো থলথলে দেহটায় তৈলমর্দ্দন করছিলেন। মাথায় চুলের লেশ নেই, বিরাট টাক। বাঁ হাতের তালু দিয়ে তিনি সজোরে মাথাটা ঘষছিলেন, কখনও সোজা ভাবে, কখনও বৃত্তাকারে, কখনও বা তেরছা, তির্য্যক ভাবে। কবে যেন কোন্ মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলেন, মাথায় রক্তচলাচল ভাল হলে চুল হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত। বিয়ের পর থেকে এ পর্য্যন্ত তেইশ বছর

ধরে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিধিটি তিনি পালন করে এসেছেন, অবশ্য শেষের দিকে উদ্দেশ্যের কথাটা আর স্মরণ নেই, অভ্যাসটা কিন্তু থেকে গেছে। কাঁসার বাটিতে রক্ষিত তেল বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে নাসিকা-গহ্বরে চালান করে সজোরে নিশ্বাসের সঙ্গে তেলটুকু আত্মসাৎ করে নিলেন ব্রজেশ্বর বাবু।

তেল সম্বন্ধে তাঁর রীতিমত দুর্ব্বলতা আছে। জিনিসটির কার্য্যকারিতায় তিনি শুধু বিস্মিত নন মুগ্ধও বলা চলে। ব্যবহারিক জীবন থেকে সুরু করে চাকরী জীবন পর্য্যন্ত পদে পদে এটার দরকার। এমন অদ্ভুত গুণের যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না। একযোগে খাদ্য ও ওষধি, একসঙ্গে তীব্রতা ও মসৃণতা, লঘুতে সুপাচ্য, গুরুতে দুষ্পাচ্য আর সঙ্গী হিসেবে ত অপরিহার্য্য। চলৎশক্তির, তা যন্ত্রেরই হোক আর ব্যবসা, চাকুরী বা রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক একে পরম বন্ধুস্থানীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। পথ সুগম করে চিক্কন কোমলতা এনে দেয়, মন্থরতা অদৃশ্য হয়ে আসে নিরঙ্কুশ গতিবেগ, মোলায়েম নির্ভরতা।

ব্রজেশ্বর বাবুর চোখে জল এসে গেল। তৈলস্তবের গুণ-গরিমায় নয়, তেলটায় বেশ ঝাঁজ আছে, জবর রকম ঝাঁজ, এইটেই ত নিগূঢ় আনন্দ, পরম উপভোগ্য।

কলঙ্ক-ধরা তেলের বাটির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলেন, তার পর পায়ের নখগুলোতে নিপুণতার সঙ্গে সমান ভাবে তেল লাগালেন, নিখুঁত শিল্পীর ভঙ্গীতে তাঁর মোটা আঙুলটাকে সূক্ষ্ম তুলি বলে ভুল করা বাইরের লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। পায়ের নখে তেল দিলে যে চোখের জ্যোতি বাড়ে একথা তিনি জানেন। পাশ থেকে একটি পালক তুলে নিয়ে তৈলসিক্ত করে কানে দিলেন, তার পর পালকটা দুটি আঙুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলেন, আরামে চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল ব্রজেশ্বর বাবুর। "কানে কাঠি নাকে তেল মধ্যে মধ্যে খাবে বেল", বলতেন ভূপতি মাষ্টার। ছেলেবেলায় আরামবাগে থাকবার সময় ভূপতি মাষ্টার পড়াতেন ব্রজেশ্বর বাবুকে। ভূপতি মাষ্টার আজ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, তাঁর সেই শীর্ণকায় অবাধ্য ছাত্রটি তাঁর উপদেশ অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে কি পরিমাণে লুপ্ত স্বাস্থ্য উদ্ধার করেছেন।

বাবা!

কি রে বুড়ি?

ব্রজেশ্বর বাবুর মেয়ে কল্যাণী, শাড়ীটা কোমরে জড়ানো, বেশ লম্বা, কপালের কাছে একটা কাটা দাগ, ঠিক ভ্রূ দুটোর মাঝখানে। স্কুলের মেয়েরা তাকে ত্রিনয়নী বলত সেই জন্য। রংটা বেশ ফর্সা, ঘন কুঁচকানো লম্বা চুল। কল্যাণীকে ব্রজেশ্বর বাবু বুড়ী বলে ডাকেন।

এবারে ওঠ। বললে কল্যাণী।

এই উঠি আর কি!

না এখুনি ওঠ, মা রাগ করছে।

একটু আরাম করে তেলও মাখতে দিবি না।

দেড় ঘণ্টা ত হ'ল, ওদিকে রান্না সব কমপ্লিট।

প্রায় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন সুরমা দেবী শাড়ীতে হাত মুছতে মুছতে, কি গো হ'ল?

হ্যাঁ, এই যে যাই। মা বেটি একসঙ্গে তাগাদা সুরু করেছ আর কি রক্ষে আছে, একটু আরাম করে যে তেল মাখব তারও উপায় নেই।

রান্না হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।

কি রান্না করলে?

যা হুকুম হয়েছে তাই।

আহা বলই না ছাই, শুনি।

শুক্তো, কুমড়োফুল ভাজা, মুগের ডাল, আলু ভাতে, মাছের ঝোল, আর চাটনী।

আর পেঁপে ছেঁচকি? সেটা ভুলে গেছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেঁপে ছেঁচকিও করেছি—নাও ওঠ দিকি নি।

এই উঠি। আর দু'খানা অমনি পাঁপড় ভাজলে না কেন?

বেশ খেতে বস, গরম গরম ভেজে দেব'খন।

ভাজতে ভাজতে আবার চাখতে সুরু করো না যেন। একটু রসিকতা করলেন ব্রজেশ্বর বাবু। কল্যাণী একটু হেসে চলে গেল।

কি আক্কেল বল ত? অত বড় মেয়ে, তার সামনে এই রকম ঠাট্টা করতে একটু লজ্জা করে না? কিন্তু তাঁর গলার স্বরে রাগের আভাস থাকলেও ভাল লাগার ইঙ্গিতই অধিক পরিস্ফুট। তার পর একটু চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁ গা, ওখানে গেছলে?

হুঁ।

কি বললে?

ডাঃ নৃপেন মুখার্জ্জী মানে পাত্রের দাদার মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে।

ছেলে দেখে এসেছ ত?

না। আমতা আমতা করলেন ব্রজেশ্বর বাবু।

কেন? কোন কাজ যদি তোমার দ্বারা হয়। বিরক্ত হয়ে বললেন সুরমা দেবী।

কি করব বল, এদিকে আবার এক ঝামেলা।

কি আবার ?

ঘাড়ে আর একটা কেস চাপিয়েছেন সেমসাহেব। টাকা চুরির ব্যাপার।

তুমি বললে না কেন যে এখন তোমার সময় নেই।

তা বললে শুনছে কে ? এর নাম হ'ল চাকরী। তা যাই হোক খোঁজ অবশ্য সবই পেয়েছি, দু'একদিনের মধ্যেই মিটে যাবে বলে মনে হয়। খবরটা একটু পরেই বাসদেও নিয়ে আসবে হয় ত।

যাও, চান করে নাও। বললেন সুরমা দেবী।

সুবোধ বালকের মত ব্রজেশ্বরবাবু স্নানের ঘরে ঢুকলেন। পরিপাটি করে স্নান করলেন, তার পর আহার সেরে পানের ডিবেটি নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। কিন্তু বসতে না বসতে বাসদেও একটা মস্ত স্যালুট করে এসে দাঁড়াল। ব্রজেশ্বরবাবু তার মুখের দিকে তাকালেন।

হুজুর পাত্তা মিল গিয়া। বাসদেও বললে।

যাক বাঁচা গেল।

লেকিন হুজুর...

আবার কি ?

আজ ভাগে গা।

এই মরেছে, কোথায় ?

সাত নম্বর প্লাটফরম—ট্রেনসে কাঁহী যায়গা।

কথাটা শুনে ব্রজেশ্বর বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই শীতের রাতে একটা জুয়াচোরের পিছনে পিছনে পাড়ি দিতে হবে নাকি ? কিন্তু উপায় কি, কথায় বলে চাকরী !

ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি এখুনি হেড আপিসে যাচ্ছি।

বাসদেও স্যালুট করে চলে গেল।

সুরমা যখন ঘরে ঢুকলেন, ব্রজেশ্বর বাবু তখন জামা-কাপড় প্রায় পরে ফেলেছেন।

অবেলায় আবার কোথায় বেরুচ্ছ ?

হুঁ, চাকরীর আবার বেলা আর অবেলা। ব্রজেশ্বরবাবুর কথাটা অনেকটা কান্নার মত শোনাল। একটা জোচ্চরের পিছনে এখন ধাওয়া করে মরি !

কোথায় ?

রিপোর্ট পেলাম ত ট্রেনে করে বাইরে যাচ্ছেন।

সেকি, তোমাকেও যেতে হবে নাকি ?

তা হয় ত হবে।

তা হলে কল্যাণীর বিয়ের কি হবে ?

ফিরে আসি, তার পর।

ক'দিন লাগবে ?

বামালসুদ্ধ ধরা পড়লে দু'একদিনেই ফিরতে পারব।

আমি এদিকে বিকেলের জন্য একগাদা কড়াইশুঁটির কচুরী আর আলুর দম করে রেখেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তা হলে এক কাজ কর না ..

কি ?

টিফিন কেরিয়ারে দিয়ে দাও, ট্রেনে ধীরে সুস্থে খাওয়া যাবে'খন।

ব্রজেশ্বর বাবু যখন ৭নং প্ল্যাটফরমে এসে পৌছলেন তখন ট্রেন ছাড়তে আর বেশী দেরী নেই, পিছনের দিকের কোন কামরায় জায়গা নেই, সুতরাং এগিয়ে চললেন তিনি। মেদ-বহুল দেহটা যতদূর সম্ভব দ্রুত চালান যায় তার চেষ্টা করলেন। অবশেষে একটা জায়গা পেলেন। সুটকেস, বেডিং আর টিফিন কেরিয়ারটা সযত্নে বেঞ্চির তলায় রেখে দিয়ে ব্রজেশ্বর বাবু প্ল্যাটফরমে নামলেন। অদূরে বাসদেও দাঁড়িয়ে, সেও সঙ্গে যাচ্ছে। ট্রেনের পিছনের দিকে বিজয়সিংহ জায়গা পেয়েছে। দেহরক্ষী হিসাবে ব্রজেশ্বর বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই সে থাকে। কালো, লম্বা, অনেকটা কুস্তিগীরের মত চেহারা। চকিতে বাসদেও তাঁকে ইশারা করলে। এতক্ষণ পর আসামীকে দেখতে পাওয়া গেল, লোকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে, পরনে কালো আচকান ও পায়জামা, মাথায় একটা মুসলমানী ধরণের কালো টুপী। ঘুরে দাঁড়াল—বাঃ, চমৎকার চেহারা ত, বাঙালী না কাশ্মীরী ? নাম ত সুনীল রায়। হ্যাঁ, জামাই করবার মত চেহারা বটে ! পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে গেল সুনীল রায় একজন পলাতক আসামী। দরকার নেই বাবা চেহারার।

বুড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। ডাঃ নৃপেন মুখার্জ্জির ভাই কেমন দেখতে কে জানে। একবার দেখে এলেই হ'ত। যত সব ঝক্কি ঝামেলা। পাশ দিয়ে একটা লোক হনহন করে চলে গেল। মোটা থপথপে চেহারা, কিন্তু জামার বাহার দেখবার মত। লোকটা বড় বড় রঙীন হরিণ মার্কা হাওয়াই সার্ট, আর একটা নীল রঙের প্যাণ্ট পরে রয়েছে, বয়স তার চেয়ে কম নয়, কিন্তু সাজের ঘটার কমতি নেই।

ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় সুনীলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছিল।

ব্রজেশ্বর বাবু নিজের জায়গায় গিয়ে জুত করে বসলেন। পানের ডিবে থেকে দু'খিলি পান আলগোছে মুখে দিলেন, সঙ্গে এক চিমটে জরদা ক্রমাগত চিবোতে লাগলেন। চিবুক আর থুৎনীর মাংসপেশীগুলো একযোগে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত

হতে লাগল—মুখ-গহ্বরের গ্রন্থিগুলো কাজ সুরু করল। সরস হয়ে এল তাঁর মন ও মুখ। একটা তৃপ্তির আবেশ এল তাঁর মুখের ভাবে।

মেজর কল্যাণ সুন্দরম্ কিন্তু লক্ষ্য করলেন, রেবা যেন প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কাজ করে চলেছে। নতুন কেসটারই ভার নিয়েছে সে। নানা ভাবে চেষ্টা করছে মৃত-প্রায় লোকটাকে টেনে আনবার জন্য। চাঞ্চল্য নেই, বরং একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা এসেছে ওর কাজের মধ্যে।

আপনার কাছে এট্রোপিন-মরফিন আছে? একজন ধূলিধূসর পোশাকে রিলিফ ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজর কল্যাণ সুন্দরম্ তার দিকে একবার তাকালেন, কেন?

একটা স্প্লিনটার ঢুকেছে এ্যাপিগাষ্ট্রীক রিজিয়নে। আমার কাছে এ্যাম্পুল নেই।

আপনি কি ডাক্তার?

হ্যাঁ, আমার নাম বলাই পালচৌধুরী।

ওঃ, চলুন।

মেজর কল্যাণ সুন্দরম একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ডাঃ পাল-চৌধুরীর সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

নাঃ, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, রেবা যেন অস্থির হয়ে উঠল, এখন কি করবে সে? কাছে যা ছিল সবই ত দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সে এত চঞ্চল হচ্ছে কেন? ও ত একটা রোগী, তাকে চিকিৎসা করছে সে, সেবা করছে। আর একটা ইনজেকশন দিলে রেবা। কপালের পাশ থেকে রক্ত পড়ছে—অনর্গল, ফোঁটা ফোঁটা করে, তিল তিল করে বেরিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে প্রাণশক্তি। ব্যাণ্ডেজটা ভিজে গেছে, চিবুকের পাশে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা শুকিয়ে রয়েছে। কালচে রঙের রক্তের রেখাটা ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে গেছে। চোখ দুটো আধ-বোজা, শ্বাস পড়ছে বটে কিন্তু কখনও বা দ্রুত ঘন ঘন, কখনও-বা স্তিমিতপ্রায়। পালসটা রেবা একবার দেখল, এত দ্রুত যে, গোনা সম্ভব হ'ল না। মাঝে মাঝে যেন অনুভবই করা যাচ্ছে না, আর একবার তাকালে রেবা—লোকটার ঠোঁট দুটো কাগজের মত ফ্যাকাসে! ঘোলাটে চোখ দুটো খুলে তাকাল লোকটা, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে যেন রেবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কে?

আমি নার্স। উত্তর দিলে রেবা।

না না, বল তুমি কে, বল। আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল কমলাকান্ত।

আমি, আমি রেবা। থরথর করে কাঁপছে রেবা, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে যেন সে, আশপাশের জিনিসগুলো সচল হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে যেন তার চতুর্দ্দিকে।...

ঝন্...ঝন্...ঝন্...। তৃতীয় বগীর চাপাটা আটকে ছিল।

এইবার ক্রেনে করে সেটা তোলা হচ্ছে। আসগরের হাতের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠেছে। কালিমাখা মুখের ওপর আলোর সতেজ রশ্মি এসে পড়েছে। কপালের শিরা-গুলো ফুলে উঠেছে। হাঁফেজ—চীৎকার করলে আসগর। লোহার ফ্রেমটা যেন প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিচ্ছে। এত দিনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা জোর করে ছিঁড়ে দিচ্ছে ওরা...।

কড়...কড়...কড়...কড়াৎ...। জোর করে সম্পর্ক কি ছিন্ন করা যায়?

রেবা আবার তাকাল লোকটার দিকে। হ্যাঁ, সেই লোক, কোন ভুল নেই। ভেবেছিল জীবনে আর কোন দিনই তার সঙ্গে দেখা হবে না। সযত্নে যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, শেষ সময় আবার তার কাছেই ফিরে এল কি করে? এ আবার সম্ভব না কি। ঘোলা ঘোলা চোখে এখনও তাকিয়ে আছে কমলাকান্ত রেবার দিকে। আঃ, কি শান্তি! আবার এত দিনের হারানো রেবা ফিরে এসেছে। তার এত কাছে! এ যে বিশ্বাস করা যায় না। কত দিন দেখি নি ওকে, ভাবছে কমলাকান্ত, থুতনির কাছে সেই পরিচিত আঁচিলটা যেন জলজল করছে। কিন্তু এ কোথায়? জায়গাটা ঠিক পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না ত? এত কলরোল কিসের? কর্কশ একটানা বজ্রনির্ঘোষ কেন? ওকি এত অন্ধকার হয়ে এল কেন? রেবা, রেবা, তুমি কোথায়? তোমায় আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কমলাকান্তের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল রেবা—ভেঙে পড়ল আকাশচুম্বী পর্ব্বত প্রচণ্ড আলোড়নে, সমুদ্রের হুঙ্কার-গর্জ্জনে সব চাপা পড়ে গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তলিয়ে দিলে রেবাকে।

কতবার তাকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হ'ল? নত-জানু হয়ে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কতবার তাকে ভূমি চুম্বন করতে হ'ল, সেবারও এই কমলাকান্তকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। রেবাদের প্রাচীনপন্থী পুরাতনধর্ম্মী সংসার ও সমাজ তার এবং কমলাকান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, মিলতে দেয় নি তাদের...

কমলাকান্ত বসেছিল চুপ করে, সামনে রেবা দাঁড়িয়ে।

কিন্তু রেবা, তোমায় ওরা জোর করে বিয়ে দেবে অন্য লোকের সঙ্গে?

হ্যাঁ কমল।

কিন্তু তুমি, তুমি কি বল রেবা ?

আমার বলার কিছু নেই, আমার যে কেউ নেই কমল।

আমি ত রয়েছি রেবা, চিরদিন তোমার পাশে থাকব। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির কি দরকার আছে ?

কমল, জীবনের সঙ্গে ভালবাসার শক্রতা আছে, তাই ভালবাসার জিনিস মিলিয়ে যায়, তলিয়ে যায় ঢেউয়ের দোলাতে—

জীবন নেই রেবা, আছে শুধু প্রান্তরের গান, মনভোলানো ছন্দ। ঢেউ নয় রেবা, মত্ততা নয়, প্রচণ্ডতা নয়, উচ্ছ্বাস নয়, বেগ নয়, আছে শুধু শান্ত গোধূলি আর হিমছোঁয়া শ্বেত শতদল।

আমি কবি নই কমল, তোমার মত চিন্তাশক্তি নেই, তাকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে কাল কাটাতে পারব না। তোমায় পেতে গেলে আমার আর একটা দিক ভেঙে যাবে, মুছে যাবে। তুমিও আমায় সবটা পাবে না।

কিন্তু তোমায় আমি হারাব না রেবা, তোমায় বিয়ে করতে না পারলেও তুমি আমার···।

ও কথায় আমি শান্তি পাব না। আমি বাস্তব চাই, সম্পূর্ণতা চাই, দুঃখ হাসি, রোগশয্যার পাশে ক্লান্তিহীন রাত্রি, ক্ষুধায় খাদ্য—স্বপ্নের কুহেলী নয়, কথার মালা নয়।

রেবার বিয়ে হয়েছিল ননীবাবুর সঙ্গে। ননীবাবু উকিল, মোটা বেঁটে লোকটি, দেখলেই মনে হয় ভালমানুষ। বিয়ের পর রেবাকে নিয়ে তিনি মালদহে চলে গেলেন। নতুন করে নিজের মনকে তৈরী করতে সুরু করলে রেবা। সংসারের মাঝখানে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিল সে। স্বপ্নের দেশ যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। জানালার ধারে রেবা দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার ওপারে, সামনে হারু ছুতোরের কারখানা। লোকটা কি কাজই না করতে পারে। শুকনো কঙ্কালসার দেহ, কিন্তু সমানে কাজ করে যায়। কিসের অনুপ্রেরণায় কে জানে!

জানালার ঠিক তলায় কাঁচা নর্দ্দমা। একবার তাকিয়ে দেখল রেবা সেই দিকে—নর্দ্দমাটার পাশে দু'তিনটে কচুগাছ-বড় বড় ঘন সবুজ পাতাগুলো ছত্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে। নর্দ্দমার জলটা কর্দ্দমাক্ত। একটা শালপাতা জলের ওপর ভেসে আসছিল, নর্দ্দমার বাঁকের মুখেতে আটকে গেল। জলটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, শুকনো শালপাতাটারও যেন জলের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা কিন্তু পারছে না, মাঝে মাঝে নড়ছে বটে কিন্তু গতিহীন।

হঠাৎ নিজের কথা মনে হ'ল রেবার। সেও যেন ওই শালপাতাটার মত আটকে আছে, কে যেন তাকে বাঁকের মুখে ধরে রেখেছে।

কি গো, কার ধ্যান করছ ? ননীবাবু কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বাঘের থাবার মত একটা লোমশ হাত রেবার কাঁধের উপর রাখলেন।

না! এমনি দেখছি। বলল রেবা।

মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই।

আমি কি মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করি শুধু ?

না, তা অবশ্য কর না কিন্তু মাঝে মাঝে অবাধ্য হও, তাতেই মা রেগে যান।

তোমার মায়ের সব কথা শোনার মত নয়।

হ্যাঁ, সে আমি জানি, তা হলেও যত দূর সম্ভব মানতে হবে।

সে উপদেশ দিনের মধ্যে আর কতবার দেবে ?

লক্ষ্য করেছি মায়ের পক্ষে কোন কথা বললেই তুমি অনর্থক রেগে যাও।

মায়ের পক্ষে সব সন্তানেরাই কথা বলে, তাতে কেউ আপত্তি করবে না।

তোমার মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে রেবা যে, স্ত্রীর কথা শুনেই প্রত্যেক লোকের চলা উচিত।

না, ও বিশ্বাস আমার নেই, আর ওটা কোনস্ত্রীরই কাম্য নয় বলে আমি মনে করি।

আচ্ছা একথা বোঝ না কেন রেবা যে, মা বুড়ো হয়েছেন, আর ক'দিনই বা আছেন, তার মনের মত চলতে আপত্তি কি ? মাও সুখী হন, সংসারেও শান্তি আসে।

সংসারে শান্তি আসা সম্ভব নয়।

কেন ? যেন অবাক হয়ে গেলেন ননীবাবু।

কারণ তোমার মা আমায় পছন্দ করেন না।

এ আর নতুন কথা কি বললে, বাংলা দেশের শাশুড়ীরা চিরকালই পুত্রবধূদের খুব ভাল চোখে দেখেন না।

অন্ততঃ ভদ্র ব্যবহারটা আশা করা চলে ত ?

সেটা উভয়তঃ।

আমার ব্যবহার খারাপ নাকি ?

হ্যাঁ।

কি রকম ?

আজই তুমি মায়ের অবাধ্য হয়েছ, ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় উঠেছিলে কেন ? জান মায়ের গঙ্গাজল আছে, ও দাওয়াতে উঠলে মায়ের রাগ হতে পারে।

সেটা আমি জানব কি করে, গঙ্গাজল ত ওখানে থাকে না।

ঐখানেই ত বিচারবুদ্ধি, ঐখানেই ত পাওয়ার অব অবজারভেশন। ননীবাবুর দুটো ভ্রূ কয়েকবার ওপর-নীচ করল,

এই ত সেদিন সেখ মন্টু আলীর কেসে আমি বললাম, 'ইওর অনার' আসামীর বাঁ চোখ খারাপ। হাকিম ত অবাক। বুঝিয়ে দিলাম, চিঠিটা পড়বার সময় সে ডান চোখ দিয়ে পড়েছে। একেই বলে 'পাওয়ার অব অবজারভেশন'। ননীবাবুর স্ফীত উদরের চর্ব্বির উপর তরঙ্গ খেলে গেল। মোটা নাকের পাশ দিয়ে শ্লেষ্মামিশ্রিত নস্যের ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে আসছে। রেবা একবার তাকিয়ে দেখল স্বামীর দিকে, মনের মধ্যে হঠাৎ যেন সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। কতকগুলো কৃমি যেন কিলকিল করে দুর্গন্ধ নর্দমাটার ভিতর থেকে উঠে আসছে।

বৌমা! সুহাসিনী দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের পরেই মা।

কি মা?

সারা সকাল কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে বাছা, গেরস্তের সংসারে, একি অলুক্ষণে কথা!

কেন মা, আমি ত···

থাক। বাধা দিলেন সুহাসিনী দেবী, তোমায় আর কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না—কাজের মধ্যে জানালার ধারে দাঁড়ান, নয় ছাদে ঘুরে বেড়ান।

না মা, আজ শরীরটা ভাল নয়। একটা অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করে রেবা।

তোমরা কলকাতার মেয়ে মা, তোমাদের শরীরটা বড়। এই যে আমার বোন, যখন বেঁচে ছিল, এই ত সেদিনের কথা, ঘরে নৃপেন, ওর ছেলে অত বড় ডাক্তার, তবু কোনদিন শরীর খারাপ উচ্চারণ করতে শুনি নি। যাও, স্নান করে এসে রান্নাঘরে যাও। ননীকে আবার কোর্টে বেরোতে হবে। সুহাসিনী দেবী নিষ্ক্রান্ত হলেন।

জানালার ফাঁক দিয়ে নর্দমাটা একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রেবা—সেই শুকনো শালপাতাটা এখনও বাঁকের মুখে আটকে রয়েছে।

কমলাকান্ত কিন্তু আটকে রইল না, জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে, তার কাব্যপ্রীতি যেন বেড়ে গেল অকস্মাৎ। প্রতিশোধের তীব্রতা দিয়ে যেন সে সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করলে। রেবার মত কমলাকান্ত কিন্তু ভোলবার চেষ্টা করে নি, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই তা সে জানে—মনের দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণের কথাও ভাবে নি সে, কারণ কমলাকান্ত জানে ক্ষতির দুঃখ মনে পুঞ্জীভূত করে রাখলেই সে ক্ষয় হয়ে যাবে। ভালবাসতে ভুলে যাবে, স্নিগ্ধ শ্যামলিমা অন্তর্হিত হবে। বনমর্ম্মর নিস্তব্ধ মূক হয়ে যাবে। বটের ছায়ায় আর রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাবে না। বুনো ঘাসের উপর জোনাকীরা আর আসবে না। না! শেষ সে হবে না, জীবনের শেষ নেই তা সে অনুভব করে। ভালবাসার কি ইতি আছে? ঊষর মরুতে সে যে কাঁটাগাছ হয়ে বেঁচে আছে। সৌখীন অর্কিডের মত নয়। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের দরকার হয় না। সঞ্জীব দত্ত আর এষাকে কমলাকান্ত চেনে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ে ওরা। ওদের মধ্যেও পরিপূর্ণতা এল না! বেশ মেয়ে এষা। কিন্তু রেবার মত নয়। রেবা অত বেশী লেখাপড়া শেখে নি বটে, কিন্তু মনের সজীবতা এষার চেয়ে অনেক বেশী। এষা আর সঞ্জীবের ভালবাসার কত গল্প রেবাও শুনেছে তার কাছে।

বেচু দত্ত ষ্ট্রীটের অন্ধকার গলির ভেতর সেই পুরনো মেসটায় কমলাকান্ত এখনও থাকে। ধূলিধূসর মলিন পরিবেশ কিন্তু বেশ আছে সে। না, কারও বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। কারণ আদর্শের গুমোটে তার মন বদ্ধ নয়। পৃথিবীর বৈচিত্র্যে তার রসপিপাসু মন ভরে আছে। কিছুই তার হারায় নি। সেদিনের বকুল ঝরা সন্ধ্যায় যে অপরূপ সঙ্গীতধারায় তার মন অভিষিক্ত হয়েছিল, তার ছন্দের ছোঁয়াচ, তার স্নিগ্ধমধুর আবেশ এখনও তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেচু দত্ত ষ্ট্রীটের মেসের কামরাটা ছেড়ে কমলাকান্ত কোথায়ও যেতে চায় না। সে নিজে স্বয়ম্ভু, পরিপূর্ণতা এসেছে ওর জীবনে।

বালিশের ওপর মাথা রেখে তাকিয়ে থাকে কাঠের পার্টিশনের দিকে। ঐ টিকটিকিটা তার খুব পরিচিত। কাটা কাটা দাগ লেজের কাছে, ক্রীম রঙের দেহ। তাকে যেন চেনে বলে মনে হয়। তার আসার অপেক্ষায় যেন উন্মুখ হয়ে থাকে।

তালাটা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে কমলাকান্ত প্রথমেই দেখে নেয় টিকটিকিটা কোথায়, রোজ প্রায় এক জায়গায়ই থাকে—পার্টিশনের কোণে, গলাটা দেহ থেকে ঊর্দ্ধদিকে তুলে তাকিয়ে থাকে। কালো ছোট ছোট গোল চোখ দিয়ে তাকে যেন নিরীক্ষণ করে দেখে। হলদে এ পার্টিশনের রঙের সঙ্গে টিকটিকির ক্রীম রঙের বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে তা সে লক্ষ্য করেছে।

কমলদা! পার্টিশনের ওপার থেকে সুকুমারের গলা শোনা গেল। সুকুমার সিটি কলেজে বি এস্‌সি পড়ে। কমলাকান্তর একজন বিশেষ ভক্ত, মানে গুণমুগ্ধ ভক্ত বলা চলে। কমলাকান্তর লেখা কবিতা, প্রবন্ধ সব তার প্রায় কণ্ঠস্থ।

কে, সুকুমার?

হ্যাঁ, দাদা আমি। আপনার বইটা বেরিয়েছে আজ ?

কবিতার বইটা ?

হ্যাঁ, ঐ যে উর্ম্মিমুখর ? অদ্ভুত হয়েছে। সুকুমারের স্বরে উৎসাহের দীপ্তি।

ছবিটা, না ফ্রেমটা ? হেসে উঠল কমলাকান্ত।

না না। ঘরের ভেতর ঢুকল সুকুমার—শীর্ণকায় যুবক, অত্যন্ত সাধারণ, কৈশোরের কোমলতার সঙ্গে এখনও ছেলে-মানুষী ভাব ফুটে আছে ওর মুখে চোখে।

প্রত্যেকটা কবিতা আমার ভাল লেগেছে কমলদা।

কেন ভাল লাগল বলত ?

তা ত জানি না—

আমি কিন্তু জানি ?

কি ?

প্রেমে পড়েছ বোধ হয়। মজা দেখবার জন্য বললে কমলাকান্ত।

কি যে বলেন কমলদা! কানের পাশ লাল হয়ে ওঠে সুকুমারের।—হ্যাঁ, আপনি সাহিত্য সম্মেলনে যাবেন না ? তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে সুকুমার।

হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত ছাড়লে না, যেতেই হবে।

আমিও যাব কমলদা।

পাগল নাকি, এক মাস বাদে পরীক্ষা, ভুলে গেছ ?

ক'দিন আর লাগবে। অনুযোগের ভঙ্গীতে বললে সুকুমার।

না, তোমার যাওয়া সম্ভব নয় সুকুমার—তোমার কমলদা তোমায় ভবঘুরে করতে চায় না নিশ্চয়ই।

ভবঘুরেরাই ত জীবনের সবটা দেখতে পারে, দুঃখ আর সৌন্দর্য্যের স্বাদ পায়।

সময় হলে সবই পাবে, এত ব্যস্ত কেন ? আশ্বাস দেয় কমলাকান্ত।

ক্রমশঃ

ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা

শিবনাথ শাস্ত্রী

[আমার ভক্তিভাজন শ্বশুর দেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে একটি রোজনামচায় তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রার্থনাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার কিছু অংশ "ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা" নামে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশের কতকটা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই ভগভক্ত অকপট খাঁটি মানুষটির আত্মপরীক্ষার ভিতর দিয়া, যে সত্য, তাঁহার অন্তরে উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা যদি বর্ত্তমান সময়ে কাহারও প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে তাহা হইলে আমার এই প্রয়াস সার্থক জ্ঞান করিব। শ্রীঅবন্তী দেবী।]

৩১-৮-৮৮ আজ প্রাতে উপাসনাটি বড় মিষ্ট লাগিল। মনে কতই ইচ্ছা হইতেছে যে এবার গিয়া নূতন আত্মোৎসর্গের ব্রত লইয়া কাজ করিতে হইবে। দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ক্ষেপাইতে না পারিলে চলিতেছে না। কিন্তু ক্ষেপায় কে ? যে ক্ষেপা সেই ক্ষেপাইতে পারে; একজন ঈশ্বরের প্রেমাগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিলে, আর দশজনের করিবার ইচ্ছা হয়। আমাকে জগদীশ্বর যতটুকু শক্তি-সাধ্য দিয়াছেন, সেইটুকু তাঁর কাজে লাগাইতে পারিলেই হইল। আপনার অবিশ্বাস ও দুরবস্থার কথা স্মরণ হইয়া এক এক সময় বড়ই লজ্জা হয়। ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছে, কিন্তু তদুপরি নির্ভর করিতে পারি না, নিজের অযোগ্যতাই বার বার মনে হয়, এবং তাহাতে মলিন করিয়া ফেলে। তাঁহার কৃপাকে ধরিবার জন্য এবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তিনি আমাদিগকে নবজীবন দিবেনই।

Matlock Bridge

৩-৯-৮৮ বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস পীড়িত হইয়া এখানকার Smedley's Hydropathic Establishment-এ আছেন। তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। কয়দিন মন উদ্বিগ্ন থাকাতে দৈনিক লিপি লিখিতে পারি নাই। কল্য হইতে তাঁহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, আমার মনটাও একটু প্রসন্ন আছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, পীড়া আপাততঃ শক্ত নহে, কিন্তু তাঁহার পিতার যক্ষ্মা হইয়াছিল, সুতরাং চিন্তার বিষয় আছে। তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল, শরীরের ভার আধ মণের অধিক কমিয়া গিয়াছে এইটাই চিন্তার বিষয়। এখন ভালাভালি তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে হয়।

গত মেইলে শরৎ লাহিড়ীর (সাধু রামতনু লাহিড়ীর পুত্র প্রসিদ্ধ

পুস্তক ব্যবসায়ী এস. কে. (লাহিড়ী) এক পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। তাহাতে জানিলাম যে আমার সম্পাদিত রঘুবংশ কাটিতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার প্রতি বঙ্গীয় পাঠক সমাজের খুব আদর ছিল; এখন দেখিতেছি তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে বিদ্বেষ বাড়িতেছে, তাহা আমার উপরে সংক্রান্ত হইয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমার মানসিক শক্তিরই বা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়েছে, এখন যাহা লিখিতেছি তাহা তত উৎকৃষ্ট হইতেছে না। আমাদের দেশের সাধারণ নিয়মই এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালীগণ যৌবনকালে বুদ্ধি ও প্রতিভার নানাপ্রকার নিদর্শন প্রদর্শন করে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা হ্রাস হইয়া যায়, অবশেষে মানুষটা যদি বাঁচিয়াও থাকে একজন সামান্য ব্যক্তি হইয়া থাকে। তাহার যৌবনের কার্য্যের সঙ্গে প্রৌঢ়াবস্থার কার্য্যের কোন তুলনাই হয় না। আমারও সেই দশা ঘটিতেছে নাকি?

বিগত দুই বৎসর হইতে আমি যেন আমার মননশক্তি হ্রাস হইতেছে, একটু একটু অনুভব করিতেছি। সেইজন্য বিগত কয়েক বৎসর এইরূপ সময়ে কার্য্য হইতে বিদায় লইয়া জুয়লজিক্যাল গার্ডেনে গিয়াছিলাম।

এই বড় দুঃখ যে, কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা, মানব ও ঈশ্বরের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা, নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে প্রবল রহিয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগের শক্তি ও মানসিক বল অস্তগমনোন্মুখ হইয়েছে। এখন দেখিতেছি বিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়, আমাদের দেশের এই নিয়ম; এ দেশে দেখিতেছি ত্রিশ বৎসরের পর জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চল্লিশের পরের দশ বৎসর, চল্লিশের আগের পাঁচ বৎসরের সমান।

এখন আর ভাবিলে কি হইবে? সবলেই হউক, দুর্ব্বলেই হউক, আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টা এবং ঈশ্বর ও মানবের সেবা-ব্রত বিফল হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। দেহ-মনে যে শক্তি থাকিবে তাহা সমগ্র তাঁহার কাজে দিতে পারিলেও যথেষ্ট। তাহাত আমরা দিতেছি না। আমাদের শক্তি সাধ্যে যতদূর হওয়া সম্ভব তাহা ত হইতেছে না। আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা ত করিতেছি না। "আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল" মৌখিক একটা কথা আছে; তাহাই ত অনেক পরিমাণে আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আমাদের শক্তি সকল সমাজের সেবায় লাগিতেছে না। বৈরাগ্যানল ভাল করিয়া জ্বলিতেছে না। প্রেমের প্রবলতার অভাবে হৃদয়গুলি একীভূত হইতেছে না।

আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন; যাহারা আমাদের সকল দলের বন্ধন রজ্জুর সমান হইবেন। তাঁহারা সকল দলের আশঙ্কা ও চেষ্টার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন, সকল দলের অভিসন্ধি ও কার্য্যের প্রতি আস্থাবান হইবেন, সহিষ্ণুতা উদারতা ও প্রেমের সহিত সকল দলের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রকৃত উদারতার অভাবে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, কেশব বাবু "সমদর্শী" দলের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না বলিয়া আর একটা পৃথক দল হইয়া গেল। বিজয় বাবুর দলের ও অপরাপর দলের প্রতি আমরা যদি সেইরূপ ব্যবহার করি, তবে কালে আমাদিগকেও সাজা পাইতে হইবে। সমাজের মধ্যে অনুদার অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণচেতা লোক সকল সময়ে থাকিবেন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে এই সকল লোককে দাবাইয়া রাখিতে হইবে।

আর একটি চিন্তা কয়েক দিন মনে উদিত হইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে এক গুরুতর বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এরূপ বোধ হইতেছে। তাহারা পার্লিয়ামেণ্টারিজম-এর পরিবর্ত্তে প্রেসিডেণ্টালিজম চায়। অর্থাৎ দশজনের হাতে রাজশক্তি বিভক্ত হইয়া না থাকিয়া একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষের হাতে কিছু অধিক শক্তি থাকে ইহাই প্রার্থনীয় মনে করে। General Boulanger,(১) এই মতের পরিপোষক ও তাঁহার জয় দেখা যাইতেছে। পার্লিয়ামেণ্টারিজমের দরুণ কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা সমুদায় জানি না কিন্তু লোকে অনিষ্ট হইতেছে ভাবিতেছে। ইহা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিছু উপদেশ লইবার আছে; আমাদেরও কার্য্যশক্তিকে ঘনীভূত করা উচিত। অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের ভার পাঁচজনের হাতে থাকাতে দুর্ব্বলভাবে চলিতেছে, তাহা দুই একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহাদিগকে খুব স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রেসিডেণ্ট যিনি, তিনি নামমাত্র একজন কর্ম্মচারী, তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই; এমন একটা প্রেসিডেণ্ট না থাকিলে আমাদের কোন কার্য্যের ক্ষতি হয় না। হয় এই পদ তুলিয়া দেওয়া ভাল, নতুবা সভাপতিকে বাস্তবিক কোন কাজ দেওয়া উচিত।

৬-৯-৮৮ গতকল্য লণ্ডনে ফিরিয়াছি। একটা বাঁধা নিয়ম একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, ছেঁড়া মালার ন্যায় মনের চিন্তাও ভাব-সকলকে কুড়াইয়া আবার বাঁধিতে দেরী হয়। একভাবে চলিয়াছিলাম হঠাৎ দুর্গামোহন বাবুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া যাইতে হইল। কয়েক দিনের জন্য মনের চিন্তা ও ভাব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এইজন্যই বোধ হয় তেমন সুন্দর স্থানে কয়েক দিন থাকিয়াও তেমন করিয়া উপাসনাদি করিতে পারি নাই। আবার লণ্ডনে নিজের গর্ত্তে আসিয়া মনটা বসিতেছে। আজ প্রাতে পাকারের প্রার্থনা ও ডেভিডের 'সাম' পড়িলাম, বড়ই আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম। ডেভিডের 'সাম' যখনই পড়ি তখনি বিশ্বাস অন্তরে জাগিয়া উঠে।

গতকল্য লণ্ডনে পৌঁছিয়া দেখি কতকগুলি চিঠি অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মধ্যে একখানি খুলিয়া দেখি যে পেল্‌মেল গেজেট আপিস হইতে, আমার লিখিত ম্যারেজ রিয়াস ইন ইণ্ডিয়া

(১) জর্জেস বুলেন্দার—তৎকালীন ফ্রান্সের লোকপ্রিয় নেতা।

সংক্রান্ত প্রবন্ধের জন্য চার পাউণ্ড পাঠাইয়াছে। কি আশ্চর্য্য আমার হাত একেবারে শূন্য। টাকায় বড় প্রয়োজন। আমি এ টাকাটার আশা মনেও করি নাই, এটা আমার গণনার মধ্যেই ছিল না। ভাবিতেছিলাম, বুঝিবা ঋণ করিতে হয়, এমন সময় এই টাকাটা যুটিয়া গেল। আনন্দে দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বলিলাম 'নিরাখালের গোদাই রাখাল'—এইরূপ করিয়া ঈশ্বর আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন। বিগত দশ বৎসর আমি দেখিতেছি, আমার সকল অভাব এক প্রকার না এক প্রকারে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কতই ভাবিতেছি, কতই উপায় যাওরাইতেছি কত দিকে সুবিধা অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ এমন একটি দিক্ দিয়া প্রয়োজনানুরূপ অর্থ আসিল যে সেদিকে চিন্তাটা যায় নাই। এমন কতবার দেখিলাম। বিধাতা এইরূপে আমাকে বিশ্বাসী করিবার জন্য কত চমৎকার দেখাইলেন। আমি জানি, আমার সকল অভাব তিনি দূর করিবেন। কিন্তু চিন্তা করিবার সময় আকাশ-পাতাল অন্বেষণ করি। ইহাই বোধ হয় ঠিক। Ignations Loyala।

সর্ব্বদা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, 'তোমরা কাজ করিবার সময় এইরূপ ভাবে কাজ করিবে, যে পৃথিবীর লোক দেখিয়া ভাবিবে তোমাদের নিজের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর, ঈশ্বরের প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর নাই; কিন্তু ঈশ্বরের দিক দিয়া তিনি দেখিবেন তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর, নিজের উপরে নির্ভর নাই। ইহা বড় পাকা কথা।

৮-৯-৮৮ ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মভাব সকলের ভিতরের সার কথা এই ঈশ্বরকে সত্য ও সারাৎসার জানিয়া তাঁহাকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত অন্বেষণ করাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপরে নির্ভর করা। যে জীবনের ভার নিজের হাতে লওয়া যায়; তাহাতে আজ উত্থান, একবার পতন একবার প্রতিজ্ঞার রজ্জু কঠিন করিয়া বন্ধন, আবার তাহার শিথিলতা একবার রিপুকুলের উপরে জয়লাভের হর্ষ আবার পরাজয়ের বিষাদ, একবার সদনুষ্ঠানের আনন্দ আবার অসদাবরণের জন্য খেদ, এইরূপ প্রাণে শক্তি থাকে না। ইহার মধ্যে কি এমন কোন পথ আছে, যাহাতে মন একটা স্থিরতর ভূমি লাভ করিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইতে পারে? এবং আপনার সমুদয় ভার, তাহার উপরে রাখিয়া শক্তি লাভ করিতে পারে? সে পথ আছে ঈশ্বরকে সত্য ও সারাৎসার বলিয়া ধরিতে পারিলেই হয়। সেই বিশ্বাসের ভূমি একবার লাভ করিতে পারিলে হয়। জীবনকে এই ভূমির উপরে দাঁড় করাইতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি প্রকাশ পাইবে না।

অদ্য ডেভিডের সাম-এর একটি চমৎকার সাম পড়িয়াছি। Except the Lord build the house you build it vain.—

কি সত্য কথা। আমরা ব্রাহ্মসমাজকে দাঁড় করাইবার জন্য যাহাই করি না কেন, প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেম আমাদের নেতা না হইলে, ঐশীশক্তি আমাদের সাহায্য না করিলে আমরা ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।

৯-৯-৮৮ আজ প্রাতে St James Hall-এ High Price Hughes (একজন ইউনিটেরিয়ানে ধর্ম্মযাজক) এর উপদেশ শুনিতে গিয়াছিলাম। লোকটিকে দেখিলে কেশববাবুকে মনে হয়, তাঁহার মত মুখের আদল কতকটা আছে এবং বলিবার ধরণও কতকটা সেইরূপ। উপদেশটি এই বিষয়ে হইল যে কি গুণে খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যেরা জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিনটি গুণ নির্দ্দেশ করিলেন। (১ম) ঐশী শক্তির সহায়তা (২য়) তাঁহাদের ভ্রাতৃভাব, (৩য়) তাঁহাদের নির্ভীকতা। লোকটির একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, হৃদয়ের ভাব জাগাইতে পারেন। সেখানে বসিয়া বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল আমাদের ব্রাহ্মসমাজের উপদেশগুলি আমরা কেবল একঘেয়ে ও প্রণালীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। জগতের চারিদিকে নিত্য কত ঘটনা হইতেছে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই, যে সকল বিষয়ে আমরা নিজেই কত অনুরক্ত তাহার সমুদায়ও সেখানে উল্লেখ করি না, ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ও ব্রাহ্মসমাজের কাজ যেন আমাদের জীবনের কেবল একটি দিক মাত্র অর্থাৎ কেবল আধ্যাত্মিক ভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এটা রহিত করা কর্ত্তব্য।

১০-৯-৮৮ আমার কন্যা গত পত্রে আমাকে লিখিয়াছে যে অনেকে গোপনে আমার নিন্দা করেন। সেজন্য সে দুঃখিত। বোকা মেয়ে জানে না তার বাবা নিজকে যত তীব্রভাবে নিন্দা করে এমন আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে নিন্দা করে নাই। আমি আপনাকে যতদূর দুর্ব্বল ও অপরাধী বলিয়া জানি বন্ধুরা যদি ঠিক তেমনি জানিতেন আরও কত নিন্দা করিতেন। অতএব ঈশ্বরের এই এক অপার কৃপা দেখি তিনি যতদূর শাস্তি দেওয়া উচিত তাহা দেন না। অন্যে আমাকে নিন্দা করেন, আমিও আমাকে নিন্দা করি, তবে এই দুই-এ এই প্রভেদ দেখিতে পাই আমি আপনাকে অতি তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াও আবার বলি, এ মানুষটা থাকুক আহা এ মানুষটা ভাল হউক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আশাও করি যে এ মানুষটা ভাল হইবে একেবারে যাইবে না। অন্যে নিন্দা করিবার সময় এ ভাব রাখিতে পারেন না। আমরা পরকে নিন্দা করিবার সময় দয়ার দ্বার ও আশার দ্বার বন্ধ করিয়া নিন্দা করি। আমাদের মধ্যে যাঁহার তিরস্কারের পশ্চাতে শুভাকাঙ্ক্ষা থাকে, অসাধুতার জন্য নিন্দার পশ্চাতে সাধুতার আশা প্রবল থাকে, তিনিই সাধু। লক্ষ গানের মধ্যে এক গান সেই—"আছে অপরাধ কত তবু নহি আশাহত তব দয়া হতে আমার দোষ ত অধিক হবে না।" আমার কন্যাকে এই সকল কথা লিখিতে হইতেছে।

১১-৯-৮৮ গতকল্য রাত্রি হইতে একটি গান আমার মনে ঘুরিতেছে। "তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে, অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।" ইহার প্রমাণ দেখিবার জন্য অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তির জীবনে যাইতে হইবে না। আমার জীবনে ঈশ্বর প্রমাণ দিয়াছেন। আমার জীবনে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্য

সুকর করিয়াছেন, আমাকে ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে ফেলে করিয়া রাখিয়াছেন, আমি কি তাহা ভুলিতে পারি? প্রার্থনার একাগ্রতা যখনই আমার জীবনে আসিয়াছে তখনই আমি তাঁহার ঐশী শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়াছি। যখনি আপনাকে নিরাপদ ও সবল ভাবিয়া স্ফীত হইয়াছি ও অল্পে অল্পে প্রার্থনার ক্রোড় হইতে নামিয়াছি অমনি আমার দুষ্প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া আমার অলঙ্কারকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। গতকল্য রাত্রি হইতে সেই কথাই মনে হইতেছে এবং প্রার্থনার ক্রোড়ে ভাল করিয়া আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হইতেছে।

এই লিপি লিখিতে দুর্গামোহন বাবুর এক পত্র পাইলাম। কি সর্ব্বনাশের খবর, ডক্টর হণ্টর বলিয়াছেন—

The injury to the Lungs produced by the plurisy is permanent and irrepairable.

কি ভয়ানক কথা, ইহার অর্থ তাঁহার যক্ষ্মা দেখা দিয়াছে। হায়, হায় যে আশঙ্কা মনে ঘুরিতেছিল তাহাই কার্য্যে ঘটিল। দুর্গামোহন দাসকে ত্বরায় হারাইতে হইবে। এখন আর একটি দিনও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। ত্বরায় তাঁহাকে দেশে পৌঁছান আবশ্যক। ২৭শে সেপ্টেম্বর জাহাজে বাড়ী যাত্রা করিতে চাহিয়াছেন। তাহার অগ্রে পারিলে ভাল হইত, কি লোকটাই হারাইতে চলিয়াছি। জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার আর কি? জীবনের কর্ত্তব্য সকল সমাধা হইয়াছে, দুটো ছেলের শিক্ষা শেষ আছে—তাহাও হইবার উপায় আছে। এখন তাঁহার মৃত্যুতে ক্লেশ নাই, কিন্তু দেশের একটা মানুষ যায়—অনেক দরিদ্রের একটা বন্ধু যায়! জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১২-১-৮৮

অদ্য প্রাতে এই মনে হইতেছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও কেশবচন্দ্র সেনের যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উজ্জ্বলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দলে কাহারও নাই। গোঁসাইজী যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহাতেও সে প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখনও তাঁহার বিষয়ে যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, তাহাতে সে শক্তির পরিচয় পাইতেছি না। তিনি নিজে কি একটা অবস্থাতে গিয়াছেন, যাহাতে বোধ হয় তিনি একটি স্থান পাইয়াছেন কিন্তু সেটি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যদিগকে সেটা ধরাইয়া দিতে পারিতেছেন না। আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন লোক অনেক রহিয়াছেন—কেহ একজন দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র না হউন, দশজনে মিলিয়া সমাজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন। ইহাতে একপ্রকার কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট নহি। একথা যথার্থ যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দেশের লোকের মনে আধ্যাত্মিক ভাব, ভাল করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা না হইলে ব্রাহ্ম সমাজের সমগ্র শক্তি প্রকাশ পাইবে না—ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতাপ্রবণ হিন্দু জাতির নিকট আদৃত হইবে না।

আমার প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক কার্য্যের ভার, ভবিষ্যতে আরও অধিক ভার পড়িবার সম্ভাবনা। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের উপরে—সমাজের অধ্যাত্মিক জীবন ও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জীবন এমন জিনিষ নয়, কল-কৌশলে উৎপন্ন করা যায়; ফিকির ফন্দীতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—কাহারও কাহারও প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল—তাঁহারা স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন। আমার প্রকৃতিতে ঈশ্বরপ্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতি অধিক—আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা লৌকিক নীতির প্রতি দৃষ্টি অধিক। আমি দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র কি উমেশচন্দ্র দত্ত ইঁহাদের প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—আধ্যাত্মিক জীবন সম্পূর্ণ ঐশী শক্তির খেলা। ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিরূপে যখন হৃদয়ে বসেন ও ক্রীড়া করেন, তখনই তাহার ফল আধ্যাত্মিক জীবন। ঐশী শক্তিই গুরু হইয়া মানবের চক্ষু খুলিয়া দেয়; ঐশী শক্তিই চক্ষের জ্যোতি হইয়া গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করে, ঐশী শক্তিই কথাতে কার্য্যতে আধ্যাত্মিক বল আনিয়া দেয়। আমাকে কি প্রভু এরূপ সহায়তা করিবেন না। আমি যে নিতান্ত তাঁহার অনুগত। আমাকে এইরূপে তিনি ঐশী শক্তির ক্রোড় গ্রহণ করুন।

প্রার্থনা

হে প্রভু! আমি কাতরেই তোমাকে ডাকিতেছি তোমার শক্তির আশ্রয় দাও। হে ভগবান আমাকে ঐশী শক্তির ক্রোড়ে লও। আমার প্রকৃতি আজও সম্পূর্ণ বশীভূত হয় নাই, আমি পাপের আস্বাদ এখনও ভুলিয়া যাই নাই, স্বার্থ বাসনা এখনও চিত্তে সম্পূর্ণ পরাভূত হয় নাই। তোমার রাজ্য কি এমনি দুর্ব্বল ভাবে চলিবে, তোমার নাম কি এমনি মলিন ভাবে প্রচার হইবে? তোমার করুণার শক্তি কি এমনি দুর্ব্বল ভাবে জগতে প্রকাশ হইবে? এস, এস, এস, শক্তিশালী পুরুষ এস। তোমার ঐশী শক্তির দ্বারা আমাদের সহায় হও।

মিশরের একাংশ

জাহাজ থেকে কায়রো

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপ-প্রত্যাগত জাহাজ এসে দাঁড়াল সকাল সাতটায়। সামনে পোর্টসৈয়দ বন্দর।

আট পাউণ্ড খরচ করে আমরা জাহাজের টিকিট কেটেছিলাম কায়রো যাবার জন্যে। বেলা এগারটা নাগাদ ছাড়া পেলাম। পোর্টসৈয়দ পুলিশ পাশপোর্টে ভিসা করে দেবার পর সেগানা হাতে নিলাম। হাতে নিলাম আরও একটি বস্তু। বড় একটি খাবারের প্যাকেট। জাহাজ থেকে পাওয়া।

লঞ্চে চড়লাম। লঞ্চ দুলে দুলে চলতে লাগল। জল ছিটকে আসতে লাগল গায়ের উপর। কাষ্টমস পেরিয়ে বাইরে আসতেই দেখি আমাদের জন্যে মোটর অপেক্ষা করছে।

একটা মোটরের ধারের সিটে গিয়ে বসলাম। এ রকম আট-খানা মোটর প্রায় একসঙ্গে ছুটতে লাগল কনভয়ের মত। পথের এক পাশে সুয়েজ খাল আর এক পাশে নালা। যত এগোতে লাগলাম, ততই মরুভূমির মত মাঠ পড়তে লাগল। কোথাও মাঠ, কোথাও বাগান, আগাছা, অফিস পেরোতে লাগলাম। দুপুরের দুরন্ত রোদ। পিপাসায় প্রাণ টা-টা করছে। তবু কিন্তু মিষ্টি হাওয়া আছে। মোটর ছুটতে লাগল সেই মিষ্টি হাওয়ার মধ্য দিয়ে। স্থানে স্থানে মজুরেরা কাজ করছে। গায়ে তাদের আলখাল্লার মত জোব্বা। কোথাও মাঠের মাঝে কাঠের একতলা বাড়ী। কোথাও মাটির ঘর, অবস্থা তার শোচনীয়। কোথাও ছোট একটা ফলের দোকান। মাছি ভ্যান ভ্যান করছে চারিধারে।

বেলা দুটো নাগাদ সমস্ত মোটর এসে একটা রেস্তোঁরার কাছে দাঁড়াল। আমরা এতক্ষণ ছোট ছোট দলে পৃথক হয়ে ছিলাম। এখন ছাড়া পেয়ে একটি বৃহত্তর দলে পরিণত হলাম। একত্র হবার, মেলবার সুযোগ পেলাম। যে এজেন্টের লোক আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেছল, সে লিমনেড খাওয়াতে লাগল। রেস্তোঁরার চত্বরে দুটো দরিদ্র কুকুর আমাদের দেশের কুকুরের মত। তাদের কাছে আমার উচ্ছিষ্ট স্যাণ্ডুইচের খানিকটা অংশ দিতেই তারা খেয়ে নিল। খেয়ে ফের মুখের দিকে চায়। যদি আরও দিই, আরও খায়।

ওখান থেকে ফের আবার মোটরে চড়ে এগিয়ে চললাম। যত এগোই ততই গ্রাম্য দোকানপাট। ভাঙা মাটির বাড়ী, খেজুর গাছ। গাছে খেজুর ধরেছে। ক্বচিৎ কোথাও সুন্দর মডেলের একখানা অট্টালিকা। দু'পাশে কোথাও সবুজ ক্ষেত, ক্ষেতে কালো কালো মানুষ কাজ করছে। পাশের নালায় বিরাট পাল তুলে নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের নৌকা। গরু দেখা গেল। এক জায়গায় চরছে তারা, গরুগুলি ঠিক আমাদের দেশের মত। রোগা রোগা—কঙ্কালসার। এক এক জায়গায় পথে এত ধুলা যে,

মোটরের চাকার স্পর্শ পেয়ে তারা মুখে এসে লাগে, উড়ে এসে কোট-প্যান্টে আটকে যায়।

আমাদের গাড়ীটা ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। তিন থাকের সিট, আমরা ড্রাইভারকে নিয়ে সবশুদ্ধ ছিলাম আট জন। ড্রাইভারের পাশে একটি ইংরেজ যুবক আর একটি ইংরেজ যুবতী। তার পিছনের বোতে একটি পার্শী দম্পতি, তার পিছনে আমি, শ্রীউপেন ভট্টাচার্য্য আর একজন পার্শী যুবক। তিনটি পার্শীতে মিলে মাঝে মাঝে এমন বকর বকর করছে যে, টেকা দায়। ইংরেজ যুবতীটি কিন্তু অদ্ভুত হাস্যময়ী, তার মধ্যে এত বেশী প্রাণবন্যার পরিচয় যে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে শহর পড়ল—কায়রো। শহর যেমন বড় বড় হয়, কায়রোও তেমনি। কলকাতা ও করাচীর মত, ট্রাম চলেছে, বাস-গুলি নজরে পড়ল, চকোলেট রঙের। বড় বড় বাড়ী, রেস্তোরা, পার্ক, সিনেমা হল—সব কিছুই আছে। শুধু ওখানকার বাসিন্দা-দের সাজ-পোষাক ভিন্ন রকম। গায়ে ঢিলা আলখাল্লা। আর মাথায় লাল টার্কিশ টুপী।

একটা বড় হোটেলের ধারে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। ভিতরে ঢুকতে যাব কি—ছেঁকে ধরল ভিখারী, ছেঁকে ধরল বিক্রেতার দল, কারও হাতে টার্কিশ লাল টুপী, কারও হাতে চামড়ার ছোট ছোট ছড়ি অথবা ব্যাগ। কারও হাতে ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড। নেব না বললে ছাড়ে না। ছিনে জোঁকের মত।

আট হাত পথ অতিক্রম করতে দু'মিনিট লেগে গেল। হোটেলে ঢুকেই পাশপোর্ট জমা দিতে হ'ল। এ যেন আজব নগরের আজব হোটেল, এ পর্য্যন্ত এত হোটেলে গেছি এ রকম হোটেলে কোন দিন ঢুকিনি। কালো কালো বেঁটে বেঁটে আরবজাতীয় লোকেরা এ-হোটেলের কর্ম্মচারী, দেখলে ভয় করে। মনে হয় বুঝি এরা ছিনিয়ে নেবে সব কিছু—একটু ফাঁক পেলেই।

দোতলায় উঠে তখনও ঘর পেলাম না কিন্তু 'টয়লেট ঘরে'র দরকার ছিল। হাত মুখ ধোয়ার দরকার, কল ছিল বাথ-টবের গায়ে। ঘোরাতে গিয়ে মাথা গা ভিজে একসা। উপরে 'শাওয়া'র ছিল অত লক্ষ্য করিনি, তা থেকে জল পড়তে শুরু করেছে। বন্ধ করবার আর সময় পেলাম না। ঐ অবস্থাতেই পালিয়ে আসতে হ'ল। পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছিলেন মিঃ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের হাতে আমার অভিভাবকত্বের ভার তুলে দিয়েছিলাম।

ভিজে ঢোল হওয়াতে কিন্তু অস্বস্তি নয় আরাম পাচ্ছিলাম। সেপ্টেম্বর মাস, কিন্তু রোদের যা তাত, মনে হচ্ছিল বুঝি বা বৈশাখ মাস এটা আমাদের দেশে, তাতে আবার গায়ে আমার গরমের পোষাক। শুনলাম এখনি পিরামিড দেখতে যেতে হবে। নীচে সবাই অপেক্ষা করছে।

—চা পাব না? জিজ্ঞাসা করলাম।

কেউ জবাব দিল না।

মোটরে চড়ে বসলাম, আবার সেই আমার নির্দ্দিষ্ট জায়গায়। চললাম পিরামিড দেখতে। পথের মাঝখানে অনেক পার্ক দোকান-পাট ও রাস্তা পড়ল, পড়ল নীল নদ, নদের জল তর তর করে বয়ে যাচ্ছে শহরের বুকের উপর দিয়ে। এক জায়গায় এসে মোটর থেমে গেল। সেখানে শুধু উটের আস্তানা।

আমাকে বলা হয়, উটে চড়।

উট হাত-পা মুড়ে শুয়েছিল, এক-একজন এক-একটা উটের পিঠে চড়ে এগিয়ে চলল। আমিই বা বাদ যাই কেন? যা থাকে কপালে! জীবনে প্রথম উটে চড়লাম। আরব বেদুইনের মত পার হতে লাগলাম মরুভূমি।

প্রথমটায় বেশ ভয় হয়েছিল। দেশে একজন ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে মরে গেছে শুনেছিলাম। আজ বিদেশে—উটে চড়ে আমি না মরে যাই। উটটা বসেছিল, যখন দাঁড়িয়ে উঠল আমাকে পিঠে নিয়ে, আমার তখন সঙ্গীন অবস্থা। উটের পিঠে বসবার সুন্দর আসন ছিল, হাত রাখবার হাতল ছিল। সেই হাতলের মধ্যে ক্যামেরার ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে হাতলটা চেপে ধরে রইলাম। আমার দু'পায়ে পরান ছিল রেকাব। কিন্তু মনে হচ্ছিল এই রেকাবটাই না আবার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে।

উট আমাকে নিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে চলল। সামনে ছাই-রঙের বালি। তার উপর বিকালের পড়ন্ত রোদ প্রতিফলিত হয়ে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে জায়গাটায়। দূরে অদূরে অনেকগুলি পিরামিড দেখা গেল। মিশরের যে পিরামিড নিয়ে একদিন কবিতা লিখেছি, কবিতা লিখে বন্ধুদের শুনিয়েছি। সেই পিরামিডের এলাকার আমি আজ অতিথি। কিন্তু যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। যে পিরামিডের কল্পনা একদিন মনে মনে পোষণ করে এসেছিলাম, এ পিরামিড—কি সেই পিরামিড? সে দিনের সিদ্ধান্ত আজ এক নিমেষে ভুল বলে প্রতিপন্ন হ'ল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ল সেদিনের স্বপ্ন: কিন্তু হতাশ হলাম না, হতাশ হবার মত অবস্থা আসে নি। বরং ভুল শোধরাবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হলাম।

মাঝে মাঝে মাহুতের ইঙ্গিতে উটটা আবার দ্রুত চলছিল। যত দ্রুত যায়, আমারও আবার পেটে ওঠে তরঙ্গ। কোমরে লাগে জোর। ভয় আসে—পড়ে না যাই! অনেক লোক এগিয়ে গেছে। আমি পড়ে আছি পিছনে। কিন্তু সকলের সুযুত সমান নয়!

দ্রুত চালাবার সপক্ষে মাহুতের একটা স্বার্থসিদ্ধির উপায় অবলুপ্ত ছিল। সেকথা মাহুত বার বার জানাবার চেষ্টা করছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে। উটের নাকের সঙ্গে আটকান যে দড়ি থাকে—সেটা ছিল মাহুতের হাতে। দড়িটা আমার হাতে তুলে দিতে এল। ইংরেজী ছাড়া ওরা কিছু বুঝে না। বুঝায়ও ইংরেজিতে। তবে ভাঙা ভাঙা ভাষায়। ইংরেজী ত ওদের মাতৃভাষা নয়।

বললাম, দড়ি ধরে কী করবো?

—তুমি একা যাবে। লোকটা ইঙ্গিতে আমাকে জানাল।

—তা হলেই হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে মরি আর কি!

সে কথা আর মুখে বললাম না। মনে মনে অনুভব করে প্রকাশ্যে বললাম, ভেব না। তোমায় কিছু দেব।

ব্যাস, লোকটা খুশি।

আমাদের এজেন্টের কাছ থেকে ত সে পাবেই। কিন্তু এজেন্টও ইজিপ্টের লোক। এদের কত দিতে হবে আর কত সরাতে হবে, সে জানে। এই সব মাহুতেরা খুব গরীব। এরা যাত্রীর কাছে কিছু পেয়েই থাকে। তাতে যদি ভয় দেখাবার দরকার হয়, পেতে গেলে তাও দেখাতে হয় বৈকি!

মাহুত জানাল, এখনি দাও।

কারণ এখনও বোকা আছে। এখনও আমি উটের পিঠে চড়ে আছি। যদি এখন না দিই, পরে হয়ত নেমে নাও দিতে পারি। লোকের কাছে ঠকে ঠকে এ অভিজ্ঞতা যথোপযুক্ত ভাবে হয়েছে।

দিলাম তাকে ব্যাগ থেকে বার করে একটা ছ পেনির সিকি। তাতে যে সে খুব আনন্দিত হ'ল মনে হ'ল না।

আবার উট যেতে লাগল দৌড়ে দৌড়ে।

বললাম, থামাও থামাও, আস্তে নিয়ে চল।

কে শোনে কার কথা? বললাম, আরও দিচ্ছি, আস্তে নিয়ে চল।

ব্যস, উট আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

বুঝলাম, উটের চলাটা বড় নয়, বড় হচ্ছে মাহুতের মর্জি।

এবার একটু রয়ে-সয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম। দিলেই ত চুকে যাবে। আবার কি হবে—কে জানে! ব্যাগ বার করে হাতে ধরে রাখলাম। ব্যাগটা যে আমার পরিপুষ্ট—মাহুতের সেটা নজর এড়ায় নি।

সে আমার সঙ্গে চলতে চলতে গল্প জমাবার চেষ্টা করল।

—তুমি কোথা থেকে আসছ?

বললাম, ইণ্ডিয়া থেকে।

—হিন্দু না মুসলমান?

—হিন্দু।

—ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলবে নাকি?

—ইচ্ছে আছে।

—দাও, ক্যামেরা তোমার। ছবি তুলে দিচ্ছি।

ক্যামেরা দিলাম। উটকে দাঁড় করিয়ে মাহুত দূরে গিয়ে আমার ছবি তুলল। ছবি তোলা শেষ হতে না হতে এক ফেরিওয়ালা এসে আক্রমণ করল। তার হাতে পাথরের একটা পুতুল। বলে, এ হচ্ছে 'মমির' পুতুল। দশ শিলিং দাম।

বললাম, নেব না।

নেব না বললে ছাড়ে কে?

—আচ্ছা সাত শিলিং।

—না।

—পাঁচ শিলিং।

আমিও নেব না। সেও বেচতে চায়! ভারি মুস্কিল।

দূরে তখন সকলেই এগিয়ে গেছে। সব চেয়ে পিছনে পড়ে আছি আমি। মাহুতকে সে কথা জানাতেই আবার সে উট চালাতে শুরু করে দিল। ফেরিওয়ালা বিজ বিজ করে কি যেন বলে কেটে পড়ল। হয় ত গাল দিল সে—তার নিজের ভাষায়। তাও হতে পারে।

মাহুত উটটাকে দেখিয়ে বললে, She is very good.

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা She, He নয়?

—না। She is my Camel.

স্ফিংক্স মূর্তির সামনে লেখক

সকলকার শেষে গিয়ে আমি নামলাম। আরও ছ পেনির একটা সিকি তার হাতে দিলাম।

লোকটা নিঃসন্দেহে খুশি হ'ত, যদি আরও তাকে দিতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারি নি। ষ্টার্লিং মুদ্রা আমার কাছে বেশি ছিল না। যা ছিল—তাও পাছে অন্য জায়গায় খরচ করতে হয়, সেই ভয়ে বার করতে পারি নি। পাউণ্ডের নোট ছিল অবশ্য কয়েকখানা। কিন্তু ভাঙাতে গেলেই ইজিপ্সিয়ান মুদ্রা নিতে হয়। ইজিপ্সিয়ান মুদ্রা নিতে গেলেই ঠকার সম্ভাবনা বেশি। তেমন কোন অভিজ্ঞ সঙ্গীর সাহায্য পাবারও আশা ছিল না।

আশেপাশে ছোট বড় অনেক পিরামিড। বড় পিরামিডের পিছনে সূর্য্য অস্তাচলগামী। লাল হয়ে উঠেছে পিরামিডের সরু মাথাটা। এক একটি পিরামিডকে দেখে মনে হয় যেন এক একটি পাহাড়। মাটি থেকে মোটা হয়ে উঠে—উপরে সরু হয়ে গেছে। অবশ্য পাথর দিয়েই তৈরি। কোথাও—কোনটাকে দেখাচ্ছে ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদের মত। কোনটায় একটা বিশেষ "Sphinx" চেহারার ইঙ্গিত। অর্থাৎ দেহটা সিংহের। মুখটা মেয়েলোকের। অথবা ঠিক তার উল্টো।

অনেক ঘুরে ঘুরে মরুভূমির মধ্যে এক রকমের আগাছা। কতকগুলি দরিদ্র ঘর। কাদায় গাঁথনি অথচ রঙ-করা।

একটা বড় বাড়ীর কয়েকটা প্রকোষ্ঠ পার হয়ে আরও এগিয়ে গেলাম। পাথরের বাড়ী। আশেপাশে অনেক সুড়ঙ্গ। অন্ধকার গহ্বর।

আবার চড়লাম উটে।

উট নিয়ে গিয়ে ফেলল বড় পিরামিডের দরজার গোড়ায়।

তিন-চার ধাপ উঠতেই পিরামিডের দরজা। পিল পিল করে লোক ঢুকে যাচ্ছে। দ্বারী চীৎকার করছে, আর নয়, আর নয়। এখনই বন্ধ হবে।

সে শুনে আরো জেদ বেড়ে যায়। ভিতরে কি আছে, দেখতেই হবে। অন্ততঃ ঢুকে ত পড়ি! তার পর বেরুবার প্রশ্ন স্বতন্ত্র। একদিনের জন্য মিশরে এসে যদি পিরামিডই না দেখে যেতে পারলাম, তার চেয়ে আর আপশোষ কি?

সক একতারা দড়ো। ভিতরে চালক আছে অনেক। কোন কোন জায়গায় ইলেকট্রিক বাল্‌ব ঝুলছে। জায়গাটাকে আলোকিত করছে। যেখানে ইলেকট্রিকের আলো নেই, সেখানে গাইডরা মোমবাতি জ্বালিয়ে যাত্রীদের পথ দেখাচ্ছে। দরজা থেকে ভিতরের দিকে একটুখানি পথে সোজা হয়ে চলা যায়। তার পরই সুড়ঙ্গ উঠে গেছে উপরে। সেখানে মাথা বাঁচিয়ে কায়ক্লেশে উঠতে হয়। অত্যন্ত সন্তর্পণে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, একটু বেহিসাবী হলেই মাথায় আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। তারপর সেই সুড়ঙ্গটুকু যদি বা পার হলাম—পরে দেখি, বৃহত্তর পরীক্ষা। সামনের পথ চলে গেছে একেবারে উপরে। যেমন করে নারিকেল গাছে চড়তে হয় তেমনি করে উপরে যাবার পথ। পথে লোহার পাত বসানো। মাঝে মাঝে কাঠ: উঠতে গিয়ে যাতে না জুতো হড়কে যায়, যাতে না গোড়েনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে নিচে পড়ে যায় লোক - তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। আলো থাকলে কি হবে, যখন উঠতে গেলাম, দেখি সামনে-পিছনে অন্ধকার। যাত্রীদের ভিড় আলোকে আড়াল করে দিয়েছে। ব্যাঙের মত সিঁড়ির হাতল ধরে উঠব কিনা ভাবছি, দেখা হয়ে গেল একটি মুখ-চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে, ভদ্রলোকটি আমাদেরই জাহাজের সহযাত্রী। আসাম থেকে বিলেতে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক। ভদ্রলোক খুব স্থূলকায়। সিঁড়ির নিচে—একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন। কপালে তাঁর বিন্দু-বিন্দু ঘাম। শুনলাম, তাঁর স্ত্রী উঠে গেলেন উপরে। তিনি উঠতে সাহস করেন নি। স্ত্রী ফিরে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বার বার ভাবলাম—উঠব না, কি হবে উপরে উঠে? পরক্ষণেই মনে হ'ল, এত আমি কাপুরুষ? আমি না সাহিত্যিক, আমি না সাংবাদিক? উপরে না উঠলে কি করে জানব, কি আছে? কেমন করে ফিরে গিয়ে জানাব, কি দেখে এলাম? কি লিখব পিরামিড সম্বন্ধে? যখন এত লোক উঠছে, আমিই বা উঠব না কেন? আমার জীবনের দাম আছে, আর ওদের জীবনের দাম নেই?

উঠতে লাগলাম সেই সিঁড়ি ধরে ধরে। একে স্থানে স্থানে অন্ধকার, তার উপর দুর্দ্দান্ত গরম। মুহূর্ত্তের মধ্যে গরম পোশাকে ঢাকা দেহটা ঘামে পিচ্ছিল হয়ে উঠল। কপাল দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরতে শুরু করল।

কিন্তু তখনো অনেকখানি পথ! একবার ঠাকুরের নাম স্মরণ করে আবার দম নিলাম। আবার এগুতে লাগলাম। কিন্তু মনে হ'ল এবার বোধ হয় আর পারব না। গলার কণ্ঠনলীটা কে যেন চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। শিথিল, অবসন্ন হয়ে আসছে শরীর। পালিয়ে গেলে কেমন হয়?

কিন্তু ছুটে পালাবারও পথ নেই। সামনে পিছনে বিপুল জনস্রোত। তাদের ঠেলে পালাতে গেলে নিজেই মারা পড়ব। তার চেয়ে সকলের দিকে চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। সকলেরই দেহ ঘামে তখন ভিজে উঠেছে। সহসা গলার টাইটার কথা মনে এল। নিঃশ্বাস নেবার পক্ষে সেটাও হয় তো কম বাধা নয়। টাইটাকে টেনে আলগা করে দিলাম।

উপরে যখন উঠলাম, আর মনে হ'ল না বেঁচে নামব। বেঁচে ফিরব। শরীরের মধ্যে তখন এক অব্যক্ত অস্বস্তি। যে অস্বস্তি অনুভূত হয় হয়ত মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে। ওখানে কি আছে, দেখবার লোভ তখন বড় নয়, বড় হচ্ছে বেঁচে বাইরে বেরুবার উদ্দীপনা। উপরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে এত ভীড় আর আলোর ন্যূনতা যে, এক মুহূর্ত্তও থাকতে ভাল লাগে না। এখানে কি আছে, একজন এজিপসিয়ান গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে, কিছুই নেই।

—কিছুই নেই তো এখানে আসবার কি দরকার ছিল?

—দরকার ছিল বৈকি। কত পুরনো আমলের জিনিস এই পিরামিড, এর 'আরকটেকচার' দেখবে না?

সে কথা সত্যি। পাথরের পর পাথর গেঁথে এই দুর্ভেদ্য মন্দিরে মমি রাখা হ'ত। সেকি আজকের ঘটনা? একটা চৌবাচ্চার মত জায়গা দেখলাম। শুনলাম, এখানে মমি থাকত। এখন নেই। একজন গাইড বললে, রোমানরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

যেভাবে পরিশ্রম করে উপরে ওঠবার উদ্যোগ, উপরে এসে কিন্তু ঠিক সেই অনুপাতেই ঠকতে হয়। তবু তো জীবনে এ নূতন অভিজ্ঞতা।

বেরিয়ে আসবার পথে আর তত বাধা পেলাম না। কি জানি কেন, ভীড় হালকা হয়ে গেছলো। আবার সেই মাথা নীচু করে নামা। কিন্তু তাতে আনন্দ ছিল।

দরজার মুখে গাইড প্রণামী আদায় করল।

ফাঁকে যখন বেরিয়ে এলাম, পুনর্জ্জন্ম হ'ল। প্রাণভরে নিঃশ্বাস

নেওয়ার আনন্দ যে এত উদগ্র হতে পারে, এর আগে আর এমন করে অনুভব করি নি।

ফিরে এলাম হোটেলে মোটরে করে।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। ফের রাত ন'টার সময় নাইট-ক্লাবে যাব।

আমাদের গাড়ীতে যে পার্শী মহিলাটি ছিল তার খুব ইচ্ছে কায়রোর নাইট-ক্লাব দেখবার। সে নাকি প্যারিসে গিয়েছিল অথচ নাইট-ক্লাব দেখতে পারে নি। তাতে তার অনুশোচনার অন্ত ছিল না।

একজন মেয়েছেলের যে নাইট-ক্লাব দেখবার সখ হতে পারে, এ আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু তার ইচ্ছে ঐ পথেই একান্ত হয়ে উঠেছিল। একজন গাইড ঠিক করে সে আমাদেরও ধরে নাইট ক্লাব দেখবার জন্তে।

—কত করে দিতে হবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

গাইড জানাল দশ শিলিং খরচ করলেই নাইট-ক্লাব দেখানো সম্ভব হতে পারে।

তা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গেলে দশ শিলিং এমন আর কি?

আমরা রাজি হই। আমরা মানে এই পাঁচ জন। আমি, ভট্টাচার্য আর মহিলাটিকে নিয়ে তিন জন পার্শী। ভট্টাচার্য না থাকলে আমি অবশ্য যেতাম না।

ভট্টাচার্য গাইডকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে আচ্ছা আচ্ছা··· দেখা যাবে তো?

—নিশ্চয়। নইলে নাইট-ক্লাব কি?

হোটেলে ফিরে গিয়েই হাতে টিকিট কাটবার টাকা দিয়ে দেওয়া হ'ল।

দুটো বিছানাওয়ালা ঘর পাওয়া গেল দোতালার উপর। ঘর খারাপ নয়। একটা বিরাট জানালা আছে। জানালা খুলে দিলেই রাস্তার দৃশ্য। রাস্তা কলকাতার পার্ক সার্কাসের মত। মুসলমানদের হোটেল আছে। হোটেলের সামনে অনেক লোক বসে আছে। গরমের জন্যে কিছু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। পরনে আলখাল্লা।

আশেপাশে বাড়ি। ছ'তলা, সাততালার মত।

দিব্যি আরাম করে শাওয়ারের জলে চান করলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ নিচে খেতে নামলাম। সব কালো কালো আরব পরিবেশক। এতদিন শাদা হাতের পরিবেশনে খেয়ে এসেছি, আজ একেবারে অজ-কালো আরবদের হাতের তৈরি রান্না। কিন্তু লোকগুলি ভদ্র। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে। আন্তরিক যত্নের সঙ্গে খাওয়াতে লাগল। এদেরও পরনে জোব্বা।

সরু চালের ভাত পেলাম। ভাতের সঙ্গে মাংস আর ঝোল। শুনলাম, এ নাকি ভেড়ার মাংস। জাহাজের খাওয়া একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। এখানে মুখ বদলাবার সুযোগ হ'ল। স্বাদটা মন্দ লাগল না। তবে আরও মাংস পেলে খুশি হতাম। আশানুরূপ পাই নি। ভাতের পর একটুকরো কেক। সেটা মিষ্টি হিসাবে প্রদত্ত। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হ'ল, পার্শীদম্পতি খেতে গেল। তারা খেয়ে উঠতেই আবার দেখা হ'ল।

মহিলাটি রাগে ফেটে পড়ল। স্বামীকে দেখিয়ে বললে, জান, ভাতটাই এ বেশি পছন্দ করে। আর কিনা ভাত খেতে পেল না! বলে, ফুরিয়ে গেছে! এমন হোটেল যে, চিসেব নেই? আমরা এতগুলো লোক যে আসব, থাকব, খাব, তার ব্যবস্থা ত আগে থেকে করবি? আশ্চর্য!

—আমরা ত ভাত পেয়েছি।

ভট্টাচার্য ইন্ধন জোগালেন।

—সেই জন্যেই ত বলছি!···একি মাগনায় আতিথ্য গ্রহণ করেছি? আমি ছাড়ব না, জাহাজে গিয়ে বলব।
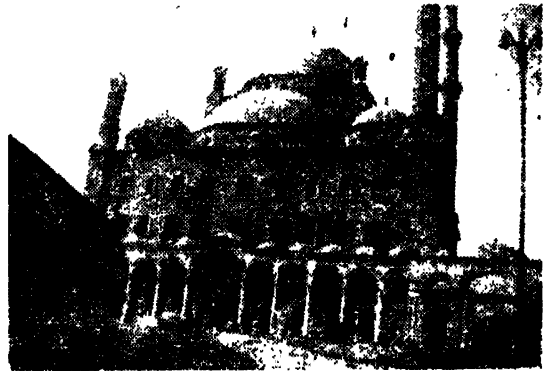
মহম্মদ আলী মসজিদের একাংশ

ন'টার সময় নাইট ক্লাবে যাবার কথা, গাইডের দেখা নেই। বললাম, কোথায় গেল লোকটা?

ভট্টাচার্য বললেন, ন'টার সময় ত নয়? দশটার সময়।

—তবে যে শুনেছিলাম···

—ভুল।

—তা হয় ত হবে।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম।

সহসা বাইরে মারামারি লেগে গেল। বহু লোকের মিলিত চীৎকার তীব্র হয়ে উঠল। লাঠি ও সড়কি নিয়ে হোটেল থেকেই কয়েকটা লোক বেরিয়ে গেল। দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল নাকি? কলকাতায় ত হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা দেখেছি, এ কোন্ দাঙ্গা? এখানে অধিবাসী বলতে ত শুধু মুসলমানই। হিন্দু কোথায়?

ভট্টাচার্য বললেন, দেখে আসুন না গিয়ে, কি হচ্ছে?

দেখতে বেরিয়ে দেখি দুটি লোক পরস্পরের দিকে আস্ফালন করে এগিয়ে আসছে, তখনও খুনোখুনি হয় নি। দু'জন মাতব্বর এসে তাদের সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছে।

ভিতরে চলে এলাম।

—কি দেখলেন? ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, আমাদের ব্যাপার নিয়ে দাঙ্গা বেধেছে।

—কি রকম?

—দুটো দালালের লড়াই লেগেছে।

চুপ করে গেলাম। ব্যস তাতেই কাজ হ'ল। ভট্টাচার্য অধৈর্য হয়ে বললেন: কি রকম—কি রকম?

খানিকটা চুপ করে রইলাম।

তাঁর পীড়াপীড়ি দেখে হাসি পেতে লাগল, দেখলাম ভট্টাচার্য ভয় পেয়েছেন। পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম, নাইট ক্লাব দেখতে গিয়ে না খুন হয়ে যাই। দু' জনেরই ইচ্ছে আমাদের নিয়ে যায়।

নিছক কৌতুক করবার জন্যেই এই মিথ্যে কথাগুলো বলে দিলাম। ভট্টাচার্যর চোখ তখন গোল হয়ে গেছে।

মিনিট তিনেক পরেই দাঙ্গা প্রশমিত হ'ল। মারপরেরা মিলে নিজেদের দাঙ্গা নিজেরাই থামিয়েছে।

গাইড এল খানিকটা বাদে।

ভট্টাচার্য বললেন, কোনো মারামারির ব্যাপার নেই ত?

গাইড হতভম্বের মত চেয়ে রইল। পরে বললে, কিসের মারামারি?

—এই যে হয়ে গেল খানিক আগে।

গাইড বুঝতে পারে না। আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি সে ত আর ভট্টাচার্য জানতেন না। পরে তাঁকে বললাম। তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

গাইড আমাদের নিয়ে বেরোল। এখানে সেখানে খানিকটা ঘুরলাম। শহর দেখে বেড়াতে লাগলাম। তা শহর ত শহর, চারধারে এত আলোর ছড়াছড়ি যে দেখবার মত। যারা প্যারিস দেখেছে সকলেই স্বীকার করল, এই রকমই নাকি প্যারিস। প্যারিসেও এই রকম আলোর ডিসপ্লে।

পৌনে দশটায় গেলাম নাইট ক্লাবে। ওকে যে নাইট ক্লাব বলে—আমার জানা ছিল না। একটা সিনেমা হলের মত বড় বাড়ীতে ঢুকে দোতলায় উঠলাম। গাইড জানিয়েছিল যে সে টিকিট কেটে রেখেছে, কিন্তু মিথ্যে কথা, আমাদের সামনে সে টিকিট কাটল। টিকিটের মূল্য ছ' শিলিং করে, চার শিলিং সে বেশি নিল টিপস্‌-হিসাবে। তাতে অবশ্য আমরা দুঃখিত হলাম না। কারণ আমাদের সে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে তুলেছে এবং যতক্ষণ না শেষ হয়, সে থাকবে সঙ্গে। এর মধ্যে মস্ত বড় একটা নিশ্চয়তা ছিল। বিদেশ-বিভুঁয়ে অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় রাত্রে ঢোকার মত আর কিছুতে বিপদ নেই।

একটি তিনতলা বাড়ীর ছাদের উপর অধিবেশন। সেখানে ষ্টেজ আছে। ষ্টেজের সামনে সিনেমা হলের মত বসবার চেয়ার। প্রথম সারির চেয়ারগুলিতে আমরা বসলাম। আশে পাশে ছোট ছোট ঘর, ঘরে বসে অনেকেই মদ খাচ্ছে। তাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

আমরা অবশ্য মদ নিলাম না কিন্তু শো সুরু হবার অপেক্ষায় বসে রইলাম। আমাদের জাহাজ থেকে যারা কায়রো দেখতে এসেছিল, দেখলাম তাদের অনেকেই চুপি চুপি এখানে এসে জুটেছে।

রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় শো সুরু হ'ল। নাচ আর গান, ষ্টেজে ইজিপ্সিয়ান নর্তকীরা এসে নাচতে লাগল। বুকে কাঁচলী আছে, কোমরে হাফ প্যাণ্ট বাকী শরীরটা নগ্ন, খুব অশ্লীল বলে মনেই হল না তবে চেহারাগুলি বেঁটে বেঁটে। রূপসী হলে কি হবে, পেটে চর্বী জমেছে। নৃত্যের তালে তালে তাদের পেটের চর্বীও নাচতে লাগল, তাল জ্ঞান আমাদের দেশের চেয়ে তাদের কোন অংশেই খারাপ নয়, নাচও মাঝে মাঝে ভাল লাগতে লাগল। তবে গানের সুর বুঝতে পারলেও বাণী বোঝবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, অনেকেই আমাদের মধ্যে হতাশ হয়ে পড়েছিল কারণ, তারা আশা করেছিল, এর চেয়েও আরও কিছু দেখবে, যা প্যারিসে বা বিলেতের উইণ্ড মিল থিয়েটারে দেখে এসেছে। কিন্তু সেরকম কিছুই নয়।

তখন রাত্রি বারটা, নাচ দেখার চেয়ে আমার ঘুমোবার দিকেই বেশি ঝোঁক আসছিল। একে পিরামিডে পা মুড়ে ঢোকার ক্লান্তি, তার উপর ছাদের মিষ্ঠি খোলা হাওয়া!

বার বার ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। সেকথা ভট্টাচার্যকে বললাম। তিনি ও আর একজন পার্শী যুবক উঠে পড়লেন। পার্শীদম্পতি বসে রইল। আমরা গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। কারণ গাইডেরও নাকি ঘুম পেয়ে গেছল।

পথে বেরিয়ে দেখি—তখনও অনেক দোকানপাট খোলা। চায়ের দোকানে গিসগিস করছে লোক। সারারাতই নাকি এখানের অনেক দোকান খোলা থাকে প্যারিসের মত।

পার্শী যুবকের পিছনে লাগল একটি ফেরিওয়ালা।

—প্যারিস পিকচারস আছে।

—কত দাম?

—পাঁচ শিলিং।

—দু শিলিং হবে?

'দেব না, দেব না করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত এসে লোকটি দু শিলিংয়েই ছবিগুলি বেচে দিয়ে চলে গেল।

প্যারিস পিকচারস এর আগে আমি কখনও দেখি নি। এক-একটা ছবি দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

পিছনে লাগল একটি ছোট মেয়ে ভিখারী। এত রাত্রেও তার ভিক্ষে করবার ঢঙ দেখে আশ্চর্য হলাম। তাকে একটা আনি দিয়েছিলাম। তা তার পছন্দ নয়। আরও চায়। একে ভিক্ষা বলব, না গুণ্ডামী? অনেক দূর পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে এল। গাইড তাকে বকতে তবে সে রেহাই দিল।

রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টগুলি অপরূপ সুন্দর। শহরে রাত্রে এত

আলো, যেন দিন বলে ভুল হয়। একটি পার্কে ফোয়ারা উঠেছে। ফোয়ারার গায়ে নানা রকমের আলো প্রতিফলিত হয়ে সেটাকে অপরূপ সুন্দর করে তুলেছে।

রাত্রি সাড়ে বারটায় হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। গাইড 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে গেল।

সকালবেলায় পার্শী দম্পতির সঙ্গে দেখা হ'ল। স্ত্রীলোকটি বললে, তোমরা চলে আসবার পরই এত সুন্দর দুটো নাচ হ'ল কি বলব।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত রাত্রে শেষ হয়েছিল?

—সাড়ে বারটায়।

—যা পরিশ্রম হয়েছিল, না চলে এসে করি কি? পায়ে যা ব্যথা হয়েছে চলতে পারছি না।

সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাষ্ট সেরে সকলে বেরিয়ে পড়লাম। আবার মোটরে করে।

গেলাম মোহাম্মদ আলী মস্ক দেখতে।

মিনারের ধারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিরাট মসজিদ। মসজিদ সংলগ্ন কত যে ছোটখাটো বাড়ী গুণে শেষ করা যায় না। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদ দেখা শেষ করতে হ'ল। অথচ এত বড় দেখবার জায়গা জগতে বোধ হয় কমই আছে।

ভিতরে ঢুকতেই দরজার পাশে একজন লোক দেখলাম। জুতোর উপর সে একটা আচ্ছাদনী পরিয়ে দিল। বড় ব্যাগের মত। পরিয়ে দিয়েই হাত পাতল। তাকে কিছু দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেখানে মসজিদের প্রসারিত প্রাঙ্গণ। এক পাশে হাত পা ধোয়ার জায়গা। যারা প্রার্থনায় যোগ দেয়, তাদের জন্যে। আশেপাশে অসংখ্য ঘর।

মসজিদের ভিতরে ঢুকে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। একজন মৌলবী মসজিদের ইতিহাস ব্যক্ত করতে লাগল। মৌলবীর গায়ে জোব্বা। কিন্তু তার কথায়-বার্তায় অত্যন্ত উদারচেতার পরিচয়। বললে, আল্লাকে যখন আমরা ডাকি, তখন সমস্ত জগতের ব্যথা বেদনার কাতরতা নিয়ে আমরা ডাকি। আমরা মনে করি, যাদের যত ঠাকুর দেবতা আছে, যত উপাস্য শক্তিমান আছে, আল্লা হচ্ছে তাদেরই প্রতীক। আল্লাই একমাত্র জগতের সান্ত্বনা, আল্লা ছাড়া কারও গতি নাই। আমি এই মসজিদে দাঁড়িয়ে আল্লাকে ডাকছি। আপনারা শুনুন। আপনারা শুনতে পাবেন, আল্লা সাড়া দিচ্ছে।

চীৎকার করে উঠল সে—আল্লা।

বিরাট, গম্ভীর মসজিদের অন্তস্থল থেকে ডাক প্রতিধ্বনিত হ'ল—আল্লা।

মসজিদের অদ্ভুত কারুকার্য, সুবিশাল গম্বুজ, চারধারে কাচের ঘড়ার মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো, গায়ে লাল নীল কাচের কাজ যে কোন আগন্তুককেই মুগ্ধ করে দেয়। অভিভূত করে। এক পাশে বেদী। মোহাম্মদ আলীর কবর। সেও দেখবার মত।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ীটার পিছনে গেলাম। সেখানে আর একখানা বাড়ী। গেটের গায়ে লেখা: GOHARA PALACE MUSEUM. ভিতরে কিছু ছবি আছে।

অদূরে একটা দোকান। সেখানে ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড আর পিরামিডের মডেল বিক্রী হচ্ছে। পাথরের মডেল।

পিরামিডের দৃশ্য

কাছেই মসজিদের এলাকা শেষ হয়েছে। অনেকখানি উঁচু জমির উপর মসজিদ। তাই সেখানে দাঁড়ালে শহরের সমস্ত বাড়ীগুলির ছাদই নজরে পড়ে। নজরে পড়ে মরুভূমি, পিরামিড। যেন পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে শহর দেখা।

গেলাম কায়রো মিউজিয়াম দেখতে।

একটি লোক এল আমাদের দেখাতে। বললে, এত বড় মিউজিয়াম আর জগতে নাই।

—সে কি কথা? লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম বড় নয়? প্যারিসের লুভর?

—না না। লোকটা রেগে গেল। যা বলছি শোন। অন্যান্য সঙ্গীরা চোখ টিপল। যেতে দাও।

লোকটার পরনে জোব্বা। কিন্তু সুন্দর ইংরেজী বলে। ফ্রেঞ্চও নাকি ভাল বলতে পারে। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

তার কাছে মোহাম্মদ আলী সম্বন্ধে কে যেন কি জিজ্ঞেস

করল। সে যা মন্তব্য করল, শুনে 'থ' হয়ে গেলাম। তার পুনরাবৃত্তি না করাই ভাল।

সে একটা পাথরের হাঁচু দেখাল।

একজন বললে, ঠিক এই মূর্ত্তিই আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখেছি।

—তাই নাকি? ওরা এক নম্বরের চোর!

এত জোরালো ভাষায় সে বললে যে তার আত্মবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য্য হলাম। সমস্ত মিউজিয়ামটা আমরা খুব ভাল করে দেখতে পেলাম। অবশ্য সেই আমাদের দেখাল। জগতের মধ্যে এটা বড় না হতে পারে কিন্তু জগতের যে কোন বড় মিউজিয়ামের তালিকায় এটাকে নিঃসন্দেহে ফেলা চলে। এত প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান হাতের কাজ ও ঐতিহ্য এতে আছে যে দেখে মুগ্ধ হতে হয়। খৃষ্ট জন্মাবার পাঁচ'শ বৎসর আগে ইজিপ্সিয়ানরা কি গয়না পরত, কি প্রণালীতে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হ'ত, কি তাদের উপাস্য দেবতা ছিল, রাজারাণীর সিংহাসন কেমন ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর নমুনা এখানে আছে। খাঁটি সোনার কাজ-করা কত যে দ্রব্যসামগ্রী আছে, তার শেষ নাই।

মিউজিয়ামের সমস্ত বিভাগেই পুলিস বিরাজমান। তারা পাহারা দিচ্ছে। পরনে তাদের সাদা পোষাক। অনেকটা আমাদের দেশের পুলিসের মত।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যকর বিষয় হচ্ছে—মমি। বড় বড় সোনার কফিনে ঢাকা মমি আছে। কিছু মমি কাপড় দিয়ে বাঁধা অবস্থায়ও আছে। আর সেগুলি শুধু মানুষেরই নয়। মাছের, বাঁদরের, বিড়ালের এবং অন্যান্য জানোয়ারেরও বটে। এমন কি, ফুল-গাছেরও মমি রয়েছে। এখনও ম্লান হয় নি।

পথে বেরিয়ে একটা দোকানে ঢুকলাম। দোকানে হাতীর দাঁতের কাজ করা কত যে জিনিস রয়েছে, তার সংখ্যা নাই। থালা, ব্যাগ, বাস্কেট—মিশরের যাবতীয় হাতের কাজ করা সে সব জিনিস দেখলে মনে হয়, সমস্ত দোকানটাকেই কিনে নিয়ে বাড়ী যাই!

সাধারণ পথঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার। কোথাও কোথাও আবর্জ্জনা অবশ্য আছে, সেখানে মাছির উৎপাতও কম নয়।

বিড়ালগুলি আমাদের দেশের মত। রোগা এবং আমাদের দেশের বিড়ালের মতই ঝগড়া করে।

এগারটা নাগাদ মোটরে চড়লাম। একটা করে খাবারের প্যাকেট পেলাম জাহাজে নিযুক্ত এজেন্টের কাছ থেকে।

এবার মোটর ছুটল পিচের রাস্তা ধরে। দু'পাশে দিগন্ত-ব্যাপী শুধু মরুভূমি। সে মরুপথের আর শেষ নেই।

কোথাও মরুভূমিতে দু-একটা দরিদ্র ঘর আর কিছু ঘাসের চাপড়া। তা ছাড়া সর্ব্বত্র বালুকা। দুপুরের চিতা জ্বলছে সে মরুভূমিতে। দূর থেকে মনে হয় যেন সরোবর। পথিককে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিন্তু মরীচিকার কাছে গেলে মৃত্যু। কোথাও ধোঁয়ার মত বালির ঘূর্ণি উঠছে আকাশে। সে একটা দেখবার মত ব্যাপার। অনেক সময় এসব পথে বালির ঝড় ওঠে। সেটাকে বলা হয় "stand storm"। ঝড়ের মুখে গাড়ি পড়লেই হয়েছে! আর যাবার উপায় থাকে না। আকাশ অন্ধকার করে দেয় বালি উড়ে। যতক্ষণ না সে অবস্থার পরিবর্ত্তন আসে ততক্ষণ লরী, মোটর যে যেমন অবস্থায় ছিল তাকে সেই অবস্থাতেই থাকতে হয়। ভাবছিলাম সে অবস্থা আসবে না তো?

বেলা আড়াইটা নাগাদ সুয়েজ টাউনের এক রাস্তার মোড়ে এসে গাড়ি আটকে গেল। রাস্তাটা শহরের অন্তর্গত। চারিধারে দোকানের প্রাচুর্য্য। পুলিস-ফাঁড়ি আছে। মুক্তব আছে। আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

একটা মালগাড়ী পাস করতে লাগল। মালগাড়ীটা এত বড় যে, তার শেষ নেই। চলেছে তো চলেছেই।

শেষ বগীখানা পর্য্যন্ত যখন অদৃশ্য হ'ল লোহার গেট খুলে গেল। একে একে গাড়ীগুলি ছাড়া পেল। আমাদের গাড়ীর সামনে আরও অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আগে সুযোগ পেল।

গরমে, রোদে, ঘামে, ধুলোয় শরীরের একাকার অবস্থা।

গাড়ী গিয়ে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াল।

গাইড বললে, এ হোটেলে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম কর। কিছু পান করবার দরকার বোধ করলে, করতে পার। তবে নিজের পয়সায়। জাহাজের এখনও কোন পাত্তা নেই। আধঘণ্টা পরে জানা যাবে মনে হয়।

নিজের পয়সায় চা বা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেতে গিয়ে প্রমাদ গণলাম। এত তার দাম যে, খরচ করা বাতুলতা! তার উপর হোটেলের বয় ইংলিশ-মানি নিতে রাজী নয়। তাকে ইজিপ্সিয়ান মুদ্রা দিতে হবে।

পাউণ্ড ভাঙিয়ে ইজিপ্সিয়ান মুদ্রা যারা করে নিয়েছিল, তারাই পানের অধিকারী হ'ল। না হয়েও উপায় ছিল না। কারণ জাহাজে ও-মুদ্রার আর বদল পাওয়া যাবে না। যাদের কাছে বেশি ছিল তারা আমাকে ধার দিল। ধার পেয়ে অনেকেই তার সদ্ব্যবহার করল। পরে তারা ইংলিশ-মুদ্রা দিয়ে ধার পরিশোধ করবে। এতে দু'পক্ষেরই লাভ। যারা ধার দিল আর যারা ধার নিল।

আমি কোনো দলেই ছিলাম না। তাই জাহাজে উঠে চা পাবার অপেক্ষায় পড়ে রইলাম।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আমরা জাহাজ ঘাটে চালান হলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, এখনও অনেক দেরি, জাহাজের কোন পাত্তাই নেই।

একটা রাস্তার কল থেকে জল পড়ছিল। জল দেখে পিপাসা বোধ করলাম। দলের একজন বললে, ও জল খাবার নয়।

—তবে কোন্ জল খাব?

একজন ইজিপ্সিয়ান মানুষ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে বলা হ'ল। সে বললে, আমার সঙ্গে এস।

তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সে নিয়ে গেল আমাকে একটা অফিসের রান্না ঘরে। সেখানে এক বাবুর্চী চা তৈরী করছিল, লোকটা বাবুর্চীকে তার দেশের ভাষায় কি বলে চলে গেল।

বাবুর্চী চা করছে ত করছেই, এক কাপ—দু'কাপ, তিন কাপ —তৈরী করে ট্রে'র উপর চাপিয়ে ডিপার্টমেণ্টে দিতে চলে গেল।

আমার সামনে একজন লোক এসে নামাজ পড়তে লাগল, ওঠে হাঁটু গেড়ে বসে, চোখ বুজে প্রার্থনা করে।

তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বাবুর্চী চা পরিবেশন করে ফিরে এল। ফের আরও কয়েক কাপ চা তৈরী করতে লাগল, সহসা আমার দিকে তার নজর পড়ে গেল। লজ্জিত হবার ভঙ্গীতে কি বললে, একটা গেলাস ভাল করে ধুয়ে নিল। তার পর সেটা ভর্ত্তি করে আমাকে জল খাওয়াল, জল খেয়ে নিয়ে গেলাসটা রাখবার সময় বললাম, সেলাম আলেকম।

—সেলাম। বাবুর্চীও কপালে হাত ঠেকাল।

এক জায়গায় কাঠ কয়লার অল্প আঁচে ভুট্টা তাতান হচ্ছিল, একজন লোক অনেক ভুট্টা নিয়ে বিক্রী করতে বসেছে, তার কাছ থেকে মিঃ সালেম (আমাদেরই সহযাত্রী) একটা ভুট্টা কিনলো। দেখে লোভ হচ্ছিল। অবশ্য না চাইতেই সালেম আধখানা আমাকে খেতে দিল, মিঃ দত্ত নামে এক যুবকও ভুট্টা কিনেছিল। সেও আমাকে কিছু ভাগ দিল।

যে লোকটা আমাকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেছল, আবার তার দেখা পেলাম। সে ফিরে এল আমাদের কাছে কিছু রঙীন ছবির পোষ্টকার্ড নিয়ে, পোষ্টকার্ড বিক্রী করতে চায়। একটার দর করলাম বলে এক শিলিং।

যার কাছে একবার উপকার পেয়েছি, তার সঙ্গে দরাদরি করতে মন চাইছিল না। কিন্তু আমার মন না চাইলেও, তার মন চাইছিল, তার এই প্রবৃত্তি দেখে বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম, শুধু বললাম, ছ'পেনি পর্য্যন্ত দিতে পারি, ছবিটার এই হচ্ছে ন্যায্য দর। উপায় থাকলে দিতে পার।

লোকটা আমাদের ছেড়ে অন্যের কাছে গেল, সেখানে কি হ'ল জানি না, কিন্তু আমার কাছে ফিরে এসে ছ' পেনিতেই ছবিটা শেষ পর্য্যন্ত দিয়ে গেল সে।

বসবার এমন কোন জায়গা ছিল না, যে, দু'দণ্ড বিশ্রাম করি। দুটো সিমেণ্ট করা বেঞ্চ ছিল কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড রোদ, কয়েকটা আপিস বাড়ী ছিল বটে কিন্তু তাদের রক নেই।

একমাত্র খানিকটা ঘাসের জমি ছিল অবশিষ্ট। কিন্তু সেখানে ভাল পোশাক পরে বসা যায় না। তা সত্ত্বেও দেখলাম, একজন পরিশ্রান্ত অবস্থায় রুমাল পেতে বসে পড়েছে।

আমাদের জাহাজ কোম্পানীর শাখা আপিস ছিল সামনেই। সেখানে দেখি প্রচণ্ড গোলযোগ। অনেক ইজিপ্সিয়ান পুলিসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ঘটনাটা এই: গতকাল জাহাজে পাশপোর্ট জমা দিয়ে কোন এক এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মহিলা নাকি নেমে পড়ে পোর্টসৈয়দে। নেমে আর জাহাজে ফিরে না। জাহাজ ছাড়বার সময় পুলিস দেখে, সকলেই পাশপোর্ট ফেরং নিয়েছে, একজন শুধু বাকী আছে। তারা বাকী মহিলাটির নাম-ধাম এবং পাসপোর্ট নম্বর টুকে নিয়ে থানায় চলে যায়।

এদিকে মহিলাটি পোর্টসৈয়দ থেকে কায়রোয় পাড়ি দিয়েছে। কায়রো থেকে পরের দিন সুয়েজে আসবার সময় পুলিস তাকে ধরেছে। পাশপোর্ট দেখতে চেয়েছে। সে দেখাতে পারে নি। তখন পুলিস তাকে সন্দেহ করে আটক অবস্থায় রেখেছিল। এখন তাকে এনেছে জাহাজ কোম্পানীর আপিসে—দয়া করে জাহাজে তুলে দিবার জন্যে।

ইজিপ্সিয়ান পুলিসের উদারতা সত্যিই লক্ষ্য করবার মত।

যখন সাড়ে চারটে বাজল, তখনও আমাদের জাহাজের দেখা নাই। তার আগেই কিন্তু আর একখানা জাহাজ চলে গেল। আমাদের চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ভয় হ'ল ডিনারের সময়ও না উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

পৌনে পাঁচটায় আমরা মোটর-লঞ্চে চড়লাম।

অনেক দূরে বিন্দুর মত আমাদের জাহাজটিকে দেখা গেল।

দু'খানা মোটর-লঞ্চ আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। দুখানাতেই আমাদের দল বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

যখন জাহাজের কাছে এলাম, জাহাজ তার গতিকে একটু মৃদু করে এনেছিল। জাহাজের গা থেকে ঝোলান সিঁড়ি নেমে এসেছে।

সিঁড়ির সঙ্গে আমাদের মোটর লঞ্চগুলিকে একে একে বাঁধা হ'ল।

জাহাজও চলেছে, মোটর লঞ্চও চলেছে। মাঝখানের ফাঁকটুকু দিয়ে বিপুল বেগে ফেনায়িত জলতরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে এক একজন করে সিঁড়িতে উঠে পড়তে লাগলাম। আর লুফে নিতে লাগল জাহাজের লোক।

ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখি, ভাঙা হাট। পাঁচটা বেজে গেছে। চা পাওয়া সুদূরপরাহত। তবে ডিনার পাব। ডিনারের ঘণ্টা ছ'টায় পড়বে। ডিনারে চা আছে।

চাকরীর সন্ধানে

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয় নাই বা বিভক্ত হয় নাই। আমি ব্রিটিশ আমলের কথাই বলিতেছি। তখনও ব্রিটিশ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে—শাসন করিতেছে—ও ব্রিটিশের বৃহৎ ছায়ার নীচে ভারতের রাজা মহারাজা জমিদারগণ পরম সুখে প্রজা শোষণ ও শাসন করিতেছেন। জনগণের দুঃখ তখনও কঠিন—তখনও মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক সরকারী চাকরী পাইবার জন্য লালায়িত। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সরকারী চাকরী জুটিতে পারে না। যাহাদের পিছনের খুঁটি বেশ শক্ত—লোকবল, সুপারিশের বল—ও অর্থবল থাকে তাহারাই সেই দুর্লভ সরকারী চাকুরী লাভে সমর্থ হয়। যাহারা তাহা পায় না, তাহারা কোনও সওদাগরী আপিসে কেরাণী অথবা স্কুলের মাষ্টারী প্রভৃতির জন্য হাঁটাহাঁটি সুরু করে। এমনটি হইয়াছিল আমাদের পরমেশের। সরকারী চাকুরী যখন জুটিল না—তখন যা হয় কিছু পাইবার জন্য, পরমেশ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথাও কিছু মিলাইতে না পারিয়া অনবরত এখানে ওখানে বহু দরখাস্ত ছাড়িয়া দেবদেবীর দুয়ারে মানত করিয়া, জ্যোতিষীর নিকট হাত দেখাইতে সুরু করিল। ইদানীং তাহার অর্থসঙ্কট চরমে উঠিয়াছে। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। তৃপ্তি কেবিনের মালিক সাধনবাবুকে এড়াইবার জন্য বহু পথ ভাঙিতে হয়। পান-সিগারেটের দোকানদার বলিয়াছে আগামী সপ্তাহে টাকা না দিলে রাস্তার মাঝে গলায় গামছা দিয়া জামা-কাপড় কাড়িয়া লইবে। আর বাবু বলিয়া বা ভদ্রলোক বলিয়া কোন খাতির করিবে না। মেসে দুই মাসের উপর টাকা বাকী পড়িয়াছে। ম্যানেজার তাহার মিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উপরন্তু বলিয়াছে—এই ওয়ার্ণিং পরমেশবাবু! সাত দিনের মধ্যে টাকা না মেটালে আর মেসে থাকতে দেওয়া হবে না।

পরমেশ ছিন্ন শয্যায় বসিয়া দুই হাতে কপাল ধরিয়া, রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। দারুণ ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে—সমস্ত শরীর চন্ চন্ করিতেছে। মাথার ঠিক নাই—মাথা ঘুরিতেছে। পরমেশ ভাবিল আশ্চর্য্য সব লোকগুলি। উহারা তাহাকে বাদ দিয়া, কেমন হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে থালা থালা ভাত সাবাড় করিতেছে। কেহই তাহার কথা ভাবিল না যে, একটা লোক কাল হইতে উপবাসী রহিয়াছে। লোকের বাড়ীতে কুকুর-বিড়াল থাকিলে তাহাদের দিয়া থাকে। কিন্তু সে কি কুকুর-বিড়ালেরও অধম। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। পরিতৃপ্তির ভোজন সমাধা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিড়ি-সিগারেটের ধুম ছাড়িতে ছাড়িতে শ্লেষাত্মক সুরে একজন বলিল, তার পর পরমেশবাবুর কি হচ্ছে?

পরমেশের তখন অবরুদ্ধ ক্রোধ ও ঘৃণা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল—কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া পরমেশ বলিল, মশাই দেখতেই ত পাচ্ছেন। উপস্থিত হাওয়া খাচ্ছি।

—হাওয়া? বেশ বেশ। হাঁ হাওয়া খান, শরীর ভাল থাকবে। মেসের মেম্বারটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। পরমেশ জামা গায়ে দিতেছিল, ইচ্ছা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিবে, কিংবা কোনও পার্কে যাইয়া ঘুমাইবে। মেসের এই আবহাওয়া অসহ্য। এখন অন্যান্য মেম্বররা কেহই নাই। ম্যানেজারবাবু ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া বড়বাজারে গিয়াছেন। অন্যান্যরা এখন আপিসে—একমাত্র শুধু পরমেশ এই অনন্ত কর্ম্ম-কোলাহলময় ধরিত্রীর মাঝখানে দুই দিন উপবাসী থাকিয়া সরকারী বাগানে ঘুমাইতে চলিয়াছে। ধিক্ ধিক্, সে মানুষ নামের অযোগ্য। পরমেশ নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিল। ইতিমধ্যে কখন যে বিজয় হালদার সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া পকেট হইতে লম্বা কবিতার খাতাখানি বাহির করিয়াছে তাহা পরমেশ লক্ষ্য করে নাই।

বিজয় একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, শোন হে পরমেশ। কাল রাতে যা একখানা কবিতা লিখেছি—তা আর কি বলব। এখন বেশ মন দিয়ে শোন দেখি। অন্য দিন হইলে পরমেশ কবিতা শুনিত—সমালোচনা করিত। কিন্তু আজ আর বিজয় হালদারের কবিতার দিকে দৃকপাত করিল না। পরমেশ সোজা তাহার সম্মুখে আসিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। কবিতার খাতাখানি টানিয়া লইয়া বলিল, চমৎকার অদ্ভুত আশ্চর্য্য কবিতা, বুঝলে হে হালদার! তার পর বিজয় হালদারের জামার বুকপকেট হইতে তাহার স্ফীতকায় মনিব্যাগটি তুলিয়া লইয়া নিজ পকেটে পুরিল। বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, বাঃ এ কি ব্যাপার? বাঃ আমার ব্যাগ।

দুই চোখে আগুন ছড়াইয়া পরমেশ বলিল, তোমার অজস্র রাশিকৃত প্রলাপ-কবিতার সমজদার রসগ্রাহী শ্রোতা ও সমালোচক হিসাবে, তার দক্ষিণা বাবদ এই নিলাম। ওটা তার দাম—আচ্ছা চলি এখন—বিজয় হালদারকে হতচকিত করিয়া পরমেশ তর তর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। নীচে নামিয়া আসিয়া পরমেশ সেই রৌদ্রতপ্ত রাস্তা দিয়া হাঁটিতে লাগিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে কখন যে কোন পথ দিয়া একেবারে গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িয়াছে, সে খেয়াল নাই। ওপারের কারখানার চিমনীগুলি, আকাশপানে যেন শত শত চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—গঙ্গার জলে অজস্র নৌকার ভীড়—দূরাগত বিচিত্র কোলাহল। তাহার চিন্তা, এই সবকে ছাপাইয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল।

নিরিবিলি একটি স্থান বাছিয়া লইয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া পরমেশ গঙ্গার জলের দিকে তাকাইয়া রহিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে পরমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মনের জ্বালা ও ক্রোধ গঙ্গার সুশীতল হাওয়ায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। অভ্যাসবশতঃ বুকপকেটে হাত দিতেই বিজয় হালদারের মনি-ব্যাগটি হাতে ঠেকিল। ব্যাগ খুলিয়া দেখিল অনেকগুলি টাকা। টাকা দেখিয়া পরমেশের ক্ষুধা যেন আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল।

বড় রাস্তায় আসিতেই সম্মুখের যে আলোকসজ্জিত রেস্তরাখানি চোখে পড়িল, পরমেশ তাহাতেই ঢুকিয়া বে-পরোয়াভাবে নানা সু-খাদ্যের ফরমাস করিল। রাশিকৃত সুখাদ্য সম্মুখে দেখিয়া পরমেশের দুই চোখ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। প্রথমে তাড়াতাড়ি করিয়া পরে ধীরে-সুস্থে বেশ রসিয়া রসিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি উদরস্থ করিয়া চায়ের হুকুম করিল। একটা কাঁচি সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া দিব্য মনের আনন্দে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। যা'ক্ রাত্রের মত নিশ্চিন্ত, অনেকরাত্রে মেসে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিতে উঠিতে অভ্যাসবশতঃ লেটার-বক্সটি খুলিতেই অবাক্। তাহার নামে একখানি পত্র রহিয়াছে। পরমেশ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল তাহাকে আবার কে পত্র লিখিল। নিজের ঘরে আসিয়া মোমবাতির মৃদু আলোকে পত্রখানি পড়িয়া পরমেশ আরও অবাক হইয়া গেল। তাহার এতদিনে চাকুরী হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে একখানি দরখাস্ত ছাড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল পূর্ব্বের মত এই দরখাস্তও বুঝি নিষ্ফল হইবে। কিন্তু কপাল সু-প্রসন্ন। এইবার তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। কালনার নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামের প্রাইভেট টিউটরের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া পরমেশ কপাল ঠুকিয়া দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল—আজ তাহারই উত্তর আসিয়াছে। ভদ্রলোক দুই-একদিনের মধ্যেই তাহাকে কাজে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। পরমেশের ইচ্ছা হইল এখনই সে চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয় যে, সে আর বেকার নয়। সে রাত্রে পরমেশের আর ঘুম আসিল না।

ছোট্ট একটা বেডিং ও একটি মাত্র সুটকেস সম্বল।

সংসারে কত লোকের কত কি জিনিস আছে। তাহাদের বাড়ীঘর জমিজমা স্ত্রী-পুত্র—কত আসবাবপত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য, পরমেশের এই পৃথিবীতে নিজের আপন জন বলিতে যেমন কেহ নাই তেমনি নাই কোন বাড়ীঘর বিষয়-সম্পদ। ও যেন স্রোতের কুটা ভাসিতে ভাসিতে এ ঘাট ও ঘাট করিতে করিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। হয় কোনদিন কূল পাইবে—অথবা সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ডুবিতে ডুবিতে কখনও ভাসিতে ভাসিতে লবণাক্ত জলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

আপন মনেই পরমেশ বলিল, নাঃ, চিঠিখানা সম্ভব ঠিকমত পৌঁছায় নি। নতুবা একটা লোকও কি ভদ্রলোক না রাখতেন? সুটকেশ আর বেডিং দুই হাতে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া পরমেশ এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কোথা হইতে একটি অত্যন্ত কৃশকায় কালো মতন লোক বিড়ি টানিতে টানিতে আসিয়া বলিল, বাবু মশায় কি কলকাতা থেকে আসছেন—

—হাঁ। কেন—

লোকটি একটি ছোট্ট কাগজ আগাইয়া দিয়া বলিল, দেখুন তবে এঁজ্ঞে এই রোকাটা। এই লেকা নামটা কি আপনার। আমাদের কত্তাবাবু এ জ্ঞে লিখে দিয়েছেন—

পরমেশ পড়িয়া দেখিল, তাহারই নাম বটে।

পরমেশ বলিল, হাঁ আমি। এখন চল—কোথায় গাড়ী। লোকটি একটা দিক দেখাইয়া বলিল—হুই যে—গাড়ী ঐ আম-তলায়। আসুন বাবু চট করে। শালার গরু নাপাতে লেগেছে। দড়ি ছিঁড়ে পালাবার মতলব। লোকটি বিড়ি টানিতে টানিতে বগলে পাঁচনগাছটি চাপিয়া ধরিয়া কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ছুটিতে লাগিল। আমগাছতলায় একখানি গাড়ি। ছই ভাঙা —তবুও রোদ আটকাইবে মনে হয়। কতগুলি খড় বিছাইয়া তাহার উপর একখানি সতরঞ্চ বিছাইয়া বিছানা করা হইয়াছে। গাড়ীর ভিতর সুটকেস আর বেডিং রাখিয়া পরমেশ গাড়ীর উপর কাত হইয়া শুইয়া বলিল, বাঃ—এ যে রাজশয্যা। কিন্তু কি নাম তোর—

—এজ্ঞে আমার নাম গগন। গগন সর্দ্দার। বাবা ছেল বিষ্ণু সর্দ্দার, ভারী লাটিখেলা জানত—বড় লেটেল ছেল কিন্তু—

পরমেশ হাসিয়া বলিল, তাতো ছেল! তা তোর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বাপু তোর চেহারাখানা দেখে, তুই যে লাঠি ধরতে পারিস তা মনে হয় না—

—হেঁ—হেঁ—করিয়া একমুখ হাসিয়া, গরুর পিঠে অকারণে দুইঘা লাঠি বসাইয়া গগন বলিল, না—তা এজ্ঞে লাঠি ধরতে আমুও জানি। তবে কি আমার কর্ত্তার মত পারি? না—তা পারি নে। গগন এইবার সজোরে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল।

রসুলপুর পৌঁছাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া যেখানে থামিল সেইখানে নামিয়া পরমেশ অবাক হইয়া গেল। সম্মুখেই প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রথমেই বাগান —নানান্ গাছ—ফল ও ফুলের গাছ। বাগানটি মালীর সযত্ন দৃষ্টি ও নিপুণ হাতের পরিচয় দিতেছে। সারি সারি বিলাতি তাল

আর ঝাউ গাছ—অজস্র গোলাপগাছ ও ফুলগাছের মধ্য দিয়া পথ। এমন গণ্ডগ্রামে এমন একটি সুসজ্জিত সুন্দর বাড়ী দেখিয়া পরমেশ অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের বারান্দায় গৃহস্বামী একখানা বেতের চেয়ারে বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিলেন। পাশের একটি চেয়ার দেখাইয়া মৃদু হাস্যে গৃহস্বামী বলিলেন, আসুন স্যর—আসুন। নমস্কার বিনিময়ের পর রাস্তায় ট্রেণ জার্ণির কষ্ট—কলকাতার নানান্ খবর—আজকের আবহাওয়া প্রভৃতি অবস্থার আলোচনার পর গৃহস্বামী শশাঙ্কবাবু বলিলেন, উঠুন, চায়ের আয়োজন হয়ে গেছে। এখন হাতমুখ ধুয়ে নিন—

দিন দুই পার হইয়া গেল। পরমেশ শশাঙ্কবাবুর সহিত, নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে, রাশিকৃত ইংরাজী, বাংলা বই ও মাসিকপত্র পড়ে, দুপুরে ঘুমাইয়া বৈকালে বেড়াইয়া সময় কাটাইয়া দেয়। কিন্তু কাহাকে যে পড়াইতে হইবে, তাহা শশাঙ্কবাবু এ পর্য্যন্ত বলেন নাই। এ বাড়ীতে যে কোন ছেলে-মেয়ে নাই, তাহা পরমেশ বুঝিতে পারিয়াছে। থাকিলে এই দু'দিনে জানিতে পারিত। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী আছেন কিনা তাহাও পরমেশ বুঝিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ ভদ্রমহিলা অত্যন্ত পর্দ্দানশীন, তাই তাহার অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত পরমেশ আঁচ করিতে পারে নাই। দিন কয় পর, পরমেশ নিজ হইতেই শশাঙ্ক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, কই আমার ছাত্র কই? বসে বসে আর কাঁহাতক থাকা যায়।

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, ছাত্র আর পাচ্ছি কোথায় বলুন। তবে ছাত্রী একজন আছেন—মানে আমার স্ত্রী। কিন্তু তিনি এতই লাজুক যে, তাঁকে রাজী করাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—আচ্ছা এখনই আমি ডাকছি। শশাঙ্কবাবু পর্দ্দার দিকে তাকাইয়া ডাকিলেন, কই গো—এখানে এস—এস। পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। শশাঙ্কবাবু একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন,—বস—বস। এই তোমার মাষ্টার মশাই। আর ইনি আমার স্ত্রী অলকা দেবী। বুঝলেন স্যর, যাতে ভালভাবে পাশ করতে পারে, তাই একটু চেষ্টা দেখবেন, শশাঙ্কবাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

অলকা যেন অগ্নিশিখা। রূপের এমন দীপ্তি, পরমেশ ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। মনে হয়, অলকার সমস্ত শরীরের ভিতর এক আগুন যেন লেলিহান ভাবে জ্বলিতেছে। পরমেশ তাহার ছাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইয়া গেল। স্থান-কাল ভুলিয়া পরমেশ বোধ করি ছাত্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। হঠাৎ এক উচ্চহাস্যে সচকিত হইয়া দেখিল, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হাসিতেছে। লজ্জিত হইয়া পরমেশ বলিল, তবে আজ থেকেই পড়া আরম্ভ করা যাক। বই-টই সব আছে ত—

ঘাড় নাড়িয়া অলকা বলিল, হু—

অলকা দীর্ঘাঙ্গী। সাগরের ঢেউয়ের মত ছন্দময়ী গতিশীলা তনুর ভঙ্গিমা। নিখুঁত মুখ। দুটি ভুরু যেন কেহ কাজলের টান দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। লম্বা দীর্ঘ পক্ষযুক্ত টানা টানা চোখ। সেই চোখের দুটি তারা নিকষ কালো। বার বার সেই মুখ—সেই চোখ তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সেই দীর্ঘ পক্ষযুক্ত টানা টানা চোখের ভিতর কি এক অস্বাভাবিক আলো জ্বলিতেছে। পরমেশ ভালো করিয়া দেখিল, ঘন একরাশ কাল চুল, দুধে আলতা গোলা দেহের রং, ননী-কোমল তনু, কৃশ-কটি, আর অপরূপ দেহ বল্লরী।

পরমেশের পক্ষে এ আশাতীত। পরমেশ যেন হঠাৎ এক আলাদীনের প্রদীপ পাইয়া গিয়াছে। এমন সুন্দর প্রাসাদোপম গৃহে বাস—তদুপরি দিনে চার-পাঁচবার রাজভোগ, আর তাহার সহিত মাসিক এক শত টাকা মাহিনা। এ যে কল্পনাতীত। পরমেশ নিজ সৌভাগ্যে অত্যন্ত বিস্মিত। কোথায় সেই কলকাতার সরু গলির ভিতর মেসবাড়ী, দিন রাত ম্যানেজারের কটু বাক্য, পান-ওয়ালা চা-ওয়ালার রূঢ় অশ্লীল অপমান। আজ সব যেন স্বপ্ন। পরমেশ মনে মনে বহু সুখের স্বপ্ন গড়িয়া তোলে।

কিন্তু মুস্কিল বাধাইয়াছে স্বয়ং ছাত্রী। পড়া আগাইতে চাহে না। এক লাইন কি দুই লাইন পড়িয়াই বই বন্ধ করিয়া ছোট্ট মেয়ের মত আবদার সুরু করে, মাষ্টারমশাই আজ পড়া থাক্—ভাল লাগছে না। তার চেয়ে আপনার গল্প বলুন—

আশ্চর্য্য হইয়া পরমেশ বলে, আমার জীবনের আবার গল্প কি? আমার জীবনে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই, ঘোর-প্যাঁচ নেই! একেবারে অত্যন্ত সাধারণ জীবন—কোন রোমান্স, কোন বীরত্ব কিছুমাত্র নেই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যান। কাকার কাছে মানুষ হই। ম্যাট্রিকটা পাশ করার পর, কাকা বললেন, বাপু এখন বড় হয়েছ, আর তোমায় পুষতে পারব না। এখন নিজের পথ দেখ। চলে এলাম কলকাতায়। দু-একটা টিউশনি অতি কষ্টে যোগাড় করে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে কোনরকমে আই-এ পাশ করে চাকরী খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু চাকরী জুটল না—ওদিকে বিস্তর দেনা। মেস, পানওয়ালা, চা-ওয়ালা সব মিলিয়ে আমায় পাগল করে তুলল। তার পর এই চাকরী। শেষে সকলকে—

হাসিয়া অলকা বলিল, ফাঁকি দিলেন বুঝি—

পরমেশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়—সত্যি সবকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম এখানে।

অলকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। পড়া বিন্দুমাত্র আগাইতে চাহে না। নানা কথা নানা গল্পের ভিতর পরমেশ সব ভুলিয়া যায়। সুন্দরী ছাত্রীর দেহ হইতে কাল রাশিকৃত চুল হইতে মনোরম সুগন্ধ নাকে আসিয়া লাগে—কখনও বা তাহার ননীর মত নরম, চাঁপাকলির মত আঙ্গুলের স্পর্শ হাতে লাগে। তাহার রঙিন বহুমূল্য রেশমী কাপড়ের অঞ্চল দুরন্ত বাতাসে উড়িয়া গায়ে আসিয়া পড়ে। পরমেশ বিহ্বল হইয়া অলকার মুখের দিকে চাহিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া যায়। অলকা হাসির সোনা-রঙ ছড়াইয়া মাথায়

বিচিত্রভাবে ঝাঁকি দিয়া বলে, চলুন মাষ্টারমশাই, আজ ঐ দিকটা বেড়িয়ে আসি।

মাঝে মাঝে শশাঙ্কবাবু সস্ত্রীক তাঁদের নিজস্ব ছোট্ট মোটরগাড়ী চড়িয়া কোথায় যেন বাহির হইয়া যান। কিন্তু কোথায় যে যান সে খবর কেহই জানে না। ঠাকুর-চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বাবু কি জানি কোথায় গিয়েছেন। তাঁর কত কি কাজ! দিন দুই পরে দুই জনে ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলেন, হ্যালো মাষ্টারমশাই! সব ভাল ত?

রোদের তেজ কমিয়া আসিয়াছে। বাহিরে বড় বড় গাছগুলির মাথায় সূর্য্যাস্তের সোনালী রঙ লাগিয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। অনেকগুলি পাখী নানান্ সুরে ডাকিতে ডাকিতে গাছের ডালে ডালে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আকাশ পরিষ্কার—স্বচ্ছ বাতাসে অজানা ফুলের আর ঘাসের গন্ধ। অলকা বলিল, চলুন—বেড়িয়ে আসি—

অলকার পরনে হালকা সবুজ রঙের সাড়ী, পিঠের উপর পুষ্ট বেণী ঝুলাইয়া অলকা বাগানের মধ্যে নামিয়া যায়। পরমেশ পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে একটা পরমস্নিগ্ধ সুগন্ধ অলকার বেশ-ভূষা হইতে পায়। বার বার সেই সুঘ্রাণ নাকে টানিতে টানিতে পরমেশের যেন নেশা লাগিয়া যায়। দুইজনে হাঁটিতে হাঁটিতে জনবিরল মাঠের মাঝে আসিয়া পড়ে। দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত—কোথাও কোন জনপ্রাণী নাই। আকাশে চক্রাকারে কতকগুলি ছোট ছোট পাখী অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে! দূর হইতে গরুর গলার ঘণ্টা-শব্দ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে।

—কি চমৎকার! অলকা সেই স্বচ্ছ বাতাস প্রাণভরে টানিতে টানিতে বলে, চমৎকার! শহরে কি এমন সুন্দর বাতাস পাওয়া যায়? আমার কিন্তু পাড়াগাঁই বেশ ভাল লাগে—

পরমেশ বলে, কিন্তু সব সময় ভাল লাগে না। মানুষের যেমন কোলাহল চাই—তেমনি নির্জ্জনতা, নিঃশব্দতাও চাই। উভয়ে হাঁটিতে থাকে। সূর্য্যাস্তের সোনা-ঝরা রোদ আসিয়া অলকার মুখে গায়ে ছড়াইয়া পড়ে। উহাকে অপরূপ দেখায়। হাঁটিতে হাঁটিতে অলকা বলে, আপনার বাড়ীতে কে আছেন বলেন নি ত।

হাসিয়া পরমেশ বলে, বলেছি বৈ কি? ভুলে গেছ। কেউ নেই আমার—

—সত্যি? অলকা একটু ভাবিয়া বলে, স্ত্রী?

হাসিয়া পরমেশ বলিল, স্ত্রী লাভ করবার সৌভাগ্য আজও হয় নি—

—বাঃ, এখনও বিয়ে করেন নি? তার পর অপরূপ ভঙ্গীতে মাথা দোলাইয়া দুই হাতে চুলগুলি ঠিক করিতে করিতে অলকা বলে, আপনার কিন্তু বিয়ে করা উচিত। পুরুষ-মানুষের জীবনে একজন সঙ্গিনী থাকা দরকার। আচ্ছা ইয়ে—আচ্ছা আপনি কাউকে ভালবাসেন নি—যদিও এটা জিজ্ঞাসা করা আমার ধৃষ্টতা। অলকা একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—

হাসিয়া পরমেশ বলে, আমি? ও-কথা ভাববার অবসর কোথায়? দিনরাত্রি পেটের ভাত, আর মাথা গোঁজার জন্য আশ্রয় যাকে খুঁজতে হয় তার কি ও-সব বিলাসিতা সাজে?

অলকা বলিল, কিন্তু ভালবাসা তো অন্য জিনিস। সত্যি কাউকেই ভালবাসেন নি? অলকা নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে—

অলকার অপরূপ মুখের দিকে চাহিয়া পরমেশের মনে হইল, সে চীৎকার করিয়া বলে, সে ভালবেসেছে। যাকে ভালবাসি—সে তুমি—তুমি। কিন্তু মনের ইচ্ছা কি সব সময় মুখ দিয়া ব্যক্ত হয়! কাহাকেও মনে মনে ভালবাসা যায়—কিন্তু মনের ভালবাসা মুখ দিয়া বাহির করা সহজ নয়। সেখানে বহু ভয়, বহু সঙ্কোচ, বহু দ্বিধা। তাই পরমেশ কোন কথাই বলিতে পারিল না। কিন্তু সম্ভবতঃ অলকা বুঝি নারী-সুলভ দৃষ্টি দিয়া বুদ্ধি দিয়া পরমেশের চোখের মাঝে মনের ভাষা পড়িয়া ফেলে।

এক সময় হাসিয়া বলে, আচ্ছা—চলুন এখন। অলকা তাহার দেহের অতি অপরূপ সৌন্দর্য্য-লহরী ছড়াইয়া হাঁটিতে থাকে।

হাঁটিতে হাঁটিতে অলকা বলে, আমার একটা কাজ করে দেবেন?

পরমেশ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাই সাগ্রহে বলিল, কাজ? কি কাজ—নিশ্চয় করে দেব।

হাসিয়া পরমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া অলকা বলিল, কিন্তু খুব কঠিন কাজ।

—হোক কঠিন। যত কঠিনই হোক সে কাজ করে দেব।

—সত্যি? অলকা পরমেশের একটা হাত ধরিয়া বলে, বেশ। সময় হলেই বলব—

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায় পরমেশের—

বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো—সমস্ত চরাচর যেন সাদা-চাদর মুড়িয়া ঘুমাইতেছে। দু-একটি রাতজাগা পাখী ডানার ঝাপট দিতেছে। পরমেশ উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইল। মনে পড়িল অলকার কথা। সে এখন ঘুমাইতেছে, তার ননী-কোমল শুভ্র-শরীর জ্যোৎস্নার ধবল আলোয় আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সিগারেট টানিতে টানিতে শুভ্র-জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া এই নিঃসঙ্গ শয্যার উপর পরমেশ মনে মনে এক দুরন্ত কামনা বোধ করিল। সারি সারি স্তব্ধ নিঃশব্দ ঘরগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হঠাৎ পরমেশ চমকাইয়া উঠিল। পরমেশ দেখিল অলকার শয্যাগৃহ হইতে লণ্ঠনের আলো দেখা যাইতেছে। আশ্চর্য্য, এত রাত্রে অলকা কি করিতেছে? সে কি এখনও জাগিয়া আছে?

কিন্তু আর ঘুম আসে না—

পরমেশের আজ সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে নিজেকে। এতদিন সে যেন শিশু ছিল—তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্তই যেন অপরিণত ছিল। এতদিন শুধু দুই মুঠা আহারের জন্য, একটু বাসস্থানের জন্য সমস্ত চিন্তা, সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু আজ এ কি কামনা তাহার মনে

আসিয়াছে! পরমেশ মাথার নীচে দুই হাত রাখিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে জাগিয়া রহিল।

এক সময় পরমেশ ঘুমাইয়া পড়ে। বেলা বেশ হইয়াছিল। হঠাৎ দরজায় দুম্‌দাম্ শব্দে পরমেশ চমকাইয়া উঠিল। এরূপ শব্দ কে করিতেছে?

দুই চোখ রগড়াইয়া দরজা খুলিয়া দিতেই পরমেশ অবাক্ হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার? পরমেশ দেখিল, অনেকগুলি পুলিস ও চার জন রিভলবারধারী উচ্চ অফিসার তাহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছে।

পরমেশ বলিল, আপনারা—

—আমরা পুলিসের লোক। আপনার নাম পরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় না?

—হ্যাঁ। কিন্তু কি ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি নি যে।

তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, আর তা পারবেন না। এখানে কি করতেন, পড়াতেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শশাঙ্কবাবুকে ডেকে দেব কি?

—কাকে ডেকে দেবেন? তাঁরা কি আর আছেন? খাঁচা শূন্য করে পাখী পালিয়েছে। আপনার অলকাদেবী, উনি একটি জাঁহাবাজ মেয়ে মশাই। উনি হলেন মৌচাকের মক্ষীরাণী। আর আপনার শশাঙ্কবাবু, ওঁর বিরুদ্ধে বোধ করি আট-দশটা ভারী ভারী শক্ত ধারা ঝুলছে। যাক্, আপনি খুব বেঁচে গেছেন মশাই—

পরমেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ যে অবাক কাণ্ড—এ যে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কথা।

পরমেশ বলিল, বলেন কি? বাড়ীর আর সব কোথায়?

—ওরা সবাই দলের লোক। এখানে রাজাবাবুদের বাগান-বাড়ীতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সেজে ভাড়া নিয়ে দিব্যি জাল নোটের কারবার খুলে বসেছিলেন। নিজের মোটর—ঠাকুর চাকর—দিব্য ভদ্রলোক সেজে ছিলেন। এখন বোধ করি অন্য কোন ডেরায় ওরা আস্তানা গেড়েছে। বহুবার পাঁকাল মাছের মত খালি খালি ফসকে যাচ্ছে ওরা—

পরমেশ বলিল, কিন্তু আমায় চাকরী দেবার মানে কি—

—আপনাকে? ওদের জাল নোটের কারবারে বড় বড় রুই-কাতলা মাছের টোপ হতেন। অলকা দেবী ছিপ ধরে থাকতেন। আপনার মত ভদ্র লেখাপড়া জানা সু-চেহারা শিক্ষিত লোকই যে ওদের দরকার। এ সব এখন বুঝবেন না। অলকা দেবীর সঙ্গ কিছুকাল পেলে আপনাকেও তাঁরা দলের লোক করে নিতেন। আপনি হতেন বড় বড় রুই-কাতলা মাছের টোপ। এখন এ সব বুঝবেন না। চলুন আপনাকে একটা ষ্টেটমেণ্ট দিতে হবে। থানায় চলুন—

—থানায়? পরমেশ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল অলকার মুখখানি। সেই মুখ, সেই সুন্দর হাসি, সেই মধু-মাখা কথা। সেই অপরূপ সুন্দর চোখের দৃষ্টি···সে কি সব অভিনয়? তা হবে। কিন্তু আমার মাহিনার টাকা?

পুলিশের উচ্চ হাসিতে পরমেশ চকিত হইয়া উঠিল।

সমবেদনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চোখের জল কি রোদে শুকাইবে ভাই?
স্নেহের প্রেমের সমবেদনার
অধরে তোমার মৃত ফুৎকার
জননীর মত বেদনা জুড়াতে
তাহার তরে কি নাই?

চোখের জল কি শুকাবে বাতাসে
কথার ছলের কপটাশ্বাসে
ব্যথিতের ক্ষত সময়ে শুকাবে
দাঁড়ায়ে দেখিবে তাই?
অশ্রুমলিন মুখখানি ধুয়াতে
তোমার অশ্রু নাই?

কালিদাস সাহিত্যে গীতার প্রভাব

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

গীতার আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্ম, ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অনাসক্ত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়া। মহাকবি কালিদাস তাঁহার সাহিত্যের স্থানে স্থানে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল গীতার আদর্শ নয়, গীতার বর্ণনা, গীতার উপমা, এমন কি গীতার কয়েকটি শ্লোকাংশ পর্য্যন্ত তাঁহার রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় ভগবদ্গীতায় তাঁহার জ্ঞান ও গীতার প্রতি তাঁহার ভক্তি কি প্রগাঢ় ছিল!

কালিদাস তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা রঘুবংশ মহাকাব্যে সূর্য্যবংশীয় রাজারা কেন যে এখনও দেশবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন, এবং কোন কোন গুণ তাঁহাদের বংশের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানং'—তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন কেবল পরকে দান করিয়া দেওয়ার জন্য। মহাকবি এখানে 'ত্যাগায়' না লিখিয়া 'দানায়' শব্দটিও লিখিতে পারিতেন, কিন্তু 'দানের' অপেক্ষা 'ত্যাগের' মধ্যে যে অধিকতর মহত্ত্ব ও অনাসক্তির ভাব প্রকাশ পায়, এবং গীতার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, হয়ত ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনি এখানে 'দানায়' না লিখিয়া 'ত্যাগায়' লিখিলেন। দান করার সময় দাতার মনে অহঙ্কার আসিতে পারে, প্রত্যুপকার পাইবার আকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে, সুকীর্ত্তি অর্জ্জনের লোভ আসিতে পারে, কিন্তু 'ত্যাগের' মধ্যে কামনা-বাসনার কথা থাকিতে পারে না। নিজেদের ভোগ ও সুখ বৃদ্ধি করার জন্য তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন না, করিতেন কেবল পরের মঙ্গলার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিয়া দেওয়ার জন্য।

তার পর তিনি বলিতেছেন, 'যশসে বিজিগীষূনাং'—যশ লাভ করার জন্য তাঁহারা দেশ জয় করিতে যাইতেন, মহাকবি এই কথায় যেন বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, সুতরাং দেশজয় করার কীর্ত্তি অর্জ্জন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাই কেবল ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য তাঁহারা দেশজয়ে বাহির হইতেন, পররাজ্য কাড়িয়া লইয়া ভোগ করার জন্য নহে, যেন অনাসক্ত চিত্তে ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল।

রঘুবংশীয় রাজাদের আরও বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য তিনি বলিতেছেন, 'প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং'—তাঁহারা বিবাহ করিতেন সন্তান লাভের জন্য, বংশরক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য, পুত্রলাভ করিতে না পারিলে পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় না, যেন কেবল মাত্র এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহারা বিবাহ করিতেন, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নহে।

রঘুবংশীয় রাজাদের সাধারণ ভাবে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাইবার পর কালিদাস প্রথমে রাজা দিলীপের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি 'ভোজে ধর্ম্মামনাতুরঃ'(রঘু-১।২১) রুগ্ন বা বিপদগ্রস্ত না হইয়াও তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। মহাকবি যেন এখানে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, সংসারে সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, মানুষেরা যখন রোগে ভোগে বা বিপদে পড়ে, কেবল তখন তাহাদের ভগবানকে মনে পড়ে ও তাহারা তাঁহার কৃপালাভ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু রাজা দিলীপ এ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না, তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে আসিতেন, তাহার প্রধান কারণ তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মানুষের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, কোনও ইষ্ট লাভের বা বিপদ হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ভগবানের আরাধনা করিতেন না।

দিলীপ রাজার আরও গুণ দেখাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন, 'অগৃধ্নুরাদদেহর্থং' তিনি লোভী ছিলেন না, তথাপি তিনি প্রজাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন। অর্থের উপর তাঁহার লোভ না থাকিলেও তিনি রাজার প্রাপ্য নির্দ্ধারিত কর আদায় করিতেন। রাজার কর্ত্তব্য কর আদায় করা—সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া অর্থাৎ প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া—সে অর্থ লইয়া তিনি কি করিতেন তাহাও জানাইবার জন্য মহাকবি একস্থানে বলিতেছেন, 'প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ' (রঘু-১।১৮) প্রজাদেরই মঙ্গলার্থে ব্যয় করার জন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, নিজের ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করিয়া লওয়া তাঁহার অভিলাষ ছিল না, সমস্ত অর্থ প্রজাদের হিতকার্য্যে ব্যয় করা ছিল তাঁহার কর গ্রহণের উদ্দেশ্য। বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি এখানে একটি উপমা দিলেন 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসংরবিঃ' সূর্য্য যেমন পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহা সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বৃষ্টিরূপে আবার পৃথিবীকেই প্রদান করিয়া থাকেন। মহাকবি এখানেও স্পষ্টরূপে না বলিলেও, অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সূর্য্য তাঁহার কিরণের সাহায্যে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া লয়েন সত্য কিন্তু সে রস তিনি নিজে ভোগ করেন না, নিজে তাহার এক ফোঁটা ভোগ করা দূরে থাকুক, তাহাকে বরং সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বৃষ্টিরূপে আবার পৃথিবীকেই প্রদান করিয়া দেন।

রাজা দিলীপের জীবনীতে মহাকবি আরও দেখাইয়াছেন যে, যেমন অর্থের প্রতি, তেমন সুখের প্রতি তাঁহার কোনও আসক্তি

ছিল না, তিনি 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ' (রঘু-১।২১), সুখভোগ করিতেন আসক্তিহীন হইয়া, যেন রাজত্ব করিতে থাকিলে, যে সুখ রাজাদের ভোগ না করিলে নয়, কেবলমাত্র সেই সুখ তিনি অনাসক্ত চিত্তে ভোগ করিতেন।

যেন গীতার নির্দ্ধারিত পথে চলায় রাজা দিলীপ একজন প্রকৃত পথিক ছিলেন, ইহা দেখাইবার জন্য মহাকবি 'রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেহ ও প্রাণের উপরও কোন আসক্তি ছিল না। গুরুদেব বশিষ্ঠের গাভীকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এক সিংহ আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া যেমন দিলীপ তাহাকে মারিবেন বলিয়া তূণীর হইতে বাণ বাহির করিতে গেলেন, দৈবের বিড়ম্বনায় তাঁহার হাতটি তূণীরের সংলগ্ন হইয়া রহিল, বাহির করিয়া লওয়া গেল না। এমন অবস্থায় নিরুপায় রাজা সিংহকে অনুরোধ করিলেন, সে যেন কৃপা করিয়া তাঁহার গুরুদেবের গাভীটিকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করে কারণ তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন 'একান্ত বিধ্বংসিষু মদ্বিধানং পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু' (রঘু-২।৫৭) আমাদের মত লোকের এই ধ্বংসশীল মাংসপিণ্ডরূপ দেহের প্রতি কোনও আসক্তি নাই।

সুবিস্তৃত রাজ্যের প্রতাপশালী অধীশ্বর দিলীপ বলিতেছেন, 'এই ধ্বংসশীল মাংসপিণ্ডটার প্রতি কোনও আসক্তি নাই।' সমাজের উপর সে যুগে গীতার প্রভাব যে কি প্রবল ছিল, ইহা হইতে তাহার কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে।

'রঘুবংশের' আর একজন রাজা অতিথির চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া মহাকবি অনাসক্ত চিত্তকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, 'কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থঃ সংগ্রহঃ' (রঘু-১৭।৬০) অর্থ সঞ্চিত থাকিলে পরকে আশ্রয় দেওয়া যায় অর্থাৎ সাহায্য করা যায় এই কারণে তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেন। মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন 'নতুলোভাৎ' লোভের জন্য তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেন না, অর্থের উপর তাঁহার লোভ ছিল না. কেবল পরকে তাহাদের দুঃসময়ে নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

রাজা দশরথের চরিত্র বর্ণনায় মহাকবি একস্থানে বলিতেছেন :

ন মৃগয়াভিরতি নর্দুরোদরং
ন চ শশি প্রতিমাভানং মধু।
তমুদয়ায় নবা নবযৌবনা
প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ। (রঘু-৯।৭)

তিনি যখন জীবনে উন্নতি করিতেছিলেন, মৃগয়া, পাশাক্রীড়া, জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র মদ্য, কিংবা নবযৌবনবতী স্ত্রী (মল্লিনাথ) তাঁহার মন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

মহাকবি এখানে যেন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জীবনে উন্নতি করিতে হইলে শিকার করা, পাশা খেলা মদ্যপান করা বা নারীদের সহিত বিহারে মত্ত হওয়া এই সমস্ত রাজসিক সুখের পথ পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। যেন এই সমস্ত ব্যসন উন্নতির পরিপন্থী ত বটেই, অধঃপতনে লইয়া যাওয়ারও হেতু, গীতার উক্তি 'রজসস্ত-ফলং দুঃখং' কথাগুলির প্রামাণিকতা যেন মহাকবি এখানে দেখাইতে চাহেন।

রঘুবংশীয় অধিকাংশ রাজাদের শেষ জীবন বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি যে আদর্শটি দেখাইয়াছেন তাহা—'বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্' বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারা মুনিদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন—সংসার ছাড়িয়া, রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া মুনিদের মত বনে গিয়া ভগবদারাধনায় জীবন-যাপন করিতেন, এবং শেষে যোগ দ্বারা দেহ বিসর্জ্জন দিতেন। যেন সারা জীবন তাঁহারা সংযমী হইয়া থাকিতেন এবং রাজার কর্ত্তব্য নিষ্কাম ভাবে পালন করিয়া শেষ জীবনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যোগাভ্যাসে দেহত্যাগ করিতেন।

'কুমার-সম্ভব' কাব্যের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ শিব ও পার্ব্বতীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচনা করা হইয়াছে। শিব-চরিত্রে মহাকবি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ অল্প দেখান নাই। নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসার জন্য শিব সাতজন ঋষিকে নির্দ্দেশ দিয়া বলিতেছেন—

'বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
ননু মূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোঽস্মি সূচিতঃ॥' (কু-৬।২৬)

আপনারা জানেন যে, আমার কোনও কাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় না ; পরের মঙ্গল করার জন্য আমার এইরূপ অষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হওয়া।

মহাকবি দেখাইলেন যে, স্বয়ং মহেশ্বর জগতে অষ্টমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, কেবল নিষ্কাম ভাবে পরের মঙ্গল করিয়া যাওয়া তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথ বলেন, 'পারার্থ্যমিতি অনুমেয়াৎ' —কেবল পরের জন্য ইহাই বুঝিতে হইবে।

তার পর ঋষিদিগকে তিনি আবার বলিতেছেন, যে দেবতারা অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার একটি সন্তান প্রার্থনা করিয়াছেন, যে সন্তান দেবতাদের সেনাপতি হইয়া অসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গ উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি বলিতেছেন—

'অতঃ অহমপি ইচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে।
উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্॥' (কু-৬।২৮)

যজ্ঞের অগ্নি জ্বালিতে হইলে যজমানকে যেমন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হয়, আমিও তেমনি পুত্রোৎপাদন করার জন্য পার্ব্বতীকে আহরণ করিতে চাই।

মহাকবি এখানে যেন বলিতে চাহিতেছেন যে, দেবতারা বিপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য ভাবিয়া শিবকে পুত্রোৎপাদন করার নিমিত্ত বিবাহ করিতে হইতেছে, বিবাহ করা তাঁহার নিজের

প্রয়োজন নয়। প্রয়োজন কেবল দেবত্বার্থ সিদ্ধ করার যেন নিষ্কাম কর্ম্মের বাস্তব উদাহরণ।

মহাকবি গীতার আদর্শ কি ভাবে তাঁহার সাহিত্যে গ্রহণ করিয়াছেন, এতক্ষণ কেবলমাত্র তাহাই দেখান হইল। এইবার গীতার বর্ণনা, গীতার উপমা প্রভৃতির সহিত মহাকবির সাহিত্যের কোথায় কোথায় কি মিল রহিয়াছে, দেখান হইতেছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু'—(গী-৭৷৮)

সকল বেদের মধ্যে আমিই প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার।

প্রথমে প্রণব বা ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া তবে বেদ পাঠ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তিনিই এই প্রণব, যেন সমস্ত বেদের তিনি আদি।

'রঘুবংশে' কালিদাস যে রাজবংশের—সূর্য্যবংশের রাজাদের জীবনচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বংশের আদি পুরুষ সূর্য্যপুত্র মনু সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

'প্রণবশ্ছন্দসামিব' (রঘু-১ ১১)।

সকল বেদের প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারের মত সূর্য্যপুত্র মনু ছিলেন এই রাজবংশের রাজাদের আদি পুরুষ।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগ ও যোগীপুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়। কালিদাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভবে' যোগীশ্বর শিবের ধ্যানমূর্ত্তির ও তপস্যার এবং 'রঘুবংশে' রঘুর সন্ন্যাস-জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে, গীতার যোগীপুরুষের বর্ণনার দ্বারা তাহারা প্রভাবিত। এখানে সেগুলি দেখান গেল—

গীতার যোগীপুরুষের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা' (গী—৬-১৯)।

বায়ুবিহীন স্থানের দীপ যেমন নিষ্কম্প, যোগীর চিত্তের সহিত তাহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

'কুমার সম্ভবে' মহাযোগী শিবের বর্ণনায় কালিদাস বলিতেছেন—

'নিবাত-নিষ্কম্প ইব প্রদীপম্।' (কু—৩ ৪৮)।

সমাধিমগ্ন শিবকে দেখাইতেছিল যেন একটি বায়ুবিহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, গীতায় যোগীপুরুষের মনের ও কুমার-সম্ভবে স্বয়ং যোগীপুরুষের বায়ুহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় কেবলমাত্র অচঞ্চলতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গীতার ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর 'নিষ্কম্পতার সহিত 'প্রকাশকত্ব' ভাবটি যোগ করিয়া দেওয়াতে উপমাটি আরও সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগীপুরুষের আরও বর্ণনা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্' (গী—৬ ১৩)।

যোগী নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিবেন আর অন্য কোনও দিকে চাহিবেন না।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটির ভাষ্যে বলেন, 'অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র হইয়া থাকিবেন।

'কুমার-সম্ভবে' সমাধিমগ্ন যোগীশ্বর শিবের বর্ণনায় কালিদাস বলিতেছেন—

'লক্ষ্যীকৃত ঘ্রাণং' (কু—৩ ৪৭)।

তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নাসিকার 'অগ্রভাগে' (মল্লিনাথ)।

মল্লিনাথ তাঁহার ব্যাখ্যার এই যে অগ্রভাগ শব্দটি যোগ করিয়া দিলেন, তাহার কারণ মনে হয়, তিনি যে গীতার উপরোক্ত শ্লোকের 'নাসিকাগ্রং' শব্দটিকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যেন তাহাই দেখাইতে চাহেন।

উপরোক্ত 'গীতার' ও 'কুমার-সম্ভবে'র শ্লোক দুইটির মধ্যে আরও লক্ষ্য করার বিষয় রহিয়াছে। শ্রীধর স্বামী তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র' হইয়া থাকিবেন। কালিদাস যে স্বামীজীর এ ব্যাখ্যা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যেভাবে তিনি ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন—

'কিঞ্চিৎ প্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ
ভ্রুবিক্রিয়ায়াবিরত প্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিত পক্ষ্মমালৈঃ ইত্যাদি—

চক্ষুর তারা ঈষৎ প্রকাশিত, স্তিমিত ও উগ্র, ভ্রূর বিক্ষোভ নাই, চোখের পাতা নড়ে না, দৃষ্টি নিম্নদিকে, সুতরাং মহাকবির এই বর্ণনাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মহাযোগীশ্বরও অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইয়া ধ্যান করিতেন।

যোগীপুরুষের আরও বর্ণনা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' (গী-৬ ৮)

যাঁহার নিকট ঢেলাও যা, লোহও তা, স্বর্ণও তাই—সব সমান।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভাষ্যে বলেন, কোনও 'কিছু হেয় বা উপাদেয় নয়।'

যোগাভ্যাসে রত বৃদ্ধ রঘুর বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি এইরূপ উপমা দিয়া বলিতেছেন—

'প্রকৃতিস্থং সমলোষ্ট্রকাঞ্চনম্' (রঘু—৮ ২১)।

যোগাভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার নিকট সকল বস্তু সমান হইয়া গেল—মৃত্তিকার ঢেলাতে ও সুবর্ণেতে কোনও ভেদ রহিল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' কথাগুলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

যোগীপুরুষের আরও বর্ণনা গীতায় পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্' (গী—৫।১৩)

প্রথম চরণটি ইহার সহিত এক সঙ্গে পাঠ না করিলে ভালভাবে ব্যাখ্যা বুঝা যায় না বলিয়া প্রথম চরণটিও এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

—'সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যাস্তে সুখংবশী'।

বশী অর্থাৎ জিতচিত্ত মানুষ বিবেক-যুক্ত মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নয়টি দ্বারযুক্ত দেহরূপ গৃহে অনহংকার হইয়া সুখে বাস করেন।

সুখে বাস করেন বলার উদ্দেশ্য এই যিনি চিত্তকে জয় করিতে পারিয়াছেন, বিবেক যুক্ত যাঁহার মন, অহং ভাব যাঁর মনে নাই, তিনিই সুখী।

দেহের নয়টি দ্বার কি কি তাহা জানাইবার জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে, দেহের উপরিভাগের দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও একটি মুখ, এই সাতটি মস্তকগত দ্বার, শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন, এই সাতটি 'উপলব্ধি' দ্বার। অধোভাগের দুইটি দ্বার—পায়ু ও উপস্থ—বিমূত্রত্যাগের দ্বার, দেহরূপ গৃহের এই নয়টি দ্বার।

যোগীপুরুষ দেহের এই নয়টি দ্বারের কোনটিই ব্যবহার করেন না, 'বাহ্য-ইন্দ্রিয়' গুলির কাজ রুদ্ধ রাখিয়া, তিনি কেবল মানসিক শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা সুখলাভ করেন।

'কুমার-সম্ভবে' কালিদাস যোগীশ্বর শিবের বর্ণনায় বলেন,

'মনোনবদ্বার নিষিদ্ধ বৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।' (কু—৩।৫০)।

যিনি দেহের নয়টি দ্বারের কাজ বন্ধ রাখিয়া মনকে সমাধির বলে বশীভূত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন।

যোগীশ্বর শিব দেহরূপ গৃহের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি রূপ নয়টি দ্বার সমাধির অভ্যাস দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সমস্ত দ্বারের ভিতর দিয়া মন হৃদয় ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে। তাঁহার মনকে তাই হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

সেই 'জ্ঞেয়পুরুষ' অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে' (গী—১৩।১৭)।

যিনি সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থকে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, অজ্ঞতা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'আদিত্যবর্ণংতমসঃ পরস্তাৎ' শ্রুতির এই বাক্য হইতে ইহা লওয়া হইয়াছে।

সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ককে যিনি জ্যোতিঃ প্রদান করেন, যাঁহার দেওয়া জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্ময়, তিনি স্বয়ং যে পরমজ্যোতিঃ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মহেশ্বরের তপস্যা প্রসঙ্গে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় কালিদাস বলেন—

'যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসজ্ঞং
দৃষ্ট্বা পরমজ্যোতিরুপাররাম।' (কু—৩।৫৮)।

তিনি শিব সে সময় হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমজ্যোতিঃ যাহাকে বলা হয় 'পরমাত্মা', দর্শন করিয়া যোগ (ধ্যান) হইতে মন মুক্ত করিয়া লইতেছিলেন।

পরমাত্মার স্বরূপ কি তাহা বুঝাইবার জন্য গীতায় বলা হইয়াছে, তিনি 'জ্যোতিঃ' পরমজ্যোতিঃ; কালিদাসও শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিলেন, 'সেই পরমজ্যোতিঃ, যাঁহাকে বলা হয় পরমাত্মা', যেন পরমাত্মার স্বরূপ—পরমজ্যোতিঃ।

'জ্ঞেয় পুরুষের' স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতার উপরি উক্ত শ্লোকাংশের প্রথম ভাগে তাঁহাকে 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ' বলা হইয়াছে। তার পর শ্লোকাংশটির শেষ ভাগে, তাঁহার আরও বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'তমসঃ পরমুচ্যতে'। বেদেও যে পরমাত্মার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'তমসঃ পরস্তাৎ' বলা হইয়াছে, শ্রীধর স্বামী সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। 'তমসঃ পরমুচ্যতে' শব্দগুলির ভাষ্য করিতে গিয়া শ্রীমদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'অজ্ঞতা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না', শ্রীধর স্বামীও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কালিদাসও যে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় গীতার তথা বেদের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি যে ভাবে তাঁহার 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে রঘুর সন্ন্যাস-জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন—

'তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগ সমাধিনা রঘুঃ' (রঘু—৮।২৪)।

রঘু যোগ ও সমাধি দ্বারা সেই অব্যয়—অবিনাশী—পুরুষকে প্রাপ্ত হইলেন, যিনি 'তমসঃপরং', অজ্ঞতা-রূপ মায়ার অতীত (মল্লিনাথ)।

আচার্য্য শঙ্কর 'তমঃ' শব্দের অর্থ করিলেন অজ্ঞতা, মল্লিনাথও সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন অজ্ঞতা-রূপ মায়া।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।' (গী—৪।৩৮)

হে অর্জ্জুন, প্রজ্জলিত অগ্নি যে ভাবে কাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধনকে ভস্ম করিয়া ফেলে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপে সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া দেয়।

শ্রীমদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেন যে, জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম্মগুলিকে নির্বীজ করিয়া দেয়। তাঁহার মতে জ্ঞানাগ্নি যে সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের কর্ম্ম দগ্ধ করে, তাহা নহে, কর্ম্মের ফলকে নির্বীজ করিয়া দেয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর পূর্ব্বকৃত সমস্ত কর্ম্মের ফল ভস্ম হইয়া যায় বলিয়া সে ফল আর তাহাকে ভোগ করিতে হয় না, কর্ম্মের বন্ধন হইতে সে মুক্তি পায়, কর্ম্মের বন্ধনে তাহাকে আর বদ্ধ হইতে হয় না।

গীতার এ মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়। রঘুর সন্ন্যাস-জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়া কালিদাস বলিতেছেন—

'ইতরোদহনে স্বকর্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা' (রঘু—৮।২০)

অপর জন (বৃদ্ধ রঘু) তত্ত্বজ্ঞান রূপ অগ্নি দ্বারা 'পুনর্জ্জন্মের বীজ রূপ' স্বীয় কর্ম্মগুলি ভস্ম করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

মল্লিনাথও স্বকর্ম্ম বলিতে 'পুনর্জন্মের বীজরূপ স্বীয় কর্ম্মকে' বুঝাইয়াছেন, তিনিও গীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

গীতার নিজের স্বরূপ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। (গী-৩.২২)।

আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই, কারণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবনের মধ্যে আমার প্রাপনীয় আমায় পাইতে হইবে— এমন কিছুই নাই, এবং আমি পাই নাই এমনও কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া যাই, অর্থাৎ কর্ম্মেতেই ব্যাপৃত থাকি।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলেন, কর্ম্ম করিয়া যাওয়ার কারণ লোকসংগ্রহ (গী-৩.২০), লোকেদের উন্মার্গগামী হইয়া যাওয়া নিবারণ করা।

শ্রীহরির স্বরূপ বর্ণনায় কালিদাস 'রঘুবংশে' দেবতাদের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

'অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্ম কর্ম্মণোঃ। (রঘু-১০.৩১)।

এমন কিছুই নাই যাহা তুমি পাও না, এবং এমন কিছুই নাই যাহা তোমায় পাইতে হইবে, তথাপি যে তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর (অবতাররূপে) এবং কর্ম্ম করিতে থাক, তাহার একমাত্র কারণ জীবকে অনুগ্রহ দেখানো।

গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ যাহাতে কাহারও উন্মার্গগামী হওয়া প্রবৃত্তি না হয় তাহা করার জন্য পরমপুরুষ কর্ম্ম করিয়া যান। কেবল যে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকের পূর্ব্বে এক শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন কর্ত্তু মর্হসি' (গীতা-৩.২০) লোকেরা যাহাতে নিজ নিজ কর্ম্মে পরায়ণ হয়, তাহার জন্য তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়া উচিত।

কালিদাস এখানে মনে হয় যেন, গীতার লোকসংগ্রহ কথাগুলি মনঃপূতঃ হওয়ায়, নিজের রচনার মধ্যে 'লোকানুগ্রহ' এর শব্দগুলি ব্যবহার করিলেন, যেন জানাইলেন যে, গীতার বাণী অনুসারে জীবজগতের কল্যাণের নিমিত্ত যে পরমপুরুষ নিজের কোনও প্রাপনীয়, অপ্রাপ্য বা কর্ত্তব্য কোনও কিছু না থাকিলেও জন্মগ্রহণ করেন ও কর্ম্ম করিয়া যান ইহা তিনি খুব বিশ্বাস করেন।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম। (গী-১২.৬৭)

যাহারা সকল কর্ম্ম আমার উপর (ভগবানের উপর) সমর্পণ করিয়া আমার ভক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতে করিতে আমার উপাসনা করে, আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুযুক্ত সংসার-রূপ সাগর হইতে উদ্ধার করিতে বিলম্ব করি না।

ভগবানের ভক্তদিগকে যাহাতে পুনরায় এ সংসারে আসিয়া জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়িতে না হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই ভাবটি 'রঘুবংশের' দশম সর্গে পাওয়া যায়। দেবতারা শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাং
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয় সন্নিবৃত্তয়ে। (রঘু-১০.২৭)।

তোমার প্রতি যাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়া দেয়, তোমার উপর সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া থাকে, সেই সকল বিষয় বাসনার প্রতি আসক্তিহীন ভক্তদিগের তুমিই হও গতি, সংসারে পুনরায় যাহাতে তাহাদিগকে আসিতে না হয়, তুমিই সে ব্যবস্থা করিয়া থাক।

ভগবানের উপর অর্পিতচিত্ত ভক্তদিগকে যাহাতে পুনরায় এ সংসারে থাকিয়া জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়িতে না হয় ভগবান সে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। (গী-৯.২১)।

যাহারা বহু পুণ্যকাজ অনুষ্ঠান করার ফলে সুবিস্তৃত স্বর্গলোকে যাইতে পান, সেখানে গিয়া প্রভূত সুখভোগ করার পর পুণ্য যখন ক্ষীণ হইয়া আসে আবার তাঁহাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় (এইরূপ যাতায়াত চলিতে থাকে)।

'মেঘদূতে' কালিদাস যেন শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী অনুসরণ করিয়া লিখিতেছেন—

'স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাম্ (মে-পূ-৩১)

যে পুণ্যফলে মানুষ স্বর্গে যাইতে পায় তাহা যখন স্বল্প হইয়া আসে আবার তাহাকে তখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় (মনে হয় যেন ফিরিয়া আসার সময় তাহাদের অবশিষ্ট পুণ্যটুকুর জোরে স্বর্গের এক-এক খণ্ড কান্তি সঙ্গে করিয়া আনিয়া এইখানে এই উজ্জয়িনীতে রাখিয়াছে।)।

পুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করার পর যখন সেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া আসে আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়—ভগবানের এই বাণী কালিদাস যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকে দেখা গেল।

এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গলোক শব্দটির একটি বিশেষণ দিয়াছেন, 'বিশাল' অর্থাৎ সুবিস্তৃত।

'মেঘদূতে'ও কালিদাস বলিতেছেন—

'পূর্ব্বোদিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্'

'পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছি সেই বিশাল উজ্জয়িনী নগরীতে যেও।' শ্রীবিশালা শব্দের অর্থ মল্লিনাথ করিয়াছেন উজ্জয়িনী, সুতরাং যেন বিশাল স্বর্গের সহিত শ্রীবিশালা অর্থাৎ উজ্জয়িনীর সমতুল্যতা দেখাইবার জন্য মহাকবি 'বিশালা' বিশেষণটি ব্যবহার করিলেন। তিনি যেন দেখাইতে চাহেন যে, উজ্জয়িনীর কান্তি যে কেবল স্বর্গের কান্তির একটা অংশ তাহা নহে, উজ্জয়িনীও স্বর্গের মত একটা বিশাল শহর।

গীতার অনুসরণে বিশালা বিশেষণটির ব্যবহারের আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। হয়ত, কালিদাস ইহা ছাড়া বিদ্বান ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন, যেন জানাইতে চাহেন যে, এই ভাবটি পুণ্য স্বল্প হইয়া আসিলে পুণ্যবানকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় ইহা তাঁহার খেয়ালী কথা বা কবির কল্পনা নয়, গীতার আপ্তবাক্য।

'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দটি শুনিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহা যেন গীতার নিজস্ব শব্দ, কিন্তু কালিদাস তাঁহার 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অনুরূপ শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত' (গী-১৩.২)

দেহধারী সকল জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

শ্রীধর স্বামী তাঁহার ভাষ্যে বলেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ 'সংসারিণং জীবং' সকল জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 'আমাকে' জানিতে হইবে। স্বামীজী আরও বলেন যে, বেদোক্ত 'তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা উপলক্ষিত ভগবানের স্বরূপ যে চিদংশের জ্ঞান, ইহা দ্বারা সেই জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

শ্রীমদ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, যিনি 'ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত বহু রূপে বিভক্ত, প্রাণীবর্গের মধ্যে থাকিলেও সকল ভেদাভেদের অতীত।

এই শ্লোকের পূর্ব্বের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে', হে পার্থ, এই দেহকেই বলা হয় 'ক্ষেত্র' আর 'এতদ্যো বেত্তি তংপ্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ'—

ইহা যিনি জানেন, তাঁহাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'আপাদতল মস্তকং' অর্থাৎ চরণের তল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে হউক বা উপদেশ শুনিয়াই হউক যিনি দেহের সমস্ত বিভাগগুলি জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছেন—করিয়া জানাইয়াছেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রীধরস্বামী ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

দেহকে কেন ক্ষেত্র বলা হয়, শ্রীধর স্বামী তাহার কারণ দেখাইতেছেন। তিনি বলেন, 'সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ'—দেহ হইল সংসাররূপ বৃক্ষের প্ররোহভূমি, এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র।

কালিদাসও শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'ক্ষেত্র' শব্দে দেহকে বুঝাইয়াছেন, 'কুমার-সম্ভবের' ষষ্ঠসর্গে তিনি বলিতেছেন—

'যোগিনো যং বিচিন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনম' (কু-৬।৭৭)।

যোগীপুরুষেরা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত (সর্ব্বভূতে অবস্থিত), যাহারা ধ্যান করিয়া থাকেন। এখানে মল্লিনাথ ক্ষেত্রশব্দে দেহকেই বুঝাইয়াছেন।

'কুমার-সম্ভবের' তৃতীয় সর্গে সমাধি-মগ্ন শঙ্করের বর্ণনায় কালিদাস বলিতেছেন—

'মমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তম' (কু—৩৫০)

যাহাকে 'ক্ষেত্রবিদ' পুরুষেরা অবিনাশী বলিয়া জানিয়াছেন।

মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ ক্ষেত্রবিদ শব্দের কোনও অর্থ করিলেন না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের পার্থক্যের বিষয় যাহারা জানেন উহাদিগকে 'তদ্বিদঃ' বলিয়াছেন। কালিদাসও এখানে 'ক্ষেত্রবিদ' শব্দে তত্ত্বজ্ঞ (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ভেদের তত্ত্বজ্ঞ) পুরুষকে বুঝাইতেছেন।

গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকের সাদৃশ্য কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের একটি উক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

গীতার সুপ্রসিদ্ধ মহাবাক্য—

'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম' (গী—৯.২২)।

এই শ্লোকের প্রথম চরণ 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে'—ইহার সহিত এক সঙ্গে পাঠ করিলে, অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয়, তাই চরণটি উদ্ধৃত করিলাম। ইহার অর্থ—যাহারা অপর কোনও কিছুর চিন্তা বা কামনা না করিয়া কেবল আমারই উপাসনা করে, আমার প্রতি সর্ব্বদা একনিষ্ঠ সেই সকল ভক্তগণের সাধনার ফল ও তাহা রক্ষা করার উপায় (তাহারা না চাহিলেও— শ্রীধর স্বামী) আমি স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দিয়া আসি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন, যাহারা একান্ত ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, ভগবান তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

মহাকবি কালিদাস কিন্তু গীতার এই অনুপম মহাবাক্যটির প্রতি সুবিচার করেন নাই, তিনি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে সামান্য একটা বিদূষকের মুখ দিয়া যে সময়ে ও যে অবস্থায় গীতার বাক্য উচ্চারণ করাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে মনে হয়, এ মহাবাক্যটির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

ব্যাপারটি এই—রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার এক রাণীর অনুচরী মালবিকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহারাণী মালবিকাকে কারারুদ্ধা করেন। রাজার অনুরোধে তাঁহার প্রিয়বন্ধু বিদূষক যে কোনও উপায়ে মালবিকাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে স্বীকৃত হইয়া মহারাণীর হস্তের সর্পচিহ্নিত অঙ্গুরীটি অপ-কৌশলে হস্তগত করার অভিপ্রায়ে সাপে কামড়ানোর ভাণ করিয়া রাণীর সম্মুখে রাজাকে কাতরাইতে কাতরাইতে বলিতেছেন—

'অবিকারেণ অপুত্রায়ৈ জনস্যৈ যোগক্ষেমংবহ'।

(যে নিষ্ঠার সহিত এতদিন কেবল আপনারই সেবা করিয়া আসিয়াছি) আমার সেই একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার আমার পুত্রহারা জননীকে বহিয়া লইয়া গিয়া দিয়া আসিবেন।

বিদূষক এখানে বলিতে চাহিতেছেন যে, তিনি সর্প দংশনের ফলে মারা যাইবেন, রাজা যেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অকুণ্ঠিত ও একনিষ্ঠ সেবা স্মরণ করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার পুত্রহারা জননীকে উপযাচক হইয়া প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করিয়া আসেন, জননীকে যেন রাজার দ্বারে আসিয়া সাহায্যের প্রার্থনা করিতে না হয়।

ব্যাপারটা সমস্তই ছলনা, মিথ্যার আবরণে আবৃত, সাপে কামড়ানো ভাণমাত্র, ভাঁওতা দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা, তাই মনে হয়, গীতার এ মহাবাক্যের উল্লেখ এখানে না হইলেই ভাল হইত। তবে, এখানে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, হয়ত, মহাকবির সময় ভগবদগীতার চর্চ্চা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটু বিশেষ ভাবে হইত, এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরস্পরের মধ্যে 'যোগক্ষেমংবহ' কথাটি লইয়া রসিকতাও চলিত, না হইলে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে বিদ্বান দর্শকদের সম্মুখে সামান্য একটা অশিক্ষিত ভাড়ের মুখ দিয়া গীতার একটি মহাবাক্য লইয়া রসিকতা করার প্রবৃত্তি মহাকবি কালিদাসের কখনও হইত না।

গীতার পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। (গী—৮,৯)

যিনি সকলের পোষক, যাঁহার রূপ চিন্তার অতীত, যিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট, অজ্ঞতা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীধর স্বামী তাঁহার ভাষ্যে 'ধাতারং' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পোষকং'—যিনি সকল প্রাণীকে পোষণ করেন।

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'সর্ব্বস্য-ধাতারং' শব্দের অর্থ, যিনি প্রাণীদিগকে তাহাদের নানা বিচিত্র কর্ম্মের ফল ভাগ করিয়া দেন, তিনি।

পূর্ব্বে গীতার 'তমসঃ পর' বাক্যের সহিত কালিদাসের 'রঘুবংশে' লিখিত 'তমসঃ পরঃ' শব্দগুলির সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে, এখানে কেবল 'সর্ব্বস্য ধাতারং' বাক্যগুলির সহিত মহাকবির 'কুমার-সম্ভবে' লিখিত একটি শ্লোকাংশের বাক্যগুলির সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হইতেছে।

'কুমার-সম্ভবে' লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্তব করিতে করিতে দেবতারা বলিতেছেন—

'সর্ব্বস্যধাতারম' (কু—২,৩)।

মল্লিনাথ এই পদটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'ধাতারং' শব্দে বুঝিতে হইবে 'স্রষ্টারং', যিনি সকল পদার্থ ও প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি—চতুর্মুখ ব্রহ্মা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

'বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম' (গী—১১,৩৮)

তুমি সকল বিষয়ের জ্ঞাতা, এবং জ্ঞেয়বস্তু, তুমিই পরমপদ।

শ্রীধর স্বামী 'বেত্তাসি' শব্দের অর্থে বলিয়াছেন 'জ্ঞাতা'। শ্রীমদ শঙ্করাচার্য্যের মতে 'বেত্তা' শব্দের অর্থ বেদিতা।

'কুমার-সম্ভবে' ব্রহ্মার স্তব করিতে করিতে দেবতারা বলিতেছেন—

'বেদ্যশ্চ বেদিতাচাসি জ্ঞাতা ধ্যেয়াত যৎ পরম। (কু—২,১৫)।

টীকাকার মল্লিনাথের মত অনুসারে ইহার অর্থ হয়—

তুমিই সাক্ষাৎ কার্য্যবস্তু, তুমিই সাক্ষাৎ কর্ত্তা, তুমিই ধাতা, তুমি পরম জ্ঞেয়বস্তু।

কিন্তু 'বেদিতা' শব্দের অর্থ কর্ত্তা না করিয়া শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে জ্ঞাতা এবং 'বেদ্যঃ' শব্দের অর্থ জ্ঞেয়বস্তু করিলে সমীচীন হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জ্ঞান।

গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে করিতে স্তম্ভিত ও বিহ্বল অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :

'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ'। (গী—১১,২৯)।

পতঙ্গেরা যেমন ধ্বংস হইবার জন্য অতি বেগের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

শ্রীধর স্বামী তাঁহার ব্যাখ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, পতঙ্গেরা জানিয়া শুনিয়া আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও অগ্নিতে প্রবেশ করে।

মদন যখন ধ্যানরত শিবের মনে পার্ব্বতীর প্রতি প্রণয়াসক্তি জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য 'সম্মোহন' নামক পুষ্পবাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিলেন, কালিদাস সে সময় ঠিক এই ভাবের উপমা 'কুমার-সম্ভবের' নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যবহার করিয়াছেন—

'কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'। (কু—৩,৬৪)।

মদন যিনি বাণ নিক্ষেপ করার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অগ্নির মুখে প্রবেশোন্মুখ পতঙ্গের মত (উমার সম্মুখেই হরের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বার বার ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)।

কালিদাসও দেখাইলেন যে, পতঙ্গেরা ইচ্ছা করিয়াই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়।

সাত্ত্বিক পুরুষের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :

'মুক্তসঙ্গোনেহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ'। (গী—১৮,২৬)।

যিনি সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছেন। যাঁহার সকল কর্ম্মে উৎসাহের অন্ত নাই, 'আমি', 'আমার' কথাগুলি যাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় না (তিনিই সাত্ত্বিক পুরুষ)।

আনন্দগিরি তাঁহার গীতার ভাষ্যে 'সঙ্গ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা' অথবা 'কর্ত্তৃত্বের অভিমান', সুতরাং তাঁহার মতানুসারে অর্থ হইবে, যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যান, অথবা 'আমিই করিলাম' এই অভিমানটুকু যিনি বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন।

'কুমার-সম্ভবে' মহাকবি এই ভাবটির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :

'তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্ত সঙ্গঃ'। (কু—১।৫৩)

শিব সে সময় সঙ্গ অর্থাৎ বিষয়-বাসনা (মল্লিনাথ) হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দিন হইলে কি হয়, এবং রাত্রি হইলেই বা কি হয় জানাইবার জন্য গীতায় বলিতেছেন :

'অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলয়তে।

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবন্ত্যহরাগমে'॥(গী—৮।১৮,১৯)

ব্রহ্মার যখন দিন আরম্ভ হয় সমস্ত চরাচর ভূতবর্গ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়,আর রাত্রি হইয়া আসিলে (ব্রহ্মা-শয়ন সময়) তাহারা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। তার পর আবার রাত্রির আগমনে তাহারা পূর্ব্বে যাহারা ছিল—অবশ হইয়া পড়ে অর্থাৎ অব্যক্তে বিলীন হয় এবং ব্রহ্মার দিন আরম্ভ হইলে তাহারাও প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়ে।

গীতার এই ভাবটির অনুসরণ 'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি ব্রহ্মার স্তবকারী দেবতাদের মুখ দিয়া বলাইতেছেন :

'স্বকাল পরিমাণেন ব্যস্ত রাত্রিন্দিবস্য তে।

যৌতু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ'। (কু—২।৮)

তুমি তোমার নিজের মত করিয়া সময়কে দিন ও রাত্রিতে ভাগ করিয়া লইয়াছ, যখন তুমি নিদ্রা যাও, অর্থাৎ যখন তোমার রাত্রি হয়, ভূতসমূহের প্রলয় উপস্থিত হয়, আবার যখন তুমি জাগরিত হও, অর্থাৎ যখন তোমার দিন হয়, ভূতবর্গের উত্থান হয়।

কালিদাসের 'প্রলয়' ও 'উদয়' যে গীতার 'অব্যক্ত' ও 'ব্যক্ত' শব্দ দুইটিকে বুঝাইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

'অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ'॥ (গী—৩।১৪)।

কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে হয় মেঘের সৃষ্টি, মেঘের বর্ষণে ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন (দেহে গিয়া শুক্র-শোণিতে পরিণত হয় এবং তাহা) হইতে জীবের জন্ম হয়।

আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী গীতার দুইজন ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য সমর্থন করিবার জন্য বেদের এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনটি এই :

'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ'।

সূর্য্য হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণী।

মহাকবি কালিদাস যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী অনুসরণ করিয়া কুমার-সম্ভবের' দশম সর্গে লিখিয়াছেন :

'নিধৎসে হুতর্থকায় স পর্জ্জন্যোঽভি বর্ষতি।

ততোঽন্নোসি প্রজাস্তেভ্য স্তেনাসি জগতঃ পিতা॥ (কু—১০,২০)

যে আহুতি তোমাকে দেওয়া হয় সে সমস্ত তুমি সূর্য্যকে প্রদান করিয়া থাক, সূর্য্য সে আহুতি মেঘের দ্বারা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিয়া দেন, বৃষ্টি হইতে হয় অন্ন, অন্ন হইতে হয় প্রাণীর উৎপত্তি, সে কারণে তুমি জগতের পিতা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত,

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা। (গী—১৪।১০)।

সত্ত্বগুণ যেমন রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া বৃদ্ধি পায়, তেমনি রজঃগুণও সত্ত্ব ও তমঃকে, এবং তমঃগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া বৃদ্ধি পায়।

কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে তমঃগুণ সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবটি লইয়া উপমা রচনা করিয়াছেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে দিতে বলিতেছেন :

'জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভাব পরাক্রমৌ।

অঙ্গিনাং তমসেবোক্তৌ গুণৌ প্রথম মধ্যমৌ'॥ (রঘু—১০।৩৮)

আমি জানি যে, দেহীর তমঃগুণ যেমন প্রথম ও মধ্যম গুণকে (সত্ত্ব ও রজঃ) পরাভূত করে, তেমনি রাক্ষস তোমাদের মহিমা ও পৌরুষকে পরাভূত করিয়াছে।

মানুষ যে তাহার নিজের দেহের মধ্যে ধ্যানযোগে মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারে শ্রীকৃষ্ণ সে কথা গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :

'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা' (গী—১৩।২৪)।

কেহ কেহ ধ্যানযোগে স্বীয় দেহেই মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

'কুমার-সম্ভবে' কালিদাস তপস্যারত শিবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

'আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্' (কু-৩।৫০)।

শিব তখন নিজদেহে আত্মাকে দর্শন করিতেছিলেন।

মানুষের মন যে অতি চঞ্চল, এবং তাহাকে বশে রাখা এক অসাধ্য ব্যাপার—অর্জ্জুনের এই বিশ্বাসের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'। (গী-৬।৩৫)।

হে অর্জ্জুন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া রাখা যায়। এখানে 'অভ্যাস' অর্থে শ্রীধর স্বামী বলেন চিত্তের বিক্ষোভ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য পরমাত্মার চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখার চেষ্টা।

কালিদাস 'রঘুবংশে' যেন গীতার এই কথাটিরই পুনরুক্তি করিয়াছেন। নারায়ণের স্তব করিতে করিতে দেবতারা বলিতেছেন—

'অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ (রঘু-১০।২৩)।

(যোগীপুরুষেরা) অভ্যাসের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় তোমার ধ্যান করিয়া থাকেন।

মল্লিনাথ 'অভ্যাস' শব্দের কোনও অর্থ দেন নাই বটে, তবে বলিয়াছেন যে, অপর সকল বিষয় হইতে মনকে অভ্যাসের দ্বারা সরাইয়া আনিয়া একমাত্র সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের চিন্তায় নিরত রাখিতে হইবে।

চাটগাঁর লোক-সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতা

শ্রীশিপ্রা দত্ত

যে যুগে সহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ এত সহজ ছিল না, সভ্যতার ক্ষীণ আলোও আজ সুদূর দরিদ্র, অজ্ঞ গ্রামবাসীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারত না, বৈজ্ঞানিক যুগের সভ্যতায় যে যুগের কুটিরে বসে নানা আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব হ'ত না—সে যুগে সরল, দরিদ্র গ্রামবাসী তাদের সারাদিনের শ্রম-ক্লান্তির পর ক্ষণিকের অবসর-বিনোদনের মুহূর্তগুলি পরিপূর্ণ করে, তুলত তাদেরই রচিত লোক-সঙ্গীতে। এই সব লোক-সঙ্গীতের রচয়িতা কে তা জানা যায় না। নানা ভ্রমভ্রান্তি-যুক্ত এই গানগুলি দূর করে দিত গ্রামবাসীর সব শ্রান্তি, ক্লান্তি। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়েছে এই সব গানে। ছন্দ, ভাষা, ভাব, ব্যাকরণের ভ্রান্তি পরিপূর্ণ এই গানগুলিই একমাত্র ছিল দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনের আনন্দের উৎস। এই সব অসংলগ্ন ছড়া বা গানগুলির মধ্যে বহুমূল্য সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনেক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এরাও গেয়েছে গান। সে সব সঙ্গীতকে সাহিত্যের আসর হ'তে একেবারেই বিতাড়িত করা যায় না। তাদের সরল হৃদয়ের আকুতি, দৈনন্দিন দারিদ্র্য ভারাক্রান্ত জীবনের শ্রান্তির আবেশ এই গানের লহরীতে পায় এক অনাস্বাদিত আনন্দের প্রস্রবণ। তাই তারা মাতোয়ারা হয়ে পড়ে এই সব সঙ্গীত-মাধুরীতে। সেই লোক-সঙ্গীতের একটি বিশেষ অংশ সম্বন্ধে আমি আজ কিছু পরিবেশন করব।

যে আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে কত সাহিত্য, বিশেষ করে আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্যের কাঠামো যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেই বিষয়-বস্তুটিকে কেন্দ্র করেও সঙ্গীত রচনা করেছে আমাদের পূর্ব্ব বাংলার সরল গ্রামবাসীরা। চাটগাঁর লোক-সঙ্গীতেও স্পর্শ লেগেছে সাধনমার্গের দর্শনের। তারই একটি গান শুনুন—

"ভাঙ্গা কাষ্ঠর তরী লইয়া মাজি অইয়া,
আইলাম সন্‌সারে।
ওরে, নৌকার মইদ্ধে উইট্যে জল,
দারী নাই রে—মাজি নাই রে,
হাবা বলাবল।
মারা গেল সাধর তরী রে।
গুরু ডুবাইলি আম্রা রে।
ও রে আম্রারে।"

ভাঙা কাঠের তরীর চালক হয়ে কবি এই সংসার-তরণীতে এসে ছিলেন। নৌকার মধ্যে জল উঠেছে—তরীতে হাল নেই—তাই আর ধরে রাখা গেল না। হাওয়ার সঙ্গে তরী ডুবে গেল—তরীর চালকও ডুবে গেল। অর্থাৎ এই সংসারে ভগবান আমাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু সংসারের মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে কবি ঠিক ভাবে জীবন-তরী চালাতে পারেন নি, তাই সেই তরী ডুবে গেল। পাপের বোঝায় যেন জীবন-তরী সংসার-সাগরে ডুবে গেল।

আর একটি গানে কবি যেন জীবন-তরী খুলে সেই পরপারে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছেন—

"মন পঅলা গুরু কি ধন চিন্‌লী না,
নোকা খুলি দেশত চল না।
আইলাম ভবর মাঝত,
দিন গেল মিছা কামত
সাধন ভজন অইল না।
উন্মত্ত পঅলার মত,
অবিরত সন্‌সারের কামত,
মিছা কামত ডুবি মরি,
কন্ আছে আম্রার আপন আপনা ?
মন পঅলা গুরু কি ধন চিন্‌লী না।"

কবি যেন আক্ষেপ করে বলছেন, সারাটা জীবন বৃথা সংসারের মায়ায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে, কবি পরকালের কোন পাথেয়ই এ জন্মে সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই নশ্বর জীবনের মত সংসারের কেউই যে আপন নয়, সবই যে অলীক, এ কথা সারা জীবনেও তিনি যেন বুঝতে পারেন নি। মানুষ যেন ভবসংসারের যাত্রী। কিন্তু এই সংসারে এসে যাত্রী সংসারের মোহে আবদ্ধ হয়ে তার গন্তব্যস্থলের কথা যেন বিস্মৃত হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে, পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়ে মানুষ মিথ্যে মায়ায় নিজেকে ডুবিয়ে বৃথা সময় যাপন করছে।

আর একটি গীতে আমাদের এই নশ্বর জীবন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"আর কত দিন খেলা খাইবা,
পোয়ার মতন্ ধুইল লই ?
যমে যেদিন সময় অইব,
হেই দিন ধরি নিবগৈ।
খেলার ঘরত খেলা রইল,
তারা কডে লুকাইলগৈ।

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে

এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি
আপনাকে সুরক্ষিত ও
সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো

Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বুকে স্নো

এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে
আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন
আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

Erasmic
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
MADE IN INDIA FOR ERASMIC-LONDON

HBS. 14-X52 BG

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।
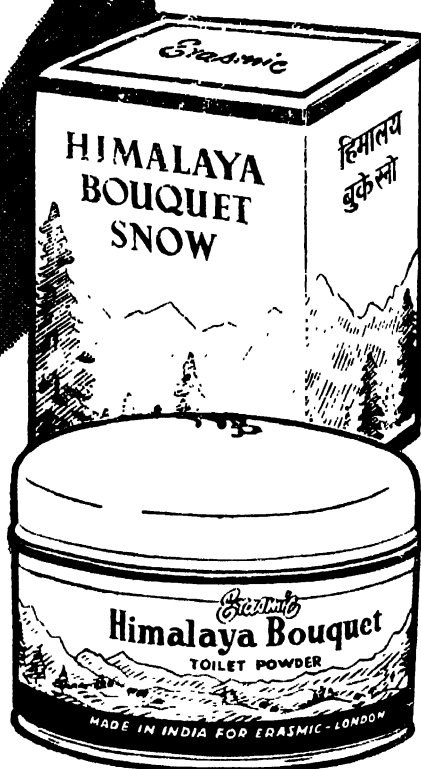
আয়ু খঅন শেষ অইব,
যমে আই দেখা দিব।
আচম্বিতে যম আইয়া,
তোরে ধরি নিবগৈ।"

শিশুর মত ধুলো নিয়ে আর কত দিন খেলা করবে? যেদিন সময় হবে, সেদিন যম এসে নিয়ে যাবে। সেদিন খেলাঘরের মত এই সংসার পড়ে থাকবে। পার্থিব জীবনকে শিশুর খেলাঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যেন আমরা এই ভবসংসারে এসেছি। সময় উত্তীর্ণ হলে যম এসে নিয়ে যাবে। যম যেন পরমেশ্বরের দূত স্বরূপ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যম আমাদের ভবসংসাররূপ খেলাঘর হতে নিয়ে যায়। এই দুনিয়ার খেলা সাঙ্গ হলে যম মৃত্যুর শমন নিয়ে আসে—

"দিন ফুরাইল সইন্দা অইল,
পথর সম্বল লইলা কি?
ভবর মায়া তেয়াগ গরি,
খঅন পইরব তরাতরি।
ন গেলে তে বান্ধি নিব,
মোটা রছি গলাত দিই।
পেয়াদা যারা আছে খাড়া,
শমন লই পিছুদি।"

সন্ধ্যা-সমাগমে গৃহী যেমন গৃহে প্রত্যাগমন করে, তেমনি জীবন-সন্ধ্যার অবসানে জীবাত্মাকেও পরমাত্মায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তীর্থযাত্রীরূপ জীবাত্মা পরপারের পাথেয় কি সঞ্চয় করেছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন কবি। এই পার্থিব সংসারের মায়া ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি যাবার সময় এসেছে। যম শমন নিয়ে এসেছে, পরমাত্মার পেয়াদাকে ফেরান যাবে না।

মুসাফিরকে মহাযাত্রায় যেতে হবে। ষোল হাত ঘরে যার কুলোয় নি, তাকে সোয়া হাত কবরের মধ্যে বাস করতে হবে।

"মুসাফির হঙ্গী তালাশ গর,
ডাক দিলে চলি যাবি কবরের ভিতর।
ষোল হাত্যা বাশর ঘর, ন কুলাইল জনম ভর।
পাঁচ পাহাত্যা মাটীর ঘর,
যাইবি এগেশ্বর।
মুসাফির হঙ্গী তালাশ গর।"

এই লোক-সাহিত্যে এই ভাবে হাল্কা গানের সুরের মাধ্যমে পরকালের অনেক তত্ত্বকথা গাওয়া হয়েছে। সংসারী মানুষ নিজেকে সর্ব্বদা মায়া-মোহ-বন্ধ সংসারে আবদ্ধ রাখে। ধনী বিলাস-ব্যসনে বাস করে পরমাত্মার কথা বা পরকালের কথা বিস্মৃত হয়। কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসী সারাদিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও তার অন্নদাতার কথা বিস্মৃত হয় না, তাই তাদের অবসর-বিনোদন-সঙ্গীতেও শোনা যায় সেই অসীমের মহিমা, বিশ্বাত্মার যশ ও পরমাত্মার অস্তিত্বের বাণী। পল্লী-সঙ্গীতের যে ছন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে পল্লীর বেদনা যে সুরে অনুরণিত হয়েছে তাদের নিরাশার মধ্যে আশার সম্ভাবনা, সেই সঙ্গীত-কল্লোলে জেগেছে আধ্যাত্মিকতার রেশ। এই লোক-সঙ্গীত পল্লীবাসীদের অতীত গৌরব—বর্ত্তমানের আনন্দ-উৎস—ভবিষ্যতের আলোর নিশানা। ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহের সতর্ক বাণী বয়ে আনে এই সব গানের মূর্চ্ছনা। তাই এই সব লোক-সঙ্গীতের সহস্র ত্রুটি ডুবে যায়—এদের সরলতার ঐকান্তিকতায়, অনুভূতির গভীরতায় ও অকৃত্রিমতার মাধুরীমায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা বা দার্শনিকতার সুরও ঝঙ্কৃত হয়েছে এই সব লোক-সঙ্গীতে। ভাবের, ভাষার, অর্থের বা ব্যাকরণের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, এই সব পল্লী-সঙ্গীতে। বিশেষ কোন ছন্দকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি এই সব সাহিত্যে। তাদের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই সব গানে। সাহিত্যাকাশের অগণিত তারকার মত লোক-সঙ্গীতও একটি তারকা। তার ক্ষীণালোকে উদ্ভাসিত করছে বিশ্ব-সাহিত্যাকাশকে।
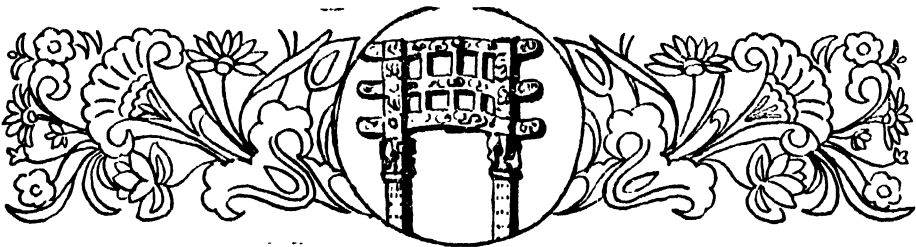
সেক্সপীয়ারের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

আভনের কলকণ্ঠ রাজহংস-কবি,
ধন্য হইয়াছি তব পক্ষের শীকরকণা লভি।
এদেশ করিল জয় তোমার স্বজাতি,
ছল-বল-কৌশলের ইন্দ্রজাল পাতি ;
হারালাম বাহ্য স্বাধীনতা,
মনের মুক্তির রাজ্যে ডাক দিয়া ভুলালে সে ব্যথা।
পাণ্ডিত্যের কূটবুদ্ধি ছিল না তোমার
অকপটে খুলি তব হৃদয়ের দ্বার,
করি গেলে তব রস-ভাণ্ডারের সবই বিতরণ
কুহক মন্ত্রের বলে যা-কিছু করিলে আহরণ।
চিরন্তন মহোৎসব তব কাব্য রসানন্দময়
মাতিল তাহাতে কত তরুণ হৃদয়।
পণ্ডিতেরা এলো তার পর
তাহাদের গবেষণা-কষোপলে শাণিত নখর
তোমার সৃষ্টির গাত্র বিদারিয়া তথ্য নব নব
কত তত্ত্ব, কত অর্থ ছিলনা'ক যাহা স্বপ্নে তব—
বিদ্যাবত্তা করিতে জাহির
ক্রমশঃ ব্যাখ্যার ছলে সব কিছু করিল বাহির
হায় তব উৎসব মন্দির
ধরিল অদ্ভুত রূপ মেডিক্যাল লেবরেটরির।

মনের ছুঁড়িও তব করি আবিষ্কার
দেখাইল তারা তব ঋণ-করা উপাদানভার।
তব নাটশালা
বেত্রপাণি জনার্দ্দন পণ্ডিতের হলো পাঠশালা।
চাহিল তাহারা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের যশ
তাহারা খুঁজিল তত্ত্ব, খুঁজিল না রস।
কাড়ি নিল প্রস্পেরোর স্বর্ণময় কুহকের কাঠি,
পরীদের পাখা দিল ছাঁটি।
মানস-সন্তান তব চিত্তলোকে যাহারা অমর
তারা বলে, মূর্ত্তিমান তত্ত্ব ওরা, নহে নারী নর।
হাহাকার করে তায় তরুণ হৃদয়।
তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়
তব প্রিমরোজ পথে ছড়াইল কণ্টক কঙ্কর
সাহিত্য আর্ডেন তব হলো তায় তথ্যের কন্দর
হায় কবিকুলচন্দ্র, দিলে সুধা যেই পাত্র ভরি'
তরুণ-তরুণী আজ দুই হাতে সেই পাত্র ধরি
ঔষধ বলিয়া হায় করে পান নিম্বের নির্যাস
নিবারিতে দুষ্ট ব্যাধি—পরীক্ষার ত্রাস।

সময়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উড়ে যায়
এখানে-ওখানে আঙিনায়
ঝিরিঝিরি হাল্‌কা হাওয়ায়
ধুলো-ছাই, পাতা।
গাছ ঝাড়ামাথা
হয়। একরাশ
রোদ-পোড়া ঘাস।

যা কিছু পুরোনো—
মানুষের মনও
বদলায়।
নাড়া খায়।

গাছে-গাছে শাখার শিখরে
আবার সবুজ রং ধরে।
একটি নতুন দোলা—
শিহরণ
ব'য়ে যায়,
একটি গোলাপী ঠোঁট
ছোঁয়ায় যেমন
আচম্‌কা মন।

আহা, আসে নতুন সময়
কুঁড়ি ফোটে ফের ফুল হয়·

মনও কি প্রজাপতি নয় ?

নববর্ষের সূচনায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কালের অনিবার্য নিয়মে আর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল; বর্ষ বোধনের এই শুভ ক্ষণটি আনন্দ উৎসবের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া সকল দেশের সর্বজাতির জাতীয় কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কর্তব্য বলিয়া যে উহার পশ্চাতে অন্তরের তাগিদ থাকে না তাহা নহে; উপরন্তু বাহিরের নির্দেশ-নিরপেক্ষ হইয়াই তাহারা সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে বর্ষ বরণের জন্য কোনপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন দেখি না; দেখতে পাই না পথে পথে উল্লাস মুখরিত জনসাধারণের পদচারণা। আনন্দের উৎস আজ বাংলাদেশে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; জাতীয় জীবনের কোন ঘটনা তাহা যতই বিশিষ্ট এবং আনন্দের হউক না কেন বাঙালী আজ তাহা উদ্‌যাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে না। কিরূপে হইবে? ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে সমস্যা এবং সঙ্কটের মধ্যে বাঙালীর যে যাত্রা সুরু হইয়াছে তাহা আজও শেষ হয় নাই। সমস্যার পর সমস্যা আসিতেছে; তাহারা এতই দুর্ভেদ্য যে, সমাধান সম্ভব হইতেছে না। খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি বৃহৎ সমস্যা আজ বর্তমান, যেগুলি আমাদের সঙ্কটকে ক্রমান্বয়ে জটীল করিয়া তুলিতেছে। বাংলা দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। যে স্বর্ণময় ভবিষ্যতের আশ্বাস বাঙালী স্বাধীনতা লাভের প্রথম উষায় পাইয়াছিল তাহার বাস্তব রূপ আজও দেখিল না।

আমাদের এই সমস্যাদি সম্পর্কে সরকার যে অনবহিত তাহা নয়; কিন্তু সঙ্কট মুক্তির যে পরিকল্পনা করিতেছেন তাহার সুফল আমরা অনুভবই করিতে পারিতেছি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য তাঁহারা নূতন নূতন নীতি প্রণয়ন করিতেছেন; কিন্তু তাহা আমাদের অবশিষ্ট সুখকে গ্রাস করিয়া লইতেছে; অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সুলভ না হইয়া ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইতেছে। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে গলদ আছে বলিয়াই ইহা ঘটিতেছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য। সেই গলদ দূর করিতে গেলে কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানিতে হয়; কিন্তু তাহা সম্ভব নয় সুতরাং গলদ রহিয়া যাইতেছে। সরকার আজ এমন এক শ্রেণীর ক্রীড়নক হইয়াছেন যাহাদের হস্ত হইতে বাংলা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সরকার পক্ষে কঠোর মনোবলের প্রয়োজন। আজ নববর্ষের প্রাক্কালে জনসাধারণের সম্মুখে সরকার যদি সেই কঠোর মনোবল অবলম্বনের অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে উত্যক্ত জনসাধারণ সরকারকে সাধুবাদ দিবে।

সমগ্র রাজ্য ব্যাপিয়া আজ ধ্বংসের ধূলি ঝঞ্ঝা উড়িতেছে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহা এমনভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছে যে, ভবিষ্যৎ ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। বিদ্যা, বিনয়, সততা ইত্যাদি গুণ আজ নির্গুণে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান বাংলা দেশে যে ঐগুলি পালন করিতে চায় আধুনিক বিচারে হয় সে কৃপার, নয় হাস্যের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। বাহিরের সাজ-সজ্জায় বাঙালী আজ 'স্মার্ট' হইয়াছে কিন্তু অন্তরে আজ সে সর্বাংশে দেউলিয়া; তাই বাঙালী আজ পৌরুষ বর্জিতের ন্যায় আচরণ করিতেছে। চক্ষুর সম্মুখে হীনতম অন্যায় ঘটিতে দিতেছে, চৌর্যবৃত্তিকে ধিক্কার না দিয়া তাহাতে মৌনসম্মতি দিতেছে। আমাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন শত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইবার সাহস অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই একদা সততা এবং কর্মকুশলতায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন; বাঙালীর উদ্যম সাগর এবং পাহাড়ের নিষেধ অমান্য করিয়া দূর বিদেশে আপনার যশ ছড়াইয়া দিয়াছিল। সেই মহীয়ান পূর্ব পুরুষের বর্তমান উত্তরাধিকার আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত রহিয়াছি। অন্যে আসিয়া যখন আমাদের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে আমরা তখন নিরন্ন পশ্চিমবঙ্গবাসীর শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া অফিস, আদালত ও বিধানসভা ঘেরাও করিতেছি। যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোটি কোটি টাকা মনিঅর্ডার যোগে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে প্রেরিত হইতেছে সেই বাংলা দেশের যুবকের চাকুরী নাই, জীবিকার সুযোগ নাই।

একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তাহার যুবশক্তির উপর। দেশের সমৃদ্ধি আনয়নের সম্পূর্ণ ভার দেশের যুবক এবং তরুণদের, কিন্তু আমাদের বর্তমান বাংলা দেশ সেই প্রচণ্ড শক্তির অপব্যয় ঘটিতেছে। হতাশা এবং উদ্যমহীনতা বাংলা দেশের তরুণ জন-জীবনে এমনই ভাবে বসিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে আশু মুক্তিলাভের সম্ভাবনা দেখি না। এই হতাশা দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া যুবশক্তির ক্ষয়

ঘটাইতেছে। একদল হইয়া উঠিতেছে দুর্বিনীত এবং উচ্ছৃঙ্খল। তাহারা ন্যায় অন্যায় মানিতেছে না; অভিভাবক মানিতেছে না, শিক্ষককে অপমান করিতেছে আর সামাজিক সভ্যতা ভব্যতাকে জলাঞ্জলি দিতেছে। অন্যদল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়াবহতায় নির্জীব নিষ্প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। যুবশক্তির এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহার বিচারের সময় আর নাই, কিরূপে এই বিপথগামী শক্তিকে সুপথে পরিচালিত করা যায় তাহার চিন্তার প্রয়োজন। এ কর্তব্য শুধু সরকারের নয়, সরকার এবং সরকার বিরোধী উভয়েরই।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক; আর তাহাই আজকের দুর্দিনে আমাদের আশ্বাসস্বরূপ। বাংলা দেশের ইতিহাস সঙ্কট আর সংশয়ে সমাচ্ছন্ন; জাতীয় জীবনে যখনই কোন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তখনই এক বলিষ্ঠ চরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পালযুগের সূচনার পূর্ব মুহূর্তে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু পাল রাজাদের নেতৃত্বে বাংলা আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই আজ নববর্ষের বোধন লগ্নে আশা করিতেছি এই নেতৃত্ববিহীন বাংলা দেশে নিশ্চয়ই এক নূতন নেতার আবির্ভাব ঘটিবে যিনি তাঁহার মানসিক বলিষ্ঠতায় বাংলা দেশের বর্তমান অন্ধকার দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন; তাঁহার নেতৃত্বে বাঙালী পুনরায় আপনার ঐতিহ্যের দ্যুতিতে ভারতবর্ষের চলার পথ আলোকিত করিবে। রবীন্দ্রনাথের এক বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি "আশা করব মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" যদিও রবীন্দ্রনাথ ইহা লিখিয়াছিলেন অন্য প্রসঙ্গে তবুও বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা অবতারণা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইল না।

বর্ষ শেষ

শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

১

তখন বিহ্বল উতলা বাতাস বয়,
দলিত শাখায় ফুলেরা কি কথা কয়;—
সে যে গো চৈত্র,—মদির চৈত্র-ভোর।
ঝলমল পথে চল উচ্ছল সুখে,
জয়ের লিখন ফুটিল কি চোখে মুখে;
বিভাস রাগিণী আনে কি স্বপন ঘোর!

২

ভস্মের সাথে জেগেছে মহেশ্বর,
পুড়ে খাঁক হবে আজি যেন চরাচর;—
সে যে গো চৈত্র,—চৈত্র মধ্য-দিবা।
কোথায় গভীর শীতল অন্ধকার,
খুঁজিছ আবাস কেবলই কি লুকাবার;—
জ্বালনি মনেতে দহন রূপের বিভা?

৩

ঈশান কোণেতে ওঠে গুরু গুরু ডাক,
রুদ্ধ নিশ্বাসে ত্রাসে ধরা নির্বাক;—
এ যে গো চৈত্র,—চৈত্র-সন্ধ্যা ভীম',
ত্রিশূলে বাঁধিয়া ডম্বরু আপনার,
পিনাকী খুলিল কুটিল জটার ভার,—
এবার তোমার ভাঙিবে পথের সীমা।

পুস্তক পরিচয়

ভারতের মুক্তি সন্ধানী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৫৲ টাকা

ভারতের মুক্তি সন্ধানী বলিতে সাধারণ ভাবে পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী এই অর্থই মনে জাগে, কিন্তু গ্রন্থকার ব্যাপক অর্থেই ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয়-মুক্তির সহিত তাঁহার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজের বিবিধ সংস্কারকেই গ্রন্থকার মুক্তি আখ্যা দিয়াছেন। ভারতের প্রকৃত মুক্তি হইয়াছে ঐদিক দিয়াই।

রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের বলিয়াছেন ভারত-পথিক, সেই সব মুক্তি-সন্ধানী মহাপুরুষরাই ভারত-চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীটি ভারতের এক গৌরবময় যুগ। এ যেন ভারতের অতি-প্রয়োজনে তাঁহাদের একই সঙ্গে আবির্ভাব।

এই দিক দিয়া গ্রন্থকার যাঁহাদের কথা আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই কথা আমরা জানি না অথবা জানিলেও ভুলিয়া গিয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের উপকারই করিয়াছেন। আজ ভারতের যে ঐতিহ্যের আমরা গর্ব্ব করি তাহার মূলে ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মনীষি। ভারত ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই।

মুক্তি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। এই দিক দিয়া গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। গ্রন্থারম্ভে আচার্য্য যদুনাথ সরকার ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় গ্রন্থের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠক মহলেও ইহার উপযুক্ত মূল্য নিরূপিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

উনবিংশ শতাব্দীটি বাংলার চিরস্মরণীয় অধ্যায়। বস্তুত এই একটি শতাব্দীতেই আমরা একই সঙ্গে বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। জাতির প্রয়োজনে—বোধ করি, জগতের প্রয়োজনেই ইঁহাদের আবির্ভাব। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই উনিশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহারই জীবন-কাহিনী। সংক্ষিপ্ত কিন্তু নানা তথ্যে পূর্ণ। বাস্তবিক এরূপ ঘটনাবহুল জীবন-চরিত আমাদের দেশেও খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখ কষ্টে মানুষ হইলেই সকলে বড় হয় না—বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। এই আকাঙ্ক্ষাই প্রফুল্লচন্দ্রকে বড় করিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষাই পাঠ্যাবস্থায় সাহিত্যানুরাগী হইয়াও তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। এ যে কত বড় দুঃসাহস তা তিনি পরে বুঝিয়াছিলেন। বিলেত হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী লইয়া আসিয়াও, এ দেশে কোথাও আমল পাইলেন না। কারণ, এ দেশের কলেজগুলিতে রসায়ন-শাস্ত্রের আদর তখনও হয় নাই। বরং এ পর্য্যন্ত তাহা উপেক্ষিতই হইয়া আসিয়াছে। এই উপেক্ষিত বিজ্ঞানের প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট করা সেদিন বড় সহজসাধ্য ছিল না। আচার্য্য সেই অসাধ্য সাধন করিলেন। কঠোর সংযম এবং আত্মোৎসর্গের এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

বিরাম নেই বিশ্রাম নেই—"ক্লাস হয়ে গেলেও তাঁর ছুটি নেই। যতটা পারেন ল্যাবরিটরিতেই কাটান। নানা পরীক্ষা ও তার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। যদি বেড়ান, বেশী দূরে যান না, কলেজ স্কোয়ারেই বেড়ান, কখনও বা গড়ের মাঠে। সঙ্গে থাকেন ছাত্রদল। তাঁরাই তাঁর বন্ধু, সখা ও সম্বল। স্বজন-পরিজন তাঁকে আয়ত্তে রাখতে পারে নি—কেবল কাজ আর কাজ তাঁর চারিদিকে একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছিল, যা ক্রমশঃ তাঁকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের একজন করে তুলেছিল। বিষয়ে বিরাগী, জ্ঞানান্বেষণে তাপস, আচারে ব্যবহারে শিশু, পরিচ্ছদে অতি সাধারণ এই অধ্যাপকের খ্যাতি ক্রমশঃ কলকাতার সুধী ও বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন এনে দিল।"

এই কর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁহার জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফলেই, তিনি রসায়নকে শিল্পকার্য্যে প্রয়োগ ও তাহাকে জীবিকায় পরিণত করার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র আর একবার কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সূচনা এইখান হইতেই।

তখন ইংরেজিয়ানার যুগ—কিন্তু কোন প্রভাবই তাঁহার জীবনকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। জাতীয়তাবোধ ছিল তাঁহার চির জাগ্রত। জাতিকে সচেতন করিবার জন্যই তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় মানবে' এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন-যশ-মানের সহস্র প্রলোভন তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে নাই। বাস্তবিক এরূপ আদর্শ-পুরুষ জগতে বিরল।

জাতির দুর্দ্দিনে এরূপ আদর্শ চরিত্র-চিত্রণের সত্যই প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকারের ভাষা ভাল—সব কথা গুছাইয়া বলিবার মুন্সিয়ানাও আছে। বইখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই মনে করি।

সিপাহী যুদ্ধের গল্প—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। এন, কে, চক্রবর্ত্তী, ২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড—কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা 'সিপাহী যুদ্ধের গল্প'। গ্রন্থকার ইতিহাস হইতে এমন একটি গল্প বাছিয়া লইয়াছেন যা সময়োপযোগী হইয়াছে। অনেকে বলেন, 'সিপাহী যুদ্ধ' ভারতের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম। সেদিক দিয়াও ইহার মূল্য অনেকখানি।

সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পরাধীনতার জন্য এতকাল আমাদের নিকট অজ্ঞাতই ছিল, ধীরেন্দ্রলাল সেই গোপন তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করায় মহৎ উপকার সাধন করিলেন। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গিটি চমৎকার। বইখানি ছেলেদের উদ্দেশ্যে লেখা হইলেও বড়রাও ইহাতে কম উপকৃত হইবে না।

শ্রীগৌতম সেন

প্রাকৃত সাহিত্য—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। বিশ্বভারতী সংগ্রহ। সংখ্যা ১২৬। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—০'৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তিকায় সাধারণ ভাবে প্রাকৃত কাব্য-সাহিত্যের সরল সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃত গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শন সমূহ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। কাব্য ছাড়া প্রাকৃত সাহিত্য অন্যান্য নানা দিকে যে বিস্তার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহারও কিছু কিছু বিবরণ ইহার সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত। তবে আমাদের দেশে পণ্ডিত সমাজেও প্রাকৃত সাহিত্য যেরূপ উপেক্ষিত ও অপরিচিত তাহাতে এ জাতীয় আংশিক পরিচয়েরও বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজন আছে। ইহার সাহায্যে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি প্রাকৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপও ক্রমপরিণতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞান অপরিহার্য্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই
এসব কাচা হয়েছে!
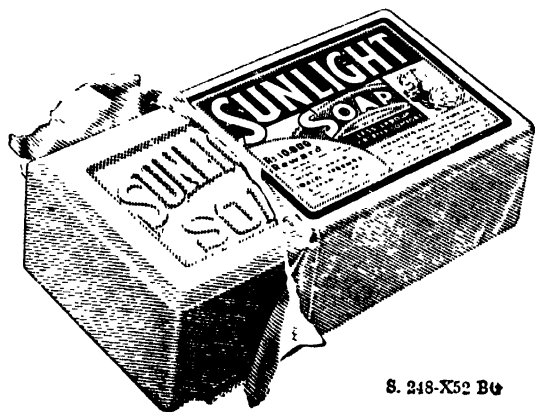
নব জ্ঞান-ভারতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য শোভন এবং সাধারণ সংস্করণ যথাক্রমে ২০৲ এবং ১৫৲। পৃষ্ঠা ৬১২।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি একখানি ভৌগোলিক অভিধান। বঙ্গভাষায় এরূপ ভৌগোলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং সার্থক রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষাভাষী জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিশিষ্ট দেশ, নদী, হ্রদ,পর্ব্বত, নগর ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক বিপ্লবের দরুণ যে সকল স্থান, নগর ও দেশের নাম বদলাইয়া গিয়াছে তাহাদের সন্ধানও এ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ভারতের ছয় শতাধিক অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্যের সন্ধান ও বিবরণ ইহাতে মিলিবে। ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্থান আজ ভারতের বাহিরে—ইহার ভূগোল স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতের ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী পাকিস্থানের ভৌগোলিক তথ্যের সহিত আর তেমন পরিচিত থাকিবে না। গ্রন্থকার সেজন্য সঙ্কলনকালে পাকিস্থানের তথ্যবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং যুক্ত বঙ্গদেশের জেলা, মহকুমা, থানা, শহর, নদী, তীর্থ ও শিল্পস্থান এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলি যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এরূপগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারকে বহু গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে এবং প্রায় এককভাবে এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ একখানি গ্রন্থে কয়েকখানি মানচিত্র সংযোজিত হইলে পাঠকের আরও সুবিধা হইত, আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা করা হইবে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে নূতন নূতন তথ্যাদির সন্নিবেশ এবং পুরাতন তথ্যের পরিবর্জ্জন এবং সংশোধন আবশ্যক, সুতরাং নব জ্ঞান-ভারতীর ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিও এই পথ অনুসরণ করিলে অচিরে বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষার অভিধানগুলির মতই সমান আদর পাইবে এবং নির্ভরশীল বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিবে, ইহাতে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই।

বাংলা দেশের প্রত্যেক শিক্ষালয়—স্কুল এবং কলেজ, গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার এরূপ একখানি ভৌগোলিক অভিধান দ্বারা নিজেদের গ্রন্থসঞ্চয় পরিপুষ্ট করিলে শিক্ষার্থী ও বাঙালী পাঠক মাত্রেই উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নব জ্ঞান-ভারতীর বিপুল প্রচার আমরা কামনা করি। পুস্তকের কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই উচ্চাঙ্গের।
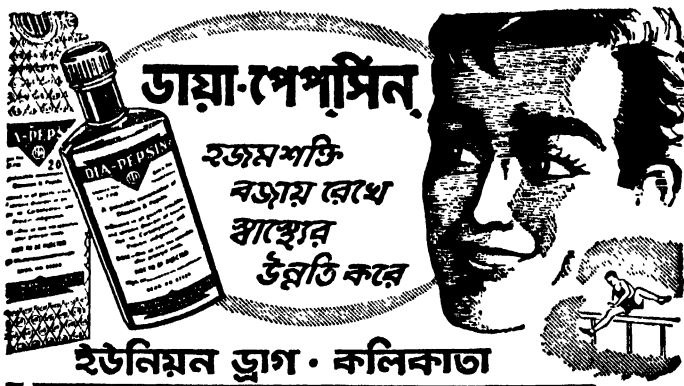
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রীঅশোক সেন। এ. মুখার্জ্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। মূল্য—৬৲

সমালোচনার বই আজ কাল অনেকে লিখছেন। বোঝা যায়, এ জাতীয় গ্রন্থের চাহিদা বাড়ছে।

ইদানীং প্রকাশিত কোন কোন সমালোচনা গ্রন্থে দেখেছি, লেখক আলোচ্য পুস্তকের কথাগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য ভাষায় লিখেছেন মাত্র; কোথাও তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের আগ্রহে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে দেশ-বিদেশের বহু লেখকের কথা উদ্ধৃত করেছেন; কোথাও বা উদ্ধত অযৌক্তিক কোনও মত সজোরে প্রচার করেছেন। এই সব সঙ্কট এড়িয়ে রসিক জনের উপভোগ্য গ্রন্থ রচনা খুব সহজ নয়।

এ বইখানিতে সাহিত্যের অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু একটি মনের সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হলাম। এতেও অনেক উক্তি আছে, কিন্তু অবান্তর নয়। সর্ব্ব

প্রথমে লেখক রূপকলার ক্ষেত্রে নাটকের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক বিচার করেছেন ; অতঃপর রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরণের নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা কেবল 'পরীক্ষার্থিহিতায়' নয়। হয় ত তাদেরও কাজে লাগতে পারে ; কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে লেখা হয় নি। সাহিত্য রাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের আনন্দই এ লেখায় প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থকার নিজে ভেবেছেন এবং পাঠকের ভাবনাকে উদ্রিক্ত করেছেন। তাই দর্শন ও কলা, গণিত ও সঙ্গীতের মূলগত ঐক্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি পড়েছে এবং সে-কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

বইখানির দু'টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ নাটক, আর দ্বিতীয় খণ্ডে সাঙ্কেতিক নাটক। সব নাটকের আলোচনা সমান বিস্তৃত নয়, তবে যে-গুলিতে ভাববার কথা বেশি, সে-গুলি সম্পর্কে লেখক কৃপণতা করেন নি ; যেমন 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জ্জন', 'রক্তকরবী'র বেলায়। প্রসঙ্গতঃ তিনি বহু বিদেশী নাটকের এবং নাট্যালোচনার উল্লেখ করেছেন। তাতে তাঁর বক্তব্য বিশদ হয়েছে এবং পাঠকও তাঁর 'পরিক্রমা'র অংশীদার হতে পেরেছেন। এ বইয়ে কোন্ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন্ কথাটি বলা হয় নি, সে বিচার করতে বসা সঙ্গত হবে না। রবীন্দ্র নাট্য অধ্যয়ন উপলক্ষে আমরা এখানে নাট্য সাহিত্যের নানা লক্ষণ বিচারের এবং আধুনিক সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যাপক পরিচয় গ্রহণের যে সুযোগ পেলাম, তাই মস্ত লাভ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লীলানুস্মৃতি—দ্বারিকানাথ রায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬ : মূল্য—৩্

একখানি উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মপুস্তক। লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী, জীবনের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহাদের প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগাইতে সক্ষম হইবে। ধর্ম্ম আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের অঙ্গবিশেষ, এই কথাটিই লেখক তাঁহার নানা অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্য দিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ছাপা এবং গেট-আপ প্রশংসার যোগ্য। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

(১) হিসাব নিকাশ (২) মা যশোদা—শ্রীকেশবলাল দাস। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩্ ও ২্।

উপন্যাস। কিন্তু পুস্তকখানিকে উপন্যাস বলা চলে না। লেখক প্রাচীনকালের, কলেজের বেতনের, অঙ্ক পুস্তক ক্রয়ের হিসাব, হষ্টেলের খরচের এবং আরও বহুবিধ অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ও একটি মেধাবী ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফলের কাহিনী বর্ণনায় বর্ত্তমান পুস্তকের প্রায় বার আনা অংশ ব্যয় করিয়াছেন। পুস্তকের নায়ক মহাদেবকে লইয়াই গল্প। তাহার স্কুল, কলেজ, চাকুরী ও বিবাহিত জীবন, সব কটি সন্তানের মৃত্যু ঘটাইয়া বংশলোপ, স্ত্রীর মৃত্যু—শেষ পর্য্যন্ত মহাদেবকেও সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করাইয়া তবেই তিনি থামিয়াছেন।

(২) লেখক শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যজীবন অবলম্বনে মা যশোদার আদর্শ জননীরূপটি উপযুক্ত ভাষায় সুন্দর ভাবে আঁকিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে এক বিচিত্র ভাবাবেগের সঞ্চার হয়।

পুস্তকখানি সুলিখিত হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আত্মার আলো—শ্রীমৎ উপানন্দ মহারাজ। প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স—৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। (১০+৫৬) পৃষ্ঠা, মূল্য—অনুল্লিখিত।

গ্রন্থকার এক অলৌকিক ভগবৎ কৃপাবলে যৌবন প্রারম্ভে কোনও শক্তিমান সৎগুরুর আকর্ষণে জাগতিক সম্পর্কের সব ভুলিয়া গিয়া গুরুর কৃপায় দীক্ষা ও গৃহ-সন্ন্যাস লাভ করিয়া কঠোর সাধন-ভজনে আত্ম নিয়োগ করেন। দীর্ঘ সাধনার কালে তিনি যে সব আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেছেন সে

সবই অবসর কালে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তদবলম্বনেই আলোচ্য গ্রন্থের পরিণতি। সিদ্ধযোগী পুরুষ উদার দৃষ্টিতে বেদ বেদান্ত, তন্ত্র, শাক্ত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সত্য সিদ্ধান্তগুলি অতীব সংক্ষেপে, সহজ সরল ভাষায় বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করেছেন। বহু দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব ও তাঁহার অনুভূতিলব্ধ বর্ণনা প্রভাবে সহজবোধ্য হইয়াছে। সাধন-ভজনে ব্রতী লোকেরা গ্রন্থ পাঠে অনেক উপাদেয় খোরাক পাবেন। যোগীবরের প্রতিচ্ছবি গ্রন্থ প্রারম্ভে স্থান পাওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়াছে।

বিচারচন্দ্রোদয়—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য। সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ২, বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা—৯। (৬+১৩২) পৃষ্ঠা। মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আজীবন সদাচার-নিষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়ের সুচিন্তিত অবদান। কয়েকটি প্রবন্ধ হিন্দী সাময়িক পত্রে "কল্যাণে" প্রকাশিত নিবন্ধের মনোজ্ঞ বঙ্গানুবাদ, বাকী প্রায় সবই সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার মুখপত্র (অধুনালুপ্ত) "সত্য প্রদীপে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সাময়িকপত্রে প্রকাশ কালেই এই সব প্রবন্ধ পাঠে সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছি, এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় "সংসারে সংসারী সাজিও, সংসারী হইও না" হইতে "পঞ্চভূতের বিচার" পর্য্যন্ত পঞ্চ দশটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিবন্ধ পাঠে নর-নারী মাত্রেই উপকৃত হইবেন। কাগজ ছাপা মোটামুটি ভাল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আলোচনা

"গীতাঞ্জলির সংস্কৃতানুবাদ"

শ্রীরাজশেখর বসু

"গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীকামিনীকুমার অধিকারী ভাগবতভূষণ-কৃত গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদের কথা আছে। অনেকে হয়ত জানেন না, বহুকাল পূর্বে অমরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণতর্কতীর্থ গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৩৩৬ সালে মুদ্রিত সেই পুস্তকের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ লিখিত সম্মতিপত্রের প্রতিলিপি আছে।

পুস্তকের প্রথম কবিতা 'আমার মাথা নত করে দাও'-এর অনুবাদের কয়েকটি লাইন এই :

অবনময় শিরো মে নাথ তে পাদধূলৌ
নিখিলপদভিমানং মজ্জয়াশ্রুপ্রবাহে ।
গর্বমুত্তমবমস্থে যে হ্যমাত্মানমেব
ভ্রমিভিরমিত এবং সংমকৃত্র হতোহস্মি ।

দেশ-বিদেশের কথা

বালি রাধানাথ বাচ সমিতির

'রাজ্যপাল জয়নিধি'

নৌবাহন প্রতিযোগিতা

গত ৯ই মার্চ অপরাহ্নে বালি স্কুল মাঠের সম্মুখস্থ গঙ্গায় পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল স্বর্গীয় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত রাজ্যপাল জয়নিধি (গবর্ণর ট্রফি) নৌবাহন প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিষ্পত্তির খেলায় আরিয়াদহ রোয়িং ক্লাবের নৌকা 'মহানন্দা' দক্ষিণেশ্বর ওয়াই-এম-এ-র 'কাবেরী' নৌকাকে পুরা এক নৌকার ব্যবধানে পরাজিত করিয়াছে।
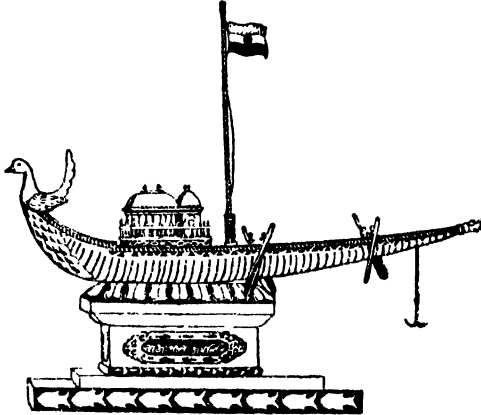
রাজ্যপাল জয়নিধি রৌপ্যনির্মিত সুদৃশ্য, সুঠাম ময়ূরপঙ্খী—প্রচলিত কাপ বা শিল্ড হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় মিউজিয়ম, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সন্ধান করিয়া জর্নাল অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট হইতে এই ময়ূরপঙ্খী চিত্রটি বাহির করেন এবং ভারতীয় কলায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর পরামর্শ ও সমর্থনে ময়ূরপঙ্খীর চিত্রটি স্বর্গীয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে লইয়া যান। জনৈক দেশীয় কারিগর এই জয়নিধি নির্মাণ করেন। তৎপরে বাচ খেলায় উৎসাহ দিবার জন্য রাজ্যপাল মহোদয় এই 'রাজ্যপাল জয়নিধি' বালি রাধানাথ বাচ সমিতির হস্তে উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন।

রাজ্যপাল জয়নিধি প্রতিযোগিতা ১৯৫৫ সনে বালি রাধানাথ বাচ সমিতি কর্তৃক আরম্ভ হয়। এই সমিতি অপর কয়টি নৌবাহন সমিতির বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের সহিত যুক্ত। নিম্নে কয় বৎসরের বিজয়ী ও বিজিত দলের নাম দেওয়া হইল:

বিজয়ী দল	বিজিত দল
১৯৫৫—বরাহনগর রোয়িং ক্লাব	বালি রাধানাথ বাচ সমিতি
১৯৫৬— ঐ ঐ	দক্ষিণেশ্বর ওয়াই-এম-এ
১৯৫৭—দক্ষিণেশ্বর ওয়াই-এম-এ	বালি রাধানাথ বাচ সমিতি
১৯৫৮—আরিয়াদহ স্পোর্টিং	দক্ষিণেশ্বর ওয়াই-এম-এ

প্রতিযোগিতার পর পারিতোষিক প্রদান করা হয়। সভায় হাওড়া জেলা-অধিকর্তা শ্রীবিনয়ভূষণ মণ্ডল সভাপতি হন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন এফ. আর. এস. প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বিজয়ী দলকে 'রাজ্যপাল জয়নিধি', বিজিত দলকে 'কেদারপ্রসাদ স্মৃতি পারিতোষিক' এবং খেলোয়াড়দের পদক প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে হলডেন সাহেব অক্সফোর্ডের বাচ খেলার সহিত আমাদের এই বাচ খেলার তুলনা করেন এবং ভারসাম্য রাখা এই নৌবাহনের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বাচ খেলা প্রধান অতিথির খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

'রাজ্যপাল জয়নিধি' প্রতিযোগিতায় বর্তমান বৎসরে কলিকাতা, বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, আরিয়াদহ, চাতরা, উত্তরপাড়া, বালি ও বেলুড় হইতে ১৯টি দল নাম দিয়াছিল। ১৯৫১ সনে বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের যুক্ত দলগুলির নৌকা ছিল মাত্র ৩ খানি। এক্ষণে বাচ খেলার প্রসার হইয়াছে। নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১খানি হইয়াছে। একখানি নৌকাগঠনেরও বর্তমান ব্যয় প্রায় ২৫০০৲। নৌকাগুলির নাম—অলকানন্দা, সারদা, জাহ্নবী, গঙ্গা, মহানন্দা, কাবেরী, সুরধুনী, ভাগীরথী প্রভৃতি। আমাদের বাংলায় বাচ খেলা অতি পুরাতন জাতীয় ক্রীড়া। মুক্ত আকাশতলে গঙ্গাবক্ষে এই খেলা যুবকগণের বলিষ্ঠ দেহ ও বলিষ্ঠ মন গঠনে প্রভূত পরিমাণে সহায় হইতেছে। অন্যান্য দলের মত বালি রাধানাথ সমিতির বাচের দল এই খেলার প্রসারে আন্তরিক সহযোগিতা করিতেছে। ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এফ. আর. সি. এস (এডিন) ডি এল ও (লণ্ডন) বর্তমানে এই সমিতির সভাপতি এবং ক্রীড়ামোদী শ্রীভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। বঙ্গীয় নৌবাহন সঙ্ঘের উদ্যোগ, উপায়কুশলতা ও গঠনক্ষমতা নদীমাতৃক দেশের এই বলিষ্ঠ জাতীয় ক্রীড়াকে ক্রমশঃ প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এই চেষ্টা সফল হউক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সাহিত্য-বাসরে ডাঃ সুকুমার সেনের ভাষণ দান

গত ৪ঠা ফাল্গুন ইংরাজী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় হলঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা একটি সাহিত্য-বাসরের আয়োজন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় পরিষৎ শাখা কর্তৃক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। জ্ঞানতপস্বী এই প্রবীণ অধ্যাপককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—বিষ্ণুপুর শাখার পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরিষৎ শাখার পক্ষ হইতে ডাঃ সেনকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়। পরিষৎ শাখার সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহের কার্য্যবিবরণী পাঠ এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ রায় কর্তৃক বিষ্ণুপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার পর প্রধান অতিথির আসন হইতে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা, কোচবিহার ও বিষ্ণুপুর এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা ও বিষ্ণুপুর বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজকীর্ত্তির নিদর্শন মন্দিরগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, 'ভারতের কয়েকটি দ্রষ্টব্য শিল্পের উল্লেখ করিতে হইলে তাহার মধ্যে—"শ্যামরায়ের মন্দির" উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহের প্রশংসা করিয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার আহ্বান জানান। শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি মহাপ্রভু চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন —"চৈতন্যের ধর্ম্ম ভিক্ষুকের ধর্ম্ম নহে। ইহা তেজস্বী বীর্য্যবানের ধর্ম্ম।" তিনি আরও বলেন, "মহাপ্রভু শুধু ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না। তাঁহাকে বর্ত্তমান বাঙালী জাতির জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যবন হরিদাসকে কোল দিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বীজ বপন করেন। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বাঙালীর সহিত সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করেন। সুবুদ্ধি মিশ্র, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মাগণকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া এবং স্বয়ং নীলাচলে অবস্থান করিয়া তিনি বাঙালী বৈষ্ণবগণের সহিত সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসাধনের সেতু রচনা করেন। ইহাই বর্ত্তমানে বাঙালীর জাতীয়তাবোধের মহা মহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অপাংক্তেয় ছিল। মহাপ্রভুর পর বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সহিত সমমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখায় অবস্থানকালের অধিকাংশ সময়ই তিনি পরিষৎ শাখার পুথিশালায় অতিবাহিত করেন। পরিষৎ শাখার সংগ্রহের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, সময়ের অনুপাতে পরিষৎ শাখার সংগ্রহ প্রচুর এবং মূল্যবান।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন এবার ২০শে পৌষ হইতে ২৭শে পৌষ ১৩৬৪ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এতৎসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীরও আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামে শল্য, শালক্য, কায়-চিকিৎসা, অগদতন্ত্র, কৌমারভৃত্য, ভেষজ বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, রসশাস্ত্র, রসায়ন-বাজীকরণ, মনোবিজ্ঞান—ভূতবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব—এই এগারটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বিশিষ্ট পারদর্শী কবিরাজগণের সভাপতিত্বে এবং বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাচক্রে যোগদান করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে ঋতু-উপঋতু, রত্ন-উপরত্ন, ঔষধি, জনস্বাস্থ্যের চার্ট, মুষ্টিযোগের চার্ট, দ্রব্যাদির গুণাগুণের চার্ট, আয়ুর্ব্বেদীয় পুঁথি ও গ্রন্থরাজি প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে জনপ্রিয় বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভাগীয় অধিবেশনগুলি কলেজ স্কোয়ারস্থিত ষ্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন; আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার স্বাগত সম্ভাষণ ও পরিষদের কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। পরিষদের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ প্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ প্রদান করেন।

এই অধিবেশনে শুধু আয়ুর্ব্বেদের সমগ্র বিষয়ের আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠই হয় নাই, প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া দ্রব্যাদির প্রত্যক্ষদর্শন ও বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে ইহাতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরদেশী শাসকদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইলেও নিজ বৈশিষ্ট্যের গুণে আয়ুর্ব্বেদ ভারতীয় জনসাধারণের রোগমুক্তি আনিয়া দিয়াছে। সরকারী সাহায্যও তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। তাহার অমূল্য অবদান বিচিত্র জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতে উহার সম্যক্ উন্নতি সাধন ও বিস্তৃত অনুসন্ধিৎসা নির্ভর করে স্বাধীন সরকারের উপরে। আশা করি, এই দিকে বিস্তৃত ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমুন্নতি সাধন করিতে সরকার পশ্চাৎপদ হইবেন না।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

গত শুক্রবার ১১ই এপ্রিল বেলা ২-১৫ মিঃ সময় শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম-এ, এল-এল-বি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবন ৪, গোপীকৃষ্ণ পাল লেনে করোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বর্গীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকমণ্ডলীর সাহায্যে 'ঋগ্বেদ সংহিতা' সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' এবং স্বর্গীয় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার সম্পাদনায় 'বৌদ্ধকোষ' প্রকাশ করেন। ডঃ বিমলাচরণ লাহার এবং স্বর্গীয় ডঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকারের সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান কালচার' প্রকাশ করেন। তিনি নিজে বহুদিন যাবৎ 'শ্রীভারতী' নামক মাসিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সমস্ত বিখ্যাত তত্ত্ববহুল পত্রিকা নিজ প্রেস শ্রীভারতী প্রেসে মুদ্রণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালে (১৯৪২) তিনি ভারতী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভারতী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'দেব-দেবী তত্ত্ব', 'মহাপুরুষের জীবনী', 'কলা বিদ্যা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ীর সহযোগিতায় পাঞ্জিকা সংস্কারের চেষ্টা করেন! এই পঞ্জিকা সংস্কারই বর্ত্তমান ভারত সরকারের 'পঞ্জিকা-সংস্কারক' কমিটি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল।

মহেশচন্দ্র দেব

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীমহেশচন্দ্র দেব মহাশয় বিগত ১লা জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার সততা, সাহস ও স্বদেশানুরাগ সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি তাঁহার সন্তানদিগকেও স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দেব অতি অল্প বয়সেই কারাবরণ করেন। মহেশবাবু তাঁহার স্বগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই স্বধর্ম্মীদের একাংশের বিরোধিতায় সে কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি চুন্টা গ্রামের লাইব্রেরীটির উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করেন এবং এক সময় উহার সভাপতিরূপেও কার্য্য করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী বৎসরের কিছু বেশী হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং চারি কন্যা বর্ত্তমান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দেব একজন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে তিনি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। মহেশবাবুর আত্মার সদ্‌গতি হউক ইহাই আমাদের কামনা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঘুঁটেওয়ালী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

লছমনঝোলা [ফোটো : শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

আশা-নিরাশায় [ফোটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ ১ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জয়ন্তী, মুক্তি ও মরণ

আজকাল দেশে একটা হুজুগ চলিয়াছে রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে উপলক্ষ করিয়া। সারা ভারতেই ভারতের মহান সন্তানদিগের স্মরণে তাঁহাদের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে সভা-সমিতিতে বেতারের ধ্বনিতে সেই সকল মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অতীতকে স্মরণ করাইয়া জাতির মনকে জাগ্রত করা। গৌণ উদ্দেশ্য উৎসব এবং সেই উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ। সেই কারণে নগরের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে, দেশের বর্দ্ধিষ্ণু বা লোকপরিপূর্ণ অঞ্চলে চাঁদা তুলিয়া বক্তৃতা, আবৃত্তি, নাচ-গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয় এবং সাহিত্য বা রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম-ডাক আছে তাঁহাদের লোকজনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এক সমারোহের সৃষ্টি করা হয়।

ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা, তাহা অতি উচ্চ আদর্শের আনুষঙ্গিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতীত ও বর্ত্তমান কালের যে একই স্রোতের ধারা এবং অতীতের গৌরব যে বর্ত্তমানের ঐতিহ্যের ভিত্তি ও মূল এটা জাতির প্রত্যেক লোকের স্মরণ রাখা উচিত, কেননা উহার উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা ও শক্তি নির্ভর করে। আমরা কে এবং আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাই বা কে ছিলেন এ কথাই ত সমাজ ও জাতি গঠনের প্রধান উপাদান।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখি যে, এই মুখ্য উদ্দেশ্য দিনে দিনে যেন পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে এবং গৌণ যাহা ছিল তাহাকেই সামনে আনিয়া ঘটা করিয়া উৎসবের ব্যবস্থা চলিতেছে। শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই সার্থক হয় যখন মহাপুরুষের জীবনদর্শন বা জীবনের আদর্শকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি। "মহাজনগণ যে পথে চলিয়াছিলেন সেই পন্থা" এই প্রবাদ শুধুমাত্র লোকাচার বা সামাজিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত নহে। যে পথের কথা বলা হইয়াছে তাহা জীবনের পথ—জাতীয় প্রগতির পন্থা।

যদি সত্য সত্যই আমরা ঐ পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে আমাদের বাধা কোথায়? সভা-সমিতিতে বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণকে সাধুবাদ দিয়া আমরা "নমো নমঃ" করিয়া শ্রদ্ধার পাঠ শেষ করি এবং প্রকৃত বাহবা দিই নাচ-গান উপভোগ্য মনে হইলে। সভা সাঙ্গ হইতে না হইতেই মহাজনের সকল প্রসঙ্গ মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমরা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলি।

যাঁহাদের স্মৃতি লইয়া আমরা ক্ষণিক গৌরব অনুভব করি তাঁহারা সকলেই আমাদের জাতির ও সমাজের একটি বিশিষ্ট স্তরের এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কীর্ত্তির দ্বারা ঐ স্তরকে উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। দেশের যেটুকু প্রগতি যেটুকু গৌরব আমাদের সময়ে হইয়াছে সবই গঠিত হইয়াছে ঐ স্তর হইতে। আমাদের দেশ ও সমাজ যে পথে উন্নত হইতেছিল, জগতের মানবসমাজের প্রত্যেক মহামানব সেই একই পথ নির্দ্দেশ করিয়া ঐ একই স্তরকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। সেই স্তরের মূলমন্ত্র ছিল বিদ্যার্জ্জন ও চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য। ঐ শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার সহিত অধ্যবসায়ের যোগে তাঁহারা আমাদের দেশকে ও জাতিকে, দৈহিক মানসিক ও রাজনৈতিক দাসত্বের মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের এবং জগতের সকল মহামানবের পথনির্দ্দেশ ঐ একই পন্থার অনুরূপ।

আজ আমাদের মধ্য হইতে সেই বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা, সেই উচ্চস্তরের স্বাধীন চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ লোপ পাইতে চলিয়াছে। একদল বিদেশী উচ্ছিষ্টভোজী ত ঐ উন্নত স্তরকেই "বুর্জ্জোয়া" আখ্যা দিয়া ঘৃণা করিতেই ব্যস্ত।

তবে এই জয়ন্তী-উৎসবের সার্থকতা কোথায়? আমাদের জাতি, বিশেষতঃ বাঙালী জাতি ত ডুবিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

আমরা এখন অবনতির পথে চলিয়াছি, যাহার শেষ জাতির মৃত্যু। সে পথ হইতে জাতিকে ফিরাইয়া যদি প্রগতির পথে তাহাকে চালাইতে পারা যায় তবেই রক্ষা। স্বাধীন চিন্তাই জীবনের পথ। মৃত্যুর সরল ও পিচ্ছিল পথে স্বাধীন চিন্তা নাই, আছে শ্লোগান, আছে স্তোকবাক্য।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ভাণ্ডার

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকীর আর মাত্র তিন বৎসর বাকি। রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য হিসাবে শ্রীজবাহরলাল নেহরু একটি জয়ন্তী ফাণ্ড খুলিয়াছেন। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ কার্য্য চালাইয়া যাওয়া এবং এই ভাবে কার্য্যে ও সেবায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তাহা করা হইয়াছে। পণ্ডিতজী সকলকে এই ফাণ্ডে অর্থদানের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহার আবেদনের পুনরুক্তি করিতেছি।

মুক্তিদাতা রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই মে এক বেতারভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি ছিলেন শিক্ষক এবং মুক্তিদাতা—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে আমাদের মন ও সমাজকে মুক্ত করার জন্যই তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনেহরু বলেন, "ভারতের এই মহান সন্তান যিনি আধুনিক তরুণ-তরুণীদিগের পূর্ব্বপুরুষদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের কি ধারণা তাহা আমি জানি না। আমি সেই যুগের লোক, যে যুগে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোকে আমাদের মন ও জীবন উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। তিনি কি ছিলেন না? কল্পনাবিলাসী কবি, গায়ক, শিল্পী ও সঙ্গীতবিদ, নাট্যকার, অভিনেতা, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ্, এবং মানবদরদী, জাতীয়তাবাদী এবং বিশ্বপ্রেমিক, দার্শনিক এবং কর্ম্মযোগী। তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মজীবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে তাঁহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার কথা ও গানের মোহনস্পর্শ আজও আমাদের মনে বিরাজমান। তাঁহার রচিত "জনগণমন" গানটিই আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহার রচনা ও জীবনগাথা হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। ভারতবাসীদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য কালে কালে এ দেশে যে মুনি-ঋষিদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ রবীন্দ্রনাথকে সেই মহাপুরুষদেরই একজন বলিয়া ভাবিবেন। কিন্তু তাঁহারা কি এই মহাপুরুষের বাণী স্মরণ রাখিয়া নিজ নিজ কর্ম্মপথে আগাইয়া যাইবেন?"

শ্রীনেহরু অতঃপর বলেন, "কবি ছিলেন শিক্ষক ও মুক্তিদাতা। আমাদের মন আর সামাজিক কাঠামোকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য তিনি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন খাটি ভারতীয়। ভারতের মাটি, চিন্তাধারা আর বিরাট ঐতিহ্য হইতে প্রাণশক্তি আহরণ করিয়াছিলেন। তবু তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বিশ্বনাগরিক। তাঁহার জাতীয়তাবাদ উদারতম আন্তর্জাতিকতার মিশিয়া গিয়াছিল। চিন্তা এবং কর্ম্মের সংহতি তাঁহার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। শান্তিনিকেতনে তাঁহার চিন্তাধারাকে ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ লইতে দেখি, যাহার ফলে বিশ্বভারতী স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার মনে যে প্রেরণা ছিল তাহাই বাস্তবে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্ত্তী শ্রীনিকেতনের রূপ লইয়াছে।"

ভূমি-সংস্কার

রাজ্যগুলিতে ভূমি-সংস্কারের প্রগতিতে পরিকল্পনা কমিশন যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ গত তিন-চার বৎসর ধরিয়া ভূমি-পরিকল্পনার কোনও প্রকার উন্নতি সাধিত হয় নাই। আইন অবশ্য পাশ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করা কোনও প্রদেশেই সম্ভবপর হয় নাই। তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি: আইনের গলদ এবং কর্ম্মচারীদের অসাধুতা। জমিদারী প্রথা লোপের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি প্রধান এই ছিল যে, জমি বণ্টনে সাম্য আনয়ন করা। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ভূমিহীন, সুতরাং বর্ত্তমান মালিকদের অতিরিক্ত জমি ইহাদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী প্রথা লোপের আইনের মধ্যে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে কারণ কেবলমাত্র কৃষিজমির পরিমাণ ২৫ একরের অধিক হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং ২৫ একরের অধিক যদি কৃষিজমি থাকে তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। সবচেয়ে গলদ ঘটিয়াছে এইখানেই এবং ইহার ফলে রাষ্ট্র কিছু উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত জমি পায় নাই বলিলেই চলে।

পঁচিশ একরের অতিরিক্ত কৃষিজমিকে দখলীস্বত্ব ও অকৃষিজমি হিসাবে সেটলমেণ্ট রেকর্ডে দেখানো হইতেছে। অকৃষিজমির পরিমাণের কোনও সীমা নাই; দুই-তিন হাজার একর কিংবা তাহারও অধিক পরিমাণ জমি এক-এক জনের অধীনে থাকিতে পারে। সবটাই হইতেছে ঘুষের খেলা; ঘুষের দ্বারা অতিরিক্ত কৃষিজমিকে অকৃষিজমি হিসাবে দেখানো হইতে পারে। অকৃষিজমি জমিদারী-বিলোপের আইনের আওতার মধ্যে পড়ে না; সুতরাং আইনের ফাঁক দ্বারা আইন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলকেও আইনের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতেও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে বহু একর জমি থাকিয়া যাইতেছে। মৎস্যচাষ-ভূমিকে এই আইন হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে কৃষিজমির সংজ্ঞা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ভূমি-সংস্কারের নামে সরকারী গাফিলতী ও কানুনগোদের অসাধুতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঘুষের জোরে জমির মালিকানা সকালে বিকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে শুনা যায়। অধিকাংশ জেলাতেই এমন গণ্ডগোল করা হইয়াছে যে, ভূমি-ব্যবস্থার সত্যিকার সংস্কারসাধন করিতে এখনও দশ বছর লাগিবে এবং সেই সঙ্গে অতি অবশ্য প্রয়োজন আইনের সংস্কার।

খাদ্য-উৎপাদন

মে মাসের প্রথমে দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত বৎসর ভারতে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মোটেই আশাপ্রদ নহে। ১৯৫৭ সনে ৬·৮৭ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১৯৫৬ সনের তুলনায় ইহা মাত্র ১৪ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫৬ সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬·৫৩ কোটি টন। ১৯৬০-৬১ সনে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৮·০৫ কোটি টনে নির্দ্ধারিত আছে; কিন্তু এই পরিমাণ খাদ্য-উৎপাদন আর বাকী তিন বৎসরে সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ বাকি তিন বৎসরে এখনও ১·৩৮ কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে; যেখানে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ১৪ লক্ষ টন, সেখানে বাকি তিন বৎসরে মোট ৫০ লক্ষ টনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথমে কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের জন্য ৫৬৮ কোটি টাকা খরচা ধরা হইয়াছিল। খরচার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৫১০ কোটি টাকা করা হইয়াছে এবং হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১০·২ শতাংশ। গত দুই বৎসরে মূল্যমান বৃদ্ধির হিসাব ধরিলে ব্যয়হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশের অধিক হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৪,১৮৫ বীজক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল; প্রথম দুই বৎসরে মাত্র ৯০৩টি বীজক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। সেচের প্রগতিও সন্তোষজনক নহে। ১৯৫৮-৫৯ সনে ২০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করিবার কথা; কিন্তু সেই তুলনায় প্রথম দুই বৎসরে মাত্র ১৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সেচের লক্ষ্য প্রথমে ১·২০ কোটি একরে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, পরে ইহার পরিমাণ ১ কোটি ৪০ হাজার একরে হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। সেচের প্রগতি ব্যাহত হওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায় যে, মাঠে জলসরবরাহ বিতরণকারী প্রয়োজনীয় খালগুলি যথেষ্ট পরিমাণে কাটা হয় নাই; কৃষিজমির কাছাকাছি এলাকায় জল জমানোর কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্র এবং উন্নততর বপনপ্রণালীর অভাবেও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া জাতীয় উন্নয়ন সমিতি মনে করেন। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ কৃষিভূমি ভারতবর্ষে অবস্থিত, তথাপি ইহা দুঃখের বিষয় যে, এই দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারিতেছে না। কৃষি-উৎপাদন, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে শিল্পোন্নয়নের প্রগতিও আশানুরূপ হইবে না। বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্য আমদানীর জন্য খরচা হইয়া যাইতেছে এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনগণের যে পরিমাণে ইচ্ছাপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল তাহা পাওয়া যায় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অতি-অবশ্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য। একদিকে ঘাটতি ব্যয় ও অন্য দিকে খাদ্যাভাব এই দুইয়ে মিলিয়া মূল্যমানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে রাজ্যগুলির; কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে দলাদলির রাজনীতি এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, জাতীয় বৃহত্তর আদর্শ উপেক্ষিত হইতে বাধ্য। কথায় কথায় ধর্মঘট, দলীয় সংঘর্ষ প্রভৃতি মন্ত্রীপরিষদের সমস্ত মনোযোগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতেছে। তবে ইহাও ঠিক যে, ভূমি-সংস্কার সমস্যার আশু সমাধান করিতে না পারিলে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে। এতদিন পর্য্যন্ত দেশে সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদনের হিসাব করা হইত; কিন্তু তাহাতে আঞ্চলিক প্রয়াসের যথাযথ হিসাব পাওয়া যাইত না। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এবার হইতে প্রতিটি গ্রামের জন্য আলাদা আলাদাভাবে খাদ্য-উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করা হইবে। গ্রামবাসীদের উপর লক্ষ্য নির্দ্ধারণের ভার থাকিবে, তবে কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দিবেন যাহাতে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইতে পারে। লক্ষ্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে রাজ্যগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা এবং গত বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব বিবেচনা করা হইবে। এই ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। গ্রামগুলির নিজস্ব উৎপাদন-পরিমাণ প্রান্তিক উৎপাদনের হিসাব রাখিতে সুবিধা করিয়া দিবে। কারখানায় যেমন প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার অল্প-বিস্তর হিসাব রাখা হয়, সেইরূপ সঠিক না হইলেও অন্ততঃ অধিক পরিমাণে গ্রামগুলির উৎপাদনশীলতার হিসাব রাখা প্রয়োজন। জাতীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র গ্রামের উৎপাদনশীলতা সর্ব্বোচ্চ হারে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় বিস্তৃতি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে প্রতি গ্রামের নির্দ্ধারিত উৎপাদনশীলতা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া প্ল্যানিং কমিশন মনে করেন। ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খাদ্যমূল্য ও খাদ্য-সরবরাহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, গত দুই বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রগতিও ব্যাহত হইয়াছে। খাদ্যমূল্য ভারতে মূল্য-মানের চাবিকাঠি; ইহার ভিত্তিতে অন্যান্য মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে শহরে মধ্যবিত্ত লোকের আয় হইতে উদ্বৃত্ত রাখা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন কি খাদ্যমূল্য অল্প বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ীরা বাজারে মাল ছাড়িতে রাজী হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্ল্যানিং কমিশন তাই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

ভারতে মজুতী স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খুব সমাদর আছে এবং গহনা, বাসনপত্র ইত্যাদির দ্বারা ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য জমানো হয়। সময়ের অতিক্রমেও এই বাসনার কোনও প্রকার নিবৃত্তি হয় নাই এবং আধুনিককালেও দেখা যায় যে, গহনার জন্য স্বর্ণের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে। সেই কারণে আন্তর্জ্জাতিক মূল্য হইতে ভারতে স্বর্ণের মূল্য দ্বিগুণেরও অধিক। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি হিসাব করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কত টাকার মূল্যের স্বর্ণ মজুত আছে। এইরূপ হিসাব অবশ্য নিখুঁত হইতে পারে না, কারণ বহু অনিশ্চিত তথ্যের দ্বারা এই হিসাব করা হইয়াছে। ভারতে স্বর্ণ উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক-শতাংশেরও কম এবং ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বর্ণের চোরা আমদানীর দ্বারা ভারতের আভ্যন্তরিক চাহিদার ৫০ শতাংশেরও অধিক মিটানো হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে স্বর্ণ আমদানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ১৯৫৬ সনের মে মাসে তিব্বত হইতে রৌপ্যমুদ্রা আমদানী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কারণ ইহাতে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ভারত বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ১৩ কোটি আউন্স স্বর্ণ ছিল। ১৮৫০ সন হইতে ভারতে যত স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে, তাহার সহিত আভ্যন্তরিক উৎপাদনের পরিমাণ যোগ দিয়া এই অঙ্ক বাহির করা হইয়াছে। ১৮৫০ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোট সাড়ে বারো কোটি আউন্সের স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। ১৯৩১ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বর্ণ রপ্তানী করে এবং এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪·৩ কোটি আউন্স। ১৯৪৩ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ৭০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ আমদানী করিয়াছে। এই স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানীর হিসাব কেবলমাত্র সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসাব। স্থলপথে স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানীর হিসাব করা সম্ভবপর হয় নাই।

১৮৮২ সন হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ২·১৮ কোটি আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হয়। ইহার মধ্যে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষ হইতে ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত ৭৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ বিক্রীত হয়। এই সব বাদ দিয়া দেখা যায় যে, ১৮৫০ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ১১·৩ কোটি আউন্স স্বর্ণ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে। স্বর্ণের চোরা আমদানীর কোনও হিসাব নাই। অবিভক্ত ভারতের যে ১৩ কোটি আউন্স স্বর্ণ ছিল, তাহার মধ্যে পাকিস্থান ও বার্ম্মার অংশ ছিল প্রায় ৩ কোটি আউন্স। ১৯৪৮-৪৯ সনে মোট ব্যক্তিগত মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১০·৫ কোটি আউন্স। বর্ত্তমান বাজার দরে ইহার মূল্য ৩,০৩৫ কোটি টাকা এবং ইহার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য ১,৭৫০ কোটি টাকা।

কংগ্রেস ও কৃষক-সম্প্রদায়

কৃষক ও কৃষিসমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"জমিদারী উচ্ছেদ হইয়াছে। সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫ একরের বেশী জমি কেহ রাখিতে পারিবে না—এই আইন চালু হইয়াছে। রাসায়নিক সার বণ্টন হইতেছে, কৃষি বিভাগকে নূতন ছাঁচে ঢালা হইয়াছে, সম্ভবমত এলাকায় ক্যানাল জল সরবরাহ করা হইতেছে এবং ক্যানাল খননের কাজ পুরাদমে চলিতেছে—এ সমস্ত সত্য। তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও আশা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। কেন পায় নাই তাহা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে হইবে না। কেবলমাত্র দুই-একটি কথা বলিলেই এই উৎপাদন-বৃদ্ধির অন্তরায় কি এবং কোথায় তাহাই প্রতিভাত হইবে।

"আইন পাস করিয়াই যদি মনে করা যায় সমস্যার সমাধান হইল তাহা হইলে প্রচণ্ড ভুল করা হইবে। হইয়াছেও তাহাই। জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে; জমিদারের খাস জমি এখনও বিলি করা হয় নাই। হাজার হাজার একর জমি এইভাবে পড়িয়া আছে। ২৫ একরের বেশী জমি যাহাদের আছে তাহাদের উদ্বৃত্ত জমি এখনও গ্রহণ করা হয় নাই—লওয়া হইবে বলিয়া বছরের পর বছর চলিয়া যাইতেছে। সার বণ্টনে স্বজন-প্রীতি, আত্মীয়-তোষণ নীতি অবাধে চলিতেছে। কৃষিবিভাগ ঠিক যন্ত্রের মত চলিতেছে, প্রাণহীন, দায়িত্বহীন, উদ্বেগহীন, উৎসাহহীন। ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিকানা দিবার কথা ঘটা করিয়া অহরহ বলা হইতেছে—আজও এক কাঠা দেওয়া হয় নাই। অন্তরায় কি জানা নাই। কৃষক উৎপাদন-বৃদ্ধিতে উৎসাহ পাইবে তখনই যখন সে জমির মালিক হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় আবাদ আরম্ভ করিবে তখনই যখন সার ও জলের গ্যারাণ্টি পাইবে। চাষে কৃষক অনুপ্রাণিত হইবে তখনই যখন সে প্রয়োজনকালে ঋণ পাইবে এবং উৎপাদন ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ফসলের মূল্য পাইবে।"

"বর্দ্ধমানবাণী" বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেসের প্রভাবশালী অংশের মুখপত্র। কংগ্রেস সরকারের বাস্তব কার্য্যক্রমের কংগ্রেসী সমালোচনা হিসাবে "বর্দ্ধমানবাণী"র মন্তব্যের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। সরকারী-নীতির অন্তঃসারশূন্যতা আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, কংগ্রেসের দলীয় মুখপত্রগুলিতেও কংগ্রেসের কার্য্য ও নীতির সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

ভূমি-সংস্কার ও উচ্ছেদ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনায় সাপ্তাহিক "দামোদর" লিখিতেছেন যে, ভূমি-সংস্কার আইন পাস হইবার পর চার বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সরকারী গাফিলতি ও দুর্নীতির সুযোগ লইয়া বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি ২৫

একরের উদ্বৃত্ত জমি বেনামী করিয়া রাখিবার সুযোগ পাইয়াছে। "দামোদর" লিখিতেছেন :

"বড় বড় ভূমিবান জোতদারদের মধ্যে যাঁহারা আবার ছোট ছোট জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই তারিখ পিছাইয়া চেক কাটিয়া নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের নামে পৃথক পৃথক জমা করিয়া দিয়াছেন। সেটেলমেণ্টের সময় ঐ সময় জমার দখলের তারিখ লিখাইতে গিয়া এমন জুয়াচুরি চালাইয়াছেন যে, হিসাব করিলে দেখা যায় দখলের সময় দখলীকার প্রসব পর্যন্ত হয় নাই মাতৃগর্ভেই রহিয়া গিয়াছে।"

• জমিদারদের খাস জমিগুলি সরকারী খাস জমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল জমি সরকারের পক্ষ হইতে ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে বিলি হইবার কথা। কিন্তু কার্যতঃ তাহা করা হয় নাই। "দামোদর" লিখিতেছেন, "পরিতাপের বিষয় ঐ সমস্ত জমি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা বিগায়ী জমিদারগণের নিকট ব্যবস্থা করিয়া জবর দখল করিতেছেন। প্রতি বৎসর তাঁহারা নিয়মিত চাষ করিতেছেন, তাঁহারাই দখলীকার হইতেছেন বলিয়া সেটেলমেণ্টে দরখাস্ত করিতেছেন।" যে সকল জমি এইভাবে যায় নাই সেইগুলি সরকারী তহশিলদারদের যোগসাজসে সুবিধাবাদিগণ দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। খাস জমিগুলি কোথাও সরকারের দখলে নাই, সুবিধাবাদী ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক দখল করিয়া বসিয়া আছে।

প্লানিং কমিশনের পুনর্গঠন

লোকসভার এষ্টিমেটস কমিটি সম্প্রতি প্লানিং কমিশনের পুনর্গঠনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির মতে প্লানিং কমিশনের প্রশাসনিক কার্য্যে মাথা ঘামান উচিত হইবে না, পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য কমিশনের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। কমিশন একটি উপদেষ্টা-সংস্থা, উহাকে সরকারের অংশ বলিয়া মনে করা ভুল, কমিটির ইহাই অভিমত। যাহাতে জনসাধারণের মনে পরিকল্পনা কমিশনের কার্য্যাবলী এবং ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকিতে পারে সেজন্য এষ্টিমেটস কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যেন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা কমিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীকেও প্লানিং কমিশনের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

এষ্টিমেটস কমিটি তাঁহাদের সুপারিশের সমর্থনে যে কয়েকটি যুক্তি দিয়াছেন তাহা ফেলিবার মত নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনা কমিশন গঠনের সময় নূতন সংস্থাটি যাহাতে কর্তৃত্বপূর্ণ হয় তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন থাকিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সেই প্রয়োজন আর নাই। সরকার এবং কমিশনের কাজের মধ্যে সংযোগ এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইলে পরিকল্পনা কমিশনের অধিবেশনে মন্ত্রীদিগকে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে এবং কমিশনের সদস্যবৃন্দকে মন্ত্রীসভার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। ইহাও সত্য যে, স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে কমিশনের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কমিশনের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে মন্ত্রীদিগের সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পরিবর্তনের সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার কোন ক্ষমতা কি এষ্টিমেটস কমিটির আছে? আমাদের মনে হয় এষ্টিমেটস কমিটির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের সুপারিশ করিবার কোন বাস্তব অধিকার নাই। সেই জন্যই এই সুপারিশকে অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি প্রথম হইতে ভারতের এক বিশেষ প্রভাবশালী অংশ পরিকল্পনা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। পার্লামেণ্ট, মন্ত্রীসভা, এমন কি পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যেও তাহাদের অনেক সমর্থক রহিয়াছে—সময়ে অসময়ে তাহারা সাধারণভাবে পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিশেষ ভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া থাকেন। যাহারা পরিকল্পনা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের পরিকল্পনাগুলির সমালোচনা করিয়া থাকেন সেই সকল বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনার সহিত এই শ্রেণীর সমালোচকদের কোন মিল নাই, ইহাদের উদ্দেশ্য হইল যে কোন প্রকারে হউক ভারত হইতে পরিকল্পনা-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা, তাহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃপক্ষে পরিকল্পনা-ব্যবস্থাকে এরূপভাবে চালিয়া সাজানো যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয়। পরিকল্পনা কমিশন শক্তিশালী হওয়াতে ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সমালোচকগণ কি প্রকারে পরিকল্পনা কমিশনের কর্তৃত্ব হ্রাস করা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

যদিও ভারতের—বলিতে গেলে যে কোন পশ্চাদপদ দেশের—উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য্য, কয়েকটি বিশেষ কারণে এই সকল দেশে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। প্রথমতঃ পরিকল্পনা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন রহিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা-ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও যাহাতে তাহা জনসাধারণের স্বার্থের পরিপোষক না হইয়া মুষ্টিমেয় ধনীর স্বার্থের পরিপোষক হয় তজ্জন্য চেষ্টার বিরাম নাই। ইহা ছাড়া নানারূপ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা ত আছেই। ভারতের সম্মুখে সকল সমস্যাগুলিই আছে—উপরন্তু ভারতের প্রশাসনব্যবস্থার যাহারা কর্ণধার সেই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই পরিকল্পনা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থাহীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্লানিং কমিশন যদি কোন উত্তম কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা বহুলাংশে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্যই হইয়াছে বলিলে বিশেষ ভুল বলা হয় না। নিঃসন্দেহে, প্লানিং কমিশনের অনেক সদস্যই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ভারতে পরিকল্পনা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্ত শ্রীনেহরু যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন আর কেহই একক ভাবে তাহা করেন নাই। চারিদিক হইতে প্ল্যান বাতিল করিয়া দিবার জন্ত বা যে প্ল্যানটিকে ছাঁটাই বাতিল করিয়া দিবার জন্ত, যে কলরব উঠিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনেহরুর প্লানিং কমিশন পরিত্যাগ উহার সমাধি রচনারই সমতুল্য হইবে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে, নীতিগতভাবে কমিশনের সদস্যপদ হইতে মন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্য হ্রাসের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, এখনও মন্ত্রীদের ছাড়া প্লানিং কমিশনের চলিবার মত ক্ষমতা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না—অর্থাৎ এষ্টিমেটস কমিটির প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার সময় এখনও আসে নাই।

তবে একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, পরিকল্পনা কমিশন যথোপযুক্ত কাজ করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। প্রথম পরিকল্পনা-কালীন কার্য্যের যে আলোচনা কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ হতাশাজনক। উপরন্তু, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াও শীঘ্রই প্রকাশ করিতে হইবে; কিন্তু এই সম্পর্কে কমিশন তৎপর হইয়াছেন বলিয়া আমরা কোন খবর পাই নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা কমিশনের পক্ষে কিরূপ মর্য্যাদাহানিকর হইয়াছিল কমিশন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। উপরন্তু, দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন সম্পর্কেও কমিশন বিশেষ নিষ্ক্রিয়তা দেখাইয়াছেন। কমিশনের কার্য্যধারার উন্নতি না ঘটিলে পরিকল্পনা-বিরোধী সমালোচকদের সমালোচনার খোরাক বৃদ্ধি পাইবে; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

মধ্যস্কুল পরীক্ষা

১৯৫২ সন হইতে আসাম সরকার মধ্যস্কুল পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরীক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবকদের চরম দুর্গতি হইয়াছে। ফলে, আসামের দায়িত্বশীল জনমত প্রায় সমস্বরে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা রদ করিবার জন্ত সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় আলোচনায় এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, উহা একটি জাতীয় অপচয়। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

'সম্প্রতি আসাম রাজ্য বিধানসভায় শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না চন্দ ও কমলকুমারী বরুয়া (উভয়েই কংগ্রেস সদস্যা) এই অবাঞ্ছিত পরীক্ষা অবিলম্বে বন্ধ করা সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহার পশ্চাতে যে রাজ্যের জনমতের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে, তাহা আসামের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয় অভিমতাদি হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অথচ সরকার কেন তাহাদের অযৌক্তিক জিদ ছাড়িতেছেন না তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।—নানা দিক হইতে বিচারের কষ্টিপাথরে এই পরীক্ষার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে এই পরীক্ষার জাঁতাকলে পিষিয়া মারিবার কোনও সার্থকতা আছে কি? ইহার ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার এই পর্য্যায়ে উক্ত পরীক্ষা বালক-বালিকাদের জ্ঞানবিকাশের কোনও সহায়তা করিতে পারে না, বরং না বুঝিয়া তোতাপাখীর মত কোন প্রকারে পরীক্ষা পাস করার উপযোগী মুখস্থ করাকেই উৎসাহ দেয়। পরীক্ষা দেওয়ার পর তরলমতি এই সকল বালক-বালিকা ফল প্রকাশ পর্য্যন্ত ৩৪ মাস 'বেকার' থাকার জন্ত অনধ্যায় হেতু একদিকে অধীত বিষয় প্রায় নিঃশেষে ভুলিয়া যায়, অন্যদিকে লিখনপঠনহীন নানা নষ্টামি-দুষ্টামিতে ডুবিয়া গিয়া যে অবস্থায় পড়ে তাহাতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফল প্রকাশ হইলে তাহাদিগকে পুনরায় পাঠে নিবিষ্ট তথা আকৃষ্ট করাইতে একেবারে নূতন ভাবে সুরু করিতে হয়। ইহার তিক্ত অভিজ্ঞতা অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের হইয়াছে। এই পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নত না হইয়া অবনত হইয়াছে ইহাই প্রায় সকলের অভিমত।'

পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের সাহায্য করা। সেই পরীক্ষা-ব্যবস্থা যদি জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক না হইয়া তাহার প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার বিলোপসাধন অবশ্য করণীয় হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে পরীক্ষার ছড়াছড়ি—অথচ নিত্যনূতন পরীক্ষার ফলে ছাত্রদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের মানের যে বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে বা হইতেছে এমন মনে হয় না। তাহা ভিন্ন বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রণালীর অন্তর্গত ছাত্রদের মধ্যেও পরীক্ষা-ব্যাপারে কোন সমতা নাই। আসামে উচ্চ এবং মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যস্কুল পরীক্ষা দিতে হয় অথচ জুনিয়র কেম্ব্রিজ সিলেবাস অনুযায়ী পঠনরত বিদ্যার্থীদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হয় না। সরকারী নীতির যৌক্তিকতা থাকা প্রয়োজন। যখন জনমতের বিশেষ অংশ সেই যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দিহান হয় তখন সরকারের উচিত জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা অথবা তাহা প্রত্যাহার করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকার জনমতের সমালোচনা সম্পর্কে নীরব থাকেন—যেন জনসাধারণের মতামত, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সরকারের কোন করণীয় নাই। আসাম সরকারও এই ঐতিহ্যই অনুসরণ করিতেছেন। মধ্যস্কুল পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলনের সময় হইতেই যদিও আসামের জনসাধারণ এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন, তথাপি সরকার তাহা প্রত্যাহারও করেন নাই, অথচ ঐ ব্যবস্থা চলিতে দেওয়ার পিছনে কি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে তাহাও বুঝাইয়া বলেন নাই।

বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্ত্তি সমস্যা

১লা এপ্রিল হইতে নূতন শিক্ষা-বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরেই শিক্ষা-বৎসর আরম্ভে অভিভাবকদিগকে ছাত্রভর্ত্তি লইয়া

বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে এই বৎসর অভিভাবকদের দুর্গতি বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সর্ব্বত্রই স্থানাভাব। শহরাঞ্চলেই ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে যে-সংখ্যক ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে আসে, কোনক্রমে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ রহিয়াছে, সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বাহিরের স্কুল হইতে কার্য্যতঃ কোন ছাত্র ভর্ত্তি করিতে পারে না। উপরন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে দশম এবং একাদশ শ্রেণীতে ভাগ করায় সমস্যা আরও তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে সমস্যা কিরূপ সঙ্কটজনক রূপ ধারণ করিয়াছে সাপ্তাহিক 'পল্লীবাসী'র নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহা আংশিক অনুমান করা যাইবে :

"মার্চ মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করিয়া এপ্রিল হইতে নূতন ক্লাস সুরু করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ছেলে ভর্ত্তি করা লইয়া অভিভাবকগণ আজ বিষম বিপন্ন।

"বড় বড় স্কুল—ছাত্রদের হাঁকাইয়া দেন, সরকার হইতে কাঁড়িল টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়ায়, ছাত্র লওয়া না লওয়া তাঁহাদের ইচ্ছাধীন।

"ছোটখাটো যে স্কুলেই যান সেইখানেই ছাত্রের ভিড়। বেতন সাধ্যাতীত অঙ্কে স্ফীত। অথচ ভর্ত্তি করিতেই হইবে, বাড়ীতে বসাইয়া রাখা যায় না। তা ছাড়া একরাশি টাকার নূতন বই কিনিবার চাপ ত আছেই।

"একাদশ শ্রেণীর ঝোঁক অনেকের ইতিমধ্যেই কাটিয়াছে। দশম শ্রেণীতে উঠিয়া অনেকেই অন্ধকার দেখিতেছে। অনেকেই আবার একাদশী স্কুল হইতে পুরাতন পাঠ্যসূচীর আগ্রহে দশম শ্রেণীর স্কুলে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাদেরও কি কম শাস্তি!

"এ তো গেল পাশকরাদের কথা, এইবার ফেল ছাত্রদের কথা ভাবুন। বিপুউজী গ্রাণ্ট ঘুচিল। পুরা বেতন টানিতে হইবে। সারা বছরের খোরাক-পোষাক না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কোন হেডমাষ্টার দয়া করিয়া ইহাদের প্রমোশন দিলেই বা কি হইবে? উপর ক্লাসে একবর্ণও ত সে বুঝিতে পারিবে না, ক্লাসে শুধু গণ্ডগোল বাধাইবে।"

মোটর দুর্ঘটনা ও জনসাধারণ

মোটর দুর্ঘটনায় প্রতি বৎসর বহু লোকের জীবনহানি ঘটে। কলিকাতা শহরেও মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ বহুবিধ। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই যে দুর্ঘটনা চালকদের অমনোযোগিতা এবং অযত্নের জন্যই ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোটর দুর্ঘটনায় আহত অথবা নিহত ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু "সেবক" পত্রিকা ২৭শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় আলোচনায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোটর দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যুর জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। এ সম্পর্কে "সেবকে"র বিস্তৃত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বহু মূল্যবান আলোচনার মধ্য হইতে আমরা অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীবনলতা পাল নাম্নী জনৈকা মহিলা মোটর দুর্ঘটনায় নিহত তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে "সেবক" লিখিতেছেন :

"মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অথবা কোন সম্পত্তির ক্ষতি হইলে ত্রিপুরারাজ্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না, ইহা এক অদ্ভুত কাণ্ড। ইদানীং পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে যোগাযোগ মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৭ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ২৭৯ জন ব্যক্তি মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। তন্মধ্যে একজনও ক্ষতিপূরণ পায় নাই। ১৯৩৯ সনের মোটর ভেহিকল এক্ট এই রাজ্যে বলবৎ আছে এবং ঐ এক্টবলে প্রত্যেক মোটর মালিক তাহার গাড়ীর ইন্সিওর করিয়া রাখিতে বাধ্য এবং ইন্সিওরেন্স না করিলে তাহারা আইনতঃ দণ্ডনীয়। আমরা যতদূর জানি মোটর মালিক মোটর ইন্সিওর করিয়া থাকেন। তবে কেন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষতিপূরণ পায় না? যোগাযোগ মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, একটি মোটর দুর্ঘটনারও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। কেন দেওয়া হয় নাই অথবা কেন দেওয়া হয় না সে সম্পর্কে তিনি অবশ্য কিছুই বলেন নাই। ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি কারণ বলিয়া আমাদের ধারণা : (১) ত্রিপুরার অধিবাসী বিশেষতঃ গ্রামবাসী (নিরক্ষর গ্রামবাসীই অধিকাংশ দুর্ঘটনায় পতিত হয়) জানে না ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় কিনা এবং কি ভাবে পাইতে হয়; (২) ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপারে পুলিসের এবং মোটর মালিকদের নিষ্ক্রিয়তা; এবং (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওভারলোড প্রমাণিত হয় বলিয়া ইন্সিওর কোম্পানীর দায়িত্ব অস্বীকার। প্রথমোক্ত দুইটি কারণ মারাত্মক এবং সরকারের চরম উদাসীনতাই এই দুইটি কারণের প্রশ্রয় দান করিতেছে। মোটর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় বিষয়ে ক্ষতিপূরণ প্রাপক এবং সরকারের অবশ্যই যুগপৎ করণীয় বিষয় রহিয়াছে। মোটর মালিককে চাপ দিলেই ক্ষতিপূরণ আদায় হইতে পারে। ওভারলোড ছিল বলিয়া যদি কোন ইন্সিওর কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে তবে মোটর মালিককেই আদালতের নির্দ্দেশানুসারে ক্ষতিপূরণ আদায় দিতে হইবে। মোটর দুর্ঘটনার সব কেস পুলিস কোর্টে উপস্থিত করে কিনা তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইন্সিওর কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিলে প্রাপক ক্ষতিপূরণ পাইবে না আইনে নিশ্চয়ই এইরূপ বিধান নাই। মূলতঃ মোটর মালিকই ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য দায়ী; তিনি ইন্সিওর করিয়া একটি কোম্পানীকে তাহার দায়িত্ব গ্রহণে অংশীদার করিয়াছেন মাত্র। ইন্সিওর কোম্পানী ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে অস্বীকার করে বলিয়া মালিক বা চালক তাহাদের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না।"

মফঃস্বলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের অব্যবস্থা

মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে-বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ অসন্তোষজনক অবস্থায় রহিয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরকার বিদ্যুৎ-সরবরাহ পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর পূর্ব্বের অব্যবস্থা অনেকাংশে হ্রাস পাইলেও এখনও জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইবার পরও বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব এবং অব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে উচিত নহে। অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করা এখনই সম্ভব নহে, কিন্তু নদী পরিকল্পনার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ-সরবরাহের অব্যবস্থা এবং অপ্রতুলতার কারণ সহজে বোধগম্য হয়।

সম্প্রতি আগরতলা হইতে প্রকাশিত "সেবক" পত্রিকা আগরতলার বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নহে অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্ন শহরে বিদ্যুত-সরবরাহ ব্যবস্থার নানারূপ ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে যাহা সংশোধন করা বিশেষ কঠিন হইবে না।

"সেবক" লিখিতেছেন :

"১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে আগরতলার ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ইহা আজ ৪ বৎসরের কথা। কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা হাতে লইয়া ৪টি পূর্ণ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেও আমরা যাঁহারা সাধারণ লোক সামান্য একটু আলোর সন্ধানে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করি ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাজকর্ম্মের কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। আজও ভোল্টেজের অভাবে সেই মান্ধাতা আমলের টিমটিম আলোর অন্ধকারে হাতবাইয়াই কাজ করিতে হয়, আজও একবার ১১০, একবার ১৫০, একবার ১৮০ ভোল্টেজের বাল্‌ব প্রতিদিন পরিবর্তন করিতে হয়, আজও তারের গোলযোগে একবার বাতি নিভিয়া গেলে বহুকষ্টে কানেকশন পাওয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে তার ঝুলাইয়া বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সুরু হইয়াছিল; সেই তার আজও ঝুলিতেছে. তার পাল্টাইবার প্রয়োজনটাই সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারে যে ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই ব্যাণ্ডেজের প্রতি ২৫ লক্ষ টাকার প্ল্যান হাতে লইয়াও রোধ করা যায় নাই।

"ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের গ্রাহকগণকে বৎসরের পর বৎসর যে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইতেছে তাহা কবে শেষ হইবে জানি না। বারম্বার লাইন খারাপ হইয়া প্রত্যহ তাহাদিগকে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহার প্রতি কোন দায়িত্বসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকিতে পারেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে লাইন মেরামতের জন্য সংবাদ দেওয়া গ্রাহকদের দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার একটি বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া গ্রাহকগণকে প্রত্যহ কেন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন? লাইন ঠিক করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক লোক, যানবাহন আছে কি না তাহারও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী গাড়ীটি হাওয়া খাইবে আর সাইকেল নাই অতএব মেরামতকারী লোক আসিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া যখন জানান হয় তখন গ্রাহকগণ নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের শ্রাদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে না।"

ভারতে ট্রেণ চলাচল

ভারতে দৈনিক যাত্রীবাহী এবং মালবাহী সাত হাজার ট্রেণ চলাচল করে। এই সকল ট্রেণ দৈনিক ৫৬২,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। ১৯৫৬-৫৭ সনে ট্রেণগুলি যেরূপ ব্যস্ত ছিল ইতিপূর্ব্বে কখনও ট্রেণগুলি সেইরূপ কর্ম্মরত ছিল না। যাত্রীবাহী ট্রেণগুলি দৈনিক ৩২৫,০০০ মাইল এবং মালবাহী ট্রেণগুলি দৈনিক ২৩৭,০০০ মাইল ভ্রমণ করে।

শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তার

মুক্তিদানের পর শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করিতে হইল, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা ব্যতীত কাশ্মীর সরকারের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। ভারত সরকার শেখ আবদুল্লাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না, এই তথ্য সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু কাশ্মীরের পরিস্থিতি, পাকিস্তানী উস্কানী এবং সর্ব্বোপরি বিভেদ-সৃষ্টির জন্য আবদুল্লার প্রচেষ্টা পর্য্যালোচনা করিয়া আবদুল্লার গ্রেপ্তারে সম্মতি দিতে ভারত সরকার বাধ্য হইয়াছেন।

শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক প্রভাব যে বিশেষ ছিল না, কাশ্মীরী জনসাধারণের আচরণ হইতে তাহা বিশেষরূপেই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শেখ আবদুল্লা গুপ্তভাবে এবং প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতা এবং বিভেদের যে বিষ ছড়াইতেছিল তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নহে। মুক্তির সুযোগ লইয়া আবদুল্লা কাশ্মীরের পবিত্র মসজিদগুলিকে তাহার ভারতবিরোধী সাম্প্রদায়িক বিষ প্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিয়াছিল।

শেখ আবদুল্লা কেবলমাত্র কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চাহে নাই। পঞ্জাব এবং কাশ্মীরের স্বাধিকারের দাবিতে শেখ আবদুল্লা আকালী দলের একাংশের সহিত এক সম্মিলিত ভারত-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভে সচেষ্ট হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আকালী নেতৃবৃন্দ শেখ আবদুল্লার সেই দেশদ্রোহী প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা স্পষ্টই আবদুল্লাকে জানাইয়া দেন যে যদি আবদুল্লা কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করে, কেবলমাত্র তখনই আকালীদল তাহার সহিত সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন চালাইতে

প্রস্তুত থাকিবেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও শেখ আবদুল্লার অভিসন্ধি ইহাতে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উত্তর ভারতের জনসাধারণের একাংশের অসন্তোষকে শেখ আবদুল্লা নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য লাগাইতে গিয়াছিল তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। মাষ্টার তারা সিং শেখ আবদুল্লাকে "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার" বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক ভারতকে দুই ভাগ করিয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আলজিরিয়া ও ফ্রান্স

আলজিরিয়া লইয়া ফ্রান্সে গৃহবিবাদের সূচনা দেখা দিয়াছে। দ'গলপন্থীরা আলজিরিয়াতে সরকারী ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের মতে আলজিরিয়াতে সরকারের আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ফরাসী সরকার এতদিন পর্য্যন্ত আলজিরিয়াতে যে ধরণের আচরণ করিয়া আসিতেছেন তাহা সভ্য সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। সুতরাং যাহারা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের আন্দোলন করিতেছে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। ফরাসী সরকার আলজিরিয়াতে যে আচরণ করিয়াছে তাহাতে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ফ্রান্সের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র Sorbonne এর অধ্যাপকবৃন্দপ্রকাশ্যেই সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। Sorbonne-এর কুড়ি জন বিশিষ্ট অধ্যাপকের নেতৃত্বে অধ্যাপক আলবার্ট স্যাটেলেট (Prof. Albert Chatelet)-এর সভাপতিত্বে ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্রের দুইশত অধ্যাপক মিলিয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আলজিরিয়াতে ফরাসী সরকারের আচরণ বিশ্বের নিকট ফরাসী সভ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই একশন কমিটি সর্ব্বপ্রথম "অডিন কেস" সম্পর্কে প্রচার-কার্য্য চালাইবেন। অডিন একজন আলজিরিয় অধ্যাপক। নয় মাস পূর্ব্বে প্যারাট্রুপ দল হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু তাহার পর তাঁহার আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ফরাসী সরকারের সামরিক এবং বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-নিবেদন করিয়াও অডিন সম্পর্কে কোন সংবাদই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

কমিটির অন্যতম সদস্য বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ লরেন্ট সোয়ার্টস বলেন যে, 'অডিন ঘটনা' হইতে বুঝা যায় যে, ফ্রান্স হইতে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

আফ্রিকার নবজাগরণ

সম্প্রতি ঘানার রাজধানী আক্রা নগরীতে আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির যে সম্মেলন হইয়া গেল আফ্রিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আক্রা সম্মেলন স্বাধীন আফ্রিকান রাজ্যগুলির প্রথম সম্মেলন, এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মরক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র (প্রাক্তন মিশর ও সিরিয়া), সুদান, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া এবং ঘানা। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঘানার প্রধান মন্ত্রী ডঃ নক্রুমা। সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং বর্ণবৈষম্য নীতি। আফ্রিকার রাজ্যগুলি ঔপনিবেশিক শাসন এবং বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। সুতরাং স্বাধীন হইবার পর আফ্রিকার জনসাধারণ এবং তাঁহাদের সরকার যে এই দুইটি বিষময় ব্যবস্থার বিলোপের জন্য সচেষ্ট হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আলজিরিয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবে আক্রা সম্মেলন অবিলম্বে আলজিরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটানর জন্য ফ্রান্সের নিকট অনুরোধ জানান। ফরাসী সরকার এই অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। পর্তুগীজদের ন্যায় ফ্রান্স সম্মানের সহিত কোন উপনিবেশ ছাড়িয়া আসিতে জানে না। ইন্দোচীনে প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিনের বিশেষ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবগুলি বাতিল করিয়া ফরাসী সরকার অস্ত্রবলে ইন্দোচীন দখলে রাখিবার সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু ডিয়েন বিয়েন ফু'র অপমানের পর ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে সম্মত হয়। আলজিরিয়াতেও ফ্রান্স সহজে তাহার প্রভুত্ব ছাড়িবে না। কিন্তু আফ্রিকার নিদ্রা আজ ভঙ্গ হইয়াছে। ফ্রান্স কখনই বেশিদিন আর আলজিরিয়া দখলে রাখিতে পারিবে না।

আক্রা সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকা, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান ফেডারেশন এবং কেনিয়াতে জাতিবৈষম্য-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলন এই "অমানুষিক" এবং "অসাধু" ব্যবস্থার অবসানের দাবী জানাইয়া বলেন যে, যদি শীঘ্রই এই ব্যবস্থা তুলিয়া না দেওয়া হয় তবে আফ্রিকা মহাদেশে ব্যাপক ভাবে হিংসা এবং রক্তপাতের সূচনা হইবে।

আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টাতে সকল ভারতবাসীই আনন্দিত হইবেন। ভারতবাসী আফ্রিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সর্ব্বদাই সমর্থন করিয়াছে এবং আলজিরিয়া, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে এখনও করিতেছে। সাহারাতে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইবে বলিয়া ফরাসী সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছে আক্রা সম্মেলনে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির নূতন ঐক্য দেখিবার পর সে বিষয়ে ফরাসী সরকার পুনর্বিচার করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যখন আণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী পরীক্ষামূলক আন্দোলন চলিতেছে, তখন সাহারাকে নূতন করিয়া একটি আণবিক বিস্ফোরণের ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত করিবার প্রস্তাব নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা এবং হঠকারিতার পরিচায়ক। যদি ইহা কার্য্যতঃ করা হয় তবে আফ্রিকার দেশগুলির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। যাহাতে ফরাসী সরকার সাহারাকে একটি বিপজ্জনক আণবিক ঘাঁটিতে পরিণত করিতে

পারেন তজ্জন্য আক্রা সম্মেলনের দেশগুলিকে আরও সক্রিয় ভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে।

ডাঃ খান সাহেব

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং পাকিস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ডাঃ খান সাহেব গত ৯ই মে লাহোরে তাঁহার পুত্রের বাসভবনে আতা মহম্মদ (৩০) নামক এক আততায়ীর ছুরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। ঘটনার যতটুকু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আতা মহম্মদ ঐ ঘটনার দিন প্রাতঃকালে ডাঃ খানসাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একটি চাকরী সংগ্রহ করিয়া দিতে বলে (আতা মহম্মদকে দুই বৎসর পূর্ব্বে নাকি ডাঃ খানসাহেবের আদেশে পদচ্যুত করা হয়)। ডাঃ খানসাহেব তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে সে ফিরিয়া যায়। অতঃপর ডাঃ খানসাহেব যখন প্রাতঃরাশের পর বারান্দায় দাঁড়াইয়া রিপাবলিকান দলের একজন নেতার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন তখন আতা মহম্মদ পুনরায় তাঁহার নিকট আসে এবং খানিকক্ষণ বাদানুবাদের পর একটি নয় ইঞ্চি লম্বা ছুরিকাদ্বারা ডাঃ খানসাহেবকে আক্রমণ করে। ডাঃ খান সাহেব আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ইতিমধ্যে চীৎকার শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আতা মহম্মদকে ধরিয়া ফেলে।

ডাঃ খান সাহেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাহরম খাঁ। তিনি পেশোয়ার এবং বোম্বাই-এ শিক্ষা সমাপনান্তে ইংলণ্ড যান এবং সেখান হইতে ডাক্তারী ডিগ্রী লইয়া আসেন। ১৯২০ সনে তিনি নাগপুর কংগ্রেসে একজন প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। নাগপুর কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নিজগ্রাম উতমানজাইতে একটি জাতীয় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই বিদ্যালয়ের প্রভাব বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্য হইতেই খুদাই খিদমতগার (ভগবানের দাস) আন্দোলনের সুরু হয়। ১৯২০ সনে ডাঃ খান সাহেব এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খান আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে খুদাই খিদমতগার আন্দোলন যাহাকে অনেক সময় লালকোর্ত্তা আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করা হইত সেই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অহিংস উপায়ে মানুষের চিত্ত জয় করিয়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন। গান্ধীজী-প্রদর্শিত কর্ম্মপন্থার সহিত এই কর্ম্মপন্থার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল সেইজন্য লালকোর্ত্তা দলের নেতা খান আবদুল গফুর খাঁকে "সীমান্ত গান্ধী" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রথম নির্ব্বাচিত মন্ত্রীসভা কার্য্য গ্রহণ করে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন ডাঃ খান সাহেব। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা ১৯৩৯ সনের নবেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতেও ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি পাকিস্থানের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাকে লীগ সরকার বন্দী করিয়া রাখে। দীর্ঘ সাত বৎসর বন্দীদশার পর মুক্তিলাভ করিয়া ডাঃ খান সাহেব পাকিস্থানের রাজনীতিতে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারও একজন সদস্য হন। মৃত্যুকালে তাঁহার নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান দলের সদস্যগণই কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকার পরিচালনা করিতেছিলেন।

ডাঃ খান সাহেবের এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে ভারতবাসী যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছে। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের সম্মুখস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের চরিত্রবল, সততা এবং সাহস সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল ডাঃ খান সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে খান ভ্রাতৃদ্বয়ের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শেষজীবনে তিনি যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিতেছিলেন তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করে নাই—অনেক বিবেচনাসম্পন্ন পাকিস্থানী নাগরিকও তাঁহার গৃহীত নীতি মানিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু মতবিরোধের জন্য ডাঃ খান সাহেবের শৌর্য্য, স্বার্থত্যাগ এবং নীতিপরায়ণতার কথা ভারতবাসী কখনই ভুলিবে না। খান সাহেবের হত্যা উপলক্ষ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুর খাঁ বলিয়াছেন যে, নীতিভ্রষ্ট হইয়া খান সাহেব যাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহারাই তাঁহাকে (খান সাহেবকে) হত্যা করিয়াছে। একদিক হইতে বিচার করিলে এই মহাপুরুষের কথাই ঠিক।

পশ্চিমবঙ্গে তীব্র খাদ্যসঙ্কট

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ এক তীব্র খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন। বিভিন্ন স্থানে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিতরণের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু নানা কারণেই এই ব্যবস্থা ঠিক সন্তোষজনকরূপে কার্য্যকরী হইতেছে না। ৫ই মে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার জন্য মোট ৩৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা কৃষিঋণ বাবদ বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই চাউলের দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মফঃস্বলের শহরগুলিতেও চাউলের মণ ২৫ টাকার উপর উঠিয়াছে। অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে এই বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সকল প্রকার সম্ভাবনা পুরাপুরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র রেশনিং প্রথা চালু করিলে এই খাদ্যসঙ্কট হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণের একটি উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কলিকাতার মেয়র

৫ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল) কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় ১৯৫৮-৫৯ সনের জন্ম ডঃ ত্রিগুণা সেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র এবং শ্রীকেশব বসু ভোটাধিক্যে ডেপুটি মেয়র পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। দলমতনির্ব্বিশেষে সভায় কাউন্সিলর এবং অল্ডারম্যানদের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া মেয়রের পদে বৃত হওয়ার নজীর কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে সম্ভবত নাই। নিঃসন্দেহে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়নের পর ডঃ ত্রিগুণা সেনের সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচন একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ডেপুটি মেয়র পদের জন্ম কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীকেশব বসুর এবং সংযুক্ত নাগরিক কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অনিল মৈত্রের নাম প্রস্তাব করা হয়। শ্রী বসু ৪৪—৪৩ ভোটে জয়লাভ করেন। মেয়র পদে ডঃ ত্রিগুণা সেন ছাড়া কর্পোরেশনের আর প্রত্যেকটি পদের জন্মই পাল্টা নাম প্রস্তাব করা হয়।

পুনর্নির্ব্বাচনের পর সকলের অভিনন্দনের উত্তরে মেয়র ডঃ সেন যাহা বলেন তাঁহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেন। ডঃ সেন বলেন, "আপনারা পুনরায় আমার উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন ইহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে; কিন্তু উহার মূল্য সম্পর্কে কিছুটা সংশয় লইয়াই আজ পুনরায় এই সম্মানিত আসনে আমি বসিয়াছি। এই আসন 'গৌরবোজ্জ্বল নিষ্ফল' আসন বলিয়াই আমি দেখিতে পাইয়াছি।" তিনি বলেন এই পদ হয়ত মর্যাদাপূর্ণ, কিন্তু ক্ষমতাশূন্য। মহানগরীর দুস্থ মানুষ হয়ত মেয়রের নিকট অনেক কিছু আশা করে, "কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী যেসব কর্ম্মকর্তা, মেয়র তাহাদের হাতেই চূড়ান্তরূপে অসহায়।" কাউন্সিলারগণেরও এই ব্যাপারে প্রায় একই অবস্থা।

মেয়র দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, কলিকাতার নাগরিকদের কষ্টলাঘবের জন্ম যদি মেয়র বা কাউন্সিলরগণ কোন নির্দ্দেশ দেন তাহা অধিকাংশ সময়েই যথাযথ পালিত হয় না।

ব্যাধিগ্রস্ত কংগ্রেস

কংগ্রেস এখন দুর্নীতি ও চক্রান্তের ফলে ভীষণভাবে ব্যাধিগ্রস্ত। কর্তারা বুঝেন সবই কিন্তু বোধ হয় বলিতে লজ্জা পাইতেছেন। সেইজন্মই নিম্নস্থ মন্তব্যগুলি অপরূপ :

২০শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বলেন, কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কংগ্রেসকর্ম্মী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা অসার ও নিষ্ফল উক্তি আর কিছু হইতে পারে না।

গত কয়েক বৎসরে জনকল্যাণ কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ কংগ্রেস করিয়া দিয়াছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারিগণের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

উক্ত বৈঠকে বক্তৃতাকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনকল্পে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। বিরোধী দলসমূহ এ সমস্যার সমাধানে সহায়তা না করিয়া বরং উহাকে জটিল করিয়া তুলিতেছেন।

শ্রীনেহরু বলেন, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়ায় উহাতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এগুলি সাময়িক। দেশের কোন কোন অংশে কয়েকটি নির্ব্বাচনে যদি আমরা পরাস্ত হই, তবে তাহাতে উদ্বেগবোধ করার কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। মূল আদর্শের প্রতি যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, তবে আমরা জয়ী হইবই।

নয়াদিল্লী, ১০ই মে—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ঢেবর অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের নিকট এক স্মারকলিপি প্রচার করিয়া "প্রতিষ্ঠানের যে সকল ভুল ত্রুটি ও গলদের জন্ম" শ্রীনেহরু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেগুলি দূর করার জন্ম আহ্বান জানান।

শ্রীঢেবর বলেন, জনগণের আচার-আচরণের মান নামিয়া যাইতেছে এবং সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে বলিয়াই শ্রীনেহরু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

ইহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে শ্রীঢেবর তাঁহার স্মারকলিপিতে বলেন, যোগ্যতাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল লোকেরা যাহাতে কংগ্রেসে যোগদানে আকৃষ্ট হন, তজ্জন্ম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন।

স্মারকলিপিতে ইহাও বলা হয় যে, কল্যাণ-রাষ্ট্রের পটভূমিকায় উন্নয়নের মূল কাজে সরকারী দায়িত্ব ও জনগণের দায়িত্বের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কার্য্যক্ষেত্রে পার্লামেণ্টারী পার্টি হিসাবে যে কাজ করে, সেরূপ গণসংস্থা বাঁচাইয়া রাখার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। কেননা গণ-সংযোগের দায়িত্ব সম্পর্কে উহা যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে, তাহা পার্লামেণ্টারী পার্টির নিজেরই মৃত্যুর কারণ হইবে।

শ্রী ঢেবর বলেন, পণ্ডিতজী প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যক্ত হওয়ায় সমগ্র জাতি, বিশেষ করিয়া এই সংস্থা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। জাতির এবং এই সংস্থার জীবনে পণ্ডিতজী এমন কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে অতিমাত্রায় ব্যথিত করিয়াছে এবং তজ্জন্মই তিনি পদত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি পার্টির নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। যদিও তিনি আমাদের উপর কোন সর্ত্ত চাপাইয়া দেন নাই, তথাপি তিনি যে পার্টি ও দেশের অভিমতের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের উপর একটি দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

আজ আমাদিগকে আত্মানুসন্ধানে লিপ্ত হইতে হইবে এবং যে সকল ভুল-ত্রুটি এবং গলদ তাঁহাকে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া

তুলিয়াছে, সেগুলি নির্মূল করার জন্য চূড়ান্ত প্রয়াসে লিপ্ত হইতে হইবে।

এ ধরণের আত্মানুসন্ধানে মনোনিবেশ করাই এই ঘরোয়া আলোচনার উদ্দেশ্য। স্বাধীনভাবে আলোচনায় আমি বাধা দিতে চাহি না।

কিন্তু আমাদের হাতে সময় অল্পই আছে। এ অবস্থায় মূল সমস্যাবলী সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণার জন্য সেগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া উচিত বলিয়াই আমি মনে করি।

শ্রীডেবর বলেন, জনগণের আচার-আচরণের মান যেরূপ নামিয়া আসিয়াছে এবং সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মনোবৃত্তি যেরূপ উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই পণ্ডিতজীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য তাঁহার উদ্বেগের অন্য কারণও রহিয়াছে।

এ সকলের মূলে রহিয়াছে ক্ষমতালাভের লিপ্সা। আমরা সবেমাত্র ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়াছি। মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য হাতে ক্ষমতা পাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের রহিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ক্ষমতালিপ্সাও দেখা যায়—নিজকে সমাজের নিকট প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার আন্তরিকতাহীন অভিলাষের দ্বারা এই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন রাখা হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণের ব্যাপারটি নিছক লোকদেখানো ব্যাপার—আসল কথা হইল, নিছক ক্ষমতার জন্য ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

ইহা ছাড়া আর একটি মনোবৃত্তিও রহিয়াছে এবং তাহা হইল এই যে, একটি বিশেষ দলের হাতে ক্ষমতা রাখিতেই হইবে। বাস্তবিক ক্ষমতার কেন্দ্র-স্থল কোথায় অবস্থিত থাকিবে, তাহা লইয়াই ধনতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। ধনতন্ত্রবাদ চাহে যে, শিল্পপতিদের হস্তেই ক্ষমতা রাখিতে হইবে, কম্যুনিজম উহা রাজনীতিকদের হস্তে তুলিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করে।

শ্রীডেবর বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিজস্ব কর্ম্মধারা রহিয়াছে। আমরা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব। কিন্তু আমরা শুধু একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি না। সুনির্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার অবিচলিত সঙ্কল্প লইয়া আমরা একটি নূতন সমাজ গঠন করিতেও চাহিতেছি। এ ধরণের পরীক্ষা এযাবৎ কোথাও চালানো হয় নাই। বাস্তবিক কংগ্রেস এতকাল যেভাবে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, পশ্চিম জগতের চিন্তা-ধারাও আজ সেদিকেই মুখ ফিরাইতেছে। তাহারা আজ ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে যে বিপুল ক্ষমতা হাতে আসিয়াছে, সেরূপ ক্ষমতাশালী ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রতিষেধকও প্রয়োজন।

শ্রীডেবর বলেন, বৈষয়িক উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে পশ্চিম জগতে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে, এদেশেও তাহা দেখা দিবে। কিন্তু আমাদের একটি ঐতিহ্য রহিয়াছে। আমরা দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বন্ধ রাখিতে পারি না।

কিন্তু যে সকল মনোবৃত্তি আমাদিগকে আমাদের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চলিয়াছে, তাহা অবশ্যই আমরা বর্জ্জন করিব। বাস্তবিক বর্জ্জনীয় জিনিসকে বর্জ্জন করাই আমাদের ঐতিহ্য।

১০ই মে—অদ্য এখানে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিবিধ সমস্যা আলোচিত হয়। বর্ত্তমানে কংগ্রেসকে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে—বিশেষ করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মীদের "ক্ষমতার লালসা" এবং কংগ্রেসের অন্যান্য গলদ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করা হয়।

কংগ্রেস সভাপতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আলোচনা হয়। ঐ পত্রে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে সব গলদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সাময়িকভাবে প্রধান-মন্ত্রীর পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই সব ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ও সেগুলি দূর করার জন্য কাজ করিতে হইবে।

দুইটি বিষয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছে—একটি হইতেছে "চালচলনের অধোগতি" এবং অপরটি হইতেছে "চাকুরী-শিকারের মনোভাব।"

এই সবের মূলে রহিয়াছে "ক্ষমতালাভের লালসা।" প্রকাশ যে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার উদ্বোধন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে "মাতব্বরির মনোভাব" এবং "ক্ষমতালাভের লালসার" নিন্দা করেন। প্রকাশ যে তিনি বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা বলিয়া মনে করা উচিত নহে। প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে এই মাতব্বরি এবং ক্ষমতালাভের জন্য কাড়াকাড়ি বন্ধ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের নীতি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হইবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিদের দৈনন্দিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীরা যদি অন্যায় আচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অপসরণ করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু 'পশ্চাৎমুখী' মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ঐরূপ মনোভাব প্রতিক্রিয়াশীল।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যাইতেছে।

কি কারণে তিনি সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, দেশে এবং কংগ্রেসের মধ্যে গলদ কোথায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করার জন্যই তিনি কয়েক মাসের অবসর লইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এরূপ মন্তব্য করেন যে, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুনই তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, "আমি কখন বলি নাই যে, আমি কর্ম্মজীবন

হইতে অবসর লইতে চাই। আমি রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হইতে চাহি না।"

প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকর্ম্মীদের আত্মানুসন্ধান করিয়া প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে বলেন। প্রতিষ্ঠানের গলদের জন্য আমাদের অন্যকে দোষী করা উচিত নহে। আমাদের ইহাই মনে করা উচিত যে, আমরা ভুল করিতেছি এবং আমরা কি ভুল করিতেছি তাহা খুজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অপরকে কাজ করিতে বলিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে।

মাদ্রাজ, ২১শে এপ্রিল—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর দক্ষিণ-ভারত সফর আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি অদ্য স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টি উহার অমৃতসর অধিবেশনে দলের মৌলিক আদর্শের যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষে এক বিরাট সাফল্য। কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথের সন্ধান দিয়াছে। কংগ্রেসের সেই চিন্তাধারা কম্যুনিষ্ট পার্টি গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামের পথ ত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীঢেবর বলেন যে, কম্যুনিষ্টরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আনিবার জন্য জনগণ শ্রেণী-সংগ্রাম চাহে না। তবে এখনও দ্রাবিড় কাজাগাম এবং দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগাম সংঘর্ষে বিশ্বাস করে। কংগ্রেসের সত্য ও অহিংসার মৌলিক আদর্শ একদিন তাহাদিগকেও তাহাদের ভুল বুঝাইতে সক্ষম হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, কংগ্রেসের মণ্ডল অফিস শুধু ফাইল রাখিবার স্থান হইবে না, উহা সামাজিক সাম্য ও সুবিচারের মন্দির হইবে। তিনি কংগ্রেসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সদস্যদের নিকট আবেদন করেন এবং তাঁহাদিগকে খাল কাটিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া, সার জোগাড় করিয়া, ঋণের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করিতে বলেন। কৃষকদের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উদ্যোগী হইতেও তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদের কাছে আবেদন করেন।

পণ্ডিত নেহরুর অন্তর্দ্বন্দ্ব

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বাৎসরিক নিয়ম অনুসারে এবারও পদত্যাগ ইচ্ছা জ্ঞাপন ও প্রত্যাহার করিয়াছেন।

১লা মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু অদ্য কংগ্রেস পার্লা-মেণ্টারী পার্টির জরুরী বৈঠকে বলেন, দেশের গলদ যে কোথায়, তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য সরকারী দপ্তরের ধরা-বাঁধা রুটিনমাফিক কাজ হইতে আমি মনকে মুক্ত রাখিতে চাহি।

পার্টি বা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ রহিয়াছে বলিয়া আমি দৈনন্দিন সরকারী কাজ হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি না। বিগত কিছুকাল যাবৎ আমি মনে একটি গভীর আবেগ অনুভব করিতেছি এবং তাহা আজ প্রায় "দুরূহ" হইয়া উঠিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, কংগ্রেসের প্রত্যেকটি লোক কর্ম্মকর্ত্তা হইতে চাহিতেছে, প্রত্যেকটি লোক বিধানসভা বা সংসদের নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে। নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু প্রত্যেক কাজেরই একটি সীমা থাকা উচিত। আমার ধারণা, আমরা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেবলমাত্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে নহে, সমগ্র দেশেই দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা দিয়াছে।

মাসের পর মাস চিন্তা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, কিছুদিনের জন্য যদি আমি পার্লামেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাজের বাহিরে অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করি, তবে হয়ত আমার ও দেশের কল্যাণ হইবে।

প্রধানমন্ত্রীকে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার অনুরোধ জানাইয়া কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, সে সম্পর্কে শনিবার পুনরায় আলোচনা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী যে সংক্ষিপ্ত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ দেন, উহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, দেশ ও কংগ্রেসের সম্মুখে যে সকল আসল সমস্যা রহিয়াছে, সেগুলি সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক আগ্রহ দেখা না গেলে তিনি তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেই চাহিবেন। প্রায় দশ জন সদস্য শ্রীনেহরুকে তাঁহার বর্ত্তমান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে আবেগপূর্ণ অনুরোধ জানান।

৩রা মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অবসর গ্রহণ করিবেন না। অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীবৃন্দের অনুরোধের ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্বঘোষিত সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

যে সকল ভুল-ত্রুটির ফলে প্রধানমন্ত্রীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা হইবে বলিয়া কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যগণ প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। বিনম্রনম্রচিত্তে আমি জানাইতেছি যে, আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সভাস্থলে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

তাঁহার পূর্ব্বতন বিবৃতির ফলে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নিরসন করিয়া শ্রী নেহরু বলেন, বৃহত্তর ভারতের চিত্র দেখিয়াই আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি—উহার সহিত পার্লামেণ্টারী পার্টি, কংগ্রেস বা মন্ত্রীসভার কার্য্যকলাপের কোন সম্পর্ক নাই।

তিনি বলেন, কংগ্রেসের কথা চিন্তা করিয়া আমি একথা বলিতেছি না। সমগ্র দেশে আচার-আচরণের মান যেরূপ নামিয়া

আসিয়াছে, শিষ্টাচার-বহির্ভূত কার্য্যকলাপ যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে, তাহাই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের সমগ্র আবহাওয়া আজ কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে—যেন নিঃশ্বাস ফেলাও কঠিন।

শ্রী নেহরু বলেন, কেবলমাত্র কংগ্রেসে নহে, ভারতের সমগ্র জনজীবনেও কিছুটা রীতিবিরুদ্ধ, অশিষ্ট আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে। "পুরাতনের পুনরুজ্জীবনের" যে লক্ষণ আমি দেখিয়াছি, তাহা আমার নিকট নিছক প্রগতিবিরোধিতা বলিয়াই মনে হইয়াছে। এমন কি, কংগ্রেসকর্ম্মিগণের মধ্যেও কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল ব্যাপার দেখিয়াই আমি সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগের সঙ্কল্প করি। দেশের সমগ্র আবহাওয়া যেন ধোঁয়াটে ও কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি, কোন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে নিঃশ্বাস ফেলাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার হয়ত কিছুটা যোগ্যতা ও দক্ষতা রহিয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই আমার মনে হইতেছে যে, আমি যেন একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের ন্যায় কাজ চালাইয়া যাইতেছি। "হৃদয়ের গভীর অনুভূতি" সেখানে আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ অবস্থায় আমার মনে হইল যে, আমি যদি কয়েক মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে ছাড়া পাই—অবশ্য, অবস্থার চাপে হয়ত আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইতে পারে—তবে হয়ত নিজেকে অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিব এবং অবস্থার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পারিব।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা

পশ্চিম বাংলায় মাৎস্যন্যায় চলিতে বেশী দেরী লাগিবে না বোধ হয়। বর্ত্তমান পুলিস মন্ত্রী বোধ হয় তাহার পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

২৪শে এপ্রিল—এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক কুখ্যাত গুণ্ডাদল সাকরাইল ও ডোমজুড় থানায় অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে কিছুদিন যাবৎ ব্যাপক রাহাজানি, ডাকাতি, নারীধর্ষণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব ঘটনার সংবাদ পাইয়া হাওড়া পুলিস সুপার শ্রীকরালী বসু গত রবিবার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতিকারকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন। প্রকাশ, পুলিস এ পর্য্যন্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই এপ্রিল গভীর রাত্রে কোড়লা গ্রামের একটি হিন্দুবাড়ীতে একদল গুণ্ডা চড়াও হয় এবং জনৈকা হিন্দু বৃদ্ধার ২০ বৎসর বয়স্কা একটি বিবাহিতা কন্যাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। ঐ দিন রাত্রে গ্রামবাসীগণ সারারাত্রি খোঁজখবর করিয়াও অপহৃতা তরুণীর কোন সংবাদ না পাইয়া গ্রামবাসীগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। পরদিন সকালবেলা গ্রামের শেষ সীমান্তে অবস্থিত একটি গৃহ হইতে তরুণীকে গ্রামবাসীগণ উদ্ধার করে। উক্ত তরুণীর বিবৃতিতে প্রকাশ, ৬।৭ জন দুর্বৃত্ত তাঁহার উপর পর পর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে।

সংবাদে আরও জানা গিয়াছে যে, গত ১৯শে এপ্রিল ধূলাগাড়ী গ্রামের জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতেও উক্ত গুণ্ডাদল হানা দিয়া গৃহস্বামীর ৪ বৎসরের একটি শিশু সন্তান ও স্ত্রীকে বেপরোয়াভাবে মারপিট করিয়াছে। প্রকাশ শিশুটির একটি হাত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ যে, গত ৬ই এপ্রিল উক্ত গুণ্ডাদল ডোমজুড় থানার অন্তর্গত কোড়লা গ্রামের একটি বাড়ীতে হানা দিয়া জনৈকা মহিলা ও তাঁহার পুত্রকে গুরুতররূপে আহত করে। গ্রামবাসীগণ দুর্বৃত্ত দলকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলে দুর্বৃত্তগণ বোমা ছুঁড়িয়া পলায়ন করে। ১৫ই এপ্রিল পুনরায় উক্ত কুখ্যাত গুণ্ডাদলের ১০।১২ জন লোক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়। একদল গ্রামবাসী বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সর্ব্বশেষ সংবাদ প্রকাশ, সাকরাইল ও ডোমজুড় থানার অন্তর্গত উপদ্রুত অঞ্চলে দুর্বৃত্তদল পথচারীদের আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের অর্থাদি অপহরণ করিয়া নানা ভাবে হামলা করিতেছে।

বুধবার সকালে রাজ্য পরিবহন বিভাগের মিশন রো-স্থিত কেন্দ্রীয় অফিসের সম্মুখে পরিবহন বিভাগের ডিরেক্টর অব অপারেশন শ্রী বি, সি, গাঙ্গুলী ছোরার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন। মোটরগাড়ী হইতে নামার অব্যবহিত পরেই আততায়ী অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করে।

প্রকাশ, আততায়ীকে পরিবহন বিভাগের জনৈক বরখাস্ত কণ্ডাক্টর শ্রীকৃষ্ণলাল কাঞ্জিলাল বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে উক্ত কর্ম্মচারীকে নাকি অল্প কিছুকাল আগে বরখাস্ত করা হয়।

ঘটনাটি হয় সকাল ১০টা নাগাদ। প্রকাশ ঐ সময় শ্রী গাঙ্গুলী অফিসে আসিতেছিলেন এবং নিজ গাড়ী হইতে নামার পরই অদূরে অপেক্ষমান ঐ ব্যক্তি বড় ছোরা হাতে ছুটিয়া আসে। অতর্কিতভাবে ছোরার আঘাতে শ্রী গাঙ্গুলী ধরাশায়ী হইয়া যান।

শ্রী গাঙ্গুলীকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তথায় তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আততায়ী পলায়নের চেষ্টা করিলেও পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

জামসেদপুরে "ধর্ম্মঘট"

দলগত স্বার্থ বড় না দেশের স্বার্থ বড় ? টাটার শ্রমিক নেতৃবর্গ তাহার উত্তর নিম্নরূপে দিয়াছেন :—

জামসেদপুর, ১লা মে—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

প্রভাবিত জামসেদপুর মজদুর ইউনিয়ন আগামী ১২ই মে হইতে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের উপর যে ধর্ম্মঘটের নোটিশ জারী করিয়াছিল, বিহার সরকার ঐ প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘটকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কম্যুনিষ্ট এম-এল-এ শ্রীকেদার দাসের নিকট বিহার সরকারের শ্রমদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী বি পি সিং কর্ত্তৃক প্রেরিত এক পত্রে রাজ্য সরকারের ঐ সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হয়।

উক্ত পত্রে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে, টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ১৯৫৭ সনের ৮ই নবেম্বর তারিখে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্মারকলিপিতে চাকুরীর সর্ত্তাবলী এবং বেতন সংক্রান্ত দাবীগুলির অধিকাংশই উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহা এখনও চালু আছে। ঐ নিষ্পত্তির সর্ত্তাবলী অনুযায়ী সমগ্র বেতনের কাঠামোটি এক্ষণে পর্য্যালোচনা করা হইতেছে এবং এজন্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। সেহেতু রাজ্য সরকার বিরোধের বিষয়গুলি সালিশীর জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিতে চাহেন না।

স্বীকৃতিদানের জন্য উক্ত ইউনিয়ন হইতে যে দাবী পেশ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে উল্লিখিত পত্রে শ্রমদপ্তরের সেক্রেটারী ১৯৫২ সনের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে রাজ্য সরকারের ৫১০নং প্রস্তাবের প্রতি (স্বীকৃতিদানের জন্য ইউনিয়নের প্রতিনিধিমূলক) ইউনিয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তদনুযায়ী কাজ করিবার জন্য ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

ঐ পত্রে আরও বলা হয় যে, এমতাবস্থায় শ্রমবিরোধ আইনের ২৩নং ধারা অনুযায়ী ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে ধর্ম্মঘটের বিজ্ঞপ্তি বেআইনী হইবে। রাজ্য সরকার আশা করেন যে, ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকগণ তাঁহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মঘটে প্রবৃত্ত হইবেন না।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

এই দপ্তরটির মস্তক চর্ব্বণ বহু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি টাকা যেখানে অযোগ্য কর্ত্তৃত্বের ফলে নষ্ট হইয়াছে সেখানে ৮ লক্ষ টাকা ত কিছুই নয়। তবুও সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের নামে রাজ্য সরকারের পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কোন কোন কর্ম্মচারীর যোগসাজসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া লইয়া তাহা তছরূপ করিবার অভিযোগে কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেণ্ট শাখার অফিসারদের সাহায্যে ব্যারাকপুর পুলিস ইতিমধ্যে ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ, ঐ অভিযোগ সম্পর্কে পুলিসের আবেদনক্রমে ব্যারাকপুরের এস-ডি-ও কর্ত্তৃক অন্যতম উদ্বাস্তু নেতা ও একজন প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট এম এল এ শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তীর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে উদ্বাস্তু-আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া এক্ষণে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। প্রকাশ পুলিস তাঁহার ঐ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়া তাঁহাকে ব্যারাকপুরে লইয়া যাইবার জন্য শুক্রবার দমদম সেণ্ট্রাল জেলে যায়। কিন্তু শ্রী চক্রবর্ত্তী কারাভ্যন্তরে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া ঐদিন আর ঐ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে পুলিস যাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছেন ইমারত নির্ম্মাণের দুইটি কণ্ট্রাক্টার ফার্ম্মের দুইজন কণ্ট্রাক্টার, একজন উদ্বাস্তু-ঋণগ্রহীতা এবং ব্যারাকপুরস্থ অতিরিক্ত পুনর্ব্বাসন অফিসার (এ-আর-ও) শ্রী আর কে আচার্য্য।

খড়দহ অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য জমি কিনিয়া উহাতে গৃহনির্ম্মাণের জন্য পুনর্ব্বাসন দপ্তর হইতে গৃহীত প্রায় ৮ লক্ষ টাকা তছরূপের এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত সংযুক্ত কলিকাতাস্থ সেণ্টাল এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের হাতে দেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ শাখা হইতে গোপনে ব্যাপক তদন্ত হয় এবং উহারই ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হয় বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ, এই সম্পর্কে আরও কয়েক জনের বিরুদ্ধে পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিগত ২১শে এপ্রিল কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া দীর্ঘকাল অতি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাব্রত পালন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্যে রত হন। তাহার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার রেজিষ্ট্রার পদেও কিছুকাল কার্য্য করেন। তিনি পর পর বেথুন কলেজ, রাজশাহী কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কলেজ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্র অধ্যাপনাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই অন্তবিধ শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কর্ম্মেও রত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং পুথিশালাধ্যক্ষ পদে কার্য্য করিয়া পরিষৎ তথা বাংলা সাহিত্য-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টেরও একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স, ইণ্ডিয়ান ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস, ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিষ্টস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। ইণ্ডিয়ান ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের একটি বিভাগে উমেশচন্দ্র ১৯৩৭ সনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সঙ্গে উমেশচন্দ্র অন্যতম লেখক ও সমালোচকরূপে বহু বৎসর যুক্ত ছিলেন। দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্যের

দরুন তাঁহার সাময়িক সমস্যাগুলির উপরে লিখিত রচনাগুলিকেও ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিত। অথচ তাঁহার রচনাবলী ছিল খুবই প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং পাঠকদের চিত্তগ্রাহী। তিনি কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। 'দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি', 'ভারত-দর্শন সার" "চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন"—গ্রন্থগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত 'হিষ্ট্রী এণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপল'-এর প্রথম পাঁচ খণ্ডের তিনি অন্যতম লেখক ছিলেন। উমেশচন্দ্র সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় পাণ্ডিত্যের ছাপ থাকিত বটে, কিন্তু অতি সাধারণ সভাভব্য মানুষের মতই তাঁহার ব্যবহার ছিল। উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

অনুরূপা দেবী

সাহিত্যগতপ্রাণা অনুরূপা দেবী বিগত ৬ই বৈশাখ কলিকাতায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি সুবিখ্যাত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুযোগ্য পুত্র হারাইয়া ছিলেন। তাঁহার পতিবিয়োগও ঘটিয়াছে। কিন্তু শোক-তাপ, আপদ-বিপদ সত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্য-সাধনা বরাবর অব্যাহত ছিল। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শেষ উপন্যাস 'বিচারপতি' সমাপ্ত করেন। সম্প্রতি উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১৯ খ্রীঃ অনুরূপা 'শ্রীভারত মহামণ্ডল' হইতে 'ধর্ম্ম চন্দ্রিকা' উপাধি, একটি মানপত্র ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। ১৯২৩ সনে শ্রীশ্রীবিশ্বমানব মহামণ্ডল হইতে 'ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ তিনি লীলা লেকচারার পদে অধিষ্ঠিতা হন।

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'পোষ্যপুত্র,' 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা,' 'মা', 'বাগদত্তা', 'জ্যোতিহারা,' 'উত্তরায়ণ', 'পথহারা', 'চক্র', 'বিবর্ত্তন', 'সর্ব্বাণী', 'হিমাদ্রি', 'গরীবের মেয়ে', 'হারানো খাতা,' 'সোনার খনি', 'ত্রিবেণী', 'জোয়ার ভাঁটা', 'রামগড়', 'পথের সাথী', 'প্রাণের পরশ', 'রাঙা শাখা', 'মধুমল্লী,' 'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'বিদ্যারণ্য,', 'কুমারিল ভট্ট', 'নাট্যচতুষ্টয়', 'বর্ষচক্র', 'সাহিত্য ও সমাজ', 'সাহিত্যে নারী', 'উত্তরাখণ্ডের পত্র' এবং 'বিচারপতি' এইগুলিই প্রধান। তাঁহার অসমাপ্ত রচনা 'জীবনের স্মৃতিলেখা'।

আজীবন সাহিত্যসেবী অনুরূপা দেবী বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন।

আমাদের সঙ্গে অনুরূপা দেবীর বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের বহু রচনা আমরা পত্রস্থ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার সম্ভবতঃ শেষ রচনা 'ধর্ম্ম' প্রকাশিত হইল।

নরেন্দ্রনাথ রায়

প্রবীণ সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদ নরেন্দ্রনাথ রায় গত ২৩শে এপ্রিল, বুধবার রাত্রিতে যাদবপুরস্থ নিজ বাসভবনে হৃদরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

নরেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল ডাকবিভাগে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৪৮ সনে উড়িষ্যারাজ্যের গঞ্জাম জেলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিনি ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই, সিকিম, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে, পরিভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেশ ও জনজীবন সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহিত্য-সেবাব্রতে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল। ছাত্র-জীবন হইতেও নরেন্দ্রবাবু বাংলাভাষার উন্নতিসাধন ও চর্চা জীবনের ব্রতহিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৩২ সনে আচার্য্য যদুনাথ সরকারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি বাংলা ভাষায় 'টাকার কথা' নামক অর্থনীতিবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে 'ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা', 'টাকাকড়ির কথা' বাণিজ্যিক পত্র রচনা প্রভৃতি অর্থ-নীতিবিষয়ক তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রবাসী, পরিচারিকা, আর্থিক উন্নতি, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার নানা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মুসাফিরের ডায়ারি' নামে তাঁহার যে ধারাবাহিক রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এবং তাহার সহিত অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া তিনি 'মুসাফিরের ডায়ারি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই ছদ্মনামে তিনি শিশুদের জন্য "মনের পটে অমর ছবি" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বাংলায় 'ডাকের কথা' নামক গ্রন্থ এবং ইংরেজীতে "হাউ টু ডিটেক্ট কাউণ্টারফীট কয়েনস অ্যাণ্ড ফোর্জ্জড নোটস" এবং "দি পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড দি ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি" নামক দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনেই সাহিত্য-সেবায় মন দিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঐ সময়েই পরিচিত হন। তিনি তাঁহার নিকট হইতে তথ্যমূলক বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় প্রথম হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিলেন। এই অনুপ্রাণনারই একটি বিশেষ ফল—অর্থনীতির আলোচনায় মনঃসংযোগ। তাঁহার প্রথম জীবনের অর্থনীতিমূলক, বিশেষতঃ পরিভাষা সংক্রান্ত রচনা 'প্রবাসী'তে স্থান পাইয়াছিল। প্রথম জীবনের এই যোগাযোগ নরেন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে ভুলেন নাই। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক তাঁহার বহু রচনা প্রবাসীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র-নাথের অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

দশহরা

শ্রীসুখময় সরকার

যে কর্ম দ্বারা নিজের ও পরের ঐহিক ও পারত্রিক অকল্যাণ হয়, তাহাই পাপ। পাপকর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে পারে এমন মানুষ সংসারে অতি বিরল। পাপ জ্ঞাতসারে হইতে পারে, অজ্ঞাতসারেও হইতে পারে। যে পাপ জ্ঞাত, তাহা ইচ্ছাকৃত হইতে পারে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে। সকল পাপই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, —কায়িক, মানসিক ও বাচনিক। কায়িক পাপ ত্রিবিধ। যথা,—চৌর্য, অবৈধ হিংসা ও পরদারোপসেবা। মানসিক পাপ ত্রিবিধ। যথা,—পরদ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও অসত্যে অভিনিবেশ। বাচনিক পাপ চতুর্বিধ। যথা, —পারুষ্য, অনৃতবাদিতা, পৈশুন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আমাদের শাস্ত্রে এই দশবিধ পাপের উল্লেখ আছে। এই দশবিধ পাপ যিনি হরণ করেন, সেই পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভুবনতারিণী ভগবতী গঙ্গার নামই দশহরা। স্মৃতিশাস্ত্রে যেদিন গঙ্গাদেবীর পূজার বিধান হইয়াছে, সেদিনটিও দশহরা নামে কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে দশহরা। সেদিন গঙ্গাজলে দেহ নিমজ্জিত করিয়া মাতৃরূপা গঙ্গার নিকট পাপ স্বীকার করিতে হয়। প্রার্থনা করিতে হয়,— "মাতঃ! আমার দশ জন্মার্জিত দশবিধ পাপ হরণ কর। হে বিষ্ণুপাদোদ্ভবে, ত্রিপথগামিনী জাহ্নবি! তোমার অমৃত-সলিল-স্পর্শে আমার দেহ ও মন পাপমুক্ত হউক।"

সংসারে পাপ আছে, কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও আছে। দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা কায়িক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শাস্ত্রে দশহরার দিন যে উপবাস বিহিত হইয়াছে তাহা দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন এবং ইহা দ্বারা কায়িক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অনুতাপ দ্বারা মানসিক পাপের এবং পাপ স্বীকার দ্বারা বাচনিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। এই হেতু জননী ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে নিমজ্জিত অবস্থায় অনুতাপ ও পাপস্বীকারের বিধান হইয়াছে। সেদিন গঙ্গাস্নানান্তে দান অবশ্যকর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত দান করিলেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

স্মৃতির বিধান আমরা সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে মানিয়া চলি। ভারতের সকল রাজ্যের লোকই স্মৃতিবিহিত দিবসে দশহরা-পর্ব পালন করিয়া থাকে। দশহরা-দিবসে কলিকাতার পার্শ্বে প্রবাহিতা ভাগীরথীতে স্নানের নিমিত্ত প্রতি বৎসর বিপুল লোক-সমাগম হয়। কেবল কলিকাতায় নয়, গঙ্গাতীরবর্তী সকল গ্রামে, নগরে, জনপদে দশহরায় গঙ্গাস্নান একটা বৃহৎ পর্বানুষ্ঠান। আবার কেবল গঙ্গায় নয়, অক্ষম হইলে লোকে অন্য নদীকেও গঙ্গা কল্পনা করিয়া পুণ্যস্নান করে এবং প্রার্থীকে সাধ্যমত দান করে। দেখিয়াছি, দামোদরে, দ্বারকেশ্বরে,এমন কি শিলাবতীতে কত লোক দশহরায় পুণ্যস্নান করিতেছে। "মা গঙ্গার সঙ্গে সকল স্রোতেরই যোগ আছে; যে-কোন স্রোতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়"—এমন কথাও শুনিয়াছি।

রামায়ণে এবং বহু পুরাণে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধি আছে, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে গঙ্গাদেবী মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। আবার মতান্তরে সেদিন গঙ্গার জন্ম হইয়াছিল। যাহা হউক, স্মৃতির বিধানে সেদিন গঙ্গাদেবীর পূজা। কেহ কেহ দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির নির্মাণ করিয়া পূজা করে। দেবী শুভ্রবর্ণা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বর ও অভয়, বাম করদ্বয়ে লীলাকমল ও কমণ্ডলু। দেবী মকরবাহিনী। মকর একটা কাল্পনিক জলচর প্রাণী। ইহার মুখে হস্তীর ন্যায় শুণ্ড আছে, দেহ মৎস্যের ন্যায়। গঙ্গা দ্রবময়ী, 'তরলতরঙ্গা'; সুতরাং তাঁহার বাহন জলচর হইয়াছে।

পঞ্জিকায় জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে মনসা-পূজাও বিহিত হইয়াছে। বাঁকুড়ায় সেদিন লোকে গঙ্গা-পূজা করুক বা না করুক, মনসাদেবীর পূজা অবশ্যই করে। অধিকাংশের গৃহে তুলসীমঞ্চের নিকটে সিজ-মনসার গাছ দেখা যায়। দশহরার দিন বাঁকুড়ায় এমন কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, যাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বাঁকুড়ার ভূখণ্ড অতি প্রাচীন; এখানে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার বহু রীতিনীতি, বহু আচার-অনুষ্ঠান, বহু ধর্মবিশ্বাস অতিশয় প্রাচীন। মধ্যযুগের স্মৃতিকারগণ যে সকল রীতিনীতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আধুনিক যুগের পঞ্জিকাকারগণ যে সকল আচারের কথা কদাপি শ্রবণ করেন নাই, বাঁকুড়ায় এবংবিধ রীতিনীতি ও আচার অদ্যাপি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। এ সকল আচারকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করা চলিবে না, শ্রদ্ধাসহকারে ইহাদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে। শাস্ত্রে যে সকল

আচারাদির উল্লেখ নাই অনেকে তাহাদের কোন মূল্য দিতে চাহেন না, নিছক দেশাচার বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, শাস্ত্রকারগণও মানুষ ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বাস করিতেন, সকল দেশের সকল কালের সকল আচার ও রীতিনীতি শাস্ত্রনিবদ্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

বাঁকুড়ায় দশহরার দিন তুলসীতলায় মনসাদেবীর পূজা হয়। দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও চিপিটক দিয়া মনসাদেবীর ভোগ নিবেদিত হয়। পূজান্তে জাঁতি দিয়া কেলেকোঁড়া (কালি-কণ্টক ?)-ফল* বলি দেওয়া হয়। বলি-প্রদত্ত কেলেকোঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলে প্রসাদস্বরূপ ভক্ষণ করে। বিশ্বাস, ইহা ভক্ষণ করিলে সর্পবিষ নিবারিত হয়। যাহারা সর্পদ্রষ্ট রোগীর চিকিৎসা করে, তাহাদের মুখেও শুনিয়াছি, কেলে-কোঁড়া সর্পবিষের প্রতিষেধক। 'দশর-বেড়ী' (দশহরা-বেষ্টনী) দেওয়া বাঁকুড়ায় একটি বিশেষ ধর্মকৃত্য। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া শুচিবস্ত্র পরিধানপূর্বক গৃহকর্ত্রী অথবা অপর কোন সক্ষম ব্যক্তি বাসগৃহের ও বাস্তুভিটার চতুর্দিকে গোময়ের বেষ্টনী অঙ্কিত করিতে থাকেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই গোময়-বেষ্টনী-অঙ্কন সমাপ্ত করিতে হয় এবং যতক্ষণ তিনি বেষ্টনী অঙ্কন করেন ততক্ষণ তাঁহাকে মৌনী থাকিতে হয়। বিশ্বাস 'দশর-বেড়ী' দিলে সংবৎসরের মধ্যে বাস্তুভিটার অভ্যন্তরে সর্প প্রবেশ করিতে পারে না।

দশহরার দিন 'ঘুড়ি উড়ানো' বাঁকুড়ায় একটি উল্লেখ-যোগ্য উৎসব। যাহাদের সখ আছে, তাহারা অবশ্য চৈত্র মাস হইতেই বৈকালের দিকে ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ করে। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈকালের আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে কোন স্থানে দশ-বিশটা ঘুড়ি উড়িতে দেখা যায়। নানা বর্ণের নানা আকারের ঘুড়ি; আকার অনুসারে তাহা-দের ভিন্ন ভিন্ন নাম। চিল-ঘুড়ি, ডাঁশ-ঘুড়ি, সাপ-ঘুড়ি, ফানুস-ঘুড়ি ইত্যাদি। দশহরার দিন ঘুড়ি উড়ানো শেষ। সেদিন ঘুড়িতে ঘুড়িতে আকাশ ছাইয়া যায়। কয়েকদিন পূর্ব হইতে ঘুড়ি নির্মাণ ও ডোর প্রস্তুত করার হুল্লোড় পড়িয়া যায়। কাচের শিশি-বোতল গুঁড়া করিয়া বালকেরা ঘুড়ির ডোরে মাঞ্জা লাগাইতে থাকে। দোকানে দোকানে প্রচুর ঘুড়ি ও ডোর বিক্রয় হইতে থাকে। দশহরার দিন ঘুড়ি কেবল উড়ানো হয় না, ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। পথে, ঘাটে, মাঠে ও ঘরের ছাদে বালক-যুবকেরা আকাশে ঘুড়ি ছাড়িয়া দিয়া এবং লাটাই ধরিয়া তাহার উড্ডয়ন-লীলা নিরীক্ষণ করিয়া আমোদ পাইতে থাকে। কেহ-বা আকাশে উড্ডীয়মান অন্য ঘুড়ির ডোরে নিজের ঘুড়ির ডোর লাগাইয়া টানাটানি করিতে থাকে। কাচ-চূর্ণলিপ্ত ডোর পরস্পর ঘর্ষণের ফলে কাটিয়া যায়। যে-বালক অন্য ঘুড়ির ডোর কাটিয়া ফেলিতে পারে, সে আনন্দে 'ব-কাট্টা' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠে। ছিন্ন-ডোর ঘুড়িগুলা ভূমিতে পতিত হইলে একদল বালক সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; ইহাতেই তাহাদের আনন্দ।

দশহরা উপলক্ষ্যে বহুস্থানে স্নানযাত্রার মেলা বসে। কোথাও বা গঙ্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাত্রাগান হয়। বাঁকুড়া জেলায় কোন কোন গ্রামে দশহরায় মনসা-উপলক্ষ্যে 'ঝাঁপান' হয়। সর্প-বৈদ্যগণ সর্বাঙ্গে সর্পের আভরণ ধারণ করিয়া একটা শকটে আরোহণপূর্বক গ্রামের পথে পথে মনসামঙ্গল গাহিতে গাহিতে গমন করে; সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য স্বভাবতঃই লোক-সমাগম হয়। শুনিয়াছি, দশহরার দিন সাপের ওঝারা ঔষধ সংগ্রহ করে এবং মন্ত্রের পুরশ্চরণ করে। দশহরার দিন মনসা-পূজা কেন, সকলের মনেই এ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। পরে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

এখন দশহরার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, পুরাণ বলেন যে, দশহরার দিন মর্ত্যে গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল। কথাটা হেঁয়ালির মত। যাঁহারা ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, একটা নদী কোন বিশেষ দিনে পৃথিবীতে প্রবাহিত হইয়াছিল, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বাস্তবিক একদিনে কোন নদীর জন্ম হয় না, গঙ্গারও হয় নাই। যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানকে অহিফেনসেবীর বিজৃম্ভন বলিয়া নস্যাৎ করিয়া দিতে চাহেন। আবার যাহারা ভক্ত, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, মুনি-ঋষিগণ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি মিথ্যাবাদী ছিলেন? নাস্তিকের বিশ্বাস করিবার শক্তি এত অল্প যে, সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত! আবার, ভক্তের বিশ্বাস করি-বার শক্তি এত অধিক যে, সত্যের বিকৃত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু অবিশ্বাস বা অতি-বিশ্বাসের ধূম্রজালে জ্ঞানীর দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন হয় না। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে ধরায় গঙ্গার আবির্ভাব ব্যাপারটা জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া দেখিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে, মুনি-ঋষিগণ শাস্ত্রে মিথ্যাকথা লিখিয়া যান নাই।

* কেলেকোঁড়া গোলাপাদিবর্গের একপ্রকার কণ্টকী গুল্ম। পাতা প্রায় বৃত্তাকার, বর্ণ গাঢ় হরিৎ। ফল পেয়ারার মত।

গঙ্গা যেমন মর্ত্যে আছে, স্বর্গেও সেইরূপ একটি গঙ্গা আছে। স্বর্গের গঙ্গার নাম মন্দাকিনী। অথবা, 'ত্রিপথ-গামিনী' গঙ্গার স্বর্গে প্রবাহিত ধারার নাম মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী, রসাতলে ভোগবতী। মন্দাকিনী কল্পনামাত্র নয়, ইহা মানবের দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দাকিনীর বা স্বর্গগঙ্গার বৈদিক নাম সরস্বতী; কালিদাস ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ছায়াপথ'; ইংরেজী নাম Milky Way, জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয়

গঙ্গার আবির্ভাব
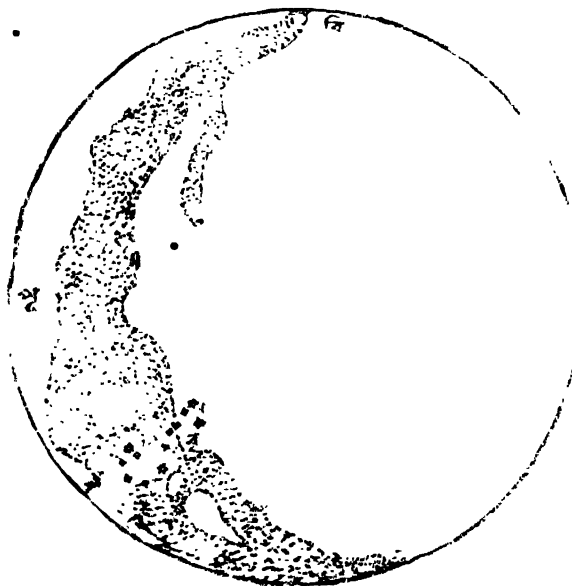
প—পূর্ব্ব দিগন্ত, বি—বিষ্ণুলোক, ব—বৃশ্চিক

সপ্তাহে সন্ধ্যার পর ছায়াপথকে পূর্ব-দিগন্তে উদিত হইতে দেখা যায়। আকাশের উত্তর-মেরু-বিন্দু হইতে প্রায় দক্ষিণ-মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটা দুগ্ধ ধবল বলয়ার্ধ দৃষ্টি-পথে পতিত হয়; যেন একটা নদীর শুভ্র জলরাশি উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে। ইহাই স্বর্গের গঙ্গা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে (অথবা দুই-চারি দিন আগে-পরে) ইহারই আবির্ভাব হয়। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা। আকাশের উত্তর-বিন্দুতে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক, স্বর্গগঙ্গা সেখান হইতেই প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই আকাশে স্বর্গগঙ্গার আবির্ভাব দেখিতে পাইবেন। স্বর্গগঙ্গার মধ্যে বিপুলাকার বৃশ্চিক রাশি। ইহার তারাগুলি যোগ করিলে একটা অতিকায় বৃশ্চিক হইতে পারে, আবার কল্পনান্তরে একটা মকরও হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই বৃশ্চিক রাশিই গঙ্গার বাহন মকররূপে কল্পিত হইয়াছে। (চিত্র পশ্য।) কিন্তু স্বর্গের গঙ্গায় ত মানুষ স্নান করিতে পারে না; তাই শাস্ত্রকার তত্তুল্য পবিত্র মর্ত্য-গঙ্গায় স্নানের বিধান দিয়াছেন।

যেমন সকল নক্ষত্রের উদয়ের দিন নির্দিষ্ট আছে, তেমনই স্বর্গগঙ্গার (ছায়াপথের) উদয়ের দিনও নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট তিথি হয় না। বর্তমান বর্ষে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী হইবে, গত বৎসর ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী হইয়াছিল। গত বৎসর দশহরার দিন স্বর্গগঙ্গার উদয় স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল, এ বৎসর দশহরার দিন দেখা যাইবে না, পাঁচ-সাত দিন পরে দেখা যাইবে। এক অতি প্রাচীনকালে ঠিক জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখা গিয়াছিল এবং সেকালে উক্ত দিবসে এক বর্ষগণনার প্রচলন হইয়াছিল। সেদিন নববর্ষ না হইলে স্নান-দানাদি উৎসবের বিধান হইত না। দশহরার দিন ঘুড়ি উড়ানো ও অন্যান্য নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ সে যুগের নববর্ষোৎসবের স্মৃতি বহন করিতেছে। দশহরার দিন যে এককালে নববর্ষ হইত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কষ্ট-কল্পনা করিতে হইবে না, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। স্মার্তচূড়ামণি রঘুনন্দন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "তিথিতত্ত্বে" লিখিয়াছেন:

> জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সংবৎসরমুখী স্মৃতা।
> তস্যাং স্নানং প্রকুর্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে এককালে নববর্ষ আরম্ভ হইত, রঘুনন্দনের কালেও লোকে তাহা বিস্মৃত হয় নাই; এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি। বিষুব-দিন অথবা অয়ন-দিন ব্যতীত নববর্ষ আরম্ভ হয় না। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-দশমীতে নিশ্চয় এইরূপ একটা যোগ ছিল। বলা বাহুল্য, সেদিন মহাবিষুব বা বাসন্ত-বিষুব দিন হইয়াছিল। বিষুব দিন (এবং অয়ন-দিন) স্থির থাকে না। শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদগত হইতে থাকে। একমাস পশ্চাদগত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ধরিতে পারি। যেকালে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে নববর্ষ ধরা হইত, সেকালে নিশ্চয় জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহাবিষুব দিন হইত। বর্তমানে ৭ই চৈত্র মহাবিষুব-দিন হয়। অতএব বিষুব-দিন—

জ্যৈষ্ঠের	২১।২২ দিন	= ¾ মাস
বৈশাখের	৩১ দিন	= ১ মাস
চৈত্রের	২৩ দিন	= ¾ মাস
		২½ মাস

তদবধি ২॥ মাস পশ্চাদগত হইয়াছে। সুতরাং আনু-মানিক ২১৬০×২॥=৫৪০০ বৎসর পূর্বে, খ্রী-পূ ৩৪০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে রবির মহা-বিষুব-সংক্রান্তি হইত। দশহরা উৎসবে সেই প্রাচীনকালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সূক্ষ্মতর জ্যোতিষিক গণনায় পাইয়াছেন, খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে মহাবিষুব-দিন হইয়াছিল এবং সে বৎসর ছিল এক মন্বন্তরের মুখ।

এক্ষণে দশহরার দিন মনসাপূজার হেতু বুঝিতে পারিতেছি। মনসাপূজা অর্বাচীন হইতে পারে, কিন্তু সর্পপূজা প্রাচীন। সর্পপূজাই ক্রম-বিবর্তনের ফলে মনসাপূজায় পরিণত হইয়াছে। দশহরার দিন সর্পপূজা কেন? আমরা দেখিয়াছি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে রবির মহাবিষুব হইত। মহাবিষুব দিনে দিবা ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়, সেদিন হইতে শীত একেবারে চলিয়া যায়, এবং গ্রীষ্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শীতকালে সর্প গর্তের মধ্যে নিদ্রিত থাকে; গ্রীষ্ম আরম্ভ হইলেই তাহারা গর্ত পরিত্যাগ করিয়া খাদ্যের অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই সময় হইতে সর্প-দংশনের ভয় প্রবল হইয়া উঠে। এই সর্পভীতি নিবারণের জন্য বিষুবদিনে সর্পপূজার বিধান হইয়াছিল, সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে কেলেকোঁড়া খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং গোময়ের গন্ধে সর্প আসে না বলিয়া 'দশর-বেড়ী' দেওয়ার প্রচলন হইয়াছিল। এখন আর দশহরা বিষুব-দিনে না হইলেও আমরা প্রাচীন ঐতিহ্য মানিয়া চলিতেছি।

রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, এ কথার কি অর্থ হইতে পারে? কোন মানুষ কি একটা নদীকে কোন দেশের উপর বহাইয়া দিতে পারে? অথবা, আমাদের উপাখ্যানের গঙ্গা যদি আকাশের মন্দাকিনী হয়, তবে মানুষ ভগীরথ তাহাকেই বা কিরূপে মর্ত্যে আনয়ন করিবেন? ইহার উত্তর অত্যন্ত দুরূহ। তবে আমাদের মনে হয়, যে যুগে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখিয়া বিষুব দিন নির্ণীত হইত এবং নববর্ষ আরম্ভ হইত, ভগীরথ সেই স্মরণাতীত যুগে রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে গঙ্গার আবির্ভাবের সহিত তাঁহার নাম জড়িত হইয়া গিয়াছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র অভ্রান্তভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয় করিয়াছেন। উহা খ্রী-পূ ১৪৪২ অব্দের ঘটনা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্বল নিহত হইয়াছিলেন। রাজা ভগীরথ ছিলেন বৃহদ্-বলের পূর্বপুরুষ; উভয়ের মধ্যে ৫৪ পুরুষের ব্যবধান। এখন আমরা ১০০ বৎসরে ৪ পুরুষ ধরি; প্রাচীনকালের হিসাবে ৩ পুরুষ ধরিতে হইবে। ৫৪ পুরুষে ১৮০০ বৎসর। অতএব ভগীরথ আনুমানিক খ্রী-পূ ১৪৪২+১৮০০=৩২৪২ অব্দের নিকটবর্তী কালে রাজত্ব করিতেন। খ্রী পূ ৩২৫৬ অব্দও হইতে পারে। আমাদের পূজা-পার্বণে কতকালের স্মৃতি রক্ষিত আছে এবং ভারতে আর্য-সভ্যতার বয়স কত, পাঠক চিন্তা করুন।

সেও বুঝি সব নয়

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

আকাশে জাগিছে রাত্তি, আর জাগে তারা—
ম্লান জ্যোৎস্নালোকে জাগে অতন্দ্র নয়ন,
নিবিড় দিগন্ত-ছোঁয়া একটি স্বপন
সেও বা জাগিছে নিশা ক্লান্ত দিশাহারা
পিয়াসী দু'চোখে তব কি গাঢ় ইশারা!
বাসনা-শিখর ছেয়ে ভাঙে কি প্লাবন?
উচ্ছ্বাস উত্তাল ভরে স্তব্ধ বাতায়ন—
অধীর হিয়া সে দোলে—নামে মুক্তধারা।..

আকাশ বিলায় আলো—ভাঙা জোছনা সে,
ধরণী করিছে স্নান অবনতমুখী—
কি বন্যা দুকূলহারা! চিত্ত তায় ভাসে,
যা চেয়েছ সবই তার নিঃশেষে দিনু কি?...

নিরুপায় চলা ভেসে নিরুদ্দেশ ঘাটে—
সেও বুঝি সব নয়—স্বপ্ন লেখা কাটে।...

মেঘলা দিন

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল পেরিয়ে, ধূ ধূ প্রান্তর বাঁয়ে রেখে, বরকাকানা থেকে গোমো—ডিহরী অন শোন লাইনের ধারে ধারে বুরকুণ্ডার দিকে এগিয়ে গেছে বিসর্পিল পায়ে-চলা পথ। লাইনের এপাশে যত দূর চোখ যায়, এবড়ো-খেবড়ো ঢেউ-খেলানো মাঠ মিলিয়েছে দিগন্তে পাহাড়ের ইসারায়। আর এপারে শ্যামল শস্যক্ষেতটি পার হয়ে আচমকা আকাশে মাথা তুলেছে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের সারি। মহুয়া আর পলাশের অসংলগ্ন ছায়া-সঙ্কেত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে নিদাঘ সূর্য্যের তাপ-দগ্ধ পথিককে।

রামগড় থেকে বরকাকানা হয়ে বুরকুণ্ডার দিকে এগিয়ে গেছে চওড়া পীচের সড়ক। তার দু'পাশে গড়ে উঠেছে বরকাকানা রেলওয়ে কলোনী। একতলা ছোট ছোট কোয়ার্টার, দুটি করে পরিবার সংসার গেড়েছে তার প্রত্যেকটিতে। পথের দু'ধারে দুটি বিরাট জলাশয়, লোকে বলে বরকাকানা লেক। তার এপাশে ওপাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে কলোনী। কলোনীর মধ্যে হসপিটাল, এমপ্লয়ীজ ক্লাব, ছোট্ট একটি বাজার আর বরকাকানা রেলওয়ে জংসন ষ্টেশন।

তা এই কলোনীতেই শেষ পর্য্যন্ত এসে উঠতে হ'ল রথীন সরকারকে। বরকাকানা জংসনের নতুন টিকেটবাবু, টিকেট কলেক্টর।

নমিতা কোয়ার্টার দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—দেখেছ, সামনেই কত বড় পাহাড়! কি চমৎকার জায়গা, কি ফাঁকা!

ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে বাসযোগ্য করে তুলবার চেষ্টায় ছিল রথীন। টেবিলটা জানালার কাছে পাতবে, না দেয়াল ঘেঁষে রাখবে, খাটটাকেই বা কোথায় বসানো যায়, তা ছাড়া ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি জিনিসপত্র—ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও!

নমিতার কথা শুনে বাইরে এসে দাঁড়াল স্মিত হেসে, বললে—ভাল লাগছে তোমার? পছন্দ হয়েছে জায়গাটা?

—খুব। নমিতা খল্‌খল্‌ হাসল—বাংলার বাইরে এত সুন্দর দেশ আছে, কে জানত! সামনে ধূসর পাহাড়, চার দিকে ধূ ধূ মাঠ, ফাঁকা রাস্তা—শুধু ঘুরেই সময় কাটিয়ে দেব, তুমি দেখে নিও—

—তা দিও। রথীন বললে—আপাততঃ ঘরে ত এস একবার। গুছিয়ে ফেলি সব, বেশ মনের মত করে। সময় ত বেশী নেই, পরশু দিনেই জয়েন করতে হবে।

গাছ-কোমর বেঁধে ওরা লেগে গেল নতুন সংসার গোছাতে।

সব কিছুই জোগাড় করতে হবে নতুন করে। বাজার করতে হবে, কয়লা আনতে হবে, ধোপা-নাপিত ঠিক করা আছে—কত কাজ। নতুন করে সংসার সাজানোর কত জ্বালা। কাজ করতে গিয়ে দেখা যাবে, এটা নেই, ওটা নেই; তখন ছোট বাজারে। বিদেশ-বিভূঁই, ছুটি থাকতে থাকতে সব গুছিয়ে বসতে হবে। না হলে বেচারা নমিতা পড়বে মুশকিলে।

ওরা নিরিবিলি থাকতে চায়। সমাজের হুল্লোড়-হুজ্জুত বাঁচিয়ে। ভীড় ওদের পছন্দ নয়। বেশ নিরিবিলি, নিরুদ্বিগ্ন জীবন। অবসর কাটানোর জন্যে ভাবনা নেই। নমিতার তানপুরো, হারমোনিয়ম আছে, রথীনের নিজস্ব লাইব্রেরী। তাতেও না হলে উন্মুক্ত পাহাড়-প্রকৃতি পড়ে আছে। লোকজন থেকে যতটা দূরে সরে থাকা যায়, ততই ভাল।

সব গোছগাছ করে বিকেলের দিকে ওরা একসঙ্গে বেরুল—ষ্টেশনের দিকে। ইচ্ছে একবার দেখে তার পর ঘুরবে যথেচ্ছ।

ইউনিফর্ম্ম পরে গেটের কাছে বসেছিল রবীন মজুমদার। মৌজ করে একটি বিড়ি ধরাবার মতলব আঁটছিল। রথীনদের আসতে দেখে সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল। সকালে কিছু কথা-বার্ত্তা হয়েছিল ওদের সঙ্গে, প্লাটফরমে দাঁড়িয়েই।

এগিয়ে গেল মজুমদার। সহাস্যে আহ্বান জানাল—আসুন সরকার বাবু, আসুন, আসুন!

টিকিটঘর পেরিয়ে ওরা এসে ঢুকল প্লাটফরমে। করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে রথীন বললে—একটু বেড়াতে বেরিয়েছি মজুমদার মশাই, সেইসঙ্গে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপ করবার ইচ্ছে।

—আরে হবে মশাই, হবে। মজুমদার হাসল—এ গোয়ালে যখন ঢুকেছেন, সবাইকে চিনবেন। ইন্দ্রজিৎপ্রসাদ আছে, ভবতোষ মিত্তির আছে, রামজনম সিং আছে, আরও অনেক। এ-এস-এম, বুকিং ক্লার্ক, ট্রেনস ক্লার্ক, আপিস

ক্লার্ক, গার্ড—সকলের সঙ্গেই পরিচয় হবে। জানবেন, চিনবেন, এত তাড়া কিসের? যথেষ্ট বাঙালীও আছেন। তা সে সব থাক, কেমন লাগছে বলুন।

—মিতা ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। নমিতাকে দেখিয়ে রথীন হাসল।

—ভাল লাগছে বুঝি? মজুমদার এতক্ষণে তাকাল নমিতার দিকে। বললে—তা প্রথম প্রথম ভাল লাগবে বৌদি, আমাদেরও লেগেছিল। কয়েকটা মাস যেতে দিন না। দেখবেন, পালাতে পথ পাবেন না।

—আপনি কি সস্ত্রীক…। প্রশ্নটা করতে গিয়েও মাঝ-পথে থেমে গেল নমিতা।

—আর বলেন কেন! ঠোঁটটা একবার ওল্টালো মজুমদার—এসেছিলাম ত সস্ত্রীকই, তা এখন আর নেই, আমাকে ফেলে স্ত্রাটি পালিয়েছেন এদেশ ছেড়ে, গজুহাত, ভাল লাগছে না। কি ভাগ্যি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড দিতুয়া আছে, না হলে হাত পোড়াতে হ'ত। বুঝবেন রথীনবাবু আপনিও, সময় থাকতে একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড জোটান।

নমিতা হাসল। বনিষ্ঠ কণ্ঠে বললে—স্ত্রীর মন বসে না বুঝি?

—স্বামীরও নয়। মুখ বিকৃত করল মজুমদার—এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ভদ্রলোক থাকে। কি বলব বৌদি, নেহাৎ উপায় নেই, চাকরীর দড়ি ঝুলছে গলায়, টানাটানি করলে ফাঁস লাগবে গলায় বলে নট-নড়ন-চড়ন হয়ে বসে আছি। ছেলেপিলেগুলোর লেখাপড়া হবার উপায় নেই, কলোনীর বাইরে একটা সমাজ নেই, স্রেফ চাকরী আর কোয়ার্টার। খুব হাঁফিয়ে উঠলেন ত নিদেন ট্রেনে বা বাসে করে গিয়ে রামগড় টাউনের শান্তি সিনেমায় লজ্ঝর রদ্দি সিনেমা দেখে আসুন। ব্যস্, জীবন বলতে এই, কাঁহাতক মন টেঁকে বলুন। বউকেই বা দোষ দিই কি করে?

রাঁচী এক্সপ্রেস ছাড়বার সময় হয়ে এল। যাত্রী আসছে একে একে। পিছনে বেডিং-বাক্স-মাথায় কুলী। ব্যস্ত হয়ে উঠল মজুমদার। টিকিট পাঞ্চ করতে করতেই বললে—এল ফিফটিন্ ত আপনার বাসার নম্বর? কাল সকালে যাব। থাকবেন ত?

একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। রথীন বললে নিরাসক্ত কণ্ঠে—থাকব।

ওরা এগোলো। ষ্টেশন থেকে ফিরে পথে পথে ঘুরল সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসা পর্য্যন্ত। পাহাড়তলীর বুকে, শ্যামল মাঠ আর ধূসর পাহাড়-চূড়ায় আবীর ছড়িয়ে ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য্য, আর সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসিতে উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠল নমিতা।

বারান্দায় বসে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছিল রথীনের, ছাত্রজীবনের স্বপ্ন থেকে সুরু করে আজকের এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। যেন একটি রুদ্ধশ্বাস দৌড় প্রতি-যোগিতা! আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সকল স্বপ্ন থেকে বিতাড়িত-হওয়া জীবনে ছিটকে আসা। কি চেয়েছিল আর কি পেল।

এই-ই বোধ হয় ভাল। মনে হ'ল রথীনের, এমনই শান্ত, নিরুপদ্রব একটি জীবনই বুঝি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওর। সকল আকর্ষণ পিছনে পড়ে থাক্, সকল কল্পনার রং মুছে যাক জীবন থেকে। এই ভাল, এই সুদূরের নির্ব্বাসন। এই পাহাড় ঘের, রেল-কলোনীর বিঘ্নহীন জীবন। সুখ না থাক, স্বস্তি আছে।

ষ্টোভ জ্বালিয়ে রান্না শেষ করছিল নমিতা। আজ আর উনুন ধরাতে ভাল লাগছে না। আলু সেদ্ধ, একটি তরকারী আর ডিমের কারি। কুকারে ভাত-ডাল হচ্ছে। পরে ষ্টোভে একটু ফোড়ন দিয়ে নিলেই চলবে ডালে। মনটা খুশী খুশী লাগছে দিন ধরে। অনেক দিনের পাষাণ-ভার সরিয়ে যেন মনের মাঝে সুরের বীণার রেশ শোনা যাচ্ছে। বাইরে রথীন একা একা বসে কি ভাবছে কে জানে। গুন্‌গুন্ করে গান ধরেছে নমিতা। সুর আসছে মনের ভিতর থেকে গুন্‌গুনিয়ে, আজ তানপুরাটা নিয়ে বসতে হবে।

হ্যারিকেনটা টেবিলের উপরে ডিম করা। বারান্দাটা অন্ধকার। ও ঘরে নমিতার চুড়ির রিন্‌ঝিন্ শোনা যাচ্ছে। বাইরের ঝিম-ধরা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল রথীন। ভাবছিল আপন মনে।

খানিকক্ষণ পর নমিতা এসে বসল একটি মোড়া নিয়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল রথীন—কি, রান্না হয়ে গেল এর মধ্যেই!

—আবার কতক্ষণ লাগবে? খুশী-ডগমগ-কণ্ঠে নমিতা বললে—আজকের রান্নাটা ষ্টোভেই করে ফেললাম। তা চুপ করে বসে আছ যে তখন থেকে?

—কি করব! রথীনের কণ্ঠ নিস্পৃহ শোনাল।

—মন খারাপ লাগছে বুঝি? নমিতা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল মোড়াটা নিয়ে—তুমি ভুলতে পারছ না আমি জানি। আমার জন্যে তোমাকে সব কিছু ছাড়তে হ'ল, এ দুঃখ তোমাকে আনমনা করে তুলছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল রথীন। ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে নমিতাকে টেনে নিল কাছে, বললে—ছিঃ মিতা, ও কথা ভাবতে নেই। আমি এখনকার কথাই ভাব-ছিলাম। অতীতটা পচা ঘায়ের মত, ওকে কেটে বাদ দিলেও ক্ষতি নেই, বরং বাকী শরীরটা ওর বিষাক্ত

আক্রমণের হাত থেকে বাঁচে। মরা অতীতের দিকে আর তাকিও না। নতুন করে, নতুন জীবন তৈরী করে আমরা বাঁচব।

নমিতা তেমনি মাথা হেঁট করেই বসে রইল। কে জানে রথীনের কথাগুলি ওর কানে গেল কিনা। ম্লান হাসি ফুটল রথীনের মুখে। মনে হ'ল, এ ব্যথা সান্ত্বনা দিয়ে দূর করা যায় না। এ গ্লানি আদর করে মুছে দেওয়া যায় না। নমিতার সারা জীবনটা বিস্বাদ করে দিয়েছে সে দুর্ঘটনা। আর পূতি-গন্ধ আবর্জনায় আকৃষ্ট মাছির মত কুৎসা-লোলুপ মানুষের তীক্ষ্ণ রসনা উত্যক্ত করে দিয়েছে সে ব্যথা-জর্জ্জর জীবনকে। ওদের পালিয়ে আসতে হয়েছে সকল পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে। মানুষের কাছে ওরা ক্ষমা পায় নি। অপরাধকে ঘৃণা করে না লোকে, যতটা করে সে অপরাধের গ্রাসকে।

নমিতাকে স্বীকার করে নিতে পারে নি ওদের আত্মীয়-পরিজন। তাই সেই আত্মীয়স্বজনকেও স্বীকার করতে পারে নি রথীন। পারে নি তাদের বিধি-নিষেধ মেনে নিতে। অথচ মানুষের সমাজেই বাস করতে হবে তাকে। তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু তাতে দুঃখ নেই রথীনের। সুখী হোক নমিতা। ওর বিড়ম্বিত জীবনে শান্তি আসুক, এই কামনা রথীনের।

তানপুরাটা নিয়ে গিয়ে বসল নমিতা। রথীনও গিয়ে বসল নমিতার সামনে। সুর বাঁধল নমিতা, বেহাগ ধরল। ধীরে ধীরে ওর মিষ্টি কণ্ঠস্বর সুরবিস্তার করতে লাগল এল ফিফটিনের কোয়ার্টারে। বাইরে চন্দ্রালোকিত রাত্রি, সুরের ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়-প্রাচীর আর নিশুতি রাতের স্তব্ধতা যেন গুমরে গুমরে কাঁদল নমিতার কণ্ঠে বেহাগের আলাপে।

আর তন্ময় হয়ে শুনল রথীন। নমিতার মনের বদ্ধ কপাট ভেঙে যেন অবরুদ্ধ কান্না টলমল করে ভাসল চোখের কোণে কোণে। সারাদিনের অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে ভরা নমিতার মনটা বুঝি এই মুহূর্তে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। হাসি আর কথার ফোয়ারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা হৃদয় বুঝি গানের সুরে সুরে এমনি করে কাঁদে। রথীন পারে নি ওর মনের এই কান্নাকে নিস্তব্ধ করতে। ভোলাতে পারে নি ওর সুদীর্ঘ গত জীবনের ব্যথা-পঙ্কিল ইতিহাস। চঞ্চল হাসির অন্তরালে ওর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়টা বুঝি এমনি করেই নিরন্তর অশ্রু ঝরায়।

এ ব্যথায় সান্ত্বনা জাগাতে পারে নি রথীন, পারে নি আপন প্রেমের অজস্র ধারায় অবগাহন করিয়ে ওর মনের ক্ষতটিকে নিরাময় করতে। ওর গানের সুরে সুরে, রাত-জাগা অতন্দ্র চোখের জলে বুককাটা দীর্ঘশ্বাসে সে ক্ষতটা রক্তক্ষরণ করে। সারা অন্তর দিয়ে নমিতার গ্লানিকে আপন করে দিয়েছে রথীন, তবু সে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় নি।

মনে পড়ছে সে রাত্রিটাকে। দশ বছর আগেকার একটি মৃত্যুমলিন ভয়ঙ্কর রাত্রি। ওদের সমস্ত জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, ওদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া অভিশপ্ত রাত্রিটাকে মনে পড়ছে রথীনের। সুরে সুরে যখন এমনি করে কাঁদে নমিতা,রাত-জাগা অতন্দ্র চোখে যখন অশ্রু ঝরায়, বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে যখন অবারিত করে মনের গহন রাজ্য, মনে পড়ে যায় রথীনের। সারাটা শরীর শিউরে ওঠে বীভৎস আতঙ্কে।

বি-এ পাস করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাকরীটা পেয়ে যায় রথীন। মা-বাপ কেউ ছিলেন না, ভাই-বোনও নয়। কাকার কাছে মানুষ, আর সেই কাকা দেখেশুনে যখন নমিতাকে পছন্দ করলেন, অমত করবার কিছুই পায় নি রথীন। বিয়ে হয়ে গেল।

কত আর বয়স! রথীন কুড়ি, নমিতা সতের। ডিউটি করে রথীন যখন ফিরত, দেখত ওর ঘরে আনমনে বসে রয়েছে নমিতা ওরই প্রতীক্ষায়। দিনে, রাত্রে, সকালে, বিকেলে—সব সময়।

কাকীমা হাসতেন। লজ্জা পেত রথীন। চোখে পড়লে কাকা মুখ ফিরিয়ে পালাতেন। তা ভ্রূক্ষেপও ছিল না নমিতার।

ইউনিফর্ম খুলবার সময় হ'ত না, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরত রথীনকে। বুকে মুখ গুঁজে নিঃসাড় হয়ে থাকত। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসত রথীন।

বলত স্মিত মুখে—এই! দেখে ফেলবে কেউ।

—দেখুক গে। বুকের মধ্যে মিশে থেকেই নমিতা হাসত—তোমার বুকে মাথা রাখলে দোষ হয় বুঝি?

—তাই বলে দিনে দুপুরে, সকলের সামনে বুঝি? সাদরে ওর মুখখানা তুলে ধরত রথীন—নাইট ডিউটিতে যখন থাকি, সারারাত এমনি করে জেগে বসে থাক নাকি?

—থাকিই ত। নমিতা ওর ইউনিফর্মের বোতাম খুলতে খুলতে বলত—তুমি সারা রাত জেগে থাকবে আর আমি বুঝি বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাব?

—আমার ত চাকরী। রথীন হাসত খিলখিল করে—না জেগে উপায় নেই। তোমার কি যে তুমি জাগবে?

—আমারও চাকরী। নমিতা বলত হাসতে হাসতে—তুমি জাগলে আমারও না জেগে উপায় নেই। ঘুমই আসে না তা কি করব।

একটি বছর যে কোথা দিয়ে কেমন করে কাটল, কে জানে! বন্ধু-বান্ধবের কথা ভুলে গেল, বাড়ীর বাইরে যে

আরও একটা বৃহত্তর সমাজ আছে, সেকথা মনেই রইল না রথীনের। চাকরী না করে উপায় নেই, কিন্তু ঐ আট ঘণ্টা চাকরী ছাড়া সারাটা সময় কাটত নমিতার পাশে।

নমিতা বলত—এতক্ষণ তুমি কেমন করে চাকরী কর গো! থাকতে পার?

—তুমিও ত পার বেশ। রথীন মৃদু টোকা দিত ওর গালে—তুমিই কি পার হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে ছুটে যেতে?

—বারে, আমি কেমন করে যাব? নমিতা ভেঙে পড়ত হাসিতে।

ওরা শুধু হাসত। চোখে চোখে চেয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে সাঁতরে চলত কালের সমুদ্রে।

রথীন একদিন বললে—জান মিতা, আমাকে এবারে রোগে ধরেছে।

উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে নমিতা এগিয়ে এল—সে কি, ডাক্তার দেখাও নি কেন?

—যে সে রোগ নয়। মিষ্টি মিষ্টি হাসত রথীন—এ রোগ ডাক্তারের অসাধ্য। কাব্য-রোগ মিতা। রাতের ডিউটিতে কাল কাজ করব কি, রিটার্নের পাতায় কবিতা লিখে ফেলেছি।

হেসে গড়িয়ে পড়ল নমিতা। বললে—কবিতা না ছাই, ও কি লিখেছ আমি জানি।

—বল ত কি?

—আমাকে যা বল, তাই।

—ইস্!

—ইস্ কি, দেখাও তবে। নমিতা বললে—তুমি আবার কবিতা লিখবে, হুঁঃ!

—দেখাব না তবে। রথীন বললে—পারি কিনা দেখবে। আজ সকালেই সে কবিতা মাসিক 'রুদ্র'তে পাঠিয়েছি। প্রকাশ হলে দেখবে।

বিশ্বাস করলে না নমিতা। মিটি মিটি হাসতে লাগল। বললে—তুমি ত কারও কাছে শেখো নি কবিতা লেখা, কেমন করে লিখলে? আমি যে গান গাই তা কি না শিখলে গাইতে পারতাম?

কবিতা লেখা শিখে হয় না গো! রথীন গম্ভীর হবার ভান করল—গান গাওয়া আর কবিতা লেখা এক জিনিস নয়।

তা কবিতাটা বেরুল রথীনের। দেখে সে কি আনন্দ নমিতার!

বললে—আগেই বলেছি, যা বল তাই লিখেছ। না হয় ছন্দে ছন্দে। আমাকে বলা কথাগুলো সারা দেশ জে[নে] গেল ত।

—ভালই হ'ল! রথীন বললে—সকলের মনে ম[নে] বেঁচে থাকব আমরা।

নমিতা গান গাইত আর তন্ময় হয়ে শুনত রথীন। রথী[ন] কবিতা লিখত, পাশে বসে অশেষ আগ্রহে দেখত নমিতা দিনের পর দিন।

গাইতে গাইতে লিখতে লিখতে চোখে চোখে তাকি[য়ে] খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠত ওরা দুজনে। আর পাশের ঘ[রে] কাকা-কাকীমার মনও বুঝি ছুটে চলে যেত অতীতের ফেলে আসা দিনের স্মৃতিকন্দর অন্বেষণে।

এমনি করে একটি বছর। দেহ-মনের প্রতি কোণে কোণে আনন্দের উদ্বেল জোয়ার। অশেষ তৃপ্তির অসহ আনন্দ। হাওড়া ষ্টেশনের শিফট-ডিউটি টিকেট কালেক্টর রথীন সরকার নয়, অনাদি কালের এক পুরুষ। আর আঠারো বছরের উচ্ছলযৌবনা স্বামীর পথ-চাওয়া নমিতা সরকার নয়, অনন্ত যুগের আদিম প্রকৃতি। একাত্ম, একক, অচ্ছেদ্য।

কিন্তু এল সেই মর্মান্তিক রাত্রি। ওদের স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল, জীবনটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছড়িয়ে দিল পথের ধুলোয়।

স্বাধীনতা নয়, ওদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্যেই যেন সারাটা দেশ মেতে উঠেছিল পৈশাচিক আনন্দে নোয়াখালিতে, বিহারে, অবশেষে কলকাতায়।

শহর কলকাতার বুকে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল সেদিন রাজাবাজারের গলিটাতে মানুষের দেহ সেদিন শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা মানুষকে টেনে নামাল পশুত্বের পঙ্কে। মানুষের বুকে ছোরা বসাল মানুষ। মানুষের রক্তে হাত রাঙাল মানুষ, শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, কেউ বাদ গেল না সে হত্যাকাণ্ডে।

পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না। বাইরে উন্মত্ত জনতা রক্তোন্মাদ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতার খড়্গ ঝুলছে ওদের মাথার ওপর। রক্ত চায় ওরা, টাটকা লাল রক্ত, মানুষের বুক চেরা, হৃৎপিণ্ড-উপরানো রক্ত!

রথীনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল নমিতা। কাকা-কাকীমা অজ্ঞান হয়ে গেছেন ভয়ে আর আতঙ্কে। বাইরে ক্ষুব্ধ জনতা মত্ত হয়ে উঠেছে রক্ত-পিপাসায়। দরজায় আঘাত পড়ছে অনবরত। পলকপাতের মধ্যে হয় ত ওদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে পথের ধূলি।

নমিতার হাত ছাড়িয়ে রথীন ছুটে গেল নীচে। বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটেরা এসে সদর দরজাটা চেপে ধরেছে প্রাণপণে।

টীর যত চেয়ার-টেবিল, আসবাব-পত্র সব এনে জড়ো করা হয়েছে প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়ার জন্যে। রথীন এগিয়ে এসে যোগ দিল সে আত্মরক্ষী দলে।

কিন্তু জরাজীর্ণ সদর দরজাটা পারল না বাইরের সেই ক্রোধোন্মত্ত জনতাকে আটকে রাখতে। চুণ-বালির মত পুরনো দরজাটা ভেঙে পড়ল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে। পলক পাতের মধ্যে নররক্তলোভী মানুষের বন্যা ঢুকে গেল বাড়ীটার মধ্যে। মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়ল রথীন। তার পর আর কিছু মনে নেই।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল রথীনের। সর্ব্বনাশটাকে আটকাতে পারল না সে, সে ত ওর আর ওদের সমাজের শক্তিহীনতার জন্যেই। তাদের সম্পত্তি, আত্মীয়-পরিজনের প্রাণ, আর স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষার মত শক্তি তারা সঞ্চয় করতে পারে নি, পারে নি ঐ রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে, সে অপমান ত তাদেরই।

হাসপাতালে চার দিন পরে জ্ঞান হ'ল রথীনের। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই রক্তপিপাসু উন্মত্ত জনতা। ভীত-বিহ্বল নর-নারীর আর্ত্ত চীৎকার ওর শ্রবণে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল আবার।

মাথার কাছে কাকা বসে। আশ্চর্য্য! কিছুই হয় নি ওর। চোখ বুজল রথীন। বুঝল জিজ্ঞাসা করা বৃথা, নমিতা নেই, থাকতে পারে না। সেই নরমাংসলোলুপ দানবগুলির হাত থেকে নমিতাকে বাঁচাবার সাধ্য কারও ছিল না।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন কাকা। মনের অবাধ্য আবেগগুলি নীরবে ঝরতে লাগল কাকার আকুতিতে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, প্রবোধ দেবার মত অবস্থা নয়।

কলকাতার আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে এল আবার। রক্ত-নেশাতুর পশুরা আবার নখদংষ্ট্রা লুকোলো মনুষ্যদেহের অন্তরালে। নমিতা ফিরে এল না।

তার পর আরও আট বছর কেটে গেছে এক অস্পষ্ট অন্ধকারে। চোখের সামনে শুধু জলেছে নমিতার ভীতি-বিহ্বল মুখখানা। সকল সামর্থ্য দিয়ে নমিতাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছে রথীন। পাগলের মত ছুটেছে পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে। বস্তীর আস্তাকুঁড়ে, এঁদো গলির অন্ধকারে, কিন্তু নমিতাকে পাওয়া যায় নি।

কত সান্ত্বনার কথা শুনেছে বন্ধু-বান্ধবের মুখে। কাকীমাও বেঁচে উঠেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত। তিনিও প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছেন। এ বৃথা চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন ওকে। কিন্তু কোন কথা শোনে নি রথীন। চাকরী ছাড়ে নি, কিন্তু তাঁর আয়ের প্রতিটি পয়সা খরচ করে ও অনুসন্ধান করেছে নমিতার।

জীবনের সবটা সময়ই সামনে পড়ে। এক বছরের একটুখানি স্মৃতি হয় ত হারিয়ে যাবে দূর ভবিষ্যতে। কিন্তু বাঁচবার অবলম্বন কই রথীনের। একটা আলেয়ার পিছে পিছেই কি কাটবে সারা জীবন? একটি অপহৃতা মেয়ের অনুসন্ধানে। কত অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ—কিন্তু বৃথা। নমিতাকে ভোলা অসম্ভব। সারা জীবন এমনি করে আশায় বুক বেঁধে ও নমিতাকে খুঁজে বেড়াবে, সেও ভাল, কিন্তু নতুন করে ঘর সাজাবার কথা আর নয়। মানুষ ওকে চরম আঘাত দিয়েছে, আবার মানুষই ওকে চরম আনন্দ দিয়েছে। আর ঘর বাঁধা নয়।

দীর্ঘ আটটি বছর। অক্লান্ত, অবিশ্রান্ত। শেষ পর্য্যন্ত একদিন পাওয়া গেল নমিতাকে। মেদিনীপুরের এক গ্রাম থেকে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে এল গোয়েন্দা পুলিস। সর্ব্বস্বান্ত, রিক্তা, ধর্ষিতা নমিতা। আট বছরের অত্যাচারের পঙ্ক মেখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। হাসি নয়, অশ্রু নয়। সব হারানোর ব্যথায় ক্লান্ত, পঙ্কিল জীবনের বিষে জর্জ্জরিত ক্লেদাক্ত নমিতা।

একটি কথাও বলল না রথীন, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল না। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল নমিতার। পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললে—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। দাঙ্গায় যাকে হারিয়ে-ছিলাম।

নমিতা শুধু মাথাটা নোয়ালো। ওর বেদনাহত কণ্ঠে ভাষা ফুটল না। রথীনের হাত ধরে এসে উঠল ট্যাক্সিতে।

কাকা-কাকীমা চমকে উঠলেন নমিতাকে দেখে।

ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—এ তুই কি করলি রথী! ওকে ঘরে এনে তুললি?

নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল রথীন।

কাকীমা বললেন—এ হয় না, হতে পারে না। আট বছরে ও সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, ও কলঙ্কিত। এ বাড়ীর পরিচয়ে নমিতা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। ওকে তুই ফিরিয়ে দিয়ে আয় রথী।

—না, না, না। প্রায় চীৎকার করে উঠল রথীন—ওকে রক্ষা করতে পারি নি, এ কি ওর অপরাধ। ক্ষিপ্ত মানুষের কামনা যদি ওর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, সে অপরাধ কি ওর? ওকে ত্যাগ করতে বলো না কাকীমা, আমি পারব না। অনেক অত্যাচার ও সহ্য করেছে। আমাদের অক্ষমতা ওর সারা জীবনে এনেছে অভিসম্পাত। অনেক বিষ ও হজম করেছে এ আট বছর ধরে। আর নয়, ওকে বাঁচতে দাও। আমাদের মাঝে ওকে শান্তি পেতে দাও তোমরা।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কাকীমা বললেন—অবুঝ হোস নে রথী। সমাজে বাস করতে হলে একথা তোকে মানতেই হবে। দশের জন্মে একজনকে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। একথা অস্বীকার করিস নে। তোর সম্মান, তোর স্বীকৃতি—

—মানি নে, মানি নে ও সব। তীব্রকণ্ঠে রথীন বললে যে সম্মানবোধ একজন নিরীহ নিরপরাধকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, সে স্বীকৃতির মূল্যে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে আজীবন বঞ্চনা আর অপমান সহ্য করতে হয়, সে ভুয়ো সম্মান আর স্বীকৃতি চাইনে আমি। কোথায় ছিল এই সম্মানিত সমাজ যেদিন নিরপরাধ মানুষের মনুষ্যত্ব, নিষ্পাপ মেয়ের সতীত্ব পদদলিত হয়েছিল? তখন কেন পারে নি রক্ষা করতে? কেন, কেন। আজ কেন তবে তার তর্জ্জন শুনব? মানি না। সমাজ মানি না, সম্মান চাই না, তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না কাকীমা। আমি বেঁচে থাকতে এ হতে দিতে পারব না।

কাকা বললেন—সমাজকে অস্বীকার করে বাঁচবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না রথী। আমি বৃদ্ধ, জীবন-যুদ্ধ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। আমি শান্তি চাই।

—তাই হবে। রথীন ম্লান হাসল, তীব্র কণ্ঠে ওর নেমে এল অশ্রু। বললে—আমিই সরে যাব কাকা। আপনার শান্তি নষ্ট হবে না। কিন্তু নমিতাকে আর অপমান করতে দিতে পারব না আমি। ওর সম্মান, ওর সতীত্ব রক্ষা করতে পারি নি বলে ওকে ত্যাগ করতে পারব না। ওকে শান্তি দিতে চাই আমি। ওর দমিত জীবনটাকে নিরাময় করে তুলতে চাই স্নেহে, দয়ায়, মায়ায়। প্রীতি দিয়ে ওকে সঞ্জীবিত করতে চাই। আমি চলে যাব কাকা, আপনার ইচ্ছাকেই মেনে নিলাম আমি।

বেরিয়ে আসতেই থমকে গেল রথীন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নমিতা। ওর দুই ক্লান্ত আঁখির কোল বেয়ে ঝরছে অশ্রুর বন্যা। মনের সকল বাধা অমান্য করে গলা বেয়ে উঠছে অবাধ্য ক্রন্দনোচ্ছাস।

রথীনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল নমিতা, থরথর কাঁপল। নিজের বুকে ওকে একান্ত আদরে টেনে নিল রথীন, এগিয়ে গেল নিজের ঘরে।

বললে—মিতা, যে মানুষ আশ্রয় দিতে পারেনি বিপন্নকে, সেই মানুষই আবার সমাজের নিয়ম তৈরী করে অত্যাচারিত মানুষকে নির্ব্বাসন দেবার জন্যে। এদেশের ভাগ্য মন্দ, তাই আমাদের এ অধঃপতন। আমরা এ নিয়ম মানব না, আমরা সব অত্যাচারকে অবহেলা করে মাথা তুলে দাঁড়াব।

—তুমি কেন আমার জন্যে এ অপমান সইবে? এতক্ষণে কথা বলতে পারল নমিতা। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—কেন সব হারাবে একটি সর্ব্বহারার জন্যে?

—নিজের অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করব মিতা। নিষ্ঠুর আবেগে নমিতাকে বুকে চেপে ধরল রথীন—আমার প্রেম যে ভুল, সে যে মানে না কোন হিংস্র পশুর আঘাতকে, কালজয়ী সর্ব্বজয়ী অক্ষত হৃদয়কে সে যে অনায়াসে টেনে নিতে পারে দুরন্ত প্রেমে, সেকথা প্রমাণের দিন এসেছে। যারা আঘাত করল, এ অপমান তাদের। যারা তোমার অক্ষম বুকের উপর দিয়ে অত্যাচারের নিষ্পেষণ চালিয়ে গেল, এ গ্লানি তাদের। মানুষ মরে না মিতা। তোমার আত্মা, তোমার মনের মনুষ্যত্ব ত ক্লেদাক্ত হয় নি। আমাদের প্রেম কেন সে অন্ধকারটুকু দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে? ভালবাসার ত মৃত্যু নেই মিতা।

বন্ধু-বান্ধব ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আত্মীয়স্বজন স্বার্থ কুটিল কদর্য্যতায় পরিত্যাগ করেছে। তা করুক। কাউকে প্রয়োজন নেই ওদের। দরকার নেই সমাজকে।

একটিমাত্র বন্ধু ওকে এ বিপদে ত্যাগ করল না, সে হিরণ্ময়। ওর দুঃখে সমবেদনা জানাল, পাশে এসে দাঁড়াল নির্ভয়ে। ওদের দুঃখ আর ব্যথা ভাগ করে নিল নিঃশব্দে এবং হাসিমুখে। নিজের চেষ্টায় ডি.এম. আপিসে সে দায়িত্বশীল পদের অধিকারী। তারই চেষ্টায় এবং আন্তরিকতায় হাওড়া থেকে বরকাকানা এত তাড়াতাড়ি ট্রান্সফার নেওয়া সম্ভব হ'ল।

আসবার সময় সে বলে দিল—যদি অসুবিধে হয়, আমায় জানাতে দ্বিধা করো না রথী! প্রয়োজন হলে ইণ্টার-রেল ট্রান্সফার করিয়ে দেওয়া যাবে। আদর্শকে ছেড়ো না, তার জন্যে যে মূল্য দিতে হয়, দেবে। ভারতের যে প্রান্তে প্রয়োজন হয় যাবে। আমি আছি তোমার পাশে।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে নমিতা। মনের ক্ষত হয় ত সারে নি, কিন্তু আবার হাসি ফুটেছে ওর মুখে। আট বছরের অভিশপ্ত জীবনের পরে আবার নতুন করে জেগেছে নমিতা। নতুন করে পরিচয় হয়েছে পরস্পরের।

রথীন বলত—জীবনের পথটা বড় জটিল মিতা। এখানে ফুলের সঙ্গে কাঁটা আছে, অমৃতের সঙ্গে গরল। জীবনকে উপভোগ করতে হলে দুটোর স্বাদই পেতে হবে। তোমার মাঝে জীবনের এই পরিচয় আমি নতুন করে পাচ্ছি মিতা।

নমিতা বলত—আমার জন্যে ত্যাগ তুমি অনেক করেছ, কিন্তু তোমায় দিতে পারলাম কি? আমার যে আর কিছুই নেই দেবার মত।

—সব আছে, সব আছে। রথীন বলত—কিছুই তুমি হারাও নি মিতা। মনের ভাণ্ডার ফুরোয় না। দু'হাত

যে সারা জীবন নিলেও তোমার কাছে আমার সব নেওয়া হবে না।

আবার হাসল, আবার গাইল নমিতা। রথীন আবার কবিতা লিখল। তার পর সব ছেড়ে দিয়ে এই নির্ব্বাসন। এ ত নির্ব্বাসন নয়, নবপ্রতিষ্ঠা। এই বরকাকানা রেল কলোনীতে।

গান থামল নমিতার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নমিতার পিঠে একখানা হাত রাখল রথীন। বললে—ভুলতে পারছ না, না মিতা?

নমিতা অবনত মস্তকে চুপ করে রইল।

—কি দরকার আমাদের লোকসমাজে বল। রথীন আবার বললে—তুমি ভুলে থাকতে পারবে, শান্তি পাবে। এই জন্তেই পরিচয় করতে চেয়েছি বাইরের লোকের সঙ্গে। ভুলে গিয়েছিলাম, ওরা যেমন তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে পারে, তেমনি ত্যাগও করতে পারে। চাই না ওসব আর।

—তুমি কি নিয়ে থাকবে বল? নমিতা মৃদু কণ্ঠে বললে—এই নির্ব্বাসনে কতটুকু শান্তি তুমি খুঁজে পাবে আমার মাঝে?

উত্তর দিল না রথীন। দুজনে নীরবে বসে রইল মুখোমুখী।

বাইরের রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা জানালাটা দিয়ে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। ধূসর পাহাড়টাকে ছায়া-দৈত্যের মত মনে হচ্ছে। রাত হ'ল অনেক।

পরদিন সকালেই এলেন মজুমদার। ছট্‌ফটে লোক, মুখে খৈ ফুটছে।

বললে—শোনেন নি বুঝি সরকার বাবু, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে কাল রাতে—

হাতে-হলুদ মেখে সহাস্যে এসে দাঁড়াল নমিতা। রথীন প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার, জানি না ত?

—কলোনীতে এই ত এলেন সবে। মজুমদার বিজ্ঞের মত বললে—কত কীর্ত্তিই দেখবেন একে একে। ট্রেন্‌স্ ক্লার্ক চন্দের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে সিগন্যালার হরদেও সিং।

—সে কি! নমিতা আঁতকে উঠল—কি হয়েছিল?

—হিন্দী-বাংলার লড়াই। মজুমদার বললে—আরে বাপু, তোরা হলি রেল কোম্পানীর অকাজের কাজী। হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হোক আর বাংলাই হোক, তোদের কি এসে যায়? একজন আজীবন গাড়ীর নম্বর টুকে মরবি, আর একজন ঐ টরে-টক্কার ঢেঁকিকল চালিয়ে হাতের কবজি করবি ঘায়েল। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে মাথা ফাটাফাটি কেন?

—বটেই ত। সায় দিল রথীন—কি দরকার অযথা গোলমালের।

—কার কথা কে শোনে মশাই! মজুমদার গ্যাঁট হয়ে বসল চেয়ারটায়। বললে—আসল কথা কি জানেন? ওদের ঐ ঝগড়াটা আজকের নয়। হিন্দী-বাংলা নয়, বহুদিন থেকে ওরা পরস্পর মুখিয়ে আছে এক ব্যাপারে।

নমিতা আবার গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। কেৎলীতে জল চাপাল।

রথীন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার?

—আর বলবেন না। মজুমদার এই প্রশ্নটারই যেন অপেক্ষা করছিল এমন ভাবে বললে—রেল কলোনীর ব্যাপার ত জানেন না, এখানে মুখে সবাই পড়শী। এমন ভাব দেখাবে যে, আপনার আপদ-বিপদ তাদেরই। কিন্তু মনে মনে দেখুন গে, সবাই আপনার মাথাটা বে-ধড় করবার তাল আঁটছে। এই চন্দ আর সিংয়ের ব্যাপারটাই দেখুন না কেন। দুটোই অল্প বয়সের ছেলে, বন্ধুত্বও জমেছিল বেশ। তা কোত্থেকে এসে পড়ে মাঝ থেকে গোল পাকালে ঐ ইন্দারজিত প্রসাদ আর তার মেয়ে ললিতা প্রসাদ। ঐ ছোঁড়া দুটো মাছির মত লেগে গেল মেয়েটার পিছনে। ইন্দারজিত প্রশ্রয় দিত হরদেও সিংকে, আর ললিতা বুঝি চন্দকে। মুখ দেখাদেখি ত বন্ধ হ'লই, শেষে এই কাণ্ড।

—ও তাই বলুন! হাঁফ ছাড়ল রথীন—এ সব ছেলে-মানুষী ঈর্ষা, বুঝলেন না!

একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল মজুমদার, হাতের মুঠোয় দেশলাই কাঠিটি জ্বালিয়ে বাগিয়ে ধরেছে। মুখ তুলে বাধা দিলে বিড়ি ঠোঁটে চেপে—না মশাই, এ উৎপাত এখানে লেগেই আছে। শুধু ছেলেদের কেলেঙ্কারীই নয়, বুড়োরাও যা খেল দেখাল সেদিন।

নমিতা এসে ঢুকল—এক হাতে ধূমায়মান চায়ের কাপ, আর এক হাতে একটি ডিসে কয়েকখানি পরোটা। বললে—খেল-এর খবর পরে শোনা যাবে মজুমদার মশাই, আপাততঃ এগুলোর একটা ব্যবস্থা করুন দেখি।

তা ব্যবস্থা করলে মজুমদার। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে—লোভ দেখিয়ে দিচ্ছেন বৌদি, এর পর কিন্তু হামেশা আসব ব্যবস্থা করতে।

চকিতে রথীনের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল নমিতার। কি বুঝল সেই জানে, বললে—আসবেন বৈকি, নিশ্চয় আসবেন।

আগেকার কথা চাপা পড়ে গেল মজুমদারের। বললে—বাজার হয়ে গেছে নাকি আপনাদের ?

সহাস্যে রথীন বললে—হ্যাঁ, হয়ে গেছে।

মজুমদার উঠে পড়ল। বললে—আমাকেও ত বাজার করতে হবে। সিতোয়া বসে থাকবে হয় ত।

নমিতার কি যে হয়েছে আজ হাসছে অনবরত। মজুমদার চলে যেতেই বললে—আসতে ত বলে দিলাম তোমার ঐ ভদ্রলোককে। কিন্তু এবার যদি দল পাকিয়ে আসে ?

গম্ভীর হয়ে রথীন বললে—মিশে যেতে হবে ওদের সঙ্গেও। নতুন নিয়মে, নতুন করে। তার পর একদিন ওরা যখন পিছু ফিরে তাকাবে, তখন হয় ত ঘৃণায় ফিরিয়ে নেবে মুখ। তখন আবার পথ খুঁজে নিতে হবে কোথাও।

হাসতেই থাকল নমিতা। বললে—সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়। ঘরই যখন ছাড়লে তুমি, তখন এই বরকাকানা রেল-কলোনীও যদি ছেড়ে যেতে হয় দুঃখ করব না। তুমি আছ আমার, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি কাদা ছড়ায়, তবে সে আমাকে স্পর্শও করবে না। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব তোমার সঙ্গে। আর দু'চোখ ভরে দেখব, কত নোংরা ঘাঁটতে পারে মানুষ।

রথীন কথা বলল না। ওর সৎসাহসের, ওর একনিষ্ঠার ওর প্রেমের দাম দিল না কেউ। শুধু ঘৃণা করল, শুধু মুখ ফিরিয়ে রইল। আজ এতদিন পরে মনে হ'ল ওর, বড় ক্লান্ত সে, বড় অসহায়।

দু'দিন পরে ডিউটিতে রিপোর্ট করল রথীন। আলাপ হ'ল অনেকের সঙ্গেই, বিশেষ করে বাঙালীরা ওকে ডেকে নিল সাগ্রহে। মনের ভার অনেক হালকা হয়ে গেল রথীনের।

দেশ বিদেশের নানা রকম বইয়ের একটি মাঝারী সংগ্রহ আছে রথীনের, লাইব্রেরীও বলা যায়। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ হরেকরকম বই। যখন থাকে না রথীন, খুঁটিনাটি কাজ সেরে বই নিয়ে বসে নমিতা। দেশ-বিদেশের কত মানুষের মনের ছাপ আঁকা, কত জীবনের হাসি-কান্নার দোলা-লাগানো কাহিনী। বইয়ের মধ্যে ডুবে যেত নমিতা, অন্ততঃ ডুবে থাকতে চাইত।

কখনও-বা তানপুরাটা নিয়ে বসে দরজা বন্ধ করে। কখনও ভৈরবীর চপল ছন্দে, কখনও বেহাগের করুণ কান্নায়, কখনও দরবারীর। উদার গাম্ভীর্য্যে ওর কণ্ঠ লীলায়িত হয়ে ওঠে। জীবনে যা হারাল, তার চিন্তা নয়। যা পেল হৃদয় ভরে, অন্তরের অণু-পরমাণুতে যাকে অনুভব করতে পারল, সেই বাধাহীন প্রেম। যে প্রেম ভিক্ষা চায় না, যে প্রেম দাবী জানায় না। যে প্রেম ওর সারা দেহ ও অন্তরের তট ভেঙে দিশাহারা আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিতে পারে, তার চিন্তা। চাওয়া আর পাওয়ার ঊর্দ্ধে মানুষের আকূতি যেখানে গুমরে মরে, সেখানে উঠবার সাধনা। কখনও চোখের জলে, কখনও হাসির মূর্চ্ছনায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অবলম্বনে সেই অদৃশ্যের আরাধনা।

মানুষ যা খুশি ভাবুক, যা খুশি বলুক, যেমন চায় করুক। কিছু এসে যায় না। হারিয়েছে সে সব কিছু। কিন্তু হারিয়েছিল বলেই নতুন করে সর্ব্বস্ব পেয়েছে। ওর দুকূল ছাপিয়ে হৃদয় পরিপূর্ণ করে, যা হারিয়েছিল তার অনেক বেশী।

কেন সে ফেলবে চোখের জল ? কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে অতীতকে স্মরণ করে ? যে গেছে সে মুছে যাক, সে ক্ষত পড়ে থাক চোখের আড়ালে। যা পেল, জীবনে তার চেয়ে বেশী কিছু পাবার নেই।

দিনের পর দিন মন বাঁধল নমিতা। হাসি আর গানে ধুয়ে দেবার চেষ্টা করল রথীনের মনের কোণের বিষণ্ণতা। আবার ওরা আকাশের তারায় তারায় দেখল আনন্দের জাগরণ, পাখীর কাকলিতে শুনল নতুন জীবনের গান। গাছের পাতায় পাতায় নবীন সূর্য্যের দিঙনির্ণেয়ী আলোর ঝিকিমিকি।

রাঁচী এক্সপ্রেস হু-হু হুস্‌হুস্ করে বেরিয়ে যায় কলোনী কাঁপিয়ে। গোমো-ডিহরী অন শোন লাইন ধরে ছুটে যায় টাটা-পাটনা প্যাসেঞ্জার। সামনের রাস্তায় তীক্ষ্ণ হর্ন বাজিয়ে ছোটে লরী, বাস, মোটরগাড়ী, চলে টুংটাং সাইকেল রিক্সা। পাহাড়ে পাহাড়ে তিমিরাবগুণ্ঠনের মাঝে জ্বলে জ্বলে ওঠে আলোর মালা। পলাশ আর মহুয়ার শাখায় শাখায় আসে বসন্তের মন্ত্র-গুঞ্জরণ।

আর বরকাকানা রেল-কলোনীর এল্ ফিফ্‌টিনের ঘরে বসে দুটি উচ্ছল প্রাণ নতুন জীবনের স্বপ্ন বোনে। লেকের ধারে কলোনীর ছেলেমেয়েরা খেলে বেড়ায় ছুটে ছুটে। বৃদ্ধেরা লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে গল্প করতে করতে পথ চলেন। পরিশ্রান্ত ঘর-ফেরা রেল-কর্ম্মচারীরা দল ধরে আসে ভারী জুতোর গটগট শব্দ তুলে। ওরা দেখে আর চোখে চোখে চেয়ে হাসে।

রথীন একদিন এসে বললে—হিরণ্ময় ট্রান্সফার নিয়েছে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের হেড আপিসে, অন প্রমোশন। আমায় লিখেছে, ইচ্ছে করলে আমরা যেতে পারি, ও ব্যবস্থা করে দেবে, যাবে নাকি ?

—কি দরকার ? নমিতা উচ্ছল হয়ে উঠল—বড় ভাল লাগছে এখানকার জীবন। প্রয়োজন কি আর দূরে যাবার ? কিন্তু তোমার কি মন চাইছে ?

—না, না। রথীন হাসিমুখে বললে—তোমার কথা ভেবেই বলছিলাম। এখানে হয় ত একা একা তোমার ভাল লাগছে না, ওখানে গেলে হয় ত খানিকটা বৈচিত্র্য থাকত, ওকে লিখে দিই, যে একথা পরে ভেবে দেখব, কি বল ?

—তাই ভাল। নমিতা বললে—নেহাৎ যদি শেষ পর্য্যন্ত ভাল নাই লাগে, তখন যাওয়া যাবে। বেচারা হিরু ঠাকুরপো আমাদের জন্যে অনেক করেছে, আর কেন ?

—তা থাকগে। রথীন উঠে দাঁড়াল—আজকের বিকেলটা কি সুন্দর দেখেছ ? চল ঐ কলকনিয়ার দিক থেকে ঘুরে আসি।

—চল। সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল নমিতা, বললে—একটু দাঁড়াও তুমি, আমি ঝপ করে কাপড়টা পালটে নিই।

মাঝে মাঝে আসে মজুমদার। কখনও তার সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ মিত্তির, তার বউ। কখনও সন্ধ্যায়, কখনও সকালে। যখন ডিউটি থাকত না রথীনের। নানা সুখ-দুঃখের কথা হ'ত। আর ধ্বংস হ'ত নমিতার চা-পরোটা।

ডিউটিতেই আলাপ হয়েছিল কয়েকজনের সঙ্গে। হেড টি-সি আনন্দীরামই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তুষিত দাশ-গুপ্ত, নিতাই রায় আর অবন্তী মণ্ডল। চেকিং ষ্টাফ বলতে বেশীর ভাগই বাঙালী। শুধু বিহারী লালতাপ্রসাদ আর ইউ-পি'র রামস্বরূপ সিং বাদে।

কখনও গেট, কখনও প্লাটফরম চেকিং কখনও বা রিটার্ন ডিউটি পড়ত বিভিন্ন শিফ্‌টে, পারমানেণ্ট আপিস ডিউটিই নেবার ইচ্ছে ছিল রথীনের, কিন্তু ডে-শিফটের উপর লোভ সকলেরই, পাওয়া যায় নি তাই। মোটের উপর তাই ভালই লাগছিল রথীনের।

ট্রেণের সংখ্যাই বা ক'খানা। সকালে বিকেলে আজ ডাউন রাঁচী এক্সপ্রেস, ডাউন পাটনা প্যাসেঞ্জার আর কয়েক খানি লোক্যাল ট্রেণ। শিফ্‌টে দু'খানার বেশী নয়, কাজ বলতে ঘণ্টাদুয়েক। বাকী সময় টিকিট কালেক্টার্স আপিস সরগরম। হালকা সুরে দিন কাটিয়ে যাওয়া।

কখনও ঘুমিয়ে, কখনও বই পড়ে সময় যখন কাটত না, তানপুরার সুরও লাগত একঘেয়ে, তখন ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ত নমিতা। হাসপাতালের পাশ কাটিয়ে লেকের জলে ছায়া ফেলে ফেলে, পীচের সড়ক ছেড়ে আঁকাবাঁকা পথে পথে, পাহাড়ী গ্রামের পথে এগিয়ে যেত নমিতা। রেল কলোনীর কোলাহল থাকত পিছনে পড়ে, শুধু মাঝে মাঝে শান্টিং ইঞ্জিনের হুইস্‌ল ভেসে আসত। সারা আকাশকে রক্তস্নান করিয়ে দূরের পাহাড়ের পিছনে ডুব দিত সূর্য্য। আর পথচলার আনন্দে ঘরে ফিরত নমিতা।

কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে ও আলাপ করে নি। পরিচয় হয় নি কোন স্বতঃপ্রণোদিতা সঙ্গিনীর সঙ্গে, একাই ভাল—নিরবলম্ব। দু'চোখ ভরে দেখা, হৃদয়ের কোণে কোণে সঞ্চয় করে রাখা। কথার প্রয়োজন নেই, শুধু উপলব্ধি। প্রকৃতির অণুপরমাণু থেকে শুধু মধু আহরণ করে নেওয়া।

নির্জ্জন মাঠের মাঝে যেতে যেতে গুনগুন করে গান ধরত নমিতা। মাথার উপর সার-বাঁধা নীড়-ফেরা বকের দল উড়ে যেত। সোনালী রঙের পড়ন্ত রোদে মহুয়ার পাতায় লাগত ঝিকিমিকি। রাঙা পলাশের আগুন লাগত যেন বনে বনে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখে দেখে হতবাক্ হয়ে যেত নমিতা। এই ভাল, এই ভাল ; এমনি করে সব থেকে দূরে সরে থেকে পথের নির্জ্জনতায় নিজের মর্ম্মোদ্ধার করা। আত্মোপলব্ধির মাঝে প্রকৃতির পরিচয়লিপি গেঁথে নেওয়া, এই ভাল।

কিন্তু এত সুখ কি নমিতার ভাগ্যে লিখেছেন বিধাতা ? রথীন কি নিয়ে এসেছে এত স্বস্তির সৌভাগ্য ? এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মাঝে না হলে আবার বেসুরো বাজবে কেন ?

কোথায় কলকাতা আর কোথায় বরকাকানা। এখানকার মানুষ কখনও দেখেনি যন্ত্রদানব কলকাতার কাতর আর্ত্তনাদ, ওখানকার রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলা লোক উপলব্ধি করেনি এখান-কার পাণ্ডুর প্রান্তর আর ধূসর পাহাড়ের ব্যাপ্তি। তবুও বাদ সাধলেন বিধাতা।

সুখবর ছড়ায় কিনা জানি না, কিন্তু অমঙ্গল সংবাদ ঠিক পৌঁছে যায় লোকের মুখে মুখে। না হলে নমিতার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জানবার কথা ছিল না বরকাকানা রেল-কলোনীর বাসিন্দাদের। ওদের ক্ষতবিক্ষত মনের গভীরে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনাও ছিল না কোন।

তবু সে রটনা ছুটে এল রথীন-নমিতার পিছে পিছে, কালকেউটের মত বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে। বহন করে নিয়ে এল নতুন এ-এস-এম অনিমেষ ঘোষ, হাওড়া বিলিভিং, এখানে নতুন পোষ্টিং পেয়ে আসা।

বললে প্রথম রথীনকেই—আপনিই আর. সরকার, না ?

নতুন মুখ দেখে রথীন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন ত ?

ওকে আপাদমস্তক কয়েকবার নিরীক্ষণ করলেন এ-এস-এম ঘোষ। যেন লেহন করলেন চোখ দিয়ে। আপনিই ত হাওড়া থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছেন, না ?

ভীরু সন্ত্রাসে বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত চমকে উঠল রথীনের। বললে—তাই বটে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখখানা বেশ করে রগড়ে

ঘগড়ে মুছলেন ঘোষ। বললেন চেপে চেপে—আপনি কি সপরিবারেই এসেছেন, না একাই!

মনের ভীরু মানুষটা এবার মরিয়া হয়ে উঠল রথীনের। বললে—সে কথার জবাব পরে দিচ্ছি। আগে বলুন এত কথা জিজ্ঞেস করবার অর্থ কি!

—না না, অর্থ আর কি। কুটিল হাসিতে ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করে ঘোষ বললেন—অর্থ কিছুই নয়। সেদিন হাওড়ায় শুনলাম আপনার মত জীবনের কাহিনীটা, ভেরী স্যাড্। আপনার সৎসাহস রিয়েলী ওয়াণ্ডারফুল।

তীব্র ঘৃণায় আর আকুল উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ বুজে এল রথীনের। ঘোষের কৌতুকোচ্ছল চোখের দিকে তাকিয়ে মাথাটা ওর দপদপ করতে লাগল বৃথা আক্রোশে। এত দূরে এসেও পরিত্রাণ পাবে না সে মানুষের ক্রূর কুৎসা থেকে। পাগলা কুকুরের মত তাড়া করে ফিরবে দেশ থেকে দেশান্তরে!

গেট দিয়ে কত লোক পার হয়ে গেল, কিছুই দেখল না রথীন। ওর শুধু মনে হতে থাকল, এত নিষ্ঠুর কেন পৃথিবী? কেন এত নির্দয়? সমবেদনা নেই, মায়া নেই, সৎ-সাহস নেই একটি জীবনকে স্বীকৃতি দেবার?

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যেতে কয়েকটি ঘণ্টাই যথেষ্ট। লোকের চোখে চোখে রথীন দেখল, কৌতূহলের আড়ালে ঝিক্‌মিক্ করছে নিষ্ঠুর ঘৃণা আর কৌতুক। ওর স্ত্রীর চারিত্রিক দৈন্য জেনে গেছে সকলে। দাশগুপ্ত মুখ মটকে হাসল, নিতাই রায় কপট সমবেদনায় তীব্র ইঙ্গিত জানিয়ে গেল। মজুমদার ওকে দেখেও না দেখার ভান করে সরে গেল।

আশ্চর্য্য! সব মানুষের মন এক কথা বলে। ওদের মেনে নিতে পারল না কেউ। অস্থির নৈরাশ্যে পদচারণা করতে করতে একসময় থমকে দাঁড়াল রথীন। ভাবল কয়েকটি মুহূর্ত্ত, তার পর ছুটল টেলিগ্রাম আপিসের দিকে। জানাতে হবে হিরণ্ময়কে, সে রাজী। যেখানে বলবে সে, সেখানেই যাবে রথীন। যত দূর, তত ভাল। এ নিষ্ঠুর রটনা আর রসনার রেশ যেখানে পৌঁছয় না, সেখানে। হোক সে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, হোক সে তুষারমৌলী হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ। যাবে রথীন, পশু আর অরণ্যের মাঝেই সে থাকবে সারাজীবন, তবু এই মানুষের সমাজে আর নয়।

চোখ দুটো ওর লাল হয়ে গেছে। রাত্রি জাগরণ আর দুশ্চিন্তায়। নমিতা বুঝল না।

ভোরের আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছে নমিতাকে। স্নেহে মমতায় ভিজে গেল রথীনের মনটা। বললে—মিতা, ইচ্ছেটা পালটেই ফেললাম। টেলী করে দিয়েছি হিরুকে। আমি রাজী।

—সে কি! বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকাল নমিতা—সেদিন যে লিখলে যাবে না?

ইচ্ছে হ'ল, কথাটা বলে; কিন্তু কি হবে বলে। শুধু শুধু আঘাত দিয়ে আর কি হবে ঐ আহত বুকখানায়। ওর নরম মনটার উপর দিয়ে অনেক অত্যাচারের স্রোতই ত বয়ে গেল, আর নয়।

বললে, মন টি কছে না এখানে। তা ছাড়া তা ছাড়া··· আপিসটাও সুবিধের নয়, বড় কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে। আমাদের দূরই ভাল নমিতা, অনেক··অনেক দূর। যেখানে এ দেশের মানুষের নজর পৌঁছবে না।

অবাকবিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে নমিতা শুধু তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

বিদিশা ও কানেরি

৪

ধীরে ধীরে মোটর অভিমুখে রওনা হই। চোখের সামনে ভাসতে থাকে ভাজার বিহারের প্রাচীরের অঙ্গের দৃশ্যাবলী। ভেসে ওঠে চৈত্যের সম্মুখভাগ ও তার লুপ্ত গৌরবের এক মহিমময় ইতিহাস। জানতেও পারি না কখন মোটরে উঠে বসি আর মোটর ছাড়ে। সম্বিৎ ফিরে আসে একটা বিরাট ঝাকানি দিয়ে মোটর থেমে যাওয়ায়। রুদ্ধ হয় মোটরের গতি। দেখি, সামনে প্রসারিত উঁচু-নীচু পাহাড়ের রাস্তা। সম্ভব নয় মোটরের এমন অমসৃণ পথে চলা। তাই মোটর থেকে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হই। প্রায় চার মাইল পদব্রজে অতিক্রম করলে বিদিশায় গিয়ে পৌঁছাব। দর্শন হবে তার প্রসিদ্ধ চৈত্য। বিদিশায় চৈত্য দেখে, ফিরে এসে আবার পুণায় পৌঁছাতে হবে। তবেই আজকের যাত্রার পরিসমাপ্তি হবে।

উঁচু-নীচু অমসৃণ পাহাড়ের রাস্তা, দুর্গম ও সহজ নয় পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা, নয় সুন্দরও। তবুও সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয় লঙ্ঘন করে সমস্ত বিঘ্ন।

ডাঃ সান্যাল ত রেগেই আগুন। তিনি মোটরবিহারী, অধিকারী মোটরের, অভ্যস্ত নন পায়ে হেঁটে চলায়। সুখী ধনী ও ভব্য, শান্ত। অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠে তাঁর মুখে। কর্ম্মঠ, উদ্যমশীল সরকার, বয়সেও নবীনতম, আগে আগে চলে। ভ্রূক্ষেপ নাই তার রাস্তার অমসৃণতায়, মানে না সে কোন বাধা। অগ্রসর হয় বীরদর্পে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। আমিও কষ্ট অনুভব করি। অনভ্যস্ত আমিও এই রকম পথ চলায়। কিন্তু আমারই উদ্যোগে আর ইচ্ছায় বিদিশায় যাওয়া। তাই শোভন নয় আমার পক্ষে কোন অনুযোগ করা, রুদ্ধ অভিযোগের পথও, চলতে হয় হাসিমুখেই। নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হয় এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার সমস্ত গ্লানি। বাদ-প্রতিবাদের কলরোলে সমস্ত রাস্তা মুখরিত করে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে আমরা বিদিশার গুহামন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। তখন তপনদেব পশ্চিম গগনে এগিয়ে আসেন, ম্লান হয়ে আসে তাঁর তেজ, প্রশমিত হয় দীপ্তি।

নির্ম্মিত হয় এই চৈত্যটি খ্রীষ্টের জন্মের একশ পঁচাত্তর বছর পূর্ব্বে। সুঙ্গ রাজারাই নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীনতর কার্লির চৈত্যের অপেক্ষা বুকে নিয়ে আছে এই চৈত্যটি অনবদ্য শিল্পসম্ভার, নিদর্শন প্রকৃষ্টতম আর সুন্দরতম বৌদ্ধ চৈত্যের এক সুন্দরতম সৃষ্টির, এক অমর কীর্ত্তির।

ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এগিয়ে আসি। দেখি, বিভিন্ন এই চৈত্যের সম্মুখভাগের পরিকল্পনা, পৃথক নির্ম্মাণ-কৌশলও। ভাজার চৈত্যের সম্মুখভাগের সঙ্গে মেলে না। অনুরূপ নয় কার্লির চৈত্যের সম্মুখ ভাগেরও।

পশ্চিমঘাটের শৈলমালার অঙ্গ কেটে নির্ম্মিত হয় চৈত্যের সম্মুখ ভাগ, একটি অলিন্দ, পেছনে তার অর্দ্ধ-গোলাকৃতি পর্দ্দা। রচিত হয় অলিন্দে চারিটি পঁচিশ ফুট উঁচু অপরূপ সুষ্ঠু-গঠন স্তম্ভ, স্তম্ভের দুই পাশে উদ্গত স্তম্ভের বেষ্টনী। অনুরূপ এই স্তম্ভগুলি প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত স্তম্ভের, শীর্ষে নিয়ে আছে ঘণ্টা, ঘণ্টার অঙ্গে শিরা। ঘণ্টার শীর্ষদেশে শোভা পায় চতুষ্কোণ আসন। চারিটি থাকে বিভক্ত এই আসন—আসনের উপর তিনটি মূর্ত্তি, মূর্ত্তি অশ্বের, হস্তীর আর ষণ্ডের। প্রতিটি অশ্ব ও হস্তীর পৃষ্ঠে বসে আছে এক-জন নর সঙ্গে নিয়ে একটি নারী। বিস্তৃত তাদের পদযুগল। সজ্জিত তারা বহুমূল্য বসনে, ভূষিত মূল্যবান ভূষণেও। অনবদ্য, জীবন্ত সুষ্ঠু-গঠন এই মূর্ত্তিগুলির। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের ভিতরের স্তম্ভের শীর্ষদেশের মূর্ত্তির, পড়ে সমপর্য্যায়েও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে বৌদ্ধ স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, যেন রচিত হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে। তাই মহিমময়; সুন্দরতম, পরিচায়ক তাঁদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-জ্ঞানের। অশোকের স্তম্ভের উন্নততর সংস্করণ এই স্তম্ভগুলি। কিন্তু বিভিন্ন এই স্তম্ভগুলির দণ্ডের আকৃতি। অষ্টকোণ, বৃত্তাকার নয় অশোকের স্তম্ভদণ্ডের মত। বিভিন্ন পাদদেশের গঠনও রচিত হয় বৃত্তাকার পাত্রের আকারে। নাই এই পাত্রের আকার অশোকের স্তম্ভের পাদদেশে। রচনা করেন স্থপতি স্তম্ভের শীর্ষদেশের মূর্ত্তির উপর অলিন্দের ছাদ। তার অঙ্গেও কাঠের তৈরী শিরার আকারে কড়ি, নির্ম্মিত মন্দিরের ভিতরের ছাদের অনুকরণে।

স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলে নির্ম্মিত হয় দুইটি খিলানযুক্ত মন্দিরের প্রবেশ-পথ, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তাদের শীর্ষদেশ। তার উপরে রেল। অলিন্দের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য্য-গবাক্ষ। অনুরূপ প্রবেশ-পথের শীর্ষ-দেশের—আকৃতিতে ও গঠনপ্রণালীতে। সবার উপরে শোভা পায় একটি অলিন্দ, অঙ্গে নিয়ে অনুপম, সুন্দরতম রেল, শীর্ষে নিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য্য-গবাক্ষ—অনুরূপ প্রথম সূর্য্য-গবাক্ষের আকৃতিতে ও গঠনে। দেখি স্তব্ধ হয়ে সম্মুখভাগের এই মহিমময় পরিকল্পনা,

:আর তার অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান। দেখি বৌদ্ধ স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

চৈত্যের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি। পরিধি তার সাড়ে পঁয়তাল্লিশ ফিট দীর্ঘ, একশ ফিট প্রস্থ। ক্ষুদ্রতর কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের তুলনায়। দশ ফিট উঁচু স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয় তার কেন্দ্রস্থলকে তিন দিকের গলিপথ থেকে। অষ্টকোণ এই স্তম্ভগুলি, দাঁড়িয়ে আছে দণ্ডের আকারে। নাই তাদের শীর্ষদেশে কোন শিল্পসম্ভার। বৃত্তাকার নয় তাদের পাদদেশও। বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি স্তম্ভ শুধু বুদ্ধের প্রতীক।

রচিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশে অর্দ্ধগোলাকৃতি পিলানযুক্ত অপরূপ ছাদ, তার অঙ্গেও ঘন-সন্নিবিষ্ট কাঠের সমকেন্দ্রিক কড়ি, রচিত শিরার আকারে। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের ছাদের, মহিমময় পরিকল্পনায় আর সুন্দরতম রূপদানে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

চৈত্যের প্রান্ততম প্রদেশে বৃত্তাংশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধগোলক স্তূপ—মহিমময়। অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি স্তর, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা আর ছত্র। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের গঠনে। কিন্তু সুন্দরতর ও শোভনতর এই স্তূপটি। নাই রেল এই স্তূপের অঙ্গে, নাই অন্য কোন ভূষণও। চিত্র-সম্ভারে শোভিত ছিল এই স্তূপের অঙ্গ। ছিল প্রাচীরের গাত্র আর স্তম্ভের অঙ্গও। নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই চিত্রসম্ভার কালের করালে, নাই কিছু অবশিষ্ট।

মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখি এই মহামহিমময় স্তূপ, ভক্তিভরে প্রণতি জানাই বুদ্ধকে, জানাই তথাগতকে। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠে এক অপরূপ দৃশ্য, দৃশ্য এক পূর্ব্ব গৌরবের।

দু'হাজার বছর আগে, খ্রীষ্টের জন্মের শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবল হয় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ কৃষ্টি উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। নির্ম্মিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-মন্দির। অঙ্গে নিয়ে স্তূপ বা দাগোবা, বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক, পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গ কেটে ভাজাতে, বিদিশাতে, কার্লিতে, নাসিকে, আর কনুড়নে। হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাতেও। বাস করেন এই সব স্থানে কত শত বৌদ্ধ শ্রমণ। তাঁদের অঙ্গে শোভা পায় হরিদ্রা আর ঘন পীতবর্ণের বসন, বিস্তৃত পা পর্য্যন্ত। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ছড়িয়ে পড়ে সেই পুণ্যধ্বনি দিকে দিকে। মুখরিত হয় দিগন্ত।

অবসান হয় রাত্রি। ঘুম ভাঙে তাঁদের পাখীর কাকলিতে। প্রাতঃকৃত্য সেরে তাঁরা সজ্জিত হন পীত বসনে। যাজকের নির্দ্দেশে নিনাদিত হয় ঢক্কা, নির্দ্দেশক পূজার সময়ের। চৈত্যের সামনে বসে বাদকেরা সেই ঢাক বাজান। প্রতিধ্বনিত হয় তার আওয়াজ নিভৃত-নির্জ্জন পর্ব্বত-কন্দরে, হয় গিরিগুহায় আর শৈল শিখরে—ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। পৌঁছায় বিহারে অধিষ্ঠিত শ্রমণদের কানেও। নিদ্রাভঙ্গে পূজায় জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। আসেন নগ্নপদে বৌদ্ধ পুরোহিত আর ধর্ম্মযাজকও। ভূষিত তাঁরাও পীত বসনে—তাঁদের হস্তে শোভা পায় পূজার উপচার। পুষ্পপাত্রে সজ্জিত কত বিভিন্ন ফুল আর ফল, কত বিচিত্র সুগন্ধি। একে একে চৈত্যের সম্মুখের প্রাঙ্গণে আর অলিন্দে এসে হাজির হন। পরিপূর্ণ হয় প্রাঙ্গণ আর অলিন্দ ধূপের সৌগন্ধে। সমাচ্ছন্ন হয় সুগন্ধি ধোঁয়ায়।

আবার নিনাদিত হয় ঢক্কা—তাঁরা পূজার উপচার হস্তে নিয়ে, শোভাযাত্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ধীরে ধীরে গলিপথ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। অবনত তাঁদের মস্তক—শব্দহীন তাঁদের পদক্ষেপ। তাঁদের হস্তের সুগন্ধি ধোঁয়া স্পর্শ করে মন্দিরের ছাদ। সুগন্ধে আমোদিত হয় গলিপথ—পরিপূর্ণ হয় সারা সভাগৃহ।

গলিপথ অতিক্রম করে মহা পবিত্র স্তূপকে বেষ্টন করে তাঁরা উপনীত হন সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে। নামিয়ে দিয়ে আসেন পূজার উপচার প্রধান পুরোহিতের হাতে। তিনি বসে থাকেন স্তূপের সামনে সভাগৃহের দক্ষিণ পাশে সুউচ্চ কাঠের সিংহাসনে। বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত সেই সিংহাসন।

স্থাপিত হয় মূল্যবান আসনও প্রতিটি স্তম্ভের পাদদেশে। বিভিন্ন তাদের বর্ণ, বিচিত্র তাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। উপবেশন করেন তাঁরা একে একে সেই সব আসনে। নিস্তব্ধ থাকে তাঁদের দৃষ্টি মহা পবিত্র স্তূপে।

সুরু হয় স্তূপের পূজা, বুদ্ধের প্রতীকের, পূজা বুদ্ধের। পূজা করেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মন্ত্র। ধ্বনিত হয় বুদ্ধের বাণী—বাণী অহিংসার, বাণী সাম্যের আর শান্তির। বাণী মোক্ষলাভের উপায়েরও। তার সঙ্গে বাজে ভেরী, বাজে শিঙ্গাও। বাজান বাদকেরা, সভাগৃহের এক প্রান্তে বসে। পূজিত হয় তথাগত।

সুউচ্চ, সুন্দরতম আবরণে ভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রধান পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের সুগম্ভীর, সুউচ্চ মন্ত্রোচ্চারণ, সুললিত ভাষণ আর সুমধুর সঙ্গীত। ভেরীর নিনাদ আর শিঙ্গার আওয়াজ। মূল্যবান বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত আসনে উপবিষ্ট পীতবসনে ভূষিত শ্রমণের দল। প্রাচীরের গাত্রের আর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প ও মূর্ত্তিসম্ভার চমৎকার। মন্দিরের ভিতরের আলোছায়ার সমাবেশ। সৃষ্টি করে এক অলৌকিক, অলোকসুন্দর পরিবেশ, এক রহস্যময় স্বপ্নপুরী, যেন কল্পলোক।

পুনরাবৃত্তি হয় এই অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাবেলাতেও, যেব দিবাকর যখন যান অস্তাচলে, পাখীর কূজনে মুখরিত হয় যখন শৈল-শিখর। হয় প্রতি সকাল সন্ধ্যায়। হয় দীর্ঘ সহস্র বৎসর। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান।

আসে নবম আর দশম শতাব্দী। প্রবলতম হন হিন্দু ভারতে। হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। প্রবলতর হয় জৈনধর্ম্মও। ক্ষীণ বল হয় বৌদ্ধধর্ম্ম, হন ভারতের বৌদ্ধেরাও। তাঁরা পরিত্যাগ করেন ভারতবর্ষ। যান তিব্বতে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে। যান যবদ্বীপে,

সুমাত্রায় আর মালয়েও। সঙ্গে নিয়ে যান বৌদ্ধ স্থপতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ কৃষ্টি। গড়ে ওঠে স্তূপ, চৈত্য আর বিহার সেই সব দেশে, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন।

পরিত্যক্ত হয় ভারতের স্তূপ, চৈত্য আর বিহার বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। অঙ্গে নিয়ে কত বহুশত বৎসরের স্থপতির আর ভাস্করের সাধনার দান, কত অমূল্য সম্পদ কত অলৌকিক কাহিনী, কাহিনী জাতকের, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর আর হিন্দু দেব-দেবীরও। পরিত্যাগ করে যান পীত-বসনে ভূষিত শ্রমণেরা, বৌদ্ধ পুরোহিত আর ধর্ম-যাজকেরা। তীর্থ দর্শনে আসেন না কোন বৌদ্ধ যাত্রী। শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় এই সব স্থান। পরিণত হয় মহা-অরণ্যে, বাসস্থান হিংস্র শ্বাপদের, বাঘ, সিংহ, ভল্লুক ও আরও কত জানোয়ারের। বাসস্থান কত ভয়াল ময়াল আর অজগরেরও। শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। চলে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আবার আসে আবিষ্কারের প্রেরণা। আবিষ্কৃত হয় তারা একে একে। ফিরে পায় তারা লুপ্ত গৌরব। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে। ছড়িয়ে পড়ে তাদের অঙ্গের অনুপম, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভারের বার্তা—তাদের প্রাচীরের গাত্রের আর স্তম্ভের অঙ্গের ও শীর্ষদেশের অনবদ্য শোভন-গঠন, মহামহিমময় জীবন্ত মূর্তি-সম্ভারের আর তুলনাহীন চিত্র-সম্ভারের। বার্তা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের। ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। আসে দলে দলে যাত্রী, আসে সুদূর বিদেশ থেকেও। নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি। ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়।

আমরাও শ্রদ্ধা জানাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থপতিকে আর ভাস্করকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে।

গভীর রাত্রিতে উপনীত হই পুণায়। পরিসমাপ্ত হয় যাত্রা।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। বন্ধুবর ভাণ্ডারী বেড়াতে এসেছেন আমাদের মাতুঙ্গার বাসায়। শুনি, আছে নাকি কানেরিতে শতাধিক গুহামন্দির। আছে বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার। বোম্বাই থেকে উনিশ মাইল দূরে বি, বি, সি, আই (অধুনা পশ্চিম) রেলে বোরিভিলি ষ্টেশন। সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কানেরির গুহামন্দির। যেতে হয় পদব্রজে।

স্থির হয় আগামী রবিবারে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে কানেরি অভিমুখে রওনা হওয়া যাবে। বন্ধুবর সঙ্গী হবেন। আর যাবেন আমার গৃহিণী আর কন্যা। সঙ্গী হবে আমার তিন পুত্রও। তারা তখন বোম্বাইতে গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করছে।

রবিবারে খাওয়া-দাওয়া করে দুই টিফিন-ক্যারিয়ারে লুচি, আলুর দম ও ডিম-সেদ্ধ ভরে নিয়ে মাতুঙ্গা থেকে ট্রেনে করে সকলে ভি. টি. অভিমুখে রওনা হই। ভি. টিতে নেমে বাসে করে চার্চগেট ষ্টেশন। সেখানে একটি দ্রুতগামী ট্রেনে চেপে বসি। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়ে।

বিদিশা—চৈত্য হল

মেরিন ড্রাইভ ষ্টেশন পেরিয়ে ট্রেন একেবারে সমুদ্র-সৈকতের কিনারা দিয়ে চলতে থাকে। বামে দিগন্তপ্রসারী আরব সাগর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে তটের উপর লুটিয়ে পড়ে। বিরামহীন সেই লুটিয়ে পড়া। দক্ষিণে অভ্রভেদী অট্টালিকার শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি প্রাসাদের মত। সামনে মালাবার হিলস, অঙ্গে নিয়ে শ্যাম আভরণ। সাগরের বক্ষ ভেদ করে ওঠে মালাবার। বিস্তৃত হয় দক্ষিণ থেকে বামে। প্রশমিত হয় তার উচ্চতা যত হয় বিস্তৃতি। শেষে মিলিয়ে যায় একেবারে আরবের বুকে। অদৃশ্য হয়ে যায় দিগন্তে। এক হয়ে যায় মালাবার, সাগর আর দিগন্ত। হারিয়ে ফেলে পৃথক সত্ত্বা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ।

সুন্দরতম মালাবার, অমরাবতী বোম্বাইয়ের, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য নয়নাভিরাম উদ্যানে বেষ্টিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার শ্রেণী—বাসস্থান বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আর ধনিকদের, আবাসস্থল ক্রোড়পতিদের। সঙ্গমস্থলে সুন্দরতম রাজপ্রাসাদে বাস করেন প্রদেশের রাজ্যপাল। শীর্ষদেশে রচিত হয় (হ্যাঙ্গিং) ঝোলানো উদ্যান। অপরূপ সুপরিকল্পিত, সুদৃশ্য, শোভন এই উদ্যানটি—বোম্বাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

বিদ্যুৎগতিতে ট্রেন এগিয়ে যায়। অন্তর্হিত হয়ে যায় সাগর

অট্টালিকার অন্তরালে, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। মালাবারও চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। অতিবাহিত হয় প্রায় একটি ঘণ্টা, ট্রেন বোরিভলি ষ্টেশনে এসে থামে। প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে বোরিভিলি। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ট্রেন থেকে নেমে কুলির হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার দুটি দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে কানেরি অভিমুখে অগ্রসর হই। মাইল খানেক পথ পরিক্রম করে আমরা জাতীয় উদ্যানে (ন্যাশনাল পার্কে) উপনীত হই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রওনা হই। সর্পিল গতিতে পথ যায়, যায় ঘন বন-বীথি ভেদ করে। কখনও উঁচুতে ওঠে, কখন নীচে নামে। মাঝে মাঝে ছুটে আসে রূপালী স্রোতস্বিনী, আসে নৃত্য-চপল গতিতে অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। ভেদ করে আসে ঘনশ্যাম বন-বীথি। আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যায় সবুজের অন্তরালে। ক্ষীণতর হতে থাকে তার কলধ্বনি। শেষে নীরব হয়ে যায় একেবারে।

অগ্রসর হই। দেখতে দেখতে যাই প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা। বাড়তে থাকে শোভা যত অগ্রসর হই। বর্দ্ধিত হয় শুভ্র শ্বেত-বসনা নৃত্য চপলা কলনাদিনীর আর ঘন-শ্যামল অরণ্যানীর লুকোচুরি খেলাও। শেষে মন্দিরের পদপ্রান্তে এসে উপনীত হয় চরমে। পরিণত হয় এক সুন্দরতম লীলা-নিকেতনে, এক নন্দন কাননে। তাই বেছে নেন এই স্থান এই স্বর্গোদ্যান বৌদ্ধ প্রধান পুরোহিত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য। পশ্চিমঘাট শৈল-মালার অঙ্গ কেটে নির্ম্মিত হয় একটি চৈত্য, বুকে নিয়ে স্তূপ রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি। সেই চৈত্যে এসে নিভৃতে, নির্জ্জনে, আলোক-সুন্দর পরিবেশে পূজা করেন বৌদ্ধ পুরোহিত, করেন বৌদ্ধ শ্রমণও। তাঁদের থাকবার জন্য নির্ম্মিত হয় একটি বিহার। ক্রমে বাড়ে শ্রমণের সংখ্যা, আসেন তাঁরা দলে দলে, আসেন সুন্দরের আকর্ষণে, বর্দ্ধিত হয় বিহারের সংখ্যাও। শেষে পরিণত হয় সেই সংখ্যা একশতে। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই স্থান। নাই এত বৌদ্ধ মন্দির অন্য কোন স্থানে। নাই বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাতে, নাই এলোরাতে, নাই নাসিকেও।

ধীরে ধীরে এসে আমরা চৈত্যের সামনে উপস্থিত হই।

হীনযান সম্প্রদায়ের শেষ চৈত্য। নির্ম্মিত হয় এই চৈত্যটি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে, নির্ম্মাণ করেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা অন্ধ্র সাত-বাহন রাজারা। লেখা আছে চৈত্যের অঙ্গে।

অপরূপ এই চৈত্যটি, দাঁড়িয়ে আছে এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গে। আছে নিভৃতে, নির্জ্জনে। বেষ্টিত হয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যানী আর রূপালী নৃত্য-পরায়ণা সর্পিল-গতি নির্ঝরিণী দিয়ে। শোনা যায় পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি। কানে ভেসে আসে নির্ঝরের মৃদু গুঞ্জনও। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখি প্রকৃতির এই স্বপ্নময় অলোকসুন্দর পরিবেশ, এই রহস্যলোক।

নির্ম্মিত এই চৈত্যের সম্মুখভাগ কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অনুকরণে। কিন্তু সুষ্ঠু নয় এই অনুকরণ। অসম্পূর্ণও। দেখি দাঁড়িয়ে আছে এক নিকৃষ্ট অসম্পূর্ণ অনুকরণ কার্লির চৈত্যের। ক্ষুদ্রতর আয়তনেও। দুই-তৃতীয়াংশ কার্লির চৈত্যের। বাইরের অলিন্দের পর্দ্দার অঙ্গে দুই দম্পতির মূর্ত্তি। তাঁদেরই অর্থে নির্ম্মিত হয় এই চৈত্যটি। অনুরূপ এই মূর্ত্তিগুলি কার্লির চৈত্যের দম্পতির মূর্ত্তির।

এই চৈত্যটির নির্ম্মাণ সুরু হয় ক্ষীণবল হন যখন হীনযান সম্প্র-দায়ের বৌদ্ধেরা। তাঁরা ভারতে প্রবল থাকেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত—দীর্ঘ চারি শত বৎসর, অন্তর্হিত তাঁদের ক্ষমতা, তাঁদের প্রভাব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাই সম্ভব হয় না তাঁদের এই চৈত্যের সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। থেকে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। বাস করেন না কোন বৌদ্ধ শ্রমণ এই চৈত্যে। পূজা দেন না কোন বৌদ্ধ পুরোহিত এই স্তূপে। থাকে না কানেরিতে কোন জনমানব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। পরিত্যক্ত থাকে কানেরি ২০০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরিণত হয় হিংস্র শ্বাপদের আবাসস্থলে। বাসস্থান হয় ভয়াল সর্পেরও।

আসে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ: প্রবলতম হন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে। আবার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থস্থানে পরিণত হয় কানেরি। ফিরে পায় তার লুপ্ত গৌরব। আসেন দলে দলে বৌদ্ধ শ্রমণ, আসেন বৌদ্ধ পুরোহিতও। বাস করেন এসে কানেরিতে। আবার মুখর হয় কানেরি পীতবসনে ভূষিত পুরোহিত আর শ্রমণের কলকণ্ঠে। প্রতিধ্বনিত হয় শান্তির বাণী, বাণী অহিংসার আর সাম্যেরও তার আকাশে বাতাসে। নির্ম্মিত হয় নূতন নূতন বিহার বুকে নিয়ে বৌদ্ধ স্থপতির প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, রচিত হয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত। নির্ম্মিত হয় মূর্ত্তি, মূর্ত্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের সেই সব বিহারে।

মূর্ত্তি দিয়ে শোভিত করা এই চৈত্যটির অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রও। রচিত হয় তার দুই প্রান্তে দুইটি পঁচিশ ফুট উঁচু মহা-মহিমময় বুদ্ধমূর্ত্তি। রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি গুপ্ত রাজাদের আমলে—তাঁদের প্রেরণায় ও অর্থে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, মহাপরাক্রমশালী, অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল প্রতাপে, হন সার্ব্বভৌম সম্রাট উত্তর ভারতের। বিস্তৃত তাঁদের আধিপত্য মালবে আর দাক্ষিণাত্যেও। তাঁরাই রচনা করেন কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অপরূপ বুদ্ধমূর্ত্তি। সুন্দরতম বুদ্ধমূর্ত্তি দিয়ে সাজান নাসিকের বিহারকেও। অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব এই মূর্ত্তিগুলির, মহা-মহিমময়। লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের মূর্ত্তিসম্ভারের দরবারে।

নিবদ্ধ থাকে পরবর্ত্তী স্থপতির উন্নততর সজ্জা শুধু এই চৈত্যের সম্মুখভাগে। প্রবেশ করতে পারে না তার অভ্যন্তরে—সভা-

গৃহে। স্পর্শ করে না স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশও, থেকে যায় অপরিবর্তিত অবস্থায়।

দেখি চৈত্যের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, বেষ্টিত নীচু প্রাচীর দিয়ে। তার প্রবেশপথে, সোপান-শ্রেণী। সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রাঙ্গণের সুবিশাল সিংহস্তম্ভ শীর্ষে নিয়ে জোড়া সিংহ। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সামনের সিংহস্তম্ভের গঠনে ও অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারে, দাঁড়িয়ে আছে এই সিংহস্তম্ভগুলি পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গীভূত হয়ে। পৃথক নয় তারা কার্লির সিংহস্তম্ভের মত। দেখি এই স্তম্ভের দণ্ডের কেন্দ্রস্থলে যদিও, বিভিন্ন কার্লির স্তম্ভের দণ্ড হতে। দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশেও চতুষ্কোণ পতাকার অঙ্গে মূর্তি দিয়ে রচিত বন্ধনী (কীচক বন্ধনী)। নাই এই বৈশিষ্ট্যও কার্লির সিংহস্তম্ভে।

দেখি স্তম্ভের পিছনে পর্দা দিয়ে রচিত চৈত্যের সম্মুখভাগ। আছে তাতে তিনটি উচ্চ চতুষ্কোণ প্রবেশপথ। দেখি এক সারিতে পাঁচটি গবাক্ষও, প্রবেশপথ মন্দিরে আলোর। আছে পর্দার অঙ্গেও অনেকগুলি ছিদ্র। খুব সম্ভব ছিল এখানেও কাঠের কাজ। ছিল কাঠের তৈরী ঝোলানো মঞ্চ, বসতেন সেখানে বাদকেরা। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে কাঠের কাজ। নাই কিছু অবশিষ্ট।

সম্মুখের পর্দার পিছনে প্রাচীরের গাত্রে দেখি একটি অনবদ্য অলিন্দ, অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সম্মুখভাগের অলিন্দের। দেখি তিনটি প্রবেশপথও। নির্মিত হয় একটি সুবিশাল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য-গবাক্ষও। শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ চৈত্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার অঙ্গের শিল্পসম্ভার। উপনীত হই অলিন্দে। দেখি তার প্রাচীরের গাত্রে ব্যালকনির ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন দুইটি দম্পতি। তাঁদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কটিদেশে কোমরবন্ধ, দক্ষিণ হস্তে চক্র। অনবদ্য তাঁদের গঠন-সৌষ্ঠব। সুন্দরতম ব্যালকনির নির্মাণ-কৌশল আর তার অঙ্গের শিল্পসম্ভারও। তাদের দুই দিকে দুইটি স্তম্ভ শীর্ষে নিয়ে দুইটি সিংহের মূর্তি। ছাদের অঙ্গে রেলের কার্নিস। অপরূপ, সুন্দরতম এই মূর্তিগুলি, রচনা করেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা। দেখি স্তব্ধ হয়ে অলিন্দের দুই প্রান্তদেশের দুই মহিমময় বুদ্ধমূর্তিও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত ভাস্করের।

সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি রচিত এই সভাগৃহটিও কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের অনুকরণে, বৃত্তাকার তার প্রান্ত প্রদেশ। ছিয়াশি ফিট দীর্ঘ, চল্লিশ ফিট প্রস্থ আর পঞ্চাশ ফিট উচু এই সভাগৃহটি দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমময় মূর্তিতে।

দেখি চৌত্রিশটি স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক করা হয়েছে স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলকে চারিপাশের গলিপথ থেকে। ঘন-সন্নিবিষ্ট এই স্তম্ভগুলিও বুকে নিয়ে আছে তাদের কয়েকটি অনুপম শিল্পসম্ভার। দেখি তাদের শীর্ষদেশেও অনবদ্য মূর্তিসম্ভার। অনুরূপ কার্লির চৈত্যের সভাগৃহের স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের এই মূর্তিগুলি, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম রূপদানে। দেখি বিস্মিত হয়ে। সময় হয় নাই অন্য স্তম্ভগুলির সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। পরিসমাপ্ত হয় নাই তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কাজ। লাভ করে নাই পূর্ণ পরিণতি।

বিদিশা—বারান্দা

কার্লির চৈত্যের অনুকরণেই নির্মিত হয় এই সভাগৃহের অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট সমকেন্দ্রিক কাঠের তৈরী কড়ি। দেখি মুগ্ধ হয়ে ছাদের নির্মাণ-কৌশল।

দেখি বৃত্তাংশে একটি মহামহিমময় স্তূপও। প্রণাম জানাই তথাগতকে।

বেরিয়ে এসে দেখতে থাকি একে একে বিহারগুলি।

উপনীত হই দশম গুহামন্দিরে। পরিচিত এই গুহামন্দিরটি দরবার-গৃহ নামে। মিলন হ'ত এই দরবার-গৃহে বৌদ্ধ শ্রমণদের। আসতেন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে; আসতেন সুদূর বিদেশ থেকেও—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা আর মালয় থেকেও। অনুষ্ঠিত হ'ত এই দরবার-গৃহে এক মহা সম্মেলন—সম্মেলন বিশ্বের বৌদ্ধ শ্রমণের। যোগ দিতেন সেই সম্মেলনে বিশ্বের বৌদ্ধেরাও। বিশ্লেষণ হ'ত ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্বের। বিনিময় হ'ত সংস্কৃতি

এই দরবার গৃহ বিশ্বের মিলনের কেন্দ্রস্থল।

সবশেষে দেখব ষ্টি নম্বরের গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি তার প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিসম্ভার। দেখি মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে

একটি উপাসনার দৃশ্য। উপাসনা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের। দাঁড়িয়ে আছেন অবলোকিতেশ্বর সঙ্গে নিয়ে দুইটি পরমা রূপবতী নারী। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ। শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ নারীদের শিরেও। উপাসনা করেন তাঁদের কত নর, কত নারী। উপরে বসে, দুই দেবতা দেখেন সেই উপাসনা। মন্দিরের দ্বারে দ্বারপাল। দাঁড়িয়ে আছে মহিমময় মূর্ত্তিতে হস্তে নিয়ে চামর। মূর্ত্তি দিয়েই রচিত দেখি দ্বারের চৌকাঠ। শোভা পায় পদ্মের বৃন্ত আর প্রস্ফুটিত পদ্মও। দ্বারপালের মস্তকের উপর এক দম্পতি বসে আছেন। দেখি গুপ্তযুগের ভাস্করের এক সুন্দরতম সৃষ্টি, এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, যেমন মহিমময় পরিকল্পনায়, তেমনই অনবদ্য সুন্দরতম রূপদানে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা জানাই স্থপতিকে। নিবেদন করি ভাস্করকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে।

ফিরবার পথে দেখে আসি মণ্ডপেশ্বর। বোরিভিলি ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত এই মণ্ডপেশ্বর। ছিল এখানে তিনটি গুহামন্দির নির্ম্মিত অষ্টম শতাব্দীতে।

পূর্ব্বদিকের গুহামন্দিরটি ছ' ফিট প্রস্থ আর একুশ ফিট দীর্ঘ। এটি একটি ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির, আছে এই মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত জলাধার।

দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গুহামন্দিরটি সাতাশ ফুট দীর্ঘ পনের ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। রচিত দেখি তার প্রাচীরের গাত্রে গণদেবতার মূর্ত্তি।

বৃহত্তম পশ্চিম প্রান্তের তৃতীয় গুহামন্দিরটি, একটি বৌদ্ধবিহার। বাস করতে পারতেন এই বিহারে দশ থেকে বার জন বৌদ্ধ শ্রমণ। ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হয় এই বিহারটি। উৎপাটিত হয় তার প্রাচীরের গাত্র থেকে বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একেবারে। পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জজের আদেশে চার্চের প্রতিপালনে ব্যয়িত হয় এই মন্দিরের আয়।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হয় নাই ভারতের আর কোন মন্দির। বাজেয়াপ্ত হয় নাই মন্দিরের সম্পত্তি। একমাত্র ব্যতিক্রম এই মণ্ডপেশ্বর। আজও তার স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে এখানে একটি অনাথ আশ্রম। আছে একটি পর্তুগীজ ধর্ম্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও।

আমরা মণ্ডপেশ্বর দেখে ফিরে আসি বোরিভিলি ষ্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে বোম্বাইতে। তখন রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিগন্ত।

প্রাত্যহিক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সকাল সন্ধ্যা কাজ আর কাজ—
নাহি ক্ষণিকের অবকাশ,
শূন্য কঠোর এ পোড়া জঠর
করিবারে চায় সব গ্রাস!
বহিয়া মাথায় লক্ষ ঝামেলা
শুধু উঠি ছুটি খাটি সারাবেলা;—
হায় অদৃষ্ট, তবু অলক্ষ্মী
ছাড়িতে না চায় মোর পাশ!

উদয়-অস্ত করি সমস্ত—
যাহা কিছু আছে করিবার,
তিলে তিলে মরি তবু এক তিল
সময় নাহিক মরিবার!

ব্যস্ত-ত্রস্ত শ্রান্ত ক্লান্ত
হন্তদন্ত অবিশ্রান্ত;—
ব্যর্থ প্রয়াস হায় রে ভ্রান্ত,
আলেয়ার আলো ধরিবার।

এই তো জীবন!—তিক্ত নীরস,
দুঃখ-গরল মাখা সে,
সুখ?—বাজে কথা?—অতি মনোহর
কবি কল্পনা ফাঁকা সে!
আজ মৌতাত ছুট হল তাই—
ক্ষুধা যে সত্য—জানিয়াছি ভাই,
চাঁদ নয় আজ—অন্নের থালা
খুঁজে মরি সারা আকাশে!

প্রাচীর

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

রংটা মাজা মাজা। ফর্সা বলাও চলে না আবার কালো বললেও রাগ করবার আশঙ্কা ষোল আনা। মুখশ্রীও এমন কিছু আহা মরি নয়, তবে হ্যাঁ,—চোখ দুটি। অতলদীঘির কালো জল যেন বাসা বেঁধে আছে তাতে, মেঘের ছায়ায় কখনও তা নিবিড় নীল, আবার নির্মেঘ সূর্য্যের প্রখর আলোয় কখনও-বা পুলকোদ্ভাসিত। ঘন আয়ত পক্ষ্ম দুটি যেন দীঘির কোলে ঘনশ্যামল তালীবনের ইশারা। নামটিও সম্ভাবনাপূর্ণ।

লিপিকা।

আমি লিপিকার। এক মুহূর্তেই যে ওর প্রেমে পড়া সেটা যেন ছিল বিধাতারই অলক্ষ্য বিধান। কিন্তু···

প্রথম দেখা বুড়ীগঙ্গার ধারে। বিকালবেলার উজ্জ্বল-পাণ্ডু আকাশের রং ঝিকিমিকি এঁকে দিচ্ছে চলমান জল-স্রোতে। বাঁধের রাস্তার অবিরল জনস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল সে, বেগুনী রঙের স্তবকিত কচুরী-কুসুমগুচ্ছের মত।

এগিয়ে গেলাম। কিন্তু রোমান্সের সূত্রপাতেই মুদ্গরা-ঘাতের মত ভুঁই ফুঁড়ে চোখের সমুখে আবির্ভূত হলেন ছেড়ে-আসা ইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়।

সংস্কৃত দেবভাষা মানি, তবু দেবতা নই বলেই বুঝি তার থেকে শতহস্ত দূরে থাকাটাই শ্রেয়ঃ মনে করে এসেছি চিরটা কাল। তাই বহুদিন আগেকার দুঃস্বপ্নের মত শত লাঞ্ছনা-বিজড়িত ইস্কুলিক দিনগুলি পণ্ডিত মশায়ের শরীর থেকে যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাঁর স্বস্তিবাচন, কুশল প্রশ্ন সবই দূরাগত সমুদ্র-গর্জনের মত অর্থহীন বলে মনে হ'ল।

কিন্তু আশ্চর্য! স্বল্প আলাপনের পর স্বস্তিমুখে আবিষ্কার করলাম যে, সংস্কৃত ছেড়ে ইকনমিকস-এ এম-এ দেব শুনে খুশীই হলেন পণ্ডিত মশায়।

"ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া চাই কিন্তু বাবা—"

অপাঙ্গে অনালাপী তার দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম,"আশা ত করছি—"

আক্ষেপের সুরে পণ্ডিত মশায় বললেন—"সর্ব্বান্তকরণে তাই আশীর্বাদ করছি মলয়। ডেড ল্যাংগুয়েজের চর্চা করে আমরা ত ডেড হয়ে ফরগটেন।" একটা নিশ্বাস পড়ল তাঁর।

পশ্চিম দিগন্তের মেঘে মেঘে তখন আসন্ন সূর্যাস্তের সকরুণ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে।

"এটি আমার মেয়ে লিপিকা, দেখেছ বোধ হয় এর আগে, খুব ছোট ছিল তখন।" সস্নেহে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন পণ্ডিত মশায়।

মনে পড়ল—ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটি, সংস্কৃত পরীক্ষার নম্বর জানতে পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি গেলে মিনমিনে গলায় বলত—"বাবা বাড়ী নেই, অথবা বাবা বললেন, আপনি কেল।"

কিন্তু আজ আর সাহস করে তার মুখের দিকে তাকাতেই পারলাম না।

ব্রীড়া-কুণ্ঠাভরা আমাদের অতর্কিত সাক্ষাৎ লিপিকা কি ভাবে নিল কে জানে!

২

নববর্ষার সবুজ সকালে রমনার মাঠ সবুজে সবুজ। সবুজ শাড়িতেই ভাল মানাত, কিন্তু না, ফিকে কমলা রঙের শাড়ী পরে' উয়ারী ক্লাবের পাশ দিয়ে সেগুন-বাগিচার দিকে যাচ্ছিল লিপিকা। নববর্ষার ছোঁয়ায় ফুলে-ওঠা নদীর মতই যৌবনের উচ্ছ্বাস জেগেছে ওর দেহে।

এক খণ্ড মেঘের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল লিপিকা। আজ একা। কাছাকাছি হতেই মুখ তুলে তাকাল সে। সলজ্জ একটু হাসি যেন খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে।

"বাড়ী ফিরছ?"

মাথা হেলিয়ে ও বলল—"হ্যাঁ।" ওর চঞ্চল চোখে কৌতুকের ঝিকিমিকি। ছেলেবেলার দ্বিধা-সংশয়ভরা সাক্ষাৎ-গুলি বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ল আমার। কি বলব ভেবে পেলাম না।

পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমরা দুজনে নীরবে। সহসা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে আমার, অথচ পার্শ্ববর্তিনী আমারই কথা শুনবার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুনছে।

প্রকাশ-ব্যাকুল কথার মালা হৃদয়-দুয়ারে বৃথাই মাথা কুটে মরল।

জোর করেই যা হোক একটা কিছু বলার জন্যই হঠাৎ বলে উঠলাম—"আজ বুঝি আর বৃষ্টি হবে না।"

অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল লিপিকা। মেঘমেদুর আকাশ। নিথর-স্তব্ধ প্রকৃতি বৃষ্টির জন্য প্রহর গুনছে। আমার কথাটাই বুঝি ক্যাটালাইটিক এজেন্টের কাজ করল, অথবা আকাশে মেঘের দল অট্টহাসে উপহাস করল বুঝি আমায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চারধার লেপে মুছে একাকার করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল!

একটা বড় অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে খুব ভিজলাম দু'জনে। ছাতা ছিল না কারুর সঙ্গেই। অশ্বত্থপাতার ছুঁচলো সবুজ প্রান্ত বেয়ে বেয়ে অজস্র ধারে জল পড়তে লাগল আমাদের মাথায়। এ যেন বহিঃপ্রকৃতির অভিষেক-বারি।

রিমঝিম রিমঝিম শব্দে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ছে অবিরাম, জোলো হাওয়ায় শীত শীত ভাব। ইচ্ছে হ'ল রবীন্দ্রনাথের মত বর্ষার গান চীৎকার করে গাই।

কিন্তু তার আগেই সভয়ে শুনতে পেলাম তন্ময় চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে লিপিকা আবৃত্তি করছে:

নিতান্ত নীলোৎপল পত্র কান্তিভিঃ
কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জন রাশি সন্নিভৈঃ।
কচিৎ মগভ প্রমদা-স্তন প্রভৈঃ
সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ॥

কানের ভিতর যেন গরম সীসা প্রবেশ করল। লিপিকার বৃষ্টি-ভেজা মুখের দিকে একবার তাকিয়েই কচি ঘাসের ওপর দিয়ে ছপ ছপ শব্দ তুলে ছুটে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।

৩

লিপিকাদের বাড়ী আসা-যাওয়া সহজ হয়ে এল ক্রমে। পণ্ডিতমশায়ের আর তাঁর স্ত্রীর সাগ্রহ অনুমোদনই ছিল তাতে। কিন্তু লিপিকার মনের নাগাল পেতাম না, আমাকে দেখলেই হয় সে কুমারসম্ভব নিয়ে বসত অথবা ভটিকাব্যম। মোহমুদ্গরের শ্লোকের মতই তারা আঘাত করত আমার নীরব প্রেমের কল্পনাকে।

"কি অদ্ভুত সুন্দর এই ভাষা! তুমি শেখো না কেন মলয়? আমার কাছে তালিম নিয়ে দেখ, অল্পদিনেই শিখে ফেলবে।" অনুনয়ের সুরে কখনও কখনও বলত আমাকে লিপিকা।

তার উত্তরে রান্নাঘরে লিপিকার মার হাতে তৈরি ছানার বড়া খেতে ছুটতে হ'ত আমাকে।

আক্ষেপ করতেন পণ্ডিতমশায়—"দেখেও শেখে না পাগলী মেয়ে, ও ভাষার কি কদর আছে আর?"

আমার মনে হ'ত যেন তাঁর ঐ আক্ষেপের সুরে লুকিয়ে আছে প্রশংসার একটি সুর, তা না হলে সেকথা শুনে গর্কোৎফুল্ল চোখে আমার দিকে অমন করে তাকাত কেন লিপিকা?

মনের রঙীন আশায় বেদনার ছায়াপাত করে এমনি ভাবে কেটে গেল একটি বছর। আমার চোখের নীরব মিনতি লিপিকা বুঝল কিনা কে জানে? কঠিন পৃথিবীর দাবি মিটাতে ঢাকা ছাড়তে হ'ল একদিন আমায়, চাকরী পেলাম দিল্লী নগরীতে।

লিপিকা তখন সংস্কৃত অনার্সে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দেখা হতেই বলল—"বাণভট্টের কাদম্বরী পড়েছ মলয়? কি আশ্চর্য্য লেখা, কি অপূর্ব ভাষা-বিন্যাস। আহা—"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম—"না।"

অশ্রুসিক্ত চোখে নিবিড় আলিঙ্গন করে আমাকে বিদায় দিলেন পণ্ডিত মশায়। তাঁরই এক ছাত্র আজ রাজধানী দিল্লীতে উচ্চপদে যোগদান করতে যাচ্ছে তার সীমাহীন আনন্দ যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না তিনি আর তাঁর স্ত্রী।

আরও বছরখানেক পরে বসন্তের এক রাগরক্ত সন্ধ্যায় গোলাপী আমন্ত্রণ লিপিখানা আমার হৃদয়কে মুচড়ে ভেঙে ফেলল যেন।

বিয়ে হচ্ছে লিপিকার। বিয়ে হচ্ছে প্রসিদ্ধ এক সংস্কৃত স্কলারের সঙ্গে।

নাইটমেয়ার

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির সংবাদ অবশেষে সুদূর দিল্লীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে তাঁহার নিকট "নাইটমেয়ার" (বোবা-ধরার স্বপ্ন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এই আশা পোষণ করিতেছি, তিনি এই বোবা-ধরার স্বপ্নের মূল অন্বেষণ করিয়া তাহার প্রতিকার সাধনে প্রয়াসী হইবেন। কিন্তু তিনি যদি ইহার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারেই নিমজ্জিত হইয়া থাকিবে। বাংলার ভাগ্য-গগনে আর সৌভাগ্যের সূর্য উদিত হইবে না।

বহু দিন বহু বৎসর পূর্ব হইতেই বাংলা দেশের বর্তমান দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার প্রতি সরকারের, নেতৃবৃন্দের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সতর্কতা সর্বক্ষেত্রেই অরণ্যে রোদনের সামিল হইয়াছে। আজ যখন অবস্থা চরমে উঠিয়াছে তখনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। পশ্চিম বাংলায় ত সমস্যার সমারোহ চলিতেছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন্ বিষয় সমস্যা নাই? একের পর এক সমস্যা আসিতেছে এবং দেশের জীবনে তাহারা স্থায়ী আসন সংগ্রহ করিয়া বাঙালীর জীবনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। আজ দেশে সম্পদের নিরাপত্তা নাই, সমাজের অনুশাসন নাই, যোগ্যের মর্যাদা নাই, নাই সম্মানিতের সমাদর। চতুর্দিকেই বিশৃঙ্খলার সর্বময় কর্তৃত্ব; অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার দমনে যেমন সরকারী উদ্যম নাই, তেমনি এই দিকে জনসাধারণেরও মনোযোগ ও সহযোগিতাও নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর প্রদেশের এই অরাজক, জটিল এবং অনিয়মিত অবস্থা সত্যই উদ্বেগের কারণ। যে বাঙালী জাতি একদা সমগ্র ভারতে শতদল পদ্মের ন্যায় আপনার প্রতিভাকে প্রসারিত করিয়াছিল, সেই বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থার হেতু অনুসন্ধানের আশু প্রয়োজন। বাংলা দেশে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সমস্যা উদ্বাস্তু-সমস্যা, এ বিষয়ে আজ আর দ্বিমত থাকিতে পারে না; এবং অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সূচনা হইয়াছে তাহার মূলে এই উদ্বাস্তু-সমস্যাই বর্তমান। দেশ-বিভাগের পর প্রায় এক যুগ অতীত হইতে চলিল কিন্তু বিভাগজনিত রক্তমোক্ষণ আজিও শেষ হইল না। দেশ বিভাগে সম্মতি প্রদান করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাসিন্দারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন; সুতরাং বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দায়িত্ব একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয়, ইহা জাতীয় দায়িত্ব। এই উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানের উপরই নির্ভর করিতেছে সমৃদ্ধ এবং সম্মানিত জাতি হিসাবে বাঙালীর বাঁচিয়া থাকা। কিন্তু অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া এ ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের নামে যে নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহাকে "প্রহসন" আখ্যা দিলে সম্ভবতঃ ভুল হইবে না। সুতরাং ক্যাম্প এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে অপমানিত জীবনযাপনকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা এবং অনশনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের স্বাভাবিক জীবনকে বিঘ্নিত করিতেছে। সমগ্র পুনর্বাসন সমস্যাটিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া উপযুক্ত কর্মীদলের ও সংস্থার উপর তাহার পরিচালনার ভার দিতে হইবে; নতুবা এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। উদ্বাস্তু-সমস্যার জটিলতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, বেকার-সমস্যা ততই তীব্রতা লাভ করিতেছে; লক্ষ লক্ষ বেকারের মধ্যে আবার হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার বর্তমান; নূতন নূতন বিভাগ স্থাপন করিয়া, উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম কর্মচারী নিয়োগ করিয়াও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহার ফলে ভাগ্যবান কয়েক জনের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিতে পারে। সামান্যতম চাকুরী হইতে উচ্চ পর্যায়ের চাকুরীর সুযোগ এতই সীমাবদ্ধ যে, বেকার-সমস্যা অচল অনড় পর্বতের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। বেদনায় হতমান এই যুবশক্তির অসহিষ্ণুতার সাম্প্রতিক প্রকাশ ঘটিয়াছে কোন এক সংস্থায় সামান্য চাকুরীর জন্য 'ইণ্টারভিউ' গ্রহণের সময়। এই অসহিষ্ণুতা এবং অসন্তোষ পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনের সকল দিকেই বিদ্যমান, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সমাজের এত গভীরে ইহার শিকড় প্রবেশ করিয়াছে, যাঁহারা জনসাধারণের সঙ্গে

প্রত্যহ সংস্পর্শে আসেন তাঁহারা তাহা ভাল ভাবেই জানেন।

চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী আজ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহার বর্তমান উৎকেন্দ্রীক অবস্থার তাহাও একটি কারণ। তাহার কর্মে কাজে সুচিন্তিত পরিকল্পনার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, সরকারও যেরূপ পূর্বাপর চিন্তা না করিয়া কর্মোদ্যমে নামিতেছেন এবং ব্যর্থকাম হইতেছেন, বিরোধী পক্ষও তেমনি যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াও ঐ একই কারণে তাঁহাদের কর্মপরিচালনায় জনসাধারণের তেমন সহযোগিতা পাইতেছেন না, সম্প্রতি পর পর যে কয়টি আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পশ্চাতে প্রথমতঃ সরকারী ঔদাসীন্য ত ছিলই—নেতৃবৃন্দেরও বিচার-বিবেচনার যথেষ্ট অভাব ছিল। এই কারণেই তাহারা জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন করিতে পারেন নাই।

সমস্যার ভিড়ে ও চাপে বাঙালীর প্রতিভা আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; বাঙালীর কর্মকুশলতা লোপ পাইতেছে, সে হতাশায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। সেও "বোবা-ধরা"র স্বপ্ন দেখিতেছে। নিরুদ্ধ শক্তি যখন সুপথে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করে না তখন তাহা ভিন্ন পথে, ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে; স্বাভাবিক পথে উদ্ভাসিত হইলে যাহা সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করিত, অস্বাভাবিক ভাবে ভিন্নপথে আত্মপ্রকাশ করায় তাহার মধ্যে ধ্বংসের বীভৎসতা দেখা যাইতেছে। আজ বাংলাদেশে তাহাই ঘটিতেছে; তাই এত চাঞ্চল্য, এত অসন্তোষ, এত বিদ্বেষ। এক দিকে চলিতেছে অপর্যাপ্ত বিলাস-ব্যসন, অন্য দিকে অভাবের অন্তহীন হাহাকার; বাঙালী এই বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল।

সরকার পক্ষে আজ যেমন দরকার সংবেদনশীলতা, অপর পক্ষেও প্রয়োজন সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান; দেশ সরকারের নয়, দেশ কোন দলের নয়, দেশ জনসাধারণের; সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তাকে সর্বক্ষেত্রে সকল কাজে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহা অনুসরণ করিলে বাঙালীর জীবন-যন্ত্রণার হয়ত উপশম ঘটিতে পারে।

রূপ দাও

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

একটি পরশ দাও মোহময় মদিরার স্বপ্নীল আবেশে
অনঙ্গ তনুয়-তীরে কল্লোলিনী কল্পনার বিদেহী-বিলাস
শীতের নিশীথ-রাতে স্তিমিত জ্যোছনারাশি পাণ্ডু হাসি হেসে
যেমন জড়ায়ে থাকে বেলোয়ারি বালুতট নিস্তব্ধ উদাস!

একটি আকাঙ্ক্ষা দাও রক্তের-নিবিড়ে-মেশা কবোষ্ণ রক্তিম,
ক্ষুধিত পাষাণে-জাগা আশা-ব্যক্ত উচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ ধারা—
দাও নব আস্বাদের নব সম্ভাবনাময় বিভঙ্গ-ভঙ্গিম
যুগ-হতে-যুগান্তরে-বিনিঃসৃত চিরন্তনী প্রেমপুঞ্জীপারা!

তুহিনগিরির শিরে ঘনায়িত দুর্যোগের যে-তীব্র স্বনন
ভেঙে পড়ে শৃঙ্গ হতে নিষ্করুণ, অম্বুদার ঝঞ্ঝায় বর্ষায় --
দিন হতে দিনান্তরে আহরিত সে-কি স্তব্ধ অসহ্য সহন,
দাও সেই সুদুর্লভ উপলব্ধি, দাও মোর নীরব সত্তায়!

একটি আশ্চর্য ঊষ্মা, তালুর বিতংসহীন 'জঙ্ঘ র গণ্ডূষ' —
দাও মোরে দাও সেই উপদ্রুত অধৈর্যের প্রচণ্ড প্রয়াস,
ঐহিক অমোঘ তেজ উন্মত্ত উত্তুঙ্গ উগ্র নিত্য নিরঙ্কুশ,
বহ্নিস্রাবী রসনায় সিন্ধুগ্রাসী চেতনার অ'ল বিশ্বাস!—

একটি বৈরাগ দাও, বুকজোড়া বেদনার-অনুভূতি-সুর,
যুগান্তের-মর্ম-হতে-বেজে-ওঠা করুণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে --
সর্বহারা রিক্ততার কি-যে তৃপ্তি অনাবিল চিত্ত পরিপুর—
ধূলিভস্মে স্বেচ্ছাসুখ দাও সেই 'হর-হর'-মন্ত্রের সঙ্গীতে!

একটি বিচ্ছেদ দাও শেফালির দীর্ঘশ্বাসে—শান্ত সুরভিত,
মাটির ঘাসের বুকে ঝরে-পড়া অসহায় আর্ত হাহাকার,
করুণ চোখের জলে শোকসিক্ত সিঞ্চনের চিহ্ন রেখাঙ্কিত
সোনালী আলোর নীচে দূরাগত পদধ্বনি দুখের সঞ্চার!

যে-লিপ্সা ফেনায়ে ওঠে অস্থির এ-চিত্ততলে সর্বসত্তা ভরি'
দাও তারে রূপ দাও, হে মোর জীবন-নট, দিবস-শর্বরী।

সুলতান

শ্রীসুবোধ বসু

'কি এটা?'

'আজ্ঞে সুলতান সিংয়ের ছুটির দরখাস্ত।' আমার ক্লার্ক নির্বিকার মুখে কহিল।

'আবার!' বিস্মিত ও বিরক্ত ভাবেই কহিলাম, 'এক মাসও হয় নি ছুটি থেকে ফিরেছে। এবার কি ব্যাপার?'

'একই।' নিরুচ্ছ্বাস জবাব আসিল।

'আবার বউ পালিয়েছে! আচ্ছা লোক নিয়ে পড়া গেছে ত! দিন কাগজটা।' বলিয়া দরখাস্তখানা টানিয়া লইয়া 'নো' লিখিয়া দিলাম।

আঠারো মাস আগে 'পি-ডবলিউ-ডি'র সহকারী এঞ্জিনীয়ার হিসাবে যোগদান করিবার পর হইতেই ঝাড়ুদার, ধাঙর ও বেয়ারা-দারোয়ানদের ছুটি মঞ্জুরের ভার আমার হাতে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সুলতান সিং অন্ততঃ আট বার ছুটি লইয়াছে এবং প্রত্যেক বারই একই প্রয়োজন অর্থাৎ বউ পালাইয়াছে এবং তাকে পলায়নস্থান হইতে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনাইতে হইবে! সুলতান সিংয়ের নাম বা চেহারা কোনওটাই আমার মনে রাখিবার কথা নহে, কিন্তু ছুটির দরখাস্তের পৌনঃপুনিকতা এবং একই কারণের পুনরাবর্তন তাহাকে আমার কাছে সুপরিচিত করিয়াছে। প্রয়োজনের গুরুত্বটা অস্বীকার করিবার মত নয়। তবে একই কারণ বার বার দেখাইলে তার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।

দুপুরের খাওয়া সারিয়া আপিসে আসিয়া কেবল বসিয়াছি, এমন সময় সুলতান সিং ঝাড়ুদার স্বয়ং আভূমি সেলাম করিয়া আমার চোখের সম্মুখে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্যের মত আত্মপ্রকাশ করিল। বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের জোয়ান লোক। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় হালকা আকারের পাগড়ী। গায়ে জখম-ভরা ডোরাকাটা কামিজ। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি।

'সাহাব।'

তার চেহারার সঙ্গে তার আর্দ্র গলার করুণ আওয়াজ এমনি বেমানান যে হাসি, চাপিয়া রাখা মুশকিল। সন্দিহান দৃষ্টিতে দুই সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকাইয়া লইলাম। স্থির করিলাম, তার কোনও কৌশলেই ভুলিব না।

'লোকের ভয়ানক অভাব। এখন ছুটি মিলবে না।' আমি ভূমিকা না করিয়াই কহিলাম।

'দরকারটা জরুরী, হুজুর।' সুলতান সিং তার বিহারী হিন্দীতে বিনীত আর্ত্তকণ্ঠে কহিল।

'বারে বারে বউ পালালে হয় তোমার বউ বদলাতে হবে নইলে সরকারের ঝাড়ুদার বদলাতে হবে।' আমি হিংস্র ভাবেই কহিলাম, 'ক'দিন পরে পরেই বউ পালায় কেন? দারু খেয়ে খুব পেটাস বুঝি?'

'পরমাত্মার দোহাই হুজুর' সুলতান সিং হাত জোড় করিয়া কহিল, 'সেই যে আগের সালে হুজুরের কাছে ছুটি নিয়েছিলাম বউকে ফিরিয়ে আনবার জন্য, তার পরে দুই কান মলেছি। দারু খেয়ে আর কখনও বাড়িতেই ঢুকিনি।'

'তবে এবার কি?' আমি কিছুটা কৌতূহল এবং কিছুটা কর্ত্তব্যের খাতিরে জেরা করিলাম। 'সেই আগের বারের লোকটা আবার ভাগিয়ে নেয় নি ত?'

'না হুজুর, তা নয়!' সুলতান সিং জানাইল। 'শয়তান ফুসলাবার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু আমিও সর্দ্দারদের বলে রেখেছি। এবার যদি হারামের বাচ্চা আমার সাদী করা বউয়ের দিকে হাত বাড়ায়, তবে ওকে জানে মেরে আমি ফাঁসি যাব, তবু ছেড়ে দেব না। তুই যখন সাদী করতে পারতিস, তখন ওকে সাদী করিস নি কেন? এখন অন্যের ঔরতের দিকে নজর দেওয়া কেন রে, কুত্তা...'

বুঝিলাম, সুলতান সিং উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছে, নইলে আমার সম্মুখে এসব কটু বাক্য উচ্চারণ করিত না। বউ পালানোয় কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমারও দোষ আছে। আমিই প্রথম আস্কারা দিয়াছি।

'এবার পালাল কেন?' আমি আপিসী ঢঙে প্রশ্ন করিলাম।

'এবার ও নিজে পালায় নি হুজুর।' সুলতান কহিল, 'বাপের বাড়ী গিয়েছিল। ওর মা আটকে ফেলেছে।'

'কেন?'

'বিয়ের সময় দুশ' টাকা পণ কবুল করেছিলাম। এখনও চার কুড়ি টাকা বাকি। শাশুড়ী বলছেন, পাঁচ বছর সাদী

হয়েছে, এর মধ্যে যে জামাই দু'শ' টাকাই শুধতে পারে না, সে আবার একটা মরদ! আমি অন্য জায়গায় আবার মেয়ের বিয়ে দেব।...চুপে চুপে খবর মিলেছে, অন্য জায়গায় নাকি বিয়ের চেষ্টা চলছে। তবেই বুঝুন, কি বিপদ। তাড়াতাড়ি গিয়ে না পড়লে নির্ঘাৎ ওকে অন্য জায়গায় সাদী দিয়ে দেবে...'

'তাও কখনও হয়! আমি তাহার আশঙ্কাকে আস্কারা না দিয়া কহিলাম, 'এটা এমন কিছু জরুরী নয়। ও রকম মতলব থাকলেও দু'এক হপ্তায় কিছু হবে না। আসছে হপ্তায় বিশু ফিরে আসছে, তখন বলিস, ভেবে দেখব। এবার পালা।' বলিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিয়া বেতের ট্রে হইতে ফাইল উঠাইয়া লইলাম।

সুলতান সিং আরও কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিল হুকুম পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখি কিনা সেই প্রত্যাশায়। তার পর অসহায় মুখে ধীরে ধীরে দরজার দিকে হাঁটিয়া গেল, আর কিছু বলিবার সাহস হইল না।

কেন জানি না, আপিসের অবশিষ্ট সময় বারবার সুলতান সিংয়ের খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখের সেই অসহায় চেহারাটা মনশ্চক্ষে হাজির হইল। আমি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল-প্রকৃতি—বন্ধুরা যাকে বলে, ভালমানুষ। পারতপক্ষে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের হতাশ করি না। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেক ধাঙড় ছুটিতে গিয়াছে। সুলতান সিংয়ের ভয়টা যতই তীব্র হউক, তার প্রয়োজনটা তত জরুরী মনে হয় নাই। একজনের বিয়ে করা স্ত্রীকে কি এত সহজেই অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়—তা হইলই বা ধাঙরের সমাজ। সুলতান সিংয়ের বউয়ের বয়স ত্রিশের উপর। এই বয়সেও যদি তার এতটুকুও আনুগত্য ও বিবেক না জন্মাইয়া থাকে, তবে এমন স্ত্রী না থাকাই ভাল।

বৈকালিক চা, মিষ্টি এবং হাসি পরিবেশন করিবার পর গৃহিণী মাধবী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, 'একটা কথা রাখবে?'

বিস্মিত হইয়া তাকাইলাম। 'তোমার কোন্ কথাটা রাখি নি, জানতে পারি কি?' আমার স্বরও বেশ অভিমান গম্ভীর!

'না, আপিসের ব্যাপার নিয়ে কিছু বললে তুমি রাগ কর ত, তাই বলছি।' মাধবী কহিল। 'কিন্তু এ অনুরোধটা রাখতেই হবে। সুলতান সিংকে তোমার ছুটি দিতেই হবে।'

চালাক লোক সুলতান সিং। বেশ জানে, হাকিমের রায়ের উপরও আপীল চলে। তাই আমার কাছে ব্যর্থকাম হইয়া মাধবীর চিত্ত গলাইয়া গেছে।

'আমার ভয়ানক লোকের অভাব।' আমি কহিলাম, 'আর ওর বউ পালানো একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওটা অতি পাজি বউ! তোমার মত মোটেই নয়। এর সঙ্গে পালায়, ও ফুসলিয়ে নেয়, আর একজনের সঙ্গে প্রেম করে। এ বউ অন্যে বিয়ে করে নিলে আমরাও বাঁচি, আর ও বেচারীও বাঁচে।'

'সব কথাই আমাকে সুলতান সিং বলেছে।' মাধবী গম্ভীর স্বরেই কহিল। 'ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে আরও দু'বার নাকি মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল। তার পর আবার কার সঙ্গে নাকি দু'বছর প্রেম করে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে লোকটা ধোঁকা দিয়ে পালায়। তার পর সুলতান সিংয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। অথচ সেই প্রেমিকবর নাকি এখনও ফুসলাবার চেষ্টায় আছে। আর বউটার যে খুব আপত্তি আছে, তাও নয়। এ সবই আমি শুনেছি। ওকে বললাম, "যে বউকে একটুও ভরসা করতে পার না, তাকে ঘরে রেখে কি লাভ হবে?" সে কি জবাব দিল জান?...'

'কি?'

'বললে, "আপনার কথা ঠিকই, মেমসাব! ওর মনে কোনও ভালবাসা নেই। থাকলে কি কেউ পালায়? কিন্তু আমি যে ওকে প্যার করি। ও যদি সত্যিই চলে যায়, তবে আমার কি উপায় হবে?"...'

সুলতান সিংয়ের দুই সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছিল।

ইহার দিন পাঁচেক পরে আপিসে ঢুকিতে যাইতেছি, সুলতান সিং নীরবে প্রকাণ্ড এক সেলাম করিল।

'কি খবর, সুলতান সিং, ছুটিতে যাও নি?'

'গিয়েছিলাম হুজুর, সবটা দরকার লাগল না। হুজুরের লোক কম আছে, তাই চলে এলাম।'

'বউকে নিয়ে এসেছ?'

'ও আর আসবে না।' বলিয়া আর একটা সেলাম করিয়া সুলতান সিং মাঠে ঝাড় দেওয়া সুরু করিল।

সুলতান সিং অতি সংক্ষেপেই প্রসঙ্গটা সমাপ্ত করিলেও আপিসের কাজকর্ম্মের মধ্যে তার সর্ব্বনাশটা যেন একটা কাঁটার মত আমার মনের ভিতর খচখচ করিতে লাগিল। ভাগ্যিস, মাধবীর কথা শুনিয়াছিলাম, নইলে এই বিচ্ছেদের জন্য নিজেকে অনেকটাই দায়ী মনে হইত।

বিকালে মাধবীকে সংবাদটা দিলাম। দেখিলাম, সে আগেই শুনিয়াছে। আমাদের কোয়ার্টার্স ঝাঁট দিতে আসিয়া মেমসাহেবকে সে পুরা কাহিনী শোনাইয়া গিয়াছে।

ছুটি পাইয়া সে দিনই সে শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে রওনা হয়। বিরাউনী জংশন হইতে তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয়। পৌঁছাইতে দুপুর হইয়া গেল। শ্বশুরালয়ের কাছাকাছি হাজির হইয়া দেখে একটা মহুয়া গাছের তলায় লম্বা এক বাঁশ হাতে তার বউ দুলারী শূয়োর চরাইতেছে। দূর হইতেই সুলতান সিং হাঁক দিল, 'দুলারী'। বার দুই-তিন হাঁক ছাড়িবার পর দুলারী ফিরিয়া চাহিল, যেন চেনেই না।

'দুলারী, আমি এসে গেছি।' খুশি মেশানো সুরে নিজের উপস্থিতি পুনর্ব্বার ঘোষণা করিয়া সুলতান সিং তার দিকে ছুটিল।

দুলারী কোনও পরোয়াই করিল না। একটা শূয়োর দূরের কাঁটাবনের ভিতর পলাইতেছিল, দুলারী সেই দিকে ছুটিল—একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তবু সুলতান অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিল। রৌদ্রে পথ চলায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত সে। এই উপেক্ষায় চোখে কান্না বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। স্পষ্টই বুঝা গেল দুলারীর কাঁটাবন হইতে বাহির হইয়া আসিবার কোনও ইচ্ছাই নাই।

সুলতান সিং আরও হাঁটিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। মাটির ঘরের সামনে খাটিয়া বাহির করিয়া শাশুড়ী বসিয়াছিলেন, জামাইকে সহসা হাজির হইতে দেখিয়া বেশ একটু বিব্রত বোধ করিলেন। কিন্তু হৃদ্যতা প্রকাশ করিতে দেরী করিলেন না। কহিলেন, 'আরে বেটা, না বলে-কয়ে তুমি হঠাৎ হাজির হলে কোত্থেকে? এস, বস। খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছ কি? না হয়ে থাকলে বল, সরম করো না, রুটি পাকাই···।

'আজ্ঞে না. আমি খানা খেয়ে এসেছি। ক্ষুধার্ত্ত সুলতান সিং অভিমান করিয়া মিথ্যা কহিল।

'এস, খাটিয়ায় বস। তারপর সমাচার কি বল।'

'আমি দুলারীকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

শাশুড়ী গম্ভীর হইয়া গেলেন। নানা রকম ভূমিকা করিলেন। তার পর কহিলেন, 'কিছু মনে করো না বাছা। মেয়ের আর তোমার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা নেই। তুমিই বল, যদি মনে মিলই না হয়, তবে মিছিমিছি ঘর করে কি লাভ? হয়রাণি ছাড়া এতে আর কোনই ফয়দা নেই। আমাদের এমন আদরের মেয়েটা মনের দুঃখে কেবলই কেঁদে মরবে, তা আমরাই বা কি করে দু'চোখে দেখি। তাই আমরা ওর আর একটা বিয়ে ঠিক করেছি। বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার, চার-চারটে মাটির ঘর, খেত-খামার, কুড়িটা শূয়োর, চারটে ভইস। আর পাত্রও মর্দ জোয়ান। পাঁচটা বাচ্চা থাকলে কি হবে, বয়স আমাদের বেটীর চেয়ে দু'চার বছর কমই হবে। রূপোর মল, রূপোর বালা, রূপোর হাঁসুলী আরও কত কি দেবে বেটীকে। তা ছাড়া আমাকে নগদ পাঁচশ' টাকা গুণে দেবে।···কিছু মনে করো না, বাবাজী, তোমার কাছে বিয়ের পণের এখনও আমার চার কুড়ি টাকা বাকী। এ বিয়েটা হয়ে গেলে তোমারও লাভ—সে টাকাটা আমি আর চাইব না।···চল না, পাত্রের বাড়ীটা তোমাকে দেখিয়ে আনি। ঐ সমুখের কাঁটাবনের ওদিকেই। এক গাঁয়েরই জানাশুনা ঘর। মেয়েটা যদি সুখী হয়, তবে তোমারও কি আপত্তি করা উচিত? তুমি ত মানুষটি তেমন কিছু খারাপ নও। চল না, একবার নিজের চোখেই সব দেখে আসবে?···'

'দুলারী নিজে এখানে সাদী চায়?' সুলতান সিং ভাঙা গলায় প্রশ্ন করিল। 'সে যদি চায়, তবে আমি আপত্তি করব না···'

'চায় বৈকি, না চাইলে আমরা এত সব হাঙ্গামায় যাই। বেটা, এ বেটা ··'

'ডেকে দরকার নেই, আমি উঠি। আর এই নিন চার কুড়ি টাকা—পণের যা বাকী ছিল।' বলিয়া ট্যাঁক হইতে নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া খাটিয়ায় শাশুড়ীর কাছে রাখিয়া সুলতান সিং চলিয়া আসে। স্টেশনে আসিয়া পৌঁছানোর আগে আর থামে নাই।

'আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম', মাধবী বলিল, 'তুমি তোমার বউকে ডেকে একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা করে এলে না কেন?···'

'তার আর দরকার ছিল না, হুজুর। কাঁটাবনের ভেতর একটা জোয়ান মর্দ্দের কাছে বসে সে হাসাহাসি করছে, দেখে এসেছি। হ্যাঁ, ছোক্‌রাটা ভালই দেখতে, আমার চেয়ে বয়সও অনেক কম।'

'তোমার কি উপায় হবে?' মাধবী সহানুভূতির সঙ্গে কহিল।

'আমার ত সুখ হবারই নয়, হুজুর। তবু সে যদি সুখী হয়, হোক না। সে বেইমানী করেই পালাত। তার চেয়ে আমি নিজেই রাজী হয়ে এলাম। আমার উপর আর কোনও নালিশই তার থাকতে পারবে না।' বলিয়া ঝাঁটাটা বাঁ কাঁধের উপর ফেলিয়া সরকারী ধাঙর সুলতান সিং মস্ত সেলাম ঠুকিয়া তার নিত্যনৈমিত্তিক প্রথামত অন্যান্য কোয়ার্টার্সে জঞ্জাল সাফ করিতে গেল।

অরণ্য

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৩)

কয়েকমাস কেটে গেছে, শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে, এই অরণ্যলোকে আমি আর নতুন মানুষ নই। অরণ্যের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ঘটেছে। প্রথম দর্শনের ভয় ও বিস্ময় গিয়ে এখন সুরু হয়েছে ভালবাসা।

প্রতিবেশীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। আমার ডেরার উত্তর দিকে যে কয়ঘর সাঁওতাল পরিবার বাস করে তাদের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সামনের দু'খানা ঘরে সপরিবারে বাস করে মঙ্গরু মাঝি ও বড়কু মাঝি। পলাশতলার ছোট ঘরখানিতে থাকে দুটি তরুণ-তরুণী, মিতান আর তিতলী। মিতান সুস্থ সবল যুবক, মাথায় লম্বা চুল, কাঠের কাঁকুই দিয়ে পাট করা; তিতলীর দেহ যেন কালো পাথর কেটে গড়া, সাঁওতালী আদর্শমতে নিখুঁত সুন্দরী। মিতানের পাশে থাকে বুড়ো টুকু মাঝি, রোগা লম্বা শরীর, হাড় এখনও শক্ত, এখনও অনায়াসে পাঁচ ক্রোশ পাহাড়ে-রাস্তা চলে যায়। তার বুড়ী অনেক দিন মারা গেছে, আছে এক বার-তের বছরের অবিবাহিত মেয়ে, নাম সোনিয়া। এদের নাম যেমন জানি, এদের সুখদুঃখের খবরও কিছু কিছু জানি। মঙ্গরু মাঝির অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, অতএব অভাব অন্যের তুলনায় বেশী, রাত-দিন তার অন্নচিন্তা। বুড়ো টুকুর মেয়ে সোনিয়ার বিয়ের কথা চলছে, একদিন তার ছোট ঘর খালি করে সে চলে যাবে—সেই ভাবনায় টুকু এখন থেকেই কাতর হয়ে পড়েছে। মিতান আর তিতলীর সংসারে কোন অভাব নাই, মিতান কখনও শিকার থেকে খালি হাতে ফেরে না, নাচে গানে তিতলীর মত উৎসাহী কেউ নয়, তবু ওদের অন্তরের নিভৃত কোণে একটা ব্যথার সুর বাজে, ওদের সংসারে এখনও শিশুর আবির্ভাব হয় নি।

এইবার আমার ডেরার দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশীদের কথা বলি। আমার দক্ষিণ দিকে পাহাড়, সেই পাহাড়ে থাকে বাঘ ভালুক হায়না হরিণ ও আরও অনেক ছোট জানোয়ার। ওদের সঙ্গে এখনও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি, তবে দেখা সাক্ষাৎ চলছে। বড় বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) এ জঙ্গলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। পশ্চিমের গুজাস্তি সুরগার গভীর বন থেকে পরেশনাথ পাহাড়ে যাতায়াত করবার এই হচ্ছে পথ, সেই হিসেবে বড় বাঘ পথ চলতে চলতে আমাদের অরণ্যে কখনও কখনও দু'চার দিনের জন্যে আস্তানা গাড়ে। ইতিমধ্যে বড় বাঘের সাক্ষাৎ লাভ ত দূরের কথা, আওয়াজও আমি শুনতে পাই নি।

ফাল্গুনের শেষ, রাত্রে তখনও শীত, কিন্তু দিনের বেলা ভারি সুন্দর, বসন্তের উষ্ণ নিঃশ্বাসে প্রকৃতির চেতনা ফিরে এসেছে। গাছের পাতার রং বদল হতে সুরু হয়েছে। অরণ্যের রূপ দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। দুপুর বেলা আমার ঘরের পাশে একটা পলাশ গাছের তলায় খাটিয়া টেনে শুয়ে আছি উপরের দিকে তাকিয়ে। পলাশের আঁকাবাঁকা ডালে কোথাও একটি পাতা নাই, আছে পুঞ্জ পুঞ্জ লাল ফুল। এ এক অপূর্ব দৃশ্য, সত্যিই যেন ডালে ডালে আগুন জ্বলছে। দেশে গাঁয়ে পলাশ গাছ দেখেছি বটে, কিন্তু এমন কাছে বসে ভাল করে দেখিনি, তাই পলাশের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তা ছাড়া ছেলেবেলায় পড়েছিলাম পলাশ ফুল দেখতে সুন্দর হলেও গন্ধ নেই বলে কেউ আদর করে না। সেটা পলাশের প্রতি মনকে অনেকখানি বিরূপ করেই রেখেছিল। আজ পলাশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, বুঝলাম গুণ বিচার করতে গেলে নাকের সাক্ষ্যই একমাত্র সাক্ষ্য নয়।

দেখছি এই পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের মধ্যে দলে দলে শালিখ আর বুলবুলি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। আরও দু'একটি পাখী দেখলাম তাদের চিনতে পারলাম না। এক ঝাঁক টিয়ে এসে একবার বসল, আবার

কলরব করে উড়ে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ফুলের রাজ্যে পাখীদের হল্লা চলে। পাখীরা কিন্তু নাক ও চোখ বাদ দিয়ে কেবল জিহ্বার সাক্ষ্য গ্রহণ করে পলাশ ফুলের এত পক্ষপাতী হয়েছে।

নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছি এমন সময় শুনতে পেলাম গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে। বেশ দ্রুততালে বাজছে, যেন গরুর পাল ছুটে আসছে। সকাল বেলা এই পথ দিয়েই রাখাল শিশুরা গ্রামের গরু পাহাড়ের কোলে চরাতে নিয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম তারাই আবার ফিরে আসছে। কিন্তু ঘণ্টা বাজার তালটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হ'ল না, উঠে বসলাম। একটু পরেই দেখলাম গরুর পাল বনের ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে আসছে, পিছন থেকে চীৎকার করে তাদের তাড়া করে আনছে উলঙ্গ রাখাল শিশুরা। রাখালদের উত্তেজনা দেখে মনে হ'ল কিছু একটা ঘটেছে। গোলমাল শুনে মনু আর নানকুও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলি ছুটতে ছুটতে আমাদের পাশ দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। রাখালেরা গরু তাড়াতেই ব্যস্ত, কাহারও কথার জবাব দিতে চায় না, একটাকে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে বল?" সে বললে, "বাবু, পাহাড়ে শের (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) এসেছে।" ব্যগ্র ভাবে আবার রাখালকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় বাঘ? কে দেখেছে? গরু মেরেছে নাকি?" সে বললে, "না বাবু, গরু মারে নি, শেরও আমরা কেউ দেখিনি।" আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "তবে কি কেবল আন্দাজের উপর এত ছুটাছুটি আর হল্লা!" নানকু এগিয়ে এসে বললে, "আন্দাজ নয় বাবু, নিশ্চয় পাহাড়ে শের এসেছে।" বললাম, "চোখে না দেখে এত নিশ্চয় হলে কেমন করে।" নানকু বললে, "বাবু, শের জঙ্গলে এলে পশু-পক্ষী মানুষ সকলেই টের পেয়ে যায়। গরুর পালের সঙ্গে গোটা-কয়েক মোষ ছিল দেখে থাকবেন, ওরাই রাখালদের সাবধান করে দিয়েছে। হামেশা চিতে বাঘ দেখে গরুও তাকে তেমন ভয় করে না, মোষ ত গ্রাহ্যই করে না, তাই মোষ যখন বনের মধ্যে ভয় পেয়ে চনমনে হয়ে উঠে—তখন বুঝতে হবে খুব কাছাকাছি শের আছে।" লোকের মুখে বড় বাঘের প্রতাপের কথা শুনে শুনে তাকে দেখবার জন্যে আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম, হঠাৎ তার আগমন-বার্ত্তা পেয়ে সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল। এতদিন প্রতীক্ষার পর অরণ্যের রাজা আজ আমাদের দেশে উপস্থিত হয়েছেন। উৎসাহ ও উত্তেজনার আতিশয্যে তখনই বাঘের সন্ধানে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু নানকু বাধা দিয়ে বলল, "এখন কোথায় যাবেন বাবু। শের যে কোথায় আছে তাও ত জানা নাই, তবে কাছাকাছি কোথাও আছে। আবার হয় ত এ বন ছেড়ে এতক্ষণ চলে গেছে, ওরা অনেক সময় এ পথ দিয়ে যায় কিন্তু দাঁড়ায় না। তবে, একটা কথা বাবু, দিনের বেলা বাঘ পথ চলে না রাত্রে সফর করে। তাই মনে হচ্ছে এখন কোথাও আড়ালে আবডালে শুয়ে পড়ে আছে।" অরণ্যের পরিবেশে চিতে বাঘ অনেকবার দেখেছি, শাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে আড়ালে মাথাটি নীচু করে অতি সাবধানে পা' ফেলে ফেলে নিঃশব্দে চোরের মত সে চলে যায়, তাকে দেখে মনে ভয় বা বিস্ময় কোন ভাবেরই উদয় হয় না। শুনেছি বড় বাঘের চলা নাকি সম্পূর্ণ অন্য রকম। সে চলে আপন মহিমায় রাজার মত ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে। অরণ্যের রাজাকে যদি অরণ্যসভায় না দেখলাম তাহলে অরণ্যে এসে করলাম কি? নানকুকে বললাম, "শের আমি দেখব।" নানকু অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "বাবু, জানিনে আপনার সাহস আছে কতখানি, শের দেখতে হলে সাহস চাই।" জোর দিয়ে বললাম, "সাহস আমার আছে, প্রথম দিন আমাকে যেমন দেখেছিলে আমি আর তেমন নেই।" নানকু বলে, "বেশ, চেষ্টা করে দেখব।" খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "চল তা হলে।" নানকু হাসতে হাসতে বললে, "বন ঢুঁড়ে শের বার করবেন বাবু, আপনি পাগল! অন্য উপায় করতে হবে, তাড়াতাড়িতে হবে না। শের যদি এ বনে দু' এক দিন থেকে যায় তা হলে আপনাকে নিশ্চয় দেখাব।" খাটিয়ার উপর বসে পড়লাম, বললাম, "উপায়টা কি বল?" নানকু বললে, "আজ কিছু করবার নাই, কাল সকালে আপনাকে নিয়ে বেরুব, যদি আপনার ভাগ্য ভাল হয় ত কালই শের দেখতে পাবেন।"

ভারি উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটতে লাগল। কোন কাজেই মন লাগছে না। পলাশের ডালে পাখীদের নাচানাচি দেখতেও ভাল লাগছে না। বিকেল বেলা দেখি বড়কু মাঝি আর তার স্ত্রী কুড়ুল নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা, জান না বুঝি পাহাড়ে শের এসেছে?" বড়কু মাঝি ঘাড় নেড়ে বললে, "তুই বলিস কি বাবু, শের এসেছে বলে কি বনে যাব না।" বড়কুর বউ হেসে বললে, "কাঠ আনতে যাচ্ছি—কাঠ না হলে রাঁধব কি দিয়ে।" অপ্রস্তুত হয়ে বললাম "এমন সময় পাহাড়ে না হয় নাই বা গেলে আজ!" বড়কু হাতখানা এমন ভাবে নাড়লে যেন ব্যাপার কিছুই নয়, বললে "মানুষের সাড়া পেলে শের সরে যাবে।" শুনে অবাক হয়ে গেলাম, এই আধ-উলঙ্গ নিরস্ত্র মানুষটিকে দেখে বড় বাঘ সভয়ে পথ ছেড়ে দেবে! বাঘও বুঝি জানে যে পৃথিবীতে মানুষ সবার চেয়ে বড়।

সকাল বেলা তাড়াতাড়ি চা ইত্যাদি খেয়ে নিয়ে নানকুর সঙ্গে বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। কি উপায়ে, কেমন করে যে সন্ধান করা হবে তা আমি কিছুই জানিনে, আমি অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি নানকুকে। নানকু নেমে গেল পাহাড়তলির ঝরণার কাছে যেখান থেকে আমাদের পল্লীর জল আনা হয়। ঝরণা বললে সাধারণতঃ মনে যে কাব্যময় ছবি ফুটে উঠে—পাহাড়ের গা' থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে, আমাদের ঝরণা একেবারেই তা নয়। এ হচ্ছে গর্ত্তময় ঝরণা, বালুকাময় নালার এক পাশে একখানা মস্ত বড় পাথর খাড়া হয়ে আছে, তারই নীচে থেকে

একটু একটু করে জল চুইয়ে এসে এক পাশে জমা হচ্ছে। সাঁওতাল মেয়েরা হাত দিয়ে বালু সরিয়ে বেশ খানিকটা গর্ত্ত করে দিয়েছে, সেই গর্ত্ত সব সময়েই পরিষ্কার জলে কানায় কানায় ভরে থাকে, এমনকি জ্যৈষ্ঠের ভীষণ গরমেও তার হ্রাস নাই। নানকু এসে সেইখানে দাঁড়াল তার পরে ঘুরে ঘুরে জলের চার পাশে দেখতে লাগল। সে যে কি খুঁজছে তা আমি বুঝতে পারলাম। রাত্রে এখানে অনেক জানোয়ার জল খেতে আসে, বালুর উপরে তাদের ছোট-বড়-মাঝারি অনেক পদচিহ্নই পড়ে আছে, কিন্তু যে সম্মানিত রাজপদের চিহ্ন খোঁজা হচ্ছে তা কোথাও পাওয়া গেল না। নানকু মাথা নেড়ে বললে "রাত্রে এদিকে আসে নি, চলুন তিল-সোতিয়ার নালায় যাওয়া যাক, যদি সেখানে রাত্রে জল খেতে এসে থাকে তা হলে বুঝব শের এখনও জঙ্গলে আছে, তা না হলে জানব সে চলে গেছে।" আমি প্রথম দিন বনে এসে ঐ তিলসোতিয়ার নালাতেই বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ছুটোছুটি করেছিলাম, সে এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূর। সেখানেও একটি ঝরণা বা এই রকম জলের ডোবা আছে, সারা বছর তাতে জল থাকে। লোকালয় অনেক দূরে বলে অরণ্যের সম্ভ্রান্তবংশীয় জানোয়ারেরা সেইখানেই জল খেতে বেশী আসে। আমরা তিলসোতিয়ার দিকে চললাম। অরণ্যের এই দিকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর, কয়েক মাস এখানে কাটাবার পরেও এ দিকে এলে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়ে, কেমন যেন অসহায় মনে হয়। শুক্‌নো পাতার উপর পা পড়ে যে আওয়াজ হয় এই অরণ্যলোকে সেই সামান্য আওয়াজ ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

একটু পরে আমরা তিলসোতিয়ার ঝরণায় এসে পৌঁছলাম। জলের ধারে এসে আঙুল দিয়ে নানকু আমাকে দেখিয়ে দিল, হেঁট হয়ে দেখলাম বহু জানোয়ারের পায়ের দাগের মধ্যে প্রকাণ্ড পাঞ্জার ছাপ। ছাপটাই একটা দেখবার জিনিস, বাঘ যে কত বড় তা এ দেখেই আন্দাজ করা যায়। আমরা দেখলাম বাঘ পাহাড় থেকে নালা ধরে নেমে এসে জল খেয়ে আবার নালা ধরে উপরে উঠে গেছে, নীচের জঙ্গলের দিকে যায় নি। নানকু খুশী হয়ে বললে, "বাবু আমার মনে হচ্ছে শের উপরের বনে হরিণ বা শূয়োর মেরেছে, তাই আজ সকালে এসে জল খেয়ে গেছে। আবার বিকেলে জল খেতে আসবে, আপনার বরাত ভাল থাকে ত তখন দেখতে পাবেন।" বড় বাঘ দেখবার ষোল আনা ইচ্ছে থাকলেও এখন হঠাৎ ভীত হয়ে পড়লাম, এ ত কলকাতার 'জু'তে ভিড় করে দাঁড়িয়ে খাঁচার বাঘ দেখা নয়, এ হ'ল গভীর অরণ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে বাঘ দেখা। এতদূর এগিয়ে, এত বীরত্ব দেখিয়ে শেষে পিছপা হওয়াটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে, তাই কি বাহানা করা যায় ভাবছি এমন সময় দেখি নানকু সামনের একটা বড় চন্দন গাছের নীচে গিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে গাছের ডালপালা লক্ষ্য করছে। নানকুর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম, মুহূর্ত্তে আমার বিগত সাহস সগৌরবে ফিরে এল, আমি বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেলাম। নানকু গাছটা পরীক্ষা করে তার হাতের কুড়ুল দিয়ে গোটা কয়েক কচি শাল কেটে ফেলল, তার পরে গাছে উঠে উপরের দুটো ডালের উপর আড়াআড়ি ভাবে গাছ কটা বিছিয়ে দুধিয়ার শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে ফেলল। এইবার কুড়ুলখানা নীচে ফেলে দিয়ে আমাকে বলল, "বেশ পাতাওয়ালা কয়েকটা ডাল কেটে আমার হাতে তুলে দেন ত বাবু।" আমি তাই দিলাম, সে ডালগুলো পর্দ্দার মত এমন ভাবে সাজিয়ে বাঁধল যে সামনে থেকে আমাদের মাচাটা দেখতে পাওয়া যাবে না, তার আড়ালে লুকিয়ে আমরা বেশ বসতে পারব। নানকু গাছ থেকে নেমে এসে বলল, "ব্যবস্থা সব করে ফেলেছি বাবু, এখন সন্ধ্যার আগে এখানে এসে মাচায় উঠে বসতে হবে।" উৎসাহ দিয়ে বললাম, "কুছ পরোয়া নেহি, এ কাজ আমি করতে পারব।"

বিকেল তিনটেতে আমরা আবার তিলসোতিয়ার দিকে রওনা হলাম এবং চারটে নাগাত মাচায় উঠে বসলাম। নিরাপদ স্থানে বসে গভীর অরণ্যের শোভা দেখতে বেশ লাগে। তখনও যথেষ্ট বেলা আছে, অরণ্য আলোছায়ায় ঝিলমিল করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, দু'একবার দূরে ময়ূর পাখা ঝটপট করে এ গাছ থেকে উড়ে ও গাছে গেল। সামনে হাত পঞ্চাশেক দূরে জলের ডোবা, পাতা পড়ে পড়ে জলের রং লাল হয়ে গেছে। সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছি—সামান্য আওয়াজ করবারও হুকুম নাই। ধীরে ধীরে সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে নামল, বিরাট ছায়া এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, অরণ্যের রূপ মুহূর্ত্তে বদলে গেল। আমার মনের অবস্থারও রূপান্তর ঘটল—গা' ছম ছম করে উঠল। উদ্‌গ্রীব হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছি—সময় কেটে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু ত আসছে না!

নালার ওপারে শুক্‌নো পাতা পড় পড় করে উঠল, আমার উত্তেজনা চরমে পৌঁছল, আমি দু' চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ নালার পাড় থেকে লাফ মেরে নীচে নামল একটা হায়না। মন আমার হায় হায় করে উঠল। বাঘ না এসে এল হায়না! ভাবটা বুঝতে পেরে নানকু আমার গা টিপে ধৈর্য্য ধরতে উপদেশ দিল। হায়না এসেছে বলে বাঘ আসবে না এমন কোন কথা নাই, সব জানোয়ারই এখানে জল খেতে আসে। হায়না এদেশে সন্ধ্যার পরে শেয়ালের মত ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, তাই একে শেয়ালের পর্য্যায়েই ফেলা যায়, তবু এই অরণ্য পরিবেশের মধ্যে তার নিশ্চিন্ত মনে জল খাওয়া দেখতে ভালই লাগল। ইতিমধ্যে আর একটা হায়না এসে উপস্থিত হচ্ছে। দুটিতে জল খেয়ে নালার উপরে উঠে আমাদের মাচার নীচে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আমরা বসে আছি, বেলা ক্রমেই পড়ে আসছে, অরণ্য জুড়ে ছায়া আরও একটু ঘন হচ্ছে। মাঝে মাঝে বন-মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছি। বাঘ আর আসে না, ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি। তা ছাড়া আর একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে,

সন্ধ্যা ত প্রায় হয়ে এল, বাড়ী ফিরব কখন! অন্ধকার হবার আগেই আমাদের মাচা থেকে নামতে হবে। নানকুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে যেমন নির্বিকার ভাবে বসেছিল তেমন ভাবেই বসে আছে, ব্যস্ততার কোন লক্ষণই তার মধ্যে নাই। আমি কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

এখন মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে শুক্‌নো পাতা খড়খড় করে উঠছে, বুঝতে পারছি অরণ্যবাসীরা চলাফেরা সুরু করেছে। পাখীরাও যে যার ঘরে ফিরছে। আমাদের গাছের একটি ডালে এক জোড়া ঘুঘু এসে বসেছে, নিশ্চিন্ত মনে ছোট ঠোঁট দিয়ে ডানার অসংযত পালক পরিপাটী করছে। এমন সময় একটা বাতাস বয়ে গেল, গাছের ডালপালা দুলে উঠল, অরণ্যময় মর্ম্মর আওয়াজ উঠল। নানকু আমার হাতখানা হঠাৎ চেপে ধরল, আমি বুঝলাম কিছু একটা শীঘ্রই ঘটবে, জলের দিকে চেয়ে আবার স্থির হয়ে বসলাম। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট, পাঁচ মিনিট, না, কিছু ঘটল না, আমি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলাম। নানকু কিন্তু তখনো আমার হাত ছাড়ে নি। আমি উপরে তাকিয়ে দেখলাম গাছের ডালে ঘুঘু-দম্পতি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। ভাবছি এরাও অরণ্যের সন্তান, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে মানুষের মত এরা ভয়ার্ত্ত হয়ে ওঠে না। নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সব ভাবছি এমন সময় নানকুর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল, আমি আবার জলের দিকে তাকাতেই যা দেখলাম তা জীবনে কখনো ভুলব না। দেখলাম বিরাটকায় এক বাঘ আমাদের দিকে সম্মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, নালাপথ দিয়ে কখন যে এসেছে তা আমি টের পাই নি। জলের সামনে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যেন পটে-আঁকা ছবি, কি নিটোল নধর কান্তি। তার গায়ের হলুদ-জমিনের উপর কালো ডোরাগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল, কেবল তার দীর্ঘ লেজের প্রান্ত দু-একবার নড়ে উঠল। তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রকাণ্ড মাথাটা হেঁট করে জল খেতে লাগল চক্ চক্, চক্ চক্। জল খাওয়া শেষ হলে মাথাটা উঁচু করে তাকাল তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক লাফে নালার উপরে উঠে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নানকু বললে, "দেখলেন বাবু শের।" এখনও আমার মন আনন্দ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে আছে, বললাম, "দেখলুম শের, কিন্তু ভয় তো হ'ল না।" নানকু একটু হাসল, তার পর বলল, "মাচায় বসে শের দেখলেন বাবু, ভয় পাবেন কেন। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যে শের দেখেছে সেই জানে ভয় হয় কিনা। শেরের চাহনিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।" কথাটা মেনে নিলাম, সামনাসামনি না দেখে রাজারাজরাকে দূর থেকে সেলাম করাই ভাল। খাঁচার বাঘকে দেখে আমার দুঃখ হ'ত, আজ অরণ্যের মাঝখানে স্বাধীন বাঘকে দেখে আমার আনন্দ হ'ল। কেন যেন মনে হ'ল সত্যিকার বীরেরা যেমন ছোট কাজ করে না, বড় বাঘও তেমনি ছোট কাজ করে না। পরবর্ত্তীকালে প্রমাণ পেয়েছি। আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও অনেকখানি সত্য।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা মাচা থেকে নেমে এলাম। নানকু দু'চার বার হাততালি দিল, চেঁচিয়ে কথা বলতে লাগল। মতলবটা এই যে, কোন জানোয়ার এমনকি বাঘও যদি কাছাকাছি থাকে তা হলে সরে যাবে। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে, আমরা তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলাম। কেমন করে বাঘের সান্নিধ্য টের পেয়ে নানকু আমার হাত চেপে ধরেছিল সেটা বুঝতে পারি নি। এখন তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। নানকু বলল, "বাবু, শের হচ্ছে বনের রাজা, ওকে পশুপক্ষী তো সমীহ করেই, গাছ-পালাও করে। মনে আছে আপনার হঠাৎ গাছের ডালপালা কেঁপে উঠল, ঐ হ'ল বনের ইশারা, বলে দিল শের আসছে 'হুঁশিয়ার, হুশিয়ার।" কথাটার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব আছে কিন্তু সত্যতা কিছু আছে বলে মনে হ'ল না। বড় বাঘ দেখে গাছপালা কেঁপে ওঠে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি অবশ্য অন্যভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি। বংশপরম্পরায় বনের মধ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে বসবাস করে এদের এমন একটা শক্তির স্ফুরণ হয়েছে যাতে করে কোন বিপদের আবির্ভাব এরা আগে থাকতে টের পায়।

খানিকদূর আসতেই রাত হয়ে গেল, পথ বলে কিছু নেই, আন্দাজে চলতে হচ্ছে। বনের মধ্যে অন্ধকারে সহজেই দিক ভুল হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখলাম অরণ্যবাসী নানকুর আর একটা শক্তির স্ফুরণ হয়েছে—সে দিক ভুল করছে না। ডেরায় ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল। তখনই ডাইরি খুলে প্রথম বড় বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা লিখতে বসলাম। সে সব পুরানো ডাইরির পাতা থেকে আজ এই কাহিনী লিখছি।

রাত্রে শুয়ে একটা কথা কেবলই আমার মনে হচ্ছিল। মাচার উপর নিরাপদে বসে আমি বহু বন্যজন্তুর চালচলন দেখতে পারি। আমার বন্দুক নেই, অতএব শিকারী হবার উপায় আমার নেই। আধুনিক shooting with the camera, তাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমার ক্যামেরা নাই, আমার আছে দুটি চোখ আর অফুরন্ত উৎসাহ। তাই নিয়ে আমি মাচায় বসে অনায়াসে বন্যজন্তু দেখতে পারি। এত বড় অরণ্য, কোন বন্যজন্তুরই অভাব এখানে নাই। সুবিধা-মত জায়গায় মাচা করে বসলে সব জানোয়ারই দেখতে পাওয়া যাবে। বন্দুক নেই বলে আমার দুঃখ নেই, কেননা কোন জানোয়ারকে মারা আমার পছন্দ নয়। সুখ-দুঃখের জীবন নিয়ে তারাও আমার প্রতিবেশী, তাদের আমি শত্রু বলে মনে করি না। আমি যে সময়ের কথা লিখছি সে সময়ে বন্দুকধারী শিকারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। দু'একজন সাহেব ও আশেপাশের একটি-দু'টি বড় জমিদার কখনও কদাচিৎ এদিকে শিকার করতে আসত, আমার পশু-প্রতিবেশীরা প্রায় নিরাপদেই বাস করত।

সকালবেলা নানকুকে আমার মতলবটা বললাম। সে বললে,

"জলের ধারে একটা ভাল-মাচা করা মুস্কিল নয়, কিন্তু আজকাল জানোয়ার তেমন আসবে না বাবু।" প্রশ্ন করলাম, "কেন আসবে না?" সে বললে, "আজকাল জানোয়ার এক জায়গায় জল খায় না। পাহাড়ের কোলে বা বনের এখানে-ওখানে এখনও অনেক জলের ডোবা আছে, যার যেমন সুবিধা সে সেইখানে জল খায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব যখন রোদের তাত হবে তখন ডোবা সব শুকিয়ে যাবে। যে ঝরণা জিয়ত (সব সময় প্রবহমান) তাতেই জল থাকবে। তখন সব জানোয়ার সকাল-সন্ধ্যা সেইখানে ভিড় করবে।" ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক, জল যখন সর্বত্র তখন এক জায়গায় কেউ ধরা-বাঁধা জল খেতে আসবে না। তিলসোতিয়ার ঝরণা জিয়ত, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাহাড়ের যত জানোয়ার সব সেখানে জল খেতে আসবে। কয়েক মাইল দূরে অবশ্য আরও জিয়ত ঝরণা আছে, এবং পাহাড়ের ওপাশে একটা বড় বাঁধও আছে, তবু বহু জানোয়ার তিলসোতিয়ার ঝরণায় জল খেতে আসবে। তখন সেখানে লুকিয়ে বসলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এটা ফাল্গুনের শেষ, জ্যৈষ্ঠ মাসের এখনও অনেক দেরি, আমার এমন প্রবল উৎসাহে বাধা পড়ে গেল। ভাবটা লক্ষ্য করে নানকু বলল, "আমি আপনাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ঘরে বসে জানোয়ার দেখাব।" আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে?" সে আঙ্গিনার মহুয়া গাছটা দেখিয়ে বললে, "দেখেছেন ডালে একটি পাতা নাই, ফুলের কুঁড়িতে ভরে গেছে। আর কয়েক দিন পরে মহুয়ার ফুল মাটিতে ঝরে পড়বে, তখন ভালুক আসবে খেতে।" শুনেছিলাম ভালুক মহুয়া ফুল খেতে ভালবাসে, অনেক সময় ফুলের লোভে গাঁয়ের মধ্যেও ঢুকে যায়। আমরা ত ভালুকের খাসতালুকে বসবাস করছি। এখানে সে আসবেই। নূতন অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, ভালুক দেখার আয়োজন সুরু হ'ল। ঘরের দরজায় কাঠের একটা জাফরী তৈরী করে লাগাবার ব্যবস্থা হ'ল, এখন নির্ভয়ে সারারাত দরজা খুলে রাখা যাবে।

চৈত্র মাস এসে গেছে, মহুয়ার ফুল ঝরতে সুরু করেছে। হলদেটে রঙের ফুল, ঠিক যেন এক-একটি রসে-ভরা বড় বড় কিসমিস। আস্বাদ বেশ মিষ্টি, গন্ধটা কিন্তু উগ্র, অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মহুয়া এ দেশের একটা বড় সম্পদ। ফুল গরু মোষ ত খায়ই, মানুষও খায়, ফল থেকে যে তেল বার হয় বাজারে তার চাহিদা খুব। মহুয়ার ফুল থেকে মদ চোলাই হয় বলেই রসিক মহলে তার আদর বেশী। এদেশের অনেকেই মদ খায়, তবে যারা আদিবাসী, যেমন ঘাটোয়ার, কোল, কুরমি ও সাঁওতাল, এরা স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মহুয়ার মদের পক্ষপাতী। কোন পূজাপার্ব্বণ উৎসবই মহুয়ার মদ বিনা সুসম্পন্ন হয় না।

মহুয়ার ফুল রাত্রেই পড়ে বেশী, দিনের বেলা তেমন পড়ে না। সারারাত ফুল পড়ে সকাল বেলা মহুয়াতলা ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তখন সাঁওতাল মেয়েরা ছোট ছোট ঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়, হাসি-গল্পে মহুয়াতলা মুখর হয়ে উঠে, বেলা হলে ফুলভরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

আমি আজকাল বারান্দায় খাটিয়া পেতে শুই, জাফরী লাগান দরজা খোলাই থাকে। একদিন অনেক রাত্রে নানকু আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখুন মহুয়াতলায় ভালুক এসেছে।" তাড়াতাড়ি উঠে বসে জাফরির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলাম দুটা জানোয়ার মহুয়াতলায় ঘুরে ঘুরে ফুল খাচ্ছে। আবছায়া অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট না দেখলেও বুঝতে পারলাম তারা ভালুক যুগল। ভালুকের চলনভঙ্গী হাস্যকর, কেমন একরকম ঢুলে ঢুলে চলে। ভালুক দুটি অনেকক্ষণ মহুয়াতলায় ঘোরাফেরা করে চলে গেল। এর পরে অনেকবার জ্যোৎস্না রাত্রে ভালুকের আনাগোনা দেখেছি। ভালুক বড় খেলা ভালবাসে, অনেক সময় দুটোকে লাফালাফি গড়াগড়ি দিয়ে খেলতে দেখেছি। ভালুক এ অরণ্যের বেশ বড় জানোয়ার, বড় বাঘের সমকক্ষ না হলেও চিতে বাঘের চেয়ে বড়, গায়ে শক্তিও খুব। কিন্তু সাহসের দিক দিয়ে সে বিশেষ বিখ্যাত নয়। সঙ্গে বাচ্চা থাকলে অবশ্য এরা সহজেই মেজাজ খারাপ করে, কিন্তু সাধারণতঃ একেবারে আক্রান্ত না হলে পলায়নেরই পক্ষপাতী। আমি একটা ভালুক পুষেছিলাম বলে ভালুক-চরিত্র জানবার সুযোগ হয়েছিল। এক সাঁওতাল বন্ধু আমাকে একটি ভালুকের বাচ্চা উপহার দিয়েছিল, সেটাকে আমাদের হাজারীবাগ রোডের বাড়ীতে নাবালক অবস্থা থেকে সাবালক করেছিলাম। জানোয়ার পোষার আমার নিজের নিয়ম অনুসারে তাকে কখনও বেঁধে রাখিনি এবং সর্ব্বদা সঙ্গদান করেছি। তাতে করে সে এমন পোষ মেনেছিল যে, পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াত এবং কুকুরের মত আমার চেয়ারের নীচে শুয়ে পড়ে থাকত। চেনা-অচেনা কাউকেই সে কোন দিন কোন ক্ষতি করে নাই।

আমার ধারণা ভালুকের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি প্রবল কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কিছু কম। অনেক সময় লক্ষ্য করেছি ভালুকের সঙ্গে খেলতে খেলতে ছুটে বাগানের মধ্যে গিয়ে সামান্য একটু গা ঢাকা দিলে সে আর খুঁজে পায় নি। অনেক বিখ্যাত শিকারী বলেন যে, বাঘের নাকি ঘ্রাণশক্তি অতি সামান্য। আমি এক জোড়া চিতে বাঘ পুষেছিলাম, তাদের ঘ্রাণশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তবে বন্যজন্তুর শক্তির পরীক্ষা মানুষের গৃহের পরিবেশে সম্ভব নয়, তার সত্যিকার পরীক্ষা হয় অরণ্যের পরিবেশে।

আমি আবার মহুয়াতলায় ফিরে আসি। একদিন এখানে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটে নি। আমার আঙ্গিনার মহুয়া গাছটার মালিক যদিও আমি, আমার প্রয়োজন নেই বলে মঙ্গরু মাঝি ও বড়কুমাঝিকে মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে নেবার হুকুম দিয়েছি। সে আমলে বনে মহুয়া গাছের অভাব ছিল না, কিন্তু মহুয়া ফুল সংগ্রহের জন্যে দূর বনে যেতে কেউ সাহস করত না, পল্লীর কাছাকাছি গাছ থেকে সংগ্রহ করত। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি মঙ্গরুর বউ আর বড়কুর বউতে বেশ আড়াআড়ি চলছে,

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, ড. রাধাকৃষ্ণন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারীলাল মেহতা!
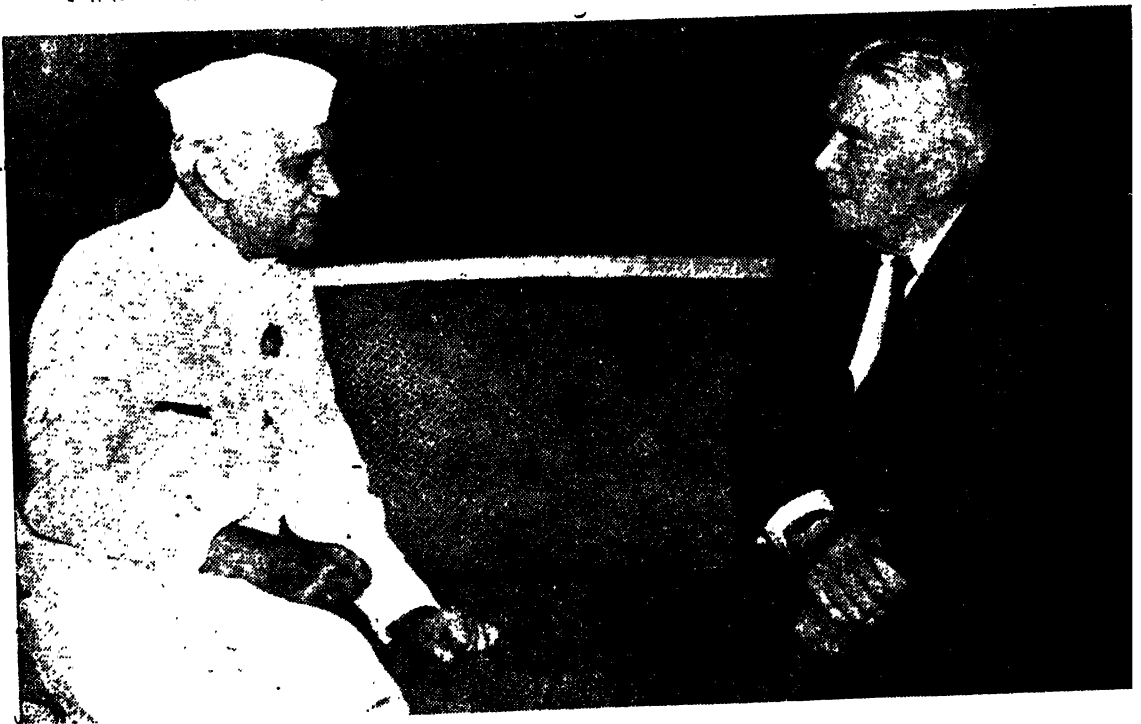
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু এবং নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ওয়ালটার ন্যাশ পরস্পর আলাপরত
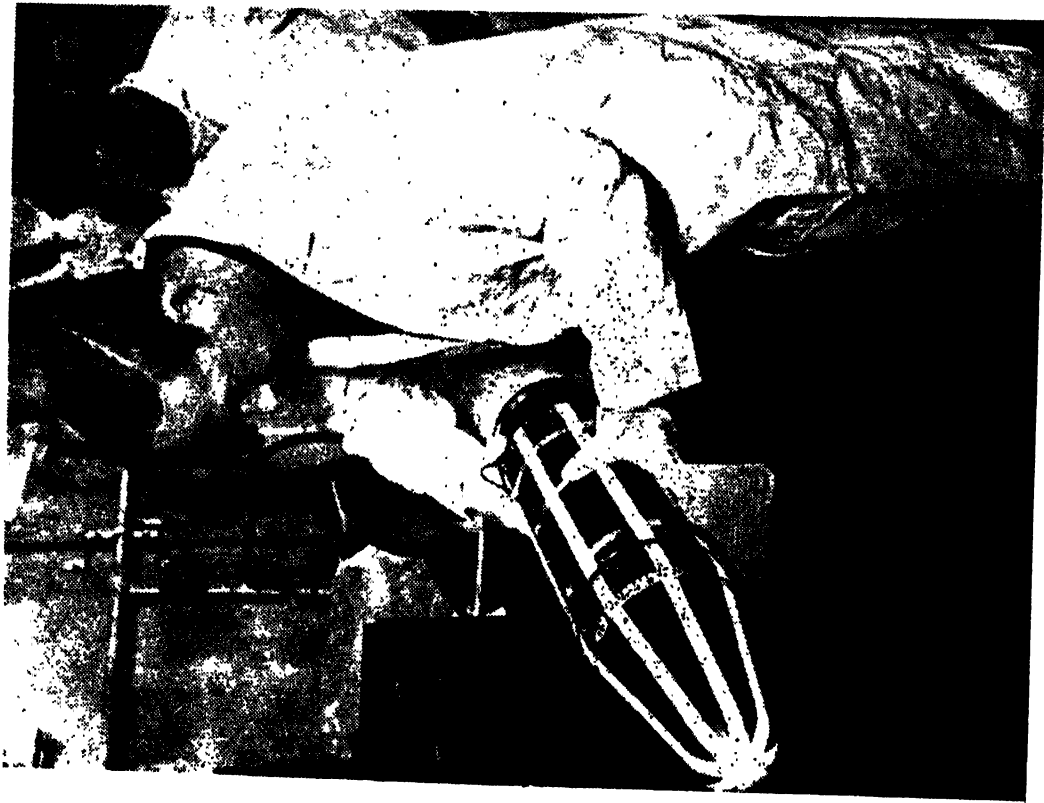
কৃত্রিম উপগ্রহ এক্‌সপ্লোরার ৩
একজন রকেট-টেকনিসিয়ান পরীক্ষা করিতেছেন

কংস-নন্দ সম্মেলন
(রাজস্থানের কোটা মিউজিয়মে রক্ষিত)

এ যদি অন্ধকার থাকতে ফুল কুড়োতে আসে তো ও আসে এক প্রহর রাত থাকতে। একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আছি এমন সময় ভয়ঙ্কর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে জাফরির ফাঁক দিয়ে দেখি আবছায়া অন্ধকারে মহুয়াতলায় দুটো জানোয়ার চীৎকার করে দুদিকে দৌড়োচ্ছে, একটা ছুটছে পাহাড়ের দিকে, আর একটা ছুটে আসছে আমার ঘরের দিকে। একটু পরে আমার দরজার উপর যে হুড়মুড় করে এসে পড়ল, তার গলার আওয়াজে বুঝলুম সে মানুষ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখি মঙ্গরুর বউ দাঁড়িয়ে আছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে সে কোন জবাব না দিয়ে পাশ কাটাল। ব্যাপার কিন্তু চাপা রইল না, সকাল হতে না হতে প্রকাশ হয়ে গেল। মঙ্গরুর বউ বড়কুর বউয়ের আগে এসে ফুল কুড়োবে বলে রাত থাকতে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেখে ইতিমধ্যে বড়কুর বউ মহুয়াতলায় এসে গেছে এবং মনোযোগ দিয়ে ফুল কুড়োচ্ছে। একটা ঝুড়ি নিয়ে মঙ্গরুর বউ তাড়াতাড়ি করে ছুটে এসে যেমন বড়কুর বউয়ের কাছে গিয়েছে অমনি এক প্রকাণ্ড ভালুক যেন খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পর দুই পক্ষেই চেঁচামেচি ও ছুটোছুটি। ভালুকটা আচমকা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে পালাল, তা না হলে মঙ্গরুর বউয়ের নাক সেদিন যথাস্থানে থাকত না।

ভালুক ডুমুর খেতে ভালবাসে এবং গাছে উঠে ডুমুর খায়। উই ভালুকের প্রিয় খাদ্য, উই-ঢিবি ভেঙে তাকে উই খেতে দেখেছি। ভালুক আরও একটা জিনিস খেতে খুব ভালবাসে, সেটা আমি হঠাৎ অতি অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার করি। আমার এক বড়লোক বন্ধু একবার গ্রীষ্মকালে হাজারীবাগ রোডে এলেন শিকার করতে, শিকারীও তিনি ভাল। আমাকে সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। শুনলুম জলের ধারে মাচা করা হয়েছে, সেখানে একটা চিতে-বাঘ জল খেতে আসে, সেইটে মারা তাঁর উদ্দেশ্য। আমি বন্যজন্তু মারা পছন্দ করি না, তবু তাঁর সঙ্গে গেলাম দুই কারণে। প্রথম কারণ বন্ধুর মোটরে প্রচুর দেশী ও বিলিতি খাদ্য তোলা হয়েছে, দ্বিতীয় কারণ জলের ধারে প্রথম দিন বসেই কেউ শিকারের দাঁও পায় না, দশ দিন বসলে একদিন হয়তো পায়। আমরা বিকেল চারটে নাগাদ জলের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম মাচা বাঁধা হয়ে গেছে। মাচায় ওঠবার আগে চা ইত্যাদি খেয়ে নিলাম। মাচায় উঠে দেখি ব্যবস্থা অতি চমৎকার। মোটা গদির উপর বড় বড় তাকিয়া ফেলা, একপাশে জলের ফ্লাস্ক, চা-এর ফ্লাস্ক, টর্চ্চ সাজানো, আর একদিকে বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাচা বাঁধা হয়েছে বড় নড়বড়ে করে। এবিষয়ে দোষী কেউ নয়, কেননা বড় গাছ না থাকায় সরু শাল গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে। মাচাটা সামনে বড্ডই ঝুঁকে পড়েছে দেখে মাচার লাগোয়া পেছনের একটা শাল গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে মাচাকে টেনে বাঁধতে বললাম। তাই বাঁধা হ'ল, সঙ্গের লোকজনকে দূরে সরে যেতে বলে আমরা হাত-পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলাম।

ক্রমে বেলা পড়ে এল, নির্জ্জন বন আরও নির্জ্জন বলে মনে হ'ল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তবু কোন জানোয়ার জল খেতে এল না। আমরা জলের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছি, ক্রমে অরণ্য অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে এল। আমরা ভাল করে আর দেখতে পাচ্ছি না। আমি একবার টের পেলাম কাছাকাছি হরিণ এসেছে কিন্তু জল খেতে আসছে না। বোধ হয় বাঘও ছিল কাছাকাছি তাই পিপাসিত হরিণ জলের কাছে এসেও ফিরে গেল। রাত হয়েছে, এমন সময় বন্ধু কানে কানে পরামর্শ দিলেন যে, খানিকক্ষণ আরাম করে শুয়ে থাকা যাক, যদি বাঘ আসেই, সে আওয়াজ করে জল খাবে। তখন উঠে আমি টর্চ্চের আলো ফেলব, আর তিনি গুলী চালাবেন। ভাল পরামর্শ, আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখছি অসংখ্য তারা আকাশে ঝলমল করছে, ভাবছি কতক্ষণে মাচা থেকে নেবে স্যাণ্ডউইচ আর চা খাব। এমন সময় হঠাৎ মাচাটা ভয়ঙ্কর দুলে উঠল, তার পর সামনে ঝুঁকে পড়ল, আর সেই সঙ্গে কি যেন ধুপ করে উপর থেকে নীচে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে আমি নিলাম টর্চ, আর বন্ধু নিলেন বন্দুক। নীচে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখলাম এক প্রকাণ্ড ভালুক হুড়মুড় করে মাচার নীচে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

ব্যাপার কি হ'ল ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে ভালুকের সঙ্গে যে তার যোগ আছে সেটা অনুমান করলাম। হাঁক-ডাক করে লোকজন আনিয়ে মাচা থেকে নেমে পড়লাম। তখন আবিষ্কার হ'ল পেছনে টেনে বাঁধা দড়িটা কোন কারণে ছিঁড়ে গেছে। এর পরে বিষয়টা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। ভালুকটা আমাদের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে পিছনের শালগাছটাতে উঠেছিল এবং মাচা বাঁধা দড়িটা দেখে তার উপর একখানা পা রেখে আরও ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরু দড়ি অত ওজন সইবে কেন, তা গেল ছিঁড়ে এবং ভালুক পড়ে গেল নীচে। এই বার আর একটা প্রশ্ন উঠল, ভালুক শালগাছে উঠেছিল কেন? গাছে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখলাম একটা ডালে লাল পিঁপড়ের বাসা রয়েছে। তখন আমার সন্দেহ হ'ল পিঁপড়ের ডিম খেতেই লোভী ভালুক গাছে উঠেছিল। পরে সাঁওতালদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, লাল পিঁপড়ের ডিম খেতে ভালুক খুব ভালবাসে।

৫

চৈত্র গিয়ে বৈশাখ এসেছে, গরম পড়েছে খুব। আজকাল সকালবেলাটা ভারি সুন্দর, তাই খুব ভোরে উঠে বেড়াতে যাই। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যে পায়ে-চলার পথ, তাই ধরে চলেছি। রাত্রে ছোট-বড় যে সব জানোয়ার এই পথ দিয়ে আনাগোনা করেছে তাদের অনেকেরই পদচিহ্ন ধুলোয় আঁকা রয়ে গেছে। আমি দু-একটা পায়ের ছাপ চিনতে পারছি, ছোট্ট ছেলের পায়ের ছাপের মত পায়ের ছাপ ভালুকের; হায়নার পায়ের থাবা, হরিণের খুরের দাগ রয়েছে। এই সব পদচিহ্নের আশে-পাশে আমি আমার জুতোর ছাপ রেখে চলেছি।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আমাদের দেশেও কোকিল ডাকে, কিন্তু এ দেশের বহু বিষয়ের মত কোকিলের ডাকেরও একটা বিশেষত্ব আছে। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোকিলের একটি ডাকও শুনি নাই, কোকিল বলে যে একটা পাখী আছে তা মনেও ছিল না। আজ সকাল থেকে হঠাৎ কোকিল ডেকে উঠল, একটা নয়, দুটো নয়, অনেক। সে ডাক আবার থামে না, কুহুধ্বনিতে সমস্ত অরণ্য মুখর হয়ে উঠল। চলতে চলতে শুনতে পাচ্ছি এ গাছে, ও গাছে, দূরে, আরও দূরে কোকিল ডাকছে। শালের ফুল ফুটেছে, গন্ধ নাই, বর্ণবৈচিত্র্য নাই, সাদামাটা ছোট ছোট ফুল, প্রাচুর্য্যই তার শোভা। শীতকালে যে সব গাছ পাতা ঝরে গিয়ে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে ছিল তাদের রূপান্তর ঘটেছে, ডালে ডালে পুঞ্জ পুঞ্জ নূতন পাতা গজিয়েছে। সেই সবুজ সমারোহের মধ্যে বহু পাখীর বসন্তোৎসব সুরু হয়েছে।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি বহু বড় বড় পাথর পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে, সিঁড়ির ধাপের মত একটা পাথরে উঠে আর একটা পাথরে ওঠা যায়। আমি সেই ভাবে উপরে উঠতে লাগলাম, অনেকখানি উপরে একখানা বড় পাথরের উপরটা বেশ পরিসর ও মসৃণ, আমি তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সেইখান থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আমি অরণ্যের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল গাছ আর গাছ, তাদের মাথায় মাথায় কাঁচা রোদ ঝলমল করছে। অনেক দূরে একখানা অদৃশ্য গাঁয়ের অবস্থান ধোঁয়া দেখে অনুমান করছি। অরণ্য যেখানে হালকা হয়ে এসেছে সেখান থেকে সুরু হয়েছে তরঙ্গিত মাঠ সেই মাঠের উপর দিয়ে একটা বালুসর্ব্বস্ব নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে। মানুষের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন তাকে কিছুদিনের জন্যে কবিত্ব রোগে ধরে, বয়সের দোষে আমিও তখন কবিত্ব রোগগ্রস্ত, তাই এমন একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে এখানে বসে কবিতা লিখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল। পরদিন সকালে খাতা-পেনসিল নিয়ে পাথরটার উপর এসে বসলাম। পেছনে পাহাড়ের গায় একটা গলগল গাছ, তার হলুদ রঙের বড় বড় ফুল পড়েছে চারিদিকে। এই পরিবেশের মধ্যে অকবিও কবি হয়ে ওঠে। কয়েক দিনের মধ্যে আমার মোটা কবিতার খাতা ভরে উঠল।

গরমের জন্যে সে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, ভোর হবার অনেক আগেই উঠে পড়েছি। এখন মহুয়ার ফুল তেমন পড়ে না, অল্প-স্বল্প যা পড়ে তা খেতে আর ভালুক আসে না, গোটা কয়েক খরগোশ আসে। আমার সাড়া পেয়ে খরগোশটা পালিয়ে গেল। মহুয়াতলায় ঘুরছি, এমন সময় দেখলাম সাঁওতাল পল্লী থেকে কে যেন এদিকে আসছে। কাছে এলে চিনলাম সে মিতান, হাতে তার তীর-ধনুক। বললাম, "রাত থাকতে কি শিকার করতে চলেছো?" সে হেসে বললে "মেজুর (ময়ূর) মারতে যাচ্ছি, যাবি বাবু?" ময়ূর মারার কথা শুনে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল, একে ত নরীহ পাখী, তার উপরে কাব্যজগতে তার খ্যাতির অন্ত নাই। আপত্তি জানাতে যাব এমন সময় মিতান বললে, "দুদিন শিকারে যাই নি, আজ একটা মেজুর মারতে না পারলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না।" এইবার মিতানের দৃষ্টিকোণটা আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল, আমার খাদ্যের অভাব নাই বলে ময়ূরকে আমি সুন্দর পাখী হিসেবে দেখি, মিতানের খাদ্যের যথেষ্ট অভাব, তাই ময়ূরকে সে খাদ্য হিসেবে দেখে। আমার যেদিন খাদ্যের অভাব হবে সেদিন ময়ূর দেখলে মেঘদূতের শ্লোক মনে পড়বে না—জিহ্বা লালায়িত হয়ে উঠবে। মিতান আবার বললে, "যাবি বাবু?" বললাম "যাব।"

অন্ধকারের মধ্যে আমরা দুজনে পশ্চিমমুখো চললাম, মিতান আগে আমি পিছনে। বনের মধ্যে মিতানের চলা দেখে তাকে একটা হিংস্র জন্তুর মতই মনে হতে লাগল। ডাইনে বাঁয়ে নজর রেখে সাবধানে পা ফেলে ফেলে সে চলেছে, একটু আওয়াজ হলে, একটু কিছু নড়লে সে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাকে নিয়ে তার অবশ্য কিছু বিপদ হয়েছে, আমি মোটেই নিঃশব্দে চলতে পারছি না। যাই হোক, আমরা এই ভাবে চলে কিছুক্ষণ পরে একটা নালার ধারে এসে উপস্থিত হলাম, তার ওপারে মস্ত বড় একটা কহুয়া গাছ (অর্জ্জুন গাছ)। এইবার মিতান আরও সাবধানে এগোতে লাগল, নালা পার হয়ে নিঃশব্দে কহুয়াতলায় এসে দাঁড়াল। আমাকে কাছে টেনে সে উপরের একটা ডাল দেখিয়ে দিল, চেয়ে দেখলাম ডালের উপরে অনেকগুলো বড় পাখী কাছাকাছি ভীড় করে বসে আছে, অন্ধকারেও তাদের বসবার ভঙ্গি ও আকার দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা ময়ূর। অন্ধকারে বেশীর ভাগ পাখীই দেখতে পায় না, এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মিতান ভোর হবার আগে ময়ূর মারতে এসেছে।

ধনুকে তীর লাগিয়ে মিতান তাক করে তীর ছুড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বার দুই ডেকে একটা ময়ূর ডানা ঝটপট করে নীচে পড়ে গেল। মিতান ছুটে গিয়ে সেটা ধরল, আমার কাছে যখন নিয়ে এল তখন সে মরে গেছে। মস্ত বড় ময়ূর, দীর্ঘ কলাপ অন্ধকারেও ঝলমল করছে। মিতান বলল, পাখী (কলাপ) বেচে সে ভাল পয়সা পাবে—বাজারে এর খুব চাহিদা। যত্ন করে মিতান ময়ূরটাকে কাঁধের উপর রাখল।

এইবার আমরা বাড়ীর দিকে ফিরে চললাম। এতক্ষণে পূর্ব্ব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার হাল্কা হয়ে গেছে। অরণ্য জেগে উঠছে, বনমোরগ ডেকে উঠল, ময়ূর ডেকে উঠল, তার পরে চেনা-অচেনা অনেক পাখী ডেকে উঠল। পাহাড়ের কোলে এসে আমরা পুরানো পথ ধরলাম। কিছু দূর এগোতেই আমার কবিতা লেখবার জায়গায় এসে পড়লাম। এমন সুন্দর আবিষ্কারটা মিতানকে দেখাবার ইচ্ছে হ'ল, ছুটে পাথর টপকে টপকে উঁচু পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিদিকে গলগল ফুল পড়ে আছে, যেন বনদেবীর আসন। মিতানকে উঠে আসতে বললাম। সে কিছুক্ষণ চুপ করে পথের উপর দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। এমন কাব্যলোকে উপস্থিত হয়েও তার মুখে আনন্দের

কোন চিহ্ন দেখলাম না। বললাম, 'এইখানে রোজ সকালে এসে আমি কবিতা লিখি, খুব সুন্দর জায়গা, তাই না?' সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এখানে রোজ আসিস?" হেসে বললাম, "হাঁ, রোজ।" শুনে মিতান বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল না। ভাবলাম সাঁওতালের ছেলে, সৌন্দর্যবোধ একেবারেই নেই। এতক্ষণে সূর্য্য উঠেছে, সামনে তাকিয়ে দেখলাম—কাঁচা রোদে অরণ্য ঝলমল করছে। মিতানের দৃষ্টি সে দিকে নাই, সে ধীরে ধীরে পাথরটার পশ্চিম প্রান্তে এগিয়ে গেল, সেদিকে পাথরখানা সাত-আট হাত খাড়া নেমে গেছে। সেইখানে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ইশারা করে ডাকল, আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিতান আঙুল দিয়ে আমাকে নীচের দিকে দেখিয়ে দিল, দেখলাম খাড়া পাথরটার নীচে অনেক শুকনো ও টাটকা গল-গল ফুল পড়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আর কিছু দ্রষ্টব্য সেখানে আছে কিনা, এমন সময় একটা গলগল ফুল নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে সেটা লম্বা হয়ে লেজের আকার ধারণ করল। ভাবছি ব্যাপারটা কি হ'ল, মিতান তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে ঠেলে আমাকে নীচে নামিয়ে দিল এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল।

পথে এসে মিতানকে প্রশ্ন করলাম, "ওটা কিসের লেজ?" মিতান বললে, "চিনতে পারলিনে বাবু, ওটা চিতে বাঘের লেজ।" আশ্চর্য হয়ে বললাম, "বল কি মিতান, বাঘটা ওখানে কি করছে? মিতান বললে, "কিছুই করছে না বাবু, তুই যে পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলি ওর নীচে বাঘের মাঁধ (গহ্বর), ঐখানে সে অনেক দিন থেকে রয়েছে। গাঁয়ের ছেলে বুড়া সবাই জানে, তুই জানিস নে?" বললাম, "না, আমি জানি নে।" মিতান হাসতে হাসতে বললে, "তোর বসবার জায়গায় আমি কতবার বাঘটাকে বসে থাকতে দেখেছি।" মিতানের হাসি আর থামে না।

ঘরে ফিরে কবিতার খাতাখানা খুলে বসলাম, এ সব কবিতার মূল্য আমার কাছে এখন অনেক বেড়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কোন কবি বোধ হয় বাঘের ড্রইংরুমে বসে কবিতা লেখেন নি। বাছা বাছা কবিতা কলকাতার কয়েকটা মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম. দুঃখের বিষয় সব ক'টাই কিছুদিনের মধ্যে ফেরত এল।

আয়ু-রশ্মি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার আয়ুর রশ্মি তোমার দু'হাতে
টানিছ প্রবল বলে হে ভাগ্য দেবতা
বুঝি আর নাহিক সময়,
যে মরেনি এতদিন সংসারের নির্মম আঘাতে
সে ত জানে মর্মে মর্মে তোমার সেকথা
তাই ত হৃদয় মোর একান্ত নির্ভয়।

জানি জানি হে নিষ্ঠুর জীবন-মৃত্যুর নিয়ামক,
তুমিও প্রশান্তি আন অপ্রমত্ত মনে,
দাও চিত্তে নূতন আস্বাদ
অগাধ অনন্ত প্রেমে তুমি নবজন্ম-বিধায়ক
সেকথাও রেখেছি স্মরণে ;
স্মরণে রেখেছি নিত্য রূপান্তরে সে এক আহ্লাদ

পরিধিরে পরিক্রমি জন্ম-মৃত্যু নিরবধি কাল
চলিছে অনন্ত পথে কেন্দ্রচ্যুত মুহূর্তেও নহে,
রাত্রিশেষে এসেছে এসেছে প্রভাত
সূর্য বোনে আকাশের অন্ধকার ভেদি মায়াজাল
স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্ত অস্থির জীবনস্রোতে বহে
বস্তুবিশ্বে এসেছে সংঘাত।

সময় সংক্ষিপ্ত যদি বিলম্বের কিবা প্রয়োজন
শেষ কোথা? কৌতূহল জাগিতেছে মনে
বীতশোক অন্তর আমার,
আমি ত প্রস্তুত আছি, আড়ম্বরহীন আয়োজন
তুমি শুধু নিয়ে চল তোমার প্রবল আকর্ষণে
বিদারিয়া রহস্য আঁধার।

দীপ্তি

দেবাচার্য্য

চতুর্থ দৃশ্য

[চক্রবর্ত্তীর বারান্দা। দীপ্তি ও উৎপলা]

উৎপলা। তোরা তা হলে কালই এ বাড়ী ছেড়ে দিবি ?

দীপ্তি। কাল, না হয় পরশু।

উৎপলা। নতুন বাসাবাড়ী কেমন—দেখে এসেছিস ?

দীপ্তি। মন্দ নয়। একতলায় বড় বড় দু'খানা ঘর। বারান্দায় এককোণে রান্না সারতে হবে এই যা অসুবিধা। পুরনো বাড়ী, বর্ষাকালে জানলা বেয়ে ঘরে জল পড়বে কিনা তা বলতে পারি না। তবে শোবার ঘর থেকে গঙ্গা দেখা যায়। আমার ত ভালই লাগল।

উৎপলা। আমাদের বাসা থেকে দেখা যায় শুধু ইটের চিমনী।

দীপ্তি। তা তোরা টালিগঞ্জের দিকে উঠে গেলি কেন ? টালায় ত বেশ ছিলি ?

উৎপলা। একটু জায়গা পেয়েছেন দাদা রিফিউজী কলোনীতে। একটা টালির শেড মত করেছেন, তা দরমার বেড়া হলেও নিজেদের বাড়ী ত। নিজস্ব জিনিসের আনন্দ আলাদা। বৌদির মুখটা যদি দেখতিস। হাসি যেন আর ধরে না।

দীপ্তি। তোর মামারাও ত ওদিকে বাড়ী করেছেন ?

উৎপলা। মামারা ভাল বাড়ীই করেছেন। কড়ি-বরগা দিয়ে। তা প্রায় দশ-বার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

দীপ্তি। তোরা তাই করলি না কেন ?

উৎপলা। তুই চিরকালই কি বোকা থাকবি ? আমাদের অবস্থা যদি অতটা ভাল হ'ত, তা হলে কি আমি কলেজে পড়তাম না ? পাশ করি আর নাই করি, অন্ততঃপক্ষে কোন কাজ না করে আই-এর দু'বছর ত, যাকে বলে 'এনজয়' করা চলত। লোকের কাছে পরিচয় বাড়ত—উৎপলা দত্ত—রং ফর্সা ;—দেখতে, চলতে পারে ; বিভার আই-এ ক্লাশের ছাত্রী ;—আর অবস্থা : টালিগঞ্জের খালপারে পাকা বাড়ী, প্রয়োজনে কড়ি-কাঠে ঝুলতে কোনই অসুবিধা নেই।

দীপ্তি। যাঃ, তুই নিজেকে নিয়ে পরিহাস করিস। তোর মন লোহা দিয়ে তৈরী।

উৎপলা। না রে, লোহা দিয়ে নয়। লোহার উপর রক্ত চলাচল করলে জং ধরে যাবে। একেবারে ইস্পাত দিয়ে তৈরি বল্। আমায় সেলাই-এর কলের কাছে এসেছ কি, সবশুদ্ধ সেলাই হয়ে যাবে। আর তোমার মতো নিতান্ত নির্ব্বোধ ভবিষ্যৎ-বিলাসিনীদের আশা-ভরসার বেলুনটাও ফুটো হয়ে যাবে। ফল খুব খারাপ নাও হতে পারে। রঙীন ফানুসগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

দীপ্তি। সত্যজিৎবাবুও কতকটা তোর মতন। বলেন, ভবিষ্যতের জন্যে রঙীন ফানুস না উড়িয়ে গোবর কুড়িয়ে ঘুটে দেওয়াও ভাল। অর্থাৎ বলতে চান, রঙীন স্বপ্ন না দেখে বাস্তব জীবনের মুহূর্ত্তগুলোকে সদ্ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

উৎপলা। সত্যজিৎবাবু তা বলতে পারেন। কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন এর মধ্যেই। বাস্তব জীবনের মুহূর্ত্তগুলোকে এখন বেশ ভালভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।

দীপ্তি। কেন রে, কি হয়েছে ?

উৎপলা (বিস্মিতভাবে)—তুই জানিস্ না !

দীপ্তি। না।

উৎপলা। কত দিন হ'ল ভবানীপুরের মেসে উঠে গিয়েছেন ?

দীপ্তি। তা প্রায় এক মাস।

উৎপলা। তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখা হয় নি ?

দীপ্তি। দশ-বার দিন আগে দেখা হয়েছিল, বললেন, মেদিনীপুরে যাচ্ছেন, ফিরতে কয়েক দিন দেরী হবে।

উৎপলা। তোকে স্নেহ করতেন বোনের মতন। তা, তোকে ত অন্ততঃ বৌভাতের নেমন্তন্ন করতে পারতেন। প্রায় দেড় বছর রান্না করে খাইয়েছিস। অসুখ-বিসুখেও সেবা করেছিস। মা-বোন এসেও এমন সেবা করতে পারত কিনা সন্দেহ। সবই ত আমি জানি।

দীপ্তি (বিবর্ণভাবে)। বৌভাত !—কার বৌভাত ?—ওর ত দাদা কেউ নেই। ভাই ত এখনও ছোট। তিনি নিজে ত আর বিয়ে করবেন না।

উৎপলা। তার মানে ! তিনি বিয়ে করবেন না কেন ? তিনিই ত বিয়ে করেছেন।

দীপ্তি। বিয়ে করেছেন—কাকে— ?

উৎপলা। কেন, ব্যারিষ্টার পরিমল চ্যাটার্জ্জীর একমাত্র মেয়ে মিনতিকে। মিনতি চ্যাটার্জ্জী—জানিস না—এ কি ! তোর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কেন রে ? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি ?

দীপ্তি। (খুঁটি ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে)—মাথাটা হঠাৎ ঘুরছিল, এখন সামলে নিয়েছি।

উৎপলা। তোর ত শরীর ভাল বলেই জানতাম। একটু আগেও ত বেশ হাসি-খুশি ছিলি। এর মধ্যেই এতটা শরীর খারাপ হয়ে পড়বে, আমি ভাবতে পারি নি। ডাক্তার দেখা, হয় ত হার্টের কোন ডিজিস।

দীপ্তি। আচ্ছা, হার্ট ডিজিস বোধ হয় সারে না কোন দিন—না রে?

উৎপলা। না না, তা ঠিক নয়, তবে একটু সাবধান থাকা ভাল। আজকাল হার্টের রোগও যেন ছোঁয়াচে হয়ে উঠেছে। মহামারী সুরু না হয় কোন দিন। যেখানেই যাই, সেখানেই শুনি—হয় মেয়েরা—না হয় ছেলেরা—কার্ডিয়াক অ্যাটাকে ভুগছে আর কোরামিন ও ছেঁপটো—রাজ্যের ওষুধ গিলছে—গিলেও কি ফল পাচ্ছে তেমন—? এক একটা ওষুধের দাম কি— !—আমি বাপু, মরে পেত্নী হব, শাকচুন্নী হব—তাও ভাল—তাও দাদাকে পয়সা খরচ করতে দেব না। শুধু তুলসীপাতার রস দাও, তাতে সারে সারুক—না সারে—কি রে এখন কেমন মনে হচ্ছে— ?

দীপ্তি। ভাল।

উৎপলা। হাঁ, যা বলছিলাম। আমি ভগবানের কাছে আজকাল কি প্রার্থনা করি জানিস?

দীপ্তি [উৎসাহহীন ভাবে, কতকটা নিজের মনের অবস্থা গোপন করবার জন্যে ম্লান হাসি হেসে বলে]। কি প্রার্থনা করিস?

উৎপলা। শুধু বেঁচে থাকবার পরিশ্রমেই হাঁফিয়ে উঠেছি—নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়—আমি হাঁপানীতে ভুগছি, হে ভগবান! আমার হৃদয়রাজ্যে যদি এর ওপর আরও কোন কক্কাই-মক্কাই প্রবেশ করে, তা হলে ত আমি গেছি—আর নেই—দুই রোগেই যদি ভুগতে হয়—একি তুই কাঁদছিস!

[উৎপলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দীপ্তির মুখের দিকে তাকায়, এগিয়ে গিয়ে দীপ্তির চিবুক ধরে। দীপ্তি মুখ তুলতে চায় না। হঠাৎ উঠে যায় বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে। উৎপলাও দীপ্তিকে অনুসরণ করে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সাত বৎসর পরে)

[সত্যজিৎ, বর্তমানে ব্যারিষ্টার এস. ব্যানার্জী, এম-এ (অক্সোন) পি-এইচ-ডি। একটি হলঘরের দৃশ্য। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে' সত্যজিৎ একটি মোটা বই নিয়ে পড়ছে—মাঝে মাঝে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছে। চোখে মোটা লেন্সের চশমা। কপালে দু-চারটা চুল পেকেছে, কিন্তু সহসা ধরা যায় না।

নেপথ্য থেকে গানের দুটি লাইন শোনা যায়। গান থেমে যায়। পর্দা ঠেলে মিনতি প্রবেশ করে।

[মিনতি ও সত্যজিতের বেশভূষায় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। (এখন আর তারা ছাত্র-ছাত্রী নয়)। দু'জনেরই অঙ্গে ধনীর পোশাক—মিনতির মাথায় ঘোমটা, চোখে রিমলেস চশমা।]

সত্যজিৎ। (বই বন্ধ করে, মিনতির দিকে ফিরে) বেশ ত গাইছিলে, বন্ধ করলে কেন?

মিনতি। (মাথায় ঘোমটা আর একটু সামনের দিকে টেনে এনে বিস্মিত ও পুলকিতভাবে) কি সৌভাগ্য আজ, সাত বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের—একদিনও তোমার মুখে এমন কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

সত্যজিৎ। কি যে বল।

মিনতি। আমি ঠিকই বলছি। তোমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের জন্যে আমার পিয়ানোয় ধুলো জমে গিয়েছে। সেতারের সব তার ছেঁড়া।

[মিনতি আবার মাথায় কাপড় টানে, কিন্তু বাতাসে ঘোমটা এবার খুলে পড়ে। মিনতি আবার ঘোমটা উঠিয়ে দেয়।]

সত্যজিৎ। ঘোমটা কেন বাপু? এখানে ত অন্য লোক কেউ নেই। [মিনতি অবাক হয়ে সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে থাকে] সাত বছর বিলেতে কাটিয়ে এলে, তাও ঘোমটা, আশ্চর্য!

মিনতি। আশ্চর্যই বটে। সাত বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কবে আমাকে ঘোমটা দিতে দেখনি। এমনকি সাহেব মেমদের মধ্যেও ত আমি বরাবরই ঘোমটা দিয়ে এসেছি। এ নিয়ে এখেলা কত হাসাহাসি করত তোমাকে বলত—মিনিস ভেল, ব্যানার্জীস মিষ্ট্রী—ভুলে গেলে!

সত্যজিৎ। ও হো, তা বটে। আচ্ছা, দেখ মিনি—তুমি—আই মিন—আই মিন—কি যেন বলছিলাম—

[সত্যজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, পায়চারী করে]

মিনতি (একটু অপেক্ষা করে)। বলতে বলতেই ভুলে গেলে!

সত্যজিৎ। না, বলছিলাম, তুমি একটা গান গাও। ঐ যে গানটা গাইছিলে, সেই গানটা শেষ কর। ওটা না বিদ্যাপতির গান—?

মিনতি। হাঁ।

সত্যজিৎ। গাও। অনেক দিন আগে—(সত্যজিৎ আবার পায়চারী করে)

মিনতি। অনেক দিন আগে কি বলছিলে—?

সত্যজিৎ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অন্যমনস্কভাবে) একটি নাচ-ওয়ালীর গান শুনেছিলাম, তার শেষ লাইনটা—

মিনতি। কি ভাবছ—?

সত্যজিৎ। ওঃ, হাঁ, নাচওয়ালী—কি যেন তার নাম—?

[সত্যজিৎ স্মরণ ক'রবার চেষ্টা করে]

নাঃ, মনে আসছে না। বেশ হাসিখুশী, গেয়েছিল একটা গান—বিদ্যাপতির।

মিনতি। কোন্ গানটা?

সত্যজিৎ। আমার কি তা মনে আছে? তোমার মত বাংলা ভাষায় আমার দখল নেই।

মিনতি। মৈথিলী ভাষা বল।

সত্যজিৎ। ঐ একই কথা হ'ল। মিথিলা মানে দ্বারভাঙ্গা, আর দ্বারভাঙ্গা মানে বঙ্গের দ্বার। বিদ্যাপতি যেমন বিহারের, বাঙ্গালারও বটে, অর্দ্ধেক কথা · অর্দ্ধেক কেন, বার আনাই বাঙ্গালী বুঝতে পারে।

মিনতি। তুমি বলতে চাও, এ একটা যুক্তি—বাংলা-বিহার যুক্তির যুক্তি বলে এটা খাড়া করা চলে।

সত্যজিৎ। না বাপু, আমি লিটারেচার ভালবাসি, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না।

মিনতি। তাই ভাল, কি যেন বলতে চেয়েছিলে, কথাটা শেষ কর।

সত্যজিৎ। হাঁা, বলছিলাম সেই শেষ লাইনটা শুধু মনে আছে—গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে। আমার এখনও সংশয় যায় নি, বিদ্যাপতি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন—কে কাকে পাবে?

মিনতি। বুঝলাম না।

সত্যজিৎ। বুঝলে না! রসিক গুণবতীকে পাবে, না গুণবতী রসিককে পাবে? কে কাকে পাবে তা তো কবি পরিষ্কার ভাষায় লেখেন নি। যে যেমন খুশী ব্যাখ্যা করতে পারে।

মিনতি। আমি কবি না হয়েও বলব—রসিক বেরসিক দুই-জনেই গুণবতীকে পেতে পারে, কিন্তু গুণবতী হলেই যে রসিককে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সত্যজিৎ। (হাসবার চেষ্টা করে) কেন, আমি কি খুব বেরসিক? আমি কি তোমার গুণকে অস্বীকার করেছি? কত বার, কত লোকের কাছে গর্ব্ব করেছি, মিনতি—আমার মিনতির তুলনা নেই।

মিনতি। করেছ, একশ' বার করেছ, হাজার বার করেছ।

সাত বছরকে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিয়ে গুণ করলে যতদিন যত রাত হয়, তত বার করেছ। মনে মুখে এক হওয়া কি অতই সোজা। আমাকে যতটা বোকা ভাব, আমি ততটা বোকা নই।

সত্যজিৎ। কি মুস্কিল, তুমি গায়ের জোরে শুধু বলেই যাবে, তাহলে আমি কি বলতে পারি! একটা দৃষ্টান্ত দেখাও, কোথায়, কবে আমি তোমাকে স্বীকার করি নি।

মিনতি। কেন, জন্মদিনে তোমার প্রথম উপহারের কথা ভুলে গিয়েছ?

সত্যজিৎ। ওই সেই একোয়ারীর কথা বলছ। তখন কি জানতাম তোমার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হবে। [পায়চারী করতে করতে, হঠাৎ ঘুরে] উপহারটার মধ্যে দোষই বা কি দেখলে?

মিনতি। দোষ দেখি নি, গুণই দেখেছি। তুমি যে সহজে মিথ্যাবাদী হতে পার না, তার স্বাক্ষর ভগবানই তোমার হাত দিয়ে তোমারই অজ্ঞাতেই আমাকে উপহার দিয়েছেন।

সত্যজিৎ। বুঝলাম না কথাটা।

মিনতি। প্রথম থেকেই তুমি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছ, তাই কি প্রকাশ হয় নি তোমার উপহারে? আমি যেন লাল নীল মাছ। আমাকে থাকতে হবে কাঁচের চৌবাচ্চায়। কলের জলে, মানুষের রচা শেওলা ও শুক্তিঘরের ফাঁকে ফাঁকে। আমার কি অন্য কোন সার্থকতা নেই?

সত্যজিৎ। গভীর জলের মাছকে—তা-ও টোপ ফেলে অনেক কষ্টে ধরতে হয়, একোয়ারীর মাছকে হাত বাড়ালেই ধরা যায়, এই কথা? তাই কি ভেবে উপহার দিয়েছিলাম আমি?

মিনতি। তুমি—তুমি—কখনই আমার জন্যে আমাকে বিয়ে কর নি।

সত্যজিৎ। (হাসি টেনে) তাহলে কিসের জন্যে? টাকার জন্যে?

মিনতি। তা জানি না। তোমার মনের খবর দেবতারা জানেন কিনা সন্দেহ।

সত্যজিৎ। মানুষরা ত কোন ছার?

[বয় এসে পেগ ও মদের গেলাস, সোডা ইত্যাদি রেখে যায়। সত্যজিৎ এক পেগ মদ ঢালে গেলাসে, সোডা মেশায়, চুমুক দেয়, একটা শশা মুখে দিয়ে আবার বলে চলে]

সত্যি মিনতি, আজ আর একটি সত্যি কথা—তোমার মুখ দিয়ে তোমাদের ভগবানই বুঝি আমাকে শোনালেন।

[আবার অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে]

মিনি, তোমাকে দেখে আমার এই মুহূর্ত্তে কি মনে হচ্ছে, জান—?

মিনতি। কি মনে হচ্ছে?

সত্যজিৎ। তুমিই আমার হারিয়ে যাওয়া আকুতি। মাই সুইট ইনোসেন্স—লষ্ট কর এভার।

মিনতি। হয়েছে, হয়েছে।

সত্যজিৎ। তুমি কি ভেঙে যাবে একদিন, কাচের ঘরের মত—? একোয়ারীর লাল মাছ—কি সুন্দর—স্বপ্নের মত সুন্দর—স্বপ্নেরও কি সার্থকতা নেই মানুষের জীবনে! ওই একোয়ারীর লাল মাছগুলোর মত মানুষেরাও কি একদিন নিশ্চিন্তে খেলা করতে করতে—

কবির ভাষায়, লীলাভরে, দিন কাটাবার সুযোগ পাবে না—? না না—

[সত্যজিৎ আবার আর এক পেগ মদ খায়, সামান্য সোডা মিশিয়ে]

মিনতি। অত কম সোডা মেশাচ্ছ কেন—বুক জ্বলে যাবে যে!

সত্যজিৎ। (গভীর দৃষ্টিতে মিনতির দিকে ফিরে, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে হেসে উঠে বলে) হাঃ হাঃ হাঃ, বুক জ্বলে যাবে—! মিনতি, তুমি কি করে বুঝলে—কি করে বুঝলে বল—দশ ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি আর কুইনাইন ছাড়া ত কোন দিন মদ খাও নি—কি করে জানলে তুমি আমার বুক জ্বলে যাবে। হাঃ হাঃ হাঃ—

[হঠাৎ সত্যজিৎ মুখ ঘোরায়, উঠে পায়চারী শুরু করে মঞ্চের উপর—আপন মনে বলে যায়]

যাবে নয়, গিয়েছিল, গিয়েছে, এখন—এখন—মিনি—মাই সুইট, সুইট ড্রিমল্যাণ্ড গার্ল—ডু ইউ নো—

মিনতি। থেমে গেলে যে ?

সত্যজিৎ। না, বলছিলাম, ডাক্তারী শাস্ত্রের কোনো থিওরীই ইউনিভার্সাল না।

মিনতি। তার মানে ?

সত্যজিৎ। মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, বেঁচে আছে তোমার সামনেই উইদাউট দি বিটিংস অব দি হার্ট। তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, তোমাদের ভগবানের সঙ্গে যদি দেখা হ'ত, তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতাম—বলতাম।

মিনতি। কি বলতে ?

সত্যজিৎ। বলতাম, হ্যাণ্ডস আপ দাও ফাউল চীট, আই মাষ্ট—আই নীড শুট ইউ ডাউন—ষ্ট্রেট থ্রু দি হার্ট। ইউ আর ইমমরট্যাল, ইউ ক্যানট ডাই, আই কমিট নো ক্রাইম, আই এ্যাম দি গ্রেটেষ্ট বেনেফ্যাক্টর—আমি—জগতের ত্রাণকর্তা। আমি গুলী করব, তোমাকে, ভগবানকে—ঠিক তোমার মর্মস্থলে গিয়ে লাগুক আমার গুলী। আর সেই গুলীর ক্ষতচিহ্নের পথে—তোমার ভাগবত-বুক বেয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসুক ! —কিসের জন্যে ?

[সত্যজিৎ ঘুরে যায় আবার মদের বোতলটার উপর হাত রেখে]

মর্মবেদনায়—পৃথিবীর মানুষের অভিশপ্ত জীবনের কথা ভেবে। আমি বলতাম—দাও জোভ—দাও খোদা—দাও ঈশ্বর কম্বাইনড—তোমার পবিত্র রক্তে আমি ভাসিয়ে দিতে চাই সকল দেশের, সকল লোকের পায়ে চলার পথ।

[মদের বোতল থেকে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা খেয়ে মুখ বিকৃত করে সত্যজিৎ। মিনতি এগিয়ে গিয়ে হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নেয়]

কেন যে লোক মদ খায়—খাওয়া উচিত নয়—ওয়েষ্ট অব মানী এ্যাণ্ড লাইফ টু। জানি, জানি—হিতোপদেশ অনেক শুনেছি তোমার মুখ থেকে—কিন্তু মিনি। জান কি, ইয়োর গড, মানে তোমার ভগবান হলেন কাপুরুষ ভীরু—বুক পেতে দেবে আমার গুলীর সামনে এমন সাহস তাঁর নাই। পালিয়ে গিয়েছে, পালিয়ে যাবে—ভয়ে, আশঙ্কায়, বুঝলে—এ্যাণ্ড ডু ইউ নো, হী ইজ নট ইন হিজ সেনসেস, আইদার।

মিনতি। কি বলছ যা তা, আবার পাগলামী শুরু করলে। ঐ জন্যেই ত বলি, মদ তোমার সহ্য হয় না একেবারেই।

সত্যজিৎ। না না মিনু ! তুমি বুঝতে পারছ না আমি কি বলছি। আই এ্যাম এ্যাবসলিউটলি কারেক্ট—একটা পয়েন্টেও ভুল বলিনি—ইজ নট ইয়োর গড দি বিগেষ্ট লুন্যাটিক ? সাপোসিং হী ইজ দি ক্রিয়েটর ওয়াজ ইট নট দি ডিউটি অব এ্যান আরটিষ্ট, নর-অর-না না— শুধু নিজের স্বার্থের খাতিরেই, তাঁর উচিত ছিল—তাঁর সৃষ্টিকে নিখুঁত করে গড়া।

মিনতি। মদের নেশায় যা খুশি বলে যাচ্ছ, তোমার সঙ্গে কি তর্ক করব।

সত্যজিৎ। না না, ইউ গুড আরগু—আই লাইক এ্যান আরগুমেণ্ট ; আই নেভার লাইক টু স্লীপ ইন দি আর্মস অব এ ডাম্ব ভেনাস। ডিড আই এভার ?

মিনতি। আমি ভেনাসও নই, ডাম্বও নই। সত্যের অনুসন্ধানে তর্ক বা আলোচনা করতে আমিও চাই। আই এ্যাম নো লেস ইন্টারেষ্টেড ইন ট্রুথ দ্যান ইউ আর—কিন্তু, এখন তোমার বিচার করবার ক্ষমতা নেই।

সত্যজিৎ। ক্ষমতা নেই ! মিনি ইউ আর রঙ—কমপ্লিটলি মিসটেকন। তুমি জানো না সুরা আর সাকীর কি প্রভাব—একেবারে পরিষ্কার নীল আকাশের মতো সত্যকে দেখা যায়। দ্যাখো, তোমাদের রামকৃষ্ণদেবও সুরা ও সাকীকে বাদ দিয়েছেন—বলেছেন কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগের কথা।

মিনতি। আবার রামকৃষ্ণদেবকে টানছ কেন ?

সত্যজিৎ। টানব না, কিছুক্ষণ আগেও তো পড়ছিলাম তাঁরই কথামৃত।

মিনতি। খুব ভাল, বেশ ভাল কথা—কিন্তু কথামৃত পড়ে কি ফল হ'ল—তুমি বলে বসলে, ভগবান পাগল।

সত্যজিৎ। শুধু পাগল তো বলি নি, বলেছি চরম পাগল। আর একটি চরম পাগল হলেন তাঁর চেলা—ঐ রামকৃষ্ণ।

মিনতি। কেন, রামকৃষ্ণদেবের চরম পাগলামির পরিচয় পেলে কোথায় ?

সত্যজিৎ। চরম বোকামি তাঁর !!—তিনি বলে বসলেন—ত্যাগ কর, কামিনী ও কাঞ্চনকে ত্যাগ কর !!—তবেই ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে !!

মিনতি। এই তো আমাদের হিন্দুধর্মের বোধ হয় সকল ধর্মের আদি কথা।

সত্যজিৎ। কিন্তু একেবারেই অবাস্তব উপদেশ। নয় কি ? ভগবান নিজেই যেখানে মদ, মেয়েমানুষ আর কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে মানুষকে জন্মচক্রে জড়ান—আই মিন—আই মিন—যদি আমি মেনে নি অবশ্য ভগবান আছেন ও তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

মিনতি। ভগবানকে যদি না মান, তা হলে ভগবানের দোহাই দিও না, বোলো না ভগবানই আমাকে কামুক করেছেন, মদ খেয়ে মাতলামী করবার উপদেশ দিয়েছেন, আর পাথরের গুড়ো মিশিয়ে আটা বিক্রী করে অথবা জালিয়াতী করে, ঘুষ দিয়ে, নীতি, রীতি, হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়ে কি করে লোক ঠকিয়ে টাকা করতে হয় তার কুবুদ্ধি দিয়েছেন।

সত্যজিৎ। প্রসীড, ইয়োর লেডীশিপ, আমি কান পেতে শুনছি। সত্যানুসন্ধানীর মত। কুতর্ক করবার জন্যে নয়।

মিনতি। আর যদি ভগবানকে মান—

সত্যজিৎ। হ্যাঁ, আর যদি ভগবানকে মানি, তাহলে—তাহলে কি—বল—বল—বল—বলছ না কেন?

[মিনতি মদের বোতলটা টেবিলের উপর রেখে এগিয়ে আসে সত্যজিতের কাছে, সত্যজিতের হাতের আঙুল নিজের আঙুলের মধ্যে জড়ায়, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে]

মিনতি। তা হলে, তাঁরই সৃষ্টি মিনতির মিনতিকেও তোমার মানা উচিত নয় কি?

সত্যজিৎ। কি সে মিনতি?

মিনতি। সংযম ছাড়া জীবনে আনন্দ নেই।

সত্যজিৎ। ওঃ, ভুলে গিয়েছি বটে। তুমি হলে—রামকৃষ্ণ-ভক্ত।

মিনতি। কেন, তুমি কি তা নও? তা হলে মনোতোষ বাবুদের উৎসবে প্রিসাইড করলে কেন—আর অত উচ্ছ্বসিত ভাষা—

[বয়ের প্রবেশ। টেলিফোন। টেলিফোন ধরতে মিনতি ঘর ছেড়ে যায়। সত্যজিৎ আবার পেগে মদ ঢালে ও এক চুমুকে শেষ করে। তার পর একটি বই নিয়ে খুলে কিছুকাল পাতা উলটিয়ে বইটা রেখে, আর একটা বই খুলে পাতা উলটিয়ে যায়। এক জায়গায় থেমে বইটা হাতে নিয়ে পায়চারী করতে করতে মঞ্চের মাঝখানে এসে দরদভরা-কণ্ঠে আবৃত্তি করে]

মাধব বহুত মিনতি করো তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সোঁপায়,
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহ মোঞে ছার।
কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন,
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ।

[মিনতির পুনরায় প্রবেশ। সত্যজিতের সেদিকে লক্ষ্য না করে একমনে পড়ে যায়]

ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর

[মিনতি এগিয়ে আসে। সত্যজিৎ মুখ ফিরিয়ে আপন মনে অন্যমনস্কভাবে দূরে তাকিয়ে পাঠ শেষ করে]

তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

[চমক ভেঙে মিনতিকে দেখে সত্যজিৎ ম্লান হাসি হাসে।]

সত্যজিৎ। তোমার "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস" পড়ছিলাম। কে টেলিফোন করল?

মিনতি। মনোতোষ বাবু টেলিফোন করছেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখেছি। যাও ধর গে।

সত্যজিৎ। ও বাবা, এই অবস্থায়—মনোতোষ খেয়ে ফেলবে না। ওর নাকে টেলিফোনের তার বেয়ে মদের গন্ধ যায়: জান না তো কি ষ্ট্রং মরালিষ্ট।

মিনতি। মরালিষ্ট মাত্রেই ষ্ট্রং। ষ্ট্রং হওয়াই উচিত। ভয় নেই, তোমাকে ধমকাবেন না। তুমি একবার হাঁ বলে চলে এস। আমি তোমার হয়ে বলতে পারতাম। কিন্তু সে অধিকার তো তুমি আমায় দাও নি। তোমার মর্জ্জিমত তুমি কখনও হাঁ বল, কখনও না।

সত্যজিৎ। কি ব্যাপার?

মিনতি। তোমাকে এবারেও প্রিসাইড করতে হবে। কাউ ছাপতে যাবে।

সত্যজিৎ। সর্ব্বনাশ, আমার মতন পাপীকে আবার বিবেকানন্দের জন্মদিনে জড়ানো কেন? উঃ, এই প্রিসাইড করতে করতেই আমি শেষকালে পাগল হয়ে যাব। বলে দাও, আমি পারব না—আই ওন্ট—নো—আই এ্যাম নট গোয়িং টু প্রিসাইড। মনোতোষ! উঃ পাদ্রী, পাদ্রী! আই মাষ্ট সে, দিস ইজ আউটরেজাস! ও জানে না, আমার নার্ভের ওপর ও কি আঘাত হানে! আমি—আমি ধর্ম্মের কিছু জানি না। নর ডু আই টেক্ প্লেজার ইন অল্ দ্যাট রট এ্যাণ্ড—

মিনতি (রেগে গিয়ে)—তুমি থামো, সে প্লেজার পাবে কেন, তোমার প্লেজার হ'ল পেগ পেগ মদে আর—

সত্যজিৎ (শুষ্ক হাসি হেসে)—আর—?

মিনতি। আর কিছু কি চিনেছ পৃথিবীতে।

[মিনতি ক্ষুব্ধভাবে রেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সত্যজিৎ আবার একটা বই নিয়ে পাতা ওলটায়, বইটা ছুড়ে ফেলে দেয়। হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, সুইনবার্ণের গার্ডেন অব প্রসারপাইন থেকে আবৃত্তি করে—]

"...Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow
Creeps in this petty pace, from day to day
To the last syllable of recorded time
And all our yesterdays have landed fools
The way to dusty death...
To be or not to be—that is the question.
Iago, Iago, I have last my reputation,
I have last the immortal part of my soul.

[অসংলগ্ন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে, কখনও বা বিড়বিড় করে সত্যজিৎ মঞ্চের উপর পায়চারী করতে করতে আবৃত্তি করে— অদৃশ্য কাউকে কল্পনা করে হাত নেড়ে প্রশ্নের ভঙ্গীতে করুণ সুরে বলে—]

And the weariest river windo
Somewhere safe to the sea
—Does it—?

না না, তাও কি কখনও হয়?

The once flowing river—look!
It has lost its course, The current is choked by sedimentary rocks—and there—there, look again! All the deserts of the world are at your door!

Now Alexander, Julius, Napolean—conquerors of the world! away—away you ride upon the fasted horse! A small particle, the atom of lust is more powerful, more horible than all your murderous tribes.

(সত্যজিত মদের বোতলে মদ শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে বয়, বয়—করে চীৎকার করে। বয়ের প্রবেশ।)

উল্লুক কোথাকার! দু' পেগের বেশী দিস নি কেন?

(বয় ভয় খেয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিনতির প্রবেশ। সত্যজিৎ চীৎকার করতে থাকে—(বয়ের দিকে চেয়ে) I dismiss you, you're discharged.

মিনতি। (সক্রোধে) ও ইংরেজি জানে না। তুমি কি সত্যি পাগল হয়ে যাবে? কাকে কি বলতে হয়, তাও খেয়াল থাকে না তোমার। আমি ওকে বারণ করে দিয়েছি, ওর কোন দোষ নেই। (বয়ের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে)—যা তুই, তোর কাজে যা। আর কাজই বা কি, ঘুমুগে যা। রাত্রিও হয়েছে। (বয়ের প্রস্থান)

সত্যজিৎ। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) তুমি কি পানওয়ালার দোকানে যেতে পারবে?

মিনতি। পানওয়ালার দোকানে যাব কেন?

সত্যজিৎ। সোডা কিনতে। সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে। সোডা না হলে বুকটা জলে যায়। আজ আমার নেশা মোটেই হয় নি। আজি মধুযামিনী—পিয়ামুখচন্দা—আমাকে আমার ইচ্ছেমত থাকতে দাও। মদ আন, আরও দাও। আই এ্যাম নট মনো-পেগাস।

মিনতি। মদ আর তুমি খেতে পারবে না। এর মধ্যে দু পেগ খেয়েছ। আর না। এইবার শুয়ে পড় লক্ষীটি! আর জ্বালিও না আমাকে। তোমার সঙ্গে রাত্রি কাটানো আমার পক্ষে—কি ট্রাইং, তুমি হয় ত জান না। আমার শরীরের মধ্যে যেন কেমন মনে হচ্ছে। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।

সত্যজিৎ। (এগিয়ে এসে)—না না, মিনতি, তুমিও কি আমাকে ছেড়ে যাবে, তা হলে—তা হলে কে আমাকে দেখবে? আমি, আমিও তা হলে—

মিনতি। (ভয় পেয়ে, সত্যজিতের হাত ধরে)—খবর্দার, ও কথা যদি আবার তুমি মুখে আন, ভাল হবে না বলছি।

সত্যজিৎ। (দু'হাতের তালুর মধ্যে মিনতির মুখ নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে মিনতির চোখের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে)—মিনি, তুমি কি জান না, তোমাদের এই ভগবানের কোন বিধানই আমি মানতে বাধ্য নই। যদি স্রষ্টা হয়ে নিজের সৃষ্টিকে কলুষিত করলে তাঁর পাপ না হয়, তা হলে আমি যদি সুইসাইড করি, আত্ম-হত্যাতেই যদি আমি আনন্দ বা দুঃখের অন্ত খুঁজে পাই, তা হলে আমারই বা পাপ কোথায়?

Any man or woman who thinks to-day, should have the fundamental right to commit suicide.

মিনতি। 'Suicide' না বলে বল 'Self-cide', তাতে আমার আপত্তি নেই। নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ, নিজেকে নিয়ে শুধু ভেবে মরা—এই অজ্ঞতা, মূর্খতা হত্যা কর, আমি বারবার সেই মিনতিই ত তোমার কাছে করে আসছি। আমার দুর্ভাগ্য, তুমি আমাকে seriously নাও না।

সত্যজিৎ। (সরে গিয়ে, পায়চারী করতে করতে, আত্মগত ভাবে)—

'...And get into this world
That to the sense is shadow
And not linger co-retchedly
Among substantial things,
For it is dreams that lift us
To the flowing, changing world
That the heart longs for...'

(ফিরে) জান মিনি—ইয়েটস ইজ এ্যান্ এসকেপিষ্ট। বেচারী নিরীহ কবি, স্বপ্নের জগতে পালিয়ে যেতে চায়!

মিনতি। আমি পড়েছি ও কবিতা। আত্মহত্যার চিন্তা থেকে যদি কেউ এসকেপ করবার পথ খুঁজে পায়—সেই স্বপ্নলোকের পথকে আমি নমস্কার জানাই। তুমি কেন কবিতা লেখ না? আজকাল ত লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ। একটা কাগজে ত তোমার একটা লেখা, এমন কি একটা প্রবন্ধও বের হয় না। কাজ করবে না, কোর্ট যাবে না, কলেজে যাহোক সন্ধোবেলায় পড়াতে সাহিত্য, তাও একটা ভাল অকুপেশন ছিল—পাঁচটা ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে, অনেকগুলি তরুণের সামনে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছুটা তারুণ্য থাকে—

[সত্যজিৎ একটা সোফায় বসে পড়ে, মিনতি সোফার হাতলে বসে সত্যজিতের গলা জড়িয়ে মাথায় চুলের উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয়।]—জান—?

সত্যজিৎ। কি?

মিনতি। মায়ের বুড়ো বয়সে খোকা হয়েছে, তাইতে মা এত লজ্জিত হয়েছেন, আবার এমন খুশিও হয়েছেন। মাকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন তাঁর দশ বছর বয়েস কমে গিয়েছে। অরু মাসী আজ দুপুরে টেলিফোন ২২২ বাবা নাকি তোমাকে বঞ্চিত করেন নি, সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক উইল করে আমাকে লিখে দিয়েছেন।

সত্যজিৎ। তাই নাকি? Good news বলতাম, সন্ধ্যের আগে যদি এ খবরটা জানাতে।

মিনতি। কেন?

সত্যজিৎ। দিনের বেলায় আমি Dr. Jekyll, সন্ধ্যের পর থেকেই Mr. Hyde—ক্ষীরোদ, প্রভাস, মনোতোষ—সবাই তাই বলে—তবে উল্টো করে বলে—বলে আমি দিনের বেলায় Hyde এর ভাণ করি, রাত্রে রামকৃষ্ণের কথামৃত পড়ি।

মিনতি। তাই ত ভাল, দিনের বেলায় লোক-দেখানো সাধুত্বের বড়াই না করে রাত্রির অন্ধকারে যদি অমৃতের সন্ধান খোঁজ—সে ত প্রশংসাই করেছেন তাঁরা। ঐ ত আমাদের মিঃ দত্ত বউ হারিয়ে মদ ধরেছিলেন, তার পর কোন্ বন্ধুর পরামর্শে রামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ পাঠ করে তাঁর মন বদলে যায়, ব্যাঙ্কের মিটিংয়েতেও নাকি 'বাটন-হোলে' রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি লকেট করে পরতেন। মদ আর স্পর্শ করেন নি। আর তাঁর চরিত্র—এমন সবল, চরিত্রবান ও সার্থক বাঙালীও খুব বেশী খুঁজে পাবে না। বাবা কত প্রশংসা করেন।

সত্যজিৎ। আর তোমার স্বামীর কত নিন্দে করেন—তাই না? তোমার মায়ের সেই eternal regret কি এখনও বন্ধ হয় নি?

মিনতি। যাও, তুমি যেন কি! মা চাইতে পারেন, কিন্তু আমি কি সেই জন্যে কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করেছি?

তোমার মধ্যেই আমার সব। আমি—আমি—কি, জান—না, ও হয় ত আমার মনের ভুল।—

সত্যজিৎ। (অন্যমনস্কভাবে মাথার মধ্যে চুলকায়) মাথাটা বড় চুলকোচ্ছে কানের কাছে।

মিনতি। ইস্, এমা, তোমার চুল পেকেছে।

সত্যজিৎ। ভালই হ'ল। এবার wise man মানে বিজ্ঞ ব্যক্তি হব। অপরকে উপদেশ দেব।

মিনতি। এবং নিজেও সেই উপদেশ মেনে চলবে।

সত্যজিৎ। আবার ধর্ম্মের উপদেশ। দিলে ত ভাবটা মাটি করে। Really I can't stand your puritanism. You are hopelessly old-fashioned, Minny.

মিনতি। দেখ, পিউরিট্যান বা ওল্ড-ফ্যাশনড কথা দুটোর মধ্যে নিন্দে আছে। কয়েকটা অক্ষর বাদ দিয়ে যদি বল, আমি তোমার দুটো শব্দকেই প্রশংসা বলে গ্রহণ করতে পারি। Love of purity is the oldest and truest virtue in human, ক্লাউডেড স্কাই থেকে কি পিওর ব্লু স্কাই শতগুণে ভাল নয়? I mean—not only better, but more attractive, too.

সত্যজিৎ। কিন্তু আকাশ যে ঘুরে ফিরে মেঘাচ্ছন্ন হবেই। Where is the sky-mistress to take me above the clouds—? আমি—আমি সাধারণ মানুষ, আমি বুঝতে চাই, কোন্‌টা—কোন্‌টা হ'ল সত্য পথ? আমাকে যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে, বিজ্ঞানের পথে বুঝিয়ে দাও। অতীন্দ্রিয় জগতের কথা আমি কি বুঝি! যদি সে ক্ষমতা তোমাদের না থাকে—

Out, out, I say—

And let me live my life, অর্থাৎ বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চাই—?

আমি বলতে চাই,

আমি পাপ করি, মদ খাই,
কামিনীকাঞ্চনে সুখ খুঁজি—

তাতে তোমার কি। সমাজেরই বা কি মাথাব্যথা? আমি সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ভোগ করব, একটি প্রাণী, একটি লোকও—জানতে পারবে না, কিন্তু—

মিনতি। তোমার চরিত্র-মাধুর্য্যের যে দীপ্তি সে দীপ্তিই যদি হারিয়ে যায়, তা হলে তুমি কি সমাজের অমঙ্গল করবে না? ভাল কাকে বলে, তাও কি তোমার মত Oxfordএর একজন গ্রাজুয়েটকে আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? ভাল সেই জন্যে ভাল, ভাল কাজে অনুতাপ নেই, সবাইয়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সবাইয়ের প্রশংসা গ্রহণ করা যায়। এ ত অতি সাধারণ কথা। Even a school-boy knows—

সত্যজিৎ। কিন্তু, আমি রাজ্যের বই যে টেও তা জানি না।

মিনতি। জানবে না কেন, খুব জান—তোমার দোষ, তুমি আজকাল অলস হয়ে গিয়েছ। It was very unfortunate, রবার্টই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। রবার্টের সঙ্গে পরিচয় না হলে তুমি লণ্ডন ষ্টক্-এক্সচেঞ্জে জয়েন করতে না। My bad luck, কিছু পরিশ্রম না করেই তুমি কয়েক লাখ টাকা earn করেছ—মানে, পেয়ে গিয়েছ।

সত্যজিৎ। কেন, সে টাকা না পেলেও ত শ্বশুরের টাকার ভরসা ছিল, আজ না হয় অংশীদার জুটেছে।

মিনতি। সেটুকু মনুষ্যত্ব তোমার এখনও আছে। শ্বশুরের পয়সায় যে ঘরজামাই থাকতে তুমি কোন দিন রাজী হও নি, হবে না—সেই গর্ব্বেই ত আজও আমি মাথা তুলে বন্ধুদের কাছে দাঁড়াতে পারি। নইলে তোমার যে—

সত্যজিৎ। আমার যে—কি আমার অগৌরবের দেখেছ মিনি?

মিনতি। তুমি পাগলের মত মর্গে ছুটে যাও। আর লজেন্স, চকোলেট, ছবির বই নিয়ে স্কুলের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাক।

ওরা যে সবাই তোমাকে পাগল ভাবতে শুরু করেছে। মা ত কেঁদে কেটে বাবাকে বললেন—

সত্যজিৎ। কি বললেন ?

মিনতি। Electric shock দিয়ে তোমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে।

সত্যজিৎ। (অট্টহাস্য)—হাঃ হাঃ হাঃ !

(মিনতি ভয় পায়)

না না, ভয় পেও না, আমি এখনও পাগল হই নি। কিন্তু, মিনতি, আমার কি কোন নৈতিক কর্ত্তব্য নেই ?—

Have I not the duty—the moral obligation to stand by a poor and forlorn maid whom there were none to praise—and few to love—?

দীপ্তি—দীপ্তিকে চেন না !

She was the radiance that was mine, and mine alone. She has vanished—vanished in the darkness of the common night.—She walks on the footpath.

[আর্ত্ত ভাবে সত্যজিৎ কুশনে বসে পড়ে, মুখ ঢাকে, আবার মুখ তোলে, গম্ভীর, ভগ্নকণ্ঠে আবার বলে]

হয়ত বা, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে ! Her black emaciated body—O goodness !!—It's cruel—cruel beyond measure !! না না, হ'তে পারে না।

[সত্যজিৎ হঠাৎ মিনতির হাত দুটো টেনে নিয়ে প্রশ্নের ভঙ্গীতে]

বল বল মিনতি, এ হতে পারে না। দীপ্তি কি অন্ধকারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেবে ? না না, এ হতেই পারে না।

Light cannot be defeated by darkness, I refuse to believe it.

[মিনতি সত্যজিৎকে হাত ধরে ওঠায়। একটা সেটিতে শুইয়ে দেয়, এবং নিজে পাশে বসে। সত্যজিৎ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে মিনতির মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে, মিনতির অজ্ঞাতে আঁচল থেকে চাবী খুলে নেয়। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। মিনতি বুঝতে পারবার আগেই পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে চলে যায়। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। মিনতিও ছুটে যায়, বন্ধ দরজার উপর করাঘাত করতে থাকে]

মিনতি। খোল, খোল, দরজা খোল। লক্ষীটি, আমার কথা শোন। খেয়ো না, আর মদ খেয়ো না—পায়ে পড়ি তোমার।

[দরজা খুলে যায় একটু পরে। সত্যজিৎ একটা বোতল হাতে ঢক্ ঢক্ করে খেতে খেতে বেরিয়ে আসে, মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। মিনতি বাধা দেবার চেষ্টা করে। সত্যজিৎ এক হাতে মিনতিকে ঠেকিয়ে রাখে, বলে]

সত্যজিৎ। I apologise to Minati—my conscience-keeper. But Minati, তুমি ত শুধু মিনতি। কে তোমাকে গ্রাহ্য করে ? নির্ব্বোধেরা এক নম্বর। দুই নম্বর তোমাকে মান্য করে স্কুলমাষ্টার। তিন নম্বর তোমার মতন কাতর মিনতি জানায় যারা অপরের কাছে—মিশনারী, সাধু, ভিক্ষু,—আর—বোধ হয় মিনতি জানায়—ছেলের মা ছেলের জন্তে। বলে, হে ভগবান ! আমার ছেলেটা ভাল হোক, খুব—খুব বড় হোক।

How Silly !

They pray—they lose precious time to a Term !

Can a 'Term' give you consolation ?

Can it save you from perjury ?

From adultery ?

From murderous instincts ?

From vile ambition to own the Earth as yours, and yours alone and to dictate to others ?

ওঃ, ইংরেজী ভুলে গিয়েছ বুঝি—তাই ও রকম করে তাকাচ্ছ !—আমি বলতে চাই, ভগবানের নাম নিয়েও অনেক লোক অনেক পাপ কাজ করে থাকে। কিন্তু ভগবানের ত পৃথক অস্তিত্ব নাই। মাত্র চা'র অক্ষরেই তিনি শেষ। সেই চার অক্ষরবিশিষ্ট কল্পনার জন্যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যতটুকু ভাল হয়েছে তার চেয়েও বুঝি ক্ষতি হয়েছে অনেক, অনেক বেশী। কেন, জিগ্যেস করছ ?

উত্তর খুব সোজা। ভগবান, ভগবান করে মানুষ মানুষকে দৈত্যের ন্যায় খুন করেছে—Massacre of the Piedmontese ভুলে গেলে—১৬ই আগষ্টের রায়ট ভুলে গেলে—তাই বলি ও ঠুঁটো জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করবার প্রয়োজন নেই। আর যদিই বা সে জগন্নাথের কোন প্রকৃত ক্ষমতা থাকে, সে কি পরম নিষ্ঠুর নয় ? কে—কে আজ—আমাকে এত নিঃস্ব, এত অসহায় করেছে—বল—বল। চুপ করে রয়েছ কেন ? দীপ্তি—আমার দীপ্তি কোথায় ? দীপ্তির সন্তান সে কোথায় ? কে আমাকে প্রেরণা দিল ?

Like a Coward, to desert her—

Like a villain to cheat you—

To murder you both—?

মিনতি, তোমার ভগবানের কাছে মিনতি জানাও। কেঁদে বল, মাধব, মাধব—তুমি এ কি করেছ ! তোমারই সৃষ্টির মধ্যে এ কি ধ্বংসের বীজ !! কেন, কেন—কি প্রয়োজন ছিল—এ অসম্পূর্ণ বিকৃত মানসের ? হে অনন্ত শক্তিমান ! ক্ষুদ্র মানুষ, অতি দুর্ব্বল মানুষকে আর একটু শক্তি দিতে তোমার ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হয়ে যেত ? হে কৃপণ ! হে উদাসীন ! হে নির্ব্বিকার ? তুমি আমার স্বামী—ভ্রান্ত স্বামী, আদর্শচ্যুত স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দাও তার দীপ্তিকে—তার সন্তানকে ! আর যদি তা না পার, তা হলে—

Out, out you go !

I curse you to groan unto Eternity !!

কারণ, আমি সতী মিনতি। আমার অভিশাপ ফলবেই। ভিখিরীর মত তুমি, তুমি ভগবান—তুমিও নিরন্ন, নিঃস্ব হয়ে নরকের দোর গোড়ায় ভিক্ষা চাইবে ! কিন্তু [অট্টহাস্যে—হাঃ হাঃ হাঃ] ভিক্ষে—ভিক্ষে পাবে না। কারণ ? কারণ, সেখানে ছ'মুখো কুকুর—অনেক কুকুর আছে। তাদের চোখ জ্বলছে—বাঘিনীর চোখের চেয়েও হিংস্র, কুমীরের দৃষ্টির চেয়েও ক্রূর সে দৃষ্টি। ঐ, ঐ—এল ! ওরা পালাচ্ছে—পালাবার পথ নাই। যম আছে পিছে। না না—যমও ওদের উপর চটে আছে। তা হ'লে ত ওরা আশ্রয় পেত—পৃথিবীতে ফিরে আসবার, আবার মানুষ হবার আশা নিয়ে। নরকের দোর গোড়ায় বেঁচে থাকত না। নরকের মধ্যে যাদের অন্ততঃ সুনিশ্চিত স্থান আছে। মানুষের চেয়ে কি প্রেতেরা সুখে নেই ? বুঝতে পারলে না—বুঝতে পারলে না মিনতি ? ওই, ওই দ্যাখ, দীপ্তি মরে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। দেখছ—ওই দ্যাখ জানালা দিয়ে। তাকাও।

[মিনতি বয় বয় করে ডাকে। বয় আসে।]

মিনতি। বা শীগ্‌গির, সরকার মশায়কে বল গিয়ে আমার নাম করে, ডাক্তার সেনকে খবর দিতে, তিনি যেন এখুনি চলে আসেন।

সত্যজিৎ। (হেসে) O silly, I am not mad ! কি ভাবছ মিনতি ? তুমি কি সত্যি সত্যি ভেবে নিয়েছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। না, না।

[মিনতি বয়কে ইঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলে। বয় ত্রস্তভাবে দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

মিনতি : (সত্যজিতের হাত ধরে, মৃদু আকর্ষণ করে) এস, বহুত মিনতি (আঁচল দিয়ে চোখ মোছে) তুমি আমার কথা শোনো, আর বকো না। এস ঘুমুবে এস।

[সত্যজিৎ শান্ত ভাবে মিনতির কথা শোনে। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।]

সত্যজিৎ। (বিছানায় শুয়ে) মিনি, মাই প্রেয়ার, ভয় পেয়ো না। I am not mad—আমি পাগল হই নি, সত্যি, বিশ্বাস কর। এই তোমাকে ছুঁয়ে আমি বলছি।

মিনতি। কে বলেছে তুমি পাগল হয়েছ। মদের ঝোঁকে ও রকম প্রলাপ অনেকেই বকে। কিন্তু, আজকে তোমার প্রলাপের মধ্যে যেন কিছু সত্যের আভাস ছিল। দীপ্তি—কে সে দীপ্তি। মনের কল্পনা ? না, বাস্তবে কেউ ছিল এককালে ? অথবা এখনও সে বেঁচে আছে ? একমাত্র তুমি জান আর ভগবানই জানেন। আমাকে যদি বল সব কথা, তা হলে হয়ত আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তুমি কি দীপ্তি বলে কোন মেয়েকে ভালবাসতে ?

(ক্রমশঃ)

নাবিক-মন

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

কতকাল ধরে তুমি এ অকূল সাগরের কোলে
দ্বীপ হয়ে আছ : প্রতি রাত্রেই দীপ জ্বালো তাই,
আশা-বিক্ষত এ-নাবিক-মন নোঙরের ঠাঁই
খুঁজে পায় ঘোর প্রলয়-ঊর্মির কল-কল্লোলে !

সারাদিন শেষে তোমার ওই বুকে আশ্রয় পেতে
পথভোলা হয়ে ভেসেও শান্তি ! নিরুদ্দেশের
তৃষ্ণায় নোনা জল কেটে বুকে গণ্ডীশেষের
যত দূরে যাই ফেরার আবেশে তত উঠি মেতে !

সপ্তডিঙায় সাত সাগর আর তেরো নদী ঘোরা
শেষ। রোদে ঝড়ে জলে ও তুফানে ছেঁড়া পাল,
হাল তবু কোন আঁচড় লাগে নি অনুরাগে রাঙা
মণি মুক্তায় : রক্তাজিত প্রেমের এ-পসরা !

সাগর কন্যা, বাড়ায়ে দু'হাত এ-অলঙ্কার
ধর : রাত শেষ—সময় নিরুদ্দেশ যাত্রার !

গ্রামের নাম পরিবর্তন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

—লোকমুখে

১। সিলুয়া—সলুয়া (হুগলী)

ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত নিত্যানন্দ বংশবল্লীর ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে :

"কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টি পুত্র জন্মে তাহাদের বাসোপযোগী রাজপ্রদত্ত ৫৯খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রামের নামানুরূপ বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৫৯ গাঁঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মতান্তর মতে ৫৬ গ্রাম (রাঢ়ীয়দিগের ভরণপোষণের জন্য) মহারাজ ক্ষিতিশূর প্রদত্ত। কথায় বলে পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁঞি তা ছাড়া বামুন নাই। এক্ষণে সলুয়া মল্ল গাঁঞি ইহা হইতে পৃথক। ইহা ব্যক্তি বিশেষের বা হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম নহে। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন।

তথাহি—ততো ই ভবং বাতীতে কালে উনবিংশতি পুত্র পর্য্যায়ে বং ঈশান সুতঃ তারাপতিঃ সিলুয়া গ্রাম নিবাসত্বাৎ সিলুয়া বল্লভ গাঁঞি শ্রোত্রিয় অভিনিবেশঃ (ইতি কুল-পঞ্জিকা)।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। সিলুয়া গ্রাম এক্ষণে হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচি হইতে ১।০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে। এবং পাণ্ডুয়া হইতে ১।০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অধুনা সলুয়া নামে খ্যাত।"

মৌজা লিষ্টে পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র সলুয়া নাম পাওয়া যায়। ইহা হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানায় অবস্থিত। গ্রামের পরিমাণ ৯৪৪ বিঘা। সিলুয়া বলিয়া কোন গ্রামের নাম পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় সিলত্রানি; সিলুবদা; সিলুর গৌড়া; সিলুরিয়া। সিলুরিয়া গ্রাম দুইটি মেদিনীপুর জেলায়।

সিলুয়া নামটি ভাষার অবক্ষয়ে সলুয়ায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২। মালিহাটি—মেলেটি (মুর্শিদাবাদ)

পশ্চিমবঙ্গে মালিহাটি নামের দুইটি গ্রাম আছে। একটি মেদিনীপুর জেলার দেবরা থানায়; অপরটি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানায়। আমরা শেষোক্ত মালিহাটির কথা জানি। লোকমুখে 'মেলেটি'তে পরিণত হইয়াছে। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে হাওড়া হইতে ৯০ মাইল দূরে মালিহাটি-তালিবপুর ষ্টেশন। মালিহাটি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রঘুনন্দন দাসের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্র-পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে এই মালিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে আর কেহ ছিলেন না। জয়পুরের মহারাজা সওয়াই জয়সিংহের সভায় বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পশ্চিমদেশীয় বৈষ্ণবগণের পরকীয়া ও স্বকীয়া তত্ত্ব লইয়া বিচার হয়। বিচারে গৌড়ীয়গণের পরাজয় ঘটিলে তাঁহারা এই বিচার বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের সহিত করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য মহারাজাকে অনুরোধ করেন। মহারাজা তখন স্বকীয়া মতাবলম্বী নিজ সভাসদ সুপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাংলায় পাঠান। ইনি পথিমধ্যে প্রয়াগ, বারানসী প্রভৃতি স্থানে বিচারে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙলার শ্রীখণ্ডে ও যাজিগ্রামে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করেন। বাংলার বৈষ্ণবগণ রাধামোহন ঠাকুরের সহিত বিচার করিবার জন্য তাঁহাকে বলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এই বিচারের অনুমতি প্রদান করেন এবং নবদ্বীপ, উড়িষ্যা, কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ বিচারসভায় আগমন করেন। বিচারে কৃষ্ণদেব রাধামোহনের নিকট পরাজিত হইয়া পরকীয়া মত অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়া এই মতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইং ১৭১৮ সনে এই বিচার হইয়াছিল। রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'পদামৃত-সমুদ্র' প্রকাশ করেন। ইহাতে ৮৫২ পদের মধ্যে ৪০০টি তাঁহার নিজের। মৌজা বা গ্রামের নাম মালিহাটি হইলেও লোকে মেলিটি তো বলেই, এমন কি রাধামোহন ঠাকুরকেও মেলেটির রাধামোহন বলিয়া জানেন।

৩। বলুহাটি—বলুটি (হাওড়া)

হাওড়া জেলায় ডোমজুড় থানায় বলুহাটি একটি বিশিষ্ট গ্রাম। হাওড়া-শিয়াখালা ছোট রেল-লাইনে বলুহাটি ষ্টেশন—এখন নাম হইয়াছে জগদীশপুর-বলুহাটি, হাওড়া হইতে ৮ মাইল দূরে। ইহার নিকটবর্ত্তী নার্ণা গ্রামে বিখ্যাত পঞ্চানন ঠাকুর আছেন ও কালীর মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস যে, নার্ণার পঞ্চানন ঠাকুরের মাটী মাখিলে বাত রোগ আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়। বহু যাত্রী এ জন্য এই ষ্টেশনে নামে। লোকমুখে বলুহাটি 'বলুটি' বা 'বোলুটি'তে পরিণত হইয়াছে। একটি উইলেও 'আমার ভাগিনেয় বোলুটি নিবাসী শ্রীমান—' ইত্যাদিও দেখিয়াছি।

৪। নিমিত্তা—নিমতা (২৪ পরগণা)

২৪ পরগণা জেলায় দমদম থানার অন্তর্গত 'নিমতা' গ্রাম মৌজা হিসাবে উত্তর নিমতা ও দক্ষিণ নিমতায় বিভক্ত। এই দুই

গ্রামের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল। যথা—

উত্তর নিমতা—৯৫৬·২৩ একর
দক্ষিণ ,, —৭২৪·৭৭ ,,

১৬৮১·০০ একর বা ৫০৮৫ বিঘা

আয়তন দেখিয়া মনে হয় নিমতা এককালে গণ্ডগ্রাম ছিল। *এই গ্রামের কৃষ্ণরামদাস 'কালিকা মঙ্গল' রচনা করেন। গ্রন্থ রচনার* কাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ আছে: কোন্ সালে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত নিম্নে দিলাম। যথা—

ত্রিদিবনাথ রায় —১৫৯১ শকাব্দ
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—১৫৮৬ ,,
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১৫৯৮ ,,

এক কথায় বলা যাইতে পারে এই গ্রন্থ ইং ১৬৬৪ হইতে ইং ১৬৭৮ সনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। আজ হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে। তিনি নিজ গ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিত্তা নামেতে গ্রাম যার।"

দেখা যায় তখন গ্রামের নাম ছিল 'নিমিত্তা'—লোকমুখে ভাষার অবক্ষয়ে 'নিমতা'য় পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার, নিমিত্তা বা নিমতা ভাগীরথীর তীর হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে, অথচ কবি 'জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নদীর স্রোত ৩,৪ শত বৎসরের মধ্যে কখনও নিমতার নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল না—ইহার বহু প্রমাণ পুরাতন ম্যাপে পাওয়া যায়।

ভাষার অবক্ষয়ে লোকমুখে কিরূপে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন হয় বা হইতে পারে তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিলে ভাল হয়: কিন্তু তাহা করা আমাদের পক্ষে নানা কারণে বিশেষ করিয়া উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে, একরূপ অসাধ্য। আমরা উদাহরণ স্বরূপ দুই-একটি গ্রামের কথা বলিব।

পানিহাটি—পেনেটি।

শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটিতে আসিয়াছিলেন। জয়ানন্দর চৈতন্য-মঙ্গলে আছে—"পানিহাটি সমগ্রাম নাহি ভূমণ্ডলে।" দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের ইহা একটি সমাজ-গ্রাম—পানিহাটির কর-বংশ বিখ্যাত। লোকমুখে পানিহাটি 'পেনেটি'তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও 'পেনেটির ছাতুবাবুর বাগানে' কিছুদিন ছিলেন। কাগজে-পত্রে এখনও পানিহাটি নাম বজায় আছে; শিক্ষিত গ্রামবাসীরা গ্রামের নাম পানিহাটি বলে, 'পেনেটি' বলে না। তবুও সাধারণ লোকে বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুরা বলে পেনেটি।

৫। রাণীহাটি—রেনেটি (বর্দ্ধমান)

বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি থানার অন্তর্গত রাণীহাটি গ্রাম আছে। রাণীহাটি বলিয়া একটি পরগণাও আছে। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সাতগাঁওয়ের অধীনে রাণীহাট (রাণীহাটি নহে) পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রাজস্ব ছিল ১৩,৫৮,৫১০ দাম (৪০ দামে ১ টাকা)। কীর্ত্তনের বিভিন্ন ঢঙের মধ্যে রাণীহাটি ঢঙ বর্ত্তমানে 'রেনেটি' ঢঙ বলিয়া বহু সুধীজন উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামের নাম বা পরগণার নাম সাধারণে 'রেনেটি' বলিয়া উল্লেখ করেন।

৬। গৌরহাটি—গিরেটি (হুগলী)

হুগলী জেলায় ভাগিরথীতীরে গৌরহাটি গ্রামের কিয়দংশ ফরাসীদের অধিকারে থাকে; আর বাকি অংশ ইংরেজদের অধীনে আসে। এই অংশের মৌজার নাম চাপদানীর সহিত সংযুক্ত হইয়া হয় গৌরহাটি-চাপদানী। লোকমুখে কিন্তু উভয় অংশই গিরেটি বলিয়া উল্লিখিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা গিরেটিতে পলাইয়া যান।

"During the French Revolution the citizens of Chandernagore shared in the republican fervour of their countrymen the Governor fled to his country-house at Ghiretti but was brought back to the town by an excited mob, which wished to copy the Parisvans' march to Versaxlles."

(হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক ১০ পৃ:)। কায়স্থ-কারিকায় ইহার নাম গৌরহট্ট বলিয়া লিখিত।

৭। খিসিমা—খিসমা (নদীয়া)

মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সওদাগরের যাত্রা বিবরণে লিখিয়াছেন—

"উলা বাহিয়া যায় কিখিমার পাশে।
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু ভাসে।"

আবার ধনপতির যাত্রা বিবরণে লিখিয়াছেন—

"উলা ছাড়ি চলে ডিঙ্গা খিশমার পাশে"

মুকুন্দরামের সময় (ইং ১৫৯০) খিসমার নাম খিসিমা বা কিখিমা কি ছিল, বলা শক্ত; মনে হয় পূর্ব্বে খিসিমা ছিল পরে খিসমা হইয়াছে; তবে এই পরিবর্ত্তন বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছে। কায়স্থ-কারিকায় খিসমা চন্দ্র এই নাম পাইতেছি।

৮। বৈরাটি—বিরাটি (২৪ পরগণা ?)

দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ দে (দেব) বংশের ১১টি সমাজ-গ্রাম। ইহার মধ্যে বৈরাটি একটি। বর্ত্তমানে বৈরাটি বলিয়া কোন গ্রাম দক্ষিণ-রাঢ়ে বা রাঢ় অঞ্চলে নাই। ২৪ পরগণা জেলায় দমদম থানায় ১টি ও হুগলী জেলার আরামবাগ থানায় ১টি বিরাটি এই নামের গ্রাম পাওয়া যায়। দমদম-বিরাটি বহুকাল ধরিয়া কায়স্থ-প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত; এজন্য আমরা এই গ্রামের নাম পূর্ব্বে

বৈরাটি ছিল বলিয়া মনে করিতেছি; কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহি।

৯। চিত্রপুর—চিৎপুর (কলিকাতা)

বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল ইং ১৪৯৫ সনে রচিত। ইহাতে চিৎপুরের উল্লেখ আছে। তিনি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"রিসিড়া ডাহিনে রহে বামে শুকচর।
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোন্নগর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটি বামে।
পূর্ব্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিতপুরে পূজে রাজা সর্ব্বমঙ্গলা।
নিশি দিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্ব্বকূল এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥
পূজিল বেতাইচণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হরষিতে সাধি পায় নায়ের নফর॥"

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন ইহার প্রায় শতবর্ষ পরে চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রচনাকাল ইং ১৫৭৩ হইতে ১৬০৩ সনের মধ্যে রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালীন। কাহারও কাহারও মতে ইং ১৫৯৪ সনে কাব্য লেখা শেষ হয়।

মুকুন্দরাম দুইবার—একবার ধনপতির যাত্রাকালে আর একবার শ্রীমন্তর যাত্রাকালে 'চিত্রপুরে'র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ধনপতি-যাত্রা প্রসঙ্গে।

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান ধনপতি দেখিবারে পায়॥
নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি।
কুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি॥
ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিকা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

শ্রীমন্তের যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

চিত্রপুর ভাষার অবক্ষয়ে চিৎপুরে পরিণত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে এই অবক্ষয় বহু দিনের।

১০। দীর্ঘাঙ্গ—দেগঙ্গ (হুগলী)

দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের দত্ত বংশের ৩০টি সমাজ গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে দীর্ঘাঙ্গ একটি। সেন বংশের দুই সমাজের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গ একটি। এই দীর্ঘাঙ্গ হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর থানায় অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ বৈদ্যবাটির সন্নিকট। মৌজার বর্ত্তমান নাম কাগজপত্রে দীর্ঘাঙ্গ বলিয়া লিখিত—পরিমাণ ৪৮০৫ বিঘা। লোকমুখে দেগঙ্গ, দেগাঁ ইত্যাদি। কিন্তু এই নাম পরিবর্ত্তন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যারাম রায়ের সত্য-নারায়ণের পুথিতে আছে:

"জিরাট করিয়া পাছে সাধুর সন্ততি।
ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা হৈল ভাগীরথী॥
মুহূর্ত্তেকে এড়াইল হুগলী শহর।
চুঁচুড়ায় পূজিল ঠাকুর ষাণ্ডেশ্বর॥
দেগঙ্গে আইল তরী বায়ু অনুকূল।
যথায় নিমের গাছে ফোটে চাঁপা ফুল॥
চাকলে পূজিল হর হরিষ বিশেষ।
জগন্নাথ পূজা কৈল একেলা মাহেশ॥
ভদ্রকালি বালি বামে বরাহনগর।
ডিঙি কলিকাতা বাহি চলে সদাগর॥
ধূলন্ত রহিল বামে ডাহিনে জিরাট।
ত্যজিয়া ভবানীপুর গেল কালীঘাট॥
বিধির স্থাপিত কালী পূজিলেন তায়।
তরণিতে উঠিল অযোধ্যারাম রায়॥

(সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ১৩০৮ সাল, ৬৩ পৃঃ)

কেহ কেহ এই অযোধ্যারামকে কবিকঙ্কনের অগ্রজ বলিয়া মনে করেন। সে যাহাই হউক, এই পুথি যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত, এ বিষয়ে বহু যুক্তি আছে।

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে:

পুরাতন ম্যাপে এই জায়গায় দেগুন (বাউরের ১৬৮৮ সনের ম্যাপ), দেগম (১৭০৩ সনের পাইলট চার্টে) ও দিগম (রেনেলের ম্যাপ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইউল ইহাদের দীর্ঘাঙ্গ গ্রামের সহিত সনাক্ত করিয়াছেন। এই স্থান হইতে পশ্চিমে সিঙ্গুর পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা আছে।

লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন ইউরোপীয় ম্যাপকর্ত্তারা তাহা তাঁহাদের স্ব-স্ব ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। ফলে ভাষার অবক্ষয়ের উপর তর্জ্জমার দোষ চাপিয়া গিয়াছে।

১১। রিসিড়া—রিষড়া (হুগলী)

বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলের 'রিসিড়া' বর্ত্তমানে প্রায় শতাবধি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া 'রিষড়া'র পরিণত হইয়াছে। মৌজার নাম রিষড়া—পরিমাণ ৪৫৯৬ বিঘা। মিউনিসিপ্যালিটির নামও 'রিষড়া'।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই যে, নাম-পরিবর্ত্তনের একটি ধারা আছে। যেমন:

মানিহাটি—মেনেটি
বলুহাটি—বলুটি
পানিহাটি—পেনেটি
রাণিহাটি—রেনেটি
গৌরহট্ট—গৌরহাটি—গিরেটি
বৈরাটি—বিরাটি
আবার— নিমিত্তা—নিমতা
খিসিমা—খিসমা
রিসিড়া—রিষড়া
সিলুয়া—সলুয়া
চিত্রপুর—চিৎপুর

১২। শুকচর—সুখচর (২৪ পরগণা)

এই প্রসঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার থানা খড়দহর অন্তর্গত সুখচর গ্রামের বানান-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহা সুধীগণ সমক্ষে নিবেদন করা উচিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছি। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল 'শুকচর' এই বানান আছে (ইংরেজী ১৪৯৫ সাল)। শুকচরের পাশেই খড়দহ। এককালে এই দুই স্থান ভাগীরথী-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। শুকচরে প্রথমে বসতি স্থাপিত হইলে লোকে এই স্থানকে শুকো (শুকাইয়া গিয়াছে যে জায়গা) চর বলিত। এজন্য বানান শুকচর। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভাগীরথীর 'দহ' হইতে উত্থিত। চরে 'খড়' বা খাগড়া হইত—এজন্য এ স্থানের নাম পরে 'খড়দহ' হইয়াছে। খড়দহের উল্লেখ ইংরেজী ১৫১৬ সনেও দেখিতে পাইতেছি। 'শুকচরের' উৎপত্তির ইতিহাস লোকে ভুলিয়া গেল, ক্রমে ইহার বানান পরিবর্ত্তিত হইয়া সুখচরে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, স্তর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রামে যখন বাস করিতেন—এই গ্রাম তাঁহার জমিদারীভুক্ত, তখন তিনি জনসাধারণের সুবিধার জন্য বহু রাস্তাঘাট করিয়া দেন ও সুখচরে বহু জাতির বাস থাকিলেও শঙ্খ-বণিক কেহ না থাকায় তিনি শঙ্খ-বণিক জাতির দুই-চারিটি গৃহস্থকে জমি ও অর্থ দিয়া বাস করান। তাঁহার আমলে সুখচরে দেশী চিনি তৈয়ারির বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, এজন্য লোকে সুখে বসবাস করিত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত ৩৬টি জাতির লোকেই সুখচরে প্রাচীন হিন্দু-সমাজোক্ত প্রথায় সুখে থাকিত বলিয়া তিনি গ্রামের নাম 'সুখসায়র' রাখেন। তাহা হইতে গ্রামের নাম সুখচরে পরিণত হইয়াছে। "সুখসায়র" নাম রাখার সম্বন্ধে কোন কাগজপত্রাদি দেখি নাই—এজন্য মনে হয় ইহা কল্পনামাত্র। তবে রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন ও বহু জাতির বাস করাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য।

ফ্লেমিংগো

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কচ্ছের এলাকা জুড়ে ফ্লেমিংগোর ভিড়।
স্তূপীকৃত লবণাক্ত মৃত্তিকার চিড়
শুষে নেয় সূর্যের রুধির।
উজ্জ্বল জলন্ত ত্রস্ত ইস্পাতের ক্ষেত
হীরক রৌদ্রের ভারে অবিশ্রান্ত শ্বেত।
সে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ফ্লেমিংগোর ভিড়।
ওরা দল বাঁধে, ওরা বসে ডিম পেড়ে,
রাজহংসের কলস্বর কণ্ঠে নেয় কেড়ে।
লবণাক্ত জলাভূমি ভরে যায় চিকচিকে ডানায়,
ওদের মাংসালো জিভ উপকূলবর্তী চক্রদ্বীপেই মানায়।

সম্বর হ্রদের তীরে সন্ধ্যা এলে পর
ওদের আনন্দ হয় বসন্তের পাতার মর্মর।
স্পেনের গুয়াডিলকুইভার নদীর বদ্বীপে
ওরা ক্ষুদে কীট খোঁজে নিঃশব্দে পা টিপে।
গোলাপী-শাদায় মেশা মার্জিত পালক
সমুদ্রের সমুন্নত বুকে ঝরায় আলোক।
আফ্রিকা এশিয়া আর ইউরোপ নিয়ে,
ফ্লেমিংগোর চারণবৃত্তি—বন্ধন বাঁচিয়ে।
ঝিলে ঝিলে ছায়া ফেলে সুনীল আকাশ,
ওরা চেনে ভিজে টিলা আর ঋজু ঘাস।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দল

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১

গত একশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলি বেশ দানা বাঁধিয়াছে। আজ সেখানকার গবর্ণমেণ্ট পার্টি গবর্ণমেণ্ট। অন্যান্য যে সকল দেশে পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে ইংলণ্ডের পার্টি বা দলীয় আদর্শই তাহাদের অনুকরণীয়।

একরকম-মতের লোকদের মধ্যে সংগঠন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইংলণ্ডেও মধ্যযুগ হইতে এরূপ দলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কতকগুলি লোক ছিল 'রাজার লোক' (King's man) এবং আর একদল লোক ছিল যাহারা ইহাদিগকে হটাইতে চাহিত। কিন্তু কোন সঙ্ঘবদ্ধ দল বা সমিতি ছিল ইহা বলা চলে না। তবে বর্ত্তমানে যেরূপ পরিষ্কার ভাবে দলীয় গঠন হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সেরূপ কিছু ছিল না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে পার্লামেণ্টের ভিতরে বিভিন্ন রকমের রাষ্ট্রীয় মতবাদের জন্য Whig এবং Tory (উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল) নামে মোটামুটি দুইটি দল ছিল—কিন্তু এই দলগুলির অস্তিত্ব পার্লামেণ্টের বাহিরে মোটেই ছিল না। House of Commons-এ (লোক সভায়) বিরুদ্ধদলের আলেখ্য মোটেই প্রতিফলিত হইত না। বিরুদ্ধদল এবং সমর্থক-দলের বাধাপ্রদান ও অনুমোদন লক্ষ্য করিয়া দলীয় বিভাগগুলি করা হইত।

এরূপ অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট দলীয় সংগঠনের কারণ ছিল। নির্ব্বাচকগণের (Electorate) সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং তাহারা ছিল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সহিতও তাহাদের সম্পর্ক খুবই কম থাকিত। ১৮৩০ সনে পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সের সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৫৬ জন—বর্ত্তমানের সংখ্যা (৬৩০) হইতে কিছু বেশী। মোট ১,৪০,০০,০০০ জন লোকের মধ্যে ২,২০,০০০ জন নির্ব্বাচক বা ভোটার এই প্রতিনিধিগণকে নির্ব্বাচন করিত। অনেক বড় বড় নূতন শিল্পনগরী হইতে একজনও নির্ব্বাচিত হইত না অথচ বহু পুরাতন শহর হইতে দুইজন প্রতিনিধি যাইত। অল্পসংখ্যক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রিত করিত—জনসাধারণ কিছুই করিত না। দলমত অপেক্ষা ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বই নির্ব্বাচনে সফলতা আনিত—আর একবার নির্ব্বাচিত হইলে দল বা পার্টিকে মানিয়া চলারও দরকার হইত না।

১৮৩০ সনের পর অনেক আইন পাস হইয়াছে এবং সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটাধিকার পাইয়াছে। নির্ব্বাচনের অনেক দুর্নীতি দূর হইয়াছে। পার্লামেণ্টের সদস্যের নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলিও ন্যায্যভাবে দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য ব্যক্তির চেষ্টায় নির্ব্বাচনে সাফল্য সহজ নয়, আর পার্লামেণ্টে ব্যক্তি একক ভাবে কিছু করিতেও অক্ষম। এজন্য বহুসংখ্যক নূতন ভোটাধিকারী নরনারীকে লইয়া রাজনৈতিক নেতারা পার্টি বা দল গঠন করিতে লাগিল. নূতন নূতন নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তিতে নির্ব্বাচকগণের নিকট ভোট প্রার্থনা করিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইল।

কেবল পার্লামেণ্টের ভিতরে দল গঠন করিলে আর চলে না, এখন বাহিরেও রাজনৈতিক দলের সংগঠন আবশ্যক হইয়া পড়িল। ১৮৬১ সনে লিবারলগণ (Liberals) একটি কেন্দ্রীয় দল গঠন করিল—ইহাই কার্য্যতঃ তাহাদের দলের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে পরিণত হইল। ১৮৬৭ সনে কনজারভেটিভস দেশের সকল রক্ষণশীল সমিতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিল। ১৯০৬ সনের পর শ্রমিক দল (Labour Party) কিছু সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়। এ পর্য্যন্ত শ্রমিক সঙ্ঘ (Trade Unions) এবং বহু সমাজতন্ত্রী দলসমূহের মধ্যে কিছু কিছু যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল মাত্র।

১৯৫৫ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে দুইজন ব্যতীত সকল নির্ব্বাচিত সদস্যই যাহারা হাউস অব কমন্স-এ গিয়াছেন, তাঁহারা the Conservative and Unionist, the Labour বা the Liberal পার্টির সদস্য। কমন্স সভা হইতে স্বতন্ত্র সদস্য একেবারে লোপ পাইয়াছে। দলীয় রাজনীতি বা পার্টি সিষ্টেম ইংলণ্ডে আজ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

২

বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টে তিনটি পার্টি—ইহার মধ্যে the Conservative and Unionist, এবং the Labour ইহারাই প্রবল, Liberal partyর কমন্স সভায় সদস্যসংখ্যা মাত্র ৬ জন। অবশ্য এই তিনটি পার্টি ব্যতীত অন্যান্য দলগুলি ক্রমে ক্রমে এই তিনটি দলের সহিত মিশিয়াছে বা লোপ পাইয়াছে। রক্ষণশীল (Conservative) দলের নামে "Unionist" বাক্য যোগ হওয়ার কারণ এই যে, ১৮৮৬ সনে এক দল লিবারল আয়ারল্যাণ্ডের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে মূল দলের সহিত বিভিন্ন মত হওয়ার দরুণ দল ত্যাগ করিয়া রক্ষণশীল দলে যোগ দিয়াছে। National Liberal দলও নিজেদের দল ভাঙিয়া রক্ষণশীল দলে ভিড়িয়াছে। Ulster Unionist যাহারা উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং গ্রেট ব্রিটেনের মিলন চায় তাহারাও রক্ষণশীল দলের সমর্থক। কো-অপারেটিভ পার্টি যাহারা সমবায় আন্দোলনের সমর্থক তাহারা আবার শ্রমিক-

দলের সহায়। ১৯৫০ সন হইতে ইংলণ্ডের সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট দল পার্লামেন্টে কোন সদস্য পাঠাইতে পারে নাই।

পার্টি সিষ্টেম বলিতে ইহাই বুঝায় যে, পার্লামেন্টের কমন্স সভায় অন্ততঃ দুইটি পার্টি আছে যাহারা মূলনীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে পরস্পর হইতে পৃথক কিন্তু প্রত্যেকেই সঙ্ঘবদ্ধ এবং যে কোন সময়ে ইহাদের যে কোন একটি দল গবর্ণমেণ্ট চালাইতে সক্ষম। কমন্স সভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারাই গবর্ণমেণ্ট পরিচালন করে তবে এই দলই যে নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছে এরূপ নাও হইতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বা দলগুলি সরকারী দলের বিরোধিতা করিয়া থাকে। সুতরাং একটি পার্লামেন্টের জীবনকাল পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বিরোধীদলের কেবল পরাজিত হইবারই কথা, অবশ্য ইহাদের পৃথকনীতি থাকার দরুন আগামী নির্ব্বাচনে ইহারা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারিবে না তাহা নহে। বিরোধীদলের অস্তিত্ব কখনও লোপ পায় না। এই দলে নেতা বা লীডার সরকারী মাহিনা পায়। বিরোধী দলের "ছায়া মন্ত্রীসভা" (Shadow cabinet) থাকে, এবং যে কোন সময়ে ইহারা গবর্ণমেণ্ট চালাইবার ভার লইতে প্রস্তুত থাকে।

যদিও বিভিন্ন দলের পৃথক পৃথক কর্ম্মসূচী থাকে তবুও অন্যান্য বিষয়েই যে ইহাদের অমিল, তাহা নহে। কোন কোন মূল নীতিতে উভয় দলই বিশ্বাসী। সংস্থা বা সমিতি গঠন করিবার অধিকার বিষয়ে এবং পার্লেমেণ্টারী গবর্ণমেণ্টে বা পার্লেমেণ্টারী গণতন্ত্রে উভয় দলই সমর্থক।

এরূপ একটি মূলনীতি বিষয়ে উভয়ের বিরোধের অর্থ গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের আইন-কানুনসমূহের আমূল পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন। এরূপ অবস্থা ঘটিলে অবশ্য সুশৃঙ্খল কোন উন্নতি আশা করা যায় না।

প্রত্যেক দলের দেশময় সংঘ বা সমিতি থাকে। ইহার কতকগুলি মিলিয়া হয় জেলা সমিতি। সবগুলি জেলা সমিতির প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। এই কেন্দ্রীয় সমিতি এক দিকে পার্লেমেণ্টের দলীয় সংস্থা ও নেতার সহিত এবং অপর দিকে দেশের চারিদিকে ছড়ান সমিতিগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ এবং দলের পার্লেমেণ্টের সদস্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

Conservative Constituency Associationগুলি রক্ষণশীল দলের সভ্য লইয়া গঠিত। সভ্যেরা পার্টি-তহবিলে বার্ষিক চাঁদা দেয়। কোন কোন সমিতিতে পুরুষ ও মহিলা দুই ভাগে ভাগ করা আছে। আবার কোন কোন সমিতি মহিলাগণের অধিকার রক্ষার্থ পৃথক ভাবে গঠিত। ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের সভ্য লইয়া "Young Conservatives" দল গঠিত হয়। ইহারা নিজেরাই নিজেদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করে এবং সমিতির দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনায় ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

শ্রমিক দলের সভ্যসংখ্যা দুই প্রকার: অনুমোদিত (Afiaedlit) সমিতি এবং ব্যক্তিগত সদস্য। অনুমোদিত সমিতির মধ্যে থাকে ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিক সমিতি), কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সমবায় সমিতি), কো-অপারেটিভ পার্টির শাখা, সোসালিষ্ট পার্টির শাখা এবং চাকুরীয়াদের বৃহৎ বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত সভ্যগণকে ১৬ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক হইতে হয় এবং ইহাদিগকে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য হইতে হয়। সকলকেই 'রাজনৈতিক তহবিলে' (Political Fund) চাঁদা দিতে হয়। ২৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক তরুণ এবং মহিলা সভ্যগণকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। পার্টির অধীন সংস্থাগুলির বহুলাংশে নিজেদের দৈনন্দিন কাজে স্বাধীনতা থাকিলেও রক্ষণশীল দলে এরূপ সমিতির উপর যতটা দৃষ্টি রাখা হয়, শ্রমিক দলে তদপেক্ষা বেশী নজর রাখা হয়।

উদারনৈতিক দলের গঠনও প্রায় একই প্রকার, তবে ইহাদের সকল সভ্যকে ব্যক্তিগত ভাবে বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়; দলীয় তহবিলেও চাঁদা দিবার নিয়ম আছে। প্রত্যেক স্থানীয় সমিতি নিজেদের পরিচালনের জন্য দায়ী। সমিতিগুলি স্থানীয় এবং জাতীয় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে; শিক্ষা এবং প্রচারকার্য্য করে। ইহারা সরকারের আইন সংক্রান্ত এবং শাসন সম্পর্কীয় কাজের উপর নজর রাখে—জেলা ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী কার্য্যের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জনমত গঠন, প্রচার ও আন্দোলন চালায়।

প্রত্যেক দলই এক-একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে একজন constituency agent নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ বেতনভুক সর্ব্বসময়ের জন্য স্থায়ী কর্ম্মচারী। ইহাদিগকে আবার পার্টির হেড কোয়ার্টার হইতে এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যে, নির্ব্বাচন সংক্রান্ত সকল আইন ইত্যাদি ইহাদের জানা আছে। অবশ্য শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলগুলি অনেক সময় পার্টটাইম লোক দ্বারা কাজ চালায়। 'নির্ব্বাচন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি'ই পার্টির স্থানীয় সম্পাদক হইয়া থাকে ও উক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রের পার্লেমেণ্ট সদস্যের সহকারীর কাজ করে। স্থানীয় সভ্যগণের চাঁদা ও অন্যান্য আয় হইতে তাহার বেতন প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হয়।

পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচনের জন্য প্রত্যেক পার্টির নির্ব্বাচন-কেন্দ্রীয় শাখা-সমিতিগুলিই প্রথমতঃ সভ্য মনোনীত করে। যিনি পার্লেমেণ্টে সভ্য আছেন এরূপ ব্যক্তি পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রক্ষণশীল দল সাধারণতঃ তাহাকেই মনোনীত করিয়া থাকে। অন্যান্য দলের নির্ব্বাচন প্রার্থী বাছাই প্রায় এইরূপেই হয়। তবে একাধিক প্রার্থী থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি চূড়ান্তভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোপন ব্যালট এবং লটারি করিয়া মনোনয়ন শেষ করা হয়।

শ্রমিক দল প্রার্থীগণের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করিয়া পরে নিয়মানুযায়ী বাছাই করে।

কাজের সুবিধার জন্য তিনটি পার্টিই সমস্ত দেশকে কতকগুলি

প্রদেশে ভাগ করিয়া লইয়াছে এবং নির্ব্বাচন-কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি এই সকল কোন না কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। রক্ষণশীল দল ইংলণ্ড ও ওয়েলসকে ১২টি এবং স্কটল্যাণ্ডকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করিয়া থাকে। উদারনৈতিকগণ ইংলণ্ডকে দশটি প্রদেশে ভাগ করে। ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের জন্য পৃথক পৃথক উদারনৈতিক দল আছে। শ্রমিকদলে প্রদেশ-ভাগ কাউণ্টি হিসাবে হয় এবং একটি অঞ্চলের জন্য একটি কাউন্সিল থাকে।

(৪)

ইহার উপরেও আবার কতকগুলি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান আছে, যাহাদিগকে 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলা হয়। যথা: The National Union of Conservative and Unionist Association. স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর-আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য আবার Scottish Unionist Association এবং North Ireland Unionist Association আছে। নানা কমিটি ও কাউন্সিল মারফত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কার্য্য করে। বৎসরের একবার আড়াই দিন ধরিয়া ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের নাই—মতামত প্রকাশ ও প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা কিছু নাই।

জাতীয় শ্রমিক দল বা National Labour Party তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যথা: ট্রেড ইউনিয়ন, নির্ব্বাচন-কেন্দ্রিক কমিটি এবং কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক সমিতি। শ্রমিক দলের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী পার্টি কন্‌ফারেন্স। পার্লামেন্টের বাহিরে ইহাই পার্টির সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ইহার বার্ষিক অধিবেশন সাড়ে চারি দিনের জন্য হয় এবং তাহাতে প্রায় এগার শত প্রতিনিধি যোগদান করে। সাধারণতঃ প্রতি ৫,০০০ সভ্য একজন প্রতিনিধি পাঠায়। পার্টি বার্ষিক অধিবেশনে একটি জাতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচন করে, ইহা নানা শাখা-সমিতি ইত্যাদির সাহায্যে পার্টি নিয়ন্ত্রিত করে।

উদারনৈতিক দল বৎসরে একটি সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হয়, ইহার নাম—এসেম্বলি। এসেম্বলির নিকট পার্টির কাউন্সিল রিপোর্ট পেশ করে, এসেম্বলির বার্ষিক সভায় কাউন্সিলের ৩০ জন সভ্য নির্ব্বাচন করে—কাউন্সিল আবার কার্য্য পরিচালন জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন করে। কাউন্সিলের অধিবেশন হয় তিন মাসে এক বার, কার্য্যকরী সমিতির সভা মাসে দুই বার হয়। পার্টির দৈনন্দিন কার্য্য কার্য্যকরী সমিতি করিয়া থাকে। পার্টির সর্ব্ববিষয়ের কার্য্য পরিচালনার ভার কাউন্সিলের উপর।

(৫)

প্রত্যেক পার্টির পার্লেমেন্টের সভ্যগণ পার্লেমেন্টে তাহাদের পার্টি-নেতা বা লীডার নির্ব্বাচন করে। এইরূপে রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের লীডার নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পার্টি আবার নিজেদের 'চীফ্‌-হুইপ', 'ডেপুটি হুইপ' ও অন্যান্য হুইপ নির্ব্বাচন করে। অবশ্য হুইপগণ সকলেই পার্লেমেন্টের সভ্য। সরকারী দলের হুইপ ব্যতীত অপর কেহ বিশেষ সুবিধা বা মাহিনা পায় না।

প্রত্যেক পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় আছে—এখানে সর্ব্বসময়ে কাজ করিবার জন্য বেতনভুক কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে—তাহারাই দলের কলকব্জা চালু রাখে।

রক্ষণশীল দলের টাকা আসে সভ্যগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা হইতে এবং নির্ব্বাচন-কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির এককালীন দান হইতে। শ্রমিক দলের অর্থ সংগ্রহ হয় নানা শ্রমিক সঙ্ঘের এফিলিয়েশন ফি হইতে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং সমাজতন্ত্রী সমিতিগুলি হইতেও অর্থ সংগ্রহ হয়। উদারনৈতিক দলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হয় সভ্যগণের নিকট হইতে। নির্ব্বাচন-কেন্দ্রীয় সমিতি হইতেও অর্থ সংগ্রহ হয়।

(৬)

১৯৫৫ সনে পার্লেমেন্টের যে নির্ব্বাচন হয় তাহা হইতেই গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক দলের শক্তি বুঝা যায়:

	ভোট পাইয়াছে	সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছে
রক্ষণশীলদল ও উহার সমর্থক	১,৩৩,১১,৯৩৮	৩৪৫
শ্রমিক ও সমবায়ী	১,২৪,০৫,১৪৬	২৭৭
উদারনৈতিক	৭,২২,৫৯৫	৬
সমাজবাদী	৩৩,১৪৪	০
অন্যান্য*	২,৮৮,০৩৮	২
শতকরা যতসংখ্যক লোক ভোট দিয়াছে ৭৬·৮		৬৩০

* অন্যান্য বলিতে Welsh and Scottish Nationalists Independent Labour Party এবং অন্যান্য দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র, Irish Labour, Irish Nationalist, Irish Anti-partitionist এবং Sinn Fein বুঝায়।

যশোধরার মহাপরিনির্বাণ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

(স্থান—বেণুবনবিহার। কাল—বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রি। শিষ্যপরিবৃত, ধ্যানস্থ ভগবান্ বুদ্ধ। শিষ্যাপরিবৃতা যশোধরার প্রবেশ।)

যশোধরা। আহা! কি স্নিগ্ধ, কোমল এই বৈশাখী পূর্ণিমা রজনী। সহাস্যবদন ভগবান চন্দ্র অমৃতধারা বর্ষণ করে' অতি মধুর রূপে শোভা পাচ্ছেন। কিন্তু যিনি আমার হৃদয়-চন্দ্র তিনি তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ, শুচি, শুভ্র রূপপ্রভায় আকাশের ঐ চন্দ্রকেও ত পরাজিত করেছেন। ঐ ত আমার হৃদয়-চন্দ্র আমার সম্মুখেই বিরাজ করছেন, ঐ ত শ্রীভগবান অমিতাভ যাঁর করুণা কোমল, মৈত্রী মধুর, চিরশান্তি-ধাম, কোটি-সুধাকর-সুশীতল-তনু আজ এই বিহারকে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে।

(বুদ্ধদেবের প্রতি)

অমৃত-নির্ঝর বিশ্বচন্দ্র! ভগবন্! আপনাকে বন্দনা করি।

বুদ্ধদেব। (নয়নোন্মীলন করে) এখানে কে এসেছেন?

যশোধরা। আমি, আপনার শ্রীপাদপদ্মরেণুকা, দীনা যশোধরা।

বুদ্ধদেব। সকলের কুশল?

যশোধরা। আপনার আশীর্বাদে নিখিল বিশ্বেরই কুশল। দেব! আজ আমার মনে একটি মহান্ অভিলাষের উদয় হয়েছে। আজ এই পবিত্র পূর্ণিমা নিশীথে, আমি তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

বুদ্ধদেব। চিরকল্যাণময়ি যশোবিশালে! আমার চিত্তও সমুৎসুক হয়েছে। তোমার ললিত-মধুর বচনে আমার শ্রোত্র বিনোদন কর।

যশোধরা। নাথ!

অষ্টসপ্ততি-বর্ষ মম, আজ পরিপূর্ণ।
অদ্য রাত্রে লভি যেন, নির্বাণ সম্পূর্ণ॥
ভগবন্! তুমি ত্রাতা, জ্ঞানী, মহামুনি।
আমি উপাসিকা দীনা, তুমি শিরোমণি॥
বিশ্বের কল্যাণ লাগি', যেও তুমি পরে।
মোর গমনের আজ্ঞা, দেহ কৃপাভরে॥*

[অনুষ্টুভ]

অপরাধ সব মোর, করে নিও ক্ষমা।
আমার সুখের কোন, ছিল নাকো সীমা॥
তোমারি চিত্ত, কর্ম, পুণ্যজীবন-ব্রতে।
বিলীনা এই দীনা, সর্বদা বিশ্বগতে!॥
তুমি মোর সিদ্ধি ঋদ্ধি, হে মহাশরণ!।
তোমারি আনন্দে তৃপ্ত, সকল ভুবন॥
তোমারি স্থিতিতে মম, বিশ্ব মধুময়।
বিদায় দেহ হে আজি, মোর চিরাশ্রয়!॥

বুদ্ধদেব। মমতাময়ি! আজ কেন তোমার এই অভিলাষ? তুমি ত চিরমুক্তা, শাশ্বতকালই নির্বাণপ্রাপ্তা—তোমার পুনরায় মহাপরিনির্বাণে প্রয়োজন কি? বরং, তুমি ধর্ম ও সঙ্ঘের পরম পুষ্টি সংসাধন এবং স্নেহসুধাদানে ধরিত্রীর চিরপিপাসা নিবারণের জন্য দীর্ঘকাল এই জগতেই স্থিতি কর।

যশোধরা। করুণা-বরুণালয়! আপনার স্নিগ্ধমধুর বচনে আমার মন পরম তৃপ্ত হ'ল। কিন্তু, হে প্রজ্ঞানিধে জগৎপতে! আপনারই নির্দেশানুসারে আমি সুদীর্ঘকাল সংসারে স্থিতি করেছি। যেহেতু আমি ভারতীয়া সহধর্মিণী, সেহেতু আমার হৃদয়ের শেষ অভিলাষ এই যে, আমি যেন আপনার তিরোভাবের পূর্বেই মহাপ্রয়াণ করতে পারি। সে জন্য আমি বদ্ধকরপুট হয়ে আপনার সানন্দ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

বুদ্ধদেব। পরম-সৌভাগ্যবতি! তোমারই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। কিন্তু তোমার নিকট আমারও আজ একটি অনুরোধ আছে। সেটি হ'ল এই যে, মহাতিরোভাবের পূর্বে তুমি তোমার প্রাণপ্রতিম সন্তানদের তোমার শেষ বাণী ও মাতৃ-আশীর্বাদ দিয়ে যাও।

(ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রতি)

হে ত্যাগব্রতধারি সাধক-সাধিকাবৃন্দ! তোমরা সকলে ধরার যশোরূপিণী নিষ্কিঞ্চনা "যশোধরা"র—"গো" বা পৃথিবী পালয়িত্রী "গোপা"র—অমৃতবর্ষিণী মহাবাণী তোমাদের চিত্ত-মন্দিরে স্থাপন কর।

---

* অষ্টসপ্ততিবর্ষাহর পরিপক্বং বয়ো মম।
অদ্য রাত্রৌ গমিষ্যামি পরিনির্বাণমুত্তমম্॥১॥

* * *

মধুময়ং জগৎ সর্বং ত্বয়ি যে সম্মুখে স্থিতে।
শাস্তা পাতা মহাপ্রাজ্ঞো বিদায়মনুমোদতাম্॥৭॥

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। কুসুম-কোমলা, সর্বমঙ্গলা, স্নেহ-সুশীতলা, সৌন্দর্য-প্রোজ্জ্বলা জননীকে আমরা বন্দনা করি। আপনার স্নেহবিমণ্ডিতা বাণী আমাদের পরম সম্পদরূপেই চিরবিরাজ করবে।

আনন্দ—বস্তুতঃ,

জননীই মানব-জীবনের সর্বস্ব।

জীবন-প্রকাশে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
দিনে জাগরণে, নিশীথে স্বপনে,
রাজেন-প্রসূতি, ত্রিভুবন-দীপ্তি,
যোগ-ক্ষেম-দাত্রী, বিমোক্ষ-বিধাত্রী ॥
আদর্শিনী জননী, সাধন-রূপিণী,
ধেয়ান ধারণা, ভজন কামনা,
বিশ্ব-বিভাবনা, সর্বৈক-প্রধানা,
মাতা স্নেহধনা, তুলনাবিহীনা ॥*

আমি পুনরায় জননী নিষ্কিঞ্চনা যশোধরাকে বন্দনা করি, যিনি জগতের হিতের জন্য কেবল নিজেকেই নয়, স্বামী, একমাত্র পুত্র, রাজ্য,—এক কথায়, নারীজীবন, তথা মানব-জীবনের সকল কাম্যবস্তুই অকাতরে উৎসর্গ করেছেন। স্বীয় সাধন-প্রভাবে তিনি যে কেবল ভগবান্ বুদ্ধের শক্তিই বর্ধিত করেছেন, তাই নয়; সেই সঙ্গে, স্বীয় অনবদ্য মাতৃসুধাদানে ধর্ম ও সঙ্ঘকেও চিরপুষ্ট করেছেন। বিশ্বজননি! আপনার আশীর্বাদ পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়ে ধরিত্রীকে সুসমৃদ্ধা করে তুলুক।

যশোধরা।

"সর্বং দুঃখং দুঃখং ক্ষণিকং ক্ষণিকং
সর্বং শূণ্যং শূণ্যম"
তোমার এ তত্ত্ব নিদারুণ সত্য
অবশ্য-স্বীকার্যম্ ॥
কিন্তু শোকহীন আত্মিক জীবন
শাশ্বত পরিপূর্ণ।
তোমারি আশীষে আনন্দ বরিষে
শৃঙ্খল হ'ল চূর্ণ ॥

নব কিবা বাণী আজি দিব আনি
হবে তা প্রতিধ্বনি।
তোমারি এ তত্ত্ব আমারি ত সত্য
হে প্রজ্ঞা-দিনমণি ॥*
আদেশ-পালন জীবন-সাধন
মোর আনন্দ-গর্ব।
হে অমৃতসিন্ধু! দাও কৃপাবিন্দু
হউক মধু সর্ব ॥

ভগবন্! আজ আমার মহাপরিনির্বাণ দিবসে, আপনিই বলুন, আপনার প্রেম-সেবা-ত্যাগধর্মানুসরণে আমার কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে কিনা! একমাত্র আপনার ধর্মের অনুসরণই আমার পরম আনন্দ, পরমা সিদ্ধি, চরমা ঋদ্ধি, পরম পূর্ণতা, চরমা সার্থকতা।

"লভিয়াছি নির্বাণ করিয়াছ ঘোষণ
কৃপাভরে, জীবন ভরিও।
নির্বাণ বা বিমুক্তি নেই তাতে আকুতি
পাদপদ্মে স্থান আজি দিও ॥†

আপনার আজ্ঞানুসারে আমার সন্তানদেরও আমি কিছু বলছি:

বুদ্ধ শরণ লও সদ্ধর্ম প্রাণ হও
সঙ্ঘই হোক তব জীবন-ব্রত।
"করুণা" ও "উপেক্ষা" নিখিলে দিও শিক্ষা
"মুদিতা" "প্রজ্ঞা-পারমিতা" নিয়ত ॥‡

বুদ্ধদেব। কল্যাণি! একমাত্র তুমিই ত আমার শক্তি, তৃপ্তি, শান্তি ও মুক্তি। আমার এই সেবা-প্রেম-ত্যাগধর্ম—যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ—

---

* ধমনী-বহনে প্রাণেঽপানে
জাগরণেঽস্বা কিংবা স্বপনে।
জ্যোতির্জননী বিশ্ব-লোকনে
যোগ-ক্ষেমং নিত্য-সাধনে।
মদীয়-জননী মূর্ত-সাধনা
ধারণৈষণা ভজন-কামনা।
আসু সর্বাসু নিত্য-প্রধানা
পরাৎপরা সা বিশ্বাতুলনা।
[প্রতিপাদকং ষোড়শমাত্রকং বৃত্তম্]

* "কা স্যাম্ম বাণী সা তব প্রতিধ্বনিঃ
সত্যং তত্ত্বং তব মম সর্বম্।
তবাজ্ঞা-পালনং মম পুণ্য-সাধনং
জনয়তি জীবন-মাদন-গর্বম্।"
[সমার্ধ-ষটত্রিংশ-মাত্রকং বৃত্তম]

† "নির্বাণং পরিলব্ধং ক্রটিতং হি প্রায়ব্ধং
তবৈব শাস্তঃ! সকৃপ-ঘোষণম।
নির্বাণং বা মুক্তিস্তত্র কা মেঽনুরক্তিঃ
বাঞ্ছামি তু তব পদে স্থানম।"
[সমার্ধ-চত্বারিংশন্মাত্রকং বৃত্তম]

‡ "ভবত বুদ্ধ-শরণা ধর্ম-সঙ্ঘ-প্রাণাঃ
বিকিরত জগতি জ্যোতির্ধারাঃ।
করুণোপেক্ষা-মুদিতা- প্রজ্ঞা-পারমিতা হিতা
বিলসন্ত বিশ্বে পূর্ণসারাঃ।"
[ছন্দঃ পূর্ববৎ]

তোমারই কল্যাণমূর্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অতএব, একমাত্র তুমিই ত আমার সংস্থিতি, পূর্ণস্থিতি।

যশোধরা। নাথ, আমি কৃতকৃতার্থ হলাম। সূর্যে যেরূপ দীপ্তি, পুষ্পে যেরূপ সুরভি, সাগরে যেরূপ আর্দ্রতা, সজ্জনে যেরূপ সুষ্ঠুবাণী, ভক্তে যেরূপ সেবা, মুক্তে যেরূপ দুঃখবিরতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিরাজ করে, সেরূপ আমিও একমাত্র আপনার মধ্যেই বিরাজ করি। আজ ত আমাদের দুঃখময় বিচ্ছেদ নয়, আজ আমাদের মহামঙ্গলময় মহামিলন। এই একই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আমরা দুজনে একত্রে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলাম। এই একই বৈশাখী পূর্ণিমা নিশীথে আজ আমাদের শাশ্বত আত্মিক মিলন হবে। এই শাশ্বতী জ্যোৎস্না বিশ্বে সর্বদা শোভা পাক।

বুদ্ধদেব। আমি তোমার আর কি প্রিয়কার্য-সাধন করতে পারি?

যশোধরা। এর পরেও আর আমার কি প্রিয় থাকতে পারে?

তথাপি—

পুণ্য বসুন্ধরা বুদ্ধানুরক্তা
ধর্ম-সিদ্ধি-পূতা পাশ-বিমুক্তা।
দুঃখ-দৈন্য-জরা-মৃত্যু-বিহীনা
হোক আশীষে তব, পাদলীনা॥

প্রেমধর্ম মধু কল্যাণকর
শ্রীমুখ-নিঃসৃত শান্তি-নির্ঝর।
করুক জয় আজি বিশ্বতমঃ
দীপ্তা হোক পূতা ধরিত্রী মম॥

মৈত্রী-সূত্রাবদ্ধ সন্তান-সঙ্ঘ
সর্বত্র উদ্বেল প্রেম-তরঙ্গ।
প্রবুদ্ধ হোক আজি, হোক শেষ
নিখিলের সর্ব হিংসা-দ্বেষ।*

ধরণী অমিত ভকতি-নম্রা
সুন্দরী সুমোহিনী প্রেম-কম্রা।
হোক স্পর্শে তব, হে অমিতাভ!
বিতর প্রজ্ঞা পরা, বিশ্বপ্রভ!॥

যুগল-স্তুতি

জগতে দেখেনি কেহ
সূর্য-চন্দ্র সম্মেলন।
সূর্যোদয় হলে হয়
চন্দ্রের অস্তগমন॥
কিন্তু আজ এই বিশ্বে
কি অঘটন-ঘটন।
জ্ঞান-রবি প্রীতি-কৌমুদীর
অপূর্ব মিলন!॥

জ্ঞান-সূর্য সুগত ত্রাতা প্রীতি-জ্যোৎস্না গোপা মাতা
যুগপৎ আজি প্রকাশিত।
কনক-প্রোজ্জ্বল-বরণী স্নিগ্ধ-সুশীতল-ধরণী
বিকশিছে শোভা সুললিত।*
ভল্লিক ত্রপুষ কোণ্ডন্য সারিপুত্ত মোগলায়ন
কালোদায়ী ছন্ন ও আনন্দ।
সুজাতা সুকা কিসা চন্দা ধম্মা সোমা তিস্‌সা নন্দা
নমি সব শিষ্যশিষ্যাবৃন্দ॥

জয় জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয়।
জয় জয় জয় জয় যশোধরার জয়।
জয় জয় জয় জয় ধর্মাশোকের জয়।
জয় জয় জয় জয় দীপঙ্করের জয়।
জয় জয় জয় জয় লক্ষ্মীঙ্করার জয়।
যুগযুগান্তরব্যাপী সত্যধর্মের জয়॥

ওঁ শান্তিঃ।†

---

*"রাজতাং ভ্রাতৃসঙ্ঘঃ বর্ধতাং প্রেমাসঙ্গঃ
হিংসা-দ্বেষ-বিমুক্তা ভবতু ধরিত্রী।
অমিতাভ-ভক্তি-নম্রে বিশ্বে হি প্রেমকম্রে
প্রজ্ঞা-পারমিতা বিলসতু সুখদাত্রী।
[সমার্ধ-চতুশ্চত্বারিংশন্মাত্রকং বৃত্তম্]

*"জ্ঞান-ভানু-বুদ্ধ-শাস্তৃ কৌমুদী-গোপিকা-মাতৃ-
নিরুপম-বিমোহন-মহাশান্তি-মেলনম্।
প্রোজ্জ্বল-দিবা-বিভা প্রীতি-স্নিগ্ধ-নিশা-প্রভা
ধরাধাম-যুগপৎ-ফুল্ল-প্রকাশনম্।
অহো অদ্য বিশ্বে কিম্ অঘটন-ঘটনম্।"
[ছন্দঃ পূর্ববৎ]

† ভগবান্ বুদ্ধের লীলাসঙ্গিনী জননী যশোধরার সাধারণে অজ্ঞাত ও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাবলম্বনে গবেষণামুখে রচিত সংস্কৃত নাটকের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধি-পরিস্ফুরণ ও স্তন্যপায়ী-বিবর্ত্তন

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

স্তন্যপায়ীরা বুদ্ধিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

অভিব্যক্তি-অগ্রগতির মূল কারণ বুদ্ধির বিবর্ত্তন। স্তন্যপায়ীর উন্মেষ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যে সব প্রাণী অবনীতলে বিচরণ করত তাদের বুদ্ধির অস্তিত্বে সন্দেহ আছে। মন মাত্র কয়েকটি (৩।৪টির অধিক নয়) সহজ প্রবৃত্তির সমষ্টিমাত্র। দিনগত আহার-বিহার-সংহারের পরেও কিছু আছে, এ কথা তাদের অজানা। সুকুমার ভাবদ্যোতক প্রবৃত্তি দিয়ে মস্তিষ্ক চালনা করবার অবসর প্রাক-পক্ষী যুগে হয় নি।

মাতৃস্নেহ সমস্ত মহৎ বৃত্তির মূলাধার।* সরীসৃপযুগে তার আভাস নেই বললেই চলে। পাইথন প্রভৃতি সর্প অবশ্য কুণ্ডলীকৃত হয়ে ডিম ফোটায়। মাতার কর্ত্তব্য ঐখানেই সমাপ্ত। সেজন্য ধ্বংস যখন এল, সে রুদ্রতাণ্ডবের করাল কবল থেকে রক্ষা পেল না কেউ। পাখীরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, সুকুমার বৃত্তি অভ্যুদয়ের আভাস এদের দৈনন্দিন জীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে। বুদ্ধির উন্মেষ হলেও প্রবৃত্তির সাহায্যে অধিকাংশ কার্য্য সম্পাদিত হ'ত, দুই-এক বিষয়ে প্রশংসনীয় উন্নতি করলেও (নীড় রচনা, সন্তান পালন) নির্বুদ্ধিতা অধিক।

ভূমিতলে না আসায় অনেক বিষয়ে ভূচর অপেক্ষা এরা অনগ্রসর, আকাশ শূন্যময়, তার মধ্যে বিশেষত্ব কোথায়? আকাশে থেকে যাওয়াতে আশঙ্কাহীন অবকাশময় অলস জীবন, উদ্ভাবন করতে পারে নি অনেক কিছু কৌশল, দক্ষতা, ক্ষিপ্রনৈপুণ্য। বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় এরা পরাজয় স্বীকার করেছে।

স্তন্যপায়ী-বিবর্ত্তনে এক নূতন যুগের সূচনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগ-বিয়োগে এযাবৎ অগ্রগতি হয়েছে, এমন কি পাখীদের যে বিস্ময়কর অঙ্গডানা, তাও রূপান্তরিত হস্ত। হস্ত অঙ্গুলি দিয়ে বেচারারা স্তন্যপায়ীর সমকক্ষ হতে পারল না। স্তন্যপায়ী-বিবর্ত্তনে শারীরিক পরিবর্ত্তন বিশেষ হয় নি, পার্থক্য এসেছে মনে। এবার থেকে দেহের সকল কাজকর্ম্ম কেন্দ্রীভূত হয়ে এল এবং দ্রুত উন্নতির পথে উঠতে লাগল মস্তিষ্ক। শরীরতত্ত্বের দিক থেকে আদিম স্তন্যপায়ী ও আধুনিক স্তন্যপায়ীর ভিতর অভাবনীয় ইতর-বিশেষ দেখা যায় না, আকাশ-পাতাল তফাৎ শুধু স্বভাবে, কার্য্যে, মনে। মানুষ আধুনিকতম জীব, তুলনায় দুর্ব্বল, নিরস্ত্র, অথচ নিঃসহায় নয়, সে অতিমাত্রায় প্রবল, সসাগরা ধরণী, অনন্ত আকাশের অধীশ্বর, যা অতিকায় ডাইনসর বা পরাক্রান্ত স্তন্যপায়ীর চরমোৎকর্ষের দিনেও কল্পনা করা যেত না।

মনোবিজ্ঞানী স্তন্যপায়ীদের উন্নতির প্রধান কারণ অনুমান করেন জনিতৃযত্নে। শিক্ষার সুপ্রভাব যে কত ব্যাপক, তা বলা বাহুল্য। যে প্রাণী যত উন্নত তার শিক্ষাকাল তত দীর্ঘ। শিক্ষানবিশী প্রথম আরম্ভ হয়েছে পাখীদের সময়ে। অরণ্যচর পাখীরা তুলনায় আদিম। উটপাখী বলাকা বুনো হাঁস টার্কি-ফেজেণ্ট জন্ম হতে সতর্ক ও অর্দ্ধ স্বাবলম্বী, খুব বেশী তত্ত্বাবধান করা হয় না। শিকারী পাখী কাক পেঁচা টিয়া জন্মসময়ে মানুষের মত অসহায়, ভরণপোষণ করতে হয় অনেক দিন, মনে হয় এদেরই বুদ্ধি বেশী। কুরঙ্গ, শরভ প্রভৃতিরা অনেক সময় পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় বর্দ্ধিত হয়, অধিকাংশ মাংসাশীর সে সুযোগ নেই, প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ সাহায্য না পেলে মৃত্যু নিশ্চিত। খাদ্য, আশ্রয়, পুষ্টিরক্ষাকে কেন্দ্র করে সাহচর্য্য, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। লালন-পালনের অবদান প্রভূত অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিক্ষার সুযোগ উচ্চ স্তন্যপায়ী-মনে যে নির্ঝঞ্ঝাট নির্ভরতা সৃষ্টি করে তার মূল্য শুধু নিরূপণ করা যায় বিত্তশালী অভিভাবক ও দরিদ্র পিতামাতা কে কতখানি ও কত দিন পুত্রকে শিক্ষার সুযোগ দিতে পারে তার তুলনায়। পশুমহলে মাংসাশীরা কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল অথচ তৎপর, এরা বহুদিন লালন-পালনে পুষ্ট। বানর বনমানুষও তাই, অধিকন্তু এরা বুদ্ধিমান। তাই জীবজগতে সর্ব্বপ্রধান মানুষের উৎপত্তি এই ধারায়। প্রতিনিয়ত জনিতৃযত্ন ও সানুরাগ মনযোগ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতেছে অভিব্যক্তির ধারাকে।

বুদ্ধি-বিবর্ত্তন

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির ধারা স্বতন্ত্র, কোন ধারাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জৈব-অভিব্যক্তির সুদীর্ঘ ইতিহাসে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছে প্রভূত। বুদ্ধির ধারায় সম্বিৎ-এর অভ্যুদয়, এই ভাব প্রকট করেছে স্তন্যপায়ীকুল। বুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান—এদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, যে কিছুটা আত্মসচেতন, কাজকর্ম্ম যার স্ববশ, সে উচ্চ জীব। স্তন্যপায়ী-বিবর্ত্তন ধারায় বুদ্ধির আধিপত্য প্রবল, সহজ প্রবৃত্তির জড়ত্ব ধীরে ধীরে অবসান হয়। সহজ প্রবৃত্তি অবসান হয় নি শুধু জাড্যভাবে গেছে কেটে এবং ক্রমশঃ স্বাধিকারে এসেছে কার্য্যরীতি। বার্গ'শ বলেছেন, বুদ্ধির বিকাশ মেরুদণ্ডীদের আগমনকাল থেকে। একটু সংশোধন করে আমরা বলতে পারি, বুদ্ধির ধারা মেরুদণ্ডী বিকাশের পথ করেছে সুগম। অবশ্য যে পর্য্যন্ত না পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের স্তরে উপনীত হওয়া গেছে সে অবধি বুদ্ধির প্রভাব

---

* পূর্ব্বোল্লিখিত 'মাতৃস্নেহের বিকাশ' নিবন্ধে দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, পৌষ '৬৪

সঠিক টের পাওয়া যায় না। মৎস্য ও উভয়চর নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত, বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নাই। পরবর্তীকালে উভয়চর বিপুলায়তন-প্রাপ্ত, সরীসৃপ-ডাইনসর অতিকায় ও অস্ত্রবর্ম্ম-সমন্বিত হয়ে উঠেছিল ; এই একদেশদর্শী 'মোটা বুদ্ধি' কাজে লাগে নি, ফলে সমূলে হয়েছে নির্ম্মূল। মাছেরা বেঁচে আছে বটে তবে সে তাদের জলে থাকা নিবন্ধন, ওখানকার পরিসর অধিক, প্রতি-যোগিতা কম, জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের ফলে স্থল অপেক্ষা জলে তুলনায় কম। কুমীর কূর্ম্ম ভেক জলে পালিয়ে বেঁচেছে।

তবু সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর মাছেরা যেটুকু বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে পারে অমেরুদণ্ডীদের কেউ তা পারে না। শিক্ষাগ্রহণের শক্তি আছে, নিকট-অতীতের অভিজ্ঞতা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে সে যত সামান্য হউক না কেন কিন্তু অমেরুদণ্ডীরা আমাদের ভাষায় নির্ব্বোধ। সঙ্কীর্ণ পরিসরে কাজ অবশ্য পরিপাটি কিন্তু সে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন কাজ নয়, পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। জৈববুদ্ধি কুলস্মৃতি মনের গহনে চালনা করেছে প্রধান প্রবৃত্তিদের।

মাছের শিক্ষার ভিতর সহজ বোধ ও বিবেচনার অস্তিত্ব দেখা যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ সুফল বুঝতে পারে বেশ, নিয়োগ করে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে। গবেষণাগারে প্রায়ই হয় বুদ্ধি পরিমাপের অনুসন্ধান :

'কাঁচের জলাধারে একটি মাছ রেখে অপর প্রান্তে অবস্থিত খাদ্যের কাছে যাবার পথ দু'ভাগে পৃথক করে দেওয়া গেল ; দক্ষিণ প্রান্তের পথ যদি একটা কাঁচের স্বচ্ছ প্লেট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে যত বার দক্ষিণ দিকে যাবার প্রয়াস করবে,স্বচ্ছ দরজায় ঠোক্কর খাবে তত বার ; পরে দক্ষিণ প্রান্ত ত্যাগ করে বাম প্রান্ত দিয়ে চলবার চেষ্টা করবে, ক্রমে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দক্ষিণ দিকে ঘেঁসবেই না, বাঁ পাশ দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করবে।' প্রভেদ নিরূপণক্ষম হয়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগে বটে তবে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না।

ভাল-মন্দের বিচার-ক্ষমতা বুদ্ধিবিকাশের প্রথম পর্য্যায় যেহেতু এ অভিজ্ঞতা বেশীক্ষণ সঞ্চিত থাকে না,পরদিনই আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয়। বিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বর্ত্তমানের বিচার-বুদ্ধিপ্রবণ মানসিক শক্তির প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, এর ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার আভাস। কাজের পুনরাবৃত্তি প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি দুই দিকেই, প্রথম দিকটি ছাচে-ঢালা, বরাবর একই রকমের ; দ্বিতীয়, অর্থাৎ বুদ্ধির দিকে প্রতি কর্ম্মে প্রতি বারে কিছু না কিছু রদবদল হয় —এ হ'ল নির্ব্বাচন। 'নীরটুকু বর্জ্জনে ক্ষীরটুকু গ্রহণ' হয়ত হয় না, তবে বারংবার অভ্যাস শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার করে দেয় খানিকটা।

সহজাত বৃত্তিগুলির সমন্বয়ে মানসিক গঠন। বুদ্ধি মনকে মুক্ত ও প্রশস্ত করেছে। বুদ্ধির খাতে নমনীয়তা এত অধিক যে, যে কোন প্রতিবেশ আবশ্যক মত মানিয়ে নেওয়া চলে, ব্যক্তিগত উপায় খুঁজতে বিলম্ব হয় না। বন্ধুপ্রীতির কথাই ধরা যাক। চিড়িয়াখানায় রক্ষকেরা মাঝে মাঝে অদ্ভুত অপরূপ ঘটনা বিবৃত করেন। যে সব জন্তুদের ঝগড়াটে স্বভাব অথবা নির্জ্জনতা-প্রিয় তারাও বহু স্থলে অপরিচিত অনাত্মীয়কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ হয় না। লণ্ডন-চিড়িয়াখানায় একজাতীয় হরিণ ও ছাগলের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। গণ্ডারেরা নিরীহ-স্বভাব বলে খ্যাত নয় অথচ বাচ্ছা অবস্থা থেকে একটি গণ্ডারকে এক ছাগের সঙ্গে মিশবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ; বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত হ'ল বন্ধুভাবে, যৌবনে গণ্ডারের দেহ বিশালকায় হয়ে ওঠাতে সকলে ভাবল যে, অজনন্দন এবার একদিন গুঁতো খেয়ে পপাত ধরণীতলে। সমস্ত জল্পনা-কল্পনা মিথ্যা প্রমাণিত করে দেখা গেল ছাগলটি তার আবাল্য সুহৃদের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার হয়ে জনতাকে কসরৎ দেখাচ্ছে, একদিন দু'দিন নয় মাসের পর মাস। কিছু চেতনার উন্মেষ না হলে পরিচয়-নিবিড়তা অসম্ভব, সৌহার্দ্দ্যসখ্য উচ্চস্তরের কোমল প্রবৃত্তি। স্তন্যপায়ী অপেক্ষা নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভিতর এরূপ সখ্য-প্রীতি বিরল। যদিও কখনও কখনও এরূপ অঘটনের কথা শোনা গেছে, তবে তা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত নয়। ব্যবহারিক জীবনে অমেরুদণ্ডীরা অনেকে বেশী মাত্রায় নির্ব্বোধ। জুলিয়ান হাক্সলী কাঁকড়াদের পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, পুরুষরা যৌনমিলন কাল সমাগমে বিশাল দাঁড়া দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাইকে নিয়ে ভাগবার চেষ্টা করে, পুরুষরা মারামারি লাগিয়ে দেয়, বাধাপ্রাপ্ত না হলে বুঝতে হবে উপযুক্ত নির্ব্বাচন হয়েছে। মেরুদণ্ডীদের মধ্যে এত বোকা মেলা ভার। অমেরুদণ্ডীদের ভিতর আজকাল স্কুইড ও অক্টোপাস সবচেয়ে বৃহৎ কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এরা উন্নত মনে করা অনুচিত। বহু গুণে ছোট মাছ বিরাট স্কুইডকে গিলে খেয়ে ফেলে।

বুদ্ধির ধারায় প্রতিনিয়ত চলেছে গঠনমূলক কার্য্যাবলী। সামাজিকতা-বন্ধুত্ব-আত্মীয়তা-সহানুভূতি থেকে আরম্ভ করে ভালবাসা-দ্বেষ-হিংসা-রিরংসা প্রভৃতি অনেক জটিল বৃত্তিকে নবতর রূপ দিয়েছে বুদ্ধি। ভাষা কোন ধারার একচেটিয়া নয়, কীট-সমাজেও ভাষার আদর আছে, ইসারা-সঙ্কেতের মাধ্যমে পরস্পরকে ব্যক্ত করে মনোভাব, তবে তা সীমাবদ্ধ। পরস্পরের ভিতর আদান-প্রদানে প্রকৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর যুগ থেকে, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশিষ্ট অঙ্গে সঙ্কেতের মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের বহুল প্রচলন এদের ভিতর। পক্ষী-কাকলির প্রচ্ছন্ন যৌন-আবেদন অন্যতম উদাহরণ ; খেঁকশিয়াল, হরিণ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী স্পষ্ট ভাষায় সঙ্গিনীকে আহ্বান জানায়।

বুদ্ধি গতিশীল, পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত অবস্থার প্রয়োগ নেই, বিস্তৃতিতে অন্য কোনও মানসিক বৃত্তি এর সমকক্ষ নয়। পৃথিবীর আধুনিক স্তন্যপায়ীদের বুদ্ধি-পরীক্ষা চলেছে বিস্তর, দেখা গেছে শারীরিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ হতে যে যে-পর্য্যায়ে অবস্থিত, স্বভাবও তার সেইরূপ অর্থাৎ দৈহিক গঠন ও মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিতে উচ্চ-নীচের তারতম্য পাওয়া যায় না।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অণ্ডগর্ভ সবার নিম্নে। এদের শিক্ষা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার, সরীসৃপদের মত অরণ্যচর বর্ব্বর রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ

বৎসর পরেও। অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর সহিত আচরণে তুলনাই হয় না, সাহসিকতায় নৈপুণ্যে অধ্যবসায়ে অমরা স্তন্যপায়ী—শ্রেষ্ঠ। 'টাসমেনিয়ান ডেভিল' হিংস্র অঙ্কগর্ভ, অষ্ট্রেলিয় কৃষক এদের জ্বালায় গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী শান্তিতে পুষতে পারে না। চিড়িয়াখানায় পর্য্যন্ত এদের রাখা দায়, প্রত্যহ খাবার-দেওয়া পালককে পর্য্যন্ত চিনতে পারে না, সিংহ, ব্যাঘ্র, সীলরা অন্ততঃ এটুকু পারে। অঙ্কগর্ভদের পারিবারিক জীবন নেই একেবারে, বর্ব্বর। ক্যাঙ্গারু শাবক বহন করে নিয়ে ভ্রমণ করে বটে কিন্তু সে দয়া-মমতা-শূন্য। নিষ্প্রুস জৈব-প্রবৃত্তি। মানসিক স্নেহ-প্রেমের জৈবিক আভাস পূর্ব্বগামী কুলে, অঙ্কগর্ভ বোধ হয় কোমল-কান্ত-ভাবের অগ্রদূত, বিবর্ত্তন ধারায় নিবিড় অভিব্যক্তি হয়েছে ক্রমশ এই ভাবের, তার ফলে উচ্চ স্তন্যপায়ীকুলের অভ্যুদয়। বিপদ দেখলে ক্যাঙ্গারু-মাতা থলিস্থ শাবক দূর-নিক্ষেপে দেহ হাল্কা করে পালায়, উচ্চ স্তন্যপায়ী মণ্ডলে কেউ এরূপ করবে না, কারণ ভালবাসা সেখানে জৈবিক স্তর অতিক্রম করে মানসিক প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত।

কাঠবিড়াল-মুষিক-ইঁদুর স্তন্যপায়ীকুলের সর্ব্বনিম্নে। কাঠ বিড়াল নিম্নশ্রেণীর জীব, স্মৃতি অতি অল্প, খাবার লুকিয়ে রেখে ভুলে যায় বারংবার। খাদ্য গোপন করে রাখা, ভূমিনিম্নে সুড়ঙ্গ খননে বাসস্থান নির্ম্মাণ মুষিকদের বুদ্ধির বিস্তৃত পরিচয়, স্মৃতিশক্তি খানিকটা আছে। কুকুর- বেকুন তুলনায় অনেক উন্নত। মানুষ যে বুদ্ধিবলে বলীয়ান তার রেশ এখানে। গোলকধাঁধা-বাক্সে বন্দী করে রেখে দেখা গেছে, মুষিকরা কেবল সুড়ঙ্গ কেটে পালাবার উপযুক্ত স্থান খোঁজে; কুকুররা বন্ধ দরজার কাছে এসে কব্জা নাড়াচাড়া করে; বুঝতে পারে চাবিকাঠি ঐখানে। পিছন দিকে হুড়কো ঠেলে চাবিকল নাবানো, দড়ি টেনে কব্জাযুক্ত দরজা খোলা এদের আয়ত্তের বাইরে নয়। পরীক্ষা, অনুসন্ধান, অন্ধের ন্যায়, হাতড়াতে হাতড়াতে মুক্তির পথ খুঁজে পায় অবশেষে, হয় ত আকস্মিক, কিন্তু তার পর স্বভাব-গতিতে কার্য্যসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় কার্য্য-প্রক্রিয়া। মানুষের অজানা কাজগুলিও অনুরূপ। মানুষও পরীক্ষা-অনুমান-ভ্রমাত্মক কার্য্যের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যপথে অগ্রসর। মস্তিষ্কের বহিরাবরণের বৃদ্ধি উচ্চস্তন্যপায়ী কুলে লক্ষনীয়। স্মৃতি অবস্থানের সময় যথেষ্ট প্রসার হওয়ায় একের পর এক অবস্থার তুলনা ও বৈষম্য বিচার সম্ভব, প্রচেষ্টা ও সময়-ব্যয় সংক্ষেপ হয় এই প্রণালীতে। গো-মহিষাদি রোমন্থক স্তন্যপায়ীরা উচ্চ জীবরূপে খ্যাত,তবে ভাববিশ্লেষণ এদের স্তরে পৌঁছায়নি, বস্তু ও প্রতিরূপের পার্থক্যবোধ জন্মায় নি। কে না দেখেছে গোমাতা খড়-ভূষি-পূর্ণ বৎসের গাত্র লেহন করছে? প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের এই অভাববোধ দেখে মনে হয় সহজ-প্রবৃত্তির প্রভাব সহজ-বুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে, প্রবৃত্তিমূলক জীবন। সহজ-প্রবৃত্তি-প্রসূত কর্ম্মধারা, সরল-সহজ মারপ্যাঁচের ঝঞ্ঝাট নেই, একটি মেষকে রাগানো যেতে পারে, খুসি করা যেতে পারে, লজ্জা দেওয়া যেতে পারে। মার্জ্জারের ক্রোধ নিত্যকার ঘটনা। অনেক নৈরাশ্যব্যঞ্জনাও লক্ষ্য করে থাকবেন—এ সমস্ত কার্য্যে প্রক্ষোভের পরিমাণ অধিক। সন্তানের প্রতি পিতামাতার আকর্ষণ ও জনিত্-যত্ন যত দিন পর্য্যন্ত না দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে, মন তত দিন জৈব যন্ত্রের স্বতঃক্রিয় প্রতিক্রিয়ারূপে পরিগণিত, বুদ্ধিবৃত্তির পরিসর অল্প।

অঙ্কগর্ভ

আদিম স্তন্যপায়ী প্লাটিপাসের পরবর্ত্তী ধাপ অঙ্কগর্ভ। উদ্ভিদ-ভোজী ক্যাঙ্গারু, মাংসাশী ওপসোমরা শাবক-জন্মের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত দেহস্থ থলির মধ্যে তাদের নিয়ে বেড়ায়। জন্মকালে এরা আয়তনে অনধিক ইঞ্চি দুই, অন্ধ মাংসতাল, আত্মনির্ভরের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেই অবস্থাতে মাতৃদেহের থলির মধ্যে চলে গিয়ে স্তন্যপান করতে থাকে, বাহিরে এলেও বেশ কিছুকাল মাতৃদেহবাসী। ট্রিয়াস স্তরের শেষের দিক থেকেই এদের সন্ধান আছে, বর্ত্তমানে কেবল অষ্ট্রেলিয়া-নিউগিনিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও পুরাকালে ইংলণ্ড-ইউরোপ-আমেরিকায় ছিল।

স্তন্যপায়ী-বিবর্তনের প্রথম দুই স্তরেই পরিলক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের রেশ। হংসচঞ্চু প্লাটিপাস ডিম প্রসব করলেও সরীসৃপদের মত নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয় না, স্তন না থাকলেও দুগ্ধ-নিঃসরণ-স্থান আছে। কিছুকাল শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব রাখে নিকট-সম্বন্ধ গড়ে ওঠে মাতা ও শিশু সন্তানে। অঙ্কগর্ভদের মাতার সঙ্গে আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠ, জন্মাবার পর প্রথম দিকে মাতৃক্রোড়চ্যুত হয়। জৈব-বিবর্ত্তনের অগ্রগতিমুখে অপত্য-স্নেহ ও স্বজনপ্রীতি বেড়ে চলেছে। আবার সুকুমার বৃত্তিগুলি যে উন্নত শিক্ষিত জীবের জন্য দিচ্ছিল এ কথা অনস্বীকার্য্য। প্রথম দিককার অঙ্কগর্ভরা উদ্ভিদভোজী, পরে মাংসাশীর উদয়, ওপসোম পতঙ্গভূক, ডেসুসরাস। পরবর্ত্তী যুগের ক্যাঙ্গারুরা বড় বড়, 'ডিপ্রটোডন' বৃহত্তম, মাথার খুলি প্রায় তিন ফুট; 'থাইলাকোলি' মাংসাশী, শ্বাদন্ত তীক্ষ্ণ, বৃহদায়তন।

অঙ্কগর্ভ স্তন্যপায়ীকুলে সবচেয়ে অধস্তন মানসিক অভিব্যক্তিতেও, তেমনি। জন্মের অব্যবহিত পরে মাতৃথলিতে প্রবেশ অনিশ্চিত, কারণ মা, অসহায় ক্ষুদ্র অন্ধ শাবককে কোন সাহায্য করে না, কোনক্রমে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শিশু শাবক মায়ের লেজ বেয়ে বা বুক-পিঠের ঘন রোমরাজির মধ্য দিয়ে থলির ভিতর পড়ে। ঠিক পথে যে যাবেই এমন কোন কথা নাই, বিপথে গেলে অবধারিত মৃত্যু।

আধুনিক বুদ্ধি যদি জনিতৃযত্ন থেকে আরম্ভ হয়েছে ধরা যায়, অঙ্কগর্ভ প্রাণীরা যারা মাতৃদেহের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছিন্ন হয় না, তারা স্তন্যপায়ীর নিম্নতম সোপান। এরা সরীসৃপদের চেয়ে উন্নত, সেখানে না আছে বাৎসল্য-ভাব, না আছে অপর কোনও হৃদ্যতা। জৈব-বিবর্তনের এই ধারায় পর্য্যালোচনায় আমরা যত উপরের দিকে উঠব পিতা-মাতা ও সন্তানের মধুর সামীপ্য তত নিবিড় তত প্রাঞ্জল।

অঙ্কগর্ভরা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে নিরুপদ্রপে বেড়ে উঠেছে,

অষ্ট্রেলিয়ায় এরা বর্দ্ধিষ্ণু উপশ্রেণী। এক আমেরিকা ছাড়া (তাও শুধু ওপসোম) অপর কোথাও নাই, আবার অষ্ট্রেলিয়ায় অমরাপ্রাণী নাই। জলবায়ু দায়ী এর জন্ত। অঙ্কগর্ভরা অমরা-প্রাণীর চেয়ে প্রাচীন, বিবর্তন আরম্ভ হয়েছে অনেক পূর্ব্বে। কিছু দিনের জন্ত এদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, বিস্তার হয়েছিল পৃথিবীময় কিন্তু উন্নততর অমরাপ্রাণীর আবির্ভাবে এদের তিরোধান, বুদ্ধির দৌড়ে পাল্লা দিতে অপারগ, অতএব বসতি পরিত্যাগ করে পালাতে হ'ল দূর গহনে আমেরিকার গভীর অরণ্যে অষ্ট্রেলিয়ার মরুময় শুষ্ক প্রান্তরের পারে। প্রশ্ন উঠবে, সেখানে আমরা প্রাণী যায় নি কেন?

চেষ্টার ত্রুটি হয়ত হয় নি তবে নবাগতদের ছড়িয়ে পড়বার যখন প্রয়োজন অনুভূত হ'ল, সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী পরে, অতলস্পর্শী দুর্লঙ্ঘ্য পারাবার তখন ব্যবধান রচনা করেছে এশিয়া-অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার তটরেখা ঘেঁসে, যেখানে তারা জ্ঞাতিশত্রু অমরাযুক্তদের কবল হতে বিপদমুক্ত, নির্ব্বিঘ্নে আকৃতি ও গঠনবিন্যাসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

মহাদেশবিচ্যুত ভূভাগ মাতৃভূমির নির্দ্দেশের অপেক্ষা না রেখে নিজ নিয়মে গড়ে উঠে, সেখানকার নিয়ামক গাছপালা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক গঠন ও ভৌগোলিক অবস্থিতি। অঙ্কচ্যুত অবস্থায় জলবায়ু ও প্রাকৃতিক গঠনে মাতৃভূমির খানিকটা পরিবর্তন সাধিত হয়। যে কার্য্যকারক শক্তিনিচয় (ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস-ঘূর্ণিবাত্যা) বিচ্ছিন্ন করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টিতে, সাহায্যও করে সেই। এ কারণে যে দ্বীপ মূল ভূখণ্ড হতে যত অধিক দূরে অবস্থিত তার জলবায়ু, জীবজগৎ সেই পরিমাণে ভিন্ন, যে যত অধিককাল পূর্ব্বে আলাদা হয়েছে সে আপনার স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি প্রচেষ্টায় মশগুল, মাতৃভূমির দিকে দৃকপাতের অবকাশ কোথায়! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে নিভৃতে স্বতন্ত্র ভূখণ্ডগুলির জীবজগৎ গড়ে উঠে, একদা-প্রবাহিত জীবনধারা হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মহাকালের পক্ষপুট আশ্রয়ে এগিয়ে চলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পানে; এদিকে মাতৃভূমির জ্ঞাতিগোষ্ঠির মহলে পুরাতন ধারায় অনাবিল জীবনস্রোত, দুই পক্ষে দেখাদেখি নেই, মেলামেশা নেই, আদানপ্রদান নেই, লক্ষ কোটি বর্ষ পরে মানুষের ব্যবস্থাপনায় দেখা হলে চেনা দুষ্কর।

বৃহত্তর জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণীকুল স্তব্ধ থাকে না গড়ে ওঠে নিজস্ব গতিবেগে, আদিম প্রাণের সুপ্ত সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে চলে—এ হ'ল প্রাণসত্তার পরম বৈশিষ্ট্য। অষ্ট্রেলিয়া এক-কালে অন্য মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল, বহির্জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বহুকাল—স্তন্যপায়ী-বিবর্তনের উষাকালে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এ জগৎ, স্তন্যপায়ী অভ্যুদয়ের পুরাতন ধারায় থলিসমন্বিত স্তন্যপায়ীর বিকাশ, তারই পরাকাষ্ঠা প্রশান্ত মহাসাগরের এই মহাদ্বীপটিতে। এখানে অঙ্কগর্ভ ব্যতীত আর কোনও প্রাণী প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, উচ্চ স্তন্যপায়ীদের বিবর্তন ধারায় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন তৃণভোজী হিংস্র পিপীলিকাভুক্ বৃক্ষচর প্রভৃতি প্রাণীর অভিব্যক্তি হয়েছে সে সকল শাখার সমতুল্য প্রাণী এখানেও বর্তমান।

প্রাণাভিব্যক্তি চলে সমান্তরাল ধারায়, না হলে কীটভুক্ ওপসোম পিপীলিকাভুক্ তৃণভোজী ক্যাঙারু ওলাবি, মাংসাশী নেকড়ে-সদৃশ টাসমেনীয়ান শয়তান (ডেভিল) হিংস্র শিকারী, ওমবাটের মত অন্তর্ভূমির প্রাণীও আছে আবার ভল্লুকের মত 'কোয়েলা' নামক প্রাণী যথেষ্ট, শশক কাঠবিড়ালের প্রতিনিধিত্ব করছে 'বেণ্ডিকুট', জলজ অঙ্কগর্ভ অল্প হলেও অস্তিত্ববিহীন নয়। সবার দেহে শাবক বহনের থলি, সকলকার শাবকই কিছুকাল মাতার দেহসংলগ্ন হয়ে কাটায়। স্তন্যপায়ী-বিবর্তনের দুই প্রধান ধারা অঙ্কগর্ভ ও অমরাসংযুক্ত প্রাণী। শেষোক্ত দল পরে এসেছে ও বুদ্ধিমান বেশী অথচ এরা যে যে শাখায় বিস্তারলাভ করেছে অঙ্কগর্ভরা পুরাতন হলেও সেই সমস্ত শাখাতেই ব্যাপ্ত—অভি-ব্যক্তির এ আর এক বিস্ময়কর পরিচয়।

ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৭-৯-৮৮

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে লিখিতে দেখিতে পাইতেছি যে, বিশ্বাস ও প্রেমেতেই ইহার জন্ম হইয়াছে। বিশ্বাস ও প্রেমের শক্তিই ইহার প্রকৃত শক্তি। এই শক্তির উপরে এখনও আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। ইহার দুর্ব্বলতার চিহ্ন অনেক আছে। ইহার বাহিরে সূত্র অনেক আছে। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাধিও অনেক রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি সুদৃঢ়রূপে সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া থাকি, জয়ও বুঝি না, পরাজয়ও বুঝি না, আমাকে সত্যের অনুগত থাকিতে হইবে, বিধির কৃপার উপরে নির্ভর করিতে হইবে এই বুঝি। এইভাবে থাকিলে আমাদের মার নাই। আমাদের এক এক জনের শক্তি অল্প, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি মস্ত একটা ব্যাপার করিয়া তুলি, আমার দুর্ব্বলতা এমন রহিয়াছে যে, বন্ধুরা কেহ কেহ আমার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন না। এ ত সব সত্য কথা, কিন্তু এই আমরাই প্রভু পরমেশ্বরের অগ্নিকে হৃদয়ে রাখিতে পারিব এবং পরবর্তী বংশধরদিগকে দিয়া যাইতে পারিব যদি আমরা বিশ্বাস ও অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি। একা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ত আগুনটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই দেখিতেছি, আমাদের নেতারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত সহানুভূতি করিতে না পারাতে, তাঁহাদের সাধুতা ধরিতে না পারাতে তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা না দেখানতে, সমাজে বারবার বিচ্ছিন্নতা আসিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেমন একদিকে নিয়মতন্ত্র প্রণালী আছে ইহাতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তেমনি অন্যদিকে ইহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত উদারতা ও সহিষ্ণুতার সহিত পরের ভাব গ্রহণের শক্তির প্রয়োজন।

গত কল্য সুখের সংবাদ এই পাইয়াছি যে, দুর্গামোহন বাবুর আবার আধ সের ওজন বাড়িয়াছে। তবে ইহা যক্ষ্মা নয়। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক।

১৮-৯-৮৮

গত রবিবার যখন সাউথ প্লেস গির্জ্জাতে যাই, পথে একটি প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিলাম। এখানে যোদ্ধা বীরপুরুষের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া একজন যুবতী অতিশয় প্রেম এবং ব্যাকুলতার সহিত যেন কি বলিতেছে। দেখিয়া হেক্টর এবং এনড্রোম্যাকীর ছবি বলিয়া বোধ হইল। ছবিটি দেখিয়া হঠাৎ চিত্তে একটি অপূর্ব্ব চিন্তার উদয় হইল। চিন্তাটি এই—ইতিবৃত্তে দেখি নারী এই প্রকারে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের এই যে প্রেম ইহার মধ্যে বিধাতার গূঢ় গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে, ইহা কেবল উভয়ের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের আদর্শ মাত্র। নর-নারীর সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়, মানবজাতি রক্ষিত হয়, ইহাতে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এইরূপ নর-নারী উভয়ের মিলনে মানবজাতির সকল মহৎকার্য্য চলিবে এবং তাহা হইলে সকল কার্য্যে প্রভূত উন্নতি দৃষ্ট হইবে; নর-নারীকে স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে দূরে রাখিয়া জগতের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এই সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, যে সভ্যতাতে বিবাহ সম্বন্ধকে কঠিন করিয়া তুলিতেছে ও নর-নারীকে পরস্পর হইতে দূরে রাখিতেছে, তাহা অনিষ্ট ফল উৎপন্ন করিবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নর-নারীর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের একটা অতি আশ্চর্য্য পবিত্র ভাব মনে আসিল, এমনকি উভয়ের যে শারীরিক সম্বন্ধ তাহাও বিধির একটি মহৎ বিধান বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

নর-নারীর সম্বন্ধ বিষয়ে আর একটি চিন্তা গতকল্য উদিত হইয়াছে। গতকল্য ন্যাশানাল গ্যালারীতে বেড়াইতে গেলাম। ছবিগুলি আর একবার মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্যান্য ছবির মধ্যে 'ম্যাডোনা ইন্ প্রেয়ার' যীশুর মাতা মেরীর প্রার্থনা। কি সুন্দর, কি আশ্চর্য্য পবিত্র তার ভাব, মুখে কি বিনয়ের মাধুর্য্য ও নির্ভরের একাগ্রতা! চিত্রকর ধন্য যে, এমন ভাব বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহারি এক পার্শ্বে মেরী—'ম্যাগডেলিনি ইন্ প্রেয়ার'—ইহার মুখে সে কমনীয়তা নাই, সে নিষ্কলঙ্ক সাধুতার আভা নাই, অনেক বিষাদের রেখা মুখের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইবেই ত, ও কি জীবন হইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ছবিখানি মেরীর ছবি অপেক্ষা ভাল লাগিল।

এই নারীর জীবনের পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিয়া অন্তরে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভাবিলাম নারী হৃদয়ে এই ধর্ম্ম-সংগ্রাম কি অমৃত ফল প্রসব করে। মানব জীবনে ইহাতেই ধর্ম্মের মহিমা জানিতে পারা যায়। দেখিতে দেখিতে নারী-জীবন সম্বন্ধে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য পবিত্র ভাব উদিত হইল।

তৎপরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তাতে মনে মনে 'জানলাম না মা, বুঝলাম না মা', এই গানটি গাইতে গাইতে আসিতেছি, গাইতে গাইতে এমন ভাব হৃদয়ে উঠিল যে, পথে যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেছে ইচ্ছা হয় মা বলিয়া ডাকি। অমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা মনে হইল। শুনিয়াছি তিনি একটি বালিকা দেখিলেও "মা" বলিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিতেন।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধন করিলে, নারীজাতির প্রতি পবিত্র ভাব সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের তান্ত্রিকগণ শক্তি পূজা করিয়াও নারীকে সমুচিত ব্যবহার করে নাই।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রাহ্মণীদিগকে আরও উৎসাহিত করিতে হইবে। পুরুষদিগের মধ্যে এমন অনেক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা বাস্তবিক অনুতাপিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, নারীদিগের মধ্যে সে জীবন্ত ধর্ম্মভাব এখনও তেমন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে না। কয়েকটি মেয়ের অন্তরে আগুনটা একবার জ্বলিলে তৎপরে দেশের অন্যান্য স্ত্রীলোকের মনে জ্বলিবে।

প্রার্থনা

হে প্রভু, হে সত্য, হে একমাত্র গতি! আমাকে বিশ্বাসের সহিত তোমার উপরে নির্ভর করিতে দাও!

১৯-৯-৮৮

ইহা অতি সত্য কথা যে, যাহারা কায়-মন-প্রাণে ঐশী শক্তির হাতে আপনাদিগকে সমপর্ণ করে, ঐশী শক্তি তাহাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম জ্ঞান বুদ্ধি বল সহায় সম্বল সকলি হইয়া থাকেন। বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ঐ শক্তিই তাহাদের বুদ্ধি দেন, বলের প্রয়োজন হয়, বল দেন; অর্থের প্রয়োজন হয় অর্থ দেন; সকল অভাবই পূরণ হয়। ঐ শক্তির প্রভাবে সকল ধর্ম্ম-সমাজ চলে, তখন তাহার কিছু অভাব থাকে না। ইহা সত্য, অতি সত্য।

আমি ত ইহা বুঝিতেছি, তবে কেন আমি বিশ্বাসের সহিত ঐ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করি না? কেন আমার হৃদয় বলের ও আনন্দের চির-উৎস হইয়া থাকে না? কেন মুখ সময়ে সময়ে ম্লান হয়, কেন বিষাদের রেখা মুখে দেখা দেয়? কেন মন নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে? ইহাতেই প্রমাণ আমি এখনও প্রকৃত বিশ্বাসী হই নাই। আর কত দিন এ ভাবে চলিবে?

প্রার্থনা।

দীনবন্ধো, আর কতদিন এ ভাবে চলিবে, আর কতদিন আমি তোমার কাজ নিজের হাতে লইয়া আপনার শক্তি ক্ষয় করিব এবং কাজও নষ্ট করিব? আমার সেই অবস্থা পাইতে বড় ইচ্ছা হয়, যে অবস্থাতে আমার হৃদয় চির-আনন্দ ও চির-বলের উৎস হইয়া থাকিবে; যে অবস্থাতে তোমার ঐশী শক্তি আমার আত্মার অন্ন-পান যোগাইবে, সেই শক্তি আমাকে বুদ্ধি দিবে। হে শক্তিশালী পুরুষ, তোমার সত্যের বল কি এইরূপ ক্ষীণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ হইবে? আমরা কি মরিয়া-মরিয়া তোমার নাম করিব? তুমি এস; বিলম্ব কেন কর? তোমার শক্তি ত্বরায় আবির্ভূত হউক; গভীর গর্জ্জন করিয়া আসুক, প্রচণ্ড ঝড়ের ন্যায় আসুক, আমাদিগকে জাগাইয়া আসুক। আমাকে রাখ। আমাকে বিশেষ ভাবে রাখ। আমিও প্রশান্ত অন্তরে তোমার শক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চাই। তবে কেন আমাকে রাখিবে না?

২০।৯ ৮৮

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, প্রতিদিন উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের ভার ও আমার জীবনের ভার স্বয়ং প্রভু লইয়া বসিয়াছেন। আমি যখনই এই দুইটি সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই অবসন্ন মন জাগিয়া উঠে। আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন অত্যন্ত মলিন, তখনও এই দুইটার প্রতি সংশয় উপস্থিত হয় না। ব্রাহ্মসমাজ-রথে সেই জগন্নাথকে আরোহণ করাইয়া আমরা ভাল করিয়া টানিতে পারিতেছি না, সেইজন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা! কোন সাধনে আমরা এই ভাব পাইব? একটি চিন্তা আমার মনে অনেক বার উদয় হয় ও সেই ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছা হয়। সেটা এই: একবার রোমনগর শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে রোমানগণ বড়ই চিন্তিত হইলেন। দেবতার শরণাপন্ন হওয়াতে, প্রত্যাদেশ হইল যে, রোমীয় সেনাপতিদিগের মধ্যে একজনকে বলিস্বরূপ বিনষ্ট হইতে হইবে, তবে শত্রুকুল পরাজিত হইবে। এই আদেশ-বাণী-শ্রবণে রোমীয় সেনাপতিগণ চিন্তাযুক্ত হইয়া একস্থানে সমবেত হইয়া যুক্তি করিতেছেন। কে বিনষ্ট হইবে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ একজন সেই দলের মধ্য হইতে তীর-বেগে অশ্বারোহণে ধাবিত হইলেন এবং দেখিতে না দেখিতে অশ্বসহিত লম্ফ দিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইলেন। 'গেল রে! গেল রে!' ধ্বনি উত্থিত হইল, হুলুস্থুল পড়িয়া গেল; কিন্তু এই সংবাদ যখন শত্রু-শিবিরে গেল যে, দৈববাণীতে সেনাপতিকে বলি-স্বরূপ নিহত হইতে বলিয়াছে এবং একজন মরিয়াছে অমনি তাহাদের মনেও ত্রাসের উদয় হইল। রোমীয়গণ জিতিল। ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে কয়েক জনকে বিশেষতঃ আমাকে বলিস্বরূপ নিহত হইতে হইবে।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর, ব্রাহ্মসমাজ তোমার রথ হইবে, তাহার উপরে তোমাকে আরূঢ় করিয়া আমরা টানিব, তোমার প্রসাদে আমরা নবজীবন পাইব, আমরা পাপ-তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া তোমার নাম করিব। সেই দিন ত্বরায় আন।

২২ ৮ ৮৮

গতরাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, মার অত্যন্ত সঙ্কটপীড়া। আমার বড়দাদা (বড়পিসীর বড় ছেলে) যেন সে কথা আমাকে বলিতে পারিতেছেন না, কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। আমার হঠাৎ যেন মনে হইল—আমার জননী পীড়িত হইয়া কোন এক বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছেন; আমি তাহা জানিয়াও ৫।৭ দিন ভুলিয়া আছি এবং তাঁহাকে এক মুষ্টি অন্ন দিবার লোক নাই। সেই স্বপ্নেতেই ভয়ানক অনুতাপ হইতে লাগিল এবং আত্মগ্লানিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া মনে হইল যে, হেমের পত্রে পড়িয়াছি মা ভয়ানক কাহিল হইয়া যাইতেছেন। ক্রমে আনুপূর্ব্বিক গত জীবনের কথা সব মনে হইল। পিতামাতার, আত্মীয়স্বজনের, কি কষ্টেরই কারণ হইয়াছি! পিতাকে বৃদ্ধাবস্থাতে সুখে রাখিতে পারিলাম না, জননীকে সুখী করিতে পারিলাম না, বিবাহ সম্বন্ধে যাহাদের সঙ্গে

আবদ্ধ হইলাম, তাঁহাদিগকে চরিতার্থ ও সুখী করিতে পারিলাম না, সন্তান-সন্ততিকে স্বচ্ছলতার অবস্থায় রাখিতে পারিলাম না। একদিকে এই গেল। অপরদিকে কত প্রলোভন কত সঙ্কটে পড়িলাম, কত সময় চিত্তকে কলুষিত করিলাম, ব্রাহ্মসমাজে যাহাদের সঙ্গে মিশিলাম, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া ভালবাসতে পারিলাম না। তাঁহাদের ছেলেগুলিকে আমার ঘরের ছেলে, তাঁহাদের পরিবারগুলিকে আমার এক রক্তের পরিবার করিয়া লইতে পারিলাম না। অথচ এই সকলের মধ্যে জীবন-পথে যে এতদিন আসিয়াছি, তাহার মধ্যে আমি কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার যে কিছু ত্রুটি হইয়াছে, সে কেবল সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধরিতে পারি নাই বলিয়া। আমি তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও উপর নির্ভর কখনও করি নাই, এবং এখনও করিব না। সেই একমাত্র বন্ধু আমাকে ঘোরান্ধকারের মধ্যে দেখা দিয়াছেন—তিনিই আমাকে ঘোর বিপদের মধ্যে রাখিয়াছেন। তিনিই আমার সকল দিক রক্ষা করিবেন, আমার জনক-জননীর কল্যাণ করিবেন। এমন এক সময় ছিল, যখন আমি প্রতিদিন নিজের প্রার্থনার সহিত পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করিতাম। অনেক দিন হইল সে অভ্যাসটা সরিয়া পড়িয়াছে। আজ নিদ্রাভঙ্গে মন তাঁহাদের জন্য ব্যাকুল হইল এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলাম।

প্রার্থনা।

আমি এ জীবনে আর কাহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি! তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেই বা জানি? আমাকে তুমি রক্ষা কর।

২৪ ৯ ৮৮

একটি চিন্তাতে আমাকে সহস্র প্রলোভনের মধ্যে অপূর্ব্ব বল আনিয়া দেয়, সে চিন্তাটি এই: ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগসুখাসক্ত স্বার্থপর হইয়া জীবনধারণ করিবার জন্য আমি জন্মি নাই। ইহা অপেক্ষা এক উন্নত জীবন আছে, যাহা ধারণ করিতে পারা পরম সৌভাগ্য এবং ধারণ করাই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা। সেই জীবন ধারণ করিব বলিয়াই তিনি আমাকে আনিয়াছেন। সে জীবনে আত্মসংযম, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা, পরসেবা প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ীর জীবন হইতে ইহা কত বিভিন্ন। এই জীবনের চিন্তা আমাকে কোন রাজ্যে যেন তুলিয়া লইয়া যায়। এই জীবনের চিন্তা যখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই আমি প্রলুব্ধ হই। কল্য হইতে এই জীবনের চিন্তা আমার মনে জাগিতেছে ও আমার চিত্তকে আনন্দে ভাসাইতেছে। আমার স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা যেন অসীম। বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা দেখিতে ভাল লাগে তাহার কথা শুনিতে ভাল লাগে, তাহার চিন্তা করিতে ভাল লাগে, তাহা পাইতে ভাল লাগে। আমার চিত্তে যে এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে সে ত তিনি বলিতেছেন। এই ত তাঁহার বাণী, তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলিতেছেন, তোমাকে আমি পরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি—আমার প্রেমানলে সর্ব্বস্ব আহুতি দিবার জন্য ডাকিয়াছি। তাঁহার এই বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই মুক্তি।

প্রার্থনা

হে প্রভো! দীনবন্ধো! নিরন্তর আমাকে অগ্রসর হইতে বলিতেছ; বৈরাগ্যানলে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে বলিতেছ; আমাকে তদনুরূপ বল দেও এবং তোমার বাণীর উপরে দৃঢ়তর রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেও।

২৭ ৯.৮৮

আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন, আজ তাঁহার স্মরণার্থ একটি সভা হইবে, তাহাতে আমি বক্তৃতা করিব, সেইজন্য ব্রিষ্টলে আসিয়াছি। এখানে মৃত মিস্ মেরী কার্পেণ্টার-এর একজন ভগিনীপতি মিঃ হারাট টমাস-এর বাড়ীতে আছি। আমি আজ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষের কোন কোন লোককে বলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আসিল না। দ্বিজদাস আসিবে বলিল, কিন্তু আসিল না; বোধহয় গাড়ি ধরিতে পারিল না। যাহা হউক, একা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি। রামমোহন রায়কে তাঁহার দেশবাসিগণ এখনও চিনিল না। এক চিনিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, আর এক চিনিয়াছিলেন ঈশানচন্দ্র বসু, আর এক চিনিয়াছেন মিস কলেট, আর এক চিনিয়াছি আমি, আমি ইঁহাদের মধ্যে অধম।

জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ যে, তিনি এমন পুরুষরত্ন আমাদের দেশকে দিয়াছিলেন।

প্রার্থনা।

হে চির মঙ্গলালয় পরমেশ্বর! প্রভো, বঙ্গভূমির প্রতি, ভারতের প্রতি তোমার অপার কৃপা, যে তুমি নবভারতের উষাকালে শুক্র-তারকার ন্যায় এই মহাত্মাকে উদিত করিয়াছিলে। যে সময়ে দেশে স্বার্থপরতায় সকলে নিমগ্ন, সেই সময়ে কি নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইলেন! যে সময়ে তোমাকে হারাইয়া সকলে অন্ধকারে ঘুরিতেছিল, সেই সময়ে কি গম্ভীর স্বরে তিনি সকলকে তোমার পথে ডাকিলেন! যাঁহার জীবন তোমার সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পরলোকগত আত্মার জন্য কি প্রার্থনা করিব? তাঁহার ত্রুটি-দুর্ব্বলতা সমুদায় মার্জ্জনা করিয়া করুণাময় পিতা তুমি, তুমি তাঁহাকে উন্নতলোকে স্থান দিয়াছ। তবে আমাদের জন্য প্রার্থনা করিবার আছে, তাহাই আজ করিতেছি। তিনি অন্ধকারের দিনে কঠিন পরিশ্রমের সহিত যে সকল বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা রক্ষা করিতে পারি; আমরা যেন ধর্ম্মজীবনের সেই উদার ভাব রক্ষা করিতে পারি; আমরা যেন সেই জনহিতৈষণা দ্বারা সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত থাকি; সেই সত্যানুরাগ, সেই স্বজাতিপ্রেম, সেই ধৈর্য্য, সেই বিনয়ে ভূষিত হইয়া আমরাও যেন নিরন্তর তোমার অনুগত ভৃত্যের ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারি।

২৮ ৯ ৮৮ ব্রিষ্টল।

কল্য প্রাতে রামমোহন রায়ের সমাধি-স্থানে গিয়া একাকী উপাসনা, প্রার্থনা ও আত্মচিন্তায় কাটাইয়াছি, সমস্ত দিন রামমোহন

রায়ের চিন্তাতে গিয়াছে, রাত্রে তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছি। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান শিক্ষা কি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দুইটি সত্য আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। প্রথম, নিজের সুখ ভুলিয়া গিয়া পরোপকারার্থ জীবন ধারণ করিতে পারাই মানব-জীবনের প্রকৃত মহত্ব; দ্বিতীয়, পাপ, অসাধুতা, দুর্নীতি এই সকলের সহিত সংগ্রামে জীবন ক্ষয় করাই প্রকৃত মহত্ব। আমরা যখন নিজ জীবনে বা সমাজমধ্যে পাপ নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা তখন এক হয়।

রামমোহন রায় ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিলেন—১৮৩০ সালে কলিকাতা ছাড়িলেন, ইহার মধ্যে কিরূপে এত শিখিলেন, এত পড়িলেন, এত লিখিলেন! কি অসাধারণ পরিশ্রমের শক্তি ছিল! কিন্তু এই পরিশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলে কি দেখিতে পাই? ঐ দুইটি—পরোপকার-স্পৃহা ও সত্য ও সাধুতাতে বিশ্বাস। এই দুইয়ের উপরেই তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমি যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া একা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত উপকার পাইয়াছি। আমি ঈশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে অগণ্য ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাকে সমুচিত কৃপা করিয়াছেন। আমার হৃদয় সত্য ও সাধুতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছে।

প্রার্থনা।

ধন্য প্রভো, তুমিই ধন্য, আমাকে তুমি এই পথেই লইয়া যাও।

ঝোড়ো নদী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

মত্ত-পাগল তরঙ্গদল—জ্বলন্ত জল আছড়ে পড়ে;—
সর্ব্বনাশা মূর্ত্তি নদীর রূপ নিলো কি দারুণ ঝড়ে!
ফেনায় ফেনায় উঠ্‌ছে ফুটে নিষ্করুণের অট্টহাসি;—
চলন্ত এক ধ্বংস বুঝি দুই-উপকূল ফেলবে গ্রাসি'।
শান্ত নদীর অন্তরালের বক্ষ-কবাট লোপাট ক'রে
রুদ্র কি ওই বাহির হোলো রণাঙ্গনের মূর্ত্তি ধ'রে!
লাস্যেতে আর তাণ্ডবেতে কোথায় যে মিল—বলবে কেবা?
যে-নদীজল রসের ধারায় শ্যামল কূলের করলো সেবা,
ঘর-করনার ঘট ভরাতে যার জুড়ি নাই, তাহার তীরে
সর্ব্বনাশের মশাল জ্বলে; জ্বাললো কে হায় উর্ম্মী-শিরে?

(২)

জ্বাললো যে হায় বেহুঁস সে কি? চলেছে ক'রে বিশ্ব-লীলা;—
জল জমিয়ে করে তুষার, জল করে ফের হিমের শিলা।
জলের বুকে উর্ম্মী উঠায়—ফুটায় জলে ফুলের হাসি;
কূলের কানে সহজ প্রাণে বাজায় বিশ্ব-নাটের বাঁশী:—
সেই কূলে ফের ভাঙন লাগায়, কূল ধ্বসে যায় রুদ্র-তালে;—
এই খেলা তার নিত্য-লীলার থামবে না আর কোনও কালে?
ঝঞ্ঝাবাতের বিষম ঘাতে সর্ব্বনাশের মূর্ত্তি নদীর,—
'কালবৈশাখে'র বহ্নি-জ্বালা রুদ্র সে-রূপ দেখছে দু'তীর।
বৃক্ষ-শাখায় নৃত্য-তালের উন্মাদনায় তুফান জাগে;
বহ্নি-মুখে পতঙ্গবৎ অরূপ সে রূপ—অবাক্ লাগে।

(৩)

মুহূর্ত্তে মোর মনের মনে বিশ্ব-রূপের স্বরূপ দেখি;—
এতো রূপের অরূপতায় সেই নটরাজ আমিই—একী!
নিজেই নিজের ধ্বংস করাই, লীলায় বিভোর গড়াই ফিরে;
চলন্ত জল—জ্বলন্ত জল—হারাই-ছড়াই, গুড়াই তীরে।
কখন কাঁদি—কখন হাসি—লুটাই—ফুটাই—গুটাই—জুটাই;—
রুদ্র-লীলার—ক্ষুদ্র-লীলার—নিত্য-লীলার সমাপ্তি নাই।
ভয়ঙ্করের বক্ষে সাজাই শান্ত শিবের ধ্যানের আসন;
রাসের রসে চলছে কেবল অচিন্ত্য এক কি আস্বাদন!
আরম্ভহীন—সমাপ্তিহীন আত্মপ্রকাশ নিত্য-কালে—
তারই খানিক ওই দেখা যায় ঝড়ের-নদীর রুদ্র-তালে।

ধর্ম

অনুরূপা দেবী

সংস্কৃত মহাপরিষদে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলিব। আমরা 'ধর্ম্ম' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার ব্যাপক অর্থ আমরা হয় ত সকল সময় হৃদয়ঙ্গম করি না। আমরা বলি "শ্যাম আজকাল বেশ ধর্ম্মে মন দিয়াছে", "যদু খুব ধার্ম্মিক"। আবার একথাও বলি "লৌহের ধর্ম্ম কাঠিন্য", "অগ্নির ধর্ম্ম দহন", "জলের ধর্ম্ম তারল্য", "ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম হিংসা"। এই দুই শ্রেণীর কথাগুলিতে আমরা যে ধর্ম্ম শব্দটি ব্যবহার করি সর্ব্বত্র তাহার একার্থ নহে। ধর্ম্মের যে ব্যাপক অর্থ, আমরা তাহার যথার্থ মর্ম্ম সকল সময়ে গ্রহণ করি না। আমাদের শাস্ত্রে সমূহ ধর্ম্ম বলিতে কোন্ বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা দেখা যাক। বেদান্তদর্শনের প্রারম্ভিক সূত্রে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", আবার মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্রে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। ভাষ্যকার শবরস্বামী ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তর্ক তুলিয়াছেন, "ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ"। যদি ইহা প্রসিদ্ধ হয় তবে ইহা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি অপ্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেরূপ পদার্থের জিজ্ঞাসা করার সার্থকতা কি ?" সে কথা যাক, অত জটিল ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজন নাই। প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ যাহাই হউক না কেন, মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই কোন না কোন, তা সে আস্তিক্যপূর্ণই হউক বা নাস্তিকতাই হউক, ধর্ম্ম অবশ্য অবলম্বনীয়।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিতে হইলে প্রথমতঃ উক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করা প্রয়োজন। আত্মনেপদী অকর্ম্মক ধৃ ধাতুর উত্তর অথবা ধারণার্থক আদিগণীয় উভয়-পদী সকর্ম্মক ধৃ ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবস্থান করে অথবা যাহা বস্তুকে ধরিয়া রাখে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হয়। "ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহু ধর্ম্মং ধারয়তে প্রজা" বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্মের অর্থ এই ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—"ত্রীণি পদ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন।"

অহিংস্য (অমিত প্রভাব) গোপাবিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর) ধর্ম্মকে ধারণ করিবার জন্য পৃথিবী প্রভৃতি লোক-ত্রয়ে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই পদত্রয় দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। বেদ-ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্যের মতে এখানে ধর্ম্মের অর্থ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং মহীধরাচার্য্যের মতে যাবতীয় পুণ্যাদি কর্ম্মসমূহ।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা"—বিশ্বজগৎ ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত।

"ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি"—ধর্ম্মেই সর্ব্ববস্তু প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মশূন্য হইলে কাহারও বর্ত্তিয়া থাকার সামর্থ থাকে না, সেই জন্য ধর্ম্মকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সামগ্রী বলা যাইতে পারে। অতএব সকল দিক দিয়া দেখা গেল ধর্ম্ম শব্দের অর্থ প্রধানতঃ অবস্থান করা, বিদ্যমান থাকা বা ধরিয়া রাখা। যাহা যাহার গুণ বা শক্তি তাহাই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ। এদিকে শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, শব্দে স্থিত এবং শব্দে বিলীন হয় এই কথা আমরা বেদ হইতে পাই। আমরা বেদে আরও পাই ব্রহ্মই শব্দ এবং বেদই ব্রহ্ম। এই তিনটি কথাই এক পর্য্যায়ভুক্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে আছে শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু এ শব্দের অর্থ কি ? বিজ্ঞান বলে, স্পন্দন হইতে শব্দের উৎপত্তি। অনুমান হয় শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই বৈদিক বাক্যে শব্দ কথাটি স্থূল শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে শব্দ অর্থে স্পন্দন বা vibrationকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদও শব্দ একার্থক এবং শব্দই ব্রহ্ম। অতএব বলা যায় ব্রহ্মই ধর্ম্ম। জৈমিনি বলিয়াছেন ধর্ম্ম শব্দ বেদমূলক—"ধর্ম্মস্য শব্দ মূলত্বাৎ অশব্দ মনপেক্ষং স্যাৎ" এবং এই হেতুই তৈত্তিরীয় আরণ্যক নির্দ্দেশ দিয়াছেন :

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপ-সর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগতের আশ্রয় ধর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম। নির্ণয় জন্য লোকে ধাৰ্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হয়। ধর্ম্ম দ্বারা পাপ দূরীভূত হয়। ধর্ম্মহীনতায় কাহারও অবস্থিতি করার শক্তি থাকে না। ধর্ম্মই পরম পদার্থ। তবেই দেখা গেল ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম শব্দের ব্যাপক অর্থ ইংরেজী 'রিলিজন'-এর প্রতিশব্দ নহে। ধর্ম্ম এবং 'রিলিজন' এক পদার্থ হইলে বিজ্ঞান ও নীতিকে রিলিজন হইতে স্বতন্ত্র করিবার প্রয়োজন হইত না। আমা-দের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে ধর্ম্ম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

তাহার ভিতর নীতিবিজ্ঞান ত বটেই মানবের যাহা কিছু করণীয় ও আবশ্যকীয় এবং প্রকৃতির যাহা কিছু লীলা-বৈচিত্র্য, তৎসমূহই ইহার অন্তর্নিহিত অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যাহা কিছু এই বিশ্বে সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে সে সকলই ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে, অঙ্গীভূত। সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে দু'-চারিটি কথা দিয়া বক্তৃতা করা সম্ভব নয়। তবে এই ধর্ম্মের যে অংশ মানবধর্ম্ম অর্থাৎ যে সকল বিষয় মানবকে মানবরূপে ধারণ করিয়া আছে তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভারতবর্ষে যাঁহারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মায়াবিজৃম্ভিত অসৎ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন সেই মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী হইতে আরম্ভ করিয়া জড়োপাসক, ভূতোপাসক পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর উপাসক সম্প্রদায় ছিলেন, আজিও আছেন। সেজন্য প্রথমেই প্রশ্ন উঠে তবে কি মানব ধর্ম্ম এক নহে? যদি মানবধর্ম্ম এক, তবে ধর্ম্মরাজ্যে এত বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয় কেন?

এখানে আমাদের উত্তর স্বতঃই এইরূপ—মানবধর্ম্ম মূলতঃ একই বটে, যেমন মানব-প্রকৃতির মূল অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিবোধক স্থূলতঃ এক, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায় প্রত্যেক মানুষ এক হইয়াও বিভিন্ন। রুচি-বিভিন্নতা মানুষের মধ্যে অত্যন্তই স্বাভাবিক। শাস্ত্রে আছে:

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং":—

রুচির বিভিন্নতায় পথবৈচিত্র্যে কিন্তু শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীষ্টীয়-মুসলমান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার পরিদর্শক বৈদান্তিক পর্য্যন্ত সকলেই "নৃণামেকো গম্যস্তমসিপয়সামর্ণব ইব"। বৈচিত্র্যের মধ্যেও সাম্য আছে। গম্যস্থান একই। ঋজু, কুটিল সকল পথ দিয়াই নদী সেই এক মহার্ণবের সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী তীর্থপথযাত্রী। অতএব দেখিতে পাইতেছি যে, যে পথেই যাত্রারম্ভ করুক, পরিণামে একত্রই মিলিত হইবে। সেই মিলনস্থানকে ভিত্তি করিয়া যদি কোন মনীষী ধর্ম্মব্যাখ্যা এরূপে করিতে সমর্থ হন যাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হয়, তবেই তিনি বিশ্ব ধর্ম্ম-বৃক্ষের বীজবপনকারী প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইবেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব যদিচ গুহানিহিত তথাপি আবহমানকাল হইতে এই ভারতবর্ষে বহু মনীষী মহাপুরুষ এই গুহানিহিত ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার বিশ্বজনীন স্বরূপ প্রকটিত করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও যে হইতে পারেন নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, জরথুস্ত্র, মোশেস, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, কবীর, চৈতন্যদেব অনেকেই যুগে যুগে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত না হইলে যত বড় মহৎ উদ্দেশ্যই হউক, সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না।

আজ কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে যেরূপ দ্রুত ভাবে বৈষম্যের ভিতর সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে তাহাতে একই ব্রহ্মসত্তার ভিতর যে বহুরূপেই লীলা-বৈচিত্র্য রহিয়াছে ইহা সপ্রমাণ হইয়া এক বিশ্বধর্ম্মের পথ প্রদর্শিত হওয়া সুদূর বলিয়া মনে হয়। ভেদ-বৈষম্য নিতান্ত বাহিরের বস্তু। দেশকালপাত্রভেদে শুধু আচারের এবং স্বার্থের প্রভেদ মাত্র। গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। সকল মনুষ্য আমার পথই অনুবর্ত্তন করে।

তাই যীশুখ্রীষ্টও বহুদর্শী আত্মভোলা মানবকে লক্ষ্য করিয়া সখেদোক্তি করিয়াছিলেন:

"ফাদার! ফরগিভ দেম; দে নো নট হোয়াট দে ডু।"

সেই সঙ্গে পরমহংসদেবেরও একটি উক্তি স্মরণে আসে:

"পচা জলেই দল বাঁধে।"

কথা তিনটির ভাষা স্বতন্ত্র হইলেও ভাবার্থে একই। এ-স্থলে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কর্ম্মোপলক্ষ্যে পাটনায় থাকাকালে তিনি শহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী একটি আশ্রমে এক মুসলমান ফকিরের সহিত প্রায় দেখা করিতে যাইতেন। সহকর্ম্মী একজন মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে যাইতেন। ফকির সাহেব আমার পিতৃদেবের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। পিতৃদেবের বন্ধু মুসলমান ভদ্রলোকটি একদিন তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলেন, "আপনি মুসলমান ফকির হইয়া একজন বিধর্ম্মী হিন্দুকে এতটা আদর-আপ্যায়ন করেন কেন!" ইহাতে ফকির সাহেব হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "ভাই জেরা চড়করকে দেখো; সব বরাব্বর!" অর্থাৎ উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া নীচের দিকে চাহিলে আমগাছ ও আমড়াগাছের প্রভেদ আর দেখা যায় না।

ইহাই প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ। ধার্ম্মিক বলিতে সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্যকারী অখিল শাস্ত্রসমূহের তত্ত্বজ্ঞ যে কোন জাতির মহামানবকে নির্দেশ করে এবং এতাদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত ধার্ম্মিক পদবাচ্য। গতির চরম লক্ষ্য স্থিতি। যে পরিণামে জীবকে তাহার চরম লক্ষ্যে বা প্রকৃত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ, শাস্ত্র তাহাকে প্রেতি বা ঐকৃষ্ট গতি বলিয়াছেন। ত্রিতাপতপ্ত জীবকে সেই পরম অভ্যুদয় প্রগতির অভিমুখে যিনি প্রধাবিত করিতে পারেন তিনি দুঃখত্রয়াভিঘাত দ্বারা বিধ্বস্ত মানবের যথার্থ বন্ধু ও গুরু।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

কমলাকান্ত ভেবেছিল যেবা না হলে তার জীবন হয় ত মিথ্যা হয়ে যাবে। বোধ হয় নিজেকে স্থির রাখতে পারবে না, হয় ত তুষার-ঝটিকার মত শতধারে চূর্ণ করে ফেলবে নিজেকে। সুকুমারের মুখের দিকে তাকাল কমলাকান্ত। উজ্জ্বল চোখে যখন সুকুমার তার নিজের মনের কথা বলে, তখন বেশ লাগে। হায় রে ঐকান্তিকতা! কতটুকু মূল্য আছে তার! আজ যে সত্যকে আঁকড়ে আশ্রয় করে পাথেয় করে সারাজীবন চলতে চায় মানুষ, কাল সেটা কোথায় যায়? হায় রে! আকুলতা, পথ চলতে নবজীবনের স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে যে সে-তাকে কি ছাড়া যায়?

অনুপমের দল হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরের ভিতর, এই নিন টিকিট, চলুন, ট্যাক্সি এনেছি, একেবারে ষ্টেশনে পৌঁছে দিই। অনুপম সাহিত্যিক সম্মিলনের একজন পাণ্ডা।

কিন্তু দু'ঘণ্টা দেরী আছে যে ট্রেনের?

তা হোক, একটু আগে যাওয়াই ভাল কমলদা।

তৈরী হয়ে নিলে কমল, সামান্য খুঁটিনাটি জিনিসগুলো গুছিয়ে নিল একটা সুটকেশে। দরজা বন্ধ করবার সময় একবার ঘরের ভেতরটা তাকিয়ে দেখে নিলে। টিকটিকিটা হলদে পার্টিশনের কোণ থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অসম্ভব। চীৎকার করে উঠল কেট্, হানিফ গেছে ইলেকশন করতে, বয়টা সারাদিন পড়ে আছে অসুখের অজু-হাতে, আমি কি করব?

তা হলে কফিখানা থেকে কাবাব আর চাপাটি আনা যাক। সার্টের হাতা গুটোতে গুটোতে রবার্ট উত্তর দিলে।

মাঝে মাঝে এমন সিলি কথা বল যে, রাগ ধরে আমার। জলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় কেট্ স্বামীর দিকে।

না, না, তুমি রাগ করো না ডিয়ারী, আমি দেখেছি ডক্টর সমারসেট তোমার ব্লাডপ্রেসারের পক্ষে যা যা করতে মানা করেছেন, তুমি তাই করছ। থামাবার চেষ্টা করে রবার্ট।

স্ত্রীর অসুখের জন্য সম্প্রতি বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে তার। ডাক্তার সমারসেট নামজাদা চিকিৎসক। নেটিভ ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা ওরা করায় না, তাতে ওদের ইজ্জত যায়, সমাজে বদনাম হয়। ডাঃ সমারসেটের ফি, ওষুধের দাম, রক্ত-পরীক্ষার ফি ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা মোটা রকমের বিল হয়েছিল, সেকথা রবার্ট ভুলে যায় নি। স্ত্রীর অসুখের চেয়ে ডাক্তারের মোটা বিলটা অনেক ভয়াবহ। ওয়েলেসলির ট্রামটা মোড় ফিরছে, তারই অদূরে গলির ভেতর একটি দোতলা ফ্ল্যাটে রবার্ট ডগলাস থাকে।

সে অনেক দিনের কথা, তার বাবা তাকে ছোটবেলায় এই বাড়ীতে নিয়ে ঢুকেছিল। হরিধন আঢ্যের বাড়ী, পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, তিনটে ঘর, একটা লম্বা বারান্দা ও বাবুর্চিখানা আশপাশে বস্তি, বেশীর ভাগ অধিবাসীই মুসলমান। প্রতি-বেশী হিসাবে ওদের সঙ্গে ডগলাসদের বরাবরই প্রীতির সম্পর্ক আছে। বস্তীটায় দিবারাত্র কলরোল লেগে রয়েছে, সর্ব্বদাই যেন একটা হৈ-হৈ ভাব। বস্তীটায় না হয় হ'ল, কিন্তু সামনের ঐ কফিখানা! সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সমানে লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। এক দল ঢুকছে, আর এক দল বেরোচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান কেউ বাদ নেই। কুলি, মজুর, রিকসাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে বস্তীর মালিক আহম্মদ আলী পর্য্যন্ত সকলেরই অবারিত দ্বার, কারোর কোন দ্বিধা নেই, কারণ ওখানে পার্থক্য নেই, ভেদাভেদ নেই, অধিকার সকলের সমান। কফিখানাটার নাম হ'ল "সিতারা", দেওয়ালে নানা রঙের কাচের সংমিশ্রণে ইংরেজী এবং উর্দ্দুতে নামটি বেশ বড় হরফে লেখা। বারান্দা থেকে রবার্ট ওদের সব দেখতে পায়, দরজার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামনে একটা চৌকো ট্রে'র ধরণের উনুন থাকে—লোকটা চা তৈরী করে। সকাল থেকে এক নাগাড়ে রাত বারটা পর্য্যন্ত অদ্ভুত ক্ষিপ্র লোকটা। বোতামওয়ালা গেঞ্জী এবং লুঙ্গীপরা এই লোকটার পরিপাটী কাজ দেখবার মত—উপভোগ্য বলা যেতে পারে। পর পর সাজানো থাকে চায়ের কাপ আর ডিসগুলো। মোটা ধরণের, এক সময়ে রং সাদা ছিল। এখন সেটা একটু ম্লান হয়েছে। সাদা কলাই করা কেৎলিটা দেখবার মত, বিরাট বলা চলে। কেৎলার হ্যাণ্ডেলটা পুরনো

ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাঁধা। সামনের উনুনের সঙ্গে কেৎলীটার সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। ধূলি-মলিন কাপড় পরা মায়ের কোলে যেন অবাধ্য শিশুটি।

রবার্ট গুণে দেখেছে একসঙ্গে তেরো কাপ চা তৈরী করে লোকটা। প্রথমে একটা এ্যালুমিনিয়মের ছোট ডেকচি থেকে ছোট চামচ করে নির্ভুল হিসাবে চিনি দিয়ে দেয়, তার পর আর একটা বাটি থেকে দুধ, চামচ দিয়ে দুধের সরটা পিছন দিকে সরিয়ে দেয়। তার পর কেৎলী থেকে চায়ের লিকার ঢালে, লোকটার অদ্ভুত নিপুণতা, হিসাবে এতটুকু তারতম্য নেই, ক্রমাগত এই করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে একটা বিড়িতে দু'এক টান দিয়ে নিচ্ছে, নিভে গেলে সামনের উনুনের কয়লাতে ছুঁইয়ে নিয়ে আবার ধরিয়ে নেয়। খালি কাপগুলো ফেরত দিয়ে যাচ্ছে একটা ছোকরা। নীচে বসানো একটা বালতীর জলে সবটুকু ডুবিয়ে টেবিলের উপর জড়ো করে রাখছে, আর লোকটা একের পর এক চা করে চলেছে। অপর দিকে চেয়ারে বসে আছে দোকানের মালিক রমজান। এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে—সামনে একটা ছোট টেবিল, তার উপর কয়েকটা কাচের জারে কেক, বিস্কুট রাখা আছে, পাশে একটা ছোট কাচের আলমারী। ভেতরে মার্বেল পাথর দেওয়া মাঝারি ধরণের কয়েকটা টেবিল পাতা। ভেনেস্তা কাঠের হলদে রঙের চেয়ারগুলো সাজানো রয়েছে টেবিলগুলোর চতুর্দ্দিকে। টেবিলের উপর একটা করে সাদা রঙের জগ বসান। ওটার জল প্রয়োজনানুযায়ী ভোক্তার দল ব্যবহার করে। নানারকম লোকের সমাগম হয়। কত বিচিত্র তাদের পোশাক, বিভিন্ন রঙের লুঙ্গী, আচকান, সুট-পরিহিত এই জনতাকে দেখতে ভারী ভাল লাগে রবার্টের। তা ছাড়া এই কফিখানাটা সম্বন্ধে রবার্টের বেশ একটা মমতা জন্মে গেছে, কারণ অনেক দিন এই দোকানের রুটি-কাবাব খেয়েছে সে।

সেলাম সাহাব! মুখ ফিরিয়ে রবার্ট শহীদকে দেখতে পেল।

কি খবর? রবার্ট ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে নেয়, কাছাকাছি কেট্ আছে কিনা। শহীদের সঙ্গে রবার্টের বেশ প্রাণের যোগ আছে। দুজনে মিলে প্রায়ই কফিখানার ভেতরের ঘরে বসে এক-আধ বোতল খায়; কেট্ সেটা জানে। মত্ত অবস্থায় অনেকদিন স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, মাথায় জলপটি দিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি তাকে করতে হয়েছে রবার্টকে সামলাবার জন্তে। কেট্ জানে ঐ শহীদই রবার্টকে প্রলুব্ধ করে। বাস্তবিক পক্ষে শহীদের কিন্তু কোন দোষ নেই। এ অভ্যাসটা রবার্ট পেয়েছিল ম্যাকের কাছ থেকে—ইঞ্জিন ড্রাইভার ম্যাকডোনাল্ড, তাকে বেশ মনে আছে রবার্টের। অসুরের মত যেমন চেহারা তেমনি অপর্য্যাপ্ত খেতে পারত ম্যাক, আর শক্তিও ছিল তেমনি। প্রায় বলত, "রবার্ট, মাই বয়, লোহার দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে দেহে শক্তি চাই, খাও, প্রচুর খাও।" পাশেই বড় মগ ভর্ত্তি থাকত বিয়ার। কথায় কথায় চীৎকার করত আর মগে চুমুক দিত, তখন সবে রেল কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে রবার্ট ডগলাস।

বেশ ছিল তারা ব্রিটিশের আমলে, যেমন সম্মান তেমনি লোভনীয় চাকরী। আর এখন—ঠিকই বলে কেট্, ওদের স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে স্বাধীনতা পেয়ে। ব্রাউন লোকগুলো মাথায় সাদা টুপী পরে আবার যেন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের বড় মেয়ে জেনী স্বামীর সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। ছেলেটাকে ইংলণ্ডে রেখে গেছে, এখন স্বামী-স্ত্রী—রবার্ট এবং কেট্ ডগলাস এই পচা ভাঙা বাড়ীটায় পড়ে আছে।

রবার্ট!—ডাকলে কেট্।

ইয়েস, ডিয়ারী!

ও কে? শহীদ না? শহীদকে দেখতে পেয়েছে কেট্। শহীদ ততক্ষণে কফিখানার সংলগ্ন লাল কাপড় বিছান পানের দোকানে পান কেনার অজুহাতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে।

আরে! তাই ত মনে হচ্ছে। রবার্ট যেন এই প্রথম শহীদকে দেখতে পেল।

তোমার আর কতদিন ছুটি আছে। তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করল কেট্।

পরশু পর্য্যন্ত। তার পরেই ১১০কে নিয়ে মোগল-সরাই।

বুঝেছি। এবার তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

তুমি! কোথায়?

তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ঐ ট্রেনেই যাব। দৃঢ়-কণ্ঠে জবাব দেয় কেট্।

বেশ তাই হবে। আমি তা হলে পাসের ব্যবস্থা করি। রবার্ট নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। একটা সুন্দর রাত থেকে বঞ্চিত হ'ল সে। শহীদটা বোকার মত বাড়ীর কাছে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কেন? এখন আর অন্য কোন উপায় নেই—কেটের সঙ্গে হয় সিনেমা, না হয় উল কিনতে চাঁদনী—ধুত্তোর, বরাতটাই খারাপ।

রবার্টের যখন ছুটি থাকে, তখনই সে লক্ষ্য করেছে, তার মনে অবসাদ আসে, নানারকম অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিসগুলো চোখের সামনে বড় বলে মনে হয়, তখন কেটের

কথাবার্তা যেন তার কাছে অসঙ্গত আর অর্থহীন ঠেকে—হামিদের চিকেনকারী বিস্বাদ হয়ে যায়। রংচটা দেওয়াল, খয়েরী রঙের দরজাগুলো, টেবিলে রাখা উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি-শোভিত জ্যামপট, জানালায় টাঙান সড্ রঙের পর্দাগুলো, সবই তার কাছে শুধু নিরর্থক নয়, বিরক্তিকরও হয়ে পড়ে। অথচ ডিউটিতে থাকার সময় এইগুলোই তাকে হাতছানি দিত, ফেরবার তাগিদ দিত যেন। কিন্তু এত দিনে রবার্ট ভাল করে বুঝেছে যে, বাড়ীতে তার শান্তি নেই। আরাম আছে হয় ত, কিন্তু সুখ নেই। কোথা থেকে জড়তা এসে অদৃশ্য ক্ষয়রোগের মত তিলে তিলে তার মনকে পঙ্গু করে দেয়। তার সত্তাকে যেন বিলুপ্ত করে ফেলে।

ম্যাকডোনাল্ডের কথা মনে পড়ল—কি শক্তি, কি উৎসাহ! লৌহদানবকে চালাবার কৃতিত্ব যেন শক্তিমান পুরুষেরই কাজ।

ম্যাক্ ইঞ্জিনটাকে ভালবাসত—অদ্ভুত ভালবাসত, প্রায়ই বলত, "রবার্ট মাই বয়, মনে রেখ এটারও প্রাণ আছে। তোমার গার্লকে যেমন ভালবাস, ঠিক তেমনি এটাকেও ভালবাসতে হবে।" জুট আর ক্যান হাতে নিজে জার্নাল-এ্যাক্সেল গুলো পরীক্ষা করতো, হাতের তালু দিয়ে তাদের উষ্ণতা অনুভব করতো ছেলের কপালে হাত দিয়ে যেমন মায়েরা জ্বর দেখে। পিষ্টন-কভারের উপর স্নেহভরে হাত বুলোতো যেন অনেক দিন পর ফিরে আসা পরিচিত বন্ধু। রবার্টও নিখুঁত ভাবে দেখে নিত। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে বলত, "কি, ঠিক আছে ত ওল্ড গার্ল? কোন অসুবিধা নেই, কিসিং কম্‌ফারটেবল্? স্টোকার আবদুল তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসত—সাহেবের এ অভ্যাসটার কথা ও জানে।

প্রথম যেদিন রবার্ট গাড়ী চালায় সেকথা তার এখনও বেশ মনে আছে। প্রথমে ভয় পেয়েছিল, ১৩নং আপ নিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে অবশ্য ম্যাকডোনাল্ড ছিল—মনে মনে বেশ গর্ব্বিত রবার্ট, আজ সে নিজে গাড়ী চালাবে, আগেই ম্যাক বলে দিয়েছিল তার সাহায্য না নিয়েই গাড়ী চালাতে হবে, ভেবে নিতে হবে, ম্যাক যেন অনুপস্থিত।

যথারীতি সিগন্যাল ক্লিয়ার দিল এবং গার্ডের হুইসল পড়ল। রবার্ট রেগুলেটারটা ধরে নীচের দিকে চাপ দিল। ঘস্‌ঘস্ করে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরতে লাগল—স্লেমিং হচ্ছে, কি বিপদ! প্রথমেই এই। লিভারটা ঘুরিয়ে রেগুলেটারটা আবার চাপ দিলে সে, গাড়ী একটু পেছন দিকে চলল—তার পর লিভারটা ওপর দিকে ঘুরোল, চাপ দিল রেগুলেটারটায়, এইবার চলতে সুরু করল গজেন্দ্রগমনে। পিছনে বসে ম্যাক লক্ষ্য করছে, বাবা যেন দেখছে ছেলেটার প্রথম চলতে শেখা। দাঁত দিয়ে মোটা ধূমায়িত পাইপটা টিপে ধরে আছে, কালো রঙের টুপীটা কপালের উপর নামানো, হাতে মগ। দুটো ষ্টেশন বেশ চলল, লৌহদানব আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসের মত বেশ চলতে লাগল রবার্টের ইঙ্গিতে। পনি হুইলগুলো এক লাইন থেকে অপর লাইনে টাট্টু ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে নির্ভুল ভাবে অগ্রসর হতে লাগল—গর্ব্বিত হ'ল রবার্ট, আড়চোখে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তৃতীয় ষ্টেশনটা ছাড়বার কিছুক্ষণ পরে রবার্ট লক্ষ্য করল লাইনের ওপর প্রায় আধ মাইল দূরে পেছন ফিরে একটা মোষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হুইস্‌লের চেনটা ধরে টানল, তীক্ষ্ণ কর্কশ একটানা আওয়াজ, না! নিশ্চল হয়ে রয়েছে ওটা। রেগুলেটারটা কমিয়ে দিলে—ভ্যাকুয়াম ব্রেক টানা ছাড়া আর উপায় নেই। হঠাৎ তার হাতটা সজোরে কে যেন ঠেলে দিলে। পেছনে দাঁড়িয়ে ম্যাক, ফুল! করছো কি? ভ্যাকুয়াম দিলে গাড়ী উলটে যাবে যে।

কিন্তু ওটা! রবার্ট ইঙ্গিত করলে মোষটার দিকে।

এতগুলো লোকের জীবনের চেয়েও ওটার দাম বেশী নাকি?

রেগুলেটারটা বন্ধ করে ভ্যাকুয়ামটা ধীরে ধীরে টানতে লাগল ম্যাক। কর্কশ হুইস্‌লটা সমানে বেজে চলেছে। গাড়ীর গতি কমেছে বটে কিন্তু থামানো গেল না, হঠাৎ দুলে উঠল। প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন ইঞ্জিনটা টাল খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইঞ্জিন থেকে ম্যাকডোনাল্ড, রবার্ট, আবদুল, ফায়ারম্যান সকলে নেমে এল। হ্যাঁ, মহিষাসুর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল হ'ল আর একদিকে, যতবার ইঞ্জিন চালাতে যায় ততবার ইঞ্জিনের চাকাগুলো ঘুরে যায়, স্লেমিং হতে থাকে। মোষের মোটা চামড়া জড়িয়ে গেছে চাকার সঙ্গে। বেশ মনে আছে রবার্টের, প্রায় আধ ঘণ্টা লেগেছিল গাড়ীকে চালু করতে।

বাবুর্চি হামিদ ফিরেছে, কেটের গলা শোনা যাচ্ছে। উত্তেজিত গলার স্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠছে, সম্ভবতঃ হামিদকে উদ্দেশ্য করে। না, হামিদের কোন কসুর নেই। বাবুরা তাকে ছাড়ে নি, একটার বদলে সাতটা ভোট তাকে দিয়ে দিইয়েছে, সে কি করবে? অনেকে ত এই সুযোগে ব্যালট-পেপার বিক্রী করে বেশ কিছু রোজগার করেছে, সে ত তাও করেনি।

মুচকি হাসল রবার্ট, মনে মনে বললে, ভালই হয়েছে, মর এবার তোরা নিজেরা মারামারি করে, আমরা মজা দেখি। এই ত গত দাঙ্গার সময় কি সব জোড়জোড়—ছাদের ওপর ইঁটের গাদা, বোমা তৈরি, ছুরী শান্ দেওয়া, দোকান লুঠ করা সবই তার চোখের সামনে হয়েছে। তার কাছে এক

পক্ষ অপর পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে—অপরের নিষ্ঠুরতার ভূরি ভূরি জলন্ত নিদর্শন দিয়েছে। মাঝে থেকে গফুরের কাছ থেকে ২৫০ টাকায় একটা অলওয়েভ রেডিও সেট কিনেছিল রবার্ট এবং নন্দ গোয়ালার কাছ থেকে বার টাকায় সেলাইয়ের কল গস্ত করেছিল রবার্ট, পরে সে দুটো অবশ্য বৃদ্ধি করে টাটায় এবং ভাগলপুরে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

রবার্ট! ডাক দিল কেট্।

ইয়েস, ডিয়ারী।

হামিদের কথা শুনলে?

হ্যাঁ, তাই ত শুনছি।

এ যে চোরের রাজত্ব হ'ল।

তাই ত দেখছি। সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সায় দেয় রবার্ট।

পঁচিশ টাকার রেডিও কিংবা বার টাকার সেলাইয়ের কলের কথা ওদের আর মনে নেই, হাজার হোক্ অনেক দিনের কথা কিনা।

কোথায় বেরুচ্ছ? প্রশ্ন করল কেট্।

পাসের ব্যবস্থা করতে হবে ত। যেতে যেতে কৈফিয়ৎ দেয় রবার্ট।

দেখ আবার শহীদের সঙ্গে কোথায়ও জমে যেও না যেন। শেষ কথাটা বলে কেট্ যেন নিশ্চিন্ত হ'ল, ততক্ষণে কিন্তু রবার্ট বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, কথাটা কানে গেল কিনা সন্দেহ।

বারান্দা থেকে দেখতে পেল কেট্, রবার্ট জোর পায়ে মোড়টা পার হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেটের। আশ্চর্য্য লোকটা! এত বয়স হ'ল তবু এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান এল না। লোকটা শুধু ইঞ্জিন চালাতেই শিখেছে, জীবনে কিন্তু কি করে নিজেকে চালাতে হয় তা জানে না।

মনে পড়ে গেল কেটের প্রথম যৌবনের কথা। টাটায় থাকত কেট্ তার বাবার সঙ্গে। টাটা কোম্পানীর ফোর-ম্যান জেমস তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার বাবারও কোন অমত ছিল না। কেট্ও হয় ত জেমসকেই বিয়ে করে ফেলত, যদি না অকস্মাৎ রবার্ট ডগলাসের সঙ্গে আলাপ হ'ত। জেমসের সঙ্গে তুলনা করলে রবার্টকে ঠিক বিপরীত বলা যায়—রবার্ট যেন চমক লাগিয়ে দিলে তাকে, কারখানা-ফেরৎ ক্লান্ত স্বল্পভাষী জেমস, আর সদানন্দ-যৌবন চঞ্চল রবার্ট, কত তফাৎ! কেট্‌কে হাসিতে আনন্দে ডুবিয়ে দিলে রবার্ট। জেমসের ক্লান্ত-বিষণ্ণ মুখের জায়গায় এল আর একটা আনন্দোজ্জ্বল হাসিহাসি মুখ। কেটের বাবার কিন্তু আপত্তি ছিল—কোথাকার কে তার ঠিক নেই—রেল কোম্পানীতে সবেমাত্র চাকুরী পেয়েছে, আর তাকে কিনা কেট্ বিয়ে করতে চায়? জেমসের কত টাকা মাইনে, একটু ভারিক্কী বটে, তাতে ক্ষতি কি? হাসিখুশী দিয়ে ত আর পেট ভরবে না। কিন্তু কেটের কাছে রবার্টই একমাত্র পাওয়ার মত জিনিস হ'ল। টাকার কথা সে ভাবতেই পারলে না, বাবার অনুরোধ, উপরোধ, ভীতিপ্রদর্শন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করলে কেট্। এই সেই রবার্ট, ভাবতেও অবাক লাগে কেটের! কত পরিবর্ত্তন হয় মানুষের। এই ত সেদিনের কথা, এখনও সব ছবিগুলো যেন জল্‌জল্ করছে তার চোখের সামনে। কোথায় গেল সেই আকুলতা, কোথায় হারিয়ে গেল সে প্রাণচাঞ্চল্য!

মেমসাব! হামিদের গলা। জলের উপর প্রতিবিম্বটা হঠাৎ কে যেন নাড়া দিলে।

কি হয়েছে? হামিদের উপর এখনও বিরক্ত হয়ে আছে কেট্।

কোন্ হোল্ডঅল্‌টা বার করব?

বড়টা, এবার আমি শুদ্ধ সাহেবের সঙ্গে যাব।

কতদিন বাইরে থাকবেন হুজুর? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে হামিদ।

তা কি করে বলব। অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলে কেট্।

সত্যই তা বলা যায় না। যাওয়া-আসার পথের বাঁকে আচম্বিতে কে ধরে ফেলবে তা কি বলা যায়!

হুগলী জেলার একটি গ্রামে স্বামী স্বরূপানন্দ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে আশ্রমটি খুলেছিলেন, এখন সেটির অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। শ্রীশ্রীহরিহরানন্দ আশ্রম এবং স্বরূপানন্দ স্বামীকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। লম্বা দোহারা-চেহারা, রংটা পোড়া তামাটে ধরণের, দেহের কয়েক জায়গায় পুরনো ক্ষতের দাগ, কপালের কাছে একটা চিহ্ন, দেহটা বেশ মজবুত ধরণের—মাংসপেশীগুলো সতেজ এবং দৃশ্যমান। স্বামিজী এবং মোহান্তদের মালপো ও রাবড়ী-সেবাজনিত সাধারণতঃ যে রকম নাদুসনুদুস্ এবং তেল চুকচুকে চেহারা হয়, সে ধরণের চেহারা স্বামী স্বরূপানন্দের নয়। উচ্চারণের ভঙ্গী এবং কথায় বেশ খানিকটা হিন্দুস্থানী ভাব আছে। স্বামিজী বহুদিন হিমালয়ের গুহায় কালাতিপাত করেছেন, সুতরাং ভাষা বা দেহ কোনটাই অক্ষত থাকার কথা নয়।

আশ্রমের পূর্ব্বেকার গোলপাতার ঘর যেটি ছিল, উপস্থিত সেটাতে পাকা গাঁথুনি এবং টালি-বাঁধানো ছাদ করা গেছে। ভক্তসমাগমও যথেষ্ট বেড়েছে, মন্দিরে ভোগ, আরতি, পূজা,

হোম প্রায়ই লেগে আছে। বাজারের ভোলা মাড়োয়ারী, বেনেপাড়ার গোবিন্দ সাহা, গাঙ্গুলী পাড়ার সিধু গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেকেই আশ্রমের বিশিষ্ট ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। মধুর হরিনামের সঙ্গে ভক্তেরা অনেক জিনিসেরই আস্বাদ করতে পারেন—রসকলি-আঁকা অনেক কচিমুখের সন্ধানও এখানে পাওয়া যায়, সেকথা পৃষ্ঠপোষকেরা এবং অন্যান্যরা, ভক্তেরা জানেন, তা ছাড়া বিভিন্ন রকমের প্রসাদের কল্যাণে মুখ বদলানোর সুবিধাই বা কম কি? অনেক রকমের রুগীও আমদানী হচ্ছে। গনি মিঞার বড় তরফের নাতি মন্টু, কায়েতদের বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকেই যে স্বামিজীর কৃপায় নবজীবন লাভ করেছে, সেকথা দশখানা গ্রামের লোক হলফ করে বলতে পারে।

স্বামী স্বরূপানন্দ অনেক বিবেচনা করার পর এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাঁর দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার মত এখনও পর্য্যন্ত কোন কারণ ঘটেনি।

স্বামিজীর পূর্ব্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। সংসার-আশ্রমের কথা কেউ জানে না, জানা উচিতও নয়। ভক্তেরা বলেন, স্বামিজীর বয়স নাকি হ'ল দু'শ দশ বৎসর, প্রথম দর্শনে পাপী লোকের ৪০।৪৫ বছর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

মাধু! স্বামিজীর কণ্ঠস্বর মধুর।

প্রভু! উত্তর দিলে মেয়েটি। সামনাসামনি আসনে দুজনে আসীন।

বুঝলে? স্বামিজীর মুখে লাবণ্যের হাসি। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবীর ফাঁকে তাঁর লোমশ বুকের এক অংশ দেখা যাচ্ছে।

এই হ'ল প্রেম। গুরুতে কৃষ্ণ আরোপ করতে হবে, মনে মনে বিশ্বাস আনতে হবে—আমিই সেই। কথকনৃত্যের মুদ্রায় স্বামিজী মুখের কাছে হাত দুটি বাঁশী ধরার ভঙ্গী করে চোখ বন্ধ করলেন। এ অভিজ্ঞতা মাধবীর জীবনে নতুন। সামনে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ, ধূপধুনার পবিত্র গন্ধ, অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে স্বামিজীর উপস্থিতি, দুপুরের নিস্তব্ধতা সব মিলিয়ে মাধবীকে নিস্তেজ করে দিলে।

কি গো, মাধবী সখী! চিবুকে হাত দিয়ে মাধুকে আদর করলেন প্রভু।

শিউরে উঠল মাধবী—একি, সকলেই এক নাকি? তা হলে আরামবাগে দত্তদের সেজবাবু কি দোষ করলে? কলকাতার সেনসাহেবের বাড়ী ছেড়েই বা এল কেন? মায়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ল মাধবীর।

কতদিন আগেকার কথা—আরামবাগে বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী তারা থাকত—তার মা রান্না করত আর সে চুপ করে বসে থাকত, বাইরের দাওয়াতে। কখন্ মায়ের কাজ শেষ হবে, কখন্ মা তাকে ডাকবে উন্মুখ হয়ে তারই অপেক্ষায় বসে থাকত।

ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করত, আর চোখ দিয়ে জল পড়ত টপটপ করে। তখন তার কতই বা বয়স, বোধ হয় দশ-এগার হবে। দাদাবাবু কিন্তু তাকে খুব ভালবাসত। ব্রজ দাদাবাবুকে মনে পড়ল তার। লম্বা-চওড়া চেহারা, কালো রং, কিন্তু ভারী ভাল লোক। কতদিন তাকে খাবার কিনতে পয়সা দিয়েছেন, কতদিন তার জন্য গিন্নীমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, গিন্নীমা ভারী খিট্‌খিটে ছিল—ছেলে অত ভালমানুষ, মা কিন্তু ঠিক উল্টো। যেদিন মায়ের কলেরা হ'ল সেদিনটার কথাও বেশ মনে আছে। তখন রাত তিনটে হবে। ব্রজ দাদাবাবু কত চেষ্টা করেছিলেন, ডাক্তার ডাকা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—মা মারা গেল, তখন অবশ্য সে বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে।

তার পর ধাক্কা খেতে খেতে, ভাসতে ভাসতে কত জায়গায় না গিয়ে ঠেকল! আরামবাগের দত্তদের বাড়ীর কথা মনে হলে এখনও তার গা শিউরে ওঠে। প্রথম থেকেই সে লক্ষ্য করেছিল সেজবাবুর রকম সকম ভাল নয়—না হয় তোমরা বড়লোক, না হয় তোমাদের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তা বলে কি আমার লজ্জা-ঘেন্না থাকতে নেই। কত রকম ভাবে যে তাকে সামনে, পিছনে, নিজে অপর লোক দিয়ে বারবার লোভ আর ভয় দেখান হয়েছে, সেকথা এখনও সে ভোলে নি।

কিন্তু আরামবাগের সেজবাবুর চাইতে কলকাতার সেন-সাহেব আরও মারাত্মক, আরও ভয়ানক। সেনসাহেবের স্ত্রী খাটের ওপর দিনরাত্রি শুয়ে থাকত। বুকের কি যেন অসুখ, বড় বড় ডাক্তার আসত-যেত। নার্স, ঝি তাকে দেখা-শোনা করত, আর সেনসাহেবের ছেলের ভার ছিল তার ওপর। সাত বছরের ছেলে, কিন্তু তাকে যেন হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ত। ঐটুকুন ছেলে, গায়ের জোর কি, আর তেমনি দুরন্ত। সামাল সামাল করে তার সারাটা দিন কাটত, কিন্তু ছেলেটা তার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যেত না, রাতেও তাকে না হলে তার চলত না। কোলের কাছে, মাথাটা বুকের মধ্যে দিয়ে তবে ঘুমত। বেশ ছিল, সব ভুলে গিয়েছিল, দুঃখের জ্বালা বুকের মধ্যে, অপমানের বেদনা, সব ঐ দুষ্টু ছেলেটা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার যে পোড়াকপাল! যাকে আঁকড়াতে চায়, যে কুটোটা ধরে ভাসতে চায়, সেইটাই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারাজীবন হয় ত সে সেনসাহেবের বাড়ীতেই কাটিয়ে

দিতে পারত, তা ত হ'ল না, সেনসাহেব নিজেই যে বাদ সাধলেন! সেনসাহেব লাল রঙের লম্বা লম্বা ডোরাকাটা পায়জামা পরত। দাঁতগুলো বেশীর ভাগই বাঁধানো। বেশ ফর্সা দোহারা চেহারা। ঘাড় আর কানের উপরের চুলগুলো সাদা। বাপের মত তাকে ভক্তি করত, ভয় করত মাধবী। শেষকালে কিনা সেনসাহেবও! আরামবাগের মেজবাবুকে তবু চেনা যেত কিন্তু সেনসাহেবকে চেনবার উপায় ছিল না। মুখোস পরে একটা রক্তলোভী বাঘ যেন তাকে আড়াল থেকে প্রতিক্ষণ লক্ষ্য করত। সেদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ড্রয়িংরুমে যখন তাকে আচমকা জড়িয়ে ধরেছিল, তখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি, ভাবতেই পারে নি যে, সেনসাহেব নিজেই তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে। দাড়ি-গোঁফ-চাঁচা তোবড়ানো মুখটা যখন তার মুখের ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসছিল তখন মাধবীর হুঁস হয়েছিল। বেশ মনে আছে সেনসাহেবের তখনকার মুখের চেহারাটা। ঠোঁটের একদিকটা উঠে গিয়ে বাঁধানো দাঁতের একটা অংশ বেরিয়ে রয়েছে, হিংস্র জন্তুর লোভ আর নিষ্ঠুরতা মেশানো একটা বীভৎস ছবি। এখনও মনে পড়লে শিউরে ওঠে মাধবী। অন্য কোন উপায় ছিল না মাধবীর, প্রাণপণে সে সেনসাহেবের থুৎনী ধরে উলটে ফেলে দিয়েছিল। মার্বেলের মেঝেতে সটান লম্বা হয়ে সেনসাহেব পড়েছিল, আর দু'পাটি বাঁধান দাঁত মুখ থেকে খুলে ছিটকে বারান্দায় পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভয় হয়েছিল মাধবীর—লোকটা মরে গেল নাকি? তার পর বুঝেছিল, অপ্রত্যাশিত আঘাতে সেনসাহেব হতভম্ব হয়েছিল মাত্র, মারাত্মক কিছু নয়। সামান্য একজন দাসী যে কৃতার্থ না হয়ে এ ভাবে সক্রিয় প্রতিবাদ করবে, এ ধারণা হয় ত তার ছিল না। তার পর আর এক মুহূর্তও দেরী করেনি, ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে আবার অজানা পথে নেমে পড়ল সে।

ছেলেটা কার হাতে খায় কে জানে? কার বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে, দুষ্টু দামাল ছেলেটার কথা আর কেউ কি বুঝতে পারবে? অন্যায় আবদার করবে, হয় ত রাগ করে খাবে না—মাধবীর চোখ জলে ভরে উঠল।

স্বামিজী কিন্তু এত অল্পে বিচলিত হন না। অনেক রকম অভিজ্ঞতাই তাঁর আছে। তা ছাড়া স্ত্রীলোকের চোখের জল এর আগে বহুবার দেখেছেন, আর এ রকম অবস্থায় সকলেই প্রথমে একটু মিইয়ে পড়ে, পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। কলকাতা, বরানগর, কামারহাটিতে সব জায়গায়ই তিনি এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছেন।

মাধু, তুমি ভুল বুঝছ, আর তা ছাড়া তোমার এখনও সময় হয় নি। উদাসীন ভাবে বললেন স্বামিজী।

সময় হয় নি?

না।

কিসের?

ইষ্টলাভের। সময় না হলে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন হবে না! এ বড় কঠিন জিনিস—সাধনা চাই। বোঝবার দরকার নেই কিছু, শুধু আমার আজ্ঞা পালন করবে, গুরুবাক্য বেদবাক্য, বুঝলে মাধু?—বেদবাক্য।

কিন্তু আরামবাগের মেজবাবু, কলকাতার সেনসাহেব?

হাসলেন স্বামিজী—অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের হাসি, কিসে আর কিসে, তারা আর আমি? বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে তিনি নিজের বক্ষ স্পর্শ করলেন, চোখ বন্ধ করে মৃদু মৃদু দুলতে লাগলেন, নিজের সুখের জন্য তারা তোমায় চেয়েছিল মাধু। তোমার দেহের উপর তাদের লোভ ছিল—কিন্তু আমি? আমি কে? একটু চুপ করলেন স্বামিজী—মূর্খ বালিকার অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন। ধীর-মধুর কণ্ঠে আবার বললেন:

মাধু, আমি সেই, তাকিয়ে দেখ আমিই সেই। যাঁর জন্য মানুষ সব ছেড়ে দিতে পারে, যাঁর দর্শনের জন্য পৃথিবীর সব চাইতে দামী জিনিসও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না—আমিই সেই। বাঁশী ধরার মুদ্রাটি আবার নকল করলেন স্বামিজী।

কিন্তু আমি কি করব? আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলে মাধবী।

আমার আদেশ পালন করবে, তা হলেই সব হবে। আশ্বাস দেন স্বামিজী।

বাবাজী! সিধু গাঙ্গুলীর গলা।

ইস্, বুড়োটা আর সময় পেল না! বিরক্ত হলেন স্বামিজী। প্রত্যেক ব্যাপারে আহাম্মক লোকটা একটা-না-একটা ব্যাঘাত ঘটাবেই। কিন্তু উপায় নেই, সিধু গাঙ্গুলীকে হাতে রাখা দরকার। ভোলা মাড়োয়ারীর টাকার কিছুটা না পেলে ত মুশকিল, আর তা ছাড়া আশেপাশে নতুন নতুন লোকের মুখ দেখা যাচ্ছে—বেশ সন্দেহের কথা। নাঃ, অত সহজে ভয় পান না স্বামিজী, তবে সাবধানের মার নেই। স্বামিজী বেরিয়ে এলেন।

বাবাজী কি ধ্যানে বসেছিলেন নাকি? সিধু গাঙ্গুলীর ধূর্ত খ্যাঁকশিয়ালের মত মুখটায় চাপা হাসি ফুটে উঠল।

না, এই নতুন শিষ্যাকে উপদেশ দিচ্ছিলাম। স্বামিজী লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ সিধু গাঙ্গুলী নানারকম ভাবে চেষ্টা করছে ঘরের ভেতরটা দেখবার জন্য।

চল ওদিকে। স্বামিজী সিধু গাঙ্গুলীকে নিয়ে অদূরে নিমগাছের তলায় দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার ?

ব্যাপার সুবিধের নয়।

কেন ?

আপনি ঠিকই বলেছিলেন, লোকটা এ গ্রামের নয়।

তাই নাকি ? চিন্তিত হলেন স্বামিজী।

তবে একটা খবর পেয়েছি।

কি ?

বোধ হয় পুলিসের লোক ?

এ্যাঁ, সে কি ? স্বামিজী ভয় পেয়েছেন বলে মনে হ'ল।

অবশ্য সঠিক এখনও জানা যায় নি। সিধু গাঙ্গুলী স্বামিজীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করলে।

ওঃ, তাই বল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন স্বামিজী, আচ্ছা ওদিককার কি হ'ল ?

কোনদিককার • স্বামিজী ? বোসেদের বৌটার কথা বলছেন ? আড়চোখে খ্যাঁকশিয়াল স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে রইল।

না হে না, আমি ভোলা মাড়োয়ারীর কথা বলছি।

ওটি একটি রাম ঘুঘু—সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সিধু, দোষটা তোমার।

আমার ?

হ্যাঁ।

কেন, মহারাজ ? ভোলা মাড়োয়ারীকে আমি ত অনেক বার বলেছি, তবে ওর তেমন গা দেখছি না। যতই বলি ততই এড়িয়ে যায়, বলে "ও ঝুট্ বাত"। আর তা ছাড়া নোট ডবলের কথা আজকাল বড় জানাজানি হয়ে গেছে। কাগজে প্রায় লেখে কিনা।

তা হলে তোমারই লোকসান।

কথাটা ঠিক বুঝলাম না ত প্রভু!

ওটা আমি তোমার জন্যই করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। নিমগাছের মগডালটার দিকে তাকিয়ে স্বামিজী আলতো ভাবে কথাটা শেষ করলেন।

আমার জন্যে ? বলেন কি প্রভু।

হ্যাঁ, তোমার জন্যই—

সবটাই ? খ্যাঁকশিয়ালের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

হ্যাঁ, সবটাই। নির্লিপ্ত গলায় স্বামিজী উত্তর দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিধু গাঙ্গুলী। খ্যাঁকশিয়ালের মুখের ধূর্ত্ততার ছাপের সঙ্গে লোভাতুর দৃষ্টিটা একসঙ্গে মিলে গেল।

আমি ভুল বুঝেছিলাম প্রভু, আমায় ক্ষমা করবেন। ভক্তিতে সিধু গাঙ্গুলী স্বামিজীর পায়ের তলায় লুটিয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

স্বামিজীর দৃষ্টিটা নিমগাছের মগডাল থেকে নেমে অপস্রয়মান সিধু গাঙ্গুলীর শুষ্ক দেহের উপর পড়ল—স্বামিজীর কপালের তীর্য্যক ক্ষতচিহ্নটা অকস্মাৎ বেগুনী রং ধারণ করল।

মাধবী আর যুদ্ধ করেনি—করার উপায়ও ছিল না! কত দিন এড়িয়ে যাবে ? ধারাল নখ আর দাঁত নিয়ে কুকুরগুলো মাংসের আশায় ওঁৎ পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাকে পাশ কাটালে আর একটা, তার পর আর একটা, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাক। অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হতে পারবে সে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া কি অত সহজ নাকি ? আগামবাগে দত্ত-বাবুদের বাড়ী, কলকাতার সেনসাহেবের বাড়ী এবং আরও অনেক জায়গাতে নিশ্চিন্ত হতে সে বহুবারই চেয়েছে।

সে যাই হোক, ভোলা মাড়োয়ারী তার পরদিনই এসে ধর্ণা দিলে। লোভ সব মানুষেরই থাকে, ভোলা মাড়োয়ারীরও ছিল। সিধু গাঙ্গুলীর ধূর্ত্ততা আর মাড়োয়ারীর ব্যবসা-বুদ্ধি দুটোই ভোঁতা হয়ে গেল লোভের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। আশ্রমে এসে ভোলা মাড়োয়ারী খবর পেল ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন, দেখা হবে না। এর পূর্ব্বে ভোলা মাড়োয়ারী যতবার স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে এসেছিল কোনবার নিরাশ হয় নি। অসময়ে স্বামিজীর ধ্যানমগ্ন অবস্থা তার চাঞ্চল্য বাড়িয়ে দিলে।

কেন দেখা হবে না ? কি মুশকিল, প্রত্যেকবার দেখা হয়, এবার দেখা না হবার কারণ কি ? আশ্রমে ভোলা মাড়োয়ারীর দান ত কিছু কম নেই।

আমার নাম করে গিয়ে বল, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। দূত আবার ফিরে এল, না দেখা হবে না। ভোলা মাড়োয়ারী প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কি ? যদি না দেখা হয় তা হলে ? শ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে এল।

ক্রমশঃ

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

এদেশের মেয়েরা কি অসম্ভব খাটতে পারে! রান্না-বান্না ত করেই, তার উপর বাসন মাজা, ঘর মোছা, ছেলে মানুষ করা সব আছে। শনি-রবিতে একটু বেড়াবার ছুটি, সোমবার সকালে আবার পর্ব্বতপ্রমাণ কাপড় কাচা, কারণ ধোপার পাট প্রায় কারুর নেই। কাপড় কেচে শুকোতে দিলেই হ'ল না, সমস্ত কাপড় আবার ইস্ত্রী করে চক্‌চকে করতে হবে! ঘর ঝাড়া-মোছাও সেই রকম, কোথাও এককণা ধূলো বা কালি থাকবে না, এমন কি ঘরের ভিতরে পালিত ছোট লতাগাছটির প্রতিটি পাতাও রেশমের মত মসৃণ করে মাজা। মাচার উপর তুলে-রাখা বাসন-কোশন হঠাৎ অতিথি-সমাগমে নামিয়ে দেখবে এককণা ধূলো নেই তাতে। আমাদের প্রতিবেশিনী এক মহিলাকে দেখতাম কাঠের মেঝের কোথায় একটু তেলের দাগ পড়েছে, কোথায় কার্পেটের পাশে দৃশ্যমান কাঠটুকুর মোম-পালিশ হাল্কা হয়ে গিয়েছে, কোন্ পর্দাটার ইস্ত্রী ভাল হয় নি—সব দিকে তাঁর নজর আছে। নিজের ঘর ত আয়নার মত চক্‌চকে, আমাদেরও এ কাজে তিনি সাহায্য করতেন। ঘরের দেওয়ালও অতিথি-অভ্যাগত আসবার আগে সব পরিষ্কার করা দরকার। ভাগ্যে চূণকামের দেওয়াল নয়, তাই জল-ন্যাকড়া দিয়েই পরিষ্কার করা যায় এবং মেয়েরা নিজেরাই করে দেন। অনেক মেয়ে বৎসরান্তে স্বামীর সাহায্যে ঘর রংও করে ফেলেন। আমরা বাড়ী ছেড়ে চলে আসবার সময় আমাদের বাড়ীওয়ালী পাছে আমাদের গৃহ-মার্জ্জনায় কোন ত্রুটি আবিষ্কার করেন তাই আমাদের এই প্রতিবেশিনী রাত জেগে আমাদের রান্নাঘরের দেওয়াল, পর্দা, ষ্টোভ সব মেজে-ঘসে চক্‌চকে করে দিয়েছিলেন। কারণ এই ঘরটা শেষ করার সময় আমাদের ছিল না। বাজার করা মেয়েদেরই কাজ, অনেকেরই গাড়ী আছে তাই রক্ষে, গাড়ী করে বয়ে আনে বাড়ীতে, যার গাড়ী নেই তাকে হাতে করেই বয়ে আনতে হয়।

এখানে ছোট-বড় অনেক বেচা-কেনাই দরকার হলে চেক কেটে করা যায়! এখানে স্কুল-কলেজেও চেক ভাঙানো সহজ। মানুষকে এরা যতটা বিশ্বাস করে আমরা তা করি না, তাই আমাদের দেশে এ সব ক্ষেত্রে চেক অচল। আমরা পাঁচজনেই নিজের নিজের নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার ব্যবস্থা করলাম, যদিও টাকা বলতে তখন কিছুই নেই কয়েক দিন পরেই আমার নামে নিজস্ব নাম-ছাপা চেক-বই এল। হাতের সই ছাড়াও উপরে নাম ছাপা থাকবে। সব দেশের মত এখানেও ব্যাঙ্কে কিছু কিছু মেয়েরা কাজ করে। তবে ব্যাঙ্কটা ছোট বলে বোধ হয় তারা সংখ্যায় বেশী নয়। নিউ-ইয়র্কের 'চেস' ব্যাঙ্কে দেখেছি যত না পুরুষ তার চেয়ে বেশী মেয়ে কাজ করছে। অবশ্য বড় বড় কাজ পুরুষদেরই। সেণ্টপলের এই ছোট ব্যাঙ্কটিতে ভারতীয় মেয়ের আনাগোনা বোধ হয় ইতিপূর্বে হয় নি। তাই অকস্মাৎ চারজন ভারতীয়াকে দেখে তারা কাজের মুখোস খুলে বারে বারে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে আমাদের দিকে তাকাত। পৃথিবীর এই অংশটায় আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও যে কত নূতন তা সর্ব্বত্রই মানুষের দৃষ্টি দেখে বোঝা যেত। আমরা ঐ শহরে দশ মাসের বেশী থেকেও আর তিনটি মাত্র ভারতীয় মেয়ের সন্ধান পেয়েছিলাম।

অনেক ছোট ছেলে-মেয়েরা বেশ মজার কথা বলত। কলেজ খোলার পর একদিন আমার দ্বিতীয়া কন্যা আমাদের জন্য কলেজপাড়ায় এক জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। অকস্মাৎ সাইক্‌ল্ চড়ে দুটি ছোট ছেলে তার সঙ্গে ভাব করতে এল। তারা বলল, "তুমি কি পরেছ ওটা? কম্বল?" কন্যা বললেন, "না।" ছেলে দুটি বললে, "তবে কি?" "এটা একটা শাড়ী"। শুনে তারা, "কি? কি?" করে উঠল। এ নামটা তাদের পরিচিত নয়। তার পর বলল, "বাজারপাড়ায় যাও, গিয়ে ভদ্র একটা পোষাক কিনে আন, নইলে মোটেই আরাম পাবে না।" কন্যা বললেন, "না, এতেই বেশ আরাম পাব।" ছেলেটি বলল, "বাজি রাখবে?" কন্যা বললেন, "তা রাখতে পার।" এইবার ছেলেটি একটু ভড়কে গিয়ে বললে, "তুমি কি চীনাম্যান?" কন্যা বললেন, "না, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।" "রিয়াল ইণ্ডিয়া?" বলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেই তারা নূতন পন্থা ধরল, বললে "তোমাকে র‍্যাটল স্নেক, কুকুর বাঘ কত কি তাড়া করতে পারে জান?" আমরা ঠিক সেই সময় দূর থেকে আসছিলাম। আমাদের দেখেই তারা, "ওরে, আরো চীনাম্যান আসছে রে, বলে সাইকলে চড়ে দৌড় দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়াটি অনেকখানি জমি জুড়ে। তার আশেপাশেই অনেক প্রফেসরের ছোট ছোট বাড়ী, অনেকে আবার দূরেও থাকেন। এই পাড়ার মধ্যেই ছেলেদের ডর্ম্মিটারী ও মেয়েদের ডর্ম্মিটারি, তা ছাড়া লাইব্রেরী ও নানা বিভাগের নানা ক্লাসের বাড়ী। গীর্জ্জার মত দেখতে একটা আপিস বাড়ী; কাছেই ডাকঘর ও কো-অপারেটিভের দোকান নিজস্ব আছে। খেলাধূলা, থিয়েটার, নাচ-গান সবের বাড়ী আছে, কলা বিভাগের প্রকাণ্ড সুদৃশ্য, সুসজ্জিত বাড়ী। তাতে মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের প্রদর্শনী হয়, কখনও বা বাইরের শিল্পীর প্রদর্শনীও করা হয়। যদিও আমেরিকার শিল্পের জন্য খ্যাতি নেই, অর্থাৎ শিল্পী-শ্রেষ্ঠরা এদেশে কেউ জন্মান নি, তবু এ দেশে নানা রকম উচ্চাঙ্গের শিল্পের ও কারুশিল্পের চর্চ্চা দেখেছি যা দেখে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। অনেকের সাধনা আছে বোঝা যায়।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক। সাংসারিক কাজ, ব্যায়াম, সাঁতার, নার্সিং, নাট্যকলা, গান, বাজনা চিত্রাঙ্কণ থেকে সুরু করে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস কিছু বাদ যায় না। আমার ছোট মেয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁকে সেখানেই ভর্ত্তি করা হ'ল। যদিও মাত্র এক বৎসরে তার পড়া শেষ করা সম্ভব হ'ল না। দ্বিতীয় কন্যা ইউরোপীয় ভাষা ও সাংবাদিকতা পড়ায় ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমিও একটা ছোটখাট কাজের নাম করেই ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। তাই আমাকে ইংরেজী সাহিত্য বিভাগের কর্ণধারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ'ল। শান্ত-শিষ্ট বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক নিজেই ঘরের দরজা খুলে আমাদের বসালেন। ভারতবর্ষ, সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনেক কথা বললেন। ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করে দুটির মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য ও কোথায় পার্থক্য বোঝাতে আমাকে অনুরোধ করলেন। ওঁদের লাইব্রেরীতে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক কি বই আছে আমাকে খোঁজ নিয়ে জানানো হবে শুনলাম। পরে জেনেছিলাম খুব বেশী নেই। আমি নিজে খুঁজে খুঁজে রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা এই তিনটি পেয়েছিলাম। এ ছাড়া কয়েকটি বই ছিল যাতে বেদ, বুদ্ধচরিত, কোরাণ, নল-দময়ন্তী ইত্যাদির আংশিক অনুবাদ পাওয়া যায়। বাকী ভারতীয় বই মানেই আমেরিকান বা ইংরেজের লিখিত ভারতবর্ষের নিন্দাপ্রধান সমালোচনা। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমেরিকাতেই লেখক-খ্যাতি পান, তাই তাঁর অনেক বই লাইব্রেরীতে দেখা গেল। যতদূর মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী প্রবন্ধ ও অনূদিত নাটক কয়েকটি দেখেছি। শ্রীযুক্ত নেহরু এবং শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের দুই-একটি নামকরা বই আছে।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলেজের ক্লাশ বসে। ভোর বেলা উঠেই খাবার করার পালা সুরু হ'ল তখন থেকে, কারণ ৭টা বাজতেই চারজন কলেজে দৌড়বেন। আমি বাড়ীতে একলা, কাজকর্ম্ম ত আছেই তার উপর দরজা খোলা বার বার। সুতরাং সকালের খাবার মানে দুধ-ডিম-রুটি। শীতের দেশে উঠতে বেলা হয়ে যায়, কাজেই মেয়েরা অধিকাংশ দিন দুধ খেয়েই দৌড় দিত। কলেজের আমেরিকান মেয়েদের কাছে গল্প শুনেছি তারাও অনেকে এক পেয়ালা দুধ খেয়ে দৌড় দিত। মাঝে মাঝে দুই একজন অন্য মেয়ে দুপুরে এসে আমাদের বাড়ীতে খেতে বসে যেত।

আমার বড় মেয়ের এম, এড-এর ক্লাশ সারাদিন, তাই তাকে দুপুরে কলেজের ক্যান্টিনে খেতে হ'ত। সেখানে দামের তুলনায় বেশ ভাল খাবার দেয়। যে সব ছেলে-মেয়েরা অতটা খরচ করতে চায় না, তারা বাড়ী থেকে স্যাণ্ডউইচ আনত। মেকালেষ্টার কলেজ অন্যান্য কলেজের চেয়ে উদার। এই মেকালেষ্টার কলেজ হ্যামলিন কলেজ থেকে দূরে। এখানে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে একজন চীনা ছেলে ও একজন লাইবিরিয়ার (আফ্রিকা) মেয়ে পড়ছে। সাদা ছেলেমেয়ে ত ছিলই। ধর্ম্ম, ইতিহাস, শিক্ষা নানা বিষয়ে ক্লাশ এ বিভাগে হয়। একজন প্রফেসার ইরাণের লোক, তাঁর স্ত্রী আমেরিকান। একজন চীনা প্রফেসারও কলেজে পড়াতেন, তবে তাঁর পড়ানোর বিষয় আলাদা।

হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয় মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের। কলেজে ছেলে-মেয়ে অনেক। সংখ্যায় ছেলের চেয়ে মেয়ে বেশী, দেখতে শুনতে ও ধরন-ধারণে মেয়েরাই ভাল। ১৭।১৮ থেকে ২২।২৩ পর্য্যন্ত বয়সের মেয়েরা ছাত্রী। নার্সিং বিভাগে আরও বড় মেয়েও আছে। কিছু কিছু ছাত্রী বিবাহিতা। বেশীর ভাগ শিক্ষক পুরুষ, তবে মহিলা অধ্যাপিকাও আছেন। ২৬।২৭ থেকে ষাট পর্য্যন্ত বয়স। অধ্যাপকদের মধ্যে অবিবাহিত প্রায় দেখা যায় না, অধ্যাপিকা কেউ কেউ অবিবাহিতা। আজকাল ত আমেরিকা বাল্যবিবাহের দেশ বলা যায়। কলেজ থেকে বেরোতে না বেরোতেই ছেলেদের বিবাহ হয়ে যায়। অনেক ছেলে-মেয়ে ১৭।১৮-তেই বিবাহ করে। আমরা ওখানে থাকতে এক জার্ম্মান প্রফেসারের একটি ১৬ বছরের সুন্দর ছেলে দেখেছিলাম।

দেশে ফিরে এসে খবর পেলাম তার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। গত ডিসেম্বরে খবর পেয়েছি সেই বালকটি এখন ৩।৪টি শিশুর পিতা। দুটি যমজ এবং দুটি আলাদা। যে সব ছেলেমেয়েরা কলেজ পর্য্যন্ত পড়ে তাদের বর-কন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রও এই কলেজেই। ছেলে-মেয়েদের পূর্ব্ব-রাগের পালায় মাঝে মাঝে সমস্যাও দেখা দেয়। তবে বাইরের থেকে এক্ষেত্রে যতখানি বিশৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয়, কাছে গেলে ঠিক ততখানি লাগে না। বিবাহার্থীদের আর্থিক সমস্যা এ দেশে বড় সমস্যা নয় এবং জাত, কুল বা বংশ-মর্য্যাদা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না, কাজেই ছেলে-মেয়েদের এই পূর্ব্বরাগের পালা অল্পদিনেই বিবাহ ও ঘর-সংসারের বন্ধনে নূতন রূপ ধারণ করে। স্কুল-কলেজের দিনের হৈ-হুল্লোড় বেশী দিন চলে না। সুরু হয় বাজার করা, রান্না করা, আর ছেলে মানুষ করার পালা। এসব কাজে সহায় কেউ থাকে না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই সব করে। নিতান্ত কোন অসুবিধা থাকলে অল্পদিন বাপ-মার সংসারে এরা থাকে, কিন্তু সে খুব কম ছেলে-মেয়েই করে।

গোড়ার দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ক্যামেরা নিয়ে প্রায়ই এসে হাজির হ'ত। ভারতবর্ষ বিষয়ে অর্থাৎ দারিদ্র্য, over-population, গান্ধী, এই সব নিয়েই তারা কথা পাড়ে। বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের নাম অনেকেই জানে না। হিন্দী বলে যে একটা ভাষা আছে তা শুনেছে। একজন বললেন, মডার্ণ রিভিয়্যুয়ের নাম শুনেছেন। এঁরা Golden Book of Tagore অথবা বেনারসী শাড়ী হাতে করে আমাদের ছবি তুলতে চান। আমরা অবশ্য শাড়ীর চেয়ে বইটাই পছন্দ করলাম। খবরের কাগজের ছবি বেরোবার পর অচেনা অনেকে রাস্তায় আমাদের পাকড়ে বলত, "তোমাদের ছবি দেখেছি।" কেউ বলত, "It did not do justice to the original!" মানুষ খুশী হবে মনে করেই হয়ত বলত। অথবা এই সূত্রে আলাপ জমাবার ইচ্ছা ছিল।

দুই-একজন অধ্যাপক সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন হ্যামলিনের ইতি-হাসের অধ্যাপক। একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল তাঁর, সেও সঙ্গে আসত। ভদ্রলোক ক্যানাডার মানুষ, তাঁর স্ত্রী স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। ভদ্রমহিলা দেখলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। তাই শাড়ী ছেড়ে ফ্রক পরার তিনি বিরোধী। বললেন, "আমি আর আমার মা ত এক সময় গোড়ালি পর্য্যন্ত পোষাক পরতাম, তা একটু তুলে ধরে চলতে হ'ত। সুতরাং একটু তুলে ধরে যদি মেয়েরা চলে তাতে ক্ষতি কি? বরফের মধ্যেও তা করা যায়।"

ভদ্রমহিলা এক বিষয়ে আমার মত, মাটির তলায় টিউব রেলে যাওয়া ভালবাসেন না, তিনি পৃথিবীর উপরে বেড়াতেই চান।

অধ্যাপক মহাশয়ের চেয়ে তাঁর স্ত্রীর কথাবার্ত্তার বাঁধন অনেক বেশী। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে বেফাঁস কথা বলে ফেললে তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি সামলে নিতেন। সর্ব্বদা দেখতেন যেন আমরা কিছু মনে না করি। অধ্যাপক যদিও ঐতিহাসিক তবু রামায়ণ মহাভারতের নাম শোনেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন, তবে শান্তিনিকেতনের কথা জানেন না। এক সময় আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অত খ্যাতি হয়েছিল, কিন্তু আমরা যখন গেলাম তখন দেখলাম অতি অল্প লোকেই তাঁর নাম জানে। অধ্যাপকটি বল-ছিলেন যে, তাঁদের দেশের ছেলেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে নামলে মানুষের খ্যাতি সহজে হয়, তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম অধ্যাপক মহাশয় না জানলেও শ্যামাপ্রসাদের নাম জানেন বোঝা গেল।

আমরা মনে করতাম মিনেসোটাতে ভারতবর্ষীয় ছেলেরা বিশেষ যায় না। কিন্তু আমরা ওখানে পৌঁছবার দিন কুড়ি পরেই চার-পাঁচ জন ভারতীয় ছেলে এসে আমাদের বাড়ী হাজির। মারাঠি, পাঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশী ইত্যাদি। ওখানে একটা Indo American association করেছে। এই সব ছেলেরা একলা থাকে বলে এদের খাওয়া খরচ খুব বেশী। ক্যাফেটেরিয়া থেকে কিনে খেতে ওদের দৈনিক দুই ডলার খরচ পড়ে যায়। আমরা বাড়ীতে রান্না করতাম বলে আমাদের বোধ হয় আড়াই ডলারের মধ্যে সকলের খাওয়া হয়ে যেত, তদুপরি আতিথ্যও এরই মধ্যেই হ'ত। ভারতীয় ছেলেরা ১৫ থেকে ২৫ পর্য্যন্ত ঘর ভাড়া দিত। ভায়োলেট দাস বলে একটি ভারতীয় ক্রীশ্চান মেয়ে এবং মাসুদা খাঁ এবং রোজ নাম্নী দুইটি মুসলমান মেয়ে তখন ওখানে ছাত্রী ছিল। ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ওখানে গান্ধীজীর জন্মদিন ও স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদির অনুষ্ঠান করত। এবারকার অনুষ্ঠানে ছেলেরা আমাদের নিমন্ত্রণ করল এবং ডাঃ নাগকে কিছু বলতে বলল।

সেণ্টপল ও মিনিয়াপলিস দুটি জোড়া শহর, লোকে যমজ শহর বলে। মিনিয়াপলিসে এখানকার বড় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার বিদেশী ছাত্রদের পরামর্শদাতা ডাঃ মেনার্ড পাশিগ একদিন সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী বেড়াতে এলেন, ইনি আইন বিভাগের ডীন। এঁরা গান্ধীদিবসে আমাদের খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। এঁদের ছেলে ভারতবর্ষে বেনারস হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছিল। সেখানে তার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে।

গান্ধী দিবসে পাশিগরাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছাত্রদের বসবার ঘরে বিরাট ষ্টেজ এবং অনেক বসবার আসন। আমাদের দেশের বড় বড় রঙ্গমঞ্চে এ রকম নেই। এই বাড়ীরই উপরে campus ক্লাব, ক্লাবের রেস্তোরাঁ প্রভৃতি আছে। এই রেস্তোরাঁতেই আমাদের ডিনার দেওয়া হ'ল। সাদা পোষাক ও লাল টাইপরা ছেলেরা পরিবেশন করছিল। পাশিগ বললেন, "এরা আইন পড়ে অনেকে। এই ভাবে ওদের কিছু রোজগার হয়।" গান্ধী দিবসে ডিনার খেতে দেওয়া হ'ল অর্দ্ধ সিদ্ধ গরুর মাংস ইত্যাদি। ছুরি দিলেই রক্ত বেরিয়ে আসে। আমি তাহা না খাওয়াতে অধ্যাপক পত্নী বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, ছেলেটি ফিস ফিস করে তার বাবাকে ব্যাপারটা বলে দিলে মনে হ'ল। আমরা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের লোক পাসিগরা ভাল করে জানতেন না। কথা প্রসঙ্গে আমার কন্যা রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কথা বলাতে পাশিগ পুত্র হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম বটে যে বাঙালীদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তারা সর্ব্বদাই নিজেদের শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কার করে।" আর একজন আমেরিকান বক্তাও আমাদের সঙ্গে খেলেন। সেই ভদ্রলোক গান্ধী ও নেহরুর তুলনামূলক সমালোচনা তুললেন, গান্ধী অবতার কি না এ প্রসঙ্গও তুললেন। আমরা অবশ্য বললাম যে আমরা গান্ধীকে মানুষই বলি। তবে তিনি মহামানব। গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য্য পালন বিষয়ে বক্তাটি এমনই বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে,শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। এই ব্যক্তি একজন লেখক। একজন আমেরিকান বললেন, 'আমাদের দেশের লোকেরা ভারতবর্ষের শিখদের মত। ওদেরই মত পরিশ্রমী এবং কলকব্জা বোঝে, কিন্তু অন্য বিষয়ে বুদ্ধি কম এবং শিষ্টাচার জানে না।" সেই বক্তাও বললেন, "হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমাদের দেশের অন্য লোকের মধ্যে শিষ্টাচার (manners) দেখা যায় না।"

শুনলাম সেই লেখক বক্তাটি গান্ধীজীর নামে একটা গল্প রচনা করতে চান। খাবার টেবলে আরও নানা গল্পের পর আসল সভা বসল। সেখানে অনেক পাকিস্থানী ও ভারতবর্ষীয় দেখলাম। তার মধ্যে তিন-চারজন বাংলা বলছিলেন। বক্তাদের মধ্যে অধ্যাপক পাশিগ অল্প কথায় সুন্দর বললেন :—নানা ধর্ম্মের লোকে নানা লোককে সেণ্ট বলে। কিন্তু গান্ধীজীকে তাঁর শান্তির ও অহিংসার বাণীর জন্য এবং সকল ধর্ম্মেই তাঁর পরমত সহিষ্ণুতার জন্য সেণ্ট বলা উচিত। আমেরিকানদের বিশেষ করে তাঁর কথা মনে করা দরকার। কারণ তারা পরমতসহিষ্ণু মোটেই নয়। অধ্যাপক পাশিগের এই কথাগুলি মনে পড়ে।

গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি গীর্জাতে প্রার্থনা-সভাও হয়েছিল। সেখানে একজন হিন্দু ছাত্র গীতা পড়লেন, কুমারী মাসুদা কোরাণ পড়লেন, অধ্যাপক আশ্মাজানী (ইরানের) বাইবল পড়লেন এবং আমার কন্যারা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি করল। আমার এক কন্যা তার ইংরেজী অনুবাদটি পড়ল। "Lead kindly light" গানটি তাঁর প্রিয় ছিল বলাতে ওখানের কয়েকজন গানটি করলেন। অনুষ্ঠানটি ভারতীয়দের চেষ্টাতেই হয়েছিল।

এখানের পথেঘাটে ছোট ছেলে-মেয়েরা যদিও প্রথম প্রথম অনেকে আমাদের 'চাইনী', 'চীনাম্যান' ইত্যাদি বলত, কেউ বা খেলবার গাড়ী দিয়ে রাস্তা আটকে আমাদের পথ বন্ধ করবার চেষ্টা করত, কিন্তু দোকানপাটে বিক্রেতারা আমাদের সঙ্গে খুব ভদ্রতা করত। আমরা যা কিনতাম তার উপরেও কিছু কিছু খাদ্য-উপহার বিক্রেতাদের কাছে পেতাম। রাস্তার ঐ ছেলেমেয়েগুলিও মাঝে মাঝে আমার মেয়েদের কথা শুনে বলত, "এরা ভারী ভাল (nice) 'চাইনাজ'।"

ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয় সস্ত্রীক আমাদের মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। এখানে মিসিসিপি নদীর ধার দিয়ে সুন্দর রাস্তা, তার নাম মিস রিভার এভিনিউ। নদীতে জাহাজ চলছে, দুধারে জলের কাছ পর্য্যন্ত গাছে ভর্ত্তি। ওরা নদীর গতি এলোমেলো হয়ে বালির চড়া পড়তে দেয় না বলে বোধ হয় এইভাবে গাছ দিয়ে দেয়। আমাদের দেশের নদীর ধারে এরকম ঘন গাছ কখনও দেখি নি। যেখানে বড় বড় পাথর সেখানেও গাছ। এই শহরে মোটরগাড়ী তৈরির কারখানা আছে। তার কাজে লাগছে বলে এক জায়গায় নদীর জল বেঁধে হ্রদের মত করেছে, সেখানেই একটা পাওয়ার-হাউস। এখানে গাড়ীর সব ভিন্ন ভিন্ন অংশ কলের সাহায্যে একত্রে জোড়া হয়, তার পর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ গাড়ী ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। ভীষণ বড় ট্রাক্টরের কারখানাও দেখলাম। এর কাছেই নদীর বালি দিয়ে মোটরের কাচ তৈরি হয়।

সেণ্টপল শহরের চেয়ে মিনিয়াপোলিস অনেক বড়। এখানে বড় ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, পাবলিশিং হাউস, আট-দশ-বারো তলা বাড়ী অনেক আছে। সেণ্ট ক্যাথারিন কলেজ বলে ক্যাথলিকদের একটা মেয়েদের কলেজ বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে। সন্ন্যাসিনীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদেশের অধিকাংশ মেয়ে যদিও ছেলেদের সঙ্গে এক

কলেজেই পড়ে। তবু এরকম আলাদা মেয়েদের কলেজও বেশ চলে। সেণ্টপলে নিগ্রো বেশী দেখা যায় না, এই শহরটায় কিছু দেখলাম। এখানে ওদের প্রতি খারাপ ব্যবহার বেশী হয় না, তবে দক্ষিণ প্রদেশে খুব হয়। নিগ্রোরা গান-বাজনায় খুব ভাল, পড়াশুনা তত পারে না। আদত আফ্রিকার অনেক ছেলে এখানে পড়তে এসে ভাল ডাক্তার ও আইনজীবী প্রভৃতি হয় শুনেছি।

আমরা যেদিন সেণ্টপল পৌঁছাই সেদিন ডাঃ টার্ক আমাদের হোটেলে খাইয়েছিলেন। তার পর একদিন তাঁর নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের দুই কন্যা, দুটিই বিবাহিতা, বড়টি তখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী ছিল। তারা মার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এল—নাম জর্জ্জ আর জুডি। বাচ্চা দুটি খুব ভদ্র এবং কায়দা-দুরস্ত ভাবে কথা বলছিল। সেণ্টপলের "হিল ফাউণ্ডেশন" থেকে ডাঃ নাগকে ও-দেশে নিমন্ত্রণ করেছিল, তাই সেদিন তাদের পরামর্শদাতা হেকম্যানকেও সস্ত্রীক ডিনারে ডাকা হয়েছিল। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর চেহারা ইউরোপীয়ানদের মত নয়। আমি ত মনে করেছিলাম অন্যদেশীয়, পরে কথা শুনে বুঝলাম ওঁরা আমেরিকান। ডাঃ টার্কের খাবার ঘর খুব রূপার বাসনে সাজানো, তাঁর মার আমলের বাসনে ১৮৯৩ সাল খোদাই করা, কলেজের ছবি আঁকা প্লেট। সচরাচর আমেরিকান বাড়ীতে বাড়ীর মেয়েরাই সব খাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মিসেস টার্ক কলেজের প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, তা ছাড়া তাঁর শরীর অসুস্থ। তাই পরিবেশন, রন্ধন ইত্যাদি দুজন স্ত্রীলোককে দিয়ে করানো হ'ল। গৃহকর্ত্তা সিগারেট পর্য্যন্ত খান না। ডিনারের আরম্ভে জল এবং শেষে কফি ছাড়া আর কোনও পানীয় ছিল না। খাদ্য প্রচুর, আমাদের সাধ্য নেই যে, অত খাই। গৃহিণী বললেন, "আমাদের দেশে যে সব খাবারের আদর আমি সেই সব করেছি।" সুখাদ্য খুবই। ডাঃ টার্কের নাতনির ঘুমোবার সময় হওয়াতে সে হঠাৎ শোবার ঘর থেকে দৌড়ে এসে দাদামশায়কে চুম্বন করে বিদায় নিয়ে গেল। নাতিটি আরও ছোট, কিন্তু সে গম্ভীর ভাবে অনেক গল্প করল। পরে নিজের দিদিমাকে বলেছিল, "Dr Nag is England।" ইংরেজকে সে ইংল্যাণ্ড বলত।

ওদেশে বড় লোকের স্ত্রীরাও চাকরী করেন। মিসেস হেকম্যান কার্পাস, রেশম, পশম এবং নানা রকম আর্টিফিশিয়াল কাপড় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি একটা বড় দোকানে এই বিষয়ের কাজ করেন। কত রকম নকল সুতার কাপড় আছে এবং তা ব্যবহার করার সুবিধা এবং অসুবিধা কি, তা তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কোনো কাপড় ইস্ত্রী করতে গেলেই উড়ে পুড়ে যায়, কোনটা শীত নিবারণ করে না ইত্যাদি নানা জিনিস আছে। আমাদের দেশে কত রকম কাপড় আছে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ঢাকাই কাপড় দেখে খুব প্রশংসা করলেন, তবে শীতপ্রধান দেশে ও কাপড় চলে না।

ডাঃ টার্কের বাড়ীতে নানা দেশের ছাত্রদের দেওয়া উপহার এবং তাদের হাতের লেখা আছে। একটা উর্দ্দু হস্তাক্ষরে 'ইণ্ডিয়া' মার্কা করা আছে, সম্ভবত মুসলমান ছেলের লেখা ; দেবনাগরী থাকলে ভাল হ'ত।

টেলিভিশন অফিস থেকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে টেলিফোনে ডাক আসত। আমাকে বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি দেখাতে অনুরোধ করত। বার বার বলাতে আমি মেয়েদের কয়েকবার পাঠিয়েছিলাম। সেখানে তাদের পরিচয়ের আদি-অন্ত বলান হতো এবং গান করানো, শাড়ী ও খেলনা ইত্যাদির ছবি দেখানো প্রভৃতি অনেক কিছু হ'ত। হিন্দু কোড বিল, ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ মেমসাহেব, ভারতীয় পাক-প্রণালী বিবাহ ও পূর্ব্বরাগ ইত্যাদি নানা বিষয়ের জগাখিচুড়ী প্রশ্নোত্তর করিয়ে তবে মুক্তি দিত।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাতানব্বই বৎসর পূর্ব্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আজকের দিনে এক শিশু জন্মেছিলেন। অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। পিতাও তাঁর এক মহাপুরুষ। তবু কে সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিল সেই শিশু একদিন সমস্ত জগতে আলোড়ন আনবে? সেদিনকার সেই নবজাতকের কণ্ঠস্বর শুনে কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, এই কণ্ঠ একদিন বিশ্ববাসীর কণ্ঠে মধুবর্ষণ করবে। এই কণ্ঠের গানের ঝরণাধারায় অবগাহন করে সমস্ত জগৎ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

সেদিন কোন স্বপ্নশীলের উদ্ভট স্বপ্নও যা দেখতে পায় নি, কোন কল্পনাবিহারীর স্বেচ্ছাচারী কল্পনাও যা কল্পনা করতে পারে নি, জগতে তাই সম্ভব হয়েছিল। কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল—আজও মুগ্ধ করছে।

কবির কাব্যেই কবির পরিচয়। তিনি মহাকবি। সহস্র সহস্র বৎসর পরে জগতে এরূপ এক মহাকবির জন্ম হয়। তাঁর মহাকাব্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু সেই মানুষটি? সেই রক্ত-মাংসের দেহধারী অপূর্ব্ব পুরুষটি—যার সম্বন্ধে তাঁরই কাব্যের ভাষায় বলতে পারি—"জ্যোতির্ময় আনন্দমূরতি! দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর পরে, করুণার সুধাহাস্যজ্যোতিঃ।"

তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর যিনি শুনেছেন, তাঁর স্পর্শ যিনি পেয়েছেন, তাঁর অভিনয়, তাঁর গান, তাঁর ব্যাখ্যান, তাঁর প্রতিদিনকার সাধারণ কথাবার্ত্তা যিনি শুনেছেন তিনিই জানেন—কবি ছাড়াও মানুষ রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়েছিলাম। পিতার সঙ্গে যেমন পুত্র, ভ্রাতার সঙ্গে যেমন ভ্রাতা, বন্ধুর সঙ্গে যেমন বন্ধু, পিতামহের সঙ্গে যেমন পৌত্র মিলিত হয় সেইরূপ অন্তরঙ্গভাবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করেছি—করে এই কথাই মনে জেগেছে—"ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই!" এইরূপ এক মানুষের সংস্পর্শে এসেই একদিন কোন্ যুগে, কোন্ এক মানুষ আনন্দে অভিভূত হয়ে এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন।

মাত্র পাঁচদিন পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমা গেল। ঐ পবিত্র দিনে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব তথাগত আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তথাগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ধর্ম্মরাজ অশোকের কথা বার বার মনে আসছে। কেন? এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সেটা কি? পরধর্ম্মের প্রতি পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা।

দেহের উপর জুলুম করলে তাকে আমরা বলি জুলুম। কিন্তু মনের উপর জুলুমকে আমরা জুলুম মনে করি না—এটা আশ্চর্য্য। 'আমার মতবাদ আমি অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেব'—সমস্ত জগৎ আজ এই করতে চাচ্ছে। হয় আমার মতে এস—না হয় তোমার রক্ষা নাই।

আজ থেকে প্রায় দু' হাজার তিন শত বছর পূর্ব্বে অশোক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যে, বেদপন্থী, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমান অধিকার ছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাতে অভ্যুদয় হয়, উন্নতি হয়, তার জন্য কত প্রচেষ্টাই না মহারাজ অশোক করেছিলেন! যাতে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরের ধর্ম্মমত শ্রবণ করে লাভবান হন, তার জন্য কত রকমের ব্যবস্থাই না তিনি করেছিলেন।১

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাঁর শান্তিনিকেতনে—তাঁর বিশ্বভারতীতে সর্ব্বপ্রকার মতবাদেরই আশ্রয় মিলত। তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদীরাও নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে তাঁর প্রতিষ্ঠানে বাস করতেন। অন্যের মতবাদের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, জবরদস্তির উপর তাঁর অসীম ঘৃণা ছিল। একটি শিশুর উপরও তিনি কাউকে জবরদস্তি করতে দিতেন না।

---

(১) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সর্ব্বসম্প্রদায়ের গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীদের সম্মান করেন। তাঁহাদের নানা প্রকার দ্রব্য দান করেন এবং নানা প্রকারে সম্মানিত করেন। কিন্তু এই দান বা সম্মানকে তিনি তেমন মূল্য দেন না—যেমন মূল্য দেন তিনি প্রতি সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি বা যোগ্যতাবৃদ্ধিকে। সারবৃদ্ধি বা যোগ্যতাবৃদ্ধি বহু প্রকারের। কিন্তু তার মূল বাক-সংযম (বচোগুপ্তি)। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় অস্থানে (অপ্রকরণে) নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করিবে না। নিন্দা বা প্রশংসার স্থল উপস্থিত হইলেও উহা যথাসম্ভব কম করিবে। বস্তুতঃ স্থলবিশেষে (প্রকরণে) বা যথাস্থানে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিবে। ইহা করিলে নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইবে, অপর সম্প্রদায়ও লাভবান হইবে। ইহার অন্যথা করিলে নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিবে—অন্য সম্প্রদায়েরও ক্ষতি করিবে।

পাছে তাঁর প্রভাবে, তাঁর আওতায় কারো ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব হয়—এই আশঙ্কা তাঁর মনে জাগতো। আমরা যখন শিশু ছিলাম, *তাঁর 'হাস্যকৌতুক' থেকে নাটক অভিনয় করতাম। তিনি আমাদের বললেন—"তোমরা আমার নাটক অভিনয় করচ কেন? নিজেরাই* ত তোমরা এমন নাটক লিখতে পার।" আমরা শুনে স্তম্ভিত। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। আমাদের দিয়ে নাটক লেখালেন, অভিনয় করালেন। সেই থেকে আমরা যত না তাঁর নাটক অভিনয় করতাম, তার চেয়ে বেশী আমাদের রচিত নাটক অভিনয় করতাম। তিনি তাতে কত খুশি।

লোকে যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন—তাহা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিবশতঃ। তাঁহারা মনে করেন—"এইরূপে আমাদের সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করিব।" বস্তুতঃ তাহাতে তাঁহারা নিশ্চিতভাবে (অথবা গুরুতররূপে) নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেন।

সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায় একত্র মিলিত হওয়া ভাল। এইভাবে তাঁহারা পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল (বা আগ্রহশীল) হউন। দেবপ্রিয়ের ইচ্ছাই হইতেছে ইহা যে, সর্ব্বসম্প্রদায় বহুশ্রুত হউক, কল্যাণযুক্ত হউন।

যাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান—তাঁহাদিগকে বলা হউক দেবপ্রিয় দান বা সম্মানকে তত বড় মনে করেন না—যত বড় মনে করেন তিনি প্রতি সম্প্রদায়ের সার বা যোগ্যতা বৃদ্ধিকে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সার বা যোগ্যতাবৃদ্ধি হউক। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহী হউক। একে অন্যের সমজদার হউক। ইহারই জন্য ধর্ম্মমহামাত্র, স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্র, ব্রজভূমিকাদি উচ্চপদস্থ অধিকারীবর্গকে নিযুক্ত করা হইয়াছে (শিলালিপি ১২। ২৫৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ।—Rock Edict XII Girnar version, 256 B. C)।

একটি সামান্য—অথচ অসামান্য ঘটনার কথা বলি। আমরা তখন কবিতা লিখতাম। বলা বাহুল্য, তাঁর পাল্লায় পড়ে আমরা অনেকেই কবি হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন একবার ঈশ্বর সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহসূচক কয়েকটি কবিতা লেখে। সাহিত্য-সভায় যখন সে সেই কবিতা পাঠ করে, তখন আমাদের এক বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সে ভৎর্সনা লাভ করে। তার কি মনে হ'ল, সেইরূপ কয়েকটি কবিতা সে গুরুদেবের কাছে দিয়ে এল। দিন-কয়েক পরে অতি ভয়ে ভয়ে সে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল। পরম-ভগবদ্ বিশ্বাসী তিনি। ভগবানকে বিদ্রূপ! ভয় হবে না? কিন্তু আশ্চর্য্য! মৃদু হেসে তিনি বললেন, "কবিতাগুলি ভাল হয়েছে।" যুবকটি আনন্দে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললে, "আমি ভেবে-ছিলাম আপনি আমাকে ভৎর্সনা করবেন।" তিনি বললেন, "ভৎর্সনা করব? কেন? আমার সঙ্গে মতবাদে না মিলতে পারে, আমার মতের বিরুদ্ধই বা হ'ল। আমি কবি, আমি দেখবো—কবিতা হিসাবে ও কেমন হয়েছে।"

শান্তিনিকেতনে তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী বহু ব্যক্তিকে তিনি সাদে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য তাঁর অনেক সংস্কার-কার্য্য বিশে বাধাপ্রাপ্ত হ'ত। অনেক সময় তাঁদেরই জন্য তাঁর পরিকল্পনা সাফল্য বহু বিলম্বে হ'ত। কিন্তু তার জন্য তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হতে না। তাঁদের উপর জুলুম করতেন না। আলাপে, আলোচনায় তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, মধুর ব্যবহারে, ধীরে ধীরে তাদের ভুল-ভ্রান্তি বুঝিয়ে দিতেন, নিজের ভুল হলে স্বীকার করতেন এবং সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এইটিই বিশেষত্ব। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মান। খ্রীষ্টপূর্ব্ব আড়াই শ' বছর পূর্ব্বে অশোক-চরিত্রে যা দেখা গেছে সেদিন রবীন্দ্র-চরিত্রেও তা দেখলাম। এটি ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব। হাজার বৎসর ধরে নাস্তিক চার্ব্বাক দর্শন বেদপন্থী, বৌদ্ধ, জৈন দর্শনসমূহের পার্শ্বেই আসন পেয়েছে। কেউ তাকে নষ্ট করে নি।

বিরাট তাঁর প্রতিভা। তিনি যে জগতে বিচরণ করতেন তা আমাদের জগৎ থেকে পৃথক। তা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে তিনি কেমন সহজভাবে মিশতে পারতেন! শিশুর সঙ্গে শিশু, কিশোরের সঙ্গে কিশোর, যুবার সঙ্গে তিনি যুবা হয়ে মিশতেন। তারা তখন ভুলে যেত তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি যেন তাঁদেরই এক আত্মীয়—পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু। এ ছিল তাঁর আশ্চর্য্য গুণ।

ভারতবর্ষের দেশে দেশে, ভারতবর্ষের বাইরে, এশিয়ায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় আমেরিকায়, পৃথিবীর বহু স্থানে আজ তাঁর জন্মোৎসব হচ্ছে। তাঁরা সব কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করছেন। এখানে শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে—যেখানে বিশ্বের নানা জাতি, নানা ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য তিনি নীড় বেঁধে দিয়ে গেছেন—সেখানে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথের, আমাদের আত্মীয় রবীন্দ্র-নাথের, আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করছি। সেজন্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের বেশী করে, বিশেষ করে মনে জাগছে।

এখানের আম্রকুঞ্জের "শালবীথিকায়, আমলকী কাননে, এখানের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলায়" আমরা তাঁর পরশ পাচ্ছি। এখানের সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে, বসন্তে, 'দারুণ অগ্নিবাণ-হানা গ্রীষ্মে, প্রতি ঋতু-উৎসবে আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করছি।[২]

[২] শান্তিনিকেতনে মন্দিরে কথিত।

শেষ ঘণ্টার অপেক্ষায়

শ্রীহরিহর শেঠ

একটা কথা আছে একদা একটি মহাকায় হস্তীর অসীম বলবত্তার প্রশংসা শুনে নাকি এক পথচারী ভেক সগর্ব্বে বলেছিল, 'আমাদের চারপেয়েদের এই রকমই।' প্রখ্যাত কবি কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের গত চৈত্রের 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বার্দ্ধক্য' শীর্ষক কবিতাটি পড়ে, তারপর তাঁরই লেখা ২৩শে চৈত্রের 'যুগান্তরে' 'বৃদ্ধ' এবং ক'দিন না যেতেই ৩০শে তারিখের 'যুগান্তরে' শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সুচিন্তিত 'অবহেলিত বার্দ্ধক্য' প্রবন্ধটি হতে এবং পুনরায় বৈশাখের 'প্রবর্ত্তকে' করুণ সুরে বাঁধা কবির রচিত 'বিশ্রাম' কবিতাটি দেখে—কবিই হন আর দার্শনিকই হন, যেহেতু কালিদাস রায় মহাশয় লেখক এবং আমিও যখন লিখে থাকি সুতরাং লেখক, তখন আমার ঐ ভেকের গল্প মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমি great না হলেও, আর সেই সঙ্গে all great men think alike এই চলিত কথাটাও মনে হ'ল। তৎপরে আবার মাঘের 'উত্তরায়' উক্ত কবিবরের দিন 'ফুরানোর গান' নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তীকে কবির লিখিত পত্রে চন্দননগরে সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ না করার প্রসঙ্গ প্রভৃতি পড়ে—আমি চন্দননগরের কীট, বৃদ্ধও হয়েছি, অতি পুরাতন কথা মনে এসে একটু লেখনী কণ্ডুয়নের ইচ্ছা হ'ল।

সে অনেক দিনের কথা—মনে পড়ে ১৮৯৮.১৯০০ সনে প্রত্যক্ষ না হলেও 'প্রয়াস' নামক এক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে কবিবরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি ছোট-বড় কবিতা লিখতেন, আর আমি রাজস্থানের কমলিনী—'কৃষ্ণকুমারীর কথা', তখন বাসনা কি তা ভাল করে কোন দিন মনে না হলেও এবং তার অপূর্ণতাই বা কি তার কোন হিসাব না রাখলেও, আজকাল মাইকের মাধ্যমে কি পূজাবাটী হতে অথবা বিবাহ বা শ্রাদ্ধবাসর থেকেই হোক—'সাধ না মিটিল আশা না পুরিল—' যে গানটি সময় সময় শুনে থাকি, তখন এক আঁধার রজনীর নীরবতার মধ্যে দূর থেকে জানি না কোন ভগ্নহৃদয় যুবকের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসা এই গানটি শুনেই আমার প্রথম গল্প লেখা—'অতৃপ্ত বাসনা।'

ইচ্ছা হলেও কবিকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নাই বহু দিন পর্য্যন্ত। তার পর তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার সুহৃদবর্গের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চন্দননগরে আমার ষষ্ঠিতম জন্মোৎসবে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর্গত পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়দিগের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত উপস্থিতিতে। যিনি আমার ও বন্ধুদের সাগ্রহ নিমন্ত্রণে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেছিলেন তাতে সম্মানের পদ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু এই অকৃতী অধমের জন্মোৎসবে তিনি স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কথাও ভুলতে পারি না।

আমার এই খাপছাড়া লেখায় কাকে তৃপ্তি দিতে পারবে জানি না। কোন কোন বন্ধুর আগ্রহে এবং দুই-তিন জন পত্রিকা-সম্পাদকের অনুরোধেও আত্মজীবনী বা জীবন-স্মৃতি লিখতে পারিনি, কিন্তু 'বার্দ্ধক্য' কবিতাটি হতে উদ্ধৃত অলক্ষ্যে এ একটু জীবন-কথাই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মত বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে হয় ত কারও একটু ভাল লাগতেও পারে এই মনে করে বার্দ্ধক্য কবিতাটি নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

বার্দ্ধক্য

সত্যই হয়েছি খুব বুড়ো?
দাদু, জ্যাঠা বলে সবে, কেউ আর বলে নাক খুড়ো।
'বুড়ো হায় আস্তে ভাই,' বলে বাস-কন্‌ডাক্‌টার,
দেখিলে প্রণাম করে পক্ককেশ দন্ত নাই যার।
করুণার পাত্র আমি, সবে কয় আহা ও বুড়ায়,
আগেই বিদায় করো, বসায়ে রেখো না বেচারায়।
নিমন্ত্রণ বাড়ী শুনি ডাকে সবে 'ছাতে চলে যাও।'
আমারে ডাকিলে বলে, 'ওরে আর কেন কষ্ট দাও।'
সিঁড়িতে নামিতে গেলে কেউ এসে ধরে তাড়াতাড়ি,
মুখে বলি ধন্যবাদ, মনে করি বড় বাড়াবাড়ি।
ট্রামে চলি দাঁড়াইয়া, লেডি বলে, 'আপনি বসুন।'
বসে পড়ি তার পাশে, বুড়োর যে মাফ সাত খুন।
পথে ঘাটে দেখা হলে যত সব পরিচিত জন।
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ ভরা—প্রশ্ন করে, আছেন কেমন?
জিজ্ঞাসে, 'রক্তের চাপ কত, স্যার?' নেই ত সুগার?
প্রত্যহ খাবেন বেল। ত্রিফলায়ও হবে উপকার।
এখনো বাহিরে কেন? হুঁশ নেই বেজে গেছে সাত,
বাড়ী পঁহুছিতে দাদু রীতিমত হয়ে যাবে রাত।
বুড়া যে হয়েছি খুব সেই কথা রই ভুলিয়াই,
সেই সঙ্গে তোমারেও প্রভু, ভুলে যাই।
নানা ছলে সবাই স্মরায়
তোমারে ভুলিয়া থাকা আর মোর শোভা নাহি পায়।
বোধ হয় বিশ-বাইশ বৎসর হ'ল, কলকাতায় একদিন বাস

হতে অবতরণ করতে যাচ্ছি বাস-কণ্ডাক্টারের মুখে শুনি—'এক্‌দম্‌সে বুড্‌ঢা আদমি'। তার কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একখানি বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় এক আলুলায়িতা কেশার একগাছি পক্ককেশ-হস্তে বিষণ্ণবদনায় একটি ছবি দেখেছিলাম। তখন সেই ছবিখানি মনে হ'ল।

আমার বদন বিষণ্ণ না হলেও বুঝলাম ইহাই প্রথম ঘণ্টা। কবিতার মধ্যে আর সব যা কিছু আছে সমবয়স্কদের অবশ্যই উপভোগ্য। সত্যই এখন দাদু ছাড়া সম্বোধন আর বড় কিছু তাঁরা শুনতে পান না। বেল, ত্রিফলা এখন সত্যই তাঁদের প্রায় নিত্য-সহচর। পরের বাড়ীতে সিঁড়িতে উঠতে নামতে অন্যে হাত ধরতে প্রায় অগ্রসর হয়েই থাকেন।

তার পর সেদিন চন্দননগর কলেজের রজত-জয়ন্তী উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ডি-এম-সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধন-সভার প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয় যখন বৃদ্ধজনকে যে স্বরে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সেই স্বরে আমাকে অনুগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যামন্‌ আছ্যা-ন্‌ তখন মনে হ'ল ইহাই দ্বিতীয় ঘণ্টা। সে কথা তখন মনের মধ্যেই রেখে দিতে পারলাম না। মন্ত্রী মহাশয়কে বলে ফেললাম, এই হ'ল সেকেণ্ড বেল। আমার কথায় তাঁর আগ্রহান্বিত প্রশ্নে বাস-কণ্ডাক্টারের কথা বললাম এবং সেই সঙ্গে জানালাম, আর একটি মাত্র ঘণ্টা বাকি রইল—সেটি শেষের শয্যাপার্শ্ব হতে কোন বয়স্ক প্রৌঢ় আত্মীয় বা বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা—চিন্‌তে পার‍্যা-ন্‌।

'বৃদ্ধ' প্রবন্ধে কবি অনেক কিছু লিখেছেন যা বর্ত্তমান যুগে সার সত্য। একমাত্র পেন্সন-প্রাপ্ত বৃদ্ধ ভিন্ন আর সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই যে সংসারে আবর্জ্জনা-স্বরূপ, সকলের কৃপার পাত্র—তা পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন তাঁরা সংসারে অবাঞ্ছনীয়। এ সবের কোন প্রতিবাদ নেই। তবে সংসারে যদিও বা হয়, সমাজে যে বৃদ্ধ মাত্রেই অবাঞ্ছনীয় তা নয়। অন্ততঃ প্রবীণ কবির সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। এই মাত্র সেদিন শ্রীরামপুরে সাড়ম্বরে তাঁর সম্বর্দ্ধনার কথাও ভুলতে পারি না। কবির এ আক্ষেপ মেনে নিতে পারি না। বৈশাখের ভারতবর্ষে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও কবিশেখর' শীর্ষক আলোচনায় লেখক কবিকে যে আসনে বসাতে চেয়েছেন তা কি দুর্লভ নয়? যা হোক যুগান্তরে প্রকাশিত 'বৃদ্ধ' প্রবন্ধটি বৃদ্ধদের একবার পড়ে দেখা মন্দ নয় মনে করি। আর কবিবরের ক্ষোভমূলক প্রবন্ধ পাঠেই হোক আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধই হোক শ্রীমতী আরতি দেবীর প্রবন্ধ বৃদ্ধদের ভালই লাগবে এবং সেজন্য তাঁদের কাছে তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন। তবে জানি না তরুণীদের কাছে এজন্য কটাক্ষের পাত্রী হতে হবে কিনা।

শেষ কথা, বৃদ্ধের মনোমধ্যে সঞ্চিত অভিমানে বা কাগজে কলমে অভিযানে, অথবা দু'পাঁচ জন কোমল দরদী হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত অভিব্যক্তি—কিছুতেই কিছু হবে না। যিনি বড় সৌভাগ্যবান, ঘরে যাই হোক, হয় ত বাইরে অর্থাৎ সমাজে বাহবা বা অন্ততঃ আহা কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাড়ীতে যা ঘাস-জল বাঁধা আছে তাই বরণ করে মাথায় তুলে নিতে হবে। তাঁর প্রাপ্য তাই-ই, যুগধর্ম্ম অলঙ্ঘনীয়। একটা দিন ছিল যখন লোকে বলত—'বুড়োদের সাত খুন মাপ' আর এখনকার কথা—'বুড়ো হয়ে মরতে বসেচে তবু আক্কেল হ'ল না।' এ সব ভুললে চলবে না। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ সেই শাস্ত্রবাক্যই সার। সংসার-সমাজ আর তাদের জন্য নয়। কিন্তু নানা কারণে সে পথ অবলম্বন করা এখন কঠিন।

আমাদের দরদী জাতীয় সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনে ব্রতী হয়েছেন। উদ্বাস্তুদের জন্য যেমন দণ্ডকারণ্যের ব্যবস্থা করছিলেন, তাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তেমনই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য যদি কোন অরণ্যের ব্যবস্থা করেন, অথবা অন্ততঃপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার দেখাদেখি বৃদ্ধাশ্রমের মত কিছু করেন, তবে কতকটা মন্দের ভাল হতে পারে।

আমার এই সব লেখনীপ্রসূত বাহাদুরীর জন্য হয়ত বা কিছুটা ফলভোগ করতেও হতে পারে, তবে সে বেশিদিনের জন্য নয়, কারণ আমার এখন সেই শেষ ঘণ্টারই অপেক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান ছিল এখন আর সে সম্ভাবনা নাই।

কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কাব্য

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

সকল সংস্কৃতভাষী কবির মধ্যে কালিদাসই বোধ হয় বাঙালীর সর্বাধিক প্রিয়। তাঁর রোমান্টিক মন বাঙালীর রোমান্টিক (রং-কাতর?) মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। অবশ্য তার অর্থ নয় অভিজ্ঞাতকুল-শিরোমণি কালিদাস আজ আপামর সাধারণের 'জন-প্রিয়' কবি হয়ে উঠেছেন (যদিও অনুবাদের কল্যাণে বহুজনের দরবারে তাঁর পরিচয় অধুনা বিস্তৃততর হয়ে চলেছে); তিনি কবি শিক্ষিতজনের, শিল্পী মার্জ্জিতমনা উন্নতরুচি অভিরূপভূয়িষ্ঠের। আধুনিক কালের শিক্ষিত কবিরা কালিদাসের কাব্য-সমুদ্রে অবগাহন করেছেন; প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমন কবির সংখ্যাও বিরল নয়। বিংশ শতাব্দির মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বাংলা কাব্যলোকের একচ্ছত্র অধিপতি রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্রনাথ যে অনুগামীর উত্তরাধিকারসূত্রে এই মহাকবির কতখানি গুণ পেয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অনুরাগী ছিলেন, সে-কথা প্রমাণ করতে হলে কবির নিজস্ব রচনাকে এখানে দৃষ্টির সম্মুখে আনতে হয়।[১] রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু ব্যবধানে থেকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখেন নি, দেখেছেন অন্তরের একাত্মতায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, সম্ভ্রমভরে। যাঁকে সত্যিই শ্রদ্ধা করা যায় তাঁর গুণাগুণ কিছু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করা মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে একেবারে অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরুদ্ধ ঘটনা নয়।

তার আগে দেখা যাক কালিদাস বলতে কি বুঝি, কোন জিনিসের প্রতীক ও প্রতিভূ, কাব্যের কোন মন্ত্ররহস্যের পূজারী তিনি। সাধারণের কাছে কালিদাস অর্থ সাজসজ্জ', উপমা বলতে কালিদাস আর কালিদাস বলতে উপমা—উপমা কালিদাসস্য। এর উপর তথ্যসন্ধানী কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে বলতে পারেন, 'মেঘদূত'-কাব্যের এক পূর্ব্বমেঘের চৌষট্টিটি শ্লোকের মধ্যেই অন্তত ষোলটি অপূর্ব্ব উপমা আছে। এই দুটি বিস্তৃত দৃশ্যচিত্র তার মধ্য থেকে সংগৃহীত—

> মেঘদূত! আম্রকূট পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছ তুমি। বিপুল আম্রকূট পাহাড়ে পাকা আমের বন কাঁচা সোনার প্লাবন ঢেলে দিয়েছে—সেই সোনালী স্তম্ভে তুমি শ্যামবর্ণ যেন ধরিত্রীর পীন-পয়োধর।[২]

অথবা,

> দশাননের বাহুভারে টলে উঠেছিল যে কৈলাসগিরি তার শিখরে গিয়ে পৌঁছালে তুমি। কি দেখলে? অনন্ত বরফের বিস্তার দিকে দিকে—তা যেন দেবনারীদের প্রসাধন নিমিত্ত ঝকঝকে মুকুর। আর ওই যে অসংখ্য শুভ্র চূড়া সব, তারা যেন মুঠো করে ছড়িয়ে দেওয়া রাশি রাশি কুমুদ ফুল—না, তারা বরফও নয়, কুমুদ ফুলও নয়; তারা হল ত্র্যম্বকের যুগযুগান্ত ধরে পুঞ্জীভূত শুভ্র অট্টহাসি।[১]

যে উপমা এখানে ভাবকে প্রাঞ্জলতর, অর্থগৌরবকে সমৃদ্ধতর করেছে, বাণীশিল্পের শাস্ত্র তাকে অলঙ্কার আখ্যা দিয়েছে—তা বস্তুর উপরে অধিকন্তু, চিত্রে তা যেন তুলিকার কয়েকটি বিশেষ স্পর্শ, শিলামূর্ত্তির গাত্রে ভাস্করের কয়েকটি অর্থপূর্ণ আঘাত। শুধু অলঙ্কার, শুধু উপমা কেন বলি, বর্ণবিন্যাসের ফলে আসে যে ঐশ্বর্য্য, ধ্বনি-সন্নিবেশের ফলে উঠে যে সমুদ্রের রোল, উচ্ছৃঙ্খল উপচয় নয়—মাত্রাবোধের মধ্যে দেখা দেয় যে ভাবসৌন্দর্য্য, কালিদাসে দেখি তার চরম, পরাকাষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের—

> …খুলি দিল কেশভার
> আজানুলম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি,
> লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি।

বোধ হয় কালিদাসের এই দিকটারই একটা আভাস ও প্রতিধ্বনি। তাঁর—

> …গিরিতট তলে
> দেওদার তরু সারে সারে
> মনে হলো স্তৃষ্টি যেন স্ব.প্ন চায় কথা কহিবারে—

যেন আরো এগিয়ে গিয়েছে, ছন্দের সূক্ষ্মলোকে একটা সাধর্ম্ম্যই পেয়েছে কালিদাসের (রবীন্দ্রনাথেরও অতি প্রিয় এই পংক্তিটি)—

> মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢা
> মুহুঃ কম্পিত দেবদারু।

এই মহাবাক্যের সঙ্গে।

তবে এও হল বাহিরের দিক। অন্তশ্চেতনার দিক থেকে দেখলে দেখব আর এক রহস্য। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কাব্য ঋগ্বেদে প্রতিফলিত মানসোত্তর চেতনার আলো, পরবর্ত্তীকালে

১। রচনাবলী—'সাহিত্য' এবং 'প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য

২। ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ—
ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তার পাণ্ডু।

১। গত্বাচোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতা দর্পণস্য তিথিঃ স্যাঃ
শৃঙ্গচ্ছায়ৈ কুমুদবিশদৈর্যোবিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।

উপনিষদে প্রদীপ্ত মনের ঋজুবাক, তারও পরে পুরাণের যুগে জনশ্রুতি ও উপকথা-আশ্রয়ী প্রাণ-মন—এবার এখানে এসে মিশেছে হৃদয়ের আবেগ। ক্লাসিকাল সংস্কৃতে পরিপাটি বুদ্ধির এ ভাব অতি স্পষ্ট—কালিদাস ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতীক; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার হয়েছেন অন্তর-পসারী, সুকুমার চিত্তবৃত্তির পূজারী। প্রেমের—মানুষী প্রেমের—উপাখ্যান তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য, তিনি বর্ণনা করেছেন প্রাণের বিচিত্র লীলা, বিভঙ্গিম আবেগের বহুবর্ণাশ্লেষ। অথচ একটা সুরুচির শাসনে থেকে তা কোথাও গ্রাম্য হীন অশ্লীল হয়ে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র সুরও এই হৃদয়াবেগ নিয়েই—

প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন···

অথবা,

কপোলে তার কিরণ পড়ে তুলেছে রাঙা করি,
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে আঁচল খসি পড়ি।

কথা উঠতে পারে যে, এই ভাবই সংস্কৃতে লঘু গুরুর কলাণে ও যুক্তবর্ণের গাঢ় বন্ধতায় হয়ে ওঠে গম্ভীরতর ও গভীরতর। সমবৃত্ত যে দেয় একটা লঘুপক্ষ গতি এবং তরল লাস্যের নৃত্যছন্দ এখানে তাকে বর্জন করে মাত্রাবৃত্তের চালে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন একটা সংবৃত চাল—কালিদাসের সংস্কৃতের প্রায় সমগোত্রেরই তা। আর যখন শুনি নবঋতুর আবির্ভাবে

নূতন-জাগা কুঞ্জ বনে কুহরি ওঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।

তখন মনে হয় না কি উজ্জয়িনীর রাজকবিরই রচিত এই পরিমণ্ডল, এই আলো বাতাস?

কালিদাসের কাব্যে নারী চরিত্র অধিকার করে রয়েছে অনেক এক বৃহৎ অংশ। তার রূপলাবণ্য বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই—

তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণী ভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং···
(উ মেঘ, ২১)

পার্বতীর অনুপম রূপ মাধুরী চিত্রিত করতে গিয়ে কবি যে ভাষা ও কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তা অপর কোন কবি অতিক্রম করতে পেরেছেন?—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখ প্রভাভি—
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।১ (কু. স, ৩৩)

১। "তাঁহার চরণযুগল উন্নত অঙ্গুষ্ঠ নখের দীপ্তি হেতু ভূমি যেন দৃঢ়ভাবে স্পর্শনিবন্ধনেই লৌহিত্য প্রকাশ করি ভূপৃষ্ঠে সঞ্চরণশীল স্থলপদ্মের শোভা বিস্তার করিত।"

মেঘদূতে যক্ষিণী, বিক্রমোর্বশীতে উর্বশী, শকুন্তলায় শকুন্তলা, র বংশে সীতা—প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে কবি দিয়েছেন তাঁর নিখুঁত অপূর্ব প্রতিভার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে কালিদাসেরই অনুসর করেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারই শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে ··· (বিজয়িনী)

এখানে মূর্তিরূপ রঙে রসে ভাবে উচ্ছ্বসিত, ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় জীবনে জয় গান। এ-ধারা কালিদাসের ধারা, প্রাচীনের প্রাচ্যধারা এখানে গৌরকরোজ্জ্বল জীবন, ঔদার্য্য ও তৃপ্তির মধুমাস, সকল ব্যর্থতার শেষে সার্থক শান্তির সুর, সকল কুশ্রিতাকে ছাপিয়ে সুন্দরে শুভ্র বিজয়কেতন। এই ভারতীয় দৃষ্টিই কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথে ফুটে উঠেছে:

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধ বরণ সন্ধ্যা নীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্র শোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনক কিরণ-জ্বালা,
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু,
(সুরদাসের প্রার্থনা)

কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথেও পাই একটা প্রাচুর্য্য, ভাবের অলঙ্করণ, রাশীকৃত অথচ সুবিন্যস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। একথা প্রকৃতি এবং মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ও বিচিত্ররূপিণী, ম্যাথু আর্নল্ড অঙ্কিত নিস্পৃহ উদাসী প্রকৃতির মত নয়, গ্রীকের ট্র্যাজেডি বর্ণিত একরোখা কঠোর নিয়তির মত নয়; মানুষ এখানে হল, সেক্সপীয়র যেমন বলছেন, paragon of beauty. এ-দৃষ্টির সঙ্গে অতি-আধুনিকের দৃষ্টির কত পার্থক্য, উগ্র আধুনিক বলছেন—

দুই হাত, দুই পা, নাক ইত্যাদি
লম্বা কি অনতি; কপাল; পরণে প্যান্ট, কি খাদি
ধুতি অথবা যেমনই হোক—অর্থাৎ মানুষ।

কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয় কবিই স্বীকার করেছেন আভিজন

করেছেন পার্থিবকে। তবে সে-পার্থিব সুন্দরের রূপে অপার্থিব হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁদের কাছে। কালিদাসের কাব্যে তাঁর বিষয়বস্তুকে রসগ্রাহ্য সংহত করে ধরেছে একটা সহজাত প্রবল এসথেটিক সেন্স বা রূপরুচি—তা পারিপার্শ্বিক একটা বিশেষ সংস্কৃতির কাছে বহুলাংশে ঋণী; অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ধরে চলেছেন একটা সুপরিশীলিত রূপদক্ষ মনের অনুশাসন। সে মন উপলব্ধির দিক দিয়ে উপনিষদিক হলেও পদ্ধতির দিকে আধুনিক, বিজ্ঞানের ধারায় অভিষিক্ত। তাই কালিদাস যে য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির মতে সম্মতি দিতে পারলেন না, রবীন্দ্রনাথ "রাজা ও রাণী"তে তারই অনুসরণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জার বর্ণনায়, রোমান্টিক পরিবেশ রচনায়, রূপ-চিত্রণে কালিদাসপন্থী হয়েও এই রকমে আবার বৈজ্ঞানিক 'রিয়েলিজম'-এর কল্যাণে হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। আর একটি গুণের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগতের বাহিরে এসে পড়েছেন—সেটি তাঁর অতীন্দ্রিয়তা, উপনিষদের অবাঙমনসগোচর-প্রিয়তা যা তাঁর কাব্যের এক বৃহৎ অংশে এনে দিয়েছে ঊর্দ্ধলোকের আভাস, একটা মিসটিসিজম ও মিসটিক সুরের রেশ ও পরিবেশ—

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ পার হয়ে এসে আমরা প্রবেশ করলাম অন্য এক লোকে—এখানে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন বা যতীন্দ্রমোহন বাগচীও পুরাতন, যে সুরটি এখন প্রধান হয়ে বাজবে তার আভাস পাওয়া গেল নজরুল এবং মোহিতলালে। এটা বিদ্রোহের সুর—যার এক দিকে আছে ভাঙবার উন্মাদনা, অন্যদিকে অনাগতের আকুতি। (অচিন্ত্যকুমারের ভাষায়—'এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্ব্বব্যাপী নিরর্থকতার কান্না। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী।') কল্লোলের কথাশিল্পী এই কবিপ্রকৃতির দিয়েছেন মনোজ্ঞ বর্ণনা, জীবন্ত চিত্র। মনস্তত্ত্বের কাছে ঘটনাটির তাৎপর্য্য আর এক রকম হতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মনীশ ঘটক পর্য্যন্ত নিয়ে এই নবযুগের কাব্য স্পর্শকাতর ও কালিদাসের মতই ইন্দ্রিয়স্পর্শী হয়েছে—তবে মহাকবি কালিদাস নিজেকে আড়ালে রেখে যা বলতে পেরেছেন পরোক্ষে,[১] ইঙ্গিতে, আবরণ দিয়ে ঢেকে, মণ্ডনশ্রী দিয়ে আভরণ দিয়ে সজ্জিত সুশোভিত করে, নূতন করিয়া তারই একটা অনুভূতি, 'যৌবনের মুক্তভীর্থে' ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি—প্রকাশ করলেন আত্মনেপদী বাচ্যে, প্রথম পুরুষে, একান্ত স্পষ্টভাবে—

তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম
তাতে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম। (বু. ব.)

শুধু স্পর্শকাতরতা ইন্দ্রিয়কাতরতা নয়—পূর্ব্বের বা প্রাচীন কাব্যেও তার নিদর্শন মেলে—তা আবার বোধ করা সমস্ত সত্তা দিয়ে, শুধু বুদ্ধিতে কবিকল্পনায় নয়, উচ্ছসিত হৃদয় দিয়ে এবং এমন কি, স্নায়ুমণ্ডলী দিয়ে, অগণ্য অণুকাপ্রায় জীবকোষের রন্ধ্র দিয়ে পর্য্যন্ত, ভাবালুতার পরিবর্তে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের মধ্যে বোধ করা—এই মনে হয় নবযুগের এক রহস্য। ভাষায় তা কোথাও গ্রহণ করেছে গদ্যের ঢং, ছন্দহীনের ছন্দ, এই একটা প্রায় সাঙ্কেতিক সূত্র যা এক উপলব্ধির মর্ম্মদেশটিকে নগ্ন করে দেখায়। প্রাচীনের ব্যাসদেব অবশ্য তাঁর ভাষাকে সকল বাহুল্য থেকে সরিয়ে নিয়ে সেখানে দিয়েছিলেন একটা তপস্বীসুলভ ঋজুতা, একটা চরম সংযমের আভাস। উপনিষদ দিয়েছিল একটা সংক্ষেপের মধ্যে সম্পূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষা; রসিকচূড়ামণি শেক্সপীয়র দিয়েছেন রসঘন যথার্থোক্তি। নবযুগের কবি চেয়েছেন বৈজ্ঞানিকের ভঙ্গির অনুকরণ করে একটা অর্থবহ সূত্রের ভাষা—ফরমুলা'-ভাষা। অতি আধুনিক তাকেই টেনে নিয়ে পৌঁছেছেন এক রকম অর্থক্লিষ্টতা ও দুর্বোধ্যতায়।

কিন্তু এইটুকুই যদি শেষ কথা হ'ত তা হলে বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকত না—তা বড় জোর হতে পারত এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থ নিদর্শন। না, বাংলা কাব্যের মৃত্যু হয় নি, সেই কথাই এবার বলব। জীবন অর্থই তো চলা, এগিয়ে চলা—আর এগিয়ে যেতে পারে সে-ই যে চলতে চলতে নূতনকে গ্রহণ করতে পারে। যে শুধু চলে একই বৃত্তরেখায়, একঘেয়েমির ক্লান্তিতে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, বার্দ্ধক্যের ভার তার চরণ একদিন অনড় করে তোলে; যে গ্রহণ করে চলে পথের সঞ্চয়, নিজের মধ্যে নিত্য নূতনকে আবিষ্কার করে, যত জঞ্জাল তার জীবন-নদীতে এসে পড়ুক না প্রাণের স্রোতোবেগে সে তা কাটিয়ে উঠবেই। সাহিত্যের ইতিহাসে বারংবার এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। একটা অত্যন্ত নূতন ভাব, একটা একান্ত নূতন প্রেরণা যখন পুরাতনের মধ্যে আসন করে নিতে চায় তখন তাকে কেন্দ্র করে শিল্পীদের চলে পরীক্ষা—নূতন ভাবের উপযোগী নূতন আঙ্গিক গড়ে তোলবার নানা চেষ্টা। কখনো ধীরে কখনো ত্বরায় সে-চেষ্টা ফলবতী হয়ে ওঠে। যত বিঘ্নসঙ্কুল যত মন্থর এই পরীক্ষাকাল, যত দীর্ঘস্থায়ী এই এক্সপেরিমেন্ট, ট্রানজিশান বা যুগসন্ধিক্ষণও তত দীর্ঘ। মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভাকে পয়ারের বেষ্টনী অতিক্রম করে অমিত্রাক্ষর প্রবহমান ছন্দের ধারায় নেমে আসতে অনেক পূর্ব্বচিন্তা ও পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে,[১]—যদিও সুবিধা হিসাবে গন্তব্যের একটা নিখুঁত ছবি—মিলটনীয় ছক বা ছবি—তাঁর

১। উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলি-পার্ষ্ণি-ভাগান্ মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্ব্বহ-শ্রোণি পয়োধরার্ত্তা ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ।

কিম্বা আরো,

ইন্দ্রিয়ের দর্পে জানো গড়িয়াছি আমার ভুবন?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়ায়ে।

(বিষ্ণু দে)

শাসনে ছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ইংরেজী কাব্যে রোমান্টিক-দের আবির্ভাব এমনই একটা সঙ্কটকালে—প্রাচীনের কাব্যতীরের মধ্যে তা এনে দিল নূতনের জোয়ার; পুরাতনীদের কাছে সেদিন 'লিরিকাল ব্যালাডস'-এর তত্ত্ব ও তর্ক নবীনপন্থীদের ম্যানিফেস্টো হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী কাব্য যে মর্ম্মরোপম ক্লাসিকাল চেতনার মধ্যে নিজের নিরুদ্ধ সমাধি রচনা করছিল 'প্লেইয়াদ'-রা (Pleiade) এসে তা ভেঙেচুরে দিল—শুধু ভাবে নয়, ভাষাতেও তারা আনল এক বিপর্যয় (ক্রিয়াপদ, এমন কি, বিশেষণ পর্য্যন্ত তারা বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করতে লাগল) এমনি করে পুরাতনের তীর উত্তীর্ণ হয়ে নূতনের স্রোতবিক্ষুব্ধ খাত বয়ে ভবিষ্যতের কাব্য পরিশেষে সুস্থ রূপ নিয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হতে চলেছে মনে হয়।

নূতনের অভিসারী আধুনিক কাব্যের এইটেই চূড়ান্ত রূপ নয়। তবে সকল বিশৃঙ্খলার উপরে, এর মধ্যে থেকেই দেখা দিয়েছে যথেষ্ট ভালো কাব্য, যখন শুনি—

আমাদের হৃদয়েও সদ্যোজাত প্রশান্তির মানস-বলাকা
ছায়াপ্রদ দু'টি ডানা নাড়ে!

(কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত)

কিম্বা,

নীল পাখী এসে সাগরের গান গায়
বিস্ময়ে শোনে সবুজ বনের পাখ।;
পাহাড়িয়া পাখী দিগন্তে উড়ে যায়
আকাশের রঙ সোনালি ডানায় মাখি'।

(বিমলচন্দ্র ঘোষ

কিম্বা আরো,

মুহূর্ত্তের জন্য
বুঝি উঁকি দিলো অনন্তের অলিন্দ থেকে
বারিবাহিনী দিক্‌বালারা,—
মাথায় মেঘের গাগর!

(মনীশ ঘটক)

অথবা,

অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী;
পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা;
ঝিল্লির ডাকে মরধামে নামে উর্ব্বশী
তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা।

(সুধীন দত্ত)

দৃষ্টান্তগুলি আধুনিক এবং নিঃসন্দেহে ভালো কাব্যের। আর যেখানে ভালো কাব্য, যথার্থ সুন্দরের সৃষ্টি, কালিদাস রবীন্দ্রনাথ তো তার কাছেই—সমশ্রেণীভুক্ত প্রায়।

১। (ক) যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য (তিলোত্তমাসম্ভব) প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না —মধুসূদনের পত্র

(খ) I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.—ঐ

শেষ অশ্রুপাত করেছে কুইনলিং
(ম্যাডামকে এনো না কাঠগড়ায়)

মার্কিন মুলুকে শিক্ষা

শ্রীলীনা নন্দী, এম-এ

দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করবার পর আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায় ও শিক্ষাবিদেরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, এই আয়াসলব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন করা। পাশ্চাত্ত্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখে তাঁরা এটুকু উপলব্ধি করেছেন যে, কোনও দেশ বা জাতিকে সুস্থ, সবল, ও প্রাণপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। কি পদ্ধতিতে, কি পথে সেই উন্নতি করা যায় এ নিয়ে আমাদের দেশে আজ বহু গবেষণা-আলোচনা চলেছে। দেশের মনস্বী মানুষেরা আজ এগিয়ে এসেছেন যে, কি করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালানো যায়। এর জন্য তাঁরা বহু নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছেন, বহু নতুন প্রণালী আবিষ্কার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি বর্ত্তমান নিবন্ধে আমেরিকা—যে দেশ আজ অর্থে সামর্থ্যে শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রণী—সে দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করি তা হলে আশা করি সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপরন্তু সে আলোচনা কালোপযোগী ও প্রায়োজনিক হবে। মার্কিন শিক্ষার কি মূল্য ও উদ্দেশ্য, কি ভাবে তাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই কথাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, মার্কিনী স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি ঐ দেশের স্বাধীন ও সর্ব্বজনীন শিক্ষা-কেন্দ্রিক। মার্কিনমুলুকের লোকেরা একথা উপলব্ধি করেছেন যে, যদি দেশবাসীকে শিক্ষিত না করা যায় তা হলে কখনই তাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উন্নত থাকতে পারবে না। তাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করছে তাঁদের দেশবাসীর উপর। এজন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আপন দেশবাসীর মধ্যে তাঁদের নাগরিক দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে। প্রত্যেক মার্কিন নাগরিককে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শিশুকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী করেই ক্ষান্ত হন নি তাঁরা, তাদের কমপক্ষে আট বৎসর এবং সাধারণতঃ বারো বৎসর ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করতে বাধ্য করেছেন। মার্কিনমুলুকের অধিবাসীরা তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে নিরূপণ করলেন যে, ঐ শিক্ষা দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করবে যাতে তারা প্রত্যেকেই দেশের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করে সমাজসংরক্ষণে ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রনায়কেরা এই সর্ব্বার্থসাধক শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন; এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়ে উঠল দেশের সকলের একান্ত আগ্রহে ও সহযোগিতায়। দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাধীন নাগরিকের দায়িত্ব-সচেতনতা এনে দেওয়ার জন্য দেশে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হ'ল। দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও পাবলিক স্কুলের প্রবর্ত্তন ঘটল—সেখানে অবাধ শিক্ষার আনন্দ-মেলা। জাতীয় সরকারের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে দেশের ছেলেমেয়েদের মন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তথ্য আহরণ করবার সুযোগ পেল।

শিক্ষার মাধ্যমে মার্কিনমুলুকের লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক-জীবনের যে উৎকর্ষসাধন করেছে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিরল। শুনে অবাক লাগে যে, আমেরিকার অন্ততঃ প্রতি পাঁচ জনে একজন পুরোদিনের (full-time day) স্কুলে যোগ দিচ্ছে। আমেরিকান শিক্ষা সম্পর্কিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সনের দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৬৫,০০০,০০০ ছিল এবং প্রায় ৩৬,২০০,০০০ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে। শিক্ষা-অধিকর্ত্তারা আশা করেন যে, ১৯৬০ সনে এই শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০,০০০ দাঁড়াবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়াও বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও নানাপ্রকার ব্যক্তিগত ও কারিগরী শিক্ষালাভ করছে। আমেরিকায় সমাজের সকল স্তরে সমতা ও গণতান্ত্রিক ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাই আমরা রাশিয়ায়ও।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে কেননা মার্কিনবাসীদের বস্তুজীবনে রয়েছে প্রাচুর্য্য এবং এ প্রাচুর্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণ এই সদা প্রাগগ্রসর শিক্ষা। এই শিক্ষার লক্ষ্য সর্ব্বোদয়। গণতন্ত্র এই 'সর্ব্বোদয়' ধারণার মধ্যে বিধৃত। মার্কিন চিন্তানায়কদের মতে সরকারের প্রয়োজন দেশের লোকের কল্যাণসাধনের জন্য। আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে আরম্ভ করে ডুইট আইসেনহাওয়ার পর্য্যন্ত সকলেই দেশের এই সর্ব্বোদয় যজ্ঞে যজ্ঞাহুতি দান করেছেন। তাই তো এত বড় একটা দেশ এমন সজীব ও প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। একদিকে সুপুষ্ট প্রাণশক্তির দুর্ব্বারতা অন্যদিকে সর্ব্বব্যাপী শিক্ষার দিক-দর্শন এই দুইয়ে মিলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি অর্জ্জন করেছে এবং তার স্বাক্ষর রয়েছে সারা আমেরিকার দেহে-মনে।

মানুষের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করছে তার

অন্তরশক্তির বিকাশ। মার্কিন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় দেশবাসীকে কেবলমাত্র সৈনিক করে গড়ে তোলা। তাদের শিক্ষা regimentation বা একধর্মীকরণের বিরোধী। প্রত্যেক মানুষের অন্তরশায়ী ক্ষমতাকে জাগ্রত করে ব্যক্তি-সুখের সঙ্গে সমষ্টিগত কল্যাণের সমন্বয় ঘটানই মার্কিনী শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মানুষের নীতি-বিজ্ঞানেও এই শিক্ষাধারা সমর্থিত।

আমেরিকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় জনসমাজের উৎসাহে ও আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে এবং জনসাধারণের অর্থেই এরা পুষ্ট। যে জাতির মধ্যে রয়েছে এমন স্বদেশপ্রীতি ও আত্মজাগরণের প্রেরণা সে জাতি যে বৈভবে, শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হবে সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ কোথায়? জনসাধারণই তাঁদের প্রতিনিধি মারফৎ শিক্ষক নির্বাচন করেন; শিক্ষার পদ্ধতি, বিদ্যালয় গঠন এবং তার ব্যয়নির্বাহের জন্য কর আদায় প্রভৃতি সবই এই প্রতিনিধিরা ঠিক করেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেশের শাসক সম্প্রদায়ের বা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে নয় এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছায় গঠিত হয় বলেই এত সুন্দর তার নিয়ম ও ব্যবস্থা। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলেই তাদেরও আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে কিভাবে প্রত্যেক দেশবাসীকে শিক্ষার আলোক দান করা যায়। এমন কি 'পাবলিক' বিদ্যালয়গুলিও দেশের জনসাধারণের সম্পত্তির উপর কর বসিয়ে আপন আপন পরিচালন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। এর জন্য দেশের লোকের মনে কোনও অসন্তোষ নেই। ১৯৪৯-৫০-এর বিবরণী পাঠ করে বিস্মিত হই যে, আমেরিকায় ৮৩,২৩৭টি স্থানীয় স্কুল বোর্ডে ২৮১,০০০ স্ত্রী এবং পুরুষ অবৈতনিক ভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করছেন। এমন দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ সত্যই দুর্লভ। সম্প্রতি এই স্কুল বোর্ডগুলি (parent-teacher) 'অভিভাবক-শিক্ষক'দের এক-একটি সমিতি গড়ে তুলে শিক্ষার ভার দেশের শিশুদের মাতা-পিতার হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁরা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য-ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন এবং উপদেশ ও সাহায্য দান করেন যাতে শিশুদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

এই মার্কিন শিক্ষা-ব্যবস্থায় চারটি মূলনীতি আমরা লক্ষ্য করি। এই নীতিগুলি প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথকে সুগম করে। তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা বাস্তব জীবনে হোঁচট না খায়। সেই জন্য তারা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনকে চার ভাগে ভাগ করেছে। দৈহিক প্রয়োজন, মানসিক প্রয়োজন, বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজন মেটানো,এই চারটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে তারা তাদের শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তুলেছে। এ দেশের অধিকাংশ জায়গায় ১৬ বছর পর্য্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা রয়েছে। মার্কিন ছেলেমেয়েরা তিন বছর বয়সে নার্সারী স্কুলে যায়। সেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগের ভিতর দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে খেলাধুলা করার শিক্ষা পায়। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে তারা কিণ্ডারগার্টেনে যায়। এর উদ্দেশ্য ছাত্রদের মনে শিক্ষার ভীতিকে দূর করে লেখাপড়াকে ভালবাসতে শেখানো ও ছাত্র-ছাত্রীদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করা, নানা রকম গল্প, খেলা, নাচ-গানের ভিতর দিয়ে নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়। জানবার ও শেখবার কৌতূহল তাদের বৃদ্ধি পায়। এইখানেই তাদের তথ্য অবীক্ষণের দ্বারোদঘাটন হয়। এই জানবার বা শেখবার ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে।

মার্কিনী শিক্ষা ধারার প্রথম সূত্রপাত দেখতে পাই তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৬০ ০০০ সংখ্যার উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্দাজ ২৫,০০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বৎসর শিক্ষালাভ করছে। মার্কিনী শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুনিয়াদ এই সকল প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৬ থেকে ৮ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীরা আসে প্রথম পাঠের হাতে-খড়ি নিতে। এই সময় প্রতিটি শিশু সপ্তাহের ৫ দিন সূর্য্যের উদয়ক্ষণ থেকে দিনান্ত পর্য্যন্ত এই সকল বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে অসীম উৎসাহে ও আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক জীবনের গঠন ও প্রসারতা লাভের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম কথা হ'ল প্রত্যেকটি মানুষকে লিখতে, পড়তে ও নামতা শেখাতে হবে। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বহির্বিশ্বের জ্ঞানের প্রসারতার জন্য তাদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। আধুনিক আমেরিকান শিক্ষা-পদ্ধতি 'প্রগতিশীল' শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। আজ তাঁরা প্রচার করেছেন যে, দু'-একখানি নির্দিষ্ট বই পড়ে মুখস্থ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বচিন্তা শক্তির স্ফুরণ ঘটানো এবং শিক্ষাকে উপযুক্ত স্থানে লাগানোই শিক্ষার সার্থকতা। সেইজন্য তাঁরা শিক্ষাকে প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে বদ্ধ রাখেন নি। তাঁরা কার্য্যকরী শিক্ষাকে প্রথম স্থান দিয়েছেন।

এই প্রাথমিক শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ তাঁরা করেন নি। আমরা দেখেছি শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিয়ে নানা শিক্ষামূলক স্থানে যান, যেমন লাইব্রেরী, যাদুঘর, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদি। সেখানে ছাত্রদের মনের প্রসারতা ঘটতে পারে। ছাত্রদের জন্য তাঁরা নানা প্রকার ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছেন। এই ধরণের স্কুলে আমেরিকান বালক-বালিকারা নানা কাজের মধ্যে দিয়ে ছোট থেকে সামাজিকতা শেখে। এই সকল প্রাথমিক স্কুলে ভবিষ্যৎ মার্কিনী নাগরিকদের শিক্ষার প্রথম ভিত গাঁথা হয়। এক দিকে তাদের সুপণ্ডিত করা হয় বিভিন্ন শাস্ত্রে এবং অপরদিকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় জীবনই সুন্দর ও সুখময় হয়।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা আসে হাইস্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে সাধারণতঃ হাই স্কুলগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—জুনিয়ার ও

সিনিয়ার হাই-স্কুল। সাধারণতঃ সারা বৎসর স্কুল জীবনের মধ্যে মার্কিনী ছাত্রদের অন্ততঃ শেষ চার থেকে ছয় বছর এই মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা নিতে হয়। আমেরিকান শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে এই সব প্রাথমিক স্কুলগুলিতে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে ছাত্ররা প্রাথমিক লেখা, পড়া, নামতা গোনা শিখে নাগরিক হিসেবে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষায়তনগুলি আধুনিক সমাজের উপযুক্ত বিশেষ বিদ্যায় ছাত্রদের পারদর্শী করতে পারে না। তের বৎসরের পর প্রত্যেক মার্কিনী ছাত্র-ছাত্রীকে এই মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা নিতে হয় যদি না সে আর্থিক অক্ষমতা বা শিক্ষার অযোগ্যতার জন্ত আটকে পড়ে।

এই সব স্কুলে আমেরিকান ছাত্রদের দ্বিবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে তাতে ছাত্ররা তাদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ করে যাতে কলেজ-জীবনে প্রবেশ করতে পারে, এমন ভাবে তাদের তৈরী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষা লাভ করে ছাত্ররা আগামী দিনে অনায়াসে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। যাঁরা সাধারণ বিদ্যা নিতে চান তাঁদের এই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে হয়—ইংরাজী সাহিত্য, জ্যামিতি, স্বাভাবিক বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি। আর যাঁরা কার্য্যোপযোগী বিদ্যায় পারদর্শী হতে ইচ্ছুক হন তাঁদের উপরোক্ত বিদ্যা কিছু লাভ করতে হয়। ইংরেজী, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষালাভ করবার পরে অতিরিক্ত হিসাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মেয়েদের জন্ত)। টাইপ, ষ্টেনোগ্রাফি, কলা-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, বেতার, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি যে কোনও বিশেষ বিষয় বেছে নিয়ে ছাত্ররা এক-একটি বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। পাবলিক হাই-স্কুলগুলিতে আমেরিকান প্রাথমিক স্কুলের মত সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত হাই-স্কুলের ছাত্রদের—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই খেলাধুলায় উৎসাহিত করা হয় কারণ হাই-স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে ব্যায়াম বা শরীর-চর্চ্চা একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শরীর-গঠনে মার্কিনীরা গ্রীক আদর্শের অনুসারী।

রামমোহন রায় ও রাজনীতি

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনৈতিক উৎসব বা সভা-সমিতিতে রাজা রামমোহন রায়কে আমরা প্রায়ই স্মরণ করি না। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা ও ভাষা-সংস্কারে মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী অবদানের জন্ত তাঁহাকে যুগস্রষ্টা বলা হয়, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার স্বাধীন মত, গভীর জ্ঞান ও আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব প্রভৃতির আলোচনার তেমন প্রচলন নাই, যদিও তাহা সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর।

প্রথমোক্ত অবদানগুলি যেন শেষোক্ত অবদানটিকে ঢাকিয়া দিয়াছে। তুলনাস্বরূপ বলা যায় মধুসূদনের কাব্য যেমন তাঁহার সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টাকে ও চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি যেমন তাঁহার কবি-প্রতিভাকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

রামমোহন (১৭৭৪—২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) স্বরচিত সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণা লইয়া গৃহত্যাগ করেন।

"I proceeded on my travels···with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India."

ইহাই বোধ হয় বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তা উন্মেষের চিত্র। এক বিশিষ্ট প্রবন্ধের ভূমিকায় রামমোহন বলিয়াছেন, এ দেশেরই লোক লইয়া ইংরেজ সৈন্যদল গঠন করিয়া রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর—এই হতভাগ্য দেশে স্বাধীনতা বা দেশপ্রীতির ধারণা নাই।

"A country into which the notion of patriotism has never made its way."

পরবর্ত্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজের কাছে আমরা স্বদেশপ্রেম শিখিয়াছি।

একতার অভাবে এই দেশ বার বার বিদেশী শক্তির পদানত হইয়া নিদারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে; এজন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া রামমোহন ভারতের বাহিরে দুইটি দেশের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ কলহ-জর্জ্জর দুর্ব্বল পারস্য একতা-

বদ্ধ হইয়া সুফী সাম্রাজ্যে কিরূপ উন্নতি ও শক্তিলাভে সমর্থ হয় এবং ইংলণ্ড শতধাবিচ্ছিন্ন বিবদমান অবস্থা হইতে কেমন করিয়া ক্রমশঃ একতাসম্পন্ন গৌরবময় রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে—সে বিষয়ে তিনি সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রামমোহন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন কারণ তিনি লাহোর, মুলতান কাশ্মীর ও কাবুলের পূর্ব্বাংশ তাঁহার ছত্রতলে আনিয়া উদারতা, সৌজন্য, শুভবুদ্ধি ও একতার শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ব্যবসায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিরূপে এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে বিবাদের সুযোগ লইয়া কৌশলে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। এইরূপে রামমোহন কত বিভিন্ন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন!

রাজনৈতিক বিষয়ে গণমানসকে সচেতন করিতে তিনি বাংলায় 'সংবাদ-কৌমুদী' ও পারসীতে "মিরাত-অল-আকবর" নামক দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন (এই মন্তব্যের জন্য 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা' দ্রষ্টব্য)। সমসাময়িক বিদেশের ইতিহাস হইতে ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের লোকের মনে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগাইবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

নেপলসবাসী বহু-প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থপ্রণোদিত কার্য্যকলাপের ফলে অচিরে অষ্ট্রিয়ার পদানত হইলে রামমোহন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া এক ভোজসভার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া উদ্যোক্তা বকিংহাম সাহেবকে ১১ই আগষ্ট ১৮২১ তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আবার কিছুদিন পরে দক্ষিণ-আমেরিকার স্প্যানিশ জাতীয়তাবাদীদের মুক্তির সংবাদে আনন্দিত হইয়া নিজের বাড়ীতে আলোকসজ্জা ও বিরাট ভোজের আয়োজন করেন; সেই সভায় স্বাধীনতার অর্চনাসূচক ভাষণ দেন।

তাঁহার পত্রে প্রবন্ধে আচরণে এই ভাবটিই পরিস্ফুট হইয়াছে যে, যাহারা স্বাধীনতার শত্রু আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের বন্ধু তাহারা কখনও জয়যুক্ত হয় নাই, হইবেও না। যুক্তির উপর তাঁহার মনীষা প্রতিষ্ঠিত; জোর করিয়া নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি করেন নাই। তবে দার্শনিক Locke-এর মত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রমূলক সাধারণ নীতিবিগর্হিত নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ করার অধিকার আছে; মনীষী জেফারসনের মত তিনিও দৃঢ়ভাবে পরিচয় দিয়াছেন যে, স্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

বিলাতে অবস্থানকালে রিফর্ম বিলগুলি সম্পূর্ণভাবে মঞ্জুর হওয়ায় রামমোহন ১৮৩২, জুলাই ৩১ তারিখের পত্রে লিভারপুলের রাজনৈতিক নেতা রাথবোন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া হৃদয়হীন ধনী ও সামন্তগণ রাজনীতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া জনসাধারণকে নির্মমভাবে যে শোষণ করিয়া আসিতেছিল, এবার সেই অত্যাচার বন্ধ হইতে চলিল দেখিয়া তাহারা উল্লসিত হইয়াছে।

ফরাসী দেশের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা তাঁহার স্বাধীন চিন্তাকে দৃঢ়তর করিয়াছিল. আমেরিকার স্বাধীনতা তাঁহাকে আকৃষ্ট করায় সে দেশে যাইবার তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও যাওয়া হইল না —অকালে কাল আসিয়া আচম্বিতে তাঁহাকে হরণ করিল।

আবেগ কখনও তাঁহার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই—দূরদৃষ্টিকে ব্যাহত করে নাই; যাহা স্বদেশের পক্ষে একান্ত মঙ্গলজনক তাহাই প্রকাশ্যে গ্রহণ ও প্রচার করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রেরণা যোগাইত। জীবনের ছোটখাট ঘটনায়, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে, সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের অনুশীলনে, বাদ-প্রতিবাদে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে, চিন্তার স্বাধীনতায়, নৈতিক শুচিতায়, রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশে তাঁহার তেজস্বিতা, ধৈর্য্য ও যুক্তিবাদী মনের পরিচয় অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সহিত মিশিয়া আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

স্বাধীনতা-উৎসবে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা একান্ত সমীচীন।

দিল্লী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মহাভারতের এ মহানগরী ব্যথিত করিল মন,
নাহি মন্দির, নাহি দেবালয়, প্রসিদ্ধ পুরাতন।
নাহি ধূপ, নাহি ধূনার গন্ধ, শঙ্খ ঘণ্টা রব,
নাহি হরিনাম—রস বাদরের নিত্য মহোৎসব।
শত রাজসূয় অশ্বমেধের হাম কুণ্ডের ঠাঁই—
কোথাও প্রাচীন ছিন্ন স্মৃতির খিন্ন চিহ্ন নাই।
আঘাতে আঘাতে জাতি হয়েছিল মান মর্য্যাদাহারা,
নিজ আরাধ্যদেবের দেউল রাখিতে পায়নি খাড়া।
তবু সম্ভ্রমে মাথায় তুলিনু ইহার পথের রজঃ।
এই পথ দিয়ে কতবার গেছে সে রথ কপিধ্বজ।

২

যুগান্তব্যাপী বিভীষিকা আর লাঞ্ছনা তিলতিল
করেছিল এই উদার জাতিকে অসহ সহনশীল।
পার্থ-সারথি শ্যামসুন্দর চরণ লুটায়ে মাথা—
বন্ধ করিনু দাস-পর্ব্বের কালিমা লিপ্ত পাতা।
আজি যে দিল্লী দেখিনু—দেখিনু হয়ে অনন্যমন,—
আশার-আলোক-দীপ্ত, দৃপ্ত বিরাট সম্ভাবনা।
নূতন ভারতে ধুয়ে মুছে যাবে পরাধীনতার চিনে—
বাহুতে ও বুকে নূতন শক্তি, নব শ্যামলিমা তৃণে।
সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—
এ জাতি হইবে অনুবর্ত্তী যে সেই সে গাণ্ডীবীর।

৩

এই যে ভারত গড়িয়া উঠিছে, জাগ মঙ্গলব্রতী—
ভীতি হইবে না, ভীত হইবে না, করিবে না কারু ক্ষতি।
হবে এই ঠাঁই শৌর্যকেন্দ্র, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বলে,
সব প্রতিভার চক্রতীর্থ, এই মহীমণ্ডলে।
সংস্কৃত ও সংস্কৃতির বিপুল অভ্যুদয়,—
সব দেশ যুগ জাতির সঙ্গে ঘটাবে সমন্বয়।
মৃত নহে, নহে, অমৃতগর্ভ --সেই ভাষা সংস্কৃত
মহাযজ্ঞের সেই হবি হবে—পূর্ণাহুতির ঘৃত।
ভারতের যাহা অবিনশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—
যেই দিতে পারে—সব আগে চাই সেই গোমুখীর স্নান।

৪

বৃথা ও বিকল ভাষার দ্বন্দ্ব—এটা বুঝা যাই সবে,
অমৃতের যে বাহন—তাঁহাকে গরুড় হইতে হবে।
এই যে শক্তি, অসীম শক্তি অন্য কাহারো নাই,
গঙ্গা ধরিতে গঙ্গাধরের প্রয়োজন আছে ভাই।
যতই করি না 'দলাই' মলাই তবুও ভরসা 'খোরা'
অশ্বমেধের অশ্ব হবে কি একা গাড়ীর ঘোড়া ?
'হিন্দি বাঁচাও' 'হিন্দি বাঁচাও' শুনেছি উচ্চরব—
রাষ্ট্র তারে বাঁচাইবে কি দিয়ে 'কস্তুরীভৈরব' ?
কাব্যামৃত তৈরী হয় না কথায় জুড়িলে সুর—
কমলা লেবুর রসে দেওয়া সে তো দিল্লীর চোটা গুড়।

৫

কুরঙ্গ যূথ কমিয়া গিয়াছে, কমেছে ময়ূর ঝাঁক,
অক্ষয় আর অটুট রয়েছে কেবল দেখছি কাক।
অগুন্তি হয়ে এখনো উড়িছে—সেই যে কাকের দল,
আকবর শাহ আমলে যাদিকে শুনেছেন 'বীরবল'।
'সোন্ হালুয়া'ও চিবায়ে দেখেছি অক্ষম এই দাঁতে,
সারসের ভোজনানন্দ লভেছি শৃগাল বন্ধু সাথে।
দেখিনু চলিছে মুমূর্ষু ট্রাম— শোচনীয় অধোগতি,
'সাইকেল' আর 'ফটফটিয়া'র অশোভন উন্নতি।
দেখিলাম যাহা এ সব বাহ্য —গুরু গৌরব ভরা—
আসিছে সুদিন —দিল্লীর পানে বিস্ময়ে চাবে ধরা।

৬

ফুলের দেশেতে বিরল পুষ্প দেখি ব্যথা পেনু চিতে
ঠাকুরের পায় গান্ধী চিতায় গাঁদা ফুল হ'ল দিতে।
শুধু বিদ্যুৎ ইস্পাত, ইট নহে উন্নতি মূল —
চাই তপস্যা চাই অর্চনা—ফুল চাই, চাই ফুল।
দেখিনু রাষ্ট্রপতির ভবন—উদ্যান সুশোভন,
পুষ্প পত্রে শুচি চারুতায় হরিল নয়ন মন,
দাঁড়াইয়া আছে সজ্জিত স্থির সবল দৌবারিক
পাথর কুঁদিয়া শক্তি উৎস গড়িয়াছে যেন ঠিক।
দেখিলাম জননায়কগণের আনন্দ উৎসব—
দেশকে যাহারা আনিয়া দিতেছে অনাগত গৌরব।

মত ও পথ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

অনিমেষ শোভনাকে বিয়ে করেছিল, কি শোভনা অনিমেষকে বিয়ে করেছিল, এটা আজকের দিনে আসল কথা নয়, আসল কথা তারা বিয়ে করেছিল পরস্পরকে ভালবেসে। তারা খুশী কি সুখী অথবা দুই-ই, এটুকু আর বলে দিতে হয় না কাউকে। এ বোঝা যায় তাদের মুখ-চোখ আর পাতলা ঠোঁটের হাসি দেখে।

অনিমেষ শোভনাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার নাম অনিমেষ কেন জান?—জানি। শোভনা বলে মুখ টিপে, আমাকে ঐ-নয়নে দেখবে বলে। কথাটা সে শুনেছিল অনিমেষেরই মুখে। অনিমেষ বলে, এটা তার বিধিদত্ত নাম। শোভনাকে অনিমেষ নয়নে দেখবে বলেই ঐ নামের অধিকারী হয়েছে সে।

শোভনা বলে, আমার নাম শোভনা কেন জান?

—না ত। দুষ্ট হাসি হেসে উত্তর দেয় অনিমেষ।

—তবে শোন, আমার কোন শোভা নেই বলেই আমি শোভ-না।

—উঁহু। তুমি চিরশোভাময়ী বলেই তুমি শোভনা। অনিমেষ প্রত্যুত্তর দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

শোভনাকে সাজিয়ে সুখ পায় না অনিমেষ। বলে, আরও কিছু হলে হ'ত ভাল। মানাতও ভাল।

শোভনা মানতে চায় না একথা। বলে, এর ওপর আরও কিছু হলেই একেবারে ফিল্মষ্টার। মাগো! ঘরের বৌয়ের এত সাজ কেন? একেবারে সিনেমা-উলী?

—কেন, সিনেমা-উলী ছাড়া কেউ কি সাজে না, না সাজতে জানে না? তোমায় দেখলে সিনেমা-উলীরা কিন্তু সত্যিই হিংসা করবে শোভা।

—কারণ?

—কারণ, এত রূপ তাদের কারও নেই। দেখি ত সব। ওই ত চেহারা তাদের।

—যা—ও।

—যা—ও না, সত্যি। তুমি যদি সিনেমায় নাম, বেচারীদের অন্ন যাবে।

—তা হলে নিভাবনায় থাকতে বল তাদের। কারণ আমিও সিনেমায় নামব না, আর তাদেরও অন্ন যাবে না।

একটা বাসনা চমকে ওঠে অনিমেষের মনে। তারই ছোঁয়াচ লাগে দুটি চোখে। মুখ টিপে বলে, কেন? সিনেমায় নামতে দোষ কি?

—দোষ কি! চোখ বড় করে তাকায় শোভনা। সিনেমায় নামব আমি? ঘরের বৌ করবে সিনেমা!

—ক্ষতি কি? অনেকেই ত করছে আজকাল। পালটে গেছে দিনকাল সব।

—তা যাক। পালটে যাদের যাবার, তাদের পালটাবে। আমাদের পালটায়ও নি আর পালটাবেও না। শোভনা মাথা নাড়ে দৃঢ়ভাবে।

অনিমেষ দমে না। বলে, অনেক বড় ঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা মেয়ে, আজকাল নামছে সিনেমায়। তাদেরও স্বামী আছে, স্বামীরা সব প্রডিউসার, ডিরেক্টর সেজে বসেছে। এই ত রমলা ভট্টাচার্য্য। কত বড় ঘরের বৌ, সিনেমা করছে। স্বামী এখন ডিরেক্টর তারই দৌলতে। কতই বা বয়স, আর দেখতেও ত ওই। এরই মধ্যে খান পাঁচেক গাড়ী, খানতিনেক বাড়ীর মালিক হয়েছে। শুধু উঠতি বয়স আর মিষ্টি গলা, এরই জোরে। তার পর স্ত্রীকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে সোহাগভরে বলে, কিন্তু যতই বলি না কেন, তোমার কাছে ওর গলা লাগে না। আর এত রূপের কাছে সে ত পেত্নী বললেই হয়।

শোভনা ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে স্বামীর বাহুপাশ থেকে। এক মুহূর্ত্ত স্থির থেকে চোখ বড় করে বলে, তুমি ডিরেক্টর হতে চাও?

—নয় কেন? ওরা যদি পারে—।

—ওদের কথা বলছি না, বলছি তোমার কথা। পারবে তুমি এর ফলাফল সহ্য করতে?

—না পারবার ত কোন কারণ দেখি না।

—দেখ না গায়ে হাত লাগে নি বলে, লাগলে সইতে পারবে না। নিজের স্ত্রী পরের সঙ্গিনী হয়ে পরের অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে প্রেমালাপ করবে, ঢলাঢলি করবে এ সইতে পারে না কেউ। এতে শান্তি থাকে না সংসারে, সংসার ভেঙে যায়।

অনিমেষ একটু হাসে। বলে, এ তোমার ভুল ধারণা শোভা। তুমি যদি সত্যই ভালবাস আমায়, তোমার মনে অপরের ঠাঁই হবে কেন? এ তো অভিনয়। অভিনয়ের কি কোন দাম আছে? না, মনে কোন দাগ ফেলে।

শোভনা বলে, মন যতক্ষণ সোজা থাকে, সরল থাকে, ততক্ষণ দাগ পড়ে না। কিন্তু একবার অসরল হলেই দাগে দাগে ছেয়ে যায়। জলে দাগ কাটা যায় না বটে, যায় বরফে। গভীর ভাবেই দাগ কাটা যায় সেখানে।

অনিমেষ হাসে। বলে, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ডিরেক্টর হলে তোমায় আগলে রাখব সারাক্ষণ।

শোভনার আতঙ্ক কাটে না। বলে, না বাপু আমি পারব না। ওসব আমার দ্বারা হবে না। মঞ্চ দিয়ে একবার যদি আমি প্রবেশ

করে, ছারেখারে দেবে সব। দিনরাত ওই স্বপ্নপুরীতে বাস করতে হবে অথচ স্বপ্ন দেখব না এও কি কখন হয়? পাঁক ঘাঁটব কিন্তু পাঁকের গন্ধ হাতে লাগবে না, এমন ত শুনি নি কখনও। পর-পুরুষের সঙ্গে হাসিমস্করা করব, উঠব বসব, হাসব বেড়াব অথচ মনে তার কোন ছোঁয়াচ লাগবে না এ অসম্ভব কথা। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে ফোস্কা পড়বেই তোমায় বলে দিলাম। তখন আপশোষ করে থৈ পাবে না।

অনিমেষের কেমন জিদ বেড়ে যায়। বলে, অমন কিছু হবে না আমি জানি, তোমাকে আমি চিনি। তেমন মেয়ে তুমি নও। যাদের মনের তলায় পাঁক থাকে তাদেরই জল ঘোলা হয়। যাদের পাঁক নেই, তাদের হবে কি? লক্ষ্মীটি আমার, এই অনুরোধটুকু রাখ। আমি কত যে খুশী হব তা তোমায় বলতে পাচ্ছি না।

শোভনা একটু ভাবে। তার পর বলে, আমার জামাইবাবুর ভাই একজন সিনেমা ডিরেক্টর। আমায় বলেছিল একবার ঠাট্টা করে, সিনেমা-ওলারা তোমায় পেলে লুফে নেবে শোভনা; ফিল্মষ্টার হবার অনেক গুণ আছে তোমার মধ্যে। শুনে বাবা রাগ করেছিলেন ভয়ানক।

—কিন্তু আমি রাগ করব না একটুও বরং খুশীই হব। লক্ষ্মী সোনাটি আমার। শোভনার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটু ভেবে বলে, ঠিক বলছ? রাগ করবে না? দোষ দেবে না আমায়?

—না, না, না। হ'ল ত? তুমি এই অনুরোধটি আমার রাখ, এই বাসনাটি মেটাও, আমি খুশী মনেই আশীর্ব্বাদ করব তোমায়।

—বেশ, তোমার অনুরোধ আমি রাখব, বাসনাও মেটাব। জামাইবাবুর ভাই সীতাংশুবাবুকে খবরটা দিলেই সে ছুটে আসবে এখুনি। সব ব্যবস্থাও করে দেবে সেই।

ব্যবস্থাও হয়ে গেল সব। সীতাংশুবাবুই করে দিলেন সব। শোভনা ধীরে ধীরে পরিণত হ'ল 'ষ্টারে'।

শোভনা 'ষ্টার' হয়েছে। বছর তিনেকের মধ্যেই চিত্রজগতে খ্যাতি তার ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। যতগুলি গুণ থাকলে চিত্রজগতে খ্যাতি পাওয়া যায়, সব গুণগুলিই আছে তার। সে রূপসী, সে শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা এবং নৃত্যকুশলী। সর্ব্বোপরি সে ভদ্রঘরের মেয়ে এবং বৌ। অভিনয়ও করে মন্দ নয়। সুতরাং যুবকের দল আর সিনেমার কাগজগুলি গোড়া থেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। জয় জয়কার পড়ে গেল শোভনার। কিন্তু হ'ল না কিছুই অনিমেষের। সিনেমার ডিরেক্টর হবার আশা মিটল না তার। শুধু স্ত্রীর সঙ্গে মোটরে করে বারকয়েক আনা-গোনা, দৌড়াদৌড়ি করাই হ'ল সার। অনিমেষ ধৈর্য্যশীল পুরুষ নয়, তাই সে ধৈর্য্য হারাল চট করে। সিনেমার চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করাই হ'ল না তার। শোভনাকে ব্যূহমধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সে দ্বারী হয়ে রইল দিন কতক। কিন্তু ভিতরে অভিমন্যুবধের যে আয়োজন চলছিল, তার মৃদুমন্দ আভাস পেয়েই নিষ্ফল আক্রোশে সে সরে পড়ল একদিন। অনিমেষের সন্দেহ হ'ল শোভনার ওপর। তার ডিরেক্টর হবার পথের বাধা মনে হ'ল যেন সেই। এ যেন তারই অনিচ্ছা। নিজের অসুবিধা হবে বলেই সে যেন পরিপন্থী হয়েছে অনিমেষের, তার সিনেমা-জগতে ঢোকবার পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দেবার। অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারে না, সিনেমা-জগতে একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী সে আজ, তার পক্ষে সম্ভবপর নয় এ কাজটুকু। নিজের স্বামীর জন্যে এটুকু করা। তাই অভিমানে সে সরে আসে সিনেমার দ্বারপ্রান্ত থেকে, এমনকি একটু একটু করে শোভনার কাছ থেকেও।

শোভনার পাঁচখানা গাড়ী হয় নি বটে, তবে হয়েছে একখানা। বেশ ভাল গাড়ীই কিনেছে সে নিজে দেখে। বাড়ী এখনও হয় নি কিন্তু তোড়জোড় চলেছে তারও। অনিমেষের সারা বাড়ীখানার চেহারাটাই গেছে পালটে। আসবাবপত্র, সোফাসেট, আলমারী, ড্রেসিং-টেবিলে ঘর ভরে উঠেছে। বাহারী পর্দ্দা, নেটের পর্দ্দা সব ঘরে ঘরে। ফার্নিচারের দোকান থেকে লোক আসে ঘর সাজিয়ে দিয়ে যায় মনের মত করে। মাঝে মাঝে পুরনো ফ্যাসান পালটে ফেলা হয় সবগুলিকে নতুন ভাবে সাজিয়ে। নতুন বাড়ীর প্ল্যানও এসেছে তৈরী হয়ে। একেবারে সিনেমা ফ্যাসানের বাড়ী। শোভনারও ভোল গেছে পালটে। সেই শাঁখাশাড়ী-পরা গেরস্তর বৌ শোভনা আর নেই। এখন সে আর্টিষ্ট শোভনা। প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে তার কমনীয়তা-বর্জ্জিত মুখখানি। এ মুখ প্লাষ্টিকের মুখ, তেমনি কৃত্রিম চকচকে। পুরু পাউডারের আস্তরণে ঢাকা। কাজলের একটি বৃন্তকে দু'ভাগ করে বসান দুটি ভ্রূর ওপর। তারা নাকের ঊর্দ্ধপ্রান্ত থেকে রগের অধপ্রান্ত পর্য্যন্ত নেমে এসেছে সমানে। চোখের কাজল চোখের পরিধিকে ছাড়িয়ে দু'দিকে আরও ইঞ্চিখানেক বিস্তৃত। কপালের মাঝখানে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত স্থান জুড়ে মহাদেবের ত্রিশূল কি নন্দী-ভৃঙ্গীর ত্রিশূলের মত একটা কিছু আঁকা। মোট কথা কিছুটা নতুনত্ব—যেটা স্কুল কলেজের মেয়েদের মধ্যে আর সিনেমা-ঘেঁষা বিলাসিনীদের মধ্যে ফ্যাসানে পরিণত হতে চলেছে আজ। এর পর আছে ঠোঁটে নরখাদক বাঘের ঠোঁটের লালিমা, আর হাতে পায়ের কুড়িটা আঙ্গুলের নখে তারই দ্যুতি। চোখে রিমলেশ চশমা। কাঁধ থেকে আ-কটি-লম্বিত দামী ভ্যানিটি ব্যাগ। বাঁ-হাতে ব্রেসলেট-ফ্যাসানের সোনার রিষ্ট-ওয়াচ আর ডান হাতে ডজন দুয়েক কাচের চুড়ি। শোভনা ঢঙও শিখেছে অনেক রকম। তার মধ্যে দুটি হাত নমস্কারের ভঙ্গিমায় থুতনীর কাছ পর্য্যন্ত তুলে লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাশে দাঁত বের করে হাসিটি অন্যতম।

সময়েরও বড় অকুলান শোভনার। সকাল থেকে কাজ চলেছে তার সামনে, একটার পর আর একটা। সিনেমার সুটিং আছে, পার্টি আছে আর আছে ওস্তাদদের কাছ থেকে গান-বাজনা শেখা। দু'তিন জন ওস্তাদ শোভনার। কেউ গানের কেউ বাজনার।

নাচ শিখবে কিনা এখনও মনস্থির করতে পাচ্ছে না বলেই ওস্তাদ রাখা হয় নি তার। প্রায় প্রতি ছবিতেই আজকাল তার ডাক। মোটা মোটা কনট্রাক্ট। বেশীর ভাগই নামে সে প্রেমেন্দুর সঙ্গে। প্রেমেন্দু নায়ক, সে নায়িকা। তার সঙ্গে না নামলে দর্শকেরা যেন সুখ পায় না। দেওয়ালে দেওয়ালে দুজনার পোষ্টার, কাগজে কাগজে ছবি। এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও চলে দর্শকমহলে—বিশেষতঃ ছাত্রমহলে। আলোচনাও চলে সিনেমা-সম্বন্ধ কাগজগুলিতে। দুজনাকে নিয়ে ইঙ্গিতও থাকে নানারকমের। এ সবই চোখে পড়ে অনিমেষের। রাগে সে না কাঁপুক, কিন্তু কাঁদে ক্ষোভে। নিজের স্ত্রী আজ সাধারণী, সাধারণের আলোচনার সামগ্রী। অথচ উপায় নেই। এ সবই নিজের কৃতকর্মের ফল। নিজের স্ত্রীকে সিনেমা-আর্টিষ্ট করেছে সে নিজে। কানে কানে মন্ত্র দিয়েছে তাকে বিশ্ববিজয়িনী হবার। বলেছে, যত রূপ আছে শোভনার, যত গুণ আছে, সিনেমা-জগতে, এমন খুব কম নায়িকারই আছে। সারা ভারতবর্ষ ত বটে এমনকি বহির্বিশ্বেও তার নাম পড়বে ছড়িয়ে। শোভনার ইচ্ছা ছিল না সুরুতে, কিন্তু অনিমেষের মুখে শুনে শুনে এত বড় প্রলোভন জয় করতে পারল না সেও। স্বামীকে খুশী করবার জন্তেও বটে, আর নিজের গোপন আশাটিকে চরিতার্থ করবার জন্তেও বটে, সে যোগ দিল সিনেমাতে। কিন্তু এ সুখ সইল না অনিমেষের ভাগ্যে। সব আশা তার গেল শূন্যে মিলিয়ে। সিনেমার দ্বারপ্রান্ত থেকে সে এল ফিরে। কিন্তু ফেরাতে পারল না শোভনাকে। এ কাজ সম্ভবপরও নয় আজ। সে রস পেয়েছে, যশ পেয়েছে, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশময়। একদিন সে ছিল কুঁড়ি, আজ ফুটে উঠেছে ফুলে। সৌরভে আমোদিত করেছে দশদিক। নিজেও বিভোর হয়েছে, বিভোর করেছে সকলকে।

অনিমেষ ছবি দেখেছে শোভনার। প্রথম প্রথম শোভনার সঙ্গেই যেত সে যতদিন আশা ছিল ডিরেক্টর হবার, ততদিনই তারা গেছে একত্রে। ভাল যে লাগে নি তার তা নয়, ভাল লেগেছে তারও। লাস্যময়ী নারীচরিত্রে শোভনা অদ্বিতীয়া। এত রূপ, এত রস সে যে ফুটিয়ে তুলল কি করে, ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যেত অনিমেষ। এতখানি সহজ সরল শোভনা বোধ হয় নিজের স্বামীর কাছেও নয়, যতখানি সে পর্দায় প্রেমেন্দুর কাছে। দুইটিতে মানায় ভাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে প্লে করেও ভাল।

শোভনার সঙ্গে গেছে বটে অনিমেষ, কিন্তু দুর্ভোগও সে ভোগ করে নি কম। সকলেই চায় শোভনাকে, দলে দলে ঘিরেও ধরে শোভনাকে। অনিমেষ দলভ্রষ্ট হয়ে থাকে তফাতে। এ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, তবুও সহেছিল সব, কিন্তু যে দিন ডিরেক্টর হবার সব আশাই ভূমিসাৎ হ'ল তার, সে দিন থেকে সে আর যায় নি শোভনার সঙ্গী হয়ে। তবে গেছে লুকিয়ে। থাকতে না পেরে দেখে এসেছে ছবিগুলিকে গোপনে। সারা শহর জুড়ে শোভনা-প্রেমেন্দুর ছবি, দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো ছবি। কোথাও তারা নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবুডুবু। কোথাও তারা আদর্শ স্বামী-স্ত্রী, শোভনার পতিপরায়ণতায় হার মেনে যায় পৌরাণিক মেয়েরাও। অনিমেষের মনে হয়, এ ছবি যেন মেকী নয়, ফাঁকি নয়। পরস্পরের প্রতি অন্তরের টান না থাকলে, এতখানি দরদ দিয়ে প্লে বোধ হয় সম্ভবপরও নয়। দুজনে শুয়ে থাকে একই ঘরে, পাশাপাশি দুখানি খাটের উপর। সেখান থেকে চলে তাদের প্রণয় নিবেদন। কখনও চলে তারা হাতে হাতে ধরে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে আঁচল উড়িয়ে নদীর ধারটিতে এসে বসে নির্জ্জনে মুখোমুখি হয়ে। আধ-শোওয়া অবস্থায় দেহটিকে এলিয়ে দেয় শোভনা কচি ঘাসের উপর। তারই উপর ঝুঁকে পড়ে প্রেমেন্দু মুখের কাছে মুখ এনে, হয়ত আঙ্গুল দুয়েকেরও মাত্র ব্যবধান অথবা তাও নয়। এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে তারা, দেখে দেখে অনিমেষ গুম হয়ে যায়। কোন রক্তমাংসে গড়া মানুষই সইতে পারে না এ সব। নিজের স্ত্রীর এতখানি অনাচার, অনিমেষ গুমরে ফেরে মনে মনে। একদিন মনের কথা বলেও ফেলে স্ত্রীকে। বলে, এ সব ছেড়ে দাও শোভা। ভাল দেখায় না আর।

—কেন? শোভনা প্রশ্ন করে ঘাড় বেকিয়ে, ভ্রূ দুটি টান করে।

—পথেঘাটে যে কান পাতা যায় না।

—না? কিন্তু তুমি ডিরেক্টর হলে? কান পাতা যেত তখন?

—তখন এতখানি দৃষ্টিকটু হ'ত না ব্যাপারটা। লোকে জানত আমি আছি সঙ্গে তোমার।

—আঃ! কিন্তু এখন পেছুই কি করে। অনেকগুলি কনট্রাক্টে সই করেছি। টাকাও নিয়েছি আগে। এগুলি ত শেষ করা চাই। আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি?

—তুমিই ত চেয়েছ আমায় আর্টিষ্ট করে তুলতে, তোমার বাসনা মেটাতে। সেই দিকেই চলেছি আমি, আর্টের গন্ধ পেয়েছি, পেয়েছি তার রূপরসের স্পর্শ। আমি চাই নিজেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে। চাই লোকের প্রাণে সাড়া জাগাতে।

—কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী, তোমার এ উচ্ছৃঙ্খলতাকে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না আমি।

—উচ্ছৃঙ্খলতা? বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে শোভনা। বলে, আর্টের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নেই। আমি আর্টের উপাসক। ফুল গন্ধ ছড়ায়, সে গন্ধ উপভোগ করে সকলেই। কিন্তু ফুলের সৃষ্টি দেবতার পূজার জন্তে। আমি আর্টিষ্ট, সৌন্দর্য্য ছড়াবার জন্তেই আমার সৃষ্টি, আমার পারদর্শিতায় আমি যদি খুশী করতে পারি সকলকে, সেইখানেই আমার গর্ব্ব, আমার কৃতিত্ব। তোমায় ধন্যবাদ দি, তুমি আমায় মুক্তির পথ দেখিয়েছ। বছরে বছরে আঁতুড়ঘরের বীভৎসতার হাত থেকে রেহাই দিয়েছ। নিজেকে আমি বিলিয়ে দিতে চাই। বিশ্বজনের মাঝে নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলতে চাই রূপে, রসে, মাধুর্য্যে।

অনিমেষ বোঝে—স্বপ্ন দেখছে শোভনা। মর্ত্ত্যে বাস করে

স্বর্গের স্বপ্ন। দুঃখের পৃথিবীকে এড়িয়ে সুখের নন্দন গড়ে তোলা। এ বয়সে এ স্বপ্ন দেখে সব আর্টিষ্টই। সকলকার চোখে লেগে থাকে ঐ একই স্বপ্ন। তার পর এক দিন ঘোর কেটে যায়, স্বপ্ন টুটে যায়। তখন বিশ্বজনের দরবার ছেড়ে ফিরে আসে স্বজনের মাঝে। তখন আশ্রয় হয় ধরণীতল। সুতরাং স্ত্রীর স্বপ্নের ঘোর কাটাতে পারে না সে। রূঢ় আঘাত পেয়ে ফিরে আসে, ধীরে ধীরে একটা যবনিকা এসে পড়ে দুজনার মাঝে।

ডিরেক্টরের মোহে পড়ে আপিসের চাকরীটি খোয়ায় নি অনিমেষ, সেটা টিকে গিয়েছিল কোনমতে। আজ সেইটাই হ'ল তার একমাত্র অবলম্বন। সারাদিন সে ডুবে থাকে আপিসের কাজে। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফেরে তখন বড় নিঃসঙ্গ লাগে তার। আগের দিনগুলিতে বাড়ী ফেরবার জন্যে সে হ'ত পাগল। তখন ছিল তার শোভনা, ছিল শোভনার প্রাণমাতানো হাসিটি, আর ছিল অফুরন্ত গল্প দুজনার। আজও সন্ধ্যা আসে, কিন্তু সেখানে হাসি নেই, গল্প নেই, শোভনাও নেই। ক্লান্ত শরীরে দিনান্তে ফেরে যখন, তখন করণীয় যা কিছু, করে দেয় চাকরে। অনিমেষ শোনে, শোভনা গেছে সুটিংয়ে, না হয় ত কোন মজলিসে। মজলিসের অভাব নেই কিছু। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখন তার মজলিসী। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে নিখিল বিশ্বে না হোক, অখিল সিনেমা-জগতে। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় বাড়ী থাকে শোভনা। সেদিন সে থাকে ব্যস্ত তার পার্টি ও বন্ধুবান্ধবী নিয়ে। অনিমেষের কাছে যখন আসে, তখন হয় সে পড়েছে ঘুমিয়ে, না হয় ও পাশ ফিরেছে ঘুমবার জন্যে। সুতরাং দেখা হয় তাদের কমই।

সেদিন দুপুরে শোভনাকে কাছে পেয়ে ডাক দিল অনিমেষ, একটা কথা আছে, শুনে যেও। অনিমেষের স্বর গম্ভীর কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

শোভনা চকিত হয়। বলে, কিন্তু আমার যে সুটিং আছে। 'বিষের বাঁশী'র সুটিং। বেরোতে হবে এখুনি।

—বেরিও। তোমার বিষের বাঁশীর সময় পাবে অনেক। কিন্তু আমার বিষের জ্বালা সহ্য হচ্ছে না আর।

শোভনা ভ্রুকুটি করে। বলে, হবে না ত কি। সঙ্কীর্ণ মন যেখানে, জ্বালা সেখানে। মনটাকে একটু প্রশস্ত কর। দিনরাত ঘরের কোণে বসে থেকে কুনো হয়ে যেও না। কতবার ত বলেছি তোমায়, আমার সঙ্গে সুটিং দেখতে যাবে চল। সময়ও কাটবে, আনন্দও পাবে।

—তা পাব। তোমার রাসলীলা দেখে শরীর শীতল হয়ে যাবে আমার। জান শোভনা, এখনও এসব অনাচার, কি করে যে সহ্য করছি আমি, পাগল হয়ে যাই নি কেন, ভেবে পাই না।

—পাবেও না ভেবে কোন দিন। সহ্য করতে পারছ এই জন্তে যে তোমার কল্পনাটাই মিথ্যে। এর মধ্যে অনাচার, অবিচার যদি থাকত কিছু, পাগল হয়ে যেতে নিশ্চয়।

—না। পাপী আমি নই, তাই পাগল হয়ে যাই নি। যাবও না।

—বেশ পাপী আমি। কিন্তু পাপী লোককে এ ভাবে আটকে রেখেছ কেন? সবাই আমার জন্তে অপেক্ষা করছে জান?

—না। সে প্রয়োজন আমার নেই। আমার প্রয়োজন শুধু তোমাকে। আর প্রয়োজন একটা কথা জানাতে।

—সে কথা আমি জানি। রোজ রোজ দু'বেলা না জানালেও চলবে তোমার।

—চলত, যদি তোমার মত চোখ বুজে, স্বপ্ন দেখে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি মানুষ, আমার মনুষ্যত্ব আছে, সেগুলি বিসর্জন দিয়ে বসিনি আজও।

শোভনা বোঝে, অনিমেষের কথাগুলি বড় বাঁকা। বলে, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বলি নি আমি। মনুষ্যত্ব বজায় রেখেই কাজ করতে বলি তোমায়।

—কিন্তু আমি স্বামী। তোমায় বিয়ে করেছি শাস্ত্র অনুযায়ী। আমার অভাব আছে, অভিযোগ আছে। সংসারের সুখ দুঃখ, উপভোগ করবার বাসনা আছে। সারাদিন পরের দাসত্ব করে এ-সবের প্রতি উদাসীন থাকি কেন?

শোভনা বলে, সেকথা বলি না আমি। বলি না, পরের দাসত্ব তুমি কর। বরং বলি, চাকরীতে তোমার প্রয়োজন কি? অভাব ত আমাদের কিছু নেই। তবে এ উঞ্ছবৃত্তি কেন?

—কেন? কেন জান? উঞ্ছবৃত্তি করি মনুষ্যত্বের দায়ে। স্ত্রীর উপার্জ্জনের কাছে মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিতে পারি না বলেই এ উঞ্ছবৃত্তি করি।

—তা নয়। আমারটাকে নিজের বলে স্বীকার করতে পারলে না বলেই কর। অন্তরকে সঙ্কুচিত করে রেখেছ বলেই কর।

—হু। অনিমেষ হাসে একটুখানি। উপেক্ষায় হাসি। বলে, আর্টিষ্ট আমি নই। তোমার মত প্রশস্ত উদার অন্তরও আমার নয় যে বিশ্বজনের আসন বিছিয়ে রাখব সেখানে। মধুচক্র সৃষ্টি করব মৌমাছিদের জন্তে। আমার সঙ্কীর্ণ অন্তর। তাই ঠাঁইও সঙ্কীর্ণ। একজনের আঁটে কোনমতে। তার বেশী আর কেউ না।

শোভনার উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে না। দাসু চাকর ছুটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। বলে টেলিফোন ধরা আছে মা। প্রেমেন্দু বাবু। শীগগির।

—প্রেমেন্দু? শোভনা উঠে দাঁড়ায় তড়িৎপদে। অনিমেষকে বলে, তখুনি বলেছিলাম তোমায় সবাই অপেক্ষা করে আছে আমার জন্তে। দেখ ত ডাক পড়েছে এখন। শুনে আসি হুকুমটা কি?

অনিমেষ ভ্রুকুটি করে। নিজের স্ত্রী, চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল পরপুরুষের হুকুম তামিল করতে। এতটুকু সঙ্কোচ হ'ল না স্বামীর সামনে এতখানি বেহায়াপনা দেখাতে। কতদূর অধঃপতন হয়েছে শোভনার। চাকরটা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না তাকে। প্রেমেন্দুর গলা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে খবর দিতে। সে বুঝেছে, অনিমেষের চাইতে প্রেমেন্দুর কদর বেশী এ বাড়ীতে। তার মর্য্যাদা

বেশী শোভনার কাছে। মানব আর ভৃত্যের ব্যবহারে অবাক হয়ে যায় অনিমেষ।

ছবির পর ছবি বেরোচ্ছে শোভনার। বিধবার চরিত্রেও নেমেছে সে। থান কাপড়ে সজ্জিতা তরুণী-বিধবা, নিরাভরণা। হাতের মনিবন্ধ দুটি পর্য্যন্ত খালি তার। সকলের ভালবাসা-বঞ্চিতা, নির্য্যাতিতা মেয়ে। শুধু গোপনে ভালবেসেছে প্রতুলকে। গ্রামেরই ছেলে প্রতুল, স্বদেশী-করা-ছেলে। প্লে করছে শুভেন্দু। এ বেশেও শোভনাকে মানিয়েছে মন্দ না। কিন্তু অনিমেষের সারা শরীরটা ঝি ঝি করে ওঠে। এত সহজে যে শোভনা সিঁথের সিন্দুর ফেলতে পারে মুছে, এ কল্পনা করতে পারে নি সে। প্রেমেন্দুকে নিয়েই সে মাতোয়ারা। তার দিকে দৃষ্টিপাতের সময় কোথায় শোভনার ?

দ্বিতীয় ছবিখানি বিরহিণী প্রিয়ার ছবি !

বিরহিণী নায়িকা শোভনা। তপঃক্লিষ্টা চেহারা তার। বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে ডুবে মরতে যায় পুকুরে। নায়ক প্রেমেন্দু বাঁচায় তাকে। জলসিক্ত তন্বী দেহটি দু'হাতে তুলে নেয় একেবারে বুকের কাছটিতে। এলোচুল জলভারে পড়েছে লুটিয়ে। সিক্ত অসম্বৃত বেশবাস দেহ-সৌন্দর্য্য নগ্ন সৌন্দর্য্যেরই মত সুপরিস্ফুট। দর্শকমহলে হাততালির ধ্বনি ওঠে। টীকা-টিপ্পনীর ফোয়ারা ছোটে। সইতে পারে না অনিমেষ। এ দৃশ্য বুকে হুল ফোটায় তার। সে বেরিয়ে আসে ছুটে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে। সেই মুহূর্ত্তেই মনস্থির করে ফেলে সে। একটা কঠিন সঙ্কল্প ঠোঁট দু'খানির উপর জমাট হয়ে বসে তার। বাড়ী ফেরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে।

সেই দিনই সুটিং শেষ করে ফিরতে রাত হয়ে যায় শোভনার। তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় প্রেমেন্দু। যত্ন করে নামায় গাড়ী থেকে হাত ধরে। তার পর হাতের উপর একটা ইঙ্গিতপূর্ণ চাপ দিয়ে মুচকে হাসে, মুখের দিকে চেয়ে। এ হাসির তাৎপর্য্য বোঝে শোভনা। অন্তরের মধ্যে শিউরে ওঠে সেও। এবার বুঝতে পারে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে তারা।

একদিনের রিহার্সালের ভেতর দিয়ে প্রেমেন্দুকে চিনেছে শোভনা। চোখের তারায় তারায় তার দেখেছে আগুন। বুঝেছে, এ আগুন হোমের নয়। এ আগুন ক্ষুধার। মেয়েদের যে আগুনে ঝলসে ফেলে পুরুষ, এ সেই আগুন, এ আগুনের কাছে নিস্তার নেই তার। একদিন ঝলসে দেবে তাকেও। ঝলসে দেবে তার সারা দেহখানিকে। তার পর সিনেমা আর্টিষ্টদের গতানুগতিক যে পথ, যৌবন ভাঙিয়ে নিজেকে তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন করার যে রীতি, তাই গ্রহণ করতে হবে তাকে।

আজকের নিশীথ-অভিযান যেন চরম অভিযান। চোখ খুলে দিয়েছে শোভনার। যে ঠুলি চোখে পরে এত দিন পথ চলেছিল সে, অনিমেষের নিষেধ শোনে নি, তার সতর্কবাণী শোনে নি, আজ সে ঠুলি পড়েছে খসে। সর্ব্বনাশের রূপ দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। আজকের অভিযানের সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে ছিল প্রেমেন্দু গাড়ীর অন্ধকারের আবরণে। সক্রিয়ও হয়ে উঠেছিল বারকয়েক। পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল শোভনার দেহ-খানিকে সরীসৃপের মত। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল শোভনা। জৈবীর জৈবক্ষুধাকে চিনেছিল বলেই সামলাতে পেরেছিল নিজেকে। কিন্তু একেবারে নয়। যেটুকু আঁচড় লেগেছিল দেহে, তাহাতেই জ্বলে গেছে সে।

শোভনার অন্তরে কাঁপন ধরে। তাকিয়ে দেখে, যে বিশ্বের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে নিঃশেষে, তাকে ঘিরে রয়েছে শত শত প্রেমেন্দুর দল। প্রেতের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করে রয়েছে তারা। এখানে আর্ট নেই, আর্টিষ্ট নেই, মান নেই, সম্মান নেই। এখানে শাশ্বত শুধু ঐ জৈবক্ষুধা। এখানে আছে মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি, তার দেহ-রহস্য নিয়ে জানাজানি। আঘাত খায় শোভনা মনের গভীরে। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে ঢোকে সে বাড়ীর মধ্যে। আজ সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার।

এতক্ষণে মনে পড়ে অনিমেষকে, মনে পড়ে তার সতর্কবাণীকে। আজ বুঝেছে সে মর্ম্মে মর্ম্মে, পৃথিবীতে মেয়েদের ভরসাস্থল একমাত্র স্বামী। তার মান-সম্মানের রক্ষাকর্ত্তা তিনিই। শোভনার চোখ ফেটে জল এল বেরিয়ে। কত দুঃখই না দিয়েছে অনিমেষকে, কত হেনস্থাই না করেছে তাকে বিশ্ববিজয়িনী হবার দুরাশায়। আজ তার দুঃখের সঙ্গী হবার যোগ্যতা যদি কারও থাকে ত আছে তারই, চোখের তপ্ত অশ্রুজলে মোছাবার ক্ষমতাও আছে তারই। শোভনা ছোটে অনিমেষের ঘরের দিকে। ছাদের এক পাশে ছোট ঘর। স্ত্রীর পাশ থেকে সেদিন নিঃশব্দে সরে এসে এই ঘরখানিই বেছে নিয়েছিল অনিমেষ। অত রাত্রেও আলো জ্বলছিল ঘরের ভেতর। শোভনা এসে ঢোকে ঘরে। শূন্য ঘর, অনিমেষ নাই। টেবিলের উপর খোলা খাতাখানা পড়ে আছে তার। মনে হয়, লিখতে লিখতে কোথায় যেন উঠে গিয়েছে সে। বিস্মিত হয় শোভনা। এগিয়ে আসে টেবিলের ধারে। খাতাখানির উপর চোখ বুলোয় সে। তারপর পড়ে যায় বিস্ফারিত নেত্রে।

শোভা, মত আর পথের বিরোধে জীবন আজ দুর্ব্বহ। আজ আমার মত তোমার মত নয়, তোমার পথ আমারও পথ নয়। তাই তোমায় দিলাম মুক্তি, আমিও নিলাম মুক্তি। বেলুড়ের পথ ঘুরে আমি যাব আলমোড়ায়। সেই পথই জীবনে দেবে আমায় শান্তি। তোমার বাড়ী রইল, গাড়ী রইল। এদের উপর লোভ আমার নেই। মোহও গেছে কেটে। আর তুমি ! তোমার উপর—হ্যাঁ তোমার উপরও মোহ আমার কেটে গেছে। সেখানেও আজ আমি নির্লোভী। একটু আগেও তুমি আমায় আকর্ষণ করেছিলে, পিছু টেনেছিলে। তোমার ঐ অনুপম মুখ, হরিণ-কালো চোখ, কুসুম-কোমল বাহু আকর্ষণ করছিল আমাকে সবলে। কিন্তু সে দুর্ব্বার মোহকেও কাটিয়ে উঠেছি আমি। ইন্দ্রিয়জিত মহাপুরুষ এখনও হয়ে উঠতে পারি নি বটে, তবে মোহমুক্ত হয়েছি নিঃসন্দেহে। তাই পিছু দিকে তাকাব না আর। তোমার পথ বিশ্বের মাঝে নিজেকে

ছড়িয়ে দেওয়ার পথ—তোমায় যদি সুখ দেয়, শান্তি দেয়, আমি সুখী হব। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে তোমায় মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করব। বিদায়।

—অনিমেষ

ভয়ে কাঠ হয়ে যায় শোভনা। মুখ সাদা হয়ে উঠে, একি রূঢ় আঘাত! বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকে সে চিঠিখানার দিকে অপলকে। এই একখানা চিঠি সব শক্তি হরণ করে নেয় তার। এত যে অহঙ্কার, এত যে দর্প শোভনার, সব অন্তর্হিত হয়ে যায় নিমেষে, অনিমেষের সঙ্গে সঙ্গে। মনের সকল জোর সে ফেলল হারিয়ে। ঐ একটি মাত্র লোকই যে ছিল তার শক্তির উৎস, এতক্ষণে বুঝল শোভনা। ওরই ভরসায় সে চেয়েছিল নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে বিশ্বে। এত সাহস সে পায় নি প্রেমেন্দুর কাছে, পেয়েছিল শুধু অনিমেষের কাছে। শোভনা সইতে পারে না। তীরের মত বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে।

—বাবু কোথায় দাসু? শোভনা প্রশ্ন করে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে।

দাসু বিস্মিত হয়। বলে, বাবু ত বেরিয়ে গেলেন মা আপনারই পাশ ঘেঁষে, যখন নামলেন আপনি মোটর থেকে।

শোভনা ঘেমে উঠে। বলে, বেরিয়ে গেলেন! আমার পাশ ঘেঁষে! আর তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে হাঁ করে? বাধা দিতে পার নি? বলতে পার নি আমায়? জংলীভূত কোথাকার সব। শোভনা ছুড়ে ফেলে দেয় হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ। দামী বেশভূষা সব ছুড়ে ফেলে দেয় মেঝের উপর। আর্ত্তকণ্ঠে ডেকে উঠে, শোফার গাড়ী বের কর, বেলুড় যাব আমি, জলদি, সে দাঁড়ায় না। অস্থির পদে বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। ঝড়ের বেগে নামতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। আজ সে উন্মাদিনী, মনের আবেগে বলতে থাকে, আমি বাড়ী চাই না, গাড়ী চাই না। চাই শুধু তোমায় ফিরে পেতে, আবার তেমনি করে। বিশ্ববিজয়িনী হবার মোহ কেটে গেছে আমার। তুমি ফিরে এস, ওগো আর একটিবার। আমি হাসিমুখে মাথা পেতে নেব তোমার দেওয়া সব শাস্তি। হঠাৎ শোভনা থমকে পড়ে। চমকে উঠে বলে, এ আমি করছি কি? মোটরে আমার প্রয়োজন নেই আর। আমি চিত্রতারকা শোভনা নই, আমি শোভা, আমি হেঁটে যাব তার কাছে।

তোমার দেওয়া সব শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব হাসিমুখে। হঠাৎ শোভনা থমকে পড়ে। শিউরে উঠে বলে, এ আমি করতে চলেছি কি? আমি শোভনা নই, আমি শোভা। চিত্রতারকা শোভনা গেছে মরে। শোভা বেঁচে উঠেছে। শোভার মোটর নেই, শোভা যাবে হেঁটে। সমস্ত পথই হেঁটে যাবে বেলুড়ে। শোফার গাড়ী ফেরাও। আমায় হাঁটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চল তুমি। এই হার তোমার পুরস্কার। বলতে বলতে শোভনা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

দাসু চেঁচিয়ে উঠে, মা যে একলা বেরিয়ে গেল শোফার। চল, চল, শীগগির চল। বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে শোভনার পিছু পিছু ছুটে চলে সেও।

গান

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

তোমার বজ্রমাণিক জ্বালো।
মোর জীবনের স্বপন-পথে
ঘনায় তিমির কালো।
নামলো ছায়া আঁখির 'পরে
এই ভুবনের স্তরে স্তরে,
তুমি এসে দাঁড়াও হেসে
অন্ধকারের আলো।

বজ্রমাণিক জ্বালো।
কোন কালবৈশাখী ঝড়ে
প্রদীপ আমার নিবলো ঘরে
নিবলো ঘরে রে—
ভাঙা দেউলের স্বর্ণ-চূড়ায় রে
নামলো ছায়া কালো।
তোমার বজ্রমাণিক আলো।

তোপচাঁচি হ্রদ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

আজকে ভোরে ভাবছি যখন এখন দাঁড়ি গোঁফ চাঁচি,
এমন সময় খেয়াল হ'ল দেখতে যাব 'তোপচাঁচি'।
রূপলালকে ডেকে বাধা পাঠাল মোর সঙ্গেতে,
পৌষের শীত, 'তুষের র্যাপার' জড়াই সারা অঙ্গেতে।
'বাটা'র চটি পায়ে দিয়ে, গায়ে দিয়ে পাঞ্জাবী
হন্‌হনিয়ে ছুটে চলি, করবে না কেউ প্রাণ দাবী!
গোমো থেকে চার মাইল পথ গেলাম ছুটে একটানা,
তিন বস্তি পেরিয়ে পেলাম 'ঝরিয়া-জলের কারখানা'।

২

খেস্‌মি, ভুইয়া চিতরো এবং নর্‌কোপী, কী নামগুলো!
মাটির দেওয়াল, খাপ্‌রা-ছাওয়া তক্‌তকে সব ধামগুলো।
মানুষগুলো বেজায় কালো, দেখলে রাতে চমকাবো!
সুন্দরী, হায়, একটিও নেই – তাই ধাতাকে ধমকাবো।
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সুন্দর খুব, দুই পাশে গাছ, পিচঢালা;
রাঙামাটির দেশ বটে এই, নেইকো নদী, নেই নালা!
ঢেউ-তোলা এই রাস্তা দিয়ে ছুটছে মোটর নির্ভয়ে,
শের শাহের এই কীর্ত্তি মহান্‌ দেখছি বিপুল বিস্ময়ে।

৩

এখান থেকে কোলকাতা ঠিক পঁচানব্বই ক্রোশ দূরে,
বীর নেতাজীর হেথায় আসা – ভাবলে মাথা যায় ঘুরে!
ছায়াচ্ছন্ন পথে গেলাম দেখতে বিশাল হ্রদটিকে,
কি সুন্দর কি মনোরম, পাহাড় তাহার চারদিকে!
আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হ্রদ সবদিকেতেই বেষ্টিত,
দেড় ক্রোশ তা লম্বা হবেই, প্রাণ হ'ল খুব নন্দিত।
গাছ-গাছড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম খুব আহ্লাদে,
মত্ত হলাম ফুলপরীদের আনাগোনার সংবাদে!

৪

উচিত ছিল হেথায় আসা মোর জীবনের প্রাক্‌কালে!
ছিল যখন রূপ-যৌবন, জড়াইনিকো জঞ্জালে!
দেখতাম যবে দিবাস্বপন আমার ভরা-যৌবনে!
মন্‌-মধুপে লুটত মধু রূপের শোভন মৌ-বনে!—
হ্রদের ধারে বন্‌ভোজনের দেখে এলাম ব্যস্ততা,
মৈত্রেয় এক জায়া-পতির বন্ধ বাঘের ত্রস্ততা।
রেডিওর গান শুনতে পেলাম উত্তরের ওই চত্বরে,
সঙ্গে আনা জলখাবার খাই জলের ধারে সত্বরে।

৫

হ্রদের ভেতর দ্বীপের ওপর বড়ই ভাল বাংলোটা।
আমার চোখে দেখতে ওটা—শ্বেত পদ্মফুল ফোটা!
দ্বীপটা উঁচু টিলার মত; মেতে উঠি দর্শনে;—
প্রাণটা তখন উঠল কেঁদে অতীত স্মৃতির পর্শনে!
ছোট্ট ছোট্ট পাঁচটি কোঠার বারান্দাটি সম্মুখে,
একটি কোঠার ভেতর দিয়ে আরেকটিতে যাই ঢুকে
এ ইজীবনে ভুলব না রে কাশ্মীরী এই রূপরাশি!
হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পেলে হেথায় হতাম সন্ন্যাসী।

৬

ফরিদপুরের পালং গাঁয়ের এই এক তরুণ দম্পতী
'মধুচন্দ্র' করতে বুঝি বেরিয়ে এল সম্প্রতি।
মনোমোহন মধুর আনন, সুশ্রী শোভন সুন্দরী!
শাড়ীর ওপর লম্বা কোটে ঠেকছিল ঠিক অপ্সরী!
সিঁথায় সিঁদুর, নিটোল কপোল, নিদ্রালু চোখ, গোল মাথা,
পথের দুটি বন্ধু আমার রয় কালীঘাট কোলকাতা।
নাম-ঠিকানা টুকল হেসে তরুণ যুবক বন্ধুটি,
আর পাব না তাদের দেখা, দেখছি যমের ভিরুকুটি!

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
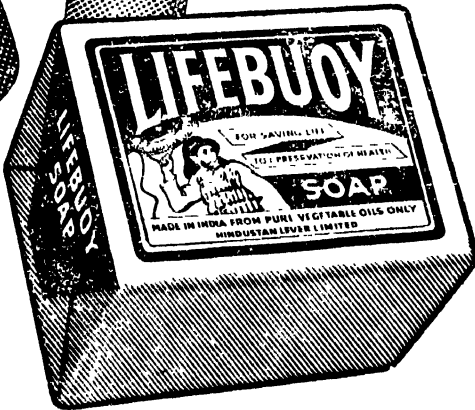
প্রবালের স্বপ্ন

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রবাল সাগরে নারকোল পাতা ছায়া ফেলে ফেলে দোলে :
এ ছবি দেখবো ব'লে
মনে মনে কতো রং বুলিয়েছি
দখিন সাগরে ডুব দিয়ে গেছি ;
ঝিনুক কোড়ানো লঘু লাবণ্য নেই যার কোনো মানে
ফেলে গেছি কোনখানে।
বলেছি, "আমায় খুঁজে দিতে পারো হারানো ঝিনুকখানা ?"
ছোটো হাতখানা ধীরে নেড়ে তুমি আড়ালে করেছো মানা ;
"হারানো-মাণিক হারিয়ে যাওয়াই ভালো।
দেখোত আমার এই দুটো চোখে কতো সাগরের কালো।
মন-ভরা দেখো কতো ঝিনুকের আলো।"
ভরাতে পারে নি ছোটো সে মানার দাবি,
অনেক দিনের বাসনার ঘায়ে ভেঙেছি ঘরের চাবী।
দুধারে আমার শৈলচূড়ার নিবিড় আলিঙ্গন ;
মাঝে একফালি বিজন বালির বন।
করবীর দলে রক্ত লেগেছে, জবায় লেগেছে দোল,
বাতাসে কিসের জোয়ার লেগেছে অস্থির কলরোল।
কে যেন জ্বেলেছে কুমারী মনেতে দীপ,
আঁচলে মালার উপচার আর মাথায় রক্তটিপ।
মনহরণিয়া রূপে
ভোলাতে চেয়েছে, ডোবাতে চেয়েছে অন্ধকারের কূপে।
ভুলি নি, ভুলি নি, ভুলবোনা রূপ দেখে
বারবার তুমি ভুলিয়ে রেখেছো বঞ্চনা সুরা মেখে।
তোমার রূপের মোহের কাজল,
কতো সংসারে ভেঙেছে আগল,
কতো আফ্রিকা ভারত আরব সন্তান গেছে বলি ;
তোমার বুকেতে কতো শতাব্দী ঢেলে গেছে অঞ্জলি।

প্রজনন তার কাঁদে,
পথে মাঠে আর কলোনীর ক্লেদে পড়েছে কঠিন ফাঁদে।
অতো সুন্দর নও তুমি নও বীভৎসা বিভীষণা ;
মানুষকে ক'রে নৌতস্কর
বর্বর রোষে করেছো প্রখর,
যুগের উপর যুগের পিপাসা বাড়িয়েছে বঞ্চনা।
কতো সীতা, রাম হারালো রাবণ-দেশে ;
কতো শৈব্যার রোহিতাশ গেলো তোমার সাগরে ভেসে ;
কতো বিধবার কাঁদা,
দেশ-হারা কতো ধনঞ্জয়ের বনে বনে বাসা বাঁধা।
আজও দেখি ঘরে ঘরে
তোমার মোহিনী পেয়ালার বিষে কারা তালু ফেটে মরে।
কালোর জীবন কালোতর করে চিনির মিঠেল সুরা,
উত্তেজনায় তুঙ্গ করেছে শ্বেতদ্বীপের চূড়া।
লাগলো না সখি ভালো,
প্রবালদ্বীপের স্বপ্নবাসবদত্তা জ্বালেনি আলো।
বালুর বনেতে বাসক করবী কাঁদে,
লাসের আঘাতে নীগ্রোর স্বপ্ন ভরেছে আর্ত্তনাদে।
পরাহত মন ভাগ্য মথিত ক্ষোভে,
দেখেছে বারাঙ্গনার বক্ষ কাঁপে কুমারের লোভে।
প্রবালদ্বীপেতে ভাই,
কতো কুমারের কমল পিপাসা পুড়ে হয়ে গেলো ছাই।
এ নীল-সবুজ হলাহল আর হিংসার প্রতিকৃতি
এতে নেই স্বীকৃতি
মানুষ মনের, মানুষ ধনের,
মানুষের কোনো সোন-স্বপ্নের
কোনো ছিঁটে ফোঁটা সম্ভাবনার এতোটুকু পরিণাম ;
এখানে জীবন বিষের ধোঁয়ায় ঝরিয়েছে শুধু ঘাম।
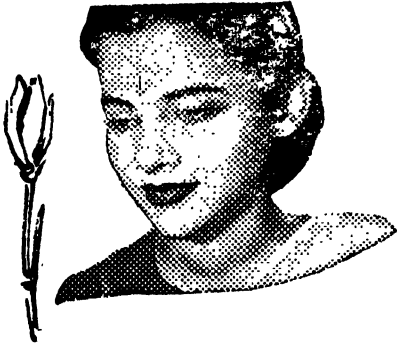
চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন

চেকোশ্লোভাকিয়ায় দু'জন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের নাম বিশেষ করে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে একজন হলেন আচার্য্য ভিন্‌সেন্‌চ লেস্‌নি। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ চেক-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রী-বন্ধনকে অনেক দিন আগেই দৃঢ় করে তুলেছিল। তা ছাড়া, বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন সম্পর্কে

লেখা লেস্‌নির বইগুলিও সারা ইউরোপে সমাদৃত। বাংলাদেশে আমরা লেস্‌নিকে প্রধানতঃ রবীন্দ্রকাব্যের চেক-অনুবাদক বলে জানি; কিন্তু তিনি সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার আর একজন বিশ্ব-বিশ্রুত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হলেন আচার্য্য বেদ্‌রিখ্ রজনি। হিটাইট লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এশিয়া-মাইনর, ভারতবর্ষ ও ক্রীটের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-অনুশীলনগুলি প্রাচ্যতত্ত্ব অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক অতি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। বৈদিক ভারত সম্পর্কে রজনির নিবন্ধগুলি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে বিশেষ মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃত।

"এঁরা দুজনে এবং আরও কয়েকজন সুবিখ্যাত চেকোশ্লোভাক প্রাচ্যবিজ্ঞানী প্রাগের প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের সঙ্গে একেবারে গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট। এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদের গবেষণা-অনুশীলনের মারফতে—বিশেষতঃ আচার্য্য লেস্‌নি, আচার্য্য রজনি এবং ডক্টর জোসেফ জুবাতির প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হতে থাকার ফলে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের কর্ম্মী-গবেষকরা স্থির করেন যে, এখন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো। কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি গবেষণার কাজ চালানো হবে, সে সম্পর্কে পাঁচ বছরব্যাপী এক-একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতে থাকে। সেই সঙ্গে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান-পরিষদের সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয় তার একটি অঙ্গ হিসাবে। তা ছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে এর আর্থিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। চলতি পাঁচসালা গবেষণা-পরিকল্পনাটিতে প্রধানতঃ জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ও পূর্ব্ব-এশিয়ার দেশগুলির সাম্প্রতিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে। বর্ত্তমানে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের পরিচালক হিসাবে আছেন বিখ্যাত চীনতত্ত্ববিদ আচার্য্য ইয়ারোস্লাভ প্রুসেক।

প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের গবেষণার কাজকর্ম্ম চারটি বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব-এশিয়া বিভাগের অন্তর্ভুক্ত চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত অনুশীলন। দ্বিতীয় বিভাগটির কাজ পুরো-পুরি ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত। তৃতীয় বিভাগটির কর্ম্মীরা পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে গবেষণা করেন। আরব, তুরস্ক আর ইরাণ সম্বন্ধে গবেষণার কাজ চতুর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মিশরতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার কাজের আলাদা একটি নিজস্ব বিভাগ চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে আছে বলে এই বিষয়টিকে প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের অঙ্গীভূত করা হয় নি।

প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের সমস্ত গবেষণা-অনুশীলনই হয় গ্রন্থাকারে আর না-হয় প্রতিষ্ঠানের দুটি মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দুটির মধ্যে একটি হ'ল "ওরিয়েন্টাল আর্কাইভস"—যাতে প্রধানতঃ পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য-দর্শন—ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। আর একটি পত্রিকা "নিউ ওরিয়েন্ট"-এ প্রকাশিত হয় প্রধানতঃ আধুনিক ও সাম্প্রতিক নানা বিষয়ের আলোচনা। এই পত্রিকাটি ১৯৪৫ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং আচার্য্য লেসনির উদ্যোগেই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভিন্‌সেন্‌চ লেসনিই ছাত্রদের বিভিন্ন প্রাচ্যদেশের ভাষা শিক্ষার জন্তে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের শাখা হিসাবে "স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গোয়েজস" প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগে বর্ত্তমানে শেখানো হয় বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ফার্সী, তামিল, চীনা, তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয়, (খালখা), বর্ম্মী, আর্ম্মেনীয়, সোয়াহিলি, প্রাচীন আরবী, মিশর-আরবী, মরক্কো-আরবী, আধুনিক হিব্রু, তুর্কী, ভিয়েৎনামী ও জর্জ্জীয়ান—এই আঠারটি প্রাচ্য ভাষা। এই সব ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান আর পাঠ্যপুস্তকও প্রাচ্যবিদ্যাভবন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এই সব দেশের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের মোটামুটি একটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে বিভিন্ন নাতিবৃহৎ পুস্তকমালা। প্রাচ্যবিদ্যাভবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখা হ'ল—প্রাচ্য-সঙ্গীত-বিভাগ। এখানে শুধু প্রাচ্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা-অনুশীলনই করা হয় না, গানও শেখানো হয়। এখানে একটি ঘরে সমস্ত রকমের প্রাচ্য বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং এই বিভাগের আধুনিক ও মার্গ প্রাচ্য-সঙ্গীতের গ্রামোফোন-রেকর্ডের সংগ্রহও খুব সমৃদ্ধ। আচার্য্য লেসনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের বহু রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলিও এখানে রাখা আছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের গ্রন্থাগার ও পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ। সাধারণ গ্রন্থাগারটির বইয়ের সংখ্যা হ'ল ২০ হাজারেরও বেশি এবং "লু-সুন গ্রন্থাগার" নামে শুধু চীন দেশ ও চীনতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি আলাদা গ্রন্থাগার আছে, যেখানকার বইয়ের সংখ্যা হ'ল ৪৫ হাজারেরও বেশি। এই "লু সুন গ্রন্থাগার"টি বর্ত্তমানে মধ্য-ইউরোপের বৃহত্তম চীনতত্ত্ব সম্পর্কিত লাইব্রেরী। প্রতি বছরে এই দুটি গ্রন্থাগার থেকে ৮ হাজারের মত বই বাইরের পাঠক-পাঠিকারা ধার নিয়ে থাকেন।—এর থেকে বোঝা যাবে, প্রাচ্য দেশগুলির শিল্প-সঙ্গীত, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে চেকোস্লোভাক জনসাধারণের আগ্রহ কত গভীর!

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে আচার্য্য বেদ্‌রিখ রজনি, আচার্য্য ভিন্‌সেন্‌চ লেসনি এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর ওল্‌দ্রিখ ফ্রিসয়েষ মৃত্যুর ফলে এই প্রাচ্যবিদ্যাভবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বর্ত্তমানে যেসব চেকোস্লোভাক পণ্ডিত এখানে গবেষণা-অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে মিশরতত্ত্ববিদ আচার্য্য ফ্রান্তিচেক লেক্সা, প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের পরিচালক চীনতত্ত্ববিদ ইয়ারোস্লাভ প্রুসেক, প্রাচ্যভাষা-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফেলিক্স তাউয়ের, ডক্টর পাভেল পুশা, আচার্য্য জান রিপকা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মূহুর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়

S 254 A X52 BG

উপনিষদের গল্প

শ্রীমণি চক্রবর্ত্তী

উপনিষদগুলিতে অনেক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাষ্যকারেরা আখ্যায়িকাগুলির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য লইয়া তত্ত্বগত আলোচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত আলোচনা উপনিষদগ্রন্থসমূহের তত্ত্বার্থজিজ্ঞাসু সকলেরই প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিছক প্রাচীন ইতিহাস লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই আখ্যায়িকাগুলি প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিকেও আলোকপাত করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সংস্কারের গোঁড়ামি পরিহারপূর্বক যদি আখ্যায়িকাগুলির আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বহু অজ্ঞাত বা অর্দ্ধজ্ঞাত ঘটনা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেনোপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত আখ্যায়িকাটি লইয়াই আলোচনা করা হইবে।

কেনোপনিষদ গ্রন্থটি চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ছন্দোবদ্ধ, আর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড গদ্যে নিবদ্ধ। ছন্দোবদ্ধ অংশে পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। গদ্যাংশেই আলোচ্যমান আখ্যায়িকাটি মিলে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই পদ্যাংশ ও গদ্যাংশের মধ্যে গদ্যাংশই প্রাচীনতর। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের এই অভিমত নিছক কথার কথা নয়, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতে পারে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আখ্যায়িকাটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়। দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতারা যে জয়ী হইলেন তাহা মূলত ব্রহ্মেরই কৃপায়; কিন্তু দেবতারা তাহা জানলেন না।

তাঁহারা ভাবিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যেই তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মিথ্যাভিমান জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্ম দেবতাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা স্থির করিলেন। নিজেদের মাহাত্ম্যগৌরবে দৃপ্ত দেবতারা বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহারা দূরে কোনও অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যক্তি-বিশেষকে দেখিতে পাইলেন। পূজ্য ব্যক্তিটিকে জানিবার জন্য তাঁহাদের খুবই ঔৎসুক্য। এই বিষয়ে সম্যক্ অবগত হইবার জন্য অগ্নিকে পাঠান হইল।

অগ্নি সেই দীপ্তিময় পুরুষের কাছে গেলে তিনিই অগ্নির নিকট হইতে তাহার নাম, পরিচয় ও ক্ষমতা কতটুকু তাহা জানিতে চাহিলেন। জাতবেদা তাঁহার নিজের পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু দগ্ধ করার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অগ্নির শক্তি পরীক্ষার জন্য সেই অচেনা পুরুষ অগ্নিরই সম্মুখে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া দগ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু অগ্নি সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও দগ্ধ করিতে পরিলেন না। ফিরিয়া গিয়া অগ্নি তাঁহার অন্য দেবতা বন্ধুদের কাছে সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

তার পর বায়ু দেবতার পালা। সেই অচেনা ব্যক্তিটির কাছে যাইয়া তিনি যথাপূর্ব নিজের পরিচয় দিলে তাঁহাকেও একখণ্ড তৃণ দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার সমস্ত ব্যয় করিয়াও তাহা উড়াইতে সক্ষম হইলেন না।

অবশেষে ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই অপূর্ব-দর্শন ব্যক্তিটি চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র কিন্তু ফিরিয়া গেলেন না। সেইখানেই অতি-সুশোভনা স্ত্রীরূপিণী উমাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উমার মুখ হইতে সেই অপূর্ব-দর্শন ব্যক্তিটির পরিচয় জানিতে পারিলেন। তিনিই যে ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অনুগ্রহে যে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের বিজয় ঘটিয়াছে—এই সমস্ত কথাই সেই স্ত্রীরূপিণী উমা হৈমবতী তাঁহার নিকট বলিলেন।

মূল আখ্যায়িকাটির এইখানেই পরিসমাপ্তি। অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র কি করিয়া অন্য দেবতাগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন—আখ্যানের শেষাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। দেবতাদের মধ্যে তাঁহারাই প্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। এই কথাও বলা হইয়াছে যে, যেহেতু ইন্দ্র সর্বাগ্রণী হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য ইন্দ্রের আসন সকল দেবতার উপরে। তিনি দেবরাজ। স্মরণ রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র বৈদিক যুগেই ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে দেখি। পরবর্তী যুগে দেবরাজ পদবী ছাড়া তাঁহার সেই প্রাধান্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৎসরের কোন্ সময়ে ইন্দ্রপূজা হয় তাহা সাধারণ লোকের ত দূরের কথা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বোধ হয় অনেক সময়েই মনে থাকে না। আজ ইন্দ্র নামেমাত্র রাজা, তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি কি ভাবে ঘটিল, তৎসম্পর্কে পৃথক আলোচনা চলিতে পারে।

সর্বশেষে আখ্যায়িকাটিতে ব্রহ্মতত্ত্বের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ব্রহ্ম কিরূপ? চমকিত বিদ্যুৎপ্রভার মত ব্রহ্মের স্বরূপ, চক্ষুর যে নিমেষ হইল, ব্রহ্ম সেইরূপ। বিদ্যুতের প্রকাশ যেমন যুগপৎ বিশ্বব্যাপী, ব্রহ্ম তেমন নিরতিশয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ। চক্ষুর নিমেষ যেমন দ্রুত হইয়া থাকে, উক্ত ব্রহ্মও স্বীয় ঐশ্বর্য সহকারে তেমন ক্ষিপ্রভাবে সৃষ্ট্যাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমার মনও উক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করিয়া বর্ত্তমান আছে, আমার মনের সঙ্কল্প ব্রহ্মবিষয়েই হইতেছে—এইরূপ চিন্তনের দ্বারাই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। সকল প্রাণিসমূহের সম্ভজনীয়রূপে যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি সকল লোকের সম্ভজনীয় হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মবিষয়ক পরাবিদ্যা। তপস্যা, দম ও কর্ম—উক্ত পরাবিদ্যার পাদস্বরূপ, বেদসমূহ তাহার বিবিধ অঙ্গ, সত্যই হইল তাহার আধার—এই ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিলে পাপ জয় করিয়া পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

উপনিষদের এই আখ্যায়িকাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীশঙ্করাচার্য প্রমুখ টীকাকারেরা তাঁহাদের রচিত ভাষ্য-টীকাদিতে তদ্বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলিয়া ব্রহ্ম নাই—এইরূপ সম্ভাব্য ভ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই আখ্যায়িকা। এই যে ব্রহ্ম তিনি দেবতাদেরও নিয়ন্তা। তিনি দুর্বিজ্ঞেয়। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের জয় ও অসুরদের পরাজয় তাঁহার জন্যই হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করাই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যার অভাবে প্রাণিবর্গের কর্তৃত্বাভিমানরূপ মিথ্যাভিমান ঘটিয়া থাকে। টীকাকারদের মতে ইন্দ্র ফিরিয়া না আসিয়া ব্রহ্মকে জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল ঔৎসুক্যই প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভক্তির জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতীরূপে দর্শন দিলেন এবং ইন্দ্রের মিথ্যাভিমান দূর করিলেন। সংক্ষেপে টীকাকারদের বক্তব্য উক্তরূপ।

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত নাতিদীর্ঘ এই আখ্যায়িকা-

টিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশে ঘটনা-বিশেষের বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে আখ্যায়িকাটির সাধারণ ব্যাখ্যা ও তৃতীয় অংশে তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা। ভাষ্যকারদের যুগে যেমন আখ্যায়িকার তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তেমন প্রয়াস আমরা উপনিষদের যুগে আখ্যায়িকার মধ্যেই দেখিতে পাই। আজও এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। আখ্যায়িকাটির মধ্যে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রম বিবর্তনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লুকায়িত আছে। ভারতের ইতিহাসে কত কত দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিভাবেই বা দেবতারা আসিলেন সেই ইতিহাস আজও সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হয় নাই। মানুষের জীবনের উত্থান-পতনের মত দেবতাদেরও উত্থান-পতন দেখিতে পাই। বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের স্থান আজ কোথায়? কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল দেবতাদের রূপের অদ্ভুত পরিবর্তন, এমন পরিবর্তন যে, চেনাই দুষ্কর। বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে পৌরাণিক বিষ্ণুর সাদৃশ্যই বা কতটুকু? পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সমস্ত বিষয় দেখিবার প্রয়াস করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অন্ধ অনুসরণের কথা আমি বলি না। তাঁহাদের বক্তব্যের সঙ্গে মূলগ্রন্থ ও টীকাকারদের বক্তব্যের বিচার করিয়াই আমরা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। সত্যই হইবে একমাত্র আশ্রয়। 'সত্যমায়তনম্'—সত্য যে ব্রহ্মবিদ্যার নিবাসস্থল—এই কথাই আমাদের মনে থাকে না। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের দেশের পণ্ডিত-বর্গের একাংশ নিজেদের গোঁড়ামির জন্য সত্যকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সকলের জানিয়া রাখা দরকার যে, ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকবাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিশেষ যুগের চিন্তানায়কদের অবদান রহিয়াছে। কোন্ ফাঁক দিয়া ব্রহ্ম ও পরলোকের আবির্ভাব ঘটিল, সমাজের কি প্রয়োজনেই বা ইহারা আত্মপ্রকাশ করিল—সেই অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করা গবেষকদের অন্যতম কাজ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন কারণ ছাড়া কোন কিছুই হয় না। অভিধানকার যখন লিখিলেন—দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে—তাহারও একটা কারণ আছে, শুধু এই কথাটির মধ্যে বুদ্ধোত্তর ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় লুকানো আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যানভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিবিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বারান্তরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। 'উমা হৈমবতী' কে এবং তাঁহাকে কেনই বা আনা হইল, তাহাও পৃথক ভাবে আলোচনার যোগ্য।

আলোচ্যমান আখ্যায়িকাটিতে আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে, বৈদিক যুগে দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব অনেককাল পরে ঘটিয়াছিল। বহু দেবতার কথা হইতে কি ভাবে 'ব্রহ্মৈব কেবলম্' ভাবের উৎপত্তি, বহু দেবতার স্থলে কি ভাবে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি তাহা লক্ষণীয়। স্ব-স্ব-প্রধান ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হবিঃ প্রদানের রেওয়াজ ছাড়িয়া ব্রহ্মধ্যানের পদ্ধতি কিভাবে আসিল এবং তৎপরবর্তী কালে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের কথাই কেন উচ্চারিত হইল, তাহা কি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? প্রবীণ পণ্ডিতবর্গের অনেকেরই ধারণা, 'ব্রহ্মবাদ' অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, এমনকি ঋগ্বেদেরও প্রাচীনতম অংশে Absolute অর্থাৎ 'পরব্রহ্ম' অর্থে ব্রহ্মের সন্ধান মিলে। তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি স্ব-স্ব-প্রধান দেবতার মিথ্যাজ্ঞান—মিথ্যাভিমানের কথা আখ্যায়িকাটিতে বলা হইল কেন? নানা কারণে সত্যার্থ উপলব্ধিতে আমাদের অসুবিধা ঘটে। গোঁড়ামির জন্য এক দিকে আমরা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই সকল গ্রন্থের পৌর্বাপর্য্য ধরিতে পারি না, অপর দিকে কি জন্যই বা সংহিতাখণ্ডের যে যে অংশ অর্বাচীন বলিয়া পরিগণিত, তাহাতেও অনেক সময়ে প্রাচীন ভাব-ধারার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সূক্তগুলি রচিত হইবার অনেক পরে সংহিতার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারই জন্য হয়ত সুপ্রাচীন বলিয়া পরিগণিত অংশগুলিতেও নবীন ধারণার আভাস মিলিতে পারে। Absolute বা পরব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মের সন্ধান ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে পাই না। ব্রহ্ম কথাটির দুই রকম অর্থ প্রাচীন অংশে দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্বরসংস্থান বিচার করিয়া আমরা অর্থের খোঁজ পাই। দুইটি অর্থের মধ্যে একটি prayer বা স্তোতা ও অপরটি prayer বা স্তোত্র। উপসংহারে বলিতে চাই—স্ব-স্ব প্রধান দেবতার কথা—যাহাকে Maxmuler Henotheism আখ্যা দিয়াছেন তাহার স্থলে সর্বোপরি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এই আখ্যায়িকাটিতে পাওয়া যায়।
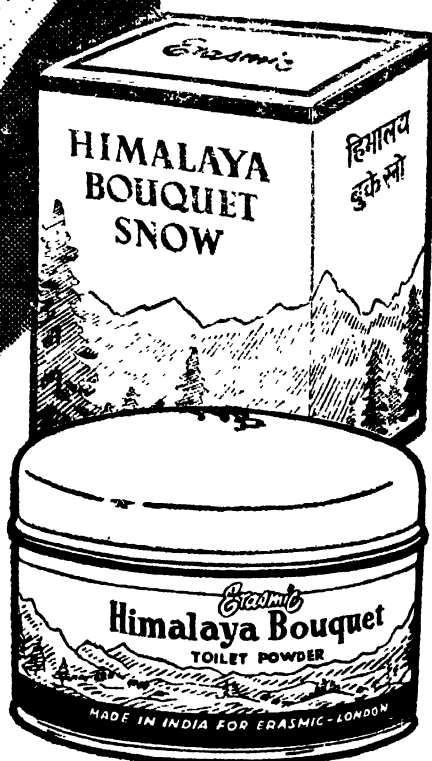
বাংলার নব্যসংস্কৃতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক বিশ্বভারতী। মূল্য ১·৪০ টাকা।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রারম্ভে যে নিবীর্য্য নিষ্ক্রিয়তা ভারতবর্ষীয়দের সামগ্রিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার বিলুপ্তিসাধন—কথা হ'ল উনিশ শতকের বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের কাহিনী। সে কাহিনী কথনের অর্থই হ'ল বাংলার নব্যসংস্কৃতির কথা বলা। আলোচ্য গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব 'সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এই সব বিষয়ের সঙ্গে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, এই ধরণের 'সভাসমিতি' এদেশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, জ্ঞান, বিজ্ঞানবিষয়ক উন্নতিবিধানে যত্নবান হয়েছিল তাদের কথাই আলোচিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বাঙালী-জীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভাসমিতির অপরিমেয় প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য্য। এই যুগের প্রধান প্রধান সভাসমিতির তথ্য লেখক সশ্রদ্ধ গবেষণায় উদ্ঘাটিত করে আলোচ্য গ্রন্থে রসিকসমাজকে নিবেদন করেছেন। গ্রন্থের পরিমিত প্রসারে গ্রন্থকার ধর্ম্ম ও রাজনীতিভিত্তিক সভাসমিতিগুলির আলোচনা করেন নি। 'ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কয়েকটি সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠানের' আলোচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নি। এই অসন্নিবেশ গ্রন্থকার অভিপ্রেত, এ কথা আমরা পুস্তকের 'পূর্ব্বাভাসেই' জেনেছি।

লেখক গ্রন্থটিতে কিঞ্চিদধিক বিংশতিটি সভার কথা আলোচনা করেছেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এবং তৎপরে বঙ্গভাষার মধ্যস্থতায় কেমন করে বাঙালীর ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবন ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোয় ভাস্বর করে তোলা যায়, তা ছিল এই সভাসমিতিগুলির উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার আলোচনার সূত্রপাত করেছেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজ থেকে। সমাজের অনুষ্ঠানপত্রে সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'ল তার মর্ম্ম হ'ল সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজকল্যাণসাধন। অনুরূপ ইউরোপীয় সভাসমিতিগুলি যে গৌড়ীয় সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার সাক্ষ্যপ্রমাণ এই অনুষ্ঠানপত্রেই মেলে।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ এই সমিতির অন্যতম কীর্ত্তি। এই সময়েই ডিরোজিও'র আবির্ভাব। হোরেস হেম্যান উইলসন্ এই কালেই হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারসাধন করেন। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পার্থেনন' নিপুণ সাংবাদিকতায় শিক্ষিত সমাজের নির্ভীক মতবাদিতাকে প্রশ্রয় দিল। তার পরে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা, প্রকাশিকা সভা বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকদানকার্য্যে ব্রতী হয়। সে প্রচেষ্টা অংশতঃ সার্থক হয়েছিল। এই ধরণের সভাসমিতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার (১৮৩৮ সন) মেয়াদ এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এই সভা স্থাপনের কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর পরে 'তত্ত্বরঞ্জিনী' বা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যকাল প্রায় বিংশতি বর্ষব্যাপী। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সভা নয়। এই সভার ভিত্তি 'উদার সর্ব্বজনীন হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বের উপর' এবং এই তত্ত্বকে সত্য করে তোলার জন্যই এই সভার বিভিন্ন কর্ম্মক্রম। তার পরে আমরা পাই পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি এবং সর্ব্বশুভকরী সভার ইতিবৃত্ত। তৎপরে গ্রন্থকার বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কাহিনী, উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থা বিশদভাবে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে। পুস্তক প্রকাশ এবং পত্রিকা পরিচালনা ব্যাপারে এই সমাজের অবদান স্মরণযোগ্য। 'সে যুগে বাংলা গদ্য সরল ও সহজবোধ্য করার পক্ষে অনুবাদক সমাজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জনচিত্তে পরবর্ত্তীকালে যে চেতনা জাগ্রত হয় তাহার মূলে এই প্রতিষ্ঠানটির সার্থক প্রয়াস নিয়ত লক্ষ্য করি।'

এর পরে আমরা বেথুন সোসাইটি, শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা, ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার কথা পড়ি। এই সময়ে বাংলা দেশের চিন্তাজগতের অধিনেতারা অন্তঃপুরের দিকেও দৃষ্টি দেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দুবিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জ্জন, বহুবিবাহ প্রচলন নিরোধকল্পে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ-সমিতি (১৮৫৪), বামাবোধিনী সভা, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা (১৮৬৪) ও বামাহিতৈষিনী

আপনার লাবণ্য

আপনার কাছে চিত্রতারকার লাবণ্যের মতই প্রিয়!

চিত্রতারকাদের ত্বক সর্বদাই মসৃণ ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আপনার নিজের ত্বকেরও যত্ন নেওয়া দরকার। সুন্দরী চিত্রতারকা নিরূপা রায় কি বলেন শুনুন—"সৌন্দর্য্যের জন্যে লাক্স টয়লেট সাবান আমার কাছে অগ্রগন্য।"

যখনই স্নান করবেন বা মুখ ধোবেন এই শুভ্র, বিশুদ্ধ সাবানটি ব্যবহার করুন—দেখবেন আপনার ত্বক কত সুন্দর ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। এর সরের মত ফেণার রাশি আপনার ত্বককে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে তোলে, এর সুগন্ধ প্রতি বারের স্নানকে করে তোলে একটি আনন্দময় অনুভূতি। সারা পৃথিবীর চিত্রতারকাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুণ—প্রতিদিন লাক্সের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

LUX TOILET SOAP

LUX

LUX

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

নিরূপা রায় মুক্তি ফিল্মের 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' চিত্রের সুন্দরী তারকা

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 561-X 52 BG

সভা (১৮৭১) বলবান হয়ে ওঠে। এতদ্‌পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা। 'এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক-রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, উচ্চশিক্ষা, লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি, স্বাস্থ্য, আধি-ব্যাধি, আইন-কানুন, আমোদ-প্রমোদ, ভাষা, সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবনচর্চার মান-উন্নয়ন মানসে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রন্থকার আপন স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনে এই সভাসমিতির প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। আমরা গ্রন্থের শেষ ভাগে সমাজবিজ্ঞান সভা ও কেশবচন্দ্রের ভারত সংস্কারসভা আরব্ধ এবং কৃতকীর্তির ধারাবিবরণী পাঠে লাভবান হয়েছি। সর্ব্বযুগের মানুষের অবশ্য কর্তব্য হ'ল তাদের পূর্ব্বসূরীদের প্রয়াসের সঙ্গে পরিচয় করা এবং পূর্ব্বাচার্যদের ঋণ শ্রদ্ধায় এবং বিনয়ে স্বীকার করা। যোগেশ-বাবুর 'নব্যসংস্কৃতি' আমাদের পূর্ব্বসূরীদের কীর্তিকাহিনী গবেষণা-সিদ্ধ পথে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। অতীত সাধনার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের তপস্যার দিক্‌দর্শন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য্য হলে 'নব্যসংস্কৃতি' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ৩৯২। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক, উচ্চশিক্ষিত এবং বরোদার প্রাচ্যমন্দির ও নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক। এরূপ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থিগণের উপকারসাধন করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে গ্রন্থাগার পরিচালন বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে এবং এই বিষয়ে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা একালের জিনিস। এদেশে খুব সম্প্রতি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইয়াছে। সরকারী এবং বে-সরকারী বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগে বয়স্ক এবং সামাজিক শিক্ষার এবং সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় হাত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার অঙ্গহিসাবে গ্রন্থাগারের উপর নজর দেওয়া হইয়াছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ সকল প্রকার গ্রন্থাগারের স্থাপন, উন্নয়ন ও প্রসারে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাবিস্তার যেরূপ বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষাব্রতী ব্যতীত সম্ভব নহে, গ্রন্থাগার বিস্তারেও অভিজ্ঞ, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ইহা অনস্বীকার্য্য। আজ দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সহস্র সহস্র কুশলী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বে কয়েকখানি সুগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সুবোধবাবুর গ্রন্থ গ্রন্থাগার-শিক্ষণ বিষয়ে বাঙালী ছাত্রের একটি বড় অভাব ঘুচাইবে, ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

লেখক উনিশটি অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন যথা: পুস্তক-নির্বাচন, বর্গীকরণ, ক্যাটালগ নির্ম্মাণ, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, গ্রন্থাগার কমিটি ও দপ্তরের কার্য্যক্রম, রেফারেন্স লাইব্রেরী, লেণ্ডিং লাইব্রেরী, বিবলিওগ্রাফী, ছোটদের গ্রন্থাগার, পাঠকের সাহায্য, গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার, গ্রন্থাগার আইন, কপিরাইট গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নথীপত্র, গ্রন্থসংরক্ষণ, গ্রন্থাগার-গৃহ এবং গ্রন্থাগার-আন্দোলন। পরিশিষ্টে আছে—গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী, দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার এবং বাংলা পরিভাষা। পুস্তকের শেষে সংক্ষিপ্ত শব্দসূচী দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা দেশের যে কোন গ্রন্থাগার এরূপ একখানা গ্রন্থ রাখিলে লাভবান হইবে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নাই এবং বহু গ্রন্থাগারই অবৈতনিক কর্ম্মী দ্বারা পরিচালিত—এই পুস্তকখানি তাহাদের খুব কাজে লাগিবে। 'গ্রন্থ-অধ্যায়সংরক্ষণ'টি সকলের পঠনীয়। "ডিউই দশমিক বর্গীকরণ" বাংলা দেশের গ্রন্থাগার কর্ম্মীর নিকট খুবই মূল্যবান। এরূপ গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা—শ্রীনরহরি কবিরাজ প্রণীত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২৬২। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার মার্কসবাদের সমর্থক এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বাংলার স্বাধীনতার আন্দোলন দেখিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে মার্কসীয় পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হইয়াছে তবে সম্পূর্ণভাবে কিংবা ত্রুটিহীনভাবে করা হইয়াছে বলা চলে না। কারণ আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বুর্জ্জোয়া' ঐতিহাসিকগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। যাহা হউক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আর্থিক ভিত্তি বিশ্লেষণে এবং আর্থিক পরিবেশ কিরূপে শোষিত এবং নির্যাতিত নিম্ন শ্রেণীসমূহের উপর প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে এবং তাহাদিগকে সমসাময়িক অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে, উহার নির্ণয়ে লেখক নানা সরকারী, বেসরকারী দলিল ও গ্রন্থাদি হইতে যে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। কোন কোন বিষয়ে হয়ত পাঠক লেখকের সহিত একমত হইবেন না কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। নিছক মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী ত্রুটিহীন না হইলেও উহার একটা মূল্য আছে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক আলোচনায়, ইহা অনস্বীকার্য্য। তবে নিছক মার্ক্সীয় পদ্ধতি ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। গোঁড়ামীর আতিশয্য সর্বত্র বর্জ্জনীয়, এক্ষেত্রেও তাহাই।

লেখক দ্বাদশ অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন যথা: মধ্যযুগের বাংলা, কোম্পানীর আমল (১৭৫৭-১৮১৩), কোম্পানীর

শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (১৭৫৭-১৮১৩), কোম্পানীর আমল (১৮১৩-১৮৫৭), ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা (১৮১৩-১৮৫৭), উপনিবেশের বাংলা, কৃষক-সংগ্রাম (১৮৫৭-১৮৮৪), জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ক্রমবিকাশ, সাম্রাজ্যবাদী আমল (১৮৮৪-১৯২৮), জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ইত্যাদি।

সম্প্রতি স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বহু ইংরেজী-বাংলা গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই শ্রেণীর গ্রন্থের পাঠকমহলে খোরাক যোগাইবে, সন্দেহ নাই।

শোষণমুক্ত রাষ্ট্রবাদের ভূমিকা—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক: মুকুল প্রকাশনী, ১০৮, ক্লিন্টন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ২৮। মূল্য ছয় আনা।

স্বাধীন ভারতে কিরূপে একটি শোষণমুক্ত আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া লেখক একটি খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পুস্তিকার লেখক নিজের মতের যেরূপ গুরুত্ব দিয়াছেন, কোন রাজনৈতিক নেতা ও পার্টি তাহা দেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষত্বহীন এবং ছাপার ভুলে পরিপূর্ণ এই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ৩৮। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাঃ শশীভূষণ চৌধুরী লিখিত পুস্তকগুলির (The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Eighteen Fifty-seven এবং Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857-59) বিষয়বস্তু ১৮৫৭ সনের ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহ ও তৎকালীন বিপ্লবের সম্পর্কে এই তিন জন ঐতিহাসিক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে পর্যালোচনা। ডাঃ মজুমদার এবং ডাঃ সেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি আলোচনা করিলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ইহা গণবিপ্লব নহে ইহা সিপাহী-বিদ্রোহ এবং রাজ্যচ্যুত, বিষয়চ্যুত, এবং সংস্কার ও প্রগতিবিরোধী ব্যক্তি ও জনগণের বিপ্লব। ডাঃ চৌধুরী ইহাকে গণবিপ্লব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে সফল হইতে পারেন নাই বরং তাঁহার ভ্রান্ত যুক্তি ধরা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকের লেখকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সমালোচনার গ্রন্থ হইলেও পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। ১৮৫৭ বিদ্রোহের পাঠকগণের মধ্যে ইহার প্রচার হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সাথী—ইসমাইল মেটার। অনুবাদক—প্রদ্যোত গুহ। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫ ১ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩৲ টাকা।

যে দেশে বেকার-সংখ্যা গভীর সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, সেই দেশের কিশোরদের রাষ্ট্রের ও পরিবারের সম্পদরূপে গড়িয়া তোলার কথাই এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। শুধু ডিগ্রীলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষা যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা নয়, সে কথা বহু দেশের বহু মনীষী স্বীকার করিয়াছেন। প্রচলিত শিক্ষার ধারাটিকে যুগোপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টাও সব দেশে দেখা যায়: দৃষ্টান্তস্বরূপ বুনিয়াদি শিক্ষার উল্লেখ করা যায়। কিন্তু পূর্ণ রাষ্ট্র-সমর্থন না থাকিলে এই শিক্ষার ধারা বাস্তবক্ষেত্রে গতিলাভ করিতে পারে না। অথচ সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা কত সুন্দর। 'সাথী' উপন্যাস এমনই

একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষালয়ের সুবন্দোবস্ত ও তরুণ চিত্তের আশা-আনন্দের ছবিতে ভরপুর। কাহিনী পাই—সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে আসিয়া একটি গ্রাম্য কিশোর বিভ্রান্ত হইবার মুহূর্তে নিজ যাত্রা-পথের সন্ধান পাইয়াছে এবং জীবনকে গড়িয়া তুলিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে অনায়াসে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সুনিয়মে নিজের গ্রাম, পরিচিত স্বজন-বান্ধব ছাড়া হইয়াও বিদেশবাসের অসুবিধা ও দুঃখ-ক্লেশ তাহাকে সহিতে হয় নাই। বাস্তব শিক্ষায় ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার মন্ত্রও সে আয়ত্ত করিয়াছে। কিশোর জীবনে এমনধারা আশা-ভরসার দৃষ্টান্ত বলকারক। এমন বই-এর অনুবাদের প্রয়োজন আছে।

আলোচ্য অনুবাদটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। আমাদের দেশে কিশোর-চিত্ত এদিকে আকৃষ্ট হইবেই। শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইবেন।

কায়া ও ছবি—লাং চ'ঙ। প্রকাশক—শ্রীসরোজকুমার নাথ। ৩৯ সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য ১10 টাকা।

ছোটগল্পের বই। অনুবাদকের নাম না থাকায় মনে হয়, রচয়িতা ছদ্মনামের আশ্রয় লইয়াছেন। গল্পগুলির গুণগত লক্ষণেও এই সত্যটি ধরা পড়ে। কয়েকটি গল্প মন্দ লাগে না, কিন্তু বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে ও প্রকাশভঙ্গীতে এগুলি সাধারণ পর্য্যায়ের।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জীবনের ঝরাপাতা—শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—চার টাকা।

বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প এবং সভ্যতা একদিন যে-বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর পারিবারিক পরিবেশই এই আলোচ্য গ্রন্থটির অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। নব্য বাংলা জন্মলাভই করিয়াছে এই ঠাকুর-বাড়ীতে। তাহার রুচি এবং ফ্যাশানের অনুকরণের মধ্যেও যেন গর্ব্ব ছিল।

সরলা দেবী চৌধুরাণী এই পরিবেশেই বড় হইয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহারই জীবন-কাহিনী। তাই বলিয়া জীবন-কথা বলিতে গিয়া কোথাও তিনি নিজেকে জাহির করেন নাই। তিনি শুধু চিত্রগুলি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই ঘরোয়া কথার মধ্যে গত দিনের ঠাকুরবাড়িকে আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রত্যক্ষ করিলাম তাঁহার পরিবারস্থ প্রতিটি মানুষকে—রচনার পারিপাট্যে যেন সকলেই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ব্রাহ্ম হ য়াও যে আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত-উৎসবাদি তাঁহারা পালন করিয়া গিয়াছেন, অনেক গোঁড়া হিন্দুঘরেও তা দুর্লভ। অনেক ব্রত-অনুষ্ঠানাদির তাঁহারাই প্রবর্ত্তক। যেমন দেখিতে পাই, 'বীরাষ্টমী' ব্রত এই বাড়ী হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

এই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সেকালে বহুগুণীজনের সমাবেশ হইয়াছে—গোখলে, তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। সরলা দেবী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসায় গ্রন্থমধ্যে অনেক কথাই প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িয়াছে, যেকথা নিতান্তই ঘরোয়া কথা।

গ্রন্থখানির মধ্যে আমরা চারটি ভাগ দেখিতে পাই—বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য। এই চারটি ভাগই বৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতার মধ্যেও সুন্দর সঙ্গতি রহিয়াছে।

বিবাহ-পূর্ব্ব জীবন হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সুরু। তাই শেষ বয়সে তাঁহাকে দেখিতে পাই, সংসারে থাকিয়াও তিনি অর্দ্ধ-সন্ন্যাসিনী। এই আধ্যাত্মিক জীবনের চিত্রটি তিনি সুন্দর আঁকিয়াছেন।

গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ। কিন্তু এত বড় হইয়াও পড়িতে কোথাও বাধে না। এই রচনা-নৈপুণ্যই পাঠক-মনকে টানিয়া লইয়া চলে।

গ্রন্থশেষে যেসব চরিত্র-পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দুর্লভ বলিয়াই পাঠকমনকে আরও কৌতূহলোদ্রিক্ত করে। ছাপা সুন্দর, প্রচ্ছদপটেও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাই।

শ্রীগৌতম সেন

হরিদাস ঠাকুর—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। প্রকাশক শমীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৭০নং রসা রোড, কলিকাতা—২৬। পৃষ্ঠা ১৬+১৪৪+১৬। মূল্য তিন টাকা।

বরিশালের স্বদেশী-আন্দোলন যুগের অন্যতম কর্ম্মীরূপে খ্যাত এই আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার মধ্যবয়সে দেশ-বিদেশ-ভ্রমণে যেমন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি সেই বয়স হইতে এক্ষণে এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব-শাস্ত্রাদি মন্থনক্রমে গভীর জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহারই সরস ফলস্বরূপ বাংলা ও ইংরেজীতে বিবিধ গ্রন্থরাজি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিবেশন করিতেছেন।

এই গ্রন্থ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বজ এবং তদীয় পার্ষদ মহা-ভাগবত যবন হরিদাসের অমর জীবনলীলা। ইহা চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব কাব্যামৃতের নির্ঝরধারায় অভিসিক্ত। যবন হরিদাস নিজ ভক্তিনিষ্ঠার অনুপম উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বৈষ্ণব-জগতে মহাভাগবত ব্রহ্ম হরিদাস রূপে চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ধারাবাহিক কোন জীবনী-গ্রন্থ এত দিন ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম ও বাল্যজীবন সম্পর্কে নানা মতভেদ বিদ্যমান। গ্রন্থকার প্রামাণ্য বৈষ্ণব কাব্য-সিন্ধু-মন্থনে এই জীবনালেখ্য উদ্ধারকরতঃ সাহিত্যজগতের পরম উপকার সাধন করিলেন। এই জীবনলীলা পাঠে চৈতন্যচরিত তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের সারতত্ত্ব আস্বাদনে সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন।

গ্রন্থমধ্যে চারিটি চিত্র এবং রঙীন প্রচ্ছদপট অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
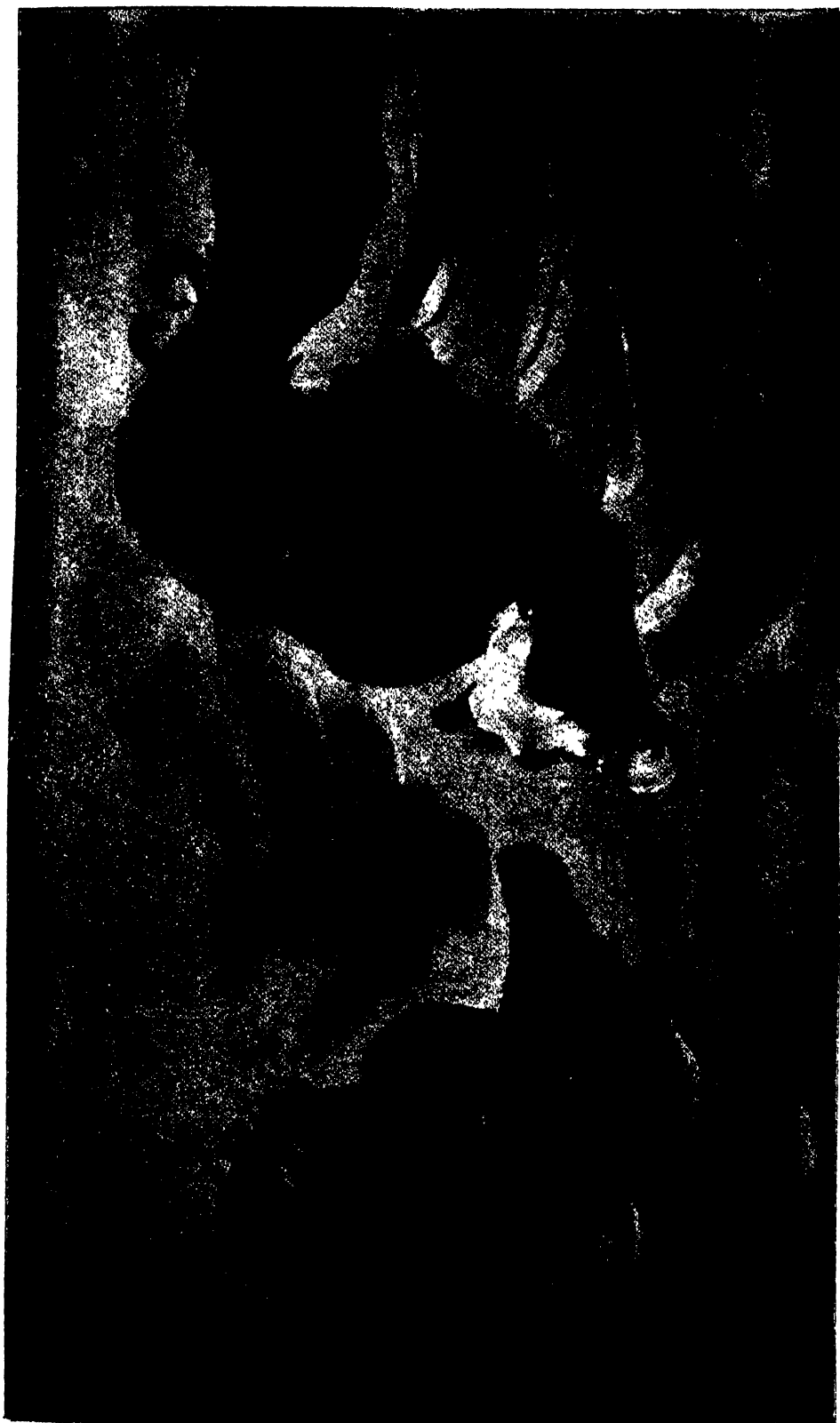
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পারাপার

শ্রীপঞ্চানন রায়

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

জন্ম : ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭০

মৃত্যু : ১৯শে মে, ১৯৫৮

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৬৫

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মৃত, মুমূর্ষু না অভিশপ্ত ?

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহরু এক সাংবাদিক বৈঠকে নানা কথাপ্রসঙ্গে কলিকাতার বিষয়ে বলেন যে, ঐ শহর মৃতপ্রায় এবং তাঁহার নিকট বিভীষিকার কারণ। কথাটা পণ্ডিত নেহরু তাঁহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের বশেই বলিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার বর্ত্তমান বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় সদা সর্ব্বদাই চাটুকার ও ফন্দিবাজ পরিবেষ্টিত থাকে, তাহার ঐ রকম বিভ্রান্ত না হওয়াই আশ্চর্য্য ! আমাদের ঘরের কাছেই ঐরূপ অবস্থার পরিচায়ক ব্যক্তিত্বের কোনও অভাব নাই।

যাই হোক, পণ্ডিত নেহরুর ঐরূপ মন্তব্যের ফলে এখানে নানা দিকে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, দুই-চারিটি সংবাদপত্র ইত্যাদিতে নানা প্রকার সমালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়—যাহার প্রায় সব কিছুই বর্ত্তমানে আমাদের—অর্থাৎ বাঙালীর—বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীন মানসিক অবস্থারও পরিচায়ক।

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, 'কলিকাতা' কিন্তু তাঁহার মনের কথা সমস্ত বাঙালী জাতির ও সমগ্র পশ্চিম বাংলার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়। ইহাও স্বাভাবিক, কেননা আমাদের নিজেদের প্রদেশেই উচ্চতম অধিকারীবর্গ এত দিন ঐ অর্থে কলিকাতাই বুঝিতেন, আজ নানা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা কলিকাতার সীমানার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া যাঁহারা কটু-কাটব্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অতীতের নজির টানিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের প্রাদেশিক কর্ত্তারাও সেই কথায় সায় দিয়াছেন—তবে স্পষ্ট ভাষায় নয়, ইঙ্গিতে ও ফেরানো কথার ছলে। কিন্তু দায়িত্ব, অর্থাৎ বাঙালীর এই অভিশপ্ত অবস্থা প্রাপ্তির দায়িত্ব কি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ভাবে অন্যের ?

আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "টাইম" তাহার ১৬ই জুনের সংখ্যায় কলিকাতার এক বর্ণনা দিয়াছে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আমরা ঐ সাপ্তাহিককে মোটেই নিরপেক্ষ বা সত্যকামী মনে করি না। কিন্তু তাহার বর্ণনায় বিদেশীর চোখে আমাদের এই মহানগরী কিরূপ প্রকাশিত হয় তাহার একটা বিশদ চিত্র আমরা পাই। ঐ বর্ণনার শিরোনামা, হইল, "Packed and Pestilential Town" অর্থাৎ লোকঠাসা ও ব্যাধিগ্রস্ত শহর। Pestilential শব্দের আরেক অর্থ ঘৃণ্য ও পাপপূর্ণ, বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সেই অর্থই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বহুদিন আগে ভারতের অন্নে পরিপুষ্ট ও অসহায় ভারতীয়দিগের শত্রু এক কুখ্যাত ইংরেজ—রাডিয়ার্ড কিপলিং কলিকাতা যে কত জঘন্য সে বিষয়ে এক কবিতা লিখেছিলেন, তাহাতে ঐ "Packed and Pestilential Town" ছত্রটি ছিল। "টাইম" সেই কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছে। উহাতে কলিকাতার বর্ণনা যাহা রহিয়াছে তাহার বিষয় বিশদ ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন, যদিও কলিকাতার পথঘাট, এই নগরীর শান্তিশৃঙ্খলা উহার বাসিন্দাদিগের চলাচল ও বসবাসের ব্যবস্থা এই সকল বিষয়ে আমাদের নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ ও প্রাদেশিক সরকারের—অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব—দায়িত্ব, ষোল আনা না হইলেও ৮৫ নয়া পয়সা মত নিশ্চয়ই। আমাদের মানসিক অবস্থার অবনতি যদি সবল ও সুস্থ হইত তবে সকল ক্ষেত্রে অবনতি সম্ভব হইত না।

বাঙালী সম্বন্ধে 'টাইম' যাহা লিখিয়াছে, তাহা আমাদের সকলের প্রণিধানযোগ্য। নীচে তাহার সরল অনুবাদ আমরা দিলাম :

"কলিকাতার অধিবাসিগণের অধিকাংশ বাঙালী। দাঙ্গায় উন্মত্ত না থাকিলে ইহারা মধুর স্বভাবাপন্ন, তবে বড়ই আয়েসী। হৈ-হল্লায়-ভরা এই শহর তাহাদের অতি প্রিয়। খাওয়ার চাইতে

যথা বলিতে তাহারা উৎসুক এবং হাত চালাইয়া কাজ করা তাহাদের ধাতে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা ভীড় করিয়া আছে (৪০,০০০), কিন্তু কলকারখানা বিহার প্রদেশের লোকে ভর্ত্তি; শারীরিক পরিশ্রমের কাজ প্রায় সবই চালায় উড়িষ্যার লোকে; চতুর মাড়োয়ারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক দখলে রাখিয়াছে। যদিও কিছু শিক্ষিত বাঙালী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, এবং আইন ও ডাক্তারী ইত্যাদি পেশাতেও তাঁহাদের প্রাধান্য, তথাপি অধিকাংশ বাঙালীর ভাগ্যে হয় কলমপেশা কেরাণীর চাকরী, নয় বেকারত্ব বাঁধা আছে।"

ইহা কি বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থার সঠিক চিত্র নয়? কবে আমরা এই অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইব?

পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি

পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি কোন পথে? বর্ত্তমান বাজেট অধিবেশনে এই বিষয়ে বহু সত্য-মিথ্যা সম্বলিত তথ্য সরকার ও বিপক্ষদল কর্ত্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে। সমস্ত বাদানুবাদ বাদ দিয়া সহজভাবে বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিতে সাম্যের অভাব আছে। ঘাটতি বাজেট, ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, ব্যবহারিক দ্রব্যের অভাব, খাদ্যশস্যের ঘাটতি প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়া এই প্রদেশের আর্থিক পরিস্থিতিকে হতাশাব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যাগুলির সমাধান সহজ-সাধ্য নহে, তথাপি কংগ্রেসী সরকারের নিশ্চেষ্টতা ও অকর্ম্মণ্যতা সমস্যাগুলিকে অধিকতর ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ২৫০ কোটি টাকার উপর ঋণ আছে। রাষ্ট্রের পক্ষে ঋণগ্রহণ মাত্রেই দোষণীয় নহে; কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এই ঋণ কি উদ্দেশ্যে লওয়া হইয়াছে এবং তাহা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ঋণের অধিকাংশই দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার জন্য গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তাহাই একমাত্র সান্ত্বনার কথা নহে। জরুরী অবস্থা ব্যতীত, স্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয় ঋণ অবশ্যই উৎপাদনশীল হইবে, তাহা না হইলে ইহাকে মূলধন হইতে পরিশোধ করিতে হইবে; ইহার অর্থ এই যে, ঋণের সমস্ত অর্থটাই বাজে খরচ হইয়াছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া যাইতেছে, সেইহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঋণ-গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই ঋণ উৎপাদনশীল না হওয়াতে প্রধানতঃ মূলধন হইতে ইহাকে পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্গতি আরও প্রখরতর হইবে। দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা বিশ বাঁশ জলের তলাতে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহা তুলিয়া আনা প্রায় অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে উৎপাদনশীল খরচের হদিস পাওয়া ভার। ইদানীং কুটীরশিল্পের জন্য যে খরচ করা হইতেছে তাহার অতি অল্প অংশই উৎপাদনশীল। এগারো বৎসরের শিক্ষার জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হইতেছে, তাহার সদ্য কি প্রয়োজন ছিল? রাষ্ট্রের বাজেট গত দশ বৎসর ধরিয়া ঘাটতি চলিতেছে, এই অবস্থায় ভাব-বিলাসী খরচ দণ্ডনীয় অপব্যয়। এগারো বৎসরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা আরও এগারো বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিত, তাহাতে পশ্চিম বাংলা রসাতলে যাইত না। বিরাট বিরাট বিদ্যালয়গৃহ তৈয়ার না করিয়া সেই অর্থে বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে এই প্রদেশের বহু মঙ্গল হইত। বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে এই প্রকার কারিগরী বিদ্যালয়গুলি শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি এই প্রদেশের মূল্যমানকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবের ফিরিস্তীর সবটাই ভুলে ভরা। ইহা সত্য যে, পরিসংখ্যানের ফিরিস্তী দিয়া দেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করা যায় না। মেদিনীপুর, সুন্দরবন অঞ্চল ও বর্দ্ধমান জেলায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভাল ফসল হইতেছে না। ইহার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কারণ অনুসন্ধান করা এবং যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। মন্ত্রীমহাশয়রা ইদানীং দলীয় এবং অন্যান্য দলের সহিত রাজনীতি লইয়া এত ব্যস্ত যে, দেশের সত্যিকার মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিবার ফুরসৎ পান না। তাঁহাদের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে নিয়মানুগত কেরাণীর মত।

সুন্দরবন, বর্দ্ধমান জেলা ও মেদিনীপুর জেলা পশ্চিম বাংলার শস্যাগারস্বরূপ। সেচের অভাব, ভূমিবণ্টনের অব্যবস্থা, কৃষিঋণের অভাব প্রভৃতি খাদ্যশস্য ঘাটতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। রূপনারায়ণ, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর গর্ভ অনেকখানি চড়া পড়িয়াছে। সেই সকল স্থানে চাষ-আবাদ সুরু করিলে প্রদেশের শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই সকল দিকে নজর দিবার সময় কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গ যে এত টাকা কেন্দ্রের নিকট হইতে ঋণ লইয়াছে, তাহা শোধ দিবে কেমন করিয়া? আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় যেখানে নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে অদূর ভবিষ্যতে এই ঋণ শোধ দেওয়ার কোনও উপায় দেখা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিনির সমবায় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহাতে বেকার সমস্যা সমাধানের সুবিধা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলা এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এই বিষয়ে কেরালা এবং অন্যান্য প্রদেশের উদাহরণ অনুধাবনযোগ্য।

প্রাচ্যে শিল্পোৎপাদন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রাচ্যের দেশগুলিতে রাজনৈতিক নবজাগরণ আসিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আসিয়াছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় প্রাচ্যের জন-

সাধারণের অর্থনৈতিক জীবনমান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। কিন্তু এই সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের অবদান ইদানীং আশানুরূপ হইতেছে না এবং তাহার প্রধান কারণ আর্থিক মূলধনের অভাব। আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক, উভয় প্রকার মূলধনের অপ্রাচুর্য্য শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত করিতেছে। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও আর একটি প্রধান কারণ যাহার জন্য শিল্পোন্নতি বাধা পাইতেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যদেশগুলির প্রধান অসুবিধা হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। কাঁচামাল সরবরাহে বাধা, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, এবং শিক্ষিত কারিগরের অভাব প্রভৃতির জন্য শিল্পপ্রগতি ইদানীং মন্দীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত দেশগুলিকে ধরা হইয়াছে, যথা, জাপান, ভারতবর্ষ ও চীন। ১৯৫৬ সন পর্যন্ত এই তিনটি দেশ শিল্পোন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করে। ১৯৫৭ সন হইতে মূলধন গঠনের গতি হ্রাস পাওয়ায় শিল্পোৎপাদনের গতিও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই বাৎসরিক ইতিবৃত্ত একটি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং ইহা এই যে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতেও শিল্পোন্নতির প্রগতি সমান হারে বজায় রাখা যায় না, যেমন ভারতবর্ষ ও চীনের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। জাপানে ব্যক্তিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেও মূলধন অবাধ হারে গঠন করা যায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক কারণে মূলধন গঠনের গতি সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলিতে আছে হংকং, দক্ষিণ-কোরিয়া, পাকিস্থান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এই দেশগুলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হওয়ার দরুণ শিল্প-মূলধন গঠনের গতি এখনও অব্যাহত আছে। কিন্তু পাকিস্থান সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, ইহার আভ্যন্তরিক মূলধন গঠন অতি নগণ্য। বৈদেশিক মূলধন সরবরাহ ইহার মূলধন গঠনের প্রধান ভিত্তি। তৃতীয় শ্রেণীতে অন্যান্য দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং ইহাদের শিল্পে প্রগতি অতি নগণ্য। তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়া শিল্পে অতি অনগ্রসর। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, প্রাচ্যদেশগুলির প্রধান উদ্দেশ্য যদিও শিল্পোন্নয়ন, তথাপি কৃষির তুলনায় শিল্প নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অত্যল্প। ১৯৫৭ সনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, যদি কৃষিজাত উৎপাদন সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে সেই অবস্থায় শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহাতে বাণিজ্যিক ঘাটতি ঘটে। মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্যিক ঘাটতির ফলে শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় মূলধন এবং কাঁচামালের অভাবে ব্যাহত হয়। এই অবস্থা অল্পবিস্তর প্রাচ্যের দেশগুলিতে ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া এই বার্ষিক বিবরণী অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। শিল্প উৎপাদনের পরিকল্পনা তাই বর্ত্তমানে নিছক আদর্শগত ভাবে না দেখিয়া বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতির সফলতার জন্য বর্ত্তমানে অর্থনীতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন, অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনে স্বাবলম্বন অগ্রে প্রয়োজন। প্রাচ্যে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, রাষ্ট্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেই শিল্পপ্রচেষ্টায় ব্রতী এবং সচেষ্ট হইয়াছে। কোনও কোনও রাষ্ট্রে অবশ্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করার জন্য রাষ্ট্র যথোচিত পন্থা অবলম্বন করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে পাকিস্থানে শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন এবং ব্রহ্ম সরকারের ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন।

ভারতবর্ষ ও চীনে রাষ্ট্র বৃহদায়তন শিল্পপ্রচেষ্টার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গ্রাম্য এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণও প্রাচ্যদেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইদানীং কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-উন্নয়নের দিকে প্রাচ্যের দেশগুলি অধিকতর জোর দিতেছে ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠার মূলধন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব। কুশলী শ্রমিকের অভাবও আর একটি প্রধান কারণ। বর্ত্তমান অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রধান দোষ এই যে, যান্ত্রিক উন্নতি ব্যতীত শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অর্থকরী ভাবে বৃদ্ধি পায় না।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও সরকার

কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘটনাবলী পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার সঙ্কটেরই প্রতিফলন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতি হইল স্থানীয় জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে স্থানীয় ব্যাপার সম্পর্কে যথাসম্ভব ক্ষমতা দান। সেই উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যথা মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, স্কুল বোর্ড প্রভৃতি গঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে তখন এই নীতি অনুসরণ করিয়াই তাহা করে—যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা সরকার নিজ হাতে রাখে - কারণ বিদেশী সরকার ভারতীয়দিগকে সর্ব্বদাই বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। যাহা হউক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশঃই অধিকতর ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতালাভের পর এই গতি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে—অর্থাৎ যতই দিন যাইতে থাকে ততই স্বাধীন সরকার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার এবং স্বাধীনতা একটির পর একটি কাড়িয়া লইতে থাকেন। ১৯৫১ সনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন এবং ১৯৫৫ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন এই অধিকার সঙ্কোচনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার সঙ্কোচনের সময় সরকার

দুর্নীতি, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি যে সকল অজুহাত দেখাইয়াছিলেন, অধিকতর সরকারী পর্য্যবেক্ষণে সেই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয় নাই, অনেক ক্ষেত্রে বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাভ হইয়াছে এই যে, পূর্ব্বে যেখানে সৎ লোক সচেষ্ট হইলে কিছু জনহিতকর কাজ করিতে পারিতেন এখন নূতন অবস্থায় সে পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাংলা দেশের অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিই আজ প্রায় অচল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

স্পষ্টতঃই এই অবস্থার জন্য মুখ্য দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের উচিত প্রথমতঃ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা রাখিবেন কি না। যদি না রাখাই সিদ্ধান্ত হয় তবে অবিলম্বে সকল মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতিকে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের প্রত্যক্ষ আওতায় লইয়া আসা কর্ত্তব্য। আর যদি সরকার মনে করেন যে, দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কার্য্যকারিতার সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে, তবে সরকারের কর্ত্তব্য হইবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের হৃত অধিকার প্রত্যর্পণ করা।

কর্পোরেশনের সভায় কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী শ্রী বি. কে. সেন সম্পর্কে অনাস্থামূলক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা কার্য্যকরী করা না হইলে কর্পোরেশন রাখিবার অর্থ কি? যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার প্রশ্ন ছাড়াও এ কথা একটা বৃহত্তর পর্য্যায়ের প্রশ্ন। কলিকাতার মেয়র যদি কোন নির্দ্দেশ দেন তাহা যদি কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা প্রতিপালন না করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার যদি মেয়রের না থাকে, তবে মেয়র রাখিবার প্রয়োজন কি? সেক্ষেত্রে কর্পোরেশনকে কোন সরকারী বিভাগের প্রত্যক্ষ আওতায় আনিয়া শাসনকার্য্য চালাইলে অধিকতর মঙ্গল হইবে।

কিন্তু অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে, বৃহৎ বৃহৎ শহরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অঞ্চলবিশেষের অভাব-অভিযোগ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি যেভাবে প্রতিকার করিতে পারে, কোন সরকারী বিভাগের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা রাখিতে হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে। সেজন্য সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক আইনগুলির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই সকল আইন এমন হাস্যকর যে, তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। যেমন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনে কোন মিউনিসিপ্যালিটি যদি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোন উৎসব করে তাহা বে-আইনী—এমন কি মিউনিসিপ্যালিটির অর্থে যদি কোন জাতীয় নেতার ছবি ক্রয় করা হয়, তাহাও বে-আইনী। এই সকল আইনের কি তাৎপর্য্য থাকিতে পারে, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। বস্তুতঃ এই সকল হাস্যকর এবং অযৌক্তিক ধারাগুলির আশু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য রূপে দেখা দিয়াছে।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৫৯ সনে পশ্চিমবঙ্গে আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিষ্ঠিত হইবে বর্দ্ধমান শহরে এবং অপরটি নদীয়া জেলার কল্যাণীতে। বর্দ্ধমান শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছিল, সরকারী সিদ্ধান্তে বর্দ্ধমানের জনমত বিশেষ সন্তুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট মতবিরোধের অবকাশ রহিয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কথা স্মরণ রাখিলে উত্তরবঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। বর্দ্ধমান বা কল্যাণী হইতে কলিকাতা আসিয়া পড়াশুনা করিতে ছাত্রছাত্রীদের যে অসুবিধা, উত্তরবঙ্গ হইতে বিহার ঘুরিয়া কলিকাতা আসিয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করা তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী অসুবিধাজনক। রাজ্যের জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টন যদি নীতিহিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে ভাল কথা, কিন্তু উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কল্যাণীতে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবেই বেমানান হয়।

বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আসানসোলের সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন:

"বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেছে শুনিয়া নিশ্চয়ই শুধু বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসীরা খুশী হইবেন না, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধিবাসীরাও খুশীই হইবেন—পুরুলিয়া জেলা বর্দ্ধমান শহর হইতে দূরে হইলেও তাঁহারাও আনন্দিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন দিন ছাত্রসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে, স্নাতকোত্তর ছাত্রদের স্থান হইতেছে না—ফলে এমন বাছাই সুরু হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষা অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ লইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় সকলের পক্ষে প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদের জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই। অতএব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকেন্দ্রীকরণ করিলে শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধা হইবে তাহা নহে, যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেছে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেক সুবিধা হইবে। কলিকাতা শহর এমনই জনবহুল হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে বাস করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া বিদ্যার্জ্জন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেই দিক হইতে বর্দ্ধমান বা কল্যাণী বহুগুণে শ্রেয়ঃ, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বর্দ্ধমান বিভাগের সকল কলেজগুলিকে আনয়ন করা হইতেছে। অর্থাৎ ১৪।১৫টি কলেজ

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসিবে। কিন্তু এই ১৪ ১৫টি কলেজের ২ ১টি বাদে বাকীগুলি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইলেও সর্ব্বস্তরের শিক্ষার সুযোগ নাই—খুব কম কলেজেই অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে আছে সেখানেও সব বিষয় অনার্স পড়ান হয় না। অতএব কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেই চলিবে না। বর্দ্ধমান বিভাগের কলেজগুলিকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করিতে হইবে। নতুবা কলিকাতায় স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পড়িবার আগ্রহ বর্দ্ধমান বিভাগের মেধাবী ছাত্রদের থাকিবে, ইহা বলিতে হইবে না। মেধাবী ছাত্ররা যদি বর্দ্ধমান বিভাগের কলেজগুলিতে পড়িবার সুযোগ না পায়, তবে অল্পমেধাবী ছাত্র লইয়া বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদান চালাইতে হইবে, ফলে উচ্চ পর্য্যায়ের গবেষণার জন্ত বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অভাব ঘটিবে। আগে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা কলিকাতায় চলিয়া আসিত, তেমনি বর্দ্ধমান বিভাগের ছাত্ররাও কলিকাতায় ভীড় করিবে। অতএব বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সেই কারণে এখন হইতে বর্দ্ধমান বিভাগের কলেজ কর্তৃপক্ষের এবং সরকারের উচিত হইবে, উক্ত কলেজসকলের পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন করা।"

বনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারী

সম্প্রতি একটি অডিন্যান্স জারী করিয়া রাষ্ট্রপতি বনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। অডিন্যান্স জারী আমরা পছন্দ করি না—কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অডিন্যান্সকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাইত। সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গত বৎসর ডাঃ, এ, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। সেই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুদালিয়র কমিটির রিপোর্টের পূর্ণ বিবরণ এখনও আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলিতে তাহার যে সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত এবং লজ্জায় অধোবদন হইতেছি। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এরূপ ঘটিতে পারে—ইতিপূর্ব্বে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। অপর কোন সূত্রে এই সকল তথ্য প্রকাশিত হইলে আমরা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিতাম। কিন্তু মুদালিয়র কমিটির রিপোর্ট অবিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই। কমিটিতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সাহস, সততা এবং নির্ভীকতা সর্ব্বজনবিদিত। ডাঃ মুদালিয়র এবং অধ্যাপক ওয়াদির প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং ভারতের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার, ডঃ সুব্বরয়ান এবং শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত, পঞ্চম সদস্য শ্রীমেহেরচাঁদ মহাজন—ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। ইঁহাদের সম্মিলিত সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করিবার কোনই উপায় নাই।

বনারস বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সারাংশ মাত্র আমরা দৈনিক পত্রিকা হইতে এখানে দিলাম :

কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যদিও বারাণসী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের একদল লোক নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল লোকেদের প্রভুত্বের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বজনপোষণ এবং নানারূপ দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষক নির্ব্বাচনের সময় শিক্ষকদের গুণাগুণ অপেক্ষা দলীয় সম্পর্কের উপর জোর বেশী দেওয়ায় বহুক্ষেত্রেই অযোগ্য লোক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছে। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের শেষে একটি তালিকা দিয়াছেন যাহাতে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট চল্লিশ জনের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা সকলেই পূর্ব্ব উত্তরপ্রদেশের লোক।

ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা অপেক্ষা রাজনীতি প্রাধান্ত পাওয়ায় শিক্ষার মান ক্রমশঃই অধোগতি হইয়াছে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত আচরণের মানও নিম্নগামী হইয়াছে। একাধিক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে নৈতিক পদস্খলনের অভিযোগ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, অনেক ছাত্র এবং কয়েকজন অধ্যাপকের আচরণ নৈতিক দিক হইতে বিশেষভাবেই গর্হিত। অপর একজন অধ্যাপক ছাত্রদের জন্ত প্রদত্ত সুবিধাজনক হারে রেলের টিকিট ক্রয় করিয়া বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া যান। পরে ইহাকে রাষ্ট্রপতির পদক দেওয়া হয় এমনই তাঁহার প্রভাব। অপর একজন অধ্যাপক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। উপরন্তু তিনি চাকুরীতে থাকাকালীন যে ভাড়া দিতেন তাহার অর্দ্ধেক ভাড়া দিয়া তিনি সেখানে থাকেন।

কমিটি বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালদের হাতে অত্যধিক ক্ষমতার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ইঁহারা এরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। বহুক্ষেত্রেই বিভাগীয় প্রধানদিগকে যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হয় না।

কমিটি বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট চক্রান্তের একটি কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে। এই কোর্টের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংস্কার সম্ভব নহে। অতএব উহার পরিচালনাভার পরিদর্শকের (রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক) স্বহস্তে গ্রহণ করা কর্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব

পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্র ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং দুর্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন জেলার স্থানীয় পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে বহুদিন হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে যথাযথ কর্ত্তব্য করা হইতেছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

"দুর্ভিক্ষের সূচনা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হুগলী হইতে প্রকাশিত কংগ্রেস-পরিচালিত "বর্তমান ভারত" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের সূচনা সবে সুরু হইয়াছে। এই সময় হইতে খয়রাতি সাহায্য ও টেষ্ট রিলিফের ব্যাপক ব্যবস্থা যদি না হয়, তবে পরে অবস্থা যে সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশে অজন্মা হইবার একমাত্র কারণ সময়ে বৃষ্টির অভাব এবং বন্যা। এই দুইটি সর্বনাশা কারণ আয়ত্তে আনিবার জন্যই সরকার দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা দেশের চাষের অবস্থা হইতেই প্রমাণিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উর্ব্বর জমিতে সারের চাপান না পড়িলেও মোটামুটি ফসল ফলে, কিন্তু সময়মত সেচ-ব্যবস্থা না থাকিলে ফসলের কোন আশাই নাই। সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে কৃষকগণ ধীরেসুস্থে চাষ-আবাদ করিতে পায়, দিনমজুরেরাও সারা বৎসর কিছু কিছু কাজ পায়। ক্যানেলের ব্যবস্থাও যেখানে রহিয়াছে সেখানেও নিয়মমত জল সরবরাহ হয় না। ফলে ক্যানেল কর এবং প্রাণের দায়ে শস্য বাঁচাইবার জন্য খাল-বিল হইতে জল সেচন করিবার খরচে চাষীর ঢাকের দায়ে মনসা বিকাইয়া যায়। সেচের জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কলকব্জা, ইট, চূণ, সুরকী ও সিমেন্টের প্রাচুর্য্যে নির্মিত মাইথন, বোখারো, পাঞ্চেত, কোনার, দুর্গাপুর, ময়ূরাক্ষী, তিলপাড়া প্রভৃতি বাঁধগুলি দেখিয়া লোকে বাহবা দিয়েছে বটে, তবে তাহাতে আসল কাজের কতখানি অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাই বিচার্য। পল্লীঅঞ্চলের নরনারী না খাইয়া মরিলে এখন আর আপশোষ করিবার কিছু নাই, কারণ তাহাদের বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকিলেও দামোদর পরিকল্পনার কল্যাণে তাহাদের ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতে থাকিবে।"

বর্দ্ধমান জেলার খাদ্যসঙ্কটের আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "দামোদর" লিখিতেছেন, "সংকারী মতে আজ বাংলা দেশে শুধু পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও মালদহ জেলায় খাদ্যসংকট আছে, অন্যত্র নাই। কিন্তু বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বীরভূম জেলায় সহস্র সহস্র নরনারী যে একমুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে, এই প্রকৃত তথ্য আজ দেশবাসীর সম্মুখে ধরিবার মত সৎসাহস বর্ত্তমান সরকারের নাই।"

"দামোদর" লিখিতেছেন :

দুর্গতদের রক্ষা ও সাহায্য করিবার জন্য আদিমকাল হইতে যে সরকারী ব্যবস্থা আছে, দেশ স্বাধীন হইবার পর তাহার কিছু উন্নতি হয় নাই। উপরন্তু সরকারের খামখেয়ালী খাদ্যনীতির ফলে দেশে খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আজ দুঃখের সহিত বলিতে হয় দেশে যাঁহারাই খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারাই আবার দয়াময়রূপে খয়রাতি সাহায্য ও টেষ্ট রিলিফের ফর্দ্দ লইয়া অসহায় দুর্গতদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন এবং দেশবাসীকে দুইবাহু তুলিয়া তাঁহাদিগকে সহৃদয় সরকার বলিয়া গুণগান করিতে হইতেছে। খয়রাতি সাহায্য বলিয়া যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাহারও বণ্টন-ব্যবস্থা এরূপ, যাহাতে অধিকাংশ স্থানেই তাহা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। এমন বহু দুর্গত অঞ্চল রহিয়াছে, যেখানে আজ পর্য্যন্ত ঐ অকিঞ্চিৎকর খাদ্যশস্যও পৌঁছায় নাই। টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করিতে করিতে বর্ষাকাল আসিয়া গেল, এই অজুহাতে আর উহা কার্য্যকরী হইবে না। সস্তাদরে খাদ্যশস্যের দোকান প্রতিষ্ঠারও কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নাই। অথচ এদিকে বর্দ্ধমানের শহর ও পল্লী অঞ্চলে চাউলের দর ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। এখনই এই অবস্থা তাহা হইলে বর্ষা হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কি সাংঘাতিক অবস্থা হইবে, তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।"

ডি ভি সি'র জল ও জনসাধারণ

"দামোদর" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"ডি. ভি. সি. সময়ে অসময়ে হঠাৎ দামোদরে জল ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণের যে অসুবিধা ঘটাইতেছেন, তাহার প্রতিবাদ আমরা গত বৎসরেও করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এ পর্য্যন্ত তাহার সংশোধন হইল না। দামোদরে বৎসরে প্রায় ৭ মাস জল কম থাকে এবং ঐ সময় দামোদর-বক্ষে গো-গাড়ী ও মানুষ চলাচল করিয়া দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এক্ষণে কোন নোটিশ না দিয়াই কর্তৃপক্ষ জলাধার হইতে জল ছাড়িয়া দেন। দরিদ্র চাষী-বাসী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দামোদর তীরে আসিয়া হতাশ হইয়া গাড়ী ও জিনিসপত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ডি. ভি. সি'র গৌরী সেনের টাকার অভাব নাই। যদি তাঁহারা জল ছাড়বার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্থানীয় পত্রিকা ও দামোদর তীরবর্ত্তী বাজার, হাট ও গঞ্জগুলিতে নোটিশ ও ঢোল সহরৎ করিয়া দেন, তাহা হইলেও কোন অসুবিধা থাকে না। বর্দ্ধমানের জেলা শাসক মহাশয় এই ক্ষুদ্র অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টির সম্বন্ধে কি. ডি. ভি. সিকে সচেতন করাইতে পারেন না?"

"দামোদর" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন আশা করি।

আসানসোলে প্রচণ্ড জলকষ্ট

সমগ্র আসানসোল মহকুমায় প্রচণ্ড জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে গ্রামবাসীদের এক প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসকের সহিত দেখা করিয়া জনসাধারণের নিদারুণ কষ্টের কথা তাঁহাকে জানান। তাঁহারা মহকুমার পানীয় জল পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ শোচনীয় অবস্থারই পরিচায়ক।

অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল নাই এবং বহুস্থলেই জনসাধারণকে ৪ ৫ মাইল দূর হইতে গাড়ী, বাঁক ও মাথায় করিয়া জল আনিতে হইতেছে সাপ্তাহিক "জি, টি, রোড", "দামোদর", "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় এই সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসানসোল শহরে জলকষ্টের আলোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, বৎসরের পর বৎসর একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে অথচ পৌরসভা বা সরকার হইতে তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। এতদিন আশা ছিল সরকারী সাহায্যে ২৪ লক্ষ টাকার জলের পরিকল্পনাটি হয়ত বা কার্য্যকরী করা হইবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়া দিয়াছেন, রাজ্য সরকারের হাতে টাকা নাই, তাঁহারা কোন অর্থসাহায্য দিতে পারিবেন না।

ডঃ রায়ের মনোভাবের সমালোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন যে, অর্থাভাবে জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা হইবে ইহা এক অপরূপ যুক্তি। তাহা ছাড়া অর্থাভাবের যুক্তি কতদূর সত্য? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিলে নানা প্রকারের অর্থ খরচের অভাবে জমিয়া আছে অথবা সময়মত খরচ না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোষে ফিরিয়া যাইতেছে। এই সকল অব্যবহৃত বা উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহের মত জরুরী কার্য্যও কি সরকারের পক্ষে করা অসম্ভব?

স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফল

পশ্চিমবঙ্গে এই বৎসর লক্ষাধিক ছাত্র স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল—তন্মধ্যে শতকরা ৫০ জন পাশ করিয়াছে। ছাত্রদের শতকরা দুই ভাগেরও কম প্রথম ডিভিসনে পাশ করিয়াছে। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উদ্বিগ্ন হইবেন। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় অর্দ্ধ লক্ষেরও বেশি ছাত্র পরীক্ষায় সাফল্যলাভে ব্যর্থকাম হয় সেই ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও বিরাট গলদ রহিয়াছে। অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার অবস্থা ক্রমশঃই অধিকতর নিম্নমুখী হইতেছে। ইহার কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ দূর করিতে স্বভাবতঃই সময় লাগিবে কিন্তু প্রশাসনিক দুর্ব্বলতা ইচ্ছা করিলেই দূর করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠন করা হয় কিন্তু পর্ষদের কোন স্বাধীনতা না থাকায় উহা প্রথম হইতেই পঙ্গু অবস্থায় থাকে। ফলে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি ঘটিতে থাকে। এখনও ঘটিতেছে।

কেবলমাত্র অফিসার নিয়োগের মধ্য দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব নহে, আমরা তাহা জানি। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ ক্ষেত্রবিশেষে একজন কর্ম্মচারীর ভূমিকারও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে এখন কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা-অধিকর্ত্তা নাই। শিক্ষাবিভাগীয় সেক্রেটারীই বহুদিন যাবৎ শিক্ষা-অধিকর্ত্তার কাজ করিয়া যাইতেছেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র শিক্ষার প্রশাসনিক কার্য্য বাড়িয়াই চলিতেছে এই অবস্থায় কিরূপে একই ব্যক্তি শিক্ষাবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দুইটি পদের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা সহজে বোধগম্য নহে।

আর, জি, কর হাসপাতাল

আর, জি, কর হাসপাতালের পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বহুদিন যাবতই নানারূপ অভিযোগ শোনা যাইতেছিল। সম্প্রতি সরকার কলিকাতার এই হাসপাতাল ও তৎসংশ্লিষ্ট কলেজের পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি সরকারী পরিচালনায় হাসপাতালটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে।

বর্দ্ধমানে হাকিম দুর্ভিক্ষ

"বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন: "বর্দ্ধমানের ফৌজদারী আদালতের অবস্থা প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত সংখ্যক হাকিম না থাকায় মামলাকারী জনসাধারণ যে দুর্ভোগ ভুগিতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সাধারণতঃ বর্দ্ধমান সদরে পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীর, দুই জন দ্বিতীয় ও দুই জন তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম থাকিতেন। বর্ত্তমানে দুই জন প্রথম শ্রেণীর তন্মধ্যে একজন জুডিসিয়াল এস, ডি, ও হিসাবে কাজ করেন অর্থাৎ পুলিস ফাইল ও রেলের বিনাটিকিটে যাত্রীদের বিচার করিতেই দিন কাটিয়া যায়। আর একজন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকিম আছেন। প্রথম শ্রেণীর হাকিম শ্রীনস্কর ও শ্রীগোস্বামীর স্থানে কেহ আসেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকিম শ্রী টি, কে, ঘোষের স্থলে কেহ নাই। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রী সেন ও শ্রী দত্তের জায়গায় কেহ নাই। কেবলমাত্র শ্রীব্যানার্জী (প্রথম শ্রেণী) ও শ্রীভৌমিক (দ্বিতীয় শ্রেণী) সদরের তামাম ফৌজদারী মামলার ভার পাইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ দুইটি হাকিমকে প্রত্যহ গড়ে বারটি করিয়া মামলা করিতে হয়। আরও সহজ কথায়, প্রত্যেক মামলার একটি বা দুইটি সাক্ষী লইয়া দিন ফেলিতে হয়। হাকিমদের কাজের চাপের কথা বাদ দিলেও জনসাধারণের হয়রাণির বহর কত দূর, তাহা সহজেই অনুমেয়। শাসন বিভাগ অবিলম্বে হাকিম না পাঠাইলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আশা করিতেছি উপযুক্ত সংখ্যক হাকিম নিয়োগ দ্বারা এই অসহায় অবস্থার অবসান ঘটাইতে কর্তৃপক্ষ যত্নবান হইবেন।"

বর্দ্ধমান রাজবাটিতে কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি

বর্দ্ধমানের রাজবাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলিতেছে। রাজবাটি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে। রাজবাটির প্রাঙ্গণে লর্ড কার্জ্জনের একটি প্রতিমূর্ত্তি এখনও রহিয়াছে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ বর্দ্ধমানের সুবলদহ গ্রামে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর

জন্মভিটায় তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করিয়া যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় একটি প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে, বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত কুখ্যাত লর্ড কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি অপসারণ করিয়া তৎস্থলে বিপ্লবী রাসবিহারীর মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন করা হউক।

রাজবাটী হইতে কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি অপসারণের ব্যাপারে "দামোদর" লিখিতেছেন যে, বহুদিন পূর্ব্বেই ইহা করা উচিত ছিল।

"ব্রিটিশ রাজত্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কুখ্যাত ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের নামে দেশবাসী যখন নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিত, সেই সময় বর্দ্ধমানের রাজবংশ অজস্র অর্থে বর্দ্ধমান রাজবাটীর বহিপ্রাঙ্গণে শয়তান লর্ড কার্জ্জনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুবিখ্যাত 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' বা কার্জ্জন গেট নির্ম্মাণ করেন। দেশ হইতে ইংরেজ শাসন অপসারিত হইবার পর 'দামোদর'-এর প্রস্তাবমত তৎকালীন জেলাশাসক শ্রীঅধিক্রম মজুমদারের চেষ্টায় উক্ত তোরণ কুখ্যাত কার্জ্জনের নামের কলঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়া মহারাজা বিজয়চাঁদের নামানুযায়ী 'বিজয় তোরণ' নামে পরিগণিত হইল; কিন্তু বর্দ্ধমানের শেষ মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব নির্ব্বিকারভাবে তাঁহার প্রাঙ্গণ হইতে কার্জ্জনের মূর্ত্তিটি অপসারণের কথাও চিন্তা করিলেন না। এখন কার্জ্জনও গিয়াছেন এবং তাঁহার উপাসক রাজপরিবারও বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রাজবাটির উক্ত প্রাঙ্গণ এখন সরকারের অধীনে আসিয়াছে। জাতীয় সরকারের পক্ষে আর এক দণ্ডও এই অসম্মান বরদাস্ত করা উচিত নহে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। বর্দ্ধমান মহিলা কলেজ এই রাজবাটীতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আগামী বৎসর হইতেই এই রাজবাটীতেই বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

কেরলের উপনির্ব্বাচন

কেরল রাজ্যের দেবীকোলম নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে সম্প্রতি যে উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীমতী রোসামা পুন্নস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। ১৯৫৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনেও শ্রীমতী পুন্নস উক্ত কেন্দ্র হইতে জয়লাভ করেন, কিন্তু পরাজিত কংগ্রেসী সদস্যের আবেদনক্রমে নির্ব্বাচন কমিশন তাঁহার নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দেন। কেরল বিধানসভায় বিভিন্ন দলের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে এই উপনির্ব্বাচন বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল। বিধানসভায় কম্যুনিষ্টদের মাত্র এক ভোটে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। যদি শ্রীমতী পুন্নস পরাজিত হইতেন তবে কেরলের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। উপরন্তু এই উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস, পি-এস-পি এবং মুসলিম লীগ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ সম্মিলিতভাবে কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও যে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন তাহাতে কম্যুনিষ্টদের এই জয়ের গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নির্ব্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ: শ্রীমতী রোসামা পুন্নস (কম্যুনিষ্ট) ৫৩,০৩৮ ভোট; শ্রী বি. কে. নায়ার (কংগ্রেস) ৪৬,৮৩৩; শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম (স্বতন্ত্র) ৭৬৪০ এবং শ্রীডোমিনিক দেবসিয়া (স্বতন্ত্র) ৬৪৩। এই কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১,৬০,৬১৭, তন্মধ্যে ১,১০,৫৫৩টি ভোট প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ২৪৮২টি ভোট বাতিল হয়।

বর্ত্তমানে কেরল বিধানসভায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিসংখ্যা এইরূপ: কম্যুনিষ্ট—৫জন স্বতন্ত্র সদস্যসহ ৬৫ জন; কংগ্রেস ৪৫, প্রজা-সমাজতন্ত্রী ৯ (ইঁহাদের মধ্যে শ্রী সি, আর, জনার্দ্দন নির্ব্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করিয়াছেন); মুসলিম লীগ ৮ এবং স্বতন্ত্র ২।

ওয়ারশ' চুক্তি জোট

ওয়ারশ' চুক্তি-সংস্থা ন্যাটো চুক্তি-সংস্থার কম্যুনিষ্ট সংস্করণ। কার্য্যকালে দেখা গিয়াছে যে, সোভিয়েট শক্তি সংবর্দ্ধমানের জন্য এই সংস্থা কোন অংশকেই গণিত বলিয়া মনে করে না। ১৯৫৬ সনে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে ওয়ারশ' চুক্তি-সংস্থার আক্রমণাত্মক চরিত্র বিশেষ পরিস্ফুট হয়। তার পর বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আক্রমণাত্মক আচরণেও ওয়ারশ' চুক্তি-সংস্থার প্রতিক্রিয়াশীল রূপ প্রকাশ পায়।

সম্প্রতি মস্কোতে ওয়ারশ' চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যোগদান করেন আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ। চীনের কয়েকজন প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষক হিসাবে সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন।

সম্মেলনের শেষে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহা অনুশীলন করিলে কয়েকটি তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। ওয়ারশ চুক্তি-সংস্থার রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটি রুমানিয়া হইতে সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী রুমানিয়াতে আসে ১৯৪৪ সনে। গত চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সৈন্য সমাজতান্ত্রিক রুমানিয়াতে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য ব্রিটেনে মোতায়েন করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কম্যুনিষ্টদের যে উৎসাহ দেখা যায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে তাহারা অনুরূপ আগ্রহের সহিতই নীরব। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ সোভিয়েট সৈন্যদলের এই উপস্থিতি মোটেই স্নেহের চক্ষে দেখেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসাধারণের কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই। হাঙ্গেরীতেও এখনও বহু সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে।

ওয়ারশ চুক্তি-সংস্থার সৈন্যবাহিনী কমাইবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে সামরিক দিক হইতে তাহার কোনই গুরুত্ব নাই। তবে অবশ্য এইরূপ প্রচারমূলক সিদ্ধান্ত দ্বারা কম্যুনিষ্টরা মার্কিনী নীতির অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিবুদ্ধিতা জনসমক্ষে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তোলে।

মস্কো সম্মেলনে ওয়ারশ চুক্তি-সংস্থার রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটি যে আলোচনা করে সে সম্পর্কে "তাস" প্রচারিত একটি বিবৃতিতে নিম্নলিখিত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে:

"ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক মার্শাল কোনেফ এই কমিটিতে এইসব দেশের সেনাবাহিনীর সংখ্যায় আরও কিছুটা হ্রাস সাধন সম্পর্কে ও রুমানিয়ার ভূখণ্ড হইতে সোভিয়েট ফৌজকে সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন।

ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য-রাষ্ট্রগুলি ও "নাটো"র সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করিয়া এই কমিটি "নাটো"-সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নিকটে পত্র লিখিবেন বলিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে: ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য রাষ্ট্র-গুলি তাহাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যায় ইতিপূর্ব্বেই যে হ্রাস ঘটাইয়াছে, তাহার উপরেও ১৯৫৮ সনের মধ্যে তাহারা মোট ১,১৯,০০০ জন লোককে সেনাবাহিনী হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে—অর্থাৎ, পূর্ব্ববর্তী ঐ সংখ্যাহ্রাস সাধন করিয়া ১৯৫৮ সনে সর্ব্বসমেত ৪,১৯,০০০ জন লোককে এই সব দেশের সেনাবাহিনী হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। ঘোষণা-পত্রে এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য "নাটো" দেশগুলিও তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কমাইবে।

হাঙ্গেরীতে মোতায়েন সোভিয়েট সেনাবাহিনীর আরও এক ডিভিসন সৈন্যকে ১৯৫৮ সনের মধ্যে সরাইয়া লইবার যে সিদ্ধান্ত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, এই কমিটি তাহা অনুমোদন করেন।

পশ্চিমী শক্তিগুলি যেহেতু এক ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিস্থানীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে দিতে ইচ্ছুক নহেন, সেই হেতু ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য দেশগুলির গভর্ণমেণ্টসমূহ মতৈক্যসাধনের উদ্দেশ্যেই "নাটো" ও ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য সমস্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য লইতে হইবে বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছেন না এবং এ সম্পর্কে সম্মতি জানাইতেছেন যে, এই শীর্ষ সম্মেলনের এক বিশেষ পর্য্যায়ে যোগ-দানকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম করিয়া যেন এমনভাবে গঠিত হয় যাহাতে "নাটো" ও ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য-রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা দাঁড়ায় ৩:৪ অনুপাতে।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাঁহারা নিম্নলিখিত দেশগুলিকে এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের কর্তৃত্বাধিকার দিয়াছেন: সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, লোকায়ত্ত পোলিশ প্রজাতন্ত্র, চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্র (লোকায়ত্ত রুমানীয় প্রজাতন্ত্র)।

এই সভা ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "নাটো" জোটের নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলি কর্তৃক অনুসৃত পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতির নীতি ও পারমাণবিক অস্ত্র লইয়া আস্ফালনের নীতির পরিণাম কি তাহা উপলব্ধি করিয়া কতকগুলি "নাটো" দেশ এক সংযততর মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। এই সংযত মনোভাব—বিশেষতঃ ইউরোপে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে বিশেষভাবে অনুকূলতা করিবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সর্ব্বদাই যেরূপ করিয়া আসিয়াছে সেইরূপ ভাবেই কাজ করিয়া চলিবে যাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার সঙ্ঘে বিবৃত কর্ত্তব্যগুলি সাফল্যের সহিত পালন করিতে সমর্থ হয়।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে, ওয়ারশ চুক্তি-সংস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির অথবা এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কোনটিরই অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করিবার ও বিদেশের ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বসার কোন উদ্দেশ্য নাই, সেরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকিতেও পারে না।

উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওয়ারশ-চুক্তির সদস্য-দেশগুলি যেক্ষেত্রে ১৯৫৫ সন হইতে একতরফাভাবে তাহাদের সেনাবাহিনীগুলি হইতে ২৪,৭৭,০০০ জন লোকের সংখ্যা হ্রাস ঘটাইয়াছে এবং সেই অনুপাতে প্রতিরক্ষার ব্যয় কমাইয়াছে, সেক্ষেত্রে "নাটো" দেশগুলি তাহাদের ফৌজের সৈন্যসংখ্যা, সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বাড়াইয়াই চলিয়াছে।

এই সভার সদস্যগণ এ বিষয়ে গর্ব্ববোধ করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী তিনটি শক্তির মধ্যে এমন একটি দেশ—অর্থাৎ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—একতরফাভাবে সর্ব্বপ্রকারের পার-মাণবিক ও উদযান অস্ত্রের পরীক্ষাকার্য্য বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে দেশটি ওয়ারশ চুক্তি-সংস্থারই অন্যতম সদস্য।—ইহা একটি বিরাট মানবতাবাদী কাজ। ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যময় এই মহৎ কাজটি মানবজাতিকে ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ আশঙ্কা হইতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে মুক্ত করার পথটিকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, লোকায়ত্ত চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ কোরিয়া হইতে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইলে ও কোরিয়ায় অবস্থিত সমস্ত মার্কিন ঘাটির উচ্ছেদ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূরপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং কোরিয়ার প্রশ্নের মীমাংসায় এক মস্ত বড় অবদান রাখিতে পারিবে।

বিরোধ-বিসংবাদ দূর করার এবং দুই মুখ্য শক্তি-শিবিরের মধ্যকার স্ববিরোধ সামরিক সংঘর্ষে পর্যবসিত হইতে না দিবার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া এই সম্মেলনে ওয়ারশ-চুক্তি ও নাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি-সম্পাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সম্মেলন কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া চুক্তিতে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি-গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে: সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি বলপ্রয়োগ করিবে না বা বলপ্রয়োগের হুমকি দিবে না; তাহারা পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবে; পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও ন্যায়বোধের আদর্শে ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ-আলোচনা মারফৎ সর্বপ্রকার বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইবে শান্তিপূর্ণ পন্থায়। ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এরূপ পরিস্থিতি যখনই দেখা দিবে তখনই পারস্পরিক আলোচনার জন্য বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

সম্মেলনে এই বিষয়টিকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে যে, এক অনাক্রমণ-চুক্তির ধারণা সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মতিসূচক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ আভাস দিয়াছেন।)

ওয়ারশ-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ঘোষণা করিতেছে যে, চুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী লইয়া "নাটো" প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের জন্য তাহারা যে কোন সময় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে সম্মত আছে। শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ব্বেই অগোচরে এরূপ মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যায় এবং তদ্দ্বারা শীর্ষ সম্মেলনে চুক্তি সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ পরিষ্কার হইবে।

কম্যুনিষ্ট গোঁড়ামির নূতন রূপ

সরকারী কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি যে কিরূপ অযৌক্তিক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে, যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির নব আক্রমণে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কার্ল মার্ক্স অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করিয়া একটি অধিকতর সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার পথনির্দ্দেশ করেন। তাঁহার চিন্তাধারার যৌক্তিকতা তখনকার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং বহুদিন পরে মার্ক্সবাদ বিশ্বের চিন্তাধারার উপর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মার্ক্সবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবনিষ্ঠা, কিন্তু আজ তথাকথিত কম্যুনিষ্টরা মার্ক্স-এর নামে এমন সকল কার্য্য করিতেছে, যাহা মার্ক্স কখনও কল্পনা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ কম্যুনিষ্টদের আচরণে আর যাহাই থাকুক, বাস্তবনিষ্ঠা নাই। কয়েকটি ঘটনা অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ষ্ট্যালিনের আমলে ষ্ট্যালিন যখন যাহা করিতেন, তখন সকল দেশের কম্যুনিষ্টদের নিকট তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল কার্য্য বলিয়া মনে হইত। কখনও কোন কম্যুনিষ্ট পার্টি ষ্ট্যালিনের কার্য্যাবলীর নিরপেক্ষ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করে নাই। ষ্ট্যালিন যখন ১৯৪৩ সনে কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া কম্যুনিষ্টদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাঙ্গিয়া দিলেন—তখন সমগ্র বিশ্বের কম্যুনিষ্টরা তাহা সমর্থন করিল; পুনরায় চার বৎসর পরে ষ্ট্যালিন যখন ইউরোপীয় কম্যুনিষ্টদের একটি প্রতিষ্ঠান—কমিনফর্ম্ম গঠনের কথা বলিলেন, তখনও চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সমর্থন আসিল। রুশবিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে যখন ষ্ট্যালিন রাষ্ট্রদ্রোহী, সাম্রাজ্যবাদী চর হিসাবে হত্যা করিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে কম্যুনিষ্ট মহল তাহারও প্রশংসা করিল। ১৯৩৮ সনে পোলাণ্ডে সরকারী সন্ত্রাসবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ সমাজ-তান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে নিয়া আশ্রয় লইলেন, তখন ষ্ট্যালিন তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী চর বলিয়া ঘোষণা করিয়া হত্যা করিলেন। কিন্তু কোন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি ইহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করিল না।

এতদিন পর্য্যন্ত এ সকল তথ্যকে কম্যুনিষ্টরা "সাম্রাজ্যবাদী রটনা" বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইত। কিন্তু ১৯৫৬ সনে সোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ক্রুশ্চেভ স্বয়ং এই সকল অন্যায় স্বীকার করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ জানাইলে সোবিয়েটের বাহিরের কম্যুনিষ্টরা বিপদে পড়ে, কিন্তু এই সকল অন্যায় এবং হত্যাকাণ্ড কম্যুনিষ্টদের নিকট কেবলমাত্র "ভুল"—"অপরাধ" বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নহে।

১৯৪৭ সনে কমিনফর্ম্ম গঠিত হইবার পর বিভিন্ন পূর্ব্ব-ইউরোপীয় দেশগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপনিবেশে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ষ্ট্যালিন যুগোস্লাভিয়ার নিকট বাধা পান। ইতিপূর্ব্বে ষ্ট্যালিন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভুত্ব-স্থাপনের সকল প্রকার প্রতিবন্ধক সবলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং সকল ব্যাপারেই তাঁহার মত চালাইতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং টিটো যখন ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশ মানিতে অস্বীকার করিলেন তখন ষ্ট্যালিন টিটোকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং গুপ্তচর বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। যুগোস্লাভিয়াকে অর্থনৈতিক এবং পরোক্ষভাবে সামরিক চাপে রাখিয়া জব্দ করিবার কোন প্রকার প্রয়াস সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি বাকী রাখে নাই। বহির্বিশ্বের কম্যুনিষ্টরা যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সকল প্রকার সোভিয়েট বর্ব্বরতাকে সমর্থন করিয়া চলে।

১৯৫৩ সনে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে যুগোস্লাভিয়ার প্রতি ষ্ট্যালিনের নীতির নিন্দা করেন এবং স্বয়ং ক্রুশ্চেভ বেলগ্রাদে যাইয়া যুগোস্লাভিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। টিটোর দাবীতে ১৯৫৬ সনে কমিনফর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বিশ্বের যে সকল কম্যুনিষ্ট পার্টি যুগো-স্লাভিয়ার নিন্দায় এবং কমিনফর্ম্মের সমর্থনে এতদিন গলা ফাটাইয়া

চীৎকার করিয়া আসিতেছিল—তাহারা তখন সম্পূর্ণরূপে নীরব রহিল। ক্রমে ক্রমে কম্যুনিষ্টদের আলোচনায় যুগোস্লোভিয়াকে পুনরায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

এখন আবার যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে রুশ অভিযান সুরু হইয়াছে। এবারে আক্রমণের পুরোভাগে রহিয়াছে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি। ১৯৫৪ সনের পর যুগোস্লাভিয়ার নীতির কি কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? মোটেই না। তবে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এই নূতন আক্রমণের ভিত্তি কি? ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই কঠিন—বিশেষতঃ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে সকল নূতন অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া সাধারণ যুক্তিতে ইহার কোনরূপ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর। নূতন অভিযোগে বলা হইতেছে যে, ১৯৪৮ সনে ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশে কমিনফর্ম যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করিয়াছে তাহা যথার্থ। যুগোস্লাভিয়া বুর্জ্জোয়া-পন্থী, সংস্কারবাদী—অতএব মার্কসপন্থী বন্ধুগণ, সাবধান! অজ্ঞ লোক প্রশ্ন করিতে পারে—১৯৪৮ সনের সমালোচনাই যদি ঠিক তবে ১৯৫৪ সনের যুগোস্লাভিয়ার নিকট সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে তজ্জন্য ক্ষমা চাওয়া হইয়াছিল কি জন্য? কম্যুনিষ্টরা এখন বলিতেছে, যুগোস্লাভিয়াকে কম্যুনিজমের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির উহা একটি পরম নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। প্রশ্ন হইতে পারে, ১৯৫৪ সনে কি দেখিয়া সোভিয়েট পার্টি যুগোস্লাভিয়ার সহিত মিতালী পাতাইতে গিয়াছিল, আর এখনই বা যুগোস্লাভ নীতিতে এমন কি পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, যাহার জন্য নূতন ভাবে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে হইতেছে? ইহার কোন সদুত্তর নাই। কিন্তু বিশ্বের প্রায় সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্টরা রাশিয়ার সমর্থনে ইতিমধ্যেই বহু বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যুগোস্লাভিয়ার বক্তব্য আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করে নাই।

ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি অধিকতর ষ্ট্যালিনপন্থী—এই দলের নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য এমন সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহার সহিত ষ্ট্যালিনের কর্ম্ম-পন্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণে ইহারা সবিশেষ উল্লসিত। যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে চীনের পার্টির সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি উহারা নিজেদের পত্র-পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাহার উত্তরে যুগোস্লাভ পার্টি যাহা বলিয়াছে তাহা ছাপানো প্রয়োজন মনে করে নাই। যুগো-স্লাভিয়ার বক্তব্য না জানিয়া কি ভাবে সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা সাধারণ মানুষের নিকট দুর্ব্বোধ্য ঠেকিলেও যাহারা রাশিয়াকে ইহকাল-পরকাল মানিয়া লইয়াছে, তাহাদের নিকট কোন বিষয়ে রাশিয়ার বক্তব্য শুনিবার পর আর কাহারও বক্তব্য শুনিবার প্রয়োজন থাকে না। চিন্তার এই দাসত্ব সত্যই অভিনব!

ফরাসী গণতন্ত্রের পতন

ফরাসী গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু গণতন্ত্রের দেশ ফ্রান্সে গণতন্ত্রের যে এইরূপ অপমৃত্যু ঘটিবে, তাহা অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী কমিউনিষ্টরাই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিয়াছে।

ফ্রান্সে জেনারেল চার্লস ড্গল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী হইয়া তিনি ছয় মাসের জন্য পার্লামেণ্টকে, পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে, বাতিল করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসী সংবিধান সংশোধনের জন্যও তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় পরিষদের সহিত কোনরূপ আলোচনা না করিয়াই তিনি সংবিধানের সংশোধন করিবেন এবং তাহা সমর্থন অথবা প্রত্যাখ্যানের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবনতির জন্য কোনক্রমেই সংবিধানকে দায়ী করা যাইতে পারে না। ফ্রান্সের সঙ্কটের জন্য দায়ী ফ্রান্সের নীতি। একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া নীতি সম্পর্কে অন্যান্য দল-গুলির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইন্দোচীন, মরক্কো, টিউনিস এবং এলজিরিয়া সম্পর্কে বহু বৎসর যাবৎ সমাজতান্ত্রিক, মধ্যপন্থী এবং রক্ষণশীল দলগুলির নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের এই নীতিজ্ঞানহীনতার জন্যই ড্গল সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ডিক্টেটরী ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

ফ্রান্সের অক্ষম সরকারী নীতিতে আভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তেই হয় ত সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত। বস্তুতঃ এলজিরিয়া এবং কর্সিকাতে সামরিক অধিনায়কেরা প্রকাশ্যেই সরকারের বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কটজনক অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। বহুদিন হইতেই ইহার সূচনা দেখা দিয়াছিল। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে অনেক বিদেশী সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছিলেন যে, ড্গলের ক্ষমতালাভ প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

দ্যগল প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, এখন কোন সংবিধানগত দুর্ব্বলতা তাঁহাকে বাধা দিতেছে না—কিন্তু ফ্রান্সের কোন প্রকৃত সমস্যার সমাধানের দিকে তিনি বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অথবা এলজিরিয়া কোনটিরই সমাধানের পথ সুগম হয় নাই। অপরপক্ষে দ্যগল এলজিরিয়া সম্পর্কে যে সকল ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে এলজিরিয়ার সঙ্কট বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া কমিবে না।

ছত্রপতি দ্যগল

ফ্রান্সে দলীয় বিক্ষোভের পরিণতির প্রথম সংবাদ নিম্নরূপ।

প্যারিস ৩রা জুন—ফরাসী পার্লামেণ্ট জেনারেল ড্গলের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব অদ্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন।

সংবিধানের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ছগলকে অনুমতিদানের উদ্দেশ্যে আনীত বিলটি অদ্য সকালে সেনেটে (উর্দ্ধতন পরিষদ) বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। বিলটি এখন আইনে পরিণত হইল।

দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সর্ত্ত হিসাবে ছগল যে দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংবিধান সংশোধনের কথাটিও ছিল।

ইহার পূর্ব্বে নিম্ন পরিষদেও বিলটি গৃহীত হয়।

জেনারেল ছগল আর একটি বিষয়ের উপরও জোর দিয়াছিলেন এবং তাহা ছিল এই যে, আগামী ছয় মাস তিনি পার্লামেন্টের সহায়তা ছাড়াই শাসন চালাইবেন। এতদুদ্দেশ্যে আনীত বিলটিও উভয় পরিষদে গৃহীত হয়।

অদ্যকার ভোট গ্রহণের পূর্ব্বে জেনারেল ছগল সেনেটে দশ মিনিট বক্তৃতা দেন এবং শাসন সংস্কার বিলটি সমর্থন করিতে অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে জনগণের অভিমত জানিয়া লওয়া হইবে। বিলটি অবিলম্বে আইনে পরিণত হওয়ার জন্য তিন-পঞ্চমাংশ ভোট পাওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, ছগল অনায়াসেই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছেন। সেনেটে বিলটি ২৫৬—৩০ এবং জাতীয় পরিষদে ৩৫০—১৬৩ ভোটে গৃহীত হয়। জেনারেল ছগল এখন আলজিরিয়া অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সংবিধান সংস্কার বিলটি সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে বক্তৃতাকালে ছগল বলেন, আপনারা যদি আমার হস্তে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সংবিধান সংস্কারের সুযোগ না দেন, তবে আগামীকল্য সকালে এই মন্ত্রিসভার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

তিনি পরিষ্কারভাবে নাটকীয় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আপনারা হয় এই বিলটি মানিয়া লউন অথবা আমাকে স্বীয় পল্লীভবনে গিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে দিন।

পরিষদে ভোটাধিকার কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিলটির সংশোধন করার সুপারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু জেনারেল ছগল অদ্য কালবিলম্ব না করিয়া ঘোষণা করেন যে, মূল বিলের কোন সংশোধনই চলিবে না। বিলটি যে আকারে আপনাদের নিকট পেশ করা হইয়াছে, ঠিক সে আকারেই গ্রহণ করুন। অন্যথায় আমি বিদায় লইতেছি।

সংবিধান সংশোধনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই আমার মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। আমাকে প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা পরিবর্ত্তন কামনাই প্রকাশ করিয়াছেন।

জেনারেল ছগল কম্যুনিষ্ট নেতা মঃ ডুক্লোসের বক্তৃতা গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

ডুক্লোস বলেন, ছগলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। বিলটির বিরুদ্ধেও আমরা ভোট দিব।

সেনেট গত রাত্রিতে বিশেষ ক্ষমতা বিলটি ২৬০—৪৮ ভোটে অনুমোদন করেন। বিলটি এখন আইনে পরিণত হইল।

লেবাননের ঘটনাবলী

লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক স্থিতি কত দুর্ব্বল। লেবানন সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তী একটি আরব রাজ্য। ইহার আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৬,২৫,০০০। রাজনৈতিকভাবে লেবাননকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা: উত্তর লেবানন, মাউণ্ট লেবানন, বেরুথ, দক্ষিণ লেবানন এবং বেকা। লেবাননের রাজধানী বেরুথ একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর দিয়া ২০ লক্ষ টন মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। লেবাননের অপর তিনটি প্রধান শহর হইল ত্রিপলি (লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ) সৈদা (৬০,০০০) এবং জাহলে (৩০,০০০)। বেরুথ নগরীর লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ।

লেবানন আরব রাজ্য। কিন্তু অন্যান্য আরব রাজ্যে যেমন ইসলামধর্ম্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এখানে সেরূপ নহে। লেবাননে ইসলামধর্ম্মাবলম্বীরা সমগ্র লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ৪৬·৫ অংশ। এখানকার শতকরা ৫৩ জন লোক খৃষ্টান। দেশের শাসনব্যবস্থায় "কনফেশনালিজম" (confessionalism) একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পদে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের আসনদান সম্পর্কে উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে যে চুক্তি রহিয়াছে, তাহাকেই "কনফেশনালিজম" বলা হয়।

লেবাননের অর্থনীতি পশ্চাদপদ। রাষ্ট্রের প্রায় শতকরা ৫০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবাদী মোট তিন লক্ষ হেক্টার জমির অধিকাংশই জমিদার, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মালিকানায় রহিয়াছে। প্রধান কৃষিদ্রব্য হইল শস্য এবং ফল।

রাষ্ট্রের শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সিমেণ্ট, তৈল-সংশোধন এবং বস্ত্রশিল্প। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিরই সংখ্যা বেশী। সমগ্র রাষ্ট্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫,০০০।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত লেবানন তুরস্কের অধীন ছিল। ১৯১৮ সনে ফ্রান্স লেবানন অধিকার করিয়া লয়। পরে লীগ অব নেশনস ফ্রান্সকে লেবাননের শাসনভার অর্পণ করে। লেবাননের সংবিধান হইতে ১৯৪৩ সনে ফ্রান্সের ম্যানুডেট সম্পর্কিত উল্লেখ সকল তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সনের পূর্ব্বে লেবানন হইতে বিদেশী সৈন্য অপসৃত হয় নাই।

নূতন রাষ্ট্র হিসাবে প্রথম হইতেই লেবানন বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেবানন এই উদ্দেশ্য আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। ১৯৫৭ সনে লেবানন সরকারীভাবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিনী "আইসেনহাওয়ার নীতি" গ্রহণ করে। ইহাতে দেশের মধ্যে

সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। "টেলিগ্রাফ" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নসীব মেতনির হত্যাকাণ্ডের পর এই গণবিক্ষোভ আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। সরকার এই বিক্ষোভ দমনে অপারগ হইয়া মার্কিন সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। অপরপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে, লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদি মার্কিন সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন তবে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিশেষভাবে বিপন্ন হইবে। ইতিমধ্যে লেবানন সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, লেবাননের বিক্ষোভ-কারীদের পিছনে সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের উস্কানী রহিয়াছে। অবশ্য শেষোক্ত রাষ্ট্র এই অভিযোগ পুরাপুরি অস্বীকার করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যে সকল রাষ্ট্র পশ্চিমী আওতায় গিয়াছে সেখানেই জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলন প্রবলতা লাভ করিয়াছে। সেইদিক হইতে লেবাননে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের পিছনে যে দেশের জনমতের এক বিরাট অংশের সমর্থন রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের রাষ্ট্রের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন-যোগ্য নহে।

সোভিয়েট এবং মার্কিন উপগ্রহ

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি করিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহাদের নাম, নিক্ষেপের তারিখ এবং তুলনামূলক ওজন নীচে দেওয়া হইল :

সোভিয়েট উপগ্রহ	নিক্ষেপের তারিখ	ওজন
স্পুটনিক—১	৪ ১০ ৫৭	১৮৪ পাঃ
স্পুটনিক—২	৩।১১।৫৭	১,১১৮ পাঃ
স্পুটনিক—৩	১৫।৫.৫৮	২,৯২৯ পাঃ

তিনটি সোভিয়েট উপগ্রহের সম্মিলিত ওজন ৪,৩২১ পাঃ

মার্কিন উপগ্রহ	নিক্ষেপের তারিখ	ওজন
এক্সপ্লোরার—১	৩১।১.৫৮	৩০ ৮ পাঃ
ভ্যানগার্ড—১	১৭।৩ ৫৮	৩·২৫ পাঃ
এক্সপ্লোরার—৩	২৬ ৩.৫৮	৩১ পাঃ

তিনটি মার্কিন উপগ্রহের সম্মিলিত ওজন ৬৫·০৫ পাঃ

দক্ষিণ-আমেরিকায় মার্কিন বিরোধিতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নীতি যে কেবলমাত্র এশিয়া এবং আফ্রিকার জনসাধারণের নিকট হইতেই বিরোধিতা পাইতেছে তাহা নহে, ইউরোপ এবং আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্রে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আমেরিকা মহাদেশে এই প্রতিবাদ কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, বিভিন্ন দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্রে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিক্সন যেরূপ ব্যবহারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। ভেনেজুয়েলায় নিক্সন বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। তিনি বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিবার পর হইতে তাঁহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকে না—লোকেরা তাঁহার গায়ে আবর্জ্জনা এবং থুথু নিক্ষেপ করিতে থাকে। নিক্সন কোনরকমে আত্মরক্ষা করেন। ভেনেজুয়েলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি একটি সশস্ত্র সামরিক গাড়ীতে আসেন এবং সমগ্র পথটিতে কড়া সামরিক পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন মহল এই বিক্ষোভকে কম্যুনিষ্ট প্ররোচনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দায়িত্বশীল মার্কিনী মহল স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিনী নীতির জন্যই এইরূপ বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কম্যুনিষ্টরা ছাড়া বহু প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তি প্রকাশ্যেই মার্কিন নীতির সমালোচনা করিয়াছেন।

জাপানের নির্ব্বাচন

জাপানের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে জাপানের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic Party) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। দলের নেতা নবুসুকে কিশির বিরুদ্ধে জাপানে যেরূপ সমালোচনার ঢেউ বহিয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী কিশির দলের এই জয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপানী ডায়েটের (পার্লামেণ্ট) প্রতিনিধিসভার মোট সদস্যসংখ্যা ৪৬৭, তন্মধ্যে শ্রী কিশির উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল পাইয়াছে ২৮৭টি আসন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিসংখ্যার দিক হইতে সোসালিষ্ট পার্টির স্থান দ্বিতীয়, সোসালিষ্টরা ১৬৬টি আসন পাইয়াছে, স্বতন্ত্র সদস্যগণ ১২টি আসন দখল করিয়াছেন, আর কম্যুনিষ্টরা পাইয়াছে মাত্র একটি আসন।

এই বিপুল জয়লাভে শ্রী কিশি স্বভাবতঃই বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে সকল নীতিসংক্রান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞজনোচিত বলা যায় না। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি জাপানী সমাজতন্ত্রীদের নিরপেক্ষ নীতির সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিজস্ব পশ্চিমীঘেঁষা নীতিকে উচ্চে তুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাপানের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, জাপানের বর্ত্তমান সমস্যাবলীর জন্য বহুলাংশে দায়ী কিশি-সরকারের অত্যধিক পশ্চিম-প্রীতি।

শ্রমিক নীতি

বর্ত্তমানে দেশে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের যে প্রকার প্রবাহ চলিতেছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত সরকারের শ্রমিক নীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সন হইতে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য বহু আইন পাস করা হইয়াছে ; তাহাতে শ্রমিকদের মঙ্গল হইয়াছে কিনা বলা মুস্কিল ; তবে ইহা দেখা যায় যে, শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট হয় নাই। বার্ণপুর, তাহার পর জামসেদপুর, সারা দেশব্যাপী ডাক ধর্ম্মঘট শ্রমিক অসন্তোষের সূচনা করে। রেলপথ ও ডাকবিভাগের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘটের জন্য প্রায়ই হুমকী দেয়।

শ্রমিক ধর্ম্মঘটের পিছনে রাজনৈতিক দলগুলির রাজনীতি সক্রিয়ভাবে কার্য্যকরী এবং দেশের শ্রমিকদের উপর হইতে কংগ্রেসী

দলের প্রভাব দিন দিন হ্রাসমান। কিন্তু প্রধান কারণ মূল্যমান বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি। উন্নয়নী অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল্যমান ক্রমবর্দ্ধমান হইতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায়) কেবলমাত্র কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা মূল্যমানকে নির্দিষ্ট সমতায় নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। এই অবস্থায় দ্রুতহারে বর্দ্ধনশীল মূল্যমানের সহিত সমতা রক্ষার জন্য শ্রমিকগণ যে অধিকতর পারিশ্রমিক দাবী করিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় সরকারী ঔদাসীন্য শ্রমিকদের আরও সরকার-বিমুখ করিয়া দেয়।

ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘট

ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘট ত চলিতেছে। একদল রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যান্বেষি সম্প্রতি নানাস্থলে শ্রমিক সংগঠন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে দেশ ও জাতি। লাভ কাহারও যে হইতেছে বা হইবে মনে হয় না। ঐ ধর্ম্মঘটের আরম্ভের মুখে নিম্নের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১২ই জুন—দেশব্যাপী ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘটের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, উহার সম্মুখীন হইবার জন্য ভারত সরকার কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ডক শ্রমিক বোর্ডের চেয়ারম্যানগণকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছেন। জরুরী অবস্থায় প্রাপ্ত ক্ষমতা-বলে ডক শ্রমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

পি টি আই'র সংবাদে প্রকাশ, জরুরী অবস্থা ঘোষণার তাৎপর্য্য হইবে এই যে, কোন শ্রমিক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বন্দরের কাজ ব্যাহত করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ডক শ্রমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান তাহার বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং শ্রমিকগণকে বরখাস্ত বা সসপেণ্ড করার জন্য সাধারণতঃ যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা বর্জ্জন করিতেও পারিবেন। বন্দরের কার্য্য-পরিচালনার জন্য তিনি অন্য লোক নিয়োগ করিতেও পারিবেন।

১৬ই জুন তারিখে বন্দর ও ডক শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট যদি আরম্ভ হয়, তবে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরে খাদ্য, তৈল ও কয়লার ন্যায় অত্যাবশ্যক মালসমূহ খালাসের জন্য সরকারী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। সম্ভাবিত জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর অত্যাবশ্যক মাল খালাস ও বন্দরসমূহের অন্যান্য অপরিহার্য্য কাজ চালু রাখার জন্য সেনাদলের সহায়তা গ্রহণ করা হইবে।

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও কোচিন বন্দরের ১ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়াছে। কাণ্ডলার শ্রমিকরাও এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে পারে।—ইউ পি

জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যান্য বন্দর কর্তৃপক্ষও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনুমতি চাহিবেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের জরুরী ক্ষমতা গ্রহণের ফলে প্রস্তাবিত ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করা হইবে।

বোম্বাই, ১১ই জুন—বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান ২৫ হাজার ডক শ্রমিকের চারিটি ইউনিয়নকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১৫ই জুন মধ্যরাত্রি হইতে যে ধর্ম্মঘট হইবে, উহাকে বেআইনী ঘোষণা করা হইবে, কারণ শ্রমিক ও পোর্ট ট্রাষ্টের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে, তাহা এখনও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যালের বিচারাধীন আছে।

ইউনিয়নসমূহের মুখপত্র বলেন, সরকার যুক্তিসঙ্গত দাবী যদি মানিয়া না লন, তাহা হইলে ধর্ম্মঘট করা হইবে।

বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের মুখপাত্র বলেন যে, আসন্ন ধর্ম্মঘটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় যানবাহন মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল এখানে আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি 'ছুটি'তে এখানে আসিয়াছেন। বন্দর ও ডকের শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা যদি আলাপ করিতে না আসেন, তবে তিনি কোন আলাপ করিবেন না।

ফরাক্কা

ফরাক্কা বাঁধ ত কবে হইবে কোন ঠিক নাই। এদিকে কলিকাতা বন্দর ত প্রায় অচল। বিধানসভায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা নীচে দেওয়া হইল।

"শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস ও বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ একবাক্যে ধ্বনি তোলেন: অবিলম্বে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক। নতুবা পশ্চিমবঙ্গ বাঁচিবে না। বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য উহা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানান।

"এইদিন সেচ ও দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরী সম্পর্কে আলোচনা কালে উক্ত দাবী উঠে।

"সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি এইরূপ আশ্বাস দেন যে, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনাটি ধামা চাপা পড়ে নাই। ঐ সম্পর্কে অধ্যাপক হেনসনের রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় জল এবং বিদ্যুৎশক্তি কমিশন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছে এবং উহা এক্ষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীন আছে। শ্রী মুখার্জ্জি জানান যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অধ্যাপক হেনসনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

"বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ "পশ্চিম বাংলার জিয়নকাঠি" ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে যথোপযুক্ত সক্রিয় নহেন বলিয়াও অভিযোগ করেন।

"দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন সম্পর্কে শুধু বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ নহেন, এমন কি কোন কোন কংগ্রেস সদস্যও এই প্রকার

অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, ঐ পরিকল্পনা বন্যা-নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হইয়াছে, জমিতে জলসেচ করিতে অক্ষম হইয়াছে এমনকি বিদ্যুৎ-সরবরাহও আশানুরূপ নহে। রাজ্য সরকারের সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও এইদিন নানা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়।"

"সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি উদ্বোধনী-বক্তৃতায় বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সন হইতে ১৯৫৮-৫৯ সন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ প্রায় ৬১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন বা করিতেছেন এবং এই রাজ্যের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন ১৯৫৮-৫৯ সন পর্য্যন্ত ৫১কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, মোট ১১৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন ও করিতেছেন।"

রেলের শান্তিশৃঙ্খলা

কলিকাতায় সম্প্রতি রেলযাত্রীরা যেভাবে কার্য্যকলাপ করিয়াছে তাহাতে ডাঃ রায়ের টনক নড়িয়াছে। কিন্তু সারা দেশেই ত এইরকম উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা বহিতেছে। যিনি শান্তিশৃঙ্খলার দপ্তর লইয়াছেন ইহা তাঁহারই অযোগ্যতার পরিচায়ক নয় কি? ডাঃ রায়ের বিবৃতির অংশ নীচে "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে দেওয়া হইল:

"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে শহরতলী অঞ্চলে ট্রেন চলাচলে বিশেষ বিলম্ব হওয়ায় একদল যাত্রী যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ট্রেন বিলম্বে চলাচল করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যাত্রিগণ হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের আশ্রয় লইয়াছে এবং ষ্টেশনের আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করিয়া রেল-কর্ম্মীদের উপর মারপিট করিয়াছে। আমি ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাহি যে, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কখনই সহ্য করা যাইবে না।"

"শহরতলী অঞ্চলে ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হওয়ায় এবং শিয়ালদহ ও হাওড়ায় নিয়মিত সময়ের অনেক পরে ট্রেন পৌঁছিবার ফলে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমার উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। ইহার ফলে যাত্রিগণ যে কেবল কর্ম্মস্থলে যথাসময়ে পৌঁছিতে পারেন না, তাহাই নহে পরন্তু মালিকদের সহিত তাঁহাদের নানারূপ অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং তাঁহাদের (মালিক) বিরক্তির কারণ হয়। এইরূপ ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হওয়ায় কয়েকজন যাত্রী নিজেরাই আইনের ভার স্বহস্তে তুলিয়া লয়।"

কথা বনাম কাজ

নিম্নের সংবাদটির কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেট সম্পর্কে চারদিনব্যাপী বিতর্কের উত্তরদানকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গালীর কঠোর শ্রম করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, বাঙ্গালী কঠোর শ্রম করিতে অক্ষম ইহা তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। মুখ্যমন্ত্রী এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাঙ্গালীর জন্য উপযুক্ত কাজের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে তাঁহারা আশানুরূপ কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

এক ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতার উপসংহারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিন্দা বা প্রশংসায় কিছু যায় আসে না, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহাই বড় কথা। তিনি বলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত আমাকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা এবং যাহাতে উহা ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য উহাকে আরও প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলাই আমার একমাত্র ব্রত হইবে।"

ডাঃ রায় ফরাক্কা বাঁধ, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, কল্যাণী ও দুর্গাপুর পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়া সরকারী নীতি বিবৃত করেন।

এইদিন বিরোধীপক্ষের ছয়জন সদস্য উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, খাদ্য-সমস্যা, রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তর, শ্রমিক ছাঁটাই, পল্লী-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সরকারী নীতির সমালোচনা করেন।

বাঙালীর চা বাগান

নীচের খবরটি আমরা আনন্দবাজার হইতে দিলাম। বাঙালীর দুর্দ্দশা কতদূর গিয়াছে ইহা হইতে বুঝা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের যে সব চা বাগান অপেক্ষাকৃত নিরেস ধরণের সাধারণ চা উৎপাদন করে, সেগুলি এক বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। চা শিল্পে এই সঙ্কট দূরীভূত না হইলে বহু লোক বেকার হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালীদেরই ইহাতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

চা শিল্পে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে টী বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্য এবং ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রী বি. সি. ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, আন্তর্জাতিক চা চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার পর হইতে ঐ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ভারত এবং সিংহল সরকারের মধ্যে মতবিরোধের দরুন ১৯৫৫ সনের ১লা এপ্রিলের পর হইতে ঐ চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হয় নাই। এই চুক্তির দ্বারাই বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইত।

শ্রীঘোষ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উল্লিখিত শ্রেণীর চা বাগান-গুলিতে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সুগন্ধি ও উচ্চগুণসম্পন্ন চা দার্জ্জিলিঙে হয়। অবশিষ্ট ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড

চা যাহা ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, তাহা সবই সাধারণ চা। ডুয়ার্সে ১৫৫টি এবং তরাই অঞ্চলে ৪৮টি চা বাগান আছে। ডুয়ার্সের ১৪১টি এবং তরাইয়ের ৩৬টি চা বাগানের ১৪৪৩৬৬ জন শ্রমিক, ১১৯৩১ জন অধস্তন কর্মচারী এবং ৩২৮৫ জন কেরাণীর কাজে নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়াও চা বাগানের সদর অফিস (জলপাইগুড়িতে) এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্লাইউড শিল্প, বাক্স এবং যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ শিল্প প্রভৃতিতেও বহু বাঙ্গালী কাজ করে।

১৯৫৭ সনে অনুষ্ঠিত এক তদন্তে প্রকাশ যে, বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত তরাই অঞ্চলের প্রায় সব এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে অধিকাংশ চা বাগানই লোকসান দিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে এই সকল চা বাগান স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ জলপাইগুড়ির চা কোম্পানীগুলি এইক্ষেত্রে অগ্রণী। প্রকাশ, জলপাইগুড়িস্থিত এই ধরণের ৫১টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী কর্ত্তৃক চায়ের ব্যবসায়ে ৩ কোটির অধিক টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল কোম্পানীর অধিকাংশেরই মালিক কয়েক হাজার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী।

এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, উল্লিখিত চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে রপ্তানী-কর হ্রাসের দ্বারা সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করা হইলে অবিলম্বে ঐ চা বাগানগুলিতে বিরাট বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ, বাঙ্গালীরাই ইহাতে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

বিগত ১৯শে মে ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য যদুনাথ সরকার হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কয়েক মাস কম অষ্টাশী বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এদিক হইতে আমাদের শোক বা আক্ষেপের তেমন কারণ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মত এরূপ কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে ভারত-সংস্কৃতিক্ষেত্রকে হয়ত অধিকতর পুষ্ট করিয়া যাইতে পারিতেন এই কথা ভাবিয়াই আজ আমরা বিশেষ দুঃখিত ও শোকাভিভূত।

আচার্য্য যদুনাথ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগ সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫০০-১৮০০—এই তিন শত বৎসরের অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ইতিহাসের উপর নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম দ্বারা তিনি বিশেষ আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আর তাঁহার আশ্চর্য্য রচনাশৈলী বিশ্ববাসীকে তাঁহার গবেষণার ফল সহজে গ্রহণ করাইতেও সক্ষম হইয়াছেন। এই তিন শত বৎসর ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। আর এই সময়েই ভারতবর্ষে কি কি কারণে নবজাগরণের প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা পদে পদে ব্যাহত হইয়া শেষে বিদেশী শ্রেষ্ঠতর শক্তির নিকট ভারতবর্ষকে বিলাইয়া দিতে হইয়াছে, আচার্য্য যদুনাথের ইতিহাস গ্রন্থমালা—ঔরংজেবের ইতিহাস এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতন-বিষয়ক গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে তৎসমুদয় বিশেষ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ভারতেতিহাস ক্ষেত্রে আচার্য্য যদুনাথের দান অপূর্ব্ব এবং অভূতপূর্ব্ব একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। এই তিন শত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনাকালে তিনি প্রাক্-শিবাজী, শিবাজী এবং উত্তর-শিবাজী যুগের মারাঠা শক্তির ক্রমবিকাশ, উন্নতি এবং অধঃপতনের বিষয়ও অন্যান্য পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

ঐ সময়ের ইতিহাসের গবেষণা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে ভাষাতত্ত্ববিদ হইতে হইয়াছে। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বাদে ফার্সী, হিন্দী, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ভাষাও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। এই সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়াই তিনি ইতিহাসের আকরগুলি যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তাঁহার বেশীর ভাগ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলারও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা সাময়িক সমস্যা, সামাজিক উন্নতি এবং সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তেও বিভিন্ন সময়ে অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা অন্যত্র ইহার একটি ফিরিস্তী দিলাম। 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রথম সংখ্যা হইতে তিনি দীর্ঘকাল ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার শেষ রচনা বাহির হয় গত জানুয়ারী (১৯৫৮) সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে বহু বৎসর যুক্ত ছিলেন।

আচার্য্য যদুনাথ জীবনে দেশ-বিদেশ হইতে বহু সম্মান লাভ করিয়াছেন। আবার পারিবারিক জীবনেও তিনি বার বার যেরূপ শোক ও আঘাত পাইয়াছেন এরূপ কম লোকই পাইয়া থাকে। কিন্তু কোন কারণেই তাঁহার একনিষ্ঠ গবেষণা-কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। আমরা গীতাকারের কথায় বলিতে পারি—তিনি সুখে ছিলেন বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা। এই পুরুষসিংহকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

শঙ্কর-দর্শনে "জীব"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্কর তাঁর অপূর্ব অদ্বৈত দর্শনে প্রত্যেক বিষয়ই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। জীবের ক্ষেত্রেও, পারমার্থিক স্তরে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলে, সেই দিক থেকে জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বিভু ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপ্রমাণ ও অসংখ্য।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের ২।৩।১৬—৫২ অংশে শঙ্কর বিশদভাবে জীবাত্মার স্বরূপ আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, পারমার্থিক-ব্যবহারিক উভয় স্তরেই জীব নিত্য (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৬)। জীবের উৎপত্তি-প্রলয় নেই বলেই তিনি নিত্য।

আপত্তি হতে পারে যে—লৌকিক দিক থেকে, "জাতো দেবদত্তো, মৃতো দেবদত্তঃ", 'দেবদত্ত জন্মপরিগ্রহ করেছে' 'দেবদত্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর উত্তর এই যে—প্রকৃতপক্ষে, জড়দেহেরই জন্মমৃত্যু হয়, আত্মার নয়। আত্মারও যদি মৃত্যু সংঘটিত হ'ত, তা হলে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ও কর্মবাদ ব্যর্থ হয়ে যেত, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে, মৃত্যুর পর জীব প্রাক্তন কর্মানুসারে পুনর্জন্ম, স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করে। সেজন্য, আত্মাও যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এই সকল বিধিবিধান নিরর্থক হয়ে যায়। যুক্তি ও নীতির ভিত্তিতেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কর্ম করে তার ফল ভোগের হস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যুক্তি বা নীতিসঙ্গত নয়। সেজন্য একই জন্মের কর্মের ফল যখন একই জন্মে সম্পূর্ণ ভোগ করা যায় না, তখন পুনর্জন্মে সেই একই আত্মার অবস্থিতি অবশ্য-স্বীকার্য।

"ন জীবস্য উৎপত্তি-প্রলয়ৌ স্তঃ শাস্ত্র-ফল-সম্বন্ধোপপত্তেঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৬)

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, জীবাত্মা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হন, প্রলয়কালে ব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হন, সেজন্য জীবাত্মা অনিত্য। এর উত্তর হ'ল এই যে:

"ন আত্মা জীব উৎপদ্যত ইতি"

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।১৬)

"তস্মাদ্ব্রহ্মণ উৎপদ্যতে প্রবিলীয়তে বেতি।"

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।১৬)

পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। কেবল অবিদ্যাবশতঃ, উপাধি-প্রভাবেই বোধ হয় যেন জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ থেকে ভিন্ন বলে মিথ্যা প্রতীতি হয়। সেজন্য নিত্য সত্য ব্রহ্মের ন্যায় জীবও নিত্য সত্য। তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম বলে ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি ও ব্রহ্মেই লয়ের কোন প্রশ্নই এ স্থলে নেই। এমন কি ব্যবহারিক দিক থেকেও, জীব ঈশ্বরের চিৎশক্তিরূপে, ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য, এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত, প্রলয়কালে অনভিব্যক্ত হয় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই জীব নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৮)। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আত্মা নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ নয়, আগন্তুক-চৈতন্য-স্বরূপ। অর্থাৎ, আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রমেয় বস্তুর সংযোগ হলেই আত্মাতে চৈতন্যগুণের উদয় হয়, তার পূর্বে নয়, যেরূপ ঘটের সঙ্গে অগ্নির সংযোগের ফলেই ঘটে লৌহিত্য গুণ বা রক্ত-বর্ণের আবির্ভাব হয়, তার পূর্বে নয়।

এর উত্তর এই যে:

"নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপত্বমপ্যৌষ্ণ্য-প্রকাশবদিতি গম্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৮)

পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন আত্মা ব্রহ্মেরই ন্যায় বিজ্ঞানঘন, জ্ঞানস্বরূপ। অগ্নির উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির নিত্য স্বরূপ, জীবের জ্ঞান বা চৈতন্যও ঠিক তাই। ব্যবহারিক দিক থেকেও, জীব জ্ঞানস্বরূপ, যে হেতু জীব জ্ঞাতা বা জ্ঞাতৃত্ব গুণবিশিষ্ট। কিন্তু জ্ঞান যদি জীবের স্বরূপ না হয়, জীব যদি স্বরূপতঃ জ্ঞানবিহীন অজড় বস্তুমাত্রই হয়, তা হলে জ্ঞান তার গুণও হতে পারে না, যেহেতু স্বরূপ ও গুণ পরস্পর-বিরোধী হতেই পারে না। ব্যবহারিক দিক থেকে, জীব যে জ্ঞাতা তা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। প্রমাতা জীব প্রমাণাদি সাহায্যে প্রমেয় বস্তুসমূহকে জানে—'আমি ঘট প্রত্যক্ষ করছি', 'আমি অগ্নি অনুমান করছি'—ইত্যাদি প্রকারে। সেজন্য, ব্যবহারিক দিক থেকে জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানধর্মী বা জ্ঞাতা—জ্ঞান বা চৈতন্য একাধারে

তার স্বরূপ ও গুণ উভয়ই। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন নিষ্ক্রিয় জীব কেবলই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা বা জ্ঞানক্রিয়াকর্তা নয়।

তৃতীয়তঃ, ব্যবহারিক দিক থেকে, জীব কর্তা (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৩৩-৪২)।

তার কারণ হ'ল এই :

জীব কর্তা না হলে, শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের কোন অর্থ থাকে না, যেহেতু 'যাগ করবে, হোম করবে, দান করবে' ইত্যাদি রূপ বিধি জীবকে কর্তারূপে গ্রহণ করে। বিধিও তাই করে। যেমন : "আত্মা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করবে' ইত্যাদি।

পুনরায়, স্বপ্নকালে জীব যথেচ্ছ বিহার করেন, জাগ্রত কালে ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন, সেজন্য জীব নিশ্চয়ই কর্তা।

আপত্তি হতে পারে যে, জীব যদি কর্তা হন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সেক্ষেত্রে, তিনি সর্বদা নিজের প্রিয় ও হিতসাধনই করবেন। কিন্তু কার্যতঃ প্রায়ই তার বিপরীতই দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কর্তা নিজের অহিত করবেন কেন ?

এর উত্তর হ'ল এই যে, জীব উপলব্ধি বা মানসিক জ্ঞান চিন্তা, ধারণা প্রভৃতির দিক থেকে স্বাধীন হলেও, কার্য-সম্পাদনের দিক থেকে তা নয়। সেজন্য নিজের হিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প করেও দেশ-কাল-বস্তু-নিমিত্তাদি প্রমুখ বাহ্যিক কারণের জন্য, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ও সঙ্কল্প-সাধন করতে অনেক ক্ষেত্রেই জীব অসমর্থ হন। এরূপে স্বভাবতঃই স্বল্পশক্তিমান জীবের কর্মসংসাধনের জন্য বাহিরের সহায় আবশ্যক হয়, কিন্তু সেজন্যই ত তাঁর কর্তৃত্ব বিলোপ পায় না। যেমন জল, অগ্নি প্রভৃতির সহায়তা ব্যতীত পাচক রন্ধনকর্ম করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ত পাক-কর্মের কর্তাই থাকে। একই ভাবে, সহকারী প্রয়োজন হয় বলে, উপযুক্ত সহায়ের অভাবে জীব কর্তা হয়েও সর্বদা সফলকাম হতে পারে না।

উপরে জীবকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কর্তারূপে গ্রহণ করা হয়েছে ব'লে কেহ কেহ হয় ত মনে করতে পারেন যে, জীব সম্পূর্ণ রূপেই স্বাধীন, ঈশ্বরেরও অধীন নয়। তাঁদের মতে, নিজের রাগ-দ্বেষাদি প্রবৃত্তি অনুসারে ও ক্রিয়ানিষ্পাদক, প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে জীব নিজেই ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের সহায়তার তার কি প্রয়োজন ? যেমন, কৃষি-কার্যের জন্য বৃষের প্রয়োজন, ঈশ্বরের নয়। পুনরায়, ঈশ্বরই যদি জীবকে কর্মে প্রয়োজিত করেন, তা হলে ঈশ্বর নির্দয়তা ও পক্ষপাতিত্ব এই দুই দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েন, যেহেতু জীব স্বকর্মফলে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয় এবং বিভিন্ন অবস্থা-গ্রস্ত হয়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, মেঘ যেমন বিভিন্ন বীজ থেকে বিভিন্ন গুল্ম বা বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ, ঈশ্বরও ঠিক তাই। অর্থাৎ, ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন এই জন্য যে, তাদের বীজই ভিন্ন, যদিও মেঘ পক্ষপাতহীন ভাবে সকলের উপরই বারিবর্ষণ করে। একই ভাবে, ঈশ্বর বিভিন্ন জীবের প্রাক্তন কর্মানুসারেই তাদের বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করেন। এই অর্থেই জীব ঈশ্বরের অধীন। সেজন্য জীবের দুঃখশোক, অবস্থা-বৈষম্যের জন্য দায়ী জীবই স্বয়ং, ঈশ্বর নন।

এরূপে, ব্যবহারিক দিক থেকে জীব কর্তা হলেও, পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বলে নিষ্ক্রিয়। সেজন্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, আত্মার কোনরূপ ক্রিয়া-সম্বন্ধ না থাকায়, কর্তৃত্বও থাকতে পারে না। যদি বলা হয় যে, স্বয়ং কর্তা বা কর্মকারী না হলেও সন্নিধি-দ্বারাই কর্তৃত্ব সম্পাদিত হতে পারে, যেমন স্বয়ং রাজা কর্ম না করলেও, তাঁর অধীনস্থ রাজকর্মচারী ও ভৃত্যাদির কর্মকেই তাঁর কর্ম বলা হয়—তার উত্তর এই যে, রাজা ও রাজ-কর্মচারিগণের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ আছে বলেই ভৃত্যের কর্মকে প্রভুরই কর্ম বলা সম্ভব। কিন্তু আত্মার ও দেহাদির মধ্যে এরূপ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নেই—এই তথাকথিত সম্বন্ধ কেবলমাত্র মিথ্যাভিমানমূলক। সেজন্য আত্মা অকর্তা।

চতুর্থতঃ, ব্যবহারিক দিক থেকে, জীব ভোক্তা। যিনি কর্তা, তিনিই ভোক্তা—এই ত কর্মবাদের অমোঘ বিধান। সেজন্য কর্তা জীব ভোক্তাও সমভাবে। অবশ্য পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন জীব কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়।

পঞ্চমতঃ, ব্যবহারিক দিক থেকে জীব অণুপরিমাণ (ব্রহ্ম সূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৯-৩২)। তার কারণ হ'ল এই যে—জীব মৃত্যুকালে শরীর থেকে উৎক্রান্ত হয়, যথোচিত লোকে গমন করে এবং ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে ইত্যাদি। কিন্তু বিভু বস্তুর উৎক্রান্তি, গতি, আগমনাদি অসম্ভব। জৈন মতানুযায়ী, জীবাত্মার মধ্যমপরিমাণও স্বীকার্য নয় (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।২।৩৩-৩৬)। সেজন্য জীব অণুপরিমাণ। শরীরের একস্থানে পতিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চন্দনবিন্দু সমগ্র শরীরকেই স্নিগ্ধ করে, তেমনি অণুপ্রমাণ জীবও সমগ্র শরীরে সুখ-দুঃখোপলব্ধি করে অনায়াসে। অথবা গৃহের এক কোণস্থিত প্রদীপ যেমন প্রভা দ্বারা সমগ্র গৃহকেই পরিব্যাপ্ত করে, তেমনি অণু জীবও তাঁর চৈতন্য-গুণ দ্বারা সমগ্র শরীরেই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। অথবা, পুষ্পের গন্ধ যেমন দিক্

দিগন্ত পরিপ্লুত করে, তেমনি জীবের জ্ঞান-গুণও সমগ্র শরীর পরিপ্লুত করে।

পারমার্থিক দিক থেকে, অবশ্য ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন জীব বিভুস্বরূপ।

ষষ্ঠতঃ, পারমার্থিক দিক থেকে জীব বহু বা অসংখ্য। চৈত্রমৈত্রাদির দেহাদি ভিন্ন বলে, তাঁরাও পরস্পর ভিন্নরূপেই গৃহীত হন (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৪৮); অথবা ফেন, বীচি, তরঙ্গাদিকেও যেমন পরস্পর-ভিন্ন বলে পরিগণনা করা হয়, বহু জীবগণকে ঠিক তাই (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৩)।

অবশ্য, পারমার্থিক দিক থেকে এক ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন জীবও এক, বহু নন।

এরূপে, শঙ্কর অতি যত্নের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করে, বিশদ ভাবে জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব স্থাপন করেছেন তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রায় সম্পূর্ণ একটি পাদে। জীবজগতের ব্যবহারিক সত্তাকে উপেক্ষা না করে তাদের যথাযোগ্য স্থান ও মর্যাদা দান করার যে শুভ নীতি শঙ্কর বেদান্তে সর্বত্রই পরিস্ফুট সেই নীতিরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর জীবসম্বন্ধীয় এই বিস্তৃত ও যুক্তি-সম্মত আলোচনা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি যে জীবের স্বাভাবিক বা পারমার্থিক গুণ নয়, ঔপাধিক বা ব্যবহারিক গুণই মাত্র — শঙ্কর সে কথাও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। যথা:

"যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধি সম্বন্ধস্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধি-পরিকল্পিত-স্বরূপ-ব্যতিরেকে নাস্তি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৩০)

অর্থাৎ, যতদিন পর্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, ততদিন পর্যন্তই জীবের সংসারিত্ব। বুদ্ধিরূপ উপাধি ব্যতীত জীব পারমার্থিক দিক থেকে আর অন্য কিছুই নয়।

এই প্রসঙ্গে, শঙ্কর বিশেষ ভাবে, বারংবার জীবের কর্তৃত্বের পারমার্থিক অসত্যতা প্রপঞ্চিত করেছেন। তার কারণ হ'ল এই যে, অন্যান্য ব্যবহারিক গুণসমূহ এই কর্তৃত্ব-গুণ থেকেই উদ্ভূত। এরূপে, 'জ্ঞাতৃত্ব'-গুণের অর্থ হ'ল— জ্ঞান-ক্রিয়া কর্তৃত্ব। অতএব জীব কর্তা না হলে জ্ঞাতাও নয়। একই ভাবে, কর্তৃত্ব না হলে ভোক্তৃত্বেরও প্রশ্ন উঠে না। পুনরায়, জীবের অণুত্ব প্রমাণিত হয়েছে তার উৎক্রান্তি গতি, আগমনের, অথবা কর্তৃত্বের ভিত্তিতে। পরিশেষে, অণুপ্রমাণ জীবই বহু হতে পারে, বিভু জীব নয়, যে হেতু ঈদৃশ বিভু জীব একই হতে পারেন, দুই বা বহু নয়, এক বিভু জীবই সর্বব্যাপী, অন্য বিভু জীবের স্থান সেস্থলে কোথায়? সুতরাং এই ভাবে, কর্তৃত্বই জীবের ব্যবহারাবস্থার ঔপাধিক গুণাবলীর মধ্যে মূলীভূত বলে শঙ্কর জীবের পারমার্থিকত্ব প্রমাণের জন্য কর্তৃত্বের অবিদ্যামূলকতার বিষয়ে বারংবার বলছেন:

"বুদ্ধ্যুপাধি ধর্মাধ্যাস-নিমিত্তং হি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-লক্ষণং সংসারিত্বম কর্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।২৯)

"ন স্বাভাবিক কর্তৃত্বমাত্মনঃ সম্ভবতি, অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গাৎ।...তস্মাদুপাধি-ধর্মাধ্যাসেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং, ন স্বাভাবিকম্।...অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্তৃভোক্তৃত্বয়োঃ। ...নৈবং মন্তব্যং স্বাভাবিকামেবাত্মনঃ কর্তৃত্বমগ্নেরিবৌষ্ণ্যমিতি। ...তস্মাদবিদ্যাকৃতং কর্তৃত্বমুপাদায় বিধিশাস্ত্রং প্রবর্তিষ্যতে। ...ন চ তস্যামপ্যস্য কর্তৃত্বমস্তি, নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপত্বাৎ।... তস্মাৎ কর্তৃত্বমপ্যাত্মন উপাধি-নিমিত্তমেবেতি স্থিতম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৪০)

অর্থাৎ, বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম: প্রবৃত্তি প্রভৃতি আত্মায় অধ্যস্ত হয় বলেই, জীব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট হয়ে সংসারে জন্মপরিগ্রহ করে। কিন্তু যিনি নিত্যমুক্ত, সৎস্বরূপ ও সংসারবিমুক্ত, তিনি কর্তাও নন, ভোক্তাও নন।

আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নয়, না ত তার মুক্তিলাভ হ'ত না কোনদিনও। সেজন্য, উপাধির ধর্ম আত্মাতে অধ্যস্ত করলেই, আত্মা কর্তা হয় বলে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নয়। জীবের কর্তৃত্বও ভোক্তৃত্ব অবিদ্যামূলক। অতএব, উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম, কর্তৃত্ব সেরূপ জীবের নয়। সুতরাং, বিধিশাস্ত্রাদি এরূপ অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্বের ভিত্তিতেই স্থাপিত। বস্তুতঃ, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকৃত কর্তৃত্ব নেই। সেজন্য জীবের কর্তৃত্ব উপাধি-নিমিত্তক—এই হ'ল ন্যায্য সিদ্ধান্ত।

এই কারণে জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব, বহুত্ব সকলই ঔপাধিক বা ব্যবহারিক, স্বাভাবিক বা পারমার্থিক নয়। স্বীয় প্রাক্তন কর্মানুসারে জীব "উপাধি" সংশ্লিষ্ট হয়ে জন্মপরিগ্রহ করে। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি—এই ছয়টি উপাধি। জড় প্রকৃতির কার্যরূপে এই উপাধিসমূহ জড়স্বভাব। সেজন্য সাংসারিক বদ্ধ জীব জড় দেহমন প্রভৃতির ও অজড় আত্মার সমাবেশ। প্রকৃত পক্ষে, আত্মা ও অনাত্মা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হলেও, অজ্ঞান-জাত জীব দেহমন প্রভৃতির ধর্ম আত্মায় "অধ্যাস" বা আরোপপূর্বক জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়। শুভ্র স্ফটিকপাত্রে একটি রক্তবর্ণ জবাকুসুম ন্যস্ত করলে, সেই

কুসুমের রক্তবর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হয়, এবং পাত্রটিকেও রক্তবর্ণ বলে বোধ হয়, যদিও পাত্রটি প্রকৃতপক্ষে শুভ্র, রক্তবর্ণ নয়। একই ভাবে, জড় অন্তঃকরণের কর্তৃত্বাদি ধর্ম চিৎস্বরূপ আত্মায় প্রতিবিম্বিত হলে, আত্মাও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণু ও বহু রূপে প্রতিভাত হয়, যদি বাস্তবতঃ আত্মা জ্ঞানস্বরূপই মাত্র, জ্ঞাতা নয়; নিষ্ক্রিয়ই মাত্র, কর্তা নয়; ভোগবিহীনই মাত্র, ভোক্তা নয়; বিভুই মাত্র, অণু নয়; একই মাত্র, বহু নয়। এই মতবাদের নাম "প্রতিবিম্ববাদ"।

এই ভাবে, জড় দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি অজড় আত্মায় প্রতিবিম্বিত ও অধ্যস্ত হয় বলেই, জীব ভ্রমবশতঃ আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। ফলে, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ক্ষুধার্ত, আমি তৃষ্ণার্ত; আমি রোগগ্রস্ত; আমি জরাক্লিষ্ট", "আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ", "আমি ইচ্ছা করি; আমি বিবেচনা করি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ভীত, আমি ক্রুদ্ধ"—প্রমুখ নানাবিধ মিথ্যা-প্রতীতি তাঁর হয়। এরূপে স্থূলত্বাদি দেহ-ধর্ম, অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়-ধর্ম, ইচ্ছা-সুখ দুঃখাদি অন্তঃকরণ-ধর্ম, নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ আত্মায় আরোপ করে, সংসারী, অজ্ঞানতিমিরান্ধ, বদ্ধ জীব অশেষ দুঃখক্লেশভাগী হয়। অনাদি অবিদ্যা প্রসূত, এরূপ সঙ্কীর্ণ 'আমিত্ব' বা 'অহং-মম-ভাব'ই হ'ল জীবত্ব।

জীবের অবস্থাপঞ্চক

জীবের জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্ত, মূর্চ্ছা ও মরণ—এই পঞ্চবিধ অবস্থা।

জাগ্রত অবস্থার বিষয় উপরেই বলা হয়েছে। জাগ্রত কালে, জীব পূর্বোক্ত প্রকারে অবিদ্যামূলক অধ্যাসের বশীভূত হয়ে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণু ও বহু রূপে বিরাজ করে।

স্বপ্নকালেও (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।১-৬) জীব, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতিই থাকে, এবং স্বকর্মানুসারে স্বীয় পুণ্যপাপানুযায়ী, স্বসৃষ্ট দ্রব্যাদি দর্শন, উপভোগ প্রভৃতি করেন। শঙ্করের মতে, সর্বাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের স্বাপ্ন ব্যাপারেও কর্তৃত্ব থাকলেও, সাক্ষাৎ ভাবে, জীবই স্বাপ্ন-পদার্থ স্রষ্টা। এরূপে স্বপ্নকালেও জীবের অধ্যাসের বিলোপ সাধন হয় না। স্বাপ্নপদার্থ অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা মায়ামাত্র, পারমার্থিক নয়:

"মায়ামাত্রমেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ণ তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩ ২ ৩)

সত্যবস্তু-দর্শনের যা যা কারণ দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধা-রাহিত্য—সে সকল স্বাপ্ন পদার্থের ক্ষেত্রে সম্ভবপরই নয়। এরূপে, স্বপ্নে দৃষ্ট রথাদি থাকবার যোগ্য দেশ বা স্থানই নেই—এক ক্ষুদ্র দেহে, সুবৃহৎ রথ থাকবে কিরূপে? স্বপ্নের কাল-দর্শনও সত্য-দর্শন নয়—যেমন রাত্রিতেই স্বপ্নে প্রভাত-দর্শন হয়, অথবা মুহূর্তমাত্র স্থায়ী স্বপ্নেও শতবর্ষ অতিবাহনের প্রতীতি হয়। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দর্শনের উপযুক্ত নিমিত্তও স্বপ্নে থাকে না—যেমন, সেই সময়ে, ইন্দ্রিয়াদি সুপ্ত থাকে বলে রথাদি-প্রত্যক্ষের উপযুক্ত চক্ষু প্রভৃতিও থাকে না; রথাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদিও থাকে না; ইত্যাদি। পুনরায় স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তু যে জাগ্রত কালে প্রত্যহই বাধিত হয়ে যায়, কেবল তাই নয়, স্বপ্নকালেও বাধিত বা বিলীন ও অন্তর্হিত হয়ে যায়। সুতরাং, স্বভাবতঃই স্বাপ্ন জগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, স্বপ্ন স্বয়ংমিথ্যা হলেও, ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক হয়।

সুষুপ্তিকালে (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩ ২।৭) স্বপ্নবিহীন, প্রগাঢ়তম নিদ্রাকালে, জীবের জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির বিলোপ সাধিত হয়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্বপ্নকালে জীবের জাগ্রত কালের তুলনায় অস্পষ্ট হলেও, যথেষ্ট স্পষ্ট দর্শন, স্পর্শন, গমনাগমন, ভোগ প্রভৃতি হয়; যেমন—'আমি রথ দর্শন করছি, পর্বত স্পর্শন করছি, দেশবিদেশে গমন করছি, রাজসুখ ভোগ করছি' ইত্যাদি। কিন্তু সুষুপ্তিকালে এরূপ দর্শন প্রভৃতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটে—জীব কোনরূপ স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেন না। "তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্যাভাবঃ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।৭)। জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির কারণ হ'ল অবিদ্যামূলক অধ্যাস। সেজন্য সুষুপ্তি সময়ে, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির অভাব থাকে বলে অবিদ্যামূলক অধ্যাসেরও অভাব হয়। "সর্বত্র চ বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।৭)।" সুষুপ্তিকালে যে বিশেষ বিজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হয়—তা সর্বত্রই সমান—নাড়ীস্থানে, পুরীততে ব্রহ্মে।

কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির বিলয় হলেও, সুষুপ্তি অজ্ঞান অবস্থারই নামান্তরমাত্রই নয়; কারণ সেই সময়ে অবিদ্যামূলক অধ্যাসমুক্ত জীব, দেহমনোরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন করে, সাময়িক ভাবে শুদ্ধজ্ঞান ও পূর্ণানন্দরূপেই বিরাজ করে। তার প্রমাণ এই যে, সুষুপ্তির অবসানে, নিদ্রোত্থিত জীব স্পষ্ট স্মরণ করে—'এতকাল আমি সুখে নিদ্রাগত ছিলাম, কিন্তু স্বপ্নদর্শন করি নি'। এরূপ স্মৃতি, সুষুপ্তিকালীন শুদ্ধজ্ঞান (সাধারণ বিষয়মূলক জ্ঞান নয়) ও পূর্ণানন্দের সূচক। যদি সুষুপ্তি অজ্ঞান ও অনুভববিহীন অবস্থা হ'ত, তা হলে এরূপ স্মৃতি হতে পারত না। সেজন্য, সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মে উপগত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে ব্রহ্মেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হন। শঙ্কর বলছেন:

"প্রদেশান্তর-প্রসঙ্গ ব্রহ্মণোঽহ প্রতিষেধান্নাড়ী-দ্বারেণ

ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি।...ব্রহ্মৈব ত্বেকমনপায়ি সুপ্তিস্থানম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।৭)

অর্থাৎ, নাড়ীসঞ্চরণপূর্বক, সুষুপ্তি মগ্ন জীব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্মই জীবের শাশ্বত সুষুপ্তি-স্থান।

বস্তুতঃ এইভাবে কিছুক্ষণের জন্য বদ্ধজীব ব্রহ্মে বিলীন হয়ে স্বীয় আত্মাতেই বিলীন হন, সর্বোপাধি বিমুক্ত হয়ে মোক্ষানন্দ আস্বাদ করেন। এই ত্রিবিধ অবস্থার ভেদ নির্ণয় করে শঙ্কর বলছেন :

"এনং-প্রচারোপাধি-বিশেষ সম্বন্ধাদিন্দ্রিয়ার্থান্ গৃহ্ণন্তদ্-বিশেষাপন্নো জীবো জাগর্তি, তদ্বাসনা-বিশিষ্টঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্-মনঃশব্দবাচ্যো ভবতি। স উপাধিদ্বয়োপরমে সুষুপ্তাবস্থায়া-মুপাধিকৃত-বিশেষাভাবাৎ স্বাত্মনি প্রলীন ইবেতি স্বং হ্যপীতো ভবতীত্যুচ্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।১।৯)

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনে যে বিষয়াকারা বৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই মনোবৃত্তিরূপ উপাধির মাধ্যমে জীব জাগ্রত কালে নানাবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে। স্বপ্নকালেও মন দ্বারা সে নানাবিধ মনোসৃষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ করে। এরূপে, জাগ্রত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান থাকে বলে, উপাধি হ'ল ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট মনোবৃত্তি; স্বপ্ন অবস্থায়, মনোজন্য জ্ঞান থাকে বলে উপাধি হ'ল ইন্দ্রিয়-হীন মনোবৃত্তি। সুষুপ্তি অবস্থায় কিন্তু এই দুই প্রকারের উপাধিরই বিলয় হয়, কোন বিশেষ বস্তুর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অজ্ঞান-বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি থাকে না। সেজন্য সেই সময়ে জীব স্বীয় আত্মাতেই প্রলীন হয়ে যায়, স্বীয় স্বরূপই প্রাপ্ত হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্যেও শঙ্কর একই ভাবে বলেছেন যে, সুষুপ্তিকালে বদ্ধজীব স্বীয় জীবরূপ পরিত্যাগ করে, জীবত্ব-বিনির্মুক্ত হয়ে, আত্মস্বরূপ অথবা দেবতাস্বরূপ অথবা পরমার্থ সত্য যে সৎ রূপ, তাই প্রাপ্ত হন; ব্রহ্মবিদ্‌গণ সুষুপ্তি ব্যতিরেকে আর কোথাও জীবের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না।

"তত্রপরেমে চ স্বং দেবতারূপমেব প্রতিপদ্যতে।...ন হ্যন্যত্র সুষুপ্তাৎ স্বমপীতং জীবমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ। সুষুপ্ত এব দেবতারূপং জীবত্ব-বিনির্মুক্তং দর্শয়াম ...মন আদি-সংসর্গ-কৃতং জীবরূপং পরিত্যজ্য স্বং সদ্রূপং যৎপরমার্থ-সত্যমপীতোহপিগতো ভবতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য ৬ ৮ ১)

এই সুষুপ্তই হ'ল জীবের বিশ্রাম-স্থান। অতি সুন্দর উপমা দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, জ্বরাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, রোগ-নিবৃত্তিতে সুস্থ হয়ে স্বগৃহেই বিশ্রাম করেন, সূত্রবদ্ধ শ্যেন পক্ষী ইতস্ততঃ বিচরণ করে অবশেষে সেই বন্ধনস্থানেই বিশ্রাম করে। একইভাবে, জাগ্রতকালে বদ্ধ জীবও, স্বীয় কর্মানুসারে বিবিধ সুখদুঃখানুভব করে, বিবিধ প্রয়াসে রত হয়ে, বিবিধ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন শ্রমোপনোদনের জন্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি পরিবর্জন করে সে পরদেবতারূপ স্বীয় আত্মাকেই আশ্রয় করে। আত্মার এই শান্ত, স্থির বিশ্রামের অবস্থাই হ'ল সুষুপ্তি।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ ভাষ্য ৬।৮।১)

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—"অয়ং আত্মা চতুষ্পাৎ।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ ভাষ্য ১।১)

আত্মার এই চতুষ্পাদ, অংশ বা অবস্থা হ'ল জাগ্রত স্থান, স্বপ্ন স্থান, সুষুপ্তি স্থান, তুরীয় স্থান (অদ্বৈত ব্রহ্মাবস্থা বা মোক্ষ)। এস্থলেও একটি যোগ্য উপমা দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, যখন দিবস রাত্রি দ্বারা আবৃত হয়ে যায়, তখন কোন পৃথক বস্তু প্রতীত হয় না, কেবল এক পুঞ্জীভূত ঘনান্ধকারই বিরাজ করে। একই ভাবে সুষুপ্তি কালেও জীব এক অবিচ্ছিন্ন প্রজ্ঞানঘন অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, পূর্বের পৃথক পৃথক বস্তুর পৃথক পৃথক জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন আর থাকে না।

'যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ-ভাষ্য ১।১)

একই ভাবে, সেই সময়ে কোন প্রচেষ্টা ও তজ্জনিত শ্রম, উৎকণ্ঠা, দুঃখাদি থাকে না বলে জীব আনন্দপূর্ণ হয়, যদিও এই আনন্দ শাশ্বত, আত্যন্তিক আনন্দ নয়, আপেক্ষিক, সাময়িক আনন্দই মাত্র।

এই হ'ল সুষুপ্তি ও মুক্তির মধ্যে প্রভেদ। সুষুপ্তি অল্প-স্থায়ী অবস্থাই মাত্র, মোক্ষের ন্যায় শাশ্বত অবস্থা নয়। কর্ম-সংস্কারের ক্ষয় না হওয়ায়, শীঘ্রই জীবকে জাগ্রত হয়ে, সাংসারিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়, যদিও সুষুপ্তি কালেই বদ্ধ জীব প্রথম মুক্তির আস্বাদ লাভে ধন্য হয়।

এস্থলে একটি আপত্তি হতে পারে :—সুষুপ্তিকালে যদি জীব ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে একীভূত হয়ে যায়, তা হলে সেই একই জীব যে পুনরায় জাগ্রত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে—তার নিশ্চয়তা কি? যেমন, নদী বা সমুদ্রে একবিন্দু জল নিক্ষেপ করলে সেই বিন্দুটিকেই পুনরায় উত্তোলন করা অসম্ভব।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, সুষুপ্তিকালের অবসানে সেই একই সুপ্ত জীবই প্রবুদ্ধ হন, অন্য কোন জীব নয়।

তার প্রমাণ এই—যে কর্ম তিনি নিদ্রার পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন, সেই কর্মই তিনি স্মরণ করে নিদ্রাভঙ্গের পর সমাপ্ত করেন ; যে বস্তু তিনি পূর্বদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই বস্তুই তিনি পরদিন স্মরণ করেন।

বস্তুতঃ, একই আত্মা উত্থান না করলে কর্মবাদই ব্যর্থ হয়ে যায়—একের কর্মকৃত শরীরে অপরে প্রত্যাবর্তন করবে কেন ? সে ক্ষেত্রে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশ—অকৃতকর্মের ফলভোগ ও কৃতকর্মের ফলভোগাভাব—এই দুটি দোষের উদ্ভব হয়। সেজন্য নদী বা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু উত্তোলন করা সম্ভবপর না হলেও, ব্রহ্মে একীভূত আত্মা স্বকর্মানুসারে অনায়াসে স্বদেহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

অবশ্য, প্রকৃতকল্পে উপরের উত্তর-প্রত্যুত্তর নিষ্প্রয়োজন, যে হেতু 'ব্রহ্মে গমন' প্রমুখ বর্ণনা এস্থলে গৌণার্থেই প্রযোজ্য, মুখ্যার্থে নয়। স্বয়ং জীবই ত বিভূ ব্রহ্ম, স্বয়ং জীবই ত নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন। সেজন্য জীব সত্যই দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, বাহিরে ব্রহ্মে গমন করে না ; ব্রহ্ম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পুনরায় দেহে প্রত্যাবর্তনও করে না, আত্মাতেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে ধন্য হয়।

বদ্ধ জীবের চতুর্থ অবস্থা মূর্চ্ছা। একটি স্বতন্ত্র, বিশেষ অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়মূলক জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছাতে তা নেই। স্বপ্নাবস্থাতেও মনোমূলক জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছাতে জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে না, জীব অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সংজ্ঞা থাকে না এবং সুখদুঃখমুক্তি ও অধ্যাসের বিলোপ হয় না বলে মূর্চ্ছা সুষুপ্তি অবস্থাও নয়। অথচ দেহে প্রাণ থাকে বলে মূর্চ্ছা মরণ অবস্থাও নয়।

পরিশেষে, মরণ দ্বিবিধ—মুক্তির দ্বার, পুনর্জন্মের দ্বার-স্বরূপ। এইভাবে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর জীবের স্বরূপ সম্বন্ধেও অতি সুন্দর আলোচনা করেছেন।

অভিনন্দিতের ভাষণ

শ্রীকালিদাস রায়

তোমরা কারা এ অভিনন্দনে গাও আজ মোর জয়,
তোমাদের সাথে নেই ত আমার হৃদয়ের পরিচয় !
যাদের বার্ত্তা ছন্দোবন্ধে লিখে গেছি আজীবন,
আজ এ সভায় কই ত তাদের পাই নাকো দরশন।
কই সে আর্য-ঋত্বিকগণ—দেখি না সন্নিকটে,
হোমভস্মের টীকা কে পরাবে প্রণত ললাটতটে ?
শাঁখ কে বাজাবে ? বিশালার বিশালাক্ষী বধূরা কই ?
চন্দনমালা শেফালিকা সাথে কারা বা ছড়াবে খই ?
কোথা চীবরিণী স্থবিরা শ্রমণী, মহাথেরী, ভিক্ষুণী ?
বুদ্ধের জয়মঙ্গল গাথা কাদের শ্রীমুখে শুনি ?
কোথা পরিচিতা আভীর বনিতা, ব্রজের রাখালগণ ?
গাঁথি কদম্বমাল্য গলায় কে করে সমর্পণ ?
কোথা তারা ঘাটে গাগরী ভরণে দিবাশেষে যায় যারা ?
চূতশাখা দিয়ে পূর্ণ কলস হেথায় সাজাবে কারা ?
কোথা তারা আজ তুলসীতলায় সাঁঝদীপ যারা জ্বালে ?
কোথা বালিকারা শিউলিতলায় খেলাপাতি যারা পাতে ?
ভরে অঞ্জলি এনে চাঁপাকলি কারা দেবে মোর হাতে ?
ষষ্ঠীতলার জননীরা কই ? আন নি তাদের ডেকে ?
ধানদূর্বার আশিস্ কে দেবে নিছনির ডালা থেকে ?
কোথা সে কৃষাণী ? সে যদি না আসে রয়ে যাবে তবে ত্রুটি,
পাকা ধান শীষে বেঁধে কে আনবে কাঁচা যব শীষ দুটি।
কোথায় বাল্য খেলার সাথীরা ? তারা ত আসে নি ছুটে ?
কারা বনফুল বৈঁচি আনবে বটের পর্ণপুটে ?
সবচেয়ে মনে পড়ে কুড়ানীরে, দেখা কেন নেই তার ?
ভাদরে কুড়ানো পাকা তাল দেবে সাদরে কে উপহার ?

বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ—বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্য ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্য দিয়া এবং সমাজসেবা ও রাজনীতির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অবধারণ করিতে অনেকেই প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক দিয়া তাঁহার প্রতিভার ব্যাপকতা, চরিত্রের বিশালতা, জ্ঞানের গভীরতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার প্রকৃত চেষ্টা বোধ হয় এখনও হয় নাই। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মহামানব রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও মাহাত্ম্যের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করিতে সক্ষম হইব কিনা জানি না।

এক কথায় রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্ত্তক (universal man) ছিলেন। তাঁহার সহস্রমুখী প্রতিভা নানা দিকে নানা বিষয়ে বিকশিত হইয়াছিল। একদিকে তিনি যেমন অদ্বিতীয় মহাকবি ও সাহিত্যসম্রাট ছিলেন, সেইরূপ অন্য দিকে তিনি অতুলনীয় রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক, দেশ-সেবক ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে অতিসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের নানাবিধ নূতন নীতিগুলির সারতত্ত্ব তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থে বিজ্ঞানের নানাবিধ নূতন তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তীব্র পাপবোধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাহারও অন্তিমকালে ধর্ম্মযাজকের নিকট পাপ স্বীকার করা এবং ধর্ম্মযাজকের মরণাপন্ন ব্যক্তিকে পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। মনুষ্যমাত্রেই পাপী এবং আত্মার মুক্তির জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপ ক্ষালন করা নিতান্ত আবশ্যক, এই ধারণা উপরোক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সূক্ষ্ম আত্মপরীক্ষা ও পাপবোধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বকে নিরানন্দময় ও পাপে পূর্ণ দেখেন নাই, তিনি সান্ত্বনা ও আশার বাণী শুনাইয়াছেন—আনন্দরূপ ব্রহ্মের রচিত বিশ্ব নিরানন্দ ও পাপে পূর্ণ হইতে পারে না। আমারও মনে হয় অতিরিক্ত পাপবোধ মানুষের জীবনকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করিয়া দেয়। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং চারিদিক হইতে পাপ আসিয়া মানবকে আক্রমণ করিতেছে এবং মানুষ পাপে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছে—এইরূপ ধারণা আমার মনে হয়, দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক—'Defeatest mentality'র পরিচায়ক। মানুষ স্বভাবতঃই নিষ্পাপ, কিন্তু যখন সে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায় এবং শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করে, তখন সে পাপাচরণ করে। পাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এক মতবাদ আছে, তাহা এইখানে উল্লেখ করিতেছি।

কার্য্যকারণবাদ (law of causalty) যদি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বিধি হইত, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চলিত। সকল ঘটনা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিত এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকিত না। এই অবস্থায় মানুষের স্বাধীন ভাবে কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিত না—সেই হেতু এই পৃথিবীতে পাপপুণ্য বলিয়া কিছুই থাকিত না। কার্য্য ও কারণ ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিতে পারিলে যে কেহই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারিত। কিন্তু সুখের বিষয় অনির্দ্দিষ্টতাবাদ (law of uncertainty) বিশ্বের আর একটি প্রচলিত নীতি হওয়ায় মানবের স্বাধীন ইচ্ছা থাকা এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি থাকা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকারণবাদ ও অনির্দ্দিষ্টতাবাদ একত্রে কার্য্যকরী হওয়াতে মানবের ক্ষমতা ও কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন মানুষের কম-বেশী ক্ষমতা অনুসারে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের পরিসরও কমে বাড়ে। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যদি নিয়মাবদ্ধ না হইয়া বিশৃঙ্খলতার দিকে যায়, তাহা হইলে পাপ ও অন্যায়ের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানের সারতত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার অসাধারণ ক্ষমতা রবীন্দ্র-নাথের ছিল। আমি যতখানি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার পাপ সম্বন্ধে অনুভূতি এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন যে, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" ইহা অতি সমীচীন কথা। প্রত্যেক মানব যদি বৈরাগ্য সাধন করে এবং সমস্ত মানব-জাতির যদি সংসারে ঔদাসীন্য আসে, তাহা হইলে এই

পৃথিবী হইতে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্যম অন্তর্হিত হইবে এবং ক্রমশঃ মানবজাতিও লোপ পাইবে। তখন এই প্রশ্নই স্বভাবতঃ হৃদয়ে উদিত হইবে যে, বিধাতা কি অভিপ্রায়ে এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন! জাগ্রত জীবন্ত আনন্দরূপ ব্রহ্ম *কি নিরানন্দময় বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, যাহাতে* কোনও আনন্দ, উদ্যম ও উৎসাহ থাকিতে পারে না? আশা করি ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, বৈরাগ্য সাধন না করিলে পাপ, অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বৈরাগ্য সাধন না করিয়াও অকপট আড়ম্বরশূন্য ধার্ম্মিক জীবনযাপন করা যায়। মৌনতা অবলম্বন করিলে এবং গিরিকন্দরে বসিয়া একাকী তপস্যা করিলেই কেহ কখন মুনি হইতে পারে না। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে এই শ্লোকটি আছে:

"মৌনান্ন স মুনির্ভবতি নারণ্য বসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

মৌন হইলেই কেহ মুনি হয় না। অরণ্যে বাস করিলেও কেহ মুনি হয় না। কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

পুরাকালে মুনি ঋষিরা আশ্রম স্থাপন করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশকে ও ভারতকে নূতন কৃষ্টি দিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, যে কৃষ্টি তিনি বপন করিয়াছেন তাহা যেন অসংযম ও অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট না হয়। এইরূপ কৃষ্টির সাধন করিতে হইলে চরিত্রের দৃঢ়তার বিশেষ আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ ছিল যে, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্যকর্ম্ম কর, তাহার পর সঙ্গীত-নৃত্য-গীতাদি করিয়া আনন্দ লাভ কর।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ এবং সংহতির সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া পরমব্রহ্মের সত্তা তিনি অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানরসগ্রাহী মহাকবির আবির্ভাব পৃথিবীতে এই বোধ হয় প্রথম। "সীমার মাঝে অসীম তুমি" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির মধ্যে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। একটি অণুর অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে এক বিশাল সৌরজগৎ রচিত হইয়াছে। যে কোনও অন্তবিশিষ্ট সসীম (limited) সামগ্রী অগম্য অণু পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এইরূপে সসীমতার মধ্যে অসীমতা উপলব্ধি করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি নিগূঢ় ভাবে উপলব্ধি করিবার রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার গ্রন্থাগারে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু পুস্তক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের উচ্চ আদর্শগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার জীবনে সঙ্কল্প ও কার্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। আজকাল Rural University ও Rural Institute সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য পরিস্থিতির মধ্যে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই স্থানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা যাহাতে স্বাবলম্বী হয় এবং বিদ্বদ্‌জগত ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন:

"The Rural University would be to build a bridge between the World of scholarship and the life of the common people."

মহাত্মা গান্ধীর বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ Basic education এবং Rural Universityর বীজ বপন করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন গ্রাম্যপরিস্থিতির মধ্যে আদি, মাধ্যম ও উচ্চশিক্ষার পূর্ব্ব সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আদর্শের উপাসক ও কল্পনাত্মক ছিলেন তাহা নয়, তিনি বিশেষ ভাবে কাব্যপারদর্শী ছিলেন। আপনারা অনেকেই শৈশবাবস্থায় বিদ্যাসাগর প্রণীত 'প্রথম ভাগ' পড়িয়াছেন। এই পুস্তকে শিষ্ট বালক গোপাল আর দুষ্ট বালক রাখালের উপাখ্যান আছে। গোপাল অতি নিরীহ বালক—কেবল পড়াশুনা করে এবং পাঠশালায় যাইতে যাইতে নিজের পাঠ আবৃত্তি করে। সে অতি বাধ্য বালক এবং যাহা পায় তাহাই খায়। কিন্তু সে কেবলমাত্র আপন বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা কোনও কার্য্য আরম্ভ এবং শেষ করিতে অক্ষম (impractical and without initiative)। রাখাল পড়াশুনায় অবহেলা করে ও পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অনেক সময় নষ্ট করে। সে মধ্যে মধ্যে দুর্দ্দান্ত ও অবাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু সে কার্য্যনিপুণ। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, শিষ্ট, নিরীহ কিন্তু কার্য্যে অপটু ব্যক্তির দ্বারা জনসাধারণের বিশেষ কোনও উপকার সাধিত হয় না।

তিনি বলিতেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও শিষ্টতার আদর্শস্বরূপ গোপাল চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু নিজে সেই আদর্শের বালক ছিলেন না। রাখালের তেজ, উদ্যম এবং কার্য্যনিপুণতা আছে। রাখালকে যদি সৎপথে পরি-চালিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবে। আমার মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন ইহার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

শরৎচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের পর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড়

লেখক ও সাহিত্যসেবক ভারতে এবং বোধ হয় সমস্ত জগতে আর একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমার মনে হয়, ইহা অতীব সত্য কথা। মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" সেইরূপ ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, "যাহা নাই রবীন্দ্র-শাস্ত্রে তাহা নাই অপর শাস্ত্রে"।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত জগতে অতুলনীয়। এইরূপ উচ্চভাব, অপূর্ব্ব রচনা এবং সুললিত সুরের একত্র সমাবেশ অন্য কোনও দেশের ধর্ম্মসঙ্গীতে পাওয়া দুষ্কর। তিনি শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। প্রচলিত কুরীতি, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের নিগড় ভাঙিতে হইবে, অচলায়তনকেও চলনশীল করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। 'গোরা'র উপাখ্যান হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিতে পারিলে যথার্থ বিশ্ব-মানবীয়তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বাধীনতা-উদ্দীপক জাতীয়-সঙ্গীত-গুলি তাঁহার স্বদেশপ্রেমের এবং দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরম নিদর্শন ছিল।

তিনি শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি "জাতীয়তা" এই শব্দটি সমস্ত মানবজাতির সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নীতিশীল ও পরিপূর্ণ মানবীয় গুণে ভূষিত মানুষ ক্রমশঃ রাজনৈতিক ও বৈষয়িক মানুষে পরিণত হইতেছে। জাতীয়তা স্বার্থপূর্ণ স্বদেশীয়তায় (nationalism) পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি এবং ইহার নীরস ও মমতাবিহীন ব্যবস্থা মানুষকে বলদর্পে দর্পিত করিতেছে। ইহার ফলে তাহার নৈতিক গুণাবলী বিপরীত ভাবাপন্ন হইতেছে। প্রতীচ্য সভ্যতা সংঘর্ষের ভিতর দিয়া বিজয় অন্বেষণ করে এবং প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অভিলাষী হয়। ইহার ফলে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিবর্গ পরস্পরকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমরের প্রলয়মূর্তি প্রশমিত হইবার পরেও পৃথিবী অধিকারে শক্তিপুঞ্জ পুনরায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইল। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ আর কয়েকটি দেশ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। সংযুক্ত জাতি-সঙ্ঘ (United Nation's Organisation) এখন পর্য্যন্ত এই বিরোধী ভাব প্রশমিত করিতে সমর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আণবিক বোমার সৃষ্টি হয় নাই। হাইড্রোজেন বোমার আবির্ভাব তখনও হয় নাই। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার গভীর আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে কিরূপ ফলিয়াছে।

জাতীয়তা যেরূপ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, আন্তর্জ্জাতীয়তাও সেইরূপ স্বার্থের সঙ্গে সংবদ্ধ। বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে যদি মৈত্রী এবং সদ্ভাব না থাকে তাহা হইলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধ যখন সংগ্রামে পরিণত হয় তখন দুই পক্ষেরই বহু লোকক্ষয় হয় ও অনেক লোকালয় ধ্বংস হয় এবং প্রচুর ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। সেই জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিবার আশায় শক্তিপুঞ্জ মিলিত হইয়া সংযুক্ত জাতিসঙ্ঘ স্থাপন করেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির মূলে স্বার্থ আছে, সেই জন্য ইহা ভবিষ্যতে যুদ্ধ রোধ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানবের হৃদয়ের যদি পরিবর্ত্তন না হয়, মন যদি সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বপ্রেম দ্বারা সিক্ত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ কখনও অন্তর্হিত হইবে না। রবীন্দ্রনাথ আপন শক্তিশালী লেখনী দ্বারা এবং ওজস্বিনী ভাষায় সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বপ্রেম সঞ্চারিত করিতে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার কৃপা ভিন্ন এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতা ও বিশ্বমানবীয়তা অপূর্ব্ব।

সকলেই অবগত আছেন যে, জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতীয়তা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে বিশেষ রূপে বিকশিত হইয়াছিল। গান্ধীর অনুগামী ভারতের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রয়াসে বান্দুং সভায় পঞ্চশীল নীতি এশিয়ার শক্তিপুঞ্জ দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে শ্রীনেহরুর আন্তর্জ্জাতীয় উচ্চ আদর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আরও উচ্চ ছিল, তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। মানব-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান মহাত্মা গান্ধীর স্থান হইতে কোনও অংশে নিম্নে নয়। আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের আসন আরও উচ্চে।

তিন বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসব হইবে। এখন হইতে আমাদের তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রবীন্দ্র-রচনাবলী সেই সময়ে সুলভ মূল্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় এবং বিবিধ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী যাহাতে পঠিত ও আদরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিদেশীয় বিদ্বৎসমাজে রবীন্দ্রনাথ যাহাতে সম্যক্ রূপে সমাদৃত হন, তাহারও জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক শিক্ষিত জগৎবাসী রবীন্দ্র-রচনাবলীর রস আস্বাদন করিবার সুযোগ যদি পায়, তাহা হইলে জগতের পরম উন্নতি হইবে। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতি যথার্থ রূপে রক্ষা করিতে পারিব।

আমার নামে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে। নবাব বললেন, তোমার ছেলে এখনও নাবালক, ও যখন বিশ বছরের হবে তখন সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব—এই বলে কয়েক মাস মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিলেন। আমার যখন বয়স বছর চৌদ্দ, বাবার সম্পত্তি ফিরিয়ে না আনতে পেরে মনে একটা বিদ্রোহ জেগে উঠল। আমি একদিন আমার বাবার বন্দুক নিয়ে নবাবকে অতর্কিতে আক্রমণ করলাম কিন্তু আমার কাঁচা হাতে বন্দুকের গুলী নবাবের শরীরে লাগল না, নবাব হুকুম দিলেন এই ছোকরাকে বন্দী কর, না ধরতে পারলে গুলী করে মেরে ফেল। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। আমি লাহোরে গিয়ে হাজির হলাম, সেখানে কাজকর্ম্মের তল্লাসে ঘোরাঘুরি করে করাচীতে গেলাম ও সেখানে রেলওয়ে পুলিশের কাজে ভর্ত্তি হলাম। দু'বছর সেখানে কাজ করার পর আমার সৈন্যদলে যোগ দেবার ইচ্ছা হ'ল। আমি হায়দ্রাবাদে বদলী হয়ে এলাম ও সেখানে কাজ করার পর সৈন্যদলের জেনারেলের কাছে গিয়ে ফৌজে ভর্ত্তি হবার ইচ্ছা জানালাম। যদিও তখন আমার বয়স সতেরও পুরো হয় নি, কিন্তু দেখলে আমাকে বাইশ-তেইশ বছরের যুবক মনে হ'ত। লম্বায় আমি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি ছিলাম, আর এই বুকের পাটা। জেনারেল আমাকে খুশী হয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করলেন।

বেলুচীস্থানে ১০৭ নং রেজিমেণ্টে আমাকে বদলী করা হল সেখানে ভালভাবে কাজ করার পর আমাকে ১নং কোম্পানীতে প্লেটুন দেওয়া হ'ল। প্লেটুন মানে ষাট জন সৈন্য চালাবার অধিকার পাওয়া যায়। কয়েক মাস পর আমার ইরাকে যাবার হুকুম হ'ল। ইরাকে আমার কাজ দেখে প্রথমে জমাদার, তার পর সিনিয়ার জমাদারের পদে নিযুক্ত করা হল। ইরাক থেকে তখন সৈন্যদল নিয়ে আমি জলপথে বসোরা যাই। কুদ-অল-অম্মারাতে তুর্কী ও বৃটিশদের যুদ্ধ লেগেছে। সেই যুদ্ধে আমি খুব যুদ্ধ করলাম, বহু লোক মারা পড়ল, আমিও গুরুতরভাবে জখম হলাম। আমাকে ষ্টীমলঞ্চে করে হাসপাতালে নিয়ে এল।

সেখানে মাসেক কাল পর যখন সুস্থ হলাম, তখন জেনারেল এসে বললেন, "এবার তোমার কি ইচ্ছা বল।"

আমি বললাম, সাব, আবার আমি লড়াইতে যাব। সাহেব খুশী হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন ও এবার আমাকে সুবেদার মেজর বানিয়ে দিলেন। আমি কি বলব মা সাব, যখনই আমার বাড়ীঘর, সম্পত্তি, নবাবের আচরণ মনে পড়ত, আমার সমস্ত শরীরে আগুন ধরে যেত। বলতে বলতে বৃদ্ধের মুখ উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমি নবাবকে শাস্তি দিতে পারলাম না, আমার মরাই ভাল, আমি দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে যেতে উঠলাম এবং আবার ভীষণভাবে জখম হলাম। পায়ে বুলেট লেগে গভীর ক্ষত হয়ে গেল, আর তলোয়ারের আঘাতে ডান হাত অনেকটা কেটে গেল, তাড়াতাড়ি আমাকে ষ্ট্রেচারে করে বয়ে আর এক হাসপাতালে নিয়ে এল। আমি তখন বেহুঁস, এবারে আঘাত গুরুতর ছিল, অনেকদিন লাগল সুস্থ হতে। জেনারেল আমার বীরত্বে খুব খুশী হয়ে আমাকে বারো হাজার টাকা বকশিস দিলেন, আর বললেন তোমার কাজে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, এবার ইচ্ছে হলে তুমি সৈন্যদল ছেড়ে দিতে পার। আমি উত্তর দিলাম, না সাহেব আমি লড়াই করব।

সাহেব বললেন, তুমি নয়া যোয়ান, তুমি কেন এভাবে তোমার প্রাণ দিতে চাইছ।

বললাম, সাহেব, দুনিয়ায় এসেছি, একদিন মরতেই হবে, রোগে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই ভাল'।

আবার যুদ্ধে যোগ দিলাম, কিন্তু এবার তুর্কীর হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। তুর্কীরা তিন হাজার সৈন্যসহ আমাদের ঘেরাও করে বন্দী করে মার্শালে নিয়ে যায়, সেখানে এক বছর থাকার পর আমাদের কনষ্টাণ্টিনেপোলে নিয়ে আট মাস রাখে।

যুদ্ধের বর্ণনা দিতে দিতে বৃদ্ধের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার দেহের ভঙ্গী ও বলার ভঙ্গিতে মনে হ'ল তার দেহে যেন পূর্ব্বের সামর্থ্য ফিরে আসছে, সে যেন চোখের সামনে তার যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছে। আবিদকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা বল ত আবিদ, তুর্কীরা তোমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করত ?

খুশীতে একগাল হেসে আবিদ বললে মা সাব, তুর্কীরা আমাদের বড় আদর-যত্ন করেছে এ খোদারই মর্জ্জি। একজন দেখ বিনা কারণে দুঃখ-দুর্দ্দশায় ভোগে, আর একজন দেখ সুখভোগ করে, সবই কর্ম্মফল। এক হাত লম্বা আর এই মোটা এক-একটা পাঁউরুটি দিত, আর রুটির ভিতরটাও লাল। এমন নমুনার বড় ও লাল রুটি আগে আর দেখি নি। আমরা মনে করলাম নিশ্চয় তুর্কীর রক্তে ভিজিয়ে এসব রুটি দিচ্ছে। তুর্কীরা হেসে বললে, মিয়া এ আমাদের দেশের লাল গমের তৈরি, খেয়ে দেখ কেমন শক্তি পাবে। আর সেখানকার ফল-পসারী কি চমৎকার, এক-একটা টমেটো, আঃ কি তার রং আর কি তার স্বাদ, আর আকারেও খুব বড়। কাজেই তুর্কীতে বন্দী থাকলেও খাওয়া-দাওয়া হিসাবে আমরা একরকম ভালই ছিলাম। আমরা যখন ইস্তাম্বুলে তখন ১৯১৮ সনের জুন মাসের বারো তারিখে রাত বারোটার সময় খবর এল তুর্ক ও ব্রিটেনে সন্ধি

হয়েছে, যুদ্ধ শেষ। আমরা মুক্তি পেলাম—আমাদের মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেল। ইস্তাম্বুলে বন্দীদের মধ্য থেকে আমাদের বাছাই বাছাই সৈন্যদের লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। উঃ সেখানে আমাদের কি সম্মান, একদিকে রাজা অন্য দিকে রাণী, মধ্যভাগে জজ বসে আছেন। আমাদের প্রত্যেককে সোনার মেডেল ও বড় সার্টিফিকেট দিয়ে বিশেষরকম সম্মান দেখান হ'ল, আর কি হাসাহাসির ধুম। সোনার মেডেলের একদিকে রাণী ভিক্টোরিয়া বর্শা হাতে ঘোড়ায় বসে আছেন, এই মুর্ত্তি আঁকা ছিল। আমাদের চৌদ্দ দিন লণ্ডনে রাখল, ভিক্টোরীয় গাড়ীতে বসিয়ে সহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে আনল। তা যা বাব, চৌদ্দ দিনে কি আর সহরের বিষয় সব জানা যায়, না মনে থাকে? খাবার সময়ের কথা মনে আছে, টেবিলে টেবিলে খানা সাজান থাকত, কাঁটা চামচ থাকত, ছোট ছোট তোয়ালে কোলের উপর বিছিয়ে খাওয়া সুরু হ'ত।

"তুমি কি করে খেতে বলত?"

—আমি কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে পারতাম না। আমি আমার হাত দিয়েই সব সময় খেতাম, তবে বড় আজব দেশ, সেখানে রাস্তায় চেঁচামেচি নেই, ধাক্কাধাক্কি নেই, সব চুপচাপ, ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা বল, সবই অন্যরকম, আমি তাদের ভাষা কিছুই বুঝতাম না, আন্দাজে আন্দাজে কথা চালাতাম, তার পর দোভাষীও সঙ্গে থাকত। কতকগুলো শব্দ জানতাম, সেগুলো ব্যবহার করতাম—যেমন থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি গুড, সরি—এসব বলে বৃদ্ধ হাসতে লাগল, তার পর আদাব বলে চলে গেল।

এই তিরাশী বছরের বৃদ্ধকে যতই দেখি, তার কথাবার্ত্তা যতই শুনি ততই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের নায়ক আমাদের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পর আবিদের কাহিনী আরও বিচিত্র। আবিদ যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এল সৈন্যবিভাগ ছেড়ে, মান সম্ভ্রম, প্রচুর অর্থ নিয়ে সে বেরেলী চলল তার মা ও ভাইয়ের কাছে।

আবিদ বললে, বহুদিন পর বুড়ীমা আমাকে পেয়ে খুশী। আমাকে বললে, "বাবা আবিদ এবার তুই বিয়ে কর, তোর বৌ দেখে মরি।" আমি উত্তর দিলাম, মা, আমি সৈয়দ, আমি বিয়েটিয়ে করব না, তা ছাড়া আমি ভবঘুরে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব, আমাকে সাদি দিলে আমার বিবি ত আমার থাকবে না, দোসরার হয়ে যাবে। তার চেয়ে মা তুমি ছোট ভাই হাবিদের বিয়ে দাও। মা আর কি করে, আমি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করলাম, হাবিদের বিয়ে হয়ে গেল, আমার সম্পত্তির ভাগ আমি হাবিদের নামে লিখে দিলাম।

—আমি বিয়ে করলাম না বটে, কিন্তু পরে মাঝে মাঝে যেন অন্য একটা ভাব এসে যেত, মনে হ'ত আমিও বিয়ে করে ঘর-গৃহস্থী পাতাই। ক্রমে ক্রমে এক নাচের আসরে আমি এক নাচওয়ালীর প্রেমে পড়লাম। কি তার রূপ, আর কি তার নাচ-গান, যেন বেহস্তের পরী নেমে এসেছে। বেশীর ভাগ সময় আমি তার ওখানেই পড়ে থাকতাম, সেও আমাকে খুব খাতির করত, কিন্তু তখন বুঝি নাই, এখন বুঝি ঠিক ঠিক যেন সে আমাকে ভালবাসত না, যতটা ভালবাসত সে আমার ধন ঐশ্বর্য্যকে। নাচওয়ালীদের আবার ভালবাসা কি? ফুলের চারপাশে যেমন মধুঅলি গুণ গুণ করে, তেমনি তাকে ঘিরে সব সময়ই চাটুকারের দল তার কৃপাভিক্ষার জন্য স্তুতি করত। আমি মায়াবিনীর মায়াজালে পড়েছিলাম, তার চাটুবাক্যে আমিও মোহান্ধ হয়ে তাকে প্রায়ই বহুমূল্য উপঢৌকন দিতাম। একদিন তাকে বললাম, "বিবিজান, তুমি এই নাচ-গানের পেশা ছেড়ে দাও, আমি লাখ টাকার মালিক, তোমাকে বিয়ে করে আরামে রাখব।" সে কিন্তু চুপ করে গেল, কিছু বললে না। কিন্তু আমার মাথায় এক নেশা চাপল যে, একে বিয়ে করে সংসার পাতবই, একে ছাড়া আমার দিন কাটবে না। আমি প্রায়ই তাকে অনুরোধ জানাতাম, কিন্তু সে কোন জবাব দিত না। এর মধ্যে একদিন সে নাচ-গানের মুজরো নিয়ে আর এক সহরে কিছুদিনের জন্য চলে গেল, আমার আর দিন কাটে না। প্রতিমুহূর্ত্তে কুহকিনীর রূপসী মূর্ত্তি চোখে ভাসে, তার মধুর গান কানে শুনি। আমি উত্তেজিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, আর নয়, সে এলেই হয় তাকে বিয়ে করব, নয়ত তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব, এভাবে আর দিন কাটাতে পারব না। কিছুদিন পর সে চলে এল। তাকে যেন নতুন করে দেখলাম, কি তার রূপ। আমি তার হাত ধরে বললাম, "বিবিজান, এবার আর তোমায় ছাড়ব না, হয় বিয়ে করে আমার হও, নয়ত আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।" সে আমার গলা জড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না, তোমাকে সাদি করেই আমার স্বর্গ গড়ে তুলব। আমি কুহকিনীর মোহে ভুললাম। একটা বহু দামী পান্নার আংটি নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা তার তুলার মত নরম হাতখানা তুলে আঙুলে পরিয়ে দিলাম। সোনার বরণ আঙ্গুলের রং এর সঙ্গে আংটির সোনা মিশে গেল। শুধু বড় সবুজ পাথরটা জ্বল জ্বল করতে লাগল আকাশের চন্দ্রমার মত। আমি তার ঐ অপরূপ সুন্দর হাতখানা ধরে বললাম, পিয়ারী, সাদির রাতে আমার হাতের এই হীরার আংটি দেব। মেসোপটেমিয়া লুটের সময় আমি এটা পেয়েছিলাম।

পিয়ারী ভুবন-ভোলানো হাসিতে আমাকে মাৎ করে দিল। আমি চলে এলাম। আমি মধুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। একদিন সকালেই উঠে তার ওখানে গেলাম, সে আমাকে খুব আদর করে আমাকে একবাটি পায়েস এনে খেতে দিল, সে তার চাঁপার মত আঙুলগুলি দিয়ে বাটিটা তুলে ধরল, আমার মুখের সামনে, আমি চামচে করে খেতে লাগলাম। তখন বুঝিনি, এখন যেন মনে হয় তার হাতের আঙুল কাঁপছিল, তার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন চঞ্চল ছিল, সে যেন ভাল করে হেসে কথা বলতে পারে নি সেদিন। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এলাম কিন্তু কিছু পরই শরীরটা যেন কেমন করতে লাগল। হাকিমকে ডেকে পাঠালাম, হাকিম আমাকে দেখে বললে, "মিয়া সাহেব, আপনি কি দুঃখে শঙ্খিয়া (বিষ) খেতে গেলেন ?"

বিষ ! আমার সমস্ত শরীর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি বললাম, বিষ খাব কেন ?

হাকিম বললে, মিয়া সাহেব, আপনার জিভ-চোখ দেখলেই বোঝা যায় যেভাবেই হোক বিষ আপনার পেটে গিয়েছে। তা আমি ওষুধ দিচ্ছি একটা, সেটাতে আপনার দেহের বিষ কেটে যাবে। হাকিম বহু দাওয়াই করার পর সে যাত্রা আমি প্রাণে বাঁচলাম। শরীরের দুর্ব্বলতা একটু দূর হতেই আমি উঠে বসলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, বিষ কি করে আমি খেলাম, কে খাওয়ালে, কেন খাওয়ালে ? অনেকক্ষণ চিন্তার পর মনে হ'ল সেই নাচওয়ালীর বাড়ীর পায়েস খাওয়ার পরই যেন শরীর খারাপ হয়ে গেল, মাথা ঘুরতে সুরু করেছিল। তবে, তবে কি সেই শয়তানীই আমাকে বিষ খাইয়েছে ? আমার সমস্ত শরীর-মনে যেন আগুন ধরে গেল। আমি এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। যুদ্ধে আমি মস্ত বড় একটা তুর্কী রাইফেল পেয়েছিলাম, তাতে কার্তুজ ভর্ত্তি করে ছুটলাম শয়তানীর বাড়ীর দিকে। আমার আর ভাবনা চিন্তা করবার মত বুদ্ধি ছিল না। শয়তানী তার বসবার ঘরে তার এক পেয়ারের সঙ্গে বসে খুব হাসি-মস্করা করছিল। আমাকে বন্দুক হাতে ঘরে ঢুকতে দেখেই সেই বদমায়েসটা উঠে একছুটে অদৃশ্য হ'ল, আর সেই শয়তানী থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। বললে, মিয়াসাব, আদাব, আসুন বসুন। ভয়ে তার স্বর জড়িয়ে এসেছে। আমি বললাম, "বল্, কেন আমাকে বিষ খাইয়েছিস ?" সে প্রথমে আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বন্দুক উঁচিয়ে বললাম, "দেখ আমি ফৌজের লোক, এই দুনালা বন্দুক দেখেছিস, এক গুলীতে সাবাড় করে দেব। আমি মরতেও ডরাই না, মারতেও ডরাই নে, শীগগির সত্য কথা বল।" তখন সে কাঁপতে লাগল, যেন বাঁশপাতা। গলা থেকে আওয়াজ বের হয় না। অনেক কষ্টে বললে, রামজান আমাকে একটা পুরিয়া দিয়ে বললে, তুই যদি আবিদ মিয়াকে এটা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিস তবে তোর আর কোন চিন্তা নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন অনিষ্ট হবে না ত ? সে বললে অনিষ্ট হওয়া ত দূরের কথা, সে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিয়ে তোর কেনা গোলাম হয়ে যাবে। আবিদ হ'ল ফৌজের লোক, কোনদিন তোকে ছেড়ে সে আবার লড়াইতে চলে যাবে, তার লাখ টাকা আছে, আর একটা বিবি নেবে, তোর একাল-ওকাল সবই ভেস্তে যাবে। তার চেয়ে এই দাওয়াইটা খাইয়ে দে, তোর সারা জীবনের জন্য আর কোন ভয় নেই।

নাচওয়ালীর কথা শুনে আমার সমস্ত শরীর রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বললাম, "পিশাচী এবার তুই মর, তোকে আমি রাজরাণী করে রাখতাম, আর তুই কিনা রামজানের প্রেমে মজে আমার ধনের লোভে আমাকে বিষ পর্য্যন্ত খাওয়াতে সাহস করলি !" তখন আমার কোন হুঁস ছিল না। বন্দুক তুলে ধরলাম, কিন্তু সে যখন আধা চীৎকার করে উঠল তখন তার চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম। আমার হাত অবশ হয়ে গেল, অমন সোনার রং-এর মুখখানা একেবারে সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে, চোখের কি ভয়-ব্যাকুল অসহায় দৃষ্টি ! মা সাব, যাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতাম, যার চোখের মন-ভোলানো দৃষ্টি আমাকে পাগল বানিয়েছে, যার হাসি আমাকে বেহেস্তে নিয়ে গেছে, আজ তার বুকের রক্তে আমার পা ভিজবে, না পারব না, আমার হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল, আমি আমার হাতের সেই হীরার আংটিটা, যা তাকে সাদির রাতে পরিয়ে দেব বলে রেখেছিলাম, তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দুনিয়া আমার চোখে বিষিয়ে উঠল, আমি হন্ হন্ করে ছুটে চললাম পাগলের মত সহর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে। যাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতাম, আমার সর্ব্বস্ব তাকেই দিতাম, তবু সে আমাকে বিষ খাওয়াল, তবে এই দুনিয়ায় আছে কি ? কার উপর বিশ্বাস রাখব ? ধন, মান, যশ সব ছেড়ে আমি জঙ্গলের বাসিন্দা হলাম, গাছতলা হ'ল আমার শয্যা। গাছের ফল হ'ল আমার আহার্য্য, নদীর জল হ'ল পানীয়, আর বকরার (ছাগলের) ছাল হ'ল আমার পরিধানের বস্ত্র।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিদের এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে লাগলাম। এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যে কত বিচিত্র ঘটনার সংঘাত চলেছে, তা কল্পনার অতীত। আমার সামনে এই অশীতিপর বৃদ্ধ মলিন বস্ত্রে বসে আছে, সে এই গল্পের নায়ক, একদিন বহুমূল্য পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে

দাস-দাসীতে পরিবেষ্টিত ছিল, আর তারই প্রেমে মুগ্ধ বহু নারী তাকে অধিকার করতে সচেষ্ট ছিল, তা যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য।

আবিদ বলে চলল, আল্লার নাম নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে কয়েক বছর এভাবে কাটালাম, তার পর মধ্যপ্রদেশে এলাম। সহরের নিকটবর্ত্তী একটা জঙ্গলে আস্তানা গাড়লাম। গাছতলায় একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর বানালাম, সেখানেই থাকতাম। আমি ফকীর, তাই আশেপাশের কাঠুরেরা কাঠ কাটতে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে নানারকম খাদ্যদ্রব্য ভেট দিতে লাগল। আমি বললাম, আমি ফকীর, কারো দান খাই না, মেহনত করে খাব। আমি তখন জঙ্গলের ডালপালা কেটে কেটে জ্বালিয়ে অঙ্গার-কয়লা করতে লাগলাম আর ঐ কাঠ সহরে নিয়ে বেচে প্রচুর পয়সা পেতে লাগলাম। সেই পয়সা দিয়ে আমার খাওয়া-পরা ত সব হ'তই, আরো অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকত। আমি টাকা জমাব কি জন্য, কার জন্য ? পুরানো স্মৃতি মনে হলেই শরীরে জ্বালা ধরে যেত। আমি মারা গেলে যাতে আমার কফিনের পয়সার অভাব না হয়, সেজন্য আমি সর্ব্বদাই চল্লিশ টাকা মজুদ রেখে দিতাম, আর বাকী টাকা দিয়ে চাল, গম, ডাল সব কিনে নিয়ে আসতাম। কত কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। তাদের বলতাম, ভাইসব ঐ দেখ ধুনীতে আগুন জ্বলছে। ঐ ছালাতে ডাল চাল আছে, মজাসে বানাও, খাও। আমাকে খাওয়াতে হবে না, আমি ফকীর, আমি স্বপাকে খাই। তিনটি গ্রামের তিন মোড়ল আমার বড় ভক্ত ছিল। আমাকে সাহায্য করবার জন্য তারা বড় ব্যস্ত থাকত। আমি একদিন তাদের বললাম, দেখ তোমরা যদি সত্যই আমাকে সাহায্য করতে চাও, তবে আমি যে কয়লা বানাই তা বিক্রী করে এনে দাও তোমাদের ঠেলাতে করে। তারা আনন্দে সপ্তাহে সপ্তাহে আমার কয়লা বিক্রী করে দিতে লাগল। তার পর মুরগী পুষলাম। অনেকগুলি মুরগী হ'ল, খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়ালে এরা আমাকে ঘিরে এসে দাঁড়াত, রোজ বেশ কয়েকটা ডিম হ'ত, তা খেতাম। একদিন একদল জংলী বনজারা লোক একটা বাঘিনী মারল, তার একটা বাচ্চা এক-দুই দিনের বয়স, সেটা আর একটি নীল গাই আমাকে এনে দিল। আমি ত খুব খুশী। এদের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা আমার প্রধান কাজ হ'ল। বাঘের বাচ্চাটাকে মুখ হাঁ করিয়ে নলে করে দুধ ঢেলে খাওয়াতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে দুটোই বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে উঠল, আমার সব কথা বুঝতে পারত। বাঘটাকে দিনে একটা বড় কাঠের বাক্সে বন্ধ করে রাখতাম আর রাত্রে ছেড়ে দিতাম। বাঘ, নীল গাই আর মুরগীর ছানাগুলো নিয়ে আমার বেশ দিন কাটছিল। কয়েক বৎসর কেটে গেল, আবার আমার মন লোকালয়ে আসবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল, আমি আমার জঙ্গলের কুটির ছেড়ে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম, আর গাই ও বাঘকে বললাম, "যা চলে যা বেটা, তোরা স্বাধীন।" কিন্তু আমি চলতে সুরু করলে কি হবে এ দুটোও আমার পেছন পেছন চলছে। সমস্ত মনটা দুলে উঠল, এদের জন্য প্রবল স্নেহের আকর্ষণ হ'ল, কিন্তু মনটা শক্ত করে ভাবলাম, আমি ফকির, আমার ত মায়ায় জড়ানো ভাল নয়, বাঘের গলা ধরে বললাম, তুই যদি সত্যিকারের শের হ'স তবে চলে যা, আমার পেছন পেছন আসিস না। গাইটাকে আদর করে গলায় হাত বুলিয়ে বললাম, যা বেটি চলে যা, আনন্দে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস। দেখতে পেলাম বাঘের আর নীল গাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, আমার চোখও শুকনো রইল না, আর পেছনে না তাকিয়ে চলে গেলাম। হেঁটে হেঁটে এসে ষ্টেসনে দাঁড়ালাম, ভাবলাম আবার বোম্বে যাব।

সেদিনই টিকেট কিনে গাড়ীতে উঠে বসলাম। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা খুব বড় ছিল, দেখলাম খেলার পোশাকে একদল ছেলে যাচ্ছে, পাশে লম্বা বাক্সভরা ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম, একটি বয়স্ক লোক সব গুছিয়ে রাখছে, হঠাৎ তার মুখটা চেনা চেনা মনে হ'ল। সে যখন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে উঠল তখন তার দাঁত বেরিয়ে পড়ল, পরিষ্কার। এ রামরাও, কুট-আল-আম্বারাতে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের বন্দী ছিল। তার দাঁত একটা পড়ে গেছে, চুলে পাক ধরেছে, চেহারাও অনেকটা বদলে গেছে, তবু বদলায়নি সেই মারাঠা সৈন্য রামরাওর প্রাণখোলা দরাজ হাসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রামরাও ও আমার পূর্ব্বের পরিচয় ফিরে এল, দুজনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বহুদিনকার পূর্ব্বের হারানো দিনগুলির গল্প করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে খেলোয়াড়রা সে কথায় যোগ দিল। তারাও আমাকে ধরে বসল, তাদের সঙ্গে আমাকে বোম্বে যেতে হবে, তারা আমার কাজের ব্যবস্থা করে দিবে। রামরাও বর্ত্তমানে তাদের খেলার সরঞ্জাম ও খাওয়া-থাকার ভার নিয়েছে। বোম্বেতে সে একটা খেলার সরঞ্জামের দোকানের মালিক, সে তাদের ক্লাবের সব দেখাশোনা করে। রামরাও-ও সাগ্রহে বললে, দোস্ত, আমার ওখানে চল, তোমার কোন ভাবনা নেই।

সুদীর্ঘ দিন জঙ্গলবাসের পর আবার লোকালয়, ছেলেদের নির্ম্মল হাসি-কথাবার্ত্তা বড় ভাল লাগল, আমি

রাজি হয়ে গেলাম ও রামরাওর সঙ্গী হয়ে তার দোকানে গেলাম। তার দোকানে বসে বসে তার কাজ দেখতে দেখতে নিজেও শিখতে লাগলাম এবং ভাল করে খেলার ব্যাটে সুতো লাগানো, টেনিস র্যাকেটে 'গাঁট' দেওয়া ইত্যাদি কাজে আমার হাত পেকে গেল, এভাবে বোম্বেতে ছয় মাস শান্তিতে ও আনন্দে কাটল।

আমি যে পাড়ায় থাকতাম সেখানে সর্ব্বদাই দেখতাম নানারকমের লোক আসছে যাচ্ছে, তাদের আনাগোনা আমি সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলাম। দেখলাম অনেকেই সরকারকে ঠকিয়ে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে গোপন-ব্যবসা চালাচ্ছে।

তখন বর্ষা নেমেছে, খেলা-ধূলা অনেকটা বন্ধ। আমি পুরানো টেনিস ও ব্যাডমিণ্টনের র্যাকেট সংগ্রহ করে সেগুলোকে কেটে ছেঁটে জোড়া দিয়ে নতুন গাঁট লাগিয়ে খেলার উপযুক্ত করে যথাসময়ে বিক্রীর জন্য তৈরি করতে লাগলাম—এ সময়টায় তিনটি লোক ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে লাগল, যা আমি চাই নি। স্বধর্ম্মী বলে আমার উপর তাদের দাবিটা বেশী। একদিন বললে, মিঞা, ওসবকাঠ কেটে আর ছিলা লাগিয়ে ক'পয়সা আর পাও? আমাদের দলে ভিড়ে পড়, যদি সাহস থাকে তবে রাতারাতি বড়লোক হতে পারবে।

আবিদ আলিকে ওরা সাহস শেখাবে? যা হোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন ওদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শহরতলীর এক জঙ্গলে গিয়েছিলাম। একজন একটা রিভলবার বের করে বললে, কার হাত কত ঠিক দেখা যাক। একে একে তিনজন একটা লক্ষ্য ভেদ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কারুর গুলীই ঠিক লক্ষ্যে লাগল না। তখন আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, হাত নিসপিস করছিল, একটানে রিভলবারটা নিয়ে এক গুলীতে লক্ষ্য ভেদ করলাম, তারা অবাক হ'ল। বললাম, মেসোপটেমিয়ার লড়াইতে এ হাত দিয়ে কত মুণ্ডু যে উড়ে গেছে তার খবর রাখে কে? তারা মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল আর একজন বলে উঠল, এতদিনে যোগ্য লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু সে দৃষ্টি আর কথা আমার ভাল লাগল না।

একদিন গভীর রাতে তিনজন এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠাল, বললে, ভাইসাব আজ তোমাকে কিছু হিম্মৎ দেখাতে হবে। এক বাদশার পিয়ারী বোম্বেতে পালিয়ে এসেছে এক বড় ব্যাপারীর সঙ্গে আজ সকালে। কাল রাত সেই ব্যাপারীকে যেভাবেই হোক সাবাড় করতে হবে, আর বিবিজানের মুখের খুপসুরতি ছোরা দিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে। তুমি এই রিভলবার নাও, আর হামিদখাঁ ছোরা নিয়ে আসবে তোমার সঙ্গে, বলে আমার সামনে একটা রিভলবার রেখে আর একটা টাকার তোড়াও রাখল, বললে এই রইল তোমার তিনশ টাকা।

আমি শেষ কথাটা শুনে বড় অবাক হয়ে গেলাম, বললাম জান নেওয়ার মূল্য তিনশ টাকা। লোকটা অত্যন্ত চতুর, তৎক্ষণাৎ আরো দুশ টাকা বের করে বললে, এই রইল পাঁচশ টাকা, কাজ শেষ হলে বাকী হাজার পাবে। এখন ঘুমোও কাল আবার এসে বলে যাব কখন কোথায় কিভাবে তোমাকে কাজে নামতে হবে।

হঠাৎ আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, বললাম পাঁচশ টাকায় আবিদ আলিকে হাত করবে, আর যা চাই তাই করিয়ে নেবে, হা-হা-হা, তোমরা আবিদ আলিকে কি ভাব!

চতুর লোকটি নিজকে সামলে নিল, বললে ভাবি সে শের, শেরের মত তার সাহস, সে যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারে। চললাম ভাইসাব কাজ শেষ হলে বাকী হাজার পাবে, বলতে না বলতে চোখের নিমেষে গলিপথে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—আমার মনে ভীষণ ধাক্কা লাগল, কোথায় এই নরকে এসে পড়লাম। সে রাত্রেই আমি আমার পোটলা-পুটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, বোম্বে ছেড়ে এলাম। তার আগে রিভলবার আর টাকার তোড়াটা একটা পুলিন্দাতে বেঁধে ঘরে তালাবন্ধ করলাম আর চাবিটা আমার পড়োশীর কাছে দিয়ে এলাম যখন কোনার বাড়ীর লোকেরা আমার খোঁজে আসবে তখন তাদের এই চাবিটা দিয়ে দিও।

বোম্বে ছেড়ে খাস্তোয়ায় এলাম। সহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে যে রাস্তা চলেছে সেখানে একটা বটগাছের নীচে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে আমার ডেরা গাড়লাম। বোম্বে থাকতে ব্যাট ও র্যাকেট ইত্যাদির গাঁট তৈরি করতে হাত পেকে গিয়েছিল, তাই সে কাজ করাই স্থির করলাম। স্কুল, কলেজ, ক্লাব ঘুরে ঘুরে পুরানো র্যাকেট সংগ্রহ করে যখন নতুন করে দিতে লাগলাম, তখন সবাই আমার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হতে লাগল, যথেষ্ট কাজ আমার হাতে আসতে লাগল, আমাকে বেকার বসে দিন কাটাতে হ'ল না। আমার দিনগুলো পরম শান্তিতে নিরিবিলি কাটছে, এখন শুধু তাঁর কাছে যাবার অপেক্ষায় আছি তাই বলে বৃদ্ধ পরম বিশ্বাসে উপরের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে প্রণাম জানাল।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে সেই রাস্তার মোড়ে বটগাছের ছায়ায় আবিদমিয়ার সামিয়ানা খাটানো আস্তানা দেখতে পেলাম আর দেখতে পেলাম একটা খুব লম্বা আর বড় মজবুত বাক্স, আবিদমিয়ার কফিন, বর্ত্তমানে সে তাতে সযত্নে ব্যাট-র্যাকেট এসব রাখে। কিন্তু যখন তার ডাক

আসবে পরপারের, তখন বন্ধুবান্ধবহীন দেশে যাতে তার দেহ ঠিকভাবে সমাধিস্থ হতে পারে তাই সে তার ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছে।

বৃদ্ধর বিচিত্র জীবন-কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। বহুদিন কেটে গেছে হঠাৎ খাস্তোয়া ছেড়ে চলে এসেছি, আবিদের সঙ্গে আর দেখা হয় নি, আর কখন হবে কিনা জানিনে, হয়ত এতদিনে সেই তিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ ফকীর আবিদের আত্মা তার পরম ঈপ্সিতলোকে চলে গেছে। তার বলিষ্ঠ দেহ কফিনবদ্ধ হয়ে ধরিত্রী মায়ের কোলে স্থান পেয়ে চিরশান্তি লাভ করেছে।

বৃষ্টি-ধৌত ধরা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

সপ্তাহ ধরি উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হয়েছে মেলা ;
আজি ভোর হতে ছায়াতে আলোতে চলেছে সাবেক খেলা।
মিষ্টি রোদের মিষ্টি হাসিতে মুখ টিপে হাসে ফুল,
ঝলমল করে ঘাসের নোলক—পাতার শিশির-দুল,
খিলখিল ক'রে হাসিছে পাতারা—করতালি দিয়ে নাচে,
অপরূপ শোভা ফুটেছে বনের লতায়—পাতায়—গাছে।
ভিজে ভিজে মাটি—ভিজে-ভিজে বন—তারই 'পরে পড়ে আলো ;
মাটির দেশের খুসীর সকাল লাগিছে বড়ই ভালো।

২

উপবাস-ভাঙা চড়ুইভাতিতে পাখীরা মেতেছে সুখে ;—
কলকাকলিতে মুখর কানন ; রবাহূত মুখে মুখে
হয়েছে রটনা—আনন্দ-ভোজে জমেছে জটলা—ভীড় ;
পতঙ্গ-পাখী মহা-উল্লাসে কিছুতে মানে না থির !
দশ দিশি ভরি' উৎসাহ কি যে—খুসীর নাহি যে ওর ;
প্রকৃতি-সখির হাসি-মুখ দেখে এতদিনে হ'ল ভোর।
আনন্দ মোর কোথায় রাখিব ? উপচিয়া যায় প্রাণ ;—
মৌসুমী-দেশে এল মেঘে ভেসে মৌসুমী-অবদান।

৩

কানায় কানায় টলমল জল, দীঘি যে গিয়েছে ভ'রে ;
জলের জীবেরা নানা অছিলায় মহা-উৎসাহে ঘোরে।
রুই-কাতলারা কাটিছে সাঁতার, শোল-পোনাদের ঝাঁকে
মিষ্টি হাসির ঝিলিক ঝরায় সূর্য্য পাতার ফাঁকে।
ঢোল-কলমীর ডাঁটায় ডাঁটায়—শাপলা-লতার ফুলে
আকাশ-চোঁয়ানো সুধা ঢেলে পড়ে মেঘের ঢাকনা খুলে।
আকাশ-মাটির মাখামাখি কি যে ! ভাবিয়া অবাক হই,—
মেঘ-মুলুকের এত ঘনঘটা পলকে মিলাল কই !
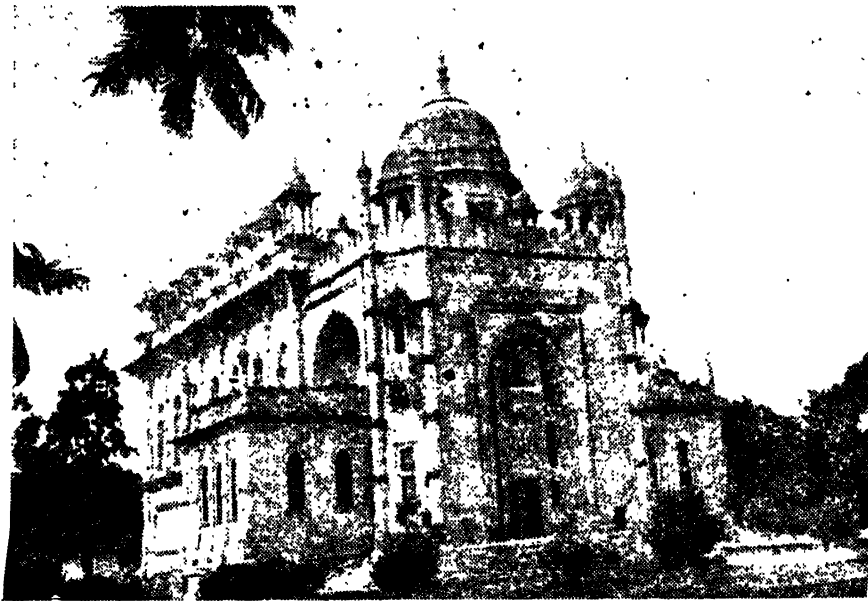
আর্ট স্কুল

মাদ্রাজ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মাদ্রাজ সেন্‌ট্রাল ষ্টেশনে জনতা এক্সপ্রেস এসে থামল। ষ্টেশনে প্রবেশের পূর্ব্বে চোখে পড়ল কবরখানা আর গীর্জ্জা অর্থাৎ ইংরেজ-জাতির স্মরণ-চিহ্ন দুটি। এক সময়ে মাদ্রাজ যে ইংরেজ-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল, এখানের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির সব কিছুই যে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের আইন মত চলত, একথা আগন্তুক মাত্রেরই মনে পড়ে যখন নগর-প্রবেশ-পথে কবরখানা আর গীর্জ্জাকে এখনও মাথা উঁচু করে থাকতে দেখে। বস্তুতঃ ইংরেজদের তৈরী মাদ্রাজ। এর গোড়াপত্তন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার ফ্রান্সিস ডে সাহেব ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা শ্রীরঙ্গরায়ের নিকট হতে স্থানটি পত্তনী নিয়ে। পরে তিনি চন্দ্রগিরির রাজপ্রতিনিধির নিকট আরও কিছু জায়গা ইজারা নেন। তার পর কুঠি হ'ল। দুর্গ গড়ে উঠল। দুর্গের নাম রাখা হ'ল সেণ্ট জর্জ্জ। কত যুদ্ধ হয়েছিল ঐ দুর্গের দখল নিয়ে। দাউদ খাঁ, মারাঠারা, ফরাসী জাতি—এরা দুর্গ আক্রমণ করে, ফরাসীরা ইংরেজদের হটিয়ে দেয় দুর্গ থেকে। ইংরেজরা পরে আবার পুনর্দ্দখল করে। শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন হায়দর আলি। কিন্তু মাদ্রাজ দুর্গ টিকে গেল। কায়েমী হয়ে বসল ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে। গড়ে উঠল মাদ্রাজ সহর, গড়ে উঠল মাদ্রাজ বন্দর। চল্লিশ ফুট চওড়া বাঁধ দিয়ে জাহাজ-ঘাটা তৈরী হ'ল। বাড়তে বাড়তে সহর আজ একফালি চাঁদের আকারে দৈর্ঘ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে সাড়ে তিন মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহরটি তৈরী করতে সেকালেও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকারও উপর পড়েছিল ইংরেজদের।

মাদ্রাজের নামের ইতিহাসও বিচিত্র। মাদারেসন অর্থে জেলে-দের গ্রাম। আর এগুলি ছিল ঠিক ডে সাহেবের দুর্গের পাশে। মাদারেসন নাম থেকেও মাদ্রাজের নামকরণ হতে পারে। আবার পর্ত্তুগীজদের গীর্জ্জার নাম হ'ল Madre de Deus—Mother of God. এর থেকেও মাদ্রাজ নাম আসা অসম্ভব নয়। মাদ্রাসার অপভ্রংশ থেকে মাদ্রাজ নামের উদ্ভব হলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

উনবিংশ শতকে বিশপ হেবার মুগ্ধ হয়েছিলেন মাদ্রাজ উপকূলের শ্যাম তটরেখা দেখে। তিনি ঘাঁটি পাতলেন এখানে। তাঁদের দল বাড়াতে দীক্ষিতের সংখ্যাও বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। তাই ভারতবর্ষে বোধ হয় নেটিভ ক্রীশ্চানের সংখ্যা এখানেই সর্ব্বাধিক।

স্কুটারে চেপে সেন্‌ট্রাল ষ্টেশন পার হলাম। রাস্তা ত্রিধা-বিভক্ত হয়েছে। এক ভাগ গেছে এগমোরের দিকে। এক ভাগ নগরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথ মাউণ্ট রোডে গিয়ে মিশেছে। আর এক ভাগে চলেছি আমরা মেরিন রোড ধরে ট্রিপ্লিকেনের দিকে। প্রথমেই নজরে পড়ে দুর্গ। তার পর মহাযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ। এ-

গুলি সমুদ্র-সমতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এগুলি অতিক্রম করে সেপিয়ার ব্রীজ পেরিয়ে সাবাসেন ইন্দসক্লিপসনবাহী গম্বুজ-ওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়-সৌধগুলি অতিক্রম করলাম। পর্য্যায়ক্রমে ইউনিভারসিটি পরীক্ষা-হল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেক্রেটারিয়েট, কুইন্স মেরী কলেজ, ইন্সপেক্টার জেনারেলস অফিস, অল ইণ্ডিয়া রেডিও অফিস প্রভৃতি চোখে পড়তে লাগল। মাদ্রাজের যা কিছু ভাল তা এই মেরিন রোড ঘিরে গড়ে উঠেছে। শান্ত পরিবেশ এখানের, বড় বড় বাড়ীগুলির সামনে ছোট ছোট বাগান। তাতে নানা রকম ফুলগাছ। ঝরে পড়ছে কীর্ণ বকুল, চামেলী। কত রঙিন চন্দ্রমল্লিকাই না ফুটে আছে থরে থরে! সমুদ্র তীরে সৌন্দর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে এখানের শিক্ষা-ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, পুলিসী ব্যবস্থা, সব কিছু। বিদ্যামন্দিরে এরা ব্যবসাদারী ঢোকায় নি। নীচের তলায় কোন দোকান পাট বসায় নি। এ অঞ্চল খুঁজলে কোথাও কোন দোকানের দর্শন পাওয়া যাবে না। মর্য্যাদায়, গাম্ভীর্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে মাদ্রাজের মেরিনা একটা দেখার মত জিনিস। যেমন নিয়মানুবর্ত্তিতা তেমনি শৃঙ্খলাবোধ এখানের। এক কথায় মেরিনাকে বলা যায় সুন্দর, অতি সুন্দর। সৌধগুলির অপর দিকে সমুদ্র তার অনন্ত নীলিমা নিয়ে বিরাজ করছে। মেরিনা যেন একটা বিরাট সরীসৃপ। দিনমানে ও ঘুমিয়ে থাকে। রাত্রে ওর জাগরণ, কাতারে কাতারে নর-নারী করে আগমন, বিশ্রম্ভালাপ, তার পর রাত্রি নয়টা বেজে গেলে ও আবার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। অতি প্রত্যূষে ওর ঘুম ভাঙে। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ও মুখর হয়ে উঠে আবার। সূর্য্যোদয় দর্শনকারীরা ভীড় জমায়। জেলেরা ডিঙি ভাসায়। ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে তারা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিঃঝুম হয়ে পড়ে মেরিনা। ক্যান্টিন, সাঁতারের পুল সব নির্ব্বাক হয়ে যায়।

মেরিনা ঘুরে ট্রিপ্লিকেনে এসে ব্রডলজ হোষ্টেলে বাসা বাঁধলাম আমরা। ফ্যাসাদ হ'ল কথা বোঝা এবং বোঝানো নিয়ে। বহু কষ্টে ট্রেনে মিঃ সুব্বারাওয়ের কাছে গোটা কয়েক তেলেগু কথা শিখেছি আর কয়েকটা খাবারের নাম সংগ্রহ করে নিয়েছি। বিনোদ তার নূতন শেখা বিদ্যের প্রয়োগ করলে সর্ব্বপ্রথম হোটেলের বয়ের উপর। বললে, এক্কেটিকি ভিল্লু চুন্নারু—কোথায় যাচ্ছ? বয় যা উত্তর দিলে তার অর্থ বোঝার সামর্থ আমাদের নেই। তবু সাহসে ভর করে বিনোদ আবার বললে, মি পারু ইয়েমি - তোমার নাম কি? সে যা উত্তর দিলে তার অর্থ বুঝলাম না। কেবল রাজু কথাটা শুনে মনে হ'ল ঐটেই হয় ত ওর নাম হবে। এর পর বিনোদের তেলেগু বিদ্যে অচল হয়ে উঠল। তাই সে বললে, রাজু মিল চাই, কখন মিলবে? কিন্তু বহু চেষ্টা করেও বিনোদ তাকে কোন কথাই বোঝাতে পারলে না। বললাম, রাজু, ইডলি, ধোসা, স্বাদম্, রসম্। আদুরে ছেলের মত বিচিত্র ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে রাজু বললে, কা—না, কা—না, নাইন, নাইট অর্থাৎ রাত্রি নটায় খানা পাওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত হলাম। মাদ্রাজে মাথা নাড়ার ভঙ্গীমাটি বড় মজার, শাঁখের করাতের মত এটি এ-পাশেও কাটে, ও-পাশেও কাটে। অর্থাৎ হাঁ বলছে কি না বলছে, বোঝা দায়।

কপালেশ্বরের মন্দির
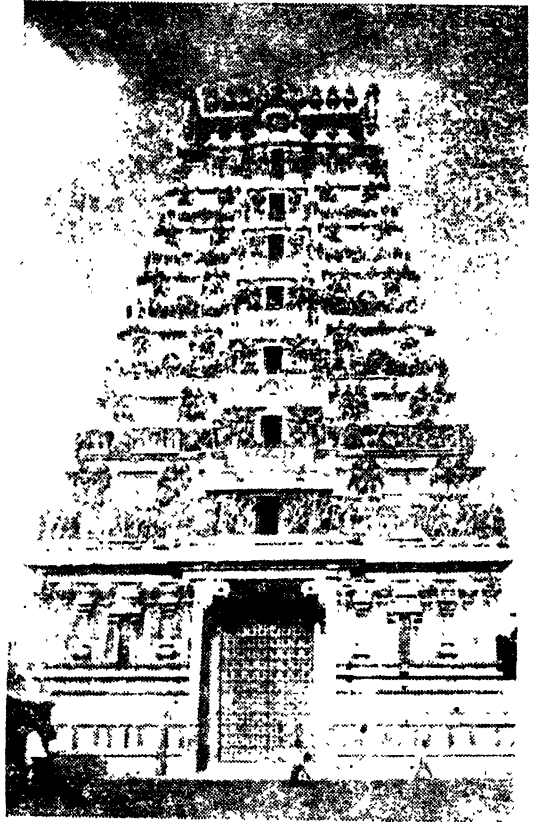
পরদিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখব বলে। পথে দেখলাম প্রায় বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখের ফুটপাত গৃহিণীরা জল দিয়ে পরিষ্কার করে চালগুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকছেন মেয়েরা এখানের কর্ম্মভীরু নন। এ পাশের রেশমী মেয়েদের মত ওঁরা বেয়ারার হাতের ধূমায়িত চা-পেয়ালার জন্য সকালে বিছানায় অপেক্ষা করে থাকেন না। এখানের পুরুষরাও অতি ভোরে স্নান সেরে কপালে চন্দন অনুলেপন করে কাজে বের হয়। তবে হোটেল-প্রীতি এ দেশের মজ্জাগত। হয় ত হোটেল সস্তা বলে অনেক বাড়ীতে রান্নার কোন ব্যবস্থাই নেই। যথাসময়ে হোটেল থেকে আহার্য্য আনানো হয়। জিনিসটা মন্দ নয়। যদিও বিদেশী ছাঁচের, তবুও মেয়েদের সারাদিন কালি-ঝুলি মেখে রান্নাশালে বসে থেকে রোগ ধরানোর চাইতে এটা অভিনব বটে। এখানে প্রতি পঁচিশটা বাড়ী অন্তর একটা হোটেল বা কাফেখানা। কফি মাদ্রাজীদের প্রিয়। হোটেলে বা কফিখানাতে এখানে কোন হৈ-চৈ নেই।

খাবার সময় কেউ শব্দ করে না, গলগুজব করে না তেমন। এক মনে খায়, দাম দেয়, চলে যায়। এ শৃঙ্খলাবোধ শেখবার।

আর একটা জিনিষ চোখে পড়ল পথে যেতে যেতে। দু-চারটে বাড়ীর সামনে ঝোলানো রয়েছে নাক-চোখ-গোঁফ আঁকা চালকুমড়া—যেন একটা মানুষের ছিন্ন-মুণ্ড। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটা করা হয় 'দৃষ্টিদোষম্' দূর করবার জন্য। মাদ্রাজীদের অনেক কুসংস্কার আছে। ওরা বিশ্বাস করে, ঐ ভাবে চালকুমড়া সামনে ঝুলিয়ে রাখলে কোন প্রেতাত্মা বা শনি রাহু প্রভৃতি গ্রহ আর গৃহের অধিবাসীদের অমঙ্গল করতে পারে না। গ্রহশান্তির যন্ত্র হিসেবে ওরা চাল-কুমড়ার মুণ্ড ব্যবহার করে থাকে।

আলপনা আঁকারও ইতিহাস আছে। কেউ বলে, আমরা যে হিন্দু তা বোঝাবার জন্য ওগুলো আঁকা হয়। কেবল হিন্দু বাড়ীর সম্মুখে আলপনা থাকে, অন্য কোন জাতির বাড়ীর সামনে থাকে না। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন, পৌষ মাস আমাদের পুণ্য মাস। এই মাসে মহিলারা প্রতিদিন মঙ্গলার্থে গৃহের সম্মুখভাগে আলপনা আঁকেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে বছরে এই মাসটাই আলপনা আঁকা হয়? তিনি বললেন, পৌষ মাসে প্রতিদিন আঁকা হয়। তা ছাড়া অন্য মাসে প্রতি শুক্রবার আঁকা হয়। আমাদের দেশে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজো করার মত মাদ্রাজে প্রতি শুক্রবার আলপনা আঁকার প্রথা আছে!

মাদ্রাজ জেগে ওঠে অতি ভোরে। পথে লোক চলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা ওভালটিন খেয়ে নিলাম একটা রেস্তোরায়। তার পর একটা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করা গেল মেরিন রোডে যাবার জন্যে। রিক্সাওয়ালা বললে, 'দু ফার্লং পথ, ভাড়া ছ' আনা।' রাজী হলাম। এখানে পথের হিসেব ধরা হয় ফার্লং দিয়ে। 'অরুম', 'অরম' বলে ঠুং ঠাং শব্দ করে রিক্সা চলল, এত ছোট রিক্সাগুলো যে, দুজনের স্থান হয় না একটা রিক্সাতে। স্কুটারগুলোতে দু'জন ভালভাবেই বসা যায়। সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে নেই। আকাশে মেঘ, আর তার আড়ালে ঢাকা সূর্য্য। জেলেরা ডিঙি তৈরি করছে। বিচ্ছিন্ন কাঠের অংশগুলোকে একত্রিত করে এক-একটা নৌকা গড়ে তুলছে তারা এবং তিন চার জন চড়ছে এক-একটা নৌকাতে। তার পর অতল সমুদ্রে তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। ফিরে আসে মধ্যাহ্নের কিছু পর। জেলেরা বড্ড গরীব, মাছ যা ধরে আনে, তা নিয়ে নেয় পাইকারে। ডিঙির কাঠের মালিকও অন্য লোক। তারাও একটা ভাড়া নেয়। কাজেই সব চুকিয়ে ওরা যা পায় তা এত সামান্য যে, দুবেলা পেট পুরে আহার জোটে না ওদের। পরিধানে তাই ওদের কৌপীন, তাও শত ছিন্ন।

ফেরার পথে বাস ধরতে গেলাম ট্রিপ্লিকেনের জন্য। উঠে পড়লাম ১ নং বাসে একজনের কথা মত। জিজ্ঞাসা করলাম কনডাকটারকে, এ বাস টিপ্লিকেনের ষ্টার সিনেমার পাশ দিয়ে যাবে কি না। ঐ অঞ্চলেই আমাদের হোটেল। কনডাকটার বললে, বলছি, আগে ভাড়া দাও। ভাড়া দিয়ে টিকেট কিনলাম বাসের কনডাকটার বললে, আগের ষ্টপেজে নেমে যাও। ৩১ নং বাস পাবে উল্টো দিকের ফুটপাতের ষ্ট্যাণ্ডে। সেই বাস যাবে তোমাদের গন্তব্য স্থানে। এ বাস টিপ্লিকেনের অন্য পাশ দিয়ে চলে যাবে। কলকাতা হলে কনডাকটারকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দিত, নেমে যাও, এ বাস যাবে না ওপথে। এখানে ঐটুকু সংবাদ জানার জন্য ফি দিতে হ'ল। ওরা হয়ত বলবে, না জেনে উঠ কেন, কোন সিভিক সেন্স নেই তোমাদের, তাই এ জরিমানা দিতে হ'ল।

৩১ নং বাস ধরতে উল্টো দিকের ফুটপাতে এলাম, চার-পাঁচ জন অপেক্ষা করছে বাসের জন্য। বাস এল, বিনোদ তাড়াতাড়ি বাসে উঠতে গেল। একজন বললে, 'Go to the que', বুঝতে পারি নি যে, ঐ সামান্য ক'জন লোক কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জিত হলাম, লজ্জা পেলেও জিনিসটা ভাল। এদের শৃঙ্খলাবোধ পথে ঘাটে পরিস্ফুট। এখানে মানুষ ঝুলতে ঝুলতে বাসে যায় না, যত জনার সিট আছে তার বেশী একজনকেও কনডাকটার নেয় না, বাস এলে যত সিট খালি আছে ঠিক তত জনই বাসে চড়ল, বাকী কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পরের বাসের আশায়, কোন হুড়োহুড়ি নেই, হৈ চৈ নেই। ভারি ভাল লাগল এ দেশের এ পদ্ধতি—এখানের বাস-ড্রাইভার বা কনডাকটারদের পায়ে জুতো নেই, বাস চলা বা থামার জন্য কনডাকটাররা বাঁশী বাজায়। কোন কোন বাসের কনডাকটার মুখে হুইসিলের মত শব্দ করে।

হোটেলে ফিরে এসে মাদ্রাজী মতে আহার সমাপ্ত করে বেরিয়ে পড়লাম পার্থসারথী মন্দির দেখতে, টিপ্লিকেনেই এ মন্দির। মন্দিরের সামনে রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বড় পাথর-বাঁধানো পুকুর। নাম তিরুইল্লিকেনী। হয়ত এই নামই উচ্চারণ-দুষ্ট হয়ে কালে ট্রিপ্লিকেনে পরিণত হয়েছে। আটতলা উঁচু গোপুরম অতিক্রম করে চত্বরে প্রবেশ করলাম, গোপুরম ক্রমশঃ ছোট হয়ে আকাশে উঠে গেছে। চত্বর ঘুরে মূল মন্দির পাওয়া গেল, মূল মন্দির গোপুরম বা সিংহদ্বারের তুলনায় উচ্চতার দিক থেকে অনেক ছোট, তবে মূল মন্দিরের মাথায় সোনার পরিমাণ মণ দেড়েক শুনলাম। দক্ষিণের মন্দিরে হীরে আর সোনার ছড়াছড়ি, তাই মন্দিরগুলিকে দুর্গের আকারে নির্ম্মাণ করার প্রথা বোধ হয় প্রচলিত হয়েছিল। পার্থসারথী মন্দিরে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দেখলাম। বৈকুণ্ঠতীর্থ ট্রিপ্লিকেন, এখানে অণ্ডাল নামে একজন সাধিকা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অমর হয়ে আছেন মানুষের মনে, উত্তর-ভারতে যেমন মীরাবাঈ দক্ষিণ-ভারতে অণ্ডাল সেইরূপ সর্ব্বজন পূজ্যা, অণ্ডালের বহু দোহা আছে, সেই দোহার কতকগুলি নিয়ে ৩০ খানি গ্রামোফোন রেকড তৈরি করা হয়েছে, পৌষ মাসে মাদ্রাজের সমস্ত মন্দিরে, বাড়ীতে, রেডিওতে ঐ দোহা-গানের রেকর্ডগুলি বাজানো হয়। আমরা যখন মন্দির পরিক্রমা করছিলাম,

সেক্রেটারিয়েট

তখন মাইক-এ ঐ রেকর্ডগুলির গান বাজানো হ'চ্ছিল। আট আনা দিয়ে গাঁদাফুলের গড়ে মালা কিনে পূজারীর হাতে দিলাম, তিনি নারায়ণের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, আমাদের দিলেন স্নানজল, আমরা তাই পান করলাম। এ পাশের মন্দিরে অর্থের জন্য কেউ চাপ দেয় না, ইচ্ছা হয় দাও, ইচ্ছা না হয় না দাও, কেউ কিছু বলবে না। এমন কি ভিক্ষুকরা পর্যন্ত জিদ ধরে না, চিৎকার করে না, হাত বাড়িয়ে বসে থাকে। ইচ্ছে হয় দাও কিছু, না হয় তারা কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

পার্থসারথীর মন্দির হতে বাইরে এসে আমরা ময়লাপুরে কপালেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলাম। ময়লাপুর শহরের দক্ষিণে এবং বেশ কিছুটা দূর। এ অঞ্চলটি পরিচ্ছন্ন নয়, মন্দির পরিকল্পনা একই প্রকারের। সেই সমুখে বাঁধানো পুকুরে, সেই চারদিকে চারটি প্রবেশ দ্বার বা গোপুরম। প্রকাণ্ড চত্বর, মাঝে প্রধান দেবতার মন্দির। গোপুরমের গায়ে বোধ হয় হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতাই বিরাজ করছেন। গোপুরমগুলি উচ্চতায় বার বা তের তলা বাড়ীর সমান, অদ্ভুত এদের শিল্প-সুষমা, মন্দিরের প্রধান দেবতা শিব। শুনলাম মন্দিরের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য কয়েক কোটি টাকা, মন্দির শীর্ষ সুবর্ণ মণ্ডিত, সম্মুখে শিবের বাহন নন্দীকেশ্বরে প্রতিমূর্ত্তি স্তম্ভে সংরক্ষিত।

কপালেশ্বর মন্দিরে সন্ন্যাসী সম্বন্দর বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিল, একবার তিনি নাম গান করে একটি মৃতা কুমারীর দেহে প্রাণসঞ্চার করেন বলে কিংবদন্তী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

ফেরার পথে শহর দেখার উদ্দেশ্যে হাঁটতে সুরু করলাম। এই ময়লাপুর তামিল কবি তিরুভালুভারের জন্মস্থান। এঁর প্রসিদ্ধ বই কুরাল সংহিতা, এঁর মতবাদ খৃষ্ট ধর্ম্মের মতবাদের অনুরূপ। এর রাজনীতি ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতির প্রতিধ্বনি। ময়লাপুরের সমুদ্রতীরে মাদ্রাজের সর্ব্বপ্রাচীন San Thome গীর্জ্জাটি আছে। এটি পর্তুগীজ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। এক সময় অঞ্চল নিয়ে লড়াই হয়েছিল। ময়লাপুর পর্তুগীজদের হাত হতে ফরাসীদের হাতে যায়। গোলকুণ্ডার সুলতান আবার কেড়ে নেন এ অঞ্চল, ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়লাপুরের পাশে তাম্বরম, এটি ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রধান কেন্দ্র।

টুরিষ্ট সীজন চলেছে এখন মাদ্রাজে, নভেম্বর থেকে মার্চ এখানে লোকে বেড়াতে আসে। নানা কনফারেন্সও হয় এই কয়েক মাসের মধ্যে, এবার মাদ্রাজ সম্মেলন-পীড়িত হয়ে উঠেছে শিক্ষা সম্মেলন, চিকিৎসক সম্মেলন, ধর্ম্মসম্মেলন, মন্ত্রী সম্মেলন নিরামিষাশী লোকদের সম্মেলন, আরও কত কি?

মাদ্রাজে জাতের গোঁড়ামি যেমন প্রবল, কুসংস্কারও তেমনি ভূত প্রেতের কোপদৃষ্টি হতে রক্ষা পাবার জন্যে চালকুমড়োর রাহুমুখ ঝুলিয়ে রাখে দরজার সম্মুখে। আলপনা এঁকে তিনটে গোবরে

ঢেলা বসিয়ে মাঝে কুমড়ো ফুল দিয়ে রাখে 'ভাগ্য-দোষম্' নিবারণার্থ, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কপালে গোবরের ফোঁটা দেয় ডাইনীর দৃষ্টি এড়াতে, পাহাড়ের গায়ে বিশেষ ধরণের চিহ্ন আঁকে আর সেই চিহ্নের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করে অসুরের কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। সধবা মেয়েরা প্রাণান্তেও রঙীন ছাড়া সাদা জমিনের শাড়ী পরে না। সাদা জমিনের শাড়ী, তাতে যত বড় পাড়ই থাকুক না কেন, পরা নাকি সধবার পক্ষে অমঙ্গল। সীঁথিতে সিন্দুর পরা এদেশের প্রথা নয়। এদেশের এয়োতি চিহ্ন কপালের লাল টিপ, বিবাহিতারা পায়ের আঙ্গুলে পরে রূপোর চুটকী, অবিবাহিতা বিবাহিতার পার্থক্য বোঝা যায় গলায় কালো কারে ঝোলান সোনার মাদুলি বা লকেট দেখে। কোন কুমারী কালো কার পরে না। কুমারী ও সধবারা মেহেদির মত পাতা দিয়ে পা রঙায়, গরিণ্টা তেলেগু নাম এই পাতার, গাছ বড় কিন্তু পাতা আকারে ছোট ছোট।

মাদ্রাজের পথে পথে ইংরেজের ছোঁয়াচ এখনও কিছু কিছু লেগে আছে, এখানের অনেক রাস্তারই এখনও সেই পূর্ব্বের ইংরেজী নাম। হিগিন বোথামের বই দোকান এখনও বড় হয়ে আছে, মাউন্ট রোডে মুনরোর প্রতিকৃতি এখনও মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে পরিবর্ত্তন আসছে। তাই এসপ্ল্যানেডের নূতন নামকরণ হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড, ময়লাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, নেতাজী এবং স্বামীজি মাদ্রাজীদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন।

ট্রামগাড়ী অচল হয়ে গেছে এখানে। স্মৃতি জেগে আছে শুধু বিবর্ণ টিন প্লেটের 'Tram cars drive slowly' লেখাগুলিতে, আর পিচগলা-পথে উঁকি মেরে থাকা লৌহপাতগুলিতে।

মধ্যাহ্ন কখনও গড়িয়ে গেল অপরাহ্ণে। আমরা পথেই চলেছি, মাঝে এক রেস্তোরায় কফি আর চালগুড়ির তৈরি রসে ডোবানো এক বিচিত্র আস্বাদের মিষ্টি দিয়ে মিষ্টিমুখ করে নিয়েছি। পা অচল হয়ে গেল। তাই রিক্সা নিলাম, রিক্সাওয়ালার খুশীমত পথে নিয়ে যেতে বলে দিলাম।

নূতন মাদ্রাজ বলতে বুঝতে হবে পাঁচটি বিভাগকে—তিরুভটিয়ুর, কাথিয়াওয়াকুম, নানগামবাকুম, ভাসারপাদি, সাতানগাড়ু, থাইয়াগারায়ানগর, গান্ধীনগর, শেনয়নগর, মাণ্ডাভেলি—এরাও আজ সামনে এসেছে তাদের দাবী নিয়ে। টনডিয়ারপেট, এগমোর, পুরসওয়ালকুম, বহুদিন পূর্ব্বে পুরাতন মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগমোর থেকে ব্রডগজ মিটারগজ রেলপথ গেছে। রামেশ্বরমের গাড়ী ছাড়ে এই এগমোর থেকেই। মাদ্রাজের আশেপাশে কত টাউনশিপ গড়ে উঠেছে, আরও উঠবে। মাদ্রাজ বাড়ছে, মাদ্রাজের একপ্রান্তে পেরাম্বুর। এখানে আছে ইনটিগ্যাল কোচ ফ্যাক্টরী, যার তৈরি বারান্দা দেওয়া বগি আমাদের এপাশেও প্রতি ট্রেনে দু চারটে দেখা যায়। মাদ্রাজের অপর প্রান্তে এডিয়ার। এখানের থিওসফিক্যাল সোসাইটির গৃহ সৌভ্রাত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এটি ডাঃ অ্যানিবেসান্তের স্মৃতি বিজড়িত। কর্ণেল ওলকট ও মাদাম ব্লাটাভস্কি এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

আমাদের ভ্রমণ চলেছে এলোমেলো ভাবে, পথঘাট চিনি না, রিক্সাওয়ালা যখন যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পথেই চলেছি। এসে পড়া গেল এডিয়ারের বিশ্ববিখ্যাত বটগাছতলায়, এ পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ বটবৃক্ষের অন্যতম। বৌদ্ধদের অশ্বত্থ বৃক্ষের মত থিওসফিষ্টদের বটবৃক্ষ অতি পবিত্র। এর পর গেলাম এডিয়ারের রুক্মিণী দেবী প্রতিষ্ঠিত কলাকেন্দ্রে, মাদ্রাজের ভারত নাট্য এবং হাঁড়ি বাজনা অদ্ভুত জিনিস, একটা হাঁড়িতে যে তবলার মত এত চমৎকার বোল বাজান যেতে পারে তা কোন দিন কল্পনাতেও ভাবি নি। ভ্রমণে ছেদ টেনে ক্লান্ত দেহে ফিরে এলাম হোটেলে রাত্রি ৮টা বেজে গেছে তখন।

পরের দিন ২৮শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ন্যাশনাল গার্লস স্কুল মণ্ডপের নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত হলাম। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডাঃ চিন্তামন দেশমুখ, প্রধান অতিথি রাজ্যপাল শ্রী পি. ভি. রাজামান্নার এবং উদ্বোধনকারিণী মাদ্রাজের পৌরপ্রধানা শ্রীমতী তারা চেরিয়ান। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন মাদ্রাজের শিক্ষা এবং অর্থমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রাহ্মনিয়াম, তা ছাড়া বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন ছটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এবং অনেক নাম করা শিক্ষাবিদ। শ্রীদেশমুখের প্রধান বক্তব্য হ'ল, শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয়কুণ্ঠার প্রতিবাদে সময় এবং শক্তি ক্ষয় না করে বরাদ্দ অর্থ কি ভাবে ব্যয় করলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয় সে বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর সংখ্যায় যোগ্যতর শিক্ষক এবং উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণ দিয়ে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে তাঁদের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদান পটুত্ব এবং তার ফলস্বরূপ শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করলেই দেশের অধিকতর কল্যাণ হবে।

রাজ্যপাল শ্রী রাজামান্নার বললেন, তিনি শিক্ষাবিদ নন, কাজেই বিশেষজ্ঞদের মত বিশেষ কিছু বলতে পারবেন না তিনি, বলবেন বাজে লোকের মত বাজে কথা। অবশ্য যা তিনি বললেন তা বেশ কাজের কথা, প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আধঘণ্টা প্রত্যেক ছেলেকে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে ভাবতে শেখানো দরকার। প্রার্থনার পর স্কুলের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত, এমন anthem তৈরি করতে হবে যা উচ্চারণ করতে কোন জাতি বা কোন ধর্ম্মের লোকের দ্বিধা বোধ হবে না। এই দিক থেকে গুরুদেবের 'অন্তর মম বিকশিত কর' কবিতার ইংরেজী তর্জ্জমা সার্ব্বজনীন প্রার্থনা-সঙ্গীত হবার যোগ্যতা রাখে। মাদ্রাজীরা রসিক। কাজেই শুষ্কমুখে কাউকেই বক্তার কথা গিলতে হয় নি।

কনফারেন্সে কাটল পর পর দুদিন। তৃতীয় দিনের প্রত্যূষে গেলাম সমুদ্রতীরে। ফেরার পথে মেরিনার কাছে এক ভদ্রলোকের

সঙ্গে দেখা। আজানুলম্বিত না হলেও বেশ দীর্ঘ শ্মশ্রু তাঁর মুখে শোভা পাচ্ছে। বিনোদ বললে, একেই জিজ্ঞাসা করুন না, পক্ষী তীর্থের বাস কোথা থেকে ছাড়ে। মাদ্রাজে ইংরেজীর মাধ্যমে অপরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'where do you come from? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'অযোধ্যা'। আবার বললাম, 'you mean Ajodhya of Faizabad. সহজ বাংলায় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'না, বাঁকুড়া জেলার গ্রাম অযোধ্যা। আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি বিবেক, আপনি ত বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, চকিতে মন ছুটে গেল অতীতে। মনে পড়ল কলেজ স্ট্রীটের পোষ্ট গ্রাজুয়েটস মেস, আর তার তেতলার ৫নং রুমের অধিবাসী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। দাড়ি তখন সবে গজাচ্ছিল। আজ বুক ছাড়িয়ে পেটে নামার উপক্রম করেছে। কাজেই বিভ্রান্তি ঘটেছিল। দীর্ঘদিনের ব্যবধান এবং অদর্শনে একান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়কল্প ব্যক্তিকেও চিনতে না পারার গ্লানি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। আজ বিবেকানন্দ কৃতী অধ্যাপক।

পথে পথে ফিরছি। হোটেল আর হোটেল, কনেমারা হোটেল এখানের সবচেয়ে নামকরা হোটেল। পুনামাল্লী রোডে মাদ্রাজ আর্টস স্কুল, তার অধ্যক্ষ শিল্পী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ভারতের সেরা শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান উচ্চে। গুইনডীতে মাদ্রাজের রেস কোর্স আর গভমেণ্ট হাউস আছে। নিনামবকমে আছে এরোড্রোম। মুর মার্কেটের পিছনে হল জু। প্যান্থিয়ন রোডে মিউজিয়াম। জু বা মিউজিয়াম কোনটাই কলকাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হল না। ব্রোঞ্জের শিবের নটরাজ মূর্ত্তি মিউজিয়ামের শোভা বর্দ্ধন করেছে। জু-এর বৈশিষ্ট্য প্রতি জাতের পাখীর জীবন-ইতিহাস দেওয়া আছে এখানে। একোয়ারিয়ামে মাছের শোভাযাত্রা মন কেড়ে নেয়।

প্রাক্তন এসপ্লানেডের পূর্ব্ব কোণে আছে ইন্দোসারাসেনি পদ্ধতিতে গড়া হাইকোর্ট সৌধ, তার মাথায় লাইটহাউস, যেন সারা নগরের উপর সজাগ প্রহরী।

মাদ্রাজে গীর্জ্জার সংখ্যা কম নয়। সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজ চার্চ্চ, সেণ্ট মেরিস চার্চ্চ, আর্মেনিয়ান চার্চ্চ, রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চ, লুথ চার্চ্চ, সেণ্ট জর্জ্জস ক্যাথিড্রাল, আরও ছোটখাটো কত চার্চ্চ আছে।

সভা-সমিতিও মেলা এখানে। একটি সভার নাম রসিকরঞ্জনী সভা। নামই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, মাদ্রাজীরা রসিক জাত, তা ছাড়া রসমের (তেঁতুলের) আধিক্যে এখানের রসনা ত রসসিক্ত হয়েই আছে। পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান মাদ্রাজের শিরায় উপশিরায়। মেথর, ধাঙড়, ধোপা, নাপিত, বেয়ারা, ফিরিওয়ালা, পোষাক তাদের যাই-হোক, ময়লা কোথাও এতটুকু নেই পোষাকে। এ দেশের নিজস্ব মেথর ধাঙড় আছে। কাজেই অন্য প্রদেশ থেকে মেথর ধাঙড়ের কাজের জন্য লোক আমদানী করার ঝক্কি পোহাতে হয় না।

মাদ্রাজের বিপনী বাঙ্গালোর, মাইশোর, মাদুরার পণ্যে ভরাট। ব্যাকিংহাম আর কর্ণাটিক মিলের জন্মস্থান মাদ্রাজ লুঙ্গির আড়ৎ এখানে। লুঙ্গিবাবাদের দেশও এখান থেকে দূরে নয়। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ এখানের নাম করা। হরিদ্বার অঞ্চলের মত এ পাশে সংস্কৃতের চর্চ্চাও আছে বলতে হবে। কিন্তু 'আংরেজী, মালুম নেই বলে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর, দক্ষিণ বলে, 'what we know, is English.

অকিঞ্চনের রথযাত্রা

শ্রীকালীপদ ঘটক

প্রতি বৎসর রথযাত্রায় ঠাকুরের লাগি অতিমাত্রায়
মনখানি যবে উন্মুখ হয়ে বাহিরের পানে চায়;
কানে এসে বাজে তাঁরই আহ্বান, ছুটে যেতে চায় আকুল পরাণ,
অন্তরীক্ষে জাগে ভগবান, ডাকে যেন—ওরে আয়।
টুকির সাজায়ে বাহিরাই পথে, জগবন্ধু যে আসিছেন রথে,
শ্রীপাট ভরিয়া কি লোকারণ্য, কি বিপুল সমারোহ!
তীর্থের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে, ভাসিছে ভক্ত প্রেমতরঙ্গে,—
হে দীনবন্ধু দীনার্তিশরণ, দূর কর মায়ামোহ।
ধূপদীপ নানা পূজা উপচার মন্দিরপথে চলে ভারে ভার;
দর্শনাকুল লক্ষ হৃদয়ে প্রেমের দেবতা জাগে।
বহু জনমের সুকৃতিফলে ঠাঁই যদি পাই চরণ কমলে,
দলে দলে গিয়ে লুটায় ভক্ত দেবতার পুরোভাগে।
কেহ ধ্যানস্থ কেহ যোড়পাণি, নেহারিছে কেহ চাঁদমুখখানি,
কেহ বলে প্রভু তুমিই সত্য, আর সব মিছে মায়া!
ছিন্ন কর হে ভববন্ধন, শোকতাপ জ্বালা কর হে মোচন,
হে দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম, দীনে দাও পদছায়া।

মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা,　　বাইরেই পড়ে রইল মনটা,
সারা মেলা জুড়ে হাজার পণ্যে ছেয়ে আছে রথতলা।
আমি অভাজন তারি এক পাশে　　সাজাই পসরা যদি ভিক্ষা বাসে,
রথের যাত্রী রথ দেখে ফিরে, আমি বেচি চাঁপাকলা।
রথ দেখা মোর হয় না ভাগ্যে,　　ভেবে নিই শেষে চুলোয় যাক গে,
কড়ি দুটো আগে সঞ্চয় করি ঠাকুর দেখা সে পরে।
পোড়া উদরের চাহিদা মিটায়ে　　রুক্ষ মাথায় তৈল ছিটায়ে
বাঁচিবার মত যৎকিঞ্চিৎ তুলিতেই হবে ঘরে।
ক্ষমা কর প্রভু এ দীন পামরে,　　কলা বেচি শুধু অন্নের তরে,
দৈন্য যে মোর ঘুচিল না আজো ক্রমেই চলেছে বেড়ে।
তুমি ত ঠাকুর সবই জান মোর,　　সাধু হতে হতে বনে গেছি চোর,
সংসার জ্বালা মোর কাছ থেকে তোমায় রেখেছে কেড়ে।
অন্তরে তবু তুমি দাও নাড়া,　　ঠেলা দিয়ে দিয়ে কর ঘরছাড়া,
পসরা মাথায় ছুটে আসি তাই চাঁদমুখ দরশনে।
মনে ভাবি শেষ করি ডালাখান,　　রথের কাছিতে দিয়ে যাব টান,
সবশেষে মোর ঠাকুর প্রণাম সারিব সঙ্গোপনে।
ভিড় জমে গেছে মেলার বাজারে,　　লোক ঠেসে আছে হাজারে হাজারে,
চলে বিকিকিনি মূল্য যাচাই দরভাও বাছাবাছি।
নগদ তঙ্কা কিসের শঙ্কা,　　ব্যাপারীর দল বাজায় ডঙ্কা,
প্রভুর কৃপায় মুনাফা এবার দ্বিগুণের কাছাকাছি।
পথে বেরুলেন রথের ঠাকুর,　　খোল করতাল বাজে ভরপুর,
কাছি ধরে টানে হাজার ভক্ত শোভাযাত্রীর দল।
ক'দিনের লাগি মন্দির ছাড়ি　　প্রভু চলেছেন গুণ্ডিচাবাড়ী
জনতার স্রোতে ভেসে চলে কে ও সোনার নীল কমল!
থিতাইয়া আসে কলগুঞ্জন,　　মেলা ভাঙিবার হ'ল কি লগন,
পসরার বোঝা শেষ করিয়াছি, থলিয়া উঠেছে ভরে।
সহসা কে ওই হাসে খিল্‌খিল্‌,　　রথ কোথা গেল কোথা সে মিছিল?
চোখের সুমুখে ছায়াবাজী সম নিমেষে গেল কি সরে?
এ কি ভোলামন, ওরে লোভাতুর,　　সুমুখ দিয়ে যে গেলেন ঠাকুর,
ক্ষণেকের তরে নয়ন ফেরাতে হ'ল নাকো অবসর।
দূর থেকে কেন মাথাটি নোয়ায়ে　　দিলি না বারেক চরণে ছোঁয়ায়ে,
আন্‌ চিন্তায় চিন্তামণিরে ভুলিলি স্বার্থপর।
একি রে দগ্ধ বিধিলিপি মোর,　　বেগার খাটিনু এ জীবন ভর,
কাচের নেশায় ভুলে আছি হায় নিকষিত কাঞ্চনে।
শয়নে স্বপনে ধ্যানে চিন্তায়　　আঁকড়িয়া ধরি শত বাসনায়,
রথ দেখিবার ভান করি আর কলা বেচি মনে মনে।
এ হীনতা প্রভু সহে না যে আর　　পারি না বহিতে পসরার ভার,
জীবন ভরিয়া করিলাম শুধু নিজেরেই অপমান।
উঞ্ছ মনের কাঙালপনায়　　ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো করি আপনায়,
দেবতার দেওয়া অমৃতপাত্রে কালকূট করি পান।
হে দীনবন্ধু নিখিল শরণ,　　অন্তরতর হে জীবনধন,
সঁপিলাম পদে সরমের ডালি জীবনের যত গ্লানি।
উদ্ধারো মোরে ধর দুটি হাত,　　বন্ধ কর এ ফাঁকির বেসাত,
কদলীর বোঝা নামায়ে বন্ধু, লও মোরে কাছে টানি।

দীপ্তি

দেবাচার্য্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ব্যারিষ্টার পরিমল চ্যাটার্জ্জীর ড্রয়িং-রুম। চ্যাটার্জ্জী ও মিসেস চ্যাটার্জ্জী। চ্যাটার্জ্জীর হাতে খবরের কাগজ, মুখে পাইপ। মিসেস উল আর কাঁটা দিয়ে বুনে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। মুখে হাসি হাসি ভাব। ক্লার্ক বিধুভূষণের প্রবেশ। কতকগুলো টাইপ করা চিঠি হাতে]

বিধুভূষণ। (মিঃ চ্যাটার্জ্জীর হাতে দিয়ে) স্যার, চিঠিগুলো সই করে দিন।

[মিঃ চ্যাটার্জ্জী চোখ বুলিয়ে একে একে সই করে ফেরত দেন]

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। দ্যাখো বিধু, এখনি একটা টেলিগ্রাম করে দাও মেদিনীপুরের ঠিকানায়। বুঝলে?

বিধুভূষণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কি বুঝলে? কি বিষয়ে টেলিগ্রাম, না শুনেই বুঝলে!

বিধুভূষণ। আমি ভেবেছি স্যার, আপনার বৈবাহিক অর্থাৎ আমাদের জামাইবাবুর বাবা শরৎবাবুকে—আমাদের খোকাবাবুর অন্নপ্রাশনে অর্থাৎ ফুডটেকিং সেরিমনিতে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। ফুড টেকিং সেরিমনি! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

বিধুভূষণ। আজ্ঞে না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (বিরক্ত ভাবে ভ্রূ কুঁচকিয়ে) আজ্ঞে না! ভগবান কেন যে এ রকম—

বিধুভূষণ। কিছু বলবেন স্যার? নোট নেব কি?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ, এই নোট নাও। [পকেট থেকে মানিব্যাগ, মানিব্যাগ থেকে নোট বের করেন]

বিধুভূষণ। (লজ্জিত ভাবে) আমি, Sir, ভেবেছিলাম আপনি বুঝি অন্য নোটের কথা বলছিলেন।

নোট নিয়ে কাজ করাই ত ভাল, আপনি বলেছেন। তাই নোট নিতে চেয়েছিলাম।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। উঃ, থামো, থামো। তোমার মত dull headed লোক এর আগে কোনদিনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তুমি আর একটি কথাও বাড়াবে না।

বিধুভূষণ। আমি Sir, কথা বাড়াচ্ছি না ত।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তবে আমিই কথা বাড়াচ্ছি—কেমন?

বিধুভূষণ! আজ্ঞা।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আবার আজ্ঞা—এর মধ্যে আজ্ঞার [কি] আছে? যাও—টেলিগ্রামটা করে এস। লিখো—Must com[e] 19th instant with family—Parimal শরতের না[মে] যাবে টেলিগ্রাম। আর দ্যাখ—একটা ফোন করে দাও। [এ]খুনি ডেকে আন সত্যজিৎকে। নিয়ে যাও। চাকর পাঠা[লে] আসবে না, যা খুশি একটা অজুহাত দেখাবে।

বিধুভূষণ। সব চেয়ে ভাল হয় Sir, দিদিমণি যদি এ[ক] লাইন লিখে দেন, তা হ'লে খুব ভাল হয়। আজকাল জামাইবা[বু] কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছেন Sir। সেদিন দেখা হ'[ল] বাসে, আমি নমস্কার করলাম, কথাও বললাম, উনি চেয়ে[ও] দেখলেন। কিন্তু, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। আশ্চর্য্য! আমাকে যে চেনেন সে ভাবও দেখালেন না একবারও।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কি বাজে বকছ। সত্যজিৎ কেন বা[সে] করে ঘুরবে। তার ত মোটর রয়েছে, সে নিজেই ড্রাই[ভ] করে যায়।

বিধুভূষণ। না স্যার, সেদিন উনি বাসেই যাচ্ছিলেন। আ[মি] স্বচক্ষে দেখেছি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। স্বচক্ষে দেখেছ? তোমার কি স্বচক্ষু আছে?

বিধুভূষণ। স্যার, কি বললেন বুঝতে পারলাম না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বুঝেও কাজ নেই। তুমি যাও, যা বললা[ম] তাই কর। urgent telegram—reply prepaid করে দিও।

বিধুভূষণ। আজ্ঞা, হ্যাঁ স্যার। না স্যার। আমি এখুনি যাচ্ছি। সব ঠিক ঠিক নোট করে নিয়ে আমি কাজ করে যাব[,] তাতে কোন ত্রুটিই পাবেন না, আমার ধারণা।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তোমার ধারণা! কি অনর্থক বকতে পার! যাও, যাও। আমার তোমার সঙ্গে বকবক করবার সময় নেই! আমার অনেক কাজ আছে।

বিধুভূষণ। না স্যার, আর আমি কথা বাড়াব না। আমি এখুনি যাচ্ছি। তবে স্যার, একটা কথা স্যার—মানে বলছিলাম একবার জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করে টেলিগ্রামটা পাঠানো কি উচি[ত] হবে না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কেন?

বিধুভূষণ। এমন ত হতে পারে, জামাইবাবুর বাবা—মা[নে]

দিদিমণির শ্বশুর অর্থাৎ শরৎবাবু এসে গিয়েছেন জামাইবাবুর কাছে, অর্থাৎ দিদিমনির বাড়ীতে।

সেক্ষেত্রে

শুধু শুধু পয়সা খরচ করার লাভ কি?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। হেভেনস সেভ মি ফ্রম সাচ এ ক্লার্ক। ডোণ্ট ইউ অর্থাৎ তুমি—তুমি [উঠে দাঁড়িয়ে, পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে]

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বিধুভূষণ, son of শশীকান্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি—ব্রিফ ষ্টেটমেণ্ট কি করে করতে হয় তা শিখবে না কোনদিনই! আশ্চর্য্য!

বিধুভূষণ। না স্যার, আপনার ব্রিফের গল্পটা আমি ঠিক ঠিক অর্থাৎ ডায়েরীর প্রথম পৃষ্ঠায় নোট করে রেখেছি।

ব্রিফ ষ্টেটমেণ্ট হবে কেমন? যেমন মেমসাহেবের গাউন—লেডিজ গারমেণ্ট—শর্ট এনাফ টু বি এ্যাট্রাকটিভ, অর্থাৎ একটু খাটো যদি না হয় তা হলে লোকে তাকিয়ে দেখবে কেন?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (অধীর ভাবে) গুড লর্ড।

[মিসেস চ্যাটার্জ্জী খিল খিল করে হেসে উঠেন]

বিধুভূষণ। (ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকিয়ে) এ্যাণ্ড, লং এনাফ টু কভার অল দি পয়েণ্টস। অর্থাৎ একটু লম্বা না হলে আবার সব পয়েণ্টস কভার করা যাবে কি করে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। থামো, থামো, আর ব্যাখ্যা শুনতে চাই না। তুমি যে খুব নোট নিতে শিখেছো, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। Idiot number one!

বিধুভূষণ। (মাথা চুলকিয়ে) স্যার, কি বললেন?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কিছু না। বলছি তুমি কি করে জানলে শরৎবাবু কলকাতায় আসতে পারেন?

বিধুভূষণ। আপনি যখন ডাকলেন আমাকে, তখন ত শরৎবাবু গেলেন মোটরে করে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। তাই ত মনে হ'ল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তাই ত মনে হল। তোমার বয়েস ত চল্লিশও হয় নি, এর মধ্যেই ছানি পড়ে গেল? তুমি কি শরৎকে এর আগে দেখ নি কোনদিন? পঁচিশ বার দেখেছো। তার বেশীও হতে পারে।

বিধুভূষণ। হ্যাঁ স্যার, তারও বেশী। আপনার কাছে চাকরী সেও ত শরৎবাবুর সুপারিশেরই জোরে। সেবার ত শরৎবাবু আমার মাকে তাই বললেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। মাকে তাই বললেন! তা হলে এর মধ্যেই শরতের চেহারা ভুলে যাও কি করে?

বিধুভূষণ। ভুলে যাব কেন স্যার। শরৎবাবু ত গাড়ীতে করে যাবার সময় একবার আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। তবে তবে আপনিই কি না বলেছেন—সব কিছু নোট করা উচিত। বিপক্ষে যা যা বলবার থাকে, সে সব কথা চিন্তা না করলে হাইকোর্ট চলে না। এক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে, শরৎবাবু যখন আমাকে দেখে হাসলেন, তখন তিনি শরৎবাবু হলেও হতে পারেন। কারণ চেহারায় মিলছে। ব্যবহারেও কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু আবার নাও হতে পারেন কারণ তিনি বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলেন অথচ নামলেন না। আপনি ত শুধু বৈবাহিক নন, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। হয়েছে—হয়েছে। আর জ্বালিও না। খুব নোট করতে শিখেছ। (প্রস্থানোদ্যত বিধুভূষণকে থামিয়ে) দাঁড়াও, যদি সত্যিই শরৎ কলকাতায় এসে থাকে, তা হলে আর মেদিনীপুরে টেলিগ্রাম পাঠিও না।

বিধুভূষণ। তা পাঠাব কেন স্যার? কারণ তা হলে যে বৃথা খরচ হবে।

[বিধুভূষণের প্রস্থান]

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। কিছু মনে কর না তুমি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। অত ভনিতা কেন, বলেই ফেল না কথাটা।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। না, বলছিলাম—নিতান্ত সংক্ষেপে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারা একটা গুণ সেটা ব্যারিষ্টারের *ক্লার্ক* থেকে ব্যারিষ্টারের পক্ষেও সমান প্রয়োজনীয় নয় কি?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আবার কেন বাড়াও।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। না, আর কথা বাড়াব না।

[মিনতির প্রবেশ। অশ্রুসজল চোখ দুটোয় গভীর বেদনার প্রলেপ। হাতে একটি কাগজের টুকরো কি যেন লেখা তাতে। মিনতির মুখ দেখলে মনে হয় যেন কোন মর্ম্মান্তিক মানসিক আঘাতে রাতারাতি তার বয়েস বেড়ে গিয়েছে]

মিনতি। বাবা, এই বিজ্ঞাপন কাগজে দিতে হবে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (অন্যমনস্কভাবে) বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন দিয়ে কি হবে। কুকুরটার জন্যে দেখছি তোর ভাল ঘুম হয় নি। চিন্তার কারণ নেই। জগা বলেছে আজকেই খোঁজ পাওয়া যাবে। বিলিতি কুকুর, যাবে আর কতদূর?

মিনতি। না বাবা, কুকুরের কথা বলছি না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তবে কিসের জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হবে? আমার আপিসে আর একটি কেরানীরও আবশ্যকতা নেই। দত্তদের আপিসেও নেই। অবশ্য এই বিধুভূষণকেও বদলিয়ে—কিন্তু, ও আবার তোমার শ্বশুরের gift—একে দিয়ে—একি! তোর মুখ অমন শুকনো কেন—চোখ ছলছল করছে, অসুখ করেছে নাকি?

মিনতি। না। তুমি এই বিজ্ঞাপনটা দেখ, কত টাকা লাগবে? যা লাগে তুমি দিয়ে দিও। বিধুবাবুকে দিয়ে না হয় তোমার আপিসের আর কোন ক্লার্ককে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। আজই যেন যায় বিজ্ঞাপনটা।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কিসের বিজ্ঞাপন ওটা? পড় ত। ক'লাইন?

মিনতি। তুমি পড়। আমার কথা বলতে কষ্ট লাগছে। বুকে বেদনা।

[মিসেস মেয়ের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকান]

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। কই দেখি, দে আমাকে। আমিই পড়ছি।

[মনে মনে পড়েন প্রথমটা, তার পর বিস্মিত ভাবে মুখ তুলে বলেন] একি !

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কি ব্যাপার ? এত রহস্য কিসের ? পড় না চেঁচিয়ে।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। (পাঠ করেন) 'দীপ্তি তুমি ফিরে এস। তোমার মিনতিদি। তার পর ঠিকানা লেখা।

মিঃ চ্যাটার্জী। মিনতি, তুইও কি শেষে পাগলামী শুরু করে দিলি।

মিসেস চ্যাটার্জী। ও কথা ত সত্য বলে থাকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। তাই ত আমাকে তুই বললি সেদিন। তোকেও কি এত দিনে দীপ্তিতে পেল। নাঃ (স্বামীর দিকে ফিরে) এ আমি ভাল বুঝছি না। তুমি একবার ত্রিলোচন পণ্ডিতকে খবর দাও। বিয়ের আগে পণ্ডিতমশায়ই কি যেন আপত্তি তুলেছিলেন। একটা স্বস্ত্যয়ন করাও। দ্যাখো ঠাকুর দেবতা একটু মানা দরকার। কর্ত্তারা মানতেন, তাই দেবতার আশীর্ব্বাদে তাঁরা এতটা করে গিয়েছেন। কোন অশান্তি কি পেয়েছিলেন কেউ তোমাদের পরিবারে ?

মিঃ চ্যাটার্জী। (চিন্তিত ভাবে) না, শুনি নি ত। কিন্তু স্বস্ত্যয়ন করবে কে ?

মিসেস চ্যাটার্জী। কেন পণ্ডিতমশায়। বস মিনতি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

[মিনতি আসন গ্রহণ করে। মায়ের পাশে। তার পর হঠাৎ ভেঙে পড়ে। মায়ের কোলে মুখ ঢাকে]

কি হয়েছে মিনু ? কাঁদছিস কেন ?

মিঃ চ্যাটার্জী। (উঠে এসে মিনতির পিঠে হাত রেখে) মিনু বল কি হয়েছে—বল কোন কথা লুকিয়ে রাখিস না আমাদের কাছে।

[মিনতি মায়ের কোল থেকে মুখ না তুলে ফুলে ফুলে কাঁদে। নীরব রোদনের দৃশ্য। মিঃ চ্যাটার্জী অভিভূত হয়ে পড়েন। স্বামিস্ত্রী দুজনে মেয়ের দু' পাশে বসে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটে]

মিনতি। (কতকটা সামলিয়ে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে) বাবা, আমি পাগলামী করছি না। এ ক্ষেত্রে এইটেই একটিমাত্র করণীয় কাজ আমার। কর্ত্তব্যও বলতে পার।

মিঃ চ্যাটার্জী। দীপ্তি হ'ল এ্যাবষ্ট্রাক্ট নাউন। মানে বিভা সত্যের আলোক অথবা সত্যজিতের পাগলামী। তার জন্তে পয়সা খরচা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াব আমি। তুই এই অনুরোধ কেন করছিস মিনু ? তোকে ত বরাবর জানি নর্ম্মাল, সেন্সিবল স্বাভাবিক সুস্থদেহ ও সুস্থমন তোর।

মিনতি। এখনও স্বাভাবিকই আছি। তবে অস্বাভাবিক অবস্থায় হঠাৎ কান্না এসে গেল। কিন্তু আর কাঁদব না আমি। দীপ্তি এ্যাবষ্ট্রাক্ট নাউন নয় বাবা, দীপ্তি হ'ল তোমার জামাইয়ের প্রথমা স্ত্রী।

মিঃ ও মিসেস (উভয়ে চমকিয়ে এবং প্রায় সমকালে, সমস্বরে) কি বললি !

মিনতি। (আর একবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছে, আত্মস্থ ভাবে) ঠিকই বলছি।

মিসেস চ্যাটার্জী। অসম্ভব ! এ হতে পারে না। কে সে ? কার মেয়ে ? কোথায় থাকে ?

মিনতি। কোথায় দীপ্তি থাকে কেউ তা জানে না। তোমার জামাইও জানে না। শুনেছি তার একটি ছেলে বা মেয়ে থাকবার কথা।

মিঃ চ্যাটার্জী। তোর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে দীপ্তিকে বিয়ে করেছিল সত্যজিৎ, আর সেই দীপ্তির ছেলে হয়েছিল। [মিঃ চ্যাটার্জীর মুখে হাসি ফুটে উঠে]

ওঃ এইবার বুঝলাম। জেরা করতে করতে এতদিনে চুল পাকিয়েছি এমনি ! ওঃ যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলি তুই ! গুড লর্ড !

মিসেস চ্যাটার্জী। (বিস্মিতভাবে ও অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে) সব মিথ্যে, না ?

মিঃ চ্যাটার্জী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব বানান ! সত্যজিৎ ঠাট্টা করেছে ওর সঙ্গে। ও রকম ঠাট্টা ত আমিও করতাম, মনে নেই। অবশ্য, under the influence of Johny walker.

মিসেস চ্যাটার্জী। কি যা তা বলছ মেয়ের সামনে।

মিঃ চ্যাটার্জী। (লজ্জিত ভাবে) ও, সরী।

মিনতি। না, না, তোমরা বুঝতে পারছ না।

মিঃ চ্যাটার্জী। খুব বুঝতে পারছি। আমিও ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যের চর্চ্চা করতাম। সাহিত্যিকদের পিছনে পিছনে ঘুরতাম। বন্ধুমহলে, আর স্ত্রীর কাছে—[আবার মিসেস ভ্রূভঙ্গ করেন ও মিঃ চ্যাটার্জী নিজেকে সামলে নেন]

হ্যাঁ, বলছিলাম—

মিনু, don't worry. আজকাল সত্য একটু টিপসী হতে আরম্ভ করেছে—তাই তোকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। স্বীকার করি—হ্যাঁ, স্বীকার করতে বাধ্য আমি—আধুনিক মহিলাদের নার্ভ ও সেন্সিবিলিটিজ এর দিক দিয়ে বিচার করলে Such humour is not good enough. But is it bad enough for a loving husband ?

মিনতি। না, বাবা, তুমি ঠিক এখনও সব কথা জান না। ও নিজ মুখে স্বীকার করেছে আমার কাছে আজ সকালে। তখন

মনের কোন প্রভাবই ছিল বলে মনে করা চলে না। তুমি বিজ্ঞাপনটা দিয়ে দাও। শেষকালে দীপ্তি, দীপ্তি করে ও কি পাগল হয়ে যাবে ? আমার যাই হোক না কেন, ও—ও ত শান্তি ফিরে পাক্।

মিঃ চ্যাটার্জী। কি বললি !! ও তোর কাছে Confess করেছে। এ্যাণ্ড হি ওয়াজ নট ড্রাঙ্ক ?? —হি ওয়াজ সিরিয়াস ?? কি বলেছে বল্। খুলে বল্। সব কথা আমার জানা দরকার। এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, কোথায় তুই ভুল বুঝেছিস। অথবা—অথবা—? O God !—This is preposterous ! I—I—simply I can't believe it !

তৃতীয় দৃশ্য

[সত্যজিতের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। শরৎবাবু, সত্যজিতের মা সর্ব্বাণী দেবী, মনোমোহনবাবু, সত্যজিতের ভাই বিশ্বজিৎ, ক্ষীরোদ, মনোতোষ ও প্রভাস। সকলেই উপবিষ্ট। সত্যজিৎ ছাড়া সকলেই হাসিমুখে কথাবার্ত্তা বলছেন। সত্যজিৎ কোর্টে যাবার ড্রেসে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে নেকটাই ঠিক করছে।]

শরৎবাবু। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হলে সত্যি ভারী আনন্দ হয়।

ক্ষীরোদ। সেটা কাকাবাবু সব ক্ষেত্রে হয় কি ?

শরতবাবু। কেন হবে না ?

ক্ষীরোদ। আমাদের সত্যজিতের দিকে চেয়ে দেখুন। আমরা এলাম এতদিন পরে। এ পর্য্যন্ত ও আমাদের সঙ্গে 'কেমন আছ' ছাড়া আর একটি কথাও বলে নি। বিশ্বজিৎ আর আপনারা না থাকলে ও হয় ত দরওয়ান দিয়ে বলে পাঠাতো—সাহেব ঘুমুচ্ছে।

[সত্যজিৎ ম্লানহাসি হাসে। কিন্তু, কোন কথা বলে না]

শরৎবাবু। সত্য, এ কিন্তু তোমার খুব অন্যায়। কোথায় তোমার বন্ধুদের দেখে—ও কিরে, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে—জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে বুঝি ?

সত্যজিৎ। না, আমি ঠিক আছি।

শরৎবাবু। (মনোমোহন বাবুর দিকে তাকিয়ে, তার পর ক্ষীরোদকে লক্ষ্য করে) এক সেকেণ্ড ক্ষীরোদ—হ্যাঁ, মনোমোহন বাবু, আপনি তা হলে কালকেই রেজিষ্ট্রী অফিসে খোঁজ নিন। সার্চ রিপোর্টটা দরকার। মামলার হারজিত কিন্তু—

মনোমোহনবাবু। রেজেষ্ট্রী অফিসে আমাদের হরেন আছে, রিপোর্ট সহজেই বের করা যাবে।

[শরৎবাবু চোখ ফেরান। চা, কেক ইত্যাদি নিয়ে বয়ের প্রবেশ]

শরৎবাবু। নাও, ক্ষীরোদ।

ক্ষীরোদ। আমাকে বলতে হবে না, কাকাবাবু। মনোতোষ আর প্রভাসকে বলুন। ওরা একটু যাকে বলে ভদ্রভাষায় লাজুকপ্রকৃতির।

[শরৎবাবু মনোতোষ ও প্রভাসকে অনুরোধ করেন। সত্যজিৎ কিছুই গ্রহণ করে না]

সত্যজিৎ। আমি এখন চা খাব না। আমার যা খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রভাস। (চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) তুমি তা হলে আজকে কোর্টে বের হচ্ছ।

মনোতোষ। বোধ হয় ছ'মাস পরে।

(সত্যজিত উত্তর দেয় না)

সর্ব্বাণী দেবী। ক্ষীরোদ, তুমি আছ কোথায় ? কি করছ ?

ক্ষীরোদ। বিশেষ কিছুই নয়। মাষ্টারী করি। থাকি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটা বোর্ডিংয়ে।

শরৎবাবু। মাষ্টারী কর ! তুমি ত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিলে ফিলজফিতে, জানতাম। তা কলেজে—

প্রভাস। ও কলেজেরই প্রফেসর।

শরৎবাবু। তবে যে বললে মাষ্টারী ?

মনোতোষ। সেটা ওর বিনয়।

ক্ষীরোদ। না বিনয় নয়। আজকাল কলেজের অধ্যাপকেরা যা মাইনে পায় তার চেয়ে ঢের বেশী মাইনে পায় একটি বড় স্কুলের হেডমাষ্টার। এত চেষ্টা করলাম, একটা স্কুলের হেডমাষ্টার হবার—সুযোগ পেলাম না। তাই মেনে নিয়েছি, ভগবান আমাকে মাষ্টার করেই সৃষ্টি করেছেন। হেড আমি কোন দিনই হতে পারব না। প্রিন্সিপাল হবার আশা ত আর এ জীবনে নেই।

সর্ব্বাণী দেবী। ক্ষীরোদ এখনও সেই ক্ষীরোদ আছে।

প্রভাস। কেন মাসীমা, আমরা কি বদলেছি ?

সর্ব্বাণী দেবী। না না, তোমরাই বা বদলাবে কেন ? তোমরা সবাই ঠিক আছ।

প্রভাস। বদলেছে শুধু আপনার ছেলে। মহাপণ্ডিত পি, এইচ, ডি—

শরৎবাবু। প্রভাস, তুমি আজকাল কি করছ ?

প্রভাস। পৈত্রিক ব্যবসাই দেখাশুনা করি।

ক্ষীরোদ। ওদের চা এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। মস্ত চালু কারবার।

শরৎবাবু। আজকে বুঝি ছুটি ?

প্রভাস। না, অফিসে যাই বেলা দুটায়। ক্ষীরোদের ছুটি আজ। গিয়েছিলাম ওর কাছেই, গিয়ে দেখি মনোতোষ। তার পর, চলে এলাম সটান সবাই মিলে। অনেক দিন সত্যজিতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই।

ক্ষীরোদ। আপনাদের সবাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

[বেগে মিঃ চ্যাটার্জীর প্রবেশ]

শরতবাবু। এস পরিমল, বোসো। এইমাত্র বিধু এসেছিল। কি ব্যাপার। আজ কোর্ট নেই ? তুমি যে মর্ণিংড্রেসেই বেরিয়েছ। আজকে যাবে না বুঝি কোর্টে ?

[মিঃ চ্যাটার্জী উত্তর দেন না]

তোমাকে যেন খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কি হ'ল ?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (আসন গ্রহণ না করে ক্ষীরোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে)—ক্ষীরোদ, তোমাকে অন্ততঃ জানতাম অনেষ্ট বলে। তুমি আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করবে এ আমি ভাবতেও পারি নি।

[সবাই হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে]

ক্ষীরোদ। একটু খুলে বলবেন কি ?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তোমার কাছে প্রশংসা শুনেই আমি এগিয়েছিলাম। শরতের ছেলে জেনেও আমি মনস্থির করতে পারি নি। আমার প্রথম থেকেই সংশয় ছিল।

ক্ষীরোদ। কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু মামাবাবু।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, থার্ড ফ্যাক্টর কিছু থাকতে পারে। এত জায়গা ছেড়ে বেলগেছের ভাঙা পুরনো বাড়ীতেই বা থাকবে কেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট হোষ্টেলও ত ছিল।

সর্ব্বাণী দেবী। বেয়াই, আপনি বসুন। যখন গুরুতর কিছু মনকে আচ্ছন্ন করে, তখন বসে স্থিরভাবে আলোচনা করাই ভাল নয় কি। আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে আমার ছেলে সত্যের বিরুদ্ধে আপনার কিছু অভিযোগ আছে।

শরৎবাবু। হ্যাঁ পরিমল, আমিও সেই অনুরোধ করি। ন্যায়-বিচার করতে গেলে—এমন কি অভিযোগও প্রপার ফর্ম্মে আনা উচিত। আই মিন, ইট শুড বি এ ডেফিনিট চার্জ্জ। আমরা এখানে সবাই অন্ততঃ তোমার কাছে এই অনুরোধ জানাব।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। না, আমি বসব না, বসতে আসি নি। আমি জানতে চাই সব কথা পরিষ্কার করে আজ। আমার মেয়ের জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখই এ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত।

[সত্যজিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে, কঠোরস্বরে]

দীপ্তি বলে একটি মেয়েকে তুমি চেন ?

[মনোমোহনবাবু উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সত্যজিৎ ছাড়া আর সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে]

সত্যজিৎ (স্থিরকণ্ঠে)। চিনি।

শরৎবাবু (আবার অনুরোধ করেন)। পরিমল, আমার অনুরোধ রাখ, বস।

[মিঃ চ্যাটার্জ্জী ভ্রূক্ষেপও করেন না]

মিঃ চ্যাটার্জ্জী (এক পা এগিয়ে হাত নেড়ে)। দীপ্তি তোমার কে ?

সত্যজিৎ (তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে)। আমার স্ত্রী।

[মনোমোহনবাবু উত্তেজনায় মঞ্চের একপাশে এসে দাঁড়ান। ক্ষীরোদ ছাড়া আর সবাই মুখ নীচু করে]

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আর মিনতি ?

সত্যজিৎ। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী।

[পুরো এক মিনিট কেটে যায়, কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অবশেষে—]

মিঃ চ্যাটার্জ্জী (ভগ্নস্বরে)। আমি তোমার শ্বশুর, তোমার বাবা-মাও রয়েছেন—তোমার ভাই, বন্ধুরা সবাই রয়েছে—সবার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা রহস্য করতেও তোমার লজ্জা করল না।

সত্যজিৎ। মিথ্যা ত বলি নি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। মিথ্যা নয় ত কি। দীপ্তি বলে কোন মেয়ে ছিল না, থাকতে পারে না। সত্যি যদি কেউ থাকত, তা হলে কি তোমাকে এতদিন সে ছেড়ে দিত। একটু চাপ দিলেই যেখানে খোর-পোষ আদায় করা যায়। না, আমি বিশ্বাস করি না একথা।—তবে বিবাহের বাইরে যদি কোন ইন্সিডেণ্ট ঘটে থাকে, সে অন্য ব্যাপার।

সত্যজিৎ। দীপ্তির একটি ছেলে বা মেয়ে থাকবার কথা। তারা বেঁচে আছে কিনা জানি না। আই হ্যাভ ফেল্‌ড ইন মাই ডিউটি টু দি মাদার এ্যাণ্ড দি চাইলড। আর সেইজন্যে আজ পর্য্যন্ত একদিনও আমি মনে শান্তি পাই নি।

আই এ্যাম্ প্রিপেয়ার্ড ফর এ ডাইভোর্স। মিনতি, লেট হার লীভ মি। আই শ্যাল টেক্ অল দি ক্যালামনি। নতুন আইনে যদি দেরী হয়, মুসলমান হয়ে সহজেই আমার সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে। আই উইল নট অপোজ।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। এই বাড়ী, টাকাকড়ি যা পেয়েছ, আর যা পেতে পার—সব ছেড়ে দিতে হবে সে খেয়াল আছে কি। দীপ্তি—তার পরিচয় কি ?

সত্যজিৎ। একজন ট্রাম-ড্রাইভারের মেয়ে। ওর বাবা অবশ্য এখন কোথায় চলে গিয়েছেন তা আমি জানি না। আমি খোঁজ করেছি, সন্ধান পাই নি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কুলোজ্জ্বল করেছ তোমার বাবার ও আমার। আর সেই কথা মুখে আনতেও তোমার একটুও বাধছে না।

সত্যজিৎ। বাধছিল, এতদিন বাধছিল, আমি সত্যকে গোপন করেছিলাম। আই হ্যাভ কজ্‌ড দি মোষ্ট গ্রিভাস হার্ট টু এ হেল্পলেস, ইনোসেণ্ট ক্রিচার। নো, শী উড নেভার কমপ্লেন্ এগেনষ্ট মি ইন দি কোর্ট—বীকজ—বীকজ—শী ইজ—

মিঃ চ্যাটার্জ্জী (বিদ্রূপের সুরে)। এ নোবল লেডী। শী উড লুজ হার সোস্যাল প্রেষ্টীজ।

সত্যজিৎ। শীয়র, শী ভয়াজ নোবল, নোবলার বীয়ণ্ড মাই ফণ্ডেষ্ট ড্রীম।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। এতই যদি তোমার শ্রদ্ধা, তা হলে মিনতির সর্ব্বনাশ করলে কেন ? ইউ অট টু হ্যাভ ষ্টেড উইথ দি নোবল লেডি।

সত্যজিৎ। মিনতি—মিনতি—এগেনষ্ট হার আই হ্যাভ সিনড নোলেস—

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। ডিসঅনারেবলি, মীনলি, ভিশাসলি। তুমি—তুমি—একটি ভণ্ড প্রতারক।

এ ক্রিমিন্তাল!—দি মোষ্ট ড্যাষ্টার্ডলি, দি মোষ্ট কাওয়ার্ডলি অফেন্স ছাট হাজ বীন এভার কমিটেড বাই এ মেম্বর অব দি লীগ্যাল প্রফেশন।

এ্যান এম-এ অব অক্সফোর্ড—পি-এইচ-ডি, ডক্টর—ও হেল—হেল্!!—ইউ আর মোর লোথসাম ছান দি ফাউলেষ্ট ষ্ট্রীট—ডগ! —মোর পয়জনাস ছান দি ডেডলিয়েষ্ট ভাইপার।

[উত্তেজনায় মিঃ চ্যাটার্জী কাঁপতে কাঁপতে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন, আর হাঁফাতে থাকেন]

শরৎবাবু। ব্লাডপ্রেশারের রুগী। শীগগির ধর। অজ্ঞান হয়ে যাবে এখুনি। ধর, ধর—।

[সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে শ্বশুরকে ধরতে যায়। চ্যাটার্জী অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে জামাই-এর হাত সরিয়ে দেন, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ান]

মিঃ চ্যাটার্জী। আমি চললাম। আই শ্যাল স্যু ইউ ইন দি কোর্ট। ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার দি চার্জ্জ এ্যাট দি বার অব পাবলিক অপিনিয়ন এ্যান্ড ওয়েল।

সমাজ জানুক, তার একটি উজ্জ্বল রত্ন বলে খ্যাতিমান সভ্য, অসভ্য নাগাদের চেয়েও মারডারাস, ভাইল ভ্যামপায়ারের চেয়েও নীরব সে ব্লাড-সাকার।

ইফ আই ক্যানট সেণ্ড ইউ টু জেল হোয়্যার ইউ অট টু বি লক্‌ড ফর দি রেষ্ট অব ইয়োর লাইফ—আই শ্যাল রীকভার মাই লাষ্ট ফারদিং ফ্রম ইউ, উইথ কমপাউণ্ড ইণ্টারেষ্ট!

তোমার বাবাকেও ছেড়ে দেব না, জেনো। ইট ওয়াজ—আই নাউ সী—ইটস এ ক্লীয়ার কেস অব দি মোষ্ট হীনাস টাইপ অব কনস্পিরেসি—

টু ম্যারি মাই ডটার ফর মানী!!

[বেগে প্রস্থান]

[সবাই চুপ করে বসে থাকে। কেবল সত্যজিৎ মুখ ফিরিয়ে সহসা পর্দ্দা ঠেলে ভিতরে চলে যায়।]

চতুর্থ দৃশ্য

[সত্যজিতের শয়নকক্ষ। সত্যজিত ও মিনতি]

সত্যজিৎ। মিনতি, তোমাকে মিনু নামে ডাকবার অধিকার হারিয়েছি। ঐ নামে ডেকে আর তোমার অমর্য্যাদা করব না। তোমার কাছে আমার এই শেষ মিনতি, তুমি এটা রাখ।

মিনতি। কি ওটা?

সত্যজিৎ। দলিল।

মিনতি। কিসের দলিল?

সত্যজিৎ। আমার অবশ্য তোমার বাবার মত অত টাকা নেই। কিন্তু এই দলিলে যে সম্পত্তির উল্লেখ আছে, তার বাজার-দর প্রায় দু'লাখ টাকা। আমার নিজের জন্যে আমি কিছুই রাখি নি। রাখা উচিত নয়। রাখলে হয় ত শেষ পর্য্যন্ত মদ খেয়েই উড়িয়ে দেব।

মিনতি। কি বলছ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সত্যজিৎ। বলছি—সম্পত্তি, টাকাকড়ি—যা আমি নিজে উপার্জ্জন করেছিলাম বিলেতে, ষ্টক-এক্সেচেঞ্জে, তা—

মিনতি। তা কি—?

সত্যজিৎ। তা—তা—আমি এই দলিলে তোমাকে—

মিনতি। দানপত্র করে দিয়েছ। তাতে এমন কি প্রভেদ হয়েছে। আমিও পৈত্রিক সম্পত্তি যা পেয়েছি না হয় তোমার নামে ট্রান্সফার করে দেব।

সত্যজিৎ। না না—ও টাকা—ও সম্পত্তি তুমি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও—দানপত্র করে লিখে দাও। দেরী কর না, কালকেই চল রেজিষ্ট্রি অফিসে—ওই সম্পত্তির লোভেই আমি—আমি—

মিনতি। আদর্শচ্যুত হয়েছ। বেশ তাই দেব লিখে। বেশী টাকা না থাকাই ভাল, আর্থিক অনটনই হয় ত তোমার পক্ষে কল্যাণকর। আমি রাজী—কালকেই চল রেজেষ্ট্রি অফিসে। কিন্তু কালকের মধ্যে কি করে দলিল তৈরী হবে? সম্পত্তির তপশীল তৈরী করা ত অত তাড়াতাড়ি হবে না। তা ছাড়া এটর্ণি দিয়ে করাতে হবে ত।

সত্যজিৎ। কাল নয়, পরশু হবে, পরশু না হয়, এক মাসে হবে। মোট কথা—ও সম্পত্তি আর তুমি রেখ না।

মিনতি। বেশ। তা হলে, তুমি কাল থেকে কোর্টে বের হচ্ছ।

[সত্যজিৎ মিনতির প্রশ্নের উত্তর দেয় না]

সত্যজিৎ। আর দেখ, এই নাও রসিদ আর ষ্টেটমেণ্ট।

মিনতি। এগুলি কি আবার?

সত্যজিৎ। তোমার বাবার কাছে যা যৌতুক পেয়েছিলাম বিয়েতে, সব টাকাই তোমার এ্যাকাউণ্টে আমি ট্রানস্ফার করিয়ে দিয়েছি। এই হ'ল ব্যাঙ্ক রিসিট—আর এই নোট বইয়ে সমস্ত হিসেব—মানে ব্যাঙ্ক ইণ্টারেষ্ট সমেত ষ্টেটমেণ্ট আছে। মদ খাই বটে, কিন্তু আমি তবুও হিসেবী। তোমার বাবার দেওয়া টাকা এক কপর্দ্দকও খোয়া যায় নি আমার হাতে। বরঞ্চ সুদ জমেছে।

মিনতি। (দলিল, রসিদ ও ষ্টেটমেণ্টের নোটবইটা হাতে নিয়ে)—তুমি তা হলে আমাকে ত্যাগ করবে ঠিক করেছ। কি আমার অপরাধ জানতে পারি কি?

সত্যজিৎ। অপরাধ! তোমার অপরাধ! কি বলছ মিনু—আই এ্যাম সরী—মিনতি, সত্যি বিশ্বাস কর আমাকে—আমি তোমাকে আমার আশ্চর্য্য মিনতি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। তোমাদের মাধব—তাঁর কাছে গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে থাকে এক সত্যজিৎ। সারা শহরের মধ্যে—তখন—তখন—

মিনতি। তখন—তখন কি?

সত্যজিৎ। তখন আমি বলি সেই Abstract Idea যাকে তোমরা জগদীশ্বর, ভগবান, গড বল—তাঁকে—তাঁকে—

মিনতি। বল, কথাটা শেষ কর।

সত্যজিৎ। আমি প্রশ্ন করি, অনুযোগ করি—আমার আশ্চর্য্য মিনতিকে কেন ব্যর্থ করলে হে ভগবান।

মিনতি। বটে, আমার জন্তেও তুমি তা হলে একটু ভাব দেখছি। এটা পাথেয় হয়েই থাক।

[মিনতি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকস্মিক ভাবে ঘর ছেড়ে চলে যায়]

[সত্যজিৎ উঠে গিয়ে মদের বোতল থেকে মদ ঢালে পেগে, তার পর কি ভেবে—পেগ সুদ্ধ মদ জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। মিনতির পুনঃ প্রবেশ। মিনতি দেখতে পায়।]

মিনতি। ফেলে দিলে পেগটা।

সত্যজিৎ। হাঁ, মিনতি। তুমি আজ আমাকে আর একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরবার প্রেরণা দিয়েছ। তাই তোমার সম্মান রাখবার জন্তে পেগভর্ত্তি মদ ফেলে দিলাম বাইরে। অন্ততঃ আজ রাত্রে মদ খাব না। পেগটাই ফেলে দিয়েছি।

দিস, আওয়ার লাষ্ট নাইট টুগেদার—লেট মি—লেট মি সেলিব্রেট ওভার এ গ্লাস অব ওয়াটার। দাও এক গেলাস জল দাও। তোমার হাতের ছোঁয়া ঠাণ্ডা জলই পান করব—তাতে কি নেশা হবে না?

মিনতি। তোমাকে আজ সত্যি আশ্চর্য্য মানুষ মনে হচ্ছে।

সত্যজিৎ। কেন জান, আমি কাল সকালেই মুক্তিলাভ করব।

মিনতি। তার অর্থ কি? আমাকে ত্যাগ করবে? আবার বলি [অশ্রুসজল চোখে] আমার অপরাধ—বল আমার কি অপরাধ তুমি পেলে, যার জন্তে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও।

সত্যজিৎ। তোমার মতন মেয়ে কখনই অপরাধ করতে পারে না। সে কথা তুমি নিজে জেনেও কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ। অপরাধী আমি, তুমিই শাস্তি দেবে আমাকে, আমি সে শাস্তি যতই কঠোর হউক না কেন, মাথা পেতে নেব।

Am·I not the foul cheat more poisonous than the deadliest viper?

তোমার বাবা রাগ করে আমাকে গাল দিয়েছিলেন। আমার কিন্তু একটুও রাগ হয় নি। আমি বেশ ভাল ভাবে নিজেকে বিচার করে দেখেছি।

মিনতি। কি দেখেছ?

সত্যজিৎ। দেখেছি, আমি শুধু বই পড়েছি অনেক, হয়ত বা এক সময় সত্যকে—কল্যাণ সুন্দরকে ভালবাসতাম—আমার প্রার্থনা ছিল—না না প্রার্থনা কোথায়—কাকে প্রার্থনা জানাব—দিস আওয়ার আর্থ ইজ এ স্নেক্ ইন দি মিষ্টেরিয়াস ইউনিভার্স।

না না না।

ভুল বলেছি—where is the mystery?

মিনতি। কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই এই সব ছাইভস্ম চিন্তা করেই ত।

সত্যজিৎ। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই বলবে ত। না না মাথা আমার ঠিক আছে। ট্রাবল মাথায় নয় মিনতি—আমার ট্রাবল হ'ল প্রবাল কীটের জ্বালা।

মিনতি। প্রবালকীটের জ্বালা! সে কি?

সত্যজিৎ। পড় নি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রবালকীটেরা গড়ে তুলেছে, তুলছে প্রবালপুরীর রাজকন্যার প্রাসাদ। সেখানে ধুলো নেই, কাদা নেই, শুধু লাল টকটকে প্রবাল। প্রবালের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় রাজকন্যা—তার কুচবরণ রঙ আর মেঘবরণ চুল—পূর্ণিমার আলোয় সাঁতার কাটে রাজকন্যা—ইন দি ক্রীক্‌স অব দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড। আর বাঁশী বাজায় পাহাড়ের উপরে বসে—সে এক সুপী তরুণ।

মিনতি। ও তুমি ভবিষ্যৎ মানব সমাজের রঙীন চিত্র আকছ কথা দিয়ে। তবে যে তুমি বল, রঙীন স্বপ্ন দেখে শুধু ভাববিলাসী কবিরা। তুমি ত কবি নও। অন্ততঃ তোমার মুখে ত তাই শুনি। বল তুমি কঠোর realist।

সত্যজিৎ। আমি রিয়ালিষ্ট বলেই ত এত জ্বালা। ইয়েটসের মত বলতে পারি না।

All would be well

Could we but give us wholly to the dreams…

শোনো, রিয়ালিষ্ট হিসাবেই সংক্ষেপে বলি এবার। আমি এককালে হয়ত ভাল ছিলাম, বা ছিলাম না তাও বলতে পারি না ঠিক। এটা সত্য, সোস্যাল এ্যাণ্ড মর‍্যাল কোডের বিরুদ্ধে আমি গিয়েছি, দীপ্তি ও তোমাকে—দুজনকে প্রতারিত করেছি—প্রতারণা করব ভেবেই করি নি—কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে নিজের পক্ষে একটা কথাও বলবার নেই আমার। আমার এই চরিত্রহীনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। না হলে—না হলে—মিনতি আমি বোধ হয় জীবনের সহজ সরল মাধুর্য্যকে অনুভব করতে পারব না আর কোন দিনই। আমার চোখে ঘুম আসে না মিনতি।

তোমার পাশে শুয়েই চোখ খুলে কতদিন যে রাত্রি কেটে গিয়েছে আমার—তাত তুমি জান না।

মিনতি। জানি বৈ কি, জানি। কিন্তু—

সত্যজিৎ। কিন্তু নেই। অপরাধী আমি—তুমি শাস্তি দাও, ঘৃণা কর আমাকে, কাল সকাল হলেই তুমি আর আমার স্পর্শও মাড়িও না।

মিনতি। তোমার উপর করুণা করবার অধিকারী তিনি, যিনি পাপপুণ্যের অন্তিম বিচারক। স্বয়ং ভগবান। আমি তোমার বিচারক নই। আমি তোমাকে কোনদিনই ঘৃণা করতে পারি না, পারব না।

সত্যজিৎ। চরিত্রহীন জেনেও না!

মিনতি। তুমি চরিত্রহীন নও। তোমার চরিত্র আছে বলেই তোমার মনে এত দ্বন্দ্ব। তোমার মত অপরাধ খোঁজ নিয়ে দেখ, কুলীন ব্রাহ্মণদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, অশিক্ষিত, শিক্ষিত সমাজে প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে আছে। যৌবনে পুরুষ ছেলে এক স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত নয়—এমন উদাহরণ খুব কমই আছে। কিন্তু সে গর্ব্ব করতে পারে মেয়েরা। তোমার মিনতির যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে সেও এই।

সত্যজিৎ। একনিষ্ঠতার গর্ব্ব! জানি ও মানি—কিন্তু তুমি এতদিন আমার সঙ্গে বিলেতে কাটিয়ে এলে—এম, এ পাশ করেছ—পৃথিবীর নানা দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধেও ত তোমার কিছু কিছু জ্ঞান হয়েছে। এই যে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে সতীত্বের উপর অযথা মর্য্যাদা আরোপ।

মিনতি। অযথা—! কি বলছ তুমি! স্ত্রীলোক যদি সতী না হয়, সভ্যতার শেষ হয়ে যাবে যে। যে ছেলে বড় হয়ে জানতে পারবে তার মা তার বাবার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী—সেই ছেলের কথাটা একবার চিন্তা করে দেখেছ।

সত্যজিৎ। আমাদের কোন ছেলে নেই। সে প্রশ্ন সুতরাং এখানে আসছে না। আর তুমি ডাইভোর্স নেবার পর পূর্ব্বের কুমারী অবস্থাই ফিরে পাবে!

মিনতি। ডাইভোর্স!

সত্যজিৎ। হ্যাঁ, আমি ডাইভোর্সের কথাই ভেবে দলিল করেছি। যে অন্যায় আমি তোমার প্রতি একদিন করেছি তা হয়ত কয়েক লাখটাকা দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না—তবু আমার সান্ত্বনা রইল—যে টাকার জন্যে আমি অন্যায় করেছিলাম, সেই টাকা, সেই কাঞ্চনের প্রতি আসক্তিকে অন্ততঃ জয় করতে পেরেছি। আমার নামটা কিছুটা সার্থক হোক। পূর্ণ সত্যের সন্ধান যদি নাও পাই জীবনে—তবু—তবু—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই জীবনের আবেষ্টন থেকে বিদায় নেব যে দিন—না না আবার ভুল করছি—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

মিনতি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর ফিলজফির ওই সব ছাইভস্ম বইগুলো পড়ো না। ক্ষীরোদবাবু তোমার সর্ব্বনাশ করলেন দেখছি!

সত্যজিৎ। না না ক্ষীরোদের দোষ দিও না। ওর তীব্র বিদ্রূপের মধ্যে সত্যের আভাস আছে। ওই একদিন আমাকে বলেছিল চিরন্তন নীতি বলে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই কিছু আছে। আছে, অন্ততঃ একটা চিরন্তন নীতির সন্ধান আমি পেয়েছি—বইয়ে পড়ে নয়, নিজের জীবনের চরম ব্যর্থতার মধ্যে। ভালবাসা ও প্রতারণা—এক সাথে চলতে পারে না। ভালবাসার মধুপান করব, আবার প্রতারণার সুযোগ নেব—তা কি হয়।

মিনতি। নিজ মুখেই যখন স্বীকার করে নিয়েছ, সত্যের মর্য্যাদা রেখেছ—তখন, তোমাকে ত আর প্রতারক বলা চলে না।

সত্যজিৎ। জানি মিনতি, তুমি আমাকে করুণা কর—ভাবছ, লোকটা বুঝি পাগলই হয়ে যাবে, ওকে আর কঠিন কথা বলা উচিত নয়—জানি জানি—আমি সব বুঝতে পারি—আমি। কিন্তু তোমাকে করুণা করি নি কোনদিন।

মিনতি। কোনদিনই তুমি আমাকে ভালবাস নি। তাই যদি বাসতে, তা হলে বিয়ের পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করে উঠতে না—দীপ্তি—দীপ্তি—তুমি ফিরে এস। কে সে দীপ্তি—দেখতে ইচ্ছে করে তাকে—। আমার চেয়েও শতগুণে সৌভাগ্যবতী সে। গরীবের মেয়ে, তুমিই বললে কালো—আশ্চর্য্য, কি তার গুণ—তুমিই জান—

তোমাকে এত গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে আছে—কোন মায়া-মন্ত্রে?—যদি জানতাম!

সত্যজিৎ। না না মিনতি, তুমি বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। এত শ্রদ্ধা কাউকেই বোধ হয় করি না আর। এখন ভাবতেও লজ্জা করে, যখন ছাত্র ছিলাম—তোমাকে ভাবতাম প্রগলভা—অতিরিক্ত পুরুষঘেষা। এখন বুঝতে পেরেছি—

মিনতি। কি বুঝতে পেরেছ?

সত্যজিৎ। সহজ সুস্থ নারীত্বের ঐশ্বর্য্য নিয়েই তুমি জন্মেছ। তাই অত্যন্ত সহজভাবে তুমি সমাজে নিজের মর্য্যাদা রাখতে পেরেছ, ভবিষ্যতেও রাখবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। একদিন তোমার বাবার কথায় ঠাট্টা করে বলেছিলাম তুমি মহামানবী। গান ও লেখাপড়া—একসঙ্গে সমানভাবে চালিয়ে যাও। এখন, জানি, তুমি মহামানবী নও, তুমি বক্তৃতা করে বেড়াও না, খবরে কাগজে নাম বের হবে রোজ এমন কোন কাজের প্রতি তোমার খুব বেশী আগ্রহ আছে বলে ত মনে হয় না—

মিনতি। হয়েছে, হয়েছে—আমি তোমার চোখে কি তা ত বললে না।

সত্যজিৎ। তুমি শোভনা।—গুণবতী।—প্রকৃত শিক্ষিতা বাংলার মেয়ে।—ভারতের নারী।—কিন্তু, তোমাকে এভাবে ব্যর্থ হতে আমি দেব না।

মিনতি, আমি তোমার যোগ্য নই।

তুমি স্যুট ফাইল কর। আমি সমস্ত ডিটেলস দেব, প্রমাণ ও সাক্ষী যোগাড় করে দেব। তোমাকে কলঙ্ক স্পর্শ করবে না। আমার কলঙ্কের কথা ত আজ সবাই জানে। নতুন করে আমার আর যশের হানি কি হবে!

মিনতি। না। বাইরের কেউই তোমার ও দীপ্তির কথা জানে না। জানে শুধু তোমার তিন বন্ধু। তারা তোমাকে ভালবাসে, তাঁদের দ্বারা এ কাহিনী প্রচার হবে না, আমি ভাল-ভাবেই জানি। বাবা অবশ্য খুবই চটে গিয়েছিলেন প্রথমটা। কিন্তু, এখন তাঁর রাগ পড়ে গিয়েছে। তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছেন। মাও তোমার দোষ বাড়িয়ে দেখতে চান না। আমিও ডাইভোর্সের জন্যে মোটেই লালায়িত নই। ডাইভোর্স। ডাইভোস নিয়ে আমার লাভ কি?
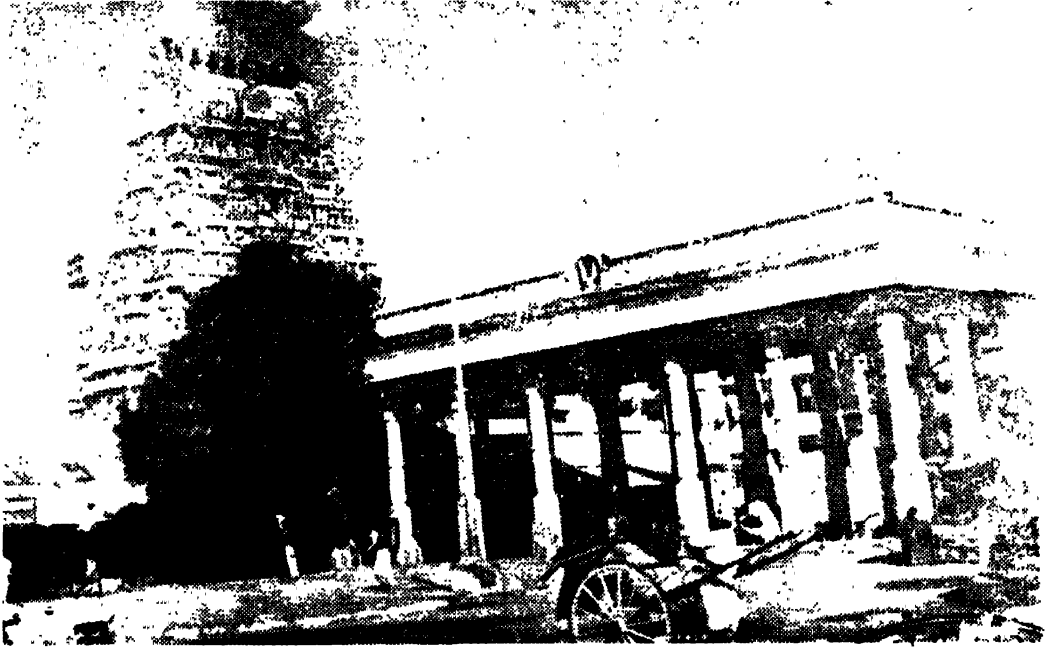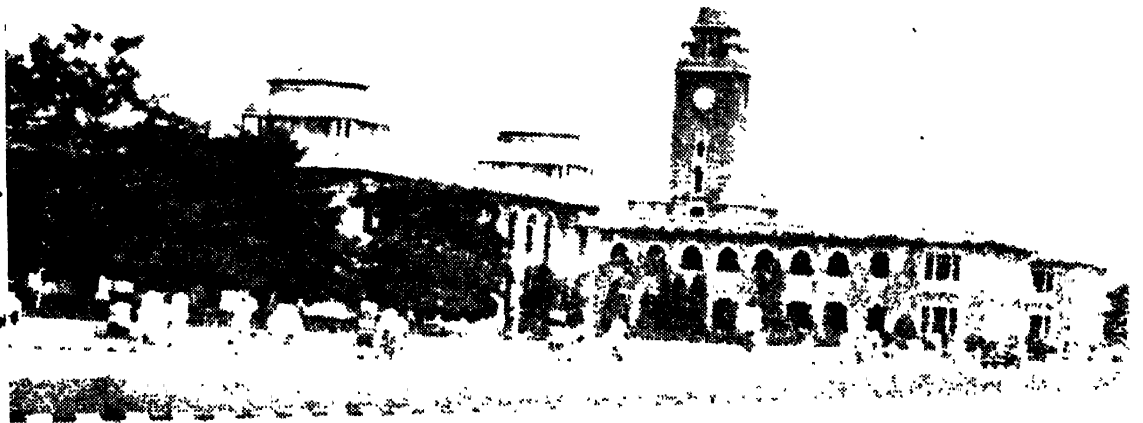
পার্থসারথী মন্দির

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়
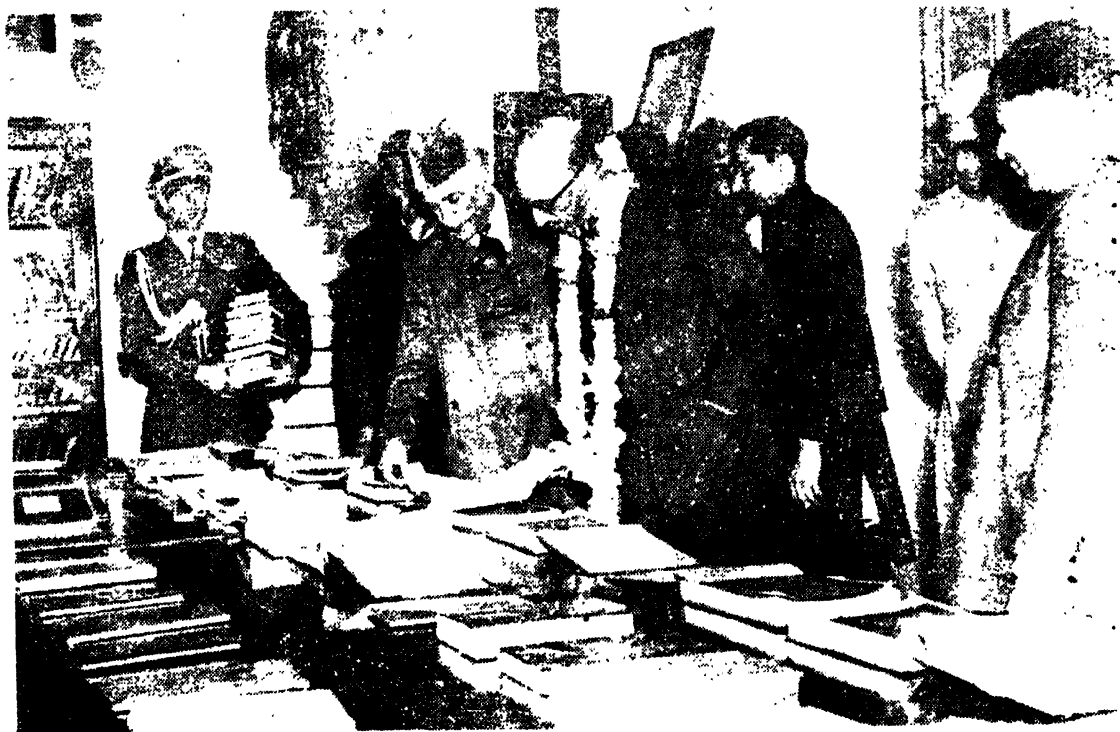
সত্যজিৎ। কেন, তুমি আবার নতুন করে জীবন সুরু করতে পার। তোমার মতন মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে অনেক সৎ পাত্রই এগিয়ে আসবে। বিশেষ করে, থ্যাঙ্কস টু দি গ্রেট গড অব চান্স—ইউ হ্যাভ গট নো বেবী। ছ-সাত বছরের ছেলে বা মেয়ে থাকলে অবশ্য তোমাকে আবার বিয়ে করবার পরামর্শ আমিও দিতাম না, কিন্তু নিষেধও করতাম না। দ্যাটস ইয়োর এফেয়ার।

মিনতি। দ্যাটস মাই এফেয়ার। আমাকে এই সব কথা বলতে তোমার একটুও আটকাচ্ছে না। কি নিষ্ঠুর, কি হৃদয়হীন তুমি। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর—। তাই আবার গর্ব্ব করে বলছ।

সত্যজিৎ। রাগ কর না মিনতি। আমি ভাল কথা—সত্য কথাই বলছি। দীপ্তিকে আর তোমাকে—একসঙ্গে ত পাবার উপায় নেই। ঐ যাকে বলে তামাক আর দুধ একই সঙ্গে খাওয়া চলে না—চললেও কোনটারই আসল রস পাওয়া যায় না। তাই নয় কি?

মিনতি। কি চাও, আরও পরিষ্কার করে বল। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তোমার হেঁয়ালী।

সত্যজিৎ। আমি বলছি,হ্যাঁ, স্বীকার করছি—আমি—আমি—

মিনতি। বল।

সত্যজিৎ। আমি দীপ্তিকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু, অর্থের লোভে তাকে—হ্যাঁ, প্রতারণাই বলতে হবে—প্রতারণা ছাড়া আর কি নামই বা দেওয়া যায়—প্রতারকের কাপুরুষতায় দীপ্তিকে ত্যাগ করে তোমাকে বিয়ে করি। সে জানতেও পারে নি। আশঙ্কাও করে নি।

দেবতা—দেবতার মতন ভক্তি করত আমাকে।—দেবতা—হাঃ হাঃ হাঃ—দেবতা, দেবতা God! Have I not behaved like a God—the olympian God?

মিনতি। কি বলছিলে বল।

সত্যজিৎ। বিবেকে বাধছিল—তখনও বিবেক ছিল—জান মিনতি, তখনও, তখনও আমার বিবেক ছিল—তাই তার শত ক্রটি বের করলাম। কেন—? না হলে, তাকে ছেড়ে যাই কি করে—? ভাবতে শুরু করলাম—নাঃ, একেবারে কালো মেয়ে—কোথায় এর সৌন্দর্য্য—রাস্তায় রাস্তায় দীপ্তির মত কত মেয়েই ত ঘুরে বেড়ায়!—ইশ, কি ভুলই করেছি—একটা সামান্য ট্রাম ড্রাইভারের মেয়ে, যার মা পাগল—যার বাপকে প্রায় buffoon বললেও দোষ হয় না—উপযুক্ত শাস্তি পাক!—এরাই চক্রান্ত করে আমাকে সেবা করেছে—কি করে যুবতী মেয়ের আকর্ষণে একটি যুবক ছাত্রের কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা আদায় করা যায়—সেই হীন বাসনার পরিচারিকাকেও ত্যাগ করলে কোন অন্যায়ই নেই আমার। কিন্তু নিজের মনকে কতক্ষণ ভোলান যায়। প্রতিমুহূর্ত্তেই চমকে উঠেছি। তাই বিয়ের দিন তোমার বন্ধুরাও সবাই তা লক্ষ্য করেছিল। বিস্মিত হয়েছিলে তুমিও, যখন I. A. S. চাকরী নিলাম না, বিয়ের কয়েক দিন পরেই চলে গেলাম বিলেতে। তোমার বাবা অবশ্য বাধা দেন নি। আর চাকরী করবার অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তবু তুমি অন্ততঃ বুঝতে পেরেছ, এই আকস্মিক ব্যগ্রতার কি কারণ। আজ সব মিথ্যে সলভড। প্রথমটা আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম—দীপ্তিই আমাকে প্রলুব্ধ করেছে—সে যদি আমার ঘরে না আসত, আমাকে টেনে না তুলত—তা হলে—তা হলে কি আমি কখনও তার মত কালো মেয়ে, গরীবের মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতাম—নিশ্চয় নয়—তা ছাড়া, সে কেন ঝাঁপ দেবে আগুনে, কুমারী মেয়ে হয়েও কেন—কেন সে—

মিনতি। (বিবর্ণ ভাবে) থাক্, আর আমাকে শোনাতে হবে না। তুমি কি জান না—কোন মেয়ে যদি একবার কোন পুরুষকে মনে প্রাণে ভালবাসে—তা হলে—

সত্যজিৎ। তা হলে কি?

মিনতি। তা হলে, সেই পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া কত কঠিন। প্রায় অসম্ভব বলাও চলে। ডায়ানা হারসেলফ কুড নট—উড নট রেসিষ্ট।

সত্যজিৎ। হয় ত বা তাই হবে। কিন্তু দীপ্তি কেন চিরকাল উজ্জ্বল থাকল না আমার মনে? আমার মনে কেন তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সংশয় এল? তাকে ম্লান নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল বলেই ত তোমাকে দেখলাম সুন্দরী।

মিনতি। আমাকেও সুন্দরী মনে হয়েছিল তোমার? কবে, কোন লগ্নে? এ সংবাদ এই প্রথম শুনলাম। তোমার মুখ দিয়ে ত কোন দিন আমার রূপের প্রশংসা শুনি নি—বরং বঙ্কিম চোয়াল বলে বিদ্রূপ করেছ, কবিতা লিখেছ।

সত্যজিৎ। ও ক্ষীরোদের কাণ্ড। তোমার গাল ত আর বঙ্কিম নয়। রঙ্গ করবার কোন হেতুই ছিল না। তবু তুমি নাকি আমার উপর ভীষণ চটে গিয়েছিলে।

মিনতি। যদি না চটতাম, তা হলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।

সত্যজিৎ। কেন?

মিনতি। কেন, তা হলে আজ এই রাত্রে পাশাপাশি বসবার কারণও ঘটত না, আর হিন্দু স্ত্রী হয়ে স্বামীর মুখ থেকে ডাইভোর্সের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভদ্র উপদেশ আমাকে শুনতে হ'ত না।

সত্যজিৎ। না না মিনতি, তোমাকে শুধু টাকার জন্যে বিয়ে করেছি, না-না—তাও সত্যি নয়—তোমাকেও বুঝি ভালবেসেছি কি জানি—তুমি আমার কথা শোনো, তুমি ফাইল কর স্যুট—এতে দু'জনেরই ভাল হবে:…

মিনতি। আমার আর ভাল দিয়ে কাজ নেই। ভগবান আমার ভাগ্যে যাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, সেই আমার আঁচলে বাঁধা থাকুক। যাও, শুয়ে পড়। আমি গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াই। শোনো, যদিও খবরটা শুনে তোমার মনে খুব আঘাত

লাগবে, তাই এতক্ষণ বলি নি। কিন্তু, আর না বলে পারছি না। বাবা লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন—দীপ্তির বাবাই স্বীকার করেছেন, কি দীপ্তির জ্যেঠামশায়ের কাছে খবর পাওয়া গিয়েছে—অত ডিটেলস আমি জানি না—তবে শুনলাম—

সত্যজিৎ। কি শুনেছ?

মিনতি। দীপ্তি বেঁচে নেই, তার ছেলেপিলেও হয় নি। গঙ্গায় পা হড়কে পড়ে যায় নাকি, ঠাকুরমার সঙ্গে চান করতে গিয়েছিল—নবদ্বীপ অঞ্চলে, কোথায় যেন—কোন ঘাটে। দীপ্তির মৃতদেহ অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। তা হলে সাত বছরে নিশ্চয়ই তার খোঁজ পাওয়া যেত।

সত্যজিৎ। না না, এ সত্যি নয়। কখনও সত্যি নয়। দীপ্তি—দীপ্তি—জান না মিনতি—সে কি অদ্ভুত বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে। সে কেন মরবে। না না—ভুল খবর—She can not die—she must not die. Were she dead, should I be still living?

মিনতি। আবার পাগলামী সুরু করলে। এতক্ষণ ত বেশ কথা বলছিলে।

সত্যজিৎ। না না, আমি পাগল হই নি, তোমরাই কেবল পাগল ভাব। জান, দীপ্তি কি বলেছিল।

মিনতি। কি বলেছিল?

সত্যজিৎ। বলেছিল, তুমি যেন শুদ্ধোধন—আর আর—আমি যেন—বলতে পারে নি লজ্জায় প্রথমটা—তার পর আমি যখন বললাম—বল বল তুমি যেন কি—?

কি বলেছিল জান, সে কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না—

কি আশ্চর্য্য, বাংলা দেশের একটি সাধারণ শ্যামলশ্রী মেয়ে বলল—আশ্চর্য্য তার চোখদুটো মেলে—আমি স্বপ্ন দেখি—

মিনতি। কি বলল বল, কি স্বপ্ন দেখে—?

সত্যজিৎ। দীপ্তি—দীপ্তি—সে যেন গৌতমের মা—তার ছেলের গর্ব্বে তার বুক ভরে গিয়েছে। সারা পৃথিবীজোড়া তার ছেলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তখনও তার চুল পাকে নি।

মিনতি। ওঃ, এই স্বপ্ন।

সত্যজিৎ। কেন, এ স্বপ্ন কি অদ্ভুত নয়?

মিনতি। আজকাল বাংলায় ইতিহাস পড়ে সব স্কুল কাইজালের মেয়েরা। গৌতম ছাড়া আর কার হতে চাইবে আমাদের দেশের মেয়েরা, বল। Gautama—is he not the greatest figure in Indian history?

সত্যজিৎ। তুমি—তুমি—নো, আই মিন, তুমিও কি—I am sorry,

Excuse me—তোমাকে সে প্রশ্ন করবার অধিকার আর নেই আমার।

মিনতি। কে বলেছে নেই। তুমি বললেই, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিনা। স্বয়ং ভগবতী এসেও যদি বলেন, ছেড়ে দে, আমি ছাড়ব না। বাঙ্গালীর হিন্দুঘরের মেয়ে—বিলেতে গেলেই কি মেম হয়ে যায়। তুমি ছাড়া গতি নেই তোমার মিনতির।

লক্ষ্মীটি, আমার মিনতি শোন—বার বার তোমায় বলছি, ভগবানকে স্বীকার কর আর নাই কর, তোমার মিনতিকে ছেড়ে যেও না। অস্বীকার কর না। সে আমি সইতে পারব না, কোনদিন।

সত্যজিৎ। দীপ্তি যদি বেঁচে থাকে, আর তার ছেলে বা মেয়ে থাকে?

মিনতি। বেশ ত, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করতে চাও; আমি কেন বাধা দেব?

সত্যজিৎ। দীপ্তির সঙ্গে, মানে সতীনের সঙ্গে আর সতীনের সন্তানকে চোখের সামনে দেখে, তুমি থাকতে পারবে?

মিনতি। দূর, তা কেন থাকব। আমার স্বামী আমার একান্তই আমার।—আর কাউকেই আমি কেন—কেউই মনে মনে সহ্য করবে না। মনে এক, বাইরে অন্য—তা আমা দ্বারা হবে না।—নিজের প্রকৃতি ও ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ততঃ সেটুকু জ্ঞান আমার হয়েছে।

সত্যজিৎ। তা হলে দীপ্তি ও তার ছেলের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করা যাবে কি করে?

মিনতি। বিজ্ঞাপন দিয়েছি। যদি দীপ্তি বেঁচে থাকে, নিশ্চয়ই আসবে। তোমার দেওয়া সমস্ত সম্পত্তি এখন আমার।—সবই দিয়ে দেব দীপ্তিকে আর ছেলে বা মেয়েকে। কিন্তু, প্রাণ থাকতে তোমাকে ছেড়ে দেব—সে কথা তুমি ভুলেও ভেব না। এ আমার মিনতি নয়—আমার ন্যায্য দাবি।—এ দাবি ছেড়ে মিনতির বেঁচে থেকে লাভ কি।

শোও, শুয়ে পড়, গান গাই। আজ কি সুন্দর পূর্ণিমার রাতটা দেখেছ। দেখ, চেয়ে দেখ—অনেকগুলো পাম গাছ, যেন নিস্তব্ধ প্রহরী ওরা—ওদের মাথার উপর দিয়ে চাঁদ যেন হাসছে। তুমি ত বিদ্যাপতির গান ভালবাস—বিদ্যাপতি থেকেই গাইছি।

[মিনতির গান]

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু—
পেখলু পিয়া-মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলু
দশ দিশ ভেল নিরানন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু,
অজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল—
টুটল সবহু সন্দেহা।

সেই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ-বাণ অব লাখ-বাণ হোউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা।
অব মঝু যবহু পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ— অল্প-ভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা।

[গান শেষে মিনতি বাইরে যায়। পরিচারিকা জানায়, টেলিফোন এসেছে দিদিমণির। সত্যজিৎ রেডিয়ো খুলে গান শোনে। গানের মাঝে পরিচারিকা হাঁফাতে হাঁফাতে সত্যজিৎকে জানায়—শীগগির আসুন, দিদিমণি সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে] ক্রমশঃ

প্রেমের জ্যামিতি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

অঞ্জলি আজ ভরব কিসে বুঝতে যে না পারি,
মন হরণের খেলার পালায় মনহারিয়ে হারি।
পেয়েও তোমায় হয় না পাওয়া,
স্বপ্ন প্রদোষ জ্যোৎস্না ছাওয়া,
সন্ধ্যা উদাস গন্ধে ভারী অভিমানের সারি ;
মনহরণের খেলার পালায় মন হারিয়ে হারি।
পরদেশী কোন দূর আকাশে ভাবনা তোমার পাল,
ফেনার মতন ফেলে চলে আমার সকল কাল।
উছল তুমি ফাগুন রসে,
রঙের সুরে শাসন খসে,
উতল হাওয়ায় আথাল পাথাল মাতাল ঢেউয়ের তাল ;
ফেনার মতন ফেলে চলে আমার সকল কাল।
কোন পুরে কোন রাজার কুমার বজ্রমণির হারে
বরণ করে নেবে তোমায় বিস্মরণের পারে।
ভেলা তোমার ভিড়লে ঘাটে
সোনার সানাই বাজাবে নাটে
কনে-দেখা-আলোর তানে নির্জ্জনতার তারে,
মেলবে পেখম মত্ত ময়ূর বিস্মরণের পারে।
এমন ধন তো নাই গো আমার, সঙ্কোচে তাই মরি,
শুধু আমার বুক উঠেছে ফুলের মতন ভরি।
অলস বেলার বিজন ছায়ে
নূপুর বাজে পাতার পায়ে
চোখের জলে তলিয়ে গেল ব্যর্থ বোঝার তরী,
শুধু আমার বুক উঠেছে ফুলের মতন ভরি।
তূণ যে তোমার গুণ জানে গো, শাণিত সম্মোহন,
তাই আগুনের ঝঙ্কারে দেয় নিঃসহ যৌবন।
দগ্ধ সুখের ছিদ্রভরে,
সুরের ঝোরা অঝোর ঝরে,
গৈরিকে দেয় লিখে তখন প্রেম যে নিঠুর পণ,
তোমার কাছে মন বিকিয়েই পেলেম ত্রিভুবন।
তুমি যখন ফেরাও মুখে, সবাই করে আড়ি,
নিয়েছ মোর কথার কুঁড়ি, ব্যথার ব্যথা কাড়ি,
রেখা যখন ঝাঁকিয়ে আঁকি
ভরে না ফাঁক, মুখর ফাঁকি,
পাথার পথে পাথর-ডুবি পায় না পারে পাড়ি,
তুমি যখন ফেরাও মুখে, সবাই করে আড়ি।
ভুলের ফসল সফল হ'ল ভালবাসার ক্ষেতে,
গিরি আলস্য পলাশ লাস্যে উল্লসিত মেতে।
হায়রে হায়, ও পোড়ামন,
মায়ামৃগের ছায়া কানন,
কে জানে কোথা মিটবে তৃষা এ বিষপথে যেতে ;
চরম দামে দেবে তো দাও অপরিচিতে পেতে।
ধরিল শুধু বুলুয়া হাতে, পোহালো রাত প্রাণে,
নিমেষে খুসী হারানো দিশি চিরকালের গানে।

হিন্দী সাহিত্যের কেশব ও বিহারী

শ্রীঅমল সরকার

রীতি বা শৃঙ্গার কাল

পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবধারা যায় বদলিয়ে—ভক্তিকালের পরবর্ত্তী যুগে হিন্দী সাহিত্যের এক নূতন অবস্থার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মোগল বাদশাহদের তখন ভারতীয় জনগণের উপর একচ্ছত্র অধিকার থাকলেও তাঁরা তাঁদের আমীর-ওমরাহদের হাতে ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি সব কিছুরই ভেতর মন্ত্রী কুশলীরা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের শাসননীতি তাঁদেরই ইঙ্গিতে চলতে থাকে। ঠিক এই সময়ে ধর্ম্মভীরু মুসলমান নায়কদের রাজত্বকালে ধন-ধান্যে-পূর্ণ ঐশ্বর্য্যেভরা ভারতবর্ষের উপর বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়ল। হিন্দুস্থানকে যেমন ভাবে হ'ক করায়ত্ত করতে হবে এই পণ করে এই সব বিদেশী শত্রুরা বারবার এদেশের উপর হামলা সুরু করে দিল, বিলাসী মোগল বাদশাহরা নাস্তানাবুদ হয়ে ভয়ে আহত মৃগশিশুর মত প্রাসাদের ভেতর আশ্রয় নিল, সুরাপান ও সাকীর সঙ্গলাভে ভীতত্রস্ত বাদশাহরা ক্ষণেকের জন্য জীবনকে উপভোগ করে নিতে মনস্থ করলেন। 'জীবন দু'দিন বই ত নয়', আনন্দ, উল্লাস ও বিলাসের মাঝে সুন্দরীকে পাশে নিয়ে সুরার নেশায় পার্থিব জগতের দুঃখ, শোক ও ভয়কে জয় করবার মন্ত্র তাঁরা গ্রহণ করলেন। আরও একটি কারণে সুরা ও নারী তাদের জীবনের পাথেয় হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে আহমদশাহ আবদালী ও নাদিরশাহের পৈশাচিক আক্রমণে মুসলমান ও হিন্দু সেনাপতি ও সৈন্যদের বিপর্য্যস্ত হতে হয়—তারা এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, এই সব নির্ম্মম নিষ্ঠুর অভিযানকারীদের অসীম শক্তিকে বাধা দিতে গেলে তাদেরও সমান শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, সর্ব্বদা তাদের সাবধান থাকতে হবে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে জীবন আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা মরিয়া হয়ে বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে যুঝবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল। কিন্তু জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলবার শক্তি তাদের কে দেবে—কোথায় পাবে তারা সাহস ও উৎসাহ। বাদশাহ মৃতপ্রায়, আদর্শ নেতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সবাই একজোটে এগিয়ে এল ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে—দিনের পর দিন দুই দলে অবিরাম যুদ্ধ চলতে লাগল—যেটুকু বিরতি পায় সৈন্যসামন্তেরা সুরার নেশায় ও সুন্দরীর নূপুরনিক্কণের মাঝখানে নিজেদের বিলিয়ে দিল। এমনি করে বাস্তবের কঠিন কশাঘাতে ধার্ম্মিক অনুপ্রেরণা, ভক্তি-ভাবনা সব কোথায় যেন মিশে যেতে লাগল। সাধারণ নাগরিকগণও ভক্তিকে ভুলে গিয়ে ভগবানকে তুচ্ছ করে ধর্ম্মকে অস্বীকার করে শাসক-প্রভুদের মত বাস্তবের আনন্দ ও উল্লাসকে জীবনের উপাদান বলে স্বীকার করে নিল। তৎকালীন ভারতীয় মনের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের চিন্তাধারাও আমূল পরিবর্ত্তিত হ'ল।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সব মহাত্মারা হিন্দী সাহিত্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি বাড়িয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন মানব-জাতির কল্যাণ-সাধনে। তাঁরা নির্ভীকভাবে তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্য-যশের প্রতি তাঁদের কোন মোহ ছিল না। কবীরদাস ছিলেন এক সামান্য তন্তুবায়, সুর ও তুলসী ত্যাগী বৈরাগী—কাজেই তাঁরা অনায়াসেই 'ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে' অর্থাৎ ভগবদ্-প্রেমের ভেতর দিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে অমর বাণী পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে কারও কারও ব্যক্তিত্ব এত উঁচু ও মহান ছিল যে, তাঁরা বাদশাহের ভ্রূভঙ্গী উপেক্ষা করে আপন কর্ত্তব্যপথে এগিয়ে চলেছিলেন। তাঁরা আপন স্বার্থের জন্য কিছুই চান নি, পরার্থে কায়-মন সব কিছু সঁপে দিয়েছিলেন। ভক্তিকালের মনীষীগণের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ বোধ হয় ভারতের ইতিহাসে বিরল। ত্যাগের এই অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রসখান 'কোটিন্ বে কলধৌত কে ধাম করীল কে কুঞ্জন উপর বারৌঁ' কে নিজের জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের এই চরম আদর্শ বেশী দিন টিকে থাকতে পারল না। ভক্তিকালের এই মহান চিন্তাধারা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বানচাল হয়ে গেল। চারিদিকে অশান্তির পরিবেশে হৃদয়ের ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়, বারাঙ্গনার নৃত্যে দেবতাকে খুসী করবার চেষ্টা চলতে লাগল। তুলসীদাসের শীল, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র 'রসিয়া' নাম ছাড়া আর কোন সমাদর পেলেন না। শ্রীরামের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। কৃষ্ণ-ভগবান তাঁর দেবত্ব হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর এক রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ-প্রেমের বিকৃত বর্ণনা এ যুগের বিকৃত মানব-মনের পরিচয় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও কলা মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে জনগণের বিলাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। নারী ও দৈহিক প্রেম কাব্যের মুখ্য বস্তু হিসাবে স্থান পেল। এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে, নারী রীতিকাব্যে কেন প্রধান স্থান অধিকার করল! এর প্রধান কারণ হ'ল এই যে, হাব-ভাব, চাল-চলনে পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে নারী অতি সহজেই মানবমনকে আকৃষ্ট করতে পারে। নারীদেহের বিশেষ অংগ বর্ণনা ও দর্শনে তাই এ যুগের কবিরা আত্মনিয়োগ করলেন। নারীর নারীত্বের এত বড় অবমাননা বোধ হয় আর কখনও হয় নি। নারীর দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনার জন্য এ যুগের কবিদের ছন্দ ও অলঙ্কারকে বেশী প্রাধান্য দিতে হ'ল।

সাহিত্যকে এক নূতন নিয়মে বা রীতিতে বেঁধে ফেলা হ'ল, ভাবের প্রাধান্য কমে গিয়ে কলা বা বাহ্যিক আড়ম্বরে সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হ'ল।

এ যুগকে সাধারণতঃ রীতিকাল বলে অভিহিত করা হয়, কিন্তু এখানে সবাই একমত নন। আচার্য্য রামচন্দ্র শুক্ল হিন্দী সাহিত্যের এই যুগকে 'রীতিকাল' আখ্যা দিয়েছেন এবং ডাঃ নগেন্দ্র ও ডাঃ শ্যামসুন্দর দাস শুক্লজীর মত পোষণ করেন। কিন্তু পণ্ডিত বিশ্বনাথ মিশ্র প্রভৃতি বিদ্বানদের মতে এই যুগকে 'শৃঙ্গারকাল' বলে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। তাঁদের মতে একালে শৃঙ্গার-সম্বন্ধীয় কবিতা অর্থাৎ নর-নারীর দৈহিক প্রেম ও নারীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনাই কবিতার প্রধান লক্ষ্য। রীতি শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ এবং যার ভেতর অলঙ্কার বা কাব্য-কলার প্রাধান্য থাকে তাকেই রীতিশাস্ত্র বলে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলছি সে যুগে অলঙ্কার, ছন্দ বা সাহিত্যের কলার প্রতি যে কবিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তা নয়, মানবীয় প্রেম ও নারীই ছিল তাঁদের কাব্যের প্রধান উপাদান, কাজেই এ যুগের কাব্যকে রীতিকাব্য না বলে শৃঙ্গার-কাব্য বলাই বোধ হয় অধিক সমীচীন হবে।

সে যাই হ'ক, রীতি বা শৃঙ্গারকালের কাব্যের শত দোষ-ত্রুটি থাকলেও এই যুগে হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে সেরা প্রেম-সম্বন্ধীয় কবিতার (love poems) রচনা হয়েছিল এবং এই দিক থেকে রীতিকালীন কবিদের দানকে কেউ কোনদিন অস্বীকার করবে না। ইংরেজী সাহিত্যের বায়রণ, শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, রসেটির প্রেম-সম্বন্ধীয় কবিতা যেমন চিরকাল মানবমনের খোরাক জোগাবে, তেমনি হিন্দী সাহিত্যের বিহারী, মতিরাম, দেবের রচনা থেকে আমরা চিরকাল পার্থিব প্রেমের আনন্দ উপভোগ করতে পারব। হয়ত ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রেম ও নারীকে রীতি-কালীন কবিদের ন্যায় দেখতে চায় না বা দেখে না, তাই তাঁদের রচনার এত বেশী সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু পার্থিব জগতে প্রেম ও নারীর এই রূপই বোধ হয় যথার্থ রূপ। কে জানে যদি পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সব কবিরা তাঁদের রচনা নিয়ে ছুটে যেতেন বা প্রতীচ্যের আবহাওয়ায় বসে শৃংগারী কাব্যের রচনা করতেন তা হলে তাঁদের অনাদর হ'ত না, সমাদর হ'ত! কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে তাঁদের রচনার তীব্র সমালোচনা হ'ল, তাঁদের মনোভাবের হীনতার দিকে বারবার ইঙ্গিত করা হ'ল এবং শেষে এই যুগকে হিন্দী সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ বলে অভিহিত করা হ'ল। তবুও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এইরকম ভাব যে কবিদের রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নি তা নয়, কারণ বিদ্যাপতি, সুরদাসের রচনায় প্রেমের এই বাস্তব রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। রীতি-কালীন কবিদের অশ্লীলতা-বর্ণনার জন্য হীন প্রতিপন্ন করবার যে চেষ্টা করা হয়েছে, সে অশ্লীলতা থেকে সুরদাসের মত নির্লিপ্ত কবিও মুক্ত নন।

ঝুঠে মোহি লগাবত খারী।
খেলত তেঁ মোহি বোলি লয়ো হৈ
দোনোঁ ভুজ ভরি দীনী অংকবারী।
অপনে কুচ মেরে কর ধারতি আপহুঁ চোলী কারী।

বিদ্যাপতি রাধার প্রেম বর্ণনা করতে গিয়ে কখনও কখনও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে গেছেন। একজন সমালোচক বলেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্ত সমস্ত কবিদের পার্থিব প্রেমের দিকে বেশী লক্ষ্য ছিল। ডাঃ রামকুমার বর্ম্মা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "রাধা প্রেম করতী হৈ ইসলিয়ে কি কৃষ্ণ সুন্দর হৈঁ ঔর সুন্দরতা সে প্রেম হোনা স্বাভাবিক হৈ। পর ঐসে প্রেম মেঁ এক দোষ আ গয়া হৈ ঔর বহ যহ কি ইস প্রেম মেঁ সদাচার কি মাত্রা কম হৈ। বিদ্যাপতি কী রাধা সদাচার করনা জানতী হী নহীঁ।" শুধু চুম্বন-আলিংগন নয়, রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগের বর্ণনা করতেও বিদ্যাপতি দ্বিধা করেন নি। 'অধর মগইতে অওধকর মাথ, সহএ ন পার পয়োধর হাথ।' রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আখ্যান শোনাতে গিয়ে হয়ত সুরদাস, বিদ্যাপতি আদি ভক্তিকালীন কবিদের শৃংগারের আশ্রয় নিতে হয়েছিল—কিন্তু শৃংগার বা নর-নারীর দৈহিক প্রেমের কথা বেশীদিন পবিত্র বা অনৈসর্গিক থাকতে পারে না, তাই পরবর্ত্তী কালে শৃংগার রসের বিষময় ফল ফলতে লাগল। কিন্তু আসলে এর বীজ ভক্তিকালেই কৃষ্ণ-কবিরা বপন করেছিলেন। হয়ত সুরদাস আদি কৃষ্ণভক্তেরা ভগবদ্-প্রেমের আবেশে এই সব পদ লিখে ফেলেছিলেন কিন্তু সাধারণ জনসমাজের ওপর যে তাদের কিরকম প্রভাব পড়বে, সে কথা বোধ হয় তাঁরা কোনদিন ভেবে দেখেন নি।

নীবী ললিত গহী যদুরাই
জব হি সরোজ ধর্যো শ্রীফল পর তব যশুমতি গই আঈ।

এই পদটি পড়ে শ্রীরাধাকে এক অসংযমী নারী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, যৌবনের উন্মাদনায় সে আপন দেহ কৃষ্ণকে উৎসর্গ করবার জন্য ব্যস্ত! এ ছাড়া কৃষ্ণের বাঁশীর তান শুনে পতি-পুত্র, ঘর-দোর, শ্বশুর-ননদকে ছেড়ে লজ্জার মাথা খেয়ে পাগলের মত গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণ-মিলনে বেরিয়ে যাওয়াকে কোন্ সমাজ বরদাস্ত করবে? গোপিনীদের নিয়ে খেলা করাই যেন ভক্তি-কালের কৃষ্ণের কাজ—এ যুগের কবিরা গোকুলের কৃষ্ণকে নিয়েই মাতামাতি করে চললেন কিন্তু দ্বারকার কৃষ্ণের রূপ একবারও তাঁদের চোখে ধরা দিল না, বিশ্ববিশ্রুত মহাভারত-যুদ্ধ-রচয়িতা পার্থ-সারথির কথা তাঁদের একবারও মনে পড়ল না। রাজনীতিজ্ঞ, প্রভাবশালী, অসীম ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই কৃষ্ণের কথা তাঁরা কিছুমাত্র যদি উল্লেখ করতেন তা হলে বোধ হয় পরবর্ত্তী অর্থাৎ রীতিকালে কৃষ্ণ-ভগবানকে কবিদের হাতে তাঁর দেবত্ব এমনি করে হারাতে হ'ত না। এইদিক থেকে দেখতে গেলে রামচন্দ্র তাঁর আপন-মর্য্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রেম ও শ্রদ্ধা রাম-ভক্তির মধ্যে মিলে গিয়ে এক নূতন ঐশ্বরীয় শক্তি জাগিয়ে দেয়।

বোধ হয় গোস্বামী তুলসীদাসের জন্ত শ্রীরামের পক্ষে তাঁর দেবত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। তুলসী রামচন্দ্রের লোকরক্ষক রূপ ও বিরাট ব্যক্তিত্বকে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং পরবর্তী কালের জনসমাজ রামচন্দ্রের এই বিরাট রূপকেই শুধু দেখতে ও জানতে পেরেছিল। তাঁকে সেই স্থান থেকে বিচ্যুত করবার সাহস কারুর হয় নি। ঠিক এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে, রীতি বা শৃংগার কালে রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে জনসমাজের কাছে কৃষ্ণই বেশী প্রিয় হয়ে পড়েছিল। ভক্তিযুগে শৃংগার-কবিতার মাধ্যমে কবিরা আপনাপন ইষ্টদেবের পূজা করতেন কিন্তু এ যুগে মানবীয় প্রেমেরই নায়ক-নায়িকা রূপে দেখা দিল রাধা ও কৃষ্ণ; ভক্তি শুধু তাঁদের বিলাসময় ভাবনায় শ্রী বজায় রাখার সাধন হয়ে দাঁড়াল।

১৭৫০ সম্বতের অথবা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে রীতিকালের আরম্ভ বলে ধরা হয়। কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পূর্ব্ববর্তী হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে রীতিশাস্ত্রের পর্যাপ্ত প্রচলন পাওয়া যায়—কালিদাস ও শ্রীহর্ষের সংস্কৃত রচনার মধ্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্ত পাওয়া যায় যদিও এই শৃঙ্গারিক চিন্তাধারাতে দার্শনিক মনোভাবের কিছুমাত্র অভাব নেই। সংস্কৃত ভাষার সংসজ এবং অমরুক শতক ও আর্য্যা-সপ্তশতী, 'দুর্গা-সপ্তশতী', 'চণ্ডী-শতক', 'বক্রোক্তি' পঞ্চাশিকা', 'কৃষ্ণ-লীলামৃত' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে যৌন-সম্বন্ধীয় রচনা পাওয়া যায়। পূর্ব্বভারতে জয়দেব ও বিদ্যাপতি কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে শ্লীলতাকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং এই দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা শৃঙ্গার-বোধ অথবা নর-নারীর দৈহিক সম্বন্ধকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। যদিও কেশবদাসকে রীতিকাব্যের প্রবর্ত্তক বলে ধরা হয় কিন্তু তাঁর পূর্ব্বে কয়েকখানি ভক্তিমূলক কাব্য বা গ্রন্থ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেকের রচনার ভিতর শৃঙ্গারের (নায়িকা-ভেদ ও নখশিখ-বর্ণন) প্রাধান্ত দেখা যায়। ১৭৯৮ সম্বতে কৃপারামের যে হিত-তরঙ্গিণী প্রকাশিত হয় তার ভিতর এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। ইনি সুরদাসের সমকালীন ছিলেন। রীতিগ্রন্থের মধ্যে অলঙ্কারের যে প্রাধান্ত দেখা যায়, তা হিন্দীর প্রথম কবি পুষ্য-রচিত গ্রন্থে এবং সুরের সাহিত্য-লহরীর মধ্যে বেশ পাওয়া যায়। 'বরবৈ রামায়ণ' রচনায় গোস্বামী তুলসীদাসও রীতিকালীন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বেশ প্রভাবান্বিত হয়েছেন। রহীমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বরবৈ নায়িকা ভেদ', নন্দদাসের 'রসমঞ্জরী', ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নায়িকা ভেদের ওপর রচিত। কেশবদাস রীতিকালীন বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রথম ইঙ্গিত করেন সত্য কিন্তু তিনি যে যুগে সাহিত্যের এই নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন সে যুগে সুর ও তুলসীর যথেষ্ট প্রাধান্ত, কাজেই তাঁর সময় এই নূতন রূপের পূর্ণবিকাশ হতে পারে নি এবং চিন্তামণির সময় থেকেই রীতিকালীন গুণগুলি হিন্দী সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

রীতিকালের অন্তান্ত কবিদের মধ্যে মহারাজ যশবন্ত সিংহ, বিহারী, মতিরাম, ভূষণ, দেব, আদি প্রধান। বেতাল, লালকবি, সুদন, পজনেস আদি কবিরা শৃঙ্গার রস ছাড়াও ভক্তি ও বীর রসে অনেক রচনা করে গেছেন। এদের কয়েকটি রচনা প্রবন্ধ-কাব্য ও স্ফুট-লীলার পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এ যুগের রচনায় যতই দোষ থাক না কেন, এই সব রচনায় নীতি, জ্ঞান, ভক্তি কোন বিষয়ের আলোচনাই বাদ পড়ে যায় নি। ১৭৯৪ সম্বতে রসলীন নামে এক মুসলমান কবি 'অঙ্গদর্পণ' নামে এই জাতীয় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ যুগের দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি কিন্তু এরাই সাধারণ জগতের স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের সজীব চিত্র এঁকে তারই মধ্যে হাসি-অশ্রু, মিলন-বিরহের দৃশ্য অবতারণা করে সমস্ত সমাজে একটা সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিলেন; এই যুগের প্রায় সব কবিতা ব্রজভাষায় রচিত হয়েছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোগল দরবারে এই ভারতীয় ভাষা সমাদর লাভ করেছিল সবচেয়ে বেশী। তখন আকবর ছিলেন ভারতের মোগল-সম্রাট, তাঁর দরবারে হিন্দুর স্থান ছিল উচ্চে ও গতি ছিল অবাধ। গঙ্গ ছিলেন বাদশাহ আকবরের রাজকবি। শুধু তাই নয় আকবর নিজেও ব্রজভাষায় অনেক পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর সময়ের তানসেন, বীরবল ও বিকানীরের পৃথ্বীরাজ—এই তিনজন বিখ্যাত মহাপুরুষের মৃত্যুতে আকবর লিখেছিলেন :

পিথল সো মজলিস গয়ী, তানসেন সো রাগ।
হাসবোঁ, রমিবোঁ, বোলিবোঁ গয়ো বীরবল সাথ।

ব্রজভাষার প্রাধান্ত থাকলেও প্রায় প্রত্যেক রচনায় অবধী ভাষার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। মুসলমানী দরবারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে এই যুগে কবিরা ফারসীবহুল সুললিত শব্দ প্রয়োগ করতেও কার্পণ্য করেন নি।

আচার্য্য কেশবদাস

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবদাস ওরছা নগরের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পণ্ডিত কাশীনাথের পুত্র ছিলেন। কয়েক পুরুষ ধরে এঁর পিতা-প্রপিতামহেরা সংস্কৃত-সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্ত রাজপণ্ডিতের সম্মান পেয়ে আসছিলেন। কেশবদাস 'নৃপমণি' মধুকরশাহের পুত্র দুলহরায়ের ভাই ইন্দ্রজিতের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজদরবারে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল, রাজা ইন্দ্রজিৎ তাঁকে গুরুর সম্মান দিতেন। একবার এঁর ছন্দে প্রসন্ন হয়ে বীরবল তাঁকে ছ'লাখ টাকা দান করেন—শুধু তাই না, এঁর কথামত বাদশাহ আকবর ইন্দ্রজিৎকে এক কোটি টাকা জরিমানা মাপ করে দেন।

কেশবদাস সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিরাট পণ্ডিত এবং পিঙ্গল ও কাব্যশাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন এবং তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করে হিন্দীপ্রেমীরা তাঁকে তুলসী ও সুরের পরেই স্থান দেন :

'সুর সুর, তুলসী সসী, উডুগণ কেশবদাস'

ডাঃ ওয়ার্থওয়ালের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়াও আচার-ব্যবহারেও

ইনি আচার্য্য ছিলেন। লালা ভগবান দীনের মতে এর সাতটি রচনা প্রধান—'রামচন্দ্রিকা', 'কবিপ্রিয়া', "রসিক-প্রিয়া", 'বিজ্ঞান-গীতা', 'বাবলী বৈঠক মে রতন', 'বীরদেবসিংহ চরিত্র' ও 'জহাঙ্গীর-জস-চন্দ্রিকা'। এই সাতটির মধ্যে আবার 'রামচন্দ্রিকা', 'কবিপ্রিয়া' ও 'বিজ্ঞান-গীতা' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কেশবদাস বলতেন, 'ভূষণবিনা ন সোহঈ কবিতা বনিতা মিও' অর্থাৎ অলঙ্কার-হীন কবিতাবধূ শোভা পেতে পারে না।

হিন্দী সাহিত্যের কালবিভাগে কেশবদাস সুর ও তুলসীর সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু তাঁর চিন্তার ধারা ছিল সুর-তুলসী-কবীরের চিন্তাধারা থেকে একেবারে বিভিন্ন। সাহিত্যের ভাবপক্ষের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, কাব্যিক ছন্দ ও অলঙ্কার (অর্থাৎ সাহিত্যের কলাপক্ষ) তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। তাঁর 'রামচন্দ্রিকায়' শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের কোন বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না, ছন্দ ও অলঙ্কার-সৌষ্ঠবই এই গ্রন্থের প্রধান ধ্যেয় বস্তু। কেশবদাসের সমস্ত রচনার মধ্যে 'রামচন্দ্রিকা'ই প্রধান। কেউ কেউ বলেন যে 'রামচন্দ্রিকা' একটি প্রবন্ধ-কাব্য কিন্তু ভাবপক্ষের ও চরিত্র-অঙ্কনের অভাবে একে ছন্দ বা অলঙ্কার-গ্রন্থ বলাই উচিত। কেশবের রাম তুলসীর রামের চেয়ে অনেক বিভিন্ন, কেশবের রামের ভেতর সে ভাব, মহিমা ও স্বর্গীয় অভিব্যক্তি নেই যা আমরা তুলসীর রামের মধ্যে পাই কিন্তু কাব্য-কলার দিক থেকে কেশবের এই রচনা হিন্দী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর-নাথ মিশ্র 'রামচন্দ্রিকা' সম্বন্ধে বলেছেন, "প্রবন্ধ-কাব্যকে বিচার সে রামচন্দ্রিকা সমর্থ রচনা নহী দিখাঈ দেতী। কথাক্রম যথাবশ্যক ন হোনেগে বহ পুস্তক মুক্তক উক্তিযোঁ কা সংগ্রহ-গ্রন্থ জান পড়তী হৈ।"

'কবিপ্রিয়া' একটি সম্পূর্ণ অলঙ্কার-গ্রন্থ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান এই রচনা থেকে লাভ করা যায়। কেশবের মতে অলঙ্কারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বর্ণ্যালঙ্কার, বর্ণালঙ্কার ও বিশেষালঙ্কার। ভিন্ন ভিন্ন রংকে 'বর্ণ্যালঙ্কার', বর্ণনা-বিষয়কে 'বর্ণালঙ্কার' ও সাহিত্যিক এবং শাস্ত্রীয় অলঙ্কারকে তিনি 'বিশেষা-লঙ্কার' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই রচনায় অলঙ্কার-বিন্যাস শাস্ত্রীয় মতে করা হয় নি, পরিভাষাও স্পষ্ট নয়, লক্ষণ ও উদাহরণের সমন্বয় পাওয়া যায় না। 'রসিকপ্রিয়া' থেকে আমরা কাব্যের রস-বর্ণনার পরিচয় পাই। তবে 'রসিকপ্রিয়া'র শৃঙ্গার রসের প্রাধান্যই দেখা যায়। নায়িকা-ভেদ, 'নখশিখ' বর্ণনা, নায়িকার জাতি-নিরূপণ আদি পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ 'রসরাজ' রূপে (রসিয়া কে রূপমে) ভক্তদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন। এই গ্রন্থের ভাষা 'রামচন্দ্রিকা'র ভাষা অপেক্ষা সরল। 'বিজ্ঞানগীতা' কবির দার্শনিক মনোভাবের পরিচায়ক। সুরতি মিশ্র, সরদার কবি ও নারায়ণ কবি 'কবিপ্রিয়া' ও 'রসিক প্রিয়া'র ওপর টীকা রচনা করেছেন এবং পরে লালা ভগবান দীন 'রামচন্দ্রিকা' ও 'কবিপ্রিয়া'র ওপর বিশদ টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হন।

'জহাঙ্গীর-জস-চন্দ্রিকা' ও 'বীরসিংহদেব-চরিত্র' সম্রাট জহাঙ্গীর ও মহারাজা বীরসিংহের উদ্দেশ্যে লিখিত, এ দুইটি ছাড়া কেশবদাসের 'রামালঙ্কৃত মঞ্জরী' নামে আর একটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রচনাটির বিষয়ে ডাঃ ওয়ার্থওয়াল বলেন যে, এটি পিঙ্গল-গ্রন্থ। 'রামালঙ্কৃত মঞ্জরী' ঠিক কোন্ সময় রচিত হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে খুব সম্ভবতঃ বিভিন্ন লক্ষণ-গ্রন্থের সঙ্কলিত রূপ ছাড়া 'রামালঙ্কৃত-মঞ্জরী' আর কিছুই নয়। কেশবের রচনাগুলি সম্বন্ধে আরও দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'রামচন্দ্রিকা'য় একই ছন্দে প্রশ্ন ও উত্তরের সমন্বয় ও বিশেষ করে লব-কুশের বার্তালাপ বড়ই সুন্দর। 'কবিপ্রিয়া'ও 'রামচন্দ্রিকা'য় কেশব প্রকৃতি-বর্ণনায় কোন ত্রুটি করেন নি। তাঁর রচনায় প্রকৃতির যাবতীয় সামগ্রী বন উপবন, নদী উপত্যকা, তাল-তমাল সবই স্থান পেয়েছে কিন্তু তবুও তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির কবি বা nature-poet আখ্যা দেওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতিকে জানবার জন্য কেশব দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান নি, ঘরে বসে বসে পুথির মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি শব্দের তুলি নিয়ে সেই সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কাব্য-পটে, কাজেই তিনি প্রকৃতির সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে পারেন নি। দণ্ডকবনে পৌঁছিয়েও শ্রীরাম রাজসেবার চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না।

শোভিত দণ্ডক কী রুচি বনী।
ভাঁতিন ভাতিন সুন্দর ঘনী।
সেব বড়ে নৃপ কি জনু লসৈ।
শ্রীফল ভূরি ভাব জহঁ বসৈ।
বের ভয়ানক সী অতি লগৈ।
অর্ক সমূহ জহাঁ জগমগৈ।

এখানে প্রকৃতির বর্ণনা আছে কিন্তু দণ্ডকবনের শোভা যেন তেমন ভাবে ধরা পড়ে না। ছন্দ ও অলঙ্কারের ইন্দ্রজাল বুনতে গিয়ে তিনি কখনও ঘটনা-প্রবাহ একেবারে ভুলে যান। তাই বোধ হয় 'রামচন্দ্রিকা' রচনা কালে শ্রীরামের অযোধ্যা ত্যাগ বা মহারাজা দশরথের মৃত্যুর কথা তাঁর একেবারেই মনে পড়ে নি, শ্রীরামের অঙ্গুরী-দর্শনে জনক-দুহিতাকে শুধু অশ্রুপাত করেই ক্ষান্ত থাকতে হ'ল। কাব্য-প্রেয়সীকে নানা অলঙ্কারে সাজাবার বাসনা তিনি চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন, একই দৃশ্যে তিনি উৎপ্রেক্ষা সন্দেহ ও রূপকের রং ভরে দিয়েছিলেন, এমন কি কামদেবকে রাক্ষসের সঙ্গে তুলনা করতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নি।

কেশব ব্রজভাষাকে তাঁর রচনায় প্রধান ভাষা বলে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে বুন্দেলখণ্ডী শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন যেমন 'মদাইন' (ইন্দ্রধনুষ), 'চোলী' (পিটারী), বরগা (কড়ী) আদি। অপ্রচলিত শব্দও অনেকক্ষেত্রে এসে পড়েছে যেমন লাচ (বিখ্যত), নারী (সমূহ), আলোক (কলঙ্ক)। কিন্তু কেশবের

ভাষায় আমরা বিদেশী শব্দ একেবারেই পাই না, এর কারণ হ'ল সংস্কৃতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ।

কেশবকে হিন্দী সাহিত্যে 'আচার্য্য কেশব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণতঃ এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে, তিনি কিসের আচার্য্য বা শিক্ষক। এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল যে, কেশবদাস ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের শিক্ষক। তাঁর 'কবিপ্রিয়া'র চারটি অধ্যায় থেকে হিন্দী সাহিত্যের কবি-শিক্ষা সম্বন্ধীয় সামগ্রী লাভ করা যায় এবং নবম পরিচ্ছেদে অলঙ্কারের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। রীতিকালে কৃপারাম, গোপ, মোহনলাল প্রভৃতি যে সব কবিদের 'আচার্য্য' আখ্যা দেওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে কেশবদাস অন্যতম। রীতিকালের এই আচার্য্যের কাব্য দোষত্রুটি থেকে অবশ্য মুক্ত নয় এবং ভাব ও ভাষার সুগমতার অভাবে তাঁর রচনা জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয় নি, তবে সুর ও তুলসীর পরে যে তাঁর স্থান, এ বিষয়ে কেউ বিমত করবে না। কাব্যে ছন্দ-রস-অলঙ্কারের যে বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য আছে কেশবদাস প্রথম তার দিকে ইঙ্গিত করেন—অলঙ্কার না থাকলে কাব্য-নারীর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ ফুটে উঠবে না, রস না থাকলে সেই সুন্দরী নারীর আত্মার বিকাশ হবে না, ছন্দ না থাকলে তার অবয়বের ভঙ্গিমা পৃথিবীর চোখে ধরা পড়বে না। কবিতা যে ব্রহ্মানন্দ সহোদর কেশব তা পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই স্বর্গীয় আনন্দ (ecstatic joy) কে পাবার জন্য তাঁকে এত আয়োজন করতে হয়েছিল। ছন্দ-রস-অলঙ্কারের আচার্য্য কেশব ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, বাইরের চাকচিক্য ও আড়ম্বরের ভেতর-ই তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল, কাজেই কবিতা-রাণীর বাইরের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতেই তাঁর রুচি, মন ও ভাবের সঙ্গে পরিচয় করবার তাঁর কিসের প্রয়োজন? কিন্তু এই বিলাসী আচার্য্য কেশবের পাণ্ডিত্যকে কেউ কোনও দিন অস্বীকার করবে না, তাঁর জীবনকালেই তাঁর কবি-প্রতিভা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল—এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ দোহার উল্লেখ করা যেতে পারে—

"সুর সুর, তুলসী সসী, উড়ুগন কেশব দাস।
অব কে কবি খদ্যোত সম, জহঁ তহঁ করত প্রকাস।

বিহারী

ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের মতে বিহারী গোয়ালিয়র রাজ্যের বসুআ গোবিন্দপুর নামক স্থানে এক মথুর চৌবে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওদিকে রাধাচরণ গোস্বামীর মতে বিহারী কবি ভাট ছিলেন। রীতি-কালীন কবিদের ভেতর কেউ বিহারীর মত জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হন নি শুধু তাই নয়, উৎকৃষ্ট কাব্য-শিল্পী হিসাবেও বিহারীর সমকক্ষ বোধ হয় কেউ নেই। তিনি জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের দরবারের রাজকবি ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ ১৬৬০ বিক্রমসম্বতে তাঁর জন্ম হয়। বিহারী তাঁর প্রসিদ্ধ 'সতসঈ' যে ১৭১৯ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ করেছিলেন, তার প্রমাণ একটি দোহা থেকে পাওয়া যায়—

'সম্বত গ্রহ শশি জলধি ছিতি, তিথি ছট বাসর চন্দ।
চৈত মাস পখ কৃষ্ণ মে, পূরণ আনন্দ কন্দ।'

(গ্রহ=৯, শশি=১, জলধি=৭ ও ছিতি (ক্ষিতি)=১ : সংখ্যার গণনা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে করা হয়, কাজেই সতসঈ রচনার সময় ১৭১৯ সম্বত)

সতসঈ রচনাকালে, বিহারীর বয়স প্রায় ৫৯ এবং এর দু'চার বছর পরেই বিহারীর মৃত্যু হয়। বিহারীর পিতার নাম ছিল কেশব। ইনি বাল্যকাল বুন্দেলখণ্ডে ও যৌবনের বেশীর ভাগ সময় শ্বশুরালয় মথুরায় অতিবাহিত করেন। এ সম্বন্ধেও একটি দোহা প্রচলিত আছে—

জন্ম গ্বালিয়র জানিয়ে, খণ্ড বুন্দেলে বাল।
তরুনাঈ আঈ সুখদ, মথুরা বসি সসুরাল।

এবং এই কারণে বিহারীর রচনায় মথুরা ও বুন্দেলখণ্ডের বহু প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায়। 'ককাহী,' 'সুরণ' আদি মথুরা চৌবেদের শব্দ ও 'লিখবী,' 'গনিবী', 'দেখিবী,' 'বীথে', 'গুহারী' আদি বুন্দেলখণ্ডী শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। তুলসীদাসের ভাষাতেও আমরা অনেক বুন্দেলখণ্ডী শব্দের উল্লেখ পাই, তার প্রধান কারণ হ'ল তুলসী রাজাপুরের নিবাসী ছিলেন। সে যাই হ'ক বিবাহের পর তিনি মথুরায় শ্বশুরালয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। কয়েক বছর বেশ কাটল কিন্তু তার পর তিনি দেখলেন যে,শ্বশুরালয়ে কেউ আর আগের মতন তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয় না; অভিমানী বিহারী একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং কালচক্রে তিনি একদিন মহারাজা জয়সিংহের দরবারের রাজকবি হয়ে বসলেন। বিহারীর জয়পুর দরবারে স্থান পাওয়া নিয়ে একটি গল্প আছে। শ্বশুরালয়ে অপমানিত বিহারী একদিন মথুরা পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত বিহারী অদৃষ্টের অদৃশ্য হাতছানিতে এগিয়ে চলেছেন, কোথায় যে তাঁর এই চলার শেষ হবে তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। কয়েকদিন অবিরত চলবার পর আগ্রা ছাড়িয়ে এক গ্রামে এসে পড়েছেন, অবসাদে পরিশ্রান্ত তাঁর শরীর কিন্তু তবুও তিনি আবার এগিয়ে চলবেন ঠিক করলেন, হঠাৎ একজন পরিচিত গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা। বিহারীর কাব্য-প্রতিভা এর ভেতরে বেশ প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। সেই গ্রামবাসী সব শুনে বলে ওঠে, "বিহারী, তুমি এ ভাবে নিজের জীবন নষ্ট করে দিও না; তুমি কবি, কাব্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দাও।" বিহারী উত্তর দেন, "আমি ত চাই, কিন্তু আমার ভাগ্য বোধ হয় তা চায় না।" গ্রামবাসী বলে, "তুমি এক কাজ কর, জয়পুর চলে যাও, সেখানে রাজ্যশাসন একেবারে বানচাল হয়ে পড়েছে।"

বিহারী জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

"শুনেছি, জয়পুরের বৃদ্ধ মহারাজা জয়সিংহ তাঁর নব-পরিণীতাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারেন না এবং রাজকার্য্যের কথা একেবারে ভুলে যেতে বসেছেন। সমস্ত রাজ্যের যে কি অবস্থা হয়েছে—

সে তোমাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। তুমি জয়পুরে যাও, ও তোমার কাব্য-শক্তির দ্বারা মহারাজার সম্বিং আবার ফিরিয়ে আন। বিহারী এ কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব।"

বিহারী আশ্চর্য্য হয়ে গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত একদিন বিহারী জয়পুরে এসে পৌঁছলেন। মহারাণীর সঙ্গে দেখা করে বললেন : "আমি এই দোহাটি লিখেছি মহারাজাকে উদ্দেশ্য করে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, মহারাজা যদি এই দোহাটি পড়েন তাঁর মনের পরিবর্ত্তন হবে।" মহারাণী উত্তর দেন, 'কবি, কিন্তু তোমার এই দোহা মহারাজার কাছে পাঠাব কি করে? মহারাজার আদেশ যে, যে-কেহই তাঁর অন্দর-মহলে তাঁর সুখে বিঘ্ন ঘটাবে তার প্রাণদণ্ড হবে!' সত্যিই এক ভীষণ সমস্যা! যাই হ'ক কোনও রকমে ত মহারাণী বিহারীর সেই দোহাটি মহারাজার কাছে পাঠালেন—দোহাতে লেখা ছিল।

'নহিঁ পরাগ, নহিঁ মধুর মধু, নহিঁ বিকাস যহী কাল।
অলি কলি হী সোঁ বিন্ধ্যো, আগে কৌন হবাল।

বৃদ্ধ মহারাজা দোহাটি পড়লেন এবং পরের দিন রাজ-দরবারে বিহারীর ডাক পড়ল। রাজদরবারে অগণিত নর-নারীর ভীড়—সবাই বিহারীর দিকে সহানুভূতিভরে তাকায় কারণ বিহারীর যে কঠিন শাস্তি, হয়ত প্রাণদণ্ড হবে এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ! বিহারী আপন ভাগ্যকে দোষ দিতে লাগলেন! মহারাজা কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হলেন ও বিহারীকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই স্তম্ভিত। বিহারীর মনে হ'ল যেন তাঁর প্রাণের গতি স্তব্ধ হয়ে আসছে! ভয়ে, সন্তর্পণে ও বিস্ময়ে মহারাজার নিকটে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ মহারাজা বিহারীকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "কবি তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছ, তুমি তোমার এই অমূল্য উপদেশের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ কর আর এর পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে আমার রাজ্যের রাজ-কবি-পদে অভিষিক্ত করলাম, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তুমি আমার রাজ্যের রাজ-কবি হয়ে কাব্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। এবং প্রতিটি দোহার জন্য আমি তোমাকে একটি অশরফী দিয়ে তোমাকে সম্মান দেব।'

সমস্ত জনতা মহারাজার এই অদ্ভুত আদেশ অবাক হয়ে শুনল। মহারাজার দিকে অপলক নেত্রে বিহারী আনন্দে উল্লাসে তাকিয়ে রইলেন। কবি তাঁর সৃষ্টি দিয়ে জীবনের গতিকে পরিচালিত করতে পারে বিহারী তার প্রমাণ দিলেন।

এর পর বিহারী মহারাজা জয়সিংহের দরবারের রাজকবি হয়ে কাব্য-সাধনায় উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি ১০০১২৬টি দোহার রচনা করেন, 'বিহারী সতসঈ' এই দোহাগুলিরই সংগ্রহ। হিন্দী সাহিত্যে বিহারী-সতসঈ-র সম্মান তার অগণিত টীকা থেকে প্রমাণিত হয়। দোহার ভিতর ছন্দ ও অলঙ্কারের এমন বাহুল্য হিন্দী-সাহিত্যের আর কোনও কবি বোধ হয় কোনদিন করতে পারেন নি। বিহারীর প্রায় প্রত্যেকটি দোহা নিজস্ব এক অনুপম ভাবের দ্বারা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে গিয়ে আঘাত করে এবং প্রতিটি অভিব্যক্তি মনের কোণে যেন বারবার ঝঙ্কৃত হতে থাকে। বিহারীর দোহার প্রশংসা করে একজন সমালোচক লিখেছেন :

'সতসৈয়া কে দোহরে, জ্যো নাবক কে তীর।
দেখত কে ছোটে লগেঁ, বেধেঁ সকল সরীর॥

'বিহারী সতসঈ' প্রধানতঃ শৃঙ্গার গ্রন্থ কিন্তু হাস্য ও শান্ত রসের সমাবেশে এই গ্রন্থ অতি সহজেই পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু শৃঙ্গাররসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রয়োগের দ্বারাই বিহারী সতসঈ হিন্দী-সাহিত্যে এত সমাদর লাভ করেছে। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল সতসঈ সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইসকে দোহে ক্যা হৈঁ, রস কী ছোটী-ছোটী পিচকারিয়া হৈঁ। যে মুঁহ সে ছুটতে হী শ্রোতা কো সিক্ত কর দেতে হৈঁ। বিহারী কী রস-ব্যঞ্জনা কা পূর্ণ বৈভব উনকে অনুভাবোঁ কে বিধান মে দিখাঈ পড়তা হৈ। অনুভাবোঁ ঔর ভাবোঁ কি ঐসী সুন্দর যোজনা কোঈ ভী শৃঙ্গারী কবি নহীঁ কর সকা হৈ।'

কিন্তু মাঝে মাঝে হাস্যরসের খোরাক যোগাতে বিহারী কার্পণ্য করেন নি।

'চিতু পিতুমারক জোগ মুনি ভয়ো ভয়ে সুত সোগ।
ফিরি হুলস্যো জিয় জোয়সী সমুঝয়ো জারজ জোগ।'

কোন জ্যোতিষীর একটি পুত্র সন্তান হয়। পিতা জন্মকুণ্ডলী বিচার করে দেখতে পান যে, পুত্রের হাতে পিতৃ-ঘাতক যোগ আছে। জ্যোতিষী শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন, আবার কুণ্ডলী বিচার করেন। এবার দেখেন যে পুত্রের জারজ-যোগ আছে অর্থাৎ পুত্র তার নিজের সন্তান নয়, এবার জ্যোতিষীর আনন্দ হয়। এর ভেতর ভারতীয় বিবাহ বা সামাজিক ব্যবস্থার দুর্ব্বলতার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

'বিহারী-সতসঈ'এর যে সব টীকার রচনা হয়েছে তাদের মধ্যে লালা ভগবান দীন ও রত্নাকরের টীকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শোনা যায় আওরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ সর্ব্বপ্রথম বিহারীর দোহাগুলিকে ক্রমবদ্ধ করবার আদেশ দেন। 'মুক্তক শৈলী'তে বিহারী প্রধানতঃ তাঁর দোহার রচনা করেছিলেন। এরূপ রচনা করা বড় কঠিন, কারণ একই পদে অনেক ভাব ও রসের সমাবেশ করতে হয়, এ যেন 'গাগর মে সাগর ভরণা হৈ।' ২৪ মাত্রার ছোট ছন্দে বিহারীর দোহার মত ভাবের অবতারণা করা হিন্দী সাহিত্যে বিরল এবং এইজন্যই তিন শ বছর ধরে বিহারী সাহিত্য-প্রেমীদের এত প্রিয়। Imperial Gazeteer of India-তে বিহারী-সতসঈ-এর সমালোচনা করে লেখা হয়েছিল—"daintest piece of art. Each verse (of 46 syllables) has in itself a miniature description of a mood or a phase of Nature, in which every touch of the

brush is exactly the needed one, and not one is superflous."

কাব্যরীতির সঙ্গে বিহারীর পরিচয় ছিল না, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তিনি কাব্য রচনা করে গিয়েছিলেন। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে বিহারীর কাব্য-প্রতিভা সুষমা-মণ্ডিতা হয়ে সকলকে মোহিত করে দিয়েছিল। বিহারী উপমা-উৎপ্রেক্ষার বোধ হয় সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করেছেন এবং এইখানে বিহারীর কল্পনাশক্তির পরিচয় আমরা পাই—

(১) সোহত ওঢ়ৈ পীতু পটু শ্যাম সলোনৈ গাত।
মনৌ নীলমনি-সৈল পর অসপ পরষৌ প্রভাত॥

(২) অধর ধরত হরি কৈঁ পাত ওঠ-ডীটি-পট-জ্যোতি।
হরিত বাঁস-কী বাঁসুরী ইন্দ্রধনুষ রঙ্গ হোতি॥

নীতি-সম্বন্ধীয় বিষয়েও বিহারী উদাসীন নন—

স্বারথু সুকৃতু ন শ্রমু বৃথা দেখি বিহঙ্গ বিচারি।
বাজ পরাঐ পানি পর তু পঞ্চীনু ন মারি॥

যমক, শ্লেষ ও অনুপ্রাসের এমন সুন্দর উদাহরণ বিহারীর দোহা ছাড়া আর বোধ হয় কোথাও পাওয়া যাবে না—

পল সো হৈঁ পগি পীক-রঙ্গ সোহৈ সব নৈন।
বল সোহৈ কত কীজিয়ত এ আলসী হৈ নৈনা॥ (৪৯৮)
বর জীতে সর নৈন কে ঐসে দেখে মৈ ন।
হরিণী কে নৈনানু তৈঁ, হরি নীকে এ নৈন॥—৬৭
(যমক)

রস সিঙ্গার মঞ্জনু কিএ কঞ্জনু ভঞ্জনু দৈন
অঞ্জনু রঞ্জনু হু বিনা খঞ্জনু গঞ্জনু নৈন (অনুপ্রাস)

'বিহারী-সতসঈ' এ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং গ্রিয়ার্সনের মতে 'সতসঈ'এর বিষয় জানতে হলে 'সতসঈ'এর প্রত্যেকটি দোহার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গৌণভাবে আমরা বলতে পারি যে, 'সতসঈ' এ দুটি বিষয়ের প্রাধান্য আছে—প্রেম ও ভক্তি। লৌকিক প্রেমের ও কৃষ্ণভক্তির প্রচার একসঙ্গে হয়েছে। সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় বিহারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন—'নখশিখ' প্রধান আলেখ্য বস্তু। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যও কবির কাছে রহস্যজালে আবৃত, আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত, বিশাল ও অনির্ব্বচনীয়—

লাল তুমহারে রূপ কী অহো রীত যহ কৌন
জাসো লাগত পলকু দৃগ, লাগত পলক পলৌন—

সৌন্দর্য্যেরও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়:

ফিরি ফিরি চিতব উতহী রহতু টুটি লাজ কি লাব।
অঙ্গ-অঙ্গ ছবি-ঝৌট মে ভয়ো ভৌর কি নাব॥

সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ ও এমন উৎকৃষ্ট কল্পনা বোধ হয় আর পাওয়া যায় না।

রূপসুধা আসো ছক্যো আসো পীত বনেন।
পিয়ালে ওঠ প্রিয়া বদন রহ্যো লগাএ নৈন॥

প্রেমাস্পদকে দেখার যে কি আকুলতা হয় প্রেমিকের মনে, তা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে।

ইন দুখিয়া অখিয়ান কে সুখ সরজোই নাহি।
দেখত বনে ন দেখতে বিন দেখে অকুলাহি॥

কবির লেখনী ও চিত্রকারের তুলিকা এমন সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করতে বোধ হয় অপারগ।

বিহারী aesthetic, নায়িকার সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেকটি ছবির মধ্যে তিনি দেখতে পান আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন—আগেই আমরা জেনেছি যে, বিহারী প্রেমের কবি। আদর্শ প্রেমের মন্ত্রে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন কাজেই তাঁর প্রেমের স্থান সাধারণ প্রেমের স্থানের চেয়ে অনেক উঁচুতে; এই জাতীয় প্রেমের পথ সরল-সহজ হয় না, বড়ই কণ্টকাকীর্ণ—কবি নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

যহ তো ঘর হৈ প্রেম কা খালা কা ঘর নাহি।
সীস উতারৈ ভৌ ধীর সো পৈঠে ইতি মাহি॥

এই প্রেমাস্পদ নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং প্রেমী ও প্রেমাস্পদের ভিতর কোন পার্থক্য থাকে না।

[সতসঈ এর ভাষা প্রধানতঃ ব্রজভাষা, কিন্তু বুন্দেলখণ্ডী, ফারসী, আরবী, পূর্বী ও 'খড়ী বোলা'র শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। (ক) বুন্দেলখণ্ডী শব্দ যেমন 'স্যো,' 'কোহ', 'চালা', 'সদ', 'চটক', 'লখিবী', 'দেখবী', 'বীধে' আদি, (খ) আরবী-ফারসী শব্দ 'অকস', 'সিরতাজ', 'খিয়াল', 'খুবী', 'অদব', 'হজার', 'গুলাব', 'কাগদ' আদি, (গ) পূর্বী শব্দ—'লীন', 'লজিয়াত', 'জিহি', কিহি ।]

'সতসঈ' এর মঙ্গলাচরণে বিহারী নিজেকে শ্রীরাধিকার একজন ভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন:

মেরী ভব বাধা হরো রাধা নাগরি সোয়।
জা তন কী ঝাঈ পড়ে শ্যাম হরিত দ্যুতি হোয়॥

কিন্তু তবুও বিহারীকে আমরা রাধাকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলে অভিহিত করতে পারি না, বস্তুতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম থাকলেও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে মধ্যযুগের কবিদের কোন বিরোধিতা নেই। প্রকৃতি-চিত্রণে বিহারী ইংরেজ সমালোচকের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। মানবীয় প্রকৃতির অনুপম বর্ণনা এমন অপূর্ব্ব শব্দজালে আর কোনও কবি করেছেন কি না সন্দেহ।

সঘন কুঞ্জ ছায়া সুখদ, শীতল সুরভি সমীর।
মন হৈ জাত অজৌ বহৈ, বা জমুনা কে তীর॥

বিহারীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল—জ্যোতিষ, রাজনীতি, চিকিৎসা, সাংখ্য, বিজ্ঞান আদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল এই রীতি-কবির।

দুসহ দুরাজ প্রজানু কৌ, ক্যো ন বঢ়ে দুখ দন্দু।
অধিক অধরো জগ করত, মিলি মাবস রবি চন্দু॥

(দু'জন শাসকের শাসন সর্ব্বদা দুঃখদায়ক হয়, শাসক একজন

হওয়া প্রয়োজন। অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্যের এক রাশি হওয়ার কারণে অন্ধকার আরও বেড়ে যায়।

সুদর্শন-চূর্ণ দিয়ে নায়িকার জ্বর প্রশমিত করবার চেষ্টা সত্যই অপূর্ব্ব এবং কবির চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিচয় দেয়। সাংখ্য-বেদান্তেও কবির জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিজ্ঞানেও যে বিহারীর সম্যক জ্ঞান ছিল, তার প্রমাণ নীচের দোহাটি থেকে পাওয়া যায়।

নর কি অরু নল-নীর কী, গতি এক করি জোঈ।
জেতৌ নীচৌ হ্বৈ চলৈ, তেতৌ উঁচৌ হোঈ॥

(যত উঁচু থেকে জল ফেলা যায় ততই সে উপরের দিকে উঠে আসে কিন্তু আবার সে নীচের দিকে নেমে যায়) দুটো কাঁচের মধ্যে কোন বস্তুকে রাখলে তার অনেক প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, 'Multiple images'-এর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গেও বিহারীর পরিচয় ছিল।

অঙ্গ-অঙ্গ প্রতিবিম্ব পরি, দরপণ সে সব গাত।
দুহরে তিহরে চোহরে, ভূষণ জানে জাত॥

বিহারী আপন কাব্য-প্রতিভা দ্বারা হিন্দী রীতি-কাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তুলসীদাস ও সুরদাস ছাড়া যেমন ভক্তিকাব্যের মূল্য নেই, তেমনি বিহারীকে বাদ দিয়ে আমরা রীতি-কাব্যের কোন কল্পনাই করতে পারি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিহারী রীতিকালের সর্ব্বোত্তম কবি। ডাঃ রামরতন ভটনাগর তাই বিহারী সম্বন্ধে বলেছেন, 'উৎকৃষ্ট কাব্য কী দৃষ্টি সে অত্যন্ত ধনী সংস্কৃত সাহিত্য কে সম্মুখ যদি হমে হিন্দী কে কবি রচনা পড় জায়ে তো হম তুলসীদাস, সুরদাস ঔর বিহারী কো হী রখ সকতে হৈঁ। বিহারী-সতসঈ, অকেলী আর্য্যা, গাথা, অমরুক ঔর অনেক শৃঙ্গার সুভাষিতোঁ পরভারী হৈ।'

থামলো-চলা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

অনেক আকাশ পার করা এই চোখ
থামল এসে কি ঘন কালো ঐ চোখে?
যেখানে ঘুমোয় অতলান্তিক জল,
বিহ্বল তারা ছলছল নভতল,
গভীর অলকা লোকে;
অনেক বুকের সীমানা ছাড়িয়ে শেষে
এ বুক পেয়েছে ও বুকের স্বর্গকে।

পাতা মেলেছিল নারকোল-পাতা মেলা
আকাশে আমার অনেক আশার ভীড়;
যেখানে তোমার হাসির মতন লাল
শাদায় ছায়ায় শাখারা বুনেছে জাল,
গা এলানো বালুতীর;
ঝাউবন, আর নারকোল, আর সুপুরি, খেজুর, কলা,
ছায়াই ফেলে নি, জল ছিল নাকো থির।

জলে ছিল কার দুরন্তপনা ভরা
আছাড়ি-পিছাড়ি অস্থির মাতামাতি,
ফেনার মতন হাল্কা মনের খেলায়
এলিয়ে পড়েছে উচ্ছল অবহেলায়
কে কোথায় কার সাথী!
এমন জলেতে ছায়াই পড়েনি ধরা,
ছায়া ফেলে নি ত আমার মনের বাতি।

কবে যেন কার চলার ধ্বনির ভাষা
শুনেছি পানামা-তীরের কুঞ্জে কবে।
কোরাল লেগুনে যার কুন্তলদাম
জলের তলায় এঁকে রেখেছিল নাম
স্মরি তার বল্লভে,
তার বিস্মৃত চলার-বলার ধ্বনি
রাখে পরিচয় এই দেহ সৌরভে।

এবার আমায় কাছেতেই নিও টেনে
পারি না এমন শুধু ঘুরে ঘুরে ফেরা।
পাহাড় সাগর নদীতীর বালুচর,
কেবল ঘুরেছি বাঁধতে একটি ঘর
সবুজ স্বপ্নে ঘেরা;
এবার আমায় বুকে টেনে তুমি নাও
সব বড় থেকে এ আকাশখানি সেরা।

এ ছোট আকাশে আশার তারারা চায়।
এখানে আমার নিখিল জ্বালানো তারা
হঠাৎ টানের ঝোঁকেতে থাকবে থেমে;
ভালোবাসাটুকু চোখ থেকে বুকে নেমে
চিরকালে হবে হারা;
একটা ফেরার পালিয়ে বেড়ানো নেশা
থেমে যাবে পেয়ে সব আকাশের সেরা।

বিনতার প্রেম

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

মাত্র দুটি বৎসরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান লেখক বলে নাম করে ফেলল সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থও এল। সুবিমল ভাবল সাহিত্যরসই এখন থেকে প্রাণরস যোগাবার অর্থেরও যোগানদার হতে পারবে সুতরাং আর গোলামী কেন? দিল ভাল মাইনের চাকুরীটি ছেড়ে। শুধু তাই নয়—যে বিনতা এতদিন ধরে কি করবে মন স্থির করতে পারছিল না—সেও অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবর্ত্তীর মোহ কাটিয়ে সুবিমলের পাশে এসে দাঁড়াল, খ্যাতি হ'ল, অর্থ হ'ল, হ'ল প্রিয়তমা পত্নী। আর কি চাই!

চার-পাঁচটা বৎসর এমনি করে কাটল—ইতিমধ্যে পাঁচ-ছ'খানা উপন্যাস আর অনেকগুলো গল্প লেখা হয়ে গেল। প্রকাশকদের তাগাদা আর মাসিক পত্রিকার অনুনয়-বিনয়ের অন্ত রইল না। কিন্তু সুবিমলের মনে তবু তৃপ্তি নাই। নাঃ ঠিকমত হ'ল না—যে কথাটি সে বলতে চায় তা যেন সে নিজেই জানে না—এ জীবনের যে সমস্যা সে তুলে ধরতে চায়—আঁকতে গিয়ে কোথায় যেন খেই হারিয়ে যায়। অবশেষে একান্ত হয়ে সাধনায় বসল সুবিমল। বৎসরখানেকের তপস্যায়, প্রাণঢালা ঐকান্তিকতায় গড়ে উঠল সুদীর্ঘ উপন্যাস, বার বার পড়ে দেখল, তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল মুখে—হাঁ হয়েছে, তার প্রাণের মূল সুরটি এবার ধরা পড়েছে। বিনতাকে পড়ে পড়ে শোনাল। উৎসাহী হয়ে উঠল বিনতা—চমৎকার হয়েছে, নূতন আলো দেখিয়েছে, পথ দেখিয়েছে, যুগান্তকারী লেখা! আবেগচঞ্চল হয়ে উঠল বিনতা, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সুবিমল।

কিন্তু কি হ'ল? এমন লেখাটি কেউ নিল না। একে একে চার-পাঁচ জন প্রকাশক পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিল—এ বই চলবে না। কেন? কি দোষ হ'ল লেখাটির ভেবে পায় না সুবিমল। নতুন কথা বলেছে সে—প্রচলিত সমাজের উপরে, ন্যাকামি আর ভণ্ডামীর উপরে নির্ম্মম ভাবে কশাঘাত করেছে। রেহাই কাউকে দেয় নাই, যা বুঝেছে স্পষ্ট করে সোজা সরল ভাষায় বলেছে এই কি অপরাধ!

প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘোরে আর মুষড়ে পড়ে সুবিমল। ঝিমিয়ে গেল সুবিমল—ঝিমিয়ে গেল মন—ঝিমিয়ে গেল কলম। আরও কিছুদিন এমনি চলার পর বড় শ্রান্ত হয়ে পড়ল সুবিমল, ভাবল আর কিছু হবে না, লেখাটি বড় অপয়া। হিসেব করে দেখল উপন্যাসখানি শেষ করার পর একটা বৎসর শুধু সে ঘুরেই মরেছে, কোন কাজই ত আর হয় নাই, কোন বড় লেখায় হাত দেয় নাই। বাজারে চালু বই ক'খানার কাটতি অসম্ভব রকম পড়ে গেছে, বিশেষ কিছুই আর পাচ্ছে না। অর্থকষ্ট আরম্ভ হ'ল। হঠাৎ জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে গেল সুবিমল—সচরাচর এমনটা বড় হয় না।

আর একটা অশান্তির কারণ ঘটে উঠতে লাগল—বিনতা আজকাল বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সংসারের অভাব-অনটন আর সে নীরবে সহ্য করতে পারে না। সুযোগ পেলেই দু'চারটে কড়া কথা সুবিমলের মুখের উপরে ছুঁড়ে মারে।

মোটে একটিমাত্র মেয়ে, তারই ভাল জুতো-জামা, খাওয়া-থাকার খরচ জোটে না। এমন অপদার্থ ভাববিলাসী অকর্ম্মণ্য মানুষ বিনতা কোনদিন দেখে নাই। লেখা? যে লেখার তোমাকে দুটি খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা নেই, তার উপর নির্ভর করে কেউ এমন একটা চাকুরী ছেড়ে দেয়? লেখাকে নাকিসুরে বিনতা "নেকা" বলে উচ্চারণ করে। নীরবে সহ্য করতে হয়, কিন্তু বুকের ভেতরে ঝড় বয়ে যায় সুবিমলের।

অনেকদিন থেকে কিছু কিছু পানদোষ ছিল সুবিমলের। কিন্তু খুব পরিমিত মাত্রায় খেত, এতে নাকি উপকারই হ'ত, কাজে উৎসাহ পেত, হজম ভাল হ'ত। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রা আর ঠিক রইল না, দিনে দিনে পুরো মাতাল হয়ে উঠল সুবিমল। একে ত অভাব-অনটনে বিনতার মেজাজ গিয়েছিল বিগড়ে, এবার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। সেদিন একান্তে বসে এই কথাই ভাবছিল বিনতা। এমন একটা লোককে সত্যিই কি ভাল বেসেছিল সে? যার জন্যে অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবর্ত্তীকে ছেড়ে আসতে পারল? ভুল—এ জীবনে মহা ভুল করেছে বিনতা। অসহ্য অনুতাপের জ্বালায় তার সারা অন্তর রি রি করে জ্বলতে থাকে।

২

সেদিন নিজের বাক্সের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা ছবি বেরিয়ে পড়ল। ছবিখানা হাতে নিয়ে খানিকটা

আশ্চর্য্য হয়ে গেল বিনতা—অনিমেষ চক্রবর্ত্তীর ফটো। কবে রেখেছিল, আজ প্রায় ভুলে গেছে। মনে পড়ছে, বছরসাতেক আগে বিনতা নিজে চেয়ে এনেছিল অনিমেষ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে ছবিখানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গৌরকান্তি চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ—তরুণ অধ্যাপক অনিমেষ। কয়েকটা বৎসরের গণ্ডী পেরিয়ে একেবারে তার কলেজ-জীবনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল বিনতা।

সে তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতার উঁচুদরের ছাপ নিয়ে অধ্যাপক হয়ে এল অনিমেষ, যোগাযোগ ঘটে গেল কিছুদিনের ভেতরেই, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল দুজনে।

বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গড়ের মাঠে, গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়ানো—ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিরিবিলি কাটান, এমনি চলল কিছুদিন। মন দেয়া-নেয়াও হয়ে গেল। এমনি সময়ে আবির্ভাব হ'ল সুবিমলের খানিকটা আকস্মিক ভাবে। কিছুদিন পূর্ব্বেই সুবিমলের সাহিত্য-যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ছাত্রমহলে জাগিয়েছিল একটি বিশেষ সাড়া। বিনতারও প্রিয় লেখক হয়ে উঠল সুবিমল। হাওড়ার এক পল্লীতে বিনতার মামার বাড়ী। বিনতা আর তার দাদা বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে—সেটা ছিল রবীন্দ্র-জয়ন্তী পক্ষ। বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে সেখানে সেদিন রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়েছিল। অন্য পাঁচ জায়গায় যেমন থাকে—নাচগান, আবৃত্তির হৈ-হুল্লোড়—এখানেও তার অভাব ছিল না। বিনতা ভাল আবৃত্তি করত—তাকেও অংশ নিতে হ'ল। এই সভায় সভাপতিত্ব করতে এল সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দর্শনেই ছাপ পড়ল বিনতার মনে। সুবিমল বারে বারে বিনতার আবৃত্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল—উপযাচক হয়ে তার আর তার দাদার সঙ্গে আলাপ সুরু করল। তার পর কয়েকটা মাস ধরে আসা-যাওয়া আলাপ-পরিচয়ে সম্বন্ধ পাকা হয়ে উঠল। শেষে পাওয়া গেল বিনতার মন—শেষ পরিণতি হ'ল বিবাহে।

কিন্তু আজ ভাবতেও কষ্ট হয় তার।

৩

দিন দিন আয় একেবারে কমে গেল সুবিমলের। কোন কোন মাসে মাসিক পত্রিকায় গল্প বা প্রকাশকদের দরজায় ঘুরে ঘুরে পঞ্চাশটি টাকাও জোটে না। তাও যেদিন কিছু হাতে পড়ে—সব ভুলে সুবিমল ছুটে যায় মদের দোকানে। কেমন করে আর সংসার চলবে? অবশেষে আর উপায়ান্তর না দেখে চাকুরীর খোঁজে বেরুতে হ'ল বিনতাকে। এমনি সময় হঠাৎ একদিন পথে অনিমেষ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা, দীর্ঘ দিন পরে দেখা। অনিমেষ আগ্রহ করে আদর করে বাড়ীতে নিয়ে গেল বিনতাকে। এর পর থেকে প্রায়ই এখন দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হয়। অনিমেষের বাড়ীতে এসেই বিনতা মিলিত হয়। কত কথা হয়—আবার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে দুজনে। মাঝখানে যে সুবিমল আছে, একথা ওরা যেন ভুলেই যায়।

যাই হোক, অনিমেষের চেষ্টায় শহরতলীর একটা ইস্কুলে চাকুরী পেল বিনতা। বাসা হতে রোজ চার-পাঁচ মাইল দূরে এসে ইস্কুল করতে হ'ত—কাজেই ইস্কুলের কাছাকাছি একটা বাসা নিয়ে পুরনো বাসা ছেড়ে দিল। নতুন বাসায় দু'খানি ঘর। একখানি ঘরের মাঝখানে চটের পর্দ্দা টাঙিয়ে একপাশে তার বইয়ের গাদার মাঝে ছোট্ট একখানা তক্তাপোশ পেতে শুয়ে থাকে সুবিমল। অন্য পাশে মেঝেয় বিছানা করে শুয়ে থাকে সুবিমলের মা। বাতের বেদনায় ইদানীং একেবারে অচল—রাত দিন কাতরাতে থাকে। অন্য ঘরটিতে থাকে বিনতা মঞ্জুকে নিয়ে। এদিকের সঙ্গে বড় একটা সম্বন্ধ নেই তার।

বিনতা ভাবে বেঁচে গেছে সে। আজকাল আর অভাবের তীব্রতা নেই—চাকুরী করে টাকা পায়, তা ছাড়া উপহার বলে অনেক কিছুই অনিমেষ পাঠায় যখন তখন।

বিনতার স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে, জীবনের দশটা বছর বয়স পিছিয়ে গেছে বুঝি তার। অনিমেষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে বিনতার।

৪

সুবিমলের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। লিভারের দোষ, বদহজম, রক্তাল্পতা একে একে এসে হাজির হতে লাগল। রোগের কোন ওষুধ নেই, পথ্যাপথ্যের বাছবিচার নেই, একটুখানি সেবাও নেই। সুবিমল বেপরোয়া, থাকলে মদ খায়, পারলে কলম চালায়, না হলে চুপ করে বসে বসে ঝিমোয়। মাঝে মাঝে মঞ্জুকে ডেকে নিয়ে গল্প করে। সাত বছরের মঞ্জু সবকিছু বোঝে না, তবু বাবার কথায় সায় দিয়ে যায়।

বাবাকে তার ভাল লাগে।

কিন্তু একদিন সুবিমলের দেহ একেবারে অচল হয়ে এল, মুখ চোখ, হাত-পা ফুলে গেল, পেটে জল দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ, কোন দিন কাপড় চোপড় নোংরা করে রাখত—দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যেত না। বিনতা সাধ্যমত

এ ঘর মাড়াত না। ঝি কোন প্রকারে চাট্টি ভাত বেড়ে রেখে যেত। সুবিমল বুঝতে পারত যে, নিজের দিন ঘনিয়ে এসেছে। শেষ বারের মত ইচ্ছে হ'ল নিজের কথা কিছু লিখে রেখে যায়। দুর্ব্বল হাতে কলম সরে না, মাথায় কিছু ঢোকে না, ব্যর্থ চেষ্টা করে সুবিমল।

সেদিন বিকেল বেলা সুবিমলের শরীরটা একটু ভাল ছিল। দরজার কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে দূর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল। দূর আকাশে দুই-একটা চিল কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। সেই নীলিমার দিকে তাকিয়ে সুবিমলের মন বহুদিন পরে আজ মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিজের সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে এই নোংরা আবর্জ্জনার মধ্যে আর সে খাঁচার আটকা-পশুর মত বন্ধ থাকতে চায় না। এই তার বাসের ঘর আর এই তার দেহ, দুই-ই সমান নোংরা। নিজের শরীরের প্রতি তাকিয়ে সে নিজেই ঘৃণায় শিউরে ওঠে। পেটটি অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে—চোখমুখ ফোলা ফোলা, কয়েকটি দাঁত ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে—মুখে একটি উৎকট দুর্গন্ধ, পা দুখানিতে রস জমে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। সুবিমল ভাবল এই ত দেহের পরিণতি। কি হবে এ দেহ দিয়ে! সে যদি পারত আজই এই নোংরা দেহ ও আবেষ্টনী পরিত্যাগ করে চলে যেত। চলে যেত ঐ নীলিমার কোণে দূর আকাশে। একটা অশরীরী অবস্থায় আকাশে-বাতাসে আলোকে-অন্ধকারে মিশে নিখিল বিশ্বের সমস্ত আনন্দের ভেতরে লুটোপুটি খেত।

বিনতা সাজগোজ করে বেরুচ্ছিল। তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বড় ভাল লাগল সুবিমলের। কই, সে ত এত দিন তাকিয়ে দেখে নি, আজকাল বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে বিনতা। সে ডাকল—শোন।

পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল বিনতা—কি বলছ?

—এস না একটু কাছে—বস না একটু।

বিরক্ত মুখে এগিয়ে এল বিনতা, বলল—দেরী হয়ে যাচ্ছে, যা বলবে তাড়াতাড়ি বল।

কয়েক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল—এত তাড়া কিসের, কোথায় যাবে?

—সে তোমার শুনে লাভ নেই, যেতে হবে এইটুকু জেনে রাখ। কিন্তু ডাকলে কেন?

সুবিমল সামলে নিয়ে বলল—বলছিলাম কি, আমার সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা ভট্টাচার্য্য পাবলিশিং কোম্পানীর কাছে অনেক দিন পড়ে আছে। কি হ'ল একবার যদি তুমি খবর নিয়ে আসতে।

বিনতা মুখ বাঁকা করে জবাব দিল—আমি? আমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না। দেখ, সত্যিই ও লেখা ভাল হয় নি—তা হলে কি সবাই এমনি করে ফিরিয়ে দিত। যা হবার খুব হয়েছে আর হ্যাংলাপনায় দরকার নেই।

জ্বলে উঠল সুবিমল—কি বোঝ তুমি লেখার?

—বেশ, আমি বুঝতে চাইনে। কিন্তু ঐ যে পাঁচ-সাতটা পাবলিশিং কোম্পানী, যারা একে একে বই ফিরিয়ে দিল—তারাও কিছু বোঝে না, না? বুঝলে ফেরাত না। যাক, আমার সময় নেই—আমি চললাম।

সুবিমল একেবারে জ্বলে উঠল, চীৎকার করে বলল—যাচ্ছ কোথায় শুনি?

বিনতা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—শুনবে? যাচ্ছি অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী, সেখানে নিমন্ত্রণ আছে।

বেরিয়ে গেল বিনতা। তার গায়ের এক ঝলক সুগন্ধ, সুবিমলের নাকে চোখে-মুখে সর্ব্বত্র যেন বিষের ফলার মত এসে বিঁধতে লাগল। উত্তেজনায় নিজের বিছানায় পড়ে আহত পশুর মত হাঁপাতে লাগল সুবিমল।

কয়েক দিন পরের কথা—সেদিন সারারাত্রি ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছিল—মঞ্জুকে নিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল বিনতা।

পাশের ঘর থেকে আজ আর কারো কাতরানি ভেসে আসছে না, বৃষ্টির ঝিমঝিম শব্দে সব শব্দ ডুবে গেছে। সকাল বেলা সুবিমলের ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে চীৎকার করে উঠল বিনতা। খাতার উপরে মাথা রেখে হাতের মুঠোয় কলমটি ধরে মরে পড়ে আছে সুবিমল।

সেদিন বিকেল বেলা ঝাঁটা ধরে সুবিমলের ঘর পরিষ্কার করছিল বিনতা। সুবিমলের লেখার খাতা আর ছাপা বইগুলি বারান্দায় এনে স্তূপাকার করে ফেলে রাখছিল, মঞ্জু সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল—বাবার বই-খাতা এমনি করে ফেলে রাখছ কেন মা?

বিনতা ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর, পুরনো কাগজওয়ালাদের কাছে বেচে দেব, জঞ্জাল জমিয়ে রেখে কি লাভ হবে বল্ ত?

মঞ্জু একটা কথাও না বলে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সুবিমলের ছবি আর মৃত্যুসংবাদ সবগুলো খবরের কাগজেই বড় বড় করে ছাপা হ'ল। কয়েক দিনের ভিতরে সুবিমলের কয়েকজন অনুরাগী সাহিত্যিক বন্ধু মিলে কল-

কাত্তায় একটা শোকসভা করল, কয়েকটি শোকসূচক চিঠি পত্রও এসে পৌঁছল বিনতার হাতে। এর মাঝে প্রায় প্রতি দিনই অনিমেষ একবার করে এসে দেখা করে যায়, কিছু টাকা-পয়সাও দিয়ে যায়।

এর কিছুদিন পরেই একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন বিনতার সঙ্গে। তিনি ভট্টাচার্য্য পাবলিশিং কোং'র লোক। তিনি বললেন—সুবিমল বাবুর একখানা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অনেক দিন ধরে তাঁদের বিবেচনাধীন ছিল। এবার তাঁরা লেখাটি ছাপতে চান। লেখাটি সম্বন্ধে যদিও যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাঁদের মনে, তবু একটা 'চান্স' নিতে চান তাঁরা।

বিনতা প্রায় তাচ্ছিল্যের সুরেই বললে—বেশ ত!

যথারীতি লেখাপড়া হয়ে গেল। কয়েক দিন যেতে না যেতে আরও দু'খানা বইয়ের নতুন সংস্করণ বের করবার জন্যে আরও দুই জন প্রকাশক কোম্পানীর লোক এসে ধর্না দিল। বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে তাঁরা সব ঠিকঠাক করে গেলেন। বিনতা ভাবল, এরা সব এতদিন কি ঘুমিয়েছিল! যে উপন্যাসখানি সুবিমলের ছিল সব চাইতে প্রিয়—আজ চার বৎসর পরে তার খোঁজ পড়ল! বেচারা বেঁচে থাকলে দেখে সুখী হ'ত। মনের কোণে একটুখানি দাগ লাগল।

মাত্র দিন কুড়ির ভেতরে সুবিমলের সেই এত সাধনার লেখাটি—"মহাযাত্রা"—বাজারে বেরুল। চমৎকার ছাপা, চমৎকার বাঁধাই, সুনিপুণ শিল্পীর আঁকা প্রচ্ছদপট, শোভন সংস্করণ! প্রকাশকের লোক সঙ্গে সঙ্গে দশ-বার কপি এনে বিনতার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেমন, ভাল হয়েছে ত?

বিনতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—বেশ হয়েছে।

মঞ্জু ছোঁ মেরে মায়ের হাত থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বলল—বাবার বই, দেখি?

বইখানি বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মঞ্জু।

প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বইখানি বের হতেই কাগজে কাগজে বিশেষ ঘটা করে অশেষ প্রশংসাবাণী ছাপা হ'ল। দুই একজন বিশিষ্ট সমালোচক প্রায় বলে ফেললেন যে, এমন বই বাংলা ভাষায় দুর্লভ। নতুন করে বেঁচে উঠল সুবিমল—শুধু বেঁচে ওঠাই নয়, হৃত আসন ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আরও মাসখানেক পরে সেই প্রকাশক কোম্পানীর ভদ্রলোক পুনরায় এসে বিনতার সঙ্গে দেখা করলেন—হাসতে হাসতে হাজারখানেক টাকা বিনতার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—অবিশ্বাস্য ব্যাপার, বুঝলেন, এরই মধ্যে প্রথম সংস্করণের দু'হাজার বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন ভাগ্য বাংলাদেশের খুব কম লেখকেরই হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ করব আমরা, আপনার অনুমতি চাই। তার পর একটা মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে—বিনতার সম্মতি আদায় করে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

সেদিন বিকেল বেলা পাশের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে মঞ্জু দেখে তার মা বাবার যে বইখাতাপত্রগুলো সেদিন গাদা করে রেখেছিল, সেগুলো যত্ন করে গুছিয়ে রাখছে। মার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হবে মা?

—বইগুলো সব গুছিয়ে রাখি। দেখেছিস ত কত নাম হয়েছে ওঁর। আমরা ত জানি নে, এই দেখ মঞ্জু আরও একখানা উপন্যাস লিখে রেখে গেছেন—এইটিই হ'ল তাঁর শেষ লেখা।—মা আর মেয়ে দুই জনে হাত লাগিয়ে সুবিমলের ঘরে এনে বইগুলো আলমারীতে সাজিয়ে রেখে দিল।

সন্ধ্যাবেলা কড়া নড়ে উঠল। বিনতা ঝিকে বলল—দেখ ত নিরু কে?

—কে গা?

বাইরে থেকে অনিমেষ জবাব দিল—আমি, দরজা খোল।

বিনতা ইসারা করে ঝিকে কাছে ডেকে বলল—বল, আজ দেখা হবে না, আমার শরীর ভাল নেই। অনিমেষ জবাব শুনে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল।

মাস দেড়েক পরের কথা। সুবিমলের সেই প্রকাশক কোম্পানীর উদ্যোগে কলকাতার একটি নামকরা হলে ভাল করে সুবিমলের স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল বেলা গাড়ী করে বিনতা আর মঞ্জুকে সভায় নিয়ে আসা হ'ল। প্রচুর লোক হয়েছে সভায়—হলটিতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। সভাপতি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। মঞ্চের উপরে বিশেষ অভ্যর্থনা করে বিনতা ও মঞ্জুকে বসান হ'ল। মঞ্চের মাঝখানে সুবিমলের একখানা বড় অয়েল-পেন্টিং ছবি ফুলপাতা দিয়ে সাজান হয়েছে। চার-পাঁচ জন বক্তা অনেকক্ষণ ধরে সুবিমলের লেখার প্রশংসা করে বক্তৃতা করলেন। বিশেষ করে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "মহাযাত্রা" উপন্যাসখানি যে একটি যুগান্তকারী লেখা সে বিষয়ে সকলেই একেবারে নিঃসন্দেহ।

সভার শেষে বিনতা ও মঞ্জুকে সেই প্রকাশক কোম্পানীর দোকানে নিয়ে আসা হ'ল। সেখানে একজন নামকরা সিনেমা কোম্পানীর লোক অপেক্ষা করছিলেন। 'মহাযাত্রা' বইয়ের বাংলা ও হিন্দী ছবি করবার প্রাথমিক কথাবার্তা তাঁদের সঙ্গে হয়ে গেল, তাঁরা হাজারদশেক টাকা দিতে রাজী

হলেন। অবশেষে তাদের জলযোগ করিয়ে সেই ভদ্রলোক নিজেই গাড়ী করে পৌঁছতে এলেন। গাড়ীতে উঠে মঞ্জু বলল—মা, বাবার ছবি নেবে না ?

প্রকাশক কোম্পানীর ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বাবার ছবি নেবে ? দিচ্ছি এনে। বলে দোকানে ঢুকে সুবিমলের ছবিখানি এনে বিনতার হাতে দিলেন। বললেন, আমরা মনে করেছিলাম ছবিখানি আমাদের দোকানে টাঙিয়ে রাখব। তা আমরা আর একখানা করে নোব। স্ত্রী-কন্যা এঁদের দাবীই ত সর্ব্বাগ্রে।

পথে যেতে যেতে ভদ্রলোক অনেক কথা বললেন—দেখুন ত কত বড় সম্মানের অধিকারী আজ আপনারা—আপনি সুবিমলবাবুর সহধর্ম্মিণী! আমাদের একমাত্র দুঃখ যে আজ তিনি বেঁচে নেই, থাকলে কি সুখীই না হতেন!

গাড়ী থেকে নেমে ভদ্রলোক বিনতার ঘরে বসে আসল কথাটি পাড়লেন। বললেন—দেখুন ত খুঁজে পেতে, আর কিছু নতুন লেখা তাঁর আছে কিনা ? থাকলে, যাই হোক মোটা টাকা দিয়ে নিতে আমরা রাজী আছি। এখন সুবিমল বাবুর নামের জোয়ার এসেছে—এ জোয়ারের বেগে যা দেবেন তাই ভেসে যাবে। আছে কিছু ?

নতুন উপন্যাসখানার কথা বিনতা বললে। মহা উৎসাহে তিনি বললেন—কাল সকালেই তিনি আসছেন, সব কথা কালই পাকা করে নেবেন।

পাশের ঘর থেকে সুবিমলের মা চেঁচিয়ে উঠলেন—ও বৌমা, বৌমা ?

বিনতা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বলল—কি মা ডাকছেন কেন ? খুব কি কষ্ট হচ্ছে ?

—না, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?

জবাব দিতে গিয়ে বিনতার দু'চোখ ছলছল্ করে উঠল। বলল—ওঁর বইয়ের খুব প্রশংসা হয়েছে মা, সেই জন্যে সভা ছিল, সেই সভায় গিয়েছিলাম।

শাশুড়ীর গায়ে মাথায় খানিকটা হাত বুলিয়ে দিয়ে বিনতা তার ঘরে এসে দেখে—মঞ্জু তার বাবার ছবির সামনে চুপ করে বসে আছে। তার পর দুজনে মিলে ছবিটি টেবিলের উপরে সাজিয়ে রেখে পাশে কয়েকটি ধূপকাঠি জেলে দিল। রাত্রে মঞ্জু ঘুমুলে বিনতা তার বাক্স খুলে অনিমেষের ছবিখানি বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। পরে গলায় আঁচল জড়িয়ে সুবিমলের ছবিখানিকে প্রণাম করে মনে মনে বলল—আমাকে ক্ষমা কর, তোমায় আমি চিনতে পারি নি।

একখানি মুখ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

একখানি মুখ, মুখ নয় সে মুরতি
রং নয় যেন ঠিকরিয়া পড়ে জ্যোতি।
লাবণ্য নয় যেন আভাময় দেহ
দেবমন্দিরে প্রদীপ জেলেছে কেহ।
বিকীর্ণ হয় তাহার কনক-দ্যুতি
কথা নয় যেন পীযুষ পরিস্রুতি।
কর পল্লবে লতায় রূপের শিখা
চূর্ণ অলকে কি জানি কি যেন লিখা।
টেপা চিবুকের উপরে কৃষ্ণতিল
চোখের তারায় নিতল সিন্ধু নীল!
সে নীল সলিলে মৃদুল মেদুর ঢেউ
কমলের 'পরে কমল দেখেছ কেউ ?

মুখের কমলে চোখের কমল দুটি
করে ঢলঢল করে যেন ফুটি ফুটি।
কাজলের রেখা যেন ভ্রমরের সারি
হাসিতে ঝরিয়া পড়ে জ্যোছনার ঝারি।
পেলব কপোল আপেলের রঙে রাঙা
সরমে লালিম সদ্য ডালিম ভাঙা।
ভুরু নয় যেন ক্ষীণপাখা কালো পাখি
আড়ালিয়া আছে দুইটি শাবক আঁখি।
রূপ নয় যেন প্রতিমা চিত্রে আঁকা
তুলা নয় তার শরতের শশী রাকা
নয়ন ভরিয়া দেখিয়া ভরেছে বুক
দেখিতে পাব না আর তাই পাই দুখ।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৬

জ্যৈষ্ঠমাস, দেশের রূপ বদলে গেছে। ফাল্গুন-চৈত্রের মৃদু উত্তাপ এখন একটা প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। সূর্য্যোদয়ের পর থেকে একটা গরম হাওয়া পশ্চিম থেকে বইতে সুরু করে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের উত্তাপ বাড়তে থাকে, সারা দিন গাছ-পালা দুলিয়ে শুকনো পাতা আর ধুলো উড়িয়ে হু-হু করে বয়ে চলে, সন্ধ্যা হলে তবে সে পাগলা বাতাস থামে। গ্রামের মধ্যে জলাভাব ঘটেছে, অনেক কুয়ো শুকিয়ে গেছে, এক-আধটা কুয়োয় যা সামান্য জল আছে তাতে গ্রামের মানুষ ও পশুর পিপাসা কোন রকমে মেটে।

অরণ্যের এখন একটা ক্লান্ত-পিপাসিত রূপ। একটি-দু'টি জিয়ত ঝরণা ছাড়া দু'চার ক্রোশের মধ্যে যত জলের ডোবা সব শুকিয়ে গেছে। খুব ভোরে পাখীর ডাক শোনা যায়, তার পরে সব কণ্ঠ নীরব, আবার সন্ধ্যার মুখে দু'-চারটে ডাকে। এই রকম সময়ে একদিন নানকু বলল, "বাবু, আজ সকালে তিলসোতিয়ার ঝরণায় গিয়েছিলাম, দেখলাম অনেক জানোয়ার জল খেতে আসছে। মাচা বাঁধতে বলেন ত ব্যবস্থা করি।" আমি ত এরই জন্যে দিন গুণছিলাম।

চন্দন গাছের উপর আমাদের পুরানো মাচাটারই সংস্কার করা হ'ল। মাচাটা কিছু বড় করে পাতার পর্দা দিয়ে ভাল করে ঘেরা হ'ল। সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই বন্য জানোয়ার জল খেতে আসে, তাই বেলা থাকতে মাচায় এসে বসব ঠিক করলাম। সন্ধ্যার পরেও যাতে আমরা দেখতে পাই, সে জন্য শুক্লপক্ষ দেখে একদিন বিকেল চারটে নাগাদ মাচায় উঠে বসলাম। তখনও গাছের ডাল-পালা ঝাঁপিয়ে গরম হাওয়া বইছে, কিন্তু আমাদের কৌতূহলের মাত্রা এতই বেশী যে, গরমের কথা মনেও হ'ল না। প্রথম দু'এক দিন বড় জানোয়ার তেমন দেখতে পাই নি, তাতে তেমন লোকসান বোধও করিনি, কেন না এ কয়দিন আমি আর একটা ভারী মজার জিনিস দেখেছি। গ্রীষ্মকালে পিপাসিত পাখীর জল খাওয়া যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন তা কত সুন্দর। মাচায় বসে আমি যেমন বড় জানোয়ারের আগমন প্রতীক্ষা করতাম, তেমনি প্রতীক্ষা করতাম ছোট বড় পাখীদের আগমন। কাছাকাছি একটা গাছের ডাল থেকে এক জোড়া ঘুঘু উড়ে এসে জলের ধারে পাথরের ছায়ায় বসল—ডানাগুলি শ্লথ, প্রচণ্ড গরমে ছোট ছোট ঠোঁট ফাঁক করে হাঁপাতে লাগল। খানিক পরে এক পা দু পা করে ডোবার ধারে এসে মাথা নীচু করে জলে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল, তার পরে জলভরা ঠোঁট দুটি উঁচু করে গলা ফুলিয়ে ঢোক ঢোক করে জল খেতে লাগল। পিপাসা মিটে গেলে ধূসর পালা মেলে তারা উড়ে চলে গেল। অতি-পরিচিত শালিক এল। যে শালিক সারা দিন পাড়া মাত করে, যার কণ্ঠে কথা ফুরায় না, এই গরমে তারও কণ্ঠ নীরব, নিঃশব্দে জল খেয়ে উড়ে গেল। কত রকমের বুলবুলি এল, তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আমি জানি নে; নীলকণ্ঠ এল, উড়ে যাবার সময় ডানার নীচেকার নীল রং ঝলমল করে উঠল। আবার এল শিকারী বাজ, পাখীর বুকের রক্তে পেলে কি হয়, এরও জল না হলে পিপাসা মেটে না। ময়ূর, বনমোরগ এল সন্ধ্যার মুখে। এরা বোধ হয় সামাজিক পাখী, একা এল না, পাড়াপড়শীকে ডেকেডুকে নিয়ে এল।

গ্রীষ্মকালের প্রায় প্রতিদিনই মাচায় গিয়ে বসি এবং অরণ্যের সব রকম পশু-পক্ষীর দেখা পাই। হরিণ দিন থাকতে আসে না,

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে অতি সাবধানে আসে। শম্বর (স্থানীয় নাম সাম্বার) আসে, ডালওয়ালা প্রকাণ্ড শিং, গায়ের রং পাটকিলে, মস্ত চেহারা কিন্তু কি সাবধান, সন্দেহজনক আওয়াজ পেলেই বিদ্যুৎবেগে ছুটে পালিয়ে যায়। চিতরা (স্থানীয় নাম) আসে, শম্বরের চেয়ে ছোট, কিন্তু দেখতে শম্বরের চেয়ে সুন্দর, তার সারা গায় পাটকিলের উপর সাদা ফুটকি। কটোরী বা সোপরি (স্থানীয় নাম) আসে, পাটকিলে রং, আকারে খুবই ছোট, প্রায় ছাগলের মত, মাথায় ছোট ছোট শিং। সোপরী এ জঙ্গলে অসংখ্য, দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। হরিণ চুমুক দিয়ে জল খায়, তাই অন্ধকারে সে যখন জল খায় তখন কাছে থাকলেও টের পাওয়া যায় না। এ অরণ্যের হিংস্র পশু হচ্ছে বাঘ (রয়েল বেঙ্গল ও চিতে), ভাল্লুক, হায়না ও হুড়ার (নেকড়ে বাঘ)। বাঘের জল খাওয়ার কোন বাঁধাধরা সময় নাই, পেটে খাদ্যদ্রব্য পড়লে সে যখন-তখন জল খেতে আসে। ভাল্লুক দিনান্তেই জল খেতে আসে, হায়নাও তাই। ভাল্লুক চুমুক দিয়ে নিঃশব্দে জল খায়, কিন্তু সে যখন আসে তখন মোটেই সাবধানে আসে না, নিঃশব্দে চলা তার স্বভাব নয়, দশজনকে জানিয়ে সে পথ চলে। অপর পক্ষে বাঘ নিঃশব্দে চলা-ফেরা করে কিন্তু জল খাবার সময় ধরা পড়ে যায়, কেন না জিব দিয়ে চক্ চক্ আওয়াজ করে সে জল খায়। এক দিন বিকেলে মাচায় ওঠবার জন্য জলের কাছে এসেছি, দেখি এক জোড়া নেকড়ে জলে গা ডুবিয়ে আরাম করে বসে আছে, আমাদের দেখে উঠে চলে গেল। মাংসাশী জানোয়ারের মধ্যে নেকড়ে সবচেয়ে ছোট হলেও বোধ হয় সবচেয়ে হিংস্র। একবার এদেশের লোক নেকড়ের উৎপাতে কতখানি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, সে কথা পরে লিখব।

মাচায় বসে যে সব দৃশ্য আমি দেখেছি তার মধ্যে দুটি দৃশ্য এমন করুণ যে, এ জীবনে তা ভুলতে পারব না। একদিন একটা রয়েল বেঙ্গল জল খেতে এল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। পাঁজরের হাড় বেরিয়ে গেছে, কি শীর্ণ তার দেহ। দেখলাম সামনের একখানা পা তার জখম। জল খেয়ে মাথাটি নীচু করে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকল, তার পরে যেমন ভাবে ধীরে ধীরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছিল তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে চলে গেল। কোন শিকারীর গুলীতে ওর পা-খানা নিশ্চয়ই এমন জখম হয়েছে যে, শিকার ধরে খেতে পারছে না, অনাহারে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছে। দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী যে বাঘ, যাকে দেখলে মাচায় বসেও বুক কেঁপে ওঠে, সেই বাঘের কি অসহায়, করুণ মূর্ত্তি! আমি জানি অপটু, ভীরু শিকারীদের এই সব অপকীর্ত্তি। তাদের বাঘ মারবার সখ আছে কিন্তু সাহস ও শিক্ষা নেই, বাঘ দেখলে এদের বুক ও হাত দুই-ই কাঁপে, তাই বেশীর ভাগ সময়ে গুলী বাঘের গায় লাগে না; আবার যখন লাগে তখন জখম হয়—বাঘ মরে না। সত্যিকার যারা শিকারী তারা আহত বাঘকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করে মেরে ফেলে, কিন্তু তথাকথিত শিকারীর সে সাহস ও যোগ্যতা থাকে না।

আর এক দিন বিকেলের দিকে মাচায় বসে আছি এমনসময় শুনতে পেলাম দূরে অসাবধানে পা ফেলে কি যেন একটা জানোয়ার তাড়াতাড়ি আসছে। শুকনো পাতার উপর যেমন ভাবে পা পড়ছে তাতে মনে হ'ল বড় জানোয়ার, হয় ত ভাল্লুক, খুসীতে ভরপুর হয়ে নাচতে নাচতে আসছে। আর একটু বাদেই তাকে দেখতে পেলাম, সে বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়, হরিণ নয়, হায়না নয়, সে একটি মেয়ে—ছুটতে ছুটতে আসছে, মাথায় আঁচল নাই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে, কচি মুখখানা শুকনো। তার ভাব দেখে মনে হ'ল সে জলের সন্ধানে আসে নাই, পথ চলতে চলতে হঠাৎ জল পেয়ে খুশী হয়ে গেছে। নালায় নেমে সে আঁজলা ভরে ভরে জল খেতে লাগল, কত প্রচণ্ড তার পিপাসা, ডোবার সবটা জলই যেন সে খেয়ে ফেলবে। জল খাওয়া শেষ হলে সে আবার ছুটে চলে গেল। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, যখন সম্বিত ফিরে এল তখন মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। কেন যে মেয়েটি এমনভাবে একা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। নানকুকে প্রশ্ন করতে সে বলল, "আহা, বেচারা শ্বশুরঘর থেকে পালিয়ে নাহিরা (বাপের বাড়ী) যাচ্ছে।" নানকুকে আর বেশী বলতে হ'ল না, আমি সব বুঝতে পারলাম, এদেশের পারিবারিক জীবনের একটা বিষময় দিক মুহূর্ত্তে আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল। পুত্রবধূকে কষ্ট দেয় এ অপবাদ আমাদের দেশের শাশুড়ীদের আছে। কিন্তু এই অপবাদ যে কতখানি সত্য, তা আমি এদেশে এসে বুঝেছি। জানিনে কোন কারণে, এদেশের শাশুড়ী ছেলের বৌকে এমন অমানুষিক কষ্ট দেয় যে, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। মারধর ত করেই, তা এদেশের মেয়েরা সইতেও পারে, কিন্তু পেটে খেতে না দিয়ে যখন পশুর মত খাটায় তখনই হয় অবস্থা মর্ম্মান্তিক। আমার চেনা সুস্থ-সবল সুন্দর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে যখন বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে তখন তাকে দেখে আমি অনেক সময় চিনতে পারি নি, হাড় গেছে বেরিয়ে, চোখ গেছে বসে, মুখ শুকনো, তেলহীন চুল রুক্ষ। আবার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আসাই কি সহজ? বাপ-ভাই বারে বারে ফিরে যাচ্ছে, শাশুড়ী বৌকে নাহিরা যাবার হুকুম দিচ্ছে না। এই অবস্থায় অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছোয় তখন কোন কোন মেয়ে পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। আজ আমি তাদেরই একটিকে দেখলাম, গভীর অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যা লেগে আসছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই, পথ সে জানে না, হয় ত এইটুকু জানে যে, তার বাপের বাড়ী পূবদিকে, তাই পূবদিকে ছুটে চলেছে। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল, নানকুকে প্রশ্ন করলাম, "চেন ওকে নানকু—তোমার গাঁয়ের মেয়ে নাকি?" মাথা নেড়ে নানকু বললে, 'না বাবু চিনিনে, তবে ওর চলা দেখে মনে হ'ল আমাদের গাঁ চেনে, সেইখানেই যাচ্ছে।" ভাবলাম তা যদি হয় তা হলে ভাল, রাত্রে আশ্রয় ত পাবে।

৭

হাজারীবাগের অরণ্য বিশেষ করে বাঘের জন্তে বিখ্যাত। প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে শ্রীচৈতন্তদেব ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। এই হাজারীবাগেরই প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ঝাড়খণ্ডের বন্তজন্তসমাকুল অরণ্যপথ সম্বন্ধে লিখেছেন—

নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র-হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥

পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র সেথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্রমৃগী মিলি চলি মহাপ্রভুর সাথ॥

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণবলে নাচে মত্ত হঞা॥

দেখতে পাচ্ছি দু'চারশ বছরেও ঝাড়খণ্ডের রূপ বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নি, বাঘ, শূয়োর, হরিণ, ময়ূর এখনও প্রচুর আছে, হস্তী ও গণ্ডারের অবশ্য অভাব ঘটেছে। আজকালও এদেশের জঙ্গল বাঘের লীলাভূমি, পথ চলতে পাঁচ-সাতটা না হলেও দু-একটা বাঘের সঙ্গে হামেশা দেখা হয়।

এখানকার অরণ্যবেষ্টিত গ্রামের লোকেরা বাঘকে শত্রু হিসেবে দেখে না, প্রতিবেশী হিসেবে দেখে। সাধারণতঃ বাঘ মানুষের ক্ষতি করে না, অরণ্যে যদি প্রচুর খাদ্য থাকে তা হলে সে গরুমোষ ইত্যাদি পালিত পশুকেও আক্রমণ করে না। মানুষ দেখলে বড়-ছোট সব বাঘই পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। মানুষ যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এটা বোধ হয় বাঘ-ভালুকেও টের পায়। তবে অরণ্যে খাদ্যের অভাব ঘটলে বাঘ পালিত গরু-মোষ মারে। এ ত আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি, আমি যখন প্রথম হাজারীবাগে আসি তখন অরণ্য গভীর ছিল, বাঘের খাদ্য হরিণ-শূয়োর ইত্যাদির অভাব ছিল না, গরু-ছাগলের জন্তে গ্রামের আশেপাশে বাঘ ঘুরত না। কিন্তু আজকাল অরণ্য কমে গেছে, হরিণ-শূয়োরও কমে গেছে, যে দু'-চারটে বাঘ এখনও এখান থেকে ডেরা তোলে নি তারা পোষা গরুটা মোষটা মেরে কোনরকমে দিন গুজরান করে। এই সব গরু-মোষ-মারা বাঘ মানুষের ক্ষতি করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, মানুষের হাতে তাদের মরতে হয়। অল্পদিন আগের ঘটনা বলছি, একটা চিতে বাঘ কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের অনেক গরু মেরে ফেলে। প্রায় প্রতিদিন একটা করে গরু কোন বাঘই মারে না, অথচ এই বাঘটার যেন কিছুতেই পেট ভরে না, তার রোজই একটা করে গরু চাই। বিকেলের দিকে ঘরে ফেরবার সময় যে গরু জঙ্গলে পিছিয়ে পড়ে তার আর রক্ষা থাকে না। গাঁয়ের লোকেরা এই উৎপাতে ভয়ানক বিব্রত হয়ে উঠল, শেষে বাঘটাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রত্যেক গ্রামেই লাইসেন্সবিহীন গাদাবন্দুকধারী শিকারী আছে, লুকিয়ে হরিণ-শূয়োর মারাই তাদের কাজ, দরকার হলে বাঘও তারা মারে। আমাদের গাঁয়ের শিকারী রঘু মহতো একদিন দুপুরে এসে বলল, "বাবু, পাহাড়ের কোলে বাঘ মরি (kill) করেছে, চলুন বিকেলে সেখানে গিয়ে বসি।" জানোয়ার মারা আমার পছন্দ নয়, তবু এক্ষেত্রে বাধা দিতে পারলাম না, যে বাঘ মানুষের ক্ষতি করতে সুরু করেছে, তার সপক্ষে ওকালতি করা চলে না। এই অসাধারণ বাঘটাকে দেখবার আমার খুব ইচ্ছে হ'ল তাই রঘুর সঙ্গে যেতে রাজী হলাম। বিকেলের আগে আমরা মরির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মরির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম কিন্তু শুকনো পাতা আর কাঁকরের উপর পায়ের দাগ বিশেষ দেখতে পেলাম না। তবু যা দেখলাম তাতে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল। কাছাকাছি মাচা করবার উপযোগী গাছ ছিল না, তাই মাটিতে বসবার আয়োজন করতে হ'ল। মাটিতে বসতে হলে বাঘ কোনদিক দিয়ে কোন পথে আসবে সেটা আন্দাজ করে উল্টো দিকে বসতে হয়, তা না হলে বাঘ পেছন থেকে এসে শিকারীর টিকি ধরে টান দিতে পারে। রঘু মহতো হুঁশিয়ার লোক, সে এসব আতঘাত জানে, ডালপালা দিয়ে একটু আড়াল করে সে বসবার জায়গা ঠিক করে নিল। অল্প লোক বিদেয় করে আমরা দুজনে বসলাম। জ্যৈষ্ঠমাস, খুব গরম, পাহাড়ের আড়ালে তখনও সূর্য্য ঢলে পড়ে নি। চুপ করে বসে আছি, অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের ছায়া এসে পড়ল আমাদের উপর। সময় হয়ে আসছে জেনে আমরা উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে সামনের একটা ঝোপের আড়াল থেকে সন্তর্পণে বাঘ বেরিয়ে এল, আর আমি যা সন্দেহ করেছিলাম দেখলাম তা ঠিক, সঙ্গে তার দুটি নবরকান্তি বাচ্চা। এইবার বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঘিনীর পেটে যখন বাচ্চা ছিল তখন তার পক্ষে ছুটোছুটি করে শিকার ধরা খুবই মুস্কিল হয়ে পড়েছিল, তাই বাচ্চা হয়ে গেলে যখন সে হাল্কা হ'ল তখন দীর্ঘ উপবাসের পরে সুযোগ পেলেই গরু মারতে লাগল। এ ঠিক খাবার জন্তে মারা নয়, শিকারের আনন্দে মারা। আমার চোখে বাঘিনী এখন নিরপরাধ, কিন্তু রঘু মহতোর চোখে ত নয়, রঘু তাই বন্দুক তুলে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগল। আমি পাশে বসে এই হত্যাকাণ্ড দেখতে লাগলাম। বাঘটা মরা গরুর পাশে এসে দাঁড়ালো, বাচ্চা দুটি খাবার দেখে আনন্দে লাফঝাঁপ দিতে লাগল, সে একটা দেখবার জিনিস। হঠাৎ রঘু গুলী করল, বাঘিনী মাটিতে ঢলে পড়ল, এক গুলীতেই শেষ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্তে বাচ্চা দুটোকে আমি সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলাম।

একবার বড় বাঘের সঙ্গে বাচ্চা দেখেছিলাম, সে এক মজার ব্যাপার। শীতকালে এ দেশের বনের ধারে তিলের ক্ষেতে হরিণ নামে। এ কথা শুনে আমার এক বন্ধু ধরে বসলেন হরিণ শিকারে নিয়ে যেতে হবে। আমি আপত্তি করলাম, "হরিণ দেখতে চাও ত সঙ্গে করে দেখিয়ে নিয়ে আসি, কিন্তু মারতে পারবে না।" বন্ধু তাতেই রাজী হলেন, তবে সঙ্গে বন্দুক রাখবার অনুমতি চাইলেন। আমি তাতে আপত্তি করলাম না। জ্যোৎস্না রাত না হলে হরিণ দেখা যাবে না। তাই শুক্লপক্ষ দেখে একদিন বন্ধুকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। পাহাড়ের কোলে অনেক তিলের ক্ষেত, খুঁজে পেতে একটা ফাঁকা জায়গায় তিলের ক্ষেত পেলাম, তারই পাশে ঢাকো (ডালপালা দিয়ে তৈরি ছোট ঘর) তৈরি করতে বললাম। সঙ্গে লোকজন ছিল, ঢাকো তৈরি হয়ে গেল। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে সারারাত সেখানে কাটাতে হবে বলে ভিতরে ভাল করে খড় বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা সন্ধ্যার মুখে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে গিয়ে বসলাম। দেখতে দেখতে অরণ্য জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেল। লোকালয় বহু দূর, মানুষের সাড়াশব্দ নেই, নিঝুম রাত, জ্যোৎস্না-ধৌত বনানীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বন্ধু ত গুন গুন করে গান ধরে দিলেন। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল, হরিণ আসবার সময় হয়ে গেল, আমরা উদগ্রীব হয়ে বসে আছি এমন সময় তিলক্ষেতের একধারে একটা চিতবার শিংওয়ালা মাথা দেখা গেল। ধীরে ধীরে হরিণটা কাছে এগিয়ে এল, তার পেছনে দেখলাম আরও কয়েকটা হরিণ চরছে। আমরা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম, হরিণের পাল চরতে চরতে এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যেতে লাগল। খানিক পরে তারা অনেক দূরে চলে গেল, আর দেখা গেল না। এইবার আমরা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাবার আয়োজন করছি, এমন সময় ঢাকো থেকে প্রায় ৬০ ৭০ হাত দূরে মাঠের মধ্যে একটা ছোট গোছের জানোয়ার এসে উপস্থিত হ'ল। বন্ধু তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে নিয়ে আমার কানে কানে বলেন, "দেখেছ হায়না, ওটাকে মেরে আমার বন্দুকের হাত দেখিয়ে দিচ্ছি।" বন্ধুর হাত থেকে বন্দুক নিয়ে বললাম, "বোধ হয় ওটা হায়না নয়, ভাল করে দেখি আগে।" জানোয়ারটা একটু এগোয় আবার দাঁড়ায়, পেছন থেকে দেখে তাকে চেনা যাচ্ছে না। একবার সে একপাশে মাথা ফেরাতেই চিনতে পারলাম, ওটি যে সে জীব নয়, অরণ্যরাজ্যের রাজকুমার, রয়েল বেঙ্গলের বাচ্চা। ধোঁয়া দেখলে যেমন বহ্নির অবস্থিতি বুঝতে পারা যায়, বাঘের বাচ্চা দেখে বুঝতে পারলাম তার মা খুব কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে। বন্ধুকে সাবধান করে দিয়ে চুপ করে বসলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, একটু পরেই দেখলাম মন্থর গতিতে চলেছে বাঘিনী, প্রকাণ্ড শরীর, জ্যোৎস্নালোকে চিক্কন দেহখানি ঝকমক করছে। বন্ধু এবার আর বন্দুক তুললেন না, কম্পমান হাতে তোলাও সম্ভব ছিল না, আমি অভয় দিয়ে বললাম, "ভয় পাবার কিছু নাই, বাঘের নাকে এখন হরিণের গন্ধ, মানুষের গন্ধ পাবে না। ধীরে ধীরে মা ও ছেলে মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

যে দেশে সাপ বেশী সে দেশে সাপের পুজো প্রচলিত আছে। এদেশে যে বাঘের পুজো হয় তা আমি জানতাম না, কেমন করে জানতে পারলাম তা বলছি। একবার আমার কিছু ভাল শাল-কাঠের দরকার হয়েছিল, এক ছুতোর মিস্ত্রী খবর আনল পাহাড়ের ওপাশে স্থানীয় জমিদারের জঙ্গলে গাছ আছে। বড় গাছ, ভাল কাঠ বেরুবে। মিস্ত্রীকে নিয়ে একদিন বিকেলে গাছ দেখতে চললাম। বেঁটেখাটো টাকমাথা আধাবয়সী জানকী মিস্ত্রী বেশ রসিক লোক, কথায় বার্তায় পথ চলতে লাগলাম। মাইল পাঁচেক রাস্তা, দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গাছের কাছে পৌঁছে গেলাম। গাছ দেখে জমিদারের সঙ্গে কথা কয়ে আমরা যখন বাড়ীর পথ ধরলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। পাহাড়ের কোল দিয়ে পথ। আমরা দুজনে বেশ তাড়াতাড়ি চলে প্রায় অর্দ্ধেক পথ এসে পড়েছি এমন সময় দেখি সামনে পথের এক পাশে বসে আছে এক বিরাট রয়েল বেঙ্গল। স্থানটা ভয়াবহ, চারিদিকে শাল জঙ্গল, একপাশে খাড়া পাহাড়। আচমকা বাঘ দেখে আমরা দুজনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাঘ আমাদের দেখতে পেয়ে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলল, লেজের ডগাটা একবার নেড়ে নির্লিপ্ত ভাবে বসে রইল। পরিস্থিতি মোটেই প্রীতিকর নয়, ভাবছি নিঃশব্দে পেছোবো কি না, এমন সময় জানকী হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে—পথের উপর ভক্তিভরে মাথা ঠুকতে লাগল আর বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। এইবার আমি ভয় পেয়ে গেলাম, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে বাঘ হয়ত আমাদের অগ্রাহ্য করত কিন্তু তার সামনে বসে অঙ্গভঙ্গী করা মানে তাকে ঘাড় মটকাবার জন্যে আমন্ত্রণ করা। জানকীকে ফেলে সরে যেতেও পারি নি, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ড দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ এই ভাবে কাটল জানিনে হঠাৎ বাঘ বিরাট হাই তুলে উঠে দাঁড়াল তার পরে লম্বা লেজটাকে উঁচু করে পাশ ফিরে মন্থর গতিতে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। জানকী তখনও ভক্তিভরে মাথা ঠুকছে। আমি দেখলাম আর দেরি করা উচিত নয়, জানকীকে টেনে তুলে কানে কানে বললাম, বাঘ সরে গেছে, চল পালাই এবার। চোখ মেলে জানকী বলল, চলে গেছেন, তা যাবেন বৈকি। তাড়াতাড়ি খানিকটা দূর এসে হাঁপ ছাড়লাম। জানকীর কিন্তু ভারি নিশ্চিন্ত ভাব। রহস্য বুঝে উঠতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি জানকী, বাঘ দেখে তুমি পথের উপর মাথা ঠুকতে লাগলে কেন?" জানকী হেসে বললে, 'তাই ত বেঁচে গেলাম বাবু, তা না হলে উনি কি আজ ছেড়ে দিতেন!' বাঘকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উনি আপনি বলা শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম বললাম, 'বিষয়টা খুলে বল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" জানকী বলল, "উনি বনের দেবতা কি না, তাই ওঁকে প্রণাম করছিলাম।" প্রশ্ন করলাম, "আর বিড় বিড় করে কি বলছিলে? জানকী বলল, 'বলছিলাম, হে দেবতা,

হে প্রভু, হে মহারাজ আমি তোমার ভক্ত, আমার পথ ছেড়ে দাও।" বললাম, "তাতেই কি উনি পথ ছেড়ে দিলেন?" জানকী হেসে বলল, "হ্যাঁ বাবু, তাই উনি পথ ছেড়ে দিলেন। আমি যে বাঘাওং ভকত।"

"বাঘাওং ভকত" মানে বাঘের ভক্ত বা বাঘের পূজারী। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানলাম যে, জানকীর পরিবারে বহুকাল আগে একজনকে বাঘে মেরেছিল। পরবর্তীকালে যাতে আর অমন দুর্ঘটনা না ঘটে সে জন্যে পরিবারের একজন বাঘদেবতার পূজারী হয় এবং বংশপরম্পরায় পূজারীর ধারা বজায় রাখে। এই রকম বাঘাওং ভকত অরণ্যপ্রদেশের অনেক গ্রামেই আছে। পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদিতে বাঘাওং ভকতের উপর বাঘদেবতার ভর হয়, তখন সে বাঘের মত গর্জন করে, লাফ মেরে চলে। এদের বিশ্বাস, যে পরিবারে বাঘাওং ভকত আছে সে পরিবারের কাউকে কখনো বাঘে মারবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জানকী সেদিন নির্ভয়ে বাঘের সামনে দণ্ডবৎ হয়েছিল। বাঘও যে ভক্তকে পথ ছেড়ে দিলেন তা ত নিজের চোখেই দেখলাম। যারা ভক্তি-মার্গের লোক নন তাঁরা অবশ্য বলবেন, বাঘ সেদিন ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে পথ ছেড়ে দেয় নাই, পেটে খিদে না থাকলে বাঘ প্রাণী হত্যা করে না বলে এবং বিশেষ করে মানুষকে সে যথেষ্ট সমীহ করে বলে পথ ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিন আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল বলেই যে বাঘ মানুষ মারে না একথা তো সত্যি নয়। তবে যে অনুপাতে বাঘ শক্তিশালী সে অনুপাতে সে খুবই কম মানুষ মারে। মানুষখেকো বাঘ (man-eater) অবশ্য অনেক সময় খুবই উৎপাত করে, কিন্তু সে বাঘ সচরাচর দেখা যায় না। কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে বাঘ মানুষখেকো হয়। আমি এদেশে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মধ্যে বার দুই মানুষখেকো বাঘের উৎপাতের কথা শুনেছি। আবার জঙ্গলে বাঘ মানুষ মেরেছে আমি নিজে কখনো তা দেখি নি, তবে বাঘ শিকার করতে গিয়ে শিকারী বাঘের হাতে মরেছে এমন ঘটনা জানি। বাঘকে উত্যক্ত করলে অনেক সময় বাঘ আক্রমণ করে ও মানুষকে ঘায়েল করে, এইভাবে ঘায়েল লোক আমি অনেক দেখেছি। এখানকার অরণ্যে ঘোরাফেরা করলে পথের ধারে এক-এক জায়গায় স্তূপাকার পাথর দেখা যায়। যে জানে না, সে ভাবে কেউ হয় তো কোন কাজের জন্যে পাথর জমা করে রেখেছে, কিন্তু আসলে এ সব হচ্ছে স্মৃতিচিহ্ন, বহুকাল আগে এই সব জায়গায় বাঘে মানুষ মেরেছিল। দেশীয় রীতি অনুসারে পথিক এই পথে চলবার সময় একখানা করে পাথর ওখানে ফেলে দিয়ে গেছে এবং কালক্রমে পাথর জমে স্তূপে পরিণত হয়েছে। এমন স্তূপে আমিও পাথর ফেলেছি।

বাঘ অরণ্যের সম্রাট; শক্তিতে, সাহসে আকারে তার সমকক্ষ জানোয়ার নেই কিন্তু হিংস্র স্বভাবের জন্য এদেশের হুড়ার (নেকড়ে বাঘ) বাঘের চেয়েও বিখ্যাত। নেকড়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং প্রত্যেক জোড়ার শিকার-ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট পরিধি থাকে। নেকড়ে যুগল যতক্ষণ পৃথকভাবে নিজেদের পরিধির মধ্যে চলাফেরা করে ততক্ষণ তারা বাছুরটা ছাগলটা মেরে মানুষের ক্ষতি করে, মানুষ কখনো মারে না। কিন্তু যেদিন থেকে তারা নিজের নিজের পরিধি ছেড়ে যথেচ্ছ চলাফেরা শুরু করে, দল বাঁধতে শুরু করে, সেদিন থেকে তারা মানুষের আতঙ্ক হয়ে ওঠে। কেন দল বাঁধে সে কথা বলা মুস্কিল। অনেকের মতে আপন আপন পরিধির মধ্যে খাদ্যের অভাব ঘটলেই এরা দল বাঁধে। এই দলবদ্ধ নেকড়ে চলবার পথে যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে। গাঁয়ের কাছে এলে এরা গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া তো মারেই, ছোট ছেলে-মেয়ে ও একা পেলে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষকেও মেরে ফেলে। আজ এখানে, কাল সেখানে এমনি ভাবে এরা বিভীষিকার মত ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলে বাঘ আছে জেনেও মানুষ জঙ্গলের পথে রাতদিন চলাফেরা করে, কিন্তু হুঁড়রাড়ি (দলবদ্ধ নেকড়ে) হলে গ্রামের লোক পথ চলে না, হাটবাজারে যায় না, ছেলেমেয়ে ঘরের বার হয় না, জীবনযাত্রা যেন অচল-অসাড় হয়ে যায়। ১০ ৬ সনে এদিকে এই রকম নেকড়ের উপদ্রব হয়েছিল। গবর্ণমেণ্ট তখন নেকড়ে পিছু পঁচিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বহু নেকড়ে মারা যাবার পর উৎপাত কমে গিয়েছিল।

আমি ও আমার এক বন্ধু একবার নেকড়ের দলের সামনে পড়েছিলাম। বন্ধুটি বিদেশী জমিদার, মাঝে মাঝে কাঠের ব্যবসাও করেন। সে সময়ে এক জঙ্গলে তাঁর শালগাছ কাটা হচ্ছে ও ষ্টেশনে চালান হচ্ছে। একদিন আমরা কাজ দেখতে জঙ্গলে গেলাম। দেখাশুনো শেষ করে ফেরবার সময় ষ্টেশনযাত্রী কাঠ-বোঝাই এক গরুর গাড়ীর উপরে চড়ে বসলাম। খানিকটা দূর আসবার পর বনের মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম দুটো নেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছুটা এগিয়ে দেখি আশেপাশে আরও নেকড়ে দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ী এগোয় আর নেকড়ের দল চক্রাকারে গাড়ীর চারিদিকে ঘোরে। গাড়োয়ান তো কাঁপতে সুরু করল। মুখে সাহস দেখালেও ভিতরে ভিতরে আমরাও বেশ কম্পমান। যতক্ষণ গাড়ী বনের মধ্যে থাকল ততক্ষণ নেকড়েগুলো একই ভাবে গাড়ীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চলল। খোলা মাঠে এসে পড়তেই তারা পিছিয়ে পড়ল, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বন্ধুর মতে গাড়ীতে স্তূপাকার কাঠবোঝাই ছিল বলে এ যাত্রা আমরা বেঁচে গেলাম। নেকড়ের দৃষ্টিতে কাঠের গাদাটা নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত ঠেকেছিল।

[ক্রমশঃ

ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা

শিবনাথ শাস্ত্রী

৩০-৯-৮৮

আজ আমি সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসার নিউম্যান মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। আমার জন্ম সার্থক। আমি এই সকল চিরস্মরণীয় ব্যক্তিকে দেখিলাম ও ইঁহাদের গৃহে অতিথি হইলাম। কি নির্ম্মল সাধুতা, তামাক খান না, সুরাপান নাই, নিরামিষাশী, জ্ঞানানুরাগী—সকল প্রকার সাধু অনুষ্ঠানের সহায়।

রামমোহন রায়ের জীবন অনুধ্যান করিয়া যে ভাব হৃদয়ে প্রবল হইয়াছিল, ইঁহাকে দেখিয়া সেই ভাবটি হৃদয়ে আজও প্রবল হইতেছে। আমি এত দিন যে জীবন কাটাইয়াছি, তাহা বালকের ক্রীড়া বোধ হইতেছে। জ্ঞানে রুচি, সাধুতাতে নিষ্ঠা, কর্ম্মে উৎসাহ এই প্রকৃত মানব জীবনের লক্ষণ। আমি অতি চঞ্চল ভাবে এইগুলিকে অবলম্বন করিয়াছি। এই মহাত্মাদের পদচিহ্ন অনুবর্ত্তন করিয়া ধীর ভাবে আবার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িতে ইচ্ছা হইতেছে। নিজের অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ক্লেশ হইতেছে।

প্রার্থনা

প্রভো, দীনবন্ধো! আমাকে প্রকৃত জীবনের পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর।

১-১০-৮৮। West Super Mare

আজ ওয়েষ্টন হইতে 'ষ্ট্রীট' গ্রামে ইম্পেদের বাড়ীতে যাইব ও সেখানে থাকিব। তিন দিন থাকিব। প্রফেসার নিউম্যানের সাধু-সহবাসে দুই দিন যাপন করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছি। এইরূপ বৃদ্ধাবস্থা কি আমার হইবে? এই দুই দিনে যে কত বিষয়ে কথা হইয়াছে, তাহা সব লিখিয়া রাখা যায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন বিষয় নাই, যে বিষয়ে চিন্তা করেন নাই। এইরূপ জীবনই সার্থক জীবন। ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া আমি আমার অজ্ঞতা যেরূপ অনুভব করিয়াছি, এমন আর পূর্ব্বে করি নাই। আমার বয়স ৪১ বৎসর, এখন আমার উদ্যমের সময়, শিখিবার সময়, নূতন নূতন জ্ঞানের রাজ্য অধিকারের সময়, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার জ্ঞানস্পৃহা মন্দীভূত হইয়াছে। বাঙালী একটু বড় হইলেই যে রোগে ধরে, সেই রোগ যেন আমাকে ধরিয়াছে। জীবনটা ইহারই মধ্যে যেন একঘেয়ে ও একপেশে হইয়া যাইতেছে। ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া বহুমুখীন জ্ঞানের সুখ ও সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছি।

আমার জ্ঞানস্পৃহা যে মন্দীভূত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। জ্ঞানচর্চ্চার অভাবের প্রধান কারণ, সময়ের প্রকৃত ব্যবহার করিবার শক্তির অভাব। পাঠ, নির্জ্জন চিন্তা, জ্ঞানালোচনার সময় রাখা হয় না। সমুদায় সময় সমাজের কাজে, হট্টগোলে যায়। আমার ইংলণ্ড যাত্রায় আর কিছু উপকার না হউক, যদি সময়ের প্রকৃত বিভাগ ও সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি জন্মে তাহা হইলেও অনেক উপকার। দেখা যাউক, কিরূপ দাঁড়ায়।

প্রফেসার নিউম্যান কৃপা করিয়া আমাদের সমাজের লোকের ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী প্রায় ৪৪০ খানা দান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আমাদের রবিবার সামাজিক উপাসনায় পড়িবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

ক্লিফটন্ হইতে আসিবার দিন মিঃ হার্বার্ট টমাস আপনা হইতে আমাকে পাঁচ পাউণ্ড দিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার নিজের ব্যবহারের জন্য। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ কিছু দিলে আমি প্রত্যাখ্যান করি না, সুতরাং আমি তাহা লইয়াছি। কিন্তু আমার নিজের ব্যয়নির্ব্বাহ এক প্রকার হইয়া যাইবে। ট্রিবনারদের নিকট হইতে কিছু পাইতে পারি, তাহাতে সাহায্য হইতে পারে। এই পাঁচ পাউণ্ড মিশনের কাজে যায় মিষ্টার টমাসের তাহা ইচ্ছা নহে, আমি ব্যবহার করি এই ইচ্ছা। অতএব এক কর্ম্ম করা যাইবে: এই পাঁচ পাউণ্ডে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত ক্রয় করিব। সেগুলি আমার নিজস্ব থাকিবে, অথচ তাহা পাঠ করিয়া আমি যে উপকার পাইব, তদ্দ্বারা সমাজও প্রচুর উপকৃত হইবে। আমাদের মেসেঞ্জার তত্ত্বকৌমুদী ক্রমে পুরাতন 'সাণ্ডে মিরর' ও 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র মত হইতেছে—ধর্ম্মভাবের কিছু বাড়াবাড়ি। এত আধ্যাত্মিক ভাব পাইলে আধ্যাত্মিক অজীর্ণরোগ জন্মে। লেখকদিগের মধ্যে কাহারও নানা প্রকার বিষয় পড়িবার অভ্যাস নাই। সকলেই কেবল নিজের inner consciousness হইতে বিষয় বাহির করিয়া লেখেন, এই জন্যই এরূপ হয়। প্রফেসার নিউম্যান বলিলেন যে, এই জন্যই তিনি 'মেসেঞ্জার' ভালবাসেন না।

প্রার্থনা

প্রভু হে! আমাকে তোমার উপর বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিতে শিক্ষা দেও। আমার জ্ঞানস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত কর, তোমার অমৃতজলে আমাকে প্রতিপালন কর।

৫-১০-৮৮ লণ্ডন

গতকল্য লণ্ডনে আসিয়াছি। কয়েকদিন কাজ ফেলিয়া যাওয়াতে যদিও ক্ষতি হইয়াছে, আবার এখন উৎসাহের সহিত কাজ করিতে পারিব। তদুপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়াছি। আর্থিক সম্বন্ধেও লাভবান হইয়া আসিয়াছি। মিসেস নিউম্যান Groves এর জীবনচরিত একখানা দিয়াছেন। মিস এইলিন জন ব্রাউনের

জীবনচরিত দিয়াছেন। মিস ক্যাথারিন ইম্পে George Fox-এর Journal দুই ভল্যুম দিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পবিত্র সহবাসে যে উপকৃত হইয়াছি, সামান্য আর্থিক উপকার তাহার কাছে কিছুই নয়। বিশেষতঃ ইম্পেরা আমার মন কাড়িয়া লইয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া পরের বাড়ী বলিয়া একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই। ক্যাথারিণ মেয়েটি কি! এইরূপ মেয়ে আমাদের দেশে তৈরী হওয়া চাই।

প্রফেসার নিউম্যানের বাড়ীতে এবং ইম্পেদের বাড়ীতে দেখিলাম যে, প্রতিদিন একটু করিয়া বাইবেল পড়িবার রীতি আছে। প্রফেসার নিউম্যান বাইবেল পড়ার পর, তাঁহারই প্রণীত প্রার্থনা-পুস্তক হইতে একটি করিয়া প্রার্থনা পড়িয়া থাকেন। ইম্পেদের বাড়ীতে দেখিলাম তাঁহারাও প্রতিদিন একটু করিয়া বাইবেল পড়েন এবং আহারের সময় ঈশ্বর স্মরণ করিয়া থাকেন। এই প্রথাটি অতি উত্তম। আমিও অনেক দিন উপাসনার পূর্ব্বে মহর্ষির ব্যাখ্যান বা বাইবেল পড়িবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া দেখিয়াছি তদ্দ্বারা অনেক উপকার হয়।

এবার দেশে ফিরিয়া গিয়া আমার বাড়ীতে নিত্য উপাসনার পূর্ব্বে একটু করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে হইবে, কিন্তু ঠিক আমাদের মনের মত কোন গ্রন্থ নাই যাহা হইতে অসঙ্কোচে পড়িতে পারা যায়। খ্রীষ্টান, কি হিন্দু, কি মুসলমান—যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে যাই, এমন কিছু কিছু আসিয়া পড়ে, যাহা বাদ দিয়া পড়িতে হয়। এই একটা বড় মুস্কিল। অনেক দিন মনে করিয়াছি যে, উপাসনার পূর্ব্বে পড়িবার উপযুক্ত বচনাবলী সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া একখানা বই করিব; এইজন্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার সঙ্কলিত খ্রীষ্টীয় বচনাবলী আনিয়া রাখিয়াছি—কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকাতে এই অভীষ্টটি সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এবারে ষ্টীমারে যাইবার সময় একমাস সময় পাইব, সেই সময় এইরূপ একখানি গ্রন্থের সূত্রপাত করিতে হইবে। Conwayর প্রণীত Sacred anthology ধরণে করিতে হইবে। দেশে পৌঁছিয়া এক মাসের মধ্যে ছাপাইয়া লইতে পারা যাইবে। অন্ততঃ আমার পারিবারিক উপাসনার সাহায্যার্থ একটা কিছু করিয়া লইতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহাকে বাড়াইতে পারা যাইবে।

জ্ঞানে রুচি, মানবে প্রেম, সদনুষ্ঠানে অক্লান্ত উৎসাহ, উপাসনাতে গাঢ় নিষ্ঠা—যে ধর্ম্মজীবনে এইগুলির সমাবেশ, সেই ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষতঃ আমার পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিগত সপ্তাহে এই বিশেষ ভাবটি হৃদয়ে প্রবল হইয়াছে।

প্রার্থনা

প্রভো, তুমি আমাকে কত স্থানে লইয়া কত শিক্ষা দিতেছ। সকলি তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য; তোমারই ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে সুদৃঢ়রূপে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এইরূপ কর।

৫-১০-৮৮। মধ্যাহ্ন।

জয়কালীর জন্য Forsyth's Differential Equations কিনিতে গিয়া পথে আসিতে আসিতে একটি চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইল:

ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কাজের জন্য এবং আমার পারিবারিক ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তার জন্য Church History, Leckie's History of European Morals; Great Saying of Great men কিনিয়া লইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন Socialist ও Secularistদিগের Literature কতকগুলি কিনিয়া লইতে হইবে। আমরা যে নূতন সমাজ গঠন করিতে যাইতেছি তাহার সম্মুখপথে কি কি আছে, তাহার জ্ঞান আবশ্যক; এই জন্য এই জাতীয় গ্রন্থ পড়া আবশ্যক। ষ্টীমারে যে একমাস থাকিব তাহার মধ্যে এই সব পড়িয়া ফেলিতে হইবে।

৭-১০-৮৮।

দুই দিন হইতে St Francis of Assissiর জীবনচরিত পড়িতেছি। আশ্চর্য্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আশ্চর্য্য ধর্ম্মানুরাগ! আজ প্রাতে পড়িতে পড়িতে দেখিলাম যে, St. Francis যখন রোমে পোপের নিকট এগার জন শিষ্য সঙ্গে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আনিতে গেলেন, তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নূতন আশ্রমকে অঙ্গীভূত করা যাইবে কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। ইহা ১২০৮ খৃষ্টাব্দের কথা হইবে; সে সময়ে San Pavlo নামে একজন বিজ্ঞ Cardinal রোমে থাকিতেন। তিনি বলিলেন যে, এই নবাগত তাপসদিগকে গ্রহণ করা উচিত। তদনুসারে তাঁহারা গৃহীত হইলেন। গ্রন্থকর্ত্রী Mrs Oliphant এ বিষয়ে রোমীয় সমাজের কার্য্যপ্রণালী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: "If it is of God, it will stand" said wise Gamaliel in an older age. "But if it is of god and stands, let holy church have the good of it" has always been the sentiment of Rome.

ইহা পড়িতে পড়িতে স্মরণ হইল যে, Ignatius Loyolaকে গ্রহণ করিবার সময়ও রোম এই ভাবে কার্য্য করিয়াছিল। বাস্তবিক এই আশ্চর্য্য উদারতা থাকাতেই রোমীয় সমাজ-দেহ বিভিন্ন আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয় নাই। Unity in things essential, liberty in things non-essential and charity in all things এই উদার ভাব অবলম্বন করিয়া রোম চিরদিন কার্য্য করিয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যখন অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ ও সম্প্রদায় সকল স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিগত প্রাধান্যের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, তখন রোম সমুদায় বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন সমাজ-সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া এক অদ্ভুত ধর্ম্মবিধান জগতে দণ্ডায়মান রাখিয়াছে।

ইহা হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। আমরা অল্পদিনের মধ্যে কত ভাগ হইয়া গেলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই দশ বৎসর মাত্র বয়সের মধ্যে গোঁসাইজী ও অগ্নিহোত্রীর ন্যায় লোক হারাইলেন। এরূপ হইতেছে কেন? দুইটি কারণে: (প্রথমতঃ, আমরা ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন—ইহার মধ্যে ধর্ম্মজীবনের মূল্য অধিক বলিয়া অনুভব করিতেছি না। হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্মদিগের জীবন ও ধর্ম্মভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সামান্য মতভেদের জন্য তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে বলিয়া আমরা ক্ষোভ করি ও তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি, আমরাও যদি মতভেদের জন্য লোককে নির্ব্বাসিত করি, আমাদিগকেও সেই ভ্রমে পড়িতে হয়। আমাদিগকেও কতকগুলি মূল মত রাখিতে হইবে, তাহাতে যাহার মিলন তিনি আমাদের সঙ্গে, অপরাপর মতে যতই প্রভেদ থাকুক না তিনি আমাদের সঙ্গে। আমাদের বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় কারণ আমরা পরস্পরের সহিত কোথায় মিলি, তাহা অনুসন্ধান করা অপেক্ষা কোথায় গরমিল আছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হইয়াছি।

এই দুইটি ভাব নিবারণ করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজ গড়িবে না, টুকরা টুকরা হইতে থাকিবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাবী কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দুইটি ভাব আনিতে হইবে। (১ম) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যেখানে যিনি যাহা করিতেছেন, তাহাকে আপনার ক্রোড়ে আনিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে।

(২য়) মূল মতে একতা, অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ও সকল বিষয়ে উদারতা এই ভাবটি কার্য্যে অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহার নিয়মতন্ত্র-প্রণালী এই উদার ভাব অবলম্বনের সম্পূর্ণ অনুকূল। কেবল আমাদিগকে এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে।

১-১০-৮৮।

গতকল্য সায়ংকালে Mr Benson নামক এখানকার একজন ভদ্রলোকের সহিত Belles Isle নামক এক পাড়ায় শ্রমজীবী-দিগের এক সভায় গিয়াছিলাম। ১৬ বৎসর হইল মিঃ বেনসন ও আরও কয়েকজন একত্র হইয়া শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য এই প্রচারালয়টি খুলিয়াছেন। প্রথমে ৪০ ৪২ জন লইয়া আরম্ভ হয়, এখন পুরুষ-রমণীতে সহস্রাধিক হইবে। মিঃ বেনসন ইটালীয়ান ব্যাঙ্কে কাজ করেন, কোন ধর্ম্মসমাজ হইতে নিযুক্ত নহেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কাজে জীবন দিতেছেন। কল্য তিনি যে উপদেশ দিলেন, তাহা শুনিতে শুনিতে একটি কথা মনে হইতে লাগিল।

আমাদের উপদেশাদি লক্ষ্যবিহীন ক্রিয়ার ন্যায় হইতেছে। কোন একটি বিশেষ ভাব সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিবার দিকে দৃষ্টি নাই। আচার্য্যগণেরও কোন বিশেষ সত্য বা ভাবের দিকে দৃষ্টি নাই। কোন দিন কি বলিব তাহা স্থির নাই, দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন সত্য-বিশেষে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নাই। যেদিন যেমন ভাব আসে তাহাই বলা যায়। একজন যদি কিছু গড়েন আর একজন দ্বারা তাহা ভাঙিয়া যায়। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিতেছে না। আমাদের নিজের জীবনেই ইহার শক্তি কাজ করিতেছে না ত, বাহিরে কি কাজ করিবে? এবার হইতে আমাকে কাজ করিবার নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে Lessons-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির সাধু-মহাজনদিগের উক্তি হইতে Lessons সংগ্রহ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উপাসকমণ্ডলীর অধিকাংশ যোগ দিতে পারেন, এমন গাথা সকল রচনা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মজীবনের বিশেষ বিশেষ অঙ্গসকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ দিতে হইবে।

এই সকল ধর্ম্মভাবকে সাধুজীবনের সাহায্যে সাধন করিতে হইবে। পারি যদি, ষ্টীমারের এক মাসের মধ্যে, এক বৎসরের মত Lessons ও উপদেশের বিষয় স্থির করিয়া রাখিতে হইবে।
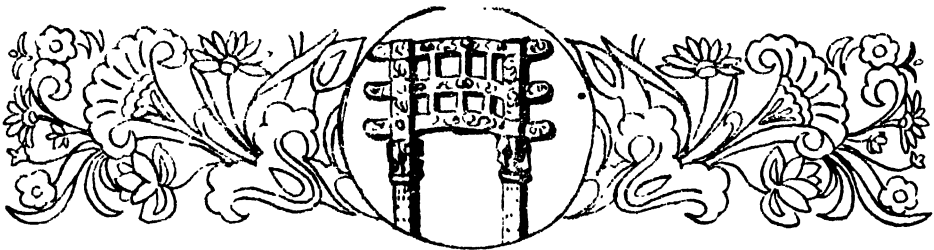
মন্দিরময় ভারত গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

যোগেশ্বরী ও এলিফ্যান্টা

৬

দু বছর বোম্বাই কাটাই। প্রতি রবিবারেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ভ্রমণে বের হই। কোন দিন জুহুতে সমুদ্রে স্নান করে, আর সমুদ্র-সৈকতে পায়চারি করে কাটাই, কোন দিন খারের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ করে, কোন দিন মেরিন ড্রাইভের জনারণ্যে ধাক্কাধাক্কি করে, কোন দিন চৌপাটিতে বেড়িয়ে, আবার কোনদিন মালাবারের শীর্ষদেশে ঝোলান উদ্যানে শুয়ে বসে। কিন্তু আমাদের বোম্বাইয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ উর্লির সমুদ্র-সৈকত আর মহালক্ষ্মীর মন্দির।

এই উর্লিতে এলেই দেখা যায় আরব সাগরের স্বরূপ। উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ভীষণ গর্জ্জনে ছুটে আসে আরব। আসে অমিত বিক্রমে, তীরের উপলখণ্ডের উপরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিরামহীন এই আসা-যাওয়া। নাই সাগরের এই উদ্দামতা বোম্বাইয়ের অন্য কোন সমুদ্র-সৈকতে—নাই নারিকেলবীথি-বেষ্টিত জুহুতে,নাই প্রাসাদে-ঘেরা মেরিন ড্রাইভে, নাই অর্দ্ধমুক্ত চৌপাটিতেও। অপরূপ উর্লির রাত্রির রূপ। সম্মুখে উদ্দাম উন্মুক্ত নীল আরব, ছুটে অনন্তের পানে, দিগন্তে গিয়ে মেশে, শোনা যায় তার গর্জ্জন, কানে চলে আসে তার অন্তরের ধ্বনি। তার বুকের উপর এক প্রশস্ত সিমেণ্ট-বাঁধান পথ, বিস্তৃত হয়ে আছে মাইল খানেক পরিধি নিয়ে। তার পিছনে পীচের প্রশস্ত রাজপথ বুকে নিয়ে উজ্জ্বল নিওন বাতি। প্রতিফলিত হয় বাতির সবুজ আলো নীল তরঙ্গের বুকে। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর, শোভন, ফুলে ভরতি প্রাঙ্গণে বেষ্টিত অট্টালিকাশ্রেণী, বাসস্থান বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের তারকাদের, সৃষ্টি করে এক রহস্যলোক—এক স্বপ্নপুরী।

অতুলনীয় মহালক্ষ্মী। বুকে নিয়ে আছে মহালক্ষ্মীর সমুদ্র-সৈকত ছোট বড় উপলখণ্ড, বিস্তৃত হয়ে আছে কিছি মাইল পরিধি নিয়ে। উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে ছুটে আসে আরব সাগর, আসে প্রমত্ত বিক্রমে, উন্মত্ত আবেগে। আসে দিগন্তের ওপার থেকে। প্রতিহত হয় এসে সেই উপলখণ্ডের উপর। বিচ্ছুরিত হয় শীকর তরঙ্গে আর শিলার সঙ্ঘাতে। প্রবাহিত হয় জলবিন্দু লক্ষশত ধারায়, প্রসারিত হয় সর্পিল-গতিতে। সৃষ্টি হয় কত অসংখ্য রূপালী, দ্রুতগামী সর্প উপল-খণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে। রচিত হয় কত ক্ষুদ্র জলাশয়ও। আমরা একের পর এক প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করে উপনীত হই এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষদেশে। বসে বসে দেখতে থাকি সাগরের অপরূপ বিচ্ছুরণ। দেখি মুগ্ধ হয়ে তার ভয়াল প্রমত্ত রূপ। দেখি তরঙ্গ আর শিলার সঙ্ঘাত, দেখি জলকণার শোভা। ক্রমে আসে জোয়ার, বর্দ্ধিত হয় সাগরের প্রচণ্ডতা, বাড়ে তরঙ্গের আকৃতি আর

এলিফ্যান্টা : মহাদেব

সমুদ্রের ভীষণতাও। তলিয়ে যায় জলের নীচে চারিপাশের অপেক্ষাকৃত নীচু শিলাখণ্ড, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। অর্দ্ধনিমজ্জিত হয় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও। তরঙ্গের বিচ্ছুরিত জলবিন্দুতে ভিজে যায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ। আমরা পরিত্যাগ করে আসি সেই উপলখণ্ড। ফিরে আসি তীরে, নিমজ্জিত আর অর্দ্ধনিমজ্জিত উপলখণ্ডের শীর্ষদেশে পা ফেলে, অতি কষ্টে। প্রণতি জানিয়ে আসি উন্মত্ত সাগরকে। তাকিয়ে দেখি নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই প্রস্তরখণ্ডও নিমজ্জিত হয়েছে সমুদ্রের অতলতলে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে সৈকতের সমস্ত শিলাও, লুপ্ত হয়েছে সাগরের জলের অন্তরালে। স্পর্শ করেছে সমুদ্রের জল সোপানশ্রেণীর পাদদেশ। এমন সময় শোনা যায় আরতির ঘণ্টা। কানে আসে ঢাকের বাদ্যও।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই শৈলমালার অধিত্যকায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণে বেষ্টিত হয়ে মহালক্ষ্মীর সুন্দর মন্দির। এই মন্দিরটি স্থাপন করেন বিশ্ববিখ্যাত যশস্বী ক্রিকেটপারদর্শী বিজয় মার্চেন্টের পূর্ব্বপুরুষেরা। মহাআড়ম্বরে পূজিতা হন এই মন্দিরের সুবর্ণ-বর্ণা দেবী মহালক্ষ্মী। স্বর্ণনির্ম্মিত তাঁর অঙ্গ। মহা জাগ্রতা এই দেবী, তাই আসে এখানে যাত্রী, সমাগত হয় দলে দলে, আসে হাজারে হাজারে। আমরাও মন্দিরের সংলগ্ন দোকান থেকে ফুল ও নারিকেল কিনে নিয়ে ভক্তিভরে দেবীর পূজা করি। পূজান্তে প্রসাদ নিয়ে বাসায় ফিরি।

সেদিন ছিল রবিবার। মেঘমুক্ত আকাশ, সকালে উঠেই চায়ের টেবিলে বসে কোথায় যাওয়া যাবে এই নিয়ে আলোচনা সুরু হয়—মহালক্ষ্মী না উর্লি। কন্যা বলে, পুরোনো হয়ে গিয়েছে মহালক্ষ্মী, উর্লি'র প্রতিও তার কোন আকর্ষণ নাই। বলে, চল না আজ যোগেশ্বরী দেখে আসি। অতি উত্তম প্রস্তাব। দেখা হবে একটি নূতন জায়গা, আগে দেখি নাই। বোম্বাইয়ের কাছাকাছি সবগুলি গুহামন্দিরও দেখা হবে, অবশিষ্ট থাকবে না একটিও। তাই রাজী হয়ে যাই কন্যার প্রস্তাবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে যোগেশ্বরী অভিমুখে রওনা হই। মাতুঙ্গায় গিয়ে ট্রেনে চড়ে ব্যান্দ্রে গাড়ী বদল করে এক ঘণ্টার মধ্যেই যোগেশ্বরীতে পৌঁছাই।

ট্রেন থেকে নেমে অতিক্রম করতে হয় আরও এক মাইল পথ, যেতে হয় পদব্রজে। দু'পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত, দিগন্তে গিয়ে মেশে। তার মাঝখান দিয়ে অপ্রশস্ত মাটির পথ, যায় বঙ্কিম গতিতে। আমরা অতিক্রম করি ধীরে সেই পথ। মাঝে মাঝে অতিক্রম করতে হয় হোগলা বনও। কোথাও বা বর্ষার প্লাবন বয়ে যায় রাস্তার বুকের উপর দিয়ে, সৃষ্টি হয় পথের বুকে ক্ষুদ্র কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। উল্লম্ফনে অতিক্রম করতে হয় সেই তরঙ্গিনী। আবার কোথাও ভিন্ন হয় পথ স্রোতস্বিনীর প্রবল গতিতে। রুদ্ধ হয় চলার গতি।

অতিকষ্টে পার হয়ে যাই সেই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন স্থান। উপনীত হই অপর পারে। অবশেষে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই।

নির্ম্মিত হয় এই গুহামন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে। নির্ম্মাণ করেন মহাপরাক্রমশালী রাষ্ট্রকূট রাজারা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা দাক্ষিণাত্যের আর দক্ষিণ ভারতের।

পতন হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্য্যাবর্ত্তে। সার্ব্বভৌম আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ হয় বাংলার শশাঙ্কের, থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধনের আর কনৌজের যশোধর্ম্মনের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠিত হয় দুইটি মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে। পল্লবেরা কাঞ্চীতে, দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রদেশে স্থাপন করেন চালুক্যরাজ বংশের প্রথম পুলকেশী ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাইয়ের বিজাপুর জেলায় বাতাপি (বর্ত্তমান বাদামি)তে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। অনুরূপ সাতকর্ণী ও বৈজয়ন্তীর কদম্বের, মানব গোত্রীয় এই চালুক্যরা। পরিচিত হারীতি পুত্র নামেও। কেউ বলেন উদ্ভূত তাঁরা অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে। বিন্ধ্য অতিক্রম করে, তাঁরা দাক্ষিণাত্যে এসে বসতি স্থাপন করেন।

পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মণ ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অধিরোহণ করেন পিতৃসিংহাসনে। অধিকার করেন তিনি কানাড়া আর কোঙ্কন, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। তার ভাই মঙ্গোলেশ রাজত্ব করেন ৫৯৭ থেকে ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে কলচারি রাজা। রত্নগিরি আসে চালুক্যের অধিকারে।

অলঙ্কৃত করেন চালুক্য সিংহাসন ৬০৯ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিবর্ম্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমসাময়িক রাজাদের মধ্যেও। পরাজিত হন উত্তর কানাড়ার কদম্ব রাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজ', কোঙ্কনের মৌর্য্যরাজ। আনুগত্য স্বীকার করেন তাঁর কাছে মালব আর গুজরাটের অধিবাসীরা। পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্ম্মণও পরাজিত হন। চোল কেরল আর পাণ্ড্য রাজাও নতি স্বীকার করেন। প্রতিরুদ্ধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণও।

তিনি পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর রাজসভায় রাজদূত প্রেরণ করেন। আবদ্ধ হন তাঁরা সখ্যতার বন্ধনে। পরিদর্শন করেন রাজসভা চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ। তাঁর প্রশংসায় মুখরিত হয় তাঁর লেখনী, লেখা আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী আইহোলীর শিলালিপিতেও। কিন্তু ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্ম্মণের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রুদ্ধ হয় তাঁর বিজয়ের অভিযান। বাতাপি আসে কিছুদিনের জন্য পল্লবদের অধিকারে।

তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব নরসিংহ বর্ম্মনকে পরাজিত করে, তাঁর রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। আবার দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত হন চোল, কেরল আর পাণ্ড্যরাজারাও।

রাজত্ব করেন একে একে বিনয়াদিত্য আর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। পাণ্ড্য ও চোল রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। করেন মালাবার উপকূলের অধিবাসীরাও। পরাজিত হন তাঁর কাছে পল্লব রাজা। ব্যাহত হয় সিন্ধুবিজেতা আরবদের

গুজরাট আক্রমণও। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তিনি, নির্ম্মিত হয় রাজধানী। বাতাপিতে এক সুন্দরতম মন্দির কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরের অনুকরণে।

দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মন শেষ রাজা এই বংশের। রাজত্ব করেন ৭৪৭ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকুট দন্তিদুর্গ অধিকার করেন চালুক্য সিংহাসন। অস্তমিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভাব দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রে, সুরু হয় রাষ্ট্রকুট শাসন, রাষ্ট্রকুট প্রতিপত্তি। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবলপ্রতাপে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলে দীর্ঘ দ্বিশত বৎসরেরও বেশী। হন সার্ব্বভৌম সম্রাট।

দন্তিদুর্গই স্থাপন করেন এই রাজবংশ। মহাভারতের যদু বংশ তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ। কেউ বলেন রাষ্ট্রীকদের বংশধর তাঁরা, ছিলেন তেলেগু কৃষিজীবী, অধিবাসী কর্ণাটকের। পরে চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজা মহাক্ষমতাশালী এই দন্তিদুর্গ। চালিত হয় তার সামরিক অভিযান কাঞ্চীতে, মহাকোশলে, মালবে আর দক্ষিণ গুজরাটে।

মহাপরাক্রমশালী তাঁর ভাই প্রথম কৃষ্ণও। অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকুট সিংহাসন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্যরাজা চতুর্থবর্দ্ধন, মহীশূরের গঙ্গরাজাও, তিনিই নির্ম্মাণ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির এলোরার কৈলাসনাথ।

রাজত্ব করেন একে একে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ আর ধ্রুব। পরাজিত হন তাঁর কাছে মহীশূরের গঙ্গরাজা। মহীশূর আসে রাষ্ট্রকূটের অধিকারে। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন কাঞ্চীর পল্লবরাজ। বিতাড়িত হন রাজপুতনার মরুভূমিতে গুর্জ্জর প্রতিহাররাজ বৎস রাজা। প্রবেশ করে তাঁর বিজয়ের অভিযান আর্য্যাবর্ত্তেও, নতি স্বীকার করেন তাঁর কাছে বাংলার ধর্ম্মপাল। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বর্দ্ধিত হয় রাষ্ট্রকুট প্রতিপত্তিও।

অলঙ্কৃত করেন তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকুট সিংহাসন ৭৯৩ থেকে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। পরাজিত করেন পল্লবরাজ দন্তিবর্ম্মনকে। দমন করেন মহীশূরের বিদ্রোহ। পরাজিত হন তাঁর কাছে গুর্জ্জর প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, বাংলার ধর্ম্মপাল আর তাঁর আশ্রিত কনৌজ রাজ চক্রায়ুধ। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে বিন্ধ্যপর্ব্বত থেকে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে।

তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষ। রাজত্ব করেন ৮১৪ থেকে ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্যরাজা। লেখা আছে শিলালিপিতে, বিস্তৃত হয় তাঁর অধিকার বাংলায় আর বিহারেও। রচয়িতা তিনি রত্নমালিকা নামক ধর্ম্মগ্রন্থের, পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যের আর ধর্ম্মেরও। মান্যখেটে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। আরব দেশীয় পর্য্যটক সুলেমানের মতে তিনি ছিলেন পৃথিবীর চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম, সমপর্য্যায়ে পড়তেন তিনি চীনের সম্রাট, বাগদাদের খালিফা ও রোমের সম্রাটের।

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যুর পর। কীর্ত্তিহীন তিনি।

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৫ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। প্রবল পরাক্রমশালী তিনিও। পরাজিত হন তাঁর কাছে কনৌজের গুর্জ্জর প্রতিহার রাজা।

রাজত্ব করেন একে একে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ আর তৃতীয় অমোঘবর্ষ। কীর্ত্তিহীন তাঁরাও, তাঁদের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে প্রশমিত হয় রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা এবং প্রাধান্য।

তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকুট সিংহাসন ৯৩৯ থেকে ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে প্রতিহার রাজা মহীপাল। কালঞ্জর আর চিত্রকুট আসে রাষ্ট্রকূটের অধিকারে, পরাজয় স্বীকার করেন পল্লব, পাণ্ড্য ও চোল রাজাও। আবার বাড়ে রাষ্ট্রকুট ক্ষমতা। বাড়ে রাষ্ট্রকুট প্রতিপত্তিও।

মৃত্যু হয় তৃতীয় কৃষ্ণের। হীনবল হতে থাকেন রাষ্ট্রকুট, অস্তমিত হতে থাকে তাঁদের ক্ষমতা। শেষে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে। পরাজিত হন শেষে রাষ্ট্রকুট রাজা কর্ক, চালুক্য বংশের দ্বিতীয় তৈলের কাছে। আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভুত্ব দাক্ষিণাত্যে।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রাষ্ট্রকুট রাজারাও। মন্দির দিয়ে সাজান তাঁদের রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। বুকে নিয়ে ছিল এই সব মন্দির শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, নিয়ে ছিল অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম সম্ভার। তাঁরাই নির্ম্মাণ করেন এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৈলাস, নির্ম্মিত হয় গুহামন্দির যোগেশ্বরীতে আর এলিফ্যান্টাতেও, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিসম্ভার।

পরিচিত এই চালুক্য বংশ কল্যাণের চালুক্য নামে। বাতাপির চালুক্য রাজবংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈল স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য কল্যাণে, দ'দশ শতাব্দীর শেষভাগে। মহাপরাক্রমশালী এই তৈল। তাঁর কাছে পরাজিত হন রাষ্ট্রকুট রাজা, হন মালবের অধিপতি পরমার বংশের মুঞ্জও। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী মান্যখেটে।

তার পর একে একে রাজত্ব করেন সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় জয়সিংহ আর সোমেশ্বর ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

মহাপরাক্রমশালী সোমেশ্বরও, তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন মালব ও চোলের অধিপতি। পরাজিত হন কাঞ্চীর বেদিরাজ, কর্ণদেবও। বাড়ে রাজ্যের সীমানা।

তাঁর পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। অধিরোহণ করেন কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। রাজত্ব করেন ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরাজিত হন তার কাছে চোল রাজা কুলতুঙ্গ। বাংলার কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে। বিদ্যোৎসাহী তিনি।

অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা। বিক্রমাঙ্ক চরিত প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন আর মিতাক্ষরা রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর।

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কালচুরি বিজ্জল অধিকার করেন সমস্ত চালুক্য রাজ্য। প্রতিষ্ঠিত হয় লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় তাঁর রাজত্বকালে।

অবশেষে গড়ে উঠে চালুক্যভূমে তিনটি মহাশক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য—দেবগিরিতে যাদব, বরঙ্গলে কাকতীয় আর মহীশূরে দ্বার-সমুদ্রে হোয়সল।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা চালুক্য রাজারা, কল্যাণের চালুক্যরা আর মহীশূরের হোয়সলেরাও গড়ে উঠে দাক্ষিণাত্যের দিকে দিকে, চালুক্যভূমে, মহীশূরে অসংখ্য মন্দির, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন খীলজির সেনাপতি কাফুর জয় করেন একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল ও দ্বার সমুদ্র। চালুক্যভূম ও মহীশূর দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধিকারে আসে। সংহারের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসেন মুসলমান বিজেতা। ধ্বংসে পরিণত হয় কত মহিমময় সুবিশাল মন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, কত অমূল্য সম্পদ অঙ্গে নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন স্থপতির বহু শত বৎসরের সাধনার দান। লুপ্ত হয়ে যায় একেবারে।

নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটি, অস্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ মহাযান ক্ষমতা ভারতে, প্রশমিত হয় যখন তাঁদের সংস্কৃতি, তাঁদের কৃষ্টি, প্রবল হয় আবার হিন্দুধর্ম, পুনর্জীবিত হয় হিন্দু স্থাপত্য। তাই অধিকার করে আছে এই মন্দিরটি একটি বিশিষ্ট স্থান ভারতের গুহামন্দিরের ইতিহাসে।

শৈব গুহামন্দির, অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব। রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে ক্রুশের আকৃতিতে। ক্রুশাকারে নির্ম্মিত হয় সভাগৃহের শীর্ষদেশও। আছে এই মন্দিরে একাধিক প্রবেশ-পথও, সমপর্য্যায়ে পড়ে এলিফ্যান্টার শৈবমন্দির, গণেশ গুম্ফার। অনুরূপ এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির ডুমারলেনারও। কিন্তু বিস্তৃততর এর পরিকল্পনা, বৃহত্তর এর পরিধি। বিভিন্ন এর পরিকল্পনা অন্য বৌদ্ধ গুহামন্দির থেকে। পৃথক এর নির্ম্মাণ-পদ্ধতিও, স্থাপিত হয় নাই বৌদ্ধ মূর্ত্তি মন্দিরের প্রান্তদেশে, নিবদ্ধ নয় শুধু একটিমাত্র প্রবেশ-পথে।

আমরা পূর্ব্বদিকের অর্দ্ধভগ্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। উপনীত হই একশ কুড়ি ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে। দাঁড়িয়ে আছে অলিন্দটি আটটি সুন্দর স্তম্ভের উপর। দাঁড়িয়ে আছে এক এক পাশে চারটি স্তম্ভ। অনুরূপ এলিফ্যান্টার স্তম্ভের। অঙ্গে নিয়ে ছিল এই স্তম্ভগুলি সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, শোভিত ছিল তাদের শীর্ষদেশও অনবদ্য, অনুপম মূর্ত্তিসম্ভারে। শোভিত ছিল অলিন্দের স্তম্ভের পিছনের (গ্যালারির) মঞ্চের প্রাচীরের গাত্রও অনুপম মূর্ত্তিসম্ভার দিয়ে। মূর্ত্তি দিয়ে রচিত ছিল কত কাহিনী, কাহিনী কত পুরাণের। কিন্তু বিলুপ্ত হয়েছে সেই শিল্পসম্ভার, বিকৃত হয়েছে মূর্ত্তিসম্ভারও কালের কবলে, হয়েছে নিশ্চিহ্ন।

অলিন্দ আর কক্ষ অতিক্রম করে আমরা একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হই। দেখি দুই পাশে দুইটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দাঁড়িয়ে আছে পৃথক হয়ে। খুব সম্ভব রাখা হয়েছিল এই দুইটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপত্যের জন্য। কিন্তু সময় হয় নাই স্থপতির তাদের অঙ্গ শিল্পসম্ভারে সাজাবার, হয় নাই সুযোগ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা আরও একটি অলিন্দে পৌঁছাই। বৃহত্তর এই অলিন্দটি। অনুরূপ আকৃতিতে আর নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে প্রথম অলিন্দের। বুকে নিয়ে আছে আটটি স্তম্ভ ও মঞ্চ। শোভিত হয়ে আছে স্তম্ভের অঙ্গ, মঞ্চের প্রাচীরের অঙ্গ ও অনবদ্য মূর্ত্তিসম্ভারে।

আছে এই অলিন্দে তিনটি প্রবেশ-পথ। যুক্ত হয় অলিন্দ মন্দিরের প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে। দেখি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে, অলিন্দের প্রাচীরের অঙ্গের মূর্ত্তিসম্ভার। দেখি স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারও। দেখি মুগ্ধ হয়ে, প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশের অনুপম মূর্ত্তিসম্ভারও।

দ্বিতীয় অলিন্দ অতিক্রম করে একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে এক প্রশস্ত চতুষ্কোণ সভাগৃহে উপনীত হই। পঁচানব্বই স্কোয়ার ফুট এই সভাগৃহটি। দাঁড়িয়ে আছে কুড়িটি সুষ্ঠু গঠন স্তম্ভের শ্রেণীর উপর, অনুরূপ এলিফ্যান্টার স্তম্ভের আকৃতিতে আর গঠনে। রচিত হয় সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার এই স্তম্ভগুলির অঙ্গেও। ভূষিত হয় তাদের শীর্ষদেশও প্রকৃষ্টতম, নিরুপম শিল্পসম্ভার দিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহের চতুর্দ্দিক গলিপথ।

সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশাকার গর্ভগৃহ। আছে তাতে চারিটি দ্বার, যুক্ত হয় দ্বার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। বিরাজ করেন সেখানে শিবলিঙ্গ, বিগ্রহ এই মন্দিরে। ভূষিত হয় গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য শিল্পসম্ভারে আর সুন্দরতম মূর্ত্তিসম্ভারে। অবলুপ্ত হয়েছে শিল্পসম্ভার, বিলুপ্ত হয়েছে মূর্ত্তিসম্ভারও কালের নির্ম্মম হস্তে, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত গুহামন্দিরটি একটি সুবিস্তৃত সমতল অধিত্যকার উপর। পরিধি তার আড়াই শত ফুট, বৃহত্তম পরিধি ভারতের গুহামন্দিরের। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটির লুপ্ত গৌরবের নিদর্শন, প্রতীক এক অতীত গৌরবময় ইতিহাসের, অঙ্গে নিয়ে আছে বিকৃত, বিলুপ্ত আর অর্দ্ধবিলুপ্ত সুন্দরতম সৃষ্টির। দেখে হতাশায় আর ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয় অন্তঃকরণ, বিমর্ষ হয় মন।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে। ফিরে আসি সঙ্গে নিয়ে আসি এক অসন্তোষের গ্লানি, এক মর্ম্মবেদনা।

৭

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস বোম্বাইতে থাকি, মাতুঙ্গার অধিবাসী। সান্ধ্যভ্রমণে দাদরে বন্ধুবর বেদারের বাসায় যাই। বন্ধুপত্নীর বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি এক খ্যাতিমান চিত্র-

পরিচালকের গৃহিণী। তিনি বলেন, দেখেন নাই তিনি এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দির, আমরাও দেখি নাই। সেদিন ছিল শনিবার, স্থির হয় পরের দিনই এলিফ্যাণ্টা দেখতে রওনা হব।

বোম্বাই বন্দর থেকে ৬ মাইল দূরে এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ, ছিল নাকি একটি সুবিশাল হস্তীমূর্তি, দ্বীপের অবতরণ স্থলে। তাই এলিফ্যাণ্টা নামে খ্যাতিলাভ করে এই দ্বীপ। সারা দ্বীপ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, মাঝখানে তার এক উপত্যকা, বুকে নিয়ে আছে পর্ব্বত একটি সুন্দরতম ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির, পরিচিত গণেশ-গুম্ফা নামে।

কার্ণাক বন্দর থেকে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে ষ্টীমার এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে যাতায়াত করে। করে না শুধু বর্ষার চার মাস। পনরই জুন থেকে পনরই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। তখন বাড়ে সমুদ্রের জলের স্ফীতি, বাড়ে গর্জ্জন আর উদ্দামতা এবং প্রচণ্ডতাও। বিপদসঙ্কুল হয় ছোট ষ্টীমারে যাতায়াত, তাই সম্ভব নয় তখন এলিফ্যাণ্টার গুহা-মন্দির দর্শনও।

ভোর চারটে থেকেই সুরু হয় এলিফ্যাণ্টা যাওয়ার প্রস্তুতি। মাতুঙ্গা থেকে ছ'টার গাড়ীতে রওনা হই। মসজিদ ষ্টেশনে নেমে পদব্রজে কর্ণাক বন্দরে উপনীত হই, সঙ্গে যান স্ত্রী ও কন্যা। দেখি বন্ধুবর ও বন্ধুপত্নী আগেই এসে হাজির হয়েছেন। হন নাই বন্ধু-পত্নীর বান্ধবী, তাঁর স্বামী ও ভগ্নী। আমরা টিকিট কিনে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। এদিকে ষ্টীমার ছাড়বার সময় এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তাঁদের দেখা নাই। শেষে তাঁদের আসবার আশা ত্যাগ করে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা ষ্টীমারের দ্বিতলের ডেকে স্থান সংগ্রহ করি। বাঁশী বাজিয়ে হাল দিয়ে জলের আওয়াজ করে ষ্টীমার ছাড়বার উপক্রম করে। খালাসীরা সিঁড়ি তুলতে ছুটে যায়। এমন সময়ে দেখি ছুটতে ছুটতে আসছেন পরিচালক মহাশয়, তাঁর পিছনে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ভগ্নী। সবার পিছনে একটি বড় ঝাঁকা মাথায় নিয়ে একটি কুলী। এই ঝাঁকাই নাকি তাঁদের দেরীর কারণ। ঝাঁকার মধ্যে আছে নানা রকমের সদ্য-প্রস্তুত খাদ্য। সময়সাপেক্ষ তাদের প্রস্তুত করা। কুলীকে বিদায় দিয়ে আমরা সকলে পাশাপাশি চেয়ারে বসি, ষ্টীমারও ছাড়ে।

প্রশান্ত সৌম্য আরব, নাই তাতে বঙ্গোপসাগরের চঞ্চলতা, নাই সে গর্জ্জন, নাই উদ্দামতাও। দিগন্তে বিস্তার করে আছে তার নীল দেহখানি, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সাগর। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার বুকের শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে যায় শরীর। আনন্দে পরিপূর্ণ হয় মন, দেখে তার অপরূপ রূপ।

অগ্রসর হতে থাকে ষ্টীমার দিগন্তের পানে অদৃশ্য হয়ে যায় কর্ণাক বন্দর, হয় বোম্বাই শহরের অট্টালিকা আর প্রাসাদও একে একে। শেষে বোম্বাই শহর দৃষ্টির বাইরে চলে যায় ঘণ্টাখানেক বাদে আমাদের ষ্টীমার এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে থামে।

আমরা ষ্টীমার থেকে নেমে কুলীর মাথায় জিনিস চাপিয়ে উপত্যকার ভিতরের একটি উঁচুনীচু রাস্তা অতিক্রম করে গুহা-মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হই। প্রায় দু'ফার্লং রাস্তা যেতে হয়, উঠতে হয় পর্ব্বতের শীর্ষদেশে। স্থান সংগ্রহ করি মন্দিরের অধ্যক্ষের বাড়ীর বারান্দায় একপ্রান্তে। সেখানে একখানি বড় টেবিল ও খান-কতক চেয়ার সাজান ছিল।

তখন এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন এক বাঙালী ব্রাহ্মণ। তিনি খবর পেয়ে ছুটে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মহিলারা অন্দরমহলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুরু হয় প্রাতরাশ। পরিচালক গৃহিণী একে একে বার করেন তাঁর সঙ্গে আনা খাবার। তাঁর সহোদরা পরিবেশন করেন। আমরা খাই আর গল্প করি, গল্প বলেন পরিচালক মহাশয় আমরা শুধু শ্রোতা, নিবদ্ধ থাকে গল্প বোম্বাইয়ের চিত্র-জগতে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক, অন্যতম প্রবীণতমও। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত চিত্র কোম্পানীতে চতুর্গুণ মাহিনায় নিযুক্ত হয়েছেন। আরও অনেক বাঙালী চিত্রশিল্পী ও চিত্রতারকাও নিযুক্ত আছেন বোম্বাইতে, কলিকাতার চতুর্গুণ মাহিনায়। স্বর্ণপ্রসূ বোম্বাই বাসস্থান কোটিপতিদের। তাই সম্ভব হয় তাদের এত অধিক মাহিনায় শিল্পী নিযুক্ত করা। সুলভ হয় শিল্পীদেরও অর্থ উপার্জ্জনে।

প্রাতরাশ সেরে আমরা সকলে মন্দির অভিমুখে রওনা হই। সঙ্গে যান মন্দিরের অধ্যক্ষ। দেখি এসেছেন বহু দর্শন-অভিলাষী, এসেছেন হাজারে হাজারে। আছেন তাঁদের মধ্যে মারাঠী, গুজরাটি, ভাটিয়া, পার্শী, ইহুদি, দক্ষিণ-ভারতীয় আরও কত অধিবাসী, কত বিভিন্ন দেশের। সার্ব্বভৌমিক নগরী বোম্বাই দাঁড়িয়ে আছে মহাভারতের সাগরতীরে, মিলন হয় এখানে বিশ্বের মানবের, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন তাদের পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাদের ভাষা। এক নয় তাদের জীবিকা অর্জ্জনের প্রণালীও। ছড়িয়ে আছে তারা বোম্বাই ও বৃহত্তর বোম্বাইয়ের দিকে দিকে। জানা যায় তাদের স্বরূপ মেরিন ড্রাইভের সৈকতে সান্ধ্যভ্রমণে। জানা যায় ছুটির দিনেও, ছুটির দিনে বোম্বাইবাসী বহির্ভ্রমণে বার হন। যান সারা বোম্বাইবাসী, যান সপরিবারে। ব্যতিক্রম শুধু প্রবাসী বাঙালীরা। কেউ যান খাওয়া-দাওয়া সেরে, কেউ টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার সঙ্গে নিয়ে, কেউ মহালক্ষ্মীতে যান, কেউ জুহুর, উর্লির, জাদরের, মহিমের আর মেরিনের সমুদ্র-সৈকতে। কারও বা মালাদে, খারের রামকৃষ্ণ আশ্রমে, যোগেশ্বরীতে, কানেরিতে, মালাবার পাহাড়ের শৃঙ্গ উদ্যানে যান আরও কত স্থানে—এলিফ্যাণ্টাতেও আসেন। সমস্ত দিন গল্প-গুজব আর ছুটোছুটি করে কাটিয়ে, সন্ধ্যার পর স্বগৃহে ফিরে আসেন। তাই সীমাহীন ভীড় হয় বৈদ্যুতিক ট্রেণে। সহজ হয় না ট্রেণে ওঠা, হয় বিপদসঙ্কুলও, উঠতে হয় মারামারি করে। প্রতিটি বাস-ষ্ট্যাণ্ডেই সৃষ্টি হয় এক ফার্লং দীর্ঘ কিউ, দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাসে স্থানসংগ্রহের অপেক্ষায়। চলে যায় নাকের উপর দিয়ে কত বাসও। পরিপূর্ণ নির্দ্দিষ্ট আসনের সংখ্যা, তাই নাই প্রবেশের অনুমতি। অপেক্ষা করতে হয় এক ঘণ্টা কখনও দু'ঘণ্টা। উত্তীর্ণ

হয় ধৈর্য্যের সীমা, শেষে বাসে আসন মেলে। তবুও শেষ নাই তাঁদের বহির্গমনের।

স্বর্ণপ্রসূ বোম্বাই নগরী। কর্ম্মমুখর তার অধিবাসীরা, সুরু হয় তাদের কার্য্যের প্রস্তুতি রাত্রি তিনটে থেকেই। বেশীর ভাগ পরিবারেরই নাই রান্নার পাট। হোটেলে গিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। সেখানেও দীর্ঘ কিউ। পরিশ্রম করে সমস্ত দিন, করে অর্থ উপার্জ্জন।

মহারাষ্ট্রীর ছাড়া নাই আর কারও সামাজিকতার বালাই, নাই আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া। তাই ছুটির দিনে তারা বহির্গমণে যায় হয়ে সারা সপ্তাহের পরিশ্রম পুষিয়ে নেয়, দূর হয় ক্লান্তি।

তা ছাড়া গৃহেও স্থানাভাব বোম্বাই শহরে। নাই পর্য্যাপ্ত স্থান বৃহত্তর বোম্বাইয়ের গৃহেও। বাস করতে হয় সংখ্যিবারে, অধিকাংশ অধিবাসীকেই এক কিংবা দুখানি ঘরে। তাই নাই তাদের গৃহের আকর্ষণ। সুখের আর স্বাচ্ছন্দ্যের নয় গৃহের বাসও, নয় আনন্দেরও। তাই তারা ছুটির দিন বাহিরে কাটায়। কাজ থেকে ফিরে এসে অন্যদিন পার্কে কাটায়। কাটে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে, তারা হোটেলে আর রেস্তোরাঁতে যায়, কাটায় আপিসে আর উদ্যানে, অসুখ হলে যায় নার্সিং হোমে। তাই বোম্বাই শহরে আর বৃহত্তর বোম্বাইতে প্রতিটি রাস্তার মোড়েই আছে এক বা একাধিক উদ্যান, রেস্তোরা আর নার্সিং হোম।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মন্দিরে প্রবেশ করি। নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটিও অষ্টম শতাব্দীতে। রাষ্ট্রকূট রাজারাই নির্ম্মাণ করেন শৈব মন্দির। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে এক সমতল উপত্যকার উপর, ১৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১২৯ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। নাই এই মন্দিরের সম্মুখভাগ, নির্ম্মিত হয় এলোরার প্রসিদ্ধ মন্দির, ডুমার লেনার অনুকরণে। মণ্ডপের সামনে রচিত হয় তিনটি প্রবেশদ্বার, একটি কেন্দ্রস্থলে আর দুইটি ঐ প্রান্তে। সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরে আলো প্রবেশ করে, আলোকিত হয় মণ্ডপ, হয় ভিতরের দুইটি গর্ভগৃহও। সৃষ্টি হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে এক মহাশান্তির আর মহা পবিত্রতার পরিবেশ।

আমরা কেন্দ্রস্থলের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরের প্রশস্ত মণ্ডপে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে দুইটি করে সিংহ সোপানশ্রেণীর দুইদিকে, প্রহরী তারা মন্দিরের। অনুরূপ উড়িষ্যার খণ্ডগিরির জৈন গণেশ-গুম্ফার। প্রহরী সেখানে হস্তী। নির্ম্মাণ করেন সেই গুম্ফা খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে কেতবংশের মহা-পরাক্রমশালী কলিঙ্গ রাজা, খারবেল।

দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপটি অনেকগুলি স্তম্ভের উপর। কোনটি পনের ফুট উচু কোনটি বা সতের ফুট। অনবদ্য এই স্তম্ভগুলি। অষ্টকোণ তাদের নির্ম্মাণ। বাঁশির আকারে রচিত তাদের কেন্দ্রস্থল, অঙ্গে নিয়ে শিরা। শীর্ষদেশে শোভা পায় বৃত্তাকার গদি। দেখেছি এলোরাতেও অনুরূপ স্তম্ভ। বিস্মিত হয়ে তাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার দেখি। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। স্তম্ভের সারি দিয়েই রচিত হয় কেন্দ্রস্থল আর গলিপথ। হয় দুই পাশের উইংস (পার্শ্বপ্রকোষ্ঠ)ও। অপরূপ এই পরিকল্পনা দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গর্ভগৃহে উপনীত হই। নির্ম্মিত হয় দুইটি পৃথক গর্ভগৃহ, বুকে নিয়ে লিঙ্গ। চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ, গর্ভগৃহের দুই পাশে দেখি দুইটি বৃহৎ মূর্ত্তি। মূর্ত্তি রক্ষাকর্ত্তার, মূর্ত্তি দ্বারপালের।

মন্দির দেখে মন্দিরের পিছনের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের সামনে উপস্থিত হই। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে তিনটি অতিকায় দ্বারপাল। দ্বারপাল নয় দানব তারা। দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ কুলুঙ্গীর মধ্যে। পৃথক হয়ে আছে কুলুঙ্গিগুলি দুই পাশের উন্নত স্তম্ভ দিয়ে। অপরূপ এই উন্নত স্তম্ভের অঙ্গের ও শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভারও। বামে, পূর্ব্বদিকের প্যানেলের অঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধনারীশ্বর, শিবের নারী এবং পুরুষরূপে প্রকাশ আছে পুরুষের বলবীর্য্য, আছে নারীর স্নেহ, তার অপরিসীম করুণাও। দক্ষিণে, বিপরীত দিকের প্যানেলে বিরাজ করেন হরপার্ব্বতী, শিবাণীকে সঙ্গে নিয়ে শিব, দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে মহিমময় অনবদ্য এই মূর্ত্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের। সৃষ্টি হয় এক অলৌকিক ঐশ্বরিক পরিবেশও।

কেন্দ্রস্থলে একটি তেইশ ফুট উচ্চ, উনিশ ফুট প্রস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে, সতর ফুট দশ ইঞ্চি উচু, মহামহিমময় ত্রিমূর্ত্তি মহেশ্বর বিরাজ করেন। মহেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, মহেশ্বর প্রলয়ঙ্কর আর উমা-মহেশ্বর।

কেন্দ্রস্থলে তিনি তৎপুরুষ, সৃষ্টি করেন জগৎ, অধিকর্ত্তা সৃষ্টি ও স্থিতিরও, তাই প্রশান্ত, সৌম্য তাঁর আনন। শিরে শোভা পায় সুউচ্চ বহুমূল্য মুকুট, আকৃতি তার স্তম্ভের মত, প্রতীক অনন্তের অধিকর্ত্তার। বৃষস্কন্ধ তিনি, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় মূল্যবান মুক্তার মালা, এক হস্তে তিনি ধারণ করেন বৃত্তাকার ফল আর এক হস্তে জপের মালা।

দক্ষিণে তিনি মহাপ্রলয়ঙ্কর ভৈরব। বিনাশ করেন জগৎ, বিলুপ্ত হয় সৃষ্টি। তাই ক্রোধে প্রদীপ্ত তাঁর নয়ন। তাঁর রোষদীপ্ত বদনে শোভা পায় শ্মশ্রু, মস্তকে দীর্ঘ জটা। চূড়ার আকারে সজ্জিত সেই জটা, নেমে আসে স্তরে স্তরে স্কন্ধের উপর। জটা দিয়ে আবৃত হয় স্কন্ধ। জটার অঙ্গে শোভা পায় পুষ্প। রচিত হয় একটি নরকঙ্কালও তার অঙ্গে, প্রতীক প্রলয়ের, হস্তে ধরে আছেন একটি ক্রুদ্ধ সর্প, বিস্তৃত তার ফণা, উদ্যত তার মুখ দংশনে। বামে তৃতীয় আননে তিনি বামদেব-উমা, দেবীরূপী শিব, চিরকল্যাণময়ী, মূর্ত্তিমতি দয়া আর করুণা। তাই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত তাঁর আনন, বিরাজ করে সেই আননে মহাপ্রশান্তি। তাঁর শিরে শোভা পায় কুঞ্চিত কুন্তল। নেমে আসে সেই কুন্তল তাঁর স্কন্ধের উপর। শোভিত হয়ে আছে কুন্তল বিভিন্ন বহুমূল্য অলঙ্কারে, মণিমুক্তাখচিত ঝাপটায় আর টায়রাতে। কর্ণে তার মূল্যবান হীরার দুল। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই ত্রি-মূর্ত্তির অপরূপ রূপ, দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে, তুলনাহীন সৃষ্টি এক মহা-

প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ ভাস্করের। ঋষি তিনি, রচনা করেন পাথরের অঙ্গে এক মহামহিমময় দেবতাকে। অনবদ্য গঠনে, নিরুপম প্রকাশে, পবিত্রতম বিকাশে। রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে, ঢেলে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। করেন এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, দেবলোকে পরিণত হয় মন্দির, পরিণত হয় স্বর্গপুরীতে।

দেখি দাঁড়িয়ে আছে ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে ও বামে দুই দ্বারপাল পাশে নিয়ে দুইটি বামন। মহিমময় তাঁরাও, তাঁদের শিরেও শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরার দুল। অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব ও নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের, দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ঘুরে ঘুরে দেখি প্রাচীরের গাত্রে অপরূপ মূর্ত্তিসম্ভার, দেখি এক মহিমময় ভৈরবের মূর্ত্তি, দেখি শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ। দেখি পার্ব্বতীর মস্তকের উপর উড়ন্ত বিদ্যাধরীর দল। দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরার ডুমারলেনেতে। সমসাময়িক এই দৃশ্যের।

দেখে মুগ্ধ হই শিবের তাণ্ডব নৃত্য। দেখি এক মহামহিমময় দশ ফুট উঁচু শিব, তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার মুকুট অনুরূপ ত্রিমূর্ত্তি শিরোভূষণের। কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে জড়োয়ার ব্রেসলেট, ভগ্ন মণিবন্ধ, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তার পদযুগলও, কটিদেশে কোমরবন্ধ, বিস্তৃত দক্ষিণ উরু পর্য্যন্ত, নাই চিহ্ন বাম উরুর, শুনি পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরাই ধ্বংসে পরিণত করেছে এই অনবদ্য মূর্ত্তিটিকে, ধ্বংস করেছে আরও অনেক মূর্ত্তি। নৃত্য করেন নটরাজ, করেন তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস হয় পৃথিবী, পরিণত হয় মহাশ্মশানে, শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় ভক্তদের অন্তঃকরণও, চূর্ণ হয় তাদের অহঙ্কার। বিচ্ছিন্ন হয় মায়ার বন্ধন, কিন্তু শেষ নাই নটরাজের নৃত্যের, অন্তহীন সেই নৃত্যও। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে চলে সৃষ্টির রহস্য, সাধিত হয় জীবন ও মৃত্যু। তাই অপরূপ সেই নৃত্যের ছন্দ। দেখেন সেই নৃত্য স্বর্গের দেবতারাও, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ উড়ন্ত অবস্থায়।

দেখি রাক্ষস রাজা লঙ্কাধিপ রাবণ স্বর্গের কৈলাসকে আন্দোলিত করছেন, দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরায় কৈলাসের মন্দিরে, দেখেছি মহীশূরের রাসমুদ্রের মন্দিরে, তাদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বুকে নিয়ে আছে এলিফ্যান্টার প্রাচীরের গাত্র।

দেখি বেষ্টন করে আছেন শিব আর পার্ব্বতীকে কত দেবতা, কত দেবী, বর্ষিত হচ্ছে পুষ্প তাঁদের শিরে। অনবদ্য এই দৃশ্যটিও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, ঘুরে ঘুরে দেখি প্রাচীরের অঙ্গের মূর্ত্তিসম্ভার। যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান, প্রতীক তারা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট ভাস্কর্য্যের। তাই এলিফান্টা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের ভাস্কর্য্যের দরবারে।

অধ্যক্ষের বাংলোতে ফিরে এসে পরিচালক-গৃহিণীর প্রস্তুত গরম গরম উপাদেয় খিচুড়ী খেয়ে আবার মন্দির-দর্শনে যাই।

নির্ম্মিত হয় একটি উপমন্দির, মূল মন্দিরের সংলগ্ন। তার পূর্ব্ব কোণে এই ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রার্থনা-কক্ষের সামনেও দেখি একটি সোপানশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায়। দাঁড়িয়ে আছে তার দুপাশেও দুইটি সিংহ-প্রহরী মন্দিরের। দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নাবস্থায় সংলগ্ন মন্দিরটি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে কিন্তু বুকে নিয়ে আছে নিখুঁত রমণীয় শিল্পসম্ভার, পরিচায়ক পূর্ব্ব গৌরবের, সমরর মূল মন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরেরও। দেখি মন্দিরের প্রাঙ্গণে নীচু হয়ে নেমে গিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে একটি অগভীর জলাশয়। খুব সম্ভব এই জলাশয়েই পূজা হ'ত সর্পদেবতার, নাগের পূজারী হিন্দুরা। তাই এই ব্যবস্থা।

উপমন্দির দেখে অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাসায় কাঁঠাল গাছের সুপক্ক কাঁঠালসহ চা পান করে জাহাজঘাটের অভিমুখে রওনা হই। ঘাটে পৌঁছে দেখি কিনারা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ষ্টীমারটি দাঁড়িয়ে আছে। ভাটার টানে কমে গিয়েছে কিনারার জল, লাঘব হয়েছে তার গভীরতা, তাই সম্ভব হয় নাই ষ্টীমারের পাড়ে লাগান। দেখি নোঙর ফেলে আছে দুইখানি বড় নৌকাও, সেই নৌকায় চড়েই যেতে হবে যাত্রীদের, উপনীত হতে হবে ষ্টীমারে। আমরা নৌকায় চড়ি, চড়েছে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ জন যাত্রীও। কিছুক্ষণ পরেই নৌকা ছাড়ে, অগ্রসর হয় মাঝ-সমুদ্রের দিকে। তরঙ্গের আঘাতে নৌকা দোলে, কাঁপে আমাদের অন্তঃকরণও। এক আতঙ্কে আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়। কখন তলিয়ে যাবে নৌকা অতলের অতল তলে, হবে সকলের সলিল-সমাধি। অগ্রসর হয় নৌকা, বাড়ে তরঙ্গের উদ্দমতা, বর্দ্ধিত হয় নৌকার কম্পনও। সীমাহীন আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তঃকরণ। মনে মনে স্মরণ করি বিপদের বন্ধু বিপদবারণ নারায়ণকে। জানতেও পারি না কখন মহিলারা গা ঘেসে বসেছেন, মুদ্রিত তাঁদের নয়ন। অবশেষে নৌকা ক্রমে ষ্টীমারের গায়ে লাগে, দূর হয় আমাদের আশঙ্কা, অবসান হয় আতঙ্কেরও, কিন্তু লাঘব হয় না কষ্টের। নৌকা থেকে একটি ঝোলান দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ষ্টীমারের ডেকে উপনীত হতে হয়। লম্বিত সেই সিঁড়ি ষ্টীমারের পিছন দিকে, কষ্টসাধ্য এই আরোহণ, দুঃসাধ্য মহিলাদের পক্ষে। ঢেউ-এর দোলায় কম্পিত নৌকা, হয় স্থানচ্যুতও প্রতি মুহূর্ত্তেই। একবার সিঁড়ি এগিয়ে আসে, ধরতে যাই হাত বাড়িয়ে, স্থানচ্যুত হয় নৌকা, সিঁড়ি চলে যায় নাগালের বাইরে। জানি না কেমন করে আর কখন দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলি সিঁড়ি, উঠে যাই ষ্টীমারেও। ওঠেন অতি কষ্টে, একে একে মহিলারাও, সবশেষে বন্ধুবরেরাও।

কিন্তু সম্ভব হয় না দ্বিতীয় নৌকাখানির ষ্টীমারের সংলগ্ন হওয়া, বুকে নিয়ে শতাধিক যাত্রী। ষ্টীমারের দশ গজ দূরে এসে হঠাৎ রুদ্ধ হয় তার গতি। এক বিপুল উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কাত হয় নৌকা এক পাশে, নিমজ্জিত হয় সমুদ্রের জলে। শুধু ভেসে থাকে তার গলুই। শত কণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ করুণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হয় দিগন্ত, ভরে যায় আকাশ বাতাস। কিছুক্ষণ স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর ভেসে যায় নৌকা বিপরীত দিকে, স্রোতের টানে, বুকে নিয়ে শতাধিক মৃত্যু-পথযাত্রী। দাঁড়িয়ে দেখেন সেই যাত্রা নিষ্পলক নেত্রে, আমাদের জাহাজের কর্ম্মকর্তারা, দেখে খালাসীরাও। সম্ভব নয় আমাদের জাহাজের পশ্চাদনুসরণ, নয় যুক্তিসঙ্গত, নইলে জাহাজের ঢেউয়ে ডুবে যাবে নৌকা, হবে সকলের জীবনান্ত। কম্পিত বক্ষে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, আমরাও দেখতে থাকি তার অধোগতি, অপেক্ষা করতে থাকি কখন আসবে সেই অন্তিম মুহূর্ত, নিমজ্জিত হবে নৌকা সাগরের অতল তলে।

হঠাৎ দূরে বেজে উঠে ঘন ঘন ষ্টীমারের বাঁশী। দেখি বিদ্যুৎ-গতিতে, দিকচক্রবাল থেকে, আসে একটি ক্ষুদ্রকায় ষ্টীমার। অগ্রসর হতে থাকে ভেসে যাওয়া নিমজ্জমান নৌকার দিকে। সাড়া পড়ে যায় আমাদের ষ্টীমারের কর্ম্মকর্তা ও খালাসীদের মধ্যেও। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে দেয় ষ্টীমার, অনুসরণ করে নৌকায়। মন্থর তার গতি, বিশ গজ দূরে এসে থাকে।

উপনীত হয় ততক্ষণে ক্ষুদ্রকায় ষ্টীমারটিও নৌকার কাছে নিক্ষেপ করে দড়ি। হাত বাড়িয়ে অতি কষ্টে নৌকার মাঝি সেই দড়ি ধরে। সংলগ্নীভূত হয় নিমজ্জমান নৌকা আর ষ্টীমার। দেখি অর্দ্ধ নিমজ্জিত হয়েছে নৌকা সাগরের তলে। দাঁড়িয়ে আছে হাঁটু সমান জলে, নিশ্চল পাষাণ প্রতিমাসম, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী অঙ্কে নিয়ে শিশু। দাঁড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পার্শী, দক্ষিণ ভারতীয় ও ইহুদী। সুনিশ্চিত মৃত্যু-পথযাত্রী তাঁরা, ফুটে উঠে তাঁদের মুখের উপর এক সীমাহীন আতঙ্কের ছায়া, এক নিশ্চিত মৃত্যুর অভিশাপ। আতঙ্কিত অন্তঃকরণে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরাও দেখি তাদের একে একে ষ্টীমারে আরোহণ। শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। গভীর রাত্রিতে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু আজও ভুলতে পারি নি সেই দৃশ্য। ভেসে উঠে চোখের সামনে নিভৃতে, নির্জ্জনে।

ক্রমশঃ

মেঠো চাঁদ

শ্রীসুনীল বসু

ওগো চাঁদ তুমি জেগে থাকো সারা রাত!
জেগে থাকো চাঁদ খড়ের ঘরের ভীরু জানালার পাশে!
তোমার জ্যোছনা মদ হয়ে ঝরে, তোমার জোছনা গান হয়ে ঝরে
ধানক্ষেতে আর সবুজ দূর্বাঘাসে।
ঘুমে দুটি চোখ ভেঙে ভেঙে আসে, তবু চাঁদ আমি
তোমার মুখেতে চেয়ে চেয়ে থাকি, বিস্ময়ে চেয়ে থাকি;
নরম মেঘের ছায়া ছায়া ঝোপে লুকোচুরি খেলে দিও না আমায় ফাঁকি!

তুমি জেগে থাকো চাঁদ,
জেগে থাকো তুমি তারার পরীর রূপালি সভার ধারে
জেগে থাকো তুমি পাখির বাসায়, সোনালি অন্ধকারে
বুকে ঢালো অবসাদ,
তোমার মুখের আলোর চুমোর মদ ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
সারা রাত চুমা ফুলের অধরে, চাঁদের শরীর ছুঁয়ে
নদীর নয়নে, হাওয়ার আদর স্বপ্নেতে ঝরে যাক।
মাঝরাতে ওই জেলে ডিঙিগুলি জাল ফেলে ফেলে
শ্যাওলায় ঢাকা সর্পিল নদী বাঁক
খুঁজে পাক চাঁদ। ওগো ক্ষীণ ভীরু চাঁদ—
দেবদারু শাখে, মেঠো পথে আর ফুলের বাগানে পাতো আলোছায়া ফাঁদ

ঐ শোন চাঁদ! ঢংঢং করে ঘড়িতে বাজল বারো
পাড়াগাঁর রাত, খোড়ো ঘরে রাত নেশায় হয়েছে গাঢ়
স্মৃতিভেজা যত নয়নের জল ঝরে;
মনে আছে চাঁদ অমি একটি সোনালি রাত্রে সে ছিল আমার ঘরে।

কালিদাস সাহিত্যে 'বৃক্ষ'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে মহাকবি কালিদাস প্রেমকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া কয়েকটি অতি সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়া প্রেমতরুটির বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোকটি এখানে দেখান গেল।

রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার প্রেমে পড়িয়া গিয়া তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বলিতেছেন :

'তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢরাগা প্রবালঃ।
হস্তস্পৃষ্টেঃ কুসুমিত ইব ব্যক্ত রোমোদ্গমত্বাৎ
কুর্য্যাৎ কান্তং মনসিজ তরুর্মাং রসজ্ঞং ফলস্য॥
(মাল-৪র্থ অঙ্ক)।

যেদিন তাহার কথা কাণে শুনিলাম প্রেমতরু আমার মনে আশারূপ শিকড় গাড়িয়া ফেলিল, তার পর যেদিন তাহাকে চোখে দেখিতে পাইলাম তাহার প্রতি মনে অনুরাগের সঞ্চার হওয়াতে প্রেমতরুতে পল্লবের আবির্ভাব হইল, যেদিন আবার তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পাইয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল প্রেমতরুতে সেদিন ফুল ফুটিল, এইবার সুমিষ্ট ফলের রসাস্বাদন করিতে দিয়া প্রেমতরু আমায় তুষ্ট করুক।

প্রেমকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের তৃতীয় অঙ্কেও পাওয়া যায়।

রাজা অগ্নিমিত্র উপবনে বৃক্ষের অন্তরালে অলক্ষিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মালবিকার চরণে আলতা পরানো দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন :

'প্রথমামিব পল্লব প্রসূতিং
হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য॥ (মাল-৩য় অঙ্ক)।

প্রিয়ার চরণের ঐ আলতায় লাল রেখা, দেখাইতেছে যেন হরের ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ মদন-বৃক্ষের আবার নূতন করিয়া বুঝি পল্লব গজাইয়াছে।

মহাকবি এখানে মদনকে প্রেমের বৃক্ষ বলিয়া কল্পনা করিয়া বলিতে চাহিতেছেন যে, ক্রুদ্ধ শিবের নয়ন-বহ্নিতে মদন-রূপ প্রেমতরু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু মালবিকার সুন্দর চরণের ঐ অতি লোভনীয় আলতার লাল দাগটি দেখিয়া মনে হইতেছে, যে প্রেমতরু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা আবার বুঝি নূতন করিয়া পল্লবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' তৃতীয় অঙ্কেও ঠিক এইরূপ উপমা পাওয়া যায়। শকুন্তলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া দুষ্যন্ত তাঁহার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে করিতে বলিতেছেন :

'হরকোপাগ্নিদগ্ধস্য দৈবেনামৃত বর্ষিণা
প্ররোহঃ সম্ভৃতো ভূয়ঃ কিংস্বিৎ কামতরোরয়ম্॥'
(শকু-৩য় অঙ্ক)

হরের কোপানলে কামরূপ বৃক্ষ দগ্ধ হইয়া যাইবার পর দেবতারা উহাতে অমৃত সিঞ্চন করায় কি এই অঙ্কুরটি উৎপন্ন হইয়াছে?

'কুমারসম্ভবে'ও মহাকবি প্রেমতরুর নূতন অঙ্কুরের উল্লেখ করিয়াছেন। শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন যে, উমার হস্তের রক্তাভ অঙ্গুলিগুলি দেখাইতেছিল যেন মদনতরুর প্রথম পল্লব :

'উমাতনৌ গূঢতনোঃ স্মরস্য
তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমেব প্ররোহম্' (কু-৭ ৭৩)।

শঙ্করের ভয়ে আর অন্য কোথাও (নির্ভরযোগ্য) আশ্রয় না পাইয়া কামদেব পার্ব্বতীর দেহের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন, উমার ঐ রক্তাভ অঙ্গুলিগুলি যেন তাঁহারই প্রথম পল্লব।

মহাকবি এখানে প্রেমের ঠাকুরকে স্পষ্টভাবে প্রেমতরু না বলিলেও 'তাঁহার প্রথম পল্লব' এই কথাগুলি বলাতে গৌণভাবে যে মদনকে বৃক্ষ বলা হইল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

'কুমারসম্ভবে' মহাকবি স্বর্গের কল্পবৃক্ষের সহিত 'সপ্তর্ষি'-মণ্ডলের সাতজন ঋষির উপমা দিয়াছেন। বৃক্ষের সহিত মানুষের উপমা দেওয়া হয়ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মহাকবির 'মায়ালেখনী'র রচনার কৌশলে এ অস্বাভাবিককেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকটি এই :

'মুক্তাযজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবল্কলাঃ।
রত্নাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ॥ (কু-৬.৬)।

যে যজ্ঞোপবীতগুলি তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি ছিল মুক্তা-নির্ম্মিত, বল্কলগুলি ছিল স্বর্ণের আর জপমালাগুলি ছিল রত্নের। দেখিয়া মনে হইতেছিল কল্পবৃক্ষগুলিই বুঝি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

এখানে মহাকবি কল্পবৃক্ষগুলির সহিত ঋষিদের উপমা দিলেন, তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সামঞ্জস্য ছিল। কল্পবৃক্ষের ছাল ছিল যেমন সোনার, ঋষিদের পরিধেয় বল্কলগুলিও ছিল তেমনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। কল্পবৃক্ষে ফুটিয়া থাকিত মুক্তা-নির্ম্মিত পুষ্পের সারি, ঋষিদেহে থাকিত মুক্তায় গাঁথা যজ্ঞোপবীত, কল্পবৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি করিত রত্নের ফল, আর ঋষিদের হাতে থাকিত রত্নের জপমালা।

মহাকবি 'কুমারসম্ভবে' যেমন স্বর্গের কল্পবৃক্ষের সহিত সপ্তর্ষির

উপমা দিয়াছেন, 'রঘুবংশে' তেমনি স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষের সহিত সর্পদের রাজা কুমুদনাগের উপমা দিয়া রচনার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

নাগরাজ কুমুদ যখন তাঁহার ভগিনী কুমুদ্বতীকে সঙ্গে লইয়া সরযূনদীর জলের নিম্নে অবস্থিত তাঁহাদের পুরী হইতে জলের উপরে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদিগকে তখন কিরূপ দেখাইতেছিল মহাকবি পারিজাত বৃক্ষের সহিত উপমা দিয়া সে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন :

'তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানা
দুদ্বৃত্ত-নক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্ম্যেব সার্ধং সুররাজবৃক্ষঃ
কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ॥ (রঘু-১৬.৭৯)।

কুমীরেরা ভিতরে তোলপাড় করিতে থাকায় জলের অবস্থা যেন মন্থন সময়ের সমুদ্রের মত হইয়া পড়িল, তারপর সহসা সে জলের ভিতর হইতে লক্ষ্মীর সহিত পারিজাত বৃক্ষের মত সর্পরাজ কুমুদ একটি মেয়েকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

সমুদ্র-মন্থনের সময় পারিজাত বৃক্ষ ও মা লক্ষ্মী একসঙ্গে জলের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, সেই চিত্রটিই লোকের মনে পড়িয়া গেল যখন বিক্ষুব্ধ জলের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিলেন উপরে কুমুদনাগ ও তাঁহার রূপসী ভগ্নী কুমুদ্বতী। কল্পবৃক্ষের সহিত দেবর্ষি নারদের উপমা 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' পঞ্চম অঙ্কে পাওয়া যায়। মহাকবি সেখানে বলিতেছেন :

'হৈমপ্ররোহইব জঙ্গম কল্পবৃক্ষঃ'।

সুবর্ণের পল্লব যুক্ত যেন চলমান কল্পতরু :

দেবর্ষির সুবর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত যেন কল্পবৃক্ষের 'হৈম পল্লব'।

পর্ব্বতের গুহামুখে শায়িত ব্যাঘ্রদের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি ঝড়ে ভেঙ্গে-পড়া শালগাছের মোটা শাখার উপমা দিয়াছেন :

'ব্যাঘ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ
ফুল্লাসনাগ্র বিটপানিব বায়ুরুগ্নান্'॥ (রঘু—৯ ৬৩)।

গুহার মুখে শায়িত ব্যাঘ্রদিগকে দেখাইতেছিল যেন বায়ুর প্রভাবে ভগ্ন পুষ্পশোভিত শালগাছের কতকগুলি শাখা (ভূমির উপর পড়িয়া গিয়াছে)।

মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ বলেন, ব্যাঘ্রদের দেহ চিত্রিত থাকে বলিয়া মহাকবি এখানে 'পুষ্পশোভিত শালবৃক্ষের শাখা'র উপমা দিলেন।

বৃক্ষদেরও যে বোধশক্তি থাকে এবং তাহারাও যে মাননীয় ব্যক্তিকে অভিনন্দিত করিতে পারে, মহাকবি যেন সেকথা নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইতে চাহিয়াছেন :

'উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানা
মালোকশব্দং বয়সং বিরাবৈঃ'। (রঘু—২ ৯)।

বৃক্ষেরা রাজাকে যাইতে দেখিলে পক্ষীদের কলধ্বনি দ্বারা যেন তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিত।

বনের ভিতর দিয়া রাজা যখন একাকী পথ চলিতেন এবং পথপার্শ্বের বৃক্ষগুলির শাখায় বসিয়া পক্ষীরা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে কলধ্বনি করিতে থাকিত, মহাকবি বলেন, তখন মনে হইত বুঝি বৃক্ষগুলিই রাজাকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিতেছে।

কেবল পক্ষীদের কলরবের দ্বারা জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া নয়, বৃক্ষেরা—আশ্রমের বৃক্ষেরা তাহাদের পল্লবগুলি এমনভাবে বদ্ধ করিতে পারে যে, দেখিলে মনে হয় তাহারা বুঝি কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন করিতেছে :

'বদ্ধপল্লবপুটাঞ্জলিদ্রুমং
দর্শনোন্মুখমৃগং তপোবনম্'॥ (রঘু—১১ ১৩)।

তপোবনের বৃক্ষেরা তাহাদের পল্লবপুট এমনভাবে বদ্ধ করিল যে, দেখিয়া মনে হইল তাহারা বুঝি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিকে অভিবাদন করিতেছে, মৃগগণ উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল।

তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন, তখন তপোবনের বৃক্ষদের বদ্ধ পল্লবগুলি দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইতেছিল যে, বৃক্ষগুলি বুঝি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

বৃক্ষেরাও যে সৎপুত্রের মত পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহার অতিথিদিগকে সৎকার করার ভার লইতে পারে, মহাকবি তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন।

'রঘুবংশের' ত্রয়োদশ সর্গে মহাকবি বলিতেছেন যে, শরভঙ্গমুনি যখন শেষ আহুতি দেওয়ার সময় নিজের দেহটাকেই মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিকে আহুতি দিয়া দিলেন, তখন তাঁহার পরলোকগমনের পর—

'ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু—
ভূয়িষ্ঠ সম্ভাব্যফলেষ্বমীষু।
তস্যাতিথীনামধুনা সপর্য্যা
স্থিতা সুপুত্রেষ্বিব পাদপেষু'॥ (রঘু—১৩.৪৬)

অতিথিদিগকে সৎকার করার ভার এখন তাঁহার আশ্রম-বৃক্ষগুলির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের পথশ্রম লাঘব করার জন্য ছায়া ও প্রচুর সুমিষ্ট ফল দিয়া সুপুত্রের মত এই বৃক্ষগুলি অতিথিদিগকে তৃপ্তিদান করে।

তপোবনের বৃক্ষরাও যে যোগীপুরুষদের মত ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারে, মহাকবি তাহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশ্য বলেন নাই যে, বৃক্ষেরা সত্যই ধ্যান করিতেছে, তবে বাতাস বহিতেছে না, বৃক্ষগুলি নিস্পন্দ দেখিয়া মনে হইতেছে তাহারা ও বুঝি ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শ্লোকটি দেওয়া গেল :

'বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণা
মমী সমাধ্যাসিব বেদিমধ্যাঃ।
নির্ব্বাত নিষ্কম্পতয়া বিভান্তি
যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি॥ (রঘু-১৩ ৫২)।

বীরাসন বন্ধন করিয়া ঋষিরা ধ্যান করিতেছেন। বাতাস

বহিতেছে না, তাই নিষ্কম্প বৃক্ষগুলিকে দেখাইতেছে যেন তাহারাও বুঝি ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করিলে সে যে মানুষের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারে, তখনকার দিনের এ বিশ্বাস মহাকবি 'রঘুবংশের' ত্রয়োদশ সর্গে জানাইয়াছেন। রাম বলিতেছেন সীতাকে :

'ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ
সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ, (রঘু-১৩ ৫৩)

পূর্ব্বে তুমি যাহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলে, ঐ দেখ সম্মুখে সেই শ্যাম নামক বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছে।

বৃক্ষেরা যে মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিতে পারে, তাহারাও পল্লবের সঞ্চালন করিয়া মানুষকে নিকটে ডাকিতে পারে মহাকবি তাহা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' প্রথম অঙ্কে বলিয়াছেন।

তপোবনের বৃক্ষে জল দিতে দিতে শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখের বৃক্ষটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া সখীদিগকে বলিতেছেন :

'দেখ-সখি, ঐ আম্রগাছও যেন ওর বাতাসে-দোলা পল্লবরূপ অঙ্গুলির সঙ্কেত করিয়া আমাকে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, ওর কাছে গিয়া বুঝিয়া আসি '

শকুন্তলা কেবল যে মুখে বলিলেন তাহা নহে, তিনি বাস্তবিকই বৃক্ষের কাছে চলিতে লাগিলেন।

বৃক্ষের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্ম মহাকবি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' পঞ্চম অঙ্কে বলিতেছেন :

অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্। (শকু-৫ম অঙ্ক)

বৃক্ষ নিজের মস্তকে রৌদ্রের তীক্ষ্ণ তাপ সহ্য করিয়া তলায় আশ্রিত জনগণকে সুশীতল ছায়া দান করিয়া তাহাদের রৌদ্রক্লেশ নিবারণ করিয়া থাকে।

'রঘুবংশে' মহাকবি লবণ রাক্ষসের সঙ্গে শত্রুঘ্নের যুদ্ধের বিবরণ দিতে দিতে বলিতেছেন যে, রাক্ষস যখন সহসা তাহার প্রকাণ্ড একটা হাত সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বিরাট বপু লইয়া শত্রুঘ্নকে মারিয়া ফেলিবার জন্ম তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহাকে কিরূপ দেখাইতেছিল :

'একতালইবোৎপাতপবন প্রেরিতো গিরিঃ'। (রঘু ১৫ ২৩)।

যেন একটা তালবৃক্ষ সমেত পর্ব্বতের খণ্ড ঝড়ের দাপটে ভগ্ন হইয়া বেগে চলিয়া আসিতেছে।

লবণ রাক্ষসের সুদীর্ঘ হাত যেন একটা দীর্ঘ তালগাছ, আর বিরাট বপু যেন ঝড়ের দাপটে ভগ্ন পর্ব্বতের একটা প্রকাণ্ড খণ্ড।

বৃক্ষ ও তাহার ছায়া লইয়া মহাকবি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর উপমা রচনা করিয়াছেন, এখানে দুই-তিনটি দেখান গেল।

'রঘুবংশের' দশম সর্গে মহাকবি বলিতেছেন :

'তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্।
অভিজগ্মুর্নিদাঘার্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ। (রঘু—১০.৫)।

পথিকেরা যেমন রৌদ্রের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, দেবতারাও সেইরূপ রাবণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তখন শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

কতকটা এই ধরণের উপমা 'বিক্রমোর্ব্বশীর' তৃতীয় অঙ্কে পাওয়া যায় :

'যদেবোপনতং দুঃখং সুখং তদ্ধি রসান্তরম্।
নির্ব্বাণায় তরুচ্ছায়া তপ্তস্য হি বিশেষতঃ॥'

(বিক্রম—৩য় অঙ্ক)

যে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে তাহাই মধুর হয়, যেমন বৃক্ষের ছায়া রৌদ্রে যাহারা তাপিত হইয়াছে তাহাদের কাছেই অত্যন্ত সুখকর হয়।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র তৃতীয় অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন লতাপকুঞ্জের মধ্যে গোপনে শকুন্তলাকে প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করিতেছিলেন ও একাকী থাকিতে ভয় পাইয়া শকুন্তলা যখন অনিচ্ছায় লতাপকুঞ্জ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুষ্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :

'ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতিঃ॥'

(শকু—৩য় অঙ্ক)।

দূরে তুমি চলিয়া যাইতেছ বটে, আমার হৃদয়কে কিন্তু ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। দিনের শেষে বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাহাকে পরিত্যাগ সে করিতে পারে না।

'রঘুবংশে'র অষ্টম সর্গে বৃক্ষ ও পর্ব্বত লইয়া মহাকবি যে মনোহর উপমাটি রচনা করিয়াছেন, সেটি এখানে দেখান গেল।

পত্নী ইন্দুমতীর অকালমৃত্যুর শোকে মুহ্যমান মহারাজ অজকে তাঁহার কুলগুরুর এক শিষ্য উপদেশ দিতেছেন :

'ন পৃথগ্জনবচ্ছুচো বশং
বশিনামুত্তমগন্তুমর্হসি।
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং
যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ'॥ (রঘু—৮.৯০)

সাধারণ মানুষের মত শোকে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবেন না মহারাজ, আপনি সংযমী পুরুষ। বায়ুর বেগে যদি বৃক্ষ ও পর্ব্বত উভয়েই বিচলিত হইয়া পড়ে তবে আর বৃক্ষে ও পর্ব্বতে পার্থক্য রহিল কোথায়?

বৃক্ষের মূল দৃঢ় হইয়া থাকিলে তাহাকে নড়াইতে পারা যায় না, এই ভাবটিকে উপমা করিয়া মহাকবি, যে রাজা প্রতিদিন প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তুলনা দিয়াছেন :

'ইত্থং জনিতরাগাসু প্রকৃতিষ্বনুবাসরম্।
অক্ষোভ্যঃ স নবোঽপ্যাসীদ্দৃঢ়মূল ইব দ্রুমম্॥'

(রঘু—১৭ ৪৪।)

তিনি নূতন রাজা হইলেও প্রতিদিনের কর্ম্ম দ্বারা প্রজাদের অনুরাগ লাভ করিতে পাইয়া দৃঢ়মূল বৃক্ষের মত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।

মহাকবি 'রঘুবংশে' যেমন দৃঢ়মূল বৃক্ষকে দুর্দ্ধর্ষের উপমান করিলেন, তেমনি আবার 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে নূতন সংরোপিত শিথিলমূলযুক্ত তরুকে যে অনায়াসে উৎখাত করিতে পারা যায় এই ভাবটিকেও উপমান করিয়া দেখাইলেন।

'অচিরাধিষ্ঠিত রাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ
নবসংরোপণ শিথিল তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্ত্তুম্।'

(মাল—১ম অঙ্ক)

যে শত্রু অল্পকাল পূর্ব্বে রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রজাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, তাহাকে নূতন সংরোপিত শিথিলমূলযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসে উৎখাত করিতে পারা যায়।

রঘুবংশের দশম সর্গে ৪৯তম শ্লোকে বৃক্ষ লইয়া মহাকবি যে উপমাটি রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বেশ একটি দার্শনিক ভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাকবির মতে পুষ্প বৃক্ষের একটা অংশ, সুতরাং বাতাস লাগিয়া পুষ্পগুলি যখন বৃক্ষ হইতে খসিয়া উড়িয়া চলিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, বৃক্ষই বাতাসের সঙ্গে চলিতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা সকলে মিলিয়া যখন শ্রীবিষ্ণুর নিকটে গিয়া রাবণের অত্যাচারের সকল দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইলেন ও শ্রীবিষ্ণু রাবণ বধ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবেন আশ্বাস দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, তখন মহাকবি বলিতেছেন—

'পুরুহূত প্রভৃতয়ঃ সুরকার্য্যোদ্যতং সুরাঃ।
অংশৈরনুযযুঃ বিষ্ণুং পুষ্পৈ বায়ুরিব দ্রুমাঃ॥'

(রঘু—১০ ৪৯)।

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা নিজ নিজ অংশ দ্বারা দেবকার্য্য সাধনে উদ্যত শ্রীবিষ্ণুর সেই ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিলেন যে ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে বৃক্ষ তাহার অংশ পুষ্প দ্বারা।

মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বলেন যে, 'দেবতাদের অংশ শ্রীবিষ্ণুর অনুসরণ করিয়া চলিল' এই কথাগুলি হইতে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীবিষ্ণুর অংশ যেমন রামচন্দ্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারাও তেমনি রামচন্দ্রের সুগ্রীব ও অন্যান্য ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এ গ্রহের কত ব্যথা

শ্রীশান্তশীল দাশ

সমস্যায় সমাকীর্ণ আজো এই মাটির পৃথিবী;
বেদনার আর্ত্তনাদ অহরহ ওঠে দিকে দিকে।
যেদিকে ফেরাও আঁখি ব্যর্থতার নিষ্করুণ ছবি;
তবু মানুষের স্পর্দ্ধা আকাশের পানে ছুটে যায়।
এ গ্রহের কত ব্যথা—আঁখিজল ঝরে অবিরত,
সে কান্না বেড়েই চলে: সভ্যতার মিছে আস্ফালন।
অনেক উর্ব্বর মাথা—এক ফোঁটা নয়নের জল
মোছাবার সাধ্য নাই; তবু তার দম্ভ সীমাহীন।

আর এক গ্রহের পানে চলেছে উদ্ধত অভিযান:
হয় ত সেখানে আছে শান্তিময় ছোট ছোট নীড়;
ভেঙেচুরে খানখান করে দেবে, জ্বালাবে আগুন:
কে জানে এ অপতৃষ্ণা কবে শেষ হবে একেবারে।
ভাঙা নয় গড়ে তোলা, আঁধারে প্রদীপশিখা ধরা;
মুমূর্ষুর উজ্জীবন—সভ্যতার সত্য পরিচয়।
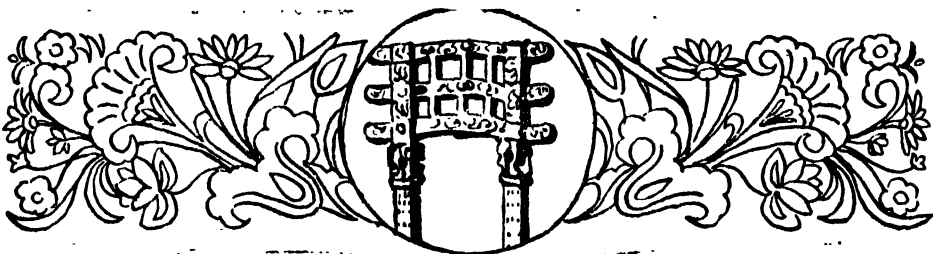
সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

স্বামী স্বরূপানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে কোনদিকে তাকালেন না, উঠান পার হয়ে নিমগাছের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। চকিতে ভোলা মাড়োয়ারী এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ল। বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন স্বামিজী।

কে ? ভোলা !

হ্যাঁ মহারাজ, হামাকে দয়া করুন। আর্তস্বরে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল ভোলা।

কেন ? হ'ল কি, অসুখ-বিসুখ নাকি ? শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন স্বামিজী।

না, মহারাজ হামাকে দয়া করুন।

ওঠ ওঠ, পা ছাড়—কি মুশকিল ! কি হয়েছে খুলে বল, অত অধীর হচ্ছ কেন ?

পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভোলা মাড়োয়ারী। তার পরে হাত জোড় করে বলল, মহারাজ হামার টাকার বহুত দরকার। পিছলা সাল সাতসট্ট হাজার রুপিয়া খালি পাটে লোকসান গেছে। এবার ভি তিরিশ হাজার তিসিতে যাবে।

গোবিন্দ, গোবিন্দ। সবই তাঁরই ইচ্ছে।

হ্যাঁ মহারাজ, ও বাত ত সহি আছে, লেকিন আপনি যদি কিরপা করেন।

আমি, আমি কি করব ? সামান্য মানুষ আমি, আমার ক্ষমতা কোথায় ?

না মহারাজ, আপনার ক্ষমতা বহুত আছে, ও খবর হামি জানে।

ভোলা মাড়োয়ারী যাকে নির্ঘাৎ ফাঁদ বলে তাতেই ধরা পড়বার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এর নাম হ'ল বিজ্ঞাপন—বিংশ শতাব্দীর সব অঘটনের মূলে রয়েছে এই বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব। স্বামিজী কিন্তু সবই জানেন। ভোলা মাড়োয়ারীর আগমনটা বস্তুতঃপক্ষে তিনি অনুমান করেছিলেন, এখন শুধু একটু খেলিয়ে নিতে ইচ্ছে হ'ল তাঁর। বঁড়শিটা বেশ ভালভাবেই গাঁথা দরকার—লেজের ঝাপটা দিয়ে পালিয়ে না যায়। মৎস্যকুলের মধ্যে ভোলা মাড়োয়ারীকে রক্তচক্ষু রোহিত বলা যায়।

স্বামিজী আবার নিমগাছের মগডালের দিকে তাকালেন। ক্ষমতা। বললেন তিনি কীটাণুকীট, দাসানুদাস আমি—আমার আবার ক্ষমতা ! যাও ভোলা, ধীরে সুস্থে বাড়ী গিয়ে ঠাণ্ডা হও, আজেবাজে কথা ভেবো না। গোবিন্দ, গোবিন্দ ! কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি, ভোলা মাড়োয়ারী নাছোড়বান্দা। স্বামিজীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল আবার।

আঃ কি বিপদ ! বিরক্ত হলেন যেন স্বামিজী।

হামাকে কিরপা করুন মহারাজ। ডুকরে কেঁদে উঠল ভোলা।

আচ্ছা, আচ্ছা ওঠ ! এস এদিকে, ঠাণ্ডা হয়ে বস এখানে। দাওয়াতে বসলেন নিজে, সম্ভ্রমে ভোলা অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।

বল কি হয়েছে, শুনি। স্বামিজীর গলার স্বর নির্লিপ্ত।

হামার কিছু রুপিয়া চাই মহারাজ !

টাকা ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি ত সাধু-সন্ন্যাসী লোক, আমি টাকা পাব কোথায় ?

আপনি ইচ্ছা করলেই হয়।

কি বাজে বকছ ভোলা, তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ মহারাজ, হামি জানি টাকা আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন—আপনি যোগী মহাপুরুষ আছেন।

হুঁঃ। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্বামিজী নিমগাছের দিকে।

তুমি জানলে কি করে ? সে ত অনেকদিনের আগেকার কথা। শোন তবে—বদরিকা আশ্রমে নিরঞ্জন শর্মা তীর্থ করতে গেছল। পরে হঠাৎ আমার খুব শরীর খারাপ হ'ল, প্রায় চলৎশক্তিরহিত। তখন ওরা স্বামিস্ত্রী দু'জনে খুব সেবা করলে আমার। ভাল হয়ে তীর্থদর্শনও করতে পারলাম। তখন আমি খুশী হয়ে তাদের কাছে যা টাকা-গয়না ছিল মন্ত্রপূত জল দিয়ে ডবল করে দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু এ সবর তুমি জানলে কি করে ?

হ্যাঁ মহারাজ হামি জানে, আপনি কিরপা করুন, সিদ্ধ-যোগী আপনি।

অন্যায় ভোলা, এ অন্যায় ! তুমি বলছ কি ! এ

বিভূতি অভ্যাস করলে আমার যে মহাপাতক হবে। না না, এ অসম্ভব।

উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। স্বামিজীর মনস্তাত্বিক জ্ঞান অতলস্পর্শী, এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলে মূল্য কমে যাবে, এমনকি সন্দেহ পর্য্যন্তও হতে পারে।

মহারাজ, হামি আপনার বেটা, আমাকে কিরপা করুন! ভোলা মাড়োয়ারীর সেই এক কথা, দুর্জয় লোভের হুতাশনে স্বামিজীর মনস্তাত্বিক প্যাঁচ ঘৃত সংযোগ করলেন। স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন স্বামিজী—দৃষ্টিটা এখনও নিম গাছের দিকে; মানসচক্ষে ভোলা মাড়োয়ারীর ভবিষ্যৎটা দেখে নিলেন যেন।

লোভ ভাল নয় ভোলা, বিপদ হতে পারে।

না মহারাজ, লোভ নয়, বহুত জরুরী দরকার। আর বিপদ কি হবে? আপনি নিজে আছেন, আমার ভয় কি?

বেশ, তা হলে সামনের অমাবস্যার দিন কিছু এনো। অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন তিনি।

কত আনব মহারাজ? ভোলা মাড়োয়ারীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

এই দু'এক শ'। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন স্বামিজী।

না মহারাজ, হামার কাছে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার রুপিয়া আছে।

অত কি হবে? স্মিতহাস্যে মুখ উজ্জ্বল হ'ল স্বামিজীর আর পাঁচশ' ভরি সোনা ভি—

বেশ তাই এনো। অগ্রাহ্যভরে উত্তর দিলেন তিনি, হাঁ, আর গোটাকতক জিনিস চাই।

হুকুম করুন মহারাজ।

দুটো কালো হাঁড়ি, সাতটা কড়ি, তিনটে রূপোর টাকা, একখান মেটে সিঁদুর আর লালপাড় শাড়ী একখানা।

আচ্ছা মহারাজ। ভক্তিভরে প্রণাম করে হৃষ্টচিত্তে চলে গেল ভোলা মাড়োয়ারী। নাঃ, আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে নিতে হবে, বেশী দেরী করলে সব দিক দিয়েই বিপদ, নিজের জালে নিজে জড়িয়ে না পড়ি। মাধুকে করায়ত্ত করতে দেরী হবে না, আর একটু খেলিয়েই তোলা যাবে। বাকি রইল ভোলা মাড়োয়ারীর টাকা আর ঐ খ্যাকশিয়ালটা।

এবারে পশ্চিম দিকে লম্বা পাড়ি দিতে হবে, টাকা কিছু জোগাড় হচ্ছে যখন তখন আর ভাবনা কি? মনে মনে সব ভেবে নিলেন স্বামিজী। বরানগরের ব্যাপারটা নিয়ে পুলিস অনেকদিন তাঁর পিছু নিয়েছে—সেকথা স্বামিজীর অগোচর নেই। জন্তু বিশেষের মত স্বামিজীর ঘ্রাণশক্তি প্রবল। বিপদের সঙ্কেত তিনি অদ্ভুত উপায়ে জানতে পারেন। সেইজন্য একবার নয়, বহুবার তিনি পিছলে পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং ঠিক সময়ে ভোলা মাড়োয়ারী একটা স্যুটকেস নিয়ে এল। তা'র কিছু আগেই সিধু গাঙ্গুলী এসে গেছে। নিমগাছের পাশের ঘরটায় তাকে সঙ্গোপনে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। দরজাটা বন্ধ করে একটু ফাঁক দিয়ে খ্যাকশিয়াল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উঠানের অপরদিকের ঘর এবং মন্দিরের দিকে। মাধবী কয়েকবার এই রাস্তায় যাতায়াত করল।

না! স্বামিজীর পছন্দ আছে, কোথা থেকে যে যোগাড় করে কে জানে! একবার টাকাটা হস্তগত হোক, তারপর সব আস্তে আস্তে মুঠোর ভেতর এসে যাবে। ভণ্ডটা শেষ পর্য্যন্ত তাকে ফাঁকি দেবে না তো? না, ফাঁকি আর দেবে কি করে? নিজেই যখন সে হাজির রয়েছে।

মাধবী একটা রেকাবী আর একটা গেলাস নিয়ে এদিকে আসছে। চলার লোভনীয় ভঙ্গিটা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে সিধু গাঙ্গুলী—আঃ যেন একটা ছবি। স্বামিজীর পছন্দের তারিফ করতে হয়। উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত-গতিতে চলতে লাগল।

মাধবী ঘরে ঢুকল —

এটা খেয়ে নিন? মাধবীর মুখে সূক্ষ্ম হাসির ছোঁয়াচ রয়েছে যেন।

কি এটা? খ্যাকশিয়ালের লোভাতুর দৃষ্টিটা মাধবীর উপর নিবদ্ধ। সে যেন চোখ দু'টো দিয়েই মাধবীর দেহ-সৌষ্ঠবটা আস্বাদ করার চেষ্টা করছে।

গোবিন্দজীর প্রসাদ। মাধবীর দৃষ্টিতে কৌতুক মেশান।

আর ওটা? খ্যাকশিয়াল মাধবীকে আটকে রাখতে চায়, যতক্ষণ পারে।

এটা ঠাকুরের চানজল, বললে মাধবী। অপর পক্ষের অবস্থাটা মাধবী বেশ অনুভব করতে পারছে।

আঃ, তুমি একটু বসবে না? উত্তেজনায় সিধু গাঙ্গুলীর সর্ব্বশরীর কাঁপছে।

আপনি আগে খেয়ে নিন, তার পর বাসনগুলো রেখে আসছি। মাধবীর কথা বলার ভঙ্গীটা মনোরম। স্বামিজীর শিক্ষার গুণ আছে। এ ক'দিনেই মাধবীর বেশ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। সিধু গাঙ্গুলী প্রসাদ ও চানজল নিঃশেষ করলে।

আসছি। ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলে দ্রুতপদে মাধবী উঠানের দিকে এগিয়ে গেল। কাপড়ের কোঁচা দিয়ে

খ্যাঁকশিয়াল মুখটা মুছে নিলে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা নিঃসরণ হচ্ছে তার।

সিধু গাঙ্গুলী অনেক দেখেছে কিন্তু এমনটি আর চোখে পড়ে নি। মাধবী এখনও আসছে না কেন? দরজার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সে। মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরে উঠল তার। পায়ের তলায় মেঝেটা যেন দুলে উঠল, ধীরে ধীরে যেন চোখের উপর অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বজ্রমুষ্টিতে তার শ্বাসনালী যেন কে টিপে ধরেছে। চীৎকার করতে চেষ্টা করলে সিধু গাঙ্গুলী, গলা দিয়ে কিন্তু কোন আওয়াজ বার হ'ল না।

চানজলের মাহাত্ম্যে ও-ঘরে ভোলামায়োয়াড়ী আর এ ঘরে সিধু গাঙ্গুলী অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ঘরে তালা বন্ধ করে স্বামী স্বরূপানন্দ ব্যাগ এবং মাধবীকে সঙ্গে করে দ্রুত মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথমেই হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হবে।

অনেক খুঁজে এবং ভেবে-চিন্তে রবীন উত্তরপাড়ায় একটা বাসা নিয়েছিল। কলকাতায় সব জিনিসেরই যেন আগুন লেগেছে। একটা ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। কিছু কম করার কথা বললে বাড়ীর মালিকের দৃষ্টিটা এত স্পষ্ট হয় যে, কিছু বলার দরকার হয় না। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে লিলিপুট অধিবাসী বামনের মত হয়ে তার পাশে নির্ব্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সুতরাং রবীন কলকাতার দিকে চেষ্টা না করে আশপাশে বাসা খোঁজার চেষ্টা করেছিল। তার মত সামান্য একজন চাকুরে বাড়ী ভাড়ার জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে খাবে কি?

আর শুধু ত সে নিজে নয়! মীরা আছে, মিণ্টু আছে তাদের জন্যই ত ভাবনা। মামা তাঁর কাজ করে সরে পড়েছেন—এখন সামলা তুই। এ যুগে এত অল্প বয়সে মামা যে কেন বিয়ে দিলেন তার, তা সে বুঝতে পারে না। অবশ্য বিয়ের সময় অমতও সে কিছু করে নি। মামার মতে বিয়ে করা তার পক্ষে নাকি অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল। এখন মনে হয় কিছুদিন পরে করলেই চলত। স্ত্রী হিসাবে মীরা সত্যিই আদর্শ। ওদিক দিয়ে অভিযোগ করার মত তার কিছু নেই, বরঞ্চ অল্প আয়ে মীরা তার ছোট্ট সংসারটিকে এই কয়েক বৎসরেই বেশ ভালভাবেই চালিয়েছে। মেয়েটা হয়েছে এক নম্বরের দুষ্টু। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমন পাকা পাকা কথা শিখেছে যে, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বাবু! মিণ্টু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

উঁঃ। রবীন হিসাব মেলাচ্ছে, খাতায় লিখে রাখছে কোথায় কোথায় গিয়েছিল। দেশাই লেবরেটারীজ-এর মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ সে। ডাক্তারবাবুদের সঙ্গেই তার কাজ। প্রত্যহ এক-একটি এলাকায় বিভিন্ন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হয়। দেশাই ল্যাবরেটারীজ-এর ওষুধ যে সর্ব্বগুণসমন্বিত এ বিষয়ে ডাক্তারবাবুদের কাছে সে অনর্গল বলে যেতে পারে—"ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন স্যার", আপনি একবার হস্‌পিটালের রিপোর্টটা দেখুন। দেশী-বিদেশী প্রত্যেক ওষুধের তুলনায় এর এফেক্টটা লক্ষ্য করুন। হিমোগ্লোবিন পারসেন্টেজটা দেখেছেন? এ্যাবসলিউটলি কনভেন্সিং, আর দামটাও বিবেচনা করুন স্যার। আমাদের গরীবের দেশে বেশী পয়সা ক'জন খরচা করতে পারে বলুন!

বাবু!

সবারই ধৈর্য্যের সীমা আছে, আর মিণ্টুও মানুষ ত?

হুঁঃ। কি বলছ বল? পেনটা পাশে রেখে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলে রবীন। 'চারমিনার'—দামও সস্তা তামাকটা খাঁটি। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট সন্তর্পণে বার করে রবীন কয়েকমুহূর্ত্ত সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে রইল। এক দিকটা ধীরে ধীরে দেশলাইয়ের ওপর ঠুকে আলতোভাবে ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। সিগারেট খাওয়ার সময় শুধু নয়, অন্য যে কোন কাজ করবার সময়ও রবীন সেটাকে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। ভঙ্গীগুলো তার সরল, কিন্তু শিল্পীর ছোঁয়াচ থাকে তাতে। 'চারমিনার' সিগারেটের নীলচে ধোঁয়াটা তার নাসারন্ধ্রের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

বাবু!

হ্যাঁ, বল?

বলছি, তুমি অত লম্বা কেন বাবু?

লম্বা!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, লম্বা। তাই ত চিন্তিত হ'ল রবীন, তার দীর্ঘতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেউ ত স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করেছে বলে ত তার মনে পড়ে না।

আমি কিন্তু জানি, মিণ্টু তার অভিমতটা জানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

কেন বল ত?

তুমি যে সাহেব, তাই অত লম্বা। কঠিন হেঁয়ালীর উত্তরটা অতি সহজেই মিণ্টু প্রকাশ করলে।

কে বললে?

কেন মা, আবার কে?

কি বলেছে বল ত? তার সম্বন্ধে মীরার মতামতের দাম আছে বৈকি।

মা, সেদিন বলেছে, আমি কি তোমার বাবুর মত সাহেব?

এর পর রবীনের দীর্ঘ কৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কারণ খোঁজার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না। কথাটা কোন প্রসঙ্গে মীরা অবতারণা করেছে তা সে জানে না. তবে মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসাবে তাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে হয়। দৈনিক নিয়মিত ক্ষৌরকর্ম্ম করা, ধোপ-দুরস্ত স্যুট পরা, রং-মেলানো টাই বাঁধা এসব তার চাকরীর পক্ষে অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা যায়।

অনেক কষ্টে এই চাকরীটা যোগাড় করা গিয়েছে। খবরের কাগজ দেখে দরখাস্তের পর দরখাস্ত লিখে যে পরিমাণ কাগজ কেনা হয়েছে তাতে টিটাগড় পেপার মিলস্-এর লভ্যাংশ অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল বলে রবীনের মনে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন এম-এল-এ-দের বাড়ীতে নিয়মিত ধর্ণা দেওয়া, তাঁদের স্তবগানে মুক্তকণ্ঠে যোগদান করা সত্ত্বেও সরকারী বেকার-নীতি তার পক্ষে অনমনীয় হয়েই রইল, অবশ্য দিল্লীর কোন একটি সরকারী অফিসে একটি ইণ্টার-ভিউ যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু নিজ ব্যয়ে দিল্লী পরিভ্রমণের মত অবস্থা না থাকায় রবীন রাজধানীর দিকে আর অগ্রসর হতে পারল না। সেই কারণে দেশাই-ল্যাবরেটরীজ-এর মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ খালি আছে এই সংবাদ পেয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে নানুভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন চাকরিটা হয়ে গেল তখন ধরাধামে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হয়েছে বলে রবীনের কাছে মনে হ'ল বৈকি!

মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ ডাক্তারবাবুদের নিয়ে, সুতরাং রবীন কালবিলম্ব না করে তাঁদের সঙ্গে যোগা-যোগ সুরু করে দিলে। ডাক্তারদের সম্বন্ধে রবীনের ধারণা অন্তরকমের ছিল। স্বল্পবাক, স্থির ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এ্যাণ্টি-সেপটিক লোসান, ডেট্‌ল ও কার্ব্বলিক সাবানের গন্ধ মিশ্রিত অবাস্তব পরিবেশকে সে সর্ব্বদা দূরে রাখার চেষ্টাই করে এসেছে, কিন্তু কিছুদিন মেশবার পর রবীনের মনে হ'ল ওদের সম্বন্ধে ধারণাটা তাঁর নির্ভুল হয় নি। সম্পর্ক এবং সম্বন্ধ নিকট হলে যে কোন বিষয়েই মতামত পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, তা সে লক্ষ্য করেছে। এপর্য্যন্ত অনেক ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এবং কয়েকজনের সঙ্গে তার বেশ হৃদ্যতাও হয়েছে, তা থেকে এটুকু সে বুঝেছে যে ডাক্তারেরা আর যাই হোক ভয়াবহ কিন্তু নয়, সুতরাং এই প্রীতির সম্পর্কটা কাজে লাগিয়ে অনেক জায়গায় দেশাই ল্যাবরেটরীর ওষুধ চালু করতে সে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অন্য ধরণের ডাক্তারও আছেন। এঁদের মধ্যে কয়েক-জন তাকে কারণে অকারণে ওষুধ সম্বন্ধে নানা উপদেশ বর্ষণ করেছেন এবং অসাধারণ জ্ঞানসুলভ ভঙ্গীতে দোষ ত্রুটির কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। এঁদের হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে বলে রবীনের মনে হয়েছে, সে কারণে তাঁরা যে স্বতঃই একটু ছিদ্রান্বেষী হয়ে পড়বেন এ আর আশ্চর্য্য কি!

যাই হোক, কিছুদিন কাজ করার পর রবীনের মনে হ'ল পূর্ব্বের স্বর্গরাজ্যটা যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দেশাই ল্যাবরেটরীজের ওষুধ সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুদের বিরুদ্ধ-মুখী সমালোচনা কিংবা তাচ্ছিল্য প্রকাশে তাকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি কিন্তু আপিসের মন্তব্যে অনেক সময় তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হবার মত হয়েছে। তাদের অক্ষমতা এবং অকর্ম্মণ্যতার জন্যেই যে যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধের কাটতি হচ্ছে না, একথা তাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে।

বাবু! মিণ্টু আবার বাবাকে ডাকলে। ডাকটা ঠিক রবীনের কানে পৌছল না। রবীন ভাবছে, একটা ভাল চাকরী পেলে সে যেন বেঁচে যায়। সব দিক দিয়ে যেন সামলানো দায় হয়ে পড়েছে। একদিকে নজর দিলে অন্য দিকে ফাঁক পড়ে যায়, শতচ্ছিন্ন কাপড়ে জোড়াতালি দেওয়ার মত হাস্যকর প্রচেষ্টা। পরিশ্রম করতে রবীন কোনদিনই কাতর নয়; কিন্তু সব সময় পরিশ্রম করলেও ফল আশানুরূপ হয় না। ডেলী প্যাসেঞ্জারীর বিড়ম্বনা সে সহ্য করতে পারে কিন্তু ৮-৪৫এর ট্রেণ ধরে ১০টার মধ্যে ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌঁছনো অনেক সময় সম্ভব হয় না। দেশী কোম্পানী হলেও দেশাই ল্যাবরেটরিজের কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মানুবর্ত্তিতাকে কর্ম্মচারীদের বেতন অপেক্ষা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেন।

বাবু! কালা হয়ে গেছে বোধ হয় বাবুটা। ভাবছে মিণ্টু। এর পর মিণ্টুর বিরক্ত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বাবু! আবার ডাকলে মিণ্টু, এবার স্বরটা একটু উচ্চ গ্রামে।

উঁ! সাড়া দিলে রবীন, চারমিনার' সিগারেটে শেষ টানটুকু দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস নিয়ে শেষে বললে—হ্যাঁ, কি বলছ বল।

বলছি যে তুমি মাকে মীরা বল কেন?

তোমার মায়ের নাম মীরা বলে।

তবে মা তোমায় ওগো বলে ডাকে কেন?

শিশু-মনস্তত্ত্বের কথা রবীন কোনদিন ভেবে দেখে নি। মাসিক পত্রিকায় ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ চোখে পড়লে সভয়ে সেগুলো এড়িয়ে যায়, কারণ পড়তে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে

পাঠকের মনের অবস্থাও যে শঙ্কাজনক হয়ে ওঠে, তা সে অনুভব করেছে।

তুমি ইঞ্জিন চালাতে পার ? হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালে মিণ্টু, অবশ্য এইটাই তার বিশেষত্ব।

না। ঘাড় নাড়লে রবীন, অক্ষমতা স্বীকার করতে লজ্জা পেল না সে।

সেকি ? আশ্চর্য্য হয়ে যায় মিণ্টু, তুমি তা হলে একটা বোকা ছেলে। ঐ দেখ, রোজ ঐ লোকটা ইঞ্জিন চালায়।

তাই নাকি ? টেবিলে রক্ষিত ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রবীন, সময় আর বেশী নেই, এইবার তাকে উঠতে হবে।

হ্যাঁ গো, রোজ ও ইঞ্জিন চালায়।

জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে রবীন। লোকটাকে সেও আগে কয়েকবার দেখেছে। মাথায় রুমাল বেঁধে নীল রঙের প্যান্ট পরে হাতে এলুমিনিয়মের ডিবেটা ঝুলিয়ে রোজ এই সময়ে লোকটা ষ্টেশনের দিকে যায়।

তুমি কি করে জানলে যে, লোকটা ইঞ্জিন চালায় ? প্রশ্ন করলে রবীন।

ও যে আমায় নিজে বলেছে। বাবুর অল্পবুদ্ধিতে মিণ্টু রীতিমত অবাক হয়ে যায়। তথ্য সংগ্রহকারিণীর আর কিছু বলবার ছিল, কিন্তু মীরা সেই সময় ঘরে ঢুকল।

কি ? বাপ-বেটি কি পরামর্শ হচ্ছে ? মীরার আঁচলটা কোমরে জড়ানো। রান্নাঘর থেকে সবেমাত্র এসেছে বলে মনে হয়, আগুনের উত্তাপে গৌরবর্ণ মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

জান মা ! বাবু আবার সিগারেট খেয়েছে।

মূল্যবান গোপন তথ্যটা প্রথম সুযোগেই মিণ্টু প্রকাশ করে দিল। আড়চোখে রবীন মিণ্টুর দিকে একবার দেখে নিল। কন্যার প্রতিভা সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহ রইল না।

আবার খেয়েছ ? শাসনের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করে মীরা।

না না, ইয়ে। বলার মত কিছু খুঁজে পায় না রবীন।

হ্যাঁ মা ! জোর গলায় সাক্ষ্য দেয় মিণ্টু।

মেয়ের সামনে মিথ্যে কথা বল না, তা হলে ও তাই শিখবে।

এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষণ করলে মীরা—

হ্যাঁ, মানে একটা। কোন দিক দিয়েই নিষ্কৃতি নেই রবীনের।

তাই বলি, ঘরে এমন মড়াপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে কেন।

মীরা নাসিকার অগ্রভাগ কয়েকবার কুঞ্চিত করলে,— তুমি বসে আছ কেন, ওঠ, চান করতে হবে না ?

যাচ্ছি। স্বরে বিশেষ উৎসাহ নেই রবীনের।

আসবার সময় তিন গজ কোরা মাকিন আনবে— বালিশের ওয়ারগুলোর দফা একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

আচ্ছা। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে রবীন।

মীরার সময়াভাব সুতরাং চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মিণ্টু তখনও আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মায়ের সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল কিন্তু···

তুমি কেন মাকে বলে দিলে যে, আমি সিগারেট খেয়েছি ? অনুযোগের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল রবীন।

বারে, খুব টেনে উত্তর দিলে মিণ্টু, মা যে আমায় বলে দিয়েছে।

কি বলেছে ?

তুমি ক'টা সিগারেট খাও, দেবুকাকার সঙ্গে সিনেমার গল্প কর কিনা, এই সব মাকে বলে দিতে বলেছে যে— যুৎসই উত্তরটা দিয়ে মিণ্টুর মুখে হাসি ফুটেছে, রবীনও হেসে উঠল।

মীরা একটা জিনিস কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, সেটা হচ্ছে রবীনের সিনেমা যাওয়া। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে অবশ্য আপত্তি নেই, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা গেলেই বিপদ। মীরাকে লুকিয়ে অনেক দিনই রবীন সিনেমা দেখেছে সেকথা ঠিক কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরাও পড়ে গেল।

সেদিন আপিস থেকে ফিরতে রবীনের দেরী হ'ল। তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল মীরা, দুর্ভাবনাও বেশ হচ্ছিল। তাই রবীন ফিরতেই তার ক্লান্তমলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মীরা প্রশ্ন করল, ফিরতে এত দেরী হ'ল যে ?

আর বল কেন, ফ্যাক্টরী যাও, গুদামে যাও, সেখান থেকে ষ্টেশনে মাল পৌছেচে কিনা খবর নাও, নানা ঝঞ্ঝাট। বিরক্ত ও ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিয়ে চেয়ারের উপর শরীরটা এলিয়ে দিলে রবীন।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মীরা, সমবেদনায় ভরে গেল তার মনটা। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রবীনের মাথাতে একবার হাতের তাপটা রাখলে। মীরার আদর করার ভঙ্গীটা একটু অন্য ধরণের। রবীনকে কাছে পেলে তার মাথাটা নিজের কাছে টেনে নেয়, আঙুলের ডগা দিয়ে রবীনের সমস্ত মুখে আলতো ভাবে ধীরে ধীরে বোলায়। চুলের ভেতর আঙুলগুলো মন্থর গতিতে চালনা করে। মীরার ভালবাসার এটা একটা বিশেষ ধরণের প্রকাশভঙ্গী। রবীন একবার মীরাকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করেছিল।

আচ্ছা মীরা, তুমি আমাকে এভাবে আদর কর কেন ?

কি ভাবে ?

ওই যে, আমার মাথাটা টেনে নাও—

তা নিলেই বা, তোমার খারাপ লাগে?

না তা নয়, তবে যেন মনে হয়—

বুঝেছি। বাধা দেয় মীরা, তোমার মনে হয় যেন একটা ছোট ছেলেকে আদর করছি না?

হ্যাঁ, হাসল রবীন—তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারছিলাম না।

থাক্ আর বুঝিয়ে দরকার নেই। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মীরা।

ভালবাসার বিশ্লেষণ করতে দেখলে মীরার রাগ হয়। মার্কেটে শাড়ী কেনার কথা মনে পড়ে যায় মীরার—কাদের তৈরী, কত নম্বরের সুতো, পাড়ের মাপটা মাফিকসই নয়। দুটো জিনিস কি এক নাকি? বিরক্ত লাগে তার, ভালবাসার মনগড়া গল্প শুনতে। আতিশয্যের কৃত্রিমতায় মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে তার। এক রসোত্তীর্ণ কোন শিল্পবস্তু নাকি যে, তাকে বার বার তারিফ করতে হবে, আর প্রশংসা করতে হবে উচ্চকণ্ঠে।

নাও ওঠ ত, বললে মীরা, কোট-প্যাণ্ট ছাড়। মুখ যে একেবারে কালো হয়ে গেছে। যাও, হাতে মুখে একটু জল দাও গে, আমি ততক্ষণে এক কাপ চা করে আনি। এই মনোযোগ, এই স্নেহসিঞ্চিত স্পর্শ রবীনের ভাল লাগে, তাকে নিয়ে বিশেষ কেউ ব্যস্ত হয়ে উঠুক এটা রবীন মনে-প্রাণে চায়। অধিকারের প্রশ্ন এটা নয়, চাইলেও হয়ত পাওয়া যায় না, কিন্তু অযাচিত ভালবাসা ,এই উষ্ণতা তাকে স্পর্শ করে—কোমল, সূক্ষ্ম রেশমের মত তার সর্ব্বাঙ্গে যেন সেটা জড়িয়ে থাকে।

বাথরুমে রবীন ঢুকল, জলের শব্দের সঙ্গে রবীনের গানের গুন্ গুন্ ধ্বনি শোনা গেল। মীরা চা নিয়ে এসেছে। চেয়ারের ওপর কোট আর প্যাণ্টটি ফেলে রেখে গেছে রবীন। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে কোট-প্যাণ্ট তুলে নিলে মীরা। রবীন চিরদিনই এইরকম অগোছালো,—কোন জিনিস তার ঠিক নেই। প্রত্যেকটি বিষয়ে মীরাকে নজর রাখতে হয়। হাতে কোটটা তুলে নজর করল মীরা-- হ্যাঁ বেশ ময়লা হয়ে গেছে, কলারে স্পষ্ট একটা ময়লা দাগের লাইন রয়েছে। প্যাণ্টটা প্রায় পায়জামার মত হয়ে এসেছে, ক্রীজগুলো অদৃশ্য প্রায়। মোড়ের অজান্তা ডাইং ক্লিনিং-এ এগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে কাল। পকেটে যদি কিছু থাকে একবার দেখে নেওয়া দরকার। কোটের পকেটে হাত ঢোকালে মীরা। ডুবুরির মত মীরার আঙুলগুলো পকেটের গহ্বর থেকে কয়েকটা জিনিস উদ্ধার করলে। প্রথমে একটা ট্রামের টিকিট, পরে একটা ওষুধের হাণ্ডবিল, মীরা পড়ে নিলে এটা। লেখা আছে—আপনার কি মাথা ঘোরে, উঠিয়া দাঁড়াইলে কি চোখে অন্ধকার দেখেন, কাজে কি আপনি মনঃসংযোগ করিতে পারেন না? লক্ষ্য করিবেন নিশ্চয়ই ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে আপনার। ডাক্তারের কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের প্রস্তুত বিশ্ববিখ্যাত টনিক লিভভিটিস্ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মন্ত্রবৎ কাজ করিবে। এক শিশি ২।৹ আনা, একসঙ্গে তিন শিশি লইলে ৬৲ টাকা মাত্র। ১১২নং গুলু ওস্তাগর লেন। একেবারে ছেলেমানুষ, ভাবলে মীরা। স্মিতহাস্যে কাগজটা হাতের তালুতে গোল করে পাকিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলে সে। আবার পকেটের ভেতর হাত ঢোকালে, একটা রুমাল, এগুলো কি? কুচো সুপুরি ও লবঙ্গ, বাঃ এই ত চারমিনার সিগারেটও রয়েছে। ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল মীরার। আর একটা ছোট ভাঁজ করা রঙীন কাগজ, একি? মেট্রো সিনেমার টিকিট দুটো—তারিখ দেখে নিল মীরা, হ্যাঁ, আজকেরই বটে, সিনেমা যাওয়া হয়েছিল, তাই এত দেরী হয়েছে। হাতে টিকিট দুটো নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। সমস্ত শরীরে যেন অকস্মাৎ একটা দুর্দ্দমনীয় অবসাদ নেমে এল তার। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, রবীনের শঠতার কথা ভেবে। প্রতারণার ছোট-বড় নেই, আজ সে সামান্য জিনিস নিয়ে প্রতারণা করছে, কাল সে বড় জিনিস নিয়ে ঠকাতে দ্বিধা করবে না নিশ্চয়। শোবার ঘরে মীরা গিয়ে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল খাটের ওপর। অন্ধকার যেন ব্যথার বন্ধু। নিজের মনকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল মীরার। তীব্র বেদনার আঘাতে যেন ভেঙ্গে পড়ল সে। কয়েক মুহূর্ত আগে রবীনের জন্য মনে যে সমবেদনা আর সহানুভূতি এসেছিল, সে জায়গায় এল প্রচণ্ড দুঃখ আর অভিমান। বাথরুম থেকে এখনও জলের ধারার শব্দ আর রবীনের গানের সুর ভেসে আসছে। রবীনের বেশ ভাল লাগছে। শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ তার লোমকূপ আর মাংসপেশীগুলোকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে, একটা মৃদু অস্পষ্ট যন্ত্রণার আমেজের মধ্যে রয়েছে আনন্দের ইঙ্গিত। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বাইরে এল রবীন। নজরে পড়ল টেবিলে রক্ষিত ধূমায়িত চায়ের কাপটার ওপর।

মীরা! ডাকল রবীন। মীরার সাড়া নেই।

মীরা! আবার ডাকল রবীন; অপেক্ষাকৃত জোর গলায়।

চায়ের কাপটা তুলে নিলে সে, দেরী হয়ে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে, আর ঠাণ্ডা চা খেলে মীরা খুব রাগ করে। দরজার কাছে মিণ্টু এসে দাঁড়িয়েছে, মুখটা যেন খুব গম্ভীর।

রবীনের সংসারের ব্যারোমিটার সে, ঝড় আর মেঘের পূর্ব্বাভাষ—তার মুখেই প্রথম প্রকাশ পায়।

কি হ'ল মিণ্টু, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন, মা কোথায়?

মায়ের পেট ব্যথা করছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভঙ্গীটা নকল করল মিণ্টু।

পেট ব্যথা করছে?

হ্যাঁ, তাই ত কাঁদছে। বললে মিণ্টু, কয়েক দিন আগে তাকেও কাঁদতে হয়েছিল ঐ একই কারণে। ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল রবীন। দ্রুত শোবার ঘরে চলে গেল সে। সত্যিই মীরা শুয়ে রয়েছে খাটের ওপর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও তার শরীরে অসুস্থতার কোন চিহ্নই ত দেখা যায় নি।

কি হয়েছে মীরা? রবীনের কণ্ঠস্বরে রীতিমত উদ্বেগ।

কিছু নয়। মুখ ফিরিয়ে নিলে মীরা।

মীরার পাশে গিয়ে বসল রবীন, তার সুডৌল পিঠের ওপর হাতের তালুটা রেখে আবার প্রশ্ন করল, অসময়ে শুয়ে কেন? কি হয়েছে বল? রবীনের হাতের উত্তাপটা মীরার পিঠ স্পর্শ করছে, অতি পরিচিত ছোঁয়াচটা।

মনটা দুলে উঠল মীরার, তবু জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কৈ, কিছু নয় ত।

লক্ষীটি, বল কি হয়েছে।

বললাম ত কিছু নয়। মীরার স্বরে বিরক্তির আভাস রয়েছে।

ব্যাকুল স্বরে রবীন আবার সেই একই প্রশ্ন করল। মীরার উত্তরেও কোন তফাৎ নেই।

মীরার দুর্জ্জয় অভিমানটা এখনও ওর মনের নির্ম্মলতাকে কর্দ্দমাক্ত আর ঘোলা করে রেখেছে, থিতিয়ে উঠতে সময় লাগবে। রবীনের সান্নিধ্য আর তাঁর স্নেহ-কোমল স্বর আবর্ত্তটায় ভাঁটা আনছে যেন। রবীনের প্রশ্ন আর মীরার উত্তর আরও কয়েকবার চলল। রবীনের বক্তব্য বিষয়টি যেমন সীমাবদ্ধ মীরার উত্তরও তাই। বাবুর পেছনে মিণ্টু এসে দাঁড়িয়েছিল। সেলুলয়েডের ভাঙা পুতুলটা নিয়ে সে মেঝেয় বসে রয়েছে। অপরপক্ষকে জানতে দেওয়া উচিত নয় তার আগমনের কারণটা। প্রতিপক্ষ যদি পুতুল খেলাটাই তার আসার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয় তা হলে সব জিনিসটাই বেশ ভাল ভাবে সে দেখতে এবং শুনতে পারবে। মীরা রবীনের দিকে তাকিয়ে বললে, তবে কেন বললে আপিসের কাজে আটকে গিয়েছিলে?

আপিসের কাজেও যাই নি কি? যুক্তি দেওয়ার একটা বিফল চেষ্টা করে রবীন।

দেরী হওয়ার কারণটা কি আপিস? ভ্রুকুঞ্চিত করলে মীরা।

না, তা অবশ্য নয়। টেনে টেনে উত্তর দিলে রবীন। স্বীকার করে নিলে অনেক দ্বন্দ্বেরই অবসান ঘটে সেকথা সে জানে। আত্মসমর্পণের পর আর কোন কথা ওঠা উচিত নয়।

মীরা কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইল রবীনের মুখের দিকে। ভ্রূ কুঞ্চিত রেখাগুলো এখন অদৃশ্যপ্রায়। সিক্ত চোখের দৃষ্টি যেন কোমল হয়ে এসেছে। বর্ষণের পর স্নিগ্ধ করুণাভাসের ইঙ্গিত।

কার সঙ্গে যাওয়া হ'য়েছিল? মীরার স্বরটা এবার নিখাদের।

আর বল কেন। উত্তর দিলে রবীন, জড়তাটা কেটে গিয়েছে। তার এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। আপিস থেকে বেরুচ্ছি এমন সময় ধীরেন ভড় পাকড়াও করলে। বলে, চল, সিনেমায় টিকিট কাটা আছে, যত তাকে বোঝাই, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার প্রয়োজন আছে, ততই সে নাছোড়-বান্দা হয়ে ওঠে—অগত্যা যেতেই হ'ল, কি আর করি বল। তালু দুটো উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে রবীন তার অসহায়তার বর্ণনা শেষ করলে।

লোকটাকে দেখলেই আমার খারাপ লাগে, দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত অসভ্য আর বেয়াদব, ধীরেন ভড় সম্বন্ধে মন্তব্য করলে মীরা।

ফিল্ম ডাইরেক্টার কিনা তাই সব সময়ে চোখ খুলে রাখতে হয়; তবে ধীরেন ভড়ের ওপর তোমার রাগ কেন আমি জানি। রহস্যঘন দৃষ্টিতে রবীন মীরার দিকে তাকায়।

কেন বল ত?

সেই যে একবার ধীরেন ভড় বলেছিল তোমায় ফিল্মে নামবার জন্যে, বোধ হয় সেই জন্য।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ফিল্মে নামতে যাব কেন?

সুন্দরী বলে। আড়চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে প্রতি-ক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে গিয়ে রবীন ধরা পড়ে গেল। হেসে উঠল মীরা।

মিণ্টু উঠে দাঁড়িয়েছে, যেটুকু তার দেখার বা শোনর দরকার ছিল সেটুকু নির্ব্বিঘ্নে দেখা হয়েছে। অবশ্য এ দৃশ্য তার কাছে নুতন নয়, প্রায় সে এটা দেখে থাকে। পুতুলটাকে মেঝের ওপর অনাদৃত অবস্থায় ফেলে রেখে মিণ্টু দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মিণ্টু! ডাকলে রবীন, মিণ্টুকে হঠাৎ সে দেখতে পেয়েছে,

মুখটা তার যেন থমথমে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল মিণ্টু, স্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে।

এদিকে এস। আদরের ভঙ্গীতে আবার ডাকল রবীন।

গম্ভীর মুখে ঘাড় হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিণ্টু। রবীনের স্নেহ-মাখানো কণ্ঠস্বরে তার মনের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। শুধু একবার মিষ্টি করে ডাকলেই ত সে যাবে না।

এস মিণ্টু, লক্ষ্মী সোনা! ডাকলে মীরা, মিণ্টুর অভিমানটা ওর চোখে আগেই ধরা পড়েছে। সজল চোখে মিণ্টু ওদের একবার চকিতে দেখে নিলে। ওরা কেন মিণ্টুর দিকে তাকালে না একবার। বাবুটা ভারি দুষ্টু, তাই জন্য ত মাকে সিগারেট খাওয়ার কথা বলে দিতে হয়।

মিণ্টুকে কোলে নিয়ে খাটে গিয়ে আবার বসল রবীন। দুজনে আদরে ডুবিয়ে দিলে মিণ্টুকে। এটা আগে করলেই হ'ত, ভাবছে মিণ্টু, সে যে অতক্ষণ একলা চুপ করে মেঝেয় বসে রইল সেটা ওরা লক্ষ্যই করল না কেন? তাকে বাদ দিয়ে ওরা দু'জনে ও রকম করে কেন? সব ভার দোষ না কি? বাবে…

বাবু! মিণ্টুর ডাক রবীনের চিন্তাস্রোতে বাধা দিলে। ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর পড়ল আবার, কাঁটাটা তার অন্যমনস্কতার সুযোগে যেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল রবীন।

মীরার হাতের চাঞ্চল্য এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। রবীনের আপিস যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসে মীরার হাত তত দ্রুতলয়ে চলতে থাকে নিখুঁত শিল্পীর ভঙ্গীতে। দু'জন দু'জনকে যেন টক্কর দিতে চায়; প্রতিযোগিতায় কেউ হটতে চায় না।

মীরা আর মিণ্টু জানালার ধারে এসে দাঁড়াল এবার।

পথে নেমে রবীন তাকালে জানালার দিকে। এটা ওদের প্রতিদিনের অভ্যাস।

বাই বাই, টা টা। হাত তুলে বললে মিণ্টু সম্প্রতি এ কথাটা ও নুতন শিখেছে।

মুখের কোণে হাসি দেখা দিল রবীনের, কালো গগলসের ওপর সূর্য্যের কিরণটা ঝলসে উঠল। মীরার এই সময়টা বেশ লাগে। দূর থেকে রবীনকে দেখে মীরার মনে হয় যেন ও কত সুন্দর। নববধূর মত লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তখন সে।

দ্রুতলয়ের ছন্দটা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় রবীনের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শিথিলতা নেমে আসে মীরার সুন্দর বঙ্কিম দেহরেখার মাঝে। ঋজু ভঙ্গীটায় অবসাদের ছোঁয়া লাগে যেন। এই সময়টা মীরার খারাপ লাগে। সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোতে মন বসাবার চেষ্টা করে। একবার ভাঁড়ারঘরে, একবার বা রান্নাঘরে, নয় ত সেলাই নিয়ে বসে মিণ্টু মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে, তারও ছোট্ট মনটা যেন কুঁকড়ে যায়।

সম্প্রতি পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে মীরার আলাপ হয়েছে। রামধন মুস্তফী পাশের বাড়ীর মালিক। পাটের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রেণু তারই মেয়ে। রেণুর বয়স মীরার চেয়ে কম কিন্তু বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়ই বলা চলে। রেণু গানের ভক্ত, আধুনিক সঙ্গীত-জগতে গায়কগায়িকাদের গান ত বটেই, এমনকি তাদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা পর্য্যন্ত রেণুর অজানা নেই। এদিক দিয়ে রেণুর জ্ঞান প্রায় গবেষক শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেলা চলে। রেণুর এখনও বিয়ে হয় নি, *নানা জায়গা থেকে কথা আসছে। সেই নিয়ে ওরা দু'জনে প্রায়ই হাসাহাসি করে। একসময়ে মীরাও সঙ্গীতচর্চা* করেছে, এখন অবশ্য অভ্যাস না থাকায় অসুবিধে হয়, তা হলেও তার সুমিষ্ট গলার কদর এখনও অনেকেই করে। সেই জন্য রেণুর সঙ্গে মীরার আলাপটা বেশ ভালভাবেই হয়েছে। রবীন আপিস যাওয়ার পরই মীরা খাওয়া দাওয়া সেরে রেণুদের বাড়ী যায়। নানারকম আলোচনা ও সঙ্গীত-চর্চায় দিনটা একরকম কেটে যায়।

সেদিন দোতলার বারান্দা থেকে রেণু চীৎকার করে ডাকলে, মীরাদি!

কি হ'ল রেণু? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে মীরা।

টেলিফোন।

কার?

আপনার—আবার কার? চোখ ঘুরিয়ে বললে রেণু।

কে করছে বলত? মীরা ভয় পেয়েছে। হঠাৎ টেলিফোন করছে কেন? হৃদপিণ্ডটা অকস্মাৎ দ্রুতগতিতে চলতে সুরু করে দিল তার।

রবীনবাবুর। আশ্বাস দেয় রেণু।

ভাবছে মীরা—নিজে যখন টেলিফোন করছে, তখন ভালই আছে নিশ্চয়ই। ফিরতে দেরী হবে হয় ত তাই দয়া করে খবরটা দেওয়া হচ্ছে। বোধ হয় সিনেমা কিংবা আপিস-ফেরত কোন বন্ধুর বাড়ী নিভাঁজ আড্ডা। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে মীরা শাড়ীটা গুছিয়ে পরে' নিলে।

মা আমি যাব। মিণ্টু ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে, ঝড়ের আগের কুটোর মত। মীরার মুখের উত্তেজনার ছাপটা মিণ্টুর মুখেও প্রতিফলিত হয়েছে। মুস্তফীদের বাড়ী

গিয়ে উঠল মীরা আর মিণ্টু। দোতলার সিঁড়িটা উঠতেই মীরা যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। হৃদ্‌পিণ্ডটা সবেগে বক্ষপিঞ্জরে যেন আছাড় খাচ্ছে। মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে তার। কপালের ঘামের আর্দ্রতায় কয়েকটা চুল আটকে রয়েছে, মুখটা হাসি হাসি, কিন্তু মনে আশঙ্কা আর ভয় রয়েছে প্রচুর।

হ্যালো! কানে রিসিভারটা দিয়ে বললে মীরা, হ্যাঁ আমি—রান্নাঘরে ছিলাম—কি? তোমাকে যেতে হবে? কেন?—আজই? কেন অন্য দিন গেলে হয় না?—মালিক গেলই বা—সঙ্গে দেশাই ফিলম আর দেশাই ল্যাবরেটরীজের লোক নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু বুঝলাম, আগে থেকে সেটা জানাবে ত?—হ্যাঁ মিণ্টু এখানেই আছে।

এই নাও মিণ্টু, বাবু তোমার সঙ্গে কথা বলবে। সাগ্রহে মিণ্টু রিসিভারটা কানে দিলে। ছোট্ট মুখের উপর রিসিভারটা বেমানান দেখাল।

হ্যাঁ আমি—না দুষ্টুমি করি নি ত।—তুমি আজ আসবে না? কেন বাবু?—রেলে চড়ে যাবে?—বা! কি মজা, আমাকে নিয়ে চল না, ফেরবার পথে পুতুল আনবে! বাঃ, কি মজা!—হ্যাঁ মাকে দিচ্ছি। বিরক্তিভরে মাকে টেলিফোন দিয়ে দিল। মা-বাবা দু'জনের ওপরেই রাগ হ'ল তার। এত তাড়াতাড়ি তাকে টেলিফোনটা দিতে হ'ল কেন; আর একটু বাবুর সঙ্গে কথা বললে কি হ'ত? অভিমানে ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল মিণ্টুর। বাবা পুতুল আনবে, ভাবছে মিণ্টু, দম দিলে নাচে, বাঃ! পুতুলের কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি টেলিফোন দেওয়ার দুঃখটা ভুলে গেল সে। ফোলানো ঠোঁটে মিষ্টি হাসি দেখা দিল আবার।

না, আমার আর অসুবিধে কি? বলছে মীরা, কিন্তু তোমার জামাকাপড় কিছু নিলে না ত?—সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে, আমি চিনি? কে বল ত?—ওঃ! ফিল্মি অ্যাকট্রেস শ্রীলেখা?—সময়টা কাটবে ভাল।—না, অত সামান্যতে আমার হিংসে হয় না—হ্যা—না, কি? যাঃ!

মীরার মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের ওধার থেকে রবীন তাকে ভালবাসা জানাচ্ছে। তার অদর্শনে কত কষ্ট হবে রবীনের সেই কথা আর ফিরে এসে…। টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিল মীরা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিণ্টু।

একদৃষ্টে মায়ের লজ্জারক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছে মিণ্টু, মায়ের ভাববৈচিত্র্যের কারণটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তার। রেণু বারান্দার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, শোনার ইচ্ছে তারও ছিল, কিন্তু অশোভন হবে বলে সে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মীরা টেলিফোনটা রেখে দিতেই রেণু এগিয়ে এসে বললে, কি মীরাদি সিনেমা নাকি?

না ভাই, উনি বাইরে যাচ্ছেন আপিসের কাজে।

বাইরে?

হ্যা, পশ্চিমের দিকে। কোম্পানীর মালিকও যাচ্ছে তাই সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

মালিককে চেনেন নাকি?

দূর বোকা মেয়ে, আমি চিনব কি করে? তবে নাম শুনেছি।

কি নাম বলুন ত?

নানুভাই দেশাই।

দেশাই ফিলম যার?

হ্যাঁ, সঙ্গে ডাইরেক্টর, অ্যাক্টর, অ্যাকট্রেস সব যাচ্ছে। কোথায় যেন স্যুটিং হবে।

আপনিও গেলেই পারতেন।

হ্যা কোম্পানীটা তোমার হলে যে সুবিধে পাওয়া যেত হয় ত।

কবে ফিরবেন?

বললেন ত এক সপ্তাহ, তার পর কি হয়!

ইস মুস্কিল ত। ভ্রূভঙ্গী করলে রেণু।

কেন, মুস্কিল আবার কিসের?

একলা থাকতে হবে—আবার কি? রেণুর কথায় হাসল মীরা। প্রচ্ছন্ন আঁধারের মধ্যে হাসির স্নিগ্ধ রশ্মিটা দেখা গেল, কয়েক পা এগিয়ে গেল সে।

কোথায় যাচ্ছেন মীরাদি। বললে রেণু, এত তাড়া কিসের, সেই গানটা তুলেছি, শুনে যান।

তাই ত, ভাবছে মীরা, আর ত তাড়া নেই। রবীন যে ওবেলা আসবে না। তা হোক, এখন তার কিছু ভাল লাগছে না, কারোর সঙ্গলাভে এখন তার উৎসাহ নেই। এই কি গান শোনার মত সময় নাকি! এখন সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায়। আশ্চর্য্য, বলা নেই কওয়া নেই, অমনি যেতে হবে, এ কি মগের মুলুক নাকি।

না ভাই চলি, অন্য সময়ে তোমার গান শুনব। বললে মীরা।

কেন, কোন কাজ আছে নাকি! নাছোড়বান্দা রেণু।

হ্যাঁ, রান্নাঘরের কাজ বাকি আছে, তা ছাড়া মিণ্টুর দুধটাও জাল দেওয়া হয় নি। অজুহাত দেখিয়ে বাড়ী ফিরে গেল মীরা। ঘরে বসে ভাবছে মীরা। এতক্ষণে ভাববার মত মনের অবস্থা আর পরিবেশ ফিরে পেয়েছে সে। অকস্মাৎ খবরটা পেয়ে সে যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিল।

আশঙ্কা, লজ্জা আর ভয়ের স্মৃতি এখনও তাকে পীড়া দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ট্রেনে পাড়ি দিতে হবে রবীনকে, কবে ফিরবে কে জানে! ট্রেন সম্বন্ধে মীরার একটা অমূলক শঙ্কা আছে। শুধু ট্রেন নয়, যে-কোন চলমান যানকেই সে ভয় করে। তার কারণ গাড়ীতে উঠলেই তার শরীর খারাপ লাগে। মাথাটা ঘোরে, পেটের মধ্যে যেন গুলিয়ে ওঠে আর বুকের মধ্যে অজানা একটা শূন্যতা অনুভব করে, এমনকি বমনোদ্রেকও হয়। মনে আছে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ওটা একটা স্নায়বিক অসুখ, ওকে নাকি ট্রাভলিং সিকনেস্ বলে। তার খারাপ লাগছে, ট্রেনের কথা মনে পড়তেই সেই ধোঁয়া-ধুলো-কর্ণবধিরকারী তীক্ষ্ণ-কর্কশ শব্দগুলো আর গতিবেগটা যেন তার স্নায়ুর ওপর তীব্র আঘাত করল। উঠে দাঁড়াল মীরা। এ চিন্তা থেকে তার নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। রান্নাঘরের দরজাটা খুলল মীরা। মিন্টুও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মা, বললে মিন্টু, জান মা, বাবু বলেছে আসবার সময় পুতুলটা আনবে?

তাই নাকি? এখনও অন্যমনস্ক রয়েছে মীরা।

হাঁ, দম দিলে সেটা নাচবে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মিন্টুর ছোট্ট মুখটা। জান মা, বাবুটা খুব ভাল, মন্তব্য করলে সে। মীরার মনটা যেন অকস্মাৎ থেমে গেছে, স্যাঁতসেঁতে, ঢিলে নির্জীব হয়ে গিয়েছে একটা ভিজে কাঁথার মত। এর আগে অনেক বারই রবীনকে ছেড়ে তাকে থাকতে হয়েছে, কিন্তু কোন বারই অবসাদে তাকে এভাবে ভেঙে পড়তে হয় নি।

হঠাৎ মীরার নজর পড়ল রান্নাঘরের উনুনের দিকে। উনুনটা জ্বলছে, লাল গনগনে আগুন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মীরা সেইদিকে—সুন্দর অথচ ভয়াবহ একটা আকর্ষণ যেন লুকিয়ে আছে ওই রক্তবর্ণ আগুনের মধ্যে। অকস্মাৎ মীরার মনে হ'ল আগুনটা যেন অস্বাভাবিক রকমের লাল, এত লাল কেন? ঠিক সিঁদুরের মত জ্বলন্ত কয়লা থেকে শিখাগুলো লকলক্ করে জ্বলছে। ধূম্রবর্ণ ছাইয়ের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে কোন কোন জায়গায়। পাশের দেওয়াল আগুনের লালচে আভাটাকে যেন শোষণ করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ মনে হ'ল মীরার উত্তাপটা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে তার দিকে। হিংস্র ক্ষুধিত নেকড়ের মত সন্তর্পণে নিঃশব্দ চলনটা অনুভব করতে পারছে মীরা—লোভাতুর রক্তবর্ণের ঘোলাটে চোখ দিয়ে যেন আগুনটা শিকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে।

নানুভাই দেশাই সহজে ব্যয় করে না, বিনা কারণে তার কাছ থেকে এক পয়সা বার করা দস্তুর মত দুরূহ ব্যাপার। সুনীল রায়কে অবশ্য তার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শ্রীলেখা ওরফে হাসনুকে যে তার একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং সুনীল রায়কেও সঙ্গে নিতে বাধ্য হ'ল নানুভাই।

নানুভাই-এর ব্যবসা অনেকদিনের, কয়লা, পাট, লোহা, চিনি ছাড়া সম্প্রতি ওষুধ ও ফিলম্ ব্যবসায়ের কাজেও সে হাত দিয়েছে। ফিলম্ সম্বন্ধে নানুভাই-এর অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। আর অভিজ্ঞতার এমন দরকারই বা কি, চোখ খোলা রাখলে আর চালাতে জানলে সব ব্যবসাই চলে, একথা নানুভাই বিশ্বাস করে। তা ছাড়া ফিলম্ ব্যবসাতে সুবিধে প্রচুর আছে তা সে ভালভাবেই বুঝেছে। এই ব্যবসাতে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে অনেকগুলো লোভনীয় জিনিস মেলে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার, মেলামেশা করার এমন প্ল্যাটফর্ম আর নেই বললেও চলে। শুভমহরৎ থেকে সুরু করে সুটিং পর্য্যন্ত কোন একটা উপলক্ষ্য করে হোমরা-চোমরাদের অনেককেই পাকড়ানো চলে। নানুভাই লক্ষ্য করেছে বর্ত্তমান যুগে একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু বা বিষয় যদি থাকে সেটি হ'ল ফিলম্। লোকেরা যেন এর প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে, আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সবাই যেন "রক এ্যাণ্ড রোল নৃত্যে" যোগদান করেছে, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের ঝোঁকই যেন একটু বেশী বলে মনে হয়, বিগত যৌবনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টাই বোধ হয় তাঁরা করে থাকেন।

ক্রমশঃ

নিভৃত স্বাক্ষর

শ্রীসমর বসু

চক্রবেড়িয়া রোডের উপর একটা পুরনো দোতালা বাড়ী। রাত্রি অনুমান বারোটা। দোতলার একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা একা থাকেন। এতক্ষণ তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। হঠাৎ কি ভেবে উঠে পড়লেন। দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে আঁটা একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ফটোটা একটি মেয়ের। কনভোকেশনের ক্যাপ-হুড আর গাউন পরা। নীচে নাম লেখা কাবেরী মৈত্র বি-এ।

অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ভদ্রমহিলার মুখ থেকে। বাতাস লেগে গাছ থেকে ঝরে-যাওয়া শুক্‌না পাতার মর্ম্মর-ধ্বনি; কপালের উপর মোটা শিরাগুলি দপ দপ করে উঠল। চোখ দুটো হয় ত জ্বলে উঠল একবার। তার পর হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। হাসির সঙ্গে অনেক কথাও যেন বলে গেলেন।

…কাবেরী মৈত্র বি-এ। কনভোকেশনে যাবে যদি—চোখে সুরমা দিয়েছিলে কেন। ঠোঁটেও বোধ হয় রঙ মেখেছিলে—তাই অত কালো দেখাচ্ছে ঠোঁট দুটো। পরিধেয়ের চাতুর্য্যে উত্তাল যৌবনকে রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলে ডিগ্রী আনতে গিয়েছিলে তুমি! একটুও লজ্জা করে নি। কি শিক্ষাই পেয়েছিলে! ছিঃ—ধিক্ তোমার ঐ শিক্ষাকে—ধিক্ তোমার ঐ রূপ আর যৌবনকে!…

এতক্ষণে হাসি থামিয়ে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বার্দ্ধক্য এবং দুর্ব্বলতাজনিত একটা বিষাদ-মাখা ক্লান্তি নেমে এল তাঁর সারা শরীরে। চেয়ারে এসে তিনি বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তার পর কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে সুরু করলেন।

…কৃষ্ণা আর কাবেরী, এরা দু'বোন। আশুতোষ বাবুর দুই মেয়ে। দু'জনেই এরা চাকরী করে। কৃষ্ণা স্কুলে আর কাবেরী সরকারী অফিসে। কৃষ্ণার চেয়ে কাবেরীর মাইনে একটু বেশী—তাই কৃষ্ণার চেয়ে সাজ-সজ্জায় একটু বেশী খরচ করে কাবেরী। তা ছাড়া স্কুল-শিক্ষিকাদের খুব সাধারণ পোষাকেই যেতে হয়—তাই কৃষ্ণার পক্ষে বেশী সাজ-পোষাকের সুযোগই মেলে না। মাঝে ওরা যখন সিনেমায় যায় তখন অবশ্য কাবেরীর নির্দ্দেশে রঙচঙে কাপড় ওকে পরতে হয়—ঠোঁটে গালেও মাখতে হয় রঙ। এই ধরণের প্রসাধনকে সুস্থ মনে কোনও দিনই অনুমোদন করা যায় না—এই কথাই কৃষ্ণা বলে—সে বলে দৈহিক সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিকতাকে বিদ্রূপ করে কৃত্রিম রূপ প্রকাশে যদি আনন্দ থাকে, সে আনন্দ বিকৃত। কিন্তু কাবেরী বলে ঠিক তার উল্টো কথা। ও বলে—রূপচর্চ্চা একটা বিশেষ ধরণের আর্ট। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মেয়েরা এই চর্চ্চা করে এসেছে এবং এখনও করে—সুতরাং আমাদেরও এর চর্চ্চা করা উচিত।—এর পর দুই বোনে তর্ক সুরু হয়।

—সে দিনও তাই হচ্ছিল। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন অনীতাদি। অনীতাদি ওদের পড়শী। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ী, পিতৃহীন ভায়ের সংসারে। কৃষ্ণাদের বাড়ীর সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা একটু গভীর। বিশেষ করে অনীতা যেন ওদেরই একজন।

দুই বোনে ঝগড়া লাগলেই দু'জনেই নালিস জানায়—অনীতাদির কাছে। অনীতাদিও ভেবেচিন্তে এমন একটা মত দেন—যাতে করে দু'জনের মধ্যে তখন সন্ধি ত হয়ই—এমন কি এতক্ষণ যে তারা ঝগড়া করছিল সে-কথাও ভুলে যায়।

কাবেরী-কৃষ্ণার বাবা আছেন, মা নেই। এক দাদা থাকেন পাটনায়, কর্ম্মস্থলে। কৃষ্ণা-কাবেরীর বয়স হয়েছে। এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। পেন্সনভোগী বৃদ্ধ আশুতোষবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ছেলেকে এ-সম্বন্ধে যতবারই চিঠি লিখেছেন তিনি—ততবারই উত্তরে বলেছে—চাকরী-বাকরী যখন করছে তখন আর বিয়ের জন্য অত তাড়াতাড়ি করে লাভ কি।—দাদা হয়ে হয় ত ও-কথা বলা যায়—কিন্তু বাবা হয়ে ঐ যুক্তি মেনে চুপ করে বসে থাকা ত সম্ভব নয়। তাই আশুতোষবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন অনীতাকে। এ-সম্বন্ধে তার মতামতের একটা মূল্য আছে—এ বিশ্বাস আছে আশুতোষবাবুর।

অনীতাদি এসেই দেখেন দুই বোন ঝগড়া করছে।

—'কি হল রে কৃষ্ণা, অত চেঁচামেচি কিসের!' অনীতাদির গলা পেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণা। চেঁচিয়ে বলে ওঠে—'আচ্ছা অনীতাদি তুমিই বলত—আমি ঠিক, না দিদি ঠিক!' তর্কের বিষয়টা সংক্ষেপে বিবৃত করে কৃষ্ণা।

কাবেরী একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তার পর হঠাৎ বলে ওঠে—'সাজপোষাকের মর্ম্ম অনীতাদি কি করে বুঝবে যে, তুই তার কাছে সালিশী মানতে গেছিস।'

কথাটা বাজের মত বেজে ওঠে অনীতাদির কানে। সাদা লংক্লথের ব্লাউজ আর সাদা থানের আড়ালে ঢাকা একাদশী-উপবাস-ক্লিষ্ট রুক্ষ শরীরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে বাতাস-লাগা দীপশিখার মত। মাথাটা ঝিম ঝিম করে। দেওয়াল ধরে নিজেকে সে সামলে নেয়। তার পর ভিজে গলায় প্রশ্ন করে—'তোমার বাবা কোথায় কৃষ্ণা?' কৃষ্ণা চমকে ওঠে, আর তখনই বুঝতে পারে,

কতখানি অন্যায় করেছে তার দিদি। বলে—'চল, বাবা উপরে আছেন।'

আশুতোষবাবু শুয়েছিলেন। পড়ছিলেন একটা ইংরেজী নভেল। 'আমায় ডেকেছেন মেসোমশাই?' অনীতা এসে বসল একটা চেয়ারে। বিছানায় উঠে বসলেন আশুতোষবাবু। চশমাটা চোখ থেকে খুলে খাপের মধ্যে পুরে রাখলেন। 'হাঁ মা, একটা জরুরী পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে—কৃষ্ণা, যাও ত মা অনীর জন্য একটু চা করে নিয়ে এস।'

—'আমার সঙ্গে আবার কিসের পরামর্শ মেসোমশাই?'

—'হাঁ, তোমার সঙ্গেই। তুমি ছাড়া এ-দায়িত্ব নেবার আমার আর কেউ নেই। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন!' কি ভেবে একটু থামলেন আশুতোষবাবু, তার পর সোজাসুজি সুরু করলেন—'কৃষ্ণা-কাবেরীর বিয়ের জন্যে তোমাকে একটু চেষ্টা করতে হবে মা। আমার বয়স হয়েছে, ক'দিনই বা বাঁচব। আর শুভেন্দুর কথা বাদই দাও না—ওটা এখনও মানুষ হ'ল না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আশুতোষবাবু।

মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল অনীতা।

—'চুপ করে থাকলে চলবে না মা, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বলে একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে আজ কোনও ভাবনাই ভাবতে হ'ত না।'

—'কাবেরীর কথা বলতে পারি না মেসোমশাই—তবে কৃষ্ণার বিয়ের একটা ব্যবস্থা আমি করবই।'

—'কাবেরী কি বিয়ে করবে না বলেছে?' ভ্রু দুটো কুঁচকে আশুবাবু তাকালেন অনীতার দিকে।

—'না, আমাকে অবশ্য সে-সব কথা কিছু বলে নি। তবে মনে হয় ওর বিয়ের ব্যবস্থা ও নিজেই করে নিতে পারবে।'

একটু চিন্তিত হয়ে ম্লান হেসে আশুতোষবাবু বললেন, 'তা করুক গে। বয়স হয়েছে—লেখাপড়া শিখেছে—নিজের ক্ষতি নিশ্চয়ই করবে না। তা হ'লে কৃষ্ণার জন্যেই তুমি চেষ্টা কর।'

অনীতার এক দূর-সম্পর্কের দেওরের বন্ধু সঞ্জয়ের সঙ্গে একদিন বিয়ে হয়ে গেল কৃষ্ণার। সঞ্জয় মফঃস্বল কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করে। বয়স বেশী নয়। কৃষ্ণার সঙ্গে মানিয়েছে সুন্দর। বিয়ের দিন কাবেরীর সে কি উৎসাহ! নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সম্ভাষণ জানানো থেকে সুরু করে সমস্ত কাজই সে একা দেখাশোনা করেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত কাজ মিটে গিয়েছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় নি কাবেরী। শুধু সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করতে সে পারে নি, কিছুতেই তার সামনে সে বেরোতে পারে নি।

কাবেরীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলেন অনীতাদি। রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছেন অনেকক্ষণ। বাসর-ঘরে মেয়েদের কলকোলাহলও থেমে গেছে। অনীতাদি ইসারায় ডাকলেন কাবেরীকে, জিগ্যেস করলেন—'তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে কাবেরী।'

—নাঃ, শরীরটা ভাল লাগছে না, যাই একটু শুই গে।' অনীতাদির দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কাবেরী। পাথরের মূর্ত্তির মত অনীতাদি সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কাবেরীর চলে যাওয়ায় গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে হাহাকার-ভরা তাঁর নিজের নিঃস্ব জীবনের কোথায় যেন মিল খুঁজে পেলেন অনীতাদি। আঁচলের খুঁট দিয়ে উদ্গত অশ্রু মুছে নিয়ে কাবেরীর জানালায় একবার উঁকি দিলেন তিনি। মস্ত বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাবেরী নিজেকে দেখছে। উচ্ছল যৌবনের অপূর্ব্ব তরঙ্গলীলা দেহের তটে এসে আছড়ে পড়ছে আর তারই দিকে নির্নিমিখ তাকিয়ে আছে কাবেরী। অনীতাদি দেখলেন কাবেরী হাসছে, অত্যন্ত ক্রুর-বীভৎস সেই নিঃশব্দ হাসি। কে জানে কেন—অনীতাদিও হেসে ফেললেন। সেই হাসির শব্দে চমক ভাঙল কাবেরীর। সে চীৎকার করে উঠল, 'কে? কে ওখানে।' এই চীৎকার করতেই চাইছিল কাবেরী। তীব্র চীৎকার করে সে জিগ্যেস করতে চাইছিল—কেন? কেন? কেন?...

তিন দিন পরে কাবেরী আপিসে এল। নিজের চেয়ারে বসে স্তূপীকৃত ফাইলের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। ফাইলগুলোর উপর ধূলো জমেছে অনেক। পিয়নকে ডেকে সেগুলো পরিষ্কার করিয়ে নেবার মত উৎসাহ নেই কাবেরীর।

কাবেরীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ঘোষ। বললেন, 'আপনার শরীর এত খারাপ ত 'জয়েন' করলেন কেন?'

—'নাঃ শরীর খারাপ ত হয় নি।' ম্লান হেসে অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিল কাবেরী।

—'চোখ-মুখ বসে গেছে—কেমন যেন রোগা রোগা হয়ে গেছেন অথচ বলছেন শরীর খারাপ হয় নি?'

কাবেরী চুপ।

সীট থেকে উঠে এলেন মিঃ ঘোষ, 'আপনি বাড়ী যান মিস মৈত্র, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।'

—দয়া করে আমার ভালো-মন্দের ভাবনাটা একটু কমাবার চেষ্টা করুন।' অত্যন্ত অস্বাভাবিক কর্কশতা ফুটে উঠল কাবেরীর কণ্ঠে। খুব বিব্রত বোধ করলেন মিঃ ঘোষ।

সীটে আর বসে থাকতে পারল না কাবেরী। তাড়াতাড়ি অফিসারের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শরীর খারাপের অজুহাতে সত্যই সে ছুটি নিয়ে চলে গেল।

বাড়ী ফিরতেও ইচ্ছা করছিল না কাবেরীর। মনে হচ্ছিল রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে বেড়াবে অনেকক্ষণ। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দিগভ্রান্ত হয়ে এদিকে ওদিকে সে ছুটে বেড়াবে। কিন্তু না, বাড়ীতেই তাকে আসতে হ'ল। ক্লান্ত পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করল তার মনের সঙ্গে। নিজের অজ্ঞাতেই সে ফিরে এল বাড়ীতে।

বাড়ীতে এসেই দেখে দাদা এসে গেছে। অবসন্ন শরীরেও বিপুল উৎসাহ অনুভব করল কাবেরী। দাদাকে দেখে এমন খুশী সে কোনদিনই হয় নি।

—'তাড়াতাড়ি ছুটি পেলাম না—তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। তা ছাড়া তোর টেলিটাও পেঁছেছিল অনেক দেরীতে। যাক্, শুভকাজটা ভালোয় ভালোয় সারতে পেরেছিস ত? ভগ্নীপতি কেমন হ'ল!' একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে শুভেন্দু থামল।

বিয়ে দেওয়ার মত একটা গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের নির্ব্বিঘ্ন সম্পাদনের সমস্ত কৃতিত্বই কাবেরীর। তাই দাদার কথাগুলোর উত্তর দেবার আগে কাবেরী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। চাপা গর্ব্বের দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে আর তারই প্রান্তে একটুকরো খুশীর ঝিলিক।

আপিসের কাপড়-জামা না বদলেই একটা চেয়ার টেনে শুভেন্দুর পাশে এসে বসল কাবেরী। বললে, 'এবার তোমার বিয়েটা দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শুভেন্দু। ওঃ এই কদিনের মধ্যেই যে খুব গিন্নী হয়ে উঠেছিস! তবে হাঁ, ছুটি যখন নিয়ে এসেছি তখন বিয়ে করে একেবারে বৌ নিয়ে ফিরব—মেসে থাকা আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু তোর বিয়ে না দিয়ে বাবা যে বড় কৃষ্ণার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমাদের বংশে এ রকম প্রিসিডেন্স আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। তা তুই কি বিয়ে থা করবি না নাকি?'

—আহা-হা কি কথাই বলেন। কৃষ্ণার বিয়ে হ'ল—চলে গেল শ্বশুর বাড়ী। তুমি বিয়ে করবে—বৌকে নিয়ে যাবে পাটনায়। এর পর আমিও বিয়ে করতে যাই। তা হলেই বুড়ো বয়সে বাবার আর কোনও কষ্টই থাকে না!'

—'তা না হয় এখন বুঝলাম। কিন্তু একদিন না একদিন বিয়ে ত করতেই হবে!'

—'তাই নাকি! তা হলে তখন তোমাকে চিঠি লিখব, তুমি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে!' কৃত্রিম হাসি দিয়ে কান্নাকে রোধ করল কাবেরী। শুভেন্দুর সামনে আর যেন সে বসে থাকতে পারছে না। কিন্তু শুভেন্দুই তার হাতটা ধরে নিয়ে গেল বারান্দায়। চেয়ার দুটো টেনে নিয়ে দু'জনে আবার বসল পাশাপাশি।

—বোনের বিয়ে যখন দিতে পেরেছিস তখন দাদার বিয়েটাও তুই দিতে পারবি। বাবাকে বলে শুধু রাজী করানো। আমাদের দু'জনকারই মত আছে।' তড়বড় করে কথাগুলো বলে, একটু লজ্জা পেল শুভেন্দু।

—'উঃ পৃথিবীটা কি ভীষণ কুটিল—আর পৃথিবীর মানুষগুলো কি নিদারুণ স্বার্থপর! দূরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল কাবেরী। গলিত সীসা যেন ঝরে পড়ছে দুপুরের আকাশ থেকে। এক ঝাঁক চিল তবুও সেখানে ঘুরপাক খেয়ে মরছে কে জানে কিসের সন্ধানে।

'কি চুপ করে রইলি কেন!'—জিজ্ঞাসা করল শুভেন্দু।

কাবেরী মুচকে হাসলে। বললে, 'বাবাকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি—তোমার আগেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।'

সুতরাং অনীতার পুনর্ব্বিবাহ হয়ে গেল শুভেন্দুর সঙ্গে। বিয়েটা অনেক দিন আগেই হতে পারত—এমন কি অন্য কোথাও না হয়ে প্রথম বিয়েটাই শুভেন্দুর সঙ্গে হতে পারত অনীতার, হয় নি শুধু অনীতার জন্যেই। অনীতা চিনিতে পারে নি নিজেকে, বুঝতে পারে নি নিজের মনকে। তাই শুভেন্দু যখন ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল পাটনায় তখন অনীতা বলেছিল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, আর আমরা কায়স্থ, এইটাই যদি বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়ে থাকে—তা হলে পাটনায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেই তোমার বাবা আমাকে মেনে নেবেন, এ কথা আমি মানি না। তোমার বাবা যদি আমাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার না করেন তা হলে তোমাকে বিয়ে করেও আমি সুখী হতে পারব না।'

অনীতাদির কাছ থেকেই সব কথা শুনেছে কাবেরী। কৃষ্ণার বিয়ের ব্যাপারে যা উপকার করেছে অনীতাদি, তাতে কৃতজ্ঞ আশুতোষবাবুর মনের অনেকখানি স্থান সে দখল করে নিয়েছে। কাবেরী লক্ষ্য করেছে বাবার এই দুর্ব্বলতা, তাই দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে—অনীতা-শুভেন্দুর বিয়ের কথা বাবাকে সে জানিয়েছিল এবং অনেক যুক্তি দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে সে রাজী করিয়েছিল।

বৌভাতের দিন অনীতাকে সাজাতে বসল কাবেরী। অনেকক্ষণ ধরে সাজালে। তারপর দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে কাবেরী শিউরে উঠল। ঐ রুক্ষ শরীরের অন্তরালে কেমন করে লুকিয়েছিল এত রূপ! একটা স্বপ্ন মধুর কামনা এত দিনেও বেঁচেছিল উপবাসক্লিষ্ট ঐ পাঁজরের তলায়? হতাশ্বাস-বিবর্ণতার আড়ালে কোথায় সঞ্চিত ছিল এত রস?

'সাজালে তোমায় এত সুন্দর দেখাবে তা আমার ধারণা ছিল না অনীতাদি।'—হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে ওর চিবুকটা তুলে ধরল কাবেরী। ঈষৎ লজ্জায় মুখটা সরিয়ে নিয়ে অনীতাদি জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু তুমি আজ সাজোনি কেন?' নিজের অত্যন্ত সাধারণ শাড়ী আর ব্লাউজের দিকে এতক্ষণে নজর পড়ল কাবেরীর। বললে, 'এ সাজই বা মন্দ কি।'

এর পরও অনেকদিন কেটে গেছে। আশুতোষবাবু মারা গেছেন অনেকদিন। কৃষ্ণার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় তাদের মাসিমাকে। দাদা-বৌদিদের খবর বিশেষ একটা পাওয়া যায় না।—সেই সরকারী আপিসে এখনও চাকরী করে কাবেরী। যারা একদিন তাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন রচনা করেছিল, অনেক নীল আশ্বাস শুনিয়েছিল তার কাণে কাণে, তারা সব একে একে বিদায় নিয়েছে কর্ম্মজীবন থেকে। ফিরে

গেছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সুখ-দুঃখ-মাখানো নিজেদের সংসারে। ···ওদের মত সংসার কি কাবেরীও গড়তে পারত না? হ্যাঁ, সেও পারত! সংসারই সে গড়তে চেয়েছিল। এই কথাই সে একদিন জানিয়েছিল তরুণ আই, এ. এস. অফিসার অনিমেষ মুখার্জ্জিকে।

তাঁর পাশে বসে ছুটির পর অনেকদিন সিনেমা দেখেছে কাবেরী। কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে সেখানে অনেকদিন তিনি বেড়াতেও গেছেন। কাবেরী কথাটা বলি বলি করেও এতদিন বলতে পারে নি। সেদিন কিন্তু সে না বলে আর পারল না। সেদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ মুখার্জ্জি গিয়েছিলেন বরানগরে। অনেক উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা সুবিস্তৃত জায়গার মধ্যে ছোট্ট একখানা ছবির মত বাড়ী। সেইখানেই কাবেরী বলতে বাধ্য হয়েছিল—আমাদের বিয়েটা এবার হয়ে যাওয়া দরকার।

—কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছিলেন মিঃ মুখার্জ্জি। উদ্যতফণা সাপ দেখেছেন যেন। ডিমলাইটের আবছায়া অন্ধকারে কাবেরীর যৌবন-পুষ্ট দেহটাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তুমি প্রাঙ্গণের মেয়ে কাবেরী, অঙ্গনের বন্দীশালায় নীতি আর ধর্ম্মাচরণের শৃঙ্খলে বেঁধে তোমাকে আমি অপমান করতে চাই না। সমুদ্রকে ধরে রাখতে চাই না ক্ষুদ্র গণ্ডূষের মধ্যে:—কথাগুলো বলে কাবেরীকে একটু আদর করতে গিয়েছিলেন মিঃ মুখার্জ্জি। জ্যামুক্ত তীরের মত মুখার্জ্জির হাত ছাড়িয়ে তীব্রবেগে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কাবেরী।—বাড়ীতে এসে ভেবেছিল এখনও হয়ত ফেরার পথ আছে। তাই অচিন্ত্যকে চিঠি লিখে তার সঙ্গে সে দেখা করতে চেয়েছিল।

—কাবেরীর সঙ্গেই কাজ করত অচিন্ত্য। কাবেরীর প্রতি তার ছিল গভীর দুর্ব্বলতা। কাবেরীও তা জানত। কিন্তু না জানার ভান করেছিল শুধু অচিন্ত্য ওর সহকর্ম্মী বলে। কাবেরীর নজর ছিল তখন অফিসারের দিকে। তাই অচিন্ত্যকে সে উপেক্ষা করেছিল, একটুকুও প্রশ্রয় দেয় নি। সরকারী অফিস ছেড়ে কোন এক মার্কেন্টাইল ফার্ম্মের জুনিয়র অফিসার হয়েছিল অচিন্ত্য। কাবেরীর চিঠিও হয়ত সে পেয়েছিল কিন্তু কোনও উত্তরই সে দেয় নি।

তবুও একটি একটি করে দিন চলে যায়। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর ফুরিয়ে আসে। বাড়ী থেকে আপিস আর আপিস থেকে বাড়ী। একই কক্ষপথে মানুষ জীবন চলতে থাকে কাবেরীর দুঃসহ একঘেয়েমীর মধ্য দিয়ে।—হঠাৎ একদিন এক বর্ষা-ঝরা সন্ধ্যায় নীল রং-এর একখানা খাম পেল কাবেরী। তবে কি শবরীর প্রতীক্ষা সার্থক হয়ে উঠল এতদিন, স্বাতী নক্ষত্রের বারিকণায় সত্য হয়ে উঠল কি শুক্তির স্বপ্ন? হতাশা-জীর্ণ বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল রক্তোচ্ছাস। হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল—তবুও সে খামটা খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি।

নিমন্ত্রণের চিঠি। দিয়েছে শেলী সরকার ধানবাদ থেকে, শেলীর বিয়ে আসছে মাসের দোসরা।—শেলী ওর কলেজের বন্ধু, থাকত বালিগঞ্জে। ওদের বাড়ী অনেকবার গিয়েছে কাবেরী কিন্তু সেবারের যাওয়াকে সে আজও ভুলতে পারে নি। আজকের নীল খামটা পুরানো জীবনের দুঃসহ অন্ধকারের আড়াল থেকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে এল এক হারানো মণিকে। শৈবাল-কীর্ণ পল্বলের অন্তরাল থেকে ফুটে উঠল একটি শ্বেত শতদল।

শেলীর জন্মতিথি উপলক্ষে ছোটখাটো একটি আনন্দানুষ্ঠান হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে নাচতে হয়েছিল কাবেরীকে। কবে ছোটবেলায় কোন এক অখ্যাত নৃত্যশিক্ষকের কাছে তার নাচ শেখা—তাই লজ্জায় রাজী হতে পারে নি কাবেরী। ঠেলে দিয়েছিল সকলকার অনুরোধ, জোড়হাতে সে নিবারণ করেছিল সকলকে, কিন্তু মাথা নীচু করে চুপ করে সে দাঁড়িয়েছিল শুধু অরূপের কাছে। অরূপ যখন তাকে এসে অনুরোধ করল—সে অনুরোধ দূরে ঠেলবার শক্তি ছিল না কাবেরীর। এর আগেও সে অনেকবার দেখেছে অরূপকে, কথাও বলেছে অনর্গল, কিন্তু সে শুধু দেখা হয়েছিল, আর সেদিন হয়েছিল দৃষ্টি-বিনিময়।

কাবেরীর আজও মনে আছে—অরূপের চোখে সে যেন কি দেখেছিল সেদিন। মেঘের সীমান্তে সূর্য্যকণার দীপ্তির মত সে-চোখে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল যেন কিসের আলো, সেই আলোর ছায়া পড়েছিল কাবেরীর--তাই অরূপের দিকে মুখ তুলে সে তাকাতে পারে নি। উষ্ণ রক্ত প্রবাহের দুর্দম গতিশীলতায় কেঁপে উঠেছিল তার শরীর বাতাস-লাগা বেতসপাতার মত। তাই মৃদু হেসে তখনই সে চলে গেল। তার পর উঠে এল মঞ্চে—নটির বেশে—নৃত্য-পটিয়সীর মত।

সমস্ত আলোগুলি নিভে গেল। শুধু দূর থেকে একফালি নীল আলো এসে ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে—বাহুমূলে, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। কানায় কানায় ভরা বর্ষার কালো দীঘির মত কাজল-টানা কালো চোখ দুটাতে জলজল করে উঠল যেন কিসের দীপ্তি। শিউরে উঠল সারা শরীর—পা-দুটো উঠল কেঁপে। হঠাৎ নূপুরের শব্দে চমক ভাঙল কাবেরীর। সুরু হ'ল নৃত্য। আপনাকে নিবেদন করবার এক গভীর আকুতি পরিস্ফুট হয়ে উঠল প্রতি পদক্ষেপে—অঙ্গভঙ্গীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে—প্রত্যেকটি মুদ্রার নীরব ব্যঞ্জনায়। কোন্ অজ্ঞাত বিধাতার বেদীমূলে নিজেকে নিবেদন করল দেবদাসী, মুক্ত পলাশ, সুপরিস্ফুট পদ্মের মত অপরূপ ভঙ্গীমায়।

নাচ শেষ হ'ল। আলোগুলি জ্বলে উঠল একে একে। কাবেরী তখনও ফিরে আসতে পারেনি সেই ভাবময় জগৎ থেকে। মনের মধ্যে তখনও সে যেন অনুভব করছিল সেই পুলক-লাগা আবেশের ধীর সঞ্চরণ। অরূপ যখন তাকে অভিনন্দন জানাতে এল, অরূপের হাত দুটার মধ্যে নিজের মুখটাকে লুকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল কাবেরী। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আতঙ্কে সে শিউরে উঠেছিল। এই নির্লজ্জ কাঙালপনা প্রকাশ করে লজ্জায় তখনই সে মরতে চেয়েছিল। তাই সকলের অলক্ষ্যে লুকিয়ে সে পালিয়ে এসেছিল বাড়ীতে।

মনে আছে কাবেরীর সেদিন অত রাত্রে বাড়ীতে ফিরেও সে

স্নান করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল। নিজেকে বার বার মনে হয়েছিল অশুচি—তাই দুঃসহ-গ্লানিমাখা ক্লেদাক্ত শরীরটাকে বার বার ধুয়ে মুছে নির্ম্মল করবার চেষ্টা করেছিল সে।

শেলীর মামাতোভাই অরূপের সঙ্গে এরপর পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল কাবেরীর। যার কাছে চরম দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে একবার ধরা পড়ে গেছে—তাকে আর ফেরাতে পারে নি কাবেরী। তাই অরূপের সঙ্গে অনেক সময় সে কাটিয়েছে এখানে সেখানে। গোধূলীর আকাশে যখন ফুটে উঠেছে পলাশ-করবী তখন তারা দু'জনে এসে বসেছে পাশাপাশি—গঙ্গার ধারে—ময়দানের শেষ-প্রান্তে। ছুটির দিনে তারা বেরিয়ে পড়েছে। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বাড়ী ফিরেছে অনেক রাত্রে।

এখনও মনে আছে কাবেরীর অরূপের সঙ্গে যেখানে শেষ দেখা হয়েছিল, সেই দার্জ্জিলিঙের কথা। বার্চ্চ হিলের উপরে এক পাইন-গাছের তলায় সেদিন ওরা দু'জনে এসে বসেছিল। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে খুব গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল অরূপ: 'আচ্ছা কাবেরী তোমার আমার এই যে ঘোরাফেরা—এতে লজ্জার কি আছে বলত? আর এতে অন্যায়টাই বা কি?' তাড়াতাড়ি একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিল কাবেরী। যেন ঐ রসহীন দীর্ঘ পাতার মধ্যেই এই প্রশ্নের রহস্য লুকানো। তারপর পাতাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে স্তূপীকৃত করে রাখল সেইখানে।

—'কি চুপ করে রইলে কেন?' অরূপ আবার জিগ্যেস করে।

—'চুপ করে থাকতে বেশ ভাল লাগছে।' মুখ না তুলে উত্তর দেয় কাবেরী। তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ। 'চল এবার নামা যাক।' কাবেরী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওভারকোটটা জড়িয়ে নিল গায়ে। অরূপ কিন্তু উঠল না, বসে রইল নির্ব্বিকার নিরালম্বের মত।

'কি রাগ হ'ল বুঝি!' কাবেরী আবার বসে পড়ে ওর পাশে। প্রথম যৌবনের চপলতা ফুটে উঠে ওর চোখে মুখে। অরূপের ডান হাতটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলে, 'এতদিন পরে হঠাৎ এ প্রশ্ন তোমার মনে কেন জাগল অরূপ?'

—'প্রশ্নটা আমার নয়, আমার আত্মীয়-স্বজনের—আমার বন্ধু-বান্ধবের। ওরা আমায় বলে কি জান—তুমি নাকি মাঝে মাঝে অফিসারের সঙ্গে মোটরে মোটরে ঘুরে বেড়াও। অনেকে নাকি দেখেছে—অনেক রাত্রে তুমি বাড়ী ফের।' শুকনো গলায় কথাগুলো বলে কাবেরীর মুখের দিকে অসহায়ের মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অরূপ। ওভারকোটের বোতাম খুলতে খুলতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাবেরী। বুকটা হয়ত তার খালি হয়ে গেল। এতদিনের আশা-আশ্বাসের বিপুল সঞ্চয় এক-নিমিষে কে যেন নিঃশেষে হরণ করে নিয়ে গেল। চোখের কোণে হয়ত চিক্‌চিকিয়ে উঠল নোনা জলের ঝিলিক। ঠোঁট দুটো হয়ত কেঁপে উঠল অজানিত আশঙ্কায়। কাবেরীকে আর একটু কাছে টেনে নিল অরূপ, বললে, 'তাই বলে ভেবো না ওদের কথামত আমি চলব। তোমাকে যখন ভালবেসেছি তখন তোমার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেব না।'

—একফালি মলিন হাসি কাবেরীর ঠোঁটের কোণে উঁকি দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। যেন দুঃসহ নৈরাশ্যের নীরব ব্যঞ্জনা। কুণ্ঠায় নয়, অত্যন্ত ক্লান্তিতে অরূপের হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে আবার উঠে পড়ল কাবেরী। দু'জনেই ওরা নেমে এল পাশাপাশি। পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সভ্যতার ব্যবধান বজায় রেখে।

তারপর আর অরূপের সঙ্গে কোনও দিন দেখা করে নি কাবেরী। সুসজ্জিত সৌধের প্রাচীরে যখন ফাটল ধরে—গভীর সৌন্দর্য্যবোধ তখন তাকে রক্ষা করতে পারে না—বিরাট ভগ্নস্তূপের দিকে তার দুর্ব্বার গতি অনিবার্য্য হয়ে উঠে, তখন নিজে ধ্বংস হয়ে সমস্ত প্রাসাদটিকেও সে ধ্বংস করে। অরূপকে বাঁচাবার জন্যেই অরূপের সঙ্গে দেখা করে নি কাবেরী। অরূপ ফিরে গিয়েছে ব্যর্থ অর্থীর মত।

এরপর মনে আছে কাবেরীর, নিজেকে নির্য্যাতিত করবার একটা উদগ্র কামনা তাকে পেয়ে বসেছিল। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পঙ্কিল আবর্ত্তে নিজেকে নিমজ্জিত করবার একটা কুৎসিত বাসনা ভূতাবিষ্টের মত তাকে টেনে নিয়ে যেত। নিজেকে সে রোধ করতে পারে নি। দুর্দ্দমনীয় আক্রোশে নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নারীত্বকে সে অপমানিত হতে দিয়েছে, লাঞ্ছিত হতে দিয়েছে।

ভেঙে-পড়া খোঁপাটাকে ঠিক করে নিয়ে ঈজিচেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল কাবেরী। শেলীর চিঠির একটি প্রান্ত দাঁত দিয়ে চেপে ধরে অরূপের সেই অসহায় মুখখানা একবার মনে করবার চেষ্টা করল। ভাবলে, অরূপ হয়ত তাকে আজও মনে রেখেছে। এখনই এই মুহূর্ত্তে যদি তাকে সে হাতছানি দিয়ে ডাকে তা হলে হয়ত সে ছুটে আসবে। যৌবনের প্রদোষলগ্নেও তার চোখে আছে সর্ব্বনাশের শিখা। দেহে আছে কমনীয়তার অবশেষটুকু।

হ্যাঁ, এখনই সে ডাক দেবে অরূপকে। অরূপের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কান্নার বন্যায় নিজেকে সে ভাসিয়ে দেবে। চোখের জলে ধুইয়ে দেবে দেহ-মনের যা কিছু গ্লানি, যা কিছু ক্লেদ, তারপর শিশির-ভেজা ফুলের মত নিজেকে সে নিবেদন করবে, যেমন করে অজ্ঞাত বিধাতার উদ্দেশে নিজেকে একদিন নিবেদন করেছিল দেবদাসী।

ঈজিচেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল কাবেরী। কিন্তু অরূপের ঠিকানা! এখন সে কোথায় আছে, কাবেরী তা কেমন করে জানবে!...তা হলে!—শেলীদের ঠিকানায় চিঠি দিলে সে চিঠি নিশ্চয়ই পাবে অরূপ। শেলীর বিয়েতে ধানবাদে সে নিশ্চয়ই আসবে। আর সেই সময় ওর হাতে গিয়ে পড়বে চিঠিখানা।

এতক্ষণে শেলীর চিঠিটা ভাল করে পড়তে সুরু করল কাবেরী। এত ভাল লাগছে ওর মিষ্টি চিঠিখানা। চোখের দৃষ্টি যেন পিছলে

পড়ছে এধার থেকে ওধারে।...হঠাৎ কি হ'ল কাবেরীর। হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে গেল কেন। শরীরটা কেন ভেঙে পড়ল টেবিলের উপর।...

...'অরুণদা তার বৌকে নিয়ে আসবে—তুই এলে যা মজা হবে।'—চিঠিটা আর পড়তে পারল না কাবেরী। চোখটা তার হঠাৎ ঝাপ্সা হয়ে উঠল। শরীরটা যেন মনে হ'ল পাখীর মত হাল্কা অথচ মাথার মধ্যে তীব্র বেদনার বোঝা। নিজেকে আর সে ঠিক রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল বিছানার উপর।...

রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবই ছিল কাবেরীর। কাবেরী নাচতে জানত—গাইতেও জানত। সাংসারিক কাজকর্ম্ম যে জানত না তাও নয়, পুরুষের প্রয়োজন মেটাবার মত শিক্ষা-সম্পদ সবই ছিল। তবুও তার বিয়ে হ'ল না। 'কেন হ'ল না'—এমন কথা কেউ কোনও দিন জিজ্ঞাসাও করে নি কাবেরীকে। করলেই কি উত্তর দিতে পারত কাবেরী! হয়ত পারত। মনগড়া এমন কথা সে বলতে পারত—যা শুনে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকত ওর দিকে। মনে মনে বলত, ধন্যি মেয়ে।

কাবেরীরও সময় হয়ে এল। তাকেও বিদায় নিতে হবে কর্ম্ম-জীবন থেকে। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির অন্তরাল থেকে শুভ্রতার চরম নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করবে এমন শক্তি কোথায় কাবেরীর? চোখের কোণে দৃষ্টিহীনতার কালিমা, আরক্ত-শুভ্র-কোমল কপোলতলে ঋতু পরিক্রমণের আবিল কুঞ্চন, পাপড়ি-ঝরা শূন্য মৃণালের মত সমস্ত শরীরে অর্থহীন দুঃসহ রিক্ততা। অতীতকে আকড়ে ধরে আর কতদিন বেঁচে থাকবে কাবেরী।

* * *

কাগজ-কলম রেখে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন ভদ্র-মহিলা। দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিটাকে নামিয়ে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেললেন ফ্রেমের কাচটাকে। তারপর ফটোটাকে বুকে নিয়ে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানি শুনে কেঁপে উঠল ঘরের বাতাস। কিন্তু টক্ টক্ করে বেজেই চলল ঘড়িটা—যেমন আগে চলত ঠিক তেমনি।

১৯৫৮-৫৯ সনের কেন্দ্রীয় বাজেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেট পেশ করেছেন। অনুমান করা হয়েছে, আগামী বছরে আয় ব্যয়ে রাজস্ব খাতে বত্রিশ কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে। প্রশ্ন হতে পারে, এই হিসাবের মূলভিত্তি কি। মূলভিত্তি হচ্ছে বর্ত্তমান কর-হার। অবশ্যি শ্রীনেহরু এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রয়োজন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করের কাঠামোর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়ত অসম্ভব নয়। তবে গত বৎসর যে সব মুখ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল সে সব ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে অব্যাহত রাখা হবে।

১৯৫৮ ৫৯ সনের বাজেট সম্পর্কে দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ইকনমিক এফেয়ার্স একটা বিবৃতি প্রচার করেছেন। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাজেটটি একেবারে মামুলী। এতে এমন কিছুই নেই যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবৃতির এক স্থানে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, গত বাজেটের ফলে যে, নৈরাশ্যের ভাব দেখা গিয়েছিল সেটার কোন প্রতিকার আলোচ্য বাজেটে দেখা যাচ্ছে না।

শ্রীনেহরু যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট থেকে জানা যায়, ১৯৫৮-৫৯ সনে দেশরক্ষা বাবদ দুই শত আঠাত্তর কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এ ছাড়া অ-সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ পাঁচ শত সতের কোটি সাতাশী লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ১৯৫৭-৫৮ সনের সংশোধিত হিসাবে দেশরক্ষা বাবদ যে ব্যয় অনুমিত হয়েছে ১৯৫৮-৫৯ সনে সেটার চাইতে বার কোটি নয় লক্ষ টাকা বেশী খরচ হবে।

এক্ষেত্রে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার আছে। সে জিনিসটি হ'ল এই যে, বিমানবহরের পুরাতন সাজসরঞ্জাম বাতিল করে নূতন সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য এই বাড়তি খরচের প্রয়োজন হবে। রাজ্যসভায় সাধারণ বাজেট সম্পর্কে আলোচনার সময়ে রাজকুমারী অমৃত কাউর দেশরক্ষা খাতে এই বাড়তি খরচের নিন্দা করেছেন। তিনি ভারত সরকারকে প্রশ্ন করেছেন, "Are we also obsessed by the fear complex that is leading the world to the brink of disaster?" তিনি জানতে চেয়েছেন, "Are we practising what we preach?"

বিগত ১০ই মার্চ তারিখে লোকসভায় সাধারণ বাজেট সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে প্রতিরক্ষা বিভাগের তিনটি শাখার মধ্যে আরও বেশী সমন্বয় সাধনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে শ্রী এইচ, এন, কুঞ্জরু জোর দিয়ে বলেছেন, বর্তমান কালের সমরনৈতিক চিন্তাধারা তিনটি শাখার একীকরণের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতে যাতে যুক্ত জেনারেল ষ্টাফ প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য সচেষ্ট হতে তিনি ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

লোকসভায় শ্রীনেহরু বলেছেন, ১৯৫৭-৫৮ সনে রাজস্ব বাবদ সাত শত চব্বিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা আয় এবং সাতশত উনিশ কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে, ফলে পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণ বশতঃ ১৯৫৭-৫৮ সনে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ অতটা কমে গেল।

কারণ হচ্ছে, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার রাজ্যগুলোকে অতিরিক্ত চৌত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা খাতে মোট দুই শত বাহান্ন কোটি একাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। অথচ খরচ করা হয়েছে দুই শত ছেষট্টি কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তের কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হ'ল চারটি। প্রথমতঃ বিমান এবং সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি। তৃতীয়তঃ সৈন্যদের মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া এদের আরও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ অতিরিক্ত অসমরিক রসদপত্র ক্রয় করতে হয়েছে।

লোকসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেট থেকে জানা যায়, ১৯৫৮-৫৯ সনে অনুমিত মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে চার শত বার কোটি টাকা। এখানে একটা কথা বলা দরকার। সে কথাটি হ'ল এই যে, ঋণ বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত আটাত্তর কোটি টাকা এই চার শত বার কোটি টাকার মধ্যে ধরা হয় নি।

১৯৫৮-৫৯ সনে ইস্পাত কারখানাগুলোর জন্য অতিরিক্ত একত্রিশ কোটি টাকা এবং শিল্পোন্নয়নের দরুণ অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐ বৎসর তিন শত বাষট্টি কোটি টাকা ঋণপ্রদান খাতে ধরা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এই তিন শত বাষট্টি কোটি টাকার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে দেওয়া হবে দুই শত চুরাশী কোটি টাকা। বাকী আটাত্তর কোটি টাকা অন্যদিকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাজেট পেশ করার সময়ে শ্রীনেহরু বলেছেন, ১৯৫৮-৫৯ সনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বাজেটে মোট সাত শত বিয়াল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এই বরাদ্দীকৃত টাকা দু' ভাগে দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ এক শত বাইশ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাকী ছয় শত একুশ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে মূলধনী বাজেটে। শ্রীনেহরু বলেছেন, রাজস্ব বাজেটে যে টাকা দেখানো হয়েছে সে টাকা থেকে তিপ্পান্ন কোটি টাকা এবং মূলধনী বাজেট থেকে এক শত আটাত্তর কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে সাহায্যের জন্য দেওয়া হবে। এ ছাড়া পরিকল্পনার জন্য রেলওয়ে নিজের সম্পদ থেকে তিরানব্বই কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলি একশত একাশী কোটি টাকা খরচ করবেন বলে শ্রীনেহরু জানিয়েছেন।

ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে শ্রীবাবুভাই চিনই-এর নাম খুব পরিচিত। ইনি ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের সভাপতি। এঁর অভিমত হ'ল, বর্তমান বাজেটে উৎসাহিত কিংবা বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। বাজেটটি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপযুক্ত আব-হাওয়া সৃষ্টি করার দিক থেকে আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন বলে মনে হয়। রাজ্যসভায় রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেছেন, 'If the private Sector is driven to the wall, it will lead to a monolithic, totalitarian State.'

শ্রী এস, সি, বসু হলেন ইংকন্স মাইনিং এণ্ড ইণ্ডষ্ট্রিয়াল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি। তিনি বলেছেন আলোচ্য বাজেটটিকে সাধারণ ভাবে নৈরাশ্যজনক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে তিনি দুটো ত্রুটির উপর জোর দিয়েছেন। প্রথমতঃ বাজেটে এমন কিছুই নেই যা থেকে মনে করা যেতে পারে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভাল ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে, আলোচ্য বাজেটে এমন কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি যার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে রাজ্যসভায় সাধারণ বাজেট সম্পর্কে আলোচনার সময়ে শ্রীএইচ, এন, কুঞ্জরু বলেছেন, 'The foreign exchange gap has been grievously under-estimated.' তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'Employment will suffer as a result of rephasing of the Plan.

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আগামী বৎসরের বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে যে সব নূতন কর ধার্য্য করার কিংবা যে সব পুরাতন করের হার পরিবর্তিত করার জন্য প্রস্তাব করেছেন, সে সব করের মধ্যে দুটো করের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বাৎসরিক দশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধে দান কিংবা সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনেহরু উত্তরাধিকার করে রেহাই-এর পরিমাণ হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। অনুমান করা হয়েছে, এই সব

ব্যবস্থার ফলে মোট আয় পাঁচ কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়। ঘাটতির পরিমাণও বত্রিশ কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা থেকে সাতাশ কোটি দুই লক্ষ টাকায় হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রীনেহরু এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সনে পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ টাকার মত উদ্বৃত্ত থাকবে। এই সনের সংশোধিত হিসাবে রাজস্ব খাতে ব্যয় বাজেটকালীন অনুমিত ব্যয়ের চাইতে পনের কোটি টাকা কম হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্যয়হ্রাসের কারণ কি। কারণ হ'ল এই যে, এক দিকে যে রকম খাদ্যক্রয় বাবদ আটত্রিশ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে, সে রকম অন্য দিকে ব্রিটেনের কাছ থেকে ষ্টার্লিং পেন্সন বাবদ অগ্রিম ষোল কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগৎ বলেছেন, 'A measure of integration between the Gift Tax and Estate Duty has been achieved by co-ordinating their rates. Provision has also been made to ensure that no transfer can be subjected to both the taxes.'

শ্রীপি. এন. তালুকদার হলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির সভাপতি। তিনি মনে করেন, সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যে সম্পত্তি-কর আরোপ করা হয়েছে সে করের ফলে বেসরকারী মালিকানার শিল্প-সম্প্রসারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ ভারতের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় বেসরকারী মালিকানার শিল্প-সংস্থাগুলোর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ১লা মার্চ্চ তারিখে দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"It is not clear, however, that the Budget speech takes account of the recession aleroad, with its impact on the export trade. If corporate enterprise is disappointed at not getting some of the fiscal reliefs for which it has asked, that section of it concerned with export industries may feel that it has a special grievance. The Budget also does not seem to do much to meet suggestions made with a view to encouraging further the foreign investor." কলকাতা শেয়ার বাজারের সভাপতি শ্রী বি. এন. চতুর্ব্বেদীর অভিমত হ'ল ডিভিডেণ্ডের উপর থেকে যাতে সুপার ট্যাক্স প্রত্যাহৃত হয় সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে ভাল হ'ত। এমন কি যদি সুপার-ট্যাক্স একেবারে প্রত্যাহার করা সম্ভবপর নাও হয় তা হলেও এই ট্যাক্সের পরিমাণ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দরকার।

শ্রী চতুর্ব্বেদী তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে দুটো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন, বর্ত্তমানে শেয়ারের বাজারে মন্দা চলছে। দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল, বিনিয়োগের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহ দেখা যাচ্ছে। শ্রী চতুর্ব্বেদী জোর দিয়ে বলেছেন, যে ভাবে বিভিন্ন কোম্পানীর পক্ষে টাকা সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে তাতে দেশের সরকারের পক্ষে উদ্বৃত্ত টাকার বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ ব্যবস্থা রদ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তাছাড়া যে ভাবে উত্তরাধিকার করের ক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকাও মন্তব্য করেছেন, "The introduction of a gift Tax had been anticipated, but it was hardly necessary to couple it with a lowering of the exemption limit for Estate Duty to Rs 50,000 or to make the Estate Duty applicable to gifts 'inter vivos' made within five years before death." বৎসরের পর বৎসর আমরা লক্ষ্য করে আসছি, লোকসভায় বাজেট পেশ করার সময় যখন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে তখন দেশের সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, অবশ্য যে কারণবশতঃ সমাজের উপর-তলাকার লোক উদ্বেগ বোধ করেন সে কারণের সঙ্গে নীচু-তলাকার লোকের উদ্বিগ্ন হবার কারণের পার্থক্য আছে।

অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তি আশঙ্কা করে থাকেন, নূতন কোন আঘাত তাঁদের উপর এসে পড়বে সে-ক্ষেত্রে নীচু-তলাকার লোক হয়ত ভাবছেন, এমন কোন প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য্য করা হবে যার ফলে তাঁর জীবন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু শ্রীনেহরু যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটে এমন কিছু নেই যার ফলে নীচু-তলাকার লোকের উদ্বেগ বেড়ে যেতে পারে যদিও যে আর্থিক বোঝা তিনি বহন করে চলেছেন সে বোঝা লাঘব করার চেষ্টা বাজেটে নেই। দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকারও অভিমত হচ্ছে, "The ordinary taxpayer may perhaps consider himself lucky to escape fresh burdens"

একটি শিকারকাহিনী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, তোমাকে আমার কুমীর শিকারকাহিনী বলা হয় নাই।

আমি বলিলাম, না, তাহা তো শুনি নাই।

'তবে শোন' বলিয়া বন্ধুবর সুরু করিলেন।

সে আমার প্রথম জীবনের কথা। চাকুরীতে পাকা হইয়া প্রথমেই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিশনগঞ্জ সাব-ডিভিসনের ভার পাইলাম। জায়গাটি আমার ভাল লাগিল। আধা শহর, আধা গ্রাম। বাংলোটি আরো ভাল। পরিবেশ মনোরম। নির্জ্জন তপোবনের মধ্যে ধ্যানমগ্ন মন্দিরের মত।

চারিদিকে বড় বড় আম-জামের গাছ; জড়াজড়ি করিয়া তাহারা একে অন্যের স্নেহরসে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। কিছু দূরেই গভীর বন, হিংস্র জন্তুর আবাস-স্থল। তাহার ওপারে দূরান্তে হিমালয়ের শীর্ষরেখা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এতদিন পরেও সে দৃশ্যটি আমার মনে সজীব হইয়া আছে।

শহর হইতে তিন চারি মাইল দূরে একটি পার্ব্বত্য নদী। এখন নাম ভুলিয়া গিয়াছি; ম্যাপ দেখিয়া বাহির করিতে পারি। বর্ষাকালে সে নদীর প্রচণ্ডতা অবর্ণনীয়, স্রোতবেগ ভয়াবহ। তখন নৌকা করিয়া সে নদী পার হইবার চেষ্টা কেহ করে না। আবার শীতের দিনে তার শীর্ণতা ক্লেশ-দায়ক। তখন নদীর বুকে অসংখ্য বালুচর; সে যেন একটা রিক্ত, শুষ্ক দরিদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি। স্রোতাবেগ একেবারে বন্ধ হয় না, তবে জল নিতান্ত অগভীর।

আমার শিকারী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা ছিল যথেষ্ট যদিও শক্তি ছিল অল্প। সে শক্তিবৃত্তের পরিধি যে কত খর্ব্ব, তাহা আমার অপেক্ষা বেশি কেহ জানিত না। আমার অবশ্য একটা রাইফেল ছিল কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহার দ্বারা আমি যে কোনদিন কোন লক্ষ্যবেধ করিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না। অথচ পরবর্ত্তী জীবনে কত কাল্পনিক শিকারকাহিনীই না নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছি! সে সকল কাহিনীর সাক্ষ্য লইয়া কুমীরটি আজও অক্ষতরূপেই বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। শহর হইতে মাইল দশেক দূরে ঐ পার্ব্বত্য নদীর ধারে একটা বনের দখল লইয়া দুই ন তালুকদারের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। দুই-একটা ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইয়া গিয়াছে। অকুস্থলে তদন্তে যাইব বলিয়া ইচ্ছা ছিল; একদিন সুযোগও ঘটিয়া গেল। বিবদমান তালুকদারদের এক পক্ষ আসিয়া বলিল, হুজুর, ওদিকে কুমীর শিকারের বড় সুবিধা আছে, যদি হুকুম হয় ত শিকারের বন্দোবস্ত করি।

শিকার-খ্যাতির লোভ তখন আমার অপরিসীম। কুমীর শিকার? সে ত যে-কোন শিকারীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ত্বরিতকর্ম্মা শিকারী ছাড়া কেহ কুমীর শিকার করিতে পারে না। তাহার উপর দৃষ্টিশক্তি চাই তীক্ষ্ণ আর নিশানা চাই নির্ভুল। কুমীরের দুইটি চোখের মধ্যস্থলে ঠিক কপালের নীচের দিকে তাক করিয়া লক্ষ্যবেধ করিতে হয়। কেতাবী বিদ্যা আমার কম ছিল না; ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, আমি সত্যই যেন একটি কুমীর শিকার করিয়া ফেলিয়াছি।

ফলে শিকারের দিনস্থির হইয়া গেল।

শীতের সকাল। কিশনগঞ্জে তখন দারুণ শীত; তার উপর পূর্ব্বের দিন একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য উঠিবার কিছু পরে আমরা সদলবলে শিকার যাত্রা করিলাম। নদীর ধারে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যদেব আকাশে অনেক ধাপ উঠিয়া গিয়াছেন। কনকনে হিমেল হাওয়া হিমালয়ের বার্ত্তা নিয়া আসিতেছে। নদীর বুকে মৃদু তরঙ্গ, দূরে প্রকাণ্ড বালুচর; তাহার বুকে কোথাও শ্যামল শোভা।

তালুকদারের লোক প্রস্তুতই ছিল। বলিল, কুমীরের আড্ডা এখান হইতে প্রায় পোয়া মাইল পথ। কিন্তু সবটা পথই নদীর ধারে ধারে বালুর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। সেখানে চরের উপরে রোজই কয়েকটা কুমীর রোদ পোহায়, আজও এক আধটা বসিয়া আছে বলিয়া খবর আসিয়াছে।

কুমীর অতি সতর্ক প্রাণী। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইলে সে ডাঙ্গা হইতে টুপ করিয়া জলে পড়িয়া যায়। আর একবার জলে পড়িয়া গেলে তাহাকে শিকার করা অসম্ভব। তাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমরা একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কিন্তু বালুর মধ্য দিয়া হাঁটা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। পদে পদে দম লইতে হয়। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নিজেরই কানে বাজে। সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা থাকে যে, যে

কোন মুহূর্ত্তে সেই অস্পষ্ট শব্দই বা বুঝি শিকারকে সতর্ক করিয়া দিবে। আর একবার সেই সরীসৃপের সন্দেহ হইলে রক্ষা নাই ; সেদিন আর শিকার মিলিবে না।

উপরে সূর্য্যদেব তাতিয়া উঠিয়াছেন অথচ মাথায় শোলার টুপি দিবার সাধ্য নাই। রাইফেলকেও যথাসাধ্য লুকাইয়া রাখিতে হইতেছে। শুনা গেল, কুমীরের দলও ইংরেজ রাজত্বের শক্তির প্রতীক শোলার টুপিকে সমীহ করিয়া চলে। শোলার টুপির সঙ্গে শিকারীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সাধারণ পথিককে তাহাদের ভয় নাই।

তখন দুর্গানাম করিতাম না। নাম না করিয়াই নিরাপদে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। অনেকক্ষণ দম নিতে হইল। সঙ্গের লোকজন ইশারায় স্থির হইতে বলিল। তাহাদের নির্দ্দেশমত বাইনাকুলার চোখে লাগাইয়া দেখিলাম, নক্রপ্রবর বালুচরে জলের ধারে নিশ্চল অবস্থায় আরাম করিয়া রৌদ্র পোহাইতেছে। মনে হইল, তাহার দৃষ্টি আমাদের দিকে। সন্দেহ হইল, এখনি হয়ত টুপ করিয়া জলে ডুবিয়া যাইবে।

ইহাই কুমীর শিকারের মাহেন্দ্রক্ষণ। ক্ষিপ্রতার সহিত তাক করিলাম। রাইফেল পর পর দুইবার গর্জ্জিয়া উঠিল।

নিজের তাকের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, সঙ্গীদের উল্লাসে সেটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। 'হো গয়া' মার ডালা' বলিতে বলিতে সঙ্গীরা মহাদর্পে নদী-তীরের তপ্ত বালুকাস্তরে পদাঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার বাইনাকুলার লাগাইয়া দেখিলাম, বিরাটকায় সরীসৃপটি নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার দেহে মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও নাই—গুলী নিশ্চয়ই একেবারে মর্ম্মস্থলে লাগিয়াছে।

তাহার পর চলিল শববহনের পালা। একখানা নৌকা করিয়া কুমীরের মৃতদেহ ওপার হইতে এপারে আনা হইল। তাহার পর তাহাকে গাড়ী বোঝাই করিয়া নিয়া আসিলাম শহরে। সেই শবদেহের পার্শ্বে রাইফেল হস্তে বীরবিক্রমে দাঁড়াইয়া ফটো তুলিলাম। সে ফটো ছাপা হইল একখানা দৈনিক কাগজে। সর্ব্বশেষে সে সরীসৃপের দেহকে অবিকৃত রাখিয়া গৃহসজ্জায় পরিণত করিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম কলিকাতার এক কারখানায়। বলা বাহুল্য, তালুকদারের লোকেরাই প্রায় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিল।

সপ্তাহখানেক পরে কারখানার লোক মারফৎ একখানা চিঠি ও একটি আংটি পাইলাম। চিঠিতে লেখা হইয়াছে, আংটিটি কুমীরের পেটে পাওয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার প্রকৃত মালিক শিকারী স্বয়ং। আংটিটি অতি সুন্দর। মূল্য সম্বন্ধে অবশ্য আমার জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ, তবে আংটিটির কারুকার্য্য যে মনোরম তাহা বুঝিবার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাইবার দরকার ছিল না। ভাবিলাম, আহা কোন অভাগা যেন এই হিংস্র সরীসৃপের কবলে পড়িয়াছিল। মনে মনে কুমীরের মনুষ্য শিকারের একটা কাল্পনিক গল্প ভাবিবার চেষ্টা করিলাম।

তখনও আমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু ভাবী বধূ স্থির হইয়া আছে। আর কিছুমাত্র দেরী না করিয়া এই কুমীর শিকারের এক দীর্ঘ কাহিনী লিখিয়া তাহাকে এই শিকারলব্ধ আংটিটি উপহার দিলাম। লিখিয়া দিলাম, এই বিজয়-অভিজ্ঞান বীরজায়ারই প্রাপ্য।

এইখানেই গল্পের শেষ নহে। আরো একটু আছে।

মাস দুই পরেই আমার বিবাহ হইল—কলিকাতায়ই। বিবাহের পরে সহসা একদিন সেই শিকারলব্ধ আংটিটির মূল্য যাচাই করিবার সখ হইল। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া একটি নামজাদা অলঙ্কারের দোকানে গেলাম। আংটিটি দেখিয়াই তাহারা বলিল, এতো আমাদেরই তৈরী আংটি। মাস দুই পূর্ব্বে কিশনগঞ্জের এক তালুকদারের কাছে বিক্রয় করিয়াছি। দাম দেড় হাজার টাকা।

স্ত্রী আমার দিকে চাহিলেন—শঙ্কিত দৃষ্টিতে। ভাবিলেন, কুমীরের পেটে আংটি পাইবার গল্প ছলমাত্র। মনে হইল, আংটির মূল্যের বহর জানিয়া এ ছলনাটুকু তাহার খুব ভাল লাগিল। আমিও কথাটা চাপিয়া গেলাম।

কিন্তু এখানেও গল্পের শেষ নহে। কিশনগঞ্জ হইতে বদলি হইবার পর সঠিক জানিতে পারিয়াছিলাম, সেদিন আমি যাহা শিকার করিয়াছিলাম তাহা সজীব কুমীর নহে—কুমীরের মৃতদেহ। কোন নামজাদা শিকারীকে দিয়া পূর্ব্ব দিন কুমীরটিকে মারা হইয়াছিল। কথাটা আমি নিজে একটুকুও অবিশ্বাস করি নাই।

বন্ধুবর চুপ করিলেন। আমি সেই ভয়াবহ সরীসৃপটার দিকে আর একবার চাহিলাম! সে যেন তাহার করাল দংষ্ট্রা বাহির করিয়া নিতান্ত উপহাসের হাসি হাসিতেছে।

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

সেণ্ট পল জায়গাটা দেখতে ভারী সুন্দর, বিশেষ করে বাইরের দিকটা। এই অঞ্চলটাকে Lake District বলে। আশেপাশে ছোটবড় অসংখ্য হ্রদ আছে। তবে অনেকগুলি হ্রদ পুকুরের মত। আমরা যে পাড়াতে থাকতাম, তার কাছে হ্রদও নেই বড় বড় দোকানপাটও নেই। দোকানপাড়া অন্য দিকে। সেটা কর্ম্মচঞ্চল পাড়া, কয়েকটা ১২।১৪ তলা বাড়ীও আছে, বোধ হয় অনেক আপিসও এই পাড়ায়। আমাদের দিকে রাস্তায় যেমন মানুষ হাঁটতে প্রায় দেখা যায় না, ওখানে তা নয়, সারাক্ষণ লোকচলাচল করছে এবং রাস্তা পার হবার জন্য মাঝে মাঝে দল বেঁধে অপেক্ষা করছে। রাস্তার ধারে যেসব জায়গায় গাড়ী রাখতে দেয় সেখানে একটা ডাকবাক্সের মত বাক্সে ভাড়াস্বরূপ পয়সা চুকিয়ে দিতে হয়। আমরা যাঁর সঙ্গে গেলাম তিনি সেদিন তাঁর গাড়ীটি ঐভাবে রেখে আমাদের নিয়ে দোকানে ঢুকলেন। এসব দোকান বিরাট, উপর নীচে যাওয়া-আসা করার তিন রকম ব্যবস্থা—পায়ে হাটা সাধারণ সিঁড়ি, লিফ্‌ট এবং এস্কালেটার (চলন্ত সিঁড়ি)। এস্কালেটারে সব চেয়ে ভীড়, দেখতেও বেশ লাগে। দোকানে সব রকম কাপড়, বাসন, খাবার, রন্ধনযন্ত্র ইত্যাদি নানা জিনিসের বিক্রয়-ব্যবস্থা নানা অংশে। সেদিন উপরে এক জায়গায় ইতালীয় জিনিসের একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। নিউইয়র্কের কয়েকটি মেয়ে ইতালীয়ান সেজে বসে আছে। লোকে ছবি তুলছে। আমাদের দেখে এক দলের ধারণা হ'ল আমরা ইতালীর বিশেষ কোন প্রদেশের মানুষ, প্রাদেশিক পোশাক পরে' এসেছি। অমনি পটাপট ছবি তোলা সুরু হয়ে গেল। টাকার দেশ, কাজেই যে কোন ছুতায়-নাতায় ছবি তোলার শেষ নেই। অন্যান্য বড় দোকানেও খুব সমারোহ।• আসবাবের দোকানে বা ডিপার্টমেণ্ট রীতিমত আলাদা আলাদা ঘর পর্দ্দা, চাদর, গদি, কার্পেট সব দিয়ে সাজিয়ে আসবাব দেখানোর ব্যবস্থা। কোন্ আসবাব দিয়ে কোন্ ঘর সাজালে কি রকম দেখাবে ভাববার দরকার নেই, লোকে দেখে নিলেই বুঝতে পারবে।

বড় বড় দোকানপাট যেমন আছে, তেমনি আবার আমাদের দেশের মত হাটও এখানে এক এক জায়গায় বসে। কলকাতায় হগ সাহেবের বাজারের পিছনে যেমন টিনের ছাউনি দেওয়া বাজার, সেই রকমই কয়েকটা ছাউনি-ঢাকা জায়গা। মেঝের উপরই জিনিস সাজানো, টেবিল কি কাউণ্টার নেই। কপি, কুমড়ো, গাজর, আলু, পেঁয়াজ, আপেল নানা তরিতরকারি ও ফল বিক্রী হয়। সবই প্রায় পাইকারী দরে। চাষীরা স্ত্রীপুরুষে বড় বড় গাড়ী করে মাল নিয়ে আসে। দু'তিন জন গৃহিণী একত্রে গেলে ঝুড়ি ভর্ত্তি জিনিস কিনে পরে ভাগ করে নিতে পারেন। কোন কোন জিনিসের ছোট "ভাগা"ও করা থাকে। একটা-দুটো কিনতে চাইলে এখানে দেয় না। আমরা বিদেশী বলে এক জন ভদ্রতা করে একটা কপি বিক্রী করল। প্রাত্যহিক বাজারে সহরের দোকানে এই কপি একটু টিকিট মেরে অনেক দামে দের দেখেছি। এই হাটের মানুষরা চাষাভূষো, কিন্তু বেশ ভদ্র। যুদ্ধের সময় কার ছেলে বা কার ভাই ভারতবর্ষে গিয়েছিল সে সব গল্পও তারা করে।

এদেশে ঠিক মুদীর দোকান বলে কিছু দেখিনি। আমরা সংসারের জন্য যে দু'তিনটি দোকানে জিনিস কিনতাম সেখানে চাল, ডাল, ময়দা, চিনিও যেমন বিক্রী হ'ত, তেমনি মাছ, মাংস, ডিম বা আলু, পেঁয়াজ, টোমাটো, কপিও পাওয়া যেত। দুধ, দই, কেক প্রভৃতি অন্যান্য অনেক খাদ্যও এখানেই কিনতাম। মানুষের সময় সংক্ষেপ করবার জন্য সব জিনিস এক জায়গায় পেলেই ভাল হয়। এদেশে প্রধানত মেয়েরাই বাজার করে। তাদের অনেকেরই বাড়ীতে ছেলেপিলে ফেলে আসার অসুবিধা আছে। তাই মোটরে ছোট শিশুকে নিয়েই তারা দোকানে যায়। অনেক দোকানের মধ্যেই একরকম ছোট ঠেলাগাড়ী থাকে তারের ফ্রেমের; ক্রেতা তাঁর পছন্দমত জিনিস নিজে হাতে তুলে নিয়ে সেই গাড়ীতে করে দরজার কাছে ফিরে আসেন। সেখানে হয় কলে হিসাব এবং দাম দেওয়া। সব জিনিসের গায়েই দাম লেখা থাকে, কাজেই যার যেমন খরচ করবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা সে সেই রকম করতে পারে। যারা ছোট ছেলে নিয়ে বাজার করে তাদের ঠেলাগাড়ীর সামনে ছেলে বসাবার একটা জায়গা থাকে। ছেলেকে সেইখানে বসিয়ে জিনিসপত্রের সঙ্গে বেশ ঠেলে নিয়ে যেতে পারে।

এদেশে যেমন একত্রে সব কেনার দোকান আছে তেমন আলাদা আলাদারও যে নেই, তা নয়। একবার একটা দোকানে গেলাম সেখানে কেবল মশলা বিক্রী হয়। আমরা মশলার ভক্ত বলে আমাদের এক বন্ধু দোকানটি দেখালেন। মশলা খাবার লোক নানা দেশেই আছে দেখলাম, না হলে দোকান চলত না। ইতালীয়ানরা বোধ হয় বেশী খদ্দের এদের।

আর এক জায়গায় একটা রান্নার সরঞ্জামের দোকান বা স্থায়ী প্রদর্শনী। তার নাম Betty Cooker's Kitchen।

কত রকম রান্নার ব্যবস্থা যে ওদেশে আছে, তার ঠিক নেই। মানুষের চিত্তাকর্ষণ করবার জন্য প্রথম যুগের আমেরিকার রান্নাঘর একটি সাজানো আছে তার সেকেলে সরঞ্জাম সমেত। সেটি এব্রাহাম লিঙ্কনের রান্নাঘরের নকল। কাঠের উনুন, হাতা, বেলুন, তরকারি কাটার ছুরি ইত্যাদি সব আছে।

তার পর আধুনিক থেকে আধুনিকতম। তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের কাঁটা-হাড় নিয়ে রাঁধুনীকে বিব্রত হতে হয় বলে একটা কল করেছে ভারী সুন্দর। সুইচ টিপে দিলেই তীক্ষ্ণ ছুরি বেরিয়ে সব খণ্ড খণ্ড করে কেটে নর্দ্দমায় চালিয়ে দিচ্ছে। বাইরে ফেলতে যাবার দরকার নেই। কোথাও-বা রান্নার উনুনের (গ্যাস) সঙ্গে তরকারী কোটবার তক্তা, রাঁধুনীর আসন সব একত্রে বিক্রী হচ্ছে। কাজ হয়ে গেলে তক্তা-আসন সব ওরই মধ্যে ঢুকে যায়।

সারা বাড়ীটা রান্নার গন্ধে আকুল, কারণ নানা রকম রান্না করা হচ্ছে সারাক্ষণ এবং দর্শকরা দেখে যাচ্ছেন। আমাদের একটু করে কেক খেতেও দিল তারা। তাতে অবশ্য ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া ছাড়া আর কিছু হ'ল না।

এদেশে বড় বড় দোকানে প্রায়ই প্রদর্শনী হয়। তার মধ্যে কোথাও কোথাও ভারতীয় ষ্টলও দেখেছি। তবে জিনিস উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। একবার দেখলাম একটা দোকানে নানারকম ভারতীয় ঘণ্টা বিক্রী হচ্ছে।

মাঝে মাঝে আমাদের একটু-আধটু গোলমালে পড়তে হ'ত। বসত বাড়ীতে গ্যাস প্রভৃতির মিটার দেখতে মাঝে মাঝে লোক আসে। আমরা যখন সবে গিয়েছি তখন ঐসবের নিয়ম এবং দিনক্ষণ জানতাম না। ওদের নাকি কাউকে না বলেও বাড়ীতে ঢোকবার অধিকার আছে। একদিন দেখি বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘরের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। খাতা-পেনসিল হাতে করে মেয়েদের একজনের সঙ্গে সে উপর নীচ ঘুরছে দেখে মনে হ'ল কোন দরকারী কাজেই এসেছে। কাজ করতে করতে সে কথা বলছিল। ভাবলাম আমরা বিদেশী বলে সবাই যেমন কথা বলে এও বুঝি তাই বলছে। তার পর শুনলাম, "তোমরা বেড়াতে বেরোও কি? আজ যাবে কি?" এই সব বলছে। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, "তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।" লোকটা তখনকার মত চলে গেল। তার পর দুপুরে দু'তিন জন মিলে গাড়ী চড়ে এসে হাজির। কোন রকমে তাদের বিদায় করা হ'ল। তাতেও রক্ষা নেই, এবার টেলিফোনে ডাকা-ডাকি। তখন ভীত হয়ে আমাদের এক প্রতিবেশিনীকে আমরা সব বলে দিলাম। তিনি ওদের আপিসে জানিয়ে দিলেন। কোন লোকের নামে নালিশ করলে তার আইন-সঙ্গত ধারা মেনে চলতে হয়। আপিস যা বলল তাতে বুঝলাম এতেও অনেক আইনের হাঙ্গামা আছে। অগত্যা একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের সাহায্য নিতে হ'ল। তিনি আপিসে বলে ঐ লোকটাকে আমাদের বাড়ীর কাজ থেকে সরিয়ে দিলেন। প্রথম দিন দেখেই যে অপরিচিত মানুষ অজানা মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, এরকম আগে কখনও দেখি নি।

মেয়েরা এই কারণে একটু ভীত হয়েছিল দিনকয়েক। তারপরে একদিন ওরা কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ী ফিরছে, এমন সময় দেখলে একটা গাড়ী ওদের পিছন পিছন আসছে। এক ভদ্রলোক গাড়ী থেকে বললেন, "মেয়েরা, গাড়ীতে যাবে?" ওরা ভয় পেয়ে, "না, ধন্যবাদ।" বলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। তখন গাড়ীটা খানিক দাঁড়িয়ে আবার পিছন পিছন এল। এবার ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামলেন এবং নেমে বললেন, "সন্দিগ্ধমনা হওয়ার জন্যে তোমাদের দোষ দিই না, তবে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ।" মেয়েরা ত অপ্রস্তুত! ক্ষমা চেয়ে রেহাই পেল। ওরা বললে, "আপনি মনে করছেন আমাদের বাড়ী দূরে। কিন্তু আমরা খুব কাছেই থাকি।"

মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর হাঙ্গামা যে না হ'ত, তা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে যেমন ট্রামেবাসেপথে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করা অনেক পুরুষের একটা রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তার কোন চিহ্ন ওদেশে দেখি নি। সবাই ভদ্রতাই করত। একবার এক ডলার মনে করে ডক্টর নাগ দশ ডলারের নোট ট্রামের বন্ধ বাক্সে ফেলে দিয়েছিলেন। তাদের গিয়ে সেকথা বলাতে তারা বাক্স খুলে সমস্ত হিসাব মিলিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছিল। মেয়েরা হাজার ভীড়ের মধ্যে উঠলেও কোন অসুবিধার কারণ গাড়ীতে হ'ত না।

এদেশে বিদেশী বন্ধুদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এবং নিমন্ত্রণ করার প্রথা খুব আছে। আমাদের অনেকেই বাড়ীতে, গীর্জ্জায়, ক্লাবে নিমন্ত্রণ করতেন। বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক খুব বেশী ছিলেন না। তবে তিনজন খুবই সাহায্য করতেন। তার মধ্যে একজন এতই বেশী নিয়ে ঘুরতেন যে, কলেজের কাজে ছাড়া আমাদের কোথাও যেতে কখনও ট্যাক্সি খরচ হয় নি বললেই চলে। যাঁরা খাওয়া দাওয়ার নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা সকলেই গাড়ী করে নিয়ে যেতেন এবং গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিতেন। অথচ আশ্চর্য্য যে, তাঁদের কারুরই মাইনে-করা ড্রাইভার ছিল না। প্রত্যেকেই নানা কাজের মধ্যে সময় করে এই ভদ্রতার কাজটিও করতেন। মিসেস এগার, নামে যে ভদ্রমহিলা;

আমাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতেন, তিনি একজন মধ্যবিত্ত গৃহিণী মাত্র। প্রতিবেশিনী বলে নিজেই এসে আলাপ করেছিলেন একদিন। নিজের তৈরি জেলী হাতে করে এনেছিলেন প্রথম পরিচয়ের দিন। বাজারহাট দোকান ত তাঁর গাড়ীতে আমরা সর্ব্বদাই করেছি; সখের ভ্রমণও কম করি নি। সহরে, সহরের প্রান্তে এবং সহর থেকে অনেক দূরে যেখানে যত দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, তিনি আমাদের দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। নূতন দেশ, কাজেই এখানে ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন দেখবার জিনিস বেশী নেই; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার মত জায়গা অনেক আছে। নদী, পাহাড়, ঝরণা, হ্রদ নানাদিকে।

আমেরিকান মেয়েদের নানারকম ক্লাব আছে। যারা স্কুল-কলেজের ছাত্রী নয় তাদের গীর্জ্জাসংক্রান্ত ক্লাবই বেশী, কারণ মিনেসোটা রাষ্ট্রের বাইবেলভক্তির খ্যাতি আছে। তবে এই সব ক্লাবে কেবল যে ধর্ম্মকথা হয়, তা নয়। এই-রকম অনেক জায়গাতেই আমার মেয়েদের বক্তৃতা বা প্রশ্নোত্তর করবার জন্য ডাকত। অনেকে ৫ ডলার, ১০ ডলার দিতও এইজন্যে। এসব জায়গায় গান্ধী, নেহরু, ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা, হিন্দুধর্ম্ম, জাতিভেদ, বিবাহ, পূর্ব্বরাগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বলতে বলত। তবে সবই ভাসা ভাসা প্রশ্ন, অনেক সময় হাস্যকর প্রশ্নও বটে। পূর্ব্বদেশ সম্বন্ধে ওদেশের অনেকের অজ্ঞতা যে কত বেশী, তা প্রায়ই বোঝা যেত। এখনও অনেকের ধারণা আমাদের দেশে ভাল ঘরবাড়ী নেই, গাছতলায় বা কাঠকুটোর কুঁড়েতেই মানুষ বাস করে, বৈদ্যুতিক বা অন্যরকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার কেউ জানে না, প্রত্যেকে চারটে বিয়ে করে ইত্যাদি। মহেঞ্জোদারো থেকে সুরু করে ভুবনেশ্বর কোনারকের খ্যাতিযুক্ত দেশ হলেও এদেশে গ্রামের লোকে এবং অন্য দরিদ্র লোকে কুঁড়েঘরে থাকে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার তারা জানে না,' এটা খুবই ঠিক বটে। তাই আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কারণ যে নেই, তা বলতে পারি না। ওদের দেশে যত ঘুরেছি তাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের বাড়ী ছাড়া কুঁড়েঘর কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না।

এইসব ছোটখাট সভাসমিতিতে মাঝে মাঝে সভ্যাদের অভিনয় গান ইত্যাদিও হ'ত, কখনও বা শুধু গানবাজনা, চা ও গল্প করার পার্টি। কিন্তু সব পার্টিতেই সভার শেষে একটু খাওয়া-দাওয়া থাকত। সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যারা যে যা পারেন চাঁদা দিয়ে যেতেন।

বড়দিনের কিছু আগে এই ধরণের ক্লাবগুলি খুব সজাগ হয়ে ওঠে। তখন ধর্ম্মসঙ্গীত, বড়দিনের গল্প, গরীবদের জন্য বড়দিনের উপহার-সংগ্রহ ইত্যাদির ধুম পড়ে যায়। ঝি-চাকর থাকে না বলে অনেকে কচি ছেলে নিয়েই ক্লাবে আসে। কেউ একজন যদি তাদের দেখার ভার নেয় ত ৫।৭ জন মা তার কাছেই শিশুদের তখনকার মত গচ্ছিত করে রাখে, না হলে নিজেই কোলে করে বসতে হয়। এ সব ক্লাবে গিয়ে দেখেছি অনেকেই জিজ্ঞাসা করত আমরা প্রেসবিটারিয়ান, না মেথডিষ্ট; আমরা যে খ্রীষ্টধর্ম্মী নই, এটা তারা ভাবতে পারত না। যখন শুনত তখন অনেকে করুণাভরে বলত, 'আশা করি তোমরা এক বছরের মধ্যেই খ্রীষ্টান হয়ে যাবে।' অবশ্য বুদ্ধিমান লোকেরা এজাতীয় কথা বলত না।

অনেক সময় স্কুলেও ভারতবর্ষের কথা বলবার জন্য নিমন্ত্রণ আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের ক্লাব, গ্রাজুয়েট মহিলাদের ক্লাব এসবও আছে। আমি দু'তিন জায়গায় বলেছি। সেখানে পড়াশুনো, বই, সাহিত্য এসব বিষয়ে বলতে হয়েছে। এই সব নানাজাতীয় ক্লাবের অধিবেশন কখনও সভ্যাদের বাড়ীতে পালা করে হয়, কখনও গীর্জ্জা বা স্কুল-বাড়ীতে হয়, অনেক ক্লাবের নিজস্ব সুন্দর বাড়ী, লাইব্রেরী সব আছে।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে আমাকে মেকালেষ্টার কলেজে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা ক্লাশ করতে যেতে হ'ত। এই ক্লাশ কলেজের সাধারণ ক্লাশের বাইরে। যে কোন মানুষ ইচ্ছা হলে এইজাতীয় ক্লাশে যোগ দিতে পারে। প্রথম দিন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে অনেকেই এসেছিলেন। তারপর অবশ্য ৭৮ জনের বেশী ছাত্রছাত্রী আসতেন না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কলেজের প্রফেসার, কেউ বাড়ীর গৃহিণী, কেউ অল্পবয়স্কা মেয়ে, কেউ বা চাকরে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে বলতে হ'ত। আধুনিকের মধ্যে আমি বাংলা সাহিত্যের কথাই বলেছি। বোর্ডে ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকে এবং সংস্কৃত কবি ও কাব্যের নাম লিখে বলতে হ'ত। তা না হলে ওরা নামগুলো ধরতে পারত না। কোন কোন দিন ক্লাশের পর চা খাওয়া হ'ত, যাতে আর একটু গল্পগাছা হতে পারে।

মহাভারত ও গীতার কথা শুনে একজন ছাত্র বললেন, "তোমাদের এত সব প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্য! কবে হয়ত শুনব যে, গীতার দ্বারা বাইবেল অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। তা হলে কিন্তু ভারী embarassing লাগবে।" ছেলেটির মাথায় একথা কেন এসেছিল আমি জানি না। কারণ বাইবেল বিষয়ে কোন কথা আমি কখনও বলতাম না।

ওখানের মহিলাবিভাগের ডীন্ মিস্ ডোটি আমার ক্লাশে আসতেন। তিনি নল-দময়ন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী শুনে একদিন বললেন, "ট্রাজেডিকে এড়িয়ে যাওয়া বুঝি তোমাদের গল্পের নিয়ম?" বললাম, "হ্যাঁ, প্রাচীনকালে তাই ছিল বটে।" ভদ্রমহিলা খুব পড়িয়ে। আমাদের

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে কার কার প্রভাব আছে, ট্রাজেডি লেখায় রচনার পরিপকতা বোঝা যায় কিনা এসব আলোচনা প্রায়ই করতেন। পঞ্চতন্ত্রের গল্প শুনে বললেন, "আরব্য উপন্যাসের মতন গল্পের ভিতর গল্প, না ?" স্বয়ম্বর-সভার গল্প এবং পাঁচজন দেবতার নল হয়ে বসার গল্প শুনে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। মিস্ ডোটি জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমাদের দেশের বাচ্চারা গোল হয়ে বসে পঞ্চতন্ত্রের জানোয়ারদের গল্প শোনে কি ?" আমি বলতাম, "না, তারা রাজারাণীর গল্প আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়ার গল্প বেশী ভালবাসে।" ডোটি বলতেন, "ও, তারা রোমান্টিক গল্প ভালবাসে ?" আমার ছাত্রছাত্রীরা বুদ্ধচরিত ও থেরী-গাথার গল্প খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। অধ্যাপক ছাত্রদের মধ্যে একজন বিবেকানন্দ মিশনের ভক্ত। কাজেই তিনি ভারতবর্ষের বিষয় কিছু কিছু জানেন। কালিদাস, শকুন্তলা, নানক, কবীর, মীরা, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, কোন নামই তাঁর অজানা নয় দেখতাম। আমরা দেশে ফিরে আসবার পরের বৎসর এই ভদ্রলোক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসেন এবং কোন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্য হন। আমেরিকায় থাকতেই ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করতেন ক্লাশে। একদিন আমি ক্লাশে রবীন্দ্রনাথের "দৃষ্টিদান"-এর অনুবাদ পড়েছিলাম। গল্পটি সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে অধ্যাপক মহাশয়ের। কারুর কারুর চোখমুখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির রেকর্ডও একদিন শোনানো হয়েছিল।

ক্লাশের পর আমার ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের গাড়ী করে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতেন। এই সূত্রে পরিচয় হওয়াতে কেউ কেউ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অনেকে যোগ রেখেছিলেন।

মেথডিষ্টদের গীর্জ্জায় একবার একটা বড় ভোজে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের বিশেষ করে উপস্থিত করা হ'ল। খুব ঘটা করে খাওয়া এবং ভাল গান হ'ল। তার কিছুদিন পরে ইউনিটেরিয়ানদের গীর্জ্জায় রামমোহনের ১৮০ বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটা সভা হয়। সেখানে ডাঃ নাগকে রামমোহন বিষয়ে বলতে বলা হয়। অনেকে প্রশ্ন এবং আলোচনাও করেন।

যে সব ক্লাব প্রভৃতিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ত সেখানে প্রায়ই দেখতাম গানবাজনা নিগ্রো-মেয়েরা করে। তাদের আদর-সম্মানও আছে মনে হয়। অনেকের চেহারা বেশ সুন্দর, বোধ হয় আধা নিগ্রো; রং ফর্সা হলে ইউরোপীয় বলে চালানো যেত।

মেকালেষ্টারের মহিলা ক্লাবে মাঝে মাঝে বড় পার্টি হয়। সেখানে ভারতবর্ষ বিষয়ে আমাদের নানা প্রশ্ন করত। কলকাতা থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত আমরা কিভাবে গেলাম, কি দেখলাম এটা অনেকেই বলতে বলত। মেয়েরাই বলত, আমি কোনদিন বলি নি। তখন "রিভার" বলে চলচ্চিত্রটি ওখানে খুব দেখানো হচ্ছে। তাই সেটাও একটা আলোচনার বিষয় ছিল। ছবিটিতে ভারতীয় বিবাহের যে রূপ দেওয়া হয়েছে, সেটা অনেকটা কাল্পনিক। কিন্তু ওরা মনে করত ঐটিই ঠিক। আমাদের দেশে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক লোকসঙ্গীত কিরকম চলিত, কন্যাদের তা বলানো হ'ত অনেক জায়গায়, সঙ্গে সঙ্গে গানও অবশ্য গাইতে হ'ত।

আমাদের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের অনেকগুলি রেকর্ড ছিল। কলেজের ছেলেমেয়েরা শচীন দেববর্ম্মণের গান পছন্দ করত। সঙ্গীত বিষয়ে কোথাও বলবার নিমন্ত্রণ থাকলে কন্যারা নিজেরা ২।১টা গান করলেও নাম-করা গায়ক-গায়িকাদের রেকর্ডগুলি প্রায়ই ব্যবহার করা হ'ত। "রঙ্গিলা রে···" গানটি যে কতবার বেজেছে আজও মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতেও লোকজন এলে এই গানটি দু'একবার না হয়ে যেত না। যখন আমরা দেশে চলে এলাম এইটি এবং "সোনার বাংলা", "সার্থক জনম আমার" ইত্যাদি কয়েকটি গানের রেকর্ড বাঙালী ছাত্ররা রেখে দিল।

ভারতবর্ষ বিষয়ে ওদেশের অজ্ঞতা অনেক জায়গায়ই ধরা পড়ত। মানুষের পরিচয়েও অনেকে নিজেদের খুশীমত যা হোক বলে দিত। একবার আমার বড় মেয়ে মঞ্জু'কে এক জায়গায় ভারতবর্ষ বিষয়ে বলবার জন্য নিয়ে গিয়ে কাগজে পরিচয় দিল—Miss Manchu Nag—a member of the Parliament of India. তার পর প্রশ্ন করল, "তোমাদের মত মেয়েদের কেন অ্যাম্বাসেডার করে বিদেশে পাঠায় না ?" কোন কোন জায়গায় অসভ্যের মত সব প্রশ্ন করত ? এক জন বলেছিল, "Was Gandhi educated ? (গান্ধী কি শিক্ষিত ছিলেন ?) আর একজন বললে, Is not your religion funny ?' (তোমাদের ধর্ম্মটা হাস্যকর না ?) মেয়েদের কথা শুনে একজন বলেছিলেন, "Oh, she loves her country." (ও, এ দেখছি নিজের দেশকে ভালবাসে)। যাই হোক এই ধরনের শ্রোতা সবাই নয়। অনেকে খুব ভদ্রভাবেই কথা বলত।

অভদ্র প্রশ্ন না হলেও কঠোর প্রশ্ন আমাদেরও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে। আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা সম্বন্ধে জানতে হলে যতই ভদ্রভাবে প্রশ্ন করা যাক, প্রশ্নটা খুব মোলায়েম হয় না।

আমি কতকগুলি প্রশ্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে-ছিলাম। সেগুলি অবশ্য ভদ্র প্রশ্নই। তার বিষয় পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিম্নু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এন্কোর, এন্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিম্নু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছি-লামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিম্নুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল---"মাসী, মাসী, নিম্নু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

S. 258A-X52 BG

"আচ্ছা, আমরা নিম্নুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিম্নুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "...ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের বিভিন্নমুখী ধারা

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের রূপ বৈচিত্র

উন্নতির প্রয়াস জীবজীবনে প্রধান। বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি যেমন স্বতঃ-গতিসম্পন্ন পরিপাক ও পুষ্টিকে কেন্দ্র করে, উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস কিছুটা সেরূপ জৈব জীবনকে ঘিরে। অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ-গতি অতিশয় মন্থর, সহস্র সহস্র বৎসরে তার বহিপ্রকাশ, লক্ষ লক্ষ বৎসরে জীব জীবনে প্রকট, তবে জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থিতি-স্থানে ক্রমোন্নতি অনেকেরই বেশ দ্রুত, ব্যক্তি-প্রকৃতি-বিকাশের প্রাচুর্য্যে শিহরিত লীলাতরঙ্গ। সামান্য সাধারণ অবস্থা হতে প্রতি জাত জীবন আরম্ভ করে, তার পর নানা দিকে প্রসারিত হয়ে পড়ে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেদের, পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে সামঞ্জস্য বিধান করে। সূক্ষ্ম অন্তর ও বহির্বিশ্বের তরঙ্গাঘাত চলছে নিশিদিন, সেখানে সেই আত্ম-অচেতন আচ্ছন্ন পরিবেশে জীবন-রসের নিত্য-লীলা। প্রাণ দূর-প্রসরণশীল, এ পথে উৎকর্ষ-অপকর্ষ দুই-ই আসতে পারে। সরীসৃপ-জগতের গতিপথ বিস্ময়কর কিন্তু স্বল্পস্থায়ী স্তন্যপায়ীকুল আরও অগ্রসর। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে বাসা নির্ম্মাণ করেছে অনেকে, বৃক্ষচর কেউ কেউ, গাছে থাকে অধিকক্ষণ, অনেকে খেচরদের নকল করে গগনবিহারী, অনেকে মাছকে অনুসরণ করে জলে নামতে ছাড়েনি। সদা-সঞ্চরমান, কর্ম্মে দৃপ্ত, মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণে উজ্জীবিত জীবন রসে, সুদূর বিসর্পী ও অপরিমেয় ভাবাবেগসম্ভূত পরিকল্পনা। কালক্রমে প্রতিবেশ দুরূপ গঠিত হয়েছে হস্তপদ, কারও হাত মৃত্তিকা-খননের উপযোগী, কারও বৃক্ষারোহণের, শাখালম্বনে ঝোলবার, কারও অকাশে ওড়বার ডানা বা জলে সন্তরণের পাখনা। বহুস্থলে দেহের পশ্চাদ্ভাগ রূপান্তরিত হয়েছে,—সাহায্যকারী হিসাবে প্রভূত অবদান জাতিগঠনকল্পে, তার সাক্ষী হাঙ্গর, তিমি, বানর, ওপসোম, খুরসমন্বিত স্তন্যপায়ীরা।

স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের কারণও বিশিষ্ট

নিজেদের ভিতরই যখন অনেক প্রকরণ সৃষ্টি হ'ল, খাদ্যান্বেষণ তথা বাদ-বিসংবাদ পরিহারের নিমিত্ত দূর দেশে যেতে হ'ল অনেককে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। প্রয়োজনানুরূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল জলে স্থলে আকাশে ও মাটির নীচে। ডাইনসর বিবর্ত্তনের পথও অনুরূপ ছিল তবে বুদ্ধিহীন মস্তিষ্ক কোনও সহায়তা করতে সক্ষম হয় নি। বুদ্ধির খাতে স্তন্যপায়ীর জন্ম, পূর্ব্বপুরুষ সামান্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল পূর্ব্বাহ্নে—খানিকটা স্বভাব, খানিকটা দেহাকৃতি-পরিবর্ত্তন তার সাক্ষী। বংশধররা জীবন-সংগ্রামের তীব্রতার সম্মুখীন হয়ে পালাল ভিন্ন প্রতিবেশে, অনাবিষ্কৃত নূতন স্থানে। পরস্পরের মধ্যে হানাহানির সম্ভাবনা গেল কমে, নিকটাত্মীয়ের ভিতর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবসান। নূতন অস্পৃষ্ট স্থানে খাদ্য সহজলভ্য, নিরাপদ ও অবাধ বিচরণ।

এবার ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল দ্রুতপদক্ষেপে, তার পর সহস্র সহস্র বৎসরে জাতির পরিবর্ত্তনে অনেকটা নিরুপদ্রবে নিঃসঙ্কোচে। সে যুগের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিবেশ বরণ করেছিল যে জাতিরা—কোটি বছর পার হয়েছে, আজও সেই পরিবর্ত্তিত স্থানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে তাদের সন্তানসন্ততি, শল্লকী চামচিকে শশক নকুল অশ্ব মৃগ ছাগ বিড়াল সীল তিমি টেপিরাস। এদের প্রত্যেকের প্রতিবেশ স্বরূপ-স্বভাব পৃথক, জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে স্ব স্ব রুচি তথা প্রয়োজনানুসারে, জন্ম দিয়েছে অগণিত জাতির, প্রতি জাতির বিবর্ত্তন হয়েছে পৃথক ভাবে প্রধান ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সারা তৃতীয় স্তর (টার্টিয়ারী) ধরে অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারা দ্রুতগতিতে নিজ পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

নূতন প্রতিবেশ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থা আপন আপন বৈশিষ্ট্য এঁকে দিল নিজ রাজ্যের বাসিন্দাদের দেহে, প্রতিবেশে অভিযোজন করবার ভার ব্যক্তিগত তথা জাতিগত কর্ম্ম প্রচেষ্টার উপর। সে কাজ নিতান্ত মন্দ হয় নি, আজও তারা বেঁচে আছে বংশধরদের ভিতরে। আধুনিক স্থলচর জীবদের ভিতর স্তন্যপায়ীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, ধরাপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আপন আপন প্রতিবেশে যে আধিপত্য লাভ করেছিল আজও তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বর্ত্তমান কালে জলে স্থলে শূন্যে মাটির নীচে সর্ব্বস্থানে স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে অন্যান্য জীবকুল (কীট পতঙ্গ সরীসৃপ পাখী) রয়েছে কিন্তু স্তন্যপায়ী যেখানে থাকে সেখানে সে সর্ব্বেসর্ব্বা।

অভিযোজন ও বিবর্ত্তন

বিভিন্ন প্রাণীদের ভিতর স্বাভাবিক সাদৃশ্য অপরিজ্ঞাত নয়। দেশকালের বেড়াজাল উন্মুক্ত করে জলবায়ু প্রতিবেশের তারতম্য তুচ্ছ করে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য বিভিন্ন জীবজন্তুর ভিতর এত অধিক যে, ওদের স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা অসম্ভব। তাপির নিরীহ প্রাণী ভারতমহাসাগরস্থিত মালয়-সুমাত্রায় নির্জ্জন অরণ্যে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা সুদূর মধ্য-এমেরিকায়। স্থানের দূরত্ব ও জলবায়ুর পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় স্থানেই বর্ত্তমান। মরু প্রদেশের শ্বেত ভল্লুক, উষ্ণ বনানীর কৃষ্ণ ভল্লুক একই শ্রেণীর রং বদলেছে, ঢং নয়, আকৃতিগত পরিবর্ত্তন বিশেষ হয় নি, নিকটতম পূর্ব্বপুরুষ যে একই জাতি-উদ্ভূত তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কুক্কুর-গোত্র। আকারে প্রকারে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে স্বভাবে প্রকৃতিতে এত ভিন্ন

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে
এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।
হিমালয় বোকে স্নো
Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বুকে স্নো
এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।
হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার
Erasmic
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
MADE IN INDIA FOR ERASMIC-LONDON
HBS. 14-X52 BG
এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।
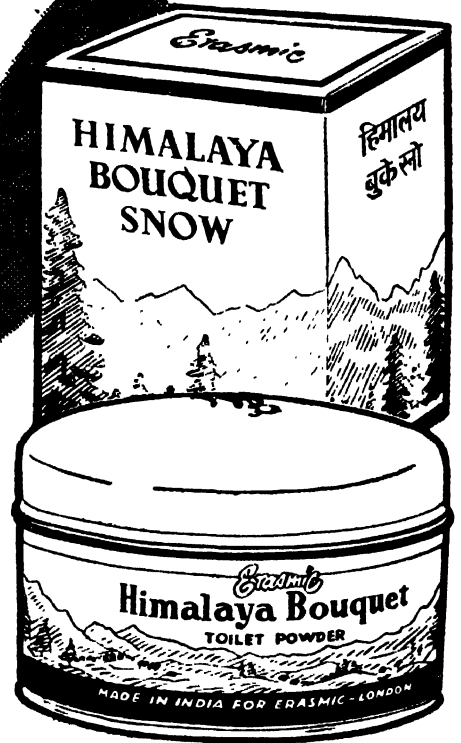
যে তার হদিশ পাওয়া ভার। সাধারণে সেণ্ট বার্ণাড বা আলশে-সীয়ানকে দেখে বলবে না যে, এরা বাড়ীর পার্শ্বস্থ নর্দ্দামায় শুয়ে থাকা লেড়ীকুত্তার জাতভাই, অথচ বিশেষজ্ঞরা তাই বলেন। ক্ষুদ্রাকৃতি টেরিয়ার স্প্যানিয়েলের সঙ্গে ব্লাডহাউণ্ড বুলডগে বাহ্যত কত তফাৎ! হিংস্র হায়না-নেকড়ে-সারমেয় গোষ্ঠি অথচ কত সরে গেছে পরস্পরের নিকট হতে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীই তাই, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, তা সে নিকট-সম্পর্ক হোক বা দূর-সম্পর্ক হোক। নেহাত পোকামাকড় বাদে, একটু উচ্চস্তরের প্রাণী, যাদেরই ওপরকার চামমাস ছাড়িয়ে নেওয়া হবে, ভিতরে কঙ্কালখানা যে প্রায় সমপ্রকার, একই প্লান অনুসারে গঠিত তা অবিশ্বাস করা চলবে না।

পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। সম্পর্ক যখন রয়েছে তখন পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ছিল, আবার তস্য পূর্ব্ব-পুরুষরা আরও নিকটাত্মীয়। নানাদিক থেকে প্রমাণিত জন্মঘটিত নৈকট্য। বিশাল বিটপীর শাখা-প্রশাখার মত যদি এরা একই মূলোৎপন্ন হয় তবে কোন মতেই এদের এক সময়ে সৃষ্ট বলা যায় না। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে, বিসদৃশ প্রতিবেশে নানা সময়ে জীবকুলের অভ্যুদয়, জৈব-বিবর্তন। প্রাণিদেহে রূপান্তর কালের গতিতে। পরিবর্তন প্রচুর, বিকশিত ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপ। জীব-জীবনের গঠন-ব্যবস্থার মূর্তীভূত ঐক্য সন্ধান দেয় একই পূর্ব্বপুরুষের। কেবল জীবজগৎ থেকে এ আত্মীয়তা-সূত্রেও সন্ধান পাওয়া যায় না প্রত্নজীবতত্ত্ব জোগায় খানিকটা উপকরণ, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ইত্যাদির ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর এবং সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ ধারা আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির নীচ থেকে, অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট ঋজুধারা ভূতত্ত্বের সমস্ত কাল ধরে অব্যাহত। জানতে পারা গেছে, বেজী নকুল স্কাংক ষ্টোটের পূর্ব্ব-পুরুষ এবং কুকুর-গোত্রের জীবদের পূর্ব্বপুরুষ এবং ভল্লুককে এই ধারাপ্রসূত বলা যায়, সীল-সিন্ধুঘোটকও যে এই গোত্রের তা কে জানত! কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, গরু ঘোড়ার চেয়ে বেশী আত্মীয় সিংহদের? সত্যই তাই। গরু ও ঘোড়ার মধ্যে সৌসাদৃশ্যের মুখ্য কারণ উৎপত্তির সমতা নয়, স্বভাবের। দু দলই তৃণভোজী ভূচর। আহার-বিহারের ব্যবস্থা সমক্ষেত্রে, সেজন্য অভিব্যক্তির ধারা সমান্তরাল যদিচ গঠনরীতিতে পার্থক্য অনেক।

জৈব-সম্পর্ককে রক্তের সম্বন্ধ বলা যায়। সে কারণে নিকট-সম্পর্কবিশিষ্ট প্রাণিজগতের জীবজন্তু প্রত্যেকের উৎস এক, ক্রম-বিকাশের ধারায় দূরে দূরে সরে গেছে, যে যত দূরে সেই অনুপাতে তাকে পর্ব্ব শ্রেণীবর্গ গোত্র গণ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করেছেন বিজ্ঞানী। এ জাতিভেদ পরিচয়-সুবিধা নিবন্ধন, যেমন মানুষ মেরুদণ্ডী পর্ব্বের, যেখানে যত মেরুদণ্ডী আছে সকলে আমাদের অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আনুমানিক ৫০ ৬০ কোটি বর্ষ ধরে এ আত্মীয়তা চলছে অর্থাৎ মানুষের প্রথম মেরুদণ্ডী পূর্ব্বপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিল ঐ সময়ের দিকে। বনমানুষ কপিমানব আমাদের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়, আমরা একই বর্গের। হিংস্র মাংসাশী, দ্রুতপদ তৃণভোজী, জলজ তিমির সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান, একই শ্রেণীর আমরা সকলে, স্তন্যপায়ী। পর্ব্ব আরও আছে যেমন শামুক, সন্ধিপদ, কণ্টকচর্ম্মী। আবার উদ্ভিদকুলের সঙ্গে এখন যে খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ, শতকোটি বর্ষ পূর্ব্বে জৈবরাজ্যের জাগরণের সময়ে সে সম্পর্ক ছিল নিবিড়, অবিমিশ্র ছিল উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষ। জৈব-বিবর্তন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মত। এর গতিধারা-সঞ্চার অতীতকালে ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে।

অভিযোজনের তারতম্য

জীবন-আবির্ভাবের সময় থেকে আজ অবধি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভূপৃষ্ঠে অসাদৃশ বিসাদৃশ আকৃতি ও স্বভাবের প্রাণী-উদ্ভিদের অভিব্যক্তির অপরূপ লীলা। প্রাণীর বৃদ্ধি প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে, দৈনন্দিন ক্রমবৃদ্ধি জীবনের প্রথম ক্ষণ হতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবহমান। এ বৃদ্ধি চমকপ্রদ নয়, হঠাৎ হয় না, গতানুগতিক নিরবচ্ছিন্ন। নিজ নিজ জাতির অনুরূপ শৈশব হতে পূর্ণাবস্থা পর্যন্ত আমাদের পরিস্ফুরণ।

কিন্তু সহস্র লক্ষ বৎসর কেউ একভাবে থাকে না, থাকতে পারে না, বদল হবেই। পরিবর্তনের মুখ্য কারণ প্রতিবেশ। প্রতিবেশ গূঢ়ার্থক, অনেক কিছু বোঝায়। জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল ঘটনার অনুক্রম ও কার্যপ্রক্রিয়া এর আওতায়, আবহাওয়া-জলবায়ু-খাদ্য, বিশেষ অবস্থান, শিক্ষা সংযম-পরিবেশ-অধ্যবসায় প্রভৃতি শত শত দিনানুদৈনিক বস্তু ও ঘটনার যেখানে জীব-জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্মিলন তার নাম প্রতিবেশ। একই পরিবারভুক্ত জীব যদি ভিন্ন পরিবেশে বর্দ্ধিত হয় তার আচরণের পরিবর্তন দেখা যাবে প্রথমে। প্রাকৃতিক অবস্থানে পার্থক্য আর্দ্রতা-শুষ্কতা-আলোছায়া। যার তারতম্য শীততাপে বৈসদৃশ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সূচনা। শীতাঞ্চল ইউরোপের অধিবাসীবৃন্দের, যারা বহুদিন গ্রীষ্মমণ্ডলে (আফ্রিকা) বাস করছে, গায়ের বর্ণ তাদের ইতিমধ্যেই তাম্রাভ হয়ে গেছে, সহস্র বৎসরে তারা নিকষ কালো। উট লেমা ইয়াক জিরাফ সবাই মৃগ গোত্রের অথচ প্রতিবেশ-স্থানের অসাদৃশ্যের জন্য পরস্পরের পার্থক্য কত বেশী। লেমা ইয়াক বসতি স্থাপনা করেছে সুউচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠে, জিরাফের উপনিবেশ সুউচ্চ বৃক্ষ সমন্বিত বনানী।

বিশ্ব-প্রকৃতির ইতিহাস বিচিত্র। সেখানে যুগে যুগে দেশে দেশে এত বার অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে যে, তার নেই লেখাজোখা। এই অস্থিরচিত্ত অপরূপ পরিবেশে লালিত-পালিত প্রাণীকুল অনন্যসাধারণ না হওয়াই আশ্চর্য্য। বায়লজিতে 'অভিযোজনে বিকিরণ' নামে একটি বিষয় আছে, অর্থ সমগোত্রের সমস্বভাববিশিষ্ট প্রাণী বিভিন্ন প্রতিবেশে নিজেকে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিলে তার পরিস্ফুরণ। সরীসৃপরা পরবর্তীকালে কত বিভিন্নাকার হয়ে উঠেছিল বলা হয়েছে। মৎস্যকুল জলের

অধিবাসী, আচার ব্যবহার প্রায় এক, অথচ স্বভাব ও আকৃতির বিশেষত্বে ভিন্ন হয়েছে বহুস্থলে। রুই-কাতলা গভীর জলের মাছ, চুনোপুটি-টেংরা-চাঁদা ভেসে বেড়ায় অগভীর জলে, দেখলেই বোঝা যায় চটপটে চঞ্চল, স্বভাবে প্রভূত প্রভেদ। উপরের স্তরে থাকে যারা তাদের কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। দ্রুত সাঁতার, ভাসতে পারা, নিশ্চল আত্মরক্ষাপদ্ধতি পরিহার, নানা রকমে খাদ্যসংগ্রহ, নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল আলো ও উত্তাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান—এগুলি অপরিহার্য্য। সুগভীর জলে মহাসমুদ্রের অতলতলে চির আঁধারের রাজ্য, সূর্য্যালোক সেখানে প্রবেশ করে না, বাতাসে সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, চাপ অধিক, সেই সুপ্তিমৌন জড়ত্বের রাজ্যে নাগরিকদের দেহ তদ্রূপ, চেপ্টা পৃষ্ঠ, নীলাভশ্বেত বর্ণ, অলস স্থবির স্বভাব, যারা একটু চলাফেরা করে ত্বকের নীচে ফসফরাস থাকায় উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলে দেহে, এরা আলোকবাহী মাছ। চাবুক-রশ্মি ও স্কেটের উপর থেকে নীচের দিক অবধি চালু, সাপের মত দীর্ঘদেহী বাণ (ঈল), পাইপ মাছও অদ্ভুত, উড়ুক্কু মাছ শূন্যে ভেসে থাকতে সক্ষম বেশ কিছুক্ষণ। চোষণ মাছ পরজীবী। কারও চক্ষু প্রকাণ্ড (কৃষ্ণ সোয়ালোয়ার, টেলিসকপ মাছ, হাঙর), কেউ অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় থাকার দরুন ক্ষীণদৃষ্টি বা দৃষ্টিহীন। অক্টোপস স্কুইড ক্যাটল মাছের (শামুক পর্ব্বের) বিচরণ-স্থল গভীর সমুদ্র। এরা মাংসাশী, শিকার ঝাপটে ধরবার জন্য ৮।১০টি বাহুর উদ্ভব, প্রত্যেক বাহুতে শোষ-নল থাকায় শিকারের দেহ-নির্য্যাস চুষে নেয়, দেহবর্ণ অনেকটা কৃষ্ণনীল।

পশুপক্ষীদের বর্ণবৈচিত্র্য অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। চারিপাশের রঙে দেহকে চিত্রিত না করলে পৃথিবীতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, শত্রুকুল পরাক্রান্ত। দুর্দ্দান্ত সিংহ, সুন্দরবনের রাজা বাঘ নিষ্ঠুর, গ্রীজলি ভল্লুক, বিরাট চন্দ্রবোড়া থেকে আরম্ভ করে ছোট টুনটুনি এমনকি কীট-পতঙ্গের (প্রজাপতি) দেহে অবধি বর্ণালী-সমারোহ। রক্ষাবর্ণের উন্মেষ জীবকুলকে জীবন-সংগ্রামে বিশেষ সাহায্য করে।

স্তন্যপায়ীরা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন প্রতিবেশ গ্রহণ করেছে, সিন্ধুঘোটক তিমি সীল জল-গাভী জলহস্তী জলেই ঘরবাড়ী তৈরি করেছে, বাদুড় আকাশে। কেউ কেউ মাটির তলায় চেষ্টা করেছে যেমন নকুল, ধীবররা নদীজলে বাঁধ বাঁধে তার নীচে সুড়ঙ্গ কেটে শীত কাটায়, ওপসম আশ্রয় করেছে বৃক্ষশাখা, কাঠবিড়াল বনের বৃক্ষকে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শুষ্ক গুহায় বাদুড়-চামচিকা-মূষিক ব্যতীত অপর কোনও প্রাণী নেই অথচ জলা, স্যাঁৎস্যেঁতে গুহাভ্যন্তরে নানা প্রকার প্রাণীর বাস। তুষারযুগে এরা সম্ভবতঃ প্রবল শীতের কবল হতে পরিত্রাণ-নিমিত্ত এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেরা আর হয় নি। মাঝামাঝি উত্তাপ, আর্দ্র বাতাস, অন্ধকার ও অশ্যামল উদ্ভিদের পরিবেশ বরদাস্ত করে নিয়েছে। কেবল কয়েক প্রকারের মৎস্যই এখানকার নাগরিক নয়, এখানে থাকেন শামুক গুগলী সালমান্ডার, পতঙ্গ, কাঁকড়াবিছা, রক্ত মাকড়সা, উভয়চর প্রোটিয়াস, এমনকি ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ।

আঁধার গুহার অধিবাসীবৃন্দ সাধারণতঃ অন্ধ, নানা প্রকারের এই অন্ধত্ব। মিটমিটে চোখ থেকে আরম্ভ করে উত্তর-এমেরিকার পূর্ণান্ধ গুহাচিংড়ি এবং বহু স্থলে দৃষ্টি-গ্রন্থি লোপ হয়ে গেছে এমন প্রাণীও বিরল নয়। ওগনেক স্বর্ণমাছ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন বহুদিন। একাদিক্রমে তিন বৎসর সূচীভেদ্য অন্ধকারে থাকবার পর তারা অন্ধ হয়ে যায় দেখা গেছে, অক্ষিপট অবধি লুপ্ত। অনেকে অবশ্য মনে করেন অন্ধত্বের কারণ, প্রকারণ এবং আঁধারগুহা ক্ষীণদৃষ্টি ও দৃষ্টিহীনদের পক্ষে নিরাপদ প্রশস্ত স্থান হওয়ায় এরা পালিয়েছে সেখানে। কিন্তু অন্ধত্ব প্রথমে কি কারণে এল তা বলতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, দৃষ্টিহীন প্রাণীদের নিকটাত্মীয় যারা উন্মুক্ত আলোকিত স্থানে বাস করে, তারাও আলো বিশেষ পছন্দ করে না। মহাসাগরে গভীর জলের নীচের বাসিন্দারা প্রায় স্পর্শেন্দ্রিয়-নির্ভর, অন্ধগুহার বাসিন্দারাও তাই; আলো উভয়ক্ষেত্রেই দুস্তর স্থান ভেদ করে পৌঁছাতে অপারগ।

বিভিন্ন গোত্রের প্রাণীদের ধরন-ধারণ কতকটা একই হয়ে গেছে এরূপ উদাহরণ যথেষ্ট। মাছেরা ডানা ও কানকোর সাহায্যে চমৎকার ভাবে জলে বসবাস করছে, পাখীরা গগনমণ্ডলে বিচরণোপযোগী লঘুদেহের অধিকারী, বায়ুপূর্ণ অস্থি। জাতকে জাত ব্যাপকরূপে একই প্রতিবেশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণে কালাতিপাত করছে এ দৃষ্টান্ত বিরল। মাছেরা পৃথিবীর আদিম মেরুদণ্ডী এবং জলে শত্রুসংখ্যা অগণিত, তথাপি মৎস্যবর্গ চিরজীবী। জৈব-বিবর্ত্তনের এ আর একটি ধারাবিন্যাস। প্রতিবেশে অভিযোজন-কর্ম্মপ্রণালী দুর্জ্ঞেয়।

ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন পরিবার, শ্রেণী, এমন কি বর্গ অবধি আলাদা কিন্তু সমপ্রতিবেশ রচনা করেছে মিলন-সেতু স্বভাব-আচরণে। চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থা এক অথবা সমধর্ম্মী হওয়ার কল্যাণে নানা ক্ষেত্র হতে প্রাণিরা এসে সমস্বভাববিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এরা আকৃতিতেও সমান হবার পথে। আকাশে উঠেছে যারা তারা প্রত্যেকে বিহঙ্গম নয়, অধিকাংশ পতঙ্গ, টেরডেকটিল, স্তন্যপায়ী চামচিকে। জলে ঘর-বাড়ী মৎস্যকুলের কিন্তু সরীসৃপ ইথথাইসুরেরা প্রায় মীনাকৃতি হয়ে গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ বৎসর জলে বাস করার। কূর্ম্ম জলে নেমেছে অনেক পরে, তবে তিমি-শুশুক-ডুগং—এরা পাকা স্তন্যপায়ী হয়েও মাছের স্বভাব-প্রতিকৃতি করে নিয়েছে ক্রমে ক্রমে, লোমশূন্য মৎস্যাকার দেহ-পাখনা-কানকো-লেজ ইত্যাদি মাছের মত, হস্তপদ অপ্রয়োজনীয় বিধায় বিলুপ্ত।

অভিসারী ধারা

উপরে বলা হয়েছে যে, বহু জীব বিভিন্ন স্থান ও অবস্থা হতে কোনও বিশেষ অনুকূল প্রতিবেশে এসে এক ধারা অভিমুখে গঠিত

হয়। খাদ্য আহরণ ও আশ্রয়স্থলের সাহচর্যে জীবিকা নির্ভরশীল, সেই সূত্রে সমস্বভাব, তুল্য আচরণ তার পর পরিস্ফুরণ-ধারার কল্যাণে প্রতিকৃতি সমান ভাবে পুনর্নির্মাণ। প্রথমে সামঞ্জস্য-বিধান স্বভাবে-আহারে-বিহারে, তার পর আকৃতি-প্রতিকৃতিতে। এখানে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধের অবসান, ঐক্যানুভূতির অভিব্যক্তি উঠেছে নিবিড় হয়ে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শাখা নদীসমূহ যেন সমধর্মে মিলিত মহানদী হয়ে ছুটেছে সাগরাভিমুখে। দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি।

বোলতা শত শত জাতিতে বিভক্ত। অথচ বোলতাদের ধরন-ধারণ-স্বভাব, শিকার-দংশন, খাদ্যগ্রহণ একই প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত কর্ম-প্রণালী। পিঁপড়ে ও উইপোকায় বিস্তর পার্থক্য। এরা ভিন্ন বর্গের কিন্তু শৃঙ্খলা-বিধান ও সুব্যবস্থিত শাসন, বাসস্থানে শিশু সন্তান-পালন, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি সমধর্মী। মহাসাগরের নিভৃত প্রদেশে শামুক জাতীয় স্কুইড, 'দূরবিক্ষণিক-চক্ষু' মাছ মাথার উপর দূরবীণের মত বেলনাকার চক্ষু দ্বারা তলদেশের অস্পষ্ট আলো ব্যবহারযোগ্য করে নিয়েছে। মাছের সঙ্গে শামুকের কোন আত্মীয়তা নেই, উভয়ে ভিন্ন বিবর্তন-ধারা সম্ভূত অথচ চক্ষুর আকৃতি ও ব্যবহার সমপ্রকার। সম পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যে প্রয়াস, চক্ষুর এই অদ্ভুত পরিস্ফুরণে তার ফল। অন্তর্ভূমির বাসিন্দা কেঁচো কেন্নো থেকে আরম্ভ করে মেরুদণ্ডী সর্পের হস্তপদবিহীন কায়াদেহের একই নমুনা। এই প্রণালীতে যে জৈব জীবনের অভিব্যক্তি তাকে বলা হয়েছে অভিসারী ধারা, পৃথক ও বিপরীত জীবনযাত্রা-প্রণালী থেকে বার হয়ে এসে সমভাবের অনুগামী হওয়া।

জীবজন্তু পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ যে যখন যেখানে স্থান সঙ্কুলান করতে না পেরেছে তাকে সরে পড়তে হয়েছে দূরে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হয়েছে উদ্যমশীলেরা, ভিন্ন দেশে নূতন প্রতিবেশে স্থাপিত হয়েছে নূতন উপনিবেশ, তরুণ জনপদ। কিন্তু ভিন্ন প্রতিবেশে বদলাতে হয়েছে শরীর অঙ্গশোভা বর্ণ স্বভাব ব্যবহার এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সকল পরিবর্তনের মূল জাতিগঠনের গোড়ার কথা এই :

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
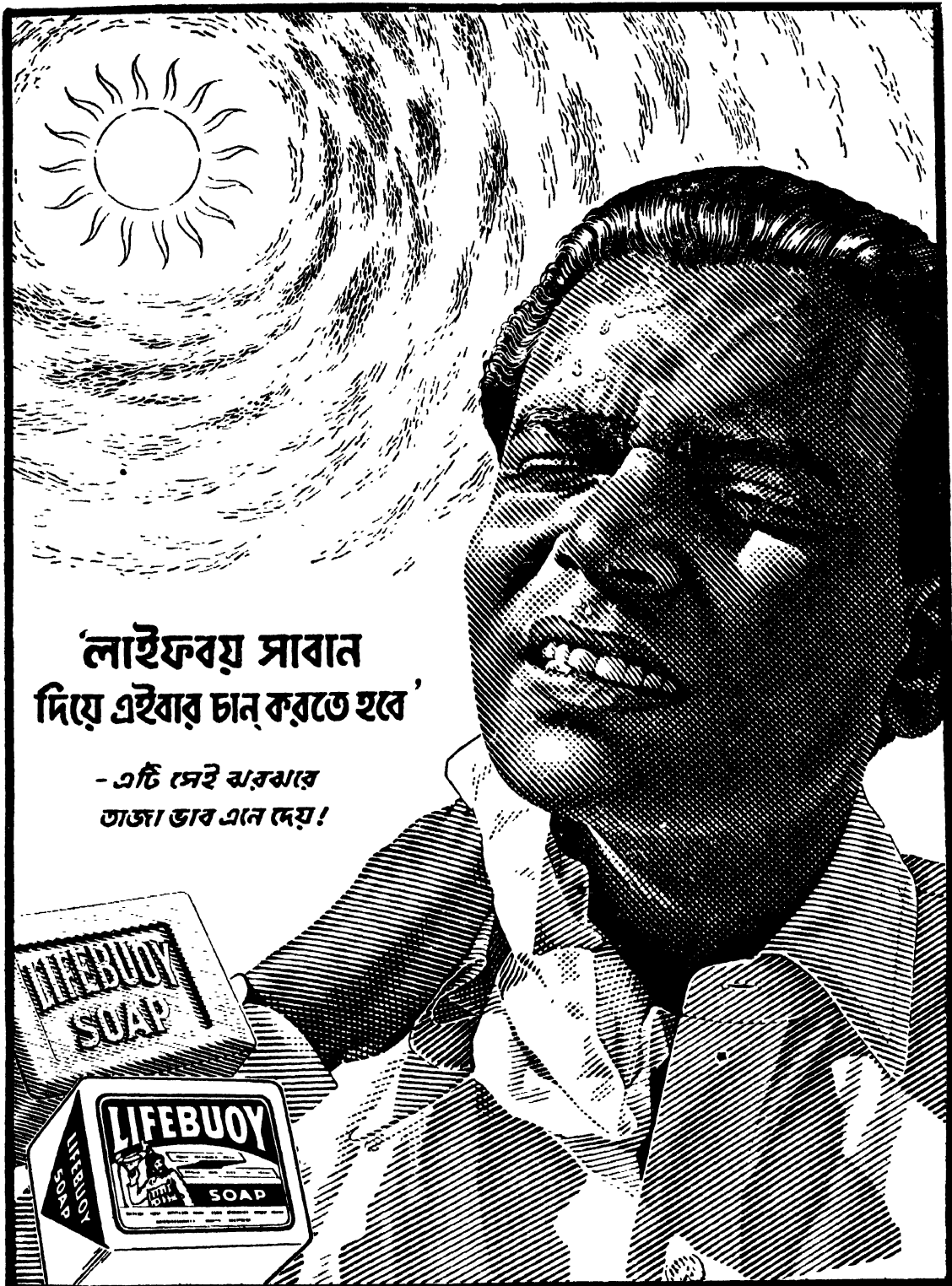
নূতন প্রতিবেশে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেওয়া। জীবজন্তু নির্ভরশীল ভৌগোলিক বিস্তার যাযাবর বৃত্তি ও পরিবেশ পরিবর্তনে, অভিনব প্রাণী-অভ্যুদয়ে প্রাধান্য থাকলে তাদের ব্যাপক বিস্তৃতি ও বহুমুখী প্রসার। প্রকরণের (বদলের) প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ, কার্য্য-প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে যে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত, পূর্ণতা তার আকৃতি পরিবর্ত্তনে, অঙ্গ সংযোজনায় ও বর্ণের সমাবেশে। মনের দিক থেকে জীবন সংগ্রামের কোনও উন্নততর পথ আবিষ্কৃত হলেই সারা অঙ্গে পড়ে যায় অনির্ব্বচনীয় সাড়া, প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিভিন্নরূপে তার বহিঃপ্রকাশ।

এককোষ পলিপ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত অভিব্যক্তিধারা-প্রবাহের কূল-কিনারা করা দুরূহ ব্যাপার। ডারউইন শুধু অভিব্যক্তির রহস্য-ময় আবরণ উন্মোচন করে ক্ষান্ত হননি, ব্যাখ্যা করে, অজস্র উদাহরণ ও টিকা-টিপ্পনী দিয়ে কারণ-সমন্বিত যুগান্তকর দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, 'জাতির গোড়া পত্তন' ও 'মানুষের উৎপত্তি' বর্ত্তমানে পণ্ডিতদের আলমারির শোভাবর্দ্ধন করছে না, পণ্ডিতি বেড়া অতিক্রম করে স্থানলাভ করেছে সাধারণের খাট-চৌকি-কেদারায়। তিনি যে চারটি মূল ঘটনা অভিব্যক্তির প্রধান কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন, তারা বংশগতি, প্রতিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক, প্রকারণ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। যুগ যুগ ধরে এই নিশ্চিত কারণ সমুদয় নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে জীবজগৎকে, আমরা প্রত্যেকে এদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল। উপরিলিখিত অভিযোজন স্থির করে প্রতিবেশের সহিত জৈব-জীবনের সম্পর্ক।

অভিব্যক্তির গতি চলনশীল চক্রের মত চিরসচল। বহিঃপ্রতি-বেশের সহিত সামঞ্জস্য রেখে অন্তরসত্তা গড়ে উঠল ভিন্ন ভিন্ন প্রতি-বেশে, তৃতীয় স্তরের সমস্ত যুগগুলি ধরে স্তন্যপায়ীর বর্গসমূহ: দন্ত-হীন আর্ম্মাডিলোর কথা বর্ণনা করা হয়েছে; কীটভুক সজারু, ছেদন-কারী শশক মূষিক লেমিং কাঠবিড়াল গিনিপিক বিবর, আকাশচর বাদুড় চামচিকে, শুণ্ডধারী করী, খুরেল অশ্ব মৃগ শূকর গণ্ডার উষ্ট্র ছাগ মেষ, মাংসাশী বিড়াল ব্যাঘ্র সিংহ কুকুর নেকড়ে প্যাণ্ডা সীল জলহস্তী সিন্ধুঘোটক, সিটেসিয়া তিমি শুশুক, প্রিমেট বানর লেমুর বনমানুষ ও মানুষ। এদের ভিতর কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে বলা দুষ্কর, তবে প্রত্যেক প্রধান শাখাই যে সমান্তরাল ভাবে বর্দ্ধিত হচ্ছিল, এ কথা বলা চলে নিঃসন্দেহে। নিরীহ তৃণভোজীরা আবির্ভূত হয় প্রথমে, তার পর আসে শক্র মাংসাশী, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি।

আচার্য্য যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধাবলী

[আচার্য্য যদুনাথ সরকার বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল 'প্রবাসী'র লেখক ছিলেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী এখানে দেওয়া হইল। পার্শ্বের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রবাসীর বর্ষ ও মাসের নির্দ্দেশক যেমন ৯।৩—৯ম বর্ষ, ১৩১৬, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়।—প্র. স]

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া উত্তমাশ্রম তপোবন পাহাড় শাখায় শ্রীশ্রীঅষ্টভূজা সিংহবাহিনী পার্ব্বতীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাম্‌ শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

গত ৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার ১৩৬৪ বাঁকুড়া কাপিষ্ঠা পোঃ অন্তর্গত তপোবন পাহাড়ের (পূর্ব্বনাম কড় পাহাড়) ৪০০ ফুট উচ্চচূড়ায় নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য মনোহর মন্দিরে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী মায়ের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য যথাযোগ্য সমারোহে ও শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী সুসম্পূর্ণ হয়।

এই উপলক্ষে এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে দেশ-বিদেশের ভক্তগণ ও উত্তমাশ্রমের শিষ্যবর্গ ঐ পাহাড়ের আশ্রমে সমবেত হন। উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান প্রধান আচার্য্য স্বামী শ্রীশ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বিগত ২০ দিন পূর্ব্বে ডুমুরদহস্থ মূল আশ্রম হইতে আসিয়া স্থানীয় আচার্য্য স্বামী শ্রীপূর্ণানন্দ গিরি ও তদীয় সহকারী স্বামী শ্রীপ্রেমানন্দ গিরি মহারাজের ও স্থানীয় গৃহী শিষ্যবৃন্দ ও ভক্ত কর্ম্মীদিগের কৃত সর্ব্ব-আয়োজন পূর্ণাঙ্গ ও সুচারুরূপে সমাধা করেন। পাহাড়টি খড়ের ও ত্রিপলে ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী যাত্রীনিবাস বক্ষে ধরিয়া এক ক্ষুদ্র গ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১০৲ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে—প্রতিষ্ঠা দিবসে সারা দিন ও রাত্র ব্যাপী প্রায় ১০ হাজার গ্রামবাসী ও দূর অঞ্চল হইতে আগত লোকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হইতে থাকে। দূর হইতে মন্দিরের দিকে চাহিলে হৃদয়ে এক মহান স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঐ মন্দির দর্শন করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য্য যদুনাথ সরকারের চিত্রখানি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ— শ্রীসরলাবালা সরকার। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকাসহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃঃ ৵০ + ২২৪। মূল্য চারি টাকা।

'দেশ' সাপ্তাহিকে যখন গ্রন্থখানি ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছিল তখন আমরা আগ্রহসহকারে ইহার প্রায় অনেকটা পাঠ করিয়াছিলাম। তখন পড়িয়া এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, লেখিকা শুধু কবি-সাহিত্যিকই নন, ঐতিহাসিক বিষয়-বিশ্লেষণে এবং রচনার পারিপাট্যে তিনি একজন উচুদরের সত্যসন্ধানী গবেষকের স্থানও গ্রহণ করিয়াছেন। লেখিকার আর একটি মস্তবড় সুবিধা এই ছিল যে, তিনি দীর্ঘজীবন স্বামীজী এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্ভবকালীন বহু বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এবং যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা শুধু স্মৃতির মণিকোঠা হইতেই টানিয়া বাহির করেন নাই, সমসাময়িকের বর্ণনা, বই, পুথি, মূল কাগজপত্র প্রভৃতির যথোচিত সাহায্য তিনি লইয়াছেন। এ কারণে ঐ সকল কাহিনী তাঁহার লেখনীমুখে শুধু তথ্যসর্বস্ব ইতিহাস হইয়া উঠে নাই, সাহিত্যের পর্য্যায়েও গিয়া উন্নীত হইয়াছে। স্বামীজীর সন্ন্যাস-জীবন, ভারতবর্ষ-পরিক্রমা, আমেরিকায় গমন প্রভৃতি বিষয় সুনিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বীজ উপ্ত হয় বরাহনগরের পোড়োবাড়ীতে, যাহাকে তদবধি বরাহনগর মঠ বলা হইত। এই সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা অনেকেই জানেন না। কোন কোন দিন অনশনে অর্দ্ধাশনে তাঁহাদিগকে কাটাইতে হইত। যখন একখানি বস্ত্রমাত্র সম্বল তখন সকলে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কোন রকমে দেহ আবৃত করিয়া রাখিতেন। বিছানার কোন বালাই ছিল না। নিত্য-পূজার্চনা, সাধনভজন, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি চালাইয়াও আবার মনুষ্যসমাজের সেবাকর্ম্মের জন্যও তাঁহারা নিজদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন। ইহা হইতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও বেলুড় মঠের উৎপত্তি। এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই সঙ্ঘ তথা বেলুড় মঠ ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব আত্মচেতনার উন্মেষ করিতে সমর্থ হয়। নানা বিপদ-আপদের মধ্যেও ইহা আজও মাথা উচাইয়া সমাজ-সেবায় একান্ত ভাবে রত রহিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে ভারত ধর্ম্মের মূল কথা ব্যাখ্যানে ঐ ঐ দেশবাসীগণের পূর্ব্বেকার ভুল ধারণাগুলি ঘুচিয়া গিয়াছে এবং ইহার সর্ব্বজনীনতা সংঘের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। লেখিকার লিপি পারিপাট্যে এই সকল বিষয়ও পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থখানির আর একটি মূল্য এই যে, তিনি সঙ্ঘভুক্ত না হইয়াও ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং দীর্ঘকাল ইহার সংস্রবে থাকায় এমন অনেক কথা তিনি বলিতে পারিয়াছেন যাহা বিশেষ কোন দলীয় ব্যক্তির পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। আমরা এই গ্রন্থখানির মধ্যে লেখিকার একটি বিশিষ্ট গবেষক-রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার গ্রন্থখানিকে 'গ্রন্থপরিচয়ে' অভিনন্দিত করিয়াছেন, এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ত্যাগপূত সেবাপরায়ণ জীবনের কথা এবং তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা সমাজের উন্নতির বিষয় আমাদিগকে তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গে একাধিকবার বলিয়াছেন। 'গ্রন্থ-পরিচয়ে'ও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি পাইতেছি। একটি সামান্য বীজ হইতে বিরাট মহীরুহের উদ্ভব কিরূপে সম্ভব, লেখিকার তদ্বিষয়ক সুনিপুণ বিবরণ হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। আচার্য যদুনাথ গ্রন্থের এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চান। 'গ্রন্থ-পরিচয়' নামটি সার্থক হইয়াছে, আর ইহা দ্বারা পুস্তক গৌরবও বৃদ্ধি পাইয়াছে খুবই। গ্রন্থখানি বহুচিত্রে শোভিত। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মণি-শিখা—শ্রীশিবপ্রসাদ ঘটক। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবাণী বুক হাউস, ১১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩॥০ টাকা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় গল্পের আরম্ভ। আদর্শবাদী শিক্ষিত যুবক মণিমোহন শিক্ষার আলোকে গ্রাম্য-সমাজের অন্ধকার দূর করিবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসে জীবিকার অন্বেষণে। শহরে আসিবার কালে শিখা নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়।

মণিমোহন শুধু শিক্ষা-বিস্তারের স্বপ্ন দেখিত না—সে ছিল লেখক। কিন্তু নূতন লেখক বলিয়া তার প্রথম উপন্যাসখানিকে প্রকাশকমহল তেমন আমল দেয় না। অতঃপর দেনার দায়ে কলিকাতার মেস ছাড়িয়া মণিমোহন বাঁকুড়ায় একটি স্কুলে চাকুরি নেয়। এদিকে শিখা মণিমোহনের সন্ধানে মেসে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত স্যুটকেসের মধ্যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে। শিখার চেষ্টায় উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় এবং জনাদর লাভ করে। অতঃপর মণির অনুসন্ধান করিতে করিতে শিখা বহরমপুরে আসে মণির দাদার কাছে। সেখানে তাহার দেখা না পাইয়া কলিকাতায় ফেরে। কলিকাতায় আসিয়া খবর পায় মণি বাঁকুড়াতে সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত। শিখা বাঁকুড়ায় ছুটিয়া যায়। মৃত্যুপথযাত্রী মণিকে নিজের দেহের রক্ত দিয়া বাঁচাইয়া তোলে। আরোগ্যলাভ করিয়া মণি জানিতে পারে শিখার চেষ্টায় তাহার প্রথম উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেখানির নবম সংস্করণ চলিতেছে ও অনেক টাকা প্রাপ্য হইয়াছে। অতঃপর মণি আর শিখার সাংসারিক জীবনের আরম্ভ ও সমাজ-কল্যাণব্রতে—শিক্ষা-বিস্তারে উভয়ের আত্মনিয়োগ।

আলোচ্য উপন্যাসখানির আঙ্গিকে ও ভাষায় প্রথম রচনার স্বাক্ষর থাকিলেও গল্পটি বলা হইয়াছে আদর্শবাদের চড়া সুরে। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

রাজকুমারী কৃষ্ণ-কমলিনী—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। প্রকাশকের নাম বা পুস্তক মূল্যের উল্লেখ নাই।

রাজকুমারী কৃষ্ণ-কমলিনী ছিলেন শোভাবাজার রাজবংশের কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যা। ভারতে বিদেশী খেলার প্রবর্ত্তক ও আই-এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ইঁহার স্বামী। কৃষ্ণ-কমলিনীর জীবনী-প্রসঙ্গে এই দুটি অতি খ্যাত সম্ভ্রান্তবংশের উপরে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন লেখক। সেকালের কলিকাতা ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের সংক্ষিপ্ত পটভূমিকায় এই গুণবতী নারী চরিত্রটি নিষ্ঠাভরে অঙ্কিত হওয়ায় ইতিহাসের উপাদানও কিছু পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। এই ধরণের জীবনী প্রকাশের সার্থকতা অবশ্যই আছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সপ্তপঞ্চ—শ্রীপরিমল গোস্বামী। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

সপ্তপঞ্চ বাইশটি রচনার সমষ্টি। বইখানিকে ঠিক প্রবন্ধ পুস্তক বলা যায় না, রসরচনাও বলা চলে না। লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন, "পাঁচমিশেলি রচনার সঙ্কলন এটি। সাতপাঁচ মানেও পাঁচমিশেলি। সাতপাঁচকেই সংস্কৃত ক'রে সপ্তপঞ্চ বানানো গেল।" গ্রন্থকার বিনয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "নামের উপরই আমার একমাত্র ভরসা।" নামের মধ্যে একটা চমক আছে সত্য, কিন্তু নামের উপর নির্ভর করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন অবশ্য তাঁহার হয় নাই। শ্রীপরিমল গোস্বামী খ্যাতনামা লেখক এবং বিষয়বস্তু সামান্য হোক অসামান্য হোক লেখার গুণে তাঁহার রচনা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। পুস্তকের কয়েকটি রচনা স্মৃতিকথা, কয়েকটি নিবন্ধ, দু-একটি আলোচনা, কয়েকটি রসরচনা এবং কয়েকটি আত্মগত ভাবনার অভিব্যক্তি। গুরু এবং লঘু—কোন বিষয়কেই গ্রন্থকার তুচ্ছ মনে করেন নাই। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ঝড়ের দিনগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া কি বই পড়ব, কি লেখা পড়ব, পল্লীসমাজ, স্বপ্ন, হাস্যকৌতুক এবং পরীক্ষা-বিভ্রাট, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, রেলের ভ্রমণ, বিপিন চৌকিদার ও আমি, সিনেমার আদি ও অন্ত পর্যন্ত সকল প্রসঙ্গকেই তিনি সমান মর্য্যাদা দিয়াছেন। বৈচিত্র্যই বইখানির বৈশিষ্ট্য। হাস্যকৌতুক প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, "প্রমথ চৌধুরী ছিলেন উইটের বাদশা। রাজশেখর বসুর কমিক-চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।" "পল্লীসমাজ" সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র যা দেখাতে চেয়েছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি এখানে এক বা একাধিক ব্যক্তিচরিত্রকে দেখাতে চান নি, তিনি সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন, এবং তাতে তিনি আশ্চর্য্য সাফল্যলাভ করেছেন।" গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে এক স্থানে তাঁহার উক্তি এইরূপ, "কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য—পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে তাকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করা। এই আনন্দলোকে অনেকগুলি স্তর।···যা আছে তা ধ্রুব নয়। তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে।···মহৎ সাহিত্যে আজকের পাঠক এই এগিয়ে চলার ইঙ্গিত দেখতে চায়।" কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, কয়েকটিতে চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছেন। প্রবন্ধ-পুস্তক সাধারণতঃ এক নিঃশ্বাসে পড়া যায় না, ধীরে-সুস্থে পড়িতে হয়। সপ্তপঞ্চ কিন্তু গল্পের বইয়ের মত চিত্তাকর্ষক। রচনা সাবলীল বলিয়া এমন সুখপাঠ্য হইয়াছে। "সপ্তপঞ্চ" সাধারণ এবং চিন্তাশীল উভয়বিধ পাঠকেরই আনন্দবিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল—কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ দাস, এম. এ., ডি. ফিল কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য—সাত টাকা।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন—আমতা কলেজের বাঙলার অধ্যাপক শ্রীযোগিলাল হালদার, এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য—আট টাকা।

এক সময়ে বাংলার সাধারণ জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থগুলি আজ শিক্ষিত বাঙালীর আলোচনার বিষয় হইয়াছে। সেই আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই সকল গ্রন্থের আধুনিক যুগোপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। এই কার্য্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এক হিসাবে পথ-প্রদর্শক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করা হইতেছে, উহারা সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমখানি ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাহিত্যিক মহলেও ইহার কোন পরিচয় জানা ছিল না। সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী থাকাকালে দাস মহাশয় এই গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়া ইহার সম্পাদন করেন। নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চলের দুইখানি পুথি অবলম্বনে গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে পুথি দুই-খানির পাঠভেদ সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও এরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য সংস্করণ কুচবিহার রাজ গ্রন্থাগারের পুথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে—অন্য কোন কোন গ্রন্থাগারের পুথিও আলোচিত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি হইতে পাঠান্তর উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ দুইখানিতেই বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমখানিতে 'শব্দ-টীকা'য় গ্রন্থমধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—দ্বিতীয়খানিতে 'নির্ঘণ্টে' কতকগুলি শব্দমাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থের ধুয়াগুলি একত্র সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মনে হয়। অথচ কোথাও সে প্রসঙ্গে কিছু বলা হয় নাই। সমস্ত ধুয়ার উল্লেখও ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহা ছাড়া, ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা গ্রন্থ-মধ্যে কোথায় আছে তাহা উল্লিখিত না হওয়ায় আলোচনার অসুবিধা হয়।

গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে সম্পাদক মহাশয়দের আন্তরিক পরিশ্রমের নিদর্শন আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিও যে নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সংস্করণে এ জাতীয় ত্রুটি অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ সম্পাদনের সমস্যা কঠিন। পুথিগুলি প্রধানতঃ অশিক্ষিত সমাজে প্রচলিত

ছিল—এই পুথির সাহায্যে শুদ্ধ পাঠ নিরূপণ করা সকল স্থানে সম্ভব নয়। পুথির পাঠ—'গন্ধাদি বাস', 'ওর্দ্ধ্যাদি' (শিব সঙ্কীর্তন—১২৯, ১৩৫) অথচ শুদ্ধ পাঠ মনে হয় 'গন্ধাধিবাস' 'গৌর্ধ্যাদি'। এইরূপ শুদ্ধ পাঠ নিরূপণ ও গ্রন্থের প্রকৃত অর্থবোধের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান এবং হিন্দুর শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকাচার ও উপভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অথচ একত্র এরূপ সংযোগ সুলভ। তার পর, প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ সম্পাদন ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও আদর্শ এখনও গড়িয়া না ওঠার ফলে বানান, শব্দসূচী, অবলম্বিত পুথির বিবরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে গ্রন্থ ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এ দিকে গ্রন্থ-সম্পাদক মাত্রেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

স্বাধিকার—ডঃ শ্রীমতিলাল দাশ। আলোকতীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩। মূল্য ছয় টাকা।

ঢাকার দাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছে। যদিও গল্প হিসাবে ইহার মধ্যে কোনও নূতনত্ব নাই—একমাত্র মিষ্ট-সংলাপই বইখানিকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। লেখক বক্তৃতার মোহ আজও ত্যাগ করিতে পারেন নাই—যার ফলে অবান্তর ঘটনা ঝোঁকের মাথায় অনেক আসিয়া পড়িয়াছে।

'সুলতাকে পাওয়া যাইতেছে না'—আসল গল্প সুরু হইতেছে এইখান হইতেই। রহস্য এবং রোমাঞ্চ সিরিজের বহুবিধ কসরতের সঙ্গে যে ভাবে গল্প আগাইতে লাগিল—ইহাতে ডিটেক্টিভ উপন্যাস বলিয়া পাঠকের বিভ্রান্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। গল্পের মোড় ফিরিয়াছে, সুবোধ, অমিতা এবং লায়লাকে লইয়া যেখান হইতে নূতন আখ্যানভাগের সুরু। উপন্যাসকারের অবাধ অধিকার থাকিলেও বিবিধ গল্পের ভারে ইহা দানা বাঁধিতে পারে নাই।

এষা ও সুবোধের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া লেখক সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে হঠাৎ অণিমাকে আনার কোন সার্থকতাই নাই। বরং অবান্তর। এষা ও সুবোধের প্রেমকে খেলাইবার অন্যপথও ছিল। দাঙ্গায় উপন্যাসের সুরু এবং দাঙ্গাতেই ইহার পরিসমাপ্তি। টেকনিকের দিক দিয়া ইহা সুন্দর হইয়াছে। তবে সুবোধকে মারিয়া ফেলার মধ্যে লেখকের দুর্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

'স্বাধিকার' পড়িয়া আর একটি কথা আমার বিশেষ করিয়া মনে হইয়াছে—লেখক নিজেকে কোথাও আড়াল করিতে পারেন নাই। তথাপি উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে—যাহা উপন্যাসের বড় গুণ। সাহিত্যক্ষেত্রে লেখক সুপরিচিত। তাঁহার অন্যান্য বইয়ের মত এ বইখানিও সমাদর লাভ করিবে—এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

ইংলণ্ডের ডায়েরী—শিবনাথ শাস্ত্রী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য চার টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা মানব-হিতৈষণাকে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাদের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায়ের পর এরূপ দৃঢ়চেতা লোক সে যুগে খুব কমই দেখা গিয়াছে। এই দৃঢ়তার জন্যই মধ্য জীবনে তিনি ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এইরূপ নিজের মতবাদকে প্রাধান্য দিতে গিয়া, জিদের বশে তিনি বহু আত্মীয়কেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁহার আদর্শ। কেবল ধর্ম-নিষ্ঠ ও কর্ম-নিষ্ঠার গুণে তিনি উত্তর-জীবনে এতখানি জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক-জীবনকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। যেখানে এবং যাহাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল দেখিয়াছেন তাহাই সযত্নে আহরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-ধর্মের উন্নতিপ্রয়াসে তিনি আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন, ইংলণ্ডে ছুটিয়া যাইবার কারণও হইল তাহাই। সে দেশের রীতিনীতিকে আত্মস্থ করিয়া নিজের দেশে প্রয়োগ—ইহা তাঁহার কর্মজীবনের একটা বড় দিক। তাঁহার এই ইংলণ্ডের ডায়েরী হইতে আমরা উনিশ শতকের ইংলণ্ডের ছবি দেখিতে পাই। যাঁহাদের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহারা ঋষিতুল্য লোক। এই ঋষিরাই যুগে যুগে সর্বদেশে মানুষের চলার পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সমাজকে বাঁধিয়াছেন নিয়মের নিগড়ে। শাস্ত্রী-মহাশয় চাহিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন করিতে। যাহার যাহা ভাল তাহাকে গ্রহণ করিয়া সমাজের উন্নতি করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কল্যাণ-ধর্মী শাস্ত্রী মহাশয় মানব-কল্যাণকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"এই আত্মচিন্তার ডায়েরীতে তিনি যে সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, উহা অনেকাংশে দৈনন্দিন-লিপি—অর্থাৎ এই ডায়েরীর পরিপূরক।" ডায়েরী হইলেও, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের একটা দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সেটি হইল, ধর্ম-জীবনে সত্যকে জানিবার জন্য তাঁহার একটা অনুসন্ধিৎসা ছিল, যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কর্মজীবনে প্রচলিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির প্রতিকূল হইলেও, সেই যুক্তিমূলক সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল, সাহসও ছিল।

এক কথায় 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' হইল তাঁহার ধর্ম-জীবনের ক্ষেত্র-প্রস্তুতি।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠক-মহলে আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীগৌতম সেন

টম সইয়ার—মার্ক টোয়েন। অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবুদ্ধ, ২২১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। ২০৪ পৃঃ। মূল্য—১.৫০।

কিশোর উপন্যাস। টম সইয়ার অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির অথচ দুঃসাহসী বালক। তাহার মাথার মধ্যে দুষ্টামির একটি কারখানা অবস্থিত, যে কারখানা হইতে নানা জাতীয় দুষ্টামি প্রতিমুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। স্নেহময়ী মাসীর আদরে ও শাসনে থাকিয়া টমের দিন কাটে। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রকৃতির বালকটিকে তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আয়ত্তে আনিতে পারেন না। নিত্য নূতন নূতন চাতুরীর দ্বারা মাসীর শাসন-দণ্ডকে সে পাশ কাটাইয়া যায়।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শিশুদের জন্য বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু শিশুদের মন এবং কিশোর জীবন নিয়া এই ধরণের দুঃসাহসিক কাহিনী খুব বেশী রচিত হয় নাই। টম সইয়ার একখানি পৃথিবীখ্যাত কিশোর উপন্যাস। টম সইয়ার ও তাহার চলার পথের সাথীগণকে কেন্দ্র করিয়া বহু কৌতুকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়া যে সব হাস্যকর অদ্ভুত কার্য্যকলাপ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখে।

বাংলা ভাষায় শিশু অথবা কিশোর উপন্যাসের অত্যন্ত অভাব। সস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাস, আজগুবি কাহিনী কিংবা ভূতের গল্প দিয়াই এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অথচ টম সইয়ারের মত দুষ্ট বালকের অভাব কোন দেশেই নাই। এই শ্রেণীর বালক-বালিকাদের চরিত্রের ভাল ও মন্দ দিকগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে কত সুন্দর পুস্তক রচনা করা সম্ভব, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমান 'টম সইয়ার'।

স্বচ্ছ অনুবাদ, ঝরঝরে ছাপা এবং সুলভ মূল্য পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মন্দিরময় ভারত—শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী এম. এ.। এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৫৲ টাকা।

"মন্দিরময় ভারত" পড়িয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখক শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী এম-এ। প্রত্যেকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া এবং নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া যে অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন তাহা পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়াই এই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারত সাধারণতঃ অনেক পুরাতন এবং অপূর্ব্ব শিল্প-সম্ভার সমন্বিত মন্দিরে পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষ যে একটি ধর্ম্মানুরাগী দেশ তাহা দক্ষিণ-ভারতে গেলে বুঝা যায়। দক্ষিণ-ভারত সাধারণভাবে গণপতি ও শিবলিঙ্গ ও তাহার বাহন নন্দী (বৃষ)-এর দেশ, যেমন উত্তর-ভারত মোহন মুরলীধারী কৃষ্ণ ও করালবদনা কালী মূর্ত্তির দেশ—যদিও দক্ষিণ-ভারতে বিরাট অনন্তশয়ন নারায়ণ মূর্ত্তি এবং (তিরুপতিতে) বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরও যেমন বিশাল এবং তাহার গোপুরম্ যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি তাহার মধ্যে শিব ও নন্দীমূর্ত্তিও বিশাল। এই বিশালতার কোন ধারণাই হয় না, দক্ষিণ-ভারতে না গেলে। আমি মার্সেই বন্দরে (Marseilles) বৃষভের এক বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম; সেইরূপ বিরাট মূর্ত্তি ইউরোপের আর কোথ ও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

উত্তর-ভারত আর্য্যসভ্যতা—তথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কেন্দ্রস্থল বলিয়া জানিতাম। কিন্তু সভ্যতার প্লাবন যে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ দক্ষিণ-ভারতের সহিত পরিচয় না ঘটিলে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয় উপলক্ষ্যে এবং তাহার পূর্ব্বেও আর্য্য সংস্কৃতি দ্রাবিড় দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু রামেশ্বরের ২৪ কুণ্ড দেখিলে মনে না হইয়াই পারে না যে, মহাভারতের যুগেরও অশেষ-বিশেষ পরিচয় ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে।

আমাদের শিল্প-প্রতিভার অনেক সাক্ষ্য আক্রমণকারীরা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাহা আছে, তাহার সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু পরিচয় ভারতবাসীদের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়। আমি "মন্দিরময় ভারতে"র বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
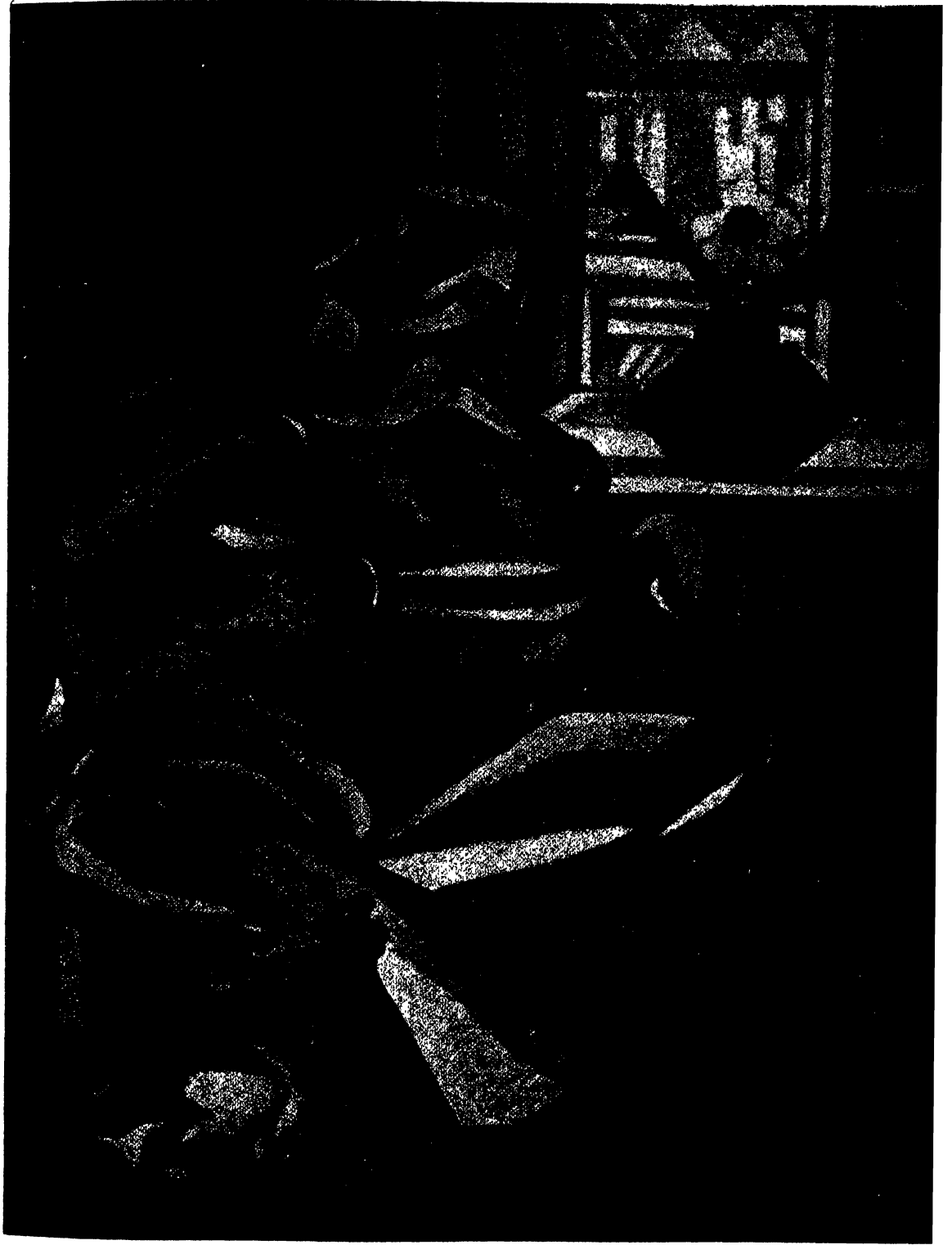
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মা ও ছেলে
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

ক্যামেল ব্যাক হিল

জলার ধারে

[ফোটো : অলক দে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬৫

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর দুর্দ্দশার প্রতিকার

কিছুদিন পূর্ব্বে বিদেশী কাগজে কলিকাতাকে জঘন্ত ও লোকপূর্ণ নরকবিশেষ বলে কুখ্যাতি দেওয়া হয়। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা বাঙালী হিসাবে আমরা সমর্থন করি কেননা বিদেশী নিন্দুকের কথা আমরা মানিয়া লইব কেন? কিন্তু উহার অর্থ, অর্থাৎ ঐরূপ সমর্থনের অর্থ, ইহা মোটেই নহে যে কলিকাতা ভূস্বর্গ। বরং আমরা বলিব যে, কলিকাতাবাসীদিগের—বিশেষতঃ বাঙালীদিগের—নাগরিক ও দৈনন্দিন জীবন ক্রমেই নরকবাসের সহিত তুলনীয় হইয়া উঠিতেছে। ঐরূপ অবনতির জন্ত দায়িত্ব অবশ্য পশ্চিম বাংলার বাঙালীদেরই প্রধানতঃ, কেননা তাঁহাদের পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব থাকিলে তাঁহারা এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইতেন। কিন্তু সরকারী অবহেলা এবং গাফিলতিও ঐ বিকারগ্রস্ত অবস্থার জন্ত বিশেষ ভাবে দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার অর্থে তাঁহারাই যাঁহারা এ দেশের অন্নজলে পরিপুষ্ট। সেই কারণে দেশমাতৃকা ও তাঁহার সন্তান যাহারা, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের জন্ত দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। এ দেশের সন্তান যাহারা তাহারা কর্ম্মবিমুখ, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ব্বিনীত, এ সবকিছুই হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সে সকল দোষ সংশোধনের চেষ্টা যাঁহাদের করার কথা তাঁহারা কি সেদিকে কোনও বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন? দেশের লোকের মধ্যে যাহারা বয়স্ক, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল, অর্থাৎ যাহাদের সাহায্য ভিন্ন দেশগঠন বা জাতিগঠন কোনটাই সম্ভব নহে, তাহাদের সহিত যোগরক্ষার কোন চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোথায় করিয়াছেন?

বাঙালী গৃহস্থ ও মধ্যবিত্তের রক্তশোষণ করিয়া যাহারা ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহাদের হাত হইতে শোষিতকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাজ্যসরকারের নাই একথা সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সেরূপ কোনও বিধান করেন নাই এবং আইন-কানুনেও সে রকম কিছু নাই একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতা ও তাহার অনুরূপ আইন সংবিধানে থাকা এখন একান্তই প্রয়োজন, একথা কি এই রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বা এখানকার প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা কেন্দ্রীয় লোকসভায় গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবহিত করিয়াছেন? না কংগ্রেস পার্টি ফণ্ডে কালোবাজারের চাঁদা বন্ধ হওয়ার ভয়ে সেটাও তাঁহারা পারেন নাই?

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিপতি জোর গলায় বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের আসন এখন পূর্ব্বেকার চাইতেও সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কথার কোনও মূল্য নাই। যে প্রমাণ তিনি দেখাইয়াছেন তাহার মূলে বিরোধীদলের প্রতিনিধি চয়ন ও নির্ব্বাচনী অভিযানের পন্থার দোষ। যদি বিরোধীদল কিছু বেশী সৎলোক মনোনীত করিতেন এবং যদি তাঁহাদের নির্ব্বাচন-অভিযানের সেই পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল এক ঢোল ও এক কাঁসী ছাড়িয়া দেশাত্মবোধক বা গঠনমূলক কোনও কর্ম্মসূচী থাকিত তবে কংগ্রেসের এরূপ জয়লাভ করা দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইত। এবার যাহা হইয়াছে তাহাতে দেশের লোকের সামনে ছিল বিষম সমস্যা। কাহাকে ভোট দিলে ক্ষতি কম হইবে এই ছিল বিচারের ব্যাপার। প্রায় অর্দ্ধেক লোক সমস্যাপূরণে অসমর্থ হইয়া ভোটই দেন নাই।

কালোবাজার বাঙালী গৃহস্থ, ছোট কারবারী ও সাধারণ নাগরিকের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া পরের নির্ব্বাচনে দেখা দিবেই।

কলিকাতায় জীবনযাপন সত্যই ভয়ানক হইয়াছে। শান্তি, নিরাপত্তা, পথেঘাটে চলাচল, এ ত সরকারের হাতে, সেখানেও ত অবনতিই হইতেছে, উন্নতির কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। আছে শুধু নানাবিধ অজুহাত।

বাসগৃহ সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে বাসগৃহ সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরগুলিতে বাসগৃহ পাওয়া একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নানা কারণে বেসরকারীভাবে এই সমস্যা সমাধানের সুযোগ নাই। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য, জমির দুর্মূল্যতা, বাসগৃহ নির্মাণোপযোগী সাজসরঞ্জাম যেমন, সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা।

কোন দেশেই বেসরকারীভাবে বাসগৃহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। খোদ লণ্ডন শহরে পর্য্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় গৃহনির্ম্মাণ সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ের মত এই ব্যাপারেও সরকারী প্রচেষ্টা একটি অজুহাতে পরিণত হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণের জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা ছিল: স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ এবং শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্ম্মাণে অর্থসাহায্য। দ্বিতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বস্তীবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্যও সাহায্য ও ঋণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি পরিকল্পনা হইতেই প্রধান সমস্যা মধ্যবিত্তদের বাসগৃহ সমস্যাটিকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় এরূপ বহু মধ্যবিত্ত পরিবার রহিয়াছে যাহাদের সমগ্র ভারতে এতটুকু জমি নাই, কলিকাতার ভাড়া-করা ফ্ল্যাট বা বাড়ীটিই তাহাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। কলিকাতার জনসংখ্যার পদ্ধতিতে যে কেবল নূতন আগন্তুকদের পক্ষেই বাড়ী সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে তাহা নহে, যাহারা পুরাতন ভাড়াটিয়া তাহাদেরও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এখন কোন বাসোপযোগী ঘর পাওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার উন্নত অঞ্চলগুলি হইতে বাঙালীরা ক্রমশঃই বিতাড়িত হইতেছে। নূতন নূতন যে সকল বাড়ী হইতেছে তাহাদের অধিকাংশেরই মালিক অবাঙালীরা—তাহারা আবার বাঙালীদের বাড়ী ভাড়া দিতে অনিচ্ছুক—প্রধান কারণ বাঙালীদের মাছ খাওয়া তাহাদের সংস্কারে বাধে। অপর পক্ষে যে দু-একজন বিত্তবান বাঙালী কলিকাতায় এখনও বাড়ী তৈয়ার করিতে পারেন তাঁহাদের কাছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি স্বজাতিপ্রীতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করে এবং ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা বাড়ী অবাঙালী সরকারী কর্ম্মচারী এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চহারে ভাড়া দেন। কলিকাতায় এমন কোন গৃহনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানও নাই যাহারা মধ্যবিত্তদের জন্য ঘর নির্ম্মাণ করে।

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট তাহাদের স্কীম কার্য্যকরী করিবার ফলে স্থানচ্যুত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য কয়েকটি বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাড়া এরূপ বেশী যে, মধ্যবিত্তরা তাহাতে স্থান পায় নাই। (দু'খানি ঘরের জন্য ৭৫-৮৫ টাকা ভাড়া দেওয়া সহজ নহে), কাজেই অধিকাংশ ফ্ল্যাটেই যাহারা স্থান পাইয়াছে [তাহাদের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইলেও] তাহারা ঠিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর্য্যায়ে পড়ে না। অন্ততঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত যাহারা সংখ্যায় বেশী এবং যাহাদের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহাদের মধ্যে কাহারও এইরূপ উচ্চহারে ভাড়া দিবার ক্ষমতা নাই। অন্যান্য দেশে মধ্যবিত্তদের জন্য অল্প ভাড়ার বাড়ী তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এখানেও সরকার শ্রমিকদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য এরূপ সাহায্য দেন। মধ্যবিত্তদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য সরকার কোন সাহায্য দিতে পারেন না কেন, বুঝা কঠিন। নিম্নস্থ সংবাদে বুঝা যায় যে সমস্যা বৃদ্ধির চেষ্টাই চলিতেছে।

শনিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাতঃকালীন অধিবেশনে বহু-বিতর্কিত কলিকাতা বস্তি অপসারণ এবং বস্তিবাসী পুনর্ব্বাসন বিলটি ১১৫—৪৬ ভোটে গৃহীত হয়।

বিধানসভার বিগত অধিবেশনে দুই সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোচনা শেষে ঐ বিলের তৃতীয় পর্য্যায়ের আলোচনা সুরু হইয়াছিল। কিন্তু বিরোধীপক্ষ হইতে রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন এবং ইহা লইয়া যে গোলযোগ সুরু হয় তাহার ফলে উহার আলোচনা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এইদিন বিলের তৃতীয় পর্য্যায়ের অসমাপ্ত আলোচনা পুনরায় সুরু হইলে বিরোধীপক্ষ হইতে আবার এইরূপ সমালোচনা করা হয় যে, উহা কলিকাতার চার হাজার বস্তির সাড়ে পাঁচ লক্ষ বাসিন্দাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উহা দ্বারা মধ্যবিত্ত বাঙালী তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতে বিতাড়িত হইবে।

স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান বলেন যে, বিরোধীপক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

বিলটি গৃহীত হইবার পর বিধানসভার অধিবেশন সোমবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার প্রগতি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পনার বিবরণী ও প্রগতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন সম্প্রতি যে রিপোর্টটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাগুলির জন্য মোট ১৫৭'৬৭ কোটি টাকা খরচ হইবে। প্রথম তিন বৎসরে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা খরচ হইবে, প্রথম দুই বৎসরে ২৮'৩৫ কোটি টাকার মত কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ব্যর্থতা দেখা যায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিষয়ে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সনে মাত্র ৮৪ হাজার টন খাদ্যশস্যের

অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে মাত্র একলক্ষ সাতাশ হাজার টনে। খাদ্যশস্য উৎপাদন অবশ্য বারিপাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং নদীপরিকল্পনাগুলি এই বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্যকারী হয় নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বলা হইত যে, ভারত সরকারের বাজেট বরুণদেবতার খামখেয়ালীর ক্রীড়নকমাত্র। আজ দশ বৎসর পরে যদিও সারা দেশব্যাপী নদী-পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে, তথাপি বরুণ-দেবতার খামখেয়ালীকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে কোথাও অতিবৃষ্টি ও কোথাও অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনিশ্চিত বিষয় হইয়া থাকিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় অনাবৃষ্টি চলিতেছে।

বারিপাতের খামখেয়ালী একমাত্র সেচকার্য্যের ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেদিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্ব নিরাশাব্যঞ্জক। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্য্য দ্বারা তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করার কথা ছিল, কিন্তু সেই তুলনায় মাত্র ৩৫ হাজার একর জমিতে ১৯৫৬-৫৭ সনে সেচকার্য্যের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে আরও ৫২ হাজার একর জমি সেচের অধীনে আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বৃহৎ ও মাঝারি নদী পরিকল্পনা আছে, যথা, দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী পরিকল্পনা। বৃহৎ ও মাঝারি পরিকল্পনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা প্রচলন করিবার কথা, কিন্তু সেই তুলনায় ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জমি এখনও সেচের আওতায় আসে নাই।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা ঘাটতি প্রদেশ, কেন্দ্র হইতে বিপুল পরিমাণ সাহায্য লইয়া খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করা হয়। খাদ্যশস্য ঘাটতির প্রধান কারণগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, কলিকাতায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ফলে কৃষিজমির পরিমাণের হ্রাস এবং জমি বণ্টনের অব্যবস্থা। জমিদারী প্রথা লোপের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিনীতিও প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। এই অব্যবস্থার ফলে বহু পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে এবং কৃষির উপযোগী পতিত জমিকে কৃষির আওতায় আনা হইতেছে না। জমিদারী প্রথা লোপের আইনে অকৃষি জমিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে মালিকরা বহু কৃষি জমিকেও অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, অর্থাৎ জমিদারী প্রথা লোপের ফলে বহু পরিমাণ কৃষি উপযোগী জমি বর্ত্তমানে অনাবাদী পড়িয়া আছে। পশ্চিম বাংলায় জমিদারী প্রথা বিলোপ করিতে গিয়া কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষই যে নাজেহাল হইয়াছেন তাহা নহে, এই প্রদেশের কৃষি-সংক্রান্ত সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অরাজকতায় ভরপুর করিয়া তুলিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বিহারে পতিত জমিসমূহকে জাতীয়করণ এবং একত্রীকরণ করিয়া সমবায় প্রথায় ট্রাক্টর দ্বারা চাষাবাদের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জমি একত্রীকরণের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ এই বিষয়ে উদাসীন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব

ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনা যে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। বৈদেশিক লেনদেন ব্যাপারে ভারতবর্ষের ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছেন ঋণ সংগ্রহের জন্য। কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগের সচিব এই প্রতিনিধিবর্গের অন্যতম সভ্য। তাঁহার অভিমতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন তিন শত কোটি বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে সাপ্তাহিক হারে ৫ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িতেছে, মাসে দাঁড়াইতেছে ২০ কোটি টাকা। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মোট মজুতের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ২১৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই অর্থের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট প্রচলনের বিরুদ্ধে জমা হিসাবে রাখিবার নিয়ম, সুতরাং বৈদেশিক পাওনা মিটাইবার জন্য মাত্র ১৫ কোটি মুদ্রা উদ্বৃত্ত আছে।

তিন শত কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আশু প্রয়োজন; আগামী তিন বৎসরে মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে ৬০০ কোটি টাকার মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ব্রিটেনকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, ভারতবর্ষও সেইরূপ প্রত্যক্ষ ঋণ চায়। বর্ত্তমানে কোন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ভারতবর্ষ ঋণ সাহায্য পাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সামগ্রিক প্রয়োজনের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতেছে না। যদি প্রয়োজনীয় সমগ্র বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি ভারত সরকারকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে মূলধন আমদানীর পক্ষে সুবিধা হয়। বর্ত্তমানে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে যে অর্থসাহায্য করিতেছেন, তাহাতে পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্য্যকারিতা ব্যাহত হয়।

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে নূতন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুনর্ব্বিবেচনার সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট খরচ যদিও ৪,৮০০ কোটি টাকায় স্থিরীকৃত আছে, তথাপি ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই দুই অংশ অবশ্য সরকারী খাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অংশে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং ইহার জন্য মোট খরচ হইবে ৪,৫০০ কোটি টাকা। প্রধান প্রধান মৌলিক শিল্প স্থাপন ও কৃষি উন্নয়নের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হইবে। দ্বিতীয় অংশে বাদবাকী পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য

৩০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। যদি ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়, তবেই এই দ্বিতীয় অংশকে কার্য্যকরী করা হইবে।

বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্গতির হিসাব অনুসারে মাত্র ৪,২৬০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যেও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আভ্যন্তরিক সঙ্গতি ঘাটতি ব্যয় কিংবা অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা সঙ্কুলান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্য বৈদেশিক মুদ্রার এত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই বৈদেশিক মুদ্রার অভাব বলিতে বর্ত্তমানে স্বর্ণ কিংবা ডলারের প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্বর্ণ কিংবা ডলার পাওয়া যাইতে পারে প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে। কিন্তু ইহারা উভয়েই যদিও ভারতবর্ষকে বহু টাকার ঋণ দিয়াছে, তথাপি যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ দেয় নাই, যেমন ইহারা দিয়াছিল ব্রিটেন কিংবা পশ্চিম-জার্ম্মানীকে।

গত দুই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৬ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৫৮ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে মোট ৮২১ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িয়াছে। এই ঘাটতির ফলে দেশের আভ্যন্তরিক মূল্যমান তথা জীবনযাত্রার মান কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ১,৪৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমান চলতি বৎসরে ৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং শেষ দুই বৎসরে ২,৪৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা শেষ দুই বৎসরে (১৯৫৯-৬১) ব্যয়িত হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে (স্বল্পাধিক দুই বৎসরে) ভারতবর্ষ ৮৩২ কোটি টাকার মত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য হিসাবে পাইয়াছে কিংবা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। এই অর্থ-প্রাপ্তির বিশদ হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

(কোটি টাকা হিসাবে)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	সাহায্য	৬৮
	ঋণ	২৪৬
বিশ্বব্যাঙ্ক	ঋণ	১৩১
রাশিয়া	ঋণ	১২৩
আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার	ঋণ	৯৫
কানাডা	সাহায্য	১৯
	ঋণ	১২
অবশিষ্ট দেশ	সাহায্য	৩
	ঋণ	১৩৫
		৮৩২

চলতি বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ৩০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন প্রথমে ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, সত্যকার প্রয়োজন ইহার অনেক অধিক হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদিও পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত অর্থের পরিমাণে স্থিরীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ও আভ্যন্তরিক মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার প্রাকৃত পরিমাণ হ্রাস পাইতে বাধ্য। যেখানে মূল্যমান ক্রমবর্দ্ধনশীল, সেখানে ব্যয়ের শেষ সীমানা স্থিরীকৃত রাখার অর্থ পরিকল্পনার অবয়বের হ্রাস।

বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির প্রধানতঃ চারিটি উপায় আছে, যথা—(১) পরিকল্পনার হ্রাস, (২) রপ্তানীর বৃদ্ধি, (৩) আমদানীর হ্রাস এবং (৪) অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি। বৈদেশিক অর্থসাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলে পরিকল্পনা কিংবা আমদানী হ্রাসের কোনওটিরও প্রয়োজন হইবে না। তবে আমদানীর মধ্যে একটি জিনিসের আমদানী হ্রাস অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাহা হইতেছে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী হ্রাস। খাদ্য আমদানীর জন্য ভারতবর্ষের বহু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা যাইতেছে না।

তবে এই বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় এবং অযথা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক আছে এবং সেই সঙ্গে আছে গুপ্ত রপ্তানী এবং হস্তান্তর। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যায়, তাহাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অধিকাংশক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত থাকিয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যয়ের মিথ্যা বিবরণী দিয়া এই উদ্‌বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা অন্যকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয়। এই গুপ্ত হস্তান্তর অবশ্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। অপ্রয়োজনীয় আমদানীর বড় উদাহরণ যানবাহন আমদানী যাহা বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির প্রায় ৩০ ভাগের জন্য দায়ী। কল-কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতির আমদানী আগে প্রয়োজন এবং কর্ত্তৃপক্ষের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবোধের অভাবে বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি এইরূপ সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অযথা ব্যয়ের উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাময়িক পত্রিকার পরিপ্লাবন।

পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাব

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই-রূপ বৃষ্টিহীনতা দেখা যায় নাই। আষাঢ় মাস শেষ হইয়া গেল অথচ চাষী এখনও চাষ আরম্ভ করিতে পারিল না। জলাভাবে আউশ ধান নষ্ট হওয়ার পথে, অপর পক্ষে আমন ধানেরও ভবিষ্যৎও বিশেষ অনিশ্চিত।

এদিকে চাউলের দাম মফঃস্বলে ত্রিশ টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের দামও বাড়িয়া চলিয়াছে।

সরকার কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত আংশিক রেশনিং (modified rationing) প্রবর্ত্তনের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ আজ এক মহা দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "ভারতী" পত্রিকা স্থানীয় খাদ্যাবস্থা আলোচনা করিয়া ২৫শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"জঙ্গীপুর মহকুমার সর্ব্বত্র তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর শস্যহানির ফলে সাধারণ মানুষের অর্থসঙ্গতি একেবারেই নাই। পুঁজি বলিতে যাহার যাহা ছিল সবই একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। চাষীরা এমন কি হালের গরু-বলদ ও ঘরের থালাবাটি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জীবনরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, দুই বেলা দূরের কথা এক বেলাও এক মুঠা অন্নের সংস্থান অনেকেই করিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমরা যে সমস্ত সংবাদ পাইতেছি তাহাতে বেশীর ভাগ লোকই আজ এটা-ওটা খাইয়া কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। ভাতের মুখ অনেকেই দেখিতে পায় না। চাল যে একেবারে দেশে নাই একথা বলা চলে না। তবে দিন দিন চালের দর যেভাবে হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে স্বল্পবিত্ত মানুষের বিশেষ করিয়া দিনমজুরের পক্ষে এই উচ্চমূল্যে চাল খরিদ করা সম্ভবপর নহে। একদিকে মানুষের ক্রয়শক্তির একান্ত অভাব অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মহার্ঘতা এই উভয়ে মিলিয়াই আজ এই সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই খাদ্যসঙ্কটের সমাধান করিতে হইলে কেবলমাত্র টেষ্ট রিলিফের কাজ চালাইয়া কিছু লোকের কর্ম্মসংস্থান করিলে বা কিছু লোকের মধ্যে খয়রাতি সাহায্য বিতরণ করিলেই চলিবে না। অবিলম্বে যাহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, বিশেষ করিয়া চালের দর হ্রাস পায় এজন্য বিভিন্ন এলাকায় অবিলম্বে কতকগুলি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা এবং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এখনও যদি সরকার এবিষয়ে গড়িমসি করেন তবে অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"

অন্যান্য জেলাতেও খাদ্যাবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। এসম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় ব্যাপক অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সরকার ডি, ভি, সি'র খালের জল ছাড়েন নাই—ইহার কারণ বুঝা শক্ত। অপর পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও মডিফায়েড রেশনিং ব্যবস্থা চালু করবার কোন চেষ্টা সরকার করেন নাই।

কৃষকের দুর্ভাগ্য

দেশের মেরুদণ্ড কৃষক। কিন্তু কৃষকদের ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ। তাহারা হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া খাদ্য উৎপন্ন করে, কিন্তু ঋণের দায়ে উৎপন্ন পণ্যের প্রায় সবটুকুই তুলিয়া দিতে বাধ্য হয় মহাজনের ঘরে। শস্য তোলার এক মাস পর হইতেই তাহাকে চাউল কিনিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হয়। বহু-ক্ষেত্রেই যে চাউল সে দশ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়াছিল তাহা তাহাকে পনর-কুড়ি টাকা মণ দরে কিনিয়া খাইতে হয়।

বর্ত্তমান অনাবৃষ্টি চাষের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। আউশ ধান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যাহারা আউশের উপর নির্ভর করিয়া কোনরকমে দিন কাটাইতেছিল সেই সকল কৃষককে উপায়ান্তর না দেখিয়া এখন মহাজনদের নিকট ঋণের জন্য দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে বলা বাহুল্য, কোন মহাজনই এই অবস্থার সুযোগ ছাড়িতেছে না। এই সম্পর্কে বর্দ্ধমানের সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" যে হিসা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৬শে আষাঢ় এক বিস্তৃ সম্পাদকীয় আলোচনার শেষে "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"পল্লীঅঞ্চলে মহাজনদের ঋণ দাদনের একটি প্রথার উল্লে করিতেছি। ধানের মণ ৫৲ টাকা স্থির করিয়া টাকা ধার দেওয় চলিতেছে। অর্থাৎ আষাঢ় মাসে ২৫৲ টাকা কর্জ্জ লইলে মা মাসে ৫ মণ ধান দিতে হইবে। এখন পল্লীগ্রামে ধানের দ মণপ্রতি ১৬৲ টাকা। আরও সংক্ষেপে ছয় মাসে ২৫৲ টাকার জ অভাবী কৃষককে ৫ মণ ধান মাঘ মাসে যাহার দাম ন্যূনপক্ষে ৬০৲ টাকা হইবে তাহা দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন এই সুদের হার কেহ কল্পনা করিতে পারেন কিনা। কাবুলী সুদের হার আট মাসে ডবল হয় শুনিয়াছি কিন্তু ছয় মাসে প্রায় তিনগুণ সুদ কল্পনার বাহিরে। কাজেই একমাত্র সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সময়মত ঋণদান ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান নাই। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

সরকার ও শিক্ষা-ব্যবস্থা

কোন রাষ্ট্রের শিক্ষিতের হার দেখিয়া সেই দেশের সরকারের চরিত্র নিরূপণ করা হয়। বর্ত্তমান বিশ্বের সকল প্রগতিশীল সরকারই শিক্ষাবিস্তারকে তাহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিভিন্ন পরাধীন দেশে যে সকল স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে, তাহাদেরও এক মৌলিক দাবী জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান দাবী ছিল জনশিক্ষার বিস্তারসাধন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর এমন সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যাহার ফলে শিক্ষার প্রসারের পরিবর্ত্তে শিক্ষার সঙ্কোচনই সাধিত হইতেছে। একথা অবশ্য সত্য যে, এমন কতক-গুলি নূতন বিষয় এখন শিক্ষাতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা ব্রিটিশ আমলে ছিল না। প্রয়োজনবিশেষে কারিগরি শিক্ষারও বিস্তারসাধন হইয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিশেষ কোন সরকারী প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় লক্ষাধিক ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে; তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই সরকারী উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। অপর-পক্ষে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সরকার এমন কতক-

গুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এবং শিক্ষাসংকোচনের পথ প্রশস্ততর হইয়াছে। একাদশ শ্রেণীসম্বলিত বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কলেজ পরিচালনা প্রভৃতি ব্যবস্থার একমাত্র কার্য্যকরী ফল হইয়াছে শিক্ষার বৈষম্য এবং সঙ্কোচন। নিঃসন্দেহে এই সকল পরিকল্পনা প্রচলনের সপক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়নের যুক্তি দেখানো হইয়াছে—কিন্তু কার্য্যতঃ প্রথমেই শিক্ষার পরিমাণ হ্রাস করিয়া উহা শিক্ষার মানবৃদ্ধির পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

দেশে এমন কেহ নাই যিনি শিক্ষার মান উন্নয়ন চাহেন না। কিন্তু সেই উন্নয়নের পথ কি জনসাধারণ বর্ত্তমানে শিক্ষালাভের যেটুকু সুযোগ পাইতেছেন তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার যে নূতন সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে, একটি কংগ্রেস-পরিচালিত পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে :

"সম্প্রতি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের সকলের কলেজে স্থান হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। বহু কলেজে তিন শিফটে ক্লাস করিয়াও চাহিদা মেটানো সম্ভব হইতেছে না। বর্দ্ধমান রাজ কলেজে গত বৎসর হইতে সকালে এবং দুপুরে দুই শিফটে অধ্যাপনা চলিতেছিল। এ বৎসর সকালের শিফটে ছাত্রভর্ত্তি ইউনিভারসিটি বন্ধ করিয়া দিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন, যদিও সকালের শিফটে অধ্যাপনা চালাইয়া যাইবার জন্য অধ্যাপক আছেন এবং ২য় ও ৪র্থ বার্ষিক ছাত্রদের সকালের শিফটে যথারীতি পড়ানোও চলিবে তথাপি কেন ১ম ও ৩য় বর্ষে ছাত্র নেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে আমরা কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। হয়ত আইনগত বাধার কারণেই ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চ্যান্সেলার সহজেই সেই বাধা অপসারণ করিয়া বা বিশেষ অনুমতি দিয়া সকালের শিফটে কলেজ চালাইতে দিতে অবশ্যই পারেন। আমরা জানি বহু ছাত্র আবেদন-পত্র ক্রয় করিয়াছে এবং কিছুসংখ্যক ছাত্র আবেদন করিয়াছে। এখন তাহাদের অর্থ ও আবেদন-পত্র ফেরৎ দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমরা ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, এ বৎসর কলেজকে সকালের শিফটে ক্লাস করিবার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হইবে ও সেই সঙ্গে সকালে শিফট চালাইবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ করণীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য কলেজকে সময় দেওয়া হইবে।"

এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক "যুগবাণী" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা যুগবাণীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ নীচে তুলিয়া দিলাম। "যুগবাণী" লিখিতেছেন :

"গ্রাণ্টস কমিশনের টাকাটার সর্ত্ত কি? উহার সর্ব্বপ্রধান সর্ত্ত কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমাইয়া দেড় হাজার করিতে হইবে, কোন শিফট রাখা চলিবে না। সকালে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কলেজ রাখিতে হইবে। উহার গবর্নিংবডি, অধ্যাপকমণ্ডলী, সমস্ত আলাদা হইবে। সন্ধ্যার কমার্স ক্লাস উঠিয়া যাইবে। কেবলমাত্র সরকারী কলেজে কমার্স শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ঐ ক্লাস হইবে দিনে। চাকুরিজীবীদের জন্য সন্ধ্যায় বি, এ. ক্লাস থাকিতে পারে, তবে তাহারও গবর্ণিং বডি এবং অধ্যাপকমণ্ডলী আলাদা হইবে। এই হইল গ্রাণ্টস কমিশনের টাকা দেওয়ার সর্ত্ত। এই সঙ্গে আরও একটি কথা আছে—কোন অধ্যাপক এক শিফটের বেশী কাজ করিতে পারিবেন না।

"কলিকাতার সাতটি কলেজ—বঙ্গবাসী, সিটি. বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, চারুচন্দ্র এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বাদ দিয়া ৭৭টি কলেজ গ্রাণ্টস কমিশনের টাকা পাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাংলা দেশে কলেজ আছে ১৩৫, তার মধ্যে বাদ গিয়াছে স্পনসর্ড কলেজগুলি। কলিকাতার বৃহত্তর ৭টি এবং আর কয়েকটি কলেজ এই সাহায্য চায়ই নাই। গ্রাণ্টস কমিশন সব টাকাও দিবেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, ম্যাচিং গ্রাণ্ট প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলি নিজেরা দিলে ডেফিসিটের অর্দ্ধেক তাহারা দিবেন। সাতাত্তরটি কলেজের জন্য অর্দ্ধেক টাকা কমিশন মে মাসে পাঠাইয়াছেন। ম্যাচিং গ্রাণ্ট দিবেন বাংলা সরকার, কিন্তু কিভাবে কত টাকা দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয় নাই। ৩০শে জুনের আগে টাকাটা খরচ না হইলে পচিয়া যাইবে, সুতরাং কলেজগুলিকে বলা হইয়াছে টাকা তুলিয়া নিজেদের ফাণ্ডে রাখিতে। কিভাবে উহা খরচ হইবে তাহা তাঁহারা পরে জানাইবেন। এখনও এই বিশৃঙ্খলাই চলিতেছে।

"গ্রাণ্টস কমিশনের আদেশ মানিতে হইলে এ বৎসরের ছাত্রসংখ্যা গতবারের সমান রাখিতে হইবে। তাঁদের ভাষায় এ বৎসর হইবে freeze। তার পর প্রতি বৎসরে এক-চতুর্থাংশ কমাইয়া চার বৎসরে দেড় হাজার করিতে হইবে। অর্থাৎ বঙ্গবাসী কলেজে দিনে আছে ৩৫০০ ছাত্র। চার বৎসরে ২০০০ কমাইতে হইবে। গ্রাণ্টস কমিশনের টাকা নিলে আগামী বৎসর হইতে এই একটি কলেজেই ৫০০ হিসাবে ছাত্রদের সিট কমিতে থাকিবে।

"কলেজগুলির বেতন ২ টাকা করিয়া বাড়িয়াছে। Freezing-এর বৎসরেই ২ টাকা বৃদ্ধি, আগামী বৎসর বাড়িবে পাঁচ টাকা এবং পঞ্চম বৎসরে কলেজ ফী ৩০ টাকা হইবে। শিক্ষা-সংহার স্কীম চালুর আগেই আমরা বলিয়াছি স্কুলের বেতন ১৫ টাকার বেশী হইতে বাধ্য। তাহাই হইয়াছে। এখন বি-এস-সির বেতন ১২ টাকা, স্কুলের Class VII-এরই বেতন ১০ টাকা।

"এই অপূর্ব্ব শিক্ষা স্কীম গ্রাণ্টস কমিশনের চেয়ারম্যান দেশমুখের প্রদেশ বোম্বাই সোজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রেসিডেন্টের নিজের প্রদেশেরা উহা নেয় নাই। মাদ্রাজ নিয়া পস্তাইতেছে। অন্ধ্র নিতে গিয়া বন্ধ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব

চীজ সাদরে বরণ করিয়া চালু করিয়াছে সারা ভারতে একা বাংলা দেশ। ইহাতে ঐ সব প্রদেশেরই সুবিধা হইবে। কেন্দ্রীয় চাকুরি হইতে বাঙালী বিতাড়িত হইয়াছে। আর কয়দিন বাদে বাংলা সরকারের চাকুরিতেই যোগ্যতাসম্পন্ন লোক মিলিবে না, ভিন্নপ্রদেশীয়দের নেওয়া হইবে। মুঙ্গেরের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এখনই ফেলকরা ছেলে নিয়োগ ত সুরু হইয়া গিয়াছে।"

গ্রাণ্টস কমিশনের অন্যতম সর্ত্ত একজন অধ্যাপক একাধিক শিফটে কাজ করিতে পারিবেন না। নৈর্ব্যক্তিক নীতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহাতে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কথা স্মরণ রাখিলে এই সর্ত্তের ক্ষতিকারক রূপ বিশেষ স্পষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের অভাব দেখা দিয়াছে। "যুগবাণী"র সংবাদমতে এক প্রেসিডেন্সি কলেজেই ১৭ জন অধ্যাপকের পদ বৎসরাধিক কাল যাবৎ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ সরকারী কলেজ—উহার মাহিনার হারও বেশী। তথাপি যদি সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত অধ্যাপক না পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য কলেজগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত সংখ্যক অধ্যাপকের অভাবে স্পনসর্ড কলেজগুলি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। বহু কলেজেই দুই-তিন মাস পর পর অধ্যাপক বদল হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপক বদলীর পর ছয় মাস পরেও তাঁহার স্থলে কোন অধ্যাপক আসিতেছেন না। বেচারী ছাত্রদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বিশেষ শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রশাসনিক ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অকর্মণ্যতা এজন্য বহুলাংশে দায়ী, কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব রহিয়াছে।

শিক্ষাসংহারের অন্য রূপ : পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্রমবর্দ্ধমান অধোগতি হইতেছে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৎসরের পর বৎসর একই ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়া চলিয়াছে অথচ তাহার প্রতিকার হইতেছে না। সকল ব্যাপারেই ছাত্রদের ঘাড়ে দোষ চাপান আজ এক সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। ছাত্ররা অপরিণতবয়স্ক, দোষ করা তাহাদের পক্ষে বিশেষ বিচিত্র নহে, কিন্তু পরিণতবয়স্ক বহুদর্শী শিক্ষাধুরন্ধরের দল যখন ভুল করেন—যে ভুলের দরুণ হাজার হাজার নির্দোষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়—তখন তাঁহাদের বিশেষ কোন সমালোচনা হয় না। সরকারী কর্ম্মে বা যে কোন কার্য্যে ভুলভ্রান্তি হইলে তাহার শাস্তি হয়, কিন্তু অধ্যাপকদের ছাত্রনিধনের ষড়যন্ত্রের (বৎসরের পর বৎসর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে?) কোন প্রতিকার হয় না। এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই জন্য দায়ী একশ্রেণীর ক্ষমতা-লোভী দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যাপক এবং শিক্ষক। ইহারা প্রতি বৎসর ভুল প্রশ্ন দিয়া ছাত্রদের জাহান্নমে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা কি জঘন্যতম অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যবস্থা কোন পর্য্যায়ে নামিয়াছে, "যুগবাণী" হইতে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলিতে তাহার আংশিক পরিচয় মিলিবে :

"এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর পরীক্ষকদের প্রথম সভায় দেখা গেল শতকরা ত্রিশ জনেরও কম অঙ্কে পাশ করিয়াছে। তখন ঠিক হইল সকলকে সাত নম্বর গ্রেস দেওয়া হইবে। তবু পাশের হার ৪২এর উপর উঠে না। গত বৎসর উহা ছিল ৪৯। অঙ্কের প্রশ্নে ভুল থাকার জন্য আই-এস-সির অধিকাংশ ছাত্র ঘাবড়াইয়া গিয়া অঙ্কের পেপার নষ্ট করিল, হাজার হাজার ছেলে প্রশ্নকর্ত্তার দোষে প্রথম ডিভিসন পাইল না। প্রথম ডিভিসনে পাশ হইলে যে সকল সুবিধা পাইত তাহাতে ইহারা বঞ্চিত হইল।

"প্রথম প্রশ্নপত্রের ২৩(ক) প্রশ্নে লেখা ছিল Cos inverse 4। এটা দারুণ ভুল। এর উত্তর হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে ১৬নং প্রশ্নে "ল্যামির থিওরেম" সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তার জন্য যে condition দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। পরীক্ষকদের সভায় অধ্যাপক রবীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আর কয়েকজন যখন ঐ ভুল দেখাইলেন তখন প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক ত্রম্বেশকর রায় তাঁহাদিগকে ধমক দিয়া বসাইয়া দিলেন। কারণ তিনিই ছিলেন প্রশ্ন-কর্ত্তা। তাঁর তৈরী প্রশ্নে ভুল—এ কথা বলার স্পর্দ্ধা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অবশেষে স্থির হইল দুটি প্রশ্নেই full credit for honest attempt দিতে হইবে। যে অঙ্ক ভুল, যার উত্তর হয় না, তার অনেষ্ট এটেম্পটের মাপকাঠি কি?

"এ বৎসর কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি ইণ্টারমিডিয়েটের সিলেবাসে ঢোকান হইয়াছে। এই প্রথম উহার পরীক্ষা হইবে বলিয়া কলেজে সার্কুলার দেওয়া হইয়াছিল—কোন tricky বা জটিল প্রশ্ন করা হইবে না। কিন্তু প্রশ্নে দেখা গেল এই নির্দ্দেশ পালিত হয় নাই! বি-এস-সি এবং বি-এস-সি অনার্স পরীক্ষাতেও ঐ জিওমেট্রির বুক আর্টিকেলের প্রশ্ন থাকে, ইণ্টারমিডিয়েটে প্রথমবারেই তাহা দেওয়া হইল না। এই পত্রের প্রশ্নকর্ত্তা তিন বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর নিয়াছেন। এক্ষেত্রেও honest attempt এর জন্য full credit দেওয়ার নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু যে 'অনেষ্ট এটেম্পট' করিতে গিয়া ছাত্রদের মাথা গরম হইল, বিভ্রান্তি ঘটিল, তার জন্য ফল খারাপ হইল—তার ক্ষতিপূরণ কোথায়? সাত নম্বর গ্রেসই কি ইহার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ?

"কয়েক বছর আগে বুক-কিপিংয়ে ব্যালান্স-শীটের প্রশ্নে ভুল ছিল, উত্তর দুদিক সমান হইবে না। ক্লাসে ছাত্রদের ইহাই শেখান হয় যে, ব্যালান্স-শীটে অ্যাসেট-লায়বিলিটি না মিলিলেই বুঝিবে তোমার কোথাও ভুল হইয়াছে। ঐ প্রশ্নের পর হইতে ছেলেদের বলিয়া দিতে হইতেছে—পরীক্ষার হলে দুদিক না মিলিলে ঘাবড়াইও না, ভাল করিয়া দেখিবে Posting ঠিক হইয়াছে কিনা, উত্তর

পিছু এক সের চাউল এবং এক সের আটা (বিকল্পে আধ সের আটা) নেওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে। সরকারী যে চাউল সরবরাহ করা হয়, তাহা বাহির হইতে আনীত। এই চাউলের দুর্গন্ধ অনেকেই সহ্য করিতে পারে না, স্বাস্থ্যের দিক হইতেও এই চাউল ক্ষতিকারক বলিয়াই অনেকের ধারণা। তবুও উক্ত চাউলের মূল্য বাজার হইতে বেশ কম হওয়ায় গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত প্রায় সকলেই তাহা খাইতেছেন। কিন্তু মুস্কিল হইল বাধ্যতামূলক আটা লইয়া।

"এতদঞ্চলের জনসাধারণ আটা ব্যবহারে মোটেই অভ্যস্ত নহেন (ইদানীং আবার সরকারী আটার মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে)। অধিকন্তু এই আটা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর—ইহাতে খুদ-কুড়া-ভুষি ইত্যাদি প্রায় অর্দ্ধেক। প্রকাশ যে, বিশেষজ্ঞ মহল এই আটা পরীক্ষা করিয়া ইহাকে ভেজালযুক্ত বলিয়া রায় দিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে দুই-একটি মামলাও নাকি বিচারাধীন আছে। তবুও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিভাবে এই অখাদ্য আটা লোককে কিনিতে বাধ্য করিতেছেন, তাহাই আশ্চর্য্য (আটা না নিলে সস্তাদরের চাউল একমুষ্টিও দেওয়া হয় না)!—ভেজাল খাদ্যবস্তু বিক্রয় করিলে সাধারণ ব্যবসায়ীর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা কি সেই আইনের আওতায় পড়েন না? এই বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণক্রমে আশু প্রতিকার দাবি করিতেছি।"

যুবকসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বাধীনতার পরবর্ত্তীযুগে যুবকসমাজের একাংশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিঃসন্দেহে সমগ্র যুবকসমাজে ইহারা অতি নগণ্য অংশ, কিন্তু ইহারা অধিকতর সক্রিয় বলিয়া এই সকল দুষ্কৃতকারীর প্রভাবই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং দুর্নাম সমগ্র যুবকসমাজের উপরই বর্ত্তাইতেছে। এ অবস্থা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কেবল যুবকদিগকেই এ অবস্থার প্রতিকারের জন্ম দায়ী করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের প্রতি কয়েকটি কথা বলিবার আছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান শহরে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের জন্ম পুলিস শহরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছয়জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় মহম্মদ ইয়াসীন রোডে নার্স হোষ্টেলের সম্মুখে ইহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই গ্রেপ্তারে অভিভাবকদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে এই সকল উচ্ছৃঙ্খল যুবকের আত্মশুদ্ধির বহু বিলম্ব ঘটিবে। "বর্দ্ধমানবাণী"র সংবাদ অনুযায়ী "অভিভাবকদের মধ্যে কেহ কেহ পুলিসের বড়কর্ত্তাদের ধরাধরি" আরম্ভ করিয়াছেন অর্থাৎ পুত্রদের কার্য্যে পরোক্ষ সমর্থন জানাইতে দ্বিধা করিতেছেন না…"

যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা সামাজিক অবনতিরই একটি রূপ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি ইহার জন্ম দায়ী। আত্মসুখের জন্ম অন্ধের মত ছেলেদের গালাগালি করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। একদিক হইতে চিন্তা করিলে প্রত্যেক ভদ্রলোকের যদি আপন আপন সন্তানসন্ততিকে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাবোধে উদ্দীপ্ত করিতে পারেন, তবে ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের বিরুদ্ধে এই ধরণের পুলিসী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত না। অনেকে বলিবেন যে, তিনি একা কি করিবেন? কথাটা আংশিক সত্য, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কাটান যাইবে কি করিয়া? কিন্তু অপরপক্ষে পারিপার্শ্বিক ত ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি দ্বারাই সৃষ্ট। যদি ব্যক্তিবিশেষ প্রত্যেকে ঠিকমত চলিবার প্রয়াস পান তবে সমাজের উন্নতি আপনিই ঘটিবে। কিন্তু সামাজিক বিকাশের ধারা এরূপ আশা পোষণের কোন সুযোগ দেয় না। এক্ষেত্রে একমাত্র করণীয় হইতেছে সামাজিক পরিবেশের উন্নতির জন্ম বাহিরের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের উন্নতির জন্ম স্ব স্ব প্রচেষ্টা করা অন্ততঃ নিজ পুত্র-কন্যার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হইলে সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

প্রশাসনিক সততা

সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন:

"পুনরায় সদর মহকুমা সরবরাহ অফিসের সিমেণ্ট সংক্রান্ত কাজ যে করণিক করিয়া থাকেন, তাহার সম্বন্ধে অসাধুতার উল্লেখ করিয়া জেলার অপর একটি সাপ্তাহিকে সংবাদ বাহির হইয়াছে। কণ্ট্রোলার সাহেব এই বিষয়ের প্রতি কেন দৃষ্টি দেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অসত্য হয় তাহা হইলে সংবাদের সত্যতা প্রমাণের জন্ম সংবাদপত্রকে আহ্বান জানানো হউক অথবা বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা হউক। আমরা জানি শাসন বিভাগীয় মহকুমা শাসক সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মহকুমা কণ্ট্রোলার সাহেবের নিকট ফোন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সরবরাহ অফিসের বহু কেরাণী, সাব-ইনসপেক্টার, ইনসপেক্টার এবং কণ্ট্রোলার বদলী হইয়াছেন। কিন্তু এই কেরাণীটি যথাস্থানে বহু বৎসর হইতে রহিয়া গিয়াছেন। ইনি টাইপিষ্ট হিসাবে এই অফিসে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া যে সিমেণ্ট বিভাগে আসিলেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহাকে লইয়া যখন কথা উঠিয়াছে তখন তাঁহাকে ঐ বিভাগে বহু বৎসর ধরিয়া রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নাই বলিয়া মনে করি।"

বর্দ্ধমান ফার্ম্মেসী ট্রেনিং সেণ্টার

বর্দ্ধমান শহরে অবস্থিত ফার্ম্মেসী ট্রেনিং সেণ্টারটি সরকার জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সরকারের এই সিদ্ধান্তে বর্দ্ধমানের দায়িত্বশীল জনমত বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বর্দ্ধমান হইতে শিক্ষণকেন্দ্রটি অপসারণের বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহার সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে আমরা বর্দ্ধমানের দুইটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের মতামত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা আশা করি, সরকার পক্ষ এই সমালোচনার সমুচিত উত্তর না দিয়া বর্দ্ধমান ফার্ম্মেসী

ট্রেনিং সেণ্টারটিকে স্থানান্তরকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকিবেন।

সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া কালনা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী" লিখিতেছেন :

"এই কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মেডিক্যাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষ জেলাবাসীর বক্ষে দারুণ বেদনা দিয়াছেন, এখন আবার বর্দ্ধমানের ফার্ম্মেসী ট্রেনিং সেণ্টারটিকে সুদূর জলপাইগুড়ি সহরে সরাইয়া লইবার ঘোষণা দিয়া এ দিকের শিক্ষার শেষ সুযোগটুকুও বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর।

"বর্দ্ধমানের এই ফার্ম্মেসী কলেজে এখন ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন, উপযুক্ত শিক্ষকসংখ্যা এবং আবশ্যক সাজসরঞ্জাম সবই ঠিক থাকা সত্ত্বেও সরকার সহসা কলেজটিকে বন্ধ করিয়া দিয়া ছাত্রগণকে জলপাইগুড়ি যাত্রা করিতে কেন যে আদেশ দিলেন, আজও তাহা জেলাবাসীর কাছে রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।"

বর্দ্ধমান শহর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দামোদর" এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া উপসংহারে লিখিতেছেন যে, মাত্র গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছাত্রদের চাপে কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রটির জন্য উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক এবং ২৩,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন। সমগ্র আয়োজন যখন স্থির এবং ৪০ জন ছাত্র যখন শিক্ষা আরম্ভ করিল, তখনই এই স্থানান্তরকরণের আদেশ আসিল।

"দামোদর" লিখিতেছেন, "গত মার্চ্চ মাসে বিধান সভায় আলোচনাপ্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলিয়াছেন, বর্দ্ধমান ও জলপাইগুড়ি দুইটি সেণ্টার মিলিয়া মাত্র ৫০ জন ছাত্র, সেজন্য একটি কেন্দ্রই রাখা উচিত। আমরাও তাহাতে একমত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু ঐটি বর্দ্ধমানেই রাখা উচিত বলিয়া জোর দিয়াছি, কেননা ৫০টির মধ্যে ৪০টি ছাত্রই বর্দ্ধমান কেন্দ্রের এবং বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের। সত্যের অবতার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে ঠিক উল্টা রিপোর্ট দিয়াছিলেন অর্থাৎ জলপাইগুড়িতেই বেশী ছাত্র ছিল বলিয়াছিলেন। তাই আমরা বিষয়টি শেষ মুহূর্ত্তেও সরকারকে বিবেচনা করিতে এবং হঠকারিতা না করিয়া বর্দ্ধমান কেন্দ্র চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, এ বৎসরও বহু ছাত্র বর্দ্ধমান কেন্দ্রে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে এবং সেগুলি নাকি কর্তৃপক্ষ উত্তর না দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা আজ এক ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে। গত দশ বৎসরে কর্ম্মবিনিময় কেন্দ্রে যাহারা নাম রেজেষ্ট্রি করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেই বার লক্ষেরও উপর লোকের জন্য কোন কাজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এই বার লক্ষ লোকের মধ্যে সাত লক্ষ উদ্বাস্তু কর্ম্মপ্রার্থী ছিল। ১৯৫৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে মোট ২,১০,৫৭৬ নাম তালিকাভুক্ত করেন, তন্মধ্যে মাত্র ১৭,৪১৯ জন কর্ম্ম পান। ১৯৫৮ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪৮,৭৩৮ জন তালিকাভুক্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ৫৮৩২ জনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে।

কর্ম্মবিনিময় কেন্দ্রের "লাইভ রেজিষ্টারে" মার্চ্চ মাসে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার কর্ম্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত ছিল। শিলিগুড়ি ও আসানসোল কেন্দ্রে নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও উত্তর কলিকাতা কেন্দ্রে ক্রমশঃ নূতন প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইলেও অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে তাহার সুযোগ গ্রহণ করা কষ্টকর। অপরপক্ষে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালীদের পক্ষে কাজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী জনাব সাত্তার স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যান্য রাজ্যে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইলেও তাহাতে বাঙালীদের উপকৃত হওয়ার বিশেষ সুযোগ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম

মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা লইয়া নানা বিতর্ক এদেশে চলিতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার নিম্নস্থ সংবাদটি সে বিষয়ে অনুধাবনীয় :

মঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ঐ মর্ম্মে এক প্রস্তাব আসে। প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৬০ সনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য এবং আইন শিক্ষাদানের সর্ব্বস্তরের বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয় : যন্ত্রবিদ্যা, কারিগরী এবং চিকিৎসাবিদ্যার বাহন আপাততঃ ইংরেজী ভাষাই থাকুক এবং ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ এবং বি-কম পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাকে এখনও আবশ্যিক বিষয়রূপেই রাখা হউক।

এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয় এবং অধিকাংশ বক্তা তাঁহাদের মনের কথা ইংরেজীতেই গুছাইয়া বলেন।

মাতৃভাষা সর্ব্বশিক্ষার বাহন হইবে, নীতিগতভাবে তাহাতে কাহারও আপত্তি হয় নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে কিভাবে তাহা লইয়া।

একদল বলেন, মাতৃভাষাকে উচ্চস্তরের শিক্ষার বাহন করা হইল মাত্র এই প্রস্তাবটুকু পাস করিলেই কাজ চুকিবে না। অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট দিন বাঁধিয়া দিলেই সকল ছাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

তাঁহারা বলেন, পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষা গ্রহণ কি ভাবে চলিবে, তাহাই হইল সমস্যা।

উচ্চস্তরে শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাইবে কোথায়? অথবা কলিকাতার মত 'পাঁচমিশেলি' (কসমোপলিটান) শহরে

শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা এবং পরীক্ষা গ্রহণ করিলে অন্য ভাষাভাষী ছাত্রদের গতি কি হইবে? এই সব প্রশ্নের মীমাংসাও করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবের সমর্থকগণ বলেন, অধিকাংশ ছাত্রই মাতৃভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রকৃত শিক্ষা যদি তাহাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় তবে মাতৃভাষাই প্রকৃষ্টতম বাহন। এই সত্যটি মনে রাখিলে বা স্বীকার করিয়া লইলে অযথা কাল-ক্ষেপের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

আলোচনার অন্তে ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুতর। কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য বটে, তবে একেবারে অসাধ্য বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। শ্রী সিদ্ধান্ত তাই প্রস্তাব করেন, এই আলোচনায় যাঁহারা যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের লইয়া এমন একটি কমিটি গঠন করা হউক, যে কমিটি এই প্রস্তাবটিকে কার্য্যক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যাইবে তৎসম্পর্কে বাস্তব পন্থাসমূহ নির্দ্ধারণ করিবেন। শ্রীসিদ্ধান্ত অবশ্য তাঁহার মূল প্রস্তাব বাংলাতেই বলেন।

বামপন্থী ও শিল্প-কারখানা

নীচের সংবাদ হইতে মনে হয় এতদিনে পশ্চিমবাংলা সরকারের চৈতন্যের উদয় হইতেছে। সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত :

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানাসমূহ বন্ধের জন্য বিরোধী-দলগুলিকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা শ্রমিকদের উস্কানী দেওয়ায় শিল্পে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। মালিকরা এইসব দেখিয়া এখান হইতে শিল্পকারখানাগুলি গুটাইয়া অন্যত্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা ঐগুলি এখানে রাখা লাভ-জনক মনে করেন না।

ঐদিন ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন বিলের (২নং) আলোচনাকালে বিরোধী সদস্যগণ বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারী ব্যর্থতার অভি-যোগ করিয়া বলেন যে, সরকার এখানকার কলকারখানাসমূহ বন্ধের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। মালিকগণ তাঁহাদের খেয়াল খুশীমত ঐসব বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বহু লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদলের এই অভি-যোগের উত্তরদান কালে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কেন এখানকার শিল্পকারখানাসমূহ বন্ধ হইতেছে? ইহার কারণ বিরোধী বন্ধুগণ বড্ড বেশী হৈচৈ করেন। শুধু রাস্তাঘাট নহে—শিল্প-কারখানার মধ্যেও বেশী হৈচৈ করা হয়। কয়েকজন শিল্পপতি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এখান হইতে কারখানা গুটাইয়া অন্য কোন স্থানে উহা স্থাপন করিবেন।

ডাঃ রায় বলেন যে, বিরোধী সদস্যগণ বেকারীর বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপে তাঁহারা বেকারের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছেন। তিনি বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিরোধী সদস্যগণ—যাঁহারা উদ্বাস্তু আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আসলে উদ্বাস্তু ও শ্রমিকদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ভাবিয়া দেখেন না। উদ্বাস্তু বা শ্রমিকগণ খাইল কি না খাইল, তাহার তাঁহাদের নিকট বড় প্রশ্ন নহে। আসল প্রশ্ন ইঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করা এবং ইঁহাদের পরিচালনা করা। ডাঃ রায় বিরোধীদলগুলির এইরূপ কার্য-কলাপের নিন্দা করেন।

চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

গত এপ্রিল ও মে মাসে কেরালা ও মাদ্রাজ রাজ্যে খাদ্যে বিষজনিত ক্রিয়ার জন্য প্রায় দেড়শত লোকের জীবনহানি ঘটে। এই ব্যাপক মৃত্যুর জন্য দায়িত্ব কাহার সে সম্পর্কে সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। কমিটি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই মৃত্যু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে "জয়হিন্দ" নামক একটি জাহাজে ঐ খাদ্য চালান আসিয়াছিল। প্রকাশ, ঐ খাদ্যের সহিত "ফলিডল" নামক অতি তীব্র কীটঘ্ন বিষের ৫৫টি পেটি ভাঙিয়া গিয়া ঐ সকল খাদ্যের সহিত কয়েক গ্যালন ফলিডল মিশিয়া যায় এবং পরে ঐ খাদ্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া যাহারা খান তাঁহাদেরই প্রাণনাশ হয়।

কমিশনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, যে ভারতীয় কোম্পানীটি এ দেশে ফলিডলের প্রধান এজেন্ট তাঁহারা এ বিষয়ে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। জাহাজ কোম্পানীটিও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন : (১) ভারতে ফলিডলের চীফ এজেন্ট টিকা প্রাইভেট লিমিটেড যে ধরণের ভঙ্গুর বোতলে ভরিয়া ঐ বিষাক্ত মালটি পাঠাইয়াছিল—সেগুলি এ জাতীয় মালের জন্য নিরাপদ আধার নহে, (২) এই ধরণের বিষাক্ত দ্রাবক চালানের সময় বোতলগুলি যেরূপ সতর্কতার সহিত মুড়িয়া দেওয়ার জন্য ভারত সরকার হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল তাহা অনুসরণ করা হয় নাই, (৩) ভিতরকার জিনিস কি ধরণের তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য পেটিগুলির উপর সঠিক লেবেল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, এবং (৪) "চালানী মালগুলি সম্পর্কে ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বিবরণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

চালানকারী ভারতীয় কোম্পানীটি জাহাজের মাল চালানের ফর্মে ফলিডলকে "নির্দ্দোষ রাসায়নিক পদার্থ" লিখিয়া দিয়াছিল। অনুসন্ধানের সময় ফলিডলের প্রস্তুতকারক বিশ্ববিখ্যাত বেয়ার কোম্পানী তাঁহাদের একজন বিশেষজ্ঞকে কমিশনের নিকট সাক্ষ্য-দানের জন্য পাঠান। সেই প্রতিনিধি বলেন যে, ফলিডলকে কোনক্রমেই "নির্দ্দোষ রাসায়নিক পদার্থ" বলা চলে না এবং মাল

চালানীর কর্মে ঐরূপ লিখিয়া দেওয়া অন্যায় হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যদি ঐ মাল চালান দেওয়া হইত তবে কখনও তাঁহারা ঐরূপ লিখিতেন না।

ভারতীয় কোম্পানীটির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা জার্মান বিশেষজ্ঞের এই বিবৃতি হইতে সবিশেষ স্পষ্ট হইয়াছে। কোম্পানীটি এইরূপ তীব্র বিষ চালান দিবার সময় প্রয়োজনীয় কোন সতর্কতাই ত অবলম্বন করে নাই, উল্টা মিথ্যা বিবরণী দিয়াছে। তাহারা অজ্ঞাতে এইরূপ করিয়াছে মনে করিবার কোন কারণই নাই, কারণ, কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে কৃষিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাও ছিল। অপরপক্ষে নিউ ঢোলেরা ষ্টীমশিপ কোম্পানী ও উহার এজেন্টগণ ফলিডল চালানের সময় কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। পেটিগুলির উপর "বিষ" কথাটি লেখা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী ভারতীয় বাণিজ্য আইনের ধারাগুলি ভঙ্গ করিয়া ঐগুলিকে খাদ্যবস্তুর পাশে রাখিয়াছিল। জাহাজ-কোম্পানীটিও যদি আইনানুগ পন্থায় চলিত তবে খাদ্যবস্তুর সহিত ফলিডল মিশিবার কোন সুযোগ ঘটিত না এবং এতগুলি লোকের প্রাণনাশ ঘটিত না।

ফলিডল এবং অনুরূপ বিষাক্ত অন্যান্য কীটঘ্ন সম্পর্কে ভবিষ্যতে কি ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে কমিশন যে সকল নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া দৈনিক "যুগান্তর" লিখিতেছেন: "তাঁহাদের (অর্থাৎ কমিশনের) মতে প্রচলিত আইনের সংশোধন দ্বারা এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাহাতে এই সকল বিষ তৈয়ারীর, মিশ্রণের ও প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের দেহ ও প্রাণ নিরাপদ থাকে। তাহাদিগকে বিষরোধের উপযুক্ত কাপড়ে মুড়িয়া দিতে হইবে। চোখে মোটা চশমা, হাতে রবারের গ্লোভ এবং শরীরে রবারের লম্বা ঝুলওয়ালা জামা পরাইয়া দিতে হইবে; আর কীটঘ্ন প্রয়োগের পরেই আধার ও পিচকারী খুব ভাল করিয়া জলে ধোওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং কাজ করিতে করিতে তাহারা যাহাতে কিছু না খায় কিংবা ধূমপান না করে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল উগ্র কীটঘ্ন তৈয়ারী ও বিক্রয় লাইসেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রণের, ক্রেতাদিগের নাম-ঠিকানা লিখিয়া রাখিবার এবং প্রত্যেক ক্রেতাকে এই সকল জিনিস ব্যবহারের বিপদ ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিকারক কীটঘ্ন আবিষ্কারের জন্য গবেষণার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

"ফলিডলের মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, তখন কোন কোন মহল তীব্র উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট পড়িলেই বুঝা যায় যে, আমাদের মন্তব্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না। তবু ফলিডলের বিষক্রিয়া মাত্র পনর দিন স্থায়ী। ক্ষেতে প্রয়োগ করার পর পনর দিন সে ক্ষেতের ফল, শাক, পাতা না খাইলেই বিপদ কাটিয়া যায়। এদেশের চাষী নিয়ত অভাবগ্রস্ত ও অশিক্ষিত বলিয়াই ভয়। কেননা পনর দিন অপেক্ষা না করিয়াও তাহারা ফল, সব্জী প্রভৃতি বাজারে পাঠাইতে পারে—আর তাহা খাইলেই পৈতৃক প্রাণ লইয়া টানাটানি। তবে ইহার বিষ শরীরে সঞ্চিত হয় না। কিন্তু ক্লোরিণঘটিত গ্যামাক্সিন, বেঞ্জামিন হেক্সোক্লোর প্রভৃতি বিষ শাকসব্জী, ফল প্রভৃতির মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করার পর সঞ্চিত হইতে থাকে—এবং কিছুদিন পরে জীবন লইয়া টানাটানি হয়। সরকারী কৃষিদপ্তর এই সব উগ্র বিষ ক্ষেতে প্রয়োগের জন্য কৃষকদিগের মধ্যে ক্রমাগত প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। অথচ বিষপ্রয়োগের পরবর্ত্তী সতর্কতা সম্পর্কে অশিক্ষিত কৃষকদিগকে সচেতন করিয়া তোলার কোন চেষ্টা নাই। অবিলম্বে ইহা বন্ধ করা উচিত। বড় বড় ক্ষেতে ও খামারে, সুশিক্ষিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধানে এই সব কীটঘ্ন ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অশিক্ষিত ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অচেতন চাষীর মধ্যে ইহা ছড়াইয়া দিলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি অনিবার্য্য; এমনকি কেরালায় ও মাদ্রাজে যে নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পুনরাবর্ত্তনও অসম্ভব নয়।"

নাগা বিদ্রোহ

পাকিস্থানের যোগসাজসে নাগা বিদ্রোহ এখনও চলিতেছে:

শিলং, ১৫ই জুলাই—গত শনিবার উত্তর কাছাড় পার্ব্বত্য অঞ্চলে বালাধন ঘাটির নিকট চেওতোয়ারক্যাপ গ্রামে এক নাটকীয় সংঘর্ষের ফলে আসাম সশস্ত্র পুলিস নাগা বিদ্রোহীদের কুখ্যাত নেতা ও তথাকথিত নাগা বাহিনীদলের অধিনায়ক থুংটিচ্যাংকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। উপদ্রুত নাগা পার্ব্বত্য জেলায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের জন্য পুলিস তিন বৎসর ধরিয়া তাহার খোঁজ করিতেছিল।

পূর্ব্বেকার সংবাদে প্রকাশ, সংঘর্ষের ফলে একজন নাগা বিদ্রোহী নেতা নিহত হয় এবং তিনজন গ্রেপ্তার হয়। তখন হইতে ধৃত নাগাদের মধ্যে একজনকে থুংটিচাং বলিয়া সনাক্ত করিয়া আসা হইতেছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, সংঘর্ষকালে ধৃত অপর একজন নাগা বিদ্রোহী নেতা ফিজোর সেক্রেটারী বলিয়া বর্ণিত পেলহৎসু অঙ্গামী নামে পরিচিত।

আসামে আত্মনির্ভর

আসাম সরকার ও আসামের লোকে নিজের বিষয়ে কতটা তৎপর, নীচের সংবাদে তাহা বুঝা যায়। পশ্চিম বাংলা সরকার সে বিষয়ে পিছনে পড়িয়া আছেন:

শিলং, ১২ই জুলাই—আসামের শিল্প-উপদেষ্টা ও আসাম শিল্প-উন্নয়ন সম্মেলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত খনিজ সম্পদ উপসমিতির সভাপতি শ্রীআর, কে, ত্রিবেদী আজ শিল্পোন্নয়ন সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপসমিতির সুপারিশসমূহ পেশ করেন। তিনি এই তথ্য প্রকাশ

করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আসামে ২৫ লক্ষ টন তৈল শোধনের উপযোগী একটি তৈল শোধানাগার নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ভারত সরকার আসামে মাত্র ৫ লক্ষ টন তৈল শোধনের উপযোগী শোধনাগার নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আসামের তৈল শোধনাগারটি খুব বৃহৎ হইবে এবং এই হেতু দ্বিতীয় শোধনাগার স্থাপনের কোন দরকার হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, তৈল শোধনাগারটি সম্ভবতঃ হয় গৌহাটি, নয় নওগাঁ-এর নিকটবর্ত্তী শিলাঘাটে স্থাপিত হইবে। এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

আসামের খনিজ সম্পদ জরীপ করার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ছয় জন ভূতত্ত্ববিদ্ নিয়োগ করিয়া রাজ্যের ভূতত্ত্ব দপ্তরের শক্তি বৃদ্ধি করিতে উপসমিতি সুপারিশ করিয়াছে।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে ভারতের সকল স্থান হইতে আগত ২ শত শিল্পপতি উপস্থিত আছেন। তাঁহারা গতকাল আসামে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশদ সুপারিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি উপসমিতি নিয়োগ করা হয়।

আসাম ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযাদবপ্রসাদ চালিহা আসামকে খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে উহা দ্রুত শিল্পায়নের সহায়ক। তিনি চা-করদিগকে নিজ নিজ এলাকা খাদ্যে আত্মনির্ভর করিবার সহায়তা করিতে অনুরোধ জানান।

সম্মেলনের সুপারিশগুলি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া রাজ্যের শিল্পাধ্যক্ষ শ্রীকে, ভি, শ্রীনিবাসন আশা ব্যক্ত করেন।

আসাম সরকার কর্ত্তৃক সম্মেলন আহূত হইয়াছে।

পাকিস্থানের কার্য্যকলাপ

পাকিস্থান তাহার ঘৃণ্য পন্থাই চালাইয়া যাইতেছে। আমরা শুধু কথাই বলি:

নয়াদিল্লী, ১১ই জুলাই—আজ ভারত সরকার আসামের ডাউকী এলাকায় পাকিস্থানী সৈন্যের ক্রমাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে এক কড়া প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্থানী হাই-কমিশনার শ্রীজিয়াউদ্দীনকে পররাষ্ট্র দপ্তরে আহ্বান করা হয়। তথায় কমনওয়েলথ দপ্তরের সচিব শ্রী এম জে দেশাই শ্রীজিয়াউদ্দীনের হাতে প্রতিবাদপত্রটি প্রদান করেন।

পাকিস্থানীরা ডাউকীর নিকট জয়ন্তীয়া পাহাড়ে পরিখায় আশ্রয় লইতেছে বলিয়া আসাম সরকারের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়ায় এই প্রতিবাদপত্র দেওয়া হয়। সংবাদে বলা হয় যে, আসাম সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকারের নিকট প্রতিবাদপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

করিমগঞ্জ, ১১ই জুলাই—নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এখান হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত নাটুর (ভারত) নিকটে পাক-সীমান্তস্থিত সশস্ত্র পাকিস্থানী সৈন্যরা আজ ভারতীয় কৃষকগণকে বন্দুকের ভয় দেখাইয়া ভারতীয় এলাকায় অবস্থিত তাহাদের জমিতে ধান কাটার কাজে বাধাদান করে।

সম্প্রতি পাক-সৈন্যরা নাটুর (ভারত) অপরদিকে পাক সীমান্তে পরিখা খনন করিয়াছে।

করিমগঞ্জের ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করেন।

সুরমা সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পাক-সৈন্যরা পরিখা খনন ও ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিতেছে। পাক-সৈন্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে পাকিস্থানী এলাকাতেও পরিখা খনন করিতেছে এবং সীমান্তে পাক-সৈন্য সমাবেশ করিতেছে।

লেবাননের সঙ্কট

গত সংখ্যায় আমরা লেবাননের সঙ্কটের রূপ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্কট সমাধানের কোন সূচনা এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। প্রেসিডেণ্ট চামুনের নেতৃত্বে লেবানন সরকার স্বদেশে কিরূপ সমর্থন হারাইয়াছেন, দীর্ঘ গৃহবিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় তাহাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহীদের প্রধান দাবী প্রেসিডেণ্ট চামুনের অপসারণ (আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই চামুনের কর্ম্মকাল শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি সংবিধান সংশোধন করিয়া নিজের প্রভুত্ব আরও দীর্ঘকাল কায়েম রাখিবার প্রয়াসী)।

লেবানন সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্যতম নিদর্শন গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্য বিদেশী সাহায্য প্রার্থনা। সোভিয়েটের ভয় না থাকিলে হয়ত এতদিনে মার্কিন-ইঙ্গ সৈন্যবাহিনী লেবাননে চলিয়া আসিত। কিন্তু কতদিন তাহারা সোভিয়েটের ভয়ে বিরত থাকিবে তাহা বলা শক্ত। লেবাননের বিদ্রোহীবাহিনীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিশেষ পরিপোষক নহে। লেবাননে পশ্চিমী প্রভুত্ব গেলে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রভুত্ব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে। এই সকল বিবেচনা লেবাননে পশ্চিমী হস্তক্ষেপের বিশেষ অনুকূল—বিশেষতঃ তাঁহারা gun-boat diplomacy-তে অভ্যস্ত। তদুপরি লেবাননের বৈধ-সরকারের আহ্বান রহিয়াছে।

কিন্তু বৈধতার কোন অছিলাতেই বিশ্ব জনমত লেবাননে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ মানিয়া লইবে না। লেবাননে গৃহযুদ্ধ লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—এত দীর্ঘ দিনেও এই যুদ্ধের অবসান না ঘটায় তাহাতে সরকারের অযোগ্যতাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিদ্রোহীদের দাবির পিছনে যথেষ্ট যুক্তি এবং গণসমর্থন রহিয়াছে। এই ব্যাপারে তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপের কোন যুক্তি নাই।

হাঙ্গেরীর হত্যাকাণ্ড

হাঙ্গেরীর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরে নজে এবং তাঁহার অপর তিনজন সহকারীকে সম্প্রতি বুদাপেস্তে অনুষ্ঠিত বিচারের প্রহসনে হত্যা করা হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড এরূপ জঘন্য ব্যাপার যে, অনেক গোঁড়া কম্যুনিষ্টও ইহাতে বিচলিত না হইয়া পারে নাই।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক "নিউ এজ" প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছে যে, এ ব্যাপারে honest difference of opinion থাকিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে মস্কোর কোন ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট পার্টি honest difference of opinion-এর সুযোগ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এরূপ ঘটনা আমাদের জানা নাই।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এই জলজ্যান্ত হত্যাকে কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছে। Honest difference of opinion বলা হইয়াছে যাহাতে দল হইতে বহু লোক সরিয়া না যায় তাহার জন্য। কিন্তু পার্টি হিসাবে নজে এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের সম্পর্কে "বিশ্বাসঘাতক" "দালাল" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে ইহাদের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রথমে কম্যুনিষ্টরা এই হত্যাকাণ্ডটিকে হাঙ্গেরীর "আভ্যন্তরীণ ব্যাপার" বলিয়া যাহারা এই দুষ্কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছে তাহাদের চূড়ান্ত গালাগাল করিয়াছে। পরে জনগণের বিরূপ মনোভাবে সচকিত হইয়া ইহারা স্বীকার করিয়াছে যে, honest difference of opinion থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিয়াছে যে, হাঙ্গেরীর হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা সাম্রাজ্যবাদের প্রচার।

যে দুইজন ভারতীয়—অশোক মেহতা এবং মিনু মাসানীকে উল্লেখ করিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহাদের বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাতে হয়ত আপত্তি তোলা যায় না। কারণ, এই দুইজনের অস্বাভাবিক পশ্চিম-প্রীতি সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ইহারা ছাড়া ভারতের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি হাঙ্গেরীর এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কম্যুনিষ্ট পার্টির কৈফিয়ৎ কি? কি দেখিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি নজের হত্যা সমর্থন করিল?

হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে যাঁহারা ওয়াকিবহাল তাঁহারাই জানেন যে, নজের মৃত্যুদণ্ড বিধানের পিছনে কোন বাস্তব যুক্তি নাই। সরকারী যুক্তি এত দুর্ব্বল যে, এরূপ একজন বিখ্যাত ব্যক্তির বিচার সকলের অগোচরে সংগঠিত করিতে হইল; বিচারের রায় বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রায় বহাল হইল। যে সকল কম্যুনিষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুর নজীর তোলে তাহারা হয়ত ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যায় যে, রোজেনবার্গ দম্পতিকে প্রায় তিন বৎসর কাল বিভিন্ন আদালতে বিচারের সুযোগ দেওয়া হয়। রোজেনবার্গ আমেরিকার একজন সাধারণ নাগরিক। অপর পক্ষে নজে হাঙ্গেরীর গণ-আন্দোলনের একজন প্রবীণ নেতা, জনসাধারণের স্বার্থে তিনি বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও কোন বিচারের সুযোগ দেওয়া হইল না। ইহাই হইল পরমারাধ্য "রুশীয় সমাজতন্ত্রের" বৈশিষ্ট্য। জারের স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা এই মানবতাহীন সমাজতন্ত্র কিরূপে ভিন্ন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন নজেকে হত্যা করিয়া সোভিয়েট এবং হাঙ্গেরীর প্রেস এবং সরকার যে পাশবিক উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে যে কোন ভদ্র মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। ভারতের জঘন্যতম শত্রুর মৃত্যুদণ্ড বিধানের পরও ভারতবাসী এরূপ নারকীয় উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিবে না। এইরূপ অমানুষিক মনোভাব মানুষের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে পরমাণবিক পরীক্ষা

প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রাষ্ট অঞ্চলগুলিতে (ইউ এন ট্রাষ্ট টেরিটোরিস) পরমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে ভারত সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ট্রাষ্টীশীপ কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ট্রাষ্ট দ্বীপপুঞ্জগুলিতে যেন অবিলম্বে পরমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রস্তাবে কোন রাষ্ট্রের নাম করা হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিশেষ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে উল্লেখ করিয়া বলা হয়, যেন মার্কিন সরকার অবিলম্বে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ট্রাষ্ট দ্বীপপুঞ্জগুলিতে পরমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করেন। পরে অবশ্য সোভিয়েট প্রতিনিধি ভারতীয় প্রস্তাবের অনুকূলে সোভিয়েট প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া ল'ন। কিন্তু ভারতীয় প্রস্তাবটিও গৃহীত হয় নাই। ২৬শে জুন ৪-৭ ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। অপর দুইটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

অছি পরিষদে (Trusteeship Council) কর্ত্তৃক ভারতীয় প্রস্তাবটির প্রত্যাখ্যানে ইহাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখনও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের আকর্ষণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রমাণ হইতেছে যে, মার্কিনী প্রতিকূলতা থাকিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত কোন সংস্থাতেই কোন প্রস্তাব পাশ হইবে না। তাহা না হইলে ভারতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতীয় প্রস্তাবটি বিশেষ সতর্কতার সহিত রচিত হইয়াছিল যাহাতে কোন রাষ্ট্র আহত না হয়। কিন্তু চোর না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। মার্কিন প্রতিনিধি ভারতীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া ভারতীয় প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গালাগালি দ্বারা নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই এই ব্যক্তিগত কুৎসাকেই ভারতীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করিলেন।

অছিভুক্ত অঞ্চলগুলি (Trust teritories) কোন রাষ্ট্রের অঙ্গও নয় অথবা উপনিবেশও নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট এই সকল অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন যাহাতে এই সকল পশ্চাদপদ অঞ্চলের জনসাধারণ স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে। স্বাধীনতালাভের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের এই সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত প্রাক্তন জাপানী অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ অঞ্চলে পরমাণবিক পরীক্ষা দ্বারা

অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ধ্বংস এবং জীবন বিপন্ন করিয়াই কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ সকল দেশের অধিবাসীকে স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে? পরমাণবিক পরীক্ষার সমূহ বিপদ সম্পর্কে আজ আর কেহই অজ্ঞ নহে। যদি পরমাণবিক পরীক্ষামাত্রই দোষনীয় হয়, তবে অন্য জাতির দেশে এই পরীক্ষা চালান কি আরও বেশী দোষনীয় নহে? ইহা কি পররাষ্ট্র আক্রমণের সমতুল্য নহে?

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিলে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনী পরমাণবিক পরীক্ষা এশীয়দের পক্ষে বিশেষ ভাবে বিপজ্জনক। প্রশান্ত-মহাসাগরে মার্কিন অধিকারে ৯৮টি দ্বীপ এবং দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে, উহাদের মোট আয়তন মাত্র ৮৪৬ বর্গমাইল। কিন্তু এগুলি এক স্থানে সীমাবদ্ধ নাই, বহুদূরবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যাহার আয়তন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের আয়তনের প্রায় সমান। এই ব্যাপক অঞ্চলে পরমাণবিক পরীক্ষার ফলে এখানকার বহু দ্বীপের অধিবাসীকে ঘরবাড়ী ছাড়িতে হইয়াছে--ইহাদের দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। এই সকল পরীক্ষায় এশিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসী-দের—যেমন জাপানীদের প্রত্যক্ষ ক্ষতি হইয়াছে এবং হইতেছে। যদি তাঁহারা বলেন যে, পরমাণবিক পরীক্ষা এশিয়াতে না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা হউক, তাহাতে কি অন্যায় হয়?

ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তি-ব্যবস্থায় ইটালীর গবর্ণমেণ্ট

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইটালীর গবর্ণমেণ্ট পেণ্টিং-আর্ট, টেকনলজি, মিউসিয়মলজি এবং ফিল্ম-টেক্‌নিকস সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রদের মাসিক ৩৮০ টাকার একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রদের যাতায়াতের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্টই বহন করিবেন।

ছাত্রদের অবশ্য ঐ সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তবে ফিল্ম-টেক্‌নিক শিক্ষার্থী যাঁহারা তাঁহাদের ম্যাট্রিকুলেশন পাস এবং ফটোগ্রাফী ডাইরেক্‌সন প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। এই সব আবেদনকারী ছাত্রের বয়স অনধিক ৩৫ বৎসর হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি এই আনুকূল্য দ্বারা ইটালীর গবর্ণমেণ্ট ভারতকেই সম্মানিত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতীয় ছাত্রেরা ইহাতে আশান্বিত হইবেন।

'মিনিষ্ট্রি অফ সায়েণ্টিফিক রিসার্চ এণ্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স-নিউদিল্লী' এই ঠিকানায় ছাত্রদের আবেদন করিতে হইবে।

রাখালদাস পালধি

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউর' অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কর্ম্মী রাখালদাস পালধি সম্প্রতি প্রায় আশী বৎসর বয়সে হুগলী জেলান্তর্গত নিজ পল্লীভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রথম যৌবনে কানপুর কটন মিলে কর্ম্ম করিতেন। 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি এলাহাবাদে আগমন করেন এবং ইহার কর্ম্মী নিযুক্ত হন। 'প্রবাসী'র পক্ষে এজেণ্টস্বরূপ তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং বহু বাঙালী প্রধান ও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। নিজ অভিজ্ঞতামূলক প্রবন্ধও তিনি প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন। 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ' কলিকাতায় স্থিত হইলে তিনি এই পত্রিকা দুইখানির বিজ্ঞাপন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন এবং অতীব যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য করিয়া বিগত ১৯৪০ সনে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি জীবনে বিস্তর শোকতাপ পাইয়াছিলেন, কিন্তু সবলচিত্তে সকলই অতিক্রম করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র অন্যতম সহকারী-সম্পাদক বিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল প্রায় উনষাট বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর যাবৎ সম্পাদকীয় বিভাগের কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্বীয় চেষ্টাযত্নে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের পূর্ব্বে কয়েকটি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিকী সাহিত্য-প্রীতি একটি পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি এই সময় বহু সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসেন। ইঁহাদের কেহ কেহ এখন বেশ খ্যাতিমান হইয়াছেন। বিজয়েন্দ্র বাবু বেশী লিখিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার পাঠানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি সমালোচনার জন্য এখানে যে সকল পুস্তক, কি ইংরেজী, কি বাংলা আসিত তাহাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হইতেন, এবং ইহা দেখিয়া আমরা বিস্ময় মানিয়াছি। প্রায় প্রত্যেকখানি বই-ই তিনি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। আর এই কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানও জন্মিয়াছিল প্রচুর। সভা-সমিতি-আড্ডা-খেলার-মাঠ কিছুই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না, একমাত্র গ্রন্থ ছাড়া। তাঁহার এই পাঠানুরক্তি দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দ পাইতাম। সব রকম দুঃখ-কষ্টই তিনি এইরূপে ভুলিয়া যাইতে পারিতেন। জগতের কোন রূপ ক্লেশই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেন; যিনি যত বড়ই হউন, খাঁটি কথা বলিতে তিনি কখনও সঙ্কোচবোধ করিতেন না। বিজয়েন্দ্র বাবু ঢিলেঢালা দিলখোলা মানুষটি ছিলেন। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত এমন বহু কথা তিনি আমাদিগকে বলিতেন যাহা অন্যের পক্ষে মোটেই মানাইত না। দীর্ঘকাল সহকর্ম্মীরূপে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল; তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রায় তিন মাস রোগভোগ করিয়া তিনি মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

ঝুলন-যাত্রা

শ্রীসুখময় সরকার

শ্রাবণের মেঘ-মেদুর গগনতলে রাধামাধবের ঝুলন-যাত্রা। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; কেতকী-কদম্বের স্নিগ্ধ সৌরভে দিঙ্মণ্ডল পরিকীর্ণ। তড়াগ-পল্বলে কুমুদ-কহ্লারের নয়ন-বিমোহিনী শোভা। কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর বক্ষে বিপুল জলোচ্ছ্বাস; তরণীবাহী নাবিকের কণ্ঠে ভাটিয়ালী সঙ্গীতের উল্লাস। মেঘের অন্তরালে শুক্লপক্ষের শশীর ম্লান জ্যোৎস্না; ধরাপৃষ্ঠে আলোছায়ার রহস্যময় চঞ্চল লীলা। শ্রাবণের বর্ষা-প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সুন্দর সজল শ্যামল পরিবেশের মধ্যে 'অখিল-রসামৃত-মূর্তি' প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ এবং 'মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী' দোলায় আরোহণ করিয়া দুলিতে থাকেন। 'দোলন' শব্দই রূপান্তরিত হইয়া 'ঝুলন' হইয়াছে। ঝুলনের অপর নাম 'হিন্দোল'। শ্রাবণের শুক্লাএকাদশীতে 'ইন্দ্রাদিদেব-বিহিত' হিন্দোল যাত্রা আরম্ভ এবং শ্রাবণী পূর্ণিমায় হিন্দোল-যাত্রা সমাপন।

যাঁহারা শালগ্রাম শিলায় অথবা কৃষ্ণ-বিগ্রহে বিষ্ণুর নিত্য-সেবা করেন, তাঁহারা ঝুলন-যাত্রার অনুষ্ঠান অবশ্যই করেন। বিশ বৎসর পূর্বে বিষ্ণু-উপাসক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে ঝুলন-পূর্ণিমার সমারোহ দেখিয়াছিলাম। বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ বিশালায়তন সুসজ্জিত নাট-মন্দিরে রৌপ্য-নির্মিত বিচিত্র ঝুলনায় শৃঙ্গার-বেশে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন হইত। বৈষ্ণবের কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর হরিনাম সংকীর্তন ভক্ত-হৃদয় বিগলিত করিত। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোকে পূজার দালান ঝলমল করিত। সন্ধ্যাকালে নহবতে সানাইয়ে পূরবী রাগিণী বাজিত; সেই সুরের মায়াজালে বিশ্বসংসার রহস্যময় বোধ হইত, মানসলোকে ভাবের বৃন্দাবন রচনা করিত। এখন আর সেদিন নাই, আর সেদিন আসিবে না।

অবশ্য ঝুলন-যাত্রা উৎসব এখনও অনেকেই উপভোগ করিতেছেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-বিগ্রহের নিত্যসেবা করেন না, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে রাধাকৃষ্ণের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করাইয়া নৈমিত্তিক উৎসবরূপে 'ঝুলন' করিয়া থাকেন। সুসজ্জিত ঝুলনার উপর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করিয়া বারংবার দোলাইতে হয়। ঝুলন-যাত্রার ইহাই মুখ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বহুবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে স্থানটিতে ঝুলন হয়, সে স্থানটিকে অতি মনোরম করিয়া সজ্জিত করা হয়। চতুর্দিকে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম নয়নাভিরাম বিচিত্র পুষ্পপল্লবের মাল্য দুলিতে থাকে; স্থানে স্থানে কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অধুনা নগরাঞ্চলে ঝুলন যাত্রা উৎসব ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। অনেকেই বৈঠকখানা-ঘরে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে পাল টাঙাইয়া 'ঝুলন' করে। মধ্যস্থলে ঝুলনায় রাধা-কৃষ্ণের চিত্রপট অথবা মৃন্ময় মূর্তি; চতুর্দিকে নানা উপায়ে সৌন্দর্য-সৃষ্টির চেষ্টা। কেহ-বা কৃত্রিম বৃন্দাবন নির্মাণ করে। কোথাও নগর, কোথাও পল্লী, কোথাও অরণ্য, কোথাও প্রান্তর। প্রান্তরে গোপ-বালকেরা গরু চরাইতেছে; তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশী, কাহারও হাতে পাচনী। অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, ময়ূর বিচরণ করিতেছে। কোথাও-বা জলাশয়ে বিচিত্রবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

কৌলিক প্রথানুযায়ী যাঁহারা ঝুলন-যাত্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন কৃষ্ণলীলা কীর্তন করাইয়া থাকেন অথবা যাত্রাগানের ব্যবস্থা করেন। কেহ-বা কৃষ্ণলীলার 'ছবি' নির্মাণ করান। একটা দীর্ঘ চালাঘরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাত্মক নানাবিধ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করাইয়া রাখা হয়; দলে দলে লোক তাহা দেখিতে আসে এবং পুরাণ কাহিনী স্মরণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ আলোচনা করে। পার্বণ-উপলক্ষ্যে এই প্রকার প্রদর্শনীর বিশেষ মূল্য আছে, এগুলি যে লোকশিক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট মাধ্যম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক মাস পুস্তক পাঠ করিয়া লোকে যাহা শিখিতে পারে না, একদিনের পার্বণে যোগদান করিয়া লোকে সেই শিক্ষা পাইতে পারে। পার্বণের অনুষ্ঠাতৃ-গণ ধনবান্ হইলে 'অন্নসত্র' করেন; যে সেখানে যায় সে-ই উদর পূরিয়া খাইতে পায়। ঝুলন-উপলক্ষ্যে কোন কোন স্থানে মেলা বসে; কিন্তু বর্ষাকাল বলিয়া সে সকল মেলায় পণ্য-সমাবেশ ও লোকসমাগম অধিক হয় না। কোন কোন মেলায় 'ঝুলনা' আসে; বালক-বালিকারা দুই-একটা পয়সা দিয়া তাহাতে ঝুলিয়া আমোদ পায়। শ্রাবণের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে মানুষ যে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে তাহার মূল্য অল্প নহে।

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে ঝুলন-যাত্রার এখন আর তেমন সমারোহ দেখা যায় না। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে উত্তর ও মধ্য ভারতে ঝুলন-যাত্রা একটা বৃহৎ উৎসবরূপে গণ্য হয়। বঙ্গদেশে নগরাঞ্চলে যে সকল অবাঙালী রহিয়াছে (এবং তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে) তাহারা আড়ম্বরের সঙ্গেই ঝুলন-যাত্রার অনুষ্ঠান করে। তাহাদের মধ্যে 'ঝুলন-পূর্ণিমা' অপেক্ষা 'রাখী-পূর্ণিমা' নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইদিনে 'রাখী-বন্ধন' তাহাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সেদিন তাহারা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনের মণিবন্ধে প্রীতিবন্ধনের নিদর্শন-স্বরূপ একখণ্ড রঞ্জিত সূত্র বাঁধিয়া দেয়; পাত্রানুসারে প্রণাম আশীর্বাদ-আলিঙ্গনাদি বিনিময় হয়। এখন বাজারে রাংতা ও জরি দেওয়া সুদৃশ্য 'রাখী' কিনিতে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানটির সহিত রাজপুতানার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান নগরে বাঙালীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইতেছে; ইহা অবশ্য মন্দ নহে। যে সকল সংস্কৃতির তাৎপর্য গৌরবজনক, ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে সে সকল সংস্কৃতির আদান-প্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ দেশনেতৃবৃন্দ 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠানের গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু তাৎপর্য না বুঝিয়া কেবল হুজুগের বশে অপরের সংস্কৃতি গ্রহণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করি না। তাহাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের আশঙ্কাই অধিক।

এক্ষণে আমরা ঝুলন-যাত্রা উৎসবের উৎপত্তি অনুসন্ধানে প্রয়াসী হইব। ঝুলন-যাত্রা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অর্থাৎ বাল্য-লীলার অন্তর্গত। মহাভারতে কৃষ্ণ-চরিত কীর্তিত হইয়াছে কিন্তু সেখানে ব্রজলীলার বর্ণনা নাই। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত-পুরাণ, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও দুই-একটা উপপুরাণে বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। উপপুরাণ-গুলিতে হিন্দোল-যাত্রার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে ইহার উল্লেখ নাই। বঙ্গদেশে আমরা রঘুনন্দনের স্মৃতি মানিয়া চলি। রঘুনন্দন মাত্র চারি শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আশ্চর্যের কথা, তিনিও হিন্দোল বা ঝুলন-যাত্রা ধরেন নাই! তবে কি চারি শত বৎসর পূর্বে হিন্দোল বা ঝুলন-যাত্রা হইত না? জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে এই প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য, 'যাহার উল্লেখ পাই না তাহার অস্তিত্ব ছিল না', এরূপ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করিবে না। সকল পুরাণে উল্লেখ না থাকিলেও উৎসবটা নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, বর্তমান আকারে না হইলেও বীজাকারে ছিল, নচেৎ পঞ্জিকাকারগণ ইহার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। আর উৎসবটা একান্ত আধুনিককালের হইলে ইহাতে 'ইন্দ্রাদি দেব-বিহিত', 'গন্ধর্বানুষ্ঠিত' বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারিত না। স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও এই উৎসব যে মানুষের স্মৃতিতে ও অনুষ্ঠানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই উৎসবের প্রাচীনতার মূলে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। যুক্তি না থাকিলে বলিতাম, উৎসবটা নিতান্ত আধুনিক।

ঝুলন-যাত্রা শ্রীকৃষ্ণের; অতএব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে হইবে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহা প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন, ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দাবনে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছিলেন। পুরাণে সে অপূর্ব লীলা পুষ্পিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কিন্তু সেখানে রাধা নাই। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবত-পুরাণেও রাধা নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং দুই-একটা উপপুরাণে রাধাকে পাওয়া যায়। জয়দেবের পর হইতে বৈষ্ণব কবিতায় রাধা আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের পর হইতে বৈষ্ণব-দর্শনে রাধাতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে। অতএব রাধা আধুনিক। কিন্তু কৃষ্ণ প্রাচীন। রক্তমাংসের দেহধারী এক শ্রীকৃষ্ণ যে ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি দ্বারকার রাজা ছিলেন; তিনি পাণ্ডবদের সখা ছিলেন; তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনিই যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় "গীতা" শোনাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাক সে কথা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সকল কি ঐতিহাসিক ঘটনা? দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ কি বাল্যকালে বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত বিহার করিতেন? তিনিই কি পুতনা-অঘ-বক কেশী বধ করিয়াছিলেন? তিনিই কি কালীয়-দমন ও গোবর্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন? বলা বাহুল্য, কৃষ্ণের এই সকল লীলা অপ্রাকৃত, অলৌকিক। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, কোন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এইরূপ অলৌকিক কর্ম করা সম্ভবপর নহে। গর্গ নামে এক জ্যোতির্বিৎ মুনি কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। গর্গ কালযবনের দেশ হইতে জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সে দেশ এক্ষণে কালডিয়া (Chaldea) নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিদ গর্গ কৃষ্ণের নাম লইয়া প্রকৃতপক্ষে সূর্যলীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা সূর্যলীলার রূপক মাত্র। (আচার্য যোগেশ-চন্দ্র-প্রণীত "পৌরাণিক উপাখ্যান" গ্রন্থে "ব্রজের কৃষ্ণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তগণ এমন কথা শুনিলে ক্রুদ্ধ হইবেন।

দার্শনিকগণ একথা শুনিলে বিরক্ত হইবেন। নাস্তিকদের কথা বাদই দিলাম, তাঁহারা বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুরাণকার ব্রজের কৃষ্ণকে স্পষ্টতঃ 'অচ্যুত ভানু', 'প্রজাপতি', 'অদিতিনন্দন', 'উপেন্দ্র' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার লীলাকে "দিব্যং কর্ম" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ব্রজের কৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছেন, সে সমুদয় দেবলোকের ব্যাপার, ভূলোকে কদাপি সংঘটিত হয় নাই। ব্রজের কৃষ্ণ মানব-দেহধারী বিষ্ণু—ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষ্ণুই। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু সূর্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ।" কৃষ্ণ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু। বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্য সূর্য। ব্রজের কৃষ্ণও সূর্য। ব্রজের কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। উভয়েই 'ব্রহ্মণ্যদেব' নামে অভিহিত হন। যে বর্তুলাকার শালগ্রাম শিলায় ব্রহ্মণ্যদেবের অর্চনা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে সূর্যের প্রতিমা। ঋগ্বেদে সূর্যকে বিচিত্রবর্ণ বর্তুলাকার অশ্ম (প্রস্তর)-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজা তথা সূর্যপূজার মূল এইখানেই। বালগোপালের হস্তে যে লড্ডুক থাকে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সূর্যের প্রতীক। পরবর্তীকালে ইহাতে দার্শনিক ব্যাখ্যা আরোপিত হইয়াছে। ঝুলন যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের হয় তাহা নহে। মাহেশে জগন্নাথদেবের ঝুলন হয়; কোন কোন স্থানে রামচন্দ্রের ঝুলন হয়। জগন্নাথ ও রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হয় বলিয়াই তাঁহাদের ঝুলন হয়।

আমরা দেখিলাম, ব্রজের কৃষ্ণ সূর্য। কিন্তু সূর্যের হিন্দোল বা ঝুলন-যাত্রা ব্যাপারটা কি? বৎসরে সূর্যের দুইটি গতি আছে—উত্তরাগতি ও দক্ষিণাগতি। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দুই গতি যথাক্রমে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন নামে অভিহিত হয়। আকাশে সূর্যোদয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সূর্য প্রতি দিন আকাশের ঠিক একই স্থানে উদিত হন না। একদিন (যথা বর্তমানকালে ৭ই চৈত্র) দেখা গেল, সূর্য পূর্ব দিগন্তের ঠিক মধ্যবিন্দুতে উদিত হইতেছেন; পরদিন দেখা যাইবে পূর্ববিন্দুর কিঞ্চিৎ উত্তরে সূর্যোদয় হইতেছে। এইরূপে তিন মাস ধরিয়া ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ উত্তর দিক্ চাপিয়া সূর্যের উদয় হইতে থাকে; অবশেষে ৭ই আষাঢ় সূর্যের এই উত্তর-গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং পরদিন হইতে দক্ষিণ গতি অর্থাৎ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। উত্তর-গতি শেষ এবং দক্ষিণ-গতি আরম্ভের সময় মনে হয় সূর্য যেন কম্পিত হইতেছেন, যেন দোলায় আরোহণ করিয়া দুলিতেছেন। দক্ষিণায়ন আরম্ভ কালে সূর্যের এই আন্দোলন কবি-কল্পনায় সূর্যরূপ কৃষ্ণের হিন্দোল বা ঝুলন-যাত্রা। আবার দক্ষিণায়ন-শেষে যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, তখনও সূর্য দোলায় আরোহণ করেন। দোলযাত্রায় এই ব্যাপারই দ্যোতিত হইয়া থাকে।

হিন্দোল বা ঝুলন-যাত্রা যে সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ সূচিত করে, তাহার পক্ষে আরও পোষক প্রমাণ আছে। পঞ্জিকায় হিন্দোল-যাত্রাকে 'ইন্দ্রাদিদেববিহিত' এবং 'গন্ধর্বানুষ্ঠিত' এই দুই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ( ) দক্ষিণায়ন-দিনে সূর্যের যে শক্তি বৃষ্টি আনয়ন করেন তিনিই ইন্দ্র। একাধিক প্রবন্ধে আমরা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ঋগ্বেদের যুগে দক্ষিণায়ন-আরম্ভের প্রাক্কালে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। ইন্দ্রদেব অবগ্রহ বিনাশ করিয়া যজমানদের জন্য মঙ্গলদায়িনী বারিধারা বর্ষণ করিতেন। দক্ষিণায়ন-দিনের সহিত ইন্দ্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অতএব তিনি যে বিষ্ণুর হিন্দোল-যাত্রার বিধায়ক হইবেন, তাহা সর্বতোভাবেই স্বাভাবিক। (২) দক্ষিণায়ন-দিনের সহিত গন্ধর্বদেরও সম্পর্ক আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, দক্ষিণায়ন-দিনে শুষ্ক মৃত্তিকার উপর বারিপাত হইলে যে সোঁধা গন্ধ উঠে, তাহাই গন্ধর্বদের বস্তুগন্ধ কল্পিত হইয়াছিল ('বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে উর্বশী-প্রকরণ দ্রষ্টব্য) অতএব দক্ষিণায়ন-দিনে গন্ধর্বেরা মিলিত হইয়া বিষ্ণুর হিন্দোল-যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এই কল্পনা অবান্তর নহে। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, দেব-বিহিত ও গন্ধর্বানুষ্ঠিত উৎসব ভূলোকে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং যে কৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা হয়, তিনি মানুষ নহেন, দেবতা। তিনি সামান্য দেবতা নহেন, সুর নর গন্ধর্ব বন্দিত ভগবান বিষ্ণু। (৩) পঞ্জিকায় শ্রাবণ মাসের শেষ দিবসে একটি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। সৌরমাস গণনায় শ্রাবণের শেষ দিবস ধরা হইলেও ইহা প্রাচীন চান্দ্রগণনার শ্রাবণ-পৌর্ণমাসীরই ইঙ্গিত করিতেছে। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় বিষ্ণুর একটি 'পদ' কল্পিত হইয়াছিল; সেদিন নিশ্চয় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। প্রবন্ধান্তরে আমরা এ বিষয়টি বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

বিশেষ একটি দিনে সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, কিন্তু ঝুলন যাত্রা পাঁচদিন ধরিয়া হয় কেন? ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। (১) বর্তমানকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে; পঞ্জিকা নির্মিত হইয়াছে; আমরা অক্লেশে দক্ষিণায়ন-দিন নির্ণয় করিতে পারি। প্রাচীনকালে যখন পঞ্জিকা ছিল না, তখন ঠিক কোন্ দিনটিতে দক্ষিণায়ন হই-তেছে জানা যাইত না বলিয়া কয়েক দিন ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইত। ঝুলন-যাত্রার পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবে সম্ভবতঃ সেই তথ্যই সূচিত হইয়াছে। (২) অতি

প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, সৌর বৎসর ৩৬৫ দিনে সম্পূর্ণ হয়। বৎসর আরম্ভের পূর্বে পাঁচটা দিন তাঁহারা 'সত্রে'র অনুষ্ঠান করিয়া কাটাইতেন। সম্ভবতঃ এককালে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন-যোগে নববর্ষ আরম্ভ হইত এবং তৎপূর্বে পাঁচদিন ধরিয়া লোকে আমোদ-আহ্লাদ করিত। ঝুলন-যাত্রার পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবের মূলে এই অনুমানও অসঙ্গত নহে।

কতকাল পূর্বে শ্রাবণী পূর্ণিমায় সূর্যের দক্ষিণায়ন হইত? সামান্য জ্যোতির্গণিতের সাহায্যে সে কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়। বর্তমান কালে ৭ই আষাঢ় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্যের দক্ষিণায়নের দ্যোতক হিন্দোল-যাত্রা হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। শ্রাবণী পূর্ণিমা শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে ধরিতে পারি (এ বৎসর শ্রাবণ মাসটা মলমাস হওয়ায় ঝুলন পূর্ণিমা ভাদ্র মাসে পড়িয়াছে)। অতএব দক্ষিণায়ন-দিন সেই প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি ১ মাস + ২৩-২৪ দিন = ১$\frac{৩}{৪}$ মাস পশ্চাদ্গত হইয়াছে। অয়নাদি এক মাস পশ্চাদ্গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। ১$\frac{৩}{৪}$ মাস পশ্চাদ্গত হইতে ২১৬০ × ১$\frac{৩}{৪}$ = ৩৭৮০ বৎসর লাগিয়াছে। অতএব আনুমানিক ৩৮০০ বৎসর পূর্বে, খ্রী পূ ১৮০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত। হিন্দোল যাত্রা তাহারই স্মৃতি।

এই কাল অন্যরূপেও পাওয়া যাইতে পারে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় চন্দ্র থাকেন শ্রবণা নক্ষত্রে। পূর্ণিমার দিন চন্দ্র ও সূর্যের ব্যবধান হয় ১৮০° অংশ। শ্রবণা হইতে ১৮০° অংশ দূরে মঘা নক্ষত্র। অতএব সেদিন সূর্য মঘানক্ষত্রে থাকেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, সূর্য সেকালে মঘানক্ষত্রে থাকিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। বর্তমানকালে সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। অতএব অয়ন-স্থান তদবধি ৪ নক্ষত্র ভাগ পশ্চাদ্গত হইয়াছে। অয়ন-স্থান এক নক্ষত্র ভাগ পশ্চাদ্গত হইতে ৯৬০ বৎসর লাগে। সুতরাং ৯৬০ × ৪ = ৩৮৪০ বৎসর পূর্বে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত। উভয় গণনায় ৬০ বৎসরের পার্থক্য হইল, ইহা অগ্রাহ্য; কারণ, ইহা স্থূল গণনা। যাহা হউক, ঝুলন-পূর্ণিমায় খ্রী-পূ ১৮০০ অব্দের আর্য সংস্কৃতির গৌরবময় স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। খ্রী-পূ ১৪৪২ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে জীবিত ছিলেন। তখন অয়নাদি দিনকয়েক পশ্চাদ্গত হইলেও, মনে হয়, শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই দক্ষিণায়ন ধরা হইত। গর্গমুনি ইহার বহুকাল পরে কৃষ্ণের নামে সূর্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা আনুমানিক খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। কিন্তু কবিতার ইন্দ্রজালে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ ও দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ একাকার হইয়া গিয়াছেন।

আবার যেতেছি ফিরে

শ্রীকরুণাময় বসু

আবার যেতেছি ফিরে গ্রামান্তের সরু পথ ধরে
বিদেশ বিভুঁই দেশে, যেথা রুক্ষ কঙ্কর-প্রান্তর ;
যেখানে দীঘির জলে রূপকথা চাঁদ ভাসে নাক',
পাতিহাঁস চোখ বুজে খোঁজে না ত সবুজ শ্যাওলা।

চলে যাই, ফিরে চাই, বকুলের ঘন ছায়াবন
হেলায়ে ফুলের শাখা ছায়ামাখা ডাক দিয়ে যায় ;
হৃদয়ে বিকেল নামে, গন্ধভরা ঘুমানো বিকেল :
যুঁইফুল উড়ে যায় এক ফোঁটা সাদা পাখা মেলি।

কোথায় আমার দেশ, কালোজলে কাজল প্রহর,
কলাবনে কুঁড়েঘর চাঁপাগন্ধে সুরভিত রাত ;
নিঝুম স্বপ্নের মত এঁকে যায় পরীর নিশ্বাস,
তার পর ভোরবেলা ফুটে ওঠে পদ্মকুঁড়ি-দিন।

আকাশে হাঁসের সারি, ঘন বনে ফুলের পশরা,
সোনালি রৌদ্রের রঙ, গোধূলিতে ঘুমের কাজল,—
সেই ত আমার দেশ চেয়ে আছে কত কত দূরে :
নির্জন মুঠোয় ভরি দিয়ে গেল মায়ের সান্ত্বনা।

সাহসিকা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈঠকখানার একধারে বসে একখানা বই পড়ছিলাম—ওরা অন্য ধারে বসে মৃদুস্বরে গল্প করছিল। ওদের সামনে পড়ে ছিল খবরের কাগজখানা। পৃষ্ঠাগুলিতে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে যে যার খুশীমত অংশগুলো বেছে নিয়ে পড়েছে। এখন তারই জের টানছে গল্পে। ওরা সবাই তরুণ, সিনেমা আর খেলার বিবরণ ওদের সবচেয়ে প্রিয়, রাজনীতি আর সাহিত্যচর্চ্চাও করে. কলেজ বা কর্ম্মজগৎও বাদ যায় না। মৃদু আলোচনার সুর চড়ে উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তখন—আমার কথা ওদের মনে থাকে না।

আজ কোলাহল উঠতেই বুঝলাম প্রসঙ্গটা উপরোক্ত কোন জাতীয় নয়, তর্কের বিষয়বস্তু হ'ল সেকাল আর একালের মেয়েদের শিক্ষা আর সাহস নিয়ে। ওদের মোটা-মুটি ধারণাটা এই—দিনদুই আগে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা নাকি সেকালে কল্পনাও করতে পারত না কেউ। সেকালের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা ছিল পুরুষের ভারস্বরূপ। তাঁদের প্রতি পদক্ষেপে জড়তা, আচার-আচরণে ভীরুতা, লজ্জা আর মূঢ়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত অজস্র। অন্তঃপুর-টুকুই ছিল তাঁদের স্বাধীন বিচরণভূমি, তাও আবার গুরুজন-কণ্টকিত বলে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ছায়াময়। কোনদিন সূর্য্যগ্রহণ হলে দিনের আকাশে কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করার অবকাশ ঘটত না। এদের নিয়ে একটা সতক প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছিল, পথি নারী বিবর্জ্জিতা। পথে এরা ভারস্বরূপ, বিঘ্নের কারণ।

কিন্তু এ যুগের মেয়েরা? অন্তঃপুর অথবা অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে দুই জগতের সীমানা দিয়েছে বাড়িয়ে। বাইরের জগতে এদের বর্জ্জন করবে এমন পুরুষ দুর্লভ, এরাই পুরুষ-সঙ্গ বর্জ্জন করে চলে। এবং যে ধৃষ্ট পুরুষ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ এদের দুর্ব্বল পক্ষ মনে করে তাদেরই ঘটে লাঞ্ছনা। যেমন সম্প্রতিকার ঘটনাটি।

ট্রামের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে অশিষ্ট আচরণ করেছিল একটি যুবক। মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার না করে স্বহস্তে প্রতিবিধান করেছিল নিজের পায়ের স্যাণ্ডাল খুলে।

সেকালে এমনধারা ব্যাপার কল্পনা করতে পারত কি কেউ? দাদু আপনি কি বলেন?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ঠিক বলেছিস ভাই, সেকালের মেয়েরা এমনটি পারতেন না।

তা হলেই দেখুন—তাঁদের সাহস ছিল না। রণেন হেসে উঠল।

বললাম, না ভাই, সাহস তাঁদের ছিল?

রণেন বলল, মানে?

মানে স্যাণ্ডাল পড়ার রেওয়াজ ছিল না ত, এমন ধারা ঘটনা ঘটবে কেমন করে!

ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, শিক্ষার সাহসে একালের মেয়েরা—

বাধা দিয়ে বললাম, পুঁথিপড়া বিদ্যা যদি সম্পূর্ণ শিক্ষার মাপকাঠি হয় তা হলে তোদের কথা মানি।

তর্কের গন্ধ পেয়ে ওরা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর।

কেন—ওটা কি শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড নয়?

অস্বীকার করছি না—তবে সম্পূর্ণ শিক্ষাও নয়। পুঁথির জগতের সঙ্গে প্রতিদিনের জগৎকে এক করে দেখার শিক্ষাও আছে—যা নাকি আজকাল বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়ের চোখ এড়িয়ে যায়। আর তাইতেই বাড়ে দুঃখ।

আপনার তত্ত্বকথা রাখুন। মেয়েরা আজকাল পুরুষের উপার্জ্জনের মুখ চেয়ে থাকে না—তারা পুরুষের সহকর্ম্মিণী, কেয়া বলল।

বললাম, টাকা উপায় করছে মানি, সংসার গড়ে তুলতে পারছে? তা ছাড়া বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে অল্পদিন।

এই ত সেদিন বেথুন কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেল, কেয়া বলল।

তাতে এমন কিছু প্রমাণ হয় নি যে, ইস্কুলের শিক্ষা না পেয়েও মেয়েরা শিক্ষিতা হতে পারতেন না। আর একশ' বছরে ক'টি মেয়েই বা শিক্ষিতা হয়েছেন?

এই মন্তব্যে ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, তর্কের খেই হারিয়ে ফেলল। বলল, আপনি সেকালের লোক, নিজের কালটাকেই বড় করে দেখছেন। জানি ত এখনই দু'চারটে বৈদিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ের নাম করবেন।

হাসলাম।

হাসছেন যে—মিথ্যে বলেছি কি?

সেজন্য হাসি নি, একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এই বাড়ীর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে—যিনি নামসই করতে জানতেন না অথচ পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসারটিকে সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

কে—কে তিনি? কৌতূহলীর দল সরে এলো এ ধারে।

আমার ঠাকুমা—তোদের বৃদ্ধা পিতামহী।

বলুন না তাঁর গল্প।

শোন্ তবে :

এ গল্পের বয়স কিন্তু অনেক। তখন বেথুন কলেজ ছিল—অল্পস্বল্প মেয়েরা পড়ত৪—তা নিয়ে প্রথমটা হৈচৈ হয়েছিল, পরে খ্রীষ্টানী কাণ্ড বলে সেই ঘটনাকে আমল দেয় নি সাধারণ গৃহস্থ। তখনকার দিনে এর চেয়ে বড় ঘটনা ছিল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, আশ্বিনের ঝড় বা জ্যৈষ্ঠের প্রবল ভূমিকম্প, বুয়র ইংরেজে যুদ্ধ কি পোর্টআর্থার নিয়ে রুশ-জাপানের লড়াই—এসব আলোচনাও হ'ত। আবার এসবকে ছাপিয়ে কার্জনের রাজনৈতিক ছুরি বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করে ফ্যাসাদ বাধিয়েছিল আর জড়নিদ্রা ভেঙে বাংলা জেগে উঠে বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিল। তার পর থেকে ভারতবর্ষে একটা-না-একটা উৎপাত লেগেই রইল। কিন্তু মেয়েদের জগৎ আলাদা। সেকালে জুতো-পায়ে সেমিজ পরা চশমা চোখে ছাতা-হাতে মেয়ে দেখলে বিজাতীয় বলে আমাদের অন্তঃপুরিকারা শতহস্তেন হতেন—ঘোমটার ইঞ্চি ফুট মেপে মেয়েদের সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়া হ'ত—আর বেশী লেখাপড় শিখলে নারী দুর্ভাগিনী হয় এ প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস ছিল অটল। অথচ সেই সময়ে আঠার বছরের একটি শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী ঘোমটা খসিয়ে হাট বাজার করছে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছে, হাঁকডাক করে নিজের সম্ভ্রম সম্পত্তি রক্ষা করছে—ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে—এটা ভাবতে পারিস? ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে না কি—সমাজপতিরা এ হেন মেয়েকে খাতির করে চলছেন, ঘোমটা খসানোর বা পথেঘাটে বেরুনোর মাশুল আদায় করে নিচ্ছেন না—তাকে একঘরে করার মৃদু সতর্কবাণীটুকুও উচ্চারণ করতে পারছেন না!

মন্দ লোক পিছনে লাগে নি কি, কিন্তু একদিন রাজরাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার পেটে পা দিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে একদিন ঠাকুমা বলেছিলেন। বলার সময় তাঁর লোল চামড়া টান্‌টান্ হয়ে উঠেছিল, দু'চোখে কলহ-নিপুণার উদ্ধত ভঙ্গি স্পষ্ট হয়েছিল।

সত্যই পাড়ায় ওর দুর্নাম ছিল কুঁদুলি বলে। গুমোট গ্রীষ্মে হাওয়া পাওয়ার আশায় সেকালের মানুষরা আর দুটি কোন্দলপরায়ণা মেয়ের সঙ্গে ওর নামটিও যোগ করে নিত।

কিন্তু আঠার বছরের কুলবধূ কেমন করে রুদ্রাণী হলেন! ঠাকুমার মুখেই শোনা কথা :

ওর মুখ-অগ্নি করতে শ্মশানে নিয়ে গেল। কোলে দুটি নাবালক—বড়টির বয়স পাঁচ পোরে নি। পাঁচ পুরলে সেই সন্তানের কাজ করতে পারত। নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না, পড়শীরা ছেলে দুটিকে আগলাবার ভার নিল, আমি দু'মাইল ভেঙে শ্মশানে চললাম।

সেখানে হাতের নোয়া খুলে নিলে—সিঁথির সিঁদুর মুছে দিলে—পেড়ে কাপড় ছাড়িয়ে সাদা থান পরালে। আঠারো বছরেই মনে হ'ল পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলাম। সঙ্গে যে পুরুষ-কেঁধোরা ছিল ওদের মতই শক্তসমর্থ—দয়ামায়াহীন। আগুনে এয়োতি পুড়ে গেল—লজ্জামান সব পুড়িয়ে দিলাম সেই সঙ্গে। নাবালক মানুষ করতে হবে—আমাকে ঘরে বসে থাকলে হবে না। যিনি মাথায় ছাতা ধরবেন—তেমন আত্মীয় শ্বশুরকুলে কেউ নেই—বাপের বাড়ীতে সে সব চুকে বুকে গেছে। মানুষ হয়েছি বড়মানুষ মামার বাড়ীতে। তাঁরাও একে একে চলে গেছেন দূর দেশে—ভিটে শুধু পড়ে আছে। সাধে কি আর মুখ ধরতে হয়েছে। কথায় বলে :

দুর্জ্জনকে নাহি পার,
দূর থেকে নমস্কার।

পথ দিয়ে চলে গেলে ওরা দূরে সরে যেত।

এ আর এমনকি সাহসের কথা! নিজের গাঁয়ে—চেনাশোনা লোকের মাঝে—এ ত সবাই পারে। ওরা হাসল।

পারে বইকি, সাহস থাকলে সবাই পারে। তবে রাত্তিরে একখানা বড় দা শিয়রের কাছে থাকত—কখন কি হয় বলা যায় না ত। আমিও একদিন ঠাকুমাকে ওই ধরণের প্রশ্ন করে এমন উত্তর পেয়েছিলাম।

বললাম, সে ছিল ইংরেজ শাসনের মধ্যযুগ—দেশজোড়া চোর-ছ্যাঁচড় ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত।

তা একলা মেয়েমানুষ সহায়সম্বলহীন, কেমন করে ছেলে দুটিকে মানুষ করলেন? ওরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

সেইটেই ত সাহসের কথা। একটা বড় নীলকুঠির খাজনা পেতেন বছরে বছরে। তা এমন দুর্দ্দান্ত সায়েবরা—সহজে খাজনা দিত না। ঠাকুরদা ছিলেন ভীতুলোক—সাহেবদের চাবুক আর কুকুর দেখে ক'বছর ও-মুখো হন নি, মোটা টাকা খাজনা পাওনা ছিল। ঠাকুমা ঠিক করলেন ওই খাজনা আদায় করতেই হবে, না হলে দুটি কচি-ছেলে নিয়ে কি শুকিয়ে মরবেন?

কালাশৌচ গেলে পাঁচ বছরের ছেলে বাবাকে নিয়ে চললেন নীলকুঠির খাজনা আদায় করতে। সবাই বারণ করল, যেয়ো না। তোমার বয়স কম, রূপ আছে, শেষকালে কি বিপদে পড়বে! ঠাকুমা বললেন, এমনিতেও মরণ, অমনিতেও মরণ—দেখি না বেয়ে-ছেয়ে কি হয়।

পেট-কোমরে একখানা ছুরি গুঁজে নিয়ে কুঠীর দিকে চললেন। বেশী দূরে নয়—গ্রাম ছাড়িয়ে একখানা বড় মাঠ, তার পর সামান্য বন—তার পরেই কুঠী। বনের মাঝ বরাবর এসে ভয় হ'ল যদি অত্যাচার করে সায়েব! পাঁচ বছরের ছেলেটাকে ধরে আছাড় দেয়? কি কুকুর লেলিয়ে দেয়? কি তাঁকেই বেইজ্জৎ করে? দুরুদুরু বুকে বনের শেষে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ তলায় এসে দাঁড়ালেন। হাতে চরকুট দিয়ে বেশ করে শিখিয়ে দিলেন ছেলেকে, সায়েব যদি জিজ্ঞেস করে কি চাও—কি বলবি?

খাজনা দাও। সপ্রতিভ ভাবে বলল ছেলে।

বলবি—আর কাগজখানা তার হাতে দিবি—কেমন?

দেব।

ভয় করবে না ত?

না। হেসে ঘাড় নাড়ল ছেলে।

ছেলে এগিয়ে গেল ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কুঠিটা সামনেই—কিন্তু ছেলেমানুষ কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে না চলে যায়। একটু পরে কুকুর ডেকে উঠল, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। উঁকি মেরে দেখি—কুঠির বারান্দায় দুটো লালমুখো সায়েব এসে দাঁড়াল। কি যেন বলল হাত নেড়ে। কুকুরের ডাক থামল—সায়েবরা হাসতে লাগল। তার পর দেখি—সেই বারান্দায় অবু আমার সায়েবদের কোলে। দেখ—মুখ রেখেছেন ভগবান, ওরা আদর করছে ছেলেকে।

অবু ফিরে এল—সঙ্গে একজন বাগদী পাইক। আমার মনে গড় হয়ে বলল, মা-ঠাকুরোণ—ধন্যি ছাওয়াল বটে, সব ট্যাকা সুদে-আসলে উশুল করেছে সায়েবদের কাছে। ঐ দেখেন পেট-কোঁচড়ে বাঁধা এক কাঁড়ি ট্যাকা—তেনাদের হুকুম বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে। আর এক মণ চাল, কটা রুইমাছ, এক হাঁড়ি মণ্ডা। একটুখানি দাঁড়াও মা-ঠাকুরোণ এগুলো রোয়াকে থুয়ে এয়েছি—চট্ করে নিয়ে আসি।

কিন্তু ফি বছর ত এত পাওনা হবে না—কাজেই অন্য উপায় বার করলেন। বাড়ীর চারদিকে একতলা সমান পাঁচিল ছিল—সেগুলো ভেঙে ইট বেচতে লাগলেন। সব টাকা সংসারে খরচ করলেন না, ওরই মধ্যে কিছু রেখে, জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতে লাগলেন। তা ছাড়া ফুলে নবলায় বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান ছিল মামাদের—ভূতে লুটেপুটে খাচ্ছিল—উনি মাঝে মাঝে গিয়ে বিলি-বন্দেজ করে যা আদায় করলেন—সেও মন্দ নয়। উপরিলাভ ফলপাকুড়টা।

আমি তখন ন'বছরের ছেলে—বাবা বিদেশে চাকরি করতেন। বদলির চাকরি বলে বাড়ীতে রেখে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মা থাকতেন বাসায়—একা ঠাকমার নয়নমণি হয়ে দিন কাটছিল বেশ। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ হলে ঠাকুমা বললেন, চ' ভাই নীলু, আজ আমরা ফুলে নবলা যাই। আমবাগান জমার টাকাটা আদায় করে নিয়ে আসি আর ফলপাকুড় যা দু'একটা পাই।

আমাদের গ্রাম থেকে পাকা দু'মাইল ফুলে নবলা। এখন যে ফুলিয়া দেখছিস ষ্টেশনের ধারে—ওটা আসল জায়গা নয়। সে হ'ল গিয়ে শান্তিপুরের দিকে উজিয়ে এক মাইল। তার পর বড় রাস্তা থেকে বনবাদাড় ভেঙে আরও আধ মাইল যেতে হয়। সেখানে আসল গঙ্গার খাত রয়েছে—যবন হরিদাসের সাধন গোফা রয়েছে—আর রয়েছে ভাঙা ইটের স্তূপ—বাঘ লুকুনো জঙ্গল। যেবার মহামারীতে উলো শ্মশান হ'ল—হালিশহর উৎসন্নে গেল—সেবার ফুলিয়াও শেষ হ'ল। মহামারী এই লাইনটা ধরে গঙ্গার কোল ঘেঁষে বরাবর এগিয়েছিল কিনা।

আপনি বড় বাজে বকেন দাদু। আপনার ঠাকুমার সাহসের গল্প করতে করতে ইতিহাসের মধ্যে সেঁধুলেন।

সেঁধুই কি সাধ করে—একটার সঙ্গে আর একটার সম্বন্ধ যে টেনে ছাড়ানো যায় না। কৃত্তিবাস বলেছেন—গ্রামরত্ন ফুলিয়া—সেটা শ্রীচৈতন্যদেবেরও আগেকার কথা। তখনকার দিনে বড় বড় বাড়ীঘর লোকজন এসব ত ছিলই, আরও ছিল ফুলিয়ার কৌলীন্য, যার থেকে হয়েছিল ফুলে মেলের উৎপত্তি। অনেক শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ বাস করতেন সেখানে। কিন্তু আমি যেবার প্রথম ঠাকুমার সঙ্গে সেখানে যাই—এই ধর পঞ্চাশ বছর আগে—সগরে মাঠের মাঝে পথ হারিয়ে এমন হয়রাণ হয়েছিলাম—যাতে মনে হয়েছিল এমন বনপুরীতে মানুষ কেন যে থাকে; আসেই বা কেন! গ্রীষ্মকালের রাতে বাঘের ডাক শুনেছিলাম।

আমরা বড় রাস্তা থেকে নেমে চাপাডাঙার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম সোজা হবে বলে, ভাগ্যদোষে মাঠের মাঝখানে অকূল পাথারে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে পা টন্‌টন্ করতে লাগল—চোখেও প্রায় জল এসে গেল।

ঠাকুমা বললেন, তাই ত রে নীলু, পথ হারালাম মনে হচ্ছে। মাঠে একটিও লোক নেই—কাকে বা জিজ্ঞেস করি! বেশ করে ঠাহর করে দেখ ত—চার-পাঁচটা তাল-গাছ এক জায়গায় গোল হয়ে আছে কোন্ দিকে? ওই দিকেই ফুলে।

বাড়ী থেকে বেরিয়েছি বেলা দশটায়—তখন দুপুর উৎরে গেছে—আমাদের ছায়া পূবদিকে লম্বা হয়েছে। আর কিছু-ক্ষণ ঘুরলে পরে মাঠের মাঝখানেই সন্ধ্যা হবে—ইহজীবনে

মাঠ পার হতে হবে না। প্রাণপণে চোখ মেলে দেখতে লাগলাম—কোথায় গোল হয়ে বৈঠক বসিয়েছে গুটিকয়েক তালগাছ। তালগাছ ত ছড়িয়ে আছে মাঠময়—তাই দিয়ে নিশানা ঠিক করা সোজা নাকি ?

অবশেষে চীৎকার করে উঠলাম, উইযে—তিনটে তাল-গাছ গোল হয়ে আছে এক জায়গায়—

ঐ—ঐ—ঐ হ'ল ফুলে নবলা। ঠাকুমা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

কিন্তু তিনটে যে।

ওই হ'ল—আর দুটো কে কেটে নিয়েছে—কি পড়ে গেছে। চ' ওই দিকে।

যাব কি করে সিজগাছের বেড়' যে।

বেড়া গলে যেতে হবে—দেখ কোথায় ফাঁক আছে। ঘুরে গেলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

তাই গেলাম। আগে ঠাকুমা—পিছনে আমি। কচার বেড়া—সিজের বেড়া—কঞ্চি-বাখারি এমনকি শেয়াকুল কাঁটা সব ঠেলেঠুলে সোজা তালগাছ লক্ষ্য করে চললাম। কাঁটায় গা-হাত ছড়ে গেল, কাপড় আটকে যেতে লাগল, ছিঁড়ে গেল, কত কাঁটা ফুটল পায়ে। কিন্তু পিছনে তেড়ে আসছে অন্ধকার—সে পৌছবার আগে আমাদের পৌঁছতে হবে গ্রামে।

শেষ বেড়া টপকে একটা নয়নজুলি তার পরেই চওড়া কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ধারে একটা লোক কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে। আমরা পগার ডিঙিয়ে তার সামনে পড়েছি সেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

লোক দেখে অকূলে কূল পেলেন ঠাকুমা। হাঁ বাবা, ফুলের পেরতাপের বাড়ী যাব কোন্ দিকে ?

লোকটা কাস্তে মাটিতে ফেলে টপ করে হাঁটু গেড়ে বসল। ঠাকুমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, মা ঠাক্রোণ সহসা এলেন—একখানি পত্তোরও যদি দেতেন ! আহা বড্ড ক্লেশ হয়েছে।

ওরা হেসে উঠল। উঃ—এতও নকল করতে পারেন দাদু। ওরা বুঝি অমনি সাধুভাষায় কথা কয় ?

যদি কখনও যাস পাড়াগাঁয়ে মিশিয়ে দেখিস। শুধু সাধু-ভাষায় কথা কয় না, এমন তত্ত্বকথা বলে যা বড় বড় সাধকরাই শুধু জানেন। যাক, ঠাকুমা বললেন, বাঁচালি বাবা। তা এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

বাড়ী যাচ্ছি—আসেন এজ্ঞে। ইটি ?

নাতি।

ওঃ, তা বেশ, বেশ। দাদামশায়দের তালুক-মুলুক দেখে শুনে নিক—তেনারা ত এমুখো হন না।

প্রতাপের মাটির দাওয়া—খড়ে-ছাওয়া ঘর। উঠোন আছে—বাড়ীর তিন ধারে বেড়া। রাংচিতার নড়বড়ে বেড়া —গরু-ছাগল ঠেকাবার জন্য, বাঘ-হরিণের পক্ষে বাধা নয়। উঠোনে একটা মস্ত উনুন তাতে প্রকাণ্ড একটা তোলো হাঁড়ী চাপানো, ধান সিদ্ধ হচ্ছে—উঠোনের চাটাইয়ে বিছান সিদ্ধ ধানের রাশি। ঢেঁকিশাল দেখলাম, গোয়াল দেখলাম। আর দেখলাম বন। একধারে বাঁশঝাড়—হাওয়ায় বাঁশ নুয়ে শব্দ হচ্ছে কট—কট-কটাস। অন্য ধারে ডোবামত পুকুর একটা—তাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম চলে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—চারিদিক নিশুতি হয়ে আসছে। মানুষজন আছে বনের ফাঁকে ফাঁকে। বনটাই ঘন—মানুষ-জন নজরে পড়ে না।

আগে এমনটি ছিল না—ঘনবসতি ছিল গ্রামে। এক বাড়ির ছাদে উঠলে প্রায় সারা গ্রামটা ঘুরে আসা যেত ঐ ছাদে ছাদে। কত টোল পাঠশালা—দোল দুর্গোৎসব—বার মাসে তের পার্ব্বণ। সোনার ফুলে ছিল।

গল্প করতে করতে ঠাকুমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। প্রতাপও চোখ মুছছে। বলছে, গেরামের সে বোলবোলাও দেখিনি মা ঠাক্রোণ, তবে শুনেছি। তা আমরাও কম দেখিনি। সে সব বা কমনে গেল !

অতীত নিয়ে দুজনে গল্পের জাল বুনতে লাগলেন। ঐশ্বর্য্য আর বেদনার রঙে তা অপরূপ হয়ে উঠল। সে গল্প শুনতে শুনতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় মামাদের আমবাগানে নিয়ে গেলেন ঠাকুমা। শোনালেন এক-একটা গাছের কথা। খানদানি সব গাছ—মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, দ্বারভাঙ্গা কোন্ দেশ বা বাদ পড়েছে। কত যত্নের বাগান—এখন হতশ্রী। একটা হেলানো কাঁঠালগাছে অজস্র ফল ফলেছে। ঠাকুমা গাছ-কোমর বেঁধে গাছে উঠলেন।

বলেন কি—গাছে উঠলেন ! ওরা হেসে উঠল।

হাঁ—সব দিকেই চৌকস ছিলেন ত। গাছে উঠে দুমদাম করে এঁচোড় পাড়তে লাগলেন।

বললাম, এত এঁচোড় কি হবে ঠাকুমা ?

নিয়ে যাব শান্তিপুরে।

কেমন করে নিয়ে যাবে - বইতে পারবে ত ?

দু'কাঁকে নেব দুটো—তুই মাথায় করে নিবি একটা। আর পরশু ত বিষ্যুদ্‌বার। পেরতাপের গাড়ী যাবে শান্তি পুরের হাটে—তাতেই ভর্ত্তি করে দেব এঁচোড়। বাজারে বিক্রী হবে।

সাবাস—বুদ্ধি ছিল আপনার ঠাকুমার।

সাহসও ছিল—কেউ ঠকিয়ে নিতে পারত না। সাহস ছিল বলেই ঠাকুমা মানুষ করতে পেরেছিলেন বাবাকে !

কারও কাছে হাত পাতেন নি—কাউকে ডাকেন নি, কিংবা ঘরে বসে হা-হুতাশও করেন নি। বাবা চাকরি করে টাকা পাঠাতেন—তা থেকে জমিয়ে জমিয়ে এই বাড়ীঘর করেছেন, জমিজমা কিনেছেন—নতুন করে তুলেছেন পাঁচিল। পাঁচিল বিক্রীর সময় পাড়াপড়শীরা ছিছি করেছিল, তারাই পরে ধন্য ধন্য করেছে। একজন উপার্জ্জনক্ষম পুরুষও এত গুছিয়ে সংসার করতে পারে কি?

ওরা চুপ করে বসে রইল। চাইল পরস্পরের পানে। হাসল।

বেলা বলল, সেকালে এসব সম্ভব ছিল, আজকালকার দিনে আর হয় না।

কেন—মানুষ বদলেছে? মন বদলেছে?

দেখছেন না চারিদিকে কি অভাব। পচিশ টাকা মণ চাল—দশ টাকা জোড়া কাপড় কিনে নিজের ভাগ্য তৈরী করা যায় না।

তবে আর তোদের সাহসটা কোথায়? ট্রামে অশিষ্ট আচরণের জন্য একটা লোককে আগুল প্রহার করে তোরা অহঙ্কারে কেঁপে উঠিস কিন্তু সংসারে অভাবের অপমান যখন তপ্ত জলের ছিটের মত সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দেয় তখন টু শব্দটি করিস না। ওটার সঙ্গে যদি লড়াই করতে পারতিস—বুঝতাম বাহাদুর সব ছেলেমেয়ে!

ওরা চুপ করে বসে রইল। ওদের কেউ কেউ ইস্কুল-কলেজে পড়ছে—কেউ কেউ বা সার্ভিস কমিশনে দু'দশখানা দরখাস্ত ছেড়ে ইণ্টারভিউয়ের আশায় দিন গুনছে। এদিকে অভাবের ভারে সংসার-তরী টলমল—সামাল দেবার কৌশল জানে না কেউ।

কিন্তু বেশীক্ষণ ওরা চুপ করে থাকতে পারল না। অবশেষে বলল, যাই বলুন দাদু—এ গল্প।

হেসে বললাম, ওইটুকুই সান্ত্বনা, নয় রে?

সময়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

হঠাৎ সময় আসে হাতে নিয়ে ঐশ্বর্য কখন—
হৃদয়ে কি রেখে যায় দাগ?
মুঠো মুঠো স্বর্য-সোনা ফাগ
এখানে-ওখানে ঝরে, মেখে নেয় মন।
সব কথা একদিন সাড়া দেবে শঙ্খের মতন।
(মানুষের জীবনের সব ইতিহাস
সেও জানি কোন এক গল্পেরই আভাস)
সোনার মুহূর্ত নিয়ে সে সব সময়
কখনো দৈবাৎ আসে—জানবার নয়।
মৃত্যুর স্তব্ধতা দিয়ে ঢাকা থাকে তখন হৃদয়।
একটি মাকড়
অলক্ষ্যে কখন এসে প্রাসাদের দেয়ালের 'পর
বুনে যায় ঊর্ণের স্বাক্ষর—
সময়ের কারুশিল্প আঁকে।
তখন হৃদয় মোড়া নানা ভাঁজে থাকে।

একদিন হৃদয়ের পাখি খুলে যায়।
অনেক রঙীন স্বপ্ন—সে সব স্বাক্ষর
একেকটি দল মেলে সৌরভ ছড়ায়।
তবুও হৃদয় কেন সেদিনকে চায়?
দুরতায় মাঠে মাঠে বুজে-যাওয়া নদী
কখনো হারানো স্রোত চড়া ভেঙে দাবী করে যদি,-
স্বপ্ন তাকে পায়?
তবুও সমুদ্র-ঢেউ তফাৎ বেড়ায়।
এইটুকু শুধু জানি সে সব সময়
সোনা-ঝরা গান নিয়ে একবার আসে
তার পর আরবার নয়।

মুসৌরী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভোরে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমাদের ডিলাক্স বাস ছাড়ল দিল্লী থেকে মুসৌরীর দিকে। বাস একটানা চলে এসে খানিক সময় থামল মীরাটে। দিল্লী থেকে মীরাট পর্য্যন্ত দুধারে কোন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য বা শ্যামশ্রী দেখতে পেলাম না। তবে বাস যতই দেরাদুনের দিকে এগোতে লাগল, ততই আবহাওয়ার বৈষম্য বুঝতে লাগলাম। দুধারের রুক্ষ প্রান্তর পেরিয়ে বাস দেরাদুনের দিকে এগিয়ে চলে হিমালয়ের নিম্নদেশে শিবালিক পর্ব্বতমালার নিবিড় অরণ্যের রাস্তা ধরল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অরণ্যের ভিতর দিয়ে সেই রাস্তা উপরে চলে গেছে। আমরা হিমালয়ের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সে শ্যামল বনশ্রী পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। তখন দেখা গেল বহুদূরব্যাপী কেবল কাঠের আড়ত চলে গেছে। দুদিকে শুধু কাঠ আর কাঠ, নানা আকারে কাটা হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে পাহাড় ও নিবিড় অরণ্য মিলিয়ে গেল। দেরাদুন শহরটা দেখা যেতে লাগল। দুদিকে শহরের দোকান-পাট, হোটেল, বাড়ীঘর এ সব অতিক্রম করে বাস দেরাদুনের মোটর-আড্ডায় থামল বেলা বারোটার সময়।

আমরা বাস থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ করে একটু পায়চারি করে আরাম পেলাম। কিছু ফল কিনলাম। দেরাদুন লিচুর জন্য বিখ্যাত। দুধারে লিচুবাগানে পক্ক অর্দ্ধ-পক্ক হাজার হাজার লিচু ঝুলে আছে দেখতে পেলাম। দিল্লী থেকে দেরাদুন পর্য্যন্ত দুধারের রাস্তায় শহরগুলিতে প্রচুর ফল দেখতে পেয়েছি। দোকানীরা সাজিয়ে বসেছিল আম, লিচু, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকরী, খোবানী, এপ্রিকট, চেরী, তুঁত ইত্যাদি। এ সব দেখতে যেমন সুদৃশ্য, খেতেও তেমনি সুস্বাদু।

দেরাদুনে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর বাস ও মোটরকার-গুলি তৈরী হতে লাগল মুসৌরী পাহাড় চড়তে। ভারতের যে কোন স্থান হতে মুসৌরী যেতে হলে দেরাদুনে আসতে হবে, কারণ এটা হ'ল উত্তর রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন। এখান হতে মুসৌরী যাবার যানবাহন হ'ল মোটরকার ও বাস। বর্ত্তমানে দেরাদুন পর্য্যন্ত রেলষ্টেশন হওয়ায় যাত্রীদের বহু অসুবিধা দূর হয়েছে। অতি পূর্ব্বে দেরাদুন এবং মুসৌরী যাত্রা বড় কষ্টকর ও বিপজ্জনক ছিল। যাত্রীরা শাহারণপুর থেকে ঘোড়ার ডাক-গাড়ীতে, গরুর গাড়ীতে ও টাটটু ঘোড়ায় চড়ে যেত। প্রায় পনের-ষোল ঘণ্টা চলবার পর তারা দেরাদুনে পৌছত। শিবালিক পাহাড়ের নিবিড় অরণ্যে ও মোহন-পাসে পথচলা বড় বিপজ্জনক ছিল। এখানে বন্য হস্তী ও অন্যান্য জানোয়ারের আক্রমণের ভয় ত ছিলই, আর তা ছাড়া পথে মধ্যে মধ্যে তীব্র স্রোতস্বিনী পার হতে হ'ত। আজকাল উত্তর প্রদেশ সরকারের সুব্যবস্থায় মুসৌরী যাত্রা সুগম হয়েছে এবং সরকারী বাস চলাচলের ব্যবস্থা করায় যাত্রীরা নির্ব্বিবাদে সেখানে আসা-যাওয়া করতে পারে। দেরাদুনের এই শিবালিক পাহাড়ের জঙ্গলে বন্য জানোয়ার শিকার করা নিষেধ আছে সরকার থেকে।

আমাদের বাস মুসৌরীর পাহাড় চড়তে সুরু করল। দেরাদুন উপত্যকা থেকে ঐ রাস্তাটা ঘুরে-ফিরে এঁকে-বেঁকে উপরে চলে গেছে, দেখে মনে হয় যেন একটা বৃহদাকার অজগর তার সর্পিল গতিতে চলেছে। সেই রাস্তা আর দুধারের পার্ব্বত্য দৃশ্যের দিকে চাইলে মনে এক বিচিত্র অনুভূতি হয়। একদিকে অজস্র গাছ-গাছড়া সম্বলিত পাহাড়ের দেওয়াল, আর অন্য দিকে শত শত ফুট নীচে জঙ্গলাকীর্ণ গভীর খাদ। তারই মধ্যে মানুষের নিপুণ হাতের তৈরী মজবুত রাস্তা দিয়ে বাস ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে লাগল। মোটর কিছু দূর উপরে উঠলেই দূর থেকে রাস্তার পাশে একটা বড় চিত্র দেখতে পাওয়া যায়—মুসৌরীর চমৎকার একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটি পাহাড়ী লোক বিউগেল বাজাচ্ছে। দূর থেকে যাত্রীরা সেই চিত্রে লেখা দেখতে পায় "পর্ব্বতরাণী মসুরী, স্বাগতম্।"

উঁচু পাহাড়ে বাস বা মোটর চললে বহু যাত্রীর বমির উদ্রেক হয়, তাই একটা ঘাটিতে ফেরিওয়ালারা নুন ও গোলমরিচের গুঁড়াসহ লেবু বিক্রী করছিল, লেবু চুষলে নাকি বমির ভাব থেমে যায়। বাস উপরে চড়তে সুরু করতেই যাত্রীরা কেউ লেবু, কেউ চুইংগাম, কেউবা লজেঞ্জ চুষতে সুরু করল। প্রশস্ত রাস্তায় দুটি বাস একসঙ্গে চলতে পারে। রাস্তাটির কিনারা সিমেন্টে বাঁধানো, খাঁজকাটা ও চুণকাম করা। কাজেই মোড় ঘুরবার সময় পথ ভুলবার ভয় থাকে না। রাস্তাটা অসম্ভব বক্রগতিতে চলে গেছে, তাই একে 'জিগজাগ' রাস্তা বলে। আমাদের ভারী বাসটি প্রতি দু-তিন মিনিট অন্তর মোড় ঘুরতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরাও দুলতে লাগল ভীষণ ভাবে। ছোট বাচ্চারা ত গাড়ীতেই বমি করতে আরম্ভ করল।

মোটর মোড় ঘুরে চলছে আর মুসৌরীর রূপ একে একে খুলছে, অতি চমৎকার সে দৃশ্য। বাস এসে মুসৌরীর এক পর্ব্বতশিখরে থামল। এ জায়গাটার নাম হ'ল "কিংক্রেগ।" এখানে মোটরের ছোট একখানা টিকেটঘর ও তার সামনে মুসৌরীর ম্যাসনিক লজ। এখানটা সমুদ্র থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে যে রাস্তা আরও উচুতে চলে গেছে, তাতে মোটর ও বাস চালাবার অনুমতি নাই, তাতে যাত্রীরা নিরুদ্বিগ্ন মনে পার্ব্বত্য

রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে। এখান হতে নীচে অরণ্য সঙ্কুল গভীর খাদ, আর উপরে সুউচ্চ শৈলশিখর অতি চমৎকার দেখায়।

মোটর ও বাস থেকে একে-হয়ে যাত্রীরা নেমে পড়তে লাগল, কুলীরা বাসের ছাদ থেকে টানা-হ্যাঁচড়া করে মালপত্র নামিয়ে

মোটর যাইবার 'জিগজাগ' রাস্তা

দড়ি দিয়ে বেঁধে পিঠে তুলে নিল, দড়িটা দুহাতে শক্ত করে ধরে নুয়ে নুয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। এসব পাহাড়ী কুলীরা অতি বিশ্বাসী। কোন্ হোটেলে যাবে বলে দিলে তারা সেখানে নিয়ে মাল হাজির করবে, চুরির ভয় নেই। একদল কুলী ছোট ছোট বেশ সুন্দর রঙীন ঝুড়ি-চেয়ার নিয়ে হাজির হ'ল। পাহাড়ে শিশুকোলে চড়া অসম্ভব,তাই মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে তাদের শিশুদের সেই গদী আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। কুলীরা তাদের পিঠে ঝুলিয়ে মায়েদের সঙ্গে চলল। পার্ব্বত্য রাস্তায় দলে দলে এসব যাত্রীদের কুলী ও মালপত্রসহ পাহাড় চড়তে দেখলে মনে হয় এরা যেন কেদারবদ্রী যাত্রী।

আমরা দুপুর দুটোর সময় মুসৌরীতে এসে পৌঁছলাম। হিমালয়ের মিষ্টি বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিল। দিনটা মেঘলা ছিল, সুদৃশ্য পরিবেশে হেঁটে হেঁটে আমরা আর একটা পাহাড়ের উপর সুন্দর একটি হোটেলে উঠলাম। পাহাড়ের উপর সামনে কতটুকু খোলা সমতল জায়গা, ছোট একটুকরো বাগান, দুটো বড় পাহাড়ী বুনো গাছ বড় বড় ডালপালা মেলে জায়গাটাকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। দুটো লোহার বেঞ্চ পাতা আছে বসবার জন্য, সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে পাহাড় আর তার গায়ে গায়ে বাড়ীগুলো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লাগছিল। সব ঘরগুলোতেই ঢেউ-টিনের ছাউনি, অধিকাংশগুলোতেই লাল রং দেওয়া, তাই পাহাড়ের গায়ে শ্যামল অরণ্যের ভিতর মাঝে মাঝে লাল রঙের বাড়ীগুলো অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের চূড়োয় আশেপাশে নীচে উপরে সারি সারি দেবদারু গাছ ডালপালা মেলে ঠিক প্যাগোডার মত দাঁড়িয়ে আছে, আর ডালে ডালে ছোট দেবদারু ফলগুলো না ঝুলে উপরে রঙীন সবুজ বাবের মত বসানো। দূর থেকে গাছটিকে বড় বিচিত্র মনে হয়।

আমরা হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে নেমে খানিক দূরে বাঁধানো চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে নীচে নামতেই দুধারে সারি সারি দোকানপাট দেখতে পেলাম। রাত্রে সেসব আলোকোজ্জ্বল সুদৃশ্য দোকানে নানা ফ্যাসনের নানা রঙের পশমের পোষাক, রেশমী শাড়ী ফ্রক ইত্যাদি ও নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুউচ্চ গিরিশিখরে নিবিড় জঙ্গলে যে এমন সুন্দর একখানা শহর গড়ে উঠেছে, নীচ থেকে তা ধারণাই করা যায় না। কিছুদূর বেড়াতে না বেড়াতেই টিপটিপ বৃষ্টি সুরু হ'ল, তার পর বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি নিকটের একটা দোকানে উঠে পড়লাম। সেখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর লাঠি ছিল, পথ চলতে সুবিধে হবে বলে আমিও একখানা সুদৃশ্য মজবুত লাঠি কিনে নিলাম। এর পর দেখতে পেয়েছি প্রায় প্রতি দোকানেই ছোট-বড় নানা ধরণের সুদৃশ্য লাঠি বিক্রয়ের জন্য স্তূপীকৃত হয়ে আছে, অধিকাংশ যাত্রীই পার্ব্বত্য পথ চলতে এই লাঠি কিনে নেয়। বৃষ্টি কমলে একটা কফিহাউসে ঢুকে পড়লাম ও সেখানে গরম গরম কফি ও সিঙ্গাড়া খেলাম। সিঙাড়াগুলি উৎকৃষ্ট ছিল। আর একটু ঘুরে ফিরে হোটেলে ফিরলাম। রাস্তায় অপ্রত্যাশিত ভাবে দিল্লীর দুটি বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় মনটা খুসী হয়ে উঠল।

কিংক্রেগ—এখানে সারিবদ্ধ ভাবে মোটর দাঁড়ায়

বেড়িয়ে রাত্রে হোটেলে ফিরলাম। আহারের পর যখন শুতে গেলাম তখন দুখানা কম্বল গায়ে জড়িয়ে মনে হচ্ছিল আর একখানা কম্বল চাপালে বোধ হয় আরও আরাম লাগবে। একদিন আগে দিল্লীর উত্তপ্ত মরুভূমির হাওয়ায় শরীর জ্বালা করেছিল, আর একদিন পরেই দুখানা তিনখানা কম্বল শরীরে চাপিয়ে ঘুমুচ্ছি ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগছিল।

এই পার্ব্বত্য মুসৌরী শহর ও দেরাদুন উপত্যকার সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস এই—নেপালরাজ সুদর্শনশাহ দেরাদুনকে এংলো-ইণ্ডিয়ান মেজর হারসের নিকট ১৮১১ সালে বিক্রী করেন। মেজর সেটা ১৮২৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বিক্রী করে দেন। তখন মুসৌরীর মুসীনগরে প্রথম বাসভবন তৈরি করা হ'ল, কিন্তু তার পর সেটা সেনানিবাস হয়ে গেল। ১৮২৭ সালে ল্যাণ্ডর বাজারে ভারতীয় বণিকরা বেচাকেনার পত্তন করে। ১৮৩৫ সালে সেখানে বহু সংখ্যক ইউরোপীয়ান এসে বাস করতে আরম্ভ করল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর স্কুল গির্জ্জা ইত্যাদি তৈরি হতে লাগল। দেখতে দেখতে মুসৌরী একটি সুন্দর শহরে পরিণত হ'ল এবং ১৮৪০ সাল থেকে এটি প্রকৃতপক্ষে শৈলাবাস হয়ে গেল। দেরাদুন থেকে মুসৌরী পনের মাইল দূর, সমুদ্র থেকে মুসৌরী পাহাড়ের উচ্চতা ছয় হাজার ফুট, তবে কোন কোন স্থানে আট হাজার ফুটের উঁচুও পর্ব্বতশিখর আছে।

হিমালয়ের নিম্নদেশের শৈলমালা শিবালিক আর মুসৌরী পাহাড় পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে প্রায় বিশ স্কোয়ার মাইল ব্যাপী চলে গেছে, তারই মধ্যে দুন উপত্যকা বিছিয়ে আছে; অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্য মুসৌরীকে পর্ব্বতরাণী বলা হয়। হিমালয়ের শৈলশ্রেণী, শ্যামল-বনানী ও কয়েকটি জলপ্রপাত মুসৌরীকে অতি রমণীয় স্থান করে তুলেছে। কয়েক দিন মুসৌরীর চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখলাম। পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়া এই শহর—পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় হোটেল, কাফে, রেস্তোরা, সিনেমা হ'ল, টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলার-রুম, স্কেটিং করবার হল কোন কিছুরই কমতি নেই। অনবরত যাত্রীর দল আসছেই আসছে। হিমাচলের সংবাদপত্রে প্রকাশ, এবারের মত এত বৃহৎ সংখ্যায় টুরিষ্ট বহু বৎসরের মধ্যে আসে নি। রাস্তায় জনসমুদ্র দেখবার মত। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রং-এর রেশমী শাড়ী, সোয়েটার, গগলস-পরিহিতা তরুণী কিশোরী বৃদ্ধারা কলরব করে চলেছে। তরুণীরা রঙ্গিন সিল্ক ছাতা মাথার উপর ধরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছে, তাদের লিপষ্টিক-রাঙ্গা ঠোঁট, পরনে রঙ্গীণ শ্লাকস। কেউ কেউ বা চাবুক হাতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে, ঘোড়ার চলার গতিতে তাদের কমনীয় দেহ আর বব্-করা চুল দুলছে। গাঢ় লাল, নীল রং-এর পশমের পোষাকে সুসজ্জিত বালক-বালিকা এবং শিশুরা মুসৌরীতে রূপের হাট খুলে বসেছে। যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবাই গরম পোষাকে সুসজ্জিত, ফিটফাট হয়ে চলছে হাসিমুখে। এ লোকারণ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখলেও ক্লান্তি আসে না।

আমাদের হোটেলটি ক্যামেল হিলের নিকটস্থ অপর এক পাহাড়ে। ক্যামেল হিলের পর্ব্বতচূড়াটি দেখতে ঠিক উটের পিঠের কুঁজের মত, তাই এর নাম হয়েছে ক্যামেল হিল। এর চূড়ায় জলের রিজার্ভার আছে। প্রতি রাত্রে সেখানে একলহরী বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। এক সন্ধ্যায় বড় সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। পাহাড়ের নীচে একটা জায়গায় পথ চলতে চলতে একরাশ মেঘ আটকে গেছে। পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার মত সাদা মেঘগুলো আকাশে উঠছে, আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনও কখনও হাওয়ার ঝাপটায় মেঘগুলো এদিকে-ওদিকে ভেসে চলছে। এক একবার আমাদের জানালার গা ঘেঁষে চলছিল,হাত বের করে মেঘের সেই শীতল স্পর্শ অনুভব করতে বেশ আমোদ লাগছিল। সাদা ধোঁয়ার মত মেঘগুলো এক-একবার উপরের দিকে উঠে পাহাড়ের চূড়ায় সেই আলোকমালাকে ঢেকে দেয়, আবার সরে যায়। সন্ধ্যায় মেঘের সেই লুকোচুরি খেলাটা দেখতে বড় ভাল লাগছিল।

ক্যামেলব্যাক রোডটি ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বড় সুন্দর। স্থানটিও অতি মনোরম। ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা যাচ্ছিল। পার্ব্বত্য রাস্তার সহিস সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই রাস্তার দু'দিকে পাইন আর দেবদারু এবং অন্য বন্য গাছ সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘন বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা মেলে রাস্তাটিকে নিবিড় ছায়াশীতল করে রেখেছে। ঐ রাস্তায় চলতে চলতে নীচের দিকে কয়েকটি সুদৃশ্য বাসভবন দেখতে পেলাম, একটি স্কুলও পাশে ছিল, তাতে লেখা আছে, "কন্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়।" "পাহাড়ী ছোট ছোট মেয়ে এবং কয়েকটি ছেলেও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলের দিকে চলেছে। তাদের মুখে খুব বেশী প্রসন্ন ভাব দেখতে পেলাম না। স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল ঠন্ ঠন্। শিশুদের কলরব শোনা যেতে লাগল।

এই রাস্তা ধরে গেলে অপর মোড়ে রিঙ্ক স্কেটিং-হল আছে। হলটি সুবৃহৎ, মুসৌরীতে আর একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্কেটিং-হল আছে, কিন্তু তা এত বড় নয়। আমরা টিকেট কিনে ভিতরে ঢুকলাম, হলের চারদিকে সারি সারি চেয়ার পাতা আছে দর্শকদের বসবার জন্য। কিশোর, বালক-বালিকা ও যুবকরা স্কেটিং করছে বাজনার মৃদু তালে তালে। একজন লোক রাখা আছে যারা নূতন স্কেটিং শিখতে আসে তাদের সাহায্য করতে। কিছুক্ষণ স্কেটিং দেখে বেরিয়ে পড়লাম। নানা জায়গা ঘুরে রয়েল কাফেতে ঢুকলাম সান্ধ্য চা খেতে। বৃহৎ কক্ষে নানাদেশীয় সুসজ্জিত পুরুষ ও নারী বসে আছে সান্ধ্য চায়ের মজলিশে। একদিকে একদল লোক অর্কেষ্ট্রা বাজাচ্ছে, আর তারই তালে তালে পা ফেলে জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণী বল-ড্যান্স করছে। অবশ্য নৈশভোজনের সময়ই বল-ড্যান্স ভাল জমে ওঠে। সেখান থেকে বের হয়ে আরও দোকান-পাট ও রঙ্গীন প্রজাপতির মত নারীর দল দেখতে দেখতে হোটেলে ফিরে এলাম।

মুসৌরী ভ্রমণের জন্য মে আর জুন মাসই প্রশস্ত। রৌদ্রের প্রখর তেজ নেই, সর্ব্বদা হিমালয়ের অরণ্যের মৃদুমন্দ বাতাস শরীরকে সঞ্জীবিত করে তোলে। কিন্তু জুলাই থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়ে যায়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বেশ সুন্দর আবহাওয়া, কিন্তু বেশ শীত, অবশ্য এর পরই প্রবল শীত পড়তে থাকে ও বরফে সব রাস্তা-ঘাট, গাছপালা ঢেকে যায়, তখনকার দৃশ্য নাকি অতুলনীয়। মুসৌরীতে সাধারণতঃ যাত্রীরা দু'ভাবে থাকে; কেউ হোটেলে, কেউ বা বাংলো বা কটেজে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য কটেজ বা বাংলো পাওয়া যায় না, পুরো বৎসরের জন্য ভাড়া দিতে হয়। অবশ্য প্রবল শীতে

মুসৌরী এক রকম শূন্যই থাকে, এমন কি রিক্সাওয়ালা ও কুলীরাও যে যার পাহাড়ে চলে যায়। এখানে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপর বহু ভাল ভাল রেস্তোরা, কাফে আছে, বারান্দায় বোর্ডে খাদ্যের মেনু ও মূল্য লেখা থাকে, যাত্রীরা রুচিমত খাদ্য অর্ডার দিয়ে খায়। বহু যাত্রী শুধু হোটেলের রুম ভাড়া নেয়। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ও বাইরে বাইরে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজন সেরে নেয়।

মুসৌরীর কুরলীবাজার, মলরোড, ল্যাণ্ডুর বাজার ও লাইব্রেরী বাজারই উল্লেখযোগ্য। কুরলীবাজারকে মুসৌরীর মধ্যকেন্দ্র বলা চলে। ওখানে আপিস, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, জেনারেল পোষ্ট-আপিস, নর্দান্ রেলওয়ে বুকিং আপিস ইত্যাদি আছে, বাজার-সওদার পক্ষে এই স্থানটাই প্রশস্ত। এখান থেকে কিছু দূরে অপর রাস্তায় "গান হিল"। এই পর্ব্বতশিখরটি সমুদ্র থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু। এখানে সকালে ঠিক বারোটার সময় কামান দাগা হ'ত, তাই তাকে সবাই "গান হিল" বলে, এখনও সেখানে কামান রাখা আছে। এখানে জলের রিজাভার আছে, তা থেকে মুসৌরীর অধিকাংশ স্থানে জল সরবরাহ হয়।

লাইব্রেরী বাজারের দিকে প্রায়ই ঘুরতে যেতাম। পাহাড়ের উপর বহুদূরবিস্তৃত সমতল ভূমিতে এই লাইব্রেরী বাজার। এখানে একটি লাইব্রেরী আছে, তাই তার নাম লাইব্রেরী বাজার, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার নাম হয়েছে গান্ধী চক। এখানে রেলিং-দেওয়া রাস্তার পাশে পাশে কয়েকটি সিমেণ্ট-বাঁধান বেঞ্চি ও সুবৃহৎ বাঁধানো চত্বর আছে, যাত্রীরা তাতে বসে। একদিকে অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অন্যদিকে দোকান-পাট রেস্তোরা দেখতে পায়। লাইব্রেরী বাজারের একপাশে সারি সারি বহু রিক্সা থাকে যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য। ঘোড়াওয়ালারাও ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাড়া দিতে।

এখানকার রিক্সা একজন লোকে টানতে পারে না, দু'জনে টানে আর পেছনে তিনজনে ধাক্কা দিতে থাকে। দু'জন আরোহী হলে সাত জন লোক লাগে। এরা বড় কষ্টসহিষ্ণু। খালি পায়ে এসব প্রস্তর-কঙ্কর-বিছানো পার্ব্বত্য পথে এরা অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আরোহীসহ রিক্সা টেনে বেড়ায়।

এখান থেকে একটা রিক্সা নিয়ে আমরা শার্লভিল হোটেলে চললাম। সেখানে আমাদের এক আমেরিকান বান্ধবী উঠেছেন, তিনি লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। পথের দুধারে সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চড়াই উৎরাই রাস্তা ভেঙে সেই হোটেলে পৌঁছালাম। একটি শৈলচূড়ায় এই সুবৃহৎ হোটেলটি। মধ্য ভাগে বিস্তৃত সমতল অঙ্গন, তাতে দু-চারটে বড় বড় পাইন ও দেবদারু গাছ, তার ছায়ায় ছায়ায় এবং কোথাও বা বড় বড় গোলাকার ছাতার নীচে চেয়ার-টেবিল পাতা বসবার জন্য। অঙ্গনের চারদিক ঘিরে হোটেলের বড় বড় কয়েকটি ভবন, সবশুদ্ধ সেখানে দেড়শ কামরা তখন দেশী ও বিশেষ করে বিদেশী যাত্রীতে পূর্ণ। এক দিকে ছেলেমেয়েদের দোলনা, নানাদেশীয় বাচ্চারা রঙীন প্রজাপতির মত ছুটাছুটি করছে, কেউ বা দুলছে, কেউ ঘোড়ায় চড়ছে। সেই মুক্ত অঙ্গনের দিকে দিকে দলে দলে লোক বসে গেছে। কেউ বই পড়ছে কেউ চিত্র আঁকছে, কেউ বা সেলাই করছে, কেউ বা গল্প করে আড্ডা জমাচ্ছে। ভিতরে বড় হল-ঘরে এক-এক দল ব্যক্তি রেশে তাস খেলতে বসে গেছে।

পাহাড়ী কুলি—শিশুদের বহিয়া লইয়া যাইতেছে

চমৎকার হোটেলটি। সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরে নিরালায় এই বিস্তৃত সমতল জায়গা দেখে আশ্চর্য্য লাগল। এই হোটেল থেকে বের হয়ে কিছু দূরে গেলেই আর একটি শৈলচূড়ায় এক দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম তা নাকি কুটেশ্বর মহারাজার দুর্গ। খানিক নীচে মর্ম্মর-পাথরের এক দেবীমন্দির দূর থেকে দেখতে পেলাম, তা ছাড়া মুসৌরী পাহাড়ে গীর্জ্জা আর বহু কনভেণ্ট-স্কুলের প্রাধান্য।

শার্লভিল হোটেলের ডাইনিং-রুমে বসে বহু পাশ্চাত্ত্য দেশীয় লোক দেখবার সুযোগ হ'ল—ডাচ, সুইডিশ, নরওয়ে, গ্রীক, চেক,

ইটালিয়ান, ব্রিটিশ, আমেরিকান ইত্যাদি বহু জাতের পুরুষ ও নারী লাঞ্চ খেতে ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে বসে গেছে। কত বয়সের কত জাতের শিশুরা। অনেক ক্ষেত্রে দেখতে বেশ মজা লাগত, যা ইংরেজী জানে না অথচ চার-পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চা কনভেন্টে পড়ে ইংরেজী শিখেছে, কেউ যার দোভাষীর কাজ করে দিচ্ছে। এই সব বিদেশীদের অধিকাংশ দিল্লী এমবেসীতে কাজ করেন।

হোটেলটির পরিবেশ অতি সুন্দর। এত লোকের বসতি কিন্তু কোন হাঁক-ডাক, চেঁচামেচি নেই। শান্ত-ভদ্র ভাবে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। রাণী মেরী যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন এই বিশেষ হোটেলটিতে এসে কিছুদিন ছিলেন।

সেখানে সারা দুপুর আনন্দে কাটিয়ে বিকেলের দিকে নিকটবর্তী মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন দেখতে গেলাম। স্থানীয় লোকেরা একে "কোম্পানীর বাগিচা" বলে। নিবিড় অরণ্যের ভিতর এই বাগানটি মন মুগ্ধ করে। খাড়া উঁচু পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী করেছে—আর পাহাড়ের কোলে সেই সমতল ও অসমতল বনভূমিতে তৈরী হয়েছে এই বাগান। কত রকমের সুন্দর সুন্দর ফুললতা সে বাগানের শোভা বাড়িয়ে তুলেছে। ঐ বাগান দেখে যখন ফিরছি তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রিক্সা চলেছে, খানিক দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ দমকা হাওয়া আর আঁধি ছুটল, মেঘের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আর অসংখ্য বৃক্ষের মাতামাতি। ঝড়ো হাওয়ায় শত শত বন-বিটপী পাগল হয়ে উঠল, সোঁ সোঁ শব্দে নিঃস্তব্ধ বনানী, শৈলশিখর মুখরিত হয়ে উঠল। সুন্দরী স্নিগ্ধা প্রকৃতি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে নাগিনীর মত ছোবল মারতে লাগল। পলকে পলকে মাটির কাঁচা সঙ্কীর্ণ রাস্তা থেকে ধুলি আর মাটি উঠে আকাশ অন্ধকার করে দিল। অজস্র বন-বিটপীর শুকনো পাতা সড়সড় করে হাওয়ায় এদিকে সেদিকে উড়তে লাগল, প্রবল হাওয়ার ঝাপটায় মনে হতে লাগল বিশাল গাছগুলো মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়বে। ভীষণ ঘূর্ণি হাওয়ায় রিক্সাওয়ালারা স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারছিল না, "জয় বদরীনারায়ণ, জয় বদরীনারায়ণ" বলে চেঁচিয়ে উঠে প্রাণপণে রিক্সা টেনে চলল, একটু অসাবধান হলে বা ঝড়ের বেগ সামলাতে না পারলে ঐ অপ্রশস্ত রাস্তা থেকে রিক্সাসমেত সবাই পাশের অতলখাদে চিরশান্তি লাভ করবে। সেই প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার চোটে চারদিকে চেয়ে দেখবার শক্তি নেই, তাড়াতাড়ি শাড়ী দিয়ে মুখমাথা ঢেকে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম, আর মাঝে মাঝে অবগুণ্ঠন একটু ফাঁক করে প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য দেখতে লাগলাম। আমার মনে একটুও ভয় হ'ল না, বরং কেমন এক বিচিত্র অনুভূতি এসে গেল। সেই গোধূলি লগ্নে নীরব নির্জন শৈলশিখরে প্রকৃতির সেই রুদ্র লীলা কালির আচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারব না। সে দৃশ্য দেখে মনে হ'ল, এ নিজের চোখ দিয়ে না দেখলে, মন দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশ অনুভব না করলে হয়ত মনে বিচিত্র অনুভূতি জাগবে না। প্রকৃতির এই অদ্ভুত সুন্দর ভয়ঙ্কর রূপ আর কখনও দেখব কি না জানি না, কিন্তু তখন ঐ পরিবেশে মনে হচ্ছিল আমার মুসৌরী আসা সার্থক হ'ল।

পিচঢালা রাস্তায় এসে রিক্সাওয়ালারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে ঝড়ের ধাক্কা কমে এল, টিপটাপ বৃষ্টি পড়তে সুরু হ'ল, বৃষ্টির ঝাপটা এসে পা ভিজিয়ে দিতে লাগল। হোটেলে পৌঁছলাম। কিন্তু চারদিক অন্ধকার, সারা মুসৌরীর আলো নিভে গেছে। কোন রকমে তালা খুলে ঘরে ঢুকে টর্চ জ্বালিয়ে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আবার আলো জ্বালা গেল, সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ল্যাণ্ডুর বাজার হ'ল পুরোনো মুসৌরী। এখানকার ঘর, দোকানপাট, বসতি সেকেলে ধরণের। এই পাহাড়ের চূড়ায় ও গায়ে গায়ে অধিকাংশ বাংলো ও কটেজগুলি আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান-দের। এখানে অরণ্যের ভিতর অতি মনোরম স্থানে একটি বাংলোর ফটকে লেখা দেখতে পেলাম The Language School এখানে আমেরিকান মিশনারীরা ভারতীয় ভাষা শিখতে আসে। এখান থেকে পুরা দেরাদুন উপত্যকা অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, আর রাত্রে আলোকোজ্জ্বল দেরাদুন আরও চমৎকার দেখায়।

মুসৌরীর সবচেয়ে উচ্চ শিখর হ'ল 'লালটিব্বা', একেবারে উপরের শিখরের নাম হ'ল পারিটিব্বা। সমুদ্র থেকে এই গিরিশিখর যথাক্রমে আট হাজার ও সাড়ে আট হাজার ফুট উচু। ল্যাণ্ডুর থেকে 'লালটিব্বা'য় যেতে হয়। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া বড় কষ্টকর তাই অধিকাংশ যাত্রীই কেউ বা ঘোড়ায়, কেউবা রিক্সায় চড়ে যায়। এক মনোরম প্রভাতে রিক্সা ভাড়া করে আমিও চললাম লালটিব্বায়, আমার ছেলে চলল ঘোড়ায় চড়ে। 'লালটিব্বা'র যে রাস্তাটা অরণ্যের ভিতর দিয়ে ঘুরে এঁকেবেঁকে উপরে চলে গেছে, নীচে থেকে তা দেখলে মনে হয় সেই দুর্গম গিরিশিখরে রিক্সা চড়া অসম্ভব, কিন্তু পাহাড়ী রিক্সাওয়ালারা সে অসাধ্যও সাধন করেছে। সে রাস্তাটা কতকদূর পর্য্যন্ত পিচ বাঁধান, তার পরই কাঁচা রাস্তা, কঙ্কর ও পাথরের টুকরা বিছানো অপ্রশস্ত পথ পাহাড় বেয়ে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। সেই রাস্তাটার কতকস্থানে সিমেন্টের বাঁধ দিয়ে রেখেছে। রিক্সাওয়ালারা বললে, বর্ষায় প্রবল বারিপাতে যখন পাহাড় বেয়ে জলধারা নীচে গড়াতে থাকে তখন তার চোটে এসব রাস্তা ধ্বসে যায়।

একদিকে সুউচ্চ শৈলমালা, অন্যদিকে জঙ্গলাকীর্ণ সুগভীর খাদ, মধ্যে পার্ব্বত্য পথ, দুধারে বাজ চৌপরী পাইন দেবদারু ইত্যাদি বিশাল তরু বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা মেলে স্থানটিকে সুন্দর-স্নিগ্ধ করে তুলেছে। এই দুর্গম পার্ব্বত্য রাস্তার ছায়াবীথিতলে চলতে চলতে মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।

দুধারের এই অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় দু ঘণ্টায় 'লাল টিব্বায়' পৌঁছলাম। আরও উপরে 'পারি টিব্বা'য় জলের রিজার্ভার আছে, সারা ল্যাণ্ডুর বাজারে ওখান থেকে জল সরবরাহ হয়। এসব দুর্গমস্থানে গিরিশিখরে অরণ্যের ভিতর একটি গির্জা

দেখতে পেলাম, সে গির্জ্জা থেকে ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল আর নীরব অরণ্যের ভিতর সে ঘণ্টাধ্বনি গম্ভীর ও মিষ্টি মনে হচ্ছিল। 'পারিটিব্বা' থেকে বদরীনারায়ণ ও নন্দাদেবীর মন্দিরের চূড়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। আমাদের ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল তাই হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণী অতি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম। এক রিক্সাওয়ালা এসে অতি আনন্দে দেখাতে লাগল, মইজি, ঐ দেখ বদরীনারায়ণ পাহাড়, এর পেছনে পাহাড়ে আমার বাড়ী। তার নির্দ্দেশে ওদিকে চেয়ে দেখলাম, কি অপরূপ দৃশ্য! নীল আকাশের কোল ঘেঁষে তুষারমণ্ডিত শৈলমালা, তার পরই অগণিত ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে অনন্তে মিলিয়ে গেছে। সেই গিরিশিখরে শ্যামল বনানী, শত শত ফুট নীচে নিবিড় অরণ্যেভরা অতল খাদ হিমালয়ের স্নিগ্ধ মধুর মলয়, বনমর্ম্মর সব কিছু মিলে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। সেই গম্ভীর নীরব, নিস্তব্ধ, অতি রমণীয় শৈলশিখর ছেড়ে ফিরে আসতে মন চাইল না, তবু ফিরতে হ'ল। এবার রিক্সাওয়ালারা অনায়াসেই রিক্সা টেনে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিল।

আর একদিন বারলং পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম দেখতে গেলাম। এ ঠিক আশ্রম নয়, কর্ম্মক্লান্ত স্বামিজীদের বিশ্রামের জায়গা। এটি সম্পূর্ণ অন্য শৈলশিখরে। বহুদূর ও দুর্গম পার্ব্বত্য রাস্তা, কিন্তু বড় সুন্দর নীরব নির্জ্জন মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলেছে। কখন কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরঝর করে ঝরণা গড়িয়ে পড়ছে। এক জায়গায় রিক্সা থেকে নেমে ঝরণার ঐ সুমিষ্ট জল পান করে তৃপ্ত হলাম। পাহাড়ের নীচে এসে রিক্সা থামল। লাঠি ভর করে পাথর-বিছানো সরু রাস্তা ধরে উপরে চড়লাম। ছোট্ট আশ্রমখানায় নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ এক আমেরিকান স্বামিজীকে দেখতে গেলাম। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আমলের লোক। গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিত আমেরিকান সাধুর নাম স্বামী অতুল্যানন্দ। যদিও তিনি খুব বৃদ্ধ তবু বেশ পরিষ্কার দেখতে পান, কানেও বেশ শোনেন। একটু জোরে কথা বলতে হয়, অন্যের সাহায্য না নিয়ে এখনও একা পার্ব্বত্য রাস্তায় হেঁটে বেড়ান। শিশুর মত সরল ও হাসিখুসী বিদেশী বৃদ্ধ স্বামিজীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেলাম।

ফিরে চললাম সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে। কোনও রাস্তা থেকে ডুন উপত্যকা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এক-একদিন এসব মেঘে ঢাকা থাকে। পাহাড়গুলিতে ঘুরে-ফিরে বেড়াবার সময় মুসৌরীকে নানাভাবে দেখতে পেয়েছি। মানুষ আর প্রকৃতি দুইয়ের সৃষ্টি মনে বিস্ময় জাগিয়েছে। পর্ব্বতমালায়, উপরে নীচে কত সুদৃশ্য ভবন, স্কুল, কলেজ, গির্জ্জা তৈরি হয়েছে, কত রাস্তা দুর্গম গিরিশিখরের বুক চিরে সাপের মত এদিক-ওদিক ঘুরে চলেছে। কোথাও বা দেখা যায়, কত কত ফুট নীচে ছোট ছোট দু-একখানা গ্রাম, ঘরগুলি টেউটিনে ছাওয়া, রোদের কিরণে ঝকঝক করছে। পাহাড়ের গায়ে চাষ-বাসের জন্য ধাপে ধাপে কেটে ছোট ছোট জমি তৈরি করে রেখেছে। রাত্রে যখন মুসৌরীর পাহাড়ে পাহাড়ে বনানীর ভিতরে প্রতিটি ভবনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠে, তখন তার দৃশ্য অতি চমৎকার, মনে হয় চারিদিকে উপরে নীচে যেন অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে।

মুসৌরীতে দেখবার অনেক কিছু আছে, পিকনিক করবার বহু সুন্দর সুন্দর স্থান আছে। অনেকগুলি জলপ্রপাত মুসৌরীর সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে, ক্যাম্পটিফলস মসিফলস, ভাটাফলস, খারডী ফলস ও সহস্রধারাফলস। এর মধ্যে সৌন্দর্য্যে ক্যাম্পটিফলস উল্লেখযোগ্য। সহস্রধারাতে একটি গন্ধকের উৎস আছে। লোকে বলে সে জল পান করে বহু দুরারোগ্য রোগ আরাম হয়।

মুসৌরী দেখা শেষ হ'ল।
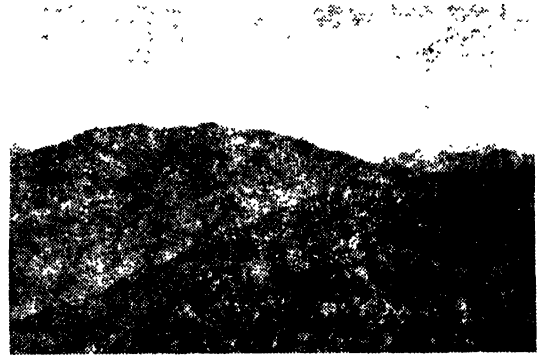
লালটিব্বা থেকে তুষারাবৃত হিমালয় দেখা যাইতেছে

এই কয়দিন গান্ধীচকের বাঁধানো চত্বরে বসে আর তার নীচের রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছি, দলে দলে যাত্রীরা আসছে, কিংক্রেগের ওদিকে রাস্তা বেয়ে পাহাড়ে উঠছে মুসৌরী দেখতে। দেখা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। সবারই আনন্দোজ্জ্বল হাসিমুখ। শুধু সে সব সুসজ্জিতদের মধ্যে পাহাড়ী কুলি ও রিক্সাওয়ালাদের ঘর্ম্মক্লান্ত মুখ, ছিন্ন-মলিন পোষাক নিতান্তই বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল। শৈলশিখরে বনবীথিতলে ধরিত্রী মায়ের কোলে পাহাড়ী বন্য শিশু উজ্জ্বল আনন্দে বেড়ে ওঠে। স্বাস্থ্য ও প্রাণের আনন্দে থাকে তারা ভরপুর। তার পর যুবক হয়ে অর্থ অন্বেষণে আসে শহরে, তাদের সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহের শক্তিসামর্থ্য, প্রফুল্ল সরল মুখের প্রসন্নতা হারিয়ে ফেলে রিক্সা আর দু মণ বোঝা পিঠে বয়ে। সেই সুন্দর সুঠাম যুবক হয়ে উঠে অকালবৃদ্ধ ন্যুব্জদেহ ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত কুলী, দেহমনে জীর্ণ হয়ে বয়ে চলে আনন্দহীন আশাহীন জীবন, দিন গোণে কবে আসবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

মাস, আবার তারা ফিরে যাবে তাদের পাহাড়ের প্রকৃতির কোলে ছোট্ট কুঁড়েঘরে, জননী-কন্যা-জায়ার স্নেহাঞ্চলে আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেবে।

মুসৌরী ছেড়ে চললাম। তন্দ্রাজড়িত চোখে ভাসে পর্ব্বতরাণী মুসৌরীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, আর তার রিক্ত-ক্লান্ত পাহাড়ী সন্তান রিক্‌শাওয়ালা, আর ভারবাহী কুলী—যারা পিঠে বিশাল বোঝা চাপিয়ে মাথা হেঁট করে দু'হাতে প্রাণপণে বোঝার রশি ধরে চলেছে পাহাড় বেয়ে, বোঝার চাপে পায়ের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে, সমস্ত শরীর বেঁকে নুয়ে গেছে। শুধু দুটি পা দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় আঁকড়ে।

অস্তরবি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।"
—রবীন্দ্রনাথ

এ নহে প্রভাত, প্রদোষের রবি চলেছে অস্তাচলে,
উদয়ে অরুণ অস্তে অরুণ রাঙায়ে গঙ্গাজলে।
যে রবি উদিল উষসীর সুরে ভোরে ভৈরবী গাহি
সে-রবি ডুবিল পুরবী গাহিয়া পূর্ব্ব গগনে চাহি।
উষ্ণ পূষন্ দীপ্ত কিরণে উজলি ভূমণ্ডল
অস্তমনের স্তিমিত নয়নে বিদায় অশ্রুজল।

যে-রবি উদিত হইল হেথায় ওঠেনি ভূমণ্ডলে
যাঁহার কিরণ অবিস্মরণ দিবসে নিশীথে জ্বলে,—
যে-রবির আলো নয়ন ভুলাল শ্রবণ ভুলাল সুরে
কক্ষচক্রে কত জ্যোতিষ্ক যাহারে ফিরিয়া ঘুরে,—
জীবনে মরণে প্রকাশে গোপনে নমি বাক্-কায়-মনে
প্রেয় আর শ্রেয় মিলাল মিলনে অচির-চিরন্তনে।

যে-রবি আপন মহামহিমায় মূর্ত্ত মন্মথময়
যাহারে গ্রহণ করিবার আগে রাহু গাহে জয় জয়,
বিশ্বরূপের নাভিপদ্মের নভোনীলিমার মাঝে
জ্যোতিঃসাগরে গভস্তিমান জাগর নয়নে রাজে।
বিশ্বহৃদয় পদ্ম ফুটিল যাহার কিরণ মাখি
ভূলোকে দ্যুলোকে খগোলে ভূগোলে বাঁধিল মিলন-রাখী।

নিখিল নয়ন ইন্দীবরের মধু যে করিল পান
ধন্য করিয়া ধন্য হইল যাহার পুণ্যদান।
রূপে আনন্দে অমৃত-বিভায় রসায়ন পরশনে
রসিয়া তুলিল নয়নে পশিয়া রশ্মি মরমে মনে।
অপরিণতের প্রাণ-পরিণতি অবিকশিতের বীজ
ভস্ম করিয়া বিশ্বভুবনে ছড়াইল মনসিজ।

নীরব ওষ্ঠে মুখর যে-রবি মুখারবিন্দ চুমি
পুষ্পিত করি তোলে মন্তরে অন্তর-মরুভূমি।
যে-রবিরশ্মি সপ্ততন্ত্রী সুরভারতীর করে
মূর্চ্ছনা তুলি গমকে চমকে নিদ্রিতে ঘরে ঘরে।
নব সবিতুর্বরেণ্য রূপ ভূ ভুব স্বঃ ভরি
নব জাগরণ মন্ত্র দিল সে নব গায়ত্রী পড়ি।

নয়নে শান্তি, বদনে কান্তি, করুণা সমুৎসার,
ঋষির দৃষ্টি বাণীমূর্ত্তি যে ভারতের আত্মার,—
যে-রবি উদিত করে প্রচোদিত প্রবোধ বুদ্ধ হিয়া
এ-কাঙাল কবি দেখাবে কি রবি প্রদীপ দীপিকা দিয়া?
(তবু)—একলব্যের একলক্ষ্যের একমুখী অনুরাগে
আঁখির সলিল দিলাম যদি সে সুধী-পাদোদকে লাগে।

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়ী আমরা যাওয়া-আসা করতাম। একজন ছিলেন পারস্যদেশীয়। ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ করে একজন আমেরিকান পাদ্রীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেন্টপলে নিজের বাড়ী করেছিলেন, কিন্তু নিজের দেশেরই নাগরিকতা রাখবেন বলে পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে যেতেন। দুটি ছেলেমেয়ে ছিল ছোট ছোট। ছেলেটি একেবারে মার্কিন টাইপ, মেয়েটিকে অনেকটা ভারতবর্ষীয় মনে হ'ত। ভদ্রলোক অত দিন ওদেশে থাকলেও ইংরেজী উচ্চারণ ভারতবর্ষীয়দের মত। বাড়ীটি অনেক সুন্দর সুন্দর পারস্যদেশীয় গালিচায় সুসজ্জিত, সেদেশের বাসন-কোসনও কিছু কিছু আছে। তিনি গল্প করতেন অত কার্পেট দেখে লোকে ওঁকে ভীষণ বড়লোক মনে করে। এঁদের বাড়ীতে আমরা প্রায় যেতাম এবং বেশ বাড়ীর মত লাগত। বাড়ীতে একজন নিজের দেশের ছেলেকে রাখতেন। সেই ছেলেটি নিজের দেশের নানা জিনিসের গল্প করত, পারসিক কবিতা আবৃত্তি করে তার অর্থ বলত। আমাদের প্রাচ্যদেশের নানা ভাষার মধ্যে কি মিল আছে এবং আমরা কোন্ কথার ও নামের ঠিক অর্থ জানি না এসব বিষয়ে খুব গল্প হ'ত। খুব মিশুক ছেলেটি।

অধ্যাপক মহাশয় বলতেন যে, তিনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন তখন নাকি বাংলাদেশ থেকে সুরু করে পেশওয়ার পর্য্যন্ত তাঁর পরিচিত সব লোকই তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, "রামানন্দবাবুকে দেখেছ কি?" তাই তিনি কলকাতায় তৎকালীন প্রবাসী-সম্পাদককে দেখতে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের নানা কাজে বেশ সাহায্য করতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। আগতপ্রায় শীতের সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেন।

এদেশের বাড়ীর সব জানালাই কাচের, গ্রীষ্মকালে থাকে একটা করে শার্সি, কিন্তু অক্টোবর মাস পড়লে শীতের সূচনায় দুটো করে শার্সি লাগানো হয়। দ্বিতীয়টির নাম 'ঝোড়ো জানালা' (Storm window)। সচরাচর বাড়ীর লোকেরা নিজেরাই গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় জানালা খুলে ঝেড়েমুছে তুলে রাখে, আবার শীতকালে ঝেড়েমুছে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ত ও বিদ্যাটা জানা ছিল না। তাই আমাদের বন্ধু মিসেস এগার বললেন যে, তিনি তাঁদের চার্চের কয়েকজন ছেলেমেয়েকে দিয়ে কাজটা করিয়ে দেবেন। ওদের কিছু খেতে দিলেই ওরা খুশী হবে। দশটার সময় একদিন ছটি মেয়ে দুটি ছেলে আর একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসেন কাজ করতে। বসবার ঘরে তাদের আপেল, স্যাণ্ডউইচ আর বরফদুধ খাবার ব্যবস্থা করলাম। মেঝেতে বসেই সবাই বেশ মহানন্দে খেল। কিছু লজেন্স চকোলেট ছিল, সেগুলো যে য'টা পারল পকেটে পুরে নিল। কাজ করতে করতে তাদের বন্ধুত্বও খুব চলছিল। এদেশে ছেলেমেয়েদের মেশামিশিতে বিশেষ কোন বাধা নেই। গল্পগাছার মধ্যে এক দিনেই সারা বাড়ীর জানালা লাগানো হ'ল।

অক্টোবর মাসের গোড়াতেই শীত বেশ জাঁকিয়ে আসে। ওদের দেশের কাছে এ শীত কিছু নয়, কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট। শেষরাত্রে ২৭ ২৮ ডিগ্রী হতে লাগল, মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত একটু snow পড়ে আবার মিলিয়ে যেত। পুরানো অধিবাসীরা আদত snwoএর ভয় দেখাতে লাগলেন। বরফ নাকি পাহাড়ের মত স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অধ্যাপক আর্ম্স্‌ট্রং জানী বললেন, "বরফের সময় এক থলি বালি রাখতে হয়। বালি ছড়িয়ে দিলে জমা বরফের উপর হাঁটা সহজ হয়।" আমাদের প্রতিবেশিনী রিয়া বললেন, "বরফে মানুষ ভীষণ আছাড় খায়, অনেকের হাত-পা ভাঙে। এই জন্যে অনেকে বীমা (insure) করিয়ে রাখে, যাতে হাত-পা ভাঙলে হাসপাতালের খরচ বীমা কোম্পানীই দেয়।" সবাই আমাদের উপদেশ দিলেন, "এবার বরফের জন্য জুতো কেন।" সে বড় বড় বুট জুতা, সাধারণ জুতা-মোজার উপরে পরতে হয়। এতে পা গরম থাকে এবং ভিতরের জুতোটা ভেজে না। কোথাও গেলে বাড়ীতে ঢুকেই লোকে এই জুতোগুলো খুলে রাখে যাতে তাদের ঘর এবং কার্পেট নষ্ট না হয়। এ জুতা শীতকালে বাড়ীর প্রথম ঘরে জড়ো হয়, সেখানে কার্পেট থাকে না। আবার ফেরবার সময় রাস্তায় পা দেবার আগেই পরে নিতে হয়। জুতো আমরা সবাই কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম, নইলে বেশী বরফে ঘর থেকে এক

পাও বেরোনো যাবে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবীমা ডঃ নাগের একলারই হয়েছিল কলেজের সাহায্যে, আমরা করাই নি। আমেরিকাতে কিন্তু কোন না কোন প্রকারের স্বাস্থ্যবীমা অর্দ্ধেক লোকেরই থাকে। তাতে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা হাত পা ভাঙলে হাসপাতালের সমস্ত খরচই বীমা কোম্পানীরা দেয়।

নবেম্বর মাসের শেষের দিকে বেশ ভাল ভাবেই বরফপড়া সুরু হ'ল। তাপ ২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামে তখন এবং বরফগুলো শূন্যেই মিলিয়ে যায় না, মাটি পর্য্যন্ত পৌঁছয়। ২৫শে নবেম্বর সকালে উঠে দেখি, ওমা! সহরটাকে ত চেনা যায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাদা হয়ে গিয়েছে। দোতলায় উঠে দেখলাম যত দূর চোখ যায় সাদা। ইতিপূর্ব্বে বড়দিনের কার্ডেই বরফে সাদা পথঘাটের ছবি দেখেছি, আজ স্বচক্ষে দেখলাম। আমরা যখন সেণ্টলুলে আসি তখন রাস্তার দু'ধারের বড় বড় গাছগুলি পত্রবহুল ছিল; ধীরে ধীরে দিনের পর দিন পাতার রং বদলাতে লাগল। লাল হলদে সোনালি নানা রং হয়ে শেষে সব ডাল খালি করে পথে স্তূপাকার হয়ে পড়ে রইল। যার যার বাড়ীর সামনে থেকে গৃহস্থরা নিজেরা ঝাঁট দিয়ে পাতা সরালেন পথ পরিষ্কার করতে। তার পর আজ শূন্য ডালে ডালে বরফ ঝুলছে। ফুটপাথ, বড় রাস্তা সব বরফে সাদা, বাড়ীর সিঁড়ি পর্য্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছে। বেশী পুরু হয়ে বরফ জমে নি, তাই ঝাঁটা দিয়ে সিঁড়ি আর ফুটপাথ পরিষ্কার করলাম। এখনও অনেকেই সাধারণ জুতো পায়ে পথ চলছে, দু'একজন snow boot পরেছে। রাস্তার গাড়ীগুলোর পিঠ সাদা, যারা গাড়ী চালাচ্ছে তাদের চালনায় পথের বরফ খানিকটা করে সরে যাচ্ছে।

আজ আবার মেকালেষ্টার কলেজে একটা বড় সভা এবং খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বিরাট লেকচার হলে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। বরফের দিন সুরু হওয়াতে সব মেয়েরাই উল বুনছে। ছেলেরা হয় বই-কাগজ পড়ছে, নয় বক্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশীর ভাগই কিছু শুনছিল না, তবে থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছিল। বক্তৃতার পর মস্ত একটা মাঠ হেঁটে পার হয়ে খেতে গেলাম। বরফের উপর পা দিয়ে ইতিপূর্ব্বে কখনও হাঁটি নি। আর সকলে বেশ অনায়াসেই অভ্যস্ত ভাবে যাচ্ছিলেন, আমি অতি সাবধানে হাঁটতে বাধ্য হলাম অভ্যাস নেই বলে। বারো জনকে এক টেবিলে খেতে দিল। দাঁড়িয়ে প্রার্থনার পর সকলে খেতে বসলাম।

সন্ধ্যার আগের থেকেই আবার বরফ পড়া সুরু হয়, বোধ হয় সারা রাত পড়েছিল। পরদিন সকালে উঠে দেখি জানালাগুলোর গায়েও বরফ জমে আছে। দরজার উপরেও বরফ, সিঁড়িতে পুরু হয়ে বরফ, ঝাঁটায় সরবে না, কোদাল লাগবে; বাইরে ত পর্ব্বতপ্রমাণ জমেছে, রেডিওতে বলল "আট ইঞ্চি বরফ পড়েছে।" এই রকম বরফে কেউ হেঁটে কলেজ যেতে চায় না, অথচ বার বার টেলিফোন করেও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। ডাঃ নাগ তখনও বরফের জুতো কেনেন নি, কাজেই তাঁর কলেজ কামাই হ'ল। সিঁড়ি আর ফুটপাথের এমন অবস্থা যে, পরিষ্কার না করলে হাঁটা যাবে না, কোদাল নিয়ে পথে নামলাম পরিষ্কার করতে। সাধারণ জুতো পায়ে আমার দ্বারা কাজ হ'ল না। তখন মেয়েরা বরফের জুতো পরে বরফ সরাতে নামল। পথের মাঝখানের বরফ কেটে কেটে দু'পাশে ফেলে দিতে হয়, দু' পাশটা উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। মেয়েদের কাজ করতে দেখে পাশের বাড়ীর ছেলেরাও তাদের একটু সাহায্য করতে এল। ছোট ছোট ছেলে, কিন্তু খুব কাজের। তাদের মা এমন একটা নূতন জিনিসের ছবি তোলবার জন্য খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারদের ফোন করে দিলেন। তারা এসে চটপট অনেকগুলোই ছবি তুলল এবং পরদিন কাগজে তা ছাপাও হয়ে গেল। শাড়ী পাছে দেখা না যায় তাই ফোটোগ্রাফাররা গরম ওভারকোট মেয়েদের পরতে দিল না। কোদাল হাতে বরফ তোলার এই ছবি মন্দ হয় নি।

এই রকম বরফ থামার পর শীত আট ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেমে গেল। দু'একদিন পরেই শূন্য ডিগ্রীর নীচে নামতে সুরু করল। এই ভাবে ঠাণ্ডা বাড়তে বাড়তে শূন্যর নীচে পনর কুড়ি ডিগ্রীও নেমে যায়। কিন্তু শীত যে কতটা বেড়েছে তা ডিগ্রীর মাপ দেখে বোঝা গেলেও গায়ে বোঝা যায় না বেশী। ঘরও গরম থাকে, পোশাকও ভাল।

এত বরফে কাজ করা অবশ্য কষ্টকর। কাপড় শুকোতে হয় ঘরের ভিতর। বরফের স্তূপের ভিতর দিয়ে হেঁটে আবর্জ্জনা ফেলতে বাইরে যেতে হয়, তা না করতে চাইলে সর্ব্বত্রই বরফ কেটে কেটে হাঁটবার পথ করে রাখতে হয়। আমাদের অত বরফকাটা অভ্যাস ছিল না বলে আমরা শুধু সামনের দিকের পথটাই পরিষ্কার করতাম। বেশী শীতে মুখটা নিয়ে বিপদ, আর সব ঢাকা গেলেও মুখ ত ঢাকা যায় না। পথে বেরোলে আমি অনেক সময় হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিতাম।

বরফের সময় মাটির উপর ত সাদা হয়ই, নদীর ধারে একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখলাম নদীটা অর্দ্ধেক জমে গিয়েছে, হ্রদ প্রভৃতিও এই রকম জমা। দেখতে চমৎকার। এই সময় গাড়ীতে বেড়াতে ভাল লাগে, কিন্তু অনেক জায়গায় গাড়ী বরফে আটকে যায় এবং অনেক চেষ্টাতেও সরানো যায় না।

পথের অন্যান্য গাড়ীচালকেরা অবশ্য কারুর বিপদ দেখলেই খুব সাহায্য করে।

এই বরফপড়ার মাঝখানে ডঃ নাগ ও অধ্যাপক আর্শ্মাজানী মিলে ওখানে ৭ই ডিসেম্বর পারস্যদেশীয় চিকিৎসক ও দার্শনিক Avicennaর সহস্রতম জন্মোৎসব করালেন। দুই কলেজের অধ্যাপকরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোশাক পরে এলেন। সারা বাড়ী নানা দেশের পতাকা ও আভিসেনার ছবি দিয়ে সাজানো হ'ল। বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতরা বক্তৃতা করলেন। প্রাচ্যদেশের এত প্রাচীন পণ্ডিতকে সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। আমাদের গর্ব্বের বিষয় বটে! কিন্তু আজ আমরা কোথায়?

একদিন ভারতীয় এম্ব্যাসি থেকে ভারতবর্ষ বিষয়ে কতকগুলি ফিল্ম আনিয়ে দেখানো হয়েছিল। হ্যামলিন ইউনিভার্সিটির 'হল অব সায়েন্সে' দেখানো হ'ল। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, গ্রামের কথা এবং অলিম্পিক গেমস্ দেখানো হয়েছিল। আমাদের দেশের কথা এদেশের লোকে ঠিকমত শোনেও না, জানেও না, কাজেই এসব ছবি দেখানো খুবই দরকার। অনেকগুলি ছবি হাতে আঁকা, কারণ সে রকম ফোটো নেই। কিছু অবশ্য ক্যামেরায় তোলা। "দল্ট মাচ্চে" পুলিস কি রকম মানুষদের পিটছে, ক্রিপস কি রকম প্লেনে চড়ে দেশে ফিরে গেলেন এসব দেখে আগেকার কথা মনে হচ্ছিল। আমাদের দেশের শারীরিক সৌন্দর্য্য একমাত্র পরিমল রায়ের চেহারাতেই দেখা গেল! স্বদেশী মিছিলে আমাদের দেশের রোগা রোগা মেয়েগুলিকে দেখে বড় দুঃখ হচ্ছিল। যারা দেখছিল সেই সব আমেরিকান ছাত্রীদের কি রকম লম্বা-চওড়া চেহারা। কিন্তু তবু ঢলঢলে সাটপরা ছেলে এবং উঁচু ফ্রকপরা রোগা মেয়েগুলিকে দেখে দেশের জন্য মন কেমন করছিল।

ডিসেম্বরের শেষে বড়দিনের আয়োজনে শহরশুদ্ধ মানুষ ও দোকানপাট মহা ব্যস্ত। বাড়ীতে কেক তৈরি করা, কার্ড আঁকা, চিঠি লেখা এবং বাইরে উপহার কেনার অন্ত নেই। দোকানের সাজে মহা আড়ম্বর। একটু শীত কমাতে বরফগুলো গলতে আরম্ভ করেছে। সকলের ছাদ থেকে বরফগলা জল রাস্তায় পড়ে কাদা হচ্ছে, পথের বরফও গলে ঝোল ঝোল অবস্থা। কাজেই দোকানবাজার করাও বড় মুস্কিলের।

গীর্জ্জাতে ১৯ ২০ তারিখ থেকেই নানা উৎসব হচ্ছে। বড়দিন মাত্র একদিনই, কিন্তু বার-চৌদ্দ দিন নানাভাবে উৎসব চলে। তা ছাড়া প্রস্তুতি আছে আরও আগে। এই সময় ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী বড়দিনের গান গেয়ে বেড়ায় আ মাদের বাড়ীতেও বন্ধুরা তাদের পাঠিয়েছিলেন। ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে, পথে ম্লান আলো, মানুষের মুখ অস্পষ্ট দেখায়। তারই মধ্যে ভারী গরম জামা মুড়ি দিয়ে ছেলেমেয়েরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে গান করে যায়।

২১শে ডিসেম্বর অধ্যাপক আর্শ্মাজানীর উপদেশ শুনতে একটা গীর্জ্জায় গেলাম। সুন্দর দেখতে গীর্জ্জা, তবে পথে বরফের কাদায় হাঁটা শক্ত। একজন সাহেব পাদ্রী ও অধ্যাপক আর্শ্মাজানী দু'জন বেদীতে বসেছেন। কয়েকটি তরুণী মেয়ে, কয়েকটি বৃদ্ধা ও জনকয়েক পুরুষ সবুজ গাউন এবং সাদা কলার পরে গান করতে করতে বেদীর দিকে এলেন। অর্গান ভারী মিষ্টি বাজছিল। দু'ধারে দুটি বড় সবুজ ঝাঁটা পাইনগাছ দাঁড়িয়ে আছে, এ দুটি 'খ্রীষ্টমাস ট্রি'। গাছ দুটি সুসজ্জিত এবং তার পদতলে উপাসিকারা নানারকম মোড়কে উপহার রেখে যাচ্ছেন। বোধ হয় যাদের উপহার দেবার কেউ নেই, এগুলি তাদের দেওয়া হয়। সকলের কাছে চাঁদা সংগ্রহ করা হ'ল। তারপর সেই টাকা পাদ্রীদের কাছে নিয়ে আকাঙ্ক্ষা যাওয়া হ'ল।

আর্শ্মাজানী উপদেশে বললেন, "খ্রীষ্টকে খ্রীষ্টানরা মহাপুরুষ বা "প্রফেট" বলে তাঁর জন্মদিন করে না। তার চেয়েও বড় কিছু ভাবে। আমি নিজে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছি, কারণ এই একমাত্র ধর্ম্ম যা পৃথিবীতে শান্তি ও মানবহিত (Goodwill) আনতে পারে।"

গীর্জ্জার পর আমরা আর্শ্মাজানীদের বাড়ী গিয়ে ভোজ খেলাম। আমরাও কিছু রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আজ থেকেই অনেক বাড়ীতে পথের ধারে জানালায় জানালায় বড় বড় রঙীন আলো জ্বলছে, কোন কোন আলো মোমবাতির মত গড়নের। ২৩'২৪ তারিখ থেকে ত দীপান্বিতা রজনী সর্ব্বত্র। এই সময় গীর্জ্জায় Candle light service অর্থাৎ দীপান্বিতা পূজা হয়। সকলে হাতে একটা করে মোমবাতির আলো উঁচু করে ধরে উপাসনায় যোগ দেয়। বাড়ী বাড়ী বড়দিনের পার্টিও চলছে। আমাদের অনেকে নিমন্ত্রণ করলেন, আবার অনেকে কেক প্রভৃতি উপহার দিয়ে গেলেন। যাঁরা ডাকতে বা উপহার দিতে আসেন নি, তাঁরা অনেকেই কার্ড পাঠিয়েছেন। এ সময় এত ডাক বিলি হয় যে, অনেক ছেলেরা শুধু এই কয় দিনের জন্যই পোষ্ট আপিসে কাজ নেয়। সচরাচর এখানে একবারই ডাক আসে, কিন্তু এই সময় দিনে তিন-চারবার ডাক বিলি হয়।

২৪শে ডিসেম্বর সব ক্রীশ্চান দেশেই মহোৎসব, এখানেও তাই। সেদিন সন্ধ্যায় কলেজের মিস ডোটি আমাদের 'হাউস অব হোপ' নামক গীর্জ্জায় নিয়ে গেলেন। এটি বেশ রঙীন কাচের ছবি দেওয়া, খানিকটা ইউরোপীয় ধরণের। বোধ

হয় এখানকার পুরাতন গীর্জ্জা। চারধারে বরফ জমে আছে। তারই ভিতর দিয়ে হেঁটে ভিতরে গেলাম। বেশ বড় গীর্জ্জা, আমরা উপরতলায় গ্যালারিতে বসলাম। সুন্দর গান হ'ল, এবং প্রায় অন্ধকারে উপাসনা হ'ল। ঘরে শুধু মোমবাতি জ্বলছিল। বেদীতে সম্পূর্ণ অন্ধকার, একটি ঢাকা বাতি আচার্য্যের পড়ার জন্য, তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। কয়েকজন পাত্রী আরবদের মত পোষাক পরে মাথায় ফিতে দিয়ে বড় রুমাল বেঁধে মিছিল করে বাতি হাতে বেদীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে পড়লেন। তার পর কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত তৈলচিত্রের ট্যাবলো দেখানো হ'ল খ্রীষ্টের জন্মবিষয়ে। শিল্পীরা যেমন এঁকেছেন ঠিক সেই রকম সাজ-পোশাক করে ছেলেমেয়েরা বেদীর পিছনে জীবন্ত ছবি হয়ে দেখা দিলেন। আমাদের দেশের ঠাকুরপূজার মত খানিকটা দেখাচ্ছিল, তবে এত শান্ত সমাহিত ভাব এবং এমন সুশৃঙ্খল ভাবে সব করা যে, এদেশের পূজার হট্টগোলের সঙ্গে ঠিক তুলনা করা চলে না।

আজ পথ আলোয় আলো। অনেকে বাইরে গাছে আলো দিয়েছে, কেউ বা বড় বড় "সান্টা ক্লস" সাজিয়ে রেখেছে বরফের উপর। এক 'সাণ্টা ক্লস' দোলনা-চেয়ারে বসে খুব দোল খাচ্ছেন দেখলাম। সাদা বরফের উপর রঙে রঙে আলোয় আলোয় শহরটা ঝলমল করছিল। নানা জায়গায় বরফের মূর্ত্তি গড়ে খ্রীষ্টজন্মের ছবি করেও সাজিয়েছে; দোকানপাড়ায় ত সারা পথে মাথার উপর বিরাট সব ঘণ্টা আর আলোর মালা। আমরা রাত্রেও দু'-এক বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলাম, কিছু উপহারও পেলাম। সব উপহার খ্রীষ্টমাস ট্রি'র তলায় সাজানো এবং প্রত্যেকের নামে নামে খুলে খুলে দেখানো হ'ল। প্রত্যেকেই সাধ্যমত ঘরবাড়ী সাজিয়েছে। আসল বড়দিনেও এই রকম এক বাড়ীতে পর্ব্বতপ্রমাণ উপহার বিতরণ দেখলাম এবং খুব ভোজ খেলাম। ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই রকম ঘটা চলল সারা দেশে। কত লক্ষ টাকার আলো যে জ্বলেছিল এই কয় দিনে, জানি না।

বড়দিন ছাড়াও এদেশে দু'-তিনটা বড় উৎসব আছে। তাতে অবশ্য এত ঘটা হয় না, তবে খাওয়া দাওয়া খুব চলে। একটা উৎসব হচ্ছে Thanks giving অর্থাৎ ধন্যবাদ প্রদান। আমেরিকানরা যেদিন এদেশে আসে বোধহয় সেইদিনকে স্মরণ করে এরা বিধাতাকে প্রতি ২৬শে নবেম্বর সমারোহ করে ধন্যবাদ দেন। এই উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ এবং টার্কি-রোষ্ট প্রভৃতি খাওয়ানোর ধূম পড়ে যায়। ঐদিন আমরা এক পাত্রীর বাড়ী নিমন্ত্রিত হই। তিনিই নিজের গাড়ী করে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু গাড়ী বরফে আটকে যাওয়ায় অপরের গাড়ীতে যেতে হ'ল। এই পাত্রী পরিবারটি দেখে খুব ভাল লাগল। সুন্দর দেখতে একটি বাড়ী। বাইরে আমাদের দেশের মত বারান্দা দেওয়া—যা আমেরিকান বাড়ীতে দেখা যায় না। সেখানে সবই কাচ দিয়ে বন্ধ। এই পাত্রী দম্পতি বহুদিন প্রাচ্যদেশে ছিলেন বলে বোধ হয় এই ধরণের বাড়ী করেছেন। বাড়ীর ভিতর ঘরগুলিও খুব বড় বড় এবং এমন করে চারিদিকে গোলভাবে জানালা দেওয়া যে, বাইরে অনেকটা দেখা যায়। ঘরের ভিতর সুন্দর সুন্দর আফ্রিকান ভায়োলেট টবে ফুটেছে যেন সুন্দর একটি প্রাচ্য বাগান এবং বাইরে প্রতীচ্যের তুষারশুভ্র পথ-ঘাট একসঙ্গেই চোখে পড়ে। ওঁরা পাত্রীর দুই বৃদ্ধা দিদি ও আমাদের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বড় দিদির বয়স ৮৫, কম শোনেন এবং মাঝে মাঝে সব ভুলে যান। তাঁর ধারণা হ'ল যে, আমরা ফিলিপাইন থেকে এসেছি, কারণ তাঁর ভাই ১৭ বৎসর সে দেশে ছিলেন। বার বার তাঁকে বলে দিতে হ'ল যে, আমরা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা বাড়ী যেতে চাইলে ভদ্রমহিলার কিছুতেই তা পছন্দ হ'ল না। তিনি ছোট মেয়ের মত বলতে লাগলেন, 'কেন ওরা চলে যাবে ?" তাঁকে বোঝাতে হ'ল, "বাড়ীতে এঁদের কাজ থাকতে পারে ত।"

মেজ বোনের বয়স ৭৫ এবং ভাই ৬৭। দুজনেই খুব কর্ম্মক্ষম। দুই ছেলে বিয়ে করে অন্যত্র থাকে, তাই এঁরা বাড়ীতে একজন 'পেইং গেষ্ট' রাখেন। এমন ফিটফাট মাজাঘষা সাজানো বাড়ী কম দেখা যায় সব স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে করেন। খাবার আগে প্রার্থনার সময় আমাদেরও কোন মন্ত্র বলতে বললেন। "ওঁ পিতা নোঽসি" বলা হ'ল। তার পর আমাদের মেয়েরা বাংলা ধর্ম্মসঙ্গীত এবং পাত্রী মহাশয় ইংরেজী ধর্ম্মসঙ্গীত গাইলেন। গানগুলি বেশ ভাল।

একটা মজার উৎসব আছে, তার নাম 'হ্যালোউইন'। বড় বড় পাকা কুমড়োতে নাক মুখ ও চোখের মত ফুটো করে ভিতরে একটা বাতি জেলে সব বাড়ীর জানালায় রেখে দেয়। আর পাড়ার যত ছোট ছেলেমেয়ে পাড়ায় প্রতি বাড়ী পয়সা এবং মিষ্টান্ন ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত রকম সাজ-পোশাক করে, কেউ ভূত, কেউ প্রেত, কেউ ডাইনী। এই ছেলেপিলেদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জো নেই। ভিক্ষা না দিলে আমাদের দেশের নষ্টচন্দ্রের উৎপাতের মত এরাও উৎপাত করে। আমাদের এক বন্ধু কুমড়োর ভূত তৈরী করে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য। এ ছাড়া ঈষ্টার এবং সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনস ডে উৎসবের দিন। এ সব দিনে কার্ড ছাপা ও বিলি এবং উপহার দেওয়ার রীতি আছে। ঈষ্টারের সময় আমাদের পাড়াপড়শীরা আমাদের

ডিমের মত গড়নের মিষ্টান্ন ছোট ছোট ডালায় করে উপহার পাঠিয়েছিলেন, কারণ ঈষ্টারে ডিমই হচ্ছে দেয়। আমাদের দেশে বিদেশী লোক এলে তাদের সব পালা-পার্ব্বণে স্মরণ করে ডাকতে বা উপহার দিতে আমরা ভয়ও পাই লজ্জাও পাই, কারণ তারা ঠিক আমাদের মত নয় বলে। তবে দেশের লোককেও যে খুব স্মরণ করি তা বলা যায় না। আমাদের দেশে কুটুম্বরা ঘাড়ে ধরে স্মরণ করায় তাই তাদেরই লোকে দেয়-থোয়। ওদেশে সহজ বন্ধুত্বটা অনেক বেশী মনে হ'ত

শিক্ষাসমস্যায় রাসেল

রেজাউল করীম

বর্ত্তমান যুগে বার্ট্রাণ্ড রাসেল একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। একদিক দিয়ে তাঁকে এযুগের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। যুগের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছেন এবং নিজস্ব স্বাধীন মত অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কোন কোন মত অনেকের মনঃপূত না হতে পারে। তবুও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁর চিন্তা ও আদর্শ মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, দর্শন, ধর্ম্ম ও শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব মত প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি পরস্পর-বিরোধী উক্তিও হয়ত করেছেন। এবং বিভিন্ন মত, আদর্শ ও চিন্তাধারার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে গিয়ে তিনি কিছুটা গোঁজামিলও দিয়েছেন। তবুও রাসেলের মতের একটা মূল্য আছে। বিশেষতঃ শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা প্রত্যেক শিক্ষাবিদের ভেবে দেখা দরকার। আজকাল সকল দেশেই শিক্ষা-সংস্কারের কথা উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সমস্যা অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। নানাপ্রকার পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় রাসেলের মতটাও আমাদের শিক্ষা-বিদ্দের জানা দরকার। একথা বলতে চাই না যে, রাসেলের মতটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতেরও যে একটা মূল্য আছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে রাসেলের আদর্শ কতটা গ্রহণ করা যেতে পারে, সেটা সকলের ভেবে দেখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে রাসেল বহু চিন্তা করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু পাস করার পর তারা কি করে? তাদের কেউ হয় কেরাণী, কেউ হয় অফিসার, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি। আবার কাজকর্ম্ম করবার সুযোগের অভাবে বহু পাস-করা ছেলেমেয়ে একদম বেকার হয়ে বসে থাকে। রাসেল বলেন যে, বড় বড় অফিসার বা কেরাণী সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, আরও মহৎ।

রাসেল দেখাতে চেয়েছেন যে, অল্পসংখ্যক লোকই দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে উপকৃত হয়। তাঁর মতে প্রবেশিকা পাস করার পর প্রত্যেক ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। প্রশ্ন এই, তবে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করতে হবে। নিশ্চয় তারা নয় যাদের যোগ্যতার একমাত্র মান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। যে-সব ছাত্রের অভিভাবকগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যয়বহুল শিক্ষার খরচ বহন করতে পারবেন, কেবল তাদেরই ছেলেরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পাবে, এ ব্যবস্থা মোটেই ঠিক নয়। আঠারো বছর বয়সের যে-কোন বালক অর্থকরী কাজ করার যোগ্য হতে পারে। রাসেলের মতে, রাষ্ট্র যদি এইসব কার্য্যক্ষম বালককে কাজের সুযোগ না দিয়ে কেবল পড়া-শুনা করতে বাধ্য করে, তবে দেখতে হবে, এবং এই নিশ্চয়তা পেতে হবে যে, এইভাবে যে জাতীয় শক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে তা সত্যই অভ্রান্ত ও বলিষ্ঠ নীতি কিনা। অর্থাৎ এই যে প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেকে কাজের সুযোগ

না দিয়ে এবং তাদের জন্য কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি না করে, কেবল উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আর যার ফলে কাজের দিকে ছেলেদের প্রবৃত্তি জাগছে না। তা ভাল কি মন্দ, তাতে দেশের কতটা উপকার হচ্ছে—এসব বিষয় খুব তলিয়ে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় যে, এইভাবে উচ্চশিক্ষা দেওয়াতে কেবল শক্তি ও অর্থের অপচয় হচ্ছে, তবে অবিলম্বে সে পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করতে হবে।

রাসেলের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য দু' প্রকার: প্রথম উদ্দেশ্য বৃত্তির জন্য কার্য্যকরী বিষয় শিক্ষাদান। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞানশিক্ষা—জ্ঞানের জন্য, বিদ্যার জন্য শিক্ষালাভ। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে, দেশের ছেলেদেরকে কতকগুলি বৃত্তির জন্য সর্ব্বপ্রকারে তৈরী করতে হবে। কিন্তু রাসেল বলেন যে, সেই সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, বৃত্তি বা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল জ্ঞান ও গবেষণার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে গবেষণার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কেবলই শিক্ষাদান করে নিজের শক্তির অযথা অপচয় করলে চলবে না। বৃত্তিশিক্ষা অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু ছাত্রকে নির্ব্বাচন করতে হবে তার অভিভাবকের অর্থ দেখে নয়, তার সামাজিক মর্য্যাদা দেখেও নয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যে মানসিক যোগ্যতার প্রয়োজন তার অভাব থাকলে কাউকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া ঠিক নয়।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করে রাসেল বলতে চান যে, সেখানে বহু সংস্কারের প্রয়োজন আছে। তাঁর আলোচনার আলোতে দেখলে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েরও বহু ত্রুটি ধরা পড়বে। কয়েক শতাব্দী ধরে বহু পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করার পর আজ বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মধ্যযুগে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মযাজক সৃষ্টি করা। তার পর এল রেনেসাঁসের যুগ। রেনেসাঁস চেয়েছিল লৌকিক (secular) মনোভাব সৃষ্টি করতে। এ যুগের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোকের মনে এই ভাবটা জেগে উঠল যে, তার সন্তানকে সাধারণ লৌকিক বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৃটিশ বিদ্যালয়গুলি যে ধরণের শিক্ষা দিত, তার নাম ছিল ভদ্রলোকের শিক্ষা (Education of a Gentleman) অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকগণ মনে করতেন যে, তাঁদের সন্তানগণ সাহিত্যকলা, শিল্প, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে লেখাপড়া শিখে ভদ্র হবে, ভদ্রসমাজে গণ্য হবে। যতদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা ছিল ততদিন নির্ব্বিঘ্নে এই ধরনের ভদ্রলোকের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হ'ল—এরা হঠাৎ গজিয়ে-উঠা বণিক-সম্প্রদায়। এদের আভিজাত্য-বোধ অত্যন্ত প্রখর। এরা বনেদী অভিজাতদের মত নিজেদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভদ্রলোক করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে লাগল। তাদের অর্থের অভাব ছিল না, তারা দু' হাতে টাকা-পয়সা খরচ করে ছেলেদের ভদ্র হবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগল। ফলে বণিকের ছেলেরা বণিক-বৃত্তি শিখল না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সুকুমার ও মানসিক বিদ্যা অর্জ্জন করতে লাগল। তার ফলে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক কাজ করার প্রতি তারা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল। সুতরাং লেখাপড়া শেখার পর তারা কোন কাজের হ'ল না। এই ধরণের উদার শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল এই দাঁড়াল যে, এক কালের বড় বড় বণিক, রাজা ও অর্থপতির সন্তানসন্ততিগণ অলস জীবনযাপন করতে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। কিন্তু কি কাজ করবে তারা? কি কাজ করতে পারে তারা? তারা ত কোন কাজ শেখে নি। এইজন্য শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হ'ল। কালক্রমে ভদ্রলোকের শিক্ষার মূল্য কমে এল। অতীতে উদার শিক্ষার ভেতর যে একটা প্রেরণা ছিল তা আর রইল না। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দী কেটে গেল। বিংশ শতাব্দীর অভিভাবকগণ অনুভব করলেন যে, শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য জ্ঞানশিক্ষার কোন বাস্তব মূল্য নেই। তাঁরা দাবী করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, পাস করে ছেলেরা যে কোন একটা বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর দেওয়া আরম্ভ হ'ল বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর। যথা—আইনবৃত্তি, যাজকবৃত্তি, চিকিৎসাবৃত্তি, সিভিলসার্ভিস ও স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি। বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হ'ল। ক্রমে ক্রমে বহু বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিকাল বিষয় শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠল। বর্ত্তমান শিল্পপ্রধান যুগে expert বা বিশেষজ্ঞের খুব প্রয়োজন। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন উদার শিক্ষার চাহিদা বা প্রয়োজন একেবারে কমে গেল।

উদার শিক্ষা অবহেলা করে এই যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে মানুষ অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করছে, এটা রাসেল মোটেই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে 'কালচার' বা সংস্কৃতি

সম্বন্ধে রেনেসাঁসের যুগে যে আদর্শ গৃহীত হয়েছিল, সেটা নানা দিক দিয়ে ভাল ছিল। "শিক্ষার জন্য শিক্ষা" এটা কোনক্রমেই অনুপযুক্ত আদর্শ নয়। রাসেল বলেন যে, সকল যুগেই "উদ্দেশ্যহীন" শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষাকে অবহেলা করলে মানসিকতার দিক দিয়ে দেশের প্রভূত ক্ষতি হবে। বর্ত্তমান যুগে যে সব নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে, সেগুলি টেকনিকাল শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দিচ্ছে। রাসেল টেকনিকাল শিক্ষার বিরোধী নন। কিন্তু তাঁর মতে টেকনিকালের সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষারও প্রয়োজন আছে এবং সে ব্যবস্থাও করতে হবে। সত্য বা উদ্দেশ্যহীন শিক্ষার পশ্চাতে কোন অর্থকরী অভিপ্রায় থাকবে না। তবুও এ ধরণের শিক্ষারও একটা সার্থকতা আছে—প্রয়োজনও আছে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার সঙ্গে উদ্দেশ্যটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রাসেল বলেন, এটা খুব অন্যায়। "কোন উদ্দেশ্যের উপর জোর দেওয়ার একটা কুফল এই যে, শিক্ষার্থীর মনে এই ভাবটা জেগে ওঠে যে, যাতে কোন অর্থলাভ হবে না, তা শিখব না। কিন্তু অর্থকরীবৃত্তি অবলম্বন করলে "জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কিছুই করব না"—এই মনোভাব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। সকলের স্মরণ রাখা দরকার যে, "জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জ্জন' নীতি গ্রহণ না করলে কোন দেশেই সত্যকার উন্নতি বা অগ্রগতি হবে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুসন্ধান হচ্ছে সমস্ত প্রকার থিওরেটিকাল বা উৎপত্তিমূলক বিজ্ঞানের উন্নতির ও বিকাশের মূল। একথা ভুললে চলবে না যে, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের মূলে আছে "থিওরী"। তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অথবা স্বপ্নদর্শীবাদী এঁরা সকলেই নিজ নিজ পন্থায় সমাজকে অনবরত এগিয়ে দিচ্ছেন। এঁদের কাজ, চিন্তা ও কথার ফল সুদূরপ্রসারী। এঁরা গোটা সমাজের মানসিক ও নৈতিক জীবন গড়ে তোলেন। সুতরাং "শিক্ষার জন্য শিক্ষা" এই নীতিকে কোনমতেই অবহেলা করলে চলবে না।

কিন্তু আজকাল অর্থকরী শিক্ষার দিকে অধিকাংশ লোকের প্রচণ্ড আগ্রহ। তা হলে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য শিক্ষাদান কেমন করে সম্ভব হবে? রাসেল বলেন, এ সম্ভব হবে তবেই, যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে মহৎ আদর্শের দ্বারা গড়ে তুলতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়টি আছে প্রধানতঃ ধনপতিদের টাকার জোরে। জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে এমনভাবে যেন আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ধনপতিদের টাকার উপর নির্ভর করতে না হয়। এমন একটা Educated democracy বা শিক্ষাপ্রাপ্ত জনমত সৃষ্টি করতে হবে যারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা আদায় করে হোক অথবা অন্যভাবে হোক, টাকা সংগ্রহ করবে। এবং এমন বিশুদ্ধ জ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করবে যা কোন ধনপতি বা রাষ্ট্র কল্পনা করতে পারবে না। জনসাধারণের দ্বারা সংগৃহীত টাকার উপর নির্ভর করেই উদার বা উদ্দেশ্যহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সব সময় খোলা থাকবে বিশেষভাবে যোগ্য ছাত্রের জন্য। সকলপ্রকার ছাত্রের এখানে প্রবেশ করার দরকার নাই। যাদের আছে দক্ষতা, কিন্তু নাই কোন অর্থ, তারা যাতে সবরকম সাহায্য রাষ্ট্র থেকে পেতে পারে সে নিশ্চয়তা থাকা চাই। কিন্তু যাদের সেরকম কোন দক্ষতা বা প্রবৃত্তি নাই, তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পেতে হলে তার শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার ও সংশোধন করা দরকার। বর্ত্তমানে প্রত্যেক ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লেকচারে যোগদান করার নিয়ম প্রচলিত আছে। রাসেলের মতে এর কোন দরকার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইকারীভাবে প্রদত্ত এইসব লেকচার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে ছাত্রদের লেখাপড়ার পথ নির্দ্দেশ করা। পাঠ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করা নয়। একটুখানি আভাস-ইঙ্গিতে পথ নির্দ্দেশ করলেই যথেষ্ট। ছাত্রকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথে কাজ করতে সাহায্য করলে যথেষ্ট উপকার হবে। ছাত্র নিজেই পড়াশুনা করবে, চিন্তা করবে, গবেষণা করবে। তার পর তার অধীত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। প্রবন্ধ রচনাটা হবে বাধ্যতামূলক। আর গবেষণা ও পাঠাভ্যাসের কালে অধ্যাপক মাঝে মাঝে পড়াশুনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করবেন, দরকার হলে তার ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিবেন, সংশোধন করবেন। তার কোন অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিবেন। কিন্তু অধ্যাপক কোনমতেই ছাত্রকে নির্দ্দেশ দিবেন না। প্রাচীন অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরণের টিউটোরিয়াল পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনপতিদের টাকার উপর নির্ভর করে বলে উক্ত প্রকার মহোপকারী পদ্ধতি নিয়মিতভাবে অনুসৃত হয় না। এখন যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে তা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে কল্যাণকর নয়। বর্ত্তমানে অধ্যাপকগণ ক্লাসে প্রবেশ করে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বক্তৃতা দেন। ব্যস্, এই শেষ! তার পর ছাত্রদের দিকে আর ফিরেও তাকান না।

তা ছাড়া আর একটা বিষয়ও দেখতে হবে, যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নিজেরাও কোন না কোন বিষয়ের

উপর গবেষণা করেন। এরূপ গবেষণা করতে হলে অধ্যাপকদের জন্য চাই প্রচুর অবসর, অবাধ স্বাধীনতা আর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। তবেই ত তাঁরা স্বাধীন ও সুস্থিরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ করতে পারবেন। অধ্যাপকদেরকে এমন সুযোগ দিতে হবে যেন তাঁরা অপরাপর দেশের সুধীমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক দ্বারা আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এরূপ সুযোগ পেলে তাঁদের চিন্তাশক্তি বিকশিত হবে, বহু বিষয়ে তাঁদের ধারণাগুলিও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে উভয়েই উপকৃত হবেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে বেতন সহ সুদীর্ঘ ছুটি দিতে হবে, যেন তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিদেশ ভ্রমণ করে জ্ঞানবৃদ্ধি করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাজ স্কুলের শিক্ষকগণের মত নয়। কিন্তু দুঃখের কথা যে, এ যুগের অধ্যাপকগণ কতকটা যান্ত্রিক হয়ে পড়েছেন। তাঁরা পরিশ্রম করেন, ক্লাসে গিয়ে বক্তৃতা দেন। কিন্তু গবেষণা করেন না, বা করবার অবসর ও সুযোগ পান না। তা ছাড়া তাঁদের এমন বহু ছাত্রকে পড়াতে হয়, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত নয়। এতে আরও অধিক সময় ও শক্তির অপচয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শে এবং অধ্যাপকদের গুরুতর দায়িত্বে রাসেল বিশ্বাসী। তিনি বলেন যে, অধ্যাপকদেরকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে হলে তাদের জন্য চাই প্রচুর অবসর। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অপরাপর দেশে কি ধরণের গবেষণা হচ্ছে তার খুঁটিনাটি খবর তাঁকে রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কৌশল বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে ছাত্রকে তার নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভে সাহায্য করা। কিন্তু অধ্যাপক যদি সমস্ত সময়টা শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যয় করেন এবং সর্ব্বদা শিক্ষাদানরূপ দায়িত্বের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে ত তাঁর দ্বারা গবেষণা বা সম্যক জ্ঞানার্জ্জন সম্ভব নয়। সুতরাং অধ্যাপককে দেশ ভ্রমণ করতে হবে, বিদেশের সুধীমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং এইভাবে জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। এই গবেষণা ও জ্ঞানচর্চ্চা হবে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। স্বার্থহীনভাবে। থিওরী বা তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়াকে অনেকে পছন্দ করেন না। তাঁরা চান আবিষ্কৃত জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিছু লাভ করতে। থিওরী অপেক্ষা আশু লাভটাই তাঁদের কাম্য। কিন্তু তাঁরা এটা ভুলে যান যে, থিওরী ব্যতীত কোন জ্ঞান সার্থক ও সম্পূর্ণ হয় না। বাস্তব ফল পেতে হলে সর্ব্বাগ্রে চাই থিওরী চর্চ্চা। ফল নিরপেক্ষ থিওরীর চর্চ্চারও একটা নিজস্ব মূল্য আছে। রাসেল বলেন যে, প্রথমে গবেষণা হবে একটা স্বপ্নের সন্ধান, একটা মহান্ আদর্শের সেবা। বাস্তবক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তার আদি ও মূলে আছে এই স্বপ্নসাধনা ও আদর্শের পূজা। শিক্ষার্থীর মনকে ও চিন্তাশক্তিকে উদ্দেশ্যমূলক দর্শন দ্বারা শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত করলে জ্ঞানেরই ক্ষতি হবে। তাই উদ্দেশ্যহীন উদার শিক্ষার উপর রাসেল এত বেশী গুরুত্ব দেন। রাসেলের এই শিক্ষানীতির তাৎপর্য্য এদেশের শিক্ষাবিদ্‌গণকে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি।

দীপ্তি

শ্রীদেবাচার্য্য

পঞ্চম দৃশ্য

[মনোতোষের বৈঠকখানা। বনেদী জমিদার বাড়ীর আসবাব কিছু কিছু। পুরাণো ও নূতন যুগের গৃহসজ্জার সংমিশ্রণ। মনোতোষ, ক্ষীরোদ, প্রভাস ও জ্যোতিষী ত্রিলোচন পণ্ডিত]

পণ্ডিত ত্রিলোচন। (আসন গ্রহণ করে) তার পর, মনোতোষ বাবু, একেবারে গাড়ী পাঠিয়ে আমাকে আনালে কেন, এমন অসময়ে ?

[হাতকাটা ফতুয়া থেকে একটা তুলোট কাগজে লেখা বের করে মনোতোষের হাতে দিয়ে]

এই নাও ব্যানার্জীর বর্ষপ্রবেশ—খুবই খারাপ বছর। খুব সাবধানে থাকা দরকার। স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।

প্রভাস। খারাপ বছর বলছেন। কি দিক দিয়ে ?

ত্রিলোচন। মানসিক আঘাত—পারিবারিক দুর্ঘটনা এই রকম অনেক খারাপ ফল হতে পারে।

প্রভাস। ওই ত আপনাদের জ্যোতিষীর প্যাঁচ। এমন ভাবে কথা বলেন, যা থেকে কিছুই ঠিক করে বোঝা যায় না। মানসিক আঘাত ত প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু থাকবে। আর পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে—পত্নীর সঙ্গে কলহ ও সাময়িক বিচ্ছেদ—সকল গৃহস্থের গৃহেই নৈসর্গিক ঘটনা—সে কথা কার জানা নেই ?

ত্রিলোচন। না, আমি বলতে চাই, এই ধরুন—

প্রভাস। আবার আপনি বলছেন কেন ?

ত্রিলোচন। ঐ দ্যাখো, ভুলে গিয়েছি। তোমরা ত দুজনেই আমাদের মনোতোষ বাবুর বন্ধু।

মনোতোষ। আবার আমাকে কেন বাবু বলা।

ত্রিলোচন। দ্যাখ, বুড়ো হয়ে গিয়েছি প্রায়। পঞ্চাশের উপর বয়েস, বানপ্রস্থ নেবার টাইম হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগে, বুঝলে না, সব খেয়াল থাকে না ঠিকমত। আচ্ছা, কি যেন বলছিলাম—ও, ওই মানসিক আঘাতের কথা, হাঁ, দ্যাখ, তোমাদের বন্ধু ওই সত্যজিৎ ব্যারিষ্টার—আমাদের চাটুজ্যে সাহেবের জামাই না ?

ক্ষীরোদ। হাঁ।

ত্রিলোচন। দ্যাখ, ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। সহসা জ্যোতিষীর কথা মানতে চাইবে না, তবে তোমরা যদি বলে কয়ে ওর বাবা বা স্ত্রীকে দিয়ে একটা স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করাতে পার, তা হলে বড় ভাল হয়।

প্রভাস। কেন ?

ত্রিলোচন। এর দুই বিয়ে না ? দুই স্ত্রী কি বেঁচে আছে এখনও। কাকে বিয়ে করেছে আগে ?

প্রভাস। বলেন কি আপনি পণ্ডিত মশায়। আমাদের বন্ধু একজন মস্ত পণ্ডিত, পি, এইচ ডি, ইউনিভার্সিটির জুয়েল যাকে বলে। সে কেন দুই বিয়ে করবে ? এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে কি আর এক স্ত্রী থাকা ভাল ?

ত্রিলোচন। দ্যাখ, ভাল মন্দের কথা তুল না। আমি শুধু জ্যোতিষী বিচারের কথা তোমাদের জানাচ্ছি।

প্রভাস। তা, আপনি যদি অবিশ্বাস্য সব কথা বলেন, তা হলে আমরা সেটা সহ্য করব কেন ?

ক্ষীরোদ। এই প্রভাস, থাম তুই—পণ্ডিতমশায়কে ঘাটাস না, পণ্ডিতমশায়কে ঠকান অত সহজ নয় যে।

ত্রিলোচন। না, ঠকবো না কেন, আমরা কি সবজান্তা ভগবান? আমরাও ভুল করি বৈকি, তবে সেটা জ্যোতিষশাস্ত্রের দোষে নয়। আমাদের জ্যোতিষীদের জ্ঞানের অভাবে এবং আলস্যের জন্যেও বটে। ভাল করে বিচার করতে হলে শুধু রাশিচক্র দেখলে হবে না, ভাবচক্র দেখতে হবে, নবাংশচক্রও বিচার করতে হবে—

ক্ষীরোদ। পণ্ডিতমশায় অনুগ্রহ করে বেণুবনে মুক্তা ছড়াবেন না। আমরা আপনার শতাংশের একাংশও বুঝতে পারব না। তার চেয়ে (হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) শুনুন—আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের বন্ধুর মা এখানে আসছেন, একটা স্বস্ত্যয়ন করাতে চান।

ত্রিলোচন। কে, সত্যজিৎ ব্যারিষ্টারের মা—অর্থাৎ আমাদের চাটুজ্যে সাহেবের বেয়ান—মিনতির শাশুড়ী।

মনোতোষ। মিনতিকে চেনেন নাকি ?

ত্রিলোচন। চিনি না, মিনতির মা যে আমাদের দেশ গাঁয়ের মস্ত বড় জমিদারের মেয়ে—রতন ঘোষালের নাতনী। ওর বিয়ের সময় ত কোষ্ঠী আমি বিচার করেছিলাম। আমার খুব মত ছিল না বিয়েতে।

ক্ষীরোদ। কেন ?

ত্রিলোচন। পাত্রের ভৌম দোষ প্রবল, পাত্রীর ভৌম দোষ একেবারেই নেই। যোটকে সন্তানসম্ভাবনাও কম, যদিই বা সন্তান

সম্ভাবনা দেখা দেয়—গর্ভিনীর পক্ষে সন্তান মাতৃহন্তার কাজ করবে—আবার নিজেও মরবে—তার মানে বুঝে নাও—প্রসব হওয়ার পথে বিপদ আছে।

মনোতোষ। মিনতি কাল মারা গিয়েছে। সন্তান আগেই মারা গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে এমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, না পা পিছলে—ঠিক কি হয়েছিল—জানা যায় নি। যত দূর আমি জানি, মিনতির আর জ্ঞান ফেরে নি। ফিরলেও দুর্ঘটনার কারণ কি বোধ হয় সে বলতে রাজী হয় নি।

(ত্রিলোচন মুখ গম্ভীর করে থাকেন)

প্রভাস। পণ্ডিতমশায় চুপ হয়ে গেলেন যে।

ত্রিলোচন। যদিও ঠিক এই রকমটি আশঙ্কা করি নি, তবু এ রকম কিছু দুর্ঘটনার আশঙ্কা যে করছিলাম, তা ত তোমাদের একটু আগে বলেছি। বড়ই দুঃখের কথা, মিনতির মতন অমন ভাল মেয়েটি মারা গেল। আর দেখ নিয়তির পরিহাস, যে সন্তান তার একান্ত কামনা, সেই সন্তানও এল, কিন্তু—

ক্ষীরোদ। সত্যি, ভারী দুঃখের। মিনতির মতন মেয়ে আমার চোখে আজও পড়েনি।

ত্রিলোচন। দ্যাখ যখন একটা মিলে গেল, তা হলে বলি খুব সাবধান—ওই তোমাদের বন্ধু সত্যজিৎ ব্যারিষ্টারের কথা বলছি—ওর মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসছে বা এসেছে। ঠিক করে বলতে পারছি না। অত হিসেব করবার পয়সাও দাও না তোমরা, সময়ও দাও না।

মনোতোষ। সত্যজিৎ পাগল হয়ে গিয়েছে।

ত্রিলোচন। এ্যাঃ! পাগল হয়ে গিয়েছে! আমিও আশঙ্কা করেছিলাম তাই।

মনোতোষ। ও মর্গে মর্গে ছুটে যেত, স্কুলের দরজায় দরজায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওর সেই হারাণো সন্তানকে খুঁজে বেড়াত। কিন্তু, আর কোন অস্বাভাবিক ভাব আমরা দেখি নি। কিন্তু, আজকাল ও আমাদের কাউকেই চিনতে পারে না। কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলে না। খালি চুপচাপ আপন মনে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না। মুখজোড়া দাড়ী—দেখলে কিন্তু আপনার মনে হবে যেন সাধু পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ওর পরণে পায়জামা, গায়ে শার্ট না থাকলে, ওকে মৌনীবাবা বলে আপনিও ভুল করতেন।

ক্ষীরোদ। সত্যি, পাগলের যে এমন বিষাদ-করুণ মূর্ত্তি হতে পারে, আমার তা জানা ছিল না।

[চাকর এসে জানায় ব্যানার্জী সাহেবের মা এসেছেন। মোটর দরজায় গোড়ায়। ক্ষীরোদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়]

প্রভাস। ব্যানার্জী কিনা ভীষণ জ্যোতিষীদের উপর চটা, তাই ওর মা এসেছেন গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ওকে পট করে নিরাশ করবেন না। ভদ্রমহিলাকে আমরা মাসীমা বলি। একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ। এমন স্নেহময়ী শাশুড়ী আর দেখি নি। মিনতিকে নিজের মেয়ের মতন দেখতেন। দুই ছেলে, কোন মেয়ে নেই কি না। তার পর অমন ছেলে হয়ে গিয়েছে পাগল।

বুঝলেন, খুব সাবধানে কথা বলবেন, যদি বোঝেন আপনার হিসেবে পাগল আর সারবে না, তা হ'লে কিছু না বলে সময় নেবেন, তারপর ক বর্গ, প বর্গ—কত ত আপনাদের আছে—যা হউক একটা—

ত্রিলোচন। জ্যোতিষীর ওপর তোমার ভক্তি নেই বেশ বুঝতে পারছি। তবে বন্ধুর প্রতি যে তোমার টান আছে, সেটাও বুঝতে কষ্ট হয় না।

প্রভাস। জ্যোতিষীর ওপর ভক্তি নেই বলতে পারি না। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কি উত্তর দিচ্ছেন না যে?

ত্রিলোচন। দ্যাখো, যারা জেগে ঘুমোয়, তাদের ঘুম ভাঙানো সহজ নয়। একটু দেরী লাগবেই লাগবে।

প্রভাস। (হাত বাড়িয়ে) আচ্ছা', বলুন ত আমার হাত দেখে গত পনের দিনে আমার জীবনে কি উল্লেখযোগ্য সুঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদি বলতে পারেন, আপনাকে আমি [পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে] হ্যাঁ, এ দশ টাকাই দেব।

মনোতোষ। প্রভাস, টাকা আর পকেটে রাখিস না। ওটা বরং টেবিলেই রেখে দে। [প্রভাস নোট রাখে]

ত্রিলোচন। (হাত দেখে মাথা নেড়ে) আশা করি সত্যি ঘটনাটা স্বীকার করবে, কারণ তুমি যদি বল না, তা হলে আমি হাঁ প্রমাণ করতে পারব না। কারণ, তোমার শরীরে তার ক্ষতচিহ্ন নেই, কিন্তু বেদনা আছে। তোমাকে বড়বাজারের ষাড় গুতিয়ে হাসপাতালে পাঠাত, ভাগ্যিস তুমি ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছিলে।

প্রভাস। তার পর?

ত্রিলোচন। তার পর অবশ্য একটু কিছুর জন্যে পা পিছলে ফুটপাতের ওপর পড়ে গিয়ে শরীরে ব্যথা পেয়েছ—এবং সেই এখনও তোমার সম্পূর্ণ সারে নি।

মনোতোষ। কেমন, প্রভাস ঠিক ত?

প্রভাস। সত্যি আশ্চর্য্য, কি করে আপনি জানলেন?

মনোতোষ। এ দশ টাকা আর তুমি ফিরে পাচ্ছ না। এ টাকা পণ্ডিত মশায়ের। সুতরাং আমার। থাক, আমার কাছে জমা থাক। পরে সদ্ব্যবহার হবে।

প্রভাস। তা রাখ নোট। আমি কথা রাখি চিরকাল। আচ্ছা, পণ্ডিত মশায় আপনি কি করে বললেন?

ত্রিলোচন। তা তোমাদের ম্লেচ্ছ শারলক হোম্‌স যদি বুদ্ধি খাটিয়ে লোককে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, তা হলে আমি ত্রিলোচন মহেশ্বরের আশ্রিত হয়ে কেন ভাই ষাড়ের খবর রাখব না?

[ক্ষীরোদ সহ সর্ব্বাণী দেবীর প্রবেশ]

এই যে আসুন।···দেখুন, আপনি আর এখানে বেশী দেরী করবেন না।···বাড়ী চলে যান। আপনার কপাল দেখে নিয়েছি। স্বস্ত্যয়নের যা হয় ব্যবস্থা আমি করব বা নিজেই করব। আপনার এখুনি বাড়ী ফিরে যাওয়াই আপনার ছেলের পক্ষে মঙ্গল। দেরী করবেন না যান।

[সর্ব্বাণী দেবী আচল থেকে একটি একশ টাকা ও পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করে ক্ষীরোদের হাতে দেন। ক্ষীরোদ ত্রিলোচনের হাতে দেয়। ত্রিলোচন পণ্ডিত ফিরিয়ে দেন টাকা।]

ক্ষীরোদ। টাকা নেবেন না কেন ?

ত্রিলোচন। আমাদের মনোতোষ বাবুর—থুড়ি, আমাদের মনোতোষের বন্ধু যখন, তখন টাকার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বস্ত্যয়ন সম্ভব যদি যে কারণে এই যোগের সূচনা সেই কারণগুলি জানা যায়। সেগুলো জেনে নেব এদের, মানে তোমাদের কাছে, ওকে এখানে বসিয়ে রেখে লাভ নেই। টাকা দেবার জন্তে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মা, আপনি যান, আর দেরী করবেন না। ক্ষীরোদ যাও, ওকে বাড়ী পৌঁছে দাওগে। আর সাবধান, ব্যানার্জ্জী যেন মোটর চালানোর কোন সুযোগই না পায়। মোটর অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা দরকার।

যাও ক্ষীরোদ, শীগগীর যাও। যান মা, আপনিও যান।

সর্ব্বাণী দেবী। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি ভার নিয়েছেন।

[ক্ষীরোদ ও সর্ব্বাণী দেবীর প্রস্থান]

প্রভাস। ব্যানার্জ্জীর মা মানে আমাদের মাসীমাকে সরিয়ে দিলেন যে ?

ত্রিলোচন। না, মানে কপালটা যখন দেখে নিয়েছি, তখন আর ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রশ্ন করে বুঝবার বিষয় আছে। উনি থাকা মানে আমার সময় নষ্ট। তা ছাড়া পাগল হলেও ব্যানার্জ্জী হয়ত মাকে দেখলে একটু শান্ত থাকবে। হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে সিড়ি থেকে পড়েও ত যেতে পারে। ওর মার চেহারা দেখে বুঝলাম, ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী, যতটা মাটির মানুষ মনে হয়, ততটা উনি নন। উনিই ছেলেকে আয়ত্তে রাখতে পারবেন। এই আর কি। তা ছাড়া বর্ষপ্রবেশ অনুযায়ী আজকের দিনে সত্যজিৎ ব্যারিষ্টারের একটা মস্ত ফাড়া আছে। সে ফাড়া হয়ত কাটতে পারে সুলক্ষণা মাতার সান্নিধ্যে।

প্রভাস। বলেন কি ? কি রকম ফাড়া ?

ত্রিলোচন। তা ঠিক এখন বলতে পারছি না। মনটাও বিক্ষিপ্ত রয়েছে কি না।

যাক বল—মনোতোষ, তাড়াতাড়ি খবরগুলো বলে আমায় বিদায় দাও। আবার আমার অন্ত কাজও পড়ে রয়েছে।

মনোতোষ। বলুন কি জানতে চান ?

ত্রিলোচন। কি কারণে ব্যানার্জ্জী পাগল হয়েছে তা তোমাকে আর বলতে হবে না, আমি সপ্তম, চতুর্থ, লগ্ন দশম ও রাহুশনির অবস্থান আর বৃহস্পতি-শুক্রের ষষ্ঠ-অষ্টম সম্বন্ধ থেকে বুঝতে পারছি। কিন্তু, আমার জিজ্ঞাস্য ঐ মেয়েটি কে ?

মনোতোষ। ট্রাম ড্রাইভার রাধিকামোহন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে। কালো হলেও সত্যজিৎ আমাকে বলেছে, খুব ভাল মেয়ে। সত্যজিৎকে দেবতার মত নাকি ভক্তি করত। সত্যজিৎ যে ওর গলায় মালা দিয়ে বসবে, তা কল্পনাই করতে পারে নি।

ত্রিলোচন। ছেলে আছে না ?

মনোতোষ। হ্যাঁ, তা এখন বয়েস সাত বছর হবে। যদি বেঁচে থাকে।

ত্রিলোচন। ছেলে না মেয়ে কি করে তুমি বুঝলে ? তুমি ত দেখ নি কাউকে।

মনোতোষ। দেখেছি বৈ কি। আমাদেরই ইটখোলায় দীপ্তির ছেলে হয়েছে। তখন যদি বুঝতে পারতাম—

প্রভাস। ইটখোলায়! বলিস কি ?

ত্রিলোচন। নাম বুঝি দীপ্তি ?

মনোতোষ। হ্যাঁ।

ত্রিলোচন। কি করে এল ? আর তখন যদি বুঝতে পারতে—কি যেন বলছিলে ?

মনোতোষ। তখন যদি জানতাম ঐ মেয়েটিই দীপ্তি! ও নাম বলেছিল তৃপ্তি, তাই প্রথমটা সন্দেহ করি নি। দীপ্তিকে আমি কোনদিন এর আগে চোখে দেখি নি। সত্যজিতের ঘরে বসে নাম শুনেছিলাম, কিন্তু কখনই তখন ভাবতে পারি নি সত্যজিতের মতন সুদর্শন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—যার সঙ্গে মালটিমিলিয়নেয়ারের মেয়ে—সুন্দরী শিক্ষিতা মিনতির বিয়ের এক রকম ঠিকঠাক হয়েই আছে—সেই সত্যজিৎ কিনা—শেষে চক্রবর্ত্তীর মেয়ে দীপ্তির প্রেমে পড়ে যাবে। যার বাবা ট্রামড্রাইভার, মা পাগল, আর সে নিজে দেখতে কাল—তাকে সত্যজিৎ এতটা গভীর ভাবে ভালবাসবে এ কল্পনার অতীত নয় কি ?

প্রভাস। ভালবাসা ব্যাপারে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ভালবাসা ও চোখের নেশা একই কথা বললেও চলে। কার চোখে কে সুন্দরী, বা সুন্দরী নয়—তা কি কেউ বলতে পারে!

ত্রিলোচন। কিন্তু, দীপ্তি কেন তোমাদের টালিগঞ্জের ইট-খোলায় যাবে ?

মনোতোষ। গর্ত্তে পড়েছিল, রক্তাক্ত বেশে—মানে প্রসবের পরের অবস্থার কথা বলছি। আমিই ত প্রথম তুলে নিলাম ধুলা-কাদা থেকে ওর খোকাকে। এ প্লাম্প বয়, বেশ পুষ্ট হয়েছিল বেবিটা—ওঙা ওঙা করে ডাকছিল।

ত্রিলোচন। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না কি করে দীপ্তি

ইটখোলায় এল—আর ওই অবস্থায় কেনই বা ইটখোলায় যাবে ?

মনোতোষ। ইটখোলায় এসেছিল হয়ত কতকগুলো মাতালের ভয়ে। কুলিরা তখন যে যার খুপরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে কাজ ছেড়ে। দুপুরের খাওয়া খাবার জন্তে। কাজে ফিরে গিয়ে টের পায় ওরা, তার পর আমাকে ডাকে।

ত্রিলোচন। অবশ্য তোমাদের ইটখোলার কাছেই তাড়িখানা, মাতাল রাস্তায় পেছু নিয়েছে এমন অবস্থায় যুবতীর পক্ষে ভয় পেয়ে ইটখোলার দিকে দৌড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

মনোতোষ। হয়ত পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল, অথবা মাটি-তোলা গর্তে লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হয় ও এসেছিল উৎপলা বলে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বেশী দূর ত নয় রেফিউজি কলোনী—উৎপলারা ওদিকে বাড়ী করেছে কিনা। মানে টালির শেড জাতীয় বাড়ী। দীপ্তির আঁচলে একশ' টাকা—দশখানা দশ টাকার নোট বাঁধা ছিল। আমার মনে হয় ও টাকা উৎপলাই দীপ্তিকে দিয়েছিল—আসন্নপ্রসবার খরচ চালাবার জন্তে।

ত্রিলোচন। তা দীপ্তিকে কেন নিয়ে যাও না সত্যজিতের কাছে ?

মনোতোষ। সেই ত সমস্তা। দীপ্তিকেই ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম আমি। আশ্চর্য্য, আমাকে কিছু না জানিয়েই তৃপ্তি ওরফে দীপ্তি কোথায় যে চলে গেল ছেলে কোলে করে, তার পর আর তার সঙ্গে এই সাত বছরের মধ্যে কোন দিনই দেখা হয় নি।

ত্রিলোচন। উৎপলারাও সন্ধান দিতে পারে নি ?

মনোতোষ। দিতে পারে নি বললে হয়ত ঠিক হবে না। দেয় নি। ইচ্ছে করেই দেয় নি।

ত্রিলোচন। কেন ?

মনোতোষ। উৎপলা—সে এক আশ্চর্য্য মেয়ে। এমন পুরুষ-বিদ্বেষী স্ত্রীলোকও আর দেখি নি। আমি গিয়েছিলাম দীপ্তির খোঁজ নিতে তার কাছে।

ত্রিলোচন। তার পর ?

মনোতোষ। সে বলল, মোটর হাঁকিয়ে দীপ্তির খোঁজ নিতে এসেছেন ? আজ সাত বছর পরে। একবার আপনার বন্ধু অনুগ্রহ করেছেন, এইবার আপনি এসেছেন দয়া দেখাতে। যান, আর আপনাদের অনুকম্পার প্রয়োজন নেই। দীপ্তি চিরদিনই অম্লান—আপন গুণেই জ্বলেছে, জ্বলবে। যান, যান—আপনি আপনার কাজে যান। আপনার সঙ্গে যে আরও বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করব সে অবসরও বিধাতা আমাকে দেন নি। আচ্ছা, নমস্কার—বলে সে উঠে গেল।

ত্রিলোচন। আচ্ছা, উৎপলা না হয় সাত বছর পরে সন্ধান দিতে রাজী হয় নি। কিন্তু, সাত বছর আগে তুমি যখন তৃপ্তিকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলে, তখন ত তার আসল পরিচয় জানতে পারতে। কি করে সে মেয়েটি—ভদ্রলোকের মেয়ে—ইটখোলায় এল—তাও আসন্নপ্রসবা অবস্থায় ?

মনোতোষ। হাসপাতালের ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন, সামান্ত উত্তেজনাও রুগিণীর পক্ষে খারাপ হতে পারে—অনেক সময় নাকি প্রসূতিরা পাগল হয়ে যায়। সেই সব কথা শুনে আমিও কৌতূহল দমন করেছিলাম। একবার মাত্র তৃপ্তি বলেছিল আমাকে হাত জোড় করে, নমস্কার ভঙ্গীতে—হাসপাতালের লাল কম্বলের নীচে প্রায় বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে—আমাকে আপনার ঠিকানাটা দিন—খোকা যখন বড় হবে বলব তাকে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটা ঠিকানা আছে যেখানে গিয়ে সে মাথা নত করতে পারে, অসঙ্কোচে, আর কিছুই বলে নি নিজে থেকে।

ত্রিলোচন। সত্যজিৎ ব্যারিষ্টার কি দীপ্তিকে শাস্ত্রীয় মতে বিয়ে করেছিল ?

মনতোষ। হ্যাঁ, কালীঘাটে এক এঁদো গলি—গোপনে বিয়ের মন্ত্র পড়বার এমন গলি আর কলকাতায় দুটো আছে কিনা সন্দেহ—গলির গলি তস্য গলি, তার মধ্যে—হরিহর গাঙ্গুলী বলে একজন বৃদ্ধ পুরোহিতকে ধরে কিছু অর্থব্যয় স্বীকার করে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করিয়েছিল সত্যজিৎ, করাতে বাধ্য হয়েছিল হয় ত। দীপ্তি কি জানি তা না হলে আত্মহত্যা করতে পারে এই ভয়ে। আত্মহত্যা করলে কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়ত, সত্যজিৎকে পুলিশে সহজে ছাড়ত না।

ত্রিলোচন। আর জানাজানি হয়ে গেলে মিনতির বাবা কখনই তুলে দিতেন না মিনতিকে সত্যজিতের হাতে। দ্যাখো, জ্যোতিষীরাও কিছু জানে না। এই কথাটা ধরি ধরি করেও আমি ঠিক ধরতে পারি নি। কিন্তু মিনতি আর সত্যজিতের বিয়ের আগে যোটক বিচারে আমি সন্তুষ্ট হই নি। নেহাৎ মিনতির মায়ের অনুরোধে পড়ে 'হ্যাঁ, না, হ্যাঁ' করে শেষ পর্য্যন্ত মত দিয়েছিলাম। আচ্ছা—দ্যাখো, একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। সত্যজিৎ যদি দীপ্তিকে শাস্ত্রীয় ভাবে বিয়ে করে থাকবে, তা হলে দীপ্তি ত মামলা করলে খেসারত আদায় করতে পারত।

প্রভাস। সব মেয়েই কি মামলা করে ? তা ছাড়া, দীপ্তির পক্ষে বিয়ে প্রমাণ করা কত কঠিন, ভেবে দেখুন। হরিহর গাঙ্গুলী বা তার বউও বেঁচে নেই, পড়ে আছে ভাঙা বাড়ী, একেবারেই যাকে বলে ধ্বসে-পড়া। এমন কি রিফিউজিরা সে বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করে না। সাক্ষীর মধ্যে এখন বেঁচে আছে চামচিকে, ইঁদুর আর আরশোলা। সত্যজিৎ প্রকাশ করবার পর আমরা খোঁজ নিয়েছি।

ত্রিলোচন। দীপ্তির বাবা, যিনি ট্রামড্রাইভার, তিনি গেলেন কোথায় ? তার কাছে দীপ্তির খোঁজ পাওয়া যায় না ?

মনোতোষ। খোঁজ নেওয়া হয়েছে। চক্রবর্ত্তী ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছে। আখড়া বানিয়েছে নাকি নবদ্বীপের কাছাকাছি

কোন্ গাঁয়ে। কাটোয়া-কালনা লাইনে কীর্ত্তন গেয়ে বেড়ায়। চক্রবর্ত্তী মেয়ের কোন সন্ধানই পান নি।

প্রভাস। চক্রবর্ত্তীর মায়ের সঙ্গে নাকি দীপ্তি একদিন গঙ্গা-স্নানে গিয়েছিল, গঙ্গায় নাকি বান এসে পড়ে। বানে ভেসে গিয়েছে দীপ্তি বলে বুড়ী প্রচার করেছে।

ত্রিলোচন। ও কলঙ্ক এড়াবার জন্যে প্রচার। দীপ্তি মারা গিয়েছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ সত্যজিৎ ব্যারিষ্টারের প্রথম ধর্ম্ম-স্ত্রী যদি হয়, তা হলে সে বেঁচে আছে। সপ্তমপতি বৃহস্পতি একাদশে। অবশ্য সপ্তম স্থানে রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। সূক্ষ্ম বিচার করে যদিও দেখিনি, তবু আমার ধারণা দীপ্তি এখনও বেঁচে আছে। তোমরা সবাই দীপ্তিকে খুঁজে বের কর। দীপ্তিকে ও তার সন্তানকে ফিরিয়ে আনো সসম্মানে। তা হলেই প্রকৃত স্বস্ত্যয়ন করা হবে। আমার সাধ্যমত আমি মহামায়াকে ডাকব। তার পর তাঁর ইচ্ছা। আচ্ছা ভাই, আজকে তোমাদের কাছ থেকে এখনি বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি, মনে কিছু কোরো না।

[ফতুয়া, তসরের চাদর গায়ে ও রূপার হাতল-মোড়া বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে পণ্ডিত ত্রিলোচন উঠে দাঁড়ান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[জ্যোতিষী ত্রিলোচনের চতুষ্পাঠী বা বৈঠকখানা। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ফরাসের ওপর বসে আছেন ত্রিলোচন। গড়গড়ার নল হাতে ত্রিলোচন কি যেন ভাবছেন, একটি ছাত্র একটু দূরে বসে অনেকগুলি কাগজপত্র ঘেটে একটা কোষ্ঠী লিখছে। মনোতোষ, প্রভাস ও ক্ষীরোদের প্রবেশ।]

ত্রিলোচন। কি খবর, একেবারে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আমার ঘরে। বোসো সব। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[তিন জন এগিয়ে এসে আসন গ্রহণ করে]

প্রভাস। আপনি ইংরেজী জানেন নাকি?

ত্রিলোচন। (হেসে) ও, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলেছি বলে? না না, ইংরেজী বিদ্যে বিশেষ কিছু নেই, যাও ছিল তাও ভুলে গিয়েছি। তবে বইটার বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে কি না। আমার এক নাতনীর বিয়েতে পাওয়া উপহার, সেটা সেদিন পড়ছিলাম। তাই তোমাদের দেখে আমার কেমন মনে এসে গেল। কেন, অন্যায় বলেছি?

ক্ষীরোদ। না অন্যায় বিশেষ কিছুই বলেন নি। এই প্রভাসটার জিভের ধারে অসিও খান্ খান্ হয়ে যায়।

প্রভাস। কোন্ জিভের ধার কম সে নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

মনোতোষ। পণ্ডিত মশায় বি-এ পাস—তা বুঝি তোরা জানিস না।

ত্রিলোচন। কোন খবর পেলে তোমরা কেউ?

মনোতোষ। না। বিশ্বজিৎকে আবার আমরা নবদ্বীপ পাঠিয়েছিলাম। সে নাকি দীপ্তির বাবাকে নবদ্বীপে মাথুর গাইতে দেখেছে, কিন্তু দীপ্তির কোন সন্ধান পায় নি।

ত্রিলোচন। বিশ্বজিৎ কে?

মনোতোষ। সত্যজিতের ভাই।

ত্রিলোচন। ও! তাই ত, ভুলে গিয়েছি। বিশ্বজিৎই ত এসেছিল সেদিন?

মনোতোষ। আপনার কাছে?

ত্রিলোচন। ওর দাদার ভবিষ্যৎ জানতেই এসেছিল আমার কাছে। তার পর?

মনোতোষ। এখন কি কর্ত্তব্য—এদিকে সত্যজিতের অবস্থা ত দিন দিন খারাপ হতে চলেছে।

ত্রিলোচন। কেন, কি হয়েছে, আরও অবনতি হয়েছে কি?

ক্ষীরোদ। সারা রাত হয় পিয়ানো, না হয় বেহালা বাজিয়ে চলে। অথবা বারান্দায় আকাশের দিকে চেয়ে পায়চারী করে। আপনার কথামত মোটর সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু, সারারাত সারা দিন ওকে কে পাহারা দেবে। সেই হয়েছে সমস্যা। কখন হয়ত বেরিয়ে পড়বে একা একা, কিনে আনবে এক ফাইল সোনেরিল। তার পর এমন ঘুম ঘুমুবে—আর চোখ খুলবে না কোন দিন। এই মতলবের দিকে কিন্তু ওর স্পষ্ট ঝোঁক আছে বোঝা যায়। ওর মার চোখেও ত ঘুম আছে।

ত্রিলোচন। রাঁচীতে নিয়ে গেলেন শরৎবাবু নাকি শুনলাম, তা কিছু ফল হ'ল না বুঝি?

[গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে টানতে থাকেন]

ক্ষীরোদ। নাঃ, ডাক্তারা ইলেকটিক শক্ দিতে নিষেধ করেছেন। যদি শকে না ভাল হয়, তা হলে নাকি চিরকালের মতন পাগলই থেকে যাবে।

ত্রিলোচন। হাঁ, কালহরণ করাই বোধ হয় কাল। কিন্তু কিন্তু—তাই ত দীপ্তিকে পেলে না তোমরা?

[আবার নল মুখে গড়গড়া টানেন]

কি যে করি। যাক, মন খারাপ করে আর কি হবে। যা হবার তা ত হবেই, যা না হবার তা হবে না। ইতি চিন্তা-বিষোঘ্নম্ অগধঃ কিং ন পীয়তে?

[ভৃত্য বেহারীর প্রবেশ]

বেহারী। সেই যিনি সেদিন এসেছিলেন তিনি এসেছেন।

ত্রিলোচন। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে কি?

বেহারী। হ্যাঁ।

ত্রিলোচন। যা ডেকে নিয়ে আয় এই ঘরে। হরেন তুমি একটু যাও ত পাশের ঘরে। এদের তিন জনকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দ্যাখো, যদি চা ও টায়ের কিছু বন্দোবস্ত করতে পার। আচ্ছা ভাই, তোমরা একটু ওঘরে যাও।

প্রভাস। আমারা বরং আজকের মত বিদায় নি। আর এক সময়ে আসব। সত্যজিতের কোষ্ঠীটা।

ত্রিলোচন। সে পরে আলোচনা করব। কিন্তু তোমরা এখন যেতে পাবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার এখনও কাজ শেষ হয় নি। বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখব না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর। ও ঘরে অনেক বই আছে। মহিলাটি আগে থেকে এনগেজমেণ্ট করে এসেছেন কিনা। কিছু মনে কোরো না।

[হরেন্দ্র, ক্ষীরোদ, প্রভাস ও মনোতোষ উঠে দাঁড়ায়। পাশের একটি দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিহারীর পশ্চাতে একটি মহিলা ও একটি সাত-আট বছরের ছেলে প্রবেশ করে। মহিলাটির সধবা বেশ। কিন্তু মাথার কাপড় এমন ভাবে দেওয়া, এমন ভাবে মুখ ঘোরানো, দর্শকরা কেউ পুরোপুরি তাকে দেখতে পাবে না। ছেলেটির পরনে শাদা হাফপ্যাণ্ট ও হাফশার্ট। দেখতে খুব সুশ্রী, রং ফর্সা।]

বিহারী। আর একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও এসেছেন। কি ব'লব ?

ত্রিলোচন। বলগে, কালকে আসতে। সন্ধ্যের দিকেও আসতে পারেন। জিগ্যেস করিস, জগদীশপ্রসাদ কি না। আমার মনে হচ্ছে সেই এসেছে। কালকেই বলে দিস আসতে।

[বিহারীর প্রস্থান]

বসুন মা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? অত লজ্জা কিসের ? বুড়ো ত্রিলোচনের কাছে কুণ্ঠিত হবার কিছুই নেই। সন, তারিখ, জন্ম সময়, আর যা যা বলেছিলাম—ঠিক ঠিক লিখে এনেছেন ?

মহিলা। (অবগুণ্ঠন আর একটু সরিয়ে) খোকার জন্মসময় কিন্তু আপনাকে ঠিক ঠিক বলতে পারব না। আন্দাজ, বোধ হয়, বেলা বারটা থেকে দুটোর মধ্যে ওর জন্ম হয়েছে।

ত্রিলোচন। সে কি ? কলকাতায় থাকেন, বাড়ীতে কি ঘড়ি নেই ?

মহিলা। বাড়ীতে ওর জন্ম হয় নি।

ত্রিলোচন। তা হলে হাসপাতালে ? হাসপাতালে ত আরও নির্ভুল সময় রাখবার কথা। কাগজটা কি হারিয়ে ফেলেছেন ? খোঁজ করলে রেকর্ড নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

মহিলা। (বিব্রতভাবে) কেন, আপনি কি ঘটনা থেকে ওর লগ্ন, রাশি, নক্ষত্র ঠিক করতে পারবেন না ?

ত্রিলোচন। (মাথা চুলকিয়ে) পারি। কিন্তু এমন কি ঘটনা ঘটেছে খোকার জীবনে, যা থেকে সন্ধিলগ্নের নির্ভুল মীমাংসা করা যাবে ?

মহিলা। ওর মায়ের জীবনের ঘটনা ত ওর চতুর্থ স্থানের নির্দেশ দিতে পারে।

ত্রিলোচন। (ঈষৎ বিস্মিত ভাবে) আপনিও দেখছি একটু-আধটু জ্যোতিষী জানেন ?

মহিলা। না, আমি কিছুই জানি না। উৎপলা বলে কি না। মানে উৎপলা বলে আমার একটি বন্ধু আছে। সে একটু-আধটু এ্যাষ্ট্রলজি ও পামিষ্ট্রি শিখেছে। তার এক মামার কাছে।

ত্রিলোচন। কি বললেন, উৎপলা ?

মহিলা। চেনেন নাকি ?

ত্রিলোচন। না, এমনি, নামটা বেশ মিষ্টি লাগল, তাই জিগ্যেস করলাম। আচ্ছা আপনার ছেলের কি হাসপাতালে জন্ম হয় নি ? সে কি করে হয় ! ঘর আর হাসপাতাল ছাড়া ত বুঝতে হবে আকাশ ! আকাশের তলায় কি ওর জন্ম ?

[মহিলাটি এবার আরও যেন বিব্রত হন। কি যেন চিন্তা করেন, প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চান। অবশেষে বলেন।]

মহিলা। ধরুন যদি বলি তাই—আর যদি বলি ওর বাবা একজন খুব ধনী আর বিদ্বান লোক. অথচ ওকে পালন করবার এক ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই, ওর জন্ম-সংক্রান্ত ঘটনা দ্বারাই ওর মায়ের জীবনে ওলটপালট এসেছে—আর—[মহিলাটির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। বলতে পারেন না আর কিছুই। ত্রিলোচন গম্ভীর ভাবে পয়েণ্টসগুলো টুকতে টুকতে বলেন :]

ত্রিলোচন। থাক্, আর বলতে হবে না আপনাকে। ছেলেটির পিতার নাম লিখে দিন একটা কাগজের টুকরোয়। আর আপনার নাম, জন্মস্থান, জন্মসময় তাও লিখে দিন। আপনার কুষ্ঠী আর আপনার ছেলের কুষ্ঠী—দুটো কুষ্ঠী হবে ত ?

মহিলা। (ঘাড় আরও হেঁট করে) হ্যাঁ। [মনিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করেন]

ত্রিলোচন। দু' সপ্তাহ পরে কুষ্ঠী দুটো নিয়ে যাবেন। টাকা আগাম দেবেন ?—তা দিন।

মহিলাটি। (নোট হাতে) আজকে এই পাঁচ টাকার নোটটা রাখুন। পরশু স্কুলের মাইনে পেলে বাকী সব টাকাই দিয়ে যাব। একটু দয়া করে দেখবেন—বিশেষ করে খোকার বিদ্যাস্থানটা। ওকি লেখাপড়ায় ভাল হবে ? ভাল হলে কতটা ভাল হবে ? ও কি—

[মহিলাটির হাত থেকে পাঁচ টাকার একটি নোট নেন ত্রিলোচন। মহিলাটি ব্লাউজের মাঝখান থেকে ফাউণ্টেন-পেন বের করে—কথা বলতে বলতে থেমে যান। কি যেন ভাবেন কয়েক মুহূর্ত ধরে]

ত্রিলোচন। (নোট ফতুয়ার পকেটে রেখে) কি বলছিলেন বলুন।

মহিলা। বলছিলাম, ও কি খুব বড়লোক হতে পারে ?

ত্রিলোচন। বড়লোক বলতে আপনি কি বোঝাতে চান ? অর্থভাগ্যের কথা বলছেন ?

মহিলা। না, আমি বলছি ওই ইংরেজীতে হাইটস অব গ্রেট যেন যাকে বলে—সে রকম কোন ?

ত্রিলোচন। সে রকম কোন 'হাইটে' উঠতে পারবে কি না? আর কি জানতে চান?

মহিলা। আর জানতে চাই—ধরুন খ্যাতিমান ত অনেকেই হয়—

ত্রিলোচন। আপনি বলতে চান, ও সত্যিকারের বড়লোক হবে কি না যাকে বলে 'রিয়েলী গ্রেট'?

মহিলা। আমি বলতে চাই, 'রিয়েলী গুড' হবে কি না। জানতে চাই, ও কি খ্যাতিমান হয়েও মিথ্যাচারী হবে কোনদিন? আর তাই যদি ভাগ্যে থাকে, তা হলে আমার আয়ুঃ কত? আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

[কলকের ফু দিতে দিতে বেহারীর প্রবেশ। গড়গড়ার কলকে বদলে দেয়। ত্রিলোচন আবার নল মুখে দিয়ে টানতে থাকেন—এক মুখ ধোয়া ছেড়ে মহিলাটির দিকে পুনরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বেহারীর প্রস্থান। মহিলাটি একখণ্ড কাগজের ওপর ফাউন্টেনপেন দিয়ে দাগ কাটেন—কলম ওঠান, এক অক্ষর লেখেন আর ভাবেন]

ত্রিলোচন। কই লিখে ফেলুন তাড়াতাড়ি। কি ভাবছেন অত?

মহিলা। এই লিখছি।

ত্রিলোচন। স্বামীর নাম মুখে বলতে নেই, কিন্তু লিখতে কি দোষ?

মহিলা। (লজ্জিত ভাবে) আদ্য অক্ষর লিখলেও ত চলতে পারে?

[লেখা শেষ করে কাগজটা ত্রিলোচনের হাতে দেন দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপে।]

ত্রিলোচন। (কাগজের খণ্ডে চোখ বুলিয়ে) তৃপ্তি দেবী! নিজের নামের শেষে বন্দ্যোপাধ্যায় কেটে 'দেবী' করলেন কেন? আজকাল ত স্বামীর উপাধিতে স্ত্রীরা পরিচিত হতে ভালবাসেন। দেবীত্বের ওপর লোভ আছে এমন কথা ত আর শুনতে পাই না।

মহিলা। মানে আমি ভাবলাম—[মহিলা মুখ নীচু করেন, এক হাত দিয়ে কার্পেটের এক কোণা ধরে, কি যেন মানসিক আবেগ সংবরণ করবার প্রবল চেষ্টা করেন]

ত্রিলোচন। (আবার কাগজটা চশমা-নাকে পরীক্ষা করে) স্বামীর নামের আদ্য অক্ষর লিখতে গিয়ে অনেক কালি ফেলেছেন, ফোটা ফোটা কালি। একি, শরীরটা বুঝি ভাল লাগছে না? আপনার কি হার্ট-ট্রাবল আছে? অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন কেন? যান ঐ কোণে ফোলডিং চেয়ারে গিয়ে বসুন। হাত-পাখা দেব?

খোকা, তোমার মাকে ধর। বেহারী—বেহারী!!

[বেহারীর প্রবেশ। খোকার কাঁধে হাত রেখে মহিলাটি ঘোমটা আর একটু টেনে, আস্তে আস্তে কোণের একটি অন্ধকারের ফোলডিং-চেয়ারে গিয়ে বসেন]

বেহারী, তুই একটু ওঁর মাথায় হাওয়া কর, এই নে হাতপাখা।

[বেহারী হাতপাখা নিয়ে এগিয়ে যায়, মহিলার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বাতাস করে। মহিলাটির মাথার ঘোমটা উড়ে যায়। দর্শকরা প্রথম পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় মহিলাটি আর কেউ নয়, দীপ্তি—সীমন্তিনী, সধবার বেশে চোখ বুজে আছে। তার মুখে অতীতের হতাশা ও বর্ত্তমানের বাৎসল্যের ভরসার মিশ্রণে একটা বেদনাকরুণ অথচ উজ্জ্বল দ্যুতি—(লাইট ফোকাস)—দীপ্তি চোখ খোলে। দর্শকদের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরায়। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কেটে যায়। দীপ্তি হাত নেড়ে বেহারীকে বাতাস করতে নিষেধ জানায়]

দীপ্তি। থাক বেহারী, আর তোমাকে বাতাস করতে হবে না, এখন ভাল বোধ করছে।

[বেহারী পাখাটা হাতে করে ত্রিলোচনের দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু স্থানত্যাগ করে না। দীপ্তি উড়ে যাওয়া ঘোমটা আবার উঠিয়ে নেয় মাথার উপর। তবে এবার ঘোমটা চুলের উপরেই থাকে, দীপ্তির মুখ বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। ত্রিলোচন আর একবার গড়গড়ায় টান দিয়ে মুখ থেকে নলটা নামান]

ত্রিলোচন। বেহারী, কলকেটা ছাখত, কি হ'ল—এর মধ্যেই তামাক জলে গেল?

বেহারী। (এগিয়ে গিয়ে কলকের উপর ছাইয়ে ফু দিয়ে) বাবু, এখনও আগুন আছে, তামাকও আছে, নলটা দেখুন ত। বোধ করি, নলেতেই আটকাচ্ছে।

ত্রিলোচন। (নলটা ফু দিয়ে, আবার এটে, টান দিয়ে) ঠিক আছে, এইবার তুই যেতে পারিস। [বেহারীর প্রস্থান]

(খোকার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) দেখি দাদু, তোমার হাতটা। উঠে এস ফরাসে—ও জুতো বুঝি পায়। আচ্ছা, খুলে নাও জুতোটা।

[বালকটির পায়ে ফিতে বাঁধা অক্সফোর্ড সু, জুতো খুলতে দেরী হয়]

খুলতে পারছ না। দাঁড়াও, আমি খুলে দিচ্ছি।

[ত্রিলোচন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির জুতোর ফিতে স্পর্শ করেন। ছেলেটি একটু এগিয়ে এসে ত্রিলোচনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে যায়। ত্রিলোচন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বাধা দেন]

আমাকে প্রণাম করবার প্রয়োজন নেই। দেখি তোমার হাতটা।

[ছেলেটি এইবার ত্রিলোচনের সামনে বসে হাত বাড়িয়ে দেয়। ত্রিলোচন তাকিয়া কোলের মধ্যে নিয়ে একটু ঝুঁকে মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটির হাতের রেখা পরীক্ষা করেন]

তোমার নাম কি?

বালক। শ্রীসৌম্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিলোচন। আচ্ছা, বলত ত্রিলোচন মানে কি?

সৌম্যেন্দ্র। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) লোচন মানে চোখ—তিন চোখ যার, শিব, ত্র্যম্বক।

ত্রিলোচন। বাঃ! এত বুদ্ধি তোমার, তবে ত বড়লোক হবেই। আচ্ছা, বলত—আমার নাম দিয়েছিলেন ঠাকুর্দা—'ত্রিলোচন'—; আমি কি করে শিব হতে পারি? মানুষ কি দেবতা হতে পারে কখনও?

[সৌমেন্দ্র এবার যেন একটু ফাঁপরে পড়ে। একবার ত্রিলোচনের দিকে, আর একবার মায়ের দিকে তাকায়। দীপ্তির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে]

দীপ্তি। (উঠে দাঁড়িয়ে, মঞ্চের মাঝে এসে) বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন ওকে। ওর বয়স এখনও পুরো সাত হয় নি। ও কি করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে?

[ত্রিলোচন আবার গড়গড়ায় টান দেন। সৌম্যেন্দ্র মায়ের দিকে আবার তাকায়, তারপর দর্শকদের দিকে মুখ ফেরায়, পুনরায় ত্রিলোচনের দিকে চেয়ে বলে]

সৌম্যেন্দ্র। মানুষ কি দেবতা হতে পারে না?

ত্রিলোচন। (নল মুখ থেকে নামিয়ে, সহাস্যে) একেবারে উল্টো চার্জ্জ। নিন, এইবার আপনার ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিন। সৌম্যেন্দ্র আমাদের সবাইকেই ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে।

[দীপ্তির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। (লাইট ফোকাস) সৌম্যেন্দ্র দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচল টেনে কি যেন বলতে চায়। দীপ্তি একটু নীচু হয়ে ছেলের কথা শোনে]

কাণে কাণে মাকে কি বলছ দাদু? আমাকে বলতে এত লজ্জা কেন—?

দীপ্তি। (আবার সোজা হয়ে ছেলেকে সামনে রেখে, দুই হাতের মধ্যে ছেলের গলা স্পর্শ করে)—ও বড় লাজুক। একা একা শুধু আমার কাছেই মানুষ কিনা। স্নেহের ডাকও খুব বেশী শোনে নি জীবনে। তাই মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

ত্রিলোচন। কি বলছে ও?

দীপ্তি। বলছে, ধ্রুব কি দেবতা হন নি?

[বৃদ্ধ ত্রিলোচন তসরের চাদর উঠিয়ে অশ্রুমার্জ্জনা করেন]

ত্রিলোচন। ঝুল ঝাড়ে না চাকরটা। কোনও কাজের নয়। ফাঁক পেলেই ফাঁকি দেবে। বেহারী—বেহারী!!

[বেহারীর প্রবেশ]

ব্যাটা, মাইনের বেলায় ত ঠিক আছে—কাজের বেলায় ঢনঢন্।

বেহারী। আজ্ঞে, কি বলছেন?

ত্রিলোচন। বলব আবার কি রে ব্যাটা! ঝুল ঝাড়িস নি কেন? সবার মাথায় ঝুল পড়ছে, চোখে যাচ্ছে।

বেহারী। ঝুল কোথায় বাবু, ঘর ত পরিষ্কার।

ত্রিলোচন। ঘর পরিষ্কার! অমনি বললেই হ'ল? ফের বেহারী তর্ক করবি না বলছি। তোর চোখে চশমা নেওয়া দরকার, বুঝলি। যা, আর এক কলকে তামাক সেজে আন।

[বেহারীর প্রস্থান। দীপ্তি এগিয়ে গিয়ে মাথা নত করে ত্রিলোচনকে প্রণাম করে, হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নেয়]

দীপ্তি। (ঈষৎ হাস্যে) দেখুন—

ত্রিলোচন। কি মা, পায়ের ধুলো নিচ্ছেন কেন? আপনি হলেন একজন হেডমিস্ট্রেস, বি-এ, বি-টি। কত ছাত্র-ছাত্রী আপনাকে প্রণাম করে ও করবে। আমি—আমি যে সামান্য গণৎকার। এ কি, আপনি কাঁদছেন!

দীপ্তি। (আচল দিয়ে চোখ মুছে) না, এ দুঃখের কান্না নয়, এ আনন্দের, ভরসার অশ্রু। দেখুন, আমি আপনার মেয়ের মত, আমাকে আর আপনি বলবেন না।

ত্রিলোচন। (স্মিতহাস্যে) তা হলে মা, একটা অভিযোগ জানাই। তুমি কেন নিজের নাম দীপ্তি না লিখে তৃপ্তি লিখলে? তোমার নাম ত তৃপ্তি নয়।

দীপ্তি। (চমকিত ভাবে) দীপ্তি!—দীপ্তি নাম কি করে জানলেন আপনি?

ত্রিলোচন। জানি, জানি। আমি যে জ্যোতিষী। বসো, চেয়ারটা টেনে বসো। তোমার আবার শরীর ভাল নেই।

দীপ্তি। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। শরীর আমার খারাপ নয়। হঠাৎ কতকগুলো অতীতের স্মৃতি মনে এল, তাই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু, এখন আর ভয় নেই।

ত্রিলোচন। এখন ভয় নেই কেন?

দীপ্তি। (মৃদুহাস্যে) আমার সৌম্যেন যে তার দাদুকে পেয়েছে।

ত্রিলোচন। ও, এই কথা। তবে—তুমি কেন সৌম্যেনের মা হয়ে—সৌম্যেনের দাদুর হাতে মিথ্যে নাম লিখে দিলে? এটা কি মিথ্যাচার নয়?

দীপ্তি। মিথ্যে ত লিখি নি। তৃপ্ত হ'ল আমার আর এক নাম। ওই নামেই আমি আই-এ, বি-এ, এমন কি বি-টিও পাশ করেছি। স্কুলের প্রসপেক্টাসে আমার নাম 'ডি' নয়—'টি' ব্যানার্জী।

ত্রিলোচন। তা হলে এফিডেভিট করে নাম বদলে ছিলে বল, ম্যাট্রিকের সময় ত তোমার নাম দীপ্তি ছিল।

দীপ্তি। আপনি এত খবর জানলেন কি করে? আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

ত্রিলোচন। আরও অবাক হয়ে যাবে। একটু সবুর কর। কই হে মনোতোষ, ক্ষীরোদ, প্রভাস—এস তোমরা। হরেন্দ্রও এস। বেহারী! বেহারী! (বেহারীর পুনঃ প্রবেশ) এই বেহারী, যা ত ওই ঘর থেকে দাদাবাবুদের ডেকে আন্। আর দ্যাখ দৌড়ে
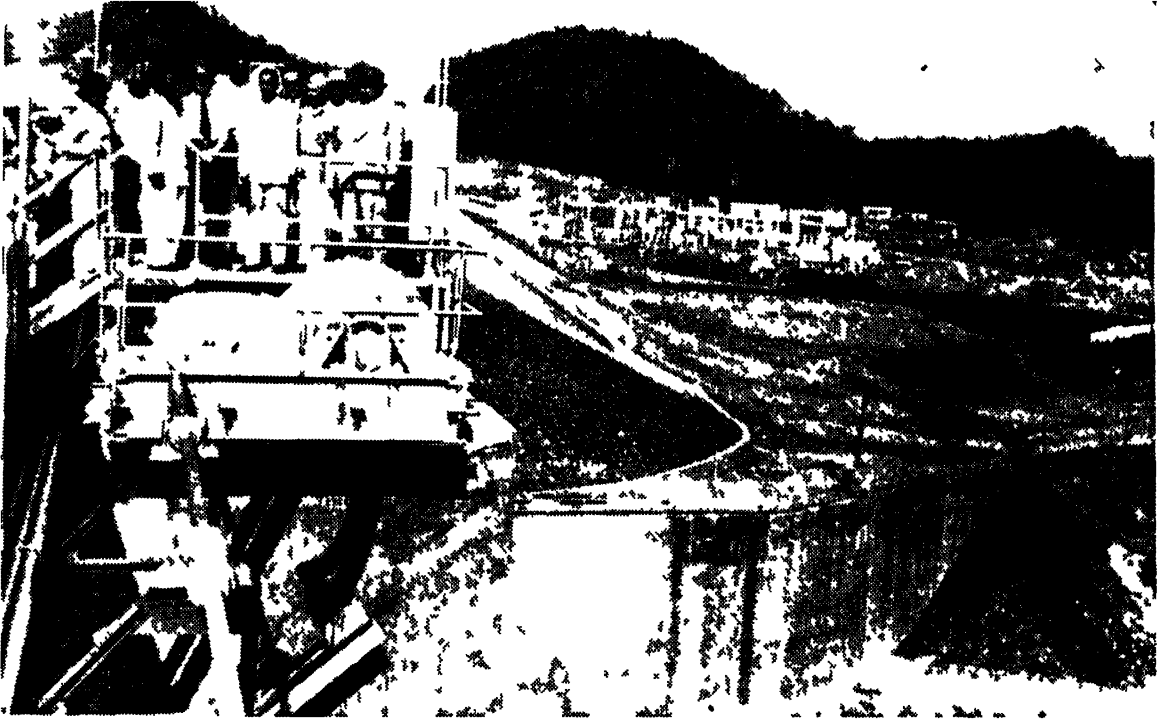
মাইথন বাঁধ প্রদর্শন-রত রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী
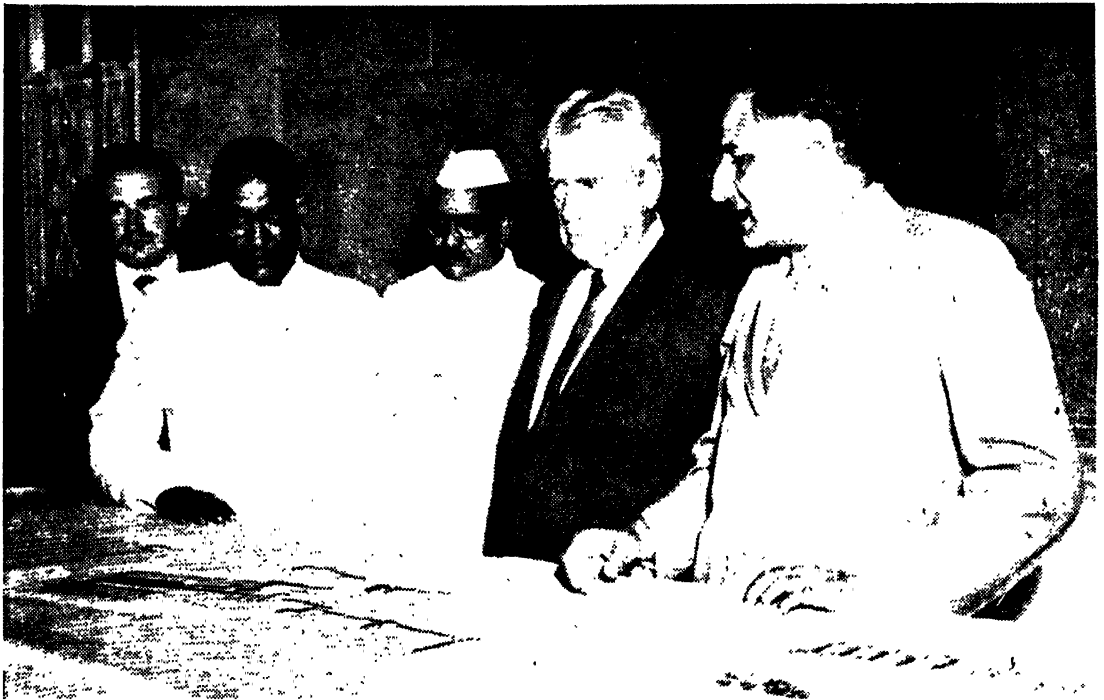
দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা পরীক্ষণরত নিউজিলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ওয়াল্টার ন্যাশ ও দুইজন ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

প্রাচীর-চিত্র অঙ্কনের শেষ পর্ব্ব। পল্লী উন্নয়ন বিভাগের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে এখানি প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে

যা, যাবি আর আসবি—মোড় থেকে দুটো ট্যাক্সী—বেবী ট্যাক্সী, মানে খোকা-ট্যাক্সী. বুঝলি—যা শীগ্‌গির কর—

[বেহারী দরজার পাল্লা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে। পাশের ঘর থেকে হরেন্দ্র, প্রভাস, ক্ষীরোদ ও মনতোষের প্রবেশ। বেহারী মঞ্চে ফিরে এসে বেগে প্রস্থান করে]

দীপ্তি। (মনতোষের দিকে তাকিয়ে) একি, আপনি এখানে।

মনতোষ। (অবাক হয়ে) তুমি তৃপ্তি—মানে—আপনিই দীপ্তি—আপনি—আপনি ?

দীপ্তি। আপনার কাছে অপরাধী আমি। কিন্তু, আমি ত আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। আমার আর উপায় ছিল না সেদিন, আপনাকে জানিয়ে যাব। খোকা, প্রণাম কর তোমার মামাবাবুকে।

[সৌম্যেন্দ্র এগিয়ে যায় প্রণাম করতে। মনোতোষ খোকাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। আরে আরে। আমি যে কায়স্থ, আমাকে আবার প্রণাম কেন।]

(বেহারীর প্রবেশ)

বেহারী। দুটো ট্যাক্সী এসে গিয়েছে আমাদের দোর গোড়ায় মোড়ে আর যেতে হ'ল নি বাবু। খোকা লয়, পেল্লায়।

ত্রিলোচন। একটা হ'ল খোকার ঠাকুর্দ্দা, আর একটা হ'ল খোকার দাদামশায়। লয় কি ? বেহারী, কোন জেলায় বাড়ী তোর ? তুই হলি আসল বাঙালী। 'নয়'কে বলিস 'লয়'। আর আমরা হলাম—

ক্ষীরোদ। আমরা হলাম কাঙালী—'নয়'কে বলি 'ছয়'। (দীপ্তির দিকে ঘুরে, মঞ্চ থেকে একটি প্লাষ্টিকের ক্লীপ তুলে) নিন্ আপনার কাঁটা [দীপ্তির হাতে দেয়]

প্রভাস। ওটাকে কাঁটা বলে না। ওটা হ'ল ক্লীপ। ক্ষীরোদ, এইবার তুই ধরা পড়ে গিয়েছিস। তোর বিয়ে হয় নি কক্ষনো। কি মিথ্যে কথাই বলতে পারিস ?

ত্রিলোচন। (ফরাস থেকে নেমে, কাঁধে চাদর ফেলে, বিদ্যাসাগরী চটিজোড়া ফরাসের তলা থেকে টেনে নিয়ে, পায়ে দিয়ে, একটি পুরনো সাপমুখো বেতের লাঠিতে ভর করে সৌম্যেন্দ্রের হাত ধরে মঞ্চের মাঝখানে এসে)

চল, চল, আর দেরী করা চলে না। ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। দীপ্তি, এস আমার সঙ্গে।

দীপ্তি। (অবাক হয়ে) কোথায় যাব আপনার সঙ্গে ?

ত্রিলোচন। সে কথা পরে জানলেও চলবে। এখন আর কথা বলবার সময় নেই।

[বিশ্বজিৎ, শরৎবাবু ও মিঃ চ্যাটার্জীর প্রবেশ]

কি সৌভাগ্য !! আপনারা ?

বিশ্বজিৎ। ওঁদের নিয়ে এসেছি। একটা স্বস্ত্যয়ন করাতে চান আপনাকে দিয়ে। মাও নাকি আপনার কাছে এসেছিলেন একবার। তা, আপনি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার আপনাকে টাকা নিতে হবে, যা খরচ লাগে, তার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না।

[মঞ্চের একদিকে দীপ্তি সঙ্কোচভরে সরে যায়। দীপ্তির মুখ ম্লান ও গম্ভীর]

শরৎবাবু। (নিম্নকণ্ঠে) ক্ষীরোদ মহিলাটি কে ?

ক্ষীরোদ। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) দীপ্তি দেবী, আপনার পুত্রবধূ।

ত্রিলোচন। এ ছেলেটি হ'ল আপনার পৌত্র—শ্রীমান সৌম্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (সৌম্যেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে) ও দাদু, তোমার আরও দুই দাদু এসেছেন। প্রণাম কর।

[সৌম্যেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে শরৎবাবু ও মিঃ চ্যাটার্জীকে প্রণাম করে]

উনি হলেন তোমার কাকাবাবু—প্রণাম কর।

[সৌম্যেন্দ্র আবার এগিয়ে যায়, বিশ্বজিৎ কোলের কাছে টেনে নেয়। সৌম্যেন্দ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। পুনরায় বেহারীর প্রবেশ]

বেহারী। বাবু, ট্যাক্সীওয়ালারা বলছে, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, ওরা আর দাঁড়াতে চাইছে না।

ত্রিলোচন। দাঁড়াতে চাইছে না ! আলবৎ দাঁড়াবে। ওয়েটিং চার্জ্জ দেব, দাঁড়াবে না—বললেই হ'ল। যা বলগে যা, ওরে, খোকা ট্যাক্সীবালা—দণ্ড পল বিপল দাঁড়িয়ে আছে—তোরা দাঁড়াবি না কেন বাপু ! তোরা দাঁড়াবি—তোদের ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দা দোতলা ষ্টেটবাসের ড্রাইভারেরা দাঁড়িয়ে থাকবে। ত্রিলোচনকে চটিয়েছ কি—কপাল পুড়ে ছারখার। একেবারে ভস্ম, মানে ছাই হয়ে উড়ে যাবে।

[বেহারী মাথা চুলকায়, কাণ চুলকায়, তার পর—'কপাল পুড়ে ছারখার—ভস্ম, মানে ছাই'—বলতে বলতে প্রস্থান]

শরৎবাবু। (দীপ্তিকে সম্বোধন করে) চল মা, আমাদের সঙ্গে চল। আমরা সবাই তোমাকেই খুঁজছি এতদিন। (ক্ষীরোদ প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করে) তোমরা সবাই এগিয়ে যাও, গাড়ীতে গিয়ে বসো—আমরা যাচ্ছি।

[ক্ষীরোদ, প্রভাস ও মনোতোষের প্রস্থান। বিশ্বজিৎ সৌম্যেন্দ্রকে হাত ধরে (মৃদু আকর্ষণে) টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সৌমেন্দ্র পিছনে ফিরে ফিরে তাকায়, মায়ের দিকে চায়। মঞ্চের উপর ত্রিলোচন, হরেন্দ্র, শরৎবাবু; মিঃ চ্যাটার্জ্জী ও দীপ্তি তখনও দাঁড়িয়ে]

ত্রিলোচন। হরেন্দ্র, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, বল গিয়ে' আমি এখন বেরুচ্ছি ফিরতে একটু দেরী হবে আজ।

[হরেন্দ্রের প্রস্থান]

শরৎবাবু। (দীপ্তির দিকে পুনরায় তাকিয়ে) কেন মা, এত কুণ্ঠিত হচ্ছ ? লজ্জিত হবার কোন কারণই তোমার নেই। তোমাকে পুত্রবধূরূপেই আমি নিয়ে যেতে চাই।

দীপ্তি। (উড়ে যাওয়া ঘোমটা পুনরায় মাথায় টেনে পরিপূর্ণ

দৃষ্টিতে সবাইয়ের দিকে চেয়ে) আমার ত কোন দাবী নেই। যাও বা ছিল, তা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি কি করে ভাঙব আমি? অকল্যাণ হবে যে।

শরৎবাবু। প্রতিশ্রুতি! অকল্যাণ! কি বলছ তুমি?

মিঃ চ্যাটার্জী। হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমিই আদায় করেছিলাম। বহু অর্থের লোভও দেখিয়েছিলাম। অর্থ নেয় নি দীপ্তি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ও আমার মেয়ের শান্তি কোনদিনও নষ্ট করবার চেষ্টা করবে না। কোন দাবীই জানাবে না কোনদিনও। আশ্চর্য্য শরৎ, আমি সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছি। আধুনিক যুগে এমনতরো প্রতিশ্রুতি আর কেউ এমন নিখুঁত ভাবে পালন করে নি।

[মিঃ চ্যাটার্জী এগিয়ে আসেন, দীপ্তির মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন]

দীপ্তি, তোমাকে আমি তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি যাও, তোমার স্বামীর কাছে যাও। সে আজ উন্মাদ, মিনতিও বেঁচে নেই।

দীপ্তি। (মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হয়ে) কি বললেন—উন্মাদ! মিনতিদি বেঁচে নেই?

[দীপ্তি আচল টেনে দুই হাতে মুখ ঢাকে]

ত্রিলোচন। ভয় নেই মা। আমি স্বস্ত্যয়ন করব। আমিই হব তন্ত্রধারক। মঙ্গলগ্রহের স্বস্ত্যয়নে পয়সা খরচ নেই। থাকলেও যৎসামান্য। সে খরচ নগণ্য। মঙ্গলের স্তবে ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার। দীপ্তিকে তার মর্য্যাদা ফিরিয়ে দেবেন—উপস্থিত সবাই যখন স্বীকার করে নিচ্ছেন, তখন আর ভয় কি। অবশ্য একথাও সত্যি, মঙ্গলগ্রহ অতি দুরারাধ্য গ্রহ। তিনি অঙ্গারক, তিনি নিষ্ঠুর শাস্তিদাতা—কিন্তু তিনিই আবার শিবদ, শান্তিদ, কুমার ও পবিত্র। তোমার সৌম্যেনকে দিয়েই মঙ্গলের স্তব পাঠ করাব আমি। পৃথিবীর পুত্র মঙ্গলগ্রহ কি দীপ্তির ছেলে সৌম্যেন্দ্রের করুণ মিনতি শুনবেন না? তাছাড়া কুষ্ঠীও বিচার করে দেখেছি। একদিন—একদিন আদর্শভ্রষ্ট, কিন্তু সত্যান্বেষী সত্যজিৎ ও তার দীপ্তি, তার তৃপ্তিকে ফিরে পাবে। দুঃখ শুধু মিনতির মত মেয়ের সঙ্গে এ জীবনে তোমার দেখা হ'ল না।

মিঃ চ্যাটার্জী। মিনতি তোমার মিনতিদি, তোমার জন্যে তার শুভেচ্ছা, আশীর্ব্বাদও বলতে পার—রেখে গিয়েছে। মৃত্যুর দিন সকালেই আমাকে বলেছিল, বাবা, দীপ্তিকে খুঁজে এনো, বল তাকে, তার মধ্যে তার মিনতিদি বেঁচে থাকবে। সে তোমার জন্যে তার সকল অলঙ্কার—সব কিছুই রেখে গিয়েছে।

ত্রিলোচন। মিনতির মান রাখ মা। চল স্বামীর কাছে ফিরে চল।

মিঃ চ্যাটার্জী। তোমার মধ্যে মিনতিকে খুঁজে পাব, এ বিশ্বাস আমার আছে। যে শোকে বুক ভেঙে যায়—অতি বড় শত্রুকেও যে শোকের অভিশাপ দিতে অতি সাধারণ লোকও দ্বিধাবোধ করে—সেই শোক—সন্তান হারাবার শোকও বুঝি আমি ভুলে যেতে পারি। ভুলে যাব।

[মিঃ চ্যাটার্জী আবার রুমাল বের করেন, কপাল, গাল, গলা, মুছবার অভিনয় করে চোখের জল মোছেন]

কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না, কিন্তু চেষ্টা করব তোমাকেই আমার মেয়ের মত ভাবতে।

এস তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম। তাই বোধ হয় মিনতি বাঁচল না। বিধাতাই সরিয়ে নিলেন তাকে—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর অতিশয় নির্ম্মম ভাগ্যবিধাতা! কিন্তু অন্যায়কে তিনি চিরদিন প্রশ্রয় দেন—এ কথা কি বলা যায়?

দীপ্তি। [আচল তুলে আবার চোখ মোছে। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সবাইয়ের দিকে চেয়ে দেখে এক মুহূর্ত্ত। গাঢ়স্বরে মিঃ চ্যাটার্জীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে] চলুন।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা

ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

একদিন সিটি কলেজের বারান্দায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে মনে হয় কোন অধ্যাপক কথা বলিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সিটি কলেজে বহুদিন অধ্যাপকতা করিয়াছেন, তখন তিনি ইউনিভার্সিটির কলেজ ইনস্‌পেক্টর। ইহার পর বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সংবাদপত্রে হরেন্দ্রকুমারের দানের কথা পড়ি আর বিস্ময়াপন্ন হই। অনুন্নত ও দুঃস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার সুবিধা নিমিত্ত তিনি এই দান করিতে-ছিলেন। কিস্তিতে কিস্তিতে যে-সব দান করিয়াছিলেন, এক সময়ে তাহার হিসাব বাহির হইল আট লক্ষ টাকা! শিক্ষাব্রতী হরেন্দ্রকুমার এত দান কেমন করিয়া করিতেছেন তাহা জনসাধারণের নিকট রহস্যের বিষয়ই বটে। কিন্তু তিনি সত্যই এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমশঃ ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য জানিতে পারিলাম।

দীর্ঘকাল কলেজ ইনস্‌পেক্টরি করিয়া পুনরায় তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকপদে তখন তিনি নিযুক্ত। তাঁহার তথ্যমূলক জাতীয়তাভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ 'মডার্ন রিভিয়ু'তে একাদিক্রমে বাহির হয়। হরেন্দ্রবাবু দেশীয় খ্রীষ্টান, কিন্তু জাতীয়তাবাদের আদর্শে একান্ত উদ্বুদ্ধ। ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইনবলে বঙ্গে যে নূতন আইন-পরিষদ গঠিত হয় তাহাতে তিনি দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আইন-পরিষদে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাগুলি লীগপন্থীদের এবং ইংরেজ 'ডাইহার্ড'দিগের মোটেই পছন্দসই ছিল না। তিনি পরিষদে সব সময় জাতীয়-পন্থীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতেন। এ কারণ তিনি জাতীয়পন্থী মাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। আমরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

পনর কি ষোল বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন মহাসমর পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। হরেন্দ্রবাবু মধুপুরের বাড়ীতে থাকিতেন। ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ী তখন অন্যদের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার ইংরেজী স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকখানি তাঁহাকে উপহার দিতে চাই—জানাইয়া পত্র দিলাম। তিনি কলিকাতায় কবে নাগাদ আসিবেন, কোথায় উঠিবেন ইত্যাদি জানাইয়া আমাকে উত্তর দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার সময় ইণ্টালী অঞ্চলের একটি গীর্জ্জায় গেলাম। হরেন্দ্রবাবু অল্পক্ষণ পরেই ইউনিভার্সিটির কি একটা মিটিং সারিয়া ওখানে ফিরিলেন। তাঁহার হুঁকা আসিল। তামাকু খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। আমার বইখানি তাঁহাকে দিলাম, তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। যেন কত কালের পরিচয়! বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন যে, বিদেশী খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এদেশীয়-দিগকে ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়াই ভীষণ ভুল করিয়া বসিয়াছেন। ভারতবাসীকে বাহিরের লোকে কি ধর্ম্ম শিখাইবে। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদেশীয়দিগকে নানা ভাবে একেবারে 'বিজাতীয়' করিয়া তোলায় যত অনর্থ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। তাঁহাদের শিক্ষা প্রচেষ্টাদির দ্বারা দেশ আরও বেশী উপকৃত হইত, যদি খ্রীষ্টীয়করণ ইহার অঙ্গীভূত না হইত। এই প্রথম দিনেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যে কত উদার মত পোষণ করেন, তাহা জানিতে পারিলাম।

ইহার পর বহুবার বিভিন্ন স্থলে তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় পুনরায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিবার পর তাঁহার ডিহি-শ্রীরামপুর ভবনেও কয়েক বার গিয়াছি। কোন কোন দিন দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইত। তিনি খুব গল্প বলিতে, অর্থাৎ সত্য ঘটনা গল্পের মত করিয়া বলিতে পারি-তেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার শিক্ষাব্রতী। মানব-মনের কোন্ তন্ত্রীতে ছোঁয়া লাগিলে কিরূপ সাড়া দেয় তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সাধারণ জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ও জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি দিনলিপি রাখি না, নহিলে দিন-তারিখ মিলাইয়া তাঁহার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতাম। যাহা হউক, স্মৃতি হইতেই এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে পারি।

প্রথম সাক্ষাৎ বা দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন আমার বাড়ী বরিশাল জানিয়া বরিশালের সঙ্গে তাঁহার প্রথম জীবনের যোগাযোগের কথা উত্থাপন করিলেন। বরিশালে তখন দুইটি কলেজ ছিল—একটি ব্রজমোহন কলেজ, অপরটি রাজচন্দ্র কলেজ। এম-এ পাস করিবার পর হরেন্দ্রবাবু রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হইয়া যান। সেখানে

কিছুকাল থাকিয়া সিটি কলেজে চাকুরী লইয়া আসেন। বরিশালে থাকিতেই তিনি স্থানীয় এক খ্রীষ্টান-দুহিতার পাণি-গ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তাঁহার প্রথমা পত্নী গত হইলে তিনি শ্রীযুক্তা বঙ্গবালাকে বিবাহ করেন। এই দিন কি অন্য দিন বলিতে পারি না, এ পুত্রের কথা উঠিতেই তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পুত্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে দুরারোগ্য টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি ভাগ্যবান, কলিকাতায় এমন নামী লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি পুত্রের অসুখের সময় এই জীর্ণ কুটীরে পদার্পণ করেন নি। সার্ আশুতোষ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরবার পথে আমার ছেলেকে দেখে যেতেন। সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী আসতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ত তাকে চিকিৎসাই করেন, যমে-মানুষে টানাটানি চলল কত দিন, পরে আমার একমাত্র পুত্র মারা গেল।" এই যে কথাগুলি আমায় বলিয়া গেলেন, এসময় তাঁহার মুখের কোন ভাবান্তর দেখি নাই। হরেন্দ্রকুমার ছিলেন ধীরস্থির।

নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান সম্মেলনের কর্ণধাররূপে তিনি দেশীয় খ্রীষ্টানমহলে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। কিন্তু কিন্তু তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধীনতাপন্থী। তিনি অধিকাংশেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্লোভ, পদের মোহ তাঁহাকে কখনও পাইয়া বসে নাই। যখন গোলটেবিল বৈঠকে দেশীয় খ্রীষ্টানদের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব হয় তখন তিনি উদার-নৈতিক খ্রীষ্টান নেতা সার মহারাজা সিংহের অনুকূলে নিজের দাবী প্রত্যাহার করেন। এই কথাপ্রসঙ্গে হরেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বলেন, "যোগেশবাবু, আপনাদের এত খাতির করি কেন জানেন? তবে বলি শুনুন। একবার দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরে গিয়েছি। ও অঞ্চলে দেশীয় খ্রীষ্টান বিস্তর। একটি সভায় আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। সভা লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে সভার প্রধান উদ্যোক্তা আমাকে এই বলে introduce করে দিলেন যে, সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিয়ু'র আমি নিয়মিত লেখক। আমার অন্য পরিচয় আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক একথা হ'ল গৌণ, আমি যে 'মডার্ন রিভিয়ু'র নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক এটিই তাঁদের নিকট আমার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়। একজন বাঙালী সম্পাদক এবং একটি বাঙালীর পত্রিকার এহেন আভিজাত্য দেখে আমার বুক আনন্দে দেড় হাত চওড়া হয়ে গেল যেন!"

'মডার্ন রিভিয়ু'তে এই সময় মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে পরি-সংখ্যানমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন হরেন্দ্রবাবু। ইহার ভিতরে দেশ-বিদেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা এবং আমাদের দেশে বিদেশী শাসনে ইহার ব্যবহার-প্রাচুর্য্য আর ইহার ফলে জাতীয় উন্নতির বাধা-বিঘ্ন-গুলির উল্লেখ করিতেও তিনি ছাড়িতেন না। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া এ বিষয়ে এত তথ্য সংগ্রহ করিলেন কিরূপে। তিনি বলিলেন, "যোগেশবাবু, এই সব লিখে আমি কর্ত্তব্য করছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃঋণও শোধ করছি।" এ কথা আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করিলে, পিতৃঋণের কথা আরও খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা তিন পুরুষের খ্রীষ্টান, কিন্তু সুরাপানে তাঁহার পিতা কি পিতামহ আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার দুই দাদা সুরা-পানে আসক্তি হেতু অকালে মারা যান। হরেন্দ্রবাবুকে দিয়া তাঁহার পিতা প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও মদ ছুঁইবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন। সুরা তথা মাদকদ্রব্যের ব্যবহারে যে কত জীবন নষ্ট হইতেছে, কত পরিবার ধ্বংসের মুখে চলি-য়াছে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। এই প্রসঙ্গে আর এক দিনের কথাও বলিয়া লই। তখন হরেন্দ্রবাবু রাজ্যপাল। কলিকাতায় আগত একখানি যুদ্ধজাহাজে নিমন্ত্রিত হইয়া সস্ত্রীক গিয়াছেন। ভোজের আয়োজন হইয়াছে, গ্লাসে সুরা জলবৎ দেখাইতেছিল। সহধর্ম্মিণী বঙ্গবালা জলভ্রমে গ্লাসে হাত দিয়াছেন। তিনি দূরে ছিলেন। চেঁচাইয়া বলিলেন, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।" তিনি বুঝিতে পারিয়া গ্লাস রাখিয়া দিলেন।

বঙ্গবালাও পতির অনুগামিনী ও সকল কাজে সহায় ছিলেন। ডিহি-শ্রীরামপুর ভবনে তাঁহার ঘরকন্না কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করিয়াছি। হরেন্দ্রবাবুর যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ তেমনি খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ। একটি হাফ-হাতা কোর্ত্তা গায়ে তিনি সারা কলিকাতা টহল দিয়াছেন, ইহাও কখন কখনও দেখিয়াছি। একদিন আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, চাকর-বাকর রাখতে পারি না। বুড়ীর কি খাটুনি! বাটনা বাটা, কুটনো কাটা, জল তোলা, ঘর মোছা, রান্না বাড়া সব তাঁকে নিজ হাতে করতে হয়। চাকরের কাজ পছন্দ হয় না। আর কি জানেন? অত টাকাই বা পাব কোথায়?" কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। এরূপ মিতাচারী না হইলে তিনি কি অত লক্ষ টাকা দান করিতে পারিতেন! হরেন্দ্রবাবু নিজে বাজার করিতেন। মধুপুরে হরেন্দ্রবাবুর একখানি

বাড়ী ছিল। জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি মধুপুরে সস্ত্রীক নিজে বাজার করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া, দরদস্তুর করিয়া প্রায়শঃই সবকিছু কিনিতেন। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—উপনিষদের এই বাণী তাঁহাতে যেন সুন্দর রূপ পাইয়াছিল।

হরেন্দ্রবাবু আমাকে প্রায়ই বলিতেন, "ধর্ম্মে আমি খ্রীষ্টান কিন্তু তাই বলে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ছাড়ব কেন?" বাস্তবিক তাঁহার এই জাতীয়তা-প্রীতির বহু প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি তখন রাজ্যপাল। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের নূতন ভবনের দ্বার-উন্মোচন উৎসব। হরেন্দ্রবাবু সভাপতি। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলিলেন, কেহ যেন মনে না করেন বিধর্ম্মী হরেন্দ্রকুমার বিজাতীয়ও বটে। তিনি বলেন,"আমি ত্রিবেণীর পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দৌহিত্রের বংশধর। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ অনুশীলনে তৎপর না হলে জাতির দুর্গতির অন্ত থাকবে না।" হরেন্দ্রবাবু বাংলা লিখিতেন কিনা জানি না। তাঁহার যে কয়েকটি বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, যত দূর জানি তাহা অন্য কর্তৃক তাঁহার ইংরেজী লেখা হইতে অনূদিত। তিনি আমাকে কয় বৎসরের মধ্যে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সবগুলিই ছিল ইংরেজিতে লিখিত। পোষ্টকার্ডের চিঠি; এত ছোট হরফে আষ্টেপৃষ্ঠে লিখিতেন যে, এক-একখানি চিঠি ছাপিলে পত্রিকার প্রায় এক পৃষ্ঠা হইয়া যাইবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দরদ বা মমতা ছিল অসাধারণ। সাহিত্যিকদের তিনি নানা ভাবে উৎসাহ দিতেন। আমার বই একখানি বাদে তখন সবই বাংলায় লেখা। তিনি সাগ্রহে পড়িতেন, পড়িতে আনন্দ পাইতেন, 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে আমার কয়েকখানি পুস্তকেরই সমালোচনা করিয়াছিলেন। একখানি বইয়ের সমালোচনা লিখিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। আমার দিক হইতে কোন তাগিদ যায় নাই। বৎসর দুই পরে তাঁহার একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম। পূর্ব্বের মত অনেক ছোট অক্ষর, এপিঠ-ওপিঠ একেবারে ঠাসা লেখা। তিনি লেখেন, বড় বলিয়া "মুক্তির সন্ধানে ভারত" তিনি এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া অতি দ্রুত শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। পত্রে বইখানির বিস্তর প্রশংসাবাদ ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখিলেন যে, এত দিন দেরী করিয়া তিনি সত্যই অপরাধী হইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হরেন্দ্রকুমারের বিনয়ের অন্ত ছিল না; ইহা সত্য সত্যই ছিল আন্তরিক। আমি জবাবে কি লিখিয়াছিলাম মনে নাই। যথাসময়ে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে তৎকৃত সমালোচনা বাহির হইল। বাংলাভাষায় এরূপ বই তিনি প্রথম পড়িলেন বলিয়া সমালোচনায় উল্লেখ ছিল।

দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বেই কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী বা গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর উহার কাজ হইল দুইটি—আইন প্রণয়ন এবং সংবিধান রচনা। নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত গণপরিষদের এই কাজ ছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি, ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি। সংবিধান রচনাকালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন, এই সময় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার অতি দক্ষতার সহিত সভাপতির কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি পাকা আইনজ্ঞ হয়েছি। তবে কি জানেন, দু'পক্ষের ভাল উকীলের জেরা, সওয়াল জবাব শুনে রায় দেওয়া বেশ সোজা। আমি সস্তায় বাজিমাৎ করছি।" নূতন সংবিধান রচনাকার্য্য চলিতেছে; হরেন্দ্রকুমার দিল্লীতে। সংবিধান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রদেশে দেশী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। হরেন্দ্রকুমার বলিলেন, "একদিন রাজকুমারী অমৃত কাউর আমার বাসস্থানে এসেছেন; একথা-সেকথার পর একবার আমায় বললেন, আপনি একবার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করুন না? এর ইঙ্গিত বুঝতে আমার সময় লাগল না। সরাসরি বললাম, কোন প্রয়োজন ত দেখি না। অমৃত কাউর চলে গেলেন।" ইহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, বল্লভভাইর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য কি বুঝেছেন ত? কোন প্রদেশের গবর্ণরি যাতে পাই তার জন্য খোশামুদি। আমি ত এ পদের জন্য লালায়িত নই। আমাকে গণপরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করেছেন, সেও কি সাধ করে? আমি একটি সামান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি; সংখ্যালঘুদেরও কিরূপ কদর করা হয় তা দেখাবার জন্য; আবার আমি ন্যাশনালিষ্ট, আমার অতীত ও বর্ত্তমান জানা। আমাকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করে নিরাপদে কর্ত্তব্য সম্পাদন করায় ত লাভ অনেক।" হরেন্দ্রবাবু আমাকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় তাঁহার কথায়ই দিতে চেষ্টা করিলাম। হরেন্দ্রবাবু শুধু নিরীহ 'মাষ্টারমশাই' নন, তাঁহার যে গূঢ় রাজনৈতিক বুদ্ধিও আছে, তাহার পরিচয় এই দিন পাইলাম। অবশ্য নূতন সংবিধান চালু হইবার পর একটি অলিখিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কর্ত্তাব্যক্তিরা তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাও যে রাজনৈতিক কারণে তাহা পরেই বলিতেছি।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর বাংলার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, বিভক্ত বাংলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভারতরাষ্ট্রের ভাগে পড়ে। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হইতে অগণিত জনসমষ্টি পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিল। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আসিল ১৯৫০ সনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এবারে যে লোক আসিতে লাগিল, আগেকার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। উদ্বাস্তু-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িল। রাষ্ট্র অধিকর্তাদের ভাবগতিকে অসন্তুষ্ট হইয়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিলেন। বাঙ্গালীর মনে ঘোর অসন্তোষ। স্বাধীন ভারতে বাংলার প্রথম গবর্ণর হইয়া আসেন শ্রীরাজাগোপাল আচার্য্য। তাঁহার উপর বাঙ্গালীর বিরাগ বহুদিনের। তিনিই প্রথম বাংলা ও পঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করিয়া লীগ-তোষণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীরাজাগোপাল আচার্য্যের পর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু গবর্ণরের মসনদে বসিলেন। তাঁহার উপরে বাঙ্গালীর বিরাগের কোন হেতু ছিল না, কিন্তু বাঙ্গালী চিত্তের ধূমায়িত অসন্তোষ ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগে একটা বিদ্বিষ্ট ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং দিল্লীর কর্ত্তারা বাংলার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিকে গবর্ণর পদে নিয়োগের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। সংবিধান রচনার কাজ তখন শেষ হইয়াছে। অবশেষে একজন বাঙ্গালীকেই গবর্ণরপদে নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আর ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

হরেন্দ্রকুমারের গবর্ণরপদে নিয়োগের সংবাদ পাইয়া এক দিন তাঁহার ডিহি-শ্রীরামপুরস্থ বাড়ীতে গেলাম। ইহার পূর্ব্বে একটি সভায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যৎসামান্য কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। গবর্ণর-নিয়োগে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া যখন এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, দুই-তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার মত লইবার জন্য দূত আসে, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কিছুই জানিতেন না। ডাঃ রায়ের গৃহ হইতে রাত্রি আটটায় দূতের আসা, সময় দিবার জন্য অনুরোধপত্র লইয়া তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, আবার ডাঃ রায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসহ হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার অনুকূল মত লওয়া ইত্যাদি ব্যাপার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটিয়া গেল। ইহার পরদিনই তাঁহার বাড়ীতে টেলিফোন লাইন বসান হইল ও তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে গবর্ণরের কার্য্যভার বুঝিয়া লইলেন। ঐ দিন সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, মোটামুটি তাহার মর্ম্মকথাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি ইহার মধ্যেই বলিলেন, "যোগেশবাবু, আমার মত একজন স্কুল-মাষ্টারকে গবর্ণরি দেওয়া কি সহজে হয়েছে? বড়কর্ত্তারা ফাঁপড়ে পড়েই রীতিবিরুদ্ধ হলেও বাঙালী আমাকে বাংলাদেশেই গবর্ণর নিযুক্ত করলেন।" বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, ডক্টর হরেন্দ্রকুমার নিজস্ব মত কখনও পরিহার করেন নাই, আর ইহা ব্যক্ত করিতেও কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না। বড়কর্ত্তাদের কথায় তিনি সর্ব্বদা 'ডিটো' বা সায় দিয়া চলিতেন না, তাহার প্রমাণ আছে।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে (তখন আর্ট কলেজ বা কলা মহা-বিদ্যালয় নামকরণ সবেমাত্র হইয়াছে) এই স্কুল-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে একদিন যাই। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মুখে শুনিলাম সেদিন গবর্ণর হরেন্দ্রবাবু আসিবেন এবং বার্ষিক আর্ট-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। আমি অনিমন্ত্রিত, কাজেই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমীচীন মনে করিলাম না; শিল্প-প্রদর্শনী দেখিব ভাবিয়া অন্যত্র শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপনে রত রহিলাম। এক সময়ে দেখিলাম এক-একটি ঘরে হরেন্দ্রবাবু পত্নী বঙ্গবালাসহ ঢুকিতেছেন, আর ছবি দেখিয়া বাহির হইতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই খুব আনন্দিত হইলেন; একান্ত অপরিচিতের মধ্যে পরিচিত কাহাকেও পাইলে যেমন মনের ভাব হয়, তাঁহার যেন সেই ভাবই হইল। বলিলেন, "আমি এখন বাংলার লাট-সাহেব, সব বিষয়েই ওস্তাদ হয়েছি।" রাজভবনে তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলে হরেন্দ্রবাবু পত্র লিখিতে বলিলেন। কারণ প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলিয়া রাখি-বেন।

'রাজ্যপাল' কথাটি তখনও চালু হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজভবনে উপস্থিত হইলাম। হরেন্দ্রবাবু আমায় এক ঘণ্টা সময় দিয়াছিলেন। ট্রাম বন্ধ হেতু কয়েক মিনিট হারাইলাম। তথাপি পৌণে এক ঘণ্টার উপর নানা বিষয়ে কথা হইল। তখন বেথুন কলেজের শতবর্ষপূর্ত্তি স্মারকগ্রন্থ সদ্য বাহির হইয়াছে। আমি নিজের হাতে একখানি তাঁহাকে উপহার দিলাম। তিনিও সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

হরেন্দ্রবাবু ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। সেখানকার বাঙালী সমিতি এই সুযোগে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীদের অপদস্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ইহাতে প্রবাসী বাঙালীদের দোষের কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণর হরেন্দ্রকুমার প্রকাশ্য জনসভায় এইরূপ একটি বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহাতে দিল্লীর উচ্চ রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হরেন্দ্র-বাবু এ বিষয়টি পূর্ব্বে জানিতেন না। জেনারল কারিয়াপ্পা হরেন্দ্রকুমারের অতিথি হইয়া আসিলেন উহার কয়েক দিন

পরে। তাঁহার প্রমুখাৎ হরেন্দ্রবাবু সব কথা শুনেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, আমি কারিয়াপ্পাকে কি বলেছি জানেন ? উচ্চ মহল আমাকে চান না জানতে পেলেই চলে যাব। আমি দুটি ট্রাঙ্ক নিয়ে এই বিরাট ভবনে ঢুকেছি, আবার সেই ট্রাঙ্ক দুটি মাত্র নিয়েই এখান থেকে বিদায় নেব।" কি দৃঢ় বিশ্বাস! আরও অনেক কথা হইল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "লেখা পড়ার চর্চা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছে। রাজভবনে অনবরত দেশী-বিদেশী পদস্থ অতিথিরা আসছেন; তাঁদের সঙ্গে আহার করতে হয় অনেক সময়। আদর-আপ্যায়নে অনেক সময় কেটে যায়।" পরে বলিলেন, যত বাধাবিপত্তিই আসুক, মডার্ন রিভিয়ুর জন্য লিখিবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প প্রায় শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল (তখন 'গবর্ণর'-এর বদলে এই কথাটি চালু হইয়াছে) হইয়া হরেন্দ্রবাবু যেন একেবারে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আধি-ব্যাধি বা বার্দ্ধক্য কিছুতেই তাঁহাকে হটাইতে পারিল না। ইহার সূচনা কিন্তু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দৃঢ়চেতা হরেন্দ্রকুমার যাহা ধরিতেন তাহাকেই সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেন। তিনি দার্জ্জিলিঙে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ যে গৃহে দেশবন্ধু শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই গৃহটিকে প্রসূতিসদনে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং প্রচুর টাকা তুলিয়া শীঘ্রই এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি ভারত-সভার হীরক-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে টাকা তুলিবার টেকনিক বা কৌশলের আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'ট্রেড সিক্রেট' ফাঁস করিতে চান না—একথাও তখন বলেন।

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। শহর ও শিল্পাঞ্চলের ত কথাই নাই, পল্লী-অঞ্চলেও ইহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। যক্ষ্মারোগীর অসুখ সারিলেও দীর্ঘকাল তাহাকে সাবধানে থাকিতে হয়। কিন্তু সামান্য আয় গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ সাবধানে রাখা কতটা সম্ভব ? হরেন্দ্রকুমার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন। রোগমুক্ত যক্ষ্মারোগীদের নিমিত্ত একটি বিশ্রাম-আবাস নির্ম্মাণের জন্য তিনি যত্নপর হইলেন। এখানে তাহারা স্বাস্থ্য ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকমের হালকা কাজও করিতে পারিবে। শহর ও জনপদ হইতে দূরে বিস্তৃত জমির উপর মুক্ত আবহাওয়ায় এই আবাস নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। এই নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের একটি সার্থক টেকনিক বা কৌশল তিনি অবলম্বন করেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যরক্ষা ক্লাব, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি নানা স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। তিনি সঙ্গতি বুঝিয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার যোগ-দানের নিমিত্ত এক-একটি ফি ধার্য্য করিতেন। আমি একাধিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ফি আদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই উপায়ে তিনি বিস্তর অর্থ তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে উৎসব বা সভায়ই যাইতেন, যক্ষ্মারোগীদের দুঃখের কথা, তাহাদের দুঃখ দূরী-করণের উপায়ের কথা উত্থাপন করিতেন। তাঁহার সহৃদয় ভাষণে শ্রোতাদের হৃদয় গলিয়া যাইত। বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃই দেহ জীর্ণ ও অপটু হইয়া যায়, হরেন্দ্রবাবু সাধারণতঃ স্বাস্থ্য-বান হইলেও শেষ দিকে বাতরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু যক্ষ্মারোগীদের বিশ্রাম নিবাস স্থাপনকল্পে তাঁহার কর্ম্মোদ্যম শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। তিনি কাজের মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন, কাজ করিতে করিতেই চলিয়া গেলেন। যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য তাঁহার আকুতি আবালবৃদ্ধ সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলিত। তাঁহাকে যথোপযুক্ত সাহায্যদানেও তাহারা আগাইয়া আসিত।

হরেন্দ্রকুমার চার-পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে একবার মাত্র রাজভবনে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। এই কয় বৎসরে কি রাজভবনে কি অন্যত্র, কি শহরে কি পল্লীতে—এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়, যেখানে রাজ্য-পাল হরেন্দ্রকুমার হয় সভাপতি, না হয় মাননীয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে গিয়াছি। হরেন্দ্রকুমারের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন, কিন্তু দুই-তিনটি কথায় তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচিতি প্রকাশ পাওয়ায় মনে হইল তিনি অবাক হইয়া গেলেন। আর একদিন কলিকাতার খানিকটা দূরে পল্লীর এক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। সেখানেও সভাপতি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয় হেতু সহজ আলাপনে রত হইলাম। শেষে বুঝিলাম, একারণে সভার প্রধানতম উদ্যোক্তা বেশ রুষ্ট হইয়াছেন। ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব-পরিচিতি অনেকের বিস্ময় ও রোষের কারণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, হরেন্দ্রকুমার ছিলেন দরিদ্রেরও বন্ধু, অনাথেরও সহায়; দুর্গত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ সহানু-ভূতি লাভ করিত, এরূপ কচিৎ কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায়। তিনি নিজে যক্ষ্মারোগীদের বিশ্রাম-নিবাস নিমিত্ত টাকা তুলিতে ব্যস্ত। পল্লীর যে সভার কথা বলিলাম

সেখানেও তিনি দুর্গত যক্ষ্মারোগীদের দুরবস্থার কথা বলিতে ভুলেন নাই। এই সময় তিনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ অর্থদান করিলেন, যাহাতে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের সাহায্যের জন্য একটি দরিদ্র-ভাণ্ডারের স্থাপনা হইতে পারে। এটি ছিল স্বাবলম্বী উদ্বাস্তু-উপনিবেশ। এই স্থানটির দ্রুত উন্নতির কথা জানিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আগত ছিন্নমূল মানব-সমষ্টির দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া কোমলপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের দুর্গতির অবসান কিরূপে হইতে পারে সে বিষয়েও তিনি ভাবিতেন, তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা আমাকেও একবার বলিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। তিনি গবর্ণর হইয়া প্রথম দিকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনে কতকটা অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

হরেন্দ্রকুমার জীবনভোর যাহা আয় করিয়াছেন, দুই হাতে তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। ডিহি-শ্রীরামপুর অঞ্চলে তাঁহার পৈতৃক জমিজমা মন্দ ছিল না। ঐ অঞ্চল সম্প্রতি বিশেষ উন্নত হইয়াছে। এই অঞ্চলের উন্নয়ন-কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা লক্ষণীয়। তিনি বহু জমি জমাবিলি করিয়া দিয়াছিলেন, কিছু কিছু বিক্রয়ও করিয়াছিলেন। এ দরুণ তাঁহার সামান্য অর্থাগম হয় নাই। এই অর্থ তিনি নিজের ভোগে লাগান নাই। তাঁহার দান ইহা দ্বারাও পুষ্ট হইয়াছে। রাজ্যপালের মাসিক বেতন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা; তিনি নিজের জন্য পাঁচ শত টাকা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সর্ব্বস্বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের বিবিধ বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত দান করিয়া গিয়াছেন। গুজব রটিয়াছিল, দিল্লীর বড়কর্ত্তারা নাকি ইহাতে অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি বড়কর্ত্তাদের ভ্রূকুটি সর্ব্বদা উপেক্ষা করিয়াই চলিতেন। তাঁহাকে একবার উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল করিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বাঙালী, ভারত-বাসীও বটেন। কিন্তু জন্মভূমি বাংলা ও স্বজাতি বাঙালীকে বড় ভালবাসিতেন। যতদিন রাজ্যপাল থাকিবেন, বাঙালীরই সেবা করিয়া যাইবেন এই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। বাঙালীর দুর্গতির অন্ত নাই; দুর্গত বাঙালীর সেবাই ত সত্যিকার ভারত সেবা। হরেন্দ্রকুমার, দুর্গতের বন্ধু, অনাথের সহায়, ধুতি চাদর-কোর্ত্তা পরা বাঙালী হরেন্দ্রকুমার প্রতিটি মানুষের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। ত্যাগ-দৃপ্ত কর্ম্মপ্রধান হরেন্দ্রকুমারের স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়া আমাদেরও জীবন ধন্য হইয়াছে।

চেকের কথা

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

আমরা এখানে চেক, চেক্‌বই ও তাহারই প্রসঙ্গে আইনের পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব। ফরাসি ভাষার eches বা chess শব্দ হইতে বর্ত্তমান চেক শব্দটি গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন কালে "স্বর্ণকারগণ" ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন। বর্ত্তমানে যে ভাবে চেকের সাহায্যে আমাদের সকল লেনদেন চলে, প্রাচীন কালে এই লেনদেন সবে তখন "Goldsmiths notes" এর মারফৎ আরম্ভ হয়। এই "Goldsmith's notes"-এর প্রসঙ্গে এই কথাটির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যথা :

That it must be remembered that the just bank notes in England were the "Goldsmiths notes" *i.e.*, receipt granted by Goldsmiths for moneys lodged with them by a depositor, whose name necessarily appeared on the receipts issued to him.

পরবর্ত্তী কালে অবশ্য কাষ্টমারগণ এই "Goldsmiths notes এর পরিবর্ত্তে লিখিত নির্দ্দেশ সম্বলিত পত্র মারফৎ টাকার লেনদেন প্রচলিত করেন। ইংলণ্ডে যৌথ ব্যাঙ্কের সূচনার পর প্রথম ১৭৮০ সনে চেক কথাটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ইহারই অল্প পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রথম ১৭৮৫ সনে চেকের প্রচলন করেন।

অবশ্য যে তিনটি ব্যাঙ্ক মিলিত হইয়া পরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত হইয়াছে—তাহার সঙ্গে এই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোন সম্পর্ক নাই। চেকের ব্যবহারের সূচনাতে ইহা বেয়ারার চেক হিসাবেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই যে চেক বা "Goldsmiths notes" যাহা মাত্র সেদিন ও slip of paper বলিয়া পরিগণিত হইত—উহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আইনগত অনেক প্রকার অসুবিধা আসিতে লাগিল বা পারে বলিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে চেকের অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হেতু ১৮৮১ সনের

"The Negotiable Instrument Act-এর ছয় ধারাতে আজকের চেকের ব্যাখ্যা আমরা পাইতেছি, যথা :

"A cheque is a bill of Exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand."

আজকের এই চেকের বিষয় আলোচনার প্রারম্ভে বিখ্যাত ব্যাঙ্কার Mr. Lovd"-এর মন্তব্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যথা :

"The history of the rise and growth of the cheque system from the open cheque to bearer, to the bearer crossed cheque and thence to the crossed cheque to order."

চেকের ইতিহাসে ইহাই ক্রম-পরিবর্তনের সূচনা মাত্র। এদেশে ইংরেজী ১৮৭৯ সনের ষ্ট্যাম্প আইনে এইরূপ বিধান ছিল যে, ২০্ টাকার উপরে যে চেক কাটা হইবে তাহাতে এক আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ২০ টাকার কম টাকার চেকে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না। ইংরেজী ১৮৯৯ সনের ষ্ট্যাম্প আইনে কিন্তু বিধান করা হয় যে, সব চেকেই এক আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। আগে যে অল্প সুবিধাটুকু ছিল তাহাও তুলিয়া দেওয়া হইল। পরে চেকের যাহাতে বহুল ব্যবহার হয়, এই উদ্দেশ্যে ইংরেজী ১৯২৭ সনে ষ্ট্যাম্প আইনের এই বিধানটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

তখন হইতে এ দেশে চেকে আর ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। বর্তমানে ষ্ট্যাম্প আইন ও নিগোসিয়েবেল ইনষ্ট্রুমেণ্ট আইনে চেকের সংজ্ঞা একই, পূর্ব্বে কিন্তু কিছু পার্থক্য ছিল। বিলাতে ১৮৫৩ সনের ষ্ট্যাম্প আইনে চেকের উপর ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প এক পেনি কমানোর ফলে চেকের ব্যবহার বাড়িয়া যায়। এদেশে ১৯২৭ সনের পর হইতে চেকের প্রসার বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যায়।

অবশ্য বিলাতে চেকের প্রসারের আরও একটি কারণ আছে। যে সময়ে অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্ক নোট ছাপিতে পারিত তাহারা ১৮৮৪ সনের পীলের আইনে সে অধিকার হারায়। আর যাহাদের সে অধিকার ছিল না তাহাদেরই প্রচেষ্টায় চেকের এত প্রসার সম্ভব হয়। চেকের এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় চেক-সম্পর্কিত সুষ্ঠু আইনের অভাব ও তাহার জটিলতা। তখন প্রথম চেকে crossing দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়, কারণ চেক হারাইয়া গেলে যে সকল সমস্যা আসিতে পারে তাহারই সমাধানকল্পে সেদিন লোকে চিন্তা করিতে থাকে। এই crossing দেওয়ার অর্থ এই যে, ব্যাঙ্ক মারফৎ চেকের টাকা লইতে হইবে। সেদিন চেকে ব্যবহৃত crossing-এ মাত্র একটি কথাই দুই লাইনের ভিতর লিখিতে হইত যথা : "& co"। পরবর্তী কালে ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। সময়ের ও যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চেকের ব্যবহারবৃদ্ধি হেতু ব্যাঙ্কার, কাষ্টমার, Payee এবং Collecting ব্যাঙ্কার প্রভৃতির সুবিধ অনেক প্রশ্নই দেখা দিতে থাকে। এ সম্পর্কে প্রথম ১৮৫২ সালে Bellamy v Marjoie bank যে মামলা হয়, তাহাতেই আমাদের সমস্যার সূচনা ও প্রতিকারের প্রশ্ন উঠে ও আলোচিত হয়। এই মামলা হইতে আমরা জানিতে পারি যে :

"Bank in question paid the cheque in spite of the fact that it bore the crossing of two bankers (though one had been crossed out by the payee). The court held that the paying bank was not liable and that the crossing was no part of the cheque itself. but a mere memorandum."

এ কথা মানিলে ভবিষ্যতে চেকের crossing উপেক্ষা হেতু আরও অনেক প্রকারের সমস্যা আসিতে পারে। কাজেই বিলাতে ১৮৫৬ সনের Crossed Cheque Act পাশ হয়। এই আইনে বলা হয় যে :

"Crossed cheque should be paid only to or through a banker."

ইহার পরও যখন সকল সমস্যার সমাধান হইল না বলিয়া মনে হইতে থাকে, তখন ১৮৫৮ সনের Crossed Cheque Act-এ বলা হইল যে :

"The crossing was made a material part of a cheque. not to be obliterated or added to except to bring in the name of a banker and so convert it into a special crossing."

অবশ্য চেক সম্পর্কে আইন ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে হইতেই বর্তমানের ১৮৮১ সনের ভারতীয় Negotiable Instrument Act-এর বিধানসমূহের উৎপত্তি। বিলাতের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা গৃহীত হয়। এখানে দেখা গেল যে, ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ সনের Crossed Cheque Act পাশ হইলেও Drawers, Payee, Bonafide Transferee of a cheque ইহাদের স্বার্থ পুরাপুরি রক্ষা পায় নাই। ইহাদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন আসিলেও তাহার সমাধান ১৮৭৫ সনের পূর্ব্বে হয় নাই। পরে যখন ১৮৭৫ সনে Smith v The union Bank of London-এর মামলা হয় তখন আমরা জানিতে পারি :

"Payment of a cheque to one bank although it was crossed to another"

এ ধরণের সমস্যা দেখা দিলে বিবাদীর কি ধরণের অসুবিধা হইতে পারে—এখানে অবশ্য দেখা যায় যে :

"It being held that he had by endorsement made the cheque payable to bearer and so the property in it had passed to the bonafide holder who—and not the plaintiff was the true owner that the bank had paid the

bankers of the true owner and the plaintiff had no rights."

এর আগে যখন বলা হয় যে :

"Crossing was made a material part of a cheque"

অথচ এখানে তাহা কি ভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়—যাহার ফলে দেখা গেল যে, crossing of a cheque তখনও effective নহে। ইহার অর্থ এই হইল যে, যে-crossing এ-যাবৎ চেকে ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা কেবল প্রথা ও ব্যাঙ্কারদের ভিতর পরস্পরের প্রতি সৌজন্যবোধেই চলিয়া আসিতেছে, আইনগত তাহার তৎকালীন কোন মূল্যই ছিল না। কাজেই ১৮৭৬ সনের চেক সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তনের সময় crossing of a chequeকে effective করার জন্য বলা হইল যে :

"That a person taking a cheque crossed specially should not have and should not be capable of giving a better title to it than had the person from whom he took it—in other words, it was proposed that the section should operate in exactly the same way as does the not-negotiable crossing today."

আরও বলা হইল যে :

"That a banker receiving payment of a cheque crossed specially for a customer in goodfaith and without negligence should not in cur liability by reason only of having received payment."

আসলে দেখা যায় যে, দেশের বাণিজ্যিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইনগত বাধা কেমন ভাবে অপসারিত হইতে সুরু হইয়া অবশেষে চেক সম্পর্কে নূতন আইন পাশ হইল। বর্তমানে বিলাতে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে,চেকের Superfluous reqirement of endorsement এড়ানো সম্ভব কি না—এই হেতু Mocatta কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির সুপারিশের ফলে ১৯৫৭ সনের Cheque Act পাশ হইয়াছে ও উহা গত ১৯৫৭ সনের ১৭ই অক্টোবর হইতে বলবৎ হইয়াছে।

ইহার মূল বিধান হইতেছে যে :

"That the banker's crossing stamp should be deemed to be the endorsement in blank of the customer for whom the cheque is collected."

এই আইনে যেমন ব্যাঙ্কারেরা যেখানে সম্ভব endorsement-কে উপেক্ষা করিতে পারিবে—তেমন ব্যাঙ্কারদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে বলা হইল যে :

"That the paying banker shall not in cur any liability by reason only of the absence of, or irregularity in, endorsement."

আরও একটি বিধান করা হইল যে :

"That the collecting banker is not to be treated for the purposes of this section as having been negligent by reason only of his failure to concern himself with the absence of or irregularity in endorsement."

অবশ্য যে হারে আমাদের চেকের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এই ধরণের পরিবর্তন যে আবশ্যক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—তবে আমাদের দেশে এই পরিবর্তন কাজে কতখানি লাগিবে বা লাগাইতে গেলে কি ভাবে কতটুকু আইনের পরিবর্তন আবশ্যক সেজন্য উপযুক্ত কমিটির মতামত প্রয়োজন এবং এই হেতু উপযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করার আবশ্যকতা আছে।
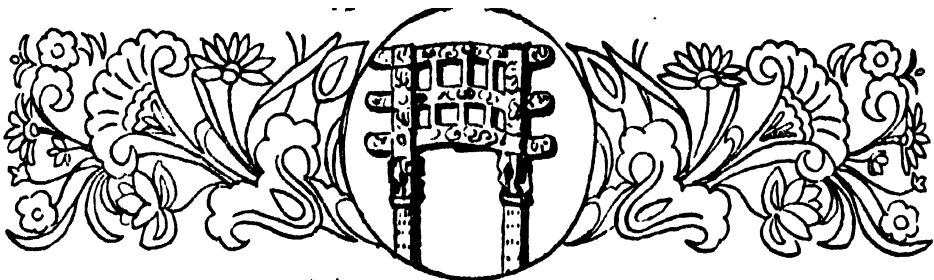
মধ্যপ্রাচ্য ও আরব-জগৎ

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর তীরে আজ সেই বাবিলনীয় সাম্রাজ্য নাই; আর জর্ডন নদীর তীরে ইহুদীগণের জুডিয়া রাজ্যও নাই। কোথায় বা বাবিলনীয় নৃপতি হামুরাবীর ও চালডীয় সম্রাট নেবুচাডনেজার—আর কোথায় বা ইহুদী আব্রাহাম ও মুসা। আরবের বিশাল মরুভূমি বেষ্টন করিয়া ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে পারস্য দেশ (ইরাণ) এবং লোহিতসাগর, ভারত-মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত বহু রাষ্ট্র ও জনপদ অতি প্রাচীনকাল হইতে গড়িয়াছে ও ভাঙ্গিয়াছে। মিশরের নেপোলিয়ন তৃতীয় থোথমেসের বিশাল সাম্রাজ্য মিশর হইতে উত্তরে প্যালেষ্টাইন ও এসিরিয়া ও পূবে ইরাণ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল; পুনরায় বাবিলন প্রভৃতির উত্থানে সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছে। তারপর আসিয়াছে পারস্যের একিমিনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাস,—বাবিলন হইতে প্যালেষ্টাইন পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্ত্তী কাম্বিসেসের রাজত্বকালে ক্রমশঃ এই সাম্রাজ্য মিশর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সে আজ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

পারস্যের পতন হইল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার মিশর হইতে ভারত-সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহার পরে রোমান সেনাপতি পম্পি জেরুজালেম অধিকার করেন এবং রোমক-সম্রাট অগাষ্টাস মিশর জয় করেন।

ইহার পরে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন যীশুখৃষ্ট। পাশ্চাত্ত্য জগতে ও পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার প্রভাব বহুদূরপ্রসারী।

চতুষ্পার্শ্বের এই সকল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত মূল আরবদেশ মরুভূমি-অধ্যুসিত। পূর্ব্বকালে আরবের এই ভূখণ্ড সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল না এবং বিদেশীদের প্রলুব্ধ করিবার মত আকর্ষণও কিছু ছিল না; সুতরাং ইহার অভ্যন্তরে বিশেষ কোনও বিদেশীর প্রবেশের প্রয়োজন ঘটে নাই। আরবগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) আরব (অর্থাৎ খাঁটি আরববাসী), (২) মোস্তারব (অর্থাৎ অতিরিক্ত যাহারা সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে)। ইহাদের মধ্যেও দুইটি শ্রেণী আছে: (১) আহল বেদু (উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু প্রভৃতিতে যাহারা বাস করে—যাযাবর), এবং (২) আহল হাদর (যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে)। মূল মরু অঞ্চলে আহল বেদুর (অর্থাৎ বেদুই জাতীর) প্রাধান্যই বেশী এবং চতুষ্পার্শ্বের উর্ব্বর ভূমিতে আহল হাদর-এর (বা মিশ্র আরব) প্রাধান্যই বেশী। মরুপ্রদেশে দুইটি মাত্র নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল—মক্কা ও জেথ্রিব (মদিনা)। এই দুর্দ্দান্ত যাযাবর জাতি বহু দলে বিভক্ত ও কলহপরায়ণ ছিল। প্রাচীনকালেও মক্কা আরবগণের তীর্থক্ষেত্র ছিল। তখন সেইখানে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা বৎসরে একবার এই তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হইত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই মক্কানগরীতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব যেন সহসা আরবজাতিকে নিদ্রা হইতে উত্থিত করিল। ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া নূতন উদ্দীপনা ও উন্মাদনায় দুর্জ্জয় সাহসে দিকে দিকে ধাবিত হইল; মহম্মদের জীবনকালেই সমগ্র আরবদেশ একটি রাষ্ট্রের অধীন হইল। পরবর্ত্তীকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। ভূমধ্যসাগর তীরে প্রাচীন মিশরের সভ্যতা লুপ্ত করিয়া নূতন ইসলাম সভ্যতার উদয় হইল। আরবদের বিজয় অভিযান পশ্চিমে সুদূর স্পেন হইতে পূর্ব্বে মঙ্গোলিয়া ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিল। প্রথম প্রবল জোয়ারের পর আসিল ভাটা; এই বিশাল সাম্রাজ্য ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। উম্মিয়াদ বংশের পরবর্ত্তী আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে প্রাচীন বাবিলনের সন্নিকটে বাগদাদে রাজধানী (বর্ত্তমান ইরাকের অন্তর্ভুক্ত) স্থাপিত হয়। উত্তর-আফ্রিকায় ও স্পেনে পৃথক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমশঃ মিশর, ইরাণ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। এই সময় মধ্য-এশিয়ার তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দলে দলে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া আসিল। ইহারা বাগদাদ অধিকার করিয়া আব্বাসাইড বংশের রাজত্বের অবসান করিল। ইহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁ ও তাহার বংশধরেরা আসিয়া বাগদাদ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রাচীন আরব সভ্যতা এক প্রকার লুপ্ত হইল বলা চলে।

গোবী মরুভূমির পশ্চিমে তুর্কী নামক এক ভবঘুরে জাতি বাস করিত। তাহারা দুর্দ্দান্ত তাতার জাতির আক্রমণে ক্রমশঃ পশ্চিম-দিকে সরিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে আরবের উত্তর অঞ্চলে আনাতোলিয়া দেশে বসবাস আরম্ভ করিল। এই তুর্কীরাও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই তুর্কীদের নাম অত্তোমান তুর্কী; পূর্ব্বেকার তুর্কীদের বলা হইত সেলজুক তুর্কী। বাগদাদ ধ্বংসের পর অত্তোমান তুর্কীগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল। এসিয়ায় পারস্য উপসাগর

হইতে ভূমধ্যসাগর তীর পর্য্যন্ত, আফ্রিকায় মিশর, এবং ইউরোপে কৃষ্ণসাগর-তীর হইতে আড্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাহাদের অধীন হইল। অতঃপর এই তুর্কী সাম্রাজ্যেরও পতন আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের পূর্ব্বেই এই পতনের সূত্রপাত হয়। তুর্কীরা কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দেয় নাই, ফলে তাহাদের মধ্যে কোনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া তুর্কীদের মধ্যে যাযাবর বৃত্তির অনেকখানি অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিধর্ম্মের প্রজাদের তাহারা আপন করিয়া লইতে পারে নাই। খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়া দিল। উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলির ন্যায় তুরস্ক বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করিল। অপরাপর বলকান সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্ত্তার ভাণ করিয়া রুশিয়া বার বার পূর্ব্ব-ইউরোপের তুর্ক সাম্রাজ্যের উপর হানা দিতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুর্কীর উপর কোনও দরদ না থাকিলেও এই সময় হইতে রুশভীতির জন্য এবং সাম্রাজ্য রক্ষার অভিসন্ধিতে তুরস্কের পক্ষে যোগ দিয়াছে। তাহার পর ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে আসিল পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে তরুণ তুর্কীদল জার্ম্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। ইহার ফলে তুর্ক সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশও তুর্কীদের হস্তচ্যুত হইল। সমগ্র আরবভূমি তুর্ক সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইল। তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে "খলিফা' পদের অবসান ঘটাইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল।

অপর দিকে আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বাধীনতা লাভের সুযোগ সুবিধা আনয়ন করিয়াছে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরব দেশ ও জাতির পৃথক কোনও অস্তিত্ব অথবা সত্তা ছিল না বলিলেই চলে। মিশর হইতে ভারতের সিন্ধুর পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ভূখণ্ড তুরস্কের অধীনে মধ্যযুগীয় অর্থনীতির প্রভাবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতির অন্ধকারে অসহায় অবস্থায় আত্মকলহে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। প্রথম যুদ্ধে তুরস্ক জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় ইংরেজ নিজ স্বার্থে আরবগণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই কার্য্যে কর্ণেল লরেন্সের অবদান অতুলনীয়। তুরস্কের অধীনস্থ আরব জায়গীরদার সম্প্রদায়কে (Feudal Chiefs) ইংরেজ প্রচুর অর্থ প্রদানে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় প্ররোচিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে (১৯১৮) বিমুক্ত সিরিয়া ও লেবাননের অভিভাবক হয় ফরাসী এবং ইরাক, জর্ডন, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতির অভিভাবক হয় ইংরেজ। এক মাত্র সৌদি আরব রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯২৭ সনের একটি চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার ইবন সৌদের অধীন সৌদি আরব রাজ্যের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়।

১৯১৭ সনের বালফুর ঘোষণায় ও ভার্সাই চুক্তিতে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীজাতির জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী আবাসভূমির ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব্বেই প্যালেষ্টাইনে বহু ইহুদী বসবাস করিত। কিন্তু সেই স্থানে সংখ্যাগুরু আরবদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী ছিল। হিটলারের আমলে বহু ইহুদী জার্ম্মানী হইতে বিতাড়িত হয়। ইংরাজ ও মিত্রপক্ষ তাহাদিগকে প্যালেষ্টাইনে বসবাস করিবার সুবিধা প্রদান করিলে আরবগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমবর্দ্ধমান হইতে থাকে। অনেক সময় অতি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিতে লাগিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদনে আরব ও ইহুদী-অধ্যুষিত অঞ্চলে দ্বিধা-বিভক্ত করা হয়। ইহুদী-অধ্যুষিত অঞ্চল, ১৯৪৮ সনে ইজরাইল রাষ্ট্র নামে অভিহিত হয়। অপর আরবীয় অংশ জর্ডন রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়। প্যালেষ্টাইন বিভাগ আরব ও ইহুদী কাহারও মনঃপূত হয় নাই। ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইন ইজরাইলের রাজ্য বলিয়া দাবী করে এবং অপর পক্ষে আরবগণ দাবী করে যে,প্যালেষ্টাইন আরবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৫০ সনে ইজরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লয়।

জর্ডন

১৯১৮ সনের পর অটোমান তুর্ক সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটিলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রদেশগুলি ক্রমশঃ কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ইহাদের মধ্যে জর্ডন অন্যতম। ১৯২২ সনে ব্রিটিশ অভিভাবকত্বের অধীনে জর্ডন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ সনের মে মাসে আরবের প্রাক্তন রাজা ও শেরিফ-ই-মক্কা হোসেনের পুত্র আবদুল্লা জর্ডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ব্রিটিশ অভিভাবকত্বের অবসান ঘোষণা করা হয়। আবদুল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাহার পুত্র তালেল কিছু দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিও তাঁহার পুত্রের পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পুত্র হোসেন ১৮ বৎসর বয়সে হাসেমাইট-রাজ্য জর্ডনের সিংহাসনে ১৯৫৩ সনে অধিষ্ঠিত হন। জর্ডন-রাজ হোসেন এবং তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফৈজল উভয়ই হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। জর্ডন রাজ্য বর্ত্তমানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে শাসিত। ১৯৫০ সনের ব্যবস্থায় প্যালেষ্টাইনের আরব-অধ্যুষিত অঞ্চল জর্ডনের অন্তর্ভুক্ত হইলে জর্ডনের মন্ত্রিসভা প্যালেষ্টাইনের আরব ও প্রাক্তন জর্ডনের সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রমহাসভা (Parliament) দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যবস্থাপক (Senate) এবং প্রতিনিধি সভা (House of Deputies)। নামে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেও রাজতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও দুর্নীতি বহু পরিমাণে বর্ত্তমান। হোসেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন; তথাপি তিনি 'আরব ঐক্য' ও 'নিরপেক্ষ' নীতি মানিয়া চলেন। এই "আরব ঐক্যের মূল কথা ইহুদী বিরোধ ও আতঙ্ক এবং বৈদেশিক

শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা। জর্ডনের শতকরা আশীজনের অধিক অধিবাসী সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। নারীর কোনও প্রকার নাগরিক অধিকার নাই। বহু বিবাহ ও অবরোধ প্রথা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত। শিল্প-বাণিজ্যের অতি শৈশব অবস্থা। জর্ডনের নিজস্ব কোনও বন্দর নাই, লেবাননের বেইরুট বন্দর যোগে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা আছে। পথ ঘাট ও যান-বাহনের অবস্থা অতি শোচনীয়। কাজেই বিদেশ হইতে আমদানী নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যের মূল্য রাজধানী আম্মনে অত্যধিক। আকাবায় একটি বন্দর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে কিন্তু সুয়েজপথ ব্যবহারে অধিক মাশুল লাগিবার আশঙ্কায় কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। জর্ডনের বর্ত্তমানে একটি প্রধান সমস্যা, ইজরাইল হইতে আগত বাস্তুহারা আরবদের পুনর্বাসন। জর্ডন রাষ্ট্র এই আরবগণকে সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়াছে। এই বিষয়ে আরব লীগের মধ্যে জর্ডন রাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হইয়াছে। জর্ডন রাজ্যের আম্মন ও মাফরাকে দুইটি ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট ঘাঁটি-চুক্তি অনুসারে অবস্থিত। জর্ডনের আরব বাহিনী ব্রিটিশের সৃষ্ট। ইহার অধিনায়করূপে বহু দিন পর্য্যন্ত সেনাপতি জন বাগট গ্লাব অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি আরব দেশে গোলাব পাশা নামে পরিচিত। এই রাজ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নির্ম্মিত দুই শত মাইল রেলপথ আছে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই উহা মেরামতের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই রেলপথের ইঞ্জিন প্রভৃতি অতি পুরাতন ও কার্য্যের অনুপযুক্ত অথচ ইহার কোনও প্রতিকার-ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয় না। প্রায় সাড়ে তের হাজার বর্গ-মাইলের এই রাজ্য বলিতে গেলে যোগাযোগ শূন্য ও বিশৃঙ্খল। জর্ডনের নব-সংযুক্ত প্যালেষ্টাইনের অংশসহ জনসংখ্যা চৌদ্দ লক্ষের অনেক কম। দেশের স্বাস্থ্যের মান অনেক নিম্নে ও মৃত্যুর হারও উচ্চ। সমগ্র রাজ্যে দেশীয় চিকিৎসকসহ মোট চিকিৎসকের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক দুই শত। দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্যের তুলনায় রাজ্যের সম্পদ নেহাৎ নগণ্য নহে, কিন্তু এই সম্পদ রাজ-পারিষদের মুষ্টিমেয় দুই-চারি জনের মধ্যেই আবদ্ধ। আরবের তৈলপ্রবাহী নল (pipe line) জর্ডন রাজ্যের মধ্য দিয়া নীত হইয়াছে। রাজ্যের মধ্য দিয়া নল চালনা করার জন্য কিছু রাজস্ব উপার্জ্জন হয়। এই রাজ্যেও কিছু পরিমাণ তৈল ও গ্যাস উৎপাদনের আশা করা যাইতেছে।

ইরাক

জর্ডনের সন্নিহিত ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত অপর রাজ্য ইরাক। ইরাকের পূর্ব্ব নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য তিন বৎসর যুদ্ধের পর এই রাজ্যটি অটোমান তুর্ক সাম্রাজ্য হইতে বিমুক্ত করে। এই যুদ্ধের বৈচিত্র্য এই যে, ইরাকের স্বাধীনতার জন্য একটি আরবীয় সৈন্যও অগ্রসর হয় নাই, ইরাকের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে ব্রিটিশ সৈন্য, অবশ্য তাহাদের নিজের স্বার্থে। এই ভূমিতেই অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতা বাবিলনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদের আবির্ভাবের পর আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে বাগদাদের গৌরব কিছুদিনের জন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। ১২৫ খ্রীঃ অব্দে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর হুলাগুর আক্রমণে এই দেশ ধ্বংসস্তূপ ও মরু-ভূমিতে পরিণত হয়। তাহার পর হইতে ইহা অটোমান তুর্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইরাকের বর্ত্তমান রাজা দ্বিতীয় ফৈজলের পিতামহ তদানীন্তন মক্কার শাসনকর্ত্তা প্রথম ফৈজল কর্ণেল লরেন্সের পক্ষাবলম্বন করিয়া ব্রিটিশের সহায়তা করেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অপর একজন তরুণ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি নুরি-আস-সৈয়দ। পরবর্ত্তী কালে তিনি উপর্য্যুপরি ছয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদে মনোনীত হন ও ইরাকের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণে সহায়তা করেন। ১৯৩৩ সনে রাজা ফৈজলের মৃত্যুর পরে ইরাকে তিনি সর্ব্বপ্রধান প্রভাব ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন।

প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াও প্রধানমন্ত্রী নুরী রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে ও নিজমতে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক দিকে ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর অংশীদারগণ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী ও ওলন্দাজ এবং তাহাদের স্বার্থের সংঘাত, ও ব্রিটিশ সৈন্যঘাটি; অপরদিকে বিপক্ষীয় রাশিয়ার সতর্ক দৃষ্টি। দেশের অভ্যন্তরে শোচনীয় দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা বিরাজমান। দেশের অধিকাংশ জমি মুষ্টিমেয় শেখ শ্রেণীর জমিদারের হস্তে। এই শেখদের অনেকেরই ব্যক্তিগত সেনা-বাহিনীও বর্ত্তমান ছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গতি ও অর্থবল অতি ক্ষীণ। নুরী দেখিলেন প্রতিবেশী রাজ্য সৌদি আরবের তৈলখনিসমূহের আয় বাবদ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তাহাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি ইরাকের রাজস্ব বাবদ সমপরিমাণ অর্থ দাবী করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও অবশেষে জয়লাভ করিলেন। ধনী রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ ও জমিদার শেখগণ মনে করিলেন, এই অর্থাগমে অন্যান্য আরব রাজ্যের ন্যায় তাঁহারাই লাভবান হইবেন। কিন্তু নুরি তাঁহাদের নিরাশ করিয়া ঘোষণা করিলেন, এই অতিরিক্ত অর্থ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে। তিনি প্রথমেই সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন বাবিলনের বিলুপ্তপ্রায় খালগুলি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইউফ্রেটিস নদীর বাঁধ পরিকল্পনা রূপায়িত করিলেন। প্রায় দেড় লক্ষ একর মরুভূমির জমি চাষের উপযুক্ত হইল। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও হইয়াছে। টাইগ্রিস নদীর উপর দিয়া অনেকগুলি সেতু নির্ম্মাণও সম্পূর্ণ হইয়াছে। মসুলে বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সামারার বাঁধ নির্ম্মাণও সম্পূর্ণ হইয়াছে। বহু বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হইয়াছে। সমস্ত রাজ্যে চার লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার প্রায় পঁচিশ হাজার সম্পূর্ণ হইয়াছে। কোনও

বিদেশী সাহায্য ব্যতিরেকেই পরিকল্পনার কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। নুরির প্রভাবে ইরাকের রাজপ্রাসাদ অন্যান্য আরবীয় রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অনেকাংশে বিলাসিতা বিবর্জ্জিত। নুরি প্রধানমন্ত্রী না থাকিলেও তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জর্ডনের ন্যায় ইরাক একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্য। এই স্থানেও একটি প্রতিনিধি পরিষদ ও রাষ্ট্রসভা আছে। আরবের অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের ন্যায় ইরাকে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অতি অল্প। ইহার ফলে ইরাকের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নে কৃষক ও মজুরের অভাব দেখা দিয়াছে। এই রাজ্যের ১১৬ হাজার বর্গ-মাইল ভূমিতে কিঞ্চিদধিক এক হাজার মাইল রেলপথ আছে। এই রাজ্যে বসরা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট বন্দর আছে। শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে তৈলসম্পদ, তাহাও বিদেশীয় হস্তে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। দেশের শিক্ষার মান অনেক নিম্নে। কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বালক-বালিকা বর্ত্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। এ রাজ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এ রাজ্যে নারীর নাগরিক অধিকার নাই, তবে এ বিষয়ে সামান্য আন্দোলন দেখা দিয়াছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক বালিকাও শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। এ দেশের স্বাস্থ্যের মানও খুব উচ্চ নহে। এ রাজ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট আছে। চিকিৎসা-ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজধানী বাগদাদেই অবস্থিত। অন্যান্য স্থানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

সিরিয়া

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে তুরস্কের দক্ষিণে ও আরবের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত সিরিয়া প্রদেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে বিমুক্ত হইলেও ফরাসীগণ তাহাদের অভিভাবকরূপে সেই দেশে অবস্থান করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে ও সিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সিরিয়ার প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। জেনারেল আদিব সেশাকলি রাষ্ট্রনায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে সিরিয়ার শাসনতন্ত্র রচিত হয়। ১৯৫৩ সনে সর্ব্বপ্রথম গণভোট গ্রহণে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রসভার সদস্যগণ প্রতি চার বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রে দলপতিগণ নিজ দলের হইয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন।

সিরিয়ার মধ্য দিয়া ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, ওরোটিস প্রভৃতি পাঁচটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই সিরিয়া এক সময় রোমক সাম্রাজ্যের একটি শস্যভাণ্ডার বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ সেখানে কৃষক সম্প্রদায় চরম দারিদ্র্য ও শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে জীবন যাপন করে। জমির অধিকাংশের মালিক শেখ সম্প্রদায় জমিদার। জমির উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করে জমিদার ও মহাজন। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অনেকক্ষেত্রে বন্ধক দেওয়া থাকে মহাজনের নিকট। পল্লী অঞ্চলের বাসগৃহ অতি দীন। গৃহপালিত পশু ও মানুষকে অনেক সময় একই কক্ষে বাস করিতে দেখা যায়। অনেক স্থানে জমিদার ও মহাজনই একাধারে জেলাশাসক, বিচারক ও বন্দীশালার অধ্যক্ষ। বহু আইন প্রণয়ন দ্বারাও ইহার প্রতিকার এখনও সম্ভব হয় নাই।

শিল্প-বাণিজ্যে মিশরের পরেই সিরিয়ার স্থান। উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও নিম্ন শ্রেণীর। বৃহৎ শিল্পের অধিকাংশই বিদেশীর কর্তৃত্বাধীনে। যন্ত্রশিল্প ও পূর্ত্তবিদ্যাবিদ সিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কেহ নাই বলিলেও চলে। দক্ষ শ্রমিকের অত্যন্ত অভাব। সূতা ও পশম বস্ত্র, কাচ, চিনি, এবং সিমেন্ট প্রধান শিল্প।

সিরিয়াবাসীর শতকরা সত্তর জনের অধিক অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। শিক্ষা-ব্যবস্থা অল্পাধিক অবস্থাপন্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাজধানী দামাস্কাসে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার শিক্ষার মান এখনও অনেক নিম্নে। রাষ্ট্রের ও সেনাবাহিনীর গঠনে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় ফরাসী প্রভাব বেশ অনুভব করা যায়। নেপোলিয়নের সময় হইতে সিরিয়ায় ফরাসী প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প শিক্ষার জন্য অদ্যাপি ফরাসী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ফরাসী খ্রীষ্টীয় মিশন অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। সিরিয়ার ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বীমা কোম্পানী, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি ফরাসীগণ কর্তৃক প্রথম গঠিত হয়।

সিরিয়া তৈল-উৎপাদক রাজ্য না হইলেও ইরাক ও সৌদি আরবের তৈলপ্রবাহী নল এই রাজ্যের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়াছে। নল স্থাপনের জন্য রাজস্ব বাবদ সিরিয়ার প্রায় পাঁচ কোটি সিরিয় পাউণ্ড উপার্জ্জন হয়।

অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের ন্যায় সিরিয়ার জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অতি সামান্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভিমতে চাষাবাদ ও শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত জনসংখ্যা অন্ততঃ আরও ত্রিশ লক্ষের অধিক বৃদ্ধির প্রয়োজন। বর্ত্তমানে অনুন্নত হইলেও সিরিয়া অনেক বিষয়ে মিশরের ন্যায় প্রগতিশীল। ১৯৫৩ সনে সিশাকলি রাষ্ট্রনায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে নারীর নাগরিক অধিকার মানিয়া লওয়া হয় এবং অনেকে নির্ব্বাচনে ভোট প্রদান করে। কিন্তু মিশরের ন্যায় পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা এখনও সিরিয়ায় আসে নাই। এই রাজ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান বিদ্বেষ বেশ প্রবল। এখনও অনেক রাষ্ট্র-পরিচালিত বিদ্যালয়ে ইহুদীর প্রবেশ নিষেধ। এই রাজ্যে খ্রীষ্ট-পরিচালিত কিছুসংখ্যক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

সিরিয়ায় একটি মাত্র বন্দর লাটাকিয়ায় অবস্থিত। লেবানন হইতে সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার ব্যবসায় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বন্দর এখনও বইরুটের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

সিরিয়ার রেলপথের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ছয়শত মাইল। মেরামতের ও রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটিতে এই রেলপথের অবস্থা শোচনীয়। দামাস্কাস হইতে লেবাননের রাজধানী বেইরুট পঁয়ষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করিতে বার ঘণ্টার অধিক সময় লাগে। এই রাজ্যে প্রায় ষোলশত মাইল পাকা রাজপথ আছে। ইহার অধিকাংশই ফরাসীগণ যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উত্তর

আফ্রিকা হইতে একটি পথ প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার মধ্য দিয়া তুরস্কে গিয়াছে ; এই পথ তুরস্ক সম্রাটের আমলে নির্ম্মিত।

লেবানন

সিরিয়ার সংলগ্ন ভূমধ্যসাগরতীরে অপর একটি রাষ্ট্র লেবানন। চারিদিকে পর্ব্বতমালা ও সাগর বেষ্টিত এই রাজ্যকে মধ্যপ্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড বলা হয়। দৈর্ঘ্যে ১২০ মাইল ও প্রস্থে ৩০ হইতে ৩৫ মাইল এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্ব্বে ইহা সিরিয়ার সহিত যুক্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী অভিভাবকত্বের অবসান হইলে লেবানন স্বাধীনতা লাভ করে। অধিবাসীদের শতকরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন মুসলমান, পঞ্চাশের উর্দ্ধে খ্রীষ্টান, ও অবশিষ্ট ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়। ইহা শিক্ষায় আরবরাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। শতকরা প্রায় বাট জনের অধিক অধিবাসী শিক্ষিত। এই রাজ্যটিও সিরিয়ার ন্যায় প্রজাতন্ত্র শাসিত। সংখ্যাগুরু খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে অনুরক্ত। অপর পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায় খ্রীষ্টান প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবার পক্ষে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে গুপ্তভাবে আন্দোলন চালাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা করে, অপর পক্ষে সিরিয়া-লেবানন সংযুক্তি-আন্দোলনের নেতা আনতুন সাদা জাতীয়তাবাদী লেবাননী খ্রীষ্টান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। উচ্চশিক্ষিত সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় খ্রীষ্টানগণের সহিত একযোগে জাতীয় উন্নয়নের চেষ্টার পক্ষপাতী। এই রাজ্যে নারীর ভোট ও সকল প্রকার নাগরিক অধিকার আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতাও আছে। অবরোধ-প্রথা অল্পসংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজধানী বেইরুটে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ; একটি আমেরিকান পরিচালিত ও অপরটি ফরাসীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের তুলনায় জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অনেক উন্নত। ইহার মূলে আমেরিকান ও ফরাসী পরিচালিত হাসপাতাল, প্রসূতি-সদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাহাদের প্রভাব। লেবাননে সহস্রাধিক চিকিৎসক আছে। উন্নত বহু ব্যাপার সত্ত্বেও অন্যান্য আরবরাজ্যের ন্যায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলতা অনেক সময় পরিদৃষ্ট হয়। পল্লী অঞ্চলে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর জীবিকা কৃষি। লেবানন রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক জমি আনুমানিক দুইশত পরিবারের হস্তে আবদ্ধ। ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্য অন্যান্য আরবরাজ্যের প্রায় সমান। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের একটি সমস্যার কারণ। এ দেশের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য অতি নগণ্য। অপরাপর দেশের আমদানী-রপ্তানীর জন্য বেইরুট বন্দর অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়। এই বন্দর হইতে শুল্ক প্রভৃতি বাবদ বেশ আয় হয়। ত্রিপলীতে অপর একটি সমুন্নত বন্দর আছে। লেবাননে তিনটি প্রধান রাজপথ আছে। সংখ্যায় কম হইলেও লেবাননের পথগুলি অনেক সুন্দর ও উন্নত। লেবানন তৈল-উৎপাদক রাজ্য না হইলেও সৌদি আরব ও ইরাকের তৈল-প্রবাহী নলের অপর প্রান্ত লেবাননে অবস্থিত। তৈলনল বাবদ তাহাদের কিছু রাজস্ব উপার্জ্জন হয়। এ দেশে বেকার-সমস্যা বেশ প্রবল। ইহার একটি কারণ এদেশের জীবনধারণের মান অন্যান্য আরবরাজ্য হইতে সামান্য উন্নত। এ দেশীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয়েরই রাষ্ট্র ও মাতৃ ভাষা আরবী। অধিবাসীদের একমাত্র ঐক্য ভাষা। এই দেশীয় খ্রীষ্টানগণ প্রাচীন প্যালেষ্টাইনের ম্যারোনাইট সম্প্রদায়-ভুক্ত খ্রীষ্টানগণের বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়।

সৌদি আরব

ইরাক ও জর্ডন রাজ্যের দক্ষিণে এবং লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর বেষ্টিত বিশাল ভূভাগ সৌদি আরবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনান্তে হেজ্জাজ, নেজদ্ প্রভৃতি চারিটি রাজ্যের সংযুক্তির দ্বারা ও ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় আবদুল আজিজ ইবন্ আবদুর রহমান আল ফৈজল আল সৌদ (সংক্ষিপ্ত নাম ইবন সৌদ) এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭ সনে একটি চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার সৌদি আরবের সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়।

ভারতবর্ষ অপেক্ষা সামান্য ছোট এই বিশাল রাজ্য আয়তনে প্রায় নয় লক্ষ বর্গ-মাইল। এই রাজ্যের অধিকাংশই মরুভূমি। আয়তনের তুলনায় জন সংখ্যা অতি সামান্য অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ-মাত্র। এই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী এক সময় যাযাবর বেদুইন শ্রেণীর ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের অনেকেই স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী রিয়াদ। পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা ভিন্ন অপর দুইটি সহর হাফুফ ও জিদ্দা। এই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছু নাই বলিলেই চলে। এই রাজ্যটি অবিমিশ্র একনায়ক রাজতন্ত্রে শাসিত বলাই সঙ্গত। ইবন সৌদের পুত্র বর্ত্তমান রাজা সৌদ একাধারে রাজা, প্রধান সেনাপতি, ধর্ম্মগুরু ও প্রধান মন্ত্রী। রাজ-উত্তরাধিকারী সৌদের ভ্রাতা ফৈজল সহকারী মন্ত্রী ও বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। নামেমাত্র একটি ক্ষমতা-বিহীন মন্ত্রণাসভাও আছে। সৌদের দুই পুত্র ও দুই জন নিকট আত্মীয় এই রাজ্যের চারটি প্রদেশের শাসন কর্ত্তা।

১৯১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত সৌদি আরবের প্রধান আয় ছিল মক্কার তীর্থযাত্রীগণের নিকট হইতে আদায় এবং তুরস্ক ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যোগদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক ষাট হাজার পাউণ্ড সাহায্য। ১৯৩৩ সনে আরাম-কোর (Arabic American Oil Company) সহিত তৈলকূপ খননের চুক্তি সৌদি আরবের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১৯১৭ সনে সৌদি আরবের বায়বরাদ্দ (Budget) ধরা হইয়াছিল এক লক্ষ পাউণ্ড, সেই স্থলে ১৯৫৪-৫৫ সনে বরাদ্দ করা হইয়াছে দশ কোটি পাউণ্ডের অধিক। তৈল উৎপাদন হইতে বর্ত্তমান আয় বিশ কোটি পাউণ্ডের বহু উর্দ্ধে। এই আয়ের অধিকাংশই রাজা সৌদ ও রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রায় তিন শত জনের ব্যক্তিগত আয় বলিয়া ধরা হয়। এই রাজ্যে নারীর কোনও

প্রকার নাগরিক বা সামাজিক অধিকার নাই। ক্রীতদাস প্রথা ও বিবাহার্থে নারী-বিক্রয় প্রথা এখনও অনেক পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়।

ইয়েমেন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সকল রাজ্য গড়িয়া ওঠে, ইয়েমেন তাহাদের অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরব হইতে ইয়েমেন সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করে। এই রাজ্যটি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় পঁচাত্তর হাজার বর্গ-মাইল ও জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ। ইয়েমেনের প্রাক্তন ইমাম তাঁহার দুই পুত্রসহ নিহত হন। আবদুল্লা-এল্-উজির নামে এক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করে। এই ব্যক্তিও গদীচ্যুত হয় এবং প্রাক্তন রাজার উত্তরাধিকারী সৈফ-আল-ইসলাম-আহমেদ ইমামের গদিতে উপবেশন করে। এই ইমামই বর্ত্তমান ইয়েমেনের রাষ্ট্রাধিনায়ক। ইমাম তাঁহার কতিপয় অনুচর-সহ সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন। ইয়েমেন বহির্জগতের সকল প্রকার প্রভাব হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন। সকল প্রকার কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইমাম ও তাঁহার পরিজন-অনুচরবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত। জনসাধারণ অতি দরিদ্র ও দীন। এই রাজ্যেও দাসপ্রথা ও নারী-অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান। নারীর কোনও প্রকার নাগরিক অধিকার নাই। সমস্ত রাজ্যে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা বিরাজমান। শতকরা আশীজনের অধিক ব্যক্তি বিবিধ রোগাক্রান্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত। ১৯৩৪ সনে ইয়েমেনের ও ব্রিটিশ সামন্তরাজ্য এডেনের সীমানা নির্দ্ধারণ-কল্পে ব্রিটিশ সরকার ইমামের সহিত একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তি ১৯৫১ সনে সংশোধিত হয়।

ইয়েমেনের স্থানে স্থানে উর্ব্বর জমিতে প্রচুর শস্য ও কফি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে কিছু পরিমাণ তৈল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদও আছে। ১৯৫৩ সনে ইয়েমেন রাজ্য একটি জর্ম্মাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তৈল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত একটি চুক্তি করে।

ক্ষুদ্র রাজ্য

ইয়েমেনসহ উপরোক্ত ছয়টি রাজ্য ভিন্ন, প্যালেস্টাইন উপসাগরতীর হইতে ভারত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ এডেন এবং ব্রিটিশের সহিত চুক্তিবদ্ধ হাড্রামাউট, মস্কট, ওমান, ট্রুসিয়াল, কাটার, কোয়াইট, বাহরেন প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যও আরবে অবস্থিত। এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোয়াইট সর্ব্বাধিক তৈল উৎপাদনে সক্ষম। আয়তনের তুলনায় এই রাজ্য সর্ব্বাধিক ধনী বলা যায়। ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র ও জনসংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার এবং তৈল বাবদ বাৎসরিক আয় প্রায় চৌদ্দ কোটি ডলার।

এই পর্য্যন্ত আরবের আরবীভাষী রাজ্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ভূমধ্যসাগরতীরের মধ্যপ্রাচ্যের একটি সমস্যা কেন্দ্র প্যালেষ্টাইনের দ্বিখণ্ডিত অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইসরাইল

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৯৪৮ সনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আয়তন আট হাজার একশত বর্গ-মাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় সতের লক্ষ। বর্ত্তমান অধিবাসীর মধ্যে আট লক্ষ বিশ হাজার জন জার্ম্মানী হইতে বিতাড়িত বাস্তুহারা ইহুদী। এখনও এক লক্ষ উনআশী হাজার আরব স্থায়ী নাগরিক হিসাবে ইসরাইল রাজ্যে বাস করে। ইসরাইল প্রজাতন্ত্র একশত কুড়ি জনের একটি রাষ্ট্রসভা (knesset) কর্ত্তৃক পরিচালিত। রাষ্ট্রাধিনায়ক প্রেসিডেণ্ট প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। একজন নির্ব্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রণাসভার (cabinet) সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। রাষ্ট্রসভা নির্ব্বাচনে স্ত্রী-পুরুষ জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে ভোটপ্রদানে অধিকারী। মধ্যপ্রাচ্যে এবং নিকটবর্ত্তী অন্য কোনও রাজ্যে এইরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আর নাই। ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উপাসনালয়গুলিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। এই রাজ্যে নিরক্ষরতা বলিয়া কোনও বস্তু নাই। পাঁচ হইতে তের বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এতাবৎ প্রায় চার হাজার নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শিশু বিদ্যালয় (kindergarten), শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান আছে। ইসরাইল রাজ্যে একটি অতি উচ্চশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চিকিৎসা, পূর্ত্তবিজ্ঞান, আইন, উচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয় বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় তালিকাভুক্ত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে উনিশখানি দৈনিক সংবাদপত্র ও বহুবিধ সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি প্রচারিত হয়। এই রাজ্যে মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে। আরবীয় মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির পূর্ণ নাগরিক অধিকার আছে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুশীলনের স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয়। প্রায় দেড় লক্ষাধিক খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রী ইসরাইলের মধ্য দিয়া জেরুজালেমে প্রতিবৎসর যাতায়াত করে। বর্ত্তমানে জেরুজালেমের এক অংশ জর্ডনরাজ্যে ও অপর অংশ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসরাইল রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, ঘড়ি, বিদ্যুৎ ও সিমেণ্ট উৎপাদন প্রভৃতির বহু শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে একটি বৃহৎ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এই কেন্দ্রে পঁচাত্তর হাজার টনের অধিক সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। শিল্পকার্য্যে ইহুদীদের দক্ষতা অতি উচ্চ মানের। ইসরাইল তৈল-উৎপাদক রাজ্য না হইলেও মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম তৈল-শোধনাগার এই রাজ্যের হাইফা বন্দরের সন্নিকটে স্থাপিত। তৈল-প্রবাহী নলের একটি প্রান্ত এই রাজ্যে অবস্থিত।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাহায্যে

ইসরাইলের কৃষি-ব্যবস্থার অতুলনীয় উন্নতি হইয়াছে। একদিকে যেমন জলাভূমি ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া কৃষির উপযোগী হইয়াছে, অপর দিকে মরু অঞ্চলে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় শস্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাম হামবুর্গ নামক একজন ইহুদী কৃষি-বিশেষজ্ঞের অবদান অতুলনীয়। রাশিয়া যেমন সাইবেরিয়ার তুষারে ফসল ফলাইয়াছে, হামবুর্গ তেমনি মরুভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন। সাম হামবুর্গ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ানের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই রাজ্যে বহুবিধ খনিজ সম্পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরব রাজ্যসমূহে খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছে বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর ইসরাইল রাজ্যের খনিজ আবিষ্কার ইহুদীগণের নিজের চেষ্টায়। রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথ সুপরিচালিত ও সুরক্ষিত। এই রাজ্যের রাজপথগুলিও উৎকৃষ্ট। ইসরাইলের হাইফা ও তেল আভিভ জাফা বন্দর অতি উন্নত ও আধুনিক। ইহুদী জাতির প্রবল গতিশীল শক্তি বিস্ময়কর।

মিশর আরব ঐক্য

বর্তমানে মিশর বৃহত্তর আরব জগতের একটি অংশ। মিশরের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৬৪) পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্ম, আরবী ভাষা, তুরস্ক ও ইহুদী বিরোধ এবং বিদেশীর আধিপত্য হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরব জগতে নব-জাগরণ ও ঐক্যের প্রচেষ্টা আনিয়াছে। আরবের জাতীয় প্রকৃতি—পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, অবিশ্বাস, কলহ-পরায়ণতা, যাযাবর প্রকৃতি, সংহতির অভাব প্রভৃতি আরবের পতন ঘটাইয়াছে। অদ্যাবধি আরবের মূল ভূখণ্ডে ইহার অভিব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায়। আরবের সাড়ে ছয়শত অধিবাসী অধ্যুষিত একটি গ্রামে সামান্য জমির সীমানা লইয়া কলহের পরিণামে ১৬১ জন নিহত ও তিনশত জন আহত হয় এবং অবশিষ্ট ১৮২ জন বৃদ্ধ নারী ও শিশু নিকটবর্তি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লয়। এইরূপ ঘটনা দৈনন্দিন না হইলেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বহু বৈষম্যের মধ্যেও আরব গোষ্ঠির মধ্যে সমগ্র আরবে কৃষ্টিগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ঐক্যের কথা অনুধাবন করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ তাহার নিজ স্বার্থে আরব সংহতির সাহায্যে আরবগণকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংহতি রক্ষার চেষ্টায় ইংরেজগণই প্রথম স্বেচ্ছায় আরব রাজ্যগুলির উপর অভিভাবকত্বের অবসান ঘটায়। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আহুত লণ্ডন সম্মেলনে ইংরেজই প্রথম সমস্ত আরব রাজ্যগুলির প্রতিনিধিকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। আরব লীগের প্রতিষ্ঠাতাও ইংরেজ। নিজ স্বার্থে ইংরেজ যাহা করিয়াছে তাহা হইতে আরব রাজ্যের কিছু মঙ্গলও হইয়াছে। আরব লীগের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিশর ও ইরাকের মধ্যে বিরোধ বাধিল। ইহার সুযোগে ইরাককে ভূতপূর্ব্ব শত্রু তুরস্কের সহিত বাগদাদ চুক্তিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তুরস্কের রুশভীতি ও মিশরের উত্থান ও নবলব্ধ শক্তি তুরস্ককে সহায়তা করিয়াছে। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী প্যাটো সম্মেলনের অধিবেশনে বলিয়াছিলেন, মিশর ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একজোটে মধ্য প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্থান ও অপর একটি স্বাক্ষরকারী। প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ না দিলেও যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির একজন সমর্থক।

মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি

১৯৫৭ সনের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহসা যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ ডালেসের বিরুদ্ধে সিরিয়া আক্রমণে তুরস্ককে প্ররোচনা দানের অভিযোগ করে। প্রকাশ পাইল সিরিয়া সীমান্ত বরাবর তুরস্কের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। সিরিয়াকে সমর্থন করিয়া আরব লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ২২শে অক্টোবর সিরিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে তুরস্কের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ পেশ করে। প্রবল বাকবিতণ্ডার পর ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রমিদ জোজের আবেদনে বিরোধের অবসান ঘটে এবং বান্দুং সম্মেলনের নীতি জয়যুক্ত হয়।

এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই বর্তমান বৎসরের ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৮) কাইরো হইতে প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং দামাস্কাস হইতে সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কুয়োৎলি মিশর ও সিরিয়ার সংযুক্তি ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, এই আরব সাধারণতন্ত্রের দুইটি ইউনিট থাকিবে, একটি মিশর ও অপরটি সিরিয়া। পরে ইয়েমেনও ইহাতে যোগ দিয়া তৃতীয় ইউনিট গঠন করে। নাসের এই সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিশরের অনুকরণে ইরাক জর্ডনকে লইয়া আর একটি "আরব ফেডারেশন ষ্টেট" গঠন করিয়াছে। মিশর-সিরিয়া মিলন ঘটিয়াছে জনগণের সম্মতিতে, অপর পক্ষে ইরাক জর্ডন মিলন একবংশোদ্ভূত দুইটি রাজতন্ত্রের সম্মিলনে। ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করিলে ইরাক-জর্ডন মিলনের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী মিশর ও সিরিয়ার নিকটতম দূরত্ব ১১০ মাইল এবং মধ্যে অন্যান্য রাজ্যের ব্যবধান বর্তমান। অপর দিকে ইরাক ও জর্ডন রাজ্যের মধ্যে কোনও ছেদ নাই। ইরাক ও জর্ডনের নেতৃবৃন্দের আশা ভবিষ্যতে সৌদি আরব রাজ্য তাঁহাদের সহিত যোগ দিবে। এই দুইটি নবগঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী হইবে কিনা, তাহা অনাগত ভবিষ্যৎ প্রকাশ করিবে।

বৃহত্তর আরব

রাশিয়াকে বাদ দিলে সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে তিনটি কৃষ্টিগত জগতে বিভক্ত করা যায়। দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় চীনের, মধ্যস্থলে ভারতের, ও পশ্চিম এসিয়ায় আরবের জগৎ। ইজরাইল ভিন্ন সমগ্র আরব জগতে আরব ভাষা প্রচলিত। ইসলাম ধর্ম্ম ও ভাষার ভিত্তিতে তাহাদের কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে।

লেবাননের অর্দ্ধাধিক অধিবাসী খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা আরব ভাষা ব্যবহার করে। তাহাদের অনেকেই আরবীয় বলিয়া গর্ব্বও অনুভব করে। আরবকে ধর্ম্মান্ধতার প্রভাব হইতে কিছু পরিমাণ মুক্ত করিয়াছে সুফীবাদের প্রভাব ও প্রচার। একজন আরবীয় মনীষী বলিয়াছেন সুফীবাদ-প্রবর্ত্তক মনসুর-আল-হাল্লাজকে আরবগণ হত্যা করিয়া সুফীবাদকে আরব দেশে জয়যুক্ত করিয়াছে। সুফীবাদের অদ্বৈত তত্ত্বের সহিত ভারতীয় বেদান্তবাদের অনেক মিল আছে। সুফীবাদ আরবগণকে বহু পরিমাণে উদার ভাবাপন্ন করিয়াছে। আরবের প্রায় সকল মনীষী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতির উপর সুফীবাদের প্রভাব দেখা যায়। আরবের ভবিষ্যৎ রচনায় ইহার প্রভাবও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

আরবের মূল ভূখণ্ডের "আরব" ও "মোস্তারব" ভিন্ন উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তি অধিবাসী "মঘারব" (অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় আরব) বলিয়া পরিচিত। মরক্কো হইতে মিশর পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে আরব ভাষা প্রচলিত। সাম্প্রতিক আলজীরিয় ঘটনাবলী এবং তিউনিসিয়ার সাকিয়েৎ-সিদি-ইউসুফ পল্লীতে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে নিরীহ জনতার উপর ফরাসীর বোমা-বর্ষণ অপর একটি সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রগঠনের বীজ রোপণ করিয়াছে। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাবিব বুরগুইবা চিরদিন পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের বন্ধু ও সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার চিন্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া উত্তর আফ্রিকার একটি আরব ফেডারেশন গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন। মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া এবং সম্ভবতঃ লিবিয়া সহ একটি আরব ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়া সম্ভব কি না, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারিবে। অতীতের আরব সাম্রাজ্যের অংশ এখন পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের উপনিবেশ এবং অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত। তথাপি বলিতে পারা যায়, ইতিহাস জনশক্তির দুর্জ্জয় অভিযানের সাক্ষী: আঘাত আসিয়া সেই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছে।

ইরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য মধু-আহরণে রত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের গুঞ্জনধ্বনিতে মুখরিত। বর্ত্তমানে একমাত্র সৌদি আরব রাজ্যে পাঁচ হাজারের অধিক আমেরিকান বাস করে। প্রগতিশীল আমেরিকান ও ইংরেজ আরবের ক্রীতদাস-প্রথা ও নারীর অবরোধ-প্রথা নির্ব্বিবাদে স্বার্থের খাতিরে মানিয়া লইয়াছে। আরবের স্থানে স্থানে রুশভীতির অজুহাতে বিদেশী সৈন্যঘাটি আছে। কিন্তু তাহা হইতে মূল্যবান পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তৈল-ভাণ্ডার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেইজন্য যথার্থ বলিয়াছেন, পশ্চিম এসিয়ার দেশগুলিকে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা বন্ধ করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "চীন ছাড়া পূর্ব্ব এসিয়ায় ও রাশিয়া ছাড়া পশ্চিম এসিয়ায় স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব নয়।" এই উক্তি অতি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার প্রবর্ত্তিত মধ্যপ্রাচ্য নীতির ঘোষণায় (Ike-Doctrine) বলা হইয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীন রাজ্যগুলিকে অস্ত্র ও দেশোন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্যের প্রয়োজন। আরও বলা হইয়াছে, সুয়েজ ঘটনার পর ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীর অপসারণে মধ্য প্রাচ্য রক্ষার শক্তি অপসারিত হইয়াছে আইসেনহাওয়ার নীতি—সেই শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক পূরণ না করিতে দেওয়া এবং বাধা দেওয়া। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার নিজ নীতির ঘোষণার প্রতিবাদ এবং বিরোধিতা নিজেই করিয়াছেন প্যারিসে আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থার বিশেষ অধিবেশনে। সেইখানে তিনি বলিয়াছেন, "উন্নত জীবনের জন্য জনগণের আগ্রহ এবং সামরিক ও শিল্প প্রসারের কাজে বিপুল অর্থব্যয়—এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা ক্রেমলিন প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার বর্ত্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেই কারণেই পরিত্যাগ করিয়াছে।" অতলান্টিক চুক্তির যুদ্ধের ঘাটি নির্ম্মাণের সহিত কি সেই বিরোধ নাই? ইহা হইতে দেখা যায় জওহরলালের প্রবর্ত্তিত সহ-অবস্থিতির শান্তিপূর্ণ পথই শ্রেষ্ঠ পথ।
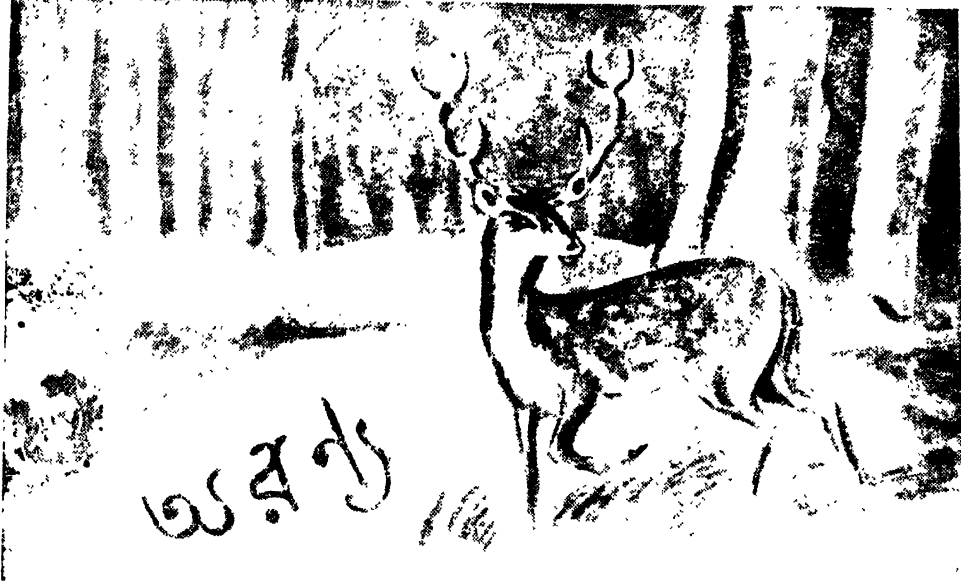
শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

অরণ্যের যেমন বিভীষিকা আছে, যেমন সৌন্দর্য্য আছে তেমনি অরণ্যের রহস্যও আছে। আমি এবার অরণ্যের রহস্য সম্বন্ধে কিছু লিখব।

একবার এক শিকারী বন্ধু আমাদের হাজারীবাগের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য এই যে, হাজারীবাগের জঙ্গল থেকে দু'-চারটে বড় বাঘ মেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাবেন। ইদানীং বহু জঙ্গল কাটা পড়ায় আশেপাশের পাহাড়ে বড় বাঘ ত দেখতে পাওয়া যায়ই না, একটা চিতা বাঘ দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা। তাই বন্ধুবর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খেচর ছাড়া ভূচর কিছুই শিকার করতে পারলেন না। এদিকে বাড়ী ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এল, তিনি খুবই মনমরা হয়ে গেলেন। জানোয়ার মারা ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নাই, তবু বন্ধুর অবস্থা দেখে একটু তৎপর হলাম, আমার এক সাওতাল বন্ধু মিতান মাঝিকে ডেকে পাঠালাম। মিতানের কাছ থেকে খবর পেলাম এখান থেকে দশ-বার মাইল পশ্চিমে যে সব পাহাড় আছে তাতে জঙ্গলও আছে জানোয়ারও আছে, সেখানে গেলে কিছু শিকার মিলতে পারে।

শুনে বন্ধু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, ধরে বসলেন সেই পাহাড়ে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। অনেক দিন অরণ্য-ভ্রমণ ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘরে বসেছিলাম, হঠাৎ যেন অরণ্যের ডাক আমারও কানে এসে পৌঁছল—আমি বললাম, 'তথাস্তু।'

যাবার আয়োজন সারা হ'ল, দু-চার দিন সেখানে থাকতে হবে বলে গরুর গাড়ীতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোঝাই করে আমরা রওনা হলাম। ভোর না হতে লোকালয় ছাড়িয়ে বনের পথ ধরলাম। মার্চ্চ মাস, শীত কমে গেছে, অরণ্যের রুক্ষ রূপের উপর সবুজ প্রসাধনের পোঁচ পড়েছে—মন আমার খুসীতে ভরে গেল। মনে হ'ল যেন অরণ্যই আমার সত্যিকার গৃহ, যেন বহু দিন পরে বিদেশ থেকে আবার স্বদেশে ফিরে চলেছি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, শালগাছে পুঞ্জ পুঞ্জ কচি পাতা গজিয়েছে, পলাশ মহুয়ার সব পাতা ঝরে পড়েছে—তারা ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখছে। শিমুল গাছের প্রসারিত শাখাবাহুতে গাঢ় সবুজ পাতা বাতাসে কাঁপছে। এক-একটা গাছ দেখছি, যেন এক-একজন পুরানো পরম বন্ধুকে দেখছি। আমি যখন সমস্ত মন দিয়ে অরণ্যলোককে স্পর্শ করে চলেছি, বন্ধুবর তখন গাড়ীর ঝাঁকানি সত্ত্বেও আমার পাশে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বিকেল বেলা আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম। ছোট্ট গাঁয়ের একপাশে পরিত্যক্ত একটা গোয়াল ঘরে আমরা আস্তানা নিলাম। নূতন পরিবেশে রাতটা ভালই কেটে গেল।

সকাল বেলা ঘুরে-ফিরে চারিদিক দেখতে লাগলাম, অরণ্যময় কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় ঘেষাঘেষি দাঁড়িয়ে আছে। ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, এ দিকটায় ঠিকাদারের কুড়ুল শালগাছের ঘাড়ে পড়ে নি। যখন অরণ্য আছে তখন জানোয়ারও আছে, আশা হ'ল বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বন্ধুবর আর মিতানকে ডেকে নিয়ে কি ভাবে শিকারের ব্যবস্থা করা যায়, সেই আলোচনায়

বসলাম। মিতান বলল, 'বাঁ দিকের ঐ ছোট পাহাড়টায় সব রকম জানোয়ার আছে, ওর আশেপাশে পাঁঠা বাঁধলে তরুপ (চিতে বাঘ) নিশ্চয়ই আসবে।' সেই পাহাড়ের পাশেই তার চেয়ে কিছু বড় একটা পাহাড়ে অরণ্য গভীরতর বলে মনে হ'ল। বললাম, 'কেন মাঝি, ঐ বড় পাহাড়টার কোলে বসলেই ত ভাল হয়। ওটাতে জঙ্গল বেশী।' মাঝি ঘাড় নেড়ে বলল, 'না বাবু, আমি যা বলছি তাই কর, ঐ বাঁ দিকের পাহাড়টার কোলে মাচা বাঁধ।' মিতান অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তবু তার কথায় কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। যে পাহাড়ে জঙ্গল বেশী, সাধারণতঃ সেই পাহাড়েই জানোয়ার থাকে বেশী—শিকারের সুযোগও সেখানে বেশী। বললাম, 'মিতান মাঝি, আমরা বড় পাহাড়ের কোলেই মাচা করা স্থির করলাম, তুমি সেই ব্যবস্থাই কর।' মিতান কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'বাবু তুই এদেশে অনেক দিন এসেছিস ঠিক কথা, তবু তুই এদেশের অনেক খবর জানিস নে। বড় পাহাড়ে জানোয়ার বেশী আছে জানি, কিন্তু তোরা ত জানোয়ার দেখতে আসিস নি, মারতে এসেছিস। তাই বলছি ছোট পাহাড়ের কোলে মাচা কর, চিতে বাঘ পেয়ে যাবি।' একটু উষ্ণ ভাবেই বললাম, 'এদেশের অনেক খবর জানিনে এ কথা তোমার মুখে আজ প্রথম শুনলাম মাঝি।' মাঝি হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যিই তুই জানিস নে বাবু, তাই বড় পাহাড়ের কোলে মাচা করতে বলছিস। শোন তোকে বলি, ঐ পাহাড়ে আজ পর্য্যন্ত কোন শিকারী সামান্য পোতামটা (ঘুঘুটা) পর্য্যন্ত মারতে পারে নি।' আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম 'কেন?' মাঝি বলল, 'ওটা দেওতার পাহাড়, দেওতার অধিষ্ঠান ঐ পাহাড়ে। যে জানোয়ার ঐ পাহাড়ে গিয়ে দেওতার আশ্রয় নিয়েছে তাকে কেউ মারতে পারে না।' পাশে একটা বোমা ফাটার শব্দ শুনে চেয়ে দেখি বন্ধুবর হো হো করে হাসছেন। আমারও হাসি পাচ্ছিল, এই আণবিক যুগে এমন আশ্রিতবৎসল দেবতা পাহাড় জাকিয়ে বিরাজ করছেন তা আমার জানা ছিল না। বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ মাঝি, এ খবর আমি জানতাম না।' খুশী হয়ে মিতান বলল, 'তা হলে বল, আমি গিয়ে ছোট পাহাড়ের কোলে মাচা বেঁধে দি।' আমি কিছু বলবার আগেই বন্ধুবর বলে উঠলেন, 'যত সব বাজে কথা, আমরা বড় পাহাড়েই শিকার করতে যাব। জঙ্গলে যদি জানোয়ার থাকে আর আমার হাতে যদি বন্দুক থাকে তা হলে সে জানোয়ার মারা পড়বেই।' মাঝি মাথা নেড়ে বলল, 'না মারা পড়বে না।' বন্ধু অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, 'মরবেই, আমি দেখিয়ে দেব—আজই দেখিয়ে দেব। চল হে, খেয়ে-দেয়ে একবার ঐ পাহাড়টা ঘুরে আসি, বড় কিছু না হোক, একটা পাখী মেরেও এদের ভুল বিশ্বাসটা ভেঙে দেওয়া যাক।' এদেশের সাধারণ লোকের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশী। ভাবলাম, এই সুযোগে এদের এমন একটা ভুল ধারণা যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা মন্দ কি! বন্ধুর কথায় রাজী হলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের পরে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। মিতান মাঝিকে সঙ্গে যেতে বলাতে বলল, 'তোরা দেওতার পাহাড়ে বন্দুক নিয়ে শিকার খেলতে যাচ্ছিস, তোদের সঙ্গে আমি যাব না। তবে পাহাড়ের কোলে তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি চল।' পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত সঙ্গে এসে মিতান মাঝি ফিরে গেল, আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। খাড়া পাহাড় নয়, ঢালু গা, উঠতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। লক্ষ্য করলাম, পাহাড়ের গায় শালগাছই বেশী, বেশ বড় বড় প্রাচীন শাল, বুঝতে পারলাম এখানে কেউ গাছ কাটতে আসে না। একটু চলতে ফিরতেই মনে হ'ল এ পাহাড়ের একটা বিশেষত্ব আছে, বোধ হয় সেটা এর সবুজ সৌন্দর্য্য। এত সবুজের সমারোহ আমি অন্য কোথাও দেখি নাই। কিছুদূর উপরে উঠে আমি দাঁড়িয়ে নীচের বনানীর দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় বন্ধু আমাকে ঠেলে চাপা গলায় বললেন, 'ঐ দেখ'। তাঁর নির্দ্দেশমত চেয়ে দেখলাম, আমাদের ডান পাশে নীচের দিকে একটা সরু নালা পাহাড়ের গা কেটে পাহাড়তলির দিকে নেমে গেছে, তার ওপারে লম্বা এক ফালি খোলা জায়গা—দু-চারটে ছোট ছোট ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে দুটো চিতরা হরিণ (spotted deer) চরছে। পিছনের গভীর অরণ্যের পটভূমিতে হরিণ দুটো ছবির মতই সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু বন্ধুর মনের অবস্থা তখন সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার মত নয়, তিনি তখন শিকারী, সেই ভাবে তন্ময়, বন্দুক-হাতে গাছের আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যেতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম, হরিণের অলক্ষ্যে যদি তিনি নালায় নেমে গা ঢাকা দিতে পারেন তা হলে অনায়াসে একটাকে ঘায়েল করতে পারবেন। অতি সাবধানে চলে বন্ধু নালায় গিয়ে নামলেন। বাতাস বইছিল পূব থেকে পশ্চিমে, হরিণ দুটি আমাদের অবস্থিতি কিছুমাত্র টের পেল না। এত সহজে শিকারের এমন সুযোগ যে পাওয়া যাবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মনে হ'ল যেন পাহাড়ের দেওতা আমাদের প্রতি বিরূপ না হয়ে বরং তুষ্টই হয়েছেন। আমি খানিকটা নীচে নেমে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসলাম। বন্ধু নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছেন, হরিণ দুটো চরতে চরতে ক্রমে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, আর একটু এলেই বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে। এসেও পড়ল, বন্ধু বন্দুকে টোটা ভরে তাক করতে লাগলেন। এইবার গুলী করবেন। করলেনও, হ্যামারের খুট করে একটু শব্দ হ'ল মাত্র, চোট হ'ল না। ঐ সামান্য শব্দেই হরিণ দুটো মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটে অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারলাম না—অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। একটু পরে বন্ধুবর বন্দুক-হাতে মহা অপরাধীর মত ধীরে ধীরে উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি, গুলি চলল না কেন? এমন শিকার ফসকে গেল!' বসে পড়ে বন্ধু বললেন, 'যা কাণ্ড করেছি তা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। এতদিন বন্দুক চালিয়েও যে আজ কেন এমন আনাড়ীর মত কাজ করলাম তা বুঝতে পারছি নে।' প্রশ্ন করলাম, 'করলে

কি?' বন্ধু অধোবদনে বললেন, 'বন্দুকের ডান চেম্বারে টোটা পুরে বাঁ চেম্বারের ট্রিগার টানলাম—ছিঃ ছিঃ।' বন্ধুর এমন দুরবস্থা দেখেও আমি না হেসে থাকতে পারলাম না, উত্তেজনার মাথায় অনেক শিকারীকে এই কাণ্ড করতে দেখেছি। বন্ধুবর যে খুবই উত্তেজিত ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, তাই তাঁর এ অপরাধ মার্জ্জনীয়। কিন্তু বন্ধু সে কথা কানে তুললেন না। বললেন, 'লোকে শুনলে বলবে এসব পাহাড়ের দেওতার মহিমা।' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'হতাশ হবার কোন কারণ নেই, এখনও অনেক সময় আছে, চল আরও খানিকটা ঘুরে দেখি, নিশ্চয় অন্য শিকার পাওয়া যাবে।'

আমরা নালা ধরে পাহাড়তলির দিকে নেমে যেতে লাগলাম। খানিকটা নীচে এসে পাহাড়ের কোলে নালা অনেকটা চওড়া হয়েছে, সেখানে একজায়গায় খানিকটা জলও আছে। জলের চারপাশে ঘুরে দেখলাম বহু জানোয়ার সেখানে জল খেতে আসে। বন্ধুকে বললাম, 'জলের ধারে কিছুক্ষণ বসে দেখা যাক্। বেলা পড়ে আসছে, হয়ত দু'-একটা জানোয়ার জল খেতে আসবে।' জলের ধারে বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলাম—কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, কোন্ দিকে বসব! চারিদিকেই পাহাড় ও অরণ্য, কোন্ দিক থেকে জানোয়ার আসবে তা স্থির করা কঠিন। অনেক ভেবে-চিন্তে বড় পাহাড়টার বিপরীত দিকে বসাই স্থির করলাম। একটা গাছের নীচে দু'-চারখানা ডালপালা দিয়ে সামনেটা আড়াল করে আমরা বসলাম। আবার যদি ভুল হয় এই ভয়ে বন্ধুবর বন্দুকের দুই চেম্বারেই এবার টোটা ভরে রাখলেন।

ক্রমে বেলা পড়ে আসতে লাগল। জানোয়ারদের জলখাবার সময় হয়ে এল। উদগ্রীব হয়ে বসে আছি এমন সময় দেখতে পেলাম বড় পাহাড়ের উপর থেকে একটা বড় জন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে আসছে। কিছুটা এগিয়ে এলে চিনতে পারলাম সেটা একটা চিতা বাঘ। বন্ধুকে সজাগ করে দিয়ে কানে কানে বললাম, 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন।' বাঘটা জলের ধারে প্রায় এসে পড়েছে, বন্ধুবর বন্দুক তুলে ধরে বসেছেন এমন সময় আমাদের পিছন দিকে ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ শুনতে পেলাম। শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, কেননা এ হচ্ছে ভালুকের পদধ্বনি। ভালুক বাঘের মত নখ গুটিয়ে নিতে পারে না, তাই সে যখন পথ চলে তখন তার বড় বড় নখ কাঁকরে লেগে ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ হয়। পদধ্বনি আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরা পড়লাম উভয় সঙ্কটে। সামনে বাঘ, পিছনে ভালুক অথচ বন্দুক একটি, কোন্ দিক সামলাব! এদিকে চিতাবাঘটা জলের ধারে এসে নিশ্চিন্ত মনে জলখেতে লাগল। পিছনে ভালুকের পায়ের আওয়াজ আরও কাছে এসে পড়ল। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল, গুলী করা হ'ল না। জল খাওয়া শেষ করে বাঘটা পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। এদিকে ভালুকের পায়ের আওয়াজও থেমে গেল। বন্ধু গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন, তার পর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'যা ঘটল তার মীমাংসা তুমি কি ভাবে করবে?' প্রশ্নের খোঁচাটা কোথায় তা বুঝতে পেরে সহজ ভাবেই বললাম, 'ভালুকের আবির্ভাবটার মধ্যে কোন দৈব ব্যাপার নেই, বনে জঙ্গলে অমন হামেশা হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস ভালুক সত্যিই এসেছিল এবং এখন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে।' শুনে বন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যা লাগতে আর বেশী দেরী নেই, বন্ধু বললে, 'একটা পাখী-টাখী মেরে ফিরে যাওয়া যাক—মিস্তান বলেছিল, ঘুঘুটা পর্য্যন্ত নাকি আমরা মারতে পারব না।' পাখীমারা আমি একেবারেই পছন্দ করি না, কিন্তু আজ যে মারার নেশা আমাকেও পেয়ে বসেছে, মনে হচ্ছে যেমন করে হউক কিছু একটা মারতেই হবে। বন্ধুকে বললাম, "তাই কর।" গাছের ডালে পাখী খুঁজছি এমন সময় একটু দূরে ময়ূর ডেকে উঠল। আমি জানি সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলে ময়ূর অন্যান্য পাখীর মত কোন বড় গাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসে, সেইখানে সে রাত কাটায়। অন্ধকারে দেখতে পায় না বলে সন্ধ্যার মুখে বা ভোর হবার আগটাতে গাছের ডালে-বসা ময়ূর মারা খুব সহজ। বন্ধুকে বললাম, 'কাছাকাছি কোন বড় গাছে নিশ্চয় ময়ূর বসেছে চল, খুঁজে বার করি।' দু'জনে ময়ূর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চললাম। খানিকটা দূরে একটা অর্জ্জুন গাছ চোখে পড়ল। গাছের কাছে গিয়ে দেখি উপরের ডালে প্রকাণ্ড লেজ ঝুলিয়ে একটা ময়ূর বসে আছে। বন্ধুকে দেখিয়ে দিতে তিনি সাবধানে যেই বন্দুক তুলেছেন অমনি ডানা ঝটপট করে ময়ূরটা উড়ে কাছাকাছি আর একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল। আমরাও সেই গাছের নীচে গিয়ে উপস্থিত হলাম, ময়ূরটা আগের মতই বসে আছে। বন্ধু গাছের ডালপালার মধ্যে ফাঁক খুঁজে নিয়ে আবার যেই বন্দুক তুলেছেন অমনি ময়ূর একটা ডাক দিয়ে উড়তে সুরু করল। জঙ্গলের মধ্যে কোন পাখীর গতি লক্ষ্য করে চলা সম্ভব নয়, তাই এবার ময়ূরটা কোন গাছে গিয়ে বসল তা আমরা দেখতে পেলাম না। তবু একটা আন্দাজ করে আমরা চললাম। অদূরে একটা শিমুল গাছ দেখে সেই দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে তার ডালে কোন রকম পাখী দেখতে পেলাম না। অন্ধকার এতক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে, আর এগোনো যুক্তিসঙ্গত নয়, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তাড়াতাড়ি দু'জনে পাহাড় থেকে নামতে সুরু করলাম। পাহাড়ের মজা হচ্ছে এই যে, ওঠার চেয়ে নামা কঠিন। অনেকখানি নেমে এলাম, পাহাড়ের প্রায় তলায় এসে পৌঁছলাম, কিন্তু সে নালা কোথায়? এদিক ওদিক ঘুরেও নালা দেখতে পেলাম না। নালা হচ্ছে আমাদের পথের নির্দ্দেশ, নালা হারিয়ে গিয়ে ভাবনায় পড়লাম—তবে কি পথ ভুল করেছি! বন্ধু বললেন, 'আমার কিন্তু বরাবরই মনে হচ্ছে আমরা উল্টো পথে আসছি, তবে তুমি হচ্ছ অরণ্যবিশারদ, তোমাকে বলতে

সাহস করি নি।' বিশারদেরও ভুল হয়, তাই আবার পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম, মতলব এই যে, বড় শিমুল গাছটার কাছে পৌঁছে উত্তর দিকে চলব, কেন না এতক্ষণ আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে এসেছি। পাহাড়ের প্রায় মাথায় উঠে এলাম, কিন্তু সে শিমুল গাছ আর খুঁজে পেলাম না, অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। বুঝলাম দিক ভুল করে বসেছি। আন্দাজে একদিকে এগোতে লাগলাম, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত জানলাম গ্রামে পৌঁছানো আজ রাত্রে অসম্ভব। অরণ্যে, বিশেষ করে রাত্রে, দিক ভুল হওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক তা আমি ভাল করেই জানি। অন্ধকারে পাহাড়ে পথ চলা মুস্কিল, তার উপরে বন্ধুর হাতে আবার ভারী বন্দুক, তিনি বললেন, 'এইবার ঠিক পথ ধরছ ত?' বললাম, 'এটা পথই নয়।' শঙ্কিত হয়ে বন্ধু বললেন, 'তবে কোথায় যাচ্ছ?' বললাম, 'চোখে ত দেখতে পাচ্ছি না—যাচ্ছি যে দিকে দু'পা যায়।' ভয় পেয়ে বন্ধু দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও দাঁড়ালাম, এমন ভাবে অন্ধের মত চলার কোন অর্থ নাই, বন্ধুকে সাহস দিয়ে বললাম, 'এ রাতটা পাহাড়েই কাটাতে—তবে ভয়ের কিছু নাই।' সেখানে বসে পড়ে বন্ধু বললে, 'ভয়ের কিছু নাই মানে? তুমি বেথা কর নি, আপনি আর কপনি, তুমি মরলে কাঁদবার কেউ নাই। আমার কথা ভাবত, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা—' বন্ধুর গলা ভারী হয়ে উঠল। শুনে দুঃখ হ'ল আবার রাগও হ'ল, সংসার নেই বলে কি আমার প্রাণের কোন মূল্য নেই? বন্ধুকে বললাম, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

গভীর অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছি। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, বোধ হয় দুপুর হ'ল। চোখে ঘুম নাই, উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে, ঝলমল করছে অসংখ্য তারা। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, যেন দিগন্তের নিঃশ্বাস, কতদূর থেকে আসছে কে জানে। গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠছে, নাম-না-জানা বুনো ফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। আকস্মিক হলেও অনেক দিন পরে অরণ্যে রাত কাটাবার সুযোগ পেয়ে মন আমার খুশীই হ'ল। কিন্তু বেশীক্ষণ মনের এ কবিত্বময় অবস্থা থাকল না। আমি যেন আশে-পাশে বন্য জন্তুর চলাফেরার আওয়াজ পেতে লাগলাম। কিছু দূর দিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে একটা ভারী জানোয়ার চলে গেল, শুকনো পাতা একটু খড় খড় করে উঠল। খানিকক্ষণ আর কোন শব্দ নাই, হঠাৎ দূরে একটা জানোয়ার হুড়মুড় করে ছুটে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেল, সেই দিক থেকে একটা চাপা গর্জ্জন শুনতে পেলাম। আবার অনেক্ষণ চুপ, কান খাড়া করে সতর্কভাবে বসে আছি এমন সময় একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের আওয়াজ এল, অন্ধকারের মধ্যে দুই চোখ বিস্ফারিত করে সেই দিকে তাকালাম, দেখলাম গভীর অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে দুটো বড় বড় চোখ। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ভয় না পেলেও একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। খানিক পরে চোখ দুটো সরে গেল, আমি আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম।

বন্ধু নীরব, কি ভাবছেন জানি না, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। একটা পাখী মাথার উপর ঝটপট করে ডানা ঝাড়ল। হঠাৎ বন্ধু আমার হাত চেপে ধরলেন, চমকে উঠে বললাম, 'তাহলে তুমি ঘুমোও নাই?' বন্ধু চাপা গলায় বললেন, 'ঐ দেখ, ঐ গাছ ক'টার—ফাঁক দিয়ে।' চেয়ে দেখলাম, দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। আগুন মানে মানুষ, মানুষ মানে আশ্রয়, মুহূর্ত্তে মনের অবসাদ কেটে গেল, বন্ধুকে টেনে তুলে বললাম, 'চল, এগিয়ে দেখি ওখানে নিশ্চয় মানুষ আছে।'

ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম, যত এগোই ততই যে আগুন পিছিয়ে যায়। এক একবার নিভে যায় আবার জ্বলে ওঠে। অতি কষ্টে আমরা চলতে লাগলাম, খানিকটা গিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামতে লাগলাম। কিসের উপর গিয়ে পড়ছি, কিসের উপর পা দিচ্ছি সে খেয়াল নাই, আগুনের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে এই আমাদের একমাত্র ভাবনা। পাহাড় থেকে নামতে নামতে একেবারে পাহাড়ের গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। আগুন যেন এখন খুব কাছে মনে হ'ল, সমতল ভূমি পেয়ে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছি খেয়াল নাই, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ দেখি আগুন নিভে গেল। তবু আমরা আন্দাজে এগোতে লাগলাম, ভাবলাম আগুন আবার জ্বলে উঠবে, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, আগুন আর জ্বলল না। আমরা কি করব ভাবছি এমন সময় সামনে ছায়ার মত ফুটে উঠল একখানা ঘর। ঘরের সামনে এসে দেখি, আশ্চর্য্য ব্যাপার—এ যে আমাদের আস্তানা!

সে রাত্রে নিরাপদে ঘরে শুয়েও আমার ঘুম হ'ল না—নানাবিধ প্রশ্ন মনে উঠতে লাগল। হুঁশিয়ার শিকারী এক ট্রিগার টানতে অন্য ট্রিগার টানলেন কেন, বাঘের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছন থেকে ভালুক এসে উপস্থিত হ'ল কেন? বিশ্বাসী মন বলল, 'দৈবশক্তি বাধা দিল বলে।' রাত্রির অন্ধকারে আমাদের চারিদিকে যখন বিপদ ঘনিয়ে এল তখন আগুনের শিখা দেখিয়ে কে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিল? বিশ্বাসী মন বলল, 'আশ্রিতবৎসল দেবতা।' আবার যুক্তিবাদী মন বলল, 'ওসব বাজে কথা, উত্তেজনার বশে বন্দুকের এক ট্রিগার টানতে অন্য ট্রিগার অনেকেই টানে, বনে জঙ্গলে শিকারীর সামনে বাঘ ও পিছনে ভালুকের আবির্ভাব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর ঐ আগুন, ওটা আগুনই বটে, গাঁয়ের মধ্যে কেউ জ্বেলেছিল, পরে নিভে গেল—আমরা তাই দেখে সিধে ঘরে পৌঁছে গেলাম।'

কিন্তু শেষ মীমাংসা কি, কার উত্তর ঠিক—বিশ্বাসী মনের—না, যুক্তিবাদী মনের?

ক্রমশঃ

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

৮

অজন্তা

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। বোম্বাইতে বদলি হই। সঙ্গে নিয়ে যাই দুটি বাসনা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। দেখব অজন্তা ও এলোরা, দর্শন হবে প্রভাসতীর্থও। দেখা হয় অজন্তা ও এলোরা, হয় না প্রভাসতীর্থ, সম্পূর্ণ সফল হয় না বাসনা।

আমরা তখন কলেজে পড়ি। সুরু হয় ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। পুরোধা হন ঋষি অবনীন্দ্রনাথ, হন অগ্রণী। শুনি, ভারতীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে অজন্তা। খবর পান শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শোনেন কলকাতাতে ঋষি অবনীন্দ্রনাথ আর ভগ্নী নিবেদিতা। অজন্তায় প্রেরিত হন উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু আর অসিত হালদার।

কিছুদিন পরেই অসিত হালদার ফিরে আসেন। অজন্তা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জানা যায় অঙ্কিত আছে নাকি অজন্তার প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে অনবদ্য চিত্রসম্ভার, নাই বিশ্বের অন্য কোন স্থানে। বিস্মিত হই দেখে তাদের অনুলিপি মাসিক পত্রিকার পাতায়, মুগ্ধ হই তাদের সৌন্দর্য্যে ও বর্ণ-সুষমায়।

শুনি ফিরে আসেন না নন্দলাল। অজন্তাতে বাসা বেঁধে তিনি সেখানকার চিত্রাবলী পর্য্যবেক্ষণ করেন, অনুশীলন করেন তাদের অঙ্কন পদ্ধতি, তাদের গঠন-সৌষ্ঠব আর বর্ণ-বিন্যাস। প্রেরণ করেন তাদের অনুলিপি প্রতি মাসে শান্তিনিকেতনে। সেগুলি মাসিকের পাতায় প্রকাশিত হয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তাদের অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব আর তুলনাহীন বর্ণ-সুষমা। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অজন্তায় অতিবাহিত করে নন্দলাল দেশে ফিরে আসেন, আসেন জয়যাত্রা থেকে, বিজয়ের মুকুট শিরে ধারণ করে, সঙ্গে নিয়ে আসেন অজন্তার চিত্রের অসংখ্য অনুলেখন। পায় দিনের আলোক, লুক্কায়িত ছিল এতদিন যা গুহার অন্ধকারে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের, চিত্রশিল্পের দরবারে হয় বিশ্বজিৎ। তাঁর জয়ের বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। বাসনা জাগে অজন্তা দর্শনের অন্তরের গহনতম প্রদেশে।

ফারগুসানের গ্রন্থে এলোরার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অবগত হই, বাসনা হয় স্থপতির এই অপরূপ কীর্ত্তির নিদর্শন দেখবারও।

তাই যখন বোম্বাইতে বদলির আদেশ পাই, ভাবি সত্যিই আসে বুঝি সে সুযোগ এতদিনে। সফল হয় অজন্তা আর এলোরা দর্শন, সফল হয় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের এক প্রবল বাসনা, লুক্কায়িত থাকে যা মনের মণিকোঠায়।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতা বর্দ্ধিত হয়েছে, উপনীত হয়েছে শিখরে। পতন হয়েছে সিঙ্গাপুরের, ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকারে এসেছে। বেটে জাপানী হানা দিচ্ছে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে, উপনীত হয়েছে আসামে, ইম্ফাহালে। হাওয়াই জাহাজের

অজন্তা—বুদ্ধের জন্ম

বুক থেকে, প্রতিদিন জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, আসামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাদ যায় না চট্টগ্রাম, বর্ষিত হয় দু'দিন কলিকাতাতেও। কখন তারা আসাম অতিক্রম করে বাংলায় প্রবেশ করবে, সেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে, তার নিশ্চয়তা নেই। জাপানী ভীতিতে আতঙ্কিত ইংরেজ, কম্পিত আমেরিকানরাও। ক্ষুদ্রকায় জাপানী নাই তাদের প্রাণের ভীতি, মানে না তারা কোন বাধা, গ্রাহ্য করে না বিঘ্ন, হাওয়াই জাহাজ

নিয়ে যেখানে সেখানে যখন তখন নেমে পড়ে, যুদ্ধ করে প্রাণপণে, সর্ব্বদা প্রস্তুত নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে, সম্ভব নয় এমন জাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

কিন্তু ভারতবর্ষকে বাঁচাতেই হবে, রক্ষা করতে হবে জাপানীদের হাত থেকে। নইলে বন্ধ হয়ে যাবে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ: তৈরি হচ্ছে যুদ্ধের উপকরণ ভারতের সমস্ত কারখানাতেই, 'ক্যামুফ্লাজ' জালের অন্তরালে। নির্ম্মিত হচ্ছে সব রকমের অস্ত্রশস্ত্রই। আমেরিকান অর্থে নূতন কারখানা গড়ে উঠেছে ভারতের দিকে দিকে। নির্ম্মিত হয়েছে কত সুদূর প্রশস্ত রাজপথও, সংযুক্ত হয়েছে কারখানা আর ডিপোগুলি বৃহৎ শহরের ও মহানগরীর সঙ্গে। তৈরি হচ্ছে সর্ব্বপ্রকারের যুদ্ধোপকরণই, সীমাহীন তাদের পরিমাণও। প্রেরিত হবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যখন আর যেখানে হবে তাদের প্রয়োজন। রুদ্ধ হবে না সরবরাহের নির্ম্মাণ, নইলে অচল হবে যুদ্ধ, হবে পরাজয় ইংরেজের। পরাজয়ের গ্লানি শিরে ধারণ করে পরিত্যাগ করতে হবে ভারতবর্ষ, এমন সুন্দর ও সুবিশাল জমিদারী হবে হস্তচ্যুত।

তাই তখন আসে হাজারে হাজারে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈনিক, আসে প্রতিদিন জাহাজ-ভর্ত্তি করে অবতরণ করে বোম্বাইয়ের বন্দরে, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আসামের যুদ্ধক্ষেত্রে রুদ্ধ করতে যায় জাপানীদের অগ্রগতি। প্রেরিত হয় যুদ্ধের উপকরণও, ট্রেনে করে, যায় ট্রাকে চড়েও। বিরামহীন এই যাওয়া, যায় রাত্রি দিন। তিল ধারণের স্থান নেই গাড়ীতে। প্রতি ট্রেনের সঙ্গেই উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী যান, তাঁদের হাতেই ন্যস্ত যাত্রীদের স্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব, নির্ভর করে তাদের মর্জ্জির উপরই অসামরিক লোকের ট্রেনে স্থান মেলাও, মেলেও কদাচিৎ। তার উপর ট্রেন ছাড়বার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, নেই পৌঁছোবারও। সামরিক "স্পেশাল" দিন রাত্রি যাচ্ছে. দিতে হয় তাদের যাওয়ার পথ, দাঁড়িয়ে থাকতে হয় "সাইডিং"-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই সম্ভব হয় না নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেনের চলাচল, বিলম্ব হয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে। তাই বন্ধ তখন বোম্বাইতে সহজ যাতায়াত, বিষম কষ্টসাধ্য, অনিশ্চিতও। অসম্ভব রেলের টিকিট কেনাও। পরিমিত স্থানের সংখ্যা, তাই ভোর হওয়ার আগেই 'কিউ"-এ গিয়ে দাঁড়াতে হয়, নিশ্চয়তা নেই টিকিট পাওয়ারও।

কল্পনাতীত মোটরে ভ্রমণ। সামরিক ট্রাক চলে রাত্রি দিন, তাদের ফাঁকে মালে-ভর্ত্তি অসামরিক লরি, স্থান নেই অন্য গাড়ীর যাতায়াতের, তার উপর আবার পেট্রলের র‍্যাশন।

তবুও ত্রুটি নাই অজন্তায় যাত্রার চেষ্টার। পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই অজন্তা দেখেছেন, তাই পাই না তাঁদের কাছে কোন উৎসাহ। শুনি নিষেধের বাণী। বলেন, উচিত হবে না যাওয়া এমন পরিস্থিতিতে, হবে না যুক্তিসঙ্গতও। কলিকাতা মেলে চড়ে মানমদ পর্য্যন্ত যেতে হবে। সেখান থেকে নিজামের ট্রেনে করে ঔরঙ্গাবাদে। ঔরঙ্গাবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে চোদ্দ মাইল দূরে এলোরা-পথে সপ্তম মাইলে দেবগিরি বা দৌলতাবাদের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ, আরও তিন মাইল দূরে অহল্যাবাই-এর মন্দির। বিপরীত দিকে উনসত্তর মাইল দূরে অজন্তা। নাই কোন ব্যবস্থা বাসের, যেতে হবে ট্যাক্সি করে।

দেখতে দেখতে দু'বৎসর অতিবাহিত হয়, কমে আসে বোম্বাই-এর স্থিতির আয়ু। পরিত্যাগ করতে হয় অজন্তা দেখার আশাও। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে ঔরঙ্গাবাদের ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানি চিঠি লিখি। জানতে চাই অজন্তা-এলোরা যাওয়ার ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না, মিললে কত ভাড়া লাগবে আর প্রতি ট্যাক্সিতে ক'জন যাত্রী নেবে। সাতদিনের মধ্যেই উত্তর আসে, ট্যাক্সি মিলবে, যত চাই। নিজামের মুদ্রায় নব্বই টাকা ভাড়া দিতে হবে প্রতি ট্যাক্সির। যাত্রী নেবে চারজন। দুদিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবে যা কিছু আছে দর্শনীয়, নাই কোন নিষেধ বাড়তি শিশু নেওয়ারও। লেখেন, তিনিই ট্যাক্সি বন্দোবস্ত করবার ভার নেবেন, ব্যবস্থা করবেন আমাদের তিনদিনের বাসেরও ষ্টেশনের সংলগ্ন ধর্ম্মশালায়, অথবা রেষ্ট-হাউসে। আমাদের ঔরঙ্গবাদের পৌঁছাবার দিন ও ক্ষণ আগে জানালে ষ্টেশনেও উপস্থিত থাকবেন।

চিঠি পড়ে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অবিলম্বে চিঠি হাতে নিয়ে পাশের কামরায় প্রবেশ করি। সেখানে আমার সতীর্থ কেদার বসু বসেন। তাঁর বাড়ী বিক্রমপুরে। তিনি খাঁটি দেশী ভাষায় কথা বলেন। উদার তাঁর অন্তঃকরণ, কিন্তু সহজেই বিচলিত হন। তিনিও সম্প্রতি বোম্বাই-এ এসেছেন, আজও দেখেন নাই এলোরা ও অজন্তা। বসু সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলেন, "হ যাইতে ত হইবই, আর কে যাইব লগে ?"

বাড়ীতে ফিরে শুনি, বন্ধুবর হাজরাও দেখেন নাই। সন্ধ্যাবেলা দাদর আর মাতুঙ্গার সন্ধিস্থলে তাঁর বাসায় উপনীত হই। হাজরা সুপ্রতিষ্ঠিত, নিরীহ, ভদ্র, ধীর, গম্ভীর। বলেন, তাঁরাও যাবেন। হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে কেদারকে খবর দিতে যাই। পথে বহু-পুরাতন বন্ধু, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বন্ধুবৎসল, কৃতকর্ম্মা সিংহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। বলেন, তিনিও সঙ্গী হবেন, কিন্তু একাকী যাবেন। একবার সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করেছিলেন প্রথম যখন বোম্বাইতে আসেন। তাঁকেও দাদরে কেদারের বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে যাই। স্থির হয় আমি আমার স্ত্রী ও কন্যা, কেদার তার স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র, সস্ত্রীক সকন্যা হাজরা আর সিংহি-সাহেবকে নিয়ে দল তৈরি হবে। পুরোধা হবেন সিংহি সাহেব। জ্যেষ্ঠ তিনি বয়সে, অবগত, এলোরা ও অজন্তার বিষয়। একজন ভাল চাকরকেও সঙ্গে নিতে হবে, ভার নেবে সে রান্নার ও শিশুদের। যাত্রা করব আগামী শনিবার। কে কি সঙ্গে নেবেন আর কি কি জিনিস নেওয়া হবে, তাও স্থির হয়। রচিত হয় ফর্দ্দ। আমার উপরে ভার বাড়ী থেকে সন্দেশ তৈরী করে নেওয়ার। খেতে হবে রাস্তায়; লাগবে সেখানকার স্থিতির সময়েও। নিয়ে যাব

টিফিন-ক্যারিয়ারে ভর্তি করে। হাজরাদের উপর মাংসের ভার, রুটি দিয়ে যাওয়া হবে অজন্তার যাত্রার প্রাক্‌কালে। বসুদের উপর ভার ডিমের কারি ও ডিম সেদ্ধ। উদরস্থ করা হবে যখন প্রয়োজন হবে। সিংহি মহাশয় নেবেন ড্রাই ফ্রুট অফুরন্ত তার সরবরাহ, দিতে হবে সবাইকে যাত্রার সুরু থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত। তা ছাড়া একটি বড় হাঁড়ি ও একটি কড়াই নিতে হবে। গোটা চারেক কাঁচের গ্লাস, এক সেট চায়ের বাসন দুটি সোরাই আর গোটা দুই জলের বোতলও। নিতে হবে ডবল রুটি প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, মসলাপাতি। বাঁধাকপি, আলু, এক পাউণ্ড চা, সের দুই-তিন চিনি ও একটি হরলিক্সের শিশি। দুজন কদলী ও তিন ডজন কমলালেবুও নিতে হবে। পুরোধা সিংহি সাহেবই জিনিসপত্র কেনার ও সংগ্রহের ভার নেন। আমাদের যাত্রার তারিখ ও সময় জানিয়ে ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশন মাষ্টারকেও চিঠি লিখে দেই

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী, খাওয়া-দাওয়া সমাপন করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা কেদার বসুর বাড়ীতে সমবেত হই। আসেন না শুধু সিংহি সাহেব তাঁর বাসায় লোক পাঠাতে যাব এমন সময় দেখি তিনি গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর পিছনে একটি কুলি, মস্তকে নিয়ে একটি বিরাট ঝুড়ি। সিংহি সাহেবের স্কন্ধে, বগলে আর হস্তেও চার-পাঁচটি বিভিন্ন আকৃতির ক্যানভাসের থলে ঝুলছে, সবগুলিই প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিপূর্ণ। বলেন, সব কিছুই জোগাড় হয়েছে, টিকিটও কেনা হয়েছে। এখন ট্যাক্সি ডাকিয়ে রওনা হতে বাকী বলেন, সম্ভব নয় দাদরে গাড়ীতে স্থান পাওয়া, উঠতে হবে ভি, টি থেকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই দুই ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র বোঝাই করে আমরা ভি. টি. অভিমুখে রওনা হই।

ভি. টি.তে পৌঁছে দেখি অসম্ভব গাড়ীতে ভীড়। নাই স্থান পা রাখবারও, কোথায় রাখা হবে জিনিস? প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে বিছানা ও সুটকেশ এসেছে, তার উপর সিংহি সাহেবের আনা ছোট-বড় পাঁচটি থলি আর বিরাট ঝুড়ি

তিন মহিলাকে অতি কষ্টে পুত্র-কন্যা ও জিনিসপত্র নিয়ে একটি মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা মধ্যম শ্রেণীতে উঠি, কোনপ্রকারে সোজা হয়ে দাঁড়াবার স্থান মেলে।

মহিলারা যে কামরাতে প্রবেশ করেন, অধিকার করেছিলেন সেই কামরা চারজন ইংরেজ মহিলা। তাঁরা সহ্য করতে পারেন না আমাদের মহিলাদের এই অনধিকার প্রবেশ, জানান অসম্মতি। বচসা হয় দুই দলে। আমাদের দলের পুরোধা হন মিসেস পুতুল বসু এম-এ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বি-এ পাশ লীলা হাজরাও সপ্রতিভ, আননে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি। শুধু আমার স্ত্রীই সক্ষম হন নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করতে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী তিনিও, বান্ধবী-গৌরবে গৌরবান্বিতা। বলেন, সুপণ্ডিতা তাঁর অধিকাংশ বান্ধবী, নাই বা হলেন তিনি বি-এ, এম-এ। সদাহাস্যময়ী, কৌতুকপ্রিয়া তিন জনই। কারণে অকারণে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হয় গৃহ, ঝঙ্কৃত হয় চতুর্দ্দিক। শেষে পরাজয় স্বীকার করেন বিদেশিনীরা। কামরা পরিত্যাগ করে স্থান সংগ্রহ করেন অন্য কামরায়।

অজন্তা—চৈত্য হল

রাত্রি আড়াইটায় ট্রেন মানমদ ষ্টেশনে উপনীত হয়। আমরা ট্রেন বদল করে ঔরঙ্গাবাদের গাড়ীতে গিয়ে উঠি। প্রাচুর্য্য স্থানের, তাই সকলে এক কামরা দখল করে বিছানা খুলে শয্যা বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধীরে ধীরে ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনে এসে থামে। ষ্টেশনে নেমে দেখি ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর কামরায় নিয়ে গিয়ে বসান। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ষ্টেশন থেকেই গরম চা পান করে আমরা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হই। পথ দেখিয়ে নিয়ে যান ষ্টেশন মাষ্টার। চৌকিদার ঘর খুলে দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সামান্য প্রয়োজনীয় আসবাবে সজ্জিত অতি প্রশস্ত এই কক্ষটি। আমরা মেঝের বিছানা পেতে একে একে শুয়ে পড়ি, আচ্ছন্ন হই গভীর নিদ্রায়। নিদ্রা যান না শুধু সিংহি সাহেব। নিযুক্ত

তিনি আর একদফা চা প্রস্তুত করাতে ব্যস্ত, অজন্তায় যাওয়ার প্রস্তুতিতেও।

সিংহি সাহেবের ডাকে গাত্রোত্থান করে ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা-গৃহের সংলগ্ন স্নানের ঘরে স্নান সমাপন করি। তার পর চা ও জলযোগ সেরে যাবার জিনিসপত্র দুই ট্যাক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে অজন্তা অভিমুখে রওনা হই। তখনও পূর্ব্বাকাশে উদয়ভানুর আগমন হয় নিই।

ট্যাক্সি বঙ্কিমগতিতে অগ্রসর হয়। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে শহরের প্রান্তদেশে উপনীত হয়। একটি দ্বার অতিক্রম করে অজন্তার রাস্তায় পৌঁছোয়। ছোটে বিদ্যুৎগতিতে, সর্পিল পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে। কখনও উঁচুতে ওঠে, কখনও নীচে নামে। রাস্তার দু'পাশে শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধুর মাঠ, নাই তাতে সবুজের লেশ। নয় শস্য-শ্যামল, তাই নয় নয়নাভিরামও। স্পর্শ করে দিগন্তের শৈল-শ্রেণীর পাদদেশ। মাঝে মাঝে এক-একটি মহীরুহ। মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি প্রহরী, প্রহরী তারা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের। শুনি এই জমিতেই ফলে বারোচের তুলা। সীমাহীন তাদের পরিমাণ, গুণেও তারা শ্রেষ্ঠ ভারতে। এখন কর্ত্তিত হয়েছে তুলার বৃক্ষ, তাই শূন্য বুক নিয়ে পড়ে আছে মাঠ, হয়েছে নিরাবরণ, নিরাভরণও। ফসলের সময় আগত হলে আবার পরিপূর্ণ হবে তার বুক তুলার বৃক্ষে। স্বর্ণপ্রসূ এই জমি, মহাসমৃদ্ধশালী বরোচ।

প্রায় মাইল ত্রিশ অতিক্রম করে আমাদের ট্যাক্সি একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে থামে। ট্যাক্সি থেকে নেমে চা পান করে আবার আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ট্যাক্সি নক্ষত্রগতিতে ছোটে, মাইলের কাঁটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে ওঠে।

দেখতে দেখতে বদলে যায় রাস্তার রূপও। কখনও এগিয়ে আসে দূরের শৈলশ্রেণী। দূর থেকে দেখে মনে হয় রুদ্ধ হয় বুঝি পথ, বন্ধ হয় গাড়ীর গতি। আবার তারা সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ায়, ভরসা দেয় চলার নিরাপত্তার। দুই পাশের শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধুর মাঠও পরিবর্ত্তিত হয় শস্যশ্যামল ক্ষেতে, প্রসারিত হয় তাদের সবুজ অঞ্চল, পর্ব্বতমালার পদতল ধন্য হয় তাদের চরণ-স্পর্শে।

কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে, অজন্তা থেকে পাঁচ মাইল দূরে, অজন্তা গ্রামে উপনীত হই। আছে এই গ্রামে একটি ডাক-বাংলো। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় রাস্তার রূপও, পরিণত হয় প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক নয়নাভিরাম লীলা-নিকেতনে। গাড়ী সর্পিলগতিতে চলে, দু'পাশের সবুজ-ঘন বন-বীথি আর লতাকুঞ্জ ভেদ করে। অতিক্রম করে শৈলমালা, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের বর্ণ—সবুজ, নীল, পীত, হরিদ্রা, রক্তাভ, গাঢ় লাল। উপনীত হয় একেবারে নিম্নতম প্রদেশে, এক সুন্দরতম শোভন-দৃশ্য পর্ব্বতকন্দরে। তার বক্ষভেদ করে প্রবাহিতা এক রূপালী, কলনাদিনী স্রোতস্বিনী।

গাড়ী থেকে নেমে স্রোতস্বিনীর শীতল জলে হাত-মুখ ধুয়ে আমরা গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী চলে। [illegible]

অতিক্রম করে সবুজ ঘন বনে আচ্ছাদিত অপরূপ সুদুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, ভেদ করে যায় নয়ন-মুগ্ধকর দুর্লঙ্ঘ্য ঘন নীল লতাগুল্মে আবৃত পর্ব্বতকন্দর। প্রায় হাজার ফুট পর্ব্বত আরোহণ করে অজন্তা পর্ব্বতের সানুদেশে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে এসে থামে। গাড়ী থেকে নামি।

দেখি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সু-উচ্চ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা এক মহামহিমময় ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে ঘন বন-বীথি, ভূষিত হয়ে আছে ঘন সবুজ আভরণে। প্রসারিত হয়ে আছে দিক্‌চক্রবালে। রচিত হয় তার ঋজু খাড়া বুকে এক স্বপ্নপুরী, এক অমরাবতী। নির্ম্মিত হয় আটাশটি গুহামন্দির, চব্বিশটি বিহার ও চারিটি চৈত্য। রচনা করেন বৌদ্ধ স্থপতি, খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত। নির্ম্মিত হয় অন্ধ্র-সাতবাহন, চালুক্য, বাকাটক ও গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাঁদের প্রেরণায় ও অর্থে। বুকে নিয়ে আছে এই সব চৈত্য আর বিহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্করের আর বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীরও। নিদর্শন মহাগৌরবময় সৃষ্টির, অক্ষয় কীর্ত্তির। বুকে নিয়ে আছে তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান।

অবগাহিত তার শীর্ষদেশ অরুণোদয়ের প্রথম স্নিগ্ধ রশ্মিতে। তার পদতলে, গভীর অরণ্যসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ভেদ করে প্রপাতের আকারে বঙ্কিম গতিতে প্রবাহিতা নৃত্যচপলা কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনি, কানে ভাসে তার মৃদু গুঞ্জনও।

বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরগুলি, কাস্তের আকারে প্রায় এক মাইল পরিধি নিয়ে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই নিভৃত, নির্জ্জন, মহিমময়, ধ্যান-গম্ভীর সুন্দরতম পরিবেশ, এই রহস্যলোক। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের সামনে উপনীত হই। সঙ্গে নিয়ে যাই একজন অভিজ্ঞ প্রদর্শক। জমা দিয়ে যাই ডাইনামোর দর্শনী, দশ টাকাও অপরিহার্য্য অজন্তার মন্দির দর্শনে। হ'ত যদি কিছু কম, সহজ হ'ত অনেকের পক্ষে দেওয়া।

প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম্ম দিকে দিকে মহারাজা প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টের জন্মের দু'শত আট বছর পূর্ব্বে। গড়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে—প্রবল থাকে বৌদ্ধধর্ম্ম সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হয় ভারতের বুকে বৌদ্ধ সভ্যতা আর সংস্কৃতি, সাজান বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর ভারতের বুক অনবদ্য স্তূপে, চৈত্যে আর বিহারে। নির্ম্মিত হয় সুন্দরতম, সুষ্ঠু-গঠন স্তম্ভও অঙ্গে নিয়ে অনুপম অতুলনীয় শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে মহিমময় জীবন্ত মূর্ত্তি-সম্ভার।

শোভিত করেন চিত্রশিল্পী এই সব বিহারের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ সুন্দরতম চিত্র-সম্ভারেও। মহিমময় তাদের পরি-কল্পনা, নিখুঁত রূপদান। সৃষ্টি হয় কত রহস্যলোক, কত স্বপ্নপুরী, [illegible] সৌন্দর্য্যের [illegible]।

রচনা করেন সাঁচীর তোরণ, নাসিকের, অজন্তার ও এলোর বিহার, কার্লির ও অজন্তার চৈত্য, অমরাবতীর রেলিং, নাসিকের, কার্লির, অজন্তার ও ভারহুতের স্তম্ভ, বিদিশার আর অজন্তার স্তূপ। অজন্তার আর বাগের চিত্র-সম্ভার। কল্পনাতীত তাদের পরিকল্পনা, তুলনাহীন, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদান।

প্রবলতম হয় ভারতে হিন্দুধর্ম, প্রবলতর হয় জৈনধর্মও, ক্ষীণমান হয় বৌদ্ধধর্ম অষ্টম শতাব্দীতে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে নবম ও দশম শতাব্দীতে। পরিত্যাগ করে যায় ভারত। যায় তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায় ও চীনে, সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের সভ্যতা, তাদের কৃষ্টি। নিয়ে যায় শিল্পীও, গড়ে উঠে বৌদ্ধ স্থাপত্য সেই সব দেশে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, শোভিত হয় অনবদ্য চিত্র-সম্ভারেও।

লুপ্ত হয়ে যায় একে একে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ স্থপতির গৌরব, বৌদ্ধ শিল্পীর অমূল্য দান অন্তর্হিত হয়ে যায় ভীষণ হিংস্র শ্বাপদ ও ভয়াল ময়াল সঙ্কুল গভীর অরণ্যের অন্তরালে, অদৃশ্য হয়ে যায় সভ্য জগতের দৃষ্টির বাইরে। সুপ্ত থাকে কয়েক শত বৎসর। আসে আবিষ্কারের প্রেরণা, আবিষ্কৃত হয় তারা একে একে। বিস্মিত হয় লোকে তাদের গঠন-গরিমা তাদের অঙ্গের সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, তাদের চরম উৎকর্ষ দেখে। ছড়িয়ে পড়ে তাদের সৌরভ দিকে দিকে। দলে দলে যাত্রী আসে, আসে দেশ বিদেশ থেকে, সুদূর সমুদ্রপার থেকেও। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় ডালি উজাড় করে। গৌরবান্বিত হয় শিল্পী, গৌরব বাড়ে ভারতবাসীর। এমন করেই একদিন, বিলুপ্ত হয়ে যায় বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজন্তাও, পরিণত হয় গভীর অরণ্যে, বাসস্থান হিংস্র শ্বাপদের আর বাদুড়ের। অন্তর্হিত হয়ে যায় সভ্য জগতের দৃষ্টির বাইরে। লুপ্ত থাকে কয়েক শত বৎসর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। জানে না কেউ তার অস্তিত্ব, শোনে নাই তার নাম। শোনে নাই এইখানেই একদিন রচিত হয়েছিল এক স্বপ্নলোক, বুকে নিয়ে বহুশত বৎসরের বৌদ্ধ স্থপতির, ভাস্করের আর চিত্রশিল্পীর সাধনার দান, এক অমূল্য সম্পদ। বাস করতেন এখানে শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ, কত বৌদ্ধ পুরোহিত আর মহাপুরোহিতও। তাঁদের সম্মিলিত উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে আর ধর্মসঙ্গীতে, সকাল সন্ধ্যায় প্রকম্পিত হ'ত এর আকাশ বাতাস —প্রতিধ্বনিত হ'ত গিরিকন্দর আর শৈলমালার শিখরদেশ। বাস করতেন কত বৌদ্ধ স্থপতি, কত বৌদ্ধ ভাস্কর কত বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীও, নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা মন্দির নির্মাণের কাজে, ভূষিত করতে তাদের অঙ্গশিল্প, মূর্তি ও চিত্র-সম্ভারেও। বিরামহীন সেই কাজ। আসতেন এখানে হাজারে হাজারে বৌদ্ধতীর্থ যাত্রীও, চরিতার্থ হ'ত তাঁদের জীবন এখানকার চৈত্যে পূজা দিয়ে সার্থক হ'ত নয়ন এখানকার বিহার ও চৈত্যের মহিমাময় সৌন্দর্য্য দেখে। মুখর হ'ত অজন্তা তাদের কলকণ্ঠে, প্রতিধ্বনিত হ'ত তার আকাশ বাতাস, তার গিরিকন্দর আর শৈলশিখরও। হয়ত এমনই করে একদিন চিরতরে বিলুপ্ত হ'ত অজন্তা সঙ্গে নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পদ, পরিণত হ'ত ধ্বংসে, নিমজ্জিত হ'ত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে, হ'ত এক অপূরণীয় ক্ষতি বিশ্বের।

আসে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ, ভারতের শিল্পের ইতিহাসের এক পরম স্মরণীয় দিন। এক দল ইংরেজ সৈনিক শিবির স্থাপন করে ভারত হায়দ্রাবাদ সীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশে। উৎসবে উন্মত্ত তারা, হঠাৎ তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সামনের পাহাড়ের অঙ্গে। মনে হয়, সারি সারি গুহা নিয়ে আছে পাহাড় অঙ্গে। কৌতূহল জাগে মনে। অতি কষ্টে পাহাড় অবতরণ করে, অতিক্রম করে এক বেগবতী স্রোতস্বিনী। তার পর সুরু হয় সম্মুখের শৈলমালায় আরোহণ। কষ্টসাধ্য এই আরোহণ। রাস্তা নাই, নাই রাস্তা পশুদের যাতায়াতের জন্যও। নিবিড় ঘন বন-বীথি আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত শৈলমালার অঙ্গ, দুর্গম, অনতিক্রম্য। তাই উঠতে হয় প্রস্তরখণ্ডের উপর পদস্থাপন করে, আর লতা-গুল্ম আঁকড়ে ধরে। আরোহণ করতে হয় অতি সাবধানে। নইলে স্খলিত হবে পদ, নিমজ্জিত হবে অতল গহ্বরে, হবে জীবনান্ত। শেষে পাহাড় অতিক্রম করে, গুহায় দ্বারে উপনীত হয়। বিস্মিত হয় দেখে তার ভিতরের শিল্প-সম্ভার।

কিছুদিন পরে সৈন্যেরা লোকালয়ে ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় এক বিস্ময়জনক বার্তা। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, উড়িয়ে দেয় হেসে। ক্রমে এই খবর সৈন্যদের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, সুধী ও বিদ্বৎ সমাজের কানে আসে। তাঁরা অজন্তা দেখতে আসেন। দেখে মুগ্ধ হন তার গুহামন্দিরের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, তার প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদের অঙ্গের চিত্র-সম্ভার। প্রকাশিত হয় অজন্তার গুহা সম্বন্ধে প্রথম বিবরণী Transactions of the Royal Asiatic Societyর পৃষ্ঠায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার দীর্ঘ দশ বৎসর পরে।

শোনেন মনীষী জেমস ফার্গুসনও। তিনিও অজন্তায় গিয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তার গুহা সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী ঐ একই পত্রিকায় লেখেন। এক জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। আলোড়িত হয় সুধী সমাজ এই সব বিবরণী পাঠ করে, অবগত হন তাঁরা অজন্তার গুহার গুরুত্ব সম্বন্ধে, জানেন এই সোসাইটির সভারাও। তাঁরাই প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদের কাছে চিঠি লেখেন। অজন্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্র-সম্ভার রক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের চিঠি পেয়ে ঐ চিত্রগুলির অনুলিপি নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ পল্টনের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর রবার্ট গিল ঐ কাজে নিযুক্ত হন।

তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ কাজে নিযুক্ত থেকে লণ্ডন সহরে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রায় ত্রিশখানি অনুলিপি পাঠান। সেগুলি লিডেন হল ষ্ট্রীটে কোম্পানীর যাদুঘরে রক্ষিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে

অনেকগুলি অনুলিপি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। প্রেরিত হয় সেগুলি সিডেনহামে কৃষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর জন্ত। প্রেরিত হয় না শুধু শেষের পাঁচখানি অনুলিপি। আগুন লেগে ভস্মে পরিণত হয় কৃষ্টাল প্যালেসে রক্ষিত সবগুলি অনুলিপিই। রক্ষিত হয় যে পাঁচখানি অনুলিপি, হয় না অগ্নিদগ্ধ, প্রেরিত হয় কেন্‌সিংটনে আজও সেখানকার ভারতীয় শাখায় প্রদর্শিত হয় এই অনুলিপিগুলি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জেম্‌স ফার্গুসান ও ডাঃ বার্জেস ভারত সরকারকে এক যুক্ত চিঠি লেখেন। লেখেন মেজর গিলের যে সমস্ত অনুলিপি আগুনে পুড়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে উচিত সেগুলির পুনরুদ্ধার করা। ফলে জর্জ্জ গ্রীফিথসকে অবিলম্বে অজন্তায় গিয়ে তার গুহা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ পাঠাতে আদেশ করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীফিথস অজন্তায় আসেন; সঙ্গে নিয়ে আসেন বোম্বাইয়ের চিত্র বিদ্যালয়ের (School of Arts) কয়েকজন শিক্ষার্থী। তাঁরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত দীর্ঘ দশ বৎসর গুহার কাজে নিযুক্ত থাকেন। প্রেরিত হয় প্রায় একশত পঁচিশ-খানি অনুলিপি সাউথ কেন-সিংটনের যাদুঘরে। তাদের মধ্যেও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাতাশি খানি অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংসে পরিণত হয়। যেগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলি নিয়েই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীফিথস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Paintings in the Buddhist caves of Aganta' রচনা করেন। তাঁর নেওয়া ছাপান্নখানি অনুলিপি আজও ভিক্টোরিয়া আর এ্যালবার্ট যাদুঘরের ভারতীয় শাখার প্রাচীরের গাত্রে বিলম্বিত আছে।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডি হেরিংটন্ ভারত দর্শনে আসেন। মুগ্ধ হন তিনি অজন্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্র-গুলি দেখে। ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার অজন্তায় আসেন; ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার; তিনিও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অজন্তার গুহার চিত্রাবলী সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন পরিচিত 'Agantafrescoes' নামে।

কিন্তু নিবদ্ধ থাকে তখনও অজন্তার গুহার চিত্রাবলী ভারতবর্ষের বাইরে সুদূর ইংলণ্ডে। প্রচারিত হয় না ভারতে, থেকে যায় ভারতের লোকচক্ষুর অন্তরালে আবদ্ধ থেকে গুহার অন্ধকারে। শেষে একদিন এই খবর এসে পৌঁছায় শান্তিনিকেতনে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কানে, শোনেন ঋষি অবনীন্দ্রনাথ, অবগত হন ভগ্নী নিবেদিতাও। প্রেরিত হন তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদীয়মান শিল্পী শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার। অজন্তায় তাঁদের নেওয়া অনুলিপিই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, যেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে। তাই তাঁদেরও প্রাপ্য অজন্তার আবিষ্কারের গৌরব।

এঁরা ছাড়াও বহু মনীষী অজন্তা দেখতে আসেন। আসেন বহু চিত্র-শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও। তাঁরা সাগর অতিক্রম করে এসে অনুশীলন করেন গুহার চিত্রাবলীর অঙ্কন পদ্ধতি, গঠন-ভঙ্গিমা আর বর্ণ সুষমা; অনুশীলন করেন তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রফেসর উলিয়াম রথেনষ্টাইন, প্রফেসর লরেঞ্জো সিকনি আর ক্যাপটেন গ্লাডষ্টোন সলোমন। তাঁরাও লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের মতামত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সরকার এখানে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেছেন। সম্যক অবগত তাঁরাও এই গুহার চিত্রাবলীর গুরুত্ব সম্বন্ধে, যত্নবান তাদের সংরক্ষণে আর সুসংস্কারেও। দেখেন যাত্রীদের ও অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পীদের [illegible]খ-সুবিধাও। রচনা করেন তাঁরাও অজন্তার গুহা সম্বন্ধে একদিন মূল্যবান পুস্তক, প্রকাশিত হয় তার প্রাচীরগাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্রের বহু সুষ্ঠু অনুলিপিও।

রং আর তুলির সাহায্যে অঙ্কিত করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী অজন্তার প্রাচীরের গাত্রে, ছাদের আর স্তম্ভের অঙ্গে জাতকের গল্প, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের। অঙ্কিত করেন তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর দৃশ্য, করেন কত পৌরাণিক কাহিনীও। করেন যুগের পর যুগ, দেন তাদের সম্পূর্ণ রূপ। দেন মনের মাধুরী মিশিয়ে উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য।

চিত্রিত করেন মানবের জীবনও, সচেতন সাংসারিক সুখে, দুঃখে, কিন্তু বিস্মৃত হয় না সে শেষের দিনের কথা, নিঃশেষ হবে যে দিন আয়ু, অবসান হবে জীবনের। ভোলে না অনিত্য এই জীবন, অনিত্য স্নেহ-মমতা, অনিত্য সুখ-দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, নিত্য শুধু ব্রহ্ম সনাতন। ভুলে না ব্রহ্ম হতেই হয়েছে উদ্ভব, আবার লীন হয়ে যেতে হবে ব্রহ্মে। যেতে হবে কয়েক সহস্র বৎসরের জন্মান্তরের সুকৃতির ভিতর দিয়ে।

রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে বহু বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ; রচনা করেন চিত্রশিল্পী বহুশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনায়। অভিনয় করেন সেই রঙ্গমঞ্চে কত রাজা, কত রাণী সঙ্গে নিয়ে কত মুনি-ঋষি। অভিনয় করেন কত মহাশক্তিশালী পুরুষও। বাদ যায় না প্রজারাও। অংশ গ্রহণ করেন এই বহু-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে সব শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই। সেজে আসেন তাঁরা বিভিন্ন আর বিচিত্র সাজে, করেন বিভিন্ন অভিনয়।

অঙ্কিত করেন কত বিচিত্র আর বিভিন্ন দৃশ্যও, দৃশ্য কত নগরের কত রাজপ্রাসাদের, কত রাজসভার, নৃত্য করেন সেই রাজসভায় কত রাজনর্ত্তকী, অনুপম, তরঙ্গায়িত তাঁদের গঠন-ভঙ্গিমা, অনবদ্য তাঁদের অঙ্গের পেলবতা, সুন্দর, শোভন, তাঁদের অঙ্গের ভূষণ। নিযুক্ত তাঁরা নৃত্যে, নিখুঁত সেই নৃত্যের ছন্দ, নির্ভুল তার তাল।

অঙ্কিত হয় কত প্রাকৃতিক দৃশ্যও, দৃশ্য কত বিস্তৃত প্রান্তরের কত অরণ্যের, কত উপবনের, কত উদ্যানেরও। কত পশু, কত পক্ষী, কত হরিণ, কত গরু, কত সিংহ, কত হস্তী বিচরণ করে সেই সব বনে উপবনে।

গ্রথিত সকলে একই গ্রন্থি দিয়ে। গ্রথিত রাজা ও রাণী, তাদের পারিষদবর্গ। গ্রথিত নর, নারী, পশু-পক্ষী, রাজপ্রাসাদ রাজসভা, অরণ্য, উদ্যান, লতা আর পল্লব। অভিনয় করেন সেই

সুরের মধ্যে প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁদের নিজস্ব অভিনয় বিকশিত হয় তাদের নিজের স্বরূপ, নিজস্ব সত্তা, লাভ করে তারা অপরূপ রূপ হয় রূপময়, প্রাণময়ও। এক মহামহিমময় উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয় তাদের প্রতিটি অঙ্গ, উদ্ভাসিত হয় তাদের আনন, হয় নয়নও। সে আলো ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণের আলো, সে দীপ্তি ভগবৎ করুণালাভের স্বীকৃতি। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার এক অপূর্ব্ব সমন্বয়।

জীবন্ত এই চরিত্রগুলি, অপরূপ প্রতিচ্ছায়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনেরও। চরম প্রকাশ শিল্পীর মনস্তত্ত্বের, তাই লাভ করে অজন্তার চিত্র-শিল্প শ্রেষ্ঠ রূপ, পায় পূর্ণ পরিণতি।

তুলনাহীন এই চিত্রসম্ভার, মহিমময় সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য অপরূপ রূপদান। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র-শিল্পের দরবারে।

এই রঙ্গমঞ্চে পরম রূপবতী নারীই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন, করেন তাকে মধ্যমণি শিল্পী। করেন তাকে সুন্দরের প্রতীক, প্রতীক বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য্যের আর সুষমার। দেন অপরিসীম নারীচরিত্র জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রতি পদক্ষেপে তার সাহায্য নেন। সাজান নারী দিয়ে সমস্ত গুহামন্দির, শোভিত করেন অপরূপ সাজে। নারীকেই করেন পুষ্প। শোভিত হন নারী দিয়েই রাজা ও রাজকুমারও, মহিমান্বিত হয় রাজসভা আর রাজপ্রাসাদ। শোভিত হয়ে আছে নারী দিয়ে পথ, ঘাট, বাতায়ন। গ্রথিত হয় নারী দিয়ে মালা।

প্রস্ফুটিত করেন শিল্পী কখনও একটি নারীকে, কখনও বা একাধিককে। অপ্সরার মত নারী উড়ে চলে। কোথাও এক যৌবন-মদে মত্তা এক মত্ত সৈনিককে রসাতলের পথে নিয়ে যায়। কোথাও নিযুক্তা নারী সংসারের কাজে ব্যাপৃতা, কোথাও শিথিল কবরী বন্ধনে হস্তে নিয়ে কনক-মুকুর, কোথাও দাঁড়িয়ে বাতায়নে, সজ্জিতা অভিসারিকার ভূষণে। কেউ মত্তা উৎসবে, নিযুক্তা কেউ গল্প-গুজবে।

আছে নারী বসে, আছে দাঁড়িয়েও। তাদের শিরে শোভা পায় স্বর্ণমুকুট, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরার দুল। বাহুতে তাদের মাণিকখচিত বহুমূল্য ব্রেসলেট, মণিবন্ধে স্বর্ণ-কঙ্কন। কোথাও নাই তাদের অঙ্গে কোন বসন, বিবসনা তারা, কোথাও স্বল্প-বসনা, কোথাও বা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিতা।

অঙ্কিত হয় নারীর মস্তকের প্রতিটি দোলন, দেহের প্রতিটি সুক্ষ্মতম গঠন, তারা যৌবন-পরিপুষ্ট পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ, বঙ্কিম গ্রীবা, ললিত কপাল, তার মদিরালস আকর্ণ-বিস্তৃত আঁখি, তার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনও। অঙ্কিত হয় তার বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশ বিন্যাসও।

অঙ্কিত করেন অজন্তার শিল্পী নারীকে কত বিভিন্নরূপে, কত বিচিত্র ভঙ্গীতে, কত বিভিন্ন সাজে। করেন তাদের সুন্দরতম। হন তাঁরা রহস্যময়ী, মহিমময়ীও। রমণীয়তম হয় অজন্তার গুহামন্দির তাঁদের সাহায্যে, হয় মহামহিমান্বিত, পরিণত হয় অজন্তা, এক স্বপ্নলোকে, এক স্বপ্নপুরীতে, বুকে নিয়ে ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তখন মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে সারা ইউরোপ।

বপন করেন বৌদ্ধ চিত্রশিল্পী যে বীজ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের সিরগুজার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, মহামহীরুহে পরিণত হয় সেই বীজ অজন্তার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে। লাভ করে পূর্ণ পরিণতি—উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় গিডটো আর লিওনার্ডোকেও। সমপর্য্যায়ে পড়ে অজন্তা সিসটাইনের ভজনালয়ের। এই ভজনালয়কে চিত্র-সম্ভারে ভূষিত করবার জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়—সিগনরেল্লি, বত্তিচেল্লি, ঘিরল্যাণ্ডাইও, পেরুগিনো ও রচেল্লির মধ্যে। শোভিত হয় তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়। কিন্তু লাভ করে না সম্পূর্ণ রূপ, পায় না পূর্ণ পরিণতি। তাই শেষ রূপ দান করতে হয় এই ভজনালয়ের সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতিভাবান চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে, দিতে হয় হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে। অমরত্ব লাভ করে ভজনালয়, অমর করে মাইকেল এঞ্জেলোও। অজন্তার চিত্রশিল্পীরাও রচনা করেন এখানে এক বহু-বিস্তৃত অনবদ্য শিল্প-সম্ভার, এক মহামহিমময় সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ। রচনা করেন যুগের পর যুগ মিশিয়ে দিয়ে অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য, নিঃশেষ করে দিয়ে হৃদয়ের সবখানি ঐশ্বর্য্য—হন বিশ্বজিৎ। অমর হয় অজন্তা, নিজেরাও লাভ করেন অমরত্ব।

ক্রমশঃ
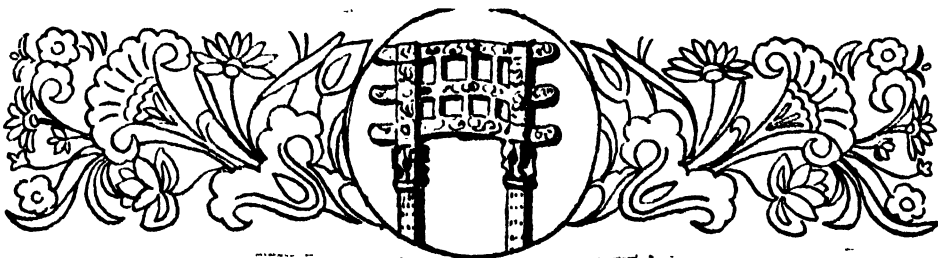
শিকার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

ছিল গ্রাম—হয়েছে মহকুমা।

স্বাধীনতার পর প্রমোশন।

প্রমোশন শুধু সরকারি চাকুরেদেরই হয় নি—স্থানেরও হয়েছে। আসল নামটি বলব না—প্রমোশন-প্রাপ্ত গ্রামের নামটি দেওয়া যাক মধুগ্রাম।

মধুগ্রাম গ্রাম ছিল বটে—কিন্তু তার দাপট কিছুটা আগের দিনেও ছিল। ছিল—মুন্সেফি চৌকি, সবরেজেষ্ট্রারি অফিস, থানা, পোষ্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড। যুদ্ধের কল্যাণে পঞ্চাশ বেডের একটা হাসপাতালও গড়ে উঠেছিল।

স্থানটির প্রমোশনের পর সেখানে এলেন মহকুমা হাকিম, সেকেণ্ড অফিসার, সার্কেল অফিসার। সঙ্গে কেরাণীকুল, নাজির, পেস্কার। স্ফীত মধুগ্রামের দিকে চেয়ে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির চোখ ঝলসে যেতে লাগল।

নূতন মহকুমা হাকিম—অরিন্দম বোস। মুখে সর্ব্বদা ষ্ট্যালিন-মার্কা পাইপ। কথা বলার সময়ও মুখ থেকে পাইপ সরাতে নারাজ—ফলে এমন হল যে, তাঁর ইংরেজীর টাক্‌না দেওয়া বাংলা কথা বোঝাও কঠিন হয়ে উঠল।

না বুঝলেও অবশ্য ক্ষতি কিছু ছিল না। অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছাড়াও মধুগ্রামের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নূতন হাকিমের স্তাবক হয়ে উঠতে দেরী হয় নি। কথা না বুঝলেও স্তাবকের দল হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিত, হাকিমের কথা তারা মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছে।

অরিন্দম বোসের পদোন্নতি একটা অভাবনীয় ব্যাপার। ছিলেন সবডেপুটি, স্বাধীনতা লাভ আর বাংলা বিভাগের পর হলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তার পর নূতন মহকুমার সবডিভিসন্যাল অফিসার।

মহকুমা হাকিমের স্তাবকদলের মধ্যে ছিলেন—উকিল রসময় ঘোষাল এবং জেলাকোর্ট থেকে সদ্য আগত মোক্তার গুণাকর মাইতি। উকিল রসময় বাবু অনেক দিন থেকেই মুন্সেফি আদালতে প্র্যাকটিস করছেন, কিন্তু ক্ষুদ্র মুনসেফি আদালতে জন পঁচিশেক উকিলের কমপিটিশনে তিনি কিছু সুরাহা করে উঠতে পারেন নি। নূতন ফৌজদারী আদালত বসতেই তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ফৌজদারী কোর্টে প্র্যাকটিশ কোনও রকমে জমিয়ে তুলতে পারলেই কাঁচা পয়সার অভাব নাই। আর ফৌজদারী আদালত যখন বসেছে—তখন খুন, রাহাজানি, মেয়ে চুরি, জাল-জালিয়াতি যে এ অঞ্চলে বেড়ে যাবে—তা তাঁর মত চৌকস অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে দেরী হয় নি। পসার অর্জ্জনের একমাত্র উপায় তিনি ঠিক করেছিলেন—হাকিমের মনোরঞ্জন। বাইরের লোক যদি বুঝতে পারে যে, সাহেবের বাংলোয় তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করছেন, হাকিম সাহেব তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলেন—তা হলে তাঁর মক্কেলদের এটুকু বোঝাতে দেরী হবে না যে, হাকিম তাঁর কথায় উঠেন বসেন।

মোক্তার গুণাকর বাবু বছর পনরো জেলার ফৌজদারী কোর্টে মোক্তারী করেছেন। কিন্তু শ'দুয়েক মোক্তারের কম্পিটিশনে তাঁর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর কোর্টের পোষাক কোট আর প্যান্টের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। মধুগ্রামে ফৌজদারী আদালতের কাজ চালু হয়ে গেলেই তিনি এখানে এসে হাজির হলেন। এমন কি মহকুমা হাকিম যে দিন প্রথম পদার্পণ করলেন—সে দিন ফুলের মালা হাতে করে তিনি ষ্টেশন পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে হাকিম সাহেবের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—আমার নাম গুণাকর মাইতি—সিনিয়র মোক্তার হুজুর।

নূতন হাকিমের মুখে হাসির রেখা।—সিনিয়র মোক্তার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। জেলায় পনরো বছরের ওপর মোক্তারী করেছি। পসারও জমেছিল ভাল। কিন্তু যেই মধুগ্রাম মহকুমা হ'ল আর হুজুর আসছেন শুনলাম—তখনই মনস্থির করে ফেললাম। হুজুরের মত সদাশয় মনিবের কাছে কাজ করা বহু ভাগ্যের কথা—এ সুযোগ কি ছাড়তে পারি সার?

নূতন পরিবেশে মহকুমা হাকিমের সময় কাটছিল মন্দ নয়। স্তাবকদের কাছে তিনি পূর্ব্ব জীবনের অনেক কথাই বলতেন। তার বেশীর ভাগই ইংরেজ আমলের চাকুরীর মর্য্যাদার কথা। আজকাল হয়েছে মুড়ি-মুড়কির এক দর। এ্যাপ্রিসিয়েসন কোথায়? তখনকার দিনের বড় বড় ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে সমান ভাবে মিশেছি। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা ছেড়েই দিন—ডিভিসন্যাল কমিশনার ব্লেক সাহেব ইন্সপেকশনে এলে ফর এ মোমেণ্ট আমাকে ছাড়তে চাইতেন না। আমার সাথে কনসাল্ট না করে তিনি কিছুই করতেন না।

উকিল রসময় বাবু সময় বুঝে বললেন—আপনার সম্মুখে বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে বটে সার—কিন্তু আমি বার-লাইব্রেরীতে প্রায়ই বলি যে, এমন বুদ্ধিমান হাকিম আমার এ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নি। কতই বা বয়স—কিন্তু এমন বিচক্ষণতা, এমন সূক্ষ্ম বিচার কই এ পর্য্যন্ত ত আর কারুরই দেখলাম না। ইংরেজ

রাজত্ব থাকলে আপনাকে জেলার ভার নিতে হ'ত। সে কাল কি আর আছে? বোঝবার মত লোক কোথায়? যা বলেছেন সার—মুড়ি-মুড়কির এক দর।

মোক্তার গুণাকর মাইতির আপশোষ হ'ল। উকিলের কথাগুলি তাঁরই ত বলা উচিত ছিল। উপস্থিত বুদ্ধিও তাঁর কম নয়। বললেন—জেলার ভার কি রসময় বাবু! একটা ডিভিসনের ভারই একদিন পেয়ে যেতেন হুজুর।

অরিন্দম বোস পাইপের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন—তার পর পাইপটি বাঁ হাতে নিয়ে বললেন—না, ঠিক অতটা বাড়াবাড়ীর কথা আমি বলছি না। তবে আপনারা আমাকে স্নেহ করেন—যা বলেন শুনতে আমার বেশ ভালই লাগে। তবু বলব—এখন মাঝে মাঝে বড্ড বোরিং মনে হয়। আমার একটা হবি ছিল শিকার। ফুরসৎ পেলেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু এখানে সে অপরচুনিটি কোথায় বলুন। তা ছাড়া তেমন সঙ্গীই বা কই?

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হরিশবাবু দেখলেন, একটা কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। বললেন—আমার ইউনিয়নে শিকারের অভাব কি হুজুর! ঘুঘু, হরিয়াল, তিতির, বেলে হাঁস—

হাকিম সাহেব পাইপের ফাঁকে বাঁকা হাসি হাসলেন, তার পর হাত নেড়ে প্রেসিডেন্টকে থামতে ইঙ্গিত করে পাইপ হাতে নিয়ে খানিকটা হো হো করে হেসে বললেন—কি যে বলেন হরিশ বাবু! আমি কি ঘুঘু শিকারের কথা বলছি? পাখী শিকার কি আর একটা শিকার—ও ত নিরীহ জীবহত্যা। আই হেট কিলিং অব বার্ডস, দোজ ইনোসেন্ট ক্রিচার্স!

প্রেসিডেন্ট সাহেব লজ্জায় অধোবদন হলেন। না জেনে শুনে কি বেফাঁস কথাই না বেরিয়ে গেল তাঁর মুখ দিয়ে! হাকিম কি ভাবলেন—তাঁকে অপমান করলাম? ছিঃ ছিঃ!

রসময় ঘোষাল ব্যঙ্গ করে বললেন—যা জান না তা নিয়ে তোমার কথা বলার অভ্যেস গেল না হরিশ! চেহারা দেখেই কি বুঝতে পার না—পাখী মারাকে উনি শিকার বলেই ভাবতে পারেন না। উনি চান—বিগ গেম।

পাইপটা দাঁতে কামড়ে হাকিম বলেন—এক্‌জ্যাক্টলি!

হরিশ বাবু কেঁপে উঠলেন—মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি ঢোক গিলে বললেন—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর।

অনুকম্পার দৃষ্টিতে হরিশবাবুর দিকে চেয়ে হাকিম বললেন—বোঝা কঠিন। বিগ গেম এখানে কোথায় মিলবে? রয়েল বেঙ্গল, লেপার্ড, বাইসন, রোগ এলিফেন্ট এমন কি রাইনো—অর্থাৎ গণ্ডার পর্য্যন্ত—।

মোক্তার গুণাকর মাইতি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—ইস, হুজুর গণ্ডার পর্য্যন্ত? এ্যা!

—বলুন বলুন মোক্তার বাবু। বললেন রসময় উকিল। নাম শুনেই এই, আর সায়েব শিকার যদি দেখতেন—তা হলে ত মূর্চ্ছা যেতেন। আপনার মুখে কিন্তু শিকারের গল্প শুনব সার। রাইনোও মেরেছেন নাকি?

—না ঠিক মারা বলতে পারি নি। জানেন ত—রাইনো মারা আইনে নিষেধ। আসাম আর ডুয়ার্সের জঙ্গলে এখনও রাইনো দেখা যায় বটে—কিন্তু নাম্বার একেবারে ইনসিগনিফিক্যান্ট ওদের—বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছেন গভর্ণমেণ্ট—অর্থাৎ কেউ গণ্ডার মারতে পারবে না। এ নিয়ম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আমল থেকেই চলে আসছে। এখনও অবিশ্যি বজায় আছে। সেবার হ'ল কি জানেন? গিয়েছি ডুয়ার্সের 'কেঁদেমরি' চা বাগানে—একটা তদন্তে।

রসময় বাবু বললেন—কেঁদে মরি?

হাকিম হেসে বললেন—ও দিকের চা-বাগানের নামগুলো ভারী অদ্ভুত। আবার 'হেসে মরি'ও আছে।

হাকিমের কথা শুনে সকলেই তো হো করে হেসে উঠলেন।

—নাম যাই হোক, বাগানটা কিন্তু ইউরোপিয়ান কনসার্ণ। ম্যানেজার নিকলসন আমার বিশেষ বন্ধু। অমায়িক দিল-খোলা লোক আর শিকারের ভারী বাতিক। তার সঙ্গে অনেকবার শিকারে গিয়েছি। বাঘ, ভালুক, চিতা, বাইসন—কিছুই বাদ যায় নি। সেবার নিকলসন বললে—মিষ্টার বোস—সবই ত হ'ল ব্রাদার—এবার রাইনো।

—জিভ কামড়ে বললাম—পাগল! জান না রাইনো মারা ইল্‌লিগ্যাল।

নিকলসন প্রাণ-খোলা হাসি হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললে—আইন ত তোমার হাতে: তুমি সঙ্গে থাকলে আবার আইনের ভয় কি?

লোভ যে আমারও না হয়েছিল তা নয়। সব ত হয়েছে, এখন রাইনো হলে আর দুঃখু থাকে না। কিন্তু বলি—তা কি হয় নিকলসন, আমি সরকারের লোক। আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? শেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ঠিক হ'ল যে শিকার চলবে না, তবে রিজার্ভ ফরেষ্টে গিয়ে সম্ভব হলে গণ্ডারের জীবনযাত্রা দেখে আসা চলতে পারে। তাই হ'ল। নিকলসনের বাগান থেকে রিজার্ভ ফরেষ্টের দূরত্ব মাইল দশেক। রাস্তা চমৎকার—রিজার্ভ ফরেষ্টের ধার পর্য্যন্ত গিয়েছে। মোটরে রওনা হলাম। সঙ্গে একটা বন্দুক নিকলসনের হাতে। আমি বন্দুক নিইনি—কারণ শিকার ত চলবে না। নিকলসনকেও নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে বলল, ব্রাদার, বনে যাচ্ছি—রাইনো না মারতে দেও—কিন্তু বনে বিপদ-আপদ আছে ত! তা ঠিক। সুতরাং আপত্তি করিনি। ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। কি বিশাল ঘন বন। বুনো ঘাস, লতাগুল্মে নীচের মাটি ঢাকা। তারই মধ্যে দুইজন এগিয়ে চললাম। কিছু দূর যেতেই শুনি—খস খস, ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। নিকলসন আস্তে আস্তে বলল—দেখছ

আদায় ! দেখলাম। প্রায় একশ' গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা গণ্ডার, তার পাশেই একটা বাচ্ছা। বড় গণ্ডারটি আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে মাথা নীচু করে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে এই দিকেই ছুটে আসছে। প্রমাদ গণলাম। এখনই ওর মাথার খড়্গ দিয়ে আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেবে। নিকলসন তর তর করে একটা গাছে উঠে পড়ে বললে—কুইক্। কিন্তু গাছে চড়া আমার অভ্যেস নেই। হঠাৎ রাইফেলের শব্দে চমকিয়ে উঠলাম। গণ্ডারকে গুলী করেছে নিকলসন। গণ্ডারটি বিকট চীৎকার করে উল্টোমুখো ছুটে চলেছে, আর গুলীটি গণ্ডারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমার পায়ের কাছে ছিটকে পড়েছে।

প্রেসিডেণ্ট হরিশবাবু উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ইস ! বড্ড বেঁচে গেছেন হুজুর। কি কাণ্ড !

হাকিম হেসে বলল—বসুন হরিশবাবু। সে এক কাণ্ডই বটে। কিন্তু তখনকার থ্রিলটা একবার কল্পনা করুন ত ! জাত শিকারী না হলে ওটা ঠিক ফিল করা যায় না। হাকিম সাহেব পাইপটা মুখে গুঁজে আবার টানতে লাগলেন।

গণ্ডারটার কি হ'ল সার ? রসময় উকিল জিজ্ঞেস করলেন।

পাইপের ফাঁকে হাকিম বললেন—বলছি। মিনিটখানেক পর মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন—কিছু হয় নি। গণ্ডারের চামড়া, যা দিয়ে ঢাল তৈরী হ'ত, গুলী লাগতেই ছিটকে উল্টো দিকে রিবাউণ্ড করে আরও জোরে ফিরে এল—আর একটু হলে আমারই গায়ে এসে বিঁধত।

গুণাকর মোক্তার মুখটা ফ্যাকাসে করে বললেন—উঃ ! ভগবান রক্ষে করেছেন।

হাকিম স্মিতহাস্যে একবার সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—নিকলসনকে বললাম—বে-আইনি কাজ করেছ তুমি। নিকলসন হেসে বললে—সে তোমারই জন্যে। তুমি যে গাছে চড়তে জান না, তা কি জানতাম। গুলী না করে উপায় ছিল কি ? কিন্তু মজা দেখো কিছু হয় নি ওটার—গায়ে ওর আঁচড়ও লাগে নি বোধ হয়। গণ্ডার মারার ট্রিক্স জানা নেই আমার। ওটা শিখতে হবে। তাই বলছিলাম—কি দিনই গিয়েছে ?

কিন্তু বোধ হয় দিন ফিরল। সেদিন হরিশ বাবু প্রায় ছুটতে ছুটতে হাকিম সাহেবের বাংলোয় এসে বললেন—হুজুর বিগ গেম ! তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না—তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

সাহেব অনুকম্পার দৃষ্টিতে হরিশ বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—বসুন বড্ড হাঁপাচ্ছেন যে। দৌড়ে এলেন বুঝি ? ব্যাপার কি মশায় ? এখানে বিগ গেম পেলেন কোথায় ? পাগল হলেন নাকি ?

হরিশ বাবু চেয়ারে বসে দম নিয়ে বললেন—না সার, পাগল হই নি। হাতী—বুনো হাতী ধানের ক্ষেতে নেমে তছনছ করে দিচ্ছে একেবারে। আহা, পাকা ধান ! এ সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচান হুজুর।

বুনো হাতি ? এখানে ? ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন হাকিম সাহেব। হরিশবাবু বলেন—নয় নম্বর ইউনিয়নের চৌকিদার খবর নিয়ে এল এইমাত্র। শুনেই ছুটে এসেছি।

তখনই ডাক পড়ল—পারিষদবর্গের। একে একে এসে পড়লেন—উকিল রসময় বাবু, মোক্তার গুণাকর মাইতি, সার্কেল অফিসার অবনীবাবু, হেড ক্লার্ক, কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক, নাজির। নয় নম্বর ইউনিয়নের চৌকিদারের মুখ থেকে যা শোনা গেল—তার মর্ম্ম এই যে, দুটো হাতী দেখা গিয়েছে—নয়াচক গ্রামের ধানক্ষেতের মধ্যে। গ্রামটি পশ্চিম বাংলার প্রান্তে। ধানক্ষেতের পরেই শালবন আরম্ভ। ভিন্ন প্রদেশের এলাকা সেটি। বন ক্রমশঃ ঘন হয়ে বিস্তার লাভ করেছে অন্য প্রদেশের এলাকার মধ্যে।

সব শুনে হাকিম বললেন—মাই গড ! এ কথা ত আগে জানতাম না। ফরেষ্ট আছে নাকি ধারে কাছে।

—ঠিক ধারে কাছে নয় হুজুর, হরিশ বাবু বললেন, মাইল চোদ্দ-পনের দূরে। অন্য প্রদেশের এলাকায় সেটা হুজুর।

ধমক দিয়ে হাকিম বললেন—যে প্রভিন্সেই হোক—সেটা ভারতবর্ষেই ত, না সেটা আফ্রিকায় হরিশ বাবু ? অন্য এলেকার হাতী এসে আমার মহকুমার ধানক্ষেত সাবড়ে দিল—এও শুনতে হয় আমাকে। আচ্ছা আগে কোনও দিন বুনো হাতী দেখা গিয়েছে ও-অঞ্চলে ?

চৌকিদার হাত জোড় করে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—না হুজুর।

হাকিম সাহেব পাইপ টানতে টানতে কি যেন চিন্তা করলেন। তার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—বুনো হাতী শিকার—বড্ড রিস্কি এ্যাফেয়ার। আমি ওটা জানি কিনা। সেবার গারো হিলে ডিক্লেয়ার্ড 'রোগ' শিকার করতে গিয়ে যে বিপদে পড়েছিলাম সে গল্প করার এখন আর সময় নেই। আচ্ছা, আশেপাশে এমন কেউ আছেন যাঁর শিকারের সখটক আছে ? দু' এক জন সঙ্গে থাকা ভাল। কিন্তু এদেশে কি আর মিলবে মশায় ? সে মিলত ডুয়ার্সে।

হরিশ বাবু কিছু বলার আগেই মোক্তার গুণাকর বাবু তাড়াতাড়ি বললেন—আছেন সার। কুমার বেণীপ্রসাদ। এ দেশের জমিদার ছিলেন। শিকারের সখ তাঁর খুব ছিল এককালে।

হাকিম সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। হাঁা। নাম শুনেছি। আপনাদের দেশে ইনিই ত বড় জমিদার—না ? কিন্তু কৈ তিনি ত আমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত দেখা করেন নি।

হরিশ বাবু মুচকি হেসে বললেন—দেখা করার কি আর মুখ আছে হুজুর ? সবই গেছে কিনা। বড্ড মুষড়ে পড়েছেন শুনেছি।

—তবু আসা উচিত ছিল। গম্ভীর হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন হাকিম সাহেব। তার পর কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ককে বললেন—দেখুন ডি. এম. কে রিপোর্ট করে দিন এখনই ব্যাপারটা জানিয়ে। লিখে দিন—আমি কালই যাচ্ছি এর ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসে ফলাফল জানাব। তার পর একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

একটা ওয়ার করে দিন মিষ্টার সেনকে কলকাতায়। এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ। আমার বিশিষ্ট বন্ধু—শিকারে হাত আছে—জানিয়ে দিন আজই যেন রওনা হয়। কাল দুপুর নাগাদ বেরবো আমরা এখান থেকে।

সার্কেল অফিসার অবনীবাবু চুপ করে ছিলেন এতক্ষণ। এইবার বললেন, কালকের দুপুর? বড্ড দেরী হবে নাকি স্যার? হাতী কি আর থাকবে অতক্ষণ?

—উপায় নেই। মিষ্টার সেন না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। চৌকিদারকে হুকুম দিলেন, তুমি চলে যাও এখনি, ওখানকার লোকদের জানিয়ে দাও, হাতীর উপর যেন নজর রাখে। পালাতে যেন না পারে, যতক্ষণ না আমরা সেখানে পৌঁছচ্ছি। পালাবে কোথায় অবনীবাবু, যখন মরবার জন্যই আমার এলাকার মধ্যে এসে পড়েছে।

অবনীবাবু অলক্ষ্যে মুখ টিপে হাসলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন, দুটো হাতীকে পাহারা দিয়ে রাখবার আদেশটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিনা।

পরদিন অকুস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বেলা প্রায় একটা হয়ে গেল। হাঁ, টেলিগ্রাম পেয়ে এ্যাসিষ্টান্ট পুলিশ কমিশনার মিষ্টার সেন এসে পৌঁছেছেন আজ সকালে। দলে রসময় ঘোষাল, গুণাকর মাইতি, হরিশ বাবুও চললেন। রসময় বাবু বললেন—আমরা কিন্তু সেফ ডিসট্যান্সে থাকব সার।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নয়াচক পৌঁছিলেন শিকার পার্টি। চৌকিদার আভূমি নত হয়ে সেলাম দিতেই হাকিম সাহেব বললেন, সব ঠিক?

হাতী দুটোকে সকালে দেখা যায় নি। দুপুরে ধানক্ষেতে দেখা গিয়েছে আবার। চৌকিদার হাত জোড় করে এই কথাগুলি নিবেদন করলে।

হাকিম সাহেব সেন সাহেবের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তোমার বরাত ভাল। তোমাকেই প্রথম ফায়ার করতে হবে সেন। আমি কিন্তু কিছু করব না।

মিঃ সেনের মুখ কিছু বিবর্ণ মনে হ'ল। শিকারের সখ আছে বটে—কিন্তু অভ্যাস নেই, মনে মনে তাই ভাবছিলেন হয় ত। হয় ত বা ভাবছিলেন দিন কয়েক পুলিশ ইনসপেক্টরের কাজ করে এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনারের পদ অলঙ্কৃত করেছেন যিনি—তিনি কি কয়েকটা নিরীহ ঘুঘু, বেলে হাঁস, গোটা তিনেক দোয়েল এবং একটা বনবেড়াল শিকার করবার পর এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নি যে, একটা দুটো হাতী শিকার করে ফেলতে পারেন।

গ্রামের পথে কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত—সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে। সুপুষ্ট ধানের শীষগুলি মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। পশ্চিমে-হেলা সূর্য্যের আলো হলুদরঙা ধানক্ষেতের উপর অপূর্ব্ব যাদু বিস্তার করে আছে। দূরে ধানক্ষেতের অপর প্রান্তে সবুজের আভা—বনের সীমা। তারপরও চোখ মেলে দেখা যায় আকাশের নীচে স্থানে স্থানে মেঘ জমে আছে। মেঘ নয় মেঘলা রঙের পাহাড়।

অবশ্য প্রাকৃতিক শোভার যাদু দেখতে আসেন নি মহকুমা হাকিম অথবা পুলিসের এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার। মিষ্টার সেন বললেন—কই হে বোস, তোমার 'গুণ্ডা' কোথায়?

বোস সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে গেল—ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে এক দল লোক এই দিকেই আসছে। সর্ব্বাগ্রে যিনি আসছেন তাঁকে দেখেই বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল হাকিম সাহেবের মুখে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা লোকটি। ব্রিচেস এবং গলাবন্ধ লম্বা কোট, পরিধানে হাতে বন্দুক। প্রশস্ত বুক বেষ্টন করে আঁটা চামড়ার পেটি—তাতে থাকে থাকে কার্টিজ সাজানো। পায়ে শিকারীর বুট।

কাছে আসতেই বোস সাহেব বললেন, আপনি?

শিকার পার্টির সকলেই আগন্তুককে দেখেছিলেন—রসময় ঘোষাল এগিয়ে এসে বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই সার—ইনিই কুমার বেণীপ্রসাদ। এখানকার জমিদার। মস্ত বড় শিকারী। এঁরই কথা বলেছিলাম সেদিন। আর ইনি আমাদের মহকুমা হাকিম, আর ইনি পুলিস কমিশনার কুমার বাহাদুর!

—নমস্কার, নমস্কার। হাত তুলে দুই জনকে নমস্কার করলেন বেণীপ্রসাদ।

কোনও রকমে বাঁ হাতটি একটু উঁচু করে প্রতি নমস্কারের ভঙ্গি দেখিয়ে হাকিম সাহেব পাইপের ফাঁকে বললেন, কোথায় গিয়েছিলেন ওদিকে? আপনাকে আসতে কই খবর দেওয়া হয় নি ত?

বেণীপ্রসাদের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখটি হাসিতে ঝলমল করে উঠল। বললে, আপনি খবর দেন নি বটে—কিন্তু খবর পেয়েছি। জঙ্গল থেকে হাতী নেমে এসে আমারই প্রজার ক্ষেত তছনছ করছে—এ কথা আমারই আগে পাওয়ার কথা মিষ্টার বোস। অবশ্য আমার প্রজা, এ কথা বলবার অধিকার ফুরিয়েছে—তবু কি এতদিনের সম্বন্ধ হুট করে ভোলা যায়? কি বলেন? তা ছাড়া ওরাই কি ভুলতে পেরেছে? তাই আপনাদের আগে আমাকেই আসতে হয়েছে। হো হো করে হেসে উঠলেন বেণীপ্রসাদ।

—তা বেশ করেছেন। কিন্তু ফায়ার করবার এ্যাটেমপ্ট করেন নি ত। জানেন বোধ হয় আমার কাছে থেকে কোনও পারমিশন আপনি নেন নি। হাকিমের স্বরে বিরক্তির আভাস।

—পারমিশন? আপনি হাসালেন মিষ্টার বোস! এ কি গবর্ণমেন্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট যে শিকার যে পারমিশন নিতে হবে। না—ফায়ার আমি করি নি—করতে পারি নি। অবশ্য সেটা আপনাদের খাতিরে নয়। আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের ফিরে যেতে অনুরোধ করব মিষ্টার বোস।

—কেন? ভ্রূকুটি করে বললেন হাকিম সাহেব।

—আপনারা দু'জন কত বড় শিকারী আমার অবশ্য জানা

নাই—কিন্তু তবু আপনাদের ফিরে যেতেই বার বার অনুরোধ করব আমি। কেন অযথা মাইলখানেক কষ্ট করে যাবেন ধান-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। শিকার আপনারা করতে পারেন না।

—কেন, আপনার হুকুমে নাকি? ব্যঙ্গ করে বললেন হাকিম সাহেব।

—না, না হুকুম নয় মিষ্টার বোস—ওটা আমার অনুরোধ।

শিকার পার্টির সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কুমার বাহাদুরের মুখের দিকে।

—যে হাতী শিকারীকে সামনে দেখেও তেড়ে আসে না বরং শুঁড় উঁচু করে তুলে অভিনন্দন জানায়, তাকে মারতে কি রাইফেল তোলা যায়? বলুন! আমি দেখেই বুঝেছি দুটোই পোষা হাতী। তা যদি না হ'ত তা হলে আমিই কাজটা শেষ করে আসতাম। আপনাদের আর কষ্ট করে যেতে হত না। হাঃ হাঃ! থাক সে কথা। ক্ষতি ওরা কিছুই করে নি—করবেও না। আবার অনুরোধ করছি, ফিরে যান।

—পাগল নাকি! হাকিম সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। আপনার অযথা উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা মনস্থির করেই এসেছি। টেম্ এলিফ্যান্ট ওখানে আসে কি করে?

চাপা রোষে আরক্তিম হয়ে উঠল বেণীপ্রসাদের মুখ। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, কি করে এল তা শুনে আপনাদের কি হবে? যখন মন স্থির করেই ফেলেছেন—তখন বেশী কিছু বলে লাভ নেই। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি—শিকার করতে চলেছেন বুনো হাতী—কিন্তু মুখে পাইপ কেন? তামাকের গন্ধ ওরা মাইল তিনেক দূর থেকেও টের পায়—তাও কি জানেন না? গুণ্ডা হাতী শিকারের যদি বাসনা থাকে—পাইপটা এখানে রেখে যান। হেসে ফেললেন বেণীপ্রসাদ। আচ্ছা চলি আমি। কিন্তু মনে রাখবেন কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার করতে চলেছেন আপনারা।

কুমার বাহাদুর ফিরে চললেন। দেখা গেল পল্লী জনতার অধিকাংশ তাঁরই অনুসরণ করছে।

প্রাসাদের পাঠকক্ষে বসেছিলেন কুমার বেণীপ্রসাদ। হাতে একখানি খোলা চিঠি—টেবিলের উপর সেদিনের খবরের কাগজ। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে তিনি এক-একবার বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করছিলেন। গোপালজীর মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় সোনার কলস রৌদ্রকিরণে ঝক্‌ঝক্ করছে। কত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির রাজপুতানার মন্দিরের ঢংয়ে তৈরী করেছিলেন রাণী রুক্মিণী দেবী—ভাবতে চেষ্টা করলেন বেণীপ্রসাদ। গৃহদেবতা গোপাল জিউ। দৈনিক দেড়মণ চালের ভোগ—সঙ্গে নানা উপকরণ। রাণী রুক্মিণীর ব্যবস্থা চালু আছে—দীর্ঘ এক শতাব্দীর। অতিথি, অভ্যাগত, দরিদ্রজনের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা। কিন্তু এর পর? দৃষ্টি ফেরালেন কুমার বেণীপ্রসাদ রাণীসাগরের দিকে। বিরাট পুষ্করিণী টলমল করছে, নির্ম্মল জল। উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছের বেষ্টনী পাড়ের ওপর। প্রাচীন গৌড়ের ঐতিহ্য সুদীর্ঘ সরোবরগুলি দেখার পর পঞ্চাশটি বিরাট পুকুর কাটিয়েছিলেন নিজ জমিদারীর মধ্যে রাজা রমাপ্রসাদ। আবার দৃষ্টি ফেরালেন আর এক দিকে। দ্বিতল গেষ্ট-হাউস। কার্পেট মোড়া ফ্লোর, খাট পালঙ্ক, সোফা, কেদারা, ড্রেসিং টেবিল—আরাম ও বিলাসের উপকরণে নিখুঁত ভাবে সাজানো। কত গুণী জ্ঞানী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার এমন কি লাটসাহেব পর্য্যন্ত থেকে গেছেন এখানে। শেষবার কোন লাট সাহেব এসেছিলেন? বারোজ সাহেব। শ্রমিক লাট। মনে মনেই হাসলেন বেণীপ্রসাদ। আবার চোখ ফেরালেন অন্য দিকে। লম্বা একটানা পাকা দালান—পঁচিশটি প্রশস্ত দরজা। অশ্বশালা পূর্ব্বে পঁচিশটি অশ্বের হ্রেষারবে, ক্ষুরের শব্দে অশ্বশালা গম গম করত। কমতে কমতে এখন সংখ্যায় দুটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ দুটি তুরঙ্গম। কিন্তু চঞ্চলতা এখনও কমে নি। সমানে ক্ষুরের শব্দ করে চলেছে মেঝের উপর। পাশেই মোটর গ্যারেজ। দুখানি মোটরগাড়ী—ক্যাডিলাক, ডজ। যন্ত্রযুগের বাহন। কিন্তু গতির ঝড় যে ভাবে বেড়ে চলেছে কতদিন আর এর খাতির। ম্লান হাসলেন বেণীপ্রসাদ। ভাবলেন—গতি নয় প্র-গতি। আবার দৃষ্টি ফেরালেন কিছু দূরে বিশাল বটগাছের দিকে। পাশেই খাঁ খাঁ করছে শূন্য হাতীশাল। সর্ব্বশেষ তিলক বাহাদুর তিন বছর আগে ঐ বটগাছের তলায় সহসা লুটিয়ে পড়ে আর ওঠে নি। ঐখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। সেই মাটির উঁচু স্তূপের দিকে কিছুক্ষণ ছল ছল নেত্রে চেয়ে রইলেন বেণীপ্রসাদ। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুলিয়ে নিলেন—হাতে ধরা চিঠিখানার ওপর। রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন চিঠির উত্তর:

—প্রিয় বিমল, আমার চোখের সামনে তোমার খোলা চিঠি আর আজকের খবরের কাগজ। দুটির মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব যোগাযোগ রয়েছে যে প্রথমেই এর উল্লেখ করলাম।

এতক্ষণ আমি জানলার ফাঁক দিয়ে আমার শূন্য হাতীশালের দিকে চেয়েছিলাম। বটগাছের গুঁড়িতে বাঁধা থাকত—আমার শেষ পেয়ারের হাতী তিলক। কত শিকারের সঙ্গী ছিল সে আমার—বিপদসঙ্কুল অরণ্যে কত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে সে আমাকে। তার সমাধিস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম সেই সব কথা। চোখের জলে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।

বিমল, তোমার চিঠি যদি দুদিন আগে পেতাম, আমি কি জানতাম তোমার দিলবাহাদুর, কুলকুমারী, মহেশ্বর। রণসিং, চঞ্চলা আর তোমার কাছে নেই—তোমার বৃহৎ হাতীশালাকে তুমি নিজের হাতেই শূন্য করেছ। কত দুঃখে যে তুমি এ কাজ করেছ—সে ত আমি নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছি। আমি ত জানি কত যত্নে রেখেছিলে তোমার ঐ সঙ্গীগুলিকে আর কত ভালবাসত তারা তোমাকে। তোমাকে সামনে না দেখলে তাদের মুখের আহার উঠত না, বিমনা হয়ে থাকত সব। সেই তুমি বনবাসে দিয়ে

এসেছ তাদের। তাদের আদি নিবাসে। গভীর অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে তুমি অপরাধীর মত পালিয়ে এসেছ। ফিরে চাইতেও তোমার সাহস হয় নি। তোমার বুক ভেঙে গেছে—এ কথা বুঝতে পারি আমি।

কিন্তু ওদের আদি নিবাস আর কি ওদের ভাল লাগে? হয়ত তারা বনে জঙ্গলে তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে—তোমাকে দেখতে না পেয়ে তাদের চোখের জল পড়েছে, সেই চোখের জলে বনের মাটি ভিজে গেছে। তোমাকে দেখতে না পেয়ে তারা কেবল ছুটোছুটি করেছে—একবিন্দু আহারও তারা মুখে তোলে নি।

বিমল, আজকের খবরের কাগজ একবার চোখের সামনে ধর। কি দেখছ? বিশালকায় বন্য হস্তী শিকার করেছেন—এ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিস কমিশনার বিখ্যাত শিকারী মিষ্টার সেন মহকুমা হাকিম মিষ্টার অরিন্দম বোসের সহায়তায়। অন্য প্রদেশের জঙ্গল থেকে এসে দুটি বন্য হস্তী মধুগ্রাম মহকুমার প্রান্তদেশে নাকি অসম্ভব উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। পাঁচশ' বিঘা জমির ধান নাকি তছনছ করে দিয়েছে তারা। দরদী মহকুমা হাকিম সংবাদ শোনামাত্র হাতী শিকারের সুব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের প্রজারা তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। শিকারীর গুলীতে একটি মারা পড়েছে—আর একটি নাকি গভীর অরণ্যে পালিয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুজি করেও তার আর সন্ধান মেলে নি।

চেয়ে দেখ একবার ছবিটার দিকে। নিখুত শিকারীর পোষাকে রাইফেলধারী মিষ্টার সেন তাঁর পাশে দিগ্বিজয়ী মহাকুমা হাকিম অরিন্দম বোস। সগর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন নিহত হস্তীর সম্মুখে এই দুই বীর পুরুষ। মুখে তাঁদের বিজয়ের হাসি। দেশের একটা বড় কাজ করে ফেলেছেন তাঁরা।

বিমল, তোমার পেয়ারের দিলবাহাদুর আর নাই। তুমি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলে গভীর অরণ্যে। কিন্তু দিলবাহাদুর, ফুলকুমারীর আর কি বন ভাল লাগে! বহুদিনের অভ্যস্ত লোকালয় তারা ছাড়তে পারে নি—তাই ঘুরতে ঘুরতে আসতে চেয়েছিল লোকালয়ের মাঝে। বোধ হয় তোমারই খোঁজে অন্ধের মত আসছিল তারা। মহেশ্বর, রণশিং, চঞ্চলা কি করছে জানি না। হয়ত তারাও একদিন কোনও সখের শিকারীর যশ ও খ্যাতির খোরাক জোগাবে।

হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম। বুনো হাতী এসে ক্ষেতের পাকা ধান নষ্ট করে দিচ্ছে—এ শুনে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? দূরে থেকে দেখলাম, বিরাট দুই হাতী। একটি মাকনা আর একটি কুনকি। হ্যাঁ, আনন্দ হয়েছিল বৈকি! এমন শিকার কয়টি মেলে জীবনে? হাতী দুইটি রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে। কিন্তু খটকা লাগল। এক জায়গায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে দুটিতে। চেয়ে দেখলাম ধানক্ষেতের কোনও অপচয় করে নি তারা। পাকা ধান নষ্ট করার কাহিনী মিছে। এগিয়ে গেলাম আরও খানিকটা। আমাকে দেখতে পেয়েই শুঁড় মাথার ওপর তুলে অভিনন্দন জানাল। বুঝলাম বুনো নয়। একবার সন্দেহ হয়েছিল দিলবাহাদুর, ফুলকুমারী নয় ত? বিমল, তোমার চিঠি যদি দু'দিন আগে পেতাম।

ফিরে আসছি—সখের শিকারীর দলের সঙ্গে দেখা। নিষেধ করেছিলাম আমি। কিন্তু পদ গরিমায় স্ফীত হাকিম সাহেব আমার মত নগণ্য লোকের কথায় কর্ণপাত করবেন কেন? তাঁর পুলিসসাহেব বন্ধুর মনোরঞ্জন করতেই হবে ত? তা তিনি বন্ধুকৃত্য করেছেন। খবরের কাগজের পাতায় তার স্বাক্ষর রয়ে গেল।

তোমার আমার অনেক শিকারের সঙ্গী দিলবাহাদুর। একবার কল্পনা কর তার বিরাট দেহের কথা। গুলীবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে সেই বিরাট কলেবর। এই ঘটনাটাই ত আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অভ্রান্ত প্রতীক।

ধ্বংসের মুখে কলিকাতা ও আশপাশের শিল্পাঞ্চল

শ্রীকানাই ঘোষ

দামোদর নদের প্রাচীন ধারা পুরাতন দামোদরের সংস্কার অবিলম্বে এবং একান্ত ভাবে প্রয়োজন। অন্যথায় কলিকাতা, ২৪ পরগণা সহ মধ্য-পশ্চিম বাংলার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী এবং হাওড়া জেলার ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রাচীন দামোদরের সংস্কারকে ফরাক্কা বা গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সংস্কারের প্রয়োজন।

পাকিস্থান কাশ্মীর এবং খালের জল সম্পর্কে যে নীতি লইয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ সূচনা বলা যায়। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে গঙ্গা বাঁধ রচনায় পাকিস্থান কোনও মতে সায় দিবে না ধরিয়া লওয়া যায়—অবশ্য অন্য পন্থা ব্যতীত। এই অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে ভবিষ্যৎ সকল দিক দিয়াই অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে।

গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা নূতন নহে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ উইলকক্স যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি মধ্য বাংলার জেলাগুলির নদী-নালা, সেচ-ব্যবস্থা, জলপথ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য পদ্মা ও জলাঙ্গীর সঙ্গমস্থানের ভাটীর নিকট গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্ধারণ করেন এবং উহা নদীয়া বাঁধ রূপে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক তদানীন্তন ইংরেজ সরকার উহা কার্য্যকরী করেন নাই। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ বিভক্ত হওয়ায় নদীয়া বাঁধের স্থানটি পূর্ব্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সে কারণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একই প্রকার রাখিয়া ভারতবর্ষকে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া উহা মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা গ্রামের নিকট স্থির করিতে হইয়াছে। তাহাতে গঙ্গা বাঁধ নদীয়া বাঁধ হইতে ফরাক্কা বাঁধ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বাঁধ রচনার কার্য্য আজিও সুরু করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু দেশের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের জন্য এই বাঁধ রচনার কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা চলে না। যদি কোনও কারণে উক্ত গঙ্গা বাঁধ রচনায় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে কিংবা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে দেশবাসীকে নূতন পথে দেশের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতির কৃপার পাত্র হইয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্ষার দিকে চাহিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-ভূমি অলস হইয়া পড়িয়া থাকে। এক দিকে দেশে খাদ্যাভাব, অপর দিকে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠাম ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যাপক চাষের প্রধানতম অন্তরায় উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাব। গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কৃষি, জলবিদ্যুৎ, ছোট বড় সেচ খাল ও নদীগুলি উপকৃত হইবে। উহার দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবে। ইহা ব্যতীত বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতির সহিত নদীপথের যোগাযোগ দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সম্ভবপর হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না এই গঙ্গা বাঁধ রচিত হইতেছে ততক্ষণ উহা শুধু পরিকল্পনা ও স্বপ্নই হইয়া থাকিবে। সে কারণ বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দামোদরের পুরাতন গতিপথের সংস্কার করিয়া দামোদরের আংশিক উদ্বৃত্ত জলধারা ভাগীরথীতে ফেলিতে পারিলে বহুবিধ উন্নতি সম্ভবপর হইবে। ইহা ব্যতীত গঙ্গা বাঁধ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত দামোদরের জল অধিক না রাখিয়া ধীরে ধীরে পুরাতন পথে ভাগীরথী ত ছাড়িলে বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে, তাহাতে ক্ষীণস্রোতা ভাগীরথী খরস্রোতা না হইলেও সমুদ্রের লবণ জলের জোয়ারকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সেচ খাল ও ছোট ছোট নদীগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণ না হইলেও আংশিক জল সরবরাহ করিতে পারিবে, আশা করা যায়।

অগ্নির দাহিকা শক্তি অপেক্ষা নদীর ধ্বংসকারিতা প্রচণ্ডতম। বাংলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করিতেছে। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সহিত কত রাজধানী, কতশত জনপদ, প্রাচীন নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাম্রলিপ্তি সুপ্রাচীন কাল হইতেই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া খণ্ডের অন্যতম সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তৎকালে বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা মহারাজা, বহির্ব্বাণিজ্যকারী বণিক এবং ভ্রমণকারীগণ প্রধানতঃ এই তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়া ভারতবর্ষে আসিতেন কিম্বা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশ যাত্রা করিতেন। তাম্রলিপ্তি হইতেই জলপথে চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয় ইন্দোচীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি সমুদ্র পারের দেশে গমনাগমন করিতে হইত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রগামী বন্দররূপে ব্যবহৃত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪৩ অব্দে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এই বন্দর হইতেই ভগবান বুদ্ধের বাণী ও পবিত্র বোধিদ্রুম বৃক্ষশিশু শান্তি-কল্যাণ ও সৌভ্রাত্রের প্রতীকরূপে সিংহলে বহন করিয়া লইয়া যান।

পাল ও সেন যুগেও বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য তাম্রলিপ্তি প্রধান বন্দররূপে ব্যবহৃত হইত এবং গৌড় হইতে ভাগীরথীর জলপথে পাল ও সেন রাজপুরুষগণ তাম্রলিপ্তি গমনাগমন করিতেন। এই জলপথের উভয় কূলে পাল ও সেন রাজগণ কীর্ত্তিস্তম্ভ, মঠ, মন্দির, ধর্ম্মশালা, কূপ, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন ও খনন করিতেন। এই

শ্রেণীর কূপ (Ringwell) চানক (বারাকপুরের প্রাচীন নাম), বোড়াল প্রভৃতি গ্রামে দেখা যায়।

সরস্বতী নদীর মুখে সমুদ্রের বালি জমিয়া অষ্টম শতাব্দী হইতে নদীর অবনতির সহিত ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াখণ্ডের অন্যতম সুপ্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির অবনতি দেখা দিতে থাকে এবং মনে হয় তখন হইতেই ধীরে ধীরে সপ্তগ্রাম বন্দর প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নদীর স্রোত সরস্বতী হইতে সরিয়া যাইতে থাকে এবং সরস্বতী নদী তীরবর্তী সপ্তগ্রাম বন্দরটি ক্রমশঃই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সরস্বতীতে পলি জমিতে থাকে, এবং স্রোত ভাগীরথীর দিকে সরিয়া আসে। সে কারণ পর্তুগীজ বাণিজ্যতরীগুলি হুগলীর দিকে আসিতে পারিত না, তাহাদের গার্ডেনরীচের নিকট বাণিজ্যতরীগুলি হইতে অপর নৌকায় করিয়া পণ্যগুলি হুগলী পর্য্যন্ত বহিয়া আনিতে হইত।

সরস্বতী নদীতে জাহাজ চলাচলের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য খিদিরপুর রাজগঞ্জের নিকট হইতে সাকরেল পর্যন্ত ভাগীরথী ও সরস্বতীকে একটি খাল খনন করিয়া যুক্ত করা হয়। এই খাল খননের ফলে সরস্বতীর উত্তরাংশের এবং ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের গতি ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায় এবং উভয় নদীর তীরবর্তী প্রাচীন জনপদগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে উভয় অঞ্চলেই বহু প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার হইতেছে। কোন কোনও অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব আবিষ্কারও সম্ভবপর হইয়াছে— যেমন চানক (বারাকপুর), বোড়াল প্রভৃতি অঞ্চলে। ইহার দ্বারা উভয় অঞ্চলের গুরুত্ব সমধিক উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বর্তমান হুগলী নদীর (ভাগীরথী সহিত) দুইটি স্বতন্ত্র নদীকে একটি ক্ষুদ্র খাল দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। যেমন খিদিরপুর হইতে উত্তরাংশ ভাগীরথী, খিদিরপুর হইতে সাকরেল পর্য্যন্ত কাটা খাল এবং সাকরেল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতী। খিদিরপুর হইতে ভাগীরথী আদি গঙ্গা নাম লইয়া কালীঘাট, চুড়াঘাট, ধনঘাট, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামগুলির পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহামুনি কপিলের আশ্রমকে পশ্চিমে রাখিয়া সমুদ্রে মিলিত হইত।

গৌড়নগরী প্রায় সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরব্যাপী বাংলার রাজধানী হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিল। গঙ্গা নদী গতি পরিবর্তন করায় গৌড় নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় নগরীতে ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয়, তাহাতে মৃতদেহ সংকার করিবার কেহই ছিল না। রাজমহল সেই একই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শতাব্দী পূর্ব্বে নদীয়া নগরী ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আছে। ইহার উপর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নদীতে নদীতে সংগ্রামের অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ইতিহাস বাংলা দেশে আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর সুরুতে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যে মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ পরস্পর আত্মঘাতের জন্য দুর্দ্ধর্ষ আত্মঘাতী সংগ্রামে আরম্ভ হয়, তাহাতে গঙ্গার অবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া মূল ধারার পরিবর্তন হইয়া গড়াই মধুমতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়। ইহার দ্বারাও ইতিহাসের বহু রূপান্তর ঘটিয়া যায়।
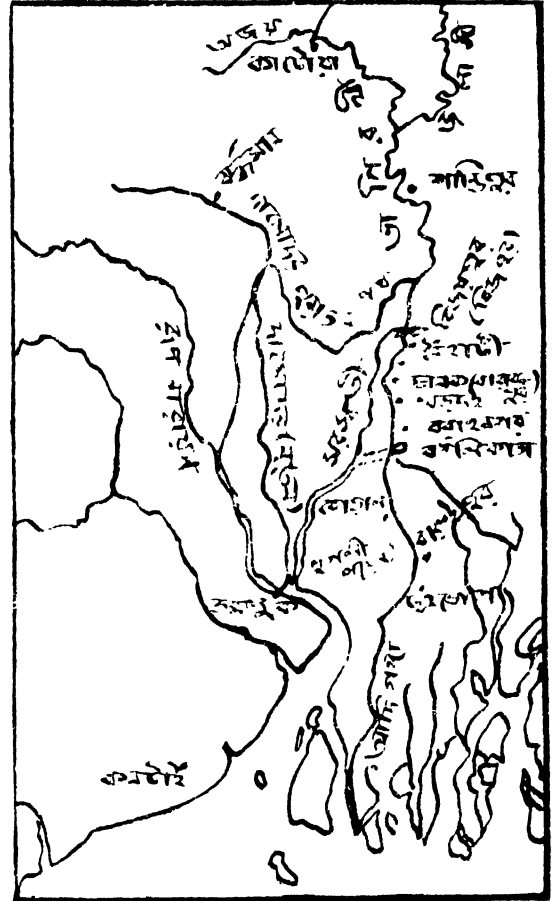
খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে মেগাস্থিনিস বর্ণনা করিয়াছেন, গঙ্গার মূল প্রবাহ চট্টগ্রামের নিকট কর্ণফুলীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইত। চট্টগ্রামের নিকট "চণ্ডীর" প্রথম প্রবক্তা মেধস বা মেধা মুনির আশ্রম আজিও বর্তমান আছে। কিন্তু পোটেলমি খ্রীষ্টীয় ১৫০ শতাব্দীতে বর্ণনা করিয়াছেন গঙ্গার মূল ধারা আদি গঙ্গা ও অপর কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হইয়া (সম্ভবতঃ ত্রিবেণীর নিকট হইতে সরস্বতী, যমুনা এবং ভাগীরথী বা আদিগঙ্গা) সমুদ্রে মিলিত হইত।

অবশ্য ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভাগীরথী জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা বা চুর্ণীর দ্বারা প্রচুর জলস্রোত লাভ করিত। তাহাতে মুর্শিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের জমির উর্ব্বরাশক্তি ও জলনিকাশি-ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নততর ছিল। এই নদীগুলির প্রচুর জল লাভ করিয়া ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীই সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ বলা যায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেই সরস্বতীর মুখে চড়া পড়িতে সুরু হয়। জাহাজ চলাচলের ক্রমশঃই অসুবিধার সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা ব্যতীত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর তাহার পুরাতন গতিপথ পরিবর্তন সূচনা হিসাবে জাহানাবাদের নিকট নূতন পথের সন্ধান সুরু করিতে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় জলধারা পরিষ্কার দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে দামোদরের মূল প্রবাহ বিপুল জলরাশি লইয়া কালনার নিকট সামান্য উত্তরে ভাগীরথীতে মিশিত। ভাগীরথীর সহিত দামোদরের জলরাশি মিশিয়া ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী হইতে সরস্বতী ও যমুনা যথেষ্ট পরিমাণে জল লাভ করিত। যমুনা হইতে নদীয়ার দক্ষিণাঞ্চল, যশোহরের আংশিক (বর্তমানে ২৪ পরগণার অংশ) এবং সমগ্র ভাবে ২৪ পরগণা জেলা উপকৃত হইত। যমুনার কয়েকটি ধারা—পদ্মা, (মরা পদ্মা), সোনাই (স্বর্ণবতী), নোয়াই (লাবণ্যবতী), সুঁটি (সন্ধ্যাবতী) প্রভৃতি নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে মিঠাজলের স্রোত বহন করিয়া আদি বিদ্যাধরী, মাতলা, পিয়ালী, আদিগঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইত। উপরের মিঠাজলের চাপ থাকায় সমুদ্রের নোনা জল উপরের দিকে উঠিতে পারিত না। কিন্তু দামোদর তাহার মূল ধারা কালনার নিকট হইতে সরাইয়া নারায়ণ গড়ের নিকট রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বর্তমান হুগলী তথা প্রাচীন সরস্বতীর নিম্নাংশের সহিত যুক্ত হয়। দামোদরের গতি পরিবর্তন ও ভাগীরথীর স্রোত সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিবেণী হইতে সাকরেল পর্য্যন্ত সরস্বতী এবং যমুনা নদী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সরস্বতীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যমুনা নদী ধ্বংস হওয়ায় ২৪ পরগণার অসংখ্য সেচ-খাল ও শাখা নদীগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপরের মিঠা জলের চাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় সমুদ্রের লবণ জলের জোয়ার আদি বিদ্যাধরি, মাতলা, পিয়ালী প্রভৃতি নদীগুলির মাধ্যমে ২৪ পরগণার বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। তাহাতে সমস্ত নদীর জল যেমন লবণাক্ত হইয়া ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে তেমনি চাষের পক্ষেও অব্যবহার্য্য হইয়াছে।

ভাগীরথীতে উপরের মিঠাজলের চাপের অভাবে পুনরায় আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসের পথে শিল্পাঞ্চল সহ কলিকাতা এবং মধ্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলাগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইবার সামান্য সময়ের ব্যবধানে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পত্তন হয়। গঙ্গার দক্ষিণমুখী গতির জন্য ভাগীরথী স্রোতবতী ছিল। কিন্তু, তাহাও বেশীদিন স্থায়ী হইল না; প্রাকৃতিক কারণে উত্তরবঙ্গের যমুনা স্ফীতি লাভ করায় গঙ্গার মূল ধারা দক্ষিণমুখী হইতে পূর্ব্বমুখী হয়। এই ঘটনায় ভাগীরথী মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গার মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, একমাত্র বর্ষায় বিচ্ছিন্ন অংশ যুক্ত হয়, কিন্তু বর্ষা শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নদীর পূর্ব্ব অবস্থা সুরু হয়। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলের নিকট বালির চড়া পড়িয়াছে এবং গঙ্গার পলি ঠেলিয়া ভাগীরথীর মুখ ক্রমশঃই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। মনে হয় গঙ্গার দক্ষিণমুখী স্রোতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীও তাহার ধারা পরিবর্তনের জন্য বর্ষায় ধুলিয়ানের নিকট নূতন পথের সন্ধান করিতেছে। যেমন দামোদর তাহার পুরাতন স্রোত-পথ ছাড়িয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। বর্তমানে ভাগীরথীর যে সামান্য স্রোত বজায় আছে তাহা অজয়, জলাঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদীর আংশিক মিঠাজল এবং সমুদ্রের প্রচুর লবণ জল মিলিত হইয়া বর্তমান স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

দামোদর পরিকল্পনার দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে দামোদরকে বাঁধিয়া তাহার উদ্বৃত্ত জলরাশি আটক রাখার জন্য রূপনারায়ণের সহিত পূর্ব্বে যে জলরাশি ভাগীরথীতে প্রবাহিত হইত বর্তমানে ভাগীরথী তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে; তাহাতে সমুদ্রের লবণ জল জোয়ারের সময় ভাগীরথীর বহু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। ইহার জন্য পলতা ও শ্রীরামপুরে অবস্থিত কলিকাতা ও হাওড়ার পরিস্রুত জল সরবরাহ কেন্দ্র লবণ জল হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। সে কারণ কলিকাতা ও হাওড়া সহ শিল্পাঞ্চলের পানীয় জল লবণ জলে পরিণত হইয়াছে। বজবজ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত অসংখ্য শিল্প-কারখানা রহিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগীরথীর লবণ-জল ব্যবহার করিতে হইতেছে। লবণজলের জন্য শিল্প-কারখানাগুলির যন্ত্রপাতি ক্ষয়জনিত ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। রেলওয়ে ইঞ্জিনে গোলযোগ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছে সে কারণ রেল কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতেছেন।

ভাগীরথী ও গঙ্গার সংযোগস্থলে চড়া পড়িয়াছে। মধ্যবর্ত্তি অংশে চড়া পড়িতেছে এবং সমুদ্র হইতে, জোয়ারের স্রোতে কলিকাতার দিকে ক্রমাগত প্রচুর বালি ঠেলিয়া আসিতেছে। সে কারণ জাহাজ চলাচল ক্রমশঃই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে, যদিও প্রতি নিয়ত নদীর মুখ বালি মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু উপরের জলের চাপের অভাবে জোয়ারের স্রোতে প্রচুর পরিমাণ বালি আসিয়া নদীর গর্ভদেশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বালি এবং সমুদ্রের লবণ-জলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য পূর্ব্বে দামোদরের যে পরিমাণ জল পাওয়া যাইত দামোদর পরিকল্পনার দ্বারা সেই সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্তন কিম্বা নদীর মুখে বালির চড়া পড়ায় যেমন তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রাম, হুগলী, কাশিমবাজার প্রভৃতি বন্দরগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তেমনি গঙ্গার দক্ষিণ অভিযান হইতে পূর্ব্বাভিযানের জন্য কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল সহ মধ্য পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গার পূর্ব্বাভিযানের জন্য ভাগীরথী ক্রমশঃই গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং নদীতে মিঠা জলের চাপ কমিতে থাকে তাহাতে সমুদ্রের

বালি নদীর মুখে জমিতে সুরু হয়। সে কারণ লর্ড ডালহৌসির সময় কলিকাতা হইতে বন্দর উঠাইয়া মাতলা নদীর মুখে পোর্ট-ক্যানিং শহরের পত্তন করিয়া বন্দর পত্তনের প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্মান ইঞ্জিনীয়ারের সাবধান বাণীর জন্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর আদেশে ক্যানিং শহরে বন্দর নির্মাণ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়।

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল সহ মধ্য পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা একমাত্র পথ নহে; কারণ উত্তরপ্রদেশে সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য গঙ্গার সহায়ক নদী ও গঙ্গা নদী হইতে প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাতে গঙ্গার প্রবাহ দামোদরের প্রবাহের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া কমিয়া যাইতেছে। সে কারণ ফরাক্কা বাঁধ নির্মিত হইলেই ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল সহ মধ্য পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী এবং ছোট ছোট নদী ও খালগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ মিঠা জল সেচ ও পানীয় হিসাবে পাওয়া যাইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ইহার সহিত জাহানাবাদের নিকট হইতে কালনার নিকট ভাগীরথী পর্যন্ত দামোদরের পুরাতন গতিপথ সংস্কৃত করিয়া দামোদরের অতিরিক্ত এবং আটক জল ভাগীরথীতে নিকাশ করিলে, ভাগীরথী হইতে ছোট ছোট নদী, খাল প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ মিঠা জলের স্রোত পাইয়া পূর্ব্ব-শ্রী ফিরিয়া আসিতে পারে এবং ভাগীরথীও লবণ ও বালির চাপ মুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যতদূর মনে হয় পাকিস্থান ফরাক্কা বাঁধের বিরোধী, সে কারণ ফরাক্কা বাঁধ সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সহায়ক না হইয়া স্বয়ং আর এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থায় একমাত্র বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে দামোদরের পুরাতন গতি পথ সংস্কার দ্বারা কলিকাতাসহ শিল্পাঞ্চলকে রক্ষা করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। অন্যথায় সমগ্র শিল্পাঞ্চলসহ কলিকাতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড় নগরীর জলনিকাশি ব্যবস্থাও ধ্বংস হইয়া যায়। নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় জলাশয় প্রভৃতি খনন করা হয় কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। নদীর পুরাতন গতিপথ মজা বিলের ন্যায় বদ্ধ জলায় পরিণত হয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা হইতে বর্ষায় প্রচুর জল তাহার পরিধি বিস্তৃত করে, নিকাশি ফলে ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। তাহাতে গৌড় নগরীর পরিবেশ দূষিত আবহাওয়ায় কবলিত হইয়া মহামারী সৃষ্টি করে। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মহামারী উল্লেখযোগ্য, গৌড় নগরীর সহিত কলিকাতার অবস্থা বিচার করিলে—অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াইয়াছে দেখা যাইবে। ভাগীরথীর উত্তর মুখে চড়া পড়িয়াছে, সমুদ্র মুখে লবণ জল ও বালি প্রবেশ করিতেছে; মধ্য পথে বারাকপুর হইতে সুখচর পর্য্যন্ত নূতন চড়া জাগিয়া উঠিতেছে। জোয়ারের সময় কোনও প্রকারে নৌকা পারাপার করা যায় কিন্তু ভাটার সময় নদীর এপার ওপার ব্যাপিয়া চড়া দেখা যাইবে। এই চড়া যদি নদী সংস্কার অভাবে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠে, তবে নদীর মধ্যপথে এক বিরাট ছেদ পড়িয়া নদী দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের খাঁড়ী নদীতে পরিণত হইবে।

ত্রিবেণী হইতে যমুনা নদী প্রচুর জলস্রোত লইয়া পূর্ব্বে ২৪ পরগণার নদী ও অসংখ্য খালগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ মিঠা জলের স্রোত প্রবাহিত করিত। ভাগীরথী সম্পর্কে নিম্ন উক্তি প্রদত্ত হইল:—

Francois Bernır says—There were on both sides of the Ganges (Bhagirathi) endless number of channels. These channels are lived on both sides with towns and villages thickly populated with Gentels. These islands vary in size but are extremely fertile surrounded with wood and abounding in fruits…"

—Travels in Moghul Empire. (1656-68)

যমুনা ধ্বংস হওয়ায় তাহার শাখানদীগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্যা দাঁড়াইয়াছে একদিকে হাজা-মজা, নদী-খাল ও অসংখ্য বিল সৃষ্টি করিয়া জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাইতেছে—অপর দিকে বর্ষার বিরাট জলরাশি নিকাশের অভাবে বিল জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া কৃষি জমি গ্রাস করিতেছে। এই সমস্ত বদ্ধ বিলগুলিতে দূষিত বায়ু ও রোগ জীবাণুর সৃষ্টি করিতেছে এবং এইগুলি কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া কণ্ঠহারের ন্যায় রহিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি বৎসরই মহামারী দেখা দিতেছে।

কলিকাতার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করিবার জন্য ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাড়দহের নিকট বিদ্যাধরীর মুখে বাঁধ দিয়া নদীর স্বাভাবিক স্রোত-ধারার সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দ্বিতীয় নিকাশিপথ ভাঙড় খাল খনন করিয়া বিদ্যাধরীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া নদীর স্বাভাবিক দক্ষিণ-মুখী গতিকে পূর্ব্বমুখী করা হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার তৃতীয় নিকাশি-ব্যবস্থা হিসাবে কৃষ্ণপুর খাল খনন করিয়া জোয়াল ভাঙ্গা ও পরাণচাপরাসী খাল দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় দক্ষিণমুখী গতি রুদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থবার কলিকাতার ময়লা জল নিকাশের জন্য যে খাল খনন করা হয়, তাহাতে পর পর তিনবার নদীগুলির স্বাভাবিক দক্ষিণমুখী গতি রুদ্ধ করিয়া নদীগুলিকে ধ্বংস করা হয়। নদীগুলি বর্ষার জল বহনেও অক্ষম হইয়া পড়ে। তাহাতে কলি-কাতার জল-নিকাশি ব্যবস্থারও অবনতি ঘটে। ইহা ব্যতীত কলিকাতাকে জলদান করিয়া বারাকপুর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়াছে এবং নৈহাটি হইতে দমদম পর্য্যন্ত অসংখ্য বিল সৃষ্টি করিয়াছে। পলতা-টালা পাইপ লাইনের জন্য তালপুকুর বা টিটাগড় খাল, বিশালাক্ষী খাল, খড়দহ খাল, গাড়ুভাঙা খাল, বাগজলা খাল, দেঁতের খাল প্রভৃতি ধ্বংস হইয়াছে। এই-

গুলি একদিকে ভাগীরথীর সহিত যুক্ত ছিল এবং নিয়মিত জোয়ার ভাটা খেলিত অপর দিকে বর্ষার জলরাশি বহিয়া আনিয়া ভাগীরথীতে নিকাশ করিত। জল সরবরাহের পাইপ লাইন অগভীর ভূপৃষ্ঠের মধ্য দিয়া পলতা হইতে টালা পর্য্যন্ত আনয়নের জন্ম খালের জলের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়াছে। এই ভাবে কলিকাতার সংলগ্ন ২৪ পরগণার বহু অঞ্চল দূষিত আবহাওয়া ও রোগবীজাণুর কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাইতেছে। অবিলম্বে ভাগীরথী সংস্কারের সহিত কলিকাতা প্রয়োজনে ২৪ পরগণার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী ক প্রয়োজন অন্যথায় কলিকাতাসহ ২৪ পরগণার ধ্বংস অনিবার্য্য।

পট পরিবর্ত্তন

শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

ছুতো-নাতা নিয়ে যখন-তখন প্রলয়কাণ্ড বেধে যায়। মারমুখী হয়ে ধেয়ে যায় এ ওর পানে। অশান্তির জ্বালা সব সময়ে আছেই মনের মধ্যে। নানা দিক থেকে আসে হাজারো সংঘর্ষ,—জ্বালা একেবারে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে দাউ-দাউ করে।

পাঁচ টাকা মূলধন পেলে নৈহাটী থেকে কয়লার গুঁড়ো এনে তা-ই নয় বিক্রি করত। দিনে দু-বার যাওয়া-আসা—দু-বস্তা গুঁড়োতে কম করে আট আনা পয়সা লাভ। পায়রাডাঙ্গার কত মেয়েছেলে পেটের জ্বালায় করছে ঐ কাজ। কয়লা পাওয়া যায় না—কলোনীর বাবুরা বাড়ী বয়ে এসে নিয়ে যায়। সে-ও করত ওদের মত। বিনা টিকিটে যেত সে-ও। কি করবে, যেমন কপাল করে এসেছিল।

ও বাড়ীর চিন্ময় বাবা—সে বুড়ো মানুষ না? গায়ে বুঝি তার অসুরের বল? সে করে কি করে! বিকেল বেলা গিয়ে ষ্টেশনে বসে। দেড় সের বাদাম ভাজা কাটায় না রোজ? বলি, কত রাত বসে থাকে সে? ন'টার মধ্যেই ত বাড়ী ফিরে আসে মাল কাটিয়ে। বার আনা, এক টাকা, কামায় সে। ওনারে বললে, শুনেই গায়ে জ্বর আসে।

উঠানের ওপরে রোদে মেলে দেওয়া সিদ্ধ ধান পা দিয়ে উল্টে দিতে থাকে সুভাষিণী, আর নিজের মনে গজরায়।

ঐ ধান ঢেঁকিতে ভানবে, মুড়ি ভাজবে, তা-ই বেচে কি-এমন সাত রাজার ধন ঘরে আসে যে, পাঁচটা মানুষের পেট চলতে পারে!

হারামজাদী, পোড়াকপালী মেয়ে আছেন ঘরে। মুড়ির খোলাটা ধরতে বলি, ঝামটা মারে মুখের উপরে—'আমি পারব না।' ওরে রাঢ়ী, হতচ্ছাড়ী, পারবি না যদি, যা তোর পেট নিয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যা।

হাড় বার করা, রোগা-জির-জিরে একটা গাই-গরু বাঁশের খুঁটির গোড়াতে বাঁধা। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এক আঁটি বিচুলি নাই যে, তাই সামনে ধরে দেয়। এখনও ঘাস কাটতে গেল না। সুভাষিণী জ্বলে উঠে। ভেংচি কাটে মুখে।

দুধ খাব, দুধ পাওয়ার চোপা কত! গরুটা না খেয়ে মরে যে, সে দিকে হুঁস নাই। তপস্যা করছ নাকি? বলি, উঠবে, না বসেই থাকবে সগ্যের দিকে হাঁ করে?

চাঁচের বেড়ায় গোঁজা কাস্তেটা তুলে নেয় গোকুল দত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে। উঠে দাঁড়ায়, মাথাটা ঘুরে যায়, চোখে অন্ধকার লাগে।

টেনে-মেনে আধসেরটাক দুধ হয় গরুটার। দুইবার সময় বাছুরটার জন্ম একবিন্দু দুধও বাঁটে রাখে না সুভাষিণী। ঐ আধসেরের দুধের সঙ্গে গুঁড়ো দুধ মিশোয়। জল ঢেলে দিয়ে করে এক সের।

রোদে পুড়ে এক ঝুড়ি ঘাস কেটে নিয়ে যখন গোকুল দত্ত উঠোনে এসে দাঁড়ায়, সুভাষিণী বলে, আমার মরণ হয় না কেন? বলি, বাজারে যাবে কখন? বাজার ভেঙে গেলেই খুব সুবিধে! দুধের ঘটি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেই হ'ল—বিক্রি হ'ল না। তখন কড়া ডুবিয়ে নিজেই খেও চক্-চক্ করে।

চামুণ্ডার মত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে সুভাষিণী। সারা বাড়ীটায় আগুনের হলকা ছড়িয়ে বেড়ায়। গোকুল দত্ত কট-মট করে চায় একবার তার দিকে। ইচ্ছা করে, হারামজাদীর গলায় কাস্তেটা দেয় বসিয়ে। কি একটা বলেও অস্ফুট স্বরে, বোঝা যায় না। গামছা মাথায় দিয়ে ঘটিটা তুলে নিয়ে বাজারের দিকে চলে যায়।

খড়ের ভাঙ্গা রান্নাঘরের পাশে এক টুকরো জমিতে খড়খড়া কয়েকটা ডাটা গাছ এখনও অবশিষ্ট আছে। তাই টেনে টেনে তুলতে থাকে সুভাষিণী।

—এর পরে আমার মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রাধিস। নিত্যি তিরিশ দিন ডাটা-চচ্চড়ি ভাত, তাও জুটবে না পাতে। বলি, ও ছাইকপালী, করছিস কি লো ধরে বসে? ঘরে যে জল নাই এক

কৌটা, তা খেয়াল আছে? পড়, পড়, গল্পের বই-ই পড়। মর তুই। ও-বই তোর চিতায় তুলে দেব।

কমলা তবু বা'র হয় না ঘর থেকে। কলসীটা তুলে নিতে ঘরে গিয়ে আর সহ্য হয় না সুভাষিণীর। মেয়ের হাত থেকে টান মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয় এক পাশে।

ঝটকা মেরে উঠে পড়ে কমলা। মাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বইটা সে তুলে নেয়। চুলগুলি তার আলুথালু, আঁচল গেছে খসে। ফুঁসে উঠে বলে, আমার গয়নাগুলি সব বাঁধা দিয়ে খেয়েছে রাক্ষুসী; আমার গয়না আমি আজই চাই। থাকব না আমি এ বাড়ীতে—যেখানে খুশী চলে যাব, যা ইচ্ছা তাই করব।

পাক দিয়ে ঘুরে এসে বিচিত্র ভঙ্গীতে মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে সুভাষিণী বলতে থাকে, যা, তুই যা। পোড়াকপালী, রাড়ী, মরণ হয় না তোর?

একদমে এতগুলো কথা বলে সুভাষিণী এবার হাঁপাতে থাকে। কলসীটাকে বাঁ পাশের কাঁকালে জড়িয়ে ধরে তার উপরে মাথা কুটতে বসে, বারান্দায় পা ছড়িয়ে।

বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। শুকনো সজনে গাছের ডালে একটা দাঁড়কাক কেবলই কা-কা করে পাখা ঝাপটায়। সুভাষিণীর কণ্ঠের দাপটে মাটিতে নামতে সাহস পায় না। কাঁদতে কাঁদতেই সুভাষিণী গোকুল দত্তের একপাটি ছেড়া চটি ছুড়ে মারে ওর দিকে—কাকটা ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে যায়।

সুভাষিণীর ছোট মেয়েটার বয়স দশ-এগার। দেখে মনে হয় নেহাৎ বাচ্চা। গায়ে মাথায় বাড়ে নি। শিশুর পর্যায়ে আজও থেমে আছে। যেমনই শান্ত, তেমনই নিষ্প্রভ। ঘরের পিছনে কয়েক ঝাড় কলাগাছ, আম-কাঁটালের ছোট ছোট চারা। জায়গাটা ছায়া-ছায়া। কবে একদিন সেইখানটা ঝাট দিয়ে ইট সাজিয়ে খেলাঘর করেছিল অমলা। ছেড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো মাটির পুতুল, নারকোলের মালায় কাদার তৈরী নানা রকমের পায়স-মিষ্টান্ন পড়েই আছে কাৎ হয়ে। অমলা আর খেলা করে না। শরীর ওর বাড়ন্ত নয়, মনের দিক থেকে বুড়ী হয়ে গেছে। মায়ের দুঃখটা ঐ বুঝি কিছুটা বোঝে। পাশে পাশে আছে ছায়ার মত। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচার নীচুটা বসে বসে পরিষ্কার করছিল এতক্ষণ। মায়ের অবস্থা দেখে এবার কাছে এল।

—ওমা, বেলা যে কত হ'ল, ভাত রান্না হবে না? দাও না কলসী, জল আনিগে। বলে হাত ছাড়িয়ে নেয় সুভাষিণীর। বাড়ীতে ওদের জলের বন্দোবস্ত নেই। একটু দূরে শ্রীধর সরকারদের বাড়ীতে টিউবওয়েল। মস্ত বড় কলসীটা কাঁকালে নিয়ে, ছেড়া তালি দেওয়া হাফ-প্যান্টপরা ছোট্ট অমলা জল আনতে যায়। কায়দা করতে পারছে না অত বড় পাত্রটাকে।

'মহুয়া মাতায় ঢোলক
দোলে পলাশের নোলক'—

চাকদায় সিনেমা দেখতে গিয়ে গানটা শুনেছে নকুল, চমৎকার লেগেছে তার। সেই থেকে গানটা তার গলায় লেগেই আছে। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে যখন তখন। স্কুলে যায় নি আজ। ইচ্ছা না হলেই যায় না। সকালে বেরিয়েছিল—'মহুয়া মাতায় ঢোলক' গাইতে গাইতে এখন বাড়ীতে ফিরছে। সার্টের কলার উল্টানো, প্যান্টের পকেটে দুই হাত ডুবানো।

বাইশ-বাই-বার সাইজের একটি আয়না কিনেছে নকুল। হালকা আর সস্তার ফ্রেমে বাঁধান, এক টাকা বার আনা দাম। ঘরে ঢুকলেই সামনে যে চাচের বেড়া, তাইতে টাঙিয়ে রেখেছে। চৌকাঠে পা দিয়ে প্রথমেই মুখখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয় কয়েকবার। তার পর পকেট থেকে চিরুনী বের করে জোরে জোরে চুল ফিরায়।

মরবে সুভাষিনী, মরবে। গলায়ই দড়ি দেবে। এ নাকি সহ্য হয় মানুষের! মরতে মরতে তবু সে সব করে। জিভ তার বেরিয়ে যায়।

গোয়ালের পাশে লঙ্কা-বেগুনের বীজ ফেলেছিল। তারই ত গরজ—তারই ত একলার পেট? এক ফোটা জল দেবে না কেউ। দু'বেলা জল ছিটিয়ে চারা তুলেছে। চারাগুলি লাগাবার উপযুক্ত হয়েছে কবে। বলে বলে মুখে তার ফ্যানা উঠে গেল। একটুখানি জায়গা কুপিয়ে চারাগুলি লাগাবার জন্য বলছে সে রোজ রোজ—কারও গ্রাহ্য নাই। না, ইষ্টদেবতা সোয়ামীর, না গুণধর পুত্রের। পাঁঠা এল এতক্ষণে রাজ্য জয় করে। ইস্কুলে গেল না, আজও বলেছিল সুভাষিনী। উড়ি-পুড়ি দক্ষিণ দুয়ারী লেগে যাক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক সব।

সাবান ঘষে ফুলেল তেল মেখে চান করে আয়। তোর উড়ে আজ ছাই বেড়ে দেব।

অনেক কামাই। পরীক্ষার ফল ভাল না। চাকদায় রোজ হাঁটাহাঁটি। একে ধরে, তাকে ধরে। হেড মাষ্টারের পায়ে ধরতেই শুধু বাকী রেখেছিল সুভাষিণী।

—বই কিনতে গবরমেণ্টের সাহায্য পঁচিশ টাকা কার দৌলতে মিলেছিল? একটা টাকা আমার হাতে দিল না। ফুলপ্যান্ট বানায়, হাওয়াই সার্ট বানায়—সাহেব সাজে। মায়ের পরনে ঝুলি ন্যাতা, আঠারো বছরের মর্দ্দ, সুপুত্র, একবার ফিরে তাকায় না তার দিকে।

—বেশী ফ্যাট-ফ্যাট কোরনা, হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। ঘাড় ফিরিয়ে গর্জ্জে ওঠে নকুল।

—কি কর্‌বিরে ড্যাক্‌রা, মারবি? আয়, তাই আয়। বাঁশ দিয়ে বাড়ি মেরে দে মাথা ফাটিয়ে। হাড় জুড়াক আমার।

মদ মানুষে খায়, আবার মদেও নাকি মানুষ খায়। মদে যাকে খেয়েছে, তার আর রক্ষা নাই। আলস্যও নাকি ঐ মদের নেশার মতই। দেউলিয়া মাতাল, সব যেতে বসেছে জেনেও, আবার মদ খায়। স্ত্রীর উপরে কি যে নির্যাতন হচ্ছে, বুঝেও গোকুল দত্ত চুপ করে বসে থাকে। কুড়েমীর কবলে গোকুল দত্ত ঐ মাতালের মতই অসহায়। লোভটাই কি তার কম!

নকুল ইস্কুল থেকে কিছু গুড়া দুধ পেয়েছিল। আধ সের গরুর দুধকে এক সের বানাতে জিনিসটা বাজার থেকে পয়সা দিয়ে কিছু দিন কিনতে হবে না—লাভটা কিছু বেশী হবে।

নজর পড়েছে তার উপর। মুখ ঝামটা খেয়েও গোকুল বলতে ছাড়ে না, আজ কাল ও দিয়ে পায়েস বেশ হয়। কর না গো এক দিন। কত দিন খাই না ও জিনিস।

রোজ রোজ শুনতে শুনতে, রাগ করেই আজ পায়েস রেঁধেছিল সুভাষিনী। দিয়েছিল ধমক্ মেরে সামনে এক বাটি।

সময়টা শীতকাল নয়, ভাদ্র মাসের গুমোট, গরমের সকাল। চেটেপুটে খেতে খেতে গোকুল তবু স্বপ্ন দেখেছিল।

তিন দিন খেঁজুর গাছকে জিরেন দিয়ে সদ্য কাটা সন্ধ্যার রস দিয়ে কি কৌশলে ছোট ছোট পাটালী তৈরী করত হাজারী সেখ। গুড় ত নয়, অমৃত! সুঘ্রাণে প্রাণ মাতোয়ারা! নামই হয়ে গেল তার হাজারী গুড়। নতুন বরণ ধানের আতপ চাল, বটের আঠার মত দুধ···

পৌষ মাসের সকালে মিঠে রোদে পীঠ দিয়ে হাজারী গুড়ের পায়েস খেতে কি যে আরাম! দেশের বাড়ীতে কত খেয়েছি। খাই—নকলই খাই এখন।

রোগা গরুটা গোয়াল ঘরের শুক্‌নো ছনের বেড়া সাবাড় করেছে। খড়ের সাধ মিটিয়েছে ছন খেয়ে।

চামুণ্ডা প্রায় ছিন্নমস্তার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এখন বেলা পড়ে এসেছে, রোদের তাত আর নেই। টিকতে না পেরে অগত্যা গোকুল উঠে পড়েছে। আড়ার ওপরে এক বোঝা পাট শোলা তোলা ছিল, নামিয়ে দিয়েছে সুভাষিনী। শোলা দিয়ে গোকুলকে আজই বেড়া সারতে হবে। কিন্তু সারার আগে কঞ্চি দিয়ে গরুটাকে কষে দু'ঘা দিল গোকুল।—আমার ভাগ্যে নকল পায়েস, তুই টেনেছিস শুকনো ছন, সাজাটা তোরও একটু হোক্।

বাড়ীটার আব্রু নাই। পূব-পশ্চিমে কচার বেড়ায় খানিকটা অবশ্য ঢাকা পড়েছে, দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা। সদর রাস্তা এবং ষ্টেশন ওই দিকে। একেবারে অবারিত দৃষ্টি।

কমলা কিন্তু এ বেলা কাজে নেমেছে। উঠোনের একপাশে শুকনো ঘুটে জড় করা, ঝুড়িতে তুলছিল বসে বসে। কে একজন নকুলের পাশে পাশে আসছে এই দিকপানে। নকুলের এক হাতে বড় একটা সুটকেশ, অন্য হাতে আর যেন কি কি সব। মস্ত বড় একটি ইলিশ মাছ ঝুলিয়ে আনছে সাথের মানুষটি।

—মা, মা, সোনাদা এসেছে, সোনাদা!

কমলা কাজ ফেলে কলকোলাহলে ছুটে গেল ছোট খুকীটির মতন। হন্ত-দন্ত হয়ে সুভাষিণী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—কার কথা বললি লো কমলি?···

রামলাল তখন উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

—এ্যা, রামলাল নাকি!

বেড়া বাঁধা ফেলে রেখে গোকুল থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

একবাটি লবণ ধার শোধ দিতে গিয়েছিল অমলা চিনুদের বাড়ীতে, সে এসে ভীতি-বিহ্বল ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সোনাদার অমি, আমাদের সোনাদা। কি বোকা!

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট বোনের ভাবখানা দেখে কমলা হেসে বাঁচে না।

—ষ্টেশনে বোঁচার সাথে গল্প করছিলাম, জান মা, সুটপরা সোনাদাকে চিনতে পারি নি আমি। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, তুই নকুল নাকি রে?

বলবার ভঙ্গিতে উল্লাস যেন উছলে পড়ছিল নকুলের। সুট পরিহিত না হ'লেও যে সে চিনতে পারতো না, এ আর তাহার মনে রইল না।

রামলাল এল আজ এ বাড়ীতে নূতন মানুষ হয়ে সাত বছর পরে। গোকুলের বড় ভাইয়ের ছেলে রামলাল। কাকা কাকীর কাছেই মানুষ, তাঁদের সাঙ্গেই এসেছিল এ দেশে। আর কেউ নেই তার। ভারী ডানপিটে আর বেপরোয়া। কাকার সঙ্গে শ্রীহীন এই বাড়ী করার সময়, কি ওর মনে হ'ল একদিন। কাউকে কিছু না বলে না কয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোথায়! যে রামলাল প্রায় মুছে গিয়েছিল সবার স্মৃতি থেকে, এমন স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়ে সে আজ ফিরে এল। বিস্ময়ের বাধা কাটতে চায় না। পশ্চিমের বিখ্যাত লোহার কারখানায় সে আজ এসিষ্ট্যাণ্ট ফোরম্যান। মাসে প্রায় পাঁচশ' টাকা রোজগার করছে।

'আমি জয়ী হয়ে ফিরলাম।' এ বার্ত্তা ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না। নিজের পরিমণ্ডলে যে দীপ্তি নিয়ে সে ফিরে আসে, সেই দীপ্তিই সে কথা জানিয়ে দেয়। রামলালের মুখ থেকে একটু একটু করে যে কথা পরে জানতে পারা যাবে, সে হবে শুধু কাহিনী। জানবার বস্তু দৃষ্টিমাত্রে জানতে পারা গেছে।

রামলালকে জোরে জোরে হাওয়া করছিল কমলা। তক্তাপোশের এক পাশে গোকুলও বসে আছে। বসার কায়দাটি আজ নূতনতর। হাত দুটি পিছনে হেলিয়ে তার উপর দেহভার রক্ষা করে যেন আয়াসে চেয়ারে বসে আছে। প্রসন্ন বিলাসের ভঙ্গীতে।

শান্ত ছোয়া লেগে ঘোমটা ঈষৎ সংযত হয়েছে সুভাষিণীর। অন্যের অলক্ষ্যে দু'তিনবার চোখের ইসারা করে গোকুলকে ডেকেছে। গোকুল দেখতেই পায় না। অবশেষে কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বলতে হ'ল, তুমি শোন ত একটু এদিকে।

আড়ালে কথা বলার সুন্দর আবশ্যকতা হঠাৎ অনুভব করেছে সুভাষিণী।

—তেল নেই ঘরে। অত বড় মাছটা এনেছে, রাত ত অনেক হবে রান্না-বান্নায়। পয়সা ধর, এক পোয়া তেল নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। বলে, আঁচলের খুট খুলছে।

কমলাকে বলল, মেজেটা ঝাট, জল-ছিট দিয়ে ঠাঁই-পিঁড়ি করত মা। রামুকে জল খেতে দিই।

গোকুল বোতল নিয়ে চলে যাচ্ছিল বাইরে, নকুল এসে সামনে দাঁড়াল।

—আপনি বসুন বাবা, আমি যাচ্ছি বাজারে। বাবাকে আজ বিশ্রাম দিতে চায় নকুল।

—এগুলি তুমি খুলে ফেল ত সোনাদা। মা গরম। সুটকেসের চাবি দাও, কাপড়-চোপড় বের করে দিচ্ছি।

কমলা তার সোনাদার ভার নিয়েছে সর্ব্ব রকমে।

হাঁড়িতে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, আরও নানা রকম মিষ্টি।

রামলাল বলল, কাকাকে কিন্তু বেশী করে দিও কাকীমা। কাকার মিষ্টি খাওয়ার সখ।

খুশীতে হা-হা করে হেসে উঠে গোকুল।

অমলা তার সোনাদার জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছিল। রামলাল তাকে হাত ধরে টেনে তুলল।

—তুই অমি, না রে? এই এতটুকু ছিলি। তোর জন্যে লজেন্স এনেছি, চকোলেট এনেছি।

আদর করতে থাকে ছোট বোনকে। অমলা আনন্দে দাদার কোলে মুখ লুকায়।

এ বাড়ীতে দৃশ্যান্তর ঘটেছে। সকাল বেলায় সজনে গাছের মরা ডালে যে দাঁড়কাকটা কর্কশ স্বরে কেবলই কা-কা করছিল পাখা ঝাপটিয়ে, সে হয়ত আবার আগামী কাল ফিরে আসবে। বসবে এসে প্রথমে ঐ গাছটিতেই। অমন ভাবে কেবলই সে আর কা-কা করবে না। বাড়ীর নূতনতর ভাবখানা লক্ষ্য করে এক সময়ে সাহস পেয়ে নীচে নেমে আসবে। শুধু এটোকাটা নয়, ভুক্তাবশিষ্ট মিষ্টির কণাও হয়ত খুঁজে পাবে। কেউ আর তাকে তাড়া করবে না।

কবি-প্রশস্তি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাত্রি শেষ, অন্ধকার ক্ষীণ হয়ে আসে;
দূর হতে ভেসে আসে সাগর কল্লোল।
তটবন্ধ ভাঙে বুঝি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে,
অশান্ত অন্তরে লাগে জীবনের দোল॥

তখনো তন্দ্রার ঘোর নয়নে নয়নে;
তোমাদের জাগরণ, যাত্রা-আয়োজন।
কে যাবে, কে যাবে সাথে, ডাকি' জনে জনে
তোমরা অজ্ঞাত পথে বাড়ালে চরণ॥

দীর্ঘ-প্রসারিত পথ আলোকে ছায়ায়,
নিশান্ত চাঁদের চোখে কোন্ স্বপ্নলেখা,
দিক্ হতে দিক্‌প্রান্ত ভরিল মায়ায়,
উদয়শিখরে বুঝি লাগে স্বর্ণরেখা॥

যুগ, দেশ পার হয়ে জীবনের বাণী
পশিল শ্রবণে আসি' সঙ্গীতের মত,
বাজিল কাব্যের বীণে কেমনে না জানি
পূরব-পশ্চিম-রাগ আচ্ছন্ন নিয়ত॥

মেঘে কার চলে রথ, হর্ম্ম্য স্বর্ণচূড়,
দুরাশার আলো জ্বলে কিরীটরতনে।
অতীত কাহিনী—তবু নহে, নহে দূর,
সে আলো জ্বলিছে আজো আমাদের মনে॥

স্বর্গের উদ্ধার লাগি' পণ দেবতার,
দধীচির আত্মদান—সে কি মিথ্যা আশা?
মেবারের ইতিহাস—বীর মহিমার,
অপূর্ব চারণ-গাথা—লুপ্ত কি সে ভাষা?

নবযুগকল্পনায় পুরাতন ছবি
ধরিয়াছে নব দীপ্তি চিত্তবিমোহন।
নূতন অমৃত তরে তোমরা হে কবি
করিয়াছ অন্তরের সমুদ্রমন্থন॥

আসন্ন প্রভাত তরে করেছ রচনা
পূজা-অর্ঘ্য। মুক্তিমন্ত্র গিয়েছ শুনায়ে।
সার্থক তপস্যা আজি। উষার সে গীতি
লক্ষ কণ্ঠ হতে ব্যাপ্ত প্রভাতের বায়ে।*

---

* মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল—এই কবিত্রয়ের উদ্দেশে।

অনুরূপা দেবী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

খ্যাতনামা স্বনামধন্য লেখিকা শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর কথা আমাদের নতুন করে বলবার কিছুই নেই। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি যে সাহিত্যসেবা ও সাধনা করেছেন তাতে তাঁর পরিচয় কারুর পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁর লেখা পড়েন নি বা নাম শোনেন নি এমন বাঙালী নেই বলা যায়।

মৃত্যুও তাঁর পরিণত বয়সেই হয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে বা কিশোরকালে যে লেখনী তিনি ধরেছিলেন তা আর থামে নি। আমরণ তিনি সাহিত্যসেবা করেছেন লোকানুরঞ্জন বা খ্যাতির মোহ না করেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠায় অনমনীয় নিজের আদর্শ অনুসারে এবং বলতে পারি তিনি প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন অগণ্য জনসাধারণের কাছ থেকে। তার পরিচয় ছড়ানো রয়েছে ঘরে ঘরে আমাদের বইয়ের তাকে আলমারীতে, লাইব্রেরীতে, সিনেমা ও নাট্যসাহিত্যে। সুতরাং আবার বলি, তাঁর পরিচয় আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই সময়ের লেখিকাদের সাহিত্য-সাধনার কথা—বলতে গেলে যা মনে পড়ে তা হচ্ছে তাঁদের সেই সেকালের সংস্কার কত বাধা কত বিধিনিষেধময় তাঁদের জীবনযাত্রার কথা। যাঁদের পিতামহীদের যুগে সংস্কার ছিল মেয়েরা লেখা পড়া শিখলে বিধবা হয়। বৈধব্যের আতঙ্ক ত কম কথা নয়, মেয়েরা ভয়ে ও পাড়ায় যেতে চাইতেন না, গুরুজনরাও যেতে দিতেন না। বেশী দিনের কথা নয় মাত্র দেড়শ' বছর আগেই এই সংস্কার ছিল। অবশ্য অনুরূপা দেবীর যুগের অনেক আগের কথা বলছি। কিন্তু এ সংস্কার সেদিনেও ছিল এবং নিরক্ষর নারীতে অন্তঃপুর ভরা ছিল যা অল্পবিস্তর আমরাও দেখেছি। আর বিয়ের বয়সেরও অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যেই যেন ঐ ব্যাপারটি চুকিয়ে নিতে পারলে ভাল হয় এই মনোভাব। লেখাপড়ায় বৈধব্যভয়ের সংস্কারটা যদি-বা এড়ানো গিয়েছিল কিন্তু বিয়ের বয়সের নিয়মের বাধা সেদিনেও ছিল।

সুতরাং 'কন্যাকাল'টি মাত্র দশ বছরে শেষ করে বধূ-জীবনের সীমানায় এসে পড়তে হ'ত। তারই মাঝে কেউ কেউ যে ভাবে হোক কিছু কিছু লেখাপড়া শিখতেন, চর্চ্চাও করতেন। কিন্তু সে চর্চ্চা নিন্দনীয় ছিল বলে তা করতে হ'ত সঙ্গোপনে। এমনি ভাবেই সেযুগের মানকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী প্রমুখ লোথকারা লেখাপড়া শিখেছেন ও কবিতা লিখে উৎসাহী বন্ধুদের দ্বারা তা প্রকাশও করেছেন। একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, আমাদের দেশের মহিলা রচিত কাব্যের বা কথা সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র একশ' বছরের। তার আগে মেয়েদের লেখা আধুনিক ধরণের উপন্যাস-গল্প দেখা যায় নি। যার কারণ ঐ বলা যায় নিরক্ষর মেয়ে বা সামান্য লেখাপড়া জানা মেয়েরা কি আর লিখবেন। বড় জোর তাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ মাত্র পড়তে পারতেন। মেয়েদের লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাস-গল্প দেখা গেল স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায়। যাঁর কথা ও নাম সকলেই জানেন। তাঁর জন্ম হয় ১৮৫৫ সনে প্রায় একশ' বছর আগে। তিনিও কম বয়সে বিবাহিতা ছিলেন। স্কুলে কিছুদিন পড়ে থাকবেন। কেন না 'জীবন-স্মৃতি'তে দেখি ছোড়দি বেণী দুলিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠতেন। কিন্তু তাঁরও কম বয়সেই বিয়ে হয়েছিল তেরো-চোদ্দর আগেই।

অনুরূপা দেবীরও বিয়ে হয় ১০ বছর বয়সে। বিখ্যাত পণ্ডিত লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ ছিলেন। লেখাপড়া বাল্যেই কিছু শিখেছিলেন। কিন্তু সে শৈশবের শিক্ষা, পরিপূর্ণ মানুষের শিক্ষা নয়। কাজেই মনে হয় কন্যা ও বধূ-জীবনের নানা কর্ত্তব্য ও কাজকর্ম্মের মাঝে, গৃহ-জীবনের পানসাজা ভাঁড়ার ঘরের কাজ, ভাই-বোন, দেবর-ননদ সমাযুক্ত দুটি বৃহৎ পরিবারের কত ছোট বড় সংস্কার ও কাজের মাঝে তিনি নিজের চেষ্টায় আরও লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং লেখার চর্চ্চা সুরু করেছিলেন।

সেই চর্চার ফলে কোথাও কোথাও কয়েকটা ছোট গল্প ও অন্য লেখার পর একটি উপন্যাস বেরুল স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত "ভারতী"তে 'পোষ্যপুত্র' নামে এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। লেখিকা প্রথম কয়েক সংখ্যায় নাম দেন নি, পরে যখন নাম দিলেন তখন লোকে বিশ্বাস করতে চায় না মেয়েদের লেখা। তাতে নামটিও তখনকার সর্ব্বসাধারণের মত নয়। ঝরঝরে চমৎকার ভাষায় লেখা, কল্পনাও নিজস্ব, রচনাভঙ্গীও পরিচ্ছন্ন, আদর্শের ধারাও নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে এনেছে। সে সময়ে এমন লেখা নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর পর দু'জন এসে-

ছিলেন—অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী। দুজনেই সমসাময়িক এবং উভয়ে পরম বন্ধুত্বসূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যা হোক, অনেকেই বললেন, এ লেখা নারীর ছদ্মনামে পুরুষের। সেটাও তাঁর অন্যতম প্রশংসাপত্রই বলা চলে। তাঁর লেখা পানসে, জলো বা একঘেয়ে মেয়েলী লেখার মত নয়।

এর পরে তাঁর বহু লেখা—'বাগদত্তা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'মহানিশা', 'রামগড়', 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি উপন্যাস "ভারতী", "ভারতবর্ষ" এবং অন্যান্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি স্বনামধন্যা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বর্ণকুমারী দেবীর পর নারী-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তিনি প্রধানতম ও বিশিষ্ট লেখিকা হয়ে আছেন।

তাঁকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রথম দেখি একটি সরস্বতী পূজার সভায়। তখন তিনি মজঃফরপুর ছেড়ে কলকাতার ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে বাস করছেন। তাঁর বড় ছেলে অম্বুজবাবু সঙ্গে এসেছিলেন। মা ও পুত্র দুজনেই তখন পৌত্রীবিয়োগে কাতর ও শোকার্ত্ত। দু'চারটি কথা হ'ল, তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। দেখলাম, সমসাময়িক লেখিকাদের নাম ও তাঁদের লেখার খোঁজখবর রাখেন। তখনও পর্দ্দার যুগ, এখনকার মত রাস্তায় বেরুনোর স্বাধীনতা মেয়েদের ছিল না। কোথাও যেতে হলে নানা ঝামেলা—গাড়ী চাই, সঙ্গী চাই, সঙ্গীর অবসর থাকা চাই। সেইজন্যে দেখাসাক্ষাৎ করা তখন আর হয়ে ওঠে নি।

পরে অবশ্য কয়েকবার দেখেছি, ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে একবার। অন্যবার তাঁর বোনের বাড়ীতে—যেখানে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং আর একবার দেখেছি—'বসুমতী'র 'দেবী আসরে' তাঁর একটি সম্বর্দ্ধনা সভায়। বহু মহিলা এসেছিলেন। চমৎকার নিরহঙ্কার সৌজন্যময় ব্যবহার যেমন বাড়ীতে, তেমনি সভাতেও। প্রায় সব লেখিকাকেই চিনতেন। কারুর নামে, কাউকে-বা ব্যক্তিগত ভাবে। সেদিনের সভায় সকলের সঙ্গেই মধুর সহজ সৌজন্যে ও স্নেহে আলাপ করলেন। খ্যাত, অখ্যাত বহু লেখিকাই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠা এবং গুণমুগ্ধা, এঁরা তাঁর 'উত্তরকালিনী'র দল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও সামাজিকতার এঁরা বিশেষ পক্ষপাতী। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁর সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চরিত্রের স্নেহমধুর দিকটির যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা আজও ভুলি নি।

সমাজ-সংস্কারের অনেক ক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীল পন্থী ছিলেন। হিন্দু কোড বিল তিনি সমর্থন করেন নি। যার ভাল মন্দ ফল এখনই বিচার করা এবং নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু যখন 'বিল' পাস হয়ে গেল তখন তিনি নীরবে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য আমরা অনেকেই এই বিলের সমর্থক ছিলাম, তাও তিনি জানতেন। কিন্তু তাতে তাঁর ব্যবহারে হৃদ্যতার অভাব হয় নি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় বললেন, "অনুরূপা দেবীর সাহিত্যজীবন তাঁর পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শের ভাষ্য...' তা খুবই সত্য মনে হ'ল। তাই হয়ত জীবনের শেষ দিকে তাঁর সাহিত্য খানিক প্রচারধর্ম্মীও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে সাহিত্য ক্ষেত্রে। তিনি এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শবাদে কারুর অনুসরণ বা অনুকরণও করেন নি। সাহিত্য, জ্ঞান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে অনুরূপা দেবী যে অটল অনমনীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সে যুগটা শেষ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও বলতে হচ্ছে যে, অনুরূপা দেবীর মৃত্যু হয়েছে গত ৬ই বৈশাখ। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম, সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তাঁর একটি শোকসভা হবে—তাঁর লেখা, তাঁর আদর্শ, তাঁর সৃষ্টির আলোচনা করে ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। যা অন্যান্যদের বেলায় হয়েছে। বলা বাহুল্য, তা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, এক সময়ে তিনি কোন লেখিকার কাছে বলেন যে, 'আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মাঝে বা পরে অসংখ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে আজও নারী সাহিত্যিকদের যেন গণ্যই করা হয় না' এমনি ভাবের কথা।

কঠোর সত্য কথাই বলেছিলেন তিনি। জনসাধারণের মধ্যে অনুরাগী পাঠক থাকলেও সাহিত্যিক সমাজে তাঁরা আজও উপেক্ষিতই রয়ে গেছেন। অবশ্য অনুরূপা দেবীর তাতে এমনকিছু ক্ষতি হয় নি, বরং আমাদেরই অকৃতজ্ঞতা তাতে প্রমাণ হয়।

তবু আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ যে এই সভার আয়োজন করেছেন সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এই উপলক্ষে আমিও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পেরে ধন্য হলাম।*

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত অনুরূপা দেবীর স্মৃতি সভায় পঠিত

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

দেশাই ষ্টুডিওতে আমন্ত্রণ তাঁদের কাছে খুবই লোভনীয়—তাঁদের আনন্দ দেওয়ার সব ব্যবস্থাই নামুভাই কল্লেন, পরিবর্ত্তে লোহার পারমিট, কয়লার কণ্টাক্টগুলো স্বল্লায়াসেই এসে পড়ে, খুব কষ্ট করতে হয় না। অপরপক্ষে কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলির পর একটু চিত্তবিনোদনের সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই বা কম কি ?

ব্যয় করতে নামুভাই দেশাই সব সময়ই প্রস্তুত। তবে তার লাভ চাই। যা দেবে তার চেয়ে বেশী চাই। যারা কোম্পানীতে কাজ করে তারা সেটা জানে সুতরাং সবাই সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর অকস্মাৎ আপ্যায়নের ক্ষেত্রটা বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় নামুভাইয়ের। ব্রিটিশ যুগে কিন্তু প্রতিবিধান ছিল। আর কিছু না হোক, কাজগুলি ঘড়ির কাঁটার মত হয়ে যেত, ঠেকে যেতে হ'ত না। আপিসের মধ্যে ছিল শৃঙ্খলাবোধ আর পরিচ্ছন্নতা! আর এখন? নিয়মকানুন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, বিশৃঙ্খলার মেলা বসেছে যেন। প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে, কে কত ভাবে নিয়ম আর শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে! যে কোন আপিসের মধ্যে গিয়ে একবার তাকালেই পার্থক্যটা রূঢ়ভাবে চোখে পড়ে। আপিসের দেওয়াল থেকে শুরু করে মেঝে অবধি সব স্থানেই পানের পিক, পোড়া বিড়ি, সিগারেটের দগ্ধাংশ, শালপাতা সবই পাওয়া যায়। টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক সর্ব্বত্রই ধূলি-ধূসরিত। দরজায় কিন্তু অনেক সময় পর্দা দেওয়া থাকে। নারিকেল দড়িতে বাঁধা রং-ওঠা শতচ্ছিন্ন পর্দাগুলো আপিসের সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে বোধ হয়। আপিসের ভিতর দিবারাত্র যে কলরোল লেগে রয়েছে, তাতে কাজের কথা ছাড়া অন্য সব রকমের আলোচনাই শোনা যায়।

যেমন—ওধার থেকে চীৎকার করলেন একজন, কি দাদা, কি রকম হ'ল ?

এদিকের দাদা উত্তর দিলেন, রকমভা আবার কি ?

কি রকম ভটাভট্ চারটে গোল ইষ্টবেঙ্গলকে ঠুকে দিলে ?

আরে রাখো রাখো, পরের মুখে আর ঝাল খাইও না, তোমার মোহনবাগানের কতই ত মুরোদ দেখলাম।

কিংবা আর একজন হয়ত বললেন, কি হে বিমল, কাজ করতে আজ আর ভাল লাগছে না ?

কেন ? ভালমানুষের মত মুখে জিজ্ঞাসা করে বিমল।

আবার কেন—ইনসপিরেসান অনুপস্থিত এ কাজ করতে কি আর ভাল লাগে!

কি যে বলেন। মৃদু আপত্তি জানায় বিমল।

অমিতার কি হয়েছে বল ত ?

তা আমি কি করে জানব ? সলজ্জ বিনীত ভাবে উত্তর দেয় সে।

তুমি জানবে না ত কি ও-পাড়ার মতিখুড়ো জানবে ? সমবেত কণ্ঠের অট্টহাসি শোনা যায়।

এসবে আপত্তি ছিল না নামুভাইয়ের, কিন্তু কাজের কথা উত্থাপন করলেই কেরাণীবাবু থেকে অফিসার পর্য্যন্ত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে দার্শনিক দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দশবার প্রশ্ন করেও কথার উত্তর পাওয়া যায় না। পরে অবশ্য যথারীতি দাওয়াই দিলে মুখ বেশ দরাজ ভাবেই খুলে যায়। চক্ষুলজ্জার কোন বালাই নেই, দুষ্কৃতির জন্যে অনুতাপ নেই, অকর্ম্মণ্যতার বা অমর্য্যাদার কোন গ্লানি ওদের যেন স্পর্শই করে না। নিজের সহকর্ম্মী থেকে সুরু করে দেশের সকলেই যে অপদার্থ সেকথা বারম্বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে ওরা বোধ হয় আত্মপ্রশংসার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ওদের লোভ পরস্ত্রীর সঙ্গলাভ থেকে সুরু করে লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পর্য্যন্ত। পরের ছিদ্র অন্বেষণ সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান অতলস্পর্শী। উর্দ্ধতন অফিসারের কাছে সহকর্ম্মীর নামে চুকলী কাটাই ওদের ধর্ম্ম। পাড়ার সার্ব্বজনীন পূজার নিমন্ত্রণ-পত্রে কার্য্যকরী সমিতির টিকিটে নিজের নাম ছাপা হলে ওরা যেন কৃতার্থ হয়। টিউবার কিউলিসিস কিংবা 'রেডক্রশ ডে'তে কয়েক আনা পয়সা দিয়ে বক্ষে পতাকা শোভিত করে নিজেকে ওরা দানবীর ভাবে। এসব গুণ নামুভাই ওদের মধ্যে খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করেছে। এক দিক দিয়ে নামুভাই খুশী হয়েছে। বাঙালীর ভেতর কেরাণীর সংখ্যা অর্দ্ধশিক্ষার মতই যে প্রচুর, সে কথা সে জানে। মেরুদণ্ডহীন এই জাতটার দিকে তাকিয়ে নামুভাই যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

যখন কোম্পানীতে লোক নেওয়া হয় তখন বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়ে তবে তাকে চাকরী দেওয়া হয়। দেশাই ফিল্মসের জন্যে পরিচালকের দরকার হওয়াতে অনেক অনুসন্ধান করার পর তবে ধীরেন ভড়কে বহাল করা হয়েছে। ধীরেন ভড় ফিল্ম লাইনে অনেক দিন আছে, পরিচালক হিসেবে নাম যত না থাক, এই ব্যাপারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। তার চেয়ে বড় একটা গুণ আছে সেটা হ'ল ফিল্ম সংক্রান্ত সব লোকের সঙ্গে আলাপ। কাকে ধরলে কোন্ কাজ সহজে হাসিল হয়, কোন্ কান টানলে কোন্ মাথা এগিয়ে আসে তা সে বিলক্ষণ জানে। এর আগেও সে কয়েকটা কোম্পানীতে কাজ করেছে কিন্তু বাঁধা মাইনে একটা চাই ত, সে হিসেবে দেশাই ফিল্মের কাজটা মন্দ নয়। ধীরেন ভড়রা কলকাতায় অনেকদিন এসেছে—প্রায় বন কেটে বাস বলা চলে, পূর্ব্বে অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তাদের নিজের বাড়ী ছিল উত্তর কলকাতায়। সেখান থেকে বহুদিন আগে বাস উঠে গিয়েছে। উপস্থিত সে খিদিরপুরে বসবাস করে। বহু পুরানো একতলা বাড়ী। রোদ বা হাওয়ার চিহ্ন নেই। নোনাধরা দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে আর বাড়ীর আবহাওয়া গুমোট। ধীরেন ভড়ের পারিবারিক জীবনের পক্ষে পরিবেশটা খুব মানানসই হয়েছে।

ধীরেন ভড়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুটি কন্যা রেখে মারা গেছেন, তার পর অপর্ণাকে বাঁকুড়া থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসে ধীরেন ভড়। সে এক মজার ব্যাপার, মেয়েরা হঠাৎ একদিন দেখলে বাবা নতুন মা নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। বড় মেয়ে সবিতার বয়স বছর সতের আর নমিতার তের। অপর্ণা পল্লীগ্রামের মেয়ে, কলকাতার হালচাল জানা ছিল না, প্রথম প্রথম তাই বেশ অসুবিধা হ'ত, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে দু'মেয়েকে আপন করে নিল। তার পর সম্প্রতি নিজেরও একটি ছেলে হয়েছে তার নাম টুকুন। ছেলেমেয়েদের থেকে ধীরেন ভড়ও যেন স্বতন্ত্র। স্ত্রী হিসেবে অপর্ণাকে ভালই বলা চলে, তবে দোষের মধ্যে ঝগড়া করতে ভালবাসে সে। ধীরেন ভড়ের সে গুণ আছে, সুতরাং জমে ভাল।

সেদিন ধীরেন ভড়ের আপিস থেকে ফিরতে একটু দেরিই হ'ল। ধীরেন ভড়ের প্রত্যাশায় সকলেই অপেক্ষা করে। ফিরলে উত্তেজনার অভাবে গোটা বাড়ীটা যেন মিইয়ে থাকে, সবিতা, নমিতা, অপর্ণা এমনকি প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত অধীর আগ্রহে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। সেদিনও সকলে অপেক্ষা করছিল।

ওই যে আসছে। জানালা দিয়ে দেখে সবিতা মাকে ধীরেন ভড়ের আসার সংবাদটা দিলে।

আজ কি বার রে? জিজ্ঞেস করলে অপর্ণা।

শনিবার। ছোট্ট করে উত্তর দিলে সবিতা।

হুঁ, তা হলে ত আসতে একটু দেরী হবেই, রেস আছে কিনা।

ধীরেন ভড়ের অনেক গুণ।

আজ মাইনে পাবার দিন না? উসকে দিলে সবিতা।

কবে যে মাইনে পায় আর কবে যে পায় না তা এই দশ বছরেও বুঝলাম না মা। স্বয়ংক্রিয় মনকে একটু তাতিয়ে নিলে অপর্ণা।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল।

সবি আবার কোথায় গেলি?

নমিকে দরজাটা খুলে দিতে বললাম।

টুকুনকে নিয়ে ও-ঘরে শুইয়ে দে। সবিতা টুকুনকে নিয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দিলে।

যুদ্ধক্ষেত্র উপযুক্ত পরিমাণে উন্মুক্ত রাখতে হবে। প্রতিযোগীদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। অসুবিধা হলে লড়াই ভাল জমবে না। সবিতা, নমিতা পাশের ছোট বারান্দায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক খেলার পূর্ব্বের অপেক্ষমান দর্শকের মত।

উঃ, যা শীত। বলতে বলতে ধীরেন ভড় ঢুকল ঘরের ভেতর।

টাকা কই? ঠাণ্ডা গলায় অপর্ণা প্রশ্ন করল।

কিসের টাকা? ধীরেন ভড় বাতাসে যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছে।

আহা ন্যাকা, টাকা কিসের? মুখের কাছে হাত নেড়ে অপর্ণা ভেংচি কাটলে—মাইনের টাকা কোথায়?

আজ মাইনে হয় নি। ধীরে-সুস্থে জামাটা খুলে ধীরেন ভড় আলনায় রাখলে। সবি, একটু চা করত মা। প্রসঙ্গের মোড় ফেরাতে প্রয়াস পায় ধীরেন ভড়, আবহাওয়াটা হাল্কা করতে চায় সে। স্নায়ুযুদ্ধের শেষ হলেই মঙ্গল, ঠাণ্ডা যুদ্ধ গরমে পরিণত হতে দেরী হয় না—এ অভিজ্ঞতা তার আছে।

ল্যাকটোজেন কৈ? আবার আক্রমণ।

টাকা পেলে আনব। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় ধীরেন ভড়। কৈ রে চায়ের জল চাপালি? চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

ততদিন কি তোমার ঐ টেকো মাথাটা খাবে ছেলে?

কেন গরুর দুধ দিলেই ত পার। যেন যুদ্ধমান বলীবর্দ্দ সিং ও ক্ষুর দিয়ে ধুলো ওড়াচ্ছে।

তাতেও পয়সা লাগে, অমনি হয় না, বুঝলে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পয়সা লাগে জানি। এবার চীৎকার করে উঠল

ধীরেন ভড়—সে পয়সা আসে কোত্থেকে ? তোমার বাবার জমিদারী থেকে ?

আমার বাবার জমিদারী থাকলে কি আর তোমার মত অখাদ্য বুড়োর হাতে পড়তাম।

অনেক বরাত ভাল তাই—

হ্যাঁ, তা আর বলতে! এক পাক ঘুরে গেল অপর্ণা—পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, আহা কি আমার বরাত রে।

বাপের বাড়ীতে কি জুটত ? সোনার থালায় পরমান্ন ?

না, মোটা ভাত মোটা কাপড়, পরমান্ন নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় অপর্ণা—কিন্তু সেখানে ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন আর বাইরে কোঁচার পত্তন নেই। অমন বার-ফট্টাই নেই। পরিবারকে, ছেলেকে খেতে না দিয়ে তারা বাইরে বুড়ো বয়সে ধ্যাতাং ধ্যাতাং করে নাচে না বুঝলে ? ধীরেন ভড়ের নাকের গোড়ায় অপর্ণা সজোরে হাতটা এগিয়ে আনলে। মাথাটা যদি ঠিক সময়ে না সরিয়ে নিত ধীরেন ভড় তা হলে হাতটা নাকের ওপর রীতিমত জোরেই এসে পড়ত।

ভিখিরীর আস্পর্দ্ধা দেখ, নাকটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে তাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলে ধীরেন ভড়।

ওরে আমার রাজরাজেশ্বর রে। দু'হাত কোমরে দিয়ে আবার এক পাক ঘুরে গেল অপর্ণা, "ভাত-কাপড়ের মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই", ঘরে যার অতবড় সোমত্ত মেয়ে সে কিনা বায়স্কোপের মেয়েছেলেদের নিয়ে ঢলাঢলি করে—ছিঃ ছিঃ, ধিক্ ধিক্।

খবরদার ছোটলোক মেয়েছেলে, মুখ সামলে। এক লাথিতে মুখ ভেঙে দোব ? সোজাসুজি আক্রমণ সুরু হ'ল এবার।

মার না মার, দেখি কত বড় সাহস, কত বড় বুকের পাটা, একবার দেখি ? বড্ড প্রাণে লেগেছে না ? রোজ রাত্রে মদ গিলে এসে এইরকম ফুটুনি করবে। আ মরণ! 'সভায় গিয়ে পায় না ঠাঁই, ঘরে এসে বৌ কিলাই'। বুড়ো ঘাটের মরা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। বাহার দেখ না, কোট-প্যাণ্টুল পরে' ছোকরা সেজে বায়স্কোপের মেয়েছেলেদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি হচ্ছে।

স্ফূর্ত্তি করলে কি এতদিন বেঁচে থাকতিস, না তোদের চিহ্ন থাকত ?

সাত জন্মের পোড়াকপাল তাই তোমার হাতে পড়েছি।

বেশ কিছুক্ষণ চলল, আশপাশের সকলেই হাতের কাজ ফেলে উন্মুখ হয়ে রস গ্রহণ করতে লাগল। অলক্ষ্যে থেকে সবিতা, নমিতাও নিত্যনৈমিত্তিক উত্তেজনায় অংশ গ্রহণ করলে। গায়ে কোটটা চাপিয়ে ধীরেন ভড় বেরিয়ে গেল। কিন্তু মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। মোড়ের ভুবন সাহার মুদীর দোকানের সামনে ছোট টুলটায় গিয়ে বসল সে।

এই যে ধীরেনবাবু! ভুবন সাহা রোজই তার দেখা পায়। পাড়ার লোকেরা সকলেই জানে এই ঝগড়ার কথা। প্রতিবেশীদের এই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে; সুতরাং ও বিষয়ে আর কেউ প্রশ্নও করে না।

এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট দাও। গম্ভীর ভাবে বললে ধীরেন ভড়।

এই নিন। ভুবন সাহা এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেটটা।

হ্যাঁ, তোমার বাকী টাকাটা এবার দিয়ে দোব। প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে ধীরেন ভড় বললে।

কত বাকী আছে বল ত ? নিজেই কথাটা পাড়লে সে।

৬২ টাকা ১২ আনা। এই একই প্রশ্ন এবং উত্তর প্রায়ই হয় জিনিস কেনার সময়, ধীরেন ভড় এ প্রশ্নটি করে, তাতে ব্যবসায়ী হিসেবে ভুবন সাহার উৎসাহ বাড়া উচিত আর দরকারী জিনিসটা পেতেও দেরী হয় না।

জান ভুবন এবার বাইরে যাচ্ছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয় ধীরেন ভড়।

বাইরে ?

হ্যাঁ। এবার স্যুটিং হবে পশ্চিমে—এবার যা বই হবে না! তোমায় পাস দোব। দু'হাত কচলালে ধীরেন ভড়।

পাস চারটে চাই বাবু।

চারটে ?

হ্যাঁ, মগরাহাট থেকে আমার এক শালী এসেছে কিনা। সলজ্জ ভাবে জানালে ভুবন সাহা।

দোব দোব, তবে সে ত এখন দেরী আছে, দাঁড়াও বইটা আগে শেষ হোক তবে ত।

আচ্ছা তবে ভুলে যাবেন না যেন।

না না, ভুলব কেন।

আর কিছু টাকা যদি।

দোব দোব, সে কি তোমায় বলে দিতে হবে ভুবন।

তার বিবেচনার ওপর অনাস্থার জন্যে যেন ক্ষুব্ধ হ'ল ধীরেন ভড়।

ধীরেন ভড় বেরিয়ে যাবার পরই অপর্ণা পাশের ঘরে

গেল। সবিতা, নমিতা অপেক্ষা করছে তখন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্যে।

টুকুনকে দুধ খাইয়েছিস? অপর্ণার গলার স্বর স্বাভাবিক কিছুই যেন হয় নি।

হ্যাঁ।

চায়ের জল?

চাপিয়েছি।

চাটা করে ফেল্, হালুয়া আর পরোটা দু'খানা রেকাবে দে, এখুনি এসে পড়বে।

জলখাবার এবং চা সাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরেন ভড় এসে পড়ল। অপর্ণার সব জানা আছে, এমনকি ঝগড়া করে বেরিয়ে যাবার কতক্ষণের মধ্যে সে ফিরে আসবে তাও সে নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারে। রাত্রে ধীরেন ভড় একটু দেরীতেই ঘুমায়। তার একটা কারণ অপর্ণার ক্রমাগত কথা বলা -

বাড়ীওয়ালার মেয়ে এসেছিল। বললে অপর্ণা।

কেন টাকা চাইতে?

না না, ভাড়া ত দেওয়া আছে, খালি চার মাসের যা বাকী। এখন অপর্ণা যেন অন্য মানুষ।

তবে?

আমাশার মাদুলী নিতে এসেছিল।

দিয়েছ?

হ্যাঁ, সাদা আমাশা, সাদা সুতো দিয়ে বাঁধতে বলে দিয়েছি।

বেশ, পিঠটা একটু চুলকে দাও ত—না ওখানে নয়—আর একটু নীচে...উঃ—

কি হ'ল?

আস্তে, একেবারে ছিঁড়ে দিলে যে।

নখগুলো বেড়েছে, কাল কাটতে হবে। বললে অপর্ণা—হ্যাঁ, ভাল কথা—সবিতার শাড়ী চাই—কি ঘুমুচ্ছ নাকি?

না, শুনেছি, আনব। ঘুম আসছে ধীরেন ভড়ের।

হ্যাঁ গো!

—উঁ।

আচ্ছা তুমি যে আমায় ব্রোঞ্জের ওপর চুড়ি করে দিয়েছিলে তার দাম কত?

কেন আরও চাই? মনে মনে বিরক্ত হ'ল ধীরেন ভড়।

না না, আমার নয়—সবি-নমির জন্যে। বড় হয়েছে ত, প্লাষ্টিকের চুড়িগুলো পরে আর কতদিন কাটায় বল, দেখতেও খারাপ লাগে।

আচ্ছা।

মানে একসঙ্গে বলছি না, এই ধর একবার সবির দু'গাছা দিলে, আবার তার পরের বার নমির দিলে, এই রকম আর কি।

বেশ। ধীরেন ভড়ের স্বরে উৎসাহের চিহ্ন নেই।

অপর্ণা সেটা অনুভব করে বললে, আমি এখুনি বলছি না যখন তোমার হাতে টাকা জমবে তখন।

টাকা আর জমেছে! দীর্ঘশ্বাস ফেললে ধীরেন ভড়।

কেন জমবে না, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ ঠিক টাকা আসবে।

ভয় কি আর সাধে পাই অপর্ণা, মেয়ে দুটো বড় হয়েছে, তার ওপর আবার বাচ্ছা ছেলেটা। এদিকে ক্রমশঃ বুড়ো হয়ে পড়ছি, কি যে করি! হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল ধীরেন ভড়।

বাজে বকো না বাবু। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অপর্ণা—বুড়ো আবার কি, এই ত কাজলার পিসেমশাই ওঁর বয়স কত জান?

কত?

একাত্তর, ছোট ছেলের বয়স মাত্র আট বুঝলে? উনি একেবারে বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

অপর্ণার অভিমতে ধীরেন ভড়ের মনটা হালকা হ'ল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম অভিমানও এসে পড়ল। সে বললে, কেন, এই ত বিকেলেই তুমি নিজে আমায় বললে—

কি বলেছি?

বুড়ো, টেকো, ঘাটের মড়া, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কত কি বললে।

কৈ, কখন আবার বললাম, যেন আকাশ থেকে পড়ল অপর্ণা।

হ্যাঁ বলেছ, রাগের মাথায় যা বল, পরে কি আর সেটা মনে থাকে তোমার?

বলেছি ত বলেছি, বেশ করেছি। ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল অপর্ণা। তার পর বললে, ভীষণ ঝগড়াটে তুমি।

কে আমি? ধীরেন ভড় আপাত্তর সুরে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, তুমি নয় ত আবার কে? কয়েক মিনিট চুপচাপ। অপর্ণাই আবার কথা সুরু করলে। রাত্রে যতক্ষণ না তার ঘুম আসে, ততক্ষণ সে বকবক করবেই আর ধীরেন ভড়ের আগেই সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়, অন্যথায় শেষ পর্য্যন্ত ঘুম আসা শক্ত হয়ে পড়ে। কারণটা অন্য কিছু নয়, ধীরেন ভড়ের

অমানুষিক আর ভয়াবহ নাসিকা গর্জ্জন। শব্দটা ঠিক কি ধরণের সেটা বোঝান শক্ত, তবে মাইক সহযোগে আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গে ভাঙা ষ্টেটবাসের আওয়াজ মেলালে অনুরূপ গর্জ্জনের খানিকটা তুলনা মেলে। আওয়াজটা প্রায় অপর্ণার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিপদ হয় মাঝে মাঝে মেয়ে ছুটোর, প্রায়ই উঠে পড়ে। সেদিন রাত্রে নমু উঠে পড়ে ডাকল, মা!

কি রে?

ঘুম হচ্ছে না।

কেন?

ঐ যে আওয়াজ।

অন্ধকারে হাসল অপর্ণা। বললে, তুই এক কাজ কর

কি?

ঐ ঝিঁঝিঁ পোকাটা ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

ঐটে একমনে শোন দিকিনি তা হলেই ঘুম আসবে। ঝিঁঝি পোকার আওয়াজটায় মনসংযোগ করলে যে নাসিকা গর্জ্জনটা আর শোনা যায় না এটা অপর্ণা নিজেই আবিষ্কার করেছে। মাথা ব্যথায় সাধারণতঃ কপালে মলমজাতীয় ওষুধ ঘষে দেওয়ার ফলে ওপরের ত্বকে জ্বালা করতে থাকে, তখন ভেতরের যন্ত্রণাদায়ক ব্যথাটা আর অনুভব করা যায় না, মনটা স্বতঃই এই নূতন জ্বালার দিকেই বদ্ধ থাকে। অপর্ণার আবিষ্কারটা অনেকটা সেই রকম। যাই হোক, অপর্ণাই নিজে আবার কথা বললে, শুনছ?

হ্যাঁ বল।

বলছি কি কালীঘাটে কি যাওয়া হবে না? নমির অসুখের সময় মানত করেছিলাম, বুক চিরে রক্ত দোব, টুকুনের বেলাতেও রূপোর জিভ দোব বলেছিলাম—সেও কতদিন হয়ে গেল। একদিন নিয়ে চল না গো, কত আর খরচ বাপু।

খরচের জন্যে নয় গো, সময় কোথায়!

খুব সময় আছে, একটু চেষ্টা করলেই হয়। চল না একদিন।

হ্যাঁ যাব, কিন্তু মুশকিল হয়েছে।

মুশকিল আবার কি?

আর বল কেন। অনুযোগের ভঙ্গীতে বলতে থাকে ফিল্ম ডাইরেক্টার ধীরেন ভড়—এদিকে আবার এক হাঙ্গামায় পড়েছি।

হাঙ্গামা মানে?

বাইরে স্যুটিংএ যেতে হবে বোধ হয়।

কেন তুমি ত বলেছিলে তার তিন মাস দেরী আছে।

আর বল কেন, ঐ সুনীল রায়ের জন্যে।

ওঃ, সেই সাহেবের মত লোকটা?

হ্যাঁ।

কেন সে কি করলে?

আর কি করলে—ডুবিয়ে দিয়েছে একেবারে—হাসনুর সঙ্গে জমে গেছে আবার কি। হাসলে ধীরেন ভড়।

হাসনু কে?

নতুন বইতে নর্ত্তকী সাজবে ইন্দ্রের সভায়।

কেমন দেখতে?

দেখতে ভালই। হালকা ভাবে উত্তর দিলে ধীরেন ভড়। স্ত্রীর সাক্ষাতে অন্য রূপসীর রূপ নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখান যুক্তিযুক্ত নয়।

হ্যাঁ গো!

কি?

আচ্ছা, ও ত মুসলমান ইন্দ্রের সভায় যাবে কি করে?

আরে কি বিপদ, ও ত সত্যি সত্যি আর ইন্দ্রসভা নয়, সিনেমার ইন্দ্রসভা। অপ্রস্তুত হ'ল অপর্ণা, যত সে ভাবে বোকা হবে না ততই ঠকে যায়।

তা ওদের ভাবসাব হয়েছে ভালই ত বাপু বিপদ আবার কি?

ভাবে যে একেবারে জমে গিয়েছে, স্যুটিংএ আসতেই চায় না, বাড়ী থেকেই বার হয় না।

বল কি?

আর শুধু কি তাই—টেলিফোন করলেও টেলিফোন ধরবে না।

আমার কিন্তু বেশ লাগে।

কি?

ঐ যে কেমন দুজনে ভালবাসে, একজন আর একজনকে ছেড়ে যেতে চায় না, বেশ বাপু, না?

হ্যাঁ, তা ভালই। আমতা আমতা করে বলে ধীরেন ভড়। ঘরে সারাদিন সুনীল রায়ের মত থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু ঘর থেকে বার করার জন্যেই ত বাইরের স্যুটিংগুলো করা হচ্ছে।

তাই নাকি?

আর তা ছাড়া সুনীল রায়ের বৌ আছে। সুনীল রায়ের ওপর হঠাৎ যেন বিতৃষ্ণা এল ধীরেন ভড়ের।

এঁ্যা, বিয়ে হয়ে গেছে? আশ্চর্য্য হ'ল অপর্ণা।

হ্যাঁ।

বিয়ে হয়ে গেছে তবু এই কাণ্ড, ছিঃ ছিঃ—

আর বল কেন।

তুমি বাপু সিনেমার কাজ ছেড়ে দাও। একটু চুপ করে থেকে অপর্ণা বললে।

কেন বল ত ?

ওরা সব ডাইনী, যাদু জানে। ধীরেন ভড় হেসে উঠল —অপ্রস্তুত হ'ল অপর্ণা, তার মনের কোণে এখনও এই টেকো বুড়ো লোকটাকে হারাবার ভয় নিশ্চয়ই রয়েছে। সব মেয়েরই হয় ত থাকে, কিন্তু অপর্ণার মত হঠাৎ দুম করে কথাটা সবাই বলে না—হাজার হোক গাঁয়ের মেয়ে ত।

এর পর দিনকতক কোন রকমে চলল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। স্যাঁতসেঁতে প্রাণহীন চারটে দেওয়াল ঘেরা খাঁচার মধ্যে ধীরেন ভড় আর অপর্ণা—সবি, নমি আর টুকুন নিজের নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

কিন্তু সেদিন আবার বিপদ ঘনিয়ে এল, সেদিন ধীরেন ভড় ব্যস্তভাবে বাড়ীতে এসে প্রথমেই বিদেশে যাওয়ার কথা বললে।

কাল যেতে হবে।

কাল ?

হ্যাঁ।

আর কোন কথা নয়, অপর্ণা সারাটা দিন গুম হয়ে রইল, ভেতরে ভেতরে যেন জ্বলে যাচ্ছে সে। ধীরেন ভড় পুরনো বড় ট্রাঙ্কটা খালি করে নিলে, একটা হোল্ডঅল অনেক দিন পূর্ব্বে কার কাছ থেকে যেন চেয়ে নিয়েছিল, সেটা আর মালিককে এ যাবৎ ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নি। মাচা থেকে নামান হ'ল সেটা। পোকায় শত ছিদ্র করে দিয়েছে—চামড়ার দুটো ষ্ট্রাপ ছিঁড়ে গেছে। ধীরেন ভড় নিরুৎসাহ হ'ল না—একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেঁড়া হোল্ড-অলটার দিকে। দৃশ্য পরিকল্পনা পূর্ব্বে ভেবে নেওয়ার অভ্যাস আছে আর হুঁ, একেবারে নিরাশ হবার মত নয়, দেখা যাক। অনেক ভাঙ্গা আর অচল জিনিসকেই সে চালিয়েছে, ষ্টুডিওতে। কাঠের খুঁটির ওপর ছেঁড়া কাপড় টাঙিয়ে অনেক দুর্গম পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে সে। পেয়ারাগাছে কাগজের ফুল গুঁজে অনেক নন্দন-কানন রচনা করেছে। খেঁদি-পেঁচি মেয়েদের মেকআপ আর জুৎসই এ্যাঙ্গেলে ছবি তুলে বহু দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করেছে সে। জোড়াতালি দেওয়া তার ব্যবসার অঙ্গ বলা চলে। সুতরাং ধীরেন ভড় নিরাশ হ'ল না, ছেঁড়া হোল্ডঅলটা উল্টেপাল্টে নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে সে। পোকায় কেটেছে বটে তবে ছিদ্রগুলো বড় নয়, খুব ছোট ছোট মিহি-ধরণের। কয়েক জায়গায় অবশ্য ছিদ্রগুলো একসঙ্গে মিলে গিয়ে বড় গর্ত্তের সৃষ্টি করেছে। ধীরেন ভড় স্বভাবতঃই ছিদ্রান্বেষী, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার সংখ্যা প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে উৎসাহের বদলে নিরাশ হ'ল সে।

সবি! ডাকলে ধীরেন ভড়—একবার এদিকে আয় ত —এটা একটু সেলাই করে দে।

যাই! উত্তর দিলে সবিতা।

সবি! সঙ্গে সঙ্গে ডাকলে অপর্ণা, পাশের ঘর থেকে—কোথায় যাচ্ছিস ?

বাবা ডাকছেন—কি যেন সেলাই করতে হবে।

এখনও ঘরের কাজ পড়ে আছে, ও সব বাজে কাজ করতে হবে না; যাবি না ওদিকে—অন্য লোককে দিয়ে সেলাই করিয়ে নিতে বল—সাতটা দাসীবাদী রেখেছে যেন, মরণ আর কি!

ধীরেন ভড় আর বেশী ঘাঁটালো না, চেপে গেল, নিজেই মোটা চশমা পরে ছুঁচসুতো নিয়ে ছেঁড়া হোল্ডঅলটা সেলাই করতে বসে গেল। কি দরকার বাবা ঘাঁটিয়ে। একবার সুরু করলেই ত চিত্তির। ছাদে কাক-চিল বসতে পারবে না। পাড়ার লোকশুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তার চেয়ে নিজে করে নেওয়াই ভাল। ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু—অত সহজে কি ঝঞ্ঝাট মেটে ? রাতটা অবশ্য কোন রকমে কাটল, কিন্তু তার পরের দিন—মানে ধীরেন ভড়ের যাত্রার দিন আবার সুরু হ'ল। গয়লা এসেছিল পাওনা টাকাটার কথা রোজের মত একবার মনে করিয়ে দিল।

টাকা পাবে না। রুক্ষস্বরে উত্তর দিলে অপর্ণা।

আজ্ঞে ? অবাক হ'ল গয়লা, অন্য রকম জবাবই সে বরাবর শুনে এসেছে। দুদিন পরে নিও কিংবা পরের সপ্তাহে দোব—এই ধরণের। এ আবার কি ? থতমত খেয়ে ঢোক গিললে বেচারী।

ওই ত বললাম—টাকা পাবে না। আর একবার বললে অপর্ণা।

কেন মা ?—দুধে জল ত সব গোয়ালাই দিয়ে থাকে—শাস্ত্রসম্মত এবং পরিমাণমত জলই ত সে দিয়েছে, ভাবছে গয়লা, তবে বলা যায় না—ছেলেটা হয়ত—বোকা ভীষণ বোকা ওটা, গরুর সঙ্গে থেকে থেকে বুদ্ধিও ঐ রকমই হয়েছে।

বাবু বাইরে যাচ্ছেন। নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিলে অপর্ণা।

ওঃ। যাক তা হলে তার ব্যবসা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নয়।—কোথায় যাবেন ? জিজ্ঞাসা করল গয়লা।

ফূর্ত্তি করতে যাবেন ?

এ্যাঁ! গরুর কাজ করে করে তবে কি সেও বোকা হয়ে যাচ্ছে নাকি ? মায়ের কথাটা ঠিক বোঝা গেল না ত—

হ্যাঁ, বায়োস্কোপের মেয়েছেলে।

পাশের ঘর থেকে ধীরেন ভড় সত্বর চলে এল। আর

দেরী করা সঙ্গত হবে না। গোয়ালাকে বললে; যা তুই, পরে টাকা পাবি।

আজ্ঞে! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! বাবু ত কোনদিন তাকে টাকার কথা বলেন না। ফুর্ত্তি করতে যাবেন বাবু। সে আবার কি? সব কথাগুলো হেঁয়ালীর মত লাগল তার। একসঙ্গে অনেক ভাবনার বোঝা নিয়ে চলে গেল গয়লা।

পৌরুষে রীতিমত আঘাত লেগেছে ধীরেন ভড়ের। গয়লার সামনে এ রকম স্পষ্ট ভাষায় তাকে অপমান করতে পারে অপর্ণা একথা তার পক্ষে ভাবা শক্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা হ'ল বিনা কারণে। যদি কারণ থাকত তা হলেও বা হ'ত। কিন্তু—রাগে ধীরেন ভড়ের মাথার ভেতর যেন জ্বালা ধরে গেল। একদৃষ্টে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, দেখ বাইরের লোকের কাছে ইতরামী করো না।

ঢাকে কাঠি পড়ল—

ওরে আমার ভদ্রলোক রে! লড়াই সুরু হ'ল আবার নবোদ্যমে। সবিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি, ডালের কড়াটা নামিয়ে। নমিতা টুকুনকে ঘুম পাড়াচ্ছিল সেও তাকে কাঁধে তুলে দ্রুত এগিয়ে এল, এ সুযোগ ওরা সহজে ছাড়ে না।

আহা, মরে যাই মরে যাই, কত ভদ্দরবে সত্যি কথা যেই বলেছি অমনি একেবারে ছটফট করে মরছে। মুখভঙ্গী করে বললে অপর্ণা।

মিথ্যে কথা! ধীরেন ভড় চীৎকার করে উঠল, সারা দিন-রাত তাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হবে। হয়ত বিশ্রাম করবার বা খাবার সময় পর্য্যন্ত পাবে কিনা সন্দেহ, আর তাকে বলে কিনা ফুর্ত্তি করতে যাচ্ছে—তা আবার গয়লার কাছে, রাগে ধীরেন ভড়ের মুখ দিয়ে কোন কথাই যেন বার হ'ল না।

মিথ্যে কথা? জেরা করলে অপর্ণা।

আলবৎ।

সঙ্গে মেয়েছেলে যাচ্ছে না? সেই হাসনু না কে?

—হ্যাঁ, তারা গেলেই বা।

হুঁ হুঁ, তবে তবে - দেখ দেখ সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির, দেখ। ওদের নিয়ে কি হবে কি,তীর্থ করবে না রামায়ণ গান শুনবে?

বাজে কথা বলো না। ধীরেন ভড় গলার স্বর নরম করে নিলে। বাইরে যাচ্ছি—বিদেশে। কবে ফিরব তার ঠিক নেই, আর এই সময় ঝগড়া সুরু করলে? একটু ভয় করে না?

কেন ভয়টা কিসের? আমি কি কারোর ধার করে খেয়েছি, যে আমার খারাপ হবে?—না কারোর সর্ব্বনাশ করেছি যে আমার সর্ব্বনাশ হবে।

সারাদিন কেটে গেল তোড়জোড়ের মধ্যে, বিছানা বাঁধা, কাপড়-জামা গোছান, খাবার তৈরি, পান সাজা—সব নিখুঁত ভাবে অপর্ণা আর সবিতা করে দিলে। পাঁচটার পর একটা ট্যাক্সি আনা হ'ল, বেরুবার মুখে সবিতা-নমিতা এসে ধীরেন ভড়কে প্রণাম করল, হঠাৎ অপর্ণাও কোথা থেকে এসে টিপ করে তাকে একটা প্রণাম করে চকিতে চলে গেল।

অপর্ণার প্রণাম করার ভঙ্গী দেখে ধীরেন ভড় আর মেয়েরা হেসে উঠল।

রাত্রের রান্না আর অপর্ণা করবে না। হঠাৎ যেন সে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন শূন্য হয়ে গেল। এ রকম ত তার কখনও মনে হয় নি! সাতটা না বাজতেই শুয়ে পড়ল সকলে। এক পাশে সবিতা, কোলের কাছে টুকুন আর টুকুনের পাশে নমিতা। ক্লান্তি আর অবসাদে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে সকলে। রাত সাড়ে ন'টায় সময় হঠাৎ টুকুন চীৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠল—অপর্ণা উঠে পড়ল—বুকটা তার ধড়াস করে উঠেছে। কান্না আর থামছে না ছেলেটার, এ রকম ত আগে কখনও কাঁদে নি। অপর্ণা বুকে জড়িয়ে ধরল টুকুনকে। সবিতার গায়ে একটা হাত রাখলে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, সবিতার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

কি রে, তুই কাঁদছিস কেন? অপর্ণা জিজ্ঞেস করলে।

শুষ্ক গলায় উত্তর দিলে সবিতা,কেমন যেন ভয় করছে মা।

ভয় কিসের বোকা মেয়ে, আমি ত রয়েছি।

নমিতা পাশ ফিরে শুলো। অপর্ণা চেয়ে আছে অপর দিকের দেওয়ালে টাঙানো সাড়ে ছ'আনা দামের কালীর ছবিটার দিকে—মাথার কাছে কাঁচের উপর সিঁদুরের টিপ, পায়ে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া। স্নান করার পর রোজই অপর্ণা এই ছবিটিতে সিঁদুর-চন্দন দেয়। একটা ধূপ জ্বালিয়ে ছবিটার চতুর্দ্দিকে আরতির ভঙ্গীতে ঘোরায়। তার ধুলা-মলিন সংসারের এই একটি শান্ত পরিবেশ—তার স্বপ্ন ও সাধনার বেদীমূলে দিনের পর দিন সরল মনে সে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে। নিজের জন্য কিছু চায়নি সে—আকাঙ্ক্ষা তার বড় নয়। সে শুধু চেয়েছে এই অপোগণ্ড সন্তানগুলো যেন সুখে থাকে। অপদার্থ স্বামীটার যেন কোন ক্ষতি না হয় —আর ত সে কিছুই চায় না। পটের দিকে তাকাল অপর্ণা। লোলজিহ্বা, খর্পরধারিণীও যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে—অপর্ণা ভয় পেল—শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল তার। মনে মনে অশিক্ষিতা পল্লীগ্রামের মেয়েটি শুধু বললে, আমি ত কিছুই করি নি মা। ক্রমশঃ

ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা

শিবনাথ শাস্ত্রী

১০-১০-৮৮।

গতকল্য Miss Manning-এর নিকট শুনিলাম যে, এন ঘোষ Indian Nation-এ লিখিয়াছেন যে, আমার বন্ধুগণ যদি আমার পত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া ছাপেন তাহা হইলে ভাল হয়। ইহার দুই অর্থ হয়। ইংরেজী ভাল হইতেছে না, দ্বিতীয় এমন কিছু থাকিতেছে, যাহা না থাকাই ভাল। আমার ইংরেজীটি যে কখনও শুধরাইবে এমন আশা হয় না। অথচ দেশের লোকের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভাল ইংরেজী বলিতে লিখিতে পারার তুল্য 'বাহাদুরী' আর নাই। সেই সপ্তম স্বর্গ। দেশের কাজ করিতে গেলে এই দুইটির বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে কাজ করিতে গেলে এই দুইটি চাই। লোকের এইরূপ প্রবৃত্তিতে কেবল অসারতাই প্রকাশ পায়। ইহাতে এই জানা যায়, চিন্তা, কাজ ও পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। এই সকল দিকে ভাবীবংশীয় দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তবে ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলী পড়া অভ্যাস থাকিলে ইংরেজিটি আপনাপনি ঘষিয়া মাজিয়া এক প্রকার দাঁড়াইতে পারে। আমাদিগকে যেরূপ একটি কাজের চক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, সমাজের নিত্য নিত্য যেরূপ নূতন কাজের সৃষ্টি হয়, তাহাতে যদি খুব দৃঢ়তা ও মানসিক বলের সহিত, কতকটা সময় পাঠাদির জন্ম না রাখা যায়, তাহা হইলে সকল সময়ের উপরেই কাজের স্রোত আসিয়া পড়ে এবং সকল সময়ই কোন না কোন কাজে যায়। অনেক সময় এমন অনেক কাজে যায় যাহাতে না গেলেও চলিত। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে dissipation of energy বলে তাহাই ঘটে। এবার এটা বারণ করিতেই হইবে। ইহাতে যদি লোকের মতে অপ্রিয়ও হওয়া যায়, তথাপি কিছু কিছু সময় পাঠ ও চিন্তার জন্ম রাখিতে হইবে। পাঠ ও চিন্তার অভ্যাস ভাঙিয়া যাওয়াতেই চরিত্রে তরলতা উপস্থিত হইয়াছে। দশ-পনর বৎসরে যাহা ভাঙিয়াছে তাহা এখন গড়িয়া তোলাই কঠিন। কিন্তু কি করা যায়, আমাদের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজের অনেক ক্ষতি হইতেছে। জ্ঞানালোচনাকে অবশ্য অবশ্য কর্তব্য কার্য্যের মধ্যে রাখিতে হইবে।

কি আশ্চর্য্য! আমার হাতে যে সকল গুরুতর কাজের ভার আছে, তাহাও সমুচিত রূপে করিতে গেলে কত চিন্তা, কত পাঠ, কত নির্জ্জন বাস করা কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে বাড়ীর বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র প্রকার করা উচিত। তাহাও এবার করিতে হইবে।

আমার পাঠের চারি প্রকার ব্যবস্থা:

১ম। মন্দিরের Lessons-এর জন্ম সংস্কৃত, জেন্দাবেস্তা, কোরাণ, বাইবেল, কনফুসের মত, পুরাতন গ্রীক উক্তি, প্রভৃতি সাধুদিগের রচনাবলী পাঠ করা।

২য়। Students service-এর জন্ম Socialist literature ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভাল ভাল movement সকলের ইতিবৃত্তাদি পাঠ করা।

৩য়। জীবনচরিত সকল পাঠ করা।

৪র্থ। নিজের ইংরেজীর উন্নতির জন্ম ইংরেজী নব্যগ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করা।

এখন হইতেই এই প্রণালী অনুসারে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

আজ প্রাতে কম্পুরাণীর এক পত্র পাইলাম। কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি মনস্বিতা, কি চিন্তাশক্তি! এই গুণেই ইংরেজের মেয়েরা এত বড়, এবং এই জন্যই ইংরেজ জাতির এত উন্নতি। পত্রের একটি স্থান অতি চমৎকার বোধ হইল। তাহা এই—I believe the mightiest for good are those who exercise a wise and strong control of their affections, those who have strong and generous impulses and yet control them, not those who have none to control, স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত কথা। কি আশ্চর্য্য! আমাতে যে সকল দুর্ব্বলতা আছে ইহাতে তাহাও আছে। এখন আর একটি লোক পাওয়া কঠিন, যাহার সঙ্গে এত মিল হয়। ইঁহার সহিত বন্ধুতা হইয়া ইংরেজ রমণীদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা দশগুণ বাড়িয়াছে।

প্রার্থনা

জগদীশ্বর, আমার নিজের দুর্ব্বলতা যত স্মরণ করি, ততই তোমার কৃপার উপরে অধিক নির্ভর হয়। আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত এখন হইতে আত্মোন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে পারি।

১১-১০-৮৮, লণ্ডন।

আজ দুর্গামোহন বাবু ও পার্ব্বতীবাবু দেশে যাইতেছেন। তিনজনে আসিয়াছিলাম, আমি একা পড়িয়া রহিলাম।

গতকল্য একটা Youths Institute দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় ২০০ শত যুবক, ইহাদের বয়স ১৪ হইতে ২২ পর্য্যন্ত, সমস্ত দিন অন্যান্য স্থানে কাজ করে, রাত্রে এখানে আসিয়া পড়ে ও নানা বিষয় শিক্ষা করে। যাঁহারা শিক্ষা দেয়, তাঁহাদের অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই কার্য্য করেন। ১৪ বৎসর এই কাজ চলিতেছে, এখন ৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ইহার একটি বাড়ী

নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই ইন্‌ষ্টিটিউটে নানা ক্লাস আছে, Reading room আছে, লাইব্রেরী gymnasium আছে, Club room আছে। প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হয়। সৎকার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি এ জাতির অসাধারণ।

আজ কাথুরাণীকে পত্র লিখিব ভাবিতেছি, ইঁহার প্রতি আমার যে ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার সময় ভয় হয়। ইঁহার মা ও ভগিনী পাছে মনে করেন, আমি ইঁহাকে love-letter লিখিতেছি। অথচ আমি যাহাদিগকে বাস্তবিক ভালবাসি, তাহাদিগকে নরম নরম ভাষায় পত্র লিখিতে পারি না। বিশেষতঃ কাথুরাণীকে আমি কখনই নিতান্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পত্র লিখিতে পারি না। যাহা হউক, আমাকে একটু সাবধান হইয়া পত্র লিখিতে হইবে।

এই একজন সামান্ত স্ত্রীলোক, সাধুকার্য্যে ইঁহার কত উৎসাহ। সাধুতাতে ও সাধুকার্য্যে বিশ্বাস, ঈশ্বরে সুদৃঢ় নির্ভর ও নিরন্তর পরিশ্রম, ইহাই মানবজীবনের প্রধান সুখের অবস্থা। আমাদের দেশে এই ভাব আনিতে হইবে, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রকার দুর্দ্দশা কোন প্রকারেই ঘুচিবে না। জগদীশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই ভাব বর্দ্ধিত করুন।

১৩-১০-৮৮।

আজ প্রাতে বেশ একটি কথা মনে হইতেছে। অনেক বৎসর হইল আমি "নবরত্ন" নামে এক গদ্যগ্রন্থ লিখিব বলিয়াছিলাম, তাহাতে নয় জন মহাপুরুষের জীবনের ছবি থাকিবে। এ কাজটা আর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। উমেশচন্দ্র বাবু (উমেশ দত্ত মহাশয়) একবার আমাকে তাড়া দিয়াছিলেন। এ সঙ্কল্পটা কিন্তু হৃদয় হইতে কখনই যায় নাই। আজ প্রাতে একটা নূতন ভাব মনে আসিতেছে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই কয় ভাবের আদর্শ স্বরূপে, বুদ্ধ, মহম্মদ, হাফেজ, চৈতন্ত, যীশু ও রামপ্রসাদ এই কয়জনের বিশেষ ভাব কবিতাতে নিবদ্ধ করিতে পারিলে মন্দ হয় না। যদি যাইবার সময় জাহাজে লিখিয়া ফেলা যায়, ১১ই মাঘের মধ্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে। একখানি বেশ কাব্যগ্রন্থ হইতে পারে; অথচ ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় সাহায্য করিতে পারে। 'ছায়াময়ী পরিণয়' ও 'যোগচক্র' এই দুইখানি কবিতাপুস্তক ১১ই মাঘের সময় বাহির করিলে বেশ হয়। দেখা যাক, কি হয়। "তপস্যা" বলিয়া যে বইখানি লিখিবার ইচ্ছা আছে, তাহা ভবিষ্যতের জন্ত রহিল। আবার কোন নির্জ্জন স্থানে বাসের সুবিধা করিয়া তাহা ধরিতে হইবে।

এবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে ফিরিতে হইবে যে, জীবনের বর্ত্তমান অসংযত ভাব ঘুচাইব ও যুবক-যুবতীগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিব।

১৫-১০-৮৮।

গতকল্য লণ্ডনের কোয়েকারদিগের একটি Adult School দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্কুলে প্রতি রবিবার ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া বাইবেল পড়ান হয়। পাঁচটি শ্রেণী আছে: এই পাঁচটি শ্রেণীতে গতকল্য ৪৩০ জনের উপরে উপস্থিত ছিল। এক এক শ্রেণীর এক এক জন প্রেসিডেণ্ট আছেন, সর্ব্বোপরি একজন সেক্রেটারী আছেন। প্রথমে সকলে একত্র হইলে একটি সঙ্গীত ও একটু প্রার্থনা হয়। তৎপরে সকলে স্ব স্ব শ্রেণীতে যায়। সেখানে গিয়া ইহাদের যে Provident Bank আছে তাহার হিসাবে ১০ ১২ মিনিট যায়, তৎপরে বাইবেল পড়া আরম্ভ হয়, একজন Speaker থাকেন, তিনি সেদিনকার lesson উপস্থিত করেন, তিনি দশ মিনিট বলেন। তাহার পর যাঁহার ইচ্ছা তিন মিনিট করিয়া বলেন, শেষে প্রেসিডেণ্ট ১০ মিনিট বলেন। আবার হলে সকলে একত্র হইয়া একটু প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর ছুটি হয়।

আমরা হিতসাধক মণ্ডলীতে প্রতি রবিবার যেরূপ পড়িতাম তাহা কতকটা ইহার অনুরূপ। কিন্তু ইহাদের প্রণালী আমাদের প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এবার দেশে গিয়া রবিবার পাঠের নিয়ম করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মুস্কিল এই, অবাধে পড়া যায়, আমাদের এরূপ গ্রন্থ নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে বেশ ব্যাখ্যা করা যায়, এমন কতকগুলি বচন ও আখ্যায়িকাদি সংগ্রহ করিয়া একখানি বই হওয়া উচিত। আমার পারিবারিক উপাসনার সাহায্যার্থ যে গ্রন্থ করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তাহাকে এইরূপ করা যাইতে পারে, যাহা হইতে পারিবারিক উপাসনাতে মন্দিরে ও অন্যান্ত স্থানে পড়া যাইতে পারে। প্রফেসার নিউম্যান যে গ্রন্থসকল দিয়াছেন, তদ্দারা এ সম্বন্ধে অনেক উপকার হইবে।

১। পারিবারিক উপাসনাটিকে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা।

২। মন্দিরের উপাসনার সুনিয়ম অর্থাৎ Lessons ও পাঠার সুব্যবস্থা।

৩। যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজ।

৪। পাঠ, চিন্তা ও লেখা।

এই চারিটি প্রধান রূপে রক্ষা করিতে হইবে।

১৯-১০-৮৮।

আমি যতই এই ইংরেজ জাতির কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি, যতই ইহাদের সহিত মিশিতেছি, ততই ইহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িতেছে। এরূপ জাতি যদি পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে না ত কোন জাতি হইবে? ইহাদের স্বাবলম্বন শক্তি অদ্ভুত, অদ্ভুত, অদ্ভুত!

White Chappel-এ ছয়টা খুন হইয়াছে। পুলিশ খুনী ধরিতে পারিতেছে না।

ডিটেক্‌টিভে হোয়াইট চ্যাপেল পূর্ণ হইয়াছে। পার্লামেণ্টের প্রতি নির্ভর নাই, সকল কাজ আপনারাই করে। যেমন পাপ আছে, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাও আছে। এখানে কিছুকাল থাকিতে পারিলে উপকার হইত, কিন্তু পরের গলগ্রহ

হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় কোনও প্রকার উপায় হইয়া যায়, থাকিয়া যাইব।

খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক ও জীবনচরিত ক্রমে সংগ্রহ করিতেছি। যীশুর নামের কি শক্তিই জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা এক আশ্চর্য্য সত্য যে, যীশুর মৃত্যুর দ্বারাই জগতের পরিত্রাণ হইয়াছে; কারণ ঐ মৃত্যুর দ্বারাই যীশুর জীবনের ও তাঁহার প্রচারিত সত্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ মৃত্যুর প্রতি, ঐ ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যীশুর শিষ্যগণ জগতকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই মৃত্যু না হইলে যীশুর ধর্ম্ম জগতে জয়লাভ করিত কিনা সন্দেহ। এই দেশে খ্রীষ্টীয় ভাবের ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মজীবনের যে ফল দেখিতেছি তাহা দেখিয়া মন বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছে। ইহার ইতিবৃত্ত আলোচনার জন্য মনে প্রবল ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। যীশুর প্রতি বা যীশুর ধর্ম্মের প্রতি আমার পূর্ব্বে কখনও এত আস্থা জন্মে নাই। একদিক দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া হইবে না, দু'দিক দেখিতে হইবে। খ্রীষ্ট-বিরোধীরা কি বলেন তাহাও দেখিতে হইবে।

প্রার্থনা

দীনবন্ধো, তোমার প্রসাদেই আমি তোমাকে জানিয়াছি, তোমার প্রসাদেই আমার অন্তরাত্মা এই মানবজীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছে। তোমার প্রসাদেই আমরা এই পথে অগ্রসর হইতে পারি। আমার একান্ত নির্ভর তোমার উপরেই। তুমি আমাকে যখন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ ও উৎসাহ দিতেছ, তখন এই পথে আমাকে লইয়া চল।

আজ মিস ম্যানিং আমাদের দেশে যাত্রা করিতেছেন। যে ভারতবর্ষের হিতার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষকে চক্ষে দেখিবেন। দেখার দরুণ ভাল মন্দ দুই হইতে পারে। প্রথম আমাদের দেশের লোকের অবস্থা, দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় আরও ভারতের দুঃখে কাঁদিতে পারে। দ্বিতীয় ভারতীয় ইংরেজদিগের মুখে শুনিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া ভারত-বিদ্বেষিনী হইতে পারেন। কিন্তু তিনি তিন মাস বই থাকিবেন না। ইহার মধ্যে তাহারা অধিক বিষ ঢালিতে পারিবে না। আমি যদি জানুয়ারীতে কলিকাতায় পৌঁছি এবং তিনি যদি তখন কলিকাতাতে আসেন একবার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

গতকল্য ষ্ট্রাউসের Life of Jesus এক ভলুম কিনিয়াছি। চারিদিক হইতেও খ্রীষ্টের জীবন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতেছি। এখানে থাকিতে যে পড়িতে পারি এরূপ বোধ হয় না। যতদিন থাকি বইখানিতে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। তৎপরে যদি কার্য্যগতিকে থাকিয়া যাওয়া হয়, তখন স্থির হইয়া পড়িতে পারি। বিধাতা যেরূপ করেন তাহাই হউক।

আমার লাইব্রেরী একবার ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীকে দিয়া ফেলিয়াছি। এখানে আসিয়া যত প্রকার চিন্তা ও বাসনা মনে প্রবল হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা এই, আমার একটি লাইব্রেরী তৈয়ার করিতে হইতেছে। তাহার পত্তন করিতেছি। একটি stamp seal করিবার অর্ডার দিয়াছি, মঙ্গলবার পাইব। একটি লাইব্রেরীর সূত্রপাত করিয়া দেশে যাইতে হইবে। খাই-বা-না-খাই, লাইব্রেরীটি করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল লাইব্রেরী করা নহে, তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। এখন অবধি যাহা কিছু লেখা বা করা যাইবে, পাকা বুনিয়াদের উপরে করিতে হইবে। এতদিন আমরা ব্রাহ্মসমাজে যে কাজ করিতেছি, তাহাতে এক কারণে দৃঢ়তা ও স্থিরতার অভাব হইয়াছে। কতকগুলি মূল ভাবকে ধরিয়া তাহা ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে সাধন করিবার চেষ্টা হয় নাই; পরন্তু যখন যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে তখন তাহার প্রতিবিধানের যাহা সদুপায় বোধ হইয়াছে, তাহা করা গিয়াছে। আমরা গড়ের উপরে সৎ ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু স্থিরচিত্তে সত্যবিশেষকে অবলম্বন, দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধন করিবার প্রয়াস বড় করি নাই। ঘটনাস্রোতে ভাসিয়াছি। সেই স্রোতকে লক্ষ্যবিশেষের দিকে প্রবাহিত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করি নাই। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের চিন্তা ও ভাবকে লক্ষ্যবিশেষের দিকে জাগ্রত রাখিবার প্রয়াস বিশেষ করি নাই। ইহার ফলে ধর্ম্মজীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এবারে গিয়া লক্ষ্যের স্থিরতা ও দৃঢ়তা সাধন করিতে হইবে। সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের লক্ষ্যের স্থিরতা থাকার নামই মাঝিগিরি। এই মাঝিগিরিটি চাই। লোকের চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতার এক চুল হ্রাস করা হইবে না। অথচ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার দ্বারা সত্যবিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; নিরাশার মধ্যে আশা, বিবাদের মধ্যে শান্তি, বিরোধের মধ্যে মিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। ইহার নাম মাঝিগিরি। প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব বশতঃই আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা।

প্রার্থনা।

হে পরাৎপর পরম পুরুষ, হে বিধাতা! ইহা ত তোমার ইচ্ছা যে ব্রাহ্মসমাজ জয়যুক্ত হয়, ভারতের অগণ্য প্রজা তোমাকে জানিতে ও প্রীতি করিতে সমর্থ হয়। আমাদিগকে সেই মহৎ কার্য্যে সহায় হইবার জন্য ডাকিয়াছ; কিন্তু সমুচিত বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবে, আমরা তোমার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছি না তোমার স্বর্গীয় অগ্নিদ্বারা সেরূপ অধিকৃত হইতেছি না। বিশ্বাস বলে বলীকর যে আমরা সত্যকে অবলম্বন করিয়া, দৃঢ়তা ও স্থিরতার সহিত সাধন করিতে পারি। হে ঈশ্বর, ভারতে তোমার সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। জীবনদাতা তাহাদিগকে জীবন দেও। আমাদিগকে সেই কার্য্যে সহায় হইবার উপযুক্ত কর।

২১-১০-৮৮।

আজ প্রাতে এই সংকল্প করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম যে, ভয়নী সাহেবের গীর্জ্জাতে উপাসনায় যাইব ও হ্যামারস্মেনের তত্ত্ব লইব। কিন্তু নীচে আসিয়া উপাসনা করিতে যাই মন বসে না, কিছুদিন হইতে উপাসনা [illegible]

আমার ধর্ম্মভাবটা যেন কিছু পাতলা হইয়াছে, বিশ্বাস নির্ভরের ভাবটা যেন কিছু শিথিল হইয়েছে, তাই আজ স্থির করিলাম যে, প্রাতে কোন গীর্জ্জাতে যাইব না, বাড়ীতে প্রার্থনা ও ধর্ম্মজীবনের আলোচনায় কাটাইব। এই সঙ্কল্প করিয়া George Mullar-এর Narrativeখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই একজন বিশ্বাসী লোক। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই Narrative পড়িয়া এক বার বড় উপকৃত হইয়াছি। অনেক বার এই বিশ্বাস লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এইভাবে কাজ করিবার প্রয়াসও পাইয়াছি কিন্তু এ বিশ্বাস লাভ করিতে পারি নাই। আজ ভাবিলাম এই চিন্তাতেই কয়েক ঘণ্টা যাপন করা যাউক। আমার ধর্ম্মজীবন এমনি শিথিল যে, যে প্রার্থনার উপরে আমার ধর্ম্মজীবন নির্ভর করে এবং যাহা আমার জীবনে আশ্চর্য্য ফল দেখাইয়াছে, তাহাই আমি প্রাণপণে অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। প্রতিদিন এমন কত কাজ করিতেছি, সামান্য সাংসারিক কাজ নহে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা কাজ করিতেছি, যাহাতে তাঁহার মুখের দিকে চাওয়া, তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক, অথচ তাহা করি না। আমার ধর্ম্মজীবন এখনও অনেক পরিমাণে ভাবের উপরে রহিয়াছে, বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হয় নাই। বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, জীবনকে ধর্ম্মশাসনাধীন রাখিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও আত্মসংযমের সহিত কিরূপে কাজ করিতে হয় তাহা এখানে প্রতিদিন দেখিতেছি। এই জন্যই প্রভু আমাকে এখানে আনিয়াছেন। যদি এই ভাবটা লইয়া ফিরিতে পারি তাহা হইলেও অনেক সুখের বিষয়।

২৩-১০-৮৮, লণ্ডন।

গতকল্য ডাক্তার রষ্ট (Rost) বলিলেন যে, Messers Trubner and Co বলিয়াছে যে, আমার বই বিক্রয় হইবে না, সুতরাং তাহারা নিতে অনিচ্ছুক। বেশ কথা, কিছুদিন আগে বলিলেই হইত। তাহা হইলে পার্ব্বতীবাবুকে এখানে রাখিয়া আমি দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে যাইতে পারিতাম, যাহা হউক এখন বোঁচকা বাঁধিতে হইতেছে ও শীঘ্র যাত্রা করিতে হইতেছে। বই-খানাতে অনেক পরিশ্রম গেল কিছু দেখাশুনা হইল না। যাহা হউক সেজন্য দুঃখিত নই, পরে ছাপান যাইবে।

কিন্তু যাইবার টাকা কই, এখন বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া যাইবার সময় নাই। টাকা পাই কোথায়? ভুবন, হকু, দেবেন প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কত টাকা দিতে পারে? দেখা যাউক, আমার বুদ্ধিতে যত যোগায়, উপায় ত করা যাউক, তৎপর প্রভু পরমেশ্বর যাহা করেন, তাহা হইবে। আমি কি অবিশ্বাসী হইয়া যাইতেছি, কেন আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেছি না? এখানে খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী সকল যেরূপ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে—কেন আমরা এরূপ স্বার্থত্যাগ, দৃঢ়তা ও উৎসাহের সহিত কাজ করি না। তাহারা যীশুকে যেরূপ সত্য বিবেচনা করে, আমরা কি ঈশ্বরকে সেরূপ সত্য বিবেচনা করি না? তবে কেন আমরা ঐরূপ জীবন সমর্পণ করিতে পারিব না? আমরাও ইউনিটেরিয়ানদের ন্যায় যদি cold হইয়া যাই, তবে ত বিভ্রাট। অতি বুদ্ধির মাথায় বাড়ি! আমরা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করিতে গিয়া মারা গিয়াছি। ঈশ্বর কি প্রার্থনা শুনেন? তিনি কি নিয়মকে অতিক্রম করিয়া কাজ করেন? হা কপাল! এই নিয়ম পাশ হইতে বন্দীপ্রায় ঈশ্বরকে উদ্ধার করিবার উপায় কি? তিনি আছেন, তিনি জানেন, তিনি ভালবাসেন, তিনি পিতা এ কথা কয়টা ত সত্য বলিয়া জানি, তবে ত ইহাও সত্য যে, আমার জীবনের উপরে তাঁহার হস্ত রহিয়াছে? ইহার গূঢ় সূত্র সকল আমার নিকট প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তাঁহার নিকট বিদিত, তবে আমি তাঁহার উপরে নির্ভর করি না কেন? কোন্ নিয়মে পাপীকে রক্ষা করিতে হইবে—তাহা তিনি ভাবুন, সে ভাবনা আমার নহে। আমার কেবল ভালবাসিবার, নির্ভর করিবার ও প্রাণ দিবার ভাবনা।

প্রার্থনা।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, আমার একান্ত নির্ভর তোমার উপরে, আমার সকল প্রকার দুর্ব্বলতা, নিরাশা, সংশয়ের মধ্যে তুমি আমাকে রাখিয়াছ, আমি যেন তোমার চরণ ছাড়া না হই; আমাকে তুমি তোমার চরণে চিরদিন রাখ। যাহারা ভ্রমের মধ্যে আছে, তাহারা তোমার সেবার জন্য প্রাণ দিবে, যাহারা সত্যকে পাইয়াছে, তাহারা সে বিষয়ে হীন থাকিবে—এই লজ্জা হইতে রক্ষা কর। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যেন সেবা, স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ হইতে পারে। তোমাকে আমি আর কি বলিব।

২৪-১০-৮৮।

ক্রমেই ভাবনা বাড়িতেছে, বাড়ী যাই কিরূপে। ষ্টীমার ভাড়া ত ৩৭ পাউণ্ড, তার পর আরও ১০ পাউণ্ড ধরিতে হইবে। এত টাকা আসে কোথা হইতে, কাহার নিকট কর্জ্জ করি? একে ত ২০০ টাকা ধার হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপরে এই ৬০০ শত টাকা দেনা হইবে। এই ঋণভার ঘাড়ে পড়িতে আসিতেছে, বন্ধুগণ এই ভারের কিয়দংশ বহিতে পারেন নাও পারেন। আমাকে ঘাড় পাতিতে হইতেছে। যদি জাহাজে যাইবার সময় নবেলখানা লিখিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে অর্থাগমের একটা উপায় হইবে।

এইমাত্র দেবেনের পত্র পাইলাম, সে লিখিয়াছে যে, যদি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি টাকা আসে তবে সে ২০ পাউণ্ড দিতে পারে। আগামী মেলে মহলানবিশ মহাশয়কে মিষ্টার নাইটের নিকট পাঠাইবার জন্য লিখিতে হইতেছে। দেবেনের ২০ পাউণ্ড, দ্বিজদাসের ৫ পাউণ্ড, এই ত ২৫ পাউণ্ড। দেখি আর কে কত দিতে পারে। বিধাতা যে উপায় দেখাইয়া দেন।

২৫-১০-৮৮।

ক্রমে ভাবিতেছি যে, যখন যাইতেই হইল, তখন যত শীঘ্র যাওয়া যায় ভাল এবং একেবারে কলিকাতায় যাওয়াই ভাল।

কারণ মাতাঠাকুরাণী হয়ত শীতের প্রারম্ভে বাড়ীতে যাইতেছেন। সেই এক কথা', দ্বিতীয়, জাহাজে একমাস কাল সময় পাইব, তাহাতে নবেলখানা শেষ করিতে পারিব, তৃতীয়, সকাল সকাল এখান হইতে ছাড়িলে সেখানে পৌঁছিয়া "ছায়াময়ী পরিণয়" বইখানা যদি শেষ করিতে পারি, ছাপাইতে পারিব। কিন্তু যে সকল বই কিনিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা কিনিবার টাকা হওয়াই মুস্কিল। প্রাচীন মহাজনদিগের বাক্যাবলী ও সোস্যালিষ্টদিগের পুস্তকাদি কি করিয়া কিনি? সোস্যালিষ্টদের গ্রন্থ কতকগুলি কিনিতেই হইবে। ইহার টাকা যোগাড় করিতেই হইবে। পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর "রোহিল্লা" নামে যে জাহাজ ৮ই ছাড়িতেছে, তাহাতে passage লইবার চেষ্টা করিতে হইবে। passageটা না হইলে আয়োজনের ভরসাটা হয় না।

২৭-১০ ৮৮।

আমার মনের এই একটা দোষ, যখন আমার মন একটা দিকে ঝোঁকে, তাহার বেগ সম্বরণ করা দুষ্কর। দেখিতেছি আমার সন্তানরাও এই ঝোঁকগ্রস্ত মন পাইয়াছে। এখন বাড়ী যাইবার জন্য মন ঝুঁকিয়াছে, এমনি ঝুঁকিয়াছে যে, জাহাজে না উঠিলে যেন মনটা সন্তুষ্ট হইতেছে না। এই মুহূর্ত্তে যদি জাহাজে গিয়া বসিতে পারি তবে যেন ভাল হয়। যাইবার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, চেষ্টার কিছু বাকি থাকিতে মন কোন প্রকারেই সুস্থির হয় না। ব্রিষ্টলে ব্রাউন কোম্পানীকে রাজার কবর মেরামতের জন্য ২০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। গ্লাসগো হইতে হরু ও ভুবন টাকা পাঠাইবে বলিয়াছে, সে টাকা না পৌঁছিলে যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। ব্রিষ্টলে টাকা পাঠাইয়া দোকানের পাঁচ পাউণ্ড শোধ দিয়া না বসিলে প্রাণটা সুখী হইতেছে না। এমন কি উপাসনারও যেন ব্যাঘাত হইতেছে। জাহাজে যে নবেলখানি লিখিয়া শেষ করিব ভাবিতেছি তাহার পরামর্শটা করিব মনে ভাবিতেছি, সে ভাবনা মনে দাঁড়াইতেছে না। এখন কেবল এই চিন্তা হইতেছে যে, এই কয় দিন কিরূপে কাটাইব, শহরে কাহার সঙ্গে দেখা করিব, ইত্যাদি।

পরশু দিন রাত্রে মিষ্টার ডবলিউ, সি, ষ্টড জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইংলণ্ডে কোন্ বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা তোমায় ভাল লাগিয়াছে? আমি বলিলাম The peoples faith in noble exertions- তিনি বলিলেন, বাস্তবিক ইহা ইংলণ্ডের একটি বিশেষ চিহ্ন। এইটাই আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এইটিরই ভারতবর্ষে বিশেষ অভাব। এই একটি কথা। দ্বিতীয়, চরিত্র ও কার্য্যের পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করিয়া কাজ করা। ইহারা লঘুভাবে দুই দণ্ডের উত্তেজনাতে কাজ করে না। যাহা করে, দৃঢ়তার সঙ্গে করে। এটি আমাদের অনুকরণীয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই দুইটি ভাবকে প্রবাহিত করিতে হইবে। এখন অবধি যাহা করিতে বা লিখিতে হইবে তাহার স্থায়িত্বের ও পরিপক্বতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে।

এ দেশে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আদর নাই, তাহা সত্য কথা। এখন সংবাদপত্রের যুগ, যে সভাটা মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে এবং সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার বিষয়ে জানিতে লোকের ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা অতি পাতলা, ক্ষণিক ও অসার। এই পাতলা ও ক্ষণিক অনুরাগের উপরে বার আনা ব্যাপার চলিতেছে। কেশববাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির গুণে বাহিরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়াছিল, তাঁহার সঙ্গেই মরিয়াছে। ভারতবর্ষ না জাগিলে এ দেশও জাগিবে না। নূতন ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না হইলে এই নিস্তেজ ভাব দূর হইতেছে না।

প্রার্থনা

হে দীনশরণ, তুমিই আমাদের ভরসা, ব্রাহ্মসমাজের হস্তে বল দেও যে তোমার নিশান ভাল করিয়া ধরুক।

বাঙালী সংস্কৃতির একদিক : লোকসঙ্গীত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সমকালীন খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ যে সাহিত্যকে জনসভার সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন, বাংলার লোকসাহিত্যকেও তেমনি চিহ্নিত করা চলে জনসভার সাহিত্য বলে। এর কারণ, এ শ্রেণীর সাহিত্য রাজ-দরবারের বাইরে জনসাধারণের মধ্য হতেই উদ্ভূত এবং এ সাহিত্যের শ্রোতা ও রসগ্রাহীও জনসাধারণ। অধুনা অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত হলেও বাংলা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ শ্রেণীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জাতীয়তাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের এক অংশ বাংলা দেশের এই বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-সংগ্রহকার্য্যে ব্যয় করেছিলেন, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ—'লোকসাহিত্য।' প্রকৃতি অনুসারে তিনি এ ধরণের সাহিত্যকে তিনটি সুবিন্যস্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : (১) ছেলে ভুলানো ছড়া; (২) কবি-সঙ্গীত ও (৩) গ্রাম্য সাহিত্য। কবি-সঙ্গীতের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্যে' লিখেছেন :

"এই নষ্ট পরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর-জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথ-প্রদর্শক।" দ্রঃ—লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৩৮ পৃঃ।

সাধারণভাবে কবি-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কতকগুলো কবি-সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য নিরূপণ করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য।

কোন্ বিশিষ্টকালে এ কবি-সঙ্গীতগুলো রচিত হয়েছিল, কোন্ কোন্ কবি এ সঙ্গীতগুলো সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কি বলা কঠিন। কারণ কবিরা এ সমস্ত সঙ্গীত রচনার সন-তারিখছু সাধারণতঃ উল্লেখ করেন নি, অনেক কবি সঙ্গীতের শেষে নিজের নামের ভনিতা পর্য্যন্ত দেন নি। কত কাল ধরে তারা সৃষ্ট হয়েছিল সে সম্বন্ধেও কিছু জোর করে বলা যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন—

"বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অত্যন্ত স্বল্প।" দ্রঃ—লোকসাহিত্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৩২।

প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সন্ধিযুগে এ কবি-সঙ্গীতগুলোর সৃষ্টি হবার অনুমান খুবই সঙ্গত বলে মনে হয় এ জন্য যে, ভাববস্তুর দিক দিয়ে এ কবি-সঙ্গীতগুলোর আদর্শ প্রাচীন, কিন্তু তাদের বাণী-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বৈষ্ণব গীতিকাব্যের মত রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই সঙ্গীতগুলোর প্রধান উপজীব্য, কিন্তু কবি-সঙ্গীতে বৈষ্ণব কবিদের "সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।" (রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, কবি-সঙ্গীত, পৃঃ ৬৩২)।

কবি-সঙ্গীতে এই অগভীর ভাব এবং গঠনের নিপুণতার অভাবের কারণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"পূর্ব্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল; তখন গুণীসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।"

("লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, কবি-সঙ্গীত', পৃঃ ৬৩২)

কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতা বা গঠন-নৈপুণ্যের অভাবের অন্য প্রধান কারণ এই যে,এ কবিরতা বৈষ্ণব কবিদের মত এত বিদগ্ধ বা ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের মত 'মহাজন' ছিলেন না। অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতের কবিই জনসাধারণের মধ্য হতেই উদ্ভূত হয়েছিলেন। অতএব তাঁদের সঙ্গীতে বৈষ্ণব-কবিদের ভাব-সম্পদ বা গঠন-নৈপুণ্য আশা করা যায় না। তথাপি কোন কোন কবির সঙ্গীতের ভিতর ভাব-গভীরতা ও বাণী-ভঙ্গীর বিদ্যুদ্দীপ্তি হঠাৎ পাঠককে চমকিত করে। রবীন্দ্রনাথ যদিও অধিকাংশ কবি-সঙ্গীতে ভাব-গভীরতার অভাব ও লিপিনৈপুণ্যের শিথিলতা দেখেছেন, তথাপি 'স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং ভাবের উচ্চতা' দেখে মুগ্ধও হয়েছেন।

এই জনসভার কবিদের কাব্যে বৈষ্ণব-কাব্যের উৎকর্ষ না থাকলেও তাঁরা ছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিদের উত্তরসাধক। যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, কেলিকদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর প্রাণমাতানো সুর ও শ্রীরাধার প্রাণের অনন্ত আকুতি—শুধু মাত্র মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিদের নয়—এ কবি-সঙ্গীতের কবিদের কল্পনাকেও সমভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। তবে বৈষ্ণব-কাব্যে চিরকিশোর এ দু'জন দেব-দেবীর মিলন-বিরহের লীলা নিয়ে যে গভীর তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় অর্দ্ধ-শিক্ষিত কবিওয়ালার কাব্যে সে তত্ত্বের অভাব। তত্ত্বের অভাব হলেও অনেক কবিওয়ালার কাব্যে যে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এ ছাড়া এ কবিওয়ালাদের বলা চলে বাংলা দেশের খাঁটি "জাতীয় কবি" এবং তাঁদের সঙ্গীতকে খাঁটি "জাতীয় সঙ্গীত।"

Nation বলতে যে রাজনৈতিক সংস্থাকে বোঝায় বাঙালীর জীবনে সেরকম সংস্থা আধুনিক যুগের পূর্ব্বে ছিল না বললেই হয়। বাঙালীর জীবন চিরকালই সমাজ ও ধর্ম্মকেন্দ্রিক। আর ইংরেজদের Rule Britannia, Britannia rules the waves-এর মত এ রকম কোন সলক্ষ জাতীয় সঙ্গীতও বাঙালীর জাতীয় জীবনে কখনও ছিল না; রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলা নিয়ে খাঁটি বাঙালী কবিদের সঙ্গীতই বাঙালী জাতির চিত্তকে সজীব ও সুস্থ রেখেছিল বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত। শুধু প্রাক্ আধুনিক যুগে কেন, বর্ত্তমান আধুনিক যুগেও দেশের যে সমস্ত অঞ্চল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্যুতালোকে এখনও দীপ্ত হয়ে ওঠে নি, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এ কবিসঙ্গীতগুলো এখনও সে সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীর চিত্তকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। অতএব কবিসঙ্গীতগুলো শুধু প্রাক্-আধুনিক যুগের বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত নয়, আধুনিক যুগেও গ্রামীণ বাংলার জাতীয় সঙ্গীত—এক কথায় জাতীয় সম্পদ। জাতি বলতে যদি আমরা নগরবাসী ছাড়াও বৃহত্তর পল্লীবাংলার অধিবাসীকেও বুঝি, তা হলে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গীতগুলোকেও জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় সাহিত্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলেই মনে করব।

৩

এই বিস্মৃতপ্রায় খাঁটি বাঙালী কবিদের জীবনী এবং তাঁদের সঙ্গীতগুলোকে পুনরুদ্ধার এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যে আমাদের একটা পবিত্র জাতীয় কর্ত্তব্য, সে সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সুকবি ঈশ্বর গুপ্তই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এ লোকসঙ্গীতের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হয়ে সেগুলো পুনরুদ্ধার ও প্রকাশের কাজে ব্রতী হন। তাঁর এই অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফল ১৩০১ থেকে ১৩০৫ সালের (১৮৯৪—১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণাত্মক গ্রন্থ "লোকসাহিত্য।" বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট দিক নিয়ে অনেক আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ সুশীলকুমার দে রচিত History of Bengali Literature in the Nineteenth Century এবং অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য-কৃত "লোকসাহিত্য।" এখনও বহু কবির ছড়া ও সঙ্গীত বিস্মৃতির অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-প্রেমিকের চেষ্টায় সেগুলির পুনরুদ্ধার এবং প্রকাশ হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

৪

এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। এ লোক-সঙ্গীতগুলির সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হয়ে প্রথম যৌবনে সেগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার এক প্রবল প্রেরণা অনুভব করি। এ উদ্দেশ্য নিয়ে একবার যাত্রা করি চট্টগ্রামের এক পার্ব্বত্য অঞ্চলে কর্ণফুলী নদীর উৎসের দিকে। কৌতূহল ছিল বাংলা দেশের সেই একপ্রান্তবর্ত্তী স্থানেও এ লোকসঙ্গীতের সন্ধান মেলে কিনা দেখা। কৌতূহল চরিতার্থ হ'ল যেদিন গেলাম তার পরের দিন সকাল বেলায়। নদীর ধারে একটা জেলে-বাড়ীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রথমে অন্তরঙ্গভাবে মিশলাম; তার পর তাদের কাছে লোক-সঙ্গীতের কথা জানতে চাইলে একজন বয়স্ক জেলে যে অপূর্ব্ব সুন্দর সঙ্গীতগুলো আমাকে শোনালে, তা শুনে অবাক হলাম। দেখলাম, সেই নিবিড় পার্ব্বত্য অঞ্চলেও অশিক্ষিত জেলের মুখে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের সেই চিরন্তন মিলন-বিরহ সঙ্গীত—যে সঙ্গীত একদিন উৎসারিত হয়েছিল বাঙালী কবির মুখে আরও বহু শত বৎসর পূর্ব্বে। এখানেও দেখি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর শব্দ, শ্রীরাধিকার প্রাণের অনন্ত আকূতি, বৃন্দা সখী ও যমুনাতীরের বৃন্দাবন-পল্লী কবির চোখে এক মোহময় স্বপ্নাবেশ রচনা করেছে—যেমন করেছিল বৈষ্ণব কবিদের গভীর ভাববিহ্বল অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর শ্রীরাধিকার চিত্তে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করেছে, তা যেমন গভীর তেমন মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীরাধিকার জবানীতে অশিক্ষিত পল্লীকবি গেয়েছেন :—

বাঁশী বাজাইও না,
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী বাঁশী নাম লইও না।
নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী শুনতে বিপরীত,
নীরবে বসিয়া আমি শুনতাম বাঁশীর গীত।
তরল বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ভেদা
বাঁশী কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা।
তরল বাঁশের বাঁশী যে মূড়াতে* পাই
কাটারি কাটিয়া বাঁশী সাগরে ভাসাই।
ভাসিতে ভাসিতে বাঁশী ঠেকল বালুর চরে,
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।

এ সঙ্গীতে গঠনের পারিপাট্যের অভাব আছে, কিন্তু ভাবের আবেদন যে অতি সূক্ষ্ম এবং চিত্তস্পর্শী তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে রাধা নামের আহ্বান শ্রীরাধার মনকে বিকল করে তুলেছে। তাই শ্রীরাধিকা যেখানে যত বাঁশী পান তা কেটে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তবুও ত শ্রীরাধিকার নিষ্কৃতি নেই। কাটা বাঁশী সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে বালুর চরে ঠেকেছে; সেখানেও বাতাসের শব্দে বাঁশীর মধ্যে 'রাধা, রাধা' সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

পরবর্ত্তী সঙ্গীতে বাঁশীর সুরে তার নাম উল্লেখ না করবার জন্যে করুণ আবেদন জানিয়েছেন শ্রীরাধিকা :—

নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।

---

* চট্টগ্রামের চলিত ভাষায় ছোট পর্ব্বতকে 'মূড়া' বলে।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে রে বঁধুয়া
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।
শ্রীচরণে হৈলাম গো দাসী
যার নামে বাজাইলাম বাঁশী
গোপীর মন ভুগ্রতে জান রে বঁধুয়া
আমার পতির এমনি বান,
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রাণ-ভুলানো সঙ্গীত শ্রীরাধাকে আজ আনমনা করে দিয়েছে, উতলা করে তুলেছে। তাই তিনি সখীকে মিনতি করে বলছেন, সে যেন বাঁকা শ্যামকে বলে আসে, এ অসময়ে বাঁশী বাজিয়ে তিনি যেন তাঁর কুলমান নষ্ট না করে দেন :—

সখী কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়,
বাগিস বনকি (?) বংশীবটে জেনে আয়।
সখী কোন্ বনে ইত্যাদি···
··· ··· ···
সখী তাকে কর গো মানা
অসময়ে রসরাজে বাঁশী বাজায় না।
ও তার বাঁশীর সুরে বৃন্দাবনে
কুলবধূর কুল মজায়,
সখী কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়।

নিম্নলিখিত গানের মধ্যেও সেই মনোমুগ্ধকর বাঁশীর সুরের কথা। সৌভাগ্যক্রমে এই গানটিতে পল্লীকবি ভনিতায় নিজের নামটি জুড়ে দিয়েছেন :—

ওহে নিঠুর কালা বাঁকা,
বাঁকা হয়ে মোহন বংশীধারী
তোমার ব্রজের খেলা অপার লীলা
বুঝিতে না পারি।
··· ··· ···
(তুমি) কৈরে বংশীর গান হরে নিলা প্রাণ
গোকুলে গোপের নারী।
তোমায় গোপকুলে সবাই বলে
মনচোরা হরি।
তোমার সে কালোবরণ ভুবনমোহন
কিবা অপরূপ হেরি।
নিজে জগৎ বলে রূপের ছটায়
ভুলাও পুরুষ নারী।

একদিকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে শ্রীরাধার অন্তরের এই দহন-জ্বালা, অন্য দিকে তার এই বিরহ-ব্যথাকে লক্ষ্য করে কুটিলার কুটিল ইঙ্গিত—এতে অসহ্য হয়ে শ্রীরাধিকা বলছেন :—

কুটিল স্বভাব রে তোর গেল না,
তোর জ্বালায় ত ও-কুটিলা
প্রাণ ত বাঁচে না।
··· ··· ···
দাদার কাছে সোহাগিনী রে কুটিলা,
কালার প্রেম ত জানিস না,
তোর জ্বালায় ত ও-কুটিলা ইত্যাদি।
কাউয়া* কালা কোকিল কালা,
আঁখির পুতলি কালা,
কালা তোমার অঙ্গের নিশানা,
কালো রূপে জগৎ জোড়া রে কুটিলা
লোকে করে ঘোষণা,
সেই কালার লাগি প্রাণ ত বাঁচে না।

কুটিলার এই কুটিল ইঙ্গিত সত্ত্বেও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের জন্য তদ্‌গত প্রাণা ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর দুশ্চর তপস্যা পল্লীকবির লেখনীতে সজীব হয়ে ফুটেছে :—

বৃন্দে সই
আসবে বলি প্রাণ কালিয়া
নিশি জেগে রই।
আজ আসবে কাল আসবে বলে
পথ পানে চেয়ে রই।
বুঝি আমার কপাল মন্দ
না আসিলে প্রাণ গোবিন্দ,
আমার মনের দুঃখ মনে রইল
তোমায় বিনে কারে কই।

এই পল্লী-কবির শ্রীরাধিকার বিরহের তীব্রতা বৈষ্ণব কবির রাধিকার চাইতে কোন অংশে কম নয় :—

সখী তোরা হেলে মরতিস প্রাণে
যার জ্বালা সে জানে,
আমি আপন জ্বালায় জ্বলে মরি
শ্যাম বঁধুয়ার প্রেম বিহনে।
যার জ্বালা সে জানে।

পল্লীকবির রাধা বৈষ্ণবকবির শ্রীরাধিকার মতই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের জন্য কুল-মান-সমাজ প্রভৃতি সমস্তই উপেক্ষা করে :

মরমসখী গো, বলুক বলুক লোকে মন্দ
কার কথা কে শোনে,
আমি ছাড়ব না সই প্রেমলালসা
এবার যদি বাঁচি গো প্রাণে।

শ্রীরাধার প্রেম প্রতিদানহীন নয়। আর একটি সঙ্গীতে দেখি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরেও শ্রীরাধার মত অন্তহীন বেদনা :

বৃন্দে অন্তরে মোর নাই রে সুখ
কৈতে নারি ফেটে যায়রে বুক।

* কাউয়া—কাক, চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত।
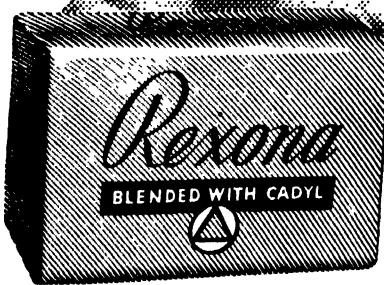
আমি রাইএর কারণে বৃন্দাবনে গো
ওগো বৃন্দে, দিয়েছি প্রেমের তমসুক।
... ...

রাই-এর জন্ত শ্যামের ব্যাকুলতারও সীমা-পরিসীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে শ্রীরাধার কুঞ্জে যাবেন সে জন্ম পায়ের নূপুরকে সকরুণ মিনতি জানাচ্ছেন সেগুলো যেন শব্দ না করে:

... ...

তোরে বলি ওরে নূপুর
উন্নুর ঝুন্নুর না বাজিও পায়
নিঃশব্দ হইয়া থাক
আমি রাধার কুঞ্জে যাই।
ও প্রেমময়ি রাই।

বৃন্দাবনের শ্রীরাধার কোন কোন সখী তার কাছে এসে জানিয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তার অজ্ঞাতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অভিসার করে। এ সংবাদ শুনে শ্রীরাধিকার অন্তরে অভিমান হয়েছে। মান ভাঙাতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট আপন হৃদয়ের গোপন কথা নিবেদন করছেন:

চিত্তধৈর্য্য ধর রাধে প্রেম রেখ গোপনে
প্রেম রেখ গোপনে রাধে
প্রেম রেখ গোপনে।
যাই না চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধে
মিছা কেন বলগো তুমি,
জন্মে জন্মে আছি বাঁধা
শ্রীচরণ কমলে।
রাধে গো প্রেম রেখ গোপনে॥

ধ্যান করি বসি গো ধ্যানে,
মূলমন্ত্র জপি তোমার নাম
মন জানে প্রাণ জানে আমার
বিচ্ছেদ জানে।
চিত্তধৈর্য্য ধর রাধে (ধুয়া)।

আমার সংগৃহীত পল্লীগীতির কয়েকটি মাত্র এখানে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হ'ল। এরূপ মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত বাংলার মাঠে, ঘাটে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কণ্ঠে নিত্য-নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। যাঁদের দরদভরা অন্তর আছে, পল্লীতে গেলেই তাঁরা এ ধরণের সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নেই।

পাঠক এ সমস্ত সঙ্গীতের ভেতর লক্ষ্য করবেন যে, এগুলোর মধ্যে ঘটনা-সন্নিবেশের অভিনবত্ব নেই, কাহিনীর বিস্তৃতি বা প্রসার নেই কিন্তু এ সঙ্গীতগুলোর বিষয়বস্তুর মূলে আছে বাঙালীর ভাবকল্পনার চিরন্তন বৃন্দাবন, কলঙ্কিনী যমুনা, কেলিকদম্ব, এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সেই সনাতন লুকোচুরি খেলা। পল্লীকবির এ সঙ্গীতগুলো বৈষ্ণবকাব্যের মত এত ভাবরসনিবিড় না হলেও একেবারে ভাবসম্পদহীন, এ কথা কোন মতে বলা চলে না, তাদের রস সংবেদনা বাঙালী চিত্তে চিরন্তন। এ জন্মই এই গীতিগুলো সাধারণ বাঙালী-চিত্তকে স্পর্শ করেছে বহুকাল ধরে। এ ধরণের সঙ্গীত রচনা করে এবং গান করে বহুকাল যাবৎ বাঙালী অন্তরে পেয়েছে অনাবিল সুখ, শান্তি ও আনন্দ। এমন কি এখন পর্য্যন্তও এ ধরণের সঙ্গীতের আবেদন পল্লীবাসী বাঙালীর চিত্তে ফুরিয়ে যায় নি। সে জন্ম বলছিলাম, এ শ্রেণীর সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক অমূল্য ও অবিনশ্বর সম্পদ।

পূর্ব্ব কথার প্রতিধ্বনি করে উপসংহারে আবার বলি, পল্লীকবির এ সমস্ত সঙ্গীত শুধুমাত্র বাঙালীর মর্ম্মসঙ্গীত নয়, সেগুলো বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীতও বটে। বাঙালী যদি nationalism-এর যথার্থ অর্থ বোঝে, তা হলে তারা এ শ্রেণীর সঙ্গীতের আদর করতে শিখবে এবং সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হবে।

* উন্নুর ঝুন্নুর—রুনু ঝুনু অর্থে—চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত।

আলোচনা

বর্দ্ধমান রাজবাটিতে কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি

শ্রীগোবিন্দলাল দে

গত সংখ্যার 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে ২৬৩,৬৪ পৃষ্ঠায় "বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কার্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি" শীর্ষক প্যারায় লিখিত হইয়াছে—"১২ই জ্যৈষ্ঠ বর্দ্ধমানের সুবলদহ গ্রামে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মভিটায় তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করিয়া যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় * * *" স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মহাশয়ের জন্মস্থান সুবলদহ নহে, ভদ্রেশ্বরের সন্নিকটে তাঁহার মাতুলালয়ে পাড়ালা বিঘাটি গ্রামে।

গত ১২ জ্যৈষ্ঠ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বসু মহাশয়ের যে স্মৃতি-সভা হয় তাহাতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান ভদ্রেশ্বরের নিকট পাড়ালা বিঘাটী গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার নামকরণে ডাকঘরের নামকরণ।" (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ দৈনিক বসুমতী দ্রষ্টব্য)। রাসবিহারী বসু স্মারক-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে রাসবিহারী বসু মহাশয় সম্বন্ধে দৈনিক বসুমতীতে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্মস্থান পাড়ালা বিঘাটী।

রাসবিহারী বসু মহাশয়ের কয়েকখানি জীবনীতে তাঁহার জন্মস্থান সুবলদহ এবং জন্মকাল সম্বন্ধে ১৮৮০, ৮২, ৮৫, ও ৮৬ লিখিত আছে। জাপানের ডাঃ ওসাওয়ার গ্রন্থের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া চন্দননগরনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ বসু মহাশয়ের সহোদরা শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী ও তাঁহার মাসীমাতা, যিনি মাতৃহারা বসু মহাশয়কে লালন-পালন করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের সহায়তায় জন্মস্থান ও জন্মতারিখ নির্দ্ধারিত হইয়া কয়েক বৎসর হইতে জন্মোৎসব পালিত হইতেছে। আমি জানি পরম শ্রদ্ধাভাজন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ও উক্ত মত পোষণ করেন। সুবলদহ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা, পিতামহের জন্মস্থান।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রূক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার রাণী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিন্নুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিন্নুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামাকাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2580-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

"উত্তমাশ্রম" পরিচিতি

শ্রীকালীকিঙ্কর দে

হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রামে ভাগীরথী-তীরে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ শান্তরসাস্পদ একটি আশ্রম—উত্তমাশ্রম নামে ইহার পরিচিতি। এই আশ্রমের পবিত্র পরিবেশ প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পার্ব্বতী দেবীর মন্দির, বাঁকুড়া

এই আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ আজ আর নরদেহে নাই—কিন্তু অগণিত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর আসন। তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—তাই শুধু নিজের মোক্ষসাধনা লইয়াই তিনি ব্যাপৃত থাকেন নাই, জগতের হিতকামনায় বিবিধ কল্যাণ-কর্ম্মেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তমাশ্রমের উর্ব্বরা ভূমিতে কর্ম্মযোগের যে বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া দিকে দিকে শাখাবাহু বিস্তার করিয়াছে।

বহুদিন আগেকার কথা। ভাবসমাধিমগ্ন অবস্থায় কাশীর ধ্রুবেশ্বর মঠের মোহান্ত উমেদগিরির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দুর্গত বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন ছবি। সেই অন্ধকারে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দিবার জন্য প্রিয়শিষ্য রামগিরি স্বামীকে তিনি পাঠাইলেন বাংলা দেশে। তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন শান্তানন্দ স্বামী। কি এক দুর্লভ রত্নের সন্ধানে ভাগীরথীর তীরে তীরে অবিরাম

পার্ব্বতী দেবী

অবিশ্রাম ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন শান্তানন্দ। অবশেষে কালনার পথে একদিন সেই দুর্লভ রত্নের সন্ধান মিলিল। যুবক নীলকান্ত একান্ত ভাবে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া স্বগৃহের অনতিদূরে "আনন্দ-কুটীরে" কঠোর সাধনায় রত হইলেন। এমনি ভাবে "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"—এক প্রদীপ হইতে অন্য দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, নীলকান্ত হইলেন স্বামী উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী!

এই নীলকান্তই কোটালপুরনিবাসী প্রবল প্রতাপান্বিত, একদা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন জমিদার নীলকান্ত সিংহরায়। গুরু-কৃপায় নীলকান্ত উত্তমানন্দে রূপান্তরিত হইয়া লাভ করিলেন দিব্য জীবন। তার পর 'বহুজন হিতায় চ সুখায় চ' জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সন ১৩১৬ সালের ভাদ্রমাস। হুগলী জেলার বলাগড় থানার অধীন, ভাগীরথী চুম্বিত ডুমুরদহ গ্রামের শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একদিন আবির্ভাব হইল তেজঃপুঞ্জ-

কলেবর এক সন্ন্যাসীর। সঙ্গে দুই জন শিষ্য—৺অচলানন্দ ও ৺ধনঞ্জয়দাস বৈরাগী। এই ডুমুরদহকে উত্তমানন্দজী নির্ব্বাচিত করিলেন তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে। স্থান নির্ব্বাচন-শুভলগ্নে উত্তমানন্দজী তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট স্থান বলিয়া বর্ত্তমান

স্বামী উত্তমানন্দ

উত্তমাশ্রমের পরিবেশের উল্লেখ করেন। প্রায় দুই বৎসর পরে এই রমণীয় স্থানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন উত্তমাশ্রম। আশ্রমের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল ১৩১৮ সালের ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার দিন। উত্তমানন্দজীর স্বপ্নদৃষ্ট স্থানই আজ ডুমুরদহ, উত্তমাশ্রম নামে পরিচিত হইয়া অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীকে অমৃতলোকের পথনির্দ্দেশ করিতেছে।

উদ্বোধন উৎসবের পর উত্তমাশ্রমে একে একে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন উত্তমানন্দের উত্তর সাধকবৃন্দ—আসিলেন স্বামী ধ্রুবানন্দ, মহিমানন্দজী, অচলানন্দ, অসিতানন্দ, হরানন্দ, প্রেমানন্দ, আত্মানন্দ, ধর্ম্মানন্দ, গিরিজানন্দ, জ্ঞানানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, সুবিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ ভক্ত কর্ম্মবীরগণ। তাঁহাদের আগমনে কর্ম্মরথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল নিভৃত আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

এবার সুরু হইল আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের পালা—ধ্রুবানন্দজীর জন্মভূমি ক্ষীরপাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইল আর একটি আশ্রম। এমনি ভাবে নানা পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে কাটিল আট-দশ বৎসর।

এই সময় ঘটিল এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রমাণিত হইল যে, "অঘটন আজো ঘটে।"

উত্তমানন্দজীর নারীভক্তদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া হইতেছেন শ্রীশ্রীকরুণাময়ী দেবী।

এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী সরোজিনী দেবীর ভগ্নী। বিজ্ঞানানন্দজীর মাতৃস্বসা এই পঙ্কজিনী দেবীই সিদ্ধিলাভ করিয়া করুণাময়ী দেবী নামে প্রখ্যাতা হন।

স্বামী ধ্রুবানন্দ

ভাবসমাধিতে নিমগ্ন থাকাকালে তাঁহার মুখ দিয়া অনর্গল প্রাকৃতভাষায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকাবলী নিঃসৃত হইতে থাকে।

করুণাময়ী দেবী দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এই অলৌকিক ঘটনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। সিদ্ধ ঘটের আবির্ভাব কালে পার্ব্বতী দেবী অলোক সুন্দরী বালিকা মূর্ত্তিতে করুণাময়ী দেবীকে দর্শন দেন। পরবর্ত্তীকালে পার্ব্বতী দেবীর এই বালিকা রূপ দর্শনেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন স্বামী মহিমানন্দজী শ্রীশ্রীধ্রুবানন্দজীর হাতে তুলিয়া দিলেন তিনি সিদ্ধ চণ্ডীঘট। সেই ঘট প্রতিষ্ঠিত হইল ডুমুরদহের আশ্রম-প্রাঙ্গণে। ইহার অনতিকাল পরেই করুণাময়ী মা অমৃতলোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

করুণাময়ীর দেহরক্ষার অব্যবহিত পরেই ডুমুরদহ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইলে আশ্রমের ভক্ত শিষ্যবৃন্দ কায়মনোবাক্যে পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, অনেকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন আশ্রমবাসী-দের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন আচার্য্য ধ্রুবানন্দজী। তাঁহার নির্দ্দেশে কর্ম্মবীর মহিমানন্দজী বাহির হইয়া পড়িলেন উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে। নানা জায়গায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে আসিয়া

কঁড়ো পাহাড়ের রমণীয় পরিবেশে তিনি মুগ্ধ হইলেন, তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় সেই পাহাড়ের সানুদেশে ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে প্রতিষ্ঠিত হইল উত্তমাশ্রমের শাখা তপোবনাশ্রম। আশ্রম প্রবেশের দিনটি উত্তমাশ্রমের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস।

স্বামী মহিমানন্দ

সেই স্মরণীয় দিবসে সহসা সুরু হইল মুষলধারায় অবিশ্রান্ত বর্ষণ, আর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝটিকার তুমুল গর্জ্জন। মনে হইল, এই প্রলয়ঝঞ্ঝা বুঝি উড়াইয়া লইয়া যাইবে নবনির্ম্মিত খোড়ো-ঘরগুলি সহ পাহাড়ের চূড়া। অন্ধকার রাত্রিতে সংহার-রূপিণী বিশ্বজননীর সেই কালনৃত্য উপভোগ করিতে লাগিলেন মহিমানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজী, নিত্যানন্দ, হেম উপাধ্যায় প্রমুখ মাতৃচরণাশ্রিত মহা ভক্তবৃন্দ।

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়
মৃত্যুরে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

—বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল সেই দুর্য্যোগরাত্রিতে। বিশ্বজননী অলোক-সুন্দরী কিশোরী বালিকারূপে আবির্ভূতা হইলেন বিজ্ঞানানন্দজীর সম্মুখে। এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়—এ যে প্রত্যক্ষ দর্শন! এই অলৌকিক ব্যাপার, এই অঘটন সম্বন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী স্বয়ং বলিয়াছেন,—"১৩২৯ সালে যখন শ্রীশ্রী-গুরুদেবের গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ মহিমানন্দ মহারাজ বাঁকুড়া পাহাড়ের উপর আশ্রম স্থাপন করিতেছিলেন, তখন আমি একদিন সাত-আট বৎসরের বালিকামূর্ত্তির দর্শন পাই। সারা পাহাড়টা তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এখন পাহাড়ের যে ৪০০ ফুট চূড়ার উপর মন্দির হইতেছে সেখানে মাকে ধরি। তখন মা বলেন, 'এখানে থাকবো আমায় ছেড়ে দে।' অপূর্ব্ব এ স্বপ্ন-কথা যখন মহিমানন্দ মহারাজকে বলি, তখন তিনি বলেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত্ত্বিক অষ্টভুজা মূর্ত্তি, ঐ পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" এই অলৌকিক

করুণাময়ী

ঘটনার ছয় বৎসর পরে ১৩৩৫ সালে পুরীধামে দেহরক্ষা করেন মহিমানন্দ মহারাজ।

ইহার পর একে একে কাটিয়া গেল একটি দুইটি নয়, ত্রিশ-ত্রিশটি বৎসর। সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে কঁড়ো পাহাড়ের চূড়ায় অষ্টভুজা পার্ব্বতীদেবীকে প্রতিষ্ঠিত যে শুভসঙ্কল্প জাগরূক হইয়াছিল, মহিমানন্দজীর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অন্তরে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। ১৩৫৯ সালে পূর্ণানন্দ স্বামী ও প্রেমানন্দের সহযোগিতায় তিনি আশ্রমের সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে চলিল শ্রীশ্রীচণ্ডীর অষ্টভুজা সাত্ত্বিক মূর্ত্তির সন্ধান। ভক্তের সেই একান্ত বাঞ্ছিত মাতৃমূর্ত্তির খোঁজ পাওয়া গেল ১৩৬১ সালে কাশীবাসী শ্রীসতীশ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। দুই শত টাকা ব্যয়ে কাশীধাম হইতে শ্বেতপাথরের সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্ত্তি আনীত হইল, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইলেন পাহাড়ের উপরকার তপোবন আশ্রমে।

বহুদিন আগে জগজ্জননী শ্রীশ্রীচণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া-ছিলেন শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মায়ের সিদ্ধবটে, এতকাল পরে রাজরাজেশ্বরী সিংহবাহিনী পার্ব্বতী দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রে পরিণত হইল তপোবন-পাহাড়।

এই নিখিল বিশ্বই মায়ের মন্দির, তবুও ইট-পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই দেব-দেউলের পাদপীঠের উপর মায়ের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে মাতৃভক্ত সাধকের আত্মার তৃপ্তি হয় না। এবার মাতৃ-মন্দিরের নির্ম্মিত সম্পূর্ণ করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। মাতৃভক্ত সন্তানের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থাকিবার কথা নয়। ১৩৬১ সালের ১২ই মাঘ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, কালু দত্ত, কৃষ্ণ মিশ্র, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ প্রমুখ ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ভিত্তি-প্রস্তর

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

স্থাপন করিলেন বরাহনগর পৌরসভার সভাপতি মাননীয় শ্রীকানাইলাল ঢোল মহাশয়। মন্দিরের গাঁথুনির কাজ আরম্ভ হইল ১৩৬৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে।

মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যের যখন সূচনা হয় অর্থসংস্থান তখন ছিল সামান্যই। কিন্তু কাজ যতই আগাইতে লাগিল, ভক্ত ও শিষ্যদের দানের মাত্রা ততই বাড়িয়া চলিল। জগজ্জননী স্বয়ং এই পাহাড়ে থাকিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তেরা নিমিত্তমাত্র হইয়া মহা পুণ্যকৃত্য সম্পাদনের অংশভাগী হইবার গৌরব অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইলেন। এইভাবে কর্ম্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং স্বামী পূর্ণানন্দজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দুই বৎসরের মধ্যে লক্ষাধিক অর্থব্যয়ে মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে নবনির্ম্মিত সুরম্য মন্দিরে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল ১৩৬৪ সালের রবিবার ৪ঠা ফাল্গুন দিবসে। চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাসাধক শ্রীশ্রীউত্তমানন্দজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের তপস্যা-পরিশুদ্ধ চিত্তে যে শুভ-সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল আজ তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া বিশ্বজননীর অপরিমেয় মাহাত্ম্যকেই সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকটিত করিল।

জগন্নাথের রথ যেমন একার টানে চলে না, অগণিত ভক্ত রথরজ্জুকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সম্মুখের পানে আগাইয়া লইয়া যায় তেমনি জগন্মাতা পার্ব্বতী দেবীর এই মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার মূলেও রহিয়াছে বহুজনের ঐকান্তিক অনুরাগ এবং অক্লান্ত প্রয়াস। ইহার পরিকল্পনা কুলটী আয়রণ ওয়ার্কসের ইঞ্জিনীয়ার ও আশ্রমের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণধন মিশ্রের।

স্বামী পূর্ণানন্দজী

এই মন্দিরের রূপদানে তাঁহার সহযোগিতা করেন শ্রীমহাদেব হাজরা, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীকানাইলাল ঢোল, শ্রীকালীকুমার দে, কালীপদ বক্সী, শিবপদ চট্টোপাধ্যায়, বাসন্তী দেবী প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ। আরও কত ভক্ত নরনারী যে এই পুণ্য-কর্ম্মে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহার অন্ত নাই। সকলের নামোল্লেখ করা এখানে সম্ভবপরও নহে। কারণ ইহা ত সত্য যে, অন্তরের প্রেরণাই ভক্তদের এই পুণ্যকর্ম্ম প্রণোদিত করিয়াছে, নামের কাঙ্গাল তাঁহারা নহেন।

একদা যে কঁড়ো পাহাড় ছিল দুরধিগম্য আজ সে স্থানে যাওয়া কত সহজসাধ্য হইয়াছে! এখন ডুমুরদহ উত্তমাশ্রম হইতে মোটরগাড়ীতে চড়িয়া যাওয়া যায় মগরার সিদ্ধাশ্রমে। তার পর সোজা দুর্গাপুরের পুলের উপর দিয়া একেবারে সরাসরি পৌঁছানো যায় পাহাড়-আশ্রমে। ট্রেণ এবং বাসে করিয়াও উত্তমাশ্রম তপোবন পাহাড়-শাখায় যাইবার ব্যবস্থা আছে।

আজ এই তপোবন পরিণত হইয়াছে বেদান্তের জ্ঞান এবং তন্ত্র-পুরাণের ভক্তির এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে।

এখানকার শান্ত পরিবেশ সাধু সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগ্রত করে অধ্যাত্ম আকূতি, গৃহীর দুঃখতাপদগ্ধ অন্তরে বুলাইয়া দেয় শান্তির প্রলেপ।

পাহাড়টি আকারে ক্ষুদ্র, মাত্র তিন চার শত বিঘা জুড়িয়া ইহার বিস্তার। প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চভূমিতে বিশ বিঘা পরিমিত এলাকায় উত্তমানন্দজীর ইষ্টক-নির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির, শান্তিনিবাস নামে যাত্রীনিবাস, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের চারচালা, মাঠকোঠা ইত্যাদির অবস্থিতি। নগ্ন পাহাড় আজ সাধু-সন্ন্যাসীদের সযত্ন-রোপিত বৃক্ষলতার শ্যামলশ্রীতে মণ্ডিত এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ।

আর চারিশত ফুট উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত সুরম্য মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবীর তুষারশুভ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সিংহবাহিনী অষ্টভুজা দেবী নানা প্রহরণধারিণী, বরাভয়করা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা। স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত প্রশান্ত আননে তাঁহার দিব্যবিভা।

ভক্তমণ্ডলীর ধ্রুব বিশ্বাস দেবীর প্রতিষ্ঠাভূমি এই তপোবন আশ্রম হইতে বিকীর্ণ আধ্যাত্মিকতার শুভ্র অমলিন রশ্মিমালায় একদিন শুধু বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্বভুবন আলোকিত হইয়া উঠিবে—মর্ত্ত্যের মানুষের সম্মুখে সেদিন উদ্ঘাটিত হইবে অমৃতলোকের নূতন দিগন্ত।
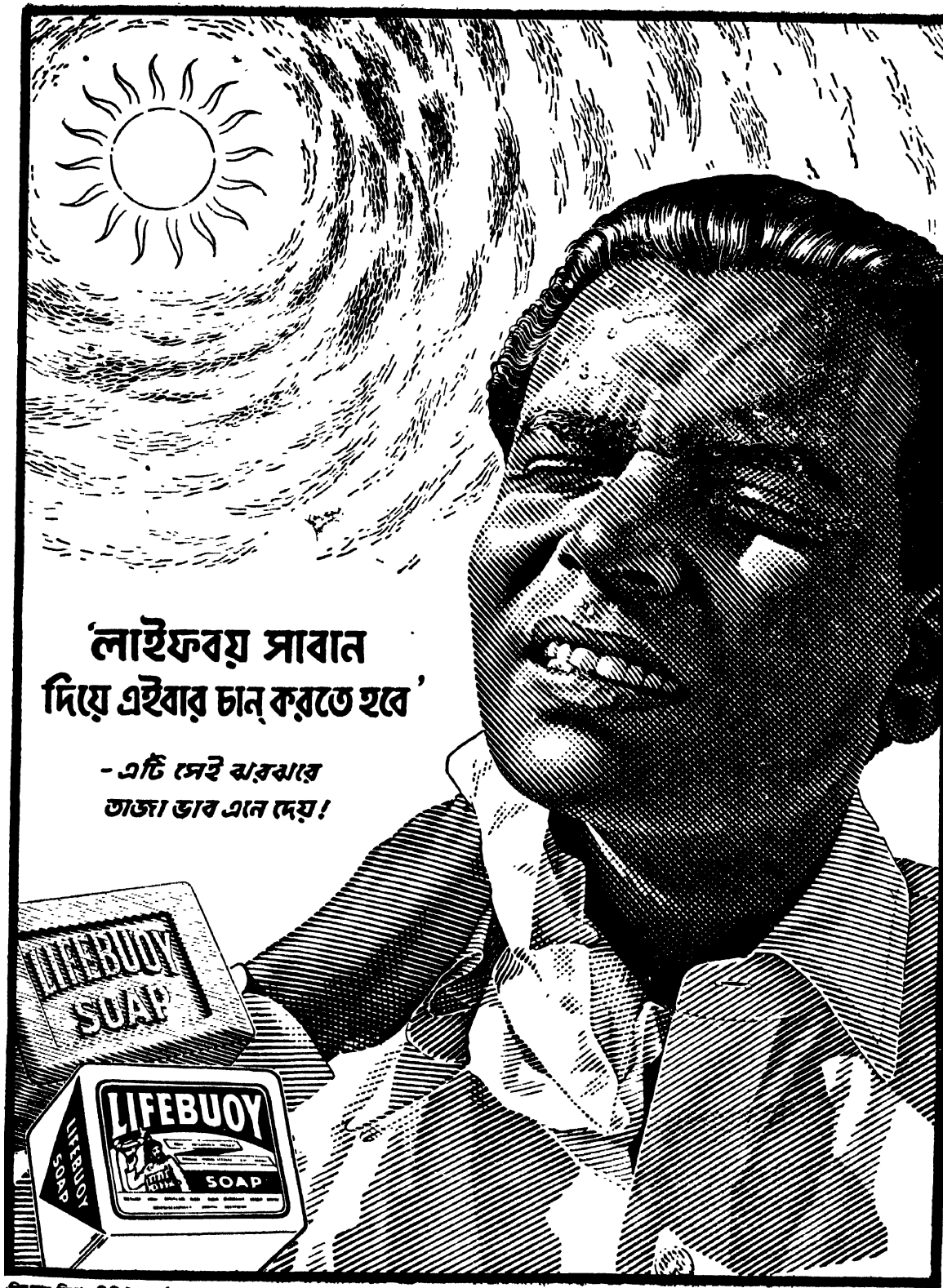
'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
-এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

নতুন জাপান—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, সচিত্র। মূল্য আট টাকা।

বিদেশী সাংবাদিকদিগের লিখিত নানা দেশের বিবরণ আমরা নানা ভাষায় পাই। সাধারণতঃ সেগুলি সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ হইতেই দৃষ্ট ও লিখিত। যে দেশের বিবরণ সেখানের লোকজন, দৃশ্যাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে অভিনব ও চমকপ্রদ একটি চিত্র দিবার প্রয়াসই ঐ জাতীয় বইয়ের প্রধান বিশেষত্ব। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের জাতীয়তাবাদের যে লুকানো ধারা তাহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলিকে একটা অদ্ভুত রূপ দান করে।

কালীপদ বাবুর "নতুন জাপান" সাংবাদিকেরই দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত। তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে, আমরা ইংরেজী বইয়ে জাপানীদের যে পরিচয় পাই এই পুস্তকে তাহা হইতে অনেক বেশী সাক্ষাৎ ও নিগূঢ় চিত্র দেওয়া হইয়াছে। জাপান ও জাপানীকে—তাহার দেশ, সমাজ, ও রাজনীতির সম্পর্কে—অনেক কাছে দেখা যায় ইহার মাধ্যমে। বিবরণও বিশেষ মনোগ্রাহী এবং ভাষা সরল। কয়েকটি সুন্দর ছবিও দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটি।

পৌরাণিক অভিধান—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ৭'০০।

এই বইটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিল। স্বর্গীয় শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বইটি বাজার হইতে যাইবার পর এই অতি-আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে কোনই তথ্যমূলক পুস্তক ছিল না। সুধীরবাবুর দীর্ঘ ছয়-সাত বৎসরের পরিশ্রমের ফলে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা বস্তুতঃই মহামূল্য।

কতক স্থলে পুনরুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই সমালোচনায় দেখাইবার মত নাই। যাহা আছে বইয়ে তাহা এতই সুন্দর ভাবে বিবৃত যে, অনেক আধুনিক নভেল অপেক্ষা সুখপাঠ্য। অভিধান অপেক্ষা পৌরাণিক কোষ ইহার নাম হইলে বোধ হয় ঠিক হইত। ঘরে ঘরে ইহা যাওয়া উচিত।

ক. চ.

মিষ্টি মন—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—দু-টাকা।

"মিষ্টি মন" কবিতা-পুস্তক। উনষাটটি গীতি-কবিতার সমষ্টি। বইয়ের নামটি মিষ্টি। লেখক তরুণ। যে বয়সে মন মধুর স্বপ্নময় এবং রোমাণ্টিক বেদনায় উদ্বেল হইয়া ওঠে, লেখকের সেই বয়স। জীবনের সুমিষ্টতার দিকে প্রবণতা তাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বইখানি তিন ভাগে বিভক্ত—'মিষ্টি মন', 'শবরী' ও 'শৃঙ্খল'। এই-রূপ বিভাগ না করিলেও চলিত। প্রথম কবিতায় লেখক বলিতে-ছেন:

ঝকঝকে রোদ-ঝরা শরতের আলো-ভরা যখন সকাল,
সেই আলো চোখে মেখে ভাবি বুঝি পাবো কার মনের নাগাল।

'মেঘ আসে' কবিতায় বলিতেছেন:

নতুন পৃথিবী আসে মেঘ বৃষ্টি ঝড়ে নেচে প্রলয়-খেলায়।

'রত্নালা'য় আছে:

ভাদ্রের ভরা জলে পদ্মপাতায় ঢাকা কান্নার বিল,
জলঝারা করে ছলছল।

শুধু বেদনা নয়, সান্ত্বনাও আছে:

সূর্য্য-গলানো শরতের রোদ চোখে চোখে ঝিলমিল,
দূরের আকাশ অজানা আশার আশ্বাসে গাঢ় নীল।

প্রেম কল্যাণময়:

নতুন কামনা নিয়ে ছন্দে ছন্দে লীলায়িত প্রেম,
চেতনায় ছুঁয়ে যায় আমাদের জীবনের ক্ষেম।

লেখক ছবি আঁকেন:

'রূপালি নদীর তীরে বুনো হাঁস ডানা ঝাপটায়।'
'সবুজ ঘাসের বুকে খেলা করে প্রজাপতি হলুদ রঙের
পাখায় নরমে মেখে রোদের সোনালী ঘ্রাণ।'

মনের 'ষ্টেশনে' মানুষ বসিয়া থাকে:

সে গাড়ীর যাত্রী কত তবু তারি মাঝে
চিনে নিতে হবে জানি একটিই মুখ।

পথ সুদূর এবং প্রশ্নের অন্ত নাই:

চলন্ত পথের মাঝে কত জাগে জীবন-জিজ্ঞাসা।

রমেন্দ্রনাথের ছন্দের হাত আছে এবং অনেকগুলি কবিতায় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দচয়নে আধুনিকতার ছাপ দেখিতে পাই। 'মিষ্টি মনে' লেখক মাধুর্য্য-সন্ধানী। কবিতাগুলি কাব্যপ্রিয় পাঠকের মিষ্ট লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬১, দাম ৫৲ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীই হইল বাঙালী প্রতিভার এক বিস্ময়কর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন। এবং এই পরিবর্ত্তনের প্রথম সাধক রাজা রাম-মোহন রায়। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া সাহিত্যকে এক নূতন-খাতে তিনিই বহাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অনুসৃত ধারাই গদ্য-সাহিত্যের নব রূপায়ণ। 'উনিশ শতকের

বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বাঙালী সংস্কৃতির ধারাকে ত্রিপুরাশঙ্কর এই ভাবেই দিগদর্শন করাইয়াছেন।

'ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি লইয়া বাঙালী যতই গর্ব্ব করুক, বিশ্ববাণীর সহিত বঙ্গবাণীর মৈত্রী-বন্ধন তখনও স্থাপিত হয় নাই, বিশ্বের আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙালী সত্তাই জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়া ছিল। রাজা রামমোহনই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে আতিথ্য দান না করিলে আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ কোন দিন সাধিত হইবে না…'

হইয়াছিলও তাহাই। প্রকৃতপক্ষে এই উনিশ শতকই হইল বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি পর্ব্ব।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার যে ভাবে অধ্যায়গুলি ভাগ করিয়াছেন, তাহা উন্নতির ক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন 'রাজা রামমোহন ও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি পর্ব্ব', 'ঈশ্বরগুপ্ত ও বাংলা কাব্যের যুগসন্ধি', 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার নব-জাগরণ', 'বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন ও সাহিত্য সাধনা', 'প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা গদ্যে পরীক্ষার যুগ', 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের উন্মেষ পর্ব্ব', 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য', 'রঙ্গলাল ও ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য', শ্রীমধুসূদন ও বাংলার কাব্য-সাহিত্যে নবযুগ', 'দীনবন্ধু ও বাংলার নাট্য-সাহিত্য', 'বঙ্কিম পরিক্রমা', কবি হেমচন্দ্র ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী', 'মহাকবি নবীনচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত', 'বিহারীলাল ও বাংলার গীতি-কবিতা।

এই শতকের শেষার্দ্ধে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে গত যুগের কবি না বলাই ভাল। প্রকৃতপক্ষে বিহারীলাল পর্য্যন্ত উনিশ শতকের শেষকাল। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ এবং তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ত্রিপুরাশঙ্কর যে ভাবে করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের কথা বলিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলার গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন।…সমাজ বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হিন্দুধর্ম্মের যে নব-জাগরণ দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার দার্শনিক, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যাহার কবি, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন ও চন্দ্রনাথ যাহার নিবন্ধকার, সেই জাগরণে বিদ্যাসাগরের স্থান কোথায়?…রাজা রামমোহন সর্ব্বপ্রথম উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। উত্তরকালে বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের সমক্ষে বেদান্তের ভেরীনিনাদ করেন। কিন্তু এই নব-জাগরণে বিদ্যাসাগরের যে দান রহিয়াছে, তাহা সহজে চোখে পড়ে না। যে বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাসে'র রচয়িতা, আমরা সে বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি না, যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-বিদ্যার মণিমঞ্জুষা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং যিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি রচনা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা হইতে বাঙালী বিদ্যার্থীকে মুক্ত করেন, আমরা সেই বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর যদি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের পথ এমন সুগম না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে এত দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং, যদিও এই জাগরণে বিদ্যাসাগর পরোক্ষভাবেই সহায়তা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষভাবে নয়, তথাপি ইহার পশ্চাতে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনলস হস্তের দান রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।"

এই গ্রন্থে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল, গ্রন্থকার কোথাও কাহাকে অযথা স্তুতি করেন নাই—প্রয়োজনানুরূপ স্পষ্ট কথায় তাঁহাদের নিন্দা না করিয়াও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যাঁহার যতটুকু স্থান তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। লেখকের পক্ষে এ সংযম রক্ষা বড় কম কথা নয়।

বস্তুতঃ 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থখানি ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। নব্য বাংলায় ইহা অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিল। সাধারণ পাঠকের জন্যই শুধু নহে, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শ্রীগৌতম সেন

আত্মবাদ—শ্রীললিতকুমার সেন: দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৮১২ পৃঃ, মূল্য দশ টাকা।

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবার মত যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে কি না এবং নৈতিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন মানব সমাজের অনুশাসনের অনুগত, না বহু উর্দ্ধে দৃঢ়মূল এই বিষয়ক জিজ্ঞাসা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া চিন্তা-ভাণ্ডার মন্থন করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করিয়াছেন। গ্রন্থে বহু শাস্ত্রবাক্য ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের এবং চিন্তানায়কের রচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও তাহার পাশাপাশি যে নিরীশ্বরবাদ ছিল তাহার আলোচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলের নিরীশ্বরবাদ এবং বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যে সকল শাখা আত্মবাদ সমর্থন করে ও ঐ সঙ্গে যে সকল মত

বিপক্ষে গিয়াছে সব বস্তুর সাধ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। বইটি Encyclopaedia; দশ প্রকরণের ভিতর প্রথম সাত প্রকরণ বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করিয়া গ্রন্থকার শেষ তিন প্রকরণে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আধুনিক যুগ সমন্বয়ের যুগ। এক দিকে বহু বৈচিত্রের একত্র সমাবেশ ও সংঘর্ষ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে—অন্য দিকে মানব-চিত্তের চিরন্তন প্রকৃতি তাহার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র যে সমন্বয়ের সাধনা আরম্ভ করেন, কেশবচন্দ্র যে সমন্বয় ধর্মকে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিয়া যান, তাহার ক্রমবিকাশ ও সাধনার ক্রম জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী আজও অব্যাহত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থটি এবং গ্রন্থকারের অশেষ পরিশ্রম তাহারই পরিচায়ক। এই সাধনাই নূতন জীবন (New pattern of life) গঠন করিবে, কেবল-মাত্র শুষ্ক চিন্তা নয়।

গ্রন্থকার উপনিষদকেই ভিত্তি করিয়াছেন। উপনিষদের শিক্ষার আলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন —আবার বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উপনিষদের গভীর অর্থ জ্ঞানের পানে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে সহজ করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। মানুষ যাহা যুক্তিবিচারে আহরণ করে তাহাই তাহার জীবনগত হয়, তাহাকেই সে ক্রমে ভালবাসে এবং আত্মস্থ করে। সত্য যাহা, তাহাকে এই ভাবে আহরণ করিয়া, জীবনগত করাই গ্রন্থকারের লক্ষ।

গ্রন্থকার বহু নূতন পরিভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। ছাপা ভাল, ভুল খুবই কম। দামও কম। চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার-প্রণালী আদৃত হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

মুঠো মুঠো কুয়াশা—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

গল্পগ্রন্থ। ছয়টি গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। যথাক্রমে বাসি ফুল, স্বর্গদ্বার, মুঠো মুঠো কুয়াশা, আলো-আঁধারি, মেঘমল্লার ও আশার আলো। প্রাণতোষ বাবুর লেখক-পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। তাঁর আকাশ পাতাল, মুক্তাভস্ম প্রভৃতি উপন্যাস-গুলি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকখানি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। গল্প লেখার হাতও তার অত্যন্ত মিঠা। বাসি ফুলে তিনি সুনন্দাকে কেন্দ্র করিয়া নারী চরিত্রের যে দিকটি দেখাইয়াছেন, তাহা চিরদিনের পুরাতন একটি অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির দিক। স্বামী সপ্তাহ অন্তে ঘরে আসিতেছেন, সঙ্গে আসিবে তাহারই সহোদরা। রুগ্না সুনন্দা আগ্রহের সহিত তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বামী আসিলেন কিন্তু সুনন্দার ভগ্নীর আসা সম্ভব হইল না। এই না আসিতে পারায় সুনন্দার মনে দুঃখের চেয়ে স্বস্তির যে ভাবটি আত্মপ্রকাশ করিল তাহা সত্যই অনুপম।

আলো-আধারিতে আমিনার বাঁদরনাচ দেখানোকে কেন্দ্র করিয়া লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রস পরিবেশন করিয়াছেন। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কি কদর্য্য রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং আমিনার মত একটি সাধারণ শ্রেণীর মেয়েও যে কত সুন্দর ভাবে নিজের ইজ্জত বাঁচাইয়াও এক শ্রেণীর মানুষকে বাঁদর নাচাইতে পারে, এই গল্পটির মধ্যে তার যে ছবি লেখক আকিয়াছেন তাহা মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখে।

মুঠো মুঠো কুয়াশা পড়িয়া মনে হইল যে, বিষয়বস্তুর চেয়েও বড় বস্তু লেখার মুন্সীয়ানা। নহিলে প্রেমিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি চিঠিকে গল্পের সুরু হইতে শেষ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কুয়াশার আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যে রস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক কথায় অপূর্ব্ব।

অন্যান্য গল্পগুলি সম পর্য্যায়ে না পড়িলেও সুলিখিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছাপা ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

ধূমায়িত পৃথিবী—অশ্বিনীকুমার। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

সামাজিক উপন্যাস। বীরু প্রধান নায়ক—টগর নায়িকা। উভয় উভয়কে ভালবাসিত কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় টগরকে বিবাহ করিতে হইল বীরুর খুল্লতাতকে। বীরু বিচলিত হইলেও অবস্থাটাকে মানিয়া লইয়া সমনের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু টগরের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। তার জীবনের দীর্ঘকাল দ্বৈত কান্তের টানাটানিতে কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ স্বামীকে শ্রদ্ধা ভক্তি আর সেবা যত্ন দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া যখন একটা বৈরাগ্যময় সুন্দরের সাধনা করিয়া চলিল টগর—হৃদয়ের কামনাময়ী ভালবাসাটা তখন অপর একজনের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে। তার পরেই দেশ বিভাগ হইল। ক্ষুধার জ্বালায় বৃদ্ধ অসমর্থ স্বামী পরপুরুষ দেখাইয়া দিল কিন্তু টগরের দেহ, মন, আত্মা কোনটারই সাড়া মিলিল না। এক সময় বৃদ্ধ মারা পড়িল, কিন্তু টগর থামিতে পারিল না। তার চোখে তখনও স্বপ্নের ঘোর—সৃষ্টির উন্মাদনা। বীরুর কাছে নিজেকে অকপটে নিবেদন করিল টগর। বীরু শিহরিয়া উঠিল। কঠিন হইয়া উঠিল। সে তার স্ত্রীকে ভালবাসে—সমাজকে, তার রীতি নীতিকে মানিয়া চলে। সুতরাং টগরকে ব্যর্থভাবে চলিয়া যাইতে হইল। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে টগরের সহিত বীরুর সাক্ষাৎ ঘটিল মায়ের মন্দিরে। টগর তখন সন্তানের জননী! প্রসূতি একটি অভিশপ্ত নির্ব্বোধ বালিকা কিন্তু জননী টগর।

মোটামুটি ঘটনাটি এইরূপ। ভাষা মোটামুটি। ঘটনা বিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। মাঝে মাঝে অতি নাটকীয়তা মনকে পীড়া দেয়।

ছায়ালোক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী। ১৯৪ বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২·৭৫।

গল্প সঙ্কলন। বারটি গল্প পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলির ব্যাখ্যা করা মানুষের সহজ বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয়। অলৌকিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলি লিখিত কিন্তু এই শ্রেণীর গল্পকে জমাইয়া তুলিতে হইলে যে ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাহার একান্ত অভাব প্রায় সবগুলি গল্পেই পরিদৃষ্ট হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ঝরা—বাগবুল ইসলাম। জাগরণ প্রকাশনী। ১২, বলাই দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য ১৷৵০।

তরুণ মনের স্বপ্ন কল্পনা সুললিত ছন্দে ও ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। ছোটখাট ত্রুটি দু'এক জায়গায় না আছে এমন নয়, কিন্তু সহজ সৌন্দর্য্যবোধ ও ঋজু প্রকাশভঙ্গীর গুণে অধিকাংশ কবিতা সুখপাঠ্য হয়েছে।

এব্ লিঙ্কন—ষ্টার্লিং নর্থ। অনুবাদক সুনীলকুমার ধর। গ্রন্থম্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ১·৫০ টাকা।

এব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার হয়েও সারা পৃথিবীর। যাঁদের মহত্ত্ব দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করেছে তিনি তাঁদের একজন। আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থখানি চমৎকার গল্পের ভঙ্গীতে লেখা। অনুবাদও সহজ সাবলীল। বালক-বালিকাদের কাছে এ রচনা লাগবে রূপকথার মত মনোরম, অথচ জীবনের সুখদুঃখের স্বাদও এতে তারা পাবে; আর অনুভব করবে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জয়যাত্রার গৌরব।

গৌরদাসের কবিতা—সম্পাদনা গৌরদাস। বাঁশবাড়ী, মালদহ। দুই টাকা।

কবিতাগুলিতে নবীন মনের সহজ উচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবির রচনায় গাঢ়তা হয়ত আসবে পরে। আপাততঃ এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাবলীল ভাবটি আমাদের খুশী করেছে। ভূমিকা পড়ে মনে হ'ল খ্যাতি-লিপ্সা কবিকে চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু সে লিপ্সা প্রবল হলে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে, তাই এ বিষয়ে সংযম বর্জনীয়।

কাব্যকাহিনী—শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্বেতাঙ্গিনী, রামের প্রতি সীতা, শিবের প্রতি সতী, নরনারী, মীনাক্ষীর মনোবেদনা, এই ছয়টি কবিতা। কবিতা? পদ্যও ত মনে হ'ল না; গদ্য কবিতাও নয়। একটু উদাহরণ:

"গ্রীষ্মের অন্তে আসে বরষা—বরসার (?)
অন্তে আসে শরৎরাণী; রাণীর পরে
রাজা হেমন্ত,—হেমন্তের সুপুত্র (?) শীত
আসে ধীরে চুপি চুপি অপলক্ষ্যে
বিশ্বের যত সুষমাবলী।"

রসিকের কাছে, আশা করি, এইটুকুই যথেষ্ট।

আরতি—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড। ৪১এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

বৈষ্ণব ভাবের কয়েকটি কবিতা। বৃদ্ধ রচয়িতা সর্ব্বদুঃখত্রাতা করুণাময় ভগবানের শরণ নিয়েছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছায়াবিহীন—শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। প্রকাশক শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫। দাম দু' টাকা।

একখানি বিয়োগান্ত নাটক। নাটকের ঘটনাগুলি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। লেখক নিজেই লিখেছেন, "জঁ। পল সার্ত্তর-এর মেন উইদাউট স্যাডোজ...অবলম্বনে" নাটকখানি রচিত এবং "সবদিক থেকে বিবেচনা করলে সার্ত্তর-এর লেখা...এর সঙ্গে ছায়াবিহীনের মিল আছে, ভাব অর্থ যার রসের দিক থেকে।" তবে চরিত্রগুলি এবং পরিবেশ বাংলা দেশের। নাটকটির বক্তব্য লেখকের কথায় 'নতুনের ক্ষমতালাভ আর পুরনোর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা।' সেজন্য কঠোর দ্বন্দ্ব এবং পাশবিক শক্তির প্রকাশ। ফলে নাটকখানির সবটুকু জুড়ে বীভৎস রসের বিস্তার। কিন্তু উপসংহারে পুরানোরই জয়ের ইঙ্গিত। নাটকখানি কলিকাতার এক নাট্যশালায় বৎসর দুই পূর্ব্বে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। কাজেই সার্থকতা পরীক্ষিত হয়েছে বলা যায়। সাহিত্য হিসাবে আমাদের ভালই লেগেছে। পড়তে পড়তে বিপ্লবী বাংলাকে মনে পড়ে।

ঝিল, দুই সৈনিক ও অন্যান্য গল্প—অনুবাদক শ্রীগৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীপদ্মা চট্টোপাধ্যায়। ১৮ বিন্দু পালিত লেন, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা-সংখ্যা, ১৫৯। দাম দু' টাকা চার আনা।

গ্রন্থখানিতে পাঁচজন মার্কিন লেখক রচিত তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম ফকনরও আছেন, পাঁচটি ছোট গল্পের অনুবাদ আছে। অনুবাদ হলেও রচনাগুলির স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা বজায় আছে। এখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। মার্কিন লেখকগণের সুন্দর মূল উপন্যাস ও নাটকগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক পাঠকের পরিচয় আছে, কিন্তু ছোট গল্প রচনায়ও মার্কিন লেখকগণ অসাধারণ কৃতী। "চলার পথে" ও "ঝিল" গল্প দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এক আকাশ তারা—শ্রীস্বপন দাস। নন্দন প্রকাশনী, ১৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

বাংলা সাহিত্যে একটা অত্যন্ত কুপ্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। তা এই : কোন বই প্রকাশের আগেই নামী সাহিত্যিকদের প্রশংসাপত্র জোগাড় করে বইয়ের মলাটে ছেপে দেওয়া। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা এই দুই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়াস হয়ত এটা। স্বপন দাস এরকম চেষ্টাই করেছেন। প্রথম সংস্করণের এই বইখানির মলাটে অন্য আর এক পত্রিকার মন্তব্য কি করে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল—এবং জুড়ে দিয়ে তার পর সমালোচনার্থে আমাদের কাছে বই পাঠানোর উদ্দেশ্যই বা কি জানি না।*

অত্যন্ত সাধারণ লেখা। জীবনের অনেকগুলি সাধারণ কাহিনী সাধারণ ভাবে বলে যাবার কি তাৎপর্য্য আছে জানি না। তবে লেখকের চিত্তে আবেগ আছে, সাহিত্য-প্রীতি আছে। বয়সও সম্ভবতঃ তাঁর অল্প। সাহিত্যে ব্রতী হয়ে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা তাঁর আছে, সুযোগও আছে। উত্তর-জীবনে তাঁকে লেখকরূপে সফল হতে দেখলে আমরা সুখী হব।

ছাপা, বাঁধাই চমৎকার। প্রচ্ছদপট লেখকের আঁকা, তাঁর অঙ্কন সুন্দর।

মায়ামৃগ—শ্রীসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী। জে, এন, চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট। মূল্য এক টাকা।

সুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তীর এখানি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ে গ্রথিত কবিতাগুলি এবং আরও অনেক কবিতা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি হিসাবে পাঠকসমাজে তবু এখন পর্য্যন্ত তিনি অপরিচিতই আছেন। কিন্তু এই কবির রচনা সম্পর্কে আমরা আগ্রহান্বিত হয়েছি। ভবিষ্যতে সার্থকতর রচনা তাঁর কাছ থেকে আশা করা অন্যায় হবে না।

তাঁর কাব্যে মধুর এবং রুদ্র একই সঙ্গে আহ্বান পাঠিয়েছে। আরও মাঝে মাঝে এক ব্যর্থতাবোধও তার ছায়া ফেলে গেছে। তাই অনেক সময় জীবনের যা কিছু উজ্জ্বল, সুন্দর দিক তা অতীতের সামগ্রীরূপে প্রতিভাত হতে চেয়েছে। আধুনিক জীবনের সংঘাতও তাঁর কবিচিত্তকে স্পর্শ না করে পারে নি। যেমন তিনি লিখছেন :

> গ্রীষ্মে যারা পুড়ে মরে রোদে,
> বর্ষায় মরিল যারা ভিজে,
> নিজের ক্ষুধার অন্ন খেলো না যে নিজে—
> তাহাদের তরে :
> পথের নির্দ্দেশ আছে রক্তিম অম্বরে।
>
> (রক্ত সংকেত)

তবে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কাব্যের কারুকলার দিকে তাঁকে আরও নজর দিতে হবে। শিল্পরূপ এবং আঙ্গিক সম্পর্কে সবিশেষ যত্নপর না হলে কাব্য সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ

গত ৫ই জুলাই হইতে ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সাত দিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসোৎসব সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়।

ঐ কয়দিনের উৎসবে বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল। আলোচনার বিষয় ছিল—বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অভ্যুন্নতি, সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণ, সংস্কৃত ও বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বভাষা সংস্কৃত। ইহা ছাড়া বিবিধ প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও সংস্কৃতচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন।

ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন—"মুসলমান রাজত্ব সময়ে মুসলমান মনীষীগণ সংস্কৃত সাহিত্য কত অনুশীলন করেছেন। মহম্মদ সাহের সঙ্গীত-মালিকা সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ, দারাশুকোইর 'সমুদ্রসঙ্গম' নামক হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়মূলক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রভৃতি তার প্রকৃত পরিচায়ক।"

তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—"সংস্কৃত সাহিত্য শুধু "ভারত-বাসীর পূর্ব্ব-পুরুষদের পবিত্রস্মৃতিমহিম অস্থি নয়, বিশ্বের প্রতি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টির যাবতীয় স্মারক পদার্থ। আজ তাই ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই বিশ্ববরেণ্য মনীষিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের মহামহিমা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে ধন্য হচ্ছেন।"

সম্প্রতি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বাংলা দেশ হইতে দাবী জানান হইয়াছে। সরকার ইহা অনুমোদন করিলে সংস্কৃত ভাষার প্রভূত উন্নতি হইবে।

বিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল
('বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আলাপরতা
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী
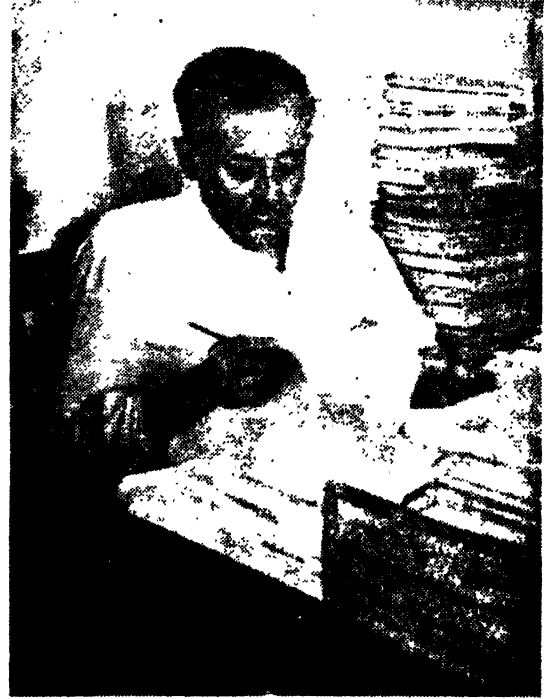
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকায় সেক্‌সপীয়ার গার্ডেন-এ গৃহীত ছবি)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ ১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৬৫ } ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জয়-পরাজয়

"প্রেষ্টিজ" নির্বাচন শেষ হইয়াছে এবং কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইয়াছেন ও "বামপন্থী"-সমর্থিত প্রার্থী জয়ী হইয়াছেন। পরাজয়ের পর কংগ্রেসের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের মনে কি চিন্তার উদয় হইয়াছে বা কি জল্পনা-কল্পনা তাঁহারা করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা শুধু জানি যে, এই প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত যুক্তি-পরামর্শের পথেই তাঁহারা কংগ্রেসকে ডুবাইতেছেন। ঐরূপ যুক্তি-পরামর্শের সরল নাম চক্রান্ত এবং চক্রান্তকারীদিগের উদ্দিষ্ট পথ অন্ধকারেই থাকে।

সে যাহাই হউক, জয়ের পরে সম্মিলিত "বামপন্থী" দল বিজয়ী প্রার্থীকে লইয়া যে "জুলুস" গঠন করিয়া পল্লী পল্লী ঘুরিয়াছিলেন, সেই অপরূপ "জুলুস" এতই অশোভন যে, উহাকে শোভাযাত্রা বলা অসম্ভব। বাস্তবিকই উহা দেখিয়া আমাদের মনে হেমচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে লিখিত অনুপ্রাসযুক্ত দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের কবিতা স্মরণ হয়। সুতরাং এই নির্বাচনে "প্রেষ্টিজ" কাহার বাড়িল?

মনে হয় যে, আজিকার দিনে পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র এতই ঘৃণ্য ও পঙ্কিল হইয়াছে যে, জাতির পরিত্রাণের পথ আর বেশী দিন থাকিবে না। যেভাবে অতীতে বহু সমৃদ্ধ জাতি ও দেশ কলুষিত রাজনীতির ও কুচক্রী নেতৃত্বের ফলে ধ্বংসের পথে নষ্ট হইয়াছে, আমাদের সাধের স্বপ্নময় সোনার বাংলাও বুঝি বা সেই নিদারুণ পরিণামই প্রাপ্ত হইবে।

কোন দেশ বা জাতির জীবনযাত্রার পথ যখন উত্তরোত্তর অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্বহ বাধাবিঘ্নপূর্ণ হইতে থাকে তখনই সমাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকেরা দলবদ্ধভাবে অসহায় জনসাধারণের দুর্দ্দশার অবকাশে নিজেদের অর্থ বা ক্ষমতা-লালসা পূর্ণ করে। ঐ মনুষ্য-দেহধারী সরীসৃপগণের মায়া-মমতা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক গুণাবলীর কিছুই থাকে না। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাট লক্ষ নরনারী ও শিশুকে তিলে তিলে বধ করিয়া বিপুল অর্থসঞ্চয় তাহার উদাহরণ।

দেশের জনসাধারণ যদি দেখে যে, শাসনতন্ত্র যাহাদের আয়ত্তে তাহারা ক্লিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত, জনসাধারণের দুর্দ্দশা লাঘব বা দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার দমনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, তখন জাতির জীবন বিকারগ্রস্ত হইতে বাধ্য। জাতির সেই দৈহিক এবং মানসিক বিকার স্বার্থান্বেষী বা ভাগ্যান্বেষী চক্রান্তকারীদিগের সুবর্ণসুযোগ। এই স্বার্থান্বেষী ও ভাগ্যান্বেষী দল বহুরূপী, "বাম" "দক্ষিণ" ইত্যাদি সব কিছুই ছলনা মাত্র। স্বার্থই তাহাদের একমাত্র পন্থা, তাহা দলগতই হউক বা ব্যক্তিগতই হউক। দেশের বা দশের উপকার বা উন্নয়ন সে পন্থার ক্ষেত্রে আসেই না। আজ পশ্চিম বাংলার এই কথা প্রমাণিত হইতেছে।

সেই কারণে যখন কোনও জাতি দুর্গম পথের পরিক্রমা আরম্ভ করে, যেমন আজ ভারত করিতেছে, তখন সে দেশের নেতৃবর্গ এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করেন। ব্রিটেন যখন বিগত মহাযুদ্ধে জীবনমরণ পণ করিয়া লড়িতেছিল এবং খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানীর পথ একেবারে রুদ্ধ তখনও সেখানে কালোবাজার-চোরাবাজার ইত্যাদি প্রবল হইতে পারে নাই। তাহার কারণ দেশের শাসনতন্ত্র যাহাদের হাতে ব্রিটিশ জাতি দিয়াছিল তাহাদের এ বিষয়ে যোগ্যতা ছিল, বুদ্ধিবিচার-ক্ষমতা ছিল এবং সর্ব্বোপরি, যেখানে তাহাদের নিজ বুদ্ধিতে সঙ্কুলান হইত না সেখানে সৎপরামর্শ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকায়, সেই পরামর্শ সংগ্রহে উৎসাহ ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই সৎপরামর্শদাতারা স্বার্থান্বেষী চাটুকার ছিলেন না। এই কারণেই আজ ব্রিটিশ জাতি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও দাঁড়াইয়া আছে।

আর আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতৃগণ? যোগ্যতা নাই, বিচারবুদ্ধি নাই, এমনকি সৎপরামর্শ লাভের স্পৃহাও নাই। আছে শুধু ক্ষমতা-লালসা, তোষামোদস্পৃহা এবং চৌরচক্র প্রতিপালন-কামনা। দেশের কি হইবে?

নির্ব্বাচন তালিকার সংশোধন

২৪শে আগষ্ট কলিকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার একটি আসন পূর্ণ করিবার জন্য উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগের ফলে যে আসনটি শূন্য হইয়াছিল তাহা পূরণের জন্যই নির্ব্বাচন হইয়াছে। শ্রী রায় এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন—তবে কংগ্রেসী প্রার্থী হিসাবে নহে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে। সিদ্ধার্থ রায় মহাশয়ের পদত্যাগে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী এই উপনির্ব্বাচনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সকলেই এই উপনির্ব্বাচনের ফলাফল জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন।

কিছুদিন যাবৎ এইরূপ অভিযোগ করা হইতেছিল যে, ভবানীপুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ভোটার তালিকা হইতে বেআইনীভাবে বহু লোকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিধানসভায় বিরোধী-পক্ষীয় নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই বিষয়টি উত্থাপন করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় স্বীকার করেন যে, তিনি নিজেও এরূপ অভিযোগ পাইয়াছেন এবং উহা বহুলাংশে সত্য, তবে বিষয়টি নির্ব্বাচন কমিশনের হাতে থাকায় রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ভাবে কোনকিছু করার উপায় নাই।

অস্থায়ী প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রী কে, ভি, কে, সুন্দরম্ কলিকাতায় আসিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার পর প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, অভিযোগের পিছনে যথেষ্ট ভিত্তি রহিয়াছে, তবে এ ব্যাপারে চীফ ইলেকটোরাল অফিসার বা ইলেকসন রেজিষ্ট্রেশন অফিসার এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের কোন দায়িত্ব নাই। তিন ব্যক্তির অভিযোগক্রমেই ডিভাইজিং অথরিটি ঐ সকল লোকের নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দেন। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া নির্ব্বাচন কমিশনার ভবানীপুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের জন্য আদেশ দেন।

নির্ব্বাচন কমিশনারের এই সিদ্ধান্তে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অনেকেই মনে করেন যে, এ ব্যাপারে আরও পূর্ব্বেই যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইত। এই ঘটনা হইতে আরও বুঝা যায় যে, ভোটার তালিকা সম্পর্কে অন্যান্যবার যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা একেবারে ভিত্তিহীন নাও হইতে পারে। নির্ব্বাচন কমিশনার স্বয়ং তদন্ত করিয়া যখন বুঝিয়াছেন যে, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে তখন কিভাবে এই ত্রুটি ঘটিল সে সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে ভবিষ্যতে এইরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি না ঘটিতে পারে সে সম্পর্কেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজতর হইবে। কি ভাবে কেবলমাত্র তিন জন লোকের কথায় ১,২০০ লোকের নাম বাদ দেওয়া হইল তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীসুন্দরম্ বলিয়াছেন যে, ইহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তিনি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা জনসাধারণের নৈতিক বোধকে উচ্চতর মানে উঠিতে সাহায্য করিবে। কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল কি করিয়া ডিভাইজিং অথরিটি তিনজনের কথায় ১,২০০ লোকের নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দিলেন।

নির্ব্বাচন-প্রথার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ জন্মিলে গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিবে। সুতরাং নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠিলে যথাশীঘ্র তাহার অনুসন্ধান এবং প্রতিকার হওয়া উচিত। ভবানীপুর-কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনের ভোটার-তালিকা প্রণয়নের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলাফল যথাশীঘ্র জনসাধারণের গোচরে আনা যেহেতু নির্ব্বাচন কমিশনারের অন্যতম দায়িত্ব।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অধিকাংশেরই নেতা শ্রমিক নহেন। এই বহিরাগত নেতৃত্বের দুর্ব্বলতা এই যে, প্রায় অধিকাংশ সময়েই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলি শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থে পরিচালিত না হইয়া রাজনৈতিক স্বার্থেই পরিচালিত হয়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আজ যে বহুধা বিভক্ত তাহারও কারণ নেতৃবৃন্দের রাজ-নৈতিক রূপ। ভারতের প্রধান চারিটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা প্রধানতঃ চারিটি রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিফলন, ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (কংগ্রেস দলীয়) নিখিল ভারত ট্রেড ইউ-নিয়ন কংগ্রেস (কমিউনিষ্ট), হিন্দ মজদুর সভা (প্রজা-সোস্যালিষ্ট) এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (অন্যান্য বামপন্থীদল সমর্থিত)। অপরপক্ষে একথাও বলা যাইতে পারে যে, ভারতের বিশেষ রাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার গোড়ার দিকে বহিরাগত নেতৃত্ব ব্যতীত কোনরূপ শ্রমিক আন্দোলনই গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত না।

ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কোন শ্রেণীর লোক? তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসই বা কি? এ সম্পর্কে এখনও কোন বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা আলোচনা হয় নাই যদিও এই অবস্থার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের টাটা ইনষ্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক এস. ডি. পুনেকার মহাশয়ের নির্দ্দেশানুযায়ী ঐ বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্র বোম্বাইয়ের ৪৫ জন শ্রমিক নেতার জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত 'ইকনমিক উইকলি' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে অধ্যাপক পুনেকার এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে বোম্বাই-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

বোম্বাইয়ের অধিকাংশ শ্রমিক মারাঠী—নেতৃবৃন্দও তাই।

তবে অধিকাংশ নেতাই মারাঠী, হিন্দী ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। শ্রমিকগণ অধিকাংশ অব্রাহ্মণ, কিন্তু নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ (শতকরা ৬০ জন) ব্রাহ্মণ। তবে শ্রমিক আন্দোলনের উপর ভাষা এবং বর্ণের প্রভাব এখন অত্যন্ত কম। নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক, কিন্তু বর্ত্তমানে বোম্বাই নগরীতেই তাঁহারা বসবাস করেন। শ্রমিক নেতারা একই সময়ে বহু ইউনিয়নের উপর কর্তৃত্ব করেন। একজন আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা ১৭টি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং অপর দুইটি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। একজন এ-আই-টি-ইউ-সি নেতা ২০টি ইউনিয়নের কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন। নেতৃবৃন্দ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতৃত্ব করিতেছেন।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবেই চলে। নেতার দলবদলের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নও অনেক সময় দল-বদল করে। একটি পি-এস-পি ইউনিয়নের নেতা যখন কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন তখন তাহার ইউনিয়ন ও হিন্দ মজদুর সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এ-আই-টি-ইউ-সিতে যোগদান করে।

অধিকাংশ শ্রমিক নেতাই রাজনীতির সহিত গভীর ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছেন। অনেকেই পৌরসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং পার্লামেণ্টের সভ্য।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই মধ্যবয়সী। শতকরা পঞ্চাশ জনের বয়স ৩১ হইতে ৪০য়ের মধ্যে। যে ৪৫ জন নেতার জীবনী সংগ্রহ করা হয় তাঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত: তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জন গ্রাজুয়েট; মাত্র দুইজনের শিক্ষা ম্যাট্রিকের নীচে।

কয়েকজন নেতা ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একজন হিন্দমজদুর সভার নেতা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, একজন আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর উপাধির অধিকারী, একজন সলিসিটর অপর একজন ব্যারিষ্টার। অনেকেই আইনজ্ঞ। নেতৃবৃন্দের জীবিকানির্ব্বাহ হয় কিরূপে? দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৮৫ জন নেতা ট্রেড ইউনিয়ন প্রদত্ত মাহিনার উপর নির্ভর করিয়াই চলেন। তাঁহাদের বেতন মাসিক ৫০ হইতে ৩৫০ টাকার মধ্যে। আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মাসে ২৫০ টাকার মত পান আর এ-আই-টি-ইউ-সি'র নেতারা পান ১৫০ টাকার মত। কয়েকজন নেতার ব্যয় বহন করেন রাজনৈতিক দল। যে সকল নেতা আইনবিদ, তাঁহারা ওকালতীর অর্থে সংসার চালান। অপর কয়েকজন স্ত্রীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল।

অধ্যাপক পুনেকার লিখিতেছেন যে, আহৃত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই নিঃস্বার্থ কর্ম্মী। তাঁহারা অপর যে কোন কাজ করিলে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা শ্রমিক নেতার উদ্বেগময় জীবন বাছিয়া লইয়াছেন। বহিরাগত নেতৃত্ব হইতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভূত সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু নেতৃবৃন্দ অত্যধিক রাজনীতি-ঘেঁষা হওয়ার জন্য শ্রমিক-আন্দোলন ব্যাহত হইয়াছে এবং শ্রমিকদের মধ্য হইতে উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সমধিকরূপেই দেখা দিয়াছে। বাংলার কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কি এই আলোচনার সূত্রপাত করা যায় না?

সরকারী কর্ম্মচারীর অধিকার

সরকারী কর্ম্মচারীদের অধিকার সম্পর্কে পাটনা হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রায়ে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মঘট করা বা কোনরূপ বিক্ষোভপ্রদর্শনে অংশগ্রহণের অধিকার সরকারী কর্ম্মচারীদের নাই। সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সাধারণ মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের মত নহে। প্রধান বিচারপতি রামস্বামী এবং বিচারপতি শ্রী আর, কে, চৌধুরী বলেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা সরকারের একটি অংশরূপে "বিশেষ মর্য্যাদা"র অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ সম্পর্কে জনসাধারণ উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি সরকারী কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দেন তবে তাঁহাদের কর্ম্মের শৃঙ্খলা এবং মানের অবনতি ঘটিবে।

মহামান্য বিচারপতিদ্বয় কেবলমাত্র ধর্ম্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকেই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কর্ম্মচারিগণ মৌখিক এবং লিখিত অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

কেরালা ও উত্তর-প্রদেশে পুলিশের গুলীবর্ষণ

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেরালাতে এক স্থানে পুলিশ গুলী চালাইলে কয়েকজন লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং কয়েকজন গুরুতর রূপে আহত হয়। কেরালাতে গুলী চালনার সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক বিক্ষোভ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং অকম্যুনিষ্ট সকল দলই এই নিন্দাবাদে যোগ দেন। এই সকল দলের আচরণ দেখিয়া একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় ভারতবর্ষে কোন রাজ্য সরকার কখনও গুলী চালনার আদেশ দেন নাই। নিতান্ত দলীয় স্বার্থেই যে এরূপ হট্টগোল চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর-প্রদেশে ছাত্রদের উপর গুলী চলিল। কেরালার গুলী চালনার বিশেষ কোন যুক্তি ছিল না বলা হইল, অথচ উত্তর-প্রদেশেও ছাত্রদের উপর গুলী চালনার পিছনে কোন যুক্তি ছিল কিনা তাহার বিচার হইল না। কেরালা সরকার গুলী চালনার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু উত্তর-প্রদেশ সরকার এরূপ কোন তদন্তে সম্মত হন না। কিন্তু তথাপি

উত্তর প্রদেশের গুলীচালনা লইয়া কেরালার ঘটনার মত কোন সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন হয় নাই।

এই মন্তব্যের ফলে যদি কেহ মনে করেন কেরালা সরকারের আচরণে কোন অন্যায় হয় নাই, তবে তিনি বিশেষ ভুল করিবেন। কেরালাতে কম্যুনিষ্ট সরকার বহু বিষয়ে অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে যখনই কোন আন্দোলন হইয়াছে তখনই তাহাকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী আন্দোলন আখ্যা দিয়া নির্ম্মমভাবে দমন করিয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা কেরালাতে পুলিশের গুলীচালনার সমর্থনে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে, তাহা হাস্যকর ও অবাস্তব। অপরপক্ষে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দলগুলির ব্যবহারেও কোন উচ্চতর নৈতিক মানের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যে কংগ্রেস কেরালায় গুলীচালনায় এত ক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে সেই কংগ্রেসই উত্তরপ্রদেশ গুলীচালনা সম্পর্কে একটি তদন্তে পর্য্যন্ত সম্মত হইতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বস্তুতঃ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির যে নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ বেদনাদায়ক। যেখানে কম্যুনিষ্টরা-বিরোধী দল, সেখানে তাহারা বিশৃঙ্খলতা প্রতিরোধ করিবার কোন প্রচেষ্টা করা দূরে থাকুক ঐরূপ শৃঙ্খলাহীনতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। জামসেদপুরের ধর্ম্মঘট তাহা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অপরপক্ষে কেরালায় যখন অকম্যুনিষ্ট দলগুলি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছে তখন তাহাদের উপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাহাদের কোন দ্বিধা দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেস সম্পর্কেও একথা উঠিতে পারে। আর প্রজাসমাজতন্ত্রী এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের ত কোন রাজনৈতিক মূল্যবোধ আছে বলিয়াই মনে হয় না।

কলিকাতাস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফিস

পাক্ষিক 'বর্ত্তমান ভারত' ১৬ই শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিতেছেন :

"অপরদিকে আর এক প্রবল সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, কলিকাতাস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বিভাগটি রহিয়াছে, উহা নাকি বাংলা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া নাগপুরে স্থাপিত হইবে। উক্ত সংবাদ সত্য হইলে ইহা খুবই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এইরূপ জরুরী একটি অফিসের সকল দিকের উপযুক্ততা হইতেছে কলিকাতা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ যুক্তিতে উহা নাগপুরে লইয়া যাইতে চাহেন তাহা আমাদের সবিশেষ জানা নাই। ইহা সত্য হইলে বর্ত্তমানে যাঁহারা চাকুরীতে আছেন তাঁহাদের হয়ত বা নাগপুরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদের চাকুরীর কাল শেষ হইলে তাঁহাদের ছেলেরা নাগপুরে চাকুরী করিতে যাইবেন, না তথায় তাঁহারা চাকুরী পাইবেন? ইহা হইলে বাংলার অধিবাসীদের উচ্চস্তরের চাকুরী লাভের এক বিরাট সুযোগ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইবে।

কলিকাতা হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিস সরাইয়া লইবার পিছনে কি যুক্তি আছে জানা নাই। ঐরূপ অপসারণে কেবল যে চাকুরীজীবীদেরই অসুবিধা হইবে তাহা নহে, বৃহত্তর জনসাধারণের উহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কলিকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়া গেলেও এখনও কলিকাতা ভারতের অন্যতম বাণিজ্য এবং শিল্পকেন্দ্র ; বিভিন্ন ব্যাপারেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত জনসাধারণকে সম্পর্ক রাখিতে হয়। এ অবস্থায় অফিসটিকে সুদূর নাগপুরে উঠাইয়া লইয়া গেলে জনসাধারণের অসুবিধা বাড়িবে বই কমিবে না। অপরপক্ষে নাগপুরের জনসাধারণের যে ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে তাহারও কোন আশা নাই।

সমবায় প্রথার গতি

যদিও আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ভারতবর্ষে সমবায় প্রথা চালু করা হইয়াছে তথাপি ইহার প্রগতি নিরাশাব্যঞ্জক। স্বাধীন ভারতে সমবায় প্রথাকে উন্নয়ন ও ব্যাপক করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংযোগ ও অংশীদারী ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্ব-ভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান কমিটি যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে সমবায় প্রথা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, তথাপি সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় প্রথার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমবায় প্রথার অধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, কিন্তু সেইখানেই ইহার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়।

১৯৫৬ সনের সমবায় আন্দোলনের যে ইতিবৃত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কৃষিঋণ সমিতিগুলির সংখ্যা ১·৩৫ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ২৯·৬৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৬ সনে ইহা দাঁড়াইয়াছে ৪৯·৬২ লক্ষ টাকায়। ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৬ সনের মধ্যে সমবায় সংস্থাগুলির আর্থিক সংগতিও যথেষ্ট দৃঢ়তর হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা হইতে ১৫ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব তহবিল ৫·৬১ লক্ষ হইতে ৭·৬৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমিতিগুলির সংখ্যা ২১ শতাংশ, সভ্যসংখ্যা ১৫ শতাংশ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩৩ শতাংশ বাড়িয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিমতে গত তিন-চার বৎসরে সমবায় আন্দোলন উন্নয়নের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে সমবায় প্রথার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত যথার্থ নহে, কারণ জাতীয় অর্থনীতির যে সকল ক্ষেত্রে সমবায় প্রথার কার্য্যকারিতা প্রগতি লাভ করা উচিত ছিল তাহা হয় নাই। ভারতে সমবায় প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য গ্রাম্য এলাকায় কৃষিঋণ সরবরাহ করা, কিন্তু সেই দিক দিয়া সমবায় প্রথার ব্যর্থতা সূচিত হয়। ভারতে বাৎসরিক কৃষিঋণের প্রয়োজন যেখানে হাজার কোটি টাকার

উপরে, সেখানে বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দান সমবায় ব্যবস্থার ব্যর্থতা ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কৃষিঋণের বিষয়ে সমবায় প্রথার আদৌ কোন কার্য্যকারিতা আছে কি না। পৃথিবীর অনেক কৃষি-উন্নত দেশে (যেমন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে) সমবায় প্রথার কোনও ব্যবস্থা নাই। সেই সকল দেশে কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে কৃষিঋণ বিতরণ করা। ভারতবর্ষে সমবায় প্রথার পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

ইদানীং কুটিরশিল্প ও স্বল্পায়তন শিল্পগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতেছে। কেবলমাত্র তাঁতশিল্পই যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে এবং ইহাতে দেখা যায় যে, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে সমবায় প্রথার উপযোগিতা আছে। সমবায় তাঁতশিল্পের অধীনে ১৯৫৬ সনে ১০ লক্ষের অধীন তাঁত চালু ছিল, এবং ১৯৫৩ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৬·৮ লক্ষ। তাঁতশিল্পে সমবায় প্রথার প্রগতি অন্যান্য কুটিরশিল্পে ইহার উপযোগিতা সূচনা করে। সমবায় বেচা-কেনা সমিতিগুলিও ইদানীং কিছু কিছু উন্নতি করিতেছে, কিন্তু ক্রেতাদের ব্যবহারিক সমবায় দিন দিন অবনতির পথে যাইতেছে। সমবায় সংস্থাগুলিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা-সমিতি সংযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ভারতীয় চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতীয় চা-শিল্প দেশের আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক আর্থিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে এই শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত, এবং ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় চা রপ্তানী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং ইহা হইতে ভারতবর্ষ বৎসরে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপায় করে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না।

১৯৫৭ সনে ভারতবর্ষে ৬৬·৬ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে উত্তর-ভারতে হইয়াছে ৫২·১৪ কোটি পাউণ্ড এবং দক্ষিণ-ভারতে ১৪·৪৬ কোটি পাউণ্ড। ১৯৫৬ সনে ৬৬·৬৭ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হিসাবে গত বৎসর উত্তর-ভারতে প্রায় ৩ কোটি পাউণ্ড চা কম উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সনে ভারতবর্ষ হইতে ৪৪·৭ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী হয় এবং ১৯৫৬ সনে ৫২·৩৬ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল।

ব্রিটেন হইতেছে ভারতীয় সাধারণ চায়ের বৃহত্তম বাজার, কিন্তু গত কয়েক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে ভারতীয় চা রপ্তানী প্রায় শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের চা ইংলণ্ড আমদানী করে এবং আন্তর্জ্জাতিক চায়ের বাজারে পূর্ব্ব-আফ্রিকা দ্রুতভাবে ভারতীয় চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় চা-শিল্পের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে উৎপাদন যদি ৭০ কোটি পাউণ্ডের অধিক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বৈদেশিক রপ্তানীর চাহিদা এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে না। ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে প্রায় ২২ কোটি পাউণ্ড চায়ের প্রয়োজন এবং ভারতীয় চা-বোর্ডের হিসাব অনুসারে ভারতে এক কোটি পাউণ্ড চায়ের চাহিদা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে ভারতবর্ষ নিজের দেশের চাহিদা মিটাইবার পর বৈদেশিক বাজারের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না।

ইরাণ এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে চা আমদানী করিত; কিন্তু বর্ত্তমানে সে নিজেই চা উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে চা আমদানী প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় চায়ের বৈদেশিক বাজারে বহু প্রতিযোগী আছে, যথা—সিংহল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং ফরমোসা। সিংহল ব্যতীত অন্যান্য কোনও দেশের চা রপ্তানীর উপর কোনও প্রকার রপ্তানী-কর নাই; ইহার ফলে ঐ সকল দেশ সস্তায় বিদেশের বাজারে চা রপ্তানী করিতে পারে এবং এই কারণে ভারতীয় চা রপ্তানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ভারতীয় চা উৎপাদনের প্রায় ৭৫ ভাগ সাধারণ চা, অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর চা। ভারতবর্ষে উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক, বিশেষতঃ ডুয়ার্স অঞ্চলে। তাহার উপর পাউণ্ড প্রতি ৩৮ নয়া পয়সা হিসাবে রপ্তানী-কর ধার্য্য থাকায় ভারতীয় চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পায়, ফলে নিকৃষ্ট চা উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে বিদেশীরা রাজী হয় না। সুতরাং ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধি করার জন্য রপ্তানী-শুল্ক রহিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। গত জুন মাস হইতে চায়ের উৎপাদন শুল্ক কিছু পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে পাউণ্ড প্রতি মাত্র আট নয়া পয়সা সুবিধা হইবে। রপ্তানী-শুল্ক হ্রাস না করিলে ভারতীয় চা বৈদেশিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে না।

ভারতীয় চিনি রপ্তানী

ভারত হইতে চিনি রপ্তানী বিষয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে এবং সকল দলের সভ্যরা এই বিষয়ে সরকারী কার্য্যে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার যথার্থ কারণও আছে। পার্লামেণ্টের অধিবেশনের একপক্ষকাল পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি চিনি রপ্তানীর সাহায্যকল্পে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন এবং তাহাতেও যথেষ্ট আপত্তি করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে শর্করাশিল্প সরকারের পোষ্যপুত্রের ন্যায় ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ভারতীয় শর্করাশিল্পের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্য্যাবলী সর্ব্বজনবিদিত; এই কয় বৎসরে শর্করাশিল্পের

ইতিহাস কালোবাজারী মুনাফার ঔজ্জ্বল্যে জাজ্বল্যমান, অবশ্য ইহা সরকারী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমর্থনে সম্ভবপর হইয়াছে। চিনি রপ্তানীর জন্য যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক, ইহা যেন শর্করাশিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য একটা অহেতুক ব্যবস্থা এবং তাহার ফলে আভ্যন্তরিক চিনির মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চিনি রপ্তানীর অর্ডিন্যান্স অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার চলতি বৎসরে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫০,০০০ হাজার টন চিনি রপ্তানীর জন্য অনুমতি দিয়াছেন। রপ্তানীর জন্য ভারতীয় শর্করাশিল্পের মালিকদের সমিতিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমিতি প্রায় ১২,৪০০ টন চিনি রপ্তানীর অর্ডার সংগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, চলতি বৎসরেই এই ৫০ হাজার টন চিনি বিক্রীত হইয়া যাইবে। ১২,৪০০ টন চিনি যাহা বিক্রীত হইয়াছে তাহার মধ্যে সুদান লইয়াছে ৯০৯০ টন। ইহা ডি-২৯ শ্রেণীর চিনি এবং বোম্বাইয়ে জাহাজী সরবরাহমূল্য টনপ্রতি ৪২৬.৬৭ টাকা পাওয়া যাইবে। বাকী ৩,৪০০ টন চিনি মালয়কে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২,৫০০ টন ডি ২৯ শ্রেণীর চিনি এবং তাহার জাহাজী সরবরাহমূল্য টনপ্রতি ৪৩৫.৩৩ টাকা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং ৯০০ টন সি-২৯ শ্রেণীর চিনির বোম্বাইয়ে জাহাজী সরবরাহমূল্য টনপ্রতি ৪৪ টাকা ঠিক হইয়াছে। ডি-শ্রেণীর চিনির বিদেশে রপ্তানীর মূল্য টনপ্রতি ৪২৭; কিন্তু এই শ্রেণীর চিনির কারখানা নির্দ্ধারিত মূল্য হইতেছে ১০৬০ টাকা।

অর্থাৎ চিনি রপ্তানীতে টনপ্রতি ৬৩৩ টাকা করিয়া ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার জন্য টনপ্রতি উৎপাদন-শুল্ক ২৯১.২০ টাকা এবং ইক্ষু-কর টনপ্রতি ৫০.৯০ টাকা কেবলমাত্র রপ্তানী চিনির উপর রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবু মোট ক্ষতির পরিমাণ টনপ্রতি ২৯১ টাকায় দাঁড়াইবে। অর্থাৎ ভারতীয় চিনি রপ্তানীর উপর সরকারী সাহায্যের জন্য বিদেশী ক্রেতারা মূল্যপ্রতি শতকরা ৬৮ ভাগ সুবিধা পাইতেছে এবং মিল-মালিকরাও লাভের অংশ পাইতেছে। পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরকালে ইহা প্রকাশিত হয় যে, আভ্যন্তরিক চিনির মূল্যবৃদ্ধির ফলে মিল-মালিকরা প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, টনপ্রতি ১,০৬০ টাকার মূল্যের চিনি ৪২৭ টাকা টনে বিদেশে রপ্তানী করিয়া কাহার লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে? অবশ্যই মিল-মালিকদের সুবিধার জন্য এবং তাহার জন্য ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণকে চিনির জন্য অধিক মূল্য দিতে হইতেছে। চিনির উৎপাদন-ব্যয় বাস্তবিকই এত অধিক কিনা এবং ভারতের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় চিনি রপ্তানী উচিত কিনা তাহার জন্য শুল্ক-কমিশন কর্ত্তৃক অনুসন্ধান প্রয়োজন। অর্ডিন্যান্স জারীর একটি কৈফিয়ৎ হিসাবে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহা না হইলে বাজারে গুজব উঠিত যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরাই চিনি রপ্তানী করিবেন। কিন্তু তাহাতে দেশের কি ক্ষতি হইত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক সংস্থা দ্বারা চিনি রপ্তানী করা যাইতে পারিত।

পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে ঢাকা হইতে প্রকাশিত অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'আমার দেশ' লিখিতেছেন:

"পাকিস্থানের প্রাক্তন আইনসচিব জনাব ব্রোহী সম্প্রতি লাহোরে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় পাকিস্থানের রাজনীতি সম্পর্কে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়াছেন। জনাব ব্রোহী বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানে স্বচ্ছ রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ক্ষমতার বেদীতে সমাসীন কতিপয় দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারীর কার্য্যকলাপের ফলে পাকিস্থানের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ পাকিস্থানে গণতন্ত্রের পরীক্ষাই হয় নাই, পাকিস্থানের বিগত দশ বৎসরের ইতিহাস হইতেছে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের সম্ভাবনা এড়াইয়া যাইবার প্রচেষ্টার ইতিহাস।

"পাকিস্থানের রাজনীতিতে আজ পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই এবং পাকিস্থানের বিগত দশ বৎসরের ইতিহাস মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এড়াইয়া যাইবার ইতিহাস। এ সম্পর্কে এদেশের বাস্তব রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই জনাব ব্রোহীর সহিত একমত হইবেন। দেশে স্বচ্ছ রাজনীতি ও গণতন্ত্র কায়েমের জন্য নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া জনাব ব্রোহী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও সময়োচিত এবং সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বিবেচক ব্যক্তিরা স্বীকার করিবেন। কিন্তু যে মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জনাব ব্রোহী এখনও সদস্য রহিয়াছেন, সেই মুসলীম লীগই কি অতীতের মত আজও এদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পথে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে না? মুসলীম লীগেরই ক্ষমতাসীন থাকার আমলেই কি তাহাদের ঘরোয়া ক্ষমতালাভের কোন্দলের ফলে নিতান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত করিয়া এদেশে অগণতান্ত্রিক রাজনীতি ও স্বৈরতন্ত্রের সূচনা করা হয় নাই?"

ইরাকের প্রজাতন্ত্র

জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইরাকের রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছে। ইরাকের রাজতন্ত্র চিরকালই পশ্চিমঘেঁষা ছিল। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও রাজতন্ত্র যে সকল নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, তাহা মূলতঃ ইরাকের জনস্বার্থের বিরোধী ছিল। ইরাকের পররাষ্ট্রনীতি ইরাককে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লেজুড়ে পরিণত করিয়াছিল। স্বভাবতঃই ইরাকের জনসাধারণ এই ব্যবস্থাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রের সংগঠন এবং

নীতির পরিবর্ত্তনের কোন পথ না পাইয়া অবশেষে ইরাকের বিরোধীদলভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটান। এই সামরিক অভ্যুত্থানে বিশেষ রক্তপাত হয় নাই, তবে রাজা ফয়জল, রাজার খুল্লতাত আমীর উল্লা এবং প্রধানমন্ত্রী নুরী এস সৈদ এবং তাঁহাদের কয়েকজন সহকর্মী জীবন হারান।

নূতন ইরাকী সরকার ভারতের প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন। নূতন নেতৃবৃন্দ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারাও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করিবেন। ইরাক বাগদাদ চুক্তি-সংস্থার অন্যতম সদস্য-রাষ্ট্র ছিল। ইরাকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে মধ্যপ্রাচ্যের বাগদাদ জোটে যে ফাটল দেখা দেয়, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে এবং ব্রিটেন জর্ডানে সৈন্য পাঠায়। তাহাতে অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিরুদ্ধভাবই প্রবলতর হয়। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ইতিহাসের অমোঘ বিধান অনুযায়ী নূতন ইরাকী প্রজাতন্ত্রকে প্রধান প্রধান পশ্চিমী রাষ্ট্র যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়।

ইরাকের নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তিনটি সংস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—(১) সার্ব্বভৌম পরিষদ: তিনজন সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদে রহিয়াছেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নজীব এল রুবাই (সভাপতি), মহম্মদ মাহদী অল কুব্বার এবং খলিদ নকসবন্দী (বাগদাদের সামরিক গবর্ণর)। (২) মন্ত্রীসভা: প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সামরিক সর্ব্বাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল আবদেল করিম এল কাসেম, সহকারী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—কর্ণেল আবদেল সালাম মহম্মদ আরিফ এবং জাতীয় নির্দ্দেশ বিভাগের মন্ত্রী মহম্মদ সাদিক শানশিল। (৩) ইরাকের সামরিক গবর্ণর এবং ইরাকী সৈন্যবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল আহমেদ এ সালে এল আবদিন।

মহম্মদ মাহদী অল কুব্বার এবং সাদিক শানশিল ইরাকের জাতীয়তাবাদীদের দক্ষিণপন্থী দলের নেতা। যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহারা ইরাকের রাজনীতিতে সক্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯৪০ সালে রসিদ আলী যখন ইরাকে বিদ্রোহ করেন তখন এই দুইজন তাঁহার সহায়তা করেন। ১৯৪৬ সালে তাঁহারা ইস্তীকলাল (Istiqlal) দল গঠন করেন। ১৯৪৭ সালে অল কুব্বার ইরাকী মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যেহেতু পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরোধী ছিলেন সেই হেতু ক্রমেই তাঁহারা রাজতন্ত্রবিরোধী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত এবং ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের পত্রিকা "ইল ইলবা অল ইস্তীকলাল" দেশের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দক্ষিণপন্থী হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য-বিরোধী হওয়ায় ইস্তীকলাল দল ক্রমে ক্রমে বামপন্থীদের সহিত সম্মিলিত কার্য্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৯৫১ সনে এই দুই দল মিলিয়া একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫২ সনে সরকার এই ফ্রন্টকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ১৯৫৪ সনের জুন মাসে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তাহারা সম্মিলিতভাবে নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। পরে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া যখন পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করা হয় তখন গণতন্ত্রী দল নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থাকিলেও ইস্তীকলাল দল তাহাতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাজা সকল রাজনৈতিক দলকেই অবৈধ ঘোষণা করেন। সুয়েজ আক্রমণের পর রাজা জাতীয় গণতন্ত্রী দলের নেতা চাদ্দেরচী এবং ইস্তীকলাল নেতা শানশিলকে পুনরায় গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। ইতিমধ্যে বাগদাদে বা-আথ চক্র নামে আর একটি দল গড়িয়া উঠিতে থাকে। সুয়েজ আক্রমণের অল্পদিনের মধ্যেই এই দল ভাঙিয়া দেওয়া হয় বটে, তবে ১৯৫৭ সনে বা-আথ এবং গণতন্ত্রী দলের নেতাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়।

জেনারেল রুবাই, খালিদ নকসবন্দী এবং মেজর-জেনারেল আবদেল করিম এল কাসেম প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমতে ইঁহারা কেহই সামরিক শাসনের পক্ষপাতী নহেন।

লেবাননে মার্কিন সৈন্য

ইরাকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই একদল মার্কিন সৈন্যকে লেবাননে পাঠান হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনও জর্ডানে সৈন্য প্রেরণ করে। এই সৈন্য প্রেরণের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়া বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুরোধেই সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই সৈন্য অপসারণ করা হইবে। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা শক্ত। লেবাননে যে ধরণের ঘটনা ঘটিতেছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষক দল এবং সেক্রেটারী-জেনারেল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহা পুরাপুরি লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করেন। লেবাননের প্রেসিডেণ্ট চামুন-এর সহিত বিরোধী দলগুলির যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহাতে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ ছিল না। মার্কিন সৈন্যের অবতরণে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বিরোধিতা প্রবল হইয়াছে। ইতিমধ্যে লেবাননে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে চামুনের পরাজয় ঘটিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দিয়াছে শীঘ্রই সকল সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে। এই আশ্বাস যত শীঘ্র কার্য্যকরী হয় ততই মঙ্গল।

চীন ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

পিকিঙে মাও-ক্রুশ্চভ সাক্ষাৎকার সাম্প্রতিক আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৩১শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলে, কিন্তু আলোচনার শেষে ৩রা আগষ্ট সরকারীভাবে ঘোষণার পূর্ব্বে চারদিন ব্যাপী এই যুক্ত

বৈঠক সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কেহই কিছু জানিতে পারেন নাই। এই বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই, উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ পেঙ-তে-হুয়ে এবং বৈদেশিক বিভাগীয়-মন্ত্রী মিঃ চেন-ই-ও উপস্থিত ছিলেন। অপর পক্ষে সোভিয়েট দলের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ছাড়া ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল রোডিওন ম্যালিনোওস্কি ও অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভ্যাসালি কুজনেসেভ। কয়েকটি কারণে এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব রহিয়াছে।

সাক্ষাৎকারের শেষে যে যুক্ত-বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ভাষা ও ভঙ্গি বিশেষ কড়া এবং সুরও বিশেষ চড়া। ইস্তাহারে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি কোন যুদ্ধ লাগে তবে বিশ্বের সকল শান্তিকামী শক্তি মিলিয়া সেই যুদ্ধকে বাধা দিবে এবং পরিণামে সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ ঘটিবে। ক্ষমতা লাভের পর মিঃ ক্রুশ্চেভের ইহাই সর্বপ্রথম পিকিং যাত্রা। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলোচনার জন্য পিকিং গিয়াছেন, এই ঘটনাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। অনেকে ইহাকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েডের ওয়াশিংটন যাত্রার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ মারফৎ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানের আলোচনার জন্য ক্রুশ্চেভ যে সম্মতি জানান তাহা সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট দলের মনঃপূত হয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদে চীনের যোগদানের কোন উপায় নাই, যেহেতু চীনও এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নাই। ইতিমধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী আলোচনাতে তাহাদের সম্মতি জানাইতে বিলম্ব করায় ক্রুশ্চেভের বিরোধী কম্যুনিষ্টরা স্পষ্টই বলিবার সুযোগ পায় যে, ক্রুশ্চেভ পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত যেভাবে আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সুফল লাভের কোন আশা নাই। নিজের দলে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্ব বিশেষ দৃঢ় নহে ; সেই অবস্থায় যদি তিনি এমন কোন আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করেন, যাহা চীনের মনঃপূত নহে তবে তাঁহার নেতৃত্ব রাখা কঠিন হইবে বুঝিতে পারিয়াই ক্রুশ্চেভ স্বয়ং পিকিং যাইয়া মাও-সে-তুংয়ের সহিত আলোচনা চালান বলিয়াই এই সকল পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস।

রাশিয়া ও চীনের নেতৃদ্বয় যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবিলম্বে শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান এবং আর একটুও কালবিলম্ব না করিয়া জর্ডান ও লেবানন হইতে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবি করা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, জাতিসমূহের স্বকীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি মনোনয়নের অধিকারকে অবশ্যই যথাযোগ্য সম্মান দিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইস্তাহারে মধ্যপ্রাচ্য হইতে নিরস্ত্রীকরণ এবং শীর্ষ সম্মেলন হইতে যুগোস্লাভ শোধনবাদ পর্যন্ত (শেষোক্ত বিষয়টিকে 'কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে প্রধান বিপদ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়) বিশ্বসমস্যাসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। সোভিয়েট ও চীনা সংবাদ এজেন্সীসমূহ ইহা প্রকাশ করেন।

যুক্ত ইস্তাহারে নেতৃদ্বয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে 'সাম্রাজ্যবাদীরা' যদি বিশ্বযুদ্ধ সুরু করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য 'শান্তিপ্রিয় জনগণ' ঐক্যবদ্ধ হইবে। রাশিয়া ও চীন বন্ধুত্বের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে।

রাশিয়া ও চীনের নেতৃদ্বয় যুক্ত ইস্তাহারে আরও বলিয়াছেন যে, নিশ্চিতরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হইতেছে নিরস্ত্রীকরণ সম্পাদন, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন, বিদেশী ঘাটিসমূহের বিলোপসাধন এবং সমস্ত সামরিক জোট ভাঙিয়া দেওয়া।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, উভয় নেতার মধ্যে সম্পূর্ণ হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার পরিবেশে আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা সকল বিষয়েই মতৈক্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য, বিশ্বসমস্যাসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে ও বিশ্বশান্তির রক্ষায় উদ্দেশ্যে যুক্তভাবে সংগ্রাম পরিচালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন।

আলোচনায় যোগদানকারী উভয় পক্ষ তাঁহাদের দুইটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ়ীকরণ, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য, বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে যুক্ত সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় সমেত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বসমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়া একমত হইয়াছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের সহিত ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের অন্যান্য দেশগুলির সহিত একযোগে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস ও শান্তিরক্ষার সংগ্রামে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছে। চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তির নীতি ক্রমশঃই বিশ্ববাসীর নিকট হইতে অধিকতর সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব রিপাবলিক এবং এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সমর্থক জনগণ শান্তি-প্রচেষ্টাকে সংহত করার ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। শান্তির শক্তিগুলি ইতিমধ্যেই অভূতপূর্ব বল সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া দলগুলির পরিচালনাধীন আক্রমণমুখী সাম্রাজ্যবাদী জোট শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সহযোগিতায় অবিশ্রান্ত বাধা উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করিতে একগুয়ে ভাবে অস্বীকার করিতেছে, বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের প্রধানগণের সম্মেলন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, নূতন যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছে এবং সকল জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে।

যুক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রবাদের শত্রু। তাহারা আক্রমণাত্মক সামরিক ও রাজনৈতিক জোট পাকাইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সামরিক ঘাটি স্থাপন করিয়াছে এবং অন্যান্য

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে অধিকতর বর্ব্বরোচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের এই সকল আক্রমণাত্মক কার্য্যের বিরুদ্ধে চীন ও রাশিয়া তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান এবং লেবানন ও জর্ডান হইতে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইতেছে।

চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত আরব রিপাবলিক ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমূহের জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন সমর্থন করিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং যে কোন যুদ্ধের বিপদ প্রতিরোধের জন্য চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া চেষ্টা করিয়া যাইবে। যে সকল দেশের সমাজব্যবস্থাদির আদর্শ স্বতন্ত্র তাহাদের সাথে বিখ্যাত 'পঞ্চশীল' নীতি অনুসারে শান্তি থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সকলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মর্য্যাদা দিতে হইবে।

কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা, তাহার মীমাংসা শুধু শান্তিপ্রিয় জনগণের সদিচ্ছা ও একতরফা চেষ্টার উপর নির্ভর করে না। আক্রমণমুখী পশ্চিমী গোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন পন্থা গ্রহণ করিতেই স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা নূতন কোন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিলে সমস্ত শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের লোকেরা আক্রমণকারী ও যুদ্ধবাজগণকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবে।

চীন ও রাশিয়ার অর্থনীতি দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, দুইটি রাষ্ট্রেরই শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের মৈত্রী ও সংহতি ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছে দেখিয়া উভয় রাষ্ট্রের নেতৃদ্বয় যুক্ত ইস্তাহারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। চীন ও রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিদ্বয় তাহাদের পবিত্র ঐক্য রক্ষা, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পবিত্রতা রক্ষা এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের মস্কো সম্মেলনে ঘোষিত নীতিসমূহ বজায় রাখা এবং "শোধনবাদে"র বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই শোধনবাদ কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভীষণ শত্রু, যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট লীগের কর্ম্মসূচীতে ইহা অন্তর্ভুক্ত।

স্বাধীনতা দিবসে পণ্ডিত নেহরু

আনন্দবাজার নিম্নস্থ সংবাদ দিয়াছেন :

বর্ত্তমানে দেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে এমনকি তাহা এই স্বাধীনতা দিবসেও ঘটিতেছে বলিয়া শ্রীনেহরু উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, 'ইহাতে মস্তক লজ্জায় অবনত হয়'। তিনি ভারতবাসীকে ইতিহাস স্মরণ করিতে বলেন এবং ব্যক্ত করেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই ভারতের পতন ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতার দ্বাদশ বৎসরেও ভারতের কোন কোন স্থানে দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে।

তিনি বলেন, আমি এখানে কাহাকেও সমালোচনা করিতে আসি নাই। কাহারও বিরুদ্ধে আমি নালিশ জানাইতেছি না। আমি আমার দেশবাসীর একজন সহযাত্রী মাত্র। এই সূত্রেই আমি আমার দেশবাসীর নিকট বর্ত্তমান সময়ের ইতিকর্ত্তব্য উপলব্ধির জন্য আবেদন জানাইতেছি। আমাদের কর্ত্তব্য যাহাই হউক না কেন, আমাদের নীতি যাহাই হউক, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমরা অহিংসার পথে, শান্তির পথে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিলেই সাফল্য লাভ করিতে পারি। ইহাই গোড়ার কথা। ইহা বুঝিতে না পারিলে আমরা কেবল একে অপরের সহিত দ্বন্দ্ব করিব, শক্তি হারাইব।

তিনি বলেন, দেশবাসীর মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহা হইলে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমেই তাহা মিটাইতে হইবে। ভারতে যদি সংগ্রাম করিয়া একের মতবাদ অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোন কিছুই লাভ করা যাইবে না। শুধু ভারতে কেন এই বিশ্বেও অস্ত্রশক্তির ঝনঝনানি দ্বারা বা হুমকি দিয়া কাহাকেও স্বমতে আনা যায় না।

শ্রীনেহরু বলেন যে, এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা বিশেষ গৌরবের দিন। কারণ, একটি বিশেষ পন্থায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং তাহা সারা বিশ্বের নিকট একটি দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আবার এইদিনই ভিন্ন প্রকার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই দেশের কোন কোন স্থান হইতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র (পাকিস্থান) হইতে যখন এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ভাই ভাইকে হত্যা করিতেছে এবং নারীর জীবন নষ্ট করিতেছে এবং শিশুদিগকে হত্যা করা হইতেছে তখন সেই গৌরবস্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীনেহরু বলেন, ১৯৪৭ সালে প্রভাতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হইলাম, কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যায় পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করিলাম। আমরা শত্রুর নিকট পরাজিত হই নাই, আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট পরাভূত হই নাই, কিন্তু আমাদের দৌর্ব্বল্য, আমাদের অন্তর্বিরোধই আমাদের কাল হইল। ব্রিটিশ সিংহের সহিত আমরা সিংহবিক্রমে সংগ্রাম করিয়াছি, কিন্তু আমাদের পিছন হইতে ভয়াল কালনাগিনী (দুর্ব্বলতা ও একতার অভাব) আমাদের ছোবল মারিতে চাহিতেছে।

গুজরাট ও অন্যান্য স্থানের ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতের সম্মুখে পূর্ব্বেও বহু বাধাবিপত্তি দেখা দিয়াছে, ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু সংগ্রাম করিয়াছে এবং

জয়লাভও করিয়াছে। ভারত কখনও মাথা নত করে নাই। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে—একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেই পতন আরম্ভ হয়।

তিনি প্রশ্ন করেন: আমরা কি গান্ধীজীর শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছি? আমরা কি ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছি? রাজনৈতিক কারণে বা যে কারণেই হউক আমরা যখন মারমুখী হই তখন আমাদের কোন শিক্ষাই কি স্মরণ আছে বলিয়া বোধ হয়? ইহা কি ধরণের মানসিক অবস্থা?

ভারত জগৎসভায় বড় বড় নীতির কথা বলিয়াছে, ভারত পঞ্চশীলের জয়ধ্বনি করিয়াছে এবং জগৎবাসীকে জানাইয়াছে যে, পঞ্চশীলের মাধ্যমেই বিশ্বের সমস্যাদির সমাধান সম্ভব, শান্তি স্থাপন সম্ভবপর।

কিন্তু এই সমস্ত নীতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটে যাহাতে 'লজ্জায় মাথা নুইয়া আসে'। আমরা নিজেরাই যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে না পারি তাহা হইলে পরকে উপদেশ দিব কেন? আমরা যদি ঘুষাঘুষি করিয়া আমাদের মত অন্যের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিছুই থাকিবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিশ্বে এমন বৃহৎ শক্তি রহিয়াছে যাহারা ইচ্ছা করিলে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। তথাপি যুদ্ধ ও হিংসার পথে কোন শক্তিই বিশ্বে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই (হর্ষধ্বনি)। শান্তির পথেই ইহা সম্ভব তথাপি ভয় পাইয়া রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। পশ্চিম এশিয়ায় আজ বহু সৈন্য রহিয়াছে। কখন কি হয় তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তথাপি এই কথা বলা যায় যে, তথায় যুদ্ধের সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। আমরা আশা করি যে, তথায় শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হইবে এবং আরববাসিগণ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

পুনরায় গুজরাটের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এক সময়ে জ্ঞান, ধীরতা এবং প্রশান্তির জন্য ভারতের সুনাম ছিল। তাহা ছাড়া এই গুজরাটেই গান্ধীজীর জন্ম হয়। গুজরাটেই তিনি অধিক সময় তাঁহার বাণী প্রচার করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গুজরাটীরাই আত্মবলি দেয়। তবে কেন গুজরাটে আজ এরূপ পাগলা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে? গুজরাটীদের আজ কেন এই অন্ধ উন্মত্ততায় পাইয়া বসিল? তাঁহারা কেবল নিজেদের সুনাম নষ্ট করেন নাই, তাঁহারা ভারতের নামেও কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।

বোম্বাই রাজ্যের দ্বিভাষা সমস্যার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, কোন সিদ্ধান্ত বা নীতি সম্পর্কে বিরোধের দরুণ গুজরাটে দাঙ্গা বা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সংঘটিত হয় নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মতামত পোষণ করিতে পারেন। স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু লাঠি বা গুলী চালাইয়া সেই মতামত অন্যের উপর চাপাইবার অধিকার কাহারও নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, আমাদের যুবক-সমাজের সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। তাহাদের উপযুক্ততা যথেষ্ট। তবে বৃহৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে এখন হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু সামান্য বিবাদ-বিসম্বাদে জড়াইয়া পড়িলে তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না।

শ্রীনেহরু আরও বলেন যে, ভারত স্বাধীনতা লাভের পর যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। ভারতের বক্তব্য আজ জগৎবাসী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের চিত্রটি কিন্তু সেরূপ নহে। এখানে নানা অভাব-অভিযোগ রহিয়াছে। এখানে বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি একের পর এক বিপর্যয় ঘটিতেছে। লোকে এই জন্য নালিশ করিবে বই কি? তাহাদের অধিকার আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা যদি ইহাও বলিত যে, এই দুর্দ্দিনেও কিছু লোক মুনাফা শিকার করিয়া বেড়াইতেছে, কালোবাজারে টাকা লুটিতেছে তাহা হইলে তাহাদের অভিযোগ খুবই সত্য হইত। আমাদেরই কিছু লোক কালোবাজার করিয়া অন্যের ক্ষতি করিবে ইহা কিরূপ দুর্ব্বলতা? সেই লোক অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু। তাহাদের বুঝা উচিত ইহার ফল কি।

তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, অনেকে কি মনে করেন, আমরা সাহসের সহিত আমাদের এই সমস্ত দুর্ব্বলতা জয় করিতে পারি না? ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে নাই। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি বরং আমাদিগের কর্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবে। তিনি বলেন, এই লালকেল্লাই এক-দিন দাসত্বের প্রতীক ছিল আজ ইহাই স্বাধীনতার বেদী। আজ গান্ধীজী এবং অন্যান্য শহীদদিগকে স্মরণ করিয়া আমরা ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইব। এখানে সমবেত প্রায় সমস্ত যুবক ও কিশোররাও গান্ধীজীকে দেখিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া গান্ধীজীর কাহিনী প্রচলিত থাকিবে কিন্তু ইহা শুধু কিংবদন্তী হইয়া থাকিবে না। অনাগতকালেও ইহা সকলকে পথ দেখাইবে। আমরা যখনই ভুল করিব, গান্ধীজীকে স্মরণ করিব।

আসামে পাকিস্থানী উৎপাত

পাকিস্থানের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে একটু বিচার করিলেই বুঝা যায় যে তাহার মতলব কি? আমাদের মনে হয় যে ভারতের কর্তৃপক্ষ যতদিন শান্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়া যাইবেন বা অনুযোগ অভিযোগ ও আক্ষেপের পথে চলিবেন ততদিনই এই উৎপাত চলিবে। যদি এখন দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা চিন্তা করা যায় ত উপায় আবিষ্কার করা অসম্ভব নহে। তবে সে উপায় পৌরুষের পথেই হইবে। নির্জীব অসহায় প্রাণীর মিত্র কেহই নাই আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

করিমগঞ্জ, ২৫শে আগষ্ট—অদ্য সরকারী বিবরণে জানা গিয়াছে যে, আসাম-পূর্ব্বপাকিস্থান সীমান্তের করিমগঞ্জ ফ্রন্টে পাকিস্থানী সৈন্যদের গুলীচালনার ফলে এ পর্য্যন্ত চারজন অসামরিক নাগরিক নিহত এবং অপর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

শিলচর হাসপাতালে অবস্থিত আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

এখানে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অদ্য পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী করিমগঞ্জ ফ্রন্টের সুতারকান্দি, লাতু মহীশাসন, বরপুঞ্জী ও মদনপুরে, কুশিয়ারা ফ্রন্টে ভাঙ্গাবাজার এলাকায় এবং সুরমা সীমান্তে গুলী বর্ষণ করে।

সরকারী সূত্রে জানা গেল যে, পাকিস্থানী সৈন্যরা কুশিয়ারা অঞ্চলে তুকেরগ্রাম এলাকা হইতে ভাঙাবাজারের দিকে ক্রমাগত গুলী চালাইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তুকেরগ্রাম এখনও পাকিস্থানীদের দখলে রহিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলেও পাকিস্থানী সৈন্যরা গুলী বর্ষণ করিতেছে।

গতকল্য বরপুঞ্জিতে ধান্যক্ষেত্রে কর্ম্মরত একজন ভারতীয় কৃষক পাকিস্থানী সৈন্যের গুলীতে মারা গিয়াছে।

আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব

লেবানন ও জর্ডানে যে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহার শান্তির পথ এতদিনে দেখা দিল। আশা করা যায় যে, যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।

নিউ ইয়র্ক, ২২শে আগষ্ট—পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৮ই আগষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল, গত রাত্রে আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর তাহা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

৮১ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের ৮০ জন সদস্য প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেন। একটি দেশের (ডোমিনিকান রিপাবলিক) প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না।

নিউ ইয়র্ক, ২১শে আগষ্ট—পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়িত্ব বিধান এবং জর্ডান ও লেবানন হইতে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য অপসারণের উদ্দেশ্যে আরব রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দশটি আরব রাষ্ট্র অদ্য সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহাতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, আরব রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ঐ প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলকে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া উদ্যোগী হইতে বলা হয়।

৮০টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেন। যখন ভোট গৃহীত হয় তখন ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।

সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। জর্ডান এবং লেবাননে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য অবতরণের পাঁচ সপ্তাহ পরে সাধারণ পরিষদে পশ্চিম এশিয়া সংক্রান্ত আরব রাষ্ট্রের প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হইল।

আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে অন্য দুইটি প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। একটি প্রস্তাব পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয় এবং সোভিয়েট রাশিয়া অপর প্রস্তাবটির খসড়া রচনা করেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাবে সেক্রেটারী-জেনারেলকে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে বলা হয়। সোভিয়েট প্রস্তাবে জর্ডান ও লেবানন হইতে অবিলম্বে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী অপসারণের জন্য দাবী জানান হয়।

কর্ম্মী না দুষ্কর্ম্মী?

আনন্দবাজারের এই সংবাদে দেশের অবস্থা কোন দিকে চলিয়াছে তাহার বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মতিভ্রম ও বুদ্ধির বিকারই এই চরম অবনতির কারণ।

এই ভাবে যদি ক্রমে সমস্ত বিষয়ে ঢিলা দিয়া দিনগত পাপক্ষয় করাই হয় তবে এই অভাগা পশ্চিমবঙ্গের অন্তিম দশা আসিতে দেরী হইবে না।

অযোগ্য লোকের হাতে শাসনতন্ত্র দেওয়ার ফলেই এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

মঙ্গলবার রাত্রে ক্রোধোন্মত্ত এক দল হাসপাতাল কর্ম্মী শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যে তাণ্ডব কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতায় এক নূতন রেকর্ড বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। উচ্ছৃঙ্খলতার এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর মিলে না।

ঐ দিন রাত্রি ৯টায় শ'খানেক হাসপাতাল কর্ম্মী (জমাদার, ঝাড়ুদার ইত্যাদি শ্রেণীর) শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের আপিস-ঘরে হানা দেয়। ঐ ঘর এবং উহার সন্নিহিত ইমার্জ্জেন্সী রুমটির আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া তচনচ করিয়া ফেলে। আট-দশ জন ডাক্তারকে বেধড়ক প্রহার দেয় এবং নার্সদের কোয়ার্টারও আক্রমণ করে বলিয়া হাসপাতালের জনৈক বাসিন্দা আমাকে জানান।

ঐ হাসপাতালের আউটডোর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মস্তকে এমন গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন যে, তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইয়াছে। রেসিডেন্ট সার্জ্জন সহ সাতজন চিকিৎসক সামান্য আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এই ঘটনায় উক্ত হাসপাতালের রোগী এবং চিকিৎসক ও নার্সদিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জলসরবরাহ লইয়াই এই ঘটনার

উৎপত্তি হয়। ঐ হাসপাতালে যে কমিটির উপর জল পাম্প করিয়া তুলিয়া দিবার ভার আছে, সেই ব্যক্তি তাহার কর্ম্ম ঠিকমত পালন না করায় কিছুদিন যাবৎ হাসপাতালের জলসরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে চিকিৎসক এবং নার্সদের কার্য্যের অসুবিধা হইতে থাকে।

প্রকাশ, মঙ্গলবার এই ব্যাপারটি চরমে উঠে। সকালে জল তুলিয়া দিবার পর লোকটি নাকি বেপাত্তা হইয়া যায়। সারাদিন হাসপাতালে জলাভাব দেখা দেয়। রাত্রে ঐ লোকটির নিকট এই ব্যাপারে কৈফিয়ৎ চাহিতে গেলে সে নানারূপ অশ্লীল গালাগালি করিতে থাকে এবং অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত জোট বাঁধিয়া একপ্রকার তাণ্ডব সৃষ্টি করে।

এক দল যখন নার্সদের কোয়ার্টারের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল তখন নার্সদিগের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাদের আর্তনাদ আকৃষ্ট হইয়া পাশের নার্স ইউনিয়নের আপিস হইতে অনেক নার্স পুলিসকে সংবাদ দেন। পুলিস আসিবার পর অবস্থা আয়ত্তে আসে বলিয়া প্রকাশ। বুধবার পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ইহাতে নানা মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে।

খাদ্যশস্য পরিস্থিতি

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন। জানি না ইহার ফলে, গৃহস্থের হাঁড়ীতে চাল ডাল পৌঁছাইবার পথ সহজ হইবে কি না।

নয়াদিল্লী, ২০শে আগষ্ট—অদ্য লোকসভায় খাদ্যসংক্রান্ত বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন, বাজারে অধিক শস্য আমদানীর সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত নহে। শ্রী জৈন বলেন, আগামী দেড় মাস হইতে দুই মাস পর্যন্ত আমাদের অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতে হইবে। আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমরা আশা করিতেছি যে, সর্বাধিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী জৈন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই চাউলের মূল্য সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঐ দুইটি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিয়াছেন।

শ্রী জৈন বলেন যে, সরকারের হাতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য রহিয়াছে এবং যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য চুক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে এই আশা করা যায় যে, খাদ্যশস্যের বর্তমান সরবরাহের হার বজায় রাখা সম্ভব হইবে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্যশস্য আমদানী সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আর একটি নূতন চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হইবে। যখন খাদ্যশস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতে পারিবেন।

খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য একটি বোর্ড গঠনের যে সুপারিশ খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটি করিয়াছেন, সরকার তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ একটি দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক নীতি প্রধানতঃ খাদ্যশস্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং সরকার আর্থিক ও বৈষয়িক নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

সরকার একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটি যে সব ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিয়াছেন, তাঁহাদের এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের লইয়া ঐ বোর্ড গঠিত হইবে। উক্ত বোর্ড খাদ্যশস্যের মূল্যের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রিসভা এবং অর্থনৈতিক কমিটি খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং খাদ্যমূল্য, কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। শ্রী জৈন বলেন, প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক সার সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না এবং এই কারণে সম্ভবতঃ আমাদের খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং আমরা খাদ্যোৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব না।

ডি-ভি-সির জল

দামোদর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যা-প্রতিরোধ ও কৃষির জন্য জলসেচে সাহায্য করা। বিদ্যুৎ-সরবরাহ ইত্যাদি গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এই দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য পালনেই অপারগ হইয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনায় কৃষির বিশেষ কোনই সাহায্য হইতেছে না। এখন জলাভাবের সময় কোন কৃষকই ডি-ভি-সির জল পান নাই। এ সম্পর্কে বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বর্দ্ধমান' লিখিতেছেন :

"জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদে প্রকাশ, যথাসময়ে জল দিতে না পারিয়া ডি-ভি-সি বর্ষা নামিবার পরে দ্বিগুণ উৎসাহে ক্যানেলগুলিকে জল ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বর্ষার জলের সহিত ক্যানেলের জল এক হইয়া কোথাও কোথাও মাঠ ভাসাইবার উপক্রম করিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যের বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ চাষের সময় যে জল তাঁহারা দিতে পারেন নাই তাহা এখন অযথা অপচয় না করিয়া পরবর্ত্তী পর্য্যায়গুলিতে যাহাতে ঠিকভাবে জল দিতে পারেন তাহার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। একেই বিলম্বে বৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপর ডি-ভি-সির জল ছাড়ার

জন্ম কৃষিকার্য্য আরও বিলম্বিত হইলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। যদি কোন অঞ্চলে জলের প্রয়োজন থাকে সেই অঞ্চলে জল দিবার ব্যবস্থা করিয়া আপাততঃ অন্যান্য অঞ্চলে জল দেওয়া বন্ধ করিবার জন্ম এবং ইতিমধ্যে ডি-ভি-সি বাঁধের ক্ষয়ক্ষতিগুলি সারিয়া লইবার জন্ম তৎপরতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

ক্যানেলের জল সরবরাহ সম্পর্কে বর্দ্ধমানের অপর একটি কংগ্রেসসমর্থক পত্রিকা সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" যাহা লিখিয়াছেন তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। "বর্দ্ধমানবাণী" ১৬ই শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন :

"ক্যানেলে জল ছাড়ার সমস্যা যদি বা কতকটা মিটিয়াছে ওদিকে আবার জমিতে জল দেওয়ার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ছোট ছোট শাখা ক্যানেলে জমিতে জল দেওয়ার পাইপ এমনভাবে বসানো হইয়াছে যে, শাখা ক্যানেলে ভর্ত্তি জল থাকা সত্ত্বেও জমিতে জল আসিতেছে না। এইভাবে পাইপ বসাইবার কারণ কি থাকিতে পারে তাহা হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিবেন। কিন্তু আমরা কোন কোন অংশের খবর লইয়া জানিয়াছি যে, ইচ্ছা করিয়াই ঐভাবে পাইপ বসানো হইয়াছে। চাষীদের কাছ হইতে টাকা আদায়ের ইহা এক অমানুষিক ফন্দী। জলের জন্ম চাষী যখন হাহাকার করিতেছে তখন এক শ্রেণীর ক্যানেল কর্ম্মচারীদের লোভের বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি। ভাবিতেছি ইহারা কাহারা। এদেশের মাটির সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে কোন যোগসূত্র আছে কি ?"

কলিকাতার বাহিরে খেলাধূলা

মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ভারতী' পত্রিকা ৮ই শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জঙ্গীপুর মহকুমার খেলাধূলার অবনতিতে আক্ষেপ করিয়া লিখিতেছেন :

"জঙ্গীপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এতদঞ্চলে খেলাধূলা ও শরীরচর্চ্চা অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শহরের এপার-ওপারে স্কুল-কলেজ আছে, কিন্তু ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চ্চার সুষ্ঠু আয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য যে কোন শহরে স্কুল-কলেজ সংলগ্ন ব্যায়ামাগার থাকে, ট্রাপিজ, প্যারালাল বার দেখা যায়। সকল ছাত্রই হয় ত ইহার সুযোগ গ্রহণ করে না কিন্তু কিছুসংখ্যক ছাত্র নিয়মিত শরীরচর্চ্চার সুবিধা ও প্রেরণা লাভ করে। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ব্যায়ামাগারের জন্ম অর্থাভাবের প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু স্থানীয় কলেজের পক্ষে এই অজুহাত যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। আসল কথা সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। শিক্ষাবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষও ছাত্রদের শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না, কারণ ছাত্রদের পাসের হার লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়া থাকেন, কিন্তু খেলাধূলা ও শরীরচর্চ্চার জন্ম বাধ্যতামূলক নির্দ্দেশ তাঁহারা দেন না কেন ? এইভাবে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার ব্যবস্থার জন্য হাজার হাজার টাকা বিশ্ব-অলিম্পিকে ব্যয়িত হইতেছে অথচ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক হকিখেলা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া মাঝে মাঝে বিবৃতি দেন কিন্তু তাহাও অরণ্যে রোদন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি কলিকাতার নামজাদা ফুটবল টিমগুলিতেও ভাড়া করিয়া অন্যান্য প্রদেশের খেলোয়াড় আমদানী করার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু এই প্রদেশের খেলোয়াড় তৈয়ারি করার কোন সংপ্রচেষ্টা দেখা যায় না। ফলে, ফুটবল খেলার মানও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছে ও ফুটবল খেলায় বাঙালীর যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।"

ট্রাম ধর্ম্মঘট

কলিকাতা নগরবাসীর যদি কষ্টের কিছু বাকী থাকে তবে এই ধর্ম্মঘটে তাহা পূর্ণ করিবে। এই ধর্ম্মঘটে আমরা নূতন কিছুই দেখিতেছি না, কেবলমাত্র দেখিতেছি দেশে দুর্দ্দশার আর এক পর্য্যায়। ধর্ম্মঘট যাহারা করেন তাঁহাদের নাগরিকের দুর্দ্দশা বা কষ্টের অথবা দেশের বা দশের বিষয়ে চিন্তার বা বিচারের কোনও স্থান আছে কি না জানি না। যদি থাকিত তবে প্রশ্ন করিতাম যে, বর্ষার পরে এই ব্যাপার ঘটিলে কি অসুবিধা তাঁহাদের হইত।

ট্রাম কোম্পানীর খরচ বাড়াইতে হইবে অথচ আয় বাড়িতে দেওয়া হইবে না। এই অপরূপ যুক্তি বোধ হয় আজব দেশ বাংলা ছাড়া আর কোথায়ও হইতে পারিত না।

পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার প্রত্যুষ হইতে কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে ট্রাম ধর্ম্মঘট সুরু হয়। অনুমান দশ হাজার ট্রাম কর্ম্মী এই ধর্ম্মঘটের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলিকাতা ও হাওড়ায় প্রতিদিন গড়ে ৪১৬টি ট্রামগাড়ী চলাচল করে এবং ঐগুলিতে দৈনিক অনুমান সাড়ে দশ লক্ষ যাত্রী চলাচল করে। সুতরাং ধর্ম্মঘটের ফলে ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই দিন উক্ত লক্ষ লক্ষ যাত্রী বিশেষ অসুবিধায় মধ্যে পড়েন। কিন্তু আশু এ ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হইবার কোন সম্ভাবনা মঙ্গলবার রাত্রি পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় নাই। কারণ, এই ধর্ম্মঘটের প্রশ্নে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে মীমাংসা সাধনের জন্ম সোমবার রাত্রে শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর বিশেষ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার মঙ্গলবার অপরাহ্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে এই ব্যাপারে তাঁহার এখন আর কিছুই করার নাই। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কোন প্রস্তাব লইয়া তাঁহার নিকট না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে নিজ হইতে মীমাংসার আর কোন প্রচেষ্টা সুরু করার কোন সুযোগ আপাততঃ দেখা যাইতেছে না।

শ্রমমন্ত্রী শ্রী সাত্তার আরও বলেন যে, শ্রীচুইটি দানের প্রস্তাব

বিবেচনার্থ কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশমূলক যে পত্র লেখার আশ্বাস তিনি দিয়াছিলেন, তাহা লেখেন নাই। কারণ, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ তাঁহার কোন অনুরোধই রাখেন নাই।

ঐদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, "সরকার দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ইউনিয়নের নেতৃবর্গ শ্রমমন্ত্রীর বারংবার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই এবং সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ কলিকাতার জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।" ঐ প্রেসনোটে ট্রাম ধর্ম্মঘটের ফলে কর্ম্মচারীদের অফিসে যাইতে বিলম্ব হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানান হয়।

ছাত্র আন্দোলন

আনন্দবাজার নীচের খবর পরিবেশন করেন। এ ব্যাপার ত এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার কয়েকটি বেসরকারী কলেজে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার ২৩শে শ্রাবণ কলিকাতায় ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট পালন করেন। ধর্ম্মঘটী ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, বিভিন্ন স্কুল কলেজ মিলাইয়া হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী "ঐ সকল" ধর্ম্মঘটে যোগদান করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানেও অনুরূপ ধর্ম্মঘট পালন করা হয়। কলিকাতার কয়েকটি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অবশ্য ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই।

এইদিন অপরাহ্ণে ১১ জন ছাত্রের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত রাইটার্স বিল্ডিংএ দেখা করিয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। প্রকাশ, শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাদের বলিয়াছেন যে, বেসরকারী কলেজগুলিতে বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নাই। তবে ছাত্রদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা করা হইবে এবং এই সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য একটি প্রেসনোট মারফৎ শনিবার জানাইয়া দেওয়া হইবে।

আরও প্রকাশ, শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, যেহেতু সরকার বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশনের সর্ত্ত অনুযায়ী কলেজ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ "ম্যাচিং গ্রাণ্টস" দিতে প্রস্তুত আছেন, সেই হেতু সরকারের পক্ষ হইতে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর কিছু কিছু সর্ত্ত আরোপ করাও অসঙ্গত নয়।

শিক্ষামন্ত্রী পরে সাংবাদিকগণকে বলেন যে, বহু কলেজ হইতে হিসাবপত্র চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। হিসাবপত্র দাখিল না করিলে ম্যাচিং গ্রাণ্টসের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলেজ কর্তৃপক্ষদের তরফ হইতে বলা হয় যে, সরকারের ম্যাচিং গ্রাণ্টস প্রাপ্তির জন্য নানা সরকারী সর্ত্তে একটি স্পনসর্ড কলেজে পরিণত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব?

এইদিন ছাত্র প্রতিনিধিদের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, এই ব্যাপারে সরকারপক্ষ একরকম বলিতেছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্যরূপ বলিতেছেন। আসল ব্যাপারটি কি তাহা সঠিক তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। সরকারী প্রেসনোট বাহির হইলে পর তাঁহারা আসল অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

জনৈক ছাত্র প্রতিনিধি বলেন যে, তাঁহারা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত দাবীর উল্লেখ আছে:—(১) বেতন বৃদ্ধি করা চলিবে না, (২) স্পনসর্ড কলেজে ডেভেলাপমেণ্ট ফি'র নাম করিয়া বেতন বাড়ান চলিবে না, (৩) কলেজগুলিতে আরও অধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৪) কারিগরী কলেজগুলিতে সীটের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, (৫) স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং (৬) শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সমেত একটি সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে। ছাত্ররা আরও দাবী করেন যে, পনেরো দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে আশ্বাস না দিলে ছাত্র আন্দোলন আরও জোরালো ভাবে সুরু করা হইবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকারী ছাত্র প্রতিষ্ঠান দলে ছয়টি ছাত্র সংগঠন ও পাঁচটি বেসরকারী কলেজের প্রতিনিধি ছিলেন।

মফঃস্বলে চুরি-ডাকাতি

খাদ্যাভাব এবং অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলারও অবনতি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, কাজেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার হয়ত কিছুই নাই, কিন্তু এই সকল সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে সাধারণ নাগরিকদের দুরবস্থা আরও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্বগুলির অন্যতম। এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষীয়দের মনোভাব যে বিশেষ আশাপ্রদ তাহা মনে হয় না। তাহা না হইলে এক মাসের মধ্যে একটি থানাতে পরপর পাঁচবার ডাকাতি সংঘটিত হয় কি করিয়া তাহা বুঝা কঠিন। বায়না থানায় সর্ব্বশেষ ডাকাতি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করিয়া বর্দ্ধমানের সাপ্তাহিক "দামোদর" লিখিতেছেন:

"পানাগড়, ২৮শে জুলাই,—গত ২৭শে জুলাই গভীর রাত্রে কাঁকসা থানার রূপগঞ্জ গ্রামে জনৈক সদ্গোপ বাড়ীতে এক ভয়াবহ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদল হাতবোমা ব্যবহার করে এবং দুই ঘণ্টা ধরিয়া লুণ্ঠন করে। ইহা লইয়া কাঁকসা থানায় একমাসের মধ্যে ৫টি ভীষণ ডাকাতি হইল।

"বিবরণে প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ প্রায় ৩০ জন ছিল। বোমার বিকট

আওয়াজে গ্রামবাসীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। গৃহস্বামীসহ পরিবারের ৮ জন স্ত্রী-পুরুষ আহত হইয়াছে। তাহার মধ্যে গৃহস্বামীর অবস্থা সঙ্কটজনক। এখানে ছোট চুরি ও রাহাজানি লাগিয়াই আছে।"

হাসপাতালের অব্যবস্থা

'বর্দ্ধমানবাণী' লিখিতেছেন :

"কয়েক দিন পূর্ব্বে রায়না থানার বেড়ুল গ্রামে এক হাঙ্গামায় বন্দুকের ব্যবহার হয়। তাহাতে কিছু ব্যক্তির গায়ে বন্দুকের ছিটায় আঘাত লাগে. তাহাদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় এবং তাহা পুলিস কর্ত্তৃকই প্রেরিত হয়। কিন্তু ঘটনা ১০ দিন পূর্ব্বের হইলেও আজ পর্য্যন্ত ঐ রোগীদের দেহ হইতে গুলীর ছিটা অপসারণ করা হয় নাই। আমরা এই অবহেলার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। হাসপাতাল সার্জ্জন, আর-এম-ও এমনকি প্রধান মেডিকেল অফিসার যখন প্রত্যহ রোগীদের খোঁজখবর লইয়া থাকেন তখন কেমন করিয়া এই চার জন গুলীতে আহত রোগীর প্রতি প্রত্যহ দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি এই রোগীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হাসপাতাল রোগ-নিরাময়ের স্থান নহে উহা বিভীষিকার স্থান।"

বাঁকুড়া বাসস্ট্যাণ্ডের অসুবিধা

বাঁকুড়া শহরে বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক বাস যাতায়াত করে। কিন্তু কোন বাস কখন ছাড়ে সে সম্পর্কে জনসাধারণের জানার কোন উপায় নাই। অনেক সময়ই বহু যাত্রীকে এক বাস হইতে নামিয়া অপর বাসে উঠিবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। কাহারও কাহারও সহিত তাহাদের স্ত্রীপুত্র-পরিবারও থাকে। কিন্তু কোন বিশ্রামাগার না থাকায় রৌদ্র-জল-ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন ঐ স্থানে কোন শৌচাগার না থাকায় মহিলা-যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "শ্রীহর্ষ" পাক্ষিক 'হিন্দুবাণী'তে লিখিতেছেন, "একটি বিশ্রামাগার ওখানে অতি অল্প আয়াসেই হইতে পারে, সরকারের ডেভেলপমেন্ট গ্রাণ্ট পাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ম্যাও ধরিবার লোক নাই। স্পনসরিং অথরিটি হইবার যোগ্যতা একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির আছে। কিন্তু পৌরসভার কোন আগ্রহ এই বিষয়ে নাই। অবশ্য টাকার অভাবের জন্যই।"

রেলওয়ে ও অবহেলিত কাছাড়

উক্ত শিরোনামা দিয়া এক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'যুগশক্তি' পত্রিকা লিখিতেছেন :

"রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে এতদঞ্চল অত্যন্ত অনগ্রসর এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অবহেলিত—ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। লামডিং হইতে আরম্ভ করিয়া এই দিককার রেলের যা অব্যবস্থা, তাহা কাছাড়ের প্রত্যেক সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছে। গাড়ী-গুলি ভাঙ্গা, ইঞ্জিনগুলি অতি পুরানো ও অকেজো, গাড়ীর নিয়মানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাব, গাড়ীতে যাত্রীদের স্থানাভাব এবং সেই হেতু জীবন বিপন্ন করিয়া পাদানিতে দাঁড়াইয়া ভ্রমণ, মালবাহী গাড়ীগুলির পথে অহেতুক ও অসঙ্গত বিলম্ব ইত্যাদি যেন দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনসাধারণ অহরহ অভিযোগ জানাইতেছেন, পত্রিকাগুলি সর্ব্বদাই অসুবিধার উল্লেখ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে লোকসভায় বা রাজ্যসভায়ও এতদঞ্চলের সদস্য এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিবিধান না হইয়া লোকের অসুবিধা ক্রমশঃ চরম পর্য্যায়ে পৌঁছাইতেছে। প্রতিকারের কোন উপায় নাই দেখিয়া জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে লামডিং পার করা হয় না। রেলের বড়কর্ত্তারা এদিকে পাও মাড়ান না, অথচ আসামের অন্যান্য অংশে প্রায়ই তাঁহারা ভ্রমণ করিতেছেন। ফলে, এতদঞ্চলের অভাব-অভিযোগ বলিবার মত স্থান বা সুযোগই যেন নাই মনে হয়।"

আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ভারতবাসী

মিঃ হারল্ড আইজ্যাকস একজন প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Revort of Asia শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তিনি আর একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম Scratches on our Minds, পুস্তকটিতে তিনি এশিয়া এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে পদস্থ মার্কিন নাগরিকদের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মিঃ আইজ্যাকস ১৮১ জন মার্কিন নাগরিকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এশিয়া এবং ভারতের বিষয়ে তাঁহাদের মনোভাব সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে। পুস্তকটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মিঃ আইজ্যাকস যে সকল মার্কিন নাগরিকের মনোভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা যে-সে ব্যক্তি নহেন। যে ১৮১ জনের অভিমত লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ৩২ জন জাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত, ৭৭ জন নিজ নিজ বৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত।

ভারত সম্পর্কে এই সকল বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকদের জ্ঞান কিরূপ? মিঃ আইজ্যাকস বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সনে একটি পরীক্ষামূলক জাতীয় ভোট গ্রহণে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬০ জন লোক পৃথিবীর কোন অংশে চীন এবং ভারত আছে তাই জানে না। ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় নাই বলিলেই চলে। ভারত সম্পর্কে মিঃ আইজ্যাকস নির্ব্বাচিত মার্কিন নাগরিকদের ধারণা হইল, "কলম্বাস, অত্যাশ্চর্য্য ভারত, সর্পসঙ্কুল দরিদ্র ভারত, হেষ্টিংস, ক্লাইভ, কলিকাতার অন্ধকূপহত্যা, তাজমহল, নগ্নপদ, ক্ষুধার্ত্ত মানবের দল, কুলির দল।"

ঐ ১৮১ জন আমেরিকানের মধ্যে শতকরা ৫৪ জনই ভারতের

প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। এই বিদ্বেষ বহুলাংশেই অজ্ঞতাপ্রসূত। একজন সাংবাদিক বলেন :

"I judge by history. India—in so far as it has a history we know—is a debased and contemptible kind of place. You can't even call it a nation with a history. Its ideas and religion are based on a mess of mystical nonsence. No resilience, no strength, never could really stand up for itself. Some Indians are a very irritating people, it is going to take an irritating kind of American to get along with them . . . I don't like half-baked easterns."

একজন বিশিষ্ট নিগ্রো পণ্ডিত বলেন :

"I had some Indian fellow-students when I was at Harvard. They kept away from Negroes, wanted nothing to do with us, They were 'Aryan' despite their colour It was a standard joke among us that all you had to do to get away from unpleasantness was to put on a turban and pass as an Indian. All they had was a selfish desire to improve their own status.... Other Negro intellectuals had similar experiences and it created a strong anti-Indian feeling among many Negroes".

ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশংসাও কেহ কেহ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। অধিকাংশের অভিমতই বিশেষ ভাবে ভারতবিরোধী। নিঃসন্দেহে এই ভারত-বিরোধিতার কারণ ভারত সম্পর্কে আমেরিকানদের যথোচিত জ্ঞানের অভাব—এবং ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমেরিকানদের বিরূপ মনোভাব। আমেরিকানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য ভারতের নীতি পরিবর্তনের কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু ভারতসম্পর্কে আমেরিকাবাসী সঠিক জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের করণীয় অনেক রহিয়া গিয়াছে। ভারতের বৈদেশিক প্রচারদপ্তর যে আপন কর্তব্য যথাযথ পালন করিতেছে না পুস্তকখানি তাহারও একটি সাক্ষ্য। ভারত-মার্কিন সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বেসরকারী ভারতীয়দেরও দায়িত্ব কম নহে। উপরে আমরা জনৈক নিগ্রো শিক্ষাবিদের যে সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা।

ভারত সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় মার্কিন নাগরিকদের অজ্ঞতায় আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। আরও বিস্মিত হইতে হয় এই দেখিয়া যে, এত অল্প জানা সত্ত্বেও ভারত সম্পর্কে তাঁহারা বিজ্ঞতার ভাণ ছাড়িতে পারে না। মিঃ আইজ্যাক্‌স বহু পরিশ্রমে এইরূপ একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ভারত সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের মতামত জানিবার সুযোগ দিয়া সকল ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই সকল সমালোচনার মধ্যে যথার্থ সমালোচনাও যে দু'একটি নাই সে কথা কেহ বলিবেন না। অকারণ নিন্দাকে আমরা যেমন প্রশ্রয় দিব না তেমনি যথাযথ সমালোচনাকেও আমরা নিন্দা করিব না। মিঃ আইজ্যাকসের পুস্তক পাঠে যদি সংশ্লিষ্ট ভারতীয়গণ নিজেদের ব্যবহারে উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হন তবেই ভারতের মঙ্গল।

জোলিও কুরি

১৪ই আগষ্ট বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী মঃ জাঁ ফ্রেডারিক জোলিও কুরির জীবনাবসান ঘটিয়াছে। জোলিও কুরির মৃত্যুতে বিশ্বজগৎ যে, কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী হারাইয়াছে তাহা নহে, একটি মহৎ প্রাণের প্রেরণা হইতে জগৎবাসী বঞ্চিত হইয়াছে। অধ্যাপক জোলিও কুরি এবং তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী আইরিনের বৈজ্ঞানিক দান সর্ব্বজনস্বীকৃত। বস্তুতঃ পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব করিয়া তোলার ব্যাপারে তাঁহাদের দান অসামান্য। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ইতিহাসে তাঁহাদের অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পৃথিবীবাসী তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপেই স্মরণ রাখিবে না, শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীরূপেও স্মরণ রাখিবে। মানবদরদী, স্বাধীনচেতা জোলিও কুরি কখনও কোন অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করেন নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পরমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারীর ব্যাপারে তিনি কোন সাহায্য করিবেন না। যুদ্ধোত্তর যুগে তিনি যখন ফ্রান্সের পরমাণবিক গবেষণা বিভাগের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন বিশেষভাবে তাঁহারই চিন্তার প্রভাবে ফরাসী সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহারা পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যই গবেষণা চালাইবেন, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী সম্পর্কে কোন গবেষণা চালাইবেন না। একশ্রেণীর ফরাসী নাগরিক —যাঁহারা হিটলারের সহিত মিলনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং বর্তমানে যাঁহারা উপনিবেশবাদ চালু রাখিতে বদ্ধপরিকর সেই সকল ফরাসীর কাছে জোলিও কুরির নীতি গ্রহণযোগ্য মনে হয় নাই। তাহাদের চক্রান্তে তাঁহাকে পরমাণবিক গবেষণা বিভাগের পদত্যাগ করিতে হয় যদিও অবশ্য তাহাতে ফরাসী দেশে পরমাণবিক গবেষণার সাহায্য হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই।

প্রথম পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময় হইতেই জোলিও কুরি পরমাণবিক বোমার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার আদর্শেই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের নিজস্ব সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হন। আইনষ্টাইন, ওপেনহেমার, বার্ণাল এবং মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির ন্যায় জোলিও কুরি বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আজ জোলিও কুরির নশ্বর দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু জোলিও কুরির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শঙ্কর-মতে "ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

অন্যান্য স্থলে যেরূপ, এস্থলেও সেরূপ, শঙ্কর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—উভয় দিক থেকেই, ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ আলোচনা করেছেন।

ব্যবহারিক দিক থেকে, শঙ্কর রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায়ই ত্রিতত্ত্ববাদী। এই দিক থেকে, শঙ্করের মতেও ; ত্রিতত্ত্ব হ'ল —ঈশ্বর, চিৎ বা জীব এবং অচিৎ বা জগৎ। এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ কারণ-কার্য, শক্তিমৎ-শক্তি, অংশি-অংশ সম্বন্ধ, অর্থাৎ, ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। যেমন, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্মতঃ ভিন্ন। সেজন্য, ব্যবহারিক দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্মতঃ ভিন্ন ; অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ ভিন্নাভিন্ন।

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর এই ব্যবহারিক দিক থেকে জীবাত্মাকে ঈশ্বরের অংশরূপে নির্দেশ করেছেন (২-৩-৪৩-৪৫-৩-২-৫)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হ'ল: ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ কি? সাধারণ ভাবে অবশ্য ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ উপকারক-উপকার্য সম্বন্ধ। কিন্তু উপকারক-উপকার্য-সম্বন্ধও দু'প্রকারের হতে পারে: স্বামি-ভৃত্যের সম্বন্ধ, এবং অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধ। মনে করা যেতে পারে যে, ঈশ্বর নিয়ন্তা ও শাসক, জীব নিয়ম্য ও শাসিত, সেজন্য স্বামি-ভৃত্যের সম্বন্ধই এক্ষেত্রে যোগ্যতম সম্বন্ধ। কিন্তু শঙ্কর বলছেন যে, ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের, অর্থাৎ, অংশি-অংশের সম্বন্ধ। প্রভু ও ভৃত্য অংশী ও অংশ নন, সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ঈশ্বর ও জীব এইভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন নন, উপরন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু উভয়েই চৈতন্য-স্বরূপ। সেজন্যই এক্ষেত্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের উপমাই গ্রহণযোগ্য, যেহেতু অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ উভয়েই উষ্ণ-স্বরূপ।

"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ, যথা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-৩-৪৩)।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর ও জীব পরস্পর ভিন্নও নিশ্চয়।

"সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবস্যেশ্বর-বিপরীতধর্মত্বম্।" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ৩-২ ৫)

যথা, ঈশ্বর সত্য-সংকল্প, জীব তা নয়, ইত্যাদি। অবশ্য জীবেও ঈশ্বরের ধর্মাদি নিহিত হয়ে আছে সত্য ; কিন্তু অবিদ্যা ব্যবধান দ্বারা সেই সকল তিরোহিত হয়ে আছে ; দেহেন্দ্রিয়াদি-সংযোগের জন্যই জীবের ঐশ্বরিক জ্ঞানৈশ্বর্যাদি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এরূপে, অংশী ঈশ্বর ও অংশ জীবের সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। সেজন্যই, পারমার্থিক দিক থেকে, একত্বই একমাত্র সত্য হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে, একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন, বৃক্ষ অনেক শাখা-বিশিষ্ট, ঈশ্বরও তেমনি অনেক শক্তিবিশিষ্ট। যেমন, বৃক্ষ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখাদিরূপে অনেক ; যেমন, সমুদ্র সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেন-তরঙ্গাদি রূপে অনেক ; যেমন, মৃৎপিণ্ড মৃৎপিণ্ডরূপে এক, কিন্তু মৃন্ময় ঘট-পাত্রাদিরূপে অনেক—তেমনি ঈশ্বরও ঈশ্বররূপে এক, কিন্তু জীব-জগদ্রূপে অনেক।

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"। (২ ১-১৪)

এই সূত্রের সুবিখ্যাত ভাষ্যে শঙ্কর উপরের উপমাবহুল মতবাদকে উপস্থাপিত করেছেন পূর্বপক্ষীয় মতবাদরূপে, অবশ্য পারমার্থিক দিক থেকেই। সেজন্য এটি ব্যবহারিক দিক থেকেই কেবল সত্য।

"অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র—২-১-২২)

এই সূত্র ভাষ্যেও শঙ্কর ব্যবহারিক দিক থেকে বলছেন:

"জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নম্বভেদ-নির্দেশোঽপি দর্শিতঃ। কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম। নৈষ দোষঃ। আকাশ-ঘটাকাশ-ন্যায়েনোভয়-সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-১-২২)

ব্রহ্ম যে জীবের অধিক বা জীব থেকে ভিন্ন, তা শ্রুতি প্রপঞ্চিত করেছেন ; অপর পক্ষে, ব্রহ্ম যে জীব থেকে অভিন্নও, তাও শ্রুতি বলেছেন। সেজন্য ব্রহ্ম (ঈশ্বর) ও জীবের সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। ভেদাভেদ বিরুদ্ধস্বভাব হলেও, ঈশ্বর ও জীবের ক্ষেত্রে একত্রে সম্ভবপর হয়, যেমন, মহাকাশ ও ঘটাকাশ প্রকৃতপক্ষে এক হলেও ভিন্নরূপেই বোধ হয়।

অন্যত্রও শঙ্কর বলছেন:

"অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ.

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২ ৩ ৪৩)

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই আছে বলে, তাঁদের সম্বন্ধ অংশি-অংশ সম্বন্ধ।

একই ভাবে, ব্যবহারিক দিক থেকে, ঈশ্বর ও জগতের সম্প ও কারণ-কার্য, শক্তিমৎ-শক্তি, অংশি-অংশ সম্বন্ধ বা ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

পারমার্থিক দিক থেকে, অবশ্য, ত্রিতত্ত্ব: ঈশ্বর, জীব, জগৎ সত্য নয়; একতত্ত্ব: একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সেজন্য, প্রকৃতপক্ষে, পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্ম জীব ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধের কোনরূপ প্রশ্নই নেই, যেহেতু একের অধিক বস্তু না থাকলে সম্বন্ধ সম্ভবপরই নয়। তা সত্ত্বেও, ব্যবহারিক দিক থেকে যখন ত্রিতত্ত্বের কথা এবং ব্যবহারিক সত্তা নিয়েই যখন প্রথম আরম্ভ করা হয়েছে, তখন বুঝাবার সুবিধার জন্য প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, পারমার্থিক স্তরে, ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্পূর্ণ রূপেই অভিন্ন—এই দিক থেকে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদের লেশমাত্রও নেই। সেজন্য শঙ্কর তাঁর সমস্ত তর্ক-কুশলতা ও প্রপঞ্চনা-নৈপুণ্য প্রয়োগে ব্রহ্ম ও জীবজগতের একত্ব ও অভিন্নত্ব প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর সমস্ত গ্রন্থে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে "বিবর্তবাদ", "অধ্যাসবাদ", "মায়াবাদ", "উপাধিবাদ" প্রভৃতি আলোচনাকালে।

অতি সংক্ষেপে পুনরায় বলতে হলে, বলা চলে যে, শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬-২-১)। সেজন্য "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩-১৪-১) "ইদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২ ৫-১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু অনাদি অজ্ঞানের বশবর্তী জীব, স্বীয় কর্মানুসারে স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দেহরূপ ছয়টি উপাধির সঙ্গে যেন সংযুক্ত হয়ে পড়েন; এবং সেই কারণে তিনি নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ও অন্যান্য জীব থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন। যথা, বদ্ধমুখ এক ঘটের অন্তর্গত আকাশ অপর এক বদ্ধমুখ ঘটের অন্তর্গত আকাশ এবং বাহিরের সর্বব্যাপী ঘটাকাশ বা মহাকাশ থেকে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন হলেও, ঘটরূপ উপাধির জন্য যেন মনে হয় যে, এই তিনটি আকাশ পরস্পর-ভিন্ন। কিন্তু উপাধিস্বরূপ ঘট দুটিকে ভেঙ্গে ফেললেই, তাদের মধ্যে কোন রূপ ভেদ থাকে না, দুটি ঘটের অন্তর্গত আকাশ নিঃশেষে মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়। পুনরায়, একটি বদ্ধমুখ মৃন্ময় ঘট এবং অপর একটি বদ্ধমুখ মৃন্ময় কলস সমুদ্রের জলে পূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে, ঘটের অন্তর্গত জল, কলসের অন্তর্গত জল ও বাহিরের সর্বব্যাপী সমুদ্রের জল পরস্পর-ভিন্ন বলে বোধ হলেও, ঘট ও কলসের অন্তর্গত জলের সঙ্গে সমুদ্রের জলের বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নেই। একই ভাবে, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির বিলয় হলেই, এমনকি জীবিত অবস্থাতেও, এক জীব চৈত্র, অপর জীব মৈত্র ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যান। সেজন্য, পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।

ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব নির্দেশ করে শঙ্কর বলছেন:

"অতশ্চ বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপ-রচিত-দেহাদ্যুপাধি-নিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্বৈর্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-৪-২২)

অর্থাৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ যে নামরূপ রচিত দেহাদিরূপ উপাধিপ্রসূত বা ঔপাধিক মাত্র, পারমার্থিক নয়—এই তত্ত্ব সমস্ত বৈদান্তিকেরই অবশ্যস্বীকার্য।

"স্থিতে চ পরমাত্ম-ক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ব-বিষয়ে সম্যগদর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি নামমাত্র-ভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ, পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবঞ্জাতীক আত্মভেদ-বিষয়োঽয়ং নির্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্র-ভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-৪-২২)

অর্থাৎ, যদি পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন—এই জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয়, তা হলে 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা', এই দুটি নামের ভেদই মাত্র থাকতে পারে। সেজন্য, 'এই জীবাত্মা সেই পরমাত্মা থেকে ভিন্ন', 'সেই পরমাত্মা এই জীবাত্মা থেকে ভিন্ন' প্রমুখ আত্মভেদ বিষয়ক প্রচেষ্টা নিরর্থক। বস্তুতঃ, একই আত্মা কেবল নামভেদের দ্বারাই বহু অভিহিত হন।

ঋগ্বেদও প্রায় একই ভাষায় বলেছেন:

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

(ঋগ্বেদ ১-১৬৪-৪৬)

সৎবস্তু একই, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁকে 'অগ্নি', 'যম', 'বায়ু' প্রমুখ বহু রূপে বা নামে অভিহিত করেন। উপরের একই সূত্রে আচার্য কাশকৃৎস্নের মত উদ্ধৃত করে শঙ্কর বলছেন:

"অবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্।"

অর্থাৎ, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব, অন্য কেহ নয়।

পুনরায় অজ্ঞানতমসাবৃত জীব, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়, ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম করেন। কিন্তু যেরূপ ভ্রমদৃষ্ট সর্প প্রকৃতপক্ষে রজ্জুই মাত্র, রজ্জু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নয়, সেরূপ জগৎও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়, ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

অদ্বৈতের পারমার্থিকতা বা সত্যত্ব এবং দ্বৈতের ব্যবহারিকতা বা মিথ্যাত্ব বিষয়ে সুন্দর উপমা দিয়ে, শঙ্কর তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদ কারিকা ভাষ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি মদমত্ত গজারূঢ় কোন ব্যক্তিকে ভূমিস্থ উন্মত্ত কোন ব্যক্তি

বলেন : 'আমিও তোমার প্রতিকূলে গজে আরোহণ করেছি, তুমিও আমার দিকে গজ চালনা কর'—তা হলেও গজারূঢ় ব্যক্তি সেরূপ কোন প্রচেষ্টা করেন না, কারণ, তিনি নিশ্চয় জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর গজারূঢ় কোন প্রতিপক্ষই নেই। একই ভাবে, অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতকে সম্পূর্ণ মিথ্যারূপে জানেন বলেই, তাঁরা দ্বৈতবাদিগণকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেন না ; অদ্বৈত ও দ্বৈতের মধ্যে কোন বিরোধের প্রশ্নই নেই, যেহেতু বিরোধ ঘটতে পারে দুই সত্য বস্তুর মধ্যে, এক সত্য ও অপর এক মিথ্যা বস্তুর মধ্যে নয়। (মাণ্ডুক্যোপনিষদ কারিকা-ভাষ্য ৮৫, অদ্বৈতপ্রকরণ)।

শঙ্করের মতবাদ বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে, যথা : "কেবলাদ্বৈতবাদ", "মায়াবাদ", "বিবর্তবাদ", "অধ্যাস-বাদ", "উপাধিবাদ", "অনির্বচনীয়বাদ" প্রভৃতি। শঙ্করের মতানুসারে, কেবল অদ্বৈতই, বা ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভিন্নত্বই সত্য ; দ্বৈত বা ব্রহ্মও জীবজগতের ভিন্নত্ব নয়—সেজন্যই তাঁর মতবাদের নাম "কেবলাদ্বৈতবাদ"। শঙ্করের মতানুসারে, মায়ারূপ শক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা, জগৎ মিথ্যা, মায়াই মাত্র—সেজন্য তাঁর মতবাদের নাম "মায়াবাদ"। শঙ্করের মতানুসারে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তই মাত্র, পরিণাম নয়—সেজন্য তাঁর মতবাদের নাম "বিবর্ত-বাদ"। শঙ্করের মতানুসারে, ব্রহ্ম ও জগতের অবিদ্যামূলক অধ্যাসই বিশ্বপ্রপঞ্চের হেতু—সেজন্য তাঁর মতবাদের নাম "অধ্যাসবাদ"। শঙ্করের মতানুসারে, ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধি এবং জীব অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট হলেই বিশ্বপ্রপঞ্চের তথাকথিত উৎপত্তি—সেজন্য তাঁর মতবাদের নাম "উপাধি-বাদ।" পরিশেষে, শঙ্করের মতে, মায়া এবং তৎপ্রসূত জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়—সেজন্য শঙ্করের মতবাদের নাম "অনির্বচনীয়বাদ"।

এরূপে, উপরের সব নামগুলিই একই মুখ্যীভূত অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হ'ল এই যে, শঙ্করের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়াই মাত্র, যদিও "আকাশ কুসুমে"র মত অসত্য নয়, "রজ্জুসর্পের" মত সাধারণ ভ্রমও নয়। বস্তুতঃ জীবজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, স্বয়ং ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানের বল

শ্রীকালিদাস রায়

এ বিশ্বের আদ্যাশক্তি সৃষ্টি কর্ম করি সমাপন
মানুষ, তোমার হাতে এ ধরারে করেছে অর্পণ,
পূর্ণরূপে অধিকারী' নূতন করিয়া তারে গড়ো,
অথবা বিজ্ঞান বলে বিধ্বংস করিবে তাই করো।
ধরারে সর্ষপকণা গণি চিরদিন
মহাশক্তি র'বে উদাসীন।
যতই বিস্তার করো মানব মহিমা,
তোমার ও-বিজ্ঞানের আছে পরিসীমা।
ক্ষণজীবী পতঙ্গ মানুষ
যতই উড়াও তুমি স্পুটনিকে খেলার ফানুষ
বিহিত সীমারই মাঝে তার লীলা চলে
সীমার লঙ্ঘন কভু তারে নাহি বলে।

যে বুদ্ধিতে করিতেছ দুঃসাধ্য সাধন,
তার বীজ মহাশক্তি তব দেহে করেছে রোপণ
এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহান্তর জিনিবার আশা
জেনো তারে বিজ্ঞানের বকাণ্ড প্রত্যাশা
অনুকূল করি প্রাণ বায়ু
বিজ্ঞান বাড়াতে পারে কিছুদিন মানবের আয়ু।
তবু তুমি জীবনান্ত-সীমার অধীন,
বিজ্ঞান লঙ্ঘিতে সেই সীমা শক্তিহীন।
প্রকৃতিরে জিনিয়াছ ধরণী তোমার ক্রীড়াভূমি,
মৃত্যু বিজয়ের কথা ভেবেছ কি তুমি ?
বিজ্ঞানের বলে নয়, লভি বল অন্য সাধনার
মানুষই জিনিয়া মৃত্যু সগৌরবে সঙ্গী হয় তার।

বংশধর

শ্রীভূপতি ভট্টাচার্য্য

রায়বাড়ীর দেওয়াল-ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একটানা দু'শ' বছর যে ঘড়ি বলে এসেছে টক্ টক্ টক্ আজ আচমকা তার দম ফুরিয়ে গেল। দু'শ' বছর—দীর্ঘ দু'শ' বছরের ইতিহাস রায়বাড়ীর এই দেওয়াল-ঘড়ি, শুধু তার স্প্রীং-এ জড়িয়েছে আর খুলেছে, কোন নিশানা রেখে যায় নি তার। তাই আজ এই ঘড়ির ভেতরটা খুলে দেখলে কিছুই পাওয়া যাবে না, সব ফাঁপা—দু'দুটো শতাব্দীর ঘূর্ণিপাকে একেবারে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

আর সত্যিই খুলে দেখেছিল রাজীব—রায়বাড়ীর পুরনো চাকর। রোজকার ছোট বড় অগুণতি কাজের মধ্যে ওই ওর প্রথম ও প্রধান কাজ। কাক-মোরগ ডাকার আগে ওকে উঠে এই দেওয়াল-ঘড়িতে দম দিতে হয়। মাটি থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট ওপরে টাঙানো। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি রাজীবের পক্ষে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মইয়ে করে উঠতে হয়। রাজীবের দম দেওয়ার খানিকবাদেই ঘড়িটা গোটা রায়বাড়ীকে সচকিত করে ঠিক পাঁচবার বেজে ওঠে — ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

তার পরেই হয় কাজ সুরু। এই ঢং ঢংয়ের জন্যেই যেন সবাই অপেক্ষা করছিল। এবার শুনতে পেয়েই রামু গোয়ালা দড়ির খাটিয়ায় আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে। চারটে ভাগলপুরী গাইয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দেখতে থাকে এক এক করে গাইগুলোর নানান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রামু গোয়ালার শুধু ভাবনা, গাইগুলো অমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই তদ্বির-তদারকের অভাব হচ্ছে। ওদিকে পশ্চিমের ফটকের দারোয়ান এই ঢং ঢং শুনেই ঝটপট খাকি বুশসার্ট আর পেন্টুলেন্ট আঁটতে থাকে। ডন-বৈঠক দিতে দিতে ওর কোন দিকে যেন খেয়ালই থাকে না। ছুঁচলো লোহার বল্লমটা নিয়ে ফটকে গিয়ে দাঁড়াতে রোজ ওর পাঁচ সাত মিনিট দেরী হয়ে যায়। রায়বাড়ীর দেউড়ীর ঠিক উল্টো দিকেই ধোপাখানার প্রায় গায়ে লেগে রয়েছে বুড়ো হরি চাটুজ্যের কুঠুরী। বড়ই ঘুমকাতুরে এই হরি চাটুজ্যে, দেওয়াল-ঘড়ির ঢং ঢং কি ধোপাদের ধুপধাপ-ধপাস কাপড়কাচার তোড় কিছুই তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারে না। কিন্তু হলে কি হবে, ঠিক পাঁচটায় তাঁকেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। শুধু ওই ধোঁয়ার জ্বালায়। ধোপাপাড়ায় সার সার তোলা উনুনের ধোঁয়া। ঘুঁটে-কয়লা দিয়ে সাজিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি হাতে করে ওরা যেন কান পেতে থাকে। পাঁচটা ঢং ঢং যেই না শেষ হ'ল, তারা ফস্ করে জ্বাললে কাঠিটা আর ছুঁড়ে দিলে উনুনের পেটে।

এমনি ভাবেই এই মস্ত দেওয়াল-ঘড়ি রায়বাড়ীর তিনতিনটে মহল্লার খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে সেই সকাল পাঁচটা থেকে সুরু করে রাত—গভীর রাত পর্যন্ত। একটানা দু'শ' বছর ত এমনিই চলে এসেছে। কোনদিন এর কোন ভুলচুক হয়েছে বলে শোনা যায় না।

আর আজ সেই দেওয়াল-ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেল।

কথাটা যত ছোট বলে মনে হচ্ছে তত মোটেই নয়। একটা দেওয়াল-ঘড়ি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে—এটা আর এমন কি ভাবনার কথা! হ্যাঁ—ভাবনার কথা বইকি। এই প্রকাণ্ড রায়বাড়ীর দেওয়ালে যে ঘড়ি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দু'শ' বছর আধিপত্য করে এসেছে—একেবারে নির্ভুল ভাবে রায়বাড়ীর তিন মহল্লাকে হাতের মুঠোয় রেখে ওঠ্-বস্ করিয়েছে —আর আজ কিনা হঠাৎ সেই দেওয়াল-ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেল! ভাববার কথা নয়? শুধু রায়বাড়ী কেন, সারাটা চক্রধরপুরের একটা বোবা-কালা অন্ধ লোকও যে কথাটা কখনও কল্পনা করতে পারত না, আজ তাই সম্ভব হয়েছে। রায়বাড়ীর দেওয়াল-ঘড়ি বন্ধ! ভাবতেই শিউরে উঠছে সবাই।

রাজীব ত একটা বিকট চীৎকার করে উঠেছিল। দেওয়ালের গায়ে মইটা ঠেসান দিয়ে যেই না পা বাড়িয়েছে, এ কি? পেণ্ডুলামের ববটা যে একটুও নড়ছে না—একদম স্থির হয়ে রয়েছে! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলে না, ভাল করে চোখ কচলে কান খাড়া করলে। কই, কোন শব্দ ত নেই। মাথাটা তখন তার ঘুরে এসেছে। কোন রকমে টলতে টলতে মইয়ের শেষ ধাপে এসে চোখ জোড়া টান টান করে ঘড়ির সারা গা ছুঁয়ে দেখলে, কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। তার পরে চাবি ঘুরিয়ে গোটাকয়েক দম দিলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। রায়বাড়ীর দেওয়াল-ঘড়ি থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে বোবা চাহনি মেলে চেয়ে রইল

রাজীবের দিকে। আর কিছু মনে নেই ওর। আবছা আবছা মনে পড়ে, হয়ত সিঁড়ির দু'চার ধাপ নেমে এসেছিল আর কতকগুলো অস্পষ্ট ছবি একের পর এক খুব তাড়াতাড়ি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তার পর আর কিছুই বলতে পারে না রাজীব।

তবে নীচের তলার জন দশ-বারো একটা বিকট চীৎকার শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছিল। এসেই তারা দেখলে, সংজ্ঞাহীন রাজীবের দেহ মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে আর তার কপাল কেটে দরদর করে রক্ত ছুটছে। আর সেই সঙ্গে তারা এও আবিষ্কার করলে, রায়বাড়ীর দুশ' বছরের দেওয়ালঘড়ির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

খবরটা যেন চোখের পলক পড়বার আগেই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। না, রাজীবের চোট খাওয়ার খবর নয়, বনেদী দেওয়াল-ঘড়ির আচমকা দম বন্ধ হয়ে যাবার খবর। দেখতে দেখতে পিলপিল করে লোক ছুটে এল দরদালানে। ফটকের বাইরে-ভেতরে, ঢালাই বারান্দায়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক গিস্‌গিস্ করতে লাগল। সকলের মুখেই ভয়, উৎকণ্ঠা আর এক অবিমিশ্র কৌতূহল। হয়ত স্বয়ং আদিত্যশঙ্কর রায়ের দম ফুরিয়ে গেলেও এতটা হৈচৈ বাধত না।

আদিত্যশঙ্কর রায়—বিখ্যাত রায়বাড়ীর বর্তমানের হকদার। সার্থকনামা ভদ্রলোক। যেমন বলিষ্ঠ, মাপ-জোখ করা চেহারা—তেমনি তেজীয়ান কাজে-কর্মে। বয়স এই পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে আটত্রিশের বেশী বলে মনে হয় না।

ভদ্রলোক জীবনে পেয়েছেন অনেক কিছুই। নাম যশ-অর্থ-জৌলুস-স্বাস্থ্য মানুষের যা কাম্য। রূপলাবণ্যবতী সতী-সাধ্বী স্ত্রী এখনও বেঁচে। কিন্তু এত সব থেকেও যেন তাঁর কিছুই নেই—বুকের একটা দিক যেন একেবারে ফাঁকা, হু হু করে জ্বলতে থাকে। নিঃসন্তান তিনি, ভগবানের সহস্র-কণা আশীর্বাদের এই একটিমাত্র থেকে তিনি বঞ্চিত। আর এইটিই হ'ল সবচাইতে নিষ্করুণ।

খবরটা তাঁর কানে যেতেও দেরি হয় নি। দোতলার পূবদিকে একেবারে শেষপ্রান্তে তাঁর শোবার ঘর।

তখন সবে তাঁর ঘুমের আমেজটা একটু কেটেছে। হঠাৎ ধুপধাপ করে লোকজনের ছুটোছুটির শব্দ কানে এল। খানিকক্ষণ কান পেতে ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করলেন, গোলমালটা যেন ক্রমশঃই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। বালিশ থেকে মাথাটা একটুখানি তুলে হাঁক পাড়লেন আদিত্যশঙ্কর, 'শ্রীমন্ত' !

শ্রীমন্ত আদিত্যশঙ্করের খাস চাকর। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সে ঘুমোয় বারান্দায়—আদিত্যশঙ্করের ঘরের বাইরে। কিন্তু তখন সে নিচে ঘড়ি-বারান্দায়। তাই আদিত্যশঙ্কর কোন উত্তর পেলেন না।

পালঙ্ক থেকে নেমে মেঝেতে পা রাখলেন তিনি। কান খাড়া রেখে ভাববার চেষ্টা করলেন নীচে নামবেন কিনা, কিন্তু ভাববার সুযোগ আর তিনি পেলেন না।

'হুজুর'।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন দরজার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়েছে দয়াল।

'কিরে তুই কেন এখানে ? শ্রীমন্ত কোথায় ?'

গম্ভীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, দয়াল তা জানে—আদিত্যশঙ্করের মন-মেজাজ তার মুখস্থ।

দু'পা এগিয়ে এল সে। পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'হুজুর একটা ভীষণ ব্যাপার। দেওয়ালঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'কি বললি ? দেওয়ালঘড়ি ! দেওয়ালঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

আঁৎকে উঠলেন আদিত্যশঙ্কর। স্বপ্ন দেখছেন না ত ! এত বড় বিপর্যয়ও কি সম্ভব ? তাঁর সারা মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়ে এল। দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপসা।

ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন নিচে—ঘড়ি-বারান্দায়। রাজীবের সংজ্ঞাহীন দেহ তখনও সরান হয় নি। কিন্তু সে দেখতে তিনি আসেন নি। এক রাজীব গেলে দশ-দশটা রাজীব এখখুনি তিনি বহাল করতে পারেন। কিন্তু রায়-বাড়ীর ঐতিহ্য যে দুশ' বছর ধরে বুকে পুষে এসেছে, সেই দেওয়াল-ঘড়ির দম যদি আজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তবে আর রইল কি ?

আদিত্যশঙ্কর নিস্পলকে চেয়ে থাকেন দেওয়ালে পঁচিশ ফুট ওপরে টাঙানো ঘড়িটার দিকে। ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলাম স্থির, শব্দহীন। দুশ' বছর আগে কোন্ এক শুভক্ষণে চলতে সুরু করে কত লক্ষ-কোটি মুহূর্তকে সীমিত করে দিয়ে এসেছে এই দেওয়াল ঘড়ি। আর আজ যেন কার অভিশাপে সে নির্বাক, নিশ্চল, মৃত্যুর মত স্থির।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে দুশ' বছর আগেকার একটা দৃশ্যপট তাঁর চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে।

জমিদার বল্লভবিহারী রায়। প্রবল প্রতাপ তাঁর, চার-চারটে গাঁয়ের লোক তাঁর ভয়ে মাথা নুইয়ে চলে—যেমনই জাঁদরেল চেহারা তেমনই কথার জোর।

তখন ইংরেজরা সবে এদেশে এসেছে। এদিক-ওদিক লুঠপাট, চুরি-জুয়াচুরি করে হাত পাকাচ্ছে। এমনি এক

সময় একদল ইংরেজ পল্টন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে তাঁবু খাটালে বল্লভবিহারী রায়ের জমিদারীর চৌহদ্দিতে। ওরা যখন-তখন গাঁয়ে ঢুকে লোকজনদের মারধোর করে টাকা-পয়সা, জিনিসপত্তর, গরুবাছুর, লুঠপাট করতে শুরু করলে। প্রথমটায় বল্লভবিহারী কথাটা তেমন গায়ে মাখেন নি। ওসব ছিঁটেফোঁটা ব্যাপার ত কতই ঘটে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে কি জমিদারী করা চলে ?

কিন্তু এবারে তিনিও বেশীদিন মুখ বুজে থাকতে পারলেন না। চারপাশের গাঁ থেকে লোক এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে এর একটা বিহিত করতেই হবে।

পা তুললেন বল্লভবিহারী রায়। চীৎকার করে বললেন, 'দাঁড়া, ব্যাটাদের শয়তানি বার করছি। শোন্, তোরা যা ত—রায় ডিঙ্গিপাবের বাঁশঝাড়টা বিলকুল সাফ করে দে।

দুদ্দাড় করে লোক ছুটল। তার পরদিনই বাঁশঝাড় একদম খতম। কাঁচা বাঁশের ওপর তেল মাখাচ্ছে গাঁয়ের লোকে।

সেদিন রাত্রেই বল্লভবিহারী চললেন জনপঞ্চাশ জবরদস্ত লাঠিয়াল নিয়ে। তেল-মাখানো কাঁচা বাঁশের লাঠি তাদের হাতে চকচক্ করছে।

ইংরেজ পল্টনগুলো তখন সারাদিন লুঠপাট করে খুব মৌজ করে বোতল ওড়াচ্ছে। নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে।

বল্লভবিহারী তাক বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওদের ওপর। মারের চোটে পল্টনদের নেশা ছুটিয়ে দিলেন। নেশা যখন ছুটল তখন ওরা রাইফেল বাগাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বল্লভবিহারী তার আগেই সার সার তাঁবুগুলোতে কেরোসিন ঢেলে জলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজ পল্টনের দল বুট-হ্যাট পরেই দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ফটিকপুরের পচা খালে। লাঠি উঁচিয়ে দলবল নিয়ে বল্লভবিহারী ফিরে এলেন গাঁয়ে।

তার বোধ হয় দিনতিনেক পর। জমিদার বল্লভবিহারী কাছারীতে বসে খাতাপত্তর দেখছেন। দারোয়ান এক লালমুখো সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। জমিদারবাবুর সঙ্গে নাকি দেখা করবে।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় সাহেব আলাপ শুরু করলে। দু' চারটে কথাতেই বল্লভবিহারী বুঝলেন, দিনকয়েক আগে যে ইংরেজ পল্টনের দল তাঁর কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে, এই সাহেবই হচ্ছে তাদের বড় অফিসার। জমিদার বাবুকে খুশী করতে ভেট নিয়ে এসেছে। একটা মস্ত কাঠের বাক্স এগিয়ে দিলে সাহেব। বল্লভবিহারী মুচকি হাসলেন। কম চালাক নাকি এই ইংরেজ জাতটা। ভেট পাঠিয়ে তাঁকে হাত করবার ফিকিরে আছে। কিন্তু জমিদার বল্লভবিহারীও অত ছেলেমানুষটি নন। সাহেবের দুটো হেঁদো কথায় গলে যাবেন! যাক্ সাহেব যখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়, মন্দ কি!

সবাই ভেবেছিল এমন আর কি জিনিস হবে। কিন্তু কাঠের বাক্স খুলতেই সবাই তাজ্জব বনে গেল। নতুন চকচক্ করছে প্রকাণ্ড এক দেওয়াল-ঘড়ি।

পরদিন সকালে হুড়মুড় করে গাঁ শুদ্ধ লোক ছুটে এল রায়বাড়ীতে। খবরটা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বয়ং সাহেব-অফিসার ভেট পাঠিয়েছে জমিদারবাবুকে একটা হাল-ফ্যাসানের ঘড়ি। জমিদার বল্লভবিহারীর ইজ্জত কম নাকি!

নিচে বারান্দার দেওয়ালে ঘড়িটা এমন ভাবে টাঙানো হ'ল যেন সদর রাস্তা থেকে লোকের নজরে পড়ে। বল্লভ-বিহারী বারান্দার নানান্ কোণ থেকে দেখলেন। হ্যাঁ—সাহেব একটা জিনিসের মত জিনিস দিয়েছে বটে। ওপর থেকে স্ত্রীকে ডেকে এনে দেখালেন।

চন্দ্রাবতী ত দেখেই গালে আঙুল দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা—ঘাড়ে না যমদূত!'

বল্লভবিহারী জিভ কেটে বললেন, 'উঁহু, বল দেবদূত।'

'দেবদূত!'

'হুঁ দেবদূত। রায়বাড়ীর ভবিষ্যতের প্রাণ রয়েছে ওতে। শুনছ না, ও কি বলছে—বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো—'

'এ্যাঁ! কোথায়, কই শুনতে পাচ্ছি না ত!'

কান পাতলেন চন্দ্রাবতী। কিন্তু ঘড়ির টকটক্ শব্দ ছাড়া কিছুই তাঁর কানে এল না।

বল্লভবিহারী চোখ জোড়া টান টান করে বললেন,'শুনতে পাচ্ছ না? বসো, পাবে'খন।'

হঠাৎ চন্দ্রাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি—পেয়েছি—ওগো শুনতে পেয়েছি—আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।'

'পেয়েছ? আমি জানি শুনতে পাবে। বেছে বেছে খাঁটি জিনিসটিই দিয়েছে সাহেব। যুগের পর যুগ রায়বাড়ীকে বাঁচিয়ে রাখবে ও। শুধু ওই বুলির জোরে। যেদিন ও এই বুলি হারাবে, রায়বাড়ীর দফারফাও সেদিন—'

'না না, ওকথা বলো না—তোমার পায়ে পড়ি ওসব অলুক্ষণে কথা বলো না।'

ভয়ে, উৎকণ্ঠায় স্বামীর মুখে আঙুল চাপা দিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী।

বল্লভবিহারীর অনুমান মিথ্যে হবার নয়। সত্যিই রায়বাড়ীতে নতুন প্রাণ ফিরে এসেছিল। কাজে-কর্মে, উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেটুকু ঘাটতি ছিল, দেওয়াল ঘড়ি আসার পর থেকে সেটুকুও যেন ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল। জমিদার বল্লভবিহারীর পসার-প্রতিপত্তি দিনের পর দিন বেড়েই চলল।

শুধু বল্লভবিহারীই নন, বল্লভবিহারীর পর মণীন্দ্রনারায়ণ, কামাখ্যাপ্রসাদ, গৌরীপ্রসন্ন প্রত্যেকেই দেওয়াল-ঘড়ির কৃপা লাভ করে এক-একজন এক একদিকে ধুরন্ধর হয়েছেন। আদিত্যশঙ্করও প্রথম জীবনে বাদ যান নি। বনেদী দেওয়াল-ঘড়ির অনুগ্রহ তাঁর ভাগ্যেও জুটেছে। তিনি একে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। তা দেবেন না কেন? যে নাকি রায়বাড়ীর পাঁচপুরুষকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গিয়েছে, তাকে না মানবার কি আছে, রায়বাড়ীর প্রাণপুরুষ এই দেওয়াল-ঘড়ি।

আদিত্যশঙ্কর নাম দিয়েছেন ঘড়ি-বারান্দা। ঠিক যেমন সদর-বারান্দা, গাড়ী-বারান্দা।

স্পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর বছরদশেক আগেকার একটা ঘটনা। সদ্য বিদেশ ঘুরে এক যুবক এসে উঠেছিল রায়বাড়ীতে। দিনকয়েক ছিল—কথায় কথায় একদিন বলেছিল, 'আপনার সবকিছুই দেখলাম রাজসিক, শুধু ওই দেওয়াল ঘড়িটা ছাড়া। বিদেশে দেখে এলাম কত নতুন নতুন ডিজাইনের ঘড়ি রয়েছে। তা আপনার এখানে—'

আর শুনতে পারেন নি আদিত্যশঙ্কর। বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ওই দেওয়ালঘড়ি নিয়ে মুখ সামলে কথা কইবে ছোকরা। ওর মূল্য বোঝা তোমার মত উটকো বুদ্ধির কম্ম নয়।'

ওপরে উঠে এলেন আদিত্যশঙ্কর। বুক ফেটে তাঁর কান্না আসছে। কিন্তু তিনি ত আর ছোট ছেলের মত পা ছড়িয়ে কাঁদতে পারেন না—জমিদার তিনি। অতীতের হাজার স্মৃতি তাঁর মাথায় এসে আজ ভিড় করেছে। একশ' দুশ' বছর আগেকার রায়বাড়ীর ইতিহাসের এক-একটা ছেঁড়া পাতা তাঁর চোখের সামনে সজীব হয়ে ফুটে উঠছে। বল্লভবিহারী, মণীন্দ্রনারায়ণ, কামাখ্যাপ্রসাদ আর গৌরীপ্রসন্ন—একে একে এই চার দিকপালকে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন আদিত্যশঙ্কর।

রাত্রে তাঁর চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করছেন। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছেন দুশ' বছরের দেওয়াল-ঘড়ির নাড়ি-স্পন্দন কি সত্যি সত্যিই থেমে গেল। যদি তাই হয়, তা হলে শুধু দেওয়াল-ঘড়িরই নয়, ওর সঙ্গে সঙ্গে সারাটা রায়বাড়ীর বুকের স্পন্দনও থেমে গিয়েছে বলতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন আদিত্যশঙ্কর, জমিদার বল্লভবিহারীর ভবিষ্যবাণী ফলবার সময় হয়ে এসেছে, নেমে আসছে বিপর্যয়—ঘোরতর বিপর্যয় রায়বাড়ীর ওপর। আর কারুরই রেহাই নেই। সব নিঃশেষে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লেন আদিত্যশঙ্কর। ঘন ঘন পায়চারী সুরু করে দিলেন ঘরের ভিতরে। উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর দৃষ্টি। এক অজানিত আশঙ্কায় তাঁর চেহারা বিপর্যস্ত।

ওপারে যাবার জন্যে বুঝি প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। মনে মনে কথা সাজাচ্ছেন বল্লভবিহারী, মণীন্দ্রনারায়ণ, কামাখ্যাপ্রসাদ আর গৌরীপ্রসন্নের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন। তাঁরা যে আদিত্যশঙ্করকেই এই দুর্বিপাকের জন্যে দায়ী করছেন।

পায়চারীটা আরও দ্রুত সুরু হ'ল। মুখেও কি যেন বিড়বিড় করছেন তিনি।

খট্ খট্ খট্। ভেজানো দরজা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে কেউ যেন ঘরে প্রবেশ করছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কে—কে ওখানে?'

'কেউ নয়, আমি।' শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর।

সুরমা এসে দাঁড়ালেন আদিত্যশঙ্করের মুখোমুখি। আদিত্যশঙ্কর চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'তুমি—তুমি এখানে কেন সুরমা? এত রাত্রে উঠে এসেছ তুমি।'

আবার সেই ধীর নম্র স্বরে উত্তর এল, 'আচ্ছা, তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? এত বড় রায়বাড়ীতে কোথায় একটা ঘড়ি বিকল হয়ে গিয়েছে—এই নিয়ে তোমার আহার-নিদ্রা বন্ধ।'

'সুরমা, তুমি বুঝবে না—বুঝতে পারবে না সে ব্যথা। এ শুধু একটা ঘড়িই নয়, ওর চেয়ে অনেক—অনেক বড়। রায়বংশের ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে ওই দেওয়াল-ঘড়ি। ওর মধ্যে ছিল এই বংশের ভবিষ্যতের প্রাণ। আজ সব শেষ হয়ে গেল। রায়বাড়ী এবার বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যেতে বসেছে—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—'

'তা হলে কি তুমি বলতে চাও ওই ঘড়িই এই আকস্মিক বিপদের জন্যে দায়ী?'

'না না না—কখখনো না।' হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন আদিত্যশঙ্কর, 'বলছি তুমি বুঝতে পারবে না—পারবে না। এর জন্যে দায়ী আমি—তুমি—আমরা। রায়বংশকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখতেই ও ঘড়ি এসেছিল, কিন্তু তা আর

হ'ল কই ? ঠিক সময়েই ওর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ও নির্দোষ—বুঝলে সুরমা, দোষী হচ্ছি আমরা। দেখতে পাচ্ছ না, রায়বংশে বাতি দেবার যে আর কেউ নেই।'

বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আদিত্যশঙ্কর। সুরমা তাঁকে ধরে এনে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এই বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার কি আর কোন উপায় নেই ?'

মৃদু হাসলেন আদিত্যশঙ্কর, 'উপায়! গত পঁচিশ বছরের কোন উপায়ই ত কাজে লাগল না, সুরমা।'

'না না, সে কথা নয়। আমি বলছি, ও ঘড়ি কি আর মেরামত করা যায় না—ওর দম কি আবার ফিরিয়ে আনা যায় না ?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন আদিত্যশঙ্কর, 'না না—সে হয় না। দু'শ' বছর ধরে যে ঘড়ি বিনা মেরামতিতে নিখুঁত সময় বলে এসেছে, আজ আচমকা সেই ঘড়ির দম যদি ফুরিয়ে যায়—মানুষের কোন হাতই নেই তার ওপর।'

বলতে বলতে গলা ধরে এসেছে আদিত্যশঙ্করের। পাশ ফিরলেন তিনি। খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন দূরে—বহুদূরে। সে দৃষ্টি গিয়ে ঠেকল লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে মিটমিটে এক তারার গায়ে। তাঁর মনে হ'ল, ওই মিটমিটে তারার মতই রায়বাড়ীর ভবিষ্যৎ কম্পমান। দৃষ্টি-পথে ধরে রাখবার জন্যে তিনি ওই তারাটির দিকে নিষ্পলকে চেয়ে রইলেন। চেয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে এল। হঠাৎ এক সময় তারাটি তাঁর চোখের সুমুখ থেকে হারিয়ে গেল।

আর তখন আদিত্যশঙ্করের মনে হ'ল যেন সমস্ত জগৎটা তাঁর চোখের সুমুখে দুলে উঠল। চারদিকে বুঝি ভীষণ চীৎকার, বিশৃঙ্খলা সুরু হ'ল।

সুরমা বললেন, 'শুনছ, একটা উপায় ভেবে পেয়েছি। ঠিক ওরই মত একটা ঘড়ি যদি কিনে এনে বসানো যায়—'

আদিত্যশঙ্কর তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হুঁ', না না, কিছুতেই কিছু হবে না। এই বিপর্যয় কেউ আটকাতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারছ না সুরমা, আজ শুধু ওই দেওয়াল-ঘড়িরই দম ফুরোয় নি, রায়বাড়ীরও দম ফুরিয়ে এসেছে।

আদিত্যশঙ্করের ভাবনা মিথ্যে গেল না। দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ীর সবাই টের পেলে এতদিনকার চলমান জীবন-রথের চাকা যেন আর ঠিকমত ঘুরছে না। কোথায় যেন কিসের একটা গলদ উঁকি দিয়েছে। গলদটা ধরা পড়তেও বেশী দেরী হ'ল না। দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দ আর নেই। ঘড়ি ধরে ঠিক নিয়মমাফিক কাজ করবার তাগিদ নেই।

ভোর পাঁচটায় এখন আর রামু গোয়ালা দড়িয় খাটিয়ায় বসে ভাগলপুরী গাইগুলোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকায় না। ঠিক আটটা বাজতেই সরকার মশাই কাগজপত্র নিয়ে এসে কাছারীঘরের দরজায় দাঁড়ান না। বিকেল পাঁচটার ঢং ঢং শুনে চাকর-বাকর সবাই চা-ঘরে গিয়ে সার বেঁধে বসে পড়ে না। যে দু'একজন যায়, গিয়ে দেখে হয়ত চা-ঘরের কর্তা-বা টির পাত্তা নেই বা হয় ত ফাঁকা উনুন খাঁ খাঁ করে জ্বলে সারা হচ্ছে। রাত ঠিক সাড়ে এগারটা বাজবার অন্তত মিনিট দশ-পনের আগেই এখন সদর দরজার দারোয়ান ছোট্ট কাঠের টুলে বসে ঝিমিয়ে পড়ে। সব জায়গাতেই ওলট-পালট, কাজে গাফিলতি।

সুরমা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে স্বামীর কানে ফের কথাটা তুলেছিলেন, 'দেখ, এমন করে আর কতদিন চলবে ? কাজের কোন মাথামুণ্ডু নেই। যখন-তখন—'

আদিত্যশঙ্কর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? এ রকম যে হবে সে ত আমি আগেই বলেছি। এই ত সবে সুরু। দেখবে সব তলিয়ে যাবে। বল্লভবিহারী, মণীন্দ্রনারায়ণ, কামাখ্যাপ্রসাদ আর গৌরী-প্রসন্নের হাতে-গড়া এই রায়বাড়ী ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—কেউ রুখতে পারবে না।'

সুরমা আজ যেন একটু বিরক্ত হ'ল। কি সেই এক কথা—তলিয়ে যাবে আর তলিয়ে যাবে। তলিয়ে যাবে ত কে কি করবে ? চিরকাল ত আর সব জিনিস থাকে না।

একটু রাগত স্বরেই বললেন তিনি, 'তাই বলে কি জেনে শুনেও এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন চেষ্টাই করবে না ? মুখ বুজে সব দেখবে ?'

আদিত্যশঙ্কর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান স্ত্রীর দিকে। সুরমা বলে চলেন, 'কাল অনিলবাবু এসে দেখে গেছেন। ও ঘড়ি আর সারানো যাবে না। তার চাইতে একটা নতুন ঘড়ি—'

হঠাৎ আদিত্যশঙ্কর হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। হাসিটা শেষ হলে বললেন, 'পারবে—পারবে তোমার ওই নতুন ঘড়ি রায়বাড়ীর নষ্ট ভবিষ্যৎকে ঠেকিয়ে রাখতে ? ও পারবে দু'শ' বছরের একটা জীবন্ত ইতিহাস খাড়া করতে ?'

'পারবে। তুমি যা যা বললে সব পারবে।'

দৃঢ়স্বরে জবাব দিয়ে সুরমা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নতুন ঘড়ি এসেছে রায়বাড়ীতে। দু'শ' বছরের পুরনো

ঘড়িকে সরিয়ে ঠিক সেই জায়গায় বসান হয়েছে এই নতুন ঘড়ি।

সকালবেলায় পুরুতঠাকুর এসে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করে গিয়েছেন। সুরমা বিকেলে নিমন্ত্রণ করেছেন গাঁ-শুদ্ধ লোককে। নতুন ঘড়ি দর্শন করে তারা পেট পুরে ভোজ খেয়েছে।

সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে, এইবারে রায়বাড়ীর পুরনো গাঁথনি আরও শক্ত হ'ল।

আদিত্যশঙ্কর আজ আর নিচে নামেন নি। দোতলা থেকে সব শুনেছেন। লোকজনের হৈ চৈ তাঁর কানে এসেছে কিন্তু ও সব ছাপিয়ে তাঁর কানে এসে বাজছে নতুন ঘড়ির টক টক্ শব্দ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন নতুন ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজ। পার্থক্যটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে তাঁর কাছে। দুই ঘড়ির টক্ টক্ আর ঢং ঢংএর মাঝে রয়েছে যেন মস্ত এক প্রাচীর। রায়বাড়ীর সেই এক অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসকে টুকরো করে এ যেন আর একটা নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে বসেছে।

আদিত্যশঙ্কর ভাবছেন আর ভাবছেন—কোন কূল পাচ্ছেন না। দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। কি জানি হয়ত বল্লভবিহারীর কানেও সেই প্রথম দিন দেওয়াল-ঘড়ির শব্দ এমনই বেজেছিল। হয়ত আজ থেকে শ' দুই বছর পরে এই নতুন ঘড়িও বাজবে কি অমনি করে—যেমনি করে ওই পুরনো ঘড়ির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বাজছে আজকে আদিত্যশঙ্করের কানে।

পুরনো ঘড়ি! ভাবতেই নিজের অজ্ঞাতে শিউরে ওঠেন আদিত্যশঙ্কর। তা হলে কি ও আজ মৃত—নিষ্প্রাণ? শুধু-মাত্র ঐতিহাসিকের কাছে একটা দুর্লভ বস্তু? তার দুশ' বছরের অফুরন্ত দম কি আজ এমনি শোচনীয় ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে?

না, না, না—তা কখখনো হতে পারে না—হতে পারে না।

ঘরের নীল গালিচার ওপর পায়চারী করতে থাকেন আদিত্যশঙ্কর।

•

রায়বাড়ীতে নতুন ঘড়ি আসার পর থেকে সত্যিই যেন শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। মাঝে দিনকতক পুরনো ঘড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় কাজেকর্মে যে বিশৃঙ্খলা আর গাফিলতির সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন ঘড়ি দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সে-সব কোথায় উবে গিয়েছে। সমস্ত দিকেই একটা শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। রায়বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী ফের বাঁধা পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

আদিত্যশঙ্করের কাছে কিন্তু সব কিছুই একটা হেঁয়ালীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রায়বাড়ীর ভবিষ্যৎ উন্নতি না অবনতি কোন্ দিকে এগুচ্ছে তা তিনি ধরে উঠতে পারছেন না। চার পুরুষ আগের জমিদার বল্লভবিহারীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর কানে ঘন ঘন বাজছে।

সুরমা সব দেখছেন, শুনছেন। কিন্তু স্বামীর এই খাম-খেয়ালীপনার পক্ষে কোন যুক্তিই দেখতে পাচ্ছেন না। একটা মান্ধাতা আমলের ঘড়ি নিয়ে স্বয়ং রায়বাড়ীর জমিদারের অত মাতামাতি করবার কি কারণ থাকতে পারে, তিনি তা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেন না। আজকাল তাঁর সঙ্গে আদিত্যশঙ্করের দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সুরমা নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন আর সেই ভোর পাঁচটায়। আর তার পর সারাটা দিন এ ঘর ও ঘর ঘুরঘুর করে বেড়ান।

সেদিন মাঝরাতে আচমকা সুরমার ঘুম ভেঙে গেল। নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়েও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস করার পর দরজার খিল নামিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বেশ ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চিন্তাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি। এমনই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তাঁর কি যেন মনে হ'ল, ঢালাই বারান্দা ধরে পূবমুখে হাঁটতে সুরু করলেন।

মাঝে শুধু দুটো ঘর। তার পরেই দোতলার একেবারে শেষ প্রান্তে আদিত্যশঙ্করের শয়ন-কক্ষ।

সুরমা এই শেষের ঘরটির সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, দরজা-জানালা বন্ধ, কিন্তু ভেণ্টিলেটর দুটো খোলা। সেই খোলা-পথ দিয়ে তীব্র আলো এসে পড়েছে বিস্তৃত বারান্দায়। কি ব্যাপার? এত রাত্রে আলো জ্বলছে আদিত্যশঙ্করের শোবার ঘরে! রাতেও কি তাঁর চোখে ঘুম নেই! শুধু ওই এক চিন্তা ছেঁকে ধরেছে তাঁকে!

সুরমা নিঃশব্দে চাপ দিলেন দরজার গায়ে। দরজা একটুখানি ফাঁক হ'ল, কিন্তু ওই সামান্য ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরকার বেশী কিছু তাঁর চোখে পড়ল না। বেশ একটু জোরে আবার তিনি দরজায় একটা চাপ দিলেন, এবার দরজা খুলে গেল। তিনি পর্দা সরিয়ে ভেতরে মুখ বাড়ালেন, কিন্তু কোথায় আদিত্যশঙ্কর? পালঙ্ক শূন্য। ধবধবে সাদা টান করে বিছানো চাদরের গায়ে একটা ভাঁজও পড়ে নি। সুরমা তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন, ঠিক এই সময় ঢং ঢং করে নতুন ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত দুটো।

টনক নড়ল সুরমার। ঝড়ের মত তিনি ঘরের বাইরে এলেন। ছুটে চললেন সিঁড়ির দিকে। তরতর করে নেমে

এলেন নীচে—একতলায়। ধরতে পেরেছেন তিনি কোথায় আদিত্যশঙ্কর। নতুন ঘড়ির শুধু দুটো ঢং ঢং তাঁকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে এই নিশুতি রাতে কোথায় আদিত্য শঙ্করের আস্তানা। যাচাই করে দেখবেন সুরমা, নতুন ঘড়ির কথা কত দূর সত্য।

নিচে এই দিকটা বড্ড বেশী ফাঁকা। ঘর মাত্র একখানা। লোকজন বড় এখানে দেখা যায় না। বিশেষ করে এই নিঃঝুম রাতে ত কথাই নেই। একেবারে সুমসাম্।

সুরমা এসে দাঁড়ালেন এখানে, খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তার পরেই এগিয়ে গেলেন দরজার খুব কাছে। একটা পাণ্ডুর আলোর রেখা এখানেও চোখে পড়ল তাঁর। কান পাতলেন তিনি দরজার গায়ে, কিছুই শুনতে পেলেন না। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল বন্ধ জানালার গায়ে একটা ফুকর—খুব ছোট্ট। কিন্তু এই যথেষ্ট—ঘরের ভেতরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার পক্ষে এই ছোট্ট ফুকরই যথেষ্ট। ধীরে ধীরে একটা চোখ তিনি নিয়ে এলেন সেই ফুকরটার কাছে—খুব কাছে। ঘরের ভেতরটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ভাঙাচোরা নানান্ আসবাব আর অকেজো-হয়ে-যাওয়া বহু লটবহরে ঘরটা বোঝাই। আর ওই কাবাড়িখানার মধ্যে এক প্রৌঢ় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন, অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে কান পেতে রয়েছেন তিনি একটি খুব পুরনো প্রকাণ্ড দেওয়াল-ঘড়ির গায়ে। দৃষ্টি তাঁর জ্বলন্ত, চেহারা তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত।

সুরমা চিনতে পারলেন, ওই প্রৌঢ়ই জমিদার আদিত্যশঙ্কর আর ওই দেওয়াল-ঘড়িই দুশ' বছরের রায়বাড়ীর প্রাণ।

জমিদার আদিত্যশঙ্কর উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের বুকের স্পন্দন শোনবার জন্যে।

শহর থেকে অনেক দূরে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শহর থেকে অনেক দূরে—
অনেক দূরে আমার গৃহ,
তরুর ছায়ায় বনের মায়ায়
লতায় পাতায় রমণীয়!
রঙ্গনে তার অঙ্গ গড়া,
অঙ্গনে জুঁই শিউলি ঝরা,
কাঞ্চনে শ্যাম আঁচল ভরা,
চাঁপায় খোঁপা বাঁধলো কিও!

পাতাবাহার শাড়ী তাহার,
অপরাজিতার হার গলায়,
বকুল তারে আকুল করে,
মাধবী তার মন ভুলায়।
কালো দীঘি সজল স্নেহে
কমল-পরশ বুলায় দেহে,
আহ্লাদী সে—কহ্লারে তার
প্রাণের খুশী উপ্‌চে যায়!

পরিপাটি—দোপাটি আর
সন্ধ্যামণির সোনার দুলে,
কে দিয়েছে লাল করবী
গরবিণীর চাঁচর চুলে!
হাস্নাহানার মদিরবাসে
অধীর আঁখি ঝিমিয়ে আসে,
কালো তিলের মতই ভ্রমর
বিরাজে তার কপোলমূলে!

শহর থেকে অনেক দূরে—
অনেক দূরে আমার বাড়ী,
তাল-তেঁতুলের তরু যেথায়
উঠেছে নীল আকাশ ছাড়ি'
মল্লী-ফোটা পল্লীবাটে
বিজন বেলা যেথায় কাটে,
যেথায় বসে বুনি আমি
রঙিন্ সুতো কল্পনারি!

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ধর্ম্মমত এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষ গত তিন শতাব্দীতে বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রাচীন খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম্ম মানবের উৎপত্তি বিষয়ে একই মত পোষণ করিত। ইহাদের মতে—এই জগতের উৎপত্তি দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, অধিকন্তু এই পৃথিবী সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত। মানুষ ভগবানের প্রতিরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। "আদম"ই জগতের সর্ব্বপ্রথম মানুষ। "আদম" ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই মানুষ পাপের বশবর্ত্তী হইয়াছে এবং দুঃখকষ্ট পাইতেছে।

গত তিন শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন ইহুদী ও খ্রীষ্টান তত্ত্ব কোনও ক্রমেই গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা নির্ণীত হইয়াছে, আমাদের পৃথিবীর বয়স প্রায় চারি শত কোটি বৎসর। পৃথিবী এই বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র, যাহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যও একটি নাতিবৃহৎ নক্ষত্র যাহা আর একটি কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের "ছায়াপথ" বা আকাশবলয়ের মধ্যস্থানেই এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। অধিকন্তু এই আকাশবলয়টি অতি বৃহৎ নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জের সমষ্টি এবং আমাদের এই সূর্য্য ইহারই অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এই আকাশবলয়টি একটি মহাপুঞ্জ। এই মহাপুঞ্জ ইহার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। এই আবর্ত্তনের বর্ষচক্র হইতেছে বিশ কোটি বৎসর। উপরোক্ত বর্ষচক্রকে ইংরেজীতে one cosmic year বলা হয়। বাংলাতে ইহাকে বক্ষ-বর্ষ বলা যাইতে পারে। আলোকেরও গতি আছে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। ক্রমাগত চলিয়া আলোক এক বৎসরে যতখানি দূরত্ব করিতে পারে সেই দূরত্বকে মাপিয়া এক প্রকাশবর্ষ (light-year) আখ্যা দেওয়া হয়। এক প্রকাশবর্ষ প্রায় ছয় মহাপদ্ম মাইলের সমান। আমাদের সূর্য্য তাহার আবর্ত্তনের কেন্দ্র হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত। আমাদের আকাশবলয়ের ব্যাসের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ প্রকাশবর্ষ। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ যাবতীয় মহাপুঞ্জের সমষ্টিকে বিশালপুঞ্জ আখ্যা দেওয়া হয়। এক-একটি বিশালপুঞ্জে প্রায়ই বিশ কোটি মহাপুঞ্জ অবস্থিত। সমস্ত বিশালপুঞ্জ একত্র হইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে।

এইবার আইনস্টাইনের আপেক্ষবাদ বিষয়ে অল্প-কিছু বলিব। যদি একটি রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে যায় এবং যদি একটি লোক হাঁটা পথে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে সেই পশ্চিম দিকেই যায়—তাহা হইলে নিউটনের নীতি অনুসারে রেলগাড়ীর বেগ লোকটির বেগের তুলনায় ঘণ্টায় ৩৬ মাইল হয়। যদি লোকটি ঘণ্টায় চার মাইল বেগে পূর্ব্বদিকে যায় তাহা হইলে নিউটনের নীতি অনুসারে রেলগাড়ীর বেগ লোকটির বেগের তুলনায় ঘণ্টায় ৪৪ মাইল হয়।

আলোকরশ্মির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। যদি আলোকরশ্মি পশ্চিম দিকে যায় এবং যদি একটি রকেট পশ্চিমদিকে সেকেণ্ডে ১,০০০ মাইল বেগে যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, আলোকের বেগ রকেটের বেগের তুলনায় প্রতি সেকেণ্ড ১,৮৬,০০০ মাইলই হয়, কমিয়া ১৮৫,০০০ মাইল হয় না। যদি রকেট পূর্ব্বমুখে যায় এবং আলোকরশ্মি পূর্ব্ববৎ পশ্চিম দিকে যায় তাহা হইলেও দেখা যায় আলোকের বেগ রকেটের বেগের তুলনায় প্রতি সেকেণ্ডে পূর্ব্ববৎ ১৮৬,০০০ মাইল হয়, যোগাঙ্ক কষিয়া ১৮৭,০০০ মাইল হয় না।

আলোকের বেগের এই বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোকের বেগের সঙ্গে অনন্ত কোন পদার্থের কোন যোগ বা বিয়োগ করা যায় তাহার যোগ বা বিয়োগ ফল আলোকের বেগই থাকে। আইনস্টাইন দেখিলেন যে, ইহা সম্ভব করিতে গেলে দেশ ও কালের মধ্যে সাম্যভাব বজায় রাখিয়া চতুঃপরিমাণ-বিশিষ্ট এক নূতন জ্যামিতি প্রণয়ন করিতে হইবে নিউটনের বলবিজ্ঞান আর চলিবে না—নিউটনের বলবিজ্ঞানে চারটি পরিবর্ত্তনশীল সংখ্যার মধ্যে কাল (time) স্বাধীন সংখ্যা আর দেশের তিন সংখ্যা অবলম্বী সংখ্যা নিউটনের বলবিজ্ঞানে জড়পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে এবং এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হইতে বেগের হ্রাস বা বর্দ্ধন হয় আইনস্টাইনের চতুঃপরিমাণ-বিশিষ্ট জ্যামিতিতে নিউটনের বলবিজ্ঞানের বেগের হ্রাস ও বর্দ্ধন দেশের বক্রতাতে পরিণত হয়। বলবিজ্ঞান শাস্ত্র আইন-

স্টাইনের সাপেক্ষবাদ দ্বারা জ্যামিতি শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। আইনস্টাইনের সমীকরণের সমাধান করিতে গিয়া দেখা যায় স্পন্দনশীল বিশ্ব একটি সম্ভবপর সমাধান। এই স্পন্দনশীল বিশ্বের পরিসর সীমাবদ্ধ এবং পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর হইতেছে এবং কখনও ক্ষুদ্রতম এবং কখনও বৃহত্তম হইতেছে। আধুনিক সময়ে আইনস্টাইন-বিশ্বের প্রসার হইতেছে। আইনস্টাইন বিশ্বে বাহিরে মহাবিশ্ব বিস্তৃত আছে। যখন আইনস্টাইন-বিশ্ব প্রসারিত হয় তখন non-Einstein মহাবিশ্বের কতক অংশ আইনস্টাইন বিশ্বে পরিণত হয়। যখন আইনস্টাইন বিশ্ব সঙ্কুচিত হয় তখন আইনস্টাইন বিশ্বের কিয়ৎ অংশ non-Einstein মহাবিশ্বে পরিণত হয়। আইনস্টাইন বিশ্ব সীমাবদ্ধ কিন্তু non-Einstien মহাবিশ্বের পরিসর অসীম ও অনন্ত। এই non-Einstein মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য আইনস্টাইন বিশ্ব সঞ্চরণ করিতেছে। স্পন্দন-শীল আইনস্টাইন বিশ্বের স্পন্দন আবহমান কাল হইতে আছে এবং ভবিষ্যতে আবহমানকাল ব্যাপিয়া থাকিবে। এই মহাবিশ্বের বিস্তৃতি অসীম এবং স্থিতি অনন্তকাল। ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে সমগ্র সৃষ্টির পরিসর অসীম এবং অনন্তকাল ব্যাপী।

মানবের পরীক্ষার ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

(a) Astronomical ;
জ্যোতিষশাস্ত্রের বৃহত্তম ক্ষেত্র,

(b) Macroscopical ;
মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র ;

(c) Microscopical.
ক্ষুদ্রতম আণবিক ক্ষেত্র।

মানুষ মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রের জীব। মানুষ এই মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি যখন পর্য্যালোচনা করে তখন তাহার মনে হয় যে, ধ্বংসশক্তি সৃষ্টিশক্তি হইতে বহুগুণ প্রবল। যেমন, কোনও একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগে কিন্তু ভূমিকম্পে কিংবা বোমার আঘাতে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। The Law of Destruction seems to be much more powerful than the law of construction."

কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের বৃহত্তম ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যে, সৃষ্টিশক্তি ও ধ্বংসশক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। দুই জ্যোতিষ্কের মধ্যে সংঘর্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহাত্মক ফালি (planetary filament) উৎপন্ন হয় এবং এই ফালি স্থানে স্থানে জমিয়া বিবিধ গ্রহেতে পরিণত হয়। সংঘর্ষ বা ধ্বংসের ফলেই গ্রহের সৃষ্টি হয়।

সেইরূপ আণবিক ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অণু-পরমাণু সংঘর্ষের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তেজ ও শক্তির উৎপত্তি হয়। ইহা থেকেও ইহা বুঝা যায় যে, সৃষ্টিশক্তি ও ধ্বংসশক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। ইহা বলা যায় যে, destruction is another phase of creation.

মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রের জীব বলিয়া মানুষ সেই ক্ষেত্রের ঘটনা-গুলি প্রকৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারে না এবং সেই জন্যই এই ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে তাহার মনে হয় যে, ধ্বংসশক্তি সৃষ্টিশক্তি হইতে বহুগুণ প্রবল। মানুষ কিন্তু অন্য দুই ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে যে, ধ্বংসশক্তি সৃষ্টিশক্তির রূপান্তর মাত্র।

সেইরূপ বৃহত্তম ক্ষেত্রের অতিবৃহৎ জীব যদি কেহ থাকে সেও নিজ ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিবে যে, ধ্বংসশক্তি সৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল। কিন্তু অন্য দুই ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া সে বুঝিতে পারিবে যে, ধ্বংসশক্তি সৃষ্টিশক্তির আর একটি রূপ মাত্র। আণবিক ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের অতি ক্ষুদ্র জীবের অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ হইবে।

প্রাচীন ইহুদী ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রমতে প্রথম মানব "আদম" প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মেছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জীবের ক্রমবিকাশ শতকোটি বৎসরের উপর চলিতেছে। মানুষ বানর বা বনমানুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উপমানব দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান মানব অন্ততঃ দেড় লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। মানবীয় সভ্যতার সূত্রপাত বোধ হয় নীল-নদের ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে হয়, এবং প্রাগৈতিহাসের আরম্ভ বোধ হয় কুড়ি হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। লিখিত ইতিহাসের সূত্রপাত বোধ হয় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে হয়।

আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানবের উৎপত্তি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন ধর্ম্মমতকে একে-বারেই অনুমোদন করে না। যদি কোনও ধর্ম্মমত বিজ্ঞান-সম্মত না হয় তাহা হইলে তাহা আমাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। যাহা বিজ্ঞানসম্মত নয় তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, আমাদের শাস্ত্রে আছে :

কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

"কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত

নহে। যুক্তিহীন বিচারে কর্ম্মহানি হয়।"

আধুনিক বৈজ্ঞানিক, কোনও একটি বিশিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অনুমানগুলি তুলনা করিয়া যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবপর মনে করেন সেইটি গ্রহণ করেন। তিনি সরলভাবে ইহা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না যে, "তিনি নিশ্চিত ভাবে জানেন না কোন্ অনুমানটি ধ্রুব সত্য"। আর একটি কথা এই সঙ্গে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুভূতি সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। অনেক সময় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলি বিজ্ঞানের মূল সত্য বলিয়া বর্ণিত হয় কিন্তু তাহা যথার্থ ভাবে সত্য নহে। আধুনিক সময়ে ইউক্লিডের জ্যামিতিশাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য জ্যামিতিশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন জ্যামিতি আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়গুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমভাবেই বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়। সেই জন্য মূল সত্য কি তাহা অবগত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যদিও বিজ্ঞান আমাদিগকে মূল প্রকৃত সত্য জানাইতে অক্ষম, তথাপি বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মূল সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি ইহা বলা যথার্থ হইবে না যে, এক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা পরবর্ত্তী যুগের বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করেন। একজন বৈজ্ঞানিক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও অনুমান আলোচনা করিয়া নিজের গবেষণার উন্নতিসাধন করেন এবং আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনেক সময় বৈজ্ঞানিককে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা মূল সত্যে পৌঁছাইবার প্রথম স্তর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং তাঁহার নিজের গবেষণা মূল সত্যে পৌঁছিবার আরও সমীপস্থ স্তরে উপনীত হইয়াছে। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন নূতন নীতির সমাবেশ করিয়া এক নূতন নীতি (higher synthesis) প্রণয়ন করেন। গত শতাব্দীতে জড়পদার্থ সংরক্ষণ-নীতি (law of conservation of mass) এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতি (law of consorvation of energy) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিক শতাব্দীতে আইনস্টাইন আবিষ্কার করিলেন যে, জড়পদার্থ তেজ ও শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা উপরোক্ত দুই নীতির সংশ্লেষণ করিয়া একটিই নীতি প্রণয়ন করেন, যথা: তেজসংরক্ষণ নীতি। আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণবাদকে সাপেক্ষবাদের অন্তর্গত করিয়াছেন। আইনস্টাইন ইহাও দেখাইয়াছেন যে, নিউটনের ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধ মাধ্যাকর্ষণ-নীতি সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে।

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে গ্রহ-উপগ্রহের গতির বিষয়ে নিউটনের গণনা অতি অধিক পরিমাণে নির্ভুল। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়ে আইনস্টাইনের গণনা আরও নির্ভুল।

জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য বিবিধ দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাসেরও আবশ্যকতা আছে। যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারিতাম যে, কেবলমাত্র একটি শাস্ত্রই সত্য এবং অপরগুলি ভ্রমাত্মক তাহা হইলে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন থাকিত না।

মানবচিত্ত হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ভাবে এই পার্থিব জগৎ অবস্থান করিতেছে। এই জগৎ মানবচিত্তের দ্বারা সৃষ্ট নহে। আমাদের অনুভূতি বলিয়া যে এক বহির্জগৎ বিদ্যমান আছে যাহা হইতে আমরা অনুভূতিবোধ লাভ করি। এই বিশ্বজগতে আমি যদি একমাত্র মানব হইতাম তাহা হইলে ইহা বলিতে পারা যাইত যে, গবেষণার বিষয়গুলি আমারই চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহা ধরিয়া লইতেছি যে, আমার ন্যায় এই বিশ্বে আরও মানব বা অনুভূতির কেন্দ্র আছে। আমি এই সকল মানবের অভিজ্ঞতা তুলনা করিয়া দেখি যে, তাহাদের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। যদি কেবলমাত্র আমারই চিত্ত হইতে এই বিষয়গুলি উদ্ভূত হইত তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতা অন্য লোকের অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র হইত। সেই জন্য ইহা মনে করা সমীচীন হইবে যে, এই বিষয়গুলি আমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত। আমার অনুভূতির কেন্দ্র যদি নাশপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও যাহা আমার চিত্তে উদ্ভূত হয় নাই, থাকিয়া যাইবে। যদিও বহির্জগৎ মানবচিত্তের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই তথাপি বহির্জগৎ বিষয়ে জ্ঞান মানবচিত্ত হইতে উদ্ভূত। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে তাহার মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব-বিশিষ্ট। আমরা দেখিতে পাই, কারণ আমাদের চক্ষুর স্নায়ু কতকগুলি বিশিষ্ট আলোকরশ্মির অনুভূতি অতি সহজেই পায়। এই বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে এবং প্রত্যেকটিরই বিশিষ্ট বর্ণ আছে। ইহা ব্যতিরেকে অনেক রশ্মি আছে যাহার অনুভূতি আমাদের চক্ষু পায় না। এই সকল রশ্মি আলোকরশ্মির সমশ্রেণীভুক্ত। আমাদের অন্য প্রকারের ইন্দ্রিয় হইতে পারিত যাহা বর্ত্তমান আলোকরশ্মির অনুভূতি পাইতে অসমর্থ কিন্তু অন্য রশ্মিসমষ্টির অনুভূতি পাইতে সক্ষম। এই অবস্থায় বহির্জগতের দৃশ্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিত। মূলতঃ বহির্জগৎ সেই একই থাকিবে কিন্তু বিভিন্ন

পরিস্থিতিতে আমাদের নিকট বিভিন্ন আকার ধারণ করিবে। *মনে হয়, আংশিক ভাবে পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তাবাদ অর্থাৎ পদার্থের অনুভূতি হইতে পদার্থের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, গ্রহণ করা যাইতে পারে।*

যদি কোনও সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ঈশ্বর সে মানে কেন? সে খুব সম্ভবতঃ উত্তর দিবে যে, তাহার ধর্ম্মের শাস্ত্র বলে যে, ঈশ্বর আছেন। হিন্দু তাহার বেদ-পুরাণ-গীতা-উপনিষদ উল্লেখ করিয়া বলিবে যে, এই সকল শাস্ত্রে লেখা আছে ঈশ্বর আছেন। মুসলমান বলিবে যে, তাহার কোর্‌আন্ শরিফে আল্লার কথা লেখা আছে। খ্রীষ্টান বলিবে যে, তাহার বাইবেল বলে যে গড্ আছেন। ইহাদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি শাস্ত্র মান কেন? সে বোধ হয় উত্তর দিবে যে, শাস্ত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য সে শাস্ত্র মানে। এই যুক্তিটি এইরূপ দাঁড়ায় যে, সাধারণ লোক শাস্ত্র মানে কারণ ঈশ্বরই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সে ভগবানকে মানে কারণ শাস্ত্র বলিতেছে যে, ভগবান আছেন। এই যুক্তিটি একটি গোলক-ধাঁধার মত। ইহাতে কিছুই প্রমাণ হয় না ঈশ্বর আছেন কি না আছেন—তাহার অন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবশ্যক। দেখা যাক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে পরমসত্তামূলক প্রমাণ (ontological argument) বিশ্বাসযোগ্য কিনা—ঈশ্বর আছেন এই প্রস্তাবটি ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা হইতে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বরকে ধারণা করিলে এই ধারণার মধ্যেই ঈশ্বর আছেন এই ভাবটা অন্তর্নিহিত আছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পরমসত্তামূলক প্রমাণ প্রকৃত পক্ষে কোনও প্রমাণই নহে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সৃষ্টিতত্ত্বমূলক প্রমাণটি বিষয়ে কিছু বলিব। এই প্রমাণটি কার্য্যকারণবাদেরই পরিণাম। কার্য্য ও কারণ ক্রমান্বয়ে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য্যকারণবাদের কোনও একটি গ্রন্থি (link) ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থির ফল এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থির কারণ। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে, এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের পশ্চাদ্দিকে যাইতে যাইতে "আদিকারণে" আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায় এবং এই "আদিকারণ"কে "ঈশ্বর" আখ্যা দেওয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে ওই অভিমতের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর আপত্তি হইতে পারে। আমরা সীমাবিহীন কার্য্যকারণ শৃঙ্খল অনুমান করিয়াছি অথচ আদি কারণ স্বীকার করিয়া ওই শৃঙ্খলের একপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আদিকারণ কোনও কিছু হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। অতএব কার্য্যকারণবাদের সঙ্গে আদিকারণ অনুমানটির কোনও সামঞ্জস্য নাই।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টিতত্ত্বমূলক প্রমাণটি, গ্রহণীয় হইতে পারে। *প্রারম্ভে জগতে তেজের সমষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ক্রমশঃ এই তেজ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায়* আসিবে যে আর কোনও কার্য্যকরী তেজ এই জগতে থাকিবে না। যেমন ঘড়িনির্ম্মাতা দম দিয়া ঘড়িকে কার্য্যক্ষম করে সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান এই জগতকে ঘড়ির ন্যায় যেন দম দিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষম করিবেন। এইরূপে পুনরায় এই জগৎ কার্য্যকরী তেজে পরিপূর্ণ হইবে এবং ক্রমশঃ এই কার্য্যকরী তেজ পূর্ব্ববৎ শেষ হইয়া যাইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বিধি অনুসারে এই জগত কার্য্যকরী তেজে পরিপূর্ণ হইবে এবং তৎপরে তেজবিহীন হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও বিলয় হইবে।

এইবার অভিপ্রায়মূলক প্রমাণ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। যাঁহাদের এই অভিমত তাঁহারা মনে করেন যে, এই প্রকৃতিতে এক অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও সঙ্কল্পের আভাস পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে বোঝা যায় যে, এক বিচারশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা ইহাও বলেন যে, এই মানুষের চক্ষু কোনও এক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ঈশ্বরই এই চক্ষু সৃজন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের মত অন্যপ্রকার, তাঁহারা ডারউইনের ক্রমবিকাশ নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা ক্রমবিকাশ নীতি বিশ্বাস করেন তাঁহাদের অভিমতে মনুষ্যচক্ষু এখনও ত্রুটিবিহীন নির্দ্দোষতা প্রাপ্ত হয় নাই। জীব এখনও নির্দ্দোষপূর্ণতা পায় নাই।

ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অনেক অপূর্ণতা ও দোষ আছে। ক্রমবিকাশে ইহা পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। ক্রমবিকাশ নীতি আমরা যদি না জানিতাম বা না বুঝিতাম তাহা হইলে আমাদের ইহা বলা অসঙ্গত হইত না যে, সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান না হইয়া অপটু ও অনিপুণ হইয়াছেন তাহার কারণ এই যে, চক্ষু ইত্যাদি যে সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে তাহারা সবই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত। ক্রমবিকাশ-নীতি এক বৈজ্ঞানিক নীতি হওয়ায় জীবজন্তুরা আপন ভাবে বিকশিত হইবার স্বাধীনতা পাইয়াছে—সেই জন্যই জগতে অসম্পূর্ণতা ও পটুতার অভাব দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর অসম্পূর্ণ ও অক্ষম নহেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সহজজ্ঞান তত্ত্বমূলক প্রমাণ কোনও প্রমাণই নহে কারণ ইহা বিচার যুক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা অনির্দ্দিষ্টতাবাদ ও সম্ভাবনাবাদ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

এইবারে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের পরস্পর সংস্পর্শে, ধর্ম্মের উপর বিজ্ঞানের যে প্রভাব সেই বিষয়ে কিছু বলিব। প্রকৃত বিজ্ঞান ও প্রকৃত ধর্ম্মের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ থাকিতে পারে না। যদি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ভগবান একই উৎস হন তবে ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। একটি অন্যটির পরিপূরক।

এলাহাবাদে একটি অতি উচ্চপদস্থ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি আপন অবসর সময়ে পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত সাপেক্ষবাদ এবং অলোকতত্ত্ব লইয়া গবেষণা করিতেন।

আমরা নানারূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা করিতাম। পরস্পরের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতাম। আমি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যদি আপনার কোনও ধর্ম্ম-মতের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ থাকে তাহা হইলে আপনি কোন্ মতটি গ্রহণ করিবেন। তিনি উত্তরে বলিলেন যে, যখন তিনি বিজ্ঞান গবেষণা করেন তখন ধর্ম্মের কোনও তত্ত্বের কথা একেবারেই ভাবেন না। আর যখন তিনি ধর্ম্মসাধন করেন তখন বিজ্ঞানের কোনও তত্ত্বের কথা একেবারেই চিন্তা করেন না। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে অবস্থিত। আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের একই মূল ভগবান এবং এই দুইটির মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব থাকিতে পারে না। যদি কোনও ধর্ম্মমত যুক্তিহীন ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় আমরা তাহা পরিহার করিব।

গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, এই বিশ্ব যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছে। উনবিংশ শতাব্দী সেই জন্য যান্ত্রিক যুগ ছিল। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হালথহল্টও বলিতেন যে, অবশেষে সমস্ত পার্থিব বিজ্ঞান যন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হইবে। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিতেন যে, প্রাকৃতিক যে কোনও ঘটনা বুঝিতে হইলে তাহার একটি যান্ত্রিক নক্‌সা অনুমান না করিতে পারিলে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না।

এই সকল অনুমানগুলির ভিত্তি ছিল কার্য্যকারণবাদ। গত শতাব্দীতে কার্য্যকারণবাদ প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান নীতি বলিয়া গৃহীত হইত। সেই যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন যে, প্রকৃতি কেবল একই পথ অবলম্বন করে। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট মার্গে অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত। কার্য্যকারণবাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা নীতিও নিহিত আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি ঘটনা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র কার্য্যকারণ-নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। এই সূত্রে আর একটি নীতির আবশ্যকতা দৃষ্ট হইল। এই নূতন নীতির নাম অনির্দ্দিষ্টতাবাদ রাখা হইল।

ইহার মধ্যে সম্ভাবনাবাদ এই নীতিও নিহিত আছে। কার্য্যকারণবাদের এক্ষণে একচ্ছত্র উচ্চতম আসন আর নাই এবং এই সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া অনির্দ্দিষ্টতাবাদের সহিত তুল্য স্থান গ্রহণ করিতে হইল। কার্য্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করা যায় না কারণ যদি কাহাকেও আঘাত করা হয় তাহার ব্যথা লাগিবে, এই স্থলে আঘাত হইল কারণ আর ব্যথা হইল ফল।

ধরুন, আপনার কাছে কিছু পরিমাণ রেডিয়াম শক্তিসম্পন্ন পদার্থ আছে। ইহাতে কোটি কোটি রেডিয়াম শক্তিসম্পন্ন অণু আছে, প্রত্যেক অণুর একই গঠন, একই পরিবেষ্টন ও একই পরিস্থিতি। তবে কেন সবই অণুগুলি একই সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হইতেছে না? একটি অণু সর্ব্বপ্রথমে তাহার পর আর একটি অণু তাহার পরে অন্য আর একটি অণু বিশ্লিষ্ট হইতেছে। কোন্ অণুটি কোন্ মুহূর্ত্তে বিশ্লিষ্ট হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। এ যেন দৈব আসিয়া কোনও একটি কণাকে আহ্বান করিয়া আদেশ দেয়, "তুমি বিশ্লিষ্ট হও" সেই কণাটি তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইতেছে। কিন্তু যখন একতাল রেডিয়াম শক্তিসম্পন্ন পদার্থের লক্ষ লক্ষ অণু বিশ্লিষ্ট হয় তখন অঙ্ক কষিয়া বলিতে পারা যায় যে, সেই তালের কত অংশ কত সময়ের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে।

এই অনির্দ্দিষ্ট নিয়মের আর একটি উদাহরণ দিতেছি। ধরা যাক, আপনি একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। আপনাকে এক শত তীর দেওয়া হইয়াছে এবং আপনাকে লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থল ভেদ করিতে হইবে। আপনি একটি তীর নিন কিন্তু সেই তীর দিয়া আপনি লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

কিন্তু আপনার সামর্থ্য দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, আপনি এক শতবারের মধ্যে সম্ভব কতবার লক্ষ্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন। উপরোক্ত দুই উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একক ব্যক্তি বা বস্তুর উপর অনির্দ্দিষ্টতাবাদেরই প্রভাব বা প্রাধান্য আছে। কিন্তু যখন বহুসংখ্যক units একত্র হয় তখন একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম পাওয়া যায়। যদি কোনও শিশু জন্মের সময় খঞ্জ কিংবা রুগ্ন হয় এবং পরে কষ্ট পাইতে থাকে তাহা হইলে "কার্য্যকারণবাদে"র অনুবর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন যে শিশু পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করিয়াছিল এবং পাপেরই ফলস্বরূপ এই জন্মে কষ্ট পাইতেছে। আমি বলিব [illegible]

সেই জন্য এই স্থলে কার্য্যকারণবাদ না প্রয়োগ করিয়া অনির্দ্দিষ্টতাবাদ প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞানসম্মত হইবে। আমার মনে হয়, যেহেতু জন্মান্তরবাদ কেবল কার্য্যকারণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য ইহা বিজ্ঞানসম্মত নয়। পৈতৃক-গুণ আর যাবতীয় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আলোচনা করিলে শিশু কেন রুগ্ন হইল তাহা বোঝা যাইতে পারে।

কার্য্যকারণবাদ যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিধি হইত তাহা হইলে সকল ঘটনাই পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত থাকিত, এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকিত না। ঠিক ভাবে কার্য্য ও কারণ বিশ্লেষণ করিতে পারিলে যে-কেহ নির্ভুল ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারিত। কিন্তু সুখের বিষয়, "অনির্দ্দিষ্টতাবাদ"ও বিশ্বের এক নীতি হওয়া মানবের স্বাধীন ইচ্ছা থাকা সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। অবশ্য মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ সেই জন্য মানুষের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

মানুষের ক্ষমতা অনুসারে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর কমে বাড়ে। কার্য্যকারণ-নীতি যদি একমাত্র নিয়ম হইত তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের ন্যায় চলিত এবং কাহারও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিত না এবং পাপপুণ্য বলিয়া কিছুই থাকিত না। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যদি নিয়মাবদ্ধ না হইয়া যথেচ্ছাচারিতার দিকে যায় তাহা হইলে পাপ ও অন্যায়ের আবির্ভাব হয়। সেই জন্য পাপ ও পুণ্যের বাস্তবত্ব আছে। যদি বা "অনির্দ্দিষ্টতাবাদ" না থাকিত তাহা হইলে এই বিশ্বে বাস করা অভিপ্রায়বিহীন হইত এবং সৃষ্টির কোন আবশ্যকতা থাকিত না। দ্বৈতনীতি বিজ্ঞানের এক নীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌মাত্রেই জানেন যে, কতকগুলি পরীক্ষায় দেখা যায় আলোকরশ্মির আচরণ পদার্থকণার ন্যায়। আরও অন্য কতকগুলি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আলোক-রশ্মির আচরণ তরঙ্গের ন্যায়। সেইরূপ কয়েক প্রকারের বৈদ্যুতিক—ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ইত্যাদি কতকগুলি পরীক্ষাতে তরঙ্গের রূপ ধারণ করে। আবার কতকগুলি পরীক্ষায় পদার্থের রূপ ধারণ করে। আলোকরশ্মি, ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ইত্যাদি যথার্থ কি দিয়া গঠিত তাহা জানা যায় না।

এই দুই প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু পরস্পরবিরোধী নহে। একটি প্রণালী অন্যটির অনুপূরক বেগুনী-রঙের চশমা দিয়া দেখিলে সমস্ত প্রকৃতি বেগুনী রং ধারণ করে এবং লাল রঙের চশমা দিয়া দেখিলে সমস্ত প্রকৃতি লাল রং ধারণ করিবে।

কিন্তু প্রকৃতি বাস্তব ভাবে লাল বর্ণেরও নয় কিংবা বেগুনী বর্ণেরও নহে। প্রকৃতি যথার্থ কি তাহা এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় না। পরীক্ষিত বস্তুর রূপ পরীক্ষা-প্রণালী বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষা-প্রণালী বা যন্ত্রের পরীক্ষকের উপর কোনও প্রভাব নাই। সেই জন্য পরীক্ষক ও পরীক্ষিত বস্তু দুইটি পৃথক্ পদার্থ—এই দুইটি একই বস্তু হইতে পারে না। সেইরূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য দ্বৈতবাদ বিজ্ঞানসম্মত। অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানসম্মত নহে। সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও আমরা বলিতে পারি যে, উপাসক ও উপাস্য কর্ত্তা কর্ম্মের ন্যায় একই বস্তু নহে। উপাসক ও উপাস্য একই বস্তু হইলে উপাসনার কোনও অর্থ থাকে না।

মহাপণ্ডিত লেপ্লেস একবার সম্রাট নেপোলিয়নকে বলে-ছিলেন যে, "বিশ্বজগতের বিষয়ে আমার যে ধারণা তাহাতে ঈশ্বর আছেন এইরূপ স্বতঃসিদ্ধের কোনও প্রয়োজন নাই।" লেপ্লেস আরও বলেছিলেন, "যদি ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়াছেন তাহা হইলে ঈশ্বরকে সৃজন করিল কে?"

"সম্ভাবনাবাদে"র সাহায্যে ইহার উত্তর এখন দেওয়া যায়।

এই বিষয়ে তিনটি সম্ভবপর অনুমান হইতে পারে যথা :

(১) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জড়পদার্থে গঠিত। এই জড়-পদার্থ যাবতীয় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত ক্রিয়া দ্বারা ক্রমবিকশিত হইয়া আপনা-আপনি সৃষ্ট হইয়াছে।

(২) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনও সর্ব্বক্ষমতাপন্ন শক্তিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই শক্তি স্বয়ম্ আত্মপ্রভাবে বিকশিত হইয়াছে।

(৩) সকল সৃষ্টি মায়া এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মায়া।

তৃতীয় অনুমান লইয়া কিছু আলোচনা করা যায় না। কারণ সকল সৃষ্টিই যদি মায়া হয় এবং যথার্থ সত্য বলিয়া কিছুই না থাকে তাহা হইলে আমরাও মায়া ভিন্ন আর কিছু নয় এবং আমাদের চিন্তা ও আলোচনা মায়া ভিন্ন কিছু নহে। প্রথম অনুমানটি হইতে দ্বিতীয় অনুমানটি বহুপরিমাণে অধিক সম্ভবপর। স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে কিংবা শক্তির স্বাভাবিক গুণ হিসাবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষমতাপন্ন শক্তিরই জড়পদার্থ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আত্ম-বিকশিত হওয়া সম্ভব। এই ক্ষমতাপন্ন শক্তিকে "স্বয়ম্ভূ" বলা যায়। "স্বয়ম্ভূ"কে ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া যায়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় যদি এই শক্তির নানাবিধ গুণ

অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা সম্ভবপর ছিল তাহা নিশ্চিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

ঈশ্বর যদি আছেন এবং তাঁহার সত্তা যদি অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে তিনি "সত্য"। তাঁহার সৃষ্টির বিস্তৃতি যদি অসীম ও অপরিসীম হয় এবং তাঁহার সৃষ্টি যদি অনাদি-কাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবহমানকাল ধরিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ঈশ্বরকে "অনন্ত" বলা যায়। যদি তিনি আপন শক্তির বলে স্বেচ্ছায় নিজাভিপ্রায়ে এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এবং সুন্দর নিয়ম ও বিধি প্রচলিত করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি "জ্ঞান"স্বরূপ। এইরূপে ব্রহ্মের অন্যান্য স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায়।

আমার নিজের অভিমতগুলি বর্ণনা করিলাম। কোনও নীতি যে অভ্রান্ত সত্য সেই কথা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বাদানুবাদ সম্ভবপর নয়, কারণ তাঁহারা অনেক সময় শাস্ত্রীয় শ্লোকাদির অভ্রান্ততা বিশ্বাস করিয়া এবং এইগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আলোচনা করেন। আমি কোনও শ্লোকের একটিও অভ্রান্ততা স্বীকার করি না এবং ভগবান স্বয়ং কোনও কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা কোনও শ্লোক স্বয়ং রচনা করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করি না।

আমার অভিমত অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—আমি ইহা দাবি করি না এবং এইরূপ অহঙ্কারও আমার নাই। আমার এই রচনাদ্বারা যদি কাহারও এই বিষয়ে চিন্তাধারার উদ্রেক হয় তাহা হইলে আমি মনে করিব যে আমার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

চিত্রকলায় জাপান

শ্রীগৌতম সেন

প্রাচীনত্বের দিক দিয়া ভারতীয় চিত্রকলার মতই জাপানী-চিত্রকলারও একটি ঐতিহ্য আছে। জাপানীরা সৌন্দর্য-প্রিয়—তাহারা জাতশিল্পী। যদিও তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ-প্রভাব সুস্পষ্ট, তবুও তাহারা নিজস্ব ধারায় জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে—কি আচার-ব্যবহারে, কি সাজসজ্জায়, কি মননশীলতায়। এই রুচি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই তাহাদের কবি-মনটি ধরা পড়িয়াছে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়—জাপানের চিত্রশিল্পী ইয়োকায়ামা ও য়ুন্সো হিষিডা ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়া একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁহার 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক পুস্তকে তাহাদের কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"তারা আমাদের পরিবারস্থ কারও কারও ফরমাসে ভারতীয় বিষয়ের অনেকগুলি চিত্র আঁকলেন। য়ুরোপীয়দের মত ক্যানভাসের উপরে নয়, রেশমের উপর আঁকেন জাপানীরা। তাতে ভারি একটি মোলায়েম ভাব হয়। আর তাঁদের তুলির স্পর্শ যে কি কোমল, রঙগুলি যে কি সুমোহন হয়ে ফোটে, তা চিত্রশিল্পী মাত্রে জানেন। আমার ফরমাসে একজন ইয়োকোমা কালী ও একজন হিষিদা সরস্বতীর ছবি আঁকলেন।

"সুরেন মহাভারতের 'গীতা' কথনের সময়কার ছবি আঁকিয়েছিলেন, তাঁর প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহাভারত' পুস্তকের অন্তঃপৃষ্ঠায় তার ফটো সন্নিবিষ্ট আছে। শ্বেত অশ্বযুগলের রথে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনে সমাসীন। সে ছবি শ্রীকৃষ্ণের তেজোময়তার একটি আদর্শ ছবি। গগনদাদা ও অবনদাদা রাসলীলা ও অন্যান্য হালকা রসাত্মক বিষয়ের ছবি আঁকিয়েছিলেন। সে রাসলীলার ছবিখানি একটু একটু মনে পড়ে—কি অপার্থিব চন্দ্রালোক, কি আকাশবৎ সূক্ষ্ম বায়বীয় উত্তরীয় গোপীদের, কি নৃত্যভঙ্গী!"

এই সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য জাপানী কারিগরীর বৈশিষ্ট্য। এ নিপুণতা তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। যাহার ফলে জাপানী কুটির শিল্প আজও জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

সম্প্রতি 'ইসমেয়ো'তে যে জাপানী-চিত্রপ্রদর্শনী হইয়া গেল তাহাতে তাঁহাদের চিত্রকলার বেশ একটি ধারা-বাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন অঙ্কন পদ্ধতি হইতে

গাছ

ফুজি পাহাড় মেঘকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে

শীত
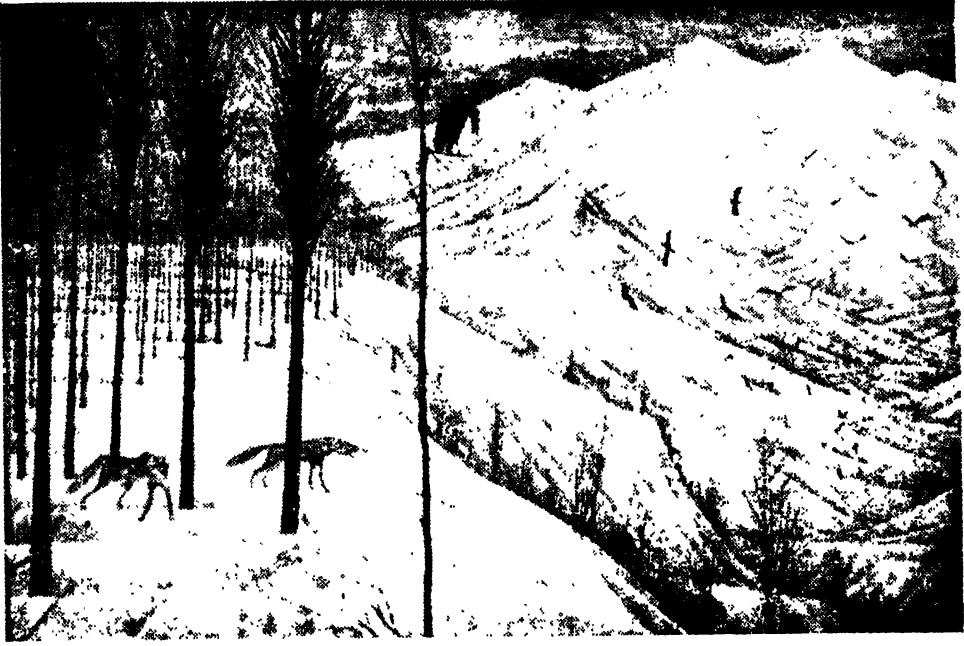
আধুনিককালের পরিবর্ত্তিত রূপ অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে সমন্বয় সাধন করিয়াছে। কাল-ধর্মকে কোথাও অস্বীকার না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ছবিগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন। এই প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্য-ভাবধারাকে অনুসরণ না করিয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করিয়া যে অপরূপ সৃষ্টি তাঁহারা করিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। যথার্থ শিল্পীর ইহা অপেক্ষা বড় পরিচয় আর নাই।

প্রথম ছবিটিতে আমরা দেখিতে পাই—'ফুজি পাহাড় মেঘকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে।' শিল্পীর কল্পনা তাঁহার তুলিস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ছবিটিকেই তাঁহারা প্রাচীন চিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রটি 'গাছ'। তৃতীয়টি 'বসন্ত' এবং আর দুটি চিত্রের মধ্যে একটি 'লেক' অপরটি 'শীত'।

এই চিত্রগুলিকে সাজানো হইয়াছে ক্রম হিসাবে। সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহার পরিবর্তন যদিও চোখে পড়ে, কিন্তু ইহাকে ক্রম-বিকাশ না বলিয়া, ক্রম-বৈচিত্র্য বলাই ভাল।

জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ওকাকুরার অঙ্কিত ছবি আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে তাঁহার ছবিগুলি যেন জীবন্ত হইয়া ওঠে। তিনিও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "The Ideal of the East, with special reference to the art of Japan" গ্রন্থটি চিত্রজগতে জাপানকে অনেকখানি পরিচিত করিয়া দিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত জাপানী সংস্কৃতির মিল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তথাপি জাতীয়তার দিক দিয়া জাপান তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই বৈশিষ্ট্যই তাহাকে মর্য্যাদার উচ্চ আসনে বসাইয়া দিয়াছে।

'ঈষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রিকা হইতে এই ছবিগুলি গৃহীত হইয়াছে।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

টেমসের জল কাদাগোলা। তার তীরে তীরে ইটপাথরে, ইস্পাতে লোহায় গড়া রাজধানী। ছোট্ট দেশখণ্ডটুকু দ্রুত ধাবমান কালখণ্ডগুলিকে দ্রুততর গতিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছে। আকাশে ঝাপসা কুয়াশা স্থবিরের মত অচল অনড়। বাতাসে মৃত্যুর মত শীতল স্পর্শ। শুধু মানুষের মনের মধ্যে উদ্দাম গতিবেগ। তার রক্তে উত্তাল প্রাণের তরঙ্গ। তার বুদ্ধিতে বেগের ঘুর্ণিপাক। এই বেগের ঘুর্ণিতে, অথবা ঘুর্ণির বেগে, ঘন হয়ে জমে উঠছে বস্তুরাশি। যেমন করে আদিকালে গতির ঘুর্ণচক্রে বাষ্পরাশি জমে উঠেছিল জড় পৃথিবীতে। তবু জমে যায় নি। কঠিন জড়ের অন্তরে ছিল সেই গতির শক্তি। সেই উদ্দাম শক্তি ক্রম-বিবর্তনে ঘুরে ঘুরে ছুটে চলেছিল।

"জড় প্রাণ পেয়েছিল জীবনে। সেই প্রাণশক্তি আজও এই জড়বিশ্বকে, এই জড়দেহকে বাসনার প্রচণ্ড ঝড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে লাটিমের মত ঘোরাচ্ছে। এই শক্তি এই প্রাণের গোড়ায় জড়—আবার জড়ের গোড়ায় শক্তি।"

—"কে বললে—ও ছুটো একটা অন্যটার আগে পরে? জড় ও শক্তি চিরকাল আছে একইসঙ্গে। সেই বাষ্পীয় আদি পৃথিবীর অন্তরেই ত ছিল শক্তির ঘুর্ণি। শক্তি ও জড় একই সঙ্গে মেতেছে এই বিশ্বলীলায়। যেমন করে প্রণয়লীলায় মিলেছে পুরুষ ও নারী। এই যে তোমার হাতে মিলেছে আমার হাত,—আর একটা অদ্ভুত সুখ আমার শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে, এই যে দুই দেহের সংঘাতে অদেহী মাধুর্য্য ফুটে উঠছে, একে তুমি কি বলবে?"

—"এই ত প্রমাণ, শক্তির গোড়ায় জড়। এই মাধুরীর গোড়ায় এই দুই জড়দেহের সম্মিলন।"—

"আবার তারও গোড়ায় যে এক বাসনার শক্তি দুই বিচ্ছিন্ন দেহকে একসঙ্গে মিলিয়েছে? এক এবং দুই একসঙ্গেই আছে এই বিশ্বতত্ত্বে।"

—"কিন্তু, শুনেছি তোমাদের সেই কি বলে জানি,—অদ্বৈতবাদ, তাতে কেবল নাকি একতত্ত্বকেই মানে—এক আত্মা।—হাসছ যে।"

—"কই হাসছি?"

—"ওই ত হাসছ। তোমার চোখ হাসছে, তোমার ঠোঁট হাসছে, তুমি আমায় ঠাট্টা করছ। কেন?"

—"চল কোথাও একটু চা খেয়ে আসি। ঠাণ্ডাটা বেশ জমে আসছে।"

—"না আমি যাব না। আগে বল, কেন তুমি হাসলে? কেন তুমি ঠাট্টা করলে?"

—"তোমায় রাগাব বলে।"

—"কেন?"

—"তা হলে তুমি বুঝবে কাকে বলে এক আত্মা, কাকে বলে দুই।"

—"কি করে?—না না, অমন করে নয় কি বলছ ফিসফিস করে বুঝতে পারছি না আমি। আশ্চর্য্য, তোমার আদরে আর কথায় কোন মিল নেই কেন? তোমার কথা কখনও উদাস, কখনও অধীর। তার সঙ্গে আমার মনের কথা সব সময় মেলে না। কিন্তু তোমার ছোঁয়ায় আমার দেহ যেন কথা কয়ে ওঠে। তোমার চুম্বনে, সুখে আমার কান্না আসে।—আশ্চর্য্য, এমন আমার কখনও হয় নি, জান? এর আগেও ত দু'একজনকে ভালবেসেছি, ধরা দিয়েছি তাদের বাহুবন্ধনে। তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদে কেঁদেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বঞ্চনা করেছে, তখন অপমানে কেঁদেছি। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে কান্না আছে, মিলনের মধ্যে যে বেদনা আছে, আনন্দের মধ্যে যে দুঃখ আছে, তা আমি আগে জানতে পারি নি।"

—"প্রেমের এই চরম অনুভবকেই যদি না জানলে, তবে প্রেম জানলে কি করে? তবে মিথ্যে কথা, তুমি ভালবেসেছ। না তুমি ভালবাসো নি আর কাউকে—আমাকে ছাড়া। হয় ত কাউকে কাউকে ভালো লেগেছিল, ভালো লেগেছিল তাদের প্রেমের খেলা। ও তোমার খেলা মাত্র।"

—"খেলা?"

—"হ্যাঁ, তাসখেলার চেয়ে খুব বেশী গভীর নয়।"

—নয়?

—হ্যাঁ, নয়ই ত। ভালবাসায় অসীম সুখ আর অনন্ত দুঃখ। আমাদের কবি বলেছেন—প্রেম যেন নদী। যদি তা থেকে ঘট ভরে নিতে চাও তোমার ঘরের কাজের জন্যে, তবে তাও ভাল। যদি তার তীরে বসে শুধু উদাস ভাবে চেয়ে থাকো, সেও একরকম সুখের ছোঁয়া। আর যদি সে নদীতে স্নান করতে চাও, তবে এসে গা ভাসিয়ে দাও—

দেখবে সে কত সুখ। আর যদি একেবারে ডুব দিতে চাও, তবে এসে ঝাঁপ দাও—দেখবে সুখের প্লাবনের মত জল-স্রোতের অন্তরে মৃত্যুর চরম অনুভব।—প্রেমের উপরতলায় সুখ আর গভীরে দুঃখ। এ দুঃখ, সুখের অভাব নয়—সুখের অতীত।

—আবার সেই দ্বৈতবাদের কথা। তোমাদের অদ্বৈত আত্মার সঙ্গে এর মিল নেই।—হাসছ যে আবার?

—দেখ, আমি তোমায় বলছি—অদ্বৈত দ্বৈতকে বাদ দিয়ে নয়, দ্বৈতকে গ্রহণ করে। দুইকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, দুইকে সম্পূর্ণ করে। বহুকে দূরে ঠেলে নয়, তার অন্তর্নিহিত সংহতিতে। তাই আমরা বহু দেবদেবীকে পূজা করি, তবু আমাদের ঈশ্বর এক। বিশ্বজোড়া বিচিত্র বিভিন্ন শক্তির দ্বৈতলীলা একটি অখণ্ড অদ্বৈত চেতনলোকের মধ্যে বিধৃত। তাই আমাদের ঈশ্বরের এক নাম অর্ধনারীশ্বর। তিনি অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী। অর্ধেক স্থির আর অর্ধেক গতি। অর্ধেক প্রকাশ আর অর্ধেক মায়া। অর্ধেক সূর্য আর অর্ধেক ছায়া। কিন্তু ঐ দেখ কুয়াশার ছায়া সরিয়ে দিয়ে ফ্যাকাশে সূর্য কেমন ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছে। চল উঠে পড়ি।

—শীত করছে বুঝি তোমার?

—একটু একটু।

—একটু নয়, বিলক্ষণ। এই ত তোমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

—ওটা শীতে নয়, তোমার আদরের স্পর্শে।

—মিথ্যেবাদী।

—তোমার জন্তে মিথ্যাভাষণেই আমার গৌরব।

ওরা কোমরে কোমরে জড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে ছুটে চলে গেল। আর শেষ নবেম্বরের হাওয়া তীক্ষ্ণ কাঁটার মত ওদের বিঁধতে বিঁধতে ছুটল। আর চেস্টনাট গাছগুলি থেকে পাতা ঝরল ঝরঝর। চলতে চলতে থমকে সেদিকে তাকিয়ে দেখল কুমার। বললে—দেখ মেরী, কেমন পাতা ঝরছে। ওরা খবর পেয়ে গেছে যে, শীত এলো বলে।

—হ্যাঁ গো খবর রটেছে অনেক আগেই। যবে থেকেই দিনগুলি শীতের ভয়ে গর্তে ঢুকতে সুরু করেছে।

—আচ্ছা, শীতে আমার তেমন কষ্ট হয় না ত? অথচ ছোটবেলা থেকে আমি এত শীতকাতুরে যে, সবাই ভেবেছিল বিলেতের শীতে আমি বুঝি মরেই যাব। কিন্তু আশ্চর্য!—এমন কিছু কষ্ট হয় না। এই ত দু'বছর হয়ে গেল,—তবু।

—হবে কি করে, তুমি যে সূর্যোদয়ের দেশ থেকে আসছ, আজন্ম কাল থেকে তোমার দেহের প্রতি রক্তকণা সূর্যালোক পান করে তাপ সঞ্চয় করে রেখেছে নিজের মধ্যে, আজ প্রয়োজনমত বোধ হয় সেগুলি কাজে লাগাচ্ছে।

—কেমন করে তাপ সঞ্চয় করল শুনি?

—যেমন করে বোধ হয় ক্লোরোফিল সঞ্চয় করে পাতা,—মেরী হেসে উঠল।

—চমৎকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কুমারও হেসে উঠল, বললে,—তা ক্লোরোফিলই বটে, তাই রঙ সব এমনি ঘন সবুজ অর্থাৎ কালো।

—হ্যাঁ, চমৎকার কালো।

—আহা কি কথাই বললে—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ'।

—ও কথার মানে কি?

—মানে এই যে,তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে, মনে পড়ছে কত হাজার বছর আগে, আমার দেশের এক গৌরাঙ্গী নায়িকা তার কালো নায়কটিকে এই কথাই বলেছিল। বলেছিল—তোমার কালো রূপে ভুবন ভোলে। বলেছিল—কালো মেঘে তোমার ছায়া, আর কালো জলে তোমার ছোঁয়া, বলেছিল—গাছের অন্ধকার ছায়ায় তোমার আলো।

—কে সেই নায়িকা, আর কে সেই নায়ক?

—কৃষ্ণ সেই নায়ক, আর রাধিকা নায়িকা।

—বাঃ, কৃষ্ণ ত শুনেছি তোমাদের ভগবান।

—হ্যাঁ, তাই ত।

—সে কি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম? মেরী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—হাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গেই ত প্রেম। কুমার দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসে।

কিন্তু সে ইঙ্গিত ধরতে পারে না মেরী, বলে ওঠে—"ছি ছি, ঈশ্বরকে দেব ভক্তি, দেব প্রাণ,—তাঁর জন্তে করব ত্যাগ। তাঁর জন্তে দুঃখভোগ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন ক্রাইস্ট। সেই ঈশ্বরের সঙ্গে নারীর প্রণয়কল্পনা? এ গর্হিত, অন্যায়।"

অচেনা সংশয়ের অন্ধকার ছায়া হঠাৎ মেরীর চোখের মধ্যে ঘন হয়ে জলে উঠল। এত দিনের বন্ধুকে হঠাৎ মনে হ'ল যেন একান্ত অপরিচিত। কোথায় সে দেশ, কত দূরে কে জানে কেমন সেখানকার আকাশ বাতাস প্রকৃতি, কেমন সেখানকার মানুষজন। তারা কি ভাষায় কথা কয়, কত আজগুবি কথা ভাবে। সেখানে নাকি মানুষ সাপের সঙ্গে এক ঘরে ভাগাভাগি করে বাস করে। সেখানে নাকি কত মানুষের অর্ধাশন আর কত মানুষের উপবাস। আবার তারই মাঝখানে হীরে-মতি আর চনি-পান্নার [illegible]

মালা-জড়ানো পাগড়ীপরা মহারাজের আনাগোনা। সে দেশের শহরে শহরে নাকি বিজ্ঞানের আধুনিকতম যান্ত্রিক প্রয়াস।—এইত কুমার নিজেই বিদ্যুৎ কারিগরী নিয়ে রিসার্চ করে উপাধি নিতে এসেছে। একটা ভাল কাজও পেয়ে যাবে বোধ হয় মাসকয়েকের মধ্যেই। তার পরে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে বিদ্যুতের খেল্ দেখাবে। অথচ, ঐ ওদেরই গ্রামে এখনও নাকি আদিযুগের অরণ্যের ছায়া ঘন হয়ে পড়ে, সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ডাকে, আর গৃহস্থের বাঁশের ঝাঁপির আড়ালে দাঁড়িয়ে নাকিসুরে ভয় দেখায় যত ভুতপ্রেতের দল। আর মধ্যরাত্রে বুকের মধ্যে হিম করে বাঁখারির দেওয়াল কেঁপে ওঠে বাঘের ডাকে। সেখানে কত আচারবিচার, ভয়। কত অর্থহীন ব্রতপূজা; আবার তারই মধ্যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তার জাল রচনা—কত ত্যাগ, কত ধর্ম, কত রহস্যমন্ত্র। এই সব অনেক রকম ভাব এবং ভাবনা একসঙ্গে ভিড় করে ওর মনের মধ্যে কথা কইতে কইতে ওর মুখ দিল বন্ধ করে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চকিত হয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

মুখোমুখী আসনে বসে সে বন্ধু তাকিয়েছিল হাসিভরা চোখে, ঠিক যে ওর দিকে তাও নয়, আবার অন্য কোন বিশেষ দিকেও নয়। দু'পাশে দুই আসনে জোড়ে বসার ব্যবস্থা। মাঝখানে একটি কালো প্লাস্টিকের ঝকঝকে নিরাভরণ টেবিল, তার উপরে দু'পেয়ালা 'এস্‌প্রেসো' কফি। তার মধ্যে থেকে সুগন্ধি এবং ধূম একসঙ্গে উত্থিত হচ্ছে। মাঝখানে একটি স্প্যানিশ সিগারেটের টিন। দেওয়ালে আঁকা ভিনিসীয়ান গণ্ডোলার ছবি। কালো কাঁচের থামে সাদা প্লাষ্টিকের টবে সরু সরু লতার ঝুরি। ছোট্ট ঘরখানায় বিলিতী দেশীবিদেশীর ভিড়। তাদের বিভিন্ন সুরের বিচিত্র ভাষার ফিসফিসে কথার সঙ্গে কফির সুগন্ধ এবং কাটাচামচের টুংটাং। তার উপরে সামনে বসে আছে শ্বেতবর্ণা, নীল-নয়না, হরিৎবসনা সুন্দরী, যে আহ্বান করেছে তাকে আত্মার আত্মীয় বলে,—অঙ্গীকার করেছে প্রেমের পণপত্রে। সমস্তটা মিলিয়ে একটা রহস্যের মায়ালোক কুমারের চোখের সামনে অর্ধস্ফুট হয়ে রইল। ও তাকিয়ে রইল সামনের দিকে, যাকে দেখছে তাকেও যেন দেখল না, অথচ তা ছাড়া অন্য কিছু যে বিশেষ করে দেখল তাও না।

তবু চোখের সামনে কত ছায়া চলে চলে সরে গেল। কত ছবি ভেসে ভেসে মুছে গেল। খোলা জানালা দিয়ে পাঁচটা না বাজতেই কালো রাস্তাটিতে অন্ধকার ছায়া পড়ল। আর ওপারের দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠল। ঝকঝকে মোটা কাঁচের ভিতর থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার ঝলমল করে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেরী ওর দিকে তাকাল।

উষ্ণ জলবাহী নলের আনাগোনায় ঘরটি গরম। তার উপরে এত লোকের ভিড় এবং গুঞ্জন। গরমে মেরীর গোলাপী মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাই মেরী কোটের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল তার হাত। আর ওর অঙ্গচ্যুত কোট চেয়ারের পিছনে নিম্নমুখ হয়ে পড়ে রইল। দোকানের একজন ইটালীয়ান্ পশারিণী এসে কেকের থালা নিয়ে সামনে দাঁড়াল। কুমার খুশী মুখে নিজের জন্যে একটা কেক্ পছন্দ করে তুলে নিল। মেরী শুধু ঘাড় নাড়ল।

কুমার ব্যস্ত হয়ে বললে—সে কি নেবে না? সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল বিদেশী পশারিণী।

মেরী বললে—আমার জন্যে একটা স্যাণ্ডউইচ আনো, প্লীজ।

ভেনিসীয়ান সুন্দরী মাথা নেড়ে বললে—'গ্রাৎসিচ'।

কুমার বললে—হঠাৎ তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন মেরী? শরীর খারাপ হ'ল কি?

মেরী কিছু না বলে শুধু একটু হাসল। ততক্ষণে ওর স্যাণ্ডউইচ এসে গেছে। ছোট এক টুকরো কেটে নিয়ে মুখে পুরে মেরী আবার হাসল।

কুমার বললে—বল লক্ষ্মীটি।

মেরী বললে—"জান, আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ছুরি দিয়ে কেক কাটতে কাটতে কুমার মুখ তুললে—"ভয়? কেন?"

মেরী হাসল—"অবাক কাণ্ড। জান, হঠাৎ মনে হ'ল, যেন তোমায় আমি কোনকালে চিনি না। তুমি আমার নেহাৎ অপরিচিত। শুনেছি, তোমাদের দেশে বিয়ের আগে বরকনের দেখাসাক্ষাৎ থাকে না। হঠাৎ মনে হ'ল, যদি কোনদিন তোমাতে আমাতে বিয়ে হয় তবে সেও যেন সেই রকমই হবে। যেন তোমায় আমি কিছুই চিনি না, যেন তুমি আমার কেউ নও। কোথায় সে কোন্ অদ্ভুত দেশে তোমার বাড়ী,—যেখানে হাজার হাজার বছরের বিভিন্ন কালস্রোত একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস অরণ্যের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে কেঁদে মরছে। হঠাৎ আমার যেন কেমন ভয় হ'ল।"

মেরী টুকরো করে স্যাণ্ডউইচ কেটে কেটে খেতে খেতে এই সব বলছিল আর কুমার অবাক হয়ে শুনছিল। ওর প্লেটে আঙুর বসানো ক্রীম কেকের টুকরোয় কাঁটা বিঁধানো ছিল। সেটা তেমনই প্লেটেই পড়ে রইল। ওর কফির পেয়ালা খালি হ'ল না। ও জলজলে চোখে তাকিয়ে রইল।

মেরী বললে—"রাগ করলে ?"

কুমার হাসল—"নাঃ।"

—"তবে খাচ্ছ না যে ?"

—"সত্যি, ইচ্ছে করছে না।" কুমার বিব্রত হ'ল—"সত্যি বিশ্বাস কর, হঠাৎ যেন খিদে কোথায় উবে গেল।"

মেরী বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু ও কথা বাড়াল না। বললে—"কফি যদি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর এক কাপ নাও না।"

—"না মেরী, চল আজ ওঠা যাক। আর ভাল লাগছে না। বড্ড যেন গরম।"

—"আচ্ছা চল। কিন্তু তুমি খেলে না, তোমাকে কি ব্যথা দিলাম ?"

কাউণ্টারে দাম চুকিয়ে দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। নবেম্বরের ঝাপসা আকাশ ওদের জড়িয়ে ধরে শিউরে উঠল। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়তেই আকাশভরা খোলা হাওয়ায় ওদের প্রাণ যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

মসৃণ পরিপাটি সুন্দরীর বেণীর মত কালো রাস্তায় পথচারীদের ভিড় একটু বিরল হয়ে এসেছে। চলতে চলতে হঠাৎ কুমারের মন কেমন করে উঠল। কে জানে কার জন্যে ? প্রিয়া ত পাশেই আছে। তবে ? কি জানি কেন ওর মুঠো করে ধরা হাতে নিজের অজ্ঞাতেই একটু চাপ দিল কুমার, আর অমনই মেরীর বুকের মধ্যে ভালবাসারা গুনগুন করে উঠল। এই স্পর্শটুকু ওর বড় বেশী চেনা। মনে আছে এই রকম একটা ছোট্ট স্পর্শেই ওরা প্রথম ধরা পড়ে পরস্পরের কাছে।

তখন বসন্তকাল। ঝরাপাতা আবার সবে একটি একটি করে ফিরে আসতে সুরু করেছে। আর তারই মাঝে মাঝে দু'একটা কুঁড়ি পত্রপুটে ভ্রূণের মত গুটিয়ে আছে। তখনও তার ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী। লেকের জলের উপরে স্লিটের সবগুলি ভেঙে ভেঙে গেছে। আর পাখীর কিচিমিচি শোনা যাচ্ছে গাছের ডালে। এমন সব দিনের একটা বিশেষ দিনে, রোদ যখন সবে মাথার ওপর থেকে একটু হেলেছে, হঠাৎ মেরীর ছুটি হয়ে গেল। ঘরে ফিরে দেখে কুমারের ঘরের দরজায় একটু ফাঁক। সহকর্মী গিবন্ সঙ্গে ছিল। বললে—"তোমার বন্ধু বাড়ী আছে দেখছি। ওকে ওর ঘর থেকে টেনে বার কর। ওর গাড়ী করে নিয়ে চলুক আমাদের 'কিউগার্ডেন্‌সে'। সেখানে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়ে, খুঁজে নিক নিজের অন্য কোন বন্ধু।

—"ঈস্, অত বোকা ভেবো না। ভারতীয়রা এসব বিষয়ে তোমাদের চেয়ে কম চালাক নয়,—বলেছিল মেরী।"

গিবন্ হেসেছিল, বলেছিল—"দূর, দূর, প্রেমের ব্যাপারে ভারতীয়রা বোকা। তোমার সাদা চামড়া দেখে ভুলে যাবে।"

মেরীও হেসেছিল—"তোমার ভয় নেই ? যদি ওর কালো চামড়া দেখে আমি ভুলে যাই ?"

গিবন্ উত্তরে বলেছিল—"ফুঃ, ভুলেও যাবে না, গলেও যাবে না জানি, তবে বোকার সঙ্গে যদি একটু খেলা করতে সাধ যায় এবং তার জন্যে যদি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, অথবা টুকিটাকি উপহারের উপরি পাও, তবে বাধা দেবো না।"

মনে আছে, তবুও সেদিন মেরী গিবন্‌কে বিশ্বাস করে নি। বলেছিল—"ভারতীয়দের মধ্যে ভুলেছে যারা, তাদের চেয়ে ভুলিয়েছে যারা তাদের সংখ্যা কম নয়।"

কাউন্টি কাউন্সিলের কোন এক স্কুলে জিওগ্রাফীর টীচার ছিল মেরী। আর গিবন্ সেখানেই করত ড্রইংয়ের মাষ্টারী। বাড়তি সময়টুকুতে সেক্রেটারীর কাজ শিখত মেরী। আর গিবন্ শিখত একটা রাতের স্কুলে পেন্টিং ও ব্লক তৈরীর কাজ। স্কুলে গিয়েই গিবনের সঙ্গে বেশ জমে উঠেছিল মেরীর। ওরা প্রায় একই বয়সী, আর গিবন্ গল্প জমাতে ওস্তাদ। অবসরটুকু ওরা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। গিবনই একদিন কুমারকে ধরে এনেছিল। বলেছিল—"তুমি অঘটনপটীয়সী জানি, তাই একে নিয়ে এলাম তোমার কাছে, তোমার এই বাড়ীতে প্রায়ই ঘর খালি হয়। বাড়ীওয়ালাকে বলে, তারই একটা ওকে জোগাড় করে দাও। ও বেচারা এখন কক্ষচ্যুত তারার মত ওর পূর্বতন বাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে আকাশে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।"

তাই অনেক চেষ্টা করে এ ঘরটা ঠিক করে দিয়েছিল মেরী। আর শুধু ঘর নয়, ঘরের জিনিসপত্রও ঠিক করে গুছিয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে মানুষটিরও সাধ্যমত যত্ন করার চেষ্টা করত, যখন সময় থাকত হাতে।

যে সময়টার কথা মেরীর হঠাৎ মনে পড়ল, তখনও মেরীর হাতের ছোঁয়ায় ওর ঘরটা তেমন করে হেসে ওঠে নি। টেবিলের উপরে আর পাশের টুলে বইয়ের স্তূপ। ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে কোটটা ফেলে দিয়েছে সোফার ওপরে ছুঁড়ে। আর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সেদিনের ডাকের চিঠি পড়ছে পিছন ফিরে। মেরী যখন বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিল, প্রথমটা শুনতে পায় নি কুমার। পরে শুনতে পেয়ে যে অস্ফুট শব্দ করল, তার অর্থ যা খুশী হতে পারে।"

সহাস্য উচ্ছল কলকণ্ঠে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মেরী, হঠাৎ কুমারের চেহারা দেখে চমকে উঠল—"ব্যাপার কি, মায়ের জন্যে মন কেমন করছে নাকি ?

অর্থহীন ভাবে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করেছিল কুমার

কিন্তু সেটা কান্নার মত ওর মুখের প্রত্যেকটি পেশীর ভাঁজে ভাঁজে আটকে গিয়েছিল। আর ওর গলা থেকে যে কথাটা বের হয়ে এল সেটা খানিকটা ভগ্নস্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

ওর সমস্ত শরীর যেন কাঁপছিল। দৃষ্টি শূন্য, তাতে কোন কথার আভাস নেই। মেরী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও প্লীজ। এই কথা ক'টা ভাঙা গলায় বলতে বলতে টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। বিস্মিত মেরী মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে ফিরে এল।

সেদিন আর কিউগার্ডেনসে যাওয়া হ'ল না। তবু ওরা অভ্যাসমত হাতে হাতে ধরে, হাসতে হাসতেই বেড়িয়ে এল। ভারতীয় ভদ্রলোকের অদ্ভুত ব্যবহার একটু ব্যঙ্গ করেই বর্ণনা করল মেরী। কথা বলতে বলতে ওরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেলো। ভাগাভাগি করে দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। গিবন্ বললে—চল পার্কে খানিক বেড়িয়ে আসি, এখনও সন্ধ্যে নামে নি, ঠাণ্ডা জমে নি। এই সময়টা ভাল লাগবে।

মেরীর যদিও তেমন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু হাতে কিছু করারও ছিল না। তাই বললে—চল।

চলতে চলতে গিবন্ ওর কোমর জড়িয়ে নিল, মেরী বাধা দিল না, বাধা দেবার কথা তত মনেও আসে না। আরও কত জনের সঙ্গেই ত এমনি করে বেড়িয়েছে, এমনি হাতে হাত মিলিয়ে, কোমরে কোমর জড়িয়ে। খুব যে গদগদ হয়ে যায় তা নয়, তবু মন্দও লাগে না। মৃদু এক ধরণের উত্তেজনা। এমন কিছু অপূর্ব নয়, তবু যা হোক একটা কিছু ত বটে। সন্ধ্যেবেলাটা কোন বন্ধুর সঙ্গে একটু গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বেড়িয়ে না এলে নিঃসঙ্গ দিনটা যেন আলুনি আলুসেদ্ধর মত পান্‌সে বিস্বাদ লাগে। খাবার পরে এক কাপ কফি কিংবা চা না খেলে যেমন হয়। সব সময় যে ভালই লাগে তা নয়, তবু ঐ ছোট্ট একটু 'তবু'।

ক্রমশঃ

মেঘলা চোখের আলো

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মেঘের পিছে মেঘ ছুটেছে আজকে কিসের টানে,
কে বলে দেয় এই অবেলায় মন কেমনের মানে!
ঘর লাগে না ভালো,
পিছল পথের ডাক এনেছে মেঘলা চোখের আলো।
ব্যাকুল বীথি কোন অতিথির বুনছে বরণ গাথা,
উড়িয়ে আঁচল দেবদারুদল মরছে কুটে মাথা
ব্যথার মহোৎসবে,
আগল টুটে পাগল এলো জয়ের কলরবে।
মনের মাঝে ঘনিয়ে উঠে ঝিরিঝিরির ঘোর,
পরিয়ে দিলে প্রাণে আমার ঝিনি সুতার ডোর
শ্যামল নীলে মেশা,
তাইতো তরুর ভীরু পাখী হেলায় নিরুদ্দেশা!
আজ আকাশের নিলাজ ভালে কে দেয় কালি লেপে,
পারছে না সে বুকের আগুন রাখতে যে আর চেপে।
নেভে দীপের শিখা,
তাইতো পড়ি দূর বিদিশার দু'এক ছত্র লিখা।
কি আশ্চর্য্য দুয়ার খুলে হঠাৎ হাওয়ার হাত
ইতিহাসের পাতায় পাতায় উপন্যাসের রাত!
আমার চির-খোঁজা
ঝর ঝর চোখের জলে ভাসায় ভাষার বোঝা।
মেঘের পিছে মেঘ ছুটেছে আজকে কিসের টানে
আপনহারা হৃদয়, বুলু, তোমার কাছে আনে
নিশির ডাকে যেন,
ঘুমভাঙা এই রাঙা কুঁড়ির ঝড়ের নেশা কেন?
কদমকেশর শিউরে উঠে সারা প্রহর ভরি,
মরণপারের যাত্রী আনে কেয়ার খেয়াতরী।
উজাড় করে ঢালো
সুরের স্বপন বপন করা মরণ-চোখের আলো।

ডালিয়া

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

খুট !

সামান্ত একটুখানি শব্দ ; কিন্তু ঘটাল বিপর্য্যয়। এতখানির জন্তে প্রস্তুত ছিল না পরিমল। একেবারে অপ্রস্তুতে পড়ে গেল সে। এমন কি ক্যামেরাটিকে গুছিয়ে নেবার মতও সময় পেল না একটুও।

তৎক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটি প্রায় তার ঘাড়ের ওপর :

মূর্ত্তি ত নয়, যেন রণরঙ্গিণী !

—কি ? ছবি তুললেন ? কোন্ সাহসে তুললেন ? কেন আমার ছবি তুললেন আপনি ?

—না ত ! থতমত খেয়ে যায় পরিমল।

—না ত ! মিথ্যা কথা। আপনি তুলেছেন ছবি। আমি দেখেছি নিজের চোখে। সৎসাহস নেই আপনার সত্য কথা বলবার ?

তাড়না খেয়ে সাহস ফিরে পায় পরিমল। বলে, তুলেছি। তবে আপনার নয়।

রণরঙ্গিণীর রণরঙ্গ যেন বেড়ে যায়। ঝাঁপিয়ে উঠে বলে, আমার নয় ? তবে কার ?

—আকাশের, বাতাসের আর এই পরিবেশের।

—আকাশের-বাতাসের ছবি ? বাহাদুর ছবি-তুলিয়ে বটে ! মিথ্যারও সীমা আছে একটা ! তারও পর্দ্দা আছে, কিন্তু আপনার তাও নেই। কই দেখি ক্যামেরা, কেমন হয়েছে আকাশের ছবি, বাতাসের ছবি ? মেয়েটি যেন ছোঁ মেরে নিতে যায় ক্যামেরাটাকে।

হাঁ হাঁ করে ওঠে পরিমল। করেন কি ? ভেঙ্গে ফেলবেন ক্যামেরাটিকে ? আলো লেগে নষ্ট হয়ে যাবে যে সব।

—যাক্। যারা লুকিয়ে ছবি তোলে, গোপনে ছবি তোলে মেয়েদের, তাদের সব নষ্ট হয়ে যাওয়াই ভাল। স্পর্দ্ধা ! কেন ? কেন ছবি তুললেন আপনি ? কেন জানালেন না আমাকে আগে ?

পরিমল ভাবে, না জানিয়ে ছবি তুলেছে বলেই মেয়েটি অসন্তুষ্ট। জানিয়ে তুললে হয়ত খুসী হয়েই মত দিত সে। তাই নম্র হয়ে বলে, যদি অনুমতি করেন, আপনারও না হয় ছবি তুলে নিই একখানা। বেশ ত, দাঁড়ান না ক্যামেরার সামনে এক মিনিট। পরিমল ফোকাশ করতে যায়। মেয়েটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে দাঁড়ায় ক্যামেরার সামনে থেকে। আগুন হয়ে বলে, খবর্দ্দার ! আবার যদি বেয়াদপি করেন, ক্যামেরা ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে দেব আমি।

ক্যামেরা বন্ধ করে দেয় পরিমল, বলে, থাক। এতখানি অনিচ্ছা যখন, তখন নাই বা তুললাম ছবি।

মেয়েটি ব্যঙ্গ করে, সাধু ! আগের ছবিটি তুলেছিলেন আমার একান্ত ইচ্ছা জেনেই, না ?

—না। সেটা ঘটনাচক্র।

—ঘটনাচক্র ? নিজের অপকীর্ত্তি চাপাতে চান ঘটনাচক্রের ওপর ?

—তাও না। ছবি উঠতই, তবে সাধারণ পরিবেশের ছবি। তার সঙ্গে আপনার কোন যোগ থাকত না। অবশ্য এখনও আছে কি না জানি না।

মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়। সন্দিগ্ধচিত্তেই প্রশ্ন করে, এর পরেও বলতে চান ছবি ওঠে নি আমার ?

—আমার বিশ্বাস তাই। ঢোক গিলে বলে পরিমল, যদি রেঞ্জের মধ্যে এসে না পড়ে থাকেন আপনি ?

—রেঞ্জের মধ্যে ? দোষটা আমারই তা হলে ? আপনার রেঞ্জের মধ্যে নিজেকে টেনে এনেছি আমি ?

পরিমল দেখে ঝগড়া করবার একটা অদম্য স্পৃহা চেপে বসেছে মেয়েটির মাথায়। এ যেন পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া। সে না করলেও করবে মেয়েটি। তাই যতখানি সম্ভব মোলায়েম সুরে বলে, দেখুন, ছবি তোলা আমার নেশা। ছবি তুলতেই আমি এসেছি এখানে। ছবি আমি তুলতামই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার ঠিক সময়টিতে আপনি এসে পড়লেন একেবারে ক্যামেরার সামনে।

—হুঁ ! তাই ভয় পেয়ে রিলিজারটা হাত থেকে গেল ছুটে। এ ঘটনাচক্র ছাড়া আর কি ? ঘটনাচক্রের যোগাযোগ না হলে এমন পরিবেশই বা সম্ভব হয় কি করে ? কি বলেন ? মেয়েটি তাকায় পরিমলের দিকে। চোখে শাণিত দৃষ্টি, অবিশ্বাসে ভরা। আগুনের ফুলকি যেন ঠিকরে পড়ছে থেকে থেকে।

চালাক-চতুর ছেলে পরিমল। কিন্তু তবুও সে ঘাবড়ে যায় মেয়েটির বচন-বিন্যাস দেখে। বানানো উত্তর যেন চট করে যোগাতে চায় না মুখে।

মেয়েটি আবার বলে শ্লেষভরে, মিথ্যের বেসাতিরও প্রয়োজন নেই কিছু। সোজা কথায় স্বীকার করে নিন না যে, ওঁৎ পেতেই বসেছিলেন আপনি এতক্ষণ ঠিক এই অবসরটুকুর জন্তে।

চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে পরিমলের। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। দুর্ব্বলতা তার যে না ছিল, তা নয়। দুর্ব্বলতার ঝোঁকেই এ কাজ করে ফেলেছে সে। তাই মেয়েটির সব

স্নোবটুই মেখে নেয় গায়ে। প্রসঙ্গটার ইতি করবার জন্যেই সে বলে, আপনার যা কিছু অভিযোগ, যা কিছু অনুযোগ সবই ত অনুমানের ওপর। সবটা অনুমানের ওপর নির্ভর না করে, প্রত্যক্ষ করেই দেখুন না কেমন ছবি উঠল আপনার। আর আদৌ ছবি উঠল কি না।

কথাটা বোধ হয় মনে ধরে মেয়েটির। অনুমানই ত? সবটাই ত তার অনুমান। অনুমানের ওপর নির্ভর করে অভিযোগ চলে না। তাই কিছুক্ষণ ভাবে সে। তার পর বলে, ভাল কথা। আপনার কথাই না হয় স্বীকার করে নিলাম আমি। কিন্তু জানব কি করে? ছবি উঠল কি না, এ খবর দেবে কে আমায়?

—সে ব্যবস্থা করব আমি। খবরও দেব আমি। জানিয়েও দেব আমি। ঠিক এমনি সময় কাল যদি দয়া করে একবারটি আসেন এখানে, জানতে পাবেন সব, দেখতেও পাবেন সব। তখন মনোমত যদি না হয়, আপনার যত কিছু রাগ, যত কিছু বীতরাগ সব উজাড় করে ঢেলে দেবেন আমার ওপর। একটা কথাও বলব না আমি। কিন্তু দোহাই আপনাকে, আজকের দিনটা অপেক্ষা করুন একটু।

কি ভেবে মেয়েটি হঠাৎ রাজি হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বলে, বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম আমি। কাল আসব আবার। ছবি আনবেন কিন্তু সঙ্গে করে। এক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে দেখে নেয় ক্যামেরাটিকে। তার পর মুখ ফিরিয়ে চলে যায় ধীরে ধীরে। যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই অদৃশ্য হয়ে যায় সাজানো বাগানগুলির পাশ দিয়ে।

পরিমল তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে। একখানা যেন শাণিত তরবারি, ঝলসে গেল তার চোখের ওপর দিয়ে। কেয়ারী-করা গাছগুলির আড়ালে যখন তার সোনার বরণ দেহটি পড়ল ঢাকা, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শান্ত হ'ল সে। তার পর ক্যামেরাটিকে বাক্সবন্দী করে সেইখানেই রইল বসে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে।

স্থান—দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটের পিছন। কাল—সেপ্টেম্বরের বিকাল। পাত্র—পরিমল ঘোষাল। পরিমল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র। চলেছে সিমলা শৈলে কেনেডি হাউসে পাবলিক সার্ভিসে ইণ্টারভিউ দিতে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইণ্টারভিউটা। এখনও দিন পাঁচেক বাকী তার। দিল্লীতে চাকরি করেন মামা। থাকেন 'ডি' কোয়ার্টারে। দিল্লীর আবহাওয়ার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হবার জন্যেই কয়েকদিন আগেই সিমলার পথে পরিমল এসে উঠেছে দিল্লীতে। সঙ্গে এনেছে সদ্য কেনা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা। পেশাদার ফটোগ্রাফার সে নয়। না হউক, ছবি তোলার দিকে ঝোঁক তার যেমনি, ছবি তুলতে ওস্তাদও তেমনি। ছবি তোলার সরঞ্জাম প্রায় ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। সিমলা শৈলে চলেছে সে এই প্রথম। অজানা জায়গায়, অজানা ছবি, শৈলশিখরের ছবি, বড় লোভনীয়। সুতরাং প্রস্তুত হয়েই বেড়িয়েছে সে।

দিল্লী শহর, আধুনিক শহর, সাজানো শহর। এর ধড় আছে, প্রাণ নেই। লোকেরা এখানে অস্থায়ী বাসিন্দা, চাকরীর খাতিরে বাসিন্দা। চাকরীলোভীর দল চাকরীর শেষে ফিরে যায় নিজ নিজ দেশে, তাই ধড় থাকলেও এর প্রাণ নেই। তবুও এই নিষ্প্রাণতার মাঝে এর কেয়ারী-করা সযত্ন-রক্ষিত বাগানগুলি ভাল লাগে পরিমলের। ছুটির দিনে অথবা আপিসের ছুটির পর যখন শহরের কর্ম্মচঞ্চলতা কমে আসে অনেকখানি, আপিস অঞ্চলগুলি পড়ে ঝিমিয়ে, সারাদিনের মুখরতার প্রতিবাদে বাকীদিনের স্তব্ধতা যখন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, তখন বেরিয়ে পড়ে পরিমল তার সঙ্গী ক্যামেরাটি নিয়ে। এক-এক দিন যায় সে এক-এক দিকে। ওকলা হয়ে গেছে, কুতুবমিনারও শেষ। আজ সেক্রেটারিয়েট। সেক্রেটারিয়েটকে ঘিরে চারিদিকে বাগান। ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বাগান টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। ভারী ভাল লাগছিল তার এই সাজানো গোছানো বাগান-গুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। কত রকমের গাছ, কত রকমের ফুল। আদিম বন্যশ্রী অন্তর্হিত হয়ে গেছে তাদের দেহ থেকে। নব-সুন্দরের মতই এদের সাজিয়ে রেখেছে মালীরা সভ্যতার আদব-কায়দায়। তাই এরা আজ অভিবাদন জানায় মাথা নাড়িয়ে, গুড ইভনিং করে। সারা ভারতের রাজধানী দিল্লী। সারা ভারতের অন্নে এরা পুষ্ট। সারা ভারতবাসীকেই এদের অভিনন্দন জানাতে হয়। তাই বাংলা, হিন্দী, উর্দু সব কিছুকে পরিহার করে এরা মাথা দুলিয়ে অভিবাদন জানায়—গুড ইভনিং।

হেসে পরিমলও মাথা দুলিয়ে বলে, গুড ইভনিং। বেশ মানিয়েছে তোমাদের, খাসা মানিয়েছে। এই রকমটিই ত চাই। তার পর সে লেগে যায় আপন কাজে। পরিবেশটি পছন্দ করে সে। সব চাইতে বড় ডালিয়াটিই তার লক্ষ্য। যেন একখানা মিনে করা রেকাবী। ফোকাস ঠিক হয়ে গেছে। রিলিজারে হাত দিল সে। এক, দুই—কিন্তু তিন আর হ'ল না। বাধা পড়ল সেই-খানে। পরিমল তাকিয়ে দেখে তার ডালিয়াকে হার মানিয়ে এগিয়ে আসে আর একটা সদ্য-ফোটা ডালিয়া চঞ্চল একটি প্রজা-পতিকে তাড়া করে। এ যেন শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করণ। আধুনিক দিল্লীর সঙ্গে মিলিয়ে আধুনিক সংস্করণ। সে যুগে সন্ত্রস্তা শকুন্তলা ভ্রমরের আক্রমণে। এ যুগে সন্ত্রস্তা প্রজাপতি শকুন্তলার আক্রমণে। পরিমল মুগ্ধ হয়ে যায়। এ অপূর্ব্ব সুযোগের অপব্যয় হতে দেয় না সে। রেঞ্জ-ফাইণ্ডারটিকে আয়ত্তে আনতে যতক্ষণ। তার পর শব্দ হয় খুট। বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত সেইখান থেকেই।

পর দিন পরিমল আসে। ঠিক সময়টিতে এসে হাজির হয় সে। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে। কিন্তু নির্জ্জন স্থানটির নির্জ্জনতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না। ভাদ্রের শেষের অপরাহ্ণ। সোনালি রোদ কিন্তু ম্লান হয়ে আসে তাড়াতাড়ি। জ্যৈষ্ঠের প্রখরতা নেই এর মধ্যে, আছে স্নিগ্ধতা। হয় ত ভাসা ভাসা মেঘের দল এ তীব্রতা শোষণ করে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে। পরিমল তাকিয়ে থাকে সেই দিকে একদৃষ্টে, যে দিকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে

কাল—সেই দিকেই। হয় ত এখনই আবির্ভাব হবে, তার পথ জুড়েই সে যেন এসে দাঁড়াবে সামনে।

কালকের ডালিয়াটি ফুটে আছে গাছের ওপর ঠিক তেমনি ভাবে। তেমনি ভাবেই স্বাগতম্ জানাচ্ছে সকলকে দুলে দুলে। হয় ত একটু ম্লান গত দিনের চেয়ে, হয় ত একটু নিষ্প্রভ, তবুও আনন্দদায়ক। পরিমলের মনে উঁকি মারে আর একটি ডালিয়া। প্রখর দীপ্তিশালিনী সে ডালিয়া। নয়নানন্দদায়ক কিনা সে জানে না কিন্তু হৃদয়বিদারক। একেবারে মহিষমর্দ্দিনী ভাবলে হৃৎকম্প হয় এখনও। অথচ অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে তারই জন্য।

বেলা বয়ে চলে তবু সে আসে না। আসতে পারে না, পরিমল ভাবে। কালকের ব্যাপার সম্পূর্ণ ঘটনাচক্র। তারই পুনরভিনয় আজ সম্ভবপর নয়। প্রত্যাশা মিলল না বলে এক দিকে কিছুটা যেমন হতাশ হয়, অপর দিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েও বাঁচে সে। মেয়েটি শুধু দুঃসাহসিকা নয়, অসম্ভব তেজী। সে 'রিপুদলবাহিনী নমামিতারিনী।' তার চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলা যায় না। চোখ পিছিয়ে আসে আপনা হতেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে পরিমল। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে অথচ আসার লক্ষণ নেই তার। সুতরাং উঠতে হয় তাকে। উঠবার চেষ্টা করে কিন্তু হয়ে ওঠে না। পিছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে কথা আসে, কই দিন ছবি। আকাশ না বাতাস কি উঠল দেখি?

পরিমল চমকে ওঠে। স্বর থেকেই সে কল্পনা করে নেয় মেয়েটির মূর্ত্তিকে। এ মূর্ত্তির মধ্যে দয়া নেই, মায়া নেই, কোমলতার লেশমাত্র নেই। আদেশের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে, তাকিয়ে দেখে পরিমল। কালকের মতই শ্বেত মূর্ত্তি, সাদাসিধা বেশবাস। কোন রকম চপলতার ইঙ্গিত তার মধ্যে নেই। হাত বাড়িয়ে দেয় পরিমলের দিকে। বলে, 'দেখি, ছবিখানা, কেমন হ'ল?'

ভালই হয়েছে ছবিখানা। মেয়েটি ফুটে উঠেছে ভাল, একেবারে হুবহু। ভঙ্গিমাটি আরও মধুর, মনমুগ্ধকর। ভাল শিল্পী না হলে এমন ছবি ওঠে না। ত্রুটী যেটুকু ছিল, শিল্পীর পরশে শুধরে গেছে তা। পাশে ডালিয়া ফুলটি ফুটে রয়েছে তার অপরূপ শোভা বিস্তার করে। তার পাশে আরও ডালিয়া, ছোট বড়, মাঝারি—এ যেন ডালিয়ার বন। আর তাদেরই মাঝে তাদের রাণী, বনবিহারিণী, অপরূপ মূর্ত্তিময়ী। চকিতে ছবিটিকে আর একবার দেখে নেয় পরিমল। মনের মধ্যে একটা গর্ব্ববোধ করে সে। এমন ছবি পছন্দ হবে না কার? পছন্দ হবে মেয়েটিরও। হয়ত অনুরোধ করবে সে। বলবে অনুরোধ করে—চকিতে পরিমল তুলে দেয় ছবিটিকে মেয়েটির হাতে। আড়চোখে দেখে তাকিয়ে। মেয়েটির মুখের পরিবর্ত্তন হয় না কিছু। একটা হাসির রেখাও ফুটে ওঠে না সেখানে। বরং গম্ভীর হয়ে যায় আরও বেশী। প্রশ্ন করে গম্ভীর ভঙ্গীতে—'এই আপনার আকাশের ছবি, বাতাসের ছবি? খা—সা হয়েছে কিন্তু। তবে আমি জানতাম না—আকাশ-বাতাসেরও আকৃতি আছে মানুষের মত।' ভ্রূকুটি করে, তির্য্যক দৃষ্টিতে তাকায় পরিমলের দিকে।

লাল হয়ে ওঠে পরিমলের সাদা মুখখানা। বলে, আমার দুর্ভাগ্য। ফোকাস যখন করি তখন ছিল না কেউ। তার পরেই এসে গেছেন রেঞ্জের মধ্যে নিশ্চয়ই।

—নিশ্চয়ই এসে গেছেন, নিশ্চয়ই। আপনাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যই এসে গেছেন। এ তার কারসাজি। কিন্তু কারসাজি যখন বুঝলেন, তখন দয়া করে শাটারটা না টিপলেই পারতেন। কি, পারতেন না? চুপ করে কেন, উত্তর দিন?

পরিমল হাঁপিয়ে ওঠে। বলে, সময় ছিল না। নিমেষেই এ কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

—অসাধুর অভাব হয় না ছলের। কোন মিথ্যাই আটকায় না মুখে। তবুও সত্য কথাটা বলতে পারলেন না সাহস করে। মেয়েটি চুপ করে যায়। একটু থেমে বলে আবার, ছবিটি আপনার ভালই হয়েছে বলব। এ ছবি আর আছে আপনার কাছে?

পরিমল ভাবে ফাঁড়া হয়ত কেটে গেল এইখানেই। তাই বলে সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে, 'আছে'—।

—'দিন'। যে ক'খানা আছে দিন আমাকে। এ অনুরোধ নয়, আদেশ। একে অমান্য করবার ক্ষমতা রইল না পরিমলের। আরও তিনখানা কপি এগিয়ে দেয় মেয়েটির দিকে।

—'আর আছে'?

—'না'।

—কিন্তু এতগুলো কেন?

—একখানা আপনার, একখানা আমার। আর দুখানা পাঠাব ভেবেছিলাম আমার দুই আর্টিষ্ট বন্ধুর কাছে। ভারী জাঁচালো হয়েছে ফটোখানা।

—হুঁ। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে মেয়েটি, একখানা আপনার, একখানা আমার, আর দুখানা দু' বন্ধুর। তাদের লিখবেন, দিল্লীতে এসে ফিয়াসে পেয়েছেন। এই তার ফটো। তাই না?

অবাক হয়ে যায় পরিমল মেয়েটির অভিযোগে। মুখে কথা যোগায় না তার। হঠাৎ মেয়েটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে বলে, বলুন, চুপ করে রইলেন কেন?

—কি বলব। নির্জ্জলা মিথ্যে কথার প্রতিবাদ করব কোন ভাষায়। পরিমল মরিয়া হয়ে বলে।

মিথ্যে কথা! মিথ্যেবাদী আমি? মেয়েটির কণ্ঠ তীব্রতর। যুধিষ্ঠির আপনি! এই নিন আপনার ছবি। সরোষে একখানা ছবিকে চার টুকরো করে সে এগিয়ে দেয় পরিমলের দিকে। এই নিন আমার ছবি। এবার ছবিখানাকে করে আট টুকরো। এই নিন আপনার বন্ধুদের ছবি। পার্শেল করে পাঠিয়ে দেবেন তাদের কাছে। কেমন জাঁচালো হয়েছে এ থেকে ভালভাবেই বুঝবে তারা। দেহের সবটুকু জোর দিয়ে ছবি দু'খানাকে কুচি কুচি

করে ফেলে সে। তার পর রক্তচক্ষু তুলে তাকায় পরিমলের দিকে, 'আর আছে ?'

মেয়েটির রাগ দেখে পরিমল অবাক হয়ে যায়। ভয়ও পায়, অপমানও বোধ করে। ধীরে ধীরে 'নেগেটিভখানা' বার করে এগিয়ে দেয়—'এই নিন'। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নেয়। এক বার ছিঁড়তেও যায়। কিন্তু সেলুলয়েডের জিনিস, হাত পিছলে যায়। থেমে পড়ে সে। ছেঁড়া হয় না। বলে, বাধা পড়ল, থাক। রেখে দিন এখানা। কিন্তু খবরদার! ছাপাবেন না বলছি আর একখানাও ছবি এ থেকে।

পরিমল নেয় না। চুপ করে থেকে বলে ধীরে ধীরে, যারা শিল্পী তাদের মন সৌন্দর্য্যলোভী। এই সুন্দরের প্রতি লোভ যদি হয়ে থাকে আমার—যদি চেষ্টা করে থাকি, তাকে লোকচক্ষুর আলোতে আনবার, সেটা কি অন্যায় করেছি খুব? এতখানি সৌন্দর্য্য-ভরা ছবি এ ভাবে নষ্ট করলেন—আপনি, এতটুকু ব্যথা পেলেন না মনে?

মেয়েটি ভড়কে যায় এবার। বলে, এ অন্যায়। একজন অপরিচিত মেয়ের ছবি, তার বিনা অনুমতিতে তোলাটাই অন্যায় হয়েছে আপনার। লোক-অপবাদের ভয় ত আছে?

কথাটা সত্যি। পরিমল অস্বীকার করতে পারে না। তার সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন, সৌন্দর্য্যের জন্য যতখানিই ব্যাকুল হউক না কেন, অন্যায় যা তাকে মেনে নিতেই হবে। তাই সে চুপ করে যায়।

মেয়েটি অনুমান করে নেয় পরিমলের অবস্থাটিকে। বলে, আমার অসৌজন্যতায় আপনি যে ব্যথা পেয়েছেন, এ গোপন নেই আমার কাছে। কিন্তু অন্যায় সইতে পারি না আমি। সই নি কোন দিনই। আপনার অন্যায়েরও প্রতিবাদ করেছি। প্রতিকারও করেছি যথাসম্ভব। মনে হয় এটুকু বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে আপনার।

মেয়েটির কথাগুলি যেন চাবুকের মত এসে পড়ে পরিমলের মুখে। সে আরক্ত মুখখানা তুলে একটু রূঢ়ভাবেই বলে, 'হয়ত হয়েছে। কিন্তু থাক তর্কে লাভ নেই, প্রবৃত্তিও নেই আমার। আপনার উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' পরিমল মুখ ফিরিয়ে নেয়। যাবার জন্যে পাও তোলে সে।

মেয়েটি ডেকে বলে, অন্যায় যখন করেছেন তখন রাগ না করাই উচিত আপনার। আবার যদি দেখা হয় আমাদের ভবিষ্যতে—

পরিমল ঝাঁঝিয়ে ওঠে, না দেখা আমাদের হবে না কিছুতেই। কোন দিনই না, কোন ভবিষ্যতেও না। এই আমাদের শেষ। মেয়েটিকে ফেলে রেখেই সে এগিয়ে যায়। হন্ হন্ করে এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘোরে।

পরদিনই দিল্লী ত্যাগ করে পরিমল। সিমলা-শৈল যে তাকে আকর্ষণ করছিল প্রবল বেগে তা নয়, দিল্লীতে তিষ্ঠিতে পারছিল না সে। ইন্টারভিউ-এর দেরী ছিল আরও একটা দিন, তবুও সে বেরিয়ে পড়ে ছুটে দিল্লী ছেড়ে। অপমানের তীব্র জ্বালা সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার। অনেক ছবি তুলেছে পরিমল এ বয়সে, ছেলের এবং মেয়ের। কিন্তু এমন ছবি তোলে নি কখনও। মীনাক্ষীর মত মেয়ে—যার বাবা সাবজজ, আহুতির মত মেয়ে—যার বাবা ভূতপূর্ব্ব আই, সি, এস, এরাও ঘুরে বেড়ায় তার পিছনে পিছনে, কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে। আর কোথাকার এ মেয়েটি—। পরিমল রাগে ঠোঁট কামড়ায় জোরে।

সিমলার পাহাড়, অনন্ত বিস্তৃত পাহাড়, অরণ্য-শোভিত পাহাড় কিন্তু বড় নীরস, বড় একঘেয়ে লাগে পরিমলের কাছে। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা নিয়ে বেরিয়েছিল সে বাড়ী থেকে। পাহাড়ের ছবি তোলবার সব সরঞ্জামই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ছবি আর তোলে নি পরিমল। সে স্পৃহা, সে আগ্রহ, কোথায় যেন সব মিলিয়ে গেছে তার। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে সেই দৃশ্যটি, মনে পড়ে মেয়েটি চলেছে। চলেছে চুপি চুপি চকিত চরণে প্রজাপতিটিকে অনুসরণ করে। সবুজ ঘাসের ওপর আঁচল পড়েছে লুটিয়ে। মুখে দুষ্টু মেয়ের হাসি। সবুজের ওপর সোনালী মীনে-করা প্রজাপতি, বাতাসে উড়ে চলেছে এঁকে বেঁকে। ধরা সে দেবে না। ব্যাধ—যত রূপসীই হউক না কেন, খর্ব্ব করবে সে তার রূপের গর্ব্ব। তাই ডানা কাঁপিয়ে চলে পাশ কাটিয়ে। ডান দিকে ডালিয়ার দল। আহ্বান জানায় পরিমলকে মাথা নেড়ে নেড়ে দুলে দুলে। রূপের পূজারী পরিমল, বিহ্বল হয়ে পড়ে মুহূর্ত্তেই। তার পর—। তার পর মনে পড়ে ছোট একটু শব্দ 'খুট'।

পরিমল মাথা নেড়ে উঠে বসে। চোখ দুটোকে রগড়ায় বার বার দুহাতের আঙুল দিয়ে। মীনাক্ষী, আহুতি, সব গেছে মিলিয়ে। আছে পড়ে শুধু সেই মেয়েটি। বড় তেজী মেয়ে, বড় রাগী মেয়ে। মুখে আটকায় না কিছু। ক্ষুরধার কথা তার ত্বক্ ভেদ করে বেঁধে মর্ম্মে। হুলের বিষ ছড়িয়ে দেয় দেহে। তবু ভাল লাগে ছবিটি তার। বড় ভাল ছবি, বড় প্রিয় ছবি পরিমলের। সে ছবিও কুচি কুচি হয়ে যায় মেয়েটির হাতে পড়ে। পরিমল তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। আজও সিমলা পাহাড়ের ওপর থেকে সে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে।

ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যায়। কেনেডি হাউসে ইন্টারভিউ। সাজগোজ করে যায় পরিমল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না সে। বোঝে, এ চাকরী হ'ল না এবার। কমিশনের মেম্বারদের খুশী করতে পারে নি সে উত্তরে। কিন্তু তার জন্যেও দুঃখ হয় না পরিমলের। চাকরি তার হবেই একদিন, কিন্তু অমন সুন্দর ছবিটা আর ফিরে পাবে না জীবনে।

সিমলায় শৈলবাসের মেয়াদ কমিয়ে আনে পরিমল। কমিয়ে আনে ইচ্ছা করেই। ভাল লাগে না, এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে

বেড়ানো, ভাল লাগে না, এ যেন নির্জ্জন কারাবাস। পরিমল নেমে আসে পাহাড় থেকে তল্পীতল্পা বেঁধে, সেদিন দুপুরেই।

আবার দিল্লী।

দিল্লী যেন তাকে টেনে আনে চুম্বকের আকর্ষণে। এ কিসের আকর্ষণ সে জানে না। কেন এ আকর্ষণ জানে না তাও। তবে এ আকর্ষণকে প্রতিরোধ করতে পারে না সে, তাই আসে ছুটে।

দিল্লী দেখা শেষ হয় নি পরিমলের। দেখার অনেক কিছুই বাকী এখনও। ডালিয়ার বাগানে আর যায় নি বটে তবে সেদিন গিয়ে হাজির হ'ল দিল্লী ফোর্টে। দিল্লী ফোর্ট ঐতিহাসিক ফোর্ট। মোগল সাম্রাজ্যের অতুল কীর্ত্তি। কত ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ প্রাসাদ, কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে। কত পুঞ্জীভূত ব্যথা জমে আছে এর খাঁজে খাঁজে, কত রহস্য এর চেতনায়; কত বাদশাহ-জাদীদের অঙ্গের সৌরভ, কত সাহাজাদীদের বিলাসের হিল্লোল। কিঙ্করীদের নূপুর-নিক্কণ ঘিরে রয়েছে এর বায়ুস্তরটিকে। মনে হয় এই বুঝি ছিলেন বাদশাহ রত্নসিংহাসনে, এই বুঝি গেলেন চলে মন্ত্রণাকক্ষে, ফিরবেন এখুনি। তাই সভাসদেরা তটস্থ, চারিদিক নিস্তব্ধ। হয়ত কি এক ষড়যন্ত্র পড়েছে ধরা বাদশাহের বিরুদ্ধে তাই এ মন্ত্রণা। অথবা সুবেদার এসেছে ঘোড়া ছুটিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে, সঙ্গে বয়ে এনেছে কি এক দুঃসংবাদ। সকলেই ম্রিয়মান। আজ প্রাসাদের সে ঐশ্বর্য্য নাই, সৌন্দর্য্য পলাতক। একদিন মোগলেরা ঢুকেছিল এ প্রাসাদে বীরদর্পে। সেদিন নহবত উঠেছিল বেজে, কোলাহলে ভরা ছিল চারিদিক। সেদিন যৌবনের প্রতাপ ছিল দুর্দ্দান্ত। কিন্তু আজ? আজ সব গেছে শূন্যে মিলিয়ে। বার্দ্ধক্যে তার জরাভার দেহটিকে ফেলে রেখে আত্মা চলে গেছে অসীম বিশ্বে। আজ সে বীরদর্প নেই, সে যৌবন নেই। আজ মোগলদের এ দুর্গ থেকে নিষ্ক্রমণ। তাই সব নীরব, নিথর।

পরিমল তাকিয়ে দেখে চারিদিক অবাক-বিস্ময়ে। পাশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে ওপরে। সামনেই সুপ্রশস্ত হল-ঘর। ছোট-খাটো একটা মিউজিয়াম। এখানে শুধু মোগল নিদর্শনই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। আছে রাজপুত, আছে পাঠান, আছে মোগলেরও অনেক জিনিস। কত অস্ত্র, কত শস্ত্র থরে থরে সাজান চারিদিকে। এদের ঐতিহ্য আছে, আভিজাত্য আছে, মান আছে, মর্য্যাদা আছে। পরিমল দেখে ঘুরে ঘুরে; ইতিহাসের পাতার মধ্যে কখন যে সে হারিয়ে যায়, জানতে পারে না। যখন হুস হয় দেখে মানবকের ছোট্ট একটি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ফুলের মত ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ ঘরের চারিদিকে। ঘিরে ফেলেছে তাকে বেষ্টনী দিয়ে। তাদেরই কলরবে নির্জীব ইতিহাস সজীব হয়ে উঠেছে মুহূর্ত্তের জন্যে। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে পরিমল। চমক লাগে তার। পরিচিত কণ্ঠস্বর তাকেই সম্বোধন করে, "কি? দেখা যে হবে না আমাদের আর? কোন দিনই না, কোন ভবিষ্যতেও না। তবে? হ'ল কি করে?"

পরিমল ফিরে তাকায়। দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি, হাসছে টিপে টিপে। আজ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি নয়। আজ বিজয়িনী মূর্ত্তি, স্মিতশুভ্র মূর্ত্তি। মুখে চোখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে পরিমলের। মেয়েটি হাসিমুখে আবার বলে, আমি জানি, যত রাগই করুন, দেখা না দিয়ে পারবেন না আপনি।'

এ আবার আর এক রকম অভিযোগ। এ ঝগড়া নয় কিন্তু ইঙ্গিত। পরিমল বিরক্ত হয়ে বলে, আমি হাত গুণতে জানি। তাই এসেছি এখানে আপনার পিছু পিছু।

রাগ দেখে মেয়েটি আমোদ বোধ করে। বলে, এ আপনার রাগের কথা। অতোখানি আমি বলি নি। আমি বলি দেখা আমাদের হবেই যখন বাস করি এক শহরে। বেড়াতে বেরিয়ে চোখ দুটো ত ফেলে আসতে পারি না বাড়ীতে। আর চোখা-চোখি হলেও পারি না মুখ ফেরাতে। কিন্তু এ ক'দিন ছিলেন কোথায়? বাগানের দিকে গিয়েছিলাম দুদিন, কিন্তু দেখা পাই নি। অবশ্য খোঁজ করেও দেখি নি ভাল করে। পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলাম শুধু।

—ছিলাম না দিল্লীতে।

—ওঃ তাই। কিন্তু গিয়েছিলেন কোথায়?

—সিমলে।

সিমলের পাহাড়? ভারী মজা ত! ছবি তুলতে নিশ্চয়ই? তুললেন ছবি? কই দেখি। মেয়েটি হাত পাতে। ছবি যেন পরিমলের পকেটে পকেটেই ঘোরে সব সময়।

—না। ইণ্টারভিউয়ে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে।

নিজের গুরুত্ব দেখাবার জন্যে পরিমল বলে গম্ভীর ভাবে।

—চাকরীর জন্যে? তাই বলুন। তরল ভঙ্গীতে মেয়েটি বলে ওঠে।

কেমন হ'ল?

ভাল না।

—জানি। ভাল হবে না। এ জানা কথা। হলেই আশ্চর্য্য হতাম।

মানে?

—যারা শিল্পী তাদের মন সৌন্দর্য্যলোভী। সৌন্দর্য্যলোভী মন আর পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইণ্টারভিউ এক জিনিস নয়। এদের মধ্যে মিল নেই। সৌন্দর্য্য খুঁজে বেড়াবেন, না ইণ্টারভিউ দিতে যাবেন? এ আপনার কাজ নয়। এ সব চেষ্টা করবেন না আর। বরং ছবি তোলা সোজা, সেই কাজ করুন।

রাগে পরিমলের মুখ জ্বলে উঠে। কিন্তু বাইরে উদ্গীরণ হতে দেয় না। শ্লেষভরে বলে, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার উপদেশের জন্যে। উপস্থিত নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই। চললাম এখন।

মেয়েটি সামনে এগিয়ে আসে। বলে, বাঃরে। চললাম বললেই ছাড়ব নাকি আপনাকে। দেখা যদি না হ'ত সে কথা আলাদা। যখন হয়েছে তখন ছাড়ছি না সহজে। এতগুলো ছেলেমেয়ে, আমি সামলাব কি করে একা?

এতক্ষণ ঠোকরই খেয়ে এসেছে পরিমল মেয়েটির কাছ থেকে। এবার দেবার সুযোগ ঘটে।

ঠোকর দিয়ে বলে, এতগুলি? সব আপনার? তাজ্জব ব্যাপার। চকিতে মেয়েটি লাল হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয় হ্যাঁ, আমারই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সব। কোর্ট দেখতে এসেছে আজ।

ওঃ স্কুল! একটা তাচ্ছিল্য পরিমলের কণ্ঠস্বরে। যেন বলতে চায় সংক্ষেপে স্কুলের মাষ্টারণী আপনি? তবে এত দেমাক কেন? কিন্তু প্রকাশ্যে বলে, অবজ্ঞাভরেই বলে, যদি সামলাতেই না পারবেন তবে বেঁধে এনেছেন কেন এতগুলোকে? আপনার মত আরও দু'একজন টিচারকে সঙ্গে নিলেই পারতেন।

খোঁচাটিকে হজম করে নেয় মেয়েটি। বলে, ছেলেমানুষের দল, একসঙ্গে না দেখলে আনন্দ পায় না। নূতন চোখ সব। হাঁ করে দেখবে ত ওরাই। আমাদের চোখ পুরোন হয়ে গিয়েছে। তাই আর আনন্দ পাই না এ সব দেখে।

শুনে পরিমল হাসে মনে মনে। তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণীর চোখ, এরই মধ্যে অরুচি ধরে গিয়েছে সব কিছুতেই।

বলে, কিন্তু এ যে মহা ঝামেলা।

—ঝামেলাই ত, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে আমি যদি সইতে পারি এ ঝামেলা, পুরুষ হয়ে পারবেন না আপনি?

পরিমল অপ্রস্তুত হয়। অপ্রতিভ মুখে বলে, কি করতে হবে আমায়।

পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে এদের। যেন দলচ্যুত না হয়ে পড়ে কেউ। সোজা কথায়, এদের সঙ্গে একটু ঘুরে বেড়ান আর ছেলেমানুষী উপদ্রব সহ্য করা।

—শুধু এই। বেশ আমি রাজি, আপনার এ প্রস্তাবে।

মেয়েটি খুশী হয়। বলে, এ আমি জানতাম। আসুন আমার সঙ্গে। পাশাপাশি চলতে থাকে দুজনে। চলতে চলতে মেয়েটি গল্প করে যায় অনর্গল ভাবে। সঙ্কোচ নেই এতটুকু। সোজা সরল ব্যবহার। এ রাজপুরীর সবকিছু যেন তার নখদর্পণে। কোথায় দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস। মোতি মসজিদের অবস্থিতি কোনখানে এ সমস্ত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায় মেয়েটি। মনে হয় সে যেন একজন পাকা 'গাইড' পরিমলকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সব। রহস্যভরা প্রাসাদ। এর কোনখানে কত কি রহস্য ঘটে গিয়েছে, কত শত বছর আগে, এখন সে সব আছে ঘুমিয়ে। তাদের সকলকে জাগিয়ে তোলে সে ঘুম থেকে একে একে। কত বাদসাহজাদীর হতাশ প্রেমের গল্প, কত অপরূপ শাহজাদীর বিচিত্র জীবন-কাহিনী সে শোনায় পরিমলকে। গল্প ফুরোতে চায় না। এ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প এক সঙ্গে গাঁথা একটার পর একটা। হতাশ প্রেমে-ভরা হারেম, হতাশ প্রেমে-ভরা বেগমমহল। এ মহল চক্রব্যূহ। ঢুকেছেন কত ধুরন্ধর সেনাপতি এ মহলে, কিন্তু পথ পান নি খুঁজে, বেরুবার। তাই নশ্বর দেহটিকে বন্দী করে রেখে গিয়েছেন এখানে আজীবন। কত ওমরাহের ছেলে, সুপুরুষ ছেলে এসেছেন প্রেয়সীর আহ্বানে অন্দরের দেউড়ী পেরিয়ে। কিন্তু লৌহকবাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে চিরতরে। খোলে নি এ কবাট তার মর-জীবনে। শ্বাসরুদ্ধ, নীরব হয়ে গেছে চিরদিনের তরে, প্রেমিকারই পাশে। গুপ্ত প্রেমের মত গুপ্ত বিষের ছড়াছড়ি এ হারেমে। কত নিষ্পাপ দেহ মুহূর্তেই হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। কত কূটনৈতিক চাল হারেমেও করে ঘোরাফেরা। সুন্দরী হারেম, কিন্তু পঙ্কিলতায় ভরা। ঘোলাটে তার আকাশ, ঘোলাটে বাতাস। এ অশুচিতার সংস্পর্শে এসে ঘোলাটে হয়ে ওঠে ফুলের মত নির্মল অন্তরগুলিও। সুন্দরীদের বোড়ের চালে ঘায়েল হবেন যে কোন বাদশাহ, কোন শাহজাদার পথ যে হবে নিষ্কণ্টক, এ বোঝা দায়। একটি আস্ত গোলক ধাঁধা। স্বর্গ এবং নরকের সঙ্গমস্থল। গল্পের রস গাঢ় হয়ে ওঠে, দানা বাঁধবার উপক্রম করে কিন্তু ছেদ ফেলে দেয় মেয়েটি নিজেই।

চকিত হয়ে উঠে বলে কই দেখছেন না ত কিছুই। গল্প করেই বেড়ালেন শুধু সারাদিন।

পরিমল হাসে। বলে, দেখার চেয়ে শোনার মাধুর্য্য অনেক। দিল্লী কোর্ট আবারও দেখতে পাব ইচ্ছে করলেই। কিন্তু এমন গল্প শুনতে পাব না তখন। তা ছাড়া, চোখও আমাদের হয়ে গেছে পুরোন। এ সবে আনন্দ পাব না আর। শেষের কথাগুলি মেয়েটির। তাকেই ফিরিয়ে দিল পরিমল।

বটে! বটে! মেয়েটি মুখ টিপে হেসে অপাঙ্গে তাকায় পরিমলের দিকে। ভারী মিষ্টি হাসিটি। মনোহারিণী এ ভঙ্গিমা। বলে কিন্তু আর নয়। আজ এই পর্য্যন্ত। বেলা পড়ে এল।

সত্যিই বেলা পড়ে আসে। এতখানি বেলা এরই মধ্যে যে কি করে কেটে যায়—পরিমল ভেবে পায় না। অথচ সূর্য্যঠাকুর মাথার ওপর হেলে পড়েছেন একপাশে। পরিমলের মনে হয়, এ বাড়াবাড়ি। সূর্য্যঠাকুর বাড়াবাড়ি করেছেন আজ। দিনের কাজ শেষ করে ফেলেছেন তাড়াতাড়ি। এ অবিচার, ঘোরতর অবিচার।

মুখে বলে, তা আসুক। এতক্ষণ একটানা ঘুরে বেড়ান হয়েছে। দু' মিনিট পা দুটোকে বিশ্রাম দেওয়া ভাল। ছেলে-মেয়ের দল—ওদের উৎসাহ অসীম। তবুও কিছুটা বিশ্রাম করে নিক ওরা। সে ব্যবস্থা করছি আমি। এইখানে বসি আসুন।

ছায়া-সুশীতল জায়গাটি, শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়া। পাশাপাশি বসে তারা, যমুনার দিকে মুখোমুখি। স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে যায় একের পর অপরের দেহের ওপর দিয়ে। শরীর জুড়িয়ে যায়।

ফুটে-ওঠা ঘামের বিন্দুগুলি অদৃশ্য হতে থাকে একে একে। ছেলে-মেয়ের দলও অদূরে বসে পড়েছে চক্রাকারে। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে পরিমলকে প্রশ্ন করে মেয়েটি, দিল্লীর স্মৃতি কোনটিকে বয়ে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে বলুন ত?

পরিমল তাকায়। মুখে বেধে যায়, তবুও বলে, এর আকাশের বাতাসের ছবিটিকে। মেয়েটি হেসে ওঠে। তার পরই গম্ভীর হয়ে যায়। বলে অনেক কথাই সেদিন বলেছিলাম আপনাকে। দেখছি ভুলতে পারেন নি সেগুলি। পরিমল লজ্জা পায়। উত্তর দেয়, শুধু কথা দিয়েই দিনকালের মূল্য নয়। পরিবেশেরও মূল্য আছে। সে পরিবেশটিকে আমি ভুলব না কোনদিন। মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অন্যমনস্ক হয়ে যায় পরিমলও। শেষ হয়ে আসে মনোরম দিনটির পরমায়ু। শেষ হয়ে আসে দিল্লী ফোর্ট বেড়ানর আয়ু। পরিমল এগিয়ে আসে গেটের বাইরে মেয়েটির পাশে পাশে। বাসে তুলে দেয় সকলকে একে একে। রিজার্ভকরা বাস, দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। মুখ বাড়িয়ে পরিমলকে বলে মেয়েটি, বাসে জায়গা খালি পড়ে আছে। এলেই পারতেন, একসঙ্গে যেতাম আনন্দে। কাশ্মীরী গেট থেকে না হয় হেঁটেই যেতেন বাকী পথটুকু।

পরিমল হেসে বলে, থাক, একদিনে সবটা নয়। কিছুটা রেখে দিলাম ভবিষ্যতের জন্যে। সেদিন প্রত্যাখ্যান করব না আপনার আহ্বানকে। মামাবাবু কাজের ভার দিয়েছেন একটা। না সেরে গেলে লজ্জা পাব।

বাস ছেড়ে দেয়। মেয়েটি রুমাল নাড়ে। ছেলে-মেয়েগুলি নাড়ে তাদের কচি কচি হাত। এইটুকু সময়ের মধ্যে পরিমল ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে। এই খুদে দলটিকে ভালবেসে ফেলেছিল সেও।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। পরিমল বাড়ী ফেরে। মামীমা বসেছিল তারই জন্যে ওৎ পেতে। বলল চা নিতে এসে—যূথিকার সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে তোমার?

পরিমল আকাশ থেকে পড়ে। বলে, যূথিকা!

—হ্যাঁ গো যূথিকা। স্যার কে. কে-র মেয়ে।

—স্যার কে. কে, বা কে, কা. কাউকে ত আমি চিনতে পারছি না, মামীমা।

—তুমি চিনবে কি করে? দিল্লীতে স্যার কে. কে-কে চেনে না এমন লোক নেই। মিনিষ্টারের ডান হাত। তাঁরই কাছে কাজ করেন তোমার মামাবাবু। কে. কে-র মেয়ে যূথিকা। আজ বিকেলে দিল্লী ফোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা কইছিলে তুমি।

পরিমল ভ্রূকুটি করে। বলে—সে ত একজন স্কুল মাষ্টারণী?

—ওমা স্কুলমাষ্টারণী কি গো। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। স্যার কে. কে-র মেয়ে যূথিকা, তারই সঙ্গে তুমি গল্প করছিলে দাঁড়িয়ে। লুকোচ্ছ কেন বাপু? তোমার মামাবাবু দেখেছেন নিজের চোখে। বল না কি করে ভাব হ'ল তোমাদের?

মামীমা পরিমলেরই সমবয়সী। তাই মনটা এখনও কাঁচা। তিন ছেলে-মেয়ের মা হলেও রোমান্সের স্বপ্ন এখনও ভেসে ওঠে চোখে। টিকোল নাকে গন্ধ টের পান।

পরিমল অবাক হয়ে যায়। স্যার কে. কে-কে চেনে না সে। মামীর কথা শুনে মনে হয় জাঁদরেল অফিসার। মিনিষ্টারের ডান হাত। তারই মেয়ে সেই মেয়েটি। নাম যূথিকা। ভুল দেখেন নি ত মামাবাবু? মেয়েটি নিজের মুখেই ত স্বীকার করেছে তার স্কুলের ছেলে-মেয়েরা ফোর্ট দেখতে এসেছে আজ দলবল বেঁধে। নাঃ ভুল হয়েছে কোথাও। মেয়েটি যূথিকা হতে পারে কিন্তু স্যার কে. কে-র মেয়ে যূথিকা এ নিশ্চয়ই নয়। মামীকে বলে, জানি না মামী তোমাদের মস্ত বড় অফিসার স্যার কে. কে-কে আর তার মেয়ে যূথিকা কে। তবে ঐ যদি স্যার কে, কের মেয়ের নমুনা হয়—মামী বাধা দেয়, "নমুনা কেন, ঐ ত স্যার কে. কে-র মেয়ে।

—মেয়েটি বড় ঝাঁঝাল। রুদ্ররস এবং তিক্তরসে মেশান। একটু ঢোঁক গিলে পরিমল বলে, আলাপ হ'ল ফোর্টে, সঙ্গে এক পাদা ছেলে-মেয়ে। বলে তারই স্কুলের ছেলে-মেয়ে। তোমাদের বড় অফিসারের মেয়েটি কি স্কুল মাষ্টারণী মামী?

—স্কুল মাষ্টারণী? তা কেন? স্কুল করেছে বাড়ীতে সখ করে, হয় ত স্কুলেরই ছেলে-মেয়ে সব।

—হবেও বা তা। বড়লোকী সখ, ও সব বুঝি না আমরা। দেখলাম ইতিহাসের উপর ঝোঁক খুব বেশী। মোগল বাদশাহজাদা-জাদীদের ইতিহাস মুখে মুখে। ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলাপ। মাত্র এক ঘণ্টার পরিচয় আমাদের।

মামী নিরাশ হয়। রোমান্সের গন্ধ যায় উপে, স্বপ্ন মিলিয়ে যায় চোখের উপর থেকে। সখেদে বলে, বড় ভাল মেয়ে যূথিকা, কিন্তু ভাগ্য বড় খারাপ তার। পরিমল উৎকর্ণ হয়ে উঠে, এই খেদোক্তির অন্তরালে কি এক ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে তা বুঝতে পারে না। মেয়েরা যখন গম্ভীরমুখে নিশ্বাস ফেলে আর একটি মেয়ের সম্বন্ধে, তখন বুঝতে হবে দীর্ঘ ইতিহাস লুকান আছে এর পেছনে। মামীও একজন নাতি-বৃহৎ অফিসারের মেয়ে। দিল্লীতে কেটেছে তার বাল্য, যৌবনও কাটতে চলেছে দিল্লীতে। দিল্লীর গোপন মহলের অনেক তথ্যই ঝুলিতে ভরা আছে তার। তাই বিচলিত হয়ে ওঠে পরিমল এ মেয়েটির গোপন ইতিহাসের বেদনায়।

একটু চুপ করে থেকে মামী খুলে বসে তার ঝুলিটিকে। পরিমলকে শোনায় যূথিকার কাহিনী। বলে, দিল্লীতে যারা আছে কিছুদিন, তাদের কাছে এ ইতিহাস একেবারে অজানা নয়। স্যার কে. কে-র খ্যাতি যেমন বিরাট, তার পরিবারটি তেমনি ছোট। ইংরেজ আমলের সিভিলিয়ান, বড় পাকা লোক। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েটি যূথিকা, সংসারের মধ্যমণি। বরাবর পড়ে

এসেছে মিশনারী স্কুলে। আই-এ পাশ করলে প্রথম হয়ে মেয়েদের মধ্যে। বি-এতে অনার্স ও পেল ভাল। দিল্লীতে সুনাম পড়ল ছড়িয়ে। ফুলের মত মেয়ে, পাখীর মত গান গায়। দিল্লীর সমাজে যূথিকার আদর ও কদর খুব। মেয়েটিও ভাল। আচার আছে, অনাচার নেই। মা জেদ ধরেন মেয়ের বিবাহ দেবার। বর জোটে ত ঘর জোটে না। ঘর জোটে ত বর জোটে না। হতাশ হয়ে পড়েন স্যার কে. কে.। হতাশ হয়ে পড়েন লেডি কে. কে.। মেয়ের পাত্র বুঝি পাওয়া যায় না। আইবুড় বুঝি থেকে গেল মেয়ে। শেষে একদিন হাসি ফুটল সকলের মুখে। হাসলেন স্যার কে, কে.। হাসলেন লেডি কে, কে,। বর জুটল মেয়ের।

সেবার স্যার কে, কে. হলেন অসুস্থ। বছরের শেষ অথচ বাজেটের সময়, কাজের অন্ত নেই। শুয়ে শুয়েই অফিস করেন কে, কে. বাড়ীতেই। কাগজপত্র নিয়ে আসে তাঁরই সহকারী ব্যানার্জী। তরুণ সুদর্শন ছেলেটি। পরীক্ষা দিয়ে চাকরীতে বহাল হয়েছে নূতন। একেবারে অফিসারের চাকরী। এরই মধ্যে সুনজরে পড়ে গেছে কে. কে-র। যত কাজ করে দেয় সে-ই। বিরাম নেই বাড়ীতেও। বলে, শুধু পথটুকু বলে দিন আপনি, তার পর যা করবার করে দেব আমি। বাড়ীতে সাহায্য করে যূথিকা বাপের হয়ে। যে ফাইলটার প্রয়োজন, এগিয়ে দেয় হাতের কাছে। ছেলেটির হাসি মুখের ধন্যবাদে খুশীতে ভরে ওঠে মন।

স্যার কে, কে সেরে ওঠেন। কিন্তু সারে না যূথিকা। অসুস্থ হয়ে ওঠে সে, তবে দেহে নয়, মনে। শেষে একদিন ভরা-মন ধরা দিয়ে ছেলেটির কাছে সুস্থ হয় যূথিকা। শুনে ঘাড় নাড়েন কে. কে.। এ অসম্মতির ঘাড় নাড়া নয়, সম্মতির। বলেন, মেয়ে যদি সুখী হয়, আমি বাধা দেব না। বিফল হয়েছে আমাদের চেষ্টা। মেয়ের চেষ্টা সফল হলে আনন্দের কথা।

শেষ পর্যন্ত আনন্দেরই হয়ে ওঠে কথাটা। যূথিকার সঙ্গে সমীরের বিয়ে হয়ে যায় মহা ধুমধামে।

সুখী দম্পতি। একটার পর আর একটা বছর গেল কেটে। সেবার পিক্‌নিকে যাবার ব্যবস্থা করল যূথিকা কুতুবের দিকে। নূতন ক্যামেরা কিনেছে সমীর, দামী ক্যামেরা। প্রথম ছবি উঠবে যূথিকার। সমীর ফিল্ম কিনতে ছোটে কনট সার্কাসে। ঘরের গাড়ীখানা ছিল অন্য কাজে ব্যস্ত। সবুর সইল না তার। সে ছুটল সাইকেলে লুকিয়ে, পাছে বাধা দেয় যূথিকা, তার পর—তার পর যা ললাট-লিখন তাই ঘটে।

বেলা বেড়ে ওঠে। যূথিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চঞ্চল চরণে ঘর বার করে ঘন ঘন। অমঙ্গল আশঙ্কায় ছোট্ট বুকখানি ভরে ওঠে তার। পিক্‌নিকের আয়োজন সব থাকে পড়ে। খাবার গেল শুকিয়ে। বাসি ফুলের মত তার সজ্জা হয়ে এল ম্লান। চোখ ভরে গেল জলে। এমন সময় খবর এল। একেবারে চরম খবর। সমীর এ্যাক্‌সিডেণ্ট করে পড়ে আছে দিল্লীর হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায়। লরী এ্যাক্‌সিডেণ্ট, গুরুতর এ্যাক্‌সিডেণ্ট, ফেরবার-পথে সাইকেলে লরীতে লেগেছিল ধাক্কা। তাইতেই এই কাণ্ড।

অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু সব শেষ তিন দিনেই। অচৈতন্য সমীরের চেতনা আর এল না ফিরে। তাকিয়েও দেখল না একবার তার প্রিয় সঙ্গিনী যূথিকাকে। মানুষের যা সাধ্য, মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সমস্তই করলেন স্যার কে, কে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার দিল্লীর দরবার ব্যস্ত, সশঙ্কিত, সে প্রতাপের কণামাত্রও পৌঁছল না যমরাজের দ্বারে। তিনি তাঁর কাজ শেষ করে বসে রইলেন স্থির হয়ে।

আঘাত পেল যূথিকা। বড় নিদারুণ আঘাত। দুলালী মেয়ে এ আঘাত পারলো না সইতে। বড় ভালবেসেছিল সমীরকে সে। এত ভাল বুঝি বাসে নি কেউ। স্বামীর বিপদের দিনে সে যেমন ছিল অচঞ্চল, মৃত্যুতে তেমনি পড়ল ভেঙে। ঘুণ ধরেছিল ভিতে, হুড়মুড় করে পড়ল ধ্বসে। মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হ'ল যূথিকা। এ মূর্চ্ছা বড় বেদনাদায়ক, বড় যাতনাময়। যেন পাঁজরের সব হাড়গুলি চূর্ণ হয়ে যায় তার। জামাইয়ের পর মেয়েকে নিয়ে পড়েন বাপ: মূর্চ্ছা থামে না। ঘন ঘন মূর্চ্ছা। বুকের মধ্যে এক যন্ত্রণা অনুভব করবার পরই সুরু হয় এ বেদনাদায়ক মূর্চ্ছা। ডাক্তারদের চেষ্টায় রোগের উপশম হয় বটে কিছুটা কিন্তু রোগিণী হয় না একেবারে নীরোগ। মূর্চ্ছা এখনও হয় তার, তবে তেমন ঘন ঘন নয়। বুকের দোষ দাঁড়িয়েছে এই বয়সেই। ডাক্তাররা বলেন, এ মানসিক আঘাত। এর ওষুধ নেই তাদের শাস্ত্রে। সময়ই এর প্রতিষেধক একমাত্র। কিন্তু রোগিণীর পরমায়ু ততদিন পর্যন্ত দেহটিকে আশ্রয় করে থাকবে কিনা এ সম্বন্ধে তারাও সন্দিহান। এই মানসিক আঘাতে আর একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে যূথিকার। মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে সে। মস্তিষ্কের সুস্থতাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে সজাগ বড় বেশী, সতর্ক খুব বেশী। এ সতর্কতা তার নিজের ছবি সম্বন্ধে। সেই দুর্ঘটনার পর সে যেন হয়ে গেছে কেমন। নিজের ছবি সে তোলায় নি কোনদিন। এমনকি ক্যামেরার সামনে এসেও দাঁড়ায় নি কোনদিন। কেউ যদি তোলে, ভুলবশতঃ তুলে ফেলে তার ছবি, ক্ষমা নেই তার। একেবারে মারমুখী হয়ে ওঠে যূথিকা। এ যেন রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। তখন চেনা যায় না মেয়েকে। যতক্ষণ না নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলবে ছবিটি, ততক্ষণ শান্তি পাবে না সে, শান্তি দেবে না কাকেও।

মেয়েকে নিয়ে বড় মুষড়ে পড়েছেন স্যার কে. কে.। এমন গুণবতী মেয়ে জোটে না সকলের ভাগ্যে। কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুরা, জুটেও তার ভাগ্যে পড়ল ফাঁকি। মেয়ের সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে সকল রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি। কিসে সে ভুলে থাকে, শান্তি পায়, সুখী হয় এই তাঁর একমাত্র চেষ্টা। মেয়ের সখ হয়েছে স্কুলের। তাই স্কুল বসিয়ে দিয়েছেন তিনি বাড়ীতে। ছেলেমেয়েও যোগাড় করে দিয়েছেন অনেকগুলি। যদি ভুলে

বোগোস্লোফ আইল্যাণ্ডের ধারে বড় বড় শীল মাছেরা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

ত্রয়ী সম্মেলন

[illegible]

'জামিয়া মিলিয়া রুরাল ইনষ্টিটিউট'এর ছাত্রগণ 'হাতে কলমে' কাজ করিবার জন্য মাঠে যাইতেছে

ছোট ছোট মেয়েরা দিল্লীর স্কুলে খেলার মাধ্যমে 'ডিসিপ্লিন' শিক্ষা করিতেছে

থাকে জীবনটাকে এদের নিয়ে। যূথিকা সেইটাকেই বলে তার স্কুল, ছেলে-মেয়েগুলিকে বলে তার ছাত্রছাত্রী।

যূথিকার ইতিহাস এইখানেই শেষ করে মামী। পরিমলকে উদ্দেশ্য করে বলে, এ সব মেয়ে আগুনের হল্কা। এদের সঙ্গে পরিচয় যত কম হয় ততই ভাল, এদের সান্নিধ্যে যত না আসা যায় ততই মঙ্গল। নইলে ঝলসে দেবে দেহমন দুটোকেই।

এ যেন কথাচ্ছলে উপদেশ দেওয়া ভাগ্নেকে। মামীকে কোন কথা ভাঙে না পরিমল। শুধু মাথা হেঁট করে থাকে লজ্জায়।

দ্বিতীয় আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে পরিমলের। এখন শুধু ট্রেনে উঠতে বিলম্ব যা। আকাশ-বাতাসের ছবির স্মৃতি আজ মুছে গেছে তার মন থেকে। আজ সারা মন জুড়ে রয়েছে শুধু একখানি ছবি—এক দরদী প্রিয়ার ছবি আর তার অশান্ত আত্মার ছবি, প্রেমের দেউলে যে আত্মা আজও অতৃপ্ত, আজও যাকে ঘিরে আছে জেগে অতীতের শত ভালবাসার কাহিনী, সাহাজাদা-সাহাজাদীদের ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস।

আকন্দ

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

মালঞ্চ-বিতানে যবে জাগে সমারোহ,
রূপ-গন্ধ-বর্ণের-মাতন,
কে তুমি একাকী,
অনাদৃত ম্লানমুখ শূন্য শুষ্ক নিঃস্বতার মর্ম্মবেদনায়
বসন্তের সভা হতে উঠে এলে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ, অবমাননায়,
মত্ত সভাসদ্-পুষ্প দিল তোমা' বিদ্রূপের লজ্জা অকারণ,
হে রিক্ত বৈরাগী,
কোন্ কৃচ্ছ্র-সাধনায় মগ্ন হলে সেই হতে কোন্ কাম্য লাগি ?

ত্যজি সর্ব্ব লোকালয় অঙ্গন-প্রাঙ্গণ
বসিলে কি শ্মশানের স্তূপে
চিতাভস্ম 'পরে ;
সর্ব্ব লোভ খেদ-ক্ষোভ-ক্ষয়-ক্ষতি-সমষ্টির-ব্যষ্টির-বিচার
দিলে তুলি' মায়ামরু-মৃত্তিকার যত গ্লানি-দুর্নিয়মভার
ঈশানের পদ-প্রান্তে, নিষ্কাম সে কামনার-রন্ধ্রে চুপে চুপে,
পুণ্য-অবসরে
মৃত্যুনীল-হলাহলে সুধা-বৃন্তে প্রস্ফুটিলে জন্মের-অন্তরে ?

শুদ্ধ তব তপশ্চর্য্যা হয়নি বিফল ;
ত্রিকালের কাল-বিম্বতলে
দোলে রাত্রিদিন।
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে তার করি নিল কণ্ঠহার সানন্দ কৌতুকে
অর্চ্চনায় উপচার হলে তুমি চম্পকের কৌলিন্য-সম্মুখে
ভিক্ষুকের দৈন্য যথা বৈরাগ্যের পীত পাণ্ডু গৈরিক-অঞ্চলে
মালিন্য-বিহীন,
তুমি সেই আজিকের দৃঢ় ঋজু দৃপ্তোচ্ছ্বাস,—সমস্যা-সঙ্গীন।

সঞ্চিত মজ্জায় তব গূঢ় গাঢ় রস
দগ্ধ-শুভ্র সফেদ নিষ্ফল
তীব্র জ্বালাময়।
পিপাসায় আর্ত্ত জিহ্বা শুষ্ক দগ্ধ মৃত-প্রায় বিশীর্ণ মলিন
ধরে আশা তৃষা-সুখ,—দাবদাহ-নির্ব্বাণের ঈপ্সা অন্তরীণ,
বাজে ব্যথা নিষ্করুণ, যন্ত্রণার হাহাকার, নির্ব্বেদ নিষ্ফস,
বহ্নির-বলয়
তাপ-তপ্ত-সন্তাপের মাঝে শান্তি অবিশ্বাস্য বিস্মৃত বিস্ময়।

প্রচ্ছন্ন নিহ্নব তেজ নিদ্রালু নিবিড়
সুনিশ্চিত অনন্ত সুদূর
নির্ম্মল নির্দ্দোষ,
নির্ভিন্ন ভেদের উর্দ্ধে স্তীর্ণ তব দল-পুঞ্জে দিব্য স্ফুটমান,
মঞ্জুরিত মমত্বের ব্যথাতুর স্পর্শ-লাগা জাগে যে-আহ্বান,
অপাংক্তেয় অস্তিত্বের চিত্তমাঝে জ্বালা তার অগ্নিমন্ত্র-সুর,
আর্ণব আক্রোশ,
বিদ্যুৎ বল্লরী-বাণী তরঙ্গিত বিক্ষোভের নির্ম্মম নির্ঘোষ।

তবু কি আশ্চর্য্য সত্তা গহন গম্ভীর,
শুদ্ধ শুচি ঋদ্ধি পরিপূর,
নির্লিপ্ত উদাস।
অকুণ্ঠ সন্তোষ-ঘন প্রশান্তির পরিতৃপ্ত আনন্দ প্রবল,
মন্থিত মৃত্যুর-বিষ ভৈরব-ললিতে কাঁপে আবেগ উচ্ছল
জীবন-সঙ্গীতে নিত্য ; নবপ্রাণে নবীরাম, স্বাতন্ত্র্য-মধুর,
সাম্য-সৌম্য-হাস
ক্ষমায় ঔদার্য্যে প্রেমে, হে পুষ্প আকন্দ, তব প্রোজ্জ্বল প্রকাশ।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

আচার্য্য যদুনাথের স্মৃতিকথা এত শীঘ্র লিখিতে হইবে কল্পনাও করি নাই। তিনি বয়সে প্রবীণ হইয়াও মনে এত নবীন ছিলেন যে, আমরা বয়ঃকনিষ্ঠরা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া বিশেষ অনুপ্রাণনা লাভ করিতাম। তিনি শেষ-জীবনে দুইটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; উভয়ই ছিল বড়রকম অস্ত্রোপচার সাপেক্ষ। বার্দ্ধক্যহেতু চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি লইতে চাহেন নাই। তাঁহারা পথ্যভিত্তিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেষ সাক্ষাৎকারে আমি উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই ঔষধস্বরূপ ঘোল গ্রহণের নির্দ্দেশ আসিল। কিছুদিন হইতে যদুনাথ সম্বন্ধে মনের গোপন কোণে কেমন একটা শঙ্কা উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে যাইতেই তাঁহার অটল ভাব দেখিয়া উহা কাটিয়া যাইত। তখন কে জানিত গোপন কোণের এই অস্ফুট আশঙ্কা অতি সত্য মৃত্যুরূপে এত শীঘ্র দেখা দিবে।

আচার্য্য যদুনাথকে দেখিয়াছি দূর ও নিকট হইতে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া। প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় প্রবাসী কার্য্যালয়েই। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। সম্পাদক রামানন্দবাবুর সঙ্গে আচার্য্য যদুনাথের পরিচয় দীর্ঘকালের। তাঁহার কত যুগান্তকারী রচনা ইতিপূর্ব্বে এই দুইখানি পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় বিভাগে আসিবার পর তিনি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে লিখিতে লাগিলেন; এবারে বাংলা প্রবন্ধই দিতে লাগিলেন বেশী। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশ-রূপে যোগ দেই। কাজেই প্রথম হইতেই 'ঐতিহাসিক' এবং 'মানুষ' যদুনাথকে নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ ঘটিল। সেই ঘনাড়ম্বর দীর্ঘকায় তেজোদৃপ্ত মানুষটি—তিনি হাঁটেন না যেন দৌড়ান, সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত।

তখন রবিবাসর বেশ জাঁকালো রকমে সুরু হয়। পক্ষান্তে অধিবেশন; কলিকাতা হোটেলে প্রায়শঃই হইত। দুইটি অধিবেশনে যদুনাথের যোগদানের কথা স্মরণ আছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তর-দিকে ক্যালকাটা হোটেল-ভবনের ত্রিতলের এক কোণের ঘরে সভা। একদিন শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ আলোচনা-বৈঠক বসিল। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) সভাপতি। আচার্য্য যদুনাথ সরকার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন। আচার্য্য যদুনাথের একটি উক্তি মনে আছে। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন মেরী করেলি বাংলা সাহিত্যে তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন খুব, কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে ইঁহারা কতটুকু টিকিয়া থাকিবেন বলা কঠিন। যদুনাথের সাহিত্যবোধ ছিল তীক্ষ্ণ, আর সাহসের সঙ্গে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেও কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। সভায় উপস্থিত বিদগ্ধজন তাঁহার এই অভিমত কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহা সঠিক মনে নাই। তবে তাহার সমর্থনও কেহ কেহ করিয়াছিলেন, এইটুকু মাত্র মনে আছে। আর একটি দিনের কথা। এদিনও রবিবাসরের অধিবেশন হইতেছিল ঐ পূর্ব্বস্থানে। যদুনাথ এ দিনের বিশেষ বক্তা। তিনি মোঘল আমলে বিচার-ব্যবস্থা শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি এক ঘণ্টারও উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইহা শুনিলাম। তখন জলধর দা (ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেন) রবিবাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক, আমি রবিবাসরের অধিবেশনগুলির কার্য্যক্রম বা প্রোসিডিংস লিখিতাম। আচার্য্য যদুনাথের বক্তৃতাটি এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, স্মৃতি হইতে পরদিন উহা লিখিয়া ফেলি। সে সময় আমি কতকটা শ্রুতি-ধর ছিলাম। ছোট বড় কত বক্তৃতা শ্রবণান্তরে বাসস্থানে বসিয়া লিখিয়া ফেলিতাম। এই বক্তৃতাটি বোধ হয় ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শে আচার্য্য যদুনাথের দৃষ্টি ও সংশোধনের জন্য পাঠাই। আমি তখনও তাঁহার নিকট প্রায় অপরিচিত। যদুনাথ কালক্ষেপ না করিয়া সংশোধনান্তর লেখাটি আমাকে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। কিছুকাল লেখাটি আমার নিকট পড়িয়া ছিল। পরে ইহা দেশ সাপ্তাহিকে মুদ্রিত হয়।

আমরা কিছুকাল রবিবাসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম; পরে সদলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগ দিলাম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের নেতা। বাংলা সাহিত্যান্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা-সৌকর্য্যার্থ পরিষদে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ তো শুধু গবেষক নন; গঠনকর্ম্মীও বটে। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ইহার দোষ-ত্রুটি স্খালন-পূর্ব্বক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যোগ করিলেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং আচার্য্য যদুনাথ সরকারকে তিনি পরিষৎ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তুলেন। সাহিত্য পরিষদের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ বিবেচিত হইবে। সাহিত্য পরিষদে আচার্য্য যদুনাথের আগমন নূতন নয়। তিনি পরিষদের প্রবীণ কর্ম্মীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরিষদের এই সময়কার কর্ম্ম-

পদ্ধতিকে প্রবীণদের আপত্তি বা বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ণভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন তিনি। অপেক্ষাকৃত নবীন কর্ম্মীদের দ্বারা পরিষদের উন্নতিসাধন দ্রুত সম্ভব হইবে বিশ্বাস তাঁহার ছিল। পরিশেষে প্রবীণেরাও নবীন কর্ম্মীদের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া তাঁহাদের প্রশস্তি করেন, এবং তাহাদের সহায়তায় রত হন। সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতিত্ব কালে কিছুদিনের জন্য আচার্য্য যদুনাথ ৯নং বাদুড়বাগান রো'তে (বর্ত্তমানে রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট) বসবাস করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রায়শঃই এই স্থানে যাইতাম। এই সময় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে নানা আলোচনা হইত। পরিষদের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার আকুতি আমাদিগকেও কাজে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিত।

আচার্য্য যদুনাথের পরিষদ-প্রীতির আর একটি পরিচয় নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দিতেছি। আমি তখন মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী ছাড়িয়া আনন্দবাজার পত্রিকা পরিচালিত দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ লইয়াছি। বড় বড় সাহিত্যিকের নিকট হইতে লেখা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। আচার্য্য যদুনাথও লেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথানির্দ্দিষ্ট দিনে আমাকে প্রবন্ধ দিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে। বাঙালীর এই জাতীয় সম্পদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আমলে তিন-চার বৎসর পরিষৎ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল।···ইংরেজী বাংলা কোন কোন পুস্তিকায় পরিষদের বিশেষ বিশেষ বিভাগের সংগ্রহ ও সজ্জা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। কিন্তু সাধারণভাবে পত্রিকার মাধ্যমে পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা এই বোধ হয় প্রথম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পরিষৎ-পরিচয়' সকলন করিয়া সাহিত্য পরিষদের পঞ্চাশ বৎসরের কার্য্যকলাপের একটি দফাওয়ারি বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লেখাটির সঙ্গে আচার্য্য যদুনাথের একখানা ছবিও বাহির হয়। এখানিতে যদুনাথের রোগাপটকা চেহারা প্রকাশ পাইয়াছিল। পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের এই ছবিখানি কবেকার করা জানি না। আচার্য্য যদুনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন ঐ পুরানো ছবি আর যেন ছাপা না হয়। তিনি এ ছবির কথা অনেকদিন ভুলিতে পারেন নাই, পরেও আমাকে উহা না ছাপার কথা বলিয়াছিলেন।

দেশ সাপ্তাহিকে কর্ম্মকালে গবেষণা-কার্য্য প্রায় ছাড়িয়াই দিতে হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে লিখিতাম। এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা যতদূর বলিতে পারি, এই সাপ্তাহিকেই সুরু হয়। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা থাকিত বটে, কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই খাপছাড়া। দেশ সাপ্তাহিকের ইহা একটি মৌলিক কৃতি। যাহা হউক, এই সময় উক্ত বিষয় আলোচনা করিবার সময় যথেষ্ট খাটিতে হইত। এ বিষয়ক পড়াশুনায়ও তখন বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ি। আচার্য্য যদুনাথ এ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সাপ্তাহিকের কার্য্য মাসিকের চেয়ে গুরুতর। সময় করিয়া উঠিতে না পারায় শেষ দিকে পরিষদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয় নাই।

চারি বৎসর দেশ সাপ্তাহিকে কার্য্য করার পর চোখে গ্লোকুমা-হেতু অস্ত্রোপচার হয় এবং ডান চোখের সম্মুখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারাই। দেশ সাপ্তাহিক হইতে বিদায় লইলাম। সাধারণ অর্থে তখন বেকার হইয়া পড়ি। বেকার কিন্তু ঠিক ছিলাম না। এই সময়ে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের ফলে আমার "মুক্তির সন্ধানে ভারত" রচনা ও প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল।

১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের দিন সকালের দিকে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি আচার্য্য যদুনাথ আসিয়াছেন। তিনি আমার পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন। আমার কুশলবার্ত্তা লইবার পর যখন শুনিলেন যে আমি আর আনন্দবাজার পরিচালিত দেশের সঙ্গে যুক্ত নাই তখন তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমার দৃঢ়তা ও উক্ত পুস্তক রচনার কথা জানিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তিনি আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও সবিশেষ খোঁজ লইলেন। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইলাম। এবারে আবার সভাপতি হইলেন আচার্য্য যদুনাথ।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে এবং ইহার সাধারণ সভা-সমিতিতে যদুনাথের সংস্রবে আসিলাম এবারে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে। পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় রামানন্দ বাবুকে মানপত্র দানের প্রস্তাব আসে—প্রস্তাব উঠিবামাত্র আচার্য্য যদুনাথ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবটি প্রথমে গোপন ভাবে তাঁহার নিকট হইতেই আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ আমাদিগকে তখন চমৎকৃত করে। এই সময়ে রামানন্দবাবু বড় জামাতা ডক্টর কালিদাস নাগের বাড়ীতে বাস করিতেন। সকাল ৮টা কি ৯টায় মানপত্র দানের সময়; আমরা সকলে একে একে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্টমত আচার্য্য যদুনাথের বাড়ীতে জড় হইলাম। যদুনাথ পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিতেন। শেষে তিনি এই নিজস্ব বাড়ীটি নির্ম্মাণ করেন। নূতন বাড়ীতে আমার, শুধু আমার কেন অনেকেরই, পদক্ষেপ এই প্রথম। পরে ষোল-সতের বৎসর যাবৎ এই বাড়ী আমাদের তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক এখান হইতে আমরা সকলে আচার্য্য যদুনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া ডক্টর নাগের বাড়ীর দিকে রওনা হই। বাড়ী দূরে নয়, গেট দিয়া সকলেই দিতলে উঠিলাম। রামানন্দ বাবুর শয্যা ঘিরিয়া আমরা সকলেই দাঁড়াইলাম। আচার্য্য যদুনাথ স্বয়ং তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে মানপত্র পাঠ করিলেন। কি গভীর পরিবেশ! দেখিলাম রামানন্দ বাবুর সর্ব্বশরীর রক্তাভ হইয়াছে। ডাক্তার নীলরতন

সরকার প্রমুখ বড় বড় চিকিৎসকেরাও তাঁহার রোগের উপশম করাইতে পারেন নাই। তখন একনাগাড়ে কিছু বলার ক্ষমতা রামানন্দ বাবুর ছিল না। তিনি সকলকে একে একে কাছে ডাকিলেন। প্রত্যেকের কুশলবার্ত্তা লইলেন। আমি পুনরায় প্রবাসী ও মডার্ণরিভিয়ুতে যোগ দিয়াছিলাম। তিনি আমার সম্বন্ধেও দু'চারিটি কথা বলিলেন। অনুষ্ঠান শেষে জলযোগের ব্যবস্থা। আমরা সকলে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া আসিলাম। আচার্য্য যদুনাথ পূর্ণোদ্যমে এই পত্রিকা দুখানিতে লেখা দিতে সুরু করিলেন।

আচার্য্য যদুনাথের স্বজনবিয়োগ সুরু হয় দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ দিক হইতে। জামাতা কর্ণেল ঘোষ সিঙ্গাপুরে নিখোঁজ হন। অদ্যাবধি তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল না। ঔরঙ্গজেবের ইতিহাসে সত্যসন্ধ যদুনাথ ঔরঙ্গজেবের কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রদায় সচেতন মুসলমান শিক্ষিত সাধারণ অনেকেই এ কারণ আচার্য্য যদুনাথের উপর মোটেই খুশী ছিলেন না। কিন্তু কে জানিত তাহাদের এই রোষ ওরূপ নির্ম্মমভাবে আচার্য্য যদুনাথের উপর নিপতিত হইবে? ১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে উদ্ভূত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জের প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিল। যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন মুসলমান আততায়ীদের ছোরার আঘাতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সত্যসন্ধানী যদুনাথ অচল অটল। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যদুনাথ-ভবনে গেলাম। প্রথম আবেগ কাটাইয়া উঠিয়া তিনি পুত্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন। পুত্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব্বদিককার ছাপাখানা হইতে ফিরিতেছিলেন; ঐ দিকে ট্রাম বাস বন্ধ থাকায় এসপ্লানেডে আসিয়া বাস কি ট্রাম ধরিবেন এই ইচ্ছা ছিল। তিনি কালা ছিলেন। মুসলমানদের হৈ-হল্লা তিনি শুনিতে পান নাই। ধর্ম্মতলায় গীর্জ্জার নিকট পৌঁছিলে মুসলমান আততায়ীর ছোরার আঘাতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এক শ্বেতকায় পাদ্রী ইহা দেখিয়াই আগাইয়া আসেন এবং হাসপাতালে লইয়া যান। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পাদ্রী তাঁহাকে পুত্রের খবর দিয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে পাদ্রীর প্রতি যদুনাথের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

গবেষণাকার্য্য নূতন ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গত দশকে কয়েকজন মান্যগণ্য বাঙালী ও বাংলা-প্রবাসীর তথ্যভিত্তিক জীবনী প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেগুলি 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল। আচার্য্য যদুনাথের আশীর্ব্বাদপূত সমালোচনা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। সে যুগের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয় গবেষণা করিতে হইলে ইংরেজী-বাংলা পত্রপত্রিকার আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভারের প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল (১৮৩৪-১৮৬২) আচার্য্য যদুনাথের রাজসাহীর বাড়ীতে ছিল। তিনি ইহা আনাইয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। অবজারভারের প্রথম দুই বৎসরের ফাইল রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগার হইতে পাইয়াছিলাম। আচার্য্য যদুনাথের নিকট হইতে কখনও একখানি কখনও দুইখানি কখনও নিজে কখন লোক মারফত আনাইয়া ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতাম। সেকালের শিক্ষা-ব্যাপারে মিশনারীদের কৃতিত্ব বিস্তর। এই মাসিকপত্রখানি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান মিশনারীদের একক মুখপত্র বলিয়া তাহাদের সমুদয় কৃতকর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে থাকিত। বাংলা প্রবাদ, বাঙালীর জাতিগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা এই পত্রিকাখানিতে প্রথম দেখি। মুখ্যত: ধর্ম্মপত্রিকা হইয়াও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যাদিও ইহাতে থাকিত। এই পত্রিকাখানি আচার্য্য যদুনাথের নিকট হইতে পাইয়া আমার গবেষণা-কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তকও আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শেষ দিকে তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে অন্যূন চারি মাস পুণার নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে প্রতি বৎসর গিয়া বাস করিতেন। এ সময়ও তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সত্যকার গবেষক-ছাত্র যাহারা, তাহাদের প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ছিল। নিজে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অন্য প্রমুখাৎও গল্প শুনিয়াছি। দুই-একটি দৃষ্টান্ত পরে দিব।

স্বাধীনতার পরে। দেশ বিভাগ হইবার ফলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে সভা হয় তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের স্বাগত করিলে ভারত রাষ্ট্রের জনবল বৃদ্ধি পাইবে, ইহাদের উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রকার উন্নতিও সম্ভব হইবে। এই সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম না বটে, কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত তদীয় বক্তৃতা তিনি সংশোধন করিয়া পাঠাইলে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে তাহা প্রকাশিত করি। শিক্ষা, সমাজ, সৈন্যবল, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার সুচিন্তিত অভিমত সংবাদপত্রে এবং মডার্ণ রিভিয়ুতে বাহির হইতে থাকে। স্বাধীনতার পরিবেশে আমাদের আচার-আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীর আশু সংস্কারের কথাও তিনি কোন কোন প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যুদ্ধের প্রণালী, রীতি-প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকান্তরে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য হয়ত তাঁহার মনে ছিল,—স্বদেশীয়দের যুদ্ধবিদ্যায় উদ্বুদ্ধ করা। তিনি সরকার প্রবর্ত্তিত ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এর বিশেষ সমর্থক

ও অনুরাগী ছিলেন। ইহার কার্য্যকারিতার সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিবার জন্ত তিনি লেখনীও ধারণ করেন। তিনি ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধেও এক প্রস্ত প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজীতে। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "শৈশব থেকেই ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধে জানবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আমার মনে উদয় হয়। আমি ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় যত বই বেরিয়েছে সব সংগ্রহ করে পড়ে নিয়েছি। ঝান্সীর রাণীর উপরে লিখিত বিস্তর বই আমার গ্রন্থাগারে।" একদিন তাঁহাকে ঝান্সীর রাণী প্রবন্ধগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কথা বলিয়াছিলাম। তিনি ইহাতে কতকটা রাজীও হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা আর কার্য্যকর হয় নাই। এই প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে যেমন আছে, পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি বলিলেন, "এর প্রথম ও মধ্যে মধ্যে কিছু সংস্কার প্রয়োজন, আবার শেষে একটি চ্যাপটার নূতন করে লিখতে হবে, এজন্ত কিছু কাগজপত্রও দেখা দরকার।" কিন্তু কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি তাহাকে পাইয়া বসিল। তিনি তাঁহার বাসনা আর পূরণ করিতে পারেন নাই।

নীল আন্দোলন সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পুস্তকে ও প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ নীলচাষীদের পক্ষ লইয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ছদ্মনামে কতকগুলি পত্র ছাপাইয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে আলোচনা দ্বারা যখন স্থিরনিশ্চয় হই যে, ছদ্মনামে প্রেরিত এই সকল পত্র শিশিরকুমারের তখন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' ফাইল হইতে এগুলি উদ্ধার করি। পত্রসংখ্যা ১২খানি। এই পত্রগুলি একখানি ছোট পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে আচার্য্য যদুনাথ ইহার একটি ভূমিকা দিতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেবের নিকটে নীলকরদের দৌরাত্ম্য এবং কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নীলকরদের সাজা দিবার কৌতুককর কাহিনী শুনিয়াছেন। ইহার কিছু কিছু তিনি উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন। যথাসময়ে তাঁহার ভূমিকা পাইলাম এবং পুস্তকখানিতে ছাপাইলাম। একখণ্ড পুস্তক তাঁহাকে দিলাম। তিনি পুস্তকখানি পাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—উহা ছাপাইবার ব্যয় কে বহন করিয়াছেন? বেশির ভাগই আমাকে দিতে হইয়াছে শুনিয়া তিনি বিশেষ অনুযোগ করিলেন। আর নিজের কষ্টার্জ্জিত বা ন্যায্য পাওনা টাকার বিনিময়ে এরূপ 'ভেঞ্চার' যেন না করি। তিনি আমার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে নিয়ত খোঁজখবর লইতেন, তাই এই অনুযোগ। দেখিয়াছি, যদি কেহ নীল আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার জন্ত উপদেশ লইতে তাঁহার নিকট যাইতেন তিনি সরাসরি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

স্বাধীনতার পরের আর একটি ঘটনা। আচার্য্য যদুনাথের ভাগিনের—যোগীশচন্দ্র সিংহ, সতীশচন্দ্র সিংহ ও হরীশচন্দ্র সিংহ। তিন জনই কৃতী পুরুষ। সতীশচন্দ্র সিংহের একখানি ইংরেজী বইয়ের পরিশিষ্টে আচার্য্য যদুনাথের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধীয় রচনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। আমার জাতীয়তামূলক পুস্তকগুলি আচার্য্য যদুনাথের নিকট তখন ছিল না, কিন্তু একটি ব্যাপারে বুঝিলাম তিনি এ সব বইয়ের খোঁজখবর রাখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের স্বাধীনতা সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, অধ্যক্ষ ডক্টর যোগীশচন্দ্র সিংহ স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন একটি প্রবন্ধে—আচার্য্য যদুনাথ আমাকে লিখিলেন, আমি যেন আমার জাতীয়তামূলক পুস্তকখানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দি। কারণ যোগীশচন্দ্রের ইহা জরুরী প্রয়োজন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি পুস্তকখানি পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে উহা ফেরতও আসিল। ম্যাগাজিন সম্পাদক স্বহস্তে আমাকে একখণ্ড দিয়া গেলেন। দেখিলাম অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র যথোচিত উল্লেখপূর্ব্বক আমার পুস্তকগুলির সদব্যবহার করিয়াছেন।

আচার্য্য যদুনাথের জীবনকথার আভাস তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা ও রচনা হইতে আমরা পাইয়াছি। 'আমার জীবনতন্ত্র' শীর্ষক রেডিও বক্তৃতাটি আমি বেতার দপ্তর হইতে প্রবাসীতে প্রকাশার্থ তাঁহার নির্দ্দেশমত নকল করিয়া আনি। যথাসময়ে প্রকাশিতও হইল। এইরূপ ইতিহাস-গবেষণার প্রবৃত্তি যে শৈশবে পিতৃদেবের নিকট হইতেই সঞ্জাত হয় ইহা পাঠে তাহা আমরা প্রথম অবগত হইলাম। তিনি ক্রমে ক্রমে ছয় বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন, তিনি এই সময়ে হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতেন। এই ছয় বৎসর তিনি অনন্যমনা হইয়া পুস্তক পাঠে মন দিয়াছিলেন। অধ্যাপক পার্সিভাল তাঁহার আদর্শশিক্ষক। এন, এন, ঘোষ সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশন-এর' ইংরেজী ছিল তাঁহার রচনার আদর্শ। প্রেসিডেন্সী কলেজের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজী, সাহিত্য, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিবরণ, নূতন নূতন আবিষ্কার ও এডভেঞ্চার তাঁহার প্রধান পঠনীয় বিষয় ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ফলে সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁহাতে অতিমাত্রায় লক্ষিত হইত। প্রাচীন হইলেই যে তাহা সত্য এবং গ্রহণযোগ্য এমন বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এ প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের অনুকূল সমালোচনা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনের আরও কোন কোন ঘটনা বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তাহাই এখানে একটু বলি।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু চর্চ্চা করিতেছি শুনিয়া আচার্য্য যদুনাথ বলিলেন, এলাহাবাদের জ্ঞানবাবু (জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের বৃহৎ 'কেশব-জীবনী' দিয়েছেন। কেশব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই ত এইখানিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। যখন বলিলাম আরও নূতন কিছু তথ্য আমি পাইয়াছি তখন তিনি মোটেই বিস্মিত হইলেন না, বরং কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে

তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব উচ্চ ধারণার কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি চুবছর কলকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়ি। দাদা ও আমাকে পড়াশুনা করার জন্ত একত্রে এখানে পাঠান হয়। সাত বছর বয়সে এসে ভর্ত্তি হই, নয় বছর বয়সে দাদা রাজসাহীতে গেলে আমিও চলে যাই। এ তু'বছরে কেশব বাবুকে একেবারে সামনে থেকে দেখেছি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে বেদীর একেবারে নিকটে করাস পাতা ছিল, সেটি শিশুদের বসবার জায়গা। তার পিছনে ও আশেপাশে বয়স্কদের জন্ত স্থান করে দেওয়া হ'ত। আমি তখন শিশুর দলে ছিলাম। আমিও করাসের উপর একেবারে সামনে বসে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে।' তিনি আরও বলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসের কথাও তাঁর স্মরণ আছে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দিয়া অনেকখানি জায়গায় বিভিন্নবর্ণের কাগজের ছোট ছোট পতাকা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণার কথাও এই সঙ্গে তু'-একটা বলি। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের ভার বিভিন্ন লোকের উপর অর্পণ করেন। তাঁহার লোক বাছাইয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি যোগ্য লোকের উপরই ভার দিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের বুঝিবার পক্ষে এই আলোচনা যে কত ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যও ইহার দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হইয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ অতি দৃঢ়তার সহিত এই কথাগুলি আমায় বলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃদেব রাজকুমার সরকার সম্বন্ধে আমার জানা একটা তথ্যের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সে যুগের রাষ্ট্রীয় শাসনের আঁটুনি যখন বাড়িতেছিল সেই সময় কলিকাতায়, জেলা ও মহকুমা শহরে এমনকি বড় বড় গঞ্জে রাজনৈতিক সভা সমিতি স্থাপিত হয়। রাজসাহীতে এইরূপ রাজনৈতিক সমিতি—'রাজসাহী পিপলস এসোসিয়েশন'—প্রতিষ্ঠা করেন রাজকুমার সরকার। রাজকুমার তখন রাজসাহীতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পুরানো ফাইল হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করি। আচার্য্য যদুনাথ শুনিলেন, কিন্তু সেদিন কিছু বলিলেন না। পিতৃদেব সম্বন্ধে 'আমার জীবনতন্ত্রে' যদুনাথ মুক্তকণ্ঠে অথচ সংক্ষিপ্তাকারে বলিয়াছেন। বহু পরে একটা অন্ত প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি পিতৃদেব সম্বন্ধে বলেন, 'পিতৃদেব খুব উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তখনকার প্রগতিশীল ব্যাপারগুলির সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি ক্রমে শিশির ঘোষের সংস্রবে আসেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন।' আচার্য্য যদুনাথ শ্রীচৈতন্তদেবের একখানি ইংরেজী জীবনকথা লিখিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা মনে হয় তিনি পিতৃকৃত্যই করিয়াছেন।

যদুনাথের সঙ্গে আমার সংস্রবের কথা লিখিতে বসিয়া অন্তান্ত প্রস্তাবের মত আমার নিজের কথা তথা অভিজ্ঞতার বিষয় আসিয়া পড়িতেছে। ইহা পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগিবে কিনা জানি না। কিন্তু উপায়ান্তর ত দেখি না। সত্যকার যদুনাথকে জানিতে বুঝিতে হইলে এ সব বিষয়ের উল্লেখ যে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বেথুন কলেজের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ আমি নিজে তাঁহাকেও একখণ্ড দিয়া আসি। কয়েকদিন পরে গিয়া দেখি তিনি উহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থখানির অর্দ্ধেকের উপর আমার লেখা। তিনি যে ইতিহাস অংশটি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন তুই-একটি কথায় তাহা বুঝিলাম। তিনি ইহার সমালোচনা কোন পত্রপত্রিকায় করেন নাই। তবে ইংরেজী ও বাংলায় এখানি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। পর পর আরও কতকগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। ঠিকা কাজ কিন্তু বড়ই পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অনুধ্যান সাপেক্ষ। একে একে হিষ্ট্রি অব 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', 'প্রমথনাথ বসু' (জীবনী) বাহির হইল। এই সময় আর একটি বিষয়ের জন্তও খুব খাটিয়াছিলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস। এসোসিয়েশন শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে একখানা ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা করিয়াছিলেন এবং এক-একটি অংশের রচনার ভার এক এক জনের উপর দিয়াছিলেন। আমার উপর প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস রচনার ভার পড়ে। এই গ্রন্থ অন্তাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল আলোচনা-গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে আচার্য্য যদুনাথের নিকট যাইতাম এবং তিনি কোন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। প্রমথনাথ বসু সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলেন, প্রমথনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না, তবে ভাইস-চ্যান্সেলার থাকাকালে তিনি তাঁহাকে একবার বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সময় যা পরিচয় হয়। আচার্য্য যদুনাথ এই তুইখানি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন মডার্ণ রিভিয়ুতে। প্রমথনাথ বসু বড় অক্ষরে ছাপা দেখিয়া তিনি বড়ই খুসী হন। তখন তিনি ছোট অক্ষর পড়া প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

আচার্য্য যদুনাথের সাহিত্য-প্রীতি যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু বলি। অধ্যয়ন, অনুধ্যান, অনুশীলন যে তাঁহার জীবন-ধর্ম্ম-কর্ম্ম। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট পড়িতেছেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ক আলোচনাদি পাঠ করিতেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে কবিতার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। গদ্য কি পদ্য বুঝা কঠিন। কোন কোন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠ পরিবর্ত্তন হওয়ায় উহার কবিত্ব কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবিষয়ে একটি প্রবন্ধও তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে লেখেন।

একদিন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে লইয়া আচার্য্য যদুনাথ ভবনে গিয়াছি। ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো উপস্থিত রহিয়াছেন। তুই-চার মিনিটের মধ্যেই একটি সাহিত্যিক পরিবেশের

সৃষ্টি হইল। ডক্টর কানুনগো বলিলেন, তিনি চাটগাঁর লোক, চট্টল কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ বইখানা প্রাইমারি ক্লাশে পড়িবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি পলাশীর যুদ্ধ হইতে কতক অংশ আবৃত্তি করিলেন। কবি নবীনচন্দ্র দাসের বাড়ীও ছিল চট্টগ্রামে। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার কথাও উঠিল। আচার্য্য যদুনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এমন প্রতিভাবান কবি সম্বন্ধে আজিকার দিনে বড় কেহ একটা জানেন না। "সাহিত্যসাধক" নবীনচন্দ্র দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে বলিলাম। নবীনচন্দ্র সংস্কৃত কাব্য হইতে বাংলা ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার ডক্টর কানুনগো নবীনচন্দ্রকৃত রঘুবংশের অনুবাদ হইতে মুখস্থ বলিতে লাগিলেন। রঘুবংশ হইতে ইহার মূল সংস্কৃত অংশগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ আবৃত্তি করিলেন। উভয়ের মুখস্থ শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের কথা উঠিল। তিনি এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমাকে দুই-এক বার বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, আধুনিক উপন্যাসে তাহা প্রায় দেখাই যায় না। যদুনাথ বলিলেন, হয়ত কোন একটি চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোনও একটি অংশ অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহা আদৌ নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডে পৌঁছিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, একটি ব্যাপারে বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দৈন্য বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। কোন কোন প্রকাশ্য সভায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করায় তিনি অনেক আধুনিক সাহিত্যিকের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। সাধারণ সম্মেলনাদিতে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদও হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

তবে সাহিত্যিক গুণপনা যাঁহাদের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রশংসা করিতে তিনি কখনও ত্রুটি করিতেন না। তা তাঁরা নামজাদা হউক বা নাই হউক। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার বর্ষীয়সী মহিলা, বাংলা সাহিত্যের সেবায় আজীবন রত আছেন। আমরা ছেলেবেলায় 'নিবেদিতা' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাঁহার নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। তাঁহার বহু গল্প, কবিতা ও স্মৃতিচিত্র বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও তাঁহার লেখনী স্বতন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহার রচনার সহজভঙ্গী, উচ্ছ্বাসবিহীন যথাযথ বর্ণনা এবং প্রসাদগুণে পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। আমি একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই এবং প্রসঙ্গতঃ আচার্য্য যদুনাথ সরকারের কথা উঠে। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য যদুনাথের পরিবারের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয়। তাঁহার স্ত্রী সরযূর সঙ্গে আমি সই পাতিয়েছিলাম। যদুনাথ আমার চেয়ে বয়সে বড়। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের একটি সভায় আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্ত যেতে হয়। যদুবাবু আমার হাত ধরে ডায়াসের উপরে নিয়ে গেলেন। আমার তো কত সঙ্কোচ, বয়সে বড় তিনি, আর আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।" সরলাবালার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা, এবং আচার্য্যদেব সম্বন্ধে তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। যদুনাথ বলিলেন, "এক সময়ে আমার দাদার সঙ্গে সরলাবালার বিবাহের প্রস্তাব হয়; এ সম্বন্ধ হয় নি। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত না হলেও আমাদের উভয় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বহু দিনের, ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল খুবই।" সরলাবালার সাহিত্যিক কৃতির কথা স্বতঃই উঠিল। বুঝিলাম সরলাবালার রচনার সঙ্গে তিনি বেশ পরিচিত। তিনি বলিলেন, "এর লেখা আমার খুব ভাল লাগে। বেশ সহজে মনের ভাব তিনি ব্যক্ত করে থাকেন।"

শ্রীযুক্তা সরকার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে পড়িল। তিনি পরমহংস শিষ্যবর্গ এবং বেলুড়মঠ সম্পর্কে দেশ সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আচার্য্য যদুনাথ এই বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশের বিষয় পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। বইখানি বাহির হইয়াছে কিনা যদুনাথ আমার নিকট খোঁজ করিলেন। প্রসঙ্গতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের কথা, বেলুড়মঠের কথা উঠিল। পূর্ব্বে এবং পরেও বেলুড়মঠ সম্পর্কে তিনি আমাকে দু'চার কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হইত যদুনাথ বেলুড়মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিলে তিনি বলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবার কাজ বেশ ভাল করিয়াই করেন। শ্রীশ্রীমার (সারদামণি দেবী) জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের তখন কথা হয়। প্রারম্ভিক আলোচনার জন্য বেলুড়মঠের পক্ষে কোন কোন স্বামীজী তাঁহার নিকট যান। তিনি তাঁহাদিগকে ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য আমার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারাও আসিয়াছিলেন এবং কথাবার্ত্তাও কিছু হইয়া ছিল। পরে অবশ্য তাঁহারা আর আসেন নাই।

যদুনাথ বার্দ্ধক্যে ছোট অক্ষরের বই বা পত্রপত্রিকা পড়া প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যতদিন দৃষ্টিশক্তি প্রবল ছিল ততদিন পঠিতব্য কোন কিছু তাঁহার চোখ এড়াইত বলিয়া মনে হইত না। তিনি সমজদার রসবেত্তা। একখানি মাসিকপত্র সম্বন্ধে আমাকে একদিন বলেন···পত্রিকাখানা আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তা ফেরত দিয়েছি। "মাসিক পত্রিকা, না পঞ্জিকা. একেবারে অপাঠ্য।" সাহিত্য সম্পর্কে আচার্য্য যদুনাথ ছিলেন একস্ট্রিমিষ্ট। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সহিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট গেলেই আগে আগে প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু সম্পর্কে অনেক কথা হইত। শেষ দিকে ছোট অক্ষরের জন্য তিনি আর বিশেষ পড়িতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "সর দেশাই (বিখ্যাত মারাঠা ঐতিহাসিক জি. এস সর দেশাই) দুঃখ করে লিখেছেন যে, তিনি আর মডার্ণ রিভিয়ু পড়তে পারেন না, এর হরফ বড় ছোট হচ্ছে।" ক্রমে দুইখানি কাগজেরই ছোট অক্ষর

কতকটা বদলানো হইয়াছে। পরে দেখিলাম আচার্য্য যদুনাথ ইহাতে বেশ খুশী হইয়াছেন। যদুনাথ সিষ্টার নিবেদিতার বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। নিবেদিতার অনেক জীবনীকারের মুখে শুনি, তিনি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আচার্য্য যদুনাথ 'কমেমরেশান ভলুমে' তাঁহার বাংলা লেখাগুলি সকলনের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নিপুণতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সমগ্র প্রবন্ধের একটি তালিকা করিয়া যান। ইহার সামান্য কিছু কিছু সংশোধন করিয়া, বাকী ছয় সাত বৎসরের বাংলা রচনাগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করি। বড়ই দুঃখের বিষয় এই 'কমেমরেশান ভলুম' পুস্তকাকারে আচার্য্য যদুনাথ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যদুনাথের লিখিত ভূমিকাগুলির তালিকা ইহাতে দিতে হইবে। নিবেদিতা গ্রন্থখানির ভূমিকা তিনি লিখিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "না, এ বইয়ের ভূমিকা আমি লিখি নি।" এ যেন সিনেমায় পর্দ্দা তোলো আর নূতন নূতন ব্যাপার দেখ। জীবনী রচনার কি এই ধরণ?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী তখন ধারাক্রমে পত্রিকান্তরে বাহির হইতেছিল। এ লেখা তিনি দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "হ্যাঁ, কিছু কিছু পড়েছি, এ এত ফেনিয়ে লেখা যে, খেই হারিয়ে যায়, আসল মানুষটিকে ত খুজে পাই না।"

এখন আবার একটু নিজের কথায় আসা যাক। "কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র" শীর্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস। অবশ্য ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত। পত্রিকান্তরে ছদ্মনামে বাহির হইতেছিল। কয়েকটি মাত্র তখন বাহির হইয়াছে। আচার্য্য যদুনাথের নিকট গিয়া এ কথা বলি। পরে সবগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে মনস্থ করিলাম পুস্তকাকারে গ্রথিত করিব। যদুনাথের নিকট এ সঙ্কল্পের কথা বলিলাম। গ্রথিত করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদস্বরূপ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে বলি। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন। তখন আমার কোন কোন রচনার ভিতরকার বিষয়াদি লইয়া, সংশোধন, পরিবর্জ্জন ও সংক্ষেপ করা সম্বন্ধে এরূপ ভাবে বলিতে লাগিলেন যাহাতে বুঝিলাম তিনি উক্ত প্রস্তাবগুলির কিছু কিছু অন্ততঃ পড়িয়াছেন। আমার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ইংরেজী বইখানি প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া নূতনরূপে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইল। আচার্য্য যদুনাথ এই পুস্তকখানি তাঁহার গ্রন্থাগারে সযত্নে রাখিয়াছিলেন। সেই চৌদ্দ-পনর বৎসর পূর্ব্বে ইহা বাহির হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে একখণ্ড দি। তিনি শুনিবামাত্র তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে প্রেসকপি করিবার জন্য দিতে চাহিলেন। নিজের পুস্তক থাকায় উহা লইবার আবশ্যক হয় নাই। পুস্তকখানির ফর্ম্মা কিছু কিছু ছাপা হয় আর তাঁহাকে পাঠাইয়া দি। এই ভাবে মূল পুস্তকের শেষ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। আচার্য্য যদুনাথকে কখনও পরের মুখে ঝাল খাইতে দেখি নাই, তিনি সব বিষয়টি নিজে পড়িয়া বুঝিয়া তবে লেখনী ধারণ করিতেন। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি ইংরেজী রচনা তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবেই তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার লেখা, আমি আর কি দেখব?" আমি বলিলাম "ইংরেজীটা দেখে দিন। নানা শোক তাপের মধ্যেও তিনি আমার সবগুলি লেখা দেখিয়া দেন। শেষ-কিস্তী লেখা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকিলে আমাকে অবসরমত একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। গিয়া দেখি তিনি প্রায় প্রতিটি রচনা সম্বন্ধে বিভিন্ন চিরকুটে নিজমন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, একটি রচনা সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি গ্রন্থাগার হইতে অনেকগুলি বই আনিলেন এবং উহা আমি দেখিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিলে বুঝিলাম তিনি বেশ খুশী হইয়াছেন। একখানি বইয়ে লিখিত একটি তারিখ ভুল বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ পেন্সিল আনিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কি সত্যানুসন্ধিৎসা। দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত "ভারতের মুক্তি-সন্ধানী পরিবর্দ্ধিত" সংস্করণের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু কি জ্ঞানগর্ভ এবং অভিজ্ঞতাপুষ্ট। প্রথম এই ভূমিকার কথা পাড়িলে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাঁহার বিরূপতার কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রথম জীবনে একনাগাড়ে বহু বৎসর কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তিনি কখনও শুনেন নাই। আমি বলিলাম আমার পুস্তকের নাম হইতেই শুধু রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্টাই বুঝায় নাই; জাতীয় জীবনসংগঠনের উপযোগী বাধাবন্ধহীন সর্ব্ববিধ মুক্তি-প্রয়াসের কথাই বিভিন্ন ব্যক্তি-জীবনের মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছি। ছাপা ফর্ম্মাগুলির প্রায় সবটা পড়িয়া তিনি উক্ত সারগর্ভ ভূমিকাটি ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন। প্রকাশিত হইবার পর পুস্তকখানি তাঁহার হাতে দিয়া আসি। তাঁহার কঠিন আধিব্যাধির কথা জানিতাম, কিন্তু এই দেখাই যে শেষ দেখা হইবে ইহা তখন ভাবিতে পারি নাই।

হিন্দীকবি দেবের সমকালীন সাহিত্য

শ্রীঅমল সরকার

দেব

ইটাবার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৩০ বিক্রম সম্বতে দেবের জন্ম হয়। রীতিকালের অন্যান্য কবিদের মত ইনিও কয়েকজন রাজার দরবারে রাজকবি হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু কোনও এক জন রাজার আশ্রয়ে বেশীদিন থাকা এঁর ভাগ্যে হয় নি বা ইনি থাকেন নি। একজন সমালোচক বলেন যে, যদি দেব কোনও একটি বিশেষ রাজার আশ্রয়ে থাকতেন তা হলে হয়ত তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিকাশলাভ করতে পারত না। আশ্রয়দাতাদের মধ্যে ভোগীলালের সঙ্গ দেবের বোধ হয় সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, এরই উদ্দেশ্যে তিনি 'রসরাজ বিলাসে'র রচনা করেছিলেন। আলমগীরের পুত্র আজমশাহের দরবারেও দেব বহুদিন ছিলেন। মুসলমান বাদশাহ আজমশাহ হিন্দী-প্রেমী ছিলেন এবং এরই দরবারে থাকাকালীন তিনি বিখ্যাত 'অষ্টযাম' ও 'ভাববিলাসে'র রচনা করেন। পিহানীর আকবর আলী খাঁকে 'সুখসাগর তরঙ্গ' সমর্পণ করেন। ভবানী দত্ত ও কুশল সিংহের জন্য 'ভবানী-বিলাস' ও 'কুশল-বিলাস' এবং উদ্যোত সিংহের উদ্দেশ্যে 'প্রেম-চন্দ্রিকা'র রচনা করেন। এই রচনাগুলি থেকে অনুমান করা হয় যে, ১৮২৫ সম্বতে ৯৫ বৎসর বয়সে দেবের মৃত্যু হয়। দেব মোট ৭২টি গ্রন্থের রচনা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি 'ভাব-বিলাসে'র ও ১৪ বৎসরে 'সুখসাগর তরঙ্গে'র রচনা করেন; জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কাব্যই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা।

দেব ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক; শব্দ-ভাণ্ডার ও কল্পনা-প্রাচুর্য্য দিয়ে সেই সৌন্দর্য্যকে রূপ প্রদান করতে চেয়েছিলেন। দেবের রচনাগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—একটি শ্রেণীর মধ্যে আসক্তিময় ভাব দেখতে পাই, অপর শ্রেণীটি 'ব্রহ্ম-দর্শন' ও 'তত্ত্ব-দর্শন' প্রভাবে প্রভাবান্বিত। প্রথমটিতে তাঁর কবি-রূপ ধরা দেয়, অন্যটিতে আমরা তাঁকে আচার্য্য-রূপে দেখতে পাই। শৃঙ্গার এর কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু নায়িকা-ভেদে রীতিকালের অন্য কোন কবি দেবের সমকক্ষ হতে পারেন নি। ষড়ঋতু, নখশিখ ও ভাব-বর্ণনায় দেব পূর্ণ সফলতা লাভ করেছেন। নায়িকাদের ভেদ, বিভেদ ও উপভেদে দেব তাঁর সমস্ত কাব্যশক্তি উজাড় করে দিয়েছেন। অনুপ্রাস ও ছন্দের ভার এর কবিতাকে ক্লিষ্ট করতে পারে নি, শব্দ ও বাক্যের যথেচ্ছাচার ব্যবহার এর রচনায় পাওয়া যায় না। সমস্ত রচনায় অর্থের প্রতি দেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আচার্য্য রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন—'ইনকা-সা অর্থ সৌষ্ঠব ঔর নবোন্মেষ বিরলে হী কবি মে। মে মিলতা হৈ। যে রীতিকাল কে কবিয়ো মে বড়ে হী প্রগলভ ঔর প্রতিভা-সম্পন্ন কবি থে, ইসমে সন্দেহ নহী। ইসকাল কে বড়ে কবিয়ো মে ইনকা বিশেষ গৌরব কা স্থান হৈ।'

দেবের ভাষা শুদ্ধ ব্রজভাষা। মিশ্রবন্ধুর মতে দেবের ভাষা মতিরামের ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রচলিত প্রবাদকে কাব্য-সাহিত্যে স্থান দিয়ে দেব জনগণের মন অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

দেবের কবিতার কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারব দেবের পাণ্ডিত্যের গভীরতা, ভাব ও ভাষার ওপর পূর্ণ অধিকার—

চলত ন দেতো চিত্ত চঞ্চল অচল করি
চাবুক চিতাবনীনি মারি মুই মোরতো।
ভারী প্রেম পাথর নগারো দৈ গরৈ সৌ বাঁধি
রাধাবর বিরদ কে বারিধি মে বোরতো।

ভূষণ

এই সময়ে জাতিকে প্রবুদ্ধ করে তোলবার জন্য ওজস্বীময় কাব্যের প্রয়োজন হ'ল। শৃঙ্গাররসের অপেক্ষা বীররসের প্রয়োজন হ'ল বেশী। হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে আর একবার বীরত্বপূর্ণ কবিতার সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। মানবমনকে উদ্দীপ্ত করে তোলবার কর্ণধার হলেন ভূষণ ও লালের মত কয়েকজন কবি। বীরগাথা বা আদিকালের চন্দকবি ও জাগনিককে আর একবার মনে পড়ল। কিন্তু চন্দ-জাগনিকের বীররসে ও ভূষণ-লালের বীররসে পার্থক্য ছিল অনেক—চন্দকে জাগাতে হয়েছিল সুপ্ত নির্জীব একটি প্রাণকে—তাঁর আশ্রয়-দাতা রাজা পৃথ্বীরাজকে আর ভূষণকে জাগাতে হ'ল সমস্ত দেশের মুহ্যমান ভীতত্রস্ত জনতাকে—এই কারণে ভূষণের কাব্যে জাতীয়তা-বোধ হ'ল প্রধান বিষয়। 'শিবরাজ ভূষণ', 'শিবা-বাবনী' ও 'ছত্রসাল-দশক' হ'ল ভূষণের প্রধান কীর্ত্তি। এ তিনটি গ্রন্থ ছাড়া 'ভূষণ-উল্লাস', 'দূষণ-উল্লাস' ও 'ভূষণ-হজারা' নামে আরও তিনটি গ্রন্থ ভূষণ রচনা করেন। এইগুলির ভেতর 'শিবরাজ-ভূষণ' একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ। ভূষণ রীতিকালীন কবি, কাজেই কাব্যের অলঙ্কারের প্রতি তাঁকে ধ্যান দিতে হয়েছিল, কিন্তু ভূষণের অলঙ্কার ছিল ভাব-প্রকাশের সাধন মাত্র। যদিও রাজার আশ্রয়ে ভূষণ কবিকে তাঁর কাব্য-সাহিত্য নির্ম্মাণ করতে হয়েছিল কিন্তু তবুও লোক-রঞ্জন ও লোক-কল্যাণের দিকে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথম দিকে তিনি শুধু শৃঙ্গারিক কবিতার রচনা করে যান কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝলেন যে, যুগের হাওয়া অন্যদিকে বইছে, জনতা চায় এক নূতন জাগরণ, এক নূতন চেতনা ও উৎসাহ, কবির মনে হ'ল যে, শৃঙ্গারী কবিতার রচনা করে তিনি কাব্য-দেবীর অবমাননা

করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় কবিতার রচনায় তিনি কায়-মন সঁপে দিলেন। ভূষণ আপন আশ্রয়দাতাকে কবিতার নায়ক করলেন বটে, কিন্তু আশ্রয়দাতার আপন মনস্তুষ্টির জন্ম নয় : শিবাজী ও ছত্রসাল এলেন জননায়ক রূপে, জনতাকে জাগিয়ে তুলবার শক্তি যে রাজার মধ্যে আছে তাই তিনি সবার সামনে তুলে ধরলেন—'বিধায়ক পুরুষে। কী প্রশস্তি' রূপে রাজা সমাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন—রাজা আপনাকে নিয়ে বিব্রত নন, প্রজার্থে তিনি আপনার সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত—রাজার এই মহান, বিরাট রূপের ছবি তিনি আঁকলেন কাব্যের মধ্যে।

'ভূষণ' কবির উপাধি, ভূষণের আসল নাম আজও পর্য্যন্ত জানা যায় নি। পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্রের মতে এঁর নাম ছিল ঘনশ্যাম, সোলাঙ্কিরাজ হৃদয়রামের পুত্র রুদ্ররামের নিকটে ইনি 'ভূষণ' উপাধি লাভ করেন। কানপুরের তিকবাঁপুর নামক স্থানে এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বংশে এঁর জন্ম হয়। জন্মতারিখ নিয়ে নানা মত আছে—রামচন্দ্র শুক্ল বলেন যে, এর জন্ম ১৬৭০ সম্বতে ও মৃত্যু ১৭৭২ সম্বতে হয়। শিবসিংহ সেঙ্গরের মতে ইনি ১৭৩৮ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন, মিশ্রবন্ধুর স্থির বিশ্বাস যে, ১৬৯২ সম্বতেই ভূষণের জন্ম হয়। চিটনাস ও মীর গুলামের মতে ভূষণ মতিরামের ভাই ছিলেন। ভূষণ শিবাজী মহারাজ ও পন্নার মহারাজা ছত্রসালের আশ্রয়ে ছিলেন—প্রথমে ছত্রসালের রাজদরবারে এবং জীবনের শেষের দিকে শিবাজীর দরবারে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে যে, পন্নার মহারাজা ভূষণ কবিকে এত সম্মান করতেন যে, বিদায়ের সময়ে কবির পালকীতে কাঁধ দিয়েছিলেন—এই সময়ে ভূষণের উক্তি সর্ব্বজনবিদিত 'সিবা কো বখানো কৈ বখানো ছত্রসাল কো।' মহারাজ শিবাজীর দরবার এর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, শিবাজীও এই প্রতিভাসম্পন্ন কবিকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদান করেছিলেন ; শোনা যায় যে ভূষণের প্রতিটি ছন্দের জন্ম শিবাজী তাঁকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিতেন। ভূষণ নাকি একশো বৎসরের উপর বেঁচেছিলেন।

ভূষণকে জানতে হলে সেই যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। আকবর তাঁর বিচক্ষণ শাসন-নীতির দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজার মধ্যে বিশ্বাস, প্রেমের ভাব আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, আকবরের সাম্য-নীতিকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর পুত্র ও পৌত্র—জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান। হিন্দু ও মুসলমান এই সময়ে এক সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করছিল, কিন্তু পিতাকে বন্দী করে ও ভ্রাতাদের হত্যা করে শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হলেন, তখন দেশের আবহাওয়া গেল বদলিয়ে। ধর্ম্মভীরু বাদশাহ মুসলমান ধর্ম্মের গোঁড়ামীর জন্ত হিন্দু প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করে দিলেন, দেশে আবার আগুন জ্বলে উঠল। শাসকের অত্যাচারে পীড়িত হিন্দুজাতি সশঙ্কিত হয়ে পড়ল, কে দেবে তাদের শক্তি ও সাহস! পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দু প্রজাগণ মুসলমান শাসকের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠল। জাতীয়তা-বোধের সূত্রপাত এইখান থেকেই! একদিকে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসাল, অপর দিকে রামদাসের শিষ্য মারাঠা রাজ শিবাজীর নেতৃত্বে জাতীয়তা-বোধের চরম বিকাশ আরম্ভ হ'ল।

'শিবা-বাবনী, ভূষণের ৫২ ছন্দের সংগ্রহ। 'ছত্রসাল-দশক' বুন্দেলের রাজপুত শাসক ছত্রসালের উদ্দেশ্যে রচিত। ভূষণের রচনায় যুদ্ধ ও যোদ্ধার এমন নিখুঁত বর্ণনার প্রধান কারণ হ'ল ভূষণ যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ম নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সেখানকার প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হতেন। ভূষণের ভাষা শুদ্ধ ব্রজভাষা কিন্তু সুদূর দক্ষিণ ভারতে প্রচার করবার জন্ম শুদ্ধ সংস্কৃত ও বিদেশী ভাষার সংমিশ্রণে তাঁর রচনার ভাষা গড়ে উঠেছে। 'জিনকী গরজ' সুনে দিগ্গজ বেআব হোত, মদ হী কে আব গরকাব হোত গিরি হৈ।' বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণে ভাষা যেন আরও তেজোময় হয়ে উঠেছে। 'জঙ্গ', 'রাই', 'উমরাব', 'খলক', 'পীল' আদি বিদেশী শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়।

ভূষণের কবিতার উদাহরণ :

(ক) ডাঢ়ী কে রখৈয়ন কী ডাঢ়ী সী রহতী ছাতী।
বাঢ়ী মরজাদ জস হদ্দ হিন্দুবানে কো।
কঢ়ি গই রৈয়ত কে মন কী কসক সব,
মিটি গই ঠসক তমাম তুরকানে কো।

(খ) ছূটত কমান ঔর গোলী তীর বানন কে
মুশকিল হোত মুরচান হূ কী ওট মে।
তাহী সমৈ সিবরাজ হাঁকি মারি হল্লা কিয়ো ;
দাবা বাঁধি পরৈ হল্লা বীরবর জোট মে।

(গ) ঐল ফৈল খৈল ভৈল খলক মে গৈল-গৈল,
গজন কো ঠেল-পেল গৈল উসলত হৈ।
তারা সো তরনি ধারা মে লগত, জিনি
ধারা পর পারা পারাবার যোঁ হলত হৈ।

লাল কবি

লাল কবি বুন্দেলখণ্ডের প্রতাপী রাজা ছত্রসালের দরবারের রাজকবি ছিলেন এবং হিন্দী-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ 'ছত্রপ্রকাশে' ছত্রসালের জীবন-চরিত্রের বর্ণনা করেন। লালের পূর্ব্বপুরুষেরা অন্ধ্রদেশে বসবাস করতেন ও জাতিতে ভট্ট উপাধিধারী তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এর সম্পূর্ণ নাম ছিল গোরেলাল পুরোহিত। ছত্রসাল মহারাজার উদ্দেশ্যে লাল দশখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন কিন্তু 'ছত্রপ্রকাশ' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। কাব্য-গ্রন্থ হলেও 'ছত্রপ্রকাশ'কে বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস বলা যেতে পারে। বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের জন্ম, চম্পত রায়ের বীরত্ব, মোগলদের বিজয় অভিযান, ছত্রসাল কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও ছত্রসালের নিকট মোগলদের পরাজয়, এই সমস্ত ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনা 'ছত্রপ্রকাশে' আত্মপ্রকাশ

করেছে। লাল কবির রাষ্ট্র চেতনা যে কত গভীর ছিল তা' ছত্রসালের রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ছত্রসালের গুণগানে ব্যস্ত থাকলেও লাল কবি শিবাজী মহারাজার বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এতটুকু উদাসীন হ'ন নি এবং ছত্রসাল নিজে যে শিবাজীকে যথেষ্ট ভক্তি করতেন তার প্রমাণ লাল কবির রচনা থেকে পাওয়া যায়। ভূষণের মতই লাল যুদ্ধের সজীব বর্ণনা করেছেন। লালের প্রায় সমস্ত কবিতাই দোহা-চৌপাইতে লেখা। ভাষার স্বাভাবিক গতির জন্যই লালের কবিতা হৃদয়কে স্পর্শ করে, ছত্রসাল ও শিবাজীর তদানীন্তন ভারতের জননায়কের সম্মেলনের দৃশ্য কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না। ছত্রপ্রকাশে ১৭৬৪ সম্বত পর্যন্ত বুন্দেল রাজ্যের প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ পাওয়া যায়। রচনা-কৌশলে তুলসীদাসের রচনার পরেই লালের 'ছত্রপ্রকাশে'র স্থান। নাগরী প্রচারিণী সভা এই অনুপম গ্রন্থের প্রকাশ করেছেন। বরবৈ ছন্দে নায়িকা-ভেদের উল্লেখ করে 'বিষ্ণু-বিলাস' নামে লাল আর একটি গ্রন্থের রচনা করেন কিন্তু কাব্য ও ইতিহাস এই দুদিক থেকে হিন্দী সাহিত্যে 'ছত্রপ্রকাশে'র ন্যায় অন্য কোনও গ্রন্থ বড়ই দুর্লভ। ছত্রপ্রকাশ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হ'ল, এই থেকে আমরা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হব:

সুব' হৈব সুভ করন সিধায়ৌ। হিত সৌ পাতসাহ পহিরায়ৌ।
সঙ্গ বাইস উমরাও পঠাএ। লৈ মুগীন চম্পতি পৈ আএ।
জোরি ফৌজ মুডকরন বুন্দেলা। ঐরছ পর কীন্হৌ বগমেলা।
বাজত সুনৈ জুধ কে ডঙ্কা। উমরি চল্যো চম্পতি রণ বঙ্কা।

সূদন

মথুরার মাথুর চৌবে সূদন কবি ভরতপুর মহারাজা সুরজমলের দরবারী কবি ছিলেন। মহারাজার প্রকৃত নাম ছিল সুজানসিংহ —এবং এই জাট রাজা সুজানসিংহের উদ্দেশ্যে 'সূদন সুজান-চরিত্র নামক একটি ঐতিহাসিক কাব্যের রচনা করেন। বিশদ বর্ণনা, অপ্রয়োজনীয় আলোচনা, ব্রজভাষা, পাঞ্জাবী ও 'খাড়ী বোলী'র যথেচ্ছ ব্যবহারে এই রচনায় মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে। কোনও কোনও স্থানে বর্ণনা-ভঙ্গী অপূর্ব্ব হলেও সাহিত্যের দিক থেকে 'সুজান চরিত্র' এক সাধারণ স্তরের কাব্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সাতটি অধ্যায় আছে এবং প্রথমে ১২৫ জন কবির নাম উল্লিখিত হয়েছে। সূদন কবির রচনায় ধ্বনি-সমন্বিত প্রচুর শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—যেমন, 'ফড়কত', 'কড়কত' আদি। সূদনের কবিতার উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল—

চুহিত্ত চুহিত্ত কেস সুলুহিত ইক মহী,
জুহিত্ত ফুহিত্ত সাগ, সুমুহিত্ত তংগ গহী।
কুহিত্ত কুহিত্ত কায় বিছুহিত্ত প্রাণ সহী,
কুহিত্ত আয়ুধ, হুহিত্ত গুহিত্ত দেহ দেহী।

× × ×

হটৈ জহ জুহে উটৈ সাহি সেনা। মিলে জুদ্ধ কৌ
উদ্ধ কৈঁ বুদ্ধ নৈনা।
কহুঁ চাপ টঙ্কার হুঙ্কার পারি। কহু ধুক বন্দুক
সে জাল ঝারী।

চন্দ্রশেখর বাজপেয়ী

ভূষণ, সূদন ও লালের মত বাজপেয়ীজীও একজন রাষ্ট্রীয় কবি। পণ্ডিত মণিরামের পুত্র চন্দ্রশেখর প্রথম জীবনে রাজা মানসিংহের ও পরবর্ত্তী জীবন পাতিয়ালার মহারাজা কর্ণসিংহের দরবারে অতি-বাহিত করেন। 'হমীর হঠ' নামক কাব্য-রচনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই রচনা ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থের স্রষ্টা, যেমন, 'বিবেক-বিলাস', 'রসিক-বিনোদ', 'হরিভক্তি-বিলাস', 'নখশিখ', 'বৃন্দাবন-শতক', 'গৃহপঞ্চাশিকা', 'তাজক-জ্যোতিষ' এবং 'মাধবী-বসন্ত'। সাহিত্য-কলার ও শৃঙ্গার রসের অপূর্ব্ব সমাবেশে ও বীরত্ব-গাথার সমন্বয়ে 'হমীর-হঠ' হিন্দী সাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। রাজপুত বীর হামীরকে নিয়ে 'হমীর-হঠে'র বিষয় বস্তু—হামীরকে ভারতের একজন আদর্শ বীর ও যোদ্ধা রূপে উপস্থিত করা হয়েছে, তাঁর বীরত্বের সামনে মুসলমান শাসকদের বার বার হার মানতে হয়েছে, 'হমীর হঠে' সম্রাট আলাউদ্দীন একজন ভীরু শাসক, পৌরুষের লেশমাত্র নেই তাঁর চরিত্রে। এই গ্রন্থে অপভ্রংশ ও বীরগাথা কালের শৃঙ্গাররস সুষ্ঠুভাবে পরিবেশ করা হয়েছে। বাজপেয়ী কবির রচনায় যে গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বীতা ও শৃঙ্গার বর্ণনার প্রাচুর্য্য পাওয়া যায় তা নীচের কয়েকটি লাইন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

ভাগে মীরজাদে পীরজাদে ঔ অমীরজাদে,
ভাগে খানজাদে প্রাণ মরত বচায় কৈ।
ভাগে লচ বাজি রথ পথ ন সম্ভারে, পরৈ,
গোলন পৈ গোল, সুর সহমি সকায় কৈ।

×

পরম পাতসাহ কে পরম অনুরাগ রঙ্গী,
চাহ ভরী চায়ল চপল দৃগ জোরতী।
কাম-অবলা সী, কলাধার কী কলা সী,
চারু চম্পক-লতা সী চপলা সী চিত চোরতী।

চিন্তামনি ত্রিপাঠী

শিবসিংহ সেঙ্গর বলেন যে চিন্তামনি ত্রিপাঠী ভূষণ, মতিরাম ও জটাশঙ্করের আপন ভাই ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট মত-দ্বৈধ আছে। চিন্তামনি কাণপুরের তিকবাঁপুর নামক স্থানে এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বংশে ১৬৬০-১৭০০ বিক্রম সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। রীতিকালীন কবিদের মধ্যে চিন্তামনি বয়সে সকলের প্রবীণ ছিলেন। নাগপুরের সূর্য্যবংশীয় ভোসলা মকরন্দ শাহের দরবারের রাজকবি হিসাবে ইনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং এইখানেই মকরন্দ শাহের উদ্দেশ্যে 'ছন্দবিচারক' নামে বিখ্যাত পিঙ্গল গ্রন্থের রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি 'কাব্য-বিবেক', 'কবিকুল-কল্পতরু', 'কাব্যপ্রকাশ' ও

'রামায়ণ' নামে আরও চারিটি গ্রন্থের রচয়িতা। এই রচনাগুলির ভেতর কোনও কোনও স্থানে কবি তাঁর নিজের নাম 'মনিমাল' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

আচার্য্য রামচন্দ্র শুক্লের মতে প্রবীণ চিন্তামনিকে রীতিকালের প্রবর্ত্তক বলে মানা উচিত, কারণ এঁর পর থেকেই রীতিকালের বৈশিষ্ট্য প্রবাহ অবিরল বইতে থাকে। কেশব অলঙ্কারকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশী, চিন্তামনি কেশব-প্রতিষ্ঠিত অলঙ্কারে-ভূষিত কাব্য-প্রতিমার ভেতর রসের সঞ্চার করে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। কেশব 'দণ্ডী' ও 'রুয্যক' ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন নি, চিন্তামনি এবং পরবর্ত্তী কবিরা 'চন্দ্রালোক' ও 'কুবলায়নন্দ'-এর আশ্রয় গ্রহণে কাব্যের পূর্ণ আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়েছিলেন। রুদ্রশাহ সোলঙ্কী, বাদশাহ শাহজাহান এবং জৈমন্দী আহম্মদ এঁর রচনায় সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

মতিরাম

মতিরাম খুব সম্ভবতঃ চিন্তামনি ও ভূষণের ভাই ছিলেন। রীতিকালের রসসিদ্ধ কবিদের মধ্যে মতিরাম অন্যতম। তিকবাঁপুরে আনুমানিক ১৬৭৪ সম্বতে এঁর জন্ম হয়। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা মিশ্রবন্ধুদ্বয় এঁর 'কবিত্ব', 'সবৈয়া'য় মুগ্ধ হয়ে এঁকে হিন্দী নবরত্নের একজন বলে গণ্য করেছেন। এঁর রচনায় রসের, বিশেষ করে শৃঙ্গার রসের, এমন সহজ প্রবাহ অন্যত্র পাওয়া কঠিন। এই কবির রস-সম্বন্ধীয় রচনা 'রসরাজ' ও অলঙ্কার-সম্বন্ধীয় রচনা 'ললিত-ললাম' বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। মতিরাম বুঁদীর ও সোলাঙ্কির মহারাজার আশ্রয়ে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাব্য-দেবীর আরাধনায় অতিবাহিত করেন। মতিরামের রচনার বৈশিষ্ট্যই হ'ল ভাষার ঐশ্বর্য্য। রীতিকালের খুব কম কবিই এত সাবলীল ভাবে ভাষার ব্যবহারে সক্ষম হয়েছেন। মতিরামের ভাষায় শব্দের কোন আড়ম্বর নেই, আছে শুধু স্বচ্ছতা ও স্বাভাবিক গতি। অনুপ্রাসের স্পর্শে ও ভাব-ব্যঞ্জনার শক্তিতে মতিরামের রচনা আরও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। 'রসরাজ' ও 'ললিত-ললাম', 'ছন্দসার', 'সাহিত্য-সার' ও 'লক্ষণ-শৃঙ্গার'আদি রচনা বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'মতিরাম-সতসই' সাত-শো দোহার সংগ্রহ এবং আপন মাধুর্য্যে এই সতসই, বিহারী সতসই অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। কয়েক বছর আগে মতিরামের এই অমূল্য নিধির খোঁজ পাওয়া যায়। মতিরাম সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা মনে রাখতে পারি; যেমন তিনি শুদ্ধ ব্রজভাষায় রচনা করেছিলেন এবং তাঁর ভাষা রীতি-কালের অন্যান্য কবিদের ভাষা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। জাগতিক প্রকৃতির ওপর তাঁর বিশেষ নজর ছিল না, মানবীয় প্রকৃতিই ছিল তাঁর কাব্যের উপাদান। কবিত্ব ও সবৈয়া রচনার সঙ্গে সঙ্গে দোহা রচনাতেও তিনি যথেষ্ট সফলতা অর্জ্জন করেছিলেন। ভাষার সুগমতা ছাড়াও অর্থের গুরুত্বও ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

মতিরামের কবিতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল—যার থেকে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারব যে, কত সহজ ছিল তাঁর ভাব ও ভাষার গতি—

(ক) জানতি সৌতি অনীতি হৈ, জানত সখী সুনীতি।
গুরুজন জানত লাজ হৈ, পীতম জানত প্রীতি।

ভিখারীদাস

শ্রীবাস্তব কায়স্থ ঘরে ভিখারীদাসের জন্ম হয়। অবধের প্রতাপগড়ের টোংগা বা হোংগা গ্রামে এঁর বসবাস ছিল। কাব্যের সকল বিষয়েই ইনি বিশদভাবে আলোচনা করেন; ছন্দ, রস, অলঙ্কার, রীতি, গুণ-দোষ, শব্দ-শক্তি প্রভৃতি কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ যায় নি। এঁর 'কাব্য নির্ণয়' নামক গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। এখনও রীতিকালের বিশেষ জ্ঞান পাবার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রেরা এই গ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ করেন। 'কাব্য-নির্ণয়' ছাড়া 'রস-সারাংশ', 'ছন্দোর্ণব পিঙ্গল', 'শৃঙ্গার-নির্ণয়', 'নাম-প্রকাশ', 'বিষ্ণুপুরাণ-ভাষা (দোহা ও চৌপাইতে) 'ছন্দ-প্রকাশ', 'শতরঞ্জ-শতিকা', 'অমর-প্রকাশ'-এর রচয়িতা ভিখারীদাস। ১৭৮৫ থেকে ১৮০৭ বিক্রম সম্বতের মাঝখানেই তিনি এই সমস্ত কাব্যগুলি রচনা করেন। দাসজীর ভাষা সাহিত্যধর্ম্মী ও মার্জ্জিত। রুচিসম্পন্ন হবার কারণে তাঁর শব্দের বড় একটা আড়ম্বর নেই। আপন বিষয়বস্তু ও ভাব-প্রকাশনে তাঁর কবিতা কখনও সংসতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলে নি। দাসজীর আশ্রয়দাতা ছিলেন প্রতাপগড়ের রাজা পৃথ্বীরাজ সিংহের ভ্রাতা হিন্দু পতিসিংহ ভিখারী-দাসকে রীতিকালীন সাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান দেওয়া উচিত, কিন্তু তাই আজ যে সম্মান আমরা তাঁকে প্রদর্শন করি, তার চেয়ে হয়ত অনেক বেশী তাঁর প্রাপ্য। সমালোচক শুক্লজীর মতে ভিখারীদাস হিন্দী সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর কবিদের অন্যতম—

বাহী ঘরী তেঁ ন সান রহৈ, ন গুমান রহৈ,
ন রহৈ সুঘরাই
দাস ন লাজ কো আজ রহে, ন রহে তনকী
ঘরকাজ কী ধাঈ।

রসলীন

রসলীন একজন মুসলমান কবি, এঁর আসল নাম হ'ল সৈয়দ গুলাম নবী। ইনি পণ্ডিতগণের প্রসিদ্ধ স্থান হরদোঈ-এর বিলগ্রাম নামক গ্রামের অধিবাসী। এঁর দোহাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে রসের প্রাচুর্য্য আছে। ইনি ১৭৯৪ বিক্রম সম্বতে প্রসিদ্ধ রচনা 'অঙ্গদর্পণের' রচনা করেন। 'অঙ্গদর্পণে' অঙ্গের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং সেইজন্য কাব্যানুরাগীদের কাছে এই গ্রন্থ বিশেষ প্রিয়। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার এমন সুন্দর সমাবেশ খুব কম রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। 'রসপ্রবোধ' ১১৫৫টি দোহার সংগ্রহ এবং নায়িকা-ভেদ, বারহ-মাসা, ঋতু বর্ণনা, রস ও ভাবের সমাবেশ 'রস-প্রবোধ'কে একটি লঘু কাব্য-গ্রন্থ বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। এঁর দোহার ভাষা সুন্দর বর্ণনা প্রশংসনীয় ও

দর্শনীয়। হিন্দী-সাহিত্যে রসলীনের কয়েকটি দোহা বিহারীর ও কেশবের দোহার ন্যায় আজও অমর হয়ে রয়েছে :

(ক) অমিয়, হলাহল, মদভরে, সেত, স্যাম, রতনার।
জিয়ত, মরত, ঝুকি ঝুকি পরত, জেহি চিতবত ইক বার।

(খ) কুমতি চন্দ প্রতি দোস বঢ়ি, মাস মাস কঢ়ি আয়।
তুম মুখ-মধুরাই লখে ফীকো পরি ঘটি জায়।

(গ) রমণী-মন পাবত নহী লাজ প্রীতি কো অন্ত।
দুহু ওর ঐ'চ রহৈ, জিমি জুবনিন কো কন্ত।

তোষনিধি

প্রয়াগে শৃঙ্গবেরপুর নামক স্থানে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ছিল চতুর্ভুজ শুক্ল। ইনি 'সুধানিধি', 'বিনয়-শতক' ও 'নখশিখ' নামক তিনখানি গ্রন্থের রচনা করেন। ১৭৯১ সম্বতে সুধানিধি রচিত হয়, সুধানিধির মধ্যে রস ও ভাব-ভেদের আলোচনা পাওয়া যায়। কবি হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁর ভাষা সহজ ও ভাবের মধ্যে সরসতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

দূলহ

কালিদাস ত্রিবেদীর পৌত্র ও উদয়নাথ কবীন্দ্রের পুত্র দূলহ কেবল একশোটি পদের রচনা করে রীতিকালের কবিদের মধ্যে স্থান অধিকার করেন। কোন সমালোচকের মতে দূলহ রায়ের মত ভাগ্য পাওয়া দুর্লভ। 'ঔর বরাতী সকল কবি, দূলহ দূলহ রায়।' এঁর রচনাকাল ১৮০০ থেকে ১৮২৫ বিক্রম সম্বতের ভেতর। আপন রচনা সম্বন্ধে এঁর যথেষ্ট গর্ব্ব ছিল, তার প্রমাণ নিজের পদটি থেকে পাওয়া যায় :

'জো যা কণ্ঠাভরণ কো, কণ্ঠ করৈ চিত লায়।
সভা মধ্য সোভা লহৈ, অলঙ্কৃতী ঠহরায়।

কবিত্ত ও সবৈয়ায় রচিত 'কবিকুল-কণ্ঠাভরণ' এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দূলহ কবির প্রতিভা, সুন্দর কল্পনা, অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা প্রত্যেকে উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। একই পদে লক্ষণ ও উদাহরণের সমাবেশ এত সুন্দর ভাবে আর কোনও কবি করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। দূলহ কবির ভাষার মধ্যে ছিল এক সহজ গতি, কিন্তু এ সবকিছুর জন্যই তিনি পণ্ডিত পিতা ও পিতামহের কাছে শিক্ষালাভ করেন।

রঘুনাথ

কাশীর মহারাজা বরীবন্ত সিংহের দরবারে কবি রঘুনাথের বিশেষ খ্যাতি ছিল। গোকুলনাথ ও গোপীনাথ এঁরই পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। শিবসিংহ সেঙ্গরের মতে ইনি পাঁচটি গ্রন্থের রচনা করেন—'কাব্য-কলাধর', 'রসিক-মোহন,' 'জগত-মোহন এবং ইশক-মহোৎসব' তাদের ভেতর অন্যতম। 'রসিক-মোহন' অলঙ্কার ও রসের গ্রন্থ। 'কাব্য-কলাধর' নায়িকা-ভেদ বর্ণনায় অপূর্ব্ব, 'জগত-মোহন'এ ভগবান কৃষ্ণকে এক প্রতাপী রাজার রূপে অঙ্কিত করে তাঁর রাজোচিত কার্য্যাবলীর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পশুপক্ষী, শতরঞ্জ খেলা থেকে রাজনীতি ও যুদ্ধ অর্থাৎ রাজার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে রঘুনাথ কবি 'জগত-মোহন' এর রচনা করেন। 'ইশক-মহোৎসব'এ আমরা 'খড়ী-বোলীর প্রয়োগ দেখতে পাই। রঘুনাথের রচনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :

গ্বাল সঙ্গ জৈবো, ব্রজ গৈয়ন চরৈবো ঐবো,
অব কহা দাহিনে যে নৈন ফরকত হৈঁ।
মোতিন কী মাল বারী ভারোঁ গুঞ্জমাল পর
কুঞ্জন কী সুধি আএ হিয়ো ধরকত হৈ।

* * *

মেরে তো লায়ক জো থা কহনা সো কহা মৈনে,
রঘুনাথ মেরী পীত ন্যায় হী কো গাবেগী।
বহ মুহতাজ আপকী হৈ, আপ উসকে ন,
আপ ক্যোঁ চলোগে ? বহ আপ পাস আবৈগী।

বেণী বন্দীজন ও বেণী প্রবীণ

রায় বেরেলী জেলার বেন্তী নামক স্থানে এঁর নিবাস ছিল এবং অবধের প্রসিদ্ধ উজির টিক্যায়ত রায়ের আশ্রয়ে এঁর কাব্য প্রতিভা বিকাশ হয়। হাস্যরসে ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বেণী কবি অন্যতম। হিন্দী সাহিত্যের পাঠকবর্গের কাছে এখনও এই কবির রচনা হাসির খোরাক জোগায়।

বেণী প্রবীণের নিবাসস্থান লক্ষ্ণৌতে ছিল ও বাজপেয়ী ব্রাহ্মণ বংশে এঁর জন্ম হয়। 'নবরস-তরঙ্গ' নামে এঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিছুদিন হ'ল প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই গ্রন্থটির নাম নবরস-তরঙ্গ কিন্তু এর মধ্যে আমরা শৃঙ্গার ও নায়িকা ভেদের বর্ণনা বিশেষ রূপে পাই। শৃঙ্গাররস ছাড়া অন্যান্য রসের বিশদ ভাবে আলোচনা নেই। এই গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এর থেকে আমরা তদানীন্তন কালের ধনী সম্প্রদায়ের ভোগ-বিলাস, আচার-ব্যবহারের অনেক কিছু জানতে পারি। এঁর রচনা ব্রজভাষায় এবং রীতি কালের প্রসিদ্ধ কবিদের অপেক্ষা এঁর ভাষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

গ্বাল, কুলপতি মিশ্র ও সেনাপতি

মথুরার এই ব্রহ্মভট্ট কবি উৎকৃষ্ট রীতি-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। 'রসিকানন্দ', 'রসরংগ', 'কৃষ্ণজুকা নখশিখ' এবং 'দূষণ-দর্পণ' তাদের মধ্যে প্রধান; এইগুলি ছাড়া 'গোপী-পচীসী', 'রামাষ্টক', 'কৃষ্ণাষ্টক', সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার উদ্যোগে এঁর রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এঁর পিতার নাম ছিল সেবারাম ও রীতিকালের পূর্ণ প্রভাবে ইনি প্রভাবান্বিত। ষড়ঋতুর ও তৎকালীন যুগের ঐশ্বর্য্য-বৈভবের সুন্দর বর্ণনা গ্বাল কবির রচনা থেকে পাওয়া যায়।

মিশ্রজী জাতিতে চৌবে ছিলেন এবং রীতিকালের মহাকবি বিহারীর ভাগনেয়। মহারাজা জয়সিংহের পুত্র মহারাজা রাম

সিংহের দরবারের ইনি রাজকবি ছিলেন। এঁর রস-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'রস-রহস্য' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এ ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচনা করেন, যাদের মধ্যে 'দ্রোণ-পর্ব্ব', 'মুক্তি-তরঙ্গিনী' 'নখ-শিখ', 'সংগ্রহ-সার' ও 'গুণ-রস-রহস্য' প্রধান। এ সবক'টি গ্রন্থই ১৬২৪ থেকে ১৭৪৩ সম্বতের ভেতর রচিত হয়।

সেনাপতির জন্ম ১৬৪৬ সম্বতের কাছাকাছি হয়। প্রথম জীবনে সেনাপতি কবি রাজ্যাশ্রয়ে অতিবাহিত করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই এঁকে অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস সহ্য করতে হয় ও জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামের উপাসনায় কাটিয়ে দেন। সেনাপতি কবির রচনা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী, শ্লেষ, শব্দধ্বনি, অনুপ্রাস যমকাদির সমন্বয়ে সবল সহজ ব্রজভাষায় লিখিত এঁর রচনা প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়কে অতি অল্প সময়ের ভেতর জয় করে ফেলে—কারণ হৃদয়ের ভক্তি ও ভাব উজাড় করে সেনাপতি কবি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর রচনা। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, 'সব কবি কান দে সুনত কবিতাই হৈ।' ছয় ঋতুর এমন অনুপম বর্ণনা বোধ হয় আর কোথাও দুর্লভ। উদ্দীপন ও অবলম্বন দুই রূপেই ইনি ঋতুকে গ্রহণ করেছেন বলে বোধ হয় এঁর বর্ণনা আরও উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

'কবিত্ব-রত্নাকর' এঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'কবিত্ব রত্নাকর' ছাড়া 'কল্পদ্রুম' নামে এঁর আর একটি উৎকৃষ্ট রচনা পাওয়া যায়। কবি সেনাপতির মত প্রকৃতির এমন সুন্দর বর্ণনা রীতিকালের আর কোন কবি বোধ হয় করতে পারেন নি—সেনাপতির রচনার কয়েকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল—

ঘন সোঁ গগন ছপ্যো, তিমির সঘন ভয়ো,
দেখি ন পরত মানো রবি গয়ো খোয় কৈ।
চারি মাস ভরি, শ্যাম নিসা কো ভরম মানি,
মেরে জান যাহী তেঁ রহত হরি সোচ কৈ।

সেনাপতি কবি আপন বংশ পরিচয় ও নিবাসস্থান সম্বন্ধে বলেছেন—

দীক্ষিত পরশুরাম দাদা হৈঁ বিদিত নাম,
জিন কানহেঁ জজ্ঞ, জাকী বিপুল বড়াঈ হৈ।
গঙ্গাধর পিতা গঙ্গাধর কে সমান জাকে,
গঙ্গাতীর বসতি 'অনূপ' জিন পাঈ হৈ।
মহা জানমনি, বিদ্যাদান হু মে চিন্তামনি,
হীরামনি দীক্ষিত তেঁ পাই পণ্ডিতাঈ হৈ।
সেনাপতি সোঈ, সীতাপতি কে প্রসাদ পাকী,
সব কবি কান দৈ সুনত কবিতাঈ হৈ।

আলম শেখ

এই সব কবি ছাড়া কয়েকজন কবি রীতিকালের বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত হয়ে সাহিত্য-সমৃদ্ধি বাড়িয়ে চলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বোধা, সম্মন, পজনেস, দ্বিজদেব, নীরদ, দীনদয়াল, গিরি, নীরদ, গিরিধর কবিরাজ, ঠাকুর, প্রতাপসাহী ও ঘন-আনন্দ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বোধা, ঠাকুর, ঘন-আনন্দ—এ তিনজনই ছিলেন প্রেমের কবি—প্রেমের বানে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক এঁদেরই একজন সমসাময়িক কবি—আলম; হয়ত আলমের প্রেমমন্ত্রে এঁরা অজ্ঞাতসারে দীক্ষা নিয়ে বসেছিলেন। আমরা জানি যে, রীতি-কালে পার্থিব প্রেমে আপনাকে উজাড় করে দেওয়াই ছিল কবিদের বৈশিষ্ট্য। আলমের জীবনে প্রেমের উজান স্রোত বইয়ে দিয়েছিল তাঁরই জীবন-সঙ্গিনী শেখ। শেখ নিজেও কবিতা লিখতেন। শেখ আলমের জীবনে একাধারে ছিল লয়লা, শিরিন ও উমরখৈয়ামের সাকী! শেখের কাজ ছিল কাপড় রঙ করা। একবার আলম তার মাথার পাগড়ীটা রঙ করবার জন্য শেখের কাছে পাঠান—ভুলে ঐ পাগড়ীটার মধ্যে আলমের লেখা দোহার একটা লাইন শুদ্ধ একটা কাগজ চলে যায়—লাইনটাতে লেখা ছিল—'কনক ছরী সী কামনী, কাহে কো কটি ছীন।' রঙ করতে নিয়ে শেখ সেটা দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরের লাইনটা লিখে ফেলে, 'কটি কো কঞ্চন কাঢ়ি বিধি, কুচন মধ্য ধরি দীন'—ব্যস, তার পর আর কি? প্রেমে-পাগল আলম মনে-দেহে পাগল হয়ে উঠল শেখকে পাবার জন্য। ব্রাহ্মণ হয়েও মুসলমানী শেখকে বিয়ে করে ফেলল। এঁরা দুজনা এক সঙ্গে অনেক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু সব স্থানে আসল নাম গোপন করে উপনাম ব্যবহার করেছেন—আলম ও শেখ।

'মাধবানল-কামকন্দলা', 'আলম-কেলী', 'শ্যাম-সনেহী' ও 'সুদামা-চরিত্র' নামে চারিটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আলম কবির রচিত। এদের মূল বিষয় বস্তু প্রেম। ৫২ সম্বতের নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকায় পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ 'আলম কী নিধিয়া' নামক লেখাতে আলম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। পরশুরাম চতুর্ব্বেদীর মতে 'মাধবানল কামকন্দলা' আলমের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা। আলমের প্রেমের বাণীতে যে কোন কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, বিহ্বলতা ও কোমলতার আবেশে ভরপুর হয়ে ওঠে, তাই বোধ হয় সেই যুগের অন্যান্য কবিরা এবং আজও এই কবির প্রেমকে আদর্শ প্রেম বলে মেনে নিয়েছে—

'আলম ঐসী প্রীতি পর, সরবস দীজৈ বার।
প্রগট আঁখিয়ন মিলৈ, দিয়ে কপট পর ভার।

রামচন্দ্র শুক্ল আলম সম্বন্ধে বলেছেন—

"আলম রীতিবদ্ধ রচনা করনেবালে কবি নহী থে। যে, প্রেমোন্মত্ত কবি থে ঔর অপনী তরঙ্গ কে অনুসার রচনা করতে থে। ইসী সে ইনকী রচনাওঁ মে হৃদয় তত্ত্ব-কী-প্রধানতা হৈ। 'প্রেম কী পীর' যা 'ইশ্ক কা দর্দ' ইনকে এক এক বাক্য মে ভরা পায়া জাতা হৈ...শৃঙ্গাররস কী ঐসী উন্মাদময়ী উক্তিয়া ইনকী রচনাওঁ মে মিলতী হৈঁ কি পঢ়নে বালে ঔর সুননেবালে লীন হো জাতে হৈঁ।..."

আলমের প্রেমের মধ্যে এমন একটা মহিমা ছিল যে সবাইকে

আকৃষ্ট করত। দক্ষিণ সাগরের কূল হতে বাতাস যেমন মর্ম্মরধ্বনি জাগায়, তেমনি আলমের নায়িকার চোখের চাওয়ায় হাসির সাড়া ওঠে জেগে, আবার বিষণ্ণ-মেদুর দৃষ্টিতে স্তিমিত আলোকের নিভৃত প্রান্তে সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসের পরম অন্ধকার ঘনায়, আবার বর্ষণ ব্যাকুল রাত্রির মত অশ্রু-ধারা বরিষণে হৃদয়ের মুক্ত বেদনা মুক্তার মত ঝরে পড়ে—

"সূরত চিরাগ রোশনাই আশনাই বীচ,
বার বার বরৈ বলি জৈসে পরবানা হৈ।
দিল সে দিলাসা দীজৈ হাল কে ন খ্যাল হূজৈ;
বেখুদ ফকীর বহ আশিক দিবানা হৈ।"

ঘন-আনন্দ ও বোধা

আগেই বলেছি যে বোধা ও ঘন-আনন্দ আলমের 'প্রেমে' অনুরাগী ছিলেন। রীতিকালের কাব্যকে যে সব কবি প্রেমরসে সিঞ্চিত করেছেন তাঁদের মধ্যে ঘন-আনন্দ অন্যতম। প্রেম-কবি আলমের মত ইনিও ছিলেন পাগল-প্রেমিক। ১৬৪৬ বিক্রম সম্বতের কাছাকাছি এর জন্ম হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ মোহম্মদ শাহের মীর মুন্সী নামে ইনি বিশেষ পরিচিত। কথিত আছে যে, একবার মোহম্মদশাহের দরবারে এঁকে গাইতে অনুরোধ করা হয়। ঘন-আনন্দের ছিল ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ। ঘন-আনন্দ রাজী হলেন একটি সর্ত্তে—তাঁর সর্ত্ত হ'ল যে তাঁর প্রেমিকা বারবণিতা সুজানকে সভায় ডেকে আনতে হবে। রাজাজ্ঞাকে সুজান প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সুজান সভায় এলে ঘন-আনন্দ প্রেমিকা সুজানের দিকে চেয়ে গাইতে আরম্ভ করলেন। বাদশাহ রইলেন ঘন-আনন্দের পেছনের দিকে। আপন প্রিয়াকে সম্মুখে পেয়ে কবি মন-প্রাণ দিয়ে গেয়ে চললেন। সবাই ঘন-আনন্দের অপূর্ব্ব কণ্ঠের অপরূপ গান শুনে মুগ্ধ, কিন্তু ঘন-আনন্দ বাদশাহের কাছ থেকে সেদিন সম্মান না পেয়ে পেলেন অভিসম্পাত। বাদশাহের দিকে পিছন ফিরে গাইবার জন্য তিনি বাদশাহকে অবমাননা করেছেন, এই অন্যায়ের শাস্তি তাঁকে পেতে হ'ল। ঘন-আনন্দকে দিল্লী শহর থেকে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হল—শহর ছেড়ে যেতে তাঁর এতটুকু দুঃখ ছিল না কারণ তাঁর বার বার মনে হ'ল যে, যে নারীর জন্য তিনি এই শাস্তি ভোগ করতে চলেছেন সে নিশ্চয় ছুটে আসবে তাঁর পথের সঙ্গিনী রূপে। কিন্তু ঘন-আনন্দের সে ব্যর্থ আশা। সুজান ঘন-আনন্দের এই আন্তরিকতাকে গ্রাহের মধ্যে আনল না। প্রেমের এতবড় আঘাত কবিকে সহ্য করতে হ'ল, আর সেই আঘাতই হ'ল ঘন-আনন্দের প্রেম কাব্যের মূল উৎস। শেষ পর্য্যন্ত ইনি বৃন্দাবনে গিয়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেন। এই সময়ে ভারতে নির্ম্মম নাদিরশাহের লুঠতরাজ সুরু হয়—নাদিরশাহের সিপাহীরা দিল্লী ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে—ঘন-আনন্দও এই পৈশাচিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পান না; নাদিরশাহের সিপাহীরা একদিন তাঁর কাছ থেকে ধনদৌলত পাবার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহ আক্রমণ করে, ঘন-আনন্দ তিন মুঠো বৃন্দাবনের 'রজ' দিয়ে বলেন যে এর চেয়ে বড় দৌলত তারা কি আশা করতে পারে—সিপাহীরা ভীষণ ক্রোধে ঘন-আনন্দকে আঘাত করে ও তাঁর একটি হাত কেটে ফেলে; কথিত আছে যে, ঘন-আনন্দ মরবার সময় নিজের রক্ত দিয়ে নীচের ছন্দটি লিখেছিলেন—

'বহুত দিনান কী অবধি আসপাস পরে,
খরে অরবরনি ভরে হৈঁ উঠি জান কো।
কহি কহি আবন ছবীলে মন-ভাবন কো,
গহি গহি রাখতি হী দৈ দৈ সনমান কো।

প্রেমের প্রত্যাখ্যানই ঘন-আনন্দ বিয়োগ শৃঙ্গার রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং মুক্তক-কাব্য রচনায় হিন্দী সাহিত্যের অন্য কোনও কবি এঁর মত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ঘন-আনন্দের সমালোচনা করতে গিয়ে বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্র বলেছেন—

"ঘন-আনন্দ বস্তুতঃ প্রেম কে পপীহে থে।...ইনকী রচনাওঁ মে বিয়োগ কী অন্তর্দশাওঁ, প্রেম কী অনেকানেক অন্তর্বৃত্তিয়োঁ, রূপ ব্যাপার কে বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রোঁ, ভাষা কী বংগোক্তময়ী শক্তিয়োঁ, বিরোধ কী চমৎকারোৎপাদক উক্তিয়োঁ আদি কা ঐসী গম্ভীরতা কে সাথ বিধান কিয়া গয়া হৈ কি 'নেহ কী পীর' কো 'হিয় কী আঁখোঁ' সে 'দেখনেবালে হী ইসে ভলী ভাঁতি সমঝ সকতে হৈঁ।"

রাজাপুরের ব্রাহ্মণ বংশে বোধার জন্ম হয়। পান্নার দরবারে এঁর কাব্যচর্চ্চা আরম্ভ হয়। এই দরবারের প্রসিদ্ধ বারবণিতা সুজানের প্রতি বোধা আসক্ত হ'ন; কিন্তু কবির মনে হয় যে এক জন বারবণিতার প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি ভীষণ অন্যায় করেছেন এবং একদিন পান্নার দরবার থেকে পালিয়ে নিজেকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবেন ঠিক করে ফেললেন। বোধা পালিয়েও গেলেন, কিন্তু সুজনকে ভুলতে পারলেন না এবং প্রায় এক বছর পরে আবার ফিরে এলেন—এবার লোকালয়ের বাইরে অজ্ঞাত ভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময়ে বোধা তাঁর প্রসিদ্ধ 'প্রেম-কাব্য' 'বিরহ-বারীশে'র রচনা করেন। বোধার মতে লৌকিক ও অলৌকিক প্রেমে কোন প্রভেদ নেই এবং ব্রজরাজ কৃষ্ণকে ইনি নিজের প্রিয়তম বলে মানতেন। 'বিরহ-বারীশ' ছাড়া ইনি 'ইস্ক-নামা' নামে আরও একটি প্রেম-কাব্যের রচনা করেন।

বোধা সম্বন্ধে শুক্লজী বলেন—

"বোধা এক রসোন্মত্ত কবি থে, ইসসে ইন্হোনে কোই রীতি গ্রন্থ ন লিখকর অপনী মৌজ কে অনুসার ফুটকল পদ্যোঁ কী রচনা কী হৈ।"

বিশ্বম্ভরলালের মতে "বোধা কুছ নয়া রংগ-ঢংগ লেকর চলনে বালে স্বচ্ছন্দ গায়ক থে।"

"কবি বোধা অনী ধনী নেযহু তেঁ চঢ়ি তাপৈ ন চিত্ত ডরাবনো হৈ।
বহ প্রেম কো পন্থ করাল মহা তরবারি কী ধার পৈ ধাবনো হৈ।

ইংরেজ-আদিবাসী সংঘর্ষের এক অধ্যায়

শ্রীঅণিমা রায়

সম্প্রতি সারা ভারত জুড়ে ১৮৫৭ সনের সিপাইবিদ্রোহের শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উৎসাহের আতিশয্যে কেহ কেহ এই বিদ্রোহকে ইংরেজ বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বললেন—কেহ কেহ গণযুদ্ধ নামে অভিহিত করলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহটি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহও নয় এবং এটি গণযুদ্ধও নয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা এ বিদ্রোহে প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল এবং এই দুইটি প্রদেশেরও সমস্ত লোক এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। সেদিন এই বিপ্লবটি সত্য যদি জনযুদ্ধ হ'ত তা হলে ইংরেজ-রাজশক্তি সেই সময়েই ভারতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তখন উড়োজাহাজ ছিল না। আর ইংলণ্ড থেকে ভারতে সৈন্য আনতে হলে ছয় মাস সময় লাগত। একদল ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা ইংরেজ আর একদল ভারতীয় সৈন্যের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। আর সিপাহীদের এই যুদ্ধ ইংরেজের শোষণনীতির বিরুদ্ধে হয় নাই। তাদের ধর্মে আঘাত দেবার জন্য এ বিদ্রোহ হয়েছিল। ইহাকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে—জনযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম কতটা বলা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সিপাইবিদ্রোহের ন্যায় ছোট বড় বহু বিদ্রোহ বা সংগ্রাম ইংরেজ ভারতে আসবার পর থেকেই ভারতের নানাস্থানে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সিপাইবিদ্রোহকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা কতটা সঙ্গত তা বলা কঠিন।

ভারতীয় আদিবাসীরা কিন্তু বার বার ইংরেজের শোষণনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং নিজেদের অধ্যুষিত স্থানগুলিকে ইংরেজ-কবলমুক্ত করবার চেষ্টা করেছে। যে উপজাতীয় গোষ্ঠী যখন বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে উপজাতীয় সমস্ত পুরুষই যুদ্ধে যোগদান করেছে। এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণযুদ্ধ বলা উচিত। ১৭৪৪ সনের খাসিবিদ্রোহ, ১৭৭২ সনের মাল পাহাড়িয়া-বিদ্রোহ, ১৭৭৮ সনের নাগাবিদ্রোহ, ১৮৩১ সনের সিংভূমে "হো"-বিদ্রোহ, ১৮৪৬ সনের খন্দবিদ্রোহ এবং ১৮৫৫ সনের সাওতালবিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ের উপজাতীয় সংগ্রাম এই পর্য্যায়ে পড়ে। এগুলি খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ, কিন্তু এগুলি সত্য সত্যই গণসংগ্রাম। অগ্রসর ভারতীয় সমাজের সংগ্রামের মত এই উপজাতীয় অনগ্রসর সমাজের ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধারণের মধ্যেও দেশপ্রেম ও গোষ্ঠীপ্রেমের প্রেরণা ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে উদয় হয়। ইংরেজ রাজশক্তি বা ইংরেজ বণিকের দল ভারতে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অগ্রসর সমাজের হাজার হাজার লোক ইংরেজের সহযোগিতা করে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। অগ্রসর সমাজের এই দল অন্য ভারতীয়দের ইংরেজ দূরীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। এই তথাকথিত "সভ্য" ভারতীয় দল ইংরেজের সেনাবিভাগ ও পুলিস বিভাগে দলে দলে চাকরী নিয়ে ইংরেজের শোষণনীতির পথ সুগম করে দিয়েছিল। 'অসভ্য' আদিবাসী এই সব দেশদ্রোহী কার্য্যাবলী থেকে সর্বদা দূরে থেকেছে। 'অসভ্য' আদিবাসীর শৌর্য্য, বীর্য্য ও দৈহিকশক্তি সভ্য ভারতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী থাকা সত্বেও ইংরেজ রাজশক্তি এই স্বাধীনতা-প্রিয় অসভ্য আদিবাসীসমাজ থেকে ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করতে সাহস করে নি।

১৭৭২ সালে কয়েকটি বাঙালী জমিদার রাজমহলের পাহাড়িয়া-দের মধ্যে ইংরেজের শোষণনীতি চালাতে সুরু করার ফলে এই সব জমিদার ও পাহাড়িয়াদের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ হয় এবং পাহাড়িয়ারা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা একযোগে ইংরেজের দালাল এই জমিদারদের উপর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের ইংরেজ-প্রণীত আইনের বাহিরে বলে ঘোষণা করে। তখন একদল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বহু আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাহাড়িয়া দমনের জন্য জমিদারদের সাহায্যার্থে যায়। এই পাহাড়িয়া সংঘর্ষে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পরাজিত হয়। এর পর ইংরেজ সেনাপতি পাহাড়িয়া-দের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। পাহাড়িয়াদের বার্ষিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করে এবং পাহাড়িয়া সর্দারদের পঞ্চায়েত শাসন স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজ কোন রকমে সেখান থেকে সরে আসে।

১৯৩৮ সনে ইংরেজ রাজ সাওতালদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাসভূমি ঠিক করে দেন। তার পর ইংরেজের বহু কর্মচারী, ঠিকাদার, হিন্দুমহাজন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ্যবিক্রেতার দল সাওতাল অঞ্চলে আবির্ভূত হয়। এই সব লোকেরা ইংরেজ প্রবর্তিত বন-আইন, রাজস্ব-আইন এবং আবগারী নীতি প্রভৃতি প্রচলিত করে সাওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয় করে তোলে। এর ওপর হিন্দুমহাজনের উৎপাতে সাওতালেরা তাদের চাষের জমি পর্য্যন্ত হারাতে বসে। এই ব্যাপারে কিছুকাল যাবৎ সাওতালদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্রমে ১৮৫৫ সনে সাওতালদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে উঠে এবং সমস্ত সাওতাল এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। বহু হিন্দু এবং ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাকে সাওতালেরা হত্যা করে ফেলে। তার পর সশস্ত্র ইংরেজবাহিনী সাওতালবিদ্রোহ দমনের জন্য তথায়

উপস্থিত হয়। ধনুর্ব্বাণ ও কুঠারধারী সাওতালের দল সাহস ও পরাক্রমের সহিত ইংরেজের কামান বন্দুকের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় দশ হাজার সাওতাল নিহত হবার পর সাওতালদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

১৮৩১ সনে ছোটনাগপুরে সমস্ত আদিবাসীর মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠে। এখানেও সশস্ত্র ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যবাহিনী গিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহটিকে ইতিহাসে কোলবিদ্রোহ বলে। বহু আদিবাসী এই বিদ্রোহে নিহত হয়।

১৭৮৯ সনে, ১৭৯৯ সনে, ১৮০৭ সনে, ১৮১২ সনে এবং ১৮১৯ সনে মুণ্ডারা বার বার ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। অবশ্য তাদের অস্ত্র ছিল ধনুর্ব্বাণ, লাঠি ও কুঠার। ইংরেজ সেনাবাহিনী প্রত্যেকবারই কামান ও বন্দুকের সাহায্যে মুণ্ডা-বিদ্রোহ দমন করে। সম্মুখ সমরে নিহত হাজার হাজার মুণ্ডার রক্তে বনজঙ্গল লাল হয়ে গিয়েছিল, তখনকার মত তারা পরাজিত হয়েছিল বটে—কিন্তু তাদের মন কোনদিনও পরাজয় স্বীকার করে নি।

এই ভাবে ভারতের নানাস্থানে আদিবাসীর বাসভূমি পাহাড় ও ও জঙ্গল ইংরেজের কবলমুক্ত করবার জন্ত হাজার হাজার আদিবাসী কামান-বন্দুকের সামনে কুঠার ও ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল করে সম্মুখ সমরে লড়েছে। কত যে অসংখ্য বীর এই সব স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মবলি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ স্বাধীন ভারতের ছোট বড় কত শহীদের মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হচ্ছে, কত শহীদের স্মৃতিপূজা চলছে, কিন্তু বনজঙ্গলের এই শহীদের দল—যাঁদের বীরত্বের তুলনা হয় না—তাঁদের অপূর্ব্ব কাহিনী 'সভ্য' সমাজের বাবুরা চিন্তার মধ্যেও আনেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যদি এই অধ্যায়টি বাদ পড়ে, তা হলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লজ্জার বিষয় যে, এই সব সংগ্রামে আদিবাসীরা অগ্রসর সমাজের নিকট কোন সাহায্য ত পায়ই নি—শুধু বিরোধীতা পেয়েছিল।

কংগ্রেসের নেতৃত্বলাভ করার পর মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই জাতি-গঠনমূলক কার্য্যে মন দেন। তাঁর পূর্ব্বে ভারতীয় বিপ্লবীদল হিংসা-নীতির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে দেশটিকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় বারবার বিফল হয়েছিলেন। মহাত্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে, সমস্ত জাতীয় দুর্ব্বলতা দূর করতে হবে এবং জাতিটিকে একতাবদ্ধ করে নিতে হবে। তাই তিনি গোড়াতেই মাদকতাবর্জন, অস্পৃশ্যতাবর্জন, চরকা প্রভৃতি গঠন-মূলক কার্য্যে মন দেন এবং অহিংসানীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজ এই গঠনমূলক অহিংস-আন্দোলনকেও সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং তার জন্ত মহাত্মা ও তাঁর অনুচরবর্গকে ইংরেজ-আদালতে ও রাজপুরুষের হাতে বার বার লাঞ্ছিত হতে হয়। ইংরেজের এই অহৈতুকী অত্যাচারে সমস্ত জাতটি কিন্তু ধাপে ধাপে শক্তিসম্পন্ন হতে থাকে এবং একতাবদ্ধ হয়। মহাত্মার সেদিনকার সমাজসংস্কারের রূপ তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি প্রায় ঢেকে ফেলেছিল।

বারংবার সশস্ত্র বিদ্রোহে নিষ্ফল হবার পর আদিবাসী সমাজেও বহু সমাজসংস্কারক আবির্ভূত হন। তাঁদের চেষ্টায় আদিবাসী বহু দুর্নীতি ও কুসংস্কার বর্জন করে এবং জাতীয়তা দেশাত্মবোধের প্রেরণা পায়।

১৯১৪ সনে যাত্রাভগত নামে একটি ওরাও যুবক ওরাও সমাজের যাবতীয় দুর্নীতি পরিত্যাগ করবার জন্ত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার ওরাও তাঁর অনুগামী হয় এবং মদ্যপান, ডাইনীতন্ত্র, ভূতপূজা ও যৌন অশুচিতা প্রভৃতি দোষ হইতে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে। এই আন্দোলন টানাভগত আন্দোলন বলে পরিচিত হয়। ইংরেজ রাজ এই আন্দোলনটিকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং এই আন্দোলন বন্ধ করে দেবার জন্ত যাত্রাভগত ও তাঁর অনুগামী বহু লোককে গ্রেপ্তার করেন। ফল কিন্তু উল্টা হয়েছিল। এই অত্যাচারে টানাভগত-আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগল এবং ওরাও ও অন্তান্ত উপজাতি সমাজের বর্দ্ধিত নৈতিক শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রযোজিত হবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

১৯৩৬ সনে বাদলশাভাই নামে একজন সমাজসংস্কারক গন্দ-সমাজে আবির্ভূত হন। ইনিও গন্দ সমাজের নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন এবং গন্দেরা দলে দলে তাঁর অনুগামী হয়। শিক্ষাবিস্তার, মদ্যপানবর্জ্জন, নারীর সম্মান রক্ষা এবং ভূতাদি কুসংস্কারবর্জ্জন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এর জন্ত বাদলশাভাই ইংরেজের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েন এবং গন্দ সমাজে ইংরেজের অত্যাচার অপ্রতিহত ভাবে চলতে থাকে। এই অত্যাচারের ফলে গন্দ সমাজে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্তান্ত উপজাতীয় সমাজেও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং এই সকল আদিবাসী একেবারে ইংরেজবিরোধী হয়ে পড়ে।

১৮৭৪ সনে রাঁচীর একটি মুণ্ডা পরিবারে বীরসামুণ্ডা জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় বীরসা মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শেখেন ও কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। পরে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুণ্ডা সমাজে ইংরেজের ও মহাজনদের শোষণনীতির পরিচয় পেয়ে তিনি মর্ম্মাহত হন এবং মুণ্ডাসমাজের যাবতীয় পঙ্কিলতা দূর করে সমাজটিকে উন্নত করবার জন্ত নিজ গ্রামে ফিরে যান। গ্রাম থেকে তিনি প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন।

তাঁহার প্রচারিত কর্ম্মপন্থা ছিল—কুসংস্কার-ত্যাগ, মাদকতা-বর্জ্জন, নিরামিষ-গ্রহণ, শিক্ষাবিস্তার, নারীসম্মান ও উপবীত গ্রহণ। উপবীত গ্রহণ করলে মুণ্ডারা ভারতের যে কোন শ্রেণীর সমকক্ষ বলে অনুভব করবে, এইটিই বোধ হয় বীরসার মনে ছিল। এই সামাজিক আন্দোলন মুণ্ডাগোষ্ঠীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিবাসী অন্তান্ত উপজাতীয় সমাজকে প্রভাবান্বিত করে তুলে। ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে তাদের চিরপরিচিত দমননীতি চালাতে আরম্ভ

করেন। ইংরেজের বিশ্বাস ছিল যে, অত্যাচারের দ্বারা ছোট-নাগপুরের এই কয়টি উপজাতীয় সমাজে এমন ভীতির সঞ্চার করবেন যে, বীরসা-আন্দোলন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ফল কিন্তু বিপরীত হ'ল। দমনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনটি উগ্রতর হয়ে উঠল। ক্রমে এই সামাজিক আন্দোলনটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হ'ল। বীরসা সমস্ত আদিবাসীকে, ইংরেজকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে বললেন। ফলে ছোটনাগপুরে বিশেষ করে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রবলভাবে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। ভারতে গান্ধীর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এই খাজনা বন্ধ আন্দোলন চালু হয়। ভারতে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে ইংরেজের প্রাপ্য রাজস্ব বন্ধ আন্দোলনের প্রথম দৃষ্টান্ত। বীরসাকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকার হাজারীবাগ জেলে আবদ্ধ রাখেন এবং সেখানে ১৯০২ সনে এই অহিংস মুণ্ডাগান্ধীর বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয়। এই মুণ্ডাবীরের মৃত্যুতে সমস্ত মুণ্ডাজাতি ক্ষেপে উঠে। তারা রাস্তা, পুল, থানা, তহসীলদারী আপিস, টেলিগ্রাম আপিস প্রভৃতির উপর হামলা চালায় এবং সরকারের বহুকুঠি ভস্মীভূত করে। মুণ্ডাদের এই জনসংগ্রাম যেন ১৯৪২ সনের জাতীয় সংগ্রামের অগ্রদূত। শেষ পর্য্যন্ত সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যদল এসে এই বিদ্রোহ দমন করে।

অহিংস মুণ্ডাবীর বীরসা আজ মুণ্ডাসমাজে বীরসা ভগবান বলে আখ্যাত এবং দিনের পর দিন সহস্র সহস্র মুণ্ডার অশ্রুভরা শ্রদ্ধাঞ্জলি পাচ্ছেন। ভারতের অগ্রসর সমাজের ভিতর ক'জন লোক এই শহীদের নাম জানেন?

মহাত্মা গান্ধী ভারতে ফিরে আসবার আগে ও পরে ভূমিহার, ভীল, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে বহু সমাজ-সংস্কারক দেখা দিয়েছেন এবং তাঁদের সমাজ-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন। এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সমস্ত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসমর ধাপে ধাপে চালিয়েছিলেন—তার মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সনের আগষ্ট সংগ্রাম তিনটি প্রধান ধাপ। এই তিনটি আন্দোলনেই আদিবাসীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯২০ সনে যখন মহাত্মা প্রথম রাচী যান, দূরস্থ জঙ্গল ও পাহাড় থেকে দলে দলে আদিবাসীরা তাঁর বাণী শুনতে এসেছিল। তাঁর কথা বুঝতে তাদের একটুও কষ্ট হয় নি। যাত্রাভগতের প্রভাবে ও "টানাভগত" আন্দোলনে তাদের মন বিশেষভাবে তৈরি ছিল। টানাভগতের দল গান্ধীর বক্তৃতা শুনে আরও অহিংস হয়ে উঠল এবং তাদের পূর্ব্বসঙ্গী চরকা ও খদ্দরকে আরও জড়িয়ে ধরল। অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার আদিবাসী কারাবরণ করেছিল। অন্যের তুলনায় তাদের শাস্তির মেয়াদ অনেক বেশী হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে তারা কেউ ভ্রূক্ষেপও করে নি। হাজারীবাগ ও পরেশনাথ পাহাড়ের আশে-পাশে সাওতালেরা এই অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করে। কয়েক হাজার সাঁওতাল ও মুণ্ডা সত্যাগ্রহে কারাবরণ করে। জলপাইগুড়িতে মেচেদের মধ্যেও আইন অমান্য আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করে এবং এদেশীয় বহু আদিবাসী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সকল সরল উপজাতির মধ্যে অহিংস-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়াতে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন এবং বিদেশীয় মিশনারীর সাহায্যে আদিবাসীর মনোভাব পরিবর্ত্তিত করে ইংরেজ-প্রীতি আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ চেষ্টা একেবারে বিফল হয়ে যায়।

১৯৩০ সনের আইন-অমান্য আন্দোলনে টানাভগতদলীয় আদিবাসীরা চৌকিদারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ইংরেজ-রাজ বহু আদিবাসীর জমি, গরু, লাঙ্গল প্রভৃতি নীলামে চড়িয়ে এই কর উসুল করবার চেষ্টা করেন। সর্ব্বস্বান্ত হয়েও টানাভগতের দল নিরুৎসাহ হয় নি।

আদিবাসীদের সবচেয়ে উৎসাহ এনেছিল জঙ্গল-আইন ভাঙবার প্রস্তাব। ভারতের বহু অঞ্চলে আদিবাসীরা জঙ্গল-আইন ভেঙ্গে কারাবরণ করেছিল।

ভীলরা ও মধ্যপ্রদেশের খন্দেরা এই সত্যাগ্রহে যোগদান করে এবং আইন অমান্য করে কারাবরণ করে। এই সম্পর্কে ভীলদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল।

নাগপুরের পতাকা সত্যাগ্রহে বহু আদিবাসী কারাবরণ করে। ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট আদিবাসীর দল থেকে বহু লোক ১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার জন্য কারারুদ্ধ হয়।

১৯৪২ সনের আগষ্ট-সংগ্রামে যখন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অগ্রসর সমাজ ইংরেজ রাজস্ব অচল করে দেবার জন্য হামলা চালান, তখন আদিবাসীরাও চুপ করে বসেছিল না। যেখানেই আদিবাসীদের এই সংগ্রামের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা দলবলে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট আদিবাসী-গোষ্ঠীর লোকেরা সংরক্ষিত জঙ্গল কেটে আগেকার মত চাষের ক্ষেত তৈরি করে আইন ভঙ্গ করেছিল। বহু সরকারী বাংলো ও বন-আপিস ভস্মীভূত করা হয়। এই সব কাছারী বাংলো কিছু পূর্ব্বেও আদিবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

সাওতাল-পরগণায় সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা বহু থানায় উপর হামলা চালায়। মদের ভাটি, মদের পিপা প্রভৃতি তারা ভেঙে চুরমার করে। কয়েকটি কাঠের পোল ভস্মীভূত করে সৈন্য চলাচল বন্ধ করবার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে তাদের এত বেশী উৎসাহ দেখা দিয়েছিল যে, খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠলে সাঁওতালেরা বলত, "আমরা ঘাসপাতা খেয়ে লড়াই করব।" এই সংগ্রামের শেষে যখন ইংরেজ ফৌজ এই অঞ্চলে এসে অত্যাচার আরম্ভ করে তখন বহু সাওতালের সর্ব্বস্ব লুঠ হয় এবং অনেক সাওতাল-পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারায়।

ওরাও ও মুণ্ডারা এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। রাচীতে অনেক থানার উপর হামলা করার জন্য টানাভগতদলীয় অনেক আদিবাসী গ্রেপ্তার ও নিহত হয়।

পশ্চিম বাংলায়, বোলপুর ও বালুরঘাটে আদিবাসীরা এই বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল এবং বিদ্রোহের শেষে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। বহু সাওতালকে প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়।

আজ অগ্রসর সমাজের ১৯৪২ সনের বহু বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে—সেদিনের বহু লোক নিজেদের কৃতিত্বের ও বীরত্বের আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জঙ্গলে, পাহাড়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এই নীরব বীরদের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী কি কাহারও মনে পড়বে না? এই সব শহীদের অনাথ স্ত্রী-পুত্রের জন্য কি স্বাধীন ভারতের কোন দায়িত্বই নেই? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

পিতা

শ্রীউমাপদ নাথ

এই হাতখানা। এই নিরেট ডান হাতখানা দিয়ে টিপে ধরেছিল ওই সরু গলাটা। কচি মুখখানা রগড়িয়ে গিয়েছিল মেজের চটা-ওঠা শানে। বীভৎস! ভয়ানক বীভৎস!

শশাঙ্কের ইচ্ছে হ'ল হাতখানা কামড়িয়ে ধরে দাঁত দিয়ে। যে দাঁতগুলো মেলে ধরেছিল পাশব রোষে, তারই ধারাল মুখ দিয়ে কেটে নিতে ইচ্ছে হ'ল হাতের কব্জিখানা। উঃ! কি বিশ্রী প্রবৃত্তি!

দেওয়ালের আয়নায় মুখের ছবিখানা ধরা পড়ল হঠাৎ। মোটা লোমের শক্ত গোঁফজোড়া মানুষের মুখের অনুপযুক্ত বোধ হ'ল তার কাছে। তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে লোমগুলো টেনে ধরল সজোরে। লোমের গোড়ার স্ফীত বিন্দুগুলো লম্বাকৃতি হয়ে উঠল টানে।

দরজার গায়ে কড়াটা লেগে টুং করে আওয়াজ হ'ল একটু। কে? কে আর, হয়ত মিনিই খেলা করছে ওপিঠে। বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরল সাড়াশির মত করে। চাপ খেয়ে গোটা তিনেক মোটা রগ জেগে উঠল চামড়ার তলায়।

"মিনি!"

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল শশাঙ্ক।

"ও মিনি, মিনি, মা!" গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করতে চেষ্টা করে সে।

সত্যিই, মিনি তখন খেলা করছে বারান্দায়। চাকা-ভাঙা টিনের মোটর গাড়ীতে চিনেমাটির পুতুলগুলো বসিয়ে বেয়ান-বাড়ী যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বার বার।

মেয়ের চিবুকটা চেপে ধরল শশাঙ্ক। "হাঁ রে তোর একটা ভাল গাড়ী চাই, না?"

দুর্ব্বল মিনির চোখে-মুখে হাসি ফুটে উঠল। ভয়ে ভয়ে আবদার জানাল, "হাঁ বাবা, একটা নতুন গাড়ী কিনে দাও না। এটা কতদিনের হয়ে গেল।"

তা প্রায় এক বছর হবে। এক বছর ধরে প্রাণহীন সন্তানদের গাড়ীতে চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াচ্ছে, পৌঁছে দিচ্ছে শ্বশুরবাড়ীর সামনে। ফুটো-পয়সার আকারের একখানা চাকা যেদিন ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল তাদের এ্যাক্সেল থেকে, সেদিন মাঝপথে গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল মিনি। এত বড় দুর্ঘটনা চিন্তাও করতে পারে নি। বাবার কাছে নিয়ে গেল হাতে করে। শশাঙ্ক নেড়ে দেখেছিল, না এটাকে আর সারানো যাবে না। তারের চেপটা মুখটা পড়ে গিয়েছে ভেঙে। বললে, "আর একটা কিনে এনে দেব, মা।"

সেই আর একটা, আর হয়ে ওঠে নি এই দু-তিন মাসের মধ্যে।

"আচ্ছা দাঁড়া, আজই এনে দিচ্ছি একটা নতুন গাড়ী।"—আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে সহিই মাথাটা গলিয়ে দিল শশাঙ্ক। "ওগো শুনছ!"—একবার হাঁক ছাড়ল রান্নাবাড়ীর দিকে। কিন্তু কি ভেবে আর দেরী করল না, বললে, "আচ্ছা থাক, তোর মাকে বলবি, বাবা বাজারে গিয়েছে, এখুনি ঘুরে আসবে।"

বাজারে যেতে যেতে কয়েক বার পাঞ্জা কষেছে নিজের হাতের সঙ্গে। চাপ দিয়ে রক্তস্রোতকে নিয়ে এসেছে আঙুলের ডগায়। সংহত রক্তের চাপে লাল টকটকে দেখিয়েছে আঙুলের প্রান্তগুলো। কিন্তু এর থেকেও লাল হয়ে উঠেছিল মিনির তুলতুলে গাল দুটো। চারটে আঙুল বসে গিয়েছিল মাংসের মধ্যে; নরম মাটিতে বন্য-পশুর পদচিহ্নের মত। হাত সামলিয়ে নেবার আগে আরও দু-চারটে চপেটাঘাত পড়েছিল পর পর।

আগে-পিছে একবার তাকিয়ে দেখল শশাঙ্ক। না, মোটেই কাছে-পিঠে তেমন লোক নেই। লোক-লুকিয়ে গোটা দুই কড়া

চড় বসিয়ে দিল নিজের গালে। এ্যাঃ এমন ছুরির মত ধারাল তার হাত! ঝিঁ ঝিঁ ধরে যায় চামড়ায়।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় এবার।

এবার আর চার আনা দামের মোটরগাড়ী নয়, দেড় টাকা দিয়ে একখানা স্প্রিং লাগানো মোটরগাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরল শশাঙ্ক।

সারা দুপুর ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে গাড়ীখানা দেখল মিনি। একেবারে মনের মত জিনিস, যেমন রং তেমনি ডিজাইন। ছেলে-পুলেকে বসিয়ে স্প্রিং দিয়ে দিব্যি ছেড়ে দেওয়া যাবে। বাঃ কি চমৎকার চলে! আর ঠেলাঠেলি নয়, আপনা থেকে দাঁড়াবে গিয়ে একেবারে বেয়াইমশায়ের দরজায়।

দিদির নতুন মোটরগাড়ী দেখে লাফিয়ে উঠল তুতু। "অ্যা, আমার জন্তে কি এসেছে?"

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু আসে নি তোমার জন্তে। তোমার তো রেলগাড়ী রয়েছেই। ওর ছিল না, ওর ভেঙে গিয়েছিল তাই—"

খোকার জন্তে যখন রেলগাড়ী এল, আর মেয়ের জন্তে এল সামান্ত মোটরগাড়ী, তখন কম কথা হয় নি তার জন্তে। হেমলতাই বলেছে, "তোমার দু' চোখে দু' নজর, ছেলেটাকে ভাখ একরকম, মেয়েটাকে ভাখ আর একরকম।"

"কি যে বল তুমি!" উপেক্ষাভরে বিস্ময় প্রকাশ করতে চেয়েছিল শশাঙ্ক।

"কেন, শুধু কি আমি বলি? সবাই বলে। পাড়াশুদ্ধ লোকের জানা। তুমি যে তুতুকে বেশী ভালবাস আর মেয়েটা যে দু' চোখের কুটো, তা কারও জানতে বাকী নেই। ওটা যেন পরের মেয়ে—"

"ভাখ, ওসব কথা বলতে নেই।"

"সাধে কেউ বলে না। কেন, দুজনের জন্তে এক জিনিষ আনতে পার না? এক জনকে বেছে ভালটা, আর একজনকে খারাপটা—এ কেন? তা ছাড়া—"

"বল তা ছাড়া কি?"

"বলবই তো। তুতুকে তুমি যতটা সহ্য কর, মিনিকে তা কর? হলইবা ভারী তিন বছরের বড়। ঐ একরত্তি মেয়ে, কিরকম দুমাদুম কিলচড় চালাও তুমি? মাষ্টারি করে করে বড় মারা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে তোমার।" হেমলতার কণ্ঠে ধমকের সুর।

"সেটা কি আর হিংসে করে?" শশাঙ্ক এবার বুঝাতে চায়, "সেটা ওরই মঙ্গলের জন্তে। আর বল কি, ওরকম গবেট মেয়ে আমি দেখি নি, একটা সামান্ত যোগ অঙ্ক হাজার বার বুঝিয়ে দিলেও মাথায় ঢুকবে না। আর পড়ার সময় বজ্জাতিই কি কম করে? এই বল বল বল, বল—সি-এ-টি ক্যাট বল। তবু মুখ বন্ধ। বোবার শত্রু নেই, না?"

শেষের দিকে মেজাজ গরম হয়ে যায় শশাঙ্কের। "ঢের ঢের ছেলেমেয়ে চরিয়েছি বাবা, কিন্তু কি বাচ্চা যে পেটে ধরেছিলে!"

বিরক্তিতে কশমশ করতে করতে বিশ্রাম করতে চলে যায় বাইরের ঘরে। যত সব বাজে ঝামেলা, রবিবারের ছুটিটাই মাটি।

আগে যখন স্কুল-মাষ্টারী করত তখন ছুটি ছিল ঢের। রবিবার ছাড়াও এটা-ওটা ছুটি। গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি। কিন্তু এখন? এখন ঠেকেছে দশটা-পাঁচটা। হপ্তা অন্তে বড় সাধের একটা রবি-বার। এটা নাকি সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের দিন। কিন্তু শশাঙ্ক জানে, সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের দিন হোক বা না হোক, এ দিনটা লক্ষ লক্ষ কেরাণীর বিশ্রাম-দিন। ভোজনের পর টান টান হয়ে একটু শুয়ে পড়ার দিন। এই একটা দিনের দিকে তাকিয়েই ত বাকী ছটা দিনের জোয়াল টানা।

এখানে ছুটি কম, তবু ছুটিবহুল মাষ্টার-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যেন স্বস্তিই পেয়েছে শশাঙ্ক। কি হবে অত ছুটিতে? বিরাম-হীনতার মাঝখানে এই মুহূর্ত্তের থামাটুকুই ত মধুর।

কিন্তু এই মধুর রবিবারটি থেকে অনেকখানি তাকে উৎসর্গ করতে হয়। এই রবিবার দিনটায় ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটু বসে। প্রাইভেট টুটর রাখার ত আর ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া নিজে অভিজ্ঞ মাষ্টার হয়ে এখন অন্ত মাষ্টারের হাতে ছেড়ে দেবে নিজের ছেলেমেয়েকে? কি দরকার? তার' চেয়ে সকাল-সন্ধ্যে যেদিন যতটুকু বলে দিতে পারে তার দাম কি কম? আর রবি-বারে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ত বেশ ভালই পড়াতে পারে।

কিন্তু এই পড়াতে গিয়েই যত। একবার, দুবার, তিনবার—আর ধৈর্য্য থাকে না শশাঙ্কের। প্রাক্তন শিক্ষক সংস্কার ক্ষেপে ওঠে পাগলা মোষের মত। এক ক্লাশ ছেলের ওপর পড়ত যে রোষ, তার সবটা ঠিক্‌রে পড়ে আট বছরের মিনির ওপর। তুতু খুবই ছোট, সবেমাত্র বর্ণপরিচয়ের ছাত্র। ক্ষমার পাওনাদার শুধু সে-ই। কিম্বা, আবার ঐ যে হেমলতা বলে, তুতুকে একটু আলাদা নজরে দেখা হয়, তাও হয়ত হতে পারে—আশ্চর্য্য কি? মেয়েটার প্রতি হয়ত অস্নেহই তার।

অথচ মাষ্টারী-জীবনে মারকুটে মাষ্টার বলে যে খুব দুর্নাম ছিল তার, তাও ত নয়। ছেলেদের ভালবাসতেই চেষ্টা করত। সামান্ত কারণে এমন ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটত না তার। পড়ানই ত তার কাজ। পড়াতে গিয়ে মেজাজ নষ্ট করা তার পক্ষে অমর্য্যাদার কথা। অথচ তাই করছে এখন হামেশা। হর দিন।

কিন্তু কড়া না হয়ে আর উপায়ই বা কি আছে? পাশের পোর্শনের অসভ্য ফ্যামিলিটার প্রভাব থেকে ওকে বাঁচাতে হবে ত। মেয়েমানুষ ত, মানুষ করতে হবে, বিয়ে দিতে হবে। পরের ঘরে যাওয়া চাই সেখানকার সুখের কারণ হয়ে। নইলে বলবে কি? বলবে, যেমন বাপ-মা তেমন মেয়ে।

'কিন্তু কোথায় যে তুমি ওকে অবাধ্য দেখলে, তাও ত বুঝি না।' হেমলতা অবশ্য মেয়ের পক্ষে ভাল দেখতে চেষ্টা করেছে।

শশাঙ্কের মাথা গরম হয়ে উঠেছে আরও তাতে। 'তোমার চোখ নেই, তাই দেখতে পাও না। আমি দেখি, আমি বুঝি। আর আমি তা সহ্যও করব না। আমার এই হাতের পাঞ্জা থাকতে মেয়েটাকে মাটি হতে দেব আমি?'

সেই রুঠো পাঞ্জাটা। সেই কর্কশ চওড়া থাবাখানা। হাতের তেলোটা চোখের সামনে রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শশাঙ্ক।

পড়াতে গিয়েও তন্দ্রা আসে না চোখে। মেয়েটার ওপর থেকে স্নেহ উঠে গিয়েছে যেন একেবারে। অথচ এই মিনিকে যখন একটা কটু কথা বলেছে তার মা, তখন খাতির করে কথা বলেনি শশাঙ্ক। ধমকিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে। দ্যাখ, ওসব চলবে না। ওতে ছেলে মানুষ হয় না। এক রত্তি শিশু, ওর জ্ঞান আছে কিছু? মেজাজখানাকে একটু ঠাণ্ডা রেখে কাজ কর, বুঝলে?'

এখন সেই অভিযোগ আসে হেমলতার তরফ থেকে। 'ওমনি করে লেখাপড়া শেখানো যায় না। তোমাকে দেখলেই ওর প্রাণ উড়ে যায়, ও পড়বে কি তোমার কাছে!'

সত্যি প্রাণ উড়ে যায় মিনির। লক্ষ্য করেছে শশাঙ্ক। হাত-খানা টান করে চাপড় তুলতেই আৎকে ওঠে মেয়েটা। পাতলা ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে থরথর করে। ফ্যাকাসে হয়ে যায় সাদা তুলোর মত। দেখেছে বই কি, শশাঙ্ক দেখেছে তা। নাম ধরে জোরে একটা হাঁক ছাড়লে অপরাধীর মত কাছে এসে দাঁড়ায় মেয়ে। কাছে এসে স্থির হয়ে থাকে কাঠের পুতুলের মত। শুধু পড়ার বেলায় নয়, অন্য সময়েও। সমান ভয় সব সময়। বোবা সেজেছে সাধে? কি বলতে কি বলে ফেলে, এই ভয় সব সময়।

না না, আর না। মারপিট ছেড়ে দেবে। এতে করে খেতলা হয়ে যাচ্ছে আরও। মানে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে একে-বারে। একটা শক্ত প্রতিজ্ঞা করে বসে শশাঙ্ক, আর হাত তুলবে না মেয়ের গায়ে। আর কদিনই বা আছে বাপের বাড়ীতে, যাবে ত পরের ঘর করতে। সেখানেই কি কপালে সুখ হবে? যে বোকা মেয়ে! অন্তত বাপের বাড়ীর একটু সুখের স্মৃতি থেকে ওকে বঞ্চিত হতে আর দেবে না। এই নাক মলা আর কান মলা।

এমনি ঢের দিন ভেবেছে শশাঙ্ক। দুদিন আগেও।

এবার ভাবলে হবে না! একটা পথ বার করতে হবে। মেয়েটাকে সত্যিই মানুষ করে তুলতে হবে। আর তা করতে হবে ভদ্রভাবে। ভালবেসে। আদরে, স্নেহে, সোহাগে।

পরশু দিন ত তাই ভেবেই পড়াতে বসেছিল মেয়েকে। আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রেখেছে মাথা ঠাণ্ডা রাখার। একবার না পারলে বুঝিয়ে দেবে বিশবার। না পারলেও হাত তুলবে না। কড়া কথা বলবে না। হাসি-হাসি মুখ রেখে বলবে, বুঝলি না মা? এই ছাখ—। হাত বুলিয়ে দেবে পিঠে। একটা অঙ্ক ঠিক করতে পারলেই প্লাষ্টিকের একটা বড় ফুল কিনে এনে দেবে ফেরবার পথে। বলবে, এই নে, ও বেলা অঙ্ক পেরেছিলি, মনে আছে?

সব ভেবেচিন্তে তৈরী হয়ে বসেছে পড়াতে। কিন্তু হায় হায়, ভাবতেই কষ্ট লাগে শশাঙ্কের। একটা অঙ্ক ঠিক করতে পারেনি দুবারেও। প্রথমে মুখখানা হাসি-হাসিই রেখেছিল শশাঙ্ক। এই ছাখ, তেরর মধ্যে সাত কবার যায়? বল, বল, লক্ষ্মী বল। কিন্তু উত্তর পায় নি, ফ্যাকাসে ঠোঁট-জোড়া কেঁপে উঠেছিল মিনির। কি জানি, যদি গণ্ডগোল হয়ে যায়! দুবার ভুল হয়েছে।

'ওরে বল, কথা বল।' একটু জোর দিয়ে কথা বলেছে শশাঙ্ক। 'বল, উত্তর দে কথার। না হোক, তবু বল।'

তবু উত্তর নেই।

কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা ভুল হয়ে যায় শশাঙ্কের। সে এখন অন্য মানুষ। সে এখন সনাতন শশাঙ্ক মাষ্টার। অপমানে আহত তার আত্মমর্য্যাদা। রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে রগের মধ্যে। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেত, কর্কশ লোমের গোঁফজোড়া কেঁপে উঠেছে উত্তেজনায়। নিজেকে ভুলে গেল শশাঙ্ক। কিংবা হয়ত ফিরে এল তার স্বকীয় সত্তায়। গর্জ্জে উঠল বনের বাঘের মত, 'হ্যাপ সয়তান।'

বিদ্যুৎচমকের মত ঘটে গেল ঘটনাটা। ক্ষুদ্র মিনির বোধের পক্ষে সে অতিরিক্ত। অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে ঘটে গেল একটা অঘটন। সব যখন ঘটে গিয়েছে—যখন দুটো গাল জ্বলে যাচ্ছে আগুনে পোড়া ক্ষতের মত, আর মেঝের থুবড়ে পড়ে ঠোঁট থেকে পড়ছে রক্তধারা, তখন বুঝতে পারল একটা কিছু হয়ে গিয়েছে। বাবা রেগে গিয়েছে খুব।

শশাঙ্ক তখনও কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে রাগে। রাগে আর উত্তেজনায়। উত্তেজনায় আর ভয়ে। আহা, কি বুঝি করে ফেললাম। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেই শশাঙ্ক। কাল রবিবারে আবার পড়াতে বসেছিল। ভীত নির্ব্বাক মেয়েটা নিঃশব্দে বসেছিল বাবার কাছে এসে। মোমের মত নিষ্প্রাণ মুখখানায় রক্তের চিহ্ন ছিল না। আর শশাঙ্ক? শশাঙ্ক আজ অতিরিক্ত সতর্ক। অতিরিক্ত আবেগ নিয়ে সন্তর্পণে চাদর মুড়ি দিয়ে চৌকিতে বসেছে সে। এক একবার চাদর ঢাকা হাতদুটো টেনে দেখছে গোপনে। সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না ত? হেমলতার পুরানো শাড়ির পাড় দিয়ে বেশ শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে হাত দুখানা। বেঁধে দিয়েছে হেমলতাই। না, বেশ জোরে বাঁধা হয়েছে, খুলবে না সহজে।

হেমলতা কি সহজে বেঁধে দিয়েছে? কত মিনতি করেছে শশাঙ্ক। 'দাও লক্ষ্মীটি আমার, এমনি করতে করতেই স্বভাব বদলিয়ে যাবে একদিন। আট-ন বছরের হ'ল মেয়ে—'

গলা ভার হয়ে উঠেছিল শশাঙ্কের। চোখ ছলছল করে উঠেছিল। হেমলতা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

পড়ান আরম্ভ হ'ল। নিঃশব্দ প্রস্তুতিতে কয়েকবার ঠোঁট-জোড়া কেঁপে উঠল মিনির। তার পরে অনুচ্ছন্দে ধীরে ধীরে পাঠ আরম্ভ করল। একটু এগিয়ে আবার থতমত খেয়ে যায়

ভয়ে। শশাঙ্ক চিনল তার ভয়কে। আশ্বাস দিল, 'ভয় কি মা, লক্ষ্মী, পড়।' ইচ্ছে হ'ল মাথায় পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দেয়।

মিনিট দশেক গিয়েছে। মিনি থেমে গিয়েছে হঠাৎ। সেই 'কিম্ভূত' বানানটা আবার জিজ্ঞেস করেছে তার বাবা। এই বানানটাই ত কাল হয়েছিল সেদিন। মুহূর্তে মিনি মৌন হয়ে গেল একেবারে। সব গুলিয়ে গেল মাথার মধ্যে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চোখ মুখ।

'বল বল, বানানটা বল।' শশাঙ্কের কণ্ঠে আজ আশ্চর্য্য কোমলতা। অভূতপূর্ব্ব স্নেহ। সে আজ কিছুতেই ধৈর্য্য হারাবে না। অটল প্রতিজ্ঞা তার।

কিন্তু মিনি তবু চুপ। চোখের জ্যোতি তার নিষ্প্রভ, নিথর, নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছে সে।

'বল'! শশাঙ্কের মাথার মধ্যে চনচন করছে। রক্তস্রোত গরম হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। স্নায়ুতন্ত্রও উত্তেজিত হয়ে উঠছে বোধ হয়। কিন্তু তাকে ঠাণ্ডা থাকতেই হবে। আশ্চর্য্য, মৃদুকণ্ঠে আবার সোহাগ দেখায় শশাঙ্ক, 'বল মা, চেষ্টা কর, সেদিন ঐ যে পড়লি—'

মিনি তবু চুপ। বাবার শান্ত মূর্ত্তিকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। বাবার সমস্ত আয়োজনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে করতে বাবার মেরুমজ্জাকে যেন চিনে ফেলেছে সে। হোক তা হাজার সামাজিক মানুষের কাছে অজানা। আট-ন বছরের মিনি যা আবিষ্কার করেছে, তার সত্যতার প্রমাণ তার জীবন।

উষ্ণ রক্তের একটা ঘূর্ণি খেলে গেল শশাঙ্কের মস্তিষ্কে। চোখ মুখ গরম হয়ে উঠেছে তার। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। ফুলে উঠছে উত্তেজনায়। এ কি বিশ্রী অবাধ্যতা! প্রচণ্ড একটা শক্তিতে হাত দুটো বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে আপনা থেকেই। নতুন আয়োজনে সংযত হতে চেষ্টা করল সে। দাঁতে দাঁত চেপে রুঢ় কাঠের মূর্ত্তির মত হয়ে বসল। ঠুটো জগন্নাথ সেজেছে আজ সে। আজ সে শিক্ষক নয়, শিক্ষিত পিতা।

কিন্তু অসহ্য। মাটির মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক হয়ে থাকবে অত বড় মেয়েটা? এমন দুর্লভ আদরকে দলে দেবে দু-পায়ে? বালির প্রাচীর নড়ে উঠল অকস্মাৎ। আসন হয়ে বসেছিল, একটা পা বিদ্যুৎ বেগে প্রসারিত হয়ে গেল নির্ব্বাক মূর্ত্তির দিকে।

'ওগো করছ কি তুমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!' হেমলতা আগে থেকেই সরে এসেছিল ঘরের দরজার কাছে।

হাতকড়া পরা শশাঙ্ক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিনি মৌন হয়ে চোখের জল ফেলছিল, মায়ের কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল এবার।

মিনিকে কোলে তুলে নিয়ে যখন স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল হেমলতা, তখন সে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। অত বড় শক্ত জোয়ান মানুষটা ফেটে পড়ছে কান্নায়। দু'খানা দেওয়ালের কোণে মুখখানা গুঁজে দিয়েছে, আর তারই মধ্যে কান্নার ঢেউয়ে আছাড় খাচ্ছে তার দেহটা। হাতদুটো তখনও তেমনি বাঁধা।

যাত্রী

শ্রীদেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

নিশির শিশির ঝরিছে আমার শিরে
অদূরে রুক্ষ পাহাড় রয়েছে খাড়া
মত্ত পবন সঘন কহিছে মোরে—
'ওরে রে পথিক দাঁড়া রে এবার দাঁড়া।'

পাহাড় তাহার দু'বাহু প্রসারি কহে
'কামিনী যামিনী এবার হইবে ভোর
ঘরে ফিরে যা রে, এ পথ ত তোর নহে
এ পথে আসিবে শতেক বিপদ ঘোর।'

কাল রাত্রির যাত্রী গো চঞ্চল
মোরে দেখে হাসে ঐ শয়তান চাঁদ
সাগর-হাঙর শতেক জলদল
আমারে থামাতে পেতেছে অনেক ফাঁদ

সুপ্ত নগরী উঠিছে আবার জাগি
লুপ্ত তপন আবার দিতেছে দেখা
পথের পথিক পথেতেই অনুরাগী
ললাটে তাহার যাত্রা করাই লেখা।

সূর্য্য আপন তূর্য্য বাজায়ে চলে
আমিও আপন পথেতে চলেছি দ্রুত
নগরী আবার নিদ্রার কোলে ঢলে
একা শুধু আমি ঘর্ম্মেতে আপ্লুত।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

অজন্তা

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অঙ্গে নিয়ে ছিল যোলটি গুহামন্দির, চিত্রসম্ভার। বিনষ্ট হয় তাদের মধ্যে দশটি কালের করালে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত হয় ধ্বংসে। অঙ্গহীন হয় অবশিষ্ট ছ'খানিও প্রকৃতির অত্যাচারে আর অনভিজ্ঞ সংস্কারে। প্রদীপ্ত ছিল একদিন এই চিত্রগুলি লাল, নীল, সবুজ, হরিদ্রা বেগুনি রঙে, প্রতিভাসিত ছিল বিভিন্ন বর্ণ-সুষমায় আর অপরূপ অনবদ্য সুসামঞ্জস্যে। আজ তারা হারিয়েছে সে প্রোজ্জ্বলতা, পরিণত হয়েছে দীপ্তিহীন চিত্রে।

আমরা প্রথম গুহ্যমন্দিরে প্রবেশ করি। একটি বিহার, নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটি ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে, নির্ম্মাণ করেন মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ স্থপতি, দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে, তাঁদের প্রেরণায়। সমসাময়িক ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে বিহারগুলি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। এই সময়েই বৌদ্ধ স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্থপতির এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, সৃষ্টি চরম উৎকর্ষের। দেখি, অপরূপ এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভার, যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের।

অলিন্দে উপনীত হই। দেখি বুকে নিয়ে আছে অলিন্দটি স্তম্ভের শ্রেণী। অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভগুলি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্তম্ভেরও, চতুষ্কোণ তাদের নিম্নতম প্রদেশ, অষ্টকোণ উপরার্দ্ধ। রচিত হয় চারিটি বামনের মূর্ত্তি, স্তম্ভের পাদদেশের চারি পাশে চারিটি, সন্ধিস্থলের চারকোণে। চারিটি অষ্টকোণের শীর্ষদেশেও, হস্তে ধারণ করে আছে তারা স্তম্ভের শীর্ষদেশ। স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশের কেন্দ্রস্থলে বায়ুনির্গমের পথ। শীর্ষদেশের নীচে আর বায়ুনির্গমের পথের উপরে নির্ম্মাণ করেন শিল্পী একটি ছেদ, শোভিত সেই ছেদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে। অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্পদে ভূষিত স্তম্ভের অঙ্গও। আবৃত স্তম্ভদণ্ড মিহি সূক্ষ্মতম আবরণে, তার দুই প্রান্তদেশে শোভা পায় পাড়। মনে হয় অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ একটি মসলিনের বসন।

স্তম্ভের শীর্ষদেশে, কেন্দ্রস্থলে, মূর্ত্তি দিয়ে রচিত, দেখি ধর্ম্মের কাহিনী। সিংহাসনে বসে আছেন এক দেবতা, তাঁর দুই পাশে বংশীবাদকেরা, নিযুক্ত বংশীবাদনে। উড়ন্ত দেবীর মূর্ত্তিও আছে। তাদের উপরে একটি ছেদ। তার উপরে এক সারি হস্তীযূথ, আর আরও অনেক জন্তু। সৃষ্টি হয় এক সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, সৃষ্টি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের নিদর্শনের।

দেখি অনুরূপ অপরূপ স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে সাজান-স্থপতি মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগও। ভিতরে প্রবেশ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ছাদের অঙ্গের প্যানেলের দৃশ্য। তার পর বাম দিক থেকে দেখতে সুরু করি প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার। দেখি শিবি জাতকের দৃশ্য। প্রদর্শক বলে তার কাহিনী, কাহিনী এক বোধিসত্ত্বের, বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের।

সিংহাসনে বসে আছেন বোধিসত্ত্ব মহারাজা শিবি। প্রাণভয়ে ভীত এক কবুতর তাঁর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাকে অনুসরণ করে এক চিল। বলে এই কবুতরই তার কাম্য খাদ্য, তাই সমর্পণ করতে হবে কবুতরকে তার হস্তে। এক তুলাদণ্ড আনিয়ে মহারাজা তার এক পাল্লায় কবুতরকে স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় অপর পাল্লায় সম পরিমাণ মাংস, স্বহস্তে কর্ত্তিত হয় সেই মাংস রাজার দেহ থেকে। দান করা হয় সেই মাংস চিলকে। আহার্য্য পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করে চিল। নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে কবুতরও। নিজের অঙ্গের মাংস দিয়ে শরণার্থীর জীবন রক্ষা করেন বোধিসত্ত্ব।

তার পরেই মহাজন জাতকের দৃশ্য দেখি। প্রদর্শক বলে বিনা কারণেই এক রাজকুমার তাঁর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নিহত হন ভ্রাতা, রাণী পলায়ন করেন, গর্ভে নিয়ে সন্তান, পরিত্যাগ করে যান নগর। জন্মগ্রহণ করেন সেই গর্ভে এক বোধিসত্ত্ব। মাতৃপালিত শিশু জানে না সে পিতৃপরিচয়। ক্রমে পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে, অবগত হয় নিজের প্রকৃত পরিচয়ও। শেষে একদিন পাড়ি দেয় সমুদ্রে, সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যপোত, পরিপূর্ণ বাণিজ্য-সম্ভারে। নিমজ্জিত হয় পোত, হয় বাণিজ্যসম্ভারও সমুদ্রের অতল তলে। হন না শুধু কুমার, এক দেবী তাঁর জীবন রক্ষা করেন, তাঁকে নিয়ে যান তাঁর পিতৃরাজ্যে। সেখানে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়ে তিনি তাঁর পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করেন। এই পিতৃব্যই তাঁর পিতাকে হত্যা করে তাঁর পিতৃসিংহাসন হরণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে সংসার পরিত্যাগ করে যান কুমার, তাঁর অনুগমন করেন তাঁর পত্নী। তাঁরা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন।

তার পাশেই প্রাচীরের গাত্রে দেখি নৃত্যপরায়ণা নর্ত্তকীর দল। অপরূপ তাদের গঠনভঙ্গিমা, অনবদ্য তাঁদের নৃত্যের ছন্দ। দেখি

মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রধানা নর্ত্তকীর বহুমূল্য শিরোভূষণ, আর তার সারা অঙ্গের মূল্যবান অলঙ্কার।

তার পাশেই অঙ্কিত দেখি এক জাতকের কাহিনী, কাহিনী সঙ্খপাল জাতকের।

তখন বারাণসী মগধের অধীনস্থ। মহারাজার প্রিয়তমা পত্নীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় দুর্য্যোধন। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব পরিত্যাগ করে পিতা সঙ্খপাল হ্রদের তীরে গিয়ে বাস করেন। সেখানে প্রতিদিন হ্রদের গর্ভ থেকে উঠে এসে নাগরাজ, সঙ্খপাল, তাঁর কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করেন। একদিন পিতাকে দেখতে এসে বোধিসত্ত্ব তাকে দেখতে পান। শোনেন তিনিই নাগরাজা সঙ্খপাল।

ক্রমে নিঃশেষ হয় বোধিসত্ত্বের আয়ু। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর অন্তঃকরণে নাগরাজা হবার বাসনা জাগে। ভূমিষ্ঠ হন তিনি নাগরাজা হয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন সেখানকার ঐশ্বর্য্যে, সুখ পান না বিলাসে ও ব্যসনে। মনস্থ করেন পরের হিতের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে, শয়ন করেন এসে একটি উইয়ের ঢিবির উপর।

কয়েকজন শিকারী বিফলমনোরথ হয়ে অরণ্য থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাঁকে ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর উপর উৎপীড়ন সুরু করে দেয়। বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন বোধিসত্ত্ব সেই অত্যাচার, দেন না কোন বাধা।

এমন সময় সেই পথ দিয়ে গৃহে ফেরেন আলারা, এক মহা-সমৃদ্ধিশালী ভূস্বামী। তিনি অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন বোধিসত্ত্বকে। মুক্তিলাভ করে আলারাকে বোধিসত্ত্ব নাগরাজ্যে নিয়ে যান। রাখেন তাঁকে সেখানে এক বছর, আদরে যত্নে আর আপ্যায়নে। শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন আলারাও, শিক্ষাগুরু হন বারাণসীর রাজার।

সঙ্খপাল জাতকের দৃশ্য দেখে আমরা এক রাজসভার দৃশ্য দেখি। অপরূপ এই দৃশ্যটি দেখি মুগ্ধ হয়ে।

বুদ্ধের সংসারত্যাগের দৃশ্য দেখে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সামনে উপনীত হই। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি অজন্তার চিত্রশিল্পীর এক মহা-মহিমময় সুন্দরতম সৃষ্টি, এক মহা-গৌরবময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্ত্তি। দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাণি এক বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, শিরে মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য মুকুট, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল। পীতবসনে ভূষিত তাঁর কটিদেশ। পীত তাঁর অঙ্গের বর্ণও। হয় এক অপরূপ সমন্বয়, পিছনের লাল পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় হয় তাঁর বিচিত্র অঙ্গ-বিন্যাসে, হস্তের পুষ্পধারণের অপরূপ ভঙ্গীতে আর তাঁর আননের বিষাদের অভিব্যক্তিতে। বার বার জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধ। হবেন বুদ্ধ, লাভ করবেন পরম জ্ঞান, উপায় নির্ব্বাণলাভের। কিন্তু হন বোধিসত্ত্ব হন না পরম জ্ঞানী। তাই পরিপূর্ণ-বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অন্তঃকরণ হতাশায় আর বিষাদে ফুটে ওঠে সেই অন্তরের ভাষা, তাঁর মুখের উপর। ফুটিয়ে তোলেন অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, নিঃশেষ করে দিয়ে মনের মাধুরী, লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন, নিখিল চিত্রশিল্পের দরবারে হন বিশ্ব-জিৎ। পরাজয় স্বীকার করতে হয় তাঁর কাছে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী মাইকেল অ্যানজেলোকে, হয় লিওনার্ডোকেও।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি পদ্মপাণিকে, জানাই চিত্রশিল্পীকেও। এগিয়ে গিয়ে প্রলোভনের দৃশ্য দেখি। দেখি এক বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধ বসে আছেন। নিমগ্ন তিনি ধ্যানে। সমাগত তাঁর মহাজ্ঞান লাভের পরম মূহূর্ত্তটি, হবেন তিনি বুদ্ধ, হবেন তথাগত। এগিয়ে আসেন তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন করতে সয়তান মার, নইলে মুক্ত হবে নির্ব্বাণলাভের পথ জগৎবাসীর কাছে, হবে তারা ধার্ম্মিক, হবে নিষ্পাপ, রইবে না তাঁর কিছু করণীয়।

প্রথমে অনুনয় করেন, মিনতি করেন, অনুরোধ করেন তপস্যা থেকে বিরত হওয়ার জন্য। পরে নিজের কন্যাদের পাঠান। পরম রূপবতী সেই কন্যারা, অধিকারী অপরিসীম ছলনারও। সঙ্গে নিয়ে আসে তারা কত বিলাসের আর ব্যসনের বস্তু। মুগ্ধ হন যদি বুদ্ধ তাদের রূপে অথবা ঐশ্বর্য্যে হন বিচলিত, জাগে তাঁর অন্তঃকরণে ভোগের লিপ্সা, হন তিনি সঙ্কল্পচ্যুত।

বুদ্ধ থাকেন অচল, অটল তাঁর সঙ্কল্প। নিবিষ্ট থাকেন কঠোর ধ্যানে। ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁর কোন কিছুতেই। মোহ নাই তাঁর সম্পদে, লোভ নাই নারীর রূপে ও লাস্যে।

বিফল হয়ে মার ক্রোধে উন্মত্ত হন। নিয়ে আসেন যত ছিল দৈত্য আর দানব। তাদের বলপ্রয়োগ করতে আদেশ করেন। বলেন, নিক্ষেপ কর বুদ্ধকে, কর আসনচ্যুত পরম জ্ঞানলাভ করবার আগেই। অগ্রসর হয় তারা বুদ্ধের দিকে, দ্রুত তাদের গতি, সজ্জিত তারা বিভিন্ন আর বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রেও। নির্ভীক বুদ্ধ, অচল হয়ে সিংহাসনে বসে থাকেন, নিযুক্ত থাকেন ধ্যানে।

সন্তুষ্ট হন দেবতারা, হন ধরিত্রীদেবীও। উপস্থিত হন সেখানে বুদ্ধকে রক্ষা করতে, সঙ্গে নিয়ে আসেন দেবসৈন্য। যুদ্ধ হয় দানবে আর দেবসৈন্যে, এক প্রচণ্ড সংগ্রাম। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দানবেরা পলায়ন করে, করেন মারও।

অবসান হয় রাত্রি, গৌতম লাভ করেন পরম জ্ঞান, হন মহা-জ্ঞানী, হন বুদ্ধ।

দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক মহামহিম পরিকল্পনার সুন্দরতম রূপ-দান।

পাশেই দেখি, অঙ্কিত কত বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রাচীরের গাত্রে। কেউ পদ্মাসনে বসে, কেউ সিংহাসনে। কারও হস্তে বরদা মুদ্রা, কারও অভয়। উদ্ভাসিত তাঁদের আনন তাঁদের অন্তরের ভাবাবেগে। দেখি মুগ্ধ হয়ে, দেখি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিও। সুন্দর, শোভন গঠন এই মূর্ত্তিটিও, আলো করে আছে প্রাচীরের গাত্র।

তার পাশেই এক জাতকের কাহিনী দেখি, কাহিনী কম্পিয়া জাতকের।

কম্প নামে এক নদী ছিল। তার এক পারে মগধের রাজ্য, অপর পারে, অঙ্গ সেই নদীগর্ভে নাগেরা বাস করতেন। বিবদমান এই রাজারা, নিযুক্ত থাকতেন রণে। একবার অঙ্গদেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন মগধরাজ। তাঁর অনুসরণ করেন অঙ্গদেশের সৈনিকেরা। মগধরাজ কম্প নদীতীরে উপনীত হন, অশ্বপৃষ্ঠে অবতরণ করেন নদীর জলে, অদৃশ্য হয়ে যান তার অতল গহ্বরে। এসে পৌঁছান কম্পিয়ার রাজসভায়, এক মণিমুক্তাখচিত সভাগৃহে।

বিস্মিত হন কম্পিয়ারাজ আগন্তুককে দেখে। জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পরিচয়! পরিচয় পেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। বাস করেন মগধরাজ কিছুদিন কম্পিয়ার সম্মানিত অতিথি হয়ে, শেষে,. নাগরাজার সাহায্যে উদ্ধার করেন তাঁর হৃত সিংহাসন। পরাজিত হন অঙ্গরাজ, অঙ্গ মগধের অধিকারে আসে। এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন মগধ আর নাগরাজা। প্রতি বৎসরই মগধরাজ কম্পিয়া নগরে যান। সঙ্গে নিয়ে যান বহুমূল্য উপঢৌকন।

অজন্তা গুহার একাংশ

বোধিসত্ত্ব তখন এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, উপনীত হন তিনিও কম্পনদীর তীরে, মগধরাজার অনুচরবর্গের সঙ্গে। মুগ্ধ হন তিনি রাজ ঐশ্বর্য্য দেখে। বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও অমনই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়ার।

পরজন্মে হন তিনি নাগরাজা। কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যে, অনুশোচনায় ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। এক সাপুড়িয়ার হস্তে নিজেকে ধরা দেন। প্রদর্শিত হন তিনি বিভিন্ন স্থানে, উপার্জ্জন করে অর্থ সাপুড়িয়া।

একদিন ঐ অবস্থায় দেখে, বারাণসীর রাজা তাঁকে সাপুড়িয়ার কাছ থেকে কিনে নেন। নাগরাজা নিজের রাজত্বে ফিরে যান, সঙ্গে নিয়ে যান মগধরাজকে। সেখানে মগধরাজ সাত দিন বাস করে অনেক ধন-দৌলত সঙ্গে নিয়ে মগধে ফিরে আসেন।

ফিরবার পথে দেখি একে একে একটি শোভাযাত্রার দৃশ্য, দেখি একটি রাজপ্রাসাদ ও একটি রাজসভার দৃশ্যও। সিংহাসনে বসে আছেন খুব সম্ভব পারস্যসম্রাট খুসরু, পাশে নিয়ে সম্রাজ্ঞী সিরিনকে। তাঁদের দুই পাশে দুই পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। সুন্দরতম প্যানেলের তিন কোণের পুষ্পগুচ্ছ, অপরূপ উপরার্দ্ধের বাম কোণের লম্বগ্রীব হংসমিথুনের চিত্রটি, বৈশিষ্ট্য অজন্তার চিত্রশিল্পীর।

সবশেষে, কৃষ্ণারাজকুমারীকে দেখি। কৃষ্ণ তাঁর অঙ্গের বর্ণ তাই বুঝি পরিচিতা কৃষ্ণারাজকুমারী নামে। কিন্তু অপরূপ রূপবতী এই নারীটি। উন্নত তাঁর নাসিকা, আকর্ণ-বিস্তৃত তাঁর নয়ন, তাঁর ললিত কপোল অর্দ্ধাবৃত হয়ে আছে মস্তকের টায়রার সংলগ্ন ঝুমকোতে। সুন্দরতম তাঁর কেশ-বিন্যাস আর গ্রীবার ভঙ্গী। তাঁর কর্ণে শোভা পায় হীরককুণ্ডল, কণ্ঠে নেকলেস আর মুক্তার মালা, বিস্তৃত সেই মালা তাঁর নিরাবরণ যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত বক্ষের উপর। আননে তাঁর বিষাদের ছাপ, বসে আছেন এক বিরহিণী, অপেক্ষা করছেন প্রিয়তমের আগমনের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এক সুন্দরতম

সৃষ্টি অজন্তার চিত্রশিল্পীর। শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

দ্বিতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। একটি বিহার, নির্ম্মিত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, সমসাময়িক প্রথম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। অনুরূপ প্রথম গুহা-মন্দিরের পরিকল্পনায়, অঙ্গের শিল্পসম্ভারে ও নির্ম্মাণ কুশলতায়, বিভিন্ন এই মন্দিরের অলিন্দের ও সভাগৃহের স্তম্ভের পরিকল্পনা, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদ আর মূর্ত্তিসম্ভারও। বুকে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলিও শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক মহা-গৌরবময় যুগের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

ভিতরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হই, দেখে ছাদের অঙ্গের চিত্রসম্ভার। অঙ্কিত হয় একটি আয়তক্ষেত্র, তার কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন পুষ্পগুচ্ছ ও লতা। চারি কোণে চারিটি উড়ন্ত অপ্সরা, তাদের মাঝেও প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ। বেষ্টিত আয়তক্ষেত্র রেলিং দিয়ে।

বামদিক থেকে প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার দেখতে সুরু করি। প্রথমেই অঙ্কিত দেখি ক্ষান্তিবাদী জাতকের কাহিনী।

এক সমৃদ্ধশালী ব্রাহ্মণ পরিবারে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ তিনি বহু শাস্ত্রে, কিন্তু যাপন করেন সাধারণ গৃহস্থের জীবন। পিতামাতার মৃত্যু হলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য দান করে, তিনি বরণ করেন সন্ন্যাসীর জীবন। কিছুদিন অতিবাহিত হলে বারাণসীতে এসে রাজোদ্যানে বাস করতে থাকেন।

একদিন সুরাপানে প্রমত্ত হয়ে কতকগুলি নর্ত্তকী সঙ্গে নিয়ে রাজা সেই উদ্যানে উপনীত হন। তাদের সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাজা নিদ্রাভিভূত হন। নর্ত্তকীরা তখন তাদের যন্ত্রপাতি দূরে নিক্ষেপ করে উদ্যান পরিক্রমায় নির্গত হয়। দর্শন লাভ করে তারা সন্ন্যাসীর, শুনতে থাকে তাঁর মুখনিঃসৃত ধর্ম্মের বাণী। নিদ্রাভঙ্গে রাজা অবগত হন নর্ত্তকীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে গিয়ে এক ফকিরের বাণী শুনছে। ক্রোধে উন্মত্ত হন রাজা, অসিহস্তে সেখানে উপস্থিত হন। জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীকে কি তাঁর বাণী? কি বাণী তিনি প্রচার করেন?

সন্ন্যাসী বলেন, প্রচার করি আমি ধৈর্য্যের বাণী।

রাজা ঘাতককে ডেকে আদেশ করেন, মারো একে কণ্টকে নির্ম্মিত চাবুকের আঘাত, দাও দু'হাজার ঘা, আঘাত কর সর্ব্বাঙ্গে। তার পর একে একে কাটো এর হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ।

ঘাতক আদেশ পালন করে, আর প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করে, কি তাঁর বাণী।

সন্ন্যাসী বলেন, প্রচার করি আমি ধৈর্য্যের বাণী, নিহিত সেই বাণী আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।

রাজা তখন তাঁর বক্ষে পদাঘাত করে প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্যানের শেষ সীমানায় বিভক্তা হন ধরিত্রীদেবী, সম্পূর্ণ গ্রাস করেন রাজাকে। মৃত্যুবরণ করেন পাপিষ্ঠ রাজা, পরিসমাপ্তি হয় তাঁর জীবনের।

শুনতে পেয়ে সেনাপতি এসে তুলে নেন সন্ন্যাসীর দেহ নিজের অঙ্কে, সেবা করেন প্রাণপণে। তাঁর যত্নে আর শুশ্রূষায় নিরাময় হন বোধিসত্ত্ব।

তার পাশেই চিত্রিত দেখি হংস জাতকের কাহিনী। একদা বারাণসীতে এক নৃপতি বাস করেন। বহু পুত্রের জনক বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। রাণীর নাম ক্ষেমা। তখন হংসরূপে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন, হন তিনি হংসরাজ, অধীনে তাঁর নব্বই সহস্র হংস। এক রাত্রিতে রাণী স্বপ্ন দেখেন, প্রচার করেন তাঁর বাণী এক অতি সুন্দর স্বর্ণ হংস। নিদ্রাভঙ্গে সেই হংসকে লাভ করবার জন্য রাণীর অন্তঃকরণে এক তীব্র বাসনা জাগে। তিনি তাঁর অন্তরের বাসনা রাজাকে জানান। এক মহা পবিত্র স্থানে পরিণত করেন রাজা তাঁর সরোবর। ঘোষিত হয় সেই বার্ত্তা চারিদিকে। সেই পবিত্র স্থান দেখতে আসেন হংসরাজ, সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি, সুমুখ। ধৃত হন তাঁরা রাজ-শিকারীর হস্তে, নীত হন রাজার সম্মুখে। সন্তুষ্ট হন নৃপতি তাদের দর্শন করে। সীমাহীন পরিচর্য্যা আর ভক্ষণ করিয়ে তাঁদের তুষ্ট করেন। শেষে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করেন, অনুরোধ করেন ধর্ম্মের কথা শোনাবার জন্য। মহাজ্ঞানী তখন তাঁর বাণী সুরু করেন। শোনেন সেই বাণী রাজা ও রাণী সারা রাত্রি ধরে, হয় না শেষ সেই রাত্রির। এক মহা-প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয় রাণীর অন্তঃকরণ, চরিতার্থ হয় তাঁর বাসনা।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলীর চিত্র দেখি। বুদ্ধ হয়ে জন্মাবার আগে, বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে বিরাজ করেন। বসে বসে ভাবেন কবে, কোন্ ভূ-ভাগে, কোন দেশে, আর কোন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। স্থির করেন সমাগত পরম-পবিত্র ক্ষণটি, ভূমিষ্ঠ হবেন তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কপিলাবস্তু নগরে, মায়ার গর্ভে। পুত্র হবেন কপিলাবস্তু-রাজ শুদ্ধোদনের।

তার পাশেই দেখি, মায়া স্বপ্ন দেখেন, স্বর্গ থেকে নেমে এসে, এক শ্বেত হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করছে। নিদ্রাভঙ্গে, মায়া এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা রাজাকে শোনান। সভা-পণ্ডিতদের ডেকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন স্বপ্নের নিহিত অর্থ। তাদের মধ্যে একজন বলেন, রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এক সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত পুত্র, অঙ্গে নিয়ে বত্রিশটি শুভ প্রতীক। যদি তিনি সংসারে বাস করে সংসারী হন, হবেন তিনি এক মহা-পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী সম্রাট। মুণ্ডিত হয় যদি তাঁর মস্তক, কেশ আর শ্মশ্রু, পরিধান করেন যদি তিনি পীতবাস, হবেন তিনি বুদ্ধ, পরম জ্ঞানী।

তার পাশেই দেখি, শিবিকা আরোহণে, রাণী পিতৃ-ভবনে গমন করছেন, যাচ্ছেন লুম্বিনী উদ্যানে। সঙ্গে যান তাঁর বান্ধবী আর সহচরীরাও।

দেখি, একটি শালবৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়ে মায়া দাঁড়িয়ে

আছেন, তাঁকে ধরে আছেন তাঁর ভগ্নী মহা-প্রজাপতি দেখি, মায়ার দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত হন নবজাতক। হস্ত প্রসারিত করে ধারণ করেন সেই নবজাতককে দেবাদিদেব ব্রহ্মা আর দেবরাজ ইন্দ্র। দেখি অগ্রসর হন নবজাতক সপ্ত পদ, তাঁর পদতলে প্রস্ফুটিত হয় সপ্ত পদ্ম, তাঁর শীর্ষে ছত্র, ধারণ করেন সেই ছত্র দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্রসর হন নবজাতক এক এক দিকে আর বলেন, তাঁর বাণী প্রতি পদক্ষেপে। পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমি লাভ করব মহানির্ব্বাণ। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে বলেন, জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমিই হব প্রধান, লাভ করব শ্রেষ্ঠত্ব। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ করে বলেন, এইটিই হবে আমার শেষ জন্ম, উত্তরে, আমিই অতিক্রম করব জন্মান্তরের মহাসমুদ্র, দূর হবে জন্মান্তরের দুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষ লাভ করবে জীব।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে, দেখি এই দৃশ্যগুলি, দেখি অজন্তার চিত্রশিল্পীর এক সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমর কীর্ত্তি।

তার পাশেই, প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত দেখি, শ্রাবস্তি নগরে, নৃপতি প্রসেনজিতের সামনে, বুদ্ধ প্রদর্শন করেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ। আছে তার মধ্যে একই সময়ে তাঁর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে দর্শন দান। বিস্মিত হয় অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণ।

ফিরবার পথে, একটি বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে দুইটি জাতক ও পূর্ণ অবদানের দৃশ্য দেখি। অনুরূপ এই প্যানেলটি বুদ্ধের জীবনাবলীর ঘটনার দৃশ্যের আকৃতিতে, আছে বিপরীত দিকেও। প্রথমেই অঙ্কিত দেখি বুদ্ধ জাতকের কাহিনী, কাহিনী এক মহা-সমৃদ্ধিশালী বণিকপুত্রের। অধিকারী সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের, কাটায় জীবন বিলাসে ও ব্যসনে। ক্রমে নিঃশেষিত হয় তার সমস্ত সম্পদ, হয় সে ঋণী। একদিন উত্তমর্ণদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্ম সে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, সাহায্যের জন্ম চীৎকার করতে থাকে।

বোধিসত্ত্ব তখন এক স্বর্ণ-মৃগ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, বাস করেন সেই স্থানে একাকী। তাঁর কর্ণে, বণিকপুত্রের কাতরধ্বনি প্রবেশ করে। তিনি দয়াপরবশ হয়ে, সেই জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। প্রতিশ্রুতি দেন বণিক-পুত্র, প্রকাশ করবেন না তিনি কাহারও কাছে স্বর্ণমৃগের কথা।

আবার মহারাণী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখেন। দেখেন, এক স্বর্ণমৃগ তাঁর কাছে বাণী প্রচার করছেন। তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা রাণীর অন্তঃকরণে জাগে। প্রেরিত হয় লোক দিকে দিকে তার অনুসন্ধানে, বণিকপুত্রও সেই বার্ত্তা শোনে প্রকাশ করে দেয় রাণীর নিকটে কোথায় আছে স্বর্ণমৃগ, সঙ্গে নিয়ে আসে রাজাকেও মৃগের আলয়ে। ভঙ্গ হয় তার প্রতিশ্রুতি। এদিকে, মৃগের কণ্ঠস্বর শুনে রাজা স্তব্ধ হয়ে যান একেবারে, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করে, কৃতাঞ্জলিপুটে করেন তাঁর স্তুতি। শেষে তাঁকে বারাণসীতে নিয়ে যান। চরিতার্থ হন মহারাণী ক্ষেমা তাঁর বাণী শুনে, পূর্ণ হয় তাঁর মনস্কাম। আদেশ করেন নৃপতি, কেউ স্পর্শ করতে পারবে না এই স্বর্ণমৃগের অঙ্গ। সেই থেকে নিষিদ্ধ বারাণসীধামে পশু-পক্ষীর অঙ্গে আঘাত।

তার পাশেই, বিদুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী দেখি। জন্ম নেন বোধিসত্ত্ব বিদুর পণ্ডিত হয়ে, নিযুক্ত হন মন্ত্রী, ইন্দ্রপ্রস্থের এক নৃপতির। নৃপতিকে তিনি শুধু ঐহিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেন না, সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিকের কথাও বলেন, শোনান তত্ত্বকথা। জম্বুদ্বীপের আরও অনেক রাজা তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বাস করেন, তাঁর মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শোনেন।

একদিন চারিজন রাজার মধ্যে তর্ক হয়, আছেন তাঁদের মধ্যে নাগরাজও। তর্ক হয় তাঁদের মধ্যে গুণে কে শ্রেষ্ঠ। মীমাংসা হয় না সে তর্কের, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের নৃপতির শরণাপন্ন হন। বলেন, আছেন নাকি এক জ্ঞানী তাঁর রাজসভায়, সক্ষম হবেন যিনি এই সমস্যার মীমাংসা করতে।

উপদেশ দেন নৃপতি তাঁদের বিদুর পণ্ডিতের কাছে যেতে। মানেন তাঁরা রাজার উপদেশ, সন্তুষ্ট হন বিদুর পণ্ডিতের মীমাংসায়, মেনে নেন তাঁর অভিমত।

পাতালে বসে শোনেন এই বার্ত্তা নাগরাণী, বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও বিদুর পণ্ডিতের আলোচনা শুনবার।

রাজা বলেন, অসম্ভব এই প্রস্তাব।

কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেন পুণ্যক যক্ষ সেনাপতি, প্রণয়ী তিনি নাগরাজ কন্যার। সর্ত্ত হয়, যোগ্য হবেন তিনি নাগিনীর পাণিগ্রহণে, সক্ষম হন যদি তিনি বিদুর পণ্ডিতকে নাগরাজ্যে আনয়নে। পুণ্যক ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের নৃপতিকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করেন। বিদুর পণ্ডিতকে পণ রাখা হয়। নাগরাজ্যে যান বিদুর পণ্ডিত সফল হয় নাগরাণীর বাসনা।

পূর্ণ অবদানের চিত্র দেখি। ভঙ্গিলা নামে এক বণিক ছিল। এক দৈত্য তার জাহাজ আক্রমণ করে, চূর্ণবিচূর্ণ করতো তার অর্ণব-পোত। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পূর্ণ এসে হাজির হন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁর অন্তঃকরণ, তাঁকে দেখে দৈত্য পলায়ন করে। হয় না কোন ক্ষতি বণিকের। পূর্ণ বলেন, ঐ পোত-ভর্ত্তি চন্দন কাষ্ঠ দিয়েই, নির্ম্মাণ কর এক মন্দির, পদার্পণ করবেন সেই মন্দিরে পরমজ্ঞানী। সেই চন্দন কাঠ দিয়েই নির্ম্মিত হয় এক সুন্দরতম মহিমময় মন্দির। সত্যই পদার্পণ করেন সেই মন্দিরে বুদ্ধ, করেন তথাগত। অপরূপ এই চিত্রটি দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি একে একে মোরগের শিক্ষা আর অসিহস্তে একটি বোধি-সত্ত্বের মূর্ত্তিও, অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে। সুন্দরতম এই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিও বৈশিষ্ট্য অজন্তার চিত্রশিল্পীর।

স্থপতি আর চিত্রশিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি একে একে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দির। সবগুলিই বিহার, সমসাময়িক প্রথম ও

দ্বিতীয় গুহামন্দিরের, নির্ম্মিত হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, নির্ম্মাণ করেন চালুক্য রাজারা। পড়ে সমপর্য্যায়েও, পরিকল্পনায় ও অঙ্গের সুন্দরতম অনুপম শিল্পসম্ভারে ও মূর্ত্তিসম্ভারে। পড়ে স্তম্ভের নিখুঁত গঠনসৌষ্ঠবে, আর তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্থপতির, অপরূপ, মহিমময় অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

বৃহত্তম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে চতুর্থ গুহামন্দিরটি। চতুষ্কোণ এই মন্দিরের সভাগৃহটি বিস্তৃত হয়ে আছে সাতাশি ফুট স্কোয়ার পরিধি নিয়ে বুকে নিয়ে আছে আটাশটি অপরূপ সুষ্ঠু গঠন, স্তম্ভ রচিত হয় শৈলমালার অঙ্গ কেটে। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য মহিমময় মূর্ত্তির সম্ভার অঙ্গে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম লতা-পল্লব। রচিত দেখি প্রধান প্রবেশ পথের কাছে মূর্ত্তি দিয়ে একটি বৌদ্ধ প্রতীক, বৈশিষ্ট্য পরবর্ত্তী যুগের মহাযান স্থাপত্যের। অসম্পূর্ণ এই মন্দিরটি, সময় হয় নাই তাকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, হ'ত এই বিহারটি বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার বুকে নিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, বেরিয়ে এসে একে একে ষষ্ঠ ও সপ্তম গুহামন্দির দেখি। বিহার তারা সমসাময়িকও, নির্ম্মিত হয় ৪৫০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দ্বিতল ষষ্ঠ গুহামন্দিরটি, খুব সম্ভব তার নির্ম্মাণ সুরু হয় সপ্তম গুহা-মন্দির নির্ম্মাণের পরে। বুকে নিয়ে আছে এই দুইটি মন্দিরই কয়েকটি সুন্দরতম ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি। অনবদ্য গঠনসৌষ্ঠবে এই মূর্ত্তি-গুলি জীবন্ত আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে দেখি অপরূপ এই মন্দির দুইটির সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভারও। সূক্ষ্মতম তাদের স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, সুন্দরতম তাদের শীর্ষদেশের মূর্ত্তিসম্ভারও, প্রতীক বৌদ্ধ স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বৌদ্ধ ভাস্করেরও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

অষ্টম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম প্রাচীনতম এই গুহামন্দিরটি, সমসাময়িক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ, গুহামন্দিরের, নির্ম্মিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে, নির্ম্মাণ করেন হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা। নাই তার অঙ্গে কোন প্রকৃষ্ট শিল্প সম্পদ।

অষ্টম গুহামন্দির দেখে নবমে উপনীত হই। একটি হীনযান চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দির, এই মন্দিরটি অন্যতম প্রাচীনতম গুহামন্দির অজন্তার। সুস্পষ্ট তার অঙ্গে কাঠের কাজের চিহ্ন। ক্ষুদ্রতর দশম গুহামন্দিরের, দেখি জীর্ণ তার সম্মুখভাগ পরিণত হয়েছে ধ্বংসে।

নবম দেখে দশমে উপনীত হই। একটি চৈত্য, প্রাচীনতম গুহামন্দির অজন্তার, লেখা আছে তার অঙ্গের লিপিতে, নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে। ছিয়ানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ, এক চল্লিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরটির উচ্চতা ছত্রিশ ফুট। দেখি রচিত এই চৈত্যের ভিতরে একটি কেন্দ্রস্থল, তার প্রান্তদেশে বৃত্তাংশে একটি দাগোবা বা স্তূপ বুদ্ধের স্মৃতির আধার। দেখি গলিপথ ও কেন্দ্রস্থলের চতুর্দ্দিকে। উন-চল্লিশটি সুন্দর স্তম্ভ দিয়ে তাদের কেন্দ্রস্থল থেকে পৃথক করা হয়েছে। নাই এই স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশ, নাই শীর্ষদেশও। দেখে মনে হয় ছিল কিছু কাঠের কাজও, ভাজার চৈত্যের মত। বুকে নিয়ে ছিল অপরূপ চিত্রসম্ভারও, দেখি তার অবশিষ্ট প্রাচীরের গাত্রে। মহা-মহিমময় ছিল এই চৈত্যের সম্মুখ ভাগ ছিল, নবম গুহামন্দিরের সম্মুখভাগও। আজ তারা হারিয়েছে তাদের পূর্ব্ব গৌরব, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে।

দশম মন্দির দেখে আমরা একে একে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্দির দেখি। অন্যতম প্রাচীনতম হীনযান বিহার তারাও, সম-সাময়িক নবম ও দশম গুহামন্দিরের। নির্ম্মিত হয় তাদের মধ্যে একাদশ সবার শেষে। একাদশ বিহারের অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে মূর্ত্তিসম্ভার দেখি। দেখি একটি গর্ভগৃহ ও সভাগৃহের প্রত্যন্ত প্রদেশ। নির্ম্মিত হয় সেগুলি পরবর্ত্তী কালে, নির্ম্মাণ করেন মহাযান বৌদ্ধ স্থপতি। নাই কোন দর্শনযোগ্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ।

তার পরে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ গুহামন্দির দেখি। অসম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ, নির্ম্মিত হয় খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পলায়ন করেন যখন বৌদ্ধ স্থপতি কাঞ্চীর পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মণের ভয়ে ভীত হয়ে, পরিত্যাগ করে যান অজন্তা। রচিত হয় ত্রয়োদশ গুহা মন্দিরের উপরে। সমসাময়িক পঞ্চদশ সপ্তম গুহামন্দিরের, পড়ে সমপর্য্যায়েও, পরিকল্পনায় আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে।

উপনীত হই ষোড়শ গুহামন্দিরে। সমসাময়িক এই গুহা-মন্দিরটি সপ্তদশের, পড়ে সমপর্য্যায়েও, নির্ম্মিত হয় ৪৭০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মাণ করেন বাকাটক বংশের শেষ রাজা, হরিসেনের সুযোগ্য মন্ত্রী বরাহদেব। হরিসেন অলঙ্কৃত করেন বাকাটক সিংহাসন ৪৬৫ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। নির্ম্মিত হয় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই সপ্তদশ গুহামন্দিরও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর অধীনস্থ এক রাজা কর্ত্তৃক। লেখা আছে তাদের অঙ্গের শিলালেখে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দির দুইটি গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তার চিত্রশিল্পীরও। পরিণত হয়ে আছে এক স্বপ্নপুরীতে, এক রহস্যলোকে, এক অমরাবতীতে। পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্য্যের ও চিত্রশিল্পের দরবারে।

আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগের অপরূপ শিল্পসম্ভার, দেখি স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, স্তম্ভযুক্ত অলিন্দে উপনীত হই। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি তার বুকের স্তম্ভের শ্রেণী। চতুষ্কোণ এই স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশ, অষ্টকোণ স্তম্ভদণ্ড। তাদের অঙ্গে শোভা পায় অনবদ্য, সূক্ষ্মতম লতাপল্লব, শীর্ষদেশে নিখুঁত সুষ্ঠু-গঠন মূর্ত্তির সম্ভার, মূর্ত্তি বুদ্ধের, মূর্ত্তি বোধিসত্ত্বেরও।

অনুরূপ এই বিহারটি, প্রথম গুহামন্দিরের (বিহারের), বিস্তৃত হয়ে আছে তার চতুষ্কোণ সভাগৃহটি পঁয়ষট্টি ফুট স্কোয়ার পরিধি নিয়ে। বেষ্টন করে আছে তার সম্মুখ ভাগ একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ,

তিন দিকে ষোলটি চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ। অনবদ্য সুন্দরতম কুড়িটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বিভক্ত হয়ে আছে সভাগৃহের কেন্দ্রস্থল, তিন দিকের পরিপথের বেষ্টনী থেকে। বিভক্ত হয়ে আছে প্রথম গুহামন্দিরের কেন্দ্রস্থলও অনুরূপ সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে, হয়ে আছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের কেন্দ্রস্থলও।

সভাগৃহের প্রত্যন্ত দেশে, শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয়েছে একটি সুপ্রশস্ত গর্ভগৃহ, বসে আছেন সেই গর্ভগৃহে এক মহামহিমময় বুদ্ধ। অপরূপ এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে, ঘুরে ঘুরে দেখি মন্দিরের অঙ্গের স্থপতির, আর ভাস্করের তুলনাহীন সাধনার দান। তার পর বাম দিক থেকে দেখতে সুরু করি, তার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় চিত্রসম্ভার।

প্রথমেই অঙ্কিত দেখি সুতোসোমা জাতকের কাহিনী। ইন্দ্রপ্রস্থের, কুরুবংশের এক নৃপতির প্রথমা পত্নীর গর্ভে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সুতোসোমা। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি শিক্ষালাভের জন্ম তক্ষশিলায় গমন করেন। পারদর্শিতা লাভ করেন সর্ব্ব বিদ্যায়, এক বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট। রাজার মৃত্যু হলে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। একদিন এক পদ্মের সরোবরে স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, এক নরখাদক দস্যু তাঁকে আক্রমণ করে। তার গৃহে নিয়ে যায়। বহুকষ্টে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দস্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। প্রাসাদে ফিরে এসে দেবতার পূজা ও অর্চনা করেন, আবার ফিরে যান বুদ্ধ দস্যুর আলয়ে। পালিত হয় তাঁর প্রতিশ্রুতি।

বিস্মিত হয় দস্যু। কল্পনাতীত তার কাছে বোধিসত্ত্বের এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে প্রত্যাবর্ত্তন। এই দস্যুই তাঁর সহপাঠী ছিল তক্ষশিলায়, অধিষ্ঠিত ছিল একদিন বারাণসীর সিংহাসনেও। পরিণত এখন সে এক নরখাদকে। দ্রবীভূত হয় দস্যুর কঠোর হৃদয় বোধিসত্ত্বের মধুর ব্যবহারে, শোনে সে তাঁর ধর্ম্মের বাণী, অশ্রুসিক্ত হয় তার নয়ন, বিস্মিত হয় নরখাদক, শেষে পরিবর্ত্তিত হয় সে একেবারে। বোধিসত্ত্বের কৃপায় ফিরে পায় সে তার রাজসিংহাসন। তার পাশেই আরও একটি জাতকের কাহিনী অঙ্কিত দেখি, প্রদর্শক বলতে পারে না তার কাহিনী।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে দেখি নন্দের পরিবর্ত্তনের দৃশ্য, 'পরিবর্ত্তিত হল নন্দ সঙ্ঘের জীবনযাত্রায়। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ। ভুলিয়ে নিয়ে আসেন বুদ্ধ তাঁকে তাঁর প্রিয়তমা, রূপবতী ভার্য্যার কাছ থেকে, হস্তে দিয়ে তাঁর নিজের ভিক্ষাপাত্র। তাঁরা সঙ্ঘে উপনীত হন। মুণ্ডিত হয় নন্দের কেশ আর শ্মশ্রু, দীক্ষিত হন তিনি সঙ্ঘের ধর্ম্মে। অভ্যস্ত ঐশ্বর্য্যে আর বিলাসের জীবনে, প্রবৃত্তি নাই নন্দের ভিক্ষুর জীবন যাপনে। তিনি ফিরে যেতে চান রাজপ্রাসাদে, প্রিয়তমা পত্নীর কাছে। বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে তিনি একদিন সঙ্ঘ থেকে পলায়ন করেন, পরিত্যাগ করেন সঙ্ঘ। প্রাসাদে যাওয়ার পথে এক আম্রকুঞ্জে উপনীত হন। জানতে পারেন বুদ্ধ। মহাকাশ দিয়ে উড়ে এসে তিনি কুঞ্জ থেকে কিছু দূরে অবতরণ করেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নন্দ এক বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হন। বুদ্ধ নিকটে আসেন, মহাশূন্যে উত্থিত হয় বৃক্ষটিও। প্রকাশিত হন নন্দ। তাঁকে ধরে নিয়ে যান বুদ্ধ, নিয়ে যান সঙ্ঘে। সফল হয় না তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রচেষ্টা।

বিপরীত দিকেও, অনুরূপ একটি প্যানেলের অঙ্গে দেখি বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলীর দৃশ্য। দৃশ্য দেখি মায়ার গর্ভধারণের। অনুরূপ এই দৃশ্যটি দ্বিতীয় গুহামন্দিরের দৃশ্যের।

তার পাশেই নিযুক্ত ঋষি অসিত, বুদ্ধের জন্মপত্রিকা রচনায়, তাঁর সামনে উপবিষ্ট রাজা ও রাণী, উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করেন। বলেন অসিত, এই পুত্রই হবেন বুদ্ধ, হবেন তথাগত। সন্তুষ্ট নন পিতামাতা এই সংবাদে, নয় তাঁদের অভিলাষিতও। তাই করেন সৃষ্টি নানা বিঘ্নের, রচিত হয় প্রতিবন্ধক প্রতি পদে। আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে পুত্র বুদ্ধ না হতে পারেন।

তার পাশেই দেখি বিদ্যালয়ে বসে আছেন বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে শাক্য পরিবারের আরও অনেক বালক। প্রদর্শন করেন তিনি বিভিন্ন জ্ঞানের পরিচয়, অজ্ঞাত গুরু বিশ্বামিত্রেরও কাছে। বিস্মিত হন গুরু, নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি মহাজ্ঞানী শিষ্যের প্রতি।

অপরূপ সুন্দরতম এই দৃশ্যগুলি দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে। ক্রমশঃ
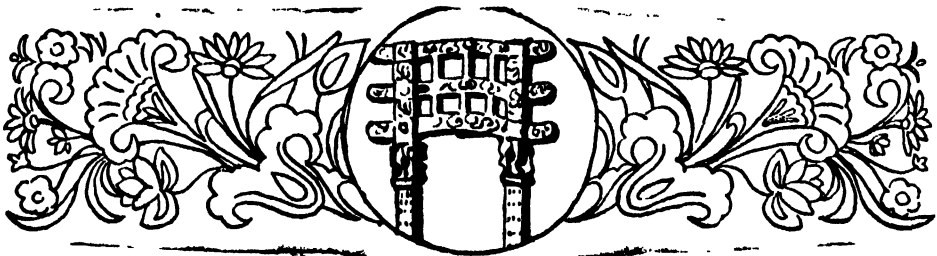
সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

সুহাসিনী দেবী কলকাতায় এসেছেন। নৃপেশ, পরেশ তাঁর দুটি বোনপোকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। অবশ্য তাঁর স্নেহের মর্য্যাদা এ পর্য্যন্ত কেউ দিয়েছে বলে ত মনে হয় না তাঁর। মালদহ ছেড়ে কলকাতা আসবার ইচ্ছা তাঁর কোন দিনই ছিল না, তবুও তাঁকে আসতে হ'ল। আর ভাল লাগছিল না তাঁর। সমস্ত জীবনটাই যেন তাঁর একটা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। এক মুহূর্ত্তও নিশ্বাস ফেলার অবকাশ তিনি পেলেন না। জীবনে অনেক আঘাত তিনি পেয়েছেন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, মর্ম্মান্তিক সে আঘাতগুলো। তাঁকে যেন শতছিদ্র করে দিয়েছে। অভাব তাঁর কিছুই ছিল না। ভরা সংসার, এতটুকুও ফাঁক ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী, সুন্দর স্বামী, ধনদৌলত কিছুরই অভাব ছিল না। একমাত্র ছেলে ননী যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে তখন সুহাসিনী দেবীর স্বামী মারা গেলেন। দুর্ভাগ্যের সুরু সেখান থেকেই। সৌভাগ্যসৌধের ভিতটা তখনই নড়ে উঠেছিল। তার পর ধীরে ধীরে একটার পর একটা ইঁট খসতে আরম্ভ করেছে, নোনা ধরেছে দেওয়ালে দেওয়ালে। ফাটলের মধ্যে বাসা বেঁধেছে বট, অশ্বত্থের ধ্বংসের শিকড়। এখন সুদিনের ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ইমারতের ভগ্নাবশেষটুকু পড়ে আছে শুধু কঙ্কালের মত। সুহাসিনী দেবী সেই স্মৃতিটাকে নিজের শুষ্ক পাঁজরার মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। সেটার তীক্ষ্ণ দংশনের ফলে তিনি আজও জর্জ্জরিত হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাকে দূরে সরাতে পারছেন না কোনমতে, সেইজন্যই তিনি কলকাতায় এসেছেন। তাঁর আর মালদহ ভাল লাগছে না।

সব যেন এখন স্বপ্নের মত মনে হয় তাঁর কাছে। স্বামী মারা যাবার পর ননীকে তিনি মানুষ করেছিলেন। কত দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে দিনগুলো কেটেছিল, এখন সে সব খুঁটিনাটি তাঁর মনেও পড়ে না। ওকালতি পাস করার পর ননীর বিয়েও দিলেন। তাঁর ছোট বোন মৃণালিনীই সম্বন্ধ ঠিক করে দিয়েছিলেন। সুন্দরী মেয়ে রেবাকে তিনি পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে ভাল চোখে দেখতেও পারেন নি বা ভাল মনে গ্রহণও করতে পারেন নি। অনেকেই তাঁর দোষ দেয় একথা তিনি জানেন। পরের মন্তব্যে অবশ্য তিনি কোনদিন কান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ভাল ছিল না। রেবা সুন্দরী ছিল সত্যি, কিন্তু সুহাসিনী দেবীর মতে যেভাবে হিন্দুঘরের মেয়েদের চলাফেরা উচিত তা তার জানাই ছিল না। কলকাতার মেয়েদের হাবভাব, চালচলন তাঁর কাছে ভাল ঠেকে না। বারব্রত, পূজা-অর্চ্চনা, সংসারের শুচিতা—এসব কলকাতার মেয়েরা জানে না বলেই সুহাসিনী দেবীর বিশ্বাস। তারা শুধু জানে রং মিলিয়ে জামাকাপড় পরতে, হাতেমুখে রং মাখতে আর বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়াতে। প্যাঁচ মেরে শাড়ী পরে' মাথার চুলটা ঘাড়ের কাছে পুঁটুলি পাকিয়ে রেখে দিয়ে ওরা ভাবে ওদের বোধ হয় খুব সুন্দর দেখায়। খোঁপার আবার কত বাহার, কত রকমের নাম! কক্কেট্, রোল, কয়েল—সাতজন্মে সুহাসিনী দেবী এমন নামও শোনেন নি। তবু যদি চুল থাকত! কালো রঙের সুতো দিয়ে নকল চুল তৈরী করে এরা। এদের সবই ভুয়ো আর নকল। অন্তঃসারশূন্য এই মেয়েগুলোর দেমাক দেখে হাসি পায় সুহাসিনী দেবীর। আর তাঁদের সময়ে চুল ছিল কি রকম? মেয়েদের যেমন চুল হওয়া উচিত, কালো কোঁচকান, ঘন, আর লম্বায় প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। সুহাসিনী দেবীর মনে আছে, বিয়ের পর তাঁর স্বামী একদিন বলেছিলেন, বাইরের দরজা যখন বন্ধ থাকবে, তখন বারান্দা থেকে চুলটা নামিয়ে দিও তাই ধরে ওপরে উঠব। সে রকম চুলের কল্পনাও আজকালকার মেয়েরা করতে পারে না। অনেকে বলে, তিনি নাকি বৌকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর একমাত্র আদরের সন্তান ননীর স্ত্রী তাকে তিনি নাকি পছন্দ করতেন না। তবে রেবা চেষ্টা করলে তাঁর মনের মত হতে পারত, রেবা যে সে চেষ্টা বিন্দুমাত্র করে নি সে বিষয়ে সুহাসিনী দেবী নিঃসন্দেহ। অনেকে আবার তাঁকে শুচিবাই-গ্রস্ত বলেও অপবাদ দেয়। এটাও অত্যন্ত মিথ্যা কথা। অনর্থক একটা দুর্নাম দিলেই হ'ল! তা বলে হিন্দুর ঘরের বিধবা হয়ে আচারভ্রষ্টা হবেন নাকি তিনি? জল খরচা অবশ্য তিনি একটু বেশীই করেন। কারণ কলকাতার মেয়েদের মত জলাতঙ্ক তাঁর নেই। ওদের কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানে হ'ল, ধোপদুরস্ত কাপড় পরা আর মুখে এক ধ্যাবড়া রং মাখা। "ওপরে চিকন্ চিকন্ ভেতরে খড়ের গাদন"। না বাবা! তা তিনি পারবেন না, লোকে

যে যাই বলুক না কেন, অশোভন তিনি সহ্য করতে পারেন না। মাঝে মাঝে অবশ্য বৌকে দু'একটা কথা বলেছেন, একথা তিনি অস্বীকার করেন না, তবে সংসার করতে গেলে, ভাল শিক্ষা দিতে গেলে, মনের মত গড়ে তুলতে হলে, নিজের পুত্রবধূকে যদি দু'একটা কথা শুনিয়ে থাকেন তা হলে এমন কি দোষ করেছেন তিনি ?

অবশ্য সে নিয়ে ননীর কাছ থেকে তাঁকে কোনদিন কিছু শুনতে হয় নি, ননী তাঁর বড় বাধ্য ছেলে, বড় ভাল। কিন্তু সেও ত রইল না, তিন দিনের জ্বরে ননী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সব ঐ অলুক্ষুণীর কাণ্ড! যেদিন থেকে ও ঘরে এসেছে সেদিন থেকেই আগুন জ্বলেছে। তুষের মত ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলতে সুরু হয়েছিল, তার প্রমাণ তিনি অনেক পেয়েছেন। তা না হলে জলজ্যান্ত ছেলেটা ধড়ফড় করে মরে যায় ? মনে মনে অনেক প্যাঁচও ছিল, তা না হলে স্বামী মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই নার্স হয়ে সে বাইরে চলে যায় ? সংসারে যে তার মন ছিল না এ সুহাসিনী দেবী অনেক দিন আগেই জানতেন।

পৃথিবীতে মানুষ নেই, ভালবাসার মূল্য নেই, তা না হলে মালদহের স্বামীর ভিটে ছেড়ে তাঁকে তীর্থ করার জন্য বোন-পোর বাড়ীতে আসতে হবে কেন ? সবই অদৃষ্ট!

হ্যাঁ, তা ত বটেই, বললে নৃপেশ, মাসীমার দুঃখের কাহিনী সে একমনেই শুনলে—তা হলে দেশে কে দেখা-শুনো করবে ?

সে হবে এখন, তুই বাবা আমায় একটু তীর্থে যাবার ব্যবস্থা করে দে।

আমি ত যেতে পারব না মাসীমা, দেখি পরেশকে বলে।

পরেশকে বলবি ?

হ্যাঁ।

পরেশ কি আমার সঙ্গে তীর্থে যাবে ? অবিশ্বাসের সুরে বললেন তিনি। পরেশকে সুহাসিনী দেবী ঠিক চিনতে পারেন না, তার কথাবার্তা অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত মনে হয় তাঁর কাছে। মনে আছে, একবার সে মালদহে গিয়ে সব জমিগুলো চাষীদের বিলিয়ে দিতে বলেছিল। ছেলের একবার কথা শোন। চিরকাল তারা ভাগ দখল করে এসেছে, চাষীরা চাষ করে এসেছে, ন্যায্য ভাগ নিয়েছে—এ আবার কি কথা। সেই পরেশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তীর্থে যাবেন ?

কথাগুলো চিন্তা করে নিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, তুই কি বিয়ে করবি না, ঠিক করেছিস ? এবার অন্য প্রসঙ্গে গেলেন সুহাসিনী দেবী।

হ্যাঁ মাসীমা, বিয়ে করব না ঠিক করেছি।

তবে কি করবি ?

যা করছি, ডাক্তারী।

ডাক্তারী করলে কি কেউ বিয়ে করে না ?

কেন করবে না ?

তবে তুই করছিস না কেন ?

সময় নেই বলে।

সময় নেই ?

না।

আজেবাজে কাজ করবার সময় আছে আর বিয়ে করবার সময় নেই ?

কি বলছ মাসীমা, আজেবাজে কাজ ? বিস্ময়ের ভঙ্গী করে হাসল নৃপেশ। মানুষের জীবন দান করছি যে।

হ্যাঁ, তা হলে আর ভাবনা ছিল না, ডাক্তাররা যদি জীবন দিতে পারত তা হলে আর ভাবনা কি ?

মনে পড়ে গেল তাঁর ননীর অসুখের কথা। ননীর অসুখের সময় অনেক চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। সিভিল সার্জন থেকে চার-পাঁচজন অন্য ডাক্তার, রেলের সেন-সাহেবকে পর্য্যন্ত আনিয়েছিলেন। কত ওষুধ আর ইনজেকশন যে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা নেই। শেষে মেরুদণ্ডটা শুদ্ধ ছেঁদা করেছিল তারা। ম্যানেনজাইটিস হয়েছিল ননীর। চেষ্টার কি ত্রুটি হয়েছিল ? কিন্তু বাঁচান গেল না কেন ? হুঁঃ! ডাক্তাররা জীবন দান করবে। অবজ্ঞা ফুটে উঠল সুহাসিনী দেবীর মুখে। বললেন, আমার পোড়া কপাল, তা না হলে আর এমন হয়, সব উবে যায় ? ভেবেছিলাম তোদের ছেলে পিলে হবে, সংসার হবে, তাদের নিয়ে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেব। এমন বরাত বৌটাশুদ্ধ নিমকহারামী করলে। অস্ফুট স্বরে শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করলেন সুহাসিনী দেবী।

কেন, বৌদি কি খারাপ করেছে ? প্রতিবাদ করল নৃপেশ।

বলিস কি নৃপেশ ? ঘরের বউ নার্স হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে, আর তুই বলছিস খারাপ কি করেছে। আশ্চর্য্য হলেন তিনি।

সংসারে থাকতে হলে একটা কিছু সম্বল চাই ত।

মেয়েদের সবচাইতে বড় সম্বল হ'ল তার স্বামীর সংসার। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন সুহাসিনী দেবী।

তা ঠিক, কিন্তু যদি স্বামী না থাকে, অন্যপরিজনের দয়ার ওপর যদি তাকে নির্ভর করতে হয় ?

দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে কেন ? তার জায়গা ত নিজে করে নেবে।

তুমি কি পারলে মাসীমা ?

কে বললে পারি নি ? উত্তেজিত হলেন সুহাসিনী দেবী।

না মাসীমা পার নি, তা হলে বৌদিও চলে যেত না, আর তুমিও আজ তীর্থে বেরোতে না।

বৌ চলে গেল তার স্বভাবের জন্যে, তার জন্যে কি আমি দায়ী ? অনেকেই ত স্বামী হারায়, তাই বলে তারা কি ঘর-দোর ছেড়ে নার্স হয়ে চলে যায় নাকি ?

না, যায় না। সেইজন্যই ত বলছি, বৌদি যদি কারোর ওপর নির্ভর করতে পারত, তা হলে হয় ত নার্স হয়ে কাজ করতে যেতে হ'ত না। আর গেলেই বা মাসীমা, আজকাল ত কত মেয়ে এভাবে সংসার প্রতিপালন করছে, এতে আর অসম্মানের কি আছে ?

সম্মান-অসম্মানের তুই কি বুঝবি, ছেলেমানুষ ? সংসার প্রতিপালন করবে পুরুষমানুষ, মেয়েদের কাজ ঘরের ভেতর, আর তা ছাড়া সে ক'টা সংসার প্রতিপালন করছে বল ত ?

কেন তোমায় টাকা পাঠায় না ?

আমি ওর টাকা নেবো কেন ? বারচারেক টাকা পাঠিয়েছিল, চিঠিও লিখেছিল, কিন্তু টাকাও ছুঁই নি, চিঠিও পড়ি নি। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি বল ? ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর দিলেন সুহাসিনী দেবী।

হ্যাঁ জানি, তুমি সম্বন্ধ রাখ নি বটে, কিন্তু বৌদি এখনও সম্বন্ধ রেখেছে, আর সম্মান রেখেছে।

তাই নাকি ? কি রকম ?

এখনও প্রত্যেক মাসে আমাকে আর পরেশকে চিঠি লেখে।

থাক বাছা, আমায় আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি, তোমরা যা ভাল বোঝ কর।

আহত স্বরে উত্তর দিলেন তিনি। রেবার পক্ষে বলার জন্যে যে অনেক লোক আছে তা তিনি বেশ জানেন।

আচ্ছা মাসীমা, তুমি কি রোজই গঙ্গাস্নান করতে যাবে ? প্রসঙ্গটা পালটায় নৃপেশ।

হ্যাঁ বাবা।

তা হলে গাড়ীটা নিয়ে যেও, আমি ড্রাইভারকে বলে দেব।

তোর অসুবিধে হবে না ত ? মাসীমা খুশী হয়ে বললেন।

না না, অসুবিধে আবার কি ?

আর অসুবিধে হলেও উপায় নেই। মামারা গিয়েছেন, মাসীমাও দুঃখ পেয়েছেন। শুচিবাইগ্রস্ত জীবনে যদি একটু শান্তি পান তা হলে তার আপত্তি কি ?

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ীর সকলে অস্থির হয়ে উঠল—সিঁড়িতে, ড্রইংরুমে কার্পেট পাতা ছিল, সেগুলো তুলে ফেলা হ'ল। মেঝে, দেওয়াল দু'বেলা ধোয়া সুরু হ'ল আর সে কি যে সে ধোয়া ! রামু, যোগী সব হিমসিম খেয়ে গেল।

ওখানটা ধোয়া হয় নি ত ? তদ্বির সুরু করলেন সুহাসিনী দেবী।

সে কি মা ! এইমাত্র ধুয়েছি ত। রামু অবাক হয়ে গেল।

কি যে বল বাছা তার ঠিক নেই, ধোয়া হয়েছে ত জল লেগে কই ?

এই ত ভিজে রয়েছে।

থাক থাক, তুমি আর ঝাঁটা হাতটা দেওয়ালে দিও না। চীৎকার করে উঠলেন সুহাসিনী দেবী, নাও ঐ থামটায় জল ঢাল ত।

ওখানে যে বাবুর যন্ত্রপাতি আছে মা। ভয়ে ভয়ে রামু বললে।

তা হোক, ঐ জন্যেই ত পরিষ্কার করা দরকার। কত রকমের রুগী ঘাঁটাঘাঁটি করে, নাও ঢাল।

সব জলে থৈ থৈ করছে—প্রায় সাঁতার দেবার মত অবস্থা, এতেও সুহাসিনী দেবী খুশী নন, ঠিক তাঁর মনের মত ধোয়া এখনও হয় নি।

সেদিন হন্তদন্ত হয়ে নৃপেশের ঘরে ঢুকে পরেশ বললে, দেখছ দাদা ?

হাতে পরেশের একগাদা বই, সেগুলো থেকে টপটপ করে জল ঝরছে।

মাসীমা কি কাণ্ড করেছেন দেখ, সোভিয়েট থেকে সবে-মাত্র এসেছে, আমি এখনও পর্য্যন্ত পড়ি নি।

আমার অবস্থাও তাই। উত্তর দিলে নৃপেশ।

কেন ?

যন্ত্রপাতি, ব্যাগ থেকে আরম্ভ করে জামাকাপড় সবই ধোলাই হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল সে।

তুমি হাসছ দাদা ? ক্ষুব্ধ হ'ল পরেশ।

কি করব বল ?

কিছু বলবে না ?

বললে আরও বেড়ে যাবে।

সে কি ?

হ্যাঁ, মানসিক ব্যাধির নিয়মই তাই।

•তা হলে ? পরেশ দস্তুরমত ঘাবড়ে গিয়েছে।

সহ্য করে থাকতে হবে।

অসম্ভব! একটু চুপ করে বললে পরেশ, এখন বুঝেছি বৌদি কেন নার্স হয়েছে।

তুমি কি ভেবেছিলে, বৌদি সখ করে নার্স হয়েছে ?

প্রথমে একটু বিরক্ত হয়েছিলাম বৈকি, হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই নার্স হতে যাচ্ছে।

হঠাৎ নয় পরেশ, আমরা একদিনেই উত্যক্ত হয়ে উঠেছি, আর বৌদি ননীদা মারা যাবার দু'বছর বাদে নার্স হয়েছিল—এই দু'বছর তাকে এর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করতে হয়েছিল।•

এর কি কোন চিকিৎসা নেই ?

আছে, আবার নেইও।

তার মানে ?

তার মানে—সাইকোঅ্যানালিসিস্ এবং আনুষঙ্গিক যা চিকিৎসা আছে, আমাদের বাঙালীর ঘরে, তা করা অনেক সময়ে হয়ে ওঠে না। আর তা ছাড়া অসুখ যখন এটা, তখন সেই ভাবেই আমাদের জিনিসটা নিতে হবে। রোগীর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে এবং সব অত্যাচারই সহ্য করতে হবে।

কথাটা কিন্তু মনঃপুত হ'ল না পরেশের। বললে, তা হলে এক কাজ করা যাক।

কি ?

মাসীমাকে তীর্থে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

তাই কর। হাসল নৃপেশ, চাপ না পড়লে বেশীর ভাগ মানুষই কর্ত্তব্য এড়িয়ে যেতে চায়।

আর এগুলোর কি হবে ? ভিজে বইগুলো তুলে দেখালে পরেশ।

এক পক্ষে ভালই হয়েছে। আস্তে আস্তে বললে নৃপেশ।

ভাল হয়েছে ? আশ্চর্য্য হ'ল পরেশ। বললে, কি রকম।

হ্যাঁ, উগ্রতা একটু কমে যাবে। বললে নৃপেশ।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিয়ে পরেশ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হাসল নৃপেশ—ছোকরা বড় অল্পেতে রেগে যায়, হিউমার জ্ঞান কম। হঠাৎ মনে পড়ল ইলার কথা। হিউমার জ্ঞান ইলারও ছিল না। মেডিক্যাল কলেজে যখন নৃপেশের ফিফথ ইয়ার তখন ইলার সঙ্গে তার পরিচয়। কান দেখাতে এসেছিল ইলা। ই-এন-টি-তে প্রফেসার ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কি অসুখ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে বেশ লম্বা একটি বক্তৃতাও দিলেন। কান টেনে যন্ত্র দিয়ে, আলো ফেলে, নাকের ভেতর একটা নল দিয়ে, জিভটা বের করে নানা রকম কায়দায় ইলাকে পরীক্ষা করলেন মেজর মিত্র। প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল ইলার। সেই সকাল আটটায় সে এসেছে, আর বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, তার ওপর কান ধরে নাক টেনে যথেচ্ছাচার, এর পর কার আর ভাল লাগে! ইলা এগিয়ে যেতেই প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে নৃপেশ বললে, এই নিন ভিটামিনটা খাবেন।

ওঃ!

আর এটা আর একটা ভিটামিনের ইঞ্জেকশন, এই লোশানটা কানে দেবেন, সকালে একবার আর রাত্রে একবার।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল ইলার। ভেবেছিল, সকাল সকাল হয়ে গেলে চলে যাবে। বাড়ী গিয়ে খেয়ে এগারটায় ক্লাস করতে পারবে, আর নিতান্তই যদি বেশী হয় তা হলে একেবারে ক্লাস করে দেড়টায় বাড়ী ফিরবে। কিন্তু ক্লাসও হ'ল না, বাড়ী ফিরতেও দেরী হয়ে গেল। তার ওপর ভিটামিন একটা খাবার একটা ইনজেকসান।

অসুখটা কি ? জানতে চাইলে ইলা।

কানের অসুখ। না তাকিয়েই উত্তর দিলে নৃপেশ।

হ্যাঁ, তা জানি।

ও নামটা জানতে চান ?

হ্যাঁ।

ওটা ইটিস মিডিয়া, বুঝলেন কিছু ?

না! ওর মানে কি ?

মানে জানতে হলে ডাক্তারী পড়তে হবে, তবে বোঝা যাবে—যা বলছি তাই করুন ত। নৃপেশের গলার স্বরটা শ্রুতিমধুর নয়।

মানুষ যে এত অসভ্য হতে পারে এ ধারণা ইলার ছিল না, কাগজটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল।

আর শুনুন! থমকে দাঁড়াল ইলা।

আমায় বলছেন ?

হ্যাঁ।

কি বলুন।

বলছি দুধ খাবেন।

দুধ ?

হ্যাঁ দুধ, তা না হলে কান সারবে না।

ওঃ! রাগে কান দুটো লাল হয়ে গেল ইলার।

কিছুদিন পরেই আবার ইলার সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে

দেখা। চানাচুর কিনছিল সে, গেটের পাশে যে লোকটা চানাচুর বিক্রী করে। তার কাছ থেকেই মুখ তুলতেই ইলা দেখতে পেল নৃপেশ দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারল—ইলার কৌতূহল হ'ল, মনের অবস্থা ঠিক সেদিনের মত নেই। এই লোকটার কথা ক'দিন ধরেই ও ভেবেছে—ভদ্রতার মুখোস নেই, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে না—মেয়েদের দেখলেই নুয়ে পড়ে না। কিন্তু খেয়ালী বলে মনে হয়।

দুজনেই হাসল।

কানটা কমেছে। ইলাই প্রথম কথা বললে।

ইনজেকসান নিয়েছিলেন? নৃপেশ আরও এগিয়ে এল।

হ্যাঁ। চানাচুরের প্যাকেটটা হাতে ধরা আছে ইলার।

দুধের বদলে চানাচুর? নৃপেশ তাকালে তার হাতের দিকে। বললে, তা হলে যে কান কালা হয়ে যাবে। কিছু বলার আগেই ইলার হাত থেকে চানাচুরের প্যাকেটটা তুলে নিল নৃপেশ।

বাঃ, বেশ খেতে ত? মুখে গোটাকতক দিয়ে বললে নৃপেশ, আপনিও নিন।

ইলা হাত পেতে নিলে। দেওয়াটা যেন নৃপেশের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ইলার খুব ভাল লাগল, ওরই জিনিস নৃপেশ ওকেই দিচ্ছে। কি রকম একটা নূতন স্বাদ পেল যেন। লোকটার কিন্তু কোন আড়ষ্টভাব নেই, কোন সঙ্কোচ নেই তা সে লক্ষ্য করল।

আমি কিন্তু ডাক্তার নই। বললে নৃপেশ।

ডাক্তার নন? আশ্চর্য্য হ'ল ইলা।

না, এইবার ফাইনাল দেব।

ওঃ!

আমার নাম নৃপেশ মুখার্জ্জি। নিজের পরিচয় দিলে নৃপেশ।

আমার নাম…

জানি। বাধা দিলে নৃপেশ, ইলা মৈত্র, না?

হ্যাঁ।

এত রোগা কেন? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল নৃপেশ, অসুখ করেছিল কিছু?

কৈ না ত! কি অদ্ভুত প্রশ্ন, লোকটার কি মাথা খারাপ—দৈহিক প্রশ্ন ছাড়া অন্য কথা লোকটা বোধ হয় জানে না। ভাবল ইলা।

তবে!

না, এমনি।

এই সব আজেবাজে জিনিস খেলে কি আর শরীর ভাল থাকে!—আচ্ছা চলি, আমার বাস এসে গেছে। চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৃপেশ। হাতে চানাচুরের প্যাকেটটা।

ইলা কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর আপন মনে বলে উঠল, লোকটা নির্ঘাৎ পাগল।

একথাটা আরও একবার শুনেছিল নৃপেশ, বলেছিল আর একটি মেয়ে—প্রতিমা ঘোষাল। মেডিক্যাল কলেজে একসঙ্গে পড়ত ওরা। সুন্দরী হিসাবে প্রতিমার নাম ছিল, কলেজের ছাত্র থেকে সুরু করে দু'একজন অধ্যাপকও তার সঙ্গে দরকারে-অদরকারে আলাপ করার চেষ্টা করতেন। সে দিক দিয়ে প্রতিমাও খুব সচেতন ছিল। তার সঙ্গে আলাপ করা যে-কোন পুরুষমানুষের পক্ষেই যে স্বাভাবিক, তা সে নিজেই অনুভব করে। সুতরাং নৃপেশ মুখার্জ্জির তাচ্ছিল্য তাকে আহত না করলেও স্পর্শ করেছিল একথা বলা চলে। তা না হলে প্রতিমা ঘোষালের মত মেয়ে যেচে আলাপ করতে নিশ্চয়ই আসত না।

সেদিন প্যাথলজি ক্লাসের পর প্রতিমা নৃপেশকে বললে, আপনার নোটটা একটু দেবেন?

একবার আড়চোখে তাকালে নৃপেশ, তার পরে বললে, কেন বলুন ত?

ক্লাসে সবটা লিখতে পারি নি তাই। সুন্দর ভঙ্গী করল প্রতিমা ঘোষাল।

একটু না লিখলেও আশ্চর্য্য হতাম না।

কেন?

পড়তে ত আসেন নি, এসেছেন শাড়ী আর গয়নার বিজ্ঞাপন দিতে।

তার মানে! বিগলিত ভাবের বদলে যুদ্ধং দেহি ভাবের প্রকাশে প্রতিমা হতচকিত হয়ে পড়েছিল।

মানে অত্যন্ত সহজ। উত্তর দিলে নৃপেশ।

আপনার কি সাধারণ কার্টসি জ্ঞানটুকুও নেই? প্রতিমা যেন রাগে কাঁপছে।

আছে, কিন্তু সকলের সামনে ত আর মুক্তো ছড়ানো যায় না। সে যাই হোক, সুধীর, রমেন, তপন সকলেই ত রয়েছে, অথচ আমার কাছে হঠাৎ নোট চাইতে এলেন কেন, এ্যাডমায়রার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান নাকি?

সেদিন প্রতিমা ঘোষাল কোন জবাব না দিয়েই চলে গিয়েছিল, কারণ জবাব দেবার মত অবস্থা তার ছিল না। এ নিয়ে ক্লাসে বেশ সোরগোলও পড়ে গিয়েছিল। রীতিমত দুটো দলের সৃষ্টি হয়ে ঘোরতর তর্ক আর উন্মাদনার স্রোত বয়ে চলল বেশ ক'দিন। প্রতিমা ঘোষালও অত সহজে ছাড়বার মেয়ে নয়। দু'একটা সুযোগও পাওয়া গেল বটে,

কিন্তু নৃপেশকে ঠিক বাগে পাওয়া গেল না, পাশ কাটিয়ে পাঁকাল মাছের মত পালিয়ে গেল সে। শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষার উত্তেজনায় জিনিসটা ধামাচাপা পড়ে গেল।

সেবার সীট্ পড়ল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে। হল ত নয়, যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। ছেলে-মেয়ে-গার্ড বেয়ারাতে একেবারে জনাকীর্ণ। গমগম করছে চতুর্দ্দিক, সবুজ রঙের ছোট ডেস্ক,পিচনে তার একটা করে টুল। হলের মধ্যে সারি সারি পাতা রয়েছে সেগুলো। যথাসময়ে সেই চিরপরিচিত ঘণ্টাটা তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারে বেজে উঠল ঢং-ঢং। 'সাইলেন্স প্লীজ'—কয়েক জন গার্ড চীৎকার করে উঠল। প্রিসাইডিং অফিসার বসে রয়েছেন অদূরে ডায়াসের ওপর। খাতা দেওয়া সুরু হয়ে গিয়েছে—ত্রস্তপদে গার্ডেরা লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে খাতা বণ্টন করতে করতে—নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অভ্যাগতদের পাতে লুচি দেওয়ার মত। সেখানে ভোক্তার দল পূরণ করতে যায়, এখানে করে উদ্গীরণ। পরীক্ষার্থীরা কলম-পেনসিল বার করে রেখেছে, কেউ বা টেবিলের তলায় মোটা ব্লটিং পেপার দিয়ে সেটার স্থৈর্য্য আনার ব্যবস্থা করছে। গুঞ্জনধ্বনিটা ধীরে ধীরে কমে আসছে, মৌমাছি ফুলের ওপর বসেছে যেন। প্রশ্নপত্র বিতরণ সুরু হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, দু'একজন হাসার চেষ্টা করলে, কিন্তু সেটা ঠিক হাসির মত বলে মনে হ'ল না। নৃপেশ খাতাটা ভাঁজ দিয়ে নিলে। হঠাৎ নজর পড়ল ডান দিকে। প্রতিমা ঘোষালের সীট্ ঠিক তার পাশেই পড়েছে। প্রতিমাও তাকে দেখেছে, তাই ঠোঁটের কোণে রয়েছে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের হাসির রেশটুকু। মুখ ফিরিয়ে নিলে প্রতিমা ঘোষাল—কানে চুণীর ফুলটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। মসীকৃষ্ণ চুলের ফাঁকে সুডৌল গ্রীবাভঙ্গীটি মনোরম ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। আশপাশের ছেলেরা কয়েক মুহূর্ত্ত শেষবারের মত দেখে নিল প্রতিমাকে। পরীক্ষার ভয়টা ছবির মাধুর্য্যকে যেন ঢেকে দিয়েছে। নৃপেশ প্রশ্নপত্র পেল। পাবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তটা একটু অস্বস্তি-কর পীড়াদায়ক, হৃদ্‌পিণ্ডটা বক্ষপঞ্জরের মধ্যে দ্রুতগতিতে চলতে সুরু করে। কানের পাশে অকস্মাৎ জ্বালা করতে থাকে, লাল হয়ে ওঠে কান দুটো, হাতের তালু দুটো অকারণে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্নপত্র পাবার পর খুসীই হ'ল সে, কারণ সবগুলিই তার ভাল ভাবে জানা আছে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের কয়েকটা জার্নাল নৃপেশ রীতিমত পড়ে। ল্যানসেট্-ব্রিটিশ এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নালের নিয়মিত পাঠক সে। প্রত্যেক প্রশ্নটা ভাল ভাবে মনে মনে ছক্ করে নিলে, তার পর নৃপেশ লিখতে সুরু করল ঝড়ের বেগে। নির্ভুল অঙ্কের মত, প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে স্পষ্ট আর সুবিন্যাস ভঙ্গীতে গড়ে উঠতে লাগল উত্তরের ইমারত। শিল্পীর নিখুঁত তুলির স্পর্শে যেন ফুটে উঠতে লাগল মনোরম একটি ছবি।

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি হঠাৎ কানে এল নৃপেশের। একবার তাকিয়ে দেখল সে, প্রতিমা জল খাচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড মোটা বেঁটে ধরণের, টুথব্রাসের মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ। সগৌরবে সার্টের ওপর ব্যাজটা সেফটিপিনে দোদুল্যমান।

আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? আস্তে আস্তে গার্ড জিজ্ঞাসা করলে প্রতিমাকে।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল নৃপেশ। প্রতিমা ঘোষালকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হ'ল না। গার্ড ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেল।

লিখতে পারছি না কিছুই। প্রতিমা কান্নার সুরে নিকটস্থ একজন এ্যাডমায়রার তপনকে বললে।

চেষ্টা করুন, সৎ উপদেশ দিয়ে তপন লিখে চলল। অযথা সময় নষ্ট করা চলবে না। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', নিজেকে না বাঁচালে অন্য কেউ বাঁচাবে না, তা সে বিলক্ষণ জানে। আর প্রতিমার বিষয়ে তার এমন কোন দায়িত্ব নেই। অবশ্য প্রতিমার সঙ্গসুখ কয়েকবার সে লাভ করেছে, কিন্তু সেটা এমনকিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, সহপাঠিনীর সঙ্গে নিজের খরচে সিনেমা বা রেস্তর াঁয় গেলে যে তার সম্বন্ধে পরীক্ষার হলেও পাস করবার দায়িত্ব নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং তপন দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের কাজ করে যেতে লাগল, প্রতিমা ঘোষাল অস্থির হয়ে পড়ল। এই একটা মাত্র পরিস্থিতি যেখানে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মনে করার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার সব শক্তিও ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা হাপুস নয়নে কাঁদতে সুরু করে দিলে। দিগভ্রান্তের মত, এলোমেলো ঝড়ের মত মনের অবস্থা হ'ল তার। প্রতিমার চিন্তা করার মত ধৈর্য্য আর অবশিষ্ট নেই যেন।

নৃপেশবাবু! ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ডাকল প্রতিমা ঘোষাল। ডুবন্ত লোকে কুটো অবলম্বন করেও বাঁচতে চায়। অবাক হয়ে তাকাল নৃপেশ।

আমায় বলছেন?

হ্যাঁ, আমি যে কিছু লিখতে পারছি না। ফিসফিস করে বললে প্রতিমা।

সেকি? বিস্মিত হ'ল নৃপেশ, আর হাতে সময়ও ত বেশী নেই। আচ্ছা, আমি খাতা খুলে রাখছি, আপনি

লিখুন। প্রতিমা একটু সরে এল। নৃপেশ খাতাটা খুলে রাখল তার চোখের সামনে। প্রতিমা একমনে টুকে নিচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা।

হয়েছে? প্রশ্ন করল নৃপেশ। আরও একটা প্রশ্ন লিখতে বাকী রয়েছে তার।

হ্যাঁ, আর একটু। প্রতিমার স্বরে মিনতি।

নো টকিং প্লীজ। বেঁটে গার্ডটা পরিক্রমা শেষ করে এগিয়ে এল সেই দিকে, তার পরে নৃপেশের দিকে তাকিয়ে বললে, কথা বলছেন কেন?

কৈ, এমন আর কি।

হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি।

ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, কুশল সংবাদ নিচ্ছিলাম।

আই ওয়াণ্ট ইউ। একটা আঙুল তুলে শাসনের ভঙ্গীতে চাপা গলায় কথাটা উচ্চারণ করে বেঁটে গার্ডটা এগিয়ে গেল ডায়াসে'র দিকে।

নিন ছবিটা এঁকে ফেলুন। বললে নৃপেশ।

ছবিটা নিজের খাতায় এঁকে নিলে প্রতিমা। মুখটা এবার তার বেশ হাসি হাসি। ঢং ঢং করে আবার ঝঙ্কার দিয়ে ঘণ্টাটা বেজে উঠল। স্টপ রাইটিং প্লীজ! গার্ডেরা সমস্বরে চীৎকার করল। বাইরে বেরিয়ে নৃপেশ দেখল প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে এগিয়ে এল সে হাসি মুখে। কৃতজ্ঞতাবোধ সকলেরই আছে, প্রতিমারও ছিল। কিন্তু কিছু বলার পূর্ব্বেই নৃপেশ বললে, কাল আমার সীটটা বদলে ফেলছি।

সেকি? আকাশ থেকে পড়ল প্রতিমা।

হ্যাঁ, প্রিসাইডিং অফিসারের পারমিসানও নিয়েছি। কথাটা বলে নৃপেশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। প্রতিমা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের অজ্ঞাতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলে, লোকটা পাগল।

হাঁ রে নৃপেশ! তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মাসীমা এসেছেন কাজের ফাঁকে।

কি বল? মাসীমার দিকে তাকাল নৃপেশ।

তুই কি পরেশের জন্যে মেয়ে দেখেছিস?

হ্যা, সে কথা ত তোমায় চিঠিতে জানিয়েছি।

সে চিঠি আমি পাই নি—আজকাল ডাকঘরের যা গণ্ডগোল হয়েছে। হ্যা, ভাল কথা, মেয়ে দেখতে কি রকম?

ভালই।

ওরা আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে জ্ঞাতি। আরামবাগের বাড়ুজ্যে। লোক কেমন বল ত?

ভালই।

ব্রজেশ্বর পুলিসে কাজ করে, তা হোক, লোক কিন্তু খুব ভাল, জানিস এককালে ওরা বেশ বড়লোক ছিল। আরামবাগে ওদের সকলেই চেনে, খুব নামডাক।

আরামবাগের জনসাধারণের বাঁড়ুজ্যেদের সম্বন্ধে মতামত জানবার জন্য নৃপেশ খুব উৎসুক নয়।

পরেশকে কিছু বলেছ না'কি মাসীমা?

বলতে আমার কসুর নেই বাবা, তোমাকেও বলেছি, পরেশকেও বলেছি তবে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝান শক্ত।

মাসীমা সুযোগ পেলেই একালের মস্তক চর্ব্বণ করে থাকেন।

তা হলে তোমরা তীর্থ থেকে ঘুরে এস, তার পর না হয় কথাবার্ত্তা পাকা করা যাবে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা নৃপেশ।

বল মাসীমা।

তোর ঐ লম্বামত চাকরটা কি জাত বল্ ত?

তা ত জানি না।

সে কি রে, কি জাত, তাও খবর রাখিস্ না! এত বড় একটা দরকারী ব্যাপার সম্বন্ধেও মানুষ খোঁজ রাখে না এ মাসীমার ধারণার বাইরে।

কেন বল ত!

কেন আবার কি! দিনরাত ঘরের ভেতর যাচ্ছে আসছে, কি কাণ্ড বাবা!

আচ্ছা আমি বারণ করে দেব না হয় তোমার ঘরে যেতে।

সে আমি নিজেই করব।

দ্রুত প্রস্থান করলেন মাসীমা। যা কিছু ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতে পারবেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। হাসল নৃপেশ—নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে মেয়েদের মতামত খুব স্পষ্ট, তা ছাড়া হিউমার জ্ঞান নেই বললেই হয়। মনে পড়ল নৃপেশের, ইলার জন্মদিনে নিমন্ত্রণের কথাটা। ড্রইং-রুম, সোফা, কৌচের ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের অনুষ্ঠান, বন্ধুর দলই বেশী—সমারোহ নেই, তবে পরিচ্ছন্নতা আছে। যথাসময়ে এল নৃপেশ। হাসিমুখে এগিয়ে এসে ইলা অভ্যর্থনা করে বললে, আসুন।

ক্রমশঃ

ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা

শিবনাথ শাস্ত্রী

২৬-১১-৮৮

S. S. Rohila. Red Sea.

গতকল্য Mr. Normau নামক Church of England-এর একজন Chaplain-এর সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল, আমি বাইবেলকে কিরূপ গ্রন্থ মনে করি তাহা বলিলাম। Mr. Mayfree 'Elements of Social Science' নামে একখানি বই পড়িতেছেন। আমাকে কোন কোন স্থান পড়িতে অনুরোধ করিলেন। এই বইখানা অনেক দিন হইল দেখিয়াছিলাম মনে হয়। শুনিয়াছি, এই বই নাকি ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বহুল প্রচার। ইহা ধর্ম্মভাব বিরোধীও শুনিয়াছি। স্ত্রী অথবা পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যেরও বিরোধী। যেটুকু দেখিলাম, লোকটি সরল ও স্বদেশানুরাগী। এই একশ্রেণীর লোক দেশের নরনারীর দুর্গতি নিবারণের জন্য কিছু বলিতেছেন ও কিছু করিতে চাহিতেছেন; ইঁহাদের কথাও গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আমাকে একখানি বই সংগ্রহ করিয়া আমার Free thought-Libraryতে রাখিতে হইবে।

আমার প্রাণটা যেন খুলিতেছে না। প্রাণের ধর্ম্মভাবটা যেন ম্লান বোধ হইতেছে। আজিকার দিনটা ধর্ম্ম-চিন্তাতে যাপন করিয়া দেখি কি হয়।

২৮-১১-৮৮

S. S. Rohila—Arabian Sea, Proceeding towards Colombo

গতকল্য রাত্রে এডেন হইতে যাত্রা করিয়া আজ কলম্বো অভিমুখে যাইতেছি। গতকল্য আমাদের সহযাত্রী মিঃ ক্রিষ্টির নিকট হইতে ডক্টর গাথ্রির জীবন চরিত চাহিয়া লইয়া পড়িয়াছি। ইহা একখানি ট্রাক্ট পড়িয়া পিপাসা মিটিল না। বড় জীবন চরিত পড়িতে ইচ্ছা হইল। ডক্টর গাথরীর জীবন দেখিলাম, তাঁহার পিতা একজন ধর্ম্মভীরু বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহার ভবনে ছেলেরা বাইবেল ও ব্যানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' ভিন্ন অন্য বই দেখিতে পাইত না। তদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যহ সায়ংকালে ডাইনিং রুমে সাতটি সন্তান ও ৩,৪ জন চাকরানীকে দাঁড় করাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মুখে মুখে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই পারিবারিক ধর্ম্ম শিক্ষাই ইংলণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্মভাবের প্রবলতার ভিত্তি। ডাক্তার গাথরীর জীবন চরিত পড়িয়া পারিবারিক ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও উজ্জ্বল রূপে অনুভব করা গেল। সমস্ত দিনটা এই ভাব হৃদয়ে বিদ্যমান। বৈকালে জাহাজ এডেনে পৌঁছিল। বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কেবল গোলমালে গেল।

সোমবার প্রায় সমস্ত দিন নিজের জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। গতকল্য ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি। আজ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় এই ভাব হৃদয়ে আসিল যে, তিনিই আমার জীবনাশ্রয়। এই ভাব হৃদয়ে আসাতে প্রাতঃকালের উপাসনা মধুময় হইল। আমার বয়স ৪২ বৎসর হইতে যায়, শরীর, মনের শক্তি হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আমার শিখিবার, জানিবার ও করিবার অসংখ্য বিষয় রহিয়াছে। ৪২ বৎসরে কত লোক কত কাজ করিয়াছে ও করিতেছে, কত শিখিয়াছে ও শিখিতেছে, আমি কি করিলাম—আমার হাতে যে কাজের ভার তাহাই ভাল করিয়া করি নাই, অন্য বিষয়ের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু কেন আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারি নাই? কেবল নিজের দুর্ব্বলতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব ও বিশ্বাসের শিথিলতার জন্য। বন্ধুদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও যে আমার প্রতি আস্থা নাই—সে কেবল আমারই ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার জন্য। তাঁহারা আমাকে যেমন যেমন দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন তাঁহাদের ভাবও সেই প্রকার। এ কারণে আমার কাজে তাঁহারা ভাল করিয়া যোগ দেন না, বরং অনেক সময় বাধা দিয়া থাকেন। এই বাধা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট, তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানকে দৃঢ় করিবার জন্য। তিনি তাঁহার সকল ভৃত্যের পথে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে তুলনাতে আমাদের পথে ত তেমন বিঘ্ন নাই বলিতে হইবে। যাহা কিছু আছে, তদ্দ্বারা আমাদের কল্যাণ। জীবনের আশ্রয় তিনি—এই ভাবটি প্রাণে জাগ্রত হইলে আর ভাবনা থাকে না। সময় সময় এই ভাবটা যখন হৃদয়ে ম্লান হয়, তখনই নিরাশা আসে। আজ প্রভু এই ভাব উজ্জ্বল করিয়াছেন।

আগামী দশ বৎসরে নিজ পরিবারের মধ্যেও সন্নিহিত কতকগুলি লোকের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজ করিতে হইবে। পরিবার মধ্যে (১) জ্ঞানালোচনা, (২) সদনুষ্ঠান, (৩) ধর্ম্মসাধন এই তিনটিকে প্রবল করিতে হইবে ও পরস্পরের সহিত ব্যবহারে Liberty, Love ও Purity এই তিনটি ভাবকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন neatness, order, punctuality and innocent diversions এই কয়েকটি তাহাতে থাকা চাই।

ইহার পরেই কতকগুলি বিশেষরূপে অনুরক্ত স্বাধীনভাবাপন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যে সকল সত্যের বীজ ভারতক্ষেত্রে বপন করিবার চেষ্টা করা

যাইতেছে তাহা অন্ততঃ হৃদয়ে ভাল করিয়া বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। দশটি হৃদয় বাস্তবিক প্রেমের সহিত এই গুলিকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, তাহা দেশে থাকিয়া যাইবে। এইরূপ একটি দল করিয়া তাহাদের সঙ্গে Sunday Reading অথবা অন্য কোন দিনে Reading-এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পরিবারে Neatness, Oreder ও Puncualityর জন্য হেমের (জ্যেষ্ঠা কন্যা) উপর নির্ভর করিতে হইবে। চিন্তা ও কার্য্য করিবার স্বাধীনতার আদর রাখিতে হইবে। পরস্পরের সহিত মিশিবার স্বাধীনতা রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোক ও পুরুষের শয়ন-গৃহাদি ও আলাপাদির বিষয়ে সতর্কতার নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রেমের দ্বারা সকলকে শাসন করিতে হইবে। ভালবাসা যাহাতে আমাদের বন্ধনরজ্জু হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমার প্রধান কাজ—

(১ম) পরিবার গঠন

(২য়) মণ্ডলী গঠন

(৩য়) শিক্ষিত যুবকদলের মনে ধর্ম্মের বীজ বপন

অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে—

(১) মহিলাদিগের উন্নতির সহায়তা

(২) বালক-বালিকার শিক্ষায় সহায়তা

২৯-১১-৮৮

গতকল্য বৈকালে জাহাজে খেলা (Sports) হইয়াছে। পুরুষেরা—দৌড়ান, লাফান, Tug-of-war, Race of obstacles খেলিয়াছে। মেয়েরা skipping, running প্রভৃতি খেলিয়াছে। race of obstacles বড় কৌতুকজনক। এই খেলার গোলমালে বৈকালটা গিয়াছে। রাত্রে Mr Maclean ও Mr Staines-এর সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে।

গতকল্য বৈকাল হইতে একটি কঠিন প্রশ্ন আমার মনে জাগিতেছে। আমি আমার আগামী দশ বৎসরের কার্য্যের যেরূপ প্রণালী লিখিয়াছি, তাহা প্রকৃতরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে আমার কলিকাতায় লাগিয়া-পড়িয়া থাকা উচিত, কিন্তু কলিকাতাতে লাগিয়া-পড়িয়া থাকিলে চারিদিকে প্রচার করা হয় না, আমি কোন আদর্শ অনুসারে চলিব? কলিকাতায় থাকিয়া সমাজের কার্য্যকে পাকা বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব কিম্বা উদাসীনের ন্যায় নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া লোককে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। কলিকাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতে গেলে দুর্ব্বলতা হইবে, কাজটা বহুদূরব্যাপী কিন্তু গভীরতায় অল্প হইবে, এরূপ কাজের স্থায়িত্ব থাকিবে না। একটা হৃদয় যদি প্রকৃতরূপে সত্যকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই বীজ রক্ষিত হইবে। এ দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করতে চাই। ইহার কোন কার্য্য আমার? বিধাতা যে পথ দেখাইয়া দেন, সেই পথই আমার। আপাততঃ একটা কথা মনে হইতেছে আমার কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ কলিকাতাতে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে সমাজ, সকল পরিদর্শন করা যাইতে পারে এবং অন্য লোককে প্রচার কার্য্যে প্ররোচনা করা যাইতে পারে। কয়েকদিন উপাসনা কালে এই বিষয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে। কলিকাতাতে থাকিলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে কাজ করা যাইতে পারে। (ক) পারিবারিক শিক্ষা (১) পাঠে সকলকে উৎসাহিত করা ও (২) সকল প্রকার সংবাদ ও জ্ঞাতব্য বিষয় গৃহে উপস্থিত করা (৩) নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে সকলকে উৎসাহিত করা (৪) দৈনিক উপাসনাতে লেসনস ও সাপ্তাহিক ধর্ম্মচর্চ্চা (৫) গোষ্ঠী সুখ। (খ) মণ্ডলী সংগঠন, Sunday Reading,—বিশেষ সঙ্গত—মাঝে মাঝে বাগানে যাওয়া—ইহাদের মধ্যে প্রচারক যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে একীভূত হওয়া। (গ) যুবকদিগের জন্য Students service —সে জন্য পাঠচিন্তা; এতদ্ভিন্ন City Collegeএ যুবকদিগের জন্য Debating Society স্থাপন করা ও অন্যান্য প্রকারে শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে কার্য্য করিবার চেষ্টা করা।

কলিকাতাতে অবস্থিতি কালে, দুপুর বেলা লোকজন আসে না, আমার সময় থাকে। ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আমার পড়িবার সময় করিতে হইবে। এই পড়াটা পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়া হইতে পারে। ১১টার সময় এক আনা ট্রাম ভাড়া দিয়া যাওয়া হইতে পারে, বৈকালে হাঁটিয়া আসা যাইতে পারে। একটু হাঁটাও হয়। প্রাতে উঠিয়াই ১৫ মিনিট অথবা ২০ মিনিট পারিবারিক উপাসনা, একটি গান, একটি Lesson, একটি প্রার্থনা, তৎপরে ইচ্ছা করিলে আর একটি গান। তার পর ছেলেরা খাইবে তখন আমি ব্যক্তিগত উপাসনা সারিয়া লইব। উপাসনা ও স্নানাদি করিয়া বাহিরে আসিব ৭টার সময়। ৭টা হইতে ৮টা বাহিরে থাকা, ৮টা হইতে সাড়ে নয়টা চিঠিপত্র লেখা ও পড়া। বৈকালে সন্ধ্যার পর সকলে একত্র আহার। আহার কালে ঈশ্বর স্মরণ। তৎপর কিয়ৎকাল আমোদ-প্রমোদ। মিটিং থাকিলে সেখানে যাওয়া, নতুবা পাঠ।

এই সকল কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া, আগামী জন্মদিনে আবার দশ বৎসরের জন্য সেবার ব্রত লইতে হইবে।

প্রার্থনা

জীবনাধার পরমেশ্বর! আমাকে নব-জীবনের সহিত আর এক বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ কর!

২৯-১১-৮৮। বৈকাল

আজ বৈকালে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা বিষয়ে অনেক চিন্তা করা গেল। চিন্তা করিতে করিতে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করা গেল যে ব্রাহ্মধর্ম্মই উভয় দেশের ভাবী ধর্ম্ম-জীবনের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইংলণ্ডে একদল খ্রীষ্টান যাজক বাইবেল অভ্রান্ত গ্রন্থ ও খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া তদুপরি ধর্ম্মভাবকে দণ্ডায়মান করাতে দুই শ্রেণীর লোক ঘৃণা করিয়া এই সকল মতকে এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মভাবকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে—(১ম

বিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বিগণ (২য়) ব্রাডলার শিষ্যগণ। ভ্রান্ত মতের প্রতি ইহাদের যে ঘৃণা, তাহা ধর্ম্মভাবের উপরে সংক্রামিত হইতেছে। বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিবাদ ঘুচিয়া যতই মিত্রতা হইবে, দরিদ্র ও পাপীদের প্রতি ধর্ম্মের দৃষ্টি যতই পড়িবে, ততই এই দুই শ্রেণীকে পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাবকে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আছে। মেস্তাঃ মিষ্টার ষ্টাপফোর্ড ব্রুক ইহার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষেও জ্ঞানালোকের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মভাব ভাঙ্গিয়া যাইবে, হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ধর্ম্মভাবকে রাখা যাইবে না, মুসলমান ধর্ম্ম যদি পুনরুজ্জীবিত ও সংস্কৃত হয় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এদেশের Reverince রক্ষা করিবে, ভবিষ্যতে উন্নতীর বীজ বক্ষে ধারণ করিবে। Reverince, Spirituality, purity, good work, ব্রাহ্মধর্ম্মে নিহিত করিতে হইবে। যে শক্তিতে ইহা দেশে প্রচার করিতে হইবে, তাহা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা কতিপয় ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে? যীশুর দৃষ্টান্ত—These are my mother and brothers অনুসারে কাজ করিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে। অগ্রে প্রেম, তৎপরে প্রচার। আগামী দশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৩০-১১-৭৮

কল্য রাত্রি হইতে ভারতের ভাবী ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিতেছি। এখন মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু, এই তিন প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতবর্ষে জয়লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ইহার মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমানদিগেরই প্রচার কার্য্য চলিতেছে, হিন্দুদিগের বাহিরে প্রচার করিবার যো নাই। তাঁহারা বাহির হইতে কাহাকেও ভিতরে আনিতে পারেন না। তবে তাঁহারা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা আত্মরক্ষার জন্য। মুসলমানগণ রাজশক্তি হারাইয়া দৈন্যদশার মধ্যে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এমন কোন Organisation নাই যদ্দারা তাঁহারা প্রচার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চালাইতে পারেন। তাঁহাদের যে প্রচার হইতেছে, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্যের দ্বারা চলিতেছে। খ্রীষ্টীয় দলই প্রকৃত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইংলণ্ডের বড় বড় সভা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল ইহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় মণ্ডলীর প্রচারের ভাব দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। যদিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি প্রচারের ভাব সকল শ্রেণীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছে, এখন এই সংগ্রামক্ষেত্রে কে জয়লাভ করিবে? এক-জনের হাতের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহার উপর দশটা ডালকুত্তা ছাড়িয়া দিলে যাহা হয়, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সেই দশা হইয়াছে। রাজশক্তি অপহরণ করিয়া ইহাকে ছিঁড়িবার জন্য নানা শত্রু লাগান হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুধর্ম্ম কতকাল বাঁচিবে? জাতিভেদ ও ইহার সামাজিক গঠনে ইহার পরমাণুপুঞ্জকে ঘননিবিষ্ট রাখাতে ইহাকে শীঘ্র ভাঙ্গিতে পারে নাই এবং এখনও ভাঙ্গিতে দেরি হইতেছে। কিন্তু কালে এই ঘননিবিষ্টতা শিথিল হইয়া যাইবে। পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া গেলে, তৎস্থানে নূতন হিন্দুধর্ম্ম উঠিবার আশা নাই। যে যে ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্ম দণ্ডায়মান, তাহার কোনটাই বিজ্ঞানের আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। বেদের অভ্রান্ততা, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ—ইহার কোনটাকেই রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। এগুলিকে ছাড়িলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে। যাঁহারা পুনরুত্থানকারী তাঁহারা একটা কিছু ধরিবার মত দেখিতে পাইতেছেন না। যাহা ধরিয়া লোককে উন্মাদপ্রস্ত করা যায়। বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ-চরিত্র খাড়া করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু যে দামের মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র জড়াইয়া আছে সে দাম কাটাইয়া বাহির করাই কঠিন। যীশুর শিষ্যগণ যীশুর চরিত্রকে, মুসলমান-গণ মহম্মদ চরিত্রকে যেমন করিয়া ধরিয়াছেন, তেমন করিয়া ধরিবার মত হইবে না সুতরাং পুরাতন ভিত্তির উপরে হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে না। মুসলমান ধর্ম্মও আপনার ভিত্তি স্থির রাখিতে পারিবে না। জ্ঞানালোচনা ও স্বাধীন চিন্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল হইলে তাঁহাদিগকে কোরাণের গণ্ডির মধ্যে আর রাখা যাইবে না। পশ্চিমে খ্রীষ্টধর্ম্মের দুর্গ তিন প্রকারে ভাঙ্গিতেছে (১ম) শিক্ষিত চিন্তানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন (২য়) শ্রমজীবী ও নিম্ন শ্রেণীর নরনারী ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। (৩য়) খ্রীষ্টীয় দলের মধ্যে অনেক উদারতা প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে খ্রীষ্টীয় মত ও শাস্ত্র ভাঙ্গিতেছে। কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্মনীতির আদর বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ভারতীয় খ্রীষ্টান মণ্ডলীকেও কালে খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু উহাদের প্রভুত্ব ভগ্ন হইলে কি থাকিবে? মানব হৃদয় হইতে Reverence কি বিলুপ্ত হইবে? Reverenceকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। বিজ্ঞানের সহিত অবিবাদ মানব চিন্তার পক্ষকে মুক্ত রাখিয়া মানবের হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পোষণ করিবে, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে অন্নপান দিবে, এরূপ ধর্ম্ম চাই; তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন যে ভাব আছে, তাহা নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে আরও Reverence, Purity, Self-Sacrifice ও Sympathy সন্নিহিত হওয়া চাই। তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি শক্তি হইবে। আমাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করিতে হইবে। আকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত ও শিক্ষার দ্বারা জয় করিতে হইবে। তবে ক্রমে ভারতে এক নব আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিবে।

প্রার্থনা

হে পরাৎপর পরম পুরুষ, ব্রাহ্মসমাজের হস্তে কত বড় কাজ। তাহার উপযুক্ত ত কিছু করা হইতেছে না। কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।

১-১২-৮৮।

আজ প্রাতে উপাসনার পূর্ব্বে, ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও কার্য্য বিষয়ে অনেক চিন্তা করা গেল। যাহাদের অন্তরে ইংরেজী শিক্ষার দরুন Reverence ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাদের অন্তরে Reverence রক্ষা করাই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ? যাহাদের অন্তরে Reverence ভাব পূর্ণ মাত্রায় আছে সেই সকল সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন কাজ নাই? পৌত্তলিকতার material conceptions of religion বিনষ্ট করিয়া spiritual conception-এর প্রতিষ্ঠা করা তাহাও ত একটা মহৎ কাজ। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইহার আধ্যাত্মিকতার উপরে বিশেষ নির্ভর করিতে হইবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

আগামী ১৯শে মাঘ আমার জন্মদিনে আবার দশ বৎসরের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সেই দিন হইতে নূতন ভাবে নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে একমাস অর্থাৎ ১৮ই পৌষ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত এই নূতন ব্রতের সংযম ও আয়োজনে কাটাইতে হইবে। এই একমাস কাল কি বিশেষ ব্রতে কাটাইতে হইবে তাহা এখনও সম্পূর্ণ স্থির করিতে পারি নাই। আপাততঃ তিনটি মনে হইতেছে: (১ম) ২৮শে নবেম্বর যে কতকগুলি অবশ্য করণীয় বিষয় লিখিয়াছি, তাহা প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনাকালে পাঠ করা। (২য়) প্রসিদ্ধ প্রচারকদিগের জীবন হইতে Lessons বা উপদেশ সংগ্রহ করা এখান হইতে প্রত্যহ উপাসনাকালে এ বিষয়ে চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে হইবে।

২-১২-৮৮।

গতকল্য রাত্রে জল ঝড় বজ্রাঘাতে রাত্রিটা গিয়াছে। কিন্তু আমি কিছু টের পাই নাই। অগাধ নিদ্রা দিয়াছিলাম। ছয় ঘণ্টার অধিক ঘুম হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর নিদ্রাটা বালকের মত অগাধ হইয়া থাকে। কলেজে পড়িবার সময় ১১ বৎসর একাদিক্রমে রাত্রি জাগিয়া ঘুমের অভ্যাসটা একেবারে গিয়াছিল, এই কয়েক বৎসর ঘুমাইয়া বাড়ান গিয়াছে। উত্তম আহার ও উত্তম নিদ্রা এই দুইটি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির বিশেষ সহায়। আমার বোধ হয় দীক্ষার্থী আসিলে তাহাকে অপরাপর প্রশ্নের মধ্যে এই দুইটি প্রশ্ন করা উচিত ভাল খাও ত? ভাল ঘুম হয়ত? কারণ যে ভাল খাইতে পারে না ও ভাল ঘুমাইতে পারে না, তাহার কোন স্থানে গোলমাল ——।

আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া Illustrated London News হইতে ১৬৮৮ সনের ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের বিবরণ পাঠ করা গেল। ইহা পড়িয়াও একপ্রকার আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করা গেল। ঈশ্বরের পালনী শক্তি যে মানব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া মানবসমাজে কার্য্য করিতেছে—তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দ হইল। আমাদের দেশকে এই আশায় শান্ত দিতে হইবে।

আমাদের সঙ্গে মিষ্টার ক্রিষ্টি নামে একজন Scotch যাইতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে "What to read for Entertainment" নামে Religious Tract Societyর মুদ্রিত একখানি বই চাহিয়া লইয়া কতকগুলি গল্প পড়িলাম, সকল গুলিতেই চক্ষের জল পড়িল। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি দেখিলে আমার মন গলিয়া যায়, আমি কাঁদিয়া আকুল হই, পড়িতে পারি না। ডেকে বসিয়া পড়া দুষ্কর হইয়া উঠিল, পাছে কেহ চক্ষের জল দেখিতে পায়। অনেক সাবধানে বই রাখিয়া বার বার চক্ষু মুছিতে হইল। পড়িতে পড়িতে মনে হইল, এইরূপ বই আমাদের দেশের লোকের জন্য করা উচিত। হেমকে এইরূপ একখানি বই দিয়া ইহার অনুরূপ বই লিখিতে বলিলে হয়—Religious Tract Societyর মুদ্রিত Penny Books for tho People. কতকগুলি কিনিয়া তাহাকে দিতে হইবে। প্রাতঃকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আমার কার্য্যভার এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বিঘ্ন এই যে, আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব। এই ভাব প্রবল করিবার পক্ষে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা করিয়াছি। এ ভাব রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য; ইহার জন্য আমি দুঃখিত নহি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কিরূপে ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন করা যায়? দুই প্রকারে হইতে পারে: (১) ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র ও প্রভাব দ্বারা। (২) সাধুভক্তি ও সত্যানুরাগের উদ্দীপনা দ্বারা। এই উভয় যদি একত্রে পাওয়া যায়, তাহার তুল্য আর কিছু নাই। কিন্তু কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব আমি চাহি না, কারণ সে কার্য্য স্থায়ী হওয়া কঠিন; সাধুভক্তি ও Love for Principles এই উভয়ের উদ্দীপনা বিশেষ প্রয়োজন। আগামী মাঘোৎসবের দিনে যদি আমাকে বেদীর কার্য্য করিতে হয়, এই দুই বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে: (১) Hope thou in God—Davids Psalm (সত্যের জয়ে অবিশ্বাস ঈশ্বরে অবিশ্বাস); (২) God speaks through his acts, through creation and through great men—"God speaks not" —Confucins.

আজ চিন্তা করিতে করিতে আমার জীবনের mission বিষয়ে এই বিশ্বাস মনে জাগিতেছে—The mission of my life is to call my countrymen, specially the rising generations, to a religious life which combines morality with sperituality, individuality with reverence, earnest cultivation of knowledge with dueculture of the emotions and devotion with active philanthropy.

আমার রসনা ও আমার লেখনী, আমার চিন্তা ও আমার কার্য্য সকলই এই পথে রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন যেন আরও একাগ্রতার সহিত থাকে।

৩-১২-৮৮।

গতকল্য সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে অনেক চিন্তা করা গেল। আমাদের পরস্পরের বিচ্ছিন্নতাই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আপনার লক্ষ্য ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। আগামী দশ বৎসরে এই ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একতাবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে: (১) ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের মহত্ব সকলের মনে মুদ্রিত করা (২ Reverence বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা। (৩) একটু মাঝিগিরি দৃঢ় রূপে করা। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখা ভাল: (ক) কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সকল শ্রেণীর মতের প্রতি দৃষ্টি কর; (খ) প্রার্থনা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান অনুসারে কার্য্য নির্দ্ধারণ কর; (গ) করিয়া যতক্ষণ আপনাকে সত্যের উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত মনে করিতেছ, ততক্ষণ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় থাক; যত নিরাশার ধ্বনি উঠে, তত আশার ধ্বনি উত্থিত কর। (ঘ) সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত সকল প্রতিবাদ শুনিতে প্রস্তুত থাক। (ঙ) যাহা করিবে তাহা অগ্রে বলিও না; আগে কর পরে কারণ প্রদর্শন আবশ্যক হইলে বলিও। (চ) কাহারও অসাক্ষাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। (ছ) সমাজ মধ্যে দোষ দেখিলে তাহার প্রতি উদাসীন হইও না, উপদেশাদিতে তাহা প্রদর্শন কর। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল করিয়া প্রচার হইতেছে না। মহর্ষি পরকালে পা বাড়াইয়াছেন, রাজনারায়ণ বাবু অকর্ম্মণ্য হইয়া আছেন; প্রতাপ বাবু নিজের দাঁড়াইবার ভিত্তির অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন, "দরবার" ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরিণত করিতেছেন। এমন সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একমাত্র আশার স্থল। আমরাই বা কি করিতেছি? আমি কি করিতেছি? আমি অবিশ্বাসী বলিয়া আমরা missionটি ধরিতে পারিতেছি না। আমার দ্বারা তেমন কার্য্য হইতেছে না। আগামী দশ বৎসরে নবভাবে কার্য্য করিতে হইতেছে।

-১২-৮৮।

আজ প্রাতে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় জাগা অবধি, ব্রাহ্মসমাজের ভাবী উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলাম। প্রাতে উপাসনার র পূর্ব্ব কয়েক দিনের ভাব আরও দৃঢ়ীভূত হইল। উপাসনার সময় "পিতা নোসি" ইত্যাদি বাক্যটি বড়ই মধুর বোধ হইতে লাগিল। অনুভব করিলাম যে, ১৮ই পৌষ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত যে ব্রত লইব এইটি সাধন করা তাহার একটি অঙ্গ অর্থাৎ ত্রিশদিন এই প্রার্থনাটি পড়িব। আর একটি ভাব হৃদয়ে উদিত হইল; সেটি এই, ইংরেজ জাতির একটা সদগুণ এই দেখিতেছি যে তাঁহারা প্রাচীনের সমাদর করেন; কিন্তু সে সমাদর নূতন গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় নহে। ব্রাহ্মসমাজকে আমরা প্রাচীন হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি। প্রাচীনের দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। কিন্তু যে প্রাচীনভাব নূতনকে ঘৃণা করে বা অন্যত্র হইতে আলোক আসিতে দেয় না, তাহা প্রার্থনীয় নহে; ব্রাহ্মসমাজ তাহা চাহেন না। এই দুইটি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া প্রাচীন ভক্তিকে প্রবল রাখিতে হইবে। সাধু ভক্তিকে জাগ্রত করিলে—এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

৫-১২-৮৮।

আমরা কলম্বোর নিকট পৌঁছিয়াছি। যতই বাড়ীর নিকট আসিতেছি, ততই পরিবারদিগের ভাবনা মনে জাগিতেছে। বিলাত যাত্রা উপলক্ষে অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছে। এই ঋণ কিরূপে শুধিব? মনে করিয়াছিলাম, নভেলখানি ও 'ছায়াময়ী পরিণয়' শেষ করিব। আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু হইয়া উঠিল না। দেখা গেল যে নির্জ্জনতা না হইলে ওরূপ কাজ করিতে পারিব না। জগদীশ্বর যেরূপ উপায় দেখাইয়া দিবেন সেইরূপ হইবে।

গত দুইদিন Mr. Norman, Mr. Walker, Mr. Macleau, Mr. Staimes প্রভৃতি সহযাত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিতে করিতে নিজের কথা অনেক বলিয়াছি। এইটা আমার বড় দোষ। একেবারে ধুকড়ি এলাইয়া বসি। এই Vanity-তে আমার অসারতা প্রকাশ করে। কতদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ বিষয়ে সাবধান হইব। এখন হইতে আরও সাবধান হইতে হইবে।

আর একটি চিন্তা বার বার মনে হইতেছে: এতদিন যেরূপে কাজ করিয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জা হইতেছে। আমার উপরে যেরূপ মহৎভার, তাহা সমুচিত রূপে অনুভব না করাতে তাহার অনুরূপ দায়িত্ববোধ হয় নাই, এবং সে স্থানও অধিকার করিতে পারি নাই। সকল সামাজিক উন্নতির মূল পরিবার মধ্যে, ইহা ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি নাই। নিজ পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু করি নাই। আগামী দশ বৎসরে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছে, কিন্তু যাহা অনিষ্ট ঘটিবার অনেকটা ঘটিয়াছে।

৭-১২-৮৮।

জাহাজ বুধবার দুপুরের সময় কলম্বো পৌঁছিলে জাহাজ হইতে নামিয়া প্রথমে Mr. Walker-এর উল্লিখিত Coffee Tavern-এ গিয়া কিছু আহার করা গেল। Candy হইতে একজন ইংরেজ ব্যাপটিষ্ট মিশনারী উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক তর্ক হইল। লোকটি উদার ভাবাপন্ন Plymanth Brethern দিগের ন্যায় নয়। Coffee Tavern-এ শুনিলাম যে, Bristol-এর George Muller কলম্বোতে আসিয়াছেন এবং তিনি এক গির্জ্জাতে উপদেশ দিবেন। Coffee Tavern হইতে Galle-face হোটেলে জর্জ্জ-মুলারের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তৎপরে Hon. Ramnadhan-এর বাড়ীতে গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখা পাইলাম না। তখন আবার George Muller এর উপদেশ শুনিয়া ফিরিয়া Hon'ble Ramonadhan-এর বাড়ী গেলাম। তিনি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

সে রাত্রি সেখানে যাপন করা গেল। সেদিন রাত্রি ও পরদিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ও তাঁহার ভ্রাতা Arunachalam-এর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেক আলাপ হইল। ইঁহারা পৌত্তলিকতাকে এক আধ্যাত্মিক ভাবে লইতেছেন। একজন গুরু পাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে, এ ব্যক্তি একজন অসাধারণ জ্ঞানী লোক। ইহাদের দুই ভাইয়ের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, ইঁহারা বাস্তবিক গুরুতর ভাবে ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা বৃথা, কারণ ইহা বহু বহু যুগ ধরিয়া কোটি কোটি নরনারীকে ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছে; ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক উচ্চভাব গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাঁহারা একটি ভাল উত্তর দিতে পারিলেন না। আহারের পর Mr. Ramonadhan আমাকে ষ্টীমার ঘাটে তুলিয়া দিয়া গেলেন। বৃহস্পতিবার ১১টার সময় আবার জাহাজ ছাড়িল।

৮-১২-৮৮।

(Proceeding to Madras)

গতকল্য সমস্ত দিন জল-বৃষ্টিতে গিয়াছে। আমি অনেক সময় আদিসমাজের উপাসনা প্রণালী মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। তাহাতে বড় আনন্দ পাই। কতকগুলি বাছা বাছা শব্দ বা উক্তি বার বার উচ্চারণ করিয়া ও সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া রাখিলে সেগুলি সাধা হইয়া যায়। আদিসমাজের প্রণালীর বচনগুলি আমার সাধা হইয়া যাইতেছে। আমি যে নিজের উপাসনা অনেক সময় ঐ প্রণালীতে করিয়া থাকি, তাহা অনেকে জানেন না। গতকল্য উপাসনাকালে একটি সত্য হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা মুখে বলি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু প্রার্থনাতে প্রকৃত বিশ্বাসী নহি। এত প্রার্থনা করা গেল, তথাপি এরূপ নির্ভর নিশ্চিন্ত ভাব হয় না যে, আমি যখন নিবেদন করিয়াছি, আমাকে পাপ হইতে বাঁচাও, তখন আবার কি? পাপ হইতে বাঁচিবই। এরূপ নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব না আসাতেই প্রমাণ যে, আমরা বিশ্বাসী নহি। আমাকে তিনি মান্দ্রাজে অবস্থিতি কালে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি আমার একমাত্র নির্জ্জনের বন্ধু। তথাপি আমার ভয়-ভাবনা যায় না, তথাপি পাপরূপ বিষ্ঠা আহারে রুচি হয়। আগামী দশ বৎসরে তিনি যদি আমাকে প্রকৃত বিশ্বাসের সুখ দেন তবে বাঁচিয়া যাই।

দ্বিতীয় একটি চিন্তা মনে হইতেছে যে, সমাজের নেতার স্থান যাহারা অধিকার করিতে চায়, অপরাপর গুণাবলীর মধ্যে তাহাদের একটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা দায়িত্ববোধ, Sense of Responsibility অর্থাৎ এই জ্ঞান যে আমার কথা ও কাজের নানা ফল নানাদিকে ফলিবে। আজ পর্য্যন্ত আমি যে ভাবে কাজ করিয়াছি তাহাতে এই দায়িত্ববোধ অধিক থাকে নাই। নিজের কথার ও কাজের মূল্য নিজেই না বুঝিলে অপরে বুঝিবে কেন? আগামী দশ বৎসরে এই অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ কিছু বলিবার ও করিবার সময় ভাবিতে হইবে যে, আমি শত শত ব্যক্তির প্রতিনিধি।

১৮ই পৌষ হইতে যে নূতন ব্রত লইয়া একমাস কাল সাধন করিব তাহার মধ্যে ১২ই আগষ্টের লণ্ডনে লিখিত প্রার্থনাটি একটি। তাহার প্রণালী এই (ক) একটি সঙ্গীত (খ) Lessons (গ) সকলে সাম্মিলিত হইয়া "পিতা নোসি" ইত্যাদি প্রার্থনা, (ঘ) একটি বিশেষ সঙ্গীত।

১০-১২-৮৮।

অদ্য প্রাতে আমরা মান্দ্রাজে পৌঁছি। জাহাজ বন্দরে পৌঁছিতে ৭টা বাজিয়া গেল। ইচ্ছা ছিল যে, একবার নামিয়া গিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা করিয়া আসি; কিন্তু জাহাজ থামিলেই শোনা গেল যে, ৯টায় আবার ছাড়িবে, সুতরাং আর নামিবার সময় হইল না। যতক্ষণ না ছাড়িল ততক্ষণ কেবল গোলমালে গেল। ছাড়ার পরও মনটা বসিতে সমস্ত দিন গেল। আজ রাত্রি শেষ হইতে দুইটি বিষয়ে চিন্তা মনে জাগিতেছে। প্রাতঃকালের উপাসনার সময় সেই দুইটি বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছি: (১ম) আমার কার্য্যক্ষেত্র কি কলিকাতায় অথবা ইতস্ততঃ? এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে হইল। (ক) যীশু তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই শিষ্যদিগকে জেরুসালেমে প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার যুক্তি আছে, কারণ জেরুসালেমে সকল শ্রেণীর য়ীহুদীগণ যাতায়াত করিত। য়ীহুদীদের মধ্যে তাঁহার এই নবধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং তিনি এই স্থানকে প্রধান স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন। (খ) কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বলীয়ান করিতে পারিলে ইহা অপরাপর স্থানে বলীয়ান হইবে। (গ) কলিকাতায় যুবকদল নানাস্থান হইতে আসিয়া বাস করে। এখানে তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে তাহারা সেই ভাবে চারিদিকে ব্যাপ্ত করিবে। (ঘ) আমাদের অল্প সংখ্যক প্রচারকদিগের মধ্যে আমারই বর্ত্তমানে কলিকাতার ন্যায় স্থানে কাজ করিবার উপযোগী শক্তি আছে, মফঃস্বলের কোন ক্ষুদ্র স্থানে তাহা ব্যয় না করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান স্থানে তাহা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। মফঃস্বলে কাজ করিবার জন্য তদুপযোগী লোক পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল চিন্তা ও প্রার্থনার ফলস্বরূপ এই স্থির হইতেছে যে, আগামী দশ বৎসর কলিকাতাকে প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়া, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে সেই কার্য্য বিস্তার করিতে হইবে এবং মফঃস্বলের জন্য এক শ্রেণীর প্রচারক প্রস্তুত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় চিন্তা—Last ten years I have been busy in breaking with individualism as my weapon. The next ten years I shall be busy in building up with reverence as my foundation. সর্ব্বতোভাবে গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয় চিন্তা—আমার পরিবার ভরণপোষণের কি হইবে? আমি ঋণগ্রস্ত হইয়াছি, এই ঋণশোধ ও অর্থাগমের, অর্থোপার্জ্জনের অনেক উপায় করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্যই ঈশ্বর আমাকে আনিয়াছেন। জীবিকা সম্বন্ধে ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের মানব বুদ্ধিতে যত প্রকার উপায় যোগাড় করিতে হইবে, চরমে তাঁহারই ইচ্ছা এই ভাবে করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের একদল লোক প্রস্তুত করা যায় কিনা, যাঁহারা Communism অনুসারে থাকিবেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন ও শ্রমের দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের সকলের ভরণপোষণ হইবে। একান্ত প্রার্থনার সহিত তাঁহার চরণে হত্যা দিতে হইবে।

১২-১২-৮৮

আজ প্রাতে আমরা Diamond Harbour-এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ভাঁটা পড়াতে জাহাজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এখানে আগামী কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে। পরন্তু বৈকালে এই সঙ্কল্প করা গেল যে, ১১ই ডিসেম্বর জাহাজের শেষ দিন, অতএব উক্ত দিনটিকে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও প্রার্থনাতে কাটান হইবে। তদনুসারে Chief Officer-এর বই ফিরাইয়া দিয়া আমার লণ্ডনের দৈনিক লিপি আদ্যোপান্ত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পরন্তু বৈকালে ও কল্য প্রাতঃকালে প্রায় সমুদায় পড়া গেল। কল্য প্রাতে উঠিয়া আমার বিগত ধর্ম্মজীবনের বিষয়, জীবনের লক্ষ্য ও কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলাম। তৎপরে উপাসনাতে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব অনেক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ জাহাজ এখানেই থাকিবে। আজও চিন্তাতে যাপন করিব। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আর একবার ভাল করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি। তিনিই আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা।

শেষ প্রার্থনা

দীনদয়াল! তুমিই আমার ধর্ম্মজীবনের গুরু—বিগত দশ বৎসর আমি অনুপযুক্তরূপে তোমার সেবা করিয়াছি। আগামী দশ বৎসরে যাহাতে প্রকৃত বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সহিত তোমার সেবা করিতে পারি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তুমিই আমাকে বিদেশে লইয়া গিয়াছিলে, তুমিই আমাকে স্বদেশের ক্রোড়ে আনিয়াছ। আমি যেন এবার তোমার প্রসাদ বিশেষরূপে অনুভব করি, তোমার ঐশীশক্তির ক্রোড়ে বিশেষ রূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।

সমাপ্ত

তোমার হৃদয়

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

কাকচক্ষু স্বচ্ছ নীর তোমার হৃদয়,
কলুষিত করেনিকো কলঙ্কের কালো আবর্জ্জনা;
আকাশের প্রতিবিম্বে বিশ্বের বিস্ময়—
বিস্ফারিত বাহু মেলে এঁকে চলে ঢেউয়ের আল্পনা।
তরঙ্গের পদক্ষেপে তটস্থ শরীর,
অর্থাৎ আমার সত্তা নুয়ে পড়ে তোমার সম্মুখে;
পশ্চাতে আক্ষেপ করে পরিত্যক্ত তীর;
তোমাতে আত্মস্থ হয়ে ভেসে চলি পূর্ণ মনসুখে।

দিনের দর্পণ যেন তোমার হৃদয়,
যত রোদ এসে লাগে তার চেয়ে ঢের বেশী আলো—
ফিরিয়ে দেবার মত সার্থক বিনয়
জানা আছে, তাই তুমি অন্ধকারে মণিদীপ জ্বালো।

নরম মাটির মত তোমার হৃদয়,
উত্তাল সমুদ্রে দ্বীপ পরম নির্ভয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বাইশ বছর আগেকার কথা। তখন চাকরী ব্যপদেশে আমি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে পোষ্টেড ছিলাম। শরৎবাবুর লেখা সব বই তখন পড়েছি—তা ছাড়া প্রতি মাসে "ভারতবর্ষে" এবং "বিচিত্রায়" তাঁর যে উপন্যাস বের হচ্ছে সে সব গোগ্রাসে গিলছি। শরৎবাবুর বই পড়তে পড়তে একটা কথা কেবলই মনে হ'ত—ভাবতাম শরৎবাবুও মানুষ, আমরাও মানুষ—তাঁরও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে, আমাদেরও আছে—অথচ তাঁর বইগুলিতে তাঁর চরিত্রেরা যে রকম করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমরা সে রকম পারি না কেন? আমাদের কথা ত এমন মিষ্টি, এমন দরদভরা হয় না? এই লোকটিকে দেখতে পেলে খুশী হতাম—দেখতাম তাঁর চাল-চলন, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার কি রকম—তাঁর চরিত্রগুলির বুকে যেমন দরদ, সহানুভূতি, বিবেচনা বাসা বেঁধে আছে, তাঁর নিজের বুকেও কি তেমনই? ইন্দ্রনাথ, অন্নদা দিদি, অভয়ার মত তাঁর বুকেও কি ভগবান বসে চোখের জল ফেলেন?

কিছুদিনের মধ্যেই একটা সুযোগ উপস্থিত হ'ল, মৃণাল সর্ব্বাধিকারী, "বিরহ মিলন কথা"র লেখক (অবশ্য তখনও বই বাহির হয় নি), হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেন্দ্র ঘোষ এসে বললেন যে, তাঁরা শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এবং আমাকে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। মনের দিক দিয়ে আমি ত তৈরী হয়েছিলামই, সুতরাং সাগ্রহেই রাজী হলাম। শরৎবাবু তখন পানিত্রাসের কাছে সামতাবেড় গ্রামে থাকতেন। সামতাবেড় নামটাও তাঁর দেওয়া—আগে অন্য কিছু একটা নাম ছিল। তাঁর দিদি অনিলা দেবী ওখানে থাকতেন, তাঁর ভগ্নিপতি, মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ী শরৎবাবুর বাড়ীর অনতিদূরে। দিদির আকর্ষণেই শরৎবাবু সামতাবেড়ে বাস করতে আসেন। এই দিদির নাম দিয়ে লেখা শরৎবাবুর গল্প "কুন্তলীন" পুরস্কার পেয়েছিল।

সকালের ট্রেনে হাওড়া থেকে আমরা চার জন রওনা হলাম। দেউলটি ষ্টেশনে যখন নামলাম তখন বেশ রোদ চড়েছে। মেঠো পথে আরও তিন-চার মাইল যেতে হবে—সময়টা গ্রীষ্মকালই ছিল। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে এবড়ো-খেবড়ো পথ অতিবাহন করে আমরা যখন শরৎবাবুর দরজায় পৌছলাম, তখন বোধ করি বেলা দশটা অতিক্রান্ত হয়েছে। টিনের ছাতওয়ালা মাটির দেওয়ালের একখানা বৈঠকখানা ঘর—একেবারে রূপনারায়ণ নদের উপর। ঘরখানিতে বসে বসে রূপনারায়ণ দেখা যায়, এমন কি তার স্রোতের মৃদু গুঞ্জনও কানে আসে। গৃহস্বামী তখন ঘরের ভিতরটায় মেজেয় বসে একটি পেট্রোম্যাক্স লাইট মেরামত করছিলেন। পরে শুনেছিলাম ঐ আলোয় বসে রাত্রে উনি লেখেন—পাড়াগাঁয়ে ত বৈদ্যুতিক আলো নেই—কেরোসিনের লণ্ঠনে ওঁর বই লেখা সুবিধা হয় না।

আমরা চারজন জোয়ান লোক রীতিমত পদশব্দ করে পৈঠা বেয়ে ঘরের বারান্দায় উঠলাম, কিন্তু গৃহস্বামীর মন আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হ'ল না। তিনি যেমন ডে-লাইট পরিষ্কার করছিলেন তেমনই করতে লাগলেন। পথশ্রমের পর এ রকম নির্ব্বাক অভ্যর্থনা নিশ্চয় আশা করি নি, সুতরাং ভাল লাগল না বললে সত্য কথাই বলা হবে। বরঞ্চ ভেবেছিলাম তিনি কাজ ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে পড়বেন এবং আপ্যায়নের আতিশয্যে আমাদের একেবারে অভিভূত করে ফেলবেন। সে রকম কিছুই হ'ল না।

শরৎবাবুর সম্বন্ধে নানা লোকের মুখে উল্টো-পাল্টা গল্প শুনেছিলাম—কেউ বলেছিলেন অতিথি-অভ্যাগত গেলে তিনি দেখাই করেন না, কেউ বলেছিলেন অতিথি-অভ্যাগত গেলে তিনি ছাড়তেই চান না ইত্যাদি। আমাদের ভাগ্যে কোনটা জুটবে, এ ছিল আমাদের মনের নীরব প্রশ্ন। ঘটনা যতদূর গড়িয়েছে, তার থেকে মনে হ'ল আমাদের ভাগ্যে প্রথমটাই ফলল।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে শরৎবাবু সজাগ হয়ে উঠলেন এবং আমাদের দেখতে পেলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। তিনি বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চিতে আমাদের বসালেন এবং নিজে কাছে বসে আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। মৃণাল এবং হীরুকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন—আমার নাম বলার পরে বললেন, 'নামটা যেন বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'তার কারণ আমি অনুমান করতে পারি।' প্রবোধ সান্যাল তখন "স্বদেশ" নামে একখানা মাসিকপত্র সম্পাদন করতেন। সেই কাগজে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একখানি চিঠি প্রবোধবাবু প্রকাশ করেন। চিঠিখানি অবশ্য ব্যক্তিগত—ছাপানোর উদ্দেশ্যে লিখিতও নয়। চিঠিখানিতে শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" বইখানি সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য ছিল। অন্নদাবাবু লিখেছিলেন যে, ইউরোপে পঞ্চাশ বছর আগে যে সব মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল এবং এক্সপেরিমেণ্ট করার পর যে সব মত পরিত্যক্ত হয়েছে, শরৎবাবু তাঁর উপন্যাসে সেই সব পুরাণো মত ঢুকিয়েছেন। যে মাসের কাগজে অন্নদাবাবুর চিঠি ছাপা হয়, তার পরের মাসেই আমি তার প্রতিবাদ করে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। লেখাটি অবশ্য দুর্ব্বল—তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতি এবং তাঁর মতের প্রতি সম্মান এবং অনুমোদন জ্ঞাপন করা ছাড়া আর বেশী যুক্তি ছিল না। কিন্তু আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, শরৎবাবুর কাছে আমার নাম পরিচিত মনে হওয়ার যোগসূত্র

আছে ঐখানে। সেটা স্পষ্ট করে বলতে উনি বললেন যে, হ্যাঁ, সে লেখা আমি দেখেছি।

তারপর নিজের মনেই বলে চললেন, 'আমি তাই ভাবি যে, যে সব মত এবং নীতি সম্বন্ধে আমি বহুকাল ধরে বহু চিন্তা করেছি, আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গ কেবলমাত্র একবার পড়েই কি করে বলে দেন যে, এমনটা হওয়া উচিত ছিল কিংবা এমনতর কিছুতেই হতে পারত না।

তারপর বললেন, যে-'শেষ প্রশ্ন' একজনের কাছে আদৌ ভাল লাগল না সেই বই সম্বন্ধে বোম্বে থেকে জাষ্টিস ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই. সি. এস. কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি লিখেছেন।

আমরা চিঠিখানি দেখতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম। একটা রংচটা টিনের বাক্স ভিতর থেকে আনালেন; অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই বাক্সের তলদেশ থেকে ক্ষিতীশবাবুর চিঠি আবিষ্কৃত হ'ল। আমরা এক রকম জোর করেই চিঠিখানি হস্তগত করলাম এবং 'ইঙ্গিত' নামক অধুনালুপ্ত মাসিকপত্রে সেটি ছাপিয়ে দিলাম। 'ইঙ্গিত' কাগজে সম্পাদক হিসাবে শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষেরই নাম থাকত কিন্তু তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলায় রঘুনাথপুর নামক একটি স্কুলের হেড মাষ্টার। সুতরাং সম্পাদকের যাবতীয় কাজকর্ম কলিকাতায় বসে আমাকেই করতে হ'ত।

ভিতরে একটি ছোট পুকুর ছিল। সেখানে জাল ফেলে আমাদের জন্য মাছ ধরানো হ'ল। ঐ পুকুরে আমরা স্নানও করলাম। স্নান করে এসে দেখলাম, শরৎবাবু ইতিমধ্যে তাঁর পূজা সেরে এসেছেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা। আমি মনে মনে ভাবলাম, শরৎবাবুর বই পড়ে অনেকে মনে করেন তিনি বুঝি নাস্তিক—কিছুই মানেন না। কিন্তু তিনি যে মনে মনে একেবারে সনাতনপন্থী, সেটা তাঁর ঐ সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করা শক্ত।

কথায় কথায় শরৎচন্দ্র সুভাষবাবু এবং দিলীপবাবুর (দিলীপকুমার রায়) উল্লেখ করলেন। দু'জনেই শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় তাঁর কথাবার্তায় বোঝা গেল। সুভাষবাবু সম্পর্কে বললেন, 'সুভাষ—সুভাষের বুকখানা ঠিক গড়ের মাঠের মত চওড়া।'

ঘরের ভিতর আলমারি ঠাসা বই, কিন্তু সাহিত্যের বই নয়—বেশীর ভাগ ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology)। বললেন, 'আমার ইতিহাস আর সমাজ-বিজ্ঞানের বই পড়তে সব চেয়ে ভাল লাগে। সাহিত্য যে একেবারে পড়ি নি তা নয়, কিন্তু যা পড়ি সব কবিতার বই।'

তারপর বললেন, 'আমাকে নিয়ে সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হয় প্রুফ-রীডারদের। আমার লেখায় যদি কোথাও একটি শব্দ তারা বদলে দেয়, তবে আমি তা তখনই জানতে পারি—আমার লেখার কথাগুলি পর্য্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে যায়।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার বইয়ের কোন একটা জায়গা থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা কর—আমি তারপর থেকে মুখস্থ বলে যাব।' একটু থেমে বললেন, 'শুধু আমার বই কেন—এ রকম অনেক বই আমার মুখস্থ আছে—রবীন্দ্রনাথের "গোরা" আমার আগাগোড়া মুখস্থ।'

এই প্রসঙ্গে আমি বললাম, আচ্ছা দাদা, আপনার লেখা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, আপনি আজ হয়ত একখানা বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ লিখলেন, আর কাল হয়ত তার তেত্রিশ পরিচ্ছেদ লিখলেন—এ গুজব কি সত্যি?

মুচকি হেসে শরৎচন্দ্র বললেন, 'সত্যি, আজ যেখানটা লিখতে ভাল লাগল সেখানটা লিখে রাখলাম। কাল যে তার পরের জায়গাটাই লিখতে হবে এমন কোন মানে নেই। কাল হয়ত তেত্রিশ পরিচ্ছেদ লিখতে ভাল লাগল ত তাই লিখলাম। আসলে ও হচ্ছে mood-এর ব্যাপার। তবে গল্প বা উপন্যাসের প্লট সম্বন্ধে আমার মনে গোড়া থেকেই একটা ছক বেঁধে যায়—সে কারণে তার কোন একটা জায়গা থেকে লিখতে আমাকে বেগ পেতে হয় না।'

খাওয়ার জন্যে জায়গা হয়ে গিয়েছিল। আমরা সকলে খেতে বসলাম। শরৎচন্দ্র আমাদের সঙ্গে বসলেন না। শুনলাম তিনি একাহারী—যা কিছু খান সে ঐ রাত্রে। তবে চা খান বহুবার—চায়ের নেশা প্রবল।

রূপনারায়ণের তীরে একটি বাঁধান বেদী—তার নীচে কাউকে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে। তিনি শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা—স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্রের মনে এই ভাইটির জন্যে একটি বিরাট ব্যথা রয়েছে দেখলাম। বললেন, ভাইটি সন্ন্যাসী হয়েছিল—রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু মঠের কর্তৃপক্ষ তার উপর সুবিচার করেন নি। তার শরীর যখন খুব অসুস্থ, সেই সময় তাকে মঠের কাজে মথুরায় পাঠালেন—সেখানে গিয়ে অত্যধিক পরিশ্রমে তার শরীর ভেঙে গেল। তার পর সে শেষ শয্যাগ্রহণ করলে এখানে এসে—এখানে তার দেহান্ত হ'ল।

শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেদনায় গাঢ় হয়ে উঠল—চারিপাশের পরিবেশ থম থম করতে লাগল। ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের কতখানি ব্যথা বুকে বাজতে পারে, অথচ সে ব্যথা কেমন করে যে মনের গভীরে নিঃশব্দে বহন করা যায় তার উজ্জ্বল নিদর্শন চোখের সামনে দেখলাম।

আমাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি লেখেন কখন?' প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, 'রাত বারোটার পর।' যে চেয়ারটায় বসে রূপনারাণের দিকে মুখ করে লেখেন সেই চেয়ারটা আমরা দেখলাম। যে ডে-লাইটটা পরিষ্কার করছিলেন তার আলোয় বসে লেখেন। অনেকগুলো ফাউন্টেন পেন কালিভরা অবস্থায় থাকে। খানকয়েক চশমাও। শরৎচন্দ্রের লেখার কাগজ বেশ পুরু এবং দামী। মোট কথা, শরৎচন্দ্রের সরস্বতী-সেবা পুরোমাত্রায় রাজসিক। এ বিষয়ে কোন দৈন্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন, 'দেখ সব বিষয়ে খরচ করতে আমরা মুক্তহস্ত—কেবল যত কার্পণ্য এই লেখাপড়া করার বেলায়।

ভাঙা কলম, ভোলো কালি, রদ্দি কাগজ। সরস্বতীর সেবা যদি করতেই হয় তবে সেটা পূজার মত করে করা উচিত।'

আবার গল্প সুরু হ'ল—বললেন, 'আগে শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। হাতের টীপ একেবারে অব্যর্থ ছিল। একবার একটা পাখী মারার পর বন্দুক চিরকালের মত ত্যাগ করেছেন। পাখীটা একজোড়ার ছিল—গুলী খেয়ে যে পাখীটা মাটিতে পড়ল তাকে ঘিরে উড়ে উড়ে অপর পাখীটার কি বোবা কান্না? এই কান্না দেখার পর আর বন্দুক হাতে করেন না।'

নূতন লেখার কথা উঠল। বললেন, 'আগেকার লেখা একখানা উপন্যাস ছিল।' নূতন উপন্যাসের নাম শুনে আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম—উপন্যাসের কি নাম হবে, কোন কাগজে বেরুবে ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র ধীরে সুস্থে উত্তর দিলেন, 'আজ কয়েক দিন হ'ল রূপনারায়ণের চড়ায় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেছি।' উপন্যাসে কি ছিল, কেন সে পাণ্ডুলিপি পোড়াতে হ'ল প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন করেও শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে ও বিষয়ে আর একটি কথাও বের করতে পারলাম না।

আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রণাম করে বিদায় নিলাম। শরৎচন্দ্র কতকদূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। তার পর তাঁর ভগ্নিপতি মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ী চলে গেলেন। মুখুজ্যে মশায় তাঁর লেখার অনুরক্ত পাঠক।

এর পর বেহালায় অনেকবার শরৎবাবুকে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র রায়ের বাড়ীতে দেখেছি। মাথায় শুভ্র কেশ—গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, মাঝে মাঝে চা খাচ্ছেন। গেলেই একেবারে আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। আমরা তখন দাদা বলতে আরম্ভ করেছি—তিনিও ঠিক ছোট ভাইকে মানুষ যে রকম ভালবাসে সেই রকম ভালবাসতেন। এ তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেত—কত ছোটখাটো খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করতেন তার সংখ্যা নেই। আমাকে ত রীতিমত ক্ষেপাতেন। তিনি জানতেন, আমি রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া ভক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথাই সহ্য করতে পারি নে। তাই বলতেন, আচ্ছা অবনী, এখন ত বেলা পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে—বল ত এখন তোমার গুরুদেব কি করছেন? আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বলতেন, এখন বোধ হয় তিনি হাতের নখে নেল পলিশ (nail polish) লাগাচ্ছেন, কেমন না? এই সময়টা ত নেল পলিশ মাখার ঘণ্টা?

আমি বেজায় চটে যেতাম—মুখ গোমড়া করে বলতাম, আমার গুরুদেব নেল পলিশ লাগান না।

শরৎচন্দ্র একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়তেন। আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন, অ্যা, তাই নাকি? নেল পলিশ লাগান না?

ঘরশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠত—আমার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যেত।

এই সময় শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের এক ডাক্তার (নাম এখন ভুলে গেছি) আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, শরৎচন্দ্রের জন্য নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বই "শ্রীকান্ত" ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী ফরাসী ভাষায় তর্জ্জমা করেছেন—ঐ বইখানা পুরস্কারের জন্য পেশ করা হবে। কিন্তু তার আগে দরকার একজন নোবেল লরিয়েটের যিনি এই বইখানিকে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যে রবীন্দ্রনাথকে যেন আমি এই সুপারিশের কথা জানাই। আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে কথাটা উত্থাপন করেছিলাম এবং তিনি রাজী হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এর পরই শরৎচন্দ্র দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন এবং তাতেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। সুতরাং উক্ত প্রস্তাবটি আর কার্য্যে পরিণত হতে পারে নি।

আর একবারের কথা মনে পড়ছে। শরৎচন্দ্র দিল্লী গিয়েছিলেন। এক রাত্রে হঠাৎ তিনি বললেন, চল, আজ আগ্রা যাওয়া যাক। তখনি কয়েকখানি মোটর কার সংগ্রহ করা হ'ল এবং দল বেঁধে সকলে আগ্রা রওনা হলেন। আগ্রায় পৌঁছে শরৎচন্দ্র গাড়ীতে বসে রইলেন—তিনি অনেকবার তাজ দেখেছেন বলে আর গেলেন না। বাকী সকলে গাড়ী থেকে নেমে তাজ দেখতে চলে গেলেন।

একটি ভিখিরী ছেলে কিছু ভিক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় শরৎচন্দ্রের গাড়ীর কাছে এসে তাঁকে বিরক্ত করতে লাগল। এই দেখে গাড়ীর সোফার ছেলেটিকে দিলে একটি প্রচণ্ড ধমক। শরৎচন্দ্র দারুণ চটে উঠলেন—তার পর ছেলেটিকে কাছে ডেকে সে কি করে, তার কে কে আছে ইত্যাদি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তার পর বকশিস হিসাবে তাকে যা দিলেন তা পাবে বলে সে আদৌ প্রত্যাশা করে নি।

সাহস পেয়ে সোফার তখন বললেন, সাব, ও ভঙ্গীকা লড়কা হ্যায়।

ছেলেটি তাই শুনে বললে, ভঙ্গীকা লড়কা হ্যায় ত কেয়া হ্যায়?

কথাটি যেন শরৎচন্দ্রকে পেয়ে বসল—একেবারে আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন। মোটরের যাত্রীরা সকলে তাজ দেখে ফিরে এল—গাড়ী পুনরায় দিল্লী অভিমুখে চলতে লাগল কিন্তু শরৎচন্দ্রের যেন আর হুঁস নেই। কেবল মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, ভঙ্গীকা লড়কা হ্যায় ত কেয়া হ্যায়?

সে রাত্রে ছেলেটির কথা শরৎচন্দ্রের ভাল লেগেছিল কিংবা আমাদের সমাজ মেথর প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির প্রতি যে অবিচার করেছে তারই বেদনা তাঁর স্পর্শাতুর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল—সে কথা বলা শক্ত। কিন্তু এই ঘটনা থেকে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটা দিক স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেটা হ'ল এই যে, শরৎচন্দ্রকে বুঝতে হলে তাঁকে এই রকম বিরল মুহূর্ত্তে দেখা চাই। যে শরৎচন্দ্র সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন এবং সভাপতিত্ব করতেন—সে শরৎচন্দ্র লেখক শরৎচন্দ্র নন। যে শরৎচন্দ্রকে

আমরা খোস-মেজাজে মণীন্দ্র রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় গল্প করতে দেখেছি সে শরৎচন্দ্রও লেখক শরৎচন্দ্র নন। কিন্তু যে শরৎচন্দ্র অন্তর্বেদনায় নির্বিশেষে ধ্যানমগ্ন, মনের গভীরে যখন তিনি সেই বিরাট ব্যথার একেবারে মুখোমুখী—তখনি আমরা লেখক শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই। অন্যায়ের এবং অপরাধের গভীর হলাহল তখন তিনি কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ।

জাড়গ্রামের কালুরায়

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়

"জাড়গ্রামের কালুরায় দিঘীড়েতে বাড়ী।
জামা জোড়া হাঁসা ঘোড়া উত্তম পাগড়ী।"

অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রামের ধর্ম্মরাজ কালুরায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বার দিন ধর্ম্ম-পুরাণের গীত হইয়া সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়াৎপুর গ্রামের অনাদিমঙ্গলের কবি রামদাস আদক জাড়গ্রামের কালুরায়ের প্রসাদে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া ধর্ম্মপুরাণ রচনা করেন।

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে বাস কালুরায় ধর্ম্ম আমি।
সুছন্দ-বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার।
শ্রীধর্ম্ম-মাহাত্ম্য মর্ত্তে হইবে প্রচার।
তুমি যে পরম ভক্ত ভারত ভুবনে।
মুখেতে ঠেকিলে গীত চাতিও কর পানে।
এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডানি কর।
মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর।"

—অনাদিমঙ্গল ভূমিকা

কবি রামদাস আদক দিগ বন্দনায় লিখেছেন :—

"জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়।
যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়।"

কবি কালুরায়ের মন্দিরের বর্ণনা দেন :—

জাড়গ্রাম বড় স্থান, ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান
দয়ার ঠাকুর কালু রায়।
তুমি যে দয়ার সিন্ধু, অনাথ অধম বন্ধু
কৃপাবিন্দু তো কিঙ্কর চায়।
ধর্ম্মগৃহ মনোহর সম্মুখেতে দামোদর,
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে
গায় কবি রামদাসে হইয়ে ব্রাহ্মণ বেশে,
যারে দয়া কৈল মায়াধর।

অনাদিমঙ্গল ৩য় পৃষ্ঠা

জাড়গ্রামের কালুরায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, বহু বহু প্রাচীন কালে জাড়গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ায় কয়েক ঘর অতি দরিদ্র সাহাদের (শুঁড়ি) বাস ছিল। দরিদ্র সাহা পাড়ায় একজন আধ-পাগলাটে যুবক বাস করিত। দরিদ্রের সংসারে নিষ্কর্ম্মা মাতা-পিতা-হীন যুবককে বহু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। উক্ত আধ-পাগল সাহা যুবককেও আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা, অনাদর সহ্য করিয়া থাকিতে হইত।

সহ্যেরও ত একটি সীমা আছে! যুবক ক্রমাগত তিরস্কার ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া হাওড়া জেলার কোন এক পল্লীতে তাহার মাসীর বাড়ী গমন করে। তখনকার দিনে মাথায় করিয়া মদ বিক্রয়ের প্রথা ছিল। তথায় যুবকও মাথায় করিয়া মদ গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু কড়িমূল্য (তৎকালীন মুদ্রা) পাইত, তাহা মাসীর সংসারে আনিয়া দিত। মদ বিক্রয় না হইলে বা কড়িমূল্য বেশী না পাইলে তথায় মাসীর পরিজনবর্গ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতে থাকে। একদিন গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে মদ বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কাঁদিতে থাকে। এক ব্রাহ্মণ সেই রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে যুবকের ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার অসহায় অবস্থার কথা জ্ঞাত হইলেন। তিনি যুবককে বলিলেন, "প্রত্যহ মদ এই গাছের তলায় ঢালিয়া দিয়া কড়ি লইয়া যাইও।" ব্রাহ্মণের কথায় অর্দ্ধপাগল যুবক প্রত্যহ মদ সেই গাছের তলায় ঢালিয়া দিয়া প্রচুর কড়ি লইয়া মাসীর সংসারে দিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ কড়ি পাইয়া তাহারা সুখী হইত। একদিন সেই ব্রাহ্মণ সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের কাছে আসিয়া বলিলেন, "পাগলা, তুই পূজা করতে পারবি?" উত্তরে যুবক বলিল "আমি মূর্খ—লেখাপড়া জানি না পূজা কেমন করে করব?" ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "প্রত্যহ স্নান করে গোটা কতক ফুল দিয়ে বলবি, 'কালুরায় নমঃ', ব্যাস, তাহলেই হবে। আগামী-কাল গঙ্গায় স্নান করে 'কালু কালু' বলে ডাকবি, তা হলেই তোর হাতে ঠাকুর আসবে।" পর দিন সাহা যুবক মদ বিক্রয় করিতে না যাইয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া 'কালু কালু'

বলিয়া ডাকিতে থাকে। তখন জল হইতে এক চতুষ্কোণ শিলাখণ্ড যুবকের হাতে আসে। যুবক ভক্তিভরে সেই শিলাখণ্ড লইয়া মাসীর গৃহের এক কুলুঙ্গীতে রাখিয়া প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিল। যুবক আর মদ বেচিতে যায় না—কেবল 'কালু কালু' বলিয়া ডাকে ও প্রত্যহ চোখের জলে পূজা করে। বাড়ীর লোকেরা যুবকের পাগলামী মনে করিয়া একদিন কুলুঙ্গী হইতে শিলামূর্ত্তিটি লইয়া এক গোবরের সারগাদায় পুতিয়া রাখে। যুবক তাহার ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া কেবল কাঁদিতে থাকে ও বলে, "কে আমার ঠাকুর লইল?" রাত্রে স্বপ্নে কালু যুবককে বলিলেন, "সারগাদায় আমাকে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, কাল সকালে গ্রামের কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে সারগাদা থেকে আমাকে তুলে পূজা করবি।" যুবক তাহাই করিল। সারগাদা হইতে ঠাকুরকে উদ্ধার করিবার জন্য কোদাল দ্বারা খুঁড়িতে থাকে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে কোদালের চোট শিলার উপরে লাগে এবং ঠাকুরকে সারগাদা হইতে উদ্ধার করিয়া কালুকে লইয়া যুবক মাসীর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া জাড়গ্রামের নিকটে হুগলী জেলার দিঘীড় গ্রামে আসিয়া বাস করে। তথায় প্রত্যহ কালুকে ভক্তিভরে পূজা করিতে থাকে এবং কালুর মাহাত্ম্যে প্রচুর অর্থাগমও হইতে থাকে। এখনও জাড়গ্রামের কালুরায়ের শিলামূর্ত্তির উপরে কোদালের চোটের দাগ আছে। প্রচুর অর্থাগম হওয়াতে জাড়গ্রামের দরিদ্র সাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া দিঘীড় গ্রাম হইতে কালুরায় ও যুবককে আনয়ন করে ও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে। সেই সময় হইতেই জাড়গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ায় অবস্থিত দরিদ্র সাহাদের আর্থিক উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। সাহারা ধর্ম্মরাজ কালুরায়ের সেবায়েতরূপে "পণ্ডিত" উপাধি গ্রহণ করে। সেই সময় হইতেই জাড়গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ার সাহাগণকে পণ্ডিত বলা হয়। কালুরায়ের কৃপায় ক্রমশঃ পণ্ডিতগণ ধনশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়।

ধর্ম্মরাজ কালুরায়কে জাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পণ্ডিতগণ দানশীল বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট মন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে। মহারাজ কালুরায়ের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য বলেন। তখন জাড়গ্রামের পণ্ডিতগণ কালুরায়কে লইয়া বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট গমন করে। কথিত আছে মহারাজ শিলামূর্ত্তিকে এক পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। মহারাজার আদেশে পণ্ডিতগণ কালুরায়কে পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া 'কালু-কালু' বলিয়া ডাকিতে থাকে এবং গভীর জল হইতে শিলামূর্ত্তি পণ্ডিতের হাতে উঠিয়া আইসে। ইহাতে মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কালুরায়কে জাগ্রত দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং ধর্ম্মরাজের মন্দির ও নাটমন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য করেন এবং নিত্যসেবা ও গাজনের জন্য বহু নিষ্কর জমি দান করেন।

হুগলী জেলার দিঘীড় গ্রামে কালুরায়ের বাটির ভগ্নাবশেষ ও মজা পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান। প্রতি বৎসর চৈত্র-গাজনের সময় 'বুড়া রায়'কে বাদ্য ও শোভাযাত্রাসহ দিঘীড় গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং পূজাদির পর পুনঃ জাড়গ্রামের মনোহর মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। কথিত আছে যখন ধর্ম্মরাজকে দিঘীড় গ্রাম হইতে জাড়গ্রামে আনা হয় তখন তিনি দিঘীড়গ্রামবাসীকে বলিয়াছিলেন, 'বৎসরে একদিন দিঘীড়ে আসিব'। বোধ সেই কারণেই এখনও এই প্রথা বর্ত্তমান আছে।

জাড়গ্রামের ধর্ম্মমন্দিরে বহু শিলামূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। বিভিন্ন রকমের শিলামূর্ত্তি ও কয়েকটি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক চৈত্য-মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি আছে এবং প্রত্যহ পূজিত হন। বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন পূজা-পার্ব্বণে কালুরায়ের বিশেষ পূজা ও অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। শারদীয়া পূজার তিন দিনই পূজা, বলিদান, সন্ধিপূজাদি নিষ্পন্ন হয়। চৈত্রমাসে শিবের গাজন, রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ় মাসের যে কোন মঙ্গলবার ঘট-স্থাপন করিয়া কালুরায়ের গাজন আরম্ভ হয়। ঐ দিন হইতেই ঘনরামের ধর্ম্ম-পুরাণের গীত হইতে থাকে, প্রত্যহ অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায়। গাজনের নবম দিনে বুধবার শ্মশান-সন্ন্যাসীরা পাট ধারণ করে। মধ্যাহ্নে মালা কাড়ান ও পরমান্ন ভোগ হয়, সন্ধ্যায় আগুনে ঝুল ও সন্ন্যাসীরা মহা হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

দশম দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগুনঝুল, অধিবাস, দিবসে সন্ন্যাসী ও সেবায়েতগণ উপবাস এবং রাত্রে অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। একাদশ দিন শুক্রবার অপরাহ্নে কর্পূর ভিক্ষা পালাগান হয় ও গায়েনদিগকে জনসাধারণ ভোজ্য প্রদান করে। রাত্রে মালা কাড়ান হয় ও ধর্ম্মরাজ কালুরায়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাদ্য, আতসবাজী ও বিরাট শোভাযাত্রা সহ নদী বা পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করেন সন্ন্যাসী ও সেবায়েতবৃন্দ। তৎপরে ধর্ম্মমন্দিরে যৌঘর অর্থাৎ পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা ধর্ম্মরাজের পাদপদ্ম অঙ্কন করিয়া পূজাদি সম্পন্ন হয়। ধর্ম্মরাজের বিবাহের পর সেবায়েতগণ লুচি ভোজন করেন। এই দিন অপরাহ্নে গ্রামের বিধবারা সমস্ত দিন উপ-বাসের পর ফলাদি ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ দিন শনিবার উষাকালে "পশ্চিম উদয়" পালাগান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসী-স্নান, বাদ্য ও শোভাযাত্রাসহ "শালেভর", মালা কাড়ান, বিশেষ পূজা, ঝাঁপ, বৈতরণী পার প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা ও সঙ সহ বহুসংখ্যক নৈবেদ্য মাথায় করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে আনীত হয়। শোভাযাত্রায় বিশেষ উত্তেজনার ভাব সৃষ্ট হয়। গ্রামের যুবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্তেজনা প্রশমিত করা হয়। ঐ দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধর্ম্মস্থানে মেলা বসে। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি মেলায় আনীত ও বিক্রীত হয়। রাত্রে "লুয়ে" পূজা ও "লুয়ে ছাগ" বলি হয়। একটি বড় নূতন হাঁড়ির ভিতর লুয়ে ছাগমুণ্ড রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সহ উহা ধর্ম্মমন্দিরে পূজাও রক্ষা করা হয়। উহাকে "লুয়ে পূজা" বলে। ত্রয়োদশ দিনে (রবিবার) পূর্ব্বাহ্নে উক্ত লুয়ে নদী বা পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দেওয়া

হয়।০ সেবায়েতগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া স্নান করেন। মধ্যাহ্নে পূজার পর শ্মশান-সন্ন্যাসীরা পাটা পরিত্যাগ করে। রাত্রে "অষ্ট-মঙ্গলা" পালাগান গীত হইয়া গাজন পর্ব্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গাজনের এই বার-তের দিন গ্রামে কাহারও বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশনাদি শুভকার্য্য সম্পন্ন হয় না। এমন কি গ্রামবাসিগণের গ্রামান্তরে গমনও নিষিদ্ধ। যদি বিশেষ কারণে গ্রামবাসীকে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইতে হয় তবে পণ্ডিতগণের অনুমতি লইয়া যাইতে হয় ও গাজনের শেষ দিন শনিবারে ফিরিতে হয়। বিবাহ উপলক্ষে দম্পতিকে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মরাজমন্দিরে গমন করিয়া প্রণামীসহ প্রণাম করিয়া তবে বাটীতে প্রবেশ করিতে হয়। কৃষকগণ তাহাদের প্রথম উৎপন্ন ফসল কালুরায়কে প্রদান করিয়া তবে নিজেরা ব্যবহার করে। পূর্ব্বে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজের কৃপায় বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এক সময়ে হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামের জমিদার বিশ্বাসবাবুদের বাটীতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে একশত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হয়। দূরস্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে ব্রাহ্মণগণ অস্বীকার করিলে জাড়গ্রামের মাত্র পাঁচজন ব্রাহ্মণ বিশ্বাসবাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। যাইবার সময় কালুরায়ের মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা জানান যে এই পাঁচ জনেই যেন সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতে পারেন, একশত ব্রাহ্মণের স্থলে মাত্র পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যাওয়ায় জমিদার দুঃখিত হন। শুনা যায় এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ একশত ব্রাহ্মণের আহার্য্য ভক্ষণ করায় জমিদারবাবু করজোড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেই বৎসর হইতে জাড়গ্রামের ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়া একটি পৃথক ছাঁদা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়। লেখক বাল্যকালেও শারদীয়া পূজায় দশঘরা বিশ্বাসবাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া একটি ছাঁদা (অর্থাৎ বাটীতে আনিবার জন্য লুচি ও মিষ্টান্নাদি প্রদান) লইয়া আসিত। জনশ্রুতি যে অমূলক নহে, ইহাতে বুঝা যায়। পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ কালুরায়ের কৃপায় গ্রামে চুরি-ডাকাতি হইত না। কালুরায় শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে স্থাপিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত জাড়গ্রামের জাগ্রত গ্রাম-দেবতা। ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ।

রামধনু

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

হৃদয় আমার নাচে আনন্দে যখন দেখিতে পাই
রামধনু নীলাকাশে :
এইরূপ ছিল কচি শিশু ছিনু যবে ;
এখনো আমার এইরূপ হয় ভবে,
তখনো হউক বুড়ো হয়ে যবে যাই,
নতুবা তখন মরণ যেন গো আসে !

শিশু পরিণত হলেই মানুষ হয় ;
আমি এই চাই—সারাটি জীবনে মোর
প্রাকৃতিক শোভা মন যেন ভালবাসে।

"The Rainbow'—by William Wordsworth
1770-1850

যন্ত্র-যুগে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দিকে দিকে নিষ্করুণ বন্ধ্যা বসুন্ধরা !
যন্ত্র-দৈত্য অবিরাম উগারে পশরা।
মানুষ মানুষ নয়—কলের পুতুল !
প্রাণ নয়, জড় পায় নৈবেদ্যের ফুল
উন্মার্গগামিনী এই বিংশ-শতাব্দীর।
জীবন্ত কঙ্কালে ভরা পল্লীর কুটীর !
অতিকায় নগরীর শুষ্ক সাহারায়
জীবনের শ্যামলিমা লুপ্ত হয়ে যায় !

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো আকাশের নীল !
আবর্জ্জনাকুণ্ড, হায়, গঙ্গার সলিল !
নিশ্চিহ্ন কুঠারমুখে সবুজ উদ্যান !
যন্ত্রের গর্জ্জনে শুব্ধ পাখীদের গান।
দিগন্তে কোথায় আলো ? শুধু অন্ধকার !
যুগের রুচির এ কী নির্লজ্জ বিকার !

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(১)

অরণ্যের সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল সাওতাল। শাল, পিয়াল, চন্দন, পলাশ গাছের মত সাওতালও ছিল অরণ্যের একটা অংশ। তাদের জন্ম হ'ত অরণ্যের অন্তরালে, বেড়ে উঠত অরণ্যের আশ্রয়ে, প্রেম করত অরণ্যের আলোছায়ায়। তারা বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়ত, হরিণের সঙ্গে ছুটত, ময়ূরের সঙ্গে নাচত, আবার তাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে অরণ্যের সম্পদ লুট করে খেত। আজকাল আগের মত সীমাহীন গভীর অরণ্যও নাই, সাওতালও নাই। এখন যাদের সাওতাল বলা হয় তারা নামেই সাওতাল, তাদের স্বাস্থ্য নাই, রূপ নাই, আনন্দ নাই, আবার তাদের ধমনীতে সে আদিম রক্তও নাই।

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তখনও সত্যিকার সাওতাল কিছু কিছু ছিল। আমার প্রতিবেশী সাওতালদের জীবনযাত্রা ভাল করেই দেখেছি, তা অতি সহজ ও সরল এবং সুন্দরও। তারা অরণ্যের ফুল পাতায় সাজ করত, চাঁদের আলোয় যখন তখন নাচ গান সুরু করত। সহরের ড্রইংরুমের আনন্দ উৎসব আমি দেখেছি, আবার অরণ্যের আলোছায়ায় কুঁড়েঘরের আঙিনায় আনন্দ-উৎসব দেখেছি, কোনটা আমার ভাল লেগেছে সে কথা এখানে গোপন করে যাওয়াই ভাল।

সাওতাল মানবশ্রেণীর কোন গোষ্ঠীতে পড়ে, তাদের বিশেষত্ব কি, ইত্যাদি নৃকুল বিদ্যার তথ্য নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না, অনেক বড় বড় পণ্ডিত এ বিষয়ে বহু আলোচনা করে গেছেন। আমি এখানে সাওতালের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সাওতালদের জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে আমি যে মনের সংস্পর্শে এসেছি সেই মনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের ঘষামাজা আলোকিত মনের তুলনায় সাওতাল মন কুয়াশা ঢাকা বনভূমির মতই রহস্যজনক।

কল্পনা করা যাক আমি এক সাওতাল বন্ধুর সঙ্গে অরণ্যপথ ধরে চলেছি। চলতে চলতে সে যা দেখছে, যা শুনছে, যা করছে, যা বলছে তা ভাল করে লক্ষ্য করে চলি, তারই মধ্যে প্রতিফলিত তার মনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সকাল বেলা বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ ধরে আমরা দুজনে চলেছি—সাওতাল বন্ধুর হাতে তীর-ধনুক। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে মাটিতে, অরণ্য আলোছায়ায় ঝিলমিল করছে। ফাল্গুন মাস, শীত নেই, বসন্তের উষ্ণ নিশ্বাস বইতে সুরু করেছে। কোথায় যেন ফুটেছে শিরীষ, সকালের বাতাস বয়ে আনছে তার মিঠে গন্ধ। গ্রাম থেকে অনেক দূরে বনভূমির মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে দুজনে চলেছি, সাওতাল বন্ধু আগে আমি পিছনে। গাছের ডালে দুএকটা ফিঙে শিস দিচ্ছে তা ছাড়া অন্য কোন শব্দ নাই। চলতে চলতে বন্ধু আঙুল দিয়ে গাছের উঁচু ডালে বসা ময়ূর দেখিয়ে দিচ্ছে, পায়ের সাড়া পেয়ে ডাইনে বায়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, খরগোস তাও দিচ্ছে দেখিয়ে, এ এক অদ্ভুত মানুষ, দুটো চোখ সামনে হলে কি হয়—নজর রয়েছে চারদিকে। হঠাৎ সাওতাল বন্ধু থমকে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম পিছনে। মনে

হ'ল কি যেন সে শুনতে পেয়েছে। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সে আমার হাত ধরে দশ পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল, তার পরে কানে কানে বলল, 'খুব বেঁচে গেছি বাবু।' আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কি, হটে এলে কেন?' অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল, 'সে কি—তুই শুনতে পাসনি?' বললাম, 'হাঁ শুনেছি, পাখী ডাকছে।' বন্ধু হেসে বলল, 'না পাখী নয়—আয় আমার সঙ্গে।' পথ ছেড়ে সে বাঁদিকে চলল—আমিও চললাম সঙ্গে। অনেকটা ঘুরে আমরা প্রায় আগের জায়গায় এসে পড়লাম। এবার শুনতে পেলাম সামনে কোথায় যেন খড় খড় আওয়াজ হচ্ছে। বন্ধুকে বললাম, 'খড়খড় আওয়াজ শুনছি।' হেসে ফিস ফিস করে সে বলল, 'এইবার ঠিক শুনেছিস।' সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঘ নয় ত?' সে বলল, 'ভয় নাই—ভালুক মাটি খুঁড়ছে।' সাবধানে এগিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বন্ধু আমাকে সামনে একটা পলাশ গাছের নীচে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। চেয়ে দেখলাম দুটো বড় বড় ভালুক উই ঢিবি খুঁড়ছে। আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেমন করে টের পেলে ভালুক—অন্য জানোয়ারও ত হতে পার ত?' হেসে বন্ধু বলল, 'আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি গো।' এত দূর থেকে মানুষ এত স্পষ্ট শুনতে পায় তা আজ নিজের চোখে না দেখলে আমি কখনই বিশ্বাস করতাম না। এ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। মনের খাতায় লিখে রাখলাম, 'সাধারণ মানুষের চেয়ে সাওতালের শ্রবণশক্তি অনেক বেশী।'

আমরা আবার পথ ধরে এগিয়ে চললাম। সামনে একটা ছোট পাহাড়, ধীরে ধীরে তার ওপরে চড়তে লাগলাম। বড় বড় পাথরের আশ পাশ দিয়ে শিশম, শাল আরও অনেক গাছ উঠেছে। মাঝে মাঝে আবার বাঁশঝাড়, সরু সরু বাঁশ সবুজ আর হলদে পাতার ভারে নুয়ে পড়েছে—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি কখনও গাছের ডালপালা ধরে, কখনও পাথরে ভর দিয়ে ওপরে উঠছি, আমার সাওতাল বন্ধু কিন্তু কোন কিছু না ধরে সড় সড় করে উঠে যাচ্ছে অথচ বেশ বয়স হয়েছে—তার চুলে পাক ধরেছে। খানিক পরে আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়লাম। সেইখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালাম, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ল—অগণিত গাছ, তাদের মাথায় পড়েছে সকাল বেলার রোদ, পূবে তৃণশ্যামল মাঠ, আরও দূরে একটা সরু নদী এঁকে-বেঁকে দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি এমন সময় আমাকে ঠেলে দিয়ে সাঁওতাল বন্ধু বলল, "ঐ দেখ বাবু।" বন্ধুর নির্দ্দেশমত সেদিকে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না, বললাম, "কই, কিছু ত দেখছি না।" সাঁওতাল বন্ধু হেসে বলল, "বাবু তোরা কি রকম বলত, শুনতেও পাস না দেখতেও পাস না। ঐ দেখ মাঠের বাঁ পাশে যেখানে মহুয়া গাছটা, ওখানে সোগরি (এক রকম হরিণ) চরছে।" বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর দেখতে পেলাম সত্যিই সেখানে হরিণ চরছে, পারিপার্শ্বিক মেটে রং-এর সঙ্গে তার গায়ের রং এমন মিশে গেছে যে সহজে চোখে পড়ে না। অথচ এখানে দাঁড়াবার এক মিনিটের মধ্যেই সাওতাল বন্ধু হরিণটাকে দেখতে পেয়েছে, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কিন্তু এক বিষয়ে বড়ই দুঃখ পেলাম, বন্ধুর সৌন্দর্য্যবোধের একান্ত অভাব দেখে। পাহাড়, বন, মাঠ, নদীর এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ তার দৃষ্টিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করল না, আকৃষ্ট করল, কোথায় কোন কোণে চরছে একটা হরিণ! মনের খাতায় লিখলাম, "সাওতালের দৃষ্টি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার সৌন্দর্য্যবোধ নাই।"

সাওতাল বন্ধু হরিণ লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগল—তার মতলব বুঝতে পারলাম, হরিণটাকে সে মারতে চায়। আমিও তাকে অনুসরণ করে চললাম। পাহাড় থেকে নেমে বন্ধু গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে এগিয়ে চলল—তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হতে লাগল, সে যেন একটা হিংস্র জানোয়ার, অতর্কিতে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্তে সন্তর্পণে চলেছে। খানিক পরে আমরা মাঠের কিনারায় এসে পৌঁছলাম। হরিণটাকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সাওতাল বন্ধুর ভাব দেখে বুঝতে পারছি তার দিক ভুল হয় নি, হরিণের সে খুব কাছে এসেই পড়েছে। ধনুক তীর বাগিয়ে আরও সাবধানে, কখনও গুড়িমেরে কখনও প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে এগোতে লাগল। সামনে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে এবার সে দাঁড়াল, আমিও কোনমতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম—আশ্চর্য্য ব্যাপার, হরিণটার যে খুব কাছে এসে পড়েছি—একেবারে তীরের পাল্লার ভিতরে! সাওতাল বন্ধু ধনুকে তীর লাগিয়ে তাক করতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না, ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হ'ল?' সে চুপি চুপি বলল, "দেখ, দেখ, ওটার সঙ্গে বাচ্চা আছে।" আবার উকিমেরে দেখলাম, সত্যিই দুটো বাচ্চা এসে জুটেছে। সাওতাল বন্ধুর ভাব একেবারে বদলে গেছে। সে হিংস্র শিকারীর ভাব আর নাই, চোখে-মুখে অপরিসীম কোমলতা ফুটে উঠেছে, মায়ের আশে-পাশে বাচ্চা দুটো লাফালাফি করছে। তা দেখে খুশীতে সে ঢলে পড়ছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, মনের খাতায় লিখলাম, "অরণ্যবাসী সাওতালের মন যেমন কঠিন, আবার কোমলও তেমনই।'

ইতিমধ্যে আমাদের সাড়া পেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল। আবার আমরা চলতে লাগলাম। পাহাড়ের ওপর থেকে যে নদীটাকে দেখেছিলাম, সেটা পাহাড়ের তলা দিয়ে ঘুরে গেছে—আমরা তার পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। সরু নদী, এক-দিকে সঙ্কীর্ণ একটি জলধারা বয়ে চলেছে, আর সবটাই বালুময়। সেইখানে দাঁড়িয়ে ওপারের দৃশ্য দেখছি এমন সময় সাওতাল বন্ধু হঠাৎ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল, 'বাহা-কানা—ফুল ফুটেছে, দেখ দেখ।' চেয়ে দেখলাম, নদীর ওপারে একটা পলাশ গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। অবাক কাণ্ড, এখনও ত পলাশ ফুল

ফোটবার সময় হয় নাই, সবে পাতা ঝরতে সুরু করেছে, এরই মধ্যে একটা গাছে কেমন করে এত ফুল ফুটল! দেখে আমারও মন খুশীতে ভরে গেল, সাওতাল বন্ধু ত আনন্দে প্রায় পাগল! তবে যে মনের খাতায় লিখলাম সাওতালের সৌন্দর্য্যবোধ নাই, তাড়াতাড়ি সেটা কেটে দিয়ে হাঁফ ছাড়লাম। ভাবতে লাগলাম একটু আগে যে লোকটা অতখানি সৌন্দর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চেতন ছিল, সে হঠাৎ পলাশের ফুল দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কেন? বুঝলাম সাওতালের মন প্রকৃতিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব করতে পারে, গাছটাকে, পাখীটাকে, মানুষটাকে পৃথক পৃথক ভাবে মনের আয়ত্তে আনতে পারে, কিন্তু এ সবের একত্রিত বিরাট রূপ তার মন গ্রহণ করতে পারে না। মনের খাতায় আবার লিখলাম, "সাওতালের সৌন্দর্য্যবোধ যথেষ্টই আছে, তবে সীমান্বিত ক্ষেত্রের মধ্যে তার খেলা।'

শিশুমনের সঙ্গে সাওতালমনের অনেক মিল আছে। শিশুর মতই এরা সহজে খুশী হয়, সহজে ব্যথা পায়। শিশুর মতই এরা ক্ষুধার সময় খাদ্য পেলে আর বিশেষ কিছু চায় না। সাওতালী মেয়েদের হাসি আর গান যেন আর কিছুতেই ফুরোয় না। এদের মনের মধ্যে কোথায় যেন আনন্দের একটা অফুরন্ত ফোয়ারা আছে, কারণে-অকারণে, সময়ে-অসময়ে, হাসিতে ফেটে পড়ে, গানে মেতে ওঠে। এরা ফুল এত ভালবাসে যে, দিনান্তে একবারও দুই কাণে দুটি আর খোঁপায় একটি ফুল গুজবেই। এদেশের অনেকের কাছেই আমি শুনেছি সাওতাল মিছে কথা বলে না। নিজেও কতবার দেখেছি সাওতাল মাঝির এক কথা, খরগোস বেচতে বাজারে এসেছে, যদি বলে দু'টাকা নেব তো দু'টাকাই নেবে, কম দিলেও নেবে না, বেশী দিলেও নেবে না। মেয়েরা বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে বাজারে বেচতে আসে, তারা দরদস্তুর জানে না, কারও হয় ত এক সের বুলুং (নুন) দরকার, সে এক সের নুনের বদলে দোকানীকে এক টাকার জিনিস দিয়ে গেল।

সাওতালের আর একটা গুণ হচ্ছে, তার চিত্তের দৃঢ়তা, কথা দিয়ে তারা প্রাণপণে কথা রাখতে চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে এক সাওতাল বন্ধুর কাছে আমি একটা গল্প শুনেছিলাম এখানে সেটা উল্লেখ করছি। গল্পটা সত্য, ঘটেছিল আমাদের সাওতাল পল্লীতেই।

শাল অরণ্যের পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ান আমার অভ্যাস, এক-দিন ঘুরতে ঘুরতে ছোট একটা টিলার উপর এসে উপস্থিত হ'লাম। চারিদিকে গভীর বন হলেও টিলার ওপর কোন গাছ নাই, সেখানে দাঁড়িয়ে অরণ্যের শোভা দেখছি, এমন সময় নজরে পড়ল, টিলার এক প্রান্তে একটা সাদা পাথরের স্তূপ, মনে হ'ল যেন কেউ পাথর জমা করে স্তূপাকার করে রেখেছে। গভীর অরণ্যের মাঝখানে ছোট টিলার ওপর সাদা পাথরের স্তূপটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্তূপের ওপর উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সঙ্গের সাওতাল সঙ্গী বাধা দিয়ে বলল, 'বাবু, ওর উপরে উঠিস নে।' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এতে দোষ কি?' সাওতাল সঙ্গী বলল, 'দোষ আছে,' তুই উঠিস নে।' বুঝলাম স্তূপটার কিছু একটা বিশেষত্ব আছে, আবার প্রশ্ন করলাম, 'এটা কিসের স্তূপ?' সে বলল, 'সে অনেক কথা, বেলা পড়ে আসছে, চল বাড়ী ফিরি—পথে যেতে যেতে তোকে সব বোলবো।' বেলা সত্যিই পড়ে আসছিল, টিলে থেকে নেমে আমরা বাড়ী ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে সঙ্গী সুরু করল—

"সে অনেক দিনের কথা, আমার গড়মবাবার (ঠাকুরদার) আমলের ঘটনা। তখনকার দিনে এ জঙ্গল আরও গভীর ছিল, তোদের মত শহরের মানুষ এখানে আসত না, সাওতাল ছিল এই মারাং বীরের (অরণ্যের) রাজা। সেই সময়ে আমাদের গাঁয়ের সর্দ্দার ছিল নিরুমাঝি। নিরুমাঝির এক সুন্দরী মেয়ে ছিল, নাম লান্দা (হাসি)। সে ছিল বড়ই আদরের। যখন তার বিয়ের বয়স হ'ল তখন নিরুমাঝি উপযুক্ত জাওয়াই (বর) খুঁজতে লাগল। এদিকে ব্যাপার এই যে, লান্দা যেত ফল কুড়োতে, লিটা আসত কাঠ কাটতে—দু জনের দেখা হ'ত পাহাড়ের মাথায়। লিটা ছোড়ার ঘর পাহাড়ের ওদিকে, মাথায় লম্বা চুল, কোমরে তিরিও (বাঁশী) গোঁজা। দেখতে দেখতে পিরিত হ'ল দুজনে। মুখ ফুটে এ কথা বাপকে বলতে পারল না লান্দা।

একদিন দূরের গ্রাম থেকে সম্বন্ধ করতে এল ছেলের বাপ। দেনা পাওনার কথা শেষ হলে ছেলের বাপ সেই রাত্রির নিরুর বাড়ী থেকে গেল। আমাদের নিয়ম হচ্ছে এই যে ছেলের বাপ এক রাত থাকবে মেয়ের বাড়ী, রাতভর যদি কোন রকম টোকটাক (অশুভ লক্ষণ) না হয় তা হ'লে সকাল বেলা পাকা কথা হয়ে যায়। অবাক কাণ্ড, সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতে ফেকার (ফেউ) ডেকে উঠল। ফেউয়ের ডাক ভারি অশুভ লক্ষণ, বিয়ের কথা আর এগোল না, ছেলের বাপ নিজের বাড়ী ফিরে গেল। লান্দার ফুল (সই) এসে বলল, 'ভাই, দেবতা তোর সহায় তাই কাল রাত্রে ফেউ ডাকল। এর আগে এমন সময় কোনদিন ত ফেউ ডাকে নি! লান্দা হেসে বলল, 'ফুল, তোর কাছে গোপন কিছুই রাখি নি, এটাও রাখব না, এ ফেউ সত্যিকার ফেউ নয়।' শুনে লান্দাকে জড়িয়ে ধরে ফুল বলল, 'তাই বল ভাই, এ সব লিটার কাণ্ড।' লান্দা হেসে মাথা নাড়ল।'

এর পরে আরও দু একটা সম্বন্ধ এই ভাবে ভেঙে গেল। কিন্তু কতকাল ফাঁকি চলে, হঠাৎ একদিন এ তল্লাটের নামকরা রুকুই মাঝি এল তার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে। সে রাত্রে আর ফেউ ডাকল না। সকাল বেলা পবিত্র বাড়ের (বট গাছের) নীচে বসে নিরুমাঝি রুকুই মাঝির ছেলেকে মেয়ে সপে দেবে বলে পাকা কথা দিয়ে দিল।

ভোর হতে না হতে ফুল ছুটে এল লান্দার বাড়ী, দেখল তার মুখ শুকনো। লান্দার কানে কানে ফুল বলল, 'কি হ'ল ভাই বল।' লান্দা বলল করুণ কণ্ঠে 'রাত্রে ফেউ ডাকে নি, নিশ্চয় খবর পায় নি সে। আজ সকালে বাবা বিয়ের কথা পাকা করেছে।

ফুল। বলল, 'কি হবে তা হলে।' লান্দা বলল, 'যা হবার হবে।'

একে একে দিন যেতে লাগল, তার পরে এল বিয়ের দিন। কন্যাপক্ষের পাওনা জিনিসপত্র—তিনখানা কাপড়, তিনটে ঝুলা (মেয়েদের গায়ের জামা) ও নয়টি টাকা নিয়ে বরপক্ষ এসে উপস্থিত হ'ল নিরুমাঝির বাড়ী। সঙ্গে কিন্তু বর নাই। সাওতাল-দের রীতি হচ্ছে এই যে বরপক্ষ কনের বাড়ী এসে একদিন এক রাত খাওয়া দাওয়া নাচ গান করে সঙ্গে করে নিয়ে যায় কনেকে বরের বাড়ী, সেইখানে হয় বিয়ে। নিরুমাঝি এসে সবাইকে অভ্যর্থনা করল, ঘরের সামনে গাছতলায় থাকবার জায়গা দিল। সন্ধ্যার আগে খাওয়া দাওয়া চুকে গেল—ভাত আর মাংস। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসতেই দেখা গেল আলোর ব্যবস্থা ভগবান করেছেন—জ্যোৎস্নায় অরণ্য প্লাবিত হয়ে গেল। তখন সুরু হ'ল নাচ আর গান। কয়েক হাঁড়ি মহুয়ার মদ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল—মেয়ে পুরুষ সবাই মহামশগুল। মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল, গান ধরল—'শালের ফুল ফুটেছে আর ফুটেছে বিয়ের ফুল। চল গো চল ফুল আনতে যাই, দেখিস কেউ যেন বনের মধ্যে হারিয়ে না যায়।' সঙ্গে মাদল আর বাঁশী বাজতে লাগল।

সে গান শেষ হলে আবার আর একটা ধরল—

'সোনার টাড় (বালা) গড়িয়ে দে তবেই রইব তোর কাছে,
র'ভা টাড় কিনে দে তবেই থাকবো তোর কাছে,
নইলে চলে যাব বাপের বাড়ী, আর আসবো না।'

নাচ গান চলছে, এদিকে লান্দার মনে সুখ নাই, ফুলকে ডেকে বলল, 'ফুল, দুপুর রাতে মহুয়াতলায় আমার প্রিয়তম আসবে, আমি তার সঙ্গে পালিয়ে যাব। আমার যখন খোঁজ পড়বে তখন তুই আপুংকে (বাপকে) সত্যি কথা বলিস, সে যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করে।' রাত দুপুর হ'ল, নাচনীদের পাশ কাটিয়ে লান্দা মহুয়া তলায় গিয়ে দাঁড়াল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লিটা। তার হাত ধরে লান্দা বনের পথ ধরে চলল। খানিক পরে লান্দার মা লান্দাকে না দেখে খোঁজাখুজি সুরু করল। অনেক খোঁজাখুজি করেও যখন পাওয়া গেল না তখন খবর গেল নিরুমাঝির কাছে। ব্যস্ত হয়ে নিরু এল ভিতরে। তখন লান্দার ফুল এগিয়ে এসে বলল, 'সর্দ্দার, লান্দা পালিয়ে গেছে।' অবাক হয়ে নিরু বলল, 'কার সঙ্গে?' ফুল বলল, 'লান্দার প্রণয়ী লিটার সঙ্গে।' রাগে গর্জ্জে উঠল নিরুমাঝি, 'কি! আমার মেয়ের এই কাজ! আমি হচ্ছি গাঁয়ের সর্দ্দার, আমার মুখে চুণকালি দিল লান্দা!' লান্দার আত্মীয়স্বজন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। মদের নেশায় নিরুর চোখ দুটি লাল, সে হেঁকে বলল, 'নিয়ে আয় আমার ধনুক তীর।' ঘর থেকে একজন ধনুক তীর এনে তার হাতে দিল। নিরু ছুটল বনের পথ ধরে। সবাই বুঝল নিরুর মতলব, সঙ্গে ছুটল আত্মীয়স্বজন।

বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে নিরু চলছে, চোখ দুটো তার জ্বলছে আগুনের মত। ঐ যে কারা চলেছে শাল গাছের আড়ালে আড়ালে! নিরু মাঝি হাঁকল, 'কে যাচ্ছিস—দাঁড়া, নইলে তীর মেরে এফোঁড় ওফোঁড় করব।' তারা দাঁড়াল না, শাল গাছের আড়াল দিয়ে ছুটল। নিরু ছুটল পিছনে। বনের মধ্যে একটা টিলে, তার উপর উঠতেই জ্যোৎস্নায় তাদের পরিষ্কার দেখা গেল, একটি পুরুষ একটি মেয়ে। নিরু মাঝি এবার হুঙ্কার দিয়ে তীর ছুড়ল, মুহূর্ত্ত পরে নারী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল, টিলার ওপর একটি মূর্ত্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।' এই পর্য্যন্ত বলে আমার সাওতাল সঙ্গী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তার পরে আবার বলতে সুরু করল, 'কিছুদিন পরে নিরু মাঝি শোকে দুঃখে মরে গেল। লিটা এসে রোজ ওই টিলার ওপর বসে থাকত আর সাদা পাথর কুড়িয়ে এনে জমা করত। রাত্তিরে কেউ টিলার কাছে যায় না—বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত্তিরে।' প্রশ্ন করলাম, 'কেন?' সঙ্গী বলল, 'কেউ কেউ একটি মেয়ের কান্না শোনে, আবার কেউ কেউ দেখতে পায়, একটি মেয়ে টিলার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে আছে।'

এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রে টিলার কাছে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পাড়াগাঁয়ের কথা লিখতে বসেছি। পশ্চিমবাংলার পাড়াগাঁ; অবহেলিত, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, জীবনের সকল রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বর্জ্জিত। পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজও প্রায় তাই। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারত আজ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে চলেছে। কিন্তু পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ-ই আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বলিলে আজ আর গ্রামাঞ্চলকে বুঝায় না, বুঝায় শুধু কলিকাতাকে। দেশে চাউলের দাম ত্রিশ টাকা হলেও কলিকাতার অধিবাসীদের জন্য, যাঁরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণ নিয়মিত অর্থোপার্জ্জন করে থাকেন, ন্যায্য মূল্যের 'রেশন সপ' খোলা হয়েছে। আর, পাড়াগাঁয়ের লোকেরা—যাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেরই অর্থোপার্জ্জনের পথ সীমাবদ্ধ—ঐ ত্রিশ টাকা দামের চাউল কিনে খেতে পারে, ভালই; আর তা না হলে গাছের পাতা, বনের কচু খেয়ে বেঁচে থাকুক। সকলে জানুন, স্বাভাবিক সময়েও এমন দিনে পাড়াগাঁয়ের অনেক লোকের শুধু পাটপাতা সিদ্ধ প্রধান খাদ্য। এবার পাটে এমন পোকা ধরেছে যে, পাটগাছে পাতাই নেই, তা খাবে কি?

পাড়াগাঁয়ের উপর ঈশ্বর বিরূপ। আর সেই জন্যই ত সরকারও বিরূপ। উপরি উপরি গত কয় বছর ধরে আমার অঞ্চলে অনাবৃষ্টি আর বন্যার লীলা। এর ফলে এ অঞ্চলে গত কয়েক বছর ধান চাষের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। সরকার বাহাদুর যে হিসাবই দিন না কেন, এ বছরে এই অঞ্চলে এই ফসলটির উৎপন্নের পরিমাণ খুবই কম। গত মরশুমের আলু-ফসলের দুরবস্থার কথা এর আগে লিখেছিলাম। এবারে এ অঞ্চলে আলু-চাষ একরকম হয় নি বললেও বেশী ভুল বলা হবে না। কারণ সেচের জলের একান্ত অভাব। গেল তিন বছরের মধ্যে বৃষ্টির জলে পুকুর ডোবা ভরে নি। গ্রাম্য সেচ ব্যবস্থা আজও বিল, পুষ্করিণী, ডোবার উপরই নির্ভরশীল; আর, সেগুলি বৃষ্টির অভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। এ সত্ত্বেও যাও বা আলু চাষ সামান্য কিছু হয়েছিল, এবারকার চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের ভীষণ গরমে ঘরে-রাখা সব আলু পচে সাবাড় হয়ে গিয়েছে। চাষীর সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে দেনা করে বীজ ও সার সংগ্রহ ও চাষের অন্যান্য খরচ বহন করেছিল। কি করে তার দেনা শোধ হবে, এই চিন্তাই এখন তার প্রবল।

মাছ আর দেশে নেই। আগেই বলেছি, পুকুর, ডোবা সব গত তিন বৎসর ভরতে পায় নি, তার ওপর এবার অনাবৃষ্টি ও গরমে সেগুলি এমন ভাবে শুকিয়ে গিয়েছে, যে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কাজেই শুধু এবারে নয়, আগামী কয়েক বৎসরও পাড়াগাঁয়ে মাছের মুখ দেখার আশা নেই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় যে সব নদী ও খাল সেচের জল বহন করবে, সেগুলির যে ভাবে সংস্কার করা হচ্ছে বা যে সব নূতন খাল কাটা হচ্ছে, সেগুলি Irrigation Canal, সেচ-খাল, এবং অতি স্বল্প-পরিসর। তাতে মাছের অভাব পূরণে সহায়তা হবার আশা নেই। এবার অনাবৃষ্টির ফলে টিউব ওয়েলের জলে গরুরও তৃষ্ণা মিটাতে হয়েছে। শৌচ কার্য্যও সমাধা করতে হয়েছে।

ঋতু হিসাবে এখন বর্ষাকাল। কিন্তু বৃষ্টি কই? মাঝে মাঝে কলিকাতায় এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে, রাস্তা ডুবে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর বোম্বাই, দিল্লী ত একেবারে জলের তলায়। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা গালে হাত দিয়ে ভাবছে, ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। কিছুটা জল দুর্ভাগ্য পশ্চিম বাংলার পাড়াগাঁয়ের মাঠে দিলে হ'ত, অবশ্য গড়ের মাঠে নয়। সেদিন আমাদের বিধানসভায় গড়ের মাঠে চাষের কথা নিয়ে খানিকটা রসিকতা হয়ে গিয়েছে।

আমার এক স্নেহভাজন ব্যক্তি আজন্ম কলিকাতাবাসী ছিলেন। অতি সম্প্রতি, স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পূর্ব্বপুরুষের গাঁয়ে এসে বাস করছেন। তিনি আমায় বললেন, বরাবরই কলিকাতায় ছিলাম। অনাবৃষ্টি হলে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কি অবস্থা হয়, কলিকাতায় তা কখনই ভাবি নি, ভাববার চেষ্টাও করি নি। এবার গাঁয়ে বসে দেখছি, সবার মলিন মুখ। কি যেন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সকলে ভীত, সন্ত্রস্ত। তাদের দেখলে আমারও দুর্ভাবনা হয়।

এই আমাদের "সুজলা, সুফলা" বঙ্গজননী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি, বর্ত্তমানে একটা বিরাট বিদ্রূপের বেশী কিছু নহে।

প্রতিটি গাঁয়ে এমন কতকগুলি পরিবার আছে, যাদের 'গতর', অর্থাৎ খাটুনী করা ছাড়া, এ সংসারে আর কোনও 'উপায়ের' পন্থা নেই। সুবৃষ্টির বৎসরে, এরা কোনও রকমে বেঁচে থাকতে পারে; কেন না চাষের মজুর হিসাবে এরা বৎসরে ৫।৬ মাস কাজ পায়। কিন্তু এবারের অবস্থা কি? গত ৩।৪ মাসকাল, এই সব লোক বেকার। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টিপাত হয় নি, কাজেই যে সব জমিতে পাট চাষ হবার কথা তা হয় নি, এদের মজুরী জোটে নি। কৃষি-শ্রমিকেরা যে সবাই মরে নির্ম্মূল হয়ে যায় নি এইটাই পরম আশ্চর্য্য! বৃষ্টি নেই, পোকায় পাটের চারা ধ্বংস। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খাল কাটা হচ্ছে, এনিকাট তৈরি হচ্ছে, পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে ঠিক কতটা ফল পাওয়া যাবে তা এখন অনুমান করা যায় না। তবে মনে হয় খালগুলি ঠিক মত কাটা হলে এবং যেখানে যেখানে দরকার, এনিকাটগুলি সেখানে সেখানে নির্ম্মিত হলে, আর সবার ওপরে

সময়ে প্রয়োজনমত জল পাওয়া গেলে, এই পরিকল্পনাধীন অঞ্চলে চাষের কিছুটা সুবিধা অবশ্যই হবে। কিন্তু বিধানসভায় যে হারে বাধ্যতামূলক ভাবে জলকর আদায়ের আইন পাশের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে 'ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী' না হয়।

নিত্যব্যবহার্য্য সব জিনিষের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। চিরদারিদ্র-ক্লিষ্ট পাড়াগাঁয়ের লোকদের একেই ত ক্রয়ক্ষমতা ছিল না কোন কালেই, এখন আবার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাদের অসহায়তা যে কতখানি বেড়েছে তা ধারণার বাহিরে। চাউলের দাম বারো আনা সের। আর ক্ষেতমজুরের দৈনিক মোট মজুরী ঊর্দ্ধপক্ষে সর্ব্বসাকুল্যে, এক টাকা ছয় আনা মাত্র, অর্থাৎ একদিনের গোটা মজুরীতে দু'সের চাউলও হয় না। "ন্যায্যমূল্যের দোকান" মারফৎ (কোনও কোনও গ্রামে, সব গ্রামে নয়) অতি সামান্য পরিমাণ চাউল ও আটা, অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত সংখ্যক লোককে সপ্তাহে সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে। আটার অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। লোকে বলে, যেটা শহরে চলে না সরকার বাহাদুর সেই মালটাই পাড়াগাঁয়ে চালান দেন। ওটা নাকি বরাবরই হয়ে আসছে। "ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।" আবার পাড়াগাঁয়ের যাদের জন্য এই সাপ্তাহিক সরবরাহের ব্যবস্থা, তাদের সপ্তাহের বরাদ্দ একেবারে নেবার ক্ষমতাই বা কোথায়? বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনেছি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন লোকও আছেন—চাউল বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অসুখের ভাণ করে রাত্রে অনাহারে থাকেন। এঁদের সংখ্যা কম নয়।

পাড়াগাঁ থেকে ম্যালেরিয়া অনেকটা দূর হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্যতার স্থান নেই, তাই তার জায়গায় এসেছে নানা ধরণের টাইফয়েড, আরও নূতন নূতন রোগ। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব ত আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব পয়সার। আর তা না হলে ওষুধ-পথ্য কিছুই হবে না। চিরদরিদ্র পাড়াগাঁয়ে অত বড় বড় রোগের ফলে কি পরিণাম হচ্ছে সে কথা বলার প্রয়োজন নেই।

এখন চুরি ডাকাতি বেড়েছে। অভাবে স্বভাব নষ্ট, অন্ততঃ গরীবদের বেলায় এ কথাটা খাটে। যাঁরা ঘুষ, অতিরিক্ত মুনাফাবাজী, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দেওয়া প্রভৃতি উপায়ে ধনকুবের হচ্ছেন তাঁরাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করছেন, তাঁদের কথা বলছি না। সম্প্রতি একজন জানালেন, কয়েকদিন আগে একই রাত্রে কয়েকজন চোর তাঁর পাড়ায় পর পর কয়েক জায়গায় চুরির চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কোথাও শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয় নি। তারা যেন পেটের দায়ে "মরিয়া হয়ে" চুরিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। গ্রামের প্রতিরক্ষা বাহিনী যথেষ্ট কাজ করছে। নতুবা বিপদ আরও বেশী হত।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামাঞ্চলে চালু হয়েছে। গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী। অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁরাই বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ করেছেন। সরকারের হাতে সেগুলি তুলে দিয়েছেন। সরকার শিক্ষকশিক্ষিকাদের বেতনের দায়িত্ব নিয়েছেন, মাঝে মাঝে কিছু কিছু আসবাবপত্রও দিচ্ছেন, বিদ্যালয়গুলিকে চালু রেখেছেন। কিন্তু তবু ঠিকমত কাজ হচ্ছে না। আরও বেশী ঘর—আসবাব চাই, শিক্ষক শিক্ষিকা চাই। শিক্ষক শিক্ষিকারা জীবন-ধারণের উপযোগী বেতন চান, এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে বেতন দেওয়া। চারিটি শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় গুলি, অন্ততঃ চারিজন শিক্ষক না হলে চলতেই পারে না, পাঁচজন হলে তবে ঠিকমত চলা সম্ভব হয়। কিন্তু এখনও এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলিতে দুইজন বা তিন জন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকও আছেন। সে সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখা বা শেখান সম্ভব নয়। পাড়াগাঁয়ের অনেক উচ্চবিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক-বিদ্যালয়ে উন্নত করা হয়েছে, একথা আগের বারে লিখেছি। বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর তৈরি হচ্ছে, বিজ্ঞানাগারের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কেনা হচ্ছে, কিন্তু কোথায়ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আর বর্ত্তমান বেতনের হারে পাওয়া সম্ভবও নয়। কিসের আকর্ষণে এই সব অনার্স গ্রাজুয়েট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ, এম-এসসি পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার জন্য নগরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৈচিত্র্য ছেড়ে যাবেন? সরকারকে এ কথাটা কিছুতেই বোঝান যাচ্ছে না, যে উপযুক্ত লোক পেতে হলে আকর্ষণীয় প্রারম্ভিক বেতন দিতে হবে। তাঁদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে ভাবে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, তার পরিবর্ত্তন না হলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার গ্রামের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের চিঠি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম—এ অবস্থা কেবল আমার গ্রামের বিদ্যালয়ের নয়, পাড়াগাঁয়ের সব গ্রামের বিদ্যালয়েও—এই চিঠিখানির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ছাড়া আর কি করতে পারি?

আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমরা আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আপনার নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, দেড় বৎসর অতীত হইতে চলিল, কিন্তু অদ্যাবধি আমাদের কোন Practical Class হইতেছে না। আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে, প্র্যাকটিক্যালে উত্তীর্ণ না হইলে পরীক্ষায় সফলকাম হওয়া যায় না। আমাদের হাতে আর মাত্র দেড় বৎসর সময় রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তিন বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করা একরূপ অসম্ভব। এক বৎসর পূর্ব্বে একাদশ শ্রেণীর জন্য নূতন বাড়ী তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল [illegible]

কার্য্য অদ্যাবধি সম্পন্ন হইল না। এদিকে শিক্ষকগণ বলিতেছেন যে নূতন বাড়ী না হইলে প্র্যাক্‌টিক্যাল করা অসম্ভব ; কারণ বিদ্যালয়ের ঘরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুতরাং প্রধানতঃ প্র্যাক্‌টিক্যাল না হওয়ার জন্ম নূতন বাড়ীই দায়ী। অপর দিকে প্র্যাক্‌টিক্যালের জন্ম যে পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি দরকার তাহার কিছু মাত্র নাই। সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাদির অভাবে আমরা পরীক্ষা করিতে পারিতেছি না। আবার একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষকতা করার জন্ম এম. এস. সি. পাস শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এম-এস-সি পাস ত দূরের কথা আমরা বি-এস-সি পাস শিক্ষকও পাইতেছি না। একজন বি-এস-সি ডিসটিঙ্কসন প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ২১শে জুলাই চলিয়া যাইতেছেন। তিনি চার মাস পূর্ব্বে তাঁহার চলিয়া যাইবার কথা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন শিক্ষকই আসিলেন না। সেকেণ্ডারী বোর্ড আমাদের উপর যে বিরাট পাঠ্য তালিকা চাপাইয়াছেন তাহা এক বৎসরের মধ্যে শেষ করা খুবই শক্ত। তাহার উপর যদি এক মাস বন্ধ যায় (কারণ চার মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য শিক্ষকের আনয়নের কথা বলিয়াছিলেন, তা হলে মনে হয় এখনও শিক্ষক আসিতে এক মাস দেরী হইবে) তা হলে যে কি ভীষণ ক্ষতি হইবে তাহা আশা করি আপনাকে বলিতে হইবে না। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যতে কি হইবে আমরা নিরূপন করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমরা আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া আপনি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, নূতন বাড়ী ও শিক্ষক আনয়ন সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিতে তৎপর হইবেন।

বিনীত—

দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

স্বাঃ ১। সত্যশঙ্কর দে।
,, ২। শুভ্রাংশুশেখর দাস।
,, ৩। অশোককুমার ঘোষ।
,, ৪। বিশ্বনাথ ঘোষ।
,, ৫। রাজেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
,, ৬। জয়দেবচন্দ্র দে।
,, ৭। সুকুমার দাস।
,, ৮। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৬৫ সাল।
আঁটপুর—উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
আঁটপুর, হুগলী।

সম্পাদক হিসেবে আমার উত্তর হচ্ছে যে, বাড়ীর প্ল্যান্ ও এষ্টিমেট কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট বহুদিন পড়ে আছে ; লিখিত ও মৌখিক তাগিদেও কোন ফল পাচ্ছি না। ঘর বাড়ীর অভাবে রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্পূর্ণ ক্রয় করা যাচ্ছে না—স্থান নেই, কোথায় তাদের রাখব ? এই কারণেই "প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস" সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করাও সম্ভব হচ্ছে না। সর্ব্বোপরি বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহে বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেও উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা পাওয়া যাচ্ছে না। কর্ত্তৃপক্ষদের গোচরে এই সকল বিষয় আনা হয়েছে ; কিন্তু অদ্যাবধি উহা ফলপ্রসূ হয় নি। আমি একেবারে সহায়হীন ও নিরুপায়। ছাত্র-ছাত্রীদের আগের এই নিঃসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছি, কিন্তু অন্তরে প্রচুর বেদনা অনুভব করছি।
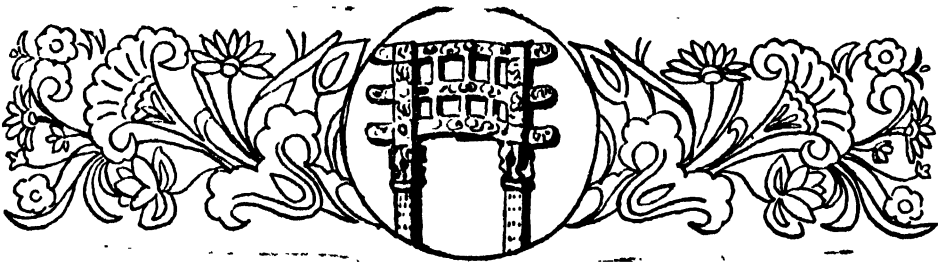
সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

আমি হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব ছেলেমেয়েদের ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে বলতাম তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল যে, তাদের দেশ সম্বন্ধে যদি আমি কিছু প্রশ্ন করি তবে তারা জবাব দেবে। আমি লিখিত প্রশ্ন কতকগুলি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে একজনের জবাবগুলি হঠাৎ চোখে পড়ল।

আমেরিকায় আভিজাত্য কিসের এবং সাধারণ লোক ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ কি আমি জানতে চেয়েছিলাম। মেয়েটি বলে—একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমেরিকায় অভিজাত শ্রেণী বলে কিছু নেই, অর্থাৎ সমস্ত দেশটার সব দলের লোকই যাদের আভিজাত শ্রেণী বলে মানবে এমন কোন শ্রেণী নেই। এক এক সম্প্রদায় বা দলের লোক কোন কোন ব্যক্তিদের অভিজাত শ্রেণীর বলে ধরে। যদিও "অ্যারিষ্টোক্রাট" কথাটা ওখানে খুবই কম ব্যবহৃত হয় এবং এক শহরে যে অভিজাত বলে পরিচিত অন্য শহরে সেই একই লোক একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। যে সম্প্রদায় যে রকমের তাদের আভিজাত্যও সেই রকম। বোষ্টন শহরে প্রধানতঃ বংশগৌরব দেখে আভিজাত্যের বিচার হয়; কিন্তু ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর আভিজাত্য নির্ভর করে। আবার কোন কোন শহরে ধন, মনীষা, শিক্ষা এমনকি দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখেও আভিজাত্যের বা কৌলীন্যের বিচার হয়। এ বিচারেও যে একেবারে সেই দলের সকলে একমত তা বলা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের নিজের আলাদা মাপকাঠি থাকতে পারে। ধন, সংস্কৃতি, বংশমর্য্যাদা বা আর কিছু যে যেটা বড় ভাবে সে সেই রকম মানুষকেই কুলীন মনে করে।

সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া অভিজাতের সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে এদেশে সহজ। যদি কোন মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কৃতি, ধন, বংশগৌরব, দৈহিক সৌন্দর্য্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পরকে আনন্দ দেবার প্রতিভার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান্ না হয়, তবে সেই হ'ল সাধারণ মানুষ। হয়ত আপনারা বলবেন যে, তা হলে ত এই সব কোন কারণে যার খ্যাতি হয়েছে সেই অভিজাত শ্রেণীর। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়, কারণ যে সম্প্রদায়ের বংশগৌরবের মোহ আছে সে শুধুমাত্র ধনীকে হীনচক্ষে দেখে। সৌন্দর্য্য-বাতিক আছে বিদ্বান-বুদ্ধিমানকেও তারা উঁচু নজরে দেখে না। সুতরাং যে দেশে নানা মুনির নানা মত, সেখানে একটা কোন নির্দিষ্ট অভিজাত শ্রেণী নেই, সেই আমেরিকায় নানা রকম কৌলীন্য আছে ধরা ভাল।

আমেরিকায় শিক্ষার প্রচার সর্ব্বত্র হয়েছে। সুতরাং সেখানে লিখন-পঠন জ্ঞানী এবং প্রকৃত শিক্ষিত শ্রেণী বলে দুটো সম্প্রদায় আছে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করি।

মেয়েটি বলে, হ্যাঁ, খানিকটা বলা যায় বটে যে, এই রকম দুটি শ্রেণী আছে। কিন্তু তাদের মাঝখানের ভেদ রেখাটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত নয়। এক দল সুশিক্ষিত এবং এক দল অল্পশিক্ষিত হলেও আমেরিকার সমস্ত জনগণই এক জায়গায় অবিভক্ত। বড় একটা টানা সিঁড়ির এক ধারে নিরক্ষর থেকে সুরু করে অল্পে অল্পে শিক্ষার ধাপ উঠতে উঠতে পাণ্ডিত্যের শিখরে ওঠার মত করে মানুষগুলিকে সাজানো যায়। এই সব মানুষেরা যে যেমন শিক্ষার ভিতর মানুষ হয়েছে সে অনেকটা সেই রকম শিক্ষিত লোকদের সঙ্গেই মেশে এবং সামাজিকতা করে, তবে কেউ একটু বেশী কিংবা কেউ একটু কম তফাৎ দেখলেও যে বন্ধুত্ব করে না, তা নয়। তবে পণ্ডিত বলেই যার নাম সে লিখন-পঠন মাত্র জ্ঞানীর সঙ্গে মেলামেশা কদাচিৎ করে।

বিবাহের বেলায়ও সমাজে যে যে স্তরের সে সেই স্তরেই বিবাহ করে, যদিও কাটাছাঁটা বিভিন্ন স্তর এদেশে ঠিক নেই। অর্থাৎ খুব ধনী, খুব বিদ্বান-বুদ্ধিমান বা খুব সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ খুব দরিদ্র, খুব অল্পবুদ্ধি বা খুব অমার্জ্জিত মেয়েকে সচরাচর বিবাহ করে না। তবে খানিকটা তফাৎ আছে এমন ছেলেমেয়ের বিবাহ প্রায়ই হয়।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রটেষ্টাণ্টরা নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ খুবই করে। তবে প্রটেষ্টাণ্টের সঙ্গে ক্যাথলিকের বিবাহ কম হয়, অথবা খ্রীষ্টানের সঙ্গে ইহুদির বিবাহও কম। ক্যাথলিকরা খুব গোঁড়া নিজেদের ধর্ম্মমত বিষয়ে।

দারিদ্র্য মিনেসোটায় কম। তবে মেয়েটি বলে অতিদরিদ্র মানুষও আছে ওদেশে। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের আয় এত কম যে, খাওয়া-পরা এবং বাসগৃহ

কালো জাত তা নয়, এদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পরিবারও আছে। তবে সম্ভবতঃ এই দরিদ্র দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় হচ্ছে উত্তর মিনেসোটার লাল ইণ্ডিয়ানরা। এরা এখনও আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে যায় নি। এদের কোন কোন পরিবারের কর্তা বা গিন্নী ভাল করে ইংরেজীও বলতে পারে না। তারা এখনও চিপেওয়া (Chippewa) ভাষা বলে। এই প্রাচীন-প্রাচীনারা নিজেদের পূর্ব্বতন সমাজের শিক্ষাই পেয়েছিল। কিন্তু সে সমাজ আজ আর নেই। কাজেই এই প্রাচীন-প্রাচীনারা আধুনিক কোন সমাজে ঠিকভাবে মিশতে চায়ও না পারেও না।

নিগ্রোদের মধ্যে অনেক ধনী পরিবারও আছে। সিকাগোতে খুব সুসজ্জিত নিগ্রো পরিবারকে বড় বড় মোটরগাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে আমরাও দেখেছি। তবে অতি-ধনী নিগ্রোদের কিরকম আয় ওই মেয়েটি তা বলতে পারে না। মিনেসোটায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গৃহে বাস করে না এমন পরিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি বলে, প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবার আছে যারা এখনও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গৃহস্থালী গড়ে তুলতে পারে নি। তারা বেশীর ভাগ দরিদ্র। তবে অবস্থাপন্ন চাষী পরিবারও এমন আছে যাদের বাড়ীতে সেণ্ট্রাল হিটিং দিয়ে ঘর গরম হয় না, বৈদ্যুতিক আলো বা কলকব্জা নেই, শৌচাগার, জলসরবরাহ, নর্দ্দমা প্রভৃতি আধুনিক প্রথার নয়। কিন্তু এই সব পরিবার বেশ আরামে এবং সুখে-সচ্ছন্দেই থাকে। এরকম অনেক পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী অন্যান্য আমেরিকানদের মতই, কেবল তাদের জীবিকার উপায় চাষবাস বলে কোন কোন বিষয়ে তারা একটু অন্যরকম চলে। তাদের খাদ্য আমাদেরই মত, তবে তারা নিজেরা যে-সব জিনিষ উৎপাদন করে সেগুলি স্বভাবতঃই বেশী খায়। তাদের পোশাক-আশাক যথেষ্ট আছে, তবে ফ্যাসানেবল নয়; বাড়ীঘরও আরামপ্রদ। এই সব মধ্যবিত্ত চাষীরা অধিকাংশই ভবিষ্যতে আধুনিক কলকব্জা গৃহস্থালীতে বসাবে ভাবে এবং টাকা জমার সঙ্গে সঙ্গে একটা দুটো করে করতে থাকে। বড় শহর থেকে দূরে থাকার জন্য কাজে দেরী হয় অনেক সময়। তবে যারা সত্যই দরিদ্র তাদের জীবন বড় কষ্টের। আমার জানা কোন কোন রেড ইণ্ডিয়ান পরিবার আছে যাদের দেখে মনে হয় কোন রকমে মাটি কামড়ে পৃথিবীতে পড়ে আছে মাত্র। তাদের কাপড়-চোপড় ছিন্নভিন্ন, নয়ত পরের পরিত্যক্ত পুরানো পোশাক, রিলিফ এজেন্সি প্রদত্ত খাদ্যই তাদের খাদ্য, অথবা সস্তায়-কেনা কোন খাবার কি শিকার-করা পশুমাংস এই দিয়ে তারা পেট ভরায়। জোড়াতালি-দেওয়া বাঁকা-চোরা ছোটখাট কুটির যা নিজেরা তৈরী করতে পারে বা পোড়ো আছে দেখে তাতেই তারা বাস করে।'

ওদেশে কারা চাকর-বাকর রাখে জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি বলে—উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী লোকেরা সাহায্যকারী রাখতে পারে। এদের তারা ভৃত্য বলে না। বলে 'ভাড়াকরা লোক।' হোটেলের এই জাতীয় মেয়ে কর্ম্মীদের 'মেড' বলা হয়। সাধারণ লোকে কেবলমাত্র টাকার জন্যই যে লোক ভাড়া করে না তা নয়; বৈজ্ঞানিক কলকব্জায় মানুষের ঘর-সংসারের কাজ অনেক কমে গিয়েছে এবং সহজ হয়ে গিয়েছে এ কারণেই অনেকে লোক রাখে না; তা ছাড়া যারা সংসারের কাজ করে টাকা রোজগার করতে পারে এমন লোক অনেক বেতন দিয়েও পাওয়া দুঃসাধ্য এই জন্যও লোক রাখার প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছে।

অধিকাংশ আমেরিকানরা নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলে। কিন্তু এদের সকলেরই আয় যে একরকম তা নয়। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩০০০ ডলার অর্থাৎ ১৫০০০ টাকা। আবার অধ্যাপক শ্রেণীর অনেকের বাৎসরিক আয় ৫০০০ কি ৬০০০ ডলার অর্থাৎ ২৫০০০।৩০০০০ টাকা। ভারতবর্ষের অনেক প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপকও বছরে ৬০০০।৭০০০ টাকায় কাজ শেষ করে জীবন কাটিয়েছেন। ওদেশের কলেজের ডীন এবং প্রেসিডেণ্টদের আয় অধ্যাপকদের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁদের ধনী বলা যায় ওদের মতেও, তাঁরা বসবাসও করেন ধনীদের পাড়ায়। এঁদের সংসারে কারুর বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন কারুর বা ২।৩ দিন গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করবার জন্য ভাড়াকরা লোক আসে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের লোকও মাঝে মাঝে খুচরা টাকা দিয়ে ছেলেপিলে আগলাতে "বেবী-সিটার" রাখে। সংসারের কাজে অনেক কর্ত্তাই গৃহিণীদের সাহায্য করেন। বাসন ধোওয়া, বরফ পরিষ্কার করা, কাঠ বয়ে আনা, পরিবেশন করা, ঘর রং ও মেরামত করা, বাগানে ঘাস কাটা ও জল দেওয়া এসব অনেক গৃহকর্ত্তাই করেন আমরাও দেখেছি। তবে রান্না, বাজার, কাপড়কাচা এসব কাজ মেয়েদের প্রায় একচেটিয়া।

পুরুষরাই প্রধানতঃ জীবিকা অর্জ্জন করেন, সুতরাং বাড়ীর বেশীর ভাগ কাজ মেয়েরা করবে এটা স্বাভাবিক। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা কিছু টাকা আনে এবং পুরুষরা কিছু সাংসারিক কাজ করে।

ছেলেমেয়েরাও অল্প বয়স থেকেই ওদেশে টাকা রোজগার করতে শেখে। সকলেই যে শৈশব থেকে করে তা নয়। অনেক পিতামাতা খুব অল্প বয়সে কাজ করা পছন্দ করেন

না। কিন্তু অনেকে আবার অনুমতিও দেন। এরকম ক্ষেত্রে ছেলেরা ৯।১০ বৎসর বয়সেই খবরের কাগজ বিক্রী প্রভৃতি কাজে নামে। মেয়েরা ১৩।১৪ বৎসর বয়সে "বেবী-সিটিং" অর্থাৎ পরের শিশু আগলানোর কাজ নেয়। আরও ছোট বয়সেও কেউ কেউ কাজে নামে।

বেশীর ভাগ পিতামাতাই ছেলেমেয়েদের টাকা রোজগার করা পছন্দ করেন, যদি না বয়সের পক্ষে কাজটা বেশী কঠিন হয়, অনেক রাত না জাগতে হয়, কুসঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং পড়াশুনা ও খেলার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

আমার প্রশ্নের উত্তরদাত্রী রোজগারী বালকবালিকাদের বিষয়ে উক্ত কথা বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি যে খুব ছোট বয়সে টাকা রোজগার করতে যাওয়ার জন্যই ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় কুপথে যায় তোমার মনে হয় না কি?

মেয়েটি বলে—কখনই না। আমেরিকায় অধিকাংশ লোকই মনে করে যে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিজেদের জন্য টাকা রোজগার করতে দিলে তাদের মধ্যে সুবিবেচনা, সততা সম্পত্তির মর্য্যাদাবোধ এবং আত্মসম্মান জাগানো হয়। অবশ্য ভাল জায়গায় কাজ করতে দিতে হবে।

কথাগুলির মধ্যে সুযুক্তি আছে অনেকটা, কিন্তু অত্যন্ত অল্প বয়সে টাকা চিনতে শেখার মধ্যে যে পাকামিটা আছে আমার চোখে তা ভাল লাগে না এবং ১০।১২ বছর থেকে কাজে নামলে সর্ব্বদাই অসৎসঙ্গ এড়ানো যায় না।

মেয়েটি বলে—ছেলেমেয়েরা বেশ বড় হলে বাবামার সংসারে কিছু টাকা দেয়, যদি পুরা কাজ করে যথেষ্ট রোজগার করে। তবে অনেক ছেলেমেয়ে পুরোপুরি কাজে নামলে নিজেদের সংসার আলাদা করে নেয়, একত্রে আর থাকে না। অনেকেই অল্পবয়সে বিবাহ করে এবং বিবাহের পর বাবামার সঙ্গে থাকা ত একেবারেই অচল। কলেজ গ্রাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ২৩।২৪ বয়সের মধ্যেই বিবাহ করে, অন্যরা আরও আগে। খুব সম্প্রতি কলেজ শেষ করার আগেই বিবাহ করা একটু বেড়েছে।

কোন কোন পিতামাতা ১৭।১৮ বছরের আগে মেয়েদের আত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে ঘোরা পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার এই ছাত্রীটি বলে যে, এক এক দলে এবং এক এক পরিবারে আলাদা আলাদা মত থাকলেও সচরাচর বছর চৌদ্দ বয়সেই মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বেরোয়। তবে পিতা-মাতার অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বাইরে যাওয়া সকলে পছন্দ করেন না। এমন পিতামাতাও আছেন যাঁরা মেয়ের বন্ধুর বংশ পরিচয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্য্যন্ত জেনে তবে তার সঙ্গে মেয়েকে বেরোতে দেন। বেশীর ভাগ পিতামাতাই প্রথম দিকে ছেলেদের বিষয় একটু খুঁটিয়ে জানতে চান, সেই সব ছেলেদের সঙ্গে নিজেরা আলাপ করতে চান। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীনতাও বাড়ে, নিজেরাই নিজেদের বন্ধু নির্ব্বাচন করে। কলেজে এবং অনেক বড় হাই স্কুলেও পিতামাতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা নামমাত্র-জানা ছেলেদের সঙ্গেও মেয়েরা 'ডেট' করে বেড়াতে যায়।

সামাজিক যে কোন স্তরের ছেলে কি যে কোন স্তরের মেয়েকে 'ডেট' করতে ডাকতে পারে?

আমার এই প্রশ্নে ছাত্রীটি বলে—"হ্যাঁ ডাকতে পারে; তবে মেয়েটি রাজী না হতে পারে।

অন্য একটি মেয়ে বলেছিল—সচরাচর মেয়েরা প্রত্যাখ্যান করে না। তবে আমার মনে হয় এই দ্বিতীয় মেয়েটি ভাল করে ভেবে জবাব দেয় নি।

মেয়েরা ছোট বয়সে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বটে, তবে মিনেসোটা ষ্টেটে ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক মেয়েদের বিবাহ আইনসঙ্গত নয়। কোন কোন রাষ্ট্রে ছোট মেয়েদের বিবাহও আইনসঙ্গত হয়।

সব ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়ে গেলে পিতামাতা যদি বৃদ্ধ হয় তবে তাদের দেখাশোনা কে করে? এই প্রশ্ন করাতে মেয়েটি উত্তর দেয়—বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেরাই নিজেদের সংসার দেখে। যদি টাকার অভাব থাকে তাহলে ছেলেমেয়েরা টাকা দিয়ে সাহায্য করে, সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে টাকা পায় অথবা কোন ছেলেমেয়ের বাড়ীতে থাকে। যদি অক্ষম হয়, নিজের যত্ন নিজে করতে না পারে তবে কোন ছেলেমেয়ের বাড়ীতে থাকে।

আমি নিজে কয়েকজন বৃদ্ধাকে দেখেছি একেবারে একলা একটা বাড়ীতে থাকতে। আবার এমনও দু' এক-জনকে দেখেছি যাঁরা ছেলের বাড়ীর আর একটা অংশে নিজের সংসার করেন। ছেলের সংসারে বাস করেন এমন নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা একজনকে দেখেছি। মেয়ের সঙ্গে বাস করেন এমন বৃদ্ধ দম্পতিও দেখেছি। ছেলের চেয়ে মেয়ের সংসারেই থাকা লোকে বেশী সুবিধার ভাবে, যদিও একেবারে একলা বা দোকলা থাকার প্রথাই বেশী। ভাল মেয়ে হলে নিজের যতই কাজ থাক না তারা মা-বাবার খোঁজ সর্ব্বদা করে দেখেছি। খাবার করে দিয়ে আসা, অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সারবার মুখে কোন আত্মীয়ের কাছে রাখা এসব ভাল বাড়ীতে খুব দেখা যায়।

এই মেয়েটি বলে যে, সাধারণ লোকের তুলনায় কলেজে পাশকরা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ কম হয়। মেয়েটি কয়েকজন বিবাহবিচ্ছিন্ন মানুষকে চেনে। সে বলে

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে সুখী ভাবেই বাস করে, কেউ কেউ দুঃখী।

অন্য ২।১টি মেয়েও বলে যে, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশী হয়।

আমরা যে-সব পরিবারের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে ২।৩ জনকে জানি যাদের প্রথম বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। এরা খুব স্বল্পশিক্ষিত পরিবার। আর একটি মেয়েকে চিনতাম সে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাকে দেখলে অবিবাহিত মনে হয়। সে আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত এবং আমরা চলে আসার পরও খোঁজ করেছে। তবে তার পারিবারিক কথা আমরা কিছু জানি না। মেয়েটি গ্রামাঞ্চলে থাকে, মাঝে মাঝে বড় শহরে মাসি-পিসির বাড়ী বেড়াতে আসে।

আমরা আমেরিকার সঙ্গে হলিউডকে জড়িত করে অনেক সময় ভাবি। কিন্তু ওদেশে যারা কলেজে শিক্ষিত-সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়ে তাদের ২।১ জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি তারা বলে সিনেমাজগৎ এত দূরের জিনিষ যে, ওসব বিষয়ে আমরা ভাবিই না। ষ্টার হবার কোন ইচ্ছা আমাদের হয় না। বড় অস্বাভাবিক জীবন। অবশ্য কলেজে এমন এক-একজনও আছে দেখেছি যারা ওদিকে যে, না যেতে পারে তা নয়। নাটক অভিনয় কলেজের একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রী কেউ কেউ হতেই পারে।

মিনেসোটাতে অনেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের পাদ্রীরা ধর্ম্মতঃ মদ্যপান নিষিদ্ধ বলেন এবং অনেকে স্পষ্ট না বললেও এই অভ্যাস পছন্দ করেন না। কিন্তু সাধারণ লোকে যে, সকলেই তাদের কথামত চলে তা নয়। ওদেশে আইনতঃ ২১ বৎসরের কম বয়স্কদের নিকট মদ বিক্রী করা বারণ। এমন অনেক পরিবার আছে যারা দোকানে মদ থাকলে সে দোকানে অন্য জিনিষও কেনে না। অথচ বয়স ভাঁড়িয়ে মদ প্রচুর কেনে নাবালক ছেলেরা, মেয়েরাও হয়ত কিছু পরিমাণ কেনে। ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই বলে যে ওদেশে মদ খাওয়ার অভ্যাসের জন্য অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং অনেকের কাজের ও জীবনের উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা যে-সব পরিবারে মাঝে মাঝে যেতাম তাদের মধ্যে অনেকের বাড়ীতেই দেখেছি অতিথিদের ফলের রস দেয় মদের বদলে। ২।১টা বাড়ীতে দুইরকম পানীয়ই সাজিয়ে আনে, যে যেটা খায় সে সেটা নেয়। কেবল একটি ধনী বাড়ীতে দেখেছিলাম বারে বারে মদ আসছে এবং বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা খুব পান করছেন।

অনেক কলেজের ছেলেরা রাত্রে লুকিয়ে শয়নকক্ষে মদ আনে এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খায় শুনেছি। এই কারণে ২।১ জায়গায় ছেলেদের কঠোর শাসন করা হয়েছে গল্প শুনেছি। তবে এগুলি ঠিক কতটা সত্য তা জানি না। মাঝে মাঝে পথে-ঘাটে মোটরের দুর্ঘটনার গল্প যেরকম কাগজে দেখতাম এবং চালকদের যেরকম বয়স পড়তাম তাতে মনে হয় পানদোষই ঐসকল দুর্ঘটনার কারণ।

অনেক দোকানে দেখেছি নাবালক ছেলেদের সিগারেট কিনতে দেওয়া হবে না লেখা থাকে, ছোট ছেলেরা তবুও যদি আসে ত দোকানদার তাড়িয়ে দেয়।

পশ্চিম দেশের লোকেদের যেরকম অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন বলে আমাদের দেশের লোকের ধারণা, আমাদের পরিচিত ওই দেশের বিবাহিত দম্পতিদের দেখে তা আমার একেবারেই মনে হয় নি। বরং আমাদের দেশেই অনেক সময় মনে হয় বিবাহের প্রতিজ্ঞার প্রতি নিষ্ঠা সবটাই স্ত্রীলোকের নিকট দাবী করা হয়, কিন্তু পুরুষের বেলা অন্নবস্ত্র দেওয়া ছাড়া অবশ্য-কর্ত্তব্য কিছুর উপর জোর নেই। পুরুষ যদি স্বভাবতঃ সুবিবেচক ও স্নেহশীল হয় তবেই সে আপনা হতে সৎপতির কর্ত্তব্য করে, না করলে এদেশে সামাজিক নিন্দা বা শাসন নেই।

শবরী রামকে

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

মনে পড়ে পরিজন উপহাসে খিলখিল করে
হেসেছিল সেদিনের কিশোরীর সদাগর লোভে,
ইঙ্গুদী-অর্জুন-শাল-জীবকের ছায়ায় ছায়ায়
মনে পড়ে তাপতপ্ত মধ্যদিন জলেছিল ক্ষোভে।

সেদিনের কিশোরীর দেহতটে মনের কামনা
শান্ত ছায়া ফেলে ফেলে কেঁপে কেঁপে উঠেছে বাতাসে,
শবরপল্লীর যুবা ধানুকীরা যেন অন্যমনা
তূণীর-বিন্যস্ত হাত ফিরিয়েছে কালো হতাশ্বাসে।

অব্যর্থ সন্ধানে যারা ফুঁড়ে দেয় সমস্ত বাসনা,
মৃগয়ার রোমাঞ্চতে পেশী যার পিচ্ছিল নিরেট,
জান্তব ক্ষুধায় যারা লাফ দেয় বিরুদ্ধ সংগ্রামে,
মৃদুমনা কুমারীর রক্তে যার আরণ্যক ভেট।

অপেক্ষার রুদ্ধশ্বাস ফেলে ছিঁড়ে যাদের উৎসাহ
দুরন্তের তীব্রবেগ বক্ষোতলে করে দাপাদাপি,
পলাশের দাবানলে ছোঁয় যারা বসন্তের দাহ,
হঠাৎ সন্ধানে যার রক্ত মেখে লুটোয় কলাপী।

সে সব শবর সাথে ঝাঁপ দিয়ে তুঙ্গভদ্রা জলে,
উন্মত্ত স্রোতের বাধা গেছি ভেঙে লীলা সমুৎসুক
সোনাপেখা বালুতীরে বর্ষার মেঘের কাজলে
কেকার কপট ডাকে জাগিয়েছি চতুর কৌতুক।

মন্দার পর্বত হতে ঋষ্যমূকে করি-শাবকেরা
বৃংহিতের আতঙ্কেতে মুখর করেছে বনতল;
মুক্তমৃত্যু সেই যূথে দাপটে করেছি ঘোরাফেরা
কিরাত-কিরাতী মিলে বিষাণে তুলেছি কোলাহল।

চিতাবাঘ ফিরে গেছে সম্বরের সতর্কিত ডাকে,
সরীসৃপ মন্থরতা বুকে নিয়ে চেয়েছে ময়াল,
ধনুকের বুকভরা নীলমৃত্যু পিয়ালের ফাঁকে
বনেচর সংহারের হানাহানি দন্তুর-ভয়াল।

সহ্যাদ্রির অঞ্চলের কোন এক শ্যামল ছায়ায়
মদাতুরা হরিণীর খোঁজে ফেরে একাকী হরিণ,
কণ্ঠে নিয়ে মিথ্যা ডাক ভ্রান্ত তাকে করি মৃগয়ায়;
বন্য আনন্দের লোভে উন্মত্ত ফিরেছি সারাদিন।

তার পরে সন্ধ্যা হয়, শবরপল্লীতে জলে বাতি।
সদ্যোমাংস রন্ধনের পীতবহ্নি লোহিত শিখায়
দিকে দিকে ওঠে জলে; দূরবনে রোমাঞ্চিত রাতি,
মনে মোর এক স্বপ্ন আঁকা হয় সুবর্ণ লিখায়।

সে বিচিত্র মনোহর জ্যোতিরূপ কিশোরীর ধ্যান।
নবকিশলয়পাত্রে সদ্যস্ফুট সে এক স্তবক
অশোকের রক্তরাগ। বসন্তের পুষ্পিত আখ্যান।
দূর্বাদলে কৃষ্ণচূড়া; কৃষ্ণকেশে শান্ত কুরুবক।

ঘনবরষার মেঘে শতচ্ছিন্ন সোনার পতাকা,
কালোর রূপের পটে গৌরীর সে নিকষ লিখন
আমায় বিভোল করে। মনে মোর সেই ছবি আঁকা;
মেদুর মানসবক্ষে কিরাতীর গূঢ় আলিঙ্গন।

সহস্রের উপহাস, সমাজের বিষের উদ্গার;
একখানি কুটীরের মায়াভরা জীবনের গান;
সমস্ত উপেক্ষা-করা সে আমার কামনা দুর্বার,
নির্জন তপস্যালোকে লোলক্ষয়ে হ'ল অবসান।

আমার সমাজ নেই; স্মৃতি নেই; নেই পরিচয়;
ধর্ম নেই; স্বর্গ নেই; এ আমার জীবন সাধনা।
তৃষিত অপেক্ষা যদি তৃপ্তি পায় সে আমার জয়;
জরতীর এ মিলন শবরীর পুষ্পিত বাসনা।

বসন্তের শ্যামলিমা বৈশাখের তাপে রুক্ষ বুক,
নতুন আষাঢ় ঝরে পর্বতের শিখরে শিখরে;
আমার মনের শাখে ডাকে শুধু একটি ডাহুক।
কত সূর্য ফিরে যায় সংক্রমণে কর্কটে-মকরে।

তখন আস নি তুমি, হে সন্ন্যাসী, কোথা ছিলে ঢাকা
দেহের দেহলীপ্রান্তে এঁকে যবে লীলা আলিম্পন
ভীরু আশাপথ চেয়ে ভেবেছি "কাঁপে কি বনশাখা,
তার আগমন গীতে?" দেহে নিত্য বন্য-প্রসাধন।

আজ এলে, কামনার স্বর্ণচূড়া জরায় লুণ্ঠিত,
স্বপ্নপোড়া ছাই শুধু, সেদিনের ক্রুর পরিশেষ;
রবাহুত সে প্রেমের জ্যোতি তবু নয় অবসিত,
উৎকণ্ঠিত সাধনার দীপ আজ শান্ত অবশেষ।

যে প্রেমে কামনা ছিল, দেহ যার ছিল উপচার,
সে নৈবেদ্য ভোজ্য নয়; সে সম্ভোগ নয় চিরন্তন।
দেহের সীমার পারে যে আমার কৌমার্য-সম্ভার
অনন্তযৌবন তাই, তাই মোর নম্র নিবেদন।

খুরেলা প্রাণীর আগমন

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন নিরন্তর। দুই এক কোটি বৎসর পূর্ব্বে যথেষ্ট গ্রীষ্মাধিক্য ছিল বহু স্থানে, এমনকি শুধু উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ছাড়া তেমন শীত কোথাও ছিল না। গহন অরণ্যের বিস্তৃতি প্রায় সর্ব্বস্থানে, বৃক্ষরাজির ঘনসন্নিবেশ বাষ্পময় করে রেখেছিল আকাশ-বাতাস, বৃষ্টিপাত প্রচুর, সমৃদ্ধি উচ্ছ্বাসে অরণ্য-জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্য্য। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন (যাকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ও বলা চলে) হ'ত ঘন ঘন, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত, ভূমি-বিদারণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা; ক্রমাগত বিদারণ ও আগ্নেয়গিরি অভ্যুত্থানের ফলে সমতলভূমি বহু স্থানে হ'ল উচ্চভূমি, তার সঙ্গে এল জলবায়ুর তারতম্য। মালভূমির শীতল বায়ুর শুষ্ক রুক্ষ ভাবের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য নেই গ্রীষ্মাঞ্চলের গাছপালার, এদের বিদায় নিতে হ'ল। বৃহৎ বিস্তৃত সরোবর। বনন্দ, বিল, নদ, জলাভূমি গেল শুকিয়ে, বদলালো পুরাতন পরিবেশ। বিশাল শাল্মলীতরুবংসদৃশ নিদাঘের সুউচ্চ বৃক্ষরাজি অন্তর্দ্ধান হলেও বিস্তৃত প্রান্তরে তৃণদলের অভাব হয় নি; বরং জংলা জায়গায় বৃক্ষদের প্রাধান্য অবসানের পর আসর সাজিয়ে বসল নব দূর্ব্বাদল, মাঠের পর মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছান। অবিসম্বাদিত ফল দেখা দিল জীবের আচার-ব্যবহারে। উন্মুক্ত প্রান্তর আর প্রচুর সূর্য্যালোক অনেকের পছন্দ হয় নি, তাদের জীবন-নাট্যে পড়ল যবনিকা, তারা নেহাৎ বুনো। স্বভাব পরিবর্ত্তনে যারা কৃতকার্য্য তারা থেকে গেল, খাওয়া-থাকার ধরনধারণ বদলে গেল। বৃক্ষলতার সরস পত্রপল্লব পাবে কোথায়, মাটিতে অঙ্কুরিত ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ। বিরাটদেহী মাই-ওসিন গ্লিপ্টোডনরা উঁচু গাছের পাতাশাখা খেতে খেতে কালক্রমে নিজেরাও উঁচু হয়ে পড়েছিল, তাদের পক্ষে শির অবনত করা কঠিন, হারল জীবন-যুদ্ধে—বিলুপ্ত। গড়ে উঠল ছোট ছোট তৃণ-ভোজী, তৃণভোজনে মুস্কিল আছে, একস্থানে অধিক দিন থাকা যায় না। তৃণাঙ্কুর পুনরপি দেখা দেয় নববর্ষার জলধারা সিঞ্চনে, ভ্রাম্যমান যাযাবর না হয়ে উপায় কি? মেষপালক রাখাল জাত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ (প্রাচীন কবি হোমার ভার্জ্জিল অমর করে গেছেন এদের) মধ্য-এশিয়া, গ্রীস, আফ্রিকা জুড়ে অবাধ চলত এদের অভিযান, ঠিক সেই মত (অবশ্য বহু লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে) একদল প্রাণীর উদ্ভব হ'ল, যারা কেবলই ঘুরে বেড়াত নতুন নতুন ঘাসের সন্ধানে। নিরন্তর ভ্রমণশীল অভ্যাস শাবকদের করে তুলল স্বাবলম্বী, শিশুদের হয় মার পিছন পিছন দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে, না হয় পরিত্যক্ত, নির্জ্জন, নিরাশ্রয়ে শিঙে ফোঁকো। নিছক বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তৃণভুক্-করভ জন্মেই স্বাবলম্বী, তিন থেকে চার ঘণ্টার ভিতর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপদ্রবে মাতৃদুগ্ধের স্বা গ্রহণ করে হস্তী, অশ্ব, ছাগ, মেষ, গো, উষ্ট্র নবজাতক।

খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী ভূ-চরদের মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাধিক প্রধানতঃ নিরামিষাহারী, যদিও কেউ কেউ প্রয়োজন বোধে নিরী প্রাণী মেরে মাংস খেতে আপত্তি করে না (ভুইকাস, তাপির) খুর দিয়ে পদাঙ্গুলী সাধারণতঃ সংযুক্ত, কারও কারও ৪৫টি তো চওড়া নখযুক্ত আঙ্গুল, অনেক খুরেল জীবের পূর্ব্বপুরুষ তৃতীয় স্তরে ঊষাকালেই দেখা গিয়েছিল—যেমন শূকর, তবে সংহত হয়ে ও অল্প আধুনিক মাইয়সিন যুগে; ধরাপৃষ্ঠের মৃত্তিকা শক্ত জমাট হ আসছিল, তখন এরা দলে দলে বিচরণ করে বেড়াত ঘাস পা লতা শাক খেয়ে আর সময় অসময় মারামারি করে। পরিবর্ত্ত যেমন দেখা গেছে, তেমনি পুরানো দেহ নিষ্ঠার সঙ্গে রেখেছে এম জীবও আছে। স্বতন্ত্রভাবে অন্য ধারায় পরিস্ফুরণ হয়েছে যাদের তাদের বংশধর হরিণ মেষ বলদ বেশ উন্নত, অনেক জাতিতে পরিণ হয়ে নানা রূপে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। এ পরিবর্ত এমন সুকৌশলে প্রতিভাত যে, অনেক স্থলে জাতকে জাত গেছে বদলে, নূতন জীবের অভ্যুদয়ে। শ্বদন্ত থেকে উৎপত্তি প্রদন্তের মিলিয়ে গেছে পেষণ দন্ত (বন্য বরাহের প্রদন্ত)। অনেকের মুখ মণ্ডল গোলাকার, দেহ বিশাল, কর্ণ পদ লেজ ক্ষুদ্রাকৃতি, যেমন জলহস্তী। প্রকাণ্ড দেহ নিয়েও সাঁতরাইতে অসুবিধা নেই। নদী-তটে বা জলতলে অনেকক্ষণ কাটায়, মানুষের উৎপাত জলে থাকতে বাধ্য করে, এরা শুধু রাত্রে উঠে আসে জলজগুল্ম শাক তৃণ খেতে। মস্তিষ্ক অপুষ্ট, জাতি উষ্ট্র মেষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শূকর নানা জাতের: গৃহপালিত, বন্যবরাহ, প্রদন্তবিশিষ্ট বাবিরুসা। শেষোক্ত প্রাণী ভারতমহাসাগরের সেলিবিস দ্বীপের পশু, পুরুষদের ৪টি বড় বড় ঘোরানো প্রদন্ত দেখবার মত, চক্ষুর নিম্নভাগের মাংসভেদ করে অতিরিক্ত প্রদন্ত দুটি গজায়। তাদের সার্থকতা পুরাতন যুগে ছিল। হয়ত কাঁটা ঝোপ ইত্যাদির হাত হতে চক্ষুকে রক্ষা করত, এখন অনাবশ্যক ভারমাত্র। পেকারী এই বর্গের, ঝগড়াটে, এক এক দলে প্রায় ৫০।১০০টি থাকে।

হিপোপটেমাস সর্ব্বভুক। বেশীক্ষণ জলে থাকায় জন্য লোম-শূন্য শরীর, চিড়িয়াখানায় শীতের প্রাক্কালে লোম ঘন হয়, সম্ভবতঃ পুরাকালে দেহ ঘন লোমে আবৃত থাকত। এখন অবশ্য মধ্য-আফ্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও নেই, পূর্ব্বেকার দক্ষিণ ইউরোপ ও মধ্য ভারতের ভূ-স্তর থেকে জানা গেছে এদের অস্তিত্ব। অতীতের

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই স্থন্দর হয়ে উঠতে পারে

চেরাকোটেমাস ও এনাথ্রাকোথেরিয়াম প্রদন্তবিশিষ্ট বরাহ পেকারী-দের উদ্বংশীয়-শাখা।

রোমন্থক

রোমন্থকদের নিকটাত্মীয় শূকরবর্গ বিখ্যাত। হরিণ গাভী মেষ জিরাফ উষ্ট্র প্রভৃতির কসের দাঁত সুপুষ্ট, এরা রোমন্থক চর্ব্বণে বিশেষত্ব আছে, জাবর কাটে অনেকক্ষণ ধরে। রোমন্থকদের উপরের পংক্তিতে ছেদনদন্ত বা শ্বদন্ত নেই, ছেদন-কর্ত্তনের সময় পৃষ্ঠভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়—দন্তহীন কঠিন মাড়ি। রোমন্থকদের ভিতর সবচেয়ে উন্নতি করেছে মৃগকুল, বিবর্ত্তন ধারা প্রবাহে অজস্র পরিবার—জাতিগণে বিভক্ত। খুরেলা প্রাণীরা সকলে একবর্গের, অর্থাৎ অশ্ব মৃগ হস্তী উষ্ট্র ছাগ ইত্যাদি আমাদের নিকট ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও উষা যুগে (তৃতীয় স্তরের) এদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল এক ও অভিন্ন। কোন প্রণালীতে, কি রূপে স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হ'ল? অভিব্যক্তি ধারায় সে বিস্ময়কর পরিচয় কিছুটা জানা গেছে—প্রধান প্রধান প্রাণীদের বিবর্ত্তনে।

উটের জন্মকথা

ভারতে উট প্রচুর। বিভিন্ন শ্রেণীতে এরা বিভক্ত হয়েছে। উষ্ট্র বিবর্ত্তনও চমৎকার কাহিনী। অনেক উপত্যকা নদীবিধৌত বসন্তের মন্থর জলপ্রবাহ বর্ষায় ছুটতে থাকে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। উত্তর আমেরিকার উটা প্রদেশ এইরূপ একটি নদীর অববাহিকা-ক্ষেত্র, উচ্ছসিত বন্যাজল বছরে বছরে তৃণচর অধিবাসীদের (যারা শ্যামল মায়া পরিত্যাগ করে যেতে পারত না) ডুবিয়ে আবদ্ধ করে রাখত কর্দ্দমপঙ্কে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে তৃণভুক প্রাণীদের কঙ্কালের ওপর বালি মাটি চাপা পড়েছে—তৈরী হয়েছে নতুন নতুন স্তর; জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃক্ষলতা বদলেছে, উত্তর গোলার্দ্ধে হিমযুগ না-আসা অবধি স্তর-বিন্যাসে ছেদ পড়ে নি।

বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় রসাল গাছপালা এল কমে, স্থান দখল করল শুষ্ক কর্কশ শাক তৃণের কাঁটা ঝোপ, সকলের পরিত্যক্ত খাদ্য। বাস্তুভিটা উষরভূমি ত্যাগ করে পালায় নি যারা সেই কষ্টসহিষ্ণু প্রাণীদের অধস্তন পুরুষ আজকের উট। উটের আদিপুরুষ দেখা গিয়েছিল এই অনুর্ব্বর প্রান্তরে, এরা মৃগ ও শূকরের মধ্যবর্ত্তী জীব। এখানে চার আঙুল সমন্বিত তৃণচরের ফসিল প্রথিত, চর্ব্বণোপযোগী আদিম 'পশ্চাতদন্ত' বিশিষ্ট মুখমণ্ডলে নতুনত্বের আভাস। এই মাটি-জমা স্তরের ওপরের দিকে যত এসে পৌঁছব, দেখা যাবে ক্রম-পরিবর্ত্তন আধুনিক উটের আকারের দিকে এগিয়ে আসছে। বাইরের আঙুলগুলি ক্ষয় হতে হতে শেষে নিশ্চিহ্ন, ভিতর দিকের দুটি আঙুলের অস্থি গাভী-মৃগের ন্যায় জুড়ে গিয়ে অঙ্গুলীদ্বয়ের শেষ-প্রান্ত ক্রমশঃ বালুকার উপর চলবার উপযোগী উত্তানপাদে পরিণত। জলাকীর্ণ তৃণভূমি থেকে কঠিন ভূমি শেষে স্টেপের অনুর্ব্বর প্রান্তর—প্রতিবেশ পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বদলেছে বিচরণ অঙ্গ অর্থাৎ পাদচতুষ্টয়ের নিম্নভাগ এবং খাদ্যচর্ব্বণ যন্ত্র অর্থাৎ দন্ত।

দুইকুঁজবিশিষ্ট ব্যাকটিয়ান উটেরা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্যে পরিতৃপ্ত, অনুর্ব্বর স্টেপের তিক্ত লতা ও লবণাক্ত হ্রদের লোনাজল পানে সন্তুষ্ট, অপর কোনও প্রাণী এরূপ ওঁচা খাদ্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। উষর-বন্ধ্যা ভূমিতে জীবন যাপন অভ্যাস করে আজ এরা পরম কষ্টসহিষ্ণু, মরুপ্রান্তরের বাহন; শৃঙ্গ ছিল না কোন কালে, এখন ইচ্ছামত নাসিকাবিবর বন্ধ করতে সক্ষম।

উষ্ট্রের শাখা-প্রশাখা হয়েছে; ভাইকিউনা জুনাকো আলপাকা দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বলিভিয়া ইকোয়েডরে থাকে লোমাও দক্ষিণ আমেরিকার পার্ব্বত্য জীব ও ভারবহনের উপযোগী।

কুরঙ্গের বিস্তৃতি

অভিব্যক্তির প্রধান ধারা স্তন্যপায়ী-বিবর্ত্তনের মাধ্যমে খুরেলা প্রাণীর উদ্ভব, মৃগবর্গ এর অন্যতম। মৃগগোষ্ঠী বহুধা-বিস্তৃত শ্রেণী পরিবারগণ জাতিতে। এদের নিকটাত্মীয় শূকর উষ্ট্র। পূর্ব্বপুরুষ এক জাতের ছিল কালক্রমে প্রতিবেশ ও স্বভাবের বৈষম্য নিবন্ধন নানা শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত। মধ্যবর্ত্তী স্তর এখনও স্বশরীরে বর্ত্তমান। তারা শেভ্রোটেন হরিণ শূকর ও উটের অন্তর্বর্ত্তী পশু: এশিয়ার দক্ষিণ উপদ্বীপগুলিতে বাসস্থান, স্বভাব শূকরের মত, জলা-জায়গায় থাকে, আকার-বর্ণে মৃগ।

মাইয়সিনের প্রথমার্দ্ধে মৃগদের প্রথম আবির্ভাব, শৃঙ্গহীন ভাবে। শেষের দিকে এক জোড়া মাত্র শিং গজায় (গাভীর অনুরূপ), প্লিয়স্টসিনে অতিবর্দ্ধন যোগ, শাখা-প্রশাখা সমন্বিত মৃগশৃঙ্গ ভারতেরই ভূস্তরে পাওয়া গেছে বিরাটকায় শিবথেরিয়াম ও ব্রহ্মথেরিয়াম, এদের নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শেষ হয় নি। ব্যক্তিজীবনের পরিস্ফুরণে আজও এই ভাবের পুনরাবৃত্তি হয়, এক বছর বয়সে শৃঙ্গহীন, দ্বিতীয় বৎসরে বেশ ছোট ছোট শৃঙ্গ, পরবর্ত্তী কালে বিরাট শৃঙ্গ। কৃষ্ণ-সারের সুদীর্ঘ শৃঙ্গ সকলেই দেখেছেন, লাল হরিণ বল্গাহরিণ আইরিশ এল্কদের শিং জটিল ও দর্শনীয়। অনেকের (সাধারণতঃ পুরুষদের) বসন্তে শৃঙ্গোদ্গম, ঝরে পড়ে বৎসরান্তে। প্রত্যেক শক্তিমান মাংসাশী মৃগের শত্রু সেজন্য বিনা দ্বিধায় বেছে নিয়েছে পলায়ন প্রবৃত্তি, পাদচতুষ্টয় দৌড়বার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। সম্ভবতঃ পালিয়ে আত্মরক্ষা করে বলে মাথাগুণতিতে বন্যপশুর ভিতর সর্ব্বাধিক। কস্তুরিমৃগের নাম সকলের জানা, এরা রাত্রিচর ও যূথ বাঁধে না; নিঃসঙ্গ কস্তুরিমৃগ পার্ব্বত্যদেশ (৭০০০ ফুটের উপর) ও মালভূমিতে বাস করায় পরিশ্রমী, পদক্ষেপ দৃঢ় সুনিশ্চিন্ত। সে সুগন্ধ থলির জন্য প্রসিদ্ধ, তার অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতায় শত্রুর উপস্থিতি টের পায় বহুদূর হতে তৎক্ষণাৎ নিঃসরিত হতে থাকে গন্ধ। নিরীহ স্তন্যপায়ীরা অনেকে এইরূপ আত্মরক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কারক, শত্রু (অনেক স্থলে স্বজাতি মিত্রও) খানিক তফাতে এসে পড়লে এক প্রকার তৈলময় গন্ধের আবির্ভাব, ত্বকের কোনও একটি বিশেষ স্থলে এই ব্যবস্থা, মেষের আঙুলে মৃগ কৃষ্ণসারের চোখের কোলে।

লম্বাগলা জিরাফ হরিণবর্গের। কানের পাশে একজোড়া শিং ছাড়া আর একটি অস্থিময় কণ্টক গজিয়ে ওঠে কপালে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে। প্লিয়সিন থেকেই এদের অস্তিত্ব জানা যায়। ভারত গ্রীস

চীন প্রভৃতি স্থানে—যেখানে এখন নায়গৰুও নেই—চিড়িয়াখানার বন্ধনদশা ছাড়া। নীল গাই কৃষ্ণসার শ্রেণীর। আফ্রিকায় নিরীহ যূথচর, ভয় পেলে এমন কাণ্ড করতে থাকে যে, হাস্যোদ্রেক হয়। এইরূপ আর একটি যূথচর শ্যাময়, ২০।২৫টি থাকে প্রতি দলে, ছোট ছোট ঘন ছাই রঙের পশমে দেহ আবৃত, মদ্দারা নিঃসঙ্গ, যূথে ফিরে আসে কেবল শৃঙ্গার ঋতুতে। কুরঙ্গ শ্রেণী উদ্ভূত খুরেলা স্তন্যপায়ী, পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত।

ছাগ মেষ বিবর্ত্তন

ছাগরা বেশীদিন আসে নি ধরাপৃষ্ঠে, জীবাশ্ম অতি অল্প। প্লিয়সিন যুগ থেকে কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। জীবিতদের ভিতর আইবেক্স পরিচিত, পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী; কস্তুরী-বলদও পার্ব্বত্য, দীর্ঘ লোমে ঢাকা হয় সর্ব্বাঙ্গ। যতদূর মনে হয় খুরেলা স্তন্যপায়ীর এই বর্গের বিবর্ত্তন হয়েছে পার্ব্বত্য উপত্যকায়, কারণ স্বভাবজ প্রকৃতি ও দেহগত আকৃতিতে উচ্চভূমির ছাপ। মৃগ কৃষ্ণসার ছাগ মেষ-প্রত্যেকেরই অঙ্গের ঘন লোমরাজি শীতল শুষ্ক পার্ব্বত্য বায়ুর প্রকোপ থেকে রক্ষা করে, পায়ের খুর কঙ্করময় বন্ধুর পার্ব্বত্য স্থানের উপযুক্ত, উচ্চস্থানে আরোহণ-অবরোহণ লম্ফ-ঝম্ফে বেশ দক্ষ। এদের কোন জাতকে উন্মুক্ত প্রান্তর জলাবাদা বা মরুভূমিতে দেখা যায় না, যদিও পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবাধগতি, অধিকাংশই দলবদ্ধ ভাবে একটি বলশালী মদ্দার নায়কত্বে থাকে, তাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে বিপদে-আপদে। আর একটি আশ্চর্য্য, মালভূমি উপত্যকা অধিত্যকায় বিচরণকালে আক্রান্ত হলে ছুটে উচ্চ পাহাড় অভিমুখে সেখানে অবলীলাক্রমে অবরোহণে সক্ষম। কেবল কৃষ্ণসার ও মৃগের আকৃতি-প্রতিকৃতি এক নয়; গোজাতীয় বাইসন ও ইয়াকরা অন্য উপবর্গের হলেও আকারে-স্বভাবে মিল অনেক। বিবর্ত্তনে পর্ব্বতের প্রভাব, পার্ব্বত্য স্বভাব। ছাগ মেষের বংশধর বর্ত্তমানে গৃহপালিত পশু, সমতলক্ষেত্রে বাস করলেও স্বভাবের ভিতর পর্ব্বতের প্রভাব উঁকি মারতে থাকে।

প্রতিবেশের প্রভাব অনতিক্রম্য, এক খুরবিশিষ্ট প্রাণীর ভিতরেই কত সহস্র উপবর্গশ্রেণী শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে নানাদিকে। প্রত্যেকের রূপ স্বয়ংস্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ত্তন ধারায় বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত।

অশ্বের বিবর্ত্তন

অশ্বের ক্রমাভিব্যক্তির কথা ধরা যাক:

এদের প্রথম পুরুষের দেখা পাই ঊষাযুগে, আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ঊষা-অশ্বের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চতায় গ্রীবা অবধি মাত্র এক হাত, পদচতুষ্টয়ে চারিটি করে আঙুল। উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকত না, অরণ্যচর, বেশী দৌড়াবার শক্তি ছিল না। অলিগসিনে উচ্চতা বৃদ্ধি, একটি আঙুল লোপে তিন আঙুল মাত্র সম্বল (মেসহিপাস)। মাইয়সিনে কয়েক প্রকার অশ্বের অভ্যুদয়, সমতলক্ষেত্রে বাহির হয়ে পড়ল একদল, তৃণভোজী হয়ে ওঠায় দন্তপংক্তিতে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, গঠন বদলালো, কসের দাঁত সুকঠিন। মুক্ত প্রান্তরে মাংসাশী শত্রুর উপদ্রব বেশী, পলায়নের তৎপরতা বাড়ল ক্রমশঃ, দ্রুতগামী অশ্বই জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত। মাইসিনের শেষে ও প্লিসটসিনের প্রারম্ভে তিন প্রকারের অশ্বের উদয়: তৃণক্ষেত্রে বিচরণশীল, অসমতল বন্ধুর পার্ব্বত্য স্থলে বিচরণশীল ও উষর-ধূসর প্রান্তর-বাসী—আমেরিকা থেকে এশিয়া, এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে অঙ্গুষ্ঠের সবখানি গেল কমে, দুটি পাশের আঙুলকে ছাপিয়ে একটি আঙুলই প্রধান, যার ওপর ভর দিয়ে দৌড়াচ্ছে, শেষে অদৃশ্য হল পাশের আঙুলগুলি অপ্রয়োজনীয় বিধায়। এইরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে শিলীভূত অবস্থায় অশ্বের পিতৃপুরুষদের দেহাবশিষ্ট সমাধিস্থ অবস্থায় আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে, স্তরের পর স্তরে উন্নতি লেখা। পাঁচ আঙুল পরিণত খুরে দন্তপংক্তির পরিবর্ত্তন, সাধারণ মার্জ্জারের উচ্চতা থেকে আজকের অষ্ট্রেলিয় ঘোড়া। ছোট ছোট পাহাড়ী টাট্টু থেকে আরবী ঘোড়া সব এক শ্রেণীর। আমেরিকা অশ্ববিবর্ত্তনের আলয় অথচ আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সে দেশ অশ্বহীন, ইউরোপ থেকে অশ্ব আমদানী করতে হয়েছিল। সাড়ে পাঁচ কোটি বর্ষ ধরে যে মহাদেশ সবচেয়ে কাজের ও সুন্দর খুরেলা জীবের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করল, শেষে সেই পড়ল ফাঁকি। বাক জেব্রা খচ্চর গর্দ্দভ ইত্যাদি জ্ঞাতিভাইকে পশুশালায় স্থান দিয়েছে এরা।

হস্তীর অভ্যুদয়

স্তন্যপায়ীর মধ্যে হাতি একেশ্বর, খুরেলা বা অন্য প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিছু কিছু সাদৃশ্য শশক ইত্যাদি কর্ত্তনকারী জীবদের সহিত থাকলেও, গজদন্ত শুণ্ড মাথার খুলি দেহের আয়তনে সাতন্ত্র্য মর্য্যাদা। নিকটাত্মীয়ের ভিতর শশকের ন্যায় হাইরাক্স শুধু বর্ত্তমান, আকারে কি বিপুল পার্থক্য। বিবর্ত্তন এদের চটকদার, মাইয়সিন প্লিয়সিন ধরে বহু বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়ে রূপান্তর, ফসিল পূর্ব্বপুরুষ ম্যামথ ম্যাষ্টোডন ট্রিলোফোডেনরা আজ যাদুঘরের মূল্যবান উপকরণ।

খর্ব্বাকৃতি ম্যাষ্টোডন হস্তীর উদ্বংশীয়, মরিথেরিয়াম নামে মাংসল নাদুস-নুদুস দু'ফুট উচ্চ এক জীব (ফেয়াম মরূদ্যানের জীবাশ্ম) বোধ হয় আদি পুরুষ। অলিগসিনে নীচের চোয়াল চাটাল দুটি গজদন্ত বেরিয়ে এসেছে ওপরের দন্তপংক্তি থেকে (প্যালিয়াষ্টোডন ও ফিউমিয়া)। আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, তার পর এশিয়া দিয়ে আমেরিকা পর্য্যন্ত এদের গমনাগমনের পরিধি, তখন প্রায় ৮ ফুট উঁচু হয়েছে। ট্রিলোফোডনরা এসেছে প্লিয়সিনে, ম্যামথের মত বিরাটাকৃতি অথচ গ্রীবাহীন মুখমণ্ডল, ওপরের চোয়ালের গজদন্ত মূলোৎপাটন কার্য্যে ব্যবহৃত হ'ত, নিম্ন চোয়ালেও কোদালের ন্যায় দুটি গজদন্ত, ওপরোষ্ঠ বৃহৎ হওয়ায় খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হ'ত ওষ্ঠদ্বারা, গ্রীবার প্রয়োজন কোথায়? পরে মূল আহার পরিত্যাগ করে যখন ডালপালা শাক ভক্ষরূপে গ্রহণ করল, যুগান্তকর পরিবর্ত্তনের সূচনা তখন হতে,

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিন্নু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এন্কোর, এন্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিন্নু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিন্নুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল---"মাসী, মাসী, নিন্নু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

নীচের চোয়াল ও গজদন্ত নিষ্প্রয়োজন বিধায় ছোট হতে আরম্ভ করল। কিন্তু জলপানের জন্যও অন্ততঃ ভূমিস্পর্শের দরকার, ওপরোষ্ঠ হতে লাগল বর্দ্ধিষ্ণু। অস্থি বিহীন ওপরোষ্ঠ রইল ঝুলে—শুণ্ডের উন্মেষ। ম্যাষ্টোডন কেবল মধ্যবর্ত্তী স্তরই নয় হস্তী-বিবর্ত্তনের সমস্ত ইতিহাস এর দেহভাগে আঁকা। পুরানো কালের সমস্ত হাতরা আজ বিলুপ্ত শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় ম্যামথের বংশধর ও আফ্রিকায় দু'প্রকার (কংগোর বামন ও আসল আফ্রিকান)।

হস্তীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও গণ্ডার খুরেল স্তন্যপায়ী। গায়ের ত্বক অত্যন্ত পুরু, নাসিকাগ্রে এক শিং (কৈশিক ঝিল্লীর, অস্থি নয়) অতিকায় দেহ। উদ্বংশীয়রাও প্রসিদ্ধ, ইউরোপ-এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে জলা জায়গায় বাস, উর্ণাময় শরীর, মাথায় দুটি শৃঙ্গ, টিচোরাইন, সাইবেরিয়ার ইলাসমোথেরিয়াম, টিটানো-থেরার আধুনিক গণ্ডারের মত বিপুলকায় ছিল। এক সময় সমৃদ্ধিশালী ছিল কিন্তু নিবুদ্ধিতার জন্য আজ বিদায়পথে। ঘ্রাণের তীক্ষ্ণতা আছে, দৃষ্টির প্রসার নেই, রাগলে সোজা মেল ইঞ্জিনের মত উদ্দাম বেগে ধাবিত হয় বাধা-বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে।

গণ্ডারের সঙ্গে অপর প্রাণীদের যোগ তাপিরের মধ্য দিয়ে। তাপির এক সময় ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজ শুধু সুমাত্রার ছায়াসমাচ্ছন্ন গভীর অরণ্যে জলের নিকট এই নিঃসঙ্গ ভীরু নিশাচর প্রাণীর বাস, আকৃতিতে কতকটা গণ্ডারের মত কেবল নাসিকার অগ্রভাগ নেই। গণ্ডারও রাত্রি জলাকাদা নির্জ্জনতা বিলাসী।

জলজ স্তন্যপায়ী

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের বিবর্ত্তন অস্পষ্ট আবছা থেকে গেছে। নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডীদের সঙ্গে বিশেষ মিল দেখা যায় না, উচ্চ স্তন্যপায়ীর সমস্ত গুণাগুণের অধিকারী, নার্ভ ও অস্থি-সংস্থান, আচরণ প্রজননরীতি অবিকল স্তন্যপায়ীর মত। ভূচর স্তন্যপায়ী থেকে জলচর স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের স্তর কিছুটা অনুমান, কিছুটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়। মৎস্য কাটলস ইত্যাদির মত পাকা জলচর এরা নয়, কারণ অনেককে সমুদ্র থেকে বাইরে এসে কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম করতে হয়, সব সময়েই জলতলে থাকা অসম্ভব। দেহ সমুদ্রে জীবনযাপনোপযোগী হয়ে আসছে, তথাপি শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ওপরে উঠে আসতে হয় মাঝে মাঝে। লেজের আকার গেছে বদলে। বারংবার ওপর-নীচ (জলের) করতে করতে মাছেদের মত নয়, অনুভূমিক (অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল) বিস্তার এদের। জলজ স্তন্যপায়ীর দেহভার সাধারণতঃ গুরু, সেজন্য খাদ্যের পরিমাণ অধিক মাংসাশী। কাঁকড়া চিংড়ির ঝাঁক ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী গলাধঃকরণ করে বেঁচে থাকে, সীলেরা অবশ্য নিজের জ্ঞাতভাই সাবাড় করতে দ্বিধা করে না। মাংসাশীর মত পরিশ্রমী, তবে নিরীহ ও বোধ হয় ভীতু, সন্তান পালনে কোনও স্তন্যপায়ী অপেক্ষা ন্যূন নয়, যূথচর কেউ কেউ শত শত এক এক দলে থাকে।

জলজ স্তন্যপায়ীর পূর্ব্বপুরুষ স্থলভাগ পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিল জলে। জল পরিত্যাগ করল কেন? দেশান্তরী হবার দুটি সহজ কারণ।

১। হিংস্র প্রাণীদের কবল হতে আত্মরক্ষার্থে।

২। খাদ্য অন্বেষণে।

উভয় কারণই যে বিস্তীর্ণ জলভাগে পৃথক স্তন্যপায়ীজগৎ সৃষ্টির জন্য দায়ী তা অনস্বীকার্য্য। এজন্য বর্ত্তমানে যত বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যপায়ী লবণাক্ত সমুদ্রজলে বা পরিষ্কার নদীজলে মৎস্য ও শামুক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাসীন তারা কেউ এক গোষ্ঠীভুক্ত নই, এক গোষ্ঠীর বংশধরও নয়, বিভিন্ন সময়ে জলে নেমেছে। জলচর হওয়ার প্রমাণ, অপর এক জাতের ভিতর সুপ্রতিষ্ঠিত। পুরাপুরি স্থলচর (যেমন শূকর ভল্লুক মৃগ) থেকে পূর্ণ জলচর হয়েছে বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সোপান হিসাবে যদি কোন প্রাণী পাওয়া যায়, যারা অর্দ্ধজলচর বাকি অর্দ্ধস্থলচর (অর্থাৎ উভয়চর স্তন্যপায়ী) তা হলে অবিশ্বাসের অতটা কারণ থাকবে না। এরূপ প্রাণীও আছে একাধিক, হিপোওটার।

পরাক্রান্ত শত্রুর তাড়া খেয়ে অগভীর জলে প্রবেশ করে আত্ম-গোপন সহজ ও স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যেখানে খাদ্য অনুসন্ধানে আসতে হয়েছে কখনও কখনও, পরিচিত স্থান। বিপদমুক্তিতে স্থান-মাহাত্ম্য জাগরূক থাকে চিরকাল, ভয়ের কারণ দেখা দিলে জলই পুনর্ব্বার মুস্কিল আসান, দুর্দ্দৈবে-দুরদৃষ্টের আশ্রয়স্থল। নিরাপত্তার নিমিত্ত জলের কাছে সন্তান প্রসব আরম্ভ হ'ল, শিশুদের পর্য্যন্ত নিরাপদ রক্ষাস্থলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকে। এই ভাবে অনেকক্ষণ করে বংশপরম্পরায় জলে অতিবাহিত করলে জলচরের সঙ্গে পার্থক্য লুপ্ত হয়, নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে জলের সঙ্গে, হিপো-প্রমুখ প্রাণীরা এখনও সামান্য আশঙ্কা দেখা দিলেই নদীগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্রুত। সম্পূর্ণ স্থলবাসী অথচ আহার অন্বেষণ করে জলে নেমে এমন জীব এখনও অনেক। পশুদের সময় অতিবাহিত হয় আহার বিহারে, তাই যারা জলেই বহুক্ষণ দিনযাপন করতে লাগল কালক্রমে তারা জলচরে পরিণত।

ওটার ব্যাজার উইজিল চৌট, ভল্লুকবর্গের জীব। এর মধ্যে শুধু ওটার নেমেছে জলে, অর্দ্ধ জলচর আহার খুঁজতে জলে প্রবেশ করে আবার স্থলেও বহুদূর ভ্রমণ করে, রাত্রিকালে। একজাত সামুদ্রিক ওটারের বাস প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির নিকট, এদের কি তিন-চতুর্থাংশ জলচর বলা হবে? এরা এ সব কাল ও কখন-সখনও অল্প সময় ব্যতীত স্থলে আসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ভূমির সঙ্গে স্বভাবজ সম্বন্ধ ঘুচে গেলেও জৈব সম্বন্ধ আছে একটু, প্রসব তাই মৃত্তিকা পৃষ্ঠে।

স্থলের মায়া আজও যারা পরিত্যাগে সমর্থ হয় নি, সীল সিন্ধু-ঘোটক তাদের দলভুক্ত, ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যবর্ত্তী স্তর। সিন্ধু-ভল্লুকের হস্ত দুটি পাখনায় পরিণত, পশ্চাদ পদদ্বয় জলক্ষেপনের

প্যাডেল; সমস্ত জলজ স্তন্যপায়ীর মধ্যে এরাই অধিকাংশ সময় কাটায় স্থলে, চার পায়ে ভর করে ভ্রমণ করে বহু দূর—প্রসব কালে স্থল ছাড়া গতি নেই—শুধু খাদ্যান্বেষণে জলভাগ প্রশস্ত। অন্যান্য স্থলচর প্রাণিদের মত পুরুষরা বলবান সমর্থ বহুপত্নীক। বারণ হরিণ প্রভৃতির মত এদের প্রণয়দ্বন্দ্ব দর্শনীয়। সিন্ধু ঘোটক দুটি ভীষণ প্রদন্তের জন্য প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা খাদ্যানুসন্ধান পিচ্ছিল পর্ব্বত গাত্র তুষার স্তবকে ওঠবার প্রয়োজনে ব্যবহার। সীল ও তার গোষ্ঠী মেরুপ্রদেশের প্রাণী হলেও নির্জ্জন দ্বীপ ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান ভালবাসে। শৃঙ্গার ও সন্তান প্রসবকালের ৩।৪ মাস স্থলে বাস, মাংসাশী স্তন্যপায়ীর বংশধর এরা সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, লক্ষ লক্ষ বৎসরের বসতি জলে। আমোদ-প্রমোদ-খেলাও লোভনীয়। বিশ্রামের জন্য যখন কূলে উঠে আসে বাচ্চারা মার সঙ্গে থাকে, যখন জলে নামে শিশুদের সন্তর্পণে নামায়, না হলে ডুবে যাবার ভয়, পূর্ণ জলচর হতে পারে নি। এখনও, মৎস্য শিশুদের জলে ডুবতে শোনা যায় নি। সম্মুখে হস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি, পদদ্বয় পুচ্ছের অনুরূপ হয়ে গেছে, ঘন ফারের আবরণ শৈশবকালে, সে আবরণ যতদিন ততদিন জলকে ভয়। উন্নত ধরণের মাস্তিষ্ক, এরা বেশ সামাজিক, মনে সুকুমার ভাবের অভাব নেই। এক সীল জল থেকে উঠে মাইল খানেক দূরবর্ত্তী এক কুটির দ্বারে উপস্থিত, কিছু আপ্যায়িত করে সমুদ্রে পৌঁছে আসা হ'ল পরদিন আবার হাজির। এইরূপ একটি সীলকে এক নির্দ্দয় ব্যক্তি মজা দেখবার জন্য অন্ধ করে দেয়, দেখা গেল বেচারা কষ্টেসৃষ্টে যথাস্থানে ঠিক এসে গেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী শুভ্র হিমবাহের ওপর যখন অনেকক্ষণ ধরে খেলা করে পূর্ব্বপুরুষের স্বপ্নময় নিবিড় অরণ্যমায়া অথবা শ্যামল শষ্পদল-স্মৃতি ফিরে আসে কিনা জানা নেই, তবে নিভৃত নদী-পথে বহুদূর চলে যায় আনমনে।

সিন্ধুঘোটকের প্রহরা অপূর্ব্ব, এক সঙ্গে শত শত ঘুমাচ্ছে, একজন হঠাৎ জেগে উঠে সন্দেহজনক ভাবে ২।৩ মিনিট এদিক ও-দিক তাকিয়ে পাশের জীবটিকে ঠেলে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, সে অবিকল আবার সেইরূপ করে ভার সমর্পণ করে তার পাশেরটিকে, এইভাবে একজন-না-একজন শান্ত্রী সদাজাগ্রত। পূর্ব্ব-পুরুষ ছিল সামাজিক স্তন্যপায়ী গোত্রের।

ভূমধ্যসাগর হতে সমস্ত আটলান্টিক জুড়ে বিচরণ করে শুশুক, স্বভাব-আচরণ জ্ঞাতিভাই তিমির মত, উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রসব করে সন্তান।. পূর্ব্বপুরুষ একদা স্থলচর ছিল, তিমির বিলীয়মান-প্রায় পশ্চাৎপদের নিদর্শন তার প্রমাণ, শুশুকদের পিছনের পদদ্বয় একেবারে নিশ্চিহ্ন অর্থাৎ তিমির চেয়ে আরও আগে জলে এসেছে।

তিমি জীবজগতের কৌতূহল।

গুরুভার দেহাকৃতি যাদুঘরে রক্ষিত দৈত্যাকৃতি ডাইনসরদের কথা মনে করিয়ে দেয় বার বার। জৈব-বিবর্ত্তন প্রাণিদেহে কি বিপুল বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম, তিমির জীবন তার জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত। একদিন বন-বাদাড়-জলা ছিল বিচরণভূমি, আহার অন্বেষণে ও আত্মরক্ষার্থে নামল জলে, লক্ষ লক্ষ বৎসরে আজ জলচর, অপূর্ব্ব অভিযোজন করে নিয়েছে জলভাগে। বর্ম্মাচ্ছন্নের আকৃতি, মসৃণ রোমশূন্য পৃষ্ঠদেশ, লেজ মৎস্যের ডানার মত, শরীর উষ্ণ রাখার জন্য পুরু চর্ব্বি, সবই জলবাসের উপযোগী। তিমি-শাবক নির্লোম নয়, মনে হয় লোমযুক্ত স্তন্যপায়ী হতে উদ্ভূত। ওষ্ঠাধরের গোঁফও সেই পরিচয় দেয়। দীর্ঘগ্রীব জীরাফের গ্রীবায় যতগুলি অস্থি আছে, গ্রীবাহীন তিমির তদপেক্ষা একখানি কম নেই; অব্যবহারে তিমি দন্তহীন কিন্তু দন্তপংক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট এবং স্পেরাম তিমির নিম্ন চোয়ালে এক পংক্তি দন্ত থাকে। প্রকাণ্ড মাথা দেহের এক-তৃতীয়াংশ, বুদ্ধিমান জীব। উচ্চ স্তন্যপায়ীর কৌশল ও বুদ্ধি রয়েছে, বাৎসল্য ভাব স্নেহপরায়ণতা আছে, শান্তি-প্রিয়তাই হয় ত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে সবাই শান্তিপ্রিয় নয় অন্ততঃ বর্ষাদন্তী নারহোয়াল নয়। জলে দ্রুত যাতায়াতের জন্য দেহ মোচাকৃতি, কর্ণের উপরাংশ না-থাকায় ঘর্ষণের অসুবিধা দূরীভূত; নাসিকাবিবর জলে বন্ধ করে নেবার উপযোগী; দেহের প্লবনশীল চর্ব্বি খাদ্যাভাবের সময় কাজ দেয়। বিরাট মুখব্যাদন ও সজীব খাদ্য গলাধঃকরণে বেড়েছে মুখ ও মাথা, অনায়াসে মুখবিবরে প্রবেশ করে আমিষ জলস্রোত বাহির হয়ে আসে যখন ঝাঁঝরির ভিতর দিয়ে খাদ্য থেকে যায় মুখমধ্যে, উদরে।

প্লিয়স্টসিনে 'সেটেথেরিয়াম' তিমির অস্তিত্ব উদ্ধার হয়েছে। শীতসাগরের সীল ও তিমির মধ্যবর্ত্তী স্তর ছিল 'জুগ্লোডন'। মাইয়সিন ও প্লিয়সিনের অধুনালুপ্ত তিমি ছিল কয়েকপ্রকার, স্কোয়ালডন, সরসটিয়া, হিংস্র ও প্রায় ৭০ হাত দীর্ঘ।

সামুদ্রিক-গাভী, ডুগং ও ম্যাণ্টি গভীর সমুদ্রের নিরামিষাশী স্তন্য-পায়ী, প্রায় অবলুপ্তির পথে, দৈর্ঘ্যে যেমন তিমির পরেই স্থান স্বভাবেও তেমনি, শাবক প্রসব করে জলে, জলচর অনেকাংশে।

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যায় (৫০৪ পৃষ্ঠায়) শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনের 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে'র সমালোচনায় যে উদ্ধৃতিটি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা লেখকের বলিয়া উল্লেখ করা হয় সে অংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সেকালে ব্রাহ্মসমাজের একজন শুদ্ধসত্ত্ব, নৈষ্ঠিক, অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। 'সেকাল' বলিতে আমি মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তাহারও পূর্ব্বে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন বাঙালী সমাজে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক অসাধারণ প্রতিপত্তি মণ্ডিত প্রতিষ্ঠান ছিল। দেশের সমস্ত বড় বড় লোক ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি বহু পূর্ব্বের কথা বলিতেছি না—আমাদের ছাত্রজীবনে দেখিয়াছি আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, কে, রায়, অধ্যাপক সুবোধ মহলানবীশ প্রমুখ আরও শত শত লোক ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মফঃস্বলের অনেক ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা উপকৃত হইত। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সমাজ-মন্দিরে ভাবসমৃদ্ধ পরিবেশে উপাসনা হইত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা পরিচালনা করিতেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন। আমি বোধ হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কেও দেখিয়াছি। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজে যে আকুল ভাবগদগদ প্রার্থনা করিতেন তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের ভুলিবার কথা নহে। উপেন্দ্রকিশোর বাবুর সঙ্গে পরে তাঁহার কন্যারাও যোগদান করিতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর পরবর্ত্তী যুগে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সুবোধ মহলানবীশ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ললিতকুমার এবং ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ডাক্তার আচার্য্যের উপাসনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ওজস্বী এবং আন্তরিকতা-পরিপূর্ণ হইত। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহার বক্তৃতা অন্তর হইতে উদ্ভূত হইত। ইহা চাতুর্য্যপূর্ণ, বাগবৈদগ্ধ মাত্র নহে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত তাঁহার বক্তৃতাগুলিও ভাবপরিপ্লুত

এবং হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পার্ঘ্য-সমন্বিত হইত। ইঁহাদের উপদেশ ও বক্তৃতায় সহস্র সহস্র লোকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মভাবধারা অনেকের জীবনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—তাহা সে যে ধর্ম্মের উপাসক হউক না।

আমাদের ছাত্র-জীবনে দেখিয়াছি, অনেক যুবকের মনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেক যুবক পেশাদার থিয়েটার দেখা অত্যন্ত গর্হিত মনে করিতেন। কারণ তখনকার দিনে পেশাদার অভিনেত্রীদল নহিলে রঙ্গমঞ্চ চলিত না। স্কুল কলেজের ছাত্ররা ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক সংস্পর্শে আসিয়া যে চরিত্রবল অর্জন করিত তাহা শাস্ত্রী মহাশয় ও ডাক্তার আচার্য্য প্রমুখ প্রচারকদিগের উপদেশের ফল।

আমি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ কালে নিজের কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ডাঃ আচার্য্যের যে চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়াছি, তাহারই একটি উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমি একবার দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হই। আমি শিবনারায়ণ দাস লেনে একটি মেসে থাকিতাম। শঙ্কর ঘোষ লেনের বিপরীত দিকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ডাক্তার আচার্য্য বাস করিতেন। এখানে মেসের ছাত্রেরা অনেকেই চিকিৎসিত হইত। সুতরাং তাহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ছিল অসীম। তিনি এমন ভাবে সকলকে চিকিৎসা করিতেন যেন কতই আপনার লোক।

আমি একবার গ্রীষ্মের বন্ধের পর দেশ (যশোর) হইতে ফিরিবার কালে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। সে সময়ে নভেম্বর মাসে এম, এ, পরীক্ষা হইত। আমি আমার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর পি. কে, রায় মহাশয়কে বলিলাম, 'আমার পক্ষে এবার পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব। আমার ম্যালেরিয়া হইয়াছে।' ডঃ রায় বলিলেন, 'No. No, you must appear. All my best students got malaria.' এই বলিয়া তিনি আমার আর কোনও কথা শুনিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবুর কাছে আমি আসিয়া সেই কথা বলিলাম। তিনি দু'চার বার ওই কথাটির আবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি কি পরীক্ষা দিতে চান?' আমি উত্তর করিলাম, 'দিতে চাইলেই কি দেওয়া যায়? ম্যালেরিয়া আমাকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমি বিন্দুমাত্র পাঠে মন দিতে পারি না।'

প্রাণকৃষ্ণবাবু উত্তরে বলিলেন, 'যদি আমার কথা শুনিয়া চলিতে পারেন তবে নিশ্চয় পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ডাক্তারের কথা আমার পক্ষে দৈববাণীর মত শুনাইল। তাঁহার অনুশাসনগুলি অত্যন্ত কঠোর হইলেও আমি সেই সকল মানিয়া চলিতাম। অল্পদিনে এই চিকিৎসার ফল ফলিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমার স্বাস্থ্য প্রায় পূর্ব্ববৎ হইল। প্রাণকৃষ্ণবাবু শুধু যে আমার এম. এ. পরীক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিলেন তাহা নহে, তিনি আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতেও রক্ষা করিলেন। তাঁহার এই অসামান্য দানের কথা আমি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ম্যালেরিয়ায় দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমার বিশ্বাস এইরূপ সুনিপুণ চিকিৎসা হইলে দেশ এইরূপে উজাড় হইত না।

প্রাণকৃষ্ণবাবু ১৯৩৬ সনে পরলোকগমন করেন। তখন তিনি হ্যারিসন রোডে নিজ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার তিরোধানের সময়ে আমি লণ্ডনে ছিলাম। খবরের কাগজে তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। এবার আমি আমার অনধিকার চর্চ্চার কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

একদিন হোটেলে ফিরিয়া দেখি তাঁহার পুত্র শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য আসিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার পরলোকগমনে একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইবে লণ্ডনের এক পল্লীতে। তিনি আমাকে এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের যিনি একজন যশস্বী নেতা, আচার্য্য এবং প্রতিভাশালী সুবক্তা ছিলেন, তাঁহারই জন্য উপাসনায় আমন্ত্রিত হওয়া এবং তাহাতে নেতৃত্ব করা আমার পক্ষে এক অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু ভবিতব্যের এ কি খেলা! যিনি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমার আমন্ত্রণ।

আমি মিঃ আচার্য্যকে লিখিলাম, 'আমার মত ত আপনি জানেন। সুতরাং উপাসনায় যোগদান করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও আমি উহাতে নেতৃত্ব করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।' বিজয়কৃষ্ণ লিখিলেন 'আমি আপনার সম্বন্ধে সব কিছুই জানি।' আপনি উপাসনা পরিচালন করিবেন। ইহার পরে আমার কোনও কথা বলা চলিল না।

বিজয়কৃষ্ণ আই-সি-এস পাস করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বেও ঢাকায় ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন।

লণ্ডনের পল্লীতে আমার সেই প্রার্থনা সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শকুন্তলা শাস্ত্রী, মিঃ এস. কে. হালদার আই-সি-এস এবং তাঁহার স্ত্রী, মিঃ প্রতাপ দত্ত আই-সি-এস (?), তাঁহার পুত্র মিঃ দত্ত (পরে ইনি আই-সি-এস হইয়াছেন) আরও অনেকে ছিলেন যাঁহাদের নাম এখন আর আমার মনে নাই।

এই ক্ষুদ্র অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে আমি পরলোকগত আত্মার জন্য ভগবানের নিকট যথাসাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। উপাসনায় মাঝে মাঝে মিসেস হালদার কয়েকখানি গান করেন। সেই গানগুলি এতই মর্ম্মস্পর্শী এবং করুণ যে আমার কানে অদ্যাপি তাহা লাগিয়া আছে। মিসেস হালদার প্রাণকৃষ্ণবাবুর কন্যা এবং শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আজ ডাঃ আচার্য্যের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষ্যে আমার গতজীবনের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়া আমার সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

প্রতিশোধ—আলেকজাণ্ডার পুস্‌কিন্। অনুবাদক—পার্থসারথী। প্রকাশক—শঙ্করীপ্রসাদ হাজরা। রোহিলা পাড়া, বর্দ্ধমান। মূল্য দু'টাকা।

অধুনা বাংলা-সাহিত্যে অনুবাদের জোয়ার আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশী সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও সেই সাহিত্যের রসাস্বাদ করার সুযোগ ঘটে বলিয়া অনুবাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু জোয়ার আসিলে আশঙ্কাও জাগে মনে। ভালমন্দ সবকিছুকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ এবং অক্ষম অনুবাদের দ্বারা মূল কাহিনীর বিকৃতি সাধন—এ প্রায়ই ঘটে। এই জন্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া ভাল। সুখের বিষয়, আলোচ্য উপন্যাসখানি সুনির্ব্বাচিত এবং সুঅনূদিত।

আলেকজাণ্ডার পুস্‌কিন্ রুশ-সাহিত্যের দিক্‌পাল। তাঁর কবি-খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত হইলেও কাহিনী-গ্রন্থনেও কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রতিশোধ—তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দুব্র-ভস্কির' অনুবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার-শাসিত রাশিয়ার দু'টি সামন্ত পরিবারের বিরোধ-কাহিনী এই গল্পের বিষয়বস্তু। আজ সামন্ততন্ত্র রাশিয়ায় নাই, কিন্তু কাহিনীটির সুবিন্যাসে পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। সমসাময়িক সমাজের চিত্রবিন্যাসে বাস্তব-বোধের পরিচয় আছে। পুসকিনের বাস্তববাদ রুশ-সাহিত্যের মূলধন—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল। বিদেশী নামের ও স্থানের জন্য পাঠককে কোথাও হোঁচট পাইতে হয় না, এইটুকু অনুবাদকের বাহাদুরি বলিতে হইবে।

মধুরা:শ্চ—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০ নয়া পয়সা।

গল্পের ভূমিকাটি সংক্ষেপতঃ এই :

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে
এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।
হিমালয় বোকে স্নো
Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বুকে স্নো
এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।
হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার
Erasmic
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত
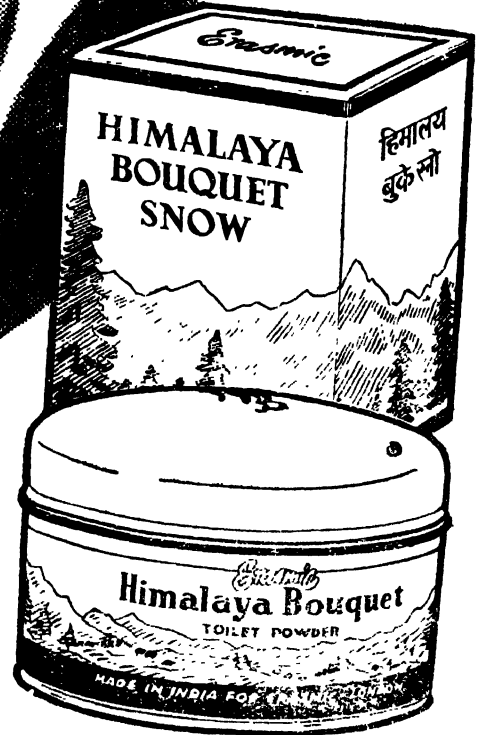
এলাহাবাদের প্রচুর বিত্তশালী জ্ঞানশঙ্করবাবু একদা যমুনোত্রীতে আসিয়া স্বপ্ন দেখিলেন যেন যম-ভগিনী যমুনা হাত পাতিয়া তাঁহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতেছেন। পূজারী স্বপ্নের অর্থ করিলেন—যমুনা শ্রেষ্ঠ রত্ন চাহিতেছেন। প্রথমে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহাকে ত্রিবেণীতে অর্পণ করিলেই যমুনা সন্তুষ্ট হইবেন। জ্ঞানশঙ্কর নাস্তিক নহেন, কিন্তু অন্ধ-সংস্কার পোষণ করেন না। পুত্রসন্তানকে তিনি জলে ভাসাইতে পারিলেন না। কিন্তু আপন করিয়া রাখিতেও পারিলেন না। অতঃপর বংশধারা বজায় রাখিবার জন্য ভাই এবং বোনের ছেলেদের পোষ্য লইলেন, তাহারাও বাঁচিল না। অবশেষে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক যুবককে পোষ্য লইবেন স্থির করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে গোপাল নামে একটি সর্বগুণসম্পন্ন ছেলে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে আসিল তার দূরসম্পর্কীয় মামার বাসায়। তাহারই জীবনীতে আলোচ্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

দিল্লীর অভিজাত সমাজের কয়েকটি তরুণ-তরুণীর সংস্পর্শে আসিল গোপাল এবং তাহাদের লইয়া জমিয়া উঠিল ভ্রমণরসসিক্ত কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে ভ্রমণের পটভূমিকাটি দীর্ঘই বলিতে হয়। যমুনোত্রী হইতে এলাহাবাদ—মাঝখানে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন। এসবের ইতিহাস এবং নানা কিম্বদন্তী তথ্য মনোজ্ঞ করিয়াই বলা হইয়াছে। মূল আখ্যানভাগের চেয়েও এগুলি পড়িতে ভাল লাগে। ফলে পটভূমিকাটি গল্পের চেয়েও উজ্জ্বল।

কাহিনীর মধ্যেও প্রেমের কয়েকটি ভুজ রচনার প্রয়াস আছে। রাণা, মিতা, চাওলা, স্বাতী এবং গোপাল নিজে এই ভুজের বিভিন্ন দিক। বিচিত্র প্রেমপ্রবাহে এই জীবনগুলি আবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বিশেষ একটি পরিণতির দিকে চালিত হয় নাই। চাওলা, মিতা, রাণা প্রত্যেকেই স্পষ্ট—বিশিষ্ট, চমৎকার সংলাপের মধ্য দিয়া নিজ নিজ জীবনকথা ব্যক্ত করিয়াছে—কিন্তু প্রেম-পরিক্রমায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নাই। এই দিক দিয়া গোপাল স্বাতীর প্রণয়কে বেশ খানিকটা আগাইয়া দিয়াছেন লেখক—যদিও পরিণতিটি প্লেটনিক লাভে পর্যবসিত হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে এই দু'টি ধারাই বেগবান, ভ্রমণ এবং কাহিনীর ধারা। পাশাপাশি চলিয়াছে দু'টি—কোথাও মিশিয়া এক হয় নাই। ইতিহাস ব্যাখ্যায় এবং গল্প বুননে দু'টিই মনোজ্ঞ, প্রকাশভঙ্গীতে অনবদ্য। এই দুটি ধারা এক হইয়া মিশিলে উপন্যাসের বাঁধুনিটি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইত এবং প্রণয়লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াও যে চরিত্রগুলি খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধে গল্প প্রিয় পাঠক-মহলে কিছুমাত্র অভিযোগ উঠিত না। 'মধুবাংশ্চে'র এই ত্রুটি অবশ্য মারাত্মক নহে। সস্তা করতালির লোভে লেখক যে দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের চরিত্রগুলিকে লইয়া মনোবিকলনের নামে যৌন আবেদন প্রচার বা বাস্তব জীবনবোধের নামে পর্ণগ্রাফির প্রসার করেন নাই, ইহাও কম সংযমের কথা নহে। কাহিনীগত সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'মধুবাংশ্চ' যে একখানি উপভোগ্য উপন্যাস একথা রসিকজন নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যুগ-স্রষ্টা নজরুল—খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। দাম পাঁচ টাকা।

'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থখানি নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা কিংবা পরিচয় নয়—ইহা কবির জীবন-আলেখ্যর সহিত নানা ছোট বড় ঘটনা-চিত্র।

কবি নজরুল আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন একটা আবির্ভাবের মত। যুদ্ধ-ফেরত হাবিলদার সৈনিক একদিন হাস্যমুখে বাংলার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন—সেদিন কে জানিত একটা স্ফুলিঙ্গ আসিয়া দাঁড়াইল! এই স্ফুলিঙ্গই সেদিন বাংলার তরুণ-রক্তে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। এই দিক দিয়া তিনি চারণ-কবি। ঝড়ের বেগে তিনি আসিয়াছিলেন, আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঝড়ের মতই তাঁহার গতি স্তব্ধ হইয়া গেল।

বাংলা সাহিত্যে—বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি আনিয়াছিলেন বিপ্লবের অভয়-মন্ত্র। সেইজন্যই তিনি 'যুগ-স্রষ্টা।'

সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করিতে যে আবেগময় ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় নজরুল গান রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস বলিয়াছেন: 'স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী কবিগণ যে ভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক তাঁহারা ঠিক ভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন।'

নজরুল-সঙ্গীতের আর এক অতুলনীয় দান—তাঁহার গজল। নজরুল হাফিজ ও খৈয়ামের বহু গজল ও রুবাই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং গজল লিখিয়া বাংলা গীতি-কবিতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরবর্তী জীবনে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের উপরও নজরুলের অসাধারণ দক্ষতা দেখিতে পাই। এই অসামান্য প্রতিভা লইয়া আসিয়াও কবি-কণ্ঠ আজ হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল—ইহা বাংলারই দুর্ভাগ্য।

গ্রন্থকার নজরুলের আবাল্য সুহৃদ। তাই এই গ্রন্থ মারফৎ কবির অনেক অ-লিখিত অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিল। যাঁহারা কবির জীবনী-গ্রন্থ রচনা করিবেন, এ বইখানি তাঁহাদের অনেক কাজে লাগিবে।

আমরা দুজনা—অবনীনাথ রায়। রিজেন্ট হোটেল, ২০৮ হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য তিন টাকা।

লেখক প্রবীণ। পাঠক-সমাজেও ইনি সুপরিচিত। প্রবাসী

বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অবনীবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপন্যাস না বলিয়া একটি 'বড় গল্প' বলাই বোধহয় সঙ্গত হইবে। গল্প বলার মুন্সিয়ানা লেখকের আছে। একটি অবাস্তব প্রেমের কাহিনী লইয়া লেখক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সম্পর্ক এবং বয়সের দিক দিয়া লেখক চলতি বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন। তবে প্রেম নাকি সকল বাঁধনের উর্দ্ধে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার বহু নজীর আছে। নায়ক ও নায়িকার কথোপকথনের ভিতরেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।

লেখকের ভাষা এবং বলিবার ভঙ্গীটি সাবলীল। আধুনিক যুগে ইহার কদর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস রাখি।

শ্রীগৌতম সেন

পল্লীবোধনে অন্ন সমস্যা—পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য—"সমাধি মঠ" ৫০ ভৈরব দত্ত লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১·৫০ টাকা, পৃষ্ঠা ১২৫।

বিভক্ত ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও দিন দিন অন্নসমস্যা গুরুতর হইতেছে। গ্রন্থকার পূর্ব্বাশ্রমে (শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং বহুদিন হইতে অন্নসমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে ভণ্ডামীর অভিনয় চলিতেছে গ্রন্থকার তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন। বুলি বা শ্লোগান দ্বারা কোন দিনই অন্ন তথা কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। অন্নসমস্যার অর্থনৈতিক কারণগুলি দূর করিতে যথার্থ চরিত্রবান, লোভত্যাগী, মানব ও স্বদেশহিতৈষী এবং রাষ্ট্রের হিতকামী কর্ম্মীর প্রয়োজন। উচ্চ মাহিনার সরকারী কর্ম্মচারীর তথা কেবলমাত্র কর্ম্মচারীর দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব নহে। পরাধীনতার সময়ে দেশে যে সকল ত্রুটি ছিল আজও তাহা চলিতেছে দেখিয়া লেখক ব্যথিত হইয়াছেন। পল্লীর উন্নতির জন্য অনেকের কুম্ভীরাশ্রুর বিরাম নাই—প্রকৃত পল্লী উন্নয়ন করিতে হইলে গ্রামের অধিবাসীগণের অর্থাৎ দেশের শতকরা ৮০ জনের অন্নসমস্যার সমাধান প্রয়োজন। কৃষক মরিলে কেহ বাঁচিবে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হইতে গত পঞ্চাশের মন্বন্তর ইংরেজ রাজত্বের এই দীর্ঘকালে এদেশের প্রায় চারি কোটি লোক অন্নাভাবে মরিয়াছে। লেখক বর্ত্তমান সময়ের অন্নাভাব দূরীকরণে ভারত ও পাকিস্থানের সমবেত প্রচেষ্টায় অনেকটা সম্ভব বলিয়া মনে করেন। তবে এজন্য সর্ব্বপ্রথমে 'টু-নেসন' মতবাদ বর্জ্জন করিতে হইবে।

অন্ন বস্ত্রাদি সমস্যার কারণ ও প্রতিকার আলোচনায় লেখক-রাষ্ট্রীয় কারণ ব্যতিরেকে চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রমিক মালিক বিরোধ, কৃষি-শিল্পাদির উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি এবং চোরাকারবার, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি। রাষ্ট্র জমিদারী-প্রথা বাতিল

করিয়াও কৃষকের ও চাষের সমস্যার অল্পই সমাধান করিয়াছেন বলিয়া লেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—(প্রথম খণ্ড) শ্রীতারকচন্দ্র রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩.১.১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস তিন খণ্ড লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইহা সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। "শনিবারের চিঠি" গত বৎসরের উল্লেখযোগ্য ৫০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ঐ গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি তাঁহার নিরলস অধ্যবসায়ের দ্বিতীয় অবদান। ইহাতে ষড়দর্শনের পূর্ব্ববর্তী যুগ পর্য্যন্ত হিন্দু দর্শনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে যে প্রকাশ এবং পরিণতি তার একটা ধারাবাহিক এবং নিখুঁত নির্য্যাস প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা সাধারণ লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া গর্ব্ববোধ করি কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের সবগুলির সহিত পরিচয় অল্প লোকেরই আছে। এই গ্রন্থে বৈদিক দর্শন, জৈন দর্শন, বুদ্ধের দর্শন, বৈভাষিক দর্শন, সৌত্রান্তিক দর্শন, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি দর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এক জায়গায় সূত্রাকারে প্রাক ভারতীয় দর্শনের একটি সংক্ষিপ্তসার আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বইখানির মধ্যে শুধু পাণ্ডিত্য নাই—সাধনারও মূল কথা আছে। তিনি লিখিতেছেন, "সমগ্র বিশ্বে বেদের ঋষি শাশ্বত অব্যভিচারী নিয়মের অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিয়মকে তাঁহারা বলিতেন ঋত। ঋতই সত্য। * * * যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত তাহাই ঋত। ঋত বিশ্বে অনুস্যূত। * * দিনের পরে রাত্রি আসে, রাত্রির পরে দিন। ছয় ঋতু একটির পরে একটি নিয়মানুসারে আসে—ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক মাসেই কৃষ্ণপক্ষের পরে শুক্লপক্ষ, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, নিয়মানুসারে আসে ও যায়। সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজত্ব। এই নিয়মই ঋত। (৩১ পৃঃ)", লেখকের এই বক্তব্যের মধ্যে সৃষ্টির আদিম রহস্যের চাবিকাঠি লুকাইয়া আছে। এই রহস্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়াই বৈদিক ঋষি একদা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

লেখক গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি নিজেও একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর মতে গায়ত্রী মন্ত্রের উপাস্য ব্রহ্ম, যিনি সূর্য্যেরও বরেণ্য—উপাস্য সবিতা বা সূর্য্য নহেন। আমরাও তাঁর মতকে সমর্থন করি। কারণ নানারকম ভাষ্যের ব্যাখ্যায় যখন আসল বস্তু চাপা পড়িয়া যায় তখন সাধকদের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। একেশ্বরবাদী বেদের সর্ব্বক্ষেত্রেই একমাত্র উপাস্য ব্রহ্ম—অপর কোন দেবতা নহেন। দেবতারা ব্রহ্মেরই আংশিক প্রকাশ, কিন্তু ব্রহ্ম নহেন। তিনি বলিতেছেন, "বৈদিক ঋষিগণ আপনাদিগকে সত্যের দ্রষ্টা বলিতেন, বৈদিক মন্ত্রসকল তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহারা মানস চক্ষুতে তাহাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিতেন। যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাঁহারা বেদের সত্য লাভ করেন নাই। এই অর্থেই তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিতেন (৪৭ পৃঃ)।" এই কথাগুলি সর্ব্বাংশে সত্য।

"ব্রাহ্মণে" মানুষের কতকগুলি ঋণের উল্লেখ আছে—ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ ইত্যাদি। বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃঋণ এবং জীবে দয়া দ্বারা মনুষ্য ও ভূত ঋণের পরিশোধ হয়। দুঃখের বিষয়, আজকালকার হিন্দুসমাজ বেদে উপদিষ্ট গৃহস্থের কর্ত্তব্যের মানদণ্ড ভুলিয়া গিয়াছে। লেখক সেগুলির পুনরুল্লেখ করিয়া উক্ত নীতিবোধ সকলের স্মরণে আনিয়া দিয়াছেন। 'শতপথব্রাহ্মণে" জন্মান্তরবাদের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুদর্শন জন্মান্তরবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এক জন্মেই যদি সমস্ত দেনা-পাওনা শোধ হইয়া যাইতে পারিত তবে চার্ব্বাকের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" নীতিই হইত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদের মনুষ্যজীবন পরিপূর্ণ জীবনের পথে চলিবার যে অভিব্যক্তি তারই একটি অংশমাত্র—ইহার আগেও জীবন আছে এবং পরেও জীবন আছে ও থাকিবে। মধ্যেকার জীবনাংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে মাত্র। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।"

গ্রন্থকার যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া আত্মার সংজ্ঞা দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। ইহার পুনরুক্তি করিলে অন্যায় হইবে না। তিনি বলিতেছেন, 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত (control) করিতেছেন, অথচ পৃথিবী যাহাকে জানে না, তিনি তোমার আত্মা।" আমাদের যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মন্ত্রও ইহাই।

বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যাইবে—তাহার স্থানাভাব। এক কথায় বলা যায়—এই বই যত্ন করিয়া পাঠ করিলে হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুদর্শনের সারমর্ম্ম পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক জায়গায় একত্রে সর্ব্বদা স্মরণীয় শ্লোকগুলি হাতের নাগালে পাইবেন। সেই হিসাবে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন আর্ত্ত ও দুঃস্থের সেবার দেড় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ

গত ১৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং সেবায়তনের প্রতিটি রোগীর নিকট গিয়া কুশল সংবাদাদি অবগত হন। এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে ফল ও মিষ্ট এবং হাসপাতালের পরিচারিকা এবং সেবক-সেবিকাবৃন্দকে নূতন বস্ত্র বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে একটি বৃহত্তর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার উপকণ্ঠে ৯।১০ বিঘা জমি ক্রয় বাবদ ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১,০০,০০০ টাকা শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ভাণ্ডার সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করেন। পরলোকগতা স্ত্রী সরযূবালা বসুর স্মৃত্যর্থে ইন্দিরা সিনেমার স্বত্বাধিকারী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি শয্যা বাবদ ২,৫০০ টাকা এবং উপস্থিত ভক্ত শিষ্য এবং শিষ্যবৃন্দের নিকট হইতে ১,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত ৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্তা চারুশীলা দাসী তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ঘোষের স্মৃত্যর্থে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের জন্য শ্রীমতী চারুশীলা ট্রাষ্ট হইতে প্রতি বৎসরে ১২,০০০ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসরে মোট ৬০,০০০ টাকা অগ্রিম দিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

অতঃপর ভাণ্ডার সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, ভাণ্ডার যখন অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকার দেনায় দিশেহারা অবস্থায় ছিল, শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আকস্মিক শুভ আবির্ভাব তখন ভাণ্ডারকে নূতন প্রাণ ও প্রেরণা দান করে। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর অগণিত শিষ্য ও শিষ্যবৃন্দের প্রণামীর তহবিল হইতে ৭০,০০০ টাকা দান করেন, এবং সেবায়তনের উদ্বোধনী দিবসে ২৬,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাকেই সূচনা করিয়া ১২টি 'ফ্রি বেড' লইয়া এই হাসপাতাল ১৯৫২ সনে আরম্ভ হয়। অনতিকাল মধ্যেই জনসাধারণ ও মহারাজের ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের সাহায্য ও আনুকুল্যে '৫৬ সনে শয্যা সংখ্যা দাঁড়াইল ৫২।

বর্ত্তমানে হাসপাতাল বৃহত্তর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে ইহার কর্ত্তৃপক্ষ। এইজন্য কলিকাতার অনতিদূরে ৯।১০ বিঘা জমির সন্ধান মিলিয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে অবিলম্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয় দেশবাসী ও মহারাজের ভক্ত ও শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানান।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী ৩০শে নবেম্বর ১৯৫৮ উপলক্ষে উৎসব-সমিতি যে কৃত্যতালিকা স্থির করিয়াছেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত বাংলা পত্রাবলী গ্রন্থাগারে প্রকাশ তাহার অন্যতম। জগদীশচন্দ্রের পত্র যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই উপলক্ষে সেগুলি জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতিকে ব্যবহার করিতে দিলে কৃতজ্ঞ হইব। মূল চিঠি পাঠাইলে নকল করিয়া সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং যাঁহারা চিঠি ব্যবহার করিতে দিবেন তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থে স্বীকৃত হইবে। নিবেদক শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, সম্পাদক, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী সমিতি।

মহিলা সংবাদ

বাংলা পরীক্ষায় বিদেশী মহিলার কৃতিত্ব

বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যক্ষ শ্রীতানয়ুন-শানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তান ওয়েন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায়, বাংলা ভাষায়, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী তান ওয়েন এখন বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র সাহিত্যে গবেষণা করিবেন।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষায় লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের হার যথাক্রমে শতকরা মাত্র ৪২, ৪২ এবং ৪৭ হইলেও ব্রেবোর্ণ কলেজের পাসের হার নিরানব্বই, নিরানব্বই ও সাতানব্বই। আই-এ'তে এই কলেজের শ্রীশুক্লা মজুমদার সপ্তম স্থান ও দু'জন করিয়া লজিক ও সংস্কৃতে "লেটার" পান। বি-এ'তে এই কলেজের শ্রীমঞ্জুশ্রী রায় দর্শনশাস্ত্র অনার্সে একমাত্র প্রথম শ্রেণী, সংস্কৃত অনার্সে শ্রীমীনাক্ষী ঘোষাল ও শ্রীমঞ্জুলিকা ঘোষ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও তৃতীয় স্থান, চুয়াল্লিশ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও পাঁচ জন ডিসটিংশন লাভ করেন। এই কলেজ দর্শনশাস্ত্র অনার্সে ১৯৫৭ সনেও একমাত্র প্রথম শ্রেণী ও ১৯৫৬ সনে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় পদ পান।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

দুঃখের দিনে
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আজমীর মিউজিয়মে রক্ষিত—

৯ম-১২শ শতকের ভাস্কর্য্য

বাঁশওয়ারা ষ্টেট হইতে প্রাপ্ত সরস্বতী মূর্ত্তি

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা এবং মাঘ পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রের প্রতীক

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ
১ম খণ্ড } আশ্বিন, ১৩৬৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের সময়ে এই ভারতবর্ষে বহু মনীষী বহু মহামানবের পরিচয় ও প্রকাশ আমরা পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে গুরু ও আচার্য্য অনেক ছিলেন। গুরুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার শিষ্যের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জীবনেই বিশেষভাবে পাওয়া যায় একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। আচার্য্য তিনিই যিনি নূতন পন্থা বা নূতন ব্যাখ্যা দিতে পারেন। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই আচার্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু গুরুর প্রকাশ আমরা পাই শিষ্যের জীবনদর্শনে, কর্ম্মজীবনে ও শিক্ষা-দীক্ষায়।

আমাদের সময়ে যে দুই গুরুর প্রভাব আমরা জগৎব্যাপী ও সর্ব্বজনীনভাবে দেখিয়াছি সেই দুই মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের বচন, ব্যাখ্যান ও কর্ম্মপদ্ধতি সারা জগতে অক্ষয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের কর্ম্মজীবন ও মানব-ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। দুই জনেরই অসংখ্য ভক্ত।

মহাত্মা গান্ধী একজন শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি তাঁহার জীবনদর্শনে, কর্ম্মপদ্ধতিতে ও শিক্ষা-দীক্ষা দানে তাঁহার গুরুর আদর্শ জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল প্রকাশে, সজীব রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে নিজস্ব শিক্ষা তিনি জগতকে আজও দিতেছেন তাহা বাস্তবিক অভিনব ও আশ্চর্য্য এবং সেই কারণে তাঁহার আচার্য্য আখ্যা সর্ব্বজনস্বীকার্য্য ও সার্থক। আমরা সেই মহাত্মা গুরুর মহৎ শিষ্য আচার্য্য বিনোবাকে তাঁহার বিগত চতুঃষষ্ঠীতম জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের সর্ব্বত্যাগী মহা-গুরুর তিনি আজ একমাত্র সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আলোকধারী শিষ্য। তাঁহার দীর্ঘজীবন ও শিক্ষার ব্যাপক প্রচার এখনও সর্ব্বজনকাম্য।

অন্য জনের কথা এখনও উৎসবে, আনন্দে ও নানা ভাবের উচ্ছ্বাসে দেশের চারিদিকে প্রচারিত হয়। তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত কবিতা, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্য আজও সারা জগতে আদৃত। তাঁহার রচিত গীত ও গীতিনাট্য সারা ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার মানবধর্ম্ম ও জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা আজও পণ্ডিতসমাজে সম্মান পাইতেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার অন্যতম কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়, আজ যোগ্য শিষ্যের অভাবে অপরিসীম দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে। অনেকদিন পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের মহা-প্রয়াণের পর যদি ঐ কর্ম্মক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইত তাহা হইলেও হয়ত ভাল ছিল। কেননা যে স্থল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও তাঁহার যোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষায় সিঞ্চিত সেই স্থান কুচক্রী ও আদর্শবিহীন ভাগ্যান্বেষীদিগের লীলাভূমিতে পরিণত হওয়া অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে।

আমরা বলি না যে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখার যোগ্য শিষ্য তাঁহার কেহই জীবিত নাই। অল্প কয়েকজন যাঁহারা এখনও কর্ম্মঠ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম উপাচার্য্যের পদের জন্য পণ্ডিত নেহরু মনোনীত বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম। সে সংবাদও এই সংখ্যায় অন্যত্র আমরা দিয়াছি। কিন্তু আমরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে শান্তি-নিকেতনের চক্রবৈঠকে উপাচার্য্যের জন্য যে তিন জনের নাম ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সেই যোগ্য লোকের নাম নাই। যে তিন জনের নাম দেওয়া হইয়াছে, শান্তিনিকেতনের পঙ্কিল কুণ্ডকে ঐ চক্রান্তকারী কূপমণ্ডুকবর্গ হইতে উদ্ধার করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাঁহাদের কাহারও আছে একথা আমরা কোথায়ও শুনি নাই।

পণ্ডিত নেহরু রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার উচিত কঠোর হস্তে তাঁহার গুরুদেব ও মহাত্মা গান্ধীর গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐ পবিত্র আশ্রমভূমিকে পাপমুক্ত করা। অন্যথায় উহা মহাশ্মশানই হইবে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল শিক্ষা-দীক্ষা ভস্মীভূত করিবার পর।

বাঙ্গালীর জাতীয় সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা অতীব শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অনাবৃষ্টি এবং পরে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে আগামী বৎসরের ফসলের সম্ভাবনাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। কিন্তু আগামী বৎসরের ফসল উঠিতে এখনও প্রায় চার মাস বাকি। এই চার মাসে বর্ত্তমান সঙ্কট যে আরও অধিকতর ব্যাপক এবং গভীর হইবে, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আশু কর্ত্তব্য হইবে, এই সঙ্কটে দেশবাসীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্থানেই চাউলের মূল্য মণপ্রতি ত্রিশ টাকায় উঠিয়াছে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময়ও যে সকল জেলা দুর্দ্দশা-মুক্ত ছিল, এবারে সেই সকল অঞ্চলেও ব্যাপক দুর্গতি দেখা দিয়াছে। জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ের পরিমাণের কথা স্মরণ রাখিলে একথা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না যে, ত্রিশ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইবার লোক বাংলাদেশে বেশী নাই। কিন্তু খাদ্য ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। যদি কয়েক বৎসর পর পরই বাঙ্গালীদিগকে এরূপ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয় তবে জাতির মেরুদণ্ড নিশ্চিতরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এরূপ দেহে ও মনে বুভুক্ষু জাতির নিকট হইতে মহৎ কিছু আশা করা অন্যায় হইবে।

খাদ্যসমস্যা সেই বিচারে বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় সমস্যা। বার বৎসর হইতে চলিল, অথচ দেশের খাদ্যসমস্যার কোন সমাধান হইল না। এই অক্ষমতার দায়িত্ব নিশ্চিতরূপে সরকারের ইচ্ছা থাকিলে, উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করিলে এবং দেশের লোক শ্রম-বিমুখ না হইলে খাদ্যসমস্যা সমাধান অসম্ভব নহে, চীন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত সাত বৎসরে চীনে বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ধাক্কা ভারত হইতে কোন প্রকারেই কম ছিল না। যখন এরূপ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চীনা সরকার দেশের খাদ্যসমস্যার মোটামুটি সমাধানে সক্ষম হইয়াছেন, তখন প্রায় দ্বিগুণ সময় পাওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকারের অক্ষমতার কৈফিয়ত জনসাধারণ সহজেই দাবী করিতে পারেন। এ বিষয়ে অবশ্য জনসাধারণের গাফিলতিও যথেষ্ট দায়ী।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জৈন বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল বা রেশনিং-এর সমস্যা নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার যে ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন তাহা আরও বিপজ্জনক। খাদ্যশস্যের ষ্টক এবং বণ্টনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তাহারা বিভিন্ন খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর বাঁধিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ সম্পর্কে একটি খসড়া অডিন্যান্স নাকি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। এক মাসের নোটিশ দিয়া এ ধরনের অর্ডিন্যান্সের কার্য্যকারিতা কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা এই যে, এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাপাইলে দেশে একটি কৃত্রিম কালোবাজারের সৃষ্টি হইবে। জনসাধারণের কোন সুবিধাই ত হইবে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিসের জন্য বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর মূল্য দিতে হইবে।

ভারতের অন্যত্র খাদ্যাবস্থা

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। বাংলা দেশ, বিহার এবং পূর্ব্ব উত্তর প্রদেশে এই সঙ্কটের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। উত্তর প্রদেশে পক্ষাধিককাল যাবত সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলি এক প্রবল আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন। এই আন্দোলন ক্রমশঃ অন্যান্য রাজ্যেও পরিব্যাপ্ত হইতে চলিয়াছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গেরও সর্ব্বত্র এক খাদ্য-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ব্যতীত অপরাপর সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। প্রথম দিনে কলিকাতায় পাঁচ জন বামপন্থী এম-এল-এ ও ৮৪০ জন কৃষক মহিলাসহ মোট ৫৮৫ জন কারাবরণ করেন।

এইরূপ আন্দোলন দ্বারা খাদ্যসমস্যার সমাধান ঘটিতে পারে না। তবে এই সকল আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন দেখিয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের অনুসৃত নীতির ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারেন তবেই মঙ্গল। খাদ্যসমস্যা সমাধানের একটিই পথ: কঠিন পরিশ্রম এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদনে সাহায্য করাই সরকারী নীতির কাজ। যে দেশে সরকার এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করেন সে দেশের উন্নতি অবধারিত। এ দেশেও সরকার সময় সময় যে সঠিক নীতি গ্রহণ করেন না এমন নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক দেরীতে এই নীতি গৃহীত হয় এবং গৃহীত হইলেও তাহার স্থায়িত্ব থাকে না। প্রতি বৎসরই কৃষিঋণ, সার প্রভৃতি বণ্টনে অতি বিলম্ব সম্পর্কে একই ধরনের অভিযোগ এই বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষ আজ গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন এবং খাদ্য আমদানীর জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইতেছে। ইদানীং বহু প্রকার প্রস্তাব দেওয়া হইতেছে যাহাতে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুবণ্টন সম্ভবপর হয়। কিন্তু বণ্টনের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনই অত্যধিক এবং সেই দিকে বর্ত্তমানে জাতীয় প্রচেষ্টা চালিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশান একটি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যাহা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় নীতির প্রয়োজন এবং সেই নীতি অনুসারে প্রতি বৎসর খাদ্যশস্য বপনের অন্ততঃপক্ষে ছয় মাস পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত মৌলিক খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন এবং সেই মূল্যে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে চাষীদের নিকট হইতে

সমস্ত খাদ্যশস্য কিনিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ চাষীরা যেন কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং শস্য বিক্রয় বিষয়ে তাহাদের যেন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে না হয়। ইহাতে চাষীরা অধিকতর পরিমাণে চাষ-আবাদ করিবার উৎসাহ ও প্রেরণা পাইবে। চাষীরা যদি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারে যে, কোন নিম্নতম মূল্যে তাহারা রাষ্ট্রকে তাহাদের উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সেই অনুসারে তাহারা কৃষিকার্যে উন্নততর বীজ, সার, সেচ, জমি-সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে সক্ষম হইবে।

যদি স্থানীয় মূল্য নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্য হইতে অধিক হয় তাহা হইলে চাষী সেই স্থানীয় মূল্যে তাহার শস্য বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং ইহাতে তাহার লাভ অধিক হইবে। কিন্তু যদি স্থানীয় মূল্য নিম্নতম মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষকে নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যেতে সমস্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। এই কারণে সারাদেশে বহু শস্যগুদাম ঘর স্থাপন করা প্রয়োজন হইবে। শস্যগুদাম প্রতিষ্ঠার একটি আইন ইতিপূর্ব্বেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কার্য্যও কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছে। তবে এই আইন অনুসারে শস্যগুদামে চাষীরা তাহাদের শস্য জমা রাখিতে পারিবে। আর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অভিমতে সরকার চাষীদের নিকট হইতে শস্য ক্রয় করিয়া লইয়া নিজেই এই সকল শস্যাগারে মজুত করিয়া রাখিবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে দেশের উৎপাদন অতিরিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং শস্য সর্ব্বদা মজুত থাকিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে যে কোনও স্থানে চালান দেওয়া যাইতে পারিবে। চাষীরা যদি আশ্বস্ত থাকে যে মূল্য পরিবর্ত্তনে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, তাহা হইলে অধিকতর জমিচাষের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে। সরকার যদি নিজেই খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া লইয়া নিজেদের গুদামে মজুত করিয়া রাখেন তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার সুবিধা হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ অবশ্যই লাভবান হইবে।

কিন্তু শুধু মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারাই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। চাষীদের আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের সরবরাহ-ব্যবস্থা। কিন্তু এই বিষয়ে সরকারী অব্যবস্থা ও অকর্ম্মণ্যতা পরিলক্ষিত হয়। কাগজে-কলমে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত কৃষিঋণের পরিমাণ এখনও নগণ্য। আর মূল্য-নির্দ্ধারণ নীতি গ্রহণ করিলে অধিকতর পরিমাণে কৃষিঋণের প্রয়োজন হইবে, কারণ চাষ-আবাদ বৃদ্ধির ফলে ঋণের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিঋণ শুধু কার্য্যকরী হইলেই চলিবে না, ইহাকে দীর্ঘমেয়াদীও হইতে হইবে। বীজ ও সার ক্রয়ের জন্য, কীটবিনাশনী ঔষধ, সেচ ও যান্ত্রিক উপকরণ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রয়োজন হইবে। কৃষিঋণের সরবরাহ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী এখনও সঠিকভাবে দানা বাঁধিতে পারে নাই এবং তাহার ফলে জোড়াতালি দিয়া কাজের প্রচেষ্টা এখনও হইতেছে অর্থাৎ, আশানুরূপ কাজ হইতেছে না।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আর একটি প্রস্তাব হইতেছে যে, ব্যক্তিগত জমির পরিমাণের আশু নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ভারতের উত্তরাধিকারী-সূত্র আইনের ফলে এবং অবাধ হস্তান্তরিত হওয়ার দরুণ জমিগুলি ক্রমশঃ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে যান্ত্রিক কর্ষণ এবং অন্যান্য উন্নতকারী ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। জমির মাথাপিছু গড় পরিমাণ নির্দ্ধারণ বিষয়ে এখনও কোনপ্রকার সর্ব্বভারতীয় নীতি নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং অদূরভবিষ্যতে তাহা হওয়ার সম্ভাবনাও কিছু দেখা যায় না।

ভারতের সেচ-ব্যবস্থাও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। যে সকল এলাকায় সেচের আশু প্রয়োজন, সেই সকল এলাকায় যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না। যেমন সুন্দরবনের কতকগুলি এলাকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি চলিতেছে, কিন্তু সরবরাহী খাল কাটিয়া সেচের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই এলাকায় চাষীদের দুর্গতির সীমা নাই এবং চাষ-আবাদও হইতেছে না।

সম্প্রতি মহীশূরে যে আন্তর্জ্জাতিক কৃষি অর্থনীতিবিদ্‌দের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের কৃষি-সমস্যা ও তাহার প্রতিবিধান বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষি অর্থনীতির প্রধান কথা একরপ্রতি জমির উৎপাদন বৃদ্ধি। বিজ্ঞান মানুষকে বহুপ্রকার উপায় দিয়াছে যাহাতে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু কৃষিকার্য তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনের সমস্যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য বিষয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষ, চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ-গুলিতে কৃষি-ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যক্তিগত কৃষি-পরিবার নহে, ইহা সমস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। সুতরাং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু কৃষি-পরিবারের উপর নির্ভর করে না; সমগ্র গ্রাম্য সমাজের উন্নতির উপর কৃষির উন্নতি নির্ভর করে। বৃহৎ বৃহৎ শহর বিস্তৃতির ফলে মানুষের কর্ম্মব্যবস্থা নৈবাক্তিক হইয়া উঠে এবং তাহাতে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আজ ভারতের গ্রামগুলি পরিত্যক্ত সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদন অবহেলিত। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে জনসাধারণকে আবার গ্রামমুখী করিতে হইবে এবং গ্রামগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনও প্রয়োজন।

কৃষক ও ক্যানেলের জল

দামোদর পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং সেচের জন্য জলসরবরাহ করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কৃষক প্রয়োজনের সময় ক্যানেলের জল হইতে কোনরূপ সাহায্যই পাইতেছে না। বর্দ্ধমান জেলা হইতে প্রকাশিত সকল দায়িত্বশীল সাময়িক পত্রিকাই এই বিষয় সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ

করিয়াছেন। "অসহায় অবস্থা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় আলোচনায় সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"এখন দেখা যাইতেছে প্রকৃতির উপর দোষারোপ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ডি-ভি-সির জলাধারে পূর্ব্ব হইতে পর্য্যাপ্ত জল সঞ্চয় না রাখার ফলে সময়মত ক্যানাল জলসরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। জলসরবরাহ যখন করা হইল তখন এমনই বেহিসাব মত তাহা করা হইল যে সকলে পাইল না, আবার কোন কোন এলাকা ক্যানাল জলে প্লাবিত হইয়া গেল। এখানে দায়িত্বহীনতার কথা নয় চরম অজ্ঞতাই এবম্প্রকার সরবরাহের জন্ম দায়ী। ক্যানাল বিভাগ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, কিছুটা বৃষ্টির জল এবং কিছুটা ক্যানাল জল সরবরাহ কালবিলম্বে হইলেও যে চাষ হইয়াছিল তাহাও আবার এখন জলাভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"বর্দ্ধমান জেলার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলের মাঠ শুকাইয়া গিয়াছে। খাদ্য-উৎপাদন যাহা হইবে তাহাতে চাষ খরচ উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। ক্যানাল জলাধারে জল নাই—বৃষ্টির জল নাই, মাঠে কোন পুকুর নাই—অল্প যে কয়টি আছে কৃষি বিভাগের কোন পাম্প না থাকায় তাহাও কাজে লাগান সম্ভব হইতেছে না। এক কথায় ফসলের অবস্থা শোচনীয়। খাদ্যাভাব বছরের প্রথম হইতেই আছে, এখন চরমে উঠিয়াছে, মাস কয়েক পর সঙ্কট-জনক অবস্থায় দাঁড়াইবে। দেশের মোটামুটি চিত্র ইহাই।"

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতের বৈদেশিক নীতি বিষয়ে সম্প্রতি লোকসভায় যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে কতকগুলি বিষয়ে ভারতের দুর্ব্বলতা প্রকটিত হইয়া উঠে। তিব্বতকে লইয়া ভারত-চীনের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহার ফলেই বহু আলোচিত ও বহু বিঘোষিত পঞ্চশীল নীতি গড়িয়া উঠে। পঞ্চশীল নীতি সম্বন্ধে মৌখিক সমর্থন যদিও সকল দেশগুলিই দেখাইতেছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কার্য্যকরী সমর্থন কোন দেশই দেখাইতেছে না। পঞ্চশীল নীতির ভঙ্গের ভিত্তিতেই ভারত-চীন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ভারতের চীন-তিব্বতী নীতি পঞ্চশীলের ব্যর্থতা সূচনা করে। পঞ্চশীল নীতির প্রধান কথা এই যে, কোনও দেশ অন্য কোনও দেশ দখল করিবে না; কিন্তু চীন কর্ত্তৃক তিব্বত অধিকার এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

তিব্বত চিরকালই চীন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিছুকাল তিব্বত চীনের অধিকারে ছিল বটে, কিন্তু ইহা কোনদিনই চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রাজনৈতিক অধীশ্বরতা সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সাম্যবাদের পরিপন্থী বলিয়া সর্ব্ববিদিত ছিল। সাম্যবাদী চীন কি করিয়া তিব্বত দখল করিল তাহাই আশ্চর্য্য। ১৯০৪ সনে ইংরেজের সহিত চুক্তির ফলে যদিও তিব্বতের উপর চীনের অধীশ্বরতা স্বীকার করা হইয়াছিল, তথাপি তিব্বতের উপর ব্রিটেনের কিছু কিছু অধিকার ছিল। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্ব শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে তিব্বত আন্তর্জ্জাতিক আইন দ্বারা প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯০৪ সনের চুক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেন ও চীনের যুক্ত মালিকত্ব তিব্বতের উপর আরোপিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ তাহার তিব্বতের অধিকার উপর ছাড়িয়া দেয় এবং ইহা তাহার রাজনৈতিক আদর্শের পরিপোষক হইয়াছিল। তবুও লাসায় তাহার ব্যবসায়িক মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৫৪ সনে ভারত-চীন চুক্তির পর চীন দাবি করে এই মিশন তুলিয়া লওয়ার জন্য এবং ভারতবর্ষ তাহা করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বে চীনের আধিপত্য কালে তিব্বতের আভ্যন্তরিক শাসন এবং অন্যান্য বিষয়ে চীন হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু সাম্যবাদী চীন বর্ত্তমানে তিব্বতের আভ্যন্তরিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের অধীনে আনিয়াছে এবং তিব্বতী শ্রমিকদিগকে বাধ্যতামূলক ভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে, যাহাকে বলা হয় Conscripted labour। তিব্বতে খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্য আছে।

লোকসভায় পণ্ডিত নেহরু ভারতের চীন-নীতিকে জোর গলায় সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিব্বতের উপর চীনের অধীশ্বরতা ছিল, সে হেতু ভারতবর্ষ চীনের তিব্বত অধিকারে বাধা দেয় নাই। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু কি জানেন না যে, অধীশ্বরতা ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ বিশ্বের প্রত্যেক নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা কামনা করে, সে চায় উপনিবেশের পরিসমাপ্তি। তিব্বত যে চীনের অধীশ্বরতায় ছিল তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, চীন জাতি হইতে তিব্বত জাতি বিভিন্ন। এক সময়ে সামরিক শক্তির প্রয়োগে চীন তিব্বতের উপর তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তথা-কথিত গণতান্ত্রিক চীন বর্ত্তমানে তিব্বতকে ও তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে শোষণ করিতে সুরু করিয়াছে। ইহা আর যাহাই হউক, সাম্যবাদীর আদর্শ নহে।

প্রত্যেক জাতিরই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, সুতরাং তিব্বতেরও আছে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য একবার প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায় না যে, বিজিত জাতি কোনও দিনই আর স্বাধীন হইতে পারিবে না। সেই হিসাবে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি কোনও দিনই স্বাধীন হইতে পারিত না। সাম্রাজ্যবাদ সকল ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় ও গর্হিত। যুদ্ধোত্তর যুগে দেখা যাইতেছে যে, সাম্যবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়া কর্ত্তৃক পূর্ব্ব জার্ম্মানী ও পূর্ব্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে দখলে রাখা সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার পরিচায়ক এবং এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়া ও চীন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং সেই কারণে চীনের তিব্বত দখলকে সমর্থন করা একেবারেই উচিত হয় নাই। যেহেতু চীন সাম্যবাদী

সেইহেতু তাহার তিব্বত দখল সাম্রাজ্যবাদ নহে—এমন যুক্তি হইতে পারে না। ভারতের নৈতিক সমর্থন না পাইলে চীন তিব্বতের উপর এত জোরদাবী করিতে পারিত না।

কূটনীতিতে ব্রিটিশ ধুরন্ধর, ইহা অবিসংবাদিত। সেই হেতু তিব্বতের উপর চীনের সম্পূর্ণ অধিকারকে সে প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে নিজের কিছু রাজনৈতিক অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। উত্তর-সীমান্ত লইয়া একদিন না একদিন চীন-ভারতবর্ষে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এখনই চীনের ম্যাপে সিকিম ও ভূটানকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হইতেছে। কেন, চীন কি জানে না যে, এই রাজ্যগুলি তাহার দেশের অন্তর্গত নহে। ইহা ভুলের দ্বারা হয় নাই, ইচ্ছাকৃত—অর্থাৎ ভবিষ্যতের চীন যে সিকিম-ভূটানকে তাহার দেশের অন্তর্গত করিবার বাসনা রাখে, ইহা তাহারই বর্ত্তমান প্রকাশ।

সাম্যবাদ কোনও দেশের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে এবং ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে চীনকে সমঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সাম্যবাদী ভেক্ লইলেও আসলে এই কাজ সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত কিছুই নহে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য চীনের অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু তাহার জন্য বারবার ভারতবর্ষের ওকালতি করার কোনও প্রয়োজন নাই। তিব্বত দখলকারী চীনের সহিত ভারতের কোনও সহযোগিতা হইতে পারে না। বর্ত্তমান নেপাল অন্তর্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত এবং নেপাল ক্রমশই ভারতবিরোধী হইয়া যাইতেছে এবং সেখানে চীনের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। ভারতের চীন নীতি তাহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

ডি-ভি-সি'র বিদ্যুৎ

প্রধানতঃ সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য পরিকল্পিত হওয়া সত্ত্বেও ডি-ভি-সি হইতে আজ পর্য্যন্ত কৃষকগণ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য পায় নাই। উক্ত পরিকল্পনার অপর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় জনসাধারণকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা। এ ব্যাপারে ডি-ভি-সি কতদূর কি করিতে পারিয়াছে নীচের আলোচনা হইতে তাহার আংশিক পরিচয় মিলিবে। বর্দ্ধমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক 'দামোদর' লিখিয়াছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ এম. দত্ত সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সার্কুলারে জানাইয়াছেন যে, উক্ত বোর্ড ডি-ভি-সি হইতে বিদ্যুৎশক্তি ক্রয় করিয়া ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন। ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁহাদের জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের পক্ষে অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নহে এবং আমরা যাহাতে বর্ত্তমান পরিমাপের অধিক সংযোগ না দিই সে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন। সেজন্য ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, যতদিন না ডি-ভি-সি বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছেন, তত দিন আমরা নূতন চাহিদা মিটাইতে পারিব না। ডাঃ দত্ত শিল্প-বাণিজ্য-সম্পর্কীয় সংযোগ-গ্রহণকারীদের অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মোটর প্রভৃতি চালু না করেন। ডাঃ দত্তের এই বিবৃতি আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে এবং ডি-ভি-সি'র আসল স্বরূপ দেশবাসীর কাছে প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। অজস্র অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত ডি-ভি-সি উপযুক্ত পরিমাণ জল সরবরাহও করিতে পারিতেছে না, এখন দেখিতেছি, বহুলপ্রচারিত অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তির আধার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তিও মিলিবে না।"

পুলিসমন্ত্রীর সফর

সম্প্রতি পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদ সীমান্ত সফরে যান। পুলিসমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভারতী" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"পুলিসমন্ত্রীর এই ব্যয়বহুল সফর কতটুকু সার্থক হইয়াছে ভবিষ্যৎকালই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তবে সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার যে গুরুতর ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ পাকিস্থানী হামলার ফলে সীমান্তবাসী ভারতীয় নাগরিকগণের মনোবল যেভাবে ক্ষুন্ন হইতে দেখিয়াছি, যদি তাঁহার সফরের ফলে ইহার কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হইব। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহার এই সফর সময়োচিত ও সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এই মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে যখন পাকিস্থানীদের অবাধ হামলা চলে ও ভারত ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা একের পর এক যখন কার্য্যতঃ তাহাদের কুক্ষিগত হয়, যখন নিরুপায় হইয়া দুর্গত জনসাধারণ সরকারের সাহায্যের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে থাকে তখন কোন মন্ত্রীমহোদয়েরই এতদঞ্চলে শুভাগমন সম্ভব হয় নাই। সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতা কোথায় সে সময়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখা বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উৎপীড়িত মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা বা আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। সীমান্তে এখন এমন কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় নাই যে জন্য তাঁহার এই ব্যয়বহুল সফরকে আমরা সাধুবাদ জানাইতে পারি। আমাদের এই দরিদ্র দেশে জনসাধারণের সামান্যতম অর্থেরও যাহাতে অপচয় না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মন্ত্রীমহোদয়গণের সফর-তালিকা প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি ?"

সফরকালে মন্ত্রীমহোদয়ের জনসংযোগ প্রচেষ্টার আলোচনা করিয়া "ভারতী" বলিতেছেন : "এই প্রসঙ্গে পুলিস-মন্ত্রীমহোদয়ের সফরের আর একটি দিকও কিছুটা আলোচনা করা সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। এতদঞ্চলে তাঁহার সফরকালীন কর্ম্মসূচীর যেটুকু আভাস আমরা আমাদের পত্রিকায় অন্যত্র প্রকাশিত সংবাদে পাইয়াছি তাহাতেও আমরা ক্ষুন্ন না হইয়া পারি না। তিনি জঙ্গীপুরে আসিলেন, তিনি গিরিয়ায় যাইলেন, কিন্তু কোন স্থানেই জনগণের সহিত মিলিত হইলেন না বা তাঁহাদের অভাব

অভিযোগ কি জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন না। মাল্যদানের জন্ম মুষ্টিমেয় লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হইলেন, সরকারী কর্ম্মচারী ও কয়েকজন কংগ্রেসী মাতব্বর তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিলেন, খানা-পিনার ব্যবস্থা হইল—ইহাতেই যদি তিনি আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহার উপর আর মন্তব্য করা আমরা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমাদের মনে হয় মন্ত্রীমহোদয়গণের সফরের কর্মসূচীতে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত মিলিত হওয়া একটি অন্যতম বিষয়বস্তু থাকা উচিত। জনসাধারণকে এড়াইয়া যাওয়ার মত যদি কোন জনপ্রতিনিধির উন্নাসিকতা থাকে তবে তাহার পক্ষে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা আদৌ সমীচীন নহে, আজ একান্ত দুঃখের সহিত আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।"

ভারতের সংবাদপত্র

সম্প্রতি লোকসভাতে প্রেস রেজিস্ট্রারের দ্বিতীয় রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হয়। এই রিপোর্টে ভারতের সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ১৯৫৭ সনে ভারতে যতগুলি সংবাদপত্র ছিল তাহাদের মধ্যে মাসিকের সংখ্যাই (২৩৫১) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সাপ্তাহিক (১৫৮৯), পাক্ষিক (৫১৭) এবং দৈনিক (৪৪৬)। পত্রিকাগুলির স্থান সংখ্যার দিক হইতে ছিল যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। সমগ্র দৈনিক পত্রিকাগুলির এক চতুর্থাংশেরও বেশী (১১৭) প্রকাশিত হয় বোম্বাই রাজ্য হইতে। উত্তরপ্রদেশ হইতে ৫৩টি দৈনিক এবং মহীশূর হইতে ৪৩টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রগুলির মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ, তন্মধ্যে দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা ছিল ৩১·৪৯ লক্ষ। সমগ্র প্রচারসংখ্যার তুলনায় দৈনিক পত্রিকার আনুপাতিক হার ১৯৫৭ সনে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা দুই ভাগ কমিয়া যায়। মাসিক পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যাও ৩৪·৭৯ লক্ষ হইতে কমিয়া ৩১·৬২ লক্ষে দাঁড়ায়। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা ৩০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া ৩০·৫০ লক্ষে পৌঁছায়। ১৯৫৭ সনে প্রচারসংখ্যার দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হয় পাক্ষিক পত্রিকাগুলি। ১৯৫৬ সনে তাহাদের প্রচারসংখ্যা ছিল ৭·৮৫ লক্ষ, ১৯৫৭ সনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৪·৪৯ লক্ষ। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার (যথা দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি) প্রচারসংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়া ৭·৬০ লক্ষ হইতে ৪·৪৮ লক্ষে নামিয়া আসে।

দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মোট প্রচারসংখ্যার (৩১·৪৯ লক্ষ) মধ্যে ইংরেজী দৈনিকগুলির প্রচারসংখ্যা ছিল ১০·০৫ লক্ষ। এক বৎসরের মধ্যে ইংরেজী দৈনিকগুলির প্রচারসংখ্যা শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রচারসংখ্যার দিক হইতে দ্বিতীয় স্থানে ছিল হিন্দী দৈনিকগুলি, হিন্দী দৈনিকের প্রচারসংখ্যা ছিল ৩·৯৪ লক্ষ। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়, আলোচ্য বৎসরে হিন্দী দৈনিকগুলির প্রচারসংখ্যা শতকরা ৮·৮ ভাগ হ্রাস পায়। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের পরে অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলির স্থান ছিল: —তামিল (২·৭৩ লক্ষ), মরাঠি (২·৪৭ লক্ষ), গুজরাটি (২·২৬ লক্ষ) এবং উর্দ্দু (২·০৩ লক্ষ)। বাংলা, কানাড়া এবং মলয়ালম ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকগুলির প্রচারসংখ্যা ছিল এক হইতে দুই লক্ষের মধ্যে।

রিপোর্টে দেখা যায়, সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নয়টি "শৃঙ্খল" এগারটি "গোষ্ঠী" এবং ২৩টি মালটিপল ইউনিট ছিল। নয়টি শৃঙ্খলের আওতায় ৬৩টি সংবাদপত্র ছিল (৪২টি দৈনিক, ১৬টি সাপ্তাহিক এবং অপরাপর পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা) যাহাদের মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ১৮,৬৬,৫৪৭। অন্যভাবে বলিলে এই নয়টি শৃঙ্খলের আওতায় সমগ্র সংবাদপত্রের শতকরা মাত্র একভাগের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, কিন্তু সমগ্র প্রচারসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগই ইহাদের আয়ত্তে রহিয়াছে। এই শৃঙ্খলের অন্তর্গত ৪২টি দৈনিকের প্রচারসংখ্যা সকল দৈনিক পত্রিকাগুলির সম্মিলিত প্রচারসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। ১১৯টি "গোষ্ঠী" ৩১৬টি সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছে যাহাদের প্রচারসংখ্যা মোট প্রচারসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ। "মালটিপল ইউনিট"গুলি ৬০টি সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যাহাদের প্রচারসংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা দশ ভাগের কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ২৭৭টি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বাঁকুড়ার জঙ্গল

বাঁকুড়ার পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় 'শ্রীহনুমুখ' লিখিতেছেন:

"বাঁকুড়া জেলা জঙ্গলের জন্ম কয়েক বৎসর আগেও প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা জঙ্গলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন জঙ্গল দেখিতে যান, দেখিবেন বাইরে দুই-চারিটা গাছ দিয়া ঢাকা আছে, কিন্তু ভিতরটা কাটিয়া একেবারে ফাঁকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন জঙ্গলে বড় গাছ একেবারে নাই। জঙ্গলের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, এই সহজ সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া সরকারের উচিত জঙ্গলসংক্রান্ত নীতির আমূল পরিবর্ত্তনসাধন। আমাদের মনে হয়, গত জুন মাসে বিষ্ণুপুরে বাঁকুড়া জেলা মধ্যবিত্ত সম্মেলন যে প্রস্তাব করিয়াছে, জঙ্গল সংরক্ষণের ব্যাপারে তাহাই সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব। উক্ত সম্মেলন প্রস্তাব করিয়াছে, জঙ্গল পূর্ব্বতন মালিকদের ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কিংবা তাহারা লইতে রাজী না থাকিলে অপর কাহাকেও দীর্ঘমেয়াদী লীজ দেওয়া হউক। জঙ্গল বিভাগকে একটি স্কেলিটন আকারে রাখিয়া এবং জঙ্গল আইন কঠোরতর করিয়া পারমিট ব্যবস্থা করা হউক। জঙ্গল বিভাগের পারমিট ব্যতীত কেহ কাটিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা হউক, তাহা হইলে আগামী ৮।১০ বৎসরের মধ্যে জঙ্গলের পুরাণো চেহারা ফিরিবার সম্ভাবনা।

"দেশের স্বার্থে কংগ্রেস সরকারের এই ভুল স্বীকার করা অন্যায় হইবে না।"

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎসরবরাহের অব্যবস্থা

বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "হিন্দুবাণী" পত্রিকার অপর এক মন্তব্যে 'শ্রীদুর্মুখ' লিখিতেছেন :

"আমরা বহুবার বলিয়াছি, বাঁকুড়া ইলেকটিক সাপ্লাই কোম্পানীর লাইনগুলি এরূপ জীর্ণ হইয়াছে যে, তাহা জোড়াতালি দিয়া কিছুদিন চলিতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ভাবে চলিতে পারে না। কাটাছেড়া তার, পুরাণো টিনের পাত মুড়িয়া পোল, বদ্দি বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রভৃতি লইয়া চালাইবার জন্য প্রায় গোলযোগ লাগিয়াই আছে। তাহার উপর অতি অল্পসংখ্যক মিস্ত্রী লইয়া কাজ চালানোর ফলে কোথাও কিছু গোলযোগ ঘটিলে মেরামত হইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায় তাহা কার্য্যকরী করিতে। ২৬শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলায় সারা শহরে বৈদ্যুতিক গোলযোগে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রিমিন্যাল অবহেলার অন্যতম উদাহরণ। এই সবের কোন প্রতিকার হয় না।"

বাঁকুড়া হাসপাতালের অব্যবস্থা

বাঁকুড়ায় হাসপাতালে রোগীদের প্রতি অবহেলা এবং অন্যান্য নানাবিধ অব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রায়ই নানারূপ অভিযোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু একই প্রকার অভিযোগের পুনরাবৃত্তিতে মনে হয় যে, এ সম্পর্কে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। কিন্তু অভিযোগগুলি সত্য হইলে সেগুলির গুরুত্ব কোনপ্রকারেই লাঘব করা যায় না। "হিন্দুবাণীর" ২৬শে আগষ্ট সংখ্যা হইতে আমরা নীচের আলোচনাটি তুলিয়া দিলাম :

"রামসাগর হেলথ সেণ্টারের এম. ও স্থানীয় জনৈক মহিলার পেটে টিউমার হইয়াছে—এই সন্দেহে তাহাকে সদর হাসপাতালে ভর্ত্তির জন্য আসিতে বলেন। ২৩শে আগষ্ট সকালে মহিলা হাসপাতালে পৌঁছিলে তাহাকে আউটডোরে কয়েকটি বড়ি দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। মহিলাটি বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট গিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে দেখিয়া শ্রীঅনঙ্গমোহন রায় রোগিণীকে পুনরায় হাসপাতালে আনিয়া ভর্ত্তির জন্য বলিলে দুপুরে রোগীকে একটি খাটে শোয়ান হয়। শনিবার তাহাকে কোন খাদ্য বা ঔষধ দেওয়া হয় নাই। রবিবার সারাদিনের মধ্যে একবার সামান্য বার্লি দেওয়া হয়, কোন ঔষধ পড়ে নাই। ওখানে কার্য্যরত কয়েকজন তাহাকে বলে যে, তোমার এখানে চিকিৎসা করা হইবে না, যে তোমাকে ভর্ত্তি করিয়াছে তাহাকেই চিকিৎসা করিতে বলিও। সোমবার বিষয়টি সিভিল সার্জ্জেনের নিকট জানান হইয়াছে।

"২৪শে আগষ্ট বেলা ৩টায় খাটাগ্রামের রাখাল পালের পুত্রবধুকে হাসপাতালে আনা হয়। তাহার পেটে সন্তান মারা গিয়াছে দেখা যায়। বেলা ৫টায় ডাক্তার আসিয়া লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া যন্ত্রপাতি গরমজলে ফুটাইতে বলিয়া ক্লাবে চলিয়া যান—রাত্রি নয়টায় ফিরিয়া আসিয়া আবার রোগীকে দেখিয়া চলিয়া যান, রাত্রি ১১টায় আসিয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে ফরসেপ দিয়া মৃত সন্তানটিকে বাহির করিয়া দিয়াই চলিয়া যান। রোগিণীকে টেবিল হইতে হাঁটাইয়া আনিয়া খাটে শোয়ানো হয়। কোন ষ্ট্রেচারও পাওয়া যায় নাই বা ঐ ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে কোন নার্স দেখেন নাই।

"২৪শে আগষ্ট বৈকাল ৫টায় পুড়ামৌলা গ্রামের হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে আনা হয়। রোগিণীর প্রসবের বেদনা তিন দিন পূর্ব্ব হইতে হইতেছে এবং জল ভাঙ্গিয়া ছেলেটি ভিতরে বসিয়া গিয়াছে দেখিয়া একজন প্রাইভেট নার্স রোগিণীকে সঙ্গে করিয়া আনেন। যন্ত্রণায় রোগিণী চীৎকার করা সত্ত্বেও কোন নার্সের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তৎক্ষণাৎ ফরসেপ দ্বারা প্রসব করান দরকার ছিল—রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার বা নার্সের সাহায্য না পাইয়া সঙ্গের প্রাইভেট নার্স শেষ পর্য্যন্ত রোগিণীর জীবন বিপন্ন দেখিয়া ছেলেটিকে হাত দিয়া টানিয়া বাহির করেন। হাসপাতালে ছেলেটিকে পরিষ্কার করার মত গরম জলও পাওয়া যায় নাই, দোকান হইতে গরম জল করিয়া আনিয়া ছেলেটিকে ধোয়ান হয় এবং রোগিণীকে টেবিল হইতে হাঁটাইয়া বেডে লইয়া যাওয়া হয়। কোন ষ্ট্রেচারও পাওয়া যায় নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, "যেসব রোগী পয়সা খরচ করিতে পারে এবং ঘুষ দিবার কায়দা জানে, তাহাদের চিকিৎসার অসুবিধা হয় না।"

উপরোক্ত অভিযোগ কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। এগুলি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রকৃত তথ্য জানা কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ কোন সমস্যার কারণ হইতে পারে না। জনস্বার্থের খাতিরে এ ব্যাপারের অবিলম্বে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কাঁথিতে একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। সরকার নবগঠিত মিউনিসিপ্যালিটিতে তের জন সদস্যকে মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম :

১। সাবডিভিসনাল অফিসার, কাঁথি
২। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস, কাঁথি
৩। সাবডিভিসনাল হেলথ অফিসার
৪। শ্রীসতীশচন্দ্র জানা
৫। ,, রাসবিহারী পাল
৬। হাজি মহম্মদ সোলেমান আলি খাঁ
৭। শ্রীনটেন্দ্রনাথ দাস
৮। ,, খগেন্দ্রনাথ শাসমল
৯। ,, শরদিন্দু দাস
১০। ,, তারাপদ মিশ্র
১১। ,, শ্রীগোবিন্দ মুখার্জ্জী
১২। ,, অমরেন্দ্রনাথ মাইতি
১৩। ,, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি

বহুদিন হইতেই কাঁথিতে একটি মিউনিসিপালিটি গঠনের জন্ম চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু স্থানীয় কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী লোকের বিরোধিতার দরুন এই চেষ্টা এতদিন ফলবতী হইতে পারে নাই। কাঁথিতে মিউনিসিপালিটি গঠিত হইলে তাঁহাদের সম্পত্তির ট্যাক্স বৃদ্ধি পাইবে মূলতঃ বিরোধিতার ইহাই ছিল প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক কালে কাঁথি শহরের লোকসংখ্যা এবং গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানীয় অঞ্চলে সরকারী প্রচেষ্টায় রাস্তাঘাটের উন্নতি-সাধিত হওয়ায় কাঁথির বিচ্ছিন্নতা অনেকাংশে কমিয়াছে। কাঁথিতে মিউনিসিপালিটি গঠন সকল দিক হইতেই সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ এই নবজাত পৌরপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের প্রকৃত সুখসুবিধাবিধানে কতখানি সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে, তাহাই হইল প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির দুরবস্থার কথা স্মরণ রাখিলে পরে নূতন নূতন মিউনিসিপালিটি গঠনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি হতাশা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে দোষাবহ মনে করা যায় না।

ভারতকে মার্কিন ঋণদান

৯ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন হইতে ঘোষণা করা হয় যে আগামী দশ মাসে মার্কিন সরকার ভারতকে প্রায় দশ কোটি ডলার ঋণ দিবেন। ইতিপূর্ব্বে লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ৪ কোটি পাউণ্ড ঋণ দিবেন।

এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়া "রয়টার" লিখিতেছেন :

"ওয়াশিংটন, ৯ই সেপ্টেম্বর—আজ মার্কিন সরকার ঘোষণা করেন যে, ভারতের আর্থিক উন্নয়নের জন্ম আমেরিকা আগামী ১০ মাসে ভারতকে প্রায় ১০ কোটি ডলার ঋণ দিবেন।

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তিন দিন ওয়াশিংটনে আলোচনা চালাইবার পর আজ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে সরকারীভাবে উপরোক্ত ঘোষণা করা হয়।

পররাষ্ট্র দপ্তর আরও ঘোষণা করে যে, ভারতের নিকট ২০ কোটি ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্যবিক্রয় সম্পর্কে আমেরিকা আলোচনা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভারতীয় টাকায় ইহার মূল্য দিতে হইবে। এই ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, ১৯৫১ সনে ভারতকে যে গম-ঋণ দেওয়া হয়, তাহার মূল্য ও সুদ দিবার সময় পরবর্তী ৯ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে নয়াদিল্লীস্থ মার্কিন দূতাবাসকে ভারত সরকারের সহিত পত্রবিনিময়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিন সরকার যে ভারতকে ঋণ দিবেন, সেই সম্পর্কে ওয়াকেবহাল মহল পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম ১০ কোটি ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্তে ২ সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে বিশ্বব্যাঙ্কের সদর কার্য্যালয়ে ভারতের প্রধান পাওনাদারদের বৈঠকে গৃহীত হয়।

এই বৈঠকের পরেই ব্রিটেন ভারতকে ১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই ঋণ আগামী ৩১শে মার্চ অর্থাৎ ভারতের চলতি আর্থিক বৎসরের শেষ ভাগের মধ্যেই দেওয়া হইবে, এই বৈঠকে পশ্চিম জার্ম্মানী, ক্যানাডা ও জাপানের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। ৫টি পাওনাদার রাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাঙ্ক আগামী কয়েক মাসে ভারতকে যে ঋণ দিবে তাহার পরিমাণও প্রায় ৩৫ কোটি ডলার হইবে।"

বিদেশে অর্থমন্ত্রী

সম্প্রতি শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিদেশ সফর সম্পর্কে যে সংবাদ আমরা পাইতেছি তাহার মধ্যে নিম্নস্থ সংবাদ প্রণিধানযোগ্য :

মন্ট্রিল, ১৫ই সেপ্টেম্বর—অদ্য এখানে কমনওয়েলথ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা হইতেছে বিশ্বের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনসাধারণকে যদি দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে কমনওয়েলথ বা বিশ্ব আগাইয়া যাইতে পারে না।

ইহা আনন্দের বিষয় যে, কমনওয়েলথভুক্ত শিল্পোন্নত দেশগুলি এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন।

তিনি বলেন, সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা। ভারত এবং কমনওয়েলথের যে সব দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা পাইয়াছেন, তাহাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থমন্ত্রী ডাঃ এ. জে. আর, ভ্যানরিঝন কমনওয়েলথ সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কমনওয়েলথ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সংযোগিতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এখানে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্মুখে পেশ করার জন্ম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন, সম্মেলন সম্ভবতঃ তাহা সমর্থন করিবে। একটি কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হইতে পারে।

সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী ডাঃ হিথকোট বলেন যে, মন্ট্রিল সম্মেলনের লক্ষ্য হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহদান। ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কমনওয়েলথের দেশগুলি নানাভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে।

বিদেশী টাকার খোঁজের খবর

বিদেশী অর্থের সন্ধান কতদূর হইয়াছে নিম্নের সংবাদে তাহার কিছু জানা যায় :

ওয়াশিংটন, ২৯শে আগষ্ট—আগামী সাত মাস ভারতের উন্নয়ন কার্য্যক্রমে অর্থসংস্থানের জন্ম ৩৫ কোটি ডলার সাহায্য-

লাভের এক বিশদ পরিকল্পনা লইয়া ভারতের ভ্রাম্যমাণ অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদূত শ্রী বি. কে. নেহরু আজ বিমানে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

বর্তমান সপ্তাহে ওয়াশিংটনে তিন দিন আলোচনার পর পাঁচটি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনায় সম্মত হইয়াছে। ভারতের এই পাঁচটি প্রধান উত্তমর্ণ দেশ হইতেছে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও কানাডা। এই পাঁচটি দেশ ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ১৯৬১ সনের মার্চ মাসের মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ মধ্যে অতিরিক্ত আরও ৬০ কোটি ডলার ঋণ দিবার বিষয় বিবেচনা করার আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছে।

লণ্ডনে শ্রীনেহরু ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সহিত মিলিত হইবেন এবং উভয়ে সাহায্যের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীদেশাই ৬ই সেপ্টেম্বর চার দিনের জন্য ওয়াশিংটনে যাইবেন, অতঃপর তিনি মন্ট্রিল যাইবেন। তথায় ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক সম্মেলন আরম্ভ হইতেছে।

সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ৩৫ কোটি ডলারের প্রথম "কিস্তি" ১৯৫৯ সনের মার্চ মাসের মধ্যেই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক আগামী মার্চ মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ১০ কোটি ডলার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। এই অর্থের অধিকাংশ রেলওয়ে উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। ব্যাঙ্ক পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য আরও সাড়ে ২২ কোটি ডলার ঋণ দিবার বিষয়ে আলোচনা করিতেও প্রস্তুত। ভারত বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট সাড়ে ৪২ কোটি ডলারের ঋণে আবদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত, ব্রিটেন ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ কোটি ডলার, পশ্চিম জার্মানী আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ৪ কোটি ও পরবর্তী দুই বৎসরে আরও ৬ কোটি ডলার এবং কানাডা আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এখনই ১ কোটি ৭০ লক্ষ ও পরে আরও ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ দিবে।

ভারতের খনিজ তৈল

বোম্বাই রাজ্যের ক্যাম্বেতে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় দেশব্যাপী উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লোকসভায় ১২ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে খনি ও তৈল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য বলেন যে, ক্যাম্বে অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের জন্য ২৫শে জুলাই হইতে পাইপ বসান হইতেছিল—২রা সেপ্টেম্বর ৫৩৬৮ ফুট পাইপ বসান হইলে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্যাম্বেতে যে তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান করিয়াছেন তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব সরকারের, কারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বহুদিন যাবৎ অনুসন্ধান চালাইতে থাকিলেও এখনও পর্য্যন্ত কোন তৈলের সন্ধান করিতে পারেন নাই। ভারতীয়, রুশ ও রুমানিয়ান বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিতভাবে এই ব্যাপারে কাজ করেন। অবশ্য বাণিজ্যিক সম্ভাবনাপূর্ণ কোন তৈলখনি পাওয়া যাইবে কিনা তাহা তখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। আগামী তিন মাস হইতে বার মাসের মধ্যে তাহা বুঝা যাইতে পারে বলিয়া শ্রী মালব্য জানাইয়াছেন।

আসামে তৈলখনিগুলির সম্প্রসারণ এবং ক্যাম্বেতে তৈলের সন্ধান স্বভাবতঃই ভারতের তৈল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আশা জাগাইয়া তোলে। অবশ্য আসাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত তৈলখনিগুলির বিকাশসাধনের পর তৈল সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা-লাভের এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিসংখ্যানের দিকে তাকাইলেই তাহা স্পষ্ট হয়। ভারতে বর্তমানে পেট্রলের বার্ষিক চাহিদা ৫৭ লক্ষ টন, তন্মধ্যে ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র আড়াই লক্ষ টন। ভারতে পেট্রলের ব্যবহার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতে ৫৩·৬৩ কোটি টাকা মূল্যের পেট্রলজাত দ্রব্য আমদানী করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সনে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় ১০৮·০৩ কোটি টাকা মূল্যের পেট্রলজাত দ্রব্য আমদানী হয়। আগামী কয়েক বৎসরে পেট্রলজাত দ্রব্যের ব্যবহার আরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইবে। কলকারখানা এবং যানবাহনের চলাচলের বিকাশসাধনের ফলেই এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অনুমান করা হইয়াছে, ১৯৬১ সনে ৭৮ লক্ষ টন পেট্রলজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে। ১৯৬৬ সনে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন এবং ১৯৭৬ সনে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টন। বস্তুতঃ এই প্রভূত পরিমাণ পেট্রল যদি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় তবে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার উপর যে চাপ পড়িবে তাহা সামলান সহজ হইবে না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পেট্রল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভায় গোলমাল

গত ৮ই সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। স্পীকারের নির্দ্দেশ অমান্য করার দরুণ সেদিন ১৪ জন সোস্যালিষ্ট সদস্যকে বিধানসভা কক্ষ হইতে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে সরকারী খাদ্য-নীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছিল সে সম্পর্কে পুলিস কর্তৃক বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিধানসভায় আলোচনার জন্য সম্মতি দিতে স্পীকারের অস্বীকৃতির ফলে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তাহারই ফলে উক্ত ঘটনা ঘটে। বিরোধী সদস্যগণ পুলিসের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে স্পীকার তাহাদিগকে চুপ করিতে বলেন। স্পীকারের রুলিং-এ অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েকজন বিরোধীসদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিরোধীসদস্যের মধ্যে কেবল সোস্যালিষ্ট দলভুক্ত সদস্যগণ থাকিয়া যান। সোস্যালিষ্ট নেতা রাজনারায়ণ উঠিয়া

গ্রেপ্তারের কারণ জানিতে চাহিলে স্পীকার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি স্পীকারের আদেশ পালন না করায় স্পীকার তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলেন। শ্রীরাজনারায়ণ এই আদেশ পালন না করায় পুলিস আসিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দেয়; কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় সভাকক্ষে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয় বার পুলিস তাঁহাকে বাহির করিয়া দিতে আসিলে তিনি শুইয়া পড়েন এবং অন্যান্য সোসালিষ্ট সদস্য তাঁহার চারিদিকে একটি বেষ্টন রচনা করেন। বিশালবপু শ্রীরাজনারায়ণকে বহন করিয়া বিধানসভা-কক্ষের বাহিরে আনিতে পুলিসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

সেইদিন হইতে বিরোধীদলগুলি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন বর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। ডেপুটি স্পীকার শ্রীরাজনারায়ণ ত্রিপাঠীও অনুপস্থিত থাকিতেছেন। ডেপুটি স্পীকারের এইরূপ অনুপস্থিতিতে সরকারপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসম্পূর্ণানন্দ বলেন যে, যদি ডেপুটি স্পীকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনার বিষয় বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার শ্রী ত্রিপাঠী পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

আমেদাবাদে গোলমাল

আগষ্ট মাসে আমেদাবাদে মহাগুজরাট জনতা-পরিষদ কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি শহীদ-মূর্ত্তি অপসারণ লইয়া পুলিস ও পরিষদ স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে পুলিসের গুলীতে কয়েক ব্যক্তি হতাহত হয়। আমেদাবাদের একটি প্রধান রাস্তায় কংগ্রেসভবনের সম্মুখে পরিষদ ৮ই আগষ্ট একটি শহীদ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১২ই আগষ্ট পুলিস জোর করিয়া ঐ মূর্ত্তি অপসারণের চেষ্টা করিলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। পুলিসের আচরণে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসভবনের সম্মুখবর্তী স্থানটিতে একটি শহীদ-মূর্ত্তি স্থাপনের অনুমতিজ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু সরকার উহাতে সম্মত না হওয়ায় আমেদাবাদে একটি শহীদ-মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয় এবং অদ্যাবধি তাহা চলিতেছে।

সামান্য একটি মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ। কিন্তু উহার পিছনে গভীরতর কারণ নিহিত রহিয়াছে। বোম্বাই রাজ্যকে একটি দ্বিভাষী রাজ্য করায় গুজরাটী বা মরাঠী ভাষাভাষিগণ কেহই সুখী হন নাই। প্রথম হইতেই রাজ্যের সর্ব্বত্র অসন্তোষের ধোঁয়া উঠিতে থাকে। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি এবং মহাগুজরাট জনতা পরিষদের প্রতিনিধিদের বিপুল জয়ে রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধিতার গভীরতা প্রকাশ পায়। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি এবং মহাগুজরাট জনতা পরিষদ বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সর্ব্বসম্মত সমাধানে সচেষ্ট রহিয়াছেন। মহাগুজরাট জনতা পরিষদ ঘোষণা করিয়াছে যে, ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করা হইলে বোম্বাই নগরীকে মহারাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত করিলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। বিরোধীদলগুলির এইরূপ সম্মতির সুযোগ লইয়া সরকার যদি বোম্বাই রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য সচেষ্ট হন তবে হয়ত অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ান সম্ভব হইবে।

ভবানীপুর উপনির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (স্বতন্ত্র—বামপন্থী সমর্থিত) কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১০,৫৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উপনির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণকারী ভোটদাতার প্রায় শতকরা ৬৪ জনের ভোট তিনি পান।

এই বৎসরের গোড়ার দিকে শ্রী রায় কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নানারূপ দুর্নীতির অভিযোগ করিয়া মন্ত্রিসভা, কংগ্রেসদল এবং বিধানসভা হইতে পদত্যাগ করেন। পরে তিনি স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে এই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এই নির্ব্বাচন লইয়া বামপন্থী ও কংগ্রেসী উভয় মহলেই বিশেষ তোড়জোড় চলে এবং উভয় পক্ষই ইহাকে দলীয় মর্য্যাদার লড়াই-এ পরিণত করে। প্রভূত উত্তেজনার মধ্যে এই নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ হয়।

পার্লামেণ্টে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ছবি

ভারতীয় পার্লামেণ্টের কেন্দ্রীয় হলে ভারতের বিশিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হইয়াছে; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত কোন বাঙালী মনীষীর প্রতিকৃতি তথায় ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তথায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিনখানি তৈলচিত্র স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ আনন্দের কথা, তবে এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে হয় যে, ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন এবং জাতীয়তার মন্ত্রদাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি অন্ততঃ সেই সঙ্গে সেখানে থাকা উচিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দেমাতরম ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত, সেই হিসাবেও অন্ততঃ পার্লামেণ্ট ভবনে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি থাকা উচিত।

কর্পোরেশন ও জনসাধারণ

"যুগবাণী" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কর্পোরেশনের বিভাগীয় অফিসারদের কর্ম্মপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন:

"কলিকাতা শহরে ১৪, দেশপ্রিয় পার্ক ইষ্ট বাড়ীটিতে নূতন কাজ হইতেছে এবং তার জন্য রাস্তায় ইট, বালি প্রভৃতি নামাইতে হইতেছে। বাড়ীর সামনে ফুটপাথে ঐগুলি নামাইলে কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হয় এবং পাঁচদিনের মধ্যে মাল সরাইয়া নিলে প্রতি বর্গফুটে এক আনা ভাড়া দিতে হয়; পাঁচদিনের বেশী হইলে চার আনা লাগে। এই টাকাটা সাধারণতঃ কর্পোরেশনের তহবিলে যায় না, ব্লক সরকার প্রভৃতির এটি উপরি আয়। যথারীতি ঐ

বাড়ীর মালিকের নিকটেও ঐ মনোভাব দেখানো হয়। তাঁহারা লাইসেন্স লইয়া যথানির্দ্দিষ্ট চার্জ্জ দিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের বিরাগভাজন হন। ২৫শে মার্চ্চ মাল নামিল, ২৭শে মার্চ্চ চিঠি আসিল যে, পাঁচদিন হইয়া গিয়াছে, অতএব চার আনা হারে ৫০·২৫ টাকা দিতে হইবে। কর্পোরেশনের ১০ মাসে বছর হয়, অনেক সময় তারও বেশী লাগে এটা জানা কথা, কিন্তু কর্পোরেশনের ক্যালেণ্ডারে দুই দিনে পাঁচদিন হয়, এটা আমাদেরও জানা ছিল না। বাড়ীর মালিক এক আনা হারে টাকা দিতে চাহিলে তাহা নেওয়া হইল না। মামলা পাঠানো হইল মিউনিসিপাল আদালতে। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং এক আনা হারে চার্জ্জ জমা নিতে আদেশ দিলেন।

এই সম্পর্কে "যুগান্তরে" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আরও চমকপ্রদ। আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম:

কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ-সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অবৈধ ক্রিয়াকলাপের চমকপ্রদ এক কাহিনী পৌরসভায় উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতেছে না। কার্য্যসূচীতে স্থান পাইলেও অন্ততঃ তিন সপ্তাহ কোন-না-কোন কারণে ইহার উত্থাপন ও আলোচনা পিছাইয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি তদন্তের জন্ম যে বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাঁহার চেয়ারম্যান গত শুক্রবার মেয়রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রকে আগামী শুক্রবারের কার্য্যসূচীতে ইহাকে প্রথম স্থান দিবার জন্ম অনুরোধ জানান। আশা করা যায়, এই শুক্রবার ইহার আলোচনা ও নিষ্পত্তি হইবে। অবশ্য নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না; কেননা, গত শুক্রবার কমিটির চারজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র চেয়ারম্যান ছাড়া আর কেহই পৌর-সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন; সেই রিপোর্টে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনশ্রুতির সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পৌর-প্রতিষ্ঠানের কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি কেমন তৎপর হইয়া উঠিতে পারেন, আবার প্রয়োজনমত শ্লথগতি হইতে পারেন এবং চক্ষু থাকিতেও অন্ধ সাজিতে পারেন তাহা কমিটি উদ্‌ঘাটিত কাহিনীতে দিবালোকের মত স্পষ্ট। খুঁটির জোর থাকিলে গৃহনির্ম্মাতারা পৌর কর্ত্তৃপক্ষের বিধিনিষেধকে কিভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নেপথ্যে প্লাস্টার চালাইয়া যাইতে পারেন সেই চলচ্চিত্রটিও কমিটির বিবরণীতে উপভোগ্য।

ভারত-পাক আলোচনা

নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ে দুইদিন ব্যাপী যে যুক্ত-বৈঠক হইয়া গেল তাহার ফলাফলে বিশেষ উৎসাহিত হইবার কারণ না থাকিলেও নিরাশারও কোন কারণ নাই। ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে কালো আবরণ ক্রমবর্দ্ধমান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল। একদিনে তাহা দূর হইতে পারে এমন আশা সম্ভবতঃ কেহই করেন নাই। সেই দিক হইতে বিচার করিলে যে সকল ব্যাপারে উভয় প্রধানমন্ত্রী একমত হইতে পারিয়াছেন, ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। বাগে রোয়েদাদের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতবিরোধ ছিল—দুইটি বিষয় সম্পর্কে সে মতবিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। অপর যে দুইটি বিষয় সম্পর্কে কোন মতৈক্য সম্ভব হয় নাই সেগুলি হইল পাথোরিয়া জঙ্গল এবং কুশিয়ারা নদী। অবশ্য পশ্চিম-সীমান্তের পাঁচটি বিতর্কমূলক বিষয়ের কোনটিতেই সমাধান হয় নাই। দুই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সকল সমস্যার সমাধান করিবেন।

সে সকল সমস্যা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে সেগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ—তবে প্রশ্নগুলি দীর্ঘদিনে যে জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে মাত্র দুই দিনের আলোচনার পর এগুলি মীমাংসা না হইয়া থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ আলোচনার মারফত সীমান্ত-সমস্যা সমাধানের যে সঙ্কল্প জানাইয়াছেন, তাহাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী ফিরোজ খাঁ নুন এবং শ্রীনেহরু পরস্পরের সহিত সংযোগ রাখিবেন বলিয়াছেন, আশা করা যায়, উভয় প্রধানমন্ত্রীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়া উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইবে।

সীমান্ত-সম্পর্কিত আলোচনায় ভারত পাকিস্থানকে কয়েক মাইল স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহাতে কোন কোন ভারতীয় মহল ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ভারতীয় সীমান্তে পাকিস্থানী হামলায় যাহারা অতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে হয়ত এই মনোভাব অপ্রত্যাশিত নহে, তবে আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়ার জন্ম কয়েক মাইল স্থান যদি ছাড়িয়া দিতে হয়, সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহা নিন্দনীয় নাও হইতে পারে। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে শ্রীনুন মুখে ভাল ভাল কথা বলিলেও কার্য্যে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া চলিবেন সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা কোথায়। পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত ভারত-পাক প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকেই বলিতেছেন যে, কাগজেপত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও দেখা গিয়াছে যে, ভারত-পাক সম্পর্কের কোন উন্নতি ত ঘটে নাই, উপরন্তু বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে অবনতিই ঘটিয়াছে। এই সকল সমালোচনার গুরুত্ব অস্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে, যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব স্থাপনের একটি মাত্র পথই খোলা রহিয়াছে—তাহা হইল পারস্পরিক বিশ্বাস। সুতরাং ভারত এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যে বোঝা-পড়া হইয়াছে, যাহাতে তাহা আরও গভীরতর এবং ব্যাপক হয় সে চেষ্টা ভিন্ন সুস্থ নাগরিকদের নিকট আর কোন পথই নাই।

নেহরু-নুন বাঁটোয়ারা

আমাদের প্রধান মন্ত্রী কোনও দিনই অঙ্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। সুতরাং যোগ বিয়োগে ভারত ঠকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য

কি? শুধু এই কথা যে এইরূপ বাঁটোয়ারা করিবার অধিকার কাহার?

নয়াদিল্লী, ১৬ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কুচবিহারের ছিটমহলগুলি ও জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বিনিময় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আটজন কংগ্রেস এম-পি শ্রীনেহেরুর নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীপশুপতি মণ্ডল ও শ্রীনৃসিংহ মল্লদেব।

প্রকাশ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী ও শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহ এবং মানচিত্র ও র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পরিষ্কার করাইয়া লইবার জন্য মঙ্গলবার বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের কমনওয়েলথ বিভাগে যাইয়া শ্রীনেহেরুর নিকট প্রেরিত পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বর্ত্তমানে জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনের সেটেলমেণ্ট ম্যাপেও তাহাই দেখানো আছে বলিয়া জানা যায়।

শ্রীনেহরু গত শুক্রবার লোকসভায় দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বোঝাপড়ার ফলে পাকিস্থানস্থিত কুচবিহারের ছিটমহলগুলি পাকিস্থানে এবং ভারতের ছিটমহলগুলি ভারতে যাইবে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ এম-পি বলেন যে, কুচবিহারের ছিটমহলগুলি পাকিস্থানে স্থানান্তরিত হইলে প্রায় দশ হাজার উদ্বাস্তু পুনরায় বাস্তুহারা হইবে। উহারা পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া এই সকল ছিটমহলে বাস করিতেছিল। তিনি আরও বলেন যে, ভারত বিনিময়ে যে অঞ্চল পাইবে তাহা পাকিস্থানকে প্রদত্ত অঞ্চলের মাত্র অর্দ্ধেক হইবে। যে দশ হাজার উদ্বাস্তু পুনরায় উদ্বাস্তু হইবে তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তিনি তাহাও জানিতে চাহেন।

জিলাবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ

বিহার সরকার জেলাবোর্ডগুলির পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর সকল রাজ্যেই জেলাবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। বিহার সরকার এক অর্ডিন্যান্স বলে সকল জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে লোকাল ও জেলাবোর্ডসমূহের ভার গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী নির্ব্বাচিত কমিটিগুলি বাতিল করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সে সরকার জেলাবোর্ডগুলির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তবে যে ভাবে অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে বিনা নোটিশে ইহা করা হইয়াছে তাহাতে যদি কেহ ধরিয়া লন যে, ইহা বোর্ডগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনেরই পূর্ব্বাভাষ তবে তাহা বিশেষ অসমীচীন হইবে না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির প্রয়োজনীয়তা কি একেবারেই শেষ হইয়াছে? এই সকল বোর্ডগুলির প্রধান কাজ ছিল রাস্তা নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জল-সরবরাহ, গো-মহিষাদি জন্তু রক্ষা ও পরিচর্য্যা, সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানে এগুলির দায়িত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। বোর্ডগুলি সেই আদায়লব্ধ অর্থে চলিত কিন্তু কোন বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে অর্থব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। প্রতিপদে তাহাদিগকে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। বিহার সরকার স্পষ্টই মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে জেলা-বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়াছে। এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। জেলাবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিহার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যেও উঠিয়াছে। সকল রাজ্যেই ইহাদের গঠন এবং কর্ম্মধারা প্রায় এক রকম—সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা মারফৎ একটি সর্ব্বভারতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

রাজ্যসভায় খাদ্য প্রসঙ্গ

খাদ্যনীতি বলিয়া কোনও কিছু আমাদের দেশের জনসাধারণ বা অধিকারীবর্গ জানেন কিনা জানি না। কিন্তু সংবাদের মধ্যে নিম্নরূপ বিবৃতি দেখিয়া মনে হয় যে সরকারের চৈতন্য উদয় হইতেছে:

নয়াদিল্লী, ১৬ই সেপ্টেম্বর—অদ্য রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বিভিন্ন রাজ্যে অনুসৃত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের পক্ষে অকার্য্যকর খাদ্যনীতির তীব্র নিন্দা করেন।

খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই দিনব্যাপী বিতর্কের উত্তরে শ্রীজৈন রাজ্যসমূহকে কঠোর ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, খাদ্যশস্যের জন্য যদি চাহিদা ক্রমাগতই বাড়িয়া যায় তবে কেন্দ্র সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

রাজ্যসমূহের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্র নিরপেক্ষ নয় এবং ভূমি-সংস্কার কার্য্যসূচী সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই বলিয়া সদস্যগণ যে সমস্ত সমালোচনা করেন বক্তৃতায় শ্রীজৈন প্রধানতঃ তাহারই জবাব দেন।

শ্রীজৈনও এ বিষয়ে একমত হন যে, খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি-সংস্কার প্রয়োজন এবং তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করিতেছে। তিনি বলেন, সমগ্র দেশে এই সংস্কারের সূচনা করা তাঁহার কাজ নয়। কংগ্রেস কর্ত্তৃক শ্রীডেবর, পণ্ডিত পন্থ ও শ্রীদেশাইকে লইয়া গঠিত ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটির আলোচনার কথা উঠে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সরকারী তথ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন, ঘাটতি রাজ্যসমূহে খাদ্যশস্য বরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্রের আচরণ উদার। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানান, রাজ্যসমূহ যদি অতিরিক্ত দাবী করে এবং যাহা মজুত আছে তাহা অপেক্ষাও যদি মোট দাবীর পরিমাণ বেশী হয়, তবে সমস্ত রাজ্যে খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যাপারে তাঁহাকে নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। কেন্দ্র হইতে অধিক খাদ্যশস্য আদায়ের জন্য রাজ্যসমূহের বিভিন্ন দল যে চাপ দিতেছে তাহাতেও তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহাতে নতি স্বীকার করিবেন না। তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, এই চাপে কাজ হইবে বলিয়া যদি ধারণা জন্মে তবে খাদ্যদপ্তর ও সরকারের সমাধি রচিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশের খাদ্যদপ্তরের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি পঞ্জাব সরকারের দৃষ্টান্তের প্রশংসা করেন। পঞ্জাব সরকার মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সাত লক্ষাধিক মণ গম উদ্ধার করিয়াছেন এবং এইভাবে মূল্যও হ্রাস করিয়াছেন।

কলিকাতার ছেলেমেয়ে

এই মহানগরীতে শিশু ও কিশোরের জীবন কিরূপ তাহার একটি চিত্র ১২ই সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় দিয়াছেন। আমরা বিনা মন্তব্যে তাহা নীচে দিলাম:

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়ে তাহাদের শতকরা ৬০ জনই অপুষ্টি অথবা কোন না কোনরূপ স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। এই সম্পর্কে কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং স্বাস্থ্য কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৭ সনের জুলাই হইতে ১৯৫৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ছাত্রছাত্রীদের যে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চালান হয়, তাহাতেই উপরোক্ত চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

ঐ পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, পর্যবেক্ষণাধীন মোট ১০,০১৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪০৯৭ জনই অপুষ্টিতে ভুগিতেছে এবং ২,৮৩০ জন দাঁত ও মাড়ির বিবিধ রোগে কষ্ট পাইতেছে। ইহা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা গলা, গ্রন্থি, গাষ্ট্রো ইনটেষ্টিনাল, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার নানা রোগেও ভুগিয়া থাকে। পর্যবেক্ষণাধীন উপরোক্ত মোটসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬,৮৭৭ জন ছিল ছাত্র এবং ৩,১৩৮ জন ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে ৪,৩৬৫ জন এবং ছাত্রীদের মধ্যে ১,৮৫৩ জনের স্বাস্থ্যই কোন না কোনভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের পর সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীতে চিকিৎসাদির সুবিধার্থ ১,৬০৫টি কার্ড ইসু করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলার কর্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এই সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নরূপে ১১ই সেপ্টেম্বর দিয়াছিলেন। তার পর আর কিছু নাই:

পশ্চিমবঙ্গে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে রাজ্য সরকার ঐসব দ্রব্যের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এক অর্ডিন্যান্স জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যায়, দুই-এক দিনের মধ্যেই এই অর্ডিন্যান্স জারী হইবে এবং সমগ্র রাজ্যে উহা বলবৎ হইবে।

প্রকাশ, চাউল, আটা, গম, সরিষার তৈল, মশলাপাতি, ডাল, শিশুদের খাদ্য যথা, গুড়া দুধ বা ঐ ধরনের দ্রব্যাদিসহ কতকগুলি ঔষধপত্রও ঐ অর্ডিন্যান্সের আওতায় আসিবে। সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ার পর যদি কোন বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী বেশী মূল্যে ঐগুলি বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা থাকিবে বলিয়া প্রকাশ। কারাবাস, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডদানের ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত কয়েকমাস ধরিয়া নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত আসিয়াছে। কতকগুলি মশলার দর দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ডালের দরও অনুরূপ বাড়িয়াছে। কতকগুলি শিশু ও রোগীর খাদ্য এবং পানীয় জাতীয় দ্রব্যের দাম দ্বিগুণের চেয়েও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানী হ্রাসের ফলে কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হইতে পারিতেছে না। ফলে, কিছু মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক ধরিয়া লইলেও এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর কার্যকলাপই একমাত্র কারণ বলিয়া সরকারী মহল মনে করেন।

কিরূপ হারে এবং কিসের ভিত্তিতে মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে এই বৎসরের গোড়ার দিকে যে মূল্য ছিল, তাহারই ভিত্তিতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া একটি মহল হইতে সংবাদ পাওয়া যায়।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স জারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলিয়া প্রকাশ। এক্ষণে উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যায়, বৃহস্পতিবার কি শুক্রবারের মধ্যে এই অর্ডিন্যান্স হইবে।

১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। চারি বৎসর পর আবার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

কলিকাতার কলেজ

কলিকাতার অতিকায় সাতটি কলেজের বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যপ্রাপ্তির প্রশ্ন লইয়া সম্প্রতি যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে এক্ষণে একটি চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রভর্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং বর্তমান ছাত্রসংখ্যার যে দুইটি রিপোর্ট ঐ সকল কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের নিকট পৃথক পৃথক ভাবে দাখিল করিয়াছেন, তাহাতেই দেখা যায় যে,

একটি মাত্র কলেজ ছাড়া প্রত্যেকটি কলেজেই বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ভর্তির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের মধ্যেই এই অসামঞ্জস্য ধরা পড়ায় রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের কেহ কেহ এবং সংশ্লিষ্ট অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

কেহ কেহ অবশ্য এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সঠিক ছাত্রসংখ্যা হয় ত আরও বেশী। অপরিসর ক্লাস-রুম, ভাল কমন-রুমের অভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধা ঐ সকল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াও কোন কোন মহলে মন্তব্য করা হয়। অফ-পিরিয়ডে ছাত্রছাত্রীদের স্থানাভাবে রাস্তায় বা পার্কে ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুমোদিত কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতনের হার উন্নয়নকল্পে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, সেই পরিকল্পনাটি কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া বৃহস্পতিবার সরকারীসূত্রে জানা যায়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে বেতনের এই নূতন হার কার্য্যকরী হইবে। অনুমোদিত এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে গত বৎসরের মঞ্জুরীকৃত টাকা এক্ষণে বণ্টন করা হইবে। রাজ্য সরকার বর্ত্তমান বৎসরের ম্যাচিং-গ্রান্টের টাকাও দিবেন। পশ্চিমবঙ্গের ১০৬টি কলেজের মধ্যে ৭৭টি কলেজ এই অর্থমঞ্জুরী পাইয়াছে।

বিদ্যাসাগর কলেজ, সিটি কলেজ এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মহিলা বিভাগও অর্থমঞ্জুরী পাইয়াছে। তবে ঐ সব কলেজে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই পার্ট-টাইম কাজ করেন বলিয়া টাকা বেশী পাওয়া যাইবে না।

জানা গিয়াছে যে, অনুমোদিত কলেজগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনার এই সুযোগ ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র তাহাদের কনষ্টিটুয়েণ্ট কলেজগুলি সম্পর্কেই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিশন এইরূপ সিদ্ধান্তও করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে যদি কোন সেকেণ্ড গ্রেড কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কলেজ) ডিগ্রী কলেজের অনুমোদন লাভ করে এবং রাজ্য সরকার ঐ কলেজ সম্পর্কে সুপারিশ করেন, তাহা হইলে উহার শিক্ষকবর্গও (যেদিন হইতে ডিগ্রী ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উন্নীত হইয়াছে) ঐ পরিকল্পনার সুযোগ লাভ করিবেন।

জগজীবনরামের রেলপথ

নীচের সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রীবর জগজীবনরাম রেলের অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া আনিতেছেন :

নয়াদিল্লী, ৩০শে আগষ্ট—আজ রেলওয়ে মন্ত্রণালয় রেল-দুর্ঘটনা সম্পর্কে এক সরকারী পর্য্যালোচনায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সনে ভারতবর্ষে যাত্রী ট্রেন ৩০ বার সজ্ঘর্ষের মুখে পড়িয়াছে এবং ২০১ বার লাইনচ্যুত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩ ও ১৯৭।

১৯৪৭-৪৮ সনে ৩৩৯টি সজ্ঘর্ষ ও লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর রেল দুর্ঘটনার ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেল দুর্ঘটনার তথ্য সর্ব্বশেষে ১৯৫৫-৫৬ সন হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসরে ভারতে যাত্রী, মাল ও অন্যান্য ট্রেন মিলাইয়া প্রতি ১০ কোটি ট্রেন মাইলে ৩৬ বার সজ্ঘর্ষ ও ৫২০ বার লাইনচ্যুতি হইয়াছিল। ১৯৫৫ সনে ব্রিটিশ রেলওয়েতে ৯৮টি সজ্ঘর্ষ ও ৫১ বার লাইনচ্যুতি ঘটে। ঐ বৎসরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেল দুর্ঘটনার হিসাবে দেখা যায় যে, ২৮৯টি ক্ষেত্রে সজ্ঘর্ষ এবং ৬২৭টি ক্ষেত্রে লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটিয়াছিল।

আচার্য্য বিনোবা জন্মোৎসব

নিম্নের সংবাদে দেখা যায় বিনোবাজীর জন্মদিনের উপহার যথার্থই ঠিক হইয়াছে :

আক্রলকুয়া (মহারাষ্ট্র), ১৪ই সেপ্টেম্বর—১১ই সেপ্টেম্বর আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে তাঁহার ৬৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে আক্রলকুয়া তালুকের ৬৪টি গ্রাম দান করা হইয়াছে।

'জন্মদিনের উপহার' সহ মহারাষ্ট্র হইতে প্রদত্ত ১৫৬টি গ্রামের দানপত্র আজ এখানে ভূদান নেতাকে অর্পণ করা হয়। আচার্য্য বিনোবা ভাবে স্বয়ং কাঁথি নামক স্থানে স্থাপিত শিবিরে জন্মদিবস অতিবাহিত করেন। গ্রামের আদিবাসীরা ৬৪টি প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। 'পদযাত্রি'গণ ভজন গান করেন এবং বিনোবাজীকে হাতে-কাটা সূতা উপহার দেন। আক্রলকুয়ার জনৈক ভূতপূর্ব্ব রাজা আচার্য্য ভাবেকে এক হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আচার্য্য ভাবে আমলাবাড়ী গ্রামের পাশ কাটাইয়া গতকাল এখানে আসেন। এই গ্রামটি তাঁহার ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ঐ গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি ঐ গ্রাম বাদ দিয়াছেন।

গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত অধিকার বর্জন করিয়া সমুদয় সম্পত্তি গ্রামের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইতে দিতে সম্মত হওয়ায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে বিভিন্ন সভায় গ্রামবাসীদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, এই আদর্শ সমগ্র জাতি ও পৃথিবীর উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করিবে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য

আনন্দবাজার পত্রিকা বিগত ১৫ই ভাদ্র নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন। তাহার পর অবস্থা ঘোরালো হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত হইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর নূতন উপাচার্য্যের নামের

তালিকা ঠিক করার জন্ম শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কর্ম্ম-সমিতির সভা বসিতেছে। শ্রী দাশ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র।

বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হওয়ায় নূতন উপাচার্য্য নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, ১লা অক্টোবর অধ্যাপক বসু উপাচার্য্য পদে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছেন।

প্রকাশ, প্রধান বিচারপতি শ্রী দাশ উপাচার্য্য পদ গ্রহণে সম্মতি দেওয়া সত্ত্বেও অবিলম্বে তাঁহাকে নিয়োগ করার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পদে তাঁহার কার্য্যকাল ১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে শেষ হওয়ার কথা। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে বিশ্বভারতীতে যোগদান করা নাকি সম্ভব নহে। তাই ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাস হইতে পুরা মেয়াদের উপাচার্য্যরূপে বিচারপতি শ্রী দাশকে নিয়োগ করিয়া অন্তর্বর্ত্তী এক বৎসর কালের জন্ম অস্থায়ী উপাচার্য্যরূপে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

পাকিস্থানের টাকার মূল্য

এই সংবাদটির খাঁটি অর্থ বুঝা দায়। তবে আমাদের লাভ হইবে না নিশ্চয়:

বোম্বাই, ১লা সেপ্টেম্বর—ব্যবসায়ী মহলে জানা যায় যে, ষ্টার্লিং অঞ্চলের মুদ্রার সহিত পাকিস্থানী টাকার মূল্য সমান হারে ধার্য্য করার ফলে আগামী কাল হইতে পাক-ভারত বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ খরচ বাড়িতে পারে।

এই সূত্রে আরও প্রকাশ যে, এতদিন ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পাকিস্থানী টাকা বেচাকেনা করিত। কিন্তু এখন ষ্টার্লিংয়ে পাওনা মিটাইতে হইবে। বাজারের অবস্থা অনুযায়ী ষ্টার্লিংয়ের হার ঠিক করা হয়। ইহার ফলে পাক-ভারত বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ খরচ বাড়িতে পারে।

গত ১৬ই আগষ্ট ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৮ সনের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য ও অন্যান্য পরোক্ষ পাওনা ষ্টার্লিং বা ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্য কোন মুদ্রায়ও মিটান যাইবে।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাকিস্থানী টাকাকে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য মুদ্রার সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলার দরুন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির লাভ হইতে পারে, কারণ ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে বৎসরে প্রায় ২০ কোটি টাকার আমদানী-রপ্তানীর কাজ হয়।

কিন্তু ১৯৫৭ সনে পাকিস্থানের সহিত ব্যবসায় ভারত মাত্র সাত কোটি টাকার রপ্তানী বাণিজ্য করে অথচ পাকিস্থান হইতে ভারত প্রায় তের কোটি টাকার মাল আমদানী করে।

পাকিস্থানের জেলে আটক বন্দীর মৃত্যু

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি"র সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্ট ইলেকট্রিক কোম্পানীর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত চৌধুরী মহাশয় ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬।০ ঘটিকায় শ্রীহট্টের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৯ বৎসর।

৮ই আগষ্ট রাত্রি ১০ ঘটিকায় শ্রীচৌধুরীকে প্রাদেশিক নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক রাখা হয় এবং তৎপর মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্ব্বাহ্নেই ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী তাঁহাকে আটক বন্দীরূপে রাখা হয়। শ্রীচৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন মহল হইতেই নানারূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, কিন্তু কোনটারই সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীচৌধুরীর শোকাবহ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "জনশক্তি" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

"মাসখানেক পূর্ব্বে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া এই সকল রাজবন্দীকে পূর্ব্ব পাকিস্থানে মন্ত্রীমণ্ডলীর পুনর্বহালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ১৮১৮ সনের তিন আইনের কবলে আনিয়া রাজবন্দী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এগার বৎসর হইল আমরা স্বাধীন হইয়াছি—কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্ম ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ যে বেআইনী আইন প্রচলিত করিয়াছিল আজও আমরা তাহার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইলাম না। যে নয় জন শ্রীহট্টবাসীকে আজ এক মাস কাল যাবত বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে তাঁহারা কি অপরাধ করিয়াছেন সিলেটের লোক কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ইঁহাদের কেহই যুক্ত ছিলেন না।

"মনোরঞ্জন বাবু দীর্ঘকাল যাবতই হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতাজনিত রোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা যতদূর সংবাদ পাইলাম, তাঁহার এই রোগের বিষয় জেল কর্ত্তৃপক্ষও অবগত ছিলেন। একটি মূল্যবান জীবনকে এই রকম করুণ অবস্থায় অবসান লাভ করিতে দেওয়ার মধ্যে কোন নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি ক্রিয়া করিতেছিল সেরূপ অভিযোগ না তুলিয়াও দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—একে এই ভাবে জেলে আটকাইয়া না রাখিয়া ইঁহার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করিয়া স্ত্রীপুত্রের সান্নিধ্যেও ত নজরবন্দী করিয়া রাখা যাইতে পারিত। যাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকারপক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাকে বিনা বিচারে আটকাইয়া রাখার সময়ে তাঁহার প্রাণরক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্বও যে সরকারকে গ্রহণ করিতে হয়, আমাদের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ এই কথা কেন ভুলিবেন তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।"

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সংস্কৃত শিক্ষা

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সংস্কৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। উপযুক্ত শিক্ষক

সংগ্রহ এমন কিছু কঠিন কাজ নহে যে, শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব ; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে তেমন আগ্রহান্বিত বলিয়াও মনে হয় না। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "বরিশাল হিতৈষী" লিখিতেছেন :

"বর্ত্তমান বৎসরে যে সব হিন্দুছাত্র সংস্কৃত বিষয় নিয়া ব্রজমোহন কলেজে ভর্ত্তি হইতেছে তাহাদের বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ভবিষ্যতে কিন্তু তাহাদের সংস্কৃত বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইতে পারে।

"আমরা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি—এই ভাবে বিশেষ এক সম্প্রদায়কে চিরাচরিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত না করিয়া যতদিন নূতন অধ্যাপক না পাওয়া যাইতেছে ততদিন অতুলবাবু ও বিপিন বাবুকে রাখিতে দোষ কি ? বার্দ্ধক্যের দিক দিয়া এঁরা বৃদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু শিক্ষকতার দিক দিয়া এরা যে বৃদ্ধ নন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়া প্রমাণ করিতে পারি। সর্ব্বশেষে আমরা আমাদের সহৃদয় জিলা শাসক মিঃ ওচমান সাহেব এর আশু দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।"

দূরপ্রাচ্যে সঙ্কট

চীনের উপকূলস্থিত দ্বীপগুলি লইয়া দূরপ্রাচ্যে এক নূতন সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। চীন অতি স্বাভাবিক কারণেই তাহার উপকূলবর্ত্তী মাৎসু ও কুয়েময় দ্বীপগুলি পুনর্দখলে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিতে উদ্যোগী হইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অযৌক্তিক আচরণ কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই সমর্থন করে নাই—ভারতও করে নাই। চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত যাহাই থাকুক না কেন সেহেতু চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই, যেমন নাই আরকানসাসের লিটল রক বিদ্যালয়ে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের। প্রধানতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া চিয়াং কাইশেক ফরমোজার এখনও প্রভুত্ব করিতে পারিতেছে। চিয়াং-এর রাজনীতি সম্পর্কে এখন আর কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। মাও-সে-তুং সরকার চিয়াং কাইশেককে সম্মানজনক সর্ত্তে রক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু চিয়াং তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। উপরন্তু ফরমোজাকে পশ্চিমী সামরিক জোটের সহিত বাঁধিয়া তিনি দূরপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ব্যাহত করিতে দ্বিধা করেন নাই। চীনা কম্যুনিষ্ট আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইবার কোন ক্ষমতাই চিয়াংয়ের নাই—কেবলমাত্র মাকিন সামরিক আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছেন। চিয়াং কাইশেকের প্রতি এই মাকিনী দরদ ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত সুনজরে দেখেন না, কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বৈদেশিক বিষয়ের পরামর্শদাতাদের ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই। অবশ্য এইরূপ অদূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বনের ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে, কিছু কিছু মাকিন নাগরিক তাহা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ দুর্ব্বল।

সোভিয়েটে পারমাণবিক গবেষণার অগ্রগতি

শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জেনেভাতে একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন চলিতেছে। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তির কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা অধ্যাপক ভ্যাসিলি ইয়েমেলিয়ানফ এক বক্তৃতায় এই ক্ষেত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের গবেষণার ধারা এবং ফলাফল সম্পর্কে এক বিবরণী দেন। অধ্যাপক ইয়েমেলিয়ানফের বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা যায় :

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের তাপ-পারমাণবিক শক্তির উৎপাদক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে একটি ব্রিটিশ "জেটা"র অনুরূপ। পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

পারমাণবিক শক্তি-চালিত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চলন্ত (মোবাইল) পারমাণবিক ষ্টেশন নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। পারমাণবিক শক্তির দ্বারা জাহাজ চালাইবার জন্য একটি "সংযুক্ত ডিউটেরিয়ম ট্রাইটিয়ম রিঅ্যাক্টর" নির্ম্মাণ করা সম্ভব বলিয়া সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়াররা মনে করিতেছেন। উরালস, লেনিনগ্রাদ ও ভোরোনেজ এলাকাগুলিতে পরমাণুশক্তি-চালিত কতকগুলি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্ম্মিত হইতেছে। "নিউক্লিয়নিক্স" সংক্রান্ত গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্য চালাইবার জন্য ভোলগা অঞ্চলে একটি বৃহৎ বীক্ষণাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে সাফল্য

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের শ্রীব্রজেন দাস সম্প্রতি ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময়ের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার পূর্ব্বে এশিয়ার আর কেহই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়া পার হইতে পারে নাই, তিনি প্রথম চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই কৃতিত্বে বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরব অনুভব করিবেন।

শঙ্কর-দর্শনে "মোক্ষ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

১

শঙ্কর-মতে, জীব অবিদ্যাপ্রসূত, সকাম কর্মবশতঃ জড় স্থূল-দেহ, সূক্ষ্মদেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সঙ্গে যেন সংযুক্ত হয়ে সংসারে জন্মপরিগ্রহ করে। এরই নাম হ'ল 'বন্ধ'। এই অবস্থায়, অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীব জড় দেহমনের ধর্মাদি অজড়, জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্যমাত্র, বিজ্ঞানঘন আত্মায় অধ্যস্ত বা আরোপ করে। এরূপ, অবিদ্যাজনিত অধ্যাসের ফলেই জীব যেন অসংখ্য দুঃখক্লেশাদিভাগী হয়। সেজন্যই সংসারকে, বন্ধাবস্থাকে সকল মতবাদেই অসীম দুঃখাগার-রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণেই বৌদ্ধমতবাদের দুটি মূলীভূত তত্ত্ব সকল মতবাদই সাধারণ ভাবে গ্রহণ করেছেন: "সর্বং দুঃখং দুঃখম্", "সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্"। বৌদ্ধমতানুযায়ী এক ক্ষণমাত্র স্থায়ী না হলেও, সত্যই প্রত্যেক পার্থিব বস্তুই অল্পস্থায়ী, জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-পরিণাম-ক্ষয়-মরণরূপ ষড়্‌বিকারভাগী। এরূপে যে কোন জাগতিক দ্রব্যই জন্মপরিগ্রহ করবার বা সৃষ্ট হবার পরে, কিছুকাল স্থিতি করে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্য দ্রব্যে পরিণত বা পরিবর্তিত হয়, বৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয়ে ক্ষয় বা জরাগ্রস্ত হয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, পরিশেষে মরণ বা ধ্বংসের কবলগ্রস্ত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়। যথা, অঙ্কুর থেকে পুষ্প জন্মলাভ করে, অল্পমাত্র কাল স্থিতি করে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ-বিকশিত হয় তার অপরূপ সৌন্দর্যে ও সৌরভে, নানারূপ পরিণাম বা পরিবর্তনভাগী হয়, অবশেষে শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে। এরূপ অতি অল্পকালস্থায়ী হ'ল পার্থিব জীবন—যিনি যতই বিত্তশালী, সম্মাননীয়, শক্তিশালী, গুণমণ্ডিত বা সৌন্দর্য-শালীই হন না কেন সকলেরই শেষ সেই একই মরণে, সকলের অদৃষ্টেই আছে সেই একই দুঃখ, ক্লেশ, নৈরাশ্য, বাধা ও দ্বন্দ্ব। সেজন্য, কালের কুটিলাগতিতে, অমোঘ সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে প্রভূত বিত্তশালী নৃপতিও নির্ধন হয়ে পড়েন, শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হ নেতাও নিন্দাভাজন হন, প্রচণ্ড শক্তিশালী বীরও অশক্ত হয়ে পড়েন, অশেষ গুণমণ্ডিত গৃহস্থও দুঃখক্লিষ্ট হন, অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী পুরস্ত্রীও কুৎসিতা হয়ে পড়েন। সুতরাং পরিবর্তন ও ক্ষয়ই সকল পার্থিব বস্তুর অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী নিয়তি বলে, শাশ্বত আনন্দ বা প্রগতি সংসারে সম্ভবপরই হয় না—যার নিজেরই কোন স্থিরতা নেই, তা অন্য কোন স্থির সত্য বা লক্ষ্যের আভাস ও প্রেরণা দান করবে কিরূপে? যেন ক্ষুদ্র দেহমনোবদ্ধ, যেন ক্ষুদ্র দেহমনের সঙ্গে একীভূত আত্মা বিকাশ ও বিস্তৃতি, প্রকাশ ও প্রগতি, ভূমা ও মহান লাভ করবে কিরূপে এই সঙ্কীর্ণতম গণ্ডীতে, এই রুদ্ধ আবহাওয়ায়, এই বদ্ধ গৃহকোটরে, এই আচ্ছাদিত দেহপিঞ্জরে? সেজন্যই এই সাধারণ সাংসারিক অবস্থাকে বলা হয়েছে 'বন্ধ', অথবা সেই অবস্থা যা জীবনকে আবদ্ধ করে রাখে, বাধা দেয় তার স্বরূপগত প্রস্ফুতিকে, সঙ্কীর্ণ করে আনে তার সত্তাগত, অন্তর্নিহিত বিস্তারকে।

ফলে, স্বভাবতঃই উদয় হয় অসংখ্যবিধ, অসংখ্যসংখ্যক, অসংখ্য-প্রসারী দুঃখের—যাকে সাংখ্য-দর্শন বিভক্ত করেছেন 'দুঃখত্রয়ে', যোগ-দর্শন 'পঞ্চক্লেশে'। 'আধ্যাত্মিক' বা অন্তঃস্থ প্রাকৃতিক কারণ বা দেহমনোজ দুঃখ, 'আধি-ভৌতিক' বা বহিঃস্থ প্রাকৃতিক কারণ বা ঝঞ্ঝাবাত, সর্পাঘাতাদিজনিত দুঃখ, 'আধিদৈবিক' বা বহিঃস্থ অপ্রাকৃতিক কারণ বা ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেব-দানবাদি-প্রসূত দুঃখ—এই হ'ল 'দুঃখত্রয়' বা 'ত্রিতাপ'। 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞানজ ক্লেশ, 'অস্মিতা' অহঙ্কারপ্রসূত ক্লেশ, 'রাগ' বা আসক্তিজনিত ক্লেশ, 'দ্বেষ' বা হিংসাকৃত ক্লেশ, 'অভিনিবেশ' বা মৃত্যুভয়োদ্ভূত ক্লেশ—এই হ'ল 'পঞ্চক্লেশ'। এরূপে, ত্রিতাপ-দগ্ধ ও পঞ্চক্লেশপিষ্ট জীবের 'বন্ধাবস্থা' গভীরতম, অনিবার্য দুঃখ-ক্লেশ, জ্বালাযন্ত্রণা, বাধা-বিপত্তি, হিংসা-দ্বেষ, অসাফল্য নৈরাশ্যেরই অবস্থামাত্র।

ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি কর্মবাদানুসারে, সকাম কর্মের ফলে, বদ্ধজীব বারংবার সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন, এবং সেজন্য বন্ধাবস্থা অনাদি অবস্থা।

কিন্তু 'বন্ধ' অনাদি হলেও, অনন্ত নয়। এই অনাদি সংসারচক্র থেকে সাধনবলে মুক্তিই হ'ল 'মোক্ষ'—মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, পরমতম পুরুষার্থ, চরমতম বিকাশ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ, মোক্ষের ক্ষেত্রেও সেরূপ, শঙ্কর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় দিক থেকেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এরূপে, তাঁর মতে ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ

অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১২—১৬ এই পাঁচটি সূত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল সূত্রেই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত মোক্ষ বর্ণিত হয়েছে।

ব্যবহারিক দিক থেকে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। এই দিক থেকে, যে ভক্ত ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মকে যথাযথ ভাবে জেনে ও উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, মৃত্যুর পরে সেই জ্ঞানী বা উপাসনাকারীর প্রথমে বাক্‌বৃত্তি পরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে, মনোবৃত্তি প্রাণে, এবং প্রাণবৃত্তি জীবে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যায়; তার পরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীব তেজপ্রমুখ, দেহবীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূতে বা লিঙ্গদেহে অবস্থান করেন। পরিশেষে, এই সকল সূক্ষ্মভূত সহকৃত লিঙ্গদেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীবের সঙ্গে পরদেবতায় বিলীন হয় (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য,৪-২-১—৬)।

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত; সূক্ষ্মভূতসহকৃত বা গঠিত, ভবিষ্য স্থূলদেহের বীজস্বরূপ যে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ, সেই লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীব মৃত্যুকালে মূর্দ্ধণ্য-নাড়ী দ্বারা স্থূলদেহ পরিত্যাগ ও সূর্যরশ্মি অনুকরণ করে উর্দ্ধগামী হন (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-২-১৭)। তার পরে তিনি দেবযান-পন্থা অবলম্বন করে ক্রমান্বয়ে জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয় মাস, সম্বৎসর, বায়ু, দেবলোক, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণলোক,ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং সর্বশেষে কার্যব্রহ্মলোকে গমন করেন (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪-৩ ১—৬)।

এস্থলে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়: প্রথমতঃ, সূক্ষ্মদেহধারী জীব যে পরমাত্মায় বিলীন হন, তা কি আত্যন্তিক ভাবে বা আপেক্ষিক ভাবে? দ্বিতীয়তঃ, এরূপ জীব যখন ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, তখন তিনি কার্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, না পরব্রহ্মকে?

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসক জীব পরমাত্মায় আত্যন্তিক ভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারেন না, যেহেতু যতদিন পর্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সংসার তিরোহিত হয় বা সংসারের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করা যায়, ততদিন জীব যেন পরমাত্মা থেকে পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করেন। মরণমাত্রেই নিরবশেষ লয় হয় না; যদি তাই হ'ত, তা হলে সমুদয় জীবই মৃত্যুকালে উপাধিবিমুক্ত হয়ে, পরব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতেন, বিধিশাস্ত্র ও বিদ্যাশাস্ত্রও নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ত। বস্তুতঃ, সংসাররূপ বন্ধ মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত, সত্য বা তত্ত্বজ্ঞানোদয় ব্যতীত তার বিনাশ নেই। সেজন্য সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে যেমন জীব পরমেশ্বরে আপেক্ষিক ভাবে বিলীন হন, সম্পূর্ণরূপে একত্ব ও অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হন না, বীজভাববিশিষ্ট হয়ে থাকেন, যার জন্যই তিনি যথাক্রমে জাগরণে ও সৃষ্টিকালে পুনরায় পরমাত্মা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন—এস্থলেও ঠিক তেমনই হয় (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-২ ৮)।

দ্বিতীয়তঃ, স্থূল দেহত্যাগী, সূক্ষ্মদেহধারী, দেবযানপন্থাগামী জীব পরিশেষে যে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, তা হ'ল কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের লোক—কার্যব্রহ্মকেই তিনি লাভ করেন, পরব্রহ্মকে নয় (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (৪-৩-৭—১০)। পরে কার্যব্রহ্মলোকের প্রলয় সমুপস্থিত হলে, সেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তিনি কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ-সহ পরব্রহ্ম লাভ করেন।

এরূপে সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ক্রমমুক্তিরই মাত্র অধিকারী (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৩-১০; ৪-৪-২২)। উপাসনা-মাহাত্ম্যে, তাঁরা প্রথমে কার্য্যব্রহ্মকে বা হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হন, দেহ থেকে উৎক্রান্তি ও দেবযানপন্থায় গতির মাধ্যমে; পরে সেই লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে কার্যব্রহ্মসহ প্রাপ্ত হন পরব্রহ্মকে। অবশ্য সংসারচক্রে প্রত্যাবর্তন তাঁদের আর নেই (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৪-২২), যদিও পরম মুক্তিলাভ হয় তাঁদের পরোক্ষ বা সাক্ষাৎ ভাবে সদ্য সদ্য নয়, পরোক্ষ ভাবে বিলম্বে।

সেজন্য শঙ্কর বলছেন:

"অদগ্ধাহত্যন্তমবিদ্যাদীন ক্লেশানপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্সতে।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪ ২-৭)

অর্থাৎ, সগুণোপাসকের অবিদ্যাপ্রমুখ ক্লেশাদি ধ্বংস হয় না; অপরা বিদ্যা বা সাধারণ উপাসনা প্রভৃতি পরমা মুক্তিদান করতে পারে না। সেজন্য সগুণোপাসকগণের মুক্তি বা অমৃতত্ব আপেক্ষিকই মাত্র—আত্যন্তিক নয়।

ঈশোপনিষদ ভাষ্যেও শঙ্কর একই ভাবে বলছেন:

"অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতম্ দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি।"

(ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ১১)

অর্থাৎ, অবিবেকী পুরুষের স্বল্প জ্ঞান ও সকাম কর্ম উভয়ই "মৃত্যু" পদবাচ্য। উভয়কেই অতিক্রম করে সাধক "বিদ্যা" বা দেবতোপাসনার দ্বারা "অমৃত" বা দেবতাভাব অথবা ক্রমমুক্তি লাভ করেন।

গীতাভাষ্যেও শঙ্কর সগুণোপাসকের ক্রমমুক্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরূপ উপাসকগণ "কালান্তরে" "ক্রমমুক্তি" লাভ করেন:

"...... ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ লবন্তো ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্ম প্রতিপত্তিসাধনত্বেন

ন্দ-মধ্যম-বুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্য ওঁকারস্য উপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেব ইহাপি।"

(গীতা-ভাষ্য, ৮-১২)।

• "যদ্যপি বিশিষ্টস্যাধিকারিণো বিনৈবোপাসনমুপনিষদ্ভ্যো ব্রহ্মণি প্রতিপত্তিরুৎপদ্যতে, তথাপি মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ তদ্বীহেতুত্বেনোকারো বিবক্ষিতঃ তচ্চোপাসনং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা শ্রুতিভিরুপদিষ্টমিত্যর্থঃ। তস্য ক্রমমুক্তিফলত্বাদনুষ্ঠেয়ত্বং সূচয়তি।"

(আনন্দগিরি টীকা)

অর্থাৎ, পরব্রহ্মবাচক ওঙ্কার প্রতিমাদির ন্যায় পরব্রহ্মের প্রতীক। যাঁরা মন্দবুদ্ধি ও মধ্যবুদ্ধি, তাঁদের জন্যই এরূপ ওঙ্কারোপাসনা বিহিত হয়েছে, যেহেতু এরূপ উপাসনা কালান্তরে তাঁদের মুক্তিরূপ ফলদান করে।

যদিও যাঁরা উৎকৃষ্টাধিকারী, তাঁরা উপাসনা ব্যতীতই উপনিষদ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তথাপি মন্দবুদ্ধি ও মধ্যবুদ্ধি ব্যক্তিগণের জন্য ব্রহ্মদৃষ্টিতে ওঙ্কারের উপাসনা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হয়েছে, যেহেতু এরূপ উপাসনা তাঁদের ক্ষেত্রে ক্রমমুক্তির সাধন হয়।

"প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি।"

(গীতা-ভাষ্য, ৮ ২৩)

"তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসনপরা জনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতি র্বা, কচিদস্তি 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে। ক্রমেণ তু গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৮-২৪)

অর্থাৎ, যে সকল প্রকৃত যোগী প্রণব বা ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান করেন এবং যাঁরা সেজন্য কালান্তরে মুক্তিলাভ করেন, তাঁদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ উত্তর মার্গ বলতে হবে।

এই মার্গে (দেবযান-পন্থায়), সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। যাঁরা সদ্যোমুক্তির অধিকারী, অর্থাৎ যাঁরা সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ বা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁদের অবশ্য কোন স্থানে গমনাগমনের প্রশ্নই উঠে না, যেহেতু তাঁরা ব্রহ্মসংলীন, ব্রহ্মময়, ব্রহ্মভূতই হয়ে আছেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ যেন ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলাভ করেন।

কেবল সগুণ ব্রহ্মোপাসক, ক্রমমুক্তির অধিকারীরই যে গতি আছে, ব্রহ্মজ্ঞানী, সদ্যমুক্তির অধিকারীর নয়—একথা শঙ্কর তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্যে (১—১১) অন্য প্রসঙ্গেও, অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ-খণ্ডনকালে বলেছেন। এ স্থলে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান কর্মের বিরোধী, যেহেতু জ্ঞান কর্মের 'উৎপত্তি-প্রাপ্তি-সংস্কার-বিকার'-রূপ চতুর্বিধ ফলের একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। এস্থলে পূর্বপক্ষবাদী আপত্তি উত্থাপন করছেন যে, জ্ঞান অন্ততঃ 'প্রাপ্তি' ফলের কার্য, যেহেতু শাস্ত্রে ব্রহ্মলাভের জন্য আত্মার উৎক্রমণ ও গমনের উল্লেখ আছে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, এই গমন সগুণোপাসক, দেবযান-পন্থানুসারী, ক্রমমুক্তির অধিকারীর গমন; ব্রহ্মজ্ঞ, সদ্যমুক্তির অধিকারীর নয়। কারণ, এক্ষেত্রে ব্রহ্ম সর্বগত এবং জীব থেকে অভিন্ন। সেক্ষেত্রে, জীব ব্রহ্মে গমনই বা করবে কি করে এবং ব্রহ্মকে লাভ করবেই বা কি করে?

"গন্তুরনন্যদ্ভিন্নদেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্য, ১-১১)

গমনকারী ও গন্তব্য স্থান পরস্পর ভিন্ন হলে, তবেই গমন সম্ভবপর হয়। কিন্তু যে বস্তু যা থেকে অভিন্ন সে বস্তু তাতে গমন করতে পারে না।

একই ভাবে, প্রাপক ও প্রাপ্তব্য বস্তু এক ও অভিন্ন হলে প্রাপ্তিও অসম্ভব।

এই ভাবে মোক্ষ প্রাপ্য নয়, মোক্ষের জন্য কোন নূতন স্থানে গমন করতেও হয় না।

এরূপ প্রাপ্তিবিষয়ক শ্রুতি কার্য-ব্রহ্ম বিষয়কই মাত্র—

"কার্য ব্রহ্ম-বিষয়ত্বাত্তাসাম্।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ১-১১)

কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনাদি নয়, কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাসই হ'ল 'বন্ধ' এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশের কারণ। সেজন্য অধ্যাসের অভাবই মোক্ষ। মুক্তপুরুষ জড় দেহমন প্রভৃতি ও অজড় চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রকৃত স্ব স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করে দেহমন প্রভৃতির ধর্মাদি আত্মায় আরোপ করেন না; ফলে, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দৈহিক প্রয়োজন, অন্ধত্ব-খঞ্জত্বাদি শারীরিক অবস্থা, রাগ-দ্বেষাদি মানসিক ভাব সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মায় অধ্যস্ত হয় না এবং আত্মাও সেই কারণে দেহমন প্রভৃতির দুঃখ, ক্লেশ, অভাব, আশা-আশঙ্কা, আকুতি, অসাফল্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট ও ক্লিষ্ট হন না।

ডাউন ট্রেন

শ্রীসাধন চৌধুরী

হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল মুকুল মাঝির। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। প্রকাণ্ড পোলের উপর দিয়ে গুম্ গুম করে গুমরে চলেছে ন'টা চল্লিশের ডাউন ট্রেনখানা।

ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল মুকুল আলি, দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের দড়িপাকানো শক্ত শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল।

তার পর একসময় আবার মিইয়ে এল। নিস্তেজ হয়ে এল। মলিন হয়ে এলো উজ্জ্বল মুখটা। ট্রেনখানা তখন ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেছে কালুরঘাট পোল পেরিয়ে।

বৈঠা চালাতে চালাতে থমকে দাঁড়ায় আব্বাসউদ্দিন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় একবার মুকুল মাঝির দিকে। চোখ দুটো ছলছল করছে মুকুল মাঝির, বরফের মত সাদা চুল-দাড়িগুলো উড়ছে বাতাসে।

ছাব্বিশ বছরের সমর্থ জোয়ান আব্বাসউদ্দিন কিছুই বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না কেন মুকুল চাচা এমনই করে প্রতিদিন তাকিয়ে থাকে ঐ প্রকাণ্ড কালুরঘাট পোলের দিকে। দোহাজারী ফেরৎ ট্রেনগুলো যখনই হুইসিল্ দিয়ে উঠবে এসে ঐ পোলের উপর, অমনই চম্‌কে উঠবে মুকুল চাচা, চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠবে এক মুহূর্তে—তার পর আবার নিভে যাবে। ট্রেন হয়ত তখন এক মুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে চলে গেছে। এ শুধু আজ নয়, প্রতিদিনই চম্‌কে ওঠে মুকুল চাচা।

কিছুই বোঝে না আব্বাসউদ্দিন। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুকুল চাচার স্থাণু মুখের দিকে।

প্রথম প্রথম কেমন যেন ঠেকত আব্বাসউদ্দিনের। ট্রেনের হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে মুকুল চাচার এমনি চমকে ওঠায় কেমন যেন ঠেকত। চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাত সামনের দিকে। পোলের উপর দিয়ে হয় ত তখন গুমরে ছুটেছে ডাউন ট্রেন। অসংখ্য লোকের ভীড় বোঝা যেত—মুরগীর খাঁচার মত ঠাসাঠাসি করা। মানুষ নয়, একপাল মুরগী যেন বাজারে চালান চলেছে।

বেশ লাগত আব্বাসউদ্দিনের, ট্রেন দেখতে বেশ ভালই লাগত একসময়। মনে পড়ে ছোটবেলায় ট্রেন দেখার জন্যে কেমন দুপুরে পালিয়ে দল বেঁধে গ্রামের প্রান্তে চলে আসত। বিরাট দৈত্যের মত ফোঁস ফোঁস করে কোথা থেকে ছুটে আসত ট্রেন, তার পর পলকের মধ্যেই আবার কোথায় উধাও হয়ে যেত। ভয় করত আব্বাসউদ্দিনের—ভালও লাগত। সে আজ অনেকদিনের কথা, তখন আব্বাস-উদ্দিনের কতটুকুই বা বয়স।

কিন্তু সেদিনের আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে আজকের আব্বাস-উদ্দিনের অনেক প্রভেদ। তখন ভয়-ভাবনাহীন মনে দুপুরে পালিয়ে ট্রেন দেখায় আশ্চর্য আনন্দ ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই। কর্ণফুলির মাঝি আব্বাসউদ্দিন; রোজই কত ট্রেন দেখছে এপার-ওপার হতে পোলের উপর দিয়ে। কিন্তু ছোট ছেলেটির মত সেদিকে আজ নজর দেবার সময় কই? জোরে জোরে বৈঠা চালিয়ে চাকতাই পৌঁছতে হবে। তার পর সওয়ার নিয়ে ফিরতে হবে। সারাদিনে অন্ততঃ চারটে ক্ষেপ না দিলে পেটে ভাত জুটবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! চাচা মুকুল মাঝির এখনও বুঝি সেই ছোট ছেলের মত ট্রেন দেখার সখ রয়ে গেছে। তাই বুঝি পোলের উপর ট্রেনের শব্দে চমকে ওঠে।

প্রথম প্রথম তাই ভাবত আব্বাসউদ্দিন। মনে মনে হাসতও।

কিন্তু চোখ দুটো এমন জ্বলে ওঠে কেন মুকুল মাঝির? চোয়ালটাই বা কেন এমন কঠিন হয়ে উঠবে? এ ত সেই অল্পবয়সে ট্রেন দেখার আনন্দ নয়।

বুঝতে পারে না আব্বাসউদ্দিন --ছাব্বিশ বছরের সমর্থ জোয়ান আব্বাসউদ্দিন এর কারণ কিছুই বুঝতে পারে না। তাই শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে চাচার স্থাণু মুখের দিকে।

জোরে জোরে বৈঠা টানে আব্বাসউদ্দিন। ঘোলা জলগুলো পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে। নৌকাটা দুলে দুলে ওঠে।

"মুকুল চাচা শক্ত গরি হাল ধর। জলদি পৌঁছাইতে হইব না?" ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠল আব্বাসউদ্দিন। শক্ত করে বৈঠা টানল বুকের দিকে।

"হয় হয়" চমকে উঠল মুকুল মাঝি। শক্ত মুঠোয় হাল চেপে ধরল। চোখের পাতা দুটো তাড়াতাড়ি ওঠানামা করল বারকতক।

ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ, বৈঠার গায়ে শুকনো দড়ির ক্যাচক্যাচানি। নৌকা এগিয়ে চলে, কালুরঘাট পোলকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলে।

শক্ত মুঠোয় হাল ধরে দাঁড়ায় নুরুল মাঝি। শুকনো হাড়ে এখনও-কি জোর! কর্ণফুলীর তীব্র জোয়ার উপেক্ষা করেও হাল বেঁকে থাকে।

জোরে আরও জোরে বৈঠা টানে আব্বাসউদ্দিন। আকাশের সূর্য অনেকটা হেলে গেছে, ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই।

দরদর করে ঘাম ঝরে গা বেয়ে। ঘাম নয়, এক এক বিন্দু রক্ত যেন ঝরে পড়ে নৌকার পাটাতনে।

চাকতাই। অসংখ্য নৌকা আর পানসির ভীড়। লাফিয়ে দাঁড়ায় আব্বাসউদ্দিন। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাঁক ছাড়ে :

"আহেন বাবুরা, আহেন। ময়ূরপঙ্খী নাও, একেবারে পক্ষিরাজের বাচ্ছা।"

চুপচাপ বসে থাকে নুরুল মাঝি, টুঁ শব্দও করে না। শুধু বার বার হাঁক ছাড়ে আব্বাসউদ্দিন, "বাবুরা আহেন, পক্ষীরাজের বাচ্ছা।"

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ কেটে যায়। হাঁক দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আব্বাসউদ্দিন। তার পর হতাশ হয়ে গামছা দিয়ে গায়ে-পিঠের ঘাম মুছতে মুছতে বসে পড়ে পাটাতনে।

কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা তুলে নিয়ে ধরায়। তাড়াতাড়ি দু'চারটে টান দেয়। তার পর নাক মুখ দিয়ে কিছু ধোঁয়া ছেড়ে মুখ খোলে হতাশার সুরে, "চাচা, কেউ ত আইল না?"

"আঁই জাইনতাম কেউ আইব না।"

জবাব দিল নুরুল মাঝি। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে।

"এই পোড়ার দ্যাশে কেউ আর আইব না। শকুন উড়ব আব্বাস, শকুন উড়ব।"

হয় ত তাই উড়বে। কিন্তু কতদিনই বা আগে? গম গম করত চাকতাই ঘাট। পূজায় দেশে ফিরত বাবুরা, সবাই দূর দূর দেশ থেকে। হাঁক দিত মাঝিরা, বিকট গলায় চেঁচাত সবাই।

"আহেন বাবুরা, ময়ূরপঙ্খী নাও।"

বিব্রত বোধ করত বাবুরা, তার পর হাসতে হাসতে উঠে আসত, হয়ত কোন পরিচিত মাঝির নৌকায়।

মনে পড়ে নুরুল মাঝির। ঘোলাটে চোখের তলা থেকে ভেসে ওঠে যেন।

ঘোষবাবুর ছেলেরা পূজায় ফিরত কলকাতা থেকে। হাতের ছোট সুটকেশ নিয়ে উঠে আসত ওরা নুরুল মাঝির নৌকায়।

উৎসাহে দাঁড় টানত নুরুল মাঝি। কাশফুলের তীর ঘেঁসে এগিয়ে চলত নৌকা। দু'একটা বক হয় ত উড়ে যেত মাথার উপর দিয়ে।

"চাচা কেমন আছ?" চকচকে হাসি হাসত ঘোষবাবুর ছোট ছেলে।

"আঁইগ্গা হ', আপনাদের দয়ায় ভালই আছি।"

"চাচী কেমন আছে?"

লজ্জা লাগত নুরুল মাঝির। আস্তে আস্তে বলত, "ভালই আছে।"

বেশ ভাল লাগে নুরুল মাঝির। এমনই করে কাছে-টানার সুরে খুব কম লোকই কথা বলে, তাই ভাল লাগে নুরুল মাঝির।

আরও জোরে জোরে বৈঠা টানে। গায়ের শক্ত পেশীগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। একটা খুশীর গমক ঘোলা জলের মতই পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে সারা শরীর বেয়ে।

কি নেই নুরুল মাঝির? গায়ে তাগদ আছে, ময়ূরপঙ্খী নাও আছে, ঘরে চাঁদমুখ বিবি আছে, আর আছে গোলাভরা ধান, আর লাক্ষ সুঁটকী। আর ভাবনা কি?

গা দিয়ে ঘাম ঝরে, একটুখানি বৈঠা থামায় নুরুল মাঝি। গামছা দিয়ে ঘাম মোছে। কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা ধরিয়ে টান দেয় দু'তিনটে। তার পর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে, "আইচ্ছা দাদাবাবু, কইলকাতা দ্যাশডা কেমন? খুব সোন্দর না?"

"সুন্দর মানে? তুমি বল কি চাচা? কলকাতার মত শহর আছে?" সোৎসাহে বলে ওঠে ওরা।

"ওখানে গাড়ী আছে, বড় বড় পাকা বাড়ী আছে, কি নাই বল? একেবারে স্বর্গপুরী চাচা, স্বর্গপুরী।"

"হইব হয়ত।" ম্লান জবাব দেয় নুরুল মাঝি। বিড়ি ফেলে দিয়ে বৈঠা ধরে আবার।

"তুমি যাবে নাকি চাচা কলকাতায়?"

"না দাদাবাবু, না।" জিভ কামড়ায় নুরুল মাঝি। "দ্যাশ ছাইড়া কোথায় যামু বাবু? ভাল হউক, মন্দ হউক, এই দ্যাশ ত আমাদেরই। একে ছাইড়া কোথাও শান্তি পামু না।"

নুরুল মাঝি সস্নেহে তাকায় একবার। নদীর দু'পাশে মুগ আর মুসুরের ক্ষেত। জলের ধারে কাশফুলের মেলা।

মাথার উপরে উজ্জ্বল আকাশ। হাতের মুঠোয় সমর্থ নৌকার শক্ত বৈঠা।

কি এক আশ্চর্য মায়া ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কি এক আশ্চর্য মমতায় জড়িয়ে গেছে নুরুল মাঝি—এই জল-মাটি আকাশের সঙ্গে।

"চাচা আজ কি রান্না হয়েছে? রূপচাঁদা শুঁটকী নাকি? খাওয়াবে না?"

"না দাদাবাবু, আপনাদের কি আর আমাগো রান্না ভাল লাগবো?"

আস্তে আস্তে জবাব দেয় নুরুল মাঝি।

"আরে কেন লাগবে না? দাও না দেখি চাচা।" উৎসাহ বলল বাবুরা।

হেসে ফেলে নুরুল মাঝি। আনন্দে সারা মুখটা ঝিলমিল করে ওঠে।

"চাচা, ও চাচা, হুঁকা লও।" ভর্তি হুঁকোটা এক সময় এগিয়ে ধরে আব্বাসউদ্দিন।

চমকে ওঠে নুরুল মাঝি। সম্বিত ফিরে পায়। হুঁকোটা তুলে নেয় আব্বাসউদ্দিনের হাত থেকে। তার পর গুড়গুড় করে ছোট ছোট টান দেয়।

দিন ছিল, সেসব দিন ছিল। সেদিনের কথা ভাবতেও ভাল লাগে বুড়ো নুরুল মাঝির।

সত্যি দিন ছিল, কিন্তু সে সব খুশীর দিন কতদিনই বা টিঁকে ছিল?

একদিন সারা আকাশ কালো করে কোথা থেকে উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু জাহাজ। ছেঁদা ছেঁদা করে ফেলল সারা চাটগাঁ। বন্ধ হ'ল ট্রেন। সারা দেশ ভরে উঠল গোরা সৈন্যে। মানুষ নয়, নরখাদক ওরা।

সেই সব বন্যপশুরা ছেয়ে ফেললো সারা দেশ। সোনার মাটি চষে গেল। তারপর লোলুপ হাত বাড়াল বাড়ীর মা-বোনের দিকে।

চকচক করে উঠল বুড়ো মাঝির চোখ দুটো। চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল এক মুহূর্ত।

"পাজি শয়তান যত সব।" মনে মনে বিড়বিড় করে নুরুল মাঝি।

ও পাড়ার দত্তবাবুদের সোমত্ত মেয়েটা পুকুরে জল আনতে গিয়ে আর বাড়ী ফিরতে পারল না। কেউ বলল জলে ডুবে গেছে, যক্ষ নিয়ে গেছে, কেউ বলল পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

বিশ্বাস করেনি নুরুল মাঝি। ঐ সব বাজে কথায় সান্ত্বনা খোঁজে নি। নুরুল মাঝি জানে, ভাল করেই জানে, ঐ সব শয়তানরা নিয়ে গেছে মেয়েটিকে। ঐ সব শকুনরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে মাটির লক্ষ্মীকে।

দুর্ভিক্ষ এল, এল মহামারী। সবকিছু ডুবে গেল পঙ্ক-গ্রাসে। ঘর, ভিটে, গরু সবকিছুই আস্তে আস্তে ডুবে গেল মহাজনের টাকার থলিতে।

ঘরের সোমত্ত বিবি গেল, কোলের ছোট খুকীটিও গেল মহামারীর কবলে। তবু কি এক আশ্চর্য মমতা, কি এক দুর্বার টান মাটির প্রতি।

তার পর আগুন জ্বলল—ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠল। এ আগুন আরও তীব্র আরও লেলিহান। দুই ভাইয়ে মুখোমুখী রুখে দাঁড়াল সাম্রাজ্যবাদীর কুটচক্রান্তে।

"যত সব নেকুরের দল।"

কঠিন হয়ে উঠল নুরুল মাঝি। চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। হাতের হুঁকোটা শক্ত করে চেপে ধরল।

আবার আস্তে আস্তে মিইয়ে এল। গুড়গুড় করে টান দিতে লাগল হুঁকোতে।

আব্বাস কখন উনুন ধরিয়ে চাল বসিয়েছে। হাঁড়ি হাতড়ে দুটো দড়িপাকানো লেটুয়া শুঁটকি নিয়ে কাটতে বসেছে।

বুড়ো নুরুল মাঝি তাই লক্ষ্য করতে লাগল। ঝাপসা চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

আকাশের উজ্জ্বল সূর্য আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। নদীর বুকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলতে লাগল ঢেউয়ের মাথায়।

ছইয়ের মধ্যে ঢুকে বসল বুড়ো নুরুল মাঝি। শেষ হয়ে আসা তামাকের কলকেটা তুলে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিকেটাকে টিপল দু'একবার, তার পর আবার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিল।

"ল আব্বাস দু'চাউরগা টান দে।"

হুঁকোটা এগিয়ে দিল নুরুল মাঝি, তার পর ছইয়ে হেলান দিয়ে বসল।

চাকতাইয়ের নৌকাঘাটে তখন নিঝুম নিস্তব্ধতা। আকাশের উত্তপ্ত সূর্যের নীচে সিলোহিটের মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি নৌকাগুলো।

ঘামতে থাকে নুরুল মাঝি। ছইয়ের নীচে বসে বসে গুমোট গরমে ঘেমে ওঠে। ক্লান্তিতে চোখ দুটোও বুজে আসতে চায়।

হঠাৎ এক সময় দুলে ওঠে নৌকাটা ঢেউয়ের ধাক্কায়। চমকে ওঠে নুরুল মাঝি। তন্দ্রার ঘোর কেটে চমকে তাকায়।

অদূরে একটা লঞ্চ চলেছে। বোঝাই মজদুর নিয়ে

চলেছে চন্দ্রকোণার পথে। কারখানা গড়ে উঠছে চন্দ্রকোণায়। সেখানে একদিন বাঁশ থেকে নাকি কাগজ তৈরী হবে। সেখানেই চলেছে ওরা।

চোখ দুটো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মুকুল মাঝির। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

দেশে মেহনৎ করার মত লোক নেই। তাই দূর দূর থেকে লোক নিয়ে আসতে হয়।

একদিন লোক ছিল এখানে, প্রচুর লোক ছিল। গম গম করত রেয়াজুদ্দিন বাজার আর চাকতাই। আর আজ? মেলাশেষের শূন্যতার মত প্রকট হয়ে উঠেছে। ডাউন ট্রেনগুলো রোজ বোঝাই করে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসে শূন্যহাতে।

কেন ওরা এমনি করে দেশ শূন্য করে চলে যায়? কিসের লোভে? কার ভয়ে? কিছুই বুঝে উঠতে পারে না মুকুল মাঝি। নিজের দীর্ঘজীবনের ফাঁকেও এর কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না।

বেলা গড়িয়ে আসে। আকাশের উজ্জ্বল সূর্য আস্তে আস্তে নিভে আসে যেন। ছায়া পড়ে নদীর বুকে।

হাই তোলে মুকুল মাঝি। আড়মোড় ভাঙে। আলস্যে আর একটুক্ষণ শুয়ে থাকে নৌকার পাটাতনে।

এবার দু-একটা জেলে-নৌকা নামে। কলাগাছের ভেলার মত ডুবু ডুবু নৌকাগুলো কর্ণফুলির বিশাল বুকের উপর অসহায়ভাবে দুলতে থাকে।

দূর থেকে ভেসে-আসা ওদের গানের দু-একটা টুকরো শোনা যায়। কে যেন পরাণ-বঁধূকে নিয়ে গান ধরেছে।

ভাল লাগে মুকুল মাঝির। মনে একটা মিষ্টি আমেজ ছড়ায়। অনেকদিন থেকে কামনা করছে মুকুল মাঝি এমনি একটা শান্তির পরিবেশ। এমনি একটা প্রশান্ত প্রলেপ চিরটাদিনের জন্যে কামনা করছে মুকুল মাঝি।

আজ শুধু রিক্ততা। শূন্য মাঠ, শূন্য বাট, কেমন যেন এক ছন্নছাড়া ভাব চারপাশে।

কান পেতে শুয়ে থাকে মুকুল মাঝি। মাথার পেছনে হাত রেখে কান পেতে শুয়ে থাকে। মাঝিদের টুকরো টুকরো গান দূর হতে দূরে মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে মুকুল মাঝি। বিদ্যুতের মত চমকে ওঠে তীব্র হুইসেলের শব্দে। তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। তার পর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কালুরঘাট পোলের দিকে।

বিকেলের ডাউন ট্রেন তখন এসে উঠেছে পোলের উপর। অসংখ্য লোক বোঝাই—গুম্ গুম্ করে গুমরে চলেছে।

"যতসব বেকুবের দল!"

তীব্র রাগে গর্জে ওঠে মুকুল মাঝি। কুঁচকে-ওঠা চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ে।

চমকে ওঠে আব্বাসউদ্দিন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ছইয়ের ভেতর থেকে। তার পর ফ্যালফ্যাল করে তাকায় মুকুল মাঝির দিকে।

দাঁতে দাঁত চেপে একমুহূর্ত থামে মুকুল মাঝি। তার পর হাত উঁচিয়ে আবার গর্জে ওঠে:

"ঐ দেখ আব্বাস, ওরা সব ভাগতেছে।"

দ্যাশ ছাইড়া ভাগতেছে। যত সব বেকুবের দল।

দড়ি-পাকানো হাতের শক্ত শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে।

তার পর... তার পর আবার আস্তে আস্তে মিইয়ে আসে মুকুল মাঝি। নিস্তেজ হয়ে আসে পড়ন্ত রোদের মত। চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। ধরা-গলায় আস্তে আস্তে বলে:

—"এ পোড়ার দ্যাশে শকুন উড়বো।

আব্বাস, শকুন উড়বো।"

মহামুনীর মেলায় কেনা পোড়ামাটির কালো কালো পুতুলের মত রোদে-পোড় মুকুল মাঝির কালো মুখটা আরো—আরো কালো হয়ে আসে।

ডাউন ট্রেনটি তখন একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে চলে গেছে কালুরঘাট পোল পেরিয়ে।

রূপকথার স্বপ্ন

শ্রীকৃষ্ণধন দে
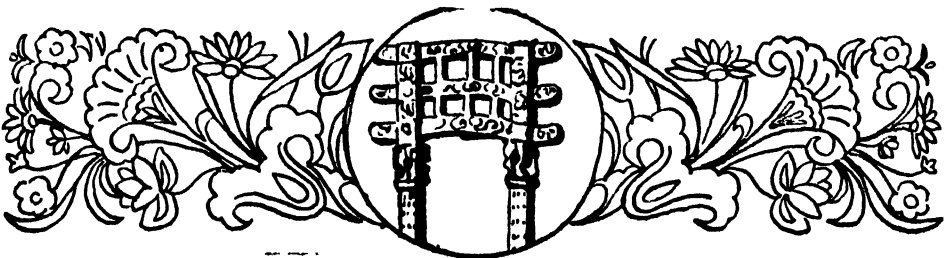
বাঁশপাতা কাঁপে শির্-শির্,
দুই পাড়ে পদ্মদীঘির,
চাঁদ ওঠে,—পাণ্ডুর চাঁদ
হিমভরা মাঝ-রাত্রির।
ঝির্-ঝিরে ঘুমেল হাওয়ায়
কত রূপকথা শোনা যায়,
নেশাধরা তন্দ্রায় চাঁদ
গান শোনে ছায়া-পৃথ্বির।
জেগে থাকি কৈশোর স্বপ্নে
আসে বুঝি কোন রাজকন্যা,
পায়ে তার বাজে মঞ্জীর,—
বাঁশপাতা কাঁপে শির্ শির।

শতদলে সাজে তার বুক,
কেতকী পরাগে রাঙা মুখ,
কবরী জড়ায় নীপমালা,
অধরে লাজুক হাসিটুক।
আধফোটা ফুলগুলি তার
মালা থেকে ঝরে বার বার,
কেঁপে-ওঠা ভীরু নিঃশ্বাস
ভরে পথ পল্লীবীথির।
জেগে থাকি কৈশোর স্বপ্নে,—
আসে বুঝি কোন রাজকন্যা,
রাত হয় আরো যে গভীর,
বাঁশপাতা কাঁপে শির্ শির্।

চাঁদের আলোয় ঝলমল্
ঢেউ তোলে দীঘিটির জল,
ডেকে ওঠে ঘুমভাঙা পাখী,
সুর তার ফেরে চঞ্চল।
একখানি মায়াভরা রাত,
একখানি চাঁদরঙা হাত
খোঁজে আকাশের সীমানায়
দুখ-সায়রের কোথা তীর।
জেগে থাকি কৈশোর স্বপ্নে
আসে বুঝি কোন রাজকন্যা
অভিসার-পথে পল্লীর।
—বাঁশপাতা কাঁপে শির্-শির্।

শিশিরের কণা-বুকে হায়
রাতজাগা কলি ঝরে' যায়,
চুপি চুপি জাগায় সে এসে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যুথীর মালায়।
আরো যদি চায় ফুল নিতে
বনের মনের পথটিতে,
ফেলে রেখে যায় গানখানি
পথ চেয়ে হারানো সাথীর।
জেগে থাকি কৈশোর স্বপ্নে,—
আসে বুঝি কোন রাজকন্যা,
রাত হয় আরো যে মদির,—
বাঁশপাতা কাঁপে শির্-শির্

ঘুমে ভরে' আসে দু'নয়ন,
অবসাদে তবু জাগে মন,
হেলে পড়ে পশ্চিমে চাঁদ,
ঢুলে পড়ে শিউলির বন।
একে একে নিভে আসে তারা
বাউল আকাশ কেঁদে সারা,
অশ্রু যে শিশির আখরে
ভরে বুক বল্লী-লিপির।
জেগে থাকি কৈশোর স্বপ্নে,—
আসে বুঝি কোন রাজকন্যা
আলো-পথে শুকতারাটির।
—বাঁশপাতা কাঁপে শির্-শির্।

ফুলফোটা রঙীন্ উষায়
কখন ঘুমায়ে পড়ি হায়,
জেগে দেখি অরুণ কিরণ
ঝলমলি' উঠেছে ধরায়।
কোথা কা'র কেশের সুবাস
ভরে আছে ভোরের বাতাস,
একখানি তুষার স্বপন
ছোঁয়া পেল সোনার কাঠির।
তবু চাঁদ ওঠা মাঝ-রাতে
এসেছিল এক রাজকন্যা,—
লিপি নিয়ে সেই অতিথির
বাঁশপাতা কাঁপে শির্-শির্।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

২

আচার্য্য যদুনাথ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত নানা কথাই হইয়াছে। কিছু কিছু এখানে বলিলাম, কিন্তু সব ত বলা বা লেখা সম্ভব নয়, হয়ত বা এ যুগের মানুষের ভাবগতিক যেরূপ তাহাতে এ ভাবে লেখা বা বলা সমীচীনও নয়। তবে আরও কয়েকটি কথা এখানে নিবেদন করিব। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ দিল। যখনই গিয়াছি ইহার কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই কাগজ দুইখানির বর্ত্তমান রূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত নিঃসংকোচে ব্যক্ত করিতেন। এই পত্রিকা দুইখানির জন্য তিনি কিছু কিছু লেখা শেষ দিকেও দিয়াছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ুর জানুয়ারী সংখ্যার (১৯৫৭) জন্য তাঁহার লেখা চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় লিখিতে পারেন নাই। এবারে আবার তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার স্মরণ ছিল, বলিলেন, 'গতবারে অসুস্থ না হলে তখনই লিখতাম। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আমরা দুজন মাত্র বেঁচে ছিলাম। ঝাভেরি (বোম্বাইয়ের কে, এম, ঝাভেরি) সে দিন মারা গেলেন।' পূর্ব্ব বৎসর তিনি আমাকে মডার্ণ রিভিয়ুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তির কথা বলিয়াছিলেন। নিতান্ত শারীরিক অসুস্থতা না ঘটিলে কোন বাধা-বিঘ্ন আচার্য্য যদুনাথকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। এবারে (জানুয়ারী—১৯৫৮) যে কত বিপদের মধ্যে তিনি মডার্ণ রিভিয়ুর লেখা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে খানিকটা বলিতে পারি। মডার্ণ রিভিয়ুতে এই তাঁর শেষ রচনা।

প্রবাসীতে তাঁহার আত্মকথা বা স্মৃতিকথা কিছু কিছু করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "বিধান (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) আমার ছাত্র। তাঁর বাবা মা ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ মানুষ ছিলেন। মাকে আমি দেখি নি, বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। পরিবারের অনেক কথা আমি জানি।" এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রবাসীতে কিছু লিখিতে বলি। একটু সুস্থ হইলেই তিনি লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন বলেন। যথা সময়ে লোক পাঠাইয়াছিলাম। একটু চিরকুটে লিখিয়া পাঠান, "শরীর অসুস্থ, এজন্য সম্ভব হইল না।" তাই মনে হয় ভারতের মুক্তি-সন্ধানীর ভূমিকাই তাঁহার শেষ বাংলা রচনা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত "রবীন্দ্র-পুরস্কার" বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আচার্য্য যদুনাথ। আট বৎসর যাবৎ তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাহাকে নিন্দা-প্রশংসা ঢের সহ্য করিতে হইয়াছে। শেষ দিকে যেন সমালোচনার মাত্রা বাড়িয়াই গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই একটি উচ্চ মান সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্যিক উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করিতেন। অন্যান্য বিচারকেরা তাহার মতামত প্রায়শঃ শ্রদ্ধা বা সমর্থন করিতেন বলিয়াই তিনি এই মান বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া রস-সাহিত্যের অপকর্ষ দেখিলে তিনি দুঃখবোধ করিতেন। তিনি কোন রকম 'ক্যানভাসিং' পছন্দ করিতেন না। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোন একজন অতি পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া যাই। আমার আগমন-বার্ত্তায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু যখন উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম এবং আগন্তুককে পরিচয় করাইয়া দিলাম, তখন তিনি বলিলেন "হ্যাঁ ওঁকে আমি জানি। এজন্য আমার কাছে আসতে হবে কেন? আর আমি এটা চাই না যে, পঞ্চাশ জন লোক আমার কাছে এসে ভোট ভোট করুক।" আমরা সময়োচিত দুই-একটা কথা বলিয়া বিদায় লইলাম। রবীন্দ্র-পুরস্কার সম্পর্কে যে ক্যানভাসিং হইত আভাসে তাহা বুঝিতাম। একদিন বলিলেন "...উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী বেশ মোটা মাইনে পান ত। একখানি চতুর্থ শ্রেণীর বই লিখে রবীন্দ্র-পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষাই বা কেন, আবার গরীব যোগ্য লেখকদের প্রাপ্যে ভাগ বসানরই বা চেষ্টা কেন?" তিনি এই ব্যাপারে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, পরেও একাধিকবার এ কথা আমাকে বলিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁহার বিচারে বরাবর সন্তুষ্টই ছিলেন। পরে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আট বৎসর পর্য্যন্ত আমি উচ্চ মান রক্ষা করে চলেছিলাম। যখন দেখলাম যাদের জন্য এই চেষ্টা তারাই অসন্তুষ্ট তখন আর আমি যুক্ত থাকা সমীচীন বোধ করি নি; গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৭) পদত্যাগ করেছি।...বলেছিল আমি যতদিন আছি ততদিন তারা নিশ্চিন্ত। এ সত্ত্বেও আমি রিজাইন করেছি। শরীরেও কুলায় না।" যদুনাথ আরও বলিলেন "...অত পণ্ডিত লোক—গতবার এমনভাবে টেবিল চাপড়ে একখানি বইয়ের সমর্থন করতে লাগলেন যে, আমি ত অবাক।" ক্যানভাসিং সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল প্রকাশ করায় যদুনাথ বলিয়াছিলেন, "খুব চলে, এবারেও এই সে দিন একজন একখানা বই নিয়ে এসেছিলেন। আমি বলে দিয়েছি যে, আমি আর কমিটিতে নেই।"

আচার্য্য যদুনাথ কাহার মধ্যে কিছু ভাল দেখিলে তাহাকে অন্তর দিয়া সমর্থন করিতেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহার কথা তাঁহার মুখে

পূর্ব্বে দুই-একবার শুনিয়া থাকিব। যদুনাথের অসুস্থতার কথা শুনিয়া কিছুদিন দেখা করিতে যাই নাই। একদিন কাগজে দেখিলাম তিনি ডক্টর সাহার মৃত্যুবার্ষিকী সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াই কুশলবার্ত্তা গ্রহণের পর উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করার কথা শুধাই। তিনি তখন বলিলেন "আমি একটু সুস্থ হয়েছি, মেঘনাদ মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে যেদিন দিল্লী যায় সে দিন সন্ধ্যায় আমার সহিত দেখা করতে এসেছিল। সে কি বললে জান? আমরা স্বাধীনতা পেয়ে পূর্ব্ববঙ্গ হারিয়েছি, বঙ্গ-বিহার মার্জ্জার হলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বটুকুও লোপ পাবে। বড় খাঁটি কথা। আমি নিছক কর্ত্তব্যবোধে সেদিন তার স্মৃতি-তর্পণ সভায় গিয়েছি।" এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে হইতেছে। আচার্য্য যদুনাথ একদিন বলেন, "বসুধারা কাগজখানি বড় ভাল হয়েছে। এর সম্পাদক আমার বন্ধুপুত্র। নির্ম্মলের (নির্ম্মলকুমার বসু) পিতা পাটনার আই-এম-এস ডাক্তার ছিলেন। বঙ্গ-বিহার মার্জ্জার সম্বন্ধে নির্ম্মলের লেখাটিতে প্রকাশিত মত আমারও মত, লেখাটি বড় ভাল হয়েছে।" তিনি এবারে এবং পরেও বহুবার এই পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য, রূপসজ্জা এবং রচনাদির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন। 'বসুধারা কাগজখানি প্রায়ই বড় বড় অক্ষরে ভাল কাগজে ছাপা', তাঁহার পড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "প্রবাসী এবার বেশ ভাল হয়েছে। কয়েকটি ভাল ভাল লেখাই তোমরা এবার দিয়েছ।" তখন পরবর্ত্তী একটি সংখ্যায় লেখা দিবেন বলিয়াছিলেন। যদুনাথ 'পরশুরামে'র লেখার বেশ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, "রাজশেখর বোস ত এখনও বেশ লিখছেন। কোন কোন পত্রিকার ত বার হচ্ছে, তোমরা তার লেখা নেবার চেষ্টা করতে পার না?" আমি উপস্থিতমত আমার বক্তব্য বললাম।

আচার্য্য যদুনাথ স্বদেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হউক ইহাই মনে প্রাণে কামনা করিতেন। তিনি তাঁহার পৌত্রদ্বয় এবং দৌহিত্রদের কাহাকেও কাহাকেও সামরিক বিভাগে যোগদানে প্রবৃত্ত করান। শুনিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও (যিনি দাঙ্গায় নিহত হন) তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্ম প্রথমে সৈন্য বিভাগে দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পৌত্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে যাই। তিনি দীর্ঘ জীবনে এ পর্য্যন্ত বহু মৃত্যু-শোক ও আঘাত পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিচলিতই দেখিয়াছি বরাবর। তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা পুরুষসিংহ। কিন্তু এদিন পৌত্রের শোকে তাঁহাকে বেশ কিছুটা বিচলিত দেখিলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "আমার সংসার এখন কে দেখবে?" তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন প্রত্যেক পরিবার থেকেই সামরিক বিভাগে ছেলেদের পাঠানো দরকার। আমি এজন্য কয়েকটি নাতিকে এ বিভাগে দিয়েছি।" পৌত্র ও দৌহিত্রেরা কে কোথায় কি ভাবে লিপ্ত আছে একে একে বলিয়া গেলেন। একটি মাত্র দৌহিত্র তাঁহার সঙ্গে আছে, বি-কম পড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে মনে হইল, আচার্য্য যদুনাথকে এরূপ বিচলিত হইতে ত কখন দেখি নাই। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কতকটা শঙ্কিত হইলাম। ওরূপ অসহায় উক্তি তাঁহার মুখ হইতে ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। এ সত্ত্বেও তাঁহার সংযম ছিল অনন্যতুল্য। নিজের নিমিত্ত ছিলেন একেবারে নির্ব্বিকার। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন দেখা করিতে যাই। তিনি বলিলেন, "তাঁহার Prostrated glands অপারেশনের কথা চলছে, বাড়ীতে ত ঘোর আপত্তি। স্ত্রী বলেছেন, "অপারেশন হলে টেবিলেই মারা যাবে।" আমাকে কেউ কেউ আবার বলেছেন মোটেই ভয় নেই। একজন নব্বই বৎসরের বুড়ো মুসলমান অপারেশনের পর একেবারে ভাল হয়ে গেছে। আমার আবার আর একটি ব্যাপারও হয়েছে; কিডনিতে পাথর। ছবি নেওয়া হয়েছে। দেখলাম তাল মিছরির বড় বড় টুকরোর মত। যা হক হাসপাতালে কয়েকদিন গিয়ে থাকতে হবে। চিকিৎসকেরা দেখে শুনে বলবেন, অপারেশন চলবে কি না।" তিনি এ সম্পর্কে লিটারেচার পড়িয়া লইয়াছেন। ঠিক শিক্ষক যেমন ছাত্রকে বোঝান আমাকে তেমনি বুঝাইতে লাগিলেন। মনে মনে তাঁহার নির্ব্বিকারচিত্ততা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। আরও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু সব কথা হয়ত বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

আচার্য্য যদুনাথের শিক্ষক ও ছাত্র গবেষকদের প্রতি প্রীতি-স্নেহ ছিল অসাধারণ। বহু ছাত্রের ডক্টরেট থিসিস সম্পর্কে তিনি নির্দ্দেশ দিতেন, থিসিস সংশোধন ও পরীক্ষা করিতেন। রচনা সংশোধন করিতেন এবং যোগ্য গবেষকদের বুধমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারের সাহায্যে বাঙালী-অবাঙালী বহু কৃতী ছাত্র গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো ছিলেন তাঁহার পুত্রতুল্য। ডঃ কানুনগোর একজন নিকট আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি প্রথম দিকে তাঁহার গবেষণা-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া যদুনাথ কতরূপে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা পরের মুখে না শুনিয়া ডঃ কানুনগোর প্রমুখাৎই এইসব কথা শুনিবার বাসনা রাখি। প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ইতিহাস গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, বহু বৎসর যাবৎ নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার জীবন-পঞ্জীতেও লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "বেগম সমরু" যদুনাথের দৃষ্টির জন্ম পাঠাইলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ইহা উপন্যাস, ইতিহাস নহে।" ইহার পর আচার্য্য যদুনাথকেই গুরুবরণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ ও পরিচালনাধীন গবেষণা-কার্য্য সুরু করেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে মোগল যুগের ইতিহাস ছাড়িয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন

দিক লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ যে ঐরূপ সার্থক গবেষণা কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল আচার্য্য যদুনাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইতিহাস গবেষণায় শিক্ষা নির্দ্দেশ। আমরা যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এবং আমাদের কার্য্যের বিশেষ খোঁজখবর লইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়, সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই প্রবন্ধে বহু স্থলে বলা হইয়াছে। একটি কথা মাত্র এখানে বলি। আমার দৃষ্টিশক্তি লোপের কথা জানিয়া তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। শেষদিকে যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি কাজ ও কথা সারিয়া সত্বর ফিরিয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিতেন। আমি নব-ব্যারাকপুরে নিজগৃহে বাস করিতেছি জানিয়া তাঁহার কতই না আনন্দ! আবার এই স্থানটির খোঁজ-খবরও তিনি রাখিতেন। এ বিষয় তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতাম। একদিন আমার পুত্রকে লইয়া গেলে ফিরিবার সময় আমার অগোচরেই তাহাকে বলেন, পরে আমি ইহা শুনি, "দেখো তোমার বাবা চোখে কম দেখেন, ঠিকমত পথ দেখিয়ে-শুনিয়ে নিও।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপায়ণে ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় আচার্য্য যদুনাথ সরকার বহু পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে তিনি নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে দুই বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই বৎসর একটি দল হইতে তাঁহাকে ভীষণ বাধা পাইতে হয়। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। স্বাধীনতার পর নূতন আইন বলে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লাইফ-মেম্বার বা আজীবন সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-উৎসব প্রতিপালিত হইবে, এই উৎসবে একখানি শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হইবে স্থির হয়। একদিন আচার্য্য যদুনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন ব্যাপারে আমাকে কোন অংশ দেওয়া হইয়াছে কিনা। উত্তর শুনিয়া তিনি বিশেষ খুশী হইলেন না। স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের পর একদিন তাঁহার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন স্বভাবতঃই এ বিষয়ে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "নিজেদের কথাই এতে বেশী ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলা হয়েছে, ইতিহাসের ধর্ম্ম ত ও নয়।" শতবর্ষ স্মারক উৎসবে কয়েকজন গুণী-জ্ঞানীকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হইবে—বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন। নিয়ম এই যে, যাঁহাকে এই সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হইবে তাঁহার পূর্ব্ব সম্মতি লইতে হয়। উপাধি-দান উৎসব হইয়া গেল। শুনব, আচার্য্য যদুনাথকেও এই সম্মান দিতে চাহিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পত্র দিয়াছিলেন। তিনি ইহার উত্তরে এক কড়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ইহা লইয়া একটি জটলাও উপস্থিত হয়। আচার্য্য যদুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। প্রসঙ্গত ঐ কথা উঠিল। তখন তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিবার জন্ত আমার সম্মতি চান, আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি আমি ডক্টরেট চাই না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়াছিলেন একুশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৬ সনে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় দেন ১৯৪৪ সনে। তিনি দেশ-বিদেশের আরও বিস্তর বিদগ্ধমণ্ডলীর নিকট হইতে বিবিধ সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি কোন সম্মানই প্রাপ্ত হন নাই। শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসবে আরও দশজনের সঙ্গে তাঁহার উক্ত সম্মান প্রদানের প্রস্তাবে তাঁহার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক, যখন আমরা দেখি তাঁহার একাধিক ছাত্র এবং ছাত্রকল্প-গুণীকে এই সঙ্গে উক্ত সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের সময়ই তিনি কথাচ্ছলে বলিলেন, "দেখ কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক বছর আগে কি একটা উৎসব উপলক্ষে এক ঝুড়ি লোককে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিলেন। আমাকেও পত্র দেন এই উপাধি দেবার জন্ত। তাঁদেরও লিখেছি, আমার ও সম্মানের প্রয়োজন নেই।... আমি কালীঘাটের পাঁঠাবলি হতে চাই না।" ব্রিটিশ আমলের উপাধিদান প্রথা রহিত করিয়া দিয়া স্বাধীন ভারতে পুনরায় অনুরূপ 'পেট্রনেজ' প্রবর্ত্তিত হয় এটা আচার্য্য যদুনাথের পছন্দসই ছিল না। শুনিয়াছি ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্ম বিভূষণ' উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন। উহা গ্রহণেও তিনি সম্মত হন নাই।

আমার একখানি বড় বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী ছিল। ইহা প্রকাশের কিছিৎ সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া তিনি খুশী হইলেন। কিন্তু প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক শুনিয়া, কি একটা হিসাব করিয়া বলিলেন, "এতে ত তোমার কাগজটা শুধু কেনা চলবে।" ইহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "সেই কাগজই বা পাবে কোথায়? আজকাল কাগজ পাওয়া বড় দুর্ঘট হয়েছে। গবর্ণমেন্টের লোক পেপার মিলে বসে আছে। তাদের দু'হাজার টন কাগজ জুগিয়ে তবে ছিটে-ফোটা অন্ত লোকে পাবে। এ ছিটে-ফোটারও ত বেশীর ভাগ যাবে পাঠ্য পুস্তক বার করতে।" সরকারের এই হস্তক্ষেপকে তিনি মোটেই ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তিনি বলিতেন, "যত সব বক্তৃতা বই করে ছাপান হচ্ছে। দিল্লীতে এগুলি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। এতে কোনই লাভ নেই। আসল ছেড়ে মেকির প্রচারে এই মাতামাতি আমাদের কত ক্ষতি করছে।"

আচার্য্য যদুনাথকে একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্ত বিচলিত হইতে দেখিয়াছি, পৌত্রের মৃত্যুতে। কিন্তু যতবার তাঁহার সান্নিধ্যে গিয়াছি দুঃখশোক তাঁহাকে যেন স্পর্শই করিতে পারিত না। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, পত্রে সে কথা না জানাইয়া লিখিলেন, "একটু পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে আছি, শীঘ্রই তোমাকে জানাইব।" এই পুত্রটি বেশ কয়েক বৎসর কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। শেষে একবার তাঁহাকে গোপালপুরে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠানো হয়। সঙ্গে যাইবে ডক্টর কানুনগোর পুত্র। তিনি সব বিষয় খুটিনাটি তাহাকে বলিয়া দিলেন। এমনকি মৃত্যু হইলে কাহাকে জানাইতে হইবে; কোথায় দাহ করাইতে হইবে, তাঁহাকে

কিরূপে জানাইবে—ইত্যাদি সব ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন। সে যাত্রা অবশ্য এরূপ বিপত্তি ঘটে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর বোধ হয় ১৯৫৫'র শীতের প্রাক্কালে পুত্রটি মারা যান। উক্ত পত্র পাইয়া কিছুকাল পরে যখন যাই তখনও তিনি আমাকে পুত্রের মৃত্যুর কথা বলেন নাই; কাজের কথা যা কিছু বলিয়া গেলেন। পরে যখন এই বিষয় জানিলাম, তখন স্বতঃই গীতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি মনে আসিল—"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা।" তাঁহার সহধর্ম্মিণী দ্বিতলে আছাড় খাইয়া পড়েন। এবং মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এ জন্য তিনি কয়েক বছরই শয্যাশায়ী ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও আচার্য্য যদুনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোন রকমে ধরিয়া উঠাইতে হয়; বৃদ্ধবয়সে স্বাভাবিক শক্তির স্বল্পতা হেতু হাড় জোড়া লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। যদুনাথ গ্রীষ্মকালে বরাবর শৈলাবাসে থাকিতেন। বার্দ্ধক্যহেতু হাই অলটিচিউডে ওঠা যখন ডাক্তারের আদেশে নিষিদ্ধ হইল তখন হইতে তিনি দার্জ্জিলিং-এ যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শেষে প্রতি বৎসর তিনি পুণায় গিয়া এই সময় সরদেশাইয়ের সন্নিধানে কাটাইতেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সহধর্ম্মিণীর অসুস্থতাহেতু শেষ তিন-চার বৎসর আর পুণায় যাইতে পারেন নাই। তিনি গ্রীষ্মের সময় কিছুই লিখিতে বা পড়িতে পারেন না বলিয়া আমার নিকট কতবার আক্ষেপ করিয়াছেন। বিদ্যাচর্চ্চায় তাঁহার কি আকুতি!

গবেষণায় যেখানে ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠার অভাব দেখিতেন সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কম্প্রোমাইজ বা আপোষ রফা কাকে বলে জানিতেন না। এইজন্য অনেক গবেষকের গবেষণা-কার্য্যের উপর তাঁহার বিরাগ দেখিয়াছি, আবার যাহার মধ্যে ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে তিনি প্রাণ ঢালিয়া সকল প্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, দল করিয়া সাহিত্য রচনা বা ইতিহাস গবেষণা হয় না। ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং গভীর সাধনা-সাপেক্ষ। সেবার নিখিল ভারত ইতিহাস সম্মেলন হইল কলিকাতায়। আচার্য্য যদুনাথের নামগন্ধ পাইলাম না। একদিন যদুনাথের নিকট যাই। ইতিহাস সম্মেলনের কথা উঠিল। ইহাতে তাঁহাকে অংশগ্রহণ করিতে না দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া ইহার কারণ শুধাইলাম। তিনি বলিলেন—"হাঁ, আমার কাছে এসেছিল, আমি যাব না বলে দিয়েছিলাম। এইরকম করে কি ইতিহাস গবেষণা হয়: না এর কোন সুযোগ করিয়ে দেওয়া যায়? এতে অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট, শক্তি ক্ষয়।" স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার তোড়জোড় খুব। তিনি বলেন, "হ্যাঁ কংগ্রেসের লোক এখানে এসেছিল. আমাকে এই ভার নিতে বলে, কিন্তু আমি এ ভার নিইনি। ওরা মোটা টাকা খরচও করবে বলেছে। দেখো, শ্রমের একটা মূল্য আছে, বিনি পয়সায় কিছু কর়ো না।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহের নিমিত্ত একটি নিয়ামক-কমিটি গঠন করেন; বর্ত্তমান লেখকও ইহার একজন সদস্য ছিলেন। কমিটির পক্ষে একদল কর্ম্মী গবেষক উক্ত কার্য্যের জন্য সবেতনে নিযুক্ত হন। আচার্য্য যদুনাথের নিকট এসব কথা বলায় বুঝিলাম তিনি সকল খবর রাখেন। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না। তাঁহার সন্দেহ শেষে কার্য্যে পরিণত হইল। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার যত উদ্যোগ কোথায় মিলাইয়া গেল। এইপ্রকার উদ্যোগ-আয়োজন যে অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয় না, আচার্য্য যদুনাথ তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমাকে দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতবর্ষের সার্থক অংশ গ্রহণের কথা একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারত সরকার কর্ত্তৃক জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস রচনার কাজে অনেকটা অগ্রসর হন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত সরকার এই ব্যক্তিকে যথাযথ খেসারত দিয়া বিদায় দিলেন। ইতিহাস রচনায় ভারতীয় ঐতিহাসিক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারীও হইলেন অনেক। ব্যয়বরাদ্দ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু কিছুকাল পরে সব আয়োজন কোথায় মিলাইয়া গেল! এইরকম স্বাধীনতার ইতিহাস রচনাও আর হইল না। তবে কোন রাজ্য-সরকার উদ্যোগী হইয়া নিজ নিজ রাজ্যের স্বাধীনতার ইতিহাস সংগৃহীত মাল-মসলার ভিত্তিতে রচনা করাইয়াছেন। বিহার রাজ্যের স্বাধীনতার ইতিহাস তিন খণ্ডে লিখিয়াছেন ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত। আচার্য্য যদুনাথ বলিলেন, "এই সেদিন কালীকিঙ্কর বিহার রাজ্যের স্বাধীনতার ইতিহাস তিন খণ্ড আমাকে দিয়ে গেছে, সে বলেছে 'ডকুমেণ্ট' সব এক জায়গায় করে দিয়েছি। অন্ততঃ এগুলো তো এই বইয়ে রক্ষিত হ'ল।" উদীয়মান ইতিহাস গবেষকদ্বয়ের একখানি বইয়ে আচার্য্য যদুনাথ, বিখ্যাত পেট্রিয়ট সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "...এর কথা তো অনেকে লেখে, দেশে ধার্ম্মিকের তো অভাব নেই, বামাক্ষ্যাপাও ধার্ম্মিক, কিন্তু সত্যকার ত্যাগী ও সেবাপরায়ণ সতীশ মুখুজ্জের কথা ক'জনে জানে? তাঁকে আমি খুব বেশি দেখি নি; কিন্তু যতটুকু দেখেছি তাতেই তাঁর সম্বন্ধে উচু ধারণা আমার জন্মেছিল।"

দুইটি পত্রিকার প্রতি আচার্য্য যদুনাথের একটি স্বাভাবিক মমতা ছিল। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় কথাবার্ত্তায় ইহা বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে একটি সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা সভা হইয়াছিল। সভার সভাপতি আচার্য্য যদুনাথ। সভান্তে একটি প্রকোষ্ঠে তিনি জলযোগে রত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই দুই-একটা কথার পর তিনি বলিলেন, "নরেন্দ্রবাবুর (কবি নরেন্দ্র দেব) একটি সুন্দর লেখা আছে শরৎচন্দ্রের উপর। এই লেখায় তিনি শরৎ-সাহিত্যের ভাল এষ্টিমেট করেছেন। লেখাটি নিয়ে তোমরা ছাপাতে পার না? হিন্দু হোষ্টেলের সভায় তিনি এটি পড়েছিলেন।"

সুরেশচন্দ্র মজুমদার পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে আচার্য্য যদুনাথ কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। ফিরিয়া আসিলে তাঁর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে সেদিন প্রথমেই কথা হইল সুরেশবাবু সম্পর্কে। যদুনাথ তাঁহার মৃত্যুতে কত দুঃখিত। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার অবস্থাদি সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার সব কথার জবাব দিতে পারিলাম না। তিনি কতকগুলি বিষয় জানিয়া খোঁজ-খবর তাঁহাকে জানাইতে বলিলেন। এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় প্রতিষ্ঠান—এখন বাঙালীর দুর্দ্দিন উপস্থিত—এটি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিবে। ইহার যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হইতে পারে সে বিষয়ে সেদিন আচার্য্য যদুনাথের কতই না ঔৎসুক্য দেখিয়াছি। ইহার পরেও 'প্রবাসী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই দুইখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ সম্বন্ধে তিনি নানা প্রশ্ন করিয়া মূল অবস্থা জানিতে চাহিতেন।

গত ত্রিশ বৎসরে আচার্য্য যদুনাথকে দূর ও নিকট হইতে নানাভাবে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তিনি কত বিষয়ে কত কথা বলিয়াছেন। এখানে যাহা কিছু মনে পড়িল তাহাই কথায় বিধৃত করিতে চেষ্টা পাইলাম। উনবিংশ শতাব্দীর টিপিকাল বাঙালী ছিলেন তিনি। তাঁহার জিজ্ঞাসু মন গত শতকের মহামনা ব্যক্তিদের মত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। এই জিজ্ঞাসু মন বিংশ শতাব্দীরও একটি পরম সম্পদ। তিনি দুই শতাব্দীর সেতু স্বরূপ হইয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমাদের নমস্য।

অনেক কথাই অ-বলা রহিল। শেষ সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করিয়া আজিকার কথা শেষ করিব। হাসপাতালে তাঁহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রোপচার করিবেন না, চিকিৎসকমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তারা আমাকে খাদ্যাখাদ্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আমার চিকিৎসা তখন পথ্যকে ভিত্তি করে। মাংস খাওয়া একেবারে নিষেধ, মাছও ত্যাগ করেছি।" অতঃপর নানা বিষয়ে কথা উঠিল। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ আমি জানিতাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তিনি জাতির প্রয়োজন-উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য চিন্তাশীল ও কর্ত্তৃস্থানীয়দের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন।

শিক্ষার কথা পাড়ায় তিনি বলিলেন, "আমি দু'বছর ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম। এডমিনিষ্ট্রেশনের দিকে কিছু কিছু সংস্কার করতে পেরেছি। শিক্ষার সংস্কার কিছুই করতে পারি নি। তখন আমার কাজে খুব বাধা পেয়েছি।...." ইহার পর তিনি বলিলেন, "আমি যখন সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নি, তখন দু'বছরের জন্য নূতন একটি সরকারী কাজের প্রস্তাব আসে। আমি তা গ্রহণ না করে কিছু ভাল কাজ করতে পারব বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করি। ঐ সরকারী পদের বেতন ছিল মাসে বার-তের শ' টাকা। এই দু'বছরে আমি ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছি। তবে কি জান, দেশের কাজ কিছু করতে হলে ত্যাগ স্বীকার চাই। এই মনোবৃত্তি আমাদের ভেতর বাড়াতে হবে।"

শেষ সাক্ষাৎকালের এই কথাগুলি এখনও যেন কানে অনুরণিত হইতেছে।

ঘুমন্ত রূপ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রমা,
ঘুমে ক্লান্তির এক-রাশ রেখা জমা!

মন ভাবে—চুপে, সবার অলখে ডাকি!
হৃদয় বেচারা ভাবে—না, না, বসে থাকি,
ওই রোগা দেহে অত খাটুনির শেষে
ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাবোনা ভালবেসে!

হায়, লোভী-মন, শুধু করে ছটফট।
কেবলই সে ভাবে—ডেকে তুলি চটপট!

হাওয়া লুটোপুটি করে কালো এলো চুলে
কটির বসন কখন যে গেছে খুলে!
কি একটা বই গড়ায় বুকের কাছে,
পাতাগুলো তার মুক্তির স্বাদে নাচে!

মন উসখুস, মরমী-হৃদয় চুপ:
মুগ্ধ দু'চোখ চুমে ঘুমন্ত-রূপ!

প্রতিঘাত

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

স্থান—কাল—পাত্র। না, কোন রকম বাছবিচারের বালাই নেই পরীর। সধবা আর নিজের সমবয়সী হলেই হ'ল। যেখানে সেখানে, যার তার কাছে—স্বামী আর গহনা নিয়ে কথা পাড়া—এ যেন স্বভাব-দোষে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। নিজের অলঙ্কার-সৌভাগ্য আর স্বামী-সোহাগের কথা শোনাতে শোনাতে অতি-মাত্রায় প্রগলভা হয়ে ওঠে যেন পরী। বলতে বলতে কি এক ধরনের তৃপ্তির স্বাদ উপভোগ করে যেন। শুধু কি তাই! কথা শোনার ফলে প্রতিক্রিয়া সুরু হয় অনেকেরই মনে। কারও মুখে চোখে অতৃপ্তিজনিত ব্যথার ভাব ফুটতে দেখলে উপভোগের স্পৃহা ওর উদ্দাম হয়ে ওঠে যেন।

এখানে এই ঝুলনের মেলায়—এত ভিড়—এই সর্ব্বব্যাপী বহুবিচিত্র কলকণ্ঠধ্বনি! এমন পরিবেশের মধ্যেও স্বভাবদোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ঠিক। ব্যতিক্রম নেই কোথাও।

—দেখি দেখি, তোমার চুড়ির 'প্যাটার্ণটা' ত বেশ ভাই। নতুন ধরণের দেখছি যেন!

ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে করে পরীর সামনেই ঠিক বসেছিল বউটি। সুরূপা না হউক—বউটির সারা মুখের পরিমণ্ডল ব্যেপে মাতৃত্বের অপরূপ মাধুর্য্য টলমল করছে যেন। বয়স বড় জোর তেইশ কি চব্বিশ। হ্যাঁ, পরীর সমবয়সী না হলেও ঠিক ওর চেয়ে খুব বেশী ছোট নয়।

খপ করে বউটির একখানা হাত টেনে নিয়ে নিতান্ত হ্যাংলার মতই তার চুড়ি ক'গাছা বার কয়েক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে পরী।

সোনার নয়। সাদামাটা পিতলের চুড়ি ক'গাছা। বুঝেও পরী না বোঝার ভাণ করলে পুরোপুরি। খুব গরীব নিশ্চয়ই বউটি। বরাতগুণে শিকার মিলেছে ভাল। মেয়ে মানুষ ত বটে! বুক জুড়ে এর স্বর্ণ-তৃষার জ্বালা থাকা স্বাভাবিক। নিজের অলঙ্কার-সৌভাগ্যের কথা শুনিয়ে এর মনে অতৃপ্তির হাহাকার জাগাতে পারলে—আনন্দ আস্বাদ মিলবে ভাল। চোখজোড়া পরীর শিকারী বিড়ালের মতই ঝক ঝক করে উঠল যেন।

এ স্বভাবদোষ নয়ত কি! সেই কোন দুপুরের আগে থেকে পদচারণা সুরু হয়েছে—আর এখন এই সুর্য্য পাটে নামল বলে। সর্ব্বক্ষণ অবিরাম ঘুরেছে পরী এই মেলাতলায়। কতখানি জায়গাজুড়ে মেলা বসেছে! সারি সারি দোকানপাট—দোকান-পাটের শেষ নেই যেন আর। তা ছাড়া, ম্যাজিক—সার্কাস, নাগর-দোলা, গোলকধাঁধা, পুতুলনাচ, যাত্রা—মেলার আনুষঙ্গিক কোন কিছুরই অভাব নেই। কতখানি জায়গাজুড়ে কত রকমের সব মূর্ত্তি গড়ে সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছে ছবির মত করে। কি নেই? অনন্তশয্যা থেকে সুরু করে ভীষ্মের শরশয্যা—মায় দশ অবতার পর্য্যন্ত। চোখের সামনে পুরাণের সব আখ্যানগুলো আকার ধরে ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন। আকর্ষণীয় আর দর্শনীয় কত কি যে রয়েছে মেলায়! ঘুরে ঘুরে দু'দুবার করে মেলার অনেক কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে পরী। পা দুটো তাই অবসন্নতায় এলিয়ে পড়ছিল যেন। এখানে এই খেয়াঘাটের উপর বটতলাটায় তাই একটু ফাকা পেয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছিল পরী। বসে সবে একটু হাঁপ ছেড়েছে বইত নয়। অমনি সুরু হয়েছে স্বভাবের লীলাখেলা।

দোষের মধ্যে বউটি ওর গায়ের গহনাগুলির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি পেতে তাকিয়েছিল কয়েকবার। কাঁকন, চুড়ি, হার, অনন্ত আর কাণবালা। মেলাতলা ভিড়ের জায়গা বলে অর্দ্ধেকেরও কম গহনা পরে এসেছে পরী। তা হাঁ করে দু'দণ্ড ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার মত গয়না কিন্তু সব।

পরীর হাতভরা সোনার চুড়িগুলোর উপর বউটির বিস্মিত দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়েছিল তখনও। হাসতে হাসতে নির্লজ্জের মত বললে পরী—গেল পুজোর সময় এই চুড়ি সখ করে গড়িয়ে দিয়েছিল ও। প্যাটার্ণটা তেমন মনে ধরে নি ভাই, সত্যি বলছি। খুৎ খুৎ করি বলে—গেল হপ্তায় আর এক সেট গড়াতে দিয়েছে তাই। তা বলতে নেই—বাড়ীর মানুষটিকে কিন্তু পেয়েছি ভাই বড় মনের মত। কানে একবার শুনলেই হ'ল। দুশো-পাঁচশো যতই লাগুক না কেন—হরি স্যাকরাকে ডেকে বায়না দিয়ে দেবে অমনি। সব্ব অঙ্গ সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে—তবু যেন আশ মেটে না ওর।

কথাটুকু নিতান্ত মিথ্যা নয় অবশ্য। প্রায় দশ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে পরীর। এই ক'বছরের মধ্যে কত রকমের গহনা যে ভেঙে গড়িয়েছে আর গড়িয়ে আবার ভেঙেছে পরী—তা আর বলবার নয়। স্বামী ওর 'না' করে নি কোনদিন। নিত্য নতুন গহনাপরা—আর অঙ্গভরা আভরণ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের সমবয়সী বউ-ঝিদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া এ নেশা যেন বেড়েই চলেছে ক্রমশঃ পরীর।

বিহ্বল দৃষ্টি যেন বউটির। শাণিত হাসি ঝকঝক করে উঠল পরীর দাঁতে দাঁতে। কথায় পরম আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে বললে—তা, সোনা কত করে লেগেছে ভাই এক এক গাছায়?

বউটি সঙ্কোচশীর্ণ হয়ে উঠল যেন একটু। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললে—এ সোনার নয় দিদি! পেতলের উপর গিল্টি করা

হয়ত। নতুন এখন, তাই চিক চিক করছে এত। দিন কতক জলহাওয়া লাগলেই ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে।

বউটির মুখের ভাব দেখে পরীর চোখ জোড়া উৎফুল্ল হয়ে নেচে উঠল যেন। হেসে বললে—তা হোক ভাই—আমার সোনার চুড়ির চেয়েও যেন জলুশ বেশী! আর 'প্যাটার্ণটাও' বেশ মনে ধরে ভাই। দুধের সাধ ঘোলে মেটে না তাই—না হলে কিনে পরতাম দু'গাছা করে।

রীতিমত বিস্ময়মাখানো মুখখানা তুলে পরীর দিকে চাইলে বউটি। বললে—আপনার সোনার থাকতে পেতলের চুড়ি পরতে যাবেন কোন দুঃখে দিদি? আমিও কি পরতাম ছাই! হাতের অই নো-ই আমার সোনা। কি হবে বলুন ত এই সব ছাই-পাঁশ পরে। আমিও পরব না—ও-ও ছাড়বে না। মেলাতলায় অতলোকের সামনে হাত ধরে সে কি সাধাসাধি! লজ্জায় মরি দিদি। কিছুতেই ছাড়লে না তাই…।

বর সঙ্গে এসেছে বুঝি? কথাটা অন্যমনস্ক হয়েই যেন বলে ফেললে পরী।

সলজ্জ স্মিতহাসি ফুটে উঠল বউটির ঠোঁটের কিনারায়। বললে—হ্যাঁ দিদি, আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে—মাদুর কিনতে গেছে দুখানা।

বউটির কোন কথাই আর শ্রুতিগোচর হ'ল না যেন পরীর। পিতলের চুড়ি পরাবার জন্যে হাত ধরে সাধাসাধি করার কথা শুনে পরীর মনটা কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। বিপুল জনতার উচ্ছসিত কলগুঞ্জন ছাপিয়ে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ওর কানের কাছে। বার-তের বছর আগে শোনা বড় অনুনয়জড়িত কণ্ঠস্বর।

—ভারি সুন্দর মানাবে তোমার হাতে পরী—সত্যি বলছি। কে বলবে এ পেতলের—সোনার চুড়ির মতই কেমন চিকচিক করছে দেখ। পরবে না ত লক্ষ্মীটি?

গোধূলি বেলা তখন। চুড়ি পরাবার জন্যে খিড়কিপুকুরের ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি হাত ধরে সে কি সাধাসাধি সুরু করেছিল মুকুন্দ! ভরা-ভর্তি চৌদ্দ বছরই বয়স হবে তখন পরীর। গড়নটাও বেশ বাড়ন্ত। ফর্সা সুন্দর মুখখানির উপর—টানা টানা ডাগর দুটি চোখ। সতের আঠার বছর বয়সের মুকুন্দ তলে তলে সম্মোহিত হয়েছিল নিশ্চয়ই।

মুকুন্দর নির্লজ্জপনার মাত্রাধিক্য দেখে প্রথমটায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল পরী। পরক্ষণেই কিন্তু রাগে ক্ষোভে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পেতলের চুড়ি ক'গাছা মুকুন্দর হাত থেকে খপ করে তুলে নিয়ে একেবারে পুকুরের মাঝ-বরাবর ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল পরী। সেই বয়সেই চোখে আগুন ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—ছোটলোক কোথাকার! গায়ে হাত দাও তুমি কোন আক্কেলে শুনি?

কথা শুনে আর পরীর চোখমুখের ভাব দেখে মুকুন্দ সেদিন চমকে উঠে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল নিমেষের মধ্যে। কিসের ঝোঁকে যে অমন অভাবনীয় কাণ্ড করে বসেছিল মুকুন্দ—তা সেদিন ঠিক না বুঝলেও—আজ কিন্তু তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে পরী।

ফেরিওয়ালাটা সেবার নতুন এক ধরনের পিতলের চুড়ি নিয়ে এসেছিল পাড়ায়। হালদারদের বার-বাড়ীর উঠানে তাকে ঘিরে হাট বসে গেল যেন। পাড়া ঝেঁটিয়ে জড় হয়েছে মেয়েরা। দু'গাছা-একগাছা করে পরছিল প্রায় সকলেই। পিতলের চুড়ি হউক—কি জলুশ আর রঙ! কে বলবে সোনার নয়। একান্ত লোলুপ দৃষ্টি পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুড়ি পরানো দেখছিল পরী। ওই ধরনের সোনার রঙের চকচকে চুড়ির উপর লোভ ছিল ওর বরাবরই। ওর মামাতো বোন দুলি ত ওর সমবয়সী প্রায়। মামীর মত দুলিরও হাতভরা সোনার চুড়ি গড়িয়ে এসেছিল দিন কতক আগে। নিরাভরণ দেহ পরীর। তলে তলে কি এক ধরনের উদগ্র বাসনা পরীর মনের পরতে পরতে অস্থিরতা জাগিয়ে তুলত যেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে দুলির হাতের ঝকঝকে সোনার চুড়ি ক'গাছার উপর নজর পড়লেই—দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ওর মাথা কুটে কুটে মরতে চাইত যেন।

কায়েত-দিদিমা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েকবার চোখা-চোখি হতেই পরীর মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন সম্ভবতঃ। দোষের মধ্যে হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি—তুইও দু'গাছা করে পর না লো পরী। তোর হাতে সকলের চেয়ে ভাল মানাবে বাপু এ চুড়ি।

সত্যি তাই। বাপমা-খেকো মেয়ে পরী। শুধু অনাদরে অব-হেলায় নয়—নানাভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহে সহে মামীর সংসারে মানুষ হয়েছে পরী। তবু গায়ের রঙ--মুখচোখ, গড়ন—অঙ্গভরা বয়ঃসন্ধির ঐশ্বর্য্য সবকিছু মিলিয়ে রূপের ওর তুলনা মিলিত না যেন।

মামী উপস্থিত ছিলেন। কথা শুনে ফোঁস করে উঠেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কায়েত-দিদিমার সঙ্গে কম বচসা হয় নি সেদিন। মামী কথা কইতেন না ত—বিষদাঁত ফুটিয়ে দিতেন যেন। সেদিনের সেই বিষ-ঢালা কথাগুলো আজও ভুলতে পারে নি পরী। কোন দিনই পারবে না হয় ত। দাঁতে দাঁত ঘষে সবাইকে শুনিয়ে মামী বলেছিলেন সেদিন—গয়না দেখলে কারও গায়ে হতচ্ছাড়ী আদেখলের মত তাকাবে গা অমনি! চোখ নয়ত—ডাইনীর দিষ্টি যেন। চোখখাগীর জন্যে দু'দণ্ড গায়ে একখানা গয়না পরে সুখ আছে? অমনি হ্যাংলার মত নজর দেবে গা! সেবার অমনি দুলির কানের দুল একটা হারিয়ে গেল কোথায়। ওই হতচ্ছাড়ীর দিষ্টি লেগে-লেগেই ত খোয়া গেল অমন জিনিসটা।

সকলের সামনেই চোখে সেদিন জল এসে পড়েছিল পরীর।

করে নি ও। চোখ মুছে মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল মুকুন্দর সঙ্গে। তার মাত্র সপ্তাহখানেক পরেই ঠিক এই কাণ্ড। এই রতনদীঘিতেই মেলা দেখতে এসেছিল মুকুন্দ। বড় সখ করেই বেচারী কিনে নিয়ে গিয়েছিল চকচকে পিতলের চুড়ি ক'গাছা। উচ্ছ্বসিত অনুরাগের ঝোঁকেই অমন অভাবনীয় কাণ্ড করে ফেলেছিল নিশ্চয়ই। না হলে চৌদ্দ বছরের মেয়েকে কাকেও না জানিয়ে চুড়ি কিনে দেওয়ার কাজটা শোভন কি অশোভন—কি ভাবে কথা উঠবে পাড়ায়—মামীই বা কি চোখে দেখবেন, কেন যে এসব চিন্তা ঠাঁই পায় নি মুকুন্দর মনে আজ তা ভালভাবেই বুঝতে পারে পরী। চুড়ি পরাবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যায় মুকুন্দর দেহমনের সেই অভাবনীয় উদ্দীপনা—সেই আবেগোজ্জ্বল অনুনয়-বিনয়—সেই সঙ্গে তার হাতের সেই অনুরাগ-বিজড়িত স্পর্শ—সবকিছু ভাবলে পরীর সারা মন জুড়ে আজও কি এক ধরনের আকুলতা জাগে যেন।

কোন দিনই কিন্তু দু'চক্ষে দেখতে পারত না পরী এই মুকুন্দকে। মামীর সম্পর্কের কেউ নয় মুকুন্দ। ওঁর বাপের বাড়ীর দেশের ছেলে। মামার তেজারতির কারবার ছিল। তা ছাড়া আদালত-ঘর করতেন মামা রোজই। মিথ্যা-সাক্ষী দেওয়া পেশা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওঁর। দশ-বিশ ঘর যজমানও ছিল মামার। পূজা-পার্ব্বণ, বিয়ে-পৈতে, সিদ্ধেশ্বরী-কালীর নিত্য-সেবা—সবকিছু সামলাতে হ'ত মামাকে একা। আর পেরে উঠছিলেন না উনি। মামী সেবার বাপের বাড়ী থেকে ফিরলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মুকুন্দকে। বামুনের ছেলে। তিনকুলে কেউ কোথাও নেই। স্বভাবটুকু নাকি খুবই ভাল। তা ছাড়া পূজা-অর্চনার কাজও শিখেছে একটু-আধটু। ভাল করে শিখিয়ে-পড়িয়ে মুকুন্দকে দিয়েই যজমান-ঘর সব বজায় রাখবেন—এই মতলবেই মামী এনেছিলেন ওকে।

পরীর চোখের সামনে একে একে চলচ্চিত্র ফুটে উঠছে যেন।

—বড় তেষ্টা লেগেছে পিসি—আগে জল দাও ত এক ঘটি। প্রথম দিন এসে উঠানে পদার্পণ করেই জল চেয়ে বসল মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ স্বরগ্রামে গলা উঠল মামীর।

—গেল কোন্ চুলোয় নবাবের মেয়ে! বলি—অ পরী—কানের মাথা খেয়েছিস নাকি? এক ঘটি জল দে দিকি মুকুন্দকে।

ঘরেই ছিল পরী। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এনে মুকুন্দর হাতে তুলে দিলে পরী। পানীয় জল আর কমলকলির মত অপরূপ লাবণ্যময়ী পানীয়-দাত্রীটিকে বার কয়েক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মুকুন্দ। কি ভাবলে কে জানে! হঠাৎ হুস করে ঘটির সব জলটুকুই উঠানে ফেলে দিলে মুকুন্দ।

মামী বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হ'ল যে—জল খেলি নে যে বড়!

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মুকুন্দ বললে, শুকো-পানা ভাসছিল পিসি জলে।

মামী দপ করে জ্বলেই উঠলেন না শুধু। এগিয়ে এসে খপ করে পরীর চুলের গোছা ধরে বার কয়েক নেড়ে দিয়ে বললেন, চোখের মাথা খেয়েছ হতচ্ছাড়ী। গেলাস-ঘটি মেজে ধুয়ে আন যখন—বেড়ালচোখে দেখতে পাও না ভেতরে কি রইল, না রইল?

সবরকম কথার আঘাতই তখন গা-সহা হয়ে গেছে পরীর। বিষ-দাঁতের দংশন জ্বালাও সহে এসেছে অনেকটা। কিন্তু ষোল-সতর বছরের অপরিচিত একটি তরুণের সামনে এমন মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা অবমাননা! তের বছরের পরী প্রথমে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চেয়েছিল যেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল পরী। এ লাঞ্ছনার মূলে ওই মুকুন্দ। নিমিত্ত-ভাগী ওই মুকুন্দকে প্রথম দর্শনের ক্ষণটিতেই বিষদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল যেন পরী।

অতিমাত্রায় অগোছালো আর আত্মভোলাগোছের ছেলে ছিল যেন এই মুকুন্দ। মুখফুটে কোন কিছুর জন্যে ফাইফরমাস করা চুলোয় যাক—নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও কেমন যেন উদাসীন ছিল মুকুন্দ। মামী কিন্তু ওর হয়ে হুকুমজারি করতেন পদে পদে।

—মুকুন্দর জামা-কাপড়গুলো বড় ময়লা হয়েছে পরী—কেচে দিস বাপু আজ সাবান দিয়ে।

ঠাকুরদালানের একপাশে নিজের হাতেই বিছানা পেতে শুত রোজ মুকুন্দ। একদিন খালি মেঝের শুয়ে হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল মুকুন্দ। মামী দেখে দাঁতখাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন পরীকে—কেন, বিছানাটা পেতে মশারীটা ফেলে রাখতে কি গতর খোয়া যায় তোমার? বেটা ছেলে—সবদিন পারে নাকি বাপু ওসব করতে!

পূজা সেরে হয়ত বাড়ী ফিরত মুকুন্দ বৈশাখের আগুন-ঝরা রোদ মাথায় করে। ঠাকুরদালানে ধাবড়ে বসে পড়ে একটু পাখার বাতাসের প্রত্যাশাতেই সম্ভবতঃ বড় করুণভাবে তাকাত যেন মুকুন্দ। রোদে-পোড়া ফর্সা মুখখানার অবস্থা দেখে পরীর মনে অল্প একটু মায়া জাগত না যে, তা নয়। সবকিছু দেখেও—নিতান্ত নির্লিপ্তের মতই দাঁড়িয়ে থাকত পরী আকাশের দিকে চেয়ে। মামী দেখতে পেলে প্রায়ই দাঁত খিঁচিয়ে বলতেন, চোখের মাথা খেয়েছ হতচ্ছাড়ী। তেতে-পুড়ে এল ছোড়াটা—কেন, পাখাটা এনে একটু হাওয়া করলে কি হাত খসে যাবে তোমার—না কুষ্ঠব্যাধি হবে হাতে?

মামীর সামনে মুখফুটে কোন কথা বলতে পারত না—কিন্তু মুকুন্দর জন্যে মামীর 'আদিখ্যেতার' বহর দেখে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠত পরী।

মুকুন্দর জন্যে যে পরিমাণ কথা শুনত পরী মামীর কাছ থেকে, সুযোগ পেলেই ঠিক সেই পরিমাণ কথার আঘাত দিয়ে দিয়ে মুকুন্দকে বিপর্য্যস্ত করবার চেষ্টা করত পরী। অদ্ভুত স্বভাব ছিল কিন্তু এই মুকুন্দর। কোন কথাই গায়ে মাখত না একটুও।

বিছানা পেতে মশারি গুঁজে দিতে দিতে প্রায়ই জ্বলে উঠত

পরী ? মুখভঙ্গী করে বিকৃতকণ্ঠে বলত, নবাব এসেছে এখানে মরতে। ছাড়া কাপড় কেচে দিতে হবে, বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে দিতে হবে—ইড়িং বিড়িং মন্ত্র-পড়া কাজ ত ভারি! তাও নিত্যি এসে হাঁপিয়ে পড়বেন বাবু—পাখা টেনে টেনে বাতাস দিতে হবে আর এক জনকে—কেন, গতরে কি শুয়োপোকা ধরেছে তোমার ? চাকরের আবার অত নবাবী কিসের শুনি !

কথার সঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েও দেখেছে পরী। নিতান্ত অনুকম্পায় ভিখারীর মত বড় করুণ দুটি চোখ তুলে হয়ত চাইত একবার শুধু মুকুন্দ। কথা কইত না একটিও।

গায়ে অল্প জ্বর নিয়েই একদিন বাড়ী বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজা করে এল মুকুন্দ। দক্ষিণা সব কোথায় কি পেলে, রাখলে, রাতে তার ঠিকমত হিসাব দিতে পারলে না মুকুন্দ মামার কাছে। পয়সাকড়ির ব্যাপার। কঞ্জুস মামা অগ্নিশর্ম্মা হয়ে যা-তা বললেন মুকুন্দকে।

পরদিন সকালে মুকুন্দর ছাড়া-কাপড় আর উড়ানিখানা কাচতে নিয়ে যাচ্ছিল পরী। দেখে, উড়ানির খুঁটে বাঁধা রয়েছে দুটি টাকা। মামা দালানের একপাশে বসে নিবিষ্টমনে সুদের হিসাব করছিলেন তখন। একটা নিষ্ঠুর আবেগের ঝোঁকে পরী ছুটে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা দুটো ফেলে দিলে মামার হিসাবের খাতার উপর।

—কিসের টাকা রে—বলে মামা অবাক হয়ে চাইলেন পরীর দিকে। মুকুন্দকে শোনাবার জন্যে বেশ খানিকটা গলা চড়িয়ে বললে পরী—কিসের আবার ! কালকের দক্ষিণের টাকা থেকে সরিয়ে রেখেছিল নিশ্চয়ই—নইলে পাবে কোথায় মুকুন্দদা !

মামা গর্জ্জন করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—ডাকত দেখি হত-ভাগাকে। কোথায় রেখেছিলি বলত, টাকা দুটো ?

চূড়ান্ত মিথ্যা কেমন করে যে সেদিন অসঙ্কোচে বেরিয়ে পড়েছিল পরীর মুখ থেকে—আজও ও ভেবে পায় না তা।

বিচিত্র মুখভঙ্গী করে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল পরী—ওই ত কুলুঙ্গির উপর—ভাগবতের তলায় রেখে দিয়েছিল লুকিয়ে। কি ভাগ্যিস দেখলুম তাই !

অপমানের চূড়ান্ত হয়েছিল সেদিন মুকুন্দর। চুরি করার মিথ্যা অপবাদে কি পরিমাণ বিচলিত করেছিল সেদিন অসহায় মুকুন্দকে, তার সেদিনের সেই লাঞ্ছনাবিড়ম্বিত-মুখচ্ছবি—আজও বেশ মনে পড়ে পরীর।

ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যার খানিক আগে বেনেপুকুরে গা ধুতে গিয়ে জলের মধ্যে ঘড়া হারালে পরী। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি ! না হলে ঘড়া ধরে সাঁতার দেয় ত ও রোজই প্রায়। শুধু পায়ে আঁচল জড়িয়ে অমন বেসামাল হয়ে পড়বে যে—তা কে জানত। এক রাশ জল সেঁদিয়ে—ধরতে গেলে অথই জলে তলিয়ে গেল ঘড়াটি।

শুধু হাতে বাড়ী ফিরলে কি পরিমাণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে যে, সে কথাই ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল পরী। সাঁতার কাটতে কাটতে ঘড়াটা জলে হারিয়েছে শুনলেই মামী ক্ষেপে উঠে হিংস্র শ্বাপদের মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপরে। মামীর সে মূর্ত্তি ভেবে—ভয়ে বাড়ীর দিকে আর পা উঠছিল না যেন পরীর।

রাতের পূজা সারবার জন্যে মুকুন্দ জ্বর গায়েই সিদ্ধেশ্বরী তলায় যাচ্ছিল। বেনেপুকুরের ধার দিয়েই পথ।

—মুকুন্দদা শুনছো ? মিনতিকরুণ কণ্ঠ পরীর। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে চমকে মুখ ফেরালো মুকুন্দ। অপ্রত্যাশিত আহ্বান।

—সাঁতার কাটতে কাটতে—সেই বড় ঘড়াটা—অনেক জলে—ওই ওখানে তলিয়ে গেল মুকুন্দদা !

পরীর চোখ সজল। সারা মুখে বিপুল শঙ্কা মাখানো। এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করে সোজা গিয়ে জলে নেমে ডুব দিয়ে কত কাণ্ড করে তবে সেদিন অথই জল থেকে মুকুন্দ ঘড়াটা উদ্ধার করে এনে পরীর হাতে তুলে দিয়েছিল। হঠাৎ সদ্যস্নাত অবস্থায় মুকুন্দকে তখনই বাড়ী ফিরতে দেখে মামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন —কি হ'ল রে ? অবেলায় চান করে এলি যে বড়—তোর না জ্বর হয়েছে কাল থেকে—হ'ল কি রে ?

মুকুন্দর মুখ দিয়েও সেদিন অভাবনীয় মিথ্যাই বেরিয়ে পড়েছিল অসঙ্কোচে।—যেতে যেতে বেনেপুকুরের ধারে নোংরা মাড়িয়ে ফেললাম পিসিমা। কি করি বল—পূজো করতে যেতে হবে ত ? তাই ডুব দিয়ে এলাম একেবারে।

অপ্রত্যাশিত কথা। কথাগুলো শুনে পরী সেদিন বিস্মিতই হয় নি শুধু—সকাল বেলার নিজের সেই নিষ্ঠুর আচরণের এমন অভাবিত প্রতিদানের কথা ভেবে অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারেনি সেদিন পরী।

আর একবার বেহুস জ্বর হয়েছিল মুকুন্দর। ভোরের দিক থেকে ঘন ঘন বমি করতে সুরু করলে মুকুন্দ। বিছানার চাদর—বালিশের ওয়াড়—পরণের কাপড়—ঠাকুরদালানের মেঝে—নোংরা হতে আর বাকি রইল না কোন কিছু। শিবরাত্রির উপোস করে-ছিল পরী। সকাল থেকেই গা-মাথা কেমন ঝিম ঝিম করছিল তার। সব জেনে শুনেও মামী হুকুম জারি করলেন। তাড়াতাড়ি সব কেচেকুচে ডুব দিয়ে আয় পরী।

পরীর মাথায় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল যেন। অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল—পারব না—পারব না আমি ওসব সাফ করতে। ওর আপনার লোক আছে যারা—তারা এসে করুক।

স্নেহ জড়িত কণ্ঠ পরীর। কথা শুনে মামী সেদিন অভাবনীয় ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বলতে আর কিছু বাকি রাখেন নি পরীকে। অত বড় মেয়ের চুলের গোছা ধরে নির্ম্মম ভাবে নেড়েও দিয়েছিলেন কয়েকবার। শেষ পর্য্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ধোয়ামোছা সাফ করা—সব কিছুই করিয়ে নিয়ে ছিলেন মামী পরীকে দিয়ে জোর করে।

নিদারুণ এই লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনার জন্যে সকলটা দায়ী

আপদ বালাই ওই মুকুন্দর মরণ কামনাও করেছিল সেদিন পরী মন-প্রাণ দিয়ে। সেদিনই দুপুরের দিক থেকে জ্বরের ঝোঁকে মুকুন্দর দেহ-মনের অস্থিরতাও বেড়েছিল অভাবনীয় রূপে। সেবাপরায়ণ একটি হাতের মমতাস্নিগ্ধ স্পর্শের লোভেই সম্ভবত: মুকুন্দর মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি ভাব জেগেছিল যেন সেদিন। না হলে মুখ ফুটে যা কোন দিন বলে নি—তেমন কথাই বা বলে ফেলবে কেন! বেহুস জ্বরের ঝোঁকেই অমন কথা বলে ফেলেছিল নিশ্চয়ই। অনেকক্ষণ থেকে জল চাইছিল মুকুন্দ। একটু জল দেবার জন্যে মুকুন্দর খুব কাছ ঘেঁসেই গিয়ে বসেছিল পরী। অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে খপ করে পরীর হাতখানা ধরে বড় মিনতি করুণকণ্ঠে বলে-ছিল মুকুন্দ—মাথার ভেতরটায় কি রকম যেন হচ্ছে আমার—একটু হাত বুলিয়ে দেবে পরী?

মমতা জাগা চুলোয় যাক—কথাগুলো পরীর মনের আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছিল যেন সেদিন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠে কথায় বিষ-মিশিয়ে বলেছিল—যমের অরুচি—'পয়ে' চড়বে তুমি কবে? তোমার জন্যে নরক ঘেঁটে মরব—যা নয় তাই কথা শুনবো—কিসের জন্যে শুনি? তোমার আপনার লোক আছে যারা—তাদের ডাকতে পার না! পরী তোমার কেনা বাঁদী নাকি?

দাঁতে দাঁত ঘসে অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা দৃষ্টি হেনে তখনি মুকুন্দর কাছ থেকে সরে এসেছিল পরী। আর কোন কথা বলবার সাহস হয় নি মুকুন্দর। বাষ্পাকুল চোখদুটিকে লুকোবার জন্যেই সম্ভবত: তাড়াতাড়ি অমন করে পাশ ফিরে শুয়েছিল হঠাৎ বেচারী।

এর ঠিক মাসখানেক পরেই মুকুন্দ যে ভাবে প্রতিদান দিয়ে ছিল এ ব্যবহারের—তা ভাবলে আজও চোখে জল এসে পড়ে পরীর। গাঁয়ে সেবার ঘরে ঘরেই প্রায় ভয়াবহ কলেরা দেখা দিয়ে-ছিল। সন্ধ্যার দিক থেকে পরীরও হঠাৎ একদিন ভেদবমি সুরু হ'ল। হাতে-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে—তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে একেবারে—জিভ যেন বেরিয়ে আসছে ক্রমশ:। দেহের রক্ত—পেটের নাড়ীভুঁড়ি—সব কিছুই যেন জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অসাড়ে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর মহালগ্ন এগিয়ে আসছিল যেন। পুরো একটা রাত কি ভাবে যে কেটেছে পরীর—তা ভাবলে আজও সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে ওর। ডাক্তার ডাকা—দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে হেঁটে গিয়ে তিনবার করে ওষুধ আনা—ডাব জোগাড় করা—শেষ রাত থেকে সর্ব্বক্ষণ পাশে বসে মাথায় হাত বুলানো—কত রকমের কথা বলে আশ্বাস দেওয়া—কি করে নি ওর জন্যে মুকুন্দ সেদিন। পরদিন সকালে ময়লা কাপড়-চোপড়গুলোও মুকুন্দকে দিয়েই কাচিয়ে নিয়েছিলেন মামী। খারাপ রোগ বলে—মামী ওর দিক মাড়ান নি একেবারে।

পাড়ার সবাই শুনে—'ধন্যি ধন্যি' করেছিল মুকুন্দকে। পরী ভাল হবার পর অনেকেই বলেছিল—গেল জন্মে মুকুন্দ নিশ্চয়ই তোর বড় আপনার কেউ ছিল পরী। না হলে, পরের জন্যে কে অমন করে বল?

এই মুকুন্দর সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য একটা সামাজিক বাঁধনে বাঁধা পড়ে যেত নিশ্চয়ই পরী। বাধ সেধেছিল অবশ্য পরী নিজেই। মুকুন্দর সঙ্গেই ওর বিয়ের সব ঠিকঠাক করলেন হঠাৎ মামামামী। গলগ্রহ বইত নয় পরী। খরচা হবে না এক পয়সাও। নমো-নমো করে দু'হাত এক করে দিলেই হ'ল কোন রকমে। বলবার-কইবার নেই কেউ।

বিয়ের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পরীর মনের মধ্যে অভাবনীয় অস্থিরতা জেগেছিল যেন। দুর্ব্বার চিন্তায়-চিন্তায় নিষ্পিষ্ট হয়ে-ছিল কয়েকদিন ধরে পরীর মনটা। মুকুন্দর স্বাস্থ্য ভাল—অসুন্দরও নয় মুকুন্দ। কিন্তু নিতান্ত নিরাশ্রয় মুকুন্দ—একান্তভাবে পর-নির্ভর। না আছে মুকুন্দর চালচুলো—না আছে সম্পর্কের কেউ। পেটে দু'কলম বিদ্যেও নেই মুকুন্দর। এই মুকুন্দর সঙ্গেই জীবনের গ্রন্থি পড়ে যাবে চিরদিনের মত। ঘরবাড়ী—স্বচ্ছল একটি সংসার—গা-ভরা সোনার গহনা, বধূজীবনের সব সোনার স্বপ্ন—সব স্বর্ণ-সম্ভাবনা নিমেষের মধ্যে লেপে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়ে-ছিল যেন পরীর চোখের সামনে থেকে।

চিত্তের সেই নিদারুণ অস্থিরতাকে চেষ্টা করেও দাবাতে পারেনি পরী। বিয়ের দু'দিন আগেই ঠিক মুকুন্দকে একান্ত নিরালায় পেয়ে—পরী দুর্ব্বার কান্নার আবেগ চেপে কোন রকমে নিজের মনের কথাগুলোকে জানিয়ে দিয়েছিল মুকুন্দকে।

—তুমি এমনি করে আমার সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না মুকুন্দদা!

কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল মুকুন্দ। হাঁ, রূপের গর্ব্ব ছিল বই কি পরীর। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে সখ যায় তোমার কোন আক্কেলে শুনি?—এমন কথাও সেদিন ফস করে বেরিয়ে পড়েছিল পরীর মুখ দিয়ে। একটিও কথা কয়নি কিন্তু মুকুন্দ। বিহ্বল দৃষ্টি পেতে শুধু তাকিয়ে ছিল পরীর মুখের দিকে।

—কি আছে তোমার শুনি? না আছে মাথা গোঁজবার ঠাঁই—না আছে খাবার-পরবার সংস্থান! পেটে এক কলম বিদ্যেও নেই তোমার—যে অন্ত কিছু একটা করে খাবে এর পর!

শেষটায় কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পরীর কণ্ঠস্বর।—তোমার কি বল না? এখানে এই মামীর সংসারে এই ভাবে পড়ে থেকে থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে আমাদের এখনও কত কাল ধরে—কে জানে! না—না—দু'টি পায়ে পড়ি তোমার—এমনি করে আমার মাথা খেও না মুকুন্দদা। জীবনের কোন সাধ আহ্লাদই মিটবে না আমার। এর চেয়ে কোথাও থেকে বিষ জোগাড় করে এনে দাও তুমি—তাতেও শান্তি পাব আমি।

কথাগুলি নির্ম্মম আঘাতের মতই সেদিন বুকে বেজেছিল নিশ্চয়ই মুকুন্দর। না হলে—করসা মুখখানা অমন ভাবে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে যাবে কেন? সতের বছরের পর্য্যাপ্ত-যৌবনা একটি মেয়েকে অবলম্বন করে মুকুন্দর মনের মধ্যে যে স্বপ্ন-সৌধ রচিত হয়েছিল এত দিন ধরে তা পরীর চোখের সামনেই ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল নিমেষের মধ্যে। কাকেও কিছু না জানিয়েই—

সেই দিনই সন্ধ্যায় মুকুন্দ চিরদিনের মতই বিদায় নিয়েছিল মামার বাড়ী থেকে। ও-মুখো হয় নি সে আর কোন দিন।

তার মাত্র মাসখানেক পরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে পরী প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল নীলরতন রায়ের সংসারে। চকমেলানো বড় বাড়ী—তেমনি বড় সংসার—বিপুল বিষয় সম্পত্তি আর কাজ-কারবার নীলরতন রায়ের। রায়মশায় সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে গেলেন পরীকে। তেজবরে স্বামী বলে মনের কোণে ক্ষোভ জাগতে পেলে না একটুও, বরং ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের বহর দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল পরীর।

মাত্র দশ বছর আগেকার কথা এসব। স্মৃতির কাঁটা খচ খচ করে বাজে সর্ব্বক্ষণই। সবকিছু পেয়েও কি একধরনের অতৃপ্তির জ্বালা অনুভব করে পরী পদে পদে। অন্তর্দাহী এই জ্বালাই পরীর মনকে বিকৃত করে তুলেছে যেন। জীবনের অপূর্ণতার বেদনাকে ভোলবার জন্তেই সম্ভবতঃ এমন অভাবনীয়রূপে অলঙ্কার-ভোগী হয়ে উঠেছে পরীর মন। কিন্তু আজ আর ওসব চিন্তার আলোড়নকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই কোন রকম। মেলার রাজ্যে হঠাৎ আবার মন ফিরে এল পরীর। সামনের সেই বউটির কোলে ছেলেটা জেগে উঠেছে ইতিমধ্যে। কোলে বসেই ছেলেটা অপরূপ ভঙ্গীতে চেয়ে চেয়ে দেখছে পরীকে।

বুক ভরে এমনি একটি শিশু-দেহের অমৃতস্পর্শ গ্রহণ করবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা পরীর বুকের মধ্যে চাপা পড়ে আছে কোন রকমে। সে আকাঙ্ক্ষা উচ্ছল হয়ে উঠল যেন ছেলেটিকে হাসতে দেখে। হেসে বললে পরী—ছেলে বুঝি এই একটি?

মাতৃত্বের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য ঝলমল করে উঠল বউটির মুখেচোখে। ছেলের মাথার সামনের চুলগুলো ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে—এর বড় আর একটি আছে দিদি। ও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তাকে।

পাশেই বসেছিল পরীর সতীন-ঝি দুটি। তাদের দেখিয়ে বউটি বললে—আপনার বুঝি এই দুটি?

কোন রকম কথা সরল না পরীর মুখ থেকে। ঘাড় নাড়লে শুধু পরী। শুধু এ দুটি নয়। আরও তিনটি মেয়ে আর দুটি ছেলে আছে নীলরতন রায়ের। বিয়ে হয়ে গেছে তিনটি মেয়েরই। বড় আর মেজ, দুটি মেয়েই পরীর চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। উত্তর দেবে কি—পরী যেন আঘাত খেয়ে ভীষণরকম বিচলিত হয়ে উঠল। ঘেমে-ঘেমে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। নিজে সন্তানবতী হয় নি সে আজও। হয়ত সে আশা ওর কোনদিনই আর পুরবে না এ জীবনে।

কথার ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে হঠাৎ বললে পরী—কষ্টেসিষ্টে ব্রঞ্জের ওপরে দু'আনা করে সোনা দিয়ে গাছকতক চুড়ি গড়িয়ে নাও না ভাই? সেও তোমার এই গিল্টির চেয়ে হাজার গুণে ভাল হবে।

পরীর স্বভাবদোষ সক্রিয় হয়ে উঠছে যেন আবার। বউটি লজ্জারুণ মুখ তুলে চাইলে একবার। উচ্ছ্বসিত স্নেহভরে ছেলের মুখখানা একটু তুলে ধরে বললে—এরাই আমার সোনা দিদি। ওসব গয়না পরার সখ নেই আমার কোন দিনই। সে সখ থাকলে কি আর বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে পালাতাম দিদি!

চমকে উঠল যেন পরী। সব সঙ্কোচের খোলস খসে গেল যেন হঠাৎ বউটির মন থেকে। দিব্যি হেসে বললে—বাপমাকে ত কখনও চোখে দেখি নি দিদি—জ্ঞান হবার আগেই হারিয়েছি তাঁদের। মেসো মানুষ করেছিল। মেসোই বড়লোক পাত্তর জোগাড় করে বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেললে। দু'হাত এক হয়ে ত যাচ্ছিল আর একটু হলেই! আমি নিজে না বাগড়া দিলে—শুধু গা-ভরা গয়না কেন—অনেক কিছুই মিলত দিদি কপালে, কিন্তু বিষয়-আশয় আর সোনাদানাই কি সব দিদি জীবনে? আপনিই বলুন না—দোজবরে পাত্তর—তাও বয়েস কম হলেও না হয় কথা ছিল! ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে। দুটি জামাইও হয়ে গেছে শুনলাম। বিয়ের পিঁড়ি থেকে কি সাধ করে উঠে পালিয়ে গিয়েছিলাম দিদি? এই যে এর চালচুলো ছিল না—সহায় সম্বল বলতে কিছু ছিল না—যা হোক কুঁড়ে একখানা-দু' বিঘে জমি করেছে ত কোন রকমে? সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল আমার। কিছু না হোক মনের মত মানুষটা ত পেয়েছি দিদি। একে পেয়ে গাছতলায় থাকি—তাও সগ্‌গ আমার, বলুন কি না?

কথাগুলো বজ্রাঘাতের মতই বুকে বাজল যেন পরীর। বুকের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত কি একধরণের আলোড়ন সুরু হ'ল সঙ্গে সঙ্গে।

ভাদ্রশেষের দিন। সূর্য্য পাটে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে গেলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। মাণিকের মা আর রাঙা পিসি উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। রাঙাপিসি পরীকে বললেন—উঠে পড় বড় বউ—আর বসে কাজ নেই বাপু—খেয়া পেরুতে হবে এখনও, সন্ধে হয়ে আসছে। টক খাবার দুটো পাথর বাটি দেখতে হবে—ভুলে গেছি মা তখন কিনতে। চল উঠি।

মুচকে মুচকে হাসছে বউটি। বিজয়িনীর হাসি যেন। নিজের স্বর্ণাভরণমণ্ডিত হাত দুখানির সব সুষমা বউটির ওই পিতলের চুড়িপরা হাতের কাছে নিতান্ত নিষ্প্রভ বলে মনে হচ্ছে যেন পরীর। উঠতে উঠতে মনের দুর্ব্বলতা চেপে অস্ফুটে বললে—পরী তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই?

তেমনি স্মিতহাসি ফুটে উঠল আবার বউটির ঠোঁটের বললে—এই ত ওপারেই দিদি। খেয়া পেরিয়েই—উত্তরে খানিকটা পথ যেতে হয়। রামরতনপুরের নাম শুনেছেন দিদি?

রামরতনপুর! গ্রামের নাম শুনে চমকে উঠল পরী। ওর স্বামীর বাপের বাড়ী ওই রামরতনপুরে। মুকুন্দ ওই গ্রামেরই ছেলে।

বিস্ময়ের চমক মনটার দোলা দিলে যেন। বটতলা ছেড়ে

যাবার আগে বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টি দিয়ে বউটি আর তার কোলের খোকাটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর একবার দেখে নিলে পরী।

কিন্তু আরও বিস্ময়ের চমক—আরও বজ্র কঠিন আঘাত অপেক্ষমান হয়েছিল যেন সেদিন পরীর জন্যে। খেয়া পার হতে হবে পরীদেরও। ওদেরও বাড়ী ওপারে। নদী পেরলেই বাস মেলে। বাসে চড়লে মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। খানিক পরে খেয়াঘাটে এল পরীদের দল। সন্ধ্যা হয় হয় তখন। খেয়া নৌকায় অকস্মাৎ ভূত দেখলে যেন পরী। দিনান্ত বেলার আলো নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি তখনও। বেশ স্পষ্টই দেখলে পরী। অতি সন্তর্পণে হাত ধরে সেই বউটিকে নৌকায় তুলে দিচ্ছে—স্বয়ং মুকুন্দ। বুকে তার সেই দেড় বছরের শিশুটি। পাঁচ বছরের ছেলেটি মুকুন্দর কোঁচার খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

চাইতে পারলে না আর পরী ওদিকে। ঘাটের সিঁড়িতে সম্বিৎ হারার মতই বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। মাথায় তাড়াতাড়ি কাপড়টা টেনে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললে—ও নৌকায় আমি যেতে পারব না রাঙা পিসি—বুকটা আমার কি রকম করছে যেন হঠাৎ। এর পরের নৌকায় যাব আমরা।

ইতিমধ্যে নৌকায় উঠে পাশাপাশি বসে পড়েছে ওরা। আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে পরী মুকুন্দকে। প্রায় দশ বছর পরে দেখা। আরও সুন্দর হয়েছে যেন মুকুন্দ। আরও বলিষ্ঠ হয়েছে দেহ—আরও উজ্জ্বল হয়েছে গায়ের রঙ। স্বামীস্ত্রী—দুটি সন্তান। পাশাপাশি কি সুন্দরই মানিয়েছে ওদের। চকিতের মধ্যে নিজের স্বামীর মুখচ্ছবি ফুটে উঠল পরীর মনের মধ্যে। পরীর রূপ আর বয়সের তুলনায়—নীলরতন রায়ের চেহারা আর বয়স যে কি ভাবে বিসদৃশ—তা ভাবলে কান্না পায় ওর। টাক ভরা মাথা আর বাঁধান দাঁতই নয় শুধু লোকটার—নজরও খাটো হয়ে এসেছে অনেকটা—হাঁপও বেড়েছে ইদানীং। সন্তানবতী হবার কোন সম্ভাবনাই নেই আর পরীর জীবনে। জীবনের অপূর্ণতার বেদনা নূতন করে বুকে বাজল যেন আজ পরীর। উদ্বেল অশ্রুসমুদ্র চোখের কিনারা ছাপিয়ে গাল বেয়ে সিঁড়িতেও গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা। নদীতীরের ঘনায়মান সন্ধ্যা ছাড়া পরীর চোখের জলের সংবাদ পেলে না আর কেউ।

পর দিনই রাতে শোবার আগে—একগাল হেসে নীলরতন রায় নীল কাগজে মোড়া নূতন চুড়ির গোছা পরীর সামনে মেলে ধরলেন। নিতান্ত নিস্পৃহ দৃষ্টি দিয়ে একবার শুধু তাকালে পরী নূতন ধরনের চুড়িগুলোর দিকে। অল্প ঝাঁঝিয়ে বললে—তুলে রাখ গে আলমারীতে—ওসব আর পরব না আমি।

কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রায়মশায়। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী পরী। মন পাবার জন্যে অতিমাত্রায় আদর দিয়ে আসছেন বরাবরই। হলে কি হবে—পরীর মতিগতি আর মেজাজের হদিস পান নি তিনি কোন দিনই। তবু অকুণ্ঠ ভাবে হেসে বললেন—আহা পরেই দেখ না ছাই! তোমার হাতে এ চুড়ি ভারী সুন্দর মানাবে গো। সোহাগ ভরে পরীর হাতটা ধরতে গেলেন রায়মশায়।

—ছাই মানাবে। বলে অগ্নিকটাক্ষ হেনে আলোটার দিকে সরে গেল পরী। পুরু চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালেন রায়মশায় পরীর দিকে। হতবাক হয়ে গেলেন তিনি পরীর চেহারা দেখে। হাতে শাখার কোলে একগাছি করে সোনার চুড়ি ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাভরণ মূর্ত্তি পরীর।

আজকালের মধ্যে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই! কিন্তু কি যে ঘটেছে—তা কিছুতেই অনুমান করতে পারলেন না রায়মশায়। বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বললেন—গায়ের সব গয়না খুলে ফেললে কেন গো? তোমার হ'ল কি হঠাৎ বড় বউ?

কি যে হয়েছে হঠাৎ—তা রূপযৌবনসম্পন্না পরী ওই একান্ত অবাঞ্ছিত জরাগ্রস্ত স্বামীকে আজ বোঝাবে কি করে? শুধু বিরক্তিব্যঞ্জককণ্ঠে বললে পরী—বাড়ীতে জামাই আসে প্রায়ই। মেয়ে দুটোও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে—ছেলেরাও বড় হয়েছে—হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সবাই—নূতন কোন গয়না পরলে। আমার ভারী লজ্জা লাগে তাই ওসব পরতে। ওসব গয়নাটয়না আর পরব না আমি—আমার ইচ্ছে—বলতে বলতে পরীর চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল হঠাৎ।

ভারতের রামরাজ্য

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় সাহিত্যে রামরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য নামে একটি আদর্শ রাজ্যের কথা পাওয়া যাচ্ছে।

বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যেই রামরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য বা ধর্ম্মরাজের১ কথা পাওয়া যায়। এই নিয়ে কত কাহিনী, কত কাব্য, কত নাটক রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষ নামের মধ্যেই এইরূপ একটি অপূর্ব্ব কাহিনী জড়িত আছে। সে কথা প্রায় সকলেই জানেন। কথিত আছে, আদর্শ রাজা ভরত তাঁর অপরাধী সন্তানের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তাই এই দেশ ভরতের দেশ, বা ভারতবর্ষ।

এইরূপ একটি আদর্শ রাজ্যের কথা বহু প্রাচীনকাল হতে শুনা গেলেও, তার আদৌ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এ বিষয়ে দেশে বিদেশে, অনেকেরই মনে সন্দেহ ছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে সে সন্দেহের নিরসন হয়েছে। সত্যই ভারতবর্ষে এইরূপ একটি আদর্শ রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজার মত কোন রাজা খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক হতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্যদেশের জগদ্বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক২ এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলে গেছেন :

"শত শত সহস্র সহস্র নরপতি পৃথিবীর ইতিহাস ভারাক্রান্ত করে বিরাজ করছেন। মহারাজ, রাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্ত্তী, এরূপ কত উপাধিধারী সম্রাটের মধ্যে অশোকের নাম প্রায় একক, আকাশে এক চন্দ্রের ন্যায়, উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে।··· ···আজকের দিনের পৃথিবীর মানব-সমাজে এমন অনেক, অনেক লোক তাঁর স্মৃতি, স্মৃতির মণিকোঠায় রক্ষা করছেন, যাঁরা কনষ্ট্যান্টিন বা শারলেম্যানের নাম শোনেন নি।"

পাশ্চাত্যদেশের এবং ভারতবর্ষের বহু বিদ্বান ব্যক্তি অশোক সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ লিখেছেন এবং আজও লিখছেন। প্রবন্ধও বহু লেখা হয়েছে। সে-সকলের বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অশোক-চরিত্রের যে-যে দিক আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ ভাবে আমি সেই সেই দিকেরই আলোচনা করব।

অশোকের সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। তাদের মধ্যে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিকই প্রধান। এই ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বললেই যেন যথেষ্ট বলা হয় না। এদের মধ্যে পদে পদে ধর্ম্মযুদ্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অশোকের মাহাত্ম্যে ও মধ্যস্থে এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রশমিত এবং মিলন সম্ভব হয়েছিল।

সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমভাব এবং সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্য আন্তরিক ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অশোক-চরিত্রের মহিমাকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

সকল ধর্ম্মেরই স্ব স্ব বিশেষত্ব আছে। কোন ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের প্রভাবে নিজের বিশেষত্ব না হারাক, উপরন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মেরই অভ্যুদয় হউক—এই ছিল অশোকের অন্তরের আগ্রহ।

নিজে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মকে রাজশক্তির সাহায্যে রাজ্যের অধিবাসীদের সবাকার ধর্ম্ম করবার প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। বরং রাজ্যের সর্ব্বত্র সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জনগণ অধিষ্ঠিত থাকুক—এই ছিল তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। (দ্রষ্টব্য শিলানুশাসন৭—)

আদর্শবাদী হলেও বাস্তবজ্ঞান তাঁর কত প্রখর ছিল, তা তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মলিপিসমূহ হতে বোধগম্য হয়।

যা সকল ধর্ম্মের সারকথা, যা নিয়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, যা আচরণ করলে সকলেই সচ্চরিত্র, সুনাগরিক হতে পারে এবং যা আচরণ করা সাধারণ লোকের পক্ষেও খুব কঠিন নয়, এমন সব ধর্ম্মকথা বা নীতিকথাই তিনি তাঁর প্রজাবর্গকে উপদেশ দিয়েছেন :

ধর্ম্ম কি? "অসদাচার কম এবং সদাচার অধিক, দয়া, দাক্ষিণ্য সত্য ও শুচিতা।" স্তম্ভানুশাসন২।

অসদাচার বা পাপ কি? "চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান (গর্ব্ব) ঈর্ষা।" স্তম্ভানুশাসন—৩।

সদাচার বা পুণ্য কি? "প্রাণিহত্যাবিরতি, জীবহিংসানিবৃত্তি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, ব্রাহ্মণশ্রমণের প্রতি যথোচিত ব্যবহার, পিতা, মাতা ও বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।" শিলানুশাসন—৪।

বন্ধু, পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজনকে ও ব্রাহ্মণশ্রমণকে দান সাধুকার্য্য। প্রাণীহত্যাবিরতি সাধুকার্য্য। অল্পব্যয় এবং অল্পসঞ্চয় সাধুকার্য্য। শিলানুশাসন—৩।

সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে দু'চার জন বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ

---

১ ধর্ম্মরাজ=ধম্মরাজা (পালি) দীঘনিকায় (পালি টেক্সট সোসাইটি), ১।৮৮-৮৯। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১।১০৯-১০; ৩।১৪৯-৫১। অশোকাবদান। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃ, ২৪৯। "লোকরঞ্জনতো রাজা" প্রজারঞ্জন করেন বলেই তিনি রাজা; ঐ।

২ H. G. Wells Outline of History, p. 490,

হবেন এবং বাকি জনগণ যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই অবস্থান করবেন, যাতে এরূপ অব্যবস্থার অবসান হয়, সৎ নাগরিকের সংখ্যা, সজ্জনের সংখ্যা যাতে শতকরা হারের সর্ব্বোচ্চ কোটির দিকে ওঠে, লোকচরিত্রে পরম অভিজ্ঞ, অশোক সেই চেষ্টাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।৩

"অসদাচার কম ও সদাচার অধিক"—এই উপদেশের মধ্যে অশোকের প্রখর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের বৃহত্তম ধর্ম্মসম্প্রদায়দ্বয়ের নেতা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি শ্রদ্ধা, ও তাঁদের উদ্দেশ্যে দানের উল্লেখ অশোকের অনুশাসনের নানা স্থানে পাওয়া যায়।

আর্য্য সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারের জন্য, ব্রাহ্মণশ্রমণকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে। তাঁদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সেই শক্তিশালী ব্রাহ্মণশ্রমণের দ্বারা ধর্ম্মের দিগ্বিজয় সম্ভব হবে—এই ছিল অশোকের স্বপ্ন। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

সে যুগের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদিক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করে, তিনি দেশের, জাতির, মানব-সম্প্রদায়ের, কেবল মানব-সম্প্রদায়ের নয়, সমস্ত প্রাণীজগতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্য্যে নিযুক্ত করেছিলেন—এই তাঁর মহত্ত্বের, কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ বলতে মূর্খ ও গুণহীন জাতিব্রাহ্মণ মাত্রই৪ পূজ্য ছিলেন না এবং শ্রমণ বলতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীমাত্রই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন না। অশোকলিপি হতে জানা যায় অযোগ্য শ্রমণকে অশোক বিহার হতে বিতাড়িত করতেন। তাঁদের কাষায় বস্ত্র কেড়ে নিয়ে গৃহস্থের বেশ (শ্বেতবস্ত্র) দিতেন (সঙ্ঘভেদ স্তম্ভানুশাসন দ্রষ্টব্য)।

গুণগ্রাহী সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে বেশ অনুমান করতে পারি, তখনকার ব্রাহ্মণসমাজে সদ্ব্রাহ্মণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। বিরাট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব নৈতিক উন্নতির দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণসমাজেও চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

ব্রাহ্মণের মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বৌদ্ধের সাম্য ও মৈত্রী, উভয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলনে এবং নির্গ্রন্থ (জৈন) আজীবিক, শৈব, পাষণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রতিভার সহযোগিতায় অশোক ভারতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠার জন্য অশোক কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন—তা তাঁর শিলালিপি হতে উদ্ধৃত হ'ল:

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সর্ব্বসম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের সম্মান করেন। তাঁদের নানা দ্রব্য দান করেন। নানাপ্রকার সাহায্য করেন। কিন্তু এই দান বা সম্মানকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন না, যেমন গুরুত্ব দেন তিনি প্রতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সার

---

৩ অশোক যে এতে বহুলপরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন তা তাঁর রাজ্যাভিষেকের ২৮ বৎসর পরে প্রকাশিত নিম্নোক্ত স্তম্ভলিপি হতে জানতে পারা যায়:

সুখের বিষয় অশোকের কর্ম্মচারিগণ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে এই কার্য্যে অশোকের সহায়তা করেছিলেন, প্রজাদের অনুপ্রাণিত করবার শক্তি তাঁদের ছিল—উপরোক্ত স্তম্ভলিপির মধ্যেই অশোক এ কথা সন্তোষের সহিত উল্লেখ করেছেন।

অশোক বলেছেন যে, দুই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে:

১। নিয়ম প্রবর্ত্তন (যথা—পশুবলি নিষিদ্ধ)।

২। প্রচার ও উপদেশ।

এর মধ্যে প্রচার ও উপদেশের (যুক্তিপূর্ব্বক বুঝিয়ে বলার) দ্বারাই অধিকতর সাফল্য লাভ হয়েছে। স্তম্ভানুশাসন-৭।

৪ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ যুগের পাঠকদের যা ধারণা—এ ব্রাহ্মণগণ কিন্তু সেরূপ ছিলেন না। এরা আহারে বিহারে এ যুগের "সনাতনী" ব্রাহ্মণদের বিপরীত ছিলেন। কারণ এরা অসবর্ণ বিবাহ করতেন এবং অন্তবর্ণের রন্ধন করা অন্ন গ্রহণ করতেন। সেই অন্নের সঙ্গে এমন দু'একটি ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হ'ত, যার উল্লেখ এ যুগের ব্রাহ্মণ, শূদ্র কারও প্রীতিকর হবে না। তাঁদের পাকশালায় অন্ন পাক করতেন শূদ্র। আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২২২৪-৬।

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ * *

ব্রাহ্মণাদিষু চ শূদ্রস্য পকতাদি ক্রিয়াপি চ * *।

* * নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

আদিত্য পুরাণ।

ব্রাহ্মণাদিষু চ শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপি চ।

নির্ণয়সিন্ধু, ৩য় পরিচ্ছেদ (পূর্বার্দ্ধ)।

ব্রাহ্মণের পুত্রই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হতেন। কিন্তু যোগ্যতা থাকলে অন্তবর্ণের ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব ছিল না।

আজীবিক: আজীবক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে গাঙ্গের উপত্যকার সমীপস্থ কোনও স্থানে এর উদ্ভব হয়। মহাবীর যেমন জৈনদের, মস্করীপুত্র গোশাল সেইরূপ আজীবিকদের শেষ তীর্থংকর। উভয়ে কিছুকাল একই সঙ্গে তপস্যা করেন। কথিত আছে, গোশালই প্রথমে সিদ্ধি (জিনত্ব) লাভ করেন এবং তিনি মহাবীরের ধর্ম্মমতে প্রভাব বিস্তার করেন।

এককালে আজীবিক সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। পরে দিগম্বর জৈন এবং শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

(যোগ্যতা)-বৃদ্ধিকে। সারবৃদ্ধি বহুপ্রকার। কিন্তু তার মূল হচ্ছে—বাক-সংযম। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় অস্থানে (অপ্রকরণে) নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করবে না। নিন্দা বা প্রশংসার স্থল উপস্থিত হলেও তা কম করবে। বস্তুতঃ স্থলবিশেষে (প্রকরণে) বা যথাস্থানে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা করবে। এতে নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হবে। অন্য সম্প্রদায়ও লাভবান হবে। অন্যথা নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করবে, অন্য সম্প্রদায়েরও অপকার করবে।

"লোকে যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন, তা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিবশতঃ। তাঁরা মনে করেন—"এইরূপে আমাদের সম্প্রদায়কে সুপ্রসিদ্ধ করব।" বস্তুতঃ তাতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেন।

"সর্ব্ব সম্প্রদায়ের একত্র মিলিত হওয়া ভাল। এইভাবে তাঁরা পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল (বা আগ্রহশীল) হউন। দেবপ্রিয়ের ইচ্ছাই হচ্ছে এই যে, সর্ব্ব-সম্প্রদায় বহুশ্রুত হউক, কল্যাণযুক্ত হউক।

"যাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান তাঁদের বলা হউক, দেবপ্রিয় দান বা সম্মানকে তত বড় মনে করেন না, যত বড় মনে করেন সর্ব্বসম্প্রদায়ের যোগ্যতাবৃদ্ধিকে। সর্ব্বসম্প্রদায়ের যোগ্যতা বৃদ্ধি হউক। এর জন্যই ধর্ম্মমহামাত্র ৫ স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র, ব্রজভূমিকাদি উচ্চপদস্থ অধিকারিবর্গকে নিযুক্ত করা হয়েছে।"

শিলানুশাসন—১২ (২৫৬ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ)।

৫ মহামাত্র নামে মন্ত্রীশ্রেণীর অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ দায়িত্বসম্পন্ন নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যেমন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নগরের বিচারবিভাগের পরিদর্শক ছিলেন। কেউ বা রাজান্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। কেউ বা রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্য হতে অশোক, তাঁর রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরে, ধর্ম্মমহামাত্র নামক এক বিশেষ শ্রেণীর কর্ম্মী নিযুক্ত করেছিলেন,; যাঁদের কাজ ছিল ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান।

কেবল কর্ম্মচারীদের উপর ভার দিয়েই অশোক এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন না। তিনি নিজে নানা সম্প্রদায়ের সভ্যগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন:

"ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বসম্প্রদায়ের জনগণের নিকট প্রত্যুপগমনকেই আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করি।" স্তম্ভানুশাসন—৬।

স্ত্রী-অধ্যক্ষমহামাত্র=স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

ব্রজভূমিক—এরা ঠিক কোন কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন জানা যায় না। তবে এরা ধর্ম্মমহামাত্রদের কার্য্যে সহায়তা করতেন।

"এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি—"

আফগানিস্থান হতে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তরবঙ্গ, নেপালের তরাই অঞ্চল হতে মহীশূর পর্য্যন্ত, ২৩শ বছরের পূর্ব্বের ভারতবর্ষকে ধর্ম্মসূত্রে এক অখণ্ড ভারতে পরিণত করেছিলেন—আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মরাজ অশোক।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাই, এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে গ্রাস করবারই চেষ্টা করেছে। অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করাই ধর্ম্ম-প্রচারকদের লক্ষ্য ছিল। অথচ সেই প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্ম-প্রচারক সম্রাট অশোক সকল ধর্ম্মেরই উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন:

"আমার ধর্ম্মমহামাত্রগণ এমন বহুবিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন যা সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই হিতকর। তাঁরা সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্যই ব্যাপৃত আছেন।

"আমার ব্যবস্থানুযায়ী তাঁদের মধ্যে অনেকে সঙ্ঘের কার্য্যে, অনেকে ব্রাহ্মণ ও আজীবিক সম্প্রদায়ের কার্য্যে, অনেকে নির্গ্রন্থদের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অন্যেরা অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কার্য্যে অভিরত আছেন।

"এইভাবে বিভিন্ন মহামাত্রগণ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের কার্য্যে অভিরত আছেন। ধর্ম্মমহামাত্রগণ যে কেবলমাত্র উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কার্য্যেই ব্যাপৃত আছেন তা নয়, যাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই সেই অনুল্লিখিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কার্য্যেও তাঁরা অভিরত আছেন।" স্তম্ভানুশাসন—৭।

প্রায় চার শ' বছর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষেই আর এক সম্রাট এইরূপ এক মহান্ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি হলেন ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী বাদশাহ আকবর।

ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার কথা মনে হলে বলতে ইচ্ছা হয়, পৃথিবী হতে সকল ধর্ম্ম লুপ্ত হউক। এই বিংশশতাব্দীর সভ্যতা-গর্ব্বিত জগতে, অশোক ও আকবরের ভারতবর্ষে, সেদিন যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বীভৎস শোণিত-স্রোত বয়ে গেল, তারও উপলক্ষ্য—ধর্ম্ম! ধর্ম্মের জন্য আড়াই হাজার বছরের অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ডিত হ'ল।

খণ্ডিত ভারতের এক অংশ অশোকের আদর্শ পালনের চেষ্টা করছেন। অশোকের ধর্ম্মচক্র তার নিশান।

খণ্ডিত ভারতের অপর অংশ আকবরের আদর্শ অনুসরণ করলে, আজও দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষেও 'ধর্ম্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্ম্মরাজ্য কাকে বলে? ধর্ম্মরাজ বা আদর্শ রাজার লক্ষণ কি? অশোকের মুখ হতেই তা শ্রবণ করুন:

"সমস্ত মানুষ আমার সন্তান। আমি যেমন কামনা করি আমার সন্তানগণ ইহলোকে এবং পরলোকে সর্ব্বপ্রকার হিতসুখ লাভ করুক, সমস্ত মানুষের জন্যও আমি ঠিক সেইরূপ কামনা করি।

পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন—১।

"যখন আমি ভোজনরত, যখন আমি অন্তঃপুরে, যখন আমি বিশ্রামাগারে, যখন আমি রথে অথবা শিবিকায়, যখন আমি উদ্যানে—সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে প্রজাদের বিষয় প্রতিবেদনের জন্য, আমি প্রতিবেদক নিযুক্ত করেছি। সর্ব্বত্র আমি জনগণের কার্য্য সমাধা করি।

"...সর্ব্বলোকের হিতসাধনই আমার কর্ত্তব্য।" শিলানুশাসন—৬

সংস্কৃত প্রজাশব্দের অর্থ লক্ষণীয়। প্রজার এক অর্থ সন্তান। প্রজার অন্য এক অর্থ রাজ্যের অধিবাসী। রাজ্যের অধিবাসীকে রাজা সন্তানের চক্ষে দেখেন। সন্তানের ন্যায় পালন করেন বলেই রাজ্যের অধিবাসীও রাজার প্রজা বা সন্তান।

অশোকেরও পূর্ব্বে, কত যুগ হতে ভারতবর্ষের রাজাগণ প্রজাদের সন্তানের ন্যায় দেখতেন, তার ইতিহাস পাওয়া না গেলেও প্রজা-শব্দই তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সঙ্গে অশোকের প্রভেদ এই যে, তিনি কেবল নিজ রাজ্যের প্রজাকেই সন্তানের চক্ষে দেখতেন না—প্রতিবেশী রাজ্যের প্রজাদেরও তিনি সেই চক্ষে দেখতেন।

কলিঙ্গ বিজয়ের পর প্রতিবেশী রাজ্যমাত্রেরই মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে—"এবার আমাদের পালা।"

সেই কথা মনে রেখেই অশোক বলছেন :

"আমার প্রচেষ্টায় প্রজাদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে। স্তম্ভানুশাসন-১।"

"আমার অবিজিত সীমান্তবাসীদের মনে হতে পারে, 'আমাদের প্রতি রাজার না জানি কি মনোভাব!' তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজার ইচ্ছা এই তাঁরা যেন আমা হতে উদ্বেগ বোধ না করেন। তাঁরা যেন আমার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। আমার কাছ হতে তাঁরা সুখই পাবেন —দুঃখ নয়।

"তাঁরা যেন একথা অবগত হন, যাঁরা ক্ষমার যোগ্য, তাঁদের রাজা ক্ষমা করবেন। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন ধর্ম্মাচরণ করেন। তাতে তাঁরা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখলাভ করবেন।" পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন—২।

সীমান্ত রাজ্যের প্রজাদের বিশ্বাস অর্জ্জনের জন্য তিনি তাঁর উচ্চপদস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে বলেছিলেন :

"আমি আপনাদের নির্দ্দেশ দিচ্ছি, আদেশ দিচ্ছি এবং সেই আদেশের মধ্যে আমার দৃঢ়সঙ্কল্প, অচল প্রতিজ্ঞা জানিয়ে দিচ্ছি। সেইভাবে আপনারা কাজ করবেন, সেইভাবে তাঁদের অনুপ্রাণিত করবেন, যাতে তাঁদের বিশ্বাস হয়—রাজা আমাদের পিতার ন্যায়। নিজের প্রতি তাঁর যেমন স্নেহ, আমাদের প্রতিও তাঁর তেমনি স্নেহ। আমরা রাজার সন্তানের ন্যায়।" ঐ।

"সমস্ত মানুষ আমার সন্তান—" একথা তাঁর কাছে কেবল কথার কথা ছিল না। কিন্তু মহামানবের বিপদ এই যে, তাঁর কথা তাঁর অনুগামীগণ ঠিক বুঝতে পারেন না। কেমন করে বুঝবেন? তাঁরা ত সেই স্তরের মানুষ নন!

তাই অশোক তাঁর উচ্চপদস্থ অধিকারীবর্গকে বলছেন : "সমস্ত মানুষ আমার সন্তান—" আপনারা বুঝতে পারেন না—এ বিষয়ে আমার মনোভাব কি এবং তা কত ব্যাপক। হয়ত বা আপনাদের মধ্যে দু-একজন একথা বুঝছেন, কিন্তু তাও সঙ্কীর্ণভাবে, অংশতঃ বুঝছেন, ব্যাপকভাবে, পূর্ণভাবে নয়।" ঐ—১

তাঁর প্রীতি ও প্রেম কেবলমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূক অসহায় পশু-পক্ষীর প্রতিও তাঁর প্রেম ছিল সুগভীর। প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় রাজাদের পাকশালায় প্রতিদিন শত শত পশুপক্ষীর মাংস পাক করা হ'ত।৬ সেই মাংস অন্নসহ প্রত্যহ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত। ঐ প্রথানুযায়ী সম্রাট অশোকের রাজকীয় মহানসেও প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণীবধ হ'ত। অশোক এই প্রথা উঠিয়ে দিলেন। তাঁর পাকশালায় প্রতিদিন দুইটি ময়ূর এবং একটি হরিণ হত্যা করা হ'ত। অবশেষে, তাও একেবারে বন্ধ করা হয়।৭

যজ্ঞে পশুবলি ছিল ভারতের বহুশত বৎসরের প্রথা। বেদ-পন্থীদের অধিকাংশই একে ধর্ম্মাচরণ মনে করতেন। অশোক এই পশুবলিও অন্যায় ও নিষ্ঠুরকার্য্য বলে নিষিদ্ধ করলেন।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি—

বজ্রের মত দৃঢ় এবং কুসুমের মত কোমল হৃদয় অশোক পশুবলির নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারেন নি। তাই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানকে অকম্পিত চিত্তে বন্ধ করে দিলেন (দ্রষ্টব্য, শিলালিপি—১। ২৫৭ খ্রীঃপূর্ব্বক)।

মহাশক্তিশালী বিরাট ব্রাহ্মণসমাজকে তাঁদের বিদ্যার জন্য, সদগুণের জন্য অশোক সম্মান করতেন। তাঁদের ধন দান করতেন। কিন্তু তাঁদের যে-আচরণ অন্যায় মনে করেতেন, তা কঠোরহস্তে দমন করতেন। যজ্ঞে পশুবলি বন্ধ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বহু শক্তিশালী সম্রাটের পক্ষেও এ অসাধ্য ছিল।

অশোকের সহৃদয় অন্তঃকরণ যেমন মনুষ্যের দুঃখে তেমনি পশুর দুঃখেও ব্যথিত হ'ত। তাই তাঁর রাজ্যের সর্ব্বত্র যেমন মনুষ্যের জন্য তেমনি পশুর জন্যও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

৬ প্রজাদের মধ্যে এইরূপ মাংসসহ অন্ন বিতরণের প্রথা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলিতে বর্ত্তমান ছিল।

৭ "সূপের জন্য তিনটি প্রাণী বধ করা হয়, দুইটি ময়ূর এবং একটি হরিণ। হরিণবধ কিন্তু প্রতিদিন হয় না। এই তিনটি প্রাণীও ভবিষ্যতে বধ করা হবে না।" শিলানুশাসন ১।

কথিত আছে ময়ূরের মাংস মগধবাসীর তথা অশোকের প্রিয় খাদ্য ছিল। "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শেখায়"—অশোকের নীতিই ছিল তাই এবং সেই জন্যই তাঁর ধর্ম্ম (বা নীতি)-প্রচার সফল হয়ে ছিল।

* ২৬০-৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম পশুর জন্য চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হয়েছিল।

যেখানে ভেষজের উপাদান ঔষধি বৃক্ষ পাওয়া যেত না, সেখানে অন্য স্থান হতে তার আমদানী করা হ'ত। তারপর সেখানে তার চাষ করবার ব্যবস্থা হ'ত।

কেবলমাত্র নিজ সাম্রাজ্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতিবেশী রাজ্যে, দূর-দূরান্তেও তিনি মনুষ্য ও পশুর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।৮

প্রাণীগণের দৈহিক কল্যাণের জন্য যেমন তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের নৈতিক কল্যাণের জন্যও তিনি তেমনি ব্যবস্থা করেছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তারই জন্য ধর্ম্মমহামাত্র নামক বিশেষ শ্রেণীর অধিকারীবর্গকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তা ছাড়া, জেলাশাসকগণকে (ও তাঁদের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণকেও) এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করতে হ'ত। কেননা, অশোক তাঁর শাসকশ্রেণীকেও শিক্ষকে পরিণত করেছিলেন। জনগণের নৈতিক উন্নয়নকার্য্যে জেলাশাসকগণকেও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর জেলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতে হ'ত।

স্বয়ং সম্রাট অশোক এই কার্য্যে সমস্ত রাজ্যে পরিভ্রমণ করতেন। পূর্ব্ব রাজগণের 'বিহারযাত্রা' বা বিলাসযাত্রার স্থলে তিনি এই রূপ 'ধর্ম্মযাত্রা'র প্রবর্ত্তন করেছিলেন।৯

ধর্ম্মমহামাত্রগণ কেবল অশোকের রাজ্যেই ধর্ম্ম প্রচার করতেন না। অন্য রাজ্যেও তাঁরা ধর্ম্মরাজদূত (Religions Ambassador) রূপে প্রেরিত হতেন। ইজিপ্টে, সিরিয়ায়, ম্যাসিডোনিয়ায়ও অশোক ধর্ম্মমহামাত্র প্রেরণ করেছিলেন।১০

মহা পরাক্রমশালী দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট হয়েও দিগ্বিজয় বা পররাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নিজরাজ্য এবং পররাজ্যের সমস্ত প্রজার হিতসুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর দ্বিতীয় কোনও সম্রাটের কথা পাওয়া যায় না।

বাল্যকাল হতে ভারতের ক্ষত্রিয় সন্তানমাত্রেরই অভিলাষ—বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হবেন। ক্ষত্রিয় সন্তান অশোক, পিতামহ যাঁর দিগ্বিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, রাজা হয়ে তিনিও যে দিগ্বিজয় আরম্ভ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কিন্তু কলিঙ্গদেশ জয় করার পরই তাঁর মনে হ'ল—না! এ পথ তাঁর পথ নয়!

ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্র যেমন একদিন বলে উঠেছিলেন, "ধিগ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং।" অশোকেরও তেমনি মনে হ'ল—ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় নয়; ব্রহ্মতেজের দিগ্বিজয়, আত্মার দিগ্বিজয়ই দিগ্বিজয়। মৈত্রীর দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা মানুষকে, প্রাণিমাত্রকেই জয় করতে হবে। সে মানুষ কোনও রাজ্য বিশেষের, দেশ বিশেষের, বর্ণ বা জাতি বিশেষের নয়; নিজ রাজ্যের, পররাজ্যের, দূরদূরান্তের—জ্ঞাত, অজ্ঞাত, পরিচিত, অপরিচিত সমস্ত মানুষকে—সমস্ত প্রাণীকে মৈত্রী, করুণা ও সেবার দ্বারা জয় করতে হবে।

প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আদর্শের সমন্বয় দেখতে পাই অশোক-চরিত্রে। ক্ষত্রিয়ের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণই তাঁর মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। তা না হলে তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ঐ বিশাল রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। প্রতিবেশী গ্রীক-রাজগণই তা দখল করত।১১

শম দম (ইন্দ্রিয়সংযম), তপঃ, শৌচ, ক্ষমা এবং ঋজুতা, যা ব্রাহ্মণের গুণ তাও তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তাঁর সংযম, তাঁর তপস্যা, তাঁর শুচিতা, তাঁর ক্ষমা এবং সর্ব্বোপরি তাঁর ঋজুতা—

---

৮ শিলালিপি—২। চোলদেশে (তাঞ্জোর-তিরুচিরপল্লী-ভূভাগে) পাণ্ড্যদেশে (মাদুরাই-রমন্থপুরম্-তিরুনেলবেলি-ভূভাগে। এই দুই দেশই মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণাংশে) কেরলপুত্রদেশে (কেরলরাজ্যে, মালয়ালমভাষী-ভূভাগে, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-উপকূলে) সাতিয়পুত্র-দেশে (কেরলপুত্র-দেশের সমীপবর্ত্তী সাতিয়-নামক-ভূভাগে) তাম্রপর্ণী (সিংহল দ্বীপে)-তে যবনরাজ অন্তিয়ক (Antiochus II, 261-246 B. C.; Theos of Western Asia, or of Syria) এবং অন্তিয়কের যাঁরা প্রতিবেশী (Ptolemy II, 285-247 B. C,; Philadelphus of Egypt; Antigonas Gonatas of Macedonia, 277-239 B.C.; Magas of Cyrêne in North Africa, 282-258 B.C. or 300-250 B.C.; Alexander of Epirus, 272-255 B.C, or of Corinth, 252-244 B C.) তাঁহাদের রাজ্যে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দুইপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। মনুষ্যচিকিৎসা এবং পশুচিকিৎসা। মনুষ্যোপযোগী এবং পশু-উপযোগী যে-সব ঔষধ যেখানে যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে সেখানে অন্য স্থান হতে তা আমদানী করা হয়েছে, এবং রোপণ করা হয়েছে। যে-মূল এবং যে-ফল যেখানে দুর্লভ, অন্য স্থান হতে তা আনয়ন করা হয়েছে। এবং রোপণ করা হয়েছে। মনুষ্য ও পশুগণের পরিভোগের জন্য পথিপার্শ্বে কূপখনন এবং বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

৯ ৮নং শিলানুশাসনে, "ধর্ম্মযাত্রাতে" যা যা ধর্ম্মকার্য্য করা হ'ত তার উল্লেখ আছে: (১) ব্রাহ্মণশ্রমণকে দর্শন এবং দান। (২) স্থবিরগণকে দর্শন এবং স্বর্ণদান। (৩) জনপদবাসিগণকে দর্শন, ধর্ম্মোপদেশ এবং তাদের উপযোগী ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন।

১০ শিলানুশাসন—১৩।

১১ অশোক যুদ্ধ বর্জ্জন করে থাকলেও প্রতিবেশী রাজগণ অশোকের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অশোকের অনুশাসনে প্রতিবেশী রাজাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, "যাঁরা ক্ষমার যোগ্য, রাজা তাঁদের ক্ষমা করবেন।" রাজা আক্রমণরূপ রাজার ক্ষমার অযোগ্য কাজ করলে তাঁদের নিস্তার নাই—উপরোক্ত ঐ মৈত্রীপূর্ণ বাণীর মধ্যেও এই ইঙ্গিত তাঁরা ভাল করেই বুঝেছিলেন।

সরলতার সাক্ষ্যরূপে তাঁর শিলালেখ ও স্তম্ভলেখগুলি ভারতের দেশে দেশে বিরাজ করছে।

অশোক অলৌকিক শক্তি, অপূর্ব্ব প্রতিভা এবং বিরাটহৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই মহাশক্তির বিকাশে সাহায্য করেছিলেন সে-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মৈত্রী করুণার আধার, জীবসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ।১২

বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে অশোকের মাহাত্ম্য অস্বীকার করা হয়েছে। শুধু মাহাত্ম্য অস্বীকার নয়, অশোককে নৃশংস ক্রূরকর্ম্মা, চণ্ডাশোক, কালাশোক-রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

নরহত্যাকারী দস্যু রত্নাকর যেমন নারদের প্রভাবে ঋষিকবি বাল্মীকি হয়েছিলেন, তেমনি নরহত্যাকারী, নারীঘাতক, নানাবিধ বীভৎস হত্যাকাণ্ডের উদ্ভাবক নরকুলকলঙ্ক অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের কল্যাণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহামানবে পরিণত হয়েছিলেন—এই কথাই বৌদ্ধ-সাহিত্য বিশ্বে প্রচার করেছে।১৩ হায়! পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধের চরিত্রমাহাত্ম্যকে বৌদ্ধগণই এইভাবে কলঙ্কিত, মসীলিপ্ত করেছে। ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ (Missionaries) যে ধর্ম্মের কত ক্ষতি করেন, (দিব্যাবদান-অন্তর্গত) অশোকাবদান প্রভৃতি গ্রন্থ পড়লেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে। এখানে এই উদ্ধৃত অশোকানুশাসনের সার্থকতা লক্ষণীয়:

"লোকে যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন, তা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি (অন্ধ?) ভক্তিবশতঃ। তাঁরা মনে করেন—'এইভাবে আমাদের সম্প্রদায়কে সুপ্রসিদ্ধ করব।' বস্তুতঃ তাতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেন।"

অশোকের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় একেবারে নীরব। বৌদ্ধসম্প্রদায় অবশ্য মুখর। কিন্তু ঐ মুখরতার চেয়ে নীরবতাও ভাল ছিল।

ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের নীরবতার কারণ কি?

অনেকে মনে করেন অশোক বৌদ্ধরাজা ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণগণ তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। কিন্তু যে বৌদ্ধরাজা ব্রাহ্মণশ্রমণ উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা করতেন সমান সম্মান ও দান করতেন—যাঁর শিলালেখ ও স্তম্ভলেখের সর্ব্বত্র শ্রমণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হয়েছে, ব্রাহ্মণগণের তাঁর প্রশংসা না করার কারণ কি? এত শ্রদ্ধা, সম্মান এবং দান সত্ত্বেও যজ্ঞে পশুবলি বন্ধ করেছিলেন—এই কারণেই কি ব্রাহ্মণসমাজ তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলেন না? তাই তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই না করে মৌন অবলম্বন করেছিলেন? কিন্তু যজ্ঞেও পশুবলি পছন্দ করতেন না—এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যাও তো নগণ্য ছিল না। তবে তাদের এই নীরবতার কারণ কি?

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের গভীর ঔদাসীন্যই সম্ভবতঃ এর কারণ। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসর ধরে ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ক্রমাগত চীনে যাতায়াত করেছেন। শত শত চীনদেশবাসীও এদেশে এসেছেন। হাজার বৎসর ব্যাপী এত বড় গুরুতর ঘটনার উল্লেখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা না হয় নীরব ছিলেন। বৌদ্ধেরা কেন নীরব রইলেন? বিরাট পালি সাহিত্যের কোথাও কোনখানে ঘুণাক্ষরেও এর আভাস পাওয়া যায় না।

এই সহস্র বৎসরের ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রসারের গৌরবময় ইতিহাস চীনদেশবাসী নিখুঁতভাবে রক্ষা করেছিলেন বলেই আজ আমরা সেকথা জানতে পারছি।

সেইরূপ অশোকের অনুশাসনবাহী শিলাগুলি, কালের করাল-গ্রাস হতে রক্ষা পেয়েছে বলেই আজ পৃথিবীর দেশে দেশে, দিকে দিকে, সকলে এই মহামানবের রূপকথার ন্যায় চমকপ্রদ চরিতকথা জানতে পারছেন।

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ—" রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, যতদিন শৈলসমূহের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন রামচন্দ্রের চরিতকথা জগতে প্রচারিত হবে; অশোক সম্বন্ধে একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে।

১২ পালিগ্রন্থে আছে মোগ্গলিপুত্ত তিসস অশোকের গুরু ছিলেন। দিব্যাবদান প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে উপগুপ্তকে অশোকের গুরু বলা হয়েছে। হয়ত এঁরা দুই নামে পরিচিত হলেও একই ব্যক্তি। কিন্তু অশোকের অনুশাসনে এঁদের কারও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কোন এক বিশেষ বৌদ্ধ তাঁর গুরু ছিলেন কিনা, তা জানা না গেলেও, সে-যুগের আত্মত্যাগী পরহিতব্রতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের দেবোপম চরিত্র যে অশোকের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৩। সর্ব্বজনপূজ্য অশোকের সে-অশ্রাব্য চরিতকথা অনর্থক উদ্ধৃত করে লেখনীকে কলঙ্কিত করতে চাই না। "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" মহতের কুৎসাকারীই শুধু পাপী নন, সেই কুৎসা শ্রবণ করেন যিনি, তিনিও পাপভাগী হন। পাঠকগণকে আর পাপভাগী করব না।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

একটা ট্যাক্সি নিলে রবার্ট ডগলাস, সাধারণতঃ যখন সে ডিউটিতে যায় তখন বাসে বা ট্রামেই তার কাজ চলে যায় কিন্তু কেট্ এবং লগেজের জন্যে ট্যাক্সি ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, সুতরাং ট্যাক্সিই নিলে সে। মাল নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকিয়ে কেটের কাছে পাসটা দিয়ে দিলে রবার্ট, তার পর চলে গেল তার হাজিরা দিতে।

ইঞ্জিনে ডিউটি দেবার আগে ড্রাইভারদের এ্যাপিয়ারেন্স বুকে সই করতে হয়, তা ছাড়া চশমা থাকলে স্পেকটিক্যাল রেজিষ্টারেও সই করা দরকার। ড্রাইভার যে ইঞ্জিনে কাজ করে তার সম্পূর্ণ ওজন এ্যাক্সেল লোড এবং টাইপও জানা উচিত। ট্রেনের বুকড স্পীড লাইনের ম্যাক্সিমাম স্পীড, ট্রেনের লোড এবং ইঞ্জিনীয়ারিং স্পীড, রেষ্ট্রিকসান কোথাও আছে কিনা তা পূর্ব্বেই জানার প্রয়োজন আছে।

কপালের ওপর টুপীটা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস। পথে গার্ডের সঙ্গে দেখা হ'ল, ঘড়িটা সেই সুযোগে মিলিয়ে নিল সে। ইয়ার্ডে গিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করল, তার পর সে নির্দ্দিষ্ট ইঞ্জিনটায় গিয়ে উঠল। আবদুল, পাণ্ডে এবং খালাসী ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। গরম ইঞ্জিনটার মধ্যে উঠে খুব ভাল লাগল রবার্টের। বন্ধুত্বের উত্তাপ যেন মিশে রয়েছে ওটার সঙ্গে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কোমরে হাত দিয়ে ইঞ্জিনের চারি দিকটা একবার দেখে নিলে রবার্ট। মনটা এতক্ষণ যেন তার নিস্তেজ হয়েছিল। কোলাহল, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, ষ্টিমের একটানা হু হু ধ্বনি, ধুলো আর কঠিন ইস্পাতের স্পর্শ এতক্ষণে যেন শক্তি আর সজীবতা সঞ্চারিত করল তার মধ্যে।

কণ্ট্রোল রুম থেকে অর্ডার আসার পর ইঞ্জিনটা পিছু হটিয়ে নিয়ে চলল সে ৭নং প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে। অবশ্য আবদুলই সব করছে, কারণ ইঞ্জিন চালনার প্রাথমিক ব্যাপারগুলো ইতিমধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এর আগে সাণ্টিংয়ের কাজও অনেকদিন করেছে আবদুল। নিয়মগুলো তার প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে—যেমন স্টার্টার সিগনালের পিছনে সাণ্টিং করতে হলে ব্লক ব্যাক করতে হয় এবং ড্রাইভারকে ও-পি-টি সেভেণ্টিনাইন দিতে হয়, কিংবা স্টার্টার সিগন্যালের আগে বা এ্যাডভান্স স্টার্টারের ভেতরে সাণ্টিং করতে হলে ড্রাইভারকে শুধু ও-পি-টি সেভেণ্টিনাইন দিলেই হয়। শুধু তাই নয়, ইঞ্জিনে বা গাড়ীতে লাগান বাতির তারতম্যও সে ভাল ভাবেই জানে, যেমন লোকো ইয়ার্ডে পাইলটের আলো হয়, আগের বাফারে লাল এবং পিছনের বাফারেও লাল। আবার ট্রাফিক ইয়ার্ড পাইলটের আলো হয়, বাঁ দিকে আগে লাল, পিছনে সাদা এবং ডান দিকে আগে সাদা পিছনে লাল রঙের। ইঞ্জিনের হুইসলের প্রভেদ সম্পর্কেও তার আর নতুন করে কিছু জানার নেই। ইঞ্জিন লোকো ইয়ার্ড থেকে ট্রাফিক ইয়ার্ডে যাবার জন্যে দুটো ছোট ছোট হুইসল বাজাতে হয়, আবার যখন ট্রাফিক থেকে লোকো যাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন বাজাতে হয় পর পর দুটো লম্বা সিটি।

অদূরে ৭নং প্লাটফর্ম্মটা দেখা গেল। ইতিমধ্যে বগীগুলো সেখানে রাখা হয়ে গিয়েছে, রেগুলেটারে চাপ দিয়ে গতিটা মন্দীভূত করল আবদুল। রবার্ট ডগলাস ঝুঁকে পিছন দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠিক হ্যায় সাহাব? জিজ্ঞাসা করল আবদুল।

ঠিক হ্যায়। উত্তর দিলে রবার্ট। ঘটাং আওয়াজ হ'ল একটা, ট্রেনে ইঞ্জিন জোড়া হ'ল।

নেমে এল রবার্ট ডগলাস প্লাটফর্ম্মের ওপর, একবার তাকিয়ে দেখল। জনাকীর্ণ ৭নং প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে, সেখানে প্রচণ্ড ভীড় রয়েছে, লড়াই হচ্ছে যেন একটা।

কপালের ওপর থেকে টুপীটা একটু উঠিয়ে দিলে সে, তার পর একদৃষ্টে ভীড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল কেট্‌কে। কিছুক্ষণ পরেই কেট্‌কে দেখা গেল। একটা কুলির মাথায় লগেজগুলো চাপিয়ে পিছনে আসছে কেট্। কেট্ কুলির পিছু পিছু চলছে কেন তা রবার্ট বুঝেছে। অতিরিক্ত সাবধান এবং সন্দিগ্ধচিত্ত কেট্। সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে সে, তার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে পড়ে মাঝে মাঝে রবার্টও, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। আবদুলের হাত থেকে জুট এবং অয়েলক্যান নিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এগিয়ে গেল রবার্ট। জার্নাল পিষ্টন কভারগুলো একবার হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করল সে, তার পর ক্র্যাক এ্যাক্সেলটার দিকে তাকিয়েই রইল কয়েক মুহূর্ত। ক্র্যাক এ্যাক্সেলের ঠিক ওপরে এবং নীচে রয়েছে ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড

একসেণ্টিক। তা থেকে চলে গিয়েছে একসেণ্টিক রড দুটো, আর দুটোর মধ্যে রয়েছে কনেক্টিং রডটা। ভাল লাগে রবার্টের এগুলো দেখতে, মনে হয় যেন সবই জীবন্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এদের সঙ্গ পেলে সে ক্লান্তিবোধ করে না একটুও, সন্দেহচিত্ত কেটের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর কৈফিয়তের কথা যেন ভুলিয়ে দেয় এরা।

সুনীল রায় এবং হাসনু মানে শ্রীলেখা যখন স্টেশনে পৌছলো তখনও ট্রেনের সময় হয় নি। একটু আগেই ওরা এসে পৌছিয়েছিল। হাসনুর পরণে ছিল সুনীলের দেওয়া সবুজ লেডিজ কোটটা। সাদা নাইলনের শাড়ীর সঙ্গে হালকা ধরনের জুয়েলারী অর্থাৎ হীরের কয়েক গাছা চুড়ি, মুক্তো-পান্নার মানতাসা আর এক ছড়া বড় মুক্তোর মালা পরেছিল সে। সবুজ কোটের অন্তরালে কারুকার্য্যখচিত গাঢ় লাল রঙের চেলীর অনেকাংশই গোপন রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার অপূর্ব্ব দেহসৌষ্ঠবের সম্যক প্রকাশ ব্যাহত হয় নি। ওদের কাছাকাছি বেশ একটা ছোটখাট ভীড়ের সৃষ্টি হ'ল। কারণ সিনেমা স্টার হিসাবে ইতিমধ্যে কয়েকটা ছবিতে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীলেখা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে সুরু করেছে বলা চলে। শ্রীলেখা কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল, প্রথমতঃ এভাবে হঠাৎ যে তাকে সুখের নীড় ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিতে হবে একথা সে কল্পনাও করে নি, আর দ্বিতীয়তঃ স্টেশনে এসে যখন শুনল তাদের জন্য আলাদা 'কূপে'র ব্যবস্থা হয় নি, তখন সে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হ'ল। সুনীল রায়ের সঙ্গে একসঙ্গে এক 'কূপে'তে ভ্রমণের কথাই সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ নানুভাই এবং কোম্পানীর অন্যান্য লোকের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণের ব্যবস্থা দেখে সে ক্রুদ্ধই হ'ল।

সুনীল রায় একবার তাকিয়ে দেখল তার রক্তাভ মুখের দিকে। হাসনুর মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তার কিছুটা অনুমান করতে সে সক্ষম বৈকি। জনাকীর্ণ স্টেশনের মধ্যে হাসনু অন্ততঃ তার ক্রোধটা সম্যক ভাবে প্রকাশ করতে পারবে না জেনে মনে মনে আশ্বস্ত হ'ল সুনীল রায়।

পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে এই ধরনের কোন কারণ ঘটলে বেশ কয়েক ডজন গ্লাস, ডিস, ফুলদানী বা গ্রামোফোনের রেকর্ড চূর্ণ হ'ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কাল-বিলম্ব না করে সুনীল রায় অন্য ব্যবস্থার চেষ্টা সুরু করল। অবশেষে বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে দুটো আলাদা বার্থ পেয়ে মনে মনে খুসীই হ'ল সে।

কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে বসল হাসনু। মুখে তার বিরক্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। লিপষ্টিকরঞ্জিত অধরোষ্ঠ মুক্তদন্ত দিয়ে দংশন করে ভ্রুকুঞ্চিত করে বসে রইল সে।

ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় শুধু বিরক্ত হয় নি—৭নং প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে সে নিজের ভাগ্যকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। বহুক্ষণ পূর্ব্বেই সে স্টেশনে এসেছে। দেশাই ফিল্মসের সে বেতনভোগী ডাইরেক্টর বটে কিন্তু ফিল্ম ডাইরেকসন ছাড়াও বিনা বেতনে তাকে উপরি কাজ করতে হয় প্রচুর। যেমন নিয়মিত নানুভাই দেশাইয়ের বড়বাজারের বাড়ীতে ধর্না দেওয়া, দৈনিক তাদের শারীরিক কুশলসংবাদ নেওয়া, দায়ে-অদায়ে এবং কাজেকর্ম্মে অযাচিত ভাবে পরিশ্রম করা এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে স্তুতিবাদ ও তোষামোদ করা ইত্যাদি। এ কাজগুলি তার অলিখিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে কয়েকটা বলা চলে। জনাকীর্ণ ৭নং প্লাটফর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়ে ধীরেন ভড় তাই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অদূরে প্রবেশপথের গেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। সপারিষদ নানুভাই দেশাই এখনও এসে পৌছতে পারে নি। নানুভাইকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার এবং লগেজের তদ্বির করার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। সে জানে এ কাজটি না করলে ভবিষ্যতে অন্যদিক দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অকস্মাৎ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেরী হবে না।

নীল রঙের প্যাণ্টের ওপর লাল হরিণ মার্কা হাওয়াই-সার্ট পরিহিত ধীরেন ভড় অস্থির ভাবে কয়েক পা পদচারণা করে অর্দ্ধদগ্ধ কাঁচি সিগারেটটায় অগ্নিসংযোগ করল। পুরো একটা সিগারেট একেবারে খাবার মত বিলাসিতার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। সুতরাং সিগারেটটা নিভিয়ে রেখে দেয় পরে ব্যবহারের জন্য। হঠাৎ গেটের অদূরে নানু-ভাইকে দেখা গেল। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ধীরেন ভড়, কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতেই তার গতি রুদ্ধ হ'ল। একপাশে প্রকাণ্ড ঝাঁচঘেরা মেঠাই-ওয়ালার ঠেলা রাখা, অপর পাশে প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর চতুর্দ্দিকে ছত্রাকারে হাঁড়িকুঁড়ি ছড়িয়ে বসে রয়েছেন একজন বৃদ্ধা, সুতরাং বিপদে পড়ল সে, না পারে এদিক যেতে না পারে ওদিক অগ্রসর হতে।

সুহাসিনী দেবী নিজেই কয়েকটা হাঁড়ি এবং টিন সরিয়ে পথ করে দিতে ধীরেন ভড় উর্দ্ধশ্বাসে গেটের দিকে ছুটে চলল। পরেশ দৃশ্যটি দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তা ছাড়া করার মত তার কিছুই ছিল না। এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে তার আসতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দাদার একান্ত অনুরোধে তাকে একটু আগেই যাত্রা করতে হয়েছিল। এখন

সে ভাবছে, এর পরে স্টেশনে পৌঁছলে নিশ্চয়ই ট্রেন পাওয়া সম্ভব হ'ত না। কারণ মাসীমা তাঁর চিঁড়ের হাঁড়ি, টিনের বাক্সে বড়ি, আমসত্ত্ব, গঙ্গাজলের কলসী ও গঙ্গামাটি ইত্যাদি মূল্যবান মালপত্রগুলি ট্যাক্সি থেকে নানা অবাঞ্ছিত স্পর্শ বাঁচিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলেন তখন প্রায় ১৫ মিনিট গত হয়ে গিয়েছে।

মাসীমাকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ যে তাকে ভুগতে হবে তা সে পূর্ব্বেই কতকটা অনুমান করে নিয়েছে। নৃপেশ এবং পরেশ যখন শুনল যে ট্রেনে ভ্রমণকালীন মাসীমা জল-স্পর্শও করবেন না, তখন তারা দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতখানি দীর্ঘপথ জলস্পর্শ না করে কি ভাবে যে তিনি কাটাবেন তা তারা বুঝতে সক্ষম হয় নি। তাদের অনুরোধে অবশ্য কাজ কিছুই হয় নি, মাসীমা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুবিধবার পক্ষে উপবাস করাটা এমনকিছু একটা ভয়াবহ নয়, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বরং উপবাস না করলেই নাকি তাঁরা অসুস্থ বোধ করেন।

সে যাই হোক, সৌভাগ্যবশতঃ টিকিট দুটো আগেই কেনা ছিল, কিন্তু পরেশ তা সত্ত্বেও মাসীমাকে নিয়ে দস্তুরমত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কয়েকবার সামলাবার বিফল চেষ্টা করে, অবশেষে সে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করল। তাতে আর কিছু না হোক, নিজের চিত্তবৈকল্য থেকে মুক্তি পেল সে। অতিকষ্টে সুহাসিনী দেবী এবং তাঁর মূল্যবান মালপত্রগুলি একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে পরেশ প্ল্যাটফর্মে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ পরে স্টেশনের চতুর্দ্দিকটা দেখার সুযোগ পেয়ে পরেশ মনে মনে খুসী হ'ল। জনস্রোত বয়ে চলেছে একধার থেকে অন্যধারে, মুহূর্ত্তের জন্যেও বিরাম নেই তার, সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল পরেশ। বিশৃঙ্খলা, চীৎকার, হুড়োহুড়ির তাণ্ডব সব লক্ষ্য করে মনটা যেন তার বিষাদে ভরে গেল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যেই সেটা বেশী লক্ষ্যণীয়। রুগ্ন, দরিদ্র, অশিক্ষিত এই লোকগুলো যেন যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। শীর্ণ শুষ্ক দেহে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অকারণ ছুটোছুটি আর চীৎকার করে চলেছে অনবরত। এই হ'ল সাধারণ ভারতীয় জনতা, ভাবছে পরেশ—সবকিছুরই অভাব এদের। প্রথমতঃ, খাদ্যের অভাব, ক্ষুধা মানুষের আদিম অনুভূতির মধ্যে প্রধান। অনুভূতিটা যে মানুষকে কোথায় নামিয়ে দিতে পারে তার ঠিক নেই। মনের পটভূমিতে ধাক্কা লেগে রূপ তার বার বার পালটে যায়। পরেশের হঠাৎ মনে হ'ল যেন একটা অসহায় আর ক্লান্ত ঘোড়াকে তীব্র কশাঘাতে দৌড় করান হচ্ছে, জোর করে সফেন মুখে লাগামের রাশটা কঠিন বজ্রমুষ্টিতে কে যেন ধরে রেখেছে। একটা যন্ত্রকে যেন পরিমাণ মত তেল না দিয়ে চালনা করা হচ্ছে নিয়মবহির্ভূত ভাবে। ঐ শীর্ণ শুষ্ক হাতপাগুলো যেন সেই বিকল যন্ত্রের কয়েকটা অকেজো ভগ্নাংশ। মানসচক্ষে সে যেন দেখতে পেল এই অসংযত জনসমুদ্রের মধ্যে আশার ইঙ্গিত। মনে পড়ল রাশিয়ার কথা, সেখানেও শিক্ষা ছিল না, সংযম বা সংহতি ছিল না। তবুও ধীরে ধীরে তারা দেশকে নবজীবনের বাণী আর সাম্যের নীতি দিয়ে গড়ে তুলেছে। অকস্মাৎ চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল পরেশের।—কিছুক্ষণ ধরে সে একটা অস্বস্তি বোধ করছিল—কারণটা ধরা পড়ল এতক্ষণে—অনেকগুলো ক্ষুদে নিশাচর পোকা তার অনাবৃত গলা এবং ঘাড় একযোগে আক্রমণ করেছে, হাত দিয়ে সেগুলো নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল সে। পরেশ লক্ষ্য করল যে, সে এতক্ষণ একটা আলোর নীচেই দাঁড়িয়েছিল। আলোটা ঘিরে ছোট ছোট অগুণতি পোকা জলস্তম্ভের আকারে সেখান থেকে নেমে আসছে। একটু দূরে সরে গিয়ে কালো ফ্রেমের চশমাটি খুলে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে নিলে তার পর কয়েক বার অঙ্গুলী সঞ্চালন করল তার রুক্ষ চুলের মধ্যে; কারণ অনেকগুলো পোকা ইতিমধ্যে তার চুলের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। দংশনের জ্বালা নেই বটে, কিন্তু উপস্থিতির অস্বস্তি আছে প্রচুর।

একটি মেয়ে পাশের উচ্চশ্রেণীর কামরায় উঠল। পরেশ একবার তাকিয়ে দেখল, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতই বটে। মুখের ভাবে বেশ একটা বলিষ্ঠ সতেজ ভাবের প্রকাশ রয়েছে। এ রকম মেয়ে পার্টিতে থাকলে কাজের অনেক সুবিধা হয়—ভাবল পরেশ। আদর্শের সঙ্গে কাজের খাপ খাইয়ে চলতে জানে এ ধরনের মেয়েরা। পরেশ লক্ষ্য করল মেয়েটির রুচিজ্ঞানও বেশ আছে, কাপড়জামা সাধারণ বলা চলে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। চুলটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বেণীবদ্ধ, দেহের রংটা একটু নিরেশ, তা হোক—ভাবল পরেশ। ঐ রংই মেয়েটিকে ভাল মানিয়েছে। বিখ্যাত রং-ব্যবসায়ীর একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে গেল তার। ছবির ওপরে বড় হরফে লেখা রয়েছে "একটি সুন্দর সংসার" সোফা, কৌচ কার্টেন সমন্বিত আধুনিক একটি ড্রইংরুমের ছবি। একটি সুবেশা তরুণী বসে আছে সামনে একটি যুবক, উভয়ের মুখেই হাসি। তরুণীর মুখের কাছে লেখা—'সত্যি তোমার পছন্দ আছে', যুবকের মুখে বিগলিত ভাব। বিজ্ঞাপনের নীচে লেখা—'আপনিও মনের মত রঙে ঘর সাজান'। সত্যি এক-একটা রং এক-একজনের পক্ষে বেশ মানানসই হয়, ভাবল পরেশ। পাশের পাঞ্জাবী পরিহিত যুবকটিকে নজর

করল সে, হাতে তার একগুচ্ছ ফুল। ফুলগুলো কিন্তু সাধারণ বলে মনে হ'ল পরেশের। নার্সারীবিক্রিত ফুলের গুচ্ছ বলে মনে হ'ল না।

পরেশের পাশ দিয়ে একজন গেরুয়া বস্ত্রধারী লোক চলে গেল, তার দিকে তাকিয়ে পরেশের মনে হ'ল এই স্টেশনটি যেন সারা ভারতের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, রোগ, শোক, অনাহারে জর্জ্জরিত, অশিক্ষিত জনগণের সঙ্গে ধর্ম্মধ্বজাধারী ভণ্ডদলের শোভাযাত্রা।

স্বামী স্বরূপানন্দ মাধবীকে নিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। হুগলী থেকে দূরগামী ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁকে প্রথমে এখানেই আসতে হ'ল। দুটো টিকিট তিনি কিনেছেন, একটা উচ্চশ্রেণীর নিজের জন্য, অপরটি তৃতীয় শ্রেণীর মাধবীর জন্য। দুজনে একত্রে ভ্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। মাধবীর হাতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দিয়ে ভোলা মাড়োয়ারীর টাকা আর গহনা ভর্তি ব্যাগটি গৈরিক বস্ত্র জড়িয়ে তিনি সন্তর্পণে বহন করে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন শেষের দিকে, সঙ্গে তাঁর একটি হোল্ডঅল, সুটকেশ ও টিফিন কেরিয়ারটা। বাসদেও শর্ম্মা ও বিজয়সিংহ দেহরক্ষী হিসাবে ব্রজেশ্বর বাবুর সঙ্গেই এল, কিন্তু দূর থেকে লক্ষ্য করলে তারা যে পরস্পরের পরিচিত একথা বোঝা বা ধারণা করাও সম্ভব হ'ল না, এক-একটা কামরায় তারা উঠে পড়ল। ব্রজেশ্বর বাবু দ্রুত এগিয়ে গেলেন উচ্চশ্রেণীর কামরার দিকে, তাঁর বড় দেরী হয়ে গিয়েছে।

কবি কমলাকান্ত সরকারকে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তা অনুপম এবং অন্যান্য ভক্তেরা যখন মাল্যদান করে ট্রেনে তুলে দিল তখন সে দস্তুরমত লজ্জিত হয়ে পড়েছে। অনাবশ্যক এ উচ্ছ্বাসের কোন কারণ ছিল বলে কমলাকান্তর মনে হ'ল না, অবশ্য আপত্তি করার মত অবকাশও পায় নি সে। যাই হোক, কামরায় উঠে অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাতে পারল না কমলাকান্ত, গলার ফুলের মালাটা খুলে হুকে টাঙিয়ে রেখে সে জানালা দিয়ে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে তাকিয়ে রইল। নীলাভ আলোর নীচে মুখর ও চঞ্চল জনতাকে লক্ষ্য করতে লাগল একমনে।

এরা কামরায় উঠে এল। সঞ্জীব ওর হাতে ফুলগুলো দিলে, দুজনেই দুজনের দিকে তাকাল শুধু, মনের কথা বলার আর প্রয়োজন নেই যেন ওদের। প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর ভীড়ের মধ্যে সঞ্জীব দাঁড়িয়ে রইল, মনটা তার হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস সামনের সিগনালটার দিকে তাকাল। সবুজ আলোর তীব্র রশ্মিটা ইঞ্জিনের গায়ে এবং লাইনের পাশে বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে। ঢং ঢং—তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার দিয়ে ঘণ্টাটা বেজে উঠল। মাইকে অনুনাসিক সুরে স্ত্রীকণ্ঠে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মের ট্রেনের যাত্রার সময়টা ঘোষণা করা হ'ল শেষবারের মত। আবদুল ফায়ার হোল ডোর হ্যাণ্ডেলটা নীচে নামিয়ে দিলে। রিভারসিং হুইম আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। রবার্ট ডগলাস ইঞ্জিনটার ওপর এবার উঠে পড়ল। ভ্যাকুয়াম গেজের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, এ পাশে রয়েছে সুপারহিট টেম্পারেচার মাপের যন্ত্র। তাপের পরিমাণ ১৩০ ডিগ্রী থেকে ১৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে, আর বয়লার প্রেসার প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চি ১৮০ পাউণ্ড হয়। ভ্যাকুয়াম ব্রেকের গেজটাও ভাল করে লক্ষ্য করে নিল রবার্ট, কারণ তারতম্যে গাড়ী অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবদুলের সামনে ষ্টীম জেট এবং এ্যাশপ্রোয়ার রয়েছে, ফায়ারম্যান হিসাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ তাকেই করতে হয়।

প্ল্যাটফর্ম্মের কোলাহল আর চঞ্চলতা অকস্মাৎ বেড়ে গেল যেন। শেষবারের মত কুলীরা যাত্রীদের সঙ্গে বোঝা-পড়ার চেষ্টা করছে। বুকষ্টলে এতক্ষণ কয়েক জন যাত্রী অধীর আগ্রহে বিনাব্যয়ে সিনেমা স্টারদের চিত্রমাধুর্য্য উপভোগ করছিলেন, এবার তাঁদের ফিরে যেতে হ'ল। সিগারেট ও পান ভেণ্ডারদের এখনও খরিদ্দার রয়েছে। মিঠাইওয়ালার কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে—কাঁচঘেরা ঠেলাটা একপাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ব্রেকভ্যানে মাল তুলে দিয়ে কুলীরা শূন্য ঠেলা নিয়ে ফিরে চলেছে। লৌহচক্রের ঘর্ঘর আওয়াজটা স্টেশনের কোলাহলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যাত্রীরা এখন সবাই ট্রেনে। বিদায় দিতে যারা এসেছে, যাত্রী অপেক্ষা তাদের সংখ্যাই যেন বেশী। ট্রেনটা ছাড়বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তারা প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর। প্ল্যাটফর্ম্মের বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটাটা ঠিক জায়গায় এসে পৌচেছে এবার। আবার সেই ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গার্ডের হুইসলের তীক্ষ্ণ ধ্বনিটা। একই বাদ্যযন্ত্রে অপটু কোন শিক্ষানবীস যেন পর পর দুটো অসঙ্গত আর বেসুরো ধ্বনি তুলেছে। প্ল্যাটফর্ম্মের কিছুটা দূরে অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়েছে গার্ড। চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠতে হবে তাঁকে। হাতের সবুজ আলোটা আন্দোলিত

হ'ল—সবুজ রশ্মিটা যেন দূরে অবস্থিত সিগনালের আলোরই প্রতিচ্ছবি। ড্রাইভার রবার্ট হুইসল চেনটা টানল—বজ্র-নির্ঘোষে হুইসলটা জনতাকে সচকিত করে বেজে উঠল। ষ্টীম রেগুলেটারটায় চাপ দিলে রবার্ট। সতেজে বাষ্পটা তার বলিষ্ঠ অস্তিত্ব ঘোষণা করল। এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা ধীর-মন্থর গতিতে। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এখনও কয়েকজন প্ল্যাট-ফর্মের ওপর চলেছে। বিদায়দানকারীদের মধ্যে কয়েক জন প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে হাত এবং রুমাল আন্দোলিত করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মিনিয়েচার ডিস্ক সিগনালের দিকে তাকিয়ে রেগুলেটারে আর একটু চাপ দিলে ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের পানিহুইলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, ক্র্যাঙ্ক এ্যাক্সেলের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে রবার্ট। আবদুল বাইরে একটু ঝুঁকে দেখছে পিছন দিকে—গার্ড 'অলরাইট সিগনাল' দিচ্ছে, প্রত্যুত্তর দিল আবদুল।

ঠং—এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাচ্ছে ইঞ্জিনটা ক্রীচ ক্রীচ—লাইন ও চাকার সংঘর্ষণে একটা আওয়াজ হচ্ছে তীক্ষ্ণ সুরে। ঝক্ ঝক্ ঝক্-ঘটর ঠং, ঘটর ঠং—ক্রীচ ক্রীচ ক্রীচ।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে, সঞ্জীব কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। এষাকে আর দেখা যাচ্ছে না, সঞ্জীব তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে অপস্রিয়মান ট্রেনটার দিকে। তার মনে হচ্ছে, এষা যেন দূরে সরে যাচ্ছে—সঞ্জীব অনুভব করল, দূরত্বটা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেড়ে যাচ্ছে। দূরে যাচ্ছে এষা, আরও দূরে। ট্রেনের পিছনের আলোটা রক্তচক্ষু মেলে অপলক দৃষ্টিতে তাকে যেন নিরীক্ষণ করছে।

মালপত্র গুছিয়ে রেখে সুনীল রায় হাতঘড়িটা প্ল্যাট-ফর্মের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল। ট্রেন ছাড়তে আর বেশী দেরী নেই তখন। মাথার টুপীটা খুলে পাশের ব্রাকেটে রেখে দিল। হাসনু একবার তাকাল ওর দিকে—দৃষ্টিটা অর্থব্যঞ্জক নয়, শুধু দেখার জন্যই দেখা। হাসনু ওরফে শ্রীলেখা দেবীর চোখের প্রশংসা অনেকেই করে থাকে। সুনীল রায় সেই দীর্ঘল সুর্মাটানা চোখের দৃষ্টির সামনে পড়ে সঙ্কুচিত আর দুর্ব্বলতা অনুভব করল। দৃষ্টির অর্থটা সম্যক বুঝতে না পেরে হাসনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ, তার পর ব্যাকব্রাশ করা চুলের ওপর আলতো ভাবে হাতের তালুটা স্পর্শ করে হাসনুর ঠিক পাশেই বসল। হাসনুর বিরক্তির কারণটা তার ইতিপূর্ব্বেই জানা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু 'কুপে' না পাওয়াতে তার ত্রুটি কোথায় তা সে অনুমান করতে পারল না। বরং অনর্থক অতগুলো টাকা বাজে খরচ করে যে এই দুটো বার্থ পাওয়া গিয়েছে তার জন্য অন্ততঃ হাসনুর মুখে হাসি দেখার আশা সে করেছিল বই কি।

পান। অস্ফুটস্বরে বলল হাসনু, বিরক্তিটা মুছে ফেলতে চায় সে আলাপের মাধ্যমে। কিছু করতে পেরে কিন্তু খুসী হ'ল সুনীল রায়। গুমোটটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় এতক্ষণ মনমরা হয়েছিল সে।

প্ল্যাটফর্মে নামল সুনীল। মিঠে পান পাওয়া গেল না, সিগারেট ছিল বটে, তবে আর এক টিন কিনে নিল সে। সিগারেট তার মনে জোর আনে। সিগারেটের অকুলান হবে এই চিন্তাটা থাকলে কোন কাজেই সে মনঃসংযোগ করতে পারে না—অদৃশ্য কাঁটার মত সেটা বার বার অস্বস্তি আনে শুধু। আশপাশে তাকিয়ে দেখল সুনীল রায়। অনেকগুলো চিন্তার ঢেউ একসঙ্গে তার মনকে উদ্বেল করে তুলেছে। অদূরে একজন কালো মোটা মত লোক যেন তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে বলে মনে হ'ল তার। না ভুল হতেও পারে—ভাবল সুনীল রায়। আর তার দিকে অনেকেই যে তাকিয়ে থাকে তা তার বিলক্ষণ জানা আছে, কথাটা ভেবে আত্মগরিমায় স্ফীত হ'ল সে।

একটা হিন্দুস্থানী লোকও যেন তাকে দেখে পিছন ফিরে দাঁড়াল। হৃৎপিণ্ডটার গতি হঠাৎ দ্রুত হয়ে গেল তার। নাঃ, ও কিছু নয়, ভাবল সুনীল রায়। এমন সব উদ্ভট আজেবাজে চিন্তা আসছে তার মনে। নিজের ওপরই বিরক্ত হ'ল সে।

সুনীল!

চমকে উঠেছে সুনীল রায়, মুখ ফিরিয়ে ধীরেন ভড়কে দেখতে পেয়ে বললে, ও তুমি, তাই ভাল।

কেন তুমি কি অন্য কেউ ভেবেছিলে, নিরাশ করলাম নাকি? হেসে বলল ধীরেন ভড়।

না, তা নয়। আমতা আমতা করল সুনীল।

জান সুনীল, তোমরা এসেছ বলে কর্ত্তা খুব খুসী।

তাই নাকি? কর্ত্তার খুসীর কারণ হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল না সুনীল রায়।

তাছাড়া এই বইতে কর্ত্তা তোমাকেও একটা চান্স দেবেন। গোপন সুসংবাদটা নিভৃতে জানিয়ে রাখল ধীরেন ভড়।

কাটা সৈনিকের পার্ট নাকি?

না না, কি যে বল।

সুসংবাদটা মাঠে মারা যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ধীরেন ভড়, কারণ ডাইরেক্টর হিসেবে প্রত্যেক জিনিসটায় এফেক্ট আশা করে সে।

তোমায় বোধ হয় কবির পার্টটাই দেওয়া হবে। আলতো ভাবে কথাটা শেষ করল ধীরেন ভড়।

পতিত পাবন

শ্রীকালিদাস রায়

এই মর্ত্তলোকে ছিলে ক'দিনই বা ছুতোরের ছেলে।
জানি নাকো মহাজ্ঞান কোথা তুমি পেলে।
মানুষের শিক্ষাধামে কর নি ত বিদ্যার অর্জন।
ছিল নাকো বহু শ্রুত, কিংবা প্রবচন।
জনারণ্যে বসিয়া পাহাড়ে—
কী তরঙ্গ তুলে গেলে মানব-জীবন-পারাবারে
বিনা ঝঞ্ঝাবাতে,
বিংশ শতাব্দীর বুকও আলোড়িত তাহার আঘাতে!
কোটি কোটি নরনারী বন্দে তোমা আজো সন্ধ্যা-প্রাতে।

বালক ছিলাম যবে পড়িতাম মিশনারী স্কুলে
বাইবেল পাঠ্য ছিল, আজো তাও যাইনিকো ভুলে।
পড়িয়া তোমার সেই জীবনান্ত-কথা
পাইতাম বুকে মোর পেরেকের ব্যথা।
খোলা বাইবেল বুকে রহিয়া শয়ান
কত সন্ধ্যা ভিতায়েছি অশ্রুজলে মোর উপাধান।
ক্ষোভে রোষে মর্ম মোর জ্বলিয়াছে দহ্যমান তুষে,
ইহুদী ফরিশীদের মনে মনে চড়ায়েছি ক্রুশে।
তখনও তোমারে আমি লই নাই মানি
ঈশ্বরের পুত্র বলি। নিতান্ত আপনজন জানি
ব্যথা পাইলাম স্মরি ক্রুশক্লিষ্ট তব মুখখানি।

পরে জানিয়াছি তোমা ঈশ্বরের বরপুত্র বলি
শোকাবেগ উঠে নাই তখন উথলি।
যাদেরে ক্ষমিয়া গেলে আমিও তাদের আজ ক্ষমি,
শুধু ক্ষমি কেন বলি? তাদেরে প্রণমি।

তাদের নিষ্ঠুরতম অপরাধও যাই আজ ভুলি,
অমৃতের উৎস তারা শলাকায় দিয়াছে যে খুলি।
রক্তপাত করিয়াছে তব বক্ষে হাতুড়ি আঘাত
রুদ্ধ করিয়াছে তা যে লক্ষ লক্ষ বক্ষে রক্তপাত।
অই রক্তটীকা পরি দেশে দেশে অগণ্য দানব
হে শরণ্য, হইয়াছে বরেণ্য মানব।
সেই রক্ত পরশিয়া যুগে যুগে সহস্র লেখনী
গ্রন্থের খনির বক্ষে বিথারিল লক্ষ স্পর্শমণি।

তব ক্রুশখানি
দেশে দেশে বহিয়াছে ক্ষমা, প্রেম, সাম্য মৈত্রী-বাণী।
কত না বর্বরে
আরোহণী রূপে তাহা তুলিয়াছে সভ্যতার স্তরে।
পতিত মানব জমি কত ছিল এই বিশ্ব ভরি'
সোনা ফলাইল সেথা তব ক্রুশ হল-রূপ ধরি।
স্বর্গলোক আছে বলি করি নি বিশ্বাস
তব ক্ষমা দিল বিশ্বে স্বর্গেরই আভাস।

সভ্যতা-গর্বিত জাতি ভুলিয়াছে তোমা
মানুষ মারিতে তারা গড়িতেছে নিত্য নব বোমা।
হে মহামানব, যেই মহাদেশে তব জন্মভূমি
সেথায় ফিরিয়া এস, মোদের উপাস্য হও তুমি।
দ্বিতীয় নিতাই রূপে নিমাইএর পাশে—
আসিয়া দাঁড়াও তুমি রহিও না অপ্রাচ্য প্রবাসে।
শয়তান 'ম্যামনের' দান ওরা করুক সম্ভোগ,
আমাদেরি সাথে তব হৃদয়ের চিরন্তন যোগ।

দিল্লীর নিকট জামিয়া মিলিয়া রুরাল ইনষ্টিটিউটে উচ্চশিক্ষার্থীরা ক্লাস করিতেছে
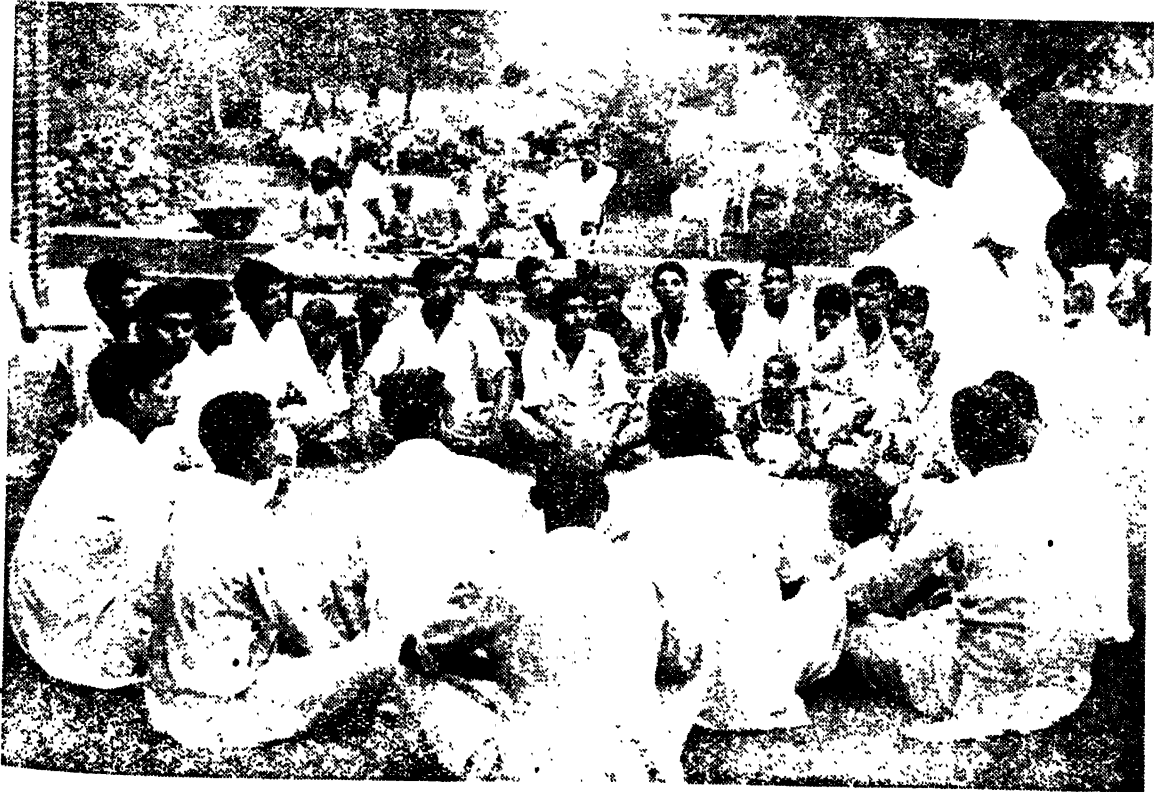
খানপুর জামিয়া মিলিয়া রুরাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রেরা তাহাদের সভায় উপস্থিত হইয়াছে

দিল্লীতে ছোট ছোট মেয়েরা খেলার মধ্য দিয়া 'ডিসিপ্লিন' শিক্ষা করিতেছে

মালভিয়া নগরে ট্রেনিং-সেণ্টারে শিক্ষার্থীরা পাঠ লইতেছে

মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মধ্যপ্রাচ্য

রেজাউল করীম

মওলানা আজাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা মওলানা সাহেবের দীপ্ত মনীষা ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সারা জীবন তিনি রাজনীতি করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক ঘটনার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোন সাময়িক সমস্যার সমাধান তিনি করিতে যান নাই। প্রত্যেক সমস্যার মূলে তিনি প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। মূল ব্যাধি যাহাতে দূর হয় সেই চেষ্টাই তিনি করিতেন। তিনি কোন দিন বিশ্বাস করিতেন না যে, মুসলিম লীগের দ্বারা উত্থাপিত কতকগুলি দাবী পূরণ হইলেই মুসলিম সমাজের চিরকল্যাণ হইয়া যাইবে। তিনি বলিতেন যে, সাম্প্রদায়িকতা দেশের সর্ব্বসমাজের বিশেষ করিয়া মুসলিম সমাজের ক্ষতিসাধন করিবে। এই সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দেয়, স্বাধীনতার পথে কণ্টক সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মনে একটা পরাজিত মনোভাবের জন্ম দেয়। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাম্প্রদায়িকতাকে ধ্বংস করার দিকে তিনি মনোযোগ দেন। সেইজন্য মুসলিম লীগের চোখধাঁধানো ভ্রান্তিকর শ্লোগান দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। তিনি আর একটা কথা বুঝিয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতার সহিত ভারতের স্বাধীনতার নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার দাবীকেও ব্যাহত করিতে পারে। খিলাফৎ আন্দোলনের অপরাপর নেতার মত তিনি কেবল মুসলিম স্বার্থের কথা ভাবেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি। ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বৃটেন আরব জগতের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিয়াছিল। তাই মওলানা আজাদসাহেব খিলাফৎ-আন্দোলনের মাধ্যমে সেই কথাটা দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরেও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব একটুও হ্রাস পায় নাই। সেইজন্য মওলানাসাহেব চাহিয়াছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের আরবরাষ্ট্রের সহিত ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে। তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাই ভারত সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির মধ্যে। ভারত সরকারের সাধারণ বৈদেশিক নীতি-নিয়ন্ত্রণে মওলানাসাহেবের যে বহু বিষয়ে পরামর্শ লওয়া হইত তাহা সর্ব্বজনবিদিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরবরাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিবার সময় নেহরুজী মওলানাসাহেবের পরামর্শ লইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মতেরও যথেষ্ট মূল্য ছিল। তাঁহারই উপদেশক্রমে ভারতের সহিত কয়েকটি আরবরাষ্ট্রের মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। পাকিস্থান আরবরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নানাভাবে ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। পাকিস্থান একটা মুসলিমরাষ্ট্র এই দাবীতে তথাকার নেতারা দেখাইতে চাহেন যে, আরব জগতের মুসলিমরাষ্ট্রের সহিত তাহার একটা নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কেবল ধর্ম্মের ভিত্তিতে এইভাবে কোন রাজনৈতিক আঁতাৎ বা মিতালী স্থাপিত হইতে পারে না। মওলানা সাহেব নিজেই আরবদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া পাকিস্থানের উক্ত প্রকার দাবীর অসারতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রভাবে আরবদেশের কয়েকটি রাষ্ট্র স্পষ্ট উপলব্ধি করিল যে, পাকিস্থানের দাবী অলীক ও যুগধর্ম্মবিরোধী। মুসলিম সংহতির নামে আরব-জগতের কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ইঙ্গ মার্কিন আঁতাতে যোগদান করা উচিত নহে। বাগদাদ-চুক্তি মুসলিম-সংহতি গঠন করিতে পারে নাই, বরং একদিক দিয়া ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আরব-জগতের কয়েকটি রাষ্ট্র কিছুতেই বাগদাদ-চুক্তিতে যোগদান করে নাই। তাহারা বেশ জানে ঐ চুক্তিতে যোগদান করার অর্থ ইঙ্গ মার্কিন আঁতাতের নিকট আত্মসমর্পণ করা। তাহাদের এই সিদ্ধান্তকে মওলানা আজাদের প্রচেষ্টা কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আরব জগতের সহিত ভারতের মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য মওলানাসাহেব যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার একটির কথা এই প্রসঙ্গে বলিব। তাঁহারই উদ্যোগে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের অধীনে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই সংস্থাগুলি বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করিতে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। "Indian Council for Cultural Relation"—এইরূপ একটি সংস্থা ইহার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯৫৮ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায়

মওলানাসাহেব সভাপতির আসন হইতে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা খুবই মূল্যবান। এই ভাষণ হইতে দেখা যাইবে ভারতবর্ষ ও আরব-জগতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য তিনি কতকগুলি কর্ম্মপরিক্রমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে, যদিও রাজনৈতিক কারণে অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া "ভারত ও পাকিস্থান" এই দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে, তবুও উক্ত দুই রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ দীর্ঘকাল একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবন এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছিল যে, দেশ বিভক্ত হইলেও সে জীবনধারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাতে উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাই মওলানাসাহেব বিশেষভাবে পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "আমি আশা করি যে, আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হইবে।" এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, ইহাতে মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক এবং মিশর এই তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থান যে সব প্রচারণা করিয়াছে তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের মিথ্যা প্রচারের ফলে মুসলিমরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ নিছক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছিল। মুসলিমরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ধারণা এই হইয়াছিল যে, "ভারত মানেই হিন্দুদের দেশ।" আর পাকিস্থানটা হইতেছে কেবল মুসলমানের দেশ। মুসলিমরাষ্ট্রের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে যে, দেশ বিভাগের পরে যদিও ভারতে কিছু সংখ্যক মুসলমান বসবাস করিতেছে তবুও তাহাদের কোন নাগরিক অধিকার নাই, ধর্ম্মব্যাপারেও তাহাদের কোন স্বাধীনতা নাই।

প্রসঙ্গক্রমে মওলানাসাহেব একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন অঞ্চল ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত। দেশ স্বাধীন হইবার কিছুদিন পরই যখন ডক্টর সৈয়দ হোসেন ভারতের দূত হইয়া মিশরে গিয়াছিলেন, তখন মিশরবাসীরা একথা আদৌ বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে, ভারতবর্ষ একজন মুসলমানকে দূত রূপে মিসরে প্রেরণ করিবে। সুতরাং ডক্টর সৈয়দ হোসেন যখন মুসলমান তখন নিশ্চয়ই তিনি পাকিস্থানের দূত। মিশরের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলি এই সংবাদ প্রকাশ করিল যে, পাকিস্থানের প্রথম দূত হিসাবে সৈয়দ হোসেন মিশর আসিয়াছেন। যখন তিনি ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মিশর সরকারকে লিখিতে বাধ্য হইলেন যে, সরকার যেন মিশরবাসীর এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে তৎপর হন। অবশেষে মিশর সরকার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া একটি বিবৃতি দিলেন, তবেই মিশরবাসী সঠিক কথা জানিতে পারিল। এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে যে, মুসলিমরাষ্ট্রসমূহে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা ও ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত কাউন্সিলের মাধ্যমে মওলানা আজাদসাহেব মধ্যপ্রাচ্যে বহু কাজ করিয়াছেন। আজ তাহারই ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে সব দেশ আর কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারতবর্ষকে অবিশ্বাস করিত আজ তাহারা ভারতের বন্ধুত্ব অর্জ্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

আজ মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ বুঝিয়াছে যে, ভারত সরকার কেবলমাত্র হিন্দুদের সরকার নহে, বরং ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জাতীয় সরকার। আরব দেশে ভারতের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মওলানা আজাদসাহেবের উদ্যোগে "সাকাফাতুলহিন্দ" নামে একটি ত্রৈমাসিক আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকা সমগ্র আরব দেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আরব-জগতের উপর বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে। মিশর, ইরাক, সিরিয়া এবং ইরাণের সংবাদপত্রগুলি ভারতের এই পত্রিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। আরব দেশের কোন কোন পত্রিকা ইহার বহু প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছে। আর ইরাণ দেশের বহু পত্রিকায় ইহার কোন কোন প্রবন্ধ ইরাণী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আরব দেশের বহু লেখক ও গ্রন্থকার ভারতের এই পত্রিকার প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি প্রবন্ধ সর্ব্বত্র অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইরাকের একটি সাংস্কৃতিক সমিতি ভারতের এই পত্রিকার বাছাই বাছাই প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছে। আবার এই সব প্রবন্ধের ফারসী অনুবাদও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী দেশের বহু প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এই পত্রিকার বহু প্রবন্ধ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ফার্সি ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার নাম "হিন্দ ও ইরাণ।"

এই পত্রিকাটিও উক্ত কাউন্সিলের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আরব-জগতের ন্যায় আরও নানা দেশের সহিত সাংস্কৃতিক-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সুদানের সহিত ভারতের মৈত্রীর সম্পর্কতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সুদান একটি নব গঠিত রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের পর সুদান অনুপ্রেরণা পাইবার জন্য ভারতের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সুদান যখন প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইল, তখন সে ভারতের দিকেই আকৃষ্ট হইল। এবং নির্ব্বাচনের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতবর্ষের • নিকট হইতে বিশেষজ্ঞ প্রার্থনা করিল। নির্ব্বাচন-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মিঃ সুকুমার সেন সুদানে প্রেরিত হইলেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে সুদানের নির্ব্বাচন-কার্য্য পরিচালনা করিয়া সেখানকার সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে ডক্টর সৈয়াদিন সুদানের মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুব্যবস্থিত করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। সুদানের বিচার বিভাগের জন্য যখন উপযুক্ত বিচারকের প্রয়োজন হইল, তখনও সে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিল। এবং যথাসময়ে সাহায্যও পাইয়াছে।

মিশর, সুদান, ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সে সব দেশের ছাত্রছাত্রীগণ আমেরিকা অথবা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় গমন করিত। কিন্তু এখন আরব-জগতের দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আরব-রাষ্ট্রসমূহের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নিজেদের দেশ ভ্রমণ করিবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বহুবার আহ্বান করিয়াছেন। এবং ঐ সব দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীগণও বহুবার নানা উপলক্ষে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ভারতে আসিয়া যে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আজ মুসলিম-রাষ্ট্রের সহিত ভারতের যে আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ, তাহাদের মধ্য হইতে ভারতবিরোধী ধারণা ও সংস্কার বহুলাংশে অপসারিত হইয়াছে। সাংস্কৃতিক সম্পর্কস্থাপনের জন্য যে কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে, তাহা এই বন্ধুত্বের সম্পর্কের জন্য কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। সত্যই মওলানা আজাদসাহেবের প্রচেষ্টায়। আরব-জগত ভারতবর্ষকে নূতন আলোতে, নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিতে শিখিয়াছে। হেজাহের রাজা ইবনে সউদ ভারত সরকার ও ভারতের অধিবাসীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের সংবিধান সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার দিয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছেন। আরব-জগতের মানুষের ভারতের প্রতি এই প্রকার মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য উক্ত সাংস্কৃতিক কাউন্সিল যে একটা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। উক্ত কাউন্সিলের অধীনে আর একটা বিভাগ আছে যথা, দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া বিভাগ। এই বিভাগের পক্ষ হইতে "India Asia Culture" নামক একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে সব ছাত্র বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি লইয়া পড়াশুনা করিতে চায় তাহারা এই পত্রিকাটি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করে।

বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া মওলানা আজাদ এই আশা পোষণ করিতেন যে, উক্ত কাউন্সিলের কার্য্যাবলী আরও প্রসারিত হইবে। কমনওয়েলথ দেশসমূহের সহিত আরও নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করিতেন। এমন কি সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপের সহিতও নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল।

সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার ছিল বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে বহু শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে, যাহাতে বিদেশের ছাত্রগণ ভারতবর্ষে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ-সুবিধা পায় সেরূপ ব্যবস্থা করার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। ভারতের বড় বড় শহরে একটা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক হোষ্টেল বা ছাত্রাবাস স্থাপন করার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য এবং প্রারম্ভিক কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় কিছু জায়গা লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই ও কলিকাতা শহরে আন্তর্জ্জাতিক ছাত্রাবাস ও ক্লাব স্থাপন করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। মওলানা উক্ত কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ এলাকায় সংস্কৃতি প্রচারকের বাহন হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। প্রত্যেক সদস্যকে এক-একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। এই সব কেন্দ্র পৃথিবী জুড়িয়া ভারতের কথা প্রচার করিবে ও বিশ্ববাসীকে ভারতের বাণী যথাযথ ভাবে বুঝাইয়া দিবে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর যদি এই সব কাজ বন্ধ না হয়, তবে ভারতের সহিত নিখিল বিশ্বের সম্পর্কটা আরও মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ হইবে।

প্রকাশ রায়ের নক্‌শা

শ্রীঅমল সরকার

আমি—প্রকাশ রায়…অনেক দিন থেকেই ভুগছিলাম। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু…

আজ সকাল থেকে অনবরত আমায় দেখবার জন্য লোকের আনাগোনা শুরু হ'ল—ব্যাপারটা প্রথমে ঠাহর করতে পারছিলাম না—পরে বুঝতে পারলাম যে, আমার অন্তিম সময় খুব কাছেই, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। আমাকে শেষ বারের মত দেখবার জন্যই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের এত ভীড়। আশ্চর্য্য! ভাবতে লাগলাম, এতদিন আমার কোন খোঁজই করে নি এরা, আজ যেন সবাইয়ের এক সঙ্গে মনে পড়ে গেছে। আরও অদ্ভুত লাগছিল, যখন ভাবলাম কোথায় যাব, কি রকমই বা সে যায়গা, বেশ ছিলাম এই পৃথিবীতে, কষ্ট-দুঃখ পেলেও কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল—ওই ত হীরেন—আমারই ছেলে কিন্তু আমার দিকে কেমন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে—ওকে সেই ছোট্ট থেকে মানুষ করলাম, কত বড় হয়ে গেল—আমাকে কত ভালবাসে, কিন্তু ওকে ছেড়ে চলে যেতে হবে—এই ত আমার মেয়ে অনু—ওষুধের বাটিটা এগিয়ে নিয়ে আসছে—কত ভালোবাসে আমাকে, সারাটা অসুখ রাত জেগে জেগে আমার সেবা করে গেল—ওকেও ছেড়ে যেতে হবে—সেই কোন এক অজানা দেশের জন্যে! সত্যি, যেতে একেবারে মন চাইছে না—কত দিনের পরিচয় এ জগতের সঙ্গে, কার-ই বা মন চায় এ সব ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। ওপারের ডাক যেন আমি শুনতে পাচ্ছি—ঐ ত কারা সব এগিয়ে আসছে, কি মুস্কিল, ভাল করে দেখতেও পাচ্ছি না, চোখ দুটোয় কিছু পড়ল নাকি, কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আকৃতিগুলোকে ভালো করে চেনাও যাচ্ছে না। ওরা সব নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে না! মনে হ'ল আমার দিকে একটা আকৃতি আঙুল দিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে বলল, এদেরই কি যমদূত বলে! না, যমদূতের চেহারা ত ভয়ঙ্কর হবে, কালো মোষের মত হবে রং, কিন্তু এদের ত ঠিক কালো মনে হচ্ছে না! ওরা যেন আমার অনেক কাছে এসে পড়েছে, মনে হ'ল আমার খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—একজন দাঁত বার করে হাসতে লাগল, আচ্ছা, হীরেনটা বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে কেন, মেরে তাড়িয়ে দিতে পারছে না—আরে, আর একটা একেবারে অনুর গা ঘেসে দাঁড়িয়ে পড়ল, অনুটা কিছু টের পাচ্ছে না…আশ্চর্য্য…চেঁচিয়ে উঠলাম 'হীরেন, অনু' ওদের তাড়িয়ে দে, আমি যাব না, না, না, তোদের ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না।'

'বাবা, আমরা ত এখানেই আছি, কই, কেউ ত আসে নি…তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে' বলে অনুটা আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আমার নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হতে লাগল…একবার মনে হ'ল মিনতি যদি বেঁচে থাকত…আমি তাকিয়েই আছি…কিন্তু ঘরের দেওয়ালের রবীন্দ্রনাথের ছবি, ক্যালেণ্ডার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। টেবিলের ওপর মিনতির ফটোটা যেন নেই মনে হচ্ছে। দরজার দিকে চাইলাম…দেখি ঐ আকৃতিগুলো আবার এসেছে, এবার যেন তাদের আগের চাইতে আরও পরিষ্কার দেখতে পেলাম…আর সংখ্যাতেও আগের চাইতে বেশী। একজন একটু বয়স্ক মনে হ'ল…সে এগিয়ে এল আমার একেবারে পাশে…মুখটা আমার কানের কাছে নিয়ে এসে বলল, '১২টা বেজে ১১ মিনিটে তোমার সময়।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে?'

'তার মানে? ১২টা বেজে ১১ মিনিটে তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে যাবার ভার আমাদের ওপর পড়েছে।'

আমার দমটা যেন আরও বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। এখন ১২টা বাজতে ১৪ মিনিট বাকী…১২টা বেজে ১১ মিনিট…আর মাত্র ২৫ মিনিট…২৫ মিনিট পরে আমাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে…না, না, আর কিছুক্ষণ সময় দাও, আমার ছোট ছেলে অতীন যে এখনও পৌঁছায় নি। তাকে একবার শেষ দেখতে দাও, ভগবান, বিকেল পর্য্যন্ত সময়টা বাড়িয়ে দাও না।'

সেই বৃদ্ধ আকৃতিটা বললে, 'না, তা আর হয় না। তোমার জন্মের সময় এই দিনের এত মিনিট পর্য্যন্ত আয়ু ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, তার এক সেকেণ্ডও বেশী বা কম হতে পারে না।'

মাথাটা একবার ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারাটা পৃথিবী যেন আরও জোরে ঘুরপাক খেয়ে উঠল…ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতি সিনেমার ছবির মত একের পর এক চোখের সামনে জেগে উঠল…

বাবার সঙ্গে চলেছি বেড়াতে…ভোর বেলা…সূর্য্য উঠছে…আকাশ লাল হয়ে উঠেছে…বাবা বলছেন 'বিলেতে এরকম সূর্য্য উঠলে চারিদিক আরও লাল হয়ে ওঠে।'

আমি জিজ্ঞেস করছি, 'ওঃ, বিলেতের সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের চেয়ে আরও বড়, বাবা…'

'না, ঠিক তা নয়…'

দিদি বলছে, 'প্রকাশ, তুমি আজকাল ভারী দুষ্ট হয়েছ, মোজা পায়ে না দিয়েই জুতো পরেছ।'

'না, না, আমি মোজা পরব না।'

'তা হলে তোমাকে কিছু দেব না, তোমাকে ভালোবাসব না।'

বাবার সঙ্গে চলেছি স্কুলে ভর্ত্তি হতে…কলেজের টেষ্ট পরীক্ষা

হয়ে গেছে···অসিত বলছে···'চল প্রকাশ, আজ একটা সিনেমা দেখা যাক···।' ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল।

সিমলায় 'ম্যাল' দিয়ে চলেছি, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে, যা ঠাণ্ডা···গিয়েই গরম রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ব। মিনতির সঙ্গে দেখা স্কুলে পড়াতে গিয়ে···

মিনতি বলে, 'আপনি বুঝি সংসার করবার রঙীন স্বপ্ন দেখেন ?'

'না, মিনতি, বাবা-মা এত কঠোর ভাবে আঘাত করবেন না।'

আমি বলছি···'তুমি আমার কাছে থাকলেই আমি বড়ো হব, মানুষ হব, সব পাব।···'

হীরেন ছুটে আসছে···'বাবা, আজ বেড়াতে নিয়ে যাবে না··· আজ কিন্তু অনুকে নিয়ে গেলে আমি যাব না···'

মিনতির পড়ে গিয়ে জ্বর হয়েছে, 'কোথায় তুমি' একি মিনতি কথা বলছো না কেন, মিনতি, মিনতি···

'বাবা, বাবা, আমি এই যে'

'ওরে, কত সময় হ'ল'

'১২টা বেজে ৪ মিনিট'

'এ্যাঁ, মাত্র ৭ মিনিট বাকী—ওরে তোরা কাছে আয়—আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে—অতীন এখনও এল না।

'ছোড়দা, বিকেলে এসে পড়বে, বাবা'

'বিকেলে কি রে ! আমার যে আর মাত্র কয়েক মিনিট—ওরে দেখ, বাইরে যেখানে মিনতির সমাধি করেছি না, ওখানে আমাকেও একটু যায়গা দিস, দেখ, আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাইছিলাম কিন্তু এরা ত দেবে না।'

অনু আমাকে জড়িয়ে ধরল—হীরেন ছুটে এল কাছে—ডাক্তার নাড়ী টিপে ধরল—'ডাক্তার, ও আর দেখছ কি, ওর গতির শেষ কয়েকটা 'বিট' বাকী আছে।'

আকৃতিগুলো আমার বুকের কাছে এসে পড়ল, বলল, 'চল, আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি, আর এক মিনিট আছে—'

'কিন্তু কয়েকটা কথা যে বলা হয় নি।'

'তা কি হবে, তা আর হয় না—চল, আমাকে টানতে লাগল, আধ মিনিট বাকী, 'অনু, অনু।'

'বাবা, বাবা, এই যে আমি।

'শোন্, তুই—অতীন—এ—লে—হীরে—ন—'

একটা হ্যাঁচকা টান লাগল। মনে হ'ল আমার শরীরটা একবার কেঁপে উঠল—নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলাম—আকৃতির একটা আমার নাক ও মুখ দুহাত দিয়ে জোরে চেপে ধরেছে, উঃ কি অদ্ভুত কষ্ট।

হঠাৎ দুটো ভাগ হয়ে গেল আমার শরীরের, আমার যেন ঐরকম একটা আকৃতি হয়ে গেল। বেশ দেখলাম, আমার শরীরটা পড়ে আছে, নিশ্চল, নিষ্প্রাণ, অনুটা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

আমার ছেড়ে আসা দেহটাকে দেখে ভারী কষ্ট হতে লাগল, ভাবলাম জীবনের এই ত পরিণতি, তবে এর জন্য কেন এত সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার জন্য কেন এত অক্লান্ত চেষ্টা, ঐ দেহটাকে আশ্রয় করে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভাবনাই না ছিল, কিন্তু এক মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল, মরতেই বা কতক্ষণ লাগল। সেই বয়স্ক আকৃতিটা একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কি ভাবছ ?'

'কিছু না, এমনি, আচ্ছা, আমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাবে তোমরা ?'

'এখন ত নয়।'

'তবে, কখন ?'

'যতক্ষণ না তোমার ঐ দেহটার সব কিছু মিলিয়ে যায় অর্থাৎ তোমার আত্মীয়েরা যতক্ষণ না শ্মশানে তোমার দেহটাকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।'

'আর যাদের পোড়ান হয় না, যেমন মুসলমান, ক্রীশ্চান, তাদের।'

'তাদের দেহ কবরে নিয়ে যতক্ষণ না ওপরে মাটি ফেলে সমান করে দেওয়া হয়।'

'এতক্ষণ কি করব ?'

'তোমার দেহের কাছে কাছেই থাকবে।'

'আমাকে নিয়ে তোমরা যাবে কোথায় ?'

'সে অনেক পথ, প্রায় ৪ মাস লাগবে।'

'চার···মাস···'

'হ্যাঁ, তবে ওটা তোমাদের পৃথিবীর লোকের হিসাবে, পৃথিবীর এক মাস আমাদের দেশের এক দিনের সমান, মাটির লোকেরা আমাদের দেশের কত নাম দিয়েছে পরলোক, স্বর্গলোক, পরপার, কিন্তু আসলে আমাদের দেশের কোন নাম নেই, মনে রাখতে গোলমাল হয়ে যায় বলেই পৃথিবীর লোকেরা নাম দেয়, আমাদের ত আর পৃথিবীর মত এদেশ যেতে হবে, ঐ যায়গায় যেতে হবে, এ সব কিছুই করতে হয় না, আমাদের ঐ এক জায়গা, যেখানে পৃথিবীর মত হিন্দু-মুসলমান, আমীর-গরীব, শিখ-খ্রীষ্টান, পাঞ্জাবী-বাঙালী, কিছুরই বালাই নেই। ওখানে যখন যাব তখন নয় নিজের চোখেই সব দেখে নিও।' বলে আকৃতিটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পড়ল, ঐ চেয়ারটায় আমি বেঁচে থাকবার সময় রোজ সকালে বসতাম, চা খেতাম আর খবরের কাগজটা পড়তাম। আমিও গিয়ে পাশে বসে পড়লাম, দুপুর তখন প্রায় তিনটে, অনু কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, একবার মনে হ'ল কাছে গিয়ে অনুকে বলি যে কেন কাঁদছিস মা, আমি ত তোদের কাছেই আছি।'

আকৃতিটা জিজ্ঞেস করল, 'কি হে, কি ভাবছ ?'

'ভাবছি মেয়েটাকে গিয়ে বলি যে ওদের কাছেই আমি রয়েছি'

'যাও না, বলে এস না ?'

আমি গেলাম, ডাকলাম, 'অনু, অনু'

অনু কোন সাড়া দিল না।

'অনু, আমি তোর কত কাছে রয়েছি, দেখ।'

অমু কিছুই বলল না। ফিরে এলাম। আকৃতিটা জিজ্ঞেস করে, 'কি, কি হ'ল ?'

'আমি মেয়েটার কাছে গিয়ে এত জোরে কথা বললাম অথচ মেয়েটা কোন উত্তর দিল না।'

'ও ত তোমার কথা শুনতে পাবে না, আমাদের কথার শব্দ পৃথিবীর বাতাসে নিয়ে যেতে পারে না, কাজেই তুমি হাজার চিৎকার কর, তোমার কথা পৃথিবীর কেউ শুনতে পাবে না। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা। তুমি আমার কথা শুনতে পাবে, বুঝতে পারবে, আমাকে দেখতে পাবে কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তুমি আবার ঐ রকম পার্থিব শরীর ধারণ করতে পার।'

'আবার কি আমি ঐ ভাবে ওদের মাঝখানে যেতে পারব ?'

'তা আমি বলতে পারি না—বিচারের দিন আসবে—তোমার বিচার হবে—আমাদের বিচারকর্ত্তা যে রায় দেবেন সেই মত তোমাকে কাজ করতে হবে।'

'ওঃ' বলে মনে মনে একটু ভয়ই হ'ল, না জানি সে বিচারশালা কেমন হবে, না জানি সে বিচারকর্ত্তাই বা কেমন হবেন! ভাবতে লাগলাম 'এসব হাঙ্গামাই বা কেন—এই জন্ম নেওয়া, মরে যাওয়া, কি আছে এর প্রয়োজন—কেনই বা সব এত আয়োজন। আকৃতিটা আমার কাছে বসেছিল—হয়ত আমাকে গার্ড দেবার জন্য—কিন্তু আমি পালিয়েই বা যাব কোথায়—পৃথিবী হলে হয়ত এ সবের হ'ত প্রয়োজন! এমনি ভাবে প্রায় ৫টা বাজল। অন্য দিনে এ সময়ে অমু, হীরেনদের চা বানাবার ধুম পড়ে যেত, আজ যেন ওরা সব কিছু ভুলে গেছে—আমার মৃতদেহটার পাশে ওরা দু জনা সেই কখন থেকে ঠায় বসে আছে। কেঁদে কেঁদে অমুটার চোখের জল পর্য্যন্ত বোধ হয় শুকিয়ে গেছে, তাই ও আর কাঁদছে না। আমার পিসতুতো ভাই সঞ্জীব এসে পৌঁছালো—আহা প্রকাশদা যে আমাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে হঠাৎ চলে যাবে তা আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নি।' সঞ্জীবের এই দেখানো টানের কথা শুনে আমার সব জ্বলে যেতে লাগল—'আহাম্মক কোথাকার! বেঁচে থাকবার সময় কতবার খবর দেওয়া হ'ল—'বড় ব্যস্ত', 'বৌমার অসুখ', 'কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে' সব বাহানা করে একবারও এল না, এখন বড় ভালবাসা দেখান হচ্ছে—তা ওরই বা কি দোষ, সমস্ত মানুষ জাতটাই ত এমনি! ৭টা বেজে গেল। আমাকে অর্থাৎ আমার দেহটাকে বিদায় করবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কি আশ্চর্য্য, একদিন এই বাড়ীর সবাই আমার উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত, আসতে একটু দেরী হলেই সবাই ভেবে হ'ত আকুল, আজ সেই 'আমাকে' তাড়াবার জন্য সবাই ব্যস্ত! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

এমন সময় আরও দু'চার জন পাড়া-প্রতিবেশী এসে উপস্থিত হ'ল। হাতে দু একটা মালা। সঞ্জীব বলে 'বাবা হীরেন, তোকে এবার বন্দোবস্ত করতে হয়। তা এ খাটই থাক না! এ রকম ভাবে আর কতক্ষণ ফেলে রাখবে।'

হীরেন কিছুই বলতে পারল না। আমাকে বেশ করে ওরা সাজালে, অবশ্য মধ্যবিত্ত ঘরে যতটা সাজানো যায়। আমার ত কোন রকম ছোঁয়াচে রোগ ছিল না, কাজেই আমাকে আর দড়ি দিয়ে কেউ বাঁধলে না! সঞ্জীব ও আর কয়েকজন সাধারণ কতকগুলো কৃত্য শেষ করে খাটটা বাইরে বার করে আনলো। এবার সত্যি আমার কষ্ট হতে লাগল···যে ঘর থেকে ওরা আমাকে বার করে আনল, ঐ ঘরটা আমার কত পরিচিত, এই ঘরে আজ থেকে ৩০ বছর আগে প্রথম এসেছিলাম, তখন একটা আপিসে চাকরী করতাম—তখন এই বাড়ীতে হীরেন, অমু কেউ ছিল না—আমি ছিলাম একলা, তার পর এল মিনতি—প্রথম যেদিন মিনতি বিয়ের পরে এই ঘরে এসেছিল সেদিন বলেছিল আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, 'ঘরটা কি সুন্দর, কি হাওয়া!' এই ঘরের সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে—কিন্তু এই যে আমার যাওয়া, এর পর এই ঘরকে হয়ত আমার মনে থাকবে না—বিচারকর্ত্তার বিচারের পর যদি আবার আসতে হয় তখন কি এই ঘরকে, এই অমু-হীরেনকে চিনতে পারব!

হঠাৎ বাবা! বাবা! বলে ছোট ছেলে অতীন ছুটতে ছুটতে আসে। হতভাগাটাকে অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু একটু আগে আসতে পারল না—এখন কি করি!

এতক্ষণ আমাকে ওরা কাঁধের ওপর তুলে ধরেছে। চীৎকার করে উঠল 'বলহরি—হরিবোল', 'বলহরি—হরিবল' ভগবানেরই নাম—কিন্তু এই নামে লোকের কিরকম একটা চাপা ভয় হয়। চারিদিক থেকে লোকেরা উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। অমু বেশ শক্ত করে নিয়েছে নিজেকে—হীরেন বলে, অতীন, তুই বাড়ীতে থাক। অমু একলা থাকবে! আমাদের আসতে বেশ দেরী হবে বোধ হয়; তুমি কিন্তু বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না। গলিটার কাছে এসে সবাই দাঁড়ায়। আমাকে বৃদ্ধ আকৃতিটা বলে, চল তোমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে এইবার তোমার যাত্রা শুরু হ'ল।' আমি একবার শেষবারের মত অমু, অতীন, বাড়ীটাকে দেখে নিলাম।···আকৃতিটাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আর যারা এসেছিল তারা কোথায় গেল ?

'কিছু ঘাবড়াবার দরকার নেই, সবাই ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত হবে—এখন চল সঙ্গে সঙ্গে···'

বড় রাস্তা রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হীরেনরা চলল। মাঝে মাঝে সেই বিকট চীৎকার 'বলহরি—হরিবোল; বলহরি—হরিবো···ল'। বাসগুলো যাচ্ছে, ট্রাম যাচ্ছে, মোটর যাচ্ছে···কখনও মোটর থেকে, কখনও বাস থেকে লোকেরা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দেহের দিকে দেখছে। রাসবিহারী রসা রোডের মোড়ে এলাম। একটা বাস আমাদের একেবারে পাশে এসে পড়ল, সামনে ভয়ানক ভীড়। বাসের লোকগুলো আমার দেহের দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি

করতে লাগল। জানালার দিকে একটা ছোট্ট মেয়ে বসেছিল। বলে উঠল, 'মা, মরা যাচ্ছে!' আমি ভাবলাম 'হায়রে নিয়তি— একদিন আমিও ঐরকম বাসে বসে যেতুম, এইখান দিয়ে কতবার গিয়েছি—ঐ ত মোড়ের পানের দোকানটা, ঐ ত বুড়ো লোকটা বসে আছে। ওর কাছ থেকে কতবার সিগারেট কিনেছি—ঐ ত রেষ্টুরেন্টটা, কতবার চা খেয়েছি। ঐ ত অন্ধটা বলছে, 'একটি পয়সা দিয়ে যান বাবু—অন্ধকে দয়া করে যান বাবু···'। কিন্তু আমার দিকে আজ সবাই ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। আমি যেন আজ অন্য দুনিয়ার লোক, একদিন আমি ওদের কত কাছে ছিলাম, আজ একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেছি।

কেওড়াতলা শ্মশান। আমাকে নামান হ'ল, রিপোর্ট দিতে আমাকে সঞ্জীবরা নিয়ে চলল আসল যায়গায়—আমাকে একেবারে বিবস্ত্র করে দিল। আশ্চর্য, আমার আজ কোন লজ্জা নেই, লজ্জা ঢাকবার কোন স্পৃহাই নেই অথচ এই দেহটাকে ঢেকে রাখবার জন্য কত পোশাক, কাপড়-চোপড়ের দরকার হ'ত। ভাল ভাল দর্জ্জির দোকান থেকে কত প্যাণ্ট, সার্ট, কোট তৈরী করতাম। কিন্তু আজ তাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে চিতায় শোয়ানো হ'ল। ওপরে কাঠ চাপাতে লাগল। সঞ্জীব বলে, 'হীরেন, বাবা তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে যে'। হীরেন এগিয়ে আসে। হঠাৎ একটা ধাক্কায় চমকিয়ে উঠলাম। দেখি বৃদ্ধ আকৃতিটি বলছে, 'এইবার আমাদের যাবার পালা। ওরা দেহটাতে আগুন ধরালেই তোমার নিজেকে আরও হাল্কা বোধ হবে। ঐ দেখ, ওরা সব এসে গেছে। দেখি, যে যে আকৃতিগুলো আমার মরবার সময় বার বার কাছে আসছিল তারা।

হীরেন আমার মুখে আগুন দিতেই সত্যিই মনে হ'ল যেন আমি খুব হাল্কা হয়ে গেছি, আর পৃথিবীর সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সঞ্জীব, হীরেনদের যেন কেমন ঘোলাটে ঘোলাটে দেখাতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরকম হচ্ছে কেন? সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন?'

'কারণ তোমার পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই, তুমি যেমন ঝাপসা দেখছ, আমরাও ঠিক তাই দেখছি।' 'আচ্ছা! আর কোনও দিন পৃথিবীতে আসতে পারব না! পৃথিবীকে দেখতে পাব না!'

'আসতেও পার আবার নাও আসতে পার! তবে এখন যেখানে যাবে সেখানে কতদিন থাকতে হবে বলতে পারি না। পৃথিবীর হিসাবে সাধারণতঃ দশ-বারো বছর থাকতে হয়, আবার কেউ কেউ পঞ্চাশ, এক শ' বছরও থাকে।'

'এরকম কেন হয়?'

'কেন হয়, সে ওখানে গেলেই জানতে পারবে। তবে পৃথিবীর লোকেদের যতক্ষণ না সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা তাদের সকল ঈপ্সা ও লিপ্সা চরিতার্থ করতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় এই পৃথিবীতে···'

এতক্ষণ আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। আলো আছে, কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। পাশে সেই বৃদ্ধ আকৃতিটি, সামনে ও পেছনে অন্য আকৃতিগুলো। বৃদ্ধ আকৃতিটি বলে, 'আমাকে তুমি চিনতে পার নি, না?'

'না, কে তুমি?'

'তোমার খুব পরিচিত···'

'এ্যা!'

'হ্যাঁ', এইরকম আরও কতজনকে দেখবে, যারা তোমার কত পরিচিত, কত আপনার···'

ভাল করে চাইলাম তার দিকে—মনে পড়েও মনে পড়ল না।

কিন্তু জানতে বেশ ভাল লাগল, সত্যি ভারী আনন্দ হতে লাগল। আমরা দু'জন অশরীরী আত্মা চলেছি, পথটা বাঁকা ত নয়, আবার সোজাও নয়। পিছন ফিরে তাকাতে চেষ্টা করলাম। বৃদ্ধ আকৃতিটি বললে, 'উঁহু, পিছনে তাকিও না—পিছনে কি ফেলে এলে দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। এগিয়ে চল সামনে—দূরে— আরও সামনে—আরও দূরে—

পৃথিবীকে আর দেখা যাচ্ছে না, পৃথিবীর কথাগুলোকে, মানুষগুলোকে ভাল করে মনে পড়ছে না। কেমন যেন ঝাপসা, ঘোলাটে, আবছা হয়ে যায়—

হঠাৎ কানে গেল - ডাক্তার বলছে, যাক আর ভয় নেই, জ্ঞান হয়েছে।

সেকি! এতক্ষণ তবে কি দেখলাম! স্বপ্ন না আর কিছু?
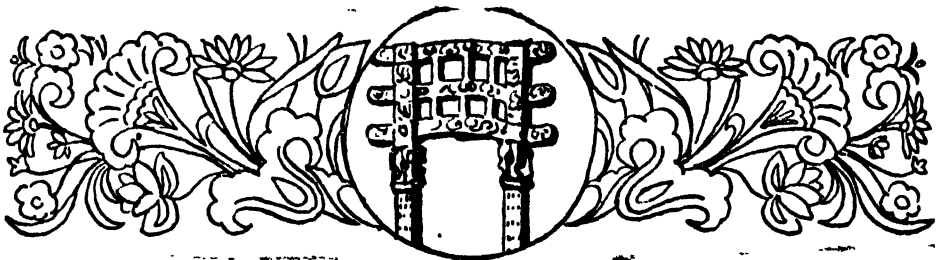
সুন্দরম্

অধ্যাপক শ্রীবিমলকৃষ্ণ মতিলাল

শিল্পে ও সাহিত্যে সুন্দরকে উপলব্ধি করি। জৈব প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে উঠিলে মানুষমাত্রেই সুন্দরের স্পর্শ পাইবার জন্ম লালায়িত। এমনকি সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে তৃপ্তি তাহা কখনও কখনও ক্ষণকালের জন্তও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রার মত জৈব প্রয়োজনের তাগিদকে ভুলাইয়া দেয়। আধুনিক যুগ বিচার-বিশ্লেষণের যুগ। সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আলোকে এই বিশ্লেষণ-রীতিকে উপস্থাপিত করা হয়।

সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে আনন্দের একটা নিকট সম্পর্ক আছে, এবং সে আনন্দ আমাদের এক হিসাবে অপ্রয়োজনের আনন্দ। সাংসারিক প্রয়োজনের মলিন ছায়া তাহাকে স্পর্শ করে না বলিয়াই এ আনন্দের বিমলজ্যোতিঃ এত রমণীয়, এত কমনীয়। আমরা জানি, চাওয়ার তীব্রতার উপর ভোগের তৃপ্তি নির্ভর করে। কিন্তু এখানে চাওয়া ও পাওয়ার সম্পর্কটি বিচিত্র ধরণের—আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আহরণের, প্রার্থনার সঙ্গে প্রাপ্তির ভেদ শুধু আকারে নহে প্রকারে এবং পরিমাণেও বটে। যাহা চাই, যে রকমভাবে চাই, তাহা হয়ত পাই না, কিন্তু যাহা পাই তাহাও যেন অনভিপ্রেত নহে বরং একান্তভাবে ঈপ্সীত। খুদ খুজিতে খুজিতে মাণিক পাইলেও আমরা তাহা কুক্কুটের মত দূরে ফেলিয়া দিই না, বরং একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের আস্বাদনে তৎপর হই। এ আনন্দের বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষাটি স্ফুট ছিল না। সৌন্দর্য্যবোধের যে আনন্দ তাহাতেও কতকটা এই ধরনের যেন অপ্রত্যাশিতের আস্বাদন আছে। যাহা পাই পূর্ব্বে তাহার আকাঙ্ক্ষাটি জাগ্রত ছিল না, মনের কোন গহন-কোণে তাহা ঘুমাইয়া ছিল; হঠাৎ যেন কোন রাজকুমারের মায়াকাঠির স্পর্শে জাগিয়া অপরূপকে নয়ন সম্মুখে নিরীক্ষণ করে। তখন তাহাকেই মনে হয় বাঞ্ছিততম। হঠাৎ যেন মনে জাগে—

'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো'

অনাদি সংস্কারবশতঃ অন্তরে সদাই যে একটা সুপ্ত বাসনা বা চাওয়া বর্ত্তমান, তাহারই পরিতৃপ্তিতে যে আনন্দ স্ফূর্ত্ত হয়, উহাই সৌন্দর্য্যের আনন্দ। এই আনন্দ-মধুর আস্বাদনলোভে শিল্পকুঞ্জবনে শোনা যায় সঙ্গরত মধুপের কলগুঞ্জন।

সৌন্দর্য্যের উপভোক্তার মত সৌন্দর্য-স্রষ্টাও আপন সৃষ্টির মাধ্যমে একটা বিশেষ ধরনের আত্মপরিচয় (Self-realisation) লাভ করে। তাহাদের অন্তরের অনুভূতিসমুদ্রে একটা বিশেষ বিমূর্ত্ত ভাবাবেগ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। এই অস্ফুট ভাবটি যেন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়। সে তাই 'বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার'। কবি, শিল্পী, চিত্রকরগণ চিত্তের এইরূপ অপূর্ব্ব অবস্থাতে কথায়, বর্ণে, রূপে, রসে, রেখায়, সুরে অন্তরের অমূর্ত্ত রূপটিকে মূর্ত্ত করিবার জন্ম সচেষ্ট হন। শিল্পকলা ও কাব্যসৃষ্টির পশ্চাতে এইরূপ একটি প্রয়াস বা চেষ্টা বর্ত্তমান এবং সে চেষ্টা অরূপকে রূপায়িত করার, অস্ফুটকে পরিস্ফুট করার, এবং অব্যক্তকে সুব্যক্ত করার। কবির বা শিল্পীর হৃদয়াকাশে যে ছায়া পড়ে, ভাষা, বর্ণ বা সুরের মাধ্যমে তাহা কায়া পরিগ্রহ করিতে চায়। আর কায়া নির্ম্মিত হইলে, কায়ার মাঝে ছায়াকে সাক্ষাৎ করায়, আনন্দপ্রস্রবণ ছোটে। যেন নূতন ধরনের এক আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে এখানে।

এই সৌন্দর্য্যবোধের প্রকৃত স্বরূপ কি, কোন্ মায়ামন্ত্রের বলে এই অপূর্ব্ব আনন্দের অলকাপুরীর দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে, বহির্ব্বাটীতে বিচারসভা বসাইলেই চলিবে না, অন্তঃপুরে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে একজন অনুভবী-পুরুষ আছে। শরীরগত চৈতন্ত এবং যাবতীয় চেতন-ব্যাপার সেই পুরুষ ধাতু বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিধৃত হয়। শাস্ত্রে বহুবিধ যুক্তির আশ্রয়ে শরীর থেকে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সে সকল শাস্ত্র প্রমাণ না মানিলেও সামান্ত অনুভবকে বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাই, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে বসিয়া একটি অহংবুদ্ধি তাহাদের নিয়ন্ত্রিত বা বিশেষিত করিতেছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই অহংবুদ্ধি যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিত্য নূতনভাবে গঠিত, বিকশিত এবং প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকেই আমরা এখানে পুরুষ বা ব্যক্তিত্ব নাম দিব। ইহা অজ, নিত্য এবং "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কথাও মানিয়া লইতে যাইব না, অথবা বিরুদ্ধবাদীদের সহিতও তর্ক করিতে বসিব না। আমরা শুধু বলিব যে, আমাদের স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে সংগৃহীত সমগ্র জ্ঞানসঞ্চয় ইহারই মধ্যে আহৃত হয় এবং উদ্বোধক অবলম্বনে বর্ত্তমানের উপযোগিতায় আসিয়া থাকে। জন্মের প্রারম্ভ থেকেই বহির্জ্জগতের বিবিধ প্রভাব আমাদের অন্তর্জ্জগতে আসিয়া পড়ে এবং বিবিধভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই আন্তর ধাতুটি একটি বিশেষরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। অন্তর্জ্জগতের গঠন ও রূপায়ণ এইভাবেই সম্ভব হয়। আন্তর ধাতুটি যেন একটা কোমল মৃত্তিকা-পিণ্ড, তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে।

জীবনের পথে যতকিছু অভিজ্ঞতা, আমাদের যতকিছু জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, সংবেগ উপস্থিত হয়, তাহারা ক্ষণস্থায়ী হইলেও সমূলে বিনাশশীল নহে। আন্তর ধাতুর উপর তাহারা আপন অবিনশ্বর চিহ্ন (impression) রাখিয়া যায়। ধাতু-পুরুষ যেন আপন অঙ্গে তাহাদের চিহ্নকে সাদরে বরণ করিয়া ধারণ করেন। শুধু তাহাই নহে, তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল, আমাদের তিল তিল অভিজ্ঞতার সংস্কার-ধাতু সেইরূপ পিণ্ডীভূত হইয়া আমাদের পুরুষ-ধাতু বা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যের জন্যই প্রতি ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের এত বৈচিত্র্য। নিত্য আত্মা বা জন্মান্তর না মানিতে চাহিলেও এ-ধরনের আত্মার কথা না মানিলে নয়।

মানুষের এই ব্যক্তিত্ব বা ধাতু-পুরুষ এক এবং অখণ্ড মনে হইলেও বিবিধ মাধ্যমের মধ্যে বিভিন্নভাবে ইহার প্রকাশ হয়। মূল ধাতু-পুরুষের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা আসে—যেমন, জৈব-পুরুষ (Biological personality), বৌদ্ধপুরুষ (Logical personality) ভাবপুরুষ ইত্যাদি। বিশেষ বিশ্লেষণ না করিলে, ইহাদের স্বাতন্ত্রকে বোঝা যায় না। কারণ, স্বতন্ত্র হইলেও ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। সূর্য্যের সিত রশ্মিচ্ছটার মধ্যে যেমন সাতরঙা রামধনু লুকাইয়া থাকে, মূল ব্যক্তিত্বের মাঝেও ইহারা একান্তভাবে মিলিয়া-মিশিয়া আছে। দেহের পশু-সাধারণ বৃত্তি, আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতির ব্যাপারের মধ্যে জৈব-পুরুষের সার্থক পরিতৃপ্তি, বুদ্ধির ক্রীড়া-প্রাঙ্গণেই বৌদ্ধপুরুষের লীলায়িত সঞ্চরণ। এইরকম প্রত্যেক পুরুষেরই স্বতন্ত্র-ব্যাপারের একটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে। এ সকল আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এখানে মূল ধাতু-পুরুষেরই একটা বিশেষ দিক আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমাদের চিত্তবৃত্তির নিরন্তর প্রবাহে যে সকল জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, হর্ষ, ভয় ভাসিয়া উঠে, তাহাদের অনেকটুকুই বিভিন্ন পুরুষের আপনাপন স্বতন্ত্র-ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই 'অনেকটুকু' বাদ দিয়া যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই আপাত-নিষ্প্রয়োজন ভগ্নাবশেষ অনুভূতি-কণাগুলি আহৃত হয় মূল ধাতু-পুরুষের মধ্যে। প্রকৃতির কোমল মুখচ্ছবি, মানুষের উদ্দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, রমণীর রমণীয়তা, মদের মাদকতা, সঙ্গীতের সুরতরঙ্গ—এ সকলের অনুভব আমাদের মানসরাজ্যে নিত্য সঞ্চরমান। তাহাদের যেটুকু অন্য পুরুষের বৃত্তির মধ্যে উপেক্ষিত সেটুকুই ক্রমশঃ সংগৃহীত হইয়া ধাতু-পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যোপাধায়ক সংস্কারকে সৃষ্টি করে। ভয়ের মধ্যে যে চাঞ্চল্যটুকু, ক্রোধের মধ্যে যে উত্তাপটুকু, হাসির মধ্যে যে উচ্ছলতাটুকু, বীরত্বের মধ্যে দীপ্তিটুকু, বিস্ময়ের মধ্যে যে দোলাটুকু, শোকের মধ্যে যে কারুণ্যটুকু, রতিক্রিয়ার মধ্যে যে পরিতৃপ্তিটুকু—এ সকলই নিজ নিজ ব্যাপারের সময় গৌণ হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের অগোচরে, এই অংশগুলিই ধাতু-পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় এবং একত্রে সংগৃহীত ও পিণ্ডীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যোপধায়ক সংস্কারকে গড়িয়া তোলে। এই পিণ্ডীভবনের সময় তাহাদের সহিত বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রের সম্বন্ধসূত্রগুলি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়। কাজেই বহির্জগতে পুনর্বার সেই জাতীয় বস্তুর সমাবেশ হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারগুলি উদ্বুদ্ধ হয়, অথচ পূর্ব্বের দেশকালপাত্রের সম্বন্ধ বর্জ্জিত বলিয়া, ঠিক স্মৃতির পর্য্যায়ে তাহারা আসে না। কিন্তু ধাতু-পুরুষের এক অভিনব উপায়ে আত্মপরিচয় লাভ করে। এ ধরনের স্মৃতিকে 'প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি' বলা যায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়টি পূর্ব্বে অনুভূত হইলেও এখন তাহার পূর্ব্ব সম্বন্ধগুলি অস্পষ্ট কুহেলী ঘেরা। অর্থাৎ, ভূমির বাঁধন কাটিয়া যেন বিষয়টি ভূমার বাহুবন্ধনে ধরা পড়িয়াছে। তাই তাহার পরিচয়ে এই আনন্দ রসধারা।

বাহিরের বস্তুসমাবেশটি যখন কৃত্রিম উপায়ে মানুষের হাতে হয়, তখন তাহার মাঝে অপূর্ব্ব সৃজন-নৈপুণ্য ও গঠন-কৌশল এবং গঠন-কর্তার স্বানুভবের গভীরতার পরিচয় পাইয়া ভোক্তার আনন্দ-রসটি আরও উদ্বেলিত হয়। স্রষ্টার তৃপ্তিটি একটু অন্য ধরনের। শিল্পীরা বা কবির হৃদয়পাত্রটি নিজ অনুভবের আনন্দে এতই ভরপুর, যে একাকী আস্বাদন করিয়া তাঁহার সাধ মিটে না বা সামর্থ্যে কুলায় না। নিখিলজনকে তাই নিমন্ত্রণ জানান আপনার শিল্প-কর্ম্মকুঞ্জে আপন হস্তে আনন্দ পরিবেশনের জন্য। একটি আলোক-রশ্মি যেমন বহু স্ফটিকপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া আলোকমালায় দিকবিদিক প্লাবিত করে, কবির আনন্দভোগ সেইরূপ প্রতি রসিক-চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং ব্যাপক আনন্দের প্লাবন আনে। এইখানেই কবি বা শিল্পী হন মহাজন। স্বভাবসৌন্দর্য্যের সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্য্যের পার্থক্য এই অংশেই সুপরিস্ফুট।

আরও একটি কথা বলিয়া আলোচনার ছেদ টানিতে চাই। সৌন্দর্য্যোপলব্ধি করিতে আমাদের একটি তৃতীয় নয়নের সৃষ্টি হয়। এবং তাহাতে একটা অলৌকিক জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অলৌকিক আনন্দের উদ্ভাস হয় কিন্তু লৌকিক বিষয়কেই আশ্রয় করিয়া। অলৌকিক অর্থে কোন ভোজবাজী বা ঈশ্বর-বিভূতি নহে। অলৌকিক বলিতে যাহা লৌকিকবিজাতীয় বা আলঙ্কারিকের ভাষায় যাহা 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত।' এখানে লৌকিক নিয়মগুলি ব্যর্থ নহে, তবে তাহারা আপন প্রাধান্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক নিয়মের অধীন থাকে। লৌকিক চর্ম্মচক্ষু দুইটি এখানে নিষ্ক্রিয় থাকে না, তবে তাহারা ঐ তৃতীয় নেত্রেরই সহকারীমাত্র। বস্তুময় (material) সকল ইন্দ্রিয়-গুলিই এখানে সক্রিয় থাকে, শুধু তাহারা আপন স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া এক অ-বস্তুময় অনুভব-করণের মাঝে আপনাকে বিলীন করিয়া দেয়। অর্থাৎ এ জগতেরই হংসবলাকার পাখা যেন কানে কানে মন্ত্রণা দেয়, 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' এই অলৌকিকত্ব আমাদের মতে আর কিছুই নহে, লৌকিকের মধ্যে তাহার অভিনবত্বের আবিষ্কারেই অলৌকিকত্বের

প্রকাশ। লৌকিক বস্তু যদি মধুর হয়, তবে তাহার মাধুর্য্যটুকুই যেন অলৌকিক, লৌকিক যদি সরল হয় তবে তাহার আস্বাদনটুকুই যেন অলৌকিক। তৃতীয় নেত্রের তির্য্যক দৃষ্টিতে অতি পরিচিতাকেও রহস্যাবগুণ্ঠিতা বলিয়া মনে হয়, ঘরের প্রেয়সীকেও অচিনদেশের অচিন রাজকুমারী বলিয়া জানি। এই জানার মধ্যেই অলৌকিকত্ব। দৃষ্টির অভিনবত্বের জন্যই লৌকিকের মধ্যে এই অভিনবত্বের সঞ্চার হয়। আর সে দৃষ্টির সূচনা হয়, যখন পূর্ব্বোক্ত ধাতু-পুরুষের ঐরূপ পূর্ব্ব দেশকালপাত্রবর্জ্জিত সৌন্দর্য্যোপধায়ক সংস্কারটি উদ্বুদ্ধ হয়। উদ্বুদ্ধ সংস্কারের পূর্ব্বসম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় তাই 'সুপ্তোত্থিতা'র মত জাগিয়া উঠিয়া সে প্রশ্ন করে—

'কে পরালো মালা?' ঐ

"স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন অমনি মনে লয়।
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়।"

অধরা

বিভা সরকার

আজন্ম খুঁজেছি যাঁরে
তবু যাঁর পাইনি সন্ধান
তাঁহারেই সঁপিলাম
স্বপ্নচ্ছন্দে রচি এই গান।
নিদাঘ মধ্যাহ্ন মাঝে
কাঁদায়েছে যে জন্ম উদাসী
বৃষ্টির নূপুর মাঝে
বিনা কাজে তাঁরে ভালবাসি।
অমাবস্যা অন্ধকারে
যেবা পায়ে বাঁশিত পরশ
পূর্ণিমার পূর্ণকলা
রচি দেয় তাঁহারই দরশ।
সকল ঐশ্বর্য্যহারা
সে আমার আঁধারে মানিক
সে অতলে ডুবি আজ
হৃদি মোর কুম্ভ ভরে নিক।
সে প্রেম নির্ঝর ধারে
আকণ্ঠ করিয়া নিক পান
অমর্ত্ত অমিয়ধারা
অজানার অক্ষয় সে দান।

দুঃসাহসী

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

এ কি মত্ত ভাঙা খেয়া কূলহীন কূলে!···
কখন খুলিয়া গেছে নোঙরের বাঁধা!
দিগন্ত হয়েছে ঘন ফেনময় শাদা—
তারও পারে রাঙা স্বপ্ন মুঞ্জরে কি ফুলে?
সে-ফুল কাড়িবে তীক্ষ্ণ চঞ্চল অঙ্গুলে?
সেথা কে হাসিতে গাঁথে অশ্রুময় কাঁদা···
সে কি নখ-সখী মোর নিত্য যারে সাধা,
যারে ঘিরি ফেরা সুখে ভুল হতে ভুলে?

দুঃসাহসী শোনে মন বন্দরের ডাক—
বিস্তীর্ণ প্লাবনে দাও কি মূল্যে এ পাড়ি?
যে-ফুল মুকুলে ঝরে যাক খসে যাক—
কোন লক্ষ্যে, রে দুরন্ত, তট যাও ছাড়ি?
তার চেয়ে এ অসীমে বোসো মৌনবাক—
অন্তর উছলি' ভর অন্তর নিঙাড়ি।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্

শ্রীসুখময় সরকার

বর্তমানে আমাদের পূজা-পদ্ধতিতে তন্ত্রের প্রাধান্য হইলেও বেদ-মন্ত্র প্রায় সকল পূজাতেই উচ্চারিত হয়। পুরোহিত আসিয়া পূজার প্রারম্ভে যে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করেন, তাহা এই :

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

অন্বয়ার্থ :—(তিনবার বিষ্ণু-স্মরণান্তে) সেই বিষ্ণুর পরম পদ সূরিগণ সর্বদা দেখিতে পান। তাঁহার দৃষ্টি (চক্ষু) দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র পূজানুষ্ঠানে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে! কিন্তু বিষ্ণু কে? তাঁহার পরম পদ কি? সূরিগণ কিরূপেই বা তাহা দেখিতে পান? এই সকল প্রশ্নের সহজ উত্তর অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বিষ্ণু জগৎ-পালয়িতা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ। তাঁহার পদ 'পরম', কারণ মোক্ষদায়ক। সূরিগণ অর্থাৎ মুনিগণ ধ্যানযোগে তাহা দেখিতে পান। এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত অর্বাচীন। বিষ্ণু যে চতুর্ভুজ নারায়ণ এই ভাবনা পুরাণের কালে আসিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ রচনার সময় হইতে আর্য-হিন্দুর বিষ্ণুভক্তি প্রবল হইলে তাঁহার পরমপদ মোক্ষদায়ক বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমাদের আলোচ্য মন্ত্রটি বেদমন্ত্র। বেদের সময়ে বিষ্ণু সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল না। মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, বেদের কালে তাহা ছিল না। সেকালে যাগ-যজ্ঞ ছিল, কিন্তু ধ্যান ধারণা পরে আসিয়াছে, অতএব এই বেদমন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাটি যথার্থ নহে; উহাতে অনৈতিহাসিকত্ব (anachronism) দোষ আসিয়া পড়িয়াছে।

কঠোপনিষদ (১।৩।৯) বলিতেছেন :

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

অর্থাৎ, যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি-রূপ সারথি আছে এবং বল্গাস্থানীয় মন যাহার অধীন, তিনিই সংসার-মার্গের অতীত বস্তু বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। টীকাকার 'বিষ্ণুর পদ' বলিতে স্বয়ং বিষ্ণুকেই বুঝিয়াছেন, যেমন 'রাহুর শির' বলিতে রাহুকেই বুঝায়। টীকাকারের মতে বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হওয়া। কঠোপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়। কিন্তু বেদের সংহিতা-ভাগের বহু বহু কাল পরে উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। উপনিষৎ বেদান্ত। সেখানে বৈদিক দেবতাগণ ভাবমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন, আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। টীকাকারগণ আরও পরবর্তীকালে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষ্য হইতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার কোন উপায় নাই।

ঋগবেদ বিষ্ণুর সম্বন্ধে বলিতেছেন (১।১৫৪।২) :

যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।

অর্থাৎ, বিষ্ণুর বিস্তীর্ণ তিন পাদক্ষেপে বিশ্বভুবন অবস্থিতি করে। ঋগবেদের প্রথম মণ্ডল অতিশয় প্রাচীন। সেই প্রাচীনকাল হইতেই 'বিষ্ণুর বিস্তীর্ণ তিন পদক্ষেপ' বিখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদের কালেও ঋষিগণ উরুক্রম (বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী) বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া শান্তিপাঠ করিতেন,—'শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)।

পুরাণে বিষ্ণুর 'ত্রিপাদক্ষেপ' অবলম্বনে উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। একদা দৈত্যরাজ বলি মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া এক বিরাট যজ্ঞ করিতেছিল। ভগবান বিষ্ণু বামন-মূর্তি ধারণপূর্বক যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। বলি দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু প্রথম পদে স্বর্গ এবং দ্বিতীয় পদে মর্ত আকীর্ণ করিলেন। বলির প্রার্থনানুসারে ভগবান্ তাঁহার তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিষ্ণুর তৃতীয় পাদসহ দৈত্যরাজ বলি পাতালে নিবদ্ধ হইল।

বেদ ও পুরাণের এই সকল উক্তি ও উপাখ্যান হইতে বিষ্ণুকে চিনিতে পারা যায়। সূর্যের এক নাম বিষ্ণু, ইহা প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। আদিত্য সূর্য, অতএব বিষ্ণুও সূর্য। বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ।" শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুর উপাসনা হয়, ইহা বিষ্ণুর প্রতীক। শালগ্রাম শিলা বর্তুলাকার, সূর্যসদৃশ; বস্তুতঃ ইহা সূর্যেরই প্রতীক। অতি প্রাচীনকালে, বৈদিক

যুগে, সূর্যই বিষ্ণু নামে অভিহিত হইতেন। সূর্য সবিতা, জগৎপ্রসবিতা; বিষ্ণুরূপে তিনিই জগৎপালয়িতা; আর রুদ্ররূপে তিনিই সংহর্তা। একই বস্তু, নামভেদে কর্মভেদ হইয়াছে।

বিষ্ণুকে চিনিলাম, কিন্তু তাঁহার 'পরমপদ' কি? এখানে বলা আবশ্যক, বিষ্ণু সূর্য, কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য নহেন। সূর্যের যে শক্তি ঋতুবিধান দ্বারা বর্ষচক্র নির্মাণ করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। এই হেতু তিনি জগৎপালয়িতা। ঋতুতে ঋতুতে নানাবিধ ফলে-ফুলে, শস্য-সম্ভারে তিনি বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিয়া জীবজগৎকে পালন করিতেছেন। অতএব বলিতে পারা যায়, বিষ্ণু চরিষ্ণু সূর্য। বেদে এবং পুরাণে বিষ্ণুর যে ত্রিবিক্রম বা ত্রিপাদক্ষেপ বিখ্যাত আছে, তাহা বুঝিলে বিষ্ণুর 'পরমপদ' দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এখানে বর্ষচক্র বলিতে রবিপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত বুঝিতেছি। এই বৃত্তের পরিধিতে সমান সমান দূরে চারিটি বিন্দু,—দুইটি অয়ন-বিন্দু এবং দুইটি বিষুব-বিন্দু। এই চারিটি বিন্দুই বিষ্ণুর 'পদ' বা স্থান। সূর্যরূপ বিষ্ণু চলিতে চলিতে একটা বিশেষ বিন্দুতে আসিলে রবির উত্তরায়ণ হয়, পরে পরে মহা-বিষুব, দক্ষিণায়ন ও জল-বিষুব হয়। পঞ্জিকায় চারিটি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি লিখিত আছে। বৈশাখ-সংক্রান্তি, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, কার্তিক-সংক্রান্তি এবং মাঘ-সংক্রান্তি—এই চারিটি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। অর্থাৎ এই চারিটি দিনে সূর্যরূপ বিষ্ণু ক্রান্তিবৃত্তের চারিটি বিশেষ স্থানে থাকেন। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু বৈশাখ-সংক্রান্তিতে মহাবিষুব বিন্দুতে, শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়ন-বিন্দুতে, কার্তিক সংক্রান্তিতে জল-বিষুব বিন্দুতে এবং মাঘ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ-বিন্দুতে থাকিতেন,—পঞ্জিকায় সেই স্মৃতিই রক্ষিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর চারিটি পদ, কিন্তু তিনটি পদক্ষেপ। কোন বিশেষ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তিনবার পদক্ষেপ করিলেই বৃত্তাকার পথের চারিটি স্থানে যাওয়া যায়। সূর্যরূপ বিষ্ণুও একটা বিশেষ বিন্দু হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং তিনবার পদক্ষেপ করিয়া চারিটি স্থান আক্রান্ত করেন (চিত্র পশ্য)।

ঋগবেদে একস্থানে (১.২২.১৭) আছে, "বিষ্ণু ত্রিধা (অর্থাৎ তিন প্রকারে) পদক্ষেপ করেন।" তিনবার পদক্ষেপ বুঝিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু তিন প্রকার পদক্ষেপ কিরূপ? নিশ্চয় বিষ্ণুর এক এক পদক্ষেপের ফলে এক একটা পৃথক্ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ, সূর্যরূপ বিষ্ণু যখন এক পদ হইতে অন্য পদে গমন করেন, তখন ঋতুর পরিবর্তন ঘটে।

মনে করি, বিষ্ণু এখন জলবিষুব পদে আছেন; প্রকৃতিতে শরৎ ঋতু চলিতেছে। ইহার পর প্রথম পদক্ষেপ করিলে তিনি উত্তরায়ণ পদে যাইবেন; তখন শীতঋতু হইবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপে তিনি মহাবিষুব-পদে যাইবেন; তখন
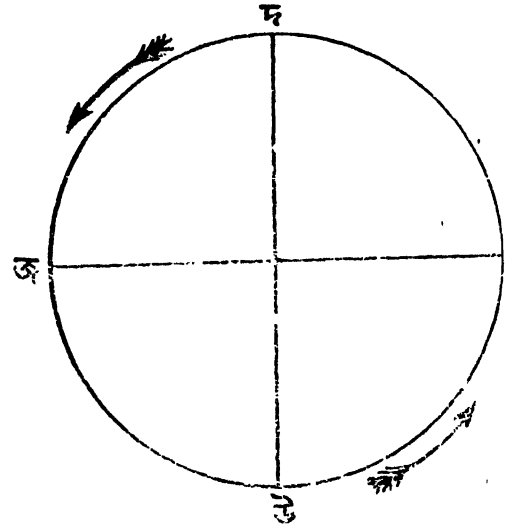
বসন্ত ঋতু হইবে। তৃতীয় পদক্ষেপে তিনি দক্ষিণায়ন পদে যাইবেন, তখন বর্ষাঋতু আরম্ভ হইবে। ঋগবেদের ঋষি এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন, "বিষ্ণু ত্রিধা পদক্ষেপ করেন।"

ঋগবেদের আর একটি সূক্তে (১.১৫৫.৫) আছে,—"মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ কীর্তন করে, তাঁহার তৃতীয় পদ ধারণা করিতে পারে না।" বলা বাহুল্য, এখানে 'মনুষ্যগণ' বলিতে প্রাকৃত মনুষ্যকে বুঝাইতেছে, যাহাদের নিকট প্রকৃতির রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। প্রবন্ধের প্রথমেই যে ঋক্‌মন্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে আছে, সুরিগণ বিষ্ণুর পরমপদ দেখিতে পান। এই সুরিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি; তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য নহেন; বিশ্ব-রহস্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। দুইটি ঋকের অর্থ-সমন্বয়ে বুঝিতেছি, বিষ্ণু তৃতীয় পদক্ষেপে যে-স্থানে গমন করেন তাহাই পরমপদ; এই পদের সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল ঋষিদের ছিল, সাধারণ মানুষের ছিল না।

বিষ্ণুর এই 'পরমপদ' কি? এখানে তাহার সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিতেছি। সূর্য প্রতিদিন আকাশের একই স্থানে উদিত হন না। মনে করিলাম, জলবিষুব-দিনে (বর্তমানে ৭ই আশ্বিন) সূর্য পূর্ব-বিন্দুতে উদিত হইলেন; পরদিন হইতে সূর্য ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিক চাপিয়া উদিত

হইতে থাকিবেন। অবশেষে ৭ই পৌষ তাঁহার দক্ষিণ-গতি শেষ হইবে, পরদিন হইতে তাঁহার উত্তর-গতি বা উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উত্তর দিক চাপিয়া উদিত হইতে হইতে সূর্য পুনরায় ৭ই চৈত্র পূর্ব-বিন্দুতে উদিত হইবেন। পরদিন ৮ই চৈত্র হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর দিক চাপিয়া উদিত হইতে থাকিবেন। এইরূপে তিন মাস শনৈঃ শনৈঃ উত্তর দিক চাপিয়া উদয় হইতে হইতে একদিন (বর্তমানে ৭ই আষাঢ়) উত্তর-গতি শেষ হইবে এবং দক্ষিণ-গতি বা দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে। আকাশে সূর্যোদয়ের এই যে উত্তর সীমা, ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ। উত্তর সীমাই উচ্চতম স্থল কল্পিত হয়, এই হেতু ইহা উত্তম বা 'পরম'। আকাশে সূর্যোদয়ের এই উত্তর-বিন্দু নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না; যে সকল ঋষি সূর্যের গতি লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারাই নির্ণয় করিতে পারিতেন।

কিন্তু বিষ্ণুর পরমপদ বা আকাশে সূর্যোদয়-স্থানের উত্তর-সীমা জানিবার জন্য এত আগ্রহ কেন? ইহা জানিবার একান্তই প্রয়োজন ছিল। যেদিন সূর্য উত্তর-সীমায় উপনীত হন, তাহার পরদিন হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই বর্ষাঋতু আসে; বর্ষা আসিলেই কৃষিকর্ম করিতে পারা যায়। কৃষিকর্ম না হইলে জীবনধারণ করিতে পারা যায় না; সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ জানিবার মূলে ছিল মানুষের প্রাণৈষণা। কবে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা কিছুদিন পূর্ব হইতেই জানার প্রয়োজন হয়, নচেৎ কৃষিকর্মের আয়োজন করিতে পারা যায় না। দক্ষিণায়ন দিন জানিবার জন্য সাধারণ মানুষকে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান্ ঋষির দ্বারস্থ হইতে হইত।

বিষ্ণু পরমপদে উপনীত হইলে ইন্দ্রের অধিকার আরম্ভ হয়; তিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন। ঋগবেদের কালে ঋষিগণ দক্ষিণায়ন দিনে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন; ইন্দ্র অবগ্রহের অসুরগণকে বিনাশ করিয়া যজমানদের জন্য কল্যাণদায়িনী বারিধারা বর্ষণ করিতেন। ঋগবেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বলিতেছেন, "সখে শীঘ্র শীঘ্র পদক্ষেপ কর।" অর্থাৎ ইন্দ্র বিষ্ণুকে দক্ষিণায়ন-স্থানে আসিবার জন্য ত্বরান্বিত হইতে বলিতেছেন। দক্ষিণায়ন-দিন ত্বরান্বিত হউক, অবগ্রহ বিদূরিত হউক, বর্ষা নামিয়া আসুক, ঋষির এই আকাঙ্ক্ষাই রূপকের মধ্যে প্রকাশলাভ করিয়াছে। ঋগবেদের কালে আর্যগণ পঞ্চনদের তীরে (পঞ্জাবে) বসবাস করিতেন। পঞ্জাব অনাবৃষ্টির দেশ। বৃষ্টি-কামনা সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, এখনও আছে। তাই বিষ্ণুর পরমপদ জানিবার জন্য এত আগ্রহ; তাই ঋগবেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া কেবল ইন্দ্রের স্তুতি।

পুরাণে বলি-রাজার যে উপাখ্যান আছে, তাহার মূল অতিশয় প্রাচীন। উপাখ্যানে আছে, বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপিত হইয়া পাতালে নিবদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুর তৃতীয় পদই যে তাঁহার পরমপদ, অর্থাৎ সূর্যের দক্ষিণায়ন-স্থান, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ক্রান্তি-বৃত্তের দক্ষিণাংশের আকাশকে প্রাচীনেরা 'পাতাল' বলিতেন। আকাশের এই অংশ পঞ্জাব হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। বলি দৈত্য। দক্ষিণ আকাশে একটা নক্ষত্রমণ্ডল আছে যাহার তারাগুলি যোগ করিলে একটা দানবের মস্তক পাওয়া যাইতে পারে। এই নক্ষত্রমণ্ডলের আধুনিক নাম মূলা, বৈদিক নাম নির্ঋতি। নির্ঋতি দানবী, তাহার নামানুসারে 'নৈঋত কোণ' হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই নির্ঋতিই কল্পনান্তরে দৈত্য-রাজ বলি। নির্ঋতি বা মূলা নক্ষত্রের অধিপতি 'রাক্ষস' বা দানব। এক্ষণে এই কল্পনার অর্থ বুঝিতে পারা যাই-তেছে। পঞ্জিকায় দীপালীর পরদিন দ্যূতপ্রতিপদে 'বলি দৈত্যরাজ পূজা' বিহিত হইয়াছে। 'দীপালী' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ—১৩৬২) দেখাইয়াছি, খ্রী-পূ ১০০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে কার্তিকী অমাবস্যায় রবির দক্ষিণায়ন হইত; দীপালী-উৎসব তাহারই স্মৃতি। এই সকল যোগাযোগ হইতে বুঝিতেছি, বলি-রাজার উপাখ্যানেও খ্রী-পূ ১০০০ অব্দের পুরাতন স্মৃতি রক্ষিত আছে।

পঞ্জিকায় যে চারি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তির উল্লেখ আছে, তাহাতে কিন্তু এত প্রাচীনকালের স্মৃতি রক্ষিত হয় নাই। যে-কোন একটি বিষ্ণুপদ ধরিয়া ইহার কাল নির্ণয় করা যায়। পঞ্জিকায় শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে একটি বিষ্ণুপদ। পূর্বে বলিয়াছি, নিশ্চয় সেদিন রবির দক্ষিণায়ন হইত; সূর্যরূপ বিষ্ণু সেদিন হিন্দোল-যাত্রা আরম্ভ করিতেন (গত শ্রাবণের প্রবাসীতে 'ঝুলন-যাত্রা' দ্রষ্টব্য)। এখন ৭ই আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন হয়। অতএব অয়ন-দিন সেই প্রাচীনকাল হইতে ১ মাস + ২৩-২৪ দিন = ১¾ মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অয়ন-দিন এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। অতএব ২১৬০ × ১¾ = ৩৭৮০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রী-পূ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পঞ্জিকায় চারি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তির কল্পনা হইয়াছিল। মনে হয়, ঐ সময়েই বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল এবং জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। ইহার কতকাল পূর্বে বেদের সংহিতা-ভাগ রচিত হইয়াছিল এবং তাহারও কতকাল পূর্বে ভারতে আর্য-সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

অজন্তা

পাশেই বুদ্ধের প্রথম ধ্যানমগ্ন হওয়ার দৃশ্য দেখি। বুদ্ধ পিতার সঙ্গে হলে যুদ্ধ ষণ্ডের প্রতিযোগিতা দেখতে পান। দেখেন, শ্রান্তিতে অবসন্ন এই ষণ্ডেরা, নির্গত হয় রক্ত তাদের স্কন্ধ থেকে। ক্লান্ত পরিচালকেরাও প্রখর সূর্য্যের তাপে। আর দেখেন, ভক্ষণ করছে পাখীরা কীট, নির্গত ধরিত্রীর বুক থেকে। এক সীমাহীন দুঃখে ও করুণায় পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। এক জম্বু-বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে তিনি ধ্যানমগ্ন হন, অভিভূত হন এক অলৌকিক ভাবাবেশে। নির্গত হন রাজপুরুষেরা রাজপুত্রের সন্ধানে। দেখেন, বুদ্ধ বসে আছেন এক বৃক্ষের নীচে, বিস্তৃত তার ছায়া তাঁর মস্তকের উপর। সংজ্ঞা নাই বুদ্ধের। অপরূপ এই দৃশ্যটি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার চিত্রশিল্পীর। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

দেখি, তার পাশেই পুত্র হবে সন্ন্যাসী, ভাবতেও এক অপরিসীম ব্যাথায় পরিপূর্ণ হয় নৃপতি শুদ্ধোধনের অন্তঃকরণ। তাই বাস করতে হয় অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, কাটাতে হয় বিলাসে আর ব্যসনে। অবরুদ্ধ তিনি অন্তঃপুরে, অনুমতি নাই প্রাসাদের বাইরে যাওয়ারও। বিদ্রোহী হন পুত্র। অনুরোধ করেন তিনি সারথী চন্দকে তাঁকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, করেন অনুনয়ও। সম্মত হন চন্দ তাঁর প্রস্তাবে, তাঁকে নগর পরিক্রমায় নিয়ে যান। যান বুদ্ধ রথ-আরোহণে। যান চারবার। দেখেন নিদারুণ দুঃখের দৃশ্য, দৃশ্য জরার আর মৃত্যুরও। স্থির করেন, রাজপ্রাসাদের আনন্দের জীবন তার জন্য নয়। পরিত্যাগ করে যেতে হবে এই জীবন, নিযুক্ত হতে হবে সংসারের দুঃখ বিমোচনের কাজে, করতে হবে প্রাণপণ। তবেই তিনি লাভ করবেন নির্ব্বাণ, হবেন তথাগত, পরম জ্ঞানী। মোক্ষলাভ করবে জীবও।

তার পাশেই সংসার পরিত্যাগ করে চলেছেন সিদ্ধার্থ। উপনীত হয়েছেন মগধের রাজধানী রাজগৃহের বিপণিতে। সংবাদ পেয়ে উপনীত হন সেখানে নৃপতি বিম্বিসারও। প্রথমে স্তুতি করেন, তার পর বলেন রাজা, দেবেন তিনি সন্ন্যাসীকে অর্দ্ধেক রাজত্ব, পরিত্যাগ করেন যদি তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম, পরিণত হন গৃহস্থে। কিন্তু অচল বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা, মোহ নাই তাঁর ঐশ্বর্য্যে, লোভ নাই রাজত্বে। প্রত্যাখ্যান করেন তিনি মহারাজার প্রস্তাব, পরিত্যাগ করে যান রাজগৃহ। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, বুদ্ধ হওয়ার পর, প্রথমেই তিনি রাজগৃহে পদার্পণ করবেন। পবিত্র হবে রাজগৃহ তথাগতের চরণস্পর্শে, ধন্য হবেন মহারাজা বিম্বিসারও তাঁর দর্শন লাভ করে।

তার পাশেই দেখি, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে বুদ্ধ নিযুক্ত কঠোর তপস্যায়, কাটান উপবাসে আর অনিদ্রায়। কিন্তু লাভ করেন না জ্ঞানের আলোক। মনস্থ করেন তখন, খাদ্য গ্রহণ করে দেহ ধারণ করবার। এক পল্লী ভূস্বামীর গৃহে সুজাতা জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে উপনীতা হয়ে, তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন, বুদ্ধ তাঁর কাছে খাদ্য প্রার্থনা করছেন। খাদ্য নিয়ে বুদ্ধের সন্ধানে যান সুজাতা। দেখেন, এক বট-বৃক্ষের নীচে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তিনি সেই সন্ন্যাসীকে খাদ্য নিবেদন করেন। গ্রহণ করেন সন্ন্যাসীও সেই আহার্য্য। ধন্যা হন সুজাতা। ভাবেন সন্ন্যাসীও, এই তবে ভগবানের নির্দ্দেশ। পরমুহূর্ত্তেই নিমগ্ন হন ধ্যানে।

তার পাশেই চিত্র আর এক কাহিনীর। সাত দিন বুদ্ধ মহাভাবে নিমগ্ন। হন তিনি ক্ষুধার্ত্ত। উড়িষ্যাবাসী বণিক ভ্রাতৃদ্বয়, ট্রাপুসা আর বল্লিকা, বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে অতিক্রম করেন সেই পথ। গমন করেন তাঁরা এক আম্রকুঞ্জের নিকট দিয়ে। সেই কুঞ্জের অভ্যন্তরেই উপবিষ্ট বুদ্ধ। বলেন তাঁদের কুঞ্জের প্রতিহারী, এই কুঞ্জের ভিতরই বসে আছেন উপবাসী বুদ্ধ। তাঁরা নিবেদন করেন তাঁকে মধু আর ছাতু। পরম পরিতৃপ্ত হন বুদ্ধ সেই ছাতু আর মধু আহার করে। ধন্য হন বণিক ভ্রাতৃদ্বয়ও, সার্থক হয় তাঁদের জীবন।

অপরূপ এই দৃশ্যগুলি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধ-চিত্রশিল্পীর, রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী।

উপনীত হই সপ্তদশ গুহামন্দিরে। সমসাময়িক এই গুহা-মন্দিরটি, ষোড়শ গুহামন্দিরের পড়ে সমপর্য্যায়েও, অঙ্গে নিয়ে আছে মহাযান বৌদ্ধস্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধভাস্করেরও সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। সাজান অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, এই দুইটি গুহামন্দিরকেই, শ্রেষ্ঠ ভূষণে, অনবদ্য অলঙ্করণে। উজাড় করে দেন জীবনের সমস্ত সাধনা, হৃদয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্য্য, মনের অপরিসীম মাধুরী। পরিণত হয় তারা অমরাবতীতে, এক স্বপ্নলোকে, অলোক সুন্দর রহস্যলোকে। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ভাস্কর্য্যের আর চিত্র-শিল্পের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ।

অনবদ্য সুন্দরতম এই মন্দিরের স্তম্ভগুলিও, অনুরূপ ষোড়শ

গুহামন্দিরের স্তম্ভের, গঠন সৌষ্ঠবে আর অঙ্গের ও শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভারে আর মূর্তিসম্ভারে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্দিরের স্থপতির আর ভাস্করের অনবদ্য সুন্দরতম সৃষ্টি দেখে, আমরা তার প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার দেখতে সুরু করি। বাম দিক থেকে অগ্রসর হই।

সংসারচক্র ও গন্ধর্ব্বদের দেখে আমরা দুইটি জাতকের কাহিনী চিত্রিত দেখি। বোধিসত্ব এক হস্তীরাজের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে তাঁর আট হাজার হস্তী। বাস করেন তাঁরা হিমালয় পর্ব্বতে, সদ্দান্ত সরোবরের তীরে, এক স্বর্ণ-বর্ণ গুহায়। চতুর্দ্দিকে তার শ্বেত, নীল আর লাল বর্ণের প্রস্ফুটিত পদ্ম বেষ্টিত হয়ে থাকে দিগন্ত-প্রসারিত স্বর্ণশীর্ষ ধানের ক্ষেতে, আর ঘন বনবীথি আর অটবীতে। বিভিন্ন তাদের রঙও। সুবিশাল সেই হস্তীর আকৃতি। তার মুখের দুই পাশ থেকে নির্গত হয় দীর্ঘ রজ্জুর আকার শুভ্র দন্ত।

তাঁর দুই রাণী ক্ষুব্ধ হন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ব্যবহারে, হন ক্রুদ্ধাও। প্রার্থনা করেন, জন্মান যেন তিনি পরজন্মে এক পরমা-রূপবতী তরুণী হয়ে। হন বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী। মুগ্ধ হন নৃপতি তাঁর রূপে, হন তাঁর আজ্ঞাবহ। প্রেরণ করেন তিনি বারাণসী থেকে রাজশিকারী, সঙ্গে নিয়ে বিষাক্ত তীর। সেই তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন হস্তীরাজ। তাঁর দন্ত উৎপাটন করে নিয়ে যায় শিকারী। হন তিনি সেই দন্তের অধিকারী, নির্গত হয় সেই গজদন্ত থেকে ছয় প্রকারের রশ্মি। তার পর, অনাহারে মৃত্যু হয় রাণীর।

সফল হয় তাঁর প্রার্থনা। তিনি পরজন্মে বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেরিত হন রাজ শিকারীও। লাগে তাঁর দীর্ঘ সাত বৎসর হিমালয়ে উপনীত হতে। বিদ্ধ হন হস্তীরাজ বিষাক্ত তীরে, কিন্তু সক্ষম হন না শিকারী তাঁর দন্ত উৎপাটন করতে। তখন তিনি নিজের হস্তে আপন দন্ত উৎপাটন করেন, উপহার দেন সেই দন্ত শিকারীকে। ফিরে গিয়ে শিকারী সেই দন্ত রাণীকে দেন। বসে আছেন তখন রাণী বাতায়নে, হস্তে নিয়ে একটি বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত ব্যজনী। স্থাপন করেন রাণী সেই গজদন্ত নিজের অঙ্কে। হস্তীরাজের কথা মনে পড়ে। ভেসে ওঠে মনের মণিকোঠায় একে একে কত প্রেমের সম্ভাষণ, কত অতুলনীয় ভালবাসার কাহিনীও। এক সীমাহীন বিয়োগ-ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। অসহনীয় সেই ব্যথা। মৃত্যুবরণ করেন রাণী সেই দিনই। পরিসমাপ্তি হয় তাঁর জীবনের।

তার পাশেই মহাকপি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ব বানররাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে তাঁর আশি হাজার বানর। একদিন এক মৎস্যজীবী বারাণসীর রাজাকে একটি আম্রফল উপহার দেন। দুর্লভ নয় অমন সুগন্ধযুক্ত আম। লুব্ধ হন নৃপতি। জিজ্ঞাসা করেন তার প্রাপ্তিস্থান। তার সঙ্গে একটি বনে উপনীত হন। দেখেন, বানরেরা বৃক্ষে আরোহণ করে আম খাচ্ছে। অনুচরদের আদেশ করেন রাজা, বেষ্টন করতে সেই অরণ্য, হত্যা করতে সমস্ত বানরকে।

এই বনের পিছনে, প্রবাহিতা একটি কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, তার অপর পারে আরও একটি গভীর অরণ্য। সেখানেও বৃক্ষারূঢ় অনেকগুলি বানর, নিযুক্ত আম্রভক্ষণে। বানররাজ বোধিসত্ব প্রজাদের প্রাণরক্ষার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। বানর দিয়েই সেই স্রোতস্বিনীর বুকে একটি সেতু নির্মিত হয়। সেই সেতু দিয়ে একে একে সমস্ত বানর অতিক্রম করে নদী, উপনীত হয় অপর পারে। কিন্তু আহত হন বানররাজ, সক্ষম হন না অপর পারে যেতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে নৃপতি এই দৃশ্য দেখেন। ভাবেন, নিশ্চয়ই হবেন ইনি কোন বানররূপী দেবতা। দ্রুতগতিতে বানররাজের নিকট উপনীত হয়ে নিযুক্ত হন তাঁর শুশ্রূষায়। শোনেন অনেক তত্ত্বকথাও, জীবিত থাকেন যতক্ষণ বানররাজ। দেহান্তে, করেন তাঁর ঊর্দ্ধদৈহিক কাজ।

অগ্রসর হয়ে বিশ্বান্তর জাতকের কাহিনী দেখি। মহারাজ শিবির পুত্র, সঞ্জয়ের রাণী ফুস্তির গর্ভে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাবার আগেই রাজার করকোষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষী বলেন, হবেন এই পুত্র একজন অসামান্য দাতা, সীমাহীন সেই দান। তার পরিচয় পাওয়া যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই। মাতৃগর্ভ থেকে সম্পূর্ণ নির্গত হওয়ার পূর্ব্বেই উচ্চারিত হয় শিশুর কণ্ঠ থেকে, মাগো, আছে কি কিছু দেওয়ার মত। বিস্মিত হয়ে মাতা শিশুর হস্তে একটি টাকার থলি অর্পণ করেন। বিতরণ করে সেই অর্থ শিশু। আট বছর বয়সে, বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণে, দান করবেন তিনি এমন সম্পদ, যা তাঁর নিজস্ব, বিতরণ করবেন নিজের কর্ণ অথবা চক্ষু অথবা হৃদয়। বর্দ্ধিত হয় বয়স, বাড়ে তাঁর দানের স্পৃহাও। অনাবৃষ্টি হয় কলিঙ্গদেশে, জ্বলে যায় ক্ষেতের সমস্ত ফসল, দুর্ভিক্ষে আর মহামারিতে ছেয়ে ফেলে সমস্ত কলিঙ্গদেশ, দান করেন বোধিসত্ব কলিঙ্গরাজকে তাঁর ঐন্দ্রজালিক হস্তীটি। সেই সঙ্গে তার বহুমূল্য সাজ-সরঞ্জাম আর মণিমুক্তা-খচিত অঙ্গের আবরণ। মহাক্রুদ্ধ হয় প্রজারা, তাঁর জীবন হয় বিপন্ন। শেষে হন তিনি নির্ব্বাসিত। সঙ্গী হন তাঁর পত্নী মাদ্রি দেবী আর পুত্র ও কন্যা। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি দান করে দিয়ে যান তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব, থাকে না কিছু অবশিষ্ট। কিন্তু অবশিষ্ট থাকেন চার ব্রাহ্মণ। তাঁদের তিনি দান করেন তাঁর রথের অশ্বদ্বয়, সেই রথে চড়েই, তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে নির্ব্বাসনে যাত্রার উপক্রম করেছিলেন। তাই পদব্রজেই সুরু হয় তাঁদের যাত্রা।

তখন দেবতারা এগিয়ে আসেন তাঁকে পরীক্ষা করতে। তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে গিয়ে, জুজাকা নামে এক নির্দ্দয় ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করেন। নিষ্ঠুর সেই ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত হয় তাঁর পুত্র ও কন্যা হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায়। রাত্রি সমাগমে তাদের পথের উপর শুইয়ে রেখে, ব্রাহ্মণ বৃক্ষে আরোহণ করে, রাত্রি যাপন করে

থাকে না তার বন্যজন্তুর আক্রমণের ভীতি। তখন তাঁদের পিতা-মাতার ছদ্মবেশে, দেবতারা সেখানে উপনীত হন। মুক্ত করেন তাদের হস্তপদের বন্ধন, অঙ্কে তুলে নিয়ে করেন কত যত্ন, কত আদর, অদৃশ্য হয়ে যান রাত্রির অবসান হওয়ার পূর্ব্বেই। প্রভাত হলে ব্রাহ্মণও বৃক্ষ থেকে অবতরণ করেন। আবার সুরু হয় তাদের উপর অত্যাচার। অবশেষে তারা তাদের পিতামহের আলয়ে উপনীত হয়, লাভ করে নিরাপদ আশ্রয়, পরিসমাপ্তি হয় তাদের অশেষ দুঃখের আর অপরিসীম কষ্টের।

শঙ্কা জাগে দেবতা শক্রের মনে, সময় হয়েছে এখন বোধিসত্ত্বের নিজের পত্নীকেও বিতরণ করবার। তাই তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে নিজেই মাদ্রিকে প্রার্থনা করেন, নইলে দান করবেন তাঁকে অন্য কোন প্রার্থীকে। একে একে প্রিয় পুত্র, কন্যা ও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দান করেন বোধিসত্ত্ব, লাভ করেন শ্রেষ্ঠ দাতার আসন জগতে।

কিছুদিন পরে, মাদ্রিকে ফিরে পেয়ে, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে সস্ত্রীক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। অবশেষে সঞ্জয় আর ফুস্সতি তাঁদের আশ্রম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। মিলন হয় তাঁদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে। লাভ করেন রাজ-সম্মান ও বোধিসত্ত্ব।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি চিত্রশিল্পীর এক অনবদ্য মহান সুন্দরতম সৃষ্টি। দেখি এক বহু-বিস্তৃত ঘটনার নিখুঁত সমাবেশ প্রাচীরের গাত্রে। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি শিল্পীকে। সুতসোমা জাতকের কাহিনী দেখে, উপস্থিত হই সারিপুত্রের প্রশ্নের দৃশ্যের সামনে।

দেখি, বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন সোপানশ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন ধাপে। ঐ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করেই তিনি স্বর্গধামে উপনীত হয়ে দেবতাদের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেন। বাণী প্রচারিত হলে বুদ্ধ ধরিত্রীতে ফিরে আসেন, প্রাচীনতম সারিপুত্র বয়সে, তাই তিনিই প্রথমে বুদ্ধকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তার পরে অন্য সকলে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোগ্গলানা ইতিপূর্ব্বেই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। পরিচয় দিয়েছেন উপালিও তাঁর অপরিসীম ধর্ম্মজ্ঞানের। কেন নাই শুধু সারিপুত্র। মনীষী তিনি, অধিকারী বহুমুখী প্রতিভার, অভিজ্ঞ সমস্ত জ্ঞানেও। জ্ঞানের পরিমাপে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান। প্রশ্ন করেন তাঁকে বুদ্ধ একের পর এক। উত্তর দেন সারিপুত্র। নির্ভুল সেই উত্তর। বিস্মিত হন উপস্থিত সকলে, নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি।

উপনীত হই একেবারে শেষ প্রান্তে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই সম্মুখের চিত্রটি দেখে। দাঁড়িয়ে আছেন এক অনিন্দ্যসুন্দর মহামহিমময় বুদ্ধ। অনবদ্য সুন্দরতম তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, দাঁড়িয়ে আছেন এক অপরূপ ভঙ্গিতে। প্রদীপ্ত তাঁর আনন আলোকসুন্দর দ্যুতিতে, নয়নে অপরিসীম করুণার আভাস। দাঁড়িয়ে আছেন দেবতা বুদ্ধ প্রাণবন্ত। বিপরীত দিকে সোপানের উপর উপবিষ্টা পত্নী যশোধরা, অঙ্কে নিয়ে শিশুপুত্র রাহুলকে। গোপার শিরে শোভা পায় মুক্তার সিঁথি, কবরিতে মুক্তার হার, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে বহুমূল্য বাজু, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ। অনুরূপ ভূষণে ভূষিত শিশুটিও। ঈষৎ প্রসারিত তাঁদের মস্তক, নিবদ্ধ তাঁদের দৃষ্টি বুদ্ধের প্রতি। উদ্ভাসিত তাঁদের আনন ঐশ্বরীক দীপ্তিতে, বিকশিত তাঁদের নয়ন অন্তরের ভাষায়। যেন বসে আছেন এক পূজারিণী মাতা, অঙ্কে নিয়ে শিশুসন্তান, পূজা করেন বুদ্ধকে। পূজা করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিঃশেষ করে দিয়ে, করেন ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তকে। অপরূপ এই দৃশ্যটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার, বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বেরও, নিদর্শন এক অমর-কীর্ত্তির। রচনা করেন শিল্পী হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে, তাই হয় বিশ্বজিৎ। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই দৃশ্যটি, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। মনে মনে ভাবি, কি আছে আমার কি দিয়ে এই মহামহিমময় পরম-সুন্দরকে বরণ করি। কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দুইটি ছত্র :

ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।

প্রদর্শকের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। ফিরবার পথে প্রথমেই সর্ব্বজাতকের কাহিনী দেখি। একদা বারাণসীর রাজা মৃগয়া করতে যান, সঙ্গে যান তাঁর সৈন্যসামন্ত আর পরিষদবর্গ। আদেশ করেন তিনি তাঁদের, সম্পূর্ণ বেষ্টন করে অরণ্য, থাকে যেন না কোন ছেদ, সক্ষম হয় না যেন কোন মৃগ পলায়ন করতে। বেষ্টিত হয় অরণ্য রাজার আদেশে। বোধিসত্ত্ব তখন এক হরিণশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। পুরোধা তিনি দেখেন রুদ্ধ পলায়ন পথ। তিনি ধাবিত হন রাজার দিকে, অতি দ্রুত তাঁর গতি। রাজা নিক্ষেপ করেন তীর, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সেই শর, কিন্তু ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন বোধিসত্ত্ব। নৃপতি ভাবেন নিশ্চয়ই বিদ্ধ হয়েছে তীর হরিণ শিশুটির অঙ্গে। পরিষদবর্গও তাঁকে ধরবার জন্য ছুটে আসেন। মুক্ত হয় পিছনের পথ। সেই পথ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে নির্গত হয় হরিণশিশু, পলায়ন করে অরণ্যের অভ্যন্তরে। স্তব্ধ বিস্ময়ে রাজা তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তার পর, দ্রুতগতিতে অনুসরণ করেন পলায়মান হরিণশিশুটিকে, পথের মাঝখানে একটি গভীর গহ্বর, আবৃত লতা-পল্লবে, অদৃশ্য হয় তাদের অন্তরালে। অতি সন্তর্পণে হরিণশিশুটি অতিক্রম করে সেই গহ্বর। কিন্তু অবগত নন রাজা তার অস্তিত্ব, নিমজ্জিত হন তিনি তার অতল গহ্বরে। ফিরে আসে হরিণশিশুটি, দেখে আবদ্ধ নৃপতি গহ্বরে, সক্ষম নন বহির্গমনে। অতি কষ্টে রাজাকে উদ্ধার করে সে তাঁকে বনের বাইরে পরিষদদের কাছে পৌঁছে দেয়। তিরস্কৃত হন রাজা তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য, শোনেন ধর্ম্মকথাও।

তার পাশেই মাতৃপোষক জাতকের কাহিনী দেখি। রাজত্ব করেন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নৃপতি। বোধিসত্ব তখন শ্বেতহস্তী হয়ে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিশাল তাঁর দেহ। মাতা তার অন্ধ। প্রতিদিন তিনি মাতার জন্য বিভিন্ন সুখাদ্য পাঠান। খেয়ে ফেলে সেই খাদ্য অন্য হস্তীরা। বঞ্চিতা হন মাতা। তাই তিনি মাকে নিয়ে চন্দ্রোনা পাহাড়ে গিয়ে বাস করেন। সুখের ও শান্তির হয় তাঁদের জীবন। পথ হারিয়ে বন বিভাগের এক কর্ম্মচারী মহারণ্যে ঘুরে বেড়ান সাত দিন, সাত রাত্রি। কিন্তু মেলে না পথের সন্ধান। দেখতে পেয়ে বোধিসত্ব তাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলে নিয়ে বনের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। যাওয়ার সময় সে চিহ্নিত করে যায় প্রতিটি বৃক্ষ, উপনীত হয় বারাণসীতে।

মৃত্যু হয় রাজহস্তীর। প্রেরিত হয় লোক দিকে দিকে, উপকারী হস্তীর অনুসন্ধানে বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারী, রাজশিকারীকে সঙ্গে নিয়ে উপকারী হস্তীটিকে ধরিয়ে দেবার জন্য উপনীত হয় সেই পর্ব্বতে। মহাশক্তিশালী শ্বেতহস্তী, সক্ষম তিনি বিনা আয়াসে ধ্বংস করতে রাজশিকারীকে আর তার সঙ্গীকে। কিন্তু ধর্ম্মের পূজারী বোধিসত্ব, অনিচ্ছুক জীবহত্যায়, তিনি আশ্রয় নেন একটি পদ্মের সরোবরে। ধৃত হন সেখানে। নিয়ে যায় তাঁকে বারাণসীতে রাজ হস্তীশালায়। সজ্জিত হন তিনি বহুমূল্য ভূষণে। পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সুখাদ্যও। কিন্তু অভুক্তা তাঁর মাতা, তাই স্পর্শ করেন না জলবিন্দুও বোধিসত্ব। বিস্মিত হন নৃপতি। তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর নিজ আবাসে প্রেরণ করেন।

মাতৃসকাশে ফিরে এসে নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণী থেকে শুঁড় দিয়ে জল তুলে মাতৃ অঙ্গে সিঞ্চন করেন। জ্ঞান লাভ করে মাতা সন্তানকে চিনতে পারেন। শতমুখে রাজার সুখ্যাতি করেন, তাঁর সততার জন্য।

ক্রমে আবদ্ধ হন রাজা ও বোধিসত্ব এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নৃপতি, যতদিন বোধিসত্ব জীবিত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্থাপন করেন সেখানে একটি প্রস্তরে তৈরি হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি। প্রতি বৎসরে সমাগত হয় সেখানে যাত্রীরা, নিবেদন করে হস্তীর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি। ক্রমে মহাপ্রসিদ্ধ হয় এই উৎসবটি, খ্যাতিলাভ করে হস্তী-উৎসব নামে।

তার পরেই, মৎস্য জাতকের কাহিনী দেখি।

বোধিসত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন কোশল রাজ্যে, শ্রাবস্তী নগরের একটি পুষ্করিণীতে। অনাবৃষ্টি হয় দেশে। জ্বলে যায় ক্ষেত্রের বুক, শস্যহীন হয় ক্ষেত। শুষ্ক হয় নদী, হয় স্রোতস্বিনী, তার পুষ্করিণীও জলহীন হয়। মৎস্যেরা কর্দ্দমের অন্তরালে আশ্রয় নেয়। উপনীত হয় চিল, বায়সও আসে, ভিন্ন হয় কর্দ্দম তাদের চঞ্চুর আঘাতে। নির্গত হয় মৎস্যকুল কর্দ্দমের অন্তরাল থেকে, ভক্ষিত হয় সকলে। করুণায় আর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয় বোধিসত্বের অন্তঃকরণ। মনস্থ করেন তিনি তাদের প্রাণ রক্ষা করবার। কর্দ্দমের অন্তরাল থেকে নির্গত হয়ে নিযুক্ত হন তিনি কঠোর তপস্যায়। সন্তুষ্ট হন তাঁর তপস্যায় দেবরাজ। বৃষ্টি নামে ধরায়, প্লাবিত হয় নদ, নদী, স্রোতস্বিনী, পুষ্করিণী সেই বৃষ্টির জলে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় সহধর্ম্মীরাও। মৃত্যুর পর, বোধিসত্ব নিজের নির্ব্বাচিত ধামে গমন করেন।

তার পাশেই শ্যামা জাতকের কাহিনী। এক শিকারীর সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন বোধিসত্ব। তাঁর নাম রাখা হয় সুবর্ণ শ্যামা। আশ্রমবাসী তাঁর পিতামাতা, অন্ধও, প্রতিফল পূর্ব্বজন্মের এক মহা-দুষ্কৃতির। তাই তাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় শ্যামার উপর, দূর হয় তাঁদের অক্ষমতার ব্যথাও শ্যামার যত্নে।

একদিন নদীর গর্ভ থেকে জল নিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হয় তাঁর দেহ। তাঁকে হরিণ মনে করে নিক্ষেপ করেন সেই তীর বারাণসীর নৃপতি। মৃত্যুবরণ করেন শ্যামা, তাঁর অন্ধ, অসহায় পিতামাতার জন্য বিলাপ করতে করতে। বিগলিত হয় রাজ-অন্তঃকরণ, প্রতিজ্ঞা করেন পুত্রাধিক যত্নে তিনি সেবা করবেন বোধিসত্বের পিতা-মাতাকে। এমন সময় এক দেবী সেখানে উপনীত হন। তাঁর করস্পর্শে পুনঃজীবিত হয় শ্যাম, দূর হয় তাঁর পিতামাতার অন্ধত্বও।

তার পাশেই মহিষ জাতকের কাহিনী। বোধিসত্ব মহিষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাশক্তিশালী তিনি, লঙ্ঘন করেন পাহাড়, পর্ব্বত, শৈলমালাও। একদিন আহার সমাপনে, তিনি একটি বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ান। এক বানর সেই বৃক্ষের শাখা থেকে নেমে এসে তাঁর পিঠের উপর বসে, লেজ দিয়ে তাঁর শিং জড়িয়ে ধরে। তার পর মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। পড়ে বারংবার। ধৈর্য্য আর দয়ার অবতার বোধিসত্ব, নিষেধ করেন না বানরকে, বলেন না নিবৃত্ত হতে। দাঁড়িয়ে থাকেন অচল, অটল, ভ্রুক্ষেপ নাই তাঁর বানরের উৎপাতে।

আর এক দিন উপনীত হয় সেখানে অপর একটি মহিষ। বন্য তার প্রকৃতি, নয় সে বোধিসত্ব। বানর ভাবে এসেছে বুঝি তার খেলার সঙ্গী, যার সঙ্গে সে খেলা করেছে দিনের পর দিন। উপবেশন করে তার পৃষ্ঠের উপর, সুরু করে খেলাও। কিন্তু সহ্য করে না দ্বিতীয় মহিষটি বানরের অত্যাচার! তাকে সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করে শিং দিয়ে বিদ্ধ করে তার উদর। পদদলিত করে তার দেহও। বিচূর্ণ হয় তার সর্ব্বাঙ্গ। মৃত্যুবরণ করে বানর, লাভ করে আপন দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিদান।

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে সিংহল অবদানের কাহিনী অঙ্কিত দেখি। দেখি নিমজ্জিত হয় সাগরের অতল জলে একটি অর্ণবপোত। দেখি, যাপন করেন জীবন নৃপতি বিজয় সিংহ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, কাটে বিলাসে আর ব্যসনে, আনন্দে আর উৎসবে নিমগ্ন হয়ে, সঙ্গে নিয়ে রক্ষকুলরাণী।

মুক্তির চিত্রও দেখি। মুক্তি সেই অতুল ঐশ্বর্য্যময় জীবন থেকে। এক শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শূন্য দিয়ে পলায়ন

করেন নৃপতি বিজয়। তাঁকে বিলাসের জীবনে ফিরিয়ে নেবার জন্ত তাঁর অনুসরণ করেন রক্ষকুলরাণী, প্রবেশ করেন তিনি সিংহ-কল্পের অন্তঃপুরে। তার পরেই দেখি, মৃত্যু হয় রাণীর। মৃত্যুবরণ করে একে একে সমস্ত সভাসদবৃন্দ আর পরিষদবর্গ। শুধু রক্ষা পান নৃপতি, অমিত তাঁর সাহস, অপরিসীম শৌর্য, তুলনাহীন প্রত্যুৎপন্নমতি। তিনি জয় করেন সিংহাসন। সবশেষে দেখি, তাঁর বিজয়ের অভিযান। যুদ্ধ করেন নৃপতি দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে। এই দ্বীপেই তাঁর অর্ণবপোত নিমজ্জিত হয়। পরাজিত হয়ে অধিবাসীরা বশুতা স্বীকার করে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই মহিমময় পরিকল্পনা—আর তার অনবদ্য রূপদান। রং আর তুলির সাহায্যে রচনা করেন অজন্তার চিত্রশিল্পী প্রাচীরের অঙ্গে এক পুরাকাহিনী, করেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুর্য্য। অনবদ্য তার প্রতিটি দৃশ্য, জীবন্ত প্রতিটি অংশ। প্রাণবন্ত কেন্দ্রস্থলের হস্তীযূথ, তুলনাহীন গঠনসৌষ্ঠবে। জীবন্ত রাজা রাণী, পরিষদবর্গরাও। তাই অপরূপ লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে। সম্ভব হয়েছিল নাকি এমন চিত্র অঙ্কন, শুধু রেনেসাঁসের যুগে, ইউরোপে, সম্ভব করেছিলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীরা। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি শিল্পীকে।

তার পাশেই শিবি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ত্ব অরিষ্টপুরের রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় শিবি। রাজার নন্দন শিবি, দয়ার অবতার, দান করেন তিনি বহু অর্থ প্রার্থীকে। একদিন বাসনা জাগে তাঁর মনে, দান করবেন এমন বস্তু, যা একেবারে তার নিজস্ব, নিজের দেহের অংশ, হৃদয় অথবা নয়ন। ভিখারীর ছদ্মবেশে, দেবতা শক্র তাঁকে পরীক্ষা করতে সেখানে উপনীত হন। প্রার্থনা করেন প্রথমে একটি নয়ন, শেষে দ্বিতীয়টিও। নিজের হস্তে উৎপাটন করেন শিবি নিজের নেত্র, দান করেন ভিক্ষুককে। অসহনীয় এই দৃশ্য, সহ্য করতে পারেন না উপস্থিত সভাসদবর্গ আর মন্ত্রিগণ, পারেন না মহিলারাও। অশ্রুসিক্ত হয় তাঁদের নয়ন। কিন্তু মমতাহীন দেবতা, তিনি চক্ষু নিয়ে দেবলোকে প্রয়াণ করেন। কিছুদিন পরে, ফিরে এসে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। ফিরে পান নয়ন বোধিসত্ত্ব, জয়ী হন এক অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষায়।

তার পাশেই, চিত্র দেখি আরও একটি মহাকপি জাতকের কাহিনীর। বাস করে কাশীতে এক ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী। একদিন সমাপ্ত হয় হল-কর্ষণ, নিযুক্ত হয় ব্রাহ্মণ অন্ত কাজে, মুক্ত করে দিয়ে জোয়াল বলদের স্কন্ধ থেকে।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ষণ্ড, তাঁর অজ্ঞাতসারে, শেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের বলদের কথা মনে পড়ে, অনুসন্ধান করে চতুর্দ্দিক। কিন্তু মেলেনা বলদ। পরিশেষে প্রবেশ করে অরণ্যে, তার অন্বেষণে। পথ হারিয়ে কাটায় অনাহারে সাত দিন, সাত রাত্রি। অবশেষে, সামনে একটি ফলে ভরতি বৃক্ষ দেখে, সেই বৃক্ষে আরোহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু দুর্ব্বল দেহ, সাতদিনের অনশনে আর ক্লান্তিতে, স্খলিত হয় তাঁর পদ। পতিত হন তিনি সে বৃক্ষ থেকে, নিমজ্জিত হন ভূতলে, হন সংজ্ঞাহীনও। কাটে আরও কয়েকদিন উপবাসে আর অনাহারে।

বোধিসত্ত্ব তখন কপি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। উদ্ধার করেন তিনি ঐ ভাগ্যহীনকে। নিদ্রায় অভিভূত হয় বোধিসত্ত্ব, তাঁর মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে একটি প্রস্তরখণ্ড সেই ব্রাহ্মণ। জাগরিত হয়ে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষে আরোহণ করেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মণকে অরণ্যের বহির্গমনের পথ নির্দ্দেশ করেন। তার পর অদৃশ্য হয়ে যান গভীর অরণ্যের অন্তরালে। কুষ্ঠ হয় ব্রাহ্মণের, লাভ করে তার মহাপাপের উপযুক্ত প্রতিফল।

মুগ্ধ হই দেখে এই সব জাতকের কাহিনী, শিল্পের অনুপম গৌরবময় সৃষ্টি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত অনবদ্য দৃশ্য, মহিমে জ্জ্বল, প্রদীপ্ত নিয়ে যায় কোন এক সুদূর অতীতের কোলে। ভুলে যাই বর্ত্তমান, বিস্মৃত হই ভবিষ্যৎ, লুপ্ত হয় পারিপার্শ্বিকতাও। সম্বিৎ ফিরে আসে গাইডের কথায়, বলে, পাশেই দেখুন বুদ্ধের এক অতিকায় হস্তী দমনের দৃশ্য।

বুদ্ধের পিতৃব্য পুত্র দেবদত্ত। সহ্য করতে পারেন না তিনি বুদ্ধের অসামান্য সফলতা, বিষবৎ তাঁর কর্ণে বুদ্ধের যশোগান, এক সীমাহীন ঈর্ষায় জর্জ্জরিত তাঁর অন্তঃকরণ। বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্ত তিনি প্রেরণ করেন এক রোষদীপ্ত অতিকায় হস্তী। কিন্তু সক্ষম হয় না হস্তী স্পর্শ করতে বুদ্ধের অঙ্গ, থাকেন তিনি অক্ষত অবস্থায়। বিফল হয় দেবদত্তের প্রচেষ্টা। এর আগেও তিনি তিন বার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হয় নাই তাঁর উদ্যম। হয় নাই কোন ক্ষতি বুদ্ধের।

দেখি, রাজকুমারীর প্রসাধনের দৃশ্য। স্বর্ণ-মুকুর হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকন্যা এক অপরূপ ভঙ্গিতে, দর্শন করেন মুখ দর্পণে। নাই কোন বসন তাঁর উর্দ্ধাঙ্গে। শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, কর্ণে হিরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মণিমুক্তাখচিত হার আর মুক্তার মালা, বিলুণ্ঠিত সেই হার তাঁর অনাবৃত যৌবনপুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষ পর্য্যন্ত। তাঁর মণিবন্ধে শোভা পায় চুড় আর মাণিক্যখচিত কঙ্কণ। আবৃত তাঁর কোটিদেশ আঁট সূক্ষ্ম পায়জামায়, আবদ্ধ কোমরবন্ধ দিয়ে বিস্তৃত জানু পর্য্যন্ত। পরিদৃশ্যমান তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব তার অন্তরাল থেকে। তার উপর শোভাপায় মূল্যবান চন্দ্রহার। মল দিয়ে ভূষিত তাঁর পদযুগল। দাঁড়িয়ে আছেন এক যৌবনমদমত্তা মদিরাক্ষী, রহস্যময়ী, বিকশিত তাঁর অন্তরের রহস্য তাঁর আননে আর নয়নে, হিল্লোলিত তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। নিযুক্তা তিনি প্রসাধনে। তাঁর দুই পাশে দুই কিঙ্করী দাঁড়িয়ে, দক্ষিণে চামর হস্তে, বামে হস্তে নিয়ে প্রসাধনের পাত্র। সজ্জিতা তাঁরাও বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। অন্ততম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অজন্তার সমপর্য্যায়ে পড়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি একে একে রাজসভার দৃশ্য, দৃশ্য পার্শিয়ার রাজাদের আর বুদ্ধের পূজার।

সুন্দর রাজসভার দৃশ্যটি। সিংহাসনে বসে আছেন রাজা ও রাণী তাঁদের সামনে ছত্র হস্তে কিঙ্কর আর কিঙ্করীর দল।

সুন্দরতম পার্শিয়ার নৃপতিদের দৃশ্য। একটি সীমাবদ্ধ পরিবেশে অন্ধকার পটভূমিকায়, মহাপরাক্রমশালী অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন নৃপতিবৃন্দ, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন এক মহৎ জনতায়। কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে এক অতিকায় সুষ্ঠুগঠন হস্তী। অপরূপ এই হস্তীটি, জীবন্ত, এক অনবদ্য সমন্বয় হয় পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। তাঁরা প্রণতি জানান দেবতা বুদ্ধকে। স্মরণ করিয়ে দেয় এই চিত্রটি স্পিনেল্লো আর্টিনোর অঙ্কিত চিত্রের, পড়ে সমপর্য্যায়েও, শ্রেষ্ঠত্বে আর অঙ্কন-বৈশিষ্ট্যে।

অপরূপ বুদ্ধের পূজার চিত্রটি। দাঁড়িয়ে আছেন বুদ্ধ এক মহামহিমময় ভঙ্গীতে। অনবদ্য, সুন্দরতম শোভন তাঁর গঠন-সৌষ্ঠব। আননে তাঁর দিব্য জ্যোতি, নয়নে অন্তরের ভাষা। সম্ভব হয়েছিল নাকি এমন চিত্র অঙ্কণ, ইটালিতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভব করেছিলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীরা।

দেখি স্তব্ধ বিস্ময়ে; ভাবি ধন্য সেই শিল্পী. যিনি অঙ্কিত করেন এমন মহামহিমময় মূর্ত্তি। অমর তিনি, অমর অজন্তাও।

ঘুরে ঘুরে দেখি, স্তম্ভের অঙ্গের আর মন্দিরের ছাদের চিত্র-সম্ভার। অনবদ্য স্তম্ভের অঙ্গের চিত্র-সম্ভার। অনুপম আর বহু বিস্তৃত ছাদের চিত্রসম্পদ, বিভিন্ন তাদের বিষয়বস্তুও। বিভিন্ন প্রতিটি অলঙ্করণ, ছাদের অঙ্গের প্যানেলের গাত্রে। সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে, রচিত হয় ছাদের অঙ্গে এক বহু বিস্তৃত সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর অনবদ্য সমাবেশ। দেখি, বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে। সমপর্য্যায়ে পড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইটালিয়ান চিত্রশিল্পীর ছাদ অঙ্কণের।

বার হয়ে এসে প্রবেশ পথের চিত্রসম্ভার দেখি। দেখি, সাজান অজন্তার চিত্রশিল্পী, প্রবেশ পথের শীর্ষদেশকে কত বিভিন্ন আর বিচিত্র অলঙ্করণ দিয়ে, কত বিভিন্ন লতা-পুষ্পে, কত সুন্দরতম মূর্ত্তিসম্ভারেও। সাজান সম্মুখভাগের আটটি প্যানেলকেও অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম চিত্রসম্ভারে। সম্পূর্ণ রূপপরিগ্রহ করে প্রবেশ পথের অলঙ্করণ। রচিত হয় এক কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, এক অলোকসুন্দর রহস্যময় পরিবেশন, এক অমরাবতী শৈলমালার অঙ্গে। নিদর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্প জ্ঞানের। সম্ভব হয়েছিল নাকি এমন অঙ্কন শুধু আধিরান চিত্রশিল্পীর দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

বুদ্ধের জন্ম—অজন্তা
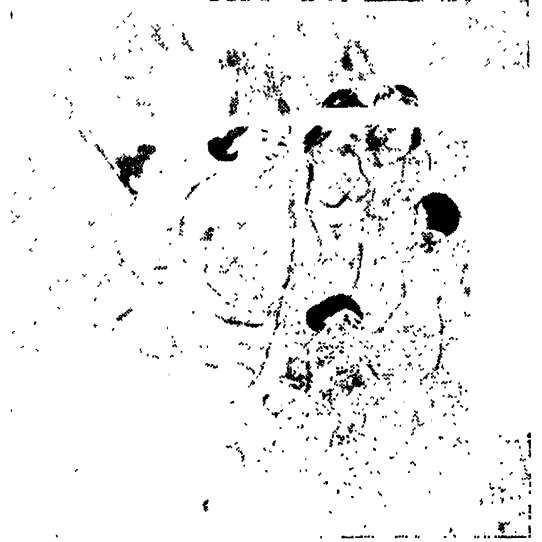
অনুরূপ অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত ষোড়শ গুহামন্দিরের, স্তম্ভের অঙ্গ, ছাদের গাত্র আর প্রবেশ পথও। তাই লাভ করে এই দুইটি গুহামন্দির শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে। বুকে নিয়ে আছে এই দুইটি গুহামন্দির স্থপতির আর ভাস্করের সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ দানও। দান এক মহাগৌরবময় যুগের। মহিমান্বিত হয়ে আছে তাদের অন্তহীন হৃদয়ের, ঐশ্বর্য্যে আর অপরিসীম মনের মাধুর্য্যে। তাই পরিণত হয় এই দুইটি গুহামন্দির অজন্তার শ্রেষ্ঠ গুহামন্দিরে, হয় ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দিরেও। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বে, হয় বিশ্বজিৎ।

শ্রদ্ধায় অঞ্জলি নিবেদন করি স্থপতিকে, করি ভাস্করকে আর চিত্রশিল্পীকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মনের মণিকোঠায়।

ক্রমশঃ

হস্তকারুশিল্প সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

হস্ত-প্রস্তুত বস্তুমাত্রকেই 'হস্তকারুশিল্প' বলা যাইতে পারে। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাহার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথে নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনীয়তা আসিয়া ভীড় করে। যুগে যুগে মানুষ এই অভাব ও প্রয়োজনীয়তা নানাভাবে মিটাইয়া আসিয়াছে বা আসিতেছে। যন্ত্রশিল্প যখন নগরে বা শহরে দশহস্ত বিস্তার

কম্বলের উপর কাজ

করে নাই, তখন একমাত্র হস্তকারুশিল্পই মানুষের নানা উপকারে আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রশিল্পের প্রভাব যখন ধীরে ধীরে মহানগরী তথা পল্লীগ্রামগুলিকেও গ্রাস করিয়া বসিল তখন এই হস্তকারুশিল্প জীবন্মৃত অবস্থায় কোনরূপে টিঁকিয়া রহিল।

যন্ত্রশিল্প মানুষের অভাববোধকে এমন ভাবে মিটাইয়াছিল যে, প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ গেল মরিয়া। যাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা অধিক, তাহারা অধিকমাত্রায় বস্তুটি কিনিয়া বস্তুমূল্য কমাইয়া দিল। আর ইহাতে বস্তু সম্বন্ধেও ভালমন্দ-বোধের চেতনা তাহাদের মন হইতে মুছিয়া গেল। এমনই ব্যাপার ঘটিল বিশ্বজুড়িয়াই।

পরাধীন ভারতে ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে যন্ত্রশিল্পের দৌলতে কুটির তথা হস্তকারুশিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে ইহা নির্মম সত্য। এই অপমৃত্যুর জন্য ইংরেজ সরকারকেই

রাজস্থান শাড়ী

পরোক্ষভাবে দায়ী করা চলে। বিশেষতঃ দেশের তাঁত-শিল্পের বিলোপ-সাধনে ইংরেজ সরকার যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছে, দুনিয়ার ইতিহাস হইতে তাহা মুছিয়া যাইবে না। তার পর অন্যান্য হস্তশিল্প যেমন—বাস্তুশিল্প, দারুশিল্প, পিতল ও তামার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির কাজ—নানা প্রকার অভাব-অভিযোগ ও আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়িয়া তাহারাও কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সম্প্রতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর

ভারত সরকারের দৃষ্টি যন্ত্রশিল্পের পঞ্চবার্ষিকী সংযোজনার সঙ্গে কুটিরশিল্পের দিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। ফলে প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে ও বেসরকারী ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধীনে কিছু কুটির ও হস্তকারুশিল্পের প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী হইয়া গেল। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বিশেষ করিয়া যেখানে তাঁত ও খাদি কাপড় ছাপানোর কাজ হইতে লাগিল, তাহার চাহিদা বাড়িয়া গেল। ক্রমে দেশে মাটি আর কাঠের কাজের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতেছে। ঐ সঙ্গে বাঁশ, তাঁত, চামড়া, চিনামাটি আর জয়পুরের পাথরের কাজেরও কদর বাড়িতে লাগিল।

বাতিদান

পাখী

এই সব প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ 'প্রোডাকসন মেজার' লইয়া কাজ করিতে লাগিল সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটা অসুবিধা ও অভাব দেখা দিল, ভাল এবং রুচিসম্মত ডিজাইন তৈয়ারী লইয়া। এই সব তথাকথিত প্রতিষ্ঠান প্রথমতঃ স্থানীয় শিল্পীদের নক্সা বা ডিজাইন লইয়া এ পর্যন্ত কাজ চালাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই সব নক্সাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব না থাকায় অতি অল্প সময়েই পুরাতন হইয়া গেল। পরিবর্তনশীল জগৎ— মানুষের মন ও রুচি নিয়তই বদলাইয়া যাইতেছে। কাজেই মানুষের মন বিরূপ হইয়া উঠিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বোর্ড সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা হইল প্রাদেশিক আর বেসরকারী হস্তকারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা করা আর কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যদান করা।

যখন কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় হস্তকারুশিল্প বোর্ডের দৃষ্টি পড়িল প্রাদেশিক হস্তকারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি রুচিসম্মত নক্সার অভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তখন ইহাদের সাহায্যার্থে এবং বিশেষ করিয়া বেসরকারী উৎপাদন কেন্দ্রগুলির জন্যও বোর্ড এমন একটি আঞ্চলিক নক্সা কেন্দ্রের পত্তন করিল, যদ্দ্বারা শুধু স্থানীয় হস্তকারুশিল্প প্রতিষ্ঠানই লাভবান হইবে না, জনসাধারণেরও রুচি পালটাইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, ডিজাইন অনুযায়ী সৃষ্টবস্তুর মূল্য জনসাধারণের ক্রয়ের আওতার মধ্যেই থাকিবে।

ভারতের চারিটি মহানগরী—বোম্বাই, কলিকাতা, বাঙ্গালোর ও দিল্লীতে আঞ্চলিক হস্তকারুশিল্প নক্সা-কেন্দ্র খোলা হইল।

আঞ্চলিক নক্সা-কেন্দ্রগুলিকে বোর্ড হইতে নিম্নলিখিতরূপ কার্যগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইল :

(ক) স্থানীয় জনসাধারণ ও লোকশিল্পের সংযোগসাধন ;

(খ) স্থানীয় লোকশিল্পের কাঠামো বা মোটিফস
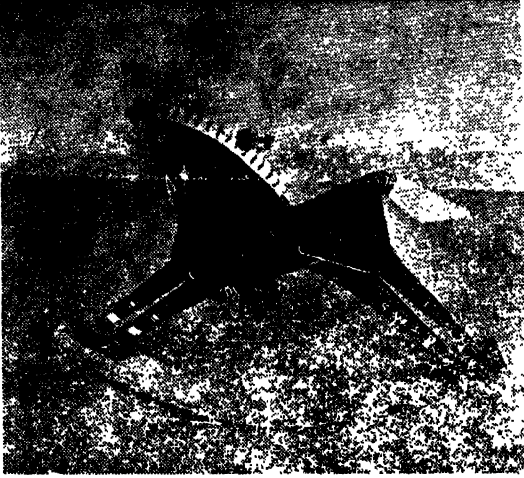
কাঠের ঘোড়া

(motifs)-এর উপর হস্তকারিগরীশিল্পের সংগঠন ও প্রস্তুতি-করণ ;

(গ) ক্লাসিক তথা আলঙ্কারিক শিল্পের সংরক্ষণ—ভারতীয় শৈলী-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করিয়া ;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে পাশ্চাত্ত্য শিল্পমত গ্রহণ করা ;

(ঙ) প্রতিটি বস্তু অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক হওয়া দরকার ;

(চ) এবং অবশ্যই তাহা ক্রয়ের আওতার মধ্যে থাকিবে।

আঞ্চলিক নক্সা-কেন্দ্রের আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, গবেষণা দ্বারা যে সমস্ত নূতন ডিজাইন তৈয়ারী হইবে, নমুনা কপি হিসাবে তাহা সংরক্ষিত থাকিবে এবং যাহারা (ব্যক্তিগত হউক অথবা যৌথ কোম্পানীই হউক) উৎপাদন করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নক্সা-কেন্দ্রের ভাল ও রুচিসম্পন্ন ডিজাইন পছন্দ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং ইহার জন্যে কাহারও কিছু ব্যয় করিতে হইবে না। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, আঞ্চলিক হস্তকারুশিল্প নক্সা-কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণের গৃহশয়ন করণ তথা গৃহগত প্রয়োজন যাহাতে সুন্দর ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় অথচ খরচখরচাও যাহাতে বেশী না হয়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অনন্ত-মুহূর্ত্ত

শ্রীনমিতা দেবী

অনন্তেরি স্পর্শভরা একটি যে মুহূর্ত্ত,
অজানিতের দুয়ার খুলে হঠাৎ হলে মূর্ত্ত।
এলে অবাক বিস্ময়েতে অতুলনের ছন্দে,
অনন্তেরি বাজল বাঁশী রূপে রসে গন্ধে।
ক্ষণকালের ছদ্মে আসে চিরকালের বর যে।
কোথায় থাকে সুপ্ত হয়ে রসেরি নির্ঝর যে।
একটি হঠাৎ রোমাঞ্চতে বয় যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত,
অকস্মাতের লীলাতে হয় চিরন্তনী মূর্ত্ত।
চমকে দেখি কাঙাল আমি রিক্ত সকল প্রাণ যে,
দিলে ক্ষণের পরশমণি অহেতুকীর দান যে।

অদৃশ্য কি পরশ আমার বুলিয়ে দিলে বক্ষে,
এক নিমেষের দিব্য আলোয় তোমার দুটি চক্ষে।
চমকে দেখি মোর পরিচয় সঙ্কেতেতে গুপ্ত,
হৃদয়খানি শিউরে জাগে বিস্মরণে সুপ্ত।
পড়েছি সেই দৃষ্টি লিপি মৌনবাণীর বরদান,
তোমায় চিনে বুঝেছি গো পেয়েছি মোর সন্ধান।
ধন্য করে এক নিমেষে করেছো মোর সব জয়,
সত্য যে মোর পরমতম আমার চির বিস্ময়।
শাশ্বত মোর অকস্মাতের আবির্ভাবে মূর্ত্ত,
অনির্ব্বচন স্পর্শভরা অনন্ত মুহূর্ত্ত।

তপোবন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড়ের নাম তপোবন। গ্রামের নামও তপোবন। শিবের নাম তপোনাথ। তপস্যা করতেন এখানে তপোধন বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী। পাহাড়ের নামের থেকে গ্রামের নামের উদ্ভব, না গ্রামের নাম থেকে পাহাড় নাম গ্রহণ করেছে বলা মুস্কিল। তবে পাহাড়ের নামানুসারেই গ্রাম পরিচিতি লাভ করেছে মনে হয়। বালানন্দ ব্রহ্মচারী

তপোবন পাহাড়ের একদিকের শীর্ষদেশ

মহারাজের সাধনা-সিদ্ধির স্থান এই তপোবন পাহাড়, দেওঘর থেকে চার মাইল দূরে তপোবন পাহাড়। ট্যাক্সি করে আমরা চলেছি সেই তপোবন পাহাড়ে।

দেওঘরের রাস্তা বাঙালীর নামে ভরা। এক সময় যে দেওঘর বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমাণ পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে। আজো রাস্তার নাম রয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী রোড, সুরেন্দ্রনাথ সরকার রোড। দ্বারিক ঘোষের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বটকেষ্ট পালের ঔষধের দোকান, তারা ষ্টোর্স, মিত্র বিদ্যালয়, জনতা লণ্ড্রী, বিশ্বাস নিবাস, অন্নপূর্ণা ..., অক্ষয় স্মৃতি—এ সব দেওঘরে বাঙালীর অস্তিত্বের কথাই প্রচার করছে, এখানের পাণ্ডা-পুরোহিতের দল ভাসা ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষা প্রয়োগ করে। কেউ বা শুদ্ধ বাংলা ভাষাও বলতে পারে। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ... সুললিত পদাবলী কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠে। এখানের ... ডাক্তার বাঙালী, আইনবিদ বাঙালী, ফটোগ্রাফার বাঙালী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমের মঠাধীশ শ্রীমৎ ...নন্দ ব্রহ্মচারী বাঙালী, সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরও বাঙালী, এত বাঙালী বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ভাণ্ডারের চাবি কিন্তু বাঙালীর হাতে নেই। স্থানটি বিহার এলাকাভুক্ত এবং বিহারীরাই কর্ত্তা এখানের।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম আর চারুশিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত যুগল মন্দিরকে ডাইনে রেখে ট্যাক্সি ছুটে চলল। ছুটো মোড় ঘুরে ট্যাক্সিটা চরকী পাহাড় নামে একটা ছোট্ট
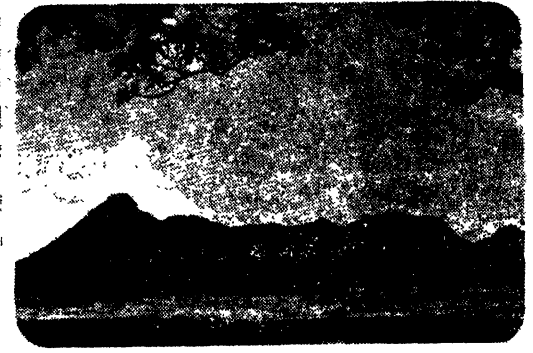
চিত্রকুট পাহাড়

একশিলা পাহাড়ের সামনের জন বিরল পথে এসে পড়ল। এ পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট মন্দিরে আছেন গণেশ আর শিব। শিবস্থান দেওঘর। কাজেই শিবলিঙ্গের প্রাচুর্য্য থাকা স্বাভাবিক। পথ চলেছে অজগরের মত এঁকে বেঁকে। কত চড়াই, কত উৎরাই। মাঝে মাঝে দুপাশের ছোট ছোট টিলাগুলি যেন মাথা উঁচু করে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আমাদের। রসহীন খর্জ্জুর বৃক্ষ কয়েকটা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের শিবপ্রাপ্তির যেন আর বেশী দেরী নেই।

চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল একটি ছোট্ট নির্ঝরিণী। হঠাৎ পথ গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। নির্ঝরিণীর ক্ষীণ-স্রোতের ধারে বসে দেহাতী মেয়ে-পুরুষে ছাতু খাচ্ছে লবণ ও লঙ্কা সংযোগে। মেয়েদের হাতে বড় বড় উল্কির ছাপ। মিশি-ঘষা ঝিঙে বীচির মত কালো কালো দাঁতে ফিকফিকে হাসি। পুরুষদের কাঁধে ভার। তারা শালপাতা, কাঠ আর দুধ বিক্রী করতে আসছে দেওঘরে। মেয়েদের মাথায় ঝুড়ি আনাজ আনছে তারা।

নদীপারের চড়াই পথে চলেছি আমরা। পথ এত উঁচু

যে, ঝুনঝুন-শব্দ করা একাগাড়ীর কয়েকজন আরোহী হেঁটে পথ অতিক্রম করছে। একার ঘোড়া আরোহীদের নিয়ে চড়াই পথে উঠতে পারছে না। নদীপাড়ে পেলাম একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রাম অর্থে বিশ-বাইশটা খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর। সামনে সারি দেওয়া আমগাছ। কিছু চষা জমি, অধিকাংশ জমিই অনুর্বর। কুতি-কলাই ও মুগের চারাগুলি বাতাসে দোল খাচ্ছে। শীর্ণ বাঁশঝাড় একটি নজরে পড়ল, শস্য ভাল হয় না এ অঞ্চলে, জলকষ্টও বেশ। আমাদের গাড়ী অগ্রসর হয়ে চলল। নজরে পড়ছে শুধু পাথর আর পাথর। আকাশ থেকে যেন পাথর বৃষ্টি হয়েছিল কোন কালে। সেই পাথরগুলি এখানে-ওখানে পড়ে এ অঞ্চলে রকমারি ছোট ছোট টিলার সৃষ্টি করেছে। হাত ধরাধরি করে আমাদের সঙ্গে চলল পাহাড়। দূরের পাহাড়রা যেন আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার কোথাও অতন্দ্র প্রহরারত পাহাড় নির্ঝরিণীরূপ স্নেহধারায় অনুর্বর অঞ্চলকে অভিসিঞ্চিত করছে বলে মনে হয়। পথে একটি কালীমন্দির দেখতে পেলাম। কালীমা উপবাসী, অর্ধহস্ত-পরিমিত রক্ত-লোলুপ লোলজিহ্বা বেরিয়ে পড়েছে মায়ের মুখ থেকে। দূরে দেখতে পেলাম ত্রিকূট পাহাড়। এর অনেক চূড়া, চূড়াগুলি স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। প্রায় আট মাইল দূরে পাহাড়টি। এখানে ত্রিকুটেশ্বর মহাদেব আছেন। মহাত্মা বম্‌বম্‌ ব্রহ্মচারী মহারাজের মনোরম আশ্রম আছে এই পাহাড়ে। অরুণাচল মিশনের বিশ্বশান্তির "ওঁ শান্তিঃ" মন্ত্র আজও এই পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

তপোবনে গাড়ী থামল আমাদের। ছোট ছোট দেহাতী ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ধরলে—"সাহেব একঠো পয়সা, শেঠ একঠো আনি" বলে আবদার জানালে তারা। তাদের ধারণা, যারা গাড়ী চড়ে আসে তারা হয় সাহেব, নয় শেঠ। অতএব তারা পয়সা দেবেই। মান বাঁচাতে তাদের প্রত্যেককেই পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হ'ল। ছুটে এল বুড়ো একজন। বললে, 'সামনের কুঁয়োর জল বড় মিষ্টি, এনে দোব এক লোটা?" অনুমতির অপেক্ষা না করে বুড়ো পড়ি-কি-মরি ভাবে এক ঘটি জল এনে দিলে। বাপু জলপান করলে। জল যে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যপ্রদ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বুড়ো হাত বাড়িয়ে দিলে বকশিসের জন্য। ভুবনেশ্বর তেওয়ারী আর বাসুদেব চৌবে—দু'জন পাণ্ডা এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালে। আগন্তুক বলতে আমরা—আর কেউ এসেছে বলে মনে হ'ল না, কাউকেই দেখি নি আমরা।

বাসুদেব বললে, দুজনে সবকিছু ভাল ভাবে দেখিয়ে দোব, বড্ড গরীব আমরা। এর পরের—অতএব বকশিস চাই—কথাটা উহ্য রইল। বেলা ন'টা তখন। একজন একটি ভার বহন করে নিয়ে এল, তাতে চায়ের সরঞ্জাম, পেঁড়া, মণ্ডা, জীর্ণ কদলী, পানের সাজ প্রভৃতি রয়েছে। লোকটি দোকান পেতে বসল। ঐ একটিমাত্র দোকান এখানকার, ক্রেতা নেই বললেই হয়, তবু যে দোকান পেতেছে এইটেই আশ্চর্যের।

পাণ্ডাদের সঙ্গে এগিয়ে চলি আমরা, ক্রম উর্ধ্বগামী পথ। কিছু পরে বাঁধানো সিঁড়ি পাওয়া গেল, ডান দিকে পড়ল পূর্ণানন্দ ফ্রি স্কুল। বালানন্দ ট্রাষ্ট এ স্কুলের পরিচালনার ভার বহন করেন। চার-পাঁচ মাইল দূরের ছেলেরাও এ স্কুলে পড়তে আসে। নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থাটি ভারী সুন্দর এখানকার। হয় ত অভাব আছে। বিদ্যালয় বাড়ীটির বহুদিন সংস্কার হয় নি দেখতে পেলাম। তবু শিক্ষার এ পরিবেশ একান্ত দুর্লভ। শিক্ষক-বৃন্দও প্রাণস্পর্শী ভাবে শিক্ষাদান করেন দেখতে পেলাম। আর প্রকৃতি সবচেয়ে বড় শিক্ষক এখানকার। এম ই স্কুল এটি, শিক্ষকমশাইরা সামনের গ্রামে থাকেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য পূর্ণানন্দ মহারাজের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বিদ্যালয় ১৯৩৩ সনে স্থাপিত হয়। ১৯৪১ সনে এ বিদ্যালয়ে টেলারিং ও উইভিং বিভাগ খোলা হয়।

প্রায় একশ' সিঁড়ি অতিক্রম করে বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মায়ের সমাধিমন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। ব্রহ্মচারীজীর মায়ের নাম নর্মদাবাঈ। মন্দিরের সম্মুখভাগে খোদাই করা আছে দুটি লাইন:

মাতাজী নর্মদাবাঈ দেবতা জননী
সমাধিমন্দিরে সুখে আছেন শায়িনী।

সমাধিমন্দির থেকে কিছু উপরে উঠে একটি শিবমন্দির পাওয়া গেল, শিবই এখানকার প্রধান দেবতা। ইনি বালেশ্বরী শিবলিঙ্গ নামে খ্যাত। এর পর আরও কিছু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পাওয়া গেল একটি হোমকুণ্ড। হোমকুণ্ডটি একটি গুহার মধ্যে। কুণ্ডের সম্মুখে একটি নির্বাপিত ধুনী এবং প্রকাণ্ড ত্রিশূল একটি নয়ন-গোচর হ'ল। কুণ্ডের নিকটে দুটি বকুলগাছ। ঝরা বকুলের গন্ধে স্থানটি আমোদিত। এই কুণ্ডে হোম করতেন বালানন্দজী এবং বিশাল ত্রিশূলটিও তাঁরই করধৃত। বাসুদেব পাণ্ডা কিছু ভস্ম এনে ললাটে লেপন করে দিলে। বাসুদেব কলকাতায় ছিল কিছুদিন। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে, কিছু ইংরেজী জানে বাংলাও বলে ভাল। বাসুদেব বললে, এখানে দশ জন পাণ্ডা আছে, দু'জন রাত্রেও থাকে এ আশ্রমে। বেশী

শ্রী আসে না তপোবনে। বালানন্দজী ব্রাহ্মণ ছিলেন, আশ্রমে উজ্জয়িনীতে নিবাস ছিল তাঁর, পূর্ব নাম পীতাম্বর। একবয়সে গৃহত্যাগ করেন। এই পাহাড়ের গুহাতে তাঁর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। মানুষ তাঁর লৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়। ক্রমে গড়ে ওঠে আশ্রম ওঘরে এবং অন্য বহুস্থানে। এখন বালানন্দ সংস্থা বিরাট, দেশের ও দশের উপকারে এই সংস্থা আত্মনিয়োগ করেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি এঁদের লক্ষ্য।

পাহাড়শীর্ষের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুশ' বাঁধানো সিঁড়ি। এর পর পাষাণের অঙ্গে পদক্ষেপ করে সন্তর্পণে উপরে উঠতে হয়। পাহাড়শীর্ষে দুটি গুহা, একটিতে তপস্যা করতেন বালানন্দজী। এই গুহাটি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। উপরে ঢাকের মত কপাট, সেই কপাট তুলে সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে যেতে হয়। অন্যপথেও ভেতর থেকে বাইরে আসা যায়। এর গুহাটির নাম রাবণগুহা। গুহাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, গলিপথে গুটিসুটি হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রাবণগুহায় প্রবেশ করলাম। কিম্বদন্তী আছে, মহাপণ্ডিত রাবণ নাকি এই গুহাতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন কিছুদিন। প্রবাদ আছে, পাহাড়ে মহর্ষি বাল্মীকিও নাকি তপস্যা করেছিলেন। এখানকার এক কুণ্ডে জনকনন্দিনী সীতাদেবী স্নান করেছিলেন—পাণ্ডারা বলে। পাহাড়শীর্ষের শিলায় লিপির মত কি যেন কিছু লেখা চোখে পড়ে। এ লিপি কোন্ যুগের তা বলা মুশকিল।

গুহা আর গুহা। কত গুহাই না ছড়িয়ে আছে তপোবন পাহাড়ে। বালানন্দজী ধ্যানধারণা করতেন, কোনটিতে শয়ন করতেন, কোনটিতে যজ্ঞ করতেন। পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে কেউ যেন এই তপোবন পাহাড় তৈরি করেছে। এ পাহাড়ের শীর্ষে একটি ঝাণ্ডা-পিলার নির্মাণ করা আছে। বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় ঐ পিলারে পতাকা উড়ানো হয়। ঝাণ্ডা-পিলারের পাশের কয়েকটি শিলায় একটি হনুমানমূর্তি অঙ্কিত আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে পর্বতশীর্ষ হতে অপর প্রান্ত দিয়ে নেমে 'কামরূপা ভগবতী'র মন্দির পাওয়া গেল। দেবী পাষাণী। চর্মচটিকার দুর্গন্ধে মূর্তিটির সম্মুখভাগে অগ্রসর হওয়া মুশকিল, তবু বাণু দেবীর চরণে সিন্দুর অনুলেপন না করে ছাড়লে না। ভগবতীর মন্দিরটি বেশ উঁচুতে, মন্দিরের বাইরের প্রকোষ্ঠটিতে শান্তির শীতলতা ছড়ানো। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম এখানে। নিকট ও দূরের গ্রাম, নির্ঝরিণী, পাহাড় ক্ষেত—সব যেন পটে আঁকা ছবি মনে হ'ল। এখানকার মাটিতে শ্যামলিমার অভাব হলেও পাহাড়ী মমতাধারা মাঝে মাঝে শীর্ণ নির্ঝররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, পাহাড়ের সানুদেশে নামগোত্রহীন কিছু ফুল ফুটে আছে। এদের শোভা আছে, তেমন সুগন্ধ নেই। তপোবনের পবিত্রতা এবং নির্জনতা পাহাড়টিতে মাখানো থাকলেও আজ আর তপস্যারত কোন যোগীবরকে নজরে পড়ল না কোথাও। শুধু পাণ্ডারা দেখিয়েছিল এক নাগা সন্ন্যাসীর সমাধি। তিনি জীবিত অবস্থাতেই যোগারূঢ় হয়ে সমাধি লাভ করেন। তাঁর নির্দেশে তাঁকে পাহাড়ে গেঁথে দেওয়া হয়। পাহাড়কে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম আমরা।

আমার কাজ

শ্রীসুনীতি দেবী

নিরালা এই ঘরে বসে থাকা,
ছেঁড়া পাতায় রঙীন ছবি আঁকা।
দূর দিগন্তে মেলে রেখে আঁখি,
উড়িয়ে দেওয়া ডানা ভাঙা পাখী।
উৎসাহেতে মাড়িয়ে কাঁকর-ঢেলা,
ছুটতে গিয়ে বেতালে পা ফেলা।

ভুলেও কিছু ভুলতে নাহি চাওয়া,
চাপা গলায় বেসুরে গান গাওয়া;
জীর্ণ বাসের করা নূতন সাজ,
এই কি আমার দিনশেষের কাজ?

কানাগলি

শ্রীগণেশ নন্দী

আরও একবার গলা ছেড়ে ডাকল হরিদাস—'কুসু-উ-উ-ম্'—শীতের হাড়-কাঁপানো একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার অন্ধকারের বুক চিরে চিরে ঘুরপাক্ খেয়ে প্রতিধ্বনিত হ'ল '—ও-উ-ম্'—! তবু কোন সাড়া এল না কুসুমের। রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল হরিদাসের।

ইচ্ছে করছিল—নচ্ছার মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে দুটো পাক দিয়ে দিতে আচ্ছা করে। নচ্ছার মেয়েমানুষ! নিজের মনে বিড় বিড় করে গাল দিতে দিতে গুটি গুটি পায়ে এগুলো হরিদাস; আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল দেহটা। হাতের লাঠিটাও আর ভর রাখছে না কিছুতেই। কাঁপতে কাঁপতে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে যেন। সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো পাতলা কাঁথাটার ফাঁক দিয়ে পিঠের দিকটা যেন কালিয়ে দিচ্ছে। নচ্ছার মেয়েটাকে কতদিন বলেছে, 'ওইটুকু ছেঁড়াটার দুটো কোড় তুলে দিস'। তা আজও হ'ল না। কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার! ভালমানুষের আর কাল নেই। যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল হরিদাস। হাতের লাঠিটা বাগ করে নিয়ে চলতে সুরু করলে সে আবার।

একে কানাগলি তায় আবার এত সরু যে সহজ মানুষেরই পথ চলা দায়।

—'কইরে কুসুম—ও কুসুম—বলি এই সাঝ-সন্ধ্যেয় ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' দোরের গোড়ায় এসে আবার ডাক পাড়লে হরিদাস।

এবারে ধড়মড়িয়ে উত্তর দিলে কুসুম—"নাগো দাদা, এতবেলায় ভাবছিলুম তুমার কথা। বেজায় ঠাণ্ডা গো! শীতে কালিয়ে গেলাম একেবারে।"

"হঁ! ব্যাত শীত সব তোর তরেই এই ঘরের মধ্যে এয়েছে। লোকে ত আর পথে বের হচ্ছে নি ক'। নে, উঠ। আমার মোহনঠাকুরের সাড়া নেই কেন রে? ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?"

ঘুমুল তুমার মোহনঠাকুর! দিব্যি প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইছে। দুষ্টু ছেলে কোথাকার! আবার হাসি হচ্ছে দেখ না?

তাই নাকি? ব্যাটা খুব হাসছে, নারে? ড্যাবাও—মজা দেখাচ্ছি একবার; হাসি! আমাদের অবস্থা দেখে হাসি! দে দিকিন, আমার কোলে দিয়ে তুই উঠ, বুঝলি কুসুম—

হঠাৎ চুপ করে থেকে বলে হরিদাস—

আজ হইছিল এখুনি।

কি গো দাদা?

হ, হ! বল্ দিকিন কি? হাতের লাঠিটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে উবু হয়ে বসল হরিদাস—'বলতে পারলি নি ত? কই, দে, আমার কোলে দে।' খোকাকে তুলে হরিদাসের কোলে দিলে কুসুম—"নাও তোমার মোহনঠাকুরকে।"

কই বললে নি তো?

হেঁ, হবে আবার কি? এমনি এমনি বলসাম। তোর উপরে গিইছিলাম খুব রেগে, তা নেহাৎ মোহনঠাকুরের জোরে—

আলতো করে দুটো চুমু দিলে হরিদাস মোহনঠাকুরের গালে আর কপালে। নরম তুলতুলে দেহটার একটা উষ্ণ উত্তাপ যেন জুড়িয়ে দিল দেহমন।

স্থাখ, স্থাখ কুসুম, ব্যাটা আবার ঘুসি পাকিয়েছে দেখ্ '

হ, তা আর পাকাবে নি; বিষ না হোক, চক্কোরটা ঠিক আছে।

কি বললি? খালি চক্কোর? হুঃ, দেখবি, দেখবি ওই চক্কোরের ওপরই একদিন মণি জ্বলবে। চার-চারটে পাশ দিয়ে দুঃখু ঘোচাবে আমাদের মোহনঠাকুর। তখন কি আর এই কানাগলির খুপসী ঘরে থাকব?

তা বেশ। তা হলে বস তুমি, আমি আগুন ধইয়ে চাড্ডি চইড়ে দিই। কুসুম উঠল। উত্তুরে হাড়-কাঁপানো হাওয়ায় বুকের মধ্যে বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে বন্ধঘরের ভুতুরে অন্ধকারে চুপটি করে বসে থাকে হরিদাস, আর আপন মনে অনেক কথা বিড়বিড় করে। হাল্‌কা হাল্‌কা শরতের মেঘের মত টুকরো টুকরো অতীতের ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই ত! হাতের নাগালের কাছ দিয়ে ঘুরে গেল কটা বছর। একটা একটা করে ধরতে গেলে আঙুল গুণে বলা যায় এখুনি। চলতি সন থেকে আরও চার-পাঁচটা সন আগে যেদিন দেশ আর দেশের বাস্তুভিটেটুকু ছেড়ে পালিয়ে এল সে। তার পর—

হ্যাঁ, তার পরই ত নয়নমণির হাত ধরে সেই রাতেই দেশ ছাড়ল হরিদাস। আর শেষটায় অনেক ঘুরে, অনেক চেষ্টায় আবিষ্কার করেছে সে এই শহরটার কোণের দিকে এই বিষাক্ত আর বীভৎস কানাগলিটা। কানাগলিটার এই মুখেই ঘুরতে গিয়ে ডানদিকে যে ঘরটা, এখন যেখানে ধীবার মা আর বাতাসী বোষ্টমী থাকে, আগে ওখানেই পাতা সংসার ছিল। হরিদাস আর নয়নমণি। সে অনেকদিন। নিজের অজান্তেই পাক খেয়ে খেয়ে একটা বোবা কান্নার চাপা নিঃশ্বেস পড়ল হরিদাসের। প্রথম প্রথম কেমন বাধো-বাধো ঠেকত হরিদাসের, আর নয়নমণিরও।

অন্ধকার, ভ্যাপসা ঘরে থেকে থেকে মনটাও কেমন চামসে আর রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন পর বলল হরিদাস—"

এমনি করে হা-পিত্যেশে আর চলবে কতদিন? চল আমরাও ন্যু হয়—

কথাটা আর সেদিন শেষ করতে দেয় নি নয়নমণি; সভয়ে আঁতকে উঠে বলেছিল—"সোয়ামীর হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষে করব কি গো?" গোঁ ধরে বসে রইল নয়নমণি। খিঁচিয়ে উঠল হরিদাস—

তা হলে মর! গোঁ ধরে ঘরের কুনায় বসে থাকবি ত এই বিদেশে খাওয়াবে নি কেও।"

গুম্ হয়ে রইল নয়নমণি। পরের দিন বেরুল হরিদাস; বাতাসী বোষ্টমীর পেছু পেছু। এক চক্কোর ঘুরে এল শেষটায়। শহরের ঠাট-ঠমকটা একটু বেশী বোঝে বাতাসী। এই শহরের কানাগলিটার এসে তার চোখ খুলে গেছে অনেক দিকে। সমস্ত দেহমন রী রী করে উঠল নয়নমণির। সারাদিন টং টং করে ওই ছুঁড়িটার সঙ্গে ধরে ঘুরবে কেন হরিদাস? ও-সব রঙ-তামাসার কথা ঢের জানা আছে তার। আর বেশ জানা আছে উসব মেয়েদের। পেরথম পেরথম ওই গলার সুরে মন ভিজিয়ে একদিন ফাঁস পরিয়ে দেয় গলাতে।

গুমরে গুমরে একদিন কান্নায় ভেঙে পড়ল নয়নমণি। অনেক কান্না কাঁদলে আর অনেক বোঝালে; কিন্তু অটল হরিদাস। সব খুইয়ে শেষে এটুকু খোয়াবার আগে ফুরিয়ে যাক না সে! কষ্টের কথা নয়, হরিদাস অনেক ভেবেছে, কষ্ট সে সইতে পারে; কিন্তু কষ্ট করে কি আর বা-ভাঙা তা জোড়া লাগাতে পারে? বুকখানা ভেঙে গেছে যে তার!

কথা বলল না নয়নমণি, আর বলতেও হ'ল না। দেখতে দেখতে যেন শুকনো গাছের পাতা উড়িয়ে দুরন্ত ঝড়ের দাপট বইল। মরা কোটালে যেন বান ডেকে গেল মরণের। পাশা-পাশি লাগুয়া বস্তীর ঘর ভরে এল ওলাইচণ্ডি আর ওলাবিবি। একটা, দুটো, তিনটে মরছেই নিত্যি।

শুধু নির্ব্বিকার হরিদাস, এসবের কথা যেন খেয়ালই নেই তার। তার পর···হ্যাঁ···সে রাত্রে হঠাৎ গা-গতরে ব্যথা নিয়ে আর উঠতে পারল না হরিদাস। সমস্ত মুখে আর দেহে গোটা গোটা গুটিতে ছেয়ে ফেলেছে তাকে। পরদিন সকালবেলায় বাসি-চোখেই শিউরে উঠল নয়নমণি। মায়ের দয়া—মায়ের দয়া হয়েছে হরিদাসের। দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল নয়নমণি।

শোন। অত কষ্টেও হাসি-হাসি চোখে একবার ভোরের দিকে ডাকল হরিদাস। এক মিনিট, ব্যস। তার পরই খোলা ফাটক দিয়ে ছুট দিল নয়নমণি। আর সেই অন্ধকার ঘরে ভ্যাপসা বাতাসে চোখ বন্ধ করলে হরিদাস। যেন এই কঙ্কালসার জীর্ণ পৃথিবীর এপিঠ থেকে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে ওপিঠে। অনেক, অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু সেই যে গেল আর ফিরল না নয়নমণি।

পুরো চার দিন বেহুসের পর যখন চোখ চাইলে হরিদাস, দেখলে কে যেন হাঁড়িচাচার কালি এনে পৃথিবীর মুখে ঘষে দিয়েছে। শুধু কালো আর কালো—একটা নিঃসীম আর ভয়ঙ্কর অন্ধকার। তীব্র আর্ত্তনাদে চীৎকার করে উঠল হরিদাস—"নয়নমণি, মণি!"

সাড়া এল 'এই যে দাদা আমি রইছি হেথায়।"

কে? কে তুমি?

আমি কুসুম গো, বাতাসীদের ঘরের কুসুম।

ওঃ! আমি ভাবলাম—তা গদাই কমনে?

উনার সব মিটে গেছে গো। থাক উসব কথা—শরীলটাতে একটু বল করে লাও। তার পর শুনোখুনি সব।

অঃ! সেই অন্ধকারের ঘনঘটায় আরও জটিল আরও রহস্যঘন হয়ে উঠল হরিদাসের সবকিছু। শেষবারের মতন দেহের সবটুকুন জোর দিয়ে প্রশ্ন করলে সে আবার—"তোর মণিদিদি গেল কমনে রে?

ঠিক বোঝা গেল না—কুসুম হাসল না ব্যঙ্গ করল, অথবা সেই হরিদাসের অন্ধকার পৃথিবীর বন্ধ ঘরের কোণে চোখের জল ফেলল দু ফোঁটা।

তার পর—বেঁচে উঠেছে হরিদাস। শুধু চিরদিনের মতন অন্ধকার হয়ে গেছে তার পৃথিবীটা, আর সেই অন্ধকার পৃথিবীটার গা বেয়ে বেয়ে ঘুরেছে হরিদাস। একটা লাঠিতে ভর দিয়েই সে বাঁচবে। কঠিন মাটির বুকে লাঠি ঠুকে ঠুকে সে তাই অনুভব করে নিজেকে আর নতুন পৃথিবীর এই অচেনা মানুষদের।

—নাও দাদা, ঠায় অন্ধকারে ভূতের মতন বসে বসে আবার অত ভাবছ কি?

হাসল হরিদাস। যেন সমস্ত দরিদ্রতাকে ব্যঙ্গ করল সে।

—নারে পাগলী, ভাবতে হয় বৈ কি। মোহনঠাকুর আমাদের বড় হচ্ছে, লেকাপড়া শিখিয়ে চারটে পাশ ত দেওয়াতে হবে।

—হু, হু! লাও দিকিন, গরম থাকতে ভাত কটা মুখে দিয়ে লাও।"

—হু! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল হরিদাসের 'দে চাচ্ছি, তবে খেয়েই নিই।

এর পর অনেক, অনেকদিন পর। একটু একটু বসতে শিখেছে কুসুমের কোলের ছেলেটা। হামা টানে ঘর থেকে দাওয়ায়। দামাল খোকার নতুন নাম দিয়েছে কুসুম 'দস্যিছেলে।' আর, হরিদাস আদর করে বলে, 'দস্যি! দস্যি নয়, বল দস্যু। বড় হয়ে ও যেন দস্যুপনাই করতে পারে।'

সেদিন ভোরের বেলা চোখ খুলেই দেখল কুসুম টিপটিপিয়ে বাদল নেমেছে ভোর থেকে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই বুঝল

হরিদাস বাইরে বৃষ্টি নেমেছে বলে স্যাঁৎস্যাঁত করছে সব ঘর-দুয়োর। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বার দুই আঃ! উঃ! করতে করতে আড়মোড়া ভাঙল হরিদাস।

—গা গতরগুলো ব্যথা ধরেছে, কুসুম, বৃষ্টি নামল দেখি। আজ তা হলে হরিমটর। চুপ করে রইল কুসুম, কোন কথার জবাব দিল না সে। কি যেন ভেবে খানিকটা চুপ করে থেকে বললে হরিদাস—'তোর লুকোনো চুরোনো চাল-ডাল আর কিছু নেই কুসুম? শুধু আজকের মতন?"

—জানি নেকো যাও, আমি কি লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে থেকে মেঙ্গে আনি নাকি? ভুমার আনা থেকেই তো দু-চারটে খেয়ে না খেয়ে তুলে রাখি, তা সে কোন জন্মে ফুইরে গেছে।'

—অঃ! তা রাগ করিস ক্যানে? বলছি, এই শীতের দিনের বাদলায় তো আর বেরুনো যাবে না কুথাও।

—তার আমি কি করব? নির্ব্বিকার আর নীরস কণ্ঠে জবাব দিলে কুসুম।

—হু, সেটা ঠিক খেয়াল ছিল না, পাক-খাওয়া একটা দীর্ঘ-শ্বাসকে চেপে নিলে হরিদাস।

—তা একটা কথা বলি—তুইও না হয়—

শেষ করতে দিলে না কুসুম। মুখ-ঝামটা দিয়ে খিচিয়ে উঠল সে হরিদাসকে।

—থাক, থাক! ওটা আমার অনেক আগুতেই জানা হয়ে গেছে।

—জানা হয়ে গেছে: ছলাৎ করে চলকে উঠল হরিদাসের বুকের মধ্যে একতাল রক্ত।

ঘোলাটে হয়ে যাওয়া গলা গলা চোখের মণিদুটো শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে টলটলে হয়ে উঠল।

'তা হলে কুসুমেরও জানা হয়ে গেছে! তাই হবে—মনে মনে ভাবল হরিদাস।

কদিন ধরেই ঘুর ঘুর করছে লকাইটা। পেটের কাঁটাটা ফেলতে না ফেলতেই গতিক বুঝে খসটান দিয়েছে গদাই বোষ্টম, এবার আবার ঘুর ঘুর করছে লকাইটা। তা বেশ জানে হরিদাস। এতখানি বয়সে নেহাৎ কম ত দেখে নি, আজই না অন্ধ হয়ে গেছে চোখদুটো। গরীবের ঘরে যতদিন গতর ততদিনই কদর। তার পর ওসব পিরীত-টিরীত ফাকা। গরীবের ঘরে ও বস্তু ঠাঁই পায় না বেশীদিন। মরুকগে, চোখে ত আর দেখতে হচ্ছে না। তার দুনিয়াটা ত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে হাতের লাঠিটা খুঁজল হরিদাস। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ছপ ছপ করে বর্ষাভেজা হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝাপটা আসছে ঘরের মধ্যে। কোলের কাছে কুঁকড়ে কাঁথা চাপা দিয়ে পড়ে আছে কুসুমের দস্যি ছেলেটা। হাঁতড়ে হাঁতড়ে লাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল হরিদাস। বর্ষাভেজা কানাগলিটা বেয়ে বেয়ে বেরিয়ে এল সে রাস্তায়।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। এই কানাগলির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনেক কথাই জানে হরিদাস। এ গলির ভ্যাপসা বাতাসে একটা বিষ আছে। সেই বিষের ছোঁয়া লেগেছে যাকে সে আর ফেরে নি। দাঁতে দাঁত লাগান উত্তুরে শীতের হাওয়ায় কনকনে বৃষ্টির ফোটাগুলো যেন রক্তকোষে-কোষে তীক্ষ্ণ ফলার মত বিঁধছে। অনড় আর অসার হয়ে আসছে পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত। গলির মুখটা পেরিয়ে এসে পশ্চিমমুখো বড় রাস্তার বাঁকের মোড়েই যে পণ্ডিতের খাবার দোকানটা, ঐ দোকানের উনুনের একটা ধারে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

আঃ! এতক্ষণে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে হরিদাস। সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে জুবরো হয়ে বসে পড়ল হরিদাস। আঃ! ইচ্ছে করছে ঐ জলন্ত কুণ্ডে ঝাপিয়ে পড়ে দুহাতে খামচা-খামচা আগুন নিয়ে লুটোপুটি খায় খানিক। বর্ষাভেজা স্যাঁতানো দেহটা একটু তাজা আর চুরচুরে করে সেঁকে নেয়। অসাড় আর কালিয়ে যাওয়া দুখানা হাতে যেন ফিরে আসছে নতুন করে। শুধু হাতে ত নয়, যেন মনেতেও লাগছে সে তাৎ। ঘরের মধ্যে খা-খেকী আজ রাগ গোসা করে রইল কুসুমটা। কি যেন হয়েছে মেয়েটার! খালি ঘ্যানর আর ঘ্যানর। হু! মোহন ঠাকুরের মা-ই বটে! আগুনে উত্তাপ নিতে নিতে নিজের মনেই একবার ফিক করে হেসে ফেলল হরিদাস। একটু নড়েচড়ে আরও খানিকটা উনুনের কাছাকাছি জুবড়ো হয়ে বসল সে। একেবারে ছেলেমানুষ মেয়েটা! খিদে পেলে একেবারে মোহন ঠাকুরেরও অধম। আহারে! বুকের মধ্যে কোথায় যেন খুচিয়ে ওঠে এক জায়গায়। ভারী কষ্ট হয়! হবে না—সেই কুসুম ত—ঢল ঢলে কচি মুখ মেয়েটার। বোকা বোকা চাওনি—এখনও যে ভাসছে চোখের ওপর। যেন পায়ে-দলা ঝরা মুকুল। দমকা ঝড়ের ওলট পালটে ছিন্নমূল একটি। সেই কুসুমের জন্যে কানায় কানায় স্নেহ আর করুণায় ভরে ওঠে হরিদাসের মনটা। চিন্ চিন্ করে বুকের মধ্যে। সেও ত তাই-ই চায়। ভরে উঠুক কুসুম। ফলে আর ফুলে মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপির মতন উবছে উঠুক ও। আর···

: উরে! মাগো মরে গেলাম মরে গেলাম। তীব্র আর্ত্তনাদে চিৎকার করে উঠল হরিদাস।

সভয়ে চমকে ফিরে তাকাল পণ্ডিত।

: কেরে! আ মলো তুই রয়েছিস ভেতরে? এ্যা! একে-বারে হাতের ওপর পড়েছে নাকি?

: উঃ মলাম গো, একেবারে শেষ হয়ে গেছে হাতটা।

: অ্যা! দেখি—

: মলাম গো—এই আগুনের ধারে একটুক সেঁকছিলাম হাত পাগুলো, তা তুমি—

: আমি কি আর দেখে খুচিয়েছি উনুনটা। এঃ! ঝলসে গেছে যে রে অনেকটা! নে নে ধর। কতকগুলো ভাঙা জিলিপির টুকরো হরিদাসের হাতে তুলে দিলে পণ্ডিত।

: উহু জলে গেল, মরে গেলাম বাবা। কি দিচ্ছ?

: নে ধর না—জিলিপি—

: জিলিপি! বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলে হরিদাস। কতকগুলা ভাঙা জিলিপির টুকরা ভিজে কাপড়ের খুটে জড়িয়ে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল হরিদাস।

ছিপ ছিপে বৃষ্টির বিরাম নেই তখনও। কাপড়ের খুটে বাঁধা জিলিপির পুটলিটা বাঁ হাতে ধরে ঝলসান ডান হাতটা বুকের কাছে তুলে ধরে ফু দিতে দিতে পায়ে পায়ে বাড়ীর দিকে এগোল হরিদাস। জ্বলছে হাতটা। একটুখানি সেকতে গিয়ে—গেরো গেরো। সব কপালের গেরো। নইলে রোজই ত যায়। আঃ যেমন জ্বলুনি পোড়া হাতটার, তেমনি প্রচণ্ড কাঁপুনি শীতের। কেঁপে কেঁপে ঠক্ ঠক্ করে যেন ঠোকাঠুকি খাচ্ছে বুকে আর পাঁজরে। শালা! শালার জীবনটা জ্বলতে জ্বলতেই শেষ হয়ে গেল। নিজের মনে নিজেকে ধিক্কার দিলে হরিদাস। পোড়া মনটাকে নিয়ে হয়েছে সব। আপন নয় নিজের নয়, তবুও—তবুও ছটফট করে উঠল মনটা। কুসুম আর মোহন ঠাকুর—দুখানা বুকের পাঁজরা যে তার। সেই ত কচি আর এক কোটা মেয়েটা—আজ মা যশোদা হয়েছে। ওর কোলের মোহন ঠাকুরকে কি আর চোখে দেখতে লাগে। ও ত, বুকের মধ্যে পটের মতন আঁকা রয়েছে।

বড় রাস্তার বাঁক পেরিয়ে গলির মুখ থেকেই ডাক পাড়লে হরিদাস।

: 'কুসুম রে—ও কুসুম—' শীতে যেন গলার স্বরটা পর্যন্ত জমে গেছে। ডাকের ওপর ডাক পাড়লে হরিদাস। কিন্তু সাড়া দিলে না কুসুম।

: মুখপুড়ী মেয়ের আবার রাগ ছাখ না! মরগে যা। আর দুদিন বাদে আমিও দেব খসাটান্। উঃ মাগো—আর একটু হলেই গিইছিল পাটা হড়কে।

: কই রে—বলি বাড়ীতে আছিস, না একেবারেই—ঘরের সামনে ঝোলান চটের পর্দাটা এক হেঁচকায় সরিয়ে দিলে হরিদাস। আর সঙ্গে সঙ্গে বুককাটা একটা তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়ল।

: মলাম মলাম মরে গেলাম একেবারে—রাক্কুসী খেল আমাকে। পোড়া ঝলসানো হাতটায় তখন রক্ত পড়ছে দর দর করে। ঝটকা টানের সঙ্গে সঙ্গে ঝলসান হাতের পোড়া মাংসটা ছিঁড়ে গেছে অনেকটা।

: যাও গেল সব গেল। কাপড়ের খুটে জড়ান জিলিপির টুকরোগুলি বাঁহাতের তেলোয় নিয়ে বললে হরিদাস।

: বলি হরিদা—

: কে? থিরার মা নাকি?

: হ্যাগো, বলি এই শীতের বাদলা মাথায় ওই একরত্তি রক্তের ডেলাকে নিয়ে কি—না গেলেই চলত না কুসুমের?

: অ্যা! কুসুম—তা হলে—

: ওমা, ক্যাকা সাজতিছ। বলি লকাই ছোড়াটাকে চেন ত? কদিন ধরেই খুব দোস্তানী যার সঙ্গে?

: লকাই।

: হ্যাগো, ওর সঙ্গেই বোধ হয় এবার নতুন ঘর পাততিছে।

: নতুন ঘর! কুসুমের? লকাই! কুসুম! আঃ! যেন থেমে গেছে হু হু করা হিমেল বাতাসের হাড় কাঁপান শীতের তীব্র কনকনানি।

আরও কি যেন বলতে বলতে চলে গেল থিরার মা।

: তা হলে—অনেকদিন আগের ঝাপসা মিলিয়ে আসা ছবিটি যেন নতুন করে ফুটে উঠল হরিদাসের চোখের ওপর।

ওরা চলেছে। ওরা আবার চলেছে। দল বেঁধে চলেছে। সারি সারি যেন একসার জীবন! কোন সোনালী স্বপ্নে ভরা ছবি। বাঁচার নিরাপত্তা নিয়ে ঘর বাঁধবে এবার। কানাগলির জীবন থেকে বাস উঠিয়েছে ওরা। কিন্তু হরিদাস? এক বুক খালি বাতাস নিতে গিয়ে হঠাৎ হাহাকার করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। খালি একেবারে খালি। তবুও যেন—হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ওখানেই বসে পড়ল সে। ভ্যাপসা অন্ধকার ঘেরা কানাগলির জীবনে তাকে ত সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে এবার। ঝলসান পোড়া জায়গাটা দিয়ে টুপিয়ে টুপিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে তখনও। আধ-ভেজা মাটির বুকে সে রক্তের দাগগুলো কামড়ে শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে।

সবার উপরে মানুষ সত্য

অস্পৃশ্যতা-পরিহার

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গীতায় আছে 'সর্ব্বস্য-চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'—ভগবান সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছেন। তিনি সকলের অন্তরবাসী, সকলের অধিদেব। তাই যিনি যোগযুক্ত সমদর্শন, তিনি সকলকে দেখেন নিজের মধ্যে, আর নিজেকে দেখেন সকলের মধ্যে, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান, আর সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান। ভেদদৃষ্টি তাঁর নেই। এই অভেদভাব, অদ্বৈতের এই নির্ম্মল উপলব্ধি ভারতীয় চিন্তার মূলে। এই উপলব্ধিবশে জীবনপথে মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে মানুষ বলেই গ্রহণ করতে হবে। মানুষের অন্তরে যিনি সন্নিবিষ্ট হয়ে আছেন, শতদলে বিকশিত হয়ে মানুষের সেই হৃদয় বাহিরে কর্ম্মপথে তাঁকে ধারন করে ধন্য হবে, সুন্দর হবে, সার্থক হবে। এই তার পরমার্থ, তার পুরুষার্থ। মানুষের সহিত মানুষের মৈত্রী সম্পর্কের গভীর সূচনা, প্রেমবন্ধনের অক্ষয় রাখী এইখানে। তাই 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই নীতিই লোক-ব্যবহারে সর্ব্বোত্তম। এই নীতি নিয়ত পালিত হলে কর্ম্মের পথ হয়ে ওঠে ধর্ম্মের পথ। আর এইরূপে রক্ষিত হলেই ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—মানুষ সম্বন্ধে এর বড় সত্য আর নেই। মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ কর, পরস্পরের কল্যাণ চিন্তায় ও সহযোগিতায় শ্রেয় লাভ কর; মানুষকে অবহেলা করো না, অবজ্ঞা করো না, অপমান করো না।

তথাপি অপমান কতই না সহ্য করেছে আমাদের সমাজের বিশাল এক অংশ। তারা ছয় কোটি। তারা তথাকথিত অস্পৃশ্য। মানুষ মর্য্যাদা-গর্ব্ব তারা বহু শতাব্দী ধরে হারিয়ে এসেছে। এদেরই জন্যে আজ নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। এই বাণী প্রেমের বাণী। ঘৃণায় যাদের দূরে পরিহার করেছি, আজ প্রেমের অভিষেকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিতে হবে।

অপমান করলে একদিন সে অপমান ফিরে আসে নিজের উপর, যেমন ফিরে আসে আঘাত প্রতিঘাত হয়ে। অপমানের অশ্রু তাই ভালবাসা দিয়ে মুছে দিতে হয়, অনাদরের বেদনায় যে হৃদয় বিদ্ধ হয়ে আছে তার জন্যে পেতে দিতে হয় প্রেমের আসন। এই প্রেমই হ'ল অস্পৃশ্যতা পরিহারের গোড়ার কথা—আপনজনকে পর করেছিলাম, তাকে আবার আপন বলে স্বীকার, বর্জ্জনের সুদীর্ঘ কাল অন্তে পুনর্গ্রহণ, বিচ্ছেদের পর মিলন।

অস্পৃশ্যতা পরিহার কেবল বৈষয়িক বুদ্ধিপ্রসূত নয়, রাজনীতি এর নিয়ামক নয়। অস্পৃশ্যতা পরিহার ধর্ম্মের অঙ্গ—প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ। এই ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্বত্র পালিত হলে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সমাজ পরিশুদ্ধ হবে, বলিষ্ঠ হবে। তখন অনুভব করব সমাজের অঙ্গে অঙ্গে নিবিড় যোগ, সমাজের প্রাণময় অখণ্ডতা।

বলিষ্ঠ হাত দুখানার জোরে যারা সেবা করে, সাফাই করে, ফসল ফলায়, শিল্প সৃষ্টি করে, দেশের জীবনপ্রবাহে যারা নিয়ত গতি সঞ্চার করে সমাজকে সুস্থ সবল করে রাখে, যাদের শক্তিসঞ্চালনে সমাজের ভিত কঠিন ও মজবুত হয়ে থাকে, তাদেরই ছয় কোটি সমাজে মানুষ-মর্যাদা পায় নি, হীনতার বোঝার ভারে তারা পরিম্লান, নতশির, শুষ্কমুখ, তারা নাকি নীচ, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য। মানুষকে যেখানে এত বড় অপমান করে, বিধাতা সেখানে বিমুখ হন। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে যে সমাজ বাধা দেয়, আর সেই পাপের সমর্থনে শাস্ত্র হতে বচন উদ্ধার করে ধর্ম্মের দোহাই পাড়ে, বিধাতার ন্যায়দণ্ডের কঠোর আঘাত পড়ে তাদের মাথার উপর।

তবু আশার আলো দেখা দেয়। প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়। সমাজের গভীর অধ্যাত্ম সত্তায় দোলা লাগে। বাণী শোনা যায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ কর, স্বীকার কর—প্রেমের জয় বিস্তার কর।

দেখি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিভৃত সাধনায় গভীরে ডুব দিয়েছেন। মায়ের কাছে নিজের অহংকে বলি দিচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সন্নিকটে একঘর অস্পৃশ্য পরিবার বাস করত। অস্পৃশ্যের ছোঁয়া পড়লে গঙ্গাস্নানের পর মন্ত্র পাঠ করে শুচি হবার বিধি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিন্তু একদিন তাদের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, দেখ ভাই, আমি তোমার ঘর দ্বার আঙিনা সমার্জ্জন করে দেব। কথা শুনে সে ত অবাক। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ কি না নীচ অন্ত্যজের ঘর দ্বার আঙিনা ঝাট দিয়ে দেবেন! এ কি কাণ্ড! সে মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছে ত? সে পাগল হয়েছে, না স্বপ্ন দেখছে? তথাপি দেখা যায়, ঠাকুর দীন নয়নে তার দিকে চেয়ে তার সম্মতির অপেক্ষায় আছেন। ঠাকুরের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম—এই অভিমান আজ তাঁকে বলি দিতে হবে। কিন্তু হ'ল না, অন্ত্যজ বিভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে গেল।

তার পর একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুর তাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মাথার দীর্ঘ কেশ দিয়ে তাদের গৃহ সমার্জ্জন করতে করতে ঠাকুর বলতে লাগলেন—"মাগো, আমাকে এই অস্পৃশ্যদের সেবক করে দে মা, আমি যে এই

দীনজনদের চেয়েও দীন এই বোধ আমার হৃদয়ে জাগিয়ে দে মা।" যাঁর সাধনায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের রাজমার্গ উন্মুক্ত হয়ে ভারতের নব জাতিগঠনের আধ্যাত্ম ভূমি রচিত হয়েছে, তিনি এমন করেই সেদিন অচ্ছুৎকে প্রেমের অভিষেক দিয়েছিলেন।

তার পর এলেন তাঁর মানসসন্তান—বেদান্তকেশরী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে অধ্যাত্ম বিপ্লব তাঁর গুরুর সাধনায় পূর্ণতালাভ করেছিল তিনি সেই বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিলেন সমাজের সকল স্তরে। তাঁর শ্লেষ-কঠিন আক্ষেপ সমাজের হৃদয়দ্বারে আঘাত হানল। তিনি বললেন, "আমরা এখন বৈদান্তিক নহি, পৌত্তলিক নহি, তান্ত্রিক নহি। আমরা এখন কেবল ছুঁৎমার্গী, আমাদের ধর্ম্ম এখন রান্নাঘর, আমাদের ঈশ্বর হয়েছেন ভাতের হাঁড়ি।" তার পর আশার বাণী দিয়ে জাতিকে আহ্বান করে বললেন, "ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।...বল ব্রাহ্মণ-ভারতবাসী, চণ্ডাল-ভারতবাসী আমার ভাই।"

এমনি করেই বাংলা দেশে এবং বাংলা হতে সারা ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়ে গেল। চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভা হতে জয়ী হয়ে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর জয় বিস্তারের সঙ্গে হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্যতার ভিত টলে উঠতে লাগল।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের বিশাল হৃদয়ের গভীর অনুভূতি অস্পৃশ্যের অপমানে চঞ্চল হয়ে উঠল। শত শত বৎসর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের এই বিষ ভারতের নাড়িতে নাড়িতে বিষর্পিত হয়ে আছে। সেই বিষক্রিয়ায় সমাজ ক্লান্ত ও দুর্ব্বল। এতকাল ধরে যাদের হেয় করে রাখা হয়েছে তারা আজ আমাদের হীনতার পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের সেই বিষাদ-মাখা গাথা—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
... ...
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

সেই অপমানের বোঝা নামিয়ে দিয়ে অপরাধ স্খালনের জন্যও তিনি দেশকে আহ্বান করেছিলেন। জাতি-চিত্তকে ভারততীর্থে জাগাবার জন্যে আর একটি গাথা তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল। সে গীতি আশার উজ্জ্বল আনন্দে উদ্বেল, তার আহ্বান সর্ব্বজনমনোজয়ী—

এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার
মার অভিষেকে এস ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

জাতি-চিত্ত অস্পৃশ্য জনগণ সম্বন্ধে ক্রমে জেগে উঠতে লাগল। লোকমান্য তিলক মহারাজের তিরোধানের পর জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভারতবর্ষকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। মার অভিষেকের মঙ্গলঘট ভরে নেবার জন্যে চাই তীর্থনীর, সেই নীর হবে সবার পরশে পবিত্র-করা। ডাক পড়ল সর্ব্বজনের স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-হরিজন, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান সকলের। কিন্তু বহু শতাব্দীর বাধা ত অস্পৃশ্যের পথও রোধ করে আছে। সে ত পতিত, অচল, অপমানভারে অবনত। তাই দেশে অভিনব প্রাণবন্যা সৃষ্টি করে দেশের প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে অস্পৃশ্যতা পরিহারের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে জনসভায় অস্পৃশ্যতা পরিহারের সঙ্কল্প গৃহীত হতে লাগল। নিষেধের গণ্ডী টেনে সমাজে সর্ব্বত্র অস্পৃশ্য ও অনাচারীদের দূরে ঠেলে রাখা হয়েছিল। দিকে দিকে এখন গণ্ডী ভেঙ্গে পড়তে লাগল। স্বয়ং পতিতপাবন এসে দাঁড়ালেন পতিতের উদ্ধারের জন্যে। যে-প্রথা স্বতঃসিদ্ধ বলে এতকাল স্বীকৃত হয়েছিল এইবার তার মূলে গিয়ে টান পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সফল হতে চলল—"বেরুক নতুন ভারত, বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।"

অস্পৃশ্যের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দিলেন গান্ধীজী আপন হাতে। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচতে হলে অস্পৃশ্যতাকে মরতে হবে, আর অস্পৃশ্যতা বাঁচলে হিন্দুধর্ম্ম মরবে।

সবরমতী আশ্রম আরম্ভের একটি কথা। একদিন এক অস্পৃশ্য পরিবার আশ্রমে এসে উপস্থিত। তাঁরা আশ্রমিক হয়ে সেই স্থানে থাকতে চান। গান্ধীজী বুঝতে পারলেন এইবার সংগ্রামের আহ্বান এসেছে। অস্পৃশ্য পরিবারকে যদি আশ্রমে স্থান দেন তবে যাদের সহানুভূতির উপর আশ্রমের নির্ভর তাঁরা কি বলবেন? তাঁরা কি সম্মতি দেবেন? তাঁরা ত সকলেই বর্ণ হিন্দু···সমাজের উচ্চ স্তরে তাঁদের স্থান। গান্ধীজী দ্বিধা করলেন না। আশ্রমে সেই পরিবার-বর্গকে গ্রহণ করে নিলেন। ক্রমে দেখা গেল, আশ্রমে বর্ণহিন্দুদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে ··তাদের সাহায্য সহানুভূতি থেকে আশ্রম ক্রমে বঞ্চিত হয়ে উঠছে। ক্রমে আশ্রমে অর্থসঙ্কট দেখা দিল। গান্ধীজী স্থির করলেন আশ্রম পরিত্যাগ করে আশ্রমিকদের নিয়ে অস্পৃশ্যদের পল্লীতে গিয়ে বাস করবেন। শরণাগত অস্পৃশ্য পরিবারকে মানুষ বা ভাগ্য কারও ভ্রূকুটির ভয়ে তিনি ত্যাগ করবেন না। শেষে বিধাতা সহায় হলেন। আশ্রমের শেষ কপর্দ্দকটি যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন অজ্ঞাত অপরিচিত কোন বন্ধু এক-

দিন অলক্ষ্যে আশ্রমকে অর্থসাহায্য করে গেলেন। আশ্রমিকদের আর আশ্রম ছেড়ে যেতে হ'ল না। তার পর ক্রমে দেশের হাওয়া ফিরতে লাগল। আর বর্ণহিন্দুদেরই উৎসাহ, অর্থসাহায্য ও কর্মতৎপরতায় অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলন ক্রমে ভারতব্যাপী হয়ে উঠল।

এইবার গান্ধীজীর সেবাগ্রাম আশ্রমের একদিনের কথা বলি। একদিন হরিজনদের একদল সেবাগ্রাম আশ্রমে এসে উপস্থিত। অস্পৃশ্যদের নূতন নামকরণ হয়েছে এই হরিজন। তাদের কি সব অভিযোগ আছে। তাই তারা দল বেঁধে সেবাগ্রাম আশ্রমে গান্ধীজীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে।

গান্ধীজী তাদের অভ্যর্থনা করে বললেন—বেশ, তোমরা এখানে কোথায় থাকবে জায়গা ঠিক করে নাও। তোমরা চাও ত আমার এই কুঁড়েঘর ছেড়ে দি।

হরিজনরা কস্তুরবার কুটীরের এক অংশ, আর বারাণ্ডা দখল করে বসল। দেখে কস্তুরবা হেসে বললেন, 'বেশ, আমি তা হলে থাকি কোথায়?'

গান্ধীজী বললেন, 'তোমার ত বেশী জায়গার দরকার হয় না। আর জান ত আমার ঘরটুকু আমি তাদের ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম।' কস্তুরবা বললেন, 'ওরা ত তোমার সন্তান,. তাই তুমি ওদের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলে।' গান্ধীজী বললেন, 'ওরা আমার যেমন সন্তান, তোমারও কি. তেমনি নয়?' কস্তুরবা হার মানলেন।

এই প্রেম দিয়েই গান্ধীজী হরিজনদের হৃদয় জয় করে তাদের মানুষ-মর্য্যাদা দিয়ে গেছেন। আজ স্বাধীন ভারতের সংবিধানে হরিজনের মর্য্যাদা অপর সকল ভারতীয়েরই সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে, সংবিধান অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেছে। সংবিধান যা সম্পূর্ণ করেছে হিন্দুসমাজ লোক ব্যবহারে এখন তা পূর্ণরূপে পালন করুক এই প্রার্থনা।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং বেতার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

বঙ্গভাষা-বন্দনা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ছন্দময়ী বঙ্গভাষা নন্দনেরি গন্ধে ঢালা,
জাতির জাগরণের সে যে জ্বালিয়ে দিল বহ্নি জ্বালা।
সৃষ্টিময়ী বিপ্লবিনীর প্রাণ মাতানো মধুর নাচন
এই ভারতের মুক্তিযোগের প্রথম সে যে স্বস্তিবাচন,
বক্ষ তাহার লক্ষ্য ধ্যানীর আত্মবলির রক্তে ঢালা।

বাংলা ভাষা মিষ্টি বড়ো দৃষ্টি তাহার সকল পাওয়া,
সৃষ্টি তাহার জগৎজয়ী কৃষ্টি তাহার আকাশ ছাওয়া,
সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার আনন্দে সে ছন্দে ঢালা।

বাংলা ভাষা সকল রসের বাদল বুকের মাদল বাজন,
দোল ঝুলনের রাসের সে গান চড়ক পূজার বাজায় গাজন
মন্দিরে তার সব ধরণীর জ্ঞানের মহাপ্রদীপ জ্বালা।

সভ্যতারি বঙ্গবেদীর প্রথম সে যে আলিম্পন,
সত্যশিবসুন্দরেরি জাতির সে যে আলিঙ্গন
মৃত্যুজয়ী অভয় দানে জীবনকে সে পরায় মালা।

বঙ্গভাষা ভাষার রাণী জাতির সে যে বিজয় নিশান,
সৃষ্টিতে সে বাজায় বাঁশী বিপ্লবে সে বাজায় বিষাণ,
অন্যায়েরি ধ্বংসে তারি চক্ষে জ্বলে বহ্নিজ্বালা।

বাংলা ভাষা জগৎসভায় আসন পেল সবার বড়ো
যাহার ক্ষীরোদ হ্রদের কূলে নিখিল মানব হৈল জড়ো,
স্বর্গভাষার আত্মজা সে জগৎরবির ছন্দে ঢালা।

রূপকথারি স্বপ্নে আঁকা প্রত্নতত্ত্ববিদের পুরী
উপন্যাস আর ইতিহাসে বিশ্বেরি মন করলে চুরি,
কণ্ঠে তোমার সকল ভাষার দুলছে যে মা বিজয়মালা।

জগৎজয়ী সে মোর মায়ের চরণ চল আজ পূজবি কে?
চলবে সে যে ঝঞ্ঝাবাদল অগ্নিরথে জয় হেঁকে,
(তার) যাত্রাপথে রাত্রি দিবা জগজ্যোতির দীপ্তি জ্বালা।

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

সবাই জানে আমেরিকা নূতন আবিষ্কৃত দেশ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি সম্বলিত জিনিস বিশেষ কিছু নেই। যা দেখি সবকিছুই কলম্বাসের আবিষ্কারের পরের সৃষ্টি। এখন যারা আমেরিকান বলে পরিচিত—তারাও প্রাচীন আমেরিকান নয়; সবাই জানে তারা ইউরোপেরই নানা জাত এদেশে এসে একটা মিশ্রিত নূতন জাতে পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে ইংরেজই প্রধান, তাই ভাষা এদের ইংরেজী। যারা প্রাচীন আমেরিকান ছিল তাদের নাম রেড ইণ্ডিয়ান বা শুধু ইণ্ডিয়ান বা চিপওয়া প্রভৃতি। কিন্তু এখন তারা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দূরে দূরে তাদের এক একটা বস্তি আছে, যেখানে আধুনিক আমেরিকান ঐশ্বর্য্য বা সভ্যতার বিশেষ চিহ্ন নেই। তবে পুরাণো রেড ইণ্ডিয়ানরা এবং ইউরোপীয় নবাগতরা যে এক সময় বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছিল এটা আধুনিক আমেরিকানদের চেহারা দেখলে খুব মনে হয়। আমেরিকান মেয়েরা দোকানে গিয়ে চুল কোঁকড়া করে, কিন্তু পুরুষদের অনেকেরই চুল কাঁটার মত সোজা। চীনা এবং জাপানীদের চেহারা আমেরিকানরা মোটেই পছন্দ করে না, অথচ রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি মিশ্রণের ফলে বহু আমেরিকানের চেহারা মঙ্গোলীয়ান ধরনের। এমন অনেককে দেখেছি যাঁরা কথা বলবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁদের চীনা ভেবেছি। কথা বলবামাত্র বোঝা যায় যে, তাঁরা আমেরিকান। ফ্রান্স বা ইটালীতে যে ধরনের চেহারা সর্ব্বদাই চোখে পড়ে সেই রকম ছাঁচা ছোলা পাতলা—ফরাসী মুখাবয়ব বা গ্রীক নাক চোখ আমেরিকাতে যে নেই তা নয়, তবে সংখ্যায় তারা অনেক কম। আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্টের চেহারা যে ইউরোপীয় চেহারা নয় তা সকলেই বলবেন।

আমরা যখন ছোট ছেলেদের আমেরিকা বিষয়ে পড়াই তখন তাঁবুর মত 'উইগওয়াম' ঘর, মাথায় পালকের মুকুটপরা পুরুষ এবং ধাবমান অশ্বের পিঠে 'Cow boy' প্রভৃতির ছবি দেখাই ও গল্প বলি। কিন্তু ছবির বইয়ের বাইরে এদের অস্তিত্ব যে কোথায় জানি না। নাচ এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ঐ রকম সাজ-সজ্জা মাঝে মাঝে দেখা যায়। শীতকালে এদেশে একটা বিরাট কার্ণিভাল উৎসব দেখেছিলাম, তাতে অনেকে মাথায় পালকের মুকুট পরে নেচেছিল; কিন্তু বাস্তবে নর্ত্তকেরা শ্বেতকায় জাতি এবং পোশাকটা যে সখের তা ত বলাই বাহুল্য। আমার মেয়েরা 'ইণ্ডিয়ান' বলত নিজেদের, তাই অনেক ছেলেমেয়েরা ওদের জিজ্ঞাসা করত যে, ওরা কম্বল পরে কিনা এবং ওদের বাবা মাথায় পালকের মুকুট পরেন কিনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই সব ছেলে-মেয়েরা 'রেড ইণ্ডিয়ান' পোশাক-পরা প্রাচীন প্রকৃত 'রেড ইণ্ডিয়ান' দেখেইনি।

প্রাচীন 'রেড ইণ্ডিয়ান'দের অনেক কারু-শিল্পের নিদর্শন এখনও কিন্তু এদিকে ওদিকে পাওয়া যায়। ওদের নক্সা-করা কম্বল, তাদের ধরনের আংটি, থলি ইত্যাদি অনেক দোকানে অল্পস্বল্প কিনেছি এবং সেগুলি বাস্তবিক ভারী সুন্দর দেখতে। 'চিকাগো'-র একটা বড় মিউজিয়মে দেখেছি এদের ব্যবহৃত সোনার গহনা, মেয়েদের সোনার কাঁচুলী, সোনার মূর্ত্তি, কাপড়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা এবং আরও অনেক ঐশ্বর্য্য মূল্যবান এবং নয়ন-মুগ্ধকর। এক সময় এই সব ঐশ্বর্য্য স্পানিয়ার্ডরা প্রচুর লুট করেছিল।

আমেরিকায় যে নানা জাতির মিশ্রণ হয়েছে তাদের শ্রেণী বিভাগ খুব বিজ্ঞানসম্মত আমার মনে হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় জাতির মিশ্রণে যাদের উৎপত্তি তারা যেখানে সভ্য ও শিক্ষিত হয়ে গিয়েছে সেখানে তারা আমেরিকান বলেই পরিচিত এবং পাশ্চাত্য জাতির মত সম্মানিত। কিন্তু নিগ্রো জাতি আফ্রিকা হতে দাসরূপে আমেরিকায় এসেছিল এবং তাদের রং ও চেহারা রেড ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে খারাপ। আমার মনে হয় সেইজন্ত নিগ্রো এবং শ্বেতকায়ে মিশ্রিত যে জাতি তারা এখনও নিগ্রো নামেই পরিচিত এবং তাদের সম্মানও শ্বেতকায়দের চেয়ে অনেক কম। নিগ্রো বলে পরিচিত অনেক মানুষ আমি দেখেছি যাদের চোখ নাক মুখ নিখুঁৎ এবং রংও কারুর কালো কারুর বা উজ্জ্বল শ্যাম অথবা প্রায় গৌর বর্ণ। চুল অবশ্য কোঁকড়া। কিন্তু এরা সবাই নিগ্রো নামেই পরিচিত। এবং কোথাও গোপনে এবং কোথাও বা প্রকাশ্যে অবজ্ঞাত এবং নানা ভাবে বঞ্চিত। কালো রং ফরসা করা যায় না। এবং প্রাচ্য দেশের অনেকেরই রং অল্প বিস্তর কালো বা শ্যামাভ। তাই কালো রঙের চেয়ে কোঁকড়া চুলের উপরই নিগ্রোদের নিজেদের আক্রোশ বেশী। অনেক মেয়েই

দেখেছি এবং হয়ত ছেলেরাও দোকানে গিয়ে চুল টানিয়ে টানিয়ে সোজা করবার চেষ্টা করে। তার ফলে কোঁকড়া চুল ক্রমশঃ ঢেউ খেলানো প্রায় সোজা হয়ে আসে। কিন্তু এত করেও শ্বেতকায়ের মত সমাদর এরা পায় না। আমি যত আমেরিকান বাড়ীতে ও ক্লাবে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি সর্ব্বত্রই নানা রকম অন্যান্য অতিথির সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু ছুটি মাত্র বাড়ীতে নিগ্রো অতিথি দেখেছি। আর ছুটি ক্লাবে দেখেছিলাম নিগ্রো মেয়েকে বড় গাইয়ে এবং বাজিয়ে বলে ডাকা হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন দেখতে মেমসাহেবেরই মত কেবল চুলটা একটু কোঁকড়া। অনেক শ্বেতকায় আমেরিকান আছে যাদের রং খুব সাদা নয়, সুতরাং রং দেখে বিচার করলে কে কোন্ জাতি ঠিক বোঝা যায় না।

যাই হউক, হোটেলেও খেতে গিয়ে দেখেছি দুই-একটা জায়গা আছে যেখানে শ্বেতকায় ছাড়া কাউকে খেতে দেয়না। তবে আমাদের কেউ কখনও বাধা দেয় নি। একটা মফস্বলের হোটেলে শুনেছিলাম আমাদের সঙ্গী দুই সাহেব ছিলেন বলে আমাদের খাবার দিয়েছিল, না হলে নাকি অশ্বেতকে খাবার তারা দেয় না। এতেই বোঝা যায় যে, নিগ্রোদের তারা ঢুকতেই দেয় না। ভারতবর্ষীয়দের সম্মান নিগ্রোর চেয়ে বেশী তবে ঠিক কতটা তা বলা শক্ত, কারণ মৌখিক ভদ্রতার কথায় সব ত বোঝা যায় না।

আমেরিকান জাহাজে দেখেছি উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীরা কেউ নিগ্রো নয়। পরিবেশন-কারী এবং চাকর-বাকররা অনেকে নিগ্রো বা আধা-নিগ্রো। শ্বেত আমেরিকানদের মতে নিগ্রোরা নাকি গান-বাজনা ছাড়া আর কোন উচ্চশ্রেণীর কাজে পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। রান্না-বান্নাও অনেকে খুব ভাল করে। তবে একদিক দিয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে নিগ্রোদের অবস্থা ভাল। কারণ নিগ্রোরা পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বেড়ায়, ভাল জায়গায় নীচু কাজ হলেও করে। কিন্তু খাঁটি অমিশ্রিত রেড ইণ্ডিয়ান যারা তারা এক একটা "রিজার্ভ"-করা এলাকার বাহিরে থাকতে পায় না। দূর থেকে একবার একটা পল্লী দেখেছিলাম—ছোট ছোট কাঠেরই বাড়ী। তবে শ্বেতকায়দের বাড়ীর মত বড় এবং সুন্দর নয়, অনেক ছোট এবং অত্যন্ত সাদাসিধা।

নিগ্রোরাও ভাল পাড়াতে বাড়ী করতে বা ভাড়া নিতে পায় না সচরাচর। শহর থেকে একটু বাইরেই তারা বাড়ী করে। ট্রেন থেকে কিছু কিছু নিগ্রো Chicagoতে পাড়া দেখেছি। বেশ দোতলা বড় বাড়ী, তবে একটু ভাঙাচোরা এবং অপরিষ্কার। আমাদের পরিচিতা একজন খুব সুশিক্ষিতা নিগ্রো মহিলার বাড়ী আমরা গিয়েছিলাম। তাঁরা পিতাপুত্রী দু'জনেই খুব পণ্ডিত এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বাস করেন মাঠের মধ্যে নির্জ্জন জায়গায় একটা ভাঙা বাড়ীতে। মানুষটি মার্জ্জিত এবং সুশিক্ষিত বলে বাড়ীর ভিতর নিজের মনের মত সুন্দর করে সাজিয়েছেন, কিন্তু ফুটো পাইপ ভাঙা কল ঝরঝরে দেয়াল যেমন তেমনই আছে। তিনি বললেন, "বাড়ীটা খুবই পুরাণো, কিন্তু এর চেয়ে ভাল বাড়ী আমি পেলাম না।" অথচ ভাল বাড়ীর অভাব ওদেশে নেই। এই ভদ্রমহিলার মা মেমসাহেবের মত ফরসা কিন্তু চুল কোঁকড়া; বাবা কালো নিগ্রোর মতই।

আমরা ওদেশে থাকতে একটি কালো মহারাষ্ট্রীয় ছেলেকে কোন শহরে একটাও হোটেলে ঢুকতে দেয় নি। সে ছেলেটি সেই ছোট শহরের স্কুল-কলেজ দেখতে গিয়ে ছিল। হোটেলে ফোন করে যখন বলে, "আমি ভারতীয়, হোটেলে জায়গা চাই।" তখন হোটেলওয়ালারা সম্মত হয়। কিন্তু গিয়ে যখন হাজির হ'ল তখন তার কালো-কোলো চেহারা দেখে একজনও ঢুকতে দিল না। অথচ এই ছেলেটি সেণ্টপল শহরে শ্বেতকায় ভদ্র পরিবারে পেইং-গেষ্ট ছিল বহুদিন। সেণ্টপলে ফিরে এসে ছেলেটি কাগজে সব কথা লিখে দেয়। কাগজের সম্পাদক ভাল বলতে হবে যে, সব ছাপেন। দিন কতক শহরে এই নিয়ে একটু চাঞ্চল্য হয়েছিল। কারণ মিনেসোটাতে নিগ্রো নিগ্রহ প্রায় হয় না। এর জন্য ভারতীয়দের কাছে কোন কোন আমেরিকান লজ্জা প্রকাশ করেন এবং মহারাষ্ট্রীয় ছেলেটি কাগজে লিখে দেওয়াতে কোন কোন ভারতীয় লজ্জিত হয়ে পড়েন।

সেণ্টপল শহরের মেকালেষ্টার কলেজে হাজার তিন ছেলে-মেয়ে পড়ত, তাদের মধ্যে ১০।১১ জনের বেশী কালো ছাত্র-ছাত্রী নয়। দু'টি ছাত্রীর মধ্যে একটি আফ্রিকার লাইবিরিয়া থেকে শিক্ষা বিষয়ে এম-এ পড়ত, অন্যটি সঙ্গীত শিক্ষা করত। দ্বিতীয়া আমেরিকান নিগ্রো। জীবনপথে ইচ্ছামত চলতে না পারার জন্য শোচনীয় ঘটনাও ঘটতে শুনেছিলাম একটি ছেলের বিষয়ে।

এই শহরেই হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪।৫ জন নিগ্রো ছাত্র ছিল। একজন দেখতে খুবই সুপুরুষ, কিন্তু যেহেতু নিগ্রোরক্ত শরীরে আছে তাই কোন শ্বেত ছাত্রী তার সঙ্গে মিশত না বা বেড়াত না। সচরাচর প্রত্যেক শ্বেত ছাত্রেরই অনেক বান্ধবী থাকে। এই নিগ্রো ছাত্রদের মধ্যে অবস্থাপন্নও ২।৩ জন ছিল। তারা বড় বড় মোটর গাড়ী চড়ে আসত। কলেজে যখন ছাত্রছাত্রীদের যুগ্ম নাচ হ'ত তখন এই ছেলেরা নাচে যেত না, কারণ ওদের সঙ্গিনী

কেউ হবে না জানত। যখন দল করে সবাই একত্রে নাচত তখন এই ছেলেরাও যোগ দিত। ছেলেদের মধ্যে ডাক্তারী পড়ে এমন ছাত্রও ছিল।

যদিও কলেজে নিগ্রো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত কম, তবু যখন ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকা হতে ভারতবর্ষে ভ্রমণে আসে তখন তাদের ৮।১০ জনের মধ্যে ২।৩ জন বা আরও বেশী নিগ্রো চীনা প্রভৃতি পাঠানো হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়।

একই জাতের মানুষ এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে কয়েক শত বৎসর বাস করলে তাদের মধ্যে নূতন কতকগুলি বিভিন্নতা গড়ে ওঠে। আমেরিকায় গেলে সেটা বেশ বোঝা যায়। আমেরিকানরা ইংরেজী বলে এবং অনেকের মধ্যেই ইংরেজ রক্ত আছে। কিন্তু এদের ব্যবহারে কয়েকটা জিনিস দেখতাম যা ইংরেজদের মধ্যে দেখি নি। এরা খুব মিশুক জাত। আমরা যখন আমেরিকার পথে ইংলণ্ড হয়ে যাই তখন অপরিচিত কোনও ইংরেজ আমাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করত না। অথচ লণ্ডনেও আমেরিকানরা দেখলেই আমাদের নাম-ধাম বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য ইত্যাদি সব জিজ্ঞাসা করত এবং নিজেদের সমস্ত পরিচয় দিত। টাকা আছে বলে কিনা জানি না, এরা খুব আতিথ্যপরায়ণ। আমরা একদিন "কোয়েকার" সম্প্রদায়ের জন কয়েকের সঙ্গে লণ্ডনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, দলে ইংরেজও কিছু কিছু ছিলেন। কিন্তু বন্ধুত্ব করলেন আমেরিকানরা আগে, এবং তাঁদের দেশে গেলে তাঁদের বাড়ী যেন কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করি ২।৩ জন মহিলা বললেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের খোঁজ-খবর করেন। আমেরিকায় পৌঁছেও দেখলাম অবস্থাপন্ন নন এমন কয়েকটি পরিবার নিজে থেকে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। তাঁরা আমাদের কলেজ সংক্রান্ত কেউ নন, কিন্তু কতবার যে একটি পরিবারের আতিথ্য আমরা ভোগ করেছি তার ঠিক নেই। অন্য জন বাড়ীতে বেশী না ডাকলেও খাবার করে পাঠানো, তদারক করতে আসা, পালায় পার্ব্বণে দেশে এবং এখানেও উপহার পাঠানো সর্ব্বদা করতেন।

আমেরিকানরা নিজের বাড়ীর অন্দরমহল ও বাহিরমহল সম্বন্ধে খুব সচেতন নয়। কোন বন্ধু বাড়ীতে এলে ওরা তাকে বাড়ীর লোকের মতই রান্নাঘর, শোবারঘর সর্ব্বত্র নিয়ে যায়। নূতন লোকেরাও যখন আমাদের বাড়ী আসতেন তখন আমাদের বাড়ীর সর্ব্বত্র দেখতাম, অবাধে তারা ঘোরাফেরা করতেন।

লর্ড বার্মিংহাম নামে এক ইংরেজ বহু বৎসর আগে লিখেছিলেন যে, ইংরেজ বা পশ্চিম-ইউরোপের কোন লোক যখন বাড়ী তৈরি করে তখন চার পাশে সর্ব্বাগ্রে পাঁচিল গেঁথে দেয়। কারণ বাড়ীর ভিতর কে কি করছে এটা তারা কাউকে দেখতে দিতে চায় না, তাদের বৈঠকখানাও লোকের চোখে পড়ে তা তারা চায় না। কিন্তু আমেরিকানরা পাঁচিল তোলায় বিশ্বাস করে না। রাস্তার ধারে তাদের বাড়ী পথিকের দৃষ্টির উপরই থাকে। প্রথম ঘরটার ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায়, অন্য ঘরও উঁকি-ঝুঁকি মারলে যে না দেখা যায় এমন নয়। দুটো বাড়ীর মাঝখানে এক হাত উঁচু ফুলের চারা ছাড়া বড় কিছু থাকে না, কাজেই কে কোথায় কাপড় কাচছে, কাপড় শুকোচ্ছে বা জঞ্জাল ফেলছে এটা পাড়া-প্রতিবেশী সবাই দেখে। সামনের পোর্চে বিকালে যদি বাড়ীর লোকে বসে জটলা করে তাও সকলেই দেখতে পায়। আমেরিকানদের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, তারা খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালবাসে। ইংলণ্ডে যদি কেউ চায়ের নিমন্ত্রণ করে তাহলে চা ছাড়া বড় কিছু খাদ্য থাকে না। আমেরিকাতে আমাদের লোকে চায়ে ডাকত না, যারাই ডাকত ৬টায় ঘটা করে প্রচুর খাদ্য দিত। বাড়ীর গৃহিণীরা যখনই ডেকেছেন পুরা খাবার খাইয়েছেন। ক্লাব প্রভৃতিতে অবশ্য কফি, চা কেক্ ইত্যাদি দিত।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

সেদিনের প্রত্যেকটি কথা মেরীর স্পষ্ট মনে আছে, এমনকি গিবনের খুঁটিনাটি কথাগুলিও। গিবন বলেছিল—আজকাল ব্যবসার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শিল্পের উন্নতি যত হচ্ছে, ততই ঘুচে যাচ্ছে কোন একজনের রাতারাতি বড়লোক হবার সম্ভাবনা। অথচ তাই হতেই সাধ গিবনের। ব্লকের কাজ এত ভাল হচ্ছে। কিন্তু ওর নিজের দিক থেকে বিশেষ কি লাভ? ওর আশা ছিল ডিপ্লোমা পেলে পূবদিকের অনুন্নত দেশগুলির কোথাও একটা গিয়ে বসবে, রাজার হালে দিন কেটে যাবে। কারণ ইউরোপ বা আমেরিকা এত ব্যাপক ভাবে, এত দ্রুত এগোচ্ছে যে একক কারও কিছু বিশেষ সুবিধা করার আশা নেই।

মেরী বলেছিল—"কিন্তু শুনছি অনুন্নত দেশগুলিও আজকাল বেশ তাড়াতাড়ি উন্নত হয়ে উঠছে, ওদিকের রাস্তাও বোধ হয় শীগগির বন্ধ হয়ে যাবে।"

গিবন বলেছিল—"তা বটে, তবে ভারতে এখনও সাদা জাতের মান আছে। কারণ ওরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে অথচ বড় হবার, উন্নতি করার ইচ্ছে খুব। কাজেই আমরা ছাড়া ওদের গতি নেই। এ আমি সাধারণ ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে মিশেই বেশ বুঝেছি। তাই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে এলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও আমাদের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।"

মেরী দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলেছিল—"সত্যি?"

গিবন বললে—"নিশ্চয়ই। তাই ত ভাবছি মেরী। তোমার বন্ধুর কাছে একবার খোঁজ কর না। সে ত নিশ্চয়ই রইস্ আদমী, নয় ত সখ করে এত দূরে পড়তে আসবে কেন?"

—"কি খোঁজ করব?"

—"খোঁজ করবে যে ওর সন্ধানে কোন বড়লোক রাজা-টাজা আছে নাকি, যে একটা প্রিন্টিং প্রেস খুলতে চায়—উইথ মোস্ট মডার্ন ইকুইপমেন্টস্। একেবারে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি।"

মেরী হেসে বললে—"আহা ও ত তোমারই বন্ধু আগে, তুমিই জিজ্ঞেস কর না।"

বলতে বলতেই দেখল সামনের একটা বেঞ্চিতে কুমার বসে আছে। দুই হাঁটুর উপরে দুই কনুই রেখে, দুই হাতের চেটোয় মুখটা রেখে সামনে তাকিয়ে বসে আছে। তাকিয়ে ছিল বটে কিন্তু কিছুই বোধ হয় দেখছিল না। কারণ মেরীরা যে প্রায় সামনে এসে ফের পিছিয়ে সরে গেল—তাও দেখতে পেল না।

গিবন চুপি চুপি বললে—"ওর কি হয়েছে জানতে চাওয়া আমার পক্ষে যেমনই অশোভন তেমনই অসঙ্গত। কিন্তু বেচারার হঠাৎ হ'ল কি বল ত?"

মেরীর মনটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল, ও বললে—"আমি যাই, ওর কাছে গিয়ে একটু বসি?"

গিবন বললে—"ঠিক বটে, তোমার মত মর্মজ্ঞামিনী মোহবতীর কাছে ওর মনের কপাট হয় ত খুলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা শামুকের খোলার মত গুটিয়ে যাবে। কাজেই—"

মেরী বললে—"সত্যি তা হলে তুমি আজ অন্য কোথাও যাও। আমি বরং কুমারের কাছেই যাই, গিয়ে দেখি বেচারার হ'ল কি?"

গিবন বললে—"যাবে যাও, কিন্তু দেখ, বেশী কাছে যেও না।"

—"দেখা যাক।" মেরী ঠাট্টা করে চোখ নাচিয়ে হাসল। তখন গিবন ওর ঘাড়ের প্রান্তে, যেখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চুলের ঝালর সুরু হয়েছে, সেখানে একটা উষ্ণ চুম্বনের ছাপ দিল। মেরী ওর চোখে চোখ রেখে হেসে উঠল।

ধীর পায়ে শব্দ না করে মেরী গিয়ে কুমারের পাশে দাঁড়াল। বললে—"বসতে পারি?"

চমকে উঠল কুমার, বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর চেনা মুখের দিকে চেয়ে, মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে অনেক কষ্টে এক টুকরো চেনা হাসি বার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে গিয়ে বসবার জায়গা করে দিতে চাইল। বললে—"নিশ্চয়।"

সঙ্কোচের তফাৎটুকু গায়ে মাখল না মেরী। ওর একান্ত সন্নিকটে বসে, ওর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে কুমার মাথা নীচু করল। নতুন সঙ্কটে ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেল দুঃসংবাদের দুঃখ।

মেরী ওর একটা হাত নিজের দু'হাতে আলিঙ্গন করে

আধো স্বরে বললে—"কুমার, আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত কুমার বসে রইল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর এই সমবেদনা ও আদরে ওর বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠল, ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল কান্না। ওর সাতাশ বছরের পূর্ণ যৌবন মনের মধ্যে, বাংলা দেশের একটি চিরকিশোর সুখদুঃখের প্রথম বিচিত্র অনুভবে মেতে উঠল। কিন্তু তার প্রকাশ হ'ল খুব সামান্য, ভিজে কাঠে যেমন অনেক ধোঁয়ার সঙ্গে ক্ষীণ একটা অগ্নি-শিখা প্রস্তুত হয়। কুমার অন্য হাতে মেরীর ধৃতমুষ্টি গ্রহণ করে, সমস্ত প্রাণের আবেগ দিয়ে অল্প একটু চাপ দিল মাত্র। এটা ও হয় ত ইচ্ছা করে করে নি তখন। তবু হয় ত ওর শরীরের রক্তকণাগুলি এই ইচ্ছাই করেছিল। হয় ত ওর অজ্ঞাতে এই মূঢ় বাসনা ওর নাড়ীতে দিয়েছিল টান। অন্ততঃ এটা ঠিক যে, ওই ছোট্ট পেষণের অন্তরালে মৃদু ভূকম্পনের মত, অনেক তীব্র, অনেক প্রচণ্ড অনুভবের আলোড়ন ছিল। আর তার দোলা এসে লেগেছিল মেরীর মুষ্টিবদ্ধ হাতে। স্নায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল তার খবর ওর দেহের প্রতি জীবকণাগুলির অন্তরে। একটা অজানা কষ্ট ওর বুকের মধ্যে টনটন করে উঠেছিল, এক মুহূর্তে ও বুঝতে পেরেছিল এতদিন ও যা নিয়ে মেতেছিল তা খেলা, আর আজ যা ও পেল, তা কি, তা সে জানেনা—যদিও তবু তা একেবারেই অন্যরকম আশ্চর্য নতুন।

মেরীর খুব ভাল করেই জানা ছিল যে, প্রেমের ব্যাপারে কুমার আনাড়ি, মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর মোহ কাটে নি, তাই মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে ওর সঙ্কোচ ঘোচে না। এতদিন মেরীর সঙ্গে একবাড়ীতে ছিল, তবু কোন ছলেই ভাব জমাতে এগিয়ে আসে নি। আজ তার সেই অতি সহজ ধরা দেওয়ার মধ্যে যে কতখানি সত্য আছে, সেকথা মেরীর অন্তরাত্মা বুঝতে পারল, অমনই ওর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। সত্যের দাবী একমুহূর্তে ওকে সত্য করে তুলল, আর সেই অচেনা সত্যের ঝাপসা আলোয় দুঃখ ও সুখ যেন একসঙ্গে ভীড় করে এগিয়ে এল—তাদের আলাদা করে চিনতে পারল না—শুধু বুক ভরে উঠল আর বিস্মিত মেরী তাকিয়ে দেখল—কুমারের বুকে ওর মাথা, কুমারের হাতে ওর হাত, কুমারের অজানা দুঃখে ওর চোখে বাঁধভাঙা জল, আর চারিদিকে নববসন্তের পড়ন্ত বিকেলের আলো।

এতদিন পরে, এই শীতাগমের সন্ধ্যাবেলায় কুমারের হাতের মৃদু চাপে, সেদিনের সেই মুগ্ধ বিকেলের কথা মেরীর মনে পড়ে গেল। আর অমনই ওর বুকের মধ্যে ভালবাসা গুণ গুণ করে উঠল। বললে—"শঙ্কা করো না, সংশয় রেখো না। আমি যখন আছি, তখন মিথ্যে তোমার ভয়।"

বাসের জন্যে 'কিউ'য়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতি-মধ্যেই বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে। কুমার আর একবার তেমনই মৃদুচাপে, ওর হাত পীড়িত করে বললে—"কি ভাবছ মেরি, আমি কতখানি তোমার অপরিচিত, না কতখানি আমায় ভয় কর?"

মেরী হাসল—"না।"

—"তবে?"

—"তুমি হাসবে।"

"না বল।"

—"আমি এই মুহূর্তে অনেক দিনের রাস্তা পার হয়ে সেই কেংসিংটন গার্ডেনের পড়ন্ত বিকেলের আধচেনা মুহূর্তে চলে গিয়েছিলাম—কি আশ্চর্য! নয়?"

"—কেন, কি এমন আশ্চর্য?"

—"বাঃ, কি অদ্ভুত এই মনটা, যখন যেখানে খুসী বেড়িয়ে আসতে পারে। শুধু দেশ দেশান্তরেই নয়, কালে কালান্তরে।"

—"অথচ সিকি পয়সা খরচ নেই।" কুমার হাসল।

—"এই ত ৭৪ নম্বর এসে গেছে, পা চালাও।"

৭৪-এর দল ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে এল।

ওরা বাসের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, কণ্ডাক্টর হাঁকলে—"মনে রেখ, মাত্র তিন জন এতে যেতে পারে। মাত্র তিন জন।"

একসঙ্গে সাত জনের সাত জোড়া হাত এগিয়ে এল। কণ্ডাক্টর আবার হাঁকলে—"মাত্র তিন জন, তোমরা যদি নিয়ম না মান, আমাদের কিন্তু মানতেই হবে।" সে তিনজনকে টপাটপ প্রায় হাত ধরে তুলে নিল, ওরা পড়ে রইল।

"চল হেঁটে এই বাগানটুকু পার হয়ে মার্কাসের ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে যাই। তার পরে ওখান থেকে একটা টিউব নিয়ে বাড়ী গেলেই হবে।"

—"বেশ চল।" মেরী বললে—"কিন্তু আমাকে কি বলতে চাইছিলে একটু আগে বললে না?"

—"কখন?" কুমার ওর চোখে চোখ রাখল।

—"এই ত একটু আগে।" মেরী হাসল।

—"কি করে বুঝলে?"

—"এমনি করে।" কুমারের নকল করে মেরী ওর হাতে একটু চাপ দিল।

—এঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—সব ভঙ্গীই চিনে রেখেছ।" কুমার হো হো করে হেসে উঠল।

উত্তরে, ইংরেজী বাংলা মেশানো সুরে মেরী বললে—"হুঁ হুঁ।"

—"তোমাকে একটা কাজের ভার দেব মৌ।" কুমার বললে—"দুটো ঘর ঠিক করে দিতে হবে। আমার বোন আসছে, আর তার ছেলে।"

—"তোমার সেই বোন, যার অসীম বেদনার মূল্য দিয়ে আমরা কিনেছি আমাদের প্রেম ?"

—"হ্যাঁ সেই।"

মেরী আবার মুহূর্তের জন্তে সেদিনের সেই বিকেলে ফিরে গেল—কুমারের সেই শোকবিধ্বস্ত চেহারার মূলে ছিল তার বোনের জীবনের চরম দুঃসংবাদ। বহুক্ষণ পরে কুমার ধীরে ধীরে তার সব গল্প করেছিল সেদিন। আজও নাকি কুমার ভেবে পায় না যে, সুধাংশুর অমন প্রাণোচ্ছল দুরন্ত হৃদয়ের মর্মে কেমন করে দুর্বলতা আটকে ছিল, অমন লোকের পক্ষে তিন দিনের জ্বরে হার্টফেল করা কি করে সম্ভব হতে পারে।

মেরী বললে—"তার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, সে এখন কেমন আছে কুমার ?"

—"কাল তাকে কিছু শান্ত করেছে মৌরি। তবু তার দু'একটা ও অন্তের অনেক চিঠিতে যেটুকু বুঝতে পারি, তাতে ত মনে হয়, এখনও জীবনকে তেমন করে স্বীকার করতে পারে নি। এখনও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে বিধি-বিধানকে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তাকে কাজের মধ্য দিয়ে শান্ত করে তোলার জন্তেই আরও ওকে এখানে পাঠাচ্ছে সবাই। একটা কাজ শিখতে গেলে মন ঠাণ্ডা করে তার মধ্যে ঢুকতেই হবে। আর তা ছাড়া ছেলেকেও বিলিতী ট্রেনিং দেবার ইচ্ছে ওদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই অনেক দিন ধরে ছিল।"

মেরী বললে—"তুমি ওকে খুব ভালবাসো, না? কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলে ওর স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুসংবাদে। অথচ ও ত তোমার নিজের বোন নয় ?"

"তোমাদের মতে অবশ্যই ও বোন নয়—কাজিন, কিন্তু," কুমার বললে, "আমাদের মতে, একেবারে নির্জলা—নির্ভেজাল বোন। আমার আপন কাকার মেয়ে।—সে আপন বোন নয় ত কি? তা ছাড়া ছোটবেলায় ওর বাবা মারা যাওয়ায় সবাই ওকে আপনের চেয়েও আপন করে দেখত। আমার দেখাদেখি ও আমার বাবাকেই বাপী বলে ডাকত। আর নিঃসন্তান ছোটকাকুর ও ছিল মাথার মণি। আমরা ত তখন একসঙ্গেই থাকতাম, আর ওর দাপটে অস্থির হয়ে যেতে সবাই যেন রীতিমত ভালবাসত। আমার যে মাঝে মাঝে হিংসে হ'ত না এমন নয়।"

পুরনো দিনের কথা সুখের মত হয়েই সাধারণতঃ মানুষের মনে আসে। কুমারের কাছেও তারা তেমনি করেই এল। ছোটবেলায় রমলার সঙ্গে যত পিঠোপিঠি, হিংসাহিংসী, মারামারি, মান-অভিমানের পালা চলত, কুমার অবাক হয়ে দেখল, সেগুলোর দুঃখ-বেদনা কবে যেন মিলিয়ে গেছে, উজ্জ্বল হয়ে আছে সবার উপরে একটা ছেলেমানুষী খুশীর স্মৃতি। সেই খুশীর হাসি মুখে মেখে কুমার বললে—"আর তা ছাড়া ওর চেহারা দিয়েও সবাইকে ভুলিয়েছিল। যেমন মিষ্টি তেমন উজ্জ্বল। বুদ্ধিও ছিল তেমনি খরধার। ছোটবেলা থেকেই লেখার হাত। মৌচাকে এক-একটা লেখা বেরুত। আর বাড়ীশুদ্ধ সবাই জড়ো হয়ে তারিফ করে করে সে লেখা শুনত। তার পরে একটু বড় হতেই চৌদ্দ-পনের বছর বয়স থেকেই ত স্বদেশীতে মাতল।"

মেরী চকিত হয়ে বললে—"স্বদেশী কি ?"

—"সে আর এক গল্প।" কুমার বললে—"সে এত চট করে হবে না, একটা পুরো ছুটির দিন লাগবে সে বেদনার ইতিহাস শুনতে।"

খালি বেদনা আর কষ্ট, অসহিষ্ণু হয়ে মেরী বললে—"তোমাদের দেশে শুধুই কি কষ্ট আর দুঃখ, ভাল কথা কি কিছুই নেই ?"

—"দুঃখের কথা হলেই যে তা ভাল কথা হবে না—এ তোমাকে কে বললে ?"

মৃদু হেসে কুমার বললে—"আমার ত মনে হয় উল্টো, আর তা ছাড়া তোমাদের কবিদেরও তাই মত—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts."

দ্বিধান্বিত হয়ে মেরী বললে—"তা বটে, তবে—"

—"তবে আবার কি ?" মেরীর মুখের কথা কেড়ে নিল কুমার—"এই রমলাকেই দেখ না। সাধারণ জীবনের জোলো জোলো ঘোরো সুখ ওর মত মেয়ের জন্তে নয়। দুঃখের তপস্যা জীবনে গ্রহণ করার যোগ্য ওই। তাই ও দুঃখ পেল। শুধু সুখযাপনের মত তুচ্ছ জীবন নয় ওর। কঠিন দুঃখের স্পর্শ পাবার অধিকারী।"

একটু চুপ করে থেকে মেরী বললে—"তোমার কি মনে হয়, ও আর বিয়ে করবে না ?"

—"বিয়ে ?" চমকে উঠে কুমার বললে—"সে কি ?"

"কেন ?" মেরী বললে—"বিয়ে করা কি অন্যায় ?"

বার্কস্টোন গার্ডেনসের একটা উঁচু বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌঁছাল ওরা। অন্যমনস্ক ভাবে কুমার বললে—"কি জানি, রমলা আবার বিয়ে করতে পারে কিনা একথা আমার কখনও মনে হয় নি।"

দরজার সামনে এসে বিদ্যুৎঘণ্টার বোতাম টিপে দিল কুমার।

—"কেন ?" মেরী বললে—"মনে হওয়া উচিত। দুঃখের তপস্যা, দুঃখের যোগ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে, তোমরা মানুষকে, বিশেষতঃ মেয়েদের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে দিতে ভালবাস। মেয়েরা যেন মানুষ নয়, আর মানুষ যেন সাধারণ নয়। যার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে সে যেন আর সাধারণ হয়ে মানুষের মত সুখদুঃখ ভোগ করতে পারবে না। কেবল দুঃখভোগের আদর্শকে বড় করে তোমরা সুখকে তুচ্ছ করে দিতে চাও। এ আমার ভাল লাগে না।"

খুট করে ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল।

—"হ্যালো,"

—"হ্যালো,"—মার্কাসের ভাই অরেলিয়াস দরজা খুলে দিল। ওদের দু'ভাইয়ের নামের মধ্যে একজন রোমানবীরের নাম গেঁথে দিয়েছেন ওদের মা।

অরেলিয়াস বললে—"অনেক দিন পরে ?"

—"তা সত্যি।" কুমার বললে—"অনেক দিন ধরেই যদিও আসব আসব করছিলাম।"

মেরী বললে—"মার্কাসের খবর কি ?"

অরেলিয়াস বললে—"সে এখন ভীষণ ব্যস্ত,এখুনি দেখতে পাবে।"

—"ব্যাপার কি ?"

—"কি একটা অরিয়েণ্টাল বিষয় নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। তাই কয়েক দিন ধরে কুমারকে ফোন করবে ভাবছে। কিন্তু ওর নতুন বাড়ীর ঠিকানা না জানায় করতে পারছিল না।"

ওরা মার্কাসের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। অরেলিয়াস বললে—"আমি যদিও তোমাদের সঙ্গে বসে এখন কিছুক্ষণ গল্প করতে পেলে খুসীই হতাম, কিন্তু আমাকে কতকগুলো কাজ আজ রাতেই শেষ করে ফেলতে হবে।

মার্কাস এসে দরজা খুলে দিল, তার হাতে সিগারেট, আর চোখে স্বপ্ন।

মার্কাস বললে—"তোমার কথাই ভাবছিলাম কুমার।"

অরেলিয়াস বললে—"তা হলে এই পর্যন্ত। ইতিমধ্যে যদি আমার কাজ শেষ হয়ে যায় ত এসে তোমাদের দলে যোগ দেব।" ও চলে গেল পাশেই নিজের ঘরে।

মার্কাস বললে—"মেরী তুমি আজকাল কুমারকে কোন সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছ খোঁজই পাওয়া যায় না।"

মেরী বললে—"কি করব বল, আমার বাড়ীওয়ালা কোথা থেকে একটা শাঁসালো ভাড়াটে জুটিয়ে এনে কুমারকে হটিয়ে দিয়েছে।

—"ভালই হয়েছে," কুমার হাসল, "মেরীর নয়নশাসন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অব্যাহতি পাওয়া গেছে।"

—"ঈস, তবে কেন ছুটি হতেই ছুটে আস ?"

—"ওঃ সে ভয়ে" মার্কাস মন্তব্য করলে—"কুমার নিশ্চয় তোমাদের ঐ শাঁসালো ভাড়াটেটিকে ভয় করে। ভাড়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ওকে বাড়ী থেকে সরিয়েছে, প্রেমের ক্ষেত্রেও যদি সে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়।"

—"দূর।" মেরী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল—"লোকটা নেহাৎ বোকা।"

কুমার গম্ভীর হবার ভান করে বললে—"সত্যি মেরী, মার্কাসের কথাটা ভেবে দেখবার মত। তোমার ঐ বোকা কথাটার মধ্যে একটু যেন আদরের মিশেল আছে।"

—"উঃ কুমার।" আবার হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'ল মেরী—"হিংসুটেপানা কোরো না কুমার।"

মার্কাস বললে—"হিংসে করে সুখ পাবার উপায়টুকুও তুমি বেচারার রাখ নি। কারণ তুমি নিশ্চয় সারাক্ষণ ধরেই কুমারের নতুন বাড়ীর তদারক করতে ব্যস্ত।"

—"বাঃ! কুমার এখনও তার নতুন বাড়ীতে আমাকে ঢুকতেই দেয় নি।" মেরীর গলায় অভিমান।

মার্কাস বললে—"ওঃ, তাই নাকি। আমি বার-দুয়েক ফোন করে তোমায় না পেয়ে সিদ্ধান্ত করলাম, তুমি নিশ্চয় কুমারের কাছে আছ।"

—"তা হয় ত কুমারের কাছে হতে পারে, তবে ওর বাড়ীতে নয়।"

—"সত্যি ?"

কুমার বললে—"সত্যি। বাড়ীটা এত অদ্ভুত বিশ্রী যে ওখানে মেরীকে নিয়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না। এখনও আমার ঘর খোঁজার বিরাম নেই, পেলেই এটা ছেড়ে দেব। সত্যি এখানে কোন বন্ধুকেই ডাকতে ইচ্ছে করে না।"

—"তা হলে আবার সেই ঘর খোঁজা চলছে ?"

—"হ্যাঁ, তোমাদের দেশে এসে অবধি আমার যাযাবর বৃত্তি বেশ ভাল ভাবেই চলছে।"

—"তোমার থিসিসের আর কত দেরী কুমার ?"

—"আর মাসছয়েকের মধ্যেই দিতে পারব ভাবছি। তার পরে যতদিন না রেজাল্ট বেরোয় ততদিন যে কোন একটা চাকরী।"

—"যে কোন চাকরী ?"

—"হ্যাঁ, যে কোন চাকরী।" মার্কাসের মুখের কথা

কেড়ে নিল কুমার—"ইঞ্জিনিয়ারই যে হতে হবে তার কোন মানে নেই। এমনকি তোমার থিয়েটারেও এসে ঢুকতে পারি ?"

—"এ্যাক্টরের কাজ নিয়ে নাকি ?" মেরী হেসে উঠল —"নাকি মেয়েদের ড্রেস-মেকার।"

কুমার বললে—"ঠাট্টা থাক, কেন আমায় খুঁজছিলে বল, তোমার সমস্যাটা কি ?"

—"সমস্যা ?" মার্কাস মৃদু হাসল—"সমস্যা—শকুন্তলা।"

—"শকুন্তলা ?" কুমার বললে—"আজকের যুগে শকুন্তলা নাটক মানাবে ?"

মার্কাস জোর দিয়ে বললে—"নির্ঘাৎ মানাবে, ওর যে অংশটা সব দেশের সব যুগের, তার উপরে, ওর যে অংশটা শুধু প্রাচীন ভারতের, সেটা একটা রং ছড়াবে মাত্র।"

—"তা কি করতে চাও ?"

—"থিয়েটার নয়, ওটাকে ব্যালে প্লাস অপেরা জাতীয় একটা কিছু করার ইচ্ছে আছে। কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা জানি না। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি ড্রেস নিয়ে।"

মেরী বললে—"কেন ? মূর্তি স্টাডি করলেই ত পার, এত অজস্র মূর্তি ?"

"আরে মূর্তি স্টাডি করতেই ত এই ক'দিন ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু—।" কুমারের দিকে চোখ টিপে হেসে বললে—"ভারতীয় মূর্তি কিছু তুমি দেখেছ মেরী ?"

মেরী বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। একটু ভেবে বললে—"দেখেছি বইকি। তবে সেগুলি বোধহয় সব নিউড ছিল।"

মার্কাস বললে—"না নিউড নয়, কাপড় আছে, তবে—"

—"তবে।" কুমার হাসল —"এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না।"

মার্কাস বললে—"ঠিক তাই। গ্রীক-মূর্তিগুলির যদিও বেশীর ভাগ নিউড। তবু যাদের কাপড় আছে তাদের মার্বেলের ভাঁজ থেকে কাপড়পরার ধরনটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু—"

কুমার বললে—এখানেও বোঝা যায়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে বেশীর ভাগ মূর্তিগুলিরই পায়ের কাছে কাপড়ের কুঁচি।"

মার্কাস বললে—"হ্যাঁ, তা দেখেছি কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারে খালি।

কুমার হাসল—"তা ঠিক, তখনকার দিনে লজ্জার সঙ্গে সজ্জার সম্পর্ক হয় ত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না, মানুষ নিজের কাজের জন্যেই হয় ত লজ্জিত হ'ত বেশী।"

মার্কাস বললে—"খুব সম্ভব তাই। তুমি 'বেসামে'র এই নতুন বইটা দেখেছ ? ভারতের উপরে ? আমার ত মনে হয় বইটা ভাল। তিনিও লিখেছেন, তখনকার দিনে মেয়েরা বোধ হয় অনাবৃত বক্ষেই ঘোরাফেরা করতে লজ্জা পেত না, এখনও মালাবারের দিকে যেমন চলন আছে।"

দ্বিধান্বিত ভাবে কুমার বললে—"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অন্ততঃ অজন্তার চিত্রলিপিতে তার প্রমাণ নেই। সেখানে অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গীর সঙ্গেই ফুলহাতা জামা পরাও মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়।"

মেরী অসহিষ্ণু হয়ে বললে—"কেন তোমাদের সাহিত্যে বেশভূষার বর্ণনা নেই ?"

উৎসাহে টেবিল চাপড়ালে কুমার। বললে—"ঠিক, ঠিক, একেই বলে নারীর সহজাত বুদ্ধি। ঠিক কথাই বলেছে মেরী। দেখ মার্কাস, শকুন্তলার বেশ নিয়ে ভাবছ কেন। কালিদাস নিজেই তার বর্ণনা করে গেছেন। সেইটে অনুসরণ করলেই ত চুকে যায়।"

মার্কাস বললে—"শোন কুমার, যে জন্যে তোমার খোঁজ করছিলাম সত্যি, সেটা এই ড্রেসের চেয়েও গুরুতর।"

"কি ব্যাপার ?"

"শকুন্তলাটা অনুবাদ করে দাও একটু আধুনিক ইংরেজীতে। অবশ্য এত আধুনিক নয়, যাতে ওর মূল সুর ব্যাহত হয়।

"আমি ?" কুমার চমকে উঠল—"ওসব আমার দ্বারা হবার নয়। কিন্তু—"। বলতে বলতে কুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"আমি জানি কে তোমায় সাহায্য করতে পারে ?"

"কে ?"

—"আমার বোন আসছে জার্নালিজম পড়তে। ছোটবেলা থেকেই ওর লেখার হাত ভাল। আর সংস্কৃতসাহিত্যও বেশ জানা আছে। ও তোমায় নিশ্চয় সাহায্য করতে পারবে।"

—"বাঃ, তবে ত ভারী মজা।"

মেরী এতক্ষণ 'বেশামে'র নতুন বইটা উলটে-পালটে ছবিগুলো দেখছিল। বললে—"রাত হ'ল কুমার। বাইরে, খুব ঠাণ্ডা হবে।"

সত্যিই ত। ঘরের মধ্যে জানালা বন্ধ, পর্দা ফেলা। ফায়ার-প্লেসে আগুন গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে। ঘরের মধ্যে এমন

চমৎকার গরম আরাম। মনেই পড়ে না যে, জানালার বাইরে নভেম্বরের কালো রাত শিউরে শিউরে কাঁপছে।

—"সত্যি অনেক রাত।" কুমার ঘড়ি দেখল—"প্রায় দু'টো বাজে।"

—"বাজুক না।" মার্কাস বললে—"কুমারের ত গাড়ী আছে।"

—"না, সেটা হাসপাতালে পাঠিয়েই ত এই দুর্গতি। আজ প্রায় দিন পনের হয়ে গেল, আর কতদিন যে লাগবে কে জানে।"

মার্কাস বললে—"তবে আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব এখন। ভাবনা নেই।"

কুমার বললে—"তার দরকার নেই।"

মেরী বললে—"বিলক্ষণ, কে বললে দরকার নেই। এই ঠাণ্ডায় হাঁটার কোন মানে নেই, বন্ধু নিজে যখন গাড়ী অফার করছে।"

মার্কাস বললে—"ব্রেভো, এসব বিষয়ে নারীর কথাই শেষ কথা। কাজেই এখন কফি খাও।"

—"প্লীজ।" কুমার বললে—"একটু আগেই গণ্ডোলায় কফি খেয়ে এসেছি। আবার ?"

—"বেশ, তা হলে চা ?"

—"তা চলতে পারে।" কুমার বললে—চা-ই আমাদের একমাত্র পানীয়। এ পানীয়ের কোন বিশেষ নিয়ম নেই। যখন-তখন যেখানে-সেখানে চলতে পারে। চা-ই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম উত্তেজনা। কে যেন বলেছেন, ঠিক মনে করতে পারছি না—যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে ফটাফট অতগুলি প্রেমের গল্প লিখেছিলেন, তারও প্রেরণা নাকি চা।"

—"সত্যি ?" মার্কাস হাসল, বলল—"আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম জানি, ইনি টেগোরের আগে ?—নয় ?"

মার্কাস বই ঠেলে উঠে পড়ল, চায়ের জোগাড় করতে করতে সুর করে ডাকল—"অরলি অরলি ?"

ভারী পর্দা ফেলা পাশের ঘর থেকে গুমগুমে চাপা গলায় অরলি বললে—"আমার জন্যে নয়।"

ওর ঘরের কাছে এসে মেরী বললে—"আসতে পারি ?"

ভিতর থেকে উত্তর এল—"নিশ্চয়, তবে একটু দাঁড়াও, পাজামার উপরে গাউনটা পরে নি, নইলে হয় ত তুমি আবার লজ্জা পাবে।"

—"ওয়েল, আই নেভার।" লজ্জা পেয়ে মেরী সরে এল।

—"তোমরা হোপলেস। এরই মধ্যে কচি খোকা সেজে শুয়ে পড়লে ?"

—"না গো না, তোমাদের মত শিশু নই। তোমরা ত 'প্লে' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, অর্থাৎ খেলা নিয়ে। আমি করছি কাজ। বিশ্বাস না হয় দেখে যাও।"

—"দরকার নেই।" মেরী কৃত্রিম রাগ দেখালে, বোঝা গেল, আপিসের কোন প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে অরেলিয়াস, দুই ভাই পাশাপাশি ঘর নিয়ে বাস করছে। না ডাকলে কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসে না। অথচ চাইলে পরে দুজনেই দুজনকে পরামর্শ দেয়, ভাবের অভাব নেই। কিন্তু কেউ কারও কাছে কোন বিষয়েই বাধ্য নয়। অরেলিয়াস আর্কিটেক্ট—কি যেন একটা ফার্মে কাজ করে। আর মার্কাস একাধারে লেখক এবং এ্যামেচার থিয়েটারের ডিরেক্টর প্রডিউসার। ওদের বাপমা থাকেন গ্রামে—ব্রিষ্টল থেকে একটু দূরে, আর এদের দু'ভাইয়ের ভাগে পড়েছে দিদিমার সম্পত্তি। অরেলিয়াসের ভাগটা ব্যাঙ্কে আছে, আর মার্কাসের ভাগটায় থিয়েটার হচ্ছে। এ ব্যাপারটা মার্কাস বোঝে ভালই, কুমার ভাবে, কই লোকসান তেমন দিয়েছে বলে ত শুনি নি।

ইতিমধ্যে মার্কাস কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছে। মার্কাসের এই একলার সংসারটি যেন ছন্দ ও সুষমায় ভরা। নরম স্প্রীঙের বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা। মোটা রঙীন ঝালর-দেওয়া চাদর দিয়ে ঢাকা। দুটো গদী-আঁটা আধুনিক সোফা। একটা বড় টেবিল, চেয়ার এবং ঘরের দেওয়ালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখা অনেকগুলি বুক-কেস। তাদের মাথাগুলি ঝকঝকে পালিশ করা। আর তার উপরে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র জিনিসের একটি-দুটি এখানে-ওখানে সাজান। নিগ্রো বাস্ট, টিবেটান কিউরিও। মেক্সিকোর শিরোভূষণ দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ। যে যার জায়গায় বসে আছে।

থালার উপরে ছোট্ট নীল ট্রে-ক্লথ পেতে, চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করতে করতেই টগবগে জল থেকে 'হুইশ্ল' বাজিয়ে ধোঁয়ার পিচকিরী উঠল। টি-পটে চা ও গরম জল দিয়ে মার্কাস অন্তরঙ্গ সুরে হুকুম করল—"হেই হো, ট্রেটা কেউ নিয়ে চল, আমি কিছু বিস্কুট নিয়ে আসছি। মেরী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ট্রেটা নিয়ে এল। কুমারের নিজেকে মনে হ'ল—ক্যাড, জংলী। আজ পর্যন্ত এই ছোটখাট অভ্যেসগুলো হ'ল না।

কি আর করবে সে, কুমার মনে মনে নিজের পক্ষ নেয়।—বরাবর দেখে এসেছে বাড়ীতে কাজ করে মেয়েরা আর তার ফলভোগ করে ছেলেরা। এইটেই স্বাভাবিক—মেয়েরা রান্না করবে ছেলেরা খাবে, মেয়েরা কাপড় কাচবে ছেলেরা পড়বে, ছেলেরা এলোমেলো করবে মেয়েরা গোছাবে। কাজেই আজকে হঠাৎ মেয়েদের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে

করার কথা মনেই পড়ে না। যদিও আজকাল এদেশে আর লোকদেখানো শিভ্যালরির চল নেই। মেয়েদের তেমন করে তোষামোদ করার দরকার হয় না। তবু একটু মৌখিক ভদ্রতা, একটু আদর দেখানো, একটু যত্নর আয়োজন করা এ সর্বত্রই আছে।

মার্কাস বললে—"ধন্যবাদ মেরী।"

টিন থেকে প্লেটে বিস্কুট বার করে মার্কাস বললে—"দু' এক টুকরো কেক বোধ হয় খুঁজলে পরে পাওয়া যাবে আমার ভাঁড়ারে। আনব নাকি?"

মেরী বললে—"আনতে পার, কুমারের বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে। কারণ গণ্ডোলায় ও আমাকে খাওয়ালো বটে, কিন্তু সেই আমারই উপর রাগ করে নিজে খেলো না।"

অপ্রতিভ হেসে কুমার বললে—"মিথ্যেবাদী।"

ওর চোখে চোখ রেখে মেরী বললে—"সত্যি কিনা তুমিই বল সত্যবাদী।"

মার্কাস বললে—"রাগের আপোষ হবার আগে, আর একটা জিনিস বার করছি, যেটা দেখলে কুমারের দেশের জন্যে মন কেমন করবে।" সে উঠে গিয়ে তার টেবিল বনাম ছোট্ট ভাঁড়ারের পর্দা সরিয়ে একটা মোটা-সোটা বেঁটে শিশি বের করে আনলে।

—"এ কি ডালমুট!" কুমার অবাক।

—"হ্যাঁ, আদি ও অকৃত্রিম তোমার "চা"য়ের ভারতের শাশ্বত ডালমুট।" মার্কাসের মুখে আত্মপ্রসাদ।

—"ডালমুট সম্বন্ধে এত তত্ত্ব জানলে কি করে?" কুমার উৎসাহিত হয়ে বলে—"শিখলে কোথায়? তোমার ও আর বেশী ভারতীয় বন্ধু ছিল না।"

—"ছিল না, হয়েছে। সেখানেই শুনলাম।"

—"আর জিনিসটা কোথায় পেলে?"

—"সেখানেই। যে এর গুণ শুনিয়েছে, সেই তার সত্য পরীক্ষা করতে দিয়েছে। আর পরীক্ষা করে জিনিসটার প্রতি ভক্তি বেড়েছে, এই মাত্র বলতে পারি।"

মেরী বললে—"বন্ধুটি কি স্ত্রীজাতীয়?"

মার্কাস হাসলে—"সে সৌভাগ্য আর হ'ল কোথায়। ভারতীয় নারী যা কয়েকটি দেখেছি, সব দূর থেকে। কথা বলার সুযোগ পাইনি কখন।"

মেরী বললে—"যাই হোক, এমন কাজের বন্ধু কোথায় সংগ্রহ করলে। আমাকে খবর দাও।"

—"কখনওই না।" মার্কাস বললে, "অমনি তুমি তাকে ভাগিয়ে নেবে। যেই সে তোমার বন্ধু হবে, অমনি তার চোখের চাওয়া বদলে যাবে, গলার সুর বদলে যাবে। স্ত্রীপুরুষে কখনই সেই অনাবিল বন্ধুত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না, পুরুষে পুরুষে যেমন হয়।"

মেরী রাগ দেখিয়ে বললে—"বাজে কথা।"

কুমার বললে—"না সত্যি, মেয়েপুরুষে বন্ধুত্ব যদিই বা কামনাশূন্য হয়, তার মধ্যে সর্বদাই একটা রহস্যের মোহ থাকে, অজানার রহস্য। ওরা যে পরস্পরের অপরিচিত, শুধু দেহে নয়, মনে। তাই রহস্য আর তাই মোহ, তাই অবাধতার বাধা।"

—"তবু বন্ধুটি কে শুনি?"

মার্কাস হাসল—"ভদ্রলোকের নাম 'দাস'। স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিসে রিসার্চ করতে এসেছে।" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, একটু ভেবে মার্কাস বললে—"বিষয়টা কি জান, বাংলা সাহিত্য।"

—"সত্যি!" কুমার অবাক হয়ে গেল—"বাংলা সাহিত্য নিয়ে রিসার্চ করতে লণ্ডনে এসেছে!"

—"হ্যাঁ।" মার্কাস বললে—"তুমি বিদ্যুৎতত্ত্ব নিয়ে রিসার্চ করছ, সে বেচারা বাংলা নিয়ে করছে। তাতে রাগ করলে চলবে কেন?"

কুমার অসহিষ্ণু হয়ে বললে—"রিসার্চ করুক না যত খুশী, কিন্তু লণ্ডনে কেন?"

—"অবভিয়াসলি।" মার্কাস গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে—লণ্ডনে তোমাদের বেঙ্গলের চেয়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চা নিশ্চয়ই বেশী আছে।"

শুনে কুমার হো হো করে হেসে উঠল, আর সেই সঙ্গে যোগ দিল মার্কাস এবং মেরী।

মার্কাস হাসতে হাসতে বললে—"হাসতে পার যত খুশী, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি।" এক মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠল কুমার,—কি অদ্ভুত বিপরীত, কি খণ্ডিত হয়ে উঠছে ভারতের জীবন!—মুখে কিছু বললে না কুমার,—চুপ করে রইল।

মেরী হাসি থামিয়ে বললে—"এবারে ফেরার কথা ভাবা উচিত সত্যিই। এদিকে রাত বাড়ছে, ওদিকে শীত জমছে। আমাকে আবার যেতে হবে, তোমার চেয়েও অনেক দূরে।"

মার্কাস বললে—"তোমাদের আর ভাবনা কি? আমাকেই তোমাদের পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হবে একা।"

—"আচ্ছা কি পাগল।" কুমার হাসল,—"কিছু দরকার নেই। আমরা দু'পা গেলেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব।"

"কি করে?" মার্কাস কৃত্রিম বিস্ময় আনলে গলায়—

"ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে যে তোমার কন্ট্রাক্ট আছে তা ত জানা ছিল না।"

কুমার হাসল—"বেশ, তবে চল।"

মার্কাস বললে—"হ্যাঁ চল, একটু বেড়িয়ে আসতে আমার এখন ভালই লাগবে। কিন্তু কুমার, তোমার বোন এলে খবর দিতে ভুলো না। তাঁর কাছে সাহায্য ত পাওয়াই যাবে, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী আকর্ষণ রঙীন শাড়ীর। কি বল মেরী।"

মেরী বললে—"রঙীন শাড়ীর এমনকিছু অপ্রতুল নেই আজকের লণ্ডনে। প্রায়ই ত চলতে চলতে ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে কলিসন্ হয়ে যায়।"

—"দেখলে কুমার, মেরী একটু জেলাস্ হয়েছে সন্দেহ নেই। মেয়েমাত্রেই মেয়েমাত্রের উপরে জেলাস্।" মার্কাস চোখ টিপে হাসল।

কুমার নিশ্বাস ফেলে বলল—"রমণীর শাড়ির রংটা আজকাল খুব ফিকে হয়ে এসেছে শুনছি। বেশীর ভাগ সাদা শাড়িই নাকি পরতে চায়।"

ওরা উঠে দাঁড়াল, মার্কাস চট করে তার কোটটা বের করে নিয়ে এল। কুমার হেসে বললে—"সাধ করে শীত-রাতে গাড়ী চালাবার দুঃখ পেতে চাও ত আর আপত্তি করে কি হবে।"

মার্কাস বললে—"আমারও স্বার্থ আছে। গাড়ীতে সম্প্রতি একটা হীটার লাগিয়েছি, তার গুণাগুণ পরীক্ষা হবে। চল তা হলে, সন্ধ্যে থেকে শকুন্তলার পোশাক ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছিল। একটু খোলা হাওয়ায় ঝাঁপ দিয়ে এলে ভালই লাগবে।"

ওরা দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির হলে কাঁচের ডুমে কমশক্তির বিদ্যুৎ, আর তার চার পাশ ঘিরে মন্থর আলোর কুয়াশা। তাতে আলোর চেয়ে ছায়ার আল্পনা বেশী। সিঁড়ির কোণে রাখা ছবি-আঁকা চায়না গামলায় বিলিতী ফার্ণ, আর ছাদে ঝুলান বাতির ঝাড়। আর দেওয়ালে দাঁড় করানো হ্যাটস্ট্যাণ্ডের নানান খাঁজ-খোঁজের বিচিত্র ছায়া যেন একটা রহস্যলোক ঘনিয়ে তুলেছে চারিদিকে।

পাছে ওদের পায়ের শব্দ পাশের ঘর থেকে শোনা যায়, তাই ওরা পা টিপে টিপে চোরের মত চুপি চুপি নামল। হয় ত কোন ঘরেই এখন লোক নেই। সবাই হয় ত বেরিয়েছে সান্ধ্য আমোদের সন্ধানে। কিন্তু রাত দশটা বাজলেই সেই সবাই আর সবাইয়ের ভয়ে চুপি চুপি আসবে। ফিসফিসিয়ে কথা কইবে, সাবধানে থাকবে যাতে আওয়াজটি না বেরোয়। যদি দৈবাৎ কেউ পাশের ঘরে থেকে থাকে, তবে আর কারও সশব্দ অথবা পানমত্ত উচ্ছ্বাস সে ক্ষমা করবে না, পরের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ভারী মজার দেশ, নিয়ম মানব না বলে যদি কেউ পণ করেও বসে, আর পাঁচজনে তাকে মানিয়ে ছাড়বে।

ওরা সাবধানে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল, আর অমনি কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের এতক্ষণের বন্ধ ঘরের গরম মুখের উপরে ঠাণ্ডা ঝাপটা ছুঁড়ে মারল।

ওভারকোট ম্যাকিণ্টসের ঘোমটা টুপিটা মাথার উপরে তুলে দিয়ে মার্কাস বললে—"দাঁড়াও আমার গাড়ীটা নিয়ে আসি।"

মেরী বললে—"ওই ত তোমার ছোট্ট লাল গাড়ী।"

রাত্রিবেলা লণ্ডনের প্রত্যেকটা রাস্তা যেন এক-একটা গ্যারেজ। সারি সারি নানা মাপের নানা ধাঁচের নানা রঙের ছোটবড় গাড়ীর সারি, সবাই রাস্তায় গাড়ী রেখে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার! যারা পরের দেশের বাড়ীঘর জমিদারী মায় গোটা দেশশুদ্ধ চুরি-জোচ্চুরি করে পকেটে পুরতে পারে, তারা নিজের দেশের সামান্য একটা গাড়ী চুরি করতে কেন ভয় পায়।

কুমারের গায়ে ওভারকোট ছিল বটে, কিন্তু মাথায় টুপি ছিল না। খালি মাথায় ঝাপসা শীতার্ত আকাশের নীচে দ্রুত পদসঞ্চালন করতে করতে সে ভাবছিল। হাতে চামড়ার দস্তানা এঁটে মোটা গরম টুপির ঘোমটায় মাথা মুড়ি দিয়ে মেরী ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। বাড়ীটার দিকে একটু ফিরে গিয়ে ফিসফিসে গলা একটু জোরে তুলে বললে—"তোমার শীত করছে না? কি বোকা। এস, এস এই পর্চের নীচে একটু দাঁড়াই।"

—"ক্ষমা কর দেবী।" কুমার মৃদু হাসল—"এখন আমি নিশ্চয়ই তোমার আদেশ অমান্য করব। কারণ বন্ধ ঘরের গরম আরামের ভিতর থেকে এসে, শীতের এই তীক্ষ্ণ দংশনে আমার শরীরে রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছে, তোমার চুম্বনে যতখানি হয় প্রায় ততখানি কিম্বা হয় ত একটু বেশী।"

মেরী হেসে উঠল, বলল—"তুমি কি নির্ভীক সত্যি-বাদী।" কিন্তু সেই সঙ্গেই ওর মনে হ'ল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যের খোঁচা বোধ হয় সত্যিই আছে। সত্যিই বোধ হয় মেরীর স্পর্শের চেয়েও খোলা হাওয়াটা কুমারের বেশী ভাল লাগে। ভালবাসার তীব্রতা কমে গেছে তাই হয় ত মেরীর স্পর্শে সে পুলক আসে না, যা আগে আসত। কিন্তু আগেও আসত কি? কুমারকে মেরীর যত ভাল লাগত, মেরীকে কুমারের তত ভাল লাগত কি? কে জানে কেন আজকাল বার বার এসব কথা মনে হয়। কোথা থেকে কিসের

বাধা কাঁটার মত ঠেলে উঠতে চায়। সে বাধা কি কুমারের মনের না মেরীর নিজের। কে জানে কেন আজকাল যেন মনে হয়, কুমার আর মেরীকে তার যথার্থ মূল্য দিচ্ছে না। ওর নিজের দেশের মেয়েদের কথা যেমন করে বলে, তাতে মনে হয় তারাও যেন মেরীরই সমান। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মেরীর চেয়ে বড়। অথচ মেরী ইচ্ছে করলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত, ওর যা চেনা-পরিচয়ের মহল। ওর বন্ধুরা ত প্রায়ই সেকথা বলে—"ছিঃ ছিঃ মেরী। এ তুমি কি করলে? ঐ ভারতীয়ের মধ্যে এমন কি দেখলে? সত্যিই এমন কি দেখেছিল মেরী, এখনও দেখছে। উপায় নেই, মেরীর উপায় নেই কুমারকে ওর কেন এত ভাল লাগে, কে সেকথা বুঝবে। তবু ওর সঙ্গে তর্ক বাধে, মতের অমিল শেষ পর্যন্ত মনে গিয়ে পৌঁছয়, তবু,—তবু ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে শ্রেণীবদ্ধ গাড়ী থেকে লালরঙের টু-সীটারটা এসে ওদের সামনে ব্রেক কসল। বাঁ হাতে দরজা খুলে দিল মার্কাস। ওরা তিনজনেই সামনের সীটে উঠে বসল। মাঝখানে মেরী, এপাশে কুমার আর ওপাশে চালকের আসনে মার্কাস নিজে।

গাড়ী স্টার্ট করে মার্কাস হীটারের সুইচ টিপে দিল। প্রথমে কারবরেটরের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়াই আসছিল, ক্রমে হাওয়া গরম হয়ে পায়ের নীচে সুড়সুড়ি দিতে সুরু করল। তখনও হাইডপার্কের গেট খোলা ছিল। ওরা বাগান পার হয়ে চলল। বন্ধ কাঁচের জানালার বাইরে হৃতপত্র গাছগুলির আঁকাবাঁকা ডালের সিলুয়েট। সারি সারি বিজলী বাতির আলোয় রাত্রি যেন নিজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে আছে। দিনের আলোর মর্যাদা সে পায়নি, হারিয়েছে আপন অন্ধকারের মহিমা। এ রাত যেন রাত নয়, নীলাভ নিয়ন সাইনের সাদা আলোয় এ যেন কোন্ সময়হারা মৃত্যুপারের দেশ।

কুমার চুপ করে বসেছিল, কি ভাবছিল কে জানে। মেরী ওর হাতে হাত জড়িয়ে ফিসফিস করে বললে—"রাধাকৃষ্ণের তর্কটা আজ মুলতুবী রইল। ওটা আমি নিজে খানিকটা ভেবে নিয়ে তবে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু রাগ করো না, আজ তোমায় ব্যথা দিয়েছি।"

কুমার হাসল—"মাঝে মাঝে ব্যথা দেওয়া ভাল—নইলে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়।

মার্কাস বললে—At such a night as this, তোমরা ফিসফিস করে কি বলছ?"

মেরী বললে—"প্রেমের কথা।"

কুমার পাদপূরণ করলে—"বলতে পারতাম, কিন্তু 'at such a night as this, তোমাদের আকাশে চাঁদ নেই। আর সেই মরাচাঁদের ভূমিকা নিয়েছে নিয়নসাইন।"

কুমারের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল। কুমার বললে—"ধন্যবাদ মার্ক। মাঝে মাঝে তোমার শকুন্তলার খবর দিও।"

মার্ক বললে—"না তাকে এখন তার নির্জন বনবাসে বন্দিনী রেখে আগে সেই গ্রীক নাটকটা ধরব ভাবছি। তার পরে তোমার বোন এলে আবার শকুন্তলাকে ডাকা যাবে।"

কুমার বললে—"খুব ভাল, আবার ধন্যবাদ।" মেরীর হাতে একটু চাপ দিয়ে নেমে পড়ল কুমার। বললে—"শুভ-রাত্রি মেরি।" ও পিছনে ফেরার আগেই মেরী ওর ছাড়া হাতটা ধরে ফেললে আবার। বললে—"থাম থাম, এইরকম করেই কি নারীর কাছে বিদায় নিতে হয়।"

কুমার একটু অপ্রস্তুত ভাবে মার্কাসের দিকে তাকিয়ে হাসল। মার্কাস ঘাড় কাঁপিয়ে ভুরু নাচিয়ে বললে—"যদি বল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমাকেই বা এই মধুর দৃশ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাও কেন?"

কুমার একটু এগিয়ে এসে থেমে গেল। মেরীর চোখে চোখ রেখে বললে—"ক্ষমা কর মেরি, নির্জনে এর শোধ নেব।"

ওর চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মেরী, বানানো অভিমানে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—"ঈস্ সজনে অবহেলা পেয়ে নির্জনে প্রেম কুড়োতে আসবে না কোন মেয়ে, তোমার কাছে।"

মার্কাস হাসল—"শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি।" বললে কুমার। ওদের গাড়ী হুস করে চলে গেল। কুমারের চারি পাশে কুয়াশার আবরণ ঘন হয়ে উঠল, রাস্তার আলো সে আবরণ যেন ছুঁয়ে আছে মাত্র ভেদ করতে পারছে না। আর থেকে থেকে ছোট ছোট হাওয়ার ঢেউ, সরু ডালগুলি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মুমূর্ষু পাতাগুলি ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এই রাতে, আধা-চেনা শহরের আধ-অন্ধকার কোণায় দাঁড়িয়ে, খসে পড়া পাতার মর্মর শুনতে শুনতে ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ওর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরপাক খেতে খেতে ওর মনের মধ্যে ক্ষোভের মত জমে উঠল। সেই দীর্ঘশ্বাসকে বার্কলে স্ট্রীটের মোড়ে ত্যাগ করে ১২নং বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল কুমার। ক্রমশঃ

ব্যতিক্রম

অনামিকা

তমিস্রা মাখান অঞ্চলখানি ধীরে,
টানিয়া দিতেছে সন্ধ্যা ধরিত্রীর 'পরে,
বিশ্রামের, বিরতির অমোঘ সংবেদ।
দিবসের যত গ্লানি,
শ্রম আনিয়াছে টানি,
মুছাবারে চাহে দেবী, সেই শ্রম-স্বেদ।

কিছুক্ষণ পরে, এলাইয়া গাঢ় কৃষ্ণ কেশে,
দেখা দিল দেবী, পুনঃ নিশীথের বেশে।
গাঢ় ঘুমে সমাচ্ছন্ন ধরিত্রীর অসংখ্য সন্তান,
লভিয়াছে গ্লানি ভুলি সুপ্তি ক্রোড়ে স্থান।
কিন্তু মাতা ধরিত্রীর ক্ষুদ্র একজনা,
কেন একা জাগে, কেন তন্দ্রাহীনা,
কেন তার মনে আজি,
শুধু জাগে প্রশ্ন রাজি?
কেন মন তার বিজ্ঞানের কৈফিয়ৎ ভুলি?
সৃষ্টির আদিম জিজ্ঞাসা ধরে তুলি,
যে জন-মন গড়ে নিয়মের সুশৃঙ্খল সহস্র নিগড়,
কেন পুনঃ সেই তারা তাহা ভাঙে নিরন্তর?
বুদ্ধির বিকাশ হতে জানে যে নিষেধ ডোরে,
কেন তাহা ভাঙে মন, আপনার জোরে?
কে জোগায় এ প্রেরণা?
ইহা কার প্ররোচনা?

তারা-ভরা ঐ স্তব্ধ নিশীথ গগনেরে হেরি,
উঠিতেছে প্রশ্ন কণ্টকিত মন মোর বিস্ময়েতে ভরি।
কে সৃজিল তারাভরা এই বিশ্ব পারাবার?
সে কি আনে মানবের মনে এই অনাচার?
সে নহে কি দায়ী ভাঙাগড়া এই নিয়মের?
যে প্রকৃতি আনে সৃষ্টি, এ মহিমা তাহারি জোরের?

জবাব মিলেছে আজি আমার প্রশ্নের,
হে অমোঘ প্রেম,
তুমি একা ব্যতিক্রম সব নিয়মের।

বেহিসাবী-অভিযান

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হেরিয়া গগনে নীল নব ঘন
নয়ন ভরিয়া যায়
ভুবনভুলানো বুঝি সেই প্রিয়
আঁখি মেলি' ওই চায়!
উল্লাসে কবি গাহে কত গান
রচে সে মিলন-বিরহ-বিতান—
রূপহীন লভে রূপের পরশ
প্রাণহীন প্রাণ পায়।

২

হিসাবী জনের মনের সীমায়
তাহার মূল্য নাই—
'কথা-অমৃতে জীবনের ক্ষুধা
মিটে না তো কভু ভাই!
এ শুধু বৃথাই সময়ের অপচয়,
মাটির ধরণী ভাবের স্বর্গ নয়,
সবারে এখন গাহিতে হইবে—
অন্ন বস্ত্র চাই।'

৩

সুন্দরে তব সাজি হ'ক ভরা—
ফুলের সুরভি চাহি,
লেখনীরে তুমি কোরো না লাঙল
দৈন্যের গান গাহি'।
জঠরের জয়ে মনের ক্ষুধা না যায়,
ভাবের সায়রে সে যে গো ডুবিতে চায়,
মাটির ধরণী হয় মধুময়
সে সুধায় অবগাহি'।

৪

মহাভারতের অমৃত ধারায়
কবি যে করায় স্নান,
পুণ্য-অয়ন সেই রামায়ণ
তাহারি তো অবদান।
আনে ভগবানে মানুষের অঙ্গনে
মানুষেরে লয় দেবের পুণ্যাসনে,
চলে যুগে যুগে 'সৃষ্টিছাড়া'র
বেহিসাবী অভিযান।

কালিদাস সাহিত্যে 'মণিমুক্তা'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

'কুমার সম্ভবে' মহাকবি নীলমাণিকে নির্শ্মিত কণ্ঠভূষণের সহিত মহাদেবের কণ্ঠের নীল আভার উপমা দিয়াছেন :

'সুবর্ণয়া কর্ণিকয়েব নীল—
মাণিক্যময্যা কুতুকেন গৌর্য্যা।
নীলস্য কণ্ঠস্য পরিস্ফুরন্ত্যা
কান্ত্যা মহতো সুবিরাজ মানম্।' (কু-১২ ১৩)।

তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে অতি-মনোরম নীলকান্তি বাহির হইতেছিল, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল গৌরী বুঝি কৌতুকবশে তাঁহার কণ্ঠে একটি নীলমাণিকে নির্শ্মিত অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছেন।

মহাদেবের দুই কর্ণে যে দুইটি মহামূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্নের কুণ্ডল দুলিতেছিল, মহাকবি সেই কুণ্ডল দুইটির বর্ণনায় বলিতেছেন :

'মহার্হরত্নাঙ্কি তয়োরুদারং
স্ফুরং প্রভামণ্ডলয়োঃ সমন্তাৎ।
কর্ণাস্থিতাভ্যাং শশিভাস্বরাভ্যাং
উপাসিতং কুণ্ডলয়োশ্ছলেন'। (কু-১২ ৪৪)।

তাঁহার দুই কর্ণে যে দুইটি কুণ্ডল দুলিতেছিল তাহারা অতীব মনোহর ও মহামূল্য রত্নে খচিত, তাহাদের দীপ্তি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দেখিলে মনে হয় যেন চন্দ্র ও সূর্য্য কুণ্ডলের ছদ্মবেশে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।

সরযূ নদীতে মহারাজ কুশ ও তাঁহার প্রাসাদের মহিলাদের স্নানের বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি রূপসী নারীদিগের মুক্তাহারের সহিত ও শ্যামকলেবর কুশের নীলমাণিকের সহিত উপমা দিয়াছেন :

'প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামা
প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্।' (রঘু-১৬ ৬৯)।

মুক্তা সকল একেই ত সকলের চক্ষে অতি সুন্দর দেখায়, তাহার উপর যদি আবার তাহাদের সঙ্গে নীলমণি যোগ করিয়া দেওয়া হয় তাহাদের শোভা যে কিরূপ বৃদ্ধি পায়, তাহা কি কাহাকে বলিয়া দিতে হয়।

নদীর জলে যে সব রূপসী নারীরা প্রথমে স্নান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতেছিল যেন পাশাপাশি বসানো এক গাছা সুন্দর মুক্তার হার নদীর শোভা বাড়াইতেছে। তার পর যখন শ্যাম কলেবর কুশ নদীতে নামিয়া তাঁহাদের সহিত স্নানে যোগ দিলেন, দেখাইল যেন সেই মুক্তার মালাটির মাঝে বুঝি একখানি সুন্দর নীলমাণিক যুড়িয়া দেওয়া হইল, শোভার আর তুলনা রহিল না।

ঠিক এইরূপ মুক্তাহারের মাঝে বসানো নীলমণির উপমা 'মেঘদূতের' পূর্ব্বমেঘে পাওয়া যায়। সেখানে মহাকবি বলিতেছেন যে,

মেঘ যখন আকাশ হইতে নামিয়া চর্ম্মন্বতী নদীর উপর আসিয়া জলপান করিতে থাকিবে, তখন উর্দ্ধ হইতে যাহারাই সে দৃশ্য দেখিবে তাহাদের মনে হইবে সূক্ষ্ম নদীটি যেন বসুন্ধরার কণ্ঠে পরান একছড়া মুক্তার হার, আর তার মাঝে কালো মেঘ, যেন মুক্তাহারের মাঝে বসান একখানি নীলমণি।

'রঘুবংশের' ত্রয়োদশ সর্গেও অনেকটা এই ধরনের উপমা পাওয়া যায়।

রামসীতার লঙ্কা হইতে আগমনের সময় 'পুষ্পক' বিমানখানি যখন প্রয়াগের উপর আসিয়া পড়িল, আকাশপথ হইতে নিম্নে যমুনার কালো জলের সহিত গঙ্গার শুভ্রজল মিশিয়া যাওয়ার দৃশ্যকে মহাকবি মুক্তাহারের মধ্যে মধ্যে যুড়িয়া দেওয়া নীলমাণিকের সহিত উপমা দিয়াছেন :

'ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ
র্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।' (রঘু-১৩।৫৪)।

কোথাও দেখাইতেছিল যেন এক ছড়া মুক্তার হারের মধ্যে মধ্যে নীলমণি জুড়িয়া দেওয়াতে তাহারা বুঝি মুক্তাগুলির উপর নীল আভা বিস্তার করিতেছে।

এক ছড়া মুক্তার মালাকে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলস্রোতের সহিত তুলনা করিয়া কালিদাস তাঁহার মহাকবি নাম সার্থক করিয়াছেন।

'রঘুবংশের' সে শ্লোকটি এখানে দেখানো গেল :

'পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ
কৢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপ রক্তসানুঃ
সনির্ঝরোদ্গারঃ ইবাদ্রিরাজঃ'। (রঘু-৬০)।

ইনি পাণ্ড্যদেশের রাজা হরিচন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ সম্পন্ন করিয়া স্কন্ধে যে ওই লম্বমান মুক্তার মালাটি ধারন করিয়া আছেন, দেখিলে কি মনে হয় না যে, বালার্কের আলোকে উজ্জ্বল নির্ঝরিণীর ধারা সমেত যেন পর্ব্বতরাজ বিরাজিত রয়েছেন ?

পাণ্ড্যরাজের বিশাল বপু যেন পর্ব্বতরাজ হিমালয়, আর তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গের লম্বমান শুভ্র মুক্তার মালাগাছটি যেন বালসূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল নির্ঝরিণীর শুভ্র প্রবাহ।

'কুমার সম্ভবে' মহাকবি শুভ্র-মুক্তার সহিত দন্তপংক্তির উপমা দিয়াছেন। উমার দন্ত বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন :

'মুক্তাফলংবা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্'। (কু-১ ৪৪)।

কিংবা, যদি বিশুদ্ধ প্রবালের উপর মুক্তাবলী সাজাইয়া রাখা হয়, তাহাদের যে শোভা হয়, উমার অধরের উপর দন্তপাতির সেইরূপ শোভা হইত।

উমার অধরোষ্ঠ ছিল প্রবালের মত রক্তবর্ণ আর দাঁতগুলি মুক্তার মত সুন্দর ও শুভ্র। মহাকবি বহুস্থানে মুক্তার সহিত নয়ন-জলের উপমা দিয়াছেন।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের সহিত রাজকুমারীর পরিচয় করাইয়া দিতে দিতে সুনন্দা অঙ্গরাজের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :

'অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দুন্
মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রু বিলাসিনীনাং
উন্মুচ্য সূত্রেন বিনৈবহারাঃ'। (রঘু-৬,২৮)।

ইনি শত্রুদের নারীগণের কণ্ঠের হার উন্মোচন করাইয়া তাঁহাদের বক্ষের উপর বিনাসূত্রে গ্রথিত স্থূলতম মুক্তার ন্যায় অশ্রুর হার প্রত্যর্পণ করেন।

মহাকবি এই শ্লোকটিতে যেন বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, এই অঙ্গদেশের রাজা বিপক্ষপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় এত বেশী বীর যোদ্ধা বধ করেন যে, সে দেশের নারীরা স্বামী-হারা হইয়া সধবার লক্ষণ কণ্ঠের মুক্তার হারগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দেন ও তাঁহারা স্বামীশোকে অভিভূতা হইয়া যখন রোদন করেন ও চক্ষু হইতে জলের বড় বড় ফোঁটা বক্ষের উপর পড়িতে থাকে, দেখিলে মনে হয় সেগুলি যেন বিনাসূত্রে গাঁথা বড় বড় মুক্তার হার বক্ষের উপর পরান রহিয়াছে।

'মেঘদূতে'র উত্তর-মেঘেও মুক্তাফলের সহিত অশ্রুর উপমা পাওয়া যায়। যক্ষ নিজের দুঃখবর্ণনায় বলিতেছেন—

'পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং।
মুক্তাস্থূলাস্তরু কিশলয়েষশ্রু লেশাঃ পতন্তি।' (উ-মে-৪৫)।

আমার এই ব্যর্থতা দেখিয়া স্থলীর দেবতারাও বৃক্ষের কিশলয়ের পর তাঁহাদের মুক্তার মত স্থূল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেও এই ধরনের উপমা পাওয়া যায়।

উর্ব্বশীকে সহসা অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া পুরূরবা বলিতেছেন—

'পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরশ্রুবিন্দু
মুক্তবলী বিরচনং পুনরুক্তম্ বৈঃ।' (বিক্রম-৫ম অঙ্ক)।

তোমার চক্ষু হইতে ওই পীনপয়োধরের উপর পতিত অশ্রুগুলির দ্বারা মুক্তার হার রচনা করিয়া রোদন করিতেছ কেন?

মহাকবি কেবল যে মুক্তার সহিত অশ্রুর উপমা দিয়াছেন তাহা নয়, তিনি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের সহিতও অশ্রুর উপমা দিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শুভজন্ম বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস বলেন—

'দশানন কিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষস-শ্রিয়ঃ।
মনিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ।' (রঘু-১০।৭৫)

ঠিক সেই সময় দশাননের মুকুট হইতে মণিগুলি খসিয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেল, দেখিয়া মনে হইল রাক্ষস রাজলক্ষ্মী বুঝি মণিরূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

রাবণের মুকুটের মণিগুলি ত মণি নয়, ওগুলি মহাকবি বলেন আসলে রাক্ষস রাজলক্ষ্মীর কয়েক ফোঁটা চোখের জল। যাঁহার আশ্রয়ে তিনি এতদিন ছিলেন সেই রাবণের দুর্গতি আসন্ন ভাবিয়া রাক্ষস রাজলক্ষ্মী যেন দুঃখে চোখের জল ফেলিতেছেন।

কাঞ্চনের সহিত রত্নের মিলন হইলে উভয়ের শোভা যেমন বৃদ্ধি পায়, রাজকুমারের অজের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ হইলে দুইজনের শোভা যে সেইরূপ বৃদ্ধি পাইবে মহাকবি সেকথা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতে চাহিতেছেন—

'ত্বমাত্মানস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব
রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন।' (রঘু-৬,৭৯)

তোমার অনুরূপ গুণবান্ রাজকুমারকে বরণ কর কাঞ্চনের সহিত রত্নের মিলন হউক।

অজ-ইন্দুমতীর মিলন যেন মণিকাঞ্চনের মিলন।

একটি বড় রক্তবর্ণের মণির মহাকবি কত প্রকার উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এখানে তাহা দেখান যাইতেছে। 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের সঙ্গমনীয় মাণিক্য বর্ণনা।

মণিটি একে লাল তার তাহাকে রাখা হইয়াছে একটা রক্তবর্ণ তাল পাতার উপর স্নানের ঘাটে, তাই তাহাকে রক্তলিপ্ত মাংসের খণ্ড মনে করিয়া আকাশ হইতে এক শকুনি তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। (বিক্রম-৫ম-অঙ্ক)

তার পর মহাকবি মণিটির জ্বলন্ত অঙ্গারের সহিত উপমা দিলেন—

'এসৌ মৃণালম্বিত-হেমসূত্রং
বিভ্রন্মণিং মণ্ডল শীঘ্রচারঃ।
অলাতচক্র প্রতিমং বিহঙ্গ
স্তদ্রাগ লেখা-বলয়ং তনোতি।'

মণিটি লইয়া ওই পক্ষী দ্রুতগতিতে মণ্ডলাকারে উড়িয়া চলিয়াছে, ওর মুখে স্বর্ণের সূত্রে মণিটি ঝুলিতেছে দেখাইতেছে যেন গোলাকার একটা জ্বলন্ত অঙ্গার চারিদিকে দীপ্তি ছড়াইতেছে।

কেবল জ্বলন্ত অঙ্গারের সঙ্গে নয়, অশোক পুষ্পের স্তবকের সহিতও মহাকবি লাল মণিটির উপমা দিয়াছেন—

'প্রভাপল্লবিতে নাসৌ করোতি মণিনা খগঃ।
অশোকস্তবকেনেব দিঙ্মুখস্যাবতং সকম্।'

দীপ্তিরূপ পল্লবযুক্ত মণিটিকে দেখাইতেছিল অশোক পুষ্পের একটি স্তবক, পক্ষী যেন উহাকে দিগ্বধূর কর্ণভূষণ করিয়াছে।

অশোক পুষ্প লাল, মণিটিও লাল; তখনকার দিনে অশোক পুষ্প কর্ণে ধারণ করিয়া নারীরা কর্ণভূষণের কাজ সারিতেন, তাই পাখীটি যখন অশোকস্তবকের মত লাল মণিটিকে লইয়া দিকে দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তখন মহাকবি বলেন, দেখাইতেছিল যেন উহা দিগ্বধূর কর্ণভূষণের কাজ করিয়া দিতেছে।

মহাকবি লাল মণিটির প্রথমে উপমা দিলেন রক্তলিপ্ত মাংস খণ্ডের সহিত, তার পর দিলেন জ্বলন্ত অঙ্গারের সঙ্গে, তার পর দিলেন অশোকপুষ্পের স্তবকের সহিত, তার পর করিলেন নারীর কর্ণভূষণের কল্পনা, কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি না পাইয়া পক্ষী যখন উহাকে মুখে লইয়া আকাশে উড়িতেছিল, তখন উহাকে 'লোহিতাঙ্গ' গ্রহ মঙ্গলের সহিত উপমা দিলেন—

'আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ।
নক্তমিব লোহিতাঙ্গঃ পরুষঘনচ্ছেদ-সংপৃক্তঃ।'

পক্ষী উহাকে বহু দূরে লইয়া যাওয়াতে মণিটিকে ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন নিশার আকাশে মঙ্গলগ্রহ বলিয়া মনে হইতেছে।

সবুজ সবুজ পাতায় ভরা 'শ্যাম'নামক বটবৃক্ষের মধ্যে মধ্যে রাঙা রাঙা ফল, দূর হইতে কিরূপ দেখায় মহাকবি তাহা 'রঘুবংশে'র ত্রয়োদশ সর্গে বলিতেছেন—

'রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং
সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি।' (রঘু-১৩.৫৩)

দেখাইতেছিল যেন রাশি রাশি পান্নার মধ্যে বুঝি কেহ এক রাশ চুনি ছড়াইয়া দিয়াছে।

রত্ন—সে মনোহর হইলেও কখনও কখনও যে আবার ভীতিপ্রদও হইতে পারে এই ভাবটি উপমা করিয়া মহাকবি বলিতেছেন যে, প্রিয়তম পুত্রের নাম 'রাম' বলিয়া রাজা দশরথের নিকট রাম নামটি ছিল অতি প্রিয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মহাশত্রু প্রতিহিংসা-পরায়ণ পরশুরামের নামও 'রাম' বলিয়া ও নামটি দশরথের নিকট ভীতিজনক হইয়া পড়িয়াছিল—

'রাম নাম ইতি তুল্যমাত্মজে—
বর্ত্তমানহিতে চ দারুণে।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভব
দ্রত্নজাত মিব হার সর্পয়োঃ।' (রঘু-১১।১৮)

রত্ন যেমন হারে থাকিলে মনোহর, অথচ সর্পের মস্তকে থাকিলে ভীতিপ্রদ হয়, রাম নামটি তেমনি নিজের পুত্রের ও ভীষণ শত্রুর উভয়েরই হওয়াতে দশরথের মনে তেমনি প্রীতি ও ভয় উভয়েরই সৃষ্টি হইল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' মহাকবি শাণযন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত মণির সহিত দীপ্তিমান পুরুষের দুঃখভারে কৃশ দেহের উপমা দিয়াছেন।

বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করায় দুঃখে ও অনুতাপে রাজা দুষ্মন্তের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল, সে সময় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কঞ্চুকী মনে মনে বলিতেছেন—

'সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে' (শকু-৬ষ্ঠ অঙ্ক)

শাণযন্ত্র দ্বারা সংস্কার করিলে মহামূল্য মণি কিছু ক্ষীণ হইয়া গেলেও তাহার দীপ্তি যেমন হ্রাস পায় না, তেমনি অনুশোচনায় ও রাত্রি জাগরণের ফলে মহারাজার দেহ কিছু ক্ষীণ হইলেও তাঁহার কান্তি হ্রাস হইয়া যায় নাই।

এসেছে আশ্বিন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বৃষ্টিঝরা দিন কবে গেছে চ'লে, এসেছে আশ্বিন
নিয়ে তার শুভ্র মেঘ, স্বর্ণালোক, নীলাকাশখানি,
নিয়ে তার স্নিগ্ধ হাসি, নিয়ে তার সুদূরের বাণী,
রাত্রির অজস্র জ্যোৎস্না, অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় দিন।
মৃদঙ্গের গুরু গুরু হ'ল কোন্ দিগন্তে বিলীন,
ক্রন্দসী কাঁদে না আর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন মুখে টানি,
কে কৌতুকে ঢেলে দেয় শ্যামাঞ্চলে শ্বেত পুষ্প আনি,
প্রকৃতি নিয়েছে তুলে করে সে সহস্রতন্ত্রী বীণ।

মনের আকাশে যদি মেঘ জমে, দিও না প্রশ্রয়,
সুদূরে সরায়ে দাও, মুছে ফেলো অশ্রু যদি আসে,
শারদ আলোর স্পর্শে হোক প্রাণ নির্ম্মল নির্ভয়,
জলভারমিক্ত, মুক্ত, শুভ্র মেঘ নীল নভে ভাসে,
অকারণে কোরো না-কো বক্ষ ভরি' বেদনা সঞ্চয়,
সে হাসি সার্থক কর যে হাসি শরৎ ভালবাসে।

বিষ-মাদক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিষ-মাদক কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এরূপ কেহ মনেই করিত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় আফিম চীনে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিল। চীন সরকার উহাতে বাধা দিলে ১৮৪০ সনে এক যুদ্ধ হয়, ইহাই 'আফিম যুদ্ধ' বা 'ওপিয়ম ওয়ার' নামে কুখ্যাত। এই যুদ্ধে হারিয়া গিয়া চীন ইংরেজকে আফিমের বাণিজ্যে সম্মতি দিতে ও কতকগুলি বন্দরে বাণিজ্যের সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই চীন হংকং দ্বীপ ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে।

ইউরোপীয়েরা মনে করিল আফিম কোকাগাছের পাতা (যাহা হইতে কোকেন প্রস্তুত হয়) এবং গাঁজা সেবন কোন কোন দেশের লোকের অস্থিমজ্জাগত স্বভাব। এই নেশার সমস্যা এক-একটি দেশের জাতীয় সমস্যা এবং ইহার সমাধান জাতিবিশেষের শক্তি ও ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

কিন্তু কালে কালে ইহা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিপুল বৃদ্ধি। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যে নূতন শ্রমিক সমাজ গড়িয়া উঠিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ কারণে নেশার মাত্রা বাড়িল। ইহার উপর আবার সভ্যতার নূতন অবদানস্বরূপ আফিম ও কোকো-পাতা হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নূতন নূতন নানাপ্রকারের নেশার বস্তু আবিষ্কৃত হইতে লাগিল।

প্রথমে যে বিপদকে স্থানীয় বা দেশবিশেষের মনে করা গিয়াছিল তাহা এখন আন্তর্জ্জাতিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর স্বাস্থ্য নষ্টের সম্ভাবনার কারণ হইল। এই বিষ-মাদকগুলির অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অপরাধপ্রবণতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা গেল, তাহাতে এই ব্যবসায়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে অবাধভাবে চলিতে দেওয়া আর কোনক্রমেই নিরাপদ বলিয়া স্বীকার করা গেল না।

জনমত আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে প্রবল হইল। এই সম্পর্কে ১৯০৯ সনে সাংহাই শহরে আন্তর্জ্জাতিক আফিম কমিশনের একটি সম্মেলন হয়। অবশ্য এই সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা হয়, তাহা ত্রুটিহীন হয় নাই।

আন্তর্জ্জাতিকভাবে বিষ-মাদক ব্যবহার হ্রাসকরণ, বিষ-মাদক গুল্মের চাষ, উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি চেষ্টাকে তিন স্তরে বিভক্ত করা চলে। প্রথম স্তরে কতকগুলি দেশের সরকার, একযোগে হইলেও, পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় স্তরে জাতিগুলি পরস্পরে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি করিয়া অথচ কোন আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা সৃষ্টি না করিয়াই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তৃতীয় স্তরে যখন লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটা স্থায়ী সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা পাকাপাকিভাবে সুরু হয়।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে পূর্ব্ব প্রাচ্যের বিষ-মাদক বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট তেরটি রাষ্ট্রশক্তি—অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, চীন, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ডস, পারস্য, পর্ত্তুগাল, রুশ, শ্যাম, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৯০৯ সনে সাংহাই নগরে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া আফিম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯১২ সনে এই রাষ্ট্রগুলিই (অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ব্যতীত) আবার হেগ শহরে মিলিত হইয়া সাংহাই-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের মূলনীতির ভিত্তিতে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করে। এই চুক্তি Convention for the suppression of the abuse of opium and other drugs নামে খ্যাত। এই চুক্তির আওতায় পড়ে আফিম (কাঁচা আফিম, আফিম দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য নেশার বস্তু এবং আফিম-সংশ্লিষ্ট ঔষধ সহ) মরফিন, কোকেন এবং হেরোইন। এই চুক্তিতে কিরূপে বিষ-মাদক আন্তর্জ্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে উহার মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয়—আজ পর্য্যন্ত এই মূলনীতিগুলি স্বীকৃত হইতেছে যথা: কারখানার উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদিত বিষ-মাদকের বিক্রয় এবং ব্যবহার, চিকিৎসা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে সীমাবদ্ধ রাখা, কাঁচা আফিমের উৎপাদন ও বণ্টন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং চণ্ডু বা আফিমের ধূমপান ক্রমে ক্রমে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া।

এই আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি বা কনভেনসনের পক্ষে একদিকে যেমন ছিল ইউরোপীয় এবং আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তিগুলি, অপরদিকে ছিল চীন, জাপান, শ্যাম এবং পারস্য দেশ—বিষ-মাদক সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতা ইহা হইতেই বুঝা যায়। চীন দেশের উপরে পাশ্চাত্য কতকগুলি দেশের বিশেষ অধিকার থাকার দরুণ ঐ সকল দেশের উপরে বিশেষ দায়িত্ব চাপান হইয়াছিল। নেদারল্যাণ্ডসকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইল যে, সে আইন ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিবে। পরবর্তী কালে এই তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষমতা অবশ্য একটি আন্তর্জ্জাতিক সংস্থার উপরে দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১২ সনের চুক্তি উৎপাদন এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় নাই,

আর এই চুক্তিতে এরূপ কোন ব্যবস্থাও ছিল না যাহাতে আফিমের ধূমপান হ্রাস পায়। ঔষধার্থে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কারণে আফিম ব্যবহার সম্পর্কে চুক্তিকারী রাষ্ট্রসমূহের পৃথক ভাবে এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকায়—এই দিক দিয়াও আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। পৃথকভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র এই কনভেনসন বা চুক্তির খসড়া অনুমোদন করিতে বহুদিন কাটিয়া গেল, এজন্য ১৯২০ সনের ১০ই জানুয়ারী অর্থাৎ যেদিন ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্র কার্য্যকরী হইল সেইদিন হইতে এই চুক্তিও বলবৎ হইল। ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্রে যে সকল রাষ্ট্র সহি করিল তাহারা ইহাও স্বীকার করিল যে, ১৯১৯-১৯২০ সনের শান্তি-চুক্তির স্বাক্ষর-কারিগণ ১৯১২ সনের হেগ কনভেনসনেরও অনুমোদনকারী এরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।

লীগ-অব-নেশনস বা জাতিসঙ্ঘ

লীগ-অব-নেশনস বা জাতিসঙ্ঘ ১৯২০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গঠনতন্ত্রের ২৩ ধারায় আফিম এবং অন্যান্য বিষ-মাদক সম্পর্কে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতার বলে জাতিসঙ্ঘ ১৯২০ সনে যখন ইহার প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তখন ১৯১২ সনের হেগ সম্মেলনে যে কনভেনসন গ্রহণ করা হয় এবং যাহার বলে নেদারল্যাণ্ডস গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষমতা পায়, তাহা সঙ্ঘ নিজেই গ্রহণ করে। সঙ্ঘের কাউন্সিলের কার্য্যের সুবিধার জন্য এই সময় আফিম ও অন্যান্য বিষ-মাদক বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একটি উপদেশ কমিটি গঠিত হয়। হেগ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ এবং চুক্তিগুলি কার্য্যকরী হইতেছে কিনা ইহা দেখিবার ভার এই কমিটির উপর বর্ত্তায়। সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল নানা উপায়ে এবং প্রশ্নাবলী পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহের ভার পাইলেন। সংস্থার দপ্তর নানা ভাবে এই উপদেশক কমিটিকে সাহায্য করিবার ভার লইল। এই দপ্তরের সংগৃহীত তথ্যাদির আলোচনার জন্যই জেনেভা নগরে ১৯২৫ সনে প্রথম এবং দ্বিতীয় আফিম সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

প্রথম জেনেভা আফিম সম্মেলনের ফলস্বরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত ইহাও স্থির হয় যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মারফৎ খুচরা বিক্রয় ব্যতীত আফিমের আমদানী, বিক্রয় এবং বণ্টন সম্পূর্ণ ভাবে সরকারের একচেটিয়া হইবে। আফিম প্রস্তুতও সরকারের একচেটিয়া হইবে। চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের নিজ রাষ্ট্র ব্যতীত উহাদের প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশ এবং অধিকারভুক্ত দেশসমূহেও এই নিয়ম কার্য্যকরী হইবে।

দ্বিতীয় জেনেভা আফিম সম্মেলন ১৯২৫ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কনভেনসন নামে খ্যাত। ইহাতে স্থির হয় যে, বিষ-মাদকের আমদানী ও রপ্তানী সরকারের অনুমতি লইয়া না করিলে তাহা আইনসম্মত হইবে না। এই কনভেনসন অনুযায়ী একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ড নামক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। ইহাও স্থির হয় যে, এই বোর্ড এরূপ আট জন ব্যক্তিদ্বারা গঠিত হইবে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, নিস্বার্থ এবং এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নন এইরূপ হইবেন, তাহা হইলেই সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন। এই সকল সভ্য এরূপ হইবেন যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবিকার জন্য সরকারের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হইতে না হয়। প্রত্যেক সভ্যকে জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন।

চুক্তিকারী রাষ্ট্রসমূহ প্রতি বৎসর বোর্ডকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইল।

(ক) কনভেনসন-অন্তর্গত দ্রব্যসমূহ আগামী বৎসরে নিজ রাষ্ট্রে খাদন জন্য কতটা দরকার।

(খ) উৎপাদন সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের উপাত্ত (data) যথা কাঁচা এবং উৎপাদিত, মজুত, খাদিক, আমদানী, রপ্তানী সামগ্রী যাহা কনভেনসনের আওতায় পড়ে। ইহা ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্যের বেআইনী আমদানী-রপ্তানী যাহা ধরা পড়িয়াছে।

ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্টের সাহায্যে বোর্ড আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিষ-মাদকের আমদানী-রপ্তানীর উপর নজর রাখিতে এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। বোর্ড যে কোন দেশের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিতে পারে, তদন্ত করিতে পারে এবং ফলাফল ও অভিমত জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলে জানাইতে পারে, দরকার হইলে সাময়িক ভাবে কনভেনসন অমান্যকারী দেশে বিষ-মাদক সম্পর্কে আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করিতে পারে। বোর্ড প্রতি বৎসর জাতি-সঙ্ঘের কাউন্সিলের নিকট বার্ষিক বিবরণী পেশ করে।

১৯২৫ সনের কনভেনসন ১৯২৮ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইয়াছিল।

১৯৩১ সনের জুলাই মাসে একটি নূতন কনভেনসন সহি করা হয়—ইহাদ্বারা বিষ-মাদকের উৎপাদন ও বণ্টন সীমাবদ্ধ করা হয়। চুক্তির রাজ্যসমূহের কেহ বার্ষিক বরাদ্দের অতিরিক্ত আমদানী করিলে বোর্ড আরও আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে পারে, রপ্তানীকারী রাজ্যকেও রপ্তানী বন্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

১৯৩১ সনের কনভেনসন বিষ-মাদক পরিদর্শক সংস্থা (The Drug supervisory Body) নামে আর একটি আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা সৃষ্টি করে—ইহার সভ্যসংখ্যা বারো—জাতিসঙ্ঘের উপদেশক কমিটি, স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ড, জাতিসঙ্ঘের স্বাস্থ্যকমিটি এবং আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য কার্য্যালয় ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারা এক-একজন সভ্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইল।

১৯৩১ সনের কনভেনসন মতে বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের মারফত পরস্পরের সহিত তথ্য বিনিময় করিতে পারে—উদ্দেশ্য বেআইনী বাণিজ্য প্রতিরোধ করা।

১৯৩১ সনের ২৭শে নবেম্বর সাতটি গবর্ণমেণ্ট শ্যামের ব্যাঙ্কক শহরে একটি নূতন চুক্তি সহি করে—উদ্দেশ্য ১৯১২ সনের হেগের কনভেনসনের সর্ত্ত কার্য্যকরী করা। ইহা দ্বারা ১৯২৫ সনের

জেনেভা চুক্তিও শক্তিমান হয়—বিশেষতঃ আফিমের ধূমপান নিরোধ সম্পর্কে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ১৯৩৬ সনের ২৬শে জুন আর একটি জেনেভা কনভেনসন হয়। ইহা দ্বারা রাষ্ট্রগুলি বিষ-মাদকের বেআইনী বাণিজ্য রোধকল্পে নিজ নিজ দেশে কতকগুলি আইন এবং শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হয়। যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক অপরাধীরা আইনের ফাঁকে কোন দেশের শাস্তি দেওয়ার অধিকার এড়াইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাময়িক ভাবে জাতিসঙ্ঘের সকল ব্যবস্থাই তছনছ হইয়া যায় এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নানা ভাবে ব্যাহত হয়। এজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে নূতন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হয়।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং বিষ-মাদক

স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ড এবং বিষ-মাদক পরিদর্শক সংস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও কিছুদিন কার্য্য চালাইয়াছিল এবং উপদেষ্টা সংস্থার সভা ১৯৪০ সনেও হইয়াছিল কিন্তু জাতিসঙ্ঘের অবলুপ্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান কার্য্যই হইল এই সকল লুপ্ত সংস্থার স্থানে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ (General Assembly) বিষ-মাদক সম্পর্কে প্রধান দায়িত্ব উহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (Economic and Social Council) উপর দিয়াছে। উক্ত পরিষদ ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সম্মেলনেই বিষ-মাদক কমিশন (Commission on Narcotic Drugs) নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্যা ১৫টি দেশ। সকলেই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য। এই সকল সদস্য-দেশে আফিম, কোকা-পাতা পাওয়া যায় বা মাদক উৎপাদন সম্পর্কে এই বস্তুগুলি ব্যবহৃত হয়—এই সকল দেশে বেআইনী ব্যবসায়ও চলে এবং তৎসম্পর্কিত নানা অনিষ্টের সম্ভাবনাও বর্ত্তমান। ১০ জন সভ্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাচিত—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ আবশ্যক হইলে ইহাদের স্থানে নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। বাকী ৫ জন সভ্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত।

অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাচিত সভ্য হইতেছে—কানাডা, চীন, ফ্রান্স, ভারত, পেরু, তুরস্ক, সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুগোস্লাভিয়া।

১৯৫৬ সনে নিম্নলিখিত দেশগুলি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ কর্ত্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে : অষ্ট্রিয়া, ইজিপ্ট, হাঙ্গারী, ইরাণ এবং মেক্সিকো।

তথ্য সংগ্রহ

প্রায় ৯০টি দেশ হইতে তথ্যসংগ্রহ করিয়া বিষ-মাদক নিবারণের কার্য্যে সহায় হয়।

এই তথ্যগুলি এরূপ : (ক) প্রত্যেক দেশে চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য কি পরিমাণ বিষ-মাদকের প্রয়োজন তাহার বার্ষিক বরাদ্দ। বৎসরের বরাদ্দ ডিসেম্বর মাসে বিষ-মাদক পরিদর্শক সংস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে সমস্ত পৃথিবীর বরাদ্দ জানা যায়।

(খ) আফিম বৃক্ষের চাষ এবং আফিম উৎপাদনের, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এবং খাদনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ। এই তথ্য স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ড প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করে—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের জ্ঞাতার্থে।

(গ) প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট বিষ-মাদক সম্পর্কিত সর্ব্ববিষয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ করে—এই সকলের চুম্বক হইতে একটি বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হয় (Summary of Annual Report)।

(ঘ) ইহা ব্যতীত বিষ-মাদকের বেআইনী ব্যবসা সম্পর্কে সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট প্রত্যেক রাষ্ট্রকে একটি পৃথক রিপোর্ট পাঠাইতে হয়—ইহার চুম্বকও একটি রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়।

(ঙ) প্রত্যেক রাষ্ট্রকে এই সম্পর্কিত নিজ দেশের আইন ও শাসনবিধি সম্বন্ধে প্রতি বৎসর একটি রিপোর্ট সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তর হইতে ইহারও একটা চুম্বক প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমানে ইহা পাঁচ বৎসর অন্তর বাহির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(চ) ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যাহারা বিষ-মাদক উৎপাদন করে বা ভবিষ্যতে করিবে তাহাদের একটি তালিকা ঠিকানা সহ সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তর হইতে এই তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়।

(ছ) বিভিন্ন রাজ্যে বিষ-মাদক আমদানী এবং রপ্তানী বিষয়ে যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ আছে, তাহাদের তালিকা সেক্রেটারী-জেনারেল বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক উপায়ে (Synthetic) বিষ-মাদক উৎপাদন

১৯৩৯ সনে একখানি জার্ম্মান সাপ্তাহিক কাগজে প্রকাশিত হইল যে, রাসায়নিক উপায়ে বিষ-মাদক দ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে। ইহাও জানা যায় যে, Dolatine বা Pethidine নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পদার্থদ্বারা আফিমের মত নেশা হয়। এই দ্রব্য শিল্পে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত হয়। এই নূতন আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়।

দেখা গেল ১৯২৫ সনের কনভেনসনের ১০ম ধারা এবং ১৯৩১ সনের কনভেনসনের ১১ ধারার আওতায় এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থগুলি পড়ে না, কারণ ইহা আফিম বা কোকা পাতা হইতে প্রস্তুত নয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৯৪৬ সনেই রাষ্ট্রপুঞ্জের

বিষ-মাদক কমিশন এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ করে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য পরিষদও এই বিষয়ে কমিশনকে বিশেষ সাহায্য করে। এই নূতন বিষ-মাদকগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ম ১৯৪৮ সনের ১৯শে নবেম্বর "Paris protocol 1948" নামক নূতন চুক্তি-দলিল সহি হয়। ১৯৪৯ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। এই নূতন চুক্তি দ্বারা তৎকালীন বিষ-মাদকের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ভবিষ্যতে যে সকল বিষ-মাদক আবিষ্কৃত হইবে, তাহাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও হয়। সকলেই স্বীকার করেন যে, ১৯৩৯ হইতে যে সকল বিষ-মাদক দ্রব্য আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, সবগুলিই ইহার আওতায় পড়ে। এই চুক্তির ব্যবস্থা মত প্রত্যেক রাষ্ট্রই এরূপ কোন সম্ভাব্য মাদকের সন্ধান পাইলে রাষ্ট্র-পুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে জানাইবেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিষ-মাদক কমিশন ও বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের গোচরে আনিবেন। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এইরূপ দ্রব্য হইতে বিষ-মাদক প্রস্তুত হইবার আদৌ সম্ভাবনা আছে কিনা এবং যদি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সেক্রেটারী জেনারেলকে তৎক্ষণাৎ জানাইবেন। সেক্রেটারী জেনারেল এই তথ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সকল সদস্যের গোচরে আনিবেন এবং যে সকল দেশ প্যারিস চুক্তির মধ্যে, তাহাদিগকে এবং বিষ-মাদক কমিশনকেও জানাইবেন। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ অভিমত জানিবার পর চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি এই নূতন বিষমাদকের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিবে। এই চুক্তিতে এরূপ একটি ধারাও আছে যাহার বলে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ অভিমত প্রাপ্তির পূর্ব্বেও নূতন বিষ-মাদক বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

এখন পর্য্যন্ত ৪৮টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই চুক্তিকারী দেশসমূহের অধিবাসী। অনেক পরাধীন দেশও এই চুক্তির এলাকায় পড়িয়াছে। যে সকল দেশ এখন পর্য্যন্ত চুক্তির মধ্যে আসে নাই তাহাদিগকেও চুক্তিবদ্ধ করিতে চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৪৮ সনের এই চুক্তির পর নূতন ৩০টি বিষ-মাদক দ্রব্য আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে।

১৯৫৩ সন হইতে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই প্রকার রাসায়নিক বিষ-মাদক সম্পর্কে গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করা গিয়াছে। এই গবেষণার ফল "Synthetic substances with Morphine-like Effects" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে।

১৯৫৩ সনের আফিম চুক্তি

বিষ-মাদক কমিশন কেবলমাত্র ঔষধার্থে এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে আফিমের ব্যবহার যাহাতে নিবদ্ধ রাখা যায়, তজ্জন্য চেষ্টিত। আর্থিক এবং সামাজিক পরিষদ তুরস্কের আঙ্কারা শহরে ১৯৪৯ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভারত, ইরান, তুরস্ক এবং যুগোস্লাভিয়া দেশের প্রতিনিধিগণের এক সভা আহ্বান করেন। প্রতিনিধিগণ চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য আফিম উৎপাদন হ্রাস করিতে এবং এই বিষয়ে সাময়িক চুক্তিবদ্ধ হইতে এবং একটি আন্তর্জ্জাতিক সংস্থার হাতে আফিমের একচেটিয়া ব্যবসায় হস্তান্তরিত করিতে রাজী হন।

১৯৫০ সনে, আফিম হইতে যে সকল দেশে ঔষধ প্রস্তুত হয় সেই সকল দেশের প্রতিনিধিগণ জেনেভায় সম্মিলিত হন এবং আঙ্কারায় যে সকল ব্যবস্থা স্থির হয় তাহা অনুমোদন করেন।

কিন্তু প্রধান প্রধান আফিম উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশের ও আফিম হইতে ঔষধ প্রস্তুতকারী দেশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঐক্যমত স্থাপিত হয় নাই যথা আফিমের মূল্য, আন্তর্জ্জাতিক তদন্ত ইত্যাদি। এজন্য ১৯৫৩ সনে মে-জুন মাসে নিউইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের আফিম কনফারেন্স একটি বিকল্প প্রস্তাব আনেন। এই চুক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে :

The Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy plant, the Production of, International and wholesale Trade in, and use of Opium. এই চুক্তি-সর্ত্তে আফিমের অতিরিক্ত উৎপাদন নিবারণের জন্য আফিম বৃক্ষের (Poppy) চাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আছে। কেবলমাত্র বুলগেরিয়া, গ্রীস, ভারত, ইরান, তুরস্ক, যুগোস্লাভিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই সাতটি দেশ রপ্তানী করিবার জন্য আফিমের চাষ করিতে পারিবে। স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ডকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ২৭টি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন করিয়াছে। চুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার জন্য অন্ততঃ ২৫টি দেশের অনুমোদন আবশ্যক, ইহার মধ্যে ৩টি আফিম চাষকারী এবং ৩টি দেশ যাহারা আদিম-দ্রব্য উৎপাদনকারী হইতে হইবে।

বহু চুক্তি স্থলে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব

১৯৪৭ সনেই বিষ-মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ১৯১২ সন হইতে যতগুলি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হইয়াছে, তৎস্থানে একটা মাত্র চুক্তি হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৮ সনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ সেক্রেটারী জেনারেলকে এই বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে বলেন। বিষ-মাদক কমিশন সেক্রেটারী জেনারেলের খসড়া আলোচনা করিয়া দশম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৫৫ সনে) রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তরকে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি নূতন খসড়া প্রস্তুত করিতে বলেন এবং উহা সকল রাষ্ট্রের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন।

এই খসড়া চুক্তিতে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি স্থান পাইয়াছে :

(১) বর্ত্তমানে বিষ-মাদক সম্পর্কে যে সকল চুক্তি বলবৎ আছে সেগুলিকে এক চুক্তির মধ্যে আনা, আফিমের এবং কোকা গুল্মের চাষ এবং গাঁজা-ভাঙের চাষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধ এবং একমাত্র ঔষধ প্রস্তুত এবং বৈজ্ঞানিক আবশ্যকতার জন্য চাষ চলিতে দেওয়া ;

(২) বিষ-মাদক কমিশন আন্ত-রাষ্ট্র সংস্থারূপে এই বিশেষ ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ;

(৩) বর্ত্তমানের পৃথক পৃথকভাবে স্থায়ী কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ড এবং পরিদর্শক সংস্থার স্থলে মাত্র একটি সংস্থা কার্য্য করিবে ;

(৪) যে সকল দেশে এই সকল বিষ-মাদকের ব্যবহারের জন্ম বহু লোক পঙ্গু হইয়াছে বা স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, আবশ্যক হইলে বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র বিশেষের এই বিষয়ে আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলেও এই ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্য হিসাবে স্বীকার করা।

(৫) কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষ-মাদকের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া।

১৯৫৭ সনের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনে পূর্ব্বের বৎসরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কমিশন আইনের ভাষায় কতকগুলি প্রস্তাব সংকলন করিয়াছে। কমিশন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদকে অনুরোধ জানাইয়াছে যে, ইহার ত্রয়োদশ সম্মেলনের অধিবেশনের সময় যেন আরও এক সপ্তাহের জন্ম বাড়াইয়া দেওয়া হয় যাহাতে চূড়ান্ত খসড়াটি ইতিমধ্যে প্রতিনিধি সম্মেলনের বিচারার্থ প্রস্তুত হইতে পারে।

১৯৫৭ সনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে বহু চুক্তির স্থলে মাত্র একটি চুক্তি গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব উহা গৃহীত হয় এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং কমিশনের অধিবেশনের সময় আরও এক সপ্তাহের জন্ম বাড়াইয়া দিয়াছে এবং নির্দ্দেশ দিয়াছে যেন অন্যান্ম বিষয়ের পরিবর্ত্তে এই বিষয়টির বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বিষ-মাদকের ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী

যতই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিষ-মাদকের ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য নয়—খুবই জটিলতাপূর্ণ। যাহারা নেশা করে কেবল তাহাদেরই নৈতিক এবং শারীরিক ক্ষতি হয় তাহা নহে, ইহার কুফল সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে খুবই সুদূরপ্রসারী। প্রত্যেক দেশের সরকারই এ বিষয় অবহিত হইতেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে বিষ-মাদক সম্পর্কে বিস্তারিত বার্ষিক রিপোর্ট পান, তাহা হইতেই বোঝা যায় এই বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে যাহাতে আফিম ব্যবহার পরিত্যাগ করে তজ্জন্ম বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যবস্থা বাড়িতেছে এবং যাহাতে ইহার ব্যবহার আদৌ না বাড়ে তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে তবে আবশ্যকের তুলনায় এই আয়োজন খুবই অল্প ইহাতে সন্দেহ নাই।

কোকা পাতার সমস্যা

বলিভিয়া এবং পেরু সরকারের অনুরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৯৪৯ সনে এই দুই দেশে অনুসন্ধান কমিশন পাঠায়। কমিশনের সুপারিশ উভয় সরকারই কোকা পাতা চোষণ বন্ধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু উভয় সরকারের শাসনব্যবস্থা আরও উন্নত না হইলে জাতীর এই বদ্ অভ্যাস দূর হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং ক্রমে ক্রমে কোকার চাষ হ্রাস এবং কোকা পাতা চোষণ নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। একমাত্র চিকিৎসা-সম্পর্কিত কাজের জন্ম কিছু কোকা চাষ এবং উহা রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হইবে, ইহাই স্থির হইয়াছে।

ভাঙ ও গাঁজার সমস্যা

গাঁজার (Indian pamp) সমস্যাও কম জটিল নহে। পৃথিবীর নানা দেশে ইহার বিভিন্ন নাম, যথা: মারিহুয়ানা, হাসিস, কিফভাং, গাঁজা, ম্যাকোনহা ইত্যাদি। এই নেশাগুলি ফূর্ত্তির জন্ম বহুদেশে খুব ব্যাপকভাবে ইহাদের ব্যবহার। চুরুট আকারে বা নলের সাহায্যে ইহাদের ধূমপান এবং মিঠাই বা সরবতের সঙ্গে মিশাইয়া ইহাদের ব্যবহার হয়। ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্ম ব্যবহার প্রায় সকল দেশেই নিষিদ্ধ।

ঔষধ প্রস্তুতে ইহাদের ব্যবহার হইলেও বিশ্বস্বাস্থ্যপরিষদ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, ইহা ব্যতীতও সংশ্লিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই মতের উপর ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ ত্রয়োদশ অধিবেশন এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সকল রাষ্ট্রই যেন ইহার ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু গাঁজার বা ভাঙের চাষ বন্ধ করা খুব সহজ সমস্যা নহে—কারণ ইহার ছাল হইতে এক প্রকার তন্তু প্রস্তুত হয় যাহা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া পৃথিবীতে বহুস্থানে ভাঙ গাছ বিনা চাষেই জঙ্গলেও জন্মায়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দ্দেশে এই বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। ১৯৫৪ সনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্ব-খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানকে এই মাদক-বৃক্ষের পরিবর্ত্তে ছালে তন্তু হয় এবং বীজে তৈল পাওয়া যায়, এরূপ বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছে। এই বিষয়ে পশ্চিম জার্ম্মানীতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতেছে।

বিষ-মাদকের ব্যবসা নিরোধ

বিভিন্ন সরকার যে সকল রিপোর্ট পাঠান তাহা হইতেই রাষ্ট্রপুঞ্জ বিষ-মাদকের বেআইনী ব্যবসা বিষয় বিশদভাবে জানিতে পারে, এই বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক পুলিস প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্ম সূত্র হইতেও খবর পাওয়া যায়। ১৯৫৬-১৯৫৭ সনে আফিম কমিশনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক পুলিস প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে লীগ অব আরব ষ্টেটের স্থায়ী বিষ-মাদক নিবারণী-সংস্থার প্রতিনিধিও যোগ দিয়াছিলেন। কমিশন বিষয়টি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া

এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-এশিয়ার বিষ-মাদকের আমদানী রপ্তানীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং মধ্য-এশিয়ারও ইহার ব্যবসা মারাত্মক রকম বেশী।

মাদক হিসাবে আফিম এবং আফিম হইতে প্রস্তুত অন্যান্য নেশার দ্রব্য (যথা: morphine, diacetylmorphine, heroin) দেশী এবং অবৈধ বিদেশী বাণিজ্যে বেশী ধরা পড়িয়াছে।

গাঁজা ও ভাঙের বেআইনী ব্যবসাও কম নহে, তবে এই অবৈধ বাণিজ্য বেশীর ভাগ দেশের মধ্যেই হয়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নহে।

কোকেনের অবৈধ ব্যবসা দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে হ্রাস পাইতেছে।

আর রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত (রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ) নেশার দ্রব্য, যাহা ধরা পড়িতেছে উহার পরিমাণ খুব বেশী নহে।

পূর্ব্বে একমাত্র সমুদ্র ও স্থলপথেই এই ব্যবসা চলিত, বর্ত্তমানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আকাশপথেও এই অবৈধ বাণিজ্য প্রসারলাভ করিতেছে।

আফিম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ আফিম বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করে। বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন আফিম যাহাতে পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায়—তদ্বিষয়ে রাসায়নিক ও অন্যান্য গবেষণা চলে। পরীক্ষা দ্বারা অবৈধ বাণিজ্যের আফিম কোন দেশের উৎপন্ন তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে উহার নিয়ন্ত্রণ বা নিবারণ সহজ, এই জন্যই প্রচেষ্টা। পরিষদ বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে বিশেষজ্ঞ এবং আফিমের নমুনা পাঠাইতে আহ্বান জানায়। বর্ত্তমানে জেনেভা শহরে Palais des Nations ভবনে পরীক্ষার জন্য একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৫৫ সনে বিষ-মাদক সম্পর্কিত কমিশন যে সকল আফিম অবৈধ বাণিজ্যে ধরা পড়ে তাহার নমুনা রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট পাঠাইতে সকল গবর্ণমেণ্টকে এক অনুরোধ জানায়। উদ্দেশ্য, এই উপায়ে অনুসন্ধান করিয়া অবৈধ ব্যবসায়ের মূল উৎসগুলি নির্দ্ধারণ করা।

কমিশন অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার জন্য নয় জন বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের অনুমোদনক্রমে বর্ত্তমানে ১৯৫৮ সনেই দুই সপ্তাহের জন্য মিলিত হইবেন। আলোচনান্তে বোঝা যাইবে এই কয় বৎসরের পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা অবৈধ আফিমের মূল উৎস নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টা কতটা সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে।

বিষ-মাদক নিবারণে বিশেষজ্ঞের সাহায্য

১৯৫১ সনে কমিশনের সুপারিশে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ বিশেষজ্ঞের বিষ-মাদক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য সম্পর্কে দুইটি মন্তব্য গ্রহণ করে।

প্রথমতঃ, ইহা রাষ্ট্রসমূহকে রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে বিষ-মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার চাষের বদলে অপর কোন গাছ বা গুল্মের চাষ সম্ভব কিনা তাহা বিবেচনা করিতে বলেন:

(ক) সাময়িক ভাবে বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য গ্রহণ,

(খ) ফেলোসিপ বা ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা,

(গ) সেমিনার বা আলোচনা সভা,

(ঘ) গবেষণাগারে রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা অবৈধ বাণিজ্যে প্রাপ্ত আফিমের উৎপত্তি স্থান নির্ণয়।

দ্বিতীয়টি, ইরান দেশে আফিমের চাষ বন্ধ করিতে গিয়া যে অসুবিধা হয় সেই সম্পর্কিত। পাঁচটি দেশে খুব বেশী পরিমাণ আফিম উৎপন্ন হয়—ইরান উহাদের অন্যতম, এখানে আফিম-খোরের সংখ্যা খুব বেশী। এদেশে আফিমগাছের (পপি) বদলে অপর কোন চাষ সম্ভব কিনা ইরান এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য চাহিয়াছিল। আর নেশাখোরদিগকে কিরূপে এই অভ্যাস হইতে মুক্ত করা যায়, ইরাণ এই বিষয়েও বিশেষজ্ঞের সাহায্য চায়।

বিশেষজ্ঞ সাহায্য দান কর্তৃপক্ষের নিকট ইরানকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ সুপারিশ করিয়াছে।

অন্যান্য সমস্যা

গত তিন বৎসর ধরিয়া বিষ-মাদক সম্পর্কীত কমিশন যে সকল মাদক দ্রব্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছে—কারণ ইহাদের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা হইতেছে—amphetamines, barbiturates, tranquillizers এবং khat।

Barbiturates সম্বন্ধে বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, ইহা দ্বারা নেশা হয় এবং ক্রমে নেশা স্বভাবে পরিণত হয় সুতরাং ইহা জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কমিশন এজন্য সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার দমনের জন্য আইন করিতে বলিয়াছেন।

Tranquilizers অথবা ataraxic মাদক ব্যবহার করিলে ইহা অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং কমিশন এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টসমূহকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছে।

এই উভয় মাদক সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নিজ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে বলা হইয়াছে।

Khat (Cathaedulis) পূর্ব্বে আফ্রিকা এবং আরব দেশে ব্যবহৃত হয়। যদিও ইহা নেশার উদ্দেশ্যে চিবানো হয় না ইহার ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিষয় আরও তথ্য সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান চলিতেছে।

শিক্ষা ও সমাজ

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

শিক্ষা ও সমাজ একই বৃক্ষের মূল ও ফুল—মূল মাটির রস আহরণের দ্বারা দেহ পুষ্ট করে। আর ফুল দেহ পুষ্টির পরিণতি। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষার বনিয়াদের উপর—যেমন বৃক্ষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে ফুলে-ফলে রসপুষ্টির সাহায্যে। আদর্শ সমাজ ও সভ্যতা গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। নিছক ভোগকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা অগ্রসর হয়, তা বাহ্যিক চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করতে পারে—হিংসা, দ্বেষ ও লোভ এবং অমানুষিকতার বাগুচরে তা গতিহীন পঙ্কিলতায় কলুষিত হবে, সঙ্কীর্ণতার মোহ-জালে আবদ্ধ হবে। বস্তুতঃ শিক্ষার বিচিত্র প্রকাশ ও উদ্ভাবনী-শক্তির-মধ্যে নিহিত থাকে বৃহত্তর সমাজের এমন কি, বিশ্বের নানাজাতির জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্রকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ক্রমবর্দ্ধমান ও পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের উৎকর্ষের বীজ। যেখানে শিক্ষার মান নিম্নস্তরেরও নীতিবহির্ভূত, সেখানে আর্থিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা আসতে পারে, তবে তা দুর্নীতিক্লিষ্ট ও সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপে পরিণত হবেই।

আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই এমন শিক্ষা যার উদারতা ব্যাপক ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বিশ্বজনীনতা। সর্ব্বোপরি, ত্যাগের মন্ত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তরাজ্যকে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের সঞ্জীবনী ধারায় প্লাবিত করতে পারে। গৃহের প্রাচীরাভ্যন্তরে যে শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সীমায়িত থাকে, বিচ্ছিন্ন থাকে, বৃহত্তর সমাজের আওতা হতে তা বদ্ধ ও পঙ্কিল জলের মত দূষিত করে নিজেকে ও বাহিরের সমাজকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকে মর্ম্মান্তিক নিষ্পেষণ ও শোষণ, অমানুষিকতার নির্ম্মম আঘাত ও নিষ্ঠুর বৈরিতায় পশুসুলভ মনোভাব দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে দেয়, পরন্তু সুশিক্ষার উর্ব্বর সার মানসক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হলে শুধু কোন আঞ্চলিক আবেষ্টনীর মধ্যে নয়, সমস্ত দেশে ও বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা প্রবাহিত করবে। হৃদয়ের খোরাক না জুগিয়ে যখন মস্তিষ্ক বড় হয়ে উঠে, তখন মরুভূমিতে বীজ বপনের মত শিক্ষা নিষ্ফল হয়। তাই দেখি, বড় বড় লোক লোকহিতের নামে লোকের ক্ষতিই করে থাকেন, বড় বড় জাতি বুদ্ধি বলে ঐশ্বর্য্যশালী হলেও উগ্র লোভ ও ক্ষমতা মুগ্ধ-মত্ততায় পৃথিবীর ধ্বংস এনে দিচ্ছে। সুতরাং ঐশ্বর্য্যের সহিত ত্যাগ, ক্ষমতার সহিত সংযম, লোভের সহিত নিস্পৃহতা, অর্জ্জনের সহিত দাক্ষিণ্য, দুঃখের সহিত সমবেদনা আনন্দের সহিত নিরানন্দ মানবজীবনে ও শিক্ষায় অঙ্গহিসাবে অপরিহার্য্য বলে অত্যন্ত কয়া প্রয়োজন। তবেই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে প্রতিনিবৃত্ত করা যেতে পারে। এ দ্বন্দ্ব শুধু পরিবার, খেলাধূলা, যৌথ কারবারে বলিতে কি, জীবনের সমস্ত স্তরে শিকড় গেড়ে আছে—যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বেঁধেই আছে। মানুষের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ইহার নিরসন করা—পৃথিবীতে সুখ সমৃদ্ধি শান্তির নীড় রচনা করা। ইহা যাতে স্বাভাবিক বৃত্তি হয়ে উঠে তার জন্যই এত আয়োজন, এত সমিতি, জাতিসঙ্ঘ, সলাপরামর্শ। যে দিন এই জড়বিজ্ঞান ও সভ্যতাদৃপ্ত বিশ্বে ইহার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, সেদিন এক নয়া স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি হবে, নচেৎ ধ্বংসের বীভৎস পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

সুশিক্ষার মধ্য দিয়ে যে সভ্যতা আসে ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়, তাতে থাকে আনন্দ, অনাবিল ও স্বার্থশূন্য, আর যাতে থাকে স্বার্থপরতা ও লোভের উগ্র গন্ধ সেখানে অঙ্কুরিত হয় দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ, অশান্তির প্রেক্ষাগৃহ, দুর্নীতির যথেচ্ছ ব্যবহার, আর ক্ষমতাহীন নিরীহের উপর দৌরাত্ম্যের তাণ্ডবলীলা। প্রকৃতির শিক্ষায় মার্জ্জিত রুচি ও মনোবৃত্তি স্বল্পায়াসে সমাজের সমস্ত স্তরে সুশৃঙ্খলা ও শান্তির স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে। দেহ ধারণ করবার জন্য খাওয়াপরা প্রয়োজন, তা যখন বড় হয়ে ওঠে এবং সমস্ত শক্তি তাতেই যখন নিয়োজিত করতে হয়, তখন মানুষ নিজেকে ছোট করে—পশু-স্তরে নেমে আসে। প্রকৃতপক্ষে পাকস্থলীর আয়তনে বা পোষাক-পরিচ্ছদ ও ভোগ্যবস্তুর নিরিখে যদি তার মহত্ত্ব বিচার করতে হয় তবে তার দাম কাণাকড়িও হয় না।

নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের বাইরে মনের যে অবাধগতি বৃহত্তর লোকসমাজের অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-দুর্দ্দশা, সেবা, মনন ও সৃজনী শক্তির নানা রূপায়ণে পরিলক্ষিত হয়, তাতে প্রাণের ও মস্তিষ্কের নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি যুগপৎ প্রকটিত হয়। এই অভিব্যক্তিই নানাভাবে সভ্যতাকে সমৃদ্ধশালী করেছে পূর্ব্বাপর। বাহ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও সমষ্টিগত ঐক্যবোধ, সুখেদুঃখে সহযোগিতা ও সমবেদনা, অজানার পথে চলবার উদ্যম ও ভীষণ দুর্য্যোগে ও অকুতোভয়ে এগিয়ে যাবার দুঃসাহসিকতা দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম ও স্বার্থের তাগিদে সমাজবোধ ও সন্তানসন্ততির স্বার্থবোধে মানুষের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, চিত্রকলায়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে, শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষা, বলিতে কি, যা কিছু দেখি প্রকৃতির পাশাপাশি মানবের সৃষ্টি—সকলের মূলে রয়েছে তার সৃজনী প্রতিভা। সমাজ বলতে শুধু

একটা শুষ্ক, অর্থহীন, স্বার্থান্ধ সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের জনসমষ্টি বুঝায় না—যারা শুষ্ক, নির্জীব ও নির্বীর্য্য কাষ্ঠখণ্ডের সমষ্টিমাত্র। সমাজ বলতে বুঝায়—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কর্ম্মের চিরন্তন উৎস। মানবপ্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে যে নব নব সৃষ্টির বিচিত্রতা সৃষ্টিকাল হতে যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে ও করবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে—তার পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্যবিধান আদর্শ সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ—পূর্ণ প্রীতির মধ্য দিয়ে, পূর্ণ প্রকাশের কালজয়ী প্রচেষ্টা ও প্রেরণা। শুধু জনসমষ্টি নয়।

আবার সমাজ বিভিন্ন প্রকারের, যথা: রাষ্ট্রপ্রধানের সমাজ, রাজামহারাজাদের সমাজ, মধ্যবিত্তদের সমাজ, আর লোক-সমাজ জনসাধারণের। এই সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হ'ল গুণ ও কর্ম্ম। অর্থবণ্টনে অসামঞ্জস্য বা অসমতা আজকাল বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তাকে স্বীকার না করে গুণ ও কর্ম্মের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থপ্রাধান্যে যে সমাজ গড়ে উঠে তার মূলে গলদ রয়ে যায় নীতিহীনতায়। কৃষ্টিমূলক অবদানের মধ্য দিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠে তাতে সমাজচরিত্র নীতিহীনতার দোষে ততটা দূষিত হতে পারে না যতটা হয় অর্থলাভের কুটিল ও জটিল পথে। অর্থের বা গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণের প্রয়োজন, কিন্তু তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভের উগ্র লোভ সমাজকে নির্ম্মম হৃদয়হীনতার পর্য্যায়ে নিয়ে যায়, তা আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি পশ্চিম বাংলায় এবং এখনও করছি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে। অন্নগত প্রাণ হলেও অন্নসংগ্রহের মনোবৃত্তি ছাড়াও যে সংস্কৃতিগত মনোভাব সমাজের সমস্ত স্তরে বিস্তৃত আছে, তা এই যান্ত্রিকযুগেও পরিলক্ষিত হয় গ্রামে ও শহরে। বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে এই বিচিত্র কৃষ্টির উন্মেষের পরিচয় পেয়ে থাকি সমাজের উচ্চ থেকে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত। লোকসমাজে লোক সংস্কৃতির বহুধা প্রকাশ পশ্চিম বাংলার প্রকৃষ্ট বিশিষ্ট অবদান। নিরক্ষর জনসঙ্ঘের মধ্য হতে সাহিত্য, কলা, নৃত্য, চিত্র, যন্ত্রসঙ্গীত, বাদ্য প্রভৃতি চিরদিন বিদগ্ধজনকে আনন্দের হিল্লোলে উৎফুল্ল করেছে। অর্থ, সঙ্গতি ও পদবীতে পার্থক্য থাকলেও উচ্চনীচ উভয়ের মধ্যে যে একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল, তা যেন নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। সেখানে অর্থের অপটুতার মধ্যেও ছিল একটা হৃদয়ের উদারতা ও সৌজন্য—মানবপ্রীতি, যা সকল প্রভেদকে অতিক্রম করত। যদিও অর্থের সমতাই সমস্ত পার্থক্যের সমাধান বলে অনেকে মনে করেন, অর্থের প্রাচুর্য্যের মধ্যে চিত্তের কৃপণতা, লোভ, হিংসা, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যে কি বৈরীভাব সৃষ্টি করছে, তার উদাহরণও প্রতিনিয়ত নয়নগোচর হচ্ছে। শিক্ষা পেলেই সং হয় না। কলের পুতুলের মত সকলকে একটি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে গড়বার ব্যর্থ চেষ্টা না করে (এবং তা প্রকৃতিবিরোধী ও সমাজের অকল্যাণকর) শিক্ষার মধ্য দিয়ে আদর্শ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অপরিণত মনকে গড়ে তুলতে হবে। আইন দ্বারা অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে যাতে সে সমস্ত সমাজকে দূষিত করতে না পারে কিন্তু সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে কলুষমুক্ত করা যায় না। আর্থিক মানের সহিত যদি নৈতিক মান উন্নত না হয় তবে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। বরাবর ভালমন্দ ছিল—ইহা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ হতে পারে—সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সমস্ত মনোবৃত্তির মূলে রয়েছে আদর্শ শিক্ষা। সেই শিক্ষাই আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে পারে। আজ যে উচ্চনীচ সমস্ত স্তরের দুর্নীতি, লোভ, কর্ত্তব্যহীনতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্দ্দয়তার বন্যায় প্লাবিত, তার মূলে রয়েছে শিক্ষার গোঁজামিল।

মস্তিষ্ক ও ক্ষমতা যখন হৃদয়কে ছাড়িয়ে যায় তখন নিষ্ঠুরতা বিরাজ করবেই সর্ব্বস্তরে। হৃদয়হীন শিক্ষিত লোক যত ক্ষতি করতে পারে, সাধারণ লোক তত ক্ষতি করতে পারে না—অশিক্ষিত হলেও। অনেকে বলেন, সভ্যতার লক্ষণ অভাবের বোধ। এই অভাববোধ যখন নিজের অবস্থার সহিত তাল রেখে চলতে পারে না তখন দুর্দ্দশা চরমে উঠে—তখন সম্বন্ধ থাকে না পিতাপুত্রে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে, মানুষে-মানুষে। সর্ব্বোপরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, নীতিজ্ঞানহীনতা ও অসংযম কলুষিত করে সমাজের সর্ব্বাঙ্গ।

আদর্শ শিক্ষাই আদর্শ সভ্যতা গঠন করতে পারে। আদর্শ সমাজ তারই অঙ্গ। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিচয়ই সভ্যতার পরিচয়। এই পরিচয় মানবমনের বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে চরম পরিণতির। সৃষ্টি হতে মনকে বাদ দেওয়া যায় না। যেমন মন তেমন সৃষ্টি, যেমন সৃষ্টি তেমন মন গঠিত হয়। আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে আদর্শ মানুষের দরকার। যে দেশে এইরূপ লোকের অভাব তার আর্থিক উন্নতি নানা কার্য্যাদির সাহায্যে হতে পারে, কিন্তু মানবীয় ধর্ম্মের বিশদ ও বিস্তৃত রূপায়ণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অসম্ভব হয়ে উঠে। বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্য ও আবিষ্কার পরিশুদ্ধ হতে পারে মানবমনের পরিশুদ্ধির সহিত, তা না হলে শোষণ ও দুর্নীতির ফলে লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে—তা স্বদেশীর দ্বারাই হউক, আর বিদেশীর দ্বারাই হউক।

মানবমনের অমানুষিকতাই সভ্যতার সঙ্কট এনে দেয়। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতি এবং সভ্যতা গঠিত হয়, সে শিক্ষা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হউক, আর নানা উপদেশপূর্ণ কথকতার মধ্য দিয়েই হউক। আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি মহাকাব্যের চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে যাত্রা, কথকতা, উপদেশাবলী জনসাধারণের মধ্যে এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে ভালমন্দ, সচ্চরিত্র ও কুচরিত্র, হিতকর ও অহিতকর নানা বিষয়ে সামান্য লোকও মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিশেষতঃ শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে চরিত্র গঠিত হয়, তাই সকলকে সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে। আজ যে উচ্চনীচ, সাধারণ-অসাধারণ প্রায় সকলের চিত্ত যাতে অবস্থিত নয়—সুবিধাবাদী, এর কারণ শিক্ষায় চরিত্রের গুরুত্ব দেওয়া হয় না, জনসাধারণ ও শাসনব্যবস্থায় চরিত্রের মাপকাঠি অবহেলিত, আদর্শ রক্ষা করবার কষ্টের চেয়ে অভাবের কষ্টকে অসহ্য বলে মনে করা, সত্য রক্ষায়

সম্মান প্রদর্শনের অভাব। সর্বোপরি স্বার্থপরতার উগ্র লোভ বিষাক্ত করেছে সমাজজীবন। ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা যেমন কর্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও ত্যাগ স্বীকারও তেমন কর্তব্য।

অভাবের বোধ বাড়িয়ে তুললে আর অর্থের মান ক্রমবিবর্দ্ধিত করলে সমাজ উন্নত হয় না। যদি চরিত্রের মান উন্নত না হয়, প্রত্যেকে নিজের ও পরের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করতে অগ্রণী না হয়, বদ্ধপরিকর না হয়, শিক্ষায় ব্যবসায়বুদ্ধি আত্মঘাতী, তাতে শিক্ষা চরিত্রগত না হয়ে দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়। গৃহে আদর্শ পিতামাতার প্রভাব, বিদ্যালয়ে আদর্শ শিক্ষক ও বৃহত্তর ছাত্রসঙ্ঘের প্রভাব মিলিত হয়ে যে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় তাই ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার বীজ, তাই আপদ-বিপদ ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে বর্ম ও চরম উন্নতির সোপান।

প্রত্যেক জাতিরই একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, একটা জাতীয় আদর্শ আছে, যা তার শিক্ষাদীক্ষা, চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশমান। কি ব্যষ্টিজীবনে, কি সমষ্টিজীবনে ও বৃহত্তর বিশ্বজীবনে মানুষ তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে—নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বাত্মাকে রূপায়িত করে। তা ঘরে বাইরে, দেশ-বিদেশে, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, নানা স্তরের কার্য্য ও দায়িত্ব সমাধানে প্রতিফলিত হয়। মানুষকে ছোট করে যেখানে, মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের সৃষ্টিকে বড় করে দেখা হয়; সেখানে অনাচার অবশ্যম্ভাবী, বিজ্ঞানের অবদান নিয়মিত হয় ত্যাগের দ্বারা, লোভের দ্বারা নয়।

আজ যে দুইটি সমাজে ও শাসনে দুর্নীতি, খাদ্যে ভেজাল, ব্যবহারে চালাকি, গুরুজন ও জ্ঞানবৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাহীন আচরণ, অতি লোভ, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থময় দৃষ্টিভঙ্গী, হৃদয়হীনতা—এর মূলে রয়েছে শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবনতি ও আদর্শের সংঘর্ষ। আদর্শ ছাত্র ও সমাজ সৃষ্টি করতে হলে, আদর্শ পিতামাতা, আদর্শ শিক্ষক ও প্রতিবেশী এবং আদর্শ শাসক চাই। সু-শিক্ষাকে চরিত্রগত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সুপ্রজননের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ নাগরিক হবার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করা দরকার।

বিচিত্র বিশ্বের নানাস্থানে নানা সভ্যতা গড়ে উঠেছে। প্রকৃতি তাহাই চায়—নানা রঙের ফুলসম্ভারে মনোরম উদ্যান। স্বাদেশিকতা কূপমণ্ডুকতা নহে, যা কিছু আনন্দের, যা কিছু কল্যাণের ও যা কিছু সত্য ও শ্রেষ্ঠ—তাদেরকে প্রদেশের উর্বর ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা, কিন্তু তা বলে তার মূলভিত্তি হারালে, নিজস্ব সংস্কৃতি হারালে, মহতী বিনষ্টি অনিবার্য্য। চিত্রগৃহের চিত্রছায়া যদি বড় হয়ে উঠে, মুখ্য হয়ে উঠে জীবনের আদর্শ, প্রদর্শনী হয় স্ত্রী-পুরুষের যৌনচর্চ্চায়, তবে কিছুটা চিত্তবিনোদন আনতে পারে—উন্মাদনাও আছে তাতে। কিন্তু বিষাক্ত মনের ছায়া পবিত্র শান্তির নীড় পরিবারে গিয়েও প্রবেশ করবে। তাতে সমাজ নীচের দিকে নামছে। সংযমেই প্রকৃত স্বাধীনতা আস্বাদ, অসংযমে দ্বন্দ্ব ও ধ্বংস।

যে উচ্ছৃঙ্খলতা আইনসভা ও কর্পোরেশনে, ছাত্র-সমাজে ও জনসাধারণের মধ্যে দেখছি তার মূলে রয়েছে সুশিক্ষার অভাব, আচার ও শালীনতার অভাব। নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম্মের মাধ্যমে যে শাসন চলে, যে সমাজ-বিধান চলে, তাতে থাকে একটা নীতি ও চরিত্রের ছাপ; আর যেখানে স্বার্থপরতা ও পদবীর কাড়াকাড়ি চলে সেখানে দেখা দেয় অব্যবস্থার চরম নিদর্শন। মানুষ যদি প্রকৃতিগত ভাল না হয় তবে শুধুমাত্র আইনের কষাঘাতে তাকে ঠিক রাখা যায় না। যে দেশে আইনভঙ্গকারীর সংখ্যা কম সেখানে শাসক ও শাসিতের নৈতিক চরিত্রের মান উচ্চ—বিশৃঙ্খলাও কম হয়; আর যেখানে আইন প্রণেতারাই আইনভঙ্গকারী সেখানে শাসিতের অপরিমিত দুঃখ ও দৈন্যে হাহাকার উঠবেই। কেননা, অন্নবস্ত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বণ্টনে ও শাসন-ব্যবস্থার দুর্নীতি থাকবেই।

মানুষ দেশে থাক, আর বিদেশেই থাক, তার চিন্তাধারায় সমাজগত, আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত একটা মিল থাকবেই, যা তার জীবননাট্যের বিভিন্ন স্তর ও বৈপরিত্যের মধ্য দিয়ে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। তার মূল আবেষ্টনী সে ছাড়তে পারে না, যদিও পরদেশী বিচিত্র চিন্তাধারার সংস্পর্শে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে যুগে যুগে নিজস্বধারার অঙ্গীভূত করে। প্রকৃতি বিচিত্রতার মধ্যে প্রকাশমান, বিশ্বপ্রকৃতি এক-প্রকৃতিভূত নয়। অনন্ত শক্তি ও প্রকৃতির আধার মানুষ। সকলকে এক করে প্রকৃতি তার অনন্ত শক্তির অপহ্নব ঘটাতে চায় না।

স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাধীন মনের স্বাভাবিক গতি নানাভাবে প্রকট হবেই। আজকাল যানবাহনের সুবিধার জন্য পৃথিবীর দেশগুলি ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে সত্য, ভারত যদি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হতে বিচ্যুত হয় পাশ্চাত্যের মুখোমুখি হয়ে, তবে তা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ। ভারতের ক্রমবিবর্ত্তন বৈচিত্র্যের ইতিহাস—রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে কত কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে তার মূলভিত্তি হারায় নি। শাশ্বতনীতির উপর নির্ভর করে সৃষ্টির বনিয়াদ রচনা করা এক কথা, আর আপাতরম্য সুবিধাবাদিতার চঞ্চল মোহে জাতির দিক-দর্শন পরিবর্ত্তিত করতে যাওয়া আর এক কথা। কোন দিনই ভারত তার জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে রাখে নি। যা কিছু শ্রেষ্ঠ বিদেশ হতে পেয়ে তা নিজের কৃষ্টির মধ্যে সুসংহত ও অঙ্গীভূত করে নিয়েছে ভারতীয় আদর্শে। তাই সে চতুর্দ্দিকে এত উত্থান-পতনের মধ্যেও নিজবৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে আছে—তার অমৃতবাণী বিশ্ববাসীকে বিতরণ করছে। লাভ ও লোকসানের ব্যবসায় বুদ্ধি সমস্ত রাষ্ট্রজীবন কলুষিত করে। পৃথিবীতে যতবার যুদ্ধ হয়েছে তার মূলেও রয়েছে ঐ একই বুদ্ধি। সমদর্শী ও ভূয়োদর্শী লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে ততই জাতিসঙ্ঘ কৃতকার্য্য হবে বিশ্বের মনোমালিন্য দূর করতে,

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল; ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

S. 258A-X52 BG

জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এড়াতে। এক পৃথিবী, এক শাসন ও এক মানব জাতি তখনই কার্যতঃ ফলপ্রসূ হবে, যখন মানবমনের মূলসূত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রূপান্তরিত হবে। মানুষ যখন পথ পায় না, জগৎজোড়া অন্ধকারের ঘূর্ণায়মান হানাহানি, স্বার্থের কাড়াকাড়ি, নৃশংসতার মধ্যে যেন সে খুঁজে বেড়ায় কি করলে শান্তি বিরাজ করবে এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল পৃথিবীতে; তাই জাতিসঙ্ঘ এক পৃথিবী বা এক শাসন-ব্যবস্থার কথা তোলে। যত সমাধানই সে করুক, ষড়রিপুর সমাধান সে করতে পারবে না। তাই সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষি বলেছেন, "ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ, মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্"। আর্য আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্য 'ব্রহ্মচর্য্য' পালনের কথা বলেছেন যেরূপেই হউক, ঐরূপে মানবীয় প্রকৃতি সুসংযত করতে হবে সুশিক্ষার মাধ্যমে। সুশাসনের আদর্শে ও আদর্শজীবনের আনন্দে নিদর্শনে—তবেই সমাজ সুখের হবে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত ভীতি উদ্রেক হবে না। তাই বলছি, সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনই একমাত্র পথের নির্দেশ দিতে পারে।

পশ্চিম বাংলা ও দ্বিতীয় অর্থকমিশনের রিপোর্ট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

১৯৫৭ সনের ১৪ই নবেম্বর তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত খবরে প্রকাশ, শ্রী কে শান্তনমের নেতৃত্বে যে দ্বিতীয় অর্থ-কমিশন গঠিত হয়েছে সে কমিশনের রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হয়েছে। সে রিপোর্টে এই মর্ম্মে সুপারিশ করা হয়েছে যে, রেলের টিকিটের উপর ধার্য্য কর থেকে যে আয় হবে সে আয়ের শতকরা ৯৯·৭৫ অংশ রাজ্যগুলোর মধ্যে করা বণ্টন দরকার। বাকী রইল সিকি শতাংশ। এটা থাকবে কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলোর জন্য, এ ছাড়া আয়করের বণ্টনযোগ্য অর্থ থেকে রাজ্যগুলোর প্রাপ্য বরাদ্দ পঞ্চান্ন শতাংশ থেকে ষাট শতাংশে বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করে জনৈক অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন:

"As regards the criterion for the disbursement of increased funds, the Commission has laid the utmost emphasis on the need to eliminate revenue deficits of the States in respect of the second Five year Plan"

রেলওয়ে ভাড়ার উপর আরোপিত কর থেকে অন্ধ্রকে ৮·৮৬, আসামকে ২·৭১, বিহারকে ৯·৩৯, বোম্বাইকে ১৬·২৮, কেরলকে ১·৮১, মধ্যপ্রদেশকে ৮·৩১, মাদ্রাজকে ৬·৪৬, মহীশূরকে ৪·৪৫ উড়িষ্যাকে ১·৭৮, পঞ্জাবকে ৮·১১, রাজস্থানকে ৬·৭৭, উত্তর-প্রদেশকে ১৮·৭৬, এবং পশ্চিম বাংলাকে ৬·৩১ শতাংশ বরাদ্দ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন।

অনুমান করা হয়েছে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত দ্বিতীয় অর্থ কমিশন যে সব সুপারিশ করেছেন সে সব সুপারিশ যদি কার্য্যে পরিণত করা হয় তা হলে কেন্দ্রীয় শুল্ক এবং কর থেকে রাজ্যগুলোর মোট প্রাপ্য হিস্যা আগের তুলনায় সাতচল্লিশ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। অর্থাৎ রাজ্যগুলোর প্রাপ্য হিস্যা বর্ত্তমান তিরানব্বই কোটি টাকা থেকে বর্দ্ধিত হয়ে একশত চল্লিশ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

অর্থ কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, সম্পত্তি করের বণ্টনযোগ্য অর্থ থেকে অন্ধ্রকে ৮·৭৬, আসামকে ২·৫৩, বিহারকে ১০·৮৬ বোম্বাইকে ১৩,৫২, কেরলকে ৩·৭৯, মধ্যপ্রদেশকে ৭·৩০, মাদ্রাজকে ৮·৪০, মহীশূরকে ৫·৪৩ উড়িষ্যাকে ৪·১০, পঞ্জাবকে ৪·৫২, রাজস্থানকে ৪·৪৭, উত্তরপ্রদেশকে ১৭·১১, পশ্চিমবাংলাকে ৭·৪৭ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ১·২৪ শতাংশ বরাদ্দ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। উত্তরাধিকার কর সম্বন্ধে যে সুপারিশ করা হয়েছে সেটা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এই কর বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে সে অর্থের এক শতাংশ নাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর জন্য রাখতে হবে। এর পর বছরে যত টাকা মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হ'ল· তত টাকা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে একটা আন্দাজী ভাগ করে নিতে হবে শুধু তাই নয়। অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবে যে টাকা পড়বে প্রত্যেকটি রাজ্যে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তির অনুপাতে সে টাকা বণ্টন করে দিতে হবে। আর যে টাকা বাকী থাকবে সে টাকাও প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে। কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আয়করের বণ্টনযোগ্য অর্থ থেকে অন্ধ্রকে ৮·১২. আসামকে ২·৪৪, বিহারকে ৯·৯৪, বোম্বাইকে ১৫·৯৭, কেরলকে ৩·১৪, মধ্যপ্রদেশকে ৬·৭২, মাদ্রাজকে ৮·৪০, মহীশূরকে ৫·৮৪, উড়িষ্যাকে ৩·৭৩, পাঞ্জাবকে ৪·২৪, রাজস্থানকে ৪·০৯, উত্তরপ্রদেশকে ১৬·৩৬, পশ্চিম বাংলাকে ১০·০৮, জম্মু ও

কাশ্মীরকে ১'১৩ শতাংশ বরাদ্দ করার জন্ত সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থকমিশন প্রস্তাব করেছেন যে সব শিল্প বাবদ সংগৃহীত উৎপাদন শুল্কের হিস্যা রাজ্যগুলো পেয়ে থাকেন সে সব শিল্পের মধ্যে একদিকে কফি, চা, শর্করা, কাগজ এবং অন্তদিকে যে সব উদ্ভিজ্জ তৈল অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই সে সব তৈলকে গণ্য করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কমিশন জোর দিয়ে বলেছেন, উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং তামাকজাত শুল্কের হিস্যা জনসংখ্যার অনুপাতে রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এ ছাড়া দেশলাই-এর উপর ধার্য্য উৎপাদন শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীট আয় হয়, রাজ্যগুলো সে আয়ের পঁচিশ শতাংশ পাবেন। মিলজাত বস্ত্র, শর্করা এবং তামাকের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বাবদ যে নীট আয়ের আশা আছে সে আয় সম্পর্কে অর্থ কমিশনের সুপারিশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। অর্থাৎ এই আয়ের ভিতর থেকে রাজ্যসমূহকে প্রথমে তাঁদের হিসাব অনুযায়ী স্থিরীকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কমিশনের রিপোর্টে উৎপাদন করের বণ্টনযোগ্য অর্থ থেকে অন্ধ্রকে ৯'৩৮, আসামকে ৩'৪৬, বিহারকে ১০'৫৭, বোম্বাইকে ১২'১৭, কেরলকে ৩'৮৪, মধ্যপ্রদেশকে ৭'৪৬, মাদ্রাজকে ৭'৫৬, মহীশূরকে ৬'৫২, উড়িষ্যাকে ৪'৪৬, পাঞ্জাবকে ৪'৫৯, রাজস্থানকে ৪'৭১, উত্তরপ্রদেশকে ১৫'৯৪, পশ্চিম বাংলাকে ৭'৫৯ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ১'৭৫ শতাংশ বরাদ্দ করার জন্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলো বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়:

"The States of Bombay and West Bengal—with larger collections but relatively small population will suffer considerably. Madras will also be adversely affected but to a limited extent. Among the principal beneficiaries will be the more populous States of U.P, Bihar, and Madhya Pradesh".

শুধু তাই নয়।

"West Bengal will suffer on another account also. As directed by the Commission, the existing grants given to West Bengal, Bihar, Assam and Orissa in lieu of the export duty on jute and jute products will cease in 1960. But thereafter these will be incorporated in the general grants-in-aid only partially".

যে ভাবে অর্থ কমিশন রাজ্যসমূহের প্রাপ্য হিস্যা বণ্টনের সুপারিশ করেছেন তাতে মনে হয়, জনসংখ্যানুপাতের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কমিশনের সুপারিশ যদি কার্য্যকরী করা হয় তা হলে প্রত্যেকটি রাজ্যের মোট প্রাপ্য হিসাব শতকরা নব্বই ভাগ জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হবে। বাকী রইল মাত্র দশ ভাগ। এটা নির্দ্দিষ্ট হবে সংগ্রহের অনুপাতে। অথচ বর্ত্তমানে রাজ্যের প্রাপ্য হিস্যার শতকরা কুড়ি ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং বাকী আশী ভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের অংশ নির্দ্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে কমিশন জনসংখ্যানুপাতের দিকেই জোর দিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলোকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় করের অংশ নির্দ্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাজেটে ঘাটতি যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখা যায়, রাজ্যসমূহের বার্ষিক সাতচল্লিশ কোটি টাকা আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এবং পাঁচ কোটি টাকা দায় মকুবের সুপারিশ করা হয়েছে তখন একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, অর্থকমিশন রাজ্যসমূহের সমস্যার গুরুত্ব ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সুপারিশগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, কর বণ্টনের ব্যাপারে বহু রাজ্য, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নি। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদি রাজ্যসমূহের অংশ বণ্টন করা হয় তা হলে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে। অবশ্য কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলার মধ্যে ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকবে না। যে সব রাজ্য শিল্পপ্রধান, সাধারণভাবে সে সব রাজ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে অংশ বণ্টিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে। অথচ অন্যদিকে যে সব রাজ্য জনবহুল সে সব রাজ্য লাভবান হবেন। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলার আয়তন এবং জনসংখ্যা কমে গেছে। তবে যেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা উন্নত সেহেতু এখানে প্রচুর আয়কর আদায় হয়। বোম্বাইয়ের পরেই পশ্চিম বাংলায় সবচাইতে বেশী আয়কর আদায় হয়ে থাকে। অবশ্য এই আদায়ীকৃত আয়করের পরিমাণকে ভিত্তি করে পশ্চিম বাংলার অংশ স্থির করা যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধারদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, যেহেতু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রোজগারের উপর এই কর ধার্য্য করা হয় সেহেতু এটা স্থানীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত, অথচ আদায়ের হারাহারি অংশ থেকে পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার প্রতি অর্থ কমিশন অবিচারই করেছেন। পশ্চিম বাংলা এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্ত আবেদন জানিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে নি, প্রধানতঃ দুটো কারণবশতঃ কেন্দ্রীয়

সরকার এই আবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছেন না। প্রথমতঃ বলা হয়েছে, সমস্বার্থের খাতিরে পশ্চিম বাংলার আবেদন গ্রহণ করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংহতির উপর জোর দিবার পক্ষপাতী। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার যে দুটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সে দুটো যুক্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু তাই বলে পশ্চিম বাংলার উপর অবিচার স্থায়ী হয়ে থাকবে এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সাংবাদিকদের বলেছেন :

"Greater emphasis on distribution on population basis will result in further reduction of West Bengal's share of income tax and certain duties"

তবে তিনি স্বীকার করেছেন :

"An encouraging feature of the recommendations from West Bengal's point of view is the increase in the additional grants-in-aid from Rs 8·3 million to Rs 32·5 million. This is obviously intended to cover the State's revenue deficit. The total contributions from the Central revenue sources will perhaps be the same as at present".

বিগত মার্চ্চ মাসে পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থ বণ্টনের মূলনীতি কর্ম্মভিত্তিক হওয়া উচিত। যেহেতু কাজের পরিমাণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থ দেবার নীতি স্বীকৃত হয় নি সেহেতু পশ্চিম বাংলা খুব অল্প অর্থ নিয়ে খুব বেশী কাজ নিষ্পন্ন করতে বাধ্য হচ্ছে। ডাঃ রায় সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় করলব্ধ অর্থ বণ্টনের জন্য এত হক ভিত্তি স্বীকার করে নেওয়া হয় নি। তাঁর ধারণা, কেবলমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর বণ্টন করার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টনের অসাম্য আরও বেড়ে গেছে। আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে, ভূমিরাজস্ব থেকে ভারতের কোন কোন রাজ্যে বেশী আয় হচ্ছে। আবার কোন কোন রাজ্যে ভূমিরাজস্ব থেকে তেমনি উল্লেখযোগ্য আয় হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলার কথা বলা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশে ভূমিরাজস্বের আয় হ'ল বিশ কোটি টাকা। অন্য দিকে পশ্চিম বাংলায় ভূমিরাজস্বের আয় কম, যদিও এই রাজ্যে শিল্প থেকে লব্ধ করের আয় বেশী। অথচ জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কর বণ্টিত হবার ফলে উত্তর প্রদেশই বেশী টাকা পাচ্ছে। মোট কথা হচ্ছে, দুদিক থেকে উত্তর প্রদেশ লাভবান হচ্ছে। প্রথমতঃ শিল্প কর বলে ভূমিরাজস্বের খাতে আয় বেশী হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ উত্তর প্রদেশকে বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীয় কর বণ্টন করা হয়েছে। ডাঃ রায় বলেছেন, প্রত্যেক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাভাবিক বাজেটে রাজস্ব খাতে সাধারণতঃ সাত কোটি আশী লক্ষ টাকার মত ঘাটতি পড়ে। অথচ দ্বিতীয় অর্থ কমিশন ঘাটতির পরিমাণ হিসাব করেছেন এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। এই ভিত্তিতে হিসাব করে বার্ষিক সাধারণ বাজেটের ঘাটতি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দের ঘাটতি যোগ করে কমিশন অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন পূরণের পক্ষে এই অর্থ বরাদ্দ খুব কম হয়েছে। আমাদের অনেকেরই হয় ত জানা আছে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর বণ্টনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন এর উপর কোন কোন রাজ্যকে অতিরিক্ত কিছু টাকা কর্জ্জ হিসাবে দেবার প্রস্তাব করেছেন। ডাঃ রায় বিধানসভায় বলেছেন, রাজ্য সরকার কর্জ্জ হিসাবে টাকা গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁদের প্রাপ্য করের অংশ বৃদ্ধি করার দাবী জানিয়েছিলেন। তাঁরা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবে রাজী ছিলেন না। ডাঃ রায়ের ভাষণ থেকে আরও জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের বর্ত্তমান-বর্দ্ধিত জনসংখ্যার উল্লেখ করে করের অংশ বর্দ্ধিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত মার্চ্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা রাষ্ট্রপতিকে এই মর্ম্মে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, কর বণ্টনের নয়া ব্যবস্থা করার জন্য আরেকটা অর্থ কমিশন অবিলম্বে নিয়োগ করা হউক। বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল সে প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে :

"এই বিধানসভা মনে করে যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় করসমূহের অংশ বণ্টন করিবার সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে এবং এর ফলে এই রাজ্য শুধুমাত্রই কেন্দ্রীয় করসমূহের অংশের উপর তাহার ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে না, এ যাবৎ যে অংশ পাইয়াছে তাহাও কমিয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সঙ্কট বিধায় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী একটি অর্থ কমিশন নিয়োগ করিতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট আবেদন করুন।" এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সংবিধানেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপর অবিচার করা হয়েছে, কারণ সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শিল্পের উপর কর বসাবার অধিকার ন্যস্ত রয়েছে, যদিও রাজ্য সরকারকে সংবিধানে কৃষির উপর কর বসিয়ে অর্থসংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের হাতে শিল্পের উপর কর বসাবার অধিকার ছেড়ে না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর কারণ খুব সুস্পষ্ট। হিসাব করে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা প্রায় আশী জন লোকের পাঁচ একরের কম জমি আছে। তাই এঁদের হাতে এমন টাকা থাকে না যা দ্বারা এঁদের উপর কর বসানো যেতে পারে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর শিল্প রয়েছে। অথচ এই শিল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয় নেই। তা ছাড়া এটা সত্যি দুঃখের কথা, দেশ বিভাগের ফলে

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে

এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো

এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

এ্যাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত
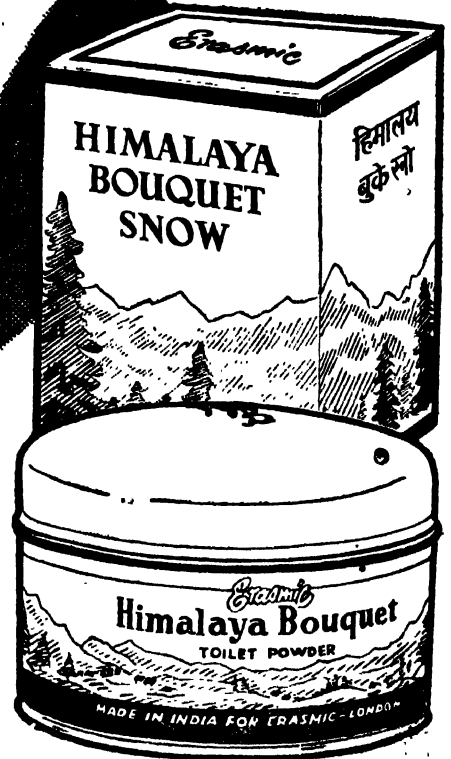
বাংলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্য অংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ বলছেন, যে রাজ্য থেকে যে পরিমাণ কর আদায় হয় সে রাজ্যকে সেই অনুপাতে অংশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এর উপরও যদি কোন রাজ্যের আরও টাকার প্রয়োজন হয় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে করের অংশ সংগ্রহের পরিমাণের ভিত্তিতে না হলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, অর্থনীতিবিদ্‌দের এই অভিমত, দেশের কোন কোন নেতার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয় নি। শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, কেবলমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে কিম্বা কেবলমাত্র আদায়ের পরিমাণের ভিত্তিতে কর বণ্টিত হওয়া ঠিক নয়। তাঁর মতানুসারে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। তবে তিনি মনে করেন :

"Gross injustice has again been done to West Bengal by the Second Finance Commission, The Commission's recommendations in regard to distribution of the divisible pool of income-tax, estates duty, union excises, tax on railway fares and grants-in-aid to different States have deprived West Bengal of its 'legitimate shares in these allocations."

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আজ আমরা সমবেত হয়েছি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে। সর্ব্বাগ্রেই বলতে হয়, বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানগরিমার খাঁটি পরিচয় আমরা পাই নি, কিংবা পাবার ক্ষমতাও হয়ত আমাদের অনেকের নাই। তাই তাঁর স্মৃতি আজ তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশেই লুপ্তপ্রায় বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কত বিচিত্র সম্পদ কি কঠোর গবেষণায় ও সাধনায় কালের ও বিস্মৃতির অতল হতে উদ্ধার করে তিনি যে তাঁর দেশবাসী আমাদের জন্ম রক্ষা করে গেছেন তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেবার জন্ম আমরা জন-কয়েক বয়োবৃদ্ধ আজ অগ্রসর হয়েছি। সাধারণের সাড়া বড় পাই নি। একি পরিতাপের বিষয় নয়?

সাধারণের নিকট আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন দার্শনিক হিসাবে; কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। কিন্তু এতে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অতি সামান্ত অংশেরই পরিচয় দেওয়া হয়। কেন না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সকলবিভাগের সকলবিষয়েই ছিল তাঁর সমান এবং অসাধারণ অধিকার। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংখ্যাবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি মানুষের বুদ্ধিগম্য এমন কোন বিদ্যা আছে কিনা জানি না, যার সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁর অধিকৃত ছিল না। এক কথায় বলা যায়, তিনি একাই ছিলেন এক বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়। এরূপ পণ্ডিতের আবির্ভাব পৃথিবীর অন্ত কোন সভ্য-দেশেও বড় দেখা যায় না। বস্তুতঃ, তিনি ছিলেন গুরুহিসাবে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের প্রতীক্। কারণ, প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-আহরণের রীতি ছিল বর্ত্তমান প্রথার বিপরীত। আধুনিক যুগে জ্ঞানের চর্চ্চা হয় খণ্ড খণ্ড ভাবে। এখনকার যুগ হচ্ছে বিশেষজ্ঞের যুগ। মানবসভ্যতার আয়ু যত বেড়ে চলেছে ততই তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার সংখ্যাও যাচ্ছে বেড়ে; এবং এ-সব শাখা হতে জন্ম নিচ্ছে আবার বহু উপশাখার। এ-সব এক একটি উপশাখার চর্চ্চা নিয়ে বহু মনীষী মেতে আছেন সারা জীবন। বর্ত্তমান যুগের মানুষ তাই বেশির ভাগ থাকে খণ্ড সত্য বা খণ্ড জ্ঞানের অনুসরণ নিয়ে। অখণ্ড বা সমগ্র সত্যের তথা জ্ঞানের যে স্বরূপ তার সন্ধানে অগ্রসর হয় খুব অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ। প্রাচীন ভারতে অখণ্ড সত্যের বা জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা—ছিল মানবজীবনের উচ্চতম ও চরম আদর্শ। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আদর্শ অনুসরণে যাবতীয় খণ্ডজ্ঞানকে সমন্বয় করে এক অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধানে প্রয়াসী ছিলেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

প্রাচীন যুগের ভারতে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নি। তাই বহু বৈজ্ঞানিক ধারণা, তথ্য এবং তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম-শাস্ত্র, কলাবিদ্যা, পুরাণ এবং তন্ত্রের মধ্যে। আবার অন্যদিকে চরক-সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যেও বহু দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। এ-সব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হতে বিজ্ঞানের সূত্র এবং তত্ত্বগুলির উদ্ধারকল্পে কোলব্রুক, উইলসন, হর্ণেল, মেকডোনেল, রয়েল প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষীদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের মধ্যে উদয়চাঁদ দত্ত, ঠাকুর সাহেব প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী কর্মীরাও এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু এ-সব প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণতা ও সমন্বয়ের অভাব ছিল। একটা ধারা-বাহিক ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার ভার নিয়েছিলেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এ বিষয়ে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সুগভীর পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ গবেষণার নিদর্শনস্বরূপ আমরা পেয়েছি তাঁর রচিত "Positive Science of the Ancient Hindus"—প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার বিবরণ হিসাবে ইহা একটি অমূল্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর উপযুক্ত সমাদর আমরা তাঁর দেশবাসীরা দিতে পারি নি। অনেকে হয়ত একে দুর্বোধ্য হিসাবে পরিহার করে থাকেন, অনেকে এর গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব গ্রহণে উন্মুখ নন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বইখানি যদি আজ ইউরোপে বা আমেরিকায় পুনঃ প্রকাশিত হয়, তবে পণ্ডিতসমাজে বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসাবে এর সমাদর হবে অসাধারণ।

অতি দুঃখের সহিত বলতে হয়, আমাদের দেশে আচার্য্য শীলের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সমুচিত সমাদর আমরা দিতে পারি নি। বাংলাদেশের খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক হয়ত তাঁর রচিত গ্রন্থাদির কোন খবর রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে হয়ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হয়ত আচার্য্য শীলের নামও এক-প্রকার অপরিচিত বললে অত্যুক্তি হয় না। এ হ'ল আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণ। যে দেশে গাছের সংখ্যা কম, সে দেশে আগাছাই পায় প্রাধান্য এবং স্বীকৃতি। প্রকৃত ও নীরব সাধনা ঢাকা পড়ে লঘুপাণ্ডিত্যের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে। এ মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, গুণের আদর করতে হলে চাই গুণ-উপলব্ধির ক্ষমতা। এ হতভাগ্য দেশে সাধারণের মধ্যে এ ক্ষমতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। তাই আমাদের দেশে দেখা যায় আসলের চেয়ে নকলের আদর, বই-এর চেয়ে নোটের কাটতি, এবং খাঁটির চেয়ে ভেজালের চলতি বেশি।

নানাবিধ সংস্কৃত মূলগ্রন্থ হতে আচার্য্য শীল বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কার করে তাদের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে দেখা যায়, আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ ঘটেছিল, তার তুলনা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যদেশে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে গ্রীস, মিশর এবং মহাচীন ভারতের সমকক্ষ বা অগ্রণী হলেও অন্যান্য বিষয়ে ভারত ছিল তাদের অগ্রণী। এ উপলক্ষে দু'একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

প্রাচীন ভারতের সাংখ্যপাতঞ্জল দর্শনে দেশ, কাল এবং হেতুবাদ বা কার্য্যকারণবাদের যে ধারণা আছে, তার ব্যাখ্যা উপলক্ষে আচার্য্য শীল দেখিয়েছেন, এরূপ ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অনুরূপ। শুধু তফাৎ এই—আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তি হচ্ছে বেশির ভাগ যন্ত্রযোগে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। প্রাচীন ভারতে কিন্তু অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিবিচার এবং চিন্তাধারার আশ্রয়ে।

আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানে বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে: বর্ত্তমানে বিশ্বজগৎ যেরূপ আছে এবং চলছে, অতীতেও তাই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। অর্থাৎ বিশ্বজগতের আদি বা অন্ত নাই। এ অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। অপর মতে: এ বিশ্বজগৎ চির ও ক্রমপরিবর্ত্তনশীল; উত্তরোত্তর এর অভিব্যক্তি চলেছে অব্যাহতভাবে। জ্যোতির্বিদেরা এর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের পরিধি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। যেহেতু, পরীক্ষায় দেখা যায়, দূর আকাশে নক্ষত্ররাজির পরস্পর দূরত্ব অসাধারণ মাত্রায় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এজন্য একে বলা হয় Expanding Universe বা বর্দ্ধমান বিশ্বজগত। সাংখ্য মতেও বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে অভিব্যক্তির প্রেরণা—প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহঙ্কারঃ ইত্যাদি। এ অভিব্যক্তি চলেছে কার্য্যকারণবাদের নিয়ম মেনে। আধুনিক বিজ্ঞানে একে বলা হয় Law of Causality. শক্তির সংরক্ষণশীলতা ও পরিণামশীলতার ধারণা হতেই গড়ে উঠেছে সাংখ্যের কার্য্যকারণবাদ।

জড়াণু সম্বন্ধে সাংখ্যের যে ধারণা আচার্য্য শীলের ব্যাখ্যানুসারে তাকে তিনটি বিশেষ সম্বন্ধভেদে প্রকাশ করা চলে—(১) দেশাবচ্ছিন্ন (position in space), (২) কালাবচ্ছিন্ন (position in time), (৩) নিমিত্তাবচ্ছিন্ন (position in causal series), শীল তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কালের কোন স্বকীয় বাস্তব অস্তিত্ব এতে থাকতে পারে না। অভিব্যক্তির শৃঙ্খলায় ঘটনাবলীকে পূর্ব্বাপর করে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টায় এ হচ্ছে আমাদের কল্পনা বা বুদ্ধিনির্ম্মাণ। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নামে কালের যে পর্য্যায়, তা শুধু পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা নির্দ্দেশের কৌশল বিশেষ। পরমবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক বাদে কালের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে সাংখ্যের ধারণার সাদৃশ্য দেখা যায়। সাংখ্যমতে কালকে অবিচ্ছিন্ন মনে না করে বিচ্ছিন্ন কণিকা বা ক্ষণের সমষ্টি হিসাবেও গণ্য করা চলে এবং বর্ত্তমান ক্ষণ বা মুহূর্ত্তই একমাত্র বাস্তব বলে যে আমাদের নিকট মনে হয় এ সম্বন্ধেও আচার্য্য শীল আলোচনা করেছেন।*
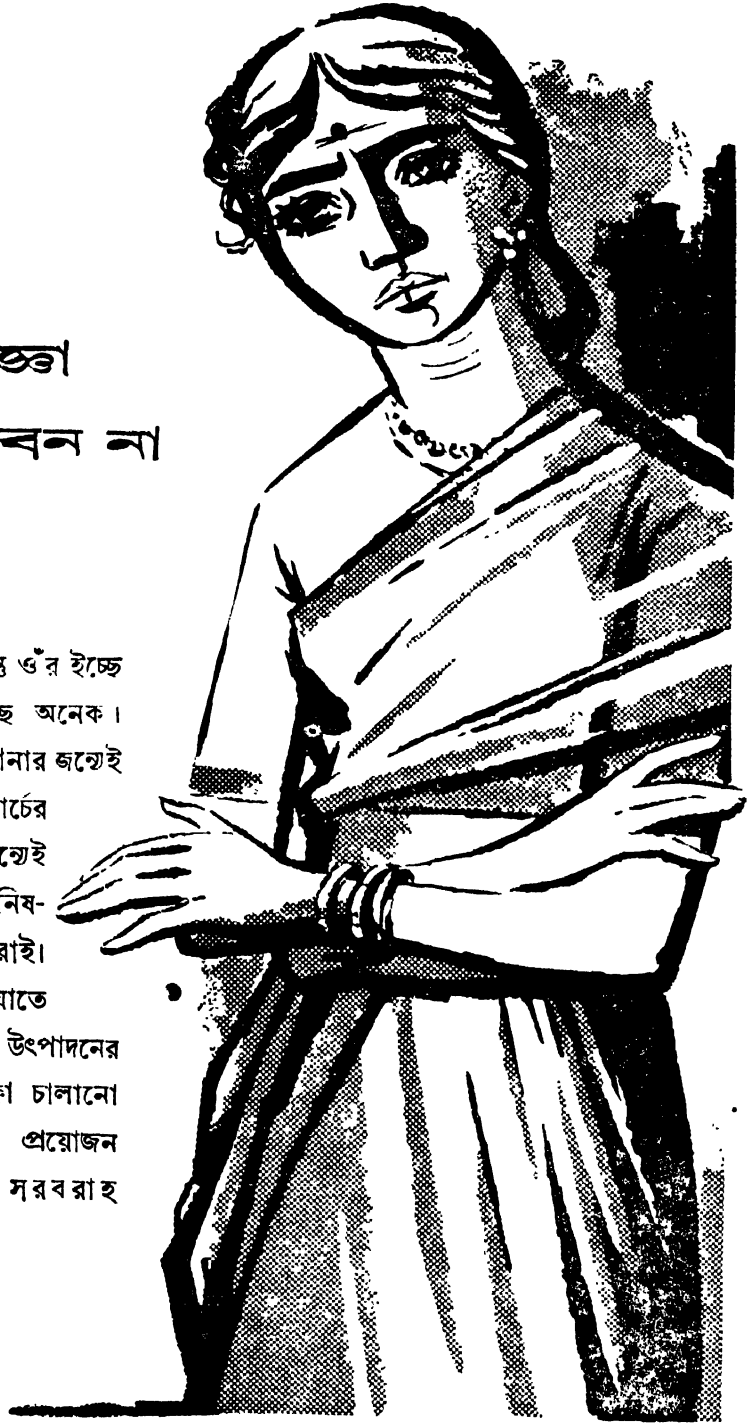
ভাস্করাচার্য্য তাঁর রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণিতে কালমনোধ্যায়ে কালের নিম্নলিখিত বিভাগ করে গেছেন।

৩০ ক্ষণে	—	একদিন	৩০ কাষ্ঠে	—	এক কলা
২ ঘটিকায়	—	এক ক্ষণ	১৮ নিমিষে	—	এক কাষ্ঠ
৩০ কলায়	—	এক ঘটিকা	৩০ তৎপরে	—	এক নিমেষ
			১০০ ত্রুটিতে	—	এক তৎপর

সুতরাং এক ত্রুটি হচ্ছে প্রায় $\frac{১}{৩৩৭৫০}$ সেকেণ্ড। কালের এই একক ত্রুটিকে ভাস্করাচার্য্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় ব্যবহার করেছেন। আচার্য্য শীলের মতে ভাস্করাচার্য্যকে নিউটনের অগ্রবর্ত্তী ও অন্তরকলন বা Differential Calculus-এর আবিষ্কর্ত্তা বলে গণ্য করা যায়। ভাস্করাচার্য্যের জন্মকাল—১১১৪ খ্রীঃ অব্দ। নিউটনের জন্মকাল হচ্ছে ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দ। গ্রহগণের তাৎকালিক গতিনির্ণয় উপলক্ষে ভাস্করাচার্য্য প্রথমতঃ তাদের পর পর অবস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং অনুমান করেন যে, দুই পর পর অবস্থানের অন্তরবর্ত্তী দেশে তাদের গতিবেগের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এ অন্তরবর্ত্তী পথ অতিক্রম করবার কাল এক ত্রুটি পরিমাণের বেশি হতে পারে না—বরং অনেক কম হবারই সম্ভাবনা; ইহাই ছিল ভাস্করাচার্য্যের ধারণা। এ তাৎকালিক গতিকে ভাস্করাচার্য্য গ্রহের সূক্ষ্মগতি বা দেশান্তর (Differential) বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

চরক এবং বাগভট হতে আচার্য্য শীল পরিপাক-প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আধুনিক শরীরবিজ্ঞানের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল। খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ করার পর গলনালী হতে আমাশয়ে (stomach) প্রবেশ করে। সেখানে ফেণীভূত কফের (gelatinous mucous) সঙ্গে উহার সংমিশ্রণ ঘটে। এই কফের স্বাদ হচ্ছে শর্করার মতন (starchy matter changing into sugar). অবশেষে খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়ে অম্লাক্ত হয় (বিদেহাদম্লতাং গতঃ)। আমরস বা gastric juice-এর অম্লতা (acid) সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকদের যে অভিজ্ঞতা ছিল ইহাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পর আমাশয় হতে গ্রহণী নাভির ভিতর দিয়ে ঐ পরিপক্ক খাদ্যবস্তুর মিশ্রণ যায় পিত্তাশয়ে। পিত্তাশয় হতে যায় আমপক্কাশয় বা ক্ষুদ্রান্ত্রে। এখানে ঐ পরিপক্ক খাদ্যমিশ্রণের উপর পিত্তরসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে, খাদ্যবস্তুর পরিণতি ঘটে রসে (chyle)—এ রসের সূক্ষ্মাংশ ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) হতে প্রাণবায়ুর চাপে যায় হৃদযন্ত্রে এবং তথা হতে যায় যকৃতে। এখানে পিত্তরসের প্রক্রিয়ায় উহা রক্তে পরিণত হয়। রক্ত হতে হয় মাংস-কোষ, মাংসতন্তু, ইত্যাদি।
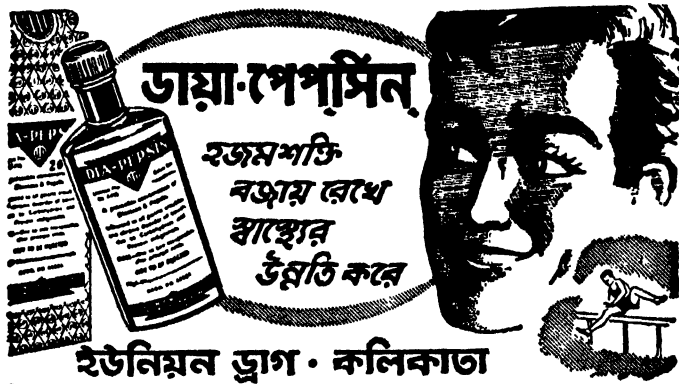
বিজ্ঞানের বহু শাখার তত্ত্ব সম্পর্কিত এরূপ বহু উদাহরণ আচার্য্য শীলের রচনা হতে উল্লেখ করে দেখান যায় যে, প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার যে উৎকর্ষ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের জানবার এখনও অনেক কিছু বাকী আছে। এ কারণে তাঁর গ্রন্থাদির পুনর্মুদ্রণ ও বহুল প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে, মনে করি।*

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জ্ঞানেই ছিল একমাত্র স্পৃহা এবং অনুরাগ। তাঁর সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ছিল জ্ঞানের সন্ধানে। বিভিন্নরূপ জ্ঞানের সমন্বয়ে যে পরম জ্ঞান তারই স্বরূপ অন্বেষণে ছিল তাঁর সাধনা। সুতরাং তিনি ছিলেন জ্ঞানযোগী। গীতার কথায় বলা যায়:—

'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥'

* আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

সামাজিকতা অভিমুখে জীব-জগৎ

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

অভিব্যক্তির যে ধারায় বুদ্ধির বিবর্তন সামাজিকতা তার প্রধান অবদান। দল বেঁধে জীবনযাপন ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা পূর্ব্বেও দেখা গেছে সামাজিক কীট-পতঙ্গের ভিতর, তবে সে প্রবৃত্তি কুলস্মৃতির যন্ত্র মাত্র, নির্জ্ঞান মনের অবচেতন ক্রিয়ানুরূপ। সেখানে ব্যক্তি তুচ্ছ, ব্যক্তিজীবন বৃহৎ সামাজিক পরিবেশে বিলীন। সমাজের কঠোর নাগপাশে বাঁধা ব্যক্তিজীবনে স্বচ্ছন্দ নেই তৃপ্তি নেই আগ্রহ নেই আছে কেবল কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা, সামাজিক অনুশাসন; অত্যধিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিজীবন। ওদের সমাজে ফ্যাসিষ্টবাদের ছাপ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন অন্ধ সমাজ। বিসদৃশ কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, কারণ সহযোগিতার ভিত্তি কোমল বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় নি। অমেরুদণ্ডী মহলে তাই ওরা উন্নত হয়েও আদিম অন্ধপ্রবৃত্তির দাসত্ব করছে, জগন্নাথের রথচক্ররূপ সমাজের নিয়মপিষ্ট। স্তন্যপায়ীর সামাজিকতায় সুকুমার বৃত্তির করস্পর্শ।

যদিচ মাছেরা ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করে অনেক সময়, পাখীদের এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্য্যন্ত যাযাবরবৃত্তি দলগত, নীড় রচনা পরিবার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সামাজিকতার আভাস আছে, কিন্তু এগুলি পরিণত নয়, অঙ্কুর মাত্র। সমৃদ্ধ প্রবৃত্তি নয়, উন্মেষের প্রথমাবস্থা।

সামাজিকতার প্রভাব প্রতিভাত উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবনে, সর্ব্বস্থলে নয়, কয়েকটি দলে।* স্তন্যপায়ীর স্বজনপ্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ চিড়িয়াখানায় প্রায়ই দৃষ্ট হয়, বনমানুষ শাখামৃগ থেকে আরম্ভ করে অশ্ব হরিণ কেহই একেলা থাকা পছন্দ করে না। সময় অসময় স্বজনকে অতিক্রম করে বন্ধুত্ববোধ দেখা যায় ভিন্ন জাতির মধ্যে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল এক তরুণ ওরাং ও ক্যাঙারুর ভিতর, কাইরোর এক সিংহ শাবকের শৈশব অতিবাহিত হয় শশকদের ভিতর—হতাহত হয় নি কেউ।

নিঃসঙ্গ একক স্তন্যপায়ী-জীবন হতে যূথচর সামাজিক জীবনযাত্রার বিবর্ত্তন—এ স্বতঃসিদ্ধ।

ওটার ব্যাজার ইত্যাদি নিঃসঙ্গ জীব, আবার বীবর কাঠবিড়ালরা একত্র থাকে।, মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান পূরণ করছে শশকজাতীয় র‍্যাবিট, প্রেয়ারীকুকুর; ঠিক সামাজিক নয় তবে সামাজিকতায় অতি নিকটে উপনীত, অনেক সময় একসঙ্গে খায় বেড়ায় খেলা করে কিন্তু কর্ম্মে সহযোগিতার অভাব। লেমিংরা একত্রে বাস করে অথচ যূথচর নয়, তীব্র খাদ্যাভাব হলে বাহির হয়ে পড়ে একসঙ্গে।

প্রেরণা রয়েছে সামাজিক হয়ে উঠবার অথচ বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠে না। মেরুদণ্ডীর প্রত্যেক শ্রেণীতে শৃঙ্গার ঋতু-উৎসবে নিমন্ত্রণ প্রত্যেক সক্ষম স্ত্রী-পুরুষের, মধুমাসের এই চেতনা পাখী ও স্তন্যপায়ী মহলে নিরুপম, নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে। অপত্যস্নেহ এসেছে তার পরে, সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় স্তর। ঘনীভূত হয়েছে স্নেহ করুণা প্রীতি সহানুভূতি সহযোগ নিষ্ঠা। যতদূর মনে হয় ভ্রাম্যমান খুরেলা প্রাণীরা দল বাঁধতে শেখে প্রথম আত্মরক্ষার্থে ও বংশরক্ষার্থে। স্বামী-স্ত্রী ও পুত্রকন্যা অর্থাৎ পরিবারকে নিয়ে সমাজের ভিত্তি। শৃঙ্গার ঋতুর পরও স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয় না, সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে সন্তান-সন্ততি, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে দৈনন্দিন কর্ম্মে সহযোগিতা করছে—এই ত প্রাথমিক সমাজ। হিংস্র ব্যাঘ্র শিকারে যায় বাঘিনী গুহাভ্যন্তরে সন্তান রক্ষা করে, ব্যাঘ্র খাদ্য সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্ত্তন করে অথবা পরিবার নিয়ে যায় নিহত প্রাণীর নিকট, শাবকদের শিকার-শিক্ষা পিতামাতার কাছে।

হস্তী মৃগ ছাগ মেষ নেকড়েরা যূথচর। মাংসাশীদের যূথচর বৃত্তি স্ফুরণ হয় নি নানা কারণে। প্রথমতঃ এরা সদা সতর্ক আক্রমণ আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর। দ্বিতীয়তঃ দৈহিক শক্তিতে আস্থাবান।

কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে শিকার করছে এও দেখা যায়, কানাডার টিম্বর নেকড়ের দল পিতামাতা সন্তান-সন্ততি নিয়ে অনধিক ৫।৭ জন, আবার উত্তর ইউরোপের দলে অগণিত নেকড়ে থাকে।

নিরামিষাশী তৃণচর-যূথ মাংসাশী যূথচর অপেক্ষা বুদ্ধিমান। আত্মরক্ষা কৌশল ও পলায়নে দক্ষতা আক্রমণ ও শক্তিমত্তা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হওয়ায় ক্রমোন্নতি হয়েছে নিরীহ প্রাণী-বিবর্ত্তন ধারায়, হিংস্র প্রাণীমধ্যে এক নেকড়ে ও কুকুরগোষ্ঠির হায়না শৃগাল কয়ওটস কেপ শিকারী কুকুর ব্যতীত আর কেউ দল বাঁধতে পারল না। শাকান্নভোজীদের পারস্পরিক সহযোগিতা আত্মরক্ষার ভিত্তি, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে অনেকে, সুষ্ঠু ও নিরাপদ জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হয়ে উঠেছে দলগত সহযোগিতা। মেষ কস্তুরীমৃগ ছাগল আপাতঃদৃষ্টিতে অতি নিরীহ কিন্তু বন্যযূথ দুর্ভেদ্য, আত্মরক্ষা সংগ্রামে প্রত্যেকের নিয়মকানুন আছে, শৃঙ্খলা সংহতি আছে, যা তাদের জয়যুক্ত করে। নেকড়ের দল হয়ত আক্রমণ করল, শিশুদের ভিতরে রেখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ তৈরি হয়ে গেল কয়েক মিনিটে, সমর্থ বলবান পুরুষগুলি দাঁড়ায় সম্মুখে এসে, কার সাধ্য তাদের পরাজিত করে ব্যূহে প্রবেশ করে। দলের শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষ

---

* লেখকের 'প্রাণীজগতে সমাজ ও সহযোগিতা' প্রবন্ধে বিশদ আলোচিত।

দলপতি, কোন দলে অপরাপর সমর্থ পুরুষ থাকে কোন দলে নেতাই একমেবদ্বিতীয়ম্। দল নেতার নিকট বশ্যতা স্বীকারে যে বিনয় নম্র মনোভাবের উন্মেষ উত্তরকালে মানবজীবনে তাহা সৌজন্য ভদ্রতা শিষ্টাচারে পরিণত। এ আনুগত্য শৃঙ্খলা-সংহতির সহায়, দলপতির নির্দ্দেশ উপেক্ষা কেউ করে না, বিপদ আপদে সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে যায় নিঃশব্দে।

যূথের শাসন-ব্যবস্থা অভিনব, দলপতি শরীররক্ষী শাসন-পরিষদ প্রহরী ত প্রত্যেক দলে থাকে, কোন কোন দলের আবার একনায়কত্ব অর্থাৎ ডিক্টেটরশিপ, ও সম্মানার্হ পদের উমেদারও থাকে একাধিক। বনমানুষকে বাদ দিলে সামাজিকতায় সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে বীবর। হিংস্র মাংসাশী বা হস্তী শৃগালের ন্যায় চতুর নয় অথচ কেবল সহযোগিতার জোরে বাঁচে জীবন-সংগ্রামে। শুধু দলবদ্ধ সামাজিক স্তন্যপায়ী বললেই সব বলা হয় না, এদের সহযোগিতার তুলনা মিলে সামাজিক পতঙ্গ মৌমাছি পিপড়েদের ভিতর।

কয়েকটি বাসা নিয়ে বীবর গ্রাম। কাছাকাছি গাছগুলি দিয়ে প্রথমে ভোজ চলে পরে দূরস্থ বৃক্ষ। খাল কাটা বাঁধ দেওয়া যদি সমবায়িতার প্রকৃত পরিচয় হয় তা হলে এরা শ্রেষ্ঠ। সময় সময় শত শত ফুট লম্বা খাল কেটে ফেলে, ছোট দ্বীপ চড়া নির্ঝরিণীর ভিতর দিয়ে সহজ পথ বার করে তার ভিতর দিয়ে আনাগোনা। দুঃসাহসিক এ কাজ উদ্দেশ্যমূলক ও সমবেত প্রচেষ্টার ফল, জলে বাঁধ দিয়ে তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করে সারা শীত নিরুপোদ্রবে তথায় ঘুমিয়ে কাটায়। দাম্পত্যজীবন একপত্নীক হওয়ায় এরা সুখী, অন্যান্য যূথচরদের মত উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপরায়ণ নয়।

বনমানুষ (শিম্পাঞ্জী গরিলা বেবুন) সমাজের আলোচনা বর্ত্তমান নিবন্ধের অন্তর্গত নয়। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, শাসন-শৃঙ্খলা সমাজব্যবস্থা নীতি-সংযম ত্যাগ-ভোগ সমস্তই ওদের জীবনে দেখা যায় তবে অপরিণত অবস্থায়। জৈব-বিবর্ত্তনে সকলের শেষে (মানুষ বাদে) এসেছে আচরণ স্বভাব ও মনে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ ওদের সুউন্নত সামাজিক জীবন।

মাংসাশী স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তন

স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের এক ধারায় যেমন সমাজনিয়ন্ত্রিত জীবন নমনীয়তা স্বজন আবেদন প্রভৃতি সদ্‌প্রবৃত্তির বিকাশ হচ্ছিল, অপর দিকে আর একটা ধারাভিমুখে আক্রমণ ক্রোধ হিংসা পশুবল আত্ম-সংস্থাপন প্রভৃতি দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তির উদ্ভব। এরা একে অপরের পরিপূরক। জৈব-অভিব্যক্তির পরম সন্ধিক্ষণে এদের আবির্ভাব, জীবনকে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধাচরণ হতে রক্ষা করে দৃঢ় সংস্থিত করেছে দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি, এর উপযোগিতা আছে।

মাংসাশীর অভ্যুদয় শাকপাতাভোজী স্তন্যপায়ীর সমকালে, ডাইনসরকুলের পুনারাবৃত্তি। কেউ পরিশ্রম সহকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, কেউ অনায়াসে তাকে শোষণ করে, পৃথিবীতে এ ব্যাপার বহু পুরাতন। মাংসাশীরা নিরামিষাহারীদের জ্ঞাতি ভাই, একই সময়ে বিবর্ত্তন, তথাপি খাদক খাদ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠায় একে অন্যের শত্রু। মাংসাশী ও খুরেলা প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষ এক, প্রত্যেকের পদ ৪ ৫টি আঙুল বিশিষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ নখযুক্ত ; প্রত্যেক পাটিতে তিনটি ধারাল, ছেদনদন্ত প্রধান অস্ত্র, তাই এঁরা শ্বাপদ। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণী নিহত করে মাংস ভক্ষণ করা এদের পেশা, অনেকে উদ্ভিদও বাদ দেয় না আবার মাংসেতেও অরুচি নেই (ভল্লুক)। কেউ কেউ ঘোরতর শাক্ত, সদ্যনিহত জন্তুর তাজা উষ্ণ রক্ত অতি উপাদেয়, যেমন রাজাবাঘ নেকড়ে। কারও জিঘাংসাবৃত্তি এত তীব্র যে ভোজনের অতিরিক্ত প্রাণী সংহার করে, হননেই আনন্দ। টাসমেনিয় শয়তানের নিষ্ঠুরতা লোক-প্রসিদ্ধ, যা খায় তার দশ গুণ হত্যা করে। নকুল জাতীয় উদ্বিড়ালরা দেখতে ছোট কিন্তু দুর্দ্দান্ত স্বভাব, এই জাতীয় 'ফিশার' সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধপ্রবণ, নিজের চেয়ে চতুর্গুণ বড় প্রাণীকে আক্রমণ ও হত্যা করে। এক আধটা যখন মানুষের জালে ধরা পড়ে, দেখা যায় দেহের চামড়ায় শত শত যুদ্ধ চিহ্ন। সিংহ ব্যাঘ্র এত নির্দ্দয় ও ক্রোধপ্রবণ নয়, তবে চিতা (পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী) ও ভালুকের কথা স্বতন্ত্র, ওরা নিতান্ত বন্য ও বিশ্বাসহন্তা। মাংসাশীর দৈহিক বিবর্ত্তন ঘটেছে অনুরূপ ভাবে, শিকার ধরবার উপযোগী সদা-তৎপর দেহ, দীর্ঘ বক্র শক্তিশালী থাবা, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা ও অসীম দৈহিক ক্ষমতা। উদবর্ত্তন হয়েছে অরণ্যের হিংস্রতা সাহস ও ধূর্ত্তামীর। উন্মুক্ত স্থানে সামনাসামনি শিকার করে না, কৌশল অবলম্বন করে। জীবজন্তুর যাতায়াতের (যেমন জলাশয়ের পথে) পথে চুপি সাড়ে গুড়ি মেরে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে, নিঃশঙ্ক নিরীহ প্রাণীর ঘাড়ে অতর্কিতে লাফিয়ে প্রাণসংহার, রাত্রির অন্ধকারে বড় বড় জন্তুও কাবু। পদতলে নরম মাংসপিণ্ড থাকায় নিঃশব্দে চলাচল। সারমেয়গোষ্ঠী কিয়ৎপরিমাণে যূথচর, নেকড়ে শৃগাল খেঁকশেয়াল বৃক্ষারোহণে অক্ষম, থাকে মাটিতে গর্ত্ত করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকরা উদ্ভিদজ খাদ্য পোকামাকড় পর্য্যন্ত খায়। বৈড়াল-গোষ্ঠীর মত একগুঁয়ে জেদী না হওয়ায় বুদ্ধিমান, মানুষ এদের পালন করছে অনেক স্থলে।

হিংস্র প্রাণীকুলে বৈড়াল গোষ্ঠী বর্দ্ধিষ্ণু, অপর সকলে অবলুপ্তির পথে। মাংসাশী জীবের শ্রীবৃদ্ধি ততদিন খাদ্য তৃণচর যতদিন অনায়াসলভ্য, নিরামিষাশীদের ক্ষয় আরম্ভ হলে এদের কাল ঘনিয়ে আসে ; অবশ্য আকস্মিক বিপদপাত অথবা অবস্থা বিপর্য্যয়ে ধ্বংস পূর্ব্বাহ্ণেই। শত শত মাইল জুড়ে এমেরিকান মহিষদের মিসিসিপির তীর হতে যাযাবর বৃত্তি আরম্ভ হ'ত সর্ব্বশেষে দেখা যেত নেকড়ে শ্রীজলি ভালুক ভোজ চালাতে পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছে। অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ পরিশ্রম-বিমুখ করে তুলেছে, ক্রমোন্নতি ধারা স্তব্ধ এখানে। সমস্ত শক্তি সংহত হয়ে কেন্দ্রীভূত, নিয়োজিত হয়েছে বলবীর্য্য শক্তিমত্তার উন্নতিসাধনে। কলা-কৌশল চাতুর্য্য উদ্ভাবনী
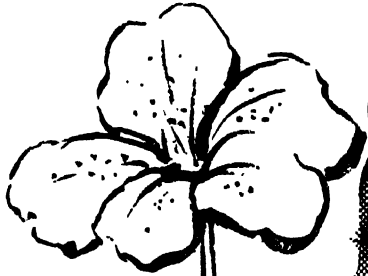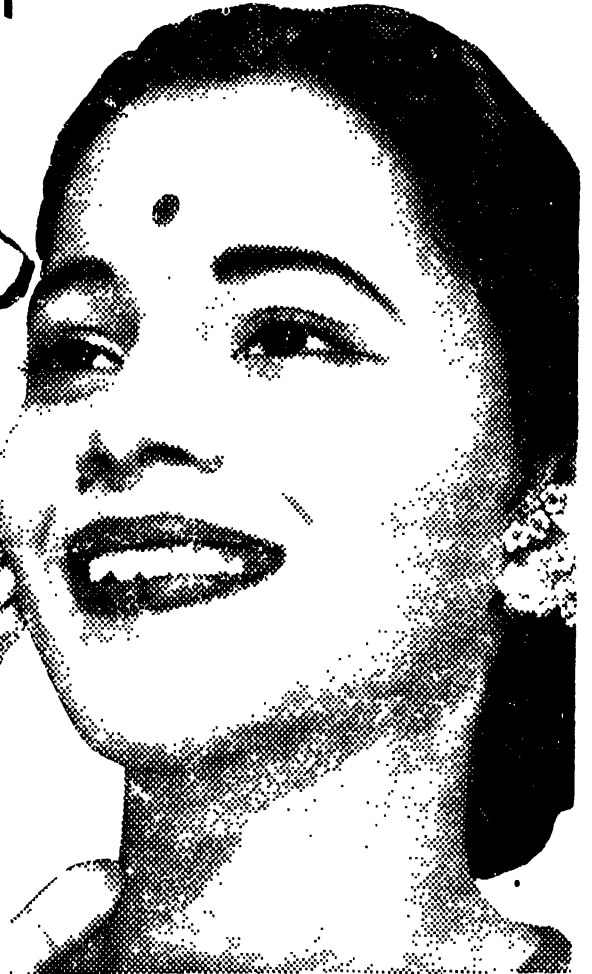
শক্তি হ্রাস, উৎকর্ষ হয়েছে আক্রমণ কার্য্যকারিতা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের। এ হ'ল মানসিক অবস্থার অবনতি, কলহপ্রিয়তার আনুষঙ্গিকে দোষগুলির বিবর্ত্তন হয়েছে, জিঘাংসা রক্তলোলুপতা দুর্দ্দান্ত বন্য আচরণ।

প্রাণীকুল আশ্চর্য্যজনক অভিযোজন ক্ষমতাবিশিষ্ট, প্রতিনিয়ত প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর। এক একটি প্রধান ধারা থেকে শাখা-প্রশাখার ন্যায় কত যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের উদ্ভব হয়েছে, তার সংখ্যা নির্দ্ধারণ দুরূহ। প্রতি ক্ষেত্রে গতি পরিবর্ত্তনে প্রভেদ এসেছে প্রচুর। জাতি হিসাবে বৈড়াল জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ, মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করেছে অনাদিকাল থেকে মাংসাশী ও প্রাণীহন্তা হয়েও। দন্ত ও থাবার প্রচণ্ড বিক্রম, সিংহের একটি থাপ্পড়ে মহিষের মাথার খুলি চুর। বাঘ সিংহ থেকে আরম্ভ করে চিতা বাঘ জাগুয়ার পুমা লিঙ্কস অসিলো সারভাল বন্যবিড়াল এবং তার সঙ্গে অগণিত প্রজাতি; একমাত্র গৃহ-বিড়ালই কতশত প্রকারের। কি বিস্ময়কর বিবর্ত্তন।

পুরাকালের কথা কিছু বলি—

বেলুচীস্থানে দীর্ঘ গ্রীবা ও পদবিশিষ্ট জিরাফাকৃতি হস্তী আয়তন শৃঙ্গহীন যে জীবের অস্থীভূত দেহটি পাওয়া গেছে সে বৃক্ষশীর্ষ ভক্ষণ করত; মঙ্গোলীয়ায় ২০ টনের এক দেহ টিটানোথেরাস ভীষণ শৃঙ্গ-ধারী, ইজিপ্টে আরসীনথেরিয়াম বৃহদায়তন হয়ে উঠেছিল। এরা কেউ অভিব্যক্তির প্রধান ধারা প্রসূত নয় গাছপালাভোজী প্রাণী বিশেষ, পেকারী হিপো লেমা উট শূকর ইত্যাদিরাও অভিব্যক্তির অপ্রধান ধারা, কারণ প্রকৃত খুরেলা প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ টিকতে পারে নি বরং তীক্ষ্নদন্তী শশক মূষিক ভোঁদ শজারু প্রভৃতিরা আজ বহু বিস্তৃত স্তন্যপায়ী, কেউ বিলুপ্ত হয় নি। মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র হলেও কর্ত্তনে পারদর্শিতা লাভ করায় জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী।

জৈব-বিবর্ত্তনের আদিকাল থেকে প্রত্যেক যুগে বৃহৎ বৃহৎ জীব-গোষ্ঠীর উত্থান-পতন ধারাবাহিক, প্রতি গোষ্ঠী কোনও কোনও সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছে একাধিপত্য করেছে ধরাতলে, প্রবাল, তারা-মাছ জেলিমাছ, শামুক কীট মৎস্য উভয়চর সরীসৃপ প্রত্যেকে নিজ নিজ কালের একচ্ছত্র অধিপতি। এদের আধিপত্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপুলায়তন ও দৈহিক শক্তির কারণে, নিজ নিজ কাল, অবস্থা ও প্রতিবেশ কিছুটা অনুকূল ছিল, তবে দেহযন্ত্র প্রকৃতির পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ পরিপুষ্টি ও অপরিমিত বৃদ্ধি স্থায়ী হয় নি বেশী দিন, আকস্মিক ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

পরিস্ফুরণের আতিশয্যে জাতির বিনাশ

স্তন্যপায়ীদের পরিস্ফুরণ নিয়ন্ত্রিত হলেও মাঝে মাঝে দৈহিক বৃদ্ধি শারীরিক বল ও বিশেষ অঙ্গের অসমবৃদ্ধি অমিতাচাররূপে প্রকট।

জিরাফের গ্রীবা ও উষ্ট্রের গ্রীবা বাড়াবাড়ির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জৈব-বিবর্ত্তনে অঙ্গের পরিস্ফুরণ শুধু চমকপ্রদ নয় সমস্যাও বটে। পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, গ্রী তার অন্যতম নিদর্শন। উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে ভ্রাম্যমানদের লম্বা, উট পাখী জিরাফ উট প্রত্যেককে আত্মরক্ষা ও আহারানুসন্ধা প্রত্যহ বহুদূর চলাফেরা করতে হয় তাই এরা দীর্ঘপদ, খাদ্য গ্রহণের উপায় কি, উপায় উদ্ভাবন করেছে প্রকৃতি, বিবর্ত্তনের ফ কেউ পেয়েছে শুড়, কার্লিউ প্রকাণ্ড চঞ্চু, অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ গ্রীব কর্দ্দমচারী পাখিদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা, জলজীবাহারী বক সা ফ্লেমিঙ্গো মাছরাঙার মত ঝাঁপ খেয়ে জলে পড়তে পারে সেজন্য গলাটি বিরাট। যাদের পা লম্বা তাদের দীর্ঘ গলা, তবে দীর্ঘগ্রীবদের দীর্ঘপদ নয়। পাতিহাঁস বলাকা পেলিকানে স গলা অথচ পদ ক্ষুদ্র। বংশপরম্পরাগত ব্যবহার অথবা অব্যবহা ফলপ্রসূত এই অঙ্গ। আলপাকা উট জাতীয়, গলা লম্বা হলে সোজা, বক্র নয়। সর্প ও কচ্ছপের গলা বেশ লম্বা আবার কুমী সরীসৃপ হলেও ক্ষুদ্র গলা, হাতী হিপো প্রায় গ্রীবাশূন্য। জলবা দের গলার প্রয়োজন নেই, যেমন মাছ, জলজ স্তন্যপায়ী অব্যবহা গলা হারিয়েছে, তিমি সীল ডুগং প্রায় গলাহীন। অন্যান্য অ হ্রাস বৃদ্ধি প্রায় সম অবস্থায়।

যে প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছিল, সে প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটে বৃদ্ধির সমাপ্তি হয় নি। বিরক্তিকর ভাবে বেড়ে উঠেছে না হোয়ালের স্ক্রুপের ন্যায় পেঁচাল সোজা ৭৮ ফুটের একটি সুন্দর অ গজদন্ত। সেলিবীস দ্বীপপুঞ্জের বন্যবরাহ 'বেবিরুসার' বিষয় হয়েছে, আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য জুজোড়া বরাহ দন্তোদ আরম্ভ হয়েছিল অতীতকালে, এখন উপরের দিকে বক্র হয়ে যাও কেবল অঙ্গশোভা কাজে দেয়নি কিছুই। একদেশদর্শী অথবা অ রিক্ত পরিস্ফুরণ কোনটাই ভাল নয়, জাতি লোপের পশ্চাতে অদৃশ্য অঙ্গুলী সঙ্কেত।

তৃতীয় যুগে (স্তন্যপায়ীর আমলে) যাদের অতি বাড় হয়েছি তাদের অনেকে শ্লথ মৃগ ম্যামথ বিশাল অঙ্গ গর্ভরা আজ নিশ্চিহ্ন প্রখ্যাত মৃগ আইরিশ এলকের শাখা-প্রশাখা সমন্বিত শৃঙ্গের বিস্ত ৯ ১১ ফুট, হিমযুগের শৃঙ্গী গণ্ডার বৃহদন্তী করীর তুলনা এ-যু মেলা ভার, খড়্গদন্ত, ব্যাঘ্র ও গুহা-ভল্লুকও কম জান না। খড়্গদন্ত খড়োর ন্যায় দুটি দন্ত ও গুহা-ভল্লুকের অসীম দৈহিক বলে সে যু সকলে ভয়ে থরহরিকম্প।

বহিপ্র্রতিবেশে অবস্থান্তরের সূত্রপাত ঘটলেই একদেশদর্শী বিশেষত্বযুক্ত প্রাণীদের মুস্কিল পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে নতুন করে খ খাইয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। শাকপাতাভোজীরা সরস সং বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ-লতা উপবনে বিলাস-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, ত কালক্রমে তারা বিশালাকায় মন্দগতি, শুষ্ক আবহাওয়া পত্রপল্ল বন অঘন হয়ে এলে তাদের জীবন শেষ। বিপুলাকার উভয়চ মারা পড়েছিল জলাভাব ও শুষ্ক শীতল বায়ুপ্রবাহে। ডাইন গোষ্ঠীর কেউ কেউ হয়ত আজও বেঁচে থাকত শুষ্ক শীতল আবহা সহ্য করে—যদি না নবাগত স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে তাদের জোর প্রা

দ্বন্দ্বিতা চলত। উন্নত দেহযন্ত্র বা বিশেষ সুবিধাসমন্বিত অভ্যাগতদের আক্রমণ সহ্য করে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব, অবস্থা যখন মন্দ হয়ে আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন হয় প্রবল। নিবিড় অরণ্যানীর জীব তৃণাচ্ছাদিত মাঠে অচল হয় স্বভাব বদলাতে, না হয় শরীরপাত,—অশ্ব-বিবর্তন ঘটেছে এইভাবে (হাইপো-হিপাসই)। খড়্গ-দন্তী বাঘ স্মাইলোডন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিপুলদেহী শ্লথ এদের প্রিয় খাদ্য, ত্বক দুর্ভেদ্য হওয়ায় চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরবার অসুবিধা, তাই বৃহৎ দন্তযুগল বিদ্ধ করে দৃঢ়-সংলগ্ন হয়ে থাকত দেহের সঙ্গে, দন্তের শ্রীবৃদ্ধি এই কারণে, আবার শাকপাতা-ভোক্তা শ্লথ ধরাবক্ষ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় মেরে গেল এদের, বৃহৎ দন্তের জন্য অপর কোন শিকার ধরা যথেষ্ট অসুবিধা। অনেকক্ষেত্রে বহু বিস্তৃত পরাক্রান্ত জাতির অন্তর্ধানের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ নেই, এমোনাইটকুল একদা সমুদ্রজল ছেয়ে ফেলেছিল; ইক্‌থাইসর প্লেসিওসরের মত পরাক্রান্ত জলচারীসব তিমি আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে তিরোহিত। বেলুচীথেরিয়াম তুষার ম্যামথ ইত্যাদির মত বৃহদায়তন স্তন্যপায়ী প্রাণী অল্পকাল ছিল পৃথিবীতে। মনে হয় দৈহিক বৃদ্ধি বা আঙ্গিক বিবর্ত্তন মস্তিষ্ক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সমান তালে চলতে অক্ষম, অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি আশু প্রয়োজনে তার সঙ্গে বুদ্ধি বিবর্ত্তনের সম্বন্ধ অল্প, অভিব্যক্তির প্রধান ধারাচ্যুত একদেশদর্শী পরিস্ফুরণ আকস্মিক নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন ও সঙ্কীর্ণ অভিপ্রায়সিদ্ধি নিমিত্ত: নিরামিষাহারী অরণ্যবাসীরা প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাসে অমিতাচারী বিলাসী; সে কারণে মেদবহুল বিপুল দেহভার। হিংস্র মাংসাশীর আক্রমণ ও যুদ্ধপ্রিয়তা উদ্ভব করেছে শক্তিমত্তা ও দেহসুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রে, কিন্তু কেহই বুদ্ধি-চাতুর্য্য কলাকৌশলের দিকে মনোযোগ দেয় নি।

অত্যধিক অঙ্গস্ফুরিত জীব সবাই নির্ম্মূল হয় নি। ঘড়িয়ালের লম্বাকৃতি তুণ্ড যে কোন্ বিশেষ উপকারে আসে জানা নেই। ব্রেজিলের কচ্ছপের ঢেউখেলান খোলসপিঠ ও মাংসল গলা জড়ভরত প্রায় করে এনেছে। গ্রীষ্মাঞ্চলে রোমশদেহ অপ্রয়োজনের বিলাস; আবিসিনিয়ার গুরেজা বানর মধ্য-আফ্রিকার কোলোবাস বানরের দীর্ঘ সরোম শ্বেত লাঙ্গুল বিস্ময়কর কিন্তু বৃথা। ধনেশ পাখীর ঠোঁট অনেকে দেখেছেন, অনেক পাখীর ওষ্ঠ এত বেড়ে গেছে যে, দেহবৈষম্য বললেই চলে। টউকান গুবিলের ঠোঁট বদখৎ। সিরাসটেস ফণী বিষাক্ত, মস্তকাগ্রে দুটি শিং কোন প্রয়োজনে লাগে? অনেক গিরগিটির কণ্টকাকৃতি দেহ ও মস্তকের ব্যবহারের হদিশ মিলে না।

গগনবিহারী স্তন্যপায়ী

কোন বর্দ্ধিষ্ণু জাতি যখন বিস্তৃত হতে থাকে তখন তার প্রভাব সর্ব্বস্থানে কোন ক্ষেত্রই অনধ্যুষিত থাকে না, জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আকাশ জয়ের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম করে মাছেরা, সফলকাম হয় নি। তার পর পতঙ্গকুল, চমৎকার অভিযোজন; টেরডক্‌টিলের প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। পক্ষীকুল ত প্রথম থেকেই ব্যোমচর, ভূতলে অবতরণ করলই না। শেষে স্তন্যপায়ীদের যখন সমৃদ্ধ অবস্থা তখন তারাও উড়ল আকাশে। বিস্ময়কর নয় মোটেই, অনন্ত আকাশরাজ্য জয় করবার বাসনা জীবকুলের চিরদিন। চাম-চিকে বাদুড় স্তন্যপায়ী খেচর। অভিব্যক্তির অদ্ভুত প্রকাশ উড্ডিয়মান স্তন্যপায়ী।

অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর সম্মুখের হস্ত অপেক্ষা পদদ্বয় আকারে বড়। এদের তা নয়, হস্তের পাঞ্জা থেকে পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত চর্ম্মের ঝিল্লি, পক্ষের আকারে পরিণত। প্রশস্ত বক্ষাস্থি পক্ষের মাংসপেশী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ভার বহন করছে, স্কন্ধাস্থি দৃঢ়। বহুকাল ধরে আকাশচারী হয়ে হস্তপদ ওড়ার কার্য্যে নিযুক্ত, স্বাভাবিক-ভাবে ভূমিতে হাঁটতে পারে না। সর্প ইত্যাদির মত প্রায় সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায় এই নিশাচর জীব তখন বাহ্যচেতনাবিহীন।

জৈব-বিবর্ত্তনের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্রমোন্নত একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে এই ধারায়। প্রথমতঃ সাধারণ স্তন্যপায়ী অপেক্ষা উন্নত শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসিকোপাঙ্গটি সম্ভবতঃ শব্দতরঙ্গগ্রাহী, মানুষ অথবা অপর প্রাণী যে শব্দতরঙ্গ-কম্পন বিচার করতে অক্ষম এরা অনায়াসে তাহা উপলব্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ স্পর্শবোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি অনুভূতি উদ্ভূত হয়েছে। চক্ষু ব্যবহার না করে নিকট বস্তুর সূক্ষ্ম অনুভূতিও বিস্ময়জনক, পশু-পক্ষী, মানুষ সকলের রাজ্য জুড়ে এ জ্ঞান অদ্বিতীয়। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোন উপায়ে সম্মুখস্থ বাধাবিঘ্ন অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে? অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি কার্য্যকরী নয়। এক অনুসন্ধানী পরীক্ষার কথা বলি:

একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে উঁচু-নীচু পাশাপাশি অনেক কাল সূতা এক কোণ হতে অপর কোণ পর্য্যন্ত বেঁধে দিয়ে কয়েকটি চামচিকা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। দেখা গেল, ঐ সূতাজালে এক বারও ধাক্কা না খেয়ে সচ্ছন্দে উড়ে বেড়াতে লাগল। এ প্রতিবন্ধক-গুলির সহিত শ্রুতি বা ঘ্রাণের কোন সম্বন্ধ নেই, তা হলে সর্ব্ব-প্রকার প্রতিরোধ পরিহার করে কি উপায়ে যথেচ্ছ বিচরণ! চাম-চিকা-দেহে রয়েছে সুবেদী স্পর্শ, ডানার রোমগুলি অনুভবক্ষম, বায়ুচাপের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া সম্ভবতঃ এই বিশেষ স্থানগুলির সংস্পর্শ-প্রসূত। দৈনন্দিন জীবনে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ব্যবহার হতে স্বতন্ত্র স্পর্শ ও শ্রুতিশক্তি সম্মিলিত কোন বিশেষ অনুভূতি এ, জন্মান্ধ যেমন একটা অদ্ভুত ধারণাশক্তির অধিকারী হয় এ সেই ধরনের। বাদুড় চামচিকেই আকাশে-ওঠা প্রথম স্তন্যপায়ী নয়, ব্যোমচারী হবার প্রয়াস করেছে অনেকে। তবে সফলকাম হয় নি। এদের আধুনিক বংশধর উড়তে অক্ষম হলেও গ্লাইডিং করতে পারে অবলীলাক্রমে। ফ্যালেঞ্জারের ডানা নেই কিন্তু শাখায় শাখায় এক বৃক্ষ হতে অন্য বৃক্ষে শূন্যমার্গ দিয়ে চলাচল করে সর্ব্বদা। এরা নিউগিনি অষ্ট্রেলিয়ার জীব ক্যাঙারুর জাতি। মালয়-ফিলি-পাইনের কবেগোর কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ শূন্যপথ ভ্রমণপটু না হলেও বিরাট বিরাট লাফ দেয়, একবার চল্লিশ

গজ চওড়া নদী শূন্য পথে পার হতে দেখা গিয়েছিল। ওড়ন কাঠ-বিড়াল আমেরিকার জীব। এর উড়বার পাল্লা পঞ্চাশ গজ অবধি, লম্ফবেগেই গতিপথ নির্দ্ধারণ করে তা নয়, শেষকালে উঁচু দিকে যেতেও দেখা গেছে। বৃক্ষচর স্তন্যপায়ী হতে কাঠবিড়ালানুরূপ লম্ফকারী পরে গ্লাইডিং শিক্ষা এবং শেষ পর্য্যায় বাদুর—বিবর্ত্তনের ধারা এইভাবে এগিয়েছে মনে হয়। এরা সবাই নিশাচর, পতঙ্গ বা ফলভুক এবং ভূমিস্পর্শ করে কদাচিৎ। স্বভাবই বদলেছে দেহ। ভারতবর্ষ বাদুড়ের দেশ, শতাধিক জাতির বাদুড় এখানে মেলে। এদের সম্বন্ধে ইউরোপে বহুদিন ধরে একটা কুসংস্কার ও ভীতি প্রচলিত ছিল, কারও কারও মুখমণ্ডল ভীষণ, নক্কারজনক। গায়ের বদগন্ধ দেহে মাংসের স্বল্পতা শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতের বাদুড় (ভ্যাম্পায়ার) পশু কদাচিৎ মানুষের রক্ত নিস্তব্ধ নিশীথে নিঃসাড়ে শোষণ করে। আশ্চর্য্য ক্ষমতা, নিদ্রিত জীব টের পায় না বিন্দুবিসর্গ, মুখের লালা দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে দেয়।

শীত এদের অসহ্য, স্থানান্তরেও যেতে অক্ষম, তবে আছে বহুদিন ধরে।

বিবর্ত্তন ধারার পারম্পর্য্য

জৈব-বিবর্ত্তনের প্রতিটি ধারা অন্য সকল ধারার সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত, একে অপরের উপর নির্ভর করে প্রবাহিত হয়েছে, কোন ধারাই পারম্পর্য্যহীন স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠে নি। পারি-পার্শ্বিকতা বাসস্থান আহার স্বভাব ইত্যাদির জন্য অপরিমেয় প্রভাব এক গোষ্ঠির অপর গোষ্ঠির উপর। এক গোষ্ঠির ক্ষমতা-ক্ষতি হ্রাসবৃদ্ধি অন্যকে এরূপ প্রভাবিত করে যে, অনেক সময় ওরা একই গোষ্ঠি সম্ভূত মনে হয়, অথচ একের সহিত অপরের প্রভেদ হয়ত দুস্তর।

ইওসিন প্রযুগের শেষ পাদে ভূপৃষ্ঠে তৃণদলের আগমন, অলিগোসিন ও পরবর্ত্তীকালে অপর উদ্ভিদকুলের সঙ্গে এদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ। কালক্রমে পৃথিবীময় ঘাসেদের আধিপত্য, উপত্যকা অধিত্যকা মালভূমি পর্ব্বতগাত্র সর্ব্বস্থলে জাঁকিয়ে বসেছে, কেবল পারে নি মরুভূমি ও তুষারাঞ্চলে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত পরিবেশে কীটেরা প্রথম নীড় রচনা করে থাকতে লাগল, তৃণাঙ্কুর ও বীজ খাদ্য হিসাবে সহজলভ্য বলে। কীটগোষ্ঠি বেড়ে উঠায় সুবিধা হ'ল পাখীদের নির্ঝঞ্ঝাটে প্রচুর খাদ্য সংস্থান হওয়ায় এদের দ্রুত পরিস্ফূরণ, পক্ষী বিবর্ত্তনে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চার।

ডালপালা-পাতাভোজী স্তন্যপায়ী মহলেও পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ। তৃণচর স্তন্যপায়ীর অভ্যুদয়, বিরাট গণ্ডার ও বেলুচীথেরিয়াম জাতীয় প্রাণী পূর্ব্বে গলা বাড়িয়ে বা মাথা উঁচু করে বৃক্ষপত্র কেটে ছিঁড়ে খেত এখন তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেল, দাঁতের গঠন গেল বদলে, সেই সঙ্গে বদলাল পরিপাক যন্ত্র আর স্বভাব ত বদলাবেই। ঘাস খাওয়া ঘুরে ঘুরে, এক স্থানে অধিক দিন থাকা যায় না—বিচরণশীল ও ভ্রাম্যমান প্রাণীর আবির্ভাব (যথা—অশ্ব, ও মৃগ বিবর্ত্তন), এইবার পরিবর্ত্তন হ'ল দেহ; ভ্রমণশীল জীবেরা স্থূলকায় হয় না, আয়তন হ্রাসপ্রাপ্ত, গতিবৃদ্ধির সঙ্গে পদ কৃশ, এল সহনশক্তি পূর্ব্বেকার অস্থিবর্ম্ম অন্তর্দ্ধান।

পেছিয়ে থাকে নি মাংসাশী, তৃণভোজীদের প্রসারে এদেরও শ্রীবৃদ্ধি। বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ কৌশল পন্থা যেমন একদিকে এদের নানাবিধ অস্ত্র ও তৎপরতামণ্ডিত করে তুলল, অন্যদিকে আবার আক্রান্তরাও নতুন নতুন প্রতিরোধ উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট রইল। উপল-সমাচ্ছন্ন বৃক্ষাকীর্ণ অরণ্যের মায়া পরিত্যাগ করে তৃণভোজীরা পূর্ব্বেই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, এখন এল ক্ষুর। দলগঠন আরম্ভ হয় এই সময়ে, যূথপতি নির্ব্বাচন শত্রুর আক্রমণ পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিরোধকল্পে।

মাংসাশীরা ক্রমান্বয়ে কর্ম্মতৎপর শক্তিমান ও কৌশলী, দ্রুতগতি বিশিষ্ট তৃণচরের পশ্চাদ্ধাবন করে কেউ কেউ দৌড়বাজ। ভারতীয় চিতা পৃথিবীর ভূচরদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, সময় সময় বেগ ঘণ্টায় ৬০ ৭০ মাইল। মৃগ শশকদের পিছনে তাড়া করে দৌড়াতে শিখেছে সন্দেহ নাই। সিংহ গোড়ায় ছিল বনভূমির বাসিন্দা, শিশুশাবকের গায়ে এখনও বনাঞ্চলের বুটিছাপ (চিতার মত) দেখা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় আদি বাসস্থানের কথা, নিরীহ অরণ্যচর এদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে পালিয়ে এল, সিংহও এল পিছু পিছু—সেই অবধি এরা উন্মুক্ত স্থানে থাকে, গায়ের রংও বদলেছে।

আধুনিক কালে আচরণ পরিবর্ত্তন বিজ্ঞানীর কাছে প্রতিভাত সর্ব্বত্র। এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রসৈকতে মাছপেঁকো কৃষ্ণচঞ্চু ও গ্যাল বেশী ছিল না, আজ সংখ্যায় যেমন বেড়েছে তেমনি

পরিবর্ত্তিত হয়েছে স্বভাব। উপকূলবর্ত্তী বাষ্পীয়পোতের চলাচল প্রভূত বৃদ্ধি পাওয়ায় হেরিং প্রভৃতি মাছেরা কূল ছেড়ে পালিয়েছে, সুতরাং ঐ পাখীরা এখন শস্যক্ষেত্রে আলু শালগম তুলে খায়; এদের শত্রু র‍্যাভেন সামুদ্রিক ঈগল ও বাজেরা উধাও, অতএব সংখ্যাবৃদ্ধি। আর্থারটমসন বিবর্ত্তনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। সকলে পরিবেশের অনুগ্রহের উপর নিজেদের সমর্পণ করে না, নিজের মত প্রতিবেশ গঠন করতেও অনেকে জানে। পূর্ব্বে ডাকাতে-কাঁকড়া থাকত জলে-স্থলে, ইদানীং নারকেল গাছে উঠে নারকেল ভেঙে খায়। মেষকে শীতাঞ্চলে স্থানান্তরিত করে দেখা গেছে দেহপশম হয়ে উঠেছে ঘন দীর্ঘ, আবার পরের বংশে লোম আরও দীর্ঘ ও ঘন।*

---

* জীব-জগতে মজ্জাগত আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটে মাঝে মাঝে, পুরাযুগে পরিবেশ তথা বাহ্যিক আচরণ বদলে জীব দেহ বদলেছে বার বার। আহার বিহার পরিবর্ত্তন আধুনিককালে অনেক দেখা যায়।

'প্রাণিজগতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৯ দ্রষ্টব্য।

বাঘের লুকোচুরি—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম দু' টাকা।

লালগোলার রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় শুধুই সুদক্ষ শিকারী নন, তিনি একজন সত্যকার সাহিত্যিক। এমন মণিকাঞ্চন-সংযোগ বড় একটা ঘটে না। আমাদের দেশে শিকারী একেবারে দুর্লভ নয়। প্রকাশের অক্ষমতায় বা অভাবে কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ শিকারীর দুঃসাহসিক কাহিনী ব্যর্থ হইয়া যায়। ধীরেন্দ্রনারায়ণের রাই-ফেলের লক্ষ্য যেমন অব্যর্থ, তেমনি সুপটু হস্তে তিনি লেখনী ধারণ করেন। "বাঘের লুকোচুরি" নয়টি শিকার-কাহিনীর সমষ্টি। প্রথম কাহিনীর নামেই বইয়ের নাম। 'বাঘের পেছনে' শেষের কাহিনী। লুকোচুরি করাই বাঘের স্বভাব। নহিলে ব্যাঘ্র-শিকারে এমন আকর্ষণ থাকিত না। লুকোচুরির পরিচয় সব গল্পেই আছে, তবে শেষের কাহিনীটিতে তাহা বার বার যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময় এবং কৌতুক দুই-ই আছে। অন্য কাহিনীগুলির নাম 'খুদরাহি ব্লকে বাঘ-শিকার', 'পদ্মার ওপারে ব্যাঘ্র-বিক্রম', 'পানের বরজে বাঘ', 'গাছে বাঘ', 'ছাতনায় বাঘ', 'গুলিখোর বাঘ', এবং 'হলদিয়ানির জঙ্গলে'। রচনাভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। মাঝে মাঝে অরণ্যের নিখুঁত বর্ণনা জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেয়। 'নিঝুম নিশুতি রাত—সমস্ত পৃথিবী নিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্ন—শুধু জেগে আছে ঊর্দ্ধে ঐ আকাশের তারা', নিয়ে এই অরণ্যের স্বপ্ন-ছাওয়া রহস্যের মায়াপুরীতে ক্লান্ত, অবসন্ন এক দুর্জ্জয় শিকারী।" অথবা, "সকালে শিশির-ভেজা ঘাসগুলো তখনো টল টল করে, গাছের ডাল থেকে আচমকা শব্দ ক'রে কোন্ এক অজানা পাখী মাথার উপর ডাক দিয়ে যায়—দৈত্যের মত বড় বড় গাছগুলো জঙ্গলের জমাট রহস্যের সাক্ষী হয়ে কতকাল নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।" এই সব বর্ণনা মনকে অরণ্যমায়ায় আচ্ছন্ন করে। কাহিনীগুলি রোমাঞ্চকর। পরিস্থিতির মধ্যে উত্তেজনা থাকিলেও লেখকের স্বাভাবিক কৌতুক-প্রিয়তা এবং রসবোধ কাহিনীগুলিকে আরো উপভোগ্য করিয়াছে। "বাঘের লুকোচুরি" পাঠককে আনন্দদান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ৩·২৫ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। সব চেয়ে ব কথা হইল, ইতিহাস হইয়াও ইহা সাহিত্যের মর্য্যাদা লা করিয়াছে।

একেবারে গোড়ার কথা—বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা হইত সুরু করিয়া যে ক্রম-বিভাগ তিনি করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য যেমন শাক্ত ও শৈব সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, পুরাণ কথা, গৌড়ী বৈষ্ণব, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, গীতসাহিত্য, ইংরেজের আগমে নূতন সংস্কৃতি, গদ্য সাহিত্য, সাময়িক পত্র, কাব্য ও কবিতা, গা নাটক, উপন্যাস, গল্প, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতি।

এ কথা অনস্বীকার্য্য, রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস বাংলার আ কবিরূপে সম্মান নিত। ইহার পূর্ব্বে যে রচনাগুলি প্রকাশ পাইয়া তাহার মূল্য সামান্যই।

আসলে এই প্রথম যুগটি হইল, বাংলার গীতি-কবিতার যুগ প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরেজ আগমনেই বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি মোড় ঘুরিয়াছে।

লেখকের কথাকেই বলি : "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ধারা বুঝতে হলে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সুরু (১৭৫ থেকে স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭) অধ্যায় পর্য্যন্ত, জাতীয় জীবনে এই ধারাবাহিক প্রবাহটা অনুধাবন করা দরকার।"

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে রামপ্রসা পর্য্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে শুধু কবিতা এবং গানের একাধিপত্য গদ্যের চলন ছিল না বলিলেই চলে। প্রকৃত গদ্য তৈরি হ ইংরেজ আমলে। গ্রন্থকারের ভাষাতেই বলি : "পাদ্রীরা চে ছিলেন দেশের লোককে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে উন্নত করে নি তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করতে। কিন্তু দেশের চিন্তাধা এ থেকে আপন মুক্তির পথ খুঁজে পেল ....সমাজ ও ধর্ম্মে যুগাজ্জি যে সমস্ত কু-সংস্কার ও কদাচার জমেছিল, তা দূর করায় এবং বাং গদ্যকে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গ তোলায়, 'সম্বাদকৌমুদী', 'প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', প্রভৃতি কাজ করেছে তা অসামান্য। তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শ একসঙ্গে এল সাহিত্য এবং স্বাদেশিকতা। এই সময় থেকে সাহিত্যপত্র এবং সংবাদপত্র আলাদা হয়ে গেল, গোড়াতে ছিল এক।"

দেশপ্রেমকে তখন জাতির মানস-লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবা

আয়োজন চলিতেছে। ইহারই প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব। এই উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাই ছিল সাহিত্য-সৃষ্টির আদি উৎস। ইহার পর হইতে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ হইয়াছে। এদিক দিয়া রাজা রামমোহনের দান সামান্য নহে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "রামমোহন শব্দ-শিল্পী ছিলেন না, যা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা রচনা-রীতিতে একটি শিল্পরূপ দিতে পারলেন।"

কিন্তু সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই বঙ্কিমচন্দ্রই দেখাইলেন সাহিত্যের নূতন রূপ। যে প্রভাব পরবর্তী যুগেও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য, বঙ্কিমচন্দ্র না আসিলে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব সম্ভব হইত না। এই রবীন্দ্রনাথ হইতেই গদ্য সাহিত্য চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও যাঁহারা সাহিত্যকে নূতন পথে মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর নাম সর্বপ্রথম মনে আসে। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইহার পর লেখক আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

যে-অভাব আমরা নিয়ত লক্ষ্য করিতাম, নন্দগোপালবাবু সেই অভাব দূর করিয়াছেন—সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ একটি দর্পণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বিস্তৃত আলোচনা না করিয়াও, এক কথায় বলিব, তাঁহার এই গ্রন্থ অমূল্য। গল্প-লেখক হিসাবে নন্দগোপাল বাবুর খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁহার এই সাহিত্যালোচনা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। তাঁহার কলম বলিষ্ঠ—সংগ্রহও হইয়াছে চমৎকার, এবং অধ্যায়গুলি যে ভাবে ভাগ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

এই গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি আলেখ্য, স্বাক্ষর এবং হস্তলিপি দিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। পরিশিষ্টে তিনি সময়ানুক্রমগুলি দিয়া গ্রন্থখানির মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হউক, এই কামনা করি।

সুরছন্দা—শ্রীজহরলাল বসু। শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

'সুরছন্দা' কবিতার বই। কবি-মহলে লেখক সম্পূর্ণ নবাগত। নূতন হইলেও লেখকের কলম বলিষ্ঠ। কবিতাগুলি স্বচ্ছন্দবিহারী —ভাবের সঙ্গে ছন্দের কোথাও লড়াই নাই। বর্তমান উগ্রপন্থীর যুগে যাহা বিরল। কবিতাগুলি অধিকাংশই সনেট জাতীয় কিন্তু কোথাও কষ্টকল্পিত নয়—স্বতঃস্ফূর্ত। কবি দৃষ্টি-শক্তিহীন। তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন—"অন্ধকারের মধ্যে কত কি দেখি এবং কত স্বর, সুর ও শব্দ শুনিতে পাই। এ সবের বাস্তব জগতে কোথাও অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না।"

এই যে অন্তর্দৃষ্টি—একেকে হারাইয়া অপরকে পাওয়া, এই শক্তিই তাঁহার কবি-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

আকারে ছোট হইলেও বিবিধ ছন্দে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। কবির হাতে পড়িয়া ছন্দগুলি যেন খেলা করিয়াছে। দৃষ্টি হারাইয়া কবি আরও কিছুকাল আনন্দলোকে [illegible] করুন—ইহাই কামনা।

শ্রী[illegible]তম সেন

নারদস্মৃতি—(টীকা [illegible])। সম্পাদক ও অনুবাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। মূল্য—তিন টাকা [illegible] নয়া পয়সা।

মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য—(বঙ্গানুবাদ) প্র[illegible] অধ্যায় ১-৩। অনুবাদক শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ। মূল্য—নয় [illegible]। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পি. সি. লাহিড়ী প্রকাশিত

আমাদের প্রাচীন পণ্ডিত সমাজের মধ্যে জ্ঞানের যে [illegible] ও ব্যাপকতা ছিল আজ তাহা ক্রমশ দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে [illegible] পরম্পরার মধ্য দিয়া সেই জ্ঞানরাশি দেশে দেশে যুগে যুগে [illegible] হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমানে কম। তাই অবিলম্বে এই জ্ঞানভাণ্ডারের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে প্রাচীন পণ্ডিতগণের দ্বারা আধুনিক কালোপযোগী গ্রন্থ রচনা করান ও তাহা প্রকাশের সুবন্দোবস্ত করাই ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন। ফলে আধুনিক বাংলার দুইজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের লেখনী নিঃসৃত দুইখানি গ্রন্থ তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে ইঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ছড়ান রহিয়াছে। তবে সসঙ্কোচে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই নিদর্শনগুলি সর্বত্র যথাযথ সুবিন্যস্ত ও সুপরিবেশিত হইয়াছে মনে হয় না। প্রথম গ্রন্থখানির অনুবাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে অনেক মূল্যবান্ তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহাদের কিছু কিছু (যেমন পাঠান্তর, অতিরিক্ত শ্লোক প্রভৃতি) সংস্কৃত মূল অংশের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। দুই এক স্থলে অন্যত্র প্রাপ্ত এইরূপ পাঠান্তর আকর নির্দেশ না করিয়াই মূলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার প্রকাশিত মূল ও অনুবাদে সমালোচিত বা গৃহীত মূল পাঠের পার্থক্য দেখা যায়।

দুরূহ মেধাতিথি ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রতিপদে অনুবাদক মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তবে কয়জন পাঠকের সমাদর এই পরিশ্রমকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে তাহাই বিচার্য। এই জাতীয় অনুবাদ অপেক্ষা মূল গ্রন্থের বিভিন্নমুখী আলোচনার চাহিদা ও আদর বেশি। একাধিক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পর্কে এইরূপ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সপ্ততীর্থ মহাশয় যদি স্বতন্ত্র ভাবে বা অনুবাদের ভূমিকায় ভাষ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। তাহা হইলে তাহা পাঠকমহলে সাদরে অভিনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই—এ কথা তাঁহাকে সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে হয় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী